প্রবাসী ১৩২৯ কার্ত্তিক—চৈত্র

২২শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়-সূচী

অকাল বন্যা (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৯১
অঙ্ক সহজ করিবার প্রণালী ... ৩৩৮
অঙ্কের কয়েকটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত নিয়ম—শ্রী ব্রহ্মদাস বৈষ্ণব গোস্বামী ... ৬৮
অগ্নি-নিবারক শিক্ষালয় (সচিত্র) ... ৩৯২
অজান্তে (গল্প)—বনফুল ... ৫০৭
অদ্ভুত প্রাকৃতিক খেয়াল (সচিত্র)—শ্রী হরিহর শেঠ ৫৩১
অধস্তন রাজ-ভৃত্যদের ছুটি ... ৭৩৬
অনুবাদের কথা—বীরবল ... ৩৭৩
অন্ধকারে দাড়ী কামানো (সচিত্র) ... ৩৯২
অভিনয় দ্বারা ইতিহাস শিক্ষা (সচিত্র) ... ৬৩১
অভিনয়ে অভিনব আকাশ-দৃশ্যপট (সচিত্র) ... ৫৪০
অমিতা (গল্প)—শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ২৩২
অম্বিকাচরণ মজুমদার (সচিত্র) ... ৫৮৪
অলকা (গল্প)—শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু ... ৪০১
অলীক (কবিতা)—শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ... ৩৯১
অশান্ত (কবিতা)—শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা ... ৩৯৬
অষ্ট্রেলিয়ার নারী (সচিত্র)—শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৪৮৬
"অস্পৃশ্যতা" ... ২৮৭
অসহযোগ আন্দোলনের ফল ... ৪৩৭
অসহযোগ-প্রচেষ্টার অবস্থা ... ৭৪০
অহিংসা ও কামাল-পাশার জয়ে উল্লাস ... ১২৯
আইন লঙ্ঘনের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল... ২৮৫
আগুন-জ্বালা ঘড়ি (সচিত্র) ... ২২৫
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ... ৪৪২
আত্মা কি ?—শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি ... ১, ২০৪
আত্মপর—বনফুল ... ৩৪১
আদিম কালের শাক-সবজী—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৬৩৩
আদেশের প্রতিবাদ—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮২
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি—শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়, বি-এ (ক্যাণ্টাব) ... ৫০৮
আফগান আমীরের গোহত্যা-নিষেধ—আমজাদ... ৩৩৯
আফগান আমীরের গোহত্যা-নিষেধ ঘোষণায় সন্দেহ—শ্রী আব্বাস সোবহান ... ৫২৮
আফগানিস্থান (সচিত্র)—মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী ... ৬৯২
আবেস্তা-সাহিত্যে "দণ্ডনীতি (কষ্টি)—শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১১৩
আমেরিকান নারীর কর্ম্মক্ষেত্র—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৪
আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের আঁকা ছবি (সচিত্র)—শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ৩৯৬
আলেয়া (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৫৩
আলো—শ্রী চারুভূষণ চৌধুরী ... ৬১১
আলোকিত বায়স্কোপ (সচিত্র) ... ৫৩৮
আলোচনা ৮৭, ২৯৭, ৩১৫, ৫২৮, ৬৬৫, ৭৮৮
আসন্ন সন্ধ্যা (কবিতা)—শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার ২০৯
আহ্বান (কবিতা)—শ্রী অশ্বিনীকুমার ঘোষ, এম-এ, বি-এল ... ৮০৯
ইউরোপের নয়া স্বরাজ—শ্রী বিনয়কুমার সরকার, এম-এ ... ৮৭৮
ইজিপ্টের নারীশক্তি—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৭৮
ইতর প্রাণীর ষষ্ঠেন্দ্রিয়—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৩০
ইম্পীরিয়াল রেকর্ড্‌স ... ৭৪০
ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী ... ৭৩৯
ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন (সচিত্র) ... ৬২৯
ইংরেজ শ্রমজীবী ও ভারতবর্ষ—শ্রী ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ... ১৬১
ইংলণ্ড্ কপট না সবল, সৎ না অসৎ ? ... ১৩০
উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন ... ২৮৩
উভর্চর গাড়ী (সচিত্র) ... ৭৭৪
ঋগ্বেদ-বর্ণিত আর্য্যনারীর অবস্থা (কষ্টি)—শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাস, পি-এইচ্-ডি ... ১০২
ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনার কালে আর্য্যগণের সমুদ্র, বিন্ধ্য-পর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল কি না—শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, পি-এইচ-ডি... ৩৪৯
একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য—শ্রী সিদ্ধেশ্বর নন্দী ... ৮৯
"একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যের মীমাংসা"—শ্রী অনিলকুমার দাস, শ্রী সুধীরমোহন মণ্ডল, শ্রী রমাপতি গুপ্ত, শ্রী হরিদাস ভট্টাচার্য, এম-এ ... ৩৩৫

একতা ও স্বাস্থ্য ... ৫৭৭
১০৫ ফুট উচ্চ দেবদারু-বৃক্ষ ... ৩৯৬
এরোমোবাইল (সচিত্র) ... ৩৯৬
এ বৎসর সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার—শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র ... ৮১৫
কবি-গাথা (কবিতা)—শ্রী মোহিতলাল মজুমদার ... ৭৮০
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিরক্ষা ... ১৩৩
কবীর—শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ ... ৭৪১
কবীরের প্রেমসাধনা (কষ্টি)—শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ ৪৭৫, ৬২৩
কবে ? (কবিতা)—বেতাল ভট্ট ... ৫১৯
"ক্যাপিটুলেশন্স" ... ২৮৩
কয়েদী (কবিতা)—শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় ... ৫৪৭
কর্ত্তব্য-পুস্তক (কষ্টি)—শ্রী সুন্দরী মোহন দাস ... ৩৬২
ক্রমবিকাশ ও আকস্মিক বিকাশ (কষ্টি)—শ্রী বিমল-চন্দ্র ঘোষ ... ৩৬২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় দুটি বিল ... ৭৩৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশের হার ... ১৩১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওকালতী ... ৮৭৩
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ... ২৮৯
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা (সচিত্র) ... ৪৪৩
কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যয়-সংক্ষেপ ... ৪৩৬
কলিকাতার কথা (কষ্টি)—রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর ১০৩, ৩৫৫, ৪৭৯, ৭৮২
কষ্টিপাথর— ১০০, ১৮২, ৩৫২, ৪৭৫, ৬২৩, ৭৮০
কংক্রিটের তৈরী "পরী-আবাস" (সচিত্র) ... ৫৪১
কংক্রিটের তৈরী বাড়ী (সচিত্র) ... ৬২৯
কংগ্রেসের মতভেদের কথা ... ৫৭৬
কান্তকবি রজনীকান্ত—শ্রী রাধাচরণ দাস ... ৬৩৫
কান্তকবির জন্ম-স্থান—শ্রী রাধাচরণ দাস ... ৮৭
কামাল পাশার ঘোষণা—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৩
কালী বৃষ্টি—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২৩০
কি কি গুণ দেখিয়া বিবাহ করা উচিত—শ্রী সুষমা সিংহ ... ৫৪৪
কিশোরীলাল গোস্বামী (সচিত্র) ... ৫৮৪
কুকুর ধাত্রী (সচিত্র) ... ২২৫
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয় (কষ্টি) ... ৬২৭
কুড়ানো মাণিক (কবিতা)—গোলাম মোস্তফা ... ২৪৯
কুষ্ঠরোগ বৃদ্ধি ... ৪৩৩
কুসুম ও কীট—শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ... ৫৭১
কোকিল রাণী (গল্প)—শ্রী কাপলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ... ৮২
কোন্ সে দেবতা ? (কবিতা)—শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ... ৮৪৮
কোল জাতি (কষ্টি)—শ্রী কামিনীমোহন দাস ... ১৮৪
কৌন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে মুসলমান মত ... ২৯৩
খাদ্য, বস্ত্র ও কর্মগৃহ ... ১১৬
খিলাফৎ ও সুলতান ... ২৮৩
খুএন—রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ ... ৩৬৫
খেলা (কবিতা, কষ্টি)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১০৭
খোকার পুলক (কবিতা)—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৭৮৭
গণিকাদের দ্বারা সৎকার্য্য করান ... ৪২৭
গণিকাদের দ্বারা সৎকর্ম্ম করান—শ্রী মন্মথমোহন দাস ... ৫২৯
গত মহাযুদ্ধে প্রথম ফরাসী নিহত ব্যক্তি (সচিত্র)... ৩৯৫
গতিবেগ ও ধ্বনিতরঙ্গের ছবি (সচিত্র) ... ২২২
গম্ভীরা উৎসব (কষ্টি)—শ্রী বলরাম যোয়ারদার ... ৩৫২
গয়া কংগ্রেসে দুটি অভিভাষণ ... ৫৭৯
গরিলার কথা (সচিত্র) ... ৩৯১
গাছ-শিকারী—শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৬৩৩
গাছের কাণ্ড—শ্রী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যার্ণব, এম-এস্‌সি ... ৮৪৬
গান (কষ্টি)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৬, ১০৮, ১৮২, ৭৮০
গির্জ্জা-গাড়ী (সচিত্র) ... ৩৯৪
গুরুকা-বাগে আহতদের তালিকা ... ২৯৪
গৃহে প্রস্তুত কালী (কষ্টি) ... ৬২৬
গোয়া ও সারস্বত ব্রাহ্মণ (সচিত্র)—শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ... ৩১৬
গোরের পরে ফুল (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৬২৭
গোষ্ঠী-বিহারে দেশসেবা (কষ্টি)—শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ৩৬২
গ্রহগণের নামানুসারে বার—শ্রী সুধাংশুভূষণ পুরকাইত ... ৩৩৮
গ্রাম ও নগর ... ৪২৪
ঘরে বসিয়া ব্যবসা (কষ্টি) ... ৬২৭
ঘুঘু পাখীর কথা—শ্রী সরলা দেবী ... ৬৯৯
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—শ্রী বীরেশ্বর বাগচী ... ৭৭৩
ঘোড়াটানা গাড়ী (সচিত্র)—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২২৯
চক্রারূঢ় অন্ধকূপ ও চৌরীচৌরা ... ৬৮৪
চতুর্ম্মুখ আম (সচিত্র)—প্রিয়ম্বদা ... ২২৫
চতুরাশ্রমের প্রাচীনত্ব (কষ্টি)—শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি এল, পি-আর-এস ... ৬৫৯
চরকায় সুতা শক্ত করিবার উপায়—শ্রী লোকেন্দ্রনাথ গুহ, বি-এ ... ১৫

চরিতার্থতা (কবিতা)—শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা ... ৬৩২
চার্ব্বাক দর্শন (কষ্টি)—শ্রী প্রিয়গোবিন্দ দত্ত ... ৩৫৩
চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ ... ২৮৪
চিত্তরঞ্জনের কাশ্মীর হইতে বহিষ্কার ... ১২২
চিত্রকরের খেয়াল (সচিত্র)—শ্রী হরিহর শেঠ ... ৫৩২
চিত্র-পরিচয়—শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ও শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ৩০০,৮৭৭
চিত্রলক্ষণ (কষ্টি)—অধ্যাপক শ্রী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম-এ ... ৭৮২
চিরস্থায়ী মোমবাতি (সচিত্র) ... ৭৭৪
চীনের নারী সমস্যা—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৩
চীনের বালিকা-বিদ্যালয়—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮১
চুম্বকের জোর (সচিত্র) ... ৭৭৭
চুলের তৈরী ছবি (সচিত্র) ... ৬৩২
চৈত্রের বর্ষণ (কবিতা)—শ্রী সুনীলচন্দ্র সরকার ... ৮২৭
চোখের ভাষা (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৫২৭
চোর-মারা শিক্ষা ... ৫৪০
চাঁদের আলো (কবিতা)—শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ১৯৭
ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ—শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন ... ৮১০
ছয় মাইল লম্বা বারান্দাওয়ালা বাড়ী—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২৩১
ছেলেদের পাততাড়ি ৮২, ৩৯৭, ৫৩১, ৬৫০
জগতের দুইটি বৃহত্তম ঘড়ি—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২৩০
জনতার ভীরুতা ... ২৯৫
জমানো কেরোসিন ... ২২৬
জর্ম্মান্ মার্কের দুরবস্থা—শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়, বি-এ (ক্যান্টাব্) ... ২৪৪
[illegible] (উপন্যাস)—শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৭, ১৯৮, ৩০৯, ৫০৩, ৬৬৯, ৭৮৯
জলপ্লাবন ও গভর্নমেণ্ট ... ২৯৩
জলপ্লাবনে বিপর্য্যস্তদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা ... ১৩৩
জাগৃহি (কবিতা)—শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় ... ৩৭৮
জাতীয় উন্নতির উপায় (কষ্টি)—শ্রী মেঘনাদ সাহা ৩৬৫
জাতীয় মহাসমিতি ও অন্যান্য সভা ... ৫৭৭
জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কার্য্য ... ৮৭৫
জাতীয় সমস্যা—শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ১৫৫
জীবদেহে প্রকৃতির খেয়াল (সচিত্র)—শ্রী হরিহর শেঠ ... ৩২৭
জুতা-বুরুশ-করা কল (সচিত্র) ... ৭৭৮
জ্যাকি কুগানের বাহাদুরী (সচিত্র) ... ৭৭৯
জ্যামিতিক চিত্র দিয়া ছবি-আঁকা (সচিত্র)—শ্রী হরিহর শেঠ ... ১৯২
ঝঞ্ঝা-ধ্রুপদ (কবিতা)—শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় ... ৩৫
টেলিফোনের কথা (সচিত্র) ... ৭৭৫
ডাকটিকিটের ইতিহাস (সচিত্র)—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২২৭
ডাকাইত ও গ্রামবাসী ... ২৮৩
ডাক্তারী শিক্ষায় আফগান রমণী—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৩
ঢাকার প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ... ৪৪১
তারহীন টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ... ১২৭
তারা (কষ্টি)—শ্রী বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ... ৩৬৪
তেল-জলের সম্বন্ধে—শ্রী অনিলকুমার দাস, বি-এস-সি ... ৮৯
তোষলা বা তুষু পূজা—শ্রী রাধারমণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার ৬২৮, ৭৮৮
দিনের পরিমাণ—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২৩০
দু'জন-বওয়া মোটর বাইক (সচিত্র) ... ৩৯২
দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ (সচিত্র) ... ২২৩
দুঃখ সুখ (কবিতা)—শ্রী নীহারিকা দেবী ... ৫৪৬
দেবতত্ত্ব (কষ্টি)—শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ৩৬৩
দেশ-বিদেশের কথা ১৩৪, ২৫৫, ৪০৮, ৫৪৯, ৭০৪, ৮২৮
দেশী রাজাদের রক্ষণার্থ আইন ... ১২২
দোদুল দুল (কবিতা)—কাজী নজরুল ইসলাম ... ৮৬৩
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৩২
দাঁতের উপর দাঁড়ানো ... ২২৭
ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সদ্ভাব ... ২৮৮
ধীরে (কবিতা)—শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা ... ২২১
ধূমপান পাইপ সাইকেল (সচিত্র) ... [illegible]৯৪
ধূলিভক্ষক গাড়ী (সচিত্র) ... ৬২৯
নখের বৃদ্ধি—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৬৭৩
নবযুগের কবি (গল্প)—শ্রী প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ... ৫৩৭
নারীদের কর্ম্মক্ষেত্র—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮২
নারীদের পথ—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮২
নারী-প্রগতি ৯৮, ২১৫, ৫৪৬
নারী-যোগ্য ব্যবসা—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮০
নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অস্বীকার—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৩
নারী-সাধনা (কষ্টি) ... ৩৫৮
নিউজিল্যাণ্ডে নূতন বিল—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৩
"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে" ... ২৯৫
নিগ্রো মুষ্টি-যোদ্ধা ... ২৮২
নির্ব্বাণ কি ?—শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি ৩০১
"নিরেস উপাধির কদর্য্য কারখানা" ... ৪৪০

বিষয়-সূচী

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (গল্প)—শ্রী লীলা দেবী ... ৮১৭
নিঃশব্দতা-উৎপাদকদের কৃত কাজ ... ৭৩১
নূতন দেবী মাহাত্ম্য (কষ্টি)—শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ ... ১০৭
পউষ (কবিতা)—কাজি নজরুল ইসলাম ... ৫৩০
পঙ্গু-গাছের আলো—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ২৯৭
পঞ্চশস্য (সচিত্র) ২২২, ৩৯১, ৫৩৮, ৬২৯, ৭৭২
পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার পাদুকা—শ্রী প্রভাকর দাস, বি এ ... ৬৩২
পথ-হারা (কবিতা)—কাজি নজরুল ইসলাম ... ৬৭৭
পথে টেলিফোন ... ২২৩
পদমর্য্যাদাবোধের খাদ্য—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২৩০
পত্র-চিত্ত—শ্রী বীরেশ্বর বাগচী ... ২৩১
পরমাণু-জগতে পরিবর্ত্তন সাধন ... ৫৩৯
পরমাণু-জগতের আধুনিক পরিকল্পনা—শ্রী ক্ষেত্রমোহন বসু, এম-এস সি ... ৯০
পল্লী-হারা—শ্রী সুরেশচন্দ্র রায় ... ৩৫
পার্কা সাঁতারী (সচিত্র) ... ২২৩
পাখীদের প্রসাধন-কার্য্য—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৬৩৩
পাতিয়ালার বাঙ্গালী (সচিত্র)—শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ... ১৬৫
পাথরের নুড়ির তৈরী গির্জ্জা (সচিত্র) ... ২২৩
পা-বাজনা (সচিত্র) ... ৭৭৫
পায়ের জোর (সচিত্র) ... ২২৩
পারাপারের ঢেউ ২৩৮, ৮১৫
পাল্কী চলে রে (কবিতা)—শ্রী গোলাম মোস্তফা ৩৯৯
পাঁচজন-চাপা গাড়ী ... ৩৯২
পুলিসের বুকে পিঠে লাল বাতি (সচিত্র) ... ৭৭৭
পুস্তক-পরিচয়—শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য; শ্রী যদুনাথ সরকার, এম-এ, পি আর এস ; শ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ ; শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি ; মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি ১৭৯, ৪৫২, ৪৮২, ৭৯৪
পৃথিবীর ছয়জন মহত্তম মানুষ ... ১২৯
পৃথিবীর প্রতি (কবিতা)—শ্রী সুনীতি দেবী ... ৪০৭
পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে মোটা (সচিত্র) ... ৫৩৯
পেটুকদাসের স্বপ্ন (কবিতা)—শ্রী সুনির্ম্মল বসু ... ৮৪
প্যান্-ইস্‌লামিজ্‌ম্ ও ভারতের মুসলমান—মোহম্মদ আহবাব চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ, বি-এ ... ৫২৮
প্রথম আলোর চরণধ্বনি (কবিতা)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৯৭
প্রথম বাংলা অভিধান (কষ্টি)—শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ৪৮১
প্রকৃতির খেয়াল (সচিত্র) ... ২৩১
প্রকৃতির পাঠশালা ... ৮৫
ফুলে মধু হয় কেন ?—শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি ... ৩৯৮
ফুলের গন্ধ—শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ... ৬৫৬
ফুলের বর্ণ—শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ... ৩৯৭
ফুলের মধু—শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ... ৮৪৭
বগধ জাতি—শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ... ১৪৬
বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব (কষ্টি)—মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই ... ৭৮১
বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশ বার্ষিক উৎসব ... ৪২১
বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী—শ্রী যদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস ... ৬৬৩
বঙ্গের অন্তঃপুর-শিল্প—শ্রী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬৮৫
বঙ্গের উপর ঘোরতর জুলুম ... ৭৪০
বঙ্গের দুঃখ ... ১১৯
বঙ্গের স্বাধীন শিক্ষানিকেতন ... ৫৮২
বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ—শ্রী উপেন্দ্রনাথ মজুমদার ৫২৮
বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ (কষ্টি)—শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল ৩৬১
বয়-স্কাউটদের কৃতিত্ব (সচিত্র) ... ৭৭৯
বরপণ ও কন্যার স্ত্রীধন ... ৪৩২
বরফকে নূতন কাজে লাগানো (সচিত্র) ... ৭৭৭
বলদটানা নৌকা (সচিত্র) ... ৭৭৮
বর্ষা-সন্ধ্যায় (কবিতা)—শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪
বসন্ত (কবিতা)—শ্রী শিবরাম চক্রবর্ত্তী ... ৭৭২
বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক সভা (সচিত্র) ... ৪৩৮
বহুকালস্থায়ী শব্দের রেকর্ড ... ৫৪২
বাঙলার "প্রথম" (কষ্টি)—শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩৫৯
বাঙালী রাসায়নিক ... ২২৫
বাঙ্গালা ভাষা—শ্রী বীরেশ্বর সেন ও শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ ... ৪৫
"বাঙ্গালী কি ঘরকুনো ?"—শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৯৮
বাঙ্গালী বীর ভীম ভবানী (সচিত্র) ... ২৪০
বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয় (কষ্টি)—শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... ১১০
বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস (কষ্টি)—শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ... ৪৭৭
বাড়্‌তি মাশুল—"বনফুল" ... ১৬৯
বাণিজ্য-শিক্ষা—শ্রী ভুঁজারসী ধর্ম্মসী ... ৮৪৯
বাণিজ্যিক লাইব্রেরী ... ৭৪০
বোবা বৈদ্যনাথ (গল্প)—শ্রী জলধর চট্টোপাধ্যায় ... ৩০১

বায়ুচালিত কলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন (সচিত্র) ... ৫৪০
বারদোলীর প্রস্তাবসমূহ ... ১৩২
বাংলা ছন্দ—শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন ... ৩০৩
বাংলাদেশের বালিকাদিগের নিম্নশিক্ষা—শ্রী মণীন্দ্রনাথ রায়, এম-এ ... ৯২
বাংলায় দুর্গোৎসব (কষ্টি) ... ১০৬
বাংলার ব্যয়সংক্ষেপ-কমিটির রিপোর্ট ... ৭৩৩
বাংলা—সেবক ১৩৯,২৫৯,৪১২,৫৬৩,৭০৭,৮১৯
বিদেশ—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ও শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি এল ১৩৪,২৫৫,৪১৯,৫৭২,৭০৪,৮২৮
বিদ্যুতের শক্তি (সচিত্র) ... ৬২৯
বিবিধ প্রসঙ্গ ১১৬,২৮২,৪২৬,৫৭৫,৭:৩,৮৬৫
বিরহী-বিশ্ব (কবিতা)—শ্রী নরেন্দ্র দেব ... ৮১৬
৯২ ফুট লম্বা রলা (সচিত্র) ... ৭৭৪
বিলাতী পণ্য বর্জ্জন ... ৫৮৭
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অর্থভেদ ... ৪৪৮
বিহারের ও গয়ার মাহাত্ম্য ... ৫৭৮
বীজ নির্ব্বাচনে ফসলের উন্নতি—শ্রী রামজীবন গুছাইত ... ১৭০
বীজের তৈরী থলে (সচিত্র)—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২২৯
বীণা-গাছের বিচিত্র শ্বাসযন্ত্র (সচিত্র)—পিয়েমডি ২২৫
বুকের ভাষা – শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৩৭০
বুদ্ধদেব (কবিতা)—শ্রী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৪৭
বেতারে সংবাদ প্রেরণের উচ্চমঞ্চ ... ৫৪০
বেতালের বৈঠক ৭৮,২৫০,৩৮১,৫২০,৬৫৭,৭৮৩
বেলুনের সাহায্যে উদ্ধার (সচিত্র) ... ৫৪২
বেশী সুদে সরকারী ঋণের আধিক্যের আর-এক কুফল ... ৮৭১
বেহালার পল্লীসংস্কার-সমস্যা—শ্রী মোহিতমোহন মুখোপাধ্যায় ... ৩৩৭
বৈদিক বিমান—শ্রী বিনোদবিহারী রায় ... ৬২০
বোম্বাই কর্পোরেশনে মহিলা সদস্য—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৩
ব্যবসা ও বিজ্ঞাপন ... ২৮২
ব্যবস্থাপক সভায় নারীদের অধিকার—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৪
ব্যয়সংক্ষেপ-কমিটির আশ্বাসবাক্য ... ৭৩৬
ব্যয়সংক্ষেপ-কমিটির কুনীতি ... ৭৩৪
ব্যয়-সংক্ষেপ-কমিটি-সমূহ ... ৮৬৫
ব্যয়সংক্ষেপের দৃষ্টান্ত ... ১৩২
ব্যয়-হ্রাস ও আয়-বৃদ্ধির উপায় ... ৮৬১
ব্যাবিলনের পথে (সচিত্র)—শ্রী বিজয়কুমার ভৌমিক ... ৮২১
ব্যারিষ্টার ও উকিল ... ৫৩৭
ব্রহ্ম—শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি ... ৪৫৩
ব্রহ্মবাদের সূচনা—শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি ৫৯৮
ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম (কষ্টি)—শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল ... ১০৯
ব্রিটিশ কূটনীতির পরাজয় ... ১২৮
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজা ... ১২৩
ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী—শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৬৩৩
ভবিষ্যৎ সরকারী ঋণ অস্বীকার ... ৫৮৭
ভাই-ফোঁটা (গল্প)—শ্রী প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৬
ভাগ্যহত (গল্প)—শ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৭৯৬
ভারত-চিত্রচর্চ্চা (কষ্টি)—শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়... ১০০
ভারতবর্ষ—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ১৭৬,২৭৫,৪০৮,৫৪৯,৭১১,৮৩২
ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণা ... ১৩০
ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণা—শ্রী জগজ্জ্যোতি পাল ... ২৯৭
ভারতীয় মহিলা ব্যারিষ্টার—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়... ৬৮৫
ভারতীয় মুসলমানগণ ও কমালের বল ... ২৯৩
ভারতের ধ্বংসোন্মুখ গোধন—শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ ... ৮৬১
ভাষাতত্ত্ব—শ্রী শ্রীনাথ সেন, শ্রীরাধাচরণ দাস ২৯৯,৮৩৯
ভাসমান সাঁতারী পোষাক (সচিত্র) ... ৩৯৪
ভিন্ দেশের খেলার সাথী (গল্প)—শ্রী কাত্যায়নী দেবী ... ৬৫০
ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষা ও সরকারী সাহায্য ... ৪৩৬
ভূ-পর্য্যটক (কবিতা)—শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৫৯৫
ভ্রম সংশোধন ... ২৯৬
মৎস্যাকৃতি জলযান (সচিত্র) ... ২২৩
মৎস্য-ব্যবসায়ের বিদ্যালয় ... ৪২৯
মনসাতত্ত্ব (কষ্টি)—শ্রী গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ... ১০৭
মন্ত্রীদের ও শাসন-পরিষদের সভ্যদের বেতন ... ৩৩৯
মহাভারতের বিবর্ত্ত—শ্রী লোকেন্দ্র নাথ গুহ, বি-এ ৫৮৮
মহিলা-প্রগতি—শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ৩৭৯
মহিলা-বৃত্তি – শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮৪
মহিলা মজলিস্ ৯২,২১০,৩৭৮,৫৪৪,৬৬৭
মহিলা-যোগ্য শ্রমশিল্প ... ৫৪৫
মহিলার সাহস ... ১৩১
মাঘ-শেষের দুপুর (কবিতা) – শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ৬২২
মাছধরা বাতি (সচিত্র) ... ৭৭৮

মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বতের নারী (সচিত্র) —শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ... ২১০
মাটির উপর দস্যুবৃত্তি (কষ্টি)—শ্রী এল কে এলম্‌হার্ষ্ট ১৮২
মাণিকজোড় (কবিতা)—শ্রী গিরিজাকুমার বসু ও কাজি নজরুল ইসলাম ... ৩৫১
মাতৃপূজা (কষ্টি) ... ১০৬
মাধুরী (গল্প)—শ্রী অমিয়া চৌধুরী ... ৪৬৪
মিউনিসিপ্যালিটিতে নারী সদস্য—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ... ৬৮২
মিনিটে ৪ মাইল ... ৫৪০
মুক্তামালার নাচ (সচিত্র) ... ৬৩০
মুক্তি-বাঁধন (কবিতা)—শ্রী হৃষীকেশ চৌধুরী ... ৩১৫
মুদ্রারাক্ষসের ভ্রমসংশোধন—রায় বাহাদুর শ্রী যতীন্দ্র-মোহন সিংহ বি-এ ... ৯০
মেক্সিকোর বিশালকায় গুহা ... ৫৪১
মেষ-শাবকের গোমাতা (সচিত্র) ... ৩৯৫
মোক্তারী পরীক্ষা ... ২৩২
মোগল দরবারে জৈনাচার্য্য সাধু (সচিত্র)—অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল, এম-এ ... ৮৫৩
মোটরগাড়ীর লম্ফ (সচিত্র) ... ৬৩১
মোহমুদ্গর (কবিতা)—শ্রী মোহিতলাল মজুমদার ৬১৯
মজের জীবন (সচিত্র) ... ২২৬
...-বিভাগের ব্যয় ও রেলওয়ের ব্যয় ... ১২৫
...বিরাম-পত্র স্বাক্ষরের স্মৃতিস্থান (সচিত্র) ... ৭৭৮
...গি-জাতি—শ্রী অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ... ৭৫৭
...বনের সাধন (কষ্টি)—শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল ... ৪৭৭
...ন্দ্রনাথ (কবিতা)—শ্রী গোলাম মোস্তাফা ... ৭২৩
...ক্ষা (উপন্যাস)—শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু ... ৪৬,১৭২,৩৪২,৫১২,৬৬৬,৮০০
...জ একাডেমির নারী সদস্য—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় ৬৮৩
...স্মৃতিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল—শ্রী যামিনীকান্ত সেন, বি-এল ... ৭
...জা রামমোহন রায় ও বঙ্গসাহিত্য—শ্রী শিবরতন মিত্র ... ৪৬৬,৬০৪
...নারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উন্মেষ (কষ্টি) —শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল ... ১৮৭
...পুতানার কথা—৺ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৭১
...শক্তি ও ধর্মগুরুর শক্তি ... ২৯৩
...শক্তির কর্ত্তব্য ... ৭২৪
...শক্তির প্রধান কর্ত্তব্য কি? ... ৭২৬
...য়ণীয় যুগের কৃষিসম্পদ (কষ্টি)—শ্রী কেদার-নাথ মজুমদার ৬২৬
...রাধাচরণ পাল বাহাদুর ৪৪৮
রাষ্ট্রদীক্ষা (কষ্টি) ... ৬৫৭
রাসায়নিক গবেষণা—শ্রী সুবোধকুমার মজুমদার ও শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৪০
রাস্তা-বুরুশ গাড়ী (সচিত্র) ... ৩৯৫
রূপকথা—অধ্যাপক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ৮৮০
রেজিং রিপোর্ট (গল্প)—শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায় ৭১৮
'রেনি ডে' (গল্প)—শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বসু ... ৭৭২
রেলে যাতায়াত ... ৪৩৪
রেলওয়ে চীফ কমিশনার নিয়োগ ... ১২২
লক্ষহীরা (গল্প)—শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৫৮
লতাপাতার দ্বারা কাপড় রংকরা (কষ্টি) ... ৬২৭
লবণের মাশুল বৃদ্ধি ... ৯৩২
লণ্ডনের মহৎ কার্য্য ... ২৯৪
লাজুক নারী (কবিতা)—শ্রী সুনির্ম্মল বসু ... ৫৪৪
লিঙ্গপুরাণে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার ... ৩৩৯
লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণ ... ৭২৯
লোকসংখ্যা হ্রাসের প্রধানতম কারণ কি? ... ৭২৯
শরাক জাতি—শ্রী রমেশ বসু, এম-এ ... ৫৫
শাক্তের গান (কবিতা)—শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় ... ৮৬০
"শান্তি ও শৃঙ্খলা" ... ৮৭৬
"শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষার মূল্য ... ৭২৮
শাস্ত্রে ভাই-দ্বিতীয়া—শ্রী রবিকিঙ্কর বটব্যাল ... ৮৯
শিক্ষকদের শিক্ষা ... ৭৩৩
শিক্ষাপরিদর্শক কর্ম্মচারী ... ৭৩৪
শিক্ষার ওজুহাতে অপব্যয় ... ১২৭
শিক্ষার ও পুলিশের ব্যয় সংক্ষেপ ... ৭৩৫
শিল্প ও দেহতত্ত্ব (কষ্টি)—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি-লিট্ ... ৩৫৯
শিশুদের নামকরণ-প্রথা (সচিত্র)—শ্রী হরিহর শেঠ ১৯৩
শূকর বলি (কষ্টি)—শ্রী গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ... ৩৬৪
শের (কবিতা)—শ্রী যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ... ৮৩৮
শেরপুর মুর্চা ও করতোয়া—শ্রী হরগোপাল দাস কুণ্ডু ৮৭
শেলি (কষ্টি)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১০৪
শোধনাগার (সচিত্র)—শ্রী উইলিয়াম উইন্‌ষ্ট্যান্‌লী পীয়ার্সন, এম-এ, বি-এসসি ... ৩৭
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ভ্রমসংশোধন—শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ... ৯০
শ্রীশ্রীদুর্গা (কষ্টি) ... ১০৬
সঙ্গীতে সরস্বস্তি বা হার্ম্মনি—অধ্যাপক শ্রী পঞ্চানন দাস, এম-এসসি ... ৭৬৪
১৭ ফুট লম্বা গোঁফ (সচিত্র) ... ৫৩৮
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র) ... ৫৮৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম-তারিখ—শ্রী সুধীরকুমার মিত্র ৬৩৫

সন্ধ্যারাণী (কবিতা)—শ্রী গোলাম মোস্তফা, বি-এ, বি-টি ... ৭৮৮
সবচেয়ে ছোট বন্দুক (সচিত্র) ... ৫৪১
সবচেয়ে বড় গোলা (সচিত্র) ... ৫৪১
সবচেয়ে বড় মুরগির-ডিম (সচিত্র) ... ৭৭৮
সমাজ-সংস্কারে দল-বিভাগ ... ৫৭৭
সম্মতির বয়স আইন ... ১২৬
সরকারী আয়ব্যয় ... ৮৬৫
সরকারী ইস্কুল সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ... ৭৩৩
সরকারী কলেজ সম্বন্ধে প্রস্তাব ... ৭৩৪
সরকারী দানের সর্ত্ত ... ৪৪৬
সহধর্ম্মিণী (কবিতা, কষ্টি)—শ্রী কালিদাস রায়, বি-এ ... ১০৯
সহরের কল ইত্যাদির ধূমে কি ক্ষতি হয় (সচিত্র) ৫৪২
সহরের পরগাছা ... ৪২৬
সাগরিকা (গল্প)—শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু ... ২৫
সামরিক বিভাগের গোশালা ... ১২৬
সামাজিক কলুষ ... ৭৪০
সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা (কষ্টি)—শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৩৬৩
সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র (কষ্টি) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল ... ৪৭৯
সিন্ধু-সাধ (কবিতা)—শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ ... ৬৪৯
সীন্ ফীন্ আন্দোলন ও আয়ার্ল্যাণ্ড—শ্রীনরেশচন্দ্র রায় ... ২৩৮
সূচীশিল্পে জীবন্ত ভল্লুক (সচিত্র) ... ৬৩০
সূর্য্য-পূজা (কষ্টি)—শ্রী সাতকড়ি অধিকারী, এম-এ ... ১০৬
সৃষ্টিবন্দনা (কবিতা)—শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ... ৮৪৭
সেয়ানে সেয়ানে (গল্প)—শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৫৩৫
সোক্রাটীস (সমালোচনা)—শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি লিট্ ... ৬৪৬
সৌন্দর্য্যের সন্ধান (কষ্টি)—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি-লিট্ ... ১৮৫
সৌন্দরনন্দ কাব্য (সমালোচনা)—শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী ... ৭৪
স্ফিঙ্কসের গল্প—গুপ্ত ... ৩৯৯
স্বপ্ন (কষ্টি)—শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস্‌সি ... ৪৮১
স্বরবৃত্ত ছন্দ—শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন ... ৪৯৬
স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব—শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন ... ৬১৩
স্বরাজ লাভের উপায় ... ৫৮২
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কারাদণ্ড ... ১২৬
স্মৃতি ও আশা (কবিতা)—বনফুল ... ৪৫১
স্মৃতিশক্তির বাহাদুরী—শ্রী বীরেশ্বর বাগ্‌চী ... ৭৭৩
সংঘবাদ ও শিরগুজা ষ্টেট্ (কষ্টি) ... ৬২৫
সংশোধনী ... ৮১৪
সিঁদেল চোরের আত্মকথা—শ্রী হেমন্তকুমার সরকার, এম-এ ... ৬৯০
হরিদ্বারের গুরুকুল ... ৮৭৬
হারানো ছেলের খোঁয়াড় (সচিত্র) ... ৭৭৯
হিন্দুমুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ... ৪২৯
হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র (কষ্টি)—শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল ... ৩৬০

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

অনিলকুমার দাস, বি-এস্‌সি—
তেল জলের সম্বন্ধে ... ৮৯
একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যের মীমাংসা ... ৩৩৫
অবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, পি-এইচ্-ডি—
ঋগ্‌বেদের মন্ত্ররচনার কালে আর্য্যগণের সমুদ্র, বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল কি না ... ৩৩৯
অমিয়া চৌধুরী—
মাধুরী (গল্প) ... ৪৬৪
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—
মগধ জাতি ... ১৪৬
যোগি-জতি ... ৭৫৭
অমৃতলাল শীল, এম-এ—
মোগল দরবারে জৈনাচার্য্য সাধু (সচিত্র) ... ৮৫৩
অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
মধ্যপ্রদেশে বাঙালী ... ৩৩৭
অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
ডাকটিকিটের ইতিহাস (সচিত্র) ... ২২৭

ঘোড়াটানা গাড়ী (সচিত্র) ... ২২৯
বীজের তৈরী থলে (সচিত্র) ... ২২৯
দিনের পরিমাণ ... ২৩০
জগতের ছুইটি বৃহত্তম ঘড়ি ... ২৩০
ইতর প্রাণীর ষষ্ঠেন্দ্রিয় ... ২৩০
কালি বৃষ্টি ... ২৩০
পদমর্য্যাদাবোধক খাদ্য ... ২৩০
ছয় মাইল লম্বা বারান্দাওয়ালা বাড়ী ... ২৩১
নখের বৃদ্ধি ... ৬৩৩
আদিমকালের শাকসব্জী ... ৬৩৩
বৃটিশ্ মিউজিয়ম্ লাইব্রেরী ... ৬৩৩
পাখীদের প্রসাধনকার্য্য ... ৬৩৩

অশোক চট্টোপাধ্যায়, বি-এ (ক্যাণ্টাব)—
জার্ম্মান মার্কের দুরবস্থা ... ২৭৪
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সংরক্ষণ-নীতি ... ৫০৮

অশ্বিনীকুমার ঘোষ, এম-এ, বি-এল—
আহ্বান (কবিতা) ... ৮০৯

আব্বাস্ সোব্‌হান—
আফ্‌গান আমীরের গোহত্যা নিষেধ ঘোষণায় সন্দেহ ... ৫২৮

আমজাদ্—
আফ্‌গান আমীরের গোহত্যা নিষেধ ... ৩৩৯

ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি—
ফুলে মধু হয় কেন? ... ৩৯৮

উইলিয়ম্ উইনষ্ট্যান্‌লী পীয়ার্‌সন, এম-এ, বি-এস্‌সি
শোধনাশ্রম (সচিত্র) ... ৩৭

উপেন্দ্রনাথ মজুমদার—
বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ ... ৫২৮

কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—
কোকিল রাণা (গল্প) ... ৮২

কাজি নজ্‌রুল ইসলাম—
মাণিকজোড় (কবিতা) ... ৩৫১
পউষ (কবিতা) ... ৫৩০
দোদুল দুল (কবিতা) ... ৮৬৩
পথহারা (কবিতা) ... ৬৭৭

কাত্যায়নী দেবী—
ভিন্ দেশের খেলার সাথী (গল্প) ... ৬৫০

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ—
অলীক (কবিতা) ... ৩৯০

ক্ষিতিমোহন সেন, এম-এ—
কবীর ... ৭৪১

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—
ইংরেজ শ্রমজীবী ও ভারতবর্ষ ... ১৬১

ক্ষেত্রমোহন বসু, এম-এস্‌সি—
পরমাণু-জগতের আধুনিক পরিকল্পনা ... ৯০

গিরিজাকুমার বসু—
মাণিকজোড় (কবিতা) ... ৩৫১

গোপেন্দ্রনাথ সরকার—
আসন্ন সন্ধ্যা (কবিতা) ... ২০৯
তোষলা বা তুষুপূজা ... ৭৮৮

গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র—
ফুলের ভূষণ ... ৩৩৮

গোলাম মোস্তফা, বি-এ, বি-টি—
কুড়ানো মাণিক (কবিতা) ... ২৪৯
পাল্কী চলে রে (কবিতা) ... ৩৩৯
রবীন্দ্রনাথ (কবিতা) ... ৭২৩
সন্ধ্যা-রাণী (কবিতা) ... ৭৮৮

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ—
ভারতের ধ্বংসোন্মুখ গোধন ... ৮৬১

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ—
আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের আঁকা ছবি ... ৩৯৬
চিত্র-পরিচয় ইত্যাদি

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ—
পুস্তক-পরিচয় ...

চারুভূষণ চৌধুরী—
আলো ... ৬১১

জগজ্জ্যোতি পাল—
ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণা ... ২৯৭

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—
সেয়ানে সেয়ানে (গল্প) ... ৫৩৫

জলধর চট্টোপাধ্যায়
বাবা বৈদ্যনাথ (গল্প) ... ৩৩১

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস—
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ভ্রম-সংশোধন ... ৯০

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—
পাতিয়ালায় বাঙ্গালী (সচিত্র) ... ১৬৫

ডুঙ্গারসী ধরমসী—
বাণিজ্য-শিক্ষা ... ৮৪৭

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—
ফুলের বর্ণ ... ৩৯৭
কুসুম ও কীট ... ৫৩১
ফুলের গন্ধ ... ৬৫৬
ফুলের মধু ... ৮৪৫

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—
জয়ন্তী (উপন্যাস) ১৭, ১৯৮, ৩০৯, ৫০৩, ৬৬৯, ৭৮৯
লক্ষহীরা (গল্প) ... ৫৮

নরেন্দ্র দেব—
বিরহী-বিশ্ব (কবিতা) ... ৮১৬
নরেশচন্দ্র রায়—
সীন্ ফীন্ আন্দোলন ও আয়র্লাণ্ড ... ২৩৮
নীহারিকা দেবী —
দুঃখ সুখ (কবিতা) ... ৫৪৬
পঞ্চানন দাস, এম-এস্‌সি—
সঙ্গীতে স্বরসন্ধি বা হার্ম্মনি ... ৭৬৪
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—
চিত্র-পরিচয় ... ৩০০
সৃষ্টি-বন্দনা (কবিতা) ... ৮৪৭
কোন্ সে দেবতা ? (কবিতা) ... ৮৪৮
প্রফুল্লচন্দ্র বসু—
'রেনি ডে' (গল্প) ... ৭৭২
প্রবোধচন্দ্র সেন—
বাংলা ছন্দ ... ৩০৩
স্বরবৃত্ত ছন্দ ... ৪৯৬
স্বরবৃত্তছন্দের বিশেষত্ব ... ৬১৩
ছন্দের শ্রেণী বিভাগ ... ৮১০
প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ—
নবযুগের কবি (গল্প) ... ৫৩৭
প্রভাকর দাস, বি-এ—
৫০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার পাদুকা ... ৬৩২
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল—
বিদেশ ২৫৫, ৪১৯, ৫৭২, ৭০৪, ৮২৮
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—
গোয়া ও সারস্বত ব্রাহ্মণ (সচিত্র) ... ৩১৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র—
এবৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ... ৮১৫
প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়—
ভাইফোঁটা (গল্প) ... ২১৬
ফকিরচন্দ্র দত্ত—
কান্তকবির জন্ম-তারিখ ... ৩৩৮
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
ভাগ্যহত (গল্প) ... ৭৯৬
"বনফুল"—
বাড়্‌তি মাশুল ... ১৬৯
আত্মপর ... ৩৪১
স্মৃতি ও আশা (কবিতা) ... ৪৫১
অজান্তে ... ৫০৭
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ—
আবেস্তা-সাহিত্যে দণ্ডনীতি ... ১১৩
বাংলা ভাষা ... ২৯৮
বিজয়কুমার ভৌমিক—
ব্যাবিলনের পথে (সচিত্র) ... ৮২১
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্—
লিঙ্গপুরাণে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ... ৩৩৯
বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী—
সৌন্দরনন্দ কাব্য (সমালোচনা) ... ৭৪
পুস্তক-পরিচয় ...
বিনয়কুমার সরকার, এম্‌-এ—
ইউরোপের নয়া স্বরাজ ... ৮৭৮
বিনোদবিহারী রায়—
বৈদিক বিমান ... ৬২০
বীরবল—
অনুবাদের কথা ... ৩৭৩
বীরেশ্বর বাগচী—
পর-চিত্ত ... ২৩১
স্মৃতিশক্তির বাহাদুরি ... ৭৭৩
ঘৃণা লজ্জা ভয় ... ৭৭৩
বীরেশ্বর সেন—
বাঙ্গলা ভাষা ... ৪৫
বেতালভট্ট—
কবে ? (কবিতা) ... ৫১৯
ব্রহ্মদাস বৈষ্ণব গোস্বামী—
অঙ্কের কয়েকটি সহজ নিয়ম ... ৬৮
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়—
রাজপুতানার কথা ... ৭১
মণীন্দ্রনাথ রায়, এম-এ—
বাংলাদেশের বালিকাদিগের নিম্নশিক্ষা ... ৯২
মণীন্দ্রলাল বসু—
সাগরিকা (গল্প) ... ২৫
রমলা (উপন্যাস) ৪৬, ১৭২, ৩৪২, ৫১২, ৬৩৬, ৮০০
অলকা (গল্প) ... ৪০১
মন্মথমোহন দাস—
গণিকাদের দ্বারা সৎকর্ম্ম করানো ... ৫২৯
মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি—
আত্মা কি ? ... ১, ২০৪
নির্ব্বাণ কি ? ... ৩০১
ব্রহ্ম ... ৪৫৩
ব্রহ্মবাদের সূচনা ... ৫৯৮
পুস্তক-পরিচয়
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, বিক্রমপুরী—
আফ্‌গানিস্থান (সচিত্র) ... ৬৯২
মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, বিদ্যাবিনোদ, বি-এ—
প্যান্ ইস্‌লামিজম্ ও ভারতের সম্মান ... ৫১৮

মোহিতমোহন মুখোপাধ্যায়—
বেহালা-পল্লী-সংস্কার-সমস্যা ... ৩৩৭
মোহিতলাল মজুমদার—
কবি-গাথা (কবিতা) ... ৩৮০
মোহমুদ্গর (কবিতা) ... ৬১৯
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
বুদ্ধদেব (কবিতা) ... ৫৪৭
যতীন্দ্রমোহন সিংহ—
মুদ্রারাক্ষসের ভ্রম-সংশোধন ... ৯০
যদুনাথ সরকার, এম্-এ ; পি-আর্-এস্—
বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী ... ৬৬৩
পুস্তক-পরিচয়
যামিনীকান্ত সেন, বি এল্—
রসসৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল ... ৭
যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—
বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প ... ৬৮৫
যোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বিদ্যানিধি, রায় বাহাদুর—
খুঞা ... ৩৬৫
যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—
শের (কবিতা) ... ৮৩৮
রবিকিঙ্কর বটব্যাল—
শাস্ত্রে ভাইদ্বিতীয়া ... ৮৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
প্রথম আলোর চরণধ্বনি (কবিতা) ... ৫৯৭
রমাপতি গুপ্ত—
একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যের মীমাংসা ... ৩৩৫
রমেশ বসু, এম-এ—
শরাক জাতি ... ৫৫
রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—
আলেয়া (কবিতা) ... ৫৩
অকাল বন্যা (কবিতা) ... ৯১
চাঁদের আলো (কবিতা) ... ১৯৭
বুকের ভাষা ... ৩৭০
চোখের ভাষা (কবিতা) ... ৫২৭
মাঘ-শেষের দুপুর (কবিতা) ... ৬২২
খোকার পুলক (কবিতা) ... ৭৮৭
গোরের'পরে ফুল (কবিতা) ... ৬২৭
রাধাচরণ দাস—
কান্তকবির জন্মস্থান ... ৮৭
ভাষা-তত্ত্ব ... ২৯৯
কান্তকবি রজনীকান্ত ... ৬৩৫
রাধারমণ চক্রবর্ত্তী—
তোষলা বা তুষু পূজা ... ৬২৮
রামজীবন গুছাইত—
বীজনির্ব্বাচনে ফসলের উন্নতি ... ১৭০
লীলা দেবী—
নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (গল্প) ... ৮১৭
লোকেন্দ্রনাথ গুহ, বি-এ—
চরকার সূতা শক্ত করিবার উপায় ... ১৫
মহাভারতের বিবর্ত্ত ... ৫৮৮
শিবরতন মিত্র—
রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ সাহিত্য ৪৫৭, ৬০৪
শিবরাম চক্রবর্ত্তী—
বসন্ত (কবিতা) ... ৭৭২
শৈলজা মুখোপাধ্যায়—
রেজিং রিপোর্ট (গল্প) ... ৭১৮
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ—
রূপকথা ... ৮৮০
শ্রীনাথ সেন—
ভাষা-তত্ত্ব ... ৮৩৯
সরলা দেবী—
ঘুঘুপাখীর কথা ... ৩৯৯
সিদ্ধেশ্বর নন্দী—
একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য ... ৮৯
সুধাংশুভূষণ পুরকাইত—
গ্রহণের নামানুসারে বার ... ৩৩৮
সুধীরকুমার চৌধুরী, বি-এ—
সিন্ধু-সাধ (কবিতা) ... ৩৪৯
সুধীরকুমার মিত্র—
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মতারিখ ... ৬৩৫
সুধীরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—
একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যের মীমাংসা ... ৩৩৫
সুনির্ম্মল বসু—
পেটুকদাসের স্বপ্ন (কবিতা) ... ৮৪
লাজুক নারী (কবিতা) ... ৫৪৪
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ ; ডি-লিট্—
সোক্রাটীস্ (সমালোচনা) ... ৬৪৬
সুনীতি দেবী—
পৃথিবীর প্রতি (কবিতা) ... ৪০৭
সুনীলচন্দ্র সরকার—
চৈত্রের বর্ষণ (কবিতা) ... ৮২৭
সুবোধকুমার মজুমদার—
রাসায়নিক গবেষণা ... ৩৪০
সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—
পচা মাছের আলো ... ২৯

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—
জাতীয় সমস্যা ... ১৫৫
ভূ-পর্য্যটক (কবিতা) ... ৫৯৫

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—
"বাঙ্গালী কি ঘরকুণো" ... ২৯৮

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—
বর্ষা-সন্ধ্যায় (কবিতা) ... ২৪

সুরেশচন্দ্র রায়—
পল্লী-হার ... ৬৫

সুরেশ্বর শর্ম্মা—
ধীরে (কবিতা) ... ২২১
অশান্ত (কবিতা) ... ৩৯৬
চরিতার্থতা (কবিতা) ... ৬৬২

সুষমা সিংহ—
কি কি গুণ দেখিয়া বিবাহ করা উচিত ... ৫৪৪

হরগোপাল দাস কুণ্ডু—
শেরপুর মুর্চা ও করতোয়া ... ৮৭

হরিদাস ভট্টাচার্য্য—
একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যের মীমাংসা ... ৩৩৬

হরিহর শেঠ—
জ্যামিতিক চিত্র দিয়া ছবি আঁকা (সচিত্র) ... ১৯১
শিশুদের নামকরণ-প্রথা ... ১৯৩
জীবদেহে প্রকৃতির খেয়াল (সচিত্র) ... ৩২৭
অদ্ভুত প্রাকৃতিক খেয়াল (সচিত্র) ... ৫৩১
চিত্রকরের খেয়াল (সচিত্র) ... ৫৩২

হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম এস্‌সি, বিদ্যার্ণব—
গাছের কাণ্ড ... ৮৪৬

হৃষীকেশ চৌধুরী—
মুক্তি-বাঁধন (কবিতা) ... ৩১৫

হেমন্তকুমার সরকার, এম-এ—
সিঁদেল-চোরের আত্মকথা ... ৬৯০

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ—
মাঞ্চুরিয়া মোঙ্গোলিয়া এবং তিব্বতের নারী (সচিত্র) ... ২১০
অমিতা (গল্প) ... ২১২
মহিলা-প্রগতি ... ৩৭৯
অষ্ট্রেলিয়ার নারী (সচিত্র) ... ৪৮৫
পঞ্চশস্য ইত্যাদি

হেমেন্দ্রকুমার রায়—
ঝঞ্ঝা-ধ্রুপদ (কবিতা) ... ৩৫[illegible]
জাগ্রহি (কবিতা) ... ৩৩৮
কয়েদী (কবিতা) ... ৫[illegible]৩
শাক্তের গান (কবিতা) ... ৮৬০

হেমেন্দ্রলাল রায়—
বিদেশ ... ১৩৪
ভারতবর্ষ ১৩৫, ২২৭, ৪৩৮, ৫৪৯, ৭১১, ৮৩২
ইজিপ্টের নারী-শক্তি ... ৬৭৮
নারী-যোগ্য ব্যবসা ... ৬৮০
নারীদের পথ ... ৬৮২
নারীদের কর্ম্মক্ষেত্র ... ৬৮২
মিউনিসিপ্যালিটিতে নারী সদস্য ... ৬৮২
চীনের নারী সদস্য ... ৬৮২
আদেশের প্রতিবাদ ... ৬৮২
নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অস্বীকার ... ৬৮৩
রয়াল একাডেমীর নারী সদস্য ... ৬৮৩
ডাক্তারী-শিক্ষায় আফগান রমণী ... ৫৮৩
কামাল পাশার ঘোষণা ... ৬৮৩
নিউজিল্যাণ্ডে নূতন বিল ... ৬৮৩
চীনের বালিকা বিদ্যালয় ... ৬৮৩
বোম্বাই করপোরেশ্যানে মহিলা সদস্য ... ৬৮৩
আমেরিকান্ নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ... ৬৮৪
মহিলা-বৃত্তি ... ৬৮৪
ব্যবস্থাপক সভায় নারীদের অধিকার ... ৬৮৪
ভারতীয় মহিলা ব্যারিষ্টার ... ৬৮৪

চিত্র-সূচী

অক্ষর দিয়া অঙ্কিত মুখ—৮ খানি ছবি ... ৫৩২
অগ্নি-নিবারক দলের (Fire brigade) কর্ম্ম-কুশলতার কসরৎ শিক্ষা ... ৩৯৩
অগ্নি-প্রহরা স্তম্ভ—শতফুট উচ্চ ... ৩৯৪
অনুস্বেদমান যন্ত্র (Microtranspirograph) আচার্য্য বসু মহাশয়ের উদ্ভাবিত ... ৪৪০
অন্ধকারে দাড়ি কামাইবার সহজ-সাধন আলোক-যুক্ত ক্ষুর ... ৩৯২
অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদের আনন্দের ভোজ ... ৪৯১
অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের ঝগড়া ... ৪৯০
অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের নাচ ... ৪৮৯
অষ্ট্রেলিয়ার উরকি জাতির নারী ... ৪৮৮
অষ্ট্রেলিয়ার (উত্তর) অসভ্য নারী ৪৮৭
অষ্ট্রেলিয়ার বিধবা নারীরা মৃত স্বামীর কবরের উপর বসিয়া শোক করিতেছে ... ৪৯১
অষ্ট্রেলিয়ার মেয়েদের সংসারের কাজ ৪৯০
অষ্ট্রেলিয়ার লারাকিয়া জাতির নারী ৪৯২
অসম্পূর্ণ মালা—শ্রী অশ্বিনীকুমার রায় ... ৮৫৭
আকাশ-দৃশ্যপট ৫৪০
আগুনজ্বালা ঘড়ি ... ২২৫
আচার্য্য বসু মহাশয়ের অনুস্বেদমান যন্ত্র (Microtranspirograph) ৪৪০
আচার্য্য বসু মহাশয়ের মায়াপুরী গবেষণা-মন্দির ও বসুরাজ বীক্ষণাগার, দার্জ্জিলিং ... ৪৩৯
আদমদিঘির পশ্চিমদিকে বন্যার এক-মাইল ভগ্ন রেলপথ ... ২৬৪
আফগান আমীরের কাবুল রাজপ্রাসাদের নকসা ... ৬৯৩
আফগান-গৃহস্থের দরমাচাটাই ঘেরা ও চামড়ায় ছাওয়া ঘর ... ৭০০
আফগান পোষ্ট-আফিস ... ৬৯৮
আফগান প্রহরী ... ৬৯৭
আফগান মহিলার পোষাকের সম্মুখের এবং পশ্চাতের দৃশ্য (দুখানি ছবি) ... ৬৯৯
আফগান সৈন্য ... ৬৯৭
আমীর আমানুল্লা খাঁ, কাবুলের ... ৬৯২
আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের আঁকা ড্রাগনের ছবি ৩৯৬
আরবের বেদুইনগণ ও উটের লোমে তৈরী তাহাদের আবাস তাঁবু ... ৮২৩
আরাধনা (রঙীন)—শ্রী নন্দলাল বসু ... ১
আলোকযুক্ত ক্ষুর ... ৩৯২
আসারার খালের তীরে বাজার ... ৮২২
আমারার মিনার ... ৮২৩
ইংলণ্ডের প্রথম ইলেক্ট্রিক ট্রেন ... ৬২৯
ইংলণ্ডে রাজকন্যার নামকরণোৎসব ... ১৯৭
উত্তরবঙ্গের ম্যাপ (কালো দাগ দেওয়া জায়গাটি বন্যাপীড়িত) ... ২৬০
উৎসুক—শ্রী সারদাচরণ উকিল ... ৪২৩
উন্মনা—শ্রী বীরেশ্বর সেন ... ৫৯৭
উভচর গাড়ী জলে স্থলে এবং পাহাড়ে চলিতেপারে ৭৭৪
এক জোড়া ক্ষুদ্রকায় বলদ ... ৫২৮
এক ডিমে দুই কুসুম ... ২৩১
একতান (রঙীন)—শ্রী অশ্বিনীকুমার রায় ৫৪৮
একদল তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ... ১১১
এক নারিকেলের মালার মধ্যে দুই খোল ... ২৩১
কঙ্কালসার পুরুষ ও তাহার স্ত্রী পুত্র ৩৩০
কর্পোরাল আঁদ্রে প্যজিও গত বিশ্বজোড়া যুদ্ধের প্রথম বলি ... ৩৯৪
কলিকাতা সায়ান্স কলেজে বন্যাক্লিষ্টদের জন্য সংগৃহীত কাপড়ের বস্তা ... ২৭৩
কংক্রিটের তৈরী পরী-আবাস ... ৫৪১
কংক্রিটের তৈরী বাড়ী ... ৬২৯
কাবুল, আফগান-গৃহস্থের দরমা-চাটাই ঘেরা এবং চামড়ায় ছাওয়া ঘর ... ৭০০
কাবুল, আফগান পোষ্ট-অফিস ... ৬৯৮
কাবুল, আফগান প্রহরী ... ৬৯৭
কাবুল, আফগান মহিলার পোষাকের সম্মুখ এবং পশ্চাতের দৃশ্য (দুখানি ছবি) ... ৬৯৯
কাবুল, আফগান সৈন্য ... ৬৯৭
কাবুল, খাইবার গিরিপথের দৃশ্য ... ৬৯৫
কাবুল, খাইবার গিরিপথে সার্থবাহদল ... ৬৯৪
কাবুল, জমরুদ কেল্লা ... ৬৯৭
কাবুল রাজপ্রাসাদের নকসা, আফগান আমীরের ... ৬৯৩
কাবুল শহরের দৃশ্য ... ৬৯৬
কাবুলের আমীর আমানুল্লা খাঁ ... ৬৯২
কাবুলের প্রহরী বালা-হিসার দুর্গ ... ৬৯৮
কারু.শরে স্মৃতিচিহ্ন ... ৭৭৪
কালো জাম (প্রচ্ছদপট, মাঘ)—শ্রী বীরেশ্বর সেন

কুকুর ধাত্রী ... ২২৫
কুকুরের অপেক্ষা ছোট ঘোড়া ... ৩২৭
কুলী দম্পতি (প্রচ্ছদ-পট—কার্ত্তিক)—শ্রী পুলিনচন্দ্র দত্ত ...
ক্ষুদ্রকায় বৃষ—মাত্র তিন ফুট উচ্চ ... ৩২৮
ক্ষুদ্রাকৃতি ঘোড়া ভেড়া ও কুকুরের সার্কাস ... ৩২৯
খাইবার গিরিপথে সার্থবাহ দল ... ৬৯৪
খাইবার গিরিপথের দৃশ্য ... ৬৯৫
গত বিশ্বজোড়া যুদ্ধের প্রথম বলি কর্পোরাল আঁদ্রে প্যজিও ... ৩৯৪
গয়া-কংগ্রেসে অকালী শিখের উদ্বোধন-সঙ্গীত ... ৫৬০
গয়া-কংগ্রেসে আর্য্যসমাজীদের বাসস্থান ... ৫৬৫
গয়া-কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্যপুরীর বাজার ও দোকান ... ৫৫৮
গয়া-কংগ্রেসে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করিতেছেন ... ৫৬০
গয়া-কংগ্রেসে সমাগত অকালী শিখদের বাসের তাঁবু ... ৫৫৯
গয়া-কংগ্রেসে সমবেত সভ্যদের বাসস্থানে ... ৫৬২
গয়া-কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির দলপতি শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ ... ৫৬৪
গয়া-কংগ্রেসের ছবি ৫৫০—৫৬৭
গয়া-কংগ্রেসের বাংলা উদ্বোধন সঙ্গীত ... ৫৬৩
গয়া-কংগ্রেসের মণ্ডপ ও ময়দান ... ৫৫৮
গয়া-কংগ্রেসের মণ্ডপে প্রবেশের প্রধান তোরণ ... ৫৫৭
গয়া-কংগ্রেসের শিল্প-প্রদর্শনী ও প্রদর্শনীর দোকান ... ৫৬২
গয়া-কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ দাঁড়াইয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপক প্রস্তাব করিতেছেন ... ৫৬১
গয়া-কংগ্রেসের স্বরাজ্যপুরী প্রবেশের একটি তোরণ ... ৫৫৭
গয়া-কংগ্রেসের স্বরাজ্যপুরীতে ফল্গুনদীর তীরে প্রভাতকালে জনতা ... ৫৬৭
গয়া-কংগ্রেসের, স্বেচ্ছাসেবক ফৌজ ফল্গুনদীর বালির চড়ায় কুচকাওয়াজে নিযুক্ত ... ৫৬৬
গয়ায় জমায়েৎ-উল্-উলেমা ... ৫৬৪
গয়ায় ফল্গুনদীর তীরে সীতাকুণ্ড ... ৫৫৬
গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দির ... ৫৫১
গয়ায় রামগয়া ... ৫৫৫
গয়ায় রামশিলা পাহাড়ের নীচে রামকুণ্ড ... ৫৫৪
গয়ায় সমবেত উদাসী-মহামণ্ডল ... ৫ ৯
গরিলা ও গরিলার দেশের মানুষের তুলনা ... ৩৯১
গরিলার মাথা—মানুষের মাথার দ্বিগুণ বড় ... ৩৯১
গোয়ার মঙ্গেশ-মন্দির ... ৩১৮
গোস্বামী, রাজা কিশোরীলাল ... ৫৮৫
গোঁপ-দাড়ির বহর ... ৫৩৮
ঘোড়াটানা গাড়ী ... ২২৯
চতুর্ম্মুখ আম ... ২২৫
চলন্ত-গির্জ্জা ও তার পরিব্রাজক পুরোহিত ... ৩৯৪
চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু, জনৈক—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪৫৩
চীনদেশে বলদে নৌকা টানে ... ৭৮
চীনদেশে শিশুর নাম-করণ-উৎসবে শিশুর মাথা ন্যাড়া করা ... ১৯৬
চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (রঙীন)—শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৭৪১
চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তির পরিমাণ ... ৭৭৭
চুল দিয়া তৈরী ছবি ... ৬৩২
চাঁদের আলো—শ্রী মহাদেব মণ্ডল ... ৮৫৭
ছেলের খেঁ যাড়, হারানো- ... ৭৭৯
ছোট-গোল-মাথাওয়ালা হিন্দুস্থানী বালক ... ৩২৯
জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানাচার্য্য, সার, এফ-আর্-এস ... ৪৩৮
জম্‌রুদ কেল্লা ... ৬৯৭
জাপানে শিশুর নামকরণোৎসব (দুখানি ছবি) ... ১৯৬
জুতা-বুরুশের কল ... ৭৭৯
জৈনাচার্য্য বিজয়ধর্ম্ম সুরি এবং ডাক্তার এল পি তেস্‌সিতোরী ... ৮৫৪
জ্যাকি কুগান তাহার পিতার সহিত মোটর দৌড় দিতেছে ... ৭৭৯
জ্যামিতিক চিত্র দিয়া ছবি আঁকা—(আটখানি ছবি) ... ১৯১
টেলিফোন কেব্‌ল্, মাটির তলায় ... ৭৭৬
টেলিফোন তার বহনকারী সবচেয়ে লম্বা থাম (নিউইয়র্ক), পৃথিবীর মধ্যে ... ৭৭৬
টেলিফোন সুইচবোর্ড, নিউইয়র্কের বর্ত্তমান ... ৭৭৪
টেলিফোনের প্রথম যুগ ... ৭৭৪
টেলিফোনের তোরণ ... ৮২৬
ট্রাফিক-পুলিসের পিঠে এবং পেটে লালবাতি ... ৭৭৭
তাইগ্রিস নদীর উপরে এজ্‌রার সমাধি-মন্দির ... ৮২৩
তিব্বতীয় ধনী রমণী ... ২১২
তিব্বতীয় মাতা এবং সন্তানবৃন্দ ... ২১৩
দীপস্তম্ভযুক্ত শান্তাদুর্গা-মন্দির (গোয়ার) ... ৩২০
দুজন-চড়া মোটর-সাইকেল ... ৩৯২
দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ-(দুখানি ছবি) ... ২২৪
ধর্ম্মচক্র (তিব্বতীয়) ... ২১৪
ধূমপূর্ণ সহর ও ধূমশূন্য সহর ... ৫৪২
ধূমভরা ফুস্‌ফুস্ ... ৫৪২
ধূলিভক্ষক গাড়ী ... ৬৩১

নবগোয়ায় আলফোন্‌সো দ্য আলবুকার্কের সমাধি ... ৩২২
নসরত্‌পুরের এক ব্রাহ্মণ জমিদারের ভগ্ন গৃহ ... ২৬৭
নসরত্‌পুরের বন্যা-পীড়িত সাহায্যপ্রার্থী অধিবাসীগণ ২৬৪
নানাদেশের দুর্লভ ও প্রথম ডাক টিকিট ... ২০৮
নিউইয়র্কের বর্ত্তমান টেলিফোন সুইচবোর্ড ... ৭৭৫
নৃত্যশীল—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৮৫৮
পথ-ঝাঁটানো গাড়ী ... ৩৯৪
পাথরের নুড়ির তৈরী গির্জ্জা ... ২২৪
পাদচারিক গাড়ী, পারিবারিক ... ৩৯২
পা-বাজনা ... ৭৭৫
পায়ের আকার আলু, মানুষের ... ৫৩২
পায়ের উপর নাগর দোলা ... ২২৩
পারিবারিক পাদচারিক গাড়ী ... ৩৯২
পার্শীদের শিশুর নামকরণ ... ১৯৬
পারস্য দেশের জাতকর্ম্ম ... ১৯৫
পুরাতন গোয়ার প্রাচীন শম্ভুমন্দির—এখন রোম্যান্ ক্যাথলিক গির্জ্জায় পরিণত ... ৩২৪
পুরাতন গোয়ার সেণ্ট্‌ফ্রান্সিস্ অব্ আসিসির গীর্জ্জার অভ্যন্তর ... ৩২৩
পৃথিবীর ভবিষ্যৎ (ব্যঙ্গ চিত্র) ... ৪২৩
পৃথিবীর মধ্যে, টেলিফোন তার-বহনকারী সব চেয়ে লম্বা থাম (নিউ ইয়র্ক) ... ৭৭৬
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ৩২৭
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট পণি বা টাট্টু ঘোড়া ৩২৭
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মোটা শিশু ... ৩৩০
প্রণতি (প্রচ্ছদপট, পৌষ)—শ্রী শান্তাদেবী ...
প্রণয়-সঙ্গীত ... ৫৩৮
প্রতীক্ষমানা (প্রচ্ছদপট, ফাল্গুন) শ্রীমহাদেব প্রসাদ বর্ম্মা ...
প্রদীপ ও পতঙ্গ (রঙীন)—মহম্মদ আবদর রহমন চাঘ্‌তাই ... ৩৮০
প্রদীপ ভাসানো—শ্রী সারদাচরণ উকিল ... ৮৮৪
প্রবাসীরপত্র (প্রচ্ছদপট, অগ্রহায়ণ) শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা ...
প্রাচীন ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপ ... ৮২৫
বন্ধনে বিপন্ন—শ্রী শান্তাদেবী ... ২৩৬
বগুড়া জেলার কুসুম্বি গ্রামে বন্যার প্রলয়কাণ্ড ... ২৫৪
বগুড়ার উতরেল গ্রামে বন্যাক্লিষ্ট লোকেদের পুকুর পাড়ে অস্থায়ী বাসস্থান ... ২৬৫
বগুড়ার চৈতন্ গাঁয়ে বন্যার ধ্বংস লীলা ... ২৮৪
বগুড়ার চৈতন্‌গাঁয়ের বন্যাপীড়িত সাহায্যপ্রার্থী অধিবাসীগণ ... ২৬৫
বগুড়ার তালসন গ্রামে বন্যার লীলা ... ২৬৯
বগুড়া-সান্তাহার লাইনে আদমদিঘি ও নসরতপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বন্যায় ভগ্ন রেলপথ ... ২৬৭
বধূ—শ্রী সারদাচরণ উকিল ... ৮৮৪
বন্দুকের গুলির গতিবেগে উৎপন্ন শব্দতরঙ্গের ফোটোগ্রাফ ... ২২২
বন্যাক্লিষ্ট গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ ও শিশুগণ ... ২৬২
বন্যাক্লিষ্টদের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রবাহী মোটর লরী ... ২৭২
বন্যায় তালোরা গ্রামের গৃহহীন লোকদের অস্থায়ী গৃহ ... ২৬৩
বন্যার ধ্বংসপ্রাপ্ত এক জমিদার গৃহ ... ২৬১
বন্যায় মৃত পশুগণকে কবর দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবী ২৭৩
বয়স্কাউটদের কৃতিত্ব ... ৭৭৯
বরফের চাপের উপর পাথরের সিংহ ... ৭৭৭
বসরার খোরা খালের দুই তীরে খর্জ্জুরকুঞ্জ ... ৮২১
বাইসাইকেল-বায়ুবল ... ৩৯৬
বাইসাইকেলে তামাকের নলের বিজ্ঞাপন ... ৩৯৪
বাগ্‌দাদ "নীল" বা হায়দার খানা মস্‌জিদ ... ৮২৪
বাগ্‌দাদের সাধারণ দৃশ্য ... ৮২৪
বাড়ীখানিকে ২০ মাইল টানিয়া আনা হয়, এই ... ৭৭৯
বামন সিন্ধু-ঘোটক ... ৩২৯
বায়ুবল বাইসাইকেল ... ৩৯৬
বায়ুচালিত কলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ... ৫৪০
বালক রাঁধুনী ... ৪১
বাস্তব অভিনয়ে ইতিহাস শিক্ষা ... ৬৩২
বিজয়ধর্ম্মসূরি, জৈনাচার্য্য এবং ডাক্তার এল পি তেসিতোরি ... ৮৫৪
বিদ্যুৎ-শক্তির ছবি ... ৬২৯
বিম্ববতী (রঙীন) শ্রীশান্তা দেবী ... ৮৪
বিরানব্বই ফুট লম্বা রল ... ৭৭৪
বীজের তৈরি থলে ... ২২৯
বীণা গাছের বিচিত্র শ্বাসযন্ত্র ... ২২৬
বুড়ো মদ্দা গরিলার মুখের পার্শ্বদৃশ্য ... ৩৯১
বুদ্ধ গয়ার, অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরের প্রস্তর বেষ্টনী ... ৫৫২
বুদ্ধগয়ার মন্দির ... ৫৫০
বুদ্ধগয়ার মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ... ৫৫১
বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছনে বোধিদ্রুম ... ৫৫৩
বুদ্ধদেব ও মেষশাবক (প্রচ্ছদপট, চৈত্র) শ্রীনন্দলাল বসু ...
বুদ্‌বুদ্ ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির গতির ফোটোগ্রাফ্ ২২২
বৃষ্টিভিন্ন-উদ্ভিজ্জতাঃ (রঙীন) শ্রী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ৬৮০
বেঙ্গল রিলিফ কমিটির মেডিক্যাল ক্যাম্প ... ২৬৯
বেঙ্গল রিলিফ কমিটির স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তারগণ ... ২৭১

বেদুইন আরবদের গৃহস্থালী ... ৮২৩
বেলুনের সাহায্যে উদ্ধার ... ৫৪২
ব্যথিত-বেদন (রঙীন)—শ্রী আবদুল রহমান ইজাজ ... ১৯২
ব্যাবিলনের একটি দোকান ... ৮২৬
ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপ, প্রাচীন ... ৮২৫
ব্যাবিলনের প্রাচীর-গাত্রে তোলা ছবি ... ৮২৬
ভারতবর্ষের বানিয়াদের জাতকর্ম্ম-পদ্ধতি ... ১৯৪
ভাসমান মাছধরা বাতি ... ৭৭৮
ভাসমান স্নান-পরিচ্ছদ ... ৩৮৪
ভীম ভবানী জাপানে—হাতে ভাঁজিবার পাঁচমণ বার্-বেল ... ২৪২
ভীম ভবানীর এক নিশ্বাসে শিকল-ছেদন ... ২৪০
ভীম ভবানীর বুকে পাথর ভাঙ্গা ... ২৪১
ভীম ভবানীর বুকের উপর হাতী ... ২৪২
ভীম ভবানী—শিকলবদ্ধ অবস্থায় ... ২৪০
ভীম ভবানী শ্মশানে ... ২৪৩
মাকেল গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শান্তা-দুর্গার মন্দির ৩১৭
মঙ্গেশ-মন্দিরের দৃশ্য (গোয়ার) ... ৩১৯
মজুমদার, অম্বিকাচরণ ... ৫৮৪
মঞ্জরী (রঙীন) শ্রী অরবিন্দ দত্ত ... ৮২০
মাঝি—শ্রী সারদাচরণ উকিল ... ১৬
মৎস্যাকৃতি জলযান ... ২২২
মহিলাদের পোলো খেলা ... ২১৬
মাঝভাগে ছিন্ন কোরান্ ... ৭১৬
মাটির তলায় টেলিফোন কেব্‌ল্ ... ৭৭৬
মাড়বারী রিলিফ্ কমিটির ভগবানদাস আগরওয়ালা বন্যাক্লিষ্টদের অন্ন ও বস্ত্র দিতেছেন ... ২৬৬
মাড়বারী সেবকগণ বন্যা-পীড়িতস্থানে যাইতেছেন ২৭২
মানুষের পায়ের-আকার আলু ... ৫৩২
মায়াপুরী গবেষণা-মন্দির ও বসুরাজ বীক্ষণাগার, দার্জিলিং ... ৪৩৯
মা—শ্রী সারদাচরণ উকিল ... ৮৫৯
মুক্তামালা পরিয়া নর্ত্তকীর নাচ ... ৬৩১
মুক্তামালা-পরিহিতা নর্ত্তকী ... ৬৩০
মুক্তামালার নাচ, অন্ধকারে ... ৬৩১
মুরগীর ডিম, সব চেয়ে বড় ... ৭৭৮
মুস্তাফা কামাল পাশা ... ১২৯
মৃত স্বামীর কবরের উপর বসিয়া শোক করিতেছে (অষ্ট্রেলিয়ার নারী) ... ৪৯১
মেক্‌সিকো দেশে শিশুর নামকরণ ... ১৯৪
"মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে, তারা যেন ডাকে আমায় ডাকে।"—শ্রী সারদাচরণ উকিল ... ১৫০
মেষশাবকের গো ধাত্রী মাতা ... ৪৯৫
মোটর গাড়ীর লাফ ... ৬৩১
মোটর সাইকেল—দুজন-চড়া ... ৩৯২
ম্যাডাগাস্কারের অতি ক্ষুদ্র বানর ... ৩২৮
ম্যাডিঙ্গো দেশে শিশুর নামকরণ ... ১৯৫
যমজ ভগিনী ... ২২৭
যমজ ভগিনীর আঁকা ছবির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ... ২২৭
যমজ যুক্ত-ভগিনী ... ২২৭
যশোদা ও কৃষ্ণ (রঙীন) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০১
যুদ্ধ-বিরাম-পত্র স্বাক্ষরের স্মৃতিস্থান (ফ্রান্স) ... ৭৭৮
য়ুরোপীয় সভ্যতার অভিযান (ব্যঙ্গচিত্র)—শ্রী চারুচন্দ্র রায় ... ৩৭২
রণ-সঙ্গীত ... ৫৬৮
রিপুকর্ম্মে ব্যস্ত ... ৪২
লক্ষ্যবেধ (রঙীন)—শ্রী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ১৪৫
লম্বা রলা, ৯২ ফুট ... ৭৭৪
ল্যাপল্যাণ্ডে শিশুর নামকরণোৎসব ... ১৯৩
শত ফুট উচ্চ অগ্নি প্রহরা স্তম্ভ ... ৩৯৫
শান্তাদুর্গা দেবীর রথ (গোয়া) ... ৩২১
শেফালি-তলায়—শ্রী দুর্গেশচন্দ্র সিংহ ... ৮৫৯
শোধনাশ্রমে ছাত্রদের বিছানা পাতা ... ৩৯
শোধনাশ্রমে আটজন ছাত্রের একত্রে খেলা ... ৪০
শোধনাশ্রমে রবীন্দ্রনাথ ... ৩৭
শ্যামদেশের যমজ যুক্ত-ভাই ... ২২৬
শ্রী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ... ১৬৬
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৫৮৩
সবচেয়ে ছোট বন্দুক ... ৫৪১
সবচেয়ে বড় গোলা ... ৫৪১
সবচেয়ে বড় মুরগীর ডিম ... ৭৭৮
সবচেয়ে মোটা বালকবালিকা ... ৫৩৯
"সাধে কি বাবা বলি"—শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ ... ৮৬
সান্তাহার রেল ষ্টেশনে রিলিফ্ কমিটি কর্ত্তৃক বন্যাক্লিষ্টদের অন্ন বস্ত্র বিতরণ ... ২৬৮
সান্তাহারে বেঙ্গল রিলিফ্ কমিটি ... ২৭০
সালেঙ্গাহাট দাঙ্গায় আহত ব্যক্তিদের ছবি ... ১৩৮
সূচী-শিল্পের জীবন্ত ভল্লুক ... ৬৩০
স্কট্‌ল্যাণ্ডে শিশুর নামকরণ-পদ্ধতি ... ১৯৭
স্নান-পরিচ্ছদ—ভাসমান ... ৩৯৪
"স্বাধীনতাজ্ঞান" বাষ্প প্রয়োগ (ব্যঙ্গ-চিত্র) ... ৪৪৪
সংসারের কাজ (অষ্ট্রেলিয়ার নারী) ... ৪৯[illegible]
সিংহ-শার্দ্দূল ... ৩২৯
সাঁতারীর বাহাদুরী ... ২২৩
হারানো ছেলের খোঁয়াড় ... ৭৭৯

হোলি খেলা—শ্রী সারদাচরণ উকিল ... ৮৫৮
হ্যারল্ড, বিদ্যালয়ের চৌকস-ছাত্র কাপ লইয়া ... ৩৮

প্রচ্ছদপট

কুলী-দম্পতি—শ্রী পুলিনচন্দ্র দত্ত (কার্ত্তিক)
প্রবাসীর পত্র—শ্রী রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা (অগ্রহায়ণ)
প্রণতি—শ্রীমতী শান্তা দেবী (পৌষ)
কালোজাম—শ্রী বীরেশ্বর সেন (মাঘ)
প্রতীক্ষমানা—শ্রী মহাবীরপ্রসাদ বর্ম্মা (ফাল্গুন)
বুদ্ধদেব ও মেষশাবক—শ্রী নন্দলাল বসু (চৈত্র)

আরাধনা

চিত্রকর শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের সৌজন্যে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২২শ ভাগ | ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩২৯ | ১ম সংখ্যা

আত্মা কি ?

উপনিষদের যুগে 'আত্মা' বিষয়ে কি কি তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১। প্রাচীনতর তত্ত্ব।

যাহা 'অতীত', তাহা সম্পূর্ণরূপে 'অতীত' নহে। মানুষ ভাবে—'যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহা চলিয়াই গিয়াছে'। কিন্তু তাহা নহে। 'অতীতই বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠা; কেবল যে প্রতিষ্ঠা তাহা নহে; অতীতের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা লইয়াই বর্ত্তমান গঠিত। বর্ত্তমানের কতটুকু পুরাতন আর কতটুকু সম্পূর্ণ নতুন তাহা বলা কঠিন। প্রাচীনকালের কত কুসংস্কার কত সুসংস্কার যে পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত কলুষিত বা সুসংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান যুগের রীতিনীতি আচারব্যবহাররূপে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ক' জন অনুধাবন করিয়া দেখেন? আমরা অতীতকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অতীত কিছুতেই অতিক্রান্ত হইবে না।

অতীত আমাদিগকে 'পাইয়া' বসিয়াছে। উপনিষদের ঋষিগণ—যাঁহারা ধর্ম্মজগতে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অতীতকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অতীত তাঁহাদিগকেও 'পাইয়া' বসিয়াছিল। 'দেহ আত্মা নহে' ইহা উপনিষদের একটি বিশেষ মত। এই মত সংস্থাপন করিবার জন্য কত স্থানে কত ভাবে কত কথা বলা হইয়াছে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও উপনিষৎ দেহাত্মবাদের অতীত হইতে পারেন নাই। কিন্তু এ মত উপনিষদের বিশেষত্ব নহে, ইহা প্রাচীনতর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। ঋগ্বেদাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে এবং শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থেও বহু স্থলে দেহকেই আত্মা বলা হইয়াছে। এই মতেরই কঙ্কাল উপনিষদের নিম্নতম স্তরে নিহিত দেখা যায়। মুখ্য বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উপনিষদের এই স্তরের মতামত বিষয়ে এস্থলে দুই-একটি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না।

উপনিষদের নিম্নস্তরে।

উপনিষদেরও অনেক স্থলে 'দেহ' অর্থে আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১)

ঐতরেয় উপনিষদের একস্থলে (৮।১) এই প্রকার আছে :—

"আত্মনি এব আত্মানম্ বিভর্ত্তি" অর্থাৎ তিনি দেহ-বীজকে (আত্মানম্) দেহে (আত্মনি) ধারণ করেন।

এস্থলে আত্মনি দেহে, আত্মানম্ দেহকে অর্থাৎ দেহবীজকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রেও 'দেহবীজ' অর্থে 'আত্মানম্' ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের এক স্থলে এইরূপ আছে :—

'সেই মৃত্যুদেবতা কামনা করিলেন' আমার দ্বিতীয় দেহ (আত্মা) উৎপন্ন হউক। ১।২।৪।

অপর একস্থলে আছে :—"তিনি কামনা করিলেন, এই দেহ মেধ্য হউক, এই শরীর দ্বারা আমি 'আত্মন্বী' (অর্থাৎ শরীরবান্) হই।" ১।২।৭

এ স্থলে আত্মন্বী—আত্মাযুক্ত অর্থাৎ দেহযুক্ত।

অন্য এক স্থলে আছে 'অয়ম্ অন্তরাত্মন্ আকাশঃ' অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরস্থ এই আকাশ (২।৩।৪ ; ২।৩।৫)। অন্তরাত্মন্—অন্তর্ আত্মনি—দেহের অভ্যন্তরে।

অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কোন কোন স্থলে 'অন্তর্হৃদয় আকাশঃ' ব্যবহৃত হইয়াছে (বৃহঃ ৪।২।৩ ; ৪।৪।২২, ছান্দোঃ ৩।১২।৯, ৮।১।৩ ইত্যাদি)। ইহার অর্থ—হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশ।

(৩)

কঠোপনিষদের একস্থলে আছে :—আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তম্ ভোক্তা আহুঃ মনীষিণঃ (৩।৪) অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং মনের সহিত যিনি যুক্ত, মনীষিগণ তাঁহাকে ভোক্তা বলেন।

এস্থলে 'আত্মা' অর্থ দেহ। অন্য একস্থলে আছে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ দেহের মধ্যে (মধ্যে আত্মনি) বাস করেন।" ৪।১২।

এস্থলে 'মধ্যে আত্মনি'=দেহের মধ্যে।

অপর একস্থলে আছে :—দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তেমনি এই দেহে (আত্মনি) ব্রহ্ম দৃষ্ট হয় ; যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তেমনি পিতৃলোকে (ব্রহ্ম দৃষ্ট হয়) ; যেমন জলে বস্তু দৃষ্ট হয়, তেমনি গন্ধর্ব্বলোকে (ব্রহ্ম দৃষ্ট হয়)। ৬।৫।

এস্থলে আত্মনি=দেহে।

(৪)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এইরূপ আছে :—

"স্বদেহকে (নিম্ন) অরণি করিয়া এবং প্রণবকে উৰ্দ্ধ-অরণি করিয়া ধ্যানরূপ ঘর্ষণ দ্বারা (সাধক) ঈশ্বরকে (অরণিস্থ) নিগূঢ় (অগ্নিবৎ) দর্শন করিবেন। (শ্বেতঃ ১।১৪)। যেমন তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, নদীগর্ভে জল, যেমন অরণিতে অগ্নি লাভ করা যায়, তেমনি আত্মাতে (আত্মনি) সেই আত্মাকে লাভ করা যায়।" (১।১৫)।

এস্থলে দেহকে অরণির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অরণিতে অগ্নি লাভ করা যায়, তেমনি দেহেও ব্রহ্ম-লাভ হয়। এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই বলা হইয়াছে যে "আত্মাতে (আত্মনি) সেই আত্মাকে লাভ করা যায়।" সুতরাং বলা যাইতে পারে এস্থলে 'আত্মনি' শব্দের অর্থ 'দেহে'। কিন্তু কেহ কেহ এই শব্দকে এস্থলে মন বুদ্ধি প্রভৃতি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মোপনিষদে এই মন্ত্রটি আছে :—"আত্মাকে (আত্মানম্) নিম্ন-অরণি এবং প্রণবকে উৰ্দ্ধ-অরণি করিয়া ধ্যানরূপ মন্থন অভ্যাস দ্বারা সেই দেবতাকে দর্শন করিবে" (৩১)।

এস্থলে 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'দেহ'। আমরা পূর্ব্বে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে একটি মন্ত্র (১।১৪) উদ্ধৃত করিয়াছি। ব্রহ্মোপনিষদের এই মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেরই উক্ত স্থল হইতে গৃহীত ; কেবল 'আত্মানম্' স্থলে 'স্বদেহম্' ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মোপনিষদে যে আত্মা শব্দ আছে তাহার অর্থ দেহ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

কৈবল্য উপনিষদেও ঐ মন্ত্রটাই কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। "আত্মাকে (আত্মানম্) নিম্ন অরণি এবং আত্মাকে উত্তর অরণি করিয়া জ্ঞান-রূপ মন্থন অভ্যাস দ্বারা পণ্ডিতগণ পাশ দগ্ধ করেন (১১)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের (১।১৪) সহিত এই মন্ত্রের তুলনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে এস্থলেও আত্মা=দেহ। আধুনিক উপনিষদেও দেহাত্মবাদ!

(৫)

তৈত্তিরীয় উপনিষদের বহুস্থলে (২।১, ২, ৩, ৪, ৫,)

মানব-দেহকে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্থলেই 'আত্মা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় স্থলেই 'আত্মা' অর্থ মধ্যদেহ অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগ। একটি স্থলে ঋষি হস্ত দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছেন—

"এই ইহার শির, এই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম পক্ষ, এই ইহার আত্মা (অর্থাৎ শরীরের কাণ্ড, বা মধ্যদেহ), প্রতিষ্ঠারূপী এই অধোভাগ ইহার পুচ্ছ।" ২।২।

এস্থলে 'আত্মা' অর্থ যে মধ্যদেহ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

(৬)

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষদের বিভিন্ন স্থলে সমুদয় বস্তুকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) দেবতা, (২) ভূত, (৩) আত্মা। দেবতা হইতে অধিদৈব, অধিদৈবত ও আধিদৈবিক, ভূত হইতে অধিভূত ও আধিভৌতিক; এবং আত্মা হইতে অধ্যাত্ম ও আধ্যাত্মিক শব্দের উৎপত্তি।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যৌ, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ (বৃহঃ ৩।৭।৩—১৪), বিদ্যুৎ মেঘ (কৌষিঃ ৪) ইত্যাদি দেবসংজ্ঞক। প্রাণ অপান, ব্যান, উদান, সমান, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, নিম্নহনু, ঊর্দ্ধহনু, জিহ্বা প্রভৃতি আত্মসংজ্ঞক (তৈত্তিঃ ১।৭, ।৩।৪ ইত্যাদি)।

আমরা কেবল দুই-একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য উপনিষদাদির বহুস্থলে এই প্রকার বহু উক্তি আছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে এক সময়ে ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত দেহকেই আত্মা বলা হইত।

ভাষা এক অদ্ভুত সাক্ষী। আমরা যাহা ভুলিয়া যাইতে চাই, ভাষা তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়; আমরা যাহা লুকাইতে চাই, ভাষা তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলে। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, এই তত্ত্ব লাভ করিয়া আমরা মনে করিতে পারি, উপনিষদের আদিতে মধ্যে এবং অন্তেও বুঝি এই তত্ত্বই। কিন্তু ভাষা বলিয়া দিতেছে আত্মতত্ত্বের প্রথম স্তর জড়বাদ, এই স্তরে 'আমি' 'আপনি' 'স্বয়ং' 'নিজ' বলিলে মানুষ দেহই বুঝিত এবং এখনও অনেকে ইহাই বুঝিয়া থাকে। ইহাই দেহাত্মবুদ্ধি। কিন্তু মানুষ চিরদিন এই স্তরে থাকিতে পারে না। প্রাচীনকালেই মানুষ এই স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চতর স্তরে উত্থিত হইয়াছিল। এখন দেখা যাউক আত্মতত্ত্ব বিষয়ে এই উচ্চতর কথা কি।

২। উপনিষদের আত্মতত্ত্ব

(ক) ছান্দোগ্য-উপনিষদে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠ করিলে মনে হয় এই যুগে আত্মার প্রকৃতি বিষয়ে তিনটি মত প্রচলিত ছিল—

(১) দেহই আত্মা।

(২) নিদ্রিতাবস্থাতে যিনি স্বপ্ন দেখেন তিনিই আত্মা।

(৩) সুষুপ্ত অবস্থাতে যাহাতে ইন্দ্রিয়াদি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ একীভূত হয় এবং যিনি স্বপ্ন দর্শন করেন না, তিনিই আত্মা।

(১)

দেহই আত্মা।

যে উপাখ্যানে এই সমুদয় মত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—(৮।৭ ১২):—

বিরোচন এবং ইন্দ্র আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রজাপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন। ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিবার পর প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন:—

'চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হয়েন, ইনিই আত্মা।'

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—'হে ভগবন্! এই যে পুরুষ জলে দৃষ্ট হয়, আর এই যে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয়, ইহা কে?'

প্রজাপতি বলিলেন—"এই সমুদয়েই আত্মা পরিদৃষ্ট হয়েন।"

তিনি আরও বলিলেন—"জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে (আত্মানম্) দেখ, দেখিয়া আত্মার (আত্মনঃ) বিষয়ে যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমাকে বলিও।"

তাহারা জলপূর্ণ পাত্রে দেখিল। তখন প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলে?"

তাহারা বলিল—"হে ভগবন্! আমরা সমগ্র

আত্মাকে (আত্মানম্) এবং লোম এবং নখ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিরূপকে দর্শন করিলাম।"

প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—"সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সুবসন পরিধান করিয়া, পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে পরিদর্শন কর।"

তাহারা তাহাই করিল। তখন প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিলে?"

তাহারা বলিল—"হে ভগবন্! এই আমরা যেমন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত, হে ভগবন্! তেমনি জলের মধ্যেও এই দুইজন সুন্দর অলঙ্কারে ও সুবসনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত।"

প্রজাপতি বলিলেন—"ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, অভয় এবং ইনিই ব্রহ্ম।"

বিরোচন শান্ত হৃদয়ে অসুরগণের নিকটে গমন করিয়া তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিল—

"এই পৃথিবীতে এই দেহই (আত্মা) পূজ্য এবং এই দেহই (আত্মা) সেব্য। দেহকে (আত্মানম্) মহীয়ান্ করিলে, দেহের (আত্মানম্) পরিচর্য্যা করিলেই ইহলোক এবং পরলোক, এই উভয় লোক লাভ করা যায়।" ৮।৪

"তাহারা গন্ধমাল্যাদি, বসন, ও অলঙ্কার দ্বারা দেহকে (শরীরম্) সজ্জিত করে এবং মনে করে, ইহা দ্বারা আমরা পরলোক জয় করিব।" ৮।৫

এই দুইটি মন্ত্রে ৬ বার 'আত্মা' এবং ১ বার 'শরীর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ সমুদয় স্থলে 'আত্মা' শব্দের অর্থ দেহ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ স্থলে যে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল, তাহা জড়বাদ, ইহাই দেহাত্মবাদ।

(২)

স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষই আত্মা।

ইন্দ্র পূর্ব্বোক্ত মতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে:—

"এই দেহ সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে, জলস্থিত দেহও সুন্দর ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, ইহা সুবসন-পরিহিত হইলে (উহাও) সুবসন-পরিহিত হয়; ইহা পরিষ্কৃত হইলে উহাও পরিষ্কৃত হয়। এই প্রকার ইহা অন্ধ হইলে, উহাও অন্ধ হয়, ইহা খঞ্জ হইলে উহাও খঞ্জ হয়, ইহার হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে উহারও হস্তপদাদি ছিন্ন হয়; ইহার বিনাশ হইলে, উহারও বিনাশ হয়। এ বিদ্যাতে আমি কোন ফল দেখিতেছি না।"

তিনি প্রজাপতির নিকট প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাকে এই সমুদয় কথা বলিলেন। প্রজাপতি বলিলেন—"হাঁ, মঘবন্! এই প্রকারই।"

ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারিরূপে সেই স্থলে বাস করিলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন—

"এই যিনি স্বপ্নাবস্থায় পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা, ইনিই অমৃত অভয়, তিনিই ব্রহ্ম।"

এই উপদেশ লাভ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে "যদিও এই শরীর অন্ধ হইলে স্বপ্নপুরুষ অন্ধ হয় না, এই শরীর খঞ্জ হইলে স্বপ্নপুরুষ খঞ্জ হয় না, যদিও শরীরের দোষে স্বপ্নপুরুষ দূষিত হয় না, দেহ বিনষ্ট হইলে যদিও ইহা বিনষ্ট হয় না—তথাপি নিদ্রিতাবস্থায় মনে হয় এই স্বপ্নপুরুষকে কেহ যেন বিনাশ করিতেছে, কেহ যেন ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, ইহা যেন রোদন করিতেছে। সুতরাং এই উপদেশে আমি কোন কল্যাণ দেখিতেছি না।"

ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। প্রজাপতি বলিলেন—"হাঁ, ইহা এই প্রকারই।"

(৩)

সুষুপ্ত পুরুষই আত্মা।

ইন্দ্র আরও ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুসরণ করিলে প্রজাপতি বলিলেন—"এই যে প্রসুপ্ত জীব একীভূত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং স্বপ্ন দর্শন করে না, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম।"

এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র এইরূপ বুঝিতে পারিলেন:—

"সুষুপ্ত অবস্থায় ইহা আত্মবিষয়ে এপ্রকার বুঝিতে

পারে না যে 'ইহাই আমি।' ইহা ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না। এই সময়ে ইহা যেন বিনাশ প্রাপ্তই হয়। এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখিতেছি না।"

প্রজাপতির সমীপে পুনরাগমন করিয়া ইন্দ্র এই সমুদয় কথা বলিলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন,—"হা, ইহা এই প্রকারই।"

ইহার পরে ইন্দ্র আরও ৫ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। তখন প্রজাপতি ইন্দ্রের নিকট প্রকৃততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন।

(৫)

আত্মার স্বরূপ।

প্রজাপতির শেষ উপদেশ এই :—

"হে মঘবন্! এই শরীর মর্ত্ত্য, মৃত্যুগ্রস্ত। কিন্তু ইহাই অমৃত এবং অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরী আত্মারই প্রিয়াপ্রিয় সংযোগ হইয়া থাকে; কিন্তু অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। বায়ু অশরীর; অভ্র, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন - এ সমুদয়ও অশরীর। বর্ষাকালে এসমুদয় স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে নূতন নূতন রূপ ধারণ করে এবং বারিবর্ষণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে মেঘাদি আবার অশরীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই সমুদয় যেমন আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় রূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি সুষুপ্ত আত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। তখন ইহা উত্তম পুরুষ। তখন স্ত্রীলোকের সহিতই হউক, বা যানে আরোহণ করিয়া হউক, বা জ্ঞাতিগণের সহিতই হউক – হাস্য করিয়া ক্রীড়া করিয়া, এবং আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করিতে থাকে। যে দেহে তাহার উৎপত্তি, সেই দেহকে তখন ভুলিয়া যায়। যেমন অশ্ব রথে সংযুক্ত থাকে তেমনি প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণ তারকাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; এই স্থলেই চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষ বিরাজিত। (এই পুরুষই দর্শন করেন), চক্ষু কেবল দর্শন করিবার যন্ত্রমাত্র। যিনি বুঝিতেছেন 'এই আমি আঘ্রাণ করিতেছি,' তিনিই আত্মা, নাসিকা কেবল ঘ্রাণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন, 'আমি এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছি,' তিনিই আত্মা, বাগ্‌ইন্দ্রিয় কেবল বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন এই 'আমি শ্রবণ করিতেছি'—তিনিই আত্মা শ্রোত্র কেবল শ্রবণ করিবার জন্য। যিনি বুঝিতেছেন, 'এই আমিই মনন করিতেছি,' তিনিই আত্মা, মন ইহার দৈব চক্ষু। তিনি মনোরূপ দৈব চক্ষু দ্বারা সমুদয় কাম্যবস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।" ছান্দোগ্য ৮।১২

প্রজাপতি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) দেহ আত্মা নহে।

(২) স্বপ্ন পুরুষও আত্মা নহে।

(৩) সুষুপ্ত পুরুষকে লোকে যে ভাবে কল্পনা করে তাহাও আত্মা নহে।

(৪) মনে হইতে পারে যে, সুষুপ্ত অবস্থাতে আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং এ অবস্থাতে ইহার আত্মজ্ঞানও থাকে না। কিন্তু তাহা নহে। এই অবস্থাতে আত্মা দেহ হইতে উত্থিত হইয়া স্বরূপ ধারণ করেন। দেহের বিনাশ হইলেও এই আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা দেহ হইতে পৃথক। দেহ আত্মার যন্ত্র; আত্মা যন্ত্রী। দেহ মর্ত্ত্য, আত্মা অমর। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দর্শনাদির যন্ত্র মাত্র। যিনি দ্রষ্টা, আঘ্রাতা, বক্তা, শ্রোতা এবং মন্তা তিনিই আত্মা।

(খ) ঐতরেয় উপনিষদের মত।

ঐতরেয় উপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায়) আত্মার বিষয়ে এইরূপ প্রশ্নোত্তর আছে :—

"আমরা 'আত্মা' বলিয়া যাহার উপাসনা করি তাহা কি? এই দুইটির মধ্যে (কতরঃ) কোনটি আত্মা? (১) যাহা দ্বারা (অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা) রূপ দর্শন করা যায়, যাহা দ্বারা শ্রবণ করা যায়, যাহা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করা যায়, যাহা দ্বারা বাক্য শ্রবণ করা যায়, যাহা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু জানা যায় (তাহাই কি আত্মা?) (২) (কিম্বা) এই যে হৃদয় ও মন—(অর্থাৎ) সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান,

প্রজ্ঞান, মেধা দৃষ্টি ধৃতি মতি মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প ক্রতু, অসু, কাম, এবং বশ—(এই সমুদয়ই কি আত্মা ?)

(ইহার উত্তরে ঋষি বলিলেন :—) এ সমুদয়ই প্রজ্ঞানের নাম। ঐঃ ৩।১,২।

ইহার পর ঋষি আরও বলিলেন—"এই ব্রহ্ম, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমুদয় দেবতা ...পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি—এই পঞ্চ মহাভূত……জঙ্গম, পতত্রি এবং স্থাবর—এই সমুদয়ই প্রজ্ঞানেত্র (অর্থাৎ প্রজ্ঞাদ্বারা চালিত), প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। লোক প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠা এবং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। তিনি (অর্থাৎ বামদেব) এই প্রজ্ঞ-আত্মা দ্বারা এই লোক হইতে উৎক্রমণ করিয়া স্বর্গলোকে সমুদয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া অমৃত হইয়াছিলেন।"

আমরা মন্ত্রসমূহের অবিকল অনুবাদ প্রদান করিলাম। বন্ধনীর মধ্যে বাংলায় যে যে অংশ দেওয়া হইয়াছে তাহা মূলে নাই. মন্ত্রসমূহকে বোধগম্য করিবার জন্যই এই সমুদয় অংশ যোগ করা হইয়াছে। উদ্ধৃতাংশের অর্থ আমরা এই প্রকার বুঝিয়াছি—

প্রথমেই প্রশ্ন করা হইল "আত্মা কি ?" এই প্রশ্ন সুস্পষ্ট করিবার জন্য বলা হইল দুইটির মধ্যে কোন্টি আত্মা ? মূলে আছে 'কতরঃ'। 'তর' প্রত্যয় হয়, যখন দুইটির মধ্যে তুলনা হয়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য—সেই দুইটি কি ? সে দুইটি এই :—

(১) যে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনাদি করা যায়, সেই সমুদয়ই কি আত্মা ?

(২) কিংবা এই যে হৃদয় ও মন—যাহাদিগকে সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞানাদিও বলা হয়—এই সমুদয়ই কি আত্মা ?

এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি সাক্ষাৎভাবে কোন উত্তরই দিলেন না। তিনি ইহাও বলিলেন না যে ইন্দ্রিয়াদি আত্মা কিংবা ইহাও বলিলেন না যে হৃদয় মন প্রভৃতিই আত্মা। তিনি বলিলেন, হৃদয় মন সংজ্ঞানাদি প্রজ্ঞানের নাম। ইহার পরে আরও বলিলেন যে ব্রহ্মাদি দেবগণ পঞ্চ মহাভূত এবং স্থাবর জঙ্গমাদি যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই প্রজ্ঞাদ্বারা চালিত এবং প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম (৩৩)।

ঋষি ইন্দ্রিয়াদির কথা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়াছেন; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। ইহার পরই বলা হইল হৃদয় মন—সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান. প্রজ্ঞান, মেধা প্রভৃতি প্রজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নাম। ঋষির মতে প্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু নাই। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয়ই প্রজ্ঞান দ্বারা চালিত এবং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে প্রজ্ঞানই আত্মা। হৃদয়, মন, সংজ্ঞান, আজ্ঞান প্রভৃতি সমুদয়ই যখন প্রজ্ঞান, তখন বলিতে হইবে হৃদয়, মন, সংজ্ঞান, আজ্ঞানাদিই আত্মা।

এস্থলে একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। ঋষি বলিয়াছেন হৃদয়, মন, সংজ্ঞান, আজ্ঞানাদি প্রজ্ঞানের নাম। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন—এ সমুদয় সাক্ষাৎ প্রজ্ঞান নহে, এ সমুদয় প্রজ্ঞানের বিকার মাত্র। কিন্তু এ অর্থ আমাদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। ঋষি বলিয়াছেন "এ সমুদয় প্রজ্ঞানের নাম।" কোন্ সমুদয় প্রজ্ঞানের নাম ? উত্তর—হৃদয় এবং মন অর্থাৎ সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম এবং বশ এই সমুদয়। সংজ্ঞানাদি ১৬টির মধ্যে প্রজ্ঞানেরও নাম রহিয়াছে। যদি বলা হয় ঐ ১৬টির কোনটিই সাক্ষাৎ প্রজ্ঞান নহে, প্রত্যেকটিই প্রজ্ঞানের বিকার, তাহা হইলে দাঁড়ায় এই ঐ ১৬টার মধ্যে যে 'প্রজ্ঞান' রহিয়াছে সেই 'প্রজ্ঞান'ও প্রজ্ঞানের বিকার। ইহা নিতান্তই অর্থশূন্য সিদ্ধান্ত। আমাদিগের মনে হয় এখানে বিকারবাদের কথাই উঠে নাই। ঋষির বলিবার উদ্দেশ্য এই যে সংজ্ঞানাদি ১৬টিকে সাধারণ ভাবে প্রজ্ঞান নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রজ্ঞান বলিলে সংজ্ঞানাদি প্রত্যেকটিকেই বুঝা যাইতে পারে। সংজ্ঞান বিজ্ঞানাদি ১৬টি যে সম্পূর্ণরূপে এক তাহা নহে। রাম, শ্যাম, যদু সকলেই মানুষ, তাই বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ইহারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে এক। সংজ্ঞান বিজ্ঞানাদির বিষয়েও এই প্রকার। ইহাদিগের কোন দুইটিই সম্পূর্ণরূপে এক নহে; তবে সাধারণ ভাবে ইহাদিগকে 'প্রজ্ঞান' বলা যাইতে পারে। অপর নাম না

দিয়া ঋষি কেন 'প্রজ্ঞান' নাম দিলেন, তাহা বলা কঠিন। ঋগ্বেদের অপরাপর শাখায় প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞান শব্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সম্ভবতঃ সেইজন্যই ঋষি এস্থলে 'প্রজ্ঞান' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। 'প্রজ্ঞান' শব্দের প্রাধান্যের জন্য সম্ভবতঃ ঐ ১৬টিকে সাধারণ ভাবে প্রজ্ঞান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে এই ১৬টি একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক্ বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সম্ভবতঃ ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। বিকারবাদের অনেক অর্থ। পূর্ব্বোক্ত অর্থে যদি কেহ ইহাকে বিকারবাদ বলিতে চাহেন, বলিতে পারেন।

সুতরাং ঐতরেয় উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে (১) ইন্দ্রিয়াদি আত্মা নহে, (২) হৃদয়, মন, সংজ্ঞানাদি একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এ সমুদয়ের সাধারণ নাম প্রজ্ঞান এবং এই প্রজ্ঞানই আত্মা।

অপরাপর উপনিষদের মত পর প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

রসসৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ললিতকলার অন্যতম ক্ষেত্র কাব্য-কলায় একবার দেখা যাক এই স্তর-বিভাগ কি রকমের ধারা পেয়েছে।

যেদিন কবিরা দুনিয়ার বাইরের দিকে দেখেছেন, receptive মাত্র হয়েছেন, ততদিন কবিতা ও কলাকে চাক্ষুষ বা শ্রাব্য মাধুর্য্যে অনুসিক্ত করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলি, এই ভিতর-বাহির কথাটি আমি ব্যবহারিক দিক্ থেকেই বল্‌ছি। যাকে sensation বলা হয় তারই বিচিত্রতার জন্য নানারকমের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মানুষের চিত্তশায়ী যে অনাদিত্ব প্রতিমুহূর্ত্তে দেশকালের বন্ধনের ভিতর আপনার ঐশ্বর্য্যে শিহরিত হচ্ছে তা মানুষকে আহ্বান করেছে—তারও ডাক মানুষ শুনেছে এবং তাতে মগ্ন হয়ে দুনিয়ার সব বস্তুতত্ত্বের সীমাকে উপেক্ষা করে' তাকেও প্রকাশ করতে চেয়েছে। যেখানে তা পারেনি সেখানে সে কবিতা ও কলাকে মন্ত্রস্থানীয় বা রূপকস্থানীয় করেও অগ্রসর হয়েছে, নিরস্ত হয়নি। ক্রমে ক্রমে কবিতা ও কলা সে পথে এসেছে।

ঔপন্যাসিক গঁকুর (Goncourt) বল্‌তেন সাহিত্যে অপেরা-গ্লাসের মত একটা কিছু আবিষ্কার করাই মস্ত কাজ। তিনি ও তাঁর ভাই তা করেছেন এবং সমসাময়িক যুবকেরাও তা তাঁদের কাছে পেয়েছে। সে জিনিষটার ভিতর দিয়ে যারা দুনিয়াকে দেখ্‌বে তারা উত্তরোত্তর অদ্ভুত ও অভিনব অনুভূতিতে (sensation) মত্ত হয়ে উঠবে। এজন্য বস্তুর দোহাই থাকলেও তাঁদের দুনিয়া বস্তুগত হয়নি। Zolaর মতে যাকে মেজাজের ভিতর দিয়ে রঞ্জিত হয়ে ওঠা বলে তাই হয়েছে। Sensationকে তীক্ষ্ণ শাণিত ও খরতর করে' যাতে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় তার জন্য অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য জিনিষ ঘেঁটে ঘেঁটে বের করা হয়েছিল। কিন্তু এরকমের ব্যাপার একটা সাময়িক নেশা মাত্র সঞ্চার করে। হাশিস্ পান করে' যেমন দুনিয়াতেও ইন্দ্রলোকের ঐশ্বর্য্য ও রূপরসগন্ধগীতের ঝঙ্কার দেখা শোনা যায়, এ যেন তেমনি। অনেক জাপানী চিত্রকরের সম্বন্ধে শোনা যায় যে তারা মদিরা পান করে' কিছুকাল বাঁশী বাজাত, তার পর রচনা সুরু করত। এ-সমস্তের ভিতরে একটা স্থায়ী ও স্থির রস পাওয়া দুরূহ—ইন্দ্রিয়কে পীড়িত করে' যে নেশা হয় সেটা নেহাৎ সাময়িক।

এরকম করে' য়ুরোপের সাহিত্যিকরা অগ্রসর হয়েছে। Zolaর রচনায় ঘটনার একটা আদ্যন্ত আছে, অন্ততঃ ঘটনা আছে; কিন্তু গঁকুরেরা যা কিছু অসম্ভব ও অলক্ষ্য তাই নিয়ে মত্ত হয়েছেন। আবার হুইস্‌মাঁতে (Huysmans) কোন ঘটনা বা চরিত্রও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কোনও লেখক বল্লেন,—

His stories are without incidents, they are con-

structed to go on until they stop, they are almost without characters. His psychology is a matter of sensations and chiefly the visual sensations.

এরূপে যাকে ডেক্যাডেণ্ট্ সাহিত্য বলা হয় তা প্রচুর ঐন্দ্রিয়িক খাদ্য জোগাড় করেছে। ভাষাকে আশ্চর্য্য ভাবে প্রাণবান্ ও পুষ্ট করে' এক অপরূপ বিশিষ্টতা দিয়েছে,—যাতে করে' তা মানবিক সম্পর্কের হিল্লোলের সহিত তাল রক্ষা করতে পারে।

কিন্তু মানস রাজ্যের আরও নিগূঢ় জায়গায় উপস্থিত হলে দেখা যায়—ভাষায় যেন সে গভীর জগৎকে প্রকাশ করা যায় না, ফরাসী এ যুগের Symbolistদের বা রূপক কবিদের ডাক পড়েছিল কাব্যসাম্রাজ্যের এই অবস্থায়। ইটসের নাম আপনাদের সুপরিচিত, তিনিও Symbolistদের অন্যতম। ম্যালার্মে ও ভেয়ারলেন অনুভূতির রাজ্য ছেড়ে শেষটা গভীর অধ্যাত্মরাজ্যে চলতে থাকেন।

ভেয়ারলেনের প্রথম লক্ষ্য ছিল—মানস অনুভূতিকে স্থিরভাবে রূপ দেওয়া—Sincerity and the impression of the moment followed to the letter. তিনি বাইরের ঘটনার পেছনে ঘুরে ক্লান্ত হননি। কবি আত্মপ্রত্যয়ের ভিতর দিয়ে বিশ্বের গভীর অধ্যাত্ম সম্পর্কে আসতে চেষ্টা করেছেন এবং কবিতায়ও তার রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। ভাষাকে এজন্য ঝঙ্কারে পরিণত করতে হয়েছে—একেবারে বস্তুনিরপেক্ষ করতে হয়েছে—এমন কি অনেক জায়গায় অস্পষ্ট করতেও হয়েছে। "It is an attempt to spiritualise literature from the old bondage of rhetoric—the old bondage of exteriority." এ হচ্ছে কোনও বিখ্যাত রসবিদের মত।

যেমন চিত্রে তেমনি কাব্যে, কলার উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দনের ভিতর দিয়ে করতে হয়। যারা বিশুদ্ধ "রূপকে" গেছে তারা আর্টের বাইরে গেছে।—কিন্তু যেমনি চিত্রে তেমনি কাব্যে, সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই বাধ্য হয়ে উপকরণের অমোঘতাকে অটুট রাখতে হয়েছে; এজন্য চিত্রের বা কাব্যের ভিতর যে ইন্দ্রিয়- বা রস-সম্পর্ক, তা pure abstract অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে। কাজেই রসার্থীরা বলেন, ভেয়ারলেনের মনের তাঁতে রূপ ও অরূপ জগৎ একসঙ্গে বোনা হয়ে যেত। প্রসঙ্গতঃ বলতে হয়, এ শ্রেণীর কাব্যে এদেশের রবীন্দ্রনাথের রচনার তুলনা কাব্য-সাহিত্যে পাওয়া কঠিন। ক্রমশঃ পশ্চিমে রসজ্ঞদের বলতে হল—বস্তুজগৎকে ঠিক করে' রচনা করতে হবেই—সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম স্বভাববাদের বা Spiritual naturalism-এর পথও কাটতে হবে।

কিন্তু "well-diggers of the soul" হতে গিয়ে অনেকে বকধার্ম্মিকও হয়ে পড়েছে, অনেকে মিষ্টিকও হয়েছে। যখনই কলা ও কাব্য অধ্যাত্ম বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করেছে তখনই বিনাশ এসে জুটেছে। যারা Symbol-এর আশ্রয়কে বড় করে' তুলেছে তারা কবি হিসেবে ছোট হয়ে পড়েছে।

কিন্তু স্বপ্নের বিষয় চিত্রেই হোক বা কাব্যেই হোক্ ভিতরের মূলের অধ্যাত্মগত হলেও বাইরের ভাষাগত বা চিত্রগত বৈচিত্র্য কেউ ত্যাগ করেনি, কারণ ইন্দ্রিয়কে ছেড়ে আর্ট হয় না, অতীন্দ্রিয়ের হিং-টিং-ছট্ আর্টের বাইরের জিনিস। ললিতকলার আহ্বান রূপরসগন্ধের ভিতরেই নিহিত। এজন্য এ-সব কবিরা ছন্দের ও ভাবের লালিত্য ছাড়েননি। Severini বা Kandinskyর মত চিত্রকরও রূপলীলার decorative বা আলঙ্কারিক ধর্ম্ম চিত্রপ্রসঙ্গে ভোলেননি। ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাখ্যান করার দুঃস্বপ্ন যেখানে হয়েছে সেখানেই আর্ট আড়ষ্ট ও দারুভূত হয়ে গেছে। যারা অধ্যাত্মতাত্ত্বিক একটু বেশী, যারা দুনিয়াতে ইন্দ্রিয়াতীতের রূপক না দেখে পারে না, তাদেরও কলা ও কাব্যের খাতিরে এই রূপসম্পর্ক রাখতে হয়। A. E.র কবিতা, এন্ড্রিয়েফের নাটক, Archipenkoe-র ভাস্কর্য্য, Kandinskyর চিত্রকলা তার নমুনা। আইরিশ কবি A. E.র কাব্যে অধ্যাত্মপ্রসঙ্গে রূপলোকের নানা লীলা দীপ্যমান হয়েছে। মেতরলিঙ্ক 'সেয়ারস্যাঁদে' যে রকম উগ্র ও প্রখর ইন্দ্রিয়সম্পর্কে পীড়িত হয়েছিলেন, শেষ যুগের আধ্যাত্মিক নাটকে তেমনি স্থলচর্ম্মী ও ভোগী হয়ে পড়েন। কারও মতে মেতরলিঙ্কের কাব্য-কলার অধঃপতনও এরকমের সুলভ রূপক ও স্বাচ্ছন্দ্যের তরল ভাবুকতা হতেই হয়েছে। "His genius was killed by happiness—his doom as an artist

was sealed when he gave up dreaming in order to live." মেতরলিঙ্কের সবচেয়ে কঠোর সমালোচক Dumont-Wilden স্পষ্টই বলেছেন মেতরলিঙ্কের Philosophy without tears-এ রসসম্পর্ক নেই। তার ভিতর বৈপরীত্যের মিলনও নেই, যা সুখকে গভীর করে' দুঃখের স্পর্শে। কলার হিসাবে রূপসম্পর্ক ও রস-সম্পর্ক সামান্য ও নগণ্য হয়েছে বলেই উচ্চদরের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত করেও মেতরলিঙ্ক লোকের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেন নি, এজন্য তা স্বাদহীন হয়েছে। "He offers a shadow of the divine to those who have resolved to dispense with the divine."

ডেক্যাডেন্ট্ কাব্য ও আদর্শ মানুষের চিত্তকে বেদনায় উৎখাত ও আলোড়িত করে। রূপরসগন্ধ-পুরী যেন সে বেদনায় রক্তিম ও করাল উত্তেজনায় উদ্ঘাটিত হয়। ভেয়ারহেয়ারেনের Trilogyতে বেদনার অসীমতা মানুষকে ইন্দ্রিয়-জগতে মথিত করে' কোথায় নিয়ে যায় তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—মানুষ যেখানে বন্ধন হতে বিদ্রোহী হয়ে মুক্তি চায়, সমস্ত sensation যার কাছে রুদ্রমূর্ত্তি ধরে' এসে পড়ে, আলোক অন্ধকার হয়ে যায়, আকাশ কাল হয়ে উঠে। একটা কবিতায় আছে :—

"I worked myself unto sadness of ink, into rages of gimlets through a thousand metals, not only my eyes, but my ears, my sense of touch, of taste, my whole body was fortune to me. I felt acids under my tongue and thorns under my nails......I did not dare to look at myself in the mirror."

কোন আলোচক এ প্রসঙ্গে বলেন :

"He has measured all the deeps of the spirit but all the words of religion and science, all the elixirs of life have been powerless to save him from this torment. He knows all sensations and there was no greatness in any of them."

উগ্র ইন্দ্রিয়-জগতের মন্থনে যে হলাহল উঠে তা পান করলে এ রকম অবস্থাই হয়। কিন্তু তার পরেই আসে বন্ধন হতে মুক্তির বাণী, বেদনার উৎস হতে আনন্দের সহস্রধারা। জীবনের ঐন্দ্রিয়িক সম্পর্কের ওকূলে আছে ধাতার চিন্ময়মূর্ত্তি; যেদিকে আগ্রহে symbolist কবি ও চিত্রকরেরা কতবার ছুটেছে।

জর্ম্মন সমালোচকেরা ভেয়ারহেয়ারেনের ভিতর নীট্‌সের Supermanএর প্রতিমা পেয়েছেন। তাঁরা বলেছেন এই ত মহত্ত্ব, এই ত হচ্ছে 'will to suffer'!

প্রসঙ্গ-ক্রমে বল্‌তে হয়, এই Supermanএর স্বপ্ন বা অতিমানব-কল্পনা য়ুরোপের জীবন-তত্ত্বে ও আর্টে একটা অনিবার্য্য সুর। বলেছি, মানুষের অবতারবাদ,—যেখানে দেবতাকে বিশ্বাস করা হয়েছে—সেখানে চল্‌তে পারে। কারণ দেবতা মানুষ হলে সে যদি ইন্দ্রিয়-জগতে এসে পড়ে তাতে মানুষেরই জয় ও আনন্দের কারণ হতে পারে, কিন্তু মানুষ যেখানে দেবতার ধার ধারে না সেখানে কোন মানুষকে দেবতাস্থানীয় করলে তা দুঃসহ হয়ে উঠে, মানবত্ব তাতে আঘাত পায়। এজন্য য়ুরোপের সাহিত্যে মানুষ যেখানে বড়-রকম কিছু করতে চেয়েছে অনেক সময় তাকে অনেকটা ক্ষ্যাপা বা ঐন্দ্রজালিক বা ওরকম কিছু করে' তৈরী করতে হয়েছে। গ্যেটের ফাউষ্ট্, সেক্সপিয়ারের হ্যাম্‌লেট, বাইরনের ম্যান্‌ফ্রেড্, ইব্‌সেনের ব্রাণ্ড, বিঅর্ণসনের ওভারইভনে হচ্ছে তার নমুনা।

কিন্তু নীট্‌সের বা তাঁর সমসাময়িক অতিমানব কল্পনার পশ্চাতে তত্ত্ব রয়েছে, রস রয়েছে, এমন কি জাতীয় প্রতীতিও রয়েছে। য়ুরোপের আর্টের কুড়ি-বছরের ইতিহাসকে এ তত্ত্ব আলোড়িত করে। বিখ্যাত হ্যান্‌ষ্টিন তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন।—ব্যক্তিতান্ত্রিক দল প্রথম কোলাহল করে' বললে, কবিতা লিখ্‌লে চল্‌বে না, শুধু নাটক ও উপন্যাস লিখ্‌তে হবে; এমন নিখুঁতভাবে তাতে সামাজিক চিত্র দিতে হবে যেমনভাবে ফটোগ্রাফের সূক্ষ্ম নেগেটিভে ছবি ওঠে। কোন লেখক তার উল্লেখ করে' বলেছেন :—

Their lenses were wrongly adjusted so that the injustice of the world appeared to them more unjust than it is and its filth still more filthy.

তারপর এল ভদ্র ও সৌখীনদের realism বা বাস্তবতা, যারা ইতরের দুঃখ দেখে' তামাসা করেছে।

After these cave men, the Troglodytes who went

delving into the moral sewers and backyards of humanity, came other aristocratic realists. In the place of tragic slum-drama came the light salon satire.

তারপরই এল নব্য রম্যবাদীর সৌন্দর্য্যধারা। জার্ম্মানীতে হাউপ্ট্মান এই অতিমানবকে কল্পনা করলেন 'artist বা শিল্পীরূপী 'হেনরিক' Henrich চরিত্রে। শিল্পীরূপে এই অতিমানব, আদর্শের খোঁজ করে' আত্মত্যাগ করলে। Zolaর His Masterpieceএ কতকটা এ ভাবটি আছে। কিন্তু বলেছি মানবত্বকে অতিক্রম করার কল্পনাটিই উরোপের পক্ষে দুঃসহ। অন্ততঃ একটা মানসিক যন্ত্রণার ভিতর না গিয়ে এ নূতন theory উরোপ নেয়নি। এজন্য ফষ্টলাস নাটকে সুপারম্যান বা অতিমানবকে ডাক্তারের চেহারা দেওয়া হয়েছে এবং একটি লক্ষাধিপতির মেয়ের খাতিরে জেলের মেয়েকে ত্যাগ করে' অতিমানবত্ব-প্রত্যাশী নায়ক কি করে' অদৃষ্টের কশাঘাতে শাপগ্রস্ত হয়েছিল দেখান হয়েছে। উইলব্রাণ্ট এড্লার চরিত্রে অতিমানবকে প্রচারক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রূপে দাঁড় করিয়েছেন, এবং শেষটায় তাকে জনতা ও সাধারণের ধিক্কারের বিষয়ীভূত করে' দেখিয়েছেন, এ যুগে সুপারম্যান হওয়া চলে না, এ যুগে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন ও কশাঘাত অতি রুক্ষ ও কঠোর, তার বাইরে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন যেন কেউ না দেখে।

চিত্রকলার বিখ্যাত জর্ম্মন শিল্পী Klinger এই অতিমানবত্ব উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন নানা কল্পনার ভিতর দিয়ে। এই অতিমানবত্বের ধারা সুইডেনে পাওয়া যাচ্ছে ষ্ট্রিণ্ডবার্গের ভিতরে, যাঁকে neurasthenic genius বলা হয়েছে। ইতালীর দান্নুন্জিও এ পথের পথিক। কিন্তু ইতালীর জলবায়ুতে প্রেম ও কলা ছাড়া জীবনের বহুমুখী জটিলতার ভিতর অতিমানবের আদর্শকে আনা সম্ভব হয়নি। ফরাসীরাও মানুষের এই সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাকে সযত্নে পোষণ করেছে। মোপাসাঁর "বেল্ আমি" Bel Ami প্রভৃতিতে এরকমের একটা ব্যাপ্তির কল্পনা আছে। রোদাঁর শিল্পও বাস্তবের নিগড় ভেঙ্গে এই আত্যন্তিকের অনুপ্রেরণায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে। ইংলণ্ডের বার্ণার্ড শয়ের ঝুলির ভিতর এই কল্পনার চিত্র পাওয়া যাবে। এইরূপে চারিদিকেই উরোপ ইন্দ্রিয়ের সীমা ভাঙতে চেয়েছে। পুরাণ উপায়ের সংস্কারের বাঁধা-পথে সৈনিকদের মত না চলে' সমস্ত ভেঙেচুরে একটা উচ্চতর জীবন রচনা করা উরোপের কাম্য হয়ে পড়েছিল এবং সে উচ্চতর জীবন-সঙ্গম যে কি করে' হতে পারে তা ভেবে উরোপ আকুল হয়েছিল। সে জীবনের সংস্পর্শের জন্য উরোপের আকুলতা সকল সীমা ছাড়িয়ে যেতেও চেয়েছে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়জগৎ ছাড়লেই অতীন্দ্রিয়জগৎ হাতের মুঠিতে আসে না। এজন্য অনেকের transcendentalismও বিলাসস্থানীয় হয়েছে। পশ্চিমের অতীন্দ্রিয়-পন্থীরা এজন্য রুগ্ন ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। কাজেই উরোপের পক্ষে will to suffer-এর আদর্শ সব-চেয়ে লোভনীয় হয়েছে। দুনিয়ার দুঃখকে যদি অতিক্রম করবার ক্ষমতা না থাকে, অতটা যীশু-সুলভ অধ্যাত্ম প্রেরণা যদি কারও না থাকে, ভগবানে নিবিড় আত্মসমর্পণে অপরূপ সান্ত্বনা যদি সম্ভব না হয়, তবে দুনিয়াকে দেখাতে হবে অদৃষ্টের প্রলয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টিকে মানুষ মানুষরূপে কি রকমে তুচ্ছ করতে পারে—ইন্দ্রিয়ের দাবানলের মাঝেও বেদনায় বিদ্ধ হয়ে তাকে মানবে না বলে' উদ্যত যমদণ্ডের বিভীষিকা সে প্রমিথিয়সের মত কি করে' ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে সহ্য করতে পারে! কোন পারলৌকিক বা আধিভৌতিক সহায়তা সে চায় না, তার গর্ব্বিত চিত্ত উৎখাত ও দীর্ণ হয়েও নত হবে না—এ হচ্ছে তার will! উরোপে প্রাকৃতবাদের সীমা এখানে এসে দাঁড়ায়! এখানেই ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করার প্রশ্ন ওঠে।—অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের সুদূর ছায়া এ সন্ধিস্থলেই এসে পড়ে। প্রফেসর Lichten Verger আধুনিক উরোপের মনের অবস্থা উল্লেখ করে' বোধ হয় এ ভাবটিকেই সমর্থন করেছেন:—

"Some took refuge in an intellectual epicureanism which enjoyed the spectacle of the world without taking it too seriously. Others arrived at a kind of contemplative asceticism......Others finally preached action—constituted themselves into professors of energy."

সৌন্দর্য্য ও রসতত্ত্ব আলোচনায় অধ্যাত্মজগতের বন্ধুর-পথে যাওয়া সম্ভব নয়? অতীন্দ্রিয়ের উৎস থেকে যতটুকু কণা রূপরসগন্ধের অঞ্চলে ক্ষরিত হয়ে পড়েছে রসার্থীরা ততটুকুই আলোচনা ও উপভোগ করতে পারে। যেখানে ইন্দ্রিয়-সম্পর্ককে নিষ্পেষিত করে'—লৌকিক ও ধর্ম্মগত শাসন তাকে পঙ্গু করেছে, কলালক্ষ্মী সেখানে শীর্ণ হয়ে গেছে—বন্দিনীর ন্যায় রমণীয় উপবনে নিহিত হয়েও অশ্রুবর্ষণ করেছে। সৌন্দর্য্যের মোহকে ঠেকান হয়েছে ভোজের রাজ্যে কঙ্কাল-যষ্টির কুহকে। ইতিহাসে বার বার এরূপ ঘটেছে!

প্রাথমিক খৃষ্টীয় আর্টকে এরূপ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। গ্রীক ও রোম্যান মিথলজির অপূর্ব্ব দেববাদ—Judaism সংস্পর্শের জন্য—খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে নি। কোন লেখক অতি সংক্ষেপে বলেছেন—

"The abraxas mysteries, occult mottoes of the Gnostics, the limited symbols of the Christians such as the fish, the anchor and the ship were but a poor substitute for the pagan mythology."

খ্রীষ্টধর্ম্ম ক্রমশঃ উগ্র ভোগবাদী উরোপীয় জাতির জন্য গ্রীক ও রোম্যান টাইপ হতে যীশু ও সাধুদের মূর্ত্তি রচনা করতে থাকে। কিন্তু পাছে কলার লালিত্য ইন্দ্রিয়কে লুব্ধ করে' অধ্যাত্মদৃষ্টিকে প্রচ্ছন্ন করে, এজন্য সমস্ত চিত্র ও মূর্ত্তি প্রভৃতি হতে ইচ্ছা করেই লালিত্য দূর করে' দেওয়ার শাসন হয়েছিল।

"Flesh is death ; spirit is life and peace. If ye live after the flesh ye shall die; but if ye through the spirit do mortify the deeds of the body ye shall live."

মরে' বাঁচার এই অদ্ভুত প্রহেলিকা খৃষ্টীয় বিধি উরোপে উপস্থিত করেছিল এবং যীশুরূপী দেবতাও কি করে' ক্রুশে মরেও বেঁচেছিলেন এই তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে সমগ্র খ্রীষ্টীয় চার্চের শাসন-ব্যবস্থা জীবন হতে রস ও সৌন্দর্য্য লুণ্ঠিত করতে উৎসাহিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চার্চ মানুষের শরীর পাপের আধার, রূপরসের ছায়াও স্পর্শ করতে নেই, এ রকমের একটা অত্যুক্তির ধ্বজা তুলে য়োরোপকে চমকে দেয়।

ক্রমশঃ এই খৃষ্টীয় আদর্শ প্যাগ্যান টাইপও গ্রাস করতে সুরু করলে। আর্টকে পঙ্গু করেও ছাড়তে পারেনি—ওখানেই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের জয়—ওখানে প্রমাণিত হয় রসজগৎ তুচ্ছ নয়, লীলারূপী প্রতিভাসে তাও অনাদ্যনন্ত ও অসীম। খৃষ্টকে ক্রমশঃ এই আর্ট অতি কুৎসিত শীর্ণ, রুগ্ন ও বিষণ্ণ করে' আঁকতে লাগল। তারা ভাবলে শরীরকে বীভৎস করলেই আত্মার মহিমা বেড়ে যায়, ইন্দ্রিয়কে দলিত করলেই অতীন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা করা হয়; আর কোন ল্যাঠা এ পথে নেই। Ravennaতে St. Nazarus ও Celsusএর যে গির্জ্জা আছে তাতে পঞ্চম শতাব্দীর একটি মোজেয়িক চিত্র আছে যাতে ভেড়াগুলিকেও বিষণ্ণ ও জীর্ণ করে' আঁকা হয়েছে, যেন দুনিয়ার উপর তারা নেহাৎ অপ্রসন্ন হয়ে আছে। মধ্যযুগের ছোট ছবিতে, দেয়ালের অঙ্কনে, জানলার রঙীন কাঁচে সমস্ত শারীর-লালিত্য দূর করে' দেওয়া হয়েছে! তার চেয়ে আরও বেশী করা হয়েছে :—

"Three hundred and thirty-eight bishops pronounced and subscribed a unanimous decree that all visible symbols of church except the Eucharist were either blasphemous or heretical."

অবশ্য কলাব্যবস্থা একেবারে উঠে যায়নি। এরকম হুকুমেও পরবর্ত্তী রাজারা আবার ধর্ম্মপ্রচারে কাব্য ও কলার সহায়তা গ্রহণ করে।

কিন্তু শিল্পী তবুও স্বাধীন হ'তে পারে নি। অষ্টম শতাব্দীতে পাদ্রীদের যে নিশিয়ান কৌন্সিল হয়, তাতে স্থির হয় যে ছবি আঁকবার ফরমায়েস পাদ্রীরাই করবেন—তাঁদের নির্দ্দিষ্ট হুকুম-মতে ছবি আঁকতে হবে—চিত্রকরদের স্বাধীনতা তাতে খুব সামান্যই থাকবে :—

"The fathers of the Catholic Church would be responsible for the pictorial conceptions of Biblical subjects and not the artists."

এত রকমে বাঁধবার চেষ্টা করেও কলালক্ষ্মীকে মানুষের হৃদয়ের শতদলাসন হ'তে বঞ্চিত করতে কেউ পারে নি। আর্কনা প্রভৃতি শিল্পীরা শেষটা কোন রকমে চিত্রপটে মানুষের মূর্ত্তিটি ছোট করে' এঁকে চারিদিক লতা পাতা ফুলের নানা বর্ণের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্যে ভরপূর করতে সুরু করলেন। কারণ আসল ছবিতে কোন রকমের পরিবর্ত্তনের অধিকার তাঁদের ছিল না।

যেন ক্রমশঃ এই-সমস্ত সমুজ্জ্বল বর্ণকলাপের ভিতর মানুষের চেহারা অতি তুচ্ছ হয়ে পড়ল। কোন লেখক বলেন :—

"It seems positively to ring with gold. Massed halos of the precious metals convert the faces of the people into mere decorative discs of colour!"

যারা আদিম চার্চের বন্ধন মেনেছে তারা এমনি করে' চারিদিকে এক রসজগৎকে ফুলপল্লবে ফুটিয়ে তুলেছে, কারণ তারা মূল ছবিটিকে ছুঁতে পারে নি। Fra Angelico, Fra Fillipo Lippi, Botticelliতে এ রকম ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। যে-সমস্ত রেনেসাঁস শিল্পী পাদ্রীদের হুকুম মানেন নি তাঁদের ছবিতে এ-সব বাইরের কোন উপকরণই পাওয়া যাবে না, কারণ তার দরকার ছিল না। মাইকেল এঞ্জেলো, টিশিয়ান প্রভৃতিতে এ-সমস্ত বাজে ক্ষুদ্র অলঙ্করণ নেই বললেই চলে। যেখানে তা আছে তা' ভিতরকার মানুষের ছবি সম্পর্কে একান্ত যৎসামান্য স্থানমাত্র অধিকার করেছে।

এরূপেই এ রকমের চিত্রের ভিতর দিয়ে শিল্পীরা নব নব রূপমাল্য অর্পণের কৌশল, যাকে Aesthetic Forms বলতে পারি—নিহিত করে' ক্রীড়া করেছেন। কিন্তু বিবাদ অপর দিকেও আছে। ধর্ম্মশাসন যখন বিধিবদ্ধ সীমার ভিতর এনে মূর্ত্তিকে আরাধ্য অর্থাৎ পূজ্য বা iconolatrous করে' তোলে তখন যেমনি ভাবে তা আড়ষ্ট অচপল ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, তেমনি যখন সামাজিক বা সাধারণ বস্তুগত রূপের ফটোগ্রাফিক বাঁধনে কলা বা কাব্য এসে পড়েছিল তখনও তা মরে' গেছে, কলের জিনিষ হয়ে পড়েছে। তাতে শিল্পীর স্বচ্ছন্দ-লীলা সম্ভব হয়নি এবং যে জাতি এরকমের নিম্নস্তরের শিল্পে নোঙর ফেলে চিত্তকে বেঁধেছে সে জাতিও জগতে টিকতে পারেনি। গ্রীক জাতি হচ্ছে তার নমুনা। গ্রীক জাতি শিল্পরচনাকে এমন একটি সুরে বেঁধেছে যে তা কোন রকমে বিচিত্র ও হিল্লোলিত হতে পারেনি। এদেশের শিল্প নানা অবস্থার ভিতর নিজের স্বচ্ছন্দ গতি বজায় রেখেছে বলে জাতিও বেঁচে আছে, শিল্পও উত্তরোত্তর আশ্চর্য্য রচনায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। এদেশের শিল্প সাঁচিস্তূপ মথুরা ও বরহুটের রচনায় পর্য্যবসিত হয়নি, তার উগ্র জীবনবন্যা মধ্যপথে গান্ধার-শিল্পকে পেয়ে বিপর্য্যস্ত ও রূপান্তরিত করে' ফেলে। গুপ্ত সাম্রাজ্যে আবার তা নব রূপে দেখা দেয়। অনুরাধাপুরে শ্রীগৃহেও অশ্রান্ত ভাবে তা লীলায়িত হয়। অজন্তায় ও উড়িষ্যায় যেমন চিত্রে, তেমনি এলোরা প্রভৃতি জায়গায় ভাস্কর্য্যে তা' পূর্ণতেজে অগ্রসর হয়। লঙ্কায় ও রাজপুত শিল্পে যে ধারা প্রবহমান থাকে, নেপাল ও তিব্বতে তা' মন্ত্রযান ও বজ্রযানের বিচিত্র দেববাদে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠে। বিধি এদেশে ছিল, মহাপুরুষলক্ষণ ও ললিতবিস্তর প্রভৃতিতে আছে, কিন্তু তা Canon of Polycletesএর মত ধর্ম্ম বা শিল্পের পথে ঐরাবতের মত দাঁড়ায়নি! এদেশের ভক্তি ও রসসম্পর্কের গঙ্গাস্রোতকে ভগীরথের মত রসশিল্পীরা শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের ভিতর সমুদ্র-সঙ্গমে এনেছে। সমস্ত জীর্ণতা নূতন পত্রপুষ্পে ভরে' উঠেছে, কঙ্কালসার মানবজীবনও আবার নবজীবন ও যৌবন লাভ করে' নূতন পুলকে উজ্জীবিত হয়েছে।

গ্রীক শিল্প সেই যে এক-জায়গায় আটকে গেল আর তার পর মাথা তুলতে পারলে না। গ্রীক জাতিরও তাতে অধঃপতন হল। কোন লেখক এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে গ্রীক শিল্পের একটা ঘোড়ার মূর্ত্তির শুধু মাথাটি আছে। তিনি পরীক্ষা করে' দেখেছেন, বৃদ্ধ যুবা বালক সহিস রাষ্ট্রবিশারদ বা ধর্ম্মপ্রচারক সকলেই সমান ভাবে মূর্ত্তিটিকে প্রশংসা করে। এই দুহাজার বছরের পরবর্ত্তী উরোপীয় জনতার সঙ্গে গ্রীক মনের কোন রকম সাদৃশ্যই কল্পনা করা যেতে পারে না। অথচ তারাও তাকে ভাল বলছে। এর মানে হচ্ছে এটা এমন সাধারণ স্তরের জিনিষ যে তাতে শিল্পীর লীলা-বিভ্রম অতি যৎসামান্যই হয়েছে; অর্থাৎ গ্রীক চিত্ত নিজেদের কোন হৃদয়-কথা বা বিশেষত্ব এই মূর্ত্তির ভিতর দিতে পারেনি। এটার form বা গঠন নিখুঁত হতে পারে—পরিচিতও হতে পারে—কিন্তু aesthetic তেমন নয়।

কাজেই ইন্দ্রিয়সম্পর্ক যেখানে নাগপাশের মত মনুষ্যকে বাঁধে সেখানে তা লৌহ-জাল হয়ে পড়ে, তার

ভিতর দিয়ে শিল্পী লীলাবিভ্রম সঞ্চার কর্‌তে পারে না।

এ যুগে সায়ান্স্ আর্টের ললিতক্ষেত্রে কলের হাত বাড়াচ্ছে—হুবহু রচনা পরমার্থ হয়ে পড়্‌লে তা' ত হবেই। কলের হাতে ছবি তৈরী হচ্ছে, রঙীন্-ফটোগ্রাফী তার নমুনা;—কলের কণ্ঠে গান শোনা হচ্ছে; কলেতে নাটক অভিনয় হচ্ছে; তা ছাড়া কার্য্যকরী শিল্পের অনেক সম্ভার কলের রুটিনে বাঁধা প্যাঁচে হাবুডুবু খেয়ে মিনার্ভার মত জন্মাচ্ছে; ভাব্‌বার কাজটিও প্রায় যান্ত্রিক হব হব কর্‌ছে; এজন্য aesthetic appeal যে কি জিনিষ তা এ যুগকে ভাল করে' তলিয়ে দেখ্‌তে হয়েছে।—তাতে করে' উরোপে কলা-ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত বিপ্লব হয়ে গেছে!

উরোপকে বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ ছাড়্‌তে হয়েছে—ললিতকলার গভীরতর লীলা-প্রসঙ্গে, কিন্তু তা মরেও মরেনি—তাকে বর্জ্জন কর্‌তেও তারই দোহাই দেওয়া হয়েছে। আইন শাস্ত্রে যেমন Legal fiction বলে' একটা ব্যাপার আছে—যাতে করে' আইনকে, আইন না বদ্‌লাবার দোহাই দিয়ে,—পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুসরণ করা হচ্ছে এরকম একটি উপলক্ষ্য করে' বদ্‌লান হয় - তেমনি উরোপের কলাশাস্ত্রের পক্ষেও একটা দোহাই Artistic fictionএ পরিণত হয়েছে।

বস্তুবাদীরা ভাব্‌লে সৃষ্টিকে ওরা হুবহু ধরেছে। 'প্রির্‍্যাফেলাইটরা' মনে কর্‌লে সৃষ্টিকে ওরা একেবারে পেরেক দিয়ে ঠুকে আট্‌কে ফেলেছে। কোন লেখক বলেন—

"And so far as it was possible as it were to nail nature down, to record her most permanent parts, these Pre-Raphaelites succeeded."

কিন্তু শেষটা তারা দেখ্‌লে তাতে আর্টের কণ্ঠরোধ হয়েছে। হুইষ্‌লার্-প্রমুখ ইম্প্রেশনিষ্ট্‌রা অর্থাৎ ভাব-চিত্রকরেরা যখন আবার নূতন পথে যেতে চাইলে তখনও আবার সেই Realismএর অর্থাৎ বাস্তবতার দোহাই দিয়েই অগ্রসর হ'ল। শিল্পীরা বল্‌লে, ও আবার কি? ওটা একেবারে মিছে। আমরা সৃষ্টিকে অমনি করে' ফটোগ্রাফের মত দেখিনে। আমরা টোনের ভিতরে দেখি, বর্ণস্তরের সমাবেশে দেখি, সেটাই হচ্ছে real সত্য। তারপর চিত্রকলার ধারাই বদ্‌লে দিলে। তারপরে আবার Divisionist বা পোয়াঁতিলিষ্ট্‌রা রঙের ব্যবহারের কায়দাও বদ্‌লালে।

আবার কেউ বল্‌লে, জিনিষের সত্যস্বরূপকে এরা একেবারে ধর্‌তে পারেনি। যে কোন জিনিষই অসংখ্য planeএর সমাবেশ—আমরা যুগপৎ দেখি বলে' ওরকম বোধ হয়। কাজেই জিনিষের স্বরূপকে নানা planeএ বিভক্ত না কর্‌লে তাকে আঁকা হল না। এ হল cubism ও simultaneism। আবার কেউ বল্‌লে, দুনিয়া স্থবিরও নয়, স্থিরও নয়, তা' ত চল্‌তি চাকার মত, তা' ত গতি! কাজেই যে আর্টে এই গতিকে ও বিবর্ত্তিত বর্ত্তমানকে উপস্থিত কর্‌তে পারেনি সে আর্ট অসত্য। এঁরা হলেন Futurist।

এই বস্তুসত্যের খাতিরের দোহাই দিয়ে উরোপীয় চিত্ত বাস্তবিক নিজের aesthetic activity বা সৌন্দর্য্য-প্রেরণারই প্রমাণ দিচ্ছে। নূতন নূতন forms বা আকারকে উপস্থাপিত করে' উরোপ ক্রমশ একটা আশ্চর্য্য ও বিপুল সত্যের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে যা আলোচনার সময় আজকে নেই। সেটা হচ্ছে pure artistic form বা নিছক শিল্পমূর্ত্তিকে সৃষ্টি করা।

বলেছি, এযুগে সৌন্দর্য্যের ডাক এসেছে। ক্রোসের মত তত্ত্বজ্ঞ আজ তারই সম্বর্দ্ধনার জন্য অগুরুচন্দন নিয়ে স্বাগত বলে' দাঁড়িয়ে আছেন। যতই যন্ত্রযুগের নির্ম্মম দংষ্ট্রা দুনিয়ার চিত্তকে ভীতিগ্রস্ত কর্‌ছে, ততই অলক্ষ্য বহু রম্যপথে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী তাঁর স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ মূর্ত্তি গ্রহণ করে' বরাভয়-করে জীর্ণ শুষ্ক হৃদয়ে বসন্ত-পবনের সূচনা কর্‌ছেন। এযুগেই শুধু pure aesthetic বা খাঁটি রসসৌন্দর্য্যের দিক্ যে কি, তা বোঝা সম্ভব হয়েছে—সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করে'—নৈতিক, তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, সমস্ত বোঝা ফেলে' সৌন্দর্য্য- ও রস-গত শ্রীকে পশ্চিমের রসার্থীরা বরণ করেছেন। কবির ভাষায়, বাঁধন যতই শক্ত হয়েছে, ততই বাঁধন ছিঁড়েছে। আজ কলের ও যন্ত্রের জগজ্জয়ী বাঁধন টুটেছে! সৌন্দর্য্য-উপাসকদের যদি জয়ধ্বনি করার সময় কখনও হয়ে থাকে তবে তা আজ!

শুধু তা নয়। আজ ইন্দ্রিয়দের ললিত-সৃষ্টির মাঝেও—রূপরসগন্ধের মাঝেও এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালে আশ্চর্য্য সামাজিকতার সঞ্চার হয়েছে। শোন্‌বার জিনিষের প্রাণকথা চোখের উপর আনা হচ্ছে—চোখে দেখ্‌বার জিনিষও ঝঙ্কারে পরিণত করা হচ্ছে! মধুরবাগিণীকে বহুপূর্ব্বে শিল্পীরা কানে শুনে, চোখে দেখে, রূপ দিয়েছিল। একালে চাক্ষুষ রূপমালাকেও ওয়াগ্‌নার ও ট্রাওস্‌ ঝঙ্কারে পর্য্যবসিত করেছেন। এক ইন্দ্রিয়ের লীলা ইন্দ্রিয়ান্তরে রূপান্তরিত করে' মানুষ তৃপ্ত হচ্ছে। এ রকমের ইন্দ্রজালও কি কখন কেউ কল্পনা করেছে? মধুর কবিতার মূর্চ্ছনাকে চিত্রশিল্পী চিত্রে গড়ে' তুলেছে—নৃত্যশিল্পী নৃত্যের রম্য ও দ্রুতস্পন্দনের মাঝে জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করে' তুল্‌ছে।

সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মান-মন্দিরে এই পরম মিলন ও সামাজিকতা ঘটেছে! এ ইন্দ্রজাল ত সকলের সেরা! শিল্পীর চিত্র, কবিতা, সঙ্গীত এসব ত চিরকাল ইন্দ্রজালই ছিল! হিল্লোলিত-রূপরসগন্ধ-জগৎকে কল্পনার স্বর্ণসূত্র দিয়ে বেঁধেছে শিল্পী গানে, ছবিতে, কবিতায় ও মূর্ত্তিতে।

শুধু তা নয়। সহস্র সৌরলোক সে বাঁধনে পড়েছে—সহস্র রূপলোক সে মায়াসূত্রে জড়িয়েছে। এজন্যই একজন ভাবুক বলেছেন, "কলায় যে ফুল ফোটে, কোন বনে তার তুলনা নেই—আর্টের রাজ্যে যে পাখী ঘোরে, কোন উপবনে তাকে পাওয়া যাবে না—কলা অনেক দুনিয়া ভাঙ্‌ছে ও গড়্‌ছে! কলার রক্তসূত্রে আকাশের চাঁদকে টেনে আন্‌তে পারে!"

আজ নানা বস্তু-সম্ভারকে তা' নিজের অধিকারে টেনে নিয়ে এসেছে। হাজার বছর হয়ে গেছে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের তর্ক, তথ্য ও তত্ত্বে দেশে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হয়েছিল; ক্রমশ তা নিয়মচক্রে পর্য্যবসিত হল, তার পর ঘন কুয়াসায় কোথায় সব মুছে গেল স্মৃতির ফলক হ'তে। কিন্তু এতকাল পরে সুকুমার সৌন্দর্য্যের সীমাহীন টানে আবার তা তিমিরের ভিতর উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় সুস্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছে—আবার নিয়মচক্রের প্রতিভূ ললিতবেগে তিব্বতীয় লামার হাতে ঘুরতে দেখে' আমরা এ যুগে রসাস্বাদে চরিতার্থ হচ্ছি। বহুকালের নিঃশব্দতায় বোধিসত্ত্বগণের মন্দিরে আবার মৃদু মৃদু বন্দনাগীতি শোনা যাচ্ছে—আবার যেন তাঁরা নূতন রূপ নিয়ে এযুগে জেগে উঠ্‌লেন! কোথায় ছিল অগণিত শক্তিমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যকরক:—সংখ্যাহীন 'তারা'র পুলকপ্রাচুর্য্য! ইতিহাসের পাতার ভিতর হ'তে অদৃশ্য অবলোকিতেশ্বর আজ আবার লুপ্ত গৌরবের অধিকারী হচ্ছেন। আজ রসলুব্ধ চিত্ত খুঁজে খুঁজে তিলোত্তমার মত এই-সমস্ত প্রতিমাধারায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করছে। তাতে করে' এ যুগে বজ্রপাণির নিবিষ্টমূর্ত্তি যেন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে—মঞ্জুশ্রী এক হাতে গ্রন্থ অন্য হাতে তরবারি নিয়ে আবার দেশের হৃদয়-মুকুরে পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছেন। নটরাজের অনন্ত নৃত্যও যেন এযুগে শতছন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ছে। পৌরাণিক ইতিহাসের অর্গলরুদ্ধ অন্ধকূপের দ্বার আজ হঠাৎ এই সৌন্দর্য্যের ঘূর্ণিবাত্যায় খুলে গেছে। এ যুগের এ ইন্দ্রজাল ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যাপার।

সৌন্দর্য্য ও রস-তত্ত্বের যে ধারা আজ বিশ্বকে এক করে' তুল্‌ছে—এ কীর্ত্তিও তার! এটা বিশ্বসামাজিকতারই ফল— আবার এই রসচর্চ্চাই 'বিশ্বসামাজিকতা সম্ভব করে' তুল্‌ছে। *

শ্রী যামিনীকান্ত সেন

* সৌন্দর্য্য ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রদত্ত বক্তৃতা।

"মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা যেন ডাকে, আমায় ডাকে।"

চিত্রকর শ্রী সারদাচরণ উকীল

চর্‌কায় সুতা শক্ত করিবার উপায়

সাধারণতঃ তুলার গুণেই সুতা শক্ত ও সরু হয়। ভোটকাপাসের তুলা, যাহার আঁশ লম্বা (Long staple) ও নরম তাহাই চর্‌কায় ব্যবহার করা সুতা শক্ত করিবার সুন্দর উপায়। সচরাচর যে রকম তুলা চর্‌কায় কাটা হইয়া থাকে তাহাতে সুতা বিশেষ শক্ত হয় না এবং সেজন্য মোটা সুতাই কাটা হয়, সরু সুতা টিকে না। এই সুতা আবার তাঁতে টানা দেওয়া কঠিন, ছিঁড়িয়া যায়।

এই সুতায় অতি সহজে মাড় দেওয়া চলে। চর্কার সুতা কাটিবার সময় একটি ছোট বাটিতে কিছু জল ও একটি ভিজে ন্যাকড়া রাখিয়া কিছু কিছু সুতা কাটা হইলে উহা ঐ ন্যাকড়া দিয়া মাঝে মাঝে ভিজাইবে। এরূপ করিলে সুতা কিছু শক্ত হইবে ও টাকু হইতে উঠাইবার সময় ছিঁড়িবে না। ঐ সুতা লম্বা একটা কাঠের খণ্ডে জড়াইবে, কিছু কিছু জড়ান হইলে একটি ন্যাকড়ায় করিয়া বার্লি বা সাগুদানা-সিদ্ধ ঘন জল (যাহা রোগীর পথ্য) ঐ কাঠে-জড়ানো সুতায় লাগাইবে। লাগাইবার কালে এক দিকেই হাত চালাইবে, অর্থাৎ হয় উপর হইতে নীচে অথবা নীচ হইতে উপরে একদিকে চালাইবে। ইহাতে সুতার আঁশ একদিকে ন্যস্ত হওয়ায় সুতা অধিক শক্ত হয়। খুব সরু চরকার সুতায়ও এরূপে মাড় লাগাইয়া সুতা বেশ শক্ত করা যায় এবং ইহা দ্বারা তাঁতে অনায়াসে টান দেওয়া যায়।

শ্রী লোকেন্দ্রনাথ গুহ

মাঝি

চিত্রকর—শ্রী সারদাচরণ উকীল

জয়ন্তী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান—এক প্রকার

অলোকসামান্য রূপবতী বনবাসিনীকে দেখিবার বাসনা দুই ব্যক্তির চিত্তে বলবতী ছিল—বিহারীলাল ও জলালুদ্দীন। বিহারীলালের মনে কোন পাপ ছিল না, কেবলমাত্র কৌতূহল। রমণী কে? কোথা হইতে একাকিনী বনের মধ্যে আসিল? সত্য কি বনবাসিনী, না শুধু ভ্রমণ করিতে বনে আসিয়াছিল? বনে ত কোথাও বাসস্থান নাই, আর রমণী যেই হউক যুবতী, একা এমন স্থানে আসিবে কেন? এই রকম নানা কথা বিহারীলালের মনে হইত, তাহার পরিচয় জানিবার ইচ্ছা হইত। সেই সঙ্গে যে হৃদয়ের একটু চঞ্চলতা হইয়াছিল তাহা নিজের কাছে স্বীকার করিতে চাহিতেন না। জলালুদ্দীনের কেবল কৌতূহল নহে, তাঁহার মনে হইতেছিল—এই রমণীর উপযুক্ত স্থান বনে নহে, তাঁহার অন্তঃপুরে। হইলই বা হিন্দু? স্বয়ং বাদশাহেরা ত হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়া হরমে রাখিতেন। কেহ বা যবনী হইত, কেহ বা হিন্দুই থাকিত। ছলে হউক, বলে হউক, এই রূপসী বনবাসিনীকে তাঁহার গৃহবাসিনী করিতে হইবে। বনের হরিণীকে সোনার শিকলে বাঁধিয়া অন্দরের উদ্যানে রাখিতে হইবে। সুভানল্লা! এমন অওরত মুনসব্‌দারের গৃহ ব্যতীত আর কোথায় শোভা পাইবে?

মৃগয়ার পর অষ্টাহ অতীত হইল। একদিন মধ্যাহ্নের পর বিহারীলাল পুণ্ডরীককে ডাকিয়া কহিলেন, "অশ্বারোহণে ভ্রমণে যাইব। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে, আর কেহ না। অশ্ব প্রস্তুত করিতে হুকুম দাও।"

পুণ্ডরীক বাহিরে রৌদ্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, "বটেও ত! রৌদ্রটা বহিয়া যাইতেছে!" বলিয়া বাহিরে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই অশ্ব দরজায় আসিল। পুণ্ডরীক বেশ পরিবর্তন করিয়া, সশস্ত্র হইয়া হাজির। বিহারীলাল উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, অস্ত্রের মধ্যে তরবারি। তাঁহার বেশ লক্ষ্য করিয়া পুণ্ডরীক মনে মনে বলিল, কোথাও নিমন্ত্রণ আছে। মুখে কিছু বলিল না।

বিহারীলাল বেগে অশ্বচালনা করিয়া বনের অভিমুখে চলিলেন, পুণ্ডরীক ঠিক তাঁহার পশ্চাতে। বিহারীলালকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পুণ্ডরীক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজও কি শীকার না কি?"

"না", বলিয়া বিহারীলাল অশ্বের বেগ শিথিল করিলেন। পুণ্ডরীক তাঁহার পাশে আসিল। বিহারীলাল তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি সেই বনবাসিনীকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি কোন কথা প্রকাশ করিবে না জানিয়া তোমাকে সঙ্গে আনিয়াছি।"

পুণ্ডরীকের ক্ষুদ্র চক্ষু বিস্ময়ে একটু বড় হইল। বলিল, "তাহাকে দেখিয়া কি হইবে? কে, কোন্ জাতি, কিছুই জান না। আর তুমি ত কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে চাও না।"

"এই স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের মত নয়। জাতিতে ক্ষত্রিয়। যদি দেখা হয় তাহা হইলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু বনে ত বাসস্থান নাই।"

"তবে কোথায় খুঁজিবে? হয়ত একদিন ইচ্ছা করিয়া কিম্বা পথ ভুলিয়া বনে আসিয়াছিল, আবার গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার পরিচয়েই বা প্রয়োজন কি? পথে ঘাটে বনে যে-কোন রমণীকে দেখিলেই তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে?"

বিহারীলাল কহিলেন, "আমি কখনও কোন রমণীর সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহি নাই, কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু এ রমণী অপরের মত নয়।"

আবার এই কথা! পুণ্ডরীক বিহারীলালের মুখ দেখিয়া ক্ষান্ত হইল, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

যে স্থানে রমণীকে দেখিয়াছিল তাহার কিছু দূরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, অশ্বকে একটা গাছের ডালে বাঁধিয়া বিহারীলাল পুণ্ডরীককে কহিলেন, "তুমি

এইখানে থাক। আমি অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।"

এবার পুণ্ডরীক রাগিয়া গেল। "তবে আমাকে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

"প্রয়োজন হইতে পারে, এখন নয়।"

"আর তোমাকে একা পাইয়া যদি কেহ তোমার গলা টিপিয়া রাখে?"

বিহারীলাল একটু হাসিলেন। "তুমি কি বিশ্বাস কর এক জন আমাকে হত্যা করিবে? আর কে আমার এমন শত্রু আছে?"

পুণ্ডরীক মুখভঙ্গী করিল। "বনে যেমন তোমার ঐ দেব কি দানব-কন্যা আছেন তেমনি দস্যু তস্কর মহাশয়েরাও এখানে আশ্রয় পাইতে পারেন। এক জন না হইয়া যদি দশ জন হয়?"

"তাহা হইলে তোমাকে ডাকিব।"

"দূরে হইলে আমি কেমন করিয়া শুনিতে পাইব?"

বিহারীলাল পকেট হইতে একটি ছোট রূপার বাঁশী বাহির করিয়া দেখাইলেন।

পুণ্ডরীক কহিল, "তবু ভাল! আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পাইয়াছে।"

বিহারীলাল হাসিলেন; পুণ্ডরীকের কথায় তিনি রাগ করিতেন না।

বিহারীলাল পদব্রজে চলিয়া গেলেন। নিকটে একটা বৃহৎ প্রাচীন বটবৃক্ষ ছিল। পুণ্ডরীক আপনার মনে গজগজ করিতে করিতে তাহার উপর উঠিল। গাছে উঠা বিদ্যায় সে বিশেষ পারদর্শী।

এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বিহারীলাল যে স্থানে বনচারিণী রমণীকে দেখিয়াছিলেন সেই স্থানে উপনীত হইলেন। কেহ কোথাও নাই। রমণী যে সে-দিনও সেই সময় সেই স্থানে থাকিবে বিহারীলাল এমন আশা করেন নাই। তিনি জানিতেন বনে কোথাও বাস-স্থান নাই। তবে যদি রমণী একদিন বনে আসিয়া থাকে তাহা হইলে আর-একদিনও আসিতে পারে। এ দিকে না আসিয়া অন্য কোনও দিকে গিয়া থাকিতে পারে। বিহারীলাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

গাছের উপর বসিয়া পুণ্ডরীক দেখিতেছিল। কখনও বিহারীলালকে দেখা যায়, কখন তিনি বৃক্ষের, কখন ঘনবিন্যস্ত গুল্মলতাদির অন্তরালে অদৃশ্য হন, আবার অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্থানে দৃষ্টিগোচর হন। পুণ্ডরীক অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দেখিতে লাগিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে বিহারীলাল একটা পল্বলের ধারে উপস্থিত হইলেন। তরুশাখা-বিলম্বিত পুষ্পিত লতা জলের উপর দুলিতেছে, পত্র ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জলের ধারে ডাক-পাখী, জলের ভিতর পানকৌড়ি ডুব দিতেছে আবার ভাসিয়া উঠিতেছে। সেই স্থানে বৃক্ষমূলে বসিয়া সেই রমণী! হস্তে অর্দ্ধবিকশিত পদ্মফুল, জলের দিকে চাহিয়া পক্ষীর ক্রীড়া দেখিতেছে।

সেই রমণী কি? বিহারীলাল তাহার পৃষ্ঠদেশ দেখিয়াছিলেন, মুখ দেখিতে পান নাই, কিন্তু রমণী যে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সুন্দরী তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। বিহারীলাল দাঁড়াইলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কেমন করিয়া রমণীর সম্মুখে যাইবেন, কেমন করিয়া কোন্ ছলনায় তাহাকে সম্ভাষণ করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

বৃক্ষশাখা হইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুণ্ডরীক তাঁহাকে দেখিতেছিল। রমণীকে দেখিতে পায় নাই।

বিহারীলাল কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় রমণী মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন বিহারীলাল অগ্রসর হইলেন। তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। স্মিতমুখে, অতি মধুর স্বরে কহিল, "আজও কি মৃগয়ায় আসিয়াছেন? তাহা হইলে একা কেন?"

বিহারীলাল কহিলেন, "আজ মৃগয়ার জন্য আসি নাই।"

রমণীর মুখে অল্প হাসি লাগিয়া ছিল। "তবে কি উদ্দেশ্যে বনে আসিয়াছেন?"

"এ কথা আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি। আমি পুরুষ, যথেচ্ছা গমন করিতে পারি, প্রয়োজন

হইলে আত্মরক্ষা করিতে পারি। আপনি স্ত্রীলোক, যুবতী সুন্দরী, একাকিনী, আপনি কোন্ সাহসে এই বনে আগমন করেন? সেদিন আপনি বলিতেছিলেন আপনি এই বনে বাস করেন, কিন্তু এখানে বাসস্থান কোথায়? আমি ত বনের সর্ব্বত্র দেখিয়াছি।"

রমণী কহিল, "আপনার কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর হইল না। আপনি কি আমাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন?"

বিহারীলাল কহিলেন, "আমার কোনরূপ অসদভিপ্রায় নাই। আপনি যদি বাস্তবিক একাকিনী এবং এই বনেই বাস করেন তাহা হইলে যদি কোনরূপে আপনার সহায়তা করিতে পারি তাহাই জানিতে আসিয়াছি।"

"আপনি অপরাধ লইবেন না, কিন্তু আমি ত কাহারও সাহায্যপ্রার্থী নহি। আর সেদিন মন্‌সব্‌দারের সহিত যে কথা হইয়াছিল তাহাতে আপনি বুঝিয়া থাকিবেন যে আমি কাহাকেও আমার পরিচয় দিতে চাই না। যদি সেই ইচ্ছা থাকিবে তাহা হইলে এমন স্থানে আসিব কেন?"

বিহারীলাল অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মন্‌সব্‌দারকে চেনেন?"

"চিনিতাম না, এখন চিনি। আপনিও অপরিচিত নহেন।"

বিহারীলাল বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমার পরিচয় জানিলেন কেমন করিয়া?"

"তাহা বলিব না, কিন্তু আপনি যে বড় মহলের জমিদার চৌধুরী বিহারীলাল তাহা জানি।"

বিহারীলাল অবাক্। বলিলেন, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদিগকে কেমন করিয়া চিনিলেন কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না। আপনি বিদেশিনী, সম্প্রতি এই বনে আসিয়াছেন, গ্রামে আপনার যাতায়াত নাই। গ্রাম হইতে কি কেহ আপনার নিকট আসে?"

রমণী কহিল, "প্রশ্ন করা আপনার অভিরুচি, উত্তর দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই আপনার পরিচয় পাইয়াছি। আপনিও যদি সেইরূপ করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে নিষেধ করিতে পারি না, নিবারণও করিতে পারি না। তবে আমার পরিচয় পাইলে আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয় সেইরূপ করিবেন।"

বিহারীলাল কহিলেন, "যদি দর্শনসুখে বঞ্চিত না করেন তাহা হইলে আমি কৌতূহল সম্বরণ করিব।"

রমণী কহিল, "শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আপনি সত্যবাদী সচ্চরিত্র জানি। আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ঘটনাধীন। আবার দেখা হইতে পারে, নাও হইতে পারে। হয়ত এই বনে, হয়ত অন্যত্র সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু আপনি সেজন্য চেষ্টিত হইবেন না, তাহাতে কোন ফল হইবে না। আপনি যে আমার সহায়তা করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে আপনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন; কিন্তু আপনাকে বলিলে ক্ষতি নাই যে আমি একাকিনী নহি, অসহায়ও নহি, এবং প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষা করিতে পারি।" বিহারীলাল যাহা বলিয়াছিলেন রমণী ঠিক সেই কথা বলিল, বলিবার সময় বিহারীলালের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

কথা কহিতে কহিতে রমণী বিহারীলালের সঙ্গে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিল। অবশেষে কহিল, "এখন আপনি গৃহে ফিরিয়া যান। আমার অনুরোধ আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু জানিবার চেষ্টা করিবেন না। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি জানিবার জন্য কোন লোক নিযুক্ত করিবেন না।"

"আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি," বলিয়া বিহারীলাল রমণীকে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রমণীও আর-এক দিকে চলিয়া গেল।

বৃক্ষে বসিয়া পুণ্ডরীক সব দেখিল। রমণীর রূপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, আপনা-আপনি বলিল, "বনের ভিতর এ কি মূর্ত্তি! অপ্সরা না বিদ্যাধরী? লালজীর ত আর রক্ষা নাই, ইহারই মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে।"

বিহারীলাল ফিরিতেছেন দেখিয়া পুণ্ডরীক আস্তে আস্তে নামিয়া ঘোড়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বিহারীলাল

আসিয়া দেখেন পুণ্ডরীককে যেখানে থাকিতে বলিয়াছিলেন সে, সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে। বিহারীলাল অশ্বে আরোহণ করিয়া বিনা বাক্যে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুণ্ডরীক গম্ভীর মুখে মৃদু স্বরে বিহারীলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "লালজী, ওটা কি মানুষী ?"

বিহারীলাল চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে ?"

"ওই যে যাহার সঙ্গে তুমি কথা কহিতেছিলে ?"

বিহারীলাল ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করিয়া দেখিলে ? তোমাকে ত আমার সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।"

"আমি ত তোমার সঙ্গে যাই নাই। যেখানে থাকিতে বলিয়াছিলে সেখানেই ছিলাম।"

"তবে দেখিলে কেমন করিয়া ?"

"গাছে উঠিয়া। তুমি ত আমাকে গাছে উঠিতে বারণ কর নাই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান—আর-এক প্রকার

মনসব্দার জলালুদ্দীনও বনচারিণী রমণীকে দেখিতে উৎসুক, কিন্তু তিনি শুধু দেখিয়া ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। এই কারণে বিহারীলাল যেরূপ বনবাসিনীকে দেখিবার জন্য একা গিয়াছিলেন, জলালুদ্দীনের মনে সেরূপ কল্পনার উদয় হয় নাই। তাঁহার হিসাবে ইহাও এক রকম শীকার। রমণীকে ধরিয়া আনিবেন তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, নিজে যাইবেন কি না সেই বিচার করিতেছিলেন। অবশেষে সাব্যস্ত করিলেন যে নিজে যাওয়া সৎপরামর্শ নহে, প্রকাশ হইলে তাঁহার অখ্যাতি হইবে। অন্য কোন উপায়ে রমণীকে আনয়ন করিয়া মহলে রাখিলে কোন গোল হইবে না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনসব্দার রমজানকে ডাকিলেন। কহিলেন, "সেদিন রাত্রে কি কথা হইয়াছিল মনে আছে ?"

"জনাবালি, সব মনে আছে।"

"সেই অওরতকে জঙ্গল হইতে ধরিয়া আনিতে হইবে। আমি তাহাকে শাদি করিব। কোরান শরিফে চার শাদির হুকুম আছে।"

"খোদাবন্দ, আপনি চার শাদি ছাড়া যত ইচ্ছা নিকা করিতে পারেন।"

"এ কাজের ভার তোমার উপর। আমি নিজে যাইব না। তাহাকে আনিয়া শাদি করিলে পর আর কোন গোল হইবে না।"

রমজান ঝুঁকিয়া কুর্নীশ করিল, বলিল, "বান্দা হাজির, যেমন হুকুম করিবেন তাহাই হইবে।"

"সঙ্গে আর তিনজন লোক লইবে, হুশিয়ার আর মজবুত সিপাহী। দুই জন হইলেই যথেষ্ট, কিন্তু লোক কিছু বেশী থাকিলে দোষ নাই। অওরতকে দেখিতে পাইলেই ধরিবে। বাঁধিয়া মুখ বন্ধ করিবে, যাহাতে গোলমাল না করে। দিনের বেলা বনের বাহিরে আনিবে না, রাত্রে ঘোড়ায় সওয়ার করাইয়া লইয়া আসিবে। ফটকের প্রহরীকে বলিবে ফটক খোলা থাকে।"

চার জন কেল্লা হইতে একসঙ্গে বাহির হইল না, তাহা হইলে লোকে লক্ষ্য করিতে পারে। একে একে, কিছু কালবিলম্ব করিয়া বাহির হইল। মনসব্দারের লোকেরা অস্ত্র না লইয়া পথে বাহির হইত না, সুতরাং এই কয়জন যে সশস্ত্রে যাইতেছে তাহাতে কোন কথা উঠিল না। চার জন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া গিয়া জঙ্গলের নিকট একত্র হইল। সর্দ্দার রমজান।

মৃগয়ার দিন রমণীকে যেখানে দেখা গিয়াছিল সে স্থান হইতে কিছু দূরে রমজান দাঁড়াইল। কহিল, "সকলের যাইবার প্রয়োজন নাই। এক জন আমার সঙ্গে আইস, আর দুই জন এখানে অপেক্ষা কর। আবশ্যক হয় ডাকিব।"

একজন বলবান ব্যক্তিকে রমজান নিজের সঙ্গে লইল। অপর দুই জন প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রমজান ও তাহার সঙ্গী অগ্রপশ্চাতে দৃষ্টি রাখিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া চলিল। রমণীকে বিহারীলাল যে স্থানে দেখিতে পাইয়াছিল ইহারাও তাহাকে সেই স্থানে দেখিতে পাইল। প্রভেদ এই যে এবার উপবিষ্ট নহে এবং তাহার পৃষ্ঠও দেখা যাইতেছে না। দাঁড়াইয়া যেন তাহাদের

অপেক্ষা করিতেছে। রমজান বুঝিল রমণীকে বলে ধরিতে হইবে, কৌশলে হইবে না। সম্মুখে গিয়া সেলাম করিল। রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?"

রমজান কোন কথা ঘুরাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল না। কহিল, "আমরা মনসব্‌দার সাহেবের সিপাহী। তাঁহার আদেশে আপনাকে তাঁহার মহলে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

রমণীর মুখে অল্প হাসি, চক্ষে কৌতুকের কটাক্ষ। কহিল, "শীকারের দিন তুমি ছিলে?"

রমজান বলিল, "ছিলাম বই কি। সেইজন্যই আপনাকে সহজে চিনিতে পারিলাম।"

"সেদিনও মনসবদার সাহেব আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন কেন?"

"তিনিই জানেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে কোন ফল নাই।"

"আজ তিনি আসেন নাই কেন? আমি কেমন করিয়া জানিব তোমরা তাঁহার লোক? আমার মনে হয় তোমরা দস্যু, অর্থলোভে আমাকে ধরিতে আসিয়াছ। তোমাদের কাছে কোন পরোয়ানা অথবা হুকুম আছে?"

রমজান তলওয়ারে হাত দিয়া বলিল, "এই আমার পরোয়ানা।"

"তোমরা বীর বটে, স্ত্রীলোককে অস্ত্র দেখাইয়া ভয় দেখাও।" রমণীর স্বর ঘৃণাপূর্ণ, তাহার কথা রমজানের কর্ণে তীব্র কষাঘাতের মত লাগিল।

রমজান কহিল, "বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন? আমাদের সঙ্গে চলুন।"

"যদি না যাই?"

"বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।"

"পথে চীৎকার করিয়া লোক জড় করিব।"

"মুখ বন্ধ করার উপায় আছে। আপনি মনসব্‌দারের বন্দী, কে আপনাকে রক্ষা বা মুক্ত করিবে, কাহার এমন মাথার উপর মাথা আছে?"

রমণী হাসিল,—নির্ভয়ের, আমোদের হাসি। কহিল, "মনসব্‌দার আমাকে বন্দী করিবেন? আমি ভাবিয়াছিলাম তিনি আমাকে বেগম করিতে চাহেন।"

"স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যান ত আমরা আপনাকে বেগম বলিয়াই সম্মানের সহিত লইয়া যাইব। নহিলে আপাততঃ বন্দী, পরে বেগম।"

"আমার অপরাধ?"

"অপরাধ অত্যন্ত কঠিন। আপনি মনসব্‌দার সাহেবের দিল্ চুরী করিয়াছেন।"

রমণী মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, "কেয়া খুব! রসিক সিপাহী তোমার তরক্কী হওয়া উচিত।"

রমজান কহিল, "আপনাকে লইয়া গেলে নিশ্চয় হইবে।"

রমজান অগ্রসর হইয়া রমণীর হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইল।

বিদ্যুতের ন্যায় রমণীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে কহিল, "নরাধম, আমাকে স্পর্শ করিলে মরিবি!"

রমণী করতালির শব্দ করিল। তৎক্ষণাৎ রমণীর পশ্চাৎ হইতে বৃক্ষশাখা সরাইয়া দুই ব্যক্তি ব্যাঘ্রের ন্যায় রমজান ও তাহার সঙ্গীকে আক্রমণ করিল। চকিতের মধ্যে তাহাদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া, তাহাদের মুখে তাহাদের নিজের রুমাল গুঁজিয়া দিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিল। তাহার পর রমণী ও সেই দুই ব্যক্তি বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

অপর দুই সিপাহী রমজান ও তাহার সঙ্গীর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইতস্ততঃ খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল জলের ধারে হাত-পা-বাঁধা রমজান ও দ্বিতীয় ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, আর কেহ কোথাও নাই। তাহাদিগকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া সকল কথা শুনিতে পাইল। লজ্জায় অধোবদন হইয়া চার সিপাহী দুর্গের অভিমুখে ফিরিল। মনসব্‌দার শুনিয়া কি বলিবেন এই ভয়ে তাহারা অস্থির হইল।

বলা বাহুল্য, মনসব্‌দার শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে রমজান ও অপর তিন জনকে শাস্তি দিলে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে এ কথাও তাঁহার মনে হইল। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দুর্গের সিংহদ্বারে নাগারায় শব্দ হইল। বিস্মিত হইয়া মনসব্‌দার

জিজ্ঞাসা করিলেন, "নগ্‌গারা বাজিল কেন ? কে আসিয়াছে ?"

ব্যস্ত হইয়া দ্বাররক্ষক প্রবেশ করিল। কহিল, "খোদাবন্দ, সুবেদার সাহেব রক্ষীবর্গে বেষ্টিত হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন। এখনি এখানে আসিয়া উপনীত হইবেন।"

মনসব্‌দার কহিলেন, "আমি ত কোন সংবাদ পাই নাই।" তিনি গৃহের বাহিরে গমন করিলেন।

রমজান ও তাহার তিন সঙ্গীর শাস্তির হুকুম মুলতবি রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাদ্‌শাহ-গৃহে—সদরে ও অন্দরে

আলমগীর বাদ্‌শাহ রোগশয্যায়। পীড়া কঠিন, হকিমেরা ভয় পাইয়াছে। কিন্তু বাদ্‌শাহের মাথা পরিষ্কার, মনের বল অসীম। তাঁহার আদেশে তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ প্রচার হয় নাই। প্রকাশ এই মাত্র যে বাদ্‌শাহ অসুস্থ এবং চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অনুসারে দিন-কয়েক দরবারে আসিবেন না। আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

পীড়িত অবস্থাতেও বাদ্‌শাহ সকল সংবাদ রাখিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রধান উজীর ও কয়েকজন কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে সকল কথা শুনাইতেন। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া বসিয়া বাদ্‌শাহ সকল কথা শুনিতেন ও নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। চিকিৎসকের নিষেধ শুনিতেন না।

বাদ্‌শাহের দুই পুত্র শাহজাদা হাতিম ও শাহজাদা রুস্তম রাজধানীতে ছিলেন না। হাতিম দাক্ষিণাত্যে, রুস্তম বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ দমন কবিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই দরবার হইতে বাদ্‌শাহের পীড়ার কোন সংবাদ পান নাই, কিন্তু রাজধানীতে উভয়ের গুপ্তচর ছিল ও সেই বিশ্বস্তসূত্রে তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন যে বাদ্‌শাহের পীড়া সাংঘাতিক এবং আশু আশঙ্কা না থাকিলেও আরোগ্য লাভ করা কঠিন। দুই ভ্রাতাই যথাসাধ্য সত্বর রাজধানীতে ফিরিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বাদ্‌শাহের বিনা অনুমতিতে এবং তাঁহাকে না জানাইয়া ফিরিতেও পারেন না। ষড়যন্ত্র উভয়ে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং দুইজনেই প্রাণপণে নিজের নিজের দলপুষ্টি করিতেছিলেন। রুস্তমের অধীনে বুন্দেলখণ্ডে অনেক সৈন্য এবং সেনাপতিত্বে তিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য অধিক সংখ্যক সৈন্যই তাঁহার পক্ষে; যাহাতে সমস্ত ফৌজ তাঁহার দিকে হয় তিনি সেই চেষ্টায় ছিলেন।

গুপ্তচর চারিদিকে; রুস্তম কি করিতেছেন সে খবর হাতিমের নিকট পঁহুছিত, আবার হাতিমের সমস্ত কথাই রুস্তম বিদিত হইতেন। বাদ্‌শাহের ব্যবস্থা আরও পাকা। তাঁহার গুপ্তচরেরা শুধু শাহজাদাদের নয়, সমস্ত দেশের গুহ্য সংবাদ আনিত। পুত্রদ্বয়ের জন্য বাদ্‌শাহ বিশেষ চিন্তা করিতেন না, কারণ রুস্তম জ্যেষ্ঠ না হইলেও হাতিমের অপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, অতএব সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য। তদ্ব্যতীত বাদ্‌শাহের বিশ্বাস যে তাঁহার মৃত্যু আসন্ন নহে। কিন্তু আর-এক সংবাদে বাদ্‌শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের কোন্ অংশে কোন্ স্থানে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই—একদল ষড়যন্ত্রকারীর বাস। তাহারা সংখ্যায় কয় জন, কখন্ কোথায় থাকে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি, চরেরা তাহা সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই; কিন্তু তাহাদের যে অত্যন্ত ক্ষমতা ও অসীম উদ্যম তাহাতে কোন সংশয় নাই। সকল দেশে, সকল লোকের মধ্যেই তাহাদের প্রভাব। তাহার নিদর্শন সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষের বিস্তার। রাজকর্ম্মচারীদের প্রভুত্ব হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সময়ে সময়ে কোন কোন রাজকর্ম্মচারী নিগৃহীত হইয়াছে এরূপও সংবাদ পাওয়া যায়। রাজকর্ম্মচারীদিগের শাস্তিবিধান বাদ্‌শাহের কিম্বা তাঁহার অধীনস্থ রাজপুরুষের কর্ত্তব্য, অপরে ইহাতে হস্তক্ষেপ করে কেন? যাহাদের এত সাহস তাহারা ত রাজ্যের প্রতিও লোভ করিতে পারে। ইহার সবিশেষ তথ্য জানিবার জন্য প্রধান রাজপুরুষগণ আদিষ্ট হইয়াছিলেন, শাহজাদারাও এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজকর্ম্ম অথবা বাদ্‌শাহী কর্ম্মের কিছুই অন্দর-মহল হইতে গোপন করা যায় না। অষ্টপ্রহর চারিদিকে প্রহরী, অন্দর-মহলের দরজায় দরজায় খোজার পাহারা,

পুরুষের সাধ্য কি মহলের ত্রিসীমায় যায়, জেনানার বেগমেরা এমন কি দাসীরা পর্য্যন্ত অসূর্য্যম্পশ্যা, তথাপি সকল কথাই অন্তঃপুরে যায়, এবং অন্তঃপুরবাসিনীগণ সকল কথা লইয়া আন্দোলন করেন। এমন কি, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-শালিনী মহিলারা যদি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন তাহা হইলে অনেক সময় সেই পক্ষের জয় হয়।

যে-সকল কথার উল্লেখ হইল ইহার কিছুই বাদ্‌শাহের অন্তঃপুরে অবিদিত ছিল না। বেগমদিগের মধ্যে প্রধান সিরাজী বেগম, প্রৌঢ়া সুন্দরী অসাধারণ বুদ্ধিমতী। বেগম ইরাণী, সঙ্গে সেই দেশের দাসী ফিরোজা। যেমন বিবি তেমনি বাঁদী, ফিরোজা চতুর গুপ্তচরকে হাটে বেচিয়া আসিতে পারে।

সিরাজী বেগম নিঃসন্তান। রুস্তমের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল; হাতিমের মাতা রুগ্ন, বুদ্ধিও তেমন তীক্ষ্ণ নয়, তিনি নিজের রোগ লইয়া ব্যস্ত, অন্য কোন কথাতে থাকিতেন না।

সিরাজী জানিতেন, বাদ্‌শাহের রোগ কঠিন, রক্ষা পাইবেন না। তিনি প্রকাশ্যে কোন শাহ্‌জাদার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, দুই ভাইকেই মিষ্ট কথায় ও ব্যবহারে তুষ্ট রাখিতেন। বেগমের এখন অসীম ক্ষমতা, কিন্তু বাদ্‌শাহের অবর্ত্তমানে কি হইবে? ফিরোজা তাঁহাকে পরামর্শ দিত এরূপে দুই নৌকায় পা দিয়া অধিক দিন চলিবে না, এক পক্ষ অবলম্বন করিতেই হইবে, নহিলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবে। বাদ্‌শাহ আর কত দিন আছেন? রুস্তম চতুর এবং সৈন্যমহলে তাঁহার প্রতিপত্তি অধিক, সুতরাং তাঁহার সহিত যোগ দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। সিরাজী তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

খোজাদিগের নিকট ও তাহাদিগের দ্বারা রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে ফিরোজা সকল সংবাদ রাখিত ও বেগমকে শুনাইত। উজীর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কর্ম্মচারীই বেগমকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য উৎসুক, কারণ সকলেই জানিত ইরাণী বেগম সর্ব্বেসর্ব্বা, বাদ্‌শাহ তাঁহার মুঠার মধ্যে। ফিরোজা সংবাদ আনিল রুস্তম ও হাতিম উভয়ে আপন আপন দল পুষ্ট করিতেছেন এবং দুইজনেই রাজধানীতে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আর এই যে নূতন ষড়যন্ত্রকারীর দল, ইহার সংবাদও বেগম পাইলেন।

বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কে? ইহারা কি চায়? ইহাদের ভিতর কোন নামজাদা লোক, কোন ক্ষমতাবান লোক আছে?"

ফিরোজা বলিল, "এ পর্য্যন্ত ইহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু প্রজারা যে দিন দিন ইহাদের বশীভূত হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাদ্‌শাহ চিন্তিত হইয়াছেন ও ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ তাকীদ করিয়াছেন। সকল দেশে গুপ্তচরেরা ইহাদের সন্ধান লইতেছে।"

বেগম বলিলেন, "ইহারা কি বাদ্‌শাহ হইতে চায়?"

ফিরোজা কহিল, "কেমন করিয়া বলিব, বেগম সাহেবা? যদি ইহাদের পল্টন লস্কর থাকিত, কোন সুবা আক্রমণ করিত, অথবা কোন শহর দখল করিত, তাহা হইলে বুঝিতাম ইহারা রাজ্যে লোভ করে, কিন্তু সে-সব ত কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। গোপনে ইহারা প্রজাদের কানে কি মন্ত্র জপাইতেছে আর প্রজাদের প্রকৃতি বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। ফৌজদার তহশীলদারকে আগের মত ভয় ও সম্মান করে না। ষড়যন্ত্রকারীর কোন লোক কখন বা অপর লোককে সঙ্গে করিয়া কোন রাজপুরুষের অপমান করে, তাহার পর অনেক খুঁজিয়াও তাহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাহারও বিচার করে, কাহাকেও শাস্তি দেয়। এ কি বাদ্‌শাহের উপর বাদ্‌শাহী, না পাগলের কাজ? ইহার ভিতরে যে কোন গূঢ় ব্যাপার আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ব্যাপার কি এ পর্য্যন্ত বাদ্‌শাহ তাহা কিছু মাত্র জানিতে পারেন নাই।"

বেগম বলিলেন, "আমার কি কর্ত্তব্য?"

"আপাততঃ কিছুই নয়। যখন কিছু জানিতে পারিবেন সেই সময় স্থির করিবেন।"

অন্তঃপুরে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে, এদিকে শাহজাদা রুস্তম বাদ্‌শাহকে লিখিলেন, "বুন্দেলখণ্ডে আর

বিদ্রোহী নাই। বিদ্রোহের নেতারা শূলে গিয়াছে। অনুমতি হয় ত এখন রাজধানীতে ফিরিয়া যাই।"

জবাব আসিল, "নূতন ষড়যন্ত্রের মূল স্থান পূর্ব্ব দেশে, বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ আসিয়াছে। তোমার আদেশ-মত কার্য্য করিবার জন্য সুবেদারকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে, দরিয়ার তীরে ও পাহাড়ের নীচে পরগনা ভাল করিয়া দেখিবে। নূরপুরের মনসব্দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তদারক করিয়া সুবেদারকে ও হুজুর বরাবর জানাইবে।"

শাহজাদা হাতিম বাদ্‌শাহকে লিখিলেন, "আমার শরীর অসুস্থ, এখানে আমার কোন প্রয়োজনও নাই। আমাকে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি হউক।"

বাদ্‌শাহ উত্তর দিলেন, "বাসীনে সমুদ্রতীরে উত্তম বাদ্‌শাহী বারাদরী আছে। সম্প্রতি সেইখানে গিয়া বাস করিবে।"

রুস্তম ও হাতিম দুইজনই বুঝিলেন যে বাদ্‌শাহের পীড়া যেমনই হউক তাঁহার মস্তিষ্কের ও বুদ্ধির কিছুমাত্র বিকার বা হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে বাদ্‌শাহের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। পুত্রদ্বয়ের অপেক্ষা পিতা অনেক চতুর এবং দীর্ঘকাল রাজ্যশাসনে অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। বাদ্‌শাহের আদেশ দুইজনকেই পালন করিতে হইল।

ক্রমশঃ

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বর্ষা-সন্ধ্যায়

আকাশের অশ্রুজলে সিক্ত আজি ধরণীর তল,
বাতাসে ঘিরিয়া ফেরে চামেলি ও যূথী-পরিমল,
অন্ধকার বনচ্ছায়ে অবিরাম দাদুরীর ডাক,
কম্পমান মহাশূন্য,—ওঠে সেথা অশনির হাঁক।

জীর্ণ কুটীরের তলে কৃষকের দুরুদুরু হিয়া,
বুকে টানি' শীর্ণ শিশু বসি তার স্বল্পবাস প্রিয়া;
মাঠ গেছে জলে ভাসি; ফসলের নাহি কোনো আশা;
মৌনমুখে দোঁহে ভাবে; মুখে তাই নাই কোনো ভাষা।

পঙ্কপল্বলের জল উপচিয়া ভাসায় আঙন,
অবিরাম বরষণে গৃহভিতে ধরেছে ভাঙন;
কলাগাছ গেছে পড়ে' ফলদান করিবার আগে;
সজিনাও ভূপতিত। দুর্ভিক্ষের ছবি মনে জাগে।

অদূরে ধনীর গৃহে উদ্ভাসিত বিজলির বাতি;
অশ্বশালে অশ্ব বাঁধা, হস্তিশালে বাঁধা আছে হাতী;
অগণিত দাসদাসী, চারিদিকে বিলাস-সম্ভার,
সেথা নাহি পশে কভু নিরন্নের মৌন হাহাকার।

সুবিস্তৃত কক্ষমাঝে কুন্দশুভ্র পাতা আস্তরণ,
তারি পরে ফেরে ঘুরে নর্ত্তকীর চপল চরণ,
নিশ্চিন্ত আরামে বসি' সুসজ্জিত পারিষদদল
উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহে; মাঝে মাঝে করে কোলাহল।

অন্দরের অলিন্দেতে দাঁড়াইয়া নারী উদাসীন,
স্বর্ণপিঞ্জরের পাখী, ম্লান মুখ, বয়সে নবীন;
চাহি' ভাবে দীন হীন কৃষকের কুটীরের পানে—
'ওই যেথা অকরুণ মত্ত বায়ু বৃষ্টিধারা হানে,

প্রাণ চায় ছুটে যেতে ছিঁড়ে এই ভোগের শিকল
অভাব দুরন্ত যেথা; মন হেথা হল যে বিকল!
অনাহার নিত্য হোথা, নাই হোথা ভূষণের মেলা;
তবু ভাল! হোথা কভু নারী নিয়ে নাই হেলাফেলা!'

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাগরিকা

প্রভাতের ডায়েরী হইতে—

বিকেলের আলো সুনীল জলে ঝলমল করছে কিশোরীর দীপ্ত নয়নের চাউনির মত। শুধু-পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। সামনের বালির রাশিতে সাগরের সামনেটা ঢাকা পড়েছে, তার শেষের ভাগ দেখা যাচ্ছে, কার শাড়ীর নীলপাড় আলোয়-ঝলমল, বাতাসে দুলছে। বালির ঢিপি পেরিয়ে চল্লুম। সমস্ত সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এ কোন্ সুন্দরী নীলবসন জড়িয়ে সোনালী বালুচরে তনু এলিয়ে পড়ে' আছে, তারি বক্ষের গুরু গুরু ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, পৃথিবীর বুক হতে উৎসারিত অফুরন্ত ঝর্ণাধারার অবিরাম কল্লোলধ্বনির মত। তার বসনের রজতশুভ্র পাড়খানি পৃথিবীর পাঁড়ে ঠেকে সাপের ফণার মত দুলছে, কাঁপছে। একবার সে নীল অবগুণ্ঠন খুলে বেরিয়ে আসে না?

বাঁশির তানের মত হাসির শব্দে চমকে উঠলুম। সাহেবদের কয়েকটা ছোট ছেলে মেয়ে ঢেউগুলোর সঙ্গে খেলা করছে, তাদেরই মাথায় তালপাতার টুপি, পরণে লাল swimming costume, তাদের দেখাচ্ছে ঠিক যেন জার্মান রূপকথার বামনদের দল। এক একটি ঢেউয়ের কল্লোলময় স্পর্শে আনন্দ-হাসির ঝর্ণা ঝরে' পড়ছে। মনে হচ্ছে এ মাটির চেয়ে ওই ঢেউগুলোর সঙ্গে কি অজানা নিবিড় যোগ আছে, তারা যেন টানছে।

চক্রতীর্থের দিকে চলেছি। পাশে একটি ছোট মেয়ে ঝিনুক কুড়োচ্ছে, আর তার সঙ্গে তার বাবা মাও ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে চলেছেন। এমন কাণ্ড যে হতে পারে, তা কি তাঁরা কলকাতা সহরের ক্ষুদ্র বাড়ীর রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে' ভাবতে পারতেন! সিন্ধুর নানা অত্যাশ্চর্য্যকর লীলার মধ্যে এই লীলাটাই প্রথমে চোখে পড়ছে, সে তার দুর্দ্দান্ত সজল স্নিগ্ধ হাওয়ায় বাঙ্গালী মেয়ের মুখ থেকে ঘোমটা খসিয়ে তার প্রাণকে মুক্তি দিয়েছে। ওই যে পেঁয়াজী রংএর শাড়ী পরে' নারী তাঁর স্বামীর পাশে পাশে চলেছেন, একটু ঘোমটা টেনে দিলেন, বাতাসে ঘোমটা সরে' গেল, আনন্দে রাঙা মুখের ওপর লালপাড় এসে পড়ল—এ স্বপ্নাতীত বেড়ীবায় আনন্দ সমুদ্র সম্ভবপর করে' তুলেছে।

কচি বাঁশের পাতার মত একটি ছোট ছেলে ঝিনুক কুড়ানো ছেড়ে অবাক হয়ে সমুদ্রের পাড়ে চুপ করে' বসেছে। আমিও তার কাছাকাছি এসে বসলুম, একেবারে ঢেউগুলোর পাশাপাশি। এর পাশে সাগরের তীরে বসে' মনে হচ্ছে এই জগৎ-পারাবারের তীরে আমি কত ছোট শিশু, যৌবন যে দ্বারে এসেছে, তা মোটেই মনে হচ্ছে না, বোধ হচ্ছে—এই সমুদ্রের ধারে ঝিনুকের মত সুন্দর শুভ্র আমার হারানো শিশু-মনকে আমি কুড়িয়ে পেলুম। একটি ছোট মেয়ে আনারসী রংএর শাড়ী পরে' কোঁকড়া চুল দুলিয়ে ঢেউগুলোর সঙ্গে খেলা করতে করতে চলেছে, ঢেউগুলো এগোচ্ছে, সে এগিয়ে আসছে, ঢেউগুলো পেছোচ্ছে, সে পেছিয়ে যাচ্ছে। তার সুন্দরী মাও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছেন। বেণী দুলিয়ে শাড়ী উড়িয়ে খুকী দিব্যি ঢেউগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, কিন্তু তার মা পেরে উঠছেন না। কল্লোলে উল্লাসে রজতশুভ্র হাস্যে নীলচঞ্চল সিন্ধুতরঙ্গ তাঁর অলক্তক-রাঙা চরণের ওপর অতর্কিতে লুটিয়ে পড়ে' একটু কাপড় ভিজিয়ে পরিহাসের সুরে দুলতে দুলতে চলে' গেল। সুন্দরীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সিন্ধুতরঙ্গের মত সুন্দর হেসে আবার সুন্দরী চলেছেন।

উঠে আবার চল্লুম। একটি বৃদ্ধ তাঁর নাত্নী-নাৎনীদের সঙ্গে বসে' বালির পাহাড় তৈরী করছেন। বালির পর বালি চাপিয়ে পাহাড় হল, ঝিনুক সাজিয়ে সহর হল, পথ হল, সহসা একটা ঢেউ বেলাভূমি লাফিয়ে এসে তাঁদের রচা জগৎটার ওপর পড়ে' ভিজিয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে দিলে, নাতি-নাৎনীর দল আনন্দে চেঁচিয়ে লাফিয়ে সরে' দাঁড়াল, বৃদ্ধ ভেজা লাঠি ধরে' কোনমতে ঢেউয়ের মুখ থেকে সরে' দাঁড়ালেন। ঢেউ চলে গেল, ছেলেমেয়েরা আবার বালির নতুন ঘর বাড়ী তৈরী করতে সুরু করছে, বৃদ্ধ কিন্তু এবার চুপ করে' সাগরের দিকে চেয়ে বসেছেন। উদাস চোখে যেন সমস্ত জীবনের কথা ভাবছেন।

চক্রতীর্থের কাছে এসে পড়েছি। ছোট মন্দিরের সামনে ধূসর বালুচরের ওপর সবুজ ঘাসের ফ্রেমে একটু স্নিগ্ধ কালো জল বাঁধা রয়েছে, বিকেলের আলোয় জলটুকু কৃষ্ণসারের গায়ের চামড়ার মত পাতা রয়েছে। পিছন ফিরে তাকালুম, পশ্চিমদিক তামার মত পীতবর্ণ মেঘে ছাওয়া, ঝাউগাছের পেছন দিয়ে রূপার চাকার মত সূর্য্য ঘুরে চলেছে, তার পাশ দিয়ে কয়েকটি নীল হাল্কা মেঘ উড়ে চলেছে পাখীর পালকের মত। Flag-staffটা সঙ্গীনের খোঁচার মত নীলিমার দিকে উঠে গেছে।

তামার রং ঘোর লাল হয়ে আসছে, সূর্য্য রক্তবিন্দুর মত জ্বলছে, সব মেঘ রক্তচন্দনের মত রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে, রাঙা আকাশের পটে ঝাউগাছের সবুজ সারি ছবির মত আঁকা, তাদের মাথা ছাড়িয়ে জগন্নাথের মন্দিরের শ্বেত চূড়া, মেঘবিচ্ছুরিত সূর্য্যালোকে আরতি-প্রদীপের শুভ্র শিখার মত জ্বল্‌ছে।

চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে চলেছি। পুরীর তীরের শেষ বাড়ী ছাড়িয়ে ডানদিকে সমুদ্র যেখানে ঘননীল চক্রবালে মিশে গেছে, সেইদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, তরুণীর জলভরা কালো আঁখির মত ওই গগনের কোণে আকাশ-সমুদ্রের মিলনবেলা হতে কে আমার দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে, আর এই পৃথিবী-সমুদ্রের মিলন-বেলায় চল্‌তে চল্‌তে আমি তার দিকে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে আছি, মাঝে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অনন্তসিন্ধুর চিরবিরহ পথ।

একা এগিয়ে চলেছি। আর লোক নেই, লোকালয় নেই, জনহীন পথহীন বালুচর সম্মুখে, এক পাশে চির কল্লোলময় চিরচঞ্চল সাগর, আর একদিকে চিরস্থির চিরস্তব্ধ পৃথিবী।

বাঁ দিকে বালির পাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, ছোট্ট ছোট সবুজ তৃণ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্বর্গদ্বারের ওধার হতে চক্রতীর্থের ওধার পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রবাল অর্দ্ধচন্দ্রের মত দেখাচ্ছে। অস্তগামীসূর্য্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। সমস্ত চক্রবাল দেখা যাচ্ছে, তার অর্দ্ধেক আগুনের রঙে রাঙা, অর্দ্ধেক আঁখির জলে কালো। মনে হচ্ছে, একটা বড় পেয়ালা, তার অর্দ্ধেক আগুনে টলমল, অর্দ্ধেক অশ্রুজলে ছলছল। সমুদ্রের কলধ্বনি স্বপ্নের সুরের মত বাজছে।

চারিদিক রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে, যেন কার গোধূলি-লগন এসেছে, গলানো সোনার মত রাঙা আলো মেঘ হতে ঝরে' ঝরে' নীলবনরেখার মাথার ওপর দিকে তরঙ্গায়িত ধূসর প্রান্ত পার হয়ে সিন্ধুতরঙ্গের মাথার ওপর অলক্তকের স্রোতের মত গড়িয়ে পড়ছে। স্তব্ধ হয়ে বসলুম।

একাকিনী উদাসিনী সন্ধ্যা কত বনপর্ব্বত কত নগর গ্রাম পার হয়ে রাঙা আঁচলখানি কালোনীল জলে লুটিয়ে আকাশভরা করুণনয়নে পৃথিবীর দিকে চেয়ে সোনালী-চেলীপরা বধূর মত অনন্ত সমুদ্রের তীর দিয়ে একটু অবগুণ্ঠন টেনে কার অভিসারে চলেছে; দিগ্বধূরা তার পথের ধারে ধারে রাঙা আলো জ্বালিয়ে ধরছে, প্রতি তরঙ্গে তার পায়ে লালমণি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমকোণের রাঙা আলো কালো হয়ে আসছে। পূর্ব্বকোণে আকাশ-সাগরের মিলনভূমির স্নিগ্ধ নীল অন্ধকার হতে রাত্রি ধীরে ধীরে তারাভরা আঁচল মেলে লক্ষ লক্ষ সাপের মণিময় ফণা দিয়ে রচা গর্জ্জমান তরঙ্গ-দলের দোলায় চড়ে' ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে।

ধীরে উঠে আবার বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্লুম। একে একে তারা ফুটে উঠ্‌ছে। স্তব্ধ স্নিগ্ধ অন্ধকারময় আকাশ-সাগরে আলোর ঢেউ উঠ্‌ছে। জোরে এগিয়ে চলেছি। তীরের বাড়ীগুলো দেখাচ্ছে পরম বিস্ময়কর ছায়া, লোকজন দেখাচ্ছে অপূর্ব্ব মায়া। কতজন পাশ দিয়ে আসছে, যাচ্ছে, তাদের খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু বোঝা যাচ্ছে পুরুষ কি নারী, তরুণী কি বৃদ্ধা।

জোয়ার আসছে, অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে অকূল হতে কোন হাওয়া এসে পৌচেছে, সেই সজল স্নিগ্ধ হাওয়ায় সব উড়ছে। আমার চাদর উড়ছে, ওই তরুণীর আঁচল উড়ছে, ওই মেয়েটির কালো বেণী উড়ছে, ওই খুকীটির রঙীন ফ্রক উড়ছে, ওই মহিলার ঘোমটা বার বার উড়ে সরে' যাচ্ছে, ওই বৃদ্ধের কোঁচা উড়ে চলেছে।

এতক্ষণ সিন্ধুর মুখে ছিল হাসি, এবার গান বেজে উঠেছে। কি বলতে চায়, সে কি বলতে চায়? একেবারে

ঢেউগুলোর সাম্‌নে জোয়ার-জলের ফেনায় ভেজা হাওয়ার মুখে এসে বস্‌লুম। দূরে একটি বৃদ্ধ দম্পতী বসে' আছেন। শুভ্রশ্মশ্রু দেখে বৃদ্ধটিকে অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বৃদ্ধাটিকে একটি ছোট মেয়ে বলে' বোধ হচ্ছে। এই জোয়ারের ঢেউয়ের গান কি সবাইয়ের কানে এক সুরে বাজ্‌ছে? এই বৃদ্ধ দম্পতীর কানে সিন্ধু কি বল্‌ছে! আর ওই যে যুবকটি উচ্ছল যৌবন নিয়ে সিন্ধুতরঙ্গের মত উদ্দাম মনে বসে' আছে, তার কানে কি বল্‌ছে! আর ওই যে খুকী এখনও অন্ধকারে বালির ঘর তৈরী করছে, তাকে কি বল্‌ছে? আর ওই যে তরুণী ঝিনুক কুড়োবার ছল করে' একটি তরুণ যুবকের মুখ বার বার দেখে নিচ্ছে তাকেই বা কি বল্‌ছে?

অনিমেষ নয়নে ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে আছি, সাপের ফণার মত দুল্‌ছে, বিদ্যুৎশিখার মত কাঁপ্‌ছে, মাদলের মত বাজ্‌ছে, প্রিয়ার আলিঙ্গনের মত লুটিয়ে পড়্‌ছে।

তিনটি মেয়ে আমার কাছে পাড়ে এসে বস্‌ল। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু কাপড়ের রং বোঝা যাচ্ছে, আর বোঝা যাচ্ছে একটি কিশোরী আর দুটি ছোট মেয়ে। শীকরসিক্ত বাতাসে আমার পাঞ্জাবী কাঁপ্‌ছে, কিশোরীর শাড়ীটা দুল্‌ছে, ছোট মেয়েগুলির চুলগুলো নাচ্‌ছে, ঢেউগুলোতে কত প্রবাল মুক্তা টলমল করছে।

কিশোরীটি কি গান ধরেছে। কথা বোঝা যাচ্ছে না, সমুদ্রের গানে সব কথা সুর ভেসে যাচ্ছে। কানটা খুব সজাগ করে' শুন্‌তে চেষ্টা করছি। ঢেউটা যখন ফিরে গেল, একটি কথা ভেসে এল, —দোলাও...

দোলাও, হে সিন্ধু, এই আলো-অন্ধকারের দোলা, সুখ-দুঃখের হাসিকান্নার জন্মমৃত্যুর দোলা, হৃদয় আমার তোমার প্রেমের দোলায় দোলাও।

মেয়ে তিনটি উঠে চলেছে। বেলাভূমি জনবিরল হয়ে আস্‌ছে। এবার তরঙ্গের কুন্দশুভ্র দোলায় চড়ে' কারা যেন পৃথিবী দেখ্‌তে আস্‌ছে, পেছনের পর পেছন উঁকি মেরে আস্‌ছে, কিন্তু তটের কাছে এসেই সঙ্কোচে সত্রাসে সলজ্জ হাস্যে সাগরে নিমেষে লুকিয়ে পড়্‌ছে, শুধু তাদের মণি-মুক্তা-বিজড়িত অবগুণ্ঠন ফেনায় লুটিয়ে পড়্‌ছে। বালির ওপর কি ঝিকিমিকি!

এবার সাগরের গান বুঝ্‌ছি। সে ডাক্‌ছে বল্‌ছে, এস, এস। মণিমুক্তা দিয়ে গড়া সাগররাজপুরীর প্রবাল-পালঙ্কে কোন সাগরিকা এম্নি তরঙ্গ-নাগিনীর লক্ষমণিময় ফণার শয্যায় শুয়ে আছে, তারি বিরহ-বেদনা ঢেউয়ে ঢেউয়ে আকুল হয়ে উঠ্‌ছে,—এই বিরহ-মিলন হাসি-কান্নার দোলা থেকে সব চাওয়া পাওয়া ছেড়ে সব ঢেউ-খাওয়া শেষ করে' ঘননীল জলে ডুবে অতলে নেমে এস।

স্তব্ধ হয়ে এই দ্যুতিময় গর্জ্জমান অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে' আছি। সিন্ধু শুধু ডাকে ডাকে আর ডাকে।

(২)

ঘুম ভাঙ্‌তেই ঢেউগুলোর ডাক কানে এসে বাজ্‌ল। সারারাত তারার আলোয় তাদের কাছাকাছি তাদের বাঁশি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমের দোলায় দুলেছি, জেগে উঠেই ঢেউগুলোর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম।

তসরের শাড়ীর মত পূর্ব্বাকাশ মেঘে ছাওয়া, সকালের আলো কচি শিশুর হাসির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছে, ঢেউগুলোর মুখেও সেই হাসি। এই প্রথম সমুদ্র দেখেই মনে হয় এর সঙ্গে যেন কত যুগের নাড়ীর যোগ, কত জন্মজন্মান্তরের চেনা।

এক তরুণী সূর্য্যের দিকে মুখ করে' ধীরে চলেছে। দেখেই মনে হল কালকের সেই কিশোরী। সে যে, তা কেমন করে' জান্‌ব? সন্ধ্যার ছায়ায় তার মুখ ত ভাল দেখা যায়নি, তবু নিশ্চয় জানি এ সে। তার সুঠাম মধুর মূর্ত্তি ছবির মত প্রভাতাকাশের পটভূমিকায়, নীলজলের কোলে আঁকা। কখন না দেখেও যে নিমিষে চিরপরিচিত বলে' চেনা যায়, এ অনুভূতি যার হয় নি, সে একথা বুঝ্‌তে পারবে না। কাউকে চিনি চোখের চাওয়ায়, কাউকে চিনি হাতের ছোঁয়ায়, কাউকে চিনি মনের লেখায়, কেউ আসে গানের সুরে, কেউ যায় ফুলের-গন্ধে-ভরা হাওয়ায়। কাল যে অন্ধকারে কাছাকাছি বসে' ছিলুম, তাইতে কি করে' পরিচয় হয়ে গেছে, তা আমিও জানি না।

মেয়েটি মুখ ফিরে চাইল। নিমেষের জন্য তার

মত, মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় ক্ষণিক হাসি-কান্নায় ভরা। দিগন্ত কালো আঁখির মত, জলে ভরে' উঠ্ছে, সাগরে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়্ছে।

মেয়েদুটি একটু দূরে বসেছে, দুজনে বালি খুঁড়ে একটা বড় গর্ত্ত তৈরী করছে, ছোটমেয়েটির উচ্ছ্বসিত হাসির ধ্বনি সাগরের হাসি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে, কিশোরীর স্নিগ্ধ মুখের ছবি ছোট মেয়েটির মুখের আড়ালে মাঝে মাঝে শরৎ-শেফালির সুগন্ধের মত ভেসে আস্ছে।

গুঁড়িগুঁড়ি বিষ্টি পড়্ছে, ছোট ছোট ফোঁটা, বালির ওপর কোন শব্দ হচ্ছে না, চোখ-মুখের ওপর দু-চারটি ফোঁটা পড়ল, কচি শিশুর আঙ্গুলের মিষ্টি ছোঁয়ার মত।

হাওয়া মেতে উঠেছে, বড় বড় ফোঁটায় বিষ্টি পড়্ছে। মেয়ে দুটি গর্ত্তটায় ঘেঁসাঘেঁসি করে' বসে' একটি ছোট ছাতা খুলেছে, কি একটা গল্প সুরু করেছে, ছোট মেয়েটি নিবিষ্ট মনে শুন্ছে আর জোরে ছাতা ধরে' আছে। ছোট ছাতা, দু তিনটে শিক থেকে কাপড় খুলে গেছে, ছেঁড়া পালের মত ছাতাটা বাতাসে কাঁপ্ছে।

মনটা উদাস হয়ে উঠ্ছে। কাছে একটা নৌকা পড়ে' আছে বড় কালো ঝিনুকের মত। তার কাছ ঘেঁসে বসে' গর্ত্ত খুঁড়ে পা দুটো বালিতে ঢেকে আমিও ছাতা খুলে বস্লুম।

হু হু করে' হাওয়া আস্ছে, ঢেউগুলো মাতাল হয়ে নাচ্ছে, ছাতার ওপর বিষ্টির ধারা মাদল বাজাচ্ছে। ওদের ছাতা উঠ্ছে, আমার ছাতা পড়্ছে, আমার ছাতা উঠ্ছে, ওদের ছাতা পড়্ছে, বিষ্টির ধারার মধ্যে মেয়েটির নয়নের দৃষ্টি বিদ্যুতের স্নিগ্ধ ঝিল্কির মত এসে সোনার কাঠির মত মনকে স্পর্শ করছে।

কাজলঘন আকাশের মত মনটা ভারি হয়ে উঠ্ছে। ওদের ছাতার দোলানি দেখ্ছি। ঝিনুক বালি নাড়্তে নাড়্তে মেয়েটি কি গল্প বল্ছে।

একটি বোনের জন্যে মন কেমন করছে। হয়ত সে কল্যাণী তার মঙ্গলগৃহকর্ম্মের মধ্যে সহসা আনমনা হয়ে আমার কথা এখন একটু ভাব্ছে। ভাব্ছি, বোনের আনন্দনিষ্ঠাপূর্ণ হস্তের স্পর্শ মাধুর্য্যময় স্নেহসঙ্গ যে পেল না এ জীবনে তার কতখানি ফাঁক রইল।

ইচ্ছে করছে, ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে ওই খুকীটির মত বসে' তার মুখ থেকে তার সহজ সরল গল্পটা শুনি।

বিষ্টিটা কমে' এসেছে। ছাতাটা মুড়ে নৌকায় হেলান দিয়ে 'এই ঝিরি ঝিরি জলধারায় ভিজ্ছি। ওরাও ছাতা মুড়ে উঠে দাঁড়াল, ছোট মেয়েটি ছাতা নিল, বড় মেয়েটি ঝিনুকের বোঝা।

এদিকে এগিয়ে আস্ছে, ঈষদার্দ্র ঘননীল শাড়ীর পাড় বালির ওপর লুটিয়ে পড়্ছে। একবার ফিরে চাইল, সাম্নে দিয়ে চলে' গেল, ছোট মেয়েটি বার বার বেল-ফুলের কুঁড়ির মত চোখ দুটো নেড়ে ফিরে ফিরে চাইছে।

বিষ্টি থেমে গেছে, সমুদ্র শান্ত হয়ে আস্ছে, আকাশ কি স্নিগ্ধ নীল। একটি ঢেউ এসে বেলাভূমিতে মেয়েটির পায়ের দাগ মুছে দিয়ে গেল। চুপ করে' মেঘ ও রৌদ্রের লীলা দেখ্ছি, এই আলোর দোলা, জলের কম্পন, সুকোমল নীল বিস্তৃতি।

(৪)

পূর্ণিমার চাঁদ পূবগগন ছাড়িয়ে উঠেছে, শুভ্র লঘু মেঘে ছাওয়া সুনীল পথ দিয়ে মোহিনী তার বুকের আলোক-সুধাভাণ্ড হতে দিকে দিকে অমৃতবণ্টন করে' নৃত্যময়ী উর্ব্বশীর মত এগিয়ে চলেছে। আকাশের মোহন ভাল-বাসার মত জোৎস্না এসে পড়েছে সাগরের বুকে, সাগরের বুকের আনন্দ দুলে দুলে উঠ্ছে আকাশের দিকে হাসির শত ফোয়ারায়; মনে হচ্ছে, সাগর ভরে' সুধা টলমল করছে, এ নীলপাত্রখানি কে আমার সম্মুখে জোৎস্নার অমৃতে ভরে' ধরেছে, চির-তৃষিত আমি তার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রূপের ঝর্ণা ঝরে' পড়্ছে তারালোক হতে পৃথিবীর দিকে, রসের ফোয়ারা উথ্লে উঠ্ছে সবুজে সুনীলে, পৃথিবীর বুক হতে অনন্তের দিকে। মুগ্ধনেত্রে চেয়ে আছি।

পূর্ব্বদিগন্ত-তোরণ হতে আমার সম্মুখে এ বালুভূমি পর্য্যন্ত চাঁদের আলো এক রজতশুভ্র পথ তৈরী করেছে, এই গলানো হীরের ধারা কাঁপ্ছে, দুল্ছে, টল্ছে। প্রবাল মুক্তা ছড়িয়ে কার আসার পথ তৈরী হচ্ছে? পথের দুপাশে উত্তরে দক্ষিণে সমুদ্র রহস্যময় আঁধারে মেশা, যেন কত মায়াদ্বীপ লুকানো আছে।

আজ ঢেউগুলো ডাকুছে না, আজ তারা জয়ধ্বনি করুছে, বলুছে—আসুছে, সে আসুছে। চাঁদের আলো বালিতে ঝিনুকে ঢেউয়ের ফেনায় মেয়েটির মুখে আমার চোখে ঝিকিমিকি করুছে।

কিশোরীটি একটু দূরে বসেছে, আজ সে একা, গান গাইছে না, আমারি মত পূর্ণিমার সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে' আছে। জ্যোৎস্না-ধোওয়া আকাশের পটভূমিকায় নীলশাড়ীমণ্ডিতার মূর্তি নিপুণ শিল্পীর ছবির মত আঁকা।

পূর্ণিমায় সাগরতীরে বসে' যে রাত জাগেনি, জীবনে সে কত বড় আনন্দের স্বাদ পায়নি। এই মেঘ ও তারার মায়ালোক, জ্যোৎস্নার ইন্দ্রজাল, জলের টলমলানি, ফেনার ঝিকিমিকি, ভিজেবালির চিকিমিকি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলো-অন্ধকারের লুকোচুরি খেলা—এই অপরূপ মায়া-রূপলোকে বসে' দেহের রক্ত ঝিলমিল করে, মনে হয় স্বপ্নাতীত এই বুঝি সম্ভব হয়ে ওঠে।

এখন যদি ওই মেয়েটি এসে জ্যোৎস্নার মত হেসে আমার সম্মুখে দাঁড়ায়, আমি কিছুই অবাক হব না, আমার মনে হবে না এ এক মাটির দেশের মেয়ে, আমার কাছা-কাছি এর বাড়ী ; আমি বেশ ভেবে নিতে পারি, সাগরের অতলজলে প্রবালমুক্তা-ঘেরা রাজপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা আজ পূর্ণিমায় জেগে উঠে এই জ্যোৎস্নাহসিত সিন্ধুর অবগুণ্ঠন খুলে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ঢেউগুলো সেতারের তারের মত কেঁপে বেজে উঠুছে। এসেছে, সে এসেছে।

এই শুভ্রতরঙ্গ ফেনপুঞ্জকে শুধু জলের ঢেউ বলে' কিছুতেই মনে করুতে পারুছি না। মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নারাতে বারুণীকন্যারা প্রবাল-পালঙ্ক হতে জেগে উঠে সাগরের ওপর ভেসে উঠেছে, তাদেরি চকিত চাউনি চারিদিকের ঝিকিমিকিতে, এই শুভ্রফেনপুঞ্জে তাদেরি হাসি। ওই কিশোরী যেন কোন সাগরিকা, বালির তটে একটু উঠে বসেছে, এই বুঝি স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে।

সমুদ্রের জ্যোৎস্নাপথের দিকে চেয়ে বসে' আছি। ওই সে এসেছে। একি, বিশ্বব্যাপিনী রূপ! চন্দ্র তার মুখের হাসি, জ্যোৎস্না তার অবগুণ্ঠন, মেঘদলে তারার মালা তার এলোকেশে ফুলভার, চক্রবাল তার মেখলা, দিগন্ত তার চাউনি, সুনীল জল তার অঞ্চল, জ্যোৎস্নাপথ তার চরণ। যাকে প্রথমে এসে দেখেছিলুম নীলবসনে তনু ঢেকে লুকিয়ে আসে, পূর্ণিমা-রাতে বালুতটের শয্যা থেকে সে উঠে দাঁড়াল।

আমার এ হৃদয় তার কিরীটের মণি, আমার এ প্রেম তার বুকের হার, আমার এ সুখ তার কানের দুল, আমার এ দুঃখ তার পায়ের নূপুর, আমার গান তার কটির কাঞ্চী, আমার প্রাণ তার করের কঙ্কণ, আমার হাসি তার কপালের টিপ, আমার কান্না তার গলার মুক্তার মালা, আমার জীবন তার হাতের লীলাপদ্ম।

'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি,
বল, কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।'

কালো মেঘে চাঁদ ঘিরে ফেলেছে, অন্ধবেগে বাতাস ছুটে আসুছে, অন্ধকার তটের কাছে ঢেউগুলো কাশফুলের ঝাড়ের মত দুলুছে।

মেয়েটি কখন উঠে চলে' গেছে, দেখিনি। বেলাভূমি বিজন। শীকরসিক্ত বাতাসের মত্ত মুখে অন্ধকার সাগরের সামনে বালির পাড়ে শুয়ে পড়েছি।

চাঁদ ডুবে গেছে, ঢেউগুলো গর্জ্জন করুছে, কোন রুদ্ধ আবেগে অজানা বেদনায় ফুলে ফুলে তটের ওপর আছাড় খাচ্ছে। মেয়েটির একটি গানের সুর কানে এসে বাজছে, অন্ধকারে কোথায় সে বসেছে জানি না—আঁধার ঘরে চুপে চুপে এস কেবল সুরের রূপে।

(৫)

দ্বিপ্রহরের তীব্রোজ্জ্বল-সূর্য্যালোক-উদ্ভাসিত সিন্ধুর দিকে চেয়ে বসে' আছি। ধূসর উদার অবারিত বালুচর বসুন্ধরার রৌদ্রদীপ্ত হিরণ্য অঞ্চলের মত লুটিয়ে পড়েছে, তার একটুকু প্রান্তে আমি আর নৌকাটা বসে' আছি। নৌকোটাকে মনে হচ্ছে আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের পায়ের চটিজুতো, রূপকথায় যে জুতো নিমেষে নগর বন পর্ব্বত নদী সমুদ্র পার করে' রাজকন্যার শিয়রে পৌঁছে দেয়।

নির্ম্মল নীল আকাশ, নীলস্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা কে উপুড় করে' ধরেছে গলানো নীলকান্ত মণিতে গড়া পেয়ালার ওপর। এই সাগরের জলে ধোয়া আলো আমার

রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এই সুনীল নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় অসীমতার সম্মুখে একা বসে' মনে হচ্ছে, এ সাগরের সঙ্গে কত জন্মের জানাশোনা। কত গতজীবনের সুখস্মৃতি-রাশি, কত শরৎপ্রভাতে সোনার আলোয় দোলা, কত জ্যোৎস্নারাতে প্রবাল-ঘরে খেলা, এই নীলাম্বরতলে ঋতুতে ঋতুতে কত লীলা—সেই-সব পূর্ব্বজন্মস্মৃতিগুলি জন্ম-জন্মান্তরের অতল সমুদ্র হতে ঢেউয়ের মত ভেসে নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার চারিদিকে কোন গত ও অনাগত দিবাস্বপ্নের মায়াজাল।

জমাট তরঙ্গফেনপুঞ্জের মত সাদা মেঘ আকাশে ভেসে চলেছে; সাগরে তাদের ছায়া পড়ছে। তটের নিকট সাগর জুঁইফুলের ঝাড়ের মত সাদা; যেখানে প্রথম ঢেউ শুক্তির কিরীট পরে' মাথা তুলেছে, সেখানে সাগর একটু পাটলবর্ণ, তার পর একটু স্নিগ্ধ সবুজ, তার পর সুস্নিগ্ধ-নীল। দূরে পিঙ্গলআভাময় মেঘের ছায়ায় সাগর ধূসর সোনালী হয়ে উঠেছে। যেন একখানি নানা-রংএর চিত্রকরা গালিচা গগনের নীল প্রান্ত পর্য্যন্ত পাতা রয়েছে। আকাশে নানা রংএর ছোপ। পূর্ব্বকোণটা স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিকের মত, উত্তরকোণ মেঘে নিকষমণির মত কালো, সম্মুখে মধুর নীলিমা, মাথার ওপর পাখীর পালখের মত হাল্কা মেঘে সূর্য্য ঢাকা পড়ে' গেছে, আলো তেজহীন স্নিগ্ধ।

চারিদিক নিঝুম, সাগরতীর বিজন। সম্মুখে বালির ওপর কয়েকটি ছোট ছেলে-মেয়ের পায়ের দাগ দেখ্‌ছি, ওই বালির পটে আঁকা কচিপায়ের ছবিগুলি ভারি সুন্দর দেখ্‌তে। এখন যদি কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে পাই, তাদের সঙ্গে এই মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুপুরে কল্পনার ধূলীন ঢেউয়ে চড়ে' বাস্তবতার বালিতট ছেড়ে গল্পের সাগরে পাড়ি দি, বিচিত্র ব্যাপার অদ্ভুত কাণ্ড অসম্ভব কথার দেশে হাজির হই।

ভেবেছিলুম আমি বুঝি একা বসে' আছি। মুখ তুলে চাইতেই দেখি নৌকার অপর দিকে বালিতে ডিঙির মত একটি সরু লম্বা গর্ত্ত করে' মেয়েটি হেলান দিয়ে বসে' আছে। চকিতে তার দিকে চেয়ে নৌকার আড়ালে লুকালুম।

মনে হচ্ছে, আজ যেমন দু'জন নৌকার দুদিকে কাছাকাছি বসে' আছি, তেম্নি কতজন্ম এই সাগরজলে পাশাপাশি কাটিয়ে এসেছি। যুগ যুগ পূর্ব্বে যখন এই মাটির পৃথিবী সাগরের নীল ক্রোড়ে জন্মলাভ করেনি, সেই সৃষ্টির উষায়, এই সিন্ধুবক্ষে কি অজানা আনন্দে অন্তর্নিগূঢ় ব্যথায় আমরা দুজন তরঙ্গে তরঙ্গে কেঁপেছি, দুলেছি, প্রবালে জলেছি, ফেনায় ঝিকিমিকি করেছি। তারপরে যখন পৃথিবী-কন্যা সমুদ্রের কোলে জন্ম নিল, সমুদ্রমেখলার কোলে জীবনধারা সুরু হল, সেই সুদীর্ঘ আনন্দময় নব নব প্রাণের অভিব্যক্তিপথের বাঁকে বাঁকে আমরা কতবার পাশাপাশি এসে পড়েছি। সবুজ লতায় হিল্লোলিত হয়ে হাওয়ার মত স্পর্শে পল্লবিত মুঞ্জরিত হয়ে এম্নি কোন সাগরতীরে দুজনে মিলে কত অরুণ-আলোর ধারা, বর্ষার বারিধারা আকণ্ঠ পান করেছি। উদ্ভিদজন্মধারার শেষে জীবজন্মের স্তরে স্তরে কত যুগে কত নব নব জীব-রূপে যে চলে' এসেছি, এই বিচিত্র অনন্ত যাত্রায় দুজনে কতবার কত কাছাকাছি এসে পড়েছি। এক বৃক্ষে নীড় বেঁধেছি, এক বনে ঘুরেছি, এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছি। সেই-সব জন্মের কত জনের সঙ্গে কত জানাশোনার স্মৃতি আজ আমাকে উন্মনা করে' তুল্‌ছে। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সেই সহজ সরল মিলনের উদার পথ খুঁজে পাচ্ছি না, সমাজ-অনুশাসন-কণ্টকিত পথে পরিচয়ের দ্বার চারিদিকে রুদ্ধ। এই ঘননীল সবুজ সাগরের দিকে চেয়ে সূর্য্যের উদার আলোয় বসে' এই কথাই ভাব্‌ছি, জন্মে জন্মে যাদের সঙ্গে কত পরিচয়ের অমৃত পান করে' এসেছি, আজ তাদের সঙ্গে একটু কথা বল্‌তেও সঙ্কুচিত।

এই যে মনে হচ্ছে, এর ত কোন প্রমাণ দিতে পারি না, শুধু মনে হচ্ছে।

দুজনেই উঠে নৌকা থেকে সরে' ঢেউগুলোর আরও কাছে এগিয়ে গেলুম। নিমেষের জন্য মেয়েটি ফিরে তাকাল, তারপর কেউ আর কারো দিকে চাইছি না।

কোন কাজ নয়, কোন চিন্তা নয়, কোন গল্পও নয়, এ মনের কুঁড়েমি কর্‌বার বেলা। শুধু কোন দরদীর পাশাপাশি চুপচাপ বসে' থাকা, আর মাঝে মাঝে ফিসফাস দুচারটি কথা বলা।

পশ্চিম কোণের সাদা মেঘগুলো ইরাণীর চোখের

কাজলের মত কালো হয়ে আস্‌ছে। মনটা একটু ভারী হয়ে আস্‌ছে। মানব-জন্ম লাভ করে' যেমন অনেক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অনুভূতির আনন্দ পেয়েছি, তেম্নি কত সহজ সরল সুখ হারিয়েছি। এই যে ফেনা হয়ে আলোয় জলেছি, ফুল হয়ে ফুটেছি, পাখী হয়ে গেয়েছি, এই আলো জল হাওয়ার স্পর্শের মত আনন্দের স্বাদ যেন ভুলে গেছ্‌লুম। ঋতুর পর ঋতু ফুলে ফলে পা মেলে চলে' যায়, আমরা যন্ত্র গড়ি, হিসেব কসি, গ্রন্থ পড়ি, নগর গড়ি, যুদ্ধ করি, সমাজ ভাঙ্গি, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার কথা ভুলে যাই। এ সমুদ্রতীরে কত হারানো জীবনের আনন্দস্মৃতি, জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে গোপন যোগের কথা উদাসী করে' তুলছে।

দুটি জগৎ পাশাপাশি চলেছে, মানুষের জগৎ আর প্রকৃতির জগৎ। মানুষ প্রকৃতিকে জয় কর্‌তে উদ্যত হয়ে উঠেছে, তার প্রেমের রসের সম্পর্ক ঘুচে গেছে। এই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে যোগাযোগের পথ, সেই গুহাহিত রহস্যময় দ্বার উদ্‌ঘাটন করে' আবার প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় কর্‌তে ইচ্ছে করে। কোন যবনিকা যেন পড়ে গেছে, আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবার রাস্তাটার সন্ধান কর্‌ছি।

কোন কথা নয়, কোন কাজ নয়, কিছু-না-ভাবার দুপুর। পূর্ব্ব দিগন্তে শুভ্রবলাকার মত ছোট মেঘখানি যেমন নীলজলের ওপর চুপ করে' শুয়ে সূর্য্যালোক পান কর্‌ছে, আর কোন নবদেশের স্বপ্ন দেখ্‌ছে; তেম্নি চুপ করে' সমস্ত মন ছড়িয়ে দেহের পাত্র ভরে' শিরায় শিরায় এই বাতাস আলো পান করা। চোখ দুটো সাগরে তলিয়ে দেওয়া। এই চিররহস্যময় কল্লোলমুখর সিন্ধুর দিকে চেয়ে আছি, যেন এক তরুণীর মুখ।

মেয়েটিও স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, খুব কাছাকাছি। কেউ কারো দিকে চাইছি না।

হে অনন্ত সমুদ্র, আজ এই আষাঢ়ের নবমেঘস্নিগ্ধ দিনে তোমাকে যে আমার সুন্দর লেগেছে, তা কি তোমায় জানানো যায় না?

কিন্তু আমার সঙ্গে এ সিন্ধুর যদি কোন মনের যোগ না থাক্‌ত, তবে কি এ বিপুল জলরাশি আমার মনকে এম্নি করে' স্পর্শ কর্‌তে পার্‌ত? তবু এর সঙ্গে সেই পরিচয়ের খোলা পথ যেন কতজন্ম রুদ্ধ হয়ে গেছে,—তাই ঢেউয়ের ভাষা বুঝ্‌ছি না, তার স্মৃতি মনকে উদাস করে' তুলেছে।

আর মেয়েটির সঙ্গেও ত সমুদ্রের মত পরিচয়ের পথ যেন বন্ধ রয়েছে। তবু জানি দুজনের মধ্যে মনের যোগ হয়ে গেছে।

মেঘের ছায়া সমুদ্রের জলে লুটিয়ে পড়েছে; মেঘের কালো বেণীর মধ্যে যেখানে অনন্ত পারাবার কোথায় ডুবে গেছে, সেই দিকে চেয়ে মেয়েটি ও আমি বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে স্তব্ধ বসে' আছি।

(৬)

সুর্ম্মা-মাখা আঁখির মত কালো আকাশ, তার তলে কিশোরীর নয়নের কালো তারকার মত সমুদ্র, শুধু তটের ধারে ধারে অশ্রুজলরেখার মত শুভ্র দীপ্ত তরঙ্গের সুদীর্ঘ রেখা টানা, তারপর চোখের কালো কোলের মত বালুতট। খোলা জানলার গরাদেয় মাথা রেখে সুদূরে চেয়ে বসে' আছি। বাতাস ক্ষেপে উঠেছে, সিরি সিরি বালি ওড়ার শব্দ হচ্ছে, ঢাকাই মস্‌লিনের শাড়ীর মত বালিগুলি উড়ে চলেছে, হাওয়ার গর্জ্জনের সঙ্গে সাগর-গর্জ্জন মিলে রুদ্রের ডিমিডিমি ডমরুধ্বনির মত বাজ্‌ছে।

কার কালো চোখের কথা ভাব্‌ছি। মেয়েটি কাল চলে' গেছে।

বোল্‌তার হুলের মত বালিগুলি গায়ে এসে বিঁধ্‌ছে, জান্‌লাটা বন্ধ করে' দিলুম।

বাইরে ঝড় উঠেছে, ঢেউগুলো ক্ষেপে উঠেছে, বিষ্টি আরম্ভ হয়েছে, অন্ধকার ঘরে বসে' আছি, সমস্ত ঘরটা জলহাওয়ার ঝাপ্‌টায় দুল্‌ছে।

কিশোরীর মুখখানি মনে পড়ছে। এই যে ক'দিন একটু দেখা, একটু চাউনি, কাছাকাছি সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে' থাকা, এর মধ্যে তার সঙ্গে যে যোগ সম্বন্ধ হয়েছে তা ঠিক বোঝাবার মত কথা বোধ হয় ভাষায় নেই, আমি ত খুঁজে পাচ্ছি না।

এই সাগরসঙ্গীতছন্দিত সূর্য্যালোক-চন্দ্রালোক-রস-ধারাস্নিগ্ধ দিন ও রাত্রিগুলির সুনীল বহিরাকাশের ওপর

কিশোরীর চিত্তাকাশের আবরণ জড়িয়ে সে কোন স্বপ্নের আকাশ সৃষ্টি করেছিল। তার এই সাগরতীরে থাকাটুকু ছিল এই সিন্ধুগীতের সঙ্গে সেতারের সঙ্গতের মত।

জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে দুজনে একটু কাছাকাছি এসেছিলুম, আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। হয়ত এ জীবনে আর তার সঙ্গে কখনও দেখা হবে না। তার জন্য একটুও দুঃখ হচ্ছে না। হয়ত কিছুদিন পরে আমি তাকে ভুলে যাব, সেও আমায় ভুলে যাবে। কিন্তু মনের যে ঘরে কত ভুলে-যাওয়া বর্ষাসন্ধ্যা, কত হারিয়ে-যাওয়া শরৎপ্রভাতের সুখস্মৃতি জমা হচ্ছে, সে ঘরে দুজনেরই এ আনন্দক্ষণগুলো জমা হয়ে থাক্‌বে, হারাবে না। কোন ফাগুনসন্ধ্যায় দখিন হাওয়ায়, কোন বর্ষামুখর রাতে অন্তর অজানা কারণে উদাস হয়ে উঠ্‌বে, এই ভুলে-যাওয়া সুখক্ষণগুলি কোনদিন কাজের মধ্যে অতর্কিতে ব্যথা দেবে, তা জান্‌বও না।

তাকে শুধু আর-একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। তাকে দেখেছি, পৃথিবী যেন সবুজ বসন পরে' কিশোরী সেজে সাগরতীরে বসেছে, আর-একবার তাকে দেখি পট্টবস্ত্র-পরিহিতা চন্দনচর্চিতভালে কল্যাণী নববধূরূপে। বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে দেখ্‌তে চাই না, রাজপথে এম্নি অতর্কিতে চতুর্দ্দোলার ফাঁক দিয়ে, হসশঙ্কাকম্পিত লজ্জারুণ নববধূর মুখ।

জানলা খুলে সাগরের দিকে চেয়ে আছি। ঝড় থেমেছে, ভিজে বালির গন্ধে ভরা বাতাস বইছে, মেঘদল বকের দলের মত উড়ে চলেছে। মেঘ হতে ঝরা একটু আলো বালির ওপর ঝিকিমিকি কর্‌ছে।

সন্ধ্যা গভীর হয়ে আস্‌ছে, আকাশ অন্ধকার করে' আবার বিষ্টি পড়্‌ছে।

"ম্লান আলোয় দখিন বাতায়নে
বস্‌ব আমি একা,
তুমি গাবে বসে' ঘরের কোণে
যাবে না মুখ দেখা।
ফুরাবে দিন, আঁধার ঘন হবে,
বৃষ্টি হবে সুরু,
উঠ্‌বে বেজে মৃদুগভীর রবে
মেঘের গুরু গুরু।"

(৭)

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চতুর্থীর চাঁদ মাঝগগনে ঢলে' পড়েছে। চুপে চুপে উঠে দরজা খুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে বালির ওপর পা টিপে টিপে চল্লুম সাগরের অভিসারে। কোন্-সুখস্বপ্নময় চোখে ঘুমন্ত পৃথিবীকে দোলাতে দোলাতে সিন্ধু গান গাচ্ছে।

ঢেউগুলির সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম, একটি ঢেউ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কাপড় ভিজিয়ে দিল।

হে চিরসুন্দরী অনাদি আদিজননী, আজ তোমার স্নিগ্ধকোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' অতল কালো স্নেহে ডুবে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিরাট জঠরে সঙ্গীতচ্ছন্দে নৃত্যলীলায় যে আনন্দ-কম্পন অনুভব করেছি, সে আনন্দ আমার দেহের শিরায় শিরায় তেম্নি করে' অনুভব করি, আবার তেম্‌নি তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে আলোকে ঝলমল করে' ফেনপুঞ্জে শুভ্রপুষ্পের মত ফুটে শিউরে নিমেষে ঝরে' পড়ে' নৃত্যপাগল হয়ে তোমার অনন্তদেহ বেষ্টন করে' এই নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা হতে সূর্য্যালোক চন্দ্রালোক পান করি, নব নব দ্বীপ গড়ি ভাঙ্গি, নব নব দেশ মহাদেশের তটে তটে কখনও প্রলয়মত্তিতে ভেঙ্গে পড়ে' সব চূর্ণবিচূর্ণ করে' তোমার অতলে তলিয়ে দি, কখনও তীরে তীরে মাতার কল্যাণহস্তের মত স্পর্শ করে' শান্তির দোলায় দোলাই; ইচ্ছে কর্‌ছে, এই তোমার বিরাট দেহে মিশে গিয়ে ওই মানবসভ্যতাপ্রপীড়িত যুদ্ধ-দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ মাটির পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিপুল অট্টহাসে রুদ্রের পিনাকধ্বনির তালে তালে মহাপ্লাবনে লুটিয়ে পড়ে' নিমেষে তোমার বিরাট জঠরে এ পৃথিবীকে ডুবিয়ে মিশিয়ে আবার নূতন পৃথিবী গড়ে' তুলি, নব মানব সৃষ্টি করি, মানব-ইতিহাসের প্রেমশান্তির পর্ব্ব খুলে দি।

পশ্চিমের কালো মেঘে চাঁদ ডুবে গেছে। আকাশ অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে, ঢেউগুলো আগুনের শিখার মত কাঁপ্‌ছে।

কিশোরীর চিররহস্যময় কালো চোখের মত সিন্ধু চেয়ে রয়েছে।

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

ঝঞ্ঝা-ধ্রুপদ

ঝোড়ো-হাওয়া, ঝোড়ো-হাওয়া! জাগাও তোমার
প্রলাপ-ভাষায়,
আমার ঘরে বন্ধু এস—আকুল আমি তোমার আশায়!
ছোট্ট-বুকের আরাম-ব্যথা
থাক্ বা না থাক্—তুচ্ছ কথা!
পত্র-পুঁথি ছিঁড়ে খুঁড়ে
'লু' চালিয়ে ফেলো ছুঁড়ে,—
মনকে আমার নাও টেনে নাও উধাও তোমার সঙ্গী করে',
যেথায় খুসী যাও নিয়ে যাও, মাতাও হাজার ভঙ্গীভরে!

জীবন-মরণ গোলাম তোমার জগৎজোড়া নাগর-দোলায়,
বিষামৃতে এক্‌সা করে' রেখেছ গো ডাগর ঝোলায়!
থামিয়ে দিয়ে প্যান্‌প্যানানি,
সংসারেরি ঘ্যান্‌ঘ্যানানি,
ঝঞ্ঝনা আর ঝঞ্ঝাবাতে,
ক্ষিপ্ত তোমার মন জানাতে
একঘেয়ে এই জীবন-স্রোতে হে বিচিত্র! জাগো—জাগো!
মলয়-গানের তান ডুবিয়ে ভয়াল করাল! ওঠো—রাগো!

ঝড় যে আমার জাঁতের ঠাকুর, ঝড় যে ওগো স্যাঙাত আমার,
ঝড় যে আনে স্বাধীনতা—পাখোয়াজ বাজিয়ে ধামার!
বিশ্বে যত ময়লা-ধূলি,
জমে' আছে কালী-ঝুলি,
বিশ্বে যত ঝরা-ঝুনো,
ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে বুনো—
হা-হা-হা-হা পাগ্‌লা হাসে পট্‌পটাপট্ হাততালিতে,
ধব্‌ধবে ঐ নরম আলো ঘুট্‌ঘুটে হয় বৈকালীতে!

মেঘের জটা যাচ্ছে খুলে, ঝট্‌কা বাজায় ঝল্লরী গো,
বিলাসীদের আরাম্-বাগে ছিঁড়ছে ফুলের বল্লরী গো!
জন্মে কভু হয়-নি নীচু,
দয়া-মায়া চায় না কিছু,
মিন্‌মিনে যার করুণ গাথা,
যায় লুটিয়ে তাহার মাথা—

হঠাৎ এসে হট্টগোলে হুড়্‌মুড়িয়ে তুড়্‌তুড়িয়ে—
ঘরমুখো সব কুণো প্যাচার ঘর ভেঙে কোণ দেয় গুঁড়িয়ে!

সাহারাতে 'সিমুম' সাজে—বালির সিন্ধু যেথায় ধু-ধু!
বালির ধারায় কুল্‌কুচো তার, দিচ্ছে দেদার হুম্‌কি শুধু!
চীন-সাগরে 'টাইফুনে'তে,
জট্‌লা করে লাখ্ খুনেতে,
ঘোরণ-পাকে হ্যাচ্‌কা-টানে—
জাহাজ টানে পাতাল-পানে—
ধ্বংস যত হর্ষ ততই—মৃত্যু যত নৃত্য তাথই—
কান্না শুনে হাস্য করে—ক্ষেপে ওঠে চিত্ত ততই!

ঝড়ের মোড়ল! শক্তি দাও গো, লাঞ্ছিতদের
দেহের শিরায়!
রুশ্-মাঝারে যে ঝড় সুরু, চল্‌ছে এখন ঐ রুসিয়ায়!
গরিব যত শ্রমীর বুকে
তোমার ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে
ক্ষুদ্র-জনে রুদ্র করে,
মান্য আনে শূদ্র-তরে,—
অত্যাচারী ভূঁইয়া-রাজা কুলীন-ধনী পালায় তখন—
'নিম্ন-জাতি' চাষা তাঁতি ফুলিয়ে ছাতি আগায় যখন।

বুদ্ধ নিমাই খৃষ্ট রূপে ঝাত্যা প্রেমের তুল্‌লে তুমি,
সব-তেয়াগী প্রেমের তোড়ে ভাসিয়ে দিলে মর্ত্ত্য-ভূমি।
দ্যাখালে প্রেম কঠোর চরম,
অর্থে-কামে হয় না নরম,
বিপুল প্রাণের অবাধ ঝড়ে,
ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ে,—
লক্ষযুগের বক্ষ-ভরা মিথ্যা যত পুঞ্জ-করা,—
দৃপ্তবেগে লুপ্ত করে'— স্নিগ্ধ করে দিগ্ধ ধরা।

তৈরি তোমার আপন হাতে কালাপাহাড় নেপোলিয়ঁ।—
দরাজ যাদের বুকের পাটা—যায় প্রাচীনে পায় দলিয়া।
কাল-বোশেখীর মেঘের মত,
মত্তিমত্ত বেগের মত,

লক্ষ মানবকের ভিড়ে
সীমার বাঁধন ফেল্‌লে ছিঁড়ে,—
বামন তাদের নিন্দা করে, ক্ষুদ্র তাদের বলে 'দানব'—
নিন্দা-খ্যাতি সমান তাদের—বিদ্রোহী যে মহামানব।

জীর্ণ প্রাণের দীর্ণ বাসা—নড়্‌বোড়ে সব পাতার কুঁড়ে,
তাণ্ডবেরি চক্রে তব হে নটবর! যায় গো উড়ে!

জ্যান্ত-মড়ার শ্মশান-মাঝে
তোমার ভীষণ বিষাণ বাজে,
হে মহাদেব! 'অতীত-ভোলা!
বর্ত্তমানের দোলাও দোলা,—
নূতন স্বজন হবে বলে' পুরাতনে ধ্বংস হানো,
ব্যর্থ জরার কবল থেকে যৌবনেরি অংশ আনো!

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

শোধনাশ্রম

কিছুদিন হইল হল্যাণ্ডের বালক অপরাধীদের একটি শোধনাশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। আশ্রমটি—আদর্শ-স্থানীয় বলিয়াই পরিচিত। বিস্তীর্ণ পাইন বনের ধারে উঁচু ডাঙার উপর সুদৃশ্য স্থানেই আশ্রমটি স্থাপিত। বাড়ী-গুলির চেহারাও মানুষের মনে একটা ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু ঢুকিবার পথটি ঠিক জেলখানার মত। একজন দ্বাররক্ষক দরজায় তালা খুলিয়া আমাদের ভিতরে ঢুকাইয়া অধ্যক্ষকে খবর পাঠাইল। দীর্ঘকায় লোকটি, মুখ শ্মশ্রুল, কঠোর, কিন্তু সদয়হাস্যরঞ্জিত। তাঁর কোমরে জড়ানো একটা শিকলে এক-গোছা চাবি। এইটিই আমার চোখে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর লাগিয়াছিল। এই চাবিগুলি দিয়া প্রত্যেক দরজা খুলিয়া তিনি আমাদের ভিতরে ঢুকাইতে-ছিলেন, আবার পিছনেরটি বন্ধ করিয়া দিতেছিলেন। বাড়ীগুলিতে পাঁচশত বালকের বাস, কিন্তু তবু চারিদিক নীরবতার দুঃসহ ভারে ভারাক্রান্ত। পড়িবার ঘরগুলিতে দেখিলাম সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবের সব ব্যবস্থা; হাতের কার্[illegible] শিখিবার ঘরও দেখিলাম, ব্যায়ামশিক্ষার জন্যও চমৎকার একটি ঘর রহিয়াছে। কিন্তু ছেলেদের মুখে কোথাও অন্ধকার আর বিষাদ ছাড়া আর-কিছুর ছায়া দেখিলাম না। ঘুরিতে ঘুরিতে অধ্যক্ষ মহাশয় এক জায়গায় কঠিন মুখে এক-জোড়া লোহার কপাটের তালা খুলিয়া একটি নির্জ্জন কক্ষ দেখাইলেন। সেই নির্জ্জন খোপটির ভিতর চোদ্দ বৎসরের একটি হতভাগ্য বালক দাঁড়াইয়া আছে, তার না আছে বসিবার কোনো রকম আসন, না আছে পড়িবার কোনো বই; ঘরে চারিদিকে জোড়া জোড়া দেয়াল, বেচারী যদি কান্নাকাটি কি চেঁচামেচি করে তবে সে শব্দ কেবল নিজের কানেই ফিরিয়া আসিবে; বাহিরে শব্দ যাইবার উপায় নাই। শুনিলাম হতভাগ্য বালক পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল তাই তাহার এমন শাস্তি। সম্ভবত সেখানকার অতগুলি ছেলের মধ্যে এই ছেলেটিই সকলের চেয়ে স্বাধীনতার ভক্ত, তবু তাহাকে এমন বীভৎস রকম শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। স্নানের ধারাযন্ত্র দেখিলাম আর দেখিলাম একটি "পরিবীক্ষণ মঞ্চ"—সেখানে একজন প্রহরী খাড়া হইয়া আছে, কেহ কোথাও আত্মহত্যার চেষ্টা করে কি না দেখিবার জন্য। তার পর শয়নাগার দেখিতে চলিলাম; তালা-বন্ধ ছোট ছোট এক-একটি খোপে এক-একটি ছেলে ঘুমায়, সঙ্গীদের সঙ্গে কারুর কোনো যোগ থাকে না। খোপগুলি নানারকম ভাবে সাজানো; এই সামান্য সাজসজ্জার ভিতর দিয়াই যেন ছেলেরা আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কোথাও উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত রেখাঙ্কণে দেয়ালগুলি সাজানো; কোথাও বা মা বাবা ভাই বোনের ফটো-গ্রাফেই দেয়াল সজ্জিত। অনেক জায়গাতেই দেখিলাম বিছানার মাথার কাছে একটি ক্রুশকাষ্ঠ ঝুলিতেছে। এক জায়গায় বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম একটি ছোট ছেলে রান্নাঘরের বাহিরে কি কাজে ব্যস্ত; আমি কৌতুকচ্ছলে দূর হইতে তাহাকে হাত নাড়িয়া

শোধনাশ্রমে রবীন্দ্রনাথ—তাঁর ডান ধারে মিঃ ষ্টার

সম্ভাষণ করিলাম, ছেলেটিও হাত নাড়িয়া আমার অভিনন্দনের সাড়া দিল। কিন্তু আমার সঙ্গী বন্ধুর কাছে শুনিলাম বাহিরের লোকের সঙ্গে ছেলেটির এই কৌতুক যদি কেহ দেখিয়া থাকে তাহা হইলে ছেলেটির কপালে কিছু বিপদ আছে।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে একটি ঘরে গেলাম, সেইটির দরজায় দেখিলাম তালা নাই। ঘরের ভিতরের ছেলেগুলিরও মুখে হাসি দেখা গেল। তাহারা বয়সে অন্যদের চেয়ে বড়। অতিথিদের দেখিয়া তাহারা ভীড় করিয়া চারিধারে আসিয়া দাঁড়াইল, বেশ হাসিমুখে খোস-মেজাজে কথাবার্ত্তায় যোগ দিল, গল্প করিল। এ ঘরের আবহাওয়ার সঙ্গে অন্যান্য ঘরের আবহাওয়ার এত আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলাম। অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার অর্থ কি! তিনি বলিলেন যে এই বড় ছেলেগুলি শোধনাশ্রমে বাসকালে ভাল ব্যবহার করিয়াছিল, এখন ইহাদের মধ্যে অনেকে নিকটবর্ত্তী সহরে কাজকর্ম্ম করে। ছোট ছেলেদের মত ইহাদের কখনও তালা-বন্ধ করিয়া রাখা হয় না, ইহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে। হল্যাণ্ডবাসী সাধারণ যুবকদের মত ষোল সতের বৎসর বয়সের পর ইহাদের ধূমপান পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন ব্যবহারে যখন স্পষ্ট সুফল পাওয়া যাইতেছে তবে সকলকার সঙ্গেই এই ভাবে ব্যবহার করা হয় না কেন? ইহারা যে সুখী ও সন্তুষ্ট তা ত দেখাই যাইতেছে।" শুনিলাম অল্পবয়স্ক অপরাধীরা এখনও এরকম স্বাধীনতা পাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। বুঝিলাম সুখী হওয়া তাহাদের কপালে নাই।

হল্যাণ্ডে সম্ভবত এমন আরো অনেক শোধনাশ্রম আছে যাহাদের কার্য্যপ্রণালী ইহার অপেক্ষা সুসংস্কৃত পথে চলে। কিন্তু শুনিয়াছি আমেরিকার বালক অপরাধীদের অনেক আশ্রমেরই পূর্ব্বোক্ত আশ্রমের দশা। এক জায়গায় শুনিয়াছি ছেলেদের সৈন্যকাওয়াজের ধরণে চালনা করিয়া খাইবার ঘরে লইয়া যাওয়া হয়, খাইতে খাইতে কথা বলাও তাহাদের বারণ। আর একটি আশ্রমে সামান্য ত্রুটি ঘটিলেই ছেলেদের ধরিয়া জলের কলের তলায় মাথা পাতিয়া দেওয়া হয়; যতক্ষণ না রুদ্ধ নিশ্বাসের চাপে তাহারা হাঁপাইয়া উঠে ততক্ষণ তাহাদের নিষ্কৃতি নাই।

হ্যারল্ড, বিদ্যালয়ের চৌকস ছাত্র কাপ লইয়া

কিন্তু আমেরিকাতেই এক জায়গায় একজন ভদ্রলোকের কাজ দেখিয়াছি যিনি "মন্দ ছেলে" কথাটাতেই বিশ্বাস করেন না। দশ বৎসর আগে বাল-অপরাধীদের লইয়া তিনি তাঁহার বিশ্বাসের পরীক্ষা সুরু করেন। তিনি মনে করেন সাধুতা জিনিষটা মানুষের অন্তরাত্মার স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র, স্বভাববিরুদ্ধ কোনো আইনের কঠোর বশ্যতা নয়। মিশিগানের অন্তর্গত এলবিয়নে বালকদের জন্য এই "ষ্টার কমনওয়েল্‌থ্‌" প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই শিক্ষালয়টি দেখিতে গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কবি প্রতিষ্ঠাতাকে লিখিয়া পাঠান :—

"মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের প্রাণময়ী নির্ঝরিণীর দেখা পাইলে মানুষের যেমন লাগে, আপনার ওখানে গিয়া আমার ঠিক তেমনই লাগিয়াছিল। যাহাদের আকৃতি বিরাট, এমন অনেক জিনিষ ভুলিয়া যাইব, কিন্তু আপনার ছোট বিদ্যালয়টুকুর স্মৃতি শেষদিন পর্য্যন্ত আমার জীবনের অংশরূপে থাকিয়া যাইবে; কারণ সেখানে আমি সত্যের স্পর্শ পাইয়াছি, সেখান হইতে কিছু সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। আপনার ছেলেদের জন্য আপনি যে কাজ গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমি বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি; আমি চিরকাল দৃঢ়তার সহিত যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, আপনি ত কাজে তাহাই দেখাইতেছেন; আমি বিশ্বাস করি বালক মাত্রেই তাহার অন্তরপ্রকৃতির বিকাশের দ্বারা মানুষের বিশ্বাস ও সহানুভূতির কাছে সাড়া দেয়।"

মিঃ ষ্টার ছেলেদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবেন এই ইচ্ছা লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম যখন তিনি কাজ সুরু করেন সেই সময় একটি বাল-অপরাধীর সম্বন্ধে সহরের বিচারপতি বলিয়াছিলেন যে এ ছেলেকে সংশোধন করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। বারবার অনেকবারই সে ছেলেটি চুরি-ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আদালতে হাজির হইয়াছিল। তাহার বয়স ছিল তের বৎসর, সেই বয়সেই যখন সে আটটি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইল, তখন অগত্যা বিচারপতি তাহাকে শোধনাশ্রমে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। মিঃ ষ্টার আদালতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ছেলেটিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের আশ্রমে লইতে চাহিলেন। তাঁহাকে লইবার অনুমতি দেওয়া হইল এই সর্ত্তে যে তিনি ছেলেটির ব্যবহারের জন্য দায়ী হইবেন। আশ্রমে পৌঁছিয়া মিঃ ষ্টার ছেলেটিকে বলিলেন :—

"শোন হ্যারল্ড, আজ থেকে তুমি আমার পরিবারের একজন। আমি কখনও দরজায় তালা লাগাই না, আর আমার টাকাকড়ি সব আমি আমার এই যে দেরাজটায় রাখি এর, চাবিও হারিয়ে ফেলেছি। তুমি উপরেই শোবে, কাজেই রাত্রিবেলা চুপিচুপি উঠে টাকাকড়িগুলো পকেটে করে বাড়ী ছেড়ে অনায়াসেই পালাতে পার, কিন্তু আমি জানি যে এমন কাজ তুমি কখনই করবে না।
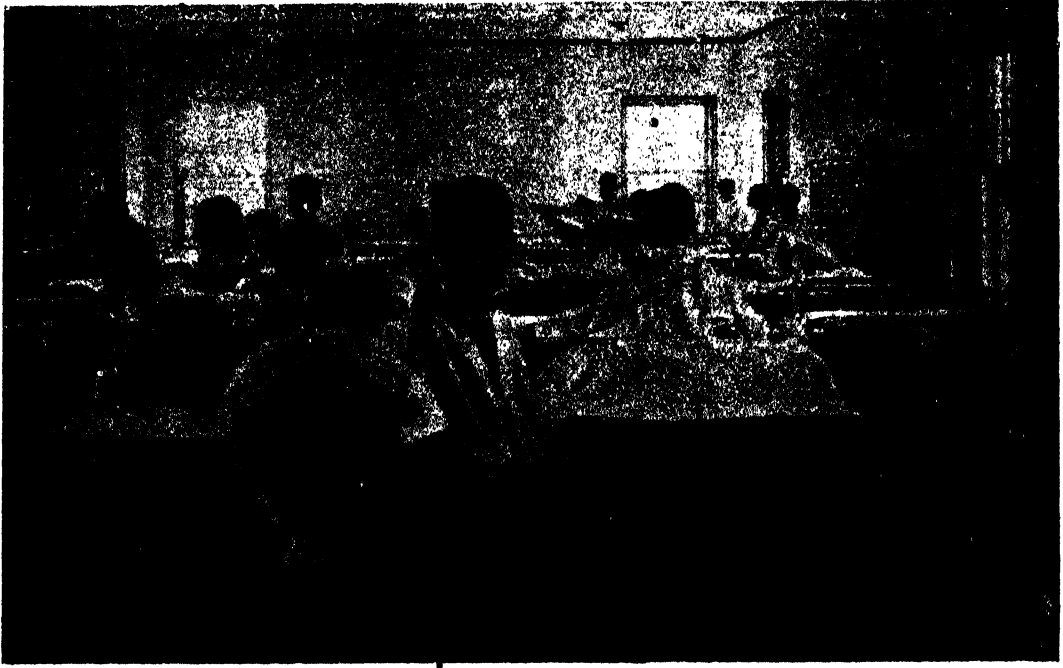
শোধনাশ্রমে ছাত্রদের বিছানা পাতা

ছেলেটির মুখে চোখে যে কি অপূর্ব্ব বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল মিঃ ষ্টার আমাকে সে কথা বলিয়াছিলেন। ছেলেটি মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরই কর-মর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বেশ, আপনি যদি আমার সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার করিতে চান, তাহা হইলে আমিও সেই পথে চলিতে পারিব। আমাকে আগে আর কেহ কখনও বিশ্বাস করে নাই।"

সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত হ্যারল্ড্ কখনও এতটুকু অন্যায় উপদ্রবও করে নাই। এক বৎসর পরে হ্যারল্ড্ বিদ্যালয়ের ছেলেদের একটি ছুটি-ছাউনিতে তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। সেখানে প্রত্যেক বৎসর বালক-সাধারণের মতে যে-বালক সব বিষয়ে চৌকস বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাকে একটি রৌপ্য-পাত্র উপহার দেওয়া হয়। সে বৎসর হ্যারল্ড্ই এই পাত্রটি জয় করিয়া আনে। তার পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, হ্যারল্ড্ এখন "ষ্টার সাধারণতন্ত্রে" মিঃ ষ্টারের সহকারীরূপে ফিরিয়া আসিয়াছে, সহকারীদের মধ্যে হ্যারল্ডের স্থান খুবই উচ্চে।

মিঃ ষ্টার কাজ সুরু করিবার কিছুদিন পরে একজন ভদ্রলোক তাহার কাজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। বসিবার ঘরে বসিয়া তিনি আর কোথায় একটি শোধনাশ্রম দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহারই গল্প করিতেছিলেন। সেখানের কি রকম চমৎকার সব বন্দোবস্ত এবং বিচার-পতি বি— যে তাহার নিকৃষ্টতম আসামীদের সেখানেই পাঠাইয়া থাকেন ভদ্রলোক তাহাও বলিতেছিলেন। চুরি জুয়াচুরি প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত বালকদেরও নাকি সেই আশ্রমে পাঠান হইত। ভদ্রলোক কথা বলিতে বলিতে লক্ষ্য করিলেন বেশ একটি হাসিখুসী ছেলে কি রকম যেন একটু অসোয়াস্তি বোধ করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। মিঃ ষ্টার বলিলেন, "ছেলেটি বিচারক বি—র আদালতেরই একটি আসামী, চুরি ও জুয়াচুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল।"

ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনি যখন ষ্টেশন হইতে আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন তখন এই ছেলেটিই না আপনার গাড়ীতে ছিল?"
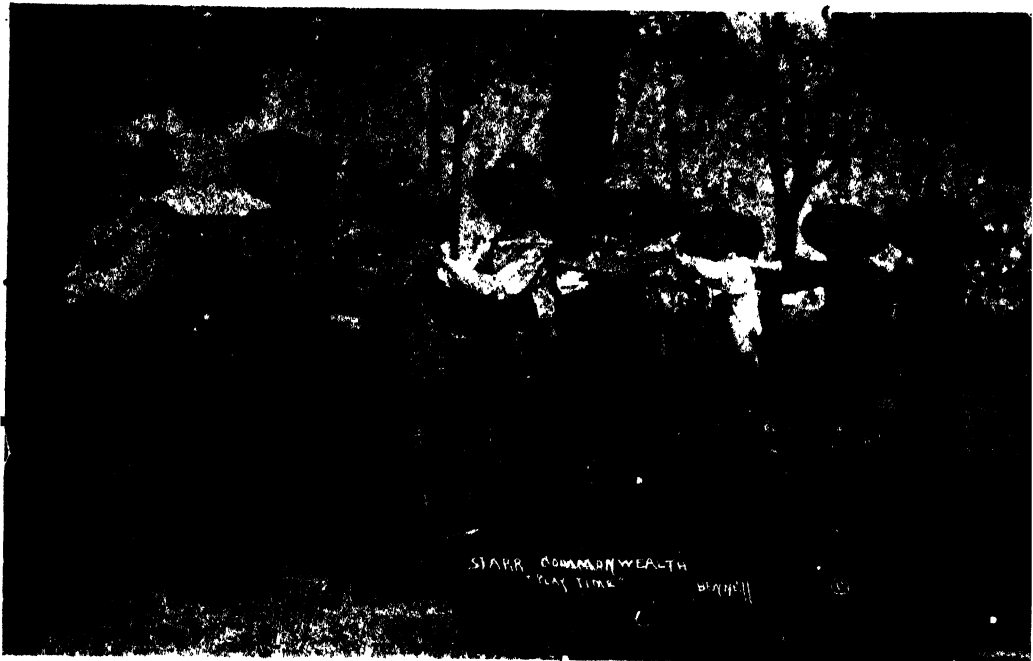
শোধনাশ্রমের আটজন ছাত্রের একত্রে খেলা

মিঃ ষ্টার বলিলেন, "হ্যাঁ।"

"আপনি না সহরের মধ্যে সঙ্গীতের পাঠ লইবার জন্য উহাকে গাড়ী হইতে নামিতে দিলেন ?"

মিঃ ষ্টার বলিলেন, "হ্যাঁ।"

"আপনি না ফিরিয়া আসিবার জন্য ছেলেটির হাতে গাড়ীভাড়ার পয়সা দিলেন ?"

মিঃ ষ্টার বলিলেন, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আচ্ছা, কাজটা কি একটু বিপদ্-জনক নয় ? আপনি ছেলেটিকে বিশ্বাস করিলেন কি করিয়া ?"

মিঃ ষ্টার বলিলেন, "ছেলেটিকে অবিশ্বাস করিবার মত কোনো ব্যবহার তাহার কাছে কখনও পাই নাই বলিয়াই তাহাকে বিশ্বাস করি। সে এখানে ছয় মাস আছে, এবং খুব চমৎকার ব্যবহারই করিয়াছে। বলিতে কি, আমার বিদ্যালয়ের ও একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আমাকে উহার কাহিনী বলুন।"

মিঃ ষ্টার বলিলেন, "এই একই ছাঁচের কাহিনী আমি আপনাকে আরও অনেক বলিতে পারি। বিশ্বাস যে বালকদের পক্ষে কত বড় জিনিষ কাহিনীটির মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন।" মিঃ ষ্টার তাহার পর নিম্নলিখিত গল্পটি ভদ্রলোকটিকে বলিলেন।

র্যাল্‌ফের পিতা তাহার মাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। র্যাল্‌ফ্ মার কাছেই থাকিত। মাকে বাধ্য হইয়া কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইত, ভাড়াটে রাখিয়া টাকার চেষ্টা করিতে হইত, কাজেই ছেলের দিকে নজর দিবার তাহার বিশেষ সময় থাকিত না। ছেলেটি বেশ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল, প্রায়ই পাঠশালা হইতে পলাইত, আর তাহারই মত পারিবারিক-বন্ধনহীন নানা ছেলের সঙ্গে মিশিয়া যত রকম ফ্যাসাদ বাধাইয়া এবং ফ্যাসাদে পড়িয়া দিন কাটাইত। সে ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে খুব ভালবাসিত; ময়লা ছেঁড়া যা-খুসী-তাই কাপড়-চোপড় পরিয়া লোকের সামনে বাহির হইতে তাহার লজ্জা করিত। কিন্তু ভাল কাপড় পরিবার মত টাকা তাহার মোটেই ছিল না; তাই প্রলোভনে পড়িয়া একদিন সে জাল চেক ভাঙ্গাইয়া ফেরারী হইয়া গেল। আদালতে সে ইতিমধ্যে অনেক-

বারই গিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই বিচারক তাহাকে ঘরে ফিরিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইবার সুযোগ দিয়াছিলেন; এবার আর তাহা হইল না। বিচারক আর তাহাকে আপনা-আপনি সারিয়া উঠিবার সুযোগ দিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। ছেলেটির বন্ধুবান্ধবেরা মিঃ ষ্টারকে তাহার ভার লইতে অনুরোধ করিল; মিঃ ষ্টার দেখিলেন ছেলেটিকে না লইলে তাহাকে সাধারণ শোধনাশ্রমে ছাড়া আর কোথাও পাঠান হইবে না, কাজেই তিনি তাহাকে লইতে রাজি হইলেন। ছেলেটির দায়িত্ব লইবার পূর্ব্বে মিঃ ষ্টার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ র‍্যাল্‌ফ্‌, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে চাই, এবং জানিতে চাই যে তুমি আমার বিশ্বাসের মূল্য রাখিবে কি না।" ছেলেটি বেশী কিছু বলিল না, কেবল বলিল, "হ্যাঁ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বিশ্বাসের মূল্য রাখিব।" মিঃ ষ্টার তাহাকে আশ্রমে লইলেন। ছেলেটি তাহার পর একদিনও নিজের প্রতিজ্ঞার অপমান করে নাই। তাহাকে লইয়া কেবল এক জায়গায় মিঃ ষ্টারের একটু গোলযোগ বাধিত; অনেককাল পর্য্যন্তই ছেলেটির ধারণা ছিল যে পোষাকেই মানুষের মূল্য। একদিন মাঠে মিঃ ষ্টার জমি চষিতেছিলেন, এমন সময় একখানা মোটর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীখানা দেখিয়াই র‍্যাল্‌ফ্‌ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ফ্রয়েড্‌ কাকা, লোকজন আসিয়া পড়িবার আগেই ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া আসুন।" মিঃ ষ্টার বলিলেন, "কখনই না। অতিথিরা যদি আমার ভাল কাপড়গুলি দেখিতে চান, তবে তুমি তাঁহাদের আমার ঘরে লইয়া গিয়া আল্‌মারি খুলিয়া দিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন। আর তাঁহারা যদি আমাকে দেখিতে চান, তাহা হইলে এইখানেই দেখিতে পারেন।"

পরের বৎসর র‍্যাল্‌ফ্‌ যখন তিন মাইল দূরে সহরের হাইস্কুলে পড়িতে যাইত, তখন সহরের সব ছেলে-মেয়েরাই তাহাকে চিনিত। তখন তাহাকে প্রায়ই গাড়ী হাঁকাইয়া আশ্রমের কয়লা আনিতে হইত; কিন্তু কয়লা-মাখা পোষাক পরিয়া এমনি অবস্থায় পথে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে তাহাকে আর কখনও লজ্জা পাইতে দেখা যায় নাই। ছেলেটি এখন বেশ পড়াশুনা কাজকর্ম্ম
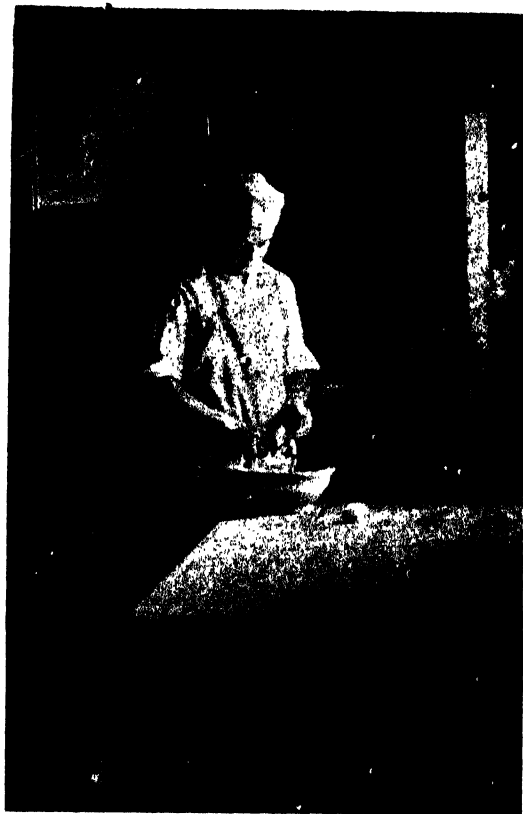
বালক-রাঁধুনী

করিতেছে, তাহার চরিত্রে ব্যবহারে আর চেহারায় খুঁৎ ধরিবার কিছু নাই।

ওয়াল্‌ডো নামক আর-একটি বালকের কাহিনীও এইরূপ চিত্তাকর্ষক। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার খাতায় এই কাহিনীর সূচনা। অত্যন্ত অল্পবয়সেই এই সভার হাতে ছেলেটি পড়িয়াছিল। সহরের এক রাস্তায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল। খাতায় তাহার নাম ভর্ত্তি করিবার সময় নামও পাওয়া যায় নাই। কাজেই লেখা হইল, "শিশু বালক। নাম অজ্ঞাত, পিতামাতা অজ্ঞাত। বয়স সম্ভবত চার কিম্বা পাচ।" ছেলেটি নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলিতে পারে নাই। অনেক কষ্টে সে বলিতে পারিল যে তাহার মা সম্প্রতি তাহার পিতার হাতে তাহাকে ও তাহার শিশুভগ্নীকে সঁপিয়া দিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। মাতার অন্ত্যেষ্টির

রিপুকর্ম্মে ব্যস্ত

পর শিশুদের লইয়া পিতা বাড়ী ফিরিয়া আসে। তাহার কিছুক্ষণ পরে ছেলেটিকে বাড়ীতে একলা ফেলিয়া দিয়া মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া পিতা বাহিরে চলিয়া যায়। অনেকক্ষণ পরে লোকটি যখন আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সঙ্গে মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। কিছু খাবার খাইতে দিয়া পিতা ছেলেটিকে দোকান বাজার দেখাইতে লইয়া যায়। ছেলেটি একমনে একটা দোকানের উজ্জ্বল সুন্দর জানালার দিকে মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া ছিল, এমন সময় তাহার পিতা কোথায় সরিয়া পড়ে; ছেলেটির চমক ভাঙিতে দেখিল জনাকীর্ণ রাস্তায় সে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রথম গৃহ সম্বন্ধে তাহার স্মৃতিতে এইটুকুই জাগিয়া আছে। তাহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর নানা লোকের তত্ত্বাবধানে তাহার দিন কাটিয়াছে; কিন্তু ছেলেটির স্বভাব এত নোংরা এবং কথাবার্ত্তা এত কুৎসিত ও অশ্লীল ছিল যে কোনো পরিবারই তাহার ভার লইতে চাহিত না। ইহা ছাড়া মিথ্যাকথা বলা ও চুরি করা—সুবিধা পাইলেই সে সে-সব দিকেও ঝুঁকিত; এমনি ভাবে অবশেষে সে একদিন বাল-আদালতের হাতে আসিয়া পড়িল। মিঃ ষ্টা কে ছেলেটির ভার লইতে বলা হইল। তাহার নাম রাখা হইয়াছিল ওয়াল্‌ডো গ্রাহাম; বয়সের কোনো হিসাব কাহারও জানা ছিল না। শরৎকালের ম্লান বিষণ্ণ কন্‌কনে এক দিনে সে এই সাধারণতন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। মিঃ ষ্টারের মা তাহাকে নিজের পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ওয়াল্‌ডো, তোমায় ভালবাসে এমন কি তোমার কেউ আছে?" কথার উত্তর দিতে ছেলেটির ছোট ছোট ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল, বড় বড় চোখ জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সে বলিল, "বোধ হয় কেউই নেই, এক ভগবান ছাড়া।"

এ ছেলেটিকে গড়িয়া তোলা বড়ই শক্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অযত্নে ও অবহেলায় কাটানো শৈশবে যে-সব কুঅভ্যাস ও দোষত্রুটি সে সঞ্চয় করিয়াছিল সে-সবের হাত হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে অনেক বৎসরের সযত্ন শিক্ষার দরকার হইয়াছিল। কিন্তু তাহার "ফ্রয়েড কাকার" বাড়ীর স্নেহ ভালবাসা তাহার হৃদয়কে শীঘ্রই স্পর্শ করিল, হৃদয় শীঘ্রই সাড়া দিতে শিখিল। তাহার ভালর জন্য যে-সব চেষ্টা হইত, ওয়াল্‌ডো নিজেই তাহার সহায়তা করিতে তৎপর হইয়া উঠিল। এখানে মাস কয়েক থাকিবার পর একদিন ছেলেটিকে বড় চুপচাপ আর বিষণ্ণ দেখা গেল। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে ছেলেটি কাঁদিয়া বলিল, "কাকা, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিতে-ছিলাম, মা আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কত আদর করিতেছি; এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া দেখিলাম যে একটা কম্বলের পুঁটলি জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া আছি। তখন মার সঙ্গে কথা বলিতে আমার কি রকম যে ইচ্ছা করিতেছিল কি বলিব!"

তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কত চেষ্টা করিয়াও কিন্তু ছেলেটির পিতামাতার কোনো পরিচয় কি সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শেষ দিনের ক্ষীণ স্মৃতি-টুকুই তাহার বাড়ীর একমাত্র সম্বল। এখন ছেলেটি বেশ সুস্থ বলিষ্ঠ যুবক হইয়া উঠিয়াছে; চাষবাসের কাজ

করিয়া আনন্দেই দিন কাটায়। এই আশ্রমে দুই বৎসর কাটাইবার পরের বড়দিনের সময় একদিন ছেলেটি আসিয়া মিঃ ষ্টারকে বলিল, "ফ্লয়েড কাকা, আমার ত টাকাকড়ি কিছু নাই, কিন্তু বড়দিনে আনন্দ করিবার জন্য গরীব ছেলেদের আমার কিছু দিতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, আমি যদি বড়দিনের আগে দুইচারবার না খাইয়া সেই পয়সাটা জমাইয়া কোনো গরীব ছেলেকে পাঠাই, আপনি কি তাহাতে মত দিবেন? আজ যদি আমি এখানে না থাকিতাম, তাহা হইলে, হয়ত কাহারও দরজার গোড়ায় কি কোনো সাঁকোর তলায় ঘুমাইয়া আমার রাত্রি কাটিত। এই রকম কত শত ছেলেই ত আছে।"

মিঃ ষ্টার ভাবিলেন হয়ত আশ্রমের অন্য অন্য ছেলেরাও এই রকম দান করিতে চাহিতে পারে। ওয়াল্‌ডোকে বলাতে সে রাত্রে খাবার সময় সকলের কাছে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিল; দেখা গেল সবাই রাজি। সেই দিন হইতে প্রতি বৎসরই বড়দিনের সময় ছেলেরা এক বেলা অনাহারে থাকিয়া স্ব-ইচ্ছায় সেই অর্থ গরীব ছেলেদের দান করে। কাছের সহরের যে-সব শিশুর পিতামাতা দারিদ্র্যের জন্য দুধ কিনিয়া সন্তানকে দিতে পারেন না, তাহাদের দুধ কিনিবার জন্য এবৎসর ষ্টার সাধারণতন্ত্রের ছেলেরা ৮০৲ টাকা আন্দাজ দান করিয়াছে।

ষ্টার কমন্‌ওয়েল্‌থে যে কি ধরণের কাজ হয় তাহা এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই যথেষ্ট বুঝা যাইবে। এই দুইটি দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটি কথাই সত্য এবং এই রকম বহু বালকের জীবনই এখানে এই ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। যাঁহারা এই বিদ্যালয় দেখিতে আসেন তাঁহারা এখানকার ছেলেদের খুসী চেহারা ও পুরুষোচিত ধরণ-ধারণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। ছেলেরা এমন সহজ সরল ভাবে সোজাসুজি গিয়া অতিথিদের অভিবাদন করে যে তাহাদের নির্ম্মল জীবন ও নৈতিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় আসে না। নিকটবর্ত্তী এল্‌বিয়ন সহরের একজন বণিক সম্প্রতি বলিয়াছেন যে ষ্টার কমন্‌ওয়েল্‌থের ছেলেদের ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখিয়াই মানুষ তাহাদের চিনিতে পারে। মনে রাখিবেন এই ছেলেরা দেশে দাগী অপরাধী বলিয়া চিহ্নিত, ইহাদের মধ্যে অনেককে তাহাদের নিজেদের পিতামাতাও ঘরে লইতে চাহে না। এই রকম যাহাদের অবস্থা, স্বগৃহে থাকিয়াও তাহাদের জীবন নির্ম্মল ও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে না।

লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই-সব ছেলেরা কি কখনও কোনো রকম গোলযোগ বাধায় না? বাধায় বৈ কি! নাই যদি বাধাইবে তবে তাহারা বালক হইয়া জন্মিয়াছে কেন? কিন্তু যে ধরণের গোলযোগ তাহারা বাধায় তাহা বাড়্‌তি বয়সেরই ধর্ম্মই। বন্ধের শাসিত জগতে যৌবন-উন্মুখ নবীন মানুষকে যখন আপনাকে খাপ খাওয়াইতে হয় তখন এ রকম গোলমাল না বাধিয়াই যায় না। কখনও কখনও ছেলেরা লুকাইয়া পলাইয়া যায়; এখানে তাহারা সুখ পায় না বলিয়া যে পালায় তাহা নয়, সুস্থ বালকের মনে কেমন একটা অজানার নেশা থাকে বলিয়াই পালায়। প্রায়ই দুজনে একসঙ্গে পলায়ন করে; নানা উত্তেজনা বৈচিত্র্য ও বিপদাপদের মধ্যে ঘুরিয়া অবশেষে পুলিশের হাতে পড়িয়া তাহাদের আইনের বন্ধনে আসিয়া বাঁধা পড়িতে হয়। ফিরিয়া আসিবার পর তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া শাস্তি দেওয়া হয় না, তবে বিদ্যালয়ের স্বরাষ্ট্রসভা মাঝে মাঝে কিছু আনন্দ কি অধিকার হরণ রূপ শাস্তির ব্যবস্থা করেন। শেষ যে তিনজন বালক পলাতক হইয়াছিল তাহারা আশ্রমে এমন ভাবে ফিরিয়া আসিল যেন ছুটিতে বেড়াইয়া বিদ্যালয়ে ফিরিতেছে। সন্ধ্যাবেলা যখন স্কুলঘরে সাপ্তাহিক বায়োস্কোপের উদ্যোগ হইতেছিল সেই সময় তাহারা ফিরিয়া আসিল; যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে আসিয়া তাহারা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বসিয়া পড়িল। আশ্রমের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এ-সব কথার উল্লেখও কখন করেন না; মিঃ ষ্টার পলাতক ছেলেদের সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তা বলিয়া বোঝাপড়া করিবেন ইহা তাঁহারা ধরিয়া লন। পলাতক ছেলে তিনটির শাস্তি হইল। তাহাদের ক্লাশের ছেলেরা যে খেলা দেখাইবার ভার লইয়াছিল, ছেলে তিনটি সে খেলায় যোগ দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ক্লাশের মধ্যে কেবল উহারা তিনজনই খেলায় যোগ দেয় নাই, সুতরাং দর্শকদের মধ্যে একঘরের

মত মুখ হেঁট করিয়া যে তাহাদের সময় কাটিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

আমি সেখানে উপস্থিত থাকিতেই একদিন একটি নবাগত বালকের বিমাতা ছেলেকে দেখিতে আসিলেন। ছেলেটির পিতা বেশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ছেলেটি ছিল ভীষণ দুর্দ্দান্ত, তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠে কাহার সাধ্য! পথে পথে লোকের জানালা ভাঙিয়া, দোকান লুট করিয়া এবং পাড়াপড়শীকে নাস্তানাবুদ করাই ছিল তাহার আনন্দ। আশ্রমে আসিয়া পর্য্যন্ত সে বেশ সুখে হাসিখুসী ভাবেই আছে, তাহার ব্যবহারও বেশ ভদ্রজনোচিত। তাহার মা বলিলেন ছেলেটি এখানে এক মাস থাকিয়া যে রকম আশ্চর্য্য বদ্‌লাইয়াছে এমন পরিবর্ত্তন তিনি জীবনে আর কাহারও দেখেন নাই।

এমন অঘটন-ঘটনের কারণটা কি? এই-সব ছেলেদের অনেককেই যাঁহারা বাড়ীতে দেখিয়াছেন তাঁহাদের কাছে ইহাদের এই রকম অদ্ভুত পরিবর্ত্তন অনেক সময় অলৌকিক ব্যাপারের মত ঠেকে। এই অলৌকিক ব্যাপারের কারণ দুটি। প্রথম হইতেছে ছেলেদের সঙ্গে মিঃ ষ্টারের ব্যবহার। তিনি তাহাদের ঠিক নিজের ছেলের মত ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন। কমন্‌-ওয়েল্‌থ্‌টি ত বিদ্যালয় নয়, ঠিক যেন তাহাদেরই নিজেদের বাড়ী। আশ্রমে ছেলেদের জন্মদিন মনে রাখিয়া উৎসব করা হয়, বাড়ীর মত বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কোনো ছেলে মৌমাছি পালন করে, কেউ পক্ষীতত্ত্ব আলোচনা করে, কেউবা কলকারখানা লইয়া ব্যস্ত। ছেলেদের এক রকম পোষাক পরিতে হয় না, কারণ মিঃ ষ্টার মনে করেন আর-সব জিনিষের মত পোষাকেও মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। ছেলেদের "কাকা" ডাকের অর্থ ত ওই ডাকের মধ্যেই পাওয়া যায়, কিন্তু তবু তাহারা যে তাঁহাকে কতখানি ভালবাসে আশ্রমে দিন-কয়েক না থাকিলে তাহা বোঝা যায় না। তিনি যখন নদী পার হন, তখন এপার হইতে ছেলেরা "ফ্রয়েড কাকা," বলিয়া হাঁক দিতে থাকে। একদিন এক আশ্রমমাতা আড়ালে দাঁড়াইয়া ছেলেদের গল্প শুনিতে পাইয়াছিলেন। একটি ছেলে বলিল, "মনে হয় আমেরিকার মধ্যে ফ্রয়েড কাকাই সকলের চেয়ে ধনী।" আর-একটি ছেলে বলিল, "কেন?" ছেলেটি বলিল, "দেখিতেছ না, আমরা এতজন ছেলে তাঁহাকে কি রকম ভালবাসি!"

দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণটিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। যেখানে ছেলেদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয় সেখানে স্বতই এমন একটা জনমত দাঁড়াইয়া গিয়াছে যাহার ফলে ষ্টার কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রত্যেক ছেলে ইহার সুনাম রক্ষা করাটা একটা গৌরবের জিনিষ মনে করে। ইহার নাম কলঙ্কিত করা এই ছেলেদের কাছে একটা মস্ত বড় অপরাধ।

বিচারপতি হয়েটের নবপ্রকাশিত পুস্তকে আছে—"বালকদের যদি ঠিক বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে কি কারণে কোন্ ক্ষেত্রে তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহারা কাজ যে কত সহজ করিয়া তুলিতে পারে দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয়। কিন্তু তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলে খাঁটি মানুষের মত কোনো ঘোরপ্যাচ না রাখিয়া সোজাসুজি করা দর্‌কার। নাকে কাঁদা প্রার্থনা কি কড়া হুকুমের চোখ রাঙানি এই দুইএর কোনোটিই ছেলেদের হৃদয় স্পর্শ কি মনে সহানুভূতির সঞ্চার করে না। আমি অনেক জায়গায় দেখিয়াছি ছেলেদের যদি ঠিকমত ঠিক পথে চালাইতে পারা যায় তাহা হইলে তাহাদের মত শান্তিরক্ষা ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে খুব কম লোকেই পারে।"

মিঃ ষ্টার বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক বালকের অন্তরেই সদ্‌বুদ্ধির অঙ্কুর আছে। বালকের এই শ্রেষ্ঠবুদ্ধির কাছেই তিনি তাঁহার আর্জ্জি বরাবর পেশ করেন, এবং আজ পর্য্যন্ত কখনও নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হয় নাই। তাঁহার পরীক্ষা এত আশ্চর্য্য ও স্পষ্ট সুফল দিয়াছে দেখিয়া আমার মনে হয় এই পথে ভিন্ন অন্য কোনো পথে আর যেন কেহ কোনো বালককে সংশোধন করিতে চেষ্টা না করেন। স্যর হোরেস প্লঙ্কেট কিছুদিন আগে এই আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলেন। মিঃ ফ্রয়েড

ষ্টারের কাজ দেখিয়া তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন পরে তাহা তাঁহার এক বন্ধুকে লিখেন। তিনি বলেন, "মানুষকে যথার্থভাবে বিকশিত করিয়া তুলিবার যে পন্থা মিঃ ষ্টার ধরিয়াছেন সে পন্থা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখাও উচিত। ব্যক্তিগত কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় যাহা এত আশ্চর্য্য সুফল দিয়াছে তাহার পরীক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহার ছেলেদের দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং তাহাদের অন্তরের সুরটি ধরিতে পারিয়া আমার মনে হইতেছিল বড় হইয়া ইহারা প্রত্যেকেই জীবনের কোনো বার্ত্তা জগৎকে শুনাইবে।"

এই কথাটা স্বীকার করা দরকার যে সংশোধন প্রয়োজন বাস্তবিক কোনো বালকের নয়, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও আবহাওয়ার। এবং এ কথাটাও মনে রাখা উচিত, যে, এই উন্নতি-প্রচেষ্টায় বালকটি নিজে যতখানি সহায় হইতে উন্মুখ তত আর অন্য কেহ নহে। চিকাগোর বিখ্যাত বালহিতৈষী মিঃ এল ই মেয়রস বলেন, "ছেলেদের কাজে যাঁহারা সকলের চেয়ে বেশীদিন সময় দিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে স্বাভাবিক বালক মাত্রই মূলতঃ সৎ এবং জীবনে যে বালক যথেষ্ট সুবিধা পায় নাই তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিলে সে যে সর্ব্বান্তঃকরণে উপকারীর ডাকে সাড়া দেয় একথাও ইহাদের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।"

উইলিয়াম্ উইনষ্ট্যানলী পীয়ারসন

বাঙ্গলা ভাষা

বাঙ্গলার কয়েকটা বর্ণচোরা শব্দ

আমাদের ভাষায় এমন কতগুলি শব্দ আছে যাহার ধ্বনি ও আকৃতি ঠিক্ সংস্কৃতের মতন, কিন্তু সংস্কৃতের সেই শব্দগুলির অর্থ বাঙ্গলায় ভিন্নরূপ এইরূপ যে কয়েকটা শব্দ এখন আমার মনে পড়িতেছে, নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করিলাম।

"সুতরাং" সংস্কৃতে অত্যন্ত। কিন্তু বাঙ্গলায় ইহার অর্থ অতএব। কেহ কেহ এই অর্থে সুতরাং শব্দ প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা বলেন যে ভুল করিয়াই সুতরাং শব্দের অতএব অর্থ করা হইয়াছে। আমার বিবেচনায় রূপ ও ধ্বনিগত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও অতএব অর্থে সুতরাং শব্দটা খাটি বাঙ্গলা এবং অত্যন্ত অর্থের সুতরাংটা সংস্কৃত। দুইটা শব্দের মধ্যে কোনরূপ জ্ঞাতিত্ব নাই। বাঙ্গলা Ram শব্দে একজন লোকের নাম বুঝায়, কিন্তু ইংরেজী Ram শব্দের অর্থ ভেড়া।

গাভী শব্দটার আকার ঠিক সংস্কৃত। গাভীদুগ্ধরূপ সমাসে গাভী স্থান পাইয়াছে এবং সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যেও ইহার প্রবেশ দেখিয়াছি, যথা অভক্ষ্যং ভক্ষয়েদ্ গাভী; অথচ শব্দটা মোটেই সংস্কৃত নহে।

মিনতি শব্দটাও বাঙ্গলা। ইহার হিন্দী রূপ মিন্তী। কিন্তু বাঙ্গলা রূপ দেখিলে সংস্কৃত বলিয়া ভ্রম হয়।

কাণ্ডারী শব্দটাকে সংস্কৃত বলিয়া ভ্রম হয়। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে একটি বাঙ্গালী পণ্ডিতের রচিত সংস্কৃত শ্লোক শুনাইয়াছিলেন যাহাতে কাণ্ডারিন্ শব্দ ছিল। আমারও বিশ্বাস ছিল যে শব্দটা সংস্কৃত। কিন্তু মজুমদার মহাশয়ই আমার সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত আমোদ শব্দের অর্থ সুগন্ধ, কিন্তু বাঙ্গলা আমোদ শব্দে রসিকতা, খেলা ইত্যাদি বুঝায়।

গল্প শব্দটিও রূপে সংস্কৃত, কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃত নহে।

বাঙ্গলায় উপন্যাস শব্দটার অর্থ গল্প, কিন্তু সংস্কৃতে উহার অর্থ উপস্থাপিত করা, প্রস্তাব করা ইত্যাদি।

বাঙ্গলা রাগ অর্থে ক্রোধ বুঝায়, কিন্তু সংস্কৃত রাগ শব্দের অর্থ ক্রোধের প্রায় বিপরীত, কেন না সংস্কৃত রাগ অর্থে ভালবাসা।

তদন্ত শব্দটাও দেখিতে শুনিতে সংস্কৃতের মত, অথচ সংস্কৃত নহে।

অবৈয়াকরণ প্রয়োগ

যে-সকল বাঙ্গালী সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা করেন তাঁহারা সেই সেই ভাষা ব্যবহারের সময়ে পাছে অবৈয়াকরণ ভুল হয় এই আশঙ্কায় কত সাবধান হইয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালী বড় বড় লেখকেরাও বাঙ্গালা লিখিবার সময়ে "একত্রিত" "মুখরিত" প্রভৃতি শব্দ লেখেন। এই শব্দগুলি ব্যাকরণসম্মত নহে। "একত্র" এবং "মুখর" লিখিলেই হয়। মুখর শব্দটা বিশেষণ। তাহা হইতে আবার কি বিশেষণ হইবে?

পশ্চিম শব্দটা বিশেষণ। পশ্চিম দেশে জাত এই অর্থে ব্যাকরণের মতে পাশ্চাত্য হয়। সুতরাং "পাশ্চাত্য দেশ" কথাটা তেমন শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া বোধ হয় না। যদি পাশ্চাত্য দেশ হয়, তাহা হইলে অত্রত্য দেশ ও তত্রত্য দেশও হইতে পারে।

দাক্ষিণাত্য দেশও সেইজন্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগকে বাঙ্গালীরা ভুল করিয়া বা বিদ্যাবত্তা দেখাইবার জন্য দাক্ষিণাত্য বলেন। কিন্তু উহার প্রকৃত নাম দক্ষিণাপথ এবং দক্ষিণ। এই ভুলের প্রবর্ত্তক ৺ তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি মিলের অনুরোধে স্বকৃত ভূগোলে প্রথম লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত—আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য। তাহার পর হইতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই ভুল করেন। পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য বিদ্যা, বুদ্ধি, লোক, বস্তু হইতে পারে, কিন্তু দেশের বিশেষণ বা দেশের নাম হইতে পারে না।

একটা জিজ্ঞাসা

আমি জানি না বলিয়াই একটা জিজ্ঞাসা করিতেছি। "প্রথম" শব্দটা ত বিশেষণ। তাহাতে কি অর্থে ষ্ণিক করিয়া নূতন বিশেষণ "প্রাথমিক" হয়? প্রথম ও প্রাথমিকে প্রভেদ কি? "প্রথম" হইতে যদি প্রাথমিক হইতে পারে, তাহা হইলে "উত্তম" হইতে ঔত্তমিক হইতে পারে কি না?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

রমলা

১৭

পরদিন রজত তাহার এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। বন্ধু বলিতে তাহার এই একটিতেই ঠেকে। কিন্তু এই একটি বন্ধু লাভ করিয়াই সে জীবনে কৃতার্থ হইয়াছিল।

আমার এই বন্ধু আছে, এ ভাবিবার সুখ যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহা বন্ধুহীনেরা জানে না। পত্নীর প্রেমের জন্য পতিকে শঙ্কিত থাকিতে হয়, পুত্রের সেবার জন্য মাতার মনে সঙ্কোচ জাগে, ভাইয়ের ভালবাসার জন্য ভাইয়ের মন দোলে, কিন্তু সত্যকার বন্ধুর দিকে চাহিলে কোন সংশয় থাকে না, তাহার চোখ দুইটি দেখিলে শ্রান্ত মন আশায় ভরে, তাহার মুখ দেখিলে ভগ্ন বুক আনন্দে দোলে, তাহার হাতের স্পর্শ পাইলে অমিত শক্তি লাভ হয়। ললিত ছিল রজতের এইরূপ বন্ধু, তাহাকে না ডাকিলে তাহার কোন আনন্দ পরিপূর্ণ হইত না।

সন্ধ্যাবেলায় রমলা একখানি বাসন্তী রংএর শাড়ী পরিয়া চেয়ারে বসিয়া দুলিতেছিল আর গুনগুন গান করিতেছিল। রজত মেজেতে মাদুরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া চুপচাপ বসিয়া ছিল। সমস্তদিন টিপটিপ বৃষ্টি পড়িয়াছে, এখন আকাশ একটু ফর্সা হইয়া কয়েকটি তারা দেখা যাইতেছে। বৃষ্টি পড়ুক আর জ্যোৎস্নাই উঠুক, তাহাতে নবদম্পতীর বিশেষ কিছু আসিয়া যাইতেছিল না।

বাড়ীর দরজায় একটি ট্যাক্সি দাঁড়াইবার শব্দ হইতেই রজত উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই মুখভরা হাসি, দুই

চোখ ভরা কৌতুক আর দুই হাতে দুই বড় ফুলের বাস্কেট লইয়া তাহার বন্ধু প্রবেশ করিল।

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল,—ইনি হচ্ছেন ললিত, আর ইনি—

বুঝ্‌তেই পারছি, বৌদিদিভ্যঃ নমঃ, বলিয়া ললিত রমলার পায়ের নিকট ফুলের দুই ঝুড়ি নামাইয়া মাথা একটু নত করিল।

রজত বলিল,—বৌদিদিভ্যঃ কি হে?

ললিত হাসিয়া বলিল,—ওটা গৌরবে বহুবচন।

রমলা স্নিগ্ধ মুগ্ধ নেত্রে ললিতের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বন্ধু যে এমন সুদর্শন তাহা সে ভাবে নাই। রজতের চেয়ে মাথায় একটু ছোট হইলেও সে রজতের চেয়েও ফর্সা, দোহারা চেহারা, মুখখানি বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রেমের স্নিগ্ধতায় ভরিয়া যৌবনের সুকুমার শ্রীতে মণ্ডিত, ঠোঁট দুইটিতে হাসি যেন লাগিয়াই আছে, গায়ে তসরের পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্পস্যু। সে ঢুকিতেই ঘর গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছিল—তাহা ফুলের গন্ধ না এসেন্সের গন্ধ তাহা রমলা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বস্তুতঃ, ললিত সিল্কের পাঞ্জাবী ও পাম্পস্যু ছাড়া কিছু পরিত না, আতর না মাখিয়া কোথাও যাইত না।

রমলা মার্শাল নে গোলাপগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল,—Lovely! কি সুন্দর গন্ধ।

ললিত রজতের দিকে হাসিমাখা চোখে কি ইঙ্গিত করিয়া বলিল,—Lovely! নয়?

রজত ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিল, রমলা মুখ রাঙা করিয়া লজ্জাবিস্ময়জড়িত চাউনিতে ললিতের দিকে চাহিল। ললিত নিঃসঙ্কোচে রমলার দোলানো চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এক বড় কাগজের ঠোঙা ও এক গাদা বই লইয়া গোপাল প্রবেশ করিতেই রজত বলিয়া উঠিল,—ও-সব আবার কি আনা হয়েছে?

ললিত ঠোঙা ও বইগুলি গোপালের হাত হইতে লইয়া বলিল,—দেখ্‌ছেন বৌদি, ওর জন্যে এতদিন যে কত জিনিষ কিনেছি, আর আপনার জন্যে কি বা আন্‌লুম, ওর jealousy হয়েছে।

রজত বলিল,—বাপু, এই ত তোমার সুরু, আমি ভাব্‌ছিলুম না জানি কি একটা খুব দামী জিনিষ হাজির কর্‌বে—

ললিত বলিল,—বেশ বলে' নাও, বলে' নাও,—মার্কেটে গেলুম, ভাব্‌লুম, খালি ফুল কি নিয়ে যাব, এখন ঠাণ্ডার দিন তাই কিছু চানাচুর—

রজত হাসিয়া বলিল,—একটা বড় দেখে পুতুল নিয়ে এলে না কেন? দেখি বইগুলো।

রমলা মধুর হাসিয়া বলিল,—বেশ করেছেন, আমি মার্কেটে গেলেই আগে ডালমুট কিনি।

ললিতের হাত হইতে ঠোঙাটা লইয়া গোপালকে প্লেট আনিতে বলিয়া বইগুলির দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—ও-সব নভেল না কি?

ললিত মৃদু হাসিয়া বলিল,—কাজে লাগ্‌বে বৌদি, নভেল ত' খালি রং-করা মিথ্যের ঝুড়ি, জীবনের সত্যিকথা পড়ুন। Marie Stopes, Ellen Key-র কতকগুলি বই, তাছাড়া Womanhood, Wise Wedlock, How to Love ইত্যাদি কতকগুলি বই।

বইগুলি নাড়িতে নাড়িতে রজত বলিল,—এনেছ ত বইগুলি, আমি যা ভয় কর্‌ছিলুম! আচ্ছা আমার স্ত্রীকে সাফ্রেজেট করে' তোমার কি লাভ বল ত?

ললিত হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—লাভ আমার, না তোমার? এই দেখ, দুটো ফুলের মালা আন্‌তে ভুলে গেলুম।

রজত ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল,—যাও, আর বেশী কবিত্ব কর্‌তে হবে না।

রমলা ধীরে বলিল,—আচ্ছা আপনি নাকি কবি, ভাল কবিতা লেখেন?

ললিত উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভরিয়া বলিল,—হাঁ, হাঁ, ছোট বেলায় এক কবিতার বই ছাপিয়েছিলুম, তাও মার চুরির টাকায় বাবার বাক্‌স থেকে। সে বইয়ের কথা সবাই ভুলে গেছে, কিন্তু কবি নামটি কেউ ভোলে নি। আচ্ছা আমায় দেখে কি কবি বলে' বোধ হয়?

কৌতুকময় দৃষ্টিতে ললিতের দিকে চাহিয়া রমলা হাসিয়া উঠিল। রজত বলিল,—ওগো তোমার পুডিংটা অনেকক্ষণ চড়িয়ে এসেছ।

উচ্ছ্বসিত হইয়া ললিত বলিল,—বেশ বেশ! পুডিং খাও!

আশ্চর্য্যের স্বরে রজত বলিল,—পোলাও কি হে?

হতাশের স্বরে ললিত বলিয়া উঠিল,—বা পোলাও নেই বুঝি?

রমলা মিষ্ট স্বরে বলিল,—না, না, আছে আছে।

যেন আশ্বাস পাইয়া আনন্দিত হইয়া ললিত বলিল,—কিন্তু শুধু পুডিং পোলাও হচ্ছে না, তার আগে কিছু গান চাই।

রজত বলিল,—বল না তোমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

ললিত বলিল,—সত্যি বৌদি, আজ মনে এমন আনন্দ হচ্ছে যে আমারও গান গাইতে ইচ্ছে করছে, এস্রাজটা কোথায়?

জিনিষপত্র নাড়ানাড়িতে এস্রাজটা নীচের ঘরে চলিয়া গিয়াছিল। রজত সেটি আনিতে গেল।

ললিত মৃদুকণ্ঠে বলিল,—রজতটা ত একটুখানি সরেছে, এই সুযোগে আমরা 'আপনি'টাও খসিয়ে ফেলি, কি বল?

রমলা সলজ্জ হাসিয়া বলিল,—বেশ ত।

বাস্তবিক এই সুদর্শন হাস্যরসিক অকপট বন্ধুটিকে তাহার খুবই ভাল লাগিতেছিল।

ললিত ধীরে বলিল,—দেখ, রজতের সব গুণ, শুধু একটা দোষ, ও যা করে একেবারে হিসেব না রেখে করে, যাকে ভালবাসবে এমন বেহিসাবী ভালবাসবে, তাইত ওর পাল্লায় পড়ে'—

রজত সেই সময়ে এস্রাজ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই সে তাহার হাত হইতে সেটি প্রায় ছিনাইয়া লইয়া রমলার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে রমলা বলিল,—না, দেখুন, পুডিং সত্যিসত্যিই পুড়ে যাবে।

ললিত বলিল,—যাক্ পুড়ে, তুমি একটু বাজিয়ে যাও।

রমলা একটুখানি এস্রাজ বাজাইয়া রজতের কোলে এস্রাজটা ফেলিয়া রান্নাঘরের দিকে ছুট দিল।

খাওয়া উপরের ঘরেই হইল। রমলার ইচ্ছা ছিল টেবিলে খাওয়া হয়, কিন্তু ললিত বলিল,—না, বৌদি, মেজেতে বসে' বেশ গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।

কিন্তু ঘরে দুইখানি বসিবার আসন। সেই দুইখানি আসন পাতিয়া দুই বন্ধুর খাবার সাজাইয়া রাখিতেই ললিত ক্রোধের ভান করিয়া বলিল,—না বৌদি, এ হবে না, তোমাকে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে।

তারপর নিজের সিল্কের চাদরখানি পাট করিয়া মেজেতে পাতিয়া দিয়া বলিল,—নিয়ে এস তোমার খাবার বৌদি।

রমলা বলিল,—আহা ওকি সিল্কের চাদরটা—

ললিত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—না বৌদি, এই চাদরের আসনে বসে' আজ তোমায় খেতেই হবে, তুমি ভাবছ, চাদরটা ময়লা হবে, আমি কাচ্‌তে দেব, মোটেই নয়, এই দাগধরা চাদর আমার বাক্সে তোলা থাক্‌বে।—তুমি খাবার নিয়ে এস।

রজত একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,—ওর সঙ্গে পার্‌বে না বাপু, নিয়ে এস তোমার খাবার।

সেই সিল্কের চাদরের উপর বসিয়া রমলাকে তাহাদের সঙ্গে খাইতে হইল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলিতে লাগিল।

ললিত বলিতে লাগিল,—দেখ বৌদি, চার্জ্জ আজ থেকেই বোঝাতে সুরু করি, যা দেখ্‌ছি একটি বোঝা ছিল, দুটি হল।

রমলা বলিল,—বুঝ্‌তে পার্‌ছি না কিছু।

ললিত হাসিয়া বলিল,—বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? সম্মুখে এই যে জীবটি দেখ্‌ছ, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, আমি এঁর বন্ধু হয়েছি, সুতরাং আমি হচ্ছি ওর প্রাইভেট সেক্রেটারী, ব্যাঙ্ক, লিগ্যাল অ্যাড্‌ভাইসার, ওর হিসাবের খাতা, চাবির থোলো—

রমলা হাসিয়া বলিল,—আপততঃ কোন পদ হতেই খালাস পাচ্ছ না, resignation not accepted।

হতাশের মত অভিনয় করিয়া ললিত বলিল,—বেশ,—কিন্তু পুডিংটা ভারি সুন্দর হয়েছে, মেসের খেয়ে খেয়ে বুঝ্‌লে বৌদি, আ সে রান্না যদি একবার খাওয়াতে পারি বৌদি, তোমাকে কিন্তু মাঝে মাঝে এসে জ্বালাতন করব বৌদি—

এত বৌদি বল্লে আমি কিন্তু হাঁপিয়ে উঠ্‌ব—বলিয়া রমলা মুখ রাঙা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইলে পান চিবাইতে চিবাইতে ললিত দুষ্টামিভরা হাসি হাসিয়া বলিল,—তা হলে আর disturb করতে চাই না, au revoir, গুড্ লাক্, সুইট ড্রিম—

রজত মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল,—না হে এত শীগ্‌গীর কোথায় যাবে ?

ললিত বলিল,—বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই। তা এ ভরাপেটে ত রাগ-রাগিণী চল্‌বে না, তাসের জোড়াটা বের কর।

রমলা বলিল,—তিনজন যে।

তাতে কি, আমি মামাবাবুকে ধরে' আন্‌ছি, বলিয়া ললিত মামাবাবুর ঘরের দিকে চলিল।

সত্যই ললিত গিয়া মামাবাবুকে ধরিয়া আনিল। তুলসী-বাবুর চরিত্রে এই মহাদুর্ব্বলতা ছিল, তাসখেলার লোভ তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেন না।

ললিতকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—আরে গাধা, এতদিন ছিলি কোথায়, টিকি দেখ্‌বার জো নেই, রজত এসেছে ত অম্নি আসা।

মামাবাবুর কাছে তাসখেলার প্রস্তাব করিতেই তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—Hence thee Satan, hence, এত রাতে আমায় লোভ দেখাতে এলি।

কিন্তু দুইবার বলিবার পরই তিনি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা মুড়িয়া ওভারকোট-গলাবন্ধ-র‍্যাপারমণ্ডিত হইয়া রজতের ঘরে তাস খেলিতে ঢুকিলেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা চলিল। খেলা শেষ হইলে যাইবার সময় ললিত বলিল,—বৌদি, তোমাদের নতুন সংসারে কি সব জিনিষ লাগ্‌বে একটা লিষ্ট্ করে' রেখ কাল, ফুলদানি আর একটা স্পিরিট ষ্টোভের কথা ভুল না, যা খোঁওয়া খাচ্ছিলে রান্নাঘরে। আর একটা পার্সিয়ান কার্পেট আসন আনা যাবে, মেজেতে পেতে মুসলমানী কায়দায় খাওয়া যাবে। আমি কাল বিকেলে ট্যাক্সি নিয়ে আস্‌ব, ঠিক থেকো—তা হলে আজ—

রমলার স্নিগ্ধ মধুর মুখের দিকে নিমেষের জন্য চাহিয়া ললিত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

আকাশে চাঁদ ও কালো মেঘের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে, নির্জ্জন স্তব্ধ জলসিক্ত নগরের পথ, গ্যাসের আলোগুলি, প্রদীপের শিখার মত, অতি ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চারিদিক ছায়াময়। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ললিত যখন মেসে ফিরিতেছিল তখন আপন মনের অবস্থা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বন্ধুর আনন্দে সুখ-মিলনে সে সত্যই আনন্দিত। তবু তাহার বক্ষের কোন্ বিরহী তরুণ হৃদয় মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মেসের ঘরে গিয়া আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াঘন রাত্রে তাহার ঘুম আসিল না, সব জানলা খুলিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া শেলী খুলিয়া পড়িতে বসিল।

১৮

ভাদ্রের স্নিগ্ধ দ্বিপ্রহর সুন্দর আলোয় উজ্জ্বল। শরতের আকাশের এক উদাস আহ্বান আছে, যেন কোন সুদূরের হাতছানি। নির্ম্মল নীলিমার দিকে চাহিয়া রমলা পিয়ানো বাজাইতেছিল। বর্ষাসঙ্গীতমুখর দিনগুলিতে পিয়ানোর কথা কাহারও মনে হয় নাই, কিন্তু আকাশে বাতাসে যখন শরৎ ঋতুর স্পর্শ জাগিল, কালো মেঘের বেণী গুটাইয়া ঝরঝর অবিশ্রাম বৃষ্টির গান বন্ধ করিয়া বর্ষা চলিয়া গেল, তখন ঘরটা যেন ফাঁকা ছোট বোধ হইতে লাগিল। তাই ললিত একটা ভাল পিয়ানো কিনিয়া আনিল।

পিয়ানো শুনিতে শুনিতে রজত সোফায় ঘুমাইয়া পড়িয়া কোন্ সুর-অলকায় চলিয়া গিয়াছিল। যখন জাগিয়া উঠিল, তাহার দুইচক্ষে কিসের স্বপ্ন জড়ান। এই নিষ্কলঙ্ক আকাশের আলো কাহার সমুদ্রনীল নয়নের চাউনি, স্তব্ধ বাড়ীখানি ঘেরিয়া এই শরতের দুপুরের আলো অতি সূক্ষ্ম তন্তুময় ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি। জাগিয়া উঠিয়া রজত ঘরখানিতে ঘুরিতে লাগিল—এ যেন কোন রূপকথার রাজকন্যার পুরী, ঘরের কোণে কোণে তাহার স্বপ্ন বিজড়িত। ড্রেসিং-টেবিলের আর্সিতে তাহার চোখের দীপ্ত চাউনি ভাসিয়া উঠিল, এই দোলানো চেয়ারের গায়ে তাহার কেশের গন্ধ, এই বিছানা ভরিয়া তাহার দেহের সৌরভ, পিয়ানোর কাঠে তাহার হাতের স্পর্শ, তাহার প্রাণের ছন্দ, ঝক্‌ঝকে সিমেণ্টের মেজেতে তাহার চরণের আভাস, এই পাপোশের কোণে তাহার নাগরাজুতাটা পড়িয়া রহিয়াছে, বারান্দার রেলিঙের কাঠে তাহার লাল শাড়ী শুকাইতেছে, কোথায় সে, ধীরে

স্বপ্নবিমুগ্ধের মত রজত পাশের ছোট ঘরে গেল,—ষ্টোভের উপর ফুটান দুগ্ধ চাপা দেওয়া, ঝাড়নটা ধূলা ঝাড়া শেষ করিয়া আল্‌নার এক কোণে বিশ্রাম করিতেছে, তাহার ঠোঁটের স্পর্শমাখান কাচের গেলাস ঠাণ্ডাজলেভরা মাটির কুঁজোর উপর চাপা দেওয়া। পাশের ঘরে গেল, বইগুলি সাজান, জামাকাপড় গুছান, চারিদিকে তাহারই মঙ্গল-কর্ম্মরত সেবাকুশল হস্তের চিহ্ন, নিবিড় প্রীতির রূপ, গোপন প্রেমের স্পর্শ—কোথায় সে? ঘরের পর ঘর রজত রমলাকে খুঁজিতে লাগিল, তাহার হাসির রেখা, দেহের স্পর্শ, পদচিহ্ন প্রাণে আসিয়া বাতাসের মত ছুঁইয়া যাইতেছে, সে রঙীন স্বপ্নমায়ার মত সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রজত রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—ওই যে জ্যোৎস্নাধৌত কাশফুলের মত সাদা আঁচল দেখা যাইতেছে, এ কি দিব্য শ্রী! শিল্পী যেটুকু অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিল, প্রেম তাহা ভরিয়া দিয়াছে, শরতের কূলে কূলে ভরা নদীর মত, ধানভরা ক্ষেতের মত রমলার যৌবনশ্রী কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ঝলমল কেশদল ছুঁইয়া রজত ধীরে বলিল,

Room after room
I hunt the house through,
We inhabit together.

—কি, খুঁজেই পাওয়া যায় না যে?

যাও, দেখছ মামার সার্টগুলি রান্না করছি, বলিয়া সাবানে সিদ্ধকরা সার্ট-রুমাল-ভরা কড়াটা উনান হইতে নামাইয়া ফাল্গুন-বাতাসের মত চঞ্চলপদে রমলা রজতের হাত ছাড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া পালাইল।

Escape me! never—Beloved! রজত তাহার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

চেয়ারে বসিয়া রমলা অতি মৃদু দুলিতে দুলিতে একখানি বই পড়িতে সুরু করিল। ঝুলিয়াপড়া চুল-গুলি দোলাইতে দোলাইতে চেয়ারের কাঠে মাথা রাখিয়া মেজেতে বসিয়া রজত কপট হতাশের সুরে বলিল,—আমি যদি টুর্গেনিভের কোন একখানা নভেল হতুম।

স্বামীর মুখের দিকে স্নিগ্ধ নয়নে চাহিয়া রমলা বলিল—তা'হলে কি হত!

রমলার হাতের চুড়িগুলি নাড়িতে নাড়িতে রজত উদাসভাবে বলিল,—এখন তাহলে একজন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিত।

যাও, আচ্ছা কি পদ্য পড়্‌বে বলছিলে, বলিয়া টুর্গেনিভের নভেলখানি মুড়িয়া রমলা চেয়ার হইতে নামিয়া স্বামীর পাশে মেজেতে বসিল।

না, না, তুমি টুর্গেনিভ পড়, বলিয়া রজত উঠিয়া বইয়ের র‍্যাক হইতে ব্রাউনিং টানিয়া বাহির করিল।

ওগো, এসোনা, বলিয়া রমলা রজতের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহার পাশে বসাইয়া, হাত হইতে ব্রাউনিং-খানি কাড়িয়া লইল।

বইখানি খুলিতেই Love in a Life পদ্যটি চোখে পড়িল। এইটাই বুঝি অত গদগদ হয়ে আমায় বলা হচ্ছিল, বলিয়া রমলা পদ্যটি পড়িতে সুরু করিল।

বা, ব্রাউনিং বেশ পদ্য লিখ্‌তে পারে ত, বলিয়া সে পদ্যটি উচ্চস্বরে পড়িয়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল।

রজত মুগ্ধনেত্রে একবার খোলা জানালা দিয়া বাহিরের আকাশের আলোছায়ার খেলা আর একবার ঐ প্রিয়ার অনুপম মুখশ্রী দেখিতে লাগিল। ইহাকেই কি সে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া পাইয়াছে আর হারাইয়াছে—এই প্রিয়াকেই কি সে কতরূপে কতবার যুগে যুগে অনিবার এই অনন্তলোকে ভালবাসিয়া আসিয়াছে?

১৯

মাঘমাসের সন্ধ্যা। দৈত্যদলের দূষিত নিশ্বাসের মত কলের ধোঁওয়ায় সমস্ত আকাশ কালো, দুঃস্বপ্নের মত ধোঁওয়ার কুজ্ঝটিকা লালসা-ঈর্ষা-ফেনিল নগরের উপর আতঙ্কের মত চাপিয়া রহিয়াছে। কিন্তু রজতের ছোট ঘরখানি যেন এই নগরের বাহিরে, এই ধন ও ভোগতৃষ্ণার চিরউদ্বেলিত সাগরমধ্যে কোন্ প্রেমস্বপ্নের দ্বীপের মত। তাই ললিত মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ নগরজীবনে শ্রান্ত হইয়া এই প্রীতিস্নিগ্ধ নীড়ে আশ্রয় লইত। ধীরে ধীরে সে আসিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইল, দেখিল, রজত দোলানো চেয়ারে বসিয়া আছে, তাহার পা ঘেঁসিয়া কোলেতে মাথা ঠেকাইয়া রমলা নীচে মেজেতে বসিয়া হাড়ের কাটি দিয়া লালপশমের এক খুব ছোট মোজা

বুনিতেছে, ললিত যে ময়ূর-আঁকা সবুজ কার্পেট তাহাদের উপহার দিয়াছে তাহারই উপর রমলা সুন্দর পা দুখানি ছড়াইয়া বসিয়া আছে, কার্পেটের এক পাশে মামাবাবুর জন্য বোনা পশমের গলাবন্ধ আর একটা কাঁথা পড়িয়া রহিয়াছে। রজতের কোলে রমলার চুলগুলির কাছে এক ঠোঙা চীনেবাদাম, রজত মাঝে মাঝে চীনেবাদাম ভাঙিয়া রমলার মুখে দিতেছে আর একখানি বই পড়িয়া শোনাইতেছে। দূর হইতেও ললিত বইখানি চিনিল, ওই সচিত্র ব্লুবার্ডখানি সে দুই বছর আগে রজতকে উপহার দিয়াছিল। তাহাদের মিষ্ট কথাবার্ত্তা কানে আসিল।

— ওগো, না, তুমি খালি বাদাম খাচ্ছ, একটু পড়্ছ না।

—বেশ, ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিচ্ছি কিনা! বেশ, পড়্ছি, আর কিন্তু বাদাম পাচ্ছ না।

—বা, পড়্তে পড়্তে বুঝি ভাঙা যায় না?

—হাঁ, ভাঙা যায়, কিন্তু খাওয়া যায় না ত।

—আচ্ছা, বেশ, তারপর কি হল, পড়।

রজত ব্লুবার্ডের The Kingdom of the Future দৃশ্যটি পড়িয়া শোনাইতেছিল। রমলার মাথায় হাত রাখিয়া সে বলিল,—শোন, সেই যে খোকাটা বল্লে না, আমি শীগ্গীর জন্মাব, সে বল্ছে, they tell us that the mothers stand waiting at the door……they are good, aren't they!

রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষালতার মত রমলার গণ্ডে আঙুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া রজত বলিল,—কি, aren't they?

রমলা তাহার ভাবী সন্তানের জন্য যে মোজা বুনিতেছিল কাঁথা সেলাই করিতেছিল তাহারই দিকে স্নেহস্নিগ্ধনয়নে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রজত পড়িতে লাগিল,—Tyltyl বল্লে, Oh, yes! they are better than anything in the world! And the grannies too; but they die too soon.

পড়িয়া মুখ তুলিতেই ঘরের কোণে আপন মাতার ফটোখানি চোখে পড়িতে রজত আর পড়িতে পারিল না। রমলার মাথাটা কোলে একটু টানিয়া লইয়া দুইজনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, শুধু হ্যারিকেন লণ্ঠনের শিখা মৃদু কাঁপিতে লাগিল।

রজত আবার পড়া সুরু করিল। রমলা আর বুনিতে পারিল না, সে অতি আদরের সহিত এক হাতে পশমগুলি ধরিয়া আর এক হাতে রজতের হাত ছুঁইয়া কোন মায়া-স্বপ্নের ঘোরে শুনিতে লাগিল। মায়ের প্রাণের রং দিয়া মায়ের বুকের অগাধ স্নেহ দিয়া রচিত, আশা স্বপ্ন দিয়া গঠিত এই অজাতশিশুদের স্বর্গলোকের কথা শুনিতে শুনিতে মন শঙ্কায় আশায় দুলিয়া উদাস মধুর হইয়া উঠিতেছিল। সে নিবিষ্টমনে শুনিতেছিল, এক খোকা বলিতেছে,—এই দেখ নীলশিশিভরা ওষুধ, এই আমি পৃথিবীতে নিয়ে যাব, এই খেলে মানুষের জীবন বেড়ে যাবে। আর এক খোকা বলিতেছে,—দেখ আমার এই যন্ত্রটা, এ ঠিক পাখীর মত ওড়ে। টিল্‌টিলকে তাহারা নিজেদের শক্তি সম্পদ দেখাইতে ব্যস্ত।

শুনিতে শুনিতে রমলার মন কল্পনার রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। তাহার বুকে যে শিশুমাণিকটি আসিবে, সে কি আলোপ্রদীপ জ্বালাইয়া আসিতেছে, কি নবশক্তি কি নবসম্পদ সে দেশকে মানবকে দান করিবে তাহার খোকা! সে কে? The second child না Fourth child না The little pink one যে পৃথিবীতে আসিয়া সব অসত্য-অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া অত্যাচারের যুগ শেষ করিয়া দিবে, না সে The little red haired one, he is to conquer death, সে পৃথিবীর মৃত্যুলোকের পারে অমৃতলোকের খবর আনিবে? তাহার খোকা কেমন হইবে!

রমলার প্রথম সন্তান যে খোকাই হইবে, এ বিষয়ে রমলার মনে কোন সন্দেহ জাগিতেছিল না।

ললিত দরজার আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধের মত এই সুখদৃশ্য দীপ্তচক্ষে দেখিতেছিল, কথাগুলি যেন পান করিতেছিল। এই দৃশ্যটি পড়া শেষ হইতেই সে আর ঘরে ঢুকিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বন্ধুর সুখে তাহার অন্তরে সুখ ভরিয়া উঠিল বটে, তবু তাহার মন একটু উদাস। পথে বাহির হইয়া একটা

ট্যাক্সিতে উঠিয়া গড়ের মাঠের দিকে হাঁকাইয়া দিতে বলিল।

নগরের উপর ধোঁওয়ার ধূসর উত্তরীয় টানা, তাহাতে দুই পাশের দোকানের পথের আলো মণিমাণিক্যের মত ঝলমল করিতেছে। জনস্রোত রথস্রোত উন্মত্ত জীবন-স্রোত এই দূর অন্ধকারে কোন্ অলক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে পৃথিবীকে দেখিয়া শিশুদের আনন্দজয়ধ্বনি মোটরের ঝকঝকে তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল।

The Earth! The Earth! How beautiful it is! How bright it is! How big it is!

এই পরম সুন্দর উজ্জ্বল বৃহৎ পৃথিবীর দিকে তাহার প্রাণের বিজন ঘরের দুয়ার খুলিয়া কোন্ বিরহিণী নারী বাহির হইয়া আসিয়া কি স্বপ্নের আশায় অনিমেষনয়নে তাকাইয়া আছে!

রমলা তখন আশা আনন্দ আশঙ্কায় দুলিয়া তাহার অজ্ঞাত স্বপ্নশিশুটিকে কতরূপে কতরঙে ভাঙিতে গড়িতে-ছিল। রজত যে এ দৃশ্য শেষ করিয়া নূতন দৃশ্য পড়িতেছে তাহা তাহার খেয়াল রহিল না। অজাতশিশুহৃদয়ের প্রশ্নটি জাগিতে লাগিল,—আচ্ছা মায়েরা নাকি আমাদের জন্যে পথ চেয়ে থাকে, তারা খুব ভাল, সত্যি?

* * * * * * *

* * *

ফাল্গুন মাসের জ্যোৎস্না।—দোলপূর্ণিমার রাত্রি। পিয়ানোর পাশে দুইজন চুপচাপ বসিয়া।

রজত ধীরে বলিল,—ওগো একটু বাজাও না।

পিয়ানো খুলিয়া এক মিনিট বাজাইয়া রমলা থামিয়া গেল।

রজত পাশে দাঁড়াইয়া বলিল,—কি হল!

—ভাল লাগ্‌ছে না। ওগো, আলোটা নিভিয়ে দাও না।

রজত আলো নিভাইয়া দিল।

উচ্ছ্বসিত হইয়া খোঁপার চুল খুলিয়া ফেলিয়া রমলা বলিল—বা কি সুন্দর জ্যোৎস্না, ওদিকের জানলাটা খুলে দাও, ও দরজাটাও। ওগো এ জানলাটা একটু বন্ধ করে দাও না।

রজত দরজা জানলা খুলিয়া দিল।

রমলা তাহার শাড়ীর আঁচল মেজেতে লুটাইয়া বলিল,—একটু অন্ধকারের পাশে আলো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে—এইখানে এসে বস।

রজত রমলার পাশে আসিয়া বসিল।

পিয়ানোটা খুলিয়া রমলা বলিল,—ওগো আলোটা একটু জালো না, স্বরলিপিটা দেখি।

রজত উঠিয়া বারান্দা হইতে একটি লণ্ঠন উস্কাইয়া আনিতেই রমলা যেন ব্যথিত হইয়া বলিল,—না, না, আলো চাই না, নিয়ে যাও, কি সুন্দর জ্যোৎস্নায় ঘর ভরা ছিল।

আব্‌দারে খুকী হয়ে উঠ্‌লে যে আজ, বলিয়া হাসিয়া রজত আলো কমাইয়া বারান্দায় রাখিয়া আসিল।

রমলা জ্যোৎস্নার মত সমস্ত ঘরে হাসির ঢেউ তুলিয়া বলিল,—বেশ, তোমার কি, আলো সব নিভিয়ে দাও। রমলা গানের এক লাইন গাহিয়া উঠিল—নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।

রজত বলিল,—সব গানটা গাও না।

—না। আ lovely! ওই লাল ফুলটা দাও না।

টেবিলের উপর ললিতের-আনা ফুলের ঝুড়ি হইতে রজত একটা বড় লাল ফুল তুলিয়া রমলার হাতে দিল।

আঃ কিছু গন্ধ নেই, ওই সাদাটা দাও, বলিয়া রমলা লাল ফুলটা একবার শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। সাদা ফুলটি দিতেও রমলা একবার নাকের কাছে ফুলটি তুলিয়া—গন্ধ নেই, বল্লম লাল গোলাপটা দাও, বলিয়া সাদা ফুলটি রজতের কোঁকড়ান চুলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল।

রজত দুইটি লাল গোলাপ বাছিয়া রমলার হাতে দিয়া পাশের চেয়ারে এলাইয়া বসিল। ভাবখানা, আর সে কোন কাজ করিতে পারিবে না।

রমলা নিজের চেয়ার রজতের চেয়ারের কাছে টানিয়া ধীরে বলিল,—আচ্ছা একটা গান গাও না।

ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ী পরিহিতা জ্যোৎস্না-ধৌতা রমলার দিকে রজত মুগ্ধ নয়নে চাহিল, এ কোন মায়াবিনী রঙীন প্রজাপতি প্রাণের গুটি কাটিয়া বাহির হইয়াছে।

ধীরে বলিল,—কি।

তার পর রজত গান ধরিল—আজ রজনী হাম—

রমলা গানে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—যাও, মামা-বাবু রয়েছেন পাশের ঘরে। কি গল্প বল্‌বে বল্‌ছিলে।

গান থামাইয়া রজত গল্প সুরু করিতেই রমলা ফুলগুলি দোলাইয়া বলিল,—আচ্ছা, অন্য সময়ে বোলো বাপু, তোমার বালিশটা কোথায় ?

রজত উঠিয়া দাঁড়াইতেই সে রজতের হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া বলিল,—থাক, থাক, খুঁজ্‌তে হবে না। In such a night as this—

রজত তাহার হাত হইতে ফুলটা লইয়া তাহার মাথায় গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—বল না সবটা।

—পারব না যাও। বল্লুম আলোটা আনি, পিয়ানো বাজাই।

—সত্যি বাজাবে ?

—না, না, এমন জ্যোৎস্না, এখন আলো আন্‌তে ইচ্ছে করে ?

—ওগো একটু বাজাও।

রজতের দিকে অতি মিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া রমলা হাসিভরা মুখে উঠিল, ঘরের কোণ হইতে সেতার বাহির করিয়া আনিয়া রজতের পায়ের কাছে মেজেতে বসিল। —

জ্যোৎস্না-বীণার অলখ তারে যে অনাহত সঙ্গীত বাজিতেছিল তাহারই সুরগুলি সেতার-ঝঙ্কারে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল।

রমলার কেশে রঙীন শাড়ীতে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার আলোয় তারগুলি ঝিকমিক করিতেছে, অদৃশ্য পরীর মত সুরগুলি আলোছায়াময় ঘরে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের তালে তালে রমলার আঙ্গুলগুলি নাচিতেছে, মুখপদ্ম টলিতেছে।

রজত ধীরে চেয়ার হইতে নামিয়া রমলার পাশে আসিয়া বসিল। জ্যোৎস্নার আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দখিন বাতাসে ঝড়ির ফুলগুলি দুলিতে লাগিল। তাহাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম বৎসরের উপর প্রেম-দেবতার আনন্দময় প্রসন্নদৃষ্টি চিরজাগ্রত রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

আলেয়া

১

তুমি, তুমি অদ্ভুত আলেয়া—
আঁধারের অকূল পাথারে
দীপ্ত বারে বারে,
তুমি মায়া-আলোকের খেয়া,
অদ্ভুত আলেয়া!
ভাঙনের কূলে বসি' যারা
বর্ষে আঁখি-ধারা,
ভাবে আর ভাবে হায়, ভেবে কিছু নাহি পায় ঠিক,—
দিনের নাবিক
দিনশেষে ঘরে গেছে ফিরে'
ওপারের তীরে;
উতল সাগর,
ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে ঝড়,
ডাকে দেয়া···
সহসা হরষে তারা
আত্ম-হারা
হেসে উঠে সবে
উচ্ছ্বসিত শত কলরবে—
আঁখি-আগে ফোটো তুমি অপরূপ আলোকের খেয়া,
অদ্ভুত আলেয়া!
কিন্তু তার শেষ ফল যাহা,
আহা!
নিদারুণ তাহা!

বিপুল বিশ্বাসে যারা হায়,
ব্যাকুল চরণে ছুটি তব পানে ধায়,—
শরণ না পায়,
সে অকূলে কূল বা কোথায়,
স্রোতে লুটে, ঢেউয়ে ভেসে যায়!

২

তুমি, তুমি আলেয়া মায়াবী—
নিশীথের নব অভিসারে
চলিতে আঁধারে
ভয় আসে মনে শত বার
অভিসারিকার;
ভয়ে আর ভাবনায় কাঁপি,
চমকিয়া থমকিয়া চলে,
চলে, আর টলে;—
কি জানি গো, মন্-ভুলে যদি কোনো মতে
চলি ভিন্ পথে,
ভিন্নদেশে
যেয়ে পড়ে শেষে?...
হে আলেয়া, কোথা হ'তে তুমি আচম্বিতে
অযাচিত আস' আলো দিতে,
জ্বালো দীপালির আলো-বাতি,—
হাসে কালো রাতি;
সেই তব বর্ণ-ভাতি দেখে—
সেই স্বর্ণ-শিখা,
ধেয়ে চলে সম্মুখে সবেগে
সে অভিসারিকা;—
ওই বুঝি মিলন-ত্রিদিব,
ওই বুঝি প্রীতি-নিকেতন, ওই বুঝি জ্বলে সারি সারি
দ্বারে আর বাতায়নে তারি
কনকের হাজারো প্রদীপ!
প্রাণে বাসি মধুর পীরিতি,
পূর্ব্বরাগ-স্মৃতি,
মুখে হাসি, কণ্ঠে মধু, মরমের গীতি
মৃদু গাহি;
হে আলেয়া, তব পানে চাহি,
গতির তরণী তার বাহি' অরি বাহি'
তর-তম ক্রম-খর বেগে
চল্ এঁকে বেঁকে।
কিন্তু অবশেষে,
সারা রাতি পথে পথে ঘুরে
কামনার কটু-তীব্র হুতাশনে পুড়ে,
নিশা-শেষে,
আঁখি-জলে ভেসে'
চেয়ে দেখে—পথ-হারা, সে যে পথ-হারা!
দু-নয়নে ধারা,
মৌন—মূক-পারা,
সীমা-হারা সুদূর গগনে
চাহে আন্‌মনে!

৩

অ-লোক আলোক
অপূর্ব্ব আ লয়া তুমি—নানারূপে ফেরো নানা লোক,
কোথা তুমি জল প্রেত-বাতি,
স-মশাল ডাকাতের দল কোথা চলো করিতে ডাকাতি;
কোথাও বা তুমি
বিকৃত বায়ুর নৃত্য—দীপ্ত করি' সিক্ত জলা-ভূমি;
এইরূপে আরো কত আর,
কত জনে কহে;—কিন্তু, কোন্ রূপ স্বরূপ তোমার?

৪

হে আলেয়া, হে অদ্ভুত, হে বিচিত্র বহুরূপী আলো,
বুঝিয়াছি, তুমি বাসো ভালো—
যে পরম আলোকের তরে
আকুল অন্তরে
নিখিলের নিখিল মানব
করি' কলরব
নিত্য কত করে'
শিখরে সাগরে
দলি' শিলা, ঠেলি' ঊর্ম্মি, মথি' ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
তিমিরের স্তরে স্তরে স্তরে
গহন-গহ্বরে,
মত্ত ফিরে' মরে,

সেই আলোকের মুখে তুমি এক মিথ্যা আলো জালি'
ভালোবাসো করিতে কেবল ক্রূরতার কূট চতুরালি!
হে চতুর, ওরে,
আরো বুঝিয়াছি আমি, ও চাতুরী তোরে
করিবে না শেষ-জয়ী—একদা নিশ্চয়
নম্রশিরে মেনে নিতে হবে পরাজয়—.
মর্ত্ত্য মানবের হবে জয়!
একদিন সেদিন আমরা
মরণের কালো বুক চিরে',
সেই আলোটিরে
চিনে লব, জিনে' লব'—সেই কালো-হরা
অমৃতের আলো মনোহরা!
সেইদিন মানবের মহা মহোৎসবে,
স্বর্গে মর্ত্তে সেতু-বন্ধ হবে;
দুঃখ যাবে, দৈন্য যাবে,—একমাত্র আনন্দের স্বরে
বিশ্ব রবে পুরে!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

শরাক জাতি

বাংলা দেশে নানা জাতির বাস। এদের সংখ্যা যে কত আর এরা যে কিরূপভাবে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এই-সব বিচিত্র জাতির বিচিত্র আচার-ব্যবহার বাংলার জাতিতত্ত্বের একটি বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। এ পর্য্যন্ত এদেশের সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি আজকালকার উচ্চজাতিগুলির বিবরণ ও মাহাত্ম্য দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশ, ও ইহার সাহিত্য ও ইতিহাস প্রকৃতভাবে বুঝিতে হইলে যে অসংখ্য মূক ও পতিতমন্য জাতি আজকাল শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে অথচ কোনকালে কোন বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ ও তাহাদের স্থান নির্ণয় না করিলে চলিবে না।

শরাক নামে একটি জাতি বাংলা দেশের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় এদের বাস। বাংলার বাহিরে ওড়িষা দেশের কটক অঞ্চলেও এই জাতির লোকেরা বাস করে। বীরভূম-বিবরণের ২য় খণ্ডে দেখা যায় যে রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী খরবোনা গ্রামে ও বলেরপুরে, এবং সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাদিপুর, শিলাজুড়ি, জয়তারা, বাঁশ-ফুলি, বিলকান্দি ও হাড়জুড়ি প্রভৃতি স্থানে শরাক জাতীয় লোক আজকালও বাস করিতেছে। পূর্ব্বে এদের সংখ্যা বড় কম ছিল না, এখন নাকি ক্রমেই কমিতেছে। এত কমিয়াছে যে ইহাদিগকে এখন ধ্বংসোন্মুখ জাতি বলা যাইতে পারে। এরা বাংলার আদিম অধিবাসী, না বাহির হইতে আসিয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের (ব্রহ্মখণ্ড, ১০ অঃ, ৮৫ শ্লো) মতে নবশাখদের উৎপত্তিস্থল "মলয়ং চন্দনালয়ম্‌" যদি ঠিক হয়, তবে এ জাতিও বাংলার বাহির হইতে আসিয়াছে বলিতে হইবে, কারণ এই গ্রন্থের মতে শরাকেরা নবশাখদের একটি সঙ্করশাখা মাত্র।

এই জাতির উৎপত্তি লইয়া নানা গ্রন্থে মতভেদ দেখা যায়। ইহারা যে কতদিন হইতে এদেশে আছে তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না—তবে অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যে আছে তাহাতে বোধ হয় আপত্তি হইতে পারে না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ে দেখা যায় যে ম্লেচ্ছ ও কুবিন্দ (তাঁতী) হইতে জোলার, এবং জোলাও কুবিদ হইতে শরাকের উৎপত্তি:—

"ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দ-কন্যায়াং জোলাজাতির্ব্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিদ-কন্যায়াং শরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
—১২১ শ্লোক।

জোলা যে মুসলমান তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। সুতরাং এখানে দেখা যায় যে শরাকেরা মুসলমান অংশে

উদ্ভূত। তাহা হইলে এদেশে মুসলমানেরা আসার পরে এদের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু গোপালভট্ট-রচিত বল্লালচরিতধৃত পরশুরামসংহিতার মতে নাপিত ও কুবেরী হইতে শরাকজাতির উৎপত্তি। সুতরাং এরা হিন্দু। এ বিষয়ে খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ তাঁহার গ্রন্থে আলাদাভাবে সকল জাতির সকল শাখার পরিচয় ও কাজকর্ম্মের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে শরাকেরা বণিক ও "নবশায়ক"দিগের অন্যতম। নাপিত ও তাঁতী "নবশায়ক"দের মধ্যে পড়ে, সুতরাং পরশুরামসংহিতার মত ঠিক হইতে পারে। বীরভূম-বিবরণেও এ মতের সমর্থক প্রথা দেখা যাইবে—"নবশাখগণের পুরোহিত দ্বারাই ইহাদের যাবতীয় পূজা পার্ব্বণ সংস্কারকার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হয়।" মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে শরাকেরা জন্ম বা কর্ম্ম দ্বারা তাঁতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কবিকঙ্কণেও পাওয়া যায়ঃ—

"বুনে নেত পাটসাড়ী"—(বঙ্গবাসী সং-পৃঃ ৮৯)

পূর্ব্বে এরা বোধহয় শুধু কাপড় বোনার কাজই করিত। কিন্তু এখন কৃষিকার্য্যই এদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে, তবে তাঁতের কাজও অনেকে করে। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ ও পরশুরামসংহিতার মতে এরা সঙ্কর জাতি বিশেষ, কিন্তু কবিকঙ্কণ ইহাদিগকে নবশাখদের অন্যান্য শাখার মত স্বতন্ত্র একটি শাখা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি বাংলাদেশে পৌরাণিক ভাব প্রবল হইতে থাকে। এই সময়ে ও পরে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন হয়। নানা সম্প্রদায়ের সংস্কারকের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শাক্ত কৃষ্ণানন্দের দ্বারা এ কার্য্যের অনেক সহায়তা হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ ও অন্যান্য সমাজের বহু জাতি যাহারা রাজ্যের মালিক ও ধর্ম্মের প্রচারক ছিল, তাহারা পূর্ব্বের গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, এবং হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে যাইয়া যথেষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। নবশাখদের অবস্থা এই কারণেই বোধ হয় সামাজিক হিসাবে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও বহুদিন পর্য্যন্ত দেশের বাণিজ্য ও অর্থ তাহাদেরই আয়ত্ত ছিল। ব্রাহ্মণ-শাসিত-সমাজভুক্ত হওয়ায় ইহাদিগকে পূর্ব্বের প্রথা পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এইরূপ ভাবে অন্যান্য নবশাখদের সঙ্গে সঙ্গে শরাকরাও হিন্দু-ভাবান্বিত হয়। আজকাল এরা অন্যান্য জাতির মতই হইয়া গিয়াছে। "এই জাতি এখন শূদ্রের মত একমাস অশৌচ পালন করে, হিন্দুর যাবতীয় ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান করে।...বিধবাগণ ব্রাহ্মণের বিধবার মত একাদশী করিতে থাকে।...ইহাদের গোত্র গৌতমঋষি, অধুঋষি (মধুঋষি ?), অনন্তঋষি, কাশ্যপ ও আদিদেব ইত্যাদি।" এদের উপাধি—'হৃদ', 'রক্ষিত', 'দত্ত', 'প্রামাণিক', 'সিংহ', 'দাস', ইত্যাদি। এই-সব উপাধি তাঁতীদের মধ্যেও চলিত আছে।

এই জাতির যাহা প্রধান বিশেষত্ব তাহা এখনও বলা হয় নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে ইহারা হিন্দু হওয়ার পূর্ব্বে কি ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। যে-সব গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ আছে তাহাতে তাহাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন খবর নাই। সমান মর্য্যাদার অন্যান্য জাতির খাদ্য সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব নাই, কিন্তু শরাকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা জাতকে জাত নিরামিষাশী। কবিকঙ্কণও এ বিষয়টি উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই, তাঁহার নিপুণ দৃষ্টিতে শরাকদের এই বিশেষত্ব ধরা পরিয়াছিলঃ—

"সরাক বৈসে গুজরাটে, জীব জন্তু নাহি কাটে,
সর্ব্বকাল করে নিরামিষ।"—(বঙ্গবাসী—পৃঃ ৮৯)

এই প্রথা শরাকদের মধ্যে এখনও চলিত আছে দেখা যায়। বীরভূম-বিবরণের মতে—"তাহাদের মধ্যে মৎস্য-মাংসের ব্যবহার নাই। বালকেও মাছ-মাংস খায় না।" বাংলা দেশ মাছের জন্য বিখ্যাত, আর বাঙ্গালী মাছ খাওয়ার জন্য অন্যপ্রদেশে ঘৃণিত—সুতরাং বাঙ্গালীর মধ্যে জন্ম-নিরামিষাশী শরাক জাতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বণিক ও নবশাখদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করায় মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু মাছ ছাড়েন নাই। শরাকদের এই উৎকট গোছের বিশেষত্ব সেইজন্য আরও বিশেষ করিয়াই চোখে পড়ে। মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইহারা কোনপ্রকার সুরা ইত্যাদি পান করে না।

বোধ হয় শরাকদের এই অহিংসা ও নিরামিষ-ভোজন দেখিয়াই অনেকে মনে করেন যে হিন্দু হওয়ার পূর্ব্বে এরা বৌদ্ধ ছিল। "পূর্ব্বে যে ইহারা বৌদ্ধ ছিল কোনো সন্দেহ নাই" (বীরভূম-বিবরণ, ২য় খণ্ড,—পৃঃ ১০২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে—জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে এখানে শরাক জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল" (ঐ—ভূমিকা—পৃঃ ১০)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই মত সমর্থন করিয়াছেন (Dacca Review, Oct., 1921)। বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের অনেক জাতিই যখন বৌদ্ধ ছিল, তখন শরাকদেরও বৌদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে, তবে এ বিষয়ে লিখিত প্রমাণ পাইলে ইহা আরও ভালরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম্মের স্বরূপ আজিও প্রমাণ সহ নির্ণীত হয় নাই, সুতরাং এরা বৌদ্ধ হইয়া থাকিলেও এদের মতামত কিরূপ ছিল জানিবার উপায় নাই। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম্মও বর্ত্তমান ছিল। জৈন ও শৈব ধর্ম্ম এক সময়ে এদেশে খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

শুধু শরাকজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হয় না, 'শরাক' এই নামটিও আলোচিত হওয়া দরকার। কারণ অনেকে শরাকদিগকে বৌদ্ধ প্রমাণিত করিতে যাইয়া 'শরাক' শব্দের নিরুক্তি বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহা বৌদ্ধ বা জৈন 'শ্রাবক' শব্দ হইতে আসিয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। "শ্রাবক হইতে ক্রমে শরাক হইয়া গিয়াছে"—(বীরভূম-বিবরণ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০২)। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়েরও এই মত—(Dacca Review, Oct., 1921)। এই বিষয়ে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কোন সময়ে এ দেশের অধিকাংশ লোক জৈন বা বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে শ্রাবক অর্থাৎ গৃহস্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল। অন্য সব জাতিকে বাদ দিয়া শুধু শরাকদিগকে জাতসুদ্ধ শ্রাবক বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে? যাহারা শরাকদের সমান ধার্ম্মিক ছিল তাহারাও শ্রাবক নাম হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কেন? তারপর, শ্রাবক শব্দ হইতে সোজাসুজি শরাক হওয়া বড় সহজ নহে। শ্রাবক হইতে 'সরাবগ' হওয়াই বোধ হয় সহজ। ১২৫৯ সালের যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর "তীর্থভ্রমণে" (পৃঃ ২০-২১) এই সরাবগ শব্দটি পরেশনাথ পাহাড়ের মাড়োয়ারী জৈনদের বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং শ্রাবক বুঝাইতে সরাবগ শব্দ বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত আছে বলিতে হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে 'শ্রাবক'কে টানিয়া বুনিয়া 'শরাক' করিবার আবশ্যকতা নাই। তারপর, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের (উত্তর খণ্ড, ১৩শ অধ্যায়) মতে 'শাবক' বলিয়া একটি জাতি আছে। যদি কোন জাতির নামের সঙ্গে শ্রাবক শব্দটি জড়িত হওয়া নিতান্ত দরকার হয় তবে 'শরাক' অপেক্ষা 'শাবক' শব্দটির সঙ্গেই জড়িত হওয়া অনেকটা সহজ বলিয়া বোধ হয়। বাংলা দেশের বহু জাতির নামের নিরুক্তি আমরা জানি না, বোধ হয় জানিবার উপায়ও নাই। শরাক জাতিরও নামের নিরুক্তি বোধ হয় এইরূপ ভাবেই বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। তাম্বুলবিক্রয়ী অর্থে 'বরাক' শব্দ পাওয়া যায় (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান)। 'শরাক' শব্দটিও সেই ধরণের হইতে পারে।

নবশাখদের মধ্যে কোন কোন জাতির প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি ও নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সমাজের মধ্যে শরাকদের স্থান কিরূপ ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। সুবর্ণবণিক কৈবর্ত্ত ইত্যাদি সমাজের মত তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অথবা অন্য প্রকারে সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল কি না বলা শক্ত। তাহারা শুধু অহিংসার জন্যই বিখ্যাত ছিল, না অন্যান্য বিষয়েও তাহাদের মর্য্যাদা ছিল তাহা অনুসন্ধান করা দরকার। এই বিচিত্র অথচ ধ্বংসোন্মুখ জাতিটির ইতিহাসের উদ্ধার না হইলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

শ্রী রমেশ বসু

লক্ষহীরা

"হাঁ, হাঁ, কি হল! কি হল!" বলে' পথের লোক ভেঙ্গে পড়্‌ল। একখানা মোটর-গাড়ীতে একটি ছেলে চাপা পড়েচে। ঘরের গাড়ী নয়, টেক্‌সী। লোক ছুটে এসে তেড়ে গাড়োয়ানকে মারতে যায়, সে লাফিয়ে পড়ে' ঊর্দ্ধ-শ্বাসে দিল ছুট। সাম্‌নেই একটা গলি ছিল, তার ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে পড়্‌ল।

ছেলেটি ঠিক চাপা পড়ে নি, কেমন করে' পাশ থেকে লেগে ঠিক্‌রে পড়ে' গিয়েছিল। গায় কোথাও চোট দেখা যায় না, কোনখান দিয়ে রক্ত পড়ে নি। পড়ে' গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। ফুট্‌ফুটে সুন্দর ছেলে, বছর সাত আট বয়স হবে, চুলগুলি কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া, পরণে বেশ ভাল কাপড়-চোপড়, ঠিক যেন ঘুমুচ্চে। চিৎ হয়ে পড়েচে, কিন্তু মাথা এক দিকে একটু কাৎ হয়ে আছে। চোকের পাতায় বড় বড় রোম, চোকের কোলে পড়েচে। ছেলে যেন খেলা কর্‌তে কর্‌তে এলোথেলো হয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে।

ভিড়ের মধ্যে ঠেলে ঢুকল পাহারাওয়ালা। বল্‌লে, "হট্‌ যাও, হট্‌ যাও, হিঁয়া কেঁও ভিড় কর্‌তা হ্যায়? তুম-লোগ কেয়া তমাসা দেখ্‌তা হ্যায়?"

পিছনে পিছনে আর-একজন ঢুক্‌ল। "সরে' যাও, সরে' যাও, আমি ডাক্তার, দেখি কোথায় লেগেচে! অত ভিড় কোরো না, সরে' দাঁড়াও, ওর গায় বাতাস লাগ্‌তে দাও।"

ছেলের পাশে বসে' ডাক্তার অনেক ক্ষণ সাবধানে পরীক্ষা করে' দেখ্‌লেন। তার পর বল্‌লেন, "বোধ হয় মাথায় লেগেচে, একে এক্ষুনি হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কেউ একজন একখানা টেক্‌সী ডাক ত!"

বল্‌তে বল্‌তে একখানা মোটর-গাড়ী এসে দাঁড়াল। মোটরখানা খুব জাঁকাল, চালকের মাথায় জরির পাগ্‌ড়ী। ভিতর থেকে কে মুখ বাড়িয়ে জিগ্‌গেস কর্‌লে, "কি হয়েচে?"

"একটি ছেলে মোটর চাপা পড়েচে।"

শুনেই যে মোটরে বসে' ছিল নেমে পড়্‌ল।

স্ত্রীলোক, যুবতী, সুন্দরী। খুব দামী জম্‌কাল পোষাক, গায় হীরার গহনা ঝক্‌মক্‌ কর্‌চে। দর্শকেরা বল্‌তে লাগ্‌ল, "লক্ষহীরা, ওরে লক্ষহীরা বাঈ!"

ভিড়ের ভিতর তখনি পথ হয়ে গেল, পাহারাওয়ালা সরে' দাঁড়াল। লক্ষহীরা বাঈজীকে কে না চেনে? তার ছবি দোকানে দোকানে, তার গান গ্রামোফোনে গ্রামোফোনে। অট্টালিকার মত তার বাড়ী লোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ডাক্তারকে লক্ষহীরা জিগ্‌গেস কর্‌লে, "আপনি ডাক্তার?"

"হাঁ।"

"কোথায় লেগেচে?"

"আমার মনে হয় মাথায়। অবিলম্বে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

"আমার মোটর রয়েচে। নিয়ে চলুন।"

ছেলেটি যেখানে পড়ে' ছিল লক্ষহীরার মোটর ঠিক তার পাশে নিয়ে এল। লক্ষহীরা ডাক্তারকে বল্‌লে, "আমি নিয়ে যাব?"

"আপনি তুল্‌তে পার্‌বেন?" ছেলে দিব্য মোটাসোটা খাসা গড়ন।

লক্ষহীরা হেঁট হয়ে দুই হাতে ছেলেকে তুল্‌লে, মা যেমন কোলের রোগা ছেলেকে বিছানা থেকে কোলে তুলে নেয় সেই রকম কোরে। চক্ষে তার মায়ের মমতা, মায়ের স্নেহ, মায়ের মত চক্ষু ছলছল কর্‌চে। ডাক্তারকে লক্ষহীরা বল্‌লে, "আপনি সঙ্গে যাবেন?"

"চলুন।"

আস্তে আস্তে মোটরে উঠে লক্ষহীরা ছেলেকে কোলে করে' বস্‌ল। ডাক্তার বস্‌লেন সাম্‌নে।

চালককে লক্ষহীরা হাঁসপাতালের নাম বলে' দিল, ভিড়ের ভিতর থেকে মোটর বেরিয়ে গেল।

২

বেলা তখন আন্দাজ তিনটে। হাঁসপাতালে গিয়ে লক্ষহীরা কারুর কোলে ছেলে দিল না, সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে নিয়ে গেল। যখন খাটে শুইয়ে দিল ছেলের

তখন চৈতন্য হয় নি, চোক বুজে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। ডাক্তার হাঁসপাতালের ডাক্তারকে দুটো চারটে কথা বলে' চলে' গেলেন। তাঁর ত নিজের রোগী আছে।

লক্ষহীরাকে কে না চেনে? তাকে ঘরে বস্‌বার জায়গা দিলে সে বসে' রইল। হাঁসপাতালের ডাক্তার ভাল করে' দেখে শুনে বল্‌লেন, "ছেলেটি আপনার কেউ হয়?"

"না। আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম। দেখ্‌তে পেয়ে নিয়ে এসেছি। কি রকম দেখ্‌ছেন?"

"মাথার ভিতর ধাক্কা লেগেছে। যদি জ্ঞান হয় তা হলে সেরে উঠ্‌বে, না হলে খুব ভয়।"

"বাপ-মাকে খবর দেওয়া হবে না?"

"সেই ত মুস্কিল, ও ত কিছু বল্‌তে পার্‌ছে না। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে।"

পুলিসে যেমন খোঁজ করে' থাকে সেই রকম কর্‌ছিল; কিন্তু ছেলের বাপ-মা অল্পক্ষণ পরেই এলেন। ছেলের সঙ্গে চাকর ছিল, তাকে কি কিন্‌তে পাঠিয়ে সে রাস্তায় আস্‌তেই দুর্ঘটনাটা হল। চাকর ফিরে এসে ভিড় দেখে জিগ্‌গেস করে' জান্‌তে পার্‌লে কি হয়েচে। ছেলে দেখ্‌তে কি রকম শুনে তার সন্দেহ রইল না। হাঁসপাতালের নাম জেনে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী গেল। ঢুক্‌তেই দেখে কর্ত্তা দাঁড়িয়ে। চাকর ড্যাক্ করে' কেঁদে ফেল্‌লে।

"কি হয়েছে রে? সত্যসুন্দর কোথায়?"

"আজ্ঞে, খোকা-বাবু—সত্যসুন্দর—মোটর—চাপা পড়েচে!"

"অ্যাঁ!"

সত্যসুন্দর বাপের এক ছেলে। বাপ শিবসুন্দরের প্রাণে এই নিদারুণ সংবাদ কেমন লাগ্‌ল! অনেক চেষ্টা করে' সাম্‌লে বল্‌লেন, "কোথায় আছে?"

চাকর হাঁসপাতালের নাম বল্‌লে।

"মোটর আন্‌তে বল্।"

কি হয়েচে শুনে বাড়ীর ভিতর থেকে গিন্নী ছুটে এলেন পাগলের মতন। "ওগো, আমিও যাব।"

"চল।"

সঙ্গে চাকর গেল। চাকর লক্ষহীরার কথা, ডাক্তারের কথা, যা যা শুনেছিল বল্‌লে।

হাঁসপাতালে গিয়ে, ছেলে যে ঘরে আছে ঢুকে সত্যসুন্দরের মা চোকের জলে দেখ্‌তে পান না। তিনি বল্‌লেন, "ছেলে কি আমার আছে?"

শিবসুন্দর বল্‌লেন, "চিত্রা, স্থির হও।"

ছেলের মাথার কাছে চেয়ারে সাদা-গাউন-পরা মাথায়-সাদা-টুপি নর্স বসে' ছিল। সে বল্‌লে, "অধৈর্য্য হবেন না, এখানে কাঁদ্‌বেন না। বিশেষ ভয়ের ত কোন কারণ নেই।"

লক্ষহীরা উঠে এক পাশে চুপ করে' দাঁড়াল। শিবসুন্দর ছেলের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে লক্ষহীরার কাছে গিয়ে বল্‌লেন, "যদি আমাদের ছেলে রক্ষা পায় তা হলে আমরা কেউ আপনার ধার শুধ্‌তে পার্‌ব না। আর আমাদের অদৃষ্টে যাই থাক্, আপনার আজকের উপকার আমরা কখন ভুল্‌ব না।"

লক্ষহীরা একটু চুপ করে' রইল। তার পর বল্‌লে, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে আপনার ছেলে সেরে উঠ্‌বে, কোন্ ভয় নেই।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!"

চিত্রা সেই যে খাটের পাশে হাঁটু পেতে ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লেন, তাঁর আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই। চোকের জল শুকিয়ে গেল, কিন্তু এমনি করে' ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন যেন তাঁর প্রাণ তাঁর চোক দিয়ে বেরিয়ে ছেলের অঙ্গে প্রবেশ কর্‌চে। চক্ষে পলক নেই, শরীরে স্পন্দন নেই, মুখে কথা নেই।

শিবসুন্দর লক্ষহীরাকে মৃদু স্বরে বল্‌লেন, "আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।"

কোন কথা না কয়ে লক্ষহীরা বস্‌ল।

রাত হতে লাগ্‌ল। ছেলে তেমনি এলিয়ে আছে, কিন্তু এক-একবার চোকের পাতা নড়্‌চে, নিশ্বাস আগের চেয়ে একটু জোরে বইচে।

শিবসুন্দর আগের মত নীচু গলায় বল্‌লেন, "রাত হচ্চে, আপনার কষ্ট হবে, বাড়ী যান।"

লক্ষহীরা মিনতির স্বরে বল্‌লে, "আর একটু থাকে

থাকতে দিন, আমাকে বিদায় করে' দেবেন না।" চক্ষে তার ভিক্ষার চাহনি!

এ কেমন ধারা! যার কথায় হীরার ধার, যার গর্ব্ব মুখের কথায়, মাথার বাঁকা ভাবে, চক্ষের কটাক্ষে, সে আজ এমন কেন হয়ে গেল? কিসের শিকড় ফণায় ঠেকে ফণিনীর মাথা নত হয়ে মাটীতে মিশিয়ে গেল?

শিবসুন্দর আর কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না।

রাত্রি সাড়ে নয়টার পর ডাক্তার এলেন। অনেকক্ষণ নাড়ী দেখ্‌লেন, চক্ষের পাতার কাঁপুনি ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, হেসে বল্‌লেন, "আর কিছু ভয় নেই, এক্ষুনি জ্ঞান হবে।"

একটু পরেই সত্যসুন্দর চোক খুল্‌লে। মাথার গোড়ায় দাঁড়িয়ে শিবসুন্দর ডাক্‌লেন, "সত্যসুন্দর!"

"বাবা!"

সত্যসুন্দর এদিক ওদিক চেয়ে আবার বল্‌লে, "মা!" অমনি মার মুখ ছেলের মুখের উপর। এবার ছেলে মার গলা জড়িয়ে ধরে' সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে প'ড়্‌ল।

৩

তার পর দিন ভোর বেলা লক্ষহীরা হাসপাতালে হাজির। সামান্য একখানা শাড়ী পরণে, গায় কোন অলঙ্কার নেই। এসে দরজার কাছে খুব নম্রভাবে দাঁড়াল, যেন ঘরে ঢুক্‌তে সাহস হচ্চে না।

চিত্রা দেখে বল্‌লেন, "এস, এস, কাল তোমার সঙ্গে একটা কথাও কই নি, মনের কিছু ঠিক ছিল না।"

সত্যসুন্দর তখন অগাধ ঘুমুচ্চে। শিবসুন্দর একবার বাইরে গিয়েচেন। একটু পরে ডাক্তারের সঙ্গে এলেন। ডাক্তার ছেলের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে আস্তে আস্তে নাড়ী দেখ্‌লেন, মাথার চারিদিকে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন। বল্‌লেন, "আর কোন চিন্তা নেই। একটু রোদ উঠলে আপনারা ছেলেকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন।"

খানিক পরে সত্যসুন্দরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোক চাইতেই মার মুখ সাম্‌নে। ছেলের মুখে হাসি ফুট্‌ল। বল্‌লে, "মা, এ ত বাড়ী নয়, এ কোথায়?"

"বাবা, এ হাসপাতাল। তোমার লেগেছিল। তোমাকে এক্ষুনি বাড়ী নিয়ে যাব।"

"আমার লেগেছিল? মাথায় ব্যথা রয়েচে। কি হয়েছিল? আঃ সেই মোটর'গাড়ী!" মনে পড়াতে ছেলে একবার শিউরে উঠ্‌ল।

মা ছেলের গায় বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। "আর ত কিছু ভয় নেই, ধন। তোমার লেগেছিল, এখন সব সেরে গিয়েচে।"

"হাঁ মা, সেরে গিয়েচে।" ছেলের আবার চোক বুজে এল।

আবার চোক মেল্‌লে। ঘরের চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। নজর পড়্‌ল লক্ষহীরার মুখের উপর। দৃষ্টি স্থির হল। বল্‌লে, "মা, উনি কে? কাছে ডাক।"

ছেলেবেলা থেকেই সত্যসুন্দর বেশ সপ্রতিভ।

চিত্রার ইশারায় লক্ষহীরা এসে সত্যসুন্দরের সাম্‌নে দাঁড়াল। সত্যসুন্দর ভুরু কুঁচ্‌কে তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার পর ব্যগ্র হয়ে বলে' উঠ্‌ল, "আমি চিনি তোমাকে। আমি তোমাকে দেখেছি, অনেক বার দেখেছি।"

মা বল্‌লেন, "না, বাবা, ওঁকে ত এর আগে দেখনি।"

"আমি বল্‌চি দেখেচি"—কথার সুরে বড় জোর, বড় জিদ্।

লক্ষহীরা খুব মিষ্টি গলায় মোলায়েম সুরে বল্‌লে, "দেখেচ বই কি, অনেক বার দেখেচ।"

"শুনলে মা? আবার তুমি বল ওঁকে আমি দেখি নি। তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না।"

"হ্যাঁ, গোপাল, আমি অনেক কথা ভুলে যাই।" চিত্রা লক্ষহীরার দিকে চেয়ে মুখ টিপে একটু হাস্‌লেন।

সত্যসুন্দর লক্ষহীরার দিকে চেয়ে হুকুম কর্‌লে, "তুমি আমার কাছে বস।"

লক্ষহীরা চিত্রার দিকে চাইলে। চিত্রা বল্‌লেন, "বস।"

সত্যসুন্দরের পাশে বসে' চিত্রা তার গায় হাত দিল।

সত্যসুন্দর বল্‌লে, "আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।"

লক্ষহীরা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

একটু পরে সত্যসুন্দর আবার বল্‌লে, "তুমি আমার কাছে সরে' এস, তোমার কোলে মাথা রেখে শোব।"

কোলে মাথা রেখে বল্লে, "এ বেশ, বালিশের চেয়ে ভাল।"

চিত্রা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তার পর তাঁর দৃষ্টি পড়্‌ল লক্ষহীরার মুখে। সে মুখে মায়ের স্নেহ, মায়ের মমতা, মায়ের আকুলতা। কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি মুখে ফুটেছে! চিত্রা চোক ফিরাতে পার্‌লেন না।

লক্ষহীরার চোক থেকে টস্ টস্ করে' জল পড়্‌ছিল।

এক ফোঁটা, দু ফোঁটা, তিন ফোঁটা সত্যসুন্দরের গালে পড়্‌ল। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বল্‌লে, "তুমি কাঁদ্‌চ কেন, কি হয়েচে?"

"কিছু হয় নি।"

"কেঁদ না, চোক মোছ।"

লক্ষহীরা আঁচল দিয়ে চোক মুছ্‌ল।

শিবসুন্দর ঘরে এসে বল্‌লেন, "মোটর এসেচে, চল সত্যসুন্দরকে নিয়ে যাই।"

লক্ষহীরা বল্‌লে, "আমি নিয়ে যাব?"

"আপনি নিয়ে যেতে পার্‌বেন?"

"কাল আমিই নিয়ে এসেছিলুম," লক্ষহীরার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

সত্যসুন্দর লক্ষহীরার গলা জড়িয়ে বল্‌লে, "তুমি আমাকে কোলে করে' নিয়ে চল।"

লক্ষহীরা খুব যত্নে সত্যসুন্দরকে কোলে করে' নিয়ে গেল। সে তার কাঁধে মাথা দিয়ে তৃপ্তিতে চুপ্‌টি করে' রইল।

মোটরে উঠ্‌বার সময় ছেলের আব্দার, "তুমি আমার সঙ্গে চল।"

লক্ষহীরা বল্‌লে, "এর পর যাব।"

"মা ওঁকে আস্‌তে বল।"

"আসবেন বই কি, উনি তোমাকে কত যত্ন করেন।"

লক্ষহীরাকে সত্যসুন্দর বল্‌লে, "তুমি আস্‌বে বল।"

"আস্‌ব,—এই যে তোমার মা বল্‌লেন। এখন চুপ কর, লক্ষী-ছেলে।"

লক্ষী-ছেলে একেবারে চুপ!

যে ডাক্তার সত্যসুন্দরকে রাস্তায় দেখেছিলেন আর সঙ্গে হাঁসপাতালে গিয়েছিলেন তাঁর নাম শিবসুন্দর হাঁসপাতালের ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন। বাড়ী গিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

ডাক্তার এলেন। শিবসুন্দর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লক্ষহীরার প্রশংসা ডাক্তারের মুখে ধরে না। বল্‌লেন, "মশাই, এ রকম ত কখন দেখি নি। সহর সুদ্ধ লোকে জানে লক্ষহীরার অহঙ্কারের সীমা নেই, মাটীতে তার পা পড়ে না। কত ধনীরা তার বাড়ী গিয়ে দেখা পায় না, তাদের বসিয়ে রাখে। মশাই, বল্‌ব কি, সে দিন তার দয়া আর মমতা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। যেন সাক্ষাৎ মা ষষ্ঠী। ছেলে তুলে যে কত যত্নে নিয়ে গেল তা বলা যায় না। হাঁসপাতালের অতগুলো সিঁড়ী ছেলে কোলে করে' উঠে গেল একটুও ক্লান্তি নেই। আর মুখে কি করুণা, চোকের জল চোক ভরে' টল টল কর্‌চে। সে করুণাময়ী মূর্ত্তি আমি কখন ভুল্‌তে পার্‌ব না।"

শিবসুন্দর চিত্রাকে সব বল্‌লেন। চিত্রা বল্‌লেন, "আমিও তার ঐ রকম মুখের ভাব দেখেছি, খোকাকে দেখে চোকের জল রাখ্‌তে পারে না, যেন মায়ের বাড়া। ও রকম মেয়েমানুষ এমনতর হয় এ ত কোথাও শুনি নি। আর সত্যসুন্দরও তাকে যেন পেয়ে বসেচে। তাকে কখন দেখে নি অথচ যেন কত কালের চেনা, কখন আস্‌বে কখন আস্‌বে করে' আমায় যেন পাগল করে' তুলেচে। আরও এক মুস্কিলের কথা। ও রকম মেয়েমানুষ হাজার ভাল হলেও ত রোজ রোজ গেরস্ত ঘরে আসা ভাল নয়। অথচ মুখ ফুটে আমরা কেউ কিছু বল্‌তেও পার্‌ব না।"

শিবসুন্দর বল্‌লেন, "সে জন্য ভাব্‌তে হবে না, সত্যসুন্দর সেরে উঠ্‌লে ও আর নিজেই আস্‌বে না। ও কি কারুর বাড়ী সহজে যায় না কি? মেয়েমানুষের প্রাণে একটা মায়ের মমতা আছে, সত্যসুন্দরকে দেখে ওর স্নেহটে জেগে উঠেচে। পাঁচ শো টাকা দিয়ে সাধাসাধি কর্‌লে তবে হয়ত কারুর বাড়ী গিয়ে ঘণ্টাখানেক গান করে। নাচ মোজ্‌রা ক' বছর থেকে বন্ধ করে' দিয়েচে।"

"তাই বু!"

চিত্রার মনে যে অল্প ঈষৎ আশঙ্কার আভাস হয়েছিল যে লক্ষহীরা হয় ত রোজ রোজ সত্যসুন্দরকে দেখ্‌তে আস্‌বে তা ত কই হল না। এক দিন গেল, দুদিন গেল, লক্ষহীরার দেখা নেই। সত্যসুন্দর সকল সময় মাকে বিরক্ত করে, "মা, তিনি কই এলেন না, তাঁকে ডাকিয়ে পাঠাও। তিনি যে বলেছিলেন আস্‌বেন।"

"আস্‌বেন বই কি! হয় ত আজ আস্‌বেন।"

"তুমি ত রোজই বল আজ আস্‌বেন, আজ আস্‌বেন। আমার বড্ড মন কেমন কর্‌চে।"

"আচ্ছা, আমি তাঁকে ডাকিয়ে পাঠাব।"

তার পরদিন সকাল বেলা লক্ষহীরা এল, হাতে এক রাশ ফুল। চিত্রাকে বল্‌লে, "খোকাকে দেখ্‌বার আগে আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

চিত্রা তাকে আলাদা ঘরে নিয়ে গেলেন। লক্ষহীরা বল্‌লে, "আপনার বাড়ীতে আমার মত লোকের সদা সর্ব্বদা আসা উচিত নয় তা বুঝ্‌তে পারি। আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন, খোকা সেরে উঠ্‌লে আমি আর বড় একটা আস্‌ব না।"

এ কথার কোন জবাব চিত্রা দিতে পার্‌লেন না, কেন না এ ত তাঁরই মনের কথার জবাব। বল্‌লেন, "খোকা সর্ব্বদাই তোমার নাম করে, তোমাকে দেখ্‌তে চায়।"

"চলুন তাকে দেখ্‌তে যাই।"

সত্যসুন্দর তখনও উঠ্‌তে পারে না, মাথায় গায় বড় ব্যথা। লক্ষহীরাকে দেখে বল্‌লে, "তুমি এতদিন এস নি কেন? আমি তোমার উপর রাগ করেচি।"

"এই ত আজ এসেচি। দেখ, তোমার জন্য কত ফুল এনেচি।"

"দেখি, দেখি, আমি ফুল বড় ভালবাসি।" ফুল পেয়ে ছেলে আহ্লাদে আটখানা।

ফুল নাড়াচাড়া করে', বিছানার চার দিকে ছড়িয়ে রেখে সত্যসুন্দর চেয়ে চেয়ে লক্ষহীরাকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। চেয়ে চেয়ে খানিকক্ষণ দেখে বলে' উঠ্‌ল, "তোমার গায় আজ গহনা নেই কেন?"

সত্যসুন্দর গ্রামোফোনের দোকানে লক্ষহীরার ছবি দেখেছিল, তাই বলেছিল তাকে অনেকবার দেখেচে।

"গহনা ত সব সময় পরি না।"

"আচ্ছা, এবার যখন আস্‌বে গহনা পরে' এস; আমি তোমার গহনা দেখ্‌ব।"

একটু পরে আবার বল্‌লে, "তোমার নাম কি, তুমি ত আমায় বল নি?"

"আমার নাম লক্ষহীরা।"

সত্যসুন্দর হাততালি দিয়ে খল্‌ খল্‌ করে' হেসে উঠ্‌ল, "বাঃ কেমন চমৎকার নাম, ঠিক্‌ যেন রূপকথার মতন! লক্ষহীরা! তা হলে তোমার এক লক্ষ হীরা আছে?"

"অত আমি কোত্থেকে পাব?"

"লক্ষহীরা, লক্ষহীরা! কেমন মজার নাম!"

৫

তার পরে লক্ষহীরা আর আসে না। পাঁচ সাত দিন কেটে গেল, তার আর দেখা নেই। সত্যসুন্দর অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। কেবল তাকে দেখ্‌তে চায়, তার জন্য কাঁদে।

চিত্রা শিবসুন্দরকে বল্‌লেন, "এ ত বড় মুস্কিল হল, ছেলে ত কেঁদে সারা। লক্ষহীরার জন্য হেদিয়েচে।"

"উপায়?"

"তাকে খবর দিতে হবে। এ রকম হলে ত ছেলের আবার অসুখ হবে।"

"কিছু যদি মনে করে?"

"তা কর্‌বে না। সে দিন আমায় বল্‌ছিল এখানে ঘন ঘন আসা যাওয়া কর্‌লে লোকে কিছু মনে কর্‌তে পারে। সেই জন্য সে আসে নি, নইলে খোকার জন্য নিশ্চয় তার মন কেমন করে। আমি নিজের মনে বুঝ্‌তে পার্‌চি।"

"কি করে' তাকে খবর পাঠাই?"

"একখানা চিঠি লেখ।"

শিবসুন্দর লিখ্‌লেন দু ছত্রের চিঠি। "সত্যসুন্দর আপনাকে দেখ্‌বার জন্য বড় অস্থির হয়েচে। দয়া করে' অবসর-মত যদি একবার এসে তাকে দেখে যান।"

তার পরদিন সকাল বেলা লক্ষহীরা এল। একটি-গা অলঙ্কার। হাতে হীরার বালা, কানে বড় বড় হীরার ফুল, গলায় নক্ষত্রমালার মত হীরার হার। সর্ব্বাঙ্গে হীরা

ঝক্‌মক্ করচে। সত্যসুন্দর যে তার গহনা দেখ্‌তে চেয়েছিল!

চিত্রা আদর করে' লক্ষহীরাকে নিয়ে এলেন। তার অলঙ্কার দেখে চিত্রা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনি ধনীর মেয়ে, ধনীর স্ত্রী, নিজের অনেক দামী দামী গহনা, অনেক বড়মানুষের বাড়ী যাওয়া আসা, কিন্তু এমন অলঙ্কার তিনি কোথাও দেখেন নি।

সত্যসুন্দর খাটে পাশ ফিরে শুয়ে ছিল, অলঙ্কারের শব্দ শুনে ফিরে চাইল। লক্ষহীরাকে দেখেই তার রাগ অভিমান কোথায় গেল। এক মুখ হেসে বল্‌লে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও,তোমার গহনা দেখি!"

লক্ষহীরা তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যসুন্দর তার গহনায় হাত দিয়ে দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। "লক্ষহীরা, লক্ষহীরা, এই ত এক লক্ষ হীরা! এই রকম ত তোমায় দেখেচি!". তার পর আরম্ভ কর্‌লে, "এর কত দাম?"

"অনেক দাম।"

"তোমায় কে দিয়েছে?"

উত্তর নেই। সত্যসুন্দর উত্তরের জন্য অপেক্ষাও কর্‌লে না। এ রকম জেরা ভাল, কেবল সওয়াল, জবাবের কোন পরোয়া নেই।

"তুমি এ গহনা নিয়ে কি কর্‌বে?"

"কি আর কর্‌ব? থাক্‌বে।"

"মেয়েকে দেবে?"

"আমার মেয়ে নেই।"

"ছেলে?"

"ছেলেও নেই।"

"বাপ-মা?"

"বাপ-মাও নেই।"

"তোমার বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে কেউ নেই?"

লক্ষহীরার কথা বাধ্‌তে লাগ্‌ল, "আমার কেউ নেই।"

সত্যসুন্দরের পুটল-চেরা ভাসা-ভাসা চক্ষুদুটি জলে পূরে এল। "আহা, কেউ নেই! তুমি এমন দুঃখী, তোমার এ হীরামুক্ত কি হবে!"

ঘর শুব্ধ, কারুর মুখে একটি কথা নেই। তার পর— তার পর সেই ছোট ছেলের মহান্ হৃদয়ে স্নেহ-মমতার তরঙ্গ উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে লক্ষহীরার হৃদয়ে আঘাত কর্‌ল, দুখানি হাত দিয়ে লক্ষহীরার গলা জড়িয়ে, তার মুখে মুখ দিয়ে অমৃতময় স্বরে বল্‌লে, "আমি তোমার ছেলে। যেমন ঐ আমার মা, তেমনি তুমি আমার মা। তুমি আমার লক্ষহীরা মা!"

লক্ষহীরার চোক দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে' জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু সে জল সে মুছ্‌লে না, হাতের রুমাল হাতেই রইল। চিত্রা অনবরত আঁচল দিয়ে চোক মুছ্‌তে লাগ্‌লেন।

আবার সব নীরব, কেউ কোন কথা কয় না। আবার সত্যসুন্দর ধীরে ধীরে, যেন আপনার মনে বল্‌তে লাগ্‌ল "কেউ নেই, এত হীরা কি হবে? আচ্ছা, লক্ষহীরা মা, অনেক সব গরিবের ছেলে-মেয়ে রাস্তায় বেড়ায়, তারা খেতে পর্‌তে পায় না। তাদের দেখেচ?"

"দেখেচি।"

"এ সব বেচে তাদের দিলে কেমন হয়?"

"বেশ হয়।"

"তবে তাই দিও।"

"তাই দেব।"

চিত্রা শুধু শুন্‌ছিলেন, একটি কথাও কন্ নি। ছেলের এমন কথার উপর কোন কথা কওয়া যায় না।

সত্যসুন্দর আবার একটু ভাব্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "লক্ষহীরা মা, আমি জানি তুমি গান গাইতে পার। একটা গান কর।"

লক্ষহীরা চিত্রার মুখের দিকে চাইলে। চিত্রা বল্‌লেন, "যা খোকা বল্‌বে তাই হবে। আর তোমার গান শোনা ত মস্ত কথা, আমি হয়ত ভরসা করে' বল্‌তেই পার্‌তুম না। তোমার ছেলের ত তোমার উপর জোর চলে।"

"সব জোর চলে।"

"বাজনা আনিয়ে দেব?"

"কোন্ দর্‌কার নেই।"

সত্যসুন্দর লক্ষহীরার হাত ধরে' ছিল। লক্ষহীরা তার হাত কোলের কাছে টেনে নিয়ে দুই হাতের মধ্যে

রাখ্‌লে। মাথা নীচু করে' একটু ভাব্‌লে। তার পর মুখ তুলে গান আরম্ভ কর্‌লে।

আগে নরম সুরে, ধীরে ধীরে, গানের কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট, সুরের তার যেন প্রাণ থেকে টানা, যে শোনে মর্ম্মে মর্ম্মে লাগে। প্রার্থনার একটি গান, অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথা, মার্জ্জনার জন্য ব্যাকুলতা। কণ্ঠ ক্রমে মুক্ত হল, ঐটুকু ঘরে যেন গলা ধরে না। এমন প্রাণের আকুলতা, যেন দেবতা সাক্ষাতে, যেন তিনি নিজে সব শুনচেন। সেই ঘরখানি যেন দেবমন্দির হয়ে উঠ্‌ল। পাপীর মুখে দেবতার নাম যেমন শোনায় এমন আর কারুর মুখে নয়, পাপী আর অনুতাপী।

গান যখন বন্ধ হল তখন চিত্রার চক্ষু জলে ভেসে যাচ্চে, শিবসুন্দর স্তব্ধ হয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে, সত্যসুন্দর লক্ষহীরার হাত চেপে ধরে' তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

৬

লক্ষহীরা আর এল না। সহরে একটা রব উঠ্‌ল যে সে সমস্ত গহনাপত্র বেচে গরিব ছেলে-মেয়েদের জন্য দান করে' কোথায় চলে' গিয়েচে কেউ জানে না। শিবসুন্দর আর সকলেই এ কথা শুন্‌লেন। সত্যসুন্দর যে-সকল কথা লক্ষহীরাকে বলেছিল চিত্রা স্বামীকে বল্‌লেন।

শিবসুন্দর বল্‌লেন, "ঐটুকু ছেলের কথায় লক্ষহীরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌লে?"

"তা ছাড়া আর কি মনে হয়? লক্ষহীরার কেউ নেই শুনে সত্যসুন্দর বল্‌লে তোমার গহনা বেচে গরিব ছেলে-মেয়েদের দান কোরো। লক্ষহীরা বল্‌লে, তাই হবে। হয়েচেও ত তাই। তখন আমি মনে করেছিলুম ছেলে-ভুলানো কথা।"

"এমনতর ক'জন পারে? আমরা নিজেদের বড় সাধু মনে করি, কিন্তু লক্ষহীরার মত কটা লোকের নাম করা যায়? এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিলে!"

"ভগবানের লীলা কে বুঝ্‌তে পারে? কখন যে কাকে কি মতি দেন তিনিই জানেন। তা নইলে এত পাপী তাপী তরে' যায়?"

সেদিন সত্যসুন্দর গাড়ীবারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারে বসে' আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশে পাতলা পাতলা মেঘ ভেসে যাচ্ছিল তাই দেখ্‌ছিল। চিত্রা এসে বল্‌লেন, "সত্যসুন্দর, তুমি যে সেই সেদিন লক্ষহীরাকে সব গহনা বেচে ফেলে গরিব দুঃখী ছেলে-মেয়েদের দান কর্‌তে বলেছিলে মনে আছে?"

"আছে।"

"সে তাই করেচে। সব দান করে' বাড়ী ঘর দোর ছেড়ে কোথায় চলে' গিয়েচে কেউ জানে না।"

"আমি জানি।"

"তোমায় ত কিছু বলে যায় নি, তুমি কেমন করে' জান্‌লে?"

"সেদিনকার তাঁর গান শোন নি? সে গানের এই মানে। তোমরা বুঝ্‌তে পার নি, আমি পেরেছিলুম। এখানে আর তাঁর গান কেউ শুন্‌তে পাবে না, বনের পাখী শুন্‌বে।"

"তার জন্য তোমার মন কেমন কর্‌বে না?"

"কর্‌বে, কিন্তু আগের মত নয়। আর আমি কাঁদ্‌ব না, তাঁর জন্য আব্‌দার নেব না।"

"তিনি কি আর আস্‌বেন না?" এবার 'সে' না বলে' চিত্রা 'তিনি' বল্‌লেন।

সত্যসুন্দর কোথায় যেন কত দূরে কি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "এখন আর আস্‌বেন না, অনেক দিন আস্‌বেন না। কিন্তু আর একবার আস্‌বেন। তাঁর গানে যে তাই বলে' গিয়েচেন।"

ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে সত্যসুন্দর আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

৭

কতদিন গেল। লক্ষহীরার নাম লোকে ভুলে গেল। সত্যসুন্দর লেখাপড়া শিখে ক্রমে বেশ কৃতী হয়ে উঠ্‌চে। সেও লক্ষহীরার নাম করে না, চিত্রা ভাব্‌লেন হয়ত ভুলে গিয়েচে।

একদিন বিকেল বেলা দাসী এসে বল্‌লে, "মা-ঠাকরুণ, একজন সন্ন্যাসিনী এসেচে, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।"

চিত্রা বল্‌লেন, "আমার এখন ফুরসত নেই, তুই গিয়ে ভিক্ষে দিয়ে দে, চাল না নেয় একটা পয়সা দিয়ে দে।"

"সে ভিক্ষে নেবে না। শুধু একবারটি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।"

"কেন?"

"তা ত কিছু বল্‌চে না। আর দেখ মা-ঠাক্‌রুণ দেখ্‌তে ঠিক যেন জগদ্ধাত্রী-ঠাক্‌রুণ। ডেকে নিয়ে আস্‌ব?"

"নিয়ে আয়।"

চিত্রা দোতালার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাসী সন্ন্যাসিনীকে সেইখানে নিয়ে এল। সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে এসে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌লে, "মঙ্গল হোক্‌, চিরসুখ-শান্তি হোক্‌!"

সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি। প্রজ্জলিত শিখার মতন তীব্র উজ্জ্বল রূপ, সন্ধ্যার আকাশে যেমন শান্তি থাকে মুখে সেই রকম শান্তি। বৈরাগ্যে, ত্যাগে, ভাবে ঢুলুঢুলু নয়ন। দেখে চিত্রা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। একদৃষ্টে সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, এই শান্ত তেজস্বিনী সন্ন্যাসিনী কে?

স্নিগ্ধ-মধুর স্বরে সন্ন্যাসিনী বল্‌লেন, "আমায় চিন্‌তে পার?"

চিত্রা বল্‌লেন, "চিনি চিনি কর্‌চি।"

এমন সময় দিব্যকান্তি প্রসন্নমুখ সত্যসুন্দর এসে উপস্থিত। "লক্ষ্মীরা মা" বলেই সন্ন্যাসিনীর পা জড়িয়ে ধর্‌লে।

সন্ন্যাসিনী নত হয়ে তাকে দুহাতে ধরে' তুলে তার মস্তক চুম্বন করে' বল্‌লেন, "বাবা, সংসারে তুমি আমার মুক্তি, তুমিই আমার বন্ধন!"

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পল্লী-হার

গোরক্ষদারের পাঁচালি

গত বৎসরে মাঘ সংখ্যায় "পাবনা জেলায় পৌষ পার্ব্বণী উৎসবে গ্রাম্য সঙ্গীত" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি পল্লীসঙ্গীত দিয়াছি। বস্তুতঃ পাবনা জেলায় বহু স্থানে এই প্রকার সঙ্গীতাদি, গাথা ও হেঁয়ালী প্রভৃতি বহু শুনা যায়,—হয়ত নিরক্ষর কৃষক কবিগণ যাহা গোচারণ-ভূমিতে অবসর-মত রচনা করিয়াছে, এবং যাহা আজও কোথাও কোথাও মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া রাখাল বালকগণ কণ্ঠস্থ রাখিয়াছে ও সুকণ্ঠে গাহিয়া থাকে।

এইবার পাবনা জেলার অন্তঃপাতী কোনও এক পল্লীগ্রামে গোরক্ষদারের পূজা বা ব্রত যেরূপ দেখিয়াছি—তাহার বিষয় ও পাচালি যথাসাধ্য শুনিয়া সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলাম। অত্রত্য জনসাধারণের বিশ্বাস, নবপ্রসূতা গাভীর প্রসবের দিবস হইতে ৩০দিন গত হইলে প্রথম রবিবারে এই গোরক্ষধার সাধন-ব্রত করিলে গরুর দুধ বেশী হয় ও কোনও কু-মন্ত্রজ্ঞ দুষ্ট ব্যক্তি উক্ত গরুবাছুরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ব্রতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম এই প্রকার যে, এক দিনের সমস্ত দুধ জ্বাল দিয়া শুকাইয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া লাড়ু স্বস্তিক প্রভৃতি করতঃ খাজা বা বাতাসার হরির লুট সহ সন্ধ্যাকালে এই ব্রত হইয়া থাকে। ব্রতশেষে একজন রাখাল সাজিয়া পূজার ফুল-দূর্ব্বা ও তণ্ডুলচূর্ণ বা দুগ্ধনির্ম্মিত গরুবাছুর একখানা কলার পাতায় জড়াইয়া গোশালার চালের এক প্রান্তে লুকাইয়া রাখিতে যায় আর অপরাপর সমবয়স্ক বালকগণ তাহাকে জলে প্রক্ষেপ করিয়া জব্দ করিবার চেষ্টা পায়। ক্রমে বেশী জলে প্রক্ষেপণাদির কারণ ঝগড়া হাতাহাতি এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যায়। অনেক সময় এমন দাঁড়ায় যে অবশেষে বয়োবৃদ্ধগণকে যাইয়া তাহাদিগের বিবাদ ভঙ্গ করিয়া দিতে হয়। এই তো ব্রত! এইরূপ হাতাহাতি পূজা শেষে নিম্নোক্ত পাঁচালি পাঠ হইয়া থাকে, নিম্নে সে পাঁচালি সন্নিবেশিত

হইল। এই পাঁচালির ছন্দের বিশেষ কোনও ঠিক নাই, তবে মিল প্রায়ই আছে, আর এই পাঁচালি বালকগণের কণ্ঠস্থ থাকে, এক জন বা দুই জন বালক অগ্রে যতি সহকারে বলিতে থাকে আর অপর সকলে একবাক্যে কেবল "হেচ্চ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। পাঁচালির যে যে স্থানে '*' তারকা চিহ্ন আছে সেই স্থানে অগ্রবর্ত্তী পাঠক একটু যতি দিতে দিতেই অপর সকলে "হেচ্চ" শব্দ সমস্বরে উচ্চারণ করিবে—ইহাই হইল এই পাঁচালি পাঠের নিয়ম। শেষোক্ত পাঁচালির সুরটা বেশ সুন্দর।

পাঁচালি যথা :—

(১)

রাণা রাণা *, দেব রাণা *,
দেবের বরে *, লক্ষ্মীর ঘরে,
লক্ষ্মী চলে *, লক্ষ্মী রায় *।
মোর প্রসাদে *, গোরক্ষের ধারে *,
ত্রিশ কোটি দেবতায় *
ফুল জল পায় *

(২)

সাত পাঁচ রাখালে *
তুইল্যা মাটী *,
হাত বসাল্যাম *
বারইহাটী *।
বারই ভাই *, আমার গোরক্ষের *
পান যোগায় *,
তোমার গৌরব *
কেমনে চিনি। *

(৩)

বল ভাই সবে সুবল ; (ক)
রাণা রাণা *। দেব রাণা *॥
দেবের কড়ি *। নও নও বুড়ি *॥
নও বুড়ি দিয়া *। সাধ করিয়া *॥
গাই কিনিলাম *
কবিল সিরি।
দুধ হয় কি *—হাঁড়ি হাঁড়ি॥
মামা দোয়ালে * নড়ে চড়ে *।
ভাগন্যা দোয়ালে * হাড়ি ভরে *॥
বল ভাই সবে সুবল। *

(৪)

ওহে ভাই * মোর বোল শোন *।
চৈত্র বৈশাখে * পাট বোন *॥
পাট বুনিলে * হবে ভাভর *,
আগা খায়্যা * গোড়া ফেলায়্যা *।
মধ্যে খানি * জলে ফেলায়্যা *।
জলে ফেল্লে * হবে কুয়ে *,
ছায়ে পোয়ে * লইব ধুইয়ে *।
ধুয়ে শুকায়ে * বাঁধা মোরা *।
তাই দিয়ে বানালাম * গরুর দড়া *॥
পাটে বলে * মুই বড় বীর *।
গরু বন্ধন * হইল স্থির *

(৫)

আশ বাশ
বাঁশের জন্ম * বৈশাখ মাস *।
গোরখনাথকে * দিলাম দাও *।
বাঁশ কাটল্যাম * চোরের দাও *।
আগা ফ্যালায়্যা * গোড়া ফ্যালায়্যা *
মধ্যের খানি * নড়ি বানায়্যা *
সোনার নড়ি * পাল্যাম গুনে *,
গরু ছাড়্ল্যাম * গোরক্ষের পুণ্যে *।
আমার গরু * আউল জটা *
ভেঙ্গে এল * বন কাঁটা *।

(৬)

ধান দাও * দিঘল নাড়া *।
গরু চলল * পূর্ব্ব পাড়া *॥
ধান দাও * দিঘল নাড়া *।
গরু চলল * দক্ষিণ পাড়া *॥

(ক) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে অপর সকলে 'আ—আ' শব্দ করিতে করিতে মুখ স্পর্শ ও ত্যাগ করিবে (অর্থাৎ থাবড়াইবে)।

ধান দাও * দিঘল নাড়া *
গরু চল্‌ল * পশ্চিম পাড়া * ।
ধান দাও * দিঘল নাড়া *
গরু চল্‌ল * উত্তর পাড়া * ।
ধান দাও * দিঘল নাড়া *
ঘুর্যা আস্‌লো * পাড়া পাড়া * ।

(৭)

জাইঠা বগির * চিক দিগল *
দিগুল্যা নদীর * পাথাল্যা খেতা *
বৎসর বৎসর কর * গোরক্ষের সেবা * ॥

(৮)

নিম্নোক্ত পাচালিটি সুর করিয়া গাহিতে হয়। প্রথম পক্ষীয়েরা প্রতি পংক্তি গাহিয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর পক্ষীয়গণ "হেচ্চ" শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকে, তৎপরে আবার প্রথম দল উহা সমতানে গাহিতে থাকে। তজ্জন্য প্রতি পংক্তির শেষে * তারকা-চিহ্ন দেওয়া হইল না, উহা ধরিয়া লইতে হইবে।

(ও হেচ্চ) এল রে ধেনু বৎস নিয়ে এল বর।
হেন কালে সেই নারী তের নাহি পোরে ॥
(ও হেচ্চ) করেন তো গোরক্ষের সেবা এ বার-বৎসর।
চরণে মাঙ্গিয়া লইল গুরুদেবের বর ॥
(ও হেচ্চ) এস মা ভগবতী আমার বাড়ী ঘর।
তোমারে পূজিব আমি দিয়ে ফুলজল ॥
(ও হেচ্চ) কবিলাস কবিলাস ব'লে তিনো ডাক দিল।
স্বর্গে ছিল কবিলাস মর্ত্তেতে নামিল ॥
(ও হেচ্চ) দশমাস দশদিনে গাভীটা বিয়ায়।
দেখিতে দেখিতে তাহে একমাস যায় ॥
(ও হেচ্চ) মায় থাকে একঘরেরে, বাছুর আর-এক ঠাই।
সারা রাত্রি মায়-ছায় দেখা সাক্ষাৎ নাই ॥
(ও হেচ্চ) প্রভাতের কালেরে গাভীটা হাম্বলায়।
দুগ্ধের পিয়াসে বাছুর গড়াগড়ি যায় ॥
(ও হেচ্চ) গাইদোয়ায় গোয়ালা ভাই সে বড় সিয়ান।
ভাগুভরা দুগ্ধ রাখে করে তো গুমান ॥
(ও হেচ্চ) পাছা পায়েরে ছাঁদ দড়ি দিয়া।
আগা পায়েরে বাছুরী বাধিয়া ॥
(ও হেচ্চ) প্রথমকার দুগ্ধ রে বসুমাতাকে দিয়া।
চারি বাটের দুগ্ধ নেয় পানাইয়া ॥
(ও হেচ্চ) একধার দুগ্ধ যদি কম হয়।
চোরা ধেনু বলিয়া পঞ্চাশটা কিল দেয় ॥
(ও হেচ্চ) আপনার দুগ্ধ রে আপনি হইলাম চোর।
চোরা ধেনু বলিয়া পাঁজরে মারে মোর ॥
(ও হেচ্চ) সুবুদ্ধি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল।
মুড়া ঝাঁটার তিন বাড়ি কবিলাসকে দিল ॥
(ও হেচ্চ) সারাদিন খাও তুমি থইলে আর জলে।
গোয়ালের গরু তুমি ভয় নাই দরে।
সন্ধ্যা হ'লে থাক তুমি নাটমন্দিরের ঘরে ॥
(ও হেচ্চ) গোয়াইল বাড়াইতে নারী করে পাল পাল।
তার পালে ধেনু বৎস থাকে যাবৎকাল ॥
(ও হেচ্চ) গোয়ালবাড়ীতে নারী কাপড়ে মুছে হাত।
তার পালে ধেনু বৎস থাকে দিন সাত ॥
(ও হেচ্চ) গোয়ালবাড়ীতে নারী পিঠে চড় দেয়।
তার পালে ধেনু বৎস গাবড়া ফেলায় ॥
(ও হেচ্চ) শনিবারে মঙ্গলবারে গোবর বিলায়।
তার পালে ধেনুবৎস আড়াই দিন যায় ॥
(ও হেচ্চ) তার পর সাজিল বৌ নাম তার সুয়া।
দুইধারে দুই দাঁত বাড়াইল ভাঙ্গা ঘরের রুয়া
(ও হেচ্চ) তার পর সাজিল বৌ নাম তার তারা।
এককুলা ধান নিয়ে ফেরে পাড়া পাড়া ॥
(ও হেচ্চ) তার পর সাজিল বউ নাম তার চাঁদ।
পার করে' আনিল বৌ চৌদ্দ বিলের ফাঁদ ॥
(ও হেচ্চ) তার পর সাজিল বৌ নাম তার অলা।
ঘুমের আলস্যে খায় চৌদ্দ ছড়ি কলা ॥
(ও হেচ্চ) তার পর সাজিল বৌ কপালে সিঁদুর।
দরজায় বসিয়া বৌ মারেন তো ইন্দুর ॥
(ও হেচ্চ) তার পর সাজিল বৌ নাম তার ওড়ি।
খাওয়ার সময়ে বৌ লাগায় দৌড়াদৌড়ি
(ও হেচ্চ) তার পর সাজিল বৌ নাম তার উমা।
একঘরে রাঁধে-বাড়ে চৌদ্দঘরে ধুমা ॥

(ও হেচ্চ) আমগাছ কাটিয়া গোয়ালা পারের বাসায় বাঁধা
তালগাছ কাটিয়া গোয়ালা মুখের বলোয় বাঁশি ॥
(ও হেচ্চ) সেই দিন যে সেই গোয়ালা মেঙ্গে নিল বর ।
এক সের দুধের মধ্যে দুই সের জল ॥
(ও হেচ্চ) সেই দিন যে সেই গোয়ালা মেঙ্গে নিল বর ।
জন্মে জন্মে শোধে গোয়ালা গোরক্ষের ধার ॥
বল ভাই সাবশুকা ॥

শ্রী সুরেশচন্দ্র রায়

অঙ্কের কয়েকটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত নিয়ম

অঙ্কশাস্ত্রের অনাবিষ্কৃত নিয়মগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি এখনও তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো নিয়মগুলিই এখনো স্কুলে কলেজে ছেলেদের শিখানো হয়। শিশুকালে সহজ ও সংক্ষিপ্ত নিয়ম শিখানো না হইলে বড় হইয়াও প্রাপ্তবয়স্ক শিশুরা আর তাহাদের অভ্যস্ত নিয়ম প্রণালী ছাড়িয়া নূতন কোন নিয়ম গ্রহণ করিয়া নিজের করিয়া লইতে চাহে না। ফলে কত মূল্যবান সময় যে তাহাদের অযথা নষ্ট হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অথচ এ সময়ের অপব্যয় নিবারণের দিকে না আছে শিক্ষা-বিভাগের দৃষ্টি, না আছে সাধারণের কোনরূপ কোন প্রচেষ্টা। আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ যদি এই অপচয়ের দিকে সাধারণের দৃষ্টি একটুও আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় তবেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে আমি গুণন অঙ্ক সহজে ও সংক্ষেপে করিবার একটা উপায় ২।৩ দিনের চেষ্টায় বাহির করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। আজ সোমেশ-বাবু অঙ্কশাস্ত্রে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া দেশে ও বিদেশে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা আমি খর্ব্ব করিতে চাহি না, কিন্তু একটু মন দিয়া গুণনের নিয়মটি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে মুখে মুখে বড় বড় গুণন অঙ্ক সমাপন করা খুব বেশী শক্ত কাজ নহে। সামান্য মৌখিক যোগ বিয়োগে যার দখল আছে সে নিশ্চয় এই নিয়মের সাহায্যে একটু আয়াস স্বীকার করিলেই গুণন অঙ্কগুলি অল্প সময়ের মধ্যে মনে মনে সম্পন্ন করিতে পারিবে। আরও দেখিবেন এই নিয়ম স্কুলে পাঠশালায় ছাত্রদিগকে বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়মের পরিবর্ত্তে শিক্ষা দিলে তাহারা কত সময় বাঁচাইয়া অন্য কাজে নিয়োগ করিতে পারিবে।

শুধু তাহাই নহে। ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে যে-সমস্ত নূতন ও সহজ সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত বা প্রচলিত হইয়াছে আমরা তাহার খোঁজও বড় একটা রাখি না বা দুই এক জনে রাখিলেও ব্যবহারিক জীবনে বা সাধারণ শিক্ষায় তাহা প্রয়োগ করিতে চাহি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতালীয়ান ভাগের প্রণালীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই নিয়ম আমার চোখে পড়িয়াছিল প্রথম মেসোপোটেমিয়ায় যখন পলিটিকাল ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি। এক জন সে-দেশী কেরাণী আমার আদেশ-মত একটা ভাগ করিতে যাইয়া যে-সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তাহা দেখিয়া আমার কেমন একটা ঔৎসুক্য জন্মে এবং ক্রমে তাহার নিকট হইতে নিয়মটি শিখিয়া লই। দেশে ফিরিয়া কোন কোন অঙ্কের বহিতে উক্ত নিয়মটি দেখিতে পাইয়াছি বটে কিন্তু ঐ-সমস্ত বহির কোনটিতেই এই নূতন নিয়মের উপর একটুও জোর দেওয়া হয় নাই, কেবল একটা অতিরিক্ত নিয়মের মত দেখান হইয়াছে। ফল হইয়াছে এই যে না শিক্ষক না ছাত্র কেহই ইহাকে অবশ্যশিক্ষণীয় বলিয়া মনে করে।

এখন দেখা যাউক প্রচলিত নিয়ম ও ইতালীয় নিয়মে ভাগের অঙ্ক করায় কি প্রভেদ ও ইতালীয় নিয়মে ভাগের অঙ্ক কষিলে সময় কতটুকু বাঁচে, পরিশ্রম এবং কাগজেরই বা কতটুকু উপচয় হয়। ধরুন, ৫৪৩৮৯৭ সংখ্যাটিকে ৮৬৮৯ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। আমাদের দেশের

প্রচলিত নিয়মে এই অঙ্কট করিতে যে প্রক্রিয়ার আবশ্যক হইবে তাহা সকলেরই জান আছে। সুতরাং প্রক্রিয়ার কথা না বলিয়া অঙ্কটি কষিয়া গেলে কি আকৃতি হয় তাহাই দেখা যাউক।

```
৮৬৮৯ | ৫৪২৮৯৭   ৬২
     | ৫২১৩৪
     ---------
        ২১৫৫৭
        ১৭৩৭৮
        -----
         ৪১৭৯
```

এখন ইতালীয় নিয়মে অঙ্কটি কষিলে তাহার যে আকার হইবে নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

```
৮৬৮৯ | ৫৪২৮৯৭ | ৬১
     | ------ |
     | ২১৫৫৭  |
       -----
        ৪১৭৯
```

সহজেই দেখা যাইবে অঙ্কটি শেষোক্ত নিয়মে কষিতে প্রচলিত নিয়মের অর্দ্ধেক মাত্র স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক সময়ের কতটুকু উপচয় হয়।

মনে রাখিতে হইবে এই নিয়মে গুণন ও ভাগ এক সঙ্গে করিতে হয়।

প্রচলিত ভাগেরই প্রক্রিয়ার মত সংক্ষিপ্ত ভাগ করিতে গিয়া প্রথম ভাজক ৫৪২৮৯ পাইতেছি। এবং দেখিতেছি ভাজ্য ৮৬৮৯ ভাজকের মধ্যে ৬ বার যাইতে পারে। এখন পূরণ ও ব্যবকলনের কার্য্য কিরূপ অগ্রসর হয় লক্ষ্য করিয়া দেখা যাউক। ভাজকের একক ৯×৬ ভাগফল ৫৪; ভাজ্যের একক ৯; এখন এমন একটি দশক সংখ্যা ধার করিতে বা লইতে হইবে যাহা হইতে ৫৪ বাদ দেওয়া চলে। ৫ দশক লওয়া হইল এবং বিয়োজক সংখ্যা পাওয়া গেল ৫৯; ইহা হইতে ৫৪ গেলে থাকিল ৫; ইহাই হইল প্রথম বিয়োগ ফল। মনে রাখিতে হইবে ৫ দশক ধার করা হইয়াছিল এবং দশক স্থানীয় অঙ্কের ভাগের সময় এই পাঁচ বিয়োগ করিয়া লইতে হইবে।

এই প্রক্রিয়ায় অঙ্কটি কষিতে হইলে এইরূপ কার্য্য হইবে।

৯×৬=৫৪; ৫৯—৫৪=৫ প্রথম বিয়োগফল; হাতে রহিল ৫। ৬×৮=৪৮; ৪৮+৫ হাতের বা ধারকরা = ৫৩; ৫৮—৫৩=৫ দ্বিতীয় বিয়োগফল; হাতে রহিল ৫। ৬×৬=৩৬; ৩৬+৫=৪১; ৪২—৪১=১ তৃতীয় বিয়োগফল; হাতে রহিল ৪। ৬×৮=৪৮; ৪৮+৪=৫২; ৫৪—৫২=২ চতুর্থ বিয়োগফল; হাতে রহিল ৫। শেষ বিয়োজক সংখ্যা ৫ বিয়োজ্য হাতের বা ধারকরা ৫ ছাড়া আর কিছুই নাই; ৫ হইতে ৫ গেলে কিছুই রহিল না।

এই প্রক্রিয়ার পর ভাজ্যের শেষ অঙ্ক ৭ লইয়া ২১৫৫৭ দ্বিতীয় ভাজ্য রূপে পাইলাম। দেখা গেল ইহার মধ্যে ভাজক সংখ্যা ২ বার (বাদ) যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় অঙ্কটি কষিয়া গেলে সহজেই অবশিষ্ট ৪১৭৯ পাওয়া যাইবে।

একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে এই নিয়মে অঙ্ক কষা কঠিন ত নয়ই, পরন্তু সহজ ও অল্প সময়-সাপেক্ষ।

গুণনের সংক্ষিপ্ত নিয়ম বাহির করিবার পর বহুদিন ভারতের বাহিরে ছিলাম এবং সেই সময়ের মধ্যে অঙ্কের দিকে আর বড় একটা মন দিতে পারি নাই। মেসোপোটেমিয়ায় থাকার সময় ইতালীয়ান ভাগের নিয়ম দেখিয়া আবার অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ সোমেশ-বাবুর কৃতিত্ব লইয়া কাগজে কাগজে আলোচনা দেখিয়াই বিশেষ করিয়া এ বিষয়ে মন দিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সোমেশ-বাবুর কৃতিত্ব খর্ব্ব করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁর যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমি যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছি তাহা আয়ত্ত করিলে আরও অনেকে ঐরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারিবেন। গত কয়েক মাসের চেষ্টার ফলে অঙ্কের যে-সমস্ত নূতন নিয়ম বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহার মধ্যে পঞ্চম মূল বাহির করিবার নিয়মই প্রধান।

পঞ্চম মূল বাহির করিতে দ্বিতীয় এবং তৎপরবর্ত্তী ভাজকগুলি বাহির করিবার জন্য এই নিয়ম পাওয়া গেছে।

প্রাপ্তব্য সংখ্যা = ক;

প্রাপ্ত সংখ্যা = খ।

$$ক^{৫} + ক^{৪} × ৫০ × খ × ক^{৩} × ১০০০ × খ^{২}$$

$$+ ক × ১০০০০ × খ^{৩} × ৫০০০০ × খ^{৫}$$

ভাজক।

৭০১৫৮৩৩৭১৫৭২৯ এর পঞ্চম মূল বাহির করিতে হইবে ধরা যাউক।

পঞ্চম মূলেও বর্গ এবং ঘন মূলের মত ভাজক বিভাগ করিয়া লইতে হয়। কেন করিতে হয় তাহা বলিবার স্থল এ নহে। এই পর্য্যন্ত বলিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে যে বর্গমূলে যেমন এক এক সংখ্যা এবং ঘনমূলে দুই দুই সংখ্যা ছাড়িয়া ছাড়িয়া ভাজক দাগিয়া লইতে হয়, পঞ্চম মূল বাহির করিবার সময় সেইরূপ চারি চারিটি সংখ্যা ছাড়িয়া ভাজক দাগিয়া লইতে হয়। তাহা করিলে সংখ্যাটিকে যেরূপে পাওয়া যাইবে নীচে তাহা দেখানো হইল।

৭০'১৫৮ ৩৩'৭১৫৪২৪'

এখন দেখিতে হইবে ৭০ প্রথম ভাজক, এর মধ্যে কোন্ সংখ্যার পঞ্চম বর্গ বা পঞ্চম শক্তি বাদ দেওয়া যাইতে পারে। $২^{৫} = ৩২$; $৩^{৫} = ২৪৩$। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে প্রথম ভাগফল তিন হইতে পারে না, দুই হইবে। অতএব দুই বার দেওয়া হইল। ৭০ হইতে ৩২ বাদ দিয়া পাওয়া গেল ৩৮; পরবর্ত্তী পাঁচ সংখ্যা নামাইয়া লইয়া রাশিটি পাওয়া গেল ৩৮১৫৮৩৩। এখন পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে অঙ্কটি কষা যাউক।

```
                    ৭০ ১৫৮৩৩ ৭১৫৪২৪ | ২৩৫
                    ৩২               |
                    ---------
        ১০৭৮৭৮১     ৩৮১৫৮৩৩
                    ৩২৩৬৩৪০
                    ---------------
  ১৪৪৮০২৬৭৮৫৬  |   ৫৭৯৪৯০৭১৪২৪
                |   ৫৭৯৪৯০৭১৪২৪
                -----------------------
```

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগফল বাহির করিবার ভাজক যে নিয়ম দেখান গিয়াছে সেই নিয়ম অনুসারে এইরূপে পাওয়া গিয়াছিল।

প্রাপ্ত সংখ্যা ২;

প্রাপ্তব্য সংখ্যা ৩।

$৩^{৪}$	৮১
$৪ × ৩^{৩} × ৫০ × ২$	২৭০০
$৩^{২} × ১০০০ × ২^{২}$	৩৬০০০
$৩ × ১০০০০ × ২^{৩}$	২৪০০০০
$৫০০০০ × ২^{৪}$	৮০০০০০
	১০৭৮৭৮১

সুতরাং দ্বিতীয় ভাগফল বাহির করিবার ভাজক হইল ১০৭৮৭৮১।

প্রাপ্ত সংখ্যা ২৩।

প্রাপ্তব্য সংখ্যা ৪।

$৫^{[illegible]}$	৬২৫
$৫^{৩} × ৫০ × ২৩$	৭১৮৭৫০
$৫^{২} × ১০০০ × ২৩^{২}$	৮৬৬৬০০০
$৫ × ১০০০০ × ২৩^{৩}$	৬০৮৩৫০০০০
$৫০০০০ × ২৩^{[illegible]}$	১৩৯৯২০৫০০০০
	১৪৪৮৭২৬৭৮৫৬

তৃতীয় ভাগফল পাওয়ায় ভাজক পাওয়া গেল ১৪৪৮৭২৬৭৮৫৬।

বলা বাহুল্য এই অঙ্ক করিতেও সংক্ষিপ্ত ভাগের নিয়ম প্রয়োগ করা যায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

উপরোক্ত পঞ্চম মূল বাহির করিবার নিয়ম অনুসন্ধান করিতে করিতে আমার ধারণা হইয়াছে যে কেবল মাত্র বর্গ ঘন প্রভৃতিকে লইয়াই একখানি গণিতশাস্ত্র রচিত হইতে পারে। আমাদের দেশের এই বিষয়ে যাহারা শক্তিশালী তাঁহারা একটু চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? সুবিধা ও সুযোগ পাইলে আমিও এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে থাকিব।

শ্রী ব্রজদাস বৈষ্ণব গোস্বামী

রাজপুতানার কথা

(১)

কেশবদাস

মোগল বাদ্‌শাহদের সময় রাজপুতানার প্রত্যেক রাজা অথবা তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে কাহাকে না কাহাকে দিল্লীতে বাদশাহের নিকট থাকিয়া প্রত্যহ দরবারে হাজরী দিতে হইত।

এক সময়ে কাছওয়ারদের রাজা জয়সিংহের দিল্লীতে গিয়া হাজরী দিবার পালা পড়ে। মহারাজা জয়সিংহের বয়স তখন ১৭।১৮ বৎসর মাত্র। তাঁহাকে অপরিণামদর্শী যুবক মনে করিয়া পাত্র মিত্র সকলেই যাত্রা-কালে তাঁহার নিকট আসিয়া নানারূপ মুরুব্বিয়ানা চালে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত হন। কেহ বলিলেন, বাদ্‌শাহ এরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার এরূপ উত্তর দিবেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মহারাজ জয়সিংহ সকলেরই পরামর্শ স্থির ও ধীর ভাবে শ্রবণ করিয়া শেষে তাঁহাদের উত্তর দিলেন,—"ভাই-সকল! তোমরা যে-সমস্ত সৎপরামর্শ দিতেছ সমস্তই মনে রাখিয়া আমি কাজ করিব। কিন্তু বাদ্‌শাহ যদি তোমাদের পরামর্শমত আমায় কোন প্রশ্ন না করিয়া একটা অদ্ভুত রকমের কোন প্রশ্ন করেন, তবে আমি কি করিব?" পাত্রমিত্রগণ তখন বলিলেন যে "যদি তাহাই হয়, তবে আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে তদ্রূপ করিবেন।" তখন জয়সিংহ বলিলেন, "পরিণামে যখন আমায় নিজের বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতে হইল, তখন এতগুলি ব্যর্থ পরামর্শ দিয়া সময় নষ্ট কেন করিতেছেন?" উত্তর শুনিয়া পরামর্শদাতাগণ নিরস্ত হইলেন। মহারাজা জয়সিংহও যথাসময়ে দিল্লী যাত্রা করিলেন।

রাজধানী পৌঁছিবার পর রাজা জয়সিংহ বাদ্‌শাহের সহিত দরবারে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বাদশাহ আমীর-ওমরাহে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় মহারাজ জয়সিংহ করজোড়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত। বাদ্‌শাহ জয়সিংহকে সসম্ভ্রমে তাঁহার দুটি হাত ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা করিলেন। মহারাজা সময় বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জাঁহাপনা! স্বামী স্ত্রীর এক হস্ত ধরিয়া পাণিগ্রহণ করে এবং তাহার ফলে স্বীয় পত্নীকে চিরকাল অর্দ্ধাঙ্গিনী করিয়া এবং একজীব হইয়া লালন পালন করে। হুজুর আমার দুই হাত ধরিয়াছেন, সুতরাং আমাকে পত্নীর অধিক সুনজরে দেখিবেন এরূপ আশা ও দাবী আমি করিতে পারি।" রাজা জয়সিংহের এই সদুত্তর শুনিয়া বাদ্‌শাহ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "আজ অবধি কাছওয়ার রাজ্য সওয়ায় নামে অভিহিত হইল।" অর্থাৎ অপর রাজ্যগুলি ওজনে একসের কিন্তু কাছওয়ার রাজ্য ওজনে সওয়া সের। তদবধি কাছওয়ার রাজ্য সওয়ায় কাছওয়ার বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং এই নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ জয়সিংহ দিল্লীনগরে থাকিয়া বাদ্‌শাহ-সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে একদিন বাদ্‌শাহ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "জয়সিংহ! তুমি আমার নিকট বর চাহ। তুমি যাহা চাহিবে তাহা দিব।" বাদ্‌শাহের কথা শুনিয়া মহারাজ জয়সিংহ বলিলেন—"যদি জাঁহাপনার এত কৃপা হইয়া থাকে তবে আমায় কেশবদাসকে দিন। আমি নিজ রাজ্যে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীত্বপদে বরণ করিতে ইচ্ছা করি।"

বাদ্‌শাহ জয়সিংহের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, জয়সিংহ হয়ত রাজ্য ধন ইত্যাদি চাহিবেন। কিন্তু কেশবদাসকে চাওয়াতে তিনি একটু ফাঁপরে পড়িলেন। কেশবদাস বাদ্‌শাহের অতি বিশ্বস্ত অনুচর ও একজন অতি বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী। বাদ্‌শাহ বলিলেন, "এ লোকটাকে লইয়া কি করিবে? ধনরত্ন রাজ্য যাহা তোমার ইচ্ছা লইতে পার।" কিন্তু জয়সিংহ কেশবদাস ব্যতীত কিছুই চাহেন না। তিনি বলিলেন, "রাম-কৃপায় এবং বাদশাহের অনুগ্রহে তাঁহার রাজ্য ধন রত্নের কোনই অভাব নাই; কেবল রাজ্য চালাইবার জন্য লোকের অত্যন্ত অভাব।" অগত্যা বাদ্‌শাহকে জয়সিংহের কথা রাখিতে হইল।

ক্ষত্রী বংশীয় কেশবদাস জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী হইয়া

আসিয়া উক্তরাজ্যের অনেক প্রকার কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহার ন্যায় প্রজাপালক সৎপথাবলম্বী ধার্ম্মিক লোক অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। মহারাজ জয়সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন, কেশবদাসের পরামর্শ ব্যতীত কখন কোন কার্য্য করিতেন না।

মহারাজ জয়সিংহের মৃত্যুর পর রাজা ঈশ্বরী সিংহ রাজা হইলেন। তাঁহার চরিত্র জয়সিংহের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সুরাপান প্রভৃতি সমস্ত দোষ তাঁহাতে লক্ষিত হইত। এবং অসৎ প্রকৃতির লোকের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা সহবাস ছিল। এই কাণ্ড জানিয়া কেশবদাস সর্ব্বদা চিন্তিত এবং মর্ম্মাহত হইয়া ছিলেন। কর্ত্তব্য বোধে তিনি মহারাজকে মধ্যে মধ্যে সৎপরামর্শ দিতেন, কিন্তু ঈশ্বরীসিংহের উহা বিষবৎ বোধ হইত। শত্রুপক্ষ সময় বুঝিয়া মহারাজের নিকট কেশবদাসের বিলক্ষণ নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ও পরে বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া শেষে শ্রাদ্ধ এতদূর গড়ায় যে চক্রান্তকারীরা বিষপ্রয়োগে কেশবদাসের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করে।

কেশবদাসের অকালমৃত্যুতে দেশে সর্ব্বশ্রেণীর লোক কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত কবিতাটি তাহার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ—

"মন্ত্রী মোটো মারিয়ো ক্ষত্রী কেশবদাস।
যবতে ছোড়ি ঈশ্বরী রাজ-কর্ণ-কি আশ॥"

অর্থাৎ,—কেশবদাসের মত প্রধান মন্ত্রী যে-দিন হত হইলেন সেই দিন অবধি ঈশ্বরীসিংহের রাজ্য করিবার আশাও লোপ পাইল।

মহারাজ মুকুন্দসিংহের বীরত্ব

যদুবংশীয় রাজা মুকুন্দদেব একদিন সংবাদ পাইলেন, "হামদানী" নামক একজন প্রসিদ্ধ দস্যু তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে বনাস নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত। মহারাজ মুকুন্দদেবের নিকট তখন সৈন্যের সুব্যবস্থা ছিল না। রাজকোষও তথৈবচ। তিনি ভাবিয়া আকুল কি করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন। যদুবংশীয়দের চিরন্তন দোষ দারিদ্র্য। মুকুন্দদেবেরই বা তাহা না হইবে কেন। তিনি নিজ সহচরবর্গ এবং সর্দ্দারদের বলিলেন, যদি তিন দিবস হামদানীকে রাজ্যের সীমায় কেহ আটকাইতে পারে তাহা হইলে তিনি কোনরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। কেহই এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

পরদিন হামদানী ষাটহাজার সেনা লইয়া যদুবংশীয়দের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুট তরাজ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা ভরতুনের গড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর সাহেব ভরতুন বেগতিক দেখিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। যাইবার সময় তিনি একটা "রেঙ্গড়ী" (এক প্রকারের ক্ষুদ্র কামান) ফেলিয়া যান। সেটাতে বারুদ ও গোলা ভরা ছিল। ঠাকুর সাহেব ভরতুন এইরূপে নিজ গড় ছাড়িয়া চলিয়া যাইলে পর প্রাতঃকালে এক ব্রাহ্মণ পূজারী গড়মধ্যস্থিত এক দেবালয়ে পূজা করিতে প্রবেশ করে। সে দেখিল একটা ক্ষুদ্র তোপ পড়িয়া আছে, কৌতূহলপরবশ হইয়া সে তাহাতে আগুন দিতেই তোপ হইতে গোলা ছুটিয়া হামদানীর দুই-চারিজন লোককে নিহত করে। তাহারা তখন ক্ষেপিয়া গড়মধ্যে প্রবেশ করে এবং পূজারী ঠাকুর ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাহাকে ধৃত করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়। তৃতীয় দিবস রাজধানী হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে বীরবাগ নামক গ্রামের নিকট হামদানী শিবির স্থাপন করিল। শিবিরে পৌঁছিয়াই হামদানী মহারাজ মুকুন্দসিংহকে বলিয়া পাঠাইল, "হয় ৫০ সহস্র মুদ্রা আমায় সৈন্যের ব্যয়স্বরূপ দাও নচেৎ তোমার রাজ্য লুটতরাজ করিয়া ছারখার করিব।" মহারাজ মহা বিপদে পড়িলেন। কারণ অর্থ সংগ্রহ কোন মতেই করিতে পারিলেন না।

দুশ্চিন্তায় মহারাজের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। মনে মনে ভাবিলেন, "আমার সম্মুখে দস্যু দেশাধিকার করিবে ইহা ত দেখিতে পারিব না, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।" সমস্ত রাত্রি চিন্তায় ছটফট করিয়া

মহারাজা অতি প্রত্যুষে নিজ অশ্ব আনাইয়া একখানি উৎকৃষ্ট বর্শা হস্তে অশ্বারোহণ করিয়া রাজবাটী হইতে একাকী বাহির হইলেন এবং রাজধানীর ফটক খুলিবা-মাত্র ছদ্মবেশে নগরের বাহির হইয়া পড়িলেন। কেহ জানিতে পারিল না মহারাজা কোথায় ?

দেখিতে দেখিতে রাজা বড়খেড়া নামক একটা ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া গেলেন। পরে দ্বিতীয় নদী পাচনার নিকটবর্ত্তী হইলে সূর্য্যোদয় হইল। পঙ্গপালের ন্যায় হামদানীর সৈন্যগণ শিবিরে পড়িয়া আছে দেখিয়া মহারাজার হৃৎকম্প হইল। হামদানী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শিবিরের বাহিরে একখানি ক্ষুদ্র চৌকিতে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে ছদ্মবেশী মহারাজাকে এক সিপাহীর বেশে ফৌজ মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন পার্শ্বচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ ত ও লোকটা কে ? কি সুন্দর কান্তি, যেন মুখমণ্ডল হইতে একটা আভা বহির্গত হইতেছে। যেমন মুখশ্রী তেমনি বলিষ্ঠ, সিপাহীর বেশ। ঐ লোকটা কি চাকরীর অনুসন্ধানে আমার শিবিরে ফৌজমধ্যে অশ্বের চাল দেখাইতেছে, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিয়াছে ?" একজন পার্শ্বচর ছদ্মবেশী মহারাজের নিকট গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, "ভাই ! আমি তোমাদের সর্দ্দারের বিশেষ বদান্যতার প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছি। আমি একজন দরিদ্র রাজপুত সিপাহী। অনেক দিন হইতে চাকরীর তল্লাসে ফিরিতেছি, যদি তোমাদের সর্দ্দার একসের আটার বন্দোবস্ত করিয়া দেন তাহা হইলে কৃতার্থ হই।" এই কথা শুনিয়া পার্শ্বচর তাঁহাকে হামদানীর নিকট লইয়া চলিল। কিছুদূর হইতে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ ?" ছদ্মবেশী মহারাজা বলিলেন—"মহাশয় একসের জওয়ারের (এক প্রকার মোটা শস্য) তল্লাসে আসিয়াছি।" হামদানী তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "বেশ্ কথা। তুমি যেরূপ সুন্দর জোয়ান দেখিতেছি তোমায় আমি চাকরী দিব এবং আমার সৈন্যে শীঘ্র অফিসর করিয়া দিব।" এই কথোপকথনচ্ছলে মুকুন্দদেব নিকটে আসিলেন এবং কথা কহিতে কহিতে হামদানীর বক্ষস্থলে বর্শা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হামদানী বর্শাবিদ্ধ হইয়া চিৎপাত হইয়া পড়িলেন। শিবিরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সৈন্যগণ ছদ্মবেশী মহারাজের প্রাণসংহারণ করিতে ছুটিল। মহারাজ অশ্ব ছুটাইয়া রাজধানী অভি-মুখে চলিলেন। কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। পথে একটা ১৮ হাত পরিমাণ চওড়া নালা পড়ে; অশ্ব এক লম্ফে নালা পার হইয়া গেল। হামদানীর সৈন্য অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। মুকুন্দদেব রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত।

তাঁহার ঈদৃশ অসমসাহসের কার্য্য দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত। নগরে যে-সমস্ত সৈন্য ছিল তাহারা পাচনা নদীর দিকে অগ্রসর হইয়া হামদানীর সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। মস্তকহীন ফৌজ প্রথম হইতেই ভগ্নহৃদয় ছিল; তাহারা যাদব সৈন্যের সম্মুখীন হইতে পারিল না, পলায়নই শ্রেয়স্কর মনে করিল। যাদব রাজ্য কেন অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য এইরূপে নিষ্কণ্টক হইল। কবি মহা-রাজের এই শৌর্য্য-কথা নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"বন্দ বিরোধ বঢ়ো গহকে গহ কাল স্বরূপ হায়
ওয়াদল ওসারো।
লে বরছি, তিরছি করি ভৌঁ যাঠ হাজার মে
জায় হকারো॥
জায় ধসো রণ মধ্য-মে মুকুন্দ—
সো উপমা পৃথীরাজ কহে নরনাহার-নে
নরনাহার মারো॥" *

অর্থাৎ আত্মবিচ্ছেদ বশতঃ রাজ্য অরাজক এবং তন্নিমিত্ত ভীষণ হামদানীর দল প্রবল হইয়া উঠে। নৃপতি মুকুন্দ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ভ্রূকুটি করতঃ বর্শা হস্তে ষষ্টি-সহস্র শত্রুর দলে গিয়া আপতিত। রণ মধ্যে এই-রূপ প্রবেশ করিয়া হামদানীর হত্যা ব্যাপার পৃথ্বীরাজ নামক কবি উপমা দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—যেন এক নরসিংহ অপর নরসিংহকে হত্যা করিয়াছে।

৺ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

* ওয়াদল—শত্রুদল অর্থাৎ হামদানী মুসলমানের দল।
তিরছি করি ভৌঁ—ভ্রূকুটি করিয়া।
নর-নাহার—নরব্যাঘ্র অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ।

সৌন্দরনন্দ কাব্য•

শ্রী বিমলাচরণ লাহা, এম এ, বি-এল, কর্ত্তৃক অনুবাদিত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, পৃ ৩+১৬৪, মূল্য এক টাকা।

বৌদ্ধসাহিত্যে অশ্বঘোষের নাম সুপ্রসিদ্ধ। মাতৃচেট ও আর্য্যশূর তাঁহারই নামান্তর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের কথা অনেকেই জানেন। ইহার তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ আছে। Cowell সাহেব সংস্কৃতের, আর Beal সাহেব চীনার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার বঙ্গানুবাদের চেষ্টা হইয়াছে; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ হয় নাই; শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও খানিকটা পদ্যে অনুবাদ করিয়া কোনো মাসিকে বাহির করিয়াছিলেন মনে হইতেছে।

সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষের অন্যতর কাব্য। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে ইহার সংবাদ দেন, ও বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে (১৯২০) ইহার একটি সংস্করণ করেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিতের ন্যায় অন্যান্য অনেক পুস্তকের তিব্বতী ও চীনা, অথবা ইহার অন্যতর অনুবাদ আছে, কিন্তু সৌন্দরনন্দের অনুবাদ নাই। ঐ দুই ভাষায় অ-বৌদ্ধ অনেক গ্রন্থেরও অনুবাদ আছে, কিন্তু সৌন্দর-নন্দের তাহা না থাকায় মনে হয় ইহার তত আদর ছিল না। ইহার একটি শ্লোক (১.২৪) অমরের কতকগুলি টীকায় (রায়-মুকুট, সর্ব্বানন্দ ও রঘুনাথ, ১.১.৯) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আলোচ্য অনুবাদের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়াছেন, তিনি তাহাতে বলিতেছেন, সর্ব্বানন্দ সৌন্দর-নন্দের "অনেক প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন।" তিনি ঐ প্রয়োগগুলি দেখাইয়া দিলে সাধারণের পক্ষে ভাল হইত। ক্ষীরস্বামীর টীকায় (K. G. Oka, Poona, 1913, p. 30) সৌন্দরনন্দের (৮.৩৫) একটি শ্লোকের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—যদিও তাহাতে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হয় নাই:—

"মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাম্
হৃদয়ে হালহলং মহদ বিষম্॥"

ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকেও (৬০) ঠিক ইহাই আছে, প্রভেদের মধ্যে কেবল একটু পাঠান্তর:—

"মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাম
হৃদি হালাহলমেব কেবলম্॥"

রঘুনাথের টীকায় (১.১.৯) সৌন্দরনন্দের আর একটি শ্লোকার্দ্ধ (১.২২) উদ্ধৃত দেখিয়াছি:—

"গুরুগোত্রাদতঃ কৌৎসাস্তে ভবন্তি স্ম গৌতমাঃ।"

এখানে একটা কথা বলিবার আছে, সর্ব্বানন্দ ও রঘুনাথ উভয়েই গ্রন্থখানির নাম ধরিয়াছেন সুন্দরানন্দ চরিত: স্পষ্টতই ইহা হয় গ্রন্থকার বা লেখকের ভ্রম। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে উল্লিখিত টীকাসমূহে গ্রন্থের নামটা থাকিলেও গ্রন্থকারের নাম লিখিত হয় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন (পৃঃ ।/০) "অষ্টম শতকের 'একখানি জৈন বইয়ে সৌন্দরনন্দের কয়েকটি খুব ভাল কবিতা তোলা আছে।" কিন্তু বইখানার নাম কি? তিনি তাহা বলেন নাই। তাঁহার কতকগুলি লেখা পড়িয়া বলিতে হইতেছে, তিনি অনেক সময় পাঠকদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেন, তাঁহার লেখা পড়িতে পড়িতে পাঠকের কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইলে, অথবা তদ্বিষয়ে কিছু অধিকতর জানিবার কৌতূহল বা আগ্রহ হইলে তাঁহাকে লিখিয়া উত্তর না আনাইলে উপায় থাকে না; তিনি কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছেন, পাঠকগণকে তিনি তাহা জানিতে দেন না, যেন তিনি যাহা বলিবেন তাহাই কেবল শুনিয়া যাইতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট জৈন বইখানার নামটা লিখিয়া দিলে তাঁহার একটুও ক্ষতি হইত না, অথচ পাঠকের উপকার হইত প্রভূত।

শাস্ত্রী মহাশয় সৌন্দরনন্দের মূলের যে সংস্করণ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ইহার একটি কারণ উপযুক্ত ভাল পুঁথির অভাব। তথাপি যে উপকরণ তাঁহার হাতে ছিল তাহা দ্বারা, মনে হয়, আরো অনেকটা শোধন করিতে পারা যাইত।

১৩১৯ সালের গৃহস্থের ফাল্গুন হইতে পরবর্ত্তী কয়েক সংখ্যায় আমি সৌন্দরনন্দের সামান্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। (সম্পা-দকের অনবধানতায় তাহাতে কয়েক স্থানে কিছু-কিছু ছাপা হয় নাই, অথবা ভুল ছাপা হইয়াছে।) ইহাতে মূল কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া উহার প্রত্যেক সর্গের বিবরণটি সংক্ষিপ্ত আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এতদিন কাব্যখানির সমগ্র অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পাঠকগণের সম্মুখে আজ তাহা উপস্থিত, ইহা আনন্দের বিষয়।

ইহার অনুবাদক বিমলাচরণ বাবু শিক্ষিতগণের নিকট অপরিচিত নহেন। তাঁহার লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধে বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ পরিশ্রমের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। তিনি অনুবাদের উপর নির্ভর না করিয়া, মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চলেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। পুগ্গলপঞ্ঞত্তি নামক পালি পুস্তকের তাঁহার কৃত ইংরেজী অনুবাদ Pali Text Societyর অনুবাদ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইবে। সেদিন তাঁহার Ksatriya Clans in Buddhist India প্রকাশিত হইয়াছে। তাই তাঁহার কৃত অনুবাদে পাঠকের আকৃষ্ট হইবার কারণ আছে।

মূল কাব্যখানি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন (পৃ ।/০) ইহাতে কালিদাসের মত "নবনবোন্মেষিণী শক্তি" অথবা নূতন জিনিস গড়ার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। দোষও ইহাতে কম নাই, কিন্তু তথাপি স্থানে-স্থানে 'ভাব, ভাষা ও কবিত্ব অত্যন্ত চমৎকার।' এ বিষয়ে আমার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে কিছু আলোচিত হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন, অধিক কিছু লিখিবারও এখন আমাদের সময় নাই।

ইহার সংক্ষিপ্ত কথাবস্তুটি এই—নন্দ বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় অথচ মাসতুত ভাই। ইঁহার স্ত্রীর নাম সুন্দরী, ইঁহারা পরস্পরে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। একদিন বুদ্ধদেব ভিক্ষার জন্য নন্দের বাড়ীতে আসেন, নন্দ তখন সুন্দরীর নিকটে। খবর পাইয়া তাঁহার আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় বুদ্ধদেব ফিরিয়া চলিলেন, নন্দও পরে পিছনে যাইতে যাইতে শেষে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশেষে নন্দের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে সেখানে সন্ন্যাস দেওয়া হইল, তিনি ভিক্ষু হইলেন। কিন্তু তিনি সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাই বুদ্ধদেব তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। পথে একটি কাণা বানরীকে দেখিতে পাইয়া তিনি নন্দকে বলিলেন 'নন্দ, তোমার স্ত্রী কি এই বানরী অপেক্ষা সুন্দরী?' নন্দ বলিল 'সে কি! ইহার সহিত কি আমার স্ত্রীর কখনো তুলনা হইতে পারে! সে কত সুন্দরী!' তিনি নন্দকে লইয়া একবারে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত। তখন নন্দন বনে অপ্সরীরা নৃত্য করিতেছিল, তিনি নন্দকে বলিলেন বেশী সুন্দরী কে,

তাহার স্ত্রী, না অপ্সরীরা। বলা বাহুল্য, নন্দ উত্তর করিলেন, অপ্সরীরাই বেশী সুন্দরী। বুদ্ধদেব বলিলেন, নন্দ একটি অপ্সরাকে চান কি না। নন্দ বলিলেন 'চাই'। বুদ্ধদেব বলিলেন, 'নন্দ, যদি তুমি অপ্সরী চাও, তবে তপস্যা কর।' নন্দ ইহা স্বীকার করিলে বুদ্ধদেব তাঁহাকে লইয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন, নন্দও তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নন্দ অপ্সরীর জন্য তপস্যা করিতেছেন ইহা জানিয়া সকলেই তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। তিনি তখন বলিলেন, 'না না, আমি অপ্সরা চাই না, আমি চাই নির্ব্বাণ, তাহারই জন্য আমি তপস্যা করিব।' বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হইয়া অনেক উপদেশ দিলেন। নন্দও তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। অনন্তর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে বলিলেন, এবং তিনিও তাহাই করিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় আলোচ্য অনুবাদের ভূমিকায় গল্পটির শেষে লিখিয়াছেন (পৃ. ॥৶০)—'সু ন্দ রী আ সি য়া ন ন্দে র চে লা হ ই ল।' কিন্তু মূলে এহার কিছু নাই। মূল সৌন্দরনন্দের ভূমিকায় (পৃ ৩) তিনি লিখিয়াছেন :—

"Budhacharita touches only on the conversion of Nanda, but it is expanded into a whole poem in Saundarananda." কিন্তু বুদ্ধচরিতে (ed Cowell) নন্দের নামও দেখা যায় না।

এইবার আমরা আলোচ্য অনুবাদ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। বিমলাচরণ বাবু আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অনেক—অনেক বেশী আশা আমাদের তাঁহার নিকটে ছিল। মনে হইতেছে, তাহার পূর্ব্বোপার্জ্জিত যশ ও গৌরব এই অনুবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদের প্রথম আশা ছিল, তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত অনুবাদকের নিকট হইতে আমরা সৌন্দরনন্দের একখানি critical অনুবাদ পাইব. ইহা একবারে ব্যর্থ হইয়াছে। ব ঙ্গ বা সী র পুরাণ অনুবাদ হইতে ইহা কোনো অংশে ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাব্যখানি ১৮ সর্গে বিভক্ত, এত বড় পুস্তকের অনুবাদে একটি মাত্রও শব্দের অর্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন টীকা বা টিপ্পনী করা হয় নাই—যদিও অনুবাদ দেখিয়া ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বহু স্থানে অর্থটা অনুবাদকেরও নিকটে স্পষ্ট নহে। অনুবাদের প্রণালী বিমলা বাবুর জানা নাই, বা তিনি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনূদিত পুস্তকাবলীর সহিত পরিচিত নহেন, ইহা কে বলিবে? তবুও তিনি কেন আজকালকার দিনে এরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিলেন জানি না।

শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন ভাল কথা, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সমগ্র কাব্যখানি সমস্ত দিক্ হইতে সমালোচনা করিয়া বিমলাচরণ বাবুর নিজের একটা বৃহৎ ভূমিকা লেখা উচিত ছিল। কাব্যখানি সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কি অভিপ্রায় পাঠকগণকে তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেন নাই। অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি কিছুমাত্র পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না; অথবা যাহা করিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। বৌদ্ধ সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত থাকিলেও স্থানে স্থানে তিনি এরূপ ভুল করিয়াছেন যাহাতে ভাবিয়া পাই না কিরূপে তাঁহার নিকট এরূপ হইল। কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করি। মূলে (১৬.১) আছে :—

"ধ্যানানি চত্বার্য্যধিগম্য যোগী
প্রাপ্নোত্যভিজ্ঞা নিয়মেন পঞ্চ ॥"

বিমলাচরণ বাবু অনুবাদ করিয়াছেন :—

"চারি প্রকার ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া যোগী যথানিয়মে পঞ্চ অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়।"

অভিজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা এক নহে। বিবিধ ঋদ্ধি বা বিভূতি, পূর্ব্ব জন্মের স্মরণ, পরচিত্ত জ্ঞান, দিব্য চক্ষু, ও দিব্য কর্ণ, এই কয়টিকে পঞ্চ অভিজ্ঞা বলা হয়। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদটি এরূপভাবে করা হইয়াছে যাহাতে বুঝিতে পারা যায় না যে, প্রথম শ্লোকে উক্ত পাঁচটি অভিজ্ঞাই দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটির সহিত আস্রব, বা আস্রবের ক্ষয়জ্ঞানকে ষট্ অভিজ্ঞা বলা হয়। এই ষষ্ঠ অভিজ্ঞারও কথা তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই ছয় অভিজ্ঞা থাকাতেই বুদ্ধের একটি নাম ষ ড় ভি জ্ঞ। চারিটি ধ্যান কি কি, তাহাও বলা হয় নাই যদিও অনুবাদকের বলা উচিত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারিটি রূপ ধ্যানের (বিতর্ক-বিচার-প্রীতি সুখ-ও একাগ্রতা-সহিত প্রথম ধ্যান, ইত্যাদির) কথা এখানে বলা হইয়াছে।

মূলের দ্বিতীয় শ্লোকটি এই :—

"ঋদ্ধিপ্রবেকঞ্চ বহুপ্রকারং পরস্য চেতশ্চরিতাববোধম্।
অতীতজন্মস্মরণঞ্চ দীর্ঘং দিব্যে বিশুদ্ধে শ্রুতিচক্ষুষী চ ॥১৬.২।

ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে—

"বহু প্রকার ঋদ্ধি, বিবেক, পরের চিত্ত এবং চরিত্র-জ্ঞান। দীর্ঘ জন্মস্মরণ, দিব্য ও বিশুদ্ধ চক্ষু ও কর্ণ লাভ করে।"

মূলের ঋ দ্ধি প্র বে ক শব্দের অর্থ ঋ দ্ধি ও বি বে ক নহে। প্র বে ক ও বি বে ক এক নহে। প্র বে ক শব্দের অর্থ 'উত্তম' 'শ্রেষ্ঠ' (অমর, ৩.১.৫৭)। অনুবাদে অন্যত্র (১৭.১৭ "মার্গপ্রবেকেন...") প্র বে ক শব্দের অর্থ 'বিজ্ঞান' ("মার্গবিজ্ঞান") করা হইয়াছে। মূলের "পরস্যচেতশ্চরিতাববোধম্" ইহার অনুবাদ "পরের চিত্ত এবং চরিত্র-জ্ঞান" ঠিক নহে। "চেতশ্চরিত" শব্দে এখানে চিত্তের গতি বুঝিতে হইবে।

চতুর্থ শ্লোকটি এই :—

বাধাত্মকং দুঃখমিদং প্রসক্তং দুঃখস্য হেতুঃ প্রভবাত্মকোঽয়ং
দুঃখক্ষয়ো নিঃশরণাত্মকোঽয়ং ত্রাণাত্মকোঽয়ং প্রশমায় মার্গঃ ॥
১৬.৪।

ইহার অনুবাদ এইরূপ :—

"এই পীড়াদায়ক দুঃখ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, দুঃখের কারণও জন্মাত্মক, দুঃখক্ষয় নিঃশরণাত্মক, এবং প্রাণাত্মক পথ শান্তির (প্রশমের) জন্য।"

এখানে অনেক কথা বলিবার আছে, সমস্ত বলিবার সময় নাই, বাহুল্যও হয়। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের পথ, বৌদ্ধদের এই চারিটি আর্য্য সত্য বলিতে কি বুঝায় মনে করিলেই অনুবাদ ঠিক হইত। এখানে একটা প্রকাণ্ড ভুল এই যে, মূলের ত্রা ণা ত্ম ক শব্দটিকে প্রা ণা ত্ম ক করিয়া পাঠ করা হইয়াছে। ইহা ছাপার ভুলও হইতে পারে। মূলের নিঃ শ র ণা ত্ম ক শব্দটিকে অনুবাদে অবিকল রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহার ব্যাখ্যা করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। অনুবাদক বহুস্থলেই এইরূপ করিয়াছেন, আলোচনাটা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বিশেষ করিয়া তাহা আর আমরা দেখাইব না। আলোচ্য স্থলে মূলের নিঃ শ র ণ শব্দটিকে নিঃ স র ণ বলিয়া পাঠ করা উচিত। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার (পালি নি স্ স র ণ) অর্থ সংসার হইতে নির্গম, পালি ন্ ব নি স্ স র ণ)। তুলনীয় সৌন্দরনন্দ, ১৭.১৩। উদীচ্য বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক স্থলে দেখা যায়, মূল সংস্কৃত শব্দের টীকাকে

শকার করা হইয়াছে, যেমন, আ স্র ব (পালি আ স ব) স্থানে আ শ্র ব, স্রো ত আ প ত্তি (পালি সো তা প ত্তি) স্থানে শ্রো ত আ প ত্তি অথবা শ্রো তা প ত্তি। আবার সংস্কৃত উ প নি ষ ৎ, পালি উ প নি সা, ইহার স্থানে উ প নি শা (শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা Bibl Ind. পৃ-১১২, ১২৩)। শেষোক্ত শব্দটি উপ + নি + √শী হইতে হয় কি না কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন।

(মূলে ১৭.২১) আছে :

"তত্তৎ প্রতীত্য প্রভবন্তি ভাবাঃ।"

অনুবাদ করা হইয়াছে :—"তত্তদ বিষয়ের প্রতীতি হইতেই ভাবসমূহ উৎপন্ন হয়।"

ইহা কিছুই হয় নাই। বিষয়টা এখানে মোটেই বুঝা হয় নাই। বৌদ্ধদের প্র তী ত্য স মু ৎ পা দ মনে করিলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। উল্লিখিত বাক্যটিকে এইরূপে অনুবাদ করা যাইতে পারে—'পদার্থসমূহ সেই সেই দ্রব্যকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয়।' এইরূপ কিছু একটা অনুবাদ দিয়া একটি টীকা দ্বারা ইহা পরিষ্কার করা উচিত। দ্রষ্টব্য ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি (Bibl. Budh.) পৃ. ৫। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রসঙ্গে অনুবাদে আর-একটি কথা আলোচনা করিবার আছে। মূলে আছে (১৬.৬৪) :—

"মোহাত্মিকায়ং মনসঃ প্রবৃত্তৌ
সেবাস্মিদংপ্রত্যয়তাবিহারঃ।"

অনুবাদ :—

"চিত্তের প্রবৃত্তি যখন মোহাত্মক হইবে তখন 'ইদম্প্রত্যয়' আশ্রয় করিবে।"

মূলে আছে ই দ ম্প্র ত্য য় তা, অনুবাদে ইহার অর্থ তো করাই হয় নাই, অধিকের উপর তাহার স্থানে করা হইয়াছে ই দ ম্প্র ত্য য়। এ দুইটি এক নহে। 'ইহা থাকিলে ইহা হয়' (ইহা না থাকিলে ইহা হয় না), সংস্কৃতে 'অস্মিন্ সতি ইদং ভবতি (অস্মিন্ অসতি ইদং ন ভবতি)' এই যে, কার্য্যকারণ ভাব, ইহারই নাম ই দ ম্প্র ত্য য় তা (মধ্যমকবৃত্তি, পৃ-৯)

মূলে এক স্থানে আছে (১৮.২৭)

"দিষ্ট্যা ত্বয়াপ ক্ষণসন্নিপাত
নায়ং কৃতো মোহবশেন মোঘঃ।
উদেতি দুঃখেন গতো হ্যধস্তাৎ
কূর্ম্মো যুগচ্ছিদ্র ইবার্ণবস্থঃ॥

চতুর্থ চরণে "কূর্ম্মো যুগচ্ছিদ্র......" পাঠ করিতে হইবে।

অনুবাদ

"সৌভাগ্যবশতঃ শুভকালোদয় সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। মোহবশে ঐ কালোদয় ব্যর্থ না করাও সুলভ নহে। সমুদ্রস্থ কূর্ম্মের ন্যায় একবার নিম্নে পতন হইলে পুনর্ব্বার উপরে আসা অতি দুঃখেই হইয়া থাকে।"

প্রথম চরণের ভাবানুবাদ অনেকটা ঠিক হইয়াছে, কিন্তু ক্ষ ণ-স ন্নি পা ত বলিতে বৌদ্ধসাহিত্যে বস্তুত কি বুঝায় তাহা অ নু বা দে বুঝান শক্ত হইলেও একটা টীকায় ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। যে ক্ষ ণ বা কালে নরক প্রভৃতিতে উৎপত্তি হয়, বা ইন্দ্রিয়-বিকলতা প্রভৃতি হয়, তাহাকে অ ক্ষ ণ বলা হয়। ইহা আট প্রকার (ধর্ম্মসংগ্রহ, পৃ-১১ ; অন্যান্য আরো অনেক গ্রন্থে ইহা বর্ণিত হইয়াছে, দ্রঃ—ঐ, পৃ ৬৬)। এই আট অ ক্ষ ণ বিনির্মুক্ত ক্ষণ অর্থাৎ শুভ কালকে ক্ষ ণ বলা হয়। আর তাহারই নাম ক্ষ ণ স ন্নি পা ত, বা ক্ষ ণ স ম্প ত্তি অর্থাৎ সমস্ত শুভক্ষণের সম্মিলন,—যখন মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়, যখন বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন, যখন ইন্দ্রিয় অবিকল থাকে, যখন বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে পারা যায়, এবং অন্যান্য এইরূপ আরো সুবিধা পাওয়া যায়। বোধিচর্য্যাবতারের (Bibl. Ind. পৃ-৯) "ক্ষণসম্পদিয়ং সুদুর্লভা" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় ইহা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আলোচ্য শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণের অনুবাদ মোটেই ঠিক হয় নাই। বুদ্ধদেব নন্দকে বলিতেছেন "(তুমি) মোহবশে ইহাকে (অর্থাৎ "ক্ষণ-সন্নিপাতকে") ব্যর্থ কর নাই।" "মোহবশে ঐ কালোদয় ব্যর্থ না করাও সুলভ নহে—" ইহা কিরূপে হয় ?

"কূর্ম্মো যুগচ্ছিদ্র ইবার্ণবস্থঃ" এই শেষ চরণটার অর্থ অনুবাদে মোটেই প্রকাশ করা হয় নাই। উদীচ্য ও অবাচ্য উভয় বৌদ্ধ সাহিত্যেই এই উপমাটি অতি প্রসিদ্ধ (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, পৃ-৪৬৩ ; বোধিচর্য্যাবতার-পঞ্জিকা, পৃ-৯ ; মজ্‌ঝিমনিকায়, PTS, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৬৯ ; ইত্যাদি)। বুদ্ধের উৎপত্তি প্রভৃতি কত দুর্লভ তাহা বুঝাইবার জন্য ইহা প্রযুক্ত হয়। হরিনাথ দে মহাশয় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন (JPTS, 1906-1907, pp. 173-175.)। উপমাটির তাৎপর্য্য এইরূপ—লাঙলের যুগের (জোয়ালের) এক এক পাশে এক-একটি বলদের জন্য দুই দুইটি করিয়া ছিদ্র থাকে। বহুদিন ব্যবহার করিতে করিতে ভাঙিয়া যাওয়ায় দুইটি ছিদ্র মিলিয়া একটা হইয়া গেলে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। যদি ইহা কোনোরূপে নদীতে গিয়া পড়ে তবে ভাসিতে ভাসিতে কোনো এক দিন সমুদ্রে গিয়া পড়িতে পারে। সমুদ্রে কাণা কচ্ছপ থাকে, সে এক-এক শত বৎসর পরে এক-একবার জলের ভিতর হইতে উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন এই কাণা কচ্ছপ সেই জোয়ালের ছিদ্রের মধ্যে নিজের গলা ঢুকাইয়া দিয়া উপরে তাকাইয়া দেখিতে পারে কি ? প্রায় অসম্ভব ; তবে হয়ত বহু বহু কালের পরে কখনো কোনরূপে ইহা সম্ভব হইতেও পারে। এইরূপ বুদ্ধের উৎপত্তি প্রভৃতি শুভক্ষণ কচিৎ কখনো হইয়া থাকে। সিংহলের আচার্য্যগণ এইরূপই ইহা ব্যাখ্যা করেন। মজ্‌ঝিমনিকায়ে (তৃতীয় খণ্ড, ১৬৯) বা থেরীগাথার (৫০০) টীকায় জোয়ালের ছিদ্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই, সাধারণতঃ এই বলা হইয়াছে যে, যদি কোন জোয়ালের একটি মাত্র ছিদ্র থাকে আর সেই জোয়ালকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা সমুদ্রে বিভিন্ন বায়ুর বেগে এদিক-ওদিক ভাসিয়া বেড়ায়। আর সমস্ত পূর্ব্বেরই মত।

মূলে ছাপা হইয়াছে (১৪.১৪)—

"অথ স্মৃতিকপাটেন পিধায়েন্দ্রিয়সংবরম্।
ভোজনে ভবম [+] ত্র [+] জ্ঞো ধ্যানায়ানাময়ায় চ॥"

অনুবাদ :—

"স্মৃতিরূপ কপাট দ্বারা ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া সমাধি ও নিরাময়তার জন্য ভোজন বিষয়ে পরিমাণজ্ঞ হইবে।" মূলের অ থ শব্দের অনুবাদ হয় নাই, আর ধ্যা ন বলিতে 'সমাধি' নহে, ধ্যান অন্য, সমাধি অন্য। যাহা হউক, ইহা তেমন কিছু নহে। "পিধায়েন্দ্রিয়সংবরং" ইহার অনুবাদ যদি "ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া" করা হয়, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে, অনুবাদক বলিতে চাহেন ইন্দ্রিয় = ইন্দ্রিয়সংবর, ইহাদের পরস্পর ভেদ নাই। অন্যথা স্বীকার করিতে হইবে, সং ব র শব্দের অনুবাদ করা হয় নাই, তাহা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। মনে হয়, অনুবাদক এখানে মূলের পাঠে গোলমালে পড়িয়াছেন। সংবরণ শব্দের অর্থ 'সংবরণ' 'সংযম' ; মূলের পিধায় শব্দের অর্থ 'আচ্ছাদন করিয়া' (অপি + √ধা)। কিন্তু ইহাতে দেখা যায় অর্থের সঙ্গতি হয় না। তাই এখানে অবশ্য বলিতে হইবে পি ধা য় স্থানে পাঠ হওয়া উচিত বি ধা য়। তাহা হইলে আর কোনো গোল হয় না : ইন্দ্রিয় সংবর বিধায়—ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া। শ্লোকের দ্বিতীয়াদ্ধে

শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ সঙ্গত পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য শব্দ সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ করা উচিত ছিল। অথবা যদি "পি ধা য়" পাঠই তাঁহার মতে সঙ্গত হয় তবে তাহারও যুক্তি দিলে ভাল হইত।

এক স্থানে (৪.২) আছে—

"নাচিন্তয়ং বৈশ্রমনম্ ন শক্রম।"

মূল পুঁথি দেখিবার সুযোগ আমাদের নাই, তবে ব্যাকরণানুসারে এখানে সন্ধি আবশ্যক ইহা বলিতে পারা যায়। যাহাই হউক, প্রধান কথা হইতেছে অনুবাদ লইয়া। এখানে বৈ শ্র ম ণ শব্দটিকে অনুবাদক বৈ শ্রমণ, এই দুইটি করিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত ইহা একটি মাত্র শব্দ। ইহার অর্থ 'বৈ শ্র ব ণ' 'কুবের'। ভুল করিয়া বৈ শ্র ব ণ কোথাও কোথাও বৈ শ্র ম ণ লিখিত হইয়া থাকে।

মূলে মুদ্রিত ভুল পাঠ অনুবাদক কিরূপ নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ৪.২৬ শ্লোকের অনুবাদ দেখিলে বুঝা যাইবে। মূলে আছে—

"কাচিৎ পিপেষাঙ্গবিলেপনং হি
বাসো ঽঙ্গনা কাচিদবাসয়চ্চ।"

অনুবাদ—

"দাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গবিলেপন পেষণ করিতেছিল, কেহ কেহ বস্ত্র গন্ধযুক্ত করিতেছিল।"

মূলে "দাসীগণের মধ্যে" নাই। তাহা যাহাই হউক, প্রশ্ন হয় অ ঙ্গ বি লে প ন জিনিসটা কি? শাস্ত্রী মহাশয় ও বিমলাচরণ বাবু উভয়েরই এ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত ছিল। বস্তুতঃ মূল পুঁথিতে যাহাই থাকুক না কেন, আসল পাঠটা হইবে অ ঙ্গ বি লে প নং, অন্য কোনো পাঠ হইতেই পারে না।

সৌন্দরনন্দের একটি শ্লোক (৭.৫) এই—

"ন ন্যায্যমন্বয়বতঃ পরিগৃহ্য লিঙ্গং
ভূয়ো বিমোক্তুমিতি যোঽপি হি মে বিচারঃ।
সোঽপি প্রণশ্যতি বিচিন্ত্য নৃপপ্রবীরান্
স্তান্ যে তপোবনমপাস্য গৃহাণ্যতীয়ুঃ॥"

অনুবাদ

"আমি বিবেচনা করিতেছি যে সৎকুলজাত ব্যক্তির ভিক্ষুচিহ্ন ধারণ করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করা ন্যায্য নহে, কিন্তু যে-সকল প্রধান নৃপতি তপোবন পরিত্যাগ করিয়া গৃহ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ভাবিলেই ঐ বিবেচনা নষ্ট হইয়া যায়।"

এখানে মূলের "তপোবনমপাস্য গৃহাণ্যতীয়ুঃ" ইহার অনুবাদ 'তপোবন পরিত্যাগ করিয়া গৃহ আশ্রয় করিয়াছেন।" মূলে আছে "গৃহাণি অ তী য়ুঃ," অ তী য়ুঃ হইতেছে অতি + √ই হইতে, অর্থ হয় 'অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন (বা গিয়াছেন); "আশ্রয় করিয়াছেন", কিরূপে হয়? বস্তুত এখানে মূল পাঠ হওয়া উচিত ছিল, এবং ছিলও অ ভী য়ুঃ", ইহা বুদ্ধচরিতের দ্বারা সমর্থিত হয়। বাহুল্য ভয়ে মূল সমস্ত শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিব না, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, সৌন্দরনন্দের উল্লিখিত ও তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকের (৭ ৫০, ৫১) সহিত বুদ্ধচরিতের ৯.৫৮,৬১ শ্লোকের কত মিল আছে; একই কথা দুই স্থানে অনেকটা একই শব্দে বলা হইয়াছে। আলোচ্য শ্লোকটির প্রতিরূপ বুদ্ধচরিতের (৯.৬১) শ্লোকটি এই:—

"এবংবিধা ধর্ম্মযশঃপ্রদীপ্তাঃ
বনানি হিত্বা ভবনান্যভীয়ুঃ।
তস্মান্ ন দোষোঽস্তি গৃহং প্রবেষ্টুং
তপোবনাদ্ ধর্ম্মনিমিত্তমেব॥"

পাঠকেরা দেখিবেন এখানে "ভবনানি অ ভী য়ুঃ" আছে, "ভবনানি অ তী য়ুঃ" নহে। অতএব সৌন্দরনন্দেও এই পাঠ গ্রহণ করা উচিত, এবং তদনুসারে তাহার অনুবাদ 'গৃহে (অথবা, গৃহের দিকে) গিয়াছিলেন (অথবা, গিয়াছেন),' করিলে আক্ষরিক হইত। বিমলাচরণ বাবু মুদ্রিত পাঠ অনুসরণ না করিয়া ভালই করিয়াছেন, যদিও "আশ্রয় করিয়াছেন" এই অনুবাদ তাঁহার ঠিক হয় নাই। এখানে মুদ্রিত পাঠ অনুসরণ না করার কারণটা বলা তাঁহার উচিত ছিল।

সৌন্দরনন্দে (৭.৪) আছে—

"নবগ্রহো গ্রাহ ইবাববুদ্ধঃ",

এখানে "অববুদ্ধঃ" স্থানে পাঠ হওয়া উচিত "অবরুদ্ধঃ", এবং ইহাও বুদ্ধচরিতের (৩.২) "নাগ ইবাবরুদ্ধঃ" এই পাঠের দ্বারা সমর্থিত হয়। অনুবাদক অনুবাদে এ শব্দটি একবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন।

সৌন্দরনন্দে প্রচুর ব্যক্তিবাচক পদ আছে। যতদূর সম্ভব এই সকল ব্যক্তির পরিচয় দিবার চেষ্টা করা অনুবাদকের খুবই উচিত ছিল; মূলে এই-সকল ব্যক্তির সংসৃষ্ট যে ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও দেখান কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তিনি এদিকে মোটেই লক্ষ্য করেন নাই, কিছুই চেষ্টা করেন নাই। অপর পক্ষে, অনুবাদের মধ্যে কোনো-কোনো স্থানে ব্যক্তিবাচক পদগুলি লিখিতেই তিনি প্রচুর ভুল করিয়াছেন; হয় তো দুইটি নামকে একটি করিয়া, অথবা একটি নামকে দুইটি করিয়া পাঠ করিয়াছেন। উদাহরণরূপে ১৬শ সর্গের ৮৭—৯১ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। "কাত্যায়নদ্রব্যপিলিন্দবৎসাঃ" (৮৭), এখানে অনুবাদে পি লি ন্দ ও ব ৎ স দুইটি পৃথক নাম ধরা হইয়াছে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, পি লি ন্দ ব ৎ স একই ব্যক্তি। এইরূপ উ র ু বি ল্ব ও কা শ্য প (৯০) দুই ব্যক্তি নহে, একই ব্যক্তি; এবং শো ণা প রা ন্ত ও পূ র্ণও দুই নহে, একই ব্যক্তি। আবার, ক্ষে মা জি ৎ (৮৯) এক নহে, ক্ষে ম (অথবা ক্ষে মা) ও অ জি ত দুই ব্যক্তি। এই শ্লোকেই আমাদের মনে হয়, ন ন্দ মা তা হইবে, ন ন্দ মা ত নহে। পরবর্ত্তী শ্লোকের ("বৃপালি-বাগাশ—") সমাধানের জন্য চিন্তা করিতে হইবে, এবং মনে হয় তাহা তত শক্ত হইবে না। উল্লিখিত শ্লোক কয়টিতে যে সকল ব্যক্তির নাম দেওয়া হইয়াছে, ইঁহাদের অনেকেরই পরিচয় অনুবাদক একমাত্র Pali Proper Names (JPTS, 1888) হইতেই দিতে পারিতেন।

পুস্তকের শেষে একটি ক্ষুদ্র নি র্ঘ ণ্ট দেওয়া হইয়াছে। ইহা যে, কিসের নির্ঘণ্ট বুঝা যায় না। ইহাতে কয়েকটি ব্যক্তিবাচক পদ আছে। অন্যান্য বহু ব্যক্তিবাচক পদ কেন ইহাতে ধরা হইল না জানি না। স্থানবাচক পদও সমস্ত ধরা হয় নাই, কয়েকটি মাত্র আছে। এমন কি ক পি ল বা স্তু র ও (৯.১, ১৭, ৪২) নামটা বাদ গিয়াছে। কয়েকটি পাখীর নাম আছে, আবার কতকগুলির নাই, যেমন ক ল হং স (২৬), জী ব জী ব ক (৮২০)। আবার যাহার নাম ধরা হইয়াছে, তাহারও সমস্ত স্থানটা নির্দ্দেশ করা হয় নাই; যেমন শ্যেন অনুবাদের ৬৪তম পৃষ্ঠাতেও আছে, অথচ তাহা লেখা হয় নাই। মৃগ-পক্ষীদের মধ্যে কেবল ঐ রা ব তে র নাম ধরা হইয়াছে কেন? নির্ঘণ্টে লেখা হইয়াছে বা রা ণ সী, কিন্তু মূলে আছে (৩.১০) ব র ণ সা। ইহাই লিখিয়া বন্ধনীতে বা রা ণ সী লিখিতে পারা যাইত। কয়েকটি নামের বানানেও ভুল হইয়াছে।

আলোচনাটা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তাই এইখানেই শেষ করা যাউক—যদিও আরো অনেক বলিবার আছে। অনুবাদখানি পড়িয়া কেবলই ইহাই মনে হইয়াছে—

"যথা যথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথা।"

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
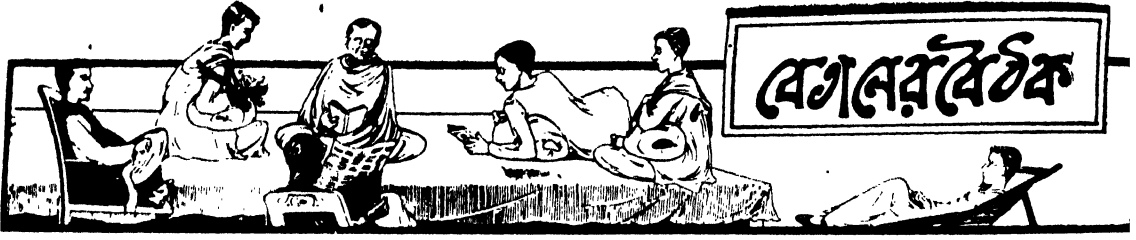
[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত যাঁহার মীমাংসায় বহুলোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৬১)

শঙ্করাচার্য্যের সময় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। ইঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ও ধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাস কি?

শ্রী প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(৬২)

দার্জ্জিলিঙ্গে মহাকালের মন্দির বা Observatory Hillএর নীচে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বহুদূর বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয়। উহার সম্বন্ধে কোন ইতিহাস জানা যাইতে পারে কি?

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়

(৬৩)

নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি কি?

১। তাঐ, তালৈ। ২। মাঐ বা মাহই।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

(৬৪)

নোয়াখালী জেলার অনেক স্থানে সুজা-বাদসাহের রাস্তা নামে এক প্রাচীন রাস্তার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রকাশ বাদসাহ সুজা ঐ রাস্তা দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন? এই প্রবাদের কোন ভিত্তি আছে কি?

শ্রী রাধিকাচন্দ্র গুহ

(৬৫)

কোন কোন পুষ্করিণীতে এক প্রকার গুঁড়ি গুঁড়ি 'পানা' হইয়া উহার জল বড়ই খারাপ করিয়া ফেলে ও ঐ পানা একবার পুষ্করিণীতে হইলে উহা বিশেষভাবে ছাঁকিয়া ফেলিলেও কোন ক্রমেই যাইতে চায় না। উহা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিবার উপায় কি?

শ্রী সুধীরচন্দ্র সৈনরায়

(৬৬)

আমেরিকার জ্যাকেস্ লোয়েব বলেন—'অনেক পতঙ্গ আলোকের দিকে ছুটিয়া যায় ও আগুনে পুড়িয়া যে মরে, তাহা পতঙ্গের পাখার কোন কোন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়াতেই ঘটে—এবং যখন তিনি পতঙ্গের পাখায় ঐ রাসায়নিক পদার্থ বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন তখন আর তাহারা আলোকের দিকে ছুটিয়া যায় না।' (বঙ্গ-বাণী, বৈশাখ, ১৩২৯)

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মতে—"পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায় তাহার দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে। প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার একটি পাখার সংযোগ। যখন দুইটা চোখের উপর আলো পড়ে কেবল তখন দুইটা ডানা একসঙ্গে একই বলে আন্দোলিত হয়। এবং পতঙ্গ তাহার অভীষ্ট লাভ করে—জীবনে কিম্বা মরণে। ইত্যাদি" (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯)

কাঁহার প্রমাণ সঠিক? শ্রী অশ্রুবিন্দু দত্ত

(৬৭)

সাধারণতঃ গরমে জিনিষ বিস্তৃত হয় এবং ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। আমাদের বাড়ীতে কাপড় রোদে দেবার জন্যে বাইরে প্রায় ৫০ হাত লম্বা একগাছা "সুন্দি" বেত টাঙ্গানো আছে। কড়া রোদের সময় তা টান হয়ে থাকে, আবার বৃষ্টির দিনে হাত দেড়েক ঝুলে পড়ে। সাধারণ নিয়মের এই ব্যতিক্রমের কারণ কি?

আনারসের ভিতরে যে ছোট ছোট বীজ থাকে, আমরা রোপণ করে' দেখেছি তা থেকে অঙ্কুর বের হয়। কিন্তু সেই অঙ্কুর আর বড় হয় না। এরূপ বীজ দিয়ে গাছ হয় কি না এবং না হ'লে (অঙ্কুর হওয়া সত্ত্বেও) তার কারণ কি?

মহি-উদ্-দীন আহমদ চৌধুরী

(৬৮)

বরিশাল জেলার উত্তর সাহাবাজপুর পরগণায় গোবিন্দপুর গ্রামে বাসুদেব-বাড়ীতে যে প্রাচীন ভাস্কর্য্যের পরিচায়ক একটি উচ্চ মঠ ও পাষাণময় বাসুদেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উক্ত মঠ ও বিগ্রহ কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা এবং কি কারণে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

শ্রী লালমোহন চক্রবর্ত্তী

(৬৯)

মীরাবাই সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন আলোচনা হইয়াছে কি? তাঁহার পদাবলীর সংগ্রহ থাকিলে কোথায় পাওয়া যাইবে?

শ্রী অনাথনাথ বসু

(৭০)

শ্যাম রাজ্য ভারতবর্ষের অতি নিকটে। শ্যামে হিন্দু উপনিবেশ ছিল, প্রমাণিত হয়েছে। শ্যামের বর্ত্তমান রাজধর্ম্ম কি? শুনেছি ব্রাহ্মণে অভিষেক করলে তবে নূতন রাজা সিংহাসন পান। তা'হলে কি শ্যামের রাজা হিন্দু? শ্যামীয় হরফের সহিত সংস্কৃত ও বাংলার যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরের সহিত এই সাদৃশ্য নেই। শ্যামরাজ্যকে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্য বলা যায় কি না, আর বর্ত্তমান আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও বাংলা পুস্তক আছে কি না জানতে ইচ্ছা করি।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসীর পৃষ্ঠায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন রুশ রাজপুরুষের ভ্রমণ-কাহিনীর অনুবাদ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাতে সব খবর পাওয়া যায় না।

শ্রী অশ্রুমালা বসু

(৭১)

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত "শাজাহান" নাটকে মির্জ্জা মোহম্মদ নিয়ামত খাঁ বলে' একজন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইনি এসিয়ার বিজ্ঞতম সুখী বলে' কথিত হয়েছেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে তিনি ঘটনাক্রমে রাজবংশের পারিবারিক কলহের আবর্ত্তে পড়েছিলেন। ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? পরিচয় কি?

মোহাম্মদ আব্দুল বারি চৌধুরী
ও
মহীদিন আহমদ চৌধুরী

(৭২)

ভেরেণ্ডা (এরণ্ড) গাছে এক প্রকার গুটি-পোকার চাষ করা যায়। তাহা হইতে নাকি "এঁড়ি" নামক রেশম প্রস্তুত হয়। কোথা হইতে ও কিরূপে ঐ পোকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ও তাহার চাষ করিবার পদ্ধতি কি? এ সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, তাহার মূল্য কত ও কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৭৩)

আওরঙ্গজেব, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত ও রাণা প্রতাপ ইঁহাদের প্রধানা মহিষীগণের কি কি নাম ছিল?

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী ও কর্ম্মী কে ছিলেন?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ

(৭৪)

ভয়ে বা হর্ষে শরীর রোমাঞ্চিত হইবার হেতু কি?

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

(৭৫)

সমুদ্র অথবা ছোট ছোট নদীর নিকটবর্ত্তী গৃহসমূহের দেওয়ালে এমনকি ইষ্টকালয়ের দেওয়ালেও লোনা ধরিতে দেখা যায়। ইহাতে দেওয়ালের বড়ই অনিষ্ট হয়। এই লোনা হইতে দেওয়ালগুলি রক্ষা করিবার উপায় কি কি?

শ্রী ধরণীধর দাস

(৭৬)

এদেশের স্ত্রীলোকদের স্বামীর বা শ্বশুরবাড়ী-সম্পর্কিত গুরুজনের নাম লইতে নাই কেন?

শ্রী হেমচন্দ্র বক্সী

মীমাংসা

(২৮)

পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাসাদের চূড়ায় অনেকস্থানেই সোনার পাত মণ্ডিত থাকিত। "কাঞ্চন-ভাজন"—সোনার তৈয়ারী পাত্রও বুঝাইতে পারে, কারণ সোনার কলসীও অনেক সময় প্রাসাদের চূড়ায় থাকিত, এমন কি এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায়। এখন দেশ দরিদ্র বলিয়া সোনার পরিবর্ত্তে কাচ ব্যবহৃত হইতেছে। ঘরের দরজায় কাচ, জানালায় কাচ; এমন কি কোন কোন গৃহের চতুর্দ্দিকের বেষ্টনী পর্য্যন্ত কাচের, এবং আলোক প্রবেশের জন্য গৃহের ছাদের দিকেও পর্য্যন্ত কাচ থাকে, এইরূপ সর্ব্বত্রই কাচের ছড়াছড়ি। কাচকে ইন্ধন বলা হইয়াছে এইজন্য হয়ত—কাচ অগ্নির সাহায্যে (বালিচূন প্রভৃতির সংযোগে) প্রস্তুত হয় বলিয়া। সোনার স্থান কাচে দখল করিয়াছে বলিয়া কবি দুঃখ করিয়াছেন। উপরন্তু কাচ ও কাচের জিনিস ব্যবহার করা আজকালকার ফ্যাসানও বটে।

শ্রী গৌরীপদ সেনগুপ্ত

(৪৭)

কোনও মন্দিরের নিকট অথবা কেবল অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের ছোট গ্রাম স্থাপন করিয়া সেই বাড়ীগুলি ব্রাহ্মণদের দান করা হইত। এই রূপ গ্রামকে অগ্রহার (বা দাক্ষিণাত্যে অগ্রহারম্) বলে। যে একটা পূর্ণ গ্রাম দান করিতে পারে না সে একটা কম্পাউণ্ডে ৫।৭ খানি ঘর বাঁধিয়া তাহাই অগ্রহারম্ বলিয়া দান করিয়া থাকে। অগ্রহারমের মধ্যে যে পথ থাকে তাহা সাধারণের সম্পত্তি নহে। সে গ্রামে বা কম্পাউণ্ডে নীচ জাতীয় পঞ্চমদের* ঢুকিবার অধিকার নাই। কেবল উচ্চশ্রেণীর সৎশূদ্রেরা ঢুকিতে পায়। অগ্রহারমের একখানা বাটী একজন নীচজাতীয় ব্যক্তি কিনিতে চাহিলে ও অগ্রহারমের অন্য অধিবাসীরা আপত্তি করিলে, খরিদ্দারকে আইনমতে বাধা দেওয়া চলে। দাক্ষিণাত্যে বড় বড় অগ্রহারম্ (যাহাতে ৫০০।৭০০ শর ব্রাহ্মণের বাস) প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪৮)

১। 'মহালয়া'—মহৎ+আলয়ঃ (আশ্রয়ঃ) স্ত্রীং আপ্। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময়।

(শব্দকল্পদ্রুমঃ)

২। 'মহালয়া'—মহতাম্ আলয়ঃ স্ত্রীং আপ্।

আলয়ঃ—আ+লী+অল্ (আগমনে)। যে তিথিতে মহৎ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণ আগমন করেন তাহাকে মহালয়া বলে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময়। অমাবস্যা তিথিতে আগমন শেষ হয় বলিয়া ঐ অমাবস্যা মহালয়া অমাবস্যা নামে কথিত হয়।

কথিত আছে পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের বংশধরগণের নিকট জল-প্রাপ্তির আশায় শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বের কৃষ্ণপক্ষে আগমন

শ্রী অমৃতলাল শীল

* আর্য্যমতে চারটি বর্ণ। ইহা ছাড়া অতি হীনজাতিকে পঞ্চম বা পঞ্চম বর্ণ বা অতিশূদ্র বলে। তাহারা দ্রবিড়দেশে এখনও অস্পৃশ্য। অগ্রহারমের সীমাতে এখনও ঢুকিতে পায় না। তবে বড় নগরে এখন আর সে নিয়ম নাই। হায়দ্রাবাদ সহরে একটি অগ্রহারম্ আছে। এখন তাহাকে "বামণ-বাড়ি" বা "ব্রাহ্মণ-বাটী" বলে, কিন্তু সেখানে এখন সকল জাতির বাস আছে।

করেন। সুতরাং তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ ঐ সময় তর্পণাদি করিয়া শেষ দিন অর্থাৎ অমাবস্যার দিন পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদি করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকেন।

মহালয়া শব্দের অর্থ 'মহৎ লোকের আগমন' করাই সঙ্গত। কারণ তাঁহারা যে আগমন করেন তাহা দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে উল্কাদান মন্ত্রে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় -

"যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।
উজ্জ্বল জ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে।"

এখন কথা হইতে পারে যে পূর্ব্বপুরুষগণ অন্য সময় আগমন না করিয়া কেবল এ সময় আগমন করেন কেন? ইহার উত্তর মনুসংহিতায় বেশ দেওয়া আছে

"অপি নঃ স কুলে জায়াদ্ যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম।
পায়সং মধুসর্পিভ্যাম্ প্রাকচ্ছায়ে কুঞ্জরস্য চ॥"

(মনুঃ ৩য় অধ্যায় ২৭৪ শ্লোক: ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীর উল্লেখ আছে।)

অস্যার্থঃ—পিতৃলোকেরা প্রার্থনা করেন যে এমন বংশধর যেন আমাদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন যিনি মঘা ত্রয়োদশীতে অথবা অন্য তিথিতেও যে কালে প্রাককুঞ্জরচ্ছায় হয় (হস্তীর ছায়া পূর্ব্বদিকে পড়ে) সেই সময় আমাদিগকে ঘৃত, মধুযুক্ত পায়স দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন।

আশ্বিন মাসে সূর্য্য হস্তা নক্ষত্রে থাকিতে মৃগা চান্দ্র ভাদ্রমাসের মঘাযুক্ত কৃষ্ণত্রয়োদশী হইলে "কুঞ্জরচ্ছায়" যোগ হয়। পিতৃগণ এই কুঞ্জরচ্ছায় যোগে শ্রাদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন।

এই কুঞ্জরচ্ছায় যোগ শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে কৃষ্ণপক্ষে হইয়া থাকে। কাজেই ঐ সময়কে মহালয়া বলা হয় এবং অমাবস্যার দিন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রী নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাবিনোদ

কেবল যে মহালয়ার দিনই উক্ত পার্ব্বণাদি কার্য্য করিতে হইবে তাহা নহে; উক্ত পার্ব্বণাদি কার্য্য ঐ পক্ষের প্রতিপদ হইতে মহালয়া পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য। তদসমর্থে ষষ্ঠ হইতে দশ দিন, তদসমর্থে একাদশী হইতে পাঁচ দিন, ন্যূনকল্পে ত্রয়োদশী হইতে তিন দিন।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(৪৯)

কোনদিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলে একই জিনিষ যে ২।৩টি করিয়া দেখা যায়, তা' ঠিক নয়—তবে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে জিনিষটা ক্রমশঃই অস্পষ্ট ও আবছায়া হইয়া উঠে; কারণ আমাদের "রূপবহা নাড়ী" (optic nerve) একই দিকে অনেকক্ষণ কাজ করিতে করিতে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং মস্তিষ্কের দৃষ্টিক্ষেত্রে (visual area) জিনিষটির ছবিটির (image) একটা সুস্পষ্ট ও সুপ্রকটিত ধারণা বা প্রতীতি (impression) জন্মাইতে পারে না।—ছবিটিও স্পষ্ট মনে হয় না।

কিন্তু চোখের পাতাকে আঙ্গুল দিয়া ধীরে ধীরে নাড়াইবে—একই জিনিষ ২।৩টি করিয়া দেখা যায়। সাধারণতঃ আমাদের দুই চোখের অক্ষরেখা একই সমতলে (horizontal plane) অবস্থিত; বস্তুবিশেষের ছবি (image) অক্ষিপটের (Retina) উপর একই সমতলে (horizontal plane) পতিত হয়; মস্তিষ্কও ছবি দুইটির ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতিকে (impressions) সংযুক্ত করিয়া একই প্রতীতি বা ধারণাতে পরিণত করে;—সুতরাং বস্তুবিশেষের একটি ছবিই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু চোখকে নাড়াইলে, চোখের অক্ষরেখা (axis of the eye) কেবলই স্বস্থানচ্যুত হইয়া একবার উপরে যায়, একবার নীচে নামিয়া আসে। তখন যে-সকল ছবির (image) উৎপত্তি হয় তাহাদের কোন দুইটিই অক্ষিপটে একই সমতলে (horizontal plane) পতিত হয় না। মস্তিষ্কও ভিন্নতলস্থ ভিন্ন ভিন্ন ছবিগুলির একাধিক প্রতীতিকে সংযুক্ত করিয়া একটি মাত্র প্রতীতিতে পরিণত করিতে পারে না। আমরাও দুই-তিনটি করিয়া ছবি দেখিতে পাই। এইজন্যই রাত্রে পথে আসিতে আসিতে কোন কারণে চোখ রগ্‌ড়াইলে আমরা রাস্তার পাশের গ্যাসল্যাম্পের একাধিক ছবি দেখিতে পাই।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার

(৫০)

ইংরেজেরা যখন আমাদের দেশে প্রথম আসিয়াছিল তখন রেলগাড়ী প্রভৃতি তো কিছুই ছিল না। তাহারা দূরে যাতায়াত করিবার সময় তাহাদের যাওয়ার আগে তাহাদের গন্তব্য পথের মাঝে মাঝে ঘোড়ার ডাক বসাইত, অর্থাৎ লোকজন এবং কাজের জিনিষপত্র ঘোড়ায় করিয়া আগে পাঠাইয়া দিত, তারপর নিজেরা সেই আড্ডায় গিয়া বিশ্রাম করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া আবার তাহাদের আগে আগে পাঠাইয়া দিত। তারপর ক্রমশঃ সেই-সব জায়গায় বাড়ী তৈয়ারী হইতে লাগিল। বাংলা দেশের বাড়ী বলিয়া ইংরেজেরা তখন তাহার নাম দিল 'বাংলা'। সেই হইতে 'ডাক বাংলা' নামের উৎপত্তি।

শ্রী উষারাণী ঘোষ

(৫১)

উদয় যখন মেবারের রাণা ছিলেন, তখন মোগল সম্রাট আকবর মেবার জয় করিতে আসেন। যুদ্ধের ভয়ে উদয় দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তখন পুত্ত উদয়ের স্থান অধিকার করেন। কিন্তু যুদ্ধে পুত্ত নিহত হন। তখন জয়মল্ল পুত্তের স্থান অধিকার করেন। একদিন রাত্রে জয়মল্ল তাঁহার লোকজনসহ চিতোর দুর্গের একধার মেরামত করিতেছিলেন, আকবর তাঁহার মাচা হইতে উহা দেখিতে পান ও তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক দ্বারা অকস্মাৎ জয়মল্লকে গুলি করেন। জয়মল্লের স্থান লইতে পারেন, চিতোরে আর এমন কেহ ছিলেন না; অনন্যোপায় হইয়া বীরগণ খোলা তরবারি হাতে মোগল সেনার উপর পড়িল, চিতোর গেল।

"যুদ্ধে যত রাজপুত মারা যান সকলের পৈতা খুলিয়া আকবর নাকি ওজন করান। সমস্ত পৈতার ওজন ৭৪॥০ মণ হইল। ইহা হইতে রাজস্থানে একটা নিয়ম হইল, লোকে পত্রের শিরোনামার উল্টা পিঠে ৭৪॥০ এই অঙ্ক লিখিয়া দিত। ঐ অঙ্ক লেখা থাকিলে যার পত্র সে ভিন্ন যদি অন্য কেহ খোলে তার চিতোরে অত নরহত্যার পাপ লাগিবে, এইরূপ একটা সংস্কার লোকের হইল এবং আমাদের বাংলাতেও ঐ নিয়ম আসে।" শ্রী কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত "রাজপুত কাহিনী" পুস্তক দেখুন।

শ্রী অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র

"Marked on the banker's letter in Rajasthan it is the strongest of seals, for 'the sin of the slaughter of Cheetore' is thereby invoked on all who violate a letter under the safeguard of this mysterious number."

(Todd's Rajasthan. Vol. I. Chap. X. Page 343.)

শ্রী পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

তৎকালে চারি সেরে এক মণ ধরা হইত।

শ্রী সনৎকুমার আঢ্য

তখন ১০ সেরে এক মণ ধরা হইত।

শ্রী পরমেশ দাশগুপ্ত

আকবরের আক্রমণ হইতে চিতোর রক্ষার যখন আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, তখন রাজপুত কুল-রমণীগণ মোগলদিগের হস্তে অবমাননা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ভীষণ জহর-ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অনলশিখায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। উক্ত রমণীগণের পরিত্যক্ত অলঙ্কার রাশির ওজন ৭৪॥ মণ হইয়াছিল। এই উভয় মতের যেটিই সত্যমূলক হউক না কেন, তৎকাল হইতেই ৭৪॥ অঙ্কটি চিতোর ধ্বংসে অনুষ্ঠিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ রাজপুতানার বণিক্ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আবৃত পত্রের পশ্চাদ্ভাগে লিখিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে বাঙ্গালাদেশেও ঐ অঙ্কটি পত্রের পশ্চাদ্ভাগে লিখিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ৭৪॥ অঙ্কিত পত্র মালিক ভিন্ন যিনি খুলিবেন তিনি চিতোর ধ্বংসের পাপে লিপ্ত হইবেন ; ইহাই অঙ্কটিতে নিহিত অভিসম্পাত।

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়

(৫২)

সূর্য্য বা চন্দ্র-গ্রহণের সময়ে যে পাকপাত্রাদি পরিত্যাগ করা হয় তাহার বৈজ্ঞানিক কোন কারণ জানি না, তবে তাহার পৌরাণিক কারণ এইরূপঃ—ঐ সময়ে রাহু সূর্য্য বা চন্দ্রকে স্পর্শ করে। রাহু জাতিতে চণ্ডাল, সুতরাং অস্পৃশ্য। তাহার স্পর্শে সূর্য্য বা চন্দ্র পর্য্যন্তও অস্পৃশ্য হয় এবং তাহাদের ছায়া পৃথিবীতে পতিত হওয়ায় পৃথিবীও ঐরূপ হয়, সুতরাং গ্রহণের পরে মুক্তিস্নান করিয়া পবিত্র হইয়া ভোজনাদি করার নিয়ম।

শ্রী বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

(৫৩)

"ঘোগ এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু, বাঘ তাহাকে পাইলেই খাইয়া ফেলে, সুতরাং সে বাঘের ঘরে বাস করিতে গেলে বাঘের কোন অনিষ্ট হয় না, তাহারই প্রাণ যায়। বলবানের নিকট দুর্ব্বল ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে বা অতি চতুরের সহিত চাতুরী করিলে এই বাদ প্রযুক্ত হয়।"　সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

(৫৬)

মাটির তাপ সঞ্চালন-শক্তিটা (Conductivity) জলের সঞ্চালনশক্তি অপেক্ষা বেশী। মাটি যেরূপ তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয় সেইরূপ তাড়াতাড়ি আবার ঠাণ্ডা হয়। শীতকালে দিনের বেলায় জল ও মাটি রৌদ্রে সমভাবেই গরম হয়, কিন্তু মাটির সঞ্চালনশক্তি অধিক থাকার জন্য জল হইতে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ তাপের সমান হয়। কিন্তু জল অত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইতে পারে না বলিয়া তাপ বেশী থাকে ; সেইজন্য সকালবেলা একটু গরম বোধ হয়। পুনর্ব্বার সূর্য্যতাপে চারি পাশের দ্রব্য জলের সমান গরম হইলে আর জল গরম বোধ হয় না।

শ্রী অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র

আবার বাহিরের শৈত্যাধিক্য লাগিয়া হাতটাও অনেক ঠাণ্ডা থাকে। সেইজন্যই কূপ বা পুষ্করিণীর জল ভোরবেলা হাত দিয়া স্পর্শ করিলে অপেক্ষাকৃত গরম বলিয়া বোধ হয়।

শ্রী শরৎচন্দ্র বসু

স্থল হইতে বিকীর্ণ তাপও জল আংশিক গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া রাত্রির ভোর পর্য্যন্ত পুকুরের ও কূপের জল একটু গরম থাকে।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(৫৭)

ভোজনকালে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে অন্ন উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। এই পঞ্চদেবতা প্রাণ, সমান, অপান, উদান, ব্যান—এই পাঁচ বায়ুরই নামান্তর মাত্র। উহাদের এক এক কাজ। উদগার নাগ বায়ুর কার্য্য, শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ উন্মেলিত করা কূর্ম্ম বায়ুর, হাঁচি কৃকর বায়ুর, আহারের জন্য মুখব্যাদান করা দেবদত্ত বায়ুর এবং ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য্য। ধনঞ্জয়ের আর-এক নাম অগ্নি। বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত কার্য্যাদি সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হওয়ার জন্য আহার-কালে প্রাগুক্ত পঞ্চদেবতার উদ্দেশে অন্ন-জল দেওয়া হয়। ইহাতে প্রকারান্তরে পঞ্চদেবতার সন্তুষ্টিই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভূ-পতি, ভুব-পতি, স্ব-পতি, ভূত-পতি এবং নারায়ণ।

(ভূঃ পতয়ে নমঃ, ভুবঃ পতয়ে নমঃ,
স্বঃ পতয়ে নমঃ, ভূতানাং পতয়ে নমঃ,
মধ্যে
শ্রীবিষ্ণুনারায়ণায় নমঃ)

প্রথম তিনটি গায়ত্রীর ত্রিলোকের অধিপতি। চতুর্থ শিব। মধ্যের অন্ন নারায়ণকে নিবেদন করা হয়।

[সংক্ষেপে, শুধু উপরের পঞ্চ-অন্ন নিবেদনের রীতি কোন কোন জায়গায় চলিতেছে। আরও যে পঞ্চ অন্ন নিবেদন নিয়ম,—প্রথমেই নিবেদিত হয় সেই পঞ্চ অন্ন। সে নিবেদন নাগ, কূর্ম্ম, অনন্ত, ধনঞ্জয় আর কর্কটকে করা হয়।—নাগায় নমঃ কূর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ ধনঞ্জয়ায় নমঃ ককটায় নমঃ। ইঁহারা বাস্তু ও পৃথিবী রক্ষক নাগ।]

(আর একটু কথা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় লেখা চলে ; অন্ন নিবেদনের পর যে প্রথম পঞ্চ গ্রাস, তাহা পঞ্চ বায়ুকে স্মরণ করিয়া লওয়া।—প্রাণায় স্বাহা—ইত্যাদি। প্রাণ (হৃদয়ে), অপান (পায়ুতে), সমান (নাভিতে), উদান (কণ্ঠে) এবং ব্যান (সর্ব্বশরীরে)। জীবন—বায়ু। ভোজন—জীবন রক্ষার প্রধান যজ্ঞ ; পঞ্চগ্রাসে ইঁহাদের পঞ্চাহুতি দিয়া যজ্ঞারম্ভ হয়। নাগ দেবতা ও বায়ুতে মোট পনেরটির আবাহন হয়।)

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

(৬০)

হিন্দু জ্যোতিষে এক সূর্য্যোদয় হইতে আর-এক সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ৬০ দণ্ড সময়কে, আড়াই দণ্ড হিসাবে ২৪টি হোরায় ভাগ করিয়া, রব্যাদি সপ্তগ্রহকে এই-সকল হোরার অধিপতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে, পৃথিবীর নিকটে চন্দ্র, তারপর বুধ, তারপর শুক্র, তারপর সূর্য্য, তারপর মঙ্গল, তারপর বৃহস্পতি ও সর্ব্বশেষে শনি এই ক্রমে গ্রহগণ খ-চক্রে অবস্থিত। [মন্দামরেজ্যভূপুত্রসূর্য্যশুক্রেন্দুজেন্দবঃ]

বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পে (কল্প—৪৩২০০০০০০০ বৎসর) যেদিন বিশ্ব প্রথম সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়াছিল, সেই দিন প্রথম হোরার আধিপত্য গ্রহরাজ রবিকে প্রদান করিয়া পরবর্ত্তী হোরাগুলির আধিপত্য যথাক্রমে পর-পরবর্ত্তী গ্রহগণকে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে ২৪এর পর ২৫ হোরার অধিপতি হইলেন চন্দ্র, ৪৯ হোরার অধিপতি হইলেন মঙ্গল, ৭৩ হোরাধিপতি হইলেন বুধ, ৯৭ হোরাধিপতি বৃহস্পতি, ১২১ হোরাপতি শুক্র, এবং ১৪৫ হোরাপতি হইলেন শনি। কাজেই পূর্ববর্ত্তী দিনগুলির বার উক্তরূপে পঠিত হইল।

শ্রী [illegible]
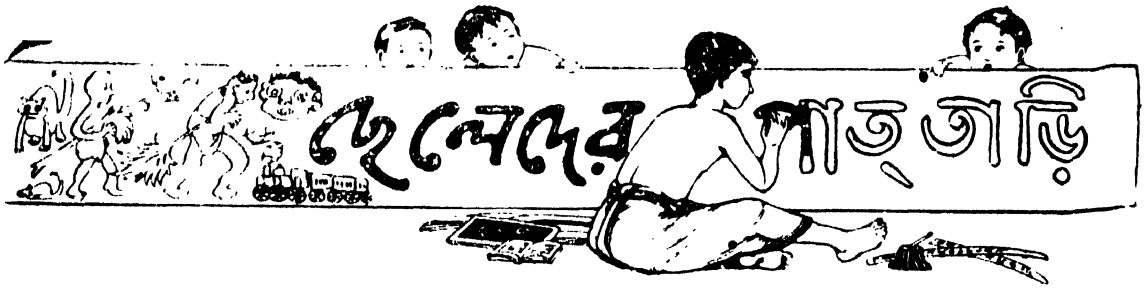
কোকিল রাণী

মিশরের রাজার চমৎকার চেহারা,—যেন স্বর্গের কার্ত্তিক। কিন্তু তাঁর যে রাণী, তিনি মোটেই সুন্দরী নন। কাফ্রিদের রাজার মেয়ে তিনি, রং তাঁর কুচকুচে কালো, চুল তাঁর খাটো আর কোঁকড়া কোঁকড়া।

কিন্তু তবুও তাঁর রূপের নিন্দে করা যায় না। কালোর মধ্যে উজ্জ্বলতায়, আর তার উপরে হলদে রংএর রেশমী শাড়ীতে, গায়ে নানান্ রকম মিশর-দেশী হীরে-জহরতে তাঁকে রাজবংশের মেয়ে বলেই বুঝিয়ে দিত। এর উপরেও ভাল ছিল তাঁর চমৎকার গলা, তাঁর গান শুন্‌লে তন্ময় হ'য়ে যেতে হ'ত।

মিশরের রাজা একবার কাফ্রিদের অরণ্যরাজ্যে গিয়ে রাজকুমারীর গলার আওয়াজে এতদূর মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে একেবারে রাণী ক'রে ফেল্লেন।

রাণীর বরাতে কিন্তু সুখ ছিল না। মিশরের রাজা রূপবান্ হ'লে কি হয়, তাঁর স্বভাবটা ছিল বড্ডই কড়া। পান থেকে চূনটি খস্‌লেই তিনি যখন-তখন রাণীর সঙ্গে মন্দ ব্যবহার কর্‌তেন। রাণী কিন্তু সদাই চেষ্টা কর্‌তেন, কিসে রাজাকে খুশী রাখেন। কিন্তু বরাত যাবে কোথা? যে রাজা তাঁর গানে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, এখন তিনি কিনা তাঁর কালো রূপের নিন্দে ক'রে ঘেন্নায় নাক সিঁট্‌কাতেন।

আরও বিপদ হ'ল তাঁর কোলে একটি ছোট্ট কালো খুকী হ'য়ে। রাজা খুকীকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। সে যখন তার ছোট্ট দু'খানি কালো হাত বাড়িয়ে রাজার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে যেত, রাজা তখন লাফিয়ে দশ হাত পিছনে চলে' যেতেন।

শেষে রাজার আর সহ্য হ'ল না। তিনি একদিন বনের মধ্যে এক কুটীর তৈরী করিয়ে রাণী আর তাঁর মেয়েকে সেইখানে রেখে এলেন। আর দিন কতক বাদে আরব দেশের বেদুইন ডাকাতের এক সর্দ্দারের সুন্দরী মেয়েকে রাণী ক'রে মিশরের রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন।

রাজ্যের পক্ষে এর পরিণাম কিন্তু বড়ই খারাপ হ'ল। কাফ্রি রাজকন্যা যতদিন রাণী ছিলেন, ততদিন প্রজাদের তিনি ছেলেমেয়ের মত দেখ্‌তেন। প্রজাদের মধ্যে যারা গরীব, তাদের তিনি প্রায়ই নানান্ রকম জিনিস দিতেন। কিন্তু বেদুইন ডাকাতের মেয়ে রাণী হ'য়ে রাজ্যে উপদ্রব কর্‌তে লাগ্‌লেন; রাজ্যের লোকদের মধ্যে যার স্ত্রীর যা' যা' ভালো ভালো গয়না ছিল, তাদের যত সব হীরে মণি মুক্তা ছিল, সব নিজের জন্যে কেড়ে নিলেন।

কাফ্রিরাণী মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলের কুঁড়েঘরখানিতে বাস করেন। তিনি বনের দেশের কাফ্রিদের রাজার মেয়ে, বনে বাস কর্‌তে তাঁর কোন কষ্ট নেই; কষ্ট যা' কিছু তা' রাজাকে না দেখ্‌তে পেয়ে—মিশরের রাজাকে তিনি বড় ভালোবাস্‌তেন। জঙ্গলের ঘরখানিতে বসে' তিনি প্রায়ই রাজার কথা ভাব্‌তেন আর চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেত।

এম্নি ভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। রাণীর মেয়েটি এখন আট বছরের হয়েছে। মাকে কাঁদ্‌তে দেখে তার মনেও এখন কষ্ট হয়।

একদিন সে তার মাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস কর্‌লে, "মা, বাবা আমাদের কবে নিয়ে যাবে?"

রাণী কিছু না ব'লে শুধু তাকে বুকে চেপে ধর্‌লেন আর হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর চোখের

জলে রাজকন্যার মাথা ভিজে গেল। রাজকন্যার চোখেও বুঝি জল আর থামে না। যে দোষে রাজা তাদের নিয়ে যান না, তা' যে ভগবানের দেওয়া। তার ত কোন উপায় নেই। তাই রাণী কোন কথাই বল্‌তে পার্‌লেন না।

রাজকন্যা ভাব্‌তে শিখেছে, উপায় ঠাওরাতে শিখেছে। একদিন আবার রাণীকে বল্লে, "মা, আমি না-হয় বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসি।"

রাণী কিছু বল্লেন না, শুধু কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। রাজকন্যা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বা'র হ'ল। জঙ্গল পার হ'য়ে, মিশর-রাজার রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছাল।

রাণী মাটীর উপর শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, "আহা, যদি রাজকন্যা রাজাকে আন্‌তে পারে, তা' হ'লে তাঁকে আরেকটিবার দেখ্‌তে পাই।"

* * * *

মিশরের রাজার রাজধানী নীল নদের ধারে। নীল নদ মিশরের গঙ্গা। সকাল হ'তে রাজা তাঁর রাজসভায় এসে বসেছেন, চারদিকে সভাসদেরা তাঁদের উজ্জ্বল পোষাকে সভা আলো ক'রে রয়েছেন। সভার কাজ আরম্ভ কর্‌বার আগে রাজার স্তুতি গান হ'ল, সোনার পাত্রে নীল নদের পবিত্রজলে তাঁকে অভিষিক্ত করা হ'ল।

সভার কাজ আরম্ভ হয় হয়, এমন সময়ে আট বছরের একটি ছোট্ট কালো মেয়ে রাজার সাম্‌নে এসে বল্লে, "হ্যাঁ গা তুমি কি আমার বাবা?"

তার বাঁশীর মত মিষ্টি গলার আওয়াজ শুনে সভার লোকে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। রাজা নিজে তন্ময় হ'য়ে গেলেন; খানিকক্ষণ চুপ ক'রে তার দিকে চেয়ে রইলেন, তার পরে বল্লেন, "হ্যাঁ গো, তুমি আমারই মেয়ে।"

মেয়েটি একগাল হেসে রাজার হাত ধর্‌লে, বল্লে, "বাবা, মার কাছে চল!"

কি মিষ্টিই তার গলার স্বর! সভার লোক একেবারে [illegible]। তখন আর সভা করা হ'ল না, রাজা মেয়ের হাত ধ'রে রাণীর কাছে চল্লেন।

কিন্তু কাফ্রি রাণীর কাছে নয়; রাজা বুঝ্‌তে পারেন নি যে, রাজকন্যা তাঁকে বনে নিয়ে যেতে এসেছে, তিনি চল্লেন—বেদুইন-রাণীর কাছে।

বেদুইন-রাণী তখন আয়নার সাম্‌নে বসে' ছিলেন, দাসীতে চুল বেঁধে দিচ্ছিল। রাজা মেয়েটিকে বল্লেন, "ওই যে তোমার মা।"

রাজকন্যা রাণীকে বল্লে, "তুমিও আমার মা? এ ত বেশ!"

রাণী ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেন, একটি ছোট্ট কালো কুচকুচে মেয়ে কথা কইছে। কিন্তু মানুষের গলার স্বর কি এত মিঠে হয়? তিনি কিচ্ছু বল্লেন না, চুপ ক'রে দাসীর কাছে চুল বাঁধ্‌তে লাগ্‌লেন। বুঝ্‌তে পার্‌লেন, এ সেই কাফ্রিরাণীর মেয়ে।

রাজা রাজকন্যাকে সেইখানে রেখে রাজ-সভায় ফিরে এলেন। রাজকন্যা এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। নানান্ ঘরে নানান্ রকম চমৎকার চমৎকার জিনিস দেখে তার চোখ জুড়িয়ে গেল। সে ভাব্‌লে, "রাজার বাড়ী এত সুন্দর হয়!" এদিক ওদিক ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একটা ঘরে দেখ্‌তে পেল, একটা সোনার রেকাবীতে রয়েছে—নানান্ রকম পাকা পাকা ফল আর মেওয়া।

সেই মেওয়া আর ফলগুলো রাণীর বাপ বেদুইন ডাকাতের সর্দ্দার আরব দেশ থেকে রাজার জন্যে পাঠিয়েছে। রাণী সোনার রেকাবীতে সেগুলো সাজিয়েছেন—রাজাকে জলখেতে দেবেন ব'লে। তার মধ্যে ছিল আরব দেশের সব চেয়ে ভালো খেজুর-গাছের একটি বড় খেজুর। রাজকন্যা লোভ সাম্‌লাতে পার্‌ল না, সে খেজুরটি তুলে মুখে দিল।

এমন সময়ে রাণী এসে হাজির। তিনি ত ব্যাপার দেখে রেগেই অস্থির, "অ্যাঁ! কি কর্‌লি! রাজার জন্যে এত যত্ন ক'রে যে খেজুর বাবা পাঠিয়েছে, তুই তা' খেয়ে ফেল্লি!" তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে তার একটা হাত ধর্‌লেন। রাজকন্যার মুখ থেকে খেজুর প'ড়ে' গেল, তার মুখে কথা আট্‌কে গেল।

রাণী তাকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেলেন—একেবারে রাজসভায়। তিনি সভার মাঝে

দৈত্যের মত হাব্‌শী দারোয়ানকে ডেকে বল্লেন, "এই মেয়েটাকে এইখানেই পঞ্চাশ ঘা কোড়া লাগাও।"

হাব্‌শী দারোয়ান কোড়া নিয়ে এল। উঃ কী ভীষণই এই কড়া চাবুক! বেতের শক্ত মোটা ছড়ির মাথা থেকে এক গোছা সরু সরু চাম্‌ড়ার ফালি। এই কোড়া দিয়েই গাড়োয়ানেরা গরু ঠেঙায়।

রাজকন্যাকে সভার মধ্যিখানে দাঁড় করান হ'ল। বেচারী বলিদানের পাঁটার মত থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো—আবার সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে অগ্নিচক্ষু বেদুইন-রাণী। রাজা অবধি ভয়ে থ মেরে গিয়েছেন।

পাথরের মত শক্ত প্রাণ এই হাব্‌শী দারোয়ানের! সে কোড়া গাছটা জোরে ধরে' মেয়েটির গা'য়ে যেই এক ঘা লাগিয়েছে, মেয়েটি অম্নি "মা গো!" বলে' কেঁদে লাফিয়ে উঠে মাটীতে শুয়ে পড়্‌লো! আবার আঘাত, আবার আঘাত! ছোট্ট রাজকন্যা মাটীতে পড়ে' ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো, তার কালো চাম্‌ড়া ছিঁড়ে লম্বা লম্বা দাগে লাল রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌লো!

রাজা চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন, রাণীর ভয়ে সভার কারো মুখে কথাটি নেই। এক ঘা, দু ঘা, তিন ঘা, চার ঘা, উঃ আর কি গোনা যায়? রাজকন্যার প্রাণ অনেকক্ষণ বেরিয়ে গিয়েছে, তবু হাব্‌শী দারোয়ান্‌কে কোড়া থামাতে বলে কারো সে সাহস নেই। উঃ কী ভীষণ এই বেদুইন ডাকাতের মেয়ে!

কারো কথা বল্‌তে না সাহস হোক্‌, কিন্তু ভগবান্‌ কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারেন? এত অত্যাচার কি তিনি সইতে পারেন? হঠাৎ নীল নদে ভীষণ বন্যা এসে জল দু'কূল ছাপিয়ে উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজধানী ভেসে গেল। রাজা তাঁর সিংহাসনে ব'সে, সভাসদেরা যে যার জায়গায়, হাব্‌শী দারোয়ান কোড়া হাতে, রাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গভীর জলের তলায় কে কোথায় তাঁরা সব মিলিয়ে গেলেন।

বনের মধ্যে কাফ্রি-রাণী তার কুঁড়েঘরখানিতে পড়ে' আছেন, এক মাস যেতে বসেছে, মেয়ে রাজধানী থেকে আজও ফেরেনি, তিনি কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছেন; খাবার জোগাড় করা বা রান্না করা একেবারে ছেড়ে দিয়ে অনবরত মেঝেয় পড়ে' চোখের জল ফেল্‌ছেন।

বনের পাখীগুলো সকাল সন্ধ্যায় দু'একটি ফল এনে তার মুখে দিত, তাতেই তিনি প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কাফ্রি রাণী ভাবেন, "আহা! আর জন্মে যেন পাখী হ'য়ে জন্মাই! এরা কত সুখেই না আছে! এদের মধ্যে ফর্সা-কালোর বাছাবাছি নেই, সব পাখীই তার বউএর সঙ্গে মনের সুখে থাকে, দু'জনে মিলে বাচ্ছাকে খেতে দেয়। আহা! আমরাও যদি পাখী হতাম!"

দিন যায়। রাজাও আসে না, রাজকন্যাও আসে না, কাফ্রি রাণীর চোখের জলও থামে না।

কিন্তু মন্দ খবর কতদিন চাপা থাকে? হঠাৎ একদিন রাণী সমস্ত কথাই শুনতে পেলেন। বন্যায় যে দু'একজন লোক বেঁচে ছিল, তারা বনটা উঁচু ছিল ব'লে, সেইখানে উঠেছিল। তাদের কাছেই রাণী খবরটা শুন্‌তে পেলেন। কথা শুন্‌তে পেয়ে রাণী একবার শুধু "উ—হু, উ—হু" ব'লে চুপ কর্‌লেন। তার পরেই সব শেষ! দুঃখিনী রাণী মরণের কোলে আশ্রয় নিলেন।

পরজন্মে কাফ্রি-রাণী জন্ম নিলেন—কোকিলপাখী হ'য়ে! তাই কোকিলের কালো রং, অথচ গলা এত মিষ্টি। এখনো কোকিল তার মিষ্টি গলায় "উ—হু, উ—হু" ক'রে অতদিনের পুরাণো বেদনা জানায়—সে দুঃখ এখনও সে ভোলেনি। "উ—হু, উ—হু" কোকিলের বুকভাঙা-কান্নার ডাক, তোমরা তাকে কখনও ভেঙ্‌চিও না।

শ্রী কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

—

পেটুক দাসের স্বপ্ন

পড়্‌তে বসে গদাইচরণ ভাব্‌ছে বসে' বিকেলে—
উচিত মত ভর্‌তে পারে পেটটা তাহার কি খেলে!
সন্দেশ কি রসগোল্লা মুড়্‌কি গজা কচুরি,
অথবা কি রাবড়ি পায়েস পোলাও লুচি প্রচুরই;

বিম্ববতী

শ্রীশান্তা দেবী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

কত রকম আস্‌ছে মনে—কোন্‌টা যে ছাই খাবে সে—
ভাব্‌তে গিয়ে তন্দ্রা এলো পড়্‌ল ঢুলে আবেশে।
স্বপ্ন এলো চোখটি জুড়ে—দেখ্‌ল গদা ঘুমিয়ে—
এসেছে সে রাজ্যে নূতন—নূতন রকম ভূমি এ;
ছানার গাঁথা বাড়ীর সারি, মোহনভোগের রাস্তা;
পথের ধারে গজার গাছে ঝুল্‌ছে খাজা খাস্তা;
উড়ছে হাওয়ায় বুঁদের গুঁড়ো, পথের কাঁকর মুড়কি,
বরফিগুলি ইটের বোঝা মিহিদানা সুরকি।
গাছে গাছে চন্দ্রপুলি আস্‌কে পাটিসাপ্‌টা
পড়্‌ছে ঝরে' যেমন জোরে লাগ্‌ছে ঝড়ের ঝাপ্‌টা।
সন্দেশেতে ঘাট বাঁধানো দুধের নদী বয় রে,
সর্‌বতেরই ঝর্‌ণা ঝরে—আর কোথা কি হয় রে?
ক্ষীর-দীঘিতে পদ্ম ফোটে টক্‌টকে লাল পান্‌তো
পদ্মপাতা ফল্‌কো লুচি—কাঁপ্‌ছে অবিশ্রান্ত।
দই-পায়েসের ভীষণ স্রোতে ভর্‌ছে নালা বিলটা;
দেখে শুনে অবাক্‌ গদাই; বড়ই খুসী দিল্‌টা।
ভাব্‌ল—আগে স্নানটা সারি তার পরেতে শেষটা
ইচ্ছামত খাবার খেয়ে ভর্‌তে হবে পেট্‌টা।
ক্ষীর-দীঘিতে যেই নেমেছে সার্‌বে বলে' স্নানটা
কোত্থেকে এক পুলিশ এসে ধর্‌লে তাহার কানটা।
লাফিয়ে উঠে গদাইচরণ দেখ্‌লে জেগে তাকিয়ে
মাষ্টার তার কান ধরেছেন চক্ষু দুটি পাকিয়ে।

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

—

প্রকৃতির পাঠশালা

লোহা কি কাঠের চেয়ে ঠাণ্ডা?

শীতের দিনে এক হাতে একটা কাঠের লাঠি অন্য হাতে একটা লোহার শিক নিলে মনে হবে, কাঠের লাঠিটার চেয়ে লোহার শিকটা অনেক বেশী ঠাণ্ডা। কিন্তু আসলে তা নয়। সাধারণ অবস্থায় যেখানকার বাতাস যত ঠাণ্ডা বা যত গরম কাঠ ও লোহা ঠিক তত গরম বা তত ঠাণ্ডাই হবে। তবু উত্তাপের তফাৎ যে মনে হয় তার কারণ এই।—

আমাদের শরীরের যে উত্তাপ আছে বাতাসের উত্তাপের চেয়ে তা' বেশী হওয়াতে কাঠের লাঠি ও লোহার শিক আমাদের শরীরের চেয়ে ঠাণ্ডাই অবশ্য হবে। লাঠি ও শিক ছোঁয়ামাত্র আমাদের শরীরের এই গরম তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে অর্থাৎ আমাদের শরীরের গরমকে তারা নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজেরাও গরম হয়ে উঠ্‌তে চায়। সব জিনিস এই গরমকে সমান তাড়াতাড়ি আত্মসাৎ করতে পারে না। লোহা কাঠের চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি নেয়, কাজেই আমাদের শরীরের যে অংশ দিয়ে লোহাকে আমরা ছুঁয়ে থাকি সেখানকার গরম চলে' গিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর আমরা মনে করি লোহাটাই ঠাণ্ডা। কাঠ তত তাড়াতাড়ি গরমটাকে আত্মসাৎ করে' নিতে পারে না, তাই যে হাতে আমরা কাঠ ছুঁয়ে থাকি তা'ও ঠাণ্ডা হয়ে যায় না, আর আমরা মনে করি কাঠটাই ঠাণ্ডা নয়।

দূরের পাহাড় নীল দেখায় কেন?

আকাশটা নীল নয় একথা হঠাৎ কেউ বল্‌লে তাকে পাগল মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক উপরের দিকে তাকিয়ে আমরা যে নীল দেখ্‌তে পাই, তা আকাশের রঙ নয়, সে রঙ বাতাসের। বাতাসেরও নিজস্ব রঙ সেটা নয়, বাতাসের সঙ্গে নানা জিনিষের যে অসংখ্য অণু বা গুঁড়ো ভেসে বেড়ায় সূর্য্যালোকের সাতটি রঙের মধ্যে নীল রঙটি তাদের উপর প্রতিফলিত হয়ে নীল দেখায়। ঘরের মধ্যের বদ্ধ বাতাসে এই নীলকে যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তার কারণ অল্প স্থানের বাতাসের রঙে এই নীলের ভাগ অতি সামান্যই থাকে। বাইরের আকাশে এই নীলকে যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় তার কারণ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের গভীর বাতাসে এই নীল অণুগুলি প্রায় ৫০ মাইল জায়গা জুড়ে আছে; এই ৫০ মাইল বাতাসের রঙ একসঙ্গে জড়ো হয়ে ঘন দেখায়। পাহাড়ে দেশে গেলেই লক্ষ্য করা যায় দূরের পাহাড়গুলি নীল দেখায়। এটা যে পাহাড়ের রঙ নয়, কাছে গেলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই নীল রঙও বাতাসেরই রঙ। দূরের পাহাড় অনেকখানি বাতাসের মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে বলে' সেই অনেকখানি বাতাসের রঙ ঘন হয়ে

পাহাড়ের সত্যকার রঙকে আড়াল করে' দেয়, এবং দূরের পাহাড় মাত্রকেই আমরা নীল দেখি। পাহাড় নীল দেখাবার এ ছাড়া অন্য কারণও কিছু কিছু থাকে।

জলকে যত খুসি গরম করা যায় কি না?

ঠাণ্ডা জলকে উনানে চড়ালে আস্তে আস্তে তা গরম হ'তে থাকে। উনানের জাল খুব বেশী থাকলে জল বেশী তাড়াতাড়ি গরম হ'তে থাকে। কিন্তু যত বেশীক্ষণ জাল দেওয়া যাবে তত বেশী গরম হবে, এটা ঠিক নয়। গরমের একটা মাত্রা বা সীমা আছে যেখানে পৌঁছলে আর যত জালই দেওয়া যাক্ জলের গরম এক রকমই থাকে। এ রকম কেন হয়? জলের গরম সেই মাত্রায় পৌঁছবার পর জল আর তরল অবস্থায় থাকতে পারে না, বাষ্প হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। যতক্ষণ তরল অবস্থায় থাকে ততক্ষণ ঐটুকুর বেশী গরম কিছুতেই তাকে করা যেতে পারে না, করতে গেলেই সে উবে গিয়ে ফুরিয়ে যেতে থাকে। উনানের উপর জল কমতে আরম্ভ করলেই বুঝতে হবে এই গরমের শেষ মাত্রায় জল এসে পৌঁছেছে, যে-কোনো দরকারে তাকে এখন নামিয়ে নিলেই চলে।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু
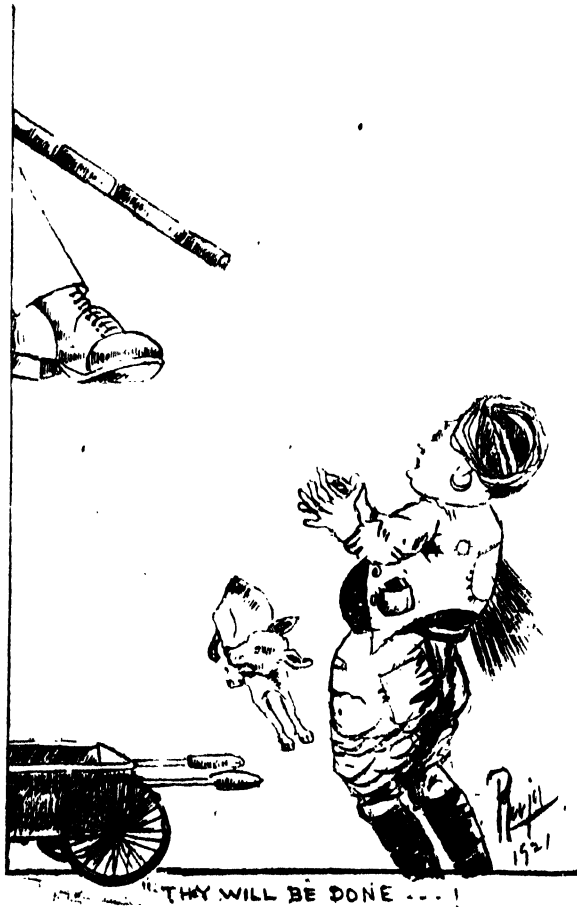
"সাধে কি বালা বলি—"

চিত্রকর শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ।

কান্ত-কবির জন্মস্থান ও জন্ম-তারিখ

গত ভাদ্রমাসের 'প্রবাসী'তে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম,-এ, সি,-আই,-ই মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত "কান্ত-কবি রজনীকান্ত" নামক চরিতপুস্তক সমালোচনার এক স্থানে একটি ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"রাজসাহীতে জন্মিলে কি হয়, রজনী বাবু যেমন সমস্ত বাঙ্গালার কবি, কুমার শরৎকুমারও সমস্ত বাঙ্গালার সম্পত্তি।"

"১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে কান্ত-কবি রজনীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন।" —'কান্ত-কবি রজনীকান্ত' ১ম পরিচ্ছেদ ১ম পৃষ্ঠা।

কবির জন্ম-তারিখ লইয়া নলিনী-বাবুও আবার একটু ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রমাণ—ঢাকা হইতে প্রকাশিত ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রতিভায়" 'রজনীকান্তের আত্মজীবন' শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহার ৬৬ পৃষ্ঠায় আছে—"বাঙ্গালা ১২৭২ সালের ১৭ই শ্রাবণ ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে আমার জন্ম হয়।" কাহার কথা সত্য? নলিনী-বাবু বোধহয় 'প্রতিভার' প্রবন্ধ পড়েন নাই।

পিতার আমল হইতেই রাজসাহীতে রজনীবাবুদের বাসা ছিল এবং তিনি একরূপ সারাটা জীবন রাজসাহীতেই কাটাইয়াছেন ইহাই বোধহয় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রমাদের মূল সূত্র।

শ্রী রাধাচরণ দাস
রজনীকান্ত পাঠাগার, পাবনা।

—

শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ

গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে খাণ্ডোয়া-প্রবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনীতে, নৈহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ মহাশয়কে 'স্বর্গীয়' বলিয়া উল্লেখ করায় যে ভুল হইয়াছিল, আশ্বিনের প্রবাসীতে তাহার প্রতিবাদ পড়িয়া যেমন লজ্জিত হইলাম তেমনি সুখী হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী-প্রসঙ্গে তিনি আমায় তাঁহার সমসাময়িক, পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী, মধ্যপ্রদেশ-প্রবাসী নেতৃস্থানীয়-গণের নাম লিখাইবার কালে হোসঙ্গাবাদ-প্রবাসী বাঙ্গালী হরিদাস বাবুর নাম "Late Babu Haridass Ghose of Naihati" এইরূপ লিখাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তখন পূর্ব্বের কয়েকজন স্বর্গীয় ব্যক্তির নামের সঙ্গে উল্লেখ করিতে গিয়া এই ভুলটি হইয়াছে। আমার খসড়া নোটের মধ্যে দেখিলাম লেখা আছে

5. Late Rai Bahadur Bhutnath Dey of Raipur. 6. Late Rai Bahadur Tara Das Banerjee of Raipur. 7. Late Babu Haridas Ghose of Naihati of Hushangabad.

যাহা হউক ভুলের জন্য আমি হরিদাস-বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং এই ভুলটি উপেক্ষা না করিয়া কিরণ-বাবু প্রমুখ যাঁহারা তাহা সংশোধিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। যদি সকল প্রবাসী ভদ্রসন্তান এইরূপে "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থকে নির্ভুল করিবার পক্ষে সহায়তা দান করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। যাহা হউক কৈফিয়ৎ দিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। শ্রদ্ধাস্পদ হরিদাস-বাবুকে এই উপলক্ষে সানন্দে জানাইতেছি যে দেশের প্রাচীন সংস্কার অনুসারে এক্ষণে তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি পাইবার কথা, এবং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি হরিদাস-বাবুর ন্যায় বিদেশে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব বৃদ্ধিকারী কৃতী বাঙ্গালীদের দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

২০—৯—২২

—

শেরপুর মূর্চা ও করতোয়া

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে "বাঙ্গালায় স্বাধীন জমিদারদের পতন" শীর্ষক একটি উপাদেয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বহু উপকার করিয়াছেন এবং পাঠকগণকে প্রবন্ধে উল্লিখিত নদী খাল ও গ্রামের স্থান নির্দ্দেশ ও বর্ণনা করিয়া পাঠাইতে আহ্বান করিয়াছেন। তাই শেরপুর মূর্চা এবং করতোয়া নদীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

শেরপুর মূর্চা গ্রামটি বগুড়া টাউন হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত; করতোয়ার তীরবর্ত্তী। ১৫৯৫ খ্রীঃ আইন-ই-আকবরীতে ইহা একটি দুর্গের অবস্থিতি-স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই দুর্গের নাম আকবরের পুত্র সেলিমের (যিনি পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর আখ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন) সম্মানার্থ 'সেলিমনগর' বলিয়া পরিচিত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গ জয় হওয়ার ও ঢাকায় শাসন-কেন্দ্র সংস্থাপনের পূর্ব্বে এই নগর সীমান্ত প্রদেশের একটি প্রধান স্থান ছিল বলিয়া আবুল ফজল এবং অন্যান্য মুসলমান লেখকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই-সকল গ্রন্থে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত সেরপুর দশকাহনীয়া হইতে পৃথক করার নিমিত্ত ইহা শেরপুর মূর্চা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পারস্য ভাষায় মূর্চা অর্থে Battery, দুর্গের বপ্র, বুরুজ।

দিল্লির সম্রাট্ সেরসার নাম হইতে এই নগরের নাম উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ কথিত হয়। মানসিংহ ১৫৮৯ খৃঃ হইতে ১৬০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত সম্রাট্ আকবরের বঙ্গদেশীয় সেনাগণের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি সেই সময় শেরপুরে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা ভনডেনব্রুক বঙ্গদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে বোয়ালিয়া হইতে পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকে যে দীর্ঘ পথ বর্ত্তমান রাজসাহী, পাবনা বগুড়া এবং রঙ্গপুর জেলা হইয়া আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে, তাহাতে পার্শ্বস্থ তৎকালীন প্রধান তিনটি নগরের নাম দৃষ্ট হয়, তাহার অন্যতমটি এই শেরপুর।

শেরপুর মূর্চা মেহমানসাহী পরগণার হেড-কোয়ার্টার ছিল। ইহার রাজস্ব ২,২০৭,১১৫ দাম।

মোগলশাসনকর্ত্তা সাহাবাজখাঁর সুবেদারীর সময়ে শেরপুর মুর্চার উল্লেখ দেখা যায়।*

নাটোরে রঘুনন্দনের পর রামজীবনের বিস্তৃত রাজ্যের তিন স্থানে তিনটি প্রধান রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই তিনটির একটি নাটোরে, একটি বড়নগরে ও একটি শেরপুরে। এখানে রাজসাহী রাজ্যের কাছারী "বারদারী কাছারী" নামে অভিহিত হইত। এই কাছারীতে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় হইত। অদ্যাপি কাছারীর স্থানটি বারদুয়ারী নামে খ্যাত।

বর্ত্তমানে এই শেরপুর বগুড়া জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান। এখানে মিউনিসিপালিটি, হাই স্কুল, হাসপাতাল, পোষ্ট টেলিগ্রাফ অফিস, রেজেষ্টি অফিস ইত্যাদি আছে এবং ইহা বহু সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা অধ্যুষিত। দুঃখের বিষয় স্থানটির স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ।†

করতোয়া বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন নদী। অধুনা জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, দিনাজপুর বগুড়া জেলা দিয়া প্রবাহিত।

মহাভারতে প্রথমে আমরা করতোয়ার পরিচয় পাই। মহাভারতের যুগে যখন ব্রহ্মপুত্র নদ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়া হিমালয়ের পাদ-বিধৌত সাগরের সহিত মিলিত ছিল, তখন করতোয়া নদী তীর্থরূপে পূজিত হইত।‡ সে সময়ে বগুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্ত সাগর-জলে প্রক্ষালিত হইত এবং করতোয়া এই খানেই সাগরের সহিত মিলিত ছিল। মহাভারতেও মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব পাঠে ইহা বেশ উপলব্ধি হয়।

মিঃ ওডোলেন লিখিয়াছেন,—"করতোয়া এককালে আকারে প্রথম শ্রেণীর নদী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এই জেলার বহু নদী অপেক্ষা অল্পপরিসর ও অগভীর। এই জেলার দুই প্রকার বিভিন্ন মৃত্তিকার সত্তার বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা ভূতত্ত্বের একটি অত্যন্ত রহস্য-জনক ব্যাপার। এই উভয় প্রকারের মৃত্তিকা পাশাপাশি অবস্থিত, কিন্তু সম্পর্কবিহীন এবং একের ধ্বংসে অন্যের কোন অংশই গঠিত নহে। সাধারণতঃ এই দুই মৃত্তিকা করতোয়া নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ ইহা অনুমান হয় যে, এই উভয় প্রকারের মৃত্তিকা—যেস্থানে গঙ্গা-বিধৌত মৃদ্ভাগ পূর্ব্বদিক হইতে ব্রহ্মপুত্র-গঠিত বদ্বীপের সহিত (এই গঙ্গা-ধৌত মৃদ্ভাগ ও ব্রহ্মপুত্র-গঠিত বদ্বীপই বঙ্গের পলি-মিশ্রিত সমভূমি) মিলিত হইয়াছে, তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে। এইরূপ হইলেই এই সংযোগ-রেখা হইতে প্রথমতঃ একটি বৃহৎ মোহনা ও তৎপরে একটি বৃহৎ নদীর সত্তার কল্পনা আমাদের মনে উদিত হয়। মোহনা (Estuary) গঠনের যুগ এক্ষণে স্মরণাতীত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যদিও ইহার সত্তার বিষয় 'ক্ষীয়ার' মৃত্তিকার নিম্নবর্ত্তী বালুকা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু করতোয়া নদী-খাতে অথবা ইহার নিকটে যে এককালে একটি বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত—তাহা কিম্বদন্তী দ্বারা এবং এই জেলা, ইহার উত্তরস্থিত রঙ্গপুর জেলা এবং দক্ষিণবর্ত্তী পাবনা জেলার বর্ত্তমান অবস্থান দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহার আকার এত বৃহৎ ছিল যে, ইহা পুরাণে গঙ্গার ন্যায় পূত-সলিলা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত Von den Bruke কৃত বঙ্গদেশের মানচিত্রে করতোয়া একটি বৃহৎ নদী রূপে এবং ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংযুক্ত চিহ্নিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার মানচিত্র আমরা বিশ্বাস করি, কেননা বঙ্গের এই অংশের পথ এবং নগর প্রভৃতি তৎকৃত মানচিত্রে সঠিক আছে।" *

করতোয়া নদীর পূর্ব্বদক্ষিণ ভূভাগ যে সাগরোত্থিত এই-সকল বিবরণ হইতে অনুমান করা কঠিন নহে। সাগরের ক্রমে নিম্নাভিমুখে গতি পরিবর্ত্তনের সহিত নদীসকলও তদনুগমন করিয়াছে। সেই জন্যই অদ্যাপি সুন্দরবনে করতোয়ার অস্তিত্বের পরিচয় পাই। করতোয়া তৎকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ দিয়া হরিণ-ঘাটার নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল। এখনও সুন্দরবনে করতোয়া নাম্নী একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে। মাথাভাঙ্গা করতোয়ায় ছিন্নদেহ বলিয়া বোধ হয়। করতোয়া হইতে দক্ষিণ বঙ্গের কুমার, ইচ্ছামতী, চূর্ণী, নবগঙ্গা বাহির হইয়াছিল। করতোয়া উপর দিক হইতে বিলুপ্ত হইলে এইসকল নদী গঙ্গার সংশ্রবে আসিয়াছে। এই-সকল স্মরণাতীত-কালের ঘটনা।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীন দেশীয় পরিব্রাজক অনু য়ুয়ন চয়ঙ্‌ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে 'ক—লো—তু' নামে একটি বিশাল নদী অতিক্রম করিয়া কামরূপ রাজ্যে গমন করেন। 'ক—লো—তু'ই করতোয়া।†

বক্তিয়ার খিলিজি কামরূপ আক্রমণ করিবার সময় গঙ্গার অপেক্ষা তিনগুণ গভীর ও বিস্তৃত এক বিশাল নদী তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় বলেন—"নদীর নাম বাগমতী, নাশিরী গ্রন্থের অনেক খণ্ড মিলাইয়া এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। * * * বাগমতীই করতোয়া।"‡

আসামের ইতিহাস প্রণেতা মাননীয় গেইট সাহেবের মতে ঐ নদী করতোয়া।

"It (Karutoa) is mentioned in the Yogini Tantra as the ancient boundary of the Kingdom of Kamrup and it was along its bank Baktyar Khilizi marched on his ill-fated invasion of Tibet. In the narrative of that expedition, it is described as being three times the width of the Ganges. It was no doubt the great river crossed by Hi-enyang on his way to Kamrupa and by Hussin Shah on his invasion of the same country. It is shown in Von den Bruke's map (1660) as flowing into the Ganges."§

পণ্ডিতবর ব্লকম্যান সাহেবও ঐ নদীকে করতোয়া বলেন।

"He (Muhammad Bakhtyar) seems to have set out from Lakhnauti or Debkot under the guidance of one Ali, who is said to have been a chief of the Mech tribe, and marched to Bardhankot (Vardhankuti). From the way in which Minhaj mentions this town, it looks as if it had lain beyond the frontier of Muhammad Bakhtyar's possessions, though

* History of India, by Sir Elliot, Vol. VI, p. 77.

† (রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৭ অতিরিক্ত সংখ্যা)

‡ মৎপ্রণীত সেরপুরের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

* Statistical Account of Bengal, Bogra Dt. vol. VIII, page 138—139.

† মৎপ্রণীত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও করতোয়া, ২৫ পৃষ্ঠা।

‡ রিয়াজ-উস-সালাতিন (বঙ্গানুবাদ) ৫২ পৃষ্ঠা।

§ Cencus Report, Bengal, 1901.

there is no doubt as to its identity. The ruins of Bardhon Koti lie due north of Baquru (Bogra) in Long. 89°28', Lat. 25°8'25", close to Govindganj on the Karatoya River."(১)

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে করতোয়ার সহিত গ্রীক বণিক্‌দের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। উহারা করতোয়া বহিয়া বাণিজ্য-পোতে তেজপাত ইউরোপে চালান দিত। (২)

বগুড়া সেরপুর হইতে ময়মনসিংহ সেরপুর পর্য্যন্ত এককালে করতোয়া বিস্তৃত ছিল। উত্তর সেরপুরের পারাপারের জন্য খেয়া নৌকায় দশ কাহন করিয়া কড়ি লাগিত। তাই ময়মনসিংহ সেরপুর দশ কাহনীয়া সেরপুর বলিয়া অভিহিত হয়। (৩)

যোগিনী তন্ত্র (৪) ও কালিকা পুরাণে (৫) করতোয়া বঙ্গ ও কামরূপের সীমারূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতে লিখিত আছে করতোয়া-তীরে ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। (৬)

স্কন্দপুরাণান্তর্গত পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়া-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে হরগৌরীর বিবাহকালে হিমালয়ের প্রদত্ত এবং হর-কর হইতে পতিত জলরাশি হইতে করতোয়া নদীর উৎপত্তি। (৭)

করতোয়া পৌণ্ড্রক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া প্রবাহিতা।

এই করতোয়াতেই বিখ্যাত পৌষনারায়ণী স্নান হইয়া থাকে।

এই-সমস্ত গ্রন্থে করতোয়ার বহু মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সে-সমস্ত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রী হরগোপাল দাসকুণ্ডু
মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। ১৩২৯, ৪ঠা ভাদ্র।

একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য

একটি খুব ছোট ছিদ্রপথে আলোকরশ্মি কি নিয়মে প্রবেশ করে তাহা যাঁহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন।

কিন্তু ইহাতে আর-একটি আশ্চর্য্যজনক রহস্য উপস্থিত হয়। আলোকতত্ত্ব যতদূর জানি তাহাতে এই ব্যাপারের উল্লেখ কোথাও খুঁজিয়া পাই না। বাস্তবিক যদি এই ব্যাপারটি পূর্ব্ব হইতেই আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রবাসীর পাঠকবর্গের কাহারও মধ্য হইতে ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। আর যদি আবিষ্কার না হইয়া থাকে তাহা হইলে পাঠকবর্গের মনোযোগ এ দিকে আকর্ষণ করি। রহস্যটি এই :—

একখানি পোষ্টকার্ড লও। একটি খুব সরু সেলাই করিবার ছুঁচ লইয়া কার্ডের কোন স্থানে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র কর। কার্ডখানি আলোকের দিকে ধর। এক চক্ষু বন্ধ করিয়া অপর চক্ষু কার্ডস্থিত ছিদ্রের অতি নিকট প্রায় লাগ-লাগ লইয়া আইস, এবং ছিদ্রটি দেখিবার চেষ্টা কর।

দেখিতে পাইবে ছিদ্রটি আকারে বড় দেখাইতেছে এবং উহা একটি নিখুঁত বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। আরও ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা কর। দেখিবে তোমার চোখের পাতার কতকগুলি চুল ঐ বৃত্তের মধ্যে দেখা যাইতেছে। চুলগুলি বড় ও মোটা (magnified) দেখাইতেছে। আরও ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে ঐগুলি উপর-পাতার চুল এবং বৃত্তের মধ্যে উল্টা (inverted) দেখাইতেছে।

হয়ত মনে করিতে পার ওগুলি চোখের পাতার চুল নহে, চক্ষু অত সন্নিকট থাকাতে দৃষ্টিবিভ্রম হেতু অন্য কিছু ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে। এ সন্দেহ দূর করিবার জন্য সেই ছুঁচটির (যাহা দিয়া ছিদ্র করিয়াছিলে) গোড়াটা ছিদ্রের ও চোখের মাঝে ধর। একটু চেষ্টা করিলেই বৃত্তের মধ্যে ছিদ্র-সমেত ছুঁচের গোড়ার একটি স্পষ্ট Magnified inverted image দেখিতে পাইবে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ছিদ্রপথে একখানি গোল ক্ষুদ্র ন্যুব্জ দর্পণ (concave mirror) বসাইলে যাহা সম্পন্ন হইত, এখানে কোনও দর্পণ না থাকা সত্ত্বেও তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ কেন হয়?

আশা করি শীঘ্রই এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

শ্রী সিদ্ধেশ্বর নন্দী

"তেল জলের" সম্বন্ধে

আশ্বিনের প্রবাসীতে "তেলে জলে" এই প্রতিবাদটি লিখিবার কোনও প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না, কেননা লেখিকার প্রতিবাদটিতেই একটি ভুল আছে, এবং শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু মহাশয়ের মীমাংসায় যে স্থানে ভুল দেখান হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোনও ভুল নাই।

লেখিকা বলিতেছেন, বিজয়বাবু যে তেলের নিম্নতল হইতে reflection হয় বলিয়াছেন, তাহা না হইয়া "তেলের নিম্নতলের নীচে অবস্থিত জলের উপরিতল থেকে" reflection হয় ইহাই হইবে। কিন্তু এই দুইটা একই জিনিস, ইহাদের একটিকে যদি ভুল বলা যায় তবে আর-একটি যে সত্য তাহাও প্রমাণ করা যাইবে না। বস্তুতঃ reflection তেলের ও জলের কোনও বিশেষ একটি বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত নহে। এই উভয়ের surface of separation হইতেই reflection হয়। এইজন্য একটির নিম্নতল ও আর-একটির উপরিতল যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারি, কোন্‌টি ভুল কোন্‌টি ঠিক এক্ষেত্রে তাহা বলা অসম্ভব,—প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এর সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে "পড়িয়া ধপ্‌ করিল, না ধপ্‌ করিয়া পড়িল।" এই দুইটা ঘটনাই যেমন coincident, তেল ও জলের এই দুই surfaceও তেমনিই coincident। এই জন্য দুইটা mediumএর surface of separation হইতে reflection হইল, বলাই ভাল। সাধারণ ক্ষেত্রে যখন বলি যে জলের উপর হইতে আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে বাতাস ও জলের এই দুই mediumএর surface of separation হইতে reflection হইয়াছে।

লেখিকা আর-একটি কথা বলিয়াছেন (অবশ্য ইহা সকলের না জানিবারই কথা) যে, ইস্পাতের surfaceএর রং সবই এক কারণে হয়; একে colour of thin plates বলে। কিন্তু ইস্পাতের surfaceএ

---

(১) J. A. S. B. 1875, No. III, page 282.

(২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যা ৫৩, ৫৪ পৃষ্ঠা।

(৩) J. A S. B. 1878—No. I, page 89 এবং লঘুভারত ৩য় খণ্ড গৌড়পর্ব্ব ১৩২ পৃষ্ঠা।

(৪) যোগিনীতন্ত্র ১১শ পটল ১৭।১৮ শ্লোক।

(৫) কালিকাপুরাণ ৩৮।১২।

(৬) মহাভারত বনপর্ব্ব ৮৫ অধ্যায়।

(৭) মৎপ্রণীত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও করতোয়া দ্রষ্টব্য।

রং colour of thin plates-এর principle অনুসারে হয় না, যদিও এপর্য্যন্ত সমস্ত আলোক-বিজ্ঞানের পুস্তকে উহাই লেখা আছে। অধুনা Dr. C. V. Raman প্রমাণ করিয়াছেন যে ঐ রং Diffraction-এর দরুণ হয়, ইতিপূর্ব্বে যে কারণ দেখান হইত (colour of thin plates এর principle অনুযায়ী) তাহা যথাথ নহে। "Nature" পত্রের গত ফেব্রুয়ারী মাসের একখানি সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রী অনিলকুমার দাস বি-এস্‌সি

—

শাস্ত্রে ভাইদ্বিতীয়া

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় "শারদীয় উৎসব" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "ভাইদ্বিতীয়া পর্ব্বটির নাম ও বিধিবিধান পুরাণ ও স্মৃতিতে পাই না।" কিন্তু লিঙ্গপুরাণে ইহার বিধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা :—

"কার্ত্তিকে তু দ্বিতীয়ায়াং শুক্লায়াং ভ্রাতৃপূজনং।
যা ন কুর্য্যাৎ বিনশ্যন্তি ভ্রাতরঃ সপ্তজন্মনি॥"

শ্রী রবিকিঙ্কর ঘটব্যাল

—

মুদ্রারাক্ষসের ভ্রমসংশোধন

এই আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে মৎপ্রণীত "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" পুস্তকের যে সমালোচনা হইয়াছে, তাহাতে অনবধানতাবশতঃ একটি গুরুতর ভুল হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমি পাগল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে আমার গ্রন্থের কোন স্থানেই এরূপ উক্তি নাই। কোন ব্যক্তি নিজে পাগল না হইলে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথকে পাগল বলিতে পারে না। আমাকে পাগলা গারদে পাঠাইবার জন্য সমালোচকের এরূপ আগ্রহাতিশয্য কেন বুঝিতে পারিলাম না। আমার পুস্তকের ১১শ পৃষ্ঠায় আছে—"এস্থলে কেহ হয়ত বলিবেন, যাঁহারা নাটক নভেল পড়েন তাঁহারা সেগুলিকে গল্প বলিয়াই মনে করেন, ও তাহার দ্বারা সাময়িক আমোদ অনুভব করেন মাত্র। তাহা তাঁহাদের জীবনে কার্য্যে পরিণত করিবেন, এরূপ পাগল সংসারে কয়জন আছেন ?

"এরূপ পাগল যে একেবারেই নাই, একথা বলা যায় না। এসম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রমাণ। তাঁহার চোখের বালির নায়িকা বিনোদিনীর সহিত বেহারীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—ইত্যাদি।"

উদ্ধৃতাংশ পড়িয়া কি কেহ মনে করিতে পারেন যে আমি রবীন্দ্রনাথকে পাগল বলিতেছি ? যাঁহার বাঙ্গলা ভাষার সামান্য জ্ঞান আছে তিনিও "প্রমাণের" মানে "দৃষ্টান্ত" বুঝিবেন না। "আমি সেক্ষপীয়ার পড়িতেছি" বলিলে একজন স্কুলের বালকও সেক্ষপীয়ার রচিত গ্রন্থ বুঝিবে, সেক্ষপীয়ার নামধারী ব্যক্তিবিশেষকে বুঝিবে না। "রবীন্দ্রনাথ আমার প্রমাণ" ইহার অর্থ রবীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থ আমার প্রমাণ ইহা সহজেই বুঝা যায়। আর তাহার পরেই রবীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থ "চোখের বালি" হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যদি কেহ বলে, "মানুষ অর্থলাভের দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া স্বগৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত পূজনীয় অতিথিকেও বধ করিতে পারে, এ সম্বন্ধে (ম্যাক্‌বেথ্‌-প্রণেতা) মহাকবি সেক্ষপীয়ার আমার প্রমাণ"—এস্থলে সেক্ষপীয়ারকেই নরহন্তা বলিয়া বুঝিতে হইবে কি ?

যাহা হউক আর বেশী বাড়াইব না। আশা করি সমালোচক মহাশয় আমাকে পাগলা গারদে পাঠাইবার আবশ্যকতা হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।

শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ

—

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ভ্রমসংশোধন

ভাদ্র মাসের প্রবাসীর ৬৬৫ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের শেষ লাইন ও ২য় স্তম্ভের প্রথম লাইনে দেখিলাম মুদ্রিত আছে "ভূতপূর্ব্ব সময় সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস"। লেখক এই ভূতপূর্ব্ব শব্দ 'সময়ের' বিশেষণ ভাবে (ভূতপূর্ব্ব 'সময়') অথবা সম্পাদকের বিশেষণ ভাবে (ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐ উভয়ভাবেই উহা অশুদ্ধ, কারণ সন ১২৯০ সালের বৈশাখ হইতে এখনও 'সময়' বাহির হইতেছে কোনদিন বন্ধ হয় নাই এবং এখনও "ভূতপূর্ব্ব" হয় নাই, এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসই সেই অবধি একাল পর্য্যন্ত সম্পাদকতা করিতেছে এখনও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক হয় নাই। ঐরূপ ভ্রমসংবাদ প্রকাশে আমাদের অনিষ্ট হইতে পারে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস

পরমাণু-জগতের আধুনিক পরিকল্পনা

নিখিল বস্তুর সূক্ষ্ম সত্তা পরমাণু। পরমাণুর গর্ভে, কেন্দ্রস্থলে একটি জড় বীজ (nucleus) আছে, তাহাতে ধন-তাড়িত ও ঋণ-তাড়িত উভয়বিধ তাড়িতই বর্ত্তমান ; কিন্তু ধন-তাড়িতের মাত্রা সমধিক, এজন্য এই তাড়িতবীজটিতে ধনতাড়িতের প্রাবল্যই রহিয়া গিয়াছে, কারণ, তাড়িত-বিজ্ঞান মতে সমপরিমাণ ধনতাড়িত ও ঋণতাড়িত উভয়ে সম্মিলিত হইয়া নিষ্ক্রিয় বা neutral হয়। সমগ্র পরমাণুর মোট তাড়িত-মাত্রা দ্বি-সংখ্যক হইলে বীজটিতে তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ একক পরিমাণ থাকিবেই থাকিবে। বীজ ভিন্ন পরমাণু-গর্ভে ইলেক্‌ট্রন্ বা ইলেক্‌ট্রনের গুচ্ছ অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তাহারা তাড়িতবীজের পারিপার্শ্বিকরূপে বিন্যস্ত। ইলেক্‌ট্রন্ বা তাড়িত-রেণুগুলির সমষ্টিতে

তাড়িতবীজের সমান-সংখ্যা ঋণ-তাড়িত বর্ত্তমান আছে, এজন্য পরমাণুটি তাড়িতধর্ম্মী হইয়াও নিষ্ক্রিয় (electrically neutral), জলজানে একটি, হিলিয়মে দুইটি, লিথিয়মে তিনটি, ত্রপুলে (tin) পঞ্চাশৎটি তাড়িত-রেণু বর্ত্তমান আছে, ইত্যাদি; সুতরাং উহাদের তাড়িত-বীজেও উক্ত ইলেক্‌ট্রন্‌-সংখ্যানুক্রমে তাড়িত-মাত্রা বর্ত্তমান, যথা জলজানে এক, হিলিয়মে দুই, লিথিয়মে তিন, ত্রপুলে পঞ্চাশ, ইত্যাদি।

সৌরজগতে গ্রহাদি যেরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ও উপগ্রহাদি গ্রহের চতুর্দ্দিকে নিজ নিজ বৃত্তাভাস-কক্ষে বিশিষ্ট গতিতে বেশ একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, বস্তুর সূক্ষ্মজগৎ পরমাণুর মধ্যে তাড়িত-রেণুসমুদয়ও তাড়িতবীজটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া বিভিন্ন বৃত্তাভাস-কক্ষে প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণায়মান আছে। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের দুই বা ততোধিক সংখ্যাও কোন বিশিষ্ট বিন্যাসধর্ম্মী হইয়া একটি কক্ষে থাকিতে পারে; ইলেক্‌ট্রন্‌গুলির পরস্পর সম্মিলিত সংযুক্ত অবস্থায় থাকা অসম্ভব, কারণ উহারা সমতাড়িত-বিশিষ্ট হওয়ায় পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হইতেছে। তাড়িত-রেণু প্রত্যেকেই সম-আয়তন ও সম-গুরুত্ববিশিষ্ট এবং সমধর্ম্মী। পরমাণুগর্ভস্থ এই দুইটি সত্তা ভিন্ন তৎগর্ভে আর কিছুই বর্ত্তমান নাই, অবশিষ্ট ব্যোমেতে পরিপূর্ণ বা vacuum, শূন্য। পরমাণুর মধ্যে তাড়িত-শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে, সে শক্তির বা sub-atomic energyর পরিমাণ অত্যন্ত বেশী,—যেন একটা বিরাট্‌ শক্তিই পরমাণু-আধারে নিহিত আছে। পরমাণুসম্পুট যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

সৌর জগতে সূর্য্য যে-কোন গ্রহ-উপগ্রহ অপেক্ষা গুরুত্বে ও আয়তনে বিশাল; তাহার অনুরূপ পরমাণু-জগতে, তাড়িত-বীজ তাড়িত-রেণু অপেক্ষা গুরুত্বে অত্যধিক হইলেও আয়তনে সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রতর। পরমাণুর ব্যাসের তুলনায় তাড়িত-বীজ অতি ক্ষুদ্র, বোধ হয় তাহার লক্ষাংশের একাংশ স্থান-ব্যাপী, যেমন পৃথিবী সৌর-জগতের লক্ষাংশের একাংশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে পরমাণুর গুরুত্ব এই তাড়িত-বীজেই রহিয়া গিয়াছে; তাড়িত-রেণুর গুরুত্ব তাহার তুলনায় নগণ্য!

শ্রী ক্ষেত্রমোহন বসু

অকাল বন্যা

পথ ভুলে আজ আশ্বিনে কোন্‌
　　শ্রাবণ এল সর্ব্বনাশী,—
ঘোর প্লাবনে ভাসিয়ে দিল
　　সুখ-শরতের সকল হাসি।
অপ্‌রাজিতার নাই নিশানা,
　　শিউলী-তলায় সাঁতার অ-থই;
বোধন-দিনে দেশাত্মা অই
　　রোদন করে ব্যথায় কতই!

ধানের দেশের ধানের ক্ষেতে
　　একটি ধানের গাছ দেখি না,
আর কিছু নেই চারদিকে এই
　　শুধুই বানের ধমক বিনা।
ঘর-বাড়ী সব ভাস্‌ছে জলে,
　　'মরাই' 'গোলা' যাচ্ছে ভাসি,
আশ্বিনে মোর অভাগ্য দেশ
　　ঘর-হারা আজ উপবাসী!

হাট ডুবেছে, বাট ডুবেছে,
　　কোথায় দাঁড়ায় মানুষ-গরু,
পুরুষ কাঁদে পৌরুষ-হীন,—
　　বে-আব্রু অন্দরের জরু।
কোথায় আছে রেলের সড়ক,
　　কোথায় কাছে শুকন ডাঙা,
সেই খোঁজে আজ ব্যস্ত সবাই,—
　　চক্ষু সবার ঝাপ্‌সা রাঙা।
পথ ভুলে হায় আশ্বিনে কোন্‌
　　শ্রাবণ এল সর্ব্বনাশী,—
বাঙ্‌লা-দেশের কাঙ্‌লা মানুষ,
　　মুছায় কে তার অশ্রুরাশি?
চক্ষু মেলে চাও ধনবান,
　　হে সহরের সৌধবাসী,
দু-এক মুঠি, দু-এক কণা,
　　দাও যা-পারো ভালোবাসি'!

আশ্বিন, ১৩২৯।　　শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বাংলাদেশের বালিকাদিগের নিম্নশিক্ষা

শৈশবশিক্ষা

বালিকাদিগের শৈশবশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি শ্রীমতী মন্টে-সরীর শৈশবাশ্রমের অনুকরণে গঠিত হওয়া উচিত, এবং এখানে কোন প্রকার বর্ণবিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আশ্রমের আস্‌বাব্‌পত্র গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবহার্য্য আস্‌বাব্‌-পত্রের অনুরূপ হইবে। শিক্ষয়িত্রী বড় একটি চৌকী অথবা বেদীর উপর গালিচা বিছাইয়া উপবেশন করিবেন; ছাত্রীরা প্রত্যেকে মেজের উপর নিজ নিজ ছোট ছোট আসনে উপবেশন করিবে, এবং প্রত্যেকের সম্মুখে একএকটি ছোট ডেস্ক্‌ থাকিবে। স্ত্রীশিক্ষার সকল স্তরেই বিদ্যালয়ের আস্‌বাব্‌ এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মন্টেসরীর উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির শিক্ষা হইবে, এবং তাঁহারই প্রণালী অনুসারে মাতৃভাষা, গণনা, যোগবিয়োগ গুণভাগের অঙ্ক, অঙ্কন, ব্যায়াম, ক্রীড়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার বিষয়-নির্ঘণ্টে যথোপযুক্ত স্থান অধিকার করিবে।

মন্টেসরীর প্রণালী ও শিক্ষা-সরঞ্জাম।

এরূপ শিক্ষা আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। এইজন্য মন্টেসরীর প্রণালী ও শিক্ষা-সরঞ্জামের (didactic materials) কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে। প্রণালীটি পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ-মূলক একটি সুব্যাখ্যাত ধারাবাহিক মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমাদের দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, উহার বাহ্য পরিবর্ত্তন খুব কষ্টসাধ্য হইবে না।

এ সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষ মুনি-ঋষির দেশ;—সন্ন্যাসী-ফকিরের সম্মান এখানকার একটি মৌলিক বিশেষত্ব। দারিদ্র্য এখানে গৌরবের বস্তু;—পাপও নয়, ঘৃণার বিষয়ও নয়। এই নিমিত্ত মন্টেসরীর শিক্ষা-সরঞ্জামগুলি আমাদের দেশের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইলে, সেগুলি যাহাতে খুব কম মূল্যে পাওয়া যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম বিদেশ হইতে এই দ্রব্যগুলি আমদানি করিতেই হইবে। কিন্তু যে-কোন শিক্ষাসঙ্ঘের চেষ্টায় এই দ্রব্যগুলি খুব অল্পমূল্যেই, বোধ হয়, এই দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে। শিক্ষা-সরঞ্জাম দেশের অবস্থার অনুকূল হওয়া আবশ্যক। বহুদিন যাবৎ শিক্ষার সহিত সংযুক্ত থাকিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, আমরা শিক্ষকেরা বাধ্য হইয়া মূল্যবান শিক্ষা-সরঞ্জামের ভিতর দিয়া বালকদিগের বিলাসিতা পরোক্ষ ভাবে বর্দ্ধিত করিয়া তুলি। এই বিষয়টিতে শিক্ষিত সমাজের ও দেশীয় শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি যথোপযুক্ত রূপে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বিদেশী জিনিষের ব্যবহারে বণিকদিগের অর্থাগমের পথ বিস্তৃত হয় বটে, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া দেশের অযথা অর্থনাশ ও শিক্ষার্থীদিগের বিলাসিতা বর্দ্ধিত হইতেছে। যে দেশে দারিদ্র্য ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত, সে দেশে শিক্ষা-সরঞ্জামে বিলাসিতার বাড়াবাড়ি মোটেই শোভা পায় না; এবং এরূপ মহার্ঘ সরঞ্জাম দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যের অনুকূল হইতে পারে না।

প্রকৃতির শিক্ষাপ্রণালী।

ক্রীড়া শৈশবশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এই ক্রীড়াই প্রকৃতির শিক্ষাপ্রণালী। ইহার ভিতর দিয়া বালিকাদিগকে গৃহস্থালীর প্রাথমিক শিক্ষা খুব সহজেই প্রদান করা যাইতে পারে। তাহারা "ঘরকন্না" "বৌ বৌ" ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলা দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনের অনুকরণ করিয়া খুব আনন্দ লাভ করে। এরূপ খেলায় উৎসাহ প্রদান করিলে ধর্ম্মাচরণ, গৃহস্থালীর অনেক ছোট ছোট কাজ, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার খুব প্রয়োজনীয় তত্ত্বগুলি অনায়াসেই ব্যবহারের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা-সুলভ ক্রীড়ার সহিত প্রতিমাগঠন

(modelling) সুচিন্তিত উপায়ে সংযোগ করিয়া দিলে, প্রাথমিক কর্ম্ম শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া শৈশবশিক্ষাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবে।

কুমার-কানন ও শৈশবাশ্রম।

দেশীয় শিক্ষাবিভাগের কুমারকানন (kindergarten) পদ্ধতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। তাই কুমার-কাননের স্থানে শৈশবাশ্রম প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। ফ্রবেল যে শিক্ষা-নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহার কুমারকানন-প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক সংস্কার হইয়া গিয়াছে। যেখানে কুমারকানন শিশুশিক্ষার স্বাভাবিক উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে, সেইখানেই শিক্ষক-সমাজে শৈশবাশ্রম শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুশিক্ষায় মণ্টেসরীর একাধিপত্য স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা খুব অধিক। কর্ম্মের সাহায্যে শিক্ষা এবং শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা,—ফ্রবেলের কিণ্ডারগার্টেন্ প্রণালীর মূলভিত্তি। কিন্তু পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে, মণ্টেসরী যেমন প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই দুইটি তত্ত্ব, তাঁহার স্বশিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ফ্রবেল নিজেও সেরূপ কৃতকার্য্য হন নাই, তাঁহার শিষ্যবর্গও এ বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাই বর্ত্তমান সময়ে মণ্টেসরীর এত আদর; এবং এই পরিবর্ত্তন অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আমাদের কুমারকাননও নাই, আর শৈশবাশ্রমও নাই;—ইহাদের যে-কোন একটিকে দেশের উপযোগী করিয়া শৈশব-শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় পাশ্চাত্য দেশসমূহের অভিজ্ঞতার উৎকৃষ্টতম ফলগুলিই অনুকরণ করা সুবিবেচনার কার্য্য। বিষয়টি জটিল; এই নিমিত্ত এই প্রবন্ধে ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনার বিষয় হইতে পারে না।

আদ্যশিক্ষার পাঠ্য বিষয়।

বালিকাদিগের আদ্যশিক্ষার কাল আট বৎসর হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। কিন্তু বালকদিগের এরূপ শিক্ষার কাল ছয় বৎসর হইতে দশ বৎসর এবং তাহাদিগের নিম্ন শিক্ষার কাল সাধারণতঃ চোদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। বালিকাদিগের আদ্যশিক্ষায় এই সময় পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক। বাংলা দেশের পর্দ্দা সত্ত্বেও, এই বয়সে স্ত্রী-শিক্ষায় অন্য প্রকার সামাজিক অন্তরায় নাই। এই কারণে এই কালটিকে স্ত্রী-শিক্ষার একটি নির্দ্দিষ্ট স্তররূপে গ্রহণ করিয়া এই সময়ের শিক্ষাকে এই বয়সের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই নিমিত্ত বালিকা-দিগের আদ্যশিক্ষা কতকটা বালকদিগের নিম্নশিক্ষার (elementary education) মতই হওয়া উচিত।

আদ্যশিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।—

(ক) নীতি ও ধর্ম্মাচরণ।
(খ) গৃহস্থালীর কর্ম্ম।
(গ) কুটীর-শিল্প।
(ঘ) চিত্রাঙ্কণ।
(ঙ) কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীত।
(চ) প্রতিমা গঠন।
(ছ) ব্যাবহারিক বিজ্ঞান।
(জ) ভূগোল ও ইতিহাস।
(ঝ) ব্যাবহারিক গণিত।
(ঞ) মাতৃভাষা ও সাহিত্য।

(ক) নীতি ও ধর্ম্মাচরণ।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নীতি ও ধর্ম্মাচরণ বিশেষ ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক। উপদেশ, ধর্ম্ম সঙ্গীত, নিয়মিত স্তোত্র পাঠ, পূজা, ব্রতনিয়মপ্রতি-পালন, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতির সাহায্যে, গৃহ ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতায়, এই শিক্ষা পরিচালন করার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইবে। এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হইতে পারে। এই শিক্ষা সকল ধর্ম্মের মেয়েদের উপযোগী করিয়া সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে দিতে হইবে।

(খ) গৃহস্থালীর কর্ম্ম।

গৃহমার্জ্জনা, শয্যারচনা, গুরুজনের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, বস্ত্র পরিষ্কার করা, দুধ জ্বাল দেওয়া, ছোট ছোট ভাই-ভগ্নীর যত্ন, গৃহপালিত পশুপক্ষীর তত্ত্বাবধান, রন্ধন-

শালার কর্ম্মে সাহায্য প্রদান, এবং সাগুবার্লি চা জল-খাবার পান ইত্যাদি ছোট ছোট জিনিষ প্রস্তুত করা,—এই বয়সের উপযোগী গৃহস্থালীর কর্ম্ম। বিদ্যালয়ে অনেক স্থলেই এরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত সহজ হইবে না। সেই জন্যই এই শিক্ষায় গৃহ ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতা বিশেষ ভাবে আবশ্যক হইবে। ধর্ম্মাচরণ ও গৃহকর্ম্মের একটি বিস্তৃত পাঠসূচী প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয় হইবে; এবং এই কার্য্যে শিক্ষিতা হিন্দু খৃষ্টান ও মুসলমান গৃহিণীদিগের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ সূচী প্রত্যেক বালিকার পাঠোন্নতি ও আচরণের বিবরণ-পুস্তকে (progress and conduct chart) লিপিবদ্ধ থাকিবে। বিভিন্ন বর্গে ও বিভিন্ন বয়সে, ধর্ম্মাচরণ ও গৃহকর্ম্মের কি কি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া বালিকা-দিগকে ব্যাবহারিকভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। গৃহে অভিভাবক ও অভিভাবিকারা উক্ত নির্দ্দেশ-মত বালিকাদিগকে ধর্ম্মাচরণ ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষার অবসর ও সুযোগ দিবেন, এবং বিভিন্ন আচরণ ও কর্ম্মে বালিকারা দক্ষতা লাভ করিলে আচরণের পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে। এইরূপ বা অন্য কোন উপায়ে গৃহের সহিত বিদ্যালয়ের সংযোগ স্থাপন ভিন্ন উপরিউক্ত দুই প্রকার শিক্ষা সার্থক হইতে পারে না। এরূপ চেষ্টা দ্বারা আর-একটি সুন্দর ফল লাভের সম্ভাবনা খুব অধিক। আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত আদর দেখা যায় না। পুংশিক্ষার অনুকরণে স্ত্রীশিক্ষা পরিচালিত হওয়ায়, এবং চাকরীই পুংশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকায়, শিক্ষা ততটা সার্থক হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষার পরিচালকেরা বালিকাদিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন,—ইহা বুঝিয়া অনেকেই এরূপ শিক্ষার প্রতি আস্থাবান হইলে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি ঘটিতে পারে।

(গ) দরজির কর্ম্ম ও সুতাকাটা।

গৃহে অবসরসময় উপযুক্তরূপে যাপন করিবার নিমিত্ত বালিকাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সাহিত্য সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কণ এই উদ্দেশ্যের অনুকূল হইলেও, সমাজের সকল শ্রেণীর সকল বালিকাকে অবস্থার অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে। পশম রেশম ও সূতার কাজ, সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কণ সমাজের সকল বিভাগে তেমন প্রয়োজনীয় না হইলেও দরজির কর্ম্ম সকল অবস্থাতেই আবশ্যক। এরূপ দক্ষতা গার্হস্থ্য জীবনের সকল স্তরেই বিশেষ আদরের জিনিষ। জ্ঞানমূলক শিক্ষা কর্ম্মশিক্ষার সহিত সংযুক্ত হইলে, শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়। এই কর্ম্মশিক্ষা যদি দৈনন্দিন জীবনের কোন একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই কর্ম্মশিক্ষা একটি আকর্ষণের বস্তু হইয়া প্রশস্ত শিক্ষাকে যথার্থ ভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার বর্দ্ধিত হয়। প্রশস্ত শিক্ষার সহিত কর্ম্মশিক্ষার বিরোধ একটি সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণা। এই উভয় প্রকার শিক্ষা পরস্পরকে সতেজ ও শক্তিশালী করে। স্ত্রীশিক্ষায় দরজির কর্ম্ম এরূপ একটি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। কোন একটি বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের মধ্যে আর্থিক অবস্থার বিভিন্নতা বিদ্যমান থাকা খুব সম্ভব, এবং সেই কারণে কাহারো কাহারো পক্ষে দরজির কর্ম্ম ততটা প্রয়োজনীয় নাও বিবেচিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও, স্ত্রীশিক্ষায় এ বিষয়টি বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। চরকায় সূতাকাটা এইরূপ আর-একটি কর্ম্ম। শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান ফল, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদিগকে স্বাবলম্বী করা। স্বাবলম্বনে উচ্চ নীচ ধনী নির্ধনের প্রভেদ থাকিতে পারে না। প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজ নিজ ভগবৎ-দত্ত শক্তি প্রয়োগ করিবার দক্ষতা লাভই স্বাবলম্বনের মূলভিত্তি। সামাজিক জীবনে সূচীকর্ম্ম ও সূতাকাটা এইরূপ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়াই, যাহাতে সকল বালিকাই প্রশস্ত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই কর্ম্মগুলিতে দক্ষতালাভ করিতে পারে, স্ত্রী-শিক্ষার আদ্যশিক্ষার কাল হইতেই সেরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

(ঘ) চিত্রাঙ্কণ ও আল্‌পনা।

চিত্রাঙ্কণ শিক্ষার খুব প্রথম হইতেই রঙ ও তুলির ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং জ্যামিতিক অঙ্কণ আদ্যশিক্ষার শেষ দিকেই আরম্ভ হইতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভে জ্যামিতিক অঙ্কন কঠিন বলিয়া বোধ হইবে। এই জ্যামিতিক অঙ্কন, ব্যাবহারিক জ্যামিতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও, ইহা প্রচলিত ব্যাবহারিক বা অঙ্কনমূলক ঔপপত্তিক জ্যামিতি নয়। প্রথম প্রথম ছক্‌কাটা কাগজের উপর এবং পরে কেবল জ্যামিতিক যন্ত্রগুলির সাহায্যে নানা প্রকার আকার উদ্ভাবনই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এরূপ শিক্ষা আল্‌পনা শিক্ষার উন্নতি করে।

আল্‌পনা হিন্দু পরিবারের একটি নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা সার্থক করিবার নিমিত্ত, বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিভিন্ন পূজা • পার্ব্বণ ও উৎসব উপলক্ষে ব্যবহৃত নানা প্রকার আল্‌পনার নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাংলার কএক জন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী আল্‌পনা সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। এরূপ সংগ্রহ প্রকাশিত হইলে, বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষায় চিত্রাঙ্কণ শিক্ষার প্রভূত উন্নতি হইবে। আল্‌পনা আমাদের দেশের জিনিষ। এরূপ বিষয় দেশীয় শিক্ষায় স্থান লাভ করিলে, স্ব স্বরূপের পরিচয়ের ভিতর দিয়া স্ত্রীশিক্ষা যথার্থ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

(ঙ) কণ্ঠ- ও যন্ত্রসঙ্গীত।

সঙ্গীত শিক্ষায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়, সৌন্দর্য্যানুভূতি সতেজ হয়, স্বাভাবিক ছন্দোলিপ্সা চরিতার্থ হয়, এবং চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত দক্ষতা অর্জ্জিত হয়। এই নিমিত্ত ইহা প্রশস্ত শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এতদ্ভিন্ন উপরি-উক্ত উৎকর্ষ লাভের সঙ্গে সঙ্গে, কণ্ঠসঙ্গীত স্বরশক্তি মার্জ্জিত ও সতেজ করে, এবং যন্ত্রসঙ্গীতে অঙ্গুলির উপর ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্গুলিচালনার সূক্ষ্ম-শক্তি বিকশিত হয়। সঙ্গীত এমন একটি কলাবিদ্যা যাহা খুব অল্পবয়স হইতে চর্চ্চা না করিলে ভবিষ্যতে সুন্দর ফল লাভ হয় না। এই কারণে ইহা প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়। অনেক • বালক বালিকাই এই বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভের উপযুক্ত শক্তি লইয়া, জন্মগ্রহণ না করিতে পারে,—শিক্ষার অনেক বিষয় সম্বন্ধেই এরূপ কথা বলা যাইতে পারে,—তথাপি অঙ্গুলি শ্রবণেন্দ্রিয় বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির উপর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই বিষয়টি শিক্ষা-নির্ঘণ্টে স্থান পাইবার উপযুক্ত। সম্যক্ ভগবৎদত্ত শক্তির অভাব সুপরিজ্ঞাত হইলে, শিক্ষার অপরাপর স্তরে, ইহা বর্জ্জন করা যাইতে পারে। কিন্তু, বোধহয়, উভয় প্রকার সঙ্গীতের মধ্যে কোন একটিতে দক্ষতা লাভ অসম্ভব নয়। যখন এরূপ আংশিক দক্ষতা সুস্পষ্ট হইবে, তখন একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটির চর্চ্চাই সঙ্গত হইবে। যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষায় কোন একটি দেশীয় সঙ্গীত-যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়। দেশীয় সঙ্গীতযন্ত্রের মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প। বিদেশী যন্ত্রকে বিদেশী বলিয়া পরিত্যাগ করা সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ, কিন্তু তাই বলিয়া দেশী জিনিষকে পরিত্যাগ করা উদারতার পরিচায়ক নহে। দেশের স্বভাব ও স্বরূপকে এবং দেশপ্রীতিকে অবমাননা ও অস্বীকার করিলেই এরূপ সঙ্কীর্ণতা উদারতা বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীশিক্ষায় এরূপ সঙ্কীর্ণতাকে স্থান দেওয়া উচিত নয়। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেবী সরস্বতী চেয়ার-আসীনাও নন, আর পিয়ানো-বাদিনীও নন,—তিনি "বীণা-পুস্তকরঞ্জিতহস্তা," শ্বেতহংসাসীনা,—বীণাবাদিনী। আমাদের দেশীয় শিক্ষায়তনে, আমাদের বালিকা ও যুবতী-দিগকে এই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(চ) প্রতিমাগঠন।

প্রতিমাগঠন হস্তের দক্ষতা লাভের উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং কর্ম্ম শিক্ষার ইহাই প্রাথমিক স্বরূপ। শিশু কাদা মাটী ধূলা ইত্যাদি লইয়া ক্রীড়া করিতে ভালবাসে। এই বস্তুগুলির সাহায্যে সে নানা প্রকার প্রতিমা উদ্ভাবন করে। ক্রীড়া সাঙ্গ হইলে, গঠিত জিনিষগুলি নষ্ট করিয়াও সে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করে। এই সৃষ্টি ও বিনাশ প্রবৃত্তি তাহার খুব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এবং প্রকৃতির গুপ্ত শিক্ষাশালায়, এরূপ নানা প্রকার ক্রীড়ার ভিতর দিয়া, সে অতর্কিত ভাবে, খুব সহজেই, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে। সৃষ্টি-শক্তির ক্রিয়াশীলতার ভিতর দিয়াই ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার বহিঃপ্রকাশ, এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাই মনুষ্যজীবনের উৎকৃষ্টতম অংশ। আমরা পরের অনুকরণ করিয়া অনেক কাজ চালাইয়া লই, কিন্তু যদি নিজ নিজ কল্পনা উদ্ভাবনা বিচারশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক শক্তির পরি-

চালনা দ্বারা, বিভিন্ন অবস্থায়, অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে সমাজের উচ্চস্তরে জন্মিয়াও নিম্নস্তরেরই উপযুক্ত রহিয়া যাই,—বয়োবৃদ্ধিতে আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা লোপ পায় না। এই ব্যক্তিগত কল্পনা, উদ্ভাবনা, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি মানসিক সামর্থ্যই ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার মূল ভিত্তি। স্বাভাবিক সৃষ্টিশক্তির চরিতার্থতায় ও কর্ষণে, এই শক্তিগুলি উন্নত হয়, এবং ইহাদের বাহ্য প্রকাশই আমাদের স্ব স্বরূপের যথার্থ প্রকাশ।

কিন্তু প্রকাশের অবলম্বনের উপর আধিপত্য না জন্মিলে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয় না। ভাষা, রঙ, মৃত্তিকা প্রস্তর, বিভিন্ন ধাতু ইত্যাদি নানা অবলম্বনের ভিতর দিয়া, ভাবপ্রকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু শিশুর পক্ষে বালি ধূলা ও মাটী এই ভাবপ্রকাশের যেমন সহজ উপায়, তেমন আর কিছুই নয়। বোধহয় এই-কারণেই স্বাভাবিক সৃষ্টিশক্তির ও ভাব প্রকাশের প্ররোচনায়, সে সর্ব্বাগ্রে এইগুলিকেই অবলম্বন করে, এবং এই কারণেই এই পদার্থগুলিই তাহার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। আমরা পিতা মাতা, অভিভাবক ও অভিভাবিকা রূপে, যখন শিশুদিগকে এরূপ নোংরা খেলার জন্য তাড়না করি, তখন তাহাদের যে কি অনিষ্ট করি, তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না। নব্য শিক্ষা এই ধূলি মাটীকে মূর্ত্তিগঠনের ভিতর দিয়া গৌরবান্বিত করিয়া মনুষ্য-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। শৈশব শিক্ষায় এই জন্যই প্রতিমাগঠন খুব প্রয়োজনীয় বিষয়, এবং যখন শক্তির অপ্রাচুর্য্য বশতঃ গৃহস্থালীর কর্ম্ম, সূচীকর্ম্ম, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ, ও সাহিত্য রচনার অবলম্বনগুলির উপর বালিকাদিগের প্রভুত্ব লাভ ঘটিতে বিলম্ব থাকে, তখন তাহাদের আদ্যশিক্ষায় কিছু দিনের জন্য শৈশব শিক্ষার এই উৎকৃষ্ট বিষয়টি শিক্ষণীয় বিষয় রূপে নির্দ্ধারিত থাকিলে মন্দ হয় না।

(ছ) ব্যাবহারিক বিজ্ঞান।

শৈশব শিক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার কাল নয়। এই কারণে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ (nature study) শিশুশিক্ষার অন্তর্গত করা হয়। দৈনন্দিন জীবনের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক বস্তুসকল, কতকটা ধারাবাহিক ভাবে, পর্য্যবেক্ষণ করাইয়া এই শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। এরূপ শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাহিরের শিক্ষা। প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল প্রাঙ্গণই ইহার শিক্ষাশালা। বিদ্যালয়-সংলগ্ন উদ্যানে হাতে-হেতেরে কাজ করিয়া, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং নানা প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থ সংগ্রহ করিয়া, এই শিক্ষা সার্থক করা হয়। ফ্রবেলের এই প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ব্বাভাস। ইহার পর আদ্য শিক্ষায়, আরো বিধিবদ্ধ ভাবে, জীববৃত্তান্ত অথবা ভৌতিক বৃত্তান্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। উদ্যান-কর্ম্ম, পর্য্যবেক্ষণ, ও ভ্রমণ,-এই দুইটি বিষয় শিক্ষারও নির্দ্দিষ্ট পন্থা। কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষায় এরূপ শিক্ষার সময় বোধ হয় এখনও আসে নাই। যদি এদেশের বালিকারা এরূপ উদ্যানকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, অথবা তাহারা এরূপ পরিভ্রমণে বাহির হয়, তাহা হইলে অনেক পিতা-মাতাই বোধ হয় আপত্তি করিবেন। শিক্ষা বিস্তারের সহিত, সংশিক্ষার দিকে অনেকেই আকৃষ্ট হইতেছেন; তথাপি খুব কম সময়ের মধ্যেই অনেক বালিকার বিদ্যা-শিক্ষা শেষ হয় বলিয়াই হৌক, অথবা পর্দ্দার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃই হৌক, অনেকেই কার্য্যকরী শিক্ষার দোহাই দিয়া এরূপ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন।

সেই কারণে অন্য প্রকার বিষয় অবলম্বন করিয়া, অপেক্ষাকৃত পরিবর্ত্তিত উপায়ে, এরূপ পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যেই, এমন একটি বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, যাহা বালিকাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে। ব্যাবহারিক শারীরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ও শুশ্রূষা, বোধ হয়, ঠিক এমনি একটি বিষয়। হার্‌বার্ট স্পেন্‌সারের মতে শারীরবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত না হইয়া কাহারোই মাতৃত্ব অথবা পিতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।

বালিকাদিগের শিক্ষায় পর্য্যবেক্ষণ- ও পরীক্ষা-মূলক শারীরবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহা বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিবেন। কিন্তু যদি স্বাস্থ্যরক্ষা, শুশ্রূষা, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদির দিক দিয়া, ব্যবহারের উপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত পাঠসূচী প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে,

বোধ হয়, এই কম বয়সেও বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে। প্রথম প্রথম বালিকাদিগের হস্তে কোন পুস্তক দেওয়া হইবে না। গল্প, রেখাচিত্র (chart), দৈহিক চিত্র (physiological chart), ঐন্দ্রজালিক লণ্ঠন (magic lantern), চলন্ত চিত্র প্রদর্শক যন্ত্র (bioscope), এবং সম্ভব হইলে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপে মৌখিক শিক্ষার বিষয় থাকিবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের সকল ফল লাভ না হইলেও বিজ্ঞান শিক্ষার, বোধ হয়, সমস্ত ফলই পাওয়া সম্ভব হইবে। যদি বালিকা-বিদ্যালয়গুলি, সুশিক্ষার জন্য, নূতন ভাবে গঠিত হয়, তাহা হইলে সহজ ভাষায় লিখিত বহুচিত্রসম্বলিত একটি পুস্তকও ব্যবহৃত হইতে পারে।

(জ) ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

বালিকাদিগের শিক্ষায়, ভূগোল ও ইতিহাস নূতন ভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পর্দ্দার জন্য আমাদের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের ভিতর কূপমণ্ডূকতা অনেক সঙ্কীর্ণতার কারণ হয়। ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দ্বারা এই দোষটি নিরাকরণের চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই কারণে বালিকাদিগকে বিশাল পৃথ্বীর সহিত এবং বিরাট মানবসমাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। এরূপ পরিচয়ের জন্য, ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষানির্ঘণ্টে একটি বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। বাঙ্গলা দেশের ভূগোলের সহিত বাংলাদেশের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ভূগোলের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনী, আরব দেশের ভূগোলের সহিত ইস্‌লাম কাহিনী, এবং বিভিন্ন মহাদেশের ভৌগোলিক বৃত্তান্তের সহিত ইহাদের বর্ত্তমান যুগের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ,—এই বিষয়টির পাঠসূচীর অন্তর্গত হইবে। বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা বিষয়টির একটি পাঠসূচী প্রস্তুত হইলে পুস্তকের অভাব হইবে না। খুব সহজ ভাষায় লিখিত, শিক্ষার্থিনীদের উপযোগী একটি পুস্তক ব্যবহৃত হইলেও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালী অনুসরণ করিয়া গল্প মানচিত্র রেখাচিত্র নক্‌সা (plans) সময়-রেখা (line of time) আদর্শ (models) ছবি, অচল ও সচল চিত্র ইত্যাদি দ্বারা মৌখিক শিক্ষার সহায়তায় সমগ্র বিষয়টিকে শিক্ষার্থিনীদিগের সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ (visualise) করিয়া তুলিতে হইবে। বালিকাদিগের শিক্ষায় ইতিহাস ও ভূগোল সন তারিখ ও নামের তালিকায় পরিপূর্ণ থাকিবে না। বিষয়টির সাহায্যে যাহাতে স্বদেশপ্রীতি, মানবপ্রেম, বিচারবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তি বর্দ্ধিত হয় সেইদিকেই বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঝ) ব্যাবহারিক গণিত।

গণিত শিক্ষায়, ব্যবহারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, গৃহকর্ম্মে যেরূপ গণিতজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাই বিশেষ ভাবে, সহজ উপায়ে, শিক্ষা দিতে হইবে। দেশীয় গণিতের কতক অংশ ও কোন কোন প্রণালী অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে, এবং বিদেশী গণিতের কিছু কিছু অংশ আমাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সাংসারিক কাজে যেমন ক্রান্তি বিন্দু ঘুণ রেণু তিল কাগ ইত্যাদি আবশ্যক হয় না, তেমনি মিনিম্ ড্রাম্ আউন্স মিনিট সেকেণ্ড ইত্যাদির প্রয়োজন হইয়াছে। এই ব্যবহারের দিকটি মনে রাখিয়া, সাধারণ বাজার ও গৃহস্থালীর হিসাবের উপযোগী পাটীগণিত বালিকাদিগের আদ্য শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় হইবে। এই মর্ম্মে শুভঙ্করের প্রণালী ও আধুনিক পাটীগণিত,—উভয়ের সংযোগে বালিকাদিগের আদ্যশিক্ষার উপযোগী একটি বিস্তৃত পাঠসূচী প্রস্তুত করা আবশ্যক। গরিষ্ঠ সাধারণ গুণণীয়ককে বাদ দিয়া, সামান্য ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, এই গণিত শিক্ষার শেষসীমা হইলেও সাঙ্কেতিক প্রণালী, ঐকিক নিয়ম, এবং দৈনিক জমাখরচ রক্ষার প্রণালী ইহার অন্তর্গত থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঞ) মাতৃভাষা ও সাহিত্য।

মাতৃভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাই বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। এই কারণে এই বিষয়টিই স্ত্রীশিক্ষার উৎকৃষ্টতম বিষয়ে পরিণত হইবে। বিষয়টির প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র হওয়ায়, দেশীয় শিক্ষায় এই বিদেশী-ভাষার শিক্ষাপ্রণালী মাতৃভাষা শিক্ষার উপর অসঙ্গত আধিপত্য

স্থাপন করিয়া দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত শিক্ষাকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। বৈয়াকরণিক প্রণালীই (grammar-grinding) ভাষা শিক্ষার একমাত্র প্রণালী বিবেচিত হয়; এবং খুব কম বয়স হইতেই, ভাষার সাহিত্য ও রচনাকে শিক্ষায় উৎকৃষ্ট স্থান না দিয়া, সকল বর্গেই সাহিত্যকে ব্যাকরণের দাসরূপে ব্যবহার করা হয়। সেই কারণেই দশ বার বৎসর বয়সেও বালকবালিকারা ভাষার সৎ সাহিত্যের সহিত সামান্যভাবেও পরিচিত হইবার সুযোগ পায় না। ইংরেজী ভাষায় যেমন নানা বিষয়ক অকিঞ্চিৎকর সাময়িক রচনাই ভাষা শিক্ষার একমাত্র পুস্তক, মাতৃভাষাতেও সেইরূপ হয়। এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। রচনার জন্য যতটুকু ব্যাকরণ দরকার ব্যাবহারিকভাবে তাহারই মৌখিক শিক্ষা হইবে, এবং ভাষার উপর কতকটা আধিপত্য জন্মিলেই সৎ সাহিত্যই ভাষা শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় হইবে। বালিকারা আদ্য শিক্ষায় কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণ, কাশীদাসের আঠারো পর্ব্ব মহাভারত, এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের সাহিত্যস্রষ্টাদিগের কোন-না-কোন উৎকৃষ্ট রচনার সহিত পরিচিত হইবে।

অপর একটি ভাষা।

বালিকাদিগের আদ্যশিক্ষায় অপর কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না, অথবা এরূপ শিক্ষার যথেষ্ট অবসর থাকিবে কি না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি এরূপ অবসর থাকে তাহা হইলে সাধারণতঃ শিক্ষার্থিনীদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে সংস্কৃত, পালি, অথবা আরবী দ্বিতীয় ভাষা রূপে নির্দ্দিষ্ট থাকার পক্ষে অনেকেই যে মত প্রকাশ করিবেন, দেশীয় জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। তবে শিক্ষিত পরিবারে, বোধ হয়, অনেকেই ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী হইবেন। সৎশিক্ষার দিক্ দিয়া ইংরেজি ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষা এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত তাহা আলোচনা দ্বারা নির্দ্ধারণ করা কঠিন, কারণ উভয় ভাষার পক্ষেই উৎকৃষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনব্যাপারকে যথার্থ অর্থযুক্ত করিয়া তুলা যদি শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, সামাজিক অবস্থা-ভেদে কোথাও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভাষা এবং কোথাও রাষ্ট্রীয় ভাষাই এই কার্য্যে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতে পারে। সংস্কৃত পালি আরবী, অথবা ইংরেজি—বালিকাদিগের আদ্য শিক্ষার নির্ব্বাচন-সাপেক্ষ বিষয়রূপে বিষয়-নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে। আদ্যশিক্ষায় এই নির্ব্বাচিত ভাষার ব্যাকরণের আলোচনা হইবে না। বালিকারা মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া নির্ব্বাচিত ভাষার সহজ সহজ গল্পের পুস্তকের অর্থগ্রহণ করিবে এবং সময় সময় উক্ত ভাষায় কথোপকথন করিবে।

আদ্যশিক্ষার সময় বিভাগ।

উপরে আদ্য শিক্ষার যে বিষয়নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের প্রাচীন প্রথানুযায়ী প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের অধিবেশন আবশ্যক হইবে; বর্ত্তমানসময়ে যেরূপ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্গ গঠিত হয়, আদ্য শিক্ষা সেইরূপ চারিটি পরস্পরবিরোধী সমান্তরাল বর্গে বিভক্ত থাকিলে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য পর্ব্ব period প্রত্যেকটি ৪০ মিনিট্ কাল স্থায়ী হইলে, প্রত্যেক বিষয়ে সপ্তাহে নিম্নপ্রদর্শিত সময় যাপন করা সম্ভব হইবে:—

পাঠ্যবিষয়	সাপ্তাহিক পর্ব্বসংখ্যা।
(১) ক্রীড়া ও ব্যায়াম	২॥০
(২) নীতি ও ধর্ম্মাচরণ	ঐ
(৩) গৃহস্থালীর কর্ম্ম	ঐ
(৪) চিত্রাঙ্কণ	ঐ
(৫) কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীত	ঐ
(৬) প্রতিমা গঠন অথবা অপর একটি ভাষা	ঐ
(৭) কুটীর-শিল্প	৫
(৮) ব্যাবহারিক বিজ্ঞান	ঐ
(৯) ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত	ঐ
(১০) ব্যাবহারিক গণিত	ঐ
(১১) মাতৃভাষা ও সাহিত্য	১০

মোট বিষয়সংখ্যা ১১
মোট পর্ব্বসংখ্যা ৪৫
প্রত্যেক পর্ব্ব ৪০ মিনিট
দৈনিক শিক্ষার সময়—৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট

বিষয়গুলি কিরূপে সময়-বিভাগে (time-table) সজ্জিত হইতে পারে, তাহা দৈনিক সময়-বিভাগের নিম্নপ্রদর্শিত আদর্শ হইতে বুঝা যাইবে।

প্রাতঃকাল

৬-৩০ / ৬-৫০	৬-৫০ / ৭-১০	৭-১০ / ৭-৫০	৭-৫০ / ৮-৩০	৮-৩০ / ৯-১০
গৃহস্থালীর কর্ম্ম	নীতি ও ধর্ম্মাচরণ	ব্যাবহারিক গণিত	মাতৃভাষা সাহিত্য	মাতৃভাষা সাহিত্য

অপরাহ্ণ

২ / ২-৪০	২-৪০ / ৩-২০	৩-২০ / ৪	৪ / ৪-৪০	৪-৪০ / ৫	৫ / ৫-২০
ব্যাবহারিক বিজ্ঞান	ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত	চিত্রাঙ্কণ ও সঙ্গীত	কুটীরশিল্প	প্রতিমা গঠন অথবা অপর একটি ভাষা	ক্রীড়া ও ব্যায়াম

প্রাতঃকালের সময়-বিভাগে প্রথম দুই পর্ব্ব একত্র করিয়া এক একটি বিষয় একদিন অন্তর একদিন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আপরাহ্ণিক সময়-বিভাগেও চিত্রাঙ্কণ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে। পঞ্চম পর্ব্বে প্রথম দুই বৎসর প্রতিমাগঠন, এবং শেষ দুই বৎসর একটি অতিরিক্ত ভাষা আলোচিত হইবে।

মণীন্দ্রনাথ রায়

—

নারী-প্রগতি

বোম্বাই শহরে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই শিক্ষা-আইন বালিকাদের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন শহরে বুল্‌গেরিয়ার রাষ্ট্রদূত-বিভাগের সেক্রেটারীর পদে শ্রীমতী নাড্‌জেডা ষ্টান্‌কিয়ফ নাম্নী এক নারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কুমারী ষ্টান্‌কিয়ফের বয়স মাত্র ২৫ বৎসর; তিনি বিখ্যাত ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয় সর্‌বনের গ্রাজুয়েট এবং সাততি বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। ইঁহার পিতা লণ্ডনে বুল্‌গেরিয়ার রাষ্ট্রদূত-বিভাগের নেতা, পিতার অনুপস্থিতিতে কন্যা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কুমারী ষ্টান্‌কিয়ফ জেনোয়া কন্‌ফারেন্সেও বুল্‌গেরিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত ছিলেন।

সার্ব্বজাতিক মহাসভা বা লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌সের 'সহযোগিতায় জ্ঞানচর্চ্চা সমিতি'তে (Intellectual Co-operation Committee) সুবিখ্যাত ফরাসী মহিলা-বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরী এবং ক্রিষ্টিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্বের মহিলা-অধ্যাপক মাদ্‌মোআজেল্‌ বোনয়ার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

* * *

গত সেপ্টেম্বর মাসে লেজিস্লেটীভ্‌ এ্যাসেম্ব্লীর ডাক্তার গৌর এই মর্ম্মে এক বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে, আইন-ব্যবসায় আইনের কথাগুলির মধ্যে Person বা ব্যক্তি কথাটিতে যাহাতে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বুঝাইতে পারে তাহার জন্য কথাগুলিকে সংশোধন করিয়া স্পষ্ট করা হউক।

* * *

স্ত্রী স্বামীর কথার অবাধ্য হইয়া স্বামীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে যাহাতে স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করার, অন্যথা কারারুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহারও সংশোধনের জন্য একটি বিল ডাক্তার গৌরের প্রস্তাবে নির্দ্দিষ্ট একটি কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। হয়ত ইহার ফলে নারীর স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথের বাধা কতকটা দূর হইবে।

* * *

স, চ,

ভারত-চিত্রচর্চ্চা

বহুযুগের অবসাদগ্রস্ত আধুনিক বাঙ্গালী শিল্প-সাধকের অনভ্যস্ত হস্ত চিত্রচর্চ্চায় ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া, রেখা এবং লেখা সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।···ব্যর্থ-চেষ্টাই সাফল্যের পূর্ব্বসূচনা।

অল্পদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাফল্যের পরিচয় প্রদান করিবার সময় বাঙ্গালী কবি "চতুঃষষ্টিকলার" উল্লেখ করিতেন। প্রমাণ,- "কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।" সে প্রথা ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় একটি কলারও বিকাশলাভের অবসর নাই।···

ভারত-চিত্রের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হইয়া না উঠিলে, ভারতবর্ষে বসিয়া চিত্রচর্চ্চা করিলে ভারত-চিত্র হইবে না, ভারতবর্ষীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্রচর্চ্চা করিলেও ভারত-চিত্র হইবে না ; ভারত-চিত্রের প্রকৃতিগত অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট লক্ষণই প্রকৃত মানদণ্ড।···

"যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাং যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥"

পর্ব্বতমালার মধ্যে সুমেরু যেমন সর্ব্বলোকবরেণ্য ;—অণ্ডজাত জীবগণের মধ্যে গরুড় যেমন সর্ব্বপ্রধান ;—নরগণের মধ্যে রাজা যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ;—কলাসমূহের মধ্যে চিত্রকল্পও সেইরূপ।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়,—পুরাতন ভারতবর্ষে চিত্র কত উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছিল।···যাহা ছিল, তাহা নাই। যাহা আছে,—সেই অজন্তাগুহা-চিত্রাবলী,···তাহাতে যাহা আছে, তাহা কিন্তু চিত্র নহে,—চিত্রাভাস। তাহা পুরাতন ভারতচিত্রের অসম্যক্ নিদর্শন, চিত্র-সাহিত্যদর্পণের "দোষ-পরিচ্ছেদের" অনায়াসলভ্য উদাহরণ। তাহা কেবল বিলাসব্যসনমুক্ত যোগযুক্ত অনাসক্ত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিভৃত-নিবাসের ভিত্তি-বিলেপন ;—বিচক্ষণ চিত্র-সমালোচকগণের নিকট ভক্তি-ভারাবনত নমস্কার লাভের যোগ্য হইলেও, ভারত-চিত্রোচিত প্রশংসা লাভের অনুপযুক্ত। তাহা একশ্রেণীর "পুণ্য-কর্ম্ম",—তাহার মূল প্রয়োজন অলঙ্করণ।···তাহাতে যাহা-কিছু চিত্র-গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অযত্ন-সম্ভূত,—আকস্মিক,—অলৌকিক। এক সময়ে সকল গৃহেই এইরূপ ভিত্তি-চিত্রের ব্যবস্থা ছিল ; কিরূপ গৃহে কোন্ শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হইবে, তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। এই-সকল ভিত্তি-চিত্রে কেহ চিত্র-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা দর্শনের আশা করিত না ; ভিত্তি-গাত্র সেরূপ প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত স্থান বলিয়াও পরিচিত ছিল না।

"স্থানং প্রমাণং ভূলম্বো মধুরত্বং বিভক্ততা।
সাদৃশ্যং ক্ষয়বৃদ্ধী চ গুণাষ্টকমিদং স্মৃতম্।
স্থান-হীনং গতরসং শূন্যদৃষ্টিমলীমসং।
চেতনা-রহিতং বা স্যাৎ তদশস্তং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

স্থান-প্রমাণ-ভূলম্ব-মধুরত্ব-বিভক্ততা-সাদৃশ্য-ক্ষয়-বৃদ্ধি,—এই আটটি পারিভাষিক সংজ্ঞায় চিত্রের আটটি গুণ উল্লিখিত। স্থান-দোষ, রস-দোষ, চিত্র-দোষ ; এই-সকল দোষদুষ্ট চিত্র অপ্রশস্ত বলিয়া নিন্দিত। এই-সকল চিত্র-গুণের এবং চিত্র-দোষের যথাযথ পর্য্যবেক্ষণে যাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট অজন্তাগুহা-চিত্রাবলী ভারত-চিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের তুলিকাসম্পাতে এই-সকল ভিত্তি-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহারা পুরাতন ভারতবর্ষে "চিত্রবিৎ" বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা নমস্য ; কিন্তু চিত্রে নহে, চরিত্রে। তাঁহাদের ভিত্তিচিত্রও প্রশংসার্হ ; কিন্তু কলা লালিত্যে নহে, বিষয়-মাহাত্ম্যে।

চিত্রবিৎ কে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য সেকালের শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—সমীরণ-সঞ্চরণে জলে তরঙ্গ উত্থিত হয় ; অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিখাবিকাশ করিয়া থাকে ; ধূম গগনমণ্ডলে আরোহণ করে ; পতাকা আকাশে অঙ্গবিস্তার করে। যিনি এই-সকল গতি-ভঙ্গী যথাযথভাবে চিত্রিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ। সুপ্ত হইলে, মনুষ্যের প্রাণস্পন্দনের চেতনা লুপ্ত হয় না ; মৃত হইলেই সে চেতনা লুপ্ত হইয়া যায় ;—দেহের সকল অংশ সমান নহে ; কোনও অংশ উন্নত, কোনও অংশ অবনত। যিনি এই-সকলের পার্থক্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ।" যথা ;—

"তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকং
বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতং।
নিম্নোন্নত-বিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥"

ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—কেবল আকারাঙ্কণে সিদ্ধহস্ত হইলেই কেহ চিত্রবিৎ বলিয়া মর্য্যাদালাভ করিতে পারিতেন না।

অ-জীবের গতি-ভঙ্গী চিত্রিত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সজীবের স্থিতিভঙ্গী চিত্রিত করাও কঠিন। তাহাতে চেতনা-ব্যঞ্জক শিল্প-কৌশল আবশ্যক। সেই চেতনায় মৃতের সঙ্গে জীবিতের পার্থক্য প্রকটিত হয়। তাহাকে আবার এমনভাবে চিত্রিত করা আবশ্যক যে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—যেন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। সেইরূপ চিত্রই চিত্র—তাহাই শুভলক্ষণ-সংযুক্ত। যথা,—

"সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।"

বিষয়-ভেদে, পদ্ধতি-ভেদে, প্রয়োজন-ভেদে, ভারত-চিত্রে অনেকগুলি বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। তথাপি পুরাতন সাহিত্যে চিত্রের মুখ্য প্রতিশব্দ—"আলেখ্য," এবং আলেখ্যের প্রধান বিষয় নায়ক-নায়িকা। বাৎস্যায়ন তাহাকেই মুখ্য ভাবে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। টীকাকার যশোধর, তাহাকে বিশদ করিবার জন্য, একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাব-লাবণ্য-যোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকা-ভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

···ভারত-চিত্র "ষড়ঙ্গক". সুতরাং যে চিত্রে ছয়টি অঙ্গই বর্ত্তমান নাই, তাহা অঙ্গহীন,—চিত্রাভাস।···

প্রথম অঙ্গ—রূপভেদ।

···"রূপের" ভেদ-সাধন। সুতরাং "রূপ" কি, তাহা জানা আবশ্যক। তাহা একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক একটি "রূপের" আধার। চিত্রে একটি রূপ হইতে আর-একটি রূপকে পৃথক করিয়া দেখিবার নাম "রূপ-ভেদ"। তাহা চিত্রগুণ-কীর্ত্তনে "বিভক্ততা"

বলিয়া উল্লিখিত। ইহা সাধারণ ভাবে "রেখা-বিন্যাস" বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে "রূপ-ভেদের" পদ্ধতি সূচিত হইলেও "রূপের" অর্থ সুব্যক্ত হয় না। যাহার প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনরূপ ভূষণ-ভূষিত না হইয়াও বিভূষিতবৎ প্রতিভাত হয়, তাহারই নাম "রূপ"। যথা,—

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তৎ রূপমিতি কথ্যতে ॥"

"রূপ" রূপ নহে ;- অ-রূপ। তাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ব্যক্ত হয়। যাহা প্রকৃত পক্ষে অনুভূতিগম্য এবং অতীন্দ্রিয়, তাহা এইরূপে দৃষ্টিগম্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভারত-চিত্রে "রেখা" রেখা নহে; তাহা "রূপ রেখা"। তাহার বিশুদ্ধি রক্ষার উপর চিত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। চিত্রের ভিন্ন-ভিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন-ভিন্ন-রুচিসম্পন্ন দর্শকের চিত্তবিনোদন করে। আচার্য্যগণ "রেখা"র প্রশংসা করিয়া থাকেন ;— বিচক্ষণগণ (আলো ও ছায়া-প্রদর্শক) "বর্ত্তনার" প্রশংসা করেন ;— রমণীগণ ভূষণ-বিন্যাসের অনুরাগিণী ;—ইতর জন "বর্ণাঢ্যতার" পক্ষপাতী ;—যথা,—

"রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ ॥"

"রূপ-ভেদ" প্রথম কার্য্য। তাহার পদ্ধতি শিল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। একটি "অনুলোম" এবং আর-একটি "প্রতিলোম" পদ্ধতি। মস্তক হইতে রেখাবিন্যাসের নাম "অনুলোম পদ্ধতি"; পদযুগল হইতে রেখা-বিন্যাসের নাম "প্রতিলোম পদ্ধতি"। দেবমূর্ত্তির চিত্রাঙ্কণে "অনুলোম-পদ্ধতিই" অবলম্বনীয়। শরীরের সকল অঙ্গকেই রূপ-ভেদে প্রদর্শিত করিতে হয় না, কারণ সকল অঙ্গ রূপের আধার নহে। যে-সকল অঙ্গ রূপের আধার, তাহা পৃথক্ ভাবে প্রদর্শিত না হইলে, "চিত্র-দোষ" সংঘটিত হয়। "অবিভক্ততা" সেই সুপরিচিত "চিত্র দোষ"। এই কারণে ভারত-চিত্রে কোন কোন অঙ্গ ইঙ্গিত মাত্রে ব্যক্ত, কিন্তু কোন কোন অঙ্গ সুনির্দ্দিষ্ট রেখা-বিন্যাসে সুবিভক্ত। ভারত-চিত্রের এই "রূপভেদ" রীতির যথাযোগ্য বিচারের অভাবে, কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে ভারত-চিত্র "রেখাত্মক" বলিয়া উল্লিখিত। ভারত-চিত্র "রেখাত্মক" নহে,—"রূপাত্মক"।

দ্বিতীয় অঙ্গ—প্রমাণ।

তালহীন সঙ্গীতের ন্যায় মানহীন চিত্র রস-বোধের অন্তরায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি পরিমাণ-পার্থক্য বর্ত্তমান। দৈর্ঘ্য বিস্তার, বেধ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিতি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, গতি বিধানের সহায়তা সাধন করে। ইহা প্রকৃত পক্ষে রেখা-বিন্যাসকে সুসংযত করিয়া চিত্র-সৌন্দর্য্য বিকাশিত করে। ইহা অনাবশ্যক শাসন-শৃঙ্খল নহে। ইহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। কেবল এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম—তাহা হাস্যরসের অবতারণায় অভিব্যক্ত। কিন্তু সেখানেও সাধারণ পরিমাণের ব্যতিক্রম ঘটিলেও, রসানুগত পরিমাণ অনতিক্রমণীয়। "প্রমাণ" সীমাকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া, চিত্রকে সুসঙ্গত করে। ইহাতে শিল্পের স্বেচ্ছাচার সংযমিত হয়,—তাহার প্রতিভা প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

তৃতীয় অঙ্গ—ভাব।

ভাব অশরীরী চিত্ত-বৃত্তি ;—তাহা বিভাব-জনিত শরীরেন্দ্রিয়বর্গের বিকার-বিধায়ক চিত্তবৃত্তি। যথা,—

"শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ।
ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ ॥"

পৃথক্ পৃথক্ ভাবের প্রভাবে শরীরেন্দ্রিয়বর্গের পৃথক্ পৃথক্ বিকার সাধিত হয়। মানব-চিত্তবৃত্তি রসানুগত; তদনুসারে "ভাব" নিয়মিত হইয়া থাকে। চক্ষুর আকার-পার্থক্যে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"চাপাকারং ভবেন্নেত্রং মৎস্যোদরমথাপি বা।
নেত্রমুৎপলপত্রাভং পদ্মপত্রনিভং তথা।
শশাকৃতির্মহারাজ পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥"

চক্ষুর আকার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত;—চাপাকার, মৎস্যোদর, উৎপলপত্রাভ, পদ্মপত্রনিভ এবং শশাকৃতি। চাপাকারের অর্থ— ধনুরাকৃতি।…

চক্ষু একটি সুপরিচিত শরীরেন্দ্রিয়; ভাবের প্রভাবে তাহার বিকার সাধিত হইয়া থাকে; এবং তদনুসারে তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হয়। এই কারণে, সকল অবস্থায় সকল নরনারীর চক্ষুর আকার একরূপ হইতে পারে না। চিত্রসূত্রোক্ত পাঁচ প্রকারের চক্ষু পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন আকার সূচিত করে; এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রভাবে সেই-সকল আকার-পার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। যথা,—

"চাপাকারং ভবেন্নেত্রং যোগভূমি নিরীক্ষণাৎ।
মৎস্যোদরাকৃতিং কার্য্যং নারীণাং কামিনাং তথা ॥
নেত্রমুৎপলপত্রাভং নির্ব্বিকারস্য শস্যতে।
ত্রস্তস্য রুদতশ্চৈব পদ্মপত্রনিভং ভবেৎ।
ক্রুদ্ধস্য বেদনার্ত্তস্য নেত্রং শশাকৃতিভবেৎ ॥"

যোগ-ভূমি নিরীক্ষণের অভ্যাসে নেত্র ধনুরাকৃতি লাভ করে,— কামিজনের এবং কামিনীগণের নেত্র (লালসাপূর্ণ বলিয়া) মৎস্যোদরাকৃতি ;—নির্ব্বিকারচিত্তের নেত্র উৎপল-দল-সদৃশ ;—যে ত্রস্ত বা রুদ্যমান, তাহার নেত্র পদ্মদলের ন্যায়; ক্রুদ্ধের এবং বেদনাগ্রস্তের নেত্র শশকাকৃতি। শরীরেন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ বিকার-বিধায়ক চিত্ত-বৃত্তির নাম "ভাব", তাহা চিত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য; তাহার অভাব চিত্র-দোষ।

চতুর্থ অঙ্গ—লাবণ্য।

…ইহা এক শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য-সাধন। "লাবণ্য" শব্দের ব্যবহারে তাহা সুস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। মুক্তা হইতে যেমন একটি তরঙ্গায়মান দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সেইরূপ তরঙ্গায়মান দ্যুতি নিষ্কাশনের নাম "লাবণ্য"-যোজন। "লাবণ্য" একটি পারিভাষিক শব্দ। যথা—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াঃ স্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে ॥"

সকল নর-নারীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতেই অল্পাধিক মাত্রায় একটি তরঙ্গায়িত দ্যুতি ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই জীবিতকে মৃত হইতে পৃথক্ করিয়া দেখায়। ইহাকে চিত্রে প্রকাশিত করিবার শিল্প-কৌশলের নাম "লাবণ্য-যোজন"। ইহাতে তরলতা আছে। তাহা "ছায়ার" অর্থাৎ "কান্তির" তরলতা। টীকাকারগণ তাহাকে "তরঙ্গায়মান" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। "লাবণ্য" অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়া ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যায়। সুতরাং তাহা কেবল ঔজ্জ্বল্য নহে,—চলোর্ম্মিবৎ চলনোন্মুখ। তাহাতেই চিত্র নির্জ্জীব হইয়াও সজীববৎ প্রতিভাত হয়। স্থিতি-ভঙ্গীর মধ্যে এইরূপ লাবণ্য-গতিভঙ্গী সঞ্চারিত না হইলে, চিত্র "দৌর্ব্বল্য-দোষের" জন্য নিন্দিত হইয়া থাকে। "অবিভক্ততা" অর্থাৎ "রূপ-ভেদের" অভাব একটি চিত্র-দোষ; যে রেখাবিন্যাস "রূপভেদ" সাধিত করে, তাহা যদি স্থূলতার অবতারণা করে, তবে তাহাও একটি চিত্র-দোষ। তাহার নাম "স্থূলরেখাত্ব"। সেইরূপ বর্ণসাঙ্কর্য্যও একটি চিত্র-দোষ। যথা,—

"দৌর্ব্বল্যং স্থূলরেখত্বমবিভক্তত্বমেব চ।
বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিত্র-দোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

পঞ্চম অঙ্গ—সাদৃশ্য।

"দৃশ্যের" সহিত তুল্যতার নাম "সাদৃশ্য"।..."দৃশ্য" কি,—তাহা বিবৃত না হইলে, "সাদৃশ্য কি,—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রত্যেক বস্তুতে দুইটি বিষয় বর্ত্তমান,—"বস্তুসত্তা" এবং "বস্তুদৃশ্য"। গো একটি চতুষ্পদ জীব। কিন্তু সকল প্রকার অবস্থানে তাহার পদচতুষ্টয় সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম "দৃশ্য"; এবং তাহার সহিত তুল্যতা সাধনের নাম "সাদৃশ্য"। পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক রস্কিনও এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন,—যে বস্তুতে যাহা আছে বলিয়া জান, তাহা অঙ্কিত করিও না; যাহা দেখিতে পাও, তাহাই অঙ্কিত কর। "দৃশ্য" দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বাহ্য এবং আন্তর। "দৃশ্য" বাহ্যজগতেই বর্ত্তমান থাকুক, অথবা অন্তর্জ্জগতে কল্পিত হউক, যাহা "দৃশ্য" তাহারই সহিত "সাদৃশ্য" আবশ্যক। পাশ্চাত্য শিল্পে ভাবাত্মক এবং আকারাত্মক নামে যে দুইটি প্রভেদ কল্পিত হইয়া আসিতেছে, ভারত-শিল্পে তাহা অপরিজ্ঞাত। "আকার" ভারত-শিল্পের "অ-বিষয়", "দৃশ্যই" তাহার শিল্পের "বিষয়"। দৃশ্য দৃশ্য, তাহা আকার হইতে পৃথক্। আকারের অন্তরালে রূপ, ভাব, লাবণ্য, ও দৃশ্য বর্ত্তমান আছে; তাহাই ভারত-চিত্রের "বিষয়"; এবং তজ্জন্য ভারত-চিত্র আকারের অনুকরণ নহে;—অনুভূতির অভিব্যক্তি। "সাদৃশ্য" শব্দে ইহাই সূচিত হইয়াছে। "সাদৃশ্য" তুল্যতা নহে, তাহা তুল্যতার হেতু।

ষষ্ঠ অঙ্গ—বর্ণিকা-ভঙ্গ।

...যেখানে যে বর্ণের সমাবেশ আবশ্যক, সেখানে সেই বর্ণের বিন্যাসের নাম "বর্ণিকা-ভঙ্গ"। ইহার ব্যতিক্রমে বর্ণের সঙ্করতা ঘটিয়া থাকে; তাহা একটি সুপরিচিত চিত্র-দোষ। ভারতীয় চিত্র-সাহিত্যে চিত্র-বস্তু ও চিত্রাঙ্কণের বস্তু—দুই শ্রেণীর রচনা দুই নামে পরিচিত হইয়াছিল,—"চিত্র-সূত্র" এবং "চিত্র-কল্প।" "চিত্র-সূত্রে" চিত্রের মূল প্রকৃতি, এবং "চিত্র-কল্পে" চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।...

স্থান, কাল, চেষ্টা, একই মনুষ্যের "দৃশ্যকে" বিবিধ ভাবে প্রদর্শিত করে; সুতরাং চিত্র সম্পূর্ণরূপে আকারাত্মক হইতে পারে না। তাহা বাহ্য-বস্তুর আকার অবলম্বনে অভিব্যক্ত হইলেও, আকারানুকৃতি নহে, দৃশ্য-সৃষ্টি। তাহার সহিত অস্থিসংস্থান-বিদ্যার সম্পর্ক বড় অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অস্থি অদৃশ্য; তাহার অস্তিত্ব কোন কোন স্থলে ঈষৎ প্রতিভাত হইলেও, দূরবর্ত্তী দর্শনস্থান হইতে অদৃশ্য। সুতরাং তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইতে পারে না। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি-শিরা মাংসপেশী প্রভৃতির স্বাভাবিক সংস্থানের জন্য যে-সকল নতোন্নত "দৃশ্য" স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং দূরবর্ত্তী দর্শন-স্থান হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইত। শিরাগুলি প্রদর্শন করা অনুচিত বলিয়া যে নিষেধ-বাক্য প্রচলিত আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—ভারত-চিত্র কি জন্য অস্থিসংস্থান-বিদ্যার উদাহরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই!..

(ভারতবর্ষ, আশ্বিন) শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

—•

ঋগ্বেদ-বর্ণিত আর্য্যনারীর অবস্থা

...ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে...প্রাচীন আর্য্যগণের সুখময় গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। একমাত্র জায়াই সুখময় গার্হস্থ্য-জীবনের কেন্দ্রস্থানীয়। গার্হস্থ্য-জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা পূর্ণতা ও পবিত্রতা একমাত্র জায়ার উপরেই নির্ভর করে।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে শ্বশুর-গৃহে নবপরিণীতা বধূর স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল। প্রাচীন আর্য্য-সমাজে কন্যাদের যে অল্পবয়সে বিবাহ হইত না এবং বালিকা-বধূদের সংখ্যা যে অতীব বিরল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।...প্রাপ্ত-যৌবনা না হইলে কন্যাদের বিবাহের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত হইত না।...

কন্যাদের পিতামাতা বা অভিভাবকগণ সম্ভবতঃ অনেক সময়ে তাহাদের উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। কিন্তু কন্যারাও যে সময়ে সময়ে তাঁহাদের মনোমত পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইতেন, ঋগ্বেদে তাহারও প্রমাণ আছে। কোনও কোনও যুবতী অর্থলোভে ধনবান্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইতেন; কিন্তু ঋগ্বেদে তাঁহাদের নিন্দা আছে।...প্রেমের জন্যই বিবাহ—বিবাহ নামের যোগ্য, এবং অর্থের লোভে বিবাহ নিন্দনীয়, ঋষি ঋকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

মনোনয়ন-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া, সম্ভবতঃ অনেক স্ত্রীলোকের বিবাহ হইত না। হয় ত কোন স্ত্রীলোক মনোমত বরলাভে অসমর্থা হইতেন; কিংবা কোনও বিবাহার্থী ব্যক্তি হয় ত তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন না। এরূপ স্থলে, সেই উপেক্ষিতা অথবা বিবাহ করিতে অনভিলাষিণী নারী আজীবন অনূঢ়া থাকিতে বাধ্য হইতেন। অন্ধ কন্যাদেরও সহজে বিবাহ হইত না।...পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে যে-সকল নারী অনূঢ়া থাকিতে বাধ্য হইতেন, বর্ত্তমান কালের কুলীনকন্যাগণের ন্যায় তাঁহারা পিতৃগৃহেই জীবন-যাপন করিতেন। এরূপ স্থলে, পিতৃকুল হইতেই তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হইত।...

পিতৃগৃহে অবস্থিতা অনূঢ়া ভগিনীদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকায়, ভ্রাতৃগণ সহোদরাগণের যথাসময়ে বিবাহ দিবার জন্য স্বভাবতঃই ব্যাকুল ও উৎসুক হইতেন। কেন না, ভগিনীদের বিবাহ হইয়া গেলে, পৈতৃকসম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না এবং কাহারও ভরণ-পোষণেরও কষ্ট হইত না।

কন্যার স্বয়ংবরা হওয়ার প্রথা বিদ্যমান থাকায়, কি জানি সে মনোমত পতি নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ না হয়, কিংবা বিবাহেচ্ছু কোনও ব্যক্তি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত না হয় এবং এইরূপ অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইলে কি জানি অনূঢ়া ভগিনীকে আজীবন প্রতিপালন করিতে হয় ও পৈতৃক ধনের অংশ দিতে হয়—এইরূপ একটি আশঙ্কাবশতঃই কি প্রাচীন আর্য্য-সমাজ হইতে কন্যাদের যৌবন-বিবাহ-প্রথা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়াছিল?...

যে বয়সে কন্যা স্বাধীনমত ব্যক্ত করিতে পারে, সেই বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহাকে "পাত্রস্থা" করিয়া উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিলেই যেন তাহার পিতামাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপেই আর্য্য-সমাজে কন্যাদের বাল্যবিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।...পুত্রহীনা বিধবা নারী স্বামীর ধন নিজ অধিকার-বলে গ্রহণ করিতেন, তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় (১০।১০২।১১)।

পিতামাতা সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করিতেন (ঋগ্বেদ ৯।৪৬।২; ১০।৩৯।১৪)। বিবাহের সময় কন্যাকে ও জামাতাকে অবস্থানুসারে বিবিধ যৌতুক ও উপঢৌকন প্রদান করা হইত। ভ্রাতাও ভগিনীকে বহু ধন দান করিতেন (১।১০৯।২)। উপঢৌকনের দ্রব্যগুলি কন্যার রথের অগ্রে অগ্রে বাহিত হইয়া যাইত। গাভীও উপঢৌকনের অঙ্গ ছিল (১০।৮৫।১৩)। (এই প্রথা বর্ত্তমান সময়ের

প্রথারই প্রায় অনুরূপ ছিল। বর নানা প্রকার অলঙ্কার ধারণ ও সাজসজ্জা করিয়া বিবাহ করিতে যাইতেন (৫।৬০।৪ ; ১০।৭৮।৭)।

অপুত্রক পিতা কন্যার প্রথম পুত্রটিকে নিজ পুত্র বা পৌত্র-রূপ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই পুত্রই পরবর্ত্তী সময়ে "পুত্রিকা-পুত্র" নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে এইরূপ দৌহিত্র পৌত্ররূপে গণ্য হইত বলিয়া উল্লেখ আছে।...

বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও আর্য্যগণের পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল ছিল।...ঔরস-জাত পুত্রের অভাবে কখন কখন অপরের পুত্রকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করা হইত।...

প্রয়োজন হইলে, ঋষিগণও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেন। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কালে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে দস্যুগণের ভয়ানক উপদ্রব ছিল। সুতরাং ঋষিগণেরও পক্ষে বীরপুত্রলাভের জন্য প্রার্থনা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক ছিল না।...

পিতামাতা সন্তানগণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন (১০।১০৬।৪)। পুত্ররাও জনক-জননীর প্রতি ভক্তিমান্ ছিল। শিশুগণ দেবশিশুর ন্যায় শুভ্র ছিল (৭।৫৬।১৬) এবং ক্রীড়াসক্ত হইয়া আনন্দ-কোলাহলে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিত।...ধনসম্পত্তি, সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী যব ও সন্তান-সন্ততিই সংসার-সুখের প্রধান উপকরণ ছিল, এবং ঋষিগণ দেবতাগণের নিকট সর্ব্বদাই এই-সকলের জন্য প্রার্থনা করিতেন (৯।৬৯।৮)।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে লোক সাধারণতঃ একাধিক দারপরিগ্রহ করিত না। কিন্তু ধনবান্ ব্যক্তিগণ ও রাজগণ ইচ্ছা করিলে বহুজায়াও গ্রহণ করিতে পারিতেন (৭।১৮।২ ; ১০।৯৫।৬)। যেখানে বহুজায়া, সেখানে সপত্নীকলহ অনিবার্য্য (১।১০৫।৮)। স্বামীর প্রিয়তমা হওয়ার জন্য সপত্নী-পীড়ন-মন্ত্রও ছিল।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে বর্ত্তমানকালের ন্যায় স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা বিদ্যমান ছিল না। মহিলারা বস্ত্রে সংবৃত হইয়া, অর্থাৎ আধুনিক ওড়নার ন্যায় বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া, বাহিরে গমন করিতেন (৮।১৭।৭)। বধূও বস্ত্রে আবৃতা থাকিতেন (৮।২৬।১৩)। নারীগণ পুষ্পচয়নার্থ পর্ব্বতে আরোহণ করিতেন, তাহার উল্লেখ দেখা যায় (১।৫৬।২)। সোমযাগের সময় সাতটি স্ত্রীলোক সোমরস নিষ্পীড়ন করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাহা চালনা করিতে করিতে সোম-বিষয়ক গান গাহিতেন (৯।৬৬।৮)। ভদ্রমহিলারা নৃত্য করিতেন কি না তাহার কোনও প্রমাণ পওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক কালের ন্যায় সেই প্রাচীন-কালেও নৃত্য-গীত-ব্যবসায়িনী "নর্ত্তকী" (নৃতু) ছিল।...

দুহিতারা সাধারণতঃ গাভীসমূহের দুগ্ধদোহন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই কারণেই তাঁহাদের নাম "দুহিতা" হইয়াছিল। রমণীগণ গৃহে বস্ত্র বয়ন করিতেন (২।৩।৬ ; ২।৩৮।৪।) এবং বস্ত্র বয়নের উপকরণ সূত্রাদিও প্রস্তুত করিতেন। সাধারণতঃ মেষলোম হইতে সূত্র প্রস্তুত হইত, এবং সেই সূত্রে বস্ত্রবয়ন হইত (১০।২৬।৬)... ঋগ্বেদে বহু মূল্যবান্ বস্ত্রেরও উল্লেখ দেখা যায় (৬।৪৭।২৩)।

সূত্রকর্ত্তন ও বস্ত্রবয়ন ব্যতীত, রমণীরা যাবতীয় গৃহস্থালী কার্য্য সম্পাদন করিতেন। শস্যের মধ্যে যবই প্রধান ছিল (১০।১৩১।২)। ঋগ্বেদে ধান্যেরও উল্লেখ দেখা যায় (১।১৬।২ ; ১০।৯৪।১৩)। তাঁহারা যবভর্জ্জন করিয়া তাহা হইতে শক্তু বা ছাতু ও করম্ভ প্রস্তুত করিতেন। সম্ভবতঃ ধান্য হইতে তাঁহাদিগকে চাউলও প্রস্তুত করিতে হইত। যবভর্জ্জন করা কোনও কোনও রমণীর বৃত্তি ছিল।...গৃহে গৃহে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উদূখল-মুসল ছিল (১।২৮।৫)। তদ্দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়িত হইত। ধান্য, যব প্রভৃতি শস্যও সম্ভবতঃ তাহাদের সাহায্যেই ছাঁটা হইত। রমণীগণ কুম্ভপূর্ণ করিয়া জল লইয়া যাইতেন (১।১৯১।১৪)।

স্ত্রীলোকেরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান, নানাবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কার ধারণ ও উত্তম বেশভূষা করিতে ভালবাসিতেন। "সুবাসা" অর্থাৎ উত্তম-পরিচ্ছদধারিণী রমণীর উল্লেখ দেখা যায় (১০।১০।৭১৯)। যুবতীগণ প্রসাধন-সময়ে মস্তকে চারিটি বেণী ধারণ করিতেন; (১০।১১৪।৩) এবং বনিতারা বেশভূষা করিয়া পতিগণের নিকট নিজ নিজ দেহ প্রকাশ করিতেন (৪।৫৮।৯ ; ১০।১১০।৫)। তাঁহাদের অলঙ্কারের মধ্যে সুবর্ণময় হার, রুক্ম (বক্ষস্থলের স্বর্ণালঙ্কার), খাদি (বলয়), কর্ণাভরণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায় (৭।৪৬।১৯ ; ৭।৫৭।৩ ; ৮।৭৮।৩ ; ৮।২০।২১ প্রভৃতি)। পুরুষরাও খাদি, কর্ণাভরণ, কনকময় কবচ (অৎক, ৫।৫৫।৬), কিরীট (৫।৫৯।৩) প্রভৃতি ধারণ করিতেন। তবে স্ত্রী ও পুরুষগণের অলঙ্কারসমূহের গঠনের তারতম্য অবশ্যই ছিল। ঋগ্বেদে স্বর্ণকারের উল্লেখ দেখা যায় (নিষ্কং কৃণবতে, ৮।৪৭।১৫)। নিষ্ক-আভরণ-নির্ম্মাতা যে স্বর্ণকার ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ যেরূপ বর্ত্তমানকালে দেখা যায়, প্রাচীন-কালেও তদ্রূপ ছিল (৮।৬২।৯).. ঋষিগণও সৌন্দর্য্যের মোহ অতিক্রম করিতে পারিতেন না।...

(মাসিক বসুমতী, ভাদ্র) শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাস

—

কলিকাতার কথা

...রাজা রামমোহন রায় ডিগ্‌বি সাহেবের অধীনে কাজ করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।...

১১ই নভেম্বর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব আসিয়াছিলেন।.. কেরী সাহেব রামরাম বসুর নিকট বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন ও তিনি বাঙ্গলায় খৃষ্টচরিত্রাদি বই ছাপাইয়া কেরী সাহেবের কার্য্যের সহায়তা করিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও পাদ্রী ও কোম্পানীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাহিনা লইয়া কার্য্য করিতেন এবং গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নাম ঐরূপ কার্য্য করার জন্য উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা সে কালের বাঙ্গলা পাঠ্যপুস্তকসকল করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারই প্রথম শুদ্ধ করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। ইঁহারই নিকট বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।...

২০শে জানুয়ারী ১৮৭১ খৃঃ গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে আশী টাকা ভাড়ায় হিন্দুকলেজ প্রথম খোলা হইয়াছিল। ঐ কলেজের ক্ষুদ্র কার্য্যকরী সভায় নিমাইচরণ মল্লিকের ও রাজা নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র রামগোপাল, গোপীমোহন ও হরিমোহন ঠাকুরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। লেফ্‌টেনেণ্ট ফ্রান্সিস্ আরভিং ও ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ দেওয়ান বৈদ্যনাথ ঐ কলেজের সেক্রেটরীর কাজ করিয়া মাসিক তিনশত ও একশত টাকা বেতন পাইতেন।

লর্ড ময়রার...আমলে বাঙ্গলা খবরের কাগজ বেঙ্গল গেজেট, সমাচার-দর্পণ প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল।...তাঁহারই আমলে কলিকাতায় অক্টারলোনির জয়স্তম্ভ হইয়াছিল।...

এখন যেমন বিদ্যালয়ে না গেলে জরিমানা দিতে হয়, তখন তেমনি যাহারা মাসের সব দিন আসিত তাহারা মাসে আট আনা, একদিন

কামাইএ ছয় আনা ও দুদিন হইলে চার আনা পুরস্কার পাইত। না আসিলে জরিমানার ত কথাই নাই, ছেলেদের বাড়ীতে গিয়া শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ খোঁজ খবর ও খোসামোদ করিত। ছেলেদের উৎসাহ দিবার জন্য মোটা মোটা বৃত্তি দেওয়া হইত। হিন্দু কলেজের ছেলেদের বৃত্তি দিবার জন্য রাজা বৈদ্যনাথ রায়, কালীমোহন ঘোষাল ও হরিনাথবাবু প্রত্যেকে কুড়িহাজার টাকা দিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের চাঁদার টাকা সেকালের জোসেফ ব্যারেটো কোষাধ্যক্ষ হইয়া ব্যবসায়ে খাটাইয়া নষ্ট করিয়াছিলেন। সেই টাকা কোম্পানিকে (?) দিয়া হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ তাহাদের হইয়াছিল। হেয়ার সাহেবের জায়গায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া ঐ বিদ্যালয় হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব ও গৌরমোহন আঢ্য খুব শিক্ষিত না হইলেও তাঁহাদের বিদ্যালয় ও এদেশের লোকদিগকে ইংরেজি শিক্ষা দিবার জন্য জীবনান্ত চেষ্টা চিরদিন স্মরণ করিবার কথা। ওরিয়েণ্টালে ব্যারিষ্টার হাফ্‌মান জিওফ্রে শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন ও অনেক ফিরিঙ্গী মাষ্টার ছিল। টরনবুল্ সাহেব ওরিয়েণ্টালের একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তখন বাঙ্গলা বিভাগে সকাল হইতে ৯॥০ ও ৩॥০টা হইতে সন্ধ্যা, এবং ইংরেজি বিভাগে ১০॥০ হইতে ২॥০টা পর্য্যন্ত পড়া হইত। গৌরমোহন ভাল শিক্ষক আনিতে গিয়া শিবচতুর্দ্দশীর দিন গঙ্গায় ডুবিয়া মারা গিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য বড়লোক হেয়ার ও ওরিয়েণ্টালের ছাত্র ছিলেন।...রাজা রামমোহন রায়, কলিকাতার আদালতে মামলা করিতে আসিয়া কলিকাতার বাসিন্দা হইয়াছিলেন ও ইংরেজি ধরণের লেখাপড়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাতে যোগদান ও তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। এই ইংরেজি শিক্ষার গৌরব বজায় রাখিবার জন্য যেমন রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া জুটিলেন, তেমনি কলিকাতার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল। ভাল ভাল কবিওয়ালারা প্রায় সেই সময় মরিয়া গিয়াছিল ও তখন উপযুক্ত কবিওয়ালা অভাবে তাহাদের উপর লোকের অশ্রদ্ধা আসিতেছিল। বাঙ্গলা ভাষার খাঁটি পদ্যলেখক রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী সমস্যা-পূরণ করিতে ও খাঁটী বাঙ্গলায় সুন্দর করিয়া অল্প কথায় মনের ভাব ও দৃশ্য যেমন আঁকিতে পারিতেন, তেমনটি আর কেহই পারিত না।...

কলিকাতার টাঁকশালের অ্যাসে-মাষ্টার হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি ইংরেজি সংস্কৃত কাব্যাদি ও হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধাদি ইংরেজিতে লিখিয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরদের শুঁড়ার বাগানে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে উত্তররামচরিত নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর

(সুবর্ণবণিক-সমাচার, আশ্বিন)

—

শেলি

...যাঁরা পৃথিবীতে কোনো একটা বড় সৃষ্টির কাজ করেছেন—কোনো সৌন্দর্য্যকে আকার দিয়েছেন, কোনো মহৎভাবকে প্রকাশ করেছেন জীবনে বা সাহিত্যে বা কোনো রকম ললিত কলায়,—তাঁরা কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী নন।...যাঁরা নিজের দেশের জন্য ধনোপার্জ্জন করে, নিজের দেশের প্রতাপ বৃদ্ধি করবার জন্য দিক্‌বিদিকে জয়-পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা তাদের নিজের দেশরই লোক, তাদের অন্য দেশে প্রবেশের সহজ অধিকার নেই। কিন্তু পৃথিবীর যেখানে যে-কোন মানুষ সত্যকে সুন্দরকে কল্যাণকে বড় করে' দেখিয়েছেন তিনি সকল দেশের অধিবাসী, সকল কালের লোক। আমাদের সম্পূর্ণ মন মুক্ত করে', সকল রকম কুণ্ঠা দূর করে' একথা স্বীকার করতে হবে। তা যদি স্বীকার না করি তা' হলে সমস্ত মনুষ্য-সমাজের মধ্যে আমাদের যে স্থান আছে সেই স্থানকেই অস্বীকার করা হবে। তা হলে এই কথা বলতে হয় যে—পৃথিবীতে আমরা জন্ম-গ্রহণ করিনি, আমরা কেবলমাত্র নিজেরই এই ক্ষুদ্রদেশের চতুঃ-সীমানার মধ্যে জন্মেছি—যা বেড়া দিয়ে আমাদের অন্তরায়নের দণ্ডে দণ্ডিত করেছে। এই কথাটা আমরা যেন অন্তরের সঙ্গে বল্‌তে পারি যে সেই দণ্ড গ্রহণের আমরা যোগ্য নই। যদি যোগ্যতা প্রমাণ করে' থাকি, যদি এমন মূঢ়তা নিয়ে আমরা গৌরব করে' থাকি যে পৃথিবীর আর কোনো মহাজনের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, অন্য দেশের যা' সৃষ্টি যা' কর্ম্ম যা' চিরন্তন সম্পদ আমরা তাকেও সদর্পে প্রত্যাখ্যান করে' থাকি—তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, বোধ হয় করেওছি ;—অনেকদিন ধরে' করেছি। কিন্তু সময় উপস্থিত হয়েছে যখন এমন করে' নিজেদের চারিদিকে এই রকম একটা মানসিক গণ্ডী টেনে সেইটিরই ভিতরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকাকে যেন আত্মাবমাননা বলে' অনুভব করি।...

পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষই ত নির্ব্বাসনের সিংহদ্বার দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে আপন অধিকার লাভ করেন।...তাঁদের সাময়িক লোকে তাঁদের নির্ব্বাসনে দিয়েছে ; তার কারণ, তাঁরা সংকীর্ণভাবে কোনো দেশের বা কোনো কালের মন জোগাতে পারেন নি। তাঁরা এমন একটি বাণী এনেছেন যা সকল কালের সকল দেশের ; এইজন্য সামান্য ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সেই বাণী আপনার স্থান পায় না। এই-সকল মহাপুরুষেরা নগদ মজুরি কখনো পান না। জীবিতকালে যশের দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে প্রবাসী হয়ে থাকেন, উপবাসী হয়ে জন্ম কাটান।

গণ্ডী আমাদের অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেচে। আমরা এই কথা বল্‌বার চেষ্টা করেছি যে আমাদের আপনাতেই আপনার সার্থকতা ও পর্য্যাপ্তি আছে। এমন কথা আমরা বলেছি যে—আমাদের সাহিত্যই একমাত্র আমাদের সাহিত্য, আমাদের ভাগ্যে আর যেন কোনো সাহিত্য নেই ; আমাদের তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র আমাদের তত্ত্বজ্ঞান ; তার বাড়া আর তত্ত্বজ্ঞান আমাদের পক্ষে হতেই পারে না ; এমন কি বিজ্ঞান সেও আমাদের নয়, সে আর কোনো দেশের। এটার ভিতর যে কত অসত্য আছে মনের অভিমানবশতঃ ক্ষোভবশতঃ আমরা সেটা ভাল করে' বুঝ্‌তে পারি নি। আমাদের প্রত্যেকের জন্য তপস্যা করেছেন সকল দেশের তপস্বী এ কথা যখন ভাবি তখন হৃদয়ের কত বড় প্রসার হয়। মানুষকে মানুষ বলে' আপন বলে' জানলে পর তাতে কত বড় শক্তি। আমাদের দেশের আমাদের অধিকারের সঙ্কীর্ণতাকে আমরা দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু রাষ্ট্রতান্ত্রিক সঙ্কোচই যে সঙ্কীর্ণতা তা ত নয়, তার চেয়ে ঢের বড় সঙ্কীর্ণতা হচ্চে মনের অধিকারের সঙ্কীর্ণতা। আমি যদি বলি আমার মন কবিকঙ্কণের বাইরে যাবে না, আমার মন দাশুরায়ের পাঁচালি ছাড়াবে না, এমন কি বৈষ্ণব-পদাবলী ছাড়া আমার পক্ষে আর গীতিকাব্য নেই, তবে অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে সমস্ত বিশ্বের যে শ্রেষ্ঠ দান বিশ্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছে এবং আমাকে বলছে—"আমি তোমার।"...

মানব-চিত্তের শিকড় বহুদূরগামী, বহুশাখাবিশিষ্ট। মহামানবের মানস-ক্ষেত্রের ভিতর গভীরভাবে এবং প্রশস্তভাবে সে যদি প্রবেশ-লাভ করতে না পারে, সমস্ত মানুষের চিত্তক্ষেত্র থেকে আপনার রস আহরণ করতে না পারে, নিশ্চয় সে মন ক্ষীণ হয়ে যায়, বুদ্ধি তার কখনই হতে পারে না ; তার বুদ্ধির, ধর্ম্মবুদ্ধির, চরিত্রনীতির উন্নতি হতে

পারে না। আমরা যে অনেক আত্মাবমাননা স্বীকার করে' নিয়েছি, অন্ধ বশ্যতায় যে কেবলমাত্র শাস্ত্রবচন বা গুরুর বাক্যকে মাথায় করে' নিয়েছি, এমন ভাবে গতানুগতিকের মতন যে জীবনহীন হয়ে চল্‌তে পেরেছি, কেন? মহামানবের চিত্ত-ক্ষেত্র থেকে আমাদের পূর্ণ খাদ্য আহরণ করতে না পারায় আমাদের মন নির্জীব হয়ে ছিল বলেই সকল কথাই নিশ্চেষ্টভাবে মেনেছি, রাষ্ট্রীয় শাসন, সামাজিক শাসন, শাস্ত্রীয় শাসন সমস্তই মাথা হেঁট্ করে' স্বীকার করতে পেরেছি। বিচার করতে চাইনি, কেননা বিচার-বুদ্ধির জন্যে মনের প্রাণশক্তির দরকার। অধীনতার যে-সমস্ত দুর্গতি থেকে আজ আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি সে সমস্তের মূল হচ্চে মনের নির্জীবতা। মনকে সজীব সবল ও সচল করতে হলে মনের খাদ্য সম্পূর্ণরূপে দিতে হয়। কোনো বাইরের অনুষ্ঠান বাইরের যান্ত্রিক কোনো একটা ক্রিয়া দ্বারা আমাদের মন কখনই জীবন লাভ করতে পারবে না, পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু বড় আছে, যার ভিতর অমরতা আছে—সেই সমস্ত নিলে পরে তবে আমাদের মন অমৃত খাদ্য লাভ করবে, এবং সেই অমৃতের দ্বারাই সে বড় হয়ে উঠ্‌বে, আর কিছু দ্বারা নয়। মৈত্রেয়ী যে বলেছিলেন যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ সে কেবল আধ্যাত্মিকতার দিকেই নয়, সমস্ত দিকে—বিদ্যার দিকে, জ্ঞানের দিকে, সমস্ত দিকেই খাটে। সমস্ত পৃথিবীর একটা অমরাবতী আছে যেখানে অমৃত উৎসারিত হচ্চে। যে সকল সাধকের মন্ত্রবলে তপস্যাবলে তা হয়েচে তারা যে-দেশেই থাকুন একই অমরাবতীর লোক। সেই অমরাবতী সকল দেশেই আছে। সেই অমরাবতীর লোক যেমন কালিদাস, সেই অমরাবতীর লোক তেমনি শেলি কি সেক্সপিয়র। তাঁদের কাছে যেতে হবে। বল্‌তে হবে "হাত পাত্‌লেম, গণ্ডূষ কর্‌লেম, দাও।" তবে আমাদের মন আপনার খাদ্য পাবে এবং শক্তি লাভ করবে।...

শেলি সর্ব্বাংশে...কবি ছিলেন...তাঁর ব্যবহার, তাঁর যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্তই এক কবিত্বের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করেছিলেন—একথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। অনেক কবিকে জানি, একটা বিশেষ সময়ে হয়ত কবিত্বের ভূত তাঁদের পেয়ে বস্‌লে পর কাব্য রচনা করেন এবং বেশ ভাল কাব্যও রচনা করেন।...কিন্তু শেলির জীবনের আশৈশব গতি এবং প্রকৃতি সমস্তই কবির। Imaginationএর আব্‌হাওয়ায় তাঁর মন নিমগ্ন ছিল। কেবল তাঁর মগজের এক অংশ নয়, তার সমস্ত জীবন নিমগ্ন ছিল। এইজন্য তাঁকে লোকে ক্ষেপা বলে' মনে করেচে অনেক সময়।

অন্যান্য সাধারণ বা অসাধারণ ব্যক্তির মত শেলিরও কতকগুলি মতামত ছিল। একথা আমরা সকলেই জানি মতামত থাকাটা কবিত্বের পক্ষে একটা বালাই। সেগুলি এসে পড়ে কেমনতর, যেমন এক একটি পাথরের টুক্‌রো আসে ঝরণার মুখে। নিজেদের বড় করে' দেখিয়ে মতামতগুলি খাড়া হয়ে ওঠে, ভ্রূকুটি করে' দাঁড়ায়, এবং রসের ধারাকে প্রতিহত করে, এইটে সাধারণতঃ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেটা আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে বিশেষ করে' দেখেচি। যেখানে তিনি রসেতে খুব পূর্ণ হয়েচেন সেখানে তিনি মতকে চাপা দিতে পেরেচেন। কিন্তু সেই পূর্ণতার একটু খর্ব্ব হবামাত্র তাঁর মতগুলো খাড়া হয়ে উঠে রসপ্রবাহের প্রতিবাদ করতে থাকে। শেলিরও মতামত ছিল স্বাধীনতা সম্বন্ধে, মানবজাতির জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে, রাজনীতি সম্বন্ধে। কিন্তু সেই মতগুলি পাগ্‌লামির দ্বারা বেশ মজে' গিয়েছিল। সে ছিল এক পাগ্‌লা কবির মতামত। সুবুদ্ধি জিনিষটা মর্ত্তের জিনিষ, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের খাঁটি যে পাগ্‌লামি সে দৈবী। তাই বুঝি সুবুদ্ধির গড়া জিনিষ ভেঙে ভেঙে পড়ে, আর পাগ্‌লামির উড়িয়ে-আনা জিনিষ বীজের মত অরণ্যের পর অরণ্য সৃষ্টি করে. তাই পাগ্‌লা শেলির বাণী আজও নবীন আছে। তার মন্ত্রগুণ আজও নষ্ট হয়নি। তিনি যখন বালক তখন থেকেই রাজশক্তি সমাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেটা যে কোনোরকম হিসেবী বুদ্ধি থেকে তা নয়। উনপঞ্চাশ পবনের দ্বারা চালিত হয়ে যেন তিনি দৌড়ে ছুটেছিলেন। অত্যন্ত উদ্দাম হৃদয়ের Imaginationএর বেগের দ্বারা উতলা হয়ে উঠে তিনি এতবড় মানব জাতির দূর ভবিষ্যৎকে মহিমামণ্ডিত করে' দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। মানব-জাতির দূর ভবিষ্যৎগৌরবের সেই স্বর্গলোককে তিনি যে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে মুগ্ধ হয়ে তিনি বর্ত্তমান কালের যা-কিছু দুর্গতি তাকে অত্যন্ত আঘাত দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ......দুই সংঘবদ্ধ শক্তিকে তিনি আঘাত করেছেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। রাজতন্ত্র এবং পুরোহিততন্ত্র। তিনি বলেচেন মানুষ এই দুই তন্ত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে একেবারে জর্জ্জর হয়ে গেল; একদিক থেকে বাইরে তাকে দাসত্বে বদ্ধ করেচে রাজশক্তি, আর একদিকে ধর্ম্মতন্ত্র তার আত্মাকে সঙ্কীর্ণ করেচে, মুগ্ধ করে' রেখে দিয়েছে। এই দাসত্বের বন্ধন আর মোহের বন্ধন তিনি সইতে পারেন নি।...

আমরাও রাজশক্তিকে তার রুদ্ধ বেষ্টনের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে' জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ করতে চাই। যে-শক্তি রাজদণ্ডরূপে আমাদের হাতে থাকবে সেটাকে আমাদের মেরুদণ্ডের উপর পড়্‌তে দিতে পারিনে, এই কথা আমাদের বল্‌বার সময় হয়েচে।

এখানে আমরা কবিকে বল্‌ব যে, তুমি আমাদের কবি, আমাদের কথাই তুমি বলেচ। ধর্ম্মতন্ত্র আমাদের আত্মাকে বস্তুপ্রবণ বস্তুতন্ত্রের দ্বারা আবিষ্ট করে' দিয়েচে—এ অত্যন্ত সত্য। আমরা যে-সব জড় বিশ্বাসকে অন্ধভাবে জড়িয়ে ধরে' জড় মন্ত্রকে না চিন্তা করে' কেবল আবৃত্তি করে' যাওয়ার ভিতরে ধর্ম্মলাভ পুণ্যলাভ করতে চেষ্টা করেছি, তার দ্বারা কতখানি নিজেকে খর্ব্ব করেছি সেটা বলা যায় না। এটা সেদিনও যেমন বিপদের কথা আজও সেইরকম বিপদের কথা।...এই দুই তন্ত্র থেকে আমাদের মুক্তিলাভ করবার দিন এসেছে।..

বিচিত্র সুখদুঃখময় মানুষের এই জীবনটাকেও শেলি যেন একটা পর্দ্দার মত করে' দেখেছিলেন। এর খণ্ডতা এর স্থূলতা যেন সত্যকে আবৃত করে' রয়েচে। এই কুহেলিকার পর্দ্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে সত্যের অখণ্ড নির্ম্মল মূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্যে কবির ভারি একটা ব্যাকুলতা ছিল। কতবার সেইজন্য তিনি মৃত্যুর মধ্যে উঁকি মেরে দেখ্‌বার চেষ্টা করেচেন। এই মুক্তিপিপাসু কবি যেমন রাজতন্ত্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের বাধা সইতে পারেন নি, তেমনিই মানুষের জীবনের খণ্ড-চেতনা বিরাট সত্যের উপলব্ধি থেকে আমাদের চিত্তকে যে গণ্ডীবদ্ধ করে' রেখেচে এও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এইখানে যেন শেলির মনের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় মনের একটা মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষও এই ব্যাবহারিক জগৎকে এই স্থূল জগৎকে সম্পূর্ণ সত্য বলে' বিশ্বাস করে না এবং এর ভিতরে অন্তরতম অন্তর্যামী যে সত্য আছে তাকেই সন্ধান করে' বেড়ায়। এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা বল্‌বার আছে। শেলিকে তাঁর জীবনকালে ও পরবর্ত্তীকালে তাঁর দেশের লোকে নাস্তিক বলে' অপবাদ দিয়েচে। তার কারণ এই যে প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রকে তিনি আঘাত করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে গভীর একটা ধর্ম্মের তৃষ্ণা ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না। তিনি তাঁর Alastor কাব্যের মধ্যে যে সন্ধানের বেদনা প্রকাশ করেচেন সে কিসের সন্ধান? মেঘদূতে বিরহী যক্ষের হৃদয়ব্যথা যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে সেই সৌন্দর্য্যের চরমতাকে অলকাপুরীতে গিয়ে স্পর্শ করেছিল, এলাস্টরেও তেমনি মানুষের

ব্যথা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতরে অমৃতের সন্ধান করে' সেই প্রকৃতির অতীত লোকে তাকে পাবার চেষ্টা করেচে। প্রকৃতির মধ্যে তার তৃপ্তির পূর্ণতা হয় নি।...তার যে বেদনা, সেই যে সন্ধান, তারই দ্বারা প্রমাণ হয় যে পরম সৌন্দর্য্যময় একটি আত্মিক সত্তা বিশ্বের মধ্যে আছে ; সে সম্বন্ধে শেলির চিত্তে গভীর বেদনাপূর্ণ একটি আকুতি ছিল।...

(ভারতী, আশ্বিন) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

সেদিন আমায় বলেছিলে,
আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে' গেলে তাই।
তখনো খেলার বেলা
বনে মল্লিকার মেলা
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই।
আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলি-বিলীন ভূষণবিহীন।
বেলা আর নাই বাকি,
সময় হয়েছে নাকি,
দিন-শেষে দ্বারে বসে' পথপানে চাই॥

(ভারতী, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শ্রীশ্রীদুর্গা

...ঋগ্বেদে এই আদ্যাশক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তটি সাধারণতঃ "দেবী-সূক্ত" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেনোপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এই ব্রাহ্মীশক্তি অর্থাৎ ভগবতী দুর্গার শক্তিসম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে।..

(গন্ধবণিক, আশ্বিন)

—

বাঙ্গালায় দুর্গোৎসব

মনুসংহিতার টীকাকারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কুল্লুকভট্টের সন্তান রাজা কংসনারায়ণ, মহামতি আকবর সাহের রাজত্ব-সময়ে বাঙ্গালায় প্রথম দুর্গাপূজা প্রচলন করেন। আচার্য্যাগ্রগণ্য রমেশ শাস্ত্রীর বিধানমতে রাজসিকভাবে দুর্গোৎসব করিতে কংসনারায়ণের প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তদবধি প্রতি বৎসর বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে প্রতি নগরে আনন্দময়ীর এই মহাযজ্ঞ মহাআড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। রাজা কংস যখন দুর্গাপূজা করেন, তখন টাকায় আড়াই মণ চাউল মিলিত, পাঁচসের ঘি মিলিত, পাঁচগণ্ডা কড়িতে এক ঘটী জলহীন দুগ্ধ পাওয়া যাইত।...

(স্বাস্থ্যসমাচার, ভাদ্র ও আশ্বিন)

—

মাতৃপূজা

...শুক্লযজুর্বেদোক্ত অম্বিকা দেবী, কেনোপনিষদুল্লিখিত উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা,... দেব্যুপনিষৎ, বহ্বৃচোপনিষৎ, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, শিবপুরাণ দশম অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ২৬০ (ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে মৎস্যপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরাণ), গরুড় পুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড ১৩৪ অধ্যায়, অগ্নি পুরাণ ৫০ অধ্যায়, দেবীপুরাণ পঞ্চাশৎ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়, মহানির্বাণতন্ত্র চতুর্থ উল্লাস ১০ শ্লোক, কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ দ্বাদশ অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণ ৩৬ অধ্যায় ২৫ শ্লোক, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৭ অধ্যায়, দেবী পুরাণ ৩৭ অধ্যায়, কালিকা পুরাণ, বরাহ পুরাণের ৯১-৯৫ অধ্যায়, মহাভাগবত পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড ২১।২২ অধ্যায়, দেবীভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ ত্রিংশ অধ্যায়... শরৎকালে মহাপূজার উৎপত্তির বিষয় কথিত আছে।...মহাভাগবতে পুরাণের অষ্টোত্তরশত নীলপদ্মের দ্বারা দেবীর পূজার আখ্যান কৃত্তিবাস স্বপ্রণীত রামায়ণে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।..বহুপ্রাচীন-কাল হইতে প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর হইল এই পূজার প্রচলন হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও শারদীয়া পূজার উল্লেখ আছে। মৎস্যপুরাণধৃত দুর্গার মূর্ত্তিনির্ম্মাণব্যবস্থা দেখিলে দুর্গাপূজার প্রাচীনত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

দেবীর বোধনমন্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে বিজিগীষু নরপতিবৃন্দ শত্রুনাশ জন্য দেবীর পূজা করিয়া দিগ্বিজয়জন্য বহির্গত হইতেন। এখনও ভারতবর্ষে নানাস্থানে বিজয়াদশমীর দিন সৈন্য পরিদর্শন (review of troops) হয় এবং রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব হয়। প্রাচীনকালে জয়ার্থী রাজগণের নীরাজনাবিধি করিতে হইত। তৎসম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে।

মহাভারত, রামায়ণ ও হরিবংশে উমা দেবীর বর্ণনা থাকিলেও উপরোক্ত প্রকার পূজার বিষয় বর্ণিত হয় নাই। দেবীর পূজা সম্বন্ধে কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও দেবীপুরাণ দ্রষ্টব্য। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন কৃত তিথিতত্ত্বেও সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। স্কন্দ ও ভবিষ্যপুরাণে এই পূজা ত্রিবিধা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।...

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে দুর্গাদেবীর রাজসিক পূজার বিধান উক্ত হইয়াছে। বলিদানের দ্বারা দুর্গাদেবীর প্রীতি হয়। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীপূজা করেন।

...হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে, আনন্দ লহরী ৯।১০, ষট্চক্রনিরূপণ ৫২।৫৩ ৫৪। ৫৫ শ্লোক প্রভৃতিতে পূজাপ্রণালী আছে।

(মাধবী, আশ্বিন)

—

সূর্য্যপূজা

...সূর্য্যদেবের পুরুষাকৃতি মূর্ত্তি শাকদ্বীপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল ও পরে তথা হইতে সূর্য্যদেবের পুরুষাকৃতি মূর্ত্তির উপাসনা অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চন্দ্রভাগাতীরে সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় সূর্য্য-প্রতিমা স্থাপন করিয়া সাম্ব শাকদ্বীপ হইতে মগ বা ভোজক ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন ও সূর্য্য-প্রতিমূর্ত্তির পরিচর্য্যা-কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এ বিষয় আমরা ভবিষ্যপুরাণ হইতে অবগত হই।...সূর্য্য-পূজার যে ক্রম বিহিত হইয়াছে, তাহাতে বিদেশীয় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।...

সূর্য্যপূজার যে ক্রম তাহাতে "মিহিরায়" এই একটি মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মিহির' সূর্য্যের আর-একটি নাম।…সূর্য্যের 'মিহির' নাম বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। স্যার ভাণ্ডারকর বলেন, মিহির শব্দ পারস্যভাষায় 'মিহর্' শব্দের সংস্কৃতের আকার। পারস্য 'মিহর্' আবেস্তার মিথ্ শব্দের অপভ্রংশ। মিথ্ শব্দটি মিত্র শব্দের অপভ্রংশ।

মিহর্ উপাসনা প্রথমে পারস্যদেশে উদ্ভূত হয়; পরে এসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এমন কি পরে রোম পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বীগণের উৎসাহে এই ধর্ম্ম পূর্ব্বদিকেও প্রসারলাভ করিয়াছিল। কণিষ্কের মুদ্রায় মিহির-মূর্ত্তি তাহারই নিদর্শন। সুতরাং কুষণ বংশীয় কণিষ্কের রাজ্যকালে এই ধর্ম্মমত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মূলতানের মন্দিরও প্রায় সেই সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সূর্য্যোপাসনা বৈদিক কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল; কাজেই মগগণের আচার যাহাই থাকুক না কেন, সূর্য্য-পূজায় ক্রমে ভারতবর্ষের প্রাচীন সূর্য্যোপাসনার প্রণালী প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।…

সূর্য্যপূজা-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই—পূজক আচমন করিবার পর শ্বাসরোধের নিমিত্ত বস্ত্র-দ্বারা নাসিকা আবৃত ও কেশের জল অপনয়ন হেতু মস্তক (বস্ত্র দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া সূর্য্যের পূজা করিবে। কোনও স্থানে আছে, 'মস্তক, নাসিকা ও মুখ যত্নপূর্ব্বক ভাল করিয়া আবৃত করিয়া সূর্য্যের পূজা করিবে। এই আবরণ শিথিল করিবে না।'

মস্তক, নাসিকা ও মুখ আবৃত করিয়া পূজা অন্য দেবতা সম্বন্ধে লক্ষিত হয় না। সুতরাং এই আচার মগগণ কর্ত্তৃক সূর্য্যপূজায় ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পারস্যদেশীয় পুরোহিতগণের যে এইরূপ আচার ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।… মগগণ সূর্য্যপূজকরূপে ভারতবর্ষে আনীত হইয়া বিশেষ সম্মান পাইয়াছিল। সেই সময় হইতে উত্তর ভারতবর্ষে সূর্য্যদেবের বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল ও যাত্রীগণ বহু দূর হইতে এই-সমস্ত মন্দিরে সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিত।

(বামাবোধিনী-পত্রিকা, আশ্বিন)

শ্রী সাতকড়ি অধিকারী

—

খেলা

কোন্ খেলা যে খেল্‌ব কখন
ভাবি বসে' সেই কথাটাই।
তোমার আপন খেলার সাথী কর
তা' হলে আর ভাবনা ত নাই॥
শিশিরভেজা সকাল বেলা,
আজ কি তোমার ছুটির খেলা?
বর্ষণহীন মেঘের মেলা,
ওর সাথে মোর মনকে ভাসাই॥
তোমার নিঠুর খেলা খেল্‌বে যে দিন
বাজ্‌বে সেদিন ভীষণ ভেরী।
ঘনাবে মেঘ, আঁধার হ'বে
কাঁদবে হাওয়া আকাশ ঘেরি।
সেদিন যেন তোমার ডাকে
ঘরের বাঁধন আর না থাকে,
অবাধরে পরাণটাকে
প্রলয়-দোলায় দোলাতে চাই।

(বিজলী)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

নূতন দেবী-মাহাত্ম্য

.. ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে গীত আছে দেবী দ্যুলোকের ও ভূলোকের পরে বর্ত্তমান, স্বর্গমর্ত্ত্য তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না—তাঁহার এতই মহিমা!

দেবীর এই অকথ্য মহিমা বা মাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় ঋষি [মার্কণ্ডেয় পুরাণের] চণ্ডী-গ্রন্থে পৌরাণিক আখ্যানের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।… মেধস্ ঋষি দেবীর মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়া তিনটি প্রাচীন 'ইতিহাস' বর্ণন করিলেন—প্রথম মধুকৈটভ বধ, দ্বিতীয় মহিষাসুর বধ, তৃতীয় শুম্ভনিশুম্ভ বধ। দেবীভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে আর-এক দেবী-মাহাত্ম্যের বিবরণ আছে।…

পূর্ব্বকালে কোশলদেশে ধ্রুবসন্ধি নামে এক তেজস্বী সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। .. রাজার পুত্র সুদর্শন।… কাশীনগরে কাশীরাজসুতা শশিকলা সুদর্শনের প্রতি অনুরক্তা হইলেন।…

দেবী কাশীরাজ সুবাহুর স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। সুবাহু বলিলেন,—এই বর দিন যে যত কাল এই কাশী পুরী পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন আপনি দুর্গারূপে এখানে অধিষ্ঠিতা থাকিবেন। দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া সুবাহুকে বর দিলেন এবং সুদর্শনকে অনুমতি করিলেন "তুমি অযোধ্যা নগরীতে আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া সযত্নে ভক্তিসহকারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে। বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্র-বিধান-মতে ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমার মহাপূজার ব্যবস্থা করিবে।"…

রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া সুদর্শনের প্রথম কার্য্য হইল দেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা।… তিনি বহু নিপুণ শিল্পী আহ্বান করিয়া এক সুমনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন এবং শুভদিনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এবং বিবিধ বিধান অনুসারে তাঁহার পূজার প্রবর্ত্তনা করিলেন। তাঁহার অনুকরণে কোশল রাজ্যের সর্ব্বত্র দেবীপূজা প্রবর্ত্তিত হইল। ওদিকে রাজা সুবাহুও কাশীতে দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া ভক্তিভরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইরূপে ধরাতলে দুর্গাদেবী বিখ্যাত হইলেন

বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গাদেবী ধরাতলে।

(ব্রহ্মবিদ্যা, আশ্বিন)।

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

—

মনসাতত্ত্ব

সমগ্র বঙ্গদেশ আসাম ও কোচবিহার এই কয় বিভাগে আপামর সাধারণ হিন্দুর গৃহে মনসা দেবী সমভাবে সমাদৃতা ও বিভিন্ন প্রণালীতে পূজিতা হইয়া থাকেন। সুতরাং অন্যান্য প্রাদেশিক দেবতার ন্যায়, ইঁহাকে প্রাদেশিক দেবতার শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা যায় না।… মনসাপূজা স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তিথিতত্ত্বে, শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়-কৃত ব্রতকালবিবেকে এবং বাচস্পতি মিশ্র কৃত কৃত্যচিন্তামণি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মৈমনসিংহ প্রদেশে প্রচলিত 'বঙ্গকুল' নামক নিবন্ধেও মনসাপূজার বিস্তৃত পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া

যায়।…পূজার কাল এবং অনুষ্ঠান-প্রণালীরও প্রভূত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধেও মতভেদের অভাব নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্বে দেবীপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদনুসারে আষাঢ়ের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে এই দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে। বচনের অর্থ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত দেবতার সহিত নিদ্রিত হন, অর্থাৎ বিষ্ণুর শয়ন হইলে সমস্ত দেবতারই নিদ্রা হইয়া থাকে। অনন্তর কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে মনসাদেবী জাগরিত হন। ঐ তিথিতে সিজবৃক্ষের শাখাশ্রিত মনসাদেবীর পূজা কর্ত্তব্য। দেবীর পূজা এবং নমস্কার করিলে সাধকের সর্পভয় বিদূরিত হয়। দেবীর পূজার পরেই অনন্তাদি মহাসর্পগণের পূজা বিহিত হইয়াছে। সর্পদিগের পূজায় ক্ষীর ও ঘৃত বিশেষ নৈবেদ্যরূপে বিহিত হইয়াছে।…

বাচস্পতিমিশ্রকৃত "কৃত্যচিন্তামণি" গ্রন্থেও হরিশয়নের অনন্তর শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমীতেই মনসা দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে, এবং দ্বারের উভয় পার্শ্বে গোময়ের দ্বারা বিষধর সর্প আঁকিয়া তাহাদের পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু গৃহমধ্যে নিম্বপত্র স্থাপনেরও বিধান আছে।…

বাচস্পতি মিশ্র যে পঞ্চমীতিথিকে "মনসাপঞ্চমী" নামে অভিহিত করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে উহার নাম "নাগপঞ্চমী"। তৎশাস্ত্রে উহা দেবপক্ষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "আষাঢ়ে নাগপঞ্চমী" মুখ্যচান্দ্র আষাঢ়ের কৃষ্ণাপঞ্চমীই গৌণ চান্দ্র শ্রাবণের তিথি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত্যতত্ত্বে ভাদ্রের শুক্লাপঞ্চমীতে নাগপূজার ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন যে বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইহারই নাম "নাগপঞ্চমী"।…

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আর-একটি কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও নাগ আঁকিয়া পূজা করিতে হইবে, ইহাতে কোন্ নাগ আঁকিতে হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তথাপি শ্রাবণ পঞ্চমীতে যে-সমস্ত নাগের পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই কর্কোট প্রভৃতি নাগদিগকেই আঁকিতে হইবে, এবং শ্রাবণী পঞ্চমীবিহিত রীত্যনুসারেই পূজা করিতে হইবে। নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীই নাগপঞ্চমী নামে অভিহিত হইয়াছে।…অতঃপর হেমাদ্রি হইতে গোময়লিখিত নাগপূজার বিধায়ক বচনাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার নাগপঞ্চমী এবং দাক্ষিণাত্যের ও হিন্দুস্থানের নাগপঞ্চমী এক তিথি নহে। বাঙ্গালার নাগপঞ্চমীতে মনসাপূজার অঙ্গরূপে নাগপূজা হইয়া থাকে। আর দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দুস্থানে প্রধানরূপেই নাগপূজার ব্যবস্থা। মৈথিলমিশ্রের মতে বাঙ্গালার নাগপঞ্চমীতেই মনসাপূজার বিধান আছে, পরন্তু ঐ তিথি নাগপঞ্চমী বলিয়া পরিচিত নহে। ভাদ্র-শুক্লাপঞ্চমীই নাগপঞ্চমী, এবং তাহাতেই স্বতন্ত্ররূপে নাগপূজার বিধান। বাঙ্গালীর গ্রন্থে নাগপঞ্চমীতে গোময়ের দ্বারা সর্পলিখনের ব্যবস্থা নাই, উহা মৈথিলের মতে আছে। ভাদ্রের শুক্লাপঞ্চমীতে নাগপূজার ব্যবস্থা মৈথিলের ও বাঙ্গালীর সমান। হেমাদ্রিধৃত বচন ভবিষ্যপুরাণীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, বাঙ্গালী রঘুনন্দন-ধৃত কৃত্যতত্ত্বের বচনগুলিও ভবিষ্যোত্তরীয় বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মাসের ঐক্য নাই। সুতরাং ইহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও অনেক দেশ্যপ্রভাব রহিয়াছে। বাঙ্গালার পুরাণ, মিথিলার পুরাণ ও দাক্ষিণাত্যের পুরাণ নামত এক হইলেও কাষ্যত সম্পূর্ণ এক নহে।…

মনসাদেবী অষ্টনাগসমাযুক্তা, এই কথা তাঁহার অনেকগুলি প্রাদেশিক ধ্যানে এবং প্রার্থনা প্রভৃতির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে।… তিথিতত্ত্বধৃত পুরাণান্তরের বচনে অষ্টনাগের নাম কথিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত বচনোল্লিখিত নাম ও সংখ্যার যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।…

পদ্মপুরাণের বচনে…তেরটি নাগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গরুড়পুরাণের বচনে…বারটি নাগ দেখা যায়।

যদিও দেবীর ধ্যান প্রভৃতিতে অষ্টনাগের উল্লেখ দেখা যায়, তথাপি পূজাপদ্ধতিতে অষ্টনাগের অতিরিক্ত নাগদিগেরও পূজা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। কোন কোন ধ্যানে অষ্টনাগ দেবীর বিবিধ আভরণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গরুড় পুরাণের বচনে নাগদিগের "অসিত" বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। আভিধানিক অর্থানুসারে অসিত শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু পদ্ধতিতে নাগদিগের যে ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতে ইহাদের নানা প্রকার বর্ণেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি-কৃত "ব্রতকালবিবেকে" জ্যৈষ্ঠশুক্ল-দশমীতে "মনসাব্রত" বিহিত হইয়াছে।…হস্তানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠশুক্ল-দশমীতে ব্রহ্মরূপিণী "মনসাদেবী" কশ্যপ হইতে জাত হইয়াছিলেন। কশ্যপের মন হইতে জাত হইয়াছিলেন, এই হেতু ইনি "মনসা" নামে অভিহিতা হইয়াছেন।…

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শূলপাণির গ্রন্থেই জ্যৈষ্ঠশুক্লাদশমীতে মনসাপূজার ব্যবস্থা দেখা যায়। অদ্যাপি রাঢ়দেশে ভগীরথ-দশহরার দিনে মনসার ঘটস্থাপন হইয়া থাকে এবং ঐদিন হইতেই পূজা আরম্ভ হয়। নাগপঞ্চমী, কর্কটসংক্রান্তি, সিংহসংক্রান্তি এবং শ্রাবণমাসের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক পঞ্চমীতেও পূজা হইয়া থাকে। রাঢ়ের পূজার আরও বৈশিষ্ট্য আছে।…নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে নাগপঞ্চমী দিনেই সিজের ডাল ঘরে স্থাপিত হয়, এবং ঐদিনে পূজা হয়। কর্কটসংক্রান্তি, সিংহসংক্রান্তি এবং শ্রাবণের অন্তঃপাতী প্রত্যেক পঞ্চমীতেই পূজা হইয়া থাকে। এই প্রথা বাঙ্গালার অনেকস্থলেই দেখা যায়। ময়মনসিংহ সদরের অধীন পুঁটাজানা দেবগ্রাম অঞ্চলে নাগপঞ্চমীতে মনসার ঘটস্থাপন করা হয়। ঐ ঘটে প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে। কর্কটসংক্রান্তি, সিংহসংক্রান্তি ও শ্রাবণের প্রত্যেক পঞ্চমীতে স্বতন্ত্র ঘটস্থাপন করা হয়। মোট পাঁচটি ঘট স্থাপিত হইয়া থাকে। যদি নাগপঞ্চমী তিথি সৌর শ্রাবণে যাইয়া পড়ে, তবে সিংহ-সংক্রান্তিতে দুইটি ঘটস্থাপন করিতে হয়। আমাদের দেশে মাঘের শুক্ল-পঞ্চমীতে মনসা-পূজা হয়। মেয়েরা বলিয়া থাকেন যে, উহা মনসার জন্মতিথি। রাজসাহী…প্রদেশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কর্কটসংক্রান্তিতে ঘটস্থাপন করেন: প্রতিদিন স্থাপিত ঘটে পূজা হইয়া থাকে। পুরুষপূজক সম্ভব না হইলে মেয়েরাও পূজা করিয়া থাকেন। শ্রাবণ-সংক্রান্তি, সিংহসংক্রান্তি এবং শ্রাবণের শুক্লাকৃষ্ণাপঞ্চমীতে কিছু ব্যাপক পূজা হইয়া থাকে।…ঐ প্রদেশে যে-সকল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা কেবল নাগপঞ্চমী দিনেই মনসাপূজা করেন, অধিকন্তু রাঢ়ীয়গণ কেবল সিজের ডালেই পূজা করেন, মূর্ত্তি করেন না। বারেন্দ্রগণ প্রতিমায় পূজা করেন, অনেক বাড়ীতে পূজায় ছাগ বলিদান হয়।…প্রদোষ সময়ে নাগমাতা মনসাদেবীর পূজার ব্যবস্থা দেখা যায়।…কুমারখালীতে কর্কটসংক্রান্তিতে মনসার ঘটস্থাপন হয়। সিংহসংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঘটে পূজা হইয়া থাকে। মেয়েরাই পূজা করেন, প্রতিবন্ধকবশতঃ মেয়েরা পূজা করিতে না পারিলে পুরোহিত পূজা করেন।

শূলপাণিধৃত ব্যাসবচনে কশ্যপ হইতে মনসার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। দেবীভাগবতে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়।…পূজার কালসম্বন্ধে দেবীভাগবতে কথিত হইয়াছে যে,—…স্নানের অনন্তর গুপ্ত গৃহমধ্যে সংক্রান্তি দিবস আবাহনের

পর ঈশ্বরীদেবীর পূজা করিবে। পঞ্চমীতেও পূজা এবং বলিদান করিতে হইবে। আর-একটি বচনে আষাঢ়সংক্রান্তিতে পঞ্চমী তিথিতে মাসান্তে অর্থাৎ শ্রাবণ-সংক্রান্তিতেও প্রতিদিন অর্থাৎ মাসব্যাপক পূজা বিহিত হইয়াছে।...

মহাভারতের আস্তিকপর্ব্বে মনসার জরৎকারু নাম, জরৎকারু-মুনির সহিত বিবাহ এবং মনসার গর্ভে আস্তিকের উৎপত্তি এই কয়টি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বাসুকির ভগিনী এ কথাও আছে। কিন্তু জরৎকারু নামের নিরুক্তি ও কশ্যপের মন হইতে উৎপত্তি এ সমস্ত বিষয়ের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

আমরা যে-সমস্ত পদ্ধতি পাইয়াছি, তত্রত্য ধ্যান, প্রার্থনা, আবাহন, স্তুতি প্রভৃতির মধ্যে অনেকস্থলেই মনসাদেবী শঙ্করের কন্যা নামে এবং পদ্মবনে সমুৎপন্না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মনসার ভাসান এবং মেয়েলী কথাতেও ইনি শঙ্করের দুহিতা এবং চণ্ডিকাদেবীর সপত্নীকন্যা বলিয়াই কথিত হইয়াছেন।...

শ্রী গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ও আশ্বিন)

—

সহধর্ম্মিণী

দেবতা হতে নাইক আমার সাধ,
চাইনা আমি তোমার আরাধনা,
শুন্‌তে আমি চাইনা তোমার কাছে
'হুজুর প্রভু জনাব্ জাঁহাপনা।'
হাজার লোকের নফর চাকর হয়ে
তোমার বুকে রাজার আসন নিয়ে
মর্য্যাদা মান শৌর্য্য এদেশ মাঝে
বিন্দুমাত্র বাড়্‌বেনাক প্রিয়ে।
এ অন্ধাগার কে সাথী হয় যদি
দাসী হয়ে শুধুই কর সেবা ?
পূজারিণী হয়েই যদি রও,
সচিব তবে আমার হবে কেবা ?
প্রেমদীক্ষায় শিষ্যা কোথা পাই
নিজকে যদি অবোধ শুধু ভাবো ;
সঙ্কোচেও শৃঙ্খলিতা যদি,
গৃহিণী মোর কোথায় তবে পাবো ?
কণ্ঠে তোমার কুণ্ঠা কেন এত ?
কুণ্ঠা প্রেমের শত্রু চিরন্তন।
মিছে কেন লজ্জা আমায় দাও
করে' আমায় আরাধনার ধন।
মিথ্যা মোহে সত্যে যদি ত্যজি,
নিত্য কোরো তীব্র তিরস্কার,
বিপদে মোর সহায় হোয়ো তুমি
বিপথ পানে রুদ্ধ কোরো দ্বার।
শাসন কোরো ব্যসন যদি বরি',
ন্যায়ের দিকে হস্তে ধরে' টেনো,
নারী-হিয়ার মহিমাটি তব
বজায় রেখে সকল আদেশ মেনো।
ভ্রুকুটিতে আমার ত্রুটী ধোরো,
সহজে দোষ করবে কেন ক্ষমা ?
আমার হাতের পুতুল হয়োনাক
পথের সাথী হওগো প্রিয়তমা।
ভীরু যারা আত্মপ্রবঞ্চক
জীর্ণ প্রেমশূন্য যাদের মন,
নারীর কাছে দেব্‌তা সেজে তারা
নারীর বুকে পাতুক রাজাসন।
আমি তোমার চাইনা দাসীপনা :
ঢের বেশী চাই তার চেয়ে যে আমি,
আমি চাহি তোমার ভালবাসা
পূজার চেয়ে অনেক বেশী দামী।

(সম্মিলনী) শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখর।

—

গান

আমার কণ্ঠ হ'তে গান কে নিল ভুলায়ে।
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে।
মেঘের দিনে শ্রাবণমাসে
যূথী-বনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে।
যখন শরৎ কাঁপে শিউলি-ফুলের হরষে,
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।
গভীররাতে কি সুর লাগায়
আধোঘুমে আধোজাগায়,
আমার স্বপন মাঝে দেয় যে কি দোল দুলায়ে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ভাদ্র ও আশ্বিন)

—

ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

স্বাধীনতার নামেই কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সঙ্গীগণ মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের দল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে মহর্ষি নিতান্ত স্বাদেশিক ছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।...রাজা রামমোহন জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের পরস্পরের বৈরিতা নষ্ট করিয়া একটা উদার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র রাজার সেই ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসকলের মধ্যে একটা সমন্বয়-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।...কেশবচন্দ্র এই সমন্বয় করিতে যাইয়া ভারতবর্ষের এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একটা অতি বড় স্বাধীনতার সনন্দ দিয়াছিলেন।...কেশবচন্দ্র পরজীবনে সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, এই মতকেও ছাড়াইয়া যান। নববিধান প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তিনি কহেন, জগতের সকল ধর্ম্মে কেবল সত্য আছে, তাহা নহে, জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য ; নিজ নিজ অধিকারে নিজ নিজ দেশকালপাত্র-বিবেচনায় সকল ধর্ম্মই সত্য। সকল ধর্ম্মই ভগবৎ-প্রতিষ্ঠিত। সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর-বিধান। এইরূপে কেশবচন্দ্র জগতের সকল ধর্ম্মকেই একটা অতি বড় স্বাধীনতার সনন্দ প্রদান করেন। যতক্ষণ না জগতের ধার্ম্মিকেরা এই সূত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ কিছুতেই নষ্ট হইবে না। সত্য অসাম্প্র-দায়িকতা এইভাবেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।...

কেশবচন্দ্র মহর্ষির সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া যে স্বাধীনতার আদর্শকে

ধরিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও গুরুতর বিরোধ প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেশবচন্দ্র অল্পদিন মধ্যেই "প্রেরিত মহাপুরুষ বাদ" প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।...কেশবচন্দ্র ক্রমে নিজেকে 'ঈশ্বর-প্রেরিত' বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।...কেশবচন্দ্র ক্রমে 'আদেশবাদ'...প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের প্রবৃত্তিমূলক সহজ কর্ম্মচেষ্টাকে ধর্ম্মের নামে সঙ্কুচিত করিয়া প্রাচীন বৈরাগ্যের আদর্শও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাও আর-একটা বিরোধের কারণ হইয়া উঠিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র নানাদিকে সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাই এই সংস্কারের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন—এস-কলের চেষ্টা হয়। ক্রমে এখানেও বিরোধ বাধিয়া উঠিল।...

কলিকাতাসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও সেইরূপ কেশবচন্দ্রের একতন্ত্র-শাসন বা অটোক্র্যাসি (autocracy) প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মেরা এইজন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিলেন।...

ব্রাহ্মসমাজে যখন এইরূপে ভাঙাভাঙি ও ভাগাভাগি হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও চারিদিকে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই সংস্কার-কার্য্যে ব্রাহ্মেরা দেশের রাজপুরুষদিগের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের সঙ্গেই এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ ছিল। হিন্দুসমাজ যথাসাধ্য ব্রাহ্মদিগকে নির্য্যাতনও করিতে ছাড়েন নাই।...এই-সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা প্রথম প্রথম ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যখন কেবল ধর্ম্ম-ও সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অল্পে অল্পে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতেছিল। কোচবিহার-বিবাহের বৎসরেই (১৮৭৮) ভারতসভার প্রতিষ্ঠা হয়।...শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত উপাসনা-প্রণালীতে জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে প্রথম প্রথম সামাজিক উপাসনাতে স্বদেশের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। এ সময়ে তিনি স্বদেশের মুক্তি-কামনায় যে সঙ্গীত রচনা করেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-পুস্তকে বোধ হয় সেইটিই একমাত্র স্বদেশী সঙ্গীত। এখনকার ব্রাহ্মেরা সেই সঙ্গীতটি প্রায় ব্যবহার করেন না বলিয়া লোকে তার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এইজন্য সেই সঙ্গীতটি তুলিয়া দিলাম।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারতভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে ;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা-আঁধার তাঁর করহ মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি
অন্তর্যামী জানিছ সে সব হে ;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
সেই কৃপাগুণে দেখি শুভক্ষণে
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন॥

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার কালে তাহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কথাই ভাবি নাই, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদিগের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।...

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের ভিতরে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল আর কাহারও মধ্যে ততটা ফোটে নাই। প্রথম যৌবনাবধি এই স্বাধীনতা এবং মানবতাই তাঁহার ধর্ম্মের মূল উপাদান হইয়াছিল।..তাঁহার নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু ছিল স্বাধীনতা। তাঁহার নিকটে এই স্বাধীনতাই ধর্ম্ম ছিল।...

তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটা ছোট দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—"স্বায়ত্ত-শাসনই (তখনও স্বরাজ-শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।" অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ত্ত-শাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্ম্মতঃ তাহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানি না। "তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন কানুন মানিয়া চলিব -কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।" এই প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল "আমরা জাতিভেদ মানিব না ; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্ব্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোলবৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।" তৃতীয় কথা ছিল—"লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্ন করিব।" চতুর্থ কথা ছিল—"অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত্র আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।" পঞ্চম কথা ছিল—"আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জন বা রক্ষা করিব না ; যে যাহা অর্জ্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"...

এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে যে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের পানে ছুটিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের সে মুক্তধারা আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই দেশের উপরে তাহার প্রভাবও কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ একদিন এদেশে এই যুগে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, ইতিহাস কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না।

(বঙ্গবাণী, আশ্বিন) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

—

বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয়

তাম্রলিপ্তি বা তমোলুক ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব হইতে একটা শ্রেষ্ঠ সাগর-তীর্থ বা বন্দর বলিয়া প্রাচ্য দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল।...ফলে বাঙ্গালা দেশ এই নর-প্রবাহের প্রণালীস্বরূপ ছিল।...তমোলুকের কল্যাণে

বৌদ্ধকালের সকল সভ্যদেশের জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতা মানবতা প্রভৃতি সবই সর্ব্বাগ্রে বঙ্গদেশে আসিয়া সঞ্চিত হইত।...তমোলুক বাঙ্গালীকে একটা অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়া রাখিয়াছে।...

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবকালে জাতি-বিচার এবং বর্ণ-বিচার তেমন সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না।...এই একাকারের খেলা মগধে এবং বঙ্গে পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালায় "বাশিষ্ঠ্য পদ্ধতি" অনুসারে পীত মঙ্গোল জাতিসকলের সহিত বাঙ্গালার আদিম দ্রবিড় জাতির এবং মুষ্টিমেয় আর্য্যজাতির বৈবাহিক আদান-প্রদান সাধারণভাবে চলিয়াছিল। বশিষ্ঠ নামের একজন তান্ত্রিক সাধক বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন: তিনি বজ্রযানী বৌদ্ধসমাজের নেতৃপুরুষ ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা দিয়া যান যে, পূর্ণাভিষিক্ত ভারতবাসী তান্ত্রিক বৌদ্ধ স্বচ্ছন্দে চীনে ভুটিয়া অহম প্রভৃতি জাতীয়া যুবতীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন; অবশ্য এমন নারীকে প্রথমে সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে, তবে তাহার সহিত শৈববিবাহ করা চলিবে।...এই শৈব-বিবাহ-পদ্ধতি ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে প্রায় দেড়হাজার বৎসরকাল বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল;...শোণিতগত এই মেলা-মেশা বঙ্গদেশে অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। তমোলুকের প্রভাবে এই শোণিতগত মেলা-মেশা বাঙ্গালার বাহিরে প্রাচ্য দেশের পীত জাতিসকলের সহিত ঘটিয়াছিল।...বিদেশে তীর্থ-ভ্রমণ...জন্য কাহারও জাতিনাশ ঘটিত না।...বৌদ্ধ সমাজে নরনারীর বিবাহ-সম্বন্ধ বড়ই আলগা ছিল। বাঙ্গালার বজ্রযানী বৌদ্ধগণ নারীকে শক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, শৈব-বিবাহপদ্ধতি প্রচলন করিয়া নর-নারীর বিবাহ-বন্ধনটা অধিকতর স্থায়ী করিয়াছিলেন। পরন্তু শৈব-বিবাহে বর্ণবিচার আদৌ ছিল না, এখনও নাই।...বাঙ্গালীর ব্রত, পূজা, নিয়ম, পাঠ, উৎসব-আনন্দ, সংস্কার প্রভৃতি সকল কর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ পদ্ধতি প্রচ্ছন্নভাবে এখনও রহিয়াছে। আমরা বাঙ্গালী এখনও দশআনা বৌদ্ধ রহিয়াছি। এই বৌদ্ধপ্রভাববশতঃ বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জাতি-সমন্বয় ঘটিয়াছিল, বাঙ্গালায় অত্যধিক মাত্রায় শোণিত-সমাবেশ ঘটিয়াছিল,—বাঙ্গালা প্রাচ্য দেশের মিলন-ক্ষেত্র ছিল, এই বঙ্গদেশেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মেলন সাধন হইয়াছিল।...

নেপালে এখনও প্রকটভাবে হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। নেপালে হিন্দুদিগকে বলে দে-ভজু বা যাহারা দেবতার ভজনা করে; আর বৌদ্ধদিগকে বলে গু-ভজু বা যাহারা গুরুর উপাসনা করে। বাস্তবিক বেদে ঠিকমত গুরুবাদ নাই; যিনি গায়ত্রী মন্ত্র শুনাইয়া থাকেন তাঁহাকে আচার্য্য পদবী দেওয়া হয় মাত্র, তিনি গুরু নহেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মেই প্রথম গুরুবাদ প্রচারিত হয়।...গুরুবাদ বেদে নাই।...তন্ত্রের ও বৌদ্ধের গুরু জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মের অতীত।...বাঙ্গালায় সকল জাতীয় মানুষই গুরুর পদ পাইয়াছেন।...এসকল সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ আদি সকল জাতীয় শিষ্য বা উপাসক পাওয়া যায়। ইহাদের সাধন-চক্রে একেবারে কোন প্রকারের জাতি-বিচার নাই।...এ সকলই ত সমাজে রহিয়াছে এবং চলিতেছে, এজন্য কেহ ত জল-অচল হয় না।

বাঙ্গালায় এক সময়ে গুরুবাদটা অতি ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। যাহা কিছু শিখিতে হইত,—শিল্প-কলা, মন্ত্রতন্ত্র, চাতুরী, হুনরী,—সকল ব্যাপারেই "গুরুকরণ" করিতে হইত। আর সে গুরুকে দেবতার আসন দিয়া অর্চ্চনা করিতে হইত।...শতবর্ষ পূর্ব্বে "গুরুকরণ" না হইলে কেহই কোন বিদ্যা কোন চাতুরী অর্জ্জন করিতে পারিত না। শিল্পী বা কুশলীর জাতিবর্ণ-ধর্ম্মের বিচার কেহ করিত না। একবার কাহাকেও কোন বিদ্যা বা চাতুরীর জন্য গুরুর আসন দিলে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয় পুরুষই তাঁহাকে দেবযোগ্য অর্চ্চনা করিতেন। বাঙ্গালার গ্রাম্য পাঠশালা-সকলের "গুরুমশাই" প্রায়ই ব্রাহ্মণ ছিলেন না।...এই গুরুবাদের প্রভাবে বাঙ্গালীজাতির মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে "ছুঁৎমার্গ"টা তেমন প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে নাই। এক কালে নেপালের সহিত বিহার এবং বাঙ্গালার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।...

বৌদ্ধ যুগের পরে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ও জাতির মধ্যে যে জাতি-বিচার ও বিভাগ প্রচলিত হইয়াছে এবং এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, সে জাতি-বিচার বর্ণগত বা বীজগত নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়-এবং বৃত্তিগত।...বাঙ্গালার এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মধ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছে।...এমন কি বৈদ্য ও কায়স্থ গুরুগিরি করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-জাতিভুক্ত হইয়াছে।...বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ নরপতিগণ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে খেলো করিবার উদ্দেশ্যে অনেক রকমের বিশিষ্টকর্ম্মী মানুষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন।

মধু কাণের সুর ও গান বাঙ্গালায় খুব প্রসিদ্ধ। "কাণ" শব্দ কিন্নর শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনেক পণ্ডিতে বলেন। প্রকৃত পক্ষে "কাণ" শব্দ "কাহ্নু" শব্দের অপভ্রংশ। কাহ্নু বা কাণহ্ন পণ্ডিত একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন; তিনি গায়ক, গীত-রচয়িতা এবং নর্ত্তক ছিলেন। জাতিতে তিনি বা তাহার পূর্ব্বপুরুষ "শ্রমণ পণ্ডিত" বা বৌদ্ধ পূজক ছিলেন। তাঁহারই সম্প্রদায়ভুক্ত বা বংশধরগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত নিজেদের জাতি-পরিচয় দিবার সময়ে বলিতেন, আমরা কাণ-বামুন। এই কাণ-জাতি এখন লোপ পাইয়াছে, অর্থাৎ বিশাল সমাজ-অঙ্গে অন্য জাতির আবরণে আত্মগোপন করিয়াছে। ইহাদের মহিলা-সকল কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা কেহই বেশ্যা বা বারমুখী ছিলেন না। বাঙ্গলার শতবর্ষ পূর্ব্বেকার বড় বড় কীর্ত্তনীয়া নারী কান বা গাধ জাতীয়া ছিলেন। স্বয়ং কবি জয়দেব, মনে হয়, কাণ জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নীসহ স্বরচিত "গীতগোবিন্দ" পদাবলী নাচিয়া-নাচিয়া গান করিয়া বেড়াইতেন।...কেঁদুলিতে তাঁহাকে অনেকে কিন্নর-ব্রাহ্মণ বা "কাণ" বলিত। কাহ্নুর রচিত অনেক দোহা ও গানে স্বজন বলিয়া জয়দেবের উল্লেখ আছে।...গাধ জাতিও এই পদ্ধতি অনুসারে রাঢ় দেশে অন্য জাতির সামিল হইয়াছে। গাধ বা গন্ধর্ব্ব জাতি অথবা "গন্ধা" সিদ্ধাচার্য্যের বংশধর ও সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি-সকল কাণেদের মতন আত্মগোপন করিয়াছে। এমন যে কত রকমের মেলা-মেশা বাঙ্গালার জাতি-সকলের মধ্যে হইয়াছে তাহার এখন হিসাব রাখা চলে না। কুলজী গ্রন্থে এক জাতি হইতে অপর জাতির মধ্যে প্রবেশের দৃষ্টান্ত অনেক আছে।...বাঙ্গালায় ব্যবসায়গত জাতি ছাড়া অন্য জাতি ছিল না—নাইও। বাঙ্গালায় বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল না, এখনও নাই।...

বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, ইহারা কেহই খাঁটি বাঙ্গালী নহে। ইহারা কান্যকুব্জ হইতে আমদানী-করা মানুষ। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের পরে, পুনঃ ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার কালে দশবিধ ব্রাহ্মণ মান্য ও গ্রাহ্য হইয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চ গৌড় এবং দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে—গৌড়, উৎকল, মৈথিল, সারস্বত এবং কান্যকুব্জ, এই পঞ্চ শ্রেণী মান্য। গৌড় ব্রাহ্মণই খাঁটি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, অথচ এখন বাঙ্গালাদেশে একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবে না। রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে, মণ্ডী রাজ্যে, ঘড়ওয়ালে এখনও অনেক গৌড় ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ এবং ডোগড়া ব্রাহ্মণ গৌড় ব্রাহ্মণদের বংশধর। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পরে মগধে এবং গৌড়ে অর্থাৎ বাঙ্গালায় গৌড় ব্রাহ্মণদের উপর উৎপাত-উপদ্রব হয়। সেই সময়ে গৌড় ব্রাহ্মণ-সকল দলে দলে বঙ্গ ও মগধ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। একদল উত্তরাখণ্ডের পার্ব্বত্য পথ অনুসরণ করিয়া নেপালে, মণ্ডী রাজ্যে টিহিরিতে যাইয়া বাস করে; তাহাদের অনেকে পরে ঘড়ওয়াল ও রোহিলখণ্ডে নামিয়া বসবাস করে।

আর একদল গঙ্গার তট ধরিয়া পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া যায়। বৌদ্ধপ্রভাব যেমন যেমন পশ্চিম ভারতবর্ষে এবং আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল, উঁহারাও তেমনি হটিয়া যাইতে লাগিল। শেষে রাজপুতানার মরুপ্রদেশে এবং পঞ্জাবের উত্তরাংশে এবং কাশ্মীরে যাইয়া উঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজপুতানার সকল রাজ্যে এখনও গৌড় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রহিয়াছে। গৌড় ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধার্থের ধর্ম্মমতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। উঁহাদের অনেকে জিনাচার বা জৈন মত মান্য করিতেন। জৈন মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত এখনও প্রায় গৌড় ব্রাহ্মণ; জৈন মুনিও অনেকে গৌড় ব্রাহ্মণ। এই গৌড় ব্রাহ্মণের trek বা দেশান্তরে গমনবার্ত্তা স্কন্দ পুরাণে উপাখ্যানের আবরণে বেশ মজা করিয়া বলা আছে।

...বৈশ্য বা শ্রেষ্ঠীদিগের মধ্যে তিনটি শ্রেণী প্রধান ছিল; যথা—গৌড়ী, মাগধী এবং মাথুরী। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের সহিত গৌড়ী শ্রেষ্ঠী বৈশ্যের দলও বৌদ্ধের উপদ্রবে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়। গৌড়ী শ্রেষ্ঠী তমোলুকের ব্যাপার-বাণিজ্য পরিচালন করিত; তাহারাই আমদানী-রপ্তানীর কাজের গোড়া বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই শ্রেষ্ঠীর দল প্রধানতঃ জিনাচারী বা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। গৌড়ী শ্রেষ্ঠীর দল দেশত্যাগ করিয়া প্রধানতঃ রাজপুতানা এবং গুর্জ্জর দেশে বাস করে। এখন বড়বাজারে (কলিকাতায়) যে-সকল মারবাড়ী ও ভাটিয়া বণিক্ আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে, ইহাদের প্রায় চোদ্দ আনা অংশ গৌড়ী অথবা মাগধী বৈশ্য,—পঞ্চগৌড়ের আদিম অধিবাসী, পুরাতন বাঙ্গালী।...

আদিশূরের সময়ে আসিয়া থাকি, বা তাহার পূর্ব্বে বা পরে দলে দলে আসিয়া থাকি, আমরা এদেশের আদিম অধিবাসী নহি।... রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ,—আমরা প্রধানতঃ কনৌজিয়া। বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য তাহারা প্রধানতঃ মৈথিল বা অযোধ্যার সরযূপারী ব্রাহ্মণ; যাহারা দাক্ষিণাত্য-শ্রেণীভুক্ত তাহারা প্রধানতঃ উৎকল বা অন্ধ্র ব্রাহ্মণ। প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কনৌজিয়া ও পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বঙ্গদেশে বাস করিলেও, এদেশের কোন ব্রাহ্মণের সহিত সাধারণভাবে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতেন না, অনেকে কান্যকুব্জ হইতে বিবাহ করিয়া পত্নীসহ বাঙ্গালায় আসিতেন, কেহ কেহ বাঙ্গালায় প্রবাসী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ করিতেন। মোগল-পাঠানের সংগ্রামের সময়ে, শের শাহের শাসনকাল পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে ঘোর অশান্তি বিরাজ করে। তখন আর কথায়-কথায় কাহারও কনৌজে যাওয়া চলিত না। সেই সময়ে, আকবরের শাসনকালের সূচনা পর্য্যন্ত, বাঙ্গালায় কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। দেবীবর সেই গণ্ডগোলের সমাধান করেন; তাঁহার মেলবন্ধন ও কৌলীন্য প্রথার প্রচলন আর কিছুই নহে, উহা বাঙ্গালার পুরাতন ব্রাহ্মণ এবং করণ জাতি সকলের সহিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বৈবাহিক সম্মেলনের নামান্তর মাত্র। কেবল ইহাই নহে। প্রথম পাঠান অভিযানের পরে, নীলচক্ষু গৌরবর্ণ সুন্দর ও সুরূপ কনৌজিয়া ব্রাহ্মণজাতির অনেক কন্যা পাঠানগণ হরণ করেন। তখন কনৌজিয়া-দিগের মধ্যে নারীর অভাব অতিমাত্রায় হইয়াছিল, তাই অনেক পাঠান-অপহৃতা ব্রাহ্মণ- বা কায়স্থ-কন্যাকে ছিনাইয়া আবার ঘরে আনা হয়। এই হেতু জাতির মধ্যে এক-একটা "দোষ" ঘটে। যথা যবন-দোষ, কৈসরখানী দোষ, রোহেলা দোষ, চাঁদাই দোষ, ইত্যাকার ছাব্বিশরকমের দোষের সমাধান দেবীবর করিয়াছিলেন। বিলাতী সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে এখনকার বিজ্ঞান-সঙ্গত ভাষায় যাহাকে Cauterisation, Insulation, Absorption এবং Transmogrification বলা হয়, তাহার সকল গুলির সমন্বয়, ব্যাখ্যা এবং সমাধান দেবীবর করিয়াছেন। দেবীবরের তুল্য সমাজ-সংস্কারক ইদানীং আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ অনেক জিনিস আত্মসাৎ করিয়াছিল। পাঠানীর গর্ভজাত পুত্র-কন্যা ব্রাহ্মণ-সমাজে চলিয়া গিয়াছিল। এমন Absorption বা একাঙ্গী-করণের পদ্ধতি দেবীবরের পরে আর কেহ এদেশে চালাইতে পারেন নাই। দেবীবরের "মেলবন্ধন" "মেলমালা" প্রভৃতি কুলজী গ্রন্থসকল ভাল করিয়া অভিনিবেশসহ পাঠ করিলে বাঙ্গালীর জাতি-তত্ত্বের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইবে।...দেবীবর বাঙ্গালার পুরাতন ব্রাহ্মণ এবং আগন্তুক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, এবং সে পক্ষে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি করিয়া বাঙ্গালার আধুনিক হিন্দু সমাজের পুষ্টি ও বিস্তৃতি সাধন এবং পারম্পর্য্য রক্ষা করেন। তাঁহার মেলবন্ধন, পালটি ও প্রকৃতিনির্দ্দেশ ব্রাহ্মণ-সমাজের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সাধন করে। একদমে পঞ্চ ব্রাহ্মণের মুষ্টিমেয় বংশধরগণ পনর লক্ষে পরিণত হয়।...

বৌদ্ধ একাকারের পরে পাঠান-উপদ্রবগত একাকার হয়। সেই নানাজাতির এবং নানা শোণিতের সম্পিণ্ডিত সমাজকে হিন্দুত্বের আবরণ দিবার উদ্দেশ্যে, উহাকে পুরামাত্রায় Nationalise করিবার চেষ্টায় বাঙ্গালার তিন ব্রাহ্মণ তিন দিক্ হইতে তিন রকমের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজে সকল দোষ দূর করিতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়—দেবীবর, সমাজের সংস্কার করিয়া, মেল, থাক্, জাতি-কুলের নির্দ্দেশ করিয়া, বৈবাহিক আদান-প্রদানের পদ্ধতি স্থির করিয়া সামাজিক শুদ্ধি সাধনের চেষ্টা করেন। তৃতীয়—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, হিন্দুর Typical Evolution বা ব্যষ্টিগত আদর্শের উন্মেষ-চেষ্টায় আচার-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন। প্রথম দুইজন Social cohesion বা সামাজিক ও জাতিগত সংহতি-শক্তির উন্মেষ সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। রঘুনন্দন আকারগত, ব্যবহারগত, আচারগত আদর্শের সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি আচার-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-ধর্ম্ম লইয়া সবিস্তর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন—বাঙ্গালায় দুই জাতি আছে—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। শূদ্রের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, (১) সৎশূদ্র বা ব্রাহ্মণ-আচার অনুকারী, (২) সাধারণ শূদ্র, ইহাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ-আচার অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা না করিবে, পুরাতন বৌদ্ধ আচার ধরিয়া থাকিবে, কেবল তাহারাই জল-অনাচরণীয় হইবে। ব্রাহ্মণের যে-সকল বৃত্তিগত সম্প্রদায় বা "প্রফেশন কাষ্ট" আছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে পারিবে, শূদ্রদিগের যে-সকল "প্রফেশন কাষ্ট্স্" আছে তারাও নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে পারিবে, এমন বিবাহ বৈধ বা স্মৃতিশাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। ইহাই রঘুনন্দনের বড় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হওয়াতে, পুরাতন বজ্রযানী বা মহাযানী বৌদ্ধ এবং নবীন হিন্দুর মধ্যে সমন্বয় সাধন হওয়াতে বাঙ্গালায় এককালে চারিকোটি হিন্দু হইয়াছিল। Social cohesiveness সাধনের এমন প্রশস্ত উপায় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার ইহা একটা বড় উপাদান।...

(বঙ্গবাণী, আশ্বিন) শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

আবেস্তা সাহিত্যে দণ্ডনীতি

আমাদের মনুসংহিতা মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে দণ্ডনীতি যেমন ধর্ম্মনীতির অংশ মাত্র, আবেস্তা সাহিত্যেও তাহাই। আবেস্তা সাহিত্যে ধর্ম্ম হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ধর্ম্মরক্ষার্থই রাজা, ধর্ম্মরক্ষার্থই রাজনীতি। সুতরাং ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিভিন্ন হইতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্যেও না, আবেস্তা সাহিত্যেও না। প্রাচীন কালে মিসর গ্রীস প্রভৃতি সকল দেশেই একরূপ প্রথা ছিল। প্রাচীন মানবের শিক্ষা ও সভ্যতা ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন হয় নাই। ধর্ম্মছাড়া শিক্ষা, বা ধর্ম্ম-ছাড়া সভ্যতা আধুনিক ভারতবর্ষ ব্যতীত বোধ হয় কোথাও নাই। অসভ্য কাফ্রিজাতি, আরণ্য সাঁওতালজাতি, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যজাতি, সকল জাতির মধ্যেই ধর্ম্মচিন্তা ও সভ্যতা অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ধর্ম্মচিন্তা একটা জিনিস এবং শিক্ষা বা সভ্যতা আর-একটা জিনিস—এ প্রকার চিন্তা বিশেষজ্ঞগণেরই নিজস্ব। সাধারণ লোকের চিন্তা ও কল্পনায় ধর্ম্মহীন যে, অসভ্য সে, অশিক্ষিত সে। সে যাহাই হউক প্রাচীনকালে শিক্ষা ও দীক্ষা এক আচার্য্যের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত এবং ধর্ম্মশিক্ষা ও কর্ম্মশিক্ষায় বিশেষ প্রভেদ ছিল না। তাই রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি পরস্পর অভিন্নভাব সম্পর্কে বিজড়িত।

আমাদের মনুসংহিতার ন্যায় পার্সীদিগের প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ 'বেন্দিদাদ্'। এই গ্রন্থে প্রাচীন পার্সীদিগের ইতিহাসের কথা এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিবিষয়ক বিধান-সমূহ তাঁহাদিগের পরমেশ্বর 'অহুরো মজ্‌দা' এবং ধর্ম্ম-প্রচারক "জরথুষ্‌ত্রে'র কথোপকথনচ্ছলে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের প্রধান ও অতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বা Law-book। ইহার অনেক পহ্লবী (Pehlevi) টীকা আছে। টীকায় মূলগ্রন্থের নানাস্থানে নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। টীকা ও মূলগ্রন্থ সাধারণতঃ একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়। টীকাবিহীন মূলগ্রন্থকে 'বেন্দিদাদ্ সাদা' বলা হয়। এই গ্রন্থে স্বয়ং অহুরো-মজ্‌দার মুখনিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া ইহা পার্সীদিগের নিকট আমাদের বেদের ন্যায় অতি পবিত্র। আমাদিগের যেমন শ্রুতি ও স্মৃতিতে ভেদ আছে, ইঁহাদের তাহা নাই। অবশ্য প্রাচীনতার তারতম্য আছে। পার্সীদিগের রাজনীতি বা আইন এই 'বেন্দিদাদ্' গ্রন্থের অনুমোদিত হওয়া চাই।

ইহাদের ধর্ম্মে প্রত্যেক অপরাধের জন্য অপরাধীর দ্বিবিধ দণ্ড হয়; ঐহিক ও পারত্রিক। সুতরাং রাজসভা বা রাজশক্তির আদেশে যে দণ্ড তাহাই চরম নহে। ইহলোকে দণ্ডভোগ করিলেও পরলোকের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দ্বিবিধ শ্রেণীবিভাগ—(১) 'পেশোতনু' অর্থাৎ কায়িক দণ্ডভোগ বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাহার নিবৃত্তি হয়, এবং (২) 'অনাপেরেথ' বা দণ্ডভোগ বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাহার পাপক্ষালন হয় না। 'পেশোতনু' অপরাধসমূহ আবার গুরুত্ব অনুসারে সপ্ত-বিধ। এই অপরাধসমূহের প্রথম তিনটির নাম যথাক্রমে 'আগেরেপ্ত', 'অবওইরিষ্‌ত' এবং 'অরেদুষ্'। অপরাধের মাত্রা অনুসারে দণ্ডেরও গুরুলাঘব হইয়া থাকে। বেত্রদণ্ডই প্রধান দণ্ড। তাহা আবার দ্বিবিধ। প্রথম শ্রেণীর বেত্রের নাম 'অশ্‌পহে-অশ্‌ত্র' ও দ্বিতীয় প্রকার বেত্রের নাম 'শ্রওষো-চরণ'। * অপরাধের মর্য্যাদা অনুসারে বেত্রাঘাতের সংখ্যা যথাক্রমে ৫, ১০, ১৫, ৩০, ৫০, ৭০, ৯০, ২০০। দ্বিবিধ বেত্রের দ্বারা আঘাত করা হয় বলিয়া প্রত্যেক সংখ্যাই আবার দ্বিগুণিত হইবে। গুরুদণ্ডের পরিমাণ হইল ২০০ বেত।

---

* দণ্ডবিধানের সাধারণ ভাষা এইরূপ—"পুরোহিত বা 'শ্রওষা-বরেজ' (শ্রওষ=দেবরক্ষী অর্থাৎ দেবতাদিগের পুলিশ-কর্ম্মচারী; 'শ্রওষা-বরেজ্'=যে পুরোহিত 'শ্রওষ'-নির্দ্দিষ্ট ঐহিক দণ্ডবিধান করেন।) 'অশ্‌পহে-অশ্‌ত্র' দ্বারা এত বেত এবং 'শ্রওষো-চরণ' দ্বারা এত বেত মারিবেন।" সংস্কৃত ভাষায় 'অস্ত্র' শব্দে হস্তীকে প্রহার করিবার অঙ্কুশ বা 'ডাঙ্গস' বুঝায়। সুতরাং 'অশ্‌পহে অশ্‌ত্র' (=অশ্বস্য-অস্ত্রম্) বোধ হয় অশ্বচালনায় ব্যবহৃত বেত। ইহাতে রজ্জু সংলগ্ন থাকে। 'শ্রওষো-চরণ' আধুনিক 'চাবুক'। সংস্কৃতে এই প্রকার পাপ ও তাহার দণ্ডের কথা আছে—"যৎ ত্রিভির্গোচর্ম্মশাটঘাতৈঃ প্রায়শ্চিত্তম্ ভবতি তাবন্মাত্রম্", অর্থাৎ তিনটি গোচর্ম্মশাটঘাতের (চাবুক-আঘাতের) দ্বারা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। বোধ হয় 'অশ্‌পহে-অশ্‌ত্র' ও 'শ্রওষো-চরণ' একই চাবুকের দ্বিবিধ নাম।

এইরূপ পাপীকেই সাধারণতঃ 'পেশো-তনু' পাপী এবং 'তনু-পেরেথ' পাপ বলা হয়। এই দুইটি শব্দের অর্থ 'যে নিজের শরীর দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে' এবং 'নিজের শরীর দান'। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এটি মৃত্যুদণ্ড। পহ্লবী টীকাতেও বহু স্থলে 'পেশোতনু' শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে 'মর্-গর্-জান্' বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়। কিন্তু বেন্দিদাদে স্বয়ং অহুরো-মজ্‌দা যে বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে 'পেশোতনু' দণ্ডের পরিমাণ ২০০ বেত।

যদি কেহ কাহাকেও প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হয় তাহা হইলে সে 'আগেরেপ্ত' অপরাধ করে। যদি কোনও ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তিকে প্রহার করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে এবং প্রহার না করে তাহা হইলে 'অবওইরিষ্‌ত' অপরাধ হয়। যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রহার করে তাহা হইলে 'অরেদুষ্' অপরাধ হয়। 'আগেরেপ্ত' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে অস্ত্রধারণ; 'অবওইরিষ্‌ত' অস্ত্র নিষ্কাসন; এবং 'অরেদুষ্', ক্ষত-বিহীন আঘাত, অথবা যে ক্ষত তিনদিনের মধ্যে আরোগ্য হয় সেই-প্রকার ক্ষতবিশিষ্ট আঘাত। 'আগেরেপ্ত' অপরাধের দণ্ড ৫ বেত, 'অবওইরিষ্‌ত' অপরাধে ১০ বেত, 'অরেদুষ্' অপরাধে ১৫ বেত। ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে গুরুতর দণ্ড; যেমন গুরু আঘাতে ৩০ বেত, শোণিতপাতে ৫০ বেত, অস্থিভঙ্গে ৭০ বেত, নরহত্যায় ৯০ বেত, তদপেক্ষা গুরু পাপে ২০০ বেত। অপরাধের পৌনঃপুনিকতায় দণ্ডের গুরুত্ব বাড়ে। 'আগেরেপ্ত' অপরাধ সাতবার হইলেই 'পেশোতনু' অপরাধের তুল্য ২০০ বেত দণ্ড হয়।

বেন্দিদাদে বর্ণিত বা বিহিত বিবিধ অপরাধের দণ্ডের বিচার করিতে গেলে আধুনিক রাজনীতির চক্ষে বড়ই বিচিত্র বোধ হয়। আমরা যাহাকে গুরু অপরাধ বলিয়া মনে করি বেন্দিদাদের নীতিতে তাহা হয়ত গুরু নহে; বেন্দিদাদে যাহাকে গুরু অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে আমাদের বিবেচনায় হয়ত তাহা অতি লঘু। মেষপালকের কুকুরকে অখাদ্য খাইতে দেওয়া নরহত্যা অপেক্ষা গুরু পাপ; নরঘাতকের দণ্ড ৯০ বেত, কিন্তু কুকুরকে অখাদ্য খাইতে দেওয়ার অপরাধে হইবে ২০০ বেত। যে ভূমিতে শব প্রোথিত করা হইয়াছে, শব প্রোথিত করিবার একবৎসরের মধ্যে তাহাতে হলকর্ষণ করিলে পেশোতনু বা ২০০ বেত দণ্ড; সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি জল-পান করিলে ২০০ বেত; রমণীর রজোরোধ* করিলে ২০০ বেত, যে গৃহে কেহ মারা গিয়াছে সেই গৃহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ২০০ বেত; যদি কেহ মৃত-দেহ বাঁধিয়া না রাখে আর শকুনে তাহার অংশ লইয়া বৃক্ষ বা জল অপবিত্র করে তাহা হইলে তাহার ২০০ বেত দণ্ড। মাটিতে মনুষ্যাস্থি নিক্ষেপ করিলে, অথবা দুই-খানি পঞ্জরের পরিমাণ কুকুরের মৃতদেহ ফেলিলে ২০০ বেত। বক্ষস্থ অস্থির ন্যায় বৃহৎ অস্থি নিক্ষেপ করিলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০০ বেত; মানুষের মাথার খুলি ফেলিলে ৬০০ বেত এবং সমগ্র শবদেহই ফেলিলে ১০০০ বেত। অপবিত্র ব্যক্তি জল বা বৃক্ষ স্পর্শ করিলে ৪০০ বেত, মৃতব্যক্তির চরণ বস্ত্রাবৃত করিলে ৪০০ বেত, সমগ্র পদযষ্টি আবৃত করিলে ৬০০ বেত, সমস্ত দেহ আবৃত করিলে ৮০০ বেত। কুকুরের বাচ্চা মারিলে ৫০০ বেত, অপরিচিত কুকুরকে মারিয়া ফেলিলে ৬০০ বেত, গৃহ-কুক্কুরকে হত্যা করিলে ৭০০ বেত, মেষপালকের কুকুরকে হত্যা করিলে ৮০০ বেত, বন্‌হাপর কুকুরকে হত্যা করিলে ১০০০ বেত এবং জলচর কুকুরকে হত্যা করিলে ১০০০০ বেত। স্পষ্ট মৃত্যুদণ্ডের কথা কেবল মাত্র দুই স্থলে আছে। নবম ফর্গর্দে যে ব্যক্তি শৌচ বিধান জানে না সে শৌচ বিধানের জন্য পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। তৃতীয় ফর্গর্দে আছে যে যদি কেহ একক শবদেহ বহন করে তাহা হইলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে। ইহা ছাড়া আর মৃত্যুদণ্ডের কথা স্পষ্টভাবে কোথাও নাই। এই-সকল দণ্ডের বিষয় ভাবিলে আমাদের মনে হয় যে ইঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে নিতান্তই লঘু-পাপে গুরু-দণ্ড ও গুরু-পাপে লঘু-দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ বিধানগুলির আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে নরহত্যা অপেক্ষা গুরু

পাপ অনেক হইতে পারে এবং তাহার জন্য গুরু-দণ্ডের ব্যবস্থা আবশ্যক। কারণ নরহত্যায় একজন লোকের বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়। দেবতাদিগের নিকট অপরাধ করিলে সমগ্র মানবজাতির প্রতি অপরাধ করা হয়। সুতরাং তাহার গুরুত্ব অধিক। সমষ্টির তুলনায় ব্যষ্টির মূল্য অল্প হওয়াই স্বাভাবিক, ব্যষ্টি ত সমষ্টিরই অন্তর্গত। আর্য্যজাতিসমূহের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই ভাব অল্পবিস্তর পরিদৃষ্ট হয়। মৃতদেহ ভূপ্রোথিত করার জন্য পার্সীদের যেরূপ দণ্ডের বিধান ছিল, ডেলসের (Delos) পবিত্র মন্দির শবদেহ দ্বারা দূষিত করিলে গ্রীকগণ তদপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড ভোগ করিতেন। এথিনীয়গণের মধ্যে কুকুর মারা মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। বেন্দিদাদে বর্ণিত বিধানসমূহ আপাত-দৃষ্টিতে মতই বিচিত্র ও উপহাসাস্পদ বোধ হউক না কেন, অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজিলে অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া যাইবে, অবশ্য পারস্য বা ইরাণ দেশে এই প্রকার ব্যবহারের মাত্রাধিক্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

Theory বা মতবাদের হিসাবে এই দণ্ডনীতি-প্রথা উপহাসাস্পদ বা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হইলেও কার্য্যতঃ কোনও কালে এই প্রকার দণ্ডনীতি অনুসৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। মেষপালকের কুকুরকে বধ করিলে কখনও ৮০০ বেত দণ্ড হইয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জলচর কুকুর হত্যার অপরাধে ১০০০০ বেত আরও সন্দেহের কারণ। কারণ মানুষের সহ্য করিবার শক্তির একটা সীমা আছে। এরূপ দণ্ডের ব্যবহার স্বীকার করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে পৃথিবীর অন্য দেশের লোক এবং আধুনিক পারস্যদেশের লোকের শরীর অপেক্ষা প্রাচীন পারস্যের অধিবাসিগণের শারীরিক গঠন ও সহিষ্ণুতার কোনও একটা বৈচিত্র্য ছিল, যাহাতে সব সহ্য করা যায়। Chardinএর সময়ে বেত্রদণ্ড তিন শতের উপরে উঠিত না। প্রাচীন জর্ম্মানীতে দুই শতের অধিক এবং হিব্রু আইনে চল্লিশের অধিক বেত্রদণ্ড দেখা যায় নাই। ইহার অধিক সংখ্যা বোধ হয় কোন দেশেই ছিল না। ইরাণ দেশে আধুনিক যুগে বেত্রদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ড অনুমোদিত আছে। সম্ভবতঃ বেন্দিদাদের সময় হইতেই বেত্রদণ্ডের বিকল্পে অর্থদণ্ড চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বেত্রদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা কাহার ইচ্ছায় হইত জানা যায় না—বিচারকের ? না অপরাধীর ? পহ্লবী 'রবাএৎ' গ্রন্থে ২০০ বেত=৩০০ইস্তীর্=১২০০ দির্হেম=১৩৫০ টাকা। অর্থাৎ এক বেত=৬৷৵ টাকা।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত্রিবিধ—(১) অর্থদণ্ড, (২) প্রওষো-চারণ, ও (৩) শৌচ। তৃতীয় বিধি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত। ইহাতে অনুতাপের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়—তাহার নাম 'পতেৎ'। 'পতেৎ' করিলে ইহলোকের অপরাধ যায় না, ইহা পরলোকের দণ্ড নিবারণের জন্য বিহিত হইয়াছে। 'পতেৎ' বা প্রায়শ্চিত্ত বিধির অনুষ্ঠান করিলে ঐহিক দণ্ডের পরিমাণ কমে না—কিন্তু 'পতেৎ' না করিলে ঐহিক দণ্ড বাড়িতে পারে।

'অনাপেরেথ' বা প্রায়শ্চিত্তবিহীন পাপে ইহলোকে মৃত্যুদণ্ড ও পরলোকে নানা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। এরূপ পাপের মুক্তি নাই। এই পাপ মহাপাপ বা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুপাপ। (১) শবদাহ, (২) শবদেহকে ভূপ্রোথিত করা, (৩) মৃত দেহ বা তদংশ ভোজন, (৪) অনৈসর্গিক পাপ, (৫) ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্বাভাবিক উপায়ে শারীরিক ক্ষতি সাধন প্রভৃতি অনাপেরেথ পাপ। এই-সকল পাপে কাহারও মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই বটে, তবে শাস্ত্রের বিধানে মৃত্যুদণ্ডই এ-সকল পাপের ঐহিক দণ্ড।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
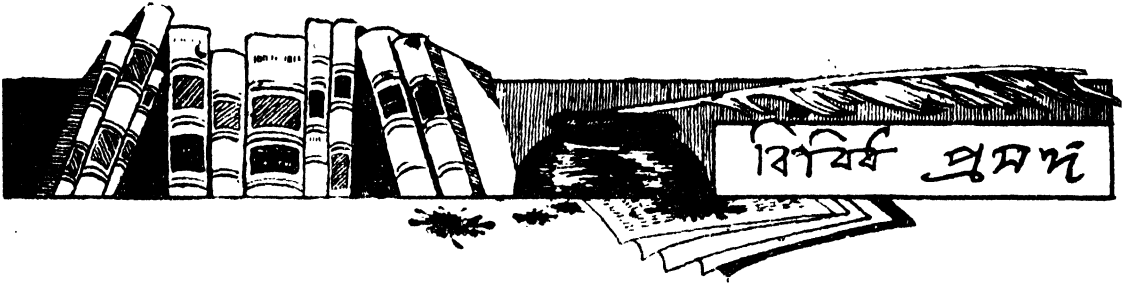
খাদ্য, বস্ত্র, ও বাসগৃহ

কোন কোন অসভ্য দেশে এমন মানুষ এখনও আছে, যাহারা নগ্ন থাকে; এবং এমন মানুষও আছে, যাহারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে না, পর্ব্বতের গুহায় বাস করে। রন্ধন করিতে জানে না, এমন মানুষও সম্ভবতঃ এখনও পৃথিবীতে কোথাও কোথাও আছে। আদিম অসভ্য মানুষের অবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ ছিল। তাহারা নগ্ন থাকিত, কাঁচা মাছ মাংস বা ফল মূল খাইত, এবং কোন কৃত্রিম গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া গুহা বা বৃক্ষশাখায় কালযাপন করিত। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশুচর্ম্ম বা গাছের ছাল এবং পরে পশম কার্পাস ও রেশমের কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, রাঁধিয়া খাইতে শিখিয়াছে, এবং গৃহনির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে। পৃথিবীতে এখনও অনেক জাতি আছে, যাহাদের মধ্যে এক এক পরিবার নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদন ও রন্ধন করে, গৃহ নির্ম্মাণ করে, এবং নিজেদের পরিচ্ছদও প্রস্তুত করে।

শ্রমবিভাগ সভ্যতার একটি লক্ষণ। কিন্তু শ্রমবিভাগ কতদূর পর্য্যন্ত হওয়া উচিত, তাহা জাতিবিশেষ, দেশবিশেষ, পরিবারবিশেষ ও মনুষ্যবিশেষের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সভ্যদেশসমূহে বিস্তর লোক কৃষিকার্য্য প্রভৃতির দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করে; যাহারা কৃষিজীবী নহে তাহারা উহাদের নিকট হইতে শস্য ফল মূল ক্রয় করিয়া ভোজন করে। এমন অনেক পরিবার আমাদের দেশেও আছে, যাহারা নিজেদের খাদ্য ও বস্ত্র নিজেরাই উৎপাদন করে। খাদ্য ও বস্ত্র ভিন্ন নিজেদের গৃহও নিজেরাই নির্ম্মাণ করে, এরূপ পরিবার ও লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত খুব কম হইলেও, তেমন লোক ও পরিবার এখনও আছে।

প্রত্যেক পরিবারের, কিম্বা বহুসংখ্যক পরিবারের নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদন ও রন্ধন যেমন অস্বাভাবিক নহে, তেমনি নিজের নিজের কাপড়ের জন্য চরখায় সূতা কাটিয়া তাহা বুনাও অস্বাভাবিক নহে। আমরা অনেকে চাষী নহি, চাষীদের উৎপন্ন জিনিষ কিনিয়া আমরা জীবনধারণ করি। কিন্তু তা বলিয়া একথা আমরা বলি না, যে, নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদন কোন পরিবারের বা মানুষের করা উচিত নহে। আমাদের অনেকের বাড়ীর সংলগ্ন জমীতে আমরা নিজেরা পরিশ্রম করিয়া তরকারীর জন্য নানাবিধ শাক সবজী ফল মূল উৎপাদন করি। ইহা আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় নহে। আমরা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চাকরী বা অন্য যে কাজ করি, তাহাতে আমাদের যাহা দৈনিক আয় হয়, সেই হারে মজুরী কষিয়া দেখিলে হয় ত দেখা যাইবে, যে, তরকারী উৎপাদনে আমাদের যে পরিশ্রম ও সময় দিতে হইয়াছে, তাহার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বাজারে তরকারী পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা তরকারী উৎপাদন করিতে নিবৃত্ত হই না। কারণ, তরকারী উৎপাদন আমরা অবসর সময়ে করি, উহার জন্য অন্য রোজগারের ক্ষতি করিতে হয় না, নগদ পয়সাও খরচ করিতে হয় না; এইজন্য বাজার হইতে তরকারী কেনা অপেক্ষা উহা সস্তাই মনে হয়, এবং তা ছাড়া এই কার্য্যে আনন্দও আছে। এই প্রকারে যদি কেহ অবসর সময়ে নিজের জন্য শুধু চরখায় সূতা কাটেন, কিম্বা অধিকন্তু ঐ সূতা হইতে কাপড়ও বুনেন, তাহা হইলে তাহার জন্য তাঁহাকে অন্য রোজগারের ক্ষতি করিতে হয় না, নগদ পয়সাও খরচ করিতে হয় না। যদি তিনি নিজের জমীতে তূলা উৎপাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তূলার দামও লাগে না। এইজন্য তাঁহার সময় ও পরিশ্রম হিসাবে মজুরীর

দাম খুব বেশী হইলেও, তাঁহার নিজের বুনা কাপড় খুব সস্তাই হইবে।

আমাদের দেশে এমন পরিবার একটিও নাই, যাহার দৈনিক আহারের জন্য প্রত্যহ দুই বেলা রাঁধা ভাত বা রুটি ও ডাল তরকারী আদি কিনিয়া আনা হয়। পল্লীগ্রামের গৃহস্থেরা জলখাবারের জিনিষও নিজের নিজের বাড়ীতেই প্রস্তুত করেন। শহরে এমন অনেক পরিবার আছেন, যাঁহাদের জলখাবার দুই বেলা বা একবেলা বাড়ীতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু এরূপ গৃহস্থ ও বাসাড়ে লোক শহরে বিস্তর আছে, যাহারা দু বেলা বা এক বেলা জলখাবার বাজার হইতে কিনিয়া আনে। কিন্তু তা বলিয়া, এরূপ কেহ বলে না, যে, ময়রার দোকান রহিয়াছে, অতএব বাড়ীতে জলখাবার প্রস্তুত করা অস্বাভাবিক বা অনুচিত। একথা ত কেহই বলে না, যে, যেহেতু "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল" বিস্তর রহিয়াছে, অতএব তাহাদের সহিত মাসিক বন্দোবস্ত না করিয়া বাড়ীতে ভাত রাঁধা অনুচিত। অবশ্য বাজারের খাবার এবং হোটেলের ভাত তরকারী অপেক্ষা বাড়ীর তৈরী জিনিষ টাট্‌কা ও ভেজালবিহীন হইতে পারে। কিন্তু সস্তায় ভাল টাট্‌কা জিনিষ দেয়, এরূপ দোকান ও হোটেল নাই বা থাকিতে পারে না, এমন নয়। পাশ্চাত্য অনেক দেশে অনেক শহরে বাড়ীতে রান্না মোটেই করে না এমন অনেক গৃহস্থ আছে। আমাদেরই দেশে আমরা দিল্লীতে শুনিয়া আসিয়াছি, যে, তথাকার অনেক পঞ্জাবী পরিবার নিজেদের রান্না নিজেদের বাড়ীতে করে না, হোটেল হইতে রুটি পুরী ভাত ডাল তরকারী প্রত্যহ কিনিয়া খায়। বাড়ীতে রান্না করার খরচের হিসাবে, আমরা বাড়ীর কর্ত্তার বা ছেলেদের বাজার হইতে জিনিষ কিনিয়া আনার মজুরী, এবং গৃহিণী বা অন্য মহিলাদের কুটনা কুটা বাটনা বাটা উনান ধরান রন্ধন ও পরিবেষণ করা এবং বাসন মাজার মজুরী ধরি না। তাহা ধরিলে বাড়ীতে দুবেলা রন্ধন ও জলখাবার প্রস্তুত করণ যতটা সস্তা মনে হয়, তত সস্তা বাস্তবিক উহা নহে; আমরা উহা সস্তা মনে করি এই জন্য, যে, পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকারা তাঁহাদের কোন রোজ্‌গারের ক্ষতি না করিয়া উহা করেন, অবসর সময়ে উহা করেন, এবং তাঁহাদিগকে উহার জন্য মজুরী দিতে হয় না। যদি বহুসংখ্যক গৃহস্থ হোটেল ও খাবারের দোকান হইতে মাসিক বন্দোবস্তে প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে এমন হোটেল ও খাবারের দোকান চালান মোটেই অসম্ভব নহে, যাহাদের বিক্রেয় খাদ্য গৃহস্থের-বাড়ীতে-পাক-করা খাদ্য অপেক্ষা সস্তা হইবে এবং তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না; কারণ, যে জিনিষ বহুপরিমাণে প্রস্তুত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত সস্তায় দেওয়া যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে যত কাঠ ও কয়লা খরচ হয়, তাহাতে রান্না করিয়াও অনেক উত্তাপের অপচয় হয়; উনান ধরাইবার সময় ও পরিশ্রম প্রত্যেক বাড়ীতে যত লাগে, একত্রে পাক করিলে তাহারও সাশ্রয় হইতে পারে। ভাত-তরকারীর অপচয়ও অনেক বাড়ীতে এত হয়, যে, তাহাতে আরও অনেক লোকের আহার চলিতে পারে।

কিন্তু এসব সম্ভাবনা সত্বেও এবং পাশ্চাত্য নানাদেশের অনেক শহরে প্রত্যহ দু তিন চার বার হোটেলে খাওয়া অনেক পরিবারের নিত্য অভ্যাস হওয়া সত্বেও আমরা বাড়ীতে রাঁধিয়া খাওয়াই স্বাভাবিক ও উচিত মনে করি। কারণ, এক অন্নে বাস করা পারিবারিক বন্ধন ও একত্বের একটি লক্ষণ, ইহাতে আনন্দ আছে, বাড়ীর রান্নার মধ্যে মাতা ভগিনী প্রভৃতির ভালবাসা মিশ্রিত থাকে, এবং পরিবারস্থ কাহারও মজুরী ধরা হয় না বলিয়া এই ব্যবস্থা সস্তাও বটে।

অবসর সময়ে বাড়ীতে সূতা কাটিলে ও কাপড় বুনিলে তাহাও যে সস্তা বোধ হইবে, তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। এখন অনেক পরিবারেই মহিলারা ছোট ছেলেমেয়েদের জামা এবং নিজেদের সেমিজ আদি প্রস্তুত করেন। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয়। কিন্তু যদি কাপড় ও সেলাইয়ের সূতার দাম ছাড়া, সেলাইয়ের কলের দামের সুদ এবং সেলাইকারিণীর মজুরী ধরা হইত, তাহা হইলে এই-সব পরিচ্ছদ কি দোকান-হইতে-কেনা পরিচ্ছদ হইতে খুব সস্তা মনে হইত? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী অনেক মহিলা এইরূপ

গৃহকার্য্য এবং রন্ধনাদি করেন। তাঁহাদের অনেকে ৭৫, ১০০, ২০০, ৩০০ টাকার চাকরী করেন। তাঁহারা যত সময় গৃহকার্য্যে যাপন করেন, তাহার পারিশ্রমিক স্থির করা কঠিন নহে। কিন্তু হিসাবে কোন পারিশ্রমিক ধরা হয় না বলিয়া তাঁহারা যে-সব জিনিষ প্রস্তুত করেন তাহা সস্তা মনে হয়। সেইরূপ যদি, গৃহের বাহিরে কাজ করিয়া যে-সকল পুরুষ ও মহিলা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা অবসর সময়ে সূতা কাটেন ও কাপড় বুনেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রম হইতে উৎপন্ন জিনিষও সস্তা হইবে; কারণ কাহাকেও মজুরী দিতে হইবে না। অবশ্য যাঁহারা বাড়ীতে বসিয়াও অবসর সময়ে বেশী নগদ টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকে সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে বলিতেছি না।

পল্লীগ্রামের চাষী লোকদের মধ্যে স্ত্রীলোক পুরুষ ও বালকবালিকা সকলেরই বৎসরের অনেক মাস প্রচুর অবসর থাকে। সেই সময়টা তাঁহারা সূতা কাটিলে ও কাপড় বুনিলে নিজেদের কাপড়ের অভাব মোচন করিতে ত পারিবেনই, অধিকন্তু সূতা ও কাপড় বিক্রি করিয়া কিছু টাকা রোজগারও করিতে পারিবেন। নিজেদের কাপাসও তাঁহারা সহজেই উৎপন্ন করিতে পারেন।

নিজেদের ক্ষেতের শস্য ফল মূল শাক তরকারী বেশী মিষ্ট লাগে। মায়ের রান্নার মত রান্না কোথাও হয় না। বাড়ীর মেয়েদের হাতের সেলাই জামা পারিসের জামার চেয়ে বেশী সুখদায়ক। বাড়ীতে উৎপন্ন কাপড়ও তেমনি আনন্দদায়ক। তন্তুবায় ব্যতীত অন্য জাতির লোকদের বাড়ীতেও বস্ত্র বয়ন মোটেই অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। আসামে খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারেও এখনও পারিবারিক তাঁতে মহিলারা কাপড় বুনিয়া থাকেন।

খাদ্য, বস্ত্র, ও মাথা-রাখিবার জায়গা, এই তিনটি, মানুষের একান্ত আবশ্যক জিনিষ। নিজের নিজের অবস্থা, সামর্থ্য ও অবসর অনুসারে কেহ ইহার একটি, কেহ দুটি, কেহ বা তিনটিই নিজের জন্য প্রস্তুত করিতে পারেন; অন্যবিধ কাজে নিযুক্ত থাকায় কেহ একটিও না করিতে পারেন, সমস্তই ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু নিজের জন্য কোনটি বা সকলগুলিই উৎপাদনে কোন অসঙ্গতি অস্বাভাবিকতা বা দোষ নাই।

ইহা গেল এক-একটি মানুষের ও পরিবারের কথা। কোন দেশের লোক-সমষ্টির কথা বলিতে গেলে, বেশ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারা যায়, যে, খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের জন্য কোন জাতিরই অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নহে। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মত এই প্রকার পরাধীনতাও লজ্জাকর। ভারতবর্ষের মত দেশে এই পরাধীনতা যারপর-নাই লজ্জার বিষয়; কারণ, আমাদের দেশে আমাদের সকল রকম খাদ্য, পরিচ্ছদ ও গৃহের উপকরণ এবং তাহা প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রামে গ্রামে চরখায় সূতা কাটিয়া হাতের তাঁতে কাপড় বুনিয়া বস্ত্রের অভাব দূর করা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা ও সুনীতির পরিপোষক উপায়।

আমেরিকার বিখ্যাত মোটরগাড়ী-নির্ম্মাতা ফোর্ড সাহেব, তদ্দেশের গ্রামের চাষীরা চাষের সময় ছাড়া অন্য সময়ে নিজেদের গৃহে বসিয়া কারখানার মত নানাবিধ পণ্যদ্রব্য কিপ্রকারে উৎপাদন করিতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ নদীতীরস্থ গ্রাম-সকলের কথাই ভাবিয়াছেন। তাঁহার মতে নদীর স্রোতের শক্তি হইতে তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করিয়া তাহার সাহায্যে গ্রামবাসীরা সস্তায় নানা পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে। প্রায় সকল দেশেই প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে অল্পাধিক পরিমাণে জলের বেগ হইতে তাড়িত শক্তি উৎপাদিত ও সঞ্চিত, এবং পরে ব্যবহৃত হইতে পারে। তা ছাড়া, সূর্য্যকিরণ হইতে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জোষীর উদ্ভাবিত ভানুতাপের মত কিন্তু তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক যন্ত্র হইতেও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত, সঞ্চিত ও পরে ব্যবহৃত হইতে পারে। বায়ুচালিত চাকার (wind-millএর) সাহায্যে অনেক দেশে গম প্রভৃতি শস্য পিষ্ট হয় ও জল তোলা হয়। এই উপায়ে বায়ুর গতি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত ও সঞ্চিত এবং পরে ব্যবহৃত

হইতে পারে। সস্তায় পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য মানুষকে চিরকালই গ্রাম ছাড়িয়া শহরের বিশাল কার্‌খানা-সকলে মজুরী করিতে যাইতে হইবে না। গ্রামে বসিয়াই বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ইহা ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে। অবশ্য তাহার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি, উদ্যমশীলতা, এবং সকলের হিতের নিমিত্ত সম্মবেত ভাবে কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তির প্রয়োজন। এই সকলের বীজ অন্য সকল জাতির মত আমাদের জাতিরও মধ্যে নিহিত আছে।

—

বঙ্গের দুঃখ

বাংলা দেশের দুঃখের অবধি নাই। বহুকাল হইতে আমাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া লাগিয়া আছে। কোন না কোন অঞ্চলে প্রতি বৎসরই বসন্ত ও ওলাউঠার আবির্ভাব হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র দেখা যায়। ক্ষয় রোগেও বিস্তর লোকের প্রাণ যায়। দারিদ্র্য ত আমাদের আমরণ নিত্যসহচর। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার দুঃখ ও অপমান জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দুর্নীতি আমাদের বহু কষ্টের কারণ। এই-সকলের উপর প্রতিবৎসরই কোথাও না কোথাও দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্যা, বা জলপ্লাবনে অগণিত লোক বিপন্ন হয়। গত বৎসর খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহার আগে পূর্ব্ববঙ্গে ঝড় হয়। কয়েক মাস পূর্ব্বে চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্‌স্‌বাজার অঞ্চলে ঝড়ে বিস্তর লোকের সর্ব্বনাশ হয়। এবৎসর প্রথমে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায়, এবং বর্দ্ধমান ও ফরিদপুর জেলার কোন কোন অংশ বন্যায় বিপন্ন হয়। তাহাতে অনেক লোকের প্রাণ যায়, এবং তদপেক্ষা অধিক লোকের সর্ব্বস্বান্ত হয়। তাহার পর সম্প্রতি রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ত্রিপুরা জেলার বহুঅংশে জলপ্লাবনে অনেক গ্রামের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে, কয়েক শত লোকের প্রাণ গিয়াছে, গবাদি পশু বিস্তর মারা পড়িয়াছে, ক্ষেত্রের শস্য বিধ্বস্ত হইয়াছে, ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, এবং লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। এই আকস্মিক মহাবিপদের উপর ভীষণতর বিপদ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা হইয়াছে।

এমন সময়ে দেশের লোক উদাসীন থাকিলে তাহা আরও ভয়ের কথা হইত। কিন্তু যখনই দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনাদিতে লোকে বিপন্ন হয়, তখন বঙ্গের অধিবাসীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ অর্থ বস্ত্র খাদ্য ঔষধ সংগৃহীত হয়, যুবকেরা সাহায্য বিতরণের জন্য অগ্রসর হন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষতঃ বোম্বাই, হইতেও বিস্তর সাহায্য আসে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, যে, আমাদের দেশের লোকেরা হৃদয়হীন নহেন। তাঁহাদের হিতৈষণা কেবল আকস্মিক বিপদের সময় বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত না করিয়া যদি সম্বৎসর তাঁহাদিগকে লোক-হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত রাখে, যদি তাঁহারা যোগ্য ব্যক্তি-সকলের পরিচালনায় সুপ্রণালীক্রমে দেশের অবস্থার উন্নতিসাধনে সতত ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে আমাদের জাতি বহু দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য অনেক স্বাধীন দেশে বহু শতাব্দী হইতে আমাদের দেশের মত মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। দুর্ভিক্ষ ত হয়ই না; কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিবামাত্র উপযুক্ত চিকিৎসকদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় তাহা মহামারীর আকার ধারণ করিতে পারে না। যাহা অন্যত্র সম্ভব হইয়াছে, তাহা এদেশেও সম্ভব। কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার দ্বারা দারিদ্র্যের প্রতিকার হইতে পারে; দারিদ্র্য দূর হইলে তাহার ফলস্বরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতিও কতকটা হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মহামারী নিবারণও করা যায়। অন্য নানা দেশে তাহা করা হইয়াছে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা, প্রভৃতির প্রতিকারও মানুষের সাধ্যায়ত্ত।

ঝড় নিবারণ করিতে মানুষ পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে ঝড়ের আগমন আগে হইতে জানা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে এবং পরে আরও সম্ভব হইবে। ঝড়ের আগমন আগে হইতে জানা থাকিলে মানুষ সাবধান হইতে পারে। তাহা হইলেও, ঝড়ের

দ্বারা অনিষ্টের হাত হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার সম্ভাবনা এখনও মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সভ্যতম, শিক্ষিততম ও খুব ধনী দেশের লোকেরাও এখনও ঝড়ে বিপন্ন হয়। ঝড়ের সময় কখন কখন সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থানসকল সমুদ্রের জল দ্বারা যেরূপ প্লাবিত হয়, তাহা নিবারণেরও কোন উপায় এখনও উদ্ভাবিত বা কল্পিত হয় নাই। ভূমিকম্পের হাত হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার কোন উপায়ও এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। কিন্তু ভূমিকম্পেও সহজে পড়িয়া যাইবে না, এরূপ গৃহের নির্ম্মাণ-প্রণালী, জাপানের মত যে-সব সভ্য দেশে বেশী ভূমিকম্প হয় সেখানে, উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইয়াছে।

ভূমিকম্প ও ঝড় অপেক্ষা অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা ও জলপ্লাবন হইতে আত্মরক্ষা মানুষের অধিকতর সাধ্যায়ত্ত। উত্তরবঙ্গের বর্ত্তমান জলপ্লাবনের একটি কারণ উচ্চ রেলের বাঁধ বলিয়া অনেকেই অনুমান করিতেছেন। ইহা যুক্তি-সঙ্গত। ইহা দেখাও যায়, যে, জলপ্লাবন হইলেই অনেক জায়গায় রেললাইন ভাঙ্গিয়া যায়। জল নিঃসারণের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হওয়ায় এরূপ ঘটে। এবিষয়ে তথ্য নির্ণয় করিয়া স্থানে স্থানে বাঁধের নীচে জলনির্গমনের পথ করিয়া দিলে ভবিষ্যতে প্লাবন কম হইবে। অতঃপর যেখানে যেখানে নূতন রেললাইন নির্ম্মিত হইবে, তথাকার স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীর উপর বাঁধ না দিয়া সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এইরূপ আইন করিয়া রেলনির্ম্মাতাদিগকে তাহা মানিতে বাধ্য করিলে সুফল হইবে। যে-যে জেলাতে এপর্য্যন্ত প্লাবন হইয়াছে, উপযুক্ত এঞ্জিনীয়ার দ্বারা সেই-সকল অঞ্চলের স্বাভাবিক উচ্চনীচতাদির নিরীক্ষা (Survey) করাইয়া শীঘ্র জল নিঃসারণের আবশ্যকমত অন্যবিধ উপায়ও অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের এবিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকা উচিত।

দেশে অরণ্য থাকিলে বৃষ্টির জল খুব শীঘ্র হঠাৎ নদীতে আসিয়া পড়িয়া বন্যা উৎপাদন করিতে পারে না। অরণ্য না থাকিলে বৃষ্টির জল গাছের পাতায় শাখায় কাণ্ডে মূলে বাধা পায় না ও আটক পড়ে না; উহা খুব দ্রুত নদীতে আসিয়া পড়ে। এইজন্য হঠাৎ বন্যা হইয়া মানুষের বিপদের কারণ ঘটে। বাংলাদেশে আগে যত অরণ্য ছিল, এখন তত নাই। পূর্ব্বে যে-সকল স্থান অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল, তাহাতে আবার এরূপ সব গাছ লাগান উচিত, যাহা হইতে অর্থাগম হইতে পারে। তাহার দ্বারা প্লাবনের আশঙ্কা কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইবে। অরণ্য-রচনা (Afforestation) বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মন দেওয়া কর্ত্তব্য।

বৃষ্টির জল যখন নদীতে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠ হইতে ধৌত অনেক মাটি বালি কাঁকরও আসিয়া পড়ে। তাহার কতক সমুদ্র পর্য্যন্ত যায় বটে, কিন্তু অনেক অংশ নদীগর্ভে ও নদীতটে পলির আকারে সঞ্চিত হয়। ফলে নদীর গর্ভ উচ্চ হইতে থাকে, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদীর দুই দিকের পাড় স্বভাবতঃ উঁচু হইতে থাকে না। এইজন্য বর্ষায় অতিবৃষ্টি হইলে জল উছলিয়া নদীর দুই পাশের জমী গ্রাম ও নগরে প্লাবন ঘটে। তাহা নিবারণের জন্য যদি নদীর দুই তটে উঁচু বাঁধ দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপাততঃ প্লাবনের প্রতিকার হয় বটে, কিন্তু বাঁধ দেওয়াতে নদীর জল উছলিয়া উভয় পার্শ্বের জমীতে ছড়াইয়া না পড়িয়া নদীগর্ভেই আবদ্ধ থাকে; সুতরাং অধিক পরিমাণে পলি পড়িয়া নদীগর্ভ আরও উঁচু হইতে থাকে। কালক্রমে নদীগর্ভ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সকল হইতে উচ্চ হইয়া যায়। নদীগর্ভ যেমন উঁচু হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধকেও উঁচু করা হয় না, এবং নদীপথের সকল স্থানে বাঁধ থাকে না। এই কারণে মধ্যে মধ্যে বাঁধ ভাঙ্গিয়া বা টপ্‌কাইয়া উভয় পার্শ্বস্থ স্থানে জল আসিয়া প্লাবন হয়; যে-সব জায়গায় বাঁধ নাই, সেখানেও প্লাবন হয়।

এই প্রকার প্লাবন কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হইয়াছিল। ইহার প্রতিকার ও নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত নহে। নদীর মুখ বহু পরিমাণে বন্ধ হইয়া যাওয়াতেও বন্যাজনিত প্লাবন হয়। ইহার নিবারণও মানুষের সাধ্যায়ত্ত। যে-সব নদীর গর্ভ উঁচু হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন কোনটির কোন কোন অংশ ড্রেজার দ্বারা খনন করিয়া আবার গভীর করা যাইতে পারে।

বন্যাজনিত প্লাবন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রে হয়। তথাকার দক্ষ এঞ্জিনীয়ারগণ কোথাও কোথাও তাহা নিবারণের উপায় ইতিমধ্যেই করিয়াছেন। ইহার সচিত্র বৃত্তান্ত সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান্ (Scientific American) নামক বৈজ্ঞানিক কাগজে বাহির হইয়াছিল। অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। প্রতিশব্দ উদ্ভাবন্ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তের অনুবাদ ছাপিলেও তাহা এঞ্জিনীয়ার ভিন্ন অন্য পাঠকদের বোধগম্য হইবে না বলিয়া আমরা উহার অনুবাদ প্রকাশিত করি নাই। যে-সব বৃহৎ লাইব্রেরীতে ঐ কাগজ রাখা হয়, তথায় অনুসন্ধান করিলে বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ প্রবন্ধটি দেখিতে পাইবেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

এ পর্য্যন্ত যে-সকল গ্রামে ও নগরে জলপ্লাবন হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে স্বভাবতঃ উচ্চতম স্থানে অন্ততঃ একটি করিয়া বিস্তৃত উঁচু মাটির ঢিবি নির্ম্মিত হওয়া উচিত। তাহার উপর সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য, বক্তৃতা ক্রীড়া নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদ প্রভৃতির জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিলে, প্লাবনের সময় সেখানে সকলে বা অনেকে আশ্রয় পাইতে পারে। এরূপ গৃহ গ্রাম ও নগরের লোকেরা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া করিতে পারেন, বা তথাকার কোন ধনী অধিবাসী প্রতিবেশীদিগকে তাহা উপহার দিতে পারেন। মিউনিসিপালিটি এবং গ্রাম্য ইউনিয়ন সমূহের দ্বারাও ইহা হইতে পারে।

রামকৃষ্ণমিশন, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী, ব্রাহ্মসমাজ, প্রভৃতি যাঁহারা বিপদের সময় লোকের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন, তাঁহাদের হাতে একটি করিয়া আকস্মিক বিপদুদ্ধার ফণ্ড (Emergency Fund) রূপে কিছু টাকা সঞ্চিত থাকিলে খুব শীঘ্র বিপন্ন লোকদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়। তা ছাড়া ভারতসভা বা তদ্রূপ সার্ব্বজনিক কোন সভার হাতে, কিম্বা জনসাধারণের সভায় এইজন্য নির্ব্বাচিত ট্রষ্টিদের হাতে এরূপ ফণ্ড থাকিলে ভাল হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষাদি নিবারণের জন্য নানা স্থানে নানা লোকের হাতে যত টাকা আসিয়াছে, তাহার সমস্ত টাকা খরচ হয় নাই; কিছু কিছু টাকা উদ্বৃত্ত আছে। এইসব টাকা যাঁহাদের নিকট আছে, সংবাদপত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের এই বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত, যে, "আমরা উদ্বৃত্ত টাকা প্লাবনে-বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করি। কোন দাতার ইহাতে আপত্তি থাকিলে তিনি নিজের দানের পরিমাণ ও তারিখ জানাইবেন।" সম্ভবতঃ কেহই আপত্তি করিবেন না।

ভিন্ন ভিন্ন হিতসাধক সমিতির দ্বারা স্বতন্ত্র কাজ হইলে, কোন কোন দুর্গম জায়গায় কেহই কাজ করিতেছে না, এবং কোন কোন সুগম স্থানে অনেকে কাজ করিতেছে, এরূপ ঘটিতে পারে। সকলে একযোগে কাজ করিলে ইহা ঘটে না। সমবেতভাবে একযোগে কার্য্য সম্পাদন (দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত) একজন নেতার পরিচালনায় হইতে পারে, সকলে পরামর্শ করিয়া বা কোথায় কি হইতেছে না-হইতেছে তাহার খবর লইয়াও হইতে পারে। সব সময়ে সকল লোকে কর্ত্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে কাজ করে না। নিজের বা নিজের সম্প্রদায় সমিতি প্রভৃতির কৃতিত্ব নাম যশের দিকেও দৃষ্টি থাকে। এইজন্য স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিলে, কখন কখন দুর্ভিক্ষাদি নিবারণের জন্য অর্থ সংগ্রহ বেশী হয়, কাজও বেশী হয়।

এই বিষয়ে আমরা উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য উপায়ও অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। রেলওয়ে লাইনের বাঁধ ছাড়া উঁচু পাকা সরকারী রাস্তা-সকলের দ্বারাও জল নির্গমনের স্বাভাবিক পথ অনেক জায়গাতেই রুদ্ধ হইয়াছে। রেলের বাঁধে যেমন, এইসকল রাস্তাতেও তেমনি ছোট বড় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া কয়েক শত হাত অন্তর অন্তর জল বাহির হইবার পথ করিয়া দেওয়া উচিত; এবং ভবিষ্যতে যত নূতন রাস্তা ও রেলের বাঁধ হইবে, সর্ব্বত্র এইরূপ সেতু থাকা উচিত।

যে-সকল নদীতে বন্যা হইয়া জলপ্লাবন হয়, তাহা হইতে অনেক কৃত্রিম খাল খনন করিয়া জল লইবার বন্দোবস্ত করিলে, জলসেচন দ্বারা কৃষির সুবিধা হয়, প্লাবনের আশঙ্কাও কতকটা দূরীভূত হয়।

রেলওয়ে চীফ্ কমিশনার নিয়োগ

ভারতবর্ষে রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও তাহার কার্য্যনির্ব্বাহ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা হইলে ভাল হয়, না কোম্পানী দ্বারা হইবে, রেলওয়ে সম্বন্ধীয় এইরূপ আরও নানা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একওয়ার্থ্ কমিটি (Acworth Committee) বসিয়াছিল। উহার রিপোর্ট অনেক দিন হইল বাহির হইয়াছে। তাহার প্রথম ফল হইয়াছে, রেলওয়ের চীফ কমিশনার নামক একটি মোটা মাহিনার পদের সৃষ্টি, এবং তাহাতে একজন ইংরেজের নিয়োগ! ভারতকামধেনুর দোহন এবং ইংরেজের পোষণ বন্ধ করা অতি কঠিন কাজ।

চিত্তরঞ্জনের কাশ্মীর হইতে বহিষ্কার

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ জেল হইতে খালাস পাইয়া, স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি সেই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে যাত্রা করেন। কাশ্মীরের দরবার তাঁহার কাছে এই স্বীকার ও অঙ্গীকার-পত্র চান, যে, তিনি কেবল স্বাস্থ্যলাভার্থ কাশ্মীর আসিয়াছেন, এবং তথায় রাজনৈতিক বক্তৃতা আলোচনা আন্দোলনাদি করিবেন না। তিনি এরূপ কোন অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে কাশ্মীর হইতে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের জর হইতেছিল। তিনি যখন দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, তখন স্বাস্থ্যলাভার্থই গিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তখন তাঁহাকে এরূপ অঙ্গীকার করিতে বলেন নাই, যে, তিনি দার্জিলিঙে কোন প্রকার রাজনৈতিক বক্তৃতাদি করিবেন না। বাস্তবিকও তিনি দার্জিলিঙে সেরূপ কিছু করেন নাই। তিনি কাশ্মীর গিয়া সেরূপ কিছু করিবেন, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ ছিল না। তথাপি তাঁহাকে একটা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে বলা হইল। এই কাজ অবশ্য ইংরেজ রেসিডেণ্টের প্ররোচনায় হইয়াছে। এইরূপ পরামর্শ রেসিডেণ্ট্রাই দিয়া থাকেন। শাসনকর্ত্তা রাজা-মহারাজারা নামেই রাজা মহারাজা। অনেক বিষয়ে তাঁহাদের অধীনতা আমাদের চেয়ে বেশী। তাঁহাদের রাজ্যে তাঁহাদের প্রজাদের এবং ব্রিটিশপ্রজাদের স্বাধীনতা ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ প্রজাদের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে কম। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্রিটিশভারতের নানা স্থানে বক্তৃতাদি করিয়া বেড়ান, কিন্তু কোন কোন দেশীয় রাজ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন না। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত রেসিডেণ্ট্ নামক কর্ম্মচারীরা যে অভিপ্রায়েই দেশীরাজ্যগুলিকে এরূপ কাজ করিতে পরামর্শ দিন্ না, ফলে লোকের এই ধারণা জন্মে যে, দেশী রাজত্ব অপেক্ষা ইংরেজ রাজত্ব ভাল। দেশী রাজ্যগুলিকে অনুন্নত ও স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি রাখিয়া তুলনায় ব্রিটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন যে রেসিডেণ্ট্দিগের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

দেশী রাজাদের রক্ষণার্থ আইন

১৯১০ সালে ব্রিটিশভারতের সংবাদপত্রগুলিকে জব্দ রাখিবার জন্য যে আইন হয়, তাহাতে দেশীয়রাজ্যগুলিকেও খবরের কাগজের সম্পাদকদিগের সমালোচনা ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। সম্প্রতি ঐ আইন রদ হওয়ায় এবং নূতন আইনে দেশীয় রাজ্যগুলির রক্ষণার্থ কোন বিধি না থাকায় গবর্ণমেণ্ট তদুদ্দেশ্যে নূতন আইন করিয়াছেন। আইনটি কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ নামক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিবার সময় মিঃ জে পি টম্সন্ তাহার বিধিগুলি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করেন :—

The Bill provides, as hon. members are aware, that whoever edits, prints or publishes, or is the author of any book, newspaper or other document which brings, or is intended to bring into hatred or contempt or excites or is Intended to excite disaffection towards any Prince or Chief of a State in India, or [the Government or administration established in such states, shall be punishable with imprisonment which may extend to five years or with fine, or with both. A subsection of that same section 3 goes on to protect—in terms which are modelled on the Explanations to Section 124-A—legitimate criticism. The next clause contains certain

necessary provisions as to the power to forfeit offending publications or to detain them in course of transmission through the post ; and the concluding section provides for the status of the Courts by which the offences may be tried, and also proposes to enact that no Court shall proceed to the trial of any such offence except on complaint made by, or under authority from, the Governor-General in Council.

এই আইনে বর্ণিত আচরণ কোন সংবাদপত্রসম্পাদক বা পুস্তকপুস্তিকালেখক ব্রিটিশভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি করিলে, তাহারও বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা অন্য একটি ভারতীয় আইনে আছে। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত অপরাধের বিচার কেবল তখনই হইতে পারিবে, যখন সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনার‍্যাল অভিযোগ করিবেন, কিম্বা তাঁহার প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে অন্য কেহ অভিযোগ করিবেন। ব্রিটিশ ভারতের খবরের কাগজের সম্পাদক বা পুস্তকপুস্তিকা-লেখকদের আক্রমণ হইতে দেশী রাজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশভারতে কোন আইনের প্রয়োজন ছিল কি না, ও থাকিলে তাহা কি প্রকারের আইন হওয়া উচিত ছিল, তাহার আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন ; কারণ বড়লাট ভারতশাসন-আইন-প্রদত্ত ক্ষমতার জোরে সরাসরি উপায়ে শীঘ্র আইন পাস্ করাইয়াছেন ; এখন আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। কেবল মডারেটদের ইহা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত, যে, যে আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা (Indian Legislative Assembly) তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেও দিলেন না, বড়লাট তাহা সহজেই পাস্ করাইতে পারিলেন, অতএব ব্যবস্থাপক মহাশয়দের ক্ষমতা কতটা নামেমাত্র ও কতটা বাস্তবিক।

দেশীয় রাজাদের রক্ষণার্থ আইনে বৈধ সমালোচনার (legitimate criticismএর) জন্য শাস্তি হইবে না, বলা হইয়াছে। কিন্তু বৈধ সমালোচনা জিনিষটা যে কি, তাহা নির্দ্ধারণের ভার গবর্ণমেণ্টের এবং বিচারকদের উপর থাকায় এই বিধি সম্পাদক ও পুস্তক-লেখকদের বেশী কাজে লাগিবে না। মিঃ টম্‌সন্ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, অনেক দেশীয় রাজ্যে খুব কুশাসন ও অত্যাচার আছে। কুশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখিতে হইলে উহা পূর্ণমাত্রায় বর্ণনা করা প্রয়োজন। সেরূপ বর্ণনা পড়িলে কুশাসক ও অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে ক্রোধ ও অবজ্ঞার উদ্রেক অনিবার্য্য। আইনে আছে যে, যে-কাজের যে ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহা সেই কাজের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। সুতরাং কোন দেশীয় রাজ্যে অত্যাচার ও কুশাসনের পুরাপুরি বর্ণনা করিলে উহার রাজার প্রতি ক্রোধ ও অবজ্ঞা উৎপাদন ঐ বর্ণনার অভিপ্রায় বলিয়া ধরিয়া লইয়া লেখককে দণ্ডিত করা যাইতে পারিবে।

—

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্য

মিঃ টম্‌সন্ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নানা সন্ধি দ্বারা এবং বহু রাজকীয় প্রতিশ্রুতি (Royal pledges) দ্বারা দেশীয় রাজ্য-সকলকে সম্পাদক ও লেখকদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য। তিনি এরূপ বাধ্যতার পরিষ্কার এবং অকাট্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার উদ্ধৃত কোন সন্ধিসর্ত্ত বা প্রতিশ্রুতিতে এবম্বিধ আক্রমণের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে একথা ঠিক্, যে, তাঁহার উদ্ধৃত কথাগুলির তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। তদনুসারে, দেশীয় রাজাদিগকে সম্পাদক ও লেখকদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

টম্‌সন্ দেশীয় রাজাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য প্রমাণ করিতে গিয়া ইহা স্বীকার করিয়াছেন, যে, অনেক দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে। সংবাদপত্র-পাঠকেরা এই অত্যাচারের মানে জানেন। কোন কোন প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, সর্ব্বনাশ সাধন, প্রহার, কারাদণ্ড, প্রাণবধ, তাহাদের স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নাশ, প্রভৃতি এই অত্যাচারের অন্তর্গত হইতে পারে। দেশীয় রাজাদের উপর ব্রিটিশ ভারতের সম্পাদক ও লেখকেরা এরূপ কিছু অত্যাচার করিতে পারেন না।

তাঁহাদের লেখা দ্বারা রাজাদের অপমান, মনস্তাপ, রাগ, বদনাম, প্রভৃতি হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কাহারও রাজ্যনাশ, প্রাণনাশ, অঙ্গহানি, স্বাধীনতা লোপ আদি হয় নাই, হইতে পারে না। তথাপি, তাঁহাদের সম্ভাবিত দুঃখ ও অনিষ্টের প্রতিকার-চেষ্টা গবর্ণমেণ্ট করিয়া ভালই করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেও, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই, তাহা প্রমাণিত হয় না।

টম্‌সন্ কি স্বীকার করিয়াছেন, দেখা যাক্।

I believe that much of the feeling which exists against this Bill is due to a conviction on the part of members of the Legislature that there is a good deal of oppression and misrule in some of the Indian States. That feeling is a feeling which is based on humanity and it is a feeling which I honour and respect. I regret that I cannot deny the charge and I do not think that Ruling Princes themselves would deny it. It is true too that Government cannot always intervene even in the cases which come to its notice.

টম্‌সন্ যেমন স্বীকার করিয়াছেন, যে, অনেক দেশীয় রাজ্যে বিস্তর অত্যাচার আছে, তেমনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, যে, অনেক অত্যাচার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলেও, গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে পারেন না। অতএব, ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না, যে, গবর্ণমেণ্ট প্রবলকে সামান্য অসুবিধা হইতে বাঁচাইবার জন্য আইন করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ব্বলকে ভীষণ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তও কোন আইন করেন নাই, এবং তদ্রূপ অত্যাচার গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলেও তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত প্রায়ই কোন চেষ্টা করিতে পারেন না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজা-সকলের যে সন্ধি আছে, তাহাকে সব্‌সিডিয়ারী এলায়েন্স (subsidiary alliance) অর্থাৎ অধীন-মিত্রের সহিত সন্ধি বলে। তাহার ফল যে কি হইবে, তাহার ফলে যে বহুস্থলে প্রজাদের দুর্গতি ও অবনতি হইবে এবং রাজারা অনেক স্থলে অত্যাচারী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইবে তাহা প্রথম হইতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জানা আছে। অথচ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এখনও দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতি দয়াপরবশ সেভাবে হন নাই, যে ভাবে রাজাদের সহায় হইয়াছেন।

সব্‌সিডিয়ারী এলায়েন্সের ফল সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টের একটি ১৮৩২ সালের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইতেছি, যে উহার ফল সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন কালেই অজ্ঞতা ছিল না।

"On the question whether the subsidiary system be favourable to the happiness of the great body of the people, great diversity of opinion appears to exist.

"The old remedy, it is said, for gross misgovernment in India, was conspiracy or insurrection. The subsidiary system, by introducing a British force, bound by Treaty to protect the Sovereign against all enemies, domestic or foreign, renders it impossible for his subjects to subvert his power by force of arms. That fear of the physical strength of the people which, in the independent Stutes of the East, checks in some degree the cruelty and rapacity of rulers, has no effect on Princes who are assured of receiving support from Allies immeasurably superior to the Natives in power and knowledge. Thus the dependent Sovereign, restricted from the pursuits of ambition, and secured from the danger of revolt, generally becomes voluptuous or miserly; he sometimes abandons himself to sensual pleasure; he sometimes sets himself to accumulate a vast hoard of wealth; he vexes his subjects with exactions so grievous that nothing but the dread of the British arms prevents them from rising up against him. The people, it is said, are degraded and impoverished. All honourable feeling is extinguished in the higher classes. A letter from Sir Thomas Munro has been quoted, in which that distinguished officer states that the effects of the Subsidiary system may be traced in decaying villages and decreasing population, and that it seems impossible to retain it without nourishing all the vices of bad Government. Mr. Russell, who was, during nearly 4 years, Resident or Assistant Resident at Hyderabad, and Mr. Bayley, who was,

during five years, a Member of Council in Bengal, have expressed the same opinion in the strongest terms. Colonel Barnewell, who was Political Agent in Kattywar, says that 'it is the most difficult thing to prevent our protection from being abused.' Mr. Jenkins, who was Resident at the Court of Nagpore, says that 'our support has given cover to oppressions and extortions which probably, under other circumstances, would have produced rebellion."'

(Pages 81-82 of *Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company ;* ordered by the House of Commons, to be printed, 16 August 1832.)

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টের সভ্যদের মধ্য হইতে পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিটির রিপোর্টে দেশীয় রাজাদের অধোগতি ও দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের দুর্গতি সম্বন্ধে উপরে উদ্ধৃত যাহা লিখিত হইয়াছিল, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য বাদ দিলে বাকী অধিকাংশ রাজ্য সম্বন্ধে তাহা এখনও সত্য। গবর্ণমেণ্ট যে আইন প্রণয়ন করিলেন, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের কোন হিত ত হইবেই না, রাজাদেরও অধোগতির কোন প্রতিকার হইবে না। সম্ভবতঃ বৈধ সমালোচনা (legitimate criticism) এবং অবৈধ সমালোচনার চুলচেরা পার্থক্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া, নিরাপদ থাকিবার জন্য, অনেক সম্পাদক দেশী রাজ্যের বিষয় কিছু লিখিবেনই না। অধিকাংশ দেশী রাজ্যে কোন খবরের কাগজ না থাকায়, এবং যে অল্পসংখ্যক রাজ্যে খবরের কাগজ আছে তাহাদেরও হাত পা কঠোর আইনের নিগড়ে বাঁধা থাকায়, এবং রাজাদের ও রাজপুরুষদের বেআইনী জুলুমের ভয় থাকায়, ফল এই হইতে পারে, যে, অত্যাচারী কুশাসক রাজারা সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ হইবে। এখনও অনেকটা সেই অবস্থা আছে, এখনও ব্রিটিশ-ভারতের সম্পাদকেরা অধিকাংশ দেশী রাজ্য সম্বন্ধে খুব কম খবরই রাখেন বা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমশঃ দেশী রাজ্যসকলের প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়িতেছিল; তাহাতে উহাদের রাজা ও প্রজাদের মঙ্গলই হইতেছিল। এখন ইহার বিপরীত অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা আশঙ্কার বিষয়।

দেশী রাজ্যসকলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত রেসিডেণ্ট এবং পলিটিক্যাল এজেণ্টদিগের দ্বারা রাজাদের ও রাজ্যসকলের যত অনিষ্ট হইয়াছে, ব্রিটিশ ভারতের সম্পাদক ও লেখকদিগের দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ অনিষ্টও হয় নাই। কোনও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলিতে পারেন না, যে, রেসিডেণ্ট ও পলিটিক্যাল এজেণ্টদের চক্রান্তে জুলুমে বা পরামর্শ-অনুসারে একজন রাজাও রাজ্য হারান নাই, একটি রাজ্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, একজন রাজাও সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন নাই, একজনেরও ক্ষমতা ও অধিকার হ্রাস হয় নাই। কোন সম্পাদকের লেখায় কখন এরূপ কিছু ঘটিয়াছে কি? অথচ আইন হইল, রাজাদিগকে সম্পাদকদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত! তাহার বহু পূর্ব্বেই প্রজাদিগকে অত্যাচারী রাজাদের কবল হইতে এবং রাজাদিগকে জবরদস্ত রেসিডেণ্ট ও পলিটিক্যাল এজেণ্টদের চক্রান্ত ও জুলুম হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন আইন করা কি উচিত ছিল না?

—

যুদ্ধ-বিভাগের ব্যয় ও রেলওয়ের ব্যয়

ভারতবর্ষের যুদ্ধবিভাগের ব্যয় অত্যন্ত বেশী ইহা সকলেই জানেন, এবং যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপের উপায় নির্দ্দেশ করিতে চান, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সামরিক ব্যয় হ্রাসের কথাই বলেন। ইহা ঠিক্। কিন্তু আরও প্রভূত অপব্যয় আছে। রায় সাহেব পণ্ডিত চন্দ্রিকাপ্রসাদ তেওয়ারী একটি সরকারী রেলওয়ের সহকারী ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি রেলওয়ে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে বেড়াইয়া তিনি রেলওয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে-সকল সম্বন্ধে একটি বহি লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে রেলওয়ের ব্যয় বাৎসরিক কুড়ি কোটি টাকা কমান যাইতে পারে। এই অপব্যয় নিবারিত হইলে রেলের ভাড়াও কমিতে পারে। এক্ষণে রেলের ভাড়া খুব বেশী বাড়িয়াছে, অথচ ইণ্টারমিডিয়েট ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি পূর্ব্ববৎ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর আছে। স্ত্রীলোকদের গাড়ী সংখ্যায় ও আয়োজনে পূর্ব্ববৎ অত্যন্ত কম আছে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কারাদণ্ড

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অকালীদের উদ্দেশে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহার এক বৎসরের সশ্রম কারাবাসের দণ্ড হইয়াছে। তিনি কাহাকেও কোন অপকর্ম্ম করিতে, মারপিট করিতে, কিম্বা অন্যপ্রকার অবৈধ বল প্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করেন নাই। তিনি অকালী না হইয়াও অকালীদের সহিত সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, বিচারকের রায় পড়িয়া মনে হয় যেন ইহাই তাঁহার একটি প্রধান অপরাধ!

—

সামরিক বিভাগের গোশালা

বেঙ্গলী লিখিয়াছেন, সামরিক হাসপাতাল, গোরা সৈনিক ও তাহাদের পরিবারবর্গ, এবং ইংরেজ সেনানায়কদিগকে দুধ মাখনাদি যোগাইবার জন্য সামরিক বিভাগের যে-সব গোশালা আছে, তাহা হইতে গোশালার দুগ্ধাদি উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা কম মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। তাহাতে ১৯১৮ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত ২৮৫২৯৭৬ টাকা লোকসান হইয়াছে। গোরারা ও তাহাদের নায়কেরা বেশ মোটা বেতন পায়। তাহার উপর তাহাদিগকে কম দামে দুধ মাখন যোগান হয়! এইসকল গোশালার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও আবার ইংরেজ। ভারতকামধেনু দোহনের উপায়ের অন্ত নাই!

—

সম্মতির বয়স আইন

বর্ত্তমান আইন অনুসারে বালিকাদের সম্মতির বয়স ১২। বখ্‌শী সোহনলাল বিবাহিতা ও অবিবাহিতা উভয়বিধ বালিকাদের সম্মতির বয়স বাড়াইয়া চৌদ্দ করিবার জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়া তাহার আলোচনা ও আবশ্যকমত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন জন্য সভ্যদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত একটি কমিটি (Select Committee) নিয়োগের অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার্ উইলিয়ম ভিন্‌সেণ্ট্ বলেন, যে, ইংলণ্ডে ১৩ বৎসরের কম বয়সের বালিকার বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহার জন্য খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তের হইতে ষোল বৎসরের বালিকার বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহার জন্য শাস্তি কিছু কম হয়। বখ্‌শী সোহনলালের প্রস্তাবিত আইনে কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের সম্বন্ধে অপরাধের জন্যও গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বিবাহিতা বালিকাদিগকে এই প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্ভূত করিতে গবর্ণমেণ্টের অধিকতর আপত্তি আছে। গবর্ণমেণ্ট দুই সর্ত্তে এই বিলের সমর্থন করিতে পারেন—১ম, বিবাহিতা বালিকাদিগকে ইহার অন্তর্ভূত করা হইবে না; ২য়, ১২ হইতে ১৪ বৎসরের বালিকাদের সম্বন্ধে অপরাধের দণ্ড ১২ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের বিরুদ্ধে অপরাধের দণ্ড অপেক্ষা কম কঠিন হইবে।

স্যার্ উইলিয়ামের এইসব কথার পর, মিঃ এলান্ বিলের প্রবল সমর্থন করেন। তিনি বলেন, ভারতে এক পুরুষে বত্রিশ লক্ষ অল্পবয়স্কা মাতার মৃত্যু হইয়াছে।

মিঃ আম্‌জাদ্ আলী বলেন, যে, বিলটি আইনে পরিণত হইলে সব (ভারতীয়) স্বামীকে জেলে যাইতে হইবে। বক্তার এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও, ইহা এ দেশের অল্পবয়স্কা বিবাহিতা বালিকাদের অধিকাংশের অবস্থার সত্য আভাস দেয়।

স্যার্ উইলিয়ম ভিন্‌সেণ্ট্ বলেন, যে, বিলের প্রস্তাবক বখ্‌শী সোহনলাল গবর্ণমেণ্টের সর্ত্ত দুটিতে সম্মতি জানাইয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ায় উহার পক্ষে ২৯ ও বিপক্ষে ৪১ জন ভোট দেওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হয়।

গবর্ণমেণ্টের সর্ত্ত অনুসারে পরিবর্ত্তিত বিলটির বিরুদ্ধেও এত "সভ্য" ভোট কেন দিলেন তাহার যুক্তিসঙ্গত বা নৈতিক কোন কারণ আমরা আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। দুর্নৈতিক কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। বুঝিলাম, বিবাহিতা বালিকাদিগকে আইনের অন্তর্গত করিলে অনেক স্বামীর বিপদ্ আছে ও সামাজিক আপত্তি আছে। কিন্তু ঐ ৪১ জন "সভ্য" কি ১৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা অবিবাহিতা বালিকাদের উপর অত্যাচারের সমর্থন করেন?

তারহীন টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ

আমেরিকায় তারহীন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনকে সংক্ষেপে রেডিও (Radio) বলে। উহা দ্বারা সেদেশে ব্যবসা বাণিজ্য সরকারী কাজ প্রভৃতি ত খুব সহজে চালান হয়ই, লোকে ঘরে বসিয়া বিখ্যাত বক্তার বক্তৃতা, বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার গান, বিখ্যাত উপদেষ্টার উপদেশ, বিখ্যাত শিক্ষকের ব্যাখ্যান, বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় শোনে। ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত আমেরিকায় রেডিওর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেছে। সেখানকার বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সচিত্র কাগজ-সকলে রেডিও সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও সংবাদ বিস্তর থাকে। অন্যান্য পাশ্চাত্য সভ্য দেশেও রেডিওর চলন খুব হইতেছে। প্রাচ্য দেশের মধ্যে জাপানে ইহার প্রচলন হইয়াছে। চীনেও ইহার দ্রুত বিস্তার হইতেছে। ভারতবর্ষে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক সন্দেহবশতঃ ইহা প্রচলিত হইতে দেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য একটি রেডিও যন্ত্র স্থাপনের অনুমতি চাওয়া হয়। গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন নাই।

—

শিক্ষার ওজুহাতে অপব্যয়

ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ প্রদেশ-সকলের মধ্যে আগ্রা-অযোধ্যা অন্তর্গত। অথচ শিক্ষার নামে এই যুক্ত-প্রদেশেই অত্যন্ত বেশী অপব্যয় হইতেছে। প্রাথমিক বা উচ্চ কোন প্রকার শিক্ষার বিস্তারই এই প্রদেশে বেশী হয় নাই। অথচ এখানে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে ও পরে হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, অন্য কোন প্রদেশে তাহা হয় নাই। আগে ছিল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। তাহার পর হয় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়। তাহার পর হইয়াছে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্প্রতি কেবল পরীক্ষক-বিশ্ববিদ্যালয় না রাখিয়া শিক্ষক-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করাও হইয়াছে। এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতেই বেশী ছাত্র নাই। অথচ প্রত্যেকটির জন্য মোটা মাহিনায় স্বতন্ত্র উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীসকল নিযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপব্যয় হইতেছে প্রাসাদ নির্ম্মাণে। পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার এবং মূ্যজিয়ম্ খুব পাকা ও উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। নতুবা পুস্তক, যন্ত্র, প্রভৃতি সুরক্ষিত হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দরিদ্র ও নিরক্ষর দেশে ছাত্রদের ক্লাস ও নিবাসের জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ গর্হিত অপব্যয়। স্বাস্থ্যকর চলনসই ঘরই যথেষ্ট। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাসাদ নির্ম্মাণে বিস্তর অপব্যয় হইয়াছে। অথচ, অবগত হইলাম, উহার অনেক লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে। অযোধ্যার তালুকদারেরা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহার জন্য একটি কন্‌ভোকেশ্যন্ হল্ (উপাধিদান প্রভৃতির জন্য গৃহ) নির্ম্মিত হইবে। ইট-পাথরের স্তূপ ত বিশ্ববিদ্যালয় নহে; ভাল ছাত্র ও ভাল অধ্যাপকের সমষ্টি এবং তাঁহাদের কার্য্যসৌকর্য্যের জন্য উৎকৃষ্ট পুস্তক যন্ত্র প্রভৃতির সংগ্রহ, ইহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে চাই। এরূপ কথা হক্‌স্‌লী বহুপূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন।

এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্র্যাল্ কলেজের হাতা যত বড়, তাহাতে কলিকাতার প্রায় সব কলেজগুলির স্থান সংকুলান হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতক শিক্ষাদানকার্য্য এখন এখানে হইতেছে। সমুদয়ই হইতে পারিত। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-বাড়ী এবং সেনেট-গৃহও সুন্দর প্রাসাদ। ছাত্রদিগকে শিক্ষা-দিবার জন্য এসকলের উপর যদি আরও কাম্‌রার প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে তাহার নিমিত্ত মিওর কলেজের হাতাতেই কিছু খরচ করিয়া তাহা নির্ম্মিত হইতে পারিত। কিন্তু জমী, ইট পাথর চূন বালীকে কর্ত্তারা শিক্ষার এরূপ একান্ত আবশ্যক উপকরণ মনে করেন, যে, তাঁহারা বিনা ব্যয়ে বা অল্পব্যয়ে যাহা হইতে পারিত, তাহার পরিবর্ত্তে প্রায় সাত লক্ষ টাকা

ব্যয় ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের বড় বড় বাড়ী, বিস্তৃত হাতা, বহু মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজ প্রভৃতি কিনিয়াছেন। এবং মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজ প্রভৃতি অনেক অংশ আবার বিক্রীও করিয়াছেন। কাগজ বিক্রীতে লোক্সান দিতে হইয়াছে।

মৌলিক কিছু করিয়াছেন এবং খুব পণ্ডিত, এরূপ লোকদেরই আজকালকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্যকর্ম্মা বেতনভোগী ভাইস্চ্যান্সেলার হওয়া সাজে। কিন্তু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্যকর্ম্মা মাসিক ৩৫০০্ টাকা বেতনভোগী ভাইস্চ্যান্সেলর হইয়াছেন স্যার্ ক্লড্ ডি লা ফস্। ইনি বহুবৎসর পূর্ব্বে কোচবিহার কলেজে চাকরী করিতেন। তাহার পর যুক্তপ্রদেশে স্কুলইন্স্পেক্টর হন; এবং শেষে ডিরেক্টর হন। জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে ইঁহার নাম কেহ জানে না। কোন সর্দ্দার-শিক্ষাদারোগাকে উঁচু মাচার উপর বসাইয়া দিলেই কি ভাইস্চ্যান্সেলার বানান যায়? আরও মজার কথা এই, যে, ডি লা ফস্ সাহেব পেন্স্যন লইবার পরই ভাইস্ চ্যান্সেলার হইয়াছেন। অর্থাৎ যিনি বয়সের আধিক্যবশতঃ আইন অনুসারে রাজকীয় কাজের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় অবসর পাইলেন, তাঁহাকে নূতন রকম বিশ্ববিদ্যালয় চালাইবার কাজে সাড়ে তিন হাজার টাকায় নিযুক্ত করা হইল! ডি লা ফস্ নিজের বেতনটি বেশ পাইতেছেন। তাহার উপর পেন্স্যন ত আছেই। অথচ ভাল অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের বেতন হাজার টাকা। এলাহাবাদের ঐ কর্ম্মচারীর বেতন ১৫০০। তাহার উপর ডেপুটী ও এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার আছে বা হইবে।

আগ্রায় ও কানপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়া আছে। এলাহাবাদে শিক্ষক-বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে উচ্চশিক্ষালাভের ব্যয় খুব বাড়িয়াছে, অথচ অধিকাংশস্থলে আগে যাঁহারা কলেজে উচ্চ শিক্ষা দিতেন, এখন তাঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। "কলেজ" নামের বদলে "বিশ্ববিদ্যালয়" নাম ব্যবহার করিলেই কি অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য এবং ছাত্রদের বিদ্যা বাড়ে? এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত অনেক কলেজে অনেক ভাল অধ্যাপক ছিলেন ও আছেন জানি; কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আখ্যা দেওয়াতেই তাঁহাদের পূর্ব্বপাণ্ডিত্যগৌরব বাড়িয়া যায় নাই।

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অট্টালিকা নির্ম্মাণে আপত্তি জানাইতেছি বলিয়া আমরা যে স্থাপত্যশিল্পের মর্য্যাদা অনবগত আছি, তাহা নয়। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্নাভাবে যাহার দেহ শীর্ণ, তাহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরাইয়া তাহার মাথায় হীরকখচিত উষ্ণীষ স্থাপন করিলে যেমন সুসঙ্গত কাজ হয়, প্রায়-নিরক্ষর অজ্ঞ ভারতে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কন্ভোকেশ্যন হল নির্ম্মাণ এবং অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত জমী ঘরবাড়ী প্রভৃতি ক্রয়ও তেমনি সঙ্গত। যুক্তপ্রদেশে শিক্ষাদানের ভার যাহাদের উপর আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি এই, যে, শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি যথোচিত হইবে না, অথচ দেখান চলিবে, যে, ঐ প্রদেশে শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইতেছে?

—

ব্রিটিশ কূটনীতির পরাজয়

ইউরোপীয় মিত্রশক্তিদের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের, পণ ছিল যে, তুর্কদিগকে ইউরোপে বা এশিয়ায় এমন কোন দেশ বা প্রদেশ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না, যাহা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু মুস্তাফা কমাল পাশা গ্রীকদিগকে উত্তমমধ্যম দিয়া এশিয়া মাইনর হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায় ক্রমে ক্রমে অগত্যা তুর্কদিগকে অনেক জায়গার দখল ফিরাইয়া দিতে হইতেছে। না দিয়া উপায় কি? আগে ভালয় ভালয় দিলে ইংলণ্ডের কূটনীতির পরাজয় হইত না। তুর্ক এখন এশিয়া মাইনরের প্রভু, শীঘ্র থ্রেসে প্রভু হইবে, এবং পরে আরো কোথায় হইবে, কে বলিতে পারে?

তুর্করা ভাল অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাইল, এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইয়াছে। বিলাতী নেশ্যন্ কাগজ বলেন, গ্রীকদের বৃত্তান্তে এই কথার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, যে, ফরাসীরা তুর্কদিগকে রণসজ্জা বিষয়ে সাহায্য

মুস্তাফা কামাল পাশা

করিয়াছিল। তুর্করা ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিল; "The Greek accounts lay stress on the fact that the Turks had been well-armed from French sources, and even made use of tanks"। ফরাসীদের তুরস্কের প্রতি কিছু টান অবশ্য বরাবরই আছে। তবে, তাহারাই সত্য সত্য তুরস্ককে সাহায্য করিয়াছিল কিনা, বলা যায় না। এরূপ কথাও ত একাধিক বার উঠিয়াছে, যে, ইংলণ্ড গ্রীস্‌কে সাহায্য করিয়াছে। এরূপ মনে করিবারও কারণ আছে, যে, রুশিয়ার বল্‌শেভিকেরা তুর্কদিগকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়াছে, এবং জার্মেনী বল্‌শেভিকদিগকে তাহা সমস্ত বা বহুপরিমাণে যোগাইয়াছিল।

অহিংসা ও কামালপাশার জয়ে উল্লাস

আমরা কামালপাশার জয়ে আহ্লাদিত হইয়াছি। কেন হইয়াছি বা হওয়া উচিত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই আহ্লাদিত হইয়াছি। কংগ্রেস্‌দলের সকলে অহিংসার প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য; খিলাফৎদলের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেস্‌ওয়ালা, তাঁহারাও অহিংসার প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবেন। অথচ সকলেই কামাল পাশার জয়ে সুখী। বোধহয় তাঁহারা আমাদেরই মত না ভাবিয়া চিন্তিয়া সুখী। নতুবা বাস্তবিক যিনি আন্তরিক অহিংসা-বাদী, তিনি ন্যায়যুদ্ধ বা ধর্ম্মযুদ্ধেরও সমর্থন করিতে পারেন না—তাহাতে জয় হউক বা না হউক। কারণ যুদ্ধ যেরূপই হউক উহা হিংসা ও রক্তপাতসাপেক্ষ। বস্তুতঃ মানুষ আসলে আত্মা হইলেও সে শরীরী বলিয়া তাহার জন্তুধর্ম্ম বিলক্ষণ আছে। সেইজন্য আত্মরক্ষার জন্য কিম্বা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কেহ আততায়ীকে হত বা আহত এবং পরাজিত করিলে স্বাভাবিক মানুষের খুসী হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীর ছয়জন মহত্তম মানুষ

এইচ্ জী ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ডের একজন জীবিত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি পৃথিবীর একটি ইতিহাস লিখিয়াছেন। "গড্ দি ইনভিজিব্‌ল্ কিং" অর্থাৎ "অদৃশ্য রাজা ঈশ্বর" নামক ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকেরও লেখক তিনি। তিনি নিজেকে খৃষ্টিয়ান বলেন না। আমেরিকান্ ম্যাগাজিন্ নামক মাসিক পত্রের পক্ষ হইতে ব্রুস্ বার্টন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতে পৃথিবীর মহত্তম ছয় জন মানুষের নাম জানিতে চান। ওয়েল্‌সের মতে এই ছয় জনের নাম, যথাক্রমে, যীশু, বুদ্ধ, গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টট্‌ল্, অশোক, রজার বেকন, এব্রাহাম লিঙ্কন। অবশ্য সমগ্র তালিকাটি সম্বন্ধে এবং প্রত্যেক নাম সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। কিন্তু ওয়েল্‌সের মতও বিবেচনার যোগ্য। ছয়টি নামের মধ্যে দুইটি ভারতবর্ষীয়, একটি ইহুদী, একটি গ্রীক্, একটি ইংলণ্ডীয় ও একটি আমেরিকান্। মহাদেশ হিসাবে তিনটি এশিয়ার, দুটি ইউরোপের, এবং একটি আমেরিকার।

ইংলণ্ড কপট না সরল সৎ না অসৎ?

লণ্ডনের টাইম্‌স্ কাগজে একজন ইংরেজ ইংলণ্ড সৎ ও সরল কি না, এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে, যে-যে বিষয়ে ভারতীয়েরা ইংলণ্ডের শঠতা ও কপটতার প্রমাণ দেখিতে পান, ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে তাহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সিমলার আদর্শ ইংরেজ আম্‌লা (bureaucrat) বলিবেন :—

"I agree," says the Simla bureaucrat, "that our mistakes have been many and various. The educational system which we evolved (without any help from Indians) has proved top-heavy. The highest posts in the services have been somewhat greedily earmarked for white men. Officers for a national army might have been trained earlier and in greater numbers. We have been backward in developing India's raw materials and industries. But none of these blunders amount to a breach of faith. Stupid we may have been. Dishonest we are not." So runs the British apology.

Yet the Indian of to-day sticks to his new and favourite epithet dishonest, and it is worth while to ask whether he has any excuse for so deeply seated a conviction. The counts under which he arraigns the British Government are four in number:—(1) Dyarchy; (2) the Caliphate; (3) Reverse Council Bills and (4) Kenya.

আমরা দেখিতেছি, ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাঁহাদের যে-যে কাজগুলিকে ভ্রম বা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ বলিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটির দ্বারা তাঁহাদের কোন না কোন স্বার্থ-সিদ্ধি ও সাংসারিক লাভ হইয়াছে। সব ভুল ও নির্বুদ্ধিতাই স্বার্থসিদ্ধি ও লাভের অনুকূল হইল কেমন করিয়া? কোন চতুর পাগল পাগ্‌লামির ভান করিলে ইংরেজীতে বলে, there is a method in his madness; সেইরূপ আমাদিগকে কি বলিতে হইবে, there is a method in England's stupidity and blunders in India? যাহা হউক, ইংলণ্ড কপট কিম্বা সরল তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। স্যার ভ্যালেন্টীন্ চিরল্ গত সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন টাইম্‌সে একটি চিঠি লিখিয়া ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির অসাধুতা ("the dishonesty of British policy") প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্য, গ্রীস্, মিশর দেশ, ভারতবর্ষ, আরব দেশ, প্যালেষ্টাইন, ইরাক্, ও সীরিয়া সম্বন্ধে ব্রিটিশ নীতির শঠতা বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, আমরা কেবল সেইটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।

In India, the effect of a really generous attempt to meet Indian political aspirations by great constitutional reforms has been largely nullified by the dishonest evasions to which recourse was had after the repression of the Punjab troubles of 1919 and by the conflict of views over the Turkish peace terms between the Imperial Government and the Government of India, which Lord Chelmsford and Lord Reading were allowed in turn to make public. Only a few months ago Mr. Srinivasa Sastri, on returning to Bombay after having represented India at the Imperial Conference in London and at the Washington Conference, warned British Ministers in his first public speech that the greatest danger for the British Raj was the complete loss of confidence in British promises and pledges. But the Prime Minister disregarded that warning in the singularly ill-informed and unwise statement which he made a few weeks later in the House of Commons.

জাতি হিসাবে আমরা আমাদের সার্ব্বজনিক কাজে ভণ্ডামি ও অসাধুতা করি কি না, আমাদের তাহাই সর্ব্বাগ্রে ভাবিবার বিষয়। ইংলণ্ড অসাধু হইলেও তাহাতে ভারতের অসাধুতা খণ্ডিয়া যাইবে না।

—

ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণা

"প্রবাসী" বঙ্গের বাহিরে এলাহাবাদে জন্ম গ্রহণ করে, এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের কৃতিত্বের বিষয় বহু বৎসর ধরিয়া ইহাতে লিখিত হইতেছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, যে, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষবাসী দেশী ও বিদেশী যত রসায়নবিৎ গবেষণা করিয়া রসায়নী বিদ্যা সম্বন্ধে নূতন প্রবন্ধ রচনা ও তাহা বিদেশী রাসায়নিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্রাল্ কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার নীলরতন ধরের নূতন গবেষণাপূর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত

হইয়াছে। যে পাঁচ জন ভারতবাসী রাসায়নিকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ গত দশ বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তালিকা নীচে দিতেছি। যিনি যে বৎসর যত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নামের নীচে দেওয়া হইল।

বৎসর	নীলরতন ধর	রসিকলাল দত্ত	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	সাইম-সেন্	ওয়াট্-সন্
১৯১৩	১১	৭	৬	৩	৮
১৯১৪	৭	৭	৫	২	৩
১৯১৫	৫	৩	১	৫	৩
১৯১৬	৫	৩	৪	০	৫
১৯১৭	২	৬	৫	২	১
১৯ ৮	০	০	০	৫	০
১৯১৯	২	৩	৫	০	০
১৯২০	৬	২	১	৩	১
১৯২১	৪	১	১	৩	১
১৯২২ (হাল নাগাদ)	১২	০	৩	১	১
মোট	৫৪	৩২	৩১	২৪	২৩

ইঁহাদের মধ্যে নীলরতন ধর ও রসিকলাল দত্ত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের শিষ্য।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা হওয়া উচিত। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে এলাহাবাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি কেন্দ্র হওয়া সন্তোষের বিষয়। কানপুর ও দেহ্‌রাদূনেও রাসায়নিক গবেষণা হইতেছে। জে এল্ সাইমন্সেন্ দেহ্‌রাদূন ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌সটিটিউটে এবং ঈ আর্ ওয়াট্‌সন্ কানপুর টেক্নো-লজিক্যাল ইন্‌সটিটিউটে কাজ করেন। এই দুই শিক্ষালয়ে কোন দেশী লোক গত দশ বৎসরে রাসায়নিক গবেষণা করিয়াছেন কিনা, তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই।

মহিলার সাহস

১৯২১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর দুপর বেলা লালগোলা-ঘাটের ষ্টেশনমাষ্টার বাবু গণেন্দ্রনাথ সরকারের আট বছরের মেয়ে নন্দরাণী পদ্মার তীর হইতে কয়েক হাত দূরে তাহাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া নদীর স্রোতের জল বহিয়া যাইতে দেখিতেছিল। সে বারাণ্ডার একটা বাঁশের খুঁটি এক হাতে ধরিয়া খেলার ছলে যথাক্রমে সাম্‌নে ও পিছনে ঝুঁকিতেছিল। একবার এত জোরে সাম্‌নে ঝুঁকিল, যে, তাল সাম্-লাইতে না পারিয়া সে একেবারে নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল এবং স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সৌভাগ্য ক্রমে তাহার দিদি শ্রীমতী কমলকুমারী নন্দী নিকটে ছিলেন। তিনি নিজের বিপদ গ্রাহ্য না করিয়া বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের সহিত নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, এবং সাঁতার দিয়া তাঁহার ভগিনীর নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে তীরে লইয়া আসিলেন। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের সুপারিসে এই ঘটনাটি রয়্যাল হিউমেন্ সোসাইটীর গোচর করা হয়। নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া কেহ অপরকে সাহসপূর্ব্বক আকস্মিক আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিলে এই সমিতি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। সমিতি শ্রীমতী কমলকুমারী নন্দীকে তাঁহার সাহসের জন্য একটি প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসের হার

কয়েক বৎসর হইল অধ্যাপক ঈ আর্ ওয়াট্‌সন্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা খুব বেশী ছাত্র পাস্ হওয়াটা ভীতিজনক, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এক কমিটি নিযুক্ত করেন। প্রধানতঃ অধ্যাপক আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের উপর অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্টের খসড়া প্রস্তুত করিবার ভার পড়ে, আমাদের এইরূপ স্মরণ হইতেছে। শোনা যায়, তদনুসারে তিনি বৎসরাধিক কাল পরিশ্রম করিয়া একটি দীর্ঘ ও সারবান্ রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, এবং তাহাতে কমিটির অন্য সভ্যেরা সায় দেন। ইহাও শুনিয়াছি, যে, এই রিপোর্টের প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে ছাপাও হইয়াছিল, কিন্তু পরে এই ছাপা পাতাগুলি এবং অন্যান্য কাগজপত্র প্রেস্ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ওয়াট্‌সন্‌ও এখন আর বাংলা দেশে কাজ করেন না।

এই প্রকারে জিনিষটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের যাহা স্মরণ আছে ও যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উকীলগণ যদি সর্ব্বসাধারণকে সমুদয় তথ্য জানান, তাহা হইলে ভাল হয়। ব্যাপারটি চাপা পড়িল কেন? কে চাপা দিল? যদি এতৎসংসৃষ্ট মুদ্রিত বা অমুদ্রিত রিপোর্ট বা অন্য কাগজপত্র হারাইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী কে? যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ দায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার বা তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

—

দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি বিশ্বভারতীর অর্থসচিব ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বহুবৎসর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সামাজিকতা ও আতিথেয়তার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গ ভালবাসিতেন। তিনি যদিও বহুবৎসরব্যাপী অনভ্যাস বশতঃ চলাফিরা সামান্যই করিতেন, তথাপি তাঁহার আরামকুর্সীতে বসিয়াই শান্তিনিকেতন পল্লীর সকলের খবর লইতেন এবং সংবাদ পাইবামাত্র যাহার যাহা আবশ্যক তাহার বন্দোবস্ত করিতেন। আমরা যতদিন ঐ পল্লীতে ছিলাম, তাহার মধ্যে কখনও কোন অসুবিধা হইলে যদি তাঁহাকে না জানাইতাম, তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইতেন। লোককে খাওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত যে মেলা হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রিয় করিবার জন্য ও তাহার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন। পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহের গৌরব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন।

—

বার্‌দোলীর প্রস্তাবসমূহ

বারদোলীতে কংগ্রেসের এক কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে অসহযোগীদিগকে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থাপত্র স্থির হয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহার এবং ইহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রচার, মদ্য বিক্রয় ও পান বন্ধ করা, অন্তরের সহিত অহিংসাব্রত গ্রহণ ও তদনুযায়ী আচরণ, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা বিবাদ ও মনোমালিন্য দূরীকরণ এই ব্যবস্থাপত্রের অভিপ্রেত কার্য্য। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যে, দেশের অধিকাংশ লোক, অথবা অধিকাংশ না হইলেও লক্ষ লক্ষ লোক, ঐ ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করিলে আমাদের জাতি রাষ্ট্রীয় স্বরাজ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া তাহাতে সফলকাম হইবার আশা করিতে পারেন, এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাজের উপযুক্তও হন। কিন্তু বার্‌দোলীর প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত হইবামাত্রই সাক্ষাৎভাবে আমরা স্বরাজ পাইব, এমন মনে করা উচিত নয়। তাহার জন্য অন্যবিধ উপায় অবলম্বন আবশ্যক। নিরুপদ্রব বা সাত্ত্বিক আইন লঙ্ঘন (civil disobedience) অন্যতম উপায়। এই প্রকারে আইন লঙ্ঘন করিবার মত অবস্থা দেশের হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কংগ্রেস এক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রিপোর্ট দিবার যে তারিখ প্রথমে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরে অন্য তারিখ স্থির করা হয়। রিপোর্ট কিরূপ হইবে, তাহা জানিবার জন্য লোকে ব্যগ্র আছে।

—

ব্যয়সংক্ষেপের দৃষ্টান্ত।

নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গোড়ার অধিবেশনেই রাজসাহীর প্রতিনিধি বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরীর এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়, যে, বাংলা গবর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের সভ্য (Executive Councillors) যেন অতঃপর দুজন হয়। কার সাহেব আসামের গবর্ণর নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার জায়গায় কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইত। কিন্তু তাঁহার জায়গায় ডোনাল্ড্ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। কিশোরী-বাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না করার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্ট বা ভারত সচিব যিনিই দায়ী হউন, ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, ভারতের ইংরেজ শাসন

কর্ত্তারা শাসনকার্য্যের ব্যয়সংক্ষেপ এরূপ ভাবে করিতে চান না যদ্দ্বারা ইংরেজের পাওনা কমে বা ইংরেজের অধিকৃত কোন পদ উঠিয়া যায়। আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত-প্রদেশের আয়তন, লোকসংখ্যা, রাজস্ব, ব্যয় বঙ্গদেশ অপেক্ষা অধিক। অথচ উহার কাজ দুজন শাসন পরিষদের সভ্য (executive councillors) এবং দুজন মন্ত্রী দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। বঙ্গদেশে তদপেক্ষা অধিক শাসন-পরিষদের সভ্য ও মন্ত্রীর প্রয়োজন নাই।

—

জলপ্লাবনে বিপর্য্যস্তদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই আবেদন করিয়াছেন—

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির আবেদন

রাজসাহী বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার কতক অংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ ৭।৮ হাত জল হওয়ায় বাড়ী ঘর শস্যাদি ত নষ্ট হইয়াছেই, মানুষ এবং পশু অনেক ভাসিয়া গিয়াছে। গত পঞ্চমীর দিন হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় আর পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। কতক লোক রেল লাইনে আশ্রয় লইয়া জীবন বাঁচাইয়াছে, আবার কতক বা ঘরের চালায় বসিয়া আছে। তাহাদের মাথার উপর জল, পায়ের নীচে জল। মানুষ ও পশু অনাহারে ও অসুস্থ হইয়া মরিতেছে। মৃতদেহ পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে। জল অপেয় হইয়াছে।

আমরা রিলিফ্ কমিটি হইতে নওগাঁ, সান্তাহার, রাণীনগর, আত্রাই ও মাধানগরে কেন্দ্র খুলিয়া সাহায্য পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রায় পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছা-সেবক এই কমিটি হইতে প্রেরিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আবার দুর্দ্দৈব যে যাহাদের উঠানে অথই জল তাহাদের দেশে নদীও নাই যে নৌকা পাওয়া যাইবে। কলার ভেলায় কাজ হইতেছে। আমরা ছয়-খানা নৌকা রেলযোগে পাঠাইয়াছি। এক্ষণে টাকার আবশ্যক, কাপড়ের আবশ্যক। সকলে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেই জলমগ্ন বিশাল অঞ্চলের কতক লোক বাঁচান যাইবে।

বৃষ্টির জলে দাঁড়াইয়া ঐ যে নরনারী কাঁপিতেছে উহাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া আজই কিছু সাহায্য দিন। উহারা আপনাদের সাহায্যের প্রতীক্ষায় আছে। অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য করিয়া উহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করুন। অর্থ পাইলে অন্ততঃ দাঁড়াইয়া অনাহারে মরা বন্ধ করা যাইবে। তারপর জল নামিয়া গেলে যে মড়কের আশঙ্কা আছে, ভগবান্ কেবল জানেন তখন কি হইবে।

অনাহারে মৃত্যু কি ভীষণ! যাহারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে আজই তাহাদের নিকট অন্ন প্রেরণ আবশ্যক। মুহূর্ত্ত বিলম্বে অধিক প্রাণহানি হইবে।

কলিকাতা সহরের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ করিয়া অনেকগুলি কেন্দ্র হইতে আমার স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ দিয়া সেবকগণের হাতে অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। তাহাদের নিকট অথবা সায়ান্স কলেজে আমার নিকট অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিবেন। এই কমিটি হইতে অন্য সমস্ত রিলিফ্ অনুষ্ঠানের সহিত একযোগে কর্ম্ম করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রেসিডেণ্ট, বঙ্গীয় রিলিফ্ কমিটি
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা।

—

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিরক্ষা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি-রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহারা সাধারণের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। আমরা আশা করি সকলে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া বঙ্গের এই প্রিয় কবির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দিবেন ও নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। সাহায্যের অর্থ পরিষদের সম্পাদকের নামে ২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিদেশ

মুদানিয়ার চুক্তিপত্র—

ইউরোপবিজয়ী তুর্কীকে বহুদিন হইতে ইউরোপ রুগ্ন মানুষ (sick man) বলিয়া অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। তাহার এই রুগ্ন অবস্থাকে চিরন্তন করিয়া রাখিবার জন্য ইউরোপ চারিদিক হইতে তাহার উপর চাপ দিতেও কসুর করে নাই। এতগুলি সতর্ক দৃষ্টির ভিতর হইতে এই রুগ্ন মানুষটি হঠাৎ কখন কেমন করিয়া সুস্থ সবল হইয়া উঠিল তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন; কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে রোগা তাহার আধিব্যাধি ঝাড়িয়া ফেলিয়া পুনঃস্বাস্থ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আজ তাহার শক্তির বহর দেখিয়া ইউরোপ বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

তুর্কির এই নব জাগরণকে যিনি এমন অদ্ভুত ও অতর্কিত ভাবে আনিয়া দিয়াছেন সেই মুস্তাফা কামাল পাশা গত গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধে অসাধারণ রাজনৈতিক দুরদর্শিতা এবং সামরিক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই কৃতিত্ব দেদীপ্যমান। কামালের সৈন্য সমাবেশে নিপুণতার পরিচয় অনেক যুদ্ধেই পাওয়া গিয়াছে। কখনো তিনি এমন ভাবে গোপনে গোপনে তাহার সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন যে গ্রীকেরা একটা যুদ্ধের পূর্ব্বে কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই যে কোন্ কেন্দ্রটি তাঁহার লক্ষ্যস্থল। আবার কখনো বা তিনি এমনই রুদ্রতেজে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন যে গ্রীকেরা বাধা দিবারও অবসর পায় নাই, তাহারা কোনোরূপে প্রাণ লইয়া পলাইয়া বাঁচিয়াছে। এমনি ভাবে একটির পর একটি করিয়া গ্রীক-অধিকৃত স্থানগুলি কামালের হস্তগত হইয়াছে।

কামালের এই জয় ইউরোপের ভিতর একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আরো একটা মহাযুদ্ধ প্রকাণ্ড আসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছিল। কিন্তু মুদানিয়ার বৈঠকে এই যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। এই মীমাংসার জন্য ফরাসী রাষ্ট্রশক্তিই বিশেষ ভাবে ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারা আগাগোড়া তুর্কের ন্যায্য দাবীর সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি যে পথ ধরিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা কামালকেই জব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তুর্কীকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য-সমাবেশ করিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। উপনিবেশগুলি হইতে সৈন্যের সাহায্য চাহিয়া নিজেদের সৈন্য জড় করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কেবল ফরাসীকে রাজি করিতে পারেন নাই বলিয়াই মিত্রশক্তি তুর্কীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করেন নাই। একথা বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

মুদানিয়ার চুক্তিপত্রে যে-সব সর্ত্ত পরিগৃহীত হইয়াছে তদনুসারে স্থির হইয়াছে ১৫ দিনের ভিতর গ্রীকেরা থ্রেস পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। অবশ্য যাহাতে গ্রীকদের থ্রেস ত্যাগ করিতে না হয় সে জন্য ভেনিজেলস্ চেষ্টা যথেষ্টই করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসী ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির কাছে দরবার করিতে ছাড়েন নাই। চতুর ভেনিজেলস্ আবার একটা বিরোধ বাধাইবারই চেষ্টায় ছিলেন। গ্রীকের শক্তি কামালের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নহে জানিয়াই তিনি যুদ্ধটা যাহাতে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের যুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় সেজন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মিত্রশক্তির কাছে তাঁহার কোন চালই টিকে নাই। ফরাসী শান্তির দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়ায় মিত্রশক্তিও শান্তির দিকে বিশেষ ভাবে ঝোঁক দিতেই বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপে ইউরোপ আবার একটা প্রকাণ্ড আসন্ন যুদ্ধের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

এই সন্ধি-ব্যাপারে তুর্কের বাহাদুরীও নিতান্ত কম নহে। এতগুলি যুদ্ধে এমন ভাবে জয় লাভের পরে জাতির চিত্ত সাধারণতঃ অধিকতর অধিকার লাভের জন্যই বেপরোয়া হইয়া উঠে। তখন তাহাকে সংযত করিয়া রাখা একান্তই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ফলে তাহার দাবীর মাত্রা বাড়িয়াই চলিতে থাকে এবং সন্ধি বা শান্তি প্রতিষ্ঠা সুদুর্লভ হইয়া পড়ে। তুর্কীদের এই অবস্থা হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ তাহাদের রাজ্যজয়-পিপাসার ইন্ধন যোগাইবার জন্য রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট রীতিমতই চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এখানেও কামালের দুরদর্শিতা তুর্কীকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কামাল পাশা একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন,—"I earnestly desire peace. Our demands remain the same after our recent victory as they were before. We ask for Asia Minor, Thrace up to river Maritza and Constantinople. We are prepared to give every security for the free passage of the Dardanelles which we undertake not to fortify" অর্থাৎ "আমি অন্তরের সহিত শান্তি কামনা করি। আমরা পূর্ব্বে যে দাবী করিয়াছিলাম বর্ত্তমান যুদ্ধজয়ের পরেও সেই দাবীই করিতেছি, দাবীর মাত্রা কিছুমাত্র বাড়াই নাই। আমরা এসিয়ামাইনর, মরিটজা নদীর তীর পর্য্যন্ত থ্রেস ও কনস্তান্তিনোপল চাই। দার্দ্দানেলিশ প্রণালী যাহাতে মুক্ত থাকে সেজন্য আমরা যে-কোন জামিন দিতে রাজি আছি এবং তাহা সুরক্ষিত করিব না এমন অঙ্গীকার করিতেও আমাদের আপত্তি নাই।" ইসমৎ বে দুই এক যায়গায় সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে আপত্তি করিলেও কামালপাশা তাহাতে জোর দেন নাই। ফলে আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট চুক্তিপত্রে সহি দিয়াছেন।

চুক্তিপত্রের সর্ত্ত হইতেছে এই, যে, গ্রীকেরা থ্রেস পরিত্যাগ করিয়া আসিলে মিত্রশক্তি একমাসের জন্য থ্রেসের ভার গ্রহণ করিবেন। একমাস পরে থ্রেস আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের হাতেই আসিবে। আঙ্গোরা বা গ্রীক গবর্মেণ্ট ইতিমধ্যে নিরপেক্ষ ভূমিতে কোনো সৈন্য পাঠাইতে পারিবেন না। থ্রেসেও আঙ্গোরা গবর্মেণ্টের সৈন্য প্রেরণের অধিকার থাকিবে না। তবে সেখানে তাঁহারা ৮০০০ সশস্ত্র পুলিশ পাঠাইতে পারিবেন—সে অধিকার তাঁহাদের আছে। নিরপেক্ষ অঞ্চল সম্বন্ধে

এখনও পাকাপাকি কোনোরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। এত সহজে সে ব্যবস্থা হইতেও পারে না। তাহা স্থির করিবার জন্য সম্ভবত এই মাসের শেষেই একটি কন্‌ফারেন্স বসিবে। সে কনফারেন্সে মিত্রশক্তির প্রত্যেকের একজন এবং আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন।

এই যুদ্ধের ফলে গ্রীকরাষ্ট্রশক্তির অন্তঃসারশূন্যতা তো প্রমাণিত হইয়াছেই, তাহা ছাড়া রাজ্যের ভিতর যথেষ্ট বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রীসের রাজা কনস্তান্তাইন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; গ্রীসের গবর্ণমেণ্টও পদত্যাগ করিয়াছে; কনস্তান্তাইনের স্থলে তাঁহার পুত্র কিং জর্জ্জ সম্মিলিত গ্রীক জাতির প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্বকালও বেশী দিন স্থায়ী হইবে না, শীঘ্রই সেখানে প্রজা-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং ইংলণ্ডেরও মন্ত্রী-পরিষৎ টলমল করিতেছে, —শীঘ্রই সেখানেও একটা ওলটপালট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

তুর্কীর এই জয় এসিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূচনা ও অন্যায়ের উপর ন্যায়ের বিজয় বলিয়া আমাদের ইহাতে আনন্দ।

গ্রীকদের অত্যাচার—

ইউরোপের শক্তিসঙ্ঘ বিশেষতঃ ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি একথা অনেকবার বলিয়াছেন যে, তুর্কীরা অতিমাত্রায় অত্যাচারী, তাহাদের নৃশংসতা অমানুষিক এবং অমুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাহাদের উৎপীড়ন অনবরত উদ্যত হইয়াই আছে। এই অজুহাত দেখাইয়াই তাঁহারা কারণে ও অকারণে তুর্কীর বিরুদ্ধে গ্রীসকে সাহায্য করিয়াছেন, এবং গ্রীসের বিরোধ নিজেদের ঘাড়ে তুলিয়া লইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু অত্যাচার যে কেবলমাত্র তুর্কীরাই করিতে জানে তাহা নহে। গ্রীকেরাও যে অত্যাচার করিতে জানে এবং তাহাদের অত্যাচারের কাছে তুর্কীদের অত্যাচারও যে হার মানিয়া যায় এবারকার যুদ্ধে তাহা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। অনেক খবরের কাগজেই গ্রীসের অত্যাচারের বিবরণ বাহির হইয়াছে। আমরা এখানে দুই একটি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকাতে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

"ইউশাকের পতনের পর গ্রীক সৈন্য আর যুদ্ধের দিকে মন দেয় নাই। তাহারা ধ্বংসের কাজেই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম পোড়াইয়া, সেতুসমূহ ধ্বংস করিয়া, পিছনে আর্ত্তের হাহাকার ধ্বনি জাগাইয়া তাহারা যেদিকে-সেদিকে কেবল পলায়নের পথ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। ইউশাককে তাহারা ধ্বংস করিয়াছে, আলাশেরকে ভগ্নস্তূপে পরিণত করিয়াছে, আইদিনকে অর্দ্ধধ্বংস অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে। ম্যাগনেশিয়ার উপরের পর্ব্বতচূড়া হইতে আমি নগরধ্বংসের ধূম্ররাশি দেখিয়াছি। সহরেই হোক আর গ্রামেই হোক গ্রীক সৈন্যের গতিপথে যাহা পড়িয়াছে তাহাতেই আগুনের রক্তজিহ্বা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্যাণ্ডারমা হইতে ব্রুসা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান, সমস্ত গ্রাম আজ চিতা-কুণ্ডে পরিণত। গ্রীকসৈন্য আনাটোলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে সত্য, কিন্তু পশ্চিম আনাটোলিয়ার কিছুমাত্র তাহারা অবশিষ্ট রাখিয়া আসে নাই, সমস্তই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া গিয়াছে। যখন আমি যুক্তরাজ্যের জাহাজে চড়িয়া কনস্তান্তিনোপল হইতে স্মার্ণায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সমস্ত স্মার্ণা সহর তখন ভয়ে এবং ভাবনায় অভিভূত। একটা অকথিত আশঙ্কায় সমস্ত লোক পলায়নের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের বিশৃঙ্খল গতিবিধিতে রাস্তা ঘাট অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। * * * একজন বিখ্যাত আমেরিকান আমার কাছে বলিয়াছেন, আইদিনে গ্রীকেরা অনেকগুলি মুসলমানকে এক মস্‌জিদে জমায়েৎ করিয়া তাহাদের উপরে প্রথমে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এবং অবশেষে তোপের দ্বারা মস্‌জিদ উড়াইয়া দিয়াছে। দূরতর গ্রাম হইতে আরো একটি সাংঘাতিক সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সংবাদটি হইতেছে এই,—সেখানে এক মস্‌জিদে আগুন লাগাইয়া গ্রীকেরা কতকগুলি রমণী ও শিশু হত্যা করিয়াছে।"

প্যারিসের "লা জুর্ণা" পত্র সংবাদ দিয়াছেন, জেনারেল পেলে ফরাসী গবর্মেণ্টকে তার যোগে জানাইয়াছেন, গ্রীকদের মতিগতি খুবই খারাপ, গ্রীকরা ইতিমধ্যেই থ্রেসের প্রায় ৫০ খানা গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে।

এমনি আরো বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায় যাহাতে গ্রীকদের পাশবিক অত্যাচারের নমুনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই অত্যাচারের দোহাই দিয়াই ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি তুর্কীর বিরুদ্ধে গ্রীসকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এবারও ইঁহারা তুর্কীর ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করিতে কসুর করেন নাই। কিন্তু সত্য এবার মিথ্যার কুহেলিকা ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই এশিয়ার বর্ব্বরতা এবার অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইয়াছে, এবং বর্ব্বরেরা যে বর্ব্বরতা করিতে পারে না সভ্য ইউরোপের পক্ষে যে তাহা অসম্ভব নয় গ্রীসের কার্য্যকলাপে তাহারই নমুনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

—

ভারতবর্ষ

ডাঃ মেহ্‌তার দান—

রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার ডাঃ প্রাণজীবন দাস মেহ্‌তা গুজরাট-বিদ্যাপীঠে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মিঃ পটেল এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মিঃ পটেল আশা করেন অক্টোবরের ভিতরেই দশ লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইবে। স্বরাজ জিনিষটা কি, কেন তাহার জন্য দেশ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, দেশের জন্য ত্যাগ করা কেন প্রয়োজন, দেশের লোক এক হইয়া উঠার সার্থকতা কোথায়, কেমন করিয়া এক হওয়া যায়, এই সব বুঝিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এ-সব দিকে নজর দেয় না। তাই সেখানে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহাতে দেশাত্মবোধ বিকাশের তেমন সাহায্য হয় না। জাতীয় বিদ্যালয়গুলি যদি এই ভার গ্রহণ করে তবে অনেক কাজ হইতে পারে। কিন্তু অর্থের অভাবে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা-কেন্দ্রের উপযোগী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ডাঃ মেহ্‌তার এই দানে গুজরাট বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে।

সূচীকার্য্য-সমিতি—

সম্প্রতি শিমলার বড়লাট ভবনে লেডি রেডিং সূচীকার্য্য সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় সমিতির কাজের যে-সব নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষভাবেই প্রশংসনীয়। প্রথম বৎসরেই তাঁহারা অনেকগুলি জিনিষ দিয়া ভারতের নানা হাসপাতালে সাহায্য করিয়াছেন। ৫৬ খানা কম্বল, ৮৬ খানা চাদর, ১০০টি বালিসের ওয়াড়, ১০০ খানি মুখ মোছার তোয়ালে; ইহা ছাড়া ফ্লানেলের সার্ট, কোর্ত্তা, টুপি ইত্যাদি আরো অনেক জিনিষ তাঁহাদের এই দানের ভিতর ছিল। এই সমস্ত দ্রব্য যাঁহারা তৈরী করিয়াছেন তাঁহাদের

ভিতর অনেক ভারত-মহিলাও আছেন। দেশের অভাব অসংখ্য। সুতরাং এ-সব প্রতিষ্ঠান দেশের ভিতর যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

সাহায্যাশ্রম—

শারীরিক অক্ষমতার দরুণ পরের দয়ার উপরে যাহাদের জীবনযাত্রার উপায় নির্ভর করে তাহাদের জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার নারায়ণ চন্দাবরকরের চেষ্টায় একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আশ্রমে স্থবির, অশক্ত, পীড়িত লোকদিগকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হয়। যাহারা কার্য্যক্ষম তাহারা যাহাতে কাজের অভাবে ভিক্ষা না করে এবং কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার দিকে নজর রাখিবার জন্যও একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চলিতেছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দুস্থ নরনারীর যে বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য বাংলাতেও এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে; কারণ বাংলাতে এরূপ নরনারীর কিছুমাত্র অভাব নাই।

রিসার্চ্ ফণ্ড্ এসোসিয়েশন্—

চা-বাগানের মজুরদের মধ্যে 'হুক্‌ওয়ার্ম্' রোগের প্রকোপ অধুনা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্ ফণ্ড্ এসোসিয়েশনের চেষ্টায় একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিটি দাক্ষিণাত্যের দুইটি চা-বাগানে তাঁহাদের পরীক্ষিত উপায় অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন। এই রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে দুইটি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ দুইটি ব্যবহার করিবার পর হইতে উক্ত বাগান দুইটির মজুরদের ভিতর মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। উক্ত এসোসিয়েশন ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্যও বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। লাহোর এবং নাগপুরকে এজন্য কার্য্যক্ষেত্র বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। বাংলার পক্ষে যে এটা বিশেষ ভাবেই সুসংবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাউণ্টেস্ ডাফ্‌রিন ফণ্ড—

কাউণ্টেস্ ডাফ্‌রিন ফণ্ডের ১৯২১ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই ফণ্ডটিকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি এই ফণ্ডের সাহায্যে অনেকগুলি বড় কাজ সাধিত হইয়াছে। এই ফণ্ডের পরিচালকেরা ডাক্তারী বিদ্যায় পারদর্শিনী মহিলাদের একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সঙ্ঘের মহিলারা গিয়া দেশের সর্ব্বত্র জেনানা হাস্‌পাতালের ভার গ্রহণ করিতেছেন। এই জেনানা হাস্‌পাতালে কেবলমাত্র রমণী এবং শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থাই বিশেষভাবে পরিগৃহীত হয় নাই, এই-সব স্থানে ভারতীয় রমণীদিগকে শুশ্রূষা-বিদ্যা এবং ধাত্রী-বিদ্যায় শিক্ষিত করিবার কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইঁহারা লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজে ছয় জন মহিলাকেও অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কলেজটি আগাগোড়া মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত এবং ইহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রেণীর ভারতীয় মহিলাদের পক্ষে ডাক্তারী ব্যবসা অবলম্বনের পথটাও খুলিয়া গিয়াছে। দুইটি মহিলা আগ্রার মহিলা মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। আর-একটি মহিলা লেডি চেম্‌স্‌ফোর্ডের মেটার্নিটি এণ্ড্ চাইল্ড্‌ওয়েলফেয়ার লিগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। সাতটি রমণীকে ইতিমধ্যেই উওম্যান্‌স্ মেডিক্যাল সার্ভিসের কার্য্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের নারীদের ভিতর সাধারণ স্বাস্থ্যজ্ঞানের যেরূপ অভাব এবং শিশুমৃত্যুর হার এখানে যেরূপ বেশী তাহাতে নারীদিগকে স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়া তোলা বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা তাহার সম্ভাবনা অনেকটা হইয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া ডাক্তারী বিদ্যায় শিক্ষিতা নারীদের উপযুক্ত বিশেষ কোনো পদও এদেশে এতদিন ছিল না। এই-সব ব্যবস্থার কল্যাণে তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে।

ইঞ্চ্‌কেপ কমিটি—

আগামী ৮ই নবেম্বর হইতে দিল্লীতে ইঞ্চ্‌কেপ কমিটি তাঁদের কাজ আরম্ভ করিবেন। কমিটি কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সভা-সমিতির মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন না, কেবলমাত্র লিখিত বিবরণ গ্রহণ করিবেন। কমিটি কেবলমাত্র ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সম্বন্ধেই আলোচনা করিবেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোনো ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহারা কোনোরূপ আলোচনা বা মন্তব্য প্রকাশ করিবেন না।

গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই সকলের আগে নজর পড়ে কর্ম্মচারীদের মাহিনার উপর। এই মাহিনার মোটা ভাগ গ্রহণ করেন এ দেশের সিভিলিয়ানেরা। সিভিলিয়ানদের মাহিনা বাড়াইবার জন্য সেদিন স্বয়ং লয়েড জর্জ্জ যে বক্তৃতা দিয়াছেন, এবং পার্লামেণ্টে এ সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা চলিয়াছে তাহাতে সিভিলিয়ানদের মাহিনা বাড়িবেই এবং তাহাদের সুখ-সুবিধার জন্য আরো কতকগুলি বেশী অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা হইবেই। ইঞ্চ্‌কেপ কমিটির তদন্তের ফলে ব্যয়ের সংক্ষেপ যে কিরূপ হইবে তাহার নমুনা এই ব্যাপারেই পাওয়া যায়। অবশ্য কমিটি তাঁহাদের রায়ে এ দিকে নজর দিবেন কি না তাহা এখনও বলা যায় না। দিলেও কর্ত্তৃপক্ষের ব্যস্ত হইবার কোনো হেতু নাই। কারণ তাঁহারা আগেই সাফাই গাহিয়া রাখিয়াছেন, ইঞ্চ্‌কেপ কমিটি কেবলমাত্র মন্তব্য প্রকাশেরই মালিক—তাহা গ্রহণ করা না-করার ভার থাকিবে সম্পূর্ণরূপেই সরকারের হাতে।

রেলওয়ের কর্ত্তৃত্বভার—

ভারতবর্ষের রেলওয়েসমূহ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত না গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসা উচিত। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে এড্‌ভাইসরী বোর্ড সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেসরকারী সভ্যদের ভিতর সাতজন মত দিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণের পক্ষে, আর চারিজন মত দিয়াছেন কোম্পানীর পক্ষে। সরকারী সভ্যেরা কোনো পক্ষেই মত প্রকাশ করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই রিপোর্ট সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবেন। সম্ভবতঃ নবেম্বর মাসেই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইবে।

রেলওয়ে কোম্পানীগুলি সমস্তই প্রায় বিদেশী বণিকের জিনিষ। বহুকোটি টাকা তাঁহারা পকেটস্থ করেন। সুতরাং সে টাকাগুলি দেশের ক্ষতি। গবর্মেণ্ট যদি ইহার কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন তবে এই দরিদ্র দেশ হইতে এতগুলি টাকা অনর্থক দেশের বাহিরে গমন করিবার অবকাশ পায় না। অন্যান্য অসুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই একটি মাত্র কারণেই রেলওয়ের কর্ত্তৃত্বভার গবর্মেণ্টের নিজের হাতে তুলিয়া লওয়া উচিত।

দেরাদুন সামরিক বিদ্যালয়—

গত বৎসর প্রিন্স অব ওয়েলস্ দেরাদুনে একটি সামরিক কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই কলেজে দেশের যুবকদিগকে এমন সমস্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে এদেশের ছাত্রেরা সৈন্য বিভাগের উচ্চপদসমূহের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে। এ দেশের সৈন্য-বিভাগের প্রধান দোষ এই যে [illegible]

বিদেশীদের দ্বারাই অধিকৃত। কোনো জাতির সেনানায়কের পদে যদি সেই জাতির লোক অধিষ্ঠিত না থাকে তবে জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, করিলেও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াই দাঁড়ায়। আমরা স্বাধীনতা ভোগ করিব এবং বিদেশীরা চিরদিন আমাদের হইয়া সংকট-মুহূর্ত্তে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিয়া লড়াই করিবে এ ব্যবস্থা যেমন লজ্জাকর তেমনি অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যবস্থা। সুতরাং স্বাধীনতা-লাভেচ্ছু জাতি মাত্রকেই সকলের আগে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া দরকার। সেইদিক দিয়া এই-সব সামরিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। এবার দেরাদুন কলেজের জন্য ছাত্র চাহিয়া পাঠানো হইয়াছিল। প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইয়া ৩৭ জন যুবক এই কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সামরিক কলেজের অধ্যক্ষ এই ছাত্রদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা গিয়াছে এই ৩৭ জন ছাত্রের ভিতর কেবলমাত্র তিন জন ছাত্র স্যাণ্ডহার্ষ্ট কলেজে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত। বাদ বাকী ছাত্রগুলি এরূপ যে তাহারা দুটি ইংরেজী শব্দ শুদ্ধ করিয়া একত্র করিয়া লিখিতে পারে না ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে তাহাদের কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, অঙ্কে তাহারা একেবারে দিগ্‌গজ পণ্ডিত। সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায় এমন যোগ্য এবং শিক্ষিত যুবকের বিশেষ অভাব আছে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না। তথাপি কেন এইসব ছাত্র মনোনীত হইল, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিবার অধিকার দেশবাসীর আছে। যাঁহারা এইসব ছাত্র মনোনীত করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাহিবেন দেশবাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এইটাই আশা করে। দেশের এত বড় স্বার্থটাকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের পেয়ারের লোককে খুসী করিতে যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের অপরাধও যে উপেক্ষার যোগ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

গুরুকাবাগ হাঙ্গামা—

গুরুকাবাগে গ্রেপ্তারের বহর বাড়িয়াই চলিয়াছে। বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দেওয়ার ব্যাপারটা বন্ধ হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮০০ আকালীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সুতরাং মেঘ যে এখনও বেশ জমাট হইয়াই আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গুরুকাবাগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা এবং তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ইঁহারা যে-সব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন তাহাদিগকে জেরা করিবার জন্য কমিটি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাহাতে স্বীকৃত হন-নাই। অজুহাত, এই কমিটি নাকি ইতিপূর্ব্বেই পুলিশের বিরুদ্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন। এবং তাঁহারা পুলিশ যে-সব অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে তাহার নিন্দা করিতেও কসুর করেন নাই। তাহা ছাড়া অকালীরা যেরূপ সংযত ভাবে এই-সব উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে তাহার জন্য কমিটি নাকি তাহাদিগকে প্রশংসাও করিয়াছেন।

কিন্তু এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, কংগ্রেস যদি সত্য সত্যই পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো ধারণা পোষণ করিয়াই থাকেন সেটা বাস্তবিকই অন্যায় হইয়াছে কি না। আমাদের বিশ্বাস দেশের লোকের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে যদি গবর্ণমেণ্টের সত্যকার কোনো দরদ থাকিত তবে এরূপ ধারণা খোদ গবর্ণমেণ্টও পোষণ না করিয়া পারিতেন না। কারণ এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব নাই—এবং তাঁহাদের ভিতর এমন প্রত্যক্ষদর্শীও যথেষ্ট আছেন যাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনোরূপই সন্দেহ করা চলে না।

তাহা ছাড়া, সত্য প্রকাশের পথ অনেকটা পুলিশের দ্বারাই বন্ধ হইয়াছে। 'অকালী' 'পরদেশী' 'প্রতাপ' 'বন্দেমাতরম্' 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' প্রভৃতি পত্রিকার কয়েকজন প্রতিনিধি ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইয়া সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু পথের মধ্যে পুলিশই তাঁহাদের বাধা দিয়া ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইতে দেয় নাই। অথচ এই-সব ভদ্রলোক ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে অনুমতি-পত্রও লইয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের মত লোককেও পুলিশ ঘটনা-স্থলে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

এই-সমস্ত ব্যাপারের পর কংগ্রেস যদি পুলিশের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন তবে তাহাকে অন্যায় বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। ন্যায়পর গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই-সব অন্যায়কে বাড়িয়া উঠিতে না দেওয়া।

এই বর্জ্জনের দ্বারা জন-সাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট তাহার চিরন্তন ধামা-চাপা-দেওয়া ব্যবস্থাটাকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

দিল্লীতে কন্‌ফারেন্স—

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীমতী বেশান্ত দিল্লীতে একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কন্‌ফারেন্সে কোনো দল-বিশেষের প্রাধান্য থাকিবে না।

ইঁহারা যে শাসন-পদ্ধতির প্রস্তাব করিবেন তাহাতে এই দাবীই পেশ করা হইবে যে—

(১) আমাদিগকে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রদান করা হউক।

(২) বৈদেশিক ব্যাপার, সেনা বিভাগ এবং নৌসেনা বিভাগের দায়িত্ব ছাড়া সপারিষদ গবর্ণরের হাতে যে-সমস্ত বিভাগ আছে তাহার দায়িত্ব মন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দিবার নীতি অবলম্বিত হউক। সেনা বিভাগ এবং নৌসেনা বিভাগের ভার কেবলমাত্র ততদিনই সপারিষদ গবর্ণরের হাতে থাকিবে যতদিন পর্য্যন্ত দেশ আত্মরক্ষার সম্যক্ শক্তি অর্জ্জন করিতে না পারিতেছে। বৈদেশিক ব্যাপার-গুলির ভার ইঁহারা ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজি আছেন। তবে এই কাউন্সিলে অন্যান্য উপনিবেশগুলির মত ভারতবর্ষকেও প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত যোশী রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। পয়সা দিয়া যাহাতে যাত্রীদিগকে ট্রেনে দাঁড়াইয়া যাইতে না হয়, তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ট্রেনে যাহাতে ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা থাকে, ওয়েটিং-রুমের অভাবে যাহাতে তাহারা কষ্ট না পায়, এইগুলিই ছিল মিঃ যোশীর প্রস্তাবিত বিষয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ভোটের জোরে প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইয়াছে। রেলের প্রধান লাভের পয়সা আসে এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরই ট্যাকের পয়সা হইতে। অথচ তাহারা যেরূপ অসুবিধা ভোগ করে সেরূপ আর কেহই করে না। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ঘোড়া গরু প্রভৃতি জীব অপেক্ষা বিশেষ উচ্চদরের জীব বলিয়া মনে করেন না। গাড়ীতে ৩০ জনের বেশী লোক ধরে না। সেখানেও ৯০ জনকে বস্তাবন্দীর মত রেলওয়ে-কর্ম্মচারীরাই গুদাম-

সালেঙ্গাহাট দাঙ্গায় আহত ব্যক্তিদের ছবি

জাত করিয়া থাকেন—ইহা প্রতিদিনের ঘটনা। ইহারা আরো অনেক অসুবিধা ভোগ করে। এ সমস্তর প্রতিকার হওয়া একান্ত ভাবেই আবশ্যক, এবং সমস্ত সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন করা উচিত।

'এন্টিবয়কট আইন'—

বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায় এন্টি-বয়কট আইন প্রচার করা হইয়াছে। এই আইনের অর্থ, রাজনৈতিক কারণে যদি কেহ কাহাকেও বয়কট করে তবে বয়কটকারীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। কাহার সঙ্গে মিশিতে হইবে, আর কাহাকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে তাহা মানুষের নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা, একান্ত ভাবেই ব্যক্তিগত জিনিষ। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাতেই হস্তক্ষেপ করা হয়। সে অধিকার গবর্ণমেন্টের আছে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ—

মালাবারের মোপলা হাঙ্গামার সময় হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছিল। মোপলারা হিন্দুদের বহু বাস-গৃহ দেবমন্দির প্রভৃতি পোড়াইয়া দেয় এবং অনেক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। এই-সব ধর্ম্মচ্যুত হিন্দুগণকে আবার স্বধর্ম্মে গ্রহণ করা যায় কি না তাহা লইয়া নানা রকমের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের তরফ হইতে যে-সব প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি বাহির হইয়াছে তাহার বহর বড় সহজ নহে। যে-সমস্ত দোষ নিজের নহে, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের এরূপ ব্যবস্থা করিলে তাহাতে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না, তাহাতে ধর্ম্মের অনুদার দিকটাই বড় হইয়া দেখা দেয়। উদারতার অভাবে সমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হিন্দু-সমাজও পড়িতেছে। হিন্দু-সমাজের লোক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রতিদিনই সংখ্যায় কম করিয়া তুলিতেছে। সে দিকে সমাজের দৃষ্টি নাই। ইহা সমাজের পক্ষে জীবনের লক্ষণ নহে। কিন্তু আর্য্য-সমাজ সঙ্কীর্ণতাকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা উদারতাকেই ভিত্তি করিয়া সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি এই আর্য্য-সমাজের চেষ্টায় মোপলাদের দ্বারা ধর্ম্মচ্যুত প্রায় দুই হাজার লোক পুনর্গৃহীত হইয়াছে।

দিল্লীতে রাজধানী—

দিল্লীতে রাজধানী নির্ম্মাণ ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। রাজধানী সম্পূর্ণ হইতে আরো কত অর্থ ও সময় লাগিবে 'কাউন্সিল অব্ ষ্টেটে' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে মিঃ বি এন্ শর্ম্মা বলিয়াছেন, নূতন রাজধানী সম্পূর্ণ করিতে ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। প্রতি বৎসর যথেষ্ট অর্থ পাওয়া গেলে ১৯২৬ সনেই রাজধানী সম্পূর্ণ হইবে। যে দেশে অর্থাভাবে শিক্ষাবিস্তার স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কাজগুলিই ধামাচাপা পড়িয়া থাকে, সে দেশে নূতন রাজধানীর গোড়া-পত্তন ও তাহার জন্য এই অসম্ভব ব্যয়—ইহা কেহই সমর্থন করিবেন না।

এইগুলিই দেশের লোকের সুখ-সুবিধার প্রতি বিদেশী রাজার বিদেশী আমলাদের দরদের নমুনা।

মিঃ মজহরল হকের মুক্তি—

বিহারের সুপ্রসিদ্ধ মিঃ মজহরল হকের অর্থদণ্ড হইয়াছিল। জরিমানা না দেওয়াতে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিয়াছেন ও তাঁহাকে জেল হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

কংগ্রেসে বিভীষণ—

গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের বোম্বাইয়ের "রাষ্ট্রসেবক" নামক সংবাদপত্রে একখানি চিঠি বাহির হইয়াছে। উক্ত চিঠিখানির লেখক নাকি কংগ্রেস কমিটির দুইজন সদস্য। ঐ চিঠিতে তাঁহারা এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ৬০ জন সদস্য অর্থাৎ মোট সদস্যের শতকরা ৪০ জনই সি-আই-ডি বিভাগের লোক। তাঁহারা বলিয়াছেন, আইন অমান্য কমিটির নিকট যে-সব সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইসব লোকের মারফতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বোম্বাই পুলিসের হস্তগত হইয়াছে।

—নবযুগ

আমীরের ঘোষণা—

আফগানীস্থানের আমীর মহোদয় তাঁহার হিন্দু প্রজাগণের প্রতি নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন :—

১। কোনও হিন্দুকেই বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইবে না।

২। প্রত্যেক হিন্দুই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। হিন্দুগণের মধ্যে বিরোধ, হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ীই নিষ্পত্তি করা হইবে।

৩। হিন্দু স্ত্রীলোকগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহারা রাজ্যের যে-কোনও স্থানে বাস করিতে পারেন।

৪। গো-হত্যা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল। কেহ মৃত গরুর মাংসও আহার করিতে পারিবে না।

৫। যে-সমস্ত হিন্দু-ধর্ম্মশালা জীর্ণদশাগ্রস্ত সেগুলি পুনঃ সংস্কার করা হইবে। হিন্দুগণ সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।

৬। হিন্দুরা আফগানিস্থানের যে-কোন অংশে জমাজমি ক্রয় ও অধিকার করিতে পারেন। মুসলমান যে পরিমাণ ট্যাক্স দেয়, হিন্দুগণকেও উহাই দিতে হইবে। হিন্দুগণকে কোন অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইবে না।

৭। যদি কোনও ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহার স্ত্রী বা স্বামীকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না।

৮। যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতা বর্ত্তমানে মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তাহার পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের দাবী করিতে পারিবে না। সে নিজে যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছে, কেবল উহারই মালিক হইবে।

৯। হিন্দুগণকে আফগানীস্থানে যাতায়াত করিতে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হইল।

১০। সরকারী চাকুরীগুলিও হিন্দু-মুসলমানের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত। তাঁহাদের দাবী সমানভাবে বিবেচনা করা হইবে।

১১। গভর্ণমেণ্ট মুসলমানগণের ন্যায় হিন্দু প্রজাগণের প্রতিও সমান দৃষ্টি রাখিবেন।

১২। হিন্দু প্রজাগণের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য জেলালাবাদ, গজনি ও কান্দাহার জিলার প্রত্যেকটি হইতে একজন বা দুইজন করিয়া হিন্দু প্রতিনিধি আমীরের ব্যবস্থা-পরিষদের জন্য নির্ব্বাচিত হইবে।

ঢাকা-প্রকাশ।

সলঙ্গা হাটের দাঙ্গা—

সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সলঙ্গা হাটে পুলিশ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইয়া বহু লোককে হত ও আহত করে, এ সংবাদ গত বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রবাসীর ৭০০ পৃষ্ঠায় আমরা দিয়াছিলাম। সম্প্রতি এক ভদ্রলোক সেই হাঙ্গামায় পুলিশের গুলিতে আহত প্রায় ৫০টি লোকের ফটোগ্রাফ আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতে দুইটি নির্ব্বাচন করিয়া আমরা ছাপিলাম।

—

বাংলা

উত্তরবঙ্গে ভীষণ জল-প্লাবন—

এই অভিশপ্ত দুর্ভাগা জাতি যে কেবল ব্যুরোক্রেসীর পীড়ন-পেষণে পিষ্ট হইতেছে, তাহা নহে। খোদার বজ্র-রোষও ইহার উপর আপতিত হইয়াছে। যে জাতির অন্তর হইতে মনুষ্যত্ব-বোধ লুপ্ত হইয়াছে, সে জাতি খোদাদত্ত জন্মগতস্বাধীনতা-স্পৃহাকে জবরদস্ত বিদেশীর পায়ের তলে জবাই করিয়া ফেলিয়াছে, খোদা তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না ত কি? তাই আজ উত্তরবঙ্গ জলে জলময়;—রাজ-সাহী-বগুড়া ডুবুডুবু। সর্ব্বনাশ যে কি হইয়াছে, তাহার চিত্র ত আঁকিয়া দেখানো যায় না,—স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের উত্তরাধিকারী হিন্দু! এমন করুণ চিত্র আর দেখিয়াছ কি? বিশ্ব-মানবতায় দীক্ষিত সন্তান মুসলমান! এ চিত্র তোমার মনুষ্যত্ব-বোধকে বিচলিত করে কি? যে দিকে চাও, সীমাহীন জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে, অসংখ্য বাড়ী ঘর ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে, গৃহাদির তৈজস-পত্র ও গৃহপালিত পশু পক্ষী আদি মৃত অবস্থায় দিগন্ত-প্রসারিত জল-রাশির উপর ভাসিয়া চলিয়াছে, গৃহবাসী স্ত্রীপুরুষগণ আপন আপন সন্তান সহ বৃক্ষ-শাখায় আশ্রয় লইয়া প্রকৃতির এই ভীষণ ধ্বংস-লীলা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে, আর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। এমন ভয়াবহ ও করুণ দৃশ্য কল্পনার চক্ষে দেখিয়া লইতে পারিয়াছ কি? বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান! তোমাদের এই বিপন্ন নিরাশ্রয় ভাইদিগকে বাঁচাইবার জন্য দিকে দিকে ছুটিয়া বাহির হও। তাহাদিগকে অনাহার মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সাধ্যমত অর্থ-সাহায্য প্রেরণ কর। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে। ইহাতে সমগ্রবাঙ্গালার প্রাণের সাড়া চাই; নতুবা এই ভাগ্য-তাড়িত জীবন-সংগ্রামে-বিপর্য্যস্ত অভাগাদিগকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

— মোহাম্মদী জগৎ

বন্যা-সাহায্য-ভাণ্ডার—

আজ উত্তরবঙ্গ হইতে বন্যা-পীড়িত হতভাগ্যদের যে আর্ত্তরোদন আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালীর

হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি, বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব-বোধ তাহা হইলে এখনো লুপ্ত হয় নাই। তাই আজ দেখিতেছি বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে দিকে দিকে সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইতেছে। সে সাহায্য-ভাণ্ডারে মুক্তহস্তে দান করিতেও বাঙ্গালী কার্পণ্য করিতেছে না। সে দিন এক বাঙ্গালী (তিনি নাম প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহেন) বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হস্তে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এ দানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুখ আছে।—এ দৃষ্টান্তে জাতির মনুষ্যত্ব উন্মেষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। চারিদিক হইতে যেরূপ সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বন্যা-পীড়িতদের অনেকটা সাহায্য হইবে বলিয়া আশা হয়। সাহায্য-ভাণ্ডার যতগুলি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের অনুষ্ঠাতাদের মধ্যে মুসলমান কাহাকেও এপর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইলাম না। আমরা বাঙ্গালী মুসলমানের এই কলঙ্ক স্খালনোদ্দেশ্যে 'মোহাম্মদী'র কর্ম্মকর্ত্তাগণের সহিত একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়াছি। এই অতিপ্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমরা সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে যথেষ্ট সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করি। বাঙ্গালী মুসলমান! এই সাহায্য-ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দান করিয়া মুসলমান সমাজের মুখ-রক্ষা কর। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা,—মৌলবী মোহাম্মদ সোলেমান খাঁ, ২৮ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মনিঃ কুপনে-'বন্যা-সাহায্য-ভাণ্ডারে দান' এই কয়েকটি কথা লিখিতে যেন ভুল না হয়। 'মোস্‌লেম জগৎ' ও 'মোহাম্মদী'তে টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

— মোস্‌লেম-জগৎ

ফরিদপুরে জলপ্লাবন—ফরিদপুর-মাদারীপুর অঞ্চলে ভীষণ বন্যার ফলে শস্যাদি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানে অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে গরু বাছুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু নাকি একটু শুষ্ক স্থানের অভাবে জলে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে পায়ে ঘা হইয়া মরিয়া যাইতেছে। বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্যের জন্য মাদারীপুরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণসহ একটি রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। ফরিদপুর জিলাবোর্ড এই বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্যের নিমিত্ত ৫০০্ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

—ঢাকা-গেজেট

দেশের অবস্থা—

বাঙ্গালার বহু স্থানেই অতিবৃষ্টির জন্য ধানের চাষ মাটী হয়ে গেছে। কোন কোন স্থানে এ পর্য্যন্তও ধানের অবস্থা ভাল, তবে শেষ রক্ষা হলেই মঙ্গল।

—বঙ্গরত্ন

শস্যকষ্ট—বরিশাল জেলায় প্রতি বৎসর মান-কচুর চাষে সুফল হইত। এবৎসর খন্দ ভাল না হওয়ায়, পূজার বাজারে যাহা-কিছু আসিয়াছে তাহার মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া উহা অনেকে ক্রয় করিতে পারে নাই। পরন্তু সুপারীর খন্দও এবার তথৈবচ।

—কাশীপুর-নিবাসী

পাটের আবাদ ও ফসল—

বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যায় এবৎসর ১,৫৫৫,৮০৬ একার জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা ৬২,৫৫২ একার অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এবৎসর উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৪,২৩৬,৮২৮ বস্তা অনুমান করা হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা ১৭১,৫১৯ বস্তা অধিক পাট এবার উৎপন্ন হইবে।

আবাদী জমির পরিমাণ।

	১৯২১ সনে একার	১৯২২ সনে একার	পার্থক্য একার
বঙ্গদেশ	১,৩২৯,১৯০	১,২১৮,৯০৮	১১০,২৮২
বিহার ও উড়িষ্যা	১০৮,৩৬৮	১৪৬,০৯৮	৩৭৭৩০
আসাম	৮০,৮০০	৯০,৮০০	১০,০০০
মোট	১,৫১৮,৩৫৮	১৪৫৫,৮০৬	৬২৫৫২

উৎপন্ন পাটের পরিমাণ।

	১৯২১ সনে বস্তা	১৯২২ সনে বস্তা	পার্থক্য বস্তা
বঙ্গদেশ	৩,৬০৫,৯৯১	৩,৫৭৭,৭৮৪	২৮,২০৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৩০৪,৯১৮	৩৯১,০৪৪	৮৬,১২৬
আসাম	১৫৪.৪০০	২৬৯,০০০	২১৩,৬০০
মোট	৪,০৬৫,৩০৯	৪,২৩৭,৮২৮	১৭১,৫১২

বৎসরের প্রথমভাগে বঙ্গদেশে বৃষ্টির অভাব হওয়াতে পাটের চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। জুলাই মাসে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের উচ্চ জমিতে নাবি আবাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। জুলাইমাসের শেষভাগে নদীর জল হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক নিম্নভূমির পাট নষ্ট হইয়াছে, কোন কোন স্থলে অসময়ে পাট কাটিতে হইয়াছে। আগষ্ট মাসের প্রথমভাগে পশ্চিম বঙ্গে অতিবৃষ্টি হয়। তাহাতে মুর্শিদাবাদ হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

—সঞ্জীবনী

বাঙ্গালীর আবাদ—

বাঙ্গালী নিতেই জানে, দিতেও জানে না, রাখ্‌তেও জানে না।

বাঙ্গালী চাষ করে, মাটীতে সার দেয় না। মাছ ধরে, পুকুরে ডিম ফেলে না। আর যখন ধর্‌তে আরম্ভ করে তখন ছোট বড় স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই মেরে বাজারে পাঠায়। ফলে বাঙ্গালীর জমী ক্রমশঃই অনুর্ব্বরা হয়ে পড়েছে, পুকুরে মাছ আর নেই বল্‌লেই চলে। দশবৎসর পূর্ব্বে সুন্দরবনে মাছ ও হরিণের অবধি ছিল না। কিন্তু ছোট বড় নির্ব্বিচারে মাছ ও হরিণ মেরে নষ্ট করে' অধিকাংশ স্থলেই এই দুইটি দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে।

—নবসঙ্ঘ

বাঙ্গালার ম্যাঞ্চেষ্টার—

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় আলগী নামক একটি গ্রাম আছে। অসহযোগ নীতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক তাঁতে কাপড় তৈয়ারী আরম্ভ করে। সম্প্রতি গ্রামে ৪০টি হেটারস্‌লি লুম ও অন্যান্য নানাপ্রকারের লুম সহ মোট ২৫০টি লুমে কাজ হইতেছে। একজন ব্রাহ্মণ, অবশিষ্ট হিন্দু প্রায় সকলেই এবং মুসলমান গৃহস্থ প্রায় সমুদয় তাঁতের কার্য্য গ্রহণ করিয়া সারাদিন উদ্যম ও উৎসাহে কাজ করিতেছে। গ্রামটি অতিক্রম করিতে কেবল খটাখট শব্দ ও আবালবৃদ্ধবনিতাকে তাঁত সংক্রান্ত কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত দেখা যায়। নানাপ্রকারের বসন ও মুসলমান স্ত্রীলোক-দিগের ব্যবহারযোগ্য সাড়ীই প্রধানতঃ তৈয়ার হয়। কেহ কেহ ৩০ ও ২৪ নম্বরের সুতায় ধুতি তৈয়ার করিয়া ৩৲ টাকা জোড়ায় বিক্রয় করিতেছে। প্রতি সপ্তাহে পাইকার আসিয়া সমুদয় কাপড় ও সাড়ী কিনিয়া লইয়া যায়; তাহাতে সাধারণ ঠক্‌ঠকী তাঁতেও প্রতি সপ্তাহে

৯।১০৲ লাভ হয়, আর হেটারস্‌লি লুম ব্যবহারকারীদের প্রথম প্রথম মাসিক ১৫০—২০০৲ টাকা আয় হইত, আর এখনও ১২৫৲ টাকার কম হইতেছে না। একজন মুসলমান গৃহস্থ সর্ব্বস্ব রেহান রাখিয়া ৮০০৲ মূল্যে একটি হেটারস্‌লি লুম কিনিয়াছিল ; ৮ মাস পরে সমুদয় ঋণ শোধ দিয়া ২৫০৲ টাকা লাভ করিয়া অপরের ক্রীত আর-একটি হেটারস্‌লি লুম ১,০০০৲ টাকায় ক্রয় করিয়া কাজ করিতেছে ; এখন আর তাহাকে টাকা কর্জ্জ করিতে হয় নাই। গ্রামের মাইনর স্কুলে একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক নানাপ্রকারের লুম গ্রামের লোককে আনাইয়া দিয়া এই এক বৎসরে প্রায় ৬০০৲—৭০০৲ টাকা কমিশন পাইয়াছেন। এই নগণ্য গ্রামটি এখন প্রায় ২০০০৲ টাকা মূল্যের নানাপ্রকারের কাপড় দৈনিক তৈয়ার করিতেছে। এইরূপ আর কোনও গ্রামে আছে কি না জানি না : কিন্তু এই গ্রামটিকে বাঙ্গালার মাঞ্চেষ্টার বলা চলে না কি ? এই গ্রামের একটু পশ্চিমে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এখন শুষ্কপ্রায়। ইহাতে যথেষ্ট ঝিনুক পাওয়া যায়। নদীর পশ্চিম তীরস্থিত বহু গ্রামের লোক কয়েক বৎসর হইতেই ঝিনুকের বোতাম তৈয়ার করিতেছে। তাহাদের উৎপন্ন বোতামের মূল্য প্রতি সপ্তাহে কয়েক সহস্র মুদ্রা। এই প্রকার একটা না একটা ব্যবসায় সকল গ্রামের লোকেই করিতে পারে। এইরূপে দেশের ঐশ্বর্য্য দেশেই রাখিতে পারা যায়। আলগী গ্রামের মুসলমান পাড়ার তাঁতের লাভ হইতে গ্রামিকেরা একটি পাকা ইন্দারা খনন করিয়াছে ; জল অতি উৎকৃষ্ট। টাকা যথেষ্ট হাতে আসিলে কিছু না কিছু ভাল কাজ হইবেই।

—সম্মিলনী

চরকার কথা—

পাঠশালায় নাকি গবর্ণমেণ্ট-শিক্ষাবিভাগ হতে চরকা কাটার কোথাও কোথাও বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভাল। এতদিনে যদি সুমতি হয়ে থাকে—সে মঙ্গলের কথা।

—বঙ্গরত্ন

পূজার বাজারে খদ্দর—

এবার পূজার বাজারে যথেষ্ট খদ্দর বিক্রয় হইতেছে। এখানকার প্রতিহাটে ৩০।৪০ হাজার টাকার খদ্দর ভিন্ন ভিন্ন জেলায় রপ্তানি হইতেছে। অবশ্য ইহার অধিকাংশই অর্দ্ধখদ্দর। যাহা হউক ইহাও মন্দের ভাল। তবে খদ্দরের এইরূপ কাট্‌তি দেখিয়া বিক্রেতাগণ খদ্দরের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যোগানের চেয়ে খদ্দরের চাহিদা বেশী। কাজেই খদ্দর তৈয়ারীর দিকে অধিকতর মনোযোগ প্রদান না করিলে এইরূপ আশাতিরিক্ত মূল্যে খদ্দর কিনিয়া লোকে পরিতে পারিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বিলাতি ও দেশী মিলের কাপড়ের দর বহুপরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। সেই অনুপাতে খদ্দরের দর না কমিলে খদ্দর প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট বাধা জন্মিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী

ঢাকায় পিকেটিং—

বিলাতি কাপড় বহিতে কুলিদের আপত্তি

ঢাকার ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পূজায় যাহাতে কেহ বিদেশী কাপড় ক্রয় না করে, সেজন্য সেখানে ভয়ানক পিকেটিং চলিয়াছে। কংগ্রেস ও খেলাফতের স্বেচ্ছাসেবকগণ অহোরাত্র কেবল যাহাতে কোন বিদেশী কাপড় সেখানে না যায়, সেজন্য পাহারা দিয়া বেড়াইয়াছে। পাঁচ দিন ধরিয়া এখানকার একজন বড় মহাজনের এক-নৌকা বিলাতি কাপড় ঘাটে পড়িয়া ছিল। কুলিরা কিছুতেই তাহা স্পর্শ করিতে চাহে নাই।

—হিন্দুস্থান

বিলাতি কাপড়—

বিলাতি কাপড় জোরদমে বাঙ্গালার বাজারে বিক্রয় হচ্ছে।

—নবসঙ্ঘ

চরকা—

বাঙ্গালী বেশী আর কেউ চরকা কাট্‌ছে না।

—নবসঙ্ঘ

কাপড়ের মূল্য—

এবার কাপড়ের মূল্য কমিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু আজিও আশানুরূপ কমে নাই। ভরসা কার্পাসের চাষের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য কমিবে।

—কাশীপুর-নিবাসী

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ গত জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে ৭৬৮৫৭৯৷৷১১ পাই সর্ব্ববিধ ব্যয় ও ট্যাক্স বাদে নীট মুনাফা পাইয়াছে। আশা করি ডিরেক্টরগণ কাপড়ের মূল্য কমাইয়া দেশের হিতসাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

—হিন্দুরঞ্জিকা

দেশীয় লোকের কল—

বঙ্গদেশে তিপ্পান্নটি পাটের কল আছে। তাহার মধ্যে দুইটি মাড়োয়ারীর, বাকী সব ইংরেজদের। মাড়োয়ারীদের মূলধন তিয়াত্তর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা, ইংরেজদের মূলধন সতর কোটি একষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা। বঙ্গদেশে তেরটি কাপড়ের কল আছে। তাহার মধ্যে দুইটি বাঙ্গালীর, তিনটি মাড়োয়ারীর, আটটি ইংরেজের। বাঙ্গালীর মূলধন তেত্রিশ লক্ষ টাকা ; মাড়োয়ারীর একটি কলের মূলধন আশী লক্ষ টাকা, বাকী মূলধন অজ্ঞাত : ইংরেজের ছয়টা কলের মূলধন এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা।

—সম্মিলনী

দুধ ও ঘি—

কলিকাতার হাসপাতালে যে দুধ ও ঘি রোগীদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, গবর্ণমেণ্টের কেমিকেল এক্‌জামিনার তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতার হাসপাতালসমূহ হইতে পরীক্ষার জন্য ১৮ বার দুধ প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১২ বারের দুধই ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ১৭ বার ঘি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহার ৮ রকম ঘি ভেজাল বলিয়া জানা গিয়াছে। হাসপাতালের দুধ ও ঘির দশা যখন এইরূপ, তখন বাজারে যাহা বিক্রয় হয় তাহা যে লোকের স্বাস্থ্য কিরূপ নষ্ট করিতেছে, তাহার বর্ণনা করা প্রয়োজন নাই। কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা না করিলে ভেজাল বন্ধ করা যাইবে না। যে-সকল স্বাস্থ্য-রক্ষকের এলাকায় ভেজাল দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে বরখাস্ত করা হইবে, এইরূপ কোন ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

—সঞ্জীবনী

শিশুমৃত্যু—

কলিকাতায় যত শিশু জন্মে তাহাদের এক বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই হাজারকরা ৩০০।৪০০ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বোম্বায়ের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর, তথায় হাজারকরা ৭০০ শিশুর মৃত্যু হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে হাজারকরা শিশুর মধ্যে ৮০ জনের বেশী মরে না। অজ্ঞতা ও কতক পরিমাণে দরিদ্রতাই এদেশের শিশুহত্যার এক কারণ। দেশ হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে উহা দূর করিতে

না পারিলে কিছুতেই দেশের কোন কল্যাণের আশা করা যায় না।

—সম্মিলনী

বাঙ্গলায় ডাকাতি—

এক সপ্তাহে ১৭টি।

২রা তারিখে যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙ্গলায় ১৭টি ডাকাতী হইয়াছে। ইহার মধ্যে মেদিনীপুর নদীয়া রাজসাহী বাখরগঞ্জ এবং ঢাকায় প্রত্যেক স্থানে একটি করিয়া; ২৪ পরগণা পাবনায় দুটি করিয়া; এবং বর্দ্ধমান ও রংপুরে পাচটি করিয়া ডাকাতী হইয়াছে।

গত মাসে মোট ৫৫টি ডাকাতী হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে মাসে হইয়াছে ৫২টি এবং গত বৎসর এই মাসে হইয়াছে ৫১টি।

—মোস্‌লেম-জগৎ

দেশলাইর নূতন কারখানা—

১৯০৫ সনে ৬০ লক্ষ টাকার দিয়াশলাই ভারতে আম্‌দানি হইয়াছিল। এই আম্‌দানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া গত বৎসর প্রায় ৩ কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। বহুদিন হইতে এই দেশে দিয়াশালাইর কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। উপযুক্ত কাঠ এবং এই দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী মশলার অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৯০৭ সনে সার রাসবিহারী ঘোষ ও বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একটি কারখানা স্থাপন করেন। সেই কারখানায় ভারতবর্ষের যাবতীয় কাঠের এবং মাল মশলা প্রভৃতির রীতিমত পরীক্ষা হয়। দার্জ্জিলিঙ্গ এবং সুন্দরবনে দিয়াশলাইর কাঠি ও বাক্সের উপযোগী দুই রকম কাঠ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন সিমুল ও কদম প্রভৃতি আরও ২১ রকম কাঠ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়া উল্লেখযোগ্য নহে। উপরোক্ত দুই জাতীয় কাঠে যে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। ঐ-সমস্ত দিয়াশলাই সুইডেন প্রভৃতি দেশের দিয়াশলাই অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। ঐ দিয়াশলাই এবং ঐ কারখানার পরিচালক মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায়।

দুঃখের বিষয় উপরোক্ত কারখানা কলিকাতায় স্থাপিত হওয়ায় আবশ্যকমত এবং স্বল্প ব্যয়ে কাঠের সরবরাহ করিতে পারা যায় নাই। এই-সমস্ত অভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া এবং ঐ কারখানার কর্ম্মী মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায়কে নিযুক্ত করিয়া "সুন্দরবন ম্যাচ্ ওয়ার্ক্‌স্" নামে একটি কারখানা খুলনায় স্থাপিত হইয়াছে। সুন্দরবনে যে কাঠ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রায় কোটী টাকার দিয়াশলাই প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইতে পারে। এবং প্রায় লক্ষ লোক নানাভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে। এই-সমস্ত কল-কারখানার জন্য শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বহু যুবকের আবশ্যক। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর যুবকের অভাব নাই। আমরা ইহার মঙ্গল কামনা করি।

—সঞ্জীবনী

ঢেঁকির উন্নতি—

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি চির-উপেক্ষিত ঢেঁকির উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে ছয়টি ঢেঁকির কার্য্য একই সময়ে একটি গরুর সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং ইচ্ছামত মুষলের আঘাত মৃদু বা গুরু করিতে পারা যায়। ৮৬ এ নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোডে সরকার মহাশয়ের কারখানাতে এই ঢেঁকি চলিতেছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী এই ঢেঁকির সাহায্যে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন কি?

—সম্মিলনী

বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়—

১৯২০-২১ সনে বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৩৫৬৯৫ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩০৭০টি উচ্চ প্রাইমারী ও ৩২৬২৫ নিম্ন প্রাইমারী। পূর্ব্ব বৎসর হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬১ হ্রাস পাইয়াছে।

—সম্মিলনী

খনি-বিদ্যালয়—

বাঙ্গলাগবর্ণমেণ্ট এই মাস হইতে রাণীগঞ্জ, ও সীতারামপুরে খনিবিদ্যা শিক্ষাদানের আয়োজন করিয়াছেন। ছাত্রদের ৩ বৎসর পাঠ করিতে হইবে। ১০০০ হইতে ১২০০ টাকার এক জন এবং ১৫০ হইতে ২৫০ টাকার ২ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে।

—সঞ্জীবনী

হাইস্কুলে মাতৃভাষা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, হাইস্কুলে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করিতে হইবে। মুসলমানেরা মনে করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে। তাই এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে তাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন। মৌলবী ফজলল হক প্রভৃতি মুসলমান প্রধানগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতায় এক মুসলমান কলেজ স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

মুসলমানেরা সকল বিষয়েই যদি হিন্দু হইতে পৃথক্ হন, তবে এক হইবেন কিরূপে? হিন্দু মুসলমান এক কলেজে যদি পাঠ করেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য হইতে পারে। যদি বিদ্যা-মন্দিরেও তাঁহারা একত্র উপবেশন করিবার সুবিধা না পান, তবে মুসলমান চিরদিনই পর হইয়া থাকিবেন।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে যদি তাঁহাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাঁহারা তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করুন, কিন্তু পৃথক কলেজ স্থাপনের চেষ্টা যেন না করেন।

—সঞ্জীবনী

রেলযাত্রীর আশার কথা—

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট রেলকোম্পানী-সমূহকে অধিক সংখ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন; পাঁচ বৎসরের মধ্যে সকল রেলকোম্পানীকেই যাত্রী-সংখ্যার অনুপাতে গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

—সম্মিলনী

স্ত্রী যাত্রীর অসুবিধা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্থানাভাব দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মহিলাযাত্রীদিগের অসুবিধার প্রতিকারে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই। আমরা একাধিকবার বলিয়াছি যে গাড়ীতে স্ত্রীলোকদিগের নির্দ্দিষ্ট কক্ষ কোথায় থাকে, তাহা নিরক্ষর পুরুষ বা স্ত্রীলোক ও

দূরের কথা, যাঁহারা প্রত্যহ ট্রেনে যাতায়াত করেন তাঁহারাও অনেক সময় সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন না। স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীর দরজায় ইংরেজীতে "স্ত্রীলোকদিগের জন্য" এই কথা লিখিত থাকে। অনেক সময় তাহা দেখিতে না পাইয়া, অথবা দেখিতে পাইলেও ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহার অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীতে উঠিয়া থাকে। বিশেষতঃ রাত্রিকালে ষ্টেশনের অস্পষ্ট আলোকে সে লেখা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা একাধিকবার অনুরোধ করিয়াছিলাম যে স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীর বর্ণ অন্য গাড়ীর বর্ণ হইতে পৃথক করিয়া দিলে ভাল হইত। ইহাতে ব্যয়বাহুল্য নাই অথচ একটা অসুবিধার প্রতিকার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবে কর্ণপাত করা রেল-কোম্পানি আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই।

—রঙ্গপুর-দর্পণ

প্রেসিডেন্সি জেলে আবার বিদ্রোহ—

গত ১লা অক্টোবর তারিখে বেলা ৭টার সময় প্রেসিডেন্সি জেলে কয়েদীদের আবার একটা বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রায় ২০০ কয়েদী বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। রক্ষীরা গুলি ছাড়িতে বাধ্য হয়। দুইজন কয়েদী আহত হইয়াছে। হাসপাতালে একজন কয়েদী-রোগীর সহিত ছোট ডাক্তারের মনোমালিন্য হয়। এই কয়েদীটি নাকি প্রায় ২০০ কয়েদীর সর্দ্দার। প্রকাশ উক্ত সর্দ্দার পূর্ব্ব রাত্রে ছোট ডাক্তারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সকালে যখন কয়েদীদিগকে বাহিরে আনা হইল তখন তাহারা জেলের হাসপাতালের দিকে ছুটিল। এই সময় বড় ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ভয়ে একটি কামরায় পলাইলেন। কয়েদীরা ডাক্তারকে না দেখিয়া সর্দ্দারকে লইয়া জেলের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর তাহারা নাকি ইট লৌহশলাকাদি ছুড়িতে থাকে এবং কয়েকজন পলাইতে চেষ্টা করে। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া গুলি ছোড়া হয়। ফলে দুইজন গুলিতে আহত হইয়াছে। লালবাজার পুলিশ বিভাগে তখনই টেলিফোন করা হয়। একজন শ্বেতাঙ্গ ডেপুটি কমিশনার অনেক পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কয়েদীরা উত্তেজিত হইয়া পুলিশের দিকে ধাবমান হয় এবং একটি কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করে। উহা ডেপুটী কমিশনারের মাথায় লাগে। ইহার পর গুলি বন্ধ করা হয় এবং কয়েদীদিগকে নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে বাধ্য করা হয়। আর কোন গোলযোগ হয় নাই। সকলেই শান্ত হইয়াছে।

—মোহাম্মদী

রাজনৈতিক বন্দীদিগের লিষ্টি—

ত্রিপুরা-হিতৈষীতে প্রকাশ;—বাঙ্গালা দেশ হইতে ৭৯৮৭ জন অসহযোগী জেল খাটিয়াছেন। তন্মধ্যে কলিকাতায় ৫৬০০, চট্টগ্রামে ৫৪৮, রংপুরে ৪৯৪, বরিশালে ৩৭২, ফরিদপুরে ৩২৫, ময়মনসিংহে ২৫০, ঢাকায় ১৯২, বর্দ্ধমানে ৯৮, দার্জ্জিলিং সহরে ৮৩, ত্রিপুরায় ৭২, নদীয়ায় ৫০, পাবনায় ৩০, খুলনায় ২৫, শ্রীহট্টে ১৯, রাজসাহীতে ১৪, যশোহরে ৮ জন।

—কাশীপুর-নিবাসী

ছাত্রের নির্ব্বেদ—

সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রকাশ যে, গত ১২ই সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে একটি ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, পীর বাদশা মিঞা ও ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কারামুক্ত হইবার পর কুষ্টিয়া গমন করেন এবং তাঁহাদের গমনের দিনে স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র স্কুলে উপস্থিত না হইয়া নেতৃদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে গমন করে। এই অপরাধের জন্যই স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে প্রত্যেককে ।০ হিসাবে জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ একত্র হইয়া জরিমানা না দিয়া একটা ধর্ম্মঘট করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু যখন অধিকাংশ ছাত্রই তাহাদের জরিমানার পয়সা দিয়া দেয়, তখন কয়েকটি বালক হতাশ হইয়া আত্মহত্যার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। একটি বালক স্কুল-সংলগ্ন পুষ্করিণীতে ঝম্প প্রদান করিয়া ডুবিয়া যায়। আর-একটি বালক ছাত্রাবাসের একটি নির্জ্জন কক্ষে উদ্বন্ধন গ্রহণ করে এবং অপর আর-একটি বালক ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। যে বালকটি ডুবিয়া গিয়াছিল তাহাকে কয়েক মিনিট পরে জল হইতে অচেতন অবস্থায় তোলা হয় দ্বিতীয় বালকটির প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে বন্ধনরজ্জু হইতে মুক্ত করা হয়। সুখের বিষয় তৃতীয় বালকটি শরীরে ছুরিকাঘাত করিবার অবসর পায় নাই। জলে ডুবা বালকটি এখনও ভালভাবে সুস্থ হয় নাই। পুলিশ ও সি আই ডি ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

—বীরভূমবার্ত্তা

ঘোড়দৌড় খেলার পরিণাম—

কলিকাতায় বৌবাজারের শ্রীমন্ত দের লেনস্থ ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক কার্ত্তিকচন্দ্র সেন চাকুরী-লব্ধ অর্থে সংসারের খরচ কুলাইত না বলিয়া ঘোড়দৌড়ে গিয়া বাজী ধরিত। রেসে অনেক টাকা হারিয়া গিয়া সে আর তাহার ১৬ বৎসর বয়স্কা পত্নী প্রভাবতী দুইজনে একসঙ্গে কেরোসিন তৈলে সিক্ত কাপড়ে অগ্নি সংযোগে আত্মহত্যা করিয়াছে।

—এডুকেশন-গেজেট

কুকুরের উপর ট্যাক্স—

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কুকুরের উপর ট্যাক্সের বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। ঠিক হইয়াছে, কর্পোরেশন ৫৲ টাকার অনধিক ট্যাক্স বসাইতে পারিবেন? যে-সকল কুকুরের ট্যাক্স আদায় হইবে না সেই-সকল কুকুরকে হয় বিক্রয় না হয় মারিয়া ফেলা হইবে।

—সম্মিলনী

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন—

ডায়মণ্ড হারবার লোকাল বোর্ড হইতে এবার পাইকপাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয়কে জেলা বোর্ডের একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। সম্প্রতি রাজা বাহাদুর সভ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন জন্য ডায়মণ্ডহারবারে গিয়া সভ্যগণকে কলিকাতা হইতে আনীত উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজনে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও মুসলমান সভ্যগণ পরস্পর পাশাপাশি ভাবে বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। দুই একজন অবশ্য বাদ ছিলেন। আজকাল এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের যুগে তাঁহাদের এই সৎসাহসের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—সম্মিলনী

সেবা-সমিতি—

নোয়াখালীতে সেবা-সমিতি (Nursing Association) নামে একটি সমিতি আজ অনেকদিন হইল সংগঠিত হইয়াছে। ইহারা রুগ্ন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে, তাহা অনেকেরই অবিদিত নহে। আমরা অনেক সময় এই যুবক সম্প্রদায়কে কলেরা নিমনিয়া, টাইফয়েড্ প্রভৃতি

অতিগুরুতর-রোগাক্রান্ত রোগীর সেবায় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। বর্ত্তমান সময় এই সমিতি আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র অসহায় রোগীদিগের পথ্য ঔষধ প্রভৃতির সাহায্য করিতেছে এবং অনেক মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্ম অর্থ সাহায্যও করিতেছে। এই সমিতির দীর্ঘ জীবন ও স্থায়িত্ব রাখার জন্ম প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিরই কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা আবশ্যক। আমরা এই সমিতির স্থায়িত্ব কামনা করি।

—নোয়াখালি-সম্মিলনী

গোরক্ষা প্রবন্ধের পুরস্কার—

১৭১ক নং হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা ঠিকানায় একটি গোরক্ষিণী সমিতি আছে। এই সমিতি হইতে "ভারতে গোহত্যা ও তাহার নিবারণের উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ"—বিষয়ে দুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্ম যথাক্রমে ১৫০্ ও ১০০্ পুরস্কার দেওয়া হইবে। ভারতবাসী যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। প্রবন্ধ সমিতির সম্পাদকের নিকট ১৩২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছান চাই।

মোহাম্মদী

দীর্ঘ সন্তরণের প্রতিযোগিতা—

ইতিপূর্ব্বে একবার খড়দহ হইতে কলিকাতার আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ১৪ মাইল পথ গঙ্গায় সন্তরণের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল; আবার ১৭ই সেপ্টেম্বর চন্দননগর হইতে আহীরিটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ২২ মাইল পথ সন্তরণের প্রতিযোগিতা হইয়া গেল। ইহাতে ষোল জন যুবক ছিলেন। বেলা ১৷৷০ টার সময় চন্দননগর ঘাট হইতে ১৬ জন সন্তরণকারী সন্তরণ আরম্ভ করেন। কলিকাতার কয়েকটি ক্লাবের ১৩ জন সভ্য ব্যতীত নাটোর কাশী ও বরিশাল হইতে ৩ জন সভ্য আসিয়াছিলেন। সন্তরণ একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম; গত বারের প্রতিযোগিতায় কোনও মুসলমানের অস্তিত্ব ছিল না, এবারেও নাই। মুসলমানগণ সকল দিকেই পশ্চাৎপদ। এ জাতির কবে চৈতন্যোদয় হইবে? খড়দহ হইতে আহিরীটোলা পর্য্যন্ত যে সন্তরণের প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল, গত পূর্ব্ব শনিবার দিন আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাব তাঁহাদের পুরস্কারাদি দিয়াছেন। বাবু আশুতোষ দত্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া শীল্ড ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য যুবকগণও যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়াছেন। এই সন্তরণপ্রতিযোগিতা একটি ভাল কাজ। দিন দিন এ বিষয়ের উৎকর্ষ বিধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবারকার প্রতিযোগিতায় কয়েকটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।—নবযুগ

সন্তরণ প্রতিযোগিতার বিপত্তি—

চন্দননগর হইতে কলিকাতা আহিরীটোলা পর্য্যন্ত বাইশ মাইল পথ ভাগীরথীর উপর দিয়া সন্তরণে আসিবার জন্ম গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ভীষণ প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় ১৪ জন যোগ দিয়াছিল, তন্মধ্যে চারি জন সফল হয়; অবশিষ্ট দশজন নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হয় নাই। সফলকাম সন্তরণকারীদিগকে দেখিবার জন্ম আহিরীটোলা ঘাটের নিকটস্থ একটি জেটীতে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। ফলে, জেটীটি ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া যায় এবং দুই জন হত ও তিনজন গুরুতররূপে আহত হয়। আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। সন্তরণকারীদের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক মোটরলঞ্চে আসিতেছিল। শ্যামনগরের নিকট একখানি মোটরলঞ্চ ডুবিয়া যায়। দাঁড়িমাঝি ও যাত্রীগণ সকলেই নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিল। জীবন-রক্ষিণী সমিতির লোকেরা সকলকেই উদ্ধার করেন, কিন্তু ডাঃ এন সি চট্টোপাধ্যায়ের কোন সন্ধান তাঁহারা পান নাই। দুই দিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিবার পর অবশেষে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী চাঁপদানি পাটকলের জেটীতে তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দিনই বেলা নয়টার সময় কলিকাতায় সংবাদ পৌঁছে। ডাঃ এন সি চট্টোপাধ্যায়ের আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণ তৎক্ষণাৎ তথায় যান এবং নৌকায় করিয়া তাঁহার মৃতদেহ জগন্নাথঘাটে লইয়া আসেন। তাঁহার মৃতদেহ দেখিবার জন্ম জগন্নাথঘাটে খুব ভিড় হইয়াছিল। তৎপরে মৃতদেহ তথা হইতে নিমতলা ঘাটে লইয়া আসিয়া দাহ করা হয়। ডাঃ এন সি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার, তিনি বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজের প্রফেসার ছিলেন।

—বীরভূমবার্ত্তা

এই সন্তরণ প্রতিযোগিতার বিচারে অত্যন্ত অন্যায় বা ভুল হইয়াছে। সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম ঘাটে আসিয়া পৌঁছেন। উদ্যোগকারীদের পক্ষের ও তাঁহাদের নিযুক্ত প্রহরী জীবনরক্ষক (লাইফ্-সেভার) ও অম্‌ব্যুলান্স এবং বহু বিশিষ্ট বিশ্বাসী ভদ্রলোক তাহার সাক্ষী আছেন। তথাপি সতীশ-বাবুর নাম বিজেতাদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া ত নহেই, এমন কি যাঁহারা সমস্ত ২২ মাইল পথ সাঁতার দিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম বলিয়াও সতীশ-বাবুর নাম উল্লেখ না করিয়া অপর চার জনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্যোগকারী লাইভ-সেভিং সোসাইটীকে বারম্বার চিঠি লিখিয়াও কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

হাঁটার প্রতিযোগিতা—

গত রবিবার ১০ মাইল হাঁটার প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। এস, সি, দত্ত (মোহন বাগান) ১ ঘণ্টা ২৩ মিনিটে, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য (লাইফ সেভিং সোসাইটি) ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিটে, রাধানাথ চন্দ্র (সরস্বতী ক্লাব) ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে, প্রবোধরঞ্জন দাসচৌধুরী ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে ১০ মাইল হাঁটিয়া গিয়াছেন।

—সঞ্জীবনী

দান—

মেদিনীপুর জেলার সাধকনগর-নিবাসী বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মিশ্র মহোদয় পাশকুড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ফণ্ডে ৩২০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে তাহাকে এই টাকার সুদ হইতে মাসিক ৮্ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন স্কুলে তিনি মাসিক চাঁদা প্রদান করেন এবং পুরস্কার বিতরণ ও বালকগণের ব্যায়াম প্রদর্শন উপলক্ষে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ভবিষ্যতে বিদ্যালয় ও লাইব্রেরীর উন্নতি কল্পে অর্থ ও পুস্তক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার এই দানের জন্ম স্কুল কমিটির সকলেই কৃতজ্ঞ।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী

দেশ-সেবকদের সাহায্য—

আমেরিকা-প্রবাসী সুযোগ্য ভারত-সন্তানগণ রাজনৈতিক বন্দীগণের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বন্দীগণের পারিবারিক সাহায্যের নিমিত্ত দেশবন্ধুর নিকট ১০০০ ডলার (প্রায় ৪০০০্ হাজার টাকা) প্রেরণ করিয়াছেন।

—দেশের বাণী

লক্ষ্যবেধ

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
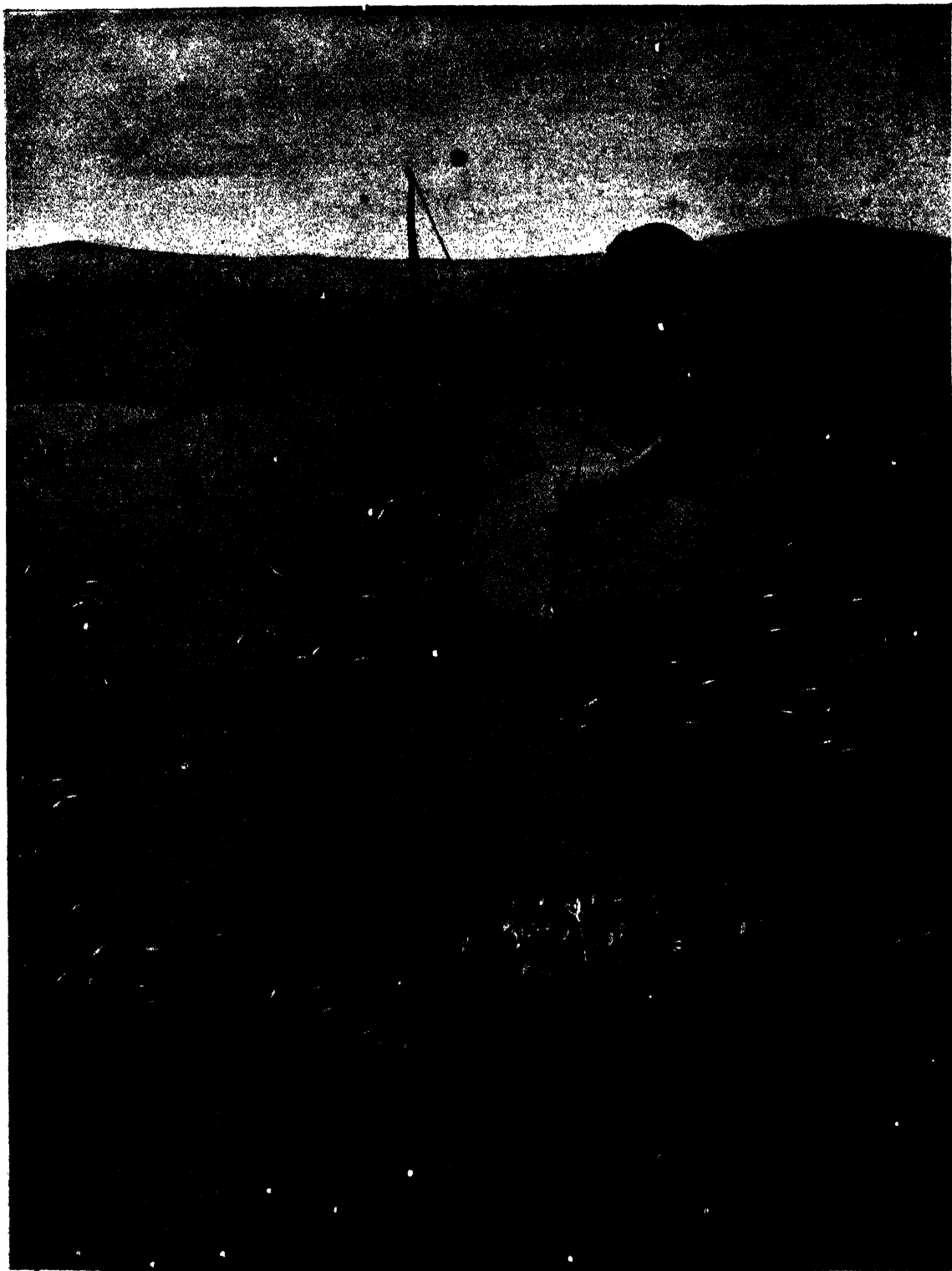
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২২শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

২য় সংখ্যা

বগধ জাতি

বঙ্গ, বগধ ও চেরো—এই তিনটি জাতির নাম ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) আছে। এই তিনটি জাতির কথা আরণ্যকের পূর্ব্বে কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

'তিস্র হ প্রজা অত্যায়মীয়ুঃ' ঋগ্বেদের[১] (৮।১০১।১৪) এই মন্ত্রপাদের ব্যাখ্যায় ঐতরেয় আরণ্যক এই তিনটি জাতির কথা উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে বঙ্গ, বগধ, চেরপাদ, এই তিনটি নাম আছে, সেইখানকার ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ আছে। আরণ্যকের সময় এখনও কেহ যুক্তি দিয়া স্থির করিতে পারেন নাই; তবে ইয়ুরোপীয়গণ তাঁহাদের অনুমান-বলে ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলির কাল ৮০০ হইতে ৬০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আর আরণ্যক যখন ব্রাহ্মণের অংশ-বিশেষ, তখন ঐতরেয় আরণ্যকও ইঁহাদের মতে ঐ সময়ের গ্রন্থ হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে সায়ণাচার্য্য ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্য প্রণয়ন করেন; তারপর আনন্দ-তীর্থ তাহার টীকা লেখেন। সায়ণের ভাষ্যের সঙ্গে টীকাকারের অর্থের ঐক্য নাই। সায়ণের ভাষ্য খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অতি সাবধানতার সহিত লিখিত হইলেও মূলগ্রন্থ রচনার (ইয়ুরোপীয় মতে) অন্ততঃ ২৫০০ বৎসরেরও অধিক পরে ভাষ্য রচনা করিতে হওয়ায় কোন কোন স্থানে প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কত জিনিস ভুলিয়া যাওয়া যায়, কত জিনিস মাথায় আসে না। এরূপ ক্ষেত্রে স্বরূপ অর্থনির্ণয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে বিচার-পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

ঋগ্বেদের পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রের প্রথম পাদের ব্যাখ্যায় ঐতরেয় আরণ্যক উপদেশ করিতেছেন,—

"প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের-পাদাঃ"—২।১।১।

'তানি ইমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ'—এই-টুকুর অর্থ সায়ণ ও আনন্দতীর্থ যেরূপ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ,—

সায়ণের অর্থ—

বয়াংসি = পক্ষিসজ্ঘ [পক্ষিণঃ কাকগৃধ্রাদয় আকাশে দৃশ্যন্তে]

বঙ্গাঃ = বৃক্ষসকল [বনগতা বৃক্ষাঃ]

অবগধাঃ = ওষধিগণ [ব্রীহিযবাদ্যা ওষধয়ঃ]

১। এই উক্তি পরে অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, তিস্রো হ প্রজা অত্যায়মায়ন্।—অথর্ববেদ, ১০।৮।৩। তিস্রো হ প্রজা অত্যায়মীয়ুঃ—জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ, ২।২২৯ (২২৪)।

ইরপাদাঃ=সর্পগণ [উর (রঃ) পাদাঃ সর্পা ভূবিলবাসিনঃ]

আনন্দতীর্থের অর্থ,—

বয়াংসি=পিশাচগণ [পিশাচাঃ]

বঙ্গাবগধাঃ=রাক্ষসগণ [রাক্ষসাঃ]

ইরপাদাঃ=অসুরগণ [অসুরাঃ]

প্রায় একই সময়ের দুইজন পণ্ডিত একই শব্দের দুইরকম অর্থ করিলেন। সায়ণ ত্রিবিধ প্রজা বুঝাইতে হইবে বলিয়া ওষধি ও বৃক্ষকে এক শ্রেণীতে টানিয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার 'বঙ্গাঃ,' 'অবগধাঃ' ও 'ইরপাদাঃ' এই শব্দত্রয়ের ব্যুৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অদ্ভুত। ইরপাদাঃ শব্দের কোন অর্থ হয় না, কাজেই ইকারকে উকারে পরিণত করিলেন। তাহাতেও মানে হয় না। শেষে রকারের পর বিসর্গ বসাইয়া অর্থ করিতে হইল। 'অবস্থি' থেকে "অব" আর 'গৃধ্যন্তে' থেকে 'গধ', ইহাও এক অদ্ভুত প্রথা। 'বনংগাঃ' হইতে বোধ হয় বাধ্য হইয়া বঙ্গাঃ সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'তানি ইমানি'—ইহার ব্যাখ্যায় সায়ণ 'তানি তথাবিধপ্রজানাং শরীরাণি তদ্দোষফলং ভোক্তুং প্রবৃত্তানি' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 'তানি' এই শব্দটিকে 'শরীরাণি'র বিশেষণ করিয়াছেন। শরীর কর্ম্মফল ভোগ করে না; শরীরী করে। অতএব 'তদ্দোষফলং ভোক্তুং প্রবৃত্তানি শরীরাণি' এরূপ ব্যাখ্যা তেমন সঙ্গত বোধ হয় না। আনন্দতীর্থ কিরূপে পিশাচ, রাক্ষস, অসুর, এরূপ অর্থ করিলেন, তাহা বোঝা যায় না। হয়ত প্রকৃত উপকরণ নিজের সম্মুখে না থাকাতেই তাঁহারা এইরূপ অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, প্রাচীন আচার্য্যদের মধ্যে আরণ্যকের এই স্থানের অর্থ লইয়া গোলযোগ ছিল। বর্ত্তমানকালের মনীষীদের মধ্যেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতান্তর আছে। কেহই এই 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা'র অর্থ লইয়া বিশেষ আলোচনা করেন নাই, কেবল এক একটি মতের অবতারণা মাত্র করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম ম্যাক্স্মূলর তাঁহার উপনিষদে (১৮৭৯ খৃঃ) এইগুলিকে জাতি বলিয়া অনুমান করিয়া লেখেন—"Possibly they are all ethnic names, like Kera, etc." [২]

২। † S. B. E. vol. 1, p. 202 f.

তার পর সুপণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সায়ণের পক্ষাবলম্বন না করিয়া বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদ বুঝিতে বঙ্গ, মগধ ও চের জনপদবাসী লিখিয়াছেন।[৩]

মনিয়র উইলিয়মস্ তাঁহার অভিধানে বঙ্গ বলিতে বৃক্ষ বুঝিয়াছেন। অবগধ ও চেরপাদ যে জাতি, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্বকোষকার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার অভিধানে বঙ্গ, মগধ ও চেরজাতি, এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কীথ্, তাঁহার ঐতরেয় আরণ্যকের অনুবাদে কয়েকটি যুক্তি দিয়া বঙ্গ, মগধ ও চেরজাতি অর্থ করেন। ১৯১২ খৃঃ 'বৈদিক সূচী'তে ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ্ এই অর্থই বজায় রাখেন। ঐ সময় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও ঐরূপ অর্থ স্থির করেন।[৪] শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[৫] ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার[৬] মহাশয় বঙ্গ, মগধ ও চেরজাতির মতই সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিষয়টি একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া সমীচীন অর্থ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ'-র নাম করিবার পূর্ব্বে ঐতরেয় আরণ্যক প্রথমেই সাধারণ সূত্ররূপে যাহা দিয়াছেন, তাহা এই,—

"ন হ্যত্যায়ন্ পূর্ব্বে যেঽত্যায়ংস্তে পরাবভূবুঃ"

[illegible]ং পূর্ব্বে কেহ [বৈদিক মার্গ] অত্যায় বা অতিক্রম করিতেন না। এটি সাধারণ উক্তি। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অতিক্রম করিয়াছিলেন,

৩। "অস্মন্মতে তত্র 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' ইত্যস্য ব্যাখ্যানাম্নেদৃশং কষ্টকল্পনং নিষ্প্রয়োজনম্; অপি 'বঙ্গা' বঙ্গদেশীয়াঃ, 'বগধা' মগধাঃ, 'চেরপাদাঃ' চেরনামজনপদবাসিনঃ। 'বয়াংসি' কাকচটকপারাবতাদিসদৃশাঃ।"—ত্রয়ীটীকা।

৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি এই মত প্রকাশ করেন। তবে পরে তিনি 'বগধ' বলিতে 'মগধ' না বুঝিয়া 'বাগদীজাতি' এই অর্থ করেন। তাঁহারই নির্দেশক্রমে আমিও বগধের অর্থ বাগদীজাতি করিয়াছি।

৫। বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ পৃঃ ১৮।

৬। মানসী, ১৩২২, মাঘ, ৩১২ পৃষ্ঠা।

তাঁহারা পুরুষার্থভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। অত্যায় শব্দের সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—উভয়বিধ আম্নায়-মার্গ অতিক্রম অর্থাৎ পরিত্যাগ। এই উভয়বিধ আম্নায়-মার্গ হইতেছে—কর্ম্মানুষ্ঠান এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন। ঐতরেয় আরণ্যকে এই দুইটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'কর্ম্ম' ও 'ব্রহ্ম'।

সায়ণ ভাষ্যে বলেন, যে-সকল নাস্তিক ["যে তু নাস্তিকাঃ"] (বৈদিক মার্গ) অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা পুরুষার্থভ্রষ্ট হইয়াছিল। ইহারা কাহারা? না, নাস্তিক। এখানে ইহাদের বর্ণসম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। যাহারা বৈদিক মার্গ অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা কেন করিয়াছিল, দেখা যাইতেছে, ইহারই ব্যাখ্যায় সায়ণ বলিয়াছেন—যে হেতু তাহারা "নাস্তিকাঃ"।

এই উক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য ঐতরেয় আরণ্যক ইহার পর 'প্রজা হ তিস্রঃ' এই মন্ত্র উদাহরণ করিয়াছেন। সায়ণ এইবার ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই 'প্রজা হ' অংশের অর্থ করিতে গিয়াছেন। তাঁহার অর্থ এইরূপ—"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রাঃ প্রজাস্তাসাং ভাগচতুষ্টয়েন বিভাগত্রয়বর্ত্তিন্যস্তিস্রঃ প্রজাঃ সত্যো যথোক্তস্য মার্গস্যাত্যায়মতিক্রমমীয়ুঃ প্রাপ্তাঃ।" সায়ণের মতে ইহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণের অন্তর্গত ত্রিবর্ণ। কোন্ তিন বর্ণ, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। চতুর্বর্ণের মধ্যে যে তিন বর্ণের প্রজা [বৈদিক মার্গ] অতিক্রম করিয়াছিল, তাহাদের সেই অতিক্রমের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে, এখানে 'তিস্রঃ' বলিতে চতুর্বর্ণের অন্তর্গত তিনকে বুঝাইতে সায়ণ চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহার পর সায়ণ আরণ্যকের ভাষ্যে "বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ"র যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার এই ব্যাখ্যা যে-প্রকারে আমরা পাইতেছি তাহা দেখিয়া দুঃখের সহিত বলিতে হয় ইহা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা-প্রসূত এবং ইহা সর্ব্বপ্রকারে ব্যাকরণবিশুদ্ধও নহে। পূজ্যপাদ সামশ্রমী মহাশয়ও এই স্থানের ব্যাখ্যাকে কষ্টকল্পিত বলিয়াছেন। এ ছাড়া আর-একটি কথা এই যে, আরণ্যক ঋগ্বেদের একপ্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ঋকের অর্থই আরণ্যকে প্রকাশিত। "প্রজা হ তিস্রঃ" এই ঋকের আরণ্যক যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে আরণ্যকের অর্থ যেন পৃথক্ করিয়া বুঝিয়াছেন। ঋকে "প্রজা হ তিস্রঃ" শব্দ দ্বারা অতিক্রম-কারীরই ত্রিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব আরণ্যকের ব্যাখ্যাও তদনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু সায়ণ আরণ্যকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অতিক্রম-কারীর ত্রিত্ব না বুঝাইয়া, অতিক্রমের ফলভূত যে নীচজন্মপ্রাপ্তি, তাহারই ত্রিত্ব বুঝান হইয়াছে। এই-সকল কারণে সায়ণ-সম্মত আরণ্যকের যে ব্যাখ্যা, তাহা হইতে একটু পৃথক্ করিয়াই আরণ্যকের ব্যাখ্যা করা আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি।

মন্ত্রে আছে—ত্রিবিধ প্রজা জ্ঞানকর্ম্মের অতিক্রম করিয়াছিল। তাহারা কাহারা? আরণ্যক বলিতেছেন, "প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ"।

ইহার সঙ্গত অর্থ আমরা এইরূপ মনে করি,—"যা বৈ প্রজা অত্যায়মায়ন্ তা ইমাঃ (প্রজাঃ) বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা-স্তানি ভূতানি ইমানি বয়াংসি (বয়াংসীব)।"

যে-সকল প্রজা এই পথ (জ্ঞান-কর্ম্ম) অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারাই কর্ম্মফল ভোগের জন্য নীচজন্ম প্রাপ্ত অর্থাৎ বঙ্গ, বগধ, চেরপাদ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহারা এই-সকল পক্ষীর ন্যায়।[৭]

৭। ইহার আর-এক প্রকার অর্থও করিতে পারা যায়। সে অর্থটি এই—"যা বৈ প্রজা অত্যায়ন্ তা ইমাঃ প্রজা বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্তানি ভূতানি এব ইমানি বয়াংসি কর্ম্মফলং ভোক্তুং পক্ষিশরীরং প্রাপ্তানি।" ইহারাই সেই (সেই জাতীয়) প্রজা (বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদগণ) যাহারা উভয় আম্নায়-পথ অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছিল। তাঁহারাই জন্মান্তরে স্বীয় কর্ম্মফলভোগের জন্য এই পক্ষিজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে।

পক্ষিজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পক্ষিজন্ম এ স্থলে নীচ জন্মের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ কেবল যে পক্ষিজন্মই তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে, পক্ষিসদৃশ নীচ জন্ম অর্থাৎ কীট পতঙ্গাদি স্থাবরান্তজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে এই জ্ঞান ও কর্ম্মের অতিক্রমের ফলরূপে যে-সকল নীচ জন্মের কথা বলা হইয়াছে দেখা যায়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ।

'এই-সকল পক্ষীর ন্যায়' এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিয়া ফল ভক্ষণ করে, কর্ম্মফলভোগী জীবাত্মারাও সেইরূপ শরীর হইতে শরীরান্তর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে। এইজন্য শ্রুতিতে বহু স্থানেই কর্ম্মফলভোগী পুরুষকে পক্ষীর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। কোন স্থানে পক্ষিরূপেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।[৮]

এখন সাব্যস্ত হইল যে, বঙ্গ, বগধ ও চেরপাদ তিনটি জাতি। এই তিন জাতি ঐতরেয় আরণ্যকের সময় লোকদের জানা ছিল। চেরপাদ জাতি—চেরো জাতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বঙ্গ ও চেরো জাতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। এইবার বগধ জাতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বগধ কাহারা? কেহ কেহ বগধকে 'মগধ' বলিয়া মনে করিয়াছেন। কেহ বা এইরূপ মনে করিবার কারণ লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপে লিপিকরপ্রমাদে বগধের 'মগধ' হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবে এই আরণ্যকের 'বগধ' কখনই 'মগধ' নয়, হইতেও পারে না। 'মগধ' এই নাম কত প্রাচীন, দেখা যাক্। ঋক্-সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকের যুগে 'মগধ' নামের অস্তিত্বের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই।[৯] প্রাগৈতিহাসিক যুগে মগধজাতির স্পষ্ট উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম আমরা অথর্ববেদে পাই। অথর্বপরিশিষ্টে (১।৭।৭) মগধ, বঙ্গ, মৎস্য শব্দের উল্লেখ আছে; কিন্তু সে অনেক পরের কথা। এখন যে জায়গাকে আমরা পাটনা ও গয়া জেলা বলি, সম্ভবতঃ সেইখানেই মগধেরা থাকিত। যজুর্বেদে মগধের লোকের ইঙ্গিত আছে। ইহার পূর্ব্বে কীকটকে যদি মগধের এক অংশ বলিয়া ধরাও যায় তাহা হইলে কীকটের নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে কোথাও মগধ শব্দের উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণগুলি মন্ত্র বা মন্ত্ররূপ সংহিতা-গ্রন্থের আদি ভাষ্যগ্রন্থ। এগুলিতে সংহিতার মন্ত্রের ব্যাখ্যান ও তাৎপর্য্য আছে। আর ব্রাহ্মণ-গুলির অংশবিশেষের নাম আরণ্যক। এগুলিকে ব্রাহ্মণের একরূপ পরিশিষ্ট বলিতে পারা যায়। ঐতরেয় আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট। এইরূপ তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অধিকাংশই অতি প্রাচীন কালের রচনা। যে-সকল ঋষি সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামেই সেগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। তবে কৌষিতকী ও শতপথ যে অথর্ববেদের পূর্ব্বে রচিত নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ঋগ্বেদের প্রথমদিকের মণ্ডল কয়টির মন্ত্র ঈরিত হইবার সময় পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্যগণ বাস করিতেন; সমুদ্রের কথা তখন তাঁহারা জানিতেন না। কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী মণ্ডলের মন্ত্রসকল যখন উদ্গীত হয়, তখন তাঁহারা সমুদ্র জানিতেন, বিন্ধ্যপর্ব্বত জানিতেন, নর্ম্মদা-নদীও জানিতেন। জানিবার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহারা তখন এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন। এই আর্য্যদের ভিতর কতকগুলি শাখা ছিল, তাহাদের মধ্যে পাঁচটির নাম পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাবি নদীর তীরে এক মহাযুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে দশজন রাজা সম্মিলিতশক্তিতে জোর করিয়া পূর্ব্ব দিক্ দিয়া পথ বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ত্রিৎসুদের অধিপতি সুদাস তাঁহাদের হটাইয়া দেন। তবে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (১ম কাণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম ব্রাহ্মণ, ১৪-১৭ কণ্ডিকা) যে আখ্যায়িকা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, নৃপতি বিদেঘমাথব সরস্বতীর তীর হইতে

কাজেই বুঝিতে হইবে, যে-যে স্থলে যে-যে জন্মপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে কেবল সেই সেই জন্মই বুঝিতে হইবে না। কারণ, একই জ্ঞান-কর্ম্মের অতিক্রমের বিভিন্ন ফল সঙ্গত হইতে পারে না। সকল স্থলেই উপলক্ষণ-রূপে শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সকল প্রকার নীচজন্ম বুঝিতে হইবে। [ছান্দোগ্য-৫ম প্র, ১০ম খণ্ড, ৭, বৃহদারণ্যক ২।২।১৬ দ্রষ্টব্য।]

৮। তৎ যথাস্মিন্নাকাশে—শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য ইত্যাদি—বৃহদারণ্যক উপ—৪।৩।১৯। যথা স শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং—ছান্দোগ্য, ৬।৮।২। ৩

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে—প্রশ্ন,৪।৭।

৯। কৌষিতকী আরণ্যকে 'মগধ' আছে। কিন্তু কৌষিতকের আরণ্যক সংগ্রহ অথর্ববেদের পরে।

পুরোহিত গৌতমের নেতৃত্বে সদানীরা নদীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সদানীরার অপর নাম করতোয়া। বর্ত্তমান বগুড়া নগর এই করতোয়ার উপর অবস্থিত। এই নদীর পূর্ব্বভাগেও তাঁহারা অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইঁহারা সরস্বতী-নদী অতিক্রম করিয়া, সেই স্থানের প্রজার উপর তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু করতোয়া-নদীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া, সেই স্থানে যাহারা বাস করিত, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বশে আনিতে পারেন নাই। তাই শতপথ বলিয়াছেন, অগ্নি অন্য সমস্ত নদীকে বিদগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কেবল সদানীরাকেই বিদগ্ধ করিতে পারে নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যে আর্য্যরা বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে আর্য্যরা বঙ্গ, বগধ ও চেরো জাতির নাম অবগত ছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যকে তাহারই দ্যোতনা প্রকারান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যেরা যখন ভারতে আসেন নাই, তখন দ্রাবিড়েরা ভারতে বাস করিত। তাহাদের সভ্যতার স্তরও কম উচ্চ ছিল না। দ্রাবিড়েরা দক্ষিণ-ভারত হইতে গিয়া তমোলুক অধিকার করে। সেখানে তারা অনেক দিন রাজ্যও করে। ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। এই সুপ্রাচীন কালে তমোলুকের নাম দামলিপ্তি ছিল—তখনও তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি নাম হয় নাই। দামলিপ্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে তদ্দ্বারা প্রধান এক ভাগ হয় 'দামল', আর এক ভাগ হয় ইপ্তি (ইপ্ত)। তামিল ভাষার 'দ্রমিড়' পদটির উচ্চারণে একটু এদিক্ ওদিক্ হইয়া 'দামল' হওয়া অসম্ভব নয়। তামিল ভাষার 'দ্রমিড়', সংস্কৃতে 'দ্রবিড়' হইয়াছে এবং পালি গ্রন্থ মহাবংশে উহা 'দমিলো' হইয়াছে। তারানাথ উহাকে 'দ্রমিল' করিয়াছেন। সংস্কৃতে ইহা তাম্রলিপ্ত হইলেও এক আধ জায়গায় 'দামলিপ্ত' নামও আছে। দশকুমার-চরিত তাহার নিদর্শন। দ্বিতীয় অংশ 'ইপ্তি' বা 'ইপ্ত' সংস্কৃত নয়, পদটির প্রধান ভাগ দামল বা তামল এবং শেষ ভাগ বা প্রত্যয়াংশ 'ইত্তি' বা 'ত্তি' সমস্তই দ্রাবিড় ভাষার।[১০] ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, দামলিপ্তি বা তামলিপ্তি পূর্ব্বে একটি দ্রাবিড় নগর ছিল। আর্য্যরা গাঙ্গেয় ভূমি ও ওড়িষায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, দ্রাবিড়েরা এই নগরের প্রতিষ্ঠা করে। এই দ্রাবিড়নগর প্রতিষ্ঠিত হইলে এই স্থানে তাম্রের যথেষ্ট ব্যবসায় চলিত। তমোলুকের নিকট সিংভূম ও ধলভূমের মধ্যে তামার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সিংভূম হইতে গাঙ্পুর ষ্টেট পর্য্যন্ত অন্যূন ৪০ ক্রোশ ব্যাপিয়া তামার খনি ছিল। ভূতাত্ত্বিকেরা এই তামার খনিগুলির নিদর্শন মাটি খুঁড়িয়া পাইয়াছেন।[১১] অনেক dolmen ও পাইয়াছেন। এই ৭০ ক্রোশ স্থানকে লোকে 'অসুরগড়' বলে। এই-সমস্ত তামা তমোলুক বন্দর দিয়া নিশ্চয়ই যাইত। তমোলুক বন্দরে তামা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিত। নিজামরাজ্যেও ঠিক এইরূপ তামার খনি পাওয়া গিয়াছে। এখানেও অনেক dolmen আছে। বর্ত্তমান মুসলমানেরা এই জায়গাকেও "অসুরগড়" বলে। দ্রাবিড়গণ ইহাকে "রাক্ষস-গুড়িয়ম্" বলে। সুপ্রাচীনকালে তমোলুক বন্দর দিয়া যে তামা বিভিন্ন প্রদেশে যাইত, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। বাবিলোনিয়ার প্রাচীন নগরগুলিতে ভূগর্ভ খনন করিয়া যে-সকল ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, প্রত্নবস্তুতাত্ত্বিকগণ সেগুলি দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ বাবিলোনিয়ায় উপনিবেশ-স্থাপনকারী সুমেরগণই বাবিলোনীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। নগরের সর্ব্বনিম্ন সমতলক্ষেত্রের মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সুমেরসভ্যতা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, লোকে তামা ব্যবহার করিতেছিল। টেল্লায় (Tella) সুমের-জাতির ৪০০০ খৃষ্টপূর্ব্বকালের তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযন্ত্রের, বাবিলোনিয়ায় প্রাপ্ত যন্ত্র-সকলের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। দ্রাবিড়- ও সুমের-সভ্যতা একই সূত্রে গ্রথিত। আসিরিয়ায়ও দ্রাবিড়-সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। অসুরদেরও অনেকে দ্রাবিড়। অসুরগড়ের সঙ্গে দ্রাবিড় অসুরদের সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। তাম্রলিপ্তির অধিবাসীদের কতককে গ্রীক ভৌগোলিকেরা "গঙ্গারিডে" বা "গঙ্গারিডেস্" নাম দিয়াছেন।

১০। Indian Ant (1914), p. 64.

১১। A Manual of the Geology of India, Part III. (1881.) By V. Ball, p. 247.

গ্রীক-ভাষায় এই শব্দের অর্থ "গঙ্গাতীরবাসী"। আমরাও গঙ্গানদীর ধারে বা কিনারায় যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে 'গঙ্গাড়ি' বলিয়া থাকি। এই অর্থ হইতে দেখা যায়, ভারতে গঙ্গাড়ি বলিয়া যে জাতি আছে, তাহারাও গঙ্গার তীরে বাস করিত। দেখা যায়, গাড়োয়াল কুম'-য়ুনের কাছে ভাগীরথীর তীরে গঙ্গাড়িরা এখনও আছে। আমাদের দেশেও গঙ্গাড়িরা আমাদের গঙ্গার ধারে বাস করিত। প্রাচীন বর্দ্ধমান এই গঙ্গাড়িদের রাজধানী ছিল। গ্রীক ভৌগোলিকেরা Parthālis বা Portalisকে গঙ্গাড়ি-দের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। M. de St. Martin সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, Parthalis ও বর্দ্ধমান অভিন্ন। সুতরাং বলিতে হয়, প্রাচীন বর্দ্ধমান গঙ্গাড়িদের রাজধানী ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর ওল্ড্‌হ্যাম্ দেখাইয়াছেন যে, এই গঙ্গাড়িদের অধিকাংশই বাগ্‌দী[১২] ছিল। এই বাগদীদের এখন বর্দ্ধমানের গাঙ্গেয়ভূমির আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করা হয়। কালে ইহারা হিন্দুদের গণ্ডীর এক কোণে একটু স্থান পাইয়াছে। পূর্ব্বে অন্ততঃ ঐতরেয় আরণ্যকের সময় ইহারা জঙ্গলে বাস করিত। জঙ্গলে বাস করিত বলিয়া ইহাদের নাম ছিল বগধ। 'বগধ' শব্দের রূপান্তর 'বগত' নামে তেলেগু জাতি এখনও দক্ষিণ-ভারতে আছে। বাগ্‌দীরা যেমন আমাদের দেশে মাছ ধরে, তেমনই ইহারাও দক্ষিণভারতে মৎস্যজীবী। ইহাদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি কতক কতক আমাদের বাগ্‌দীদের অনুরূপ। আমাদের দেশের বাগ্‌দীদের চেহারা ও রঙ্ দেখিলে ইহাদিগকে দ্রাবিড়-জাতির বংশধর বলিয়াই মনে হয়। আর অন্য কোন জাতির সহিত সম্পর্কিত বলিয়া ইহাদিগকে অনুমান করিতে পারা যায় না। তবে বাগ্‌দীদের সঙ্গে দ্রাবিড় জাতি মালেদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। আজও এই দুই জাতি এক হুঁকায় তামাক খায়, মাল ও বাগ্‌দীরা একই সূত্র হইতে উভয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুরে এই দুই জাতি এক রাজাও মানিয়া থাকে। তেলেগু বগত জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, বগত জাতি জঙ্গলে বাস করিত বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে বগত। বগধ আরও একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতের অন্যান্য স্থানেও আজও বর্ত্তমান। ডুঙ্গরপুর ও বাঁশবাড়া—এই দুইটি রাজ্য হইতে যে-সমস্ত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে দেখা যায় যে, এই দুইটি রাজ্যের সম্মিলিত নাম—বাগড।[১৩] আর এই স্থানের লোকেরা আজও এই বাগডনাম বজায় রাখিয়াছে। মেবাড়ের ছাপান্ন জেলাও পূর্ব্বে এই বাগডের অন্তর্গত ছিল। যোধপুর সহরের অংশবিশেষের নাম 'বাগড'। বাগড শব্দের অর্থ যে জঙ্গল, তাহা রাজপুতানায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। বাগড শব্দ সম্ভবতঃ বগ্‌গড (=জঙ্গল) হইতে ব্যুৎপন্ন। কচ্ছ রাজ্যের এক অংশ এবং বিকানীর রাজ্যের অংশবিশেষের নাম বাগড। পদ্মগুপ্ত-কৃত 'নবসাহসাঙ্কচরিতে' লিখিত আছে, 'সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক

১২। বাগ্‌দীজাতির জন্ম সম্বন্ধে অনেক রকম প্রবাদ, গল্প ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রিজ্‌লী কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি প্রবাদে আছে, একদিন পার্ব্বতী জেলেনী সাজিয়া শিবের চরিত্র পরীক্ষা করিতে যান। শিব জেলেনীর প্রলোভনে মুগ্ধ হন। পার্ব্বতী পরে আত্মপরিচয় দিলে শিব পার্ব্বতীর কাছে এইরূপে হারিয়া ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার গর্ভস্থ এই শিশু বাগ্‌দী হইবে এবং মৎস্যজীবী হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

আর-একটি গল্পে আছে, কোচবিহারের শিবের অনেকগুলি কোচ-জাতীয়া উপপত্নী ছিল। পার্ব্বতী ইহাতে ঈর্ষা-পরবশ হইয়া কোচদের শস্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। শিব কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া শিব পার্ব্বতীকে সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হন। শেষে শিবের ঔরসে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তাঁহার গর্ভে জন্মিবে, এইরূপ চুক্তি হওয়ায়, পার্ব্বতী ঠাণ্ডা হ'ন। ফলে পার্ব্বতীর যমজ সন্তান জন্মে। যমজ ভ্রাতা ভগিনী পরস্পরকে বিবাহ করে। এই বিবাহের ফলে বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীরের জন্ম হয়। হাম্বীরের চারি কন্যার নাম—শান্তু, নেতু, মান্তু, ক্ষেতু। এই চারিজন হইতেই তেঁতুলে, দুলে, কুসমেটো, ও মেটে বাগ্‌দীর চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

বাগ্‌দীদের কিংবদন্তীতে আদর্শ নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রও অব্যাহতি পান নাই। ইহাদের কিংবদন্তী আছে, কোনও বিধবা দাসীর গর্ভে শ্রীরামচন্দ্রের ঔরসে এই বাগ্‌দী জাতির জন্ম হয়। ইহারা ভদ্রবংশীয় বড়-ঘরের মেয়েদের পাল্কী বহিতে পারিবে, রামচন্দ্র ইহা বলিয়া যান।

এখনও উড়িষ্যায় অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। দেবতারা একদিন সকলে সম্মিলিত হইলে একজন দেবী হঠাৎ তিনটি পুত্র প্রসব করেন। অবস্থা-গতিকে তখন তিনি একটি পুত্রকে তেঁতুল খোসার উত্তাপ দিয়া, দ্বিতীয়টিকে লৌহ-কটাহে রাখিয়া, তৃতীয়টিকে তপস্বীর মঠে লুকাইয়া রাখেন। ইহা হইতেই ইহারা তেঁতুলে বাগ্‌দী, লোহার মাঝী, দণ্ডছত্র মাঝী নামে পরিচিত হয়।

১৩। বাগডবট্ট (ট) পত্রকে মহারাজাধিরাজ শ্রী সীহডদেববিজয়োদটী।...

ভৈকরোড-লেখ

বাগডবপত্রকে মহারাজকুলশ্রীবি(বী)রসিংহদেবকল্যাণবিজয়রাজ্যে...

—রাজপুতানার মিউজিয়মে সুরক্ষিত অজমের দানপত্র।

বাগডের প্রজারা বশীভূত হইয়াছিল।[১৪] এই বাগড কচ্ছপ্রদেশের পূর্ব্বাংশ। 'রত্নচূড়সম্প্রেষণম্'গ্রন্থের দশম সর্গে লিখিত আছে যে, কচ্ছের বাগড বিভাগে বর্ত্তমান কণ্ঠ-কোট অবস্থিত।[১৫] বগডা পঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলবর্ত্তী এবং রাজপুতানার উত্তরাঞ্চলবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গল।[১৬] পঞ্জাবের একটি প্রাচীন জঙ্গলের নাম বাগডী। এখন ইহা গ্রামে পরিণত হইয়াছে। রাজা মহীপ্রকাশের ইতিকথায় 'বাগডীর' বগডাল অর্থাৎ বগধ জাতির উল্লেখ আছে।[১৭]

বগধ শব্দেরই রূপান্তর বাগড। এই বগধ হইতেই বাগ্‌দী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বাগ্‌দীরা প্রথমে কোন্ স্থান হইতে বঙ্গদেশে আসে তাহা জানা যায় না। তবে তাহারা যে দ্রাবিড়, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। রাজমহলের পাহাড়ে বাধা পাইয়া গঙ্গানদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয়। সেই পরিবর্ত্তিত গতিতে যে ভূমিখণ্ড গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইখানেই গঙ্গাড়িরা বাস করিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাড়িদের অধিকাংশই বাগ্‌দী। গঙ্গাড়িরা যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ছায়ায় আসিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। গ্রীক ভৌগোলিকদের সময় বাগ্‌দীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে সামান্য একটু স্থান পাইয়াছিল। গঙ্গাড়িদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা ছিল। তাহাদের শাসকও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ বাগ্‌দীরা রীতি ও পদ্ধতি কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছে।

ভৌগোলিক হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে প্রাচীন বঙ্গজাতির বাস ছিল। তারপরে এদিকে পশ্চিমাঞ্চলে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে বগধেরা বাস করিত। এবং তৎপরে ছোটনাগপুর অঞ্চলে চেরোরা থাকিত।

১৪। Ind. Ant. (1907), vol. 36, p. 157, f.n. p. 171.

১৫। Ind. Ant. (1877), vol. 6, p. 185.

১৬। Ind. Ant. vol. 24, p. 49.

১৭। Ind. Ant. (1909). vol. 38, p. 36.

"রৈয়ৎ আয়ী রানেরী বাগডী রে বগডাইলু।" রাণার প্রজারা আসিয়াছিল, বাগডীর বগডালরা আসিয়াছিল।

বঙ্গদেশে 'বাগড়ী' দ্বীপ যখন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তখন উহা জঙ্গলময় ছিল বলিয়া বোধহয় উহার নাম বাগড়ী হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গালা দেশে বাগ্‌দীদের সংখ্যা বার লক্ষেরও অধিক। সাধারণতঃ ইহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি শ্রেণীর নাম তেঁতুলে, দুলে, কুশমেটে ও বেইসে। কোথাও কোথাও কুশমেটেকে শুধু মেটেও বলে। কোন জায়গায় আবার কুশমেটে ও মেটে স্বতন্ত্র শ্রেণী। সেখানে বেইসে নাই।

বাগ্‌দীরা বলে যে, তেঁতুল-গাছ থেকেই তাহারা তেঁতুলে নাম পাইয়াছে। কুশমেটেরা বলে, কুশ জন্মাবার মাটি থেকে তাহাদের এই নাম হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কুশ বা তেঁতুল-গাছকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না।

বাঁকুড়া জেলায় বাগ্‌দীদের শ্রেণী একটু স্বতন্ত্র। এখানকার মেটেরা দুই ভাগে বিভক্ত—কুশমেটে বা কুশ-পুত্র, আর মল্লমেটে বা মটিয়াল। বেইসের পরিবর্ত্তে এখানে গুলিমাঝি ও দণ্ডমাঝি বলিয়া মাঝিদের দুইটি বিভাগ আছে। ইহাদের আরও তিনটি উপবিভাগ আছে। তাদের নাম ওঝা, মেছো ও কসাইকুলে। কসাইকুলেদের উপাধি—মাঝি, মশালচি, পালনথৈ ও ফেরকা। দুলেদের উপাধি সর্দ্দার ও ধর। বাঘ, সাঁতরা, রায়, খাঁ, পুইলা—এগুলি তেঁতুলেদের উপাধি। সমাজে তেঁতুলে বাগ্‌দী সকলের বড়। তার পর দুলে। ওড়িষায় সকলের চেয়ে ছোট বাগ্‌দীকে নোড়া বলে। নোড়াদের সঙ্গে কেহ বিবাহ দেয় না। দুলেরা সাধারণতঃ ডুলিপাল্‌কী বয়, মাছ ধরে। তেঁতুলে ও কুশমেটেরা রাজমজুরের কাজ করে, পানে খাইবার চুনও তৈয়ারি করে। ব্রাহ্মণবাড়ী ছাড়া তেঁতুলে ও দুলেরা চাকরও হয়। নোড়ারা মাছ বেচে, মাঝির কাজও করে। বাগ্‌দীদের কেহ কেহ পাটের থলে তৈয়ারি করে, কেহ বা কাপড় বোনে; হোলী উৎসবের আবীর তৈয়ারি করা কাহারও কাহারও পেশা। বাগ্‌দীদের মধ্যে অনেকে কৃষিজীবী ও মৎস্য-জীবী। যাহারা চাষ করে, জমির উপর তাহাদের বিশেষ কোন অধিকার থাকে না। পশ্চিম-বঙ্গের বাগ্‌দীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে রৌজে মজুরী খাটিয়া খায়। হয় নগদ পয়সা লয়, না হয় তো ভাগে অপরের সঙ্গে চাষ করিয়া উৎপন্ন শস্যের ভাগ লয়। ইহাদের মধ্যে

জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি নাই বলিলেই চলে। মানভূম ও বাঁকুড়ায় কয়েকজন বাগ্‌দী রাজা ও জমিদার আছেন। তাঁহারা কিন্তু এখন আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারতের উত্তরাঞ্চল-বর্ত্তী বৃন্দাবনের নিকট জয়নগরের রাজপুত রাজাদের বংশে তাঁহাদের রাজাদের উৎপত্তি। যেহেতু উত্তরাঞ্চল-বর্ত্তী রাজারা প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া দাবী করিত, এই রাজারাও সেই একই বংশের উৎপত্তির দাবী রাখিত। এই প্রণালীর যুক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন যে, উত্তরাঞ্চলের রাজপুতেরা প্রাচীন ভারতীয় ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত নয়, এটি যেমন ধ্রুব সত্য, সেইরূপ উত্তরভারতের রাজপুতবংশ হইতেও এই-সমস্ত রাজারা উৎপন্ন নয়।

রাজপুতেরা সিদিয়া অথবা মধ্য-এসিয়ার অন্য কোনও স্থান হইতে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে ভারতে প্রবেশ করে। তাহারা রাজপুতানার মরু ও পর্ব্বতে বাস করিবার সুবিধা পায়; কেন না, তখনও হিন্দুরা এই-সমস্ত অনুর্ব্বর প্রদেশ তাহাদের অধিকারভুক্ত করে নাই। কাজেই উহারা এই-সমস্ত ভীল ও অন্যান্য বর্ব্বর জাতিকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেরা সেখানে বাস করে। কিন্তু তখনকার দিনে ভারতে অধিক কাল বাস করিতে হইলে হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ না করিলে বহু প্রত্যবায় ছিল। এইটুকু এই নবাগত জাতি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে ভারতীয় ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া প্রচারিত করিল। খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে ভারতের প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজগন যখন কতক হীন হইয়া পড়িল এবং কতক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তখন রাজপুতানার নবীন ক্ষত্রিয়গণ চারিদিকে উপনিবেশের ব্যবস্থা করিতে লাগিল এবং ভারতের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। ইহাদের নূতন রাজ্যে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ এই রাজপুতদিগের শাসনে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাহাদিগের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নানাভাবেই সাহায্য করিতে লাগিল। তাই আমরা অগ্নিপুরাণের বর্ণনায় দেখিতে পাই, প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতি নির্ম্মূল হইলে ভগবান্ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য আবু পর্ব্বতে নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিলেন। এই আবু পর্ব্বতের ক্ষত্রিয় যে রাজপুত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মানভূম ও বাঁকুড়ার রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ যে উত্তরভারতের ক্ষত্রিয়-বংশ হইতে সম্ভূত নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আদৌ বেগ পাইতে হইবে না। হাণ্টার তাঁহার Annals of Rural Bengalএ তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধ-অসভ্য জাতিরা যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন আর্য্যবংশের সহিত নিজেদের বংশের সংস্রব দেখাইবার একটা চেষ্টা তাহাদের হয়। এই চেষ্টার ফলে বীরভূমের অসভ্য জাতিগণ আপনাদের মহা-ভারতোক্ত ভীমসেনের বংশজাত বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বাঁকুড়া ও মানভূমের রাজারাও আপনাদের বড়-ক্ষত্রিয় বলিয়া দেখাইয়াছে। ঘটনা কিন্তু এই যে, এই-সমস্ত রাজারা পূর্ব্বে মল্ল নামক বর্ব্বরদিগকে এই উপাধিতে ভূষিত করিতেন। তাঁহারা যে দেশে বাস করিতেন, সেই স্থানের নামও মল্লভূমি ছিল। পরে তাঁহারা উপাধি পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কর্ণেল ড্যাল্টন দেখাইয়া-ছেন, যে, মানভূমের অধিপতিগণ পূর্ব্বে বাগ্‌দীই ছিল। ইহাদের প্রতিবেশী মালেরাও মল্ল। মল্ল দৃশ্যতঃ সংস্কৃতশব্দ, কিন্তু ইহা এই-সমস্ত জাতির উপাধি ছিল।

বাগ্‌দীরা প্রথমে কি কাজ করিত, তাহা জানিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ তাহারা মাছের ব্যবসা করিত। প্রথমে তাহাদের যে একটা খুব প্রতাপ ছিল, তাহা গঙ্গাড়িদের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারা যায়। তাহারা দাঙ্গা, হাঙ্গামা, ডাকাতিতে খুব পটু। ডাকাতিকার্য্যে তাহারা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ।

আজকাল বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলায় অল্পবিস্তর বাগ্‌দী দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা, হুগলী, হাওড়া জেলায় ইহা-দিগকে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানে ইহাদের খাস আড্ডা। তমোলুকে আসিবার পরই বাঁকুড়ার কাছাকাছি কোন স্থানে

বাগ্‌দীরা আসিয়া প্রথম বসবাস আরম্ভ করে। বাগ্‌দীরা যে ঐ স্থানের আদিম অধিবাসী তাহা নহে।

হাওড়ার অন্তর্গত আম্‌তা, জগদ্‌বল্লভপুর ও ডুমজোড়ে ইহাদের সংখ্যা বেশ জাঁকাল রকমের। হুগলী জেলায় আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, হরিপাল, পোলবা ও ধনেখালিতে ইহাদের সংখ্যা বড় কম নয়। বাগ্‌দীরা বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া হুগলীতে বাস করে। আরও পূর্ব্বে অর্থাৎ নদীয়া ও ২৪ পরগনায় ইহারা আপনাদের সমাজে খুব নীচু, কিন্তু পশ্চিমের দিকে ইহারা একটু উঁচু। বাঁকুড়ার সর্দ্দার ঘাটওয়াল, মানভূমের কয়েকজন বাগ্‌দী জমিদার তাহার দৃষ্টান্ত।

দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা যত পূর্ব্বদিকে আসিয়াছে, তত বেশী হিন্দু ভাবের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাঁকুড়া, মানভূম ও ওড়িষার উত্তর-সীমান্ত-রাজ্যে বাগ্‌দীদের বাল্য- ও যৌবন-বিবাহ হয়, বিবাহের পূর্ব্বেও ইহারা মিথুন-সম্পর্ক করিতে দেয়। এরূপে মেশামিশি তাহারা দোষের বলিয়া মনে করে না। কিন্তু হুগলীতে বালিকা-বিবাহই নিয়ম—যৌবন-বিবাহ বিরল। আবার ভাগীরথীর পূর্ব্বাঞ্চলের বাগ্‌দীরা যৌবন-বিবাহ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা জানেই না। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করাব প্রথা পশ্চিমের চেয়ে পূর্ব্বেই বেশী। হুগলীতে তেঁতুলে-বাগ্‌দীরা বিধবাদের বিবাহ করিতে দেয় না। ইহারা উচ্চশ্রেণীর বাগ্‌দীদের ভিতরে আসিতে দেয় না। পশ্চিমে কিন্তু দেয়। বাঁকুড়ার মল্লমেটেরা আশপাশের কতকগুলি জাতির সঙ্গে বিবাহাদি করে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটা থাক হইয়া গিয়াছে। এই থাকগুলির মধ্যে কাশবক, পানকুষি, শালঋষি, পাটঋষি ও কচ্ছপ প্রসিদ্ধ। কাশবক বাগ্‌দীরা কঙ্কপক্ষী মারিতে বা খাইতে পারে না। পাটঋষিরা সিম ছোঁয় না। বাগ্‌দীদের ভিতর বহুবিবাহ প্রচলিত। অনেক সময় দেখা যায়, ইহাদের যে যত জন স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে পারে, সে ততজনকে বিবাহ করে। দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করার পদ্ধতিও ইহাদের ভিতর প্রচলিত আছে।

রিজ্‌লী বহুপরিশ্রম করিয়া ইহাদের বিবাহের কয়েকটি আচার-পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মন্তব্যগুলির সার নিষ্কর্ষ করিয়া ইহাদের বিবাহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। পশ্চিম-বঙ্গের বাগ্‌দীদের মধ্যে বেশ একটি মজার নিয়ম আছে। বিবাহের দিন সকাল বেলা মিছিল করিয়া কনের বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে মহুয়া-গাছের সঙ্গে বরের বিবাহের অভিনয় হয়। সে ঐ গাছটিকে আলিঙ্গন করে, সিঁদুর দেয়, ডান-হাতের কব্জীতে সুতা বাঁধে। বৃক্ষের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া সে মহুয়া-গাছের পত্রগুলি ঐ সুতা দিয়া কব্জীতে বাঁধে। বরের মিছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বে কনের বাড়ীতে পৌছানই সাধারণ নিয়ম। বাড়ীর ভিতরের উঠানে কনের লোকজনেরা বরের মিছিলকে বাধা দেয়। উভয় পক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ হয় এবং বরের পক্ষই জয়ী হয়। ইহা রাক্ষস-বিবাহের নিদর্শন। বরপক্ষ পূর্ব্বাস্য হইয়া আসনে বসে।

শাল-পল্লব-কুঞ্জে, চারিদিকে তেল হলুদ প্রভৃতি দেওয়া হয়। মাঝখানে অল্প মাটি তুলিয়া খুব ছোট (আধ হাত কিংবা কিছু বেশী) স্থান লইয়া একটি পুকুর কাটা হয়। যখন কনে সেই পল্লবকুঞ্জে বিবাহস্থানে উপস্থিত হয়, তখন সে সাত বার ঐ স্থানটি প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ করিবার সময় কনের ডান হাতে ঐ গুচ্ছ সর্ব্বদা রাখে এবং বরের বিপরীত দিকে বসে। বর-কনের মধ্যে সেই পুকুরের জল মাত্র ব্যবধান থাকে। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া বর-কনের ও কনের অপেক্ষা বড় এমন কোনও আত্মীয়ার ডান-হাত একসঙ্গে বাঁধে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, কনেকে বরের কাছে সম্প্রদান করা হইল, এবং বর কনেকে গ্রহণ করিল। ইহার পর গোত্রান্তর হয়, পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করে। সিন্দুর-দান গোত্রান্তরের আর-একটি ব্যবস্থা। বর সিন্দুরের কৌটা বামহাতে লইয়া ডান-হাত দিয়া কনের কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অনার্য্য জাতিই সিন্দুরদান প্রথাকে বিবাহের অতি প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া মনে করে। কিন্তু হিন্দুর সপ্তপদী গমন সম্বন্ধে কোন কথাই তাহারা জানে না। ইহার পরে ইহারা পরস্পরকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়। অবশিষ্ট রাত্রি নিমন্ত্রিত-

ভোজন ব্যাপারে অতিবাহিত হয়। পরদিন সকাল বেলা বর-কনে বরের বাড়ী যাত্রা করে। বিবাহের চারিদিন পর্য্যন্ত বর-কনের গাঁটছড়া বাঁধা থাকে।

তেঁতুলে বাগ্‌দী ছাড়া আর সকল শ্রেণীর বাগ্‌দীর ভিতরেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। বিধবা-বিবাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই, মন্ত্র পাঠের প্রয়োজন নাই। সেই ঋগ্বেদের সময় হইতে বিবাহে যে যজ্ঞ প্রচলিত, সেই যজ্ঞের কোনও ব্যবস্থা ইহাতে হয় না। মধ্যবঙ্গের বাগ্‌দীর মধ্যে এইরূপ বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। বর কনে মুখোমুখী হইয়া মাদুরের উপর বসে, এবং পরস্পর পরস্পরের কপালে হলুদ ও জল দেয়। তার পর একখানা চাদর দিয়া বর-কনেকে একবার ঢাকিয়া দেওয়া হয়, এবং বর কনের বাম-হাতে লোহার খাড়ু পরাইয়া দেয়। গ্রামের স্বজাতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হয়। যদি বিধবা-বিবাহের বর ও কনে খুব গরীব হয়, তাহা হইলে ভোজের জন্য তাহারা পাঁচ সিকা দেয়। বিধবা ইচ্ছা করিলে তার দেবরকেও বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য সমাজে কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই।

স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এ বিষয়ে বঙ্গদেশের নানা স্থানে নানা ব্যবস্থা। হিন্দু-ঘেঁসা বাগ্‌দীরা উচ্চ জাতির হিন্দুর মত পত্নীত্যাগের কথা অস্বীকার করে। কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, অসতী হইলে, অবাধ্য হইলে, জাতির গ্রাম্য-ঘোঁট-সভায় তাহাদের দোষগুণ সাব্যস্ত হইয়া গেলে স্বামী স্ত্রীর বাঁ-হাত হইতে লোহার খাড়ু খুলিয়া লয় ও একখানা লাঠি দুখণ্ড করিয়া ভাঙ্গে। ছয়মাস পর্য্যন্ত এই স্ত্রী খোরাক-পোষাকের দাবী করিতে পারে। সে ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। কোন কোনও জেলায় এই বিবাহ অতি সাধারণ ঘটনা। স্বামীই সাধারণতঃ পত্নী-ত্যাগের ব্যবস্থা করে, স্ত্রীও কখন কখন স্বামী ত্যাগ করে।

তেঁতুলে বাগ্‌দী ছাড়া অন্যান্য বাগ্‌দী শ্রেণীরা তাহাদের অপেক্ষা পর্য্যায়ে বড় হইলেই তাহাদিগকে নিজের দলে গ্রহণ করে। শুধু ভোজের জন্য জাতির মোড়ল বা পঞ্চায়েৎকে ১০৲ বা ১৫৲ টাকা দিলেই হইল। স্বজাতিদের সঙ্গে প্রথমে একসঙ্গে প্রকাশ্য খাওয়া-দাওয়া হয়। দুলেদের বেলা এইরূপ ব্যাপারে পাল্কী-বহনেরও অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহা দ্বারা জাতিভেদ-প্রথাই সমর্থিত হয়। অন্যান্য জাতির মধ্যে কোনও স্ত্রীলোক অপর জাতীয় কাহারও সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করা হয়; কিন্তু বাগ্‌দী ও বাউরীরা শুধু যে অন্য জাতির সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীলোকদের থাকিতে দেয়, তাহা নহে, বরং ক্রমশঃ নিজেদের দলে তাহাদিগকে গ্রহণ করে। সেই-সমস্ত লোকেরা বাগ্‌দী স্ত্রীর রাঁধা ভাত খায় বলিয়া ক্রমশঃ নিজের দল হইতেই জাতিচ্যুত হয়।

খাটালের দুলে, মেটে ও বেইসেরা বারদিনে শ্রাদ্ধ করে। ইহাদের অশৌচে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তেঁতুলে ও কুশমেটেদের ৩১ দিনে, ত্রয়োদশাদের ১৩ দিনে ও ওড়িষার নোড়াদের ১১ দিনে অশৌচ যায়। বাগ্‌দীদের পণ্ডিতের অশৌচ দশ দিন। দুলে বাগ্‌দীরা কোথাও কোথাও জলাচরণীয়। হুগলীতে তারা জলাচরণীয় নয়। তবে তারা গঙ্গাজল আনিতে পারে। ঘী, তেল ও শুকনা জিনিসও তারা আনিতে পারে।

বাগ্‌দীরা সাধারণতঃ মৃতদেহ পুড়াইয়া ফেলে। চিতাভস্ম নদী বা পুকুরে ফেলিয়া দেয়। ওলাউঠা বা বসন্তে মরিলে ইহারা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে। সময়ে সময়ে ফেলিয়াও দেয়।

বাগ্‌দীদের ভিতর যাহারা বৈষ্ণব, তাহারা কোন মাংস খায় না। কোন কোন বাগ্‌দী সকল রকম মাংসই খায়—গোমাংস, শূকরমাংসেও তাহারা গররাজি নয়। তেঁতুলেরা গোমাংস খায় না। দুলেরা কচ্ছপের মাংস খায়। বাগ্‌দী পূর্ব্বে আদিমধর্ম্মী ছিল। ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মের ছায়ায় আসিয়া ইহাদের মধ্যে অনেক হিন্দুদেবতার পূজা স্থান পাইয়াছে। ইহাদের হিন্দু পূজাগুলি দেখিলে বুদ্ধির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিপূজা, গোঁড়া হিন্দুর পূজা ও আদিম পূজা, তিনই আছে। যে বাগ্‌দীরা যত হিন্দু-ঘেঁসা, তাহাদের ধর্ম্ম ততটুকু সংস্কৃত। বাগ্‌দীদের সাধারণতঃ পূজার পুরোহিত

থাকে না। যাহারা পূজা করে, তাহাদের মধ্যে মাংস প্রভৃতি ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সকল বাগ্‌দীরা ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহাদিগকে ইহারা পণ্ডিত, ফকির, কবি বা নারায়ণ বলে। কামার বা জেলেরাও কখন কখন পূজা করে। ইহাদের ধর্ম্মঠাকুর নানাস্থানে নানারূপ। এক এক জেলায় বহুপ্রকারের ধর্ম্মঠাকুর। এক মেদিনীপুর জেলায় বহু প্রকারের ধর্ম্মঠাকুর। ঘাটালে, নাড়াজোলের নিকট বাছড়ায়, জয়নগর ও অজিরা পলসপাইএ ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজারীকে কবি, ফকির ও নারায়ণ বলে। গোবিন্দপুরের ধর্ম্মঠাকুর কাঁকড়া-বিছা; বড়দা, হরিদাস-পুরেও তাই। দাসপুরের নিকট বলিহারপুরে ধর্ম্মের নাম "গেঁড়িবুড়ী ধর্ম্ম"। ঘাটালের ধর্ম্ম—বুড়ারায় ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মের পূজা করে জেলে। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে ধর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে। এ ছাড়া ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত শীতলাপূজা হয়। এই পূজাকে ইহারা দেশপূজা বলিয়া থাকে। মনসা-পূজা ইহাদের নিকট বড়ই প্রিয়। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাসের ৫ই ও ২০এ তারিখে ইহারা মনসা-পূজা করে। এই পূজায় ভেড়া ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। ফল ফুল, মিষ্টান্ন, চাউল প্রভৃতি পূজার উপকরণ। মনসা হংসবাহিনী, মনসার চারি হাত। প্রতি হাতে কেউটে সাপ। পূজার সময় দেবীকে গান বাদ্য করিয়া গ্রামে ঘুরাইয়া আনা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে ইহারা দশহরা স্থাপন করিয়া থাকে। আশ্বিন-সংক্রান্তিতে গুণিনীপূজা ইহাদের হইয়া থাকে। ইহারা শ্রাবণ মাসের শনি-মঙ্গল বারে ঢেরা-পূজা করিয়া থাকে। ভাদ্রে আরঙ্গ-পূজা হয়। ইহারা সাঁওতালী ঠাকুরেরও পূজা করে। গুসাই এরা, বর-পাহাড় বা মরংবুরুর পূজাই প্রধান সাঁওতালী ঠাকু-রের পূজা। ইহাদের মধ্যে "সংসারী মায়ীর" পূজাও খুব প্রচলিত। ইনি কালীমূর্ত্তি। এ ছাড়া ইহারা 'শ্যাম-সিং' ও 'ভবানী পরমেশ্বরের'ও পূজা করে। ইহাদের আর-একটি পূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাঁকুড়ার ও মানভূমের বাগ্‌দীরা ভাদ্র-সংক্রান্তিতে ভাদু-প্রতিমা লইয়া মিছিল বাহির করে। ভাদু পঞ্চকোটের এক রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি আজীবন কুমারী ছিলেন। ভাদু-পূজায় উদ্দাম নৃত্যগীত চলে। পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা, সকলেই নৃত্যগীতের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই আখ্যায়িকার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছোটনাগপুরের রাজপুত-পরিবারের মত পঞ্চকোটের রাজাদেরও মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড় দুঃসাধ্য ছিল। সেইজন্য মেয়েদের তাঁহারা ঘরে অবিবাহিত রাখিতে বাধ্য হইতেন, এবং যত দিন না যৌবন-অবস্থা অতিবাহিত হইত, ততদিন কুমারীরা অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না।

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

জাতীয় সমস্যা

মকবুল্, ১লা জুলাই, ১৯২২

এতকাল জীবনটাকে কেবল কাব্য হিসেবেই দেখে এসেছি, এইবার কর্ত্তব্য হিসেবে দেখ্‌বার তাগিদ্ এসেছে। ভয় পেয়ো না—ও থেকে মনে করে' নিও না যে এর পর থেকে আমার চিঠিতে যা পাবে সে হচ্ছে কেবল moral lectures, dissertations on domestic virtues—মোটেই নয়। কেননা আমার মতে কর্ত্তব্যকে জখম করার সবার চাইতে প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তা থেকে রং চেঁচে ফেলে রস নিঙড়ে নিয়ে তাকে অত্যন্ত রকমের একটা official চেহারা দান করা। কর্ত্তব্য ও কাব্যের মধ্যে যে একটা ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধ একথা আমি মানি নে। প্রথম মাতা তার প্রথম শিশুকে যখন বুক ভরে' পেয়েছিল তখন তার প্রাণে কি ফুটেছিল? নিশ্চয়ই কাব্য। ঘুমপাড়ানির গান খুকুমণির ছড়া ইত্যাদি তার

প্রমাণ। অথচ মাতা ও শিশুর মধ্যে একটা কতবড় কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ রয়েছে। প্রথম তরুণ যখন প্রথম তরুণীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল তখন দুজনের অন্তরে কতবড় কাব্য আপনাকে উন্মুক্ত করেছিল যার নিরিখ জগতের প্রত্যেক জাতি যুগে যুগে পুঁথিপত্রে রেখে গেছে। অথচ তরুণ-তরুণীর মধ্যে ঘর-গেরস্থালীর একটা কতবড় কর্ত্তব্য বর্ত্তমান। ঐ কাব্যের গুণে ঘর-গেরস্থালীর চেহারাই বদ্‌লে যায়। তখন শোবার ঘর হয় শয়ন-মন্দির; তক্তাপোষ হয় পালঙ্ক—আরো কত কি। তখন জ্যোস্নারাতে হাস্নুহানা—বাদল-রাতে বৈষ্ণব কবিতা,—তখন বাঁশীর স্বর শোনা যায়, সারেঙ্গীর ঝঙ্কার বেজে ওঠে—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট কাব্য। কিন্তু আসল বিষয়টি কি? একটা অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভগবানের আদেশ—সৃষ্টি রক্ষা কর।

তারপর আরো দেখ এ যুগে স্বদেশ-প্রীতির চাইতে বড় ধর্ম্ম আর কিছু নেই, দেশের সেবার চাইতে বড় কর্ত্তব্য আর কিছু নয়। অথচ এই দেশপ্রীতির সঙ্গে যে জড়িয়ে রয়েছে একটা কাব্য সে সম্বন্ধে কোনই ভুল নেই। আসলে দেশসেবা দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপর? কাব্যের উপর—একেবারে literally, যুগে যুগে কাব্য ও কবিতাই দেশ-সেবার প্রাণ দিয়েছে। তুমি কি মনে কর এ না হ'লে Aux armes citoyens ফরাসীর রাজতন্ত্রের Formex voz bataillons ধ্বংস হত? আমি কিন্তু তা মনে করি নে। ১৯০৫ সালে যে-স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ'ল তা কি মনে কর কেবল লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের জন্যে? ওর পিছনে যে কত বৎসরের বাঙালীর মনের ও বাঙ্‌লায় লেখা কাব্য আছে তার ঠিক নেই।

"কত কাল পরে বল ভারত রে
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে!"
"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়!"
"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনি সুন্দরি
যমুনে ও।"
"সুজলাং সুফলাং মলজয়শীতলাং!"
"আর চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে নবদ্বীপ!"—

ইত্যাদি কত কাব্য যে ঐ স্বদেশী আন্দোলনের সাম্‌নে পিছনে অন্তরে আছে তার হিসেব দিতে গেলে একটা ছোটখাট পঞ্জিকা হ'য়ে পড়ে। আসলে যুদ্ধক্ষেত্রই বল আর বিবাহসভাই বল এ দুয়ের পিছনেই বাঁশীর স্বর চাই, নইলে মানুষ মেতে উঠ্‌তে পারে না। তাই দেখ বিবাহ-সভায় বাজে সানাই, আর যুদ্ধক্ষেত্রে বাজে ব্যাগ্‌পাইপ্‌ ইত্যাদি। আর মানুষ মেতে না উঠ্‌লে তার দ্বারা অসাধারণ কাজ কিছুই হয় না। আর যুদ্ধ করাই বল আর বিবাহ করাই বল, এ দুইই যে সাধারণ নয় তা যারা যুদ্ধ করেছে ও করে নি এবং যারা বিয়ে করেছে ও করে নি এ রকম লোকের কাছেই জিজ্ঞেস কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বে।

আগের চিঠি পাওয়ার দুমাস পরে তোমার এই চিঠি পেলুম। এই দুমাসে দেখ্‌ছি তুমি একজন মস্ত world politician হয়ে উঠেছ, তোমার চিঠিতে লেনিন, আফগান আমির থেকে আরম্ভ করে' চ্যাং-সো-খিনের পরাজয়-বার্ত্তা ও সান্‌-ইয়াত্‌-সেনের পলায়ন-বার্ত্তা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় নি। এবং সমস্ত বিষয়েই তুমি এমন গম্ভীর ভাবে মতামত প্রকাশ করেছ যেন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তোমার স্থানটি লয়েড্‌-জর্জ্জের মতোই important বা মুস্তাফা কামালপাশার মতোই বিশিষ্ট। তোমার চিঠি পড়ে' অবশ্য আমার হাসি পেয়েছে। কেন জান? কেননা তোমার চিঠিতে আর সব দেশেরই আলোচনা আছে, নেই কেবল তোমার নিজের দেশের সম্বন্ধে। অবশ্য এতে হাসি পেলেও আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। কেননা আমাদের শিক্ষাই হয়েছে ঐ রকম। আমরা পানিপথের যুদ্ধের তারিখ জানি নে, কিন্তু শার্লেমা কবে কেমন করে' সাম্রাজ্য বিস্তার কর্‌ল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর আমরা রাখি।

এই অস্বাভাবিকতাকে আমাদের ঠেলে ফেল্‌তেই হবে। মানুষের সাধনার একটা ধারা আছে, তার মনের অনুভূতির একটা ক্রম আছে। তোমার আমার মতো লোক, যাদের মনের পরিধি পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে যায় না, তাদের মুখে বিশ্বমানবের জন্য হা-হুতাশ করা অত্যন্ত খেলো শোনাবেই। যে বৃহৎ

বস্তু আমাদের অনুভূতিতে সত্যি করে, নেই সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তায় বাইরের কিছুই আসে যায় না। বিকট বস্তুবিশ্বকে ঘিরে যে একটা বিশাল চিন্তাজগৎ আছে সে চিন্তা-জগৎকে আমরা ধাক্কা দিতে পারি—আমাদের মনের মিথ্যা চিন্তা দিয়ে নয়, আমাদের আত্মার সত্যানুভূতি দিয়ে। বিশ্বমানবের সত্যি উপকার একমাত্র তাঁদের দ্বারাই সম্ভব বিশ্বমনের সঙ্গে যাঁদের আত্মার সত্য যোগ হয়েছে।

আমার মনে হয় ঠিক ঐ একই কারণে আমাদের দেশ-সেবাতেও আমরা প্রচুর সফলতাকে আকর্ষণ করতে পারছি নে। আমাদের অধিকাংশেরই আত্মা প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক আত্মা। পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আমাদের মনের এমনি একটা সত্যিকার সন্তোষ, এমনি একটা সত্যিকার তৃপ্তি আছে, যে, আমরা নিজেরা সার্থক হবার জন্য ওর চাইতে বড় আর কোন প্রশস্ততর ক্ষেত্রের অভাবই অনুভব করি নে। আমাদের আত্মার মধ্যে অনিবার্য্য রকমের বৃহৎ এমন একটা কিছু নেই যা পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আঁটতেই পারে না। আমাদের পলিটিক্যাল প্রচেষ্টার পিছনে আছে একটা পারিবারিক মন। আমাদের রাজনৈতিক সাধনায় সিদ্ধি ততদিন কিছুতেই অনিবার্য্য হয়ে উঠবে না যতদিন আমাদের মন পরিবারের মধ্যে আপনার পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে থাকবে। তাই আমার মনে হয় আমাদের সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার গোড়াকার কাজ হচ্ছে আমাদের সমাজের পারিবারিক মনকে জাতীয় করে' তোলা—অর্থাৎ domestic mindকে national mindএ পরিণত করা। তবেই আমাদের মধ্যে সেই পদার্থের জন্ম হবে যে পদার্থ সকল বস্তু বা বিষয়কেই জাতির দিক থেকে দেখবে, আপন আপন পরিবারের দিক থেকে নয়। ব্যক্তির সফলতা যেমন পরিবারে, তেমনি পরিবারের সফলতা নেশানে। ব্যক্তির বৃহত্তর সফলতা যেমন পরিবারে, ব্যক্তির তার চাইতেও বড় সফলতা তার নেশানে,—এ জ্ঞান তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই জ্ঞান মানুষকে যে শক্তি দেবে সে শক্তির পরাজয় স্বীকার করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে সত্যিকার করে' ঐ মনের জন্ম হ'লে আমাদের জাতীয় অনেক সমস্যাই সহজ হ'য়ে উঠবে এবং দেশের সবার চাইতে বড় সমস্যাটিরও সমাধান হবার সত্য সুযোগ উপস্থিত হবে। এই বড় সমস্যাটি হচ্ছে আমার মতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এটা সবার চাইতে বড় সমস্যা, কেননা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিখিত হবে তার মূল সুরটি নির্ভর করবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন বা বিরোধের উপর। অন্ততঃ আমার এই মত।

অথচ লক্ষ্য করেছ হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনই হোক্ বা বিরোধই হোক্ সে-সম্বন্ধে আমরা কোনই আলোচনা করি নে। ঐ একটা মস্ত প্রমাণ যে ওই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের সবার মনেই একটা গভীর বেদনা আছে। এই বেদনাকে আমরা অতি যত্নে ঢেকে রেখেছি। আমাদের ভয়,—পাছে সে বেদনার উপরে কেউ আঘাত করে' বসে। কিন্তু নিস্তার নেই। কথার আঘাতকে আমরা চিরকাল এড়িয়ে চলতে পারব না। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তা পারি তবে ওর চাইতে বড় অমঙ্গল আর কিছু হবে না। কেননা কথার আঘাতকে এড়িয়ে চলবার সামর্থ্য কথার চাইতে প্রত্যক্ষ বস্তুর আঘাতকেই প্রস্তুত করতে থাকে। আজ যদি আমরা হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে প্রাণ খুলে খোলাখুলি ভাবে একটা আলোচনা সুরু করি তবে খুব সম্ভব দু'দিন যেতে না যেতে তা গালাগালিতে পরিণতি লাভ করবে; কিন্তু ঐ গালাগালিকে আজ যদি ভয় করে' চলি তবে কাল আমাদের লাঠালাঠি করতে হবে। লাঠালাঠি জিনিষটাকে আমার আর্টিষ্টিক বলে' মোটেই মনে হয় না। কাজেই হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে একটা আলোচনা তোমার সঙ্গে সুরু করছি। অবশ্য গালাগালিটাকেই যে আমার আর্টিষ্টিক বলে' মনে হয় তা নয়, তবে ও জিনিষটি আর্ট-মাফিক্ চলতে পারে।

সবার চাইতে আমার কি মনোযোগ আকর্ষণ করে জান? হিন্দু-মুসলমানের মিলন—এই ত্রিপদ-বিশিষ্ট বাক্যটি। আমাদের এই দেশে হিন্দু আছে, মুসলমান

আছে, ক্রিশ্চিয়ান আছে, বৌদ্ধ আছে, জৈন আছে। কিন্তু আমাদের পলিটিক্যাল গেরস্থালীতে হিন্দু-ক্রিশ্চিয়ান বা মুসলমান-ক্রিশ্চিয়ান মিলন এমন কথা শোনা যায় না, যা শোনা যায় সে হচ্ছে ঐ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা। এর ভিতরের নিগূঢ়তম অর্থটা কি? এর সাইকো-অ্যানালিসিস্ করলে কি পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে এই যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোথায় একটা সত্যিকার বিরোধের বীজ সজীব হয়ে আছে, যা তেমন হাওয়া তেমন আলো আর তেমন রস পেলে কচি পাতা মেলে দিতে পারে যখন-তখন,—তা খাইবার-গিরিসঙ্কটই সঙ্কটময় হয়ে উঠুক কিম্বা আরব-সাগরই উথ্‌লে উঠুক।

এখন ওকথা যদি মান—আর না মেনে উপায়ই বা কি?—আমি তোমাকে কথাটা বল্‌তে ইতস্ততঃ কর্‌ছি—কিন্তু সত্যি কথা গোপন রাখ্‌লেই যে তা মিথ্যা হ'য়ে উঠ্‌বে তা' নয়—সুতরাং তোমায় বল্‌ছি। যখন নন-কো-অপারেশন দহরম-মহরম জোর চল্‌ছিল এবং কি কংগ্রেসী বৈঠকে কি মুস্‌লিম লীগের মজ্‌লীসে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-ভেরী বাজ্‌ছিল, তখন আমি কয়েকজন শিক্ষিত হিন্দুর মুখে এই সন্দেহ প্রকাশ পেতে শুনেছি যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন যে কি করে' হবে ইত্যাদি। কোন কোন হিন্দুর মনে যখন এই সন্দেহ আছে তখন এ কথা ধরে' নেওয়া যেতে পারে যে প্রত্যেকটি মুসলমানের মনও ও-বিষয়ে নিঃসন্দেহ নয়। কেননা মুসলমান ধর্ম্ম আর যাই হোক খৃষ্টের ধর্ম্ম নয়।

সে যা হোক্—এখন এ-কথা যদি মান যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাস্তবিক কোথাও একটা বিরোধের বীজ রয়েছে, তবে ধামা-চাপা না দিয়ে তা যত আলোকে টেনে নিয়ে আসা যায় ততই মঙ্গল। কেননা আলোকের জন্ম হচ্ছে সূর্য্য থেকে। এবং সূর্য্য হচ্ছে সেই বস্তু যা সকল প্রকার ব্যাধির বীজাণুকে ধ্বংস করে। অন্ততঃ আলোক জিনিষটা যে অন্ধকারকে দূর করে সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আর বিরোধ অপ্রেম প্রভৃতি জিনিষগুলি অন্ধকারেরই তালিকাভুক্ত।

এখন তা যদি হয়, তবে সবার প্রথমে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার এই বিরোধের কারণ কি? আসলে যে-কোন বিরোধেরই কারণ কি? বিশ্লেষণ করতে করতে দেখা যাবে যে ওর মূলে যে-বস্তু থাকে সে-বস্তুর নাম হচ্ছে ভয়। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূল কারণ হচ্ছে ভয়। হিন্দুর সম্বন্ধে মুসলমানের মনে ভয় আছে ও মুসলমানের সম্বন্ধে হিন্দুর মনে ভয় আছে।

মুসলমান যে হিন্দুকে ভয় করে সে হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের জন্য। মুসলমান-সমাজের এই একটা সন্দেহ আছে যে যে-ক্ষমতা আজ ইংরেজদের হাতে আছে সে ক্ষমতা দেশের বুকে পড়লে সংখ্যায় বেশী হিন্দুরা তা লুফে নেবে এবং সংখ্যায় কম মুসলমানদের কোণ-ঠেসা করে' রাখ্‌বে—ফলে তাদের উপর অত্যাচার হতেও আটক থাকবে না। এক কথায় মুসলমানের ভয়—ভারতবর্ষের স্বরাজ হবে আসলে হিন্দুস্থানের স্বরাজ, আর মুসলমান-সমাজের অবস্থা হবে কড়া থেকে চুলোয় পড়া।

এ ছাড়া হিন্দুর সম্বন্ধে মুসলমান-সমাজের মনে আর কোন ভয় আছে কি না তা তুমি বল্‌তে পার, কিন্তু আমি জানি নে। তবে হিন্দুসমাজের মনে মুসলমান সম্বন্ধে কি ভয় আছে তা আমি বিশেষ জানি। সুতরাং তারই নিরিখ তোমার কাছে একটা ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।

মুসলমানদের সম্বন্ধে সবার প্রথমে আমাদের যা মনে হয় সে হচ্ছে এই যে তাঁদের এদেশে একটা অতীত ছিল এবং এ দেশের বাইরে একটা বর্ত্তমান আছে। এ-দেশে তোমরা বাদ্‌শাহী হারিয়েছ দেড় শ বছরও হয়নি—এবং সেটা তোমাদের মনে থাক্‌বারই কথা। আমাদের ভয় হয় পাছে তোমরা ভারতবাসীর স্বরাজের স্বপ্নের বদলে ভারতবর্ষের বাদ্‌শাহীর স্বপ্ন দেখ্‌তে থাক। তার পর তোমরা যেমন আমাদের সংখ্যাধিক্যে ভয় পাও, আমরা তেমনি ভয় পাই তোমাদের সংহত হবার শক্তিতে। হিন্দু সংখ্যায় বেশী হোক্ কিন্তু তার মধ্যে সেই বন্ধন নেই যে-বন্ধনের জোরে সমস্ত হিন্দুসমাজ একটা dynamic শক্তি হয়ে উঠতে

পারে—যে শক্তিতে হিমাদ্রি থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত তারা এক কণ্ঠে এক মন্ত্র বজ্রনির্ঘোষে গেয়ে উঠ্‌তে পারে। এ সমাজ ছাড়া-ছাড়া কাটা-কাটা—এর নাড়ীতে নাড়ীতে সেই যোগ নেই যাতে করে' এ সমাজের একখানে আঘাত পড়্‌লে তার ব্যথার সাড়া সবখানে অনুভূত হবে। হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে এ-সত্যের অল্প-বিস্তর প্রমাণ সেকেন্দর সার আমল থেকে আরম্ভ করে' জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাল পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে।

অপরপক্ষে মুসলমানদের কথা। ক্রিশ্চিয়ান ইয়োরোপের সমস্ত জাতিগুলো ক্রিশ্চিয়ান হলেও তাদের বিশেষ পরিচয় হচ্ছে ফরাসী জার্ম্মেন ইংরেজ ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান-জগতের লোকগুলো আফগান তুর্কী পারসীক হলেও তাদের প্রধান পরিচয় হচ্ছে যে তারা মুসলমান। হজরত মহম্মদের ধর্ম্মের এই দানকে যখন সমস্ত মুসলমান-সমাজের মধ্যে সজ্ঞান করে' তোল্‌বার চেষ্টা দেখি এবং নাইল থেকে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের Pan-Islamismএর এক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌বার উপক্রম দেখি, তখন স্বভাবতই আমাদের ভয় হয় পাছে ঐ মন্ত্র হিন্দুকুশের এ-পারেও এসে হাজির হয়। তাই যখন কোন মুসলমানকে বল্‌তে শুনি I am first a Musalman then an Indian তখন আমরা স্বস্তি বোধ করিনে।

ঠিক ঐ কারণেই নন্‌কোঅপারেশনের খিলাফত আন্দোলনকে আমরা অনেকেই অবিমিশ্র ভক্তির চোখে দেখ্‌তে পারি নি, কেননা তাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভয়ও মিশে গিয়েছিল। ভুল বুঝো না। আমি এ-কথা বল্‌ছি নে যে খিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতের মুসলমান সবাই উদাসীন হোক্। কোন হিন্দুর মুসলমান-সমাজকে এ-কথা বল্‌বার অধিকার আছে বলে' আমি মনে করি নে। বিশেষতঃ মুসলমান-ধর্ম্মের ভিতরের কথা আমরা এত কম জানি। মুসলমান-সমাজের সঙ্গে খিলাফতের সম্বন্ধ যে কি এবং ধর্ম্মের যা প্রধান কাজ মানুষের মধ্যেকার অধ্যাত্ম-জগৎকে পরিস্ফুট করে' তোলা, মুসলমান ধর্ম্মের সেই সাধন-রহস্যের সঙ্গে খলিফারি সম্বন্ধ যে কি, এ-সব সম্বন্ধে আমরা প্রায় সবাই নিরেট। তবে এই কথাটা আমি তোমাকে বল্‌তে চাই যে ভারতবর্ষের কোন জাতি বা সম্প্রদায়-বিশেষের একটা গভীর বন্ধন একটা প্রধান বন্ধন যদি কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সত্যি-সত্যিই থাকে তবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-গঠনে তা বাধা সৃষ্টি কর্‌তে বাধ্য।

এই কথাটা আমরা মনে করে' রাখিনে যে রাষ্ট্র গড়া বা নেশান গড়ার বড় সাধনা চলে পলিটিক্‌সের বাইরে। এ-সাধনা চলে সেইখানে যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষ প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক জাতি নিবিড়চিত্তে নিবিষ্টমনে সত্যি করে' ভাব্‌তে পার্‌ছে এই কথা যে—"এই আমার দেশ, এই আমার জন্মভূমি মাতৃভূমি, এইখানে আমার লাভ হবে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।" যেখানে সহজ মানুষ অপ্রমত্ত অবস্থায় সরলভাবে বল্‌তে পার্‌ছে—"এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।" কিন্তু কোন মানুষ বা সম্প্রদায় প্রাণ খুলে ও-কথা কিছুতেই বল্‌তে পার্‌বে না, যদি সেই মানুষ বা সম্প্রদায়কে এই চতুর্ব্বর্গের প্রথম ও প্রধান বর্গটার জন্যে বা আর-কোন বর্গের জন্যে ভিন্ন-কোন দেশের দিকে চেয়ে থাক্‌তে হয়। তেমন মানুষ বা সম্প্রদায় আপন দেশের নেশান গঠনে যে উপাদান জোগাবে সে উপাদানে একটা অনিশ্চয়তার বীজ থেকেই যাবে। তাই যখন খিলাফতকে প্রধান আশ্রয় করে' কংগ্রেস-মণ্ডপে হিন্দু-মুসলমানের মিলন দেখি, তখন এ-কথা আমি মনে না করে' পারি নে যে ওটা আসলে ভারতীয় নেশান গড়্‌বার সত্যিকারের গ্রন্থি নয়, ওটা আসলে হচ্ছে ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কাজিয়া কর্‌বার একটা মন্ত্র এবং এ এমন একটা মন্ত্র যা দিয়ে মুসলমান জনসাধারণকে অতি সহজেই আকর্ষণ করা গিয়েছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাই মনে জাগে যে শেষ পর্য্যন্ত হয় ঐ খিলাফত টিক্‌বে না, নয় ঐ মিলন টিক্‌বে না।

এবং এই যে আকর্ষণ করা গিয়েছে এইটেই প্রমাণ যে ভারতবর্ষের মুসলমানের প্রাণ রুমের বাদ্‌শার দিকে যতটা আছে ভারতের নেশান গড়ার মধ্যে

ততটা নেই। কি হিন্দু কি মুসলমান চিন্তাশীল মাত্রেই স্বীকার করবেন যে ঐ অবস্থা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে নিঃসন্দেহ ভাবে অনুকূল নয়।

আসলে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নিরিখ—পলিটিক্যাল প্ল্যাট্‌ফরমে তাঁরা ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দেবার জন্যে কতটা কণ্ঠ মিলিয়েছেন তা নয়; তা হচ্ছে, সহজ-জীবনে তাঁদের মন কতটা পরস্পরের প্রতি অনুকূল হয়েছে; দৈনন্দিন জীবনে যেখানে পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য হাসিল্ করবার মৎলব নেই বা ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে তুর্ক সাম্রাজ্যের জন্য কোন কিছু আদায় করবার ষড়যন্ত্র নেই, সেইখানে তাঁরা কতটা পরস্পরের আপনার হয়ে উঠেছেন। যেটা দেখবার বিষয় সেটা হচ্ছে এইটে যে হিন্দু-মুসলমান নিবিড় চিত্তে নিবিষ্ট মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যি করে' ভাবতে পারছে কি না—"এই আমার দেশ, এই আমার জন্মভূমি মাতৃভূমি, এইখানে আমার লাভ হবে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এ ছাড়া আর আমার গতি নেই, উপায় নেই।" এই হলেই তখন দেখব হিন্দু-মুসলমানের সত্যিকারের মিলন সহজ হয়ে গিয়েছে। এই মিলনের ফলে তাদের কণ্ঠ মিলিত হবে, সেই মিলিত কণ্ঠের পিছনে এমন একটা শক্তি জাগবে যে শক্তি বেয়োনেটেও বিদীর্ণ করতে পারবে না, বা বম্বেও বিধ্বস্ত করতে পারবে না।

মহাজরীনদের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। ঐ মহাজরীনদের মহাপ্রস্থান ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমান-সমাজের একদল লোকের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তা তাঁদের ধর্ম্মভাবের যে নিশানাই হোক না কেন, Indian Nationalismএর পক্ষে যে তা মারাত্মক তা তোমার কাছে নিশ্চয়ই প্রমাণ করে' দেখাতে হবে না। কিন্তু ঐ মহাজরীন্ ব্যাপারে আমাদের একটু বিশেষ রকম লাভও হয়েছে। ওতে আমাদের দেশের ভাব ও কল্পনা-প্রবণ মুসলমান-ভ্রাতাদের এক তুড়িতে বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছে। এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে টের পেয়েছেন যে, এ পরিচয় একটুও মোলায়েম নয়। পুরুষানুক্রমে-এদেশে-বাস-করা ছ' কোটী মুসলমানের দেশান্তরী হওয়া যদি সম্ভব হ'ত তবে তাঁদের ধর্ম্ম-সমস্যার নিশ্চয়ই সমাধান হ'য়ে যেত, এবং আমার বিশ্বাস ভারতের নেশান গড়ার জটিল সমস্যারও জটিলতা অনেক পরিমাণে কমে' যেত। কিন্তু তা সহজও নয়, সম্ভবও হয়। এটা আপ্‌শোষের কথা কি না জানি নে, কিন্তু ধর্ম্মের অনুশাসন যতই অপৌরুষেয় হোক না কেন, এটা আমরা নিত্যই দেখতে পাই যে ধর্ম্মের শাস্ত্রের পৃষ্ঠার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে মিলিয়ে মানুষের জীবনের গ্রন্থ চিরকাল লিখিত হয় না। ধর্ম্মের সনাতনত্ব সেইখানে যেখানে মানুষের জীবন অ-লৌকিক—মানুষের লৌকিক জীবন হচ্ছে তার দৈনিক জীবন। দৈনিক জীবনে তার হাজার বিচিত্র ঘটনা বিচিত্র মানুষ বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে—কোথাও অনুকূল, কোথাও প্রতিকূল—তাই তার কোথাও আকর্ষণ কোথাও বিকর্ষণ—তাই তার বেঁচে থাকবার জন্যে ক্রমাগত তার হাতে নব নব শাস্ত্র নব নব কর্ম্ম গড়ে' উঠছে। নইলে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই বিচিত্রতাকে অস্বীকার করে' কোন এক অতীতকে বড় করে' জীবনে প্রতিফলিত করে' ধরবার চেষ্টার একমাত্র ফল হচ্ছে এ জগতে পতিত হ'য়ে থাকা। বেদের জ্ঞানকেই আমরা চিরন্তনের বলে' জানি—তার কর্ম্মকাণ্ডকে কে সনাতন করে' রাখবে?

তাই আমার মনে হয় যে আজকার ভারতীয় মুসলমানদের দরকার তাঁদের জন্মভূমি ও কর্ম্মভূমির সঙ্গে তাঁদের ধর্ম্মভূমির একটা নব সামঞ্জস্য স্থাপন করা। যার ফলে তাঁদের মন থেকে Indian ও Musalmanএর বিরোধ মুছে যাবে। কেন না I am first a Musulman and then an Indian এ কথার পিছনে যে মন আছে সে-মনে এই বিশ্বাস আছে যে ভারতীয়ত্ব মুসলমানত্বের লাঘব করতে পারে। তাই জন্মভূমি ও ধর্ম্মভূমির মধ্যে নব সামঞ্জস্য স্থাপন করে' ঐ বিরোধের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বিনাশ করতে একদিন না একদিন হবেই। তখন আর এ দেশের কোন মুসলমানের মুখে I am first a Musulman then an Indian এ কথা শুনব না—তখন সকল মুসলমানের মুখ থেকে স্বতঃ এই কথাই বেরুবে যে, I am always an Indian Musulman আর

তখন আধুনিক ভারতবর্ষের একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রগঠনের পথ থেকে সবার চাইতে বড় বাধাটা অন্তর্হিত হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে যা মনে হ'ল তাই তোমাকে লিখ্‌লুম।

এ চিঠি এই খানেই শেষ করি। আমার এ চিঠিটা মৌলভী সাহেবকে দেখাবে। তিনি যেমন গোঁড়া কংগ্রেসী পলিটিশিয়ান্‌ তাতে হয়ত চিঠিটা পড়ে' চটে যাবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জান্‌বার জন্য আমার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রশান্ত

ইংরেজ শ্রমজীবী ও ভারতবর্ষ

তিন বৎসর পূর্ব্বে দেশ হ'তে যখন ইংলণ্ডে আসি, তার কিছু পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বিলাতফেরত অধ্যাপক ও বন্ধুদের মুখে শুনতুম, আমাদের দেশের ইংরেজই যা খারাপ, বিলেতের ইংরেজকে বুঝিয়ে বল্লে সে বোঝে, ও আমরা তাদের বুঝিয়ে বল্লে তারা বুঝ্‌বে। কবি রবীন্দ্রনাথও বহুদেশ ঘুরে ও দেখে তাঁর "ছোট ও বড়" প্রবন্ধে এই কথাই বলেছিলেন। তখন দেশের লোকেদের, অন্ততঃ বুদ্ধিজীবীদের, মনে, বোধ হয় পূর্ণ স্বাধীনতার কল্পনা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেনি। তারপর দেশের লোকের মত পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আসে। তাঁরা বল্লেন, না, দুজনেই ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিষয়ে একমত; স্বাধীনতা দেবে না। তখনও কিন্তু দেশের নেতাদের ইংরেজদের একটি বিশেষ দলের প্রতি বিশ্বাস ছিল—ইংলণ্ডের শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের উপর। এ বিশ্বাসের ফলে তাঁরা ইংলণ্ডে একখানা কাগজ চালাতেন ও তাদের কাগজকেও আর্থিক হিসাবে সাহায্য কর্‌তেন। কিন্তু অসহকার-মতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সবই লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রমজীবীসম্প্রদায় আমাদের সাহায্য করবে না ঠিক এই ভেবে অথবা অসহকার-প্রথার জন্যই শুধু এ কাজটা করা হয়েছিল কি না বলা শক্ত। আপাতত দু বৎসর আন্দোলনের পর চিন্তাস্রোতের গতি কিছু পরিবর্ত্তিত হ'য়ে প্রাচীন পথে আবার ফিরে আস্‌বার কতক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কাগজ ও অন্যান্য-সূত্রে-পাওয়া সংবাদ হ'তে মনে হয়, দেশের বুদ্ধিজীবীরা আপাততঃ পূর্ণমাত্রার অসহকার ছেড়ে, সহকার ও আত্মনির্ভরতার সমন্বয় ক'রে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হ'তে ইচ্ছুক। এখানে ব'সে আমাদের ভয় হয়, পাছে ঢেউয়ের উল্টা টানে আবার ইংলণ্ডের শ্রমজীবী বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর ফিরে আসে। এক-আধজন ইংরেজ যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিক্ হ'তে ভারতবর্ষের সেবায় আকৃষ্ট হয়েছেন ও হ'তে পারেন, একথা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তাতে সম্প্রদায়বিশেষের মত প্রকাশ পায় না। ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের এক-আধজন নেতা আমাদের দেশ সম্বন্ধে দু এক কথা মাঝে মাঝে বলেন; এদের অন্যান্য নেতারাও নিজেদেরকে ভারতবর্ষের বন্ধু মনে করেন ও বলেন, কিন্তু সেটা কতদূর ফাঁকা আওয়াজ তা ভাল ক'রে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য এ প্রবন্ধে আমি শ্রমজীবীদের মনোভাবের পরিচায়ক একটি ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু লিখ্‌ব। সে বিষয়ে দেশে নিশ্চয়ই যথেষ্ট আন্দোলন হয়েছে ও হচ্ছে।

২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটার সময় উশান্টের কাছে পি এণ্ড্ ও কোম্পানীর মেল জাহাজ "ঈজিপ্ট" একটি ফরাসী জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কুড়ি মিনিটের মধ্যে ডুবে যায়। জাহাজে ইংরেজ খালাসী ও কর্ম্মচারী ছিল ৮৬ জন, আমাদের খালাসী ও খান্‌সামা ২০৮ জন, ও যাত্রী ৪৪ জন। তার মধ্যে যাত্রী ১৬ জন, আমাদের লোক ৪৯ জন ও সাদা খালাসী ২২ জন মারা যায়। বাকী লোক ফরাসী জাহাজে ও নিজেদের নৌকায় উঠে নিরাপদে তীরে পৌছায়। জাহাজে ১৮টি লাইফ্-বোট ৯৫৩টি লাইফ্-জ্যাকেট্ ছিল। প্রত্যেকটি নৌকাতে ৪৫—৫০ জন লোক বেশ ধরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোটমাট ৩৩৮ জনের মধ্যে ৮৭ জনের প্রাণরক্ষা সম্ভব হয় নি। সেজন্য ইংলণ্ডে বিশেষ একটি গোলমাল ওঠে—এজন্য দায়ী কে?

জাহাজ ডোবার পরদিনের ইংরেজী ও ফরাসী কাগজে দেখা যায়, "ঈজিপ্ট" অন্য জাহাজটির ঘা খেয়ে অল্পক্ষণের

মধ্যে একেবারে হেলে প'ড়ে; আঘাতটি এত বেশী জোরে লেগেছিল, যে, অনেক লোক ধাক্কার চোটে প'ড়ে গিয়ে বিশেষরূপে আহত হয়। এর পরদিনের কাগজে দেখা গেল, অনেকগুলি মৃতদেহের মাথায় ও অন্যান্য অঙ্গে বিশেষ আঘাতের চিহ্ন আছে। কিন্তু এই দিন হ'তে কাগজগুলির সুর বদ্‌লাতে আরম্ভ হয়। ইংরেজ যাত্রীরা এবার প্রাণরক্ষা ক'রে সুস্থ হ'য়ে নিজেদের কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। একজন বল্লেন, সবই লস্করদের দোষ; তারা নৌকা বোঝাই ক'রে নিজেরা চ'লে যায়। আর একজন বল্লেন, তারা বন্দুক ও ছুরি হাতে যাত্রীদের আক্রমণ করে ও এমনই ভীষণ মারামারি করে যে ধাক্কাধাক্কিতে অনেকের মাথা ফেটে যায়। ইংলণ্ডের কাগজগুলি তৎক্ষণাৎ লিখ্‌ল, ঐ যে মাথাফাটা মৃতদেহগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি এরই প্রমাণ। লস্কররা এ-সব জান্‌লও না, সুতরাং কিছু আপত্তিও কর্‌ল না; তা ছাড়া, তারা তখন নিজেদের প্রাণরক্ষার চিন্তাতেই ব্যস্ত। জাহাজ-ডুবির ফলে নিঃস্ব এই কালো লোকগুলির জন্য সাদা জাহাজ-কোম্পানি বিশেষ কিছু বন্দোবস্ত করা দর্‌কার বোধ করেননি; যদিও অবশ্য সেটা সাদা যাত্রীদের ও সাদা খালাসীদের জন্য করা হয়েছিল। তাদের কর্ত্তাদের সামান্য যা বন্দোবস্ত ও মাত্র ফরাসী সহরটির কর্ত্তৃবর্গের স্বেচ্ছায়-দেওয়া টাকার সাহায্যে, লস্কররা কোনও রকমে জীবিতাবস্থায় দেশে ফিরে যায়। গোলমাল কিন্তু এতেই মেটেনি। যাত্রীদের গল্প আরও রঙীন হ'য়ে হ'য়ে দিন দিন কাগজে বার হ'তে লাগ্‌ল; একজন বল্লেন, তিনি স্বচক্ষে একজন লস্করকে গুলি ছুড়ে একটি যাত্রীকে মেরে ফেল্‌তে দেখেছেন।

সে যাই হোক ২৪শে জুলাই তারিখে বোর্ড অফ্ ট্রেডের তরফ হ'তে এবিষয়ে তদন্ত আরম্ভ হয়। প্রথমে লস্করদের জন্য কোনও ব্যারিষ্টার ছিল না; তার পর তাদের জন্য ইণ্ডিয়া অফিস শ্রীযুক্ত বাক্‌নীল্‌কে কৌন্সিল নিযুক্ত করেন।

তদন্তের প্রারম্ভেই দেখা গেল, দুদল লোক তাদের নিজেদের স্বার্থ বজায়ের চেষ্টা করছে; তার মাঝে পড়ে লস্কররা প্রাণে মারা না গেলেও, তাদের অন্যায় দুর্নামের বোঝার ভার হ'তে পরিত্রাণ পাবার সম্ভাবনা ছিল না। এক মাত্র, জাহাজের কাপ্তেন কলিয়ারের সাক্ষ্যে ঘটনাটির প্রকৃত বিবরণ অনেকটা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জাহাজে হঠাৎ ধাক্কা লাগে; সাদা ও ভারতীয় খালাসী দুই দলেই বিশেষ ভয় পায়; ঠিকমত কাজ কর্‌তে পারেনি। তা ছাড়া যাত্রী ও খালাসীরা জাহাজের হেলান দেখে ভয় পেয়ে জলে লাফিয়ে পড়ার ফলেই অনেকে ডুবে মারা যায়। যে ছয়টা নৌকা নামান হয়েছিল, চেষ্টা কর্‌লে, তাতেই সব লোক বাঁচান যেত।

ইংলণ্ডের নাবিকমণ্ডলীর তরফ হ'তে শ্রীযুক্ত কটার্ সোজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কাপ্তেন, আপনি মনে করেন কি না, যে জাহাজের সব খালাসী কালা আদ্‌মী না হ'য়ে, সাদা লোক হ'লে এটা সম্ভব হত? কাপ্তেন কলিয়ার উত্তরে অতি সত্য কথাই বলেন; তিনি উত্তর দিলেন—আমি যুদ্ধের সময় সাদা ও অন্য অনেক খালাসীর সঙ্গে কাজ করেছি; তাতে মনে হয়, উপযুক্ত নেতা থাক্‌লে দুদলেই সমান ভাল কাজ করে। শ্রীযুক্ত কটার তাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করে অন্য প্রশ্ন করেন।

তারপর অন্যান্য ইংরেজ নাবিক ও উপরওয়ালাদের সাক্ষ্য লওয়া হয়। তাঁরা এতটা স্পষ্ট কথা বলেননি। তাঁরা বলেন, দোষ ঠিক লস্করদের নয়, তবে তারা বড় ভয় পেয়েছিল, সাদা নাবিকরা কিন্তু ভয় পায় নি, ঠিকমত কাজ করেছিল, তবে জাহাজ বড় বেশী হেলে পড়ায় এবং শীঘ্র ডুবে যাওয়ার দরুণ নৌকা নামাবার সুবিধা হয় নি। এদের পরীক্ষার সময় একটা জিনিষ প্রকাশ পায়; জাহাজ-ডুবির ঠিক পরেই লস্করদের নামে এরা যে-সব কথা বলেছিল, তা'র অনেক অংশ এখন গোপন করে, সরকারী উকিল এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন। এর কারণ অবশ্য লস্কর-হিতৈষণা নয়। সাদা খালাসীরা যেস্থলে ১০।১২ পাউণ্ড পায়, পি এণ্ড ও কোম্পানী সেই কাজেরই জন্য কালো লোকদের ৩।৪ পাউণ্ড দিয়ে থাকেন। লস্করদের যাতে ভবিষ্যতে জাহাজে আবার নিযুক্ত কর্‌তে পারা যায়, সে পথটা এইরূপে কর্ত্তৃপক্ষ খোলসা রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলেন। এজন্যই আবার এখানকার নাবিকদের লস্কর-

দের প্রতি বিষদৃষ্টিট আরও খর হ'য়ে উঠেছে। এ কথাটি পূর্ব্বেও শুনেছিলুম এবং ইণ্ডিয়া অফিসের লস্করদের তত্ত্বাবধায়ক এটর্ণী শ্রীযুক্ত সার এডওয়ার্ড শামিয়েও সেই কথাই বল্লেন। তিনি বল্লেন, এরা লস্করদের আগুনের ধারের কাজ হ'তে তাড়াতে চায় না। গরম দেশে তা পোষাবে না। ডেকের উপরকার সহজ কাজগুলি হ'তে তাড়াবারই এদের চেষ্টা ও সেজন্যই এত আক্রোশ।

নাবিকদের ও উপরওয়ালাদের পরীক্ষার সময় লস্করদের প্রতি শ্রীযুক্ত কটারের বিদ্বেষভাব বিশেষ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই তিনি এই জাতীয় প্রশ্ন ও মন্তব্য প্রকাশ করেন (এক জন ইংরেজ নাবিক সাক্ষীকে)—কালো লস্কররা কাজ না ক'রে ব'সে রইল, আর সাদা জাতির লোক তাদের প্রাণরক্ষার জন্য জীবন পণ ক'রে খাট্‌তে লাগ্‌লো; এই অসাধারণ দৃশ্য তুমি দেখ্‌লে! ("You saw the unusual spectacle of white seamen risking their lives to save coloured sailors who would not do their work"?) এ-সব প্রশ্ন অনেক সময়ে খবরের কাগজের সংবাদদাতাগণ বাদ দিয়ে যান; কাগজে প্রকাশ হয় না। তাঁরা অধিকাংশস্থলেই প্রশ্নগুলি মোলায়েম করে' যে-সকল উত্তরে লস্করদের নাম খারাপ হয়েছে সেগুলিই ছাপান; উদাহরণ স্বরূপ বল্‌তে পারি, ৩১শে জুলাই তারিখে জাহাজের কোয়ার্টার-মাষ্টারদের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে শুধু লস্করদের দুর্ণামজনক অংশগুলিই খবরের কাগজে বাহির হয়। প্রায় প্রত্যেক কোয়ার্টার মাষ্টারই পরীক্ষার সময় স্বীকার করেন যে লস্কররা এমন কিছু করেন নি যার ফলে কারও প্রাণহানি হয়েছিল। দুতিন জন শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে, অনেকে তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। খবরের কাগজগুলিতে কিন্তু এ-সব কথার চিহ্ন পাওয়া যায় না; শুধু তাদের ভয় পাওয়া ও নৌকায় ওঠারই সুদীর্ঘ বিবরণ বাহির হয়।

তার পর জন কয়েক ভারতীয় খালাসী ও খান্‌সামার সাক্ষ্য লওয়া হয়। তারা বলে, হাঙ্গামা হট্টগোল তারা কিছু বাধায় নি। তবে তাদের লাইফ্‌-জ্যাকেট দেওয়া হয় নি; সাদা লোকদের সেগুলি ছিল। তারা নৌকায় উঠেছিল বটে, কিন্তু তাতে যাত্রীদের কোনও বাধা পড়ে নি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে ব'লে নিতে চাই। দেড়শ'র কিছু বেশী খালাসী ও খান্‌সামার মধ্য হ'তে কর্ত্তৃপক্ষ জন ছয়েক বাছাই ক'রে লণ্ডনে রেখে দেন; বাকী বম্বে চ'লে যায়। এরা সেখানকার নাবিক-সভার লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেয় ও এই কথাই বলে যে, তারা লাইফ্‌-জ্যাকেট পায় নি। তা ছাড়া নৌকা নামান সম্বন্ধে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের হুকুম সম্বন্ধেও কিছু কথা বলে। কিন্তু এ সাক্ষ্যের খবর ইণ্ডিয়া অফিস রাখেন নি। শ্রীযুত শামিয়ে ও বক্‌নীলকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বল্লেন, তাঁরা এসব কথা পূর্ব্বে শোনেন নি। বোর্ড অফ্‌ ট্রেড্‌ তাঁদের বড় অল্প সময় দেওয়ার দরুণ তাঁদের পক্ষে এ-সব জানা সম্ভব হয় নি।

তার পর পি এণ্ড ও কোম্পানীর দু একটি কর্ত্তার সাক্ষ্য পুনরায় লওয়া হয়। এঁদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক্‌ নট্‌লের জবানবন্দীতে প্রকাশ পায়—

১। সাদা বা কালো যে-কোন খালাসীদের দ্বারা বিপদের সময় ভাল ক'রে নৌকা নামান প্রভৃতির বন্দোবস্ত কর্‌তে হ'লে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ক'রে এক ঘণ্টা ধ'রে বোট্‌-ড্রিল দর্‌কার; কিন্তু ঈজিপ্টে এগুলি দশ মিনিটেই সাঙ্গ হত।

২। লস্করদের মধ্যে সারেং ছাড়া কেউ ইংরেজী জানে না (খান্‌সামা বাদ)। উপরের কয়েকজন কর্ম্মচারী ছাড়া বাকী ছোট ইংরেজ অফিসাররা হিন্দুস্থানী জানে না ও শেখে না। সারেংদের অবর্ত্তমানে এদের পক্ষে খালাসীদের হুকুম দেওয়া অসম্ভব।

৩। জাহাজ যখন বন্দরের বাহিরে চলে, তখন নৌকাগুলি ডেক হতে বা'র ক'রে ঝুলিয়ে রাখাই নিয়ম; কিন্তু ঈজিপ্টে মাত্র ছয়টি নৌকা এইরূপ ঝোলান ছিল। বাকী ডেকেতে আট্‌কান ছিল ও নামান যায় নি।

৪। তত্ত্বাবধায়কের কর্ত্তব্য সকলের লাইফ্‌-জ্যাকেট আছে কি না দেখা। তিনি যাত্রীদের ঘরে এগুলি দেখেছিলেন, কিন্তু এবারে লস্করদের বিষয় এ খবরটি নেন্‌ নি।

এ স্থলে আর-একটা কথা শুধু জানাতে চাই। ১ ও ৩ নং ভুলের জন্য জাহাজের চীফ অফিসার (কাপ্তেনের ঠিক নীচের লোক) দায়ী। ইনিই এঁর সাক্ষ্যে বলেন, লস্করেরা ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিল; সাদা লোকেরা কিন্তু কাজ ঠিকই করছিল—অর্থাৎ কি না দোষ এঁদের মোটেই নয়, লস্করদেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব। কাজ সাদা লোকেরা কিরূপ করেছিল, সেটা এই সাক্ষ্যগুলি ও মৃত্যু-সংখ্যার হার দেখলেই বেশ বুঝা যায়। সাদা ও কালো উভয়দলেরই সিকি ভাগ লোক মারা যায়। সুতরাং সংখ্যায় বেশী বাঁচলেও প্রমাণ হয় না যে কালো লোকেরা প্রাণ রক্ষায় বেশী সফল হয়েছিল। তা ছাড়া এটা বলা বাহুল্য যে, ৪৪ জন সাদা নাবিক যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই কাজ করেছিল, তা হ'লে নৌকাগুলিতে সব লোক ওঠান অসম্ভব হয়েছিল কেন? নাবিকরা সাক্ষ্যে বলে নৌকাগুলি জন-পঞ্চাশেক ধরবার জন্য ঠিক থাকলেও এক-একটিতে ষাট জনও উঠেছিল, ও তাতে নৌকা ডোবে নি। সুতরাং ছটা নৌকাতেই যে ৩৩৮ জন লোক বাঁচান সম্ভব ছিল এ কথা বলা বাহুল্য। সমস্ত তদন্তের ফলে বেশ বোঝা যায়—হঠাৎ বিপৎপাতে সব খালাসী ও কর্ম্মচারী বন্দোবস্ত-মত কাজ করতে পারে নি; জাহাজ কোম্পানী ও কর্ম্মচারীদের শ্লথতার ফলে ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। আর সব চেয়ে ভাল ক'রে ফুটে ওঠে যে, জাহাজ ডুবি হ'লে আমাদের নাবিকরা কি করে' প্রাণ রক্ষা করতে পারে সে বিষয়ে তাদের কর্ত্তৃপক্ষ কোনও খবর রাখেন না। নিয়মগুলি কেতাবেই লেখা থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে "ঈজিপ্টে"র জাহাজ ডুবি প্রসঙ্গে ইংরেজ কাগজওয়ালা ও নাবিক-সম্প্রদায় উভয় দলই, নির্দ্দোষ ভারতবাসী লস্করদের নামে একটা মিথ্যা অপবাদ দেবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এটা নূতন কিছু নয়; টাইটানিক ডোবার সময়েও তাঁরা এইরূপই আর-একটা চেষ্টা করেন। যদিও লস্বররা বরাবরই খুব ভাল কাজ ক'রে আসছে, ও যুদ্ধের সময় কোনও জাহাজ ডুবিতেই কাপুরুষতা দেখায় নি, এবং এবারেও স্পষ্টই কিছু দোষ করেনি, এসব জেনে শুনেও ইংরেজ নাবিক সম্প্রদায় এদের বিশেষ অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। এর কারণ অবশ্য পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—আমাদের বদলে কাল খালাসী চাকরী পাবে কেন?

এটা অবশ্য মোটেই আশ্চর্য্য নয়; তবে স্বার্থে ঘা লাগ্‌লে ইংরেজ শ্রমজীবীশ্রেণীর লোকেরা কতদূর নীচতা করে' বিদেশী শ্রমজীবীর অনিষ্ট হ'তে নিজেদের সুবিধা বজায়ের চেষ্টা পায় ও পেতে পারে সে বিষয়ে এটি একটি ভাল উদাহরণ। অবশ্য স্বার্থে ঘা পড়্‌লে ইংরেজ মজুর ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ বিপক্ষতাচরণ করে সেকথা নূতন নয়। সামান্য শুল্ক বসানর ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের ছোট বড় সব লোকেই এই সেদিনই কিরূপ হট্টগোল বাধিয়েছিল। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি অনেকে এ বিষয়ে অনেক কথা বলে' থাক্‌লেও, কোনও সাধারণ লোকে নিজের রুটীর মাখনটুকু অপরের সুবিধার জন্য ছেড়ে দিতে রাজী হয় না। তাহ'লে গান্ধীজী আজ জগতের কাছে এক অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ বলে' গণ্য হতেন না।

কিন্তু স্বার্থের জন্য এরকমে একদল নিরপরাধী লোকের নামে এতবড় মিথ্যা অপবাদ দেবার চেষ্টা ও সেজন্য তাদের অপমান ও দুর্ণামসূচক নানা বিষয়ের অবতারণা ও সবটা মানুষের অন্তর্নিহিত নিজেকে বাঁচাবার জন্য স্বাভাবিক প্রেরণার ঘাড়ে চাপান যায় না। এর জন্য এখানকার (বিলাতের) মজুরদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেক পরিমাণে দায়ী। এরা এদের মধ্যবিত্ত ও বড়লোকদের পরম ভক্ত; মুখে যতই সমতার কথা বলুক কাজের সময় সেটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। নানারূপ রাজনৈতিক সুবিধা ও আর্থিক ভাল অবস্থার জন্য এদের য়ুরোপের অন্য দেশের মত উপরওয়ালাদের প্রতি (অন্ততঃ গত কয়েক বৎসরের পূর্ব্বে য়ুরোপের অন্য দেশগুলির চেয়ে) বিদ্বেষভাব অবর্ত্তমান। উপরন্তু তাদেরই বাঁধা বুলিগুলি মুখস্থ ক'রে এরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা স্থির করে। আমাদের দেশের প্রতি এই মধ্যবিত্ত ও বড়-মানুষদের কি মনোভাব, তা লেখা বাহুল্য। এক কথায় তারা মনে করে ভারতবর্ষ তাদের জমিদারী; সেখান-কার'লোক তাদের জন্যই আছে।

অনেক সময় ছোটখাট ঘটনায় মজুরদের কাছেও ভারতবর্ষের প্রতি "আমাদের জমিদারী" ভাবটার পরিচয় দেয়। তার ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের যে একটা উদ্ধত মনোভাব জন্মেছে, তারই একটি উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত হব। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি ও আমার কোনও ভারতীয় বন্ধু ল্যাঙ্কেশায়ার অঞ্চলে ট্রেনে করে যাচ্ছিলুম, গাড়ীটি ম্যাঞ্চেষ্টারের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল; কাম্‌রায় অনেক-গুলি মজুর। একজন লোক হঠাৎ বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার এ অঞ্চলের দৃশ্য কিরূপ লাগে? তিনি তখন অত্যন্ত বিরস বদনে ঝুলমাখান কালো চিম্‌নী-গুলি ও তাদেরই গলা হতে ঢালা ধোঁয়াতে ভরা মাঠের দুরবস্থা দেখে কোনও রকমে সেটা সহ্য ক'রে ব'সে ছিলেন। কাজেই এরূপ প্রশ্নে তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন, ঠিক এখানকার দৃশ্য দেখ্‌লে একটু মন খারাপ হয়ে যায় না কি? লোকটি সোজা বলে' উঠ্‌ল, "কিন্তু ঐ চিম্‌নীর ধোঁয়ায় ফলেই তোমাদের দেশের কাপড়ের সংস্থান হয়।" অর্থাৎ তারা দয়া ক'রে—দয়া ক'রে—কাপড় জোগায় বলেই আমাদের নগ্নতা দূর হয়!

এদেশের পাড়াগাঁয়ের চাষাভুষো লোকেরা এখনও যথেষ্ট ভালমানুষ আছে; কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প ও প্রতিপত্তিহীন। এদেশ প্রধানতঃ কলকার্‌খানার এবং এই-সকল শ্রমজীবীদের মনে ভারতীয়দের প্রতি বেশ একটা অবজ্ঞার ভাব বর্ত্তমান আছে। ইয়র্কশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারে যাঁরা ডাক্তারী করেন, তাঁরা স্বীকার করেন যে সচ্ছল কার্‌খানায় মজুরদের মধ্যে এ মনোভাবটি বেশ প্রবল।

এই শ্রেণীর মজুররা সাধারণ মুটে ও চাষার চেয়ে বেশী শিক্ষা পায়; দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কার্‌বার অনেক বেশী; আর্থিক অবস্থা কিছু সচ্ছল। বেতন অনেক সময় সাধারণ স্কুলমাষ্টারের চেয়ে বেশী। এরা ছেলেদের অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে পাঠাবার চেষ্টা করে ও কিছুদিন পরে মধ্যবিত্ত দলে ওঠ্‌বার একটা আশা রাখে। ফলে, সাধারণ শ্রমজীবীর পক্ষে, অন্যদেশের মুটে-মজুরদের প্রতি সহানুভূতি থাক্‌বার যে সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে, সেটা লোপ পেয়ে, এই হবু মধ্যবিত্ত দলের মন তাদের উপরওয়ালাদের মতামতই প্রতিফলিত করে। এ দুদলের নিজেদের মধ্যে বাহিরে সদ্ভাব না থাক্‌লেও এদের স্বার্থ বড় বেশী রকম জড়িত ও ভারতবর্ষের জন-সাধারণের পক্ষে সমানভাবে অহিতৈষী। এজন্য, দেশের মঙ্গলের পথে অগ্রসর হবার সময় এদের কাছে কোনরূপ সহায়তা পাবার আশা রাখা খুব বড় রকমের একটা ভুল।

কেম্ব্রিজ, ইংলণ্ড।

শ্রী ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পাতিয়ালায় বাঙ্গালী

বঙ্গের বাহিরে সকল প্রদেশেই, বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্যগুলিতে, বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া আসিতেছে এবং সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর সংখ্যা ও প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা যে হ্রাস পাইতেছে, তাহা চিন্তাশীল বাঙ্গালী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সুতরাং সকল কর্ম্ম-ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থান অধিকার বাঙ্গালীর কৃতিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা এই নিয়মে নানা স্থানে দেশীয় রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদ আজিও অধিকার করিতেছেন, এবং ভারতের যে-সকল প্রতিভাবান্ সুসন্তান বিদেশ হইতে অর্জ্জিত বিদ্যা দেশের কার্য্যে লাগাইয়া দেশকে সম্পন্ন ও সমুন্নত এবং জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, প্রাচীন-ইতিহাস-বিশ্রুত ত্রিগর্ত্ত দেশ বর্ত্তমান পাতিয়ালা রাজ্যের রাসায়নিক শ্রমশিল্পবিভাগের কর্ত্তা—Director of Chemical Industries, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী টাঙ্গাইল সবডিভিসনের কুটুরিয়া নামক গ্রামে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল পাবনা জেলায়। এখনও তথায় তাঁহাদের ভূসম্পত্তি আছে। যতীন্দ্রবাবুর পিতা, খুল্লতাত এবং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ময়মন-

সিংহের স্বর্গীয় রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের জমিদারীতে কার্য্য করিতেন। যতীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায়, ঢাকার ইংরেজী স্কুল এবং পরে টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষ জাহ্নবীস্কুলে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে তাঁহাদের পারিবারিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া উঠে।

শ্রী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

জাহ্নবীস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে থাকিয়া সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করেন ও এখান হইতে এফ-এ পাশ দিয়া লণ্ডন মিশন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বঙ্গবাসী কলেজে আইন ও গৃহে এম-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বান স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সংসারিক অসচ্ছলতাবশতঃ চতুর্থ শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া বি-এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দুইবেলা প্রাইভেট ছাত্র পড়াইয়া আপনার শিক্ষাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে।

যেসময় তিনি শিক্ষকতা করিয়া স্বয়ং এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য গৃহে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই আন্দোলনে মাতিয়া বিদেশ হইতে কোনপ্রকার শিল্প শিক্ষা করিয়া আসিয়া দেশের কাজে লাগিতে উদ্যোগী হন। তখন কলিকাতার ওরিএণ্ট্যাল সোপ ফ্যাক্টরির স্বত্বাধিকারী সন্তোষের জমীদার মহাশয় কোন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া বিদেশে শিল্প-শিক্ষার্থ পাঠাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার বৃত্তিদানের সর্ত্ত এই ছিল যে তিনি যাঁহাকে পাঠাইবেন তিনি দেশে ফিরিয়া তাঁহার সোপ্ ফ্যাক্টরিতে অন্ততঃ দশবৎসর কার্য্য করিবেন। যতীন্দ্রনাথ এই জমীদার মহাশয়ের ব্যয়ে শিল্পশিক্ষার জন্য ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে গমন করেন এবং প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া তিন বৎসর General Chemistry, Applied Chemistry এবং Biological Chemistry অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে অন্যত্র ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখানে ফরাসীভাষা না জানিলে অধ্যয়ন করা বা পরীক্ষা দেওয়া চলে না। সুতরাং তাঁহাকে তিন মাসের জন্য একটি স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইল। এই স্কুলে ফরাসী মেয়েরা ইংরেজী ভাষা, ও বিদেশী মেয়েরা ফরাসী-ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। এই স্কুল হইতে ফরাসী-ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ যে শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, তথায় এক রুষ যুবক ব্যতীত সকলেই ছাত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটি ইংরেজ, কয়েকটি জার্ম্মান, কয়েকটি স্প্যানিশ এবং অবশিষ্ট মার্কিন যুবতী ছিলেন। ফরাসী মহিলারাই এই স্কুলে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি পড়াইতেন।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় General Chemistry ও Applied Chemistryতে M. Sc. উপাধিপরীক্ষায় দুইখানি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। পরে তিনি প্যারিসের Institute of Applied Chemistryতে ফলিত রসায়ন পড়িবার সময় হাতে কলমে

শিল্প শিখিবার জন্য প্যারিসের একটি সাবানের কারখানায় প্রবেশ করেন এবং মার্সেল্‌স্ নগরে এক প্রসিদ্ধ সাবানের কারখানায় থাকিয়া কিছুদিন সাবান্ গ্লিসারিন, ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন, টয়্‌লেট সোপ তৈয়ারীর জন্য প্যারিস যেমন বিখ্যাত, বড় বড় তৈলের কল এবং বিশেষতঃ নানাপ্রকার কাপড় ধুইবার সাবানের কারখানার জন্য মার্সেল্‌স্ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। এখানে কাজ শিক্ষা করিয়া তিনি ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলস্থ কান (Cannes) এবং গ্রাস (Grasse) নগরের দুইটি বৃহৎ পারফিউমারীর কারখানায় প্রবেশ করিয়া পুষ্প হইতে নানা প্রকারের সুগন্ধ-দ্রব্য-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করেন। এখানের প্রস্তুত সুগন্ধি তৈল (essential oil) পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহুমূল্যে বিক্রয় হয় এবং আজিও গুণে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ফ্রান্সের এই প্রদেশে মাঠে মাঠে গোলাপ, যুঁই, ভায়োলেট, কমলালেবু প্রভৃতি নানা প্রকার ফুলের আবাদ হয় এবং সেই-সমস্ত ফুল হইতে নানা প্রকার উন্নত প্রণালীতে পুষ্পনির্য্যাস প্রস্তুত হইয়া দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়।

যে তিন বৎসর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ফ্রান্সে ছিলেন, College de Franceএর স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক ঋষিতুল্য ভারতবন্ধু সিল্‌ভ্যাঁ লেভী তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টা ও সহায়তায় তিনি নানা প্রকার কারখানা পরিদর্শন ও ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এ-সকল কারখানার গুপ্ততত্ত্ব বাহির হইবার ভয়ে কর্ত্তারা "ফি" দিলেও শিক্ষানবীশ লইতে চাহেন না। এমন কি বহু স্থলে কারখানা পরি-দর্শন পর্য্যন্ত করিতে দেন না। সুতরাং সর্ব্বজনমান্য অধ্যাপক লেভীর আনুকূল্য ব্যতীত যে যতীন্দ্র-বাবুর এরূপ সুযোগ ঘটিত না তাহা আর বলিতে হইবে না। অধ্যাপক লেভী তাঁহাকে শুধু যে কারখানায় প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই নহে। তিনি একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকদিগের নিকট যতীন্দ্র-বাবুকে পরিচিত করিয়া দিতেন, অপর দিকে তেমনি যাহাতে তিনি ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করিতে পারেন তাহারও সুবিধা করিয়া দিতেন। এইরূপে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ফ্রান্সের সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্ পণ্ডিত মোয়াসাঁ (Moissan) হাল্যার (Haller) ল্যেশাতেলিয়ে (Le chatelier) প্রভৃতির নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছিলেন। শুদ্ধ কলিত রসায়ন পড়িয়া শিল্পশিক্ষা করিলেও কারখানায় সফলতা লাভ করা যায় না। তজ্জন্য অধ্যাপক লেভী তাঁহার কোন আত্মীয়ের ফার্মে যতীন্দ্র-বাবুকে ব্যবসা শিক্ষার জন্য প্রবেশ করাইয়া দেন। এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের সংসর্গে থাকিয়া যতীন্দ্র-বাবু বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক লেভীর গৃহ একটি তীর্থস্বরূপ। তথায় ফরাসী এবং দেশবিদেশের পণ্ডিতগণের সমাগম হয়। সেই সুযোগে চক্রবর্ত্তী মহাশয় মার্কিন, জাপান, জার্ম্মাণী, নরওয়ে প্রভৃতি বহু স্থানের বহু সুবিখ্যাত অধ্যাপকদিগের সহিত পরিচিত হইয়া উপকৃত ও প্রীত হন।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে তিনমাস ছুটি থাকে। সেই সময় যতীন্দ্র-বাবু ইংলণ্ডের কারখানা পরিদর্শন ও তথায় কাজ করিবার জন্য লণ্ডনে যান। তিনি তথাকার বিখ্যাত রাসায়নাধ্যাপক সার উইলিয়ম রাম্‌সের নিকট অধ্যাপক লেভীর পরিচয়-পত্র লইয়া যান এবং সার উলি-য়মের নিকট হইতে সুপারিশ পত্র লইয়া ইংলণ্ডের অনেক-গুলি বড় বড় সাবানের কারখানা পরিদর্শন করেন। কিন্তু দুই-একটি কারখানায় এই জগদ্বিখ্যাত রাসায়নিকের সুপারিশেও কোন ফল হয় নাই! চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, "তাহারা ভারতবাসী একটি ছাত্রকে কারখানা পরিদর্শন করিতে দিতেও সম্মত হইলেন না। ফরাসী দেশে কারখানায় প্রবেশ করা নিতান্ত কঠিন। ইংলণ্ডে গিয়া দেখিলাম সেখানে ভারতবাসীর পক্ষে কোন কারখানায় প্রবেশ করা এমন কি পরিদর্শন করাও একেবারে অসম্ভব। ভয়, পাছে বা কারখানার গুপ্তরহস্য জানিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষই তাহাদের জিনিষের প্রধান বাজার, কাজেই ভারতবর্ষে কারখানার সৃষ্টি হইলে তাহাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।" তথাপি বহুচেষ্টার পর জনৈকা সহৃদয়া ইংরেজ মহিলার (পার্লামেন্টের একজন উদারনৈতিক মেম্বরের পত্নী) অনুগ্রহে তিনি একটি কারখানায় কিছুদিন থাকিয়া ইংরেজী প্রণালীতে নানাপ্রকার সাবান

গ্লিসারিন্ প্রভৃতি তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিলেন। এইরূপে ছুটির কয়মাস লণ্ডন, লিভারপুল, ওয়ারিংটন প্রভৃতি সহরে থাকিবার পর কলেজ খুলিলে তিনি প্যারিসে ফিরিয়া যান। এবং ফ্রান্সে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে একবার জার্ম্মানীতে গমন করেন। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপকের পরিচয়-পত্র লইয়া বার্লিনের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার ভিটের (Witt) সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাক্তার ভিট্ বলেন—"তোমাদের পূর্ব্বে জাপানীরা এ দেশে আসিয়া এ দেশের কলকারখানায় ভারতবাসীদের প্রবেশ একরূপ বন্ধ করিয়া গিয়াছে। তবুও তুমি যখন অতবড় অধ্যাপকের সুপারিশ-পত্র লইয়া আসিয়াছ, তখন তোমাকে কোন কারখানায় প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিব।" যাহা হউক যতীন্দ্র-বাবু এই জার্ম্মান অধ্যাপকের অনুগ্রহে বার্লিনের এক সাবানের বৃহৎ কারখানায় কিছুদিনের জন্য কাজ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। এই কারখানাটি আবার প্রত্যক্ষ-ভাবে ভারতবর্ষে সাবান ইত্যাদি রপ্তানি করেন্। তজ্জন্য ভবিষ্যতে স্বার্থের হানি হইবে না, এই ভরসায় উক্ত অধ্যাপকের অনুরোধ রক্ষা করিতে আপত্তি করে নাই। এই কারখানার অধ্যক্ষগণ খুব করিত-কর্ম্মা (practical) লোক; তাঁহারা একদিকে যেমন তাঁহাকে তাঁহাদের প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইয়া দেন, সেই সুযোগে তেমনি তাঁহার নিকট হইতে ফরাসী প্রণালীও তাঁহারা শিক্ষা করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। এইরূপ জ্ঞানের আদান-প্রদানেই সভ্যতার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। ইহার পর বার্লিনের একটি কারখানায় তিনি অভিনব প্রণালীতে গ্লিসারিন প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া লাইপ্‌জিগ্ সহরের রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে সুগন্ধি প্রস্তুতের কারখানাগুলি দেখিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেশে আসিয়া যতীন্দ্র-বাবু কলিকাতা ওরিএন্ট্যাল সোপ ফ্যাক্টরির ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া কারখানার সকল ভার গ্রহণ করেন। এই কারখানাটি স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্থাপিত হয় এবং এক জাপানীর হস্তে ইহার কার্য্যভার প্রথমে ন্যস্ত হয়। যে-সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার ভার গ্রহণ করেন সে-সময় নানা গোলমালে কারখানার কার্য্য বন্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও পরিচালনদক্ষতার গুণে তিন চারি বৎসরের মধ্যেই ফ্যাক্টরি সমগ্র ভারতে পরিচিত হইয়া উঠে। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মৈসুর রাজ্যে সাবানের কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মৈসুর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। এখানে আসিয়া মৈসুর রাজ্যে জাত তৈলাদি হইতে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইতে পারে কি না এবং তাহা লাভজনক হইবে কি না তাহাই তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হয়। ঐ রাজ্যে রসায়নাগার না থাকায় Bangalore Indian Institute of Scienceএর Industriai Chemistry বিভাগের ল্যাবরেটরীতে তিনি পরীক্ষাকার্য্য পরিচালন করেন। তৎকালে উক্ত ল্যাবরেটরীতে কোন অধ্যাপক বা ছাত্র ছিল না তিনি এখানে আটমাসকাল পরীক্ষার পর একখানি রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি যে সাবান প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডাক্তার ওয়াট্‌সন, ডি-এস্-সি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন মৈসুর-দেশজাত উপকরণ হইতে সান্‌লাইট সাবানের সমকক্ষ সাবান তৈয়ার হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রিপোর্ট এবং সাহেবের এই অভিমত পাইয়া মৈসুর-গবর্মেণ্ট রাজ্যের ব্যয়ে একটি সাবানের কারখানা খুলিবার জন্য অনুমতি দেন। কিন্তু পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত তাঁহার বেতন বৃদ্ধি না করায় তিনি এই কার্য্য ত্যাগ করেন। এখানে পরীক্ষার কালে তিনি এক অভিনয় উপায়ে গ্লিসারিন প্রস্তুত করেন। উক্ত প্রণালীতে যে গ্লিসারিন প্রস্তুত করা যায় তাহা ভারতবর্ষে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই প্রথম প্রদর্শন করেন। রেড়ির বীজের মধ্যে যে একপ্রকার বীজাণু পাওয়া যায়, তিনি তাহারই সাহায্যে নানা প্রকার তৈল হইতে উহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বরোদা রাজ্যে Industry and Commerce Departmentএর অধীনে নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে উক্তরাজ্যজাত তৈল ও সাবানের ব্যবসায় কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া অবস্থাদি দর্শন করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য আদিষ্ট হন। বরোদায় একটি

গ্লিসারিন ও মোমবাতির কারখানা আছে। তাহার উপোৎপাদন (by-product) ব্যবহার করিতে না পারায় কারখানাটি ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছিল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বরোদায় মহারাজার আদেশে তথায় দুইমাস থাকিয়া by productএর সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এবং বরোদার কলাভবনের ছাত্রদিগকে সাবান-প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা (demonstration) প্রদর্শন করিয়া প্রায় আট-নয় মাস পরে তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করেন। তৎপরে তিনি ফরাসীদেশে পুনর্গমনের সঙ্কল্প করিয়া বোম্বায়ে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের গোলমালে জাহাজ পাইতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি বোম্বায়ের একটি কারখানায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় দুই বৎসর কর্ম্ম করিবার পর আজ প্রায় তিনবৎসর হইল পাতিয়ালা রাজ্যে Chemical Industryর Directorএর পদ খালি হইলে সেই পদে নিযুক্ত হন। পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি পাতিয়ালা রাজ্যের নানাবিধ শিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। যতীন্দ্র-বাবুর ন্যায় বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ রাসায়নিকের পরিচালনায় এই রাজ্যের শিল্প-বিভাগ যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

বাড়্‌তি মাশুল

একেই বলে বিড়ম্বনা।

আমি একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। সেদিন সমস্ত দিন আফিসে কলম পিষে উর্দ্ধশ্বাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেনের একখানি 'থার্ড ক্লাস' কাম্‌রায় বসে' হাঁপাচ্ছি—এমন সময় দেখি সাম্‌নের প্লাট্‌ফর্ম্ থেকে বম্বে মেল ছাড়্‌ছে, আর তারই একটি কাম্‌রায় এমন একখানি মুখ আমার চোখে পড়ে' গেল যাতে আমার সমস্ত বুক আশা-আনন্দে দুলে উঠ্‌ল।

বহুদিন আগে আমার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখ্‌তে গিয়ে ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যায়—আর ফেরে নি। অনেক খোঁজ খবর করেছিলাম, কিছুতেই কিছু হয় নি। ভগবানের ইচ্ছা বলে' মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তারই মুখখানি—হ্যাঁ ঠিক সেই মুখটিই—বম্বে মেলের একটা কাম্‌রায় দেখ্‌তে পেলেম।

আর কি থাক্‌তে পারি? তাড়াতাড়ি গিয়ে বম্বে মেলে উঠ্‌লাম। মেলও দিলে ছেড়ে। ট্রেনে উঠে আবার ভাল করে' দেখ্‌লাম—হ্যাঁ ঠিক সেই—পাশে একটি বৃদ্ধও বসে' আছেন।

ভয়ে ভয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—

"তোমার নাম কি বাবা? বাড়ী কোথায়?"

হা ঈশ্বর—সে উত্তর দিলে হিন্দীতে! "হামারা নাম পুছ্‌তে হেঁ? কেঁও? হামারা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা।"

সমস্ত মনটা যেন ভেঙ্গে গেল—মনে হল যেন দ্বিতীয় বার আমি পুত্রহারা হলাম।

বৃদ্ধটি বল্‌লেন—"হামারা লেড়কা হ্যায় বাবুজী। আপকো কুছ কাম হ্যায়?"

রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লাম—"কিছু না।"

বেহারী ছাপরাবাসী পিতাপুত্রকে বিস্মিত করে' দুফোঁটা চোখের জলও আমার শুষ্ক শীর্ণ গালের উপরে গড়িয়ে পড়্‌ল!

বর্দ্ধমানে নাম্‌লাম। আবার excess fare বাড়্‌তি মাশুল দিতে হল!

"বনফুল"

বীজনির্ব্বাচনে ফসলের উন্নতি

গভীর কর্ষণ যথোপযুক্ত সার, এবং নিয়মিত জলসেচন ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ফসলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এতদ্ব্যতীত বীজনির্ব্বাচনে অর্থাৎ শস্য (বিশেষে) ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্যমাংশের বীজে অপেক্ষাকৃত অধিক সুফল-প্রদান করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যেরূপ ফললাভ করিয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

বেগুন—৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে অযত্নসম্ভূত একটি দেশী সুপক্ক বেগুনকে (ওজনে প্রায় পাঁচ ছটাক হইবে) ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যমাংশ হিসাবে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করিলাম। উক্ত তিন স্থানের বীজ হইতে পৃথক্ পৃথক্ চারা প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন স্থানে একই প্রকার সার দিয়া চারা রোপণ করা হইল। ঊর্দ্ধ ও অধঃ ভাগের চারা হইতে যে ফল জন্মিল তাহা ঠিক পূর্ব্বের ফলের ন্যায় না হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও বিকৃত আকার ধারণ করিল এবং দুইবৎসরের চেষ্টায় মধ্যমাংশের বীজের চারায় যে ফল জন্মিল তাহাতে ক্রমোন্নতির ভাব দেখা গেল। তৃতীয় বৎসরে সেই ফলের মধ্যমাংশের বীজের গাছে ফলের আকার বর্দ্ধিত হইল এবং স্বাদেরও কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটিল। চতুর্থ বৎসরে পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাচিত বাজের গাছে যে ফল জন্মিয়াছে তাহার নিম্নাংশের পরিধি ১৪ইঞ্চি, ঊর্দ্ধাংশের পরিধি ৮ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৯ ইঞ্চি।

বেগুনের জন্য বীজ রাখিতে হইলে উৎকৃষ্ট গাছ নির্ব্বাচন করিয়া তাহারই মধ্যম সময়ের ফল ২।৩টী রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ গাছে অধিক ফল জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে। বীজের জন্য গাছের উপর স্বতন্ত্র যত্ন আবশ্যক। ইহাতে অধ্যবসায় সহকারে ও অনন্যচিত্ত হইয়া লাগিয়া থাকিতে হইবে।

শশা—ইহার মধ্যমাংশের বীজই শ্রেষ্ঠ। বোঁটার দিকের বীজ হইতে গোলাকৃতি শশা জন্মে এবং মধ্যমাংশের বীজ হইতে লম্বা লম্বা বেশ সুশ্রী ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাঁচি লাউ—ইহার মধ্যমাংশের বীজ হইতে ফসলের ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। উক্ত স্থানের বীজ হইতে, দুইবৎসরের চেষ্টায় ফলের ওজন প্রায় কিঞ্চিদধিক দুইসের বর্দ্ধিত হইয়াছে।

চিচিঙ্গে—ইহার ঊর্দ্ধাংশের বীজ হইতে যে ফল জন্মে তাহা স্থূল ও খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে, মধ্যমাংশের বীজ হইতে লম্বা লম্বা বেশ সুশ্রী অথচ শাঁসযুক্ত ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

জনার (মক্কা)—ইহার গোড়ার বীজ গুলি বড় বড় ও হৃষ্টপুষ্ট এবং অগ্রভাগের বীজগুলি ছোট ছোট এবং অধিকাংশই অপুষ্ট। গোড়ার বীজ হইতে বড় বড় দানা-যুক্ত লম্বা লম্বা ফল জন্মে।

লঙ্কা—লঙ্কার জন্য বীজ রাখিতে হইলে প্রতি ডালে একটির অধিক ফল রাখা উচিত নয়। এতদ্ভিন্ন বোঁটার দিকের বীজ হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল ও স্বল্পবীজবিশিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। অগ্রভাগের বীজ হইতে যে গাছ জন্মে তাহার ফল প্রায়ই অপুষ্ট ও সরু সরু হইয়া থাকে।

কুমড়া—ইহারও মধ্যমাংশের বীজ ভবিষ্যতে বপনের জন্য রাখা উচিত। অভিজ্ঞ কৃষকেরা বলিয়া থাকে যে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন অংশের বীজ বর্ষাকালে রোপনের জন্য এবং তদ্বিপরীতাংশের বা ঊর্দ্ধ দিকের বীজ গ্রীষ্মকালে আবাদের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ নির্ব্বাচিত বীজের গাছে প্রচুর ফসল জন্মিয়া থাকে।

ঝিঙ্গে—বর্ষাকালে যে ঝিঙ্গে জন্মে তাহার প্রশাখার সুপক্ক বীজ রবিখন্দের জন্য রাখা প্রশস্ত। এইরূপ বীজোৎপন্ন গাছের ৮।১০টি পাতা হইলে ফল জন্মে। মূলশাখার বীজের গাছে ফল জন্মিতে বিলম্ব হয়। সাধারণতঃ গাছ অধিক বড় না হইলে ফল জন্মে না।

খেঁসারি কলাই—হৃষ্টপুষ্ট বড় বড় বীজ ও ছোট ছোট অপুষ্ট বীজ এই উভয় প্রকার বীজ পৃথক্ পৃথক্ বপন করিয়া দেখা গিয়াছে যে সুপুষ্ট বীজ হইতে বিঘা প্রতি প্রায় একমন ফসল অধিক জন্মিয়াছে।

ধান্য—ছায়াবিহীন স্থানের সুপুষ্ট ও সতেজ গাছই বীজের জন্য নির্ব্বাচন করা উচিত। এরূপ গাছের বড় বড়

ঝাড়াল শীষের অগ্রভাগের ধান্য বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। গোড়ার দিকের ধান্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও আগড়াযুক্ত। সেই জন্য বীজের জন্য এরূপ ধান্য রাখা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাচিত বীজ হইতে দুইবৎসরের ফলে বিঘা প্রতি এক মন ধান্য অধিক ফলিয়াছে।

তামাক—তামাকের বীজ রাখিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী গাছ রাখিতে হইবে। ইহার সমস্ত শক্তি পত্রে নিয়োজিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। গাছের যৌবনের শেষাবস্থায় অগ্রভাগের ৩।৪টি পত্র রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত এবং ঐস্থানে যাহাতে অঙ্কুর উদ্গত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এইজন্য পাতা ভাঙ্গিয়া সেই ক্ষতস্থানে চূণ দেওয়া উচিত। এইরূপ নির্ব্বাচিত বীজে তামাকের ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। তামাকের বীজ একেবারেই সবগুলি পরিপক্ক হয় না। এইজন্য দুই তিনবার ধরিয়া সুপক্ক ফলগুলি তোলা উচিত। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদি ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তবে শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস, বি-এ, মহাশয়ের কৃত **"তামাকের চাষ"** নামক পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

আনারস—ইহার মাথার ফেকৃড়ি ছায়াবিহীন স্থানে বসাইলে একবৎসরেই ফল জন্মে। কিন্তু ফল তত বড় হয় না। গাছের গুঁড়িতে কলার চারার ন্যায় যে তেউড় হয় তাহাতে বেশ বড় ফল উৎপন্ন হয়।

আতা—ইহার অধোভাগের বীজই বেশ সুপুষ্ট, এই-গুলি বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্য সতেজ গাছের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অথচ মধুর স্বাদবিশিষ্ট ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

পেঁপে—একটি পেঁপে হইতে ২।৩ আকারের ফল জন্মে। ইহারও স্থানবিশেষে বীজের পার্থক্য আছে। বোঁটার নিম্নের অর্থাৎ উর্দ্ধাংশের বীজের ফল লম্বাকৃতি হইবে। নিম্নাংশের বীজের ফল গোলাকৃতি অথচ বড় বড় হইবে। বীজ প্রস্তুতের জন্য যে গাছ নির্ব্বাচিত হইবে তাহাতে ৩।৪টি হইতে ৮টির অধিক ফল রাখা কর্ত্তব্য নহে। (অর্দ্ধ পক্কাবস্থার পূর্ব্বে ফলগুলিকে মোটা কাপড় বা থলে দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।)

কাঁটাল—পূর্ণবয়স্ক গাছের সরু শাখার কাঁটাল হইতে বীজসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। সুপক্ক ফলের উর্দ্ধার্দ্ধভাগের বীজ হইতে গাছ জন্মাইলে শীঘ্রই ফল ধারণ করে। এরূপ গাছ প্রায়ই বেশ ঝাড়াল ও প্রচুর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। কাঁটাল বীজ কোষ হইতে বাহির করিবার ২।১ দিনের মধ্যেই রোপণ করিতে হয় কারণ বীজ শুষ্ক হইলে ইহার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে।

সুপারি—প্রচুর সুপারি জন্মে এমন কয়েকটি গাছ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। তন্মধ্যে যে গাছটি ফলনে শ্রেষ্ঠ হইবে তাহার দক্ষিণদিকের কাঁদির সুপক্ক ও সুপুষ্ট ফল বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। দিবসের অধিকাংশ সময় সূর্য্যের কিরণ বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে পতিত হয় বলিয়া স্বভাবতঃ উক্তস্থানের ফলে এক অভিনব গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ বীজোৎপন্ন চারা শীঘ্রই বর্দ্ধিত হয় এবং উহাতে ফল অধিক হইয়া থাকে।

নারিকেল—পুরাতন বড় বড় নারিকেল গাছের দক্ষিণদিকের কাঁদির সুপক্ক ও সুপুষ্ট ফল বীজের জন্য রাখা উচিত। এইসব নারিকেল হইতে যে গাছ জন্মে তাহা অল্পদিনের মধ্যে ফলিতে আরম্ভ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচুর ফল প্রদান করিয়া থাকে। ছোট ছোট গাছের ফলের চারায় যে গাছ উৎপন্ন হয় তাহা তেমন সুফল প্রসূ হয় না। ২।৪ বৎসর ফল প্রদান করিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফলোৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে।

কার্পাস—কার্পাস গাছের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর গাছ হইতে বীজ রাখিয়া পর বৎসর ঐ বীজ বপন করিতে হইবে। আবার তন্মধ্যে অপুষ্টগাছগুলি বাদ দিয়া ভাল ভাল কয়েকটি গাছেরই বীজ রাখিতে হইবে। এইরূপে ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই স্থানীয় আবহাওয়ার (climate) উপযোগী এক নূতন জাতীয় কার্পাসের সৃষ্টি হইবে। (কার্ত্তিক হইতে পৌষ-মাঘমাস পর্য্যন্ত যে কার্পাস জন্মে তাহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অর্থাৎ প্রথম ফলনেই ভাল জিনিষ পাওয়া যায়। সেইরূপ ফলের বীজই ভবিষ্যতে বপনের জন্য রাখা উচিত।) কার্পাসের

আঁইসের সূক্ষ্মতা—মসৃণতা—দীর্ঘতা ইত্যাদি গুণের উপর যেন বীজ নির্ব্বাচনকারীর লক্ষ্য থাকে।

বীজ প্রস্তুতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে চাষ আবাদ করা কর্ত্তব্য। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বীজের মধ্যে সুপুষ্ট ও তেজস্কর বীজগুলি বাছিয়া লইতে হয় তবেই বীজের ক্রমশঃ উন্নতির সম্ভাবনা। ইহা ২।১ বৎসরের কাজ নহে। দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত কিছুকাল এইকার্য্যে লিপ্ত থাকিলে অবশ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে।

শ্রী রামজীবন গুছাইত

রমলা

২০

দ্বিতীয় বৎসর।

সমস্ত দিন বৃষ্টির পর রাত্রির আকাশ নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছে। শুধু কয়েকখানি কালো মেঘ উত্তর দিকের নারিকেল-গাছগুলির উপর জমিয়া রহিয়াছে, ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় তারাগুলি জল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। রাত কয়টা হইবে রজতের তাহা খেয়াল ছিল না, অতি চঞ্চল হইয়া সে বারান্দায় বেড়াইতেছিল আর মাঝে মাঝে ঘরের বন্ধ দরজার কাছে আসিয়া কান পাতিয়া শুনিতেছিল।

গির্জ্জার ঘড়িতে রাত দুইটা বাজিল, সে চমকিয়া উঠিল, এই বর্ষার স্নিগ্ধরাত্রে বাহিরেও তাহার যেন দম আটকাইয়া যাইতেছিল। একবার একটু জান্‌লা ফাঁক করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—দিদিমা।

এক প্রৌঢ়ার স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—তুমি শুতে যাও ভাই, নাত-বৌ বেশ ভাল আছে, কোন ভয় নেই।

এই প্রৌঢ়া হচ্ছেন মামাবাবুর দূরসম্পর্কীয় এক বিধবা পিসি, রমলার সন্তানসম্ভাবনায় তাঁহাকে আনা হইয়াছে। তিনি প্রথমে আসিয়া বাড়ীতে খেরেস্তানী ব্যবস্থা দেখিয়া সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার পরিচয়েই রমলা তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া লইল এবং পরের দিন নূতন উনান, হাঁড়ি আর এক জোড়া কেটে কাপড় আসিতেই তিনি থাকিয়া গেলেন।

ধীরে জান্‌লা বন্ধ করিয়া রজত বারান্দার এক কোণে চেয়ারে বসিল, মেঘের আড়ালে চাঁদ লুকাইয়া গেল, তারাগুলি যেন কোন্‌ অজানা দেশের মা-হারা শিশুদের চাউনি। একটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ কানে আসিল। রজত বারান্দায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, কে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল, বারান্দার পাশের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিল। মেজেতে বিছানায় রমলা শুইয়া ছিল, তাহার মাথার কাছে দিদিমা বিনিদ্রনয়নে বসিয়া, কোণের অন্ধকারে ধাত্রী নিদ্রা যাইতেছে।

ভীত করুণ নয়নে রজত দিদিমার প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া যেন একটু আশ্বাস পাইল, দিদিমা তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু সে পারিল না। ধীরে রমলার পাশে আসিয়া একটু নীচু হইতেই রমলা চোখ মেলিয়া চাহিল। চিরপ্রিয় চিরসুন্দর এ মুখখানি রজতের কাছে অতি অপরূপ লাগিল, এ শ্রী যেন কখনও সে দেখে নাই। রমলা তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, লজ্জা-শঙ্কা-আনন্দ-জড়িত সে-হাসির উপমা নাই, সে মধুর করুণ হাসি কোন্‌ অপূর্ব্ব আনন্দের আভায় বেদনাসুন্দর মুখ মণ্ডিত করিয়া তুলিল। রজতের হাত যন্ত্রচালিতের মত রমলার এলায়িত হাতে গিয়া ঠেকিল, আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়া সে হাতখানি দৃঢ়ভাবে ধরিল, মুখে কোন কথা ফুটিল না।

পিসিমা এমন কাণ্ড তাঁহার সাত জন্মেও দেখেন নাই, তিনি প্রথমে একটু বিরক্ত হইয়া তারপর ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করিয়া, মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া সরিয়া বসিলেন।

রমলার মত রজতের বুক আশঙ্কা আনন্দে দুলিতেছে, সে যদি রমলার যন্ত্রণার ভাগ লইতে পারিত,

তাহার সহ্য করিবার শক্তি বাড়াইতে পারিত। অতি অস্ফুটস্বরে বলিল,—কষ্ট হচ্ছে, রমু?

না, বলিয়া রমলা আবার অতি মৃদু হাসিল। এই বেদনা তাহার দেহে মনে অসীম অসহনীয় সুখের মত; স্বামীর পাশে সব সহ্য করিবার শক্তি তাহার আছে। ধীরে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ধাত্রী জাগিয়া উঠিল। রজত অতি ধীরে বলিল,—কোন ভয় নেই, রমু। কথাগুলি তাহার জিহ্বায় জড়াইয়া গেল, সে আর সে ঘরে থাকিতে পারিতেছে না। রমলা বড় অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

রজত ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া মেঘ-তারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। মন দুলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মাথা নত হইয়া আসিল, হাত দুইটি যুক্ত হইয়া আসিল, যিনি তাহাদের প্রেমজীবনের চির-জাগ্রত দেবতা তাঁহারই উদ্দেশে অন্তরে আকুল প্রার্থনা উঠিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে সে কখনও ভাবিতে বসে নাই, ভাবিবার দরকার বোধ করে নাই; আজ সব তর্ক সন্দেহ নিমেষে দূর হইয়া গেল, চির-আশ্রয় চির-মঙ্গল সৃষ্টির দেবতার প্রতি প্রার্থনা উঠিল—বল দাও, প্রভু, শক্তি দাও, রক্ষা কর, তুমি রক্ষা কর। এই তাহার যৌবন-জীবনের প্রথম প্রার্থনা।

রমলার করুণকণ্ঠ আবার রজতের কানে আসিল। সে আর প্রার্থনা করিতে পারিল না। যেন কোন মানুষের সঙ্গ আশ্রয় চাই, একা থাকিতে সে পারিতেছে না। মামাবাবুর ঘরের দিকে চাহিয়া রজত দেখিল, সে ঘরেও আলো জ্বলিতেছে। সহসা দরজা খুলিয়া মামাবাবু শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। দুইজনে চুপ করিয়া বারান্দার দুই কোণে দাঁড়াইয়া নীচের উঠানের অন্ধকারের দিকে আর আকাশের তারালোকের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

রজত বুঝিতে পারিল রমলার অস্থিরতা বাড়িতেছে। সহসা তাহার মনে হইল, ডাক্তার ডাকা দরকার। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া ধাত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল- ডাক্তার ডাক্‌তে হবে? রমলার দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না।

ধাত্রী বলিল—ডাক্‌তে পারেন।

চকিতপদে সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, নীচে হইতে বারান্দায় মামার কালো মূর্ত্তি দেখিয়া শুধু বলিল,—ডাক্তার।

এবাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিলে তাহার মন যেন একটু শান্ত হয়।

ডাক্তারের বাড়ী গলির মোড়ে। তবু এইটুকু পথ তাহার যেন ফুরাইতেছিল না, স্তব্ধ-মৃদু-গ্যাসালোকিত পথ, পথ যেন শেষ হয় না। তারপর কড়ানাড়া, দরজা ঠেলা, চেঁচামেচি, চাকরের সঙ্গে বকাবকি, ডাক্তারবাবুকে জাগান, তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসা—এ-সব কাজ সে যেন স্বপ্নাহতের মত করিয়া গেল, যেন কত দী রাত্রি।

ডাক্তারকে লইয়া বাড়ী পৌছাইয়া রজত দেখিল, মামাবাবু দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ তিনি বারবার সিঁড়িতে ওঠানামা করিতেছিলেন। তিনজনেই চুপচাপ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন।

ডাক্তারকে লইয়া রজত ঘরে ঢুকিল। মামাবাবুর মনে পড়িয়া গেল তাঁহার গায়ে গেঞ্জি ছাড়া কিছু নাই, তিনি তালপাতার মত কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের ঘরের দিকে ছুট দিলেন।

ধাত্রীর সহিত কয়েকটি কথা কহিয়া ডাক্তারবাবু রজতকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। রমলার মধুর করুণ চাউনি আবার চোখে পড়িল। রজতের সত্যই কান্না পাইল, কেন সৃষ্টি এত বেদনায় ভরা! আপনাকে কোনমতে দমন করিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া এই ভাবী পিতা জগতের চিরজাগ্রত পিতার চরণে লুটাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল রজতের তাহা হুঁস ছিল না, বস্তুতঃ সময় সম্বন্ধে তাহার বোধশক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল। গির্জ্জার ঘড়িতে চারটা বাজিল, রজত চমকিয়া উঠিল। ধূসর আলোয় আকাশ ভরিয়া উঠিতেছে, সম্মুখে যে তারাটি দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহা নিভিয়া গেল।

ট্যাঁ, ট্যাঁ,—উষার আলোর সঙ্গে একটি সকরুণধ্বনি, নবজাত শিশুর প্রথম কান্না, তাহা যেমন করুণ তেমি

মিষ্টি; স্তব্ধ অন্ধকার বাড়ী রণিত করিয়া উষার আকাশে সে কান্না ছড়াইয়া গেল।

রজত যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া চমকিয়া চেয়ার হইতে উঠিল, পা টিপিয়া টিপিয়া জান্‌লার কাছে গেল, খড়খড়ি তুলিয়া দেখিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিল না। আবার সেই কান্নার শব্দ, এ যেমন মধুর তেম্নি ঝোড়ো হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসের মত। তাহার বুক দুলিতে লাগিল।

কম্পিতকণ্ঠে রজত বলিল,—কি ডাক্তার-বাবু?

ডাক্তার-বাবু ঘর হইতে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে? সেই গম্ভীরকণ্ঠ শুনিয়া রজতের ভয় হইল —কি হয়ে গেছে? রমলা! না, না, অসম্ভব।

করুণকণ্ঠে আবার রজত বলিল,—ডাক্তার-বাবু? দিদিমা?

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—ভয় নেই, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

জান্‌লা দিয়া আর রজত দেখিতে চাহিল না, ডাক্তার-বাবুর অস্ত্রগুলির শব্দ, নবজাত শিশুর স্নানের শব্দ, ধাত্রীর মৃদু গুঞ্জরণ, সব কানে আসিতে লাগিল, কিন্তু রমলার মধুর কথা একটাও শোনা যাইতেছে না। রজত চেয়ারে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার-বাবু তাহাকে ঠেলিয়া তুলিলেন —আসুন। ডাক্তার-বাবুর মৃদুহাস্যময় মুখ দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য তাহার মন ডাক্তার-সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণায় ভরিয়া গেল,—হৃদয়হীন পিশাচ!

ডাক্তার-বাবু ধীরে বলিলেন,—যেতে পারেন ঘরে, আপনার এক খোকা হয়েছে।

শঙ্কিতকণ্ঠে রজত বলিল,—আর?

আর আপনার স্ত্রী খুব ভালই আছেন, বিশেষ কোন কষ্ট হয়নি, বলিয়া ডাক্তার-বাবু পকেট হইতে এক সিগার বাহির করিয়া ধরাইলেন। তাঁহার প্রতি মনে মনে যে অবিচার করিয়াছিল তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া ডাক্তার-বাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে রজতের ইচ্ছা হইল। আপনাকে দমন করিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে গেল।

দিদিমার কোলে নেকড়া-জড়ান যে সজীব মাংসপিণ্ড চীৎকার করিয়া ঘর মুখর করিয়া তুলিয়াছে তাহার দিকে রজত চাহিল না, ধীরে রমলার পার্শ্বে গিয়া বসিল। নবমাতৃত্বের অঞ্জন-মাখান তাহার হরিণ-নয়নে কি মধুর দৃষ্টি! দিদিমা ধাত্রী সব ভুলিয়া গিয়া সে রমলার গণ্ডে কালো তিলের উপর একটি চুম্বন দিল।

দিদিমা জোর করিয়া রজতের কোলে ক্রন্দিত কাঁথার পুঁটলীটি চাপাইয়া দিলেন। পিতার কোলে আসিতেই খোকার কান্না থামিয়া গেল। এই মাংসের পুতুলের প্রতি চাহিয়া রজত পিতৃহৃদয়ের স্নেহের ভাব জাগাইতে চাহিল, একবার রমলার দিকে চাহিল, দুইজনের চোখ ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, কিন্তু রজতের মনে এই অসহায় ক্ষুদ্র মানবটির প্রতি কোন স্নেহের ভাব উদয় হইল না। কেমন একটা বিরক্তি বোধ হইল, আকৃতি-হীন রূপহীন এই মাংসপিণ্ডের প্রতি চাহিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, সে তাড়াতাড়ি আবার দিদিমার কোলে খোকাকে ফিরাইয়া দিল। কিন্তু দিদিমার কোলে দিয়াই আবার তাহার দিকে চাহিতে রজতের ইচ্ছা হইল, খোকার ছোট দেহ দেখিয়া কান্না শুনিয়া রজতের মন করুণায় ভরিয়া উঠিল, ছোট বেলায় এক ঝড়ে নীড় হইতে খসিয়া পড়া মৃতপ্রায় পাখীর শাবক কুড়াইয়া পাইয়া তাহার মনের এম্নি অবস্থা হইয়াছিল।

ধীরে রজত রমলার নিকট ঘেঁসিয়া বসিল। নবআগন্তুক আপনার আগমন-বার্ত্তা অতি উচ্চস্বরে জানাইতে লাগিল। ঐটুকু নবনী-কোমল দেহ হইতে কিরূপে এত উচ্চ শব্দ বাহির হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য শিশুটির দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই রজত দেখিল মামাবাবু দিদিমার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নব আগন্তুককে দেখিতেছেন—জীবাণু দেখিতে তিনি যেমন করিয়া মাইক্রস্‌কোপের উপর নিবিষ্টমনে ঝুঁকিয়া পড়েন।

উচ্চস্বরে হাসিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—আরে রজত, এ আবার কোন্ বাঁদর এল রে—চেঁচিয়ে মাৎ করে' তুল্লে যে।

রমলা মিষ্টি হাসিয়া বলিল,—দেখুন মামাবাবু, ওকে যদি কোন পোকা মাকড়, কি ব্যাঙাচি বল্‌বেন—"

আল্‌বাৎ বল্‌ব—না, না, এ আমার সোনা মাণিক

হীরের টুক্‌রো, বলিয়া দিদিমার কোল হইতে ক্ষণিকের জন্য খোকাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন,—কৈ ফ্লানেল কৈ? ভাল করে' জড়াও, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

রজত রমলার ম্যাডোনার মত নবশ্রীভরা মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

নব নব জন্মের সৃষ্টির দেবতার স্নেহময় প্রসন্ন দৃষ্টি তাহাদের বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বৎসরের উপর আনন্দকণা বর্ষণ করিল।

২১

সেই রাত্রে মাধবী তাহার ঘরে একা রাত্রি যাপন করিতেছে। সেই দিন সে কাজীর চিঠি পাইয়াছে—তাহার পিতার ভয়ঙ্কর অসুখ। পিতার জন্য অন্তরে উদ্বেগ থাকিলেও সে-বিষয়ে সে বিশেষ কিছু ভাবিতেছে না। তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, অনুভূতির শক্তি হারাইয়াছে। পিতার প্রতি এক ক্ষুব্ধ অভিমান নীরব ক্রোধ গোপন অন্তস্তলে ছিল বলিয়া পিতার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজী-সাহেবের চিঠি ভাল করিয়া পড়িত না, যাহা একটা কিছু ঘটিয়া গেলে সে যেন সব ভাবনা হইতে ত্রাণ পায়।

একা ঘরে বসিয়া সে তাহার স্বামীর কথা মনে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। নীল পর্দা সরাইয়া জানালা খুলিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিল, বাতাস তাহার তপ্ত কপোলে স্নিগ্ধস্পর্শের মত লাগিল। চুল খুলিয়া জলে-ভিজা হাওয়ায় দাঁড়াইয়া বারিধারাস্নাত কালো পিচে মোড়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। গ্যাসের আলোয় পথের একটি কোণ ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, কোথাও কোন মোটরকার আসার চিহ্ন নাই। কিছুক্ষণ পরে একটি মোটরকারের আলো ঝড়ে জলে আলেয়ার আলোর মত দেখা দিল, সে মোটরকার তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ধীরে জান্‌লা বন্ধ করিয়া মাধবী ধীরে বিছানার পাশে কোচে আসিয়া বসিল। সম্মুখের টেবিলে স্তূপীকৃত ইংরেজী ফরাসী নভেল। মোপাঁসার একখানি বই টানিয়া এক বারবনিতার গল্পে মন দিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

তাহার স্বামী দুইদিন হইল বাড়ী আসেন নাই, কারখানায় রহিয়াছেন, আজ রাতেও আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেদিন সন্ধ্যায় মাধবী একবার টেলিফোনে স্বামীকে ডাকিয়াছিল, তিনি এক মিনিটের জন্য আসিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—একটি নূতন মেশিন এয়েছে, বড় ব্যস্ত, লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না, আজ এক নূতন ফার্‌নেসে আগুন জ্বালাতে হবে, রাত্রে যেতে পার্‌বো না বোধ হয়।

রাত্রি যত গভীর হইতে' লাগিল মাধবীর মন বিষের জ্বালায় তত জ্বলিতে লাগিল। বাহিরের শ্রাবণ-রাত্রির মত তাহার মন কোন্ অন্ধ ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই একবৎসরের মধ্যে মাধবীর দেহে মনে ধীরে ধীরে কি বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা সে ভাবিয়া অবাক হইতেছিল। পাহাড়ের মাথায় যে শুভ্র তুষার জমিয়াছিল কোন্ বেদনা-কামনার আগুনে রাঙা হইয়া গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবার বনপর্ব্বত ভাসাইয়া প্রমত্ত স্রোতে কোন্ দিকে যাইবে কেহ বলিতে পারে না।

মাধবী কাপড়ের আল্‌মারীতে লাগান লম্বা আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্নিগ্ধ দুগ্ধশুভ্র দেহের রং গলিত স্বর্ণের আভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, নির্ম্মল চোখ দীর্ঘপল্লবঘন, কালো তারা দুটি কিসের ভারে নত, কোন্ শ্রান্তি গোপন-ব্যথা বুভুক্ষায় ভরা, যেন ওই অন্ধকারে জগতের কত রহস্য লুকান আছে। তাহার তনুতে কৈশোরের সুকুমার শ্রীর উপর পূর্ণবয়স্কা নারীর খরদীপ্তি ভরিয়া গিয়াছে, দেহ ঋজু হইয়া দেহের গাম্ভীর্য্য চলিয়া গিয়া গতিময় হইয়া উঠিয়াছে। কাঁচের অতি নিকটে নিজের মুখখানি লইয়া চোখগুলি একবার বুজিয়া আবার মেলিয়া আপনাকে করুণোজ্জ্বল নয়নে দেখিতে লাগিল। তারপর ভিক্টোরিয়া ক্রসের একখানি বই লইয়া সোফায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল।

এই নভেলগুলি তাহার একমাত্র বন্ধু ছিল। কর্ম্মহীন আনন্দহীন সঙ্গীহীন দিন ও রাত্রিগুলি সে নভেল পড়িয়া কাটাইত। দুইটি লাইব্রেরীর সে

সভ্য হইয়াছিল, তাছাড়া নিজেই থ্যাকারের বাড়ী গিয়া বই কিনিয়া আনিত। ইংরেজী ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজীতে অনূদিত অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার উপন্যাস-গুলি, বিশেষতঃ সে-সব নভেল নারীবিদ্রোহের কথা, rights of women, right to live, gospel of passion ইত্যাদি কথা লইয়া লেখা, সে-সব বই খুব বেশী কিনিয়া পড়িত। মদের মত এ বইগুলি সে পান করিত। উপন্যাস-মায়াবীর স্পর্শে তাহার অন্তরের গোপন-কক্ষে কাহারা জাগিয়া উঠিত, বইয়ের নায়িকাদের সঙ্গে কোন্ অন্তরপুরবাসিনী সাড়া দিত। সাগরের এক স্রোত যেমন গভীরজলতলে অপর স্রোতকে ডাক দেয়, তেম্নি এই নভেল-রাজ্যের জীবনস্রোত তাহার অন্তস্তলের কোন্ মগ্ন স্রোতকে আহ্বান করিয়া উৎসারিত করিয়া দিত। এই ফ্রেঞ্চ নভেলের রাজত্ব—ইহার কাফে, বুলেভার, সালোঁ, নায়কনায়িকাদের প্রেমদ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, লালসা-সংগ্রাম, কত প্রমোদউদ্যান, কত মদজ্বালাময় সুন্দরীখচিত ভোগের জ্যোৎস্নারাত্রি,—এই কাল্পনিক প্রেমসম্ভোগ-লোকে তাহার মন মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। বাহিরের পুরুষদের সঙ্গে মাধবী বড় মিশিত না। কল্পনা-রাজ্যের সুখ তাহাদের মধ্যে পাইত না বলিয়াই হউক, বা স্বামী পছন্দ করিবেন না ভাবিয়াই হউক, যে কয়জন বিলাতপ্রত্যাগত যুবক মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় তাহার বাড়ীতে আসিত, তাহাদের সহিত সে বেশী আলাপ করিতে ইচ্ছা করিত না।

ভিক্টোরিয়া ক্রসের বইখানি কয়েকপাতা পড়িয়া সে-খানি রাখিয়া আর-একখানি বই মাধবী টেবিল হইতে টানিয়া লইল। গল্পটির নাম, 'মা'। এক পতিতা মা ও তাহার মেয়ের গল্প। সে বইখানিও পড়িতে পারিল না, মন উদাস হইয়া উঠিল। হায়, তাহার মা নাই, 'মা' বলিয়া ভাবিবারও কেহই নাই, বুকে জড়াইয়া ধরিবার শিশুমাণিক হয়ত হইবে না। অন্তরের কান্না দমন করিয়া জান্লা খুলিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। এই রাস্তা দিয়া কতবার কত কুলীমজুর রমণীদের সে যাইতে দেখিয়াছে, তাহাদের ছোট মেয়ে আছে; কত ছোট ছেলেমেয়ে দেখিয়াছে, তাহাদের মা আছে।—কৈশোরে মাতৃহীনা এই প্রেমতৃষিত নারীর ক্ষুধিত হৃদয় বর্ষার রাত্রে মায়ের জন্য কাঁদিয়া উঠিল।

মাঝে মাঝে তাহার মনে কি তীব্র জ্বালাময় ইচ্ছা জাগিত, স্নায়ুগুলি শিহরিয়া উঠিত। এতদিন সব ইন্দ্রিয় সুপ্ত ছিল, এখন যে ভোগতৃষ্ণার বহ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা তাহাকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিত; পূর্ব্বের গাম্ভীর্য্য সে হারাইয়াছিল। মাঝে মাঝে এই সুসজ্জিত গৃহে দিনের পর দিন সুপ্রচুর অবসরে ঐশ্বর্য্যসুখের মধ্যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিত, ইচ্ছা করিত, রাস্তায় সে বাহির হইয়া যায়। কলিকাতাটা যদি প্যারিস হইত, সুসজ্জিত পুরুষশোভিত পথে নারীর অবাধগতি থাকিত, তবে সে পথের জনতায় ঘুরিয়া যেন শান্তি পাইতে পারিত।

জান্লা বন্ধ করিয়া আলোর পর্দ্দা টানিয়া মাধবী বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম চোখে আসে না। স্বামীর প্রতি রুদ্ধ অভিমান তপ্তবক্ষে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—আপন ভাগ্যের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর নিয়ন্তার বিরুদ্ধে এক অন্ধ ক্রোধ তাহাকে যেন দংশন করিতে লাগিল। কাহাকে সে দোষ দিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সত্যই কি তাহাদের বিবাহ একটা ভুল হইয়াছে? না, এ জীবন ভাল লাগে না, সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অবসাদ আসে। জীবনটা সত্যি কি, তাহা একবার দেখিতে, বুঝিতে চায়—এই বদ্ধ রঙীন খাঁচায় সোনার পালকে মোড়া হইয়া সোনার দাঁড়ে থাকিতে সে চায় না, প্রাণের পাখা মেলিয়া সে উড়িতে চায়, জীবনের পাত্র ভরিয়া পৃথিবীর সব সুখ সৌন্দর্য্য পান করিতে চায়, পাত্রের তলায় সুধাই থাক আর হলাহলই থাক। তাহার পিতার মতই ওমার খৈয়াম তাহার প্রিয় গ্রন্থ হইয়া উঠিতেছিল। সে পিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

মাধবী কিন্তু যতীনকে ঠিক বোঝে নাই, তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছিল। যতীন ছিল বর্ত্তমান যন্ত্রশক্তির এক বাহক, কলরাজের এক প্রতিরূপ। নারীপ্রেমের লীলা সে বুঝিত না, প্রেমের লীলাখেলা সে বড় ভালবাসিত না, নারীকে হৃদয়-মন্দিরে রাণী করিয়া পূজা করিতেও সে পারিত না, তাঁহার অন্তরের রাজা অর্থও ছিল না, সে রাজা ছিল যন্ত্র। যন্ত্ররাজের এ পূজারী

নারীবন্দনা গাহিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল। মাধবীকে সে ভালবাসিত, তাহার সুখসুবিধার জন্য বড় বাড়ী সাজাইয়া, মোটরকার রাখিয়া, চাকর রাখিয়া ও প্রচুর হাত-খরচের টাকা দিয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু অন্তরের যে প্রেম না পাইলে চিরক্রন্দিত নারীহৃদয়ের তৃষ্ণা মেটে না, তাহার নারীজন্ম ব্যর্থ হয়, সেই প্রেমের কথা সে কোন দিন ভাবে নাই।

মাধবী যখন ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, যতীন তখন মাণিকতলায় তাহার কারখানায় কাজ করিতেছিল। টিনের লম্বা শেডের এক কোণে কয়েকটা ইলেকট্রিক্ আলো জলিতেছে। ফ্লানেলের ট্রাওজার পরিয়া শার্টের আস্তিন গুটাইয়া সে এক বৃহৎ কল সাজাইয়া বসাইতেছিল। জার্ম্মানী হইতে এই কলটি নূতন আসিয়াছে, তাহার টুক্রা টুক্রা অংশ জোড়া দিয়া কলটি বসাইতেছিল; সমস্তদিন অন্যান্য কাজে সময় হয় না, তাই রাত্রেই কলটি জুড়িতে হইতেছিল। তিনজন মিস্ত্রি লইয়া কলের প্ল্যান হাতে করিয়া সে এক মনে কাজ করিতেছিল। এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে রাত একটা বাজিয়া গেল তাহা তাহার খেয়াল ছিল না।

মশা ও বৃষ্টির উপদ্রব বাড়াতে মিস্ত্রিরা সে রাত্রের মত বিশ্রাম চাহিল। যতীন তাহাদের ছুটি দিয়া আফিস-ঘরে গিয়া এক হিসাব লইয়া বসিল। যখন ঘুমাইতে গেল তখন রাত আড়াইটা।

তাহার বিবাহিত জীবনের উপর যন্ত্ররাজের চির-তৃষ্ণাময় স্বর্ণদৃষ্টি জাগিয়া রহিল।

(২১)

সেই রাত্রে হাজারিবাগের সেই বাড়ীতে।

বাহিরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় শালবনে বনে কালোসাপের কুণ্ডলীর মত মেঘস্তূপ ঘনাইয়া আসিয়াছে, সাপের বিষজিহ্বার মত বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, ঝঞ্ঝাঘন রাত্রির বাতাস শ্মশানের ভূতদলের মত হাঁকিয়া মাতাল হইয়া বেড়াইতেছে, বারিঝরার বিরাম নাই।

মুমূর্ষু যোগেশ-বাবুর মাথার কাছে কাজীসাহেব বসিয়া। ঝোড়োহাওয়া মত্ত দৈত্যদলের মত দরজা-জানালায় আঘাত করিতেছে, ঝুলানো আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

চিরপ্রসন্ন কাজীর মুখ আজ কালীতে ভরা, তাঁহার নিশিজাগরণক্লান্ত সেবাক্লিষ্ট চোখ মাতালের মত জলিতেছে। যোগেশ-বাবুর মুখখানি কদর্য্য দেখাইতেছে, তাঁহার অস্বাভাবিক লাল নাক, ফুলো ফুলো গাল, নিষ্প্রভ ঘোলা চোখ, কালো কম্বলে জড়ান দীর্ঘ দেহ। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কাজীর মন করুণাও হতাশে ভরিয়া উঠিতেছিল, মাঝে মাঝে একটু ভয়ও করিতেছিল। দুই বজ্রদগ্ধ পত্রহীন বৃক্ষের মধ্যে কচিবাঁশের মত মনিয়া কোণের এক চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

জরের ঝোঁকে ভুল বকিতে বকিতে মৃত্যু-পথিক বৃদ্ধ চুপ করিয়া ছিলেন, একবার চোখ মেলিয়া কাজীর দিকে চাহিলেন। সে চাউনিতে কাজীর গা সির্‌সির্ করিয়া উঠিল, সত্য সত্যই ভয় হইল। তিনি একটু মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ঘড়িতে রাত দুটা বাজিল। যোগেশ-বাবু হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠাতে কাজীসাহেব চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পাশের টেবিল হইতে একটা ঔষধ ঢালিয়া গ্লাসটা মুখে ধরিলেন।

যোগেশ-বাবুর নিষ্প্রভ চোখ দুইটি হঠাৎ অস্বাভাবিক রূপে জলজল করিয়া উঠিল। পাণ্ডুর মুখ কিসের বেদনায় কাঁপিতে লাগিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদে ভাঙা গলায় বলিলেন,—Oh, pain, ওঃ, না, না, বিভা, ধোরো না গেলাস, আমি খাব না, ছোঁব না, বলছি—promise—ওঃ,—না।

পরম বেদনার স্বরে কাজী বলিলেন,—সাহেব, এ ওষুধ।

রাগ্‌টা গা হইতে সরাইয়া দিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, একবার, শুধু একবার—দাও।

ঔষধটা খাইয়া যোগেশ-বাবু যেন একটু শান্ত হইলেন। কিন্তু ঠিক প্রকৃতিস্থ বোধ হইল না। সহসা বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিতে চাহিলেন, দুর্ব্বল বলিয়া পারিলেন না। দীপ্তস্বরে বলিলেন,—কে? কে তুমি?

হতাশস্বরে কাজী বলিলেন,—আমি ।

—কে ? মাধু ?

কাজীসাহেব মাধবীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিলেন,—হাঁ, বাবা।

বৃদ্ধের ভীতিপ্রদ মুখ শান্ত স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। আবেগের স্বরে বলিলেন,—আয় মা, কৈ রমলা কৈ ? রমলা ! সে যে এই বলে' গেল—আস্‌ছি আমি তোমার চা নিয়ে।

কাজী বলিলেন,—কবে এই আস্‌বে।

বিকারগ্রস্ত বৃদ্ধ অশান্ত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—মাধু, মাধু, সুখী হয়েছিস্, বিয়ে করে' সুখী হয়েছিস ?

অতি করুণকণ্ঠে কাজী বলিলেন,—হয়েছি, বাবা।

বৃদ্ধের ফ্যাকাশে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আর রমলা, কাকে বিয়ে করেছে সে—হাঁ সেই আর্টিষ্টকে—সে সুখে আছে রে ?

কাজী ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন,—আছে, বাবা।

বা, বেশ বেশ, আশীর্ব্বাদ—গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া যোগেশ-বাবু অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

ভীষণশব্দে বজ্রধ্বনি হইল, সমস্তবাড়ী কাঁপিয়া উঠিল, ঝোড়ো হাওয়ায় ঘরের দরজা আর তাহার সম্মুখের ঘরে বন্ধ দরজা খুলিয়া গেল। ওই ঘরে মাধবীর মা মরিয়াছিলেন।

যোগেশ-বাবু চমকিয়া উঠিয়া আবার অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—Oh, oh, wife dear, come at last ! যাচ্ছি, যাচ্ছি।

কাজীসাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বজ্রধ্বনিতে মনিয়ার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে চোখ মেলিয়া ভীতকরুণ নয়নে চারিদিকে চাহিল। কাজীসাহেব গেলাসের বাকী ঔষধটুকু আবার যোগেশ-বাবুর মুখে ধরিলেন।

না, না, আবার ? বলিয়া যোগেশ-বাবু নিমেষের মধ্যে কাজীসাহেবের হাত হইতে গেলাস কাড়িয়া লইয়া সম্মুখের আয়নার দিকে ছুঁড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গেলাস ধরিবার মত শক্তি হাতে নাই, ছুঁড়িতে পারিলেন না, হাত হইতে গেলাস পড়িয়া গিয়া বিছানায় ঔষধ গড়াইয়া গেল, ঝনঝন শব্দে কাঁচের গেলাস মেজেতে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

সেই গেলাস-ভাঙার ঝনঝন শব্দে যোগেশ-বাবু যেন সচেতন হইয়া উঠিলেন, নিভিবার পূর্ব্বে প্রদীপের শেষ শিখার মত তাঁহার সংজ্ঞা একটু ফিরিয়া আসিল। সম্মুখের ঘরের জল-হাওয়ার মাতামাতির ধ্বনি কানে আসিতে লাগিল।

যোগেশ-বাবু একটু স্থির হইয়া শুইয়া কাজীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—আচ্ছা কাজী, lifeটা কি—ট্রাজেডি, না কমেডি ?—হাঃ হাঃ, কমেডি, farce, farce, I say,—Ah my beloved, fill the cup, to-morrow ? to-morrow I may be—ও, কাজী, জল, জল, গলা জ্বলে' গেল—

জল খাইয়া একটু শান্ত হইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন,—কি কাজী, ডাক্তার কি বল্লে, বাঁচ্‌ব না ?

Dust into dust under dust to lie,
Sans wine, sans song, sans singer,
and sans end ?

বা !

যোগেশবাবুর চোখ আবার ঘোলা হইয়া আসিল। তিনি অতি করুণ হাসিয়া উঠিলেন—বা, বা, কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে, বিভা ! এসেছ, ও, dear dear—তিনি একটু উঠিতে চেষ্টা করিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িলেন।

বাহিরে ঝড় থামিয়াছে, ঘরে মুমূর্ষু বৃদ্ধের আর্ত্তনাদও চিরদিনের মত থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশে ঘন কালো মেঘস্তূপে রক্তের ধারার মত অরুণিমা জড়ান। সেই দিকের জান্‌লা খুলিয়া কাজী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার সমস্ত দেহ-মন অসাড়, অবসন্ন, কিছু চিন্তা করিবার অনুভব করিবার শক্তি যেন নাই। ধীরে মনিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিতেই তাঁহার নিরুদ্ধ অশ্রুধারা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল।

আকাশে বৃষ্টি থামিয়াছে, বৃষ্টিশেষের হাওয়া প্রভাতের আলোয় মধুর বহিতেছে, কিন্তু সমস্ত প্রভাত ধরিয়া এই বৃদ্ধ মুসলমান ফকিরের অশ্রুজলের বিরাম রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

জাগরণী—শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

কবিতার বই। রঙীন খদ্দর দিয়া সুন্দর বাঁধা, কবিতাগুলি আরো সুন্দর। ছন্দের বিচিত্রতায়, শব্দের ঝঙ্কারে, ভাবের গভীরতায় কবিতাগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন-বাবুর কবি-সমাজে যে প্রতিষ্ঠিত আসন আছে, এই কবিতাগ্রন্থখানি সেই আসনকে আরো সুদৃঢ় ও অলঙ্কৃত করিয়াছে। গান্ধী মহারাজ, তিলক, চিত্তরঞ্জন, গোবিন্দদাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশের নানা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে লিখিত কবিতাগুলি ও চরকাসঙ্গীত প্রভৃতি বহু কবিতার মধ্যে এমন একটি উচ্চ সুর আছে যাহা মনকে উন্নত করে, রসবোধ ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে উদ্বুদ্ধ করে। যে কেউ এই বই পড়িবেন তিনিই পরিতৃপ্ত হইবেন।

রংমশাল—শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রী চারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত। প্রকাশক—এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। এক টাকা বারো আনা।

ছেলেমেয়েদের হাতে বাৎসরিক পূজার সুন্দর উপহার। গোলাপী রঙের ভালো কাগজে পরিষ্কার ছাপা; অনেক রঙীন ও একরঙা ছবি আছে। রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাংলার প্রায় সকল প্রসিদ্ধ লেখকই কবিতা গল্পে এর অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। যে-সব বালক-বালিকা এখনও এই উপহার হাতে পায় নাই, তারা এই রংমশাল পাইলে আনন্দের হাসির রঙে গৃহ যে আলোকিত করিবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

জন্মাষ্টমী—শ্রী নলিনীমোহন রায়চৌধুরী ও শ্রী শচীন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত। প্রকাশক রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, ২৪ নং (দোতলা) কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম চব্বিশ আনা।

এখানিও ছেলেমেয়েদের বাৎসরিক উপহারের বই। অনেক রঙীন ও একরঙা ছবি ও বহু লেখকের কবিতা গল্প প্রবন্ধ আছে। এই বইখানিতে ছেলেমেয়েদের আনন্দ ও শিক্ষার একত্র সমাবেশ আছে—তারা উপহার পাইলে খুশী ও উপকৃত হইবে।

ভজার বাঁশী—শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস প্রণীত। শ্রী নন্দলাল বসু ও শ্রী অসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক চিত্রিত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। পাঁচ সিকা।

শিশুপাঠ্য ছড়ার বই। এই রচনাকে কবিতা বলা যায় না, পদ্য বলাও চলে না, তাই ছড়া বলিলাম। মধ্যম শ্রেণীর মিল ও ছন্দভঙ্গ যতিপতন স্থানে স্থানে আছে; কোথাও কোথাও ছন্দের অভাবে পদ্য প্রায় গদ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাদেশিক বাক্‌রীতিও কোথাও কোথাও আছে। ইংরেজীধরণ ছড়াগুলিতে ধরা পড়ে। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও বইখানি বেশ সরস, আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর সুদৃশ্য হইয়াছে। প্রায় সব ছড়াগুলিই উপদেশ ঢাকিয়া হাসি-মস্করা রঙ্গ-রসে ভরা। বঙ্গশিশুরা হাসে কম; তাদের বিরস বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটাইবার এই আয়োজন সার্থক হইয়াছে, সমীচীন হইয়াছে; বাংলার গৃহে গৃহে এই ভজার বাঁশীর আনন্দ-সুর বাজিলে গৃহস্থালী সুখময় হইবে নিঃসন্দেহ। ছবিগুলি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ শিল্পীদের আঁকা; প্রসিদ্ধ আর্ট-প্রিণ্টার ইউ রায় এণ্ড সন্সের ছাপাখানার সুন্দর নিঁখুত ছাপা; লেখা হাস্যরসে ভরা; সুতরাং এ বই দেখিতে সুন্দর, পড়িতে সরস। এর সমাদর যথোচিত হইবে আশা করি।

বেদানা—শ্রী হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ছয় আনা।

শিশুপাঠ্য—পদ্যে লেখা মজাদার রঙ্গরসে-ভরা গল্পের বই। ছবি দিয়া সেই-সব গল্পকথা দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে। অনেকগুলি প্রচলিত মজাদার গল্প নূতন করিয়া পদ্যে সরস ভাষায় রসাইয়া লেখা হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে প্রাদেশিক বাক্‌রীতি আছে। গল্প ও রচনা বেদানার দানার মতন ছোট হইলেও রসপূর্ণ—শিশুদের চিত্ততোষণ। কেবল ছবিগুলির প্রশংসা করা যায় না। যাই হোক ছেলেরা এই বেদানা পাইলে এর মধুর রস উপভোগ করিয়া আনন্দিত হইবে।

শতদল—শ্রী স্নেহশীলা চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রী হরিমোহন ঘোষ ১১ রাজার লেন, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্। এক টাকা।

কবিতার বই। সোজা কথায় সরলভাবের অভিব্যঞ্জনা।

দীপান্বিতা—শ্রী নরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। কুমারখালি হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আট আনা।

পল্লীদীপ, ভারতদীপ, ও পঞ্জিকাদীপ নামের তিনটি পদ্য-দীপে কবির দীপান্বিতা হইয়াছে। দীপগুলি হইতে আলোক অপেক্ষা ধোঁয়া-কালীই বেশী ছড়াইয়াছে। পল্লীর চিত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার মোটা মোটা প্রধান ব্যাপারের ফিরিস্তি, আর পঞ্জিকার উল্লিখিত চৌদ্দটি পার্ব্বণকে বারো মাস ও ছয় ঋতুর সঙ্গে মিলাইয়া রূপক—তিনটি পদ্যের বিষয়। পদ্যগুলির মিল ভালো, কিন্তু ছন্দ নাই, ভাব-বৈচিত্র্য নাই, কবিত্ব নাই।

বাল বিধবার বিবাহ—প্রকাশক শ্রী শ্রীচরণ বসাক, হেড-মাষ্টার ন্যাশনাল স্কুল, পাবনা। প্রাপ্তির ঠিকানা—শ্রী আশুতোষ কুণ্ডু, জমিদার, কুমারখালী, নদীয়া। মূল্য—সহৃদয়তা ও সহানুভূতি। ১৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

এই পুস্তিকায় বিধবা-বিবাহের অনুকূল কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকাশকেরা বাস্তবিক সত্য কথাই লিখিয়াছেন—"আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার পাইবার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি, অথচ অন্যকে তাহার ন্যায্য অধিকার দেওয়ার বেলায় খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠি, ইহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ—ইহা আমাদেরই ঋষিবাক্য।" সকলকে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার দিবার মহাসাধনার এই যুগে যে এই কথা অস্বীকার করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিবে সে মানবতার মহাশত্রু।

কুটীর-শিল্পে এণ্ডি-কীট—শ্রী মন্মথনাথ দে প্রণীত। প্রকাশক শ্রী কালীপদ ঘোষ, কৃষিসম্পদ্ আফিস, ৩১ সূত্রাপুর রোড, ঢাকা। তিন আনা।

এই পুস্তিকায় এণ্ডি-রেশমের কীটের চাষ ও রেশম প্রস্তুত ও কাপড় বোনা সম্বন্ধে বিবরণ আছে। উদ্যোগী কর্ম্মী যাঁরা নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চান তাঁরা এই বই লইয়া চেষ্টা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এই সম্বন্ধে ইংরেজী পুস্তিকাও এই গ্রন্থকারের লেখা আছে।

অবতার—শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক শ্রী লালবিহারী বড়াল (বিমলানন্দ), শান্তিধাম, হুগলী। এক টাকা।

প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পলেখক তেওফিল্ গোতিয়ে'র লেখা 'অবতার' গল্পের বঙ্গানুবাদ। এই গল্পলেখক গতিয়ে'র গদ্য রচনা লালিত্যপূর্ণ, ছন্দোময় মধুর শব্দবিন্যাসে ও অপরূপ কল্পনায় মনোহর। এঁর এই অবতার গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ নাই—সুতরাং অনেক বাঙালীর তাহা পড়িয়া রস ও আনন্দ সম্ভোগের সুযোগ ঘটে নাই। অনুবাদকর্ম্মে অক্লান্ত ও সুপটু প্রসিদ্ধ প্রবীণ লেখক এই সুন্দর গল্পটির অনুবাদ করিয়াছেন; বাঙালী পাঠক এইবার অনায়াসে ও স্বল্পব্যয়ে ফরাসী সাহিত্যের একখানি উত্তম বইএর রসাস্বাদ করিতে পারিবেন; এই সুযোগ দেওয়ার জন্য বাঙালী পাঠক অনুবাদকের নিকট কৃতজ্ঞ এবং বঙ্গসাহিত্য ঋণী।

অঞ্জলি—৺পরেশনাথ আচার্য্য ও শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায় কর্ত্তৃক লিখিত কতকগুলি স্বদেশী গানের ক্ষুদ্র সংগ্রহপুস্তক। দাম ছয় পয়সা। অঞ্জলির বিক্রয়লব্ধ আয় মেদিনীপুর জেলার রাষ্ট্রীয় সমিতিকে দান করা হইবে। গানগুলি স্বদেশপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা—শ্রী মন্মথনাথ সিংহ কর্ত্তৃক পদ্যে অনুদিত। ২৪, পরগনা মথুরাপুর। মূল্য রাজসংস্করণ ১।০, বাঁধাই ১৵০, কাগজের মলাট ১৲।

বিবেকানন্দ-চরিত—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ আনা।

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের জীবন-কথা—তদীয় পত্নী শ্রীমতী হরসুন্দরী দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত। পাঁচ সিকা। সচিত্র।

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্ত ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সত্য- ও ধর্ম্মানুরাগ, তজ্জন্য জীবনসংগ্রাম, চারিত্রবল প্রভৃতি পাঠ করিলে উপকৃত হওয়া যায়। জীবনচরিতখানি সুরচিত হইয়াছে।

মুদ্রারাক্ষস

পুরাণতত্ত্ব—প্রথম খণ্ড, শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, ব্রাহ্মণরক্ষা সভা, কাশী। পৃষ্ঠা ১০৪। মূল্য।৴০।

আমাদের পুরাণগুলির মধ্যে ক্রমে ক্রমে কত নূতন নূতন কথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, শ্রীযুত ভারতী মহাশয় তাহা পৌরাণিক প্রমাণেই যুক্তিপূর্ব্বক ইহাতে দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানা পড়িলেই মনে হয়, তিনি নিজের বক্তব্য বিষয়টি বেশ চিন্তা করিয়াছেন। যাঁহারা ঐতিহাসিক ভাবে পুরাণ আলোচনা করেন, ইহা পড়িলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। কাশীর ব্রাহ্মণ রক্ষা সভার আনুকূল্যে বইখানা প্রকাশিত, ইহা আনন্দের বিষয়—এইজন্যই আনন্দের বিষয় যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ভারতী মহাশয়ের এই আলোচনাকে সহ্য করিয়াছেন, নাস্তিক বলিয়া তাঁহারা ইঁহাকে বর্জ্জন করেন নাই। ক্ষুদ্র হইলেও বইখানা পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম ও হিঁদুয়ানী—শ্রীযুত রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর লিখিত—

রাজা বাহাদুর এই পুস্তিকাখানিতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিঁদুয়ানী এক জিনিস নহে। আজকাল আমাদের হিঁদুয়ানী আছে পুরামাত্রায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মোটেই নাই। সন্দেহ নাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অত্যন্ত—অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমরা আত্মাকে ছাড়িয়া কেবল দেহটা ধরিয়া চলিয়াছি, এবং তাহার যাহা পরিণাম তাহা হইতেছে।

হিন্দুদের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতে মরণপর্য্যন্ত যে-সকল সংস্কার বা কার্য্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, রাজা বাহাদুর দেখাইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশগুলেই (আমরা বলিতে পারি শতকরা নিরানব্বই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না) কেবল যেন-তেন-প্রকারেণ বাহিরের অনুষ্ঠানটা করা হয়, এবং তাহাতেই মনে করা হইয়া থাকে, কার্য্যগুলি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইল। সত্য কথা, যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকে এগুলি যথাবিধি অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, অন্যথা দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায়, "খালি ভস্মে ঘি ঢালা।"

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কেবল আচার নহে; আচার হইতেছে ইহার বহিরঙ্গ, আর অন্তরঙ্গ হইতেছে আত্মাকে লইয়া প্রজ্ঞাকে লইয়া। সেই আচারই আচরণীয় যাহা আত্মার বা প্রজ্ঞার উন্নতির ব্যাঘাত না জন্মায়, বা যাহা তাহার অনুকূল হয়। আচার মানিতে হইবে বৈকি, না মানিয়া উপায় ত নাই। লোকালয়ে বা সমাজে থাকিতে হইলে যে-কোন আকারেই হউক না একটা-না-একটা আচার মানিতেই হয়। তাই কাহারও বলিবার উপায় নাই যে, 'আমি আচার মানি না।' ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে এমন কতকগুলি আচার আছে যাহাতে আধ্যাত্মিক বা বাহ্য উন্নতি হয়। আবার এমনো আচার আছে, যাহা আচার মাত্র; ইহাতে লাভ কিছু নাই, আর বলিলে বলা যায়, ক্ষতিও কিছু নাই। যেমন, গৃহ্যসূত্রে আছে, ইন্দ্রধনুকে (রামধনুকে) ই ন্দ্র ধ নু বলিয়া কাহাকেও দেখাইবে না, যদি দেখাইতে হয় বলিবে ম ণি ধ নু। কেন? ই ন্দ্র ধ নু বলিলে ক্ষতি কি? কিছু না, ইহাতে বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এ একটা প্রাচীন প্রথা মাত্র, প্রাচীনেরা এইরূপ বলিবেন। ইহার পর আর কিছু নাই। নানাদেশের নানাজাতির মধ্যে এরূপ আচার আছে, কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে নহে।

কেহ ইচ্ছা করুক বা নাই করুক, এ সব বদ্‌লাইয়া যাইবেই, আর তাহা হইলেই যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল, ইহা বলা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, বা কার্য্য না করিলে বস্তুত আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত হয়, তাহা রক্ষা করিবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সে চেষ্টা সাধু।

রাজা বাহাদুর অনেক কথা বলিয়াছেন, সে-সমস্ত আলোচনা করিবার অবসর নাই, স্থানও নাই, আর করিয়াও বিশেষ লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না, তাই এক-আধটা বলি। তিনি "মদ্যমিশ্রিত বিলাতী ঔষধ" সেবনের কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধ ও পথ্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে। জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না, ইহা সেবনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কিরূপে হানি হইতে পারে? পথ্য কি? যাহা আত্মার অনুকূলভাবে বা অবিরোধে শরীরের হিতকর, আমি তো বলি, ইহাই পথ্য ইহাই খাদ্য, এবং ব্যাপকভাবে ধরিলে বলিব, ইহাই পুণ্য। মদ্য অপেয়, অস্পৃশ্য, ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই; মদ্য যখন মত্ততা আনিয়া আত্মা ও শরীরের ক্ষতি করে তখনই তাহা অপেয়, এমন কি সেইজন্যই তাহা অস্পৃশ্য; কিন্তু যখন তাহা আত্মার উন্নতির অবিরোধে শরীরের বা স্বাস্থ্যের হিতকর হয় তখন তাহা কখনই অপেয় ও অস্পৃশ্য হইতে পারে না। জীবহত্যা

করিয়া উৎপাদিত খাদ্যের ন্যায় ঔষধও ত্যাজ্য, কারণ ইহা শরীর বা স্বাস্থ্যের হিতকর হইলেও আত্মার উন্নতির বিরোধ করে। স্বয়ং ঘৃত জীব হইতে উৎপাদিত খাদ্য বা ঔষধ আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত না করিতে পারে, কিন্তু তাহা স্বাস্থ্যের বস্তুত অনুকূল কি না বিচার্য্য। অনুকূল হইলে তাহারও সেবনে বাধা হইতে পারে না। আমাদের খাদ্যাখাদ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সম্বন্ধেও এইরূপে বিচার করিয়া দেখিতে পারা যায়। শূদ্র-পক্কও খাদ্য হইতে পারে, আবার ব্রাহ্মণ-পক্কও অখাদ্য হইতে পারে; তেমনি ব্রাহ্মণও অস্পৃশ্য হইতে পারে, আবার চণ্ডালও স্পৃশ্য হইতে পারে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই বলে, এবং ঠিকই বলে, ব্রাহ্মণও চণ্ডাল হয়, আর চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হয়।

আচারের কথা, বাহ্য আচারের কথা বলিতে হইলে ইহা একটা ধর্ম্ম বৈ কি, ইহা লোকধর্ম্ম, মোক্ষ ধর্ম্ম নহে। ইহা পরিবর্ত্তনশীল। যে কোন দিকে যে কোন দেশে তাকাই না, দেখা যাইবে, পূর্ব্বের কত আচার গিয়াছে, আবার নূতন কত আচার আসিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ জাতি বা সম্প্রদায়ের আচার-পদ্ধতি তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার মূল তত্ত্বটা বুঝা যায়। যাঁহারা Frazer সাহেবের Golden Bough পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহা সবিশেষ জানেন।* ইহাতে বুঝা যায় সামান্ত সামান্ত বিষয় লইয়া মানবসমাজে যে আচার-অনুষ্ঠানের আড়ম্বর করা হইয়াছে তাহার মূল কথাটা কত সহজ, হয় তো কত ক্ষুদ্র। ঠিক একই জাতীয় অথচ একই আচার অসভ্যদের মধ্যে দেখিয়া যখন আমরা অবজ্ঞা করি তখনই দেখা যাইবে গম্ভীর শাস্ত্রের ভাষায় লিখিত হইয়া তাহা কত গম্ভীর কত বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা বাহাদুর এক স্থানে লিখিয়াছেন শাস্ত্রানুসারে মৃত্যুর সময় রোগীকে ঘরের বাহিরে পবিত্র স্থানে না আনিয়া আজকাল শিক্ষিত পরিবারে অনেকস্থলে ঘরের মধ্যে রাখা হয়; এবং মৃত্যু হইলে "ফেনাইল" প্রভৃতি দিয়া ঘর শোধন করা হয়, শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে করা হয় না। জীবনের শেষ ক্ষণে রোগীকে ধরাধরি করিয়া টানিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আনা গর্হিত নয়, ইহা বলিতে পারিব না। আর যদি কেহ ইহাকে নিষ্ঠুরতা বলেন, তবে তাহা অন্যায় ইহাও বলিতে পারি না। শব ঘরের মধ্যে থাকিলে সমস্ত ঘরই দূষিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তেমন উৎকট ব্যাধি হইলে তাহাতে ঐ দোষের সম্ভাবনা। তাই যতদূর সম্ভব এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। গৃহের শোধন কিরূপে হইবে তাহা বস্তুতত্ত্ববিদ্ অভিজ্ঞেরা বলিবেন। ফেনাইল প্রভৃতির দ্বারা যদি তাহা হয় ক্ষতি কি? গোবরই দিয়া করিতে হইবে এ নিয়ম ঠিক নহে। ইহা অপেক্ষা ভাল জিনিস যদি পাওয়া যায় তবে তাহাই ব্যবহার করা কি ঠিক নহে? লক্ষ্য ঠিক থাকিলে সময়ে সময়ে অনেক ভাল ভাল পথ পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ একটি ভাল পথ পাইয়া চলিলে কাহাকেও নিন্দা করিতে পারা যায় না। তবে অবলম্বিত পথটা বস্তুত ভাল কি না তাহা অবশ্য পরীক্ষণীয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কত ব্যাঘাত করে, রাজা বাহাদুর তাহা দেখাইয়াছেন। অনুপযুক্ত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গুরু ও পুরোহিতের দ্বারা কত ক্ষতি হয় তাহাও তিনি বলিয়াছেন। আজকাল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বৈধভাবে সম্পন্ন করা কত শক্ত রাজা বাহাদুর নিজেই তাহা অনুভব করিয়াছেন। শাস্ত্রে ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁহার পরম শ্রদ্ধা আছে। অর্থেরও তাঁহার অভাব নাই, ব্যয় করিতেও তিনি কাতর নহেন, তথাপি সেতুবন্ধে একবার শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া তিনি বহু চেষ্টাতেও একটু গাওয়া ঘিয়ের কথা দূরে থাক্, মহিষের ঘিও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, অগত্যা তাঁহাকে অনুকল্পরূপে নারিকেলের তেল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার শ্রাদ্ধ কি ব্যর্থ হইয়াছিল? কক্ষনো নহে। শ্রদ্ধা তাঁহার ছিল, তাহাতেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। যদি তাঁহার শ্রদ্ধা না থাকিত তবে প্রচুর গাওয়া ঘি পাইলেও তাঁহার শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হইত—যদিও লোকে জানিত তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যে-সমস্ত অন্তরায়ের কথা তিনি বলিয়াছেন (হয় তো সবগুলি বস্তুত অন্তরায় নহে), তাহাদের প্রতীকার কোথায়? তিনি তাহা দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া বলিয়াছেন "অসংখ্য প্রতিকূল-শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের সামর্থ্য এ সময়ে আমাদের নাই।" তিনি তাই সর্ব্বশেষে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের হৃদয়টি যেন "অন্ততঃ ব্রাহ্মণ-ভাবাপন্ন" থাকে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে বহিরঙ্গ আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে, বরাবরই ইহা হইয়াছে, কেহ ইহাকে ঠেকাইতে পারিবে না। কিন্তু ইহাতে তেমন কিছু আসিয়া যাইবে না, যদি হৃদয়টি ব্রাহ্মণভাবাপন্ন থাকে। তাই রাজাবাহাদুর ঠিকই প্রার্থনা করিয়াছেন, হৃদয়টি যেন ব্রাহ্মণভাবাপন্ন হয়।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

রণডঙ্কা—শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ফুলস্কেপ কোয়ার্টো, ৩৯+৫ পৃঃ, নয়খানি চিত্র এবং একখানি রঙ্গীন চিত্রপট সহিত। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা। বারো আনা।

গতবৎসর ব্রজেন্দ্র-বাবু ছেলেদের জন্য ঐতিহাসিক গল্পের বই "রাজা-বাদশা" লিখিয়া আদর পাইয়াছিলেন। এবার পূজার পূর্ব্বে আর-একখানি ঐধরণের অতিসুন্দর বই রণ-ডঙ্কা নামে বাহির করিয়াছেন। ইহাতে বাহমানী সাম্রাজ্যের মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ মামুদ গাওয়ান, আহমদনগরের বীর রাণী চাঁদবিবি, গোলকুণ্ডারাজের একমাত্র বিশ্বাসী সেনাপতি আবদুর রজ্জাক লারী, বঙ্গদেশের গিরিয়ার যুদ্ধের বীরবালক জালিম সিংহ, এই চারি জনের মনোহর কাহিনী রহিয়াছে। সবকটিই সত্য ইতিহাসের ঘটনা, কিন্তু সরল ভাষায় সুচারু ধরণে লেখা; আর পূর্ব্ব ইতিহাস ও পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনার আবশ্যক-মত বিবরণ দেওয়ায় শিশু-পাঠকেরও বুঝিতে ও গল্পের পূর্ণ রস পাইতে কোনই বাধা হইবে না। বীরত্ব ও ত্যাগের এই কটি সত্য কাহিনী—বঙ্গীয় বালক-বালিকাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়া যেন তাহাদেরও সেই মহাত্মাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"রণডঙ্কার" ভাষায় এবং উপকরণ-সজ্জায় ব্রজেন্দ্র-বাবু গতবৎসর অপেক্ষা আরও অধিক দক্ষতা দেখাইয়াছেন। আশা হয় ক্রমে তিনি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কাহিনী-লেখকের পদ অধিকার করিয়া বসিবেন।

মলাটের নানাবর্ণে রঞ্জিত ছবিখানিতে শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। চারিটি উটের উপর জয়ঢাক চড়াইয়া মহা উৎসাহে রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে দুইজন পতাকাধারী মুঘল অর্দ্ধচন্দ্র-অঙ্কিত ধ্বজা লইয়া অগ্রসর হইতেছে। সমস্ত ছবিখানি জীবন এবং মুঘলযুগের হাবভাবে পূর্ণ, যেন খুদাবখস পুস্তকালয়ের কোন প্রাচীন ভারতীয় চিত্র কাটিয়া বসান হইয়াছে।

শ্রী যদুনাথ সরকার

গান

এল যে শীতের বেলা বরষ পরে,
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে।
কর ত্বরা, কর ত্বরা,
কাজ আছে মাঠ ভরা,
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে।

বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা-তারা,
আসন আপন হাতে
পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথী আসিবে রাতে তাহারি তরে॥

(ভারতী, কার্ত্তিক) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

মাটির উপর দস্যুবৃত্তি

...বিখ্যাত পিয়ানোবাদক ও সঙ্গীতরচয়িতা শোপ্যাঁ ইউরোপে পর্য্যটনকালে পোল্যাণ্ড-দেশের মাটিতে পূর্ণ একটি রজতপাত্র সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। তিনি যখন তাঁহার মাতৃভূমি পোল্যাণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত হন, সে সময় তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে বিদায়-কালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহারস্বরূপ এই দেশের মাটি প্রদান করেন। আমিও আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে আপনারা দেশের মাটিকে এইরূপই আন্তরিকভাবে ভালবাসিবেন। আপনারা যে শুধু মাটির ভোগদখলের অধিকারী নন, আপনারা যে মাটির সন্তান, এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন।...

মাটিকে অবহেলা করিলে গোড়াতেই আমাদের সব কাজ ফাঁসিয়া গেল। আমরা প্রকৃতির খুব বড় একটি নিয়মকে পালন করি না বলিয়া বসুন্ধরার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হই। সে নিয়মটি এই যে, মাটির নিকট হইতে যে পরিমাণ গ্রহণ করিবে, মাটিকে আবার সেই পরিমাণই ফিরাইয়া দিতে হইবে। বাড়ীতে ভাঁড়ারঘরে যে সঞ্চয় থাকে তাহা খরচ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ক্রমাগত বাহির হইতে রসদ যোগাইয়া রাখিতে হয়, তেমনই ধরিত্রীর যে ভাণ্ডারের চাবির সন্ধান মানুষ জানে তাহা হইতে সে যে-ধন আদায় করিবে তাহার মূল্য যদি ফিরাইয়া না দেয় তবে ধরিত্রীকে ও তাঁহার ভবিষ্যৎ সন্তানদিগকে সে নিঃসম্বল করিয়া দেয়। মাটি চাষ করিয়া তাহা হইতে যে-উপাদানগুলি আদায় করিয়া লইলাম, কোনো না কোনো আকারে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।...

মানুষের খাদ্য-সামগ্রীকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম, প্রাণপ্রদখাদ্য, দ্বিতীয় শক্তিপ্রদখাদ্য।...ইহারা জীবজন্তু ও তরুলতাকে প্রাণবান্ রাখে। তরুলতা কেবল মাটি হইতে এই দুই প্রদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া গাছপালার প্রাণধারণের জন্য লৌহ, চূন, পোট্যাসিয়ম, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের আবশ্যক হয়। তাহারা এই-সকল উপাদানও মাটি হইতে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কৃষক যে-ফসল উৎপাদন করে তাহা দিয়া সে গাছপালার জীবনীশক্তির সহায়ক এই-সকল পদার্থকে মাটির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই দানকে সে যদি ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা না করে তবে সে মাটির উপর দস্যুবৃত্তি করিয়া ভবিষ্যৎমানবকে তাহার প্রাপ্যধন হইতে বঞ্চিত করিল।...

বছর বছর যে ফসল ফলিতেছে তাহাতে মানুষ ভূমিলক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্যকে তিল তিল করিয়া হরণ করিতেছে। বসুন্ধরার এই রত্নহরণ আমাদের চোখেই পড়ে না, কারণ প্রথমতঃ হয়তো একশত বৎসর অতীত না হইলে আমাদের নিকট এই সত্য সপ্রমাণ হইবার অবসর পাইবে না, এবং দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালাদেশের গঙ্গাজলবিধৌত আবাদের জমিগুলি প্রতিবৎসর নূতন পলির দ্বারা আবৃত হওয়াতে তাহা আবার তাজা হইয়া উঠিতে থাকে। আপনাদের চারিদিকে এই যে আস্‌বাবপত্র জীবজন্তুফলমূল ও আত্মীয়স্বজনদিগকে দেখিতেছেন ইহাদের সকলকেই পৃথিবীর নাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হইয়াছে। ইহাদের নিকট হইতে পৃথিবীর অংশ আবার পৃথিবী ফিরিয়া পাইবে এইরূপ কড়ার আছে। যে পরিমাণে কড়ার-মত তাহার ঋণ পরিশোধ না হয় সেই পরিমাণে তাহাকে নিঃস্ব করা হইয়া থাকে, এবং তাহার ভাবী সন্তানসন্ততিদেরও অন্নবস্ত্রের সম্বল হরণ করা হয়।...

ধান্য প্রধান শস্য।...কৃষক এই ফসল পাইয়া জমিকে কি প্রতি-দান দেয়? তাহার ধান মহাজনেরা অল্পমূল্যে কিনিয়া লইয়া গোলাজাত করে এবং পরে সুবিধামত কলিকাতায় বা কয়লার দেশে খুব উঁচু দরে বিক্রয় করে। এই রপ্তানির চাল মানুষের উদরস্থ হয় এবং মলমূত্রের আকারে তাহার যে বিকৃতি ঘটে তাহা নালা বহিয়া নদীতে গিয়া পড়ে এবং মাটি হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে ধান চালান না হইয়া গ্রামেই থাকিয়া যায় তাহা গ্রামবাসীরা সম্বৎসর ধরিয়া নিঃশেষ করে কিন্তু তাহাদের মলমূত্র ক্ষেতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। পুরুষেরা গ্রামে ইতস্ততঃ তাহা বিক্ষিপ্ত করে এবং স্ত্রীলোকেরা তাহা জলাশয়ের মধ্যে ফেলে। এই পুকুরের জলে কাপড় কাচা হয় এবং তাহা পান করা হয়। যদি বা কখনো ইহার পঙ্কোদ্ধার হইল তো তাহার তলদেশের এই ময়লাজলের ধাতবপদার্থ উপরে ধান-ক্ষেতের উপরে জমা হইল, তাহাতে জমির সহিত দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ অল্পপরিমাণে বজায় রহিল। এই-সকল ত্রুটিকে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, ইহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়া প্রতিকারের চিন্তা করিতে হইবে।...

ধানের যে বিচালী হয় তাহার কিয়দংশ গরুতে খায় এবং সেই গরুর গোবর কোনো গোলাগর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই গোবর রৌদ্রে শুকাইয়া যায় বা বৃষ্টির জলে ভাসিয়া যায়। গরুর চোনাও গোয়ালে বা পুকুরে নষ্ট হইয়া যায়। কিছু গোবর দিয়া ঘুঁটে হয় কিন্তু তাহার ছাই গ্রামে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলা হয় এবং হয়তো তাহা বৃষ্টির জলে ভাসিয়া যায়। যে-গোবর গর্ত্তে পচান হয় তাহা নিকটস্থ কোন ইক্ষু বা আলুর ক্ষেতে দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা ধান-ক্ষেতে আর ফিরিয়া যায় না। ভাতের ফেন গরুকে খাইতে দেওয়া হয়,

অথবা নালায় ফেলা হয়। চীনেরা কিন্তু এই ফেণাও খইতে ছাড়ে না। তাহার পর ধানের যে ক্ষুদকুঁড়া ও ভুষা হয় তাহা গরুকে খাইতে দেওয়া হয় কিন্তু তাহাতে সারবান্ খাদ্যপদার্থ যথাপরিমাণে না থাকাতে গোবররূপে তাহার যে পরিণতি ঘটে তাহাতে জমি লাভবান্ হয় না। যে বিচালি পাওয়া যায় তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলা হয় অথবা ঘর ছাওয়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। জমির পক্ষে এই বিচালির যে কিরূপ প্রয়োজন তাহা এ দেশের কেহ জানে না। কিন্তু আমার স্বদেশ ইংলণ্ডে আমরা যখন নূতন প্রজাকে জমি দিই তখন এই সর্ত্ত থাকে যে, সে ঐ ভূমি হইতে প্রাপ্ত সার বিক্রয় করিতে পারিবে না, বিচালি অন্যত্র সরাইতে পারিবে না। আমরা জানি যে এই সাবধানতা অবলম্বন না করিলে জমি ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহার দর ও খাজনার হার কমিয়া যাইবে। রায়তী-জমির প্রতি কৃষকের কোন মমতা থাকে না। তাহারা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খাজনায় জমি লয়, সুতরাং তাহারা তাহাকে যথাসম্ভব দোহন করিতে থাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষতিপূরণের কোনো চেষ্টাই করে না। যে দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে গিয়া বাস করে সেখানে অল্পবুদ্ধি লোকেদের হাতে পড়িয়া মাটি শীঘ্রই এই দৈন্যদশা প্রাপ্ত হয়।

ধান ছাড়া অন্যান্য শস্যের কথা ধরা যাক্। ইহাদের মধ্যে আলু ও ইক্ষুর চাসে জমি সব চেয়ে বেশী কাবু হইয়া পড়ে। ইক্ষু মাড়াইয়া রস বাহির করা হইলে তাহার ছোব্ড়া ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহার ছাই ক্ষেতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। ইক্ষুর পাতাগুলি গরুতে খাইয়া ফেলে। এই ক্ষতি সত্ত্বেও গুড়পদার্থটি মাটির উপর বেশি জুলুম করে না, কারণ তাহা খাঁটি ষ্টার্চ এবং তাহা শক্তিদায়ক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। তাহার পর চাষী যে আলু উৎপন্ন করে, তাহার অধিকাংশ মহাজনের কাছে বিক্রয় করা হয় এবং গ্রামের লোকেরা যতটুকু খায় তাহার মধ্যে আবার খোসা বাদ পড়ে। এই খোসাই আলুর সবচেয়ে সারবান্ অংশ, কিন্তু তাহা মানুষে না খাইয়া গরুতে খায়। তামাকু, শাকসবজী ও তুলাও জমির উপর কম দাবী করে না এবং তাহারা জমিকে তাহার বদলে কিছুই ফেরৎ দেয় না। তাহার পর মাটির যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান অর্থাৎ পশুপক্ষী ও মানুষ, তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। এদেশে গোমহিষ ও মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তাহারা মাটিতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। গ্রামে কোনো মহামারী হইলে মৃত গোমহিষাদিকে নিকটস্থ কোনো স্থানে প্রোথিত করা হয়। অন্যসময়ে মৃতগরুর চামড়া কলিকাতার ব্যবসায়ীগণের নিকট চালান করা হয়। চামড়া ছাড়া অবশিষ্ট মৃতদেহ পড়িয়া পচিতে থাকে, তাহার হাড়গুলি পরিষ্কৃত হইয়া বাহির হইয়া আসিলে তাহা একত্র করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। জাপান দেশের কৃষিজীবীরা মাটির দরদ বোঝে, তাই সে দেশে এই হাড়ের চাহিদা খুব বেশি। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে এই হাড়ের আমদানি করে এবং এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হয় বলিয়া এখানকার কৃষিবিভাগ এই সারের সাহায্য লইবার বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। ফলতঃ বছরের পর বছর মাটির উপর এই মারাত্মক রকমের দস্যুবৃত্তি চলিতেছে এবং তাহার কোনো প্রতীকার হইতেছে না। অন্যদেশের ন্যায় এদেশেও মানুষ মরিলে তাহার মৃতদেহের সৎকারবিধির জন্য মাটির কোনো উপকারই সাধিত হয় না।

সহরবাসীরাই সব চেয়ে মাটির উপর বেশি জুলুম করিয়া থাকে। মাটি হইতে উৎপাদিত জিনিসের জন্য তাহাদের আকাঙ্ক্ষার আর পরিতৃপ্তি নাই, অথচ মাটি হইতে প্রাপ্ত আবর্জ্জনাকে তাহারা জ্বালাইয়া ফেলে এবং নালী দিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। তাহাদের বাড়ীগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে নিজেদের এতটুকু জমি নাই যে শাকসবজী উৎপন্ন করে। তাহাদের জীবনযাত্রা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ এবং তাহারা দেশ জুড়িয়া রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই-সকল কারণে সমস্ত ঝুঁকি পড়িয়াছে কৃষকদের উপর। তাহারাও বেশ উৎসাহের সহিত মাটির উপর জোর খাটাইয়া যতটা পারে আদায় করিয়া লইতেছে। কিন্তু সহরবাসীরা চাষাদের এই শ্রমজাতসামগ্রীর পরিবর্ত্তে যে-সকল সভ্যতার উপকরণ যোগাইতেছে তাহাতে মাটির কোনো লাভ হইতেছে না।

...মাটির উপর এই দস্যুবৃত্তির ফলে মানুষের জীবনীশক্তি ও বলবীর্য্যকে তিল তিল করিয়া ক্ষয় করা হইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীগণ কি খায় তাহা একবার বিচার করিয়া দেখুন। তাহাদের প্রধান খাদ্য ভাত, এবং অনেক স্থলে শুধু ভাত ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাল, চিনি, ঘৃত, তেলকে সৌখীন খাদ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদের মধ্যে কেবল ডালেই নাইট্রোজেন আছে। এখানকার গ্রামের লোকেরা প্রায়ই শাকসবজী খায় না। তাহার উপর ভাতের রন্ধনপ্রণালীর দরুণ ভাইটামীনভাগ নষ্ট হয়। তাহলে দেখা যাইতেছে যে তাহারা কেবল শক্তিদায়ক খাদ্যই আহার করিয়া থাকে, কিন্তু যে-সকল প্রাণদায়ক খাদ্য পাইলে শরীর সুগঠিত হইয়া ঐ শক্তির সদ্‌ব্যবহার করিতে পারে তাহা তাহাদের ভাগ্যে জোটে না। ভাইটামীন না পাইলে প্রাণরক্ষা করা অসম্ভব। এদেশের লোকেদের এজন্য শরীরের শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে এবং রোগাক্রান্ত হইলে শরীর সেই রোগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না।

সকলদেশে ও সকলকালে সহরবাসীরা তাহাদের কষ্টের জন্য গ্রামবাসীদের গাল পাড়িয়াছে। আহার্য্য যখন দুর্ম্মূল্য হয়, তখন তাহার মূলকারণ অনুসন্ধান না করিয়া তাহারা কল্পনা করে কে বুঝি বা আর কেহ তাহাদের ঠকাইয়া লাভবান্ হইতেছে। যত দোষ ঐ চাষার ঘাড়ে পড়িয়াছে। কেহ কেহ বা রাজপথ ও রেলপথের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়াছে বলিয়া এই দুঃখকষ্টের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। অবশ্য রাজপথ ও রেলপথ ম্যালেরিয়া-বৃদ্ধির একটি কারণ, কিন্তু ইহার আরো কারণ আছে। সহরবাসীরা নির্দ্দয়ভাবে জঙ্গলের গাছপালা কাটিয়া ফেলাতে উঁচুজমির মাটি বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইতেছে। এই মাটি নদীর জলে মিশিয়া নরম পলিমাটির জায়গা জুড়িয়া জলচলাচলের বিঘ্ন ঘটাইতেছে। সহরবাসীরা মাটির উপর আরো কি কি দৌরাত্ম্য করে তাহা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই-সকল কারণেও ম্যালেরিয়া দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।...

মুসলমান চাষারা হিন্দুচাষা অপেক্ষা মিতব্যয়ী ও সুস্থসবল হইয়া থাকে। এই মুসলমান প্রজারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার হেতু যে-রক্তগত ও জাতিগত পার্থক্য তাহা বলা যায় না।...মুসলমানেরাই গোমহিষকে অধিক যত্ন করে।

হিন্দুরা যদি কোনো সুদূর ভবিষ্যতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায় তবে অন্ততঃ সাঁওতাল ও মুসলমানগণ আরো কিছুকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে। তাহারা খাওয়াদাওয়াব্যাপারে ও আচারপদ্ধতিতে অনেকাংশে হিন্দু অপেক্ষা স্বাধীন। আমি সকলকে মাংস খাইতে বলি না, কিন্তু মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর পদার্থ সকলের খাওয়া উচিত। ইয়োরোপীয়গণ বিভিন্ন জলবায়ু হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া যে এখানকার রোগভোগের হাতে পড়িবে তাহাই স্বাভাবিক, কিন্তু এদেশের লোকেদের তুলনায় তাহাদের স্বাস্থ্য আশ্চর্য্যরূপ সুরক্ষিত থাকে। ইহার কারণ এই যে তাহারা পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে এবং স্বাস্থ্যকর নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলে। দারুণ গ্রীষ্মপ্রধান মেসো-

পোটেমিয়ায় যে-সকল কুলী প্রেরিত হইয়াছিল, আমি দেখিয়াছি যে তাহাদের মধ্যে জাপানী ও চীনেরা ভারতীয়দের অপেক্ষা সুস্থ ও সবল। সেখানে আরব, পারসীক, কুর্দ্দী, মিসরবাসী, জাপানী ও চীনে কুলীরা পরিশ্রমে ও জীবনসংগ্রামে ভারতীয় কুলীদিগকে পরাস্ত করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আবহাওয়ার অপেক্ষা খাদ্যই দেহরক্ষার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়। ঐ বিদেশীকুলীরা দুধ ডিম-শাকসবজী ও মাংস খায়—এই-সকল খাদ্যে প্রোটীন ও ভাইটামীন অধিক পরিমাণে আছে। অনেকে হয়তো বলিবে যে এই দৈহিক বলের কারণ খাদ্য বা জলবায়ু নহে। মাটির গুণেই এইরূপ শক্তিলাভ করা সম্ভবপর। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মাটিকে যেরূপ অবহেলা করা হয় তাহাতে আমি মনে করি এই উক্তি অনেকাংশে সত্য। কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে তার জন্য আমরাই দোষী এবং ইহার প্রতীকারের ভার আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে আছে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া কিছু ফল হইবে না। ভূমিকে সুফলা করিয়া তুলুন সমবায় প্রণালীর দ্বারা সকলের সহিত সহ-যোগিতা করুন, তবেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। পৃথিবীর পূর্ব্বইতিহাস আমাদের এই পথেই চলিতে শিক্ষা দিতেছে।...

আমাদের এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে শস্য বিক্রয় করিয়া সদ্য লাভ পাইলেই সকল গোল চুকিয়া গেল না, কিন্তু তাহার চেয়ে প্রয়োজন এই শস্য উৎপন্ন করিয়া মাটির কি লাভ হইল তাহা দেখা, এই লাভের অনুপাতেই কৃষকের যথার্থ লাভ হয়। এদেশে ও বিদেশে এই ধারণা আছে যে কৃষক জমির চাষ সম্বন্ধে সবজান্তা। কৃষি সম্বন্ধেও কৃষকদের সকল বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান নাই। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থাভেদে জমির কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। এবং জল বায়ু ও রোগ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ সত্য আছে যাহা অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায় এবং যাহা জানা না থাকিলে কাজে হাত দিয়া সফলতা লাভ করা যায় না। এই-সকল স্থানীয় অবস্থার কথা জানিয়াই চাষা সন্তুষ্ট থাকে, ইহা অপেক্ষা বেশী সংবাদ সে রাখে না। পৃথিবীর সকল দেশের সাধারণ কৃষকের নিজের পেটের দায়ের দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি। সে মাটিকে অধিকতর উৎপাদনশীল করিয়া এবং মানুষের সহিত সমবায়বদ্ধ হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করিয়া ব্যাপকভাবে লাভবান্ হইবার চেষ্টা করে না। কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিবে আদিমকালীন এই মনোভাবের অনুসরণ করিয়াই ইহারা আপন আপন দায় বহন করে।

...জমি যতদিন শস্যসমৃদ্ধ ছিল ততদিন পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য খরচের ভাবনা হয় নাই। কিন্তু যখন ফসলজনিত লাভের অংশ দ্বারা জলব্যবস্থা করা ও জলাশয় সংস্কারের ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব হইল তখন পুকুরের জল পচিতে লাগিল এবং খরচ চালাইবার জন্য লোকেরা তীরস্থ গাছগুলিকে কাটিতে আরম্ভ করিল। এই স্থানে নূতন গাছ লাগানো হইল না, পাড়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার মাটি জলের মধ্যে ধসিয়া পড়িতে লাগিল।...

যেথানে জঙ্গল সেখানে মাটির ক্ষতি অপেক্ষা লাভই বেশী, কারণ সেখানকার মাটি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। যে দেশে যুদ্ধাবসানের পর দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি স্থাপিত হইয়াছে সেখানে এই হরণব্যাপার দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে, কারণ দেশে চলাচলের পথ সুগম হওয়াতে মাটির যাহা দান তাহা দেশে ও বিদেশে সহরবাসীদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করিতে দূরে চলিয়া যায়। 'সাম্রাজ্য' কথাটির সহিত এই বিত্তাপহরণের ভাবটি জড়িত আছে। শান্তির সময়ে দেশ জুড়িয়া রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মিত হইতে থাকে, সহরে ও বন্দরের জঠরে মালগাড়ী দিয়া দ্রব্যসম্ভারের বোঝা নামাইয়া পরিশূন্য হইয়া ফিরিয়া আসে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তাহার মাটিকে এমন নির্দ্দয়ভাবে শোষণ করা হয় যে তাহাতে ভূমি ক্রমে ক্রমে উৎপাদন-শক্তি হারায়। মাটিকে এই দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার উপায়গুলি আমাদের উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইবে। শিক্ষাবিস্তার ও সমবায়-প্রণালীর প্রবর্ত্তনই ইহার দুইটি প্রধান উপায়।

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ভাদ্র ও আশ্বিন)। এল্ কে এল্‌মহার্ষ্ট

কোল জাতি

...ছোটনাগপুর ইহাদের বাসভূমি। যে-সকল অনার্য্যজাতি বৈদিক সময়ে আর্য্যদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার না করিয়া নিবিড় অরণ্যে ও পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় লাভ করিয়া জীবন-ধারণ করিয়াছিল—কোলেরা তাহাদিগের অন্যতম। ইহাদিগের মধ্যে নেগ্রিটো রক্তের সংমিশ্রণ আছে।

অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় ইহাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। কোলেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—মুণ্ডা ও পারজা। যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, অর্থাৎ অধিক ধান চাউল ও গো মেষাদির সংস্থান আছে, তাহারাই মুণ্ডা নামে অভিহিত। নিম্নশ্রেণীকে পারজা কহে। মুণ্ডা অর্থে সাধারণতঃ দলপতি বা জমিদারকে বুঝায়; সে পারজাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত। মুণ্ডা ও পারজাদের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান প্রদান চলে না। মুণ্ডা পারজার মেয়ে বিবাহ করিলে অথবা সেই মেয়ের হাতে খাইলে তাহার জাতি যায় এবং সমাজে অপদস্থ হইতে হয়। ইহাদের সামাজিক রীতিনীতির বিশেষ কোন শৃঙ্খলা নাই।

কোলেরা বড়ই অপরিষ্কার। ইহারা চারিদিকে মাটির দেয়াল দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করে এবং ইহার উপরে এক প্রকার লম্বা লম্বা বন্য ঘাসের ছাউনি দিয়া বসবাস করে। কুটীরে প্রবেশ করিবার জন্য কেবল একটি মাত্র দ্বার রাখে। ইহাদের গৃহাভ্যন্তর বড়ই অপরিচ্ছন্ন ও তমসাবৃত। এমন কি দিবালোকেও গৃহস্থিত দ্রব্যাদি সম্যক্‌রূপে দর্শন করা অপরের পক্ষে অসম্ভব। একখানি ক্ষুদ্র গৃহে সকলে মিলিয়া বাস করে। কোলেরা ঘরের বাহিরের দিকের প্রাচীর লাল নীল প্রভৃতি নানাবিধ রং দিয়া চিত্রিত করে। সেজন্য দূর হইতে এই-সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশ্রেণী সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অতীব সুন্দর দেখায়। এক একখানি গ্রামে অনেকগুলি ঘর থাকে।

ইহাদের নিকট তেঁতুলবৃক্ষ বড়ই পবিত্র জিনিষ বলিয়া পরিগণিত। প্রায় সকলের গৃহসন্নিকটেই বৃহৎ বৃহৎ তেঁতুলবৃক্ষ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। ইহারা তেঁতুল বড় ভালবাসে।

পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ অসভ্যজাতিরই শারীরিক সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। কোলেরাও তাহা হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী নহে। পুরুষেরা অনেকেই বড় বড় চুল রাখে এবং তাহাতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মত চিরুণী গুঁজিয়া থাকে। পুরুষদিগের দাড়ি হয় না, গোঁপও অতি সামান্য পরিমাণে হয়। স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ চুল রাখে এবং কেশ-রচনা করিয়া উহাতে ফুল গুঁজিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। কোলে-দের গায়ের রং যদিও খুব কাল, তথাপি যুবক-যুবতীরা দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত নহে। ইহারা উল্কি পরে; কিন্তু খুব অধিক পরিমাণে নহে।

কোলদিগের কোন প্রকার লিখিত ভাষা নাই। ইহাদের কথিত ভাষার মধ্যে অনেক সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উচ্চারণ-দোষে উহারা সেগুলিকে এতদূর বিকৃত করিয়া ফেলে যে, সাদৃশ্য অনুভব করা কঠিন।

কোলদিগের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে কোনও প্রকার ঔষধ ব্যবহার করে না। 'ঔষধ' বলিয়া যে কোন জিনিষ আছে, তাহাও বোধ হয় তাহাদের ধারণাতীত। তাহাদের রোগ হইলে, তাহাদের উপাস্যদেবতা 'বোঙ্গা' ক্রোধ করিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া সকলে মিলিয়া আরোগ্যের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে ও কুক্কুট বলি দিয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করে। ইহারা 'বোঙ্গা'কে বড় ভয় করে। ইহাদের বোঙ্গা (ভূত) ব্যতীত আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। রাত্রিতে বট বা অশ্বথ বৃক্ষের নীচ দিয়া যাইতে ইহারা নারাজ। এই-সকল বৃক্ষে 'বোঙ্গা' বাস করেন বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস।

কোলেরা সত্যবাদী ও শান্তিপ্রিয়। সহজে কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিতে চাহে না; কিন্তু রাগিলে বড়ই ভীষণাকার ধারণ করে, তখন হিতাহিত কোনও জ্ঞান থাকে না। মিষ্টমুখে কথা বলিলে ইহাদের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কাজই সম্পাদন করা যায়।...

কোলেরা মৃতদেহ দাহ করে। মৃতব্যক্তি মরিবার পূর্ব্বে যে বৃক্ষদ্বারা তাহাকে পোড়াইতে নির্দ্দেশ করিয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনেরা সেই বৃক্ষদ্বারা গৃহের সন্নিকটে তাহাকে দাহ করে। পরে ভস্মাবশিষ্ট অস্থিসমূহ সমাহিত করিয়া তাহার উপরে এক দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ দাঁড় করাইয়া রাখে। মৃত্যুর পর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত শব দূরস্থ পরিজনবর্গের দেখিবার জন্য রাখিয়া দেয়। পরে সকলে আসিয়া মিলিত হইলে গগনভেদী ক্রন্দনের রোল তুলিয়া মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক হিতার্থে ও 'বোঙ্গা'র প্রীত্যর্থে কুক্কুট বলি দিয়া সৎকারকার্য্য নির্ব্বাহ করে।

কোলেরা চাষ-বাস করিতে বড়ই পটু; পুরুষ ও স্ত্রীলোক কেহই অলস নহে। তবুও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই অধিক পরিশ্রমী বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বে ইহারা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকিত। সহর হইতে দূরস্থ পল্লীতে যাহারা বাস করে, তাহারা এখনও প্রায় উলঙ্গাবস্থায় থাকে, কেবল মাত্র কটিদেশে একখণ্ড বস্ত্র জড়াইয়া 'নেংটির' ন্যায় পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা বুকে কখনও কাপড় দেয় না। আজকাল উহাদের অনেকে কাপড় বুনিতে শিখিয়াছে।

কোলদের বিবাহে পণপ্রথা প্রচলিত আছে। কন্যার পিতাকে বরের বাপের গো মহিষ টাকা ইত্যাদি পণ দিতে হয়।...কোল স্ত্রীলোকেরা এখনও অলঙ্কার-ব্যবহার শিখে নাই। কেবল মাত্র পায়ে এক প্রকার কাঁসার অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে, তাহা দেখিতে অনেকটা বাঙ্গালী রমণীদের পায়ের মলের মত; চলাফেরার সময় ইহাতে কোন শব্দ হয় না।

কোলেরা অস্ত্রের মধ্যে কেবল তীর-ধনুকের ব্যবহার করে। ইহারা তীর ছুঁড়িতে ও শীকারে খুব দক্ষ। স্ত্রীলোকেরাও তীর ছুঁড়িতে পারে। বিবাহ ইত্যাদি আমোদজনক উৎসবে স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া যখন বাজনার সহিত তালে তালে নাচে, তখন মনে হয় যেন সাগর-গর্ভে লহরী-লীলা হইতেছে।

ইহারা প্রতি কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যা নিশিতে সকলে মিলিয়া মহা-ধুমধামের সহিত 'বোঙ্গা'র উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের বড় উৎসব। এতদ্ভিন্ন আরও ছোট ছোট উৎসব আছে। বলা বাহুল্য সে-সকলই তাহাদের একমাত্র উপাস্যদেবতা 'বোঙ্গা'র উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে। কোলরমণীদের সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।...

কোলেরা আজকাল রেশমের ব্যবহার শিখিয়াছে। ইহাদের প্রায় গৃহেই গুটিপোকার চাষ হইয়া থাকে।

অনেক কোলই আজকাল খ্রীষ্টান। পাদ্রী সাহেবেরা ইহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহাদের দ্বারা ইহাদের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

দিবাবসান হইলে, কার্য্যশেষে কোল রমণীগণ সকলে মিলিয়া গলা-ধরাধরি করিয়া খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া হাসিমুখে সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে যখন গৃহে প্রত্যাগমন করে, সে দৃশ্য বড় সুন্দর। তাহাদের সুমধুর গীতধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত হয়। কোলদের মুখে সর্ব্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। ইহারা বড় সরল কিন্তু নির্ব্বোধ। অনেকে এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণিতে জানে না। ইহাদের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া সিকি দুয়ানি ইত্যাদি দিতে চাহিলে তাহারা তাহা লয় না; পয়সা ভিন্ন অন্য কিছু দিলেই প্রতারিত হইয়াছে মনে করে। এমনি সরল তাহারা।

(বিকাশ, আষাঢ়) শ্রী কামিনীমোহন দাস

—

সৌন্দর্য্যের সন্ধান

সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে-ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরের সঙ্গে হ'ল মনে না-ধরার ঝগড়া।...আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা, তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দরই দেখি। কারু কাছ থেকে ধার-করা আয়না এনে যে আমরা সুন্দরকে দেখ্‌তে পাবো তার উপায় নেই।...সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না, তাই সেখানে অন্যের মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে পেতে আন্‌তে হয় নিজের মনোমতটি।

জীবের মনস্তত্ত্ব যেমন জটিল যেমন অপার, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র তেমনি অপরিমেয়। কেউ কাজকে দেখ্‌ছে সুন্দর—সে দিনরাত কাজের ধাক্কায় ছুটছে, কেউ দেখ্‌ছে অকাজকে সুন্দর—সে সেই দিকেই চলেছে, কিন্তু মনে রয়েছে দুজনেরই সুন্দর কাজ অথবা সুন্দর রকমের অকাজ।...

ধর্‌তে গেলে সব হাহুতাশ যা চাই সেটা সুন্দরভাবে পাই-এর জন্যে, অসুন্দরের জন্যে একেবারেই নয়। সুন্দরের রূপ ও তার লক্ষণাদি সম্বন্ধে জনে জনে মতভেদ, কিন্তু সুন্দরের আকর্ষণ যে প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়ানো সে বিষয়ে দুই মত নেই। যে ভাবেই হোক, যা কিছু যার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটো দিক্ আছে—একটা মনে-ধরার দিক্ যেটাকে বলা যায় বস্তুর ও ভাবের সুন্দর দিক্। আর একটা মনে-না-ধরার দিক যেটাকে বলা চলে অসুন্দর দিক্, আমাদের জনে-জনে মনেরও ঐরকম দৃষ্টি—যাকে বলা যায় শুভ আর অশুভ বা সু আর কু দৃষ্টি! কাজেই দেখি যে দেখছে তার মন আর যাকে দেখ্‌ছে তার মন—এই দুই মনের ভিতরে মিল্‌লো তো সুন্দরের স্বাদ পাওয়া গেল, না হলেই গোল।...সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বল্‌তে পারে তো আমাদের নিজের মন। সুন্দরকেও নানা মুনি নানা ভাবে বিশ্লেষ করে' দেখেছেন, তার ফলে তিল তিল সৌন্দর্য্য নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে' তোল্‌বার একটা পরীক্ষা আমাদের দেশে এবং গ্রীসে হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের মন সেই প্রথাকে সুন্দর বলে' স্বীকার করেনি এবং সেই প্রথায় গড়া মূর্ত্তিকেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির শেষ বলেও গ্রাহ্য করেনি। বিশেষ বিশেষ আর্টের পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা ছাড়া কোন আর্টিষ্ট বলেনি অন্য সুন্দর নেই, ঐটেই সুন্দর। আমাদের দেশ যখন বল্লে সুন্দর গড়, কিন্তু সুন্দর মানুষ গোড়ো না, সুন্দর করে' দেবমূর্ত্তি গড়, সেই ভাল,—ঠিক সেই সময় গ্রীস বল্লে—না, মানুষকে করে' তোলো সুন্দর দেবতার প্রায় কিম্বা দেবতাকে করে' তোলো প্রায় মানুষ! আবার চীন বল্লে—খবরদার

দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ো তো দৈহিক এবং ঐহিক সৌন্দর্য্যকে একটুও প্রশ্রয় দিও না চিত্রে বা মূর্ত্তিতে, নিগ্রোদের আর্ট—যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিষ্ট করছে—তার মধ্যে আশ্চর্য্য রং ও রেখার খেলা এবং ভাস্কর্য্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেঢপ বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখান হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিষ্টের নিজের নিজের মনে ছাড়া বাইরেটায় নেই, কোন কালে ছিল না, কোন কালে থাকবেও না, এটা একেবারে নিশ্চয় করে' বলা যেতে পারে। সুন্দর যদি খিচুড়ি হ'তো তবে এতদিনে সৌন্দর্য্যের তিল ও তাল মিলিয়ে কোন এক বেরসিক পরম সুন্দর করে' সেটা প্রস্তুত করে' যেতো তথাকথিত কলারসিকদের জন্য, কিন্তু একমাত্র যাঁকে মানুষ বল্লে 'রসো বৈ সঃ' তিনিও সুন্দরের পরিপূর্ণ আদর্শ জনে জনে মনে মনে ছাড়া আপনার সৃষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও রাখেন নি। তাঁর সৃষ্টি সুন্দর অসুন্দর দুইই এবং সব দিক দিয়ে অপূর্ণ ও পরিপূর্ণ নয় এই কথাই তিনি স্পষ্ট করে' যে জান্তে চায় তাকেই জানিয়েছেন। শান্তিতে অশান্তিতে সুখে দুঃখে সুন্দরে অসুন্দরে মিলিয়ে হ'ল ছোট এই নীড়; তারি মধ্যে এসে মানুষের জীবনকণা পরমসুন্দরের আলো পেয়ে ক্ষণিকের শিশিরবিন্দুর মতো নতুন নতুন সুন্দর প্রভা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে' চল্লো। এই হল প্রথম শিল্পীর মানস-কল্পনা ও এই বিশ্বরচনার নিয়ম এ নিয়ম অতিক্রম করে' কোন কিছুতে পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষরূপ দিতে পারে এমন আর্টও নেই আর্টিষ্টও নেই। যা বিশ্বের মানুষের মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র হয়ে ফুটতে চাচ্ছে, সেই পরম সুন্দরের স্পৃহা জেগেই রইলো, মিটলো না।… মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রীস ভারত চীন ইজিপ্ট সবাই দেখি পরমসুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায় নি, কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে।…পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টেরও গতি চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁচাচ্ছে আর্ট এবং একটা গতি আর-একটা গতি সৃষ্টি করছে। …এইভাবে সামনে আশেপাশে নানাদিক থেকে পরমসুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে—বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্ররূপ ধরে' আসছে—চিরযৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন।

মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে মনে ভাবে সুন্দর। ঠিক সেই সময় আর-একটি সুন্দর মুখের ছায়া আয়নায় পড়ে' যে ভাবছিলো সে অবাক্ হয়ে বলে—তুমি যে আমার চেয়ে সুন্দর! অমনি স্বপ্নের মত সুন্দর ছায়া হেসে বল্লে—আমার চোখে তুমি সুন্দর। এই ভাবে এক আর্টে আর-এক আর্টে, এক সুন্দরে আর সুন্দরে পরিচয়ের খেলা চলেছে, জগৎ জুড়ে সুন্দর মনের সুন্দরের সঙ্গে মনে মনে খেলা! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে আর্ট দিয়ে ধরতে পারলে এ খেলা কোন্ কালে শেষ হয়ে যেত।…পরমসুন্দর যিনি তিনি লুকোচুরি খেলতে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধ্যে দিয়ে তাঁর একটু রূপের পরিমল, আলোর মধ্যে দিয়ে চকিতের মতো দেখা ইত্যাদি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আর্টিষ্টদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান, আর্টিষ্টের মনও সেইজন্যে এই খেলাতে সাড়া দেয়, খেলা চলেও সেইজন্যে।

আর্টিষ্টরা, ভক্তেরা, কবিরা—পরমসুন্দরের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর খেলা খেলেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা পরম সুন্দরকে অণুবীক্ষণের উপরে চড়িয়ে তাঁর হাড়-হদ্দের সঠিক হিসেব নিতে বসেন। কাজেই দেখি যারা খেলে আর যারা খেলে-না, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এ দুয়ের ধারণা এবং উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। পণ্ডিতেরা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা লিখে ছাপিয়ে গেছেন, সেগুলো পড়ে' নেওয়া সহজ, কিন্তু পড়ে' তার মধ্যে থেকে সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করাই শক্ত। আর্টিষ্টরা সুন্দরকে নিয়ে খেলা করে, সুন্দরকে ধরে' আনে চোখের সামনে মনের সামনে, অথচ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় দেখতে পাই।…

লিয়োনার্ডো ভিন্‌চি যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর্ট থেকে আরম্ভ করে' বিচিত্র জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে' গেছে, তিনি বলেছেন—পরম সুন্দর ও চমৎকার অসুন্দর দুইই দুর্লভ, পাঁচপাঁচিই জগতে প্রচুর।

এক সময়ে আর্টিষ্টদের মনে জায়গা জায়গা থেকে তিল তিল করে' বস্তুর খণ্ড খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে একটি পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তির রচনা করার মতলব জেগেছিল। গ্রীসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচজন গ্রীক সুন্দরীর পঞ্চাশ টুক্‌রো থেকে রচনা করে সমস্ত গ্রীসকে চমকে দিয়েছিল। কিছুদিন ধরে' ঐ মূর্ত্তিরই জল্পনা চল্লো, বটে কিন্তু চিরদিন নয়, শেষে এমনও দিন এল যে ঐ ভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা একথাও আর্টিষ্টরা বলে' বসলো। আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্রসম্মত মূর্ত্তিকেই রম্য বলে' পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করলেন। সে শাস্ত্র আর কিছু নয় কতকগুলো মাপ-জোখ এবং পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, নিম্বপত্র এই-সব মিলিয়ে সৌন্দর্য্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেণ্ট খাদ্যসামগ্রী। মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না, কাজেই আমাদের শাস্ত্রসম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে artificiality তা ধর্ম্মপ্রচারের কাজে লাগলেও সেখানেই আর্ট শেষ হলো একথা খাটলো না। একেবারে মস্তিষ্ক বলে' একটা জিনিষ সে বলে' উঠ্‌লো 'তদ রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ' মনে যার যা ধরলো সেই হ'ল সুন্দর! এখন তর্ক ওঠে—মনে ধরা না-ধরার উপরে সুন্দর-অসুন্দরের বিচার যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে কিছু সুন্দর কিছুই অসুন্দর থাকে না, সবই সুন্দর সবই অসুন্দর প্রতিপন্ন হয়ে যায়, কোন-কিছুর একটা আদর্শ থাকে না।…

মানুষের অন্তর বাহির দুয়ের উপরেই সুন্দরের যে বিপুল আকর্ষণ রয়েছে তা সহজেই ধরা যাচ্ছে—শুনতে চাই আমরা সুন্দর, বলতে চাই সুন্দর, উঠতে চাই, বসতে চাই, চলতে চাই সুন্দর, সুন্দরের কথা। প্রত্যেক পদে পদে আমরা স্মরণ করে' চলেছি।…যা কিছু ভাল তারি সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে দেখা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম।…ভালর সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে থাকতে যখন আমরা দেখছি তখন এটা ধরে' নেওয়া স্বাভাবিক যে সুন্দরের আকর্ষণ আমাদের মনকে ভালোর দিকেই নিয়ে চলে, আর যাকে বলি অসুন্দর তারও তো একটা আকর্ষণ আছে, সেও তো যার মন টানে আমার কাছে অসুন্দর হয়েও তার কাছে সুন্দর বলেই ঠেকে, তবে মনে ধরা এবং মন টানার দিক থেকে সুন্দরে অসুন্দরে ভেদ করি কেমন করে'? কাজেই সুন্দর অসুন্দর দুই মিলে চুম্বক পাথরের মত শক্তিমান্ একটি জিনিষ বলেই আমার কাছে ঠেকছে। সুন্দরের দিকটা হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক্ এবং অসুন্দরের দিক্‌ও হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক্। এখন এটা ধরে' নেওয়া স্বাভাবিক যে চুম্বক যেমন ঘড়ির কাঁটাকে দক্ষিণ থেকে পরে পরে সম্পূর্ণ উত্তরে নিয়ে যায় তেমনি সুন্দরের টান মানুষের মনকে ক্ষণিক ঐহিক নৈতিক এমনি নানা সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে মহাসুন্দরের দিকেই নিয়ে চলে; আর অসুন্দরের প্রভাব সেও মানুষের মনকে আর-এক ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চলে কদর্য্যতার দিকেই।…

সুতরাং সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে কোনটাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সমুদয় গিয়ে দাঁড়াবে তার নির্দ্দেশকর্ত্তা হচ্ছে আমাদের মন ও মনের ইচ্ছা। মনে হল' তো সুন্দরে গিয়ে লাগলেম, মনে হল' তো অসুন্দরে

গিয়ে পড়লেম ; কিম্বা সুন্দর থেকে অসুন্দর, অসুন্দর থেকে সুন্দরে দৌড় দিলেম, মন ও মনের শক্তি হল এ বিষয়ে নিয়ন্তা।…

আসলে যা সুন্দর তাকে নিয়ে আর্টিষ্ট কিম্বা সাধারণ মানুষের মন বিচার করতে বসে না, সবাই বলে—সুন্দর ঠেকছে কেন তা জানি না। কিন্তু সুন্দরের সাজে যে অসুন্দর আসে তাকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং আর্টিষ্টের মনে তর্কের উদয় হয় কিন্তু পণ্ডিতের মন দার্শনিকের মন ঠিক বিপরীত উপায়ে চলে। অসুন্দরের বিচার সেখানে নেই, সব বিচার-বিতর্ক সুন্দরকে নিয়ে।…এমন পণ্ডিত নেই যে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে' দেখ্‌বার চেষ্টা না করেছে—কি নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য্য ; এই বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি হিসেব করলে এই দাঁড়ায়—(১) সুখদ বলেই ইনি সুন্দর, (২) কাজের বলেই সুন্দর, (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর, (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর, (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর, (৬) সুসংহত বলেই সুন্দর, (৭) বিচিত্র-অবিচিত্র সম-বিষম দুই দিয়ে ইনি সুন্দর।

তবে আমি এইটুকু বলি—অন্যের কাছে সুন্দর কি বলে' আপনাকে সপ্রমাণিত করছে তা আমাদের দেখায় লাভ কি? আমাদের নিজের নিজের কাছে সুন্দর কি বলে' আসছে তাই আমি দেখ্‌বো।…সুন্দর এই কথাই তো বলছে আমাদের—আমি এ নই তা নই, এজন্যে সুন্দর ওজন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর।..সুন্দর নিত্য ও অমূর্ত্ত, নানা বস্তু নানা ভাবের মধ্যে তার অধিষ্ঠান ও আরোপ হলে তবে মনরসনা তার স্বাদ অনুভব করে—এমন সুন্দর, তেমন সুন্দর,—সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর!..সব দিক দিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের বোঝা-পড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে।

ভক্ত, কবি এবং আর্টিষ্ট এঁদের কাছে সুন্দর অসুন্দর বলে' দুটো জিনিস নেই, সব জিনিসের ও ভাবের মধ্যে যে নিত্য বস্তুটি সেটিই সুন্দর বলে' তাঁরা ধরেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা-কিছু তা অনিত্য, তার সুখ-শৃঙ্খলা মান পরিমাণ সমস্তই অনিত্য, সুতরাং সুন্দর যা নিত্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তার সঙ্গে মেলা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলা যেতে পারে। আমাদের মনই কেবল গ্রহণ করতে পারে সুন্দরের আস্বাদ—সুতরাং মনরসনা রোগ- বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার মতো ভীষণ বিপত্তি মানুষের হতে পারে না। আর্টের দিক দিয়ে কেউ একথা বলতে পারে না যৌবনই সুন্দর বার্দ্ধক্য সুন্দর নয়, আলোই সুন্দর অন্ধকার নয়, সুখই সুন্দর দুঃখ নয়, পরিষ্কার দিন বাদলা নয়, বর্ষার নদী শরতের নয়, চন্দ্রকলা নয় পূর্ণচন্দ্রই। যে একেবারেই আর্টিষ্ট নয়, শুধু তারি পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডভাবের একটা আদর্শ সৌন্দর্য্যকে কল্পনা করে' নেওয়া সম্ভব। কবীর ছিলেন আর্টিষ্ট, তাই তিনি বলেছিলেন—"সবহি মূরত বীচ অমুরত, মূরতকী বলিহারা।" যে সেরা আর্টিষ্ট তারি গড়া যা-কিছু তারি মধ্যে এইটে লক্ষ্য করছি—ভালমন্দ সব মূর্ত্তির মধ্যে অমূর্ত্ত বিরাজ করছেন!

রুচি বদলায়, আদর্শও বদলায়।…আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে' ধরতে পারি আর-কিছুকে নয়।. সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্য্যের পরিমাপ হল তাদের মধ্যে নিত্য রস যা তা নিয়ে। বাইরের রং রূপ বদলে চলে, কিন্তু নিত্য যা তার অদল-বদল নেই। সব শিল্পকে যাচাই করে' নেবার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের মনে নিত্য-সুন্দরের একটি আদর্শ ধরা আছে।…বড় আর্টিষ্টরা সুন্দরের আদর্শ গড়তে আসেন না, যেগুলো কালে কালে সুন্দরের বাঁধাবাঁধি আদর্শ হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করে তাকেই ভেঙ্গে দিতে আসেন, ভাসিয়ে দিতে আসেন সুন্দর-অসুন্দরের মিলনে যে চলন্ত নদী তারি স্রোতে। এইজন্য শিল্পে পূর্ব্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান্ সে পুরাতন প্রথাকে ঠেলে চলে, আর যে অশক্ত সে এই বাঁধা-স্রোত বহে' আস্তে আস্তে বড় শিল্প রচনার ধারা ও সুরে সুর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে' চলে।…সৌন্দর্য্য-লোকের সিংহদ্বারের ভিতর-দিকে চাবি, নিজের ভিতর-দিক্ থেকে সিংহদ্বার খুল্‌লো তো বাইরের সৌন্দর্য্য এসে পৌঁছল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চল্লো বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর অসুন্দরকে বোঝাবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।

(বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজনারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উন্মেষ

…রাজনারায়ণ-বাবু যে দু'তিনখানা বই লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই বসু মহাশয়ের মনীষা এবং স্বদেশ-প্রীতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। …তাঁহার "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" বিষয়ক বক্তৃতা এবং বাংলাদেশের ইংরেজীনবীশদিগের মধ্যে স্বাজাত্যাভিমানের অনুশীলন করিবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন, তাহার দ্বারাই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে রাজনারায়ণ-বাবুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।… এই বাংলাদেশে রাজনারায়ণ-বাবুর শিক্ষাদীক্ষাই সর্ব্বপ্রথমে স্বাদেশিকতার স্রোত আনিয়াছিল।..রাজনারায়ণ বসু মহাশয় পিতার নিকট হইতেই তাঁহার আমরণসাধ্য সরল ও সতেজ স্বাদেশিকতার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এইজন্যই তাহার সমসাময়িক বাঙ্গালীরা ইংরেজী পড়িয়া যতটা পরিমাণে ইংরেজের অনুকরণের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ-বাবু সেরূপ ব্যগ্র হন নাই।

মহর্ষির সঙ্গে বন্ধুতাও বসু মহাশয়ের এই স্বাদেশিকতাকে বিশেষ-ভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল।…

রাজনারায়ণ-বাবুর ক্ষাত্রভাবটা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। যখন রাজনারায়ণ-বাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও চুল সাদা হইয়া উঠিয়াছে, শরীরটাও যে খুব দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিল এমন নহে, তখন সেই বয়সে, সেই শরীর লইয়া, আমার সঙ্গে প্রথম দেখার দিনেই কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন :—আমি বেশী দিন বাঁচিব এমন আশা ত করি না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারি তবে জন্মটা সার্থক হইল মনে করিব।"

রাজনারায়ণ-বাবু সেকালের ইংরেজীনবীশদিগের মতন প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন।…রাজনারায়ণ-বাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াও এক দিনের জন্য নিজের হিন্দুত্বের গৌরব বিস্মৃত হন নাই।..

আমরা ভারতবর্ষের লোক, বর্ত্তমানে যতই অধঃপতিত হই না কেন, জগতের একটা শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী বলিয়া মানবসমাজে আচার্য্যের আসনে আমাদের অধিকার আছে, চিরদিন রাজনারায়ণ-বাবুর এই বিশ্বাস ও অভিমান ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বক্তৃতা প্রদান করেন।… এই স্বাজাত্যাভিমানের প্রথম পুরোহিত ও প্রচারক-রূপেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাংলার নবযুগের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিবেন।…

একদিন ছিল যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য সন্তানেরা বাংলাভাষায় পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তাও কহিতেন না, পত্রব্যবহারও

করিতেন না। সেই যুগেই কৃতবিদ্য রাজনারায়ণ বসু শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বাংলা ভাষাটা চালাইবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরে তাঁহাদের এক সভা ছিল। এই সভার মজলিসে সভ্যদিগকে খাঁটি বাঙ্গালাতে কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। এসকল কথোপকথনে ইংরেজী শব্দের বুক্‌নী দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনও সভ্য কোনও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহার জন্য অর্থদণ্ড হইত। প্রত্যেক ইংরেজী শব্দের জন্য বোধহয় এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইত। এই উপায়ে সভার অর্থাধারে বেশ দু' পয়সা সঞ্চিত হইত। এই-সকল রাজনারায়ণ বসুর আযৌবনসিদ্ধ স্বাদেশিকতার প্রমাণ।

রাজনারায়ণ-বাবু কেবল ধর্ম্মে ও তত্ত্বজ্ঞানেই নিজের দেশকে জগতের বরেণ্য করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু যে-সকল শক্তি এবং সাধনা থাকিলে একটা জাতি সর্ব্বতোভাবে মানবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠের পদবী প্রাপ্ত হয়, নিজের দেশবাসীকে সে-সকল শক্তি ও সাধনাসম্পন্ন করিবার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে স্বাজাত্যাভিমান ছিল না বলিলেই চলে। কৃতবিদ্যেরা নিজেদের হীনতাবোধে সর্ব্বদাই অবনত হইয়া থাকিতেন।...

সমাজের এই অবস্থায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একদিকে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা করেন, এবং অন্যদিকে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।...

রাজনারায়ণ-বাবু বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার সমাধির উপরে তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত এই কথাগুলি যেন অঙ্কিত থাকে—

"প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।

স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণ্যজাতি হইবে। এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন!"

এই কয়টি কথার ভিতরেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চরিত্রের ও সাধনার মূল প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেই আমরা তাঁহার গভীর এবং আমরণসাধ্য স্বজাতিপ্রীতির এবং স্বাজাত্যাভিমানের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হই। আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্যসমাজে এ বিষয়ে তিনিই প্রথম গুরু ছিলেন। তাঁহার grandfather of Indian Nationalism উপাধি সর্ব্বতোভাবে সার্থক ছিল।

(বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

বাঙ্গালার সমন্বয়

জৈন, বৌদ্ধ, বজ্রযানী, তান্ত্রিক, সহজিয়া, গোরক্ষনাথের "নাথী," গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্মার্ত্ত, শাক্ত, বেদাচার-অনুগত হিন্দু,—এই সকল বিরোধী মতের ও আচার-ধর্ম্মের সমন্বয়-সাধন কেমন করিয়া হইল?

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণের পক্ষে আচণ্ডালের দীক্ষাগুরু হওয়া দোষের কাজ। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে এমন কাজ করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে ঘোর পাতিত্য ঘটে, তেমন ব্রাহ্মণকে অপাংক্তেয় করিতে হয়,...বাঙ্গালায় স্মৃতির এই বিধান সর্ব্বথা অমান্য বা উপেক্ষা করা হইয়াছে। ..শাক্ত-তান্ত্রিক ঘোর কুলাচারী ব্রাহ্মণ কুলীন স্বচ্ছন্দে গোস্বামীকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, গোস্বামী-প্রভুপাদগণও অম্লানমুখে শাক্তগৃহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিয়া থাকেন ... দেবীবরের মেলবন্ধনের পরেই ব্রাহ্মণ-সমাজে এই সমন্বয় সাধিত হয়। .. "বর্ণ ব্রাহ্মণ" সকল বাঙ্গালায় কোন-কালেই অপাংক্তেয় হন নাই। কেবল অন্ত্যজ জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণগণই স্ব-স্ব-যজমানের দলভুক্ত থাকিতেন। ইহার হেতু এই যে বর্ণব্রাহ্মণ দুই-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। যাঁহারা ব্রাহ্মণ-আচার-অনুকারী সৎ-শূদ্রসকলের যজন-যাজন করিতেন তাঁহারা কখনই অপাংক্তেয় হন নাই, পরন্তু যে-সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ-আচার-সম্পন্ন হিন্দু-বিরোধী জাতিসকলের যজন যাজন করিতেন, তাঁহারাই হিন্দু-সমাজের বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। এমন বর্ণ-ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিলে কুলীনের ছেলেদের জাতি যাইত না। সামাজিক এতবড় সমন্বয় বাঙ্গালার বাহিরে রাজপুতানায় এবং গুজরাটে ঘটিয়াছিল। ইহা একটা বড়রকমের সামাজিক সমন্বয়; এই সমন্বয়ের পন্থা বাঙ্গালীই ভারতবাসীকে প্রদর্শন করেন।...

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর সমাজে "ব্রত-ব্রাহ্মণ" একটা অপূর্ব্ব জাতি ও পদার্থ। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বে মাসেক কাল যাহারা তারকনাথের বা অন্য প্রতিষ্ঠিত শিবের সন্ন্যাসী সাজে, তাহাদিগকে "ব্রত-ব্রাহ্মণ" বলে।.. আচণ্ডাল সবাই ব্রত-ব্রাহ্মণ সাজিতে পারে। "ধর্ম্মরাজের" ব্রাহ্মণ "শীতলার ব্রাহ্মণ"ও এই হিসাবের ব্রাহ্মণ।.. পূর্ব্বে নাগ বা মনসা-ব্রাহ্মণও রাঢ়ে-বঙ্গে উভয় প্রদেশে ছিল। ইদানীং নাগ-ব্রাহ্মণ আর দেখিতে পাই না। ইহারাও জাতির হিসাবে ব্রাহ্মণ নহে, নাগ পূজায় বা মনসার "জাঠে" ইহারা পুরোহিতের কাজ করিত বলিয়া ব্রাহ্মণ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। এখনও শিখদিগের মধ্যে "জাঠ" বা "ঠাঁঠা"র প্রচলন আছে।... এই ব্রত-ব্রাহ্মণ ধর্ম্মযাজী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের ব্রাহ্মণকে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে এবং সময়-বিশেষে পুরাদস্তুর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দিতেছে।

পৌরাণিক যুগে, বঙ্গদেশে, রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে পীত জাতি বাস করিত; তাহারা কৈবর্ত্তবৃত্তিক ছিল অর্থাৎ নৌ চালনা করিয়া সাগরে ও নদীতে জালিকের কাজ করিত; তাহারা মাছ খাইত, নেশার হিসাবে ভাঙ গাঁজা ও অহিফেন সেবা করিত, বেদাচার গ্রাহ্য করিত না, বেদকে মান্য করিত না। ইহাদের একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা ছিল, স্বতন্ত্র সাহিত্য ছিল। ইহারা বৈদিক আর্য্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সাগরমন্থনের অসুর বোধ হয় ইহারাই এবং ইহারাই পুরাতন বাঙ্গালার অধিবাসী ছিল—আদিম বাঙ্গালী ছিল। ইহারাই সর্ব্বাগ্রে বেদের বিরোধ ঘটায়।—চার্ব্বাক বাঙ্গালী ছিলেন, কপিল বাঙ্গালাদেশে গঙ্গা ও সাগর-সঙ্গমে বাস করিতেন।...কপিল-কণাদ-গৌতম, তিন জনই মিথিলায় ও বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই তিন জনই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালার ভাব-সমুদ্র মন্থন করেন এবং প্রাচ্য-দেশকে এক নূতন ও বিশিষ্ট ভাবের ভাবুক করিয়া তোলেন। মনে হয় ইঁহাদেরই শিক্ষাপ্রভাবে সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের উদ্ভব ঘটে এবং তাঁহার প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম মগধে এবং বাঙ্গালায় সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের হীনযান ও মহাযান এই দুই শাখা সর্ব্বাগ্রে মগধে সম্প্রসারিত হয়। বাঙ্গালী মহাযানকে অবলম্বন করে এবং তাহারে চীনে তিব্বতে এবং অন্য প্রাচ্য দেশে প্রচার করে। এই মহাযানের উপ-শাখা হিসাবে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতির উদ্ভব হয়। এই হিসাবে বাঙ্গালী পূর্ণ মাত্রায় আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত ও মান্য সকল রকমের orthodoxyর বা গোঁড়ামীর বিরোধ ঘটায়।

সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহের উদ্ভবের পূর্ব্বে জিনাচার বাঙ্গালায় প্রচারিত হইয়াছিল।...জৈনদিগের পর্য্যুষণ ব্রত এখনও আকারান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। কার্ত্তিকের পূজাটা জৈনদিগের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উৎসবের আকারান্তর। বাঙ্গালী জৈন নাই, যাহারা পূর্ব্বে ছিল

তাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবরণ গ্রহণ করিয়া আত্ম-গোপন করিয়াছে।...

গোরক্ষনাথ...মধুসূদন সরস্বতী নামে বাঙ্গালার এক ব্রাহ্মণের কীর্তি দেখিয়া বঙ্গভূমি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। রাঢ়েই তিনি শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন।...যোগী ও আগুরীজাতি নাথীধর্ম্মের ফলস্বরূপ। এই নাথী-সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাঙ্গালায় বহু শিব-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। চড়কপূজা, পিঠ ফোঁড়া, জিভ ফোঁড়া, গম্ভীরা, ভাদো প্রভৃতি উৎসব এই সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাদেরই প্রভাবে ব্রত-ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। গোরক্ষনাথ হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সমন্বয় সাধন করেন।...

বাঙ্গালার উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে নর-পূজা বা আত্ম-পূজার সম্প্রসারণ অতি মাত্রায় ঘটিয়াছিল। কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, সকল সম্প্রদায়ই নানাভাবে আত্মপূজায় রত ছিলেন। এই ভাব-প্রকাশের পদ্ধতি লইয়াই সম্প্রদায়-বিভাগ ঘটিত।...সকল সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, আরাধ্য দেবতা বা ইষ্টদেব আমাদের প্রত্যেকের দেহভাণ্ডে পরমাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, আমরা প্রত্যেকেই শিবস্বরূপ ; সেই দেহস্থ শিবকে বা পরমাত্মাকে দর্শন করা সকল সাধকের উদ্দেশ্য। উহাই উপাসনা, উহাই আরাধনা, উহাই সাধনা। সাধককে প্রেম ও আসক্তির সাহায্যে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিতে হইবে—সারূপ্য, সাযুজ্য, ও সামীপ্য লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক নরদেহে একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে, এই আসক্তি-সকলের একটা কোন আসক্তির অতিমাত্রায় উন্মেষ ঘটাইয়া পরমাত্ম-দর্শন করিতে হইবে। ভক্তি-শাস্ত্রই দ্বৈতবাদের আসন। তুমি ও আমি, সাধক ও সাধ্য, পূজক বা উপাসক এবং উপাস্য দেবতা ভক্তিশাস্ত্রই প্রথম কল্পনা করেন।...আমি ছাড়া আর একজনের অস্তিত্বের কল্পনা না করিতে পারিলে ভাবানুরাগ আসক্তি সম্ভবপর নহে। সে আর-একজন কেমন হইবেন? আমি যেমনটি চাই, তেমনটিই হইবেন। তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু,—আমার সাধ, বাসনা, আসক্তির পূর্ণ তৃপ্তি তাঁহাতেই হইবে। মানুষ আমি, আমার কল্পনায়, আমার ধ্যানে নরাকারে রূপটা স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। তিনি শ্যাম-শ্যামা।...ভক্তি ও ভাবমার্গ ছাড়া আর-একটা রসের পন্থা বাঙ্গালায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাহাই বাঙ্গালী জাতিকে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে—তাহা বাঙ্গালীর ভাষায় ও সাহিত্যে যেন ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজ করিতেছে। সেটা প্রেম ও সহজ মত। প্রেমের সাহায্যে সাধনা বাঙ্গালায় যেমন শত-শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হইয়া বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, এমনটি বোধ হয় বাঙ্গালার বাহিরে, পৃথিবীর আর কোন দেশে ও জাতির মধ্যে হয় নাই। সহজ মতই প্রেমের সাধনা ; সহজিয়ার দল প্রেম ছাড়া আর কিছু জানে না ; আর এই সহজ মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বনিয়াদ।...প্রেমের সাধনার "ফিলজফি"টুকু, মনে হয়, সহজিয়া দার্শনিকগণের নিকট হইতে পরে শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব উপাসকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সহজ মতে আছে যে, যোগ ও ভাব লইয়া কোন কাজের কাজ ত হইবে না, ভক্তির সাহায্যে মুক্তি পাইতে পার। পরন্তু মুক্তি পাইয়া ত কোন লাভ নাই। চাই আনন্দ ; জীবমাত্রের ধর্ম্মই হইল আনন্দ-পিপাসা।...আনন্দই জীবের ঈপ্সিত ও লভ্য এবং সাধ্য। সে আনন্দ কেমন? অবাঙ্মনসঃ-গোচর---বাক্য-মনের অগোচর, তাহা ভাষায় বুঝান যায় না, কেহ পারে নাই। যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, তাহার মূকাস্বাদনবৎ—বোবার মিষ্ট আস্বাদনের তুল্য অবস্থা ঘটিয়াছে।...বহির্দ্দেবতা নাই, নরক নাই, সাধন নাই, ভজন নাই, যোগ নাই, তপস্যা নাই, সংসারে—বিশাল বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আছে কেবল এই আনন্দ এবং আনন্দ-প্রাপ্তির চেষ্টা।...যাহা সহজাত যাহা হইতে জীবের উৎপত্তি, যাহার জন্য জীবের সৃষ্টি, তাহাই সহজ, সহজ ধর্ম্ম অনেকটা মধ্যযুগের ইয়োরোপের Natural Religionএর Satan Worshipএর ভারতীয় সংস্করণ।...কাম বা আদি সাধনা সহজ মতের একমাত্র সাধনা।...এমন সাধনাতত্ত্বের পরিণতি ভীষণ বা কদর্য্য হয়ই। বৌদ্ধধর্ম্মে এই অংশের অতি ভীষণ বিকৃতি ঘটিয়াছিল ; সেই বিকৃতির জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম নামতঃ লোপ পাইয়াছিল ; সহজ মতও এই হেতু গুপ্ত সাধনায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সহজ মত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের philosophical basis তাত্ত্বিকী বেদী।...রসতত্ত্ব দেহতত্ত্বের সবটাই সহজ মত হইতে সংগৃহীত। সহজ মতের ভাষাই হইল "সন্ধ্যা ভাষা" অর্থাৎ সিদ্ধাচার্য্যগণের দোহাবলীর ভাষা। রাঢ়দেশে এখনও দুই চারিটি সহজ মতের সুপণ্ডিত বাবাজি পাওয়া যায়।

এই নানা ভাবের ও রসের সমাহারে, নানা সাধন-পন্থার সমাবেশে বাঙ্গালী জাতির মনে এক অপূর্ব্ব ঔদার্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালী ভাবুক ও রসিক, কখনই গোঁড়া ও গণ্ডিবদ্ধ নহে। এই ঔদার্য্য হেতু বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। পশ্চিম প্রদেশে, আর্য্যাবর্ত্তে ও পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়-চেষ্টা যে ঘটে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। নানক-পন্থা, কবীর-পন্থা, দাদূ-পন্থা, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়-সাধক চেষ্টা-জাত ধর্ম্ম-মত মাত্র। আকবর শাহের প্রবর্ত্তিত "দীন-ই-ইলাহি" ধর্ম্ম আমাদের কিশোরকালপর্য্যন্ত পশ্চিমের লালা কায়স্থ ও ক্ষেত্রী-বণিক গৃহস্থ বিশেষের মধ্যে সজীব ভাবে প্রচলিত ছিল। জালালুদ্দিন আকবরের নামানুসারে "জালালী ফকীর" নামক এক সন্ন্যাসীর দলের সৃষ্টি হইয়াছিল ; ইহাদের বর্ণনা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় এখনও ইহারা "আউল" "বাউল" বলিয়া পরিচিত। হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধন করিতে অনেকে উদ্যত হইয়াছিলেন বটে, পরন্তু এ পক্ষে বাঙ্গালীর ব্যবস্থা অপূর্ব্ব এবং স্বতন্ত্র। বাঙ্গালী যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের হিন্দু তাহা পারে নাই। বাঙ্গালী মুসলমানের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিয়াছে, তত্ত্ব-সাধক সুফী মুসলমান ফকীরকে গুরুপদে বরণ করিয়াছে, তাহাদের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ এখনও গঙ্গাস্নান করিবার সময়ে "দরাব-গাজী"-রচিত গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন।... সত্যনারায়ণের ও সত্যপীরের কথা আছে।...Greek Churchএর খৃষ্টানগণ, Nestorian খৃষ্টানগণ তন্ত্রসাধনা করিতেন। ইয়োরোপের মধ্যযুগের Esoteric Religion তন্ত্রোক্ত সাধনার নামান্তর মাত্র। বৌদ্ধতন্ত্র, সহজ মত এবং শাক্ততন্ত্র ও ভক্তির ধর্ম্ম বাঙ্গালায় এমন একটা সমন্বয়ের এবং ঔদার্য্যের ভাবের উন্মেষ সাধন করিয়াছিল, যাহার অনুরূপ ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ও জাতির মধ্যে নাই বা ছিল না। এই ঔদার্য্য ও প্রসন্নতা শূন্যপুরাণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার আদি ও মধ্যযুগের সমগ্র সাহিত্যে, সকল মহাকাব্যে ও গাথায় পরিলক্ষিত হইবে। শূন্যপুরাণ পাঠ করিলেও মনে হয় বাঙ্গালার সহজিয়া ও বৌদ্ধগণই পাঠানদের ডাকিয়া আনিয়া বাঙ্গালায় আশ্রয় দিয়াছিল। পাঠানদের সহিত বাঙ্গালীর মেলা মেশা খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই হইয়াছিল।..

বাঙ্গালায় যখন প্রথম পাঠান-অভিযান হয়, তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অতিমাত্রায় ছিল ; তখন বজ্রযানী ও কালচক্রযানীদিগের প্রতিপত্তি খুব ছিল, সহজ মত রাঢ়ে ও বঙ্গে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, লুইপাদ-প্রমুখ সিদ্ধাচার্য্যগণের দলবল পঙ্ককোট হইতে চট্টগ্রাম ও ডবাক-প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়াছিল। নানা আকারে, নানা ভাবে, নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মহাযানী বৌদ্ধমত বাঙ্গালীজাতির প্রায় সকল স্তরেই যেন অনুস্যূত হইয়াছিল। ব্রহ্মাবর্ত্তের, কুরুক্ষেত্রের,

মিথিলার এবং দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ হিন্দু রাজার আহ্বান-মত বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহারা দেশের জনসাধারণের সহিত মেলা-মেশা করিতেন না, এমন কি বাঙ্গালার আদিম নিবাসী নর-নারীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। তাঁহারা নিজেদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাজ-পরিচ্ছদ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেন। তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিতেন না, ধর্ম্মপুস্তকসকলের ব্যাখ্যা করিতেন না; কেবল নিজেদের ঘরে থাকিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল করিতেন, রাজাদেশে যাগ-যজ্ঞাদিও করিতেন। বাঙ্গালার জনসাধারণ সিদ্ধাচার্য্যগণের দ্বারা, বৌদ্ধশ্রমণগণ দ্বারা, বৌদ্ধতান্ত্রিক কুলাচারী এবং বীরাচারী কর্ম্মীগণের দ্বারা শাসিত, পরিচালিত এবং সুরক্ষিত হইত। ...ভারতবর্ষে গোড়া হইতে পাঠানদিগের প্রবেশ বৌদ্ধদিগের সহায়তায় হইয়াছিল। কান্যকুব্জের জয়চন্দ্র যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন, সনাতনধর্ম্মীদিগের বিদ্বেষী ছিলেন, তাহা চাঁদ বর্দ্দইয়ের মহাকাব্যে পাওয়া যায়, বইজু-বাওরার একটা গানে তাহা স্পষ্ট বলা আছে। ...বাঙ্গালায় পাঠানগণ আসিলে এবং বঙ্গের কতক অংশ জয় করিয়া বসিলে, সহজিয়া ও বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে খুব আদরের আসন দিয়াছিলেন। এই আদরের ফলে, পূর্ব্ববঙ্গের অর্দ্ধেকটা—সমাজের নিম্নতম স্তরটা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে, পাঠানদিগের সহিত বৈবাহিক কুটুম্বিতা করে। বৌদ্ধ সমাজে এখনও বিবাহ-বন্ধনটা বড়ই শিথিল। ...পাঠান সংস্রবে বাঙ্গালার সামাজিক বহু স্তরে রক্তদুষ্টি ঘটিয়াছিল, পাঠানদিগের সহিত একটা অপূর্ব্ব মেলা-মেশা হইয়াছিল। সে মেলা-মেশার পরিচয় আমরা পরে মোগলপাঠানের যুদ্ধে পাইয়াছি। মোগলমারীর তিনটা যুদ্ধে পাঠান অপেক্ষা বাঙ্গালার কৈবর্ত্ত, আগুরী, গোড়োগোয়ালা প্রমুখ রণদুর্দ্দ জাতিসকল অধিকতর সংখ্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল। এমন কি দাউদ-খাঁয়ের দলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বীর অনেক ছিল। মোগল পাঠানের যুদ্ধে, মোগলমারীর রণক্ষেত্রে বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর পুরুষসকল বীরগতি লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক ইয়োরোপের তুল্য বঙ্গদেশও তখন পুরুষ-শূন্য হইয়াছিল। বাঙ্গালীর বীরত্বের প্রশংসা খোদ মোগল সেনানী মুনিম খান্ এবং রাজা তোডর মল্ল করিয়া গিয়াছেন। এই পাঠানের পতনকাল ও মোগলের উদ্ভবকাল বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যে একটা মহা মুহূর্ত্ত—সন্ধিক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সময়েই শ্রীচৈতন্যের উদ্ভব হয়, এই সময়েই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন অবতীর্ণ হন; এই সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন ঘটে, বাঙ্গালীসমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা হয়। একদিকে অরাজকতা এবং মাৎস্য-ন্যায়; অন্যদিকে নবদ্বীপে মনীষার প্রদীপ শতদ্যুতিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার বনিয়াদ গাড়া হয়, nation-building বা জাতি সৃষ্টির কাজ আরব্ধ হয়। পাঠানের আগমনের তিনশতবর্ষকাল কত বিদেশী জাতি যে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করে, তাহার হিসাব করা এখন কঠিন। পাঠান সর্দ্দারগণের অনেকেই বঙ্গমহিলাদের পত্নীপদে বরণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সোনা বিবি ইহার একটা বড় দৃষ্টান্ত। আবিসিনিয়ার গোলাম হাব্‌শী, জু-জু, উজবেগ প্রভৃতি অসংখ্য দুর্দ্দর্ষ বিদেশী মোস্‌লেম বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করে; এবং বৌদ্ধ শৈথিল্যের কল্যাণে এক-একটা সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিয়া রাখে। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনন্দন, দেবীবর প্রভৃতি মনীষিগণ বৌদ্ধ ও সহজমতে শিথিলীকৃত বাঙ্গালী সমাজকে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিশিষ্টতা-উপেত করিয়া দেন। তাঁহারাই হিন্দু-সমাজের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আদি দেবতা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

...কালাপাহাড় ও বিরূপাক্ষ, দুইজনেই উৎকট iconoclast বা ধ্বংসবাদী ছিলেন। দুইজনেই বৌদ্ধমত ও সহজ মতকে প্রমথিত করেন। বাঙ্গালার সাধারণ গৃহস্থের গৃহে কালাপাহাড়ের আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া পূজা হইত না। তান্ত্রিকগণ তাম্রের টাটে বা থালায় যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহারই উপরে নিত্য হোম করিতেন। বৈদিকগণ যথারীতি হোমকুণ্ড বানাইয়া যজ্ঞ করিতেন, চণ্ডীর উপাসকগণ ঘটস্থাপন করিয়া চণ্ডীর পূজা করিতেন। চণ্ডী-উপাসক মাত্রেই বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিলেন। চণ্ডীর ঘটস্থাপনায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, মহিলাগণ নিজেরাই ঘটস্থাপনা করেন এবং মঙ্গলচণ্ডী, জয়চণ্ডী প্রভৃতির ব্রতকথার আবৃত্তি করেন। উলাগ্রামে যে বৈশাখী পূর্ণিমায় ওলাইচণ্ডীর পূজা হইত তাহা হিন্দুতন্ত্রোক্ত শক্তি-পূজা নহে, তাহা স্পষ্ট কালচক্রযানের চণ্ডীপূজা, সিদ্ধার্থের জন্মতিথিতে বৈশাখী পূর্ণিমায় করা হইত। বাঙ্গালার মহিলাদের ব্রতসকলের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, উহার কোনটাই বৈদিক বা মূল তান্ত্রিকী ক্রিয়া নহে। উহার সবটাই হয় বৌদ্ধ, নহে ত জৈন ব্রত। তাল-নবমী, দুর্ব্বাষ্টমী, অনন্তচতুর্দ্দশী, ঘৃত-সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্রতসকলের কোনটাই বৈদিক যুগের ব্রত নহে। বৌদ্ধ-মত, সহজ-মত, বাশুলী দেবীর ব্রত এবং জৈন ব্রত প্রচ্ছন্নভাবে বাঙ্গালার মহিলাদিগের ব্রতমালার মধ্যে নিহিত আছে।...

তখন গ্রামে গ্রামে মন্দির ছিল, সে-সকল মন্দিরে বৌদ্ধ দেবদেবীর পাষাণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত এবং নরনারী এই-সকল মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করিতেন। কালাপাহাড় ও বিরূপাক্ষ বিগ্রহ চূর্ণ করিবার পরে, মালদহের বা বরেন্দ্রের রাজা জগদরাম ভাদুড়ী প্রথমে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়াইয়া নবরাত্রির ব্রত সমাধা করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মাটির মূর্ত্তি-পূজার একজন প্রবর্ত্তক। তিনি স্বয়ং মাটির কালী-প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিতেন ও পরের দিন নিরঞ্জন করিতেন। তাই গোড়ায় মাটির প্রতিমা পূজাকে জনসাধারণে "আগামবাগীশী" কাণ্ড বলিত। বাঙ্গালা ছাড়া আর কোন প্রদেশে বা জাতির মধ্যে মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা-পদ্ধতির প্রচলন নাই। বাঙ্গালার এই মূর্ত্তিপূজার বৈশিষ্ট্য কালাপাহাড়ের ও বিরূপাক্ষের ধ্বংসবাদের ফলে উন্মেষ লাভ করিয়াছিল। এখনও বাঙ্গালার কোন পুরাতন শক্তি-মন্দিরে পাষাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি নাই, সবই এক একটা যন্ত্র-লিখিত পাষাণ-খণ্ড, পরে তাহার অপর পৃষ্ঠা কতকটা চাঁচিয়া ছুলিয়া মূর্ত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব মন্দিরে যে দ্বিভুজ মুরলীধরের লক্ষ্মীনারায়ণ জিউয়ের মূর্ত্তি-সকল আছে, সে সকলই অপেক্ষাকৃত আধুনিক,—শ্রীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাবের পরে। খড়দহের শ্যামসুন্দরের বেদীর উপরে কিন্তু তান্ত্রিক যন্ত্র (ত্রিপুরাভৈরবীর) লিখিত আছে। পুরাতন সকল বৈষ্ণব মন্দির ও বিগ্রহই তন্ত্রক্ষেত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ সকলই মোগলের আমলে সমাজের পুনর্গঠন-কালে ঘটিয়াছিল।...

অনেক কথা বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার এক সময়কার প্রবল সৌর উপাসকদিগের কথা বলি নাই; মনসা পূজা ও মনসামঙ্গল এবং নাগ উপাসকদিগের কথা কহি নাই; চণ্ডীদাসের বাশুলী কে ও কি, সহজিয়াদিগের পাল্লায় পড়িয়া তিনি কেমন আকার ধারণ করিয়াছিলেন তাহারও ব্যাখ্যা করি নাই; অবধূত সম্প্রদায়ের কথা বলি নাই, শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু অবধূত হইয়া কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের মূল পুরুষ হইয়াছিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য গোড়ায় কি ছিলেন ও কেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর হইয়াছিলেন, অবধূত সমাজে 'পিশাচ খণ্ড' কি ছিল,—ইত্যাকার অনেক কথারই উল্লেখ করি নাই। আমি কেবল আধুনিক বিদ্বজ্জন-সমাজের অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক-চেষ্টায় এই তিনটি সন্দর্ভ লিখিলাম।...

(বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক) শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যামিতিক চিত্র দিয়া ছবি আঁকা

সরল ও বক্র রেখার সংমিশ্রণেই বর্ণমালা ছবি সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রভৃতি সকলই সকল দেশে অঙ্কিত হইয়া থাকে। যেমন কেবল মাত্র সরল রেখায় একটি চিত্রের সৃষ্টি করা বড় সহজ নয়, তেমনই কোন একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আকারের বক্ররেখার দ্বারাও ঠিক কোন ছবি হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি চেষ্টা করিয়া কেবলমাত্র ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ প্রভৃতি কতকগুলি জ্যামিতিক চিত্র সুকৌশলে পাশাপাশি বা একটির উপরে আর-একটি বিন্যস্ত করিয়া কেমন অদ্ভুত প্রকারের ছবি হইতে পারে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

যমজ শিশুক্রোড়ে ধাত্রী

তিরস্কার

ধনিক ও শ্রমিক

পক্ষিযুগল
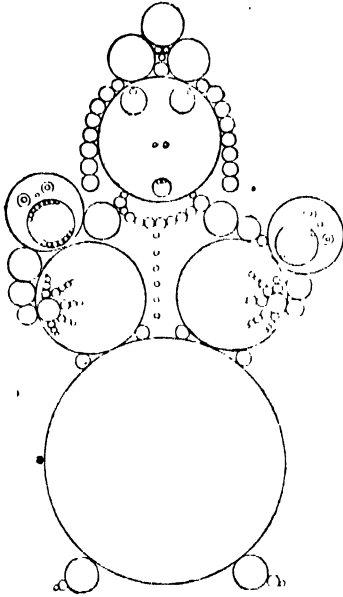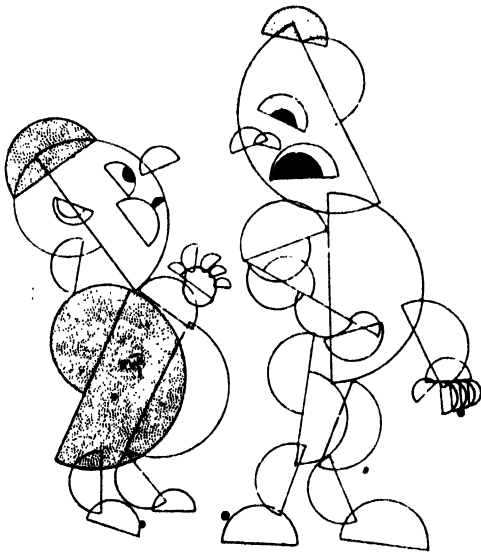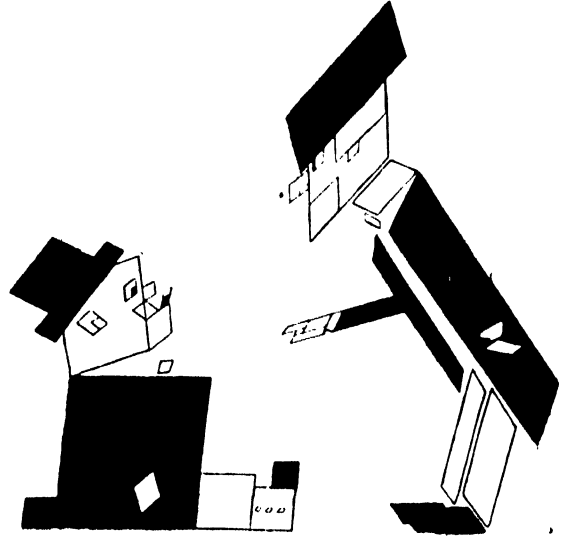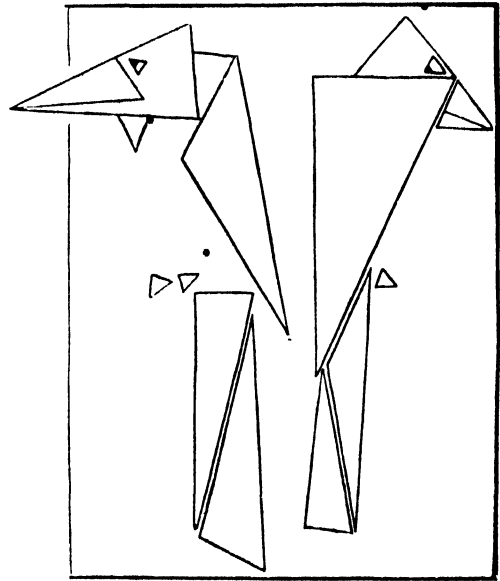
উহা ছবির হিসাবে এমন কিছু না হইলেও, উহার মধ্যে একটা নূতনত্ব, বিশেষ দর্শকের কল্পনাকে আকর্ষণ করিয়া তৎসাহায্যে ছবিগুলির পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবার ক্ষমতা দেখিয়া উহার

আত্মসম্ভ্রম-বোধ ও ধৃষ্টতা

সূর্য্যাস্ত-কালে বাঘিনীর জলপান
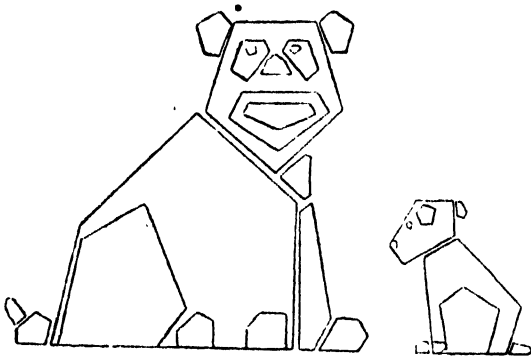
চিত্রকরের কল্পনা ও কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে হয়। এইরূপ কতকগুলি ছবির প্রতিলিপি বিলাতী কাগজ হইতে এখানে প্রদত্ত হইল।

১ম চিত্রখানি কেবলমাত্র বৃত্ত দ্বারা অঙ্কিত। উহার বিষয় এক ধাত্রী দুইটি যমজ শিশুকে কোলে করিয়া আছে।

২য় চিত্র কেবলমাত্র অর্দ্ধবৃত্ত দ্বারা অঙ্কিত। উহার বিষয়, ধনিক ও শ্রমিক। ইহা রূপক ব্যঙ্গচিত্রের ভাবে অঙ্কিত।

সাগরকূলবাসিনী সুন্দরী
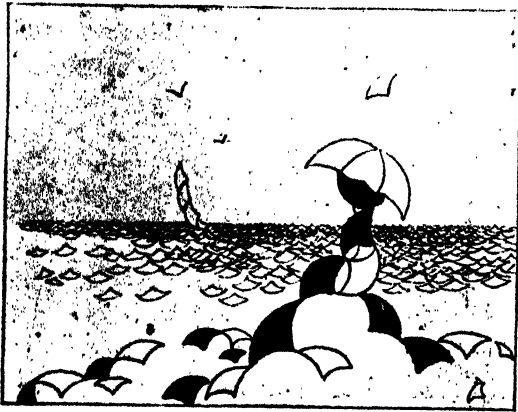
৩য় চিত্রে দুইটি মূর্ত্তি রম্বাস (Rhombus) ও অপরটি রম্বয়েড (Rhomboid) দ্বারা অঙ্কিত। এই ছবিখানির নাম দেওয়া হইয়াছে অধ্যাপক রম্বাসকে তাহার অনভ্য ব্যবহারের জন্য অধ্যাপক রম্বয়েডের তিরস্কার।

৪র্থ চিত্রে কেবলমাত্র কতকগুলি ত্রিভুজ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি কাক বা অন্য পাখী পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে।
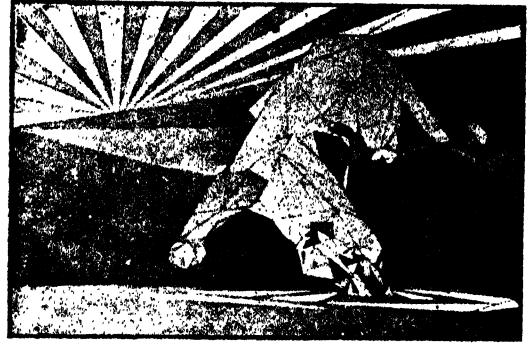
৫ম চিত্রখানিও রূপকের ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে আত্মসম্ভ্রম-বোধ ও ধৃষ্টতা—এখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর ল্যাণ্ডসিয়রের আঁকা প্রসিদ্ধ ছবির অনুকরণ। কেবলমাত্র পঞ্চকোণ ক্ষেত্র (Pentagons) দ্বারা ইহা অঙ্কিত।

৬ষ্ঠ চিত্রখানির নাম "চাতকের প্রত্যাবর্ত্তন"। ইহা চক্ররেখা ত্রিভুজ দ্বারা অঙ্কিত। মনে হয় ইহার আর-একটি নাম দেওয়া চলে "সাগরকূল-বাসিনী সুন্দরী।"
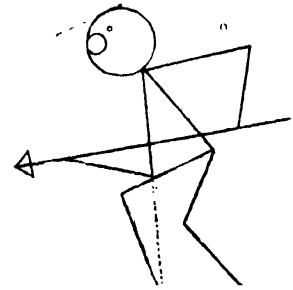
মিনার্ভার পেচক অনুধাবনকারী ডায়ানা

৭ম চিত্রের বিষয় "সূর্য্যাস্তে বাঘিনীর জলপান।" ইহা একটি ত্রিভুজ-সজ্জিত সুন্দর পরিকল্পনা।

৮ম চিত্র বৃত্ত, বৃত্তাবাস (Ellipse) এবং সরল রেখা দ্বারা অঙ্কিত। ছবির নাম "মিনার্ভার পেচক অনুধাবনকারী ডায়ানা।"

এই ছবিগুলির প্রত্যেকখানিই বুঝিতে আমাদের কল্পনার কতটা আশ্রয় লইতে হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এ জন্য মস্তিষ্কের কোনরূপ বিরক্তি বা পীড়া বোধ হয় না, এমনই সুকৌশলে চিত্রিত হইয়াছে। কল্পনায় দেখিতে হয় বলিয়াই ৬ষ্ঠ চিত্রখানি দুই-ভাবেই আমাদের দৃষ্টিতে পৌঁছিয়া থাকে।

শ্রী হরিহর শেঠ
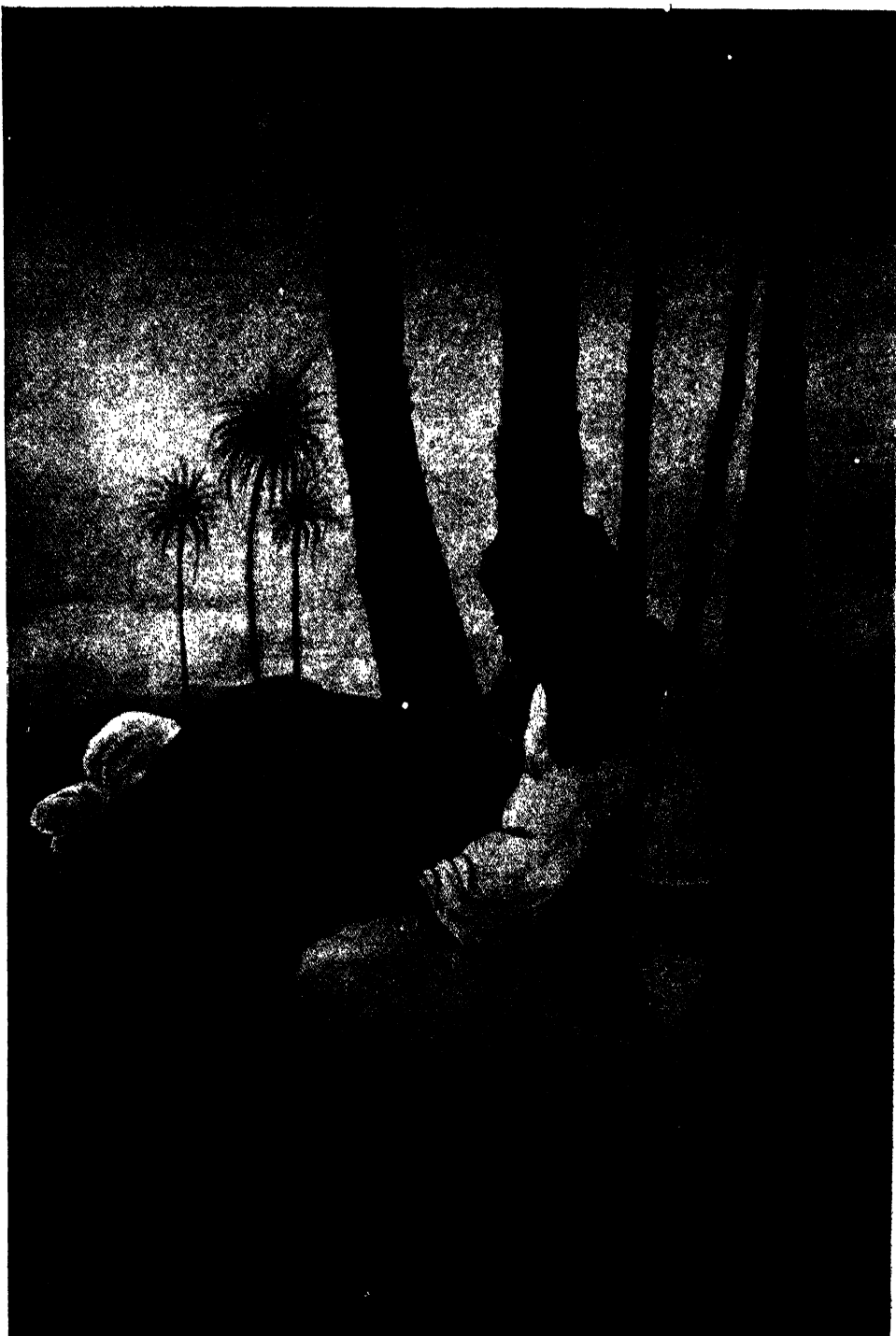
ব্যথিত-বেদন

চিত্রকর শ্রীযুক্ত আব্‌দুল্ রহ্‌মান্ ইক্সাজ।

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

শিশুদের নামকরণ প্রথা

সভ্য অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাদের জীবনে কতকগুলি সংস্কার, ক্রিয়া বা উৎসব সাধিত হইয়া থাকে। তাহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের, আবার এক দেশের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আমাদের বাঙ্গলা দেশে হিন্দুর ঘরে শিশুদের জন্মের পর ছয় দিনে ষেটেরা পূজা, আটদিনে আটকৌড়ে, একমাসে ষষ্ঠী পূজা, এই সব এখনও অবস্থাভেদে বেশ ধূমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু শিশুদের নামকরণ কথাটি পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় শুভদিনের নির্ঘণ্ট মধ্যে দেখা ভিন্ন এখানে আজকাল এজন্য বিশেষ কোন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। অন্ততঃ পশ্চিম বাঙ্গলায় ত নয়ই। এই নামকরণ ব্যাপারটি বহুদেশে বহুপ্রকার প্রথায় এবং কোথাও কোথাও বেশ উৎসবের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

চীনদেশে শিশুর নামকরণ উৎসবে শিশুর মাথা ন্যাড়া করা

আমাদের স্থায় চীনদেশে মেয়ের জন্ম সংসারে বড় আনন্দের নয়। তাহাদের দুর্ভাগ্যের সূচনা তাহাদের নামকরণ উৎসব হইতেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়। শিশুর জন্মের একমাস পরে তাহার নামকরণ হয়। পুত্রসন্তান হইলে ঐ সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি ভোজের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। একজন পুত্রবতী নারীর দ্বারা শিশুটির মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশে যেমন সধবা এবং পুত্রবতী স্ত্রীলোকের দ্বারা এমন অনেক মাঙ্গলিক কার্য্য হইয়া থাকে যাহা বিধবা বা পুত্রহীনার দ্বারা হয় না; চীনদেশেও সেইরূপ পুত্রবতী রমণীর অনেক মাঙ্গলিক কার্য্যে অধিকার আছে যাহা অপরের নাই। মস্তক মুণ্ডনের পর শিশুর একটি নাম দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা যেমন প্রথম উদ্গত দাঁতগুলিকে দুধে দাঁত বলি, চীনেরা প্রথম প্রদত্ত নামটিকে দুধে নাম বলে। এই নাম তাহাদের জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত থাকে না। বালকেরা যে দিন প্রথম বিদ্যালয়ে গমন করে সেই দিন তাহাদের পুনরায় একটি নূতন নাম দেওয়া হয়। বালিকাদেরও সেইরূপ বিবাহের দিন নব নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

পুত্র সন্তানের নামকরণ উৎসবে যে-সকল বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হন তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকই কিছু উপঢৌকন দিয়া থাকেন। দেশের কোন কোন অঞ্চলে এই উপহার সর্ব্বস্থলেই—'দীর্ঘজীবন, সম্মান ও সুখ' এই লেখাঙ্কিত একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত রেকাবি।

ভারতবর্ষের মধ্যে বেনিয়ান নামক নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী জাতিদের নামকরণ প্রথা অতি বিচিত্র প্রকারের। শিশুজন্মের চারিদিন পরে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রতিবেশী কতিপয় শিশুকে এই কার্য্যের জন্য আনা হয় এবং একখানি দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড ঘরের মেজেতে বিস্তারিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক শিশুদের ধরিতে

ল্যাপল্যাণ্ডে শিশুর নামকরণ উৎসব

দেওয়া হয়। তৎপরে পুরোহিত কিছু অন্ন ঐ বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে রাখিয়া তদুপরি নবজাত শিশুটিকে স্থাপিত করেন। তৎপরে সেই বালকগণ বস্ত্রখণ্ড ধরিয়া মেজে হইতে তুলিয়া প্রায় সিকিঘণ্টা কাল এদিক ওদিক সঞ্চালন করে। তৎপরে শিশুর কোন ভগ্নী তাহার ইচ্ছামত একটি নাম প্রদান করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের বানিয়াদের জাতকর্ম্ম পদ্ধতি

পিকার্ট (Bernard Picart) তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে এই বিবরণটি চিত্রের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই জাতি ভারতের কোথায় আছে এবং এখনও এই নিষ্ঠুর প্রথা পালিত হয় কি না তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত নহেন।

মেক্সিকো দেশে শিশুর নামকরণ

আমেরিকার ফ্লোরিডা প্রদেশে পুত্র সন্তানের নাম সংসারের কোন উত্তম মিত্রের নামের সহিত যাহাতে মিল না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া রাখা হয়। শিশুর পিতা বা পিতৃবন্ধু যদি কোন শত্রুকে সংহার করিয়া থাকে বা তাহাদের দ্বারা যদি কোন পল্লী বিধ্বস্ত হইয়া থাকে বা কোন যুদ্ধে তাহারা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকে তবে সেই সবের নাম হইতে শিশুর নাম দেওয়া হয়।

ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেশে অন্যান্য কৃশ্চান জাতির ন্যায় প্রথম ধর্ম্মসংস্কার বা দীক্ষার সহিতই নামকরণ হইয়া থাকে। এজন্য উৎসব বিশেষ কিছু না হইলেও অন্যের সহিত তুলনায় একটু নূতনত্ব আছে। নির্দ্দিষ্ট দিনে শিশুটিকে চন্দ্রাকৃতি একটি আবরণের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। ল্যাপ জাতি মাত্র গত শতাব্দীর শেষ ভাগে খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্ব সংস্কার এখনও ত্যাগ করিতে না পারার জন্য বা যে জন্যই হউক তাহারা তাহাদের সাকারবাদী পূর্ব্বপুরুষদের নামে নাম রাখিতে, বড় ভালবাসে। তাহারা শিশুকে উক্ত আবরণের মধ্যে রাখিয়া মাত্র জলের দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিয়া, একটি নাম দিয়া থাকে। তাহাদের এই নাম যাবজ্জীবন থাকিবে এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় কোন কঠিন পীড়ার পর তাহারা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রের ধারে কাবির নামে একপ্রকার জাতি আছে। খৃষ্টানদের ন্যায় তাহারা তাহাদের শিশুদের নামকরণ উৎসবে একপ্রকার ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মমাতার সাহায্য লইয়া থাকে। তাহারা ঐ সময় শিশুর কর্ণ নাসিকা ও নিম্নের ঠোঁটে অলঙ্কার পরিবার জন্য ছিদ্র করিয়া দিয়া থাকে। এই নিষ্ঠুর প্রথা বর্ত্তমান থাকার জন্য অগত্যা শিশু কিছু বড় না হইলে নামকরণ হইতে পারে না।

মেক্সিকো প্রদেশে নবজাত শিশুকে মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ধর্ম্ম-যাজক শিশুকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম উপদেশসূচক কতকগুলি কথা বলেন। তৎপরে শিশু যেমন ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যদি ঐশ্বর্য্যবানের পুত্র হয় তবে তাহার দক্ষিণ হস্তে তরবারি এবং বাম হস্তে একখানি ঢাল দেওয়া হয়; বা যদি কোন মিস্ত্রী বা কারিকরের পুত্র হয় তবে ভবিষ্যৎজীবনে যাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে এইরূপ কোন যন্ত্র দেওয়া হয়। তৎপরে বেদীর নিকট লইয়া গিয়া শিশুর অঙ্গ হইতে দুই এক বিন্দু রক্ত নির্গত করিয়া তাহাতে জলসিঞ্চন করা হয় বা ছেলেটিকে একেবারে জলে ডুবাইয়া লওয়া হয়।

ম্যাণ্ডিঙ্গো দেশে শিশুর নামকরণ

কোন কোন স্থলে সন্তানের জন্মের কিছুদিন পরে একদিন ধাত্রী তাহাকে বাটীর উঠানে লইয়া যায় এবং তথায় একটি জলপাত্রে ছেলেটিকে তিনবার নিমজ্জিত করে। প্রত্যেক নিমজ্জনের সহিত তিনটি তিনবৎসর বয়স্ক বালকের দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে একটি নাম উচ্চারণ করাইয়া শিশুর নাম দেওয়া হয়।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ম্যাণ্ডিংগো নামক এক মুসলমান জাতির নামকরণ জন্মের আটদিন পরে সাধিত হয়। তাহারা কোন আত্মীয়ের নামে বা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার নাম দিয়া শিশুদের নামকরণ করিয়া থাকে। প্রথম শিশুটির মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত জনগণের জন্য দধি ও কোন শস্যচূর্ণ দ্বারা 'ডিগা' নামে একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে। যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা ছাগ বা মেষ-মাংসও উহার সহিত দিয়া থাকে। ঐ খাদ্যদ্রব্য যে রাত্রে রাখা হয় তাহা উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারা ধৃত হয়। পুরোহিত বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত যিনি উপস্থিত থাকেন তিনি ঐ ডিগার উদ্দেশে প্রথমে দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া তৎপরে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ভগবানের নিকট তাহার ও উপস্থিত জনমণ্ডলীর জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ইহার পর শিশুর পিতা এক একটি পিণ্ডাকার করিয়া ঐ খাদ্য সকলকে প্রদান করে। ঐ সামগ্রীটির বিশেষরূপে রোগ-অপনোদক ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস থাকায় গ্রামের কেহ যদি মারাত্মক পীড়ায় অভিভূত থাকে তাহার সন্ধান করিয়া তদুদ্দেশে উহার অনেকটা অংশ প্রেরিত হইয়া থাকে।

পারস্য দেশে নামকরণের জন্য একটি শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ দিনে বন্ধুবান্ধব ও গ্রামের মোল্লাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সকলে উপস্থিত হইলে সমাগত লোকদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। তৎপরে শিশুদিগকে গন্ধাদির দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া বেশ করিয়া বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া একজন মোল্লা কর্ত্তৃক ঘরের মেজের উপর শয়ন করান হয়। এইবার পাঁচটুকরা কাগজে পাঁচটি নাম লিখিয়া একখানি কোরানের পৃষ্ঠার মধ্যে বা গালিচার নিম্নে রাখা হয়। পরে কোরানের প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠান্তে উক্ত একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া একজন মোল্লা উহাতে লিখিত নামটি শিশুর কানের কাছে উচ্চারণ করেন এবং কাগজখণ্ড ছেলেটির কাপড়ের উপর রাখিয়া দেন। এইবার আত্মীয় বন্ধুগণ তাহাদের ক্ষমতামত শিশুকে উপঢৌকন দিয়া থাকে।

পারস্যদেশের জাতকর্ম্ম।

অধ্যবসায়, সাহস এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিবার চিহ্ন বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। শিশুজন্মের একশত দিন পরে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ দিন শিন্তো মন্দিরে যাজকের বাটীতে শিশুকে লইয়া যাওয়া হয় এবং পুরোহিত একটি নাম ঠিক করিয়া দ্যান। তৎপরে যখন শিশুটির জন্য প্রার্থনা করা হয় সেই সময় তাহাকে তাহার যথেচ্ছা বিচরণের জন্য ঘরের মেজেতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিশুর গতির দিক্ লক্ষ্য করিয়া জাপানীরা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে কল্পনায় একটা নির্ণয় করিয়া লয়। এই সময় মন্দ উপদেবতারা যাহাতে শিশুর গতি বিকৃত করিতে না পারে, এইজন্য তাহার

জাপানে শিশুর নামকরণ উৎসব।

জাপানে শিশুর নামকরণ উৎসব।

মাথার উপর কতকগুলি সরু কাগজের ফালির গুচ্ছ ধরা হইয়া থাকে। দুইখানি পাখা শিশুটিকে উপহার দেওয়া হয়, পরবর্ত্তী জীবনে তরবারি তৎস্থান অধিকার করে।

পার্শিদের নামকরণের সময় বিশেষ কোন অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয় না। পুরোহিত শিশুর পিতামাতার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায়-মত একটি নাম পাঁচজনের সাক্ষাতে উল্লেখ করিয়া থাকেন। তৎপরে একটি টবের জলে বেশ করিয়া স্নান করান হয় পরে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া যাইয়া শিশুটি যদি কোন ভূত প্রেত দ্বারা আক্রান্ত থাকে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য অল্পক্ষণ অগ্নির উপর ধরা হইয়া থাকে।

অগ্নিউপাসক পার্শিদের অগ্নি দ্বারা পরি-শুদ্ধির কথার একটা অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু স্কটলণ্ডেও কিছুকাল পূর্ব্বে এই ভাবের প্রথা পরিদৃষ্ট হইত। তথায় শিশুদের সংস্কারের সময় একটি পরিষ্কার ঝুড়ির উপর বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া উহাতে শিশুটিকে সংস্থাপিত করা হইত এবং সেই সহিত কিছু রুটি ও পনির দেওয়া হইত। তৎপরে শিশুসমেত ঐ ঝুড়িটি তুলিয়া গরম জল বা খাদ্য প্রস্তুতের জন্য গৃহছাদ হইতে অগ্নির উপর বিলম্বিত হুকের মত যে লোহার শিকল থাকে উহাকে বেষ্টন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণের সহিত তিনবার প্রদক্ষিণ করা হইত। শিশুর জন্মের পর যতদিন পর্য্যন্ত

পার্শীদের শিশুর নামকরণ।

পারস্যের ন্যায় জাপানেও নামকরণ উৎসবেই প্রথম শিশুকে মেজেতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উৎসবের দিন বাটীর পার্শ্বে একটি উচ্চ বংশদণ্ডে কাগজের নির্ম্মিত একটি ফাঁপা মৎস্যাকৃতি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। উহা বাতাসে ফুলিয়া উঠে এবং দুলিতে থাকে। উহা

ইংলণ্ডে রাজকন্যার নামকরণ উৎসব

স্কটল্যাণ্ডে শিশুর নামকরণ-পদ্ধতি

না এই সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইত ততদিন পর্য্যন্ত মাতা পাছে তাহার সন্তানকে কোন পরী বদ্‌লাইয়া লইয়া যায় এই চিন্তায় পীড়িত থাকিত।

ইংলণ্ডে নামকরণ ক্রিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়-বন্ধুগণের সমক্ষে গির্জ্জায় উৎসবের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রী হরিহর শেঠ

চাঁদের আলো

মায়ের কোলে খোকা খেলে—চাঁদের আলো নদীর জলে;
গভীর স্নেহ মায়ের বুকে—গভীর বারি নদীর তলে।
খোকার হাসি মধুর অতি—চাঁদের আলো মেদুর-জ্যোতি;
উথ্‌লে ওঠে হৃদয় মায়ের—নদীর লহর অধীর চলে।
মায়ের কোলে খোকা খেলে—চাঁদের আলো নদীর জলে!

গৌর-বরণ খোকার গায়ে মায়ের কালো অলক-ছায়া—
গাছের ছায়া পড়ে' পাড়' নদীর 'পরে আলোক-ছায়া।
কচি মুখের কুন্দ-কুচি কচি ছুটি দন্ত-রুচি
আধেক মত বেশ দেখা যায় খোকার অধর-পথের টেরে—
তীরের তরুর ঝরা ক'টি শিউলী ভাসে স্রোতের-ফেরে।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

জয়ন্তী

নবম পরিচ্ছেদ

কুম্ভমেলা

মাঘ মাসে প্রয়াগে, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে কুম্ভমেলা। গঙ্গার উভয় তীর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, যাত্রী এবং কল্পবাসীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যমুনার তীরে যাত্রী-সংখ্যা অল্প। গঙ্গার বালুতটে ও চরে লোকের সংখ্যা হয় না। পূর্ব্বতটে দুই তিন ক্রোশ দূরে ঝুঁসী পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। পশ্চিমতটে রামঘাট হইতে দারাগঞ্জ ও তাহার সম্মুখের মাঠে বিপুল লোক-সমাগম। কল্পবাসীরা সেই দুরন্ত-শীতে একমাত্র কম্বল লইয়া কুটিয়ায় রাত্রি যাপন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক বিস্তর। উদাসী সাধু সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালাইয়া নগ্নদেহে, একমাত্র কৌপীন ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। কেহ এক মাসের পথ, কেহ ছয়মাসের পথ পদব্রজে আসিয়াছে। স্থানে স্থানে নাগা সন্ন্যাসীর দল। তাহারা দিগম্বর, সকল সন্ন্যাসী-দলের অগ্রণী।

জনতা হইতে দূরে, বালুর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে কয়েকজন মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছিলেন। মেলার ভিতর তাঁহাদিগকে কেহ দেখিতে পাইত না, কুটীরের বাহিরে তাঁহারা বড় একটা যাইতেন না। কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হইত এবং অতি গভীর জ্ঞানের আলোচনা হইত। একত্র তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হইত না যে দ্বাদশ-বর্ষে তাঁহাদের একবার মাত্র সাক্ষাতের সুযোগ হয়। বর্ত্তমান-কালে বিজ্ঞান-বলে যেমন বিনা-তারে বৈদ্যুতিক সংবাদ বহুদূর প্রেরণ করা যায় সেইরূপ যোগীজ্ঞানীদিগের মানসিক অথবা যোগের ক্ষমতা আছে যদ্দ্বারা তাঁহাদের পরস্পর জ্ঞানবন্ধন থাকে, স্থান ব্যবধানে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় না।

এই কুম্ভমেলায় কয়েক ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন। ইঁহারা সেই পূর্ব্বপরিচিত গিরিগুহার মন্ত্রণাকারীগণ। যাঁহাকে পথিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং যিনি এই কয়জনের নেতা তিনিও আছেন। ইঁহারা যাত্রীদিগের ও সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কোথায় কি কথোপকথন হইতেছে শুনিতেছেন, অবসর বুঝিয়া নিজেরাও কিছু বলিতেছেন। তাঁহাদের কথায় শ্রোতারা প্রথমে বিস্মিত হইতেছে, তাহার পর মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেছে, অবশেষে চিন্তামগ্ন হইতেছে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই অতিথি মেলার স্থান হইতে অনেক দূরে একটি কুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরে যিনি বসিয়াছিলেন তাঁহার সন্ন্যাসীর ঠাট কিছুই ছিল না। জটাজুট ভস্মতিলক ধুনি কিছু ছিল না। তিনি যে গৃহস্থ নহেন তাহার একমাত্র নিদর্শন গৈরিক বাস। ললাটের সে প্রশস্ততা, মুখের প্রশান্ততা এবং দৃষ্টির প্রগাঢ়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইনি মহাপুরুষ, বিক্ষিপ্তচিত্ত বিষয়াশক্ত গৃহস্থ নহেন।

পথিক ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদের ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গৌরীশঙ্কর, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা হইতেছে ?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এ কথার কেমন করিয়া উত্তর দিব ? উদ্যম ও পুরুষকার আমাদের, যিনি সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি তাঁহার অধীন। কিন্তু আপনি ত আমাকে কোন আদেশ করেন নাই, আমাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধেও কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। প্রজার মঙ্গল ব্যতীত আমাদের অপর স্বার্থ নাই, কিন্তু কোনরূপ আপনার ইঙ্গিত পাইলে যেরূপ বিশ্বাস ও বলের সহিত কার্য্য করিতে পারি শুধু আত্মনির্ভর হইয়া সেরূপ পারি না। সেই কারণে এমন মহাতীর্থ স্থানেও আপনার সমক্ষে আসিতে সাহসী হইয়াছি।"

কুটীরবাসী ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; চক্ষে অন্তর্দৃষ্টি প্রতিভাত হইল। পরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট কথায় কহিতে লাগিলেন, "তুমি এ অনুযোগ করিতে পার। আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিছু স্থির করিতে পারি নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে যেখানে রজোগুণের প্রাধান্য

সে স্থানে আমরা কি করিতে পারি? মূলে চিন্তা থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য্যতৎপরতাই এ কার্য্যের প্রধান সহায়। তোমার স্বভাব রজোগুণপ্রবল, কর্ম্মে তোমার ক্লান্তি নাই; কিন্তু আমি ত কর্ম্মী নহি; এই কারণে তোমার সহায় হইতে পরিতেছি না, তোমাকে উপযুক্ত পরামর্শও দিতে পারিতেছি না। তবে মানবের প্রকৃতি জানি, এবং সেই অনুসারে বুঝিতে পারিতেছি যে তোমার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তোমার কর্ম্মে বিঘ্নবাধা বিস্তর। যে কোন কর্ম্ম করে তাহাতে অপর কেহ হস্তক্ষেপ করিলেই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই কর্ম্মফলে লুব্ধ। রাজকর্ম্মের তুল্য প্রলোভনের কার্য্য আর নাই। যদি সে কর্ম্মে, যে-কোন কারণেই হউক, তুমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ কর, তাহা হইলেই স্বতঃ প্রমাণিত হইবে যে তুমি রাজ্যলুব্ধ, অথবা রাজ্যের অংশ চাও, সেই অভিপ্রায়ে প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করিবার প্রয়াস করিতেছ; তুমি যে নিস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। রাজপুরুষেরা ত তোমাকে ধরিতে পারিলে বিনা বিচারে তোমাকে হত্যা করিবে, তোমাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ দিবে না। তোমার মৃত্যুভয় নাই জানি, কিন্তু তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে কি না বিবেচনাস্থল।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "বাদ্‌শাহের আদেশে গুপ্তচর আমাদের পিছনে লাগিয়াছে। যদি বাদ্‌শাহ বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা দূরে থাকুক আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, কারণ প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। প্রজার হিতসাধন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গৌণ হিসাবে রাজারও হিতসাধন হইবে। কিন্তু আপনি যেরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন ঘটিয়াছেও তাহাই, কেন না বাদ্‌শাহ আমাদিগকে ষড়যন্ত্রকারী ও রাজবিদ্রোহী স্থির করিয়াছেন এবং ধৃত হইলেই আমরা ঘাতকের হস্তে সমর্পিত হইব। সেজন্য আমাদের কিছুমাত্র চিন্তা নাই এবং আমাদের কার্য্য বন্ধ হইবে না। কিন্তু আমাদের কাল পূর্ণ হইয়া থাকিলেও মৃত্যুর পূর্ব্বে কার্য্যের কোন ফল হইল কি না জানিতে ইচ্ছা করে।"

"প্রজাদের মনের অবস্থা কিরূপ?"

"রাজকর্ম্মচারীদিগের পীড়নে তাহারা উপদ্রুত হইয়াছে, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের নিকট অভিযোগ করে, কিন্তু বাদ্‌শাহের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহে না। আমরা জানি বাদ্‌শাহ সমদর্শী, রাজপুরুষদিগের প্রতি কঠিন আদেশ আছে যে ধর্ম্ম অথবা জাতিভেদে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করিবে না, এবং কদাচ কোনরূপ উৎপীড়ন করিবে না। তাঁহার পীড়া কঠিন, তথাপি তিনি রাজকর্ম্ম স্বয়ং তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করুন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং সকলকে শাসন করিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে আমরা তাঁহারই কর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু সে কথা তাঁহাকে বুঝাইবে কে? তাঁহার ধারণা আমাদের ঘোর দুরভিসন্ধি আছে এবং আমরা রাজ্যনাশের চেষ্টা করিতেছি।"

"এতদ্ভিন্ন অন্য বিশ্বাস তাঁহার মনে হইতেই পারে না। তুমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর না কেন?"

"সে ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়!"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে কহিলেন, "তাহা হইলে তোমাকে আমি এমন পরামর্শ দিতাম না। বাদ্‌শাহকে আমি সংবাদ দিব। তাঁহার অভয় পাইলে তুমি যাইবে, তবে সন্ন্যাসীর বেশে যাইও না, রাজদর্শনে যেরূপ বেশে যাওয়া উচিত সেইরূপ যাইবে, যাহাতে কর্ম্মচারী ও পার্শ্বচরেরা সন্দিগ্ধ না হয়।"

"যেরূপ আজ্ঞা", বলিয়া, প্রণাম করিয়া গৌরীশঙ্কর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পর দিবস কুম্ভযোগের স্নান। সে দৃশ্য একবার দেখিলে জীবনে ভুলিবার নহে। প্রাসাদ নাই, গৃহ নাই, অথচ বালুকাসৈকতে মহানগরীর তুল্য লোকনিবাস, লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গমে স্নান করিবে। সর্ব্ব প্রথমে নাগা সন্ন্যাসী, দুই দুই জন করিয়া সারি দিয়া চলিয়াছেন। অপর স্নানকারীরা দুই ধারে দাঁড়াইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছে। তাঁহাদের শুধু স্পর্শস্নান, তাঁহারা অবগাহন করেন না। তাঁহাদের পর আর-এক দল সন্ন্যাসী, তাহার পর আবার এক দল, শ্রেণীর পর শ্রেণী, কাতারের পর কাতার। সন্ন্যাসীদিগের পর গৃহস্থ, পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্বতন্ত্রস্থানে স্নান করিতে চলিল।

সে জনস্রোত প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ফুরায় না। সকলের মুখে একাগ্রতা ও তন্ময়তা। কাহারও কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কোন লক্ষ্য নাই, কেবল কলকল্লোল-পূর্ণ সিতাসিত-সঙ্গমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে।

গৌরীশঙ্কর ও তাঁহার সঙ্গীগণ দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতেছিলেন। গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "যদি এই একাগ্রতা, এই তন্ময়তা, কোন মহাপুরুষ আর-এক খাদে প্রবাহিত করিতে পারিতেন!"

দশম পরিচ্ছেদ

শাহজাদার আগমন

মনসব্দার জলালুদ্দীন গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সুবেদার নসরুল্লা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেছেন। মনসব্দার সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "হুজুরের আগমনের আমি কোন সংবাদ পাই নাই। এজন্য আপনাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে যাইতে পারি নাই বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি।"

সুবেদার কহিলেন, "সংবাদ দিবার অবসর হয় নাই। পশ্চাতে শাহজাদা রুস্তম আসিতেছেন, তিনি কল্য এখানে আসিয়া পঁহুছিবেন।"

মনসব্দার আকাশ হইতে পড়িলেন। "শাহজাদা ত বুন্দেলখণ্ডে, এ অঞ্চলে আসিবার ত কোন কথা প্রকাশ পায় নাই।"

"তিনি বাদশাহের আদেশে দ্রুত কুচ করিয়া আসিতেছেন, সঙ্গে সৈন্য অল্প। কয়েকটি গোপনীয় বিষয়ের তদারকের ভার তাঁহার উপর। তিনি কোথায় যাইতেছেন ফৌজে কেহ জানে না। কার্য্য সমাধা করিয়া আবার সত্বর ফিরিয়া যাইবেন।"

মনসব্দার চিন্তিত হইলেন। গোপনীয় বিষয় কি রকম? তাঁহার সংক্রান্ত কোন কথা আছে? সুবেদারকে স্পষ্ট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, বলিলেন, "আমার প্রতি কোন আদেশ আছে?"

সুবেদার কহিলেন, "শাহজাদা আসিলে জানিতে পারিবেন।"

আহারাদির পর সুবেদার আরাম করিয়া বিদ্রির গুড়গুড়িতে উত্তম খামিরা তামাকু সেবন করিতেছিলেন। মনসব্দার উপস্থিত ছিলেন। সুবেদার বলিলেন, "আমার পূর্ব্বে যে সুবেদার ছিলেন তিনি আপনার কর্ম্মে সন্তুষ্ট ছিলেন।"

মনসব্দার কহিলেন, "আমি আপনাদের তাবেদার, আপনাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

সুবেদার কহিলেন, "আমাকে সন্তুষ্ট করিবার ত কোন চেষ্টা করেন নাই?"

"আপনি সম্প্রতি আসিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সুযোগ হয় নাই। এখন যেমন আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত।"

চক্ষে চক্ষে সুবেদার ও মনসব্দারে একটা কথা হইয়া গেল।

সুবেদার কহিলেন, "গোপনীয় বিষয়ের কথা কহিতেছিলাম। তাহাতে আপনিও লিপ্ত আছেন। বাদশাহের নিকট আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে।"

মনসব্দারের মুখ শুকাইল। কহিলেন, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ? এ কোন্ দুশ্মনের কাজ?"

সুবেদার কয়েকটা গ্রামের নাম করিলেন। কহিলেন, "প্রজাপীড়নের ও পক্ষপাতিতার অভিযোগ।"

মনসব্দার কহিলেন, "আমার জান মান ইজ্জত আপনার হাতে। আপনি না রক্ষা করিলে শত্রুতে আমার সর্ব্বনাশ করিবে।"

সুবেদার কহিলেন, "তোমার সহায়তা করিব বলিয়াই তোমাকে আগে হইতে জানাইতেছি। শাহজাদার তদারকে যাহাতে কিছু প্রকাশ না পায় সে চেষ্টা তোমার হাত।"

মনসব্দার সেই রাত্রেই সুবেদারকে সন্তুষ্ট করিলেন।

শাহজাদা আসিয়া তদারক করিলেন। মনসব্দারের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। মনসব্দার কহিলেন, "জাঁহাপনা, রাজপুরুষদিগকে অনেক রকম কর্ম্ম করিতে হয়, অনেক লোককে শাসন করিতে হয়, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু অভিযোগ প্রায় অমূলক।"

রুস্তম কহিলেন, "তাহা ত দেখিতেছি, কিন্তু আর-একটা বিষয় কিছু গুরুতর। মন্‌সব্‌দার সাহেব, আপনি এই ষড়যন্ত্রকারীদিগের সম্বন্ধে কিছু অবগত আছেন?"

মন্‌সব্‌দার যুক্তকরে কহিলেন, "খোদাবন্দ, এ ইলাকায় ত কোন ষড়যন্ত্রকারী নাই।"

হাস্য করিয়া শাহজাদা কহিলেন, "তাহা হইলে আপনি সবিশেষ সংবাদ রাখেন না। ষড়যন্ত্রকারী-দিগের কি অভিপ্রায় তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহারা বিদ্রোহের সূত্রপাত করিতেছে। বাদ্‌শাহ সমস্ত দেশের সম্রাট্; রাজপুরুষগণ তাঁহার অধীনে, তাঁহার আদেশ-মত রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। প্রজার যাহা অভাব বা যে অভিযোগ তাহা রাজপুরুষদিগকে জানাইবে। অপর কোন ব্যক্তির কি ক্ষমতা যে প্রজাদিগকে কোন মন্ত্রণা দেয় অথবা রাজপুরুষদিগের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে? পথে আসিতে আমি বিশ্বস্ত সংবাদ পাইয়াছি যে এই-সকল ষড়যন্ত্রকারীগণ প্রজাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়, রাজপুরুষদিগের কর্ম্মে বাধা দিবার চেষ্টা করে। আপনি এই মহকুমার মনসব্‌দার, আপনি কোন সংবাদ রাখেন না?"

মন্‌সব্‌দার বিনীতস্বরে কহিলেন, "গরিব্‌পর্‌ওয়র, এ-রকম কোন ঘটনা গোলামের ইলাকায় হয় নাই, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় সংবাদ পাইতাম।"

শাহজাদা বলিলেন, "তাহা না হইলেও এই অঞ্চলে কোনখানে ষড়যন্ত্রকারীদিগের মন্ত্রণার স্থান আছে শাহান্‌-শাহ্ স্বয়ং পাকা সংবাদ পাইয়াছেন। আপনি কিছু জানেন না ইহা প্রশংসার কথা নহে।"

মন্‌সব্‌দার অধোবদন হইলেন। অনুনয়পূর্ব্বক কহিলেন, "যদি হুকুম হয় তাহা হইলে আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়া হুজুরে জানাইব।"

শাহজাদা কহিলেন, "আমি এক সপ্তাহ থাকিব, আপনি অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারেন আমাকে জানাইবেন।"

মন্‌সব্‌দার কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক লইয়া সমস্ত মহ-কুমায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। প্রজাদের মনোভাবে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং কয়েক ব্যক্তি সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে যাতায়াত করে ও প্রজাদিগকে কিছু পরামর্শ দেয় জানিতে পারা গেল; কিন্তু ষড়যন্ত্র, অথবা বিদ্রোহ অথবা মন্ত্রণার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। শাহজাদা আশ্বস্ত হইয়া রাজধানীতে সেইরূপ সংবাদ পাঠাইলেন।

—

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুণ্ডরীকের অন্বেষণ

মন্‌সব্‌দারের আদেশ অনুসারে যখন রমজান ও আর তিনজন লোক বনবাসিনী রমণীকে ধরিয়া আনিতে যায় সেই সময় একজন সাক্ষী ছিল। বিহারীলালের গৃহে বা সংসারে পুণ্ডরীকের কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল না। যখন যেখানে ইচ্ছা সে ঘুরিয়া বেড়াইত। ঘটনাক্রমে সে দিন বনে যাইবার পথে একটা অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলায় সে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় দেখিল কেল্লা হইতে মন্‌সব্‌-দারের একজন লোক আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই পুণ্ডরীক গাছের আড়ালে লুকাইল। বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখিল এক জনের পিছনে আর-একজন আসিতেছে, তাহার পিছনে আর-একজন, আরও পিছনে আর-একজন, এইরূপে চার জন জুটিল। পুণ্ডরীক সিদ্ধান্ত করিল ইহাদের কিছু মৎলব আছে। সে নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে তাহাদের সঙ্গ লইল।

পুণ্ডরীক যখন বুঝিল যে সেই কয়েক ব্যক্তি বনবাসিনী রমণীর সন্ধানে যাইতেছে তখন পুণ্ডরীক পূর্ব্বের মত গাছে উঠিল। যাহা যাহা ঘটিল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত দেখিল। আপনার মনে নিঃশব্দে হাসিল। পরাহত বীরেরা পলায়ন করিলে পুণ্ডরীক বৃক্ষ হইতে নামিয়া সাবধানে যেস্থানে রমণী দাঁড়াইয়াছিল সেই দিকে গমন করিল। পল্বলের পাশে উপনীত হইয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। তখন সে অত্যন্ত সতর্কভাবে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

শীকারে প্রচ্ছন্ন বা লুক্কায়িত জন্তু খুঁজিয়া বাহির করিতে পুণ্ডরীক অদ্বিতীয়। তাহার সে ক্ষুদ্র চক্ষে অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টি। বনের মধ্যে গৃহ নাই, কোথাও বাসস্থান নাই, তবে রমণী কেমন করিয়া অদৃশ্য হয়? সে দেবী নয়, মায়াবিনী রাক্ষসী নয়, সাধারণ মানবী।

অলোকসামান্য সুন্দরী কিন্তু মানবী বই আর কিছু নয়। বনের ভিতর, সম্ভবতঃ নিকটেই, অপরের অলক্ষিত এমন কোন স্থান আছে যেখানে লুকাইলে কেহ দেখিতে পায় না। সেই স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—বিহারীলাল যে কারণে রমণীকে আবার দেখিতে চাহিয়াছিলেন সে কারণে নহে, মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দিনের ইন্দ্রিয়লালসা পুণ্ডরীকের স্বপ্নের অগোচর। তাহার কেবল উদ্দেশ্যশূন্য কৌতূহল। লুকাচুরি খেলায় যেমন অপর বালকেরা লুক্কায়িত বালককে খুঁজিয়া বাহির করে ইহাও সেইরূপ। রমণী কোথায় লুকায়, কোথায় অদৃশ্য হয়, কেহ খুঁজিয়া পায় না। এ রকম লুকাচুরিতে পুণ্ডরীক সকলের অপেক্ষা মজ্‌বুত, অতএব সে খুঁজিয়া বাহির করিবে।

সে সময় পুণ্ডরীক আর-এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। দৃষ্টি চারিদিকে, বৃক্ষপত্রের পতন-শব্দ পর্য্যন্ত তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে। তাহার পদশব্দ আদৌ শুনিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের আড়ালে দ্রুত অথচ নিঃশব্দ গতিতে সে ইতস্ততঃ খুঁজিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া দেখিল অরণ্য অত্যন্ত নিবিড়, এক স্থানে একটা প্রকাণ্ড অর্দ্ধশুষ্ক বটবৃক্ষ, তাহার নীচে, এক পার্শ্বে স্তূপাকার পত্ররাশি। এমন স্থানে এরূপ করিয়া পত্র সংগ্রহ করা—হয় কোন জন্তুর কিম্বা কোন মানুষের কাজ, আপনা—আপনি এত পত্র জড় হইতে পারে না। পুণ্ডরীক বৃক্ষমূলে গিয়া, মাটীতে বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, আশে পাশে তৃণ সদ্য পদদলিত, চিহ্নে মানুষের পদ অনুমান হয়। তখন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পুণ্ডরীক সেই পত্ররাশি সরাইতে আরম্ভ করিল। পত্রস্তূপের নীচে দেখিল একটা বৃহৎ গহ্বর, গহ্বরে নামিবার সিঁড়ী। পুণ্ডরীক নির্ভয়ে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

কয়েকটা ধাপ নামিয়া গিয়া অন্ধকার। তাহার পর কতকটা সমভূমি। পুণ্ডরীক অনুমান করিল সোপান শেষ হয় নাই, আগে, আরও সিঁড়ী আছে। সে সাবধানে, ধীরে ধীরে, অগ্রসর হইল।

সহসা সেই অন্ধকারে কে পুণ্ডরীকের গলা টিপিয়া ধরিল। যে ধরিল সে সাতিশয় বলবান্। কিন্তু পুণ্ডরীক রমজান ও তাহার সঙ্গীগণের ন্যায় সহজে ধৃত অথবা পরাস্ত হইবার নহে। বলে সে প্রায় বিহারীলালের তুল্য, ক্ষিপ্রহস্ততায় তাঁহার অপেক্ষা কুশলী। সে নিমেষের মধ্যে মুক্ত হইয়া আক্রমণকারীকে লৌহদণ্ডতুল্য বাহুযুগলে ধারণ করিয়া, শিশুর ন্যায় তাহাকে তুলিয়া লইয়া দুই লম্ফে গহ্বরের বাহিরে আসিল। তাহার পর তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া জানু দিয়া চাপিয়া ধরিল।

এ পর্য্যন্ত দুই জনের কেহ একটা কথাও কহে নাই, যাহা ঘটিল তাহা নিঃশব্দে, নীরবে।

পুণ্ডরীক দেখিল—যে-ব্যক্তিকে সে ধরাশায়ী করিয়াছিল সে কোন অপর দেশবাসী, বেশ অন্য রকম, মুখশ্রী অন্য রকম, বলিষ্ঠ প্রৌঢ় পুরুষ। সে পুণ্ডরীককে দেখিতেছিল।

এই অবসরে আর দুই জন আসিয়া পুণ্ডরীককে আক্রমণ করিল। দুই জনে তাহার দুই হস্ত ধারণ করিল। তাহাদের কি সাধ্য পুণ্ডরীককে ধরিয়া রাখে? তাহার বাহু-তাড়নায় দুইজন দুই দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীক লাফাইয়া উঠিয়া, কোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া, অসি হস্তে দাঁড়াইল। তখন সেই কুৎসিত ক্ষুদ্রকায় মূর্ত্তি বীরত্বের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল, সে ক্ষুদ্র চক্ষে বিদ্যুৎ বিলসিত হইল, সেই বৃহৎ মস্তক সদর্পে সিংহের ন্যায় উন্নীত হইল, কবাটবক্ষ স্ফীত হইল, বাহুর মাংসপেশী লৌহের ন্যায় কঠিন হইল; সিংহবিক্রমে, হাস্যমুখে পুণ্ডরীক আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যে ব্যক্তি ভূতলে পতিত ছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তিন জনেই অসি নিষ্কাশিত করিয়া একত্রে পুণ্ডরীককে আক্রমণ করিল। বিচিত্র অসিচালনা করিয়া পুণ্ডরীক ক্ষণেকের মধ্যে তিনজনকেই নিরস্ত্র করিল কিন্তু তাহাদিগকে স্বয়ং আক্রমণ করিল না। তাহার মুখে হাসি লাগিয়া ছিল। পুণ্ডরীক কহিল, "তিনজনের কর্ম্ম নয়, তোমাদের দলে আরও যদি লোক থাকে ত তাহাদিগকে ডাক। আমি মন্‌সব্‌দারের পশ্চাদ্গামী শৃগাল নহি।"

"তবে তুমি কাহার অগ্রগামী সিংহ?" অমৃতময় মধুর কণ্ঠে, পুণ্ডরীকের পশ্চাৎ হইতে কে এই কথা

বলিল। পুণ্ডরীক ফিরিয়া দেখিল, বনবিহারিণী সেই মোহিনী মূর্ত্তি!

অসি নত করিয়া, অবনত মস্তকে পুণ্ডরীক অভিবাদন করিল। বিনীত স্বরে কহিল, "আমি চৌধুরী বিহারীলালের সামান্য ভৃত্য।"

সবিস্ময়ে, বিস্ফারিত চক্ষে রমণী কহিল, "যাহার ভৃত্য এমন, সে প্রভু কেমন?"

তখন পুণ্ডরীক সগর্ব্বে উত্তর দিল, "আমার প্রভুর তুল্য বীর ভারতে নাই।"

"ইহা অতি দর্পের কথা!"

"সত্য কথায় দর্প নাই। যে-কেহ অথবা যে-কয়জন আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলে তাহারা অথবা তাহাদের সহিত বিহারীলালের যুদ্ধ-পরীক্ষা হউক। মল্লযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, ধনুর্ব্বাণ-যুদ্ধ, এক প্রকার অথবা সকল প্রকার পরীক্ষা হউক, তাহা হইলেই আমার কথা অথবা আমার দর্প সত্য প্রমাণ হইবে।"

রমণী কহিল, "সে কথা যাক্। তোমাকে কি তোমার প্রভু এখানে পাঠাইয়াছেন?"

"আমি যে এখানে আসিয়াছি তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তাঁহার অজ্ঞাতে আসিয়াছি।"

"তিনি যদি তোমাকে আদেশ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তোমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?"

পুণ্ডরীক যে বীর তাহা সকলেই জানিত, কিন্তু সে যে বক্তা তাহা কেহ জানিত না। এই রমণীর সাক্ষাতে সে সর্ব্বপ্রথম বীর ও বক্তা উভয় রূপে প্রকটিত হইল। কিন্তু এখন তাহার বক্তৃতা-শক্তি লুপ্ত হইল। মুখের দীপ্তি, চক্ষের জ্যোতি তিরোহিত হইল। পুণ্ডরীক নির্ব্বোধের ন্যায় দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। অবশেষে এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, "আমার কোন উদ্দেশ্য নাই, অমনি আসিয়াছিলাম।"

রমণী হাসিল, বলিল, "তাহা হইলে এই গহ্বর খুঁজিয়া কেমন করিয়া বাহির করিলে? আর ইহাতে প্রবেশ করিবারই তোমার কি প্রয়োজন?"

পুণ্ডরীক মুস্কিলে পড়িল, বলিল, "আপনি কোথায় থাকেন তাহাই খুঁজিতেছিলাম।"

"কেন? আমি কোথায় থাকি তোমার জানিবার আবশ্যক কি? আর ব্যাঘ্র-শৃগালের মত গহ্বরে বাস করি তাহাই বা কেমন করিয়া স্থির করিলে?"

তিনজনের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিবার সময় পুণ্ডরীক হাসিতেছিল, কিন্তু এই রমণীর জেরায় তাহার ললাটে ঘাম দেখা দিল। কহিল, "আজ্ঞা, এখানে ত কোনও ঘরবাড়ী নাই। গহ্বরের বাহিরে মানুষের পদচিহ্ন ছিল। আমার মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।"

রমণী কহিল, "তাহা ত এই যুদ্ধেই বুঝিতে পারিতেছি। আমি কোথায় থাকি তাহা ত দেখিলে? গহ্বরের ভিতরে আবার যাইবে? আমার এ বাসস্থানের সংবাদ অবশ্য তোমার প্রভুকে জানাইবে?"

পুণ্ডরীক হস্তের তরবারি রমণীর পদতলে নিক্ষেপ করিল, কহিল, "আপনার অনুচরদিগকে আদেশ করুন এই অসি দ্বারা আমাকে হত্যা করে, আমি আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিব না। নচেৎ যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন তাহা হইলে আজ আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা চৌধুরী বিহারীলাল অথবা আর কেহ কখন জানিবে না।"

রমণী বলিল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি, তুমি তরবারি উঠাইয়া লও। আর তোমার প্রভুর নিকট কোন কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে বলিবে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই, যত শীঘ্র সম্ভব যেন আমার সঙ্গে এই স্থানে দেখা করেন। তুমিও তাঁহার সঙ্গে আসিও, আর যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে মাঝে মাঝে একাও আসিও। আমি তোমার নিকট তরবারি-খেলা শিখিতে চাই।"

পুণ্ডরীক অবাক্।—"তরবারি-খেলা? স্ত্রীলোক শিখিবে?"

"ক্ষতি কি!"

পুণ্ডরীক বিদায় হইল। রমণী লজ্জায়-অধোমুখ অনুচর-দিগকে কহিল, "তোমরা বীরপুঙ্গব বটে! একটা মর্কটের মত মানুষের কাছে তিনজনেই হারিলে!"

তিন জনে সমস্বরে কহিল, "ওটা কি মানুষ!"

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আত্মা কি ?

কৌষীতকি উপনিষদে।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদাদি গ্রন্থে প্রাণকে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখাতেও প্রাণের স্থান অতি উচ্চ। বহু স্থলে বলা হইয়াছে 'প্রাণই ব্রহ্ম' (কৌষী, ২।১, ২।২), 'প্রাণই আত্মা'। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ঐতরেয় উপনিষদে প্রাণকে আত্মা না বলিয়া প্রজ্ঞানকেই আত্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু কৌষীতকি উপনিষদে প্রাণকে অগ্রাহ্য করা হয় নাই। এই উপনিষদের মতে প্রজ্ঞারূপী প্রাণই আত্মা, কিংবা প্রাণরূপী প্রজ্ঞাই আত্মা। কেবল প্রাণ আত্মার বিশেষত্ব নহে এবং কেবল প্রজ্ঞাও আত্মার বিশেষত্ব নহে। প্রাণ এবং প্রজ্ঞা উভয়ই আত্মার বিশেষত্ব। অন্য ভাবে বলা যাইতে পারে এতদুভয় 'উভয় নহে', এতদুভয় একই। যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ (যঃ বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা; যা বৈ প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ।—কৌষীতকি, ৩।৩, ৪)।

কৌষীতকি উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এতদুভয়ের একত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিব।

ব্রহ্মরূপী ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন :—আমি প্রাণরূপী প্রজ্ঞাত্মা (কিংবা প্রজ্ঞাত্মা-রূপী প্রাণ) (কৌঃ ৩।২)। ইহার পরেই প্রথমে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে—আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়ু; যাবৎ এই দেহে প্রাণ, তাবৎকালই আয়ু; প্রাণ দ্বারাই পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করা যায় (৩।২)। কিন্তু ঋষি এ অংশেও প্রজ্ঞার কথা ভুলিয়া যান নাই। প্রাণ অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায়, এই কথা বলিয়াই ঋষি বলিলেন—"প্রজ্ঞা দ্বারা সত্য সঙ্কল্প লাভ করা যায়" (৩।২)। ইহার পরে আবার প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র বলিতেছেন—"যে আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করে, সে এই লোকে পূর্ণ আয়ু এবং স্বর্গলোকে অমৃতত্ব এবং অক্ষিতি লাভ করে" (৩।২)। ইহার পরের মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ। মানুষ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিরহিত হইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু মুখ্য প্রাণ না থাকিলে মানুষের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব। সুতরাং মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা (প্রাণঃ এব প্রজ্ঞাত্মা, ৩।৩)। এই প্রাণরূপী প্রজ্ঞাত্মা শরীরকে গ্রহণ করিয়া ইহাকে সঞ্জীবিত রাখে। "যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। প্রাণ এবং প্রজ্ঞা একত্র এই দেহে বাস করে এবং সম্মিলিত ভাবেই দেহ হইতে উৎক্রমণ করে" (৩।৩)। ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রেও এই অংশ পুনরুক্ত হইয়াছে (৩।৪)।

ইহার পরে তিনটি মন্ত্রে (৩।৫,৬,৭) প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে এক-একটি ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞার এক-একটি দিক্ প্রকাশ করে। ষষ্ঠ মন্ত্রের বক্তব্য এই যে প্রজ্ঞা হইতেই ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ শক্তি লাভ করে। সপ্তম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে প্রজ্ঞার জন্যই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয় অবগত হইতে পারে। মন (অর্থাৎ প্রজ্ঞা) যদি অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় তাহা হইলে চক্ষু দর্শন করিয়াও তাহা জানিতে পারে না; প্রজ্ঞা না থাকিলে অপরাপর ইন্দ্রিয়গণও নিজ নিজ বিষয় অবগত হইতে পারে না (৩।৭)। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহ প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এক-একটি ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞার এক-একটি দিক্ প্রকাশ করে (৩।৫)। ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবগত হইলে প্রজ্ঞাকে সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহকে জানিবার চেষ্টা করিবে না—এ চেষ্টা নিরর্থক; ইহা দ্বারা প্রজ্ঞা-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহার এক-একটি দিক্ প্রকাশ করে, ও যাঁহা হইতে শক্তি লাভ করে এবং যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই 'প্রজ্ঞাকেই' জানিতে চেষ্টা করিবে। যিনি বক্তা, ঘ্রাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা,

কর্ত্তা, সুখদুঃখ-জ্ঞাতা, গন্তা ও মন্তা তাঁহাকেই অবগত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই-সমুদয় স্থলে ঋষি প্রজ্ঞারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। ঋষি ইহার পরই বলিতেছেন রূপ-রসাদির নাম ভূতমাত্রা এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের নাম প্রজ্ঞামাত্রা। ভূতমাত্রার সহিত প্রজ্ঞামাত্রার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; এক অপর ভিন্ন থাকিতে পারে না।

ইহার পরের মন্ত্র এই—"যেমন রথের নেমি অরসমূহে প্রতিষ্ঠিত এবং অরসমূহ রথের নাভিতে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি তেমনি ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রায় প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এবং প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা ও আনন্দ, অজর এবং অমৃত" (৩।৮)।

ঋষি এইরূপে নানাভাবে প্রাণ ও প্রজ্ঞার একত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত—যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ; এবং আত্মা বলিলে প্রাণ ও প্রজ্ঞা উভয়কেই বুঝিতে হইবে। এই মত কৌষীতকি শাখার একটি বিশেষত্ব।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে রূপকচ্ছলে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অতি জ্ঞানগত। প্রথমে মূলের অনুবাদ দিয়া পরে সংক্ষেপে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইবে। মানুষকে পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া বলা হইতেছে :—

(১)

"এই পুরুষ অন্ন-রস-ময়। (ইহা বলিয়া ঋষি হস্ত দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছেন)—এই ইহার শরীর, এই ইহার দক্ষিণ পক্ষ, এই ইহার বাম পক্ষ, এই ইহার দেহের মধ্যভাগ। এই ইহার পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা" (২।১)।

(২)

"এই অন্নরসময় আত্মা হইতে পৃথক্ একটি আত্মা ইহার অভ্যন্তরে আছে—ইহা প্রাণময়। প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নরসময় আত্মা পূর্ণ। ইহাও মনুষ্যাকার। অন্নরসময় পুরুষের যেমন আকৃতি, প্রাণময় পুরুষেরও আকৃতি সেই-প্রকার। প্রাণ ইহার শির, ব্যান ইহার দক্ষিণ পক্ষ, অপান ইহার বাম পক্ষ, আকাশ ইহার মধ্য-দেহ, পৃথিবী ইহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা" (২।২)।

(৩)

"ঐ অন্নরসময় পুরুষের শারীর আত্মা যিনি, প্রাণময় পুরুষের আত্মাও তিনি। এই প্রাণময় আত্মা হইতে পৃথক্ একটি আত্মা ইহার অভ্যন্তরে আছে—ইহা মনোময় আত্মা। প্রাণময় আত্মা এই মনোময় আত্মা দ্বারা পূর্ণ। ইহাও মনুষ্যাকার। প্রাণময় আত্মার যেমন আকৃতি, মনোময় আত্মারও আকৃতি সেই-প্রকার। যজুঃ ইহার শির, ঋক্ ইহার দক্ষিণ পক্ষ, সাম ইহার বাম পক্ষ, (ব্রাহ্মণাদি নামক) আদেশ ইহার মধ্যদেহ এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস ইহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা" (২।৩)।

(৪)

"এই প্রাণময় পুরুষের শারীর আত্মা যিনি, মনোময় পুরুষের আত্মাও তিনি। এই মনোময় আত্মা হইতে পৃথক্ একটা আত্মা ইহার অভ্যন্তরে আছে; ইহা বিজ্ঞান-ময় আত্মা। মনোময় আত্মা এই বিজ্ঞানের আত্মা দ্বারা পূর্ণ। ইহাও পুরুষাকার। মনোময় আত্মা যে-প্রকার পুরুষাকার, বিজ্ঞানময় আত্মাও সেই-প্রকার পুরুষাকার। শ্রদ্ধা ইহার শির, ঋত ইহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য ইহার বাম পক্ষ, যোগ ইহার মধ্যদেহ, মহঃ (অর্থাৎ বুদ্ধি) ইহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা" (২।৪)।

(৫)

মনোময় পুরুষের শারীর আত্মা যিনি, বিজ্ঞানময় পুরুষের শারীর আত্মাও তিনি। এই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে পৃথক্ একটি আত্মা ইহার অভ্যন্তরে আছে—ইহা আনন্দময় আত্মা। বিজ্ঞানময় আত্মা এই আনন্দময় আত্মা দ্বারা পূর্ণ। ইহাও পুরুষাকার। বিজ্ঞানময় আত্মা যে-প্রকার পুরুষাকার, আনন্দময় আত্মাও সেই-প্রকার পুরুষাকার। প্রীতি ইহার শির, মোদ ইহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ ইহার বাম পক্ষ, আনন্দ ইহার মধ্যদেহ, ব্রহ্ম ইহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা" (২।৫)। "বিজ্ঞানময় পুরুষের শারীর আত্মা যিনি, আনন্দময় পুরুষের শারীর আত্মাও তিনি" (২।৬)।

যে ভাষায় এবং যে ভাবে এখানে আত্ম-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা সহজবোধ্য নহে। এইজন্য নিম্নে ইহার ব্যাখ্যা দিতেছি।

১। অন্নময় আত্মা।

মানুষ বলে 'আমি' 'আমার'; কিন্তু 'আমি' কি? অনেকেরই ধারণা "হস্তপদাদি-সংযুক্ত এই যে দেহ, ইহাই আমি"। দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে ইহা অনেকের চিন্তার মধ্যেই আসে না। ইহাদিগের মত দার্শনিক ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে বলিব 'দেহই আত্মা'। পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রসমূহের প্রথম অংশে এই কথাই বলা হইয়াছে। ঋষি অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক দেখাইয়া বলিতেছেন "এই মস্তকই (দেহরূপ) আত্মার মস্তক"। অঙ্গুলী দ্বারা দক্ষিণ হস্ত দেখাইয়া বলিতেছেন "এই দক্ষিণ হস্তই (দেহরূপ) আত্মার দক্ষিণ হস্ত"। অঙ্গুলী দ্বারা বাম হস্ত দেখাইয়া বলিতেছেন "এই বাম হস্তই (দেহরূপ) আত্মার বাম হস্ত"। মধ্যদেহ দেখাইয়া বলিতেছেন "ইহাই (দেহরূপ) আত্মার মধ্যদেহ"। শরীরের নিম্নভাগ দেখাইয়া বলিতেছেন "ইহাই (দেহরূপ) আত্মার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা"। সুতরাং এখানে যে এই দেহকেই আত্মা বলা হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অংশে আমরা 'দেহরূপ আত্মা' ব্যবহার করিয়াছি; এস্থলে আত্মা অর্থই দেহ।

২। প্রাণময় আত্মা।

যাহারা আরও উন্নত, তাহারা বলেন "প্রাণ প্রাণীদিগের আয়ু; যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই মানুষের জীবন। প্রাণ চলিয়া গেলেই মানুষের মৃত্যু। সুতরাং 'আমি' বলিলে প্রাণকেই বুঝিতে হইবে।" ইঁহাদিগের মতে 'প্রাণই আত্মা'। উপনিষদে যে প্রাণময় আত্মার কথা বলা হইয়াছে তাহা এই শ্রেণীর লোকেরই মত। হস্তপদাদি লইয়া যেমন মানব-শরীর, তেমনি প্রাণ-ব্যান-অপানাদি লইয়া প্রাণময় আত্মা গঠিত। প্রাণ-ব্যান ও অপানাদিকে যখন প্রাণময় আত্মার অঙ্গ বলা হইয়াছে, তখন প্রাণময় আত্মার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদের অনেক স্থলে এই প্রাণকেই আত্মা (এবং ব্রহ্ম) বলা হইয়াছে।

কৌষীতকি উপনিষদে লিখিত আছে যে কৌষীতকি, পৈঙ্গ এবং শুষ্কভৃঙ্গার প্রাণকেই আত্মা (এবং ব্রহ্ম) বলিয়া মনে করিতেন (২।১; ২।৭)।

ঐতরেয় আরণ্যকের বহু স্থলে প্রাণের মহত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। একস্থলে ব্রহ্মরূপী ইন্দ্র বিশ্বামিত্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন:—"আমি প্রাণ। হে ঋষি! তুমিও প্রাণ; সমুদয় ভূতও প্রাণ। এই যে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাও প্রাণ, আমি প্রাণ-রূপেই সমুদয় দিক্ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছি" (২।২।৩)।

বৃহদারণ্যক (১।৩) এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।২) আছে যে একমাত্র প্রাণের সাহায্যেই দেবগণ অমরগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। উদঙ্ক শৌল্বায়ন নামক ঋষি মনে করিতেন প্রাণই ব্রহ্ম (বৃহঃ ৪।১।৩)। এইরূপ আরও বহু স্থলে প্রাণকে আত্মা এবং ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে প্রাণকে আত্মা বলা হইয়াছে এই মত এক সময়ে বহুল প্রচলিত ছিল।

৩। মনোময় আত্মা।

কিন্তু 'প্রাণই আত্মা' এই মতেও অনেকে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। মানুষের প্রাণ আছে, পশু-পক্ষীরও প্রাণ আছে। সুতরাং প্রাণ মনুষ্যের বিশেষত্ব নহে। 'মন'ই মানুষের বিশেষত্ব। মন বলিতে আমরা কামনা ইচ্ছাশক্তি অভিনিবেশ সঙ্কল্পাদি বুঝিয়া থাকি। মানুষ ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ কামনা করে; এইজন্যই তাহার যজুস্, ঋক্, সামাদি আয়ত্ত করিবার প্রবৃত্তি হয় এবং এইজন্যই যাগযজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। এ-সমুদয় সম্পাদনের জন্য মানসিক শক্তির কত প্রয়োজন! কত অধ্যবসায়, মনের কত অভিনিবেশ, প্রতিজ্ঞার কত বল আবশ্যক! এই-সমুদয় মানসিক শক্তিতেই মানুষের বিশেষত্ব। ঋষিগণ যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে কুলে বাস করিতেন, সে কুলের প্রধান কর্ত্তব্য—ঋক্ যজুঃ সামাদি অধ্যয়ন এবং যজ্ঞাদি সম্পাদন। এই-সমুদয় কার্য্যেই প্রধানতঃ তাঁহাদিগের মানসিক শক্তি পর্য্যবসিত হইত। এইজন্যই যজুঃ ঋক্ সামাদিকে মনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলা হইয়াছে। যে শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইল তাঁহারা আত্মা বলিলে মনই বুঝিতেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে:—"আত্মা মনোময়।"

৪। বিজ্ঞানময় আত্মা।

কিন্তু মনোময় স্তরেও মানুষ চিরকাল বাস করিতে

পারে না। কামনা স্মৃতি অভিনিবেশ প্রভৃতি না হইলে সংসারের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না—শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং যজ্ঞাদি সম্পাদন ত দূরের কথা। কিন্তু কামনা ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি ত অন্ধ। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মানুষ কি না করিয়া থাকে? তাহার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, সত্যাসত্য নির্ণয় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, সে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। মনোময় স্তরে মানুষ অন্ধবিশ্বাস এবং প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লইয়াই জীবন ধারণ করে। সাধকগণ এই স্তর অতিক্রম করিয়া আরও উদ্ধে উঠিয়াছেন। মনোময় স্তরের উপরে বিজ্ঞানময় স্তর। মনোময় স্তর অন্ধকারময়; বিজ্ঞানময় স্তর জ্যোতিষ্মান্। মনোময় আত্মা স্বার্থান্ধ,—তাহার চিন্তা—কিসে আমার সুখ হইবে, কিসে আমার স্বজনের সুখ হইবে। কিন্তু বিজ্ঞানময় আত্মা উদার; তিনি ভাবেন—সত্য কি? কর্ত্তব্য কি? তিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা সত্য ও কর্ত্তব্যনির্ণয় করেন এবং সেইভাবেই জীবনকে নিয়মিত করেন। ঋষির ভাষায় শ্রদ্ধাই বিজ্ঞানময় পুরুষের শির, ঋত ইহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য ইহার বাম পক্ষ, যোগ ইহার মধ্যশরীর এবং বুদ্ধি ইহার পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা। এই আত্মাই বিজ্ঞানময় এবং বিজ্ঞানময় আত্মা যে মনোময় আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

৫। আনন্দময় আত্মা।

কিন্তু বিজ্ঞানও যথেষ্ট নহে। যদি নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদির কার্য্য কষ্টকর হইত, হস্ত পদাদি সঞ্চালন যদি দুঃখময় হইত, চক্ষু কর্ণাদির ব্যবহার যদি যন্ত্রণাদায়ক হইত, তবে কে জীবনকে লোভনীয় এবং ধারণ করিবার উপযুক্ত মনে করিত? যদি আনন্দ লাভ না হইত তবে কে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিত? কে যজ্ঞাদি সম্পাদন করিত? এবং কে বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা করিত? সুতরাং দেহ প্রাণ মন এবং বিজ্ঞানও যথেষ্ট নহে। আনন্দ এ-সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—এই আনন্দই আত্মা। ঋষি বলিতেছেন—'প্রিয়' ইহার শরীর, মোদ ইহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ ইহার বাম পক্ষ, আনন্দ ইহার মধ্যদেহ এবং ব্রহ্ম ইহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। এই আত্মা আনন্দময়, আনন্দই আত্মার শ্রেষ্ঠ রূপ। ঋষির মতে 'জ্ঞান' অপেক্ষা 'ভাব' শ্রেষ্ঠ।

ঋষি আত্মজ্ঞানের যে পাঁচটি স্তর দেখাইয়াছেন, ইহা যে নিতান্তই মনঃকল্পিত, তাহা নহে। বর্ত্তমান যুগেও কেহ না কেহ ইহার কোন না কোন স্তরে বাস করিতেছে। যাহারা নিম্নতর স্তরে বাস করিতেছে তাহারা ভাবে 'দেহই আমি'।

এই স্তরের লোক বৃক্ষলতাদির ন্যায় জীবন ধারণ করে। এই সোপান হইতে উর্দ্ধে উঠিলে লোকে মনে করিয়া থাকে 'প্রাণই আমি'। প্রাণ না থাকিলে দেহ থাকে না—সুতরাং দেহ অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। এই-জন্য অনেকে দেহকে 'আমি' না বলিয়া প্রাণকেই আমি বলিয়া থাকে। এই স্তরের লোক পশুপক্ষীর ন্যায় জীবন ধারণ করে। মানুষ আরও উন্নত হইলে বুঝিতে পারে 'মনই আমি'। এই স্তরের মানব প্রচলিত বিশ্বাস এবং রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে। যাহারা আরও উর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা ভাবেন 'বিজ্ঞানই আমি'। উর্দ্ধতম সোপানে আরোহণ করিলে মানুষ আনন্দময় লোকে বাস করে। তখনই সে বলিতে পারে 'আনন্দই আত্মা'।

'আত্মা কি' এ বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে অত্যন্ত মতভেদ। কেহ বলেন ইচ্ছাশক্তি আত্মার বিশেষত্ব; কাহারও মতে 'জ্ঞান' এবং কাহারও বা মতে 'ভাব'ই আত্মার বিশেষত্ব। ঋষির শেষ তিনটি স্তর বর্ত্তমান যুগের মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এই তিনটি স্তরের প্রায় অনুরূপ :—

মনোময় আত্মা - প্রধানতঃ Will (ইচ্ছাশক্তি)
বিজ্ঞানময় আত্মা – Knowledge (জ্ঞান)
আনন্দময় আত্মা – Emotion (ভাব)।

উত্তরকালে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা পঞ্চকোষ-বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এই নাম তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাওয়া যায় না। তবে ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সহজেই এই নাম সৃষ্ট হইতে পারে। অন্নময় আত্মার মধ্যে প্রাণময় আত্মা অবস্থিত, প্রাণময় আত্মার মধ্যে মনোময় আত্মা, মনোময় আত্মার মধ্যে বিজ্ঞানময় আত্মা,

এবং বিজ্ঞানময় আত্মার মধ্যে আনন্দময় আত্মা অবস্থিত। আনন্দই যেন শাঁস এবং বিজ্ঞান মন প্রাণ ও দেহ যেন এক-একটা খোসা। পরবর্ত্তী কালে আনন্দময় আত্মাকেও একটি কোষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু এই উপনিষদে আনন্দময় আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন আত্মার উল্লেখ নাই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা অতি সারগর্ভ। উপনিষদে আত্মাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ে অদ্য আমরা আলোচনা করিব না। 'আত্মা কি' তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

(১)

জনক রাজার সভায় উষস্ত চাক্রায়ণ নামক একজন ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"হে যাজ্ঞবল্ক্য! যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা, তাঁহার বিষয়ে আমাকে বল।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"এই তোমার আত্মাই সেই সর্ব্বান্তর আত্মা"।

উষস্ত বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! কোন্‌টি সর্ব্বান্তর?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"যিনি প্রাণ দ্বারা নিঃশ্বাসাদির কার্য্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্ব্বান্তর। যিনি আপন দ্বারা অপানন কার্য্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্ব্বান্তর। যিনি ব্যান দ্বারা ব্যানোচিত কার্য্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্ব্বান্তর। যিনি উদান দ্বারা উদানোচিত কার্য্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা ও সর্ব্বান্তর।"

উষস্ত চাক্রায়ণ বলিলেন—"লোকে যেমন বলে 'ঐপ্রকার বস্তু গরু' 'ঐপ্রকার বস্তু অশ্ব', তোমার উপদেশও সেইপ্রকার হইল। যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা আত্মা, এবং সর্ব্বান্তর, তাহাই আমাকে বল!"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"তোমার এই আত্মাই সেই সর্ব্বান্তর।"

উষস্ত বলিলেন—"হে যাজ্ঞবল্ক্য! কোন্‌টি সর্ব্বান্তর?"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিতে পারিবে না, শ্রুতির শ্রোতাকে শ্রবণ করিতে পারিবে না, মননের মননকর্ত্তাকে মনন করিতে পারিবে না, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিতে পারিবে না। তোমার এই আত্মাই সর্ব্বান্তর।"

(বৃহঃ ৩।৪)।

(২)

অন্য একস্থলে (বৃহঃ ৩।৭।২৩) যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই অন্যভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:— "তিনি অদৃষ্ট কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু সকলের শ্রোতা, তাঁহাকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি সকলের মননকর্ত্তা; তিনি অবিজ্ঞাত কিন্তু সকলের বিজ্ঞাতা। ইনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ শ্রোতা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ মননকর্ত্তা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার অন্তরাত্মা, ইনি অন্তর্যামী ও অমৃত (৩।৭।২৩; ৩।৮।১১ অংশও দ্রষ্টব্য)।

(৩)

এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি অন্যস্থলে (২।৪।১৪; ৪।৫।১৫) বলিয়াছেন:—"অরে! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে?"

যাজ্ঞবল্ক্যের এই মতই ঐতরেয় আরণ্যকে (৩।২।৪) এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে:—"যাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, যাঁহার নিকট গমন করা যায় না, যাঁহাকে মনন করা যায় না, যাঁহাকে বশীভূত করা যায় না, যিনি অদৃষ্ট, যিনি অবিজ্ঞাত, যাঁহাকে (শব্দাদি দ্বারা) নির্দ্দেশ করা যায় না, কিন্তু যিনি শ্রোতা, মননকর্ত্তা, দ্রষ্টা, আদেষ্টা, ঘোষণকর্ত্তা, বিজ্ঞাতা এবং যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরপুরুষ, তিনিই তোমার আত্মা" (৩।২।৪ শেষ অংশ)।

অনেকে মনে করেন যাজ্ঞবল্ক্যের মত অবলম্বন করিয়াই এই অংশ রচিত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন তাহা একটি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব। সংক্ষেপে ইহা এইরূপে বলা যাইতে পারে:— "আত্মা বিষয় নহেন; আত্মা বিষয়ী।"

বেদান্তদর্শন ও উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই কথা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন। এই মত অনুসরণ করিয়া সায়ণাচার্য্যও বলিয়াছেন—"আত্মা বিষয়ো ন ভবতি; বিষয়ী তু ভবতি" (ঐতরেয়-আরণ্যক-ভাষ্য ৩।২।৪)।

আত্মা নিত্যই বিষয়ী। এবং যিনি নিত্যই বিষয়ী, তাঁহাকে কখনই বিষয়ীভূত করা যায় না। সমুদয় জ্ঞান-ব্যাপারে যিনি জ্ঞাতা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে? সেই জ্ঞাতাকে যদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা সম্ভব হইত তাহা হইলে সে জ্ঞাতা আর জ্ঞাতা থাকিতেন না; তিনি তখন হইতেন জ্ঞানের বিষয় এবং এই বিষয়ের হইত অপর এক নূতন জ্ঞাতা। যেখানে জ্ঞানকার্য্য সেই স্থলেই একজন জ্ঞাতা। প্রত্যেক জ্ঞান-ব্যাপারেই একজন জ্ঞাতা থাকিবেন এবং এই জ্ঞাতাই আত্মা। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ ইহাই। আত্মাকে দর্শন করা যায় না, কারণ সমুদয় দর্শনকার্য্যে আত্মাই দ্রষ্টা। আত্মাকে শ্রবণ করা যায় না, কারণ সমুদয় শ্রবণকার্য্যে আত্মাই শ্রোতা। আত্মাকে মনন করা যায় না, কারণ সমুদয় মননকার্য্যে আত্মাই মননকর্ত্তা। আত্মাকে জানা যায় না, কারণ সমুদয় জ্ঞানকার্য্যে আত্মাই জ্ঞাতা। কি অর্থে আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করা যায়, তাহার আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নহে। এস্থলে আমরা যে ভাবে এবিষয়ের আলোচনা করিয়াছি তাহার সিদ্ধান্ত এই যে যিনি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা জ্ঞাতা তিনিই আত্মা। যাহাকে দর্শন শ্রবণ মনন এবং জ্ঞানাদির বিষয়ীভূত করা যায় তাহা আত্মা নহে।

জগৎ সহজে এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। মহা-দার্শনিক ক্যাণ্টের পূর্ব্বে কেহই এবিষয়ের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। শেলিং (Schelling), হার্বার্ট (Herbart), শোপেন্‌হাউয়ার (Schopenhaur) প্রভৃতি দার্শনিকগণ বিস্তৃতভাবে এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ক্যাণ্টের মতেরই প্রতিধ্বনি। ইহার বহু শতবৎসর পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ ভারতবর্ষে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন।

উপনিষৎ আলোচনা করিয়া আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি :—

১। প্রজাপতির উপদেশ এই—আত্মা দেহ হইতে পৃথক্। সুষুপ্ত অবস্থাতে আত্মা দেহ হইতে উত্থিত হইয়া স্বরূপে বিরাজ করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন এই আত্মাই দ্রষ্টা, আঘ্রাতা, বক্তা, শ্রোতা এবং মন্তা।

২। ঐতরেয় উপনিষদের মতে প্রজ্ঞানই আত্মা।

৩। কৌষীতকি উপনিষদের মতে প্রাণরূপী প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞারূপী প্রাণই আত্মা।

৪। তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে আনন্দময়ত্বই আত্মার বিশেষত্ব।

৫। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে যিনি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা জ্ঞাতা ইত্যাদি, তিনিই আত্মা। আত্মা বিষয় নহেন। আত্মা বিষয়ী।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

আসন্ন সন্ধ্যা

ও কার গৌর-বরণ রুচি
মেঘের গায়ের হিরণে?
কার চূড়কাঁকণের ঝিকিমিকি
তালের শিরের কিরণে?
রূপ দেখে তার লজ্জা পেয়ে
মুদল আঁখি কমল-মেয়ে,
তারে সন্ধ্যাতারা পরালে টিপ,
ঝিল্লী—নূপুর চরণে।

সান্ধ্যরাগীর কণ্ঠস্বরে
বাজল দিনের মেলানি,
তার শাড়ীর রঙে রাঙা হ'ল
গিরিচূড়ার বনানী।
কুমুদিনী খবর পেয়ে
ঘোমটা খুলে দেখ্‌ল চেয়ে,
নিবে এল দিনের বাতি,—
বলে' গেল পবনে।

শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার

মাঞ্চুরিয়া মোঙ্গোলিয়া এবং তিব্বতের নারী

উপরে যে তিনটি দেশের নাম করা হইল, ঐ অঞ্চলের নারীজীবনের সহিত চীনদেশের নারীজীবনের বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। চীনদেশের সভ্যতা এইসব দেশ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে, এবং প্রতিদানস্বরূপ চীনদেশের সভ্যতাও এই দেশগুলিকে নানারকমে আলিঙ্গন করিয়াছে। চীনদেশের সীমান্তে সব জাতিই প্রায় এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি, যে-সব স্থানে জাতীয়তার লক্ষণ কিছু কিছু বর্ত্তমান সেখানেও, বড়লোক-শ্রেণী, চীনদেশীয় আদব-কায়দায় দুরস্ত। এই-সমস্ত দেশের লোকেরা বহুকাল পূর্ব্বে চীনদেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু চীনদেশের সভ্যতার নিকট তাহাদের হার মানিতে হইয়াছে। মোঙ্গলজাতি যে সময় অর্দ্ধেক এশিয়া এবং ইউরোপের উপর তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই সময় তাহাদের রাজধানী ছিল চীনের পিকিং সহরে। মাঞ্চুরা ১৬৪৪ খৃঃ পিকিং সহর দখল করে এবং অল্প কয়েকবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা চীনদেশে রাজত্ব করে। উল্লিখিত তিনটি দেশে চীনা নারী এবং নরের সংখ্যা খুব বেশী; কেবল মাত্র কয়েকটি প্রদেশে চীনা-প্রভাব এখনও খুব বেশী আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। সেই-সব প্রদেশ হইতে দেশগুলির আদিম জাতীয় জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

মাঞ্চু এবং মোঙ্গল উভয় জাতি তাতার জাতি হইতে উদ্ভূত। মাঞ্চুরা পর্ব্বত এবং নদীবহুল উর্ব্বর প্রদেশে বাস করিত এবং মোঙ্গলেরা কতকটা মরুভূমির মত দেশে দিন কাটাইত। এই দুই জাতির জীবনে অনেক বিষয়ে বেশ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের বেদেদের সহিত ইহাদের অনেকটা তুলনা করা যাইতে পারে। কোন একটা নির্দ্দিষ্টস্থানে তাহারা স্থির হইয়া বাস করিতে পারে না, বিধাতার অভিশাপ যেন তাহাদিগকে ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তাড়াইয়া লইয়া যায়। যে জাতি অধিকাংশ সময় ঘোড়ার পিঠে এবং তাঁবুতে বাস করে, তাহাদের নারীদের মধ্যে পর্দ্দার ব্যবস্থা চলিতে পারে না। সেই-জন্য চীনদেশের বাহিরে এই সব দেশে নারীদের খুব বেশী স্বাধীনতা দেখা যায়। অবশ্য ইহাতে কেহ যেন মনে করিবেন না যে চীনদেশের নারীদের অপেক্ষা ইহাদের জীবন সকল বিষয়েই খুব সুখের।

মাঞ্চু-নারী প্রয়োজন-মত ঘরের বাহিরে যাওয়া-আসা করিতে পারে, ইহাতে তাহার কোন বাধা নাই। চীনা-নারীর মত লোহার জুতা পরিয়া পা সঙ্কুচিত করিবার প্রথাও ইহাদের মধ্যে কোন দিন চলিত ছিল না, তাহা থাকিলে বোধ হয় ইহাদের জীবন এমন খোলা হইতে পারিত না। উত্তর চীনে এবং মাঞ্চুরিয়াতে পুরুষদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, তাহাদের উভয়কেই এক জাতির লোক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নারীদের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। তাহাদের পোষাকের ধরণ ধারণ এবং খোঁপা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় কে চীনা এবং কে মাঞ্চু। মাঞ্চু-নারীদের যাঁহারা রাজসভায় বসিতে পান কেবল তাঁহারা মাথায় কিছু একটা পরিতে পারেন। এই শিরোভূষণ খুব জমকাল হয় এবং দুইকানের উপর দুই গোছা কৃত্রিম ফুল থাকে। মাঞ্চু বড়ঘরের মেয়েরা যদিও চীনা-নারীর চরণ-কমল ভালবাসে না, তবুও তাহারা তাহাদের উঁচুঘর দেখাইবার জন্য এমন একপ্রকার জুতা ব্যবহার করে যাহা পরিয়া বেশী চলা-ফেরা করা যায় না। জুতার উপরের চেয়ে তলা বেশী অপ্রশস্ত এবং খুবই উঁচু। অনেকের জুতার তলা প্রায় ৬ ইঞ্চি উঁচু হয়।

মাঞ্চুরিয়ার সভ্য-সমাজের গৃহস্থের সমস্ত বন্দোবস্ত উত্তর চীনদেশের লোকেদের মতই। নারীর স্থানও আইনের চোখে একই প্রকার। তবে মাঞ্চুরমণীর

একদল তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুণী।
এক জনের হাতে ধর্ম্মচক্র রহিয়াছে—সে সারাদিন বুদ্ধ-নাম জপ করিতে করিতে চক্র ঘুরায়

স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণে বেশী। মাঞ্চুরিয়াতে এখনো অনেক অর্দ্ধসভ্য এবং পুরাপুরি অসভ্য লোকও আছে। তাহাদের বেশীর ভাগ সমুদ্রের উপকূলে এবং উক্ত প্রদেশের নদীর পাশের দেশগুলিতে দেখা যায়। ইহাদের কতকগুলি এখনও তাহাদের আদিম কালের আচার ব্যবহার ধরিয়া আছে—কয়েকদল প্রাচীন কালের সভ্যতার আড়ালে বাস করিতেছে। মঙ্গোল-সভ্যতার সহিত এই সভ্যতার প্রভেদ আছে। উত্তর মাঞ্চুরিয়াতে যে-সব জাতি বাস করে, তাহাদের বুরিয়াই জাতির সহিত মঙ্গোলিয়ার লোকদের খুবই মিল আছে। তাহারা গরুবাছুরের বড় বড় দল প্রতিপালন করে, তাহাদের শরীর খুব বলবান্, তাহারা আচার ব্যবহারে তাতার এবং তিব্বতের শাসনকে মানিয়া চলে। বৌদ্ধ মঙ্গোলিয়াতে তিব্বতের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে। এই জাতির নারীদের জীবনযাত্রা মঙ্গোল-নারীদের মতই। চীন-সভ্যতাই ইহাদের একমাত্র সভ্যতার আদর্শ।

মঙ্গোলিয়ার লোকেরা এখনো আমাদের দেশের বেদেদের মত বাস করে। তাহাদের প্রধান কাজ পশু-পালন। তাহারা তাঁবুতে রাত্রি যাপন করে। এই তাঁবু খুব শক্ত বনাতের তৈরী। এই তাঁবু দেখিতে অনেকটা চিম্‌নির মতো—উপরে এক স্থানে একটু খোলা থাকে। সবাই তাঁবুর ভিতর আসিলে তাঁবুর পরদা-দুয়ার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখন হাওয়া বা আলো উপরের ছিদ্র দিয়া ভিতরে আসে। তাঁবুর মাঝখানে সর্ব্বদাই আগুন জলে, ধোঁয়া উপরের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়। তাঁবুর ভিতর, জমিতে কার্‌পেট বা গালিচা পাতা

থাকে। স্ত্রীলোকেরা দুয়ারের কাছে শোয়। শুইবার পূর্ব্বে কেহ গাত্রবস্ত্র ত্যাগ করে না, কেবল উপরের জামার বোতাম খুলিয়া দেয়। ঘুম হইতে উঠিয়া আহার করে; কিন্তু আহার করিবার পূর্ব্বে কেহ মুখ ধোয় না। কর্ত্রী সকলের আগে বিছানা ত্যাগ করে এবং চা ইত্যাদি তৈয়ার করে।

তিব্বতীয় ধনী রমনী—নানা প্রকারের গহনা এবং শিরোভূষণ দেখিবার জিনিস

চায়ের সঙ্গে অনেকে চর্ব্বি এবং মাখন মিশাইয়া খায়। ইহাকে একপ্রকার ঝোল বলিলেও চলে। চায়ের সঙ্গে পনির খাইয়া ইহারা সমস্ত দিনের ক্ষুধা দূর করে। রাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে ইহাদের পেট ভরিয়া ভোজন হয়। ইহাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান মাংস। ভেড়ার মাংসই ইহারা বেশী আহার করে। তাঁবুর বাহিরে মাংস একটা খাঁচায় জমানো বা শুকানো থাকে। ইহা হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস কাটিয়া লইয়া সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ হইলে পরে পাত্র হইতে আঙ্গুলে করিয়া মাংস তুলিয়া ভক্ষণ চলে।

মোঙ্গল নারীর মুখ ধুইবার ব্যাপারটি আমা. র খুব মনে'মত হইবে না। ইহারা মুখের মধ্যে জল লইয়া তাহা কুলকুচা করিয়া হাতে ফেলে এবং তাহা মুখময় ঘসিয়া দেয়। নারী এবং পুরুষের পোষাক প্রায় একরকম; তবে পুরুষেরা অধিকন্তু কো রে একটা পেটি ব্যবহার করে। পোষাকের প্রধান উপকরণ একটা লম্বা পিরাণের মত কোট। তাহা শীতকালে বোতাম-আঁটা থাকে; গরমকালে বোতাম খোলা থাকে। এই জামার রং খুব গাঢ় হয়। উৎসব প্রভৃতিতে এই উপর-জামা গাঢ় লাল বা হল্‌দে রংএর হয়। মোঙ্গলনারীর মস্তকাচ্ছাদন একটি বেশ দেখিবার মত জিনিষ। নারীর অবস্থানুযায়ী এই "মাথার পোষাক" নানা রকমের হইয়া থাকে। মাথার পোষাক দেখিয়া নারীর সামাজিক পরিচয় নির্ণয় করা যায়। চুলকে বশে রাখিবার জন্য নারীরা একপ্রকার আঠা ব্যবহার করে। চুলকে আঠা দিয়া বেশ করিয়া বসাইয়া তাহা হইতে নানা প্রকার রূপার গহনা মুক্তার হার, পুঁতির মালা ইত্যাদি ঝুলাইয়া দেয়। যাহারা ধনী তাহারা এইপ্রকার অলঙ্কার খুব বেশী পরে এবং যাহার অকুলানের ঘরকন্না তাহার এই গহনার বহর অতি সামান্যই থাকে। অনেক জাতির নারীরা মাথায় ধাতুনির্ম্মিত পেটি ব্যবহার করে। এই পেটি হইতে নানা-প্রকারের গহনা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই-সমস্ত দোলায়মান গহনাগুলির স্থান ঠিক রাখিবার জন্য সেগুলিকে হুকের সাহায্যে কানের সঙ্গে গাঁথিয়া দেওয়া হয়। অনেকের কানে এত টান পড়ে যে কান চিরিয়া যায়। তবুও গহনা খুলিয়া ফেলা চলিবে না। রূপ বাড়াইবার স্পৃহা মোঙ্গল নারীর অন্য কোন দেশের নারী অপেক্ষা কম নয়। নারীদের সঙ্গে সব সময় নস্যের ডিবা থাকা চাই। নস্য-ডিবা পাথরের তৈরি, এবং তাহাতে অতি সামান্য নস্য ধরে। অনেক সময় তাহা খালিই থাকে। অভ্যাগত মাত্রকেই নস্য দেওয়া হয়।

বিবাহের হাঙ্গামা মোঙ্গলদের বিশেষ কিছু নাই। পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছাতেই বেশীর ভাগ বিবাহ হয়

বিবাহের যৌতুক-দিবার প্রথা সব জাতিরই প্রায় একরকম। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা নানা-রকম অলঙ্কার, এক পাল গরু, ভেড়া ইত্যাদি অনেক কিছুই দেয়। যাহার অবস্থা মন্দ সে হয়ত কেবলমাত্র একটা ভেড়া দিয়াই কাজ শেষ করে। বরের পক্ষ এবং কন্যা-পক্ষ উভয় পক্ষ হইতেই উপহারাদির আদান প্রদান চলে। অবস্থাপন্ন লোকদের বিবাহ-উৎসব বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই হয়। উৎসব অনেক দিন ধরিয়া চলে, এবং বিরাট ভোজের আয়োজন থাকে। খাঁটি মোঙ্গল বিবাহে, বরকে পুরাকালের মত কন্যাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবার অভিনয় করিতে হয়। মোঙ্গল যুবকরা পাকা ঘোড়সোয়ার; কন্যাকে তাহারা যখন ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া দৌড় দেয়, তখন কন্যা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বিবাহে মুখের অমত জ্ঞাপন করে, মনের ভাব অবশ্য একেবারে অন্য।

বিবাহের পরেই স্ত্রী স্বামীর পরিবারে দাসীর মত হইয়া যায়। মোঙ্গল পুরুষ আইনত, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে না। তবে স্ত্রী পছন্দ না হইলে সে অনায়াসে তাহার সহিত বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে। বিবাহ-ভঙ্গের উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পারিলে স্বামীকে কন্যাপক্ষ হইতে প্রাপ্ত যৌতুকাদির অনেক অংশ ফিরাইয়া দিতে হয়। স্ত্রীও ইচ্ছা করিলে স্বামী ত্যাগ করিতে পারে, তবে স্বামী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বামী যে তাহার সহিত খারাপ ব্যবহার করে এবং স্নেহশীল নয় তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। নারীর বিবাহ-ভঙ্গ করিবার আর-একটি বিষম অন্তরায় আছে। স্বামী যেসমস্ত যৌতুক তাহাকে দিয়াছে, তাহার বেশীর ভাগই স্ত্রীর পরিবারবর্গ দখল করে। এই-সমস্ত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করিতে না পারিলে নারী স্বামীর বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। মোঙ্গলদের মধ্যে নানা-রকম প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে—তাহার দু-একটি উল্লেখ করিব। "স্ত্রীকে তোমার আত্মার মত ভালবাস, এবং তোমার কম্বলের মত প্রহার কর।" "ইহা আমার স্ত্রী, আমার জিনিষ।"

মোঙ্গলদের যে ধর্ম্ম চলিত আছে তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নামমাত্র আভাস পাওয়া যায়। ভূত-প্রেতের পূজা প্রায় সকলেই করিয়া থাকে। ধর্ম্মে নারীদের রক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। অনেক নারী সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হয়। কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিশেষ কোন সম্মান বৃদ্ধি হয় না।

তিব্বতীয় মাতা এবং সন্তানবৃন্দ

স্ত্রীলোকদের শক্ত এবং একঘেয়ে সব কাজই করিতে হয়। তাহারা "আরগোল" (গোবর) কুড়াইয়া আনে এবং শুকাইয়া ঘুঁটে করে। গরুবাছুর চরানো, তাহাদের সেবা করা, দুধ দোওয়া ইত্যাদি মেয়েদেরই কাজ। তাহারা উটের লোমের কম্বল তৈয়ার করে। এইসমস্ত কাজ ছাড়া পুরুষের প্রায় সমস্ত-রকম কাজেই নারীদের যোগ দিতে হয়। গরম কালে নারীরা যখন ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে, পুরুষেরা তখন আড্ডাতে চা পান করে, ঘোড়দৌড় করে অথবা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে দেখাশোনা করিয়া বেড়ায়। ছোট ছোট মেয়েরা এই-সমস্ত আনন্দে যোগদান করিতে পায় বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দের পরিবর্ত্তে তাহাদের কষ্টই বেশী হয়। স্ত্রীলোকদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাহাদের অতি কম বয়সেই

অনেক সময় নানা রকম ব্যাধি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অকালবৃদ্ধা করিয়া দেয়।

তিব্বতের নারী মোঙ্গলদেরই সম-জাতি। কিন্তু তিব্বত ভারতবর্ষের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এইখানের আচার ব্যবহার অনেক-কিছু ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে। তিব্বতের রাজা একজন পুরোহিত (দলাইলামা)। জগতের অন্য কোন দেশ এমনধারা ধর্ম্মযাজক-শাসিত নয়। তবে এখন চীনের শাসনে দলাইলামার শক্তি অনেক কমিয়া গেলেও অবশিষ্ট ক্ষমতা বড় কম নয়। এই দেশে নারী-পুরুষের প্রায় সকল বিষয়েই সমান অধিকার। নারীরা তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবসা বাণিজ্য দোকান ইত্যাদি সবই করিতে পারে।
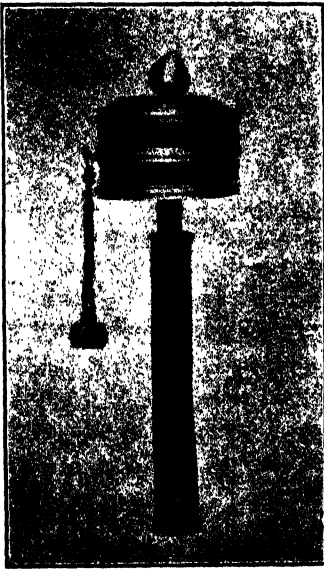
ধর্ম্মচক্র (তিব্বতীয়)

ধর্ম্মকার্য্যেও নারীর অধিকার এবং সম্মান বড় কম নহে। যে-সমস্ত নারী সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের লোকে দেবী বলিয়া মনে করে। সন্ন্যাসিনীর আবাস অতি পবিত্র স্থান।

এখানে নারী-পুরুষের অবাধ মিলন ঘটিতে বাধা নাই। স্ত্রীস্বাধীনতা তিব্বতে অবাধ। পুরুষের সকল-রকম আমোদ-আহ্লাদে নারীরা যোগদান করিতে পারে। এমন কি তাহারা উৎসবাদিতে একসঙ্গে নাচ-গানও করিতে পারে—চীন দেশে এই কথা কেহ ভাবিতেও পারে না। তিব্বতের নারী বহুবিবাহ করিতে পারে—তাহারা একসঙ্গে এবং একই সময়ে একের বেশী পুরুষ বিবাহ করিতে পারে। এই ব্যাপারের কারণ, সেখানে নারীর অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। এক মায়ের বহু পুত্রসন্তানের একটি মাত্র স্ত্রী থাকিতে পারে। বড়-ভাইএর অধিকার সবচেয়ে বেশী এবং সন্তানাদি তাহারই বলিয়া বিবেচিত হয়। তিব্বতে পুরুষেরা মেয়েদের অপেক্ষা ঢের বেশী অলস। তাহারা দলে দলে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হয়, তাহা তাহাদের আন্তরিক ধর্ম্মপিপাসার জন্য নহে, সংসারের পরিশ্রম এবং দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য। এই দেশে এবং বর্ম্মাতে নারীদের প্রকৃতি অনেকটা পুরুষদের মত, এবং পুরুষেরা নারীপ্রকৃতির। নারী পুরুষ অপেক্ষা প্রায় সকল বিষয়েই অধিক পরিশ্রম এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এই দেশে যাহারা একটু লেখা পড়া জানে তাহারা প্রায় সকলেই চীন দেশের আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। অনেকে চীনা দর্শন পাঠ করে।

তিব্বত বহু কাল হইতেই একটা রহস্যপূর্ণদেশ বলিয়া পরিচিত। এখন পর্য্যন্ত এই দেশের লোকজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কারণ ইহারা বিদেশীকে কিছুতেই স্বদেশে ঢুকিতে দেয় না। বহুকাল হইতেই তিব্বতীয় জীবন-যাপনের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাদের দৈনিক জীবনে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তিব্বতের রাজধানী লাসা সকল সময় নানা দেশের যাত্রী এবং শ্রমণে ভরা থাকে। এখানে নারীদের বিশেষ একটা রঙের কাপড় পরিতে হয়, এবং মুখে কালী মাখিতে হয়। কালী মাখিবার উদ্দেশ্য—রূপ ঢাকিয়া রাখা; তাহা হইলে ধার্ম্মিক লোকদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়া ধর্ম্মে ব্যাঘাত পড়িবে না।

মোঙ্গল দেশের মত এখানের নারীরাও মাথার চুলের বড় বেশী যত্ন করে। বড়লোকের মেয়েরা উৎসবের দিনে চুলে বেশ করিয়া তেল দিয়া বিনুনি করে, বিনুনি মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া জড়ায়। ধাতুনির্ম্মিত পেটিও মাথায় বাঁধা হয়। এই পেটি হইতে নানা-

প্রকার গহনা কানের পাশে ঝোলে। ইহারা নানা-প্রকার দামী পাথর ব্যবহার করে। যে হার ধনী নারীরা ব্যবহার করে তাহাতে নানা-প্রকার হীরা জহরৎ বসান থাকে। যাহারা পারে তাহারাই রেশম বা মখমলের কাপড়ে পোষক তৈয়ার করে। ছোট ছোট মেয়েদের গলায় নানাবিধ রক্ষা-কবচ দোলে। নারীরা তাহাদের বুকে একটা কাষ্ঠ বা ধাতু-নির্ম্মিত পানপাত্র ঝুলাইয়া রাখে।

দলাইলামা বা অন্য কোন মানী লোকের মৃত্যু হইলে সমস্ত দেশ শোক করে। কোন নারী তখন তাহার বহুমূল্য শিরোভূষণ পরিতে পায় না।

নারীরা সৌখীন এবং ধনী হইলেও পরিশ্রম করিতে লজ্জা বোধ করে না। খুব বড়ঘরের মেয়েরাও হোটেল বা খাবারের দোকান চালানোর কাজকে হীন কাজ বলিয়া মনে করে না।

তিব্বতীয়দের বিবাহপ্রথা অনেকটা চীন দেশের মতই। ঘটকেরাই প্রায় সব স্থির করে, তবে যাহারা অতি দরিদ্র তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। বিবাহে উপহারের আদান-প্রদান খুব বড় একটা ব্যাপার। বিবাহ-ব্যাপারে উপাসনাদি খুব দরকারী না হইলেও মায়েরা বর-কন্যার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা করে। বিবাহ ভঙ্গ করিতে হইলে বিবাহ-লব্ধ যৌতুক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ফেরত দিতে হয়। স্ত্রীহত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হয় না। হত্যাকারীকে কিছু জরিমানা এবং নিহতের শ্রাদ্ধের খরচ দিতে হয়। জরিমানা না দিতে পারিলে কারাবাস করিতে হয়।

তিব্বতীয় নারী সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই বলিলেই হয়, তবে তাহারা দশ এবং দেশের কাজ অনেক কিছুই করে। বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক তাহাদের দেশে এখনও ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই। তবে আশা করা যায়, ক্রমে সেখানে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, নারী তাহার অধিকার বেশ জোর করিয়া দখল করিবে। শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রে তাহাদের দাবী পূর্ণ হইবার নয়।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

নারী-প্রগতি

আমেরিকার রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিতে নারীরা অধিকার পাইয়াছেন। মিস্ লুসিল্ এ্যাচারসন্ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ইঁহাকে রাজদৌত্য-কার্য্যে মনোনীত করিবার জন্য সেনেটে প্রস্তাব করিয়াছেন।

চীন দেশে বিবাহিত মেয়েরা আপনাদের পিতৃদত্ত নাম বজায় রাখিতে পারেন। সেখানে স্ত্রীশিক্ষার খুব দ্রুত উন্নতি হইতেছে। মেয়েরা ডাক্তার, শুশ্রূষাকারিণী, শিক্ষক প্রভৃতির ও ব্যবসাক্ষেত্রে অনেক রকমের কাজ গ্রহণ করিতেছেন।

আফ্‌গানিস্তানে কাবুলে মেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাতে পাঁচশত ছাত্রী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। এখানে পশ্‌তু, পার্শী, উর্দ্দু এবং রুশ ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

কনস্টাণ্টিনোপলএ নারীসমাজে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তাঁহারা ঘোমটার সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা মাথা অনাবৃত রাখিয়া কেবল গলাটি ঢাকা দিতেছেন। আগে নিয়ম ছিল ঘোমটা কালো রঙের হইবে, এখন গলার ঢাকা পছন্দমাফিক রঙের হইতেছে। পুরুষ বন্ধুদের সহিত মেয়েরা এখন হোটেল প্রভৃতি সাধারণ ভোজনাগারে ভোজন করিতেছেন। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র হারেমের ব্যবস্থা শিথিল হইতেছে। ইচ্ছা করিলে বিবাহের পরেও মেয়েরা পিতৃদত্ত নাম বজায় রাখিতে পারেন। কনস্টাণ্টিনোপল (আমেরিকান্) কলেজে ছাত্রী-আবাসে এমন সব মুসলমান মেয়ে আছেন যাঁহারা ফরাসী দেশের মেয়েদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনভাবে আছেন।

ভারতের নারী কিন্তু অনেক পশ্চাতে। এখানে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অত্যন্ত মন্দ গতিতে চলিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে মেয়েদের জন্য সাতটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল এবং ছাত্রীর অভাবে সাতটিই এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অথচ ডাক্তারী-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিলে মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের যে কত সুবিধা হয় তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া এই কাজে দেশের এবং দশের উপকার করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

ভারতের ভদ্রঘরের মেয়েরা অজ্ঞতায় বিধ্বস্ত এবং নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা অজ্ঞতার উপরন্তু পরিশ্রমে বিধ্বস্ত। পুনার ভারত-সেবক-সমিতির শ্রীযুক্ত যোশী মহাশয় সম্প্রতি খনিসমূহের নিয়মকানুন বদলাইবার জন্য একটি আইন পেশ্ করিয়াছেন। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য খনিতে মেয়ে মজুরদের কাজ বন্ধ করা। এইসব মেয়ে-মজুররা মাটির হাজার হাজার ফুট নীচে কয়লার খনিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কাজ করে। প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই আজকাল মেয়েদের খনিতে কাজ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভারতেই কেবল এ প্রথা এখনো প্রচলিত। মেয়েরা ছেলেপিলের মাতা এবং গৃহকর্ত্রী। তাহারা যদি সমস্ত দিন ধরিয়া খনিতে রুদ্ধ থাকে তাহা হইলে সন্তান পালন করে কে এবং পরিশ্রমক্লান্ত স্বামী-পুত্রকে অন্ন দেয় কে? এইসব মেয়েদের স্বামীরাও সমস্ত দিন ধরিয়া খনিতে কাজ করে। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা না পায় প্রস্তুত অন্ন, না পায় বিশ্রামের আয়োজন, কেননা তাহাদের স্ত্রীরাও সেই সময়েই ঘরে ফেরে। গৃহের এই বিশৃঙ্খলায় মজুররা স্বভাবতই মদের দোকানে ছুটিয়া থাকে। অতএব মেয়েদের খনিতে কাজ করায় সমাজের অহিত হইতেছে—(১) মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও গৃহ-বিশৃঙ্খলা, (২) সন্তানপালনের অব্যবস্থা ও সন্তানের অপুষ্টি, (৩) পুরুষের নৈতিক অবনতি। মেয়েদের খনিতে কাজ করার বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন হওয়া উচিত।

মহিলাদের পোলো খেলা

সম্রাট্ আকবরের সভা-শিল্পী সানউল্লা কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

[মুঘল-রাজকুমারী হুমায় তাঁর তিন সহচরীর সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া পোলো খেলিতেছেন।

* এই ছবির একখানি রঙীন প্রতিলিপি শ্রীমতী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শামা-আ পত্রিকার এপ্রেল-জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে : ইহা তাহার প্রতিরূপ।]

ভাইফোঁটা

অরুণের তরুণ জীবনের শেষ হিসাব-নিকাশের জের মিটিয়ে যেদিন তার ছোট বোন রেণুকা অজানা পথের যাত্রী হলো, সেদিন থেকেই সে কেমন আনমনা আপন-ভোলা হয়ে পড়লো। তার বাপ-মায়ের শেষ আশীর্ব্বাদী দান মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনার মত পেয়েছিল তাকে, বাপ-মার পরপর মৃত্যুতে। সংসারে তার জানা আপনার কোনো লোক ছিল না আর, তার খবরদারী করবার জন্যে।

সম্বলের মধ্যে ছিল একখানি ছোট দোতালা বাড়ী আর তার হৃদয়জোড়া বিশ্বগ্রাসী স্নেহের ক্ষুধা। এই দুই সম্বল নিয়েই তার দিন কাটছিল। দোতালায় সে যে-ঘরে শুতো, সে-ঘরের পাশেই একটুখানি ছোট খোলা ছাদ। সেই ছোট ছাদেই সে টবে করে গোলাপ-যুঁয়ের বাগান করে তুলেছিল। স্নিগ্ধ জোৎস্না-রাতে যখন তার সেই ছাদ-বাগানে জোৎস্না-ঢেউয়ের সঙ্গে গোলাপ-যুঁয়ের ফুটন্ত হাসির তরঙ্গ খেলে যেত, তখন সে একখানা আরাম-কেদারা টেনে নিয়ে সেইখানে বসে যেত সেই রূপ-সুরভির দোলায়

আপনার উতলা মনকে ভোলাবার জন্যে। গোলাপ-মুঁয়ের হাসিই ছিল তার কাছে প্রেয় এবং শ্রেয়।

তার বাড়ীর ছাদের গা দিয়েই উঠেছিল আর-একখানা বাড়ী একেবারে ছাদের সঙ্গে জোড়া লেগে। কোন্ পূর্ব্বপুরুষ দুই পরিবারে অবাধ মেলা-মেশার জন্যে ছাদ এবং বাড়ীর মাঝে একটা দোর রেখেছিলেন দুই বাড়ীকে আলাদা অথচ এক করে'। অর্গল-বাহু আর সেই দোরকে ধরে' রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। বাহুর বন্ধন হতে কপাট-দুটো প্রায় মুক্ত হয়ে জীর্ণ অবস্থায় স্খলিত হয়ে ঝুলে পড়েছিল। তার অর্দ্ধ-উন্মুক্ত ফাঁক দিয়ে বাড়ীটা প্রায় সবটাই দেখা যেত। বাড়ীটায় কখনো কোন লোককে সে থাকতে দেখেনি। সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল চাম্‌চিকেদের আড্ডাবাড়ী।

যখনই অরুণ ছাদে এসে দাঁড়াতো আর তার চোখে পড়্‌তো সেই দোরটা, তখনই তার মনটাও কেমন শূন্য খাঁ খাঁ মনে হতো। তার মনে হতো 'আমার হৃদয়ের দোরও তো এই-রকম জীর্ণ হ'য়ে ভেঙে পড়েছে, তাকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সে যে ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জানি না কখনো কোনো শিল্পী এসে তাকে ফের নূতন করে' তুল্‌বে কি না বা তুল্‌তে পার্‌বে কি না!' বিশ্বসৃষ্টির অনাসৃষ্টিই তো এই খানে, যে যা' চায় সে তা পায় না।

সেদিন সকালে অরুণ যখন ছাদে বেড়াচ্ছিল তখন হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়্‌লো দোরের ফাঁক দিয়ে সেই বাড়ীটায়। বাড়ীটা আজ কার শুভাগমনে নূতন শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ঘর-দোর ধোয়া-পোঁছার শব্দ বেশ চারিদিক্ সরগরম করে' তুলেছে। হয়তো কোন্ অজানা গৃহলক্ষ্মীর প্রথম চরণপাতে সেখানে পদ্ম পুষ্পিত হয়ে উঠ্‌চে।

হঠাৎ তার কানে একটা যেন চিরপরিচিত স্বর ভেসে এলো। একি! এ যে তার রেণুর স্বর! সে পড়্‌তে পড়্‌তে নিজেকে সাম্‌লে নিলে। বারাণ্ডায় চোখ পড়্‌তেই সে আরো বেশী চম্‌কে উঠ্‌লো, সেখানে দাঁড়িয়ে এক তন্বী তরুণী ঠিক তারই রেণুর মত। তার মুখে, দেহের অঙ্গে অঙ্গে ও অঙ্গের গতিহিল্লোলে তার রেণুর আদল। মন বলে' উঠ্‌লো—'না গো না' ও তোমার রেণু নয়। সে ত তোমায় অনেকদিন ছেড়ে চলে' গেছে।' অরুণ সঙ্গে সঙ্গে মনকে ধম্‌কে উঠ্‌লো—না, না, না, ওই আমার রেণু। সে আমাকে ছেড়ে চলে' গেছে বটে কিন্তু সে যে আমার জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেছে সারা বিশ্বের মেয়ের মধ্যে রেণু রেণু করে'। এতে যে আর কোনো ভুল নেই। সে যে আমায় বড় ভালবাস্‌তো। সে কি একেবারে নিজেকে লয় করে' যেতে পারে আমাকে ছেড়ে? ওই আমার রেণু।

অরুণের আকুল চোখের উপর চোখ পড়্‌তেই তরুণীর মুখে একটা বিরক্তির ঢেউ খেলে গেল, সে সেখান হতে সরে' গেল। অরুণ খানিকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে তার ঘরে ঢুকে বিছানার উপর নিজেকে এলিয়ে দিলে। কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না তার। সে চুপ করে' চোখ বুজে শুয়ে রইলো।

তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছিল বিস্মৃতির কোলে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলো। রেণু আর সে ঠিক পিঠোপিঠি ছিল। কি ভালোই না বাস্‌তো তারা পরস্পরকে। একবার অরুণের খুব অসুখ হয়, দু'দিন তার কোনো জ্ঞান ছিল না; সেই সময় রেণু তার পাশে বসে' কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল, আর ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনাটাই না করেছিল—তা ছাড়া যে তার আর কোনো সম্বলই ছিল না। জান্‌তো কেবল সে তার দাদাকে। কিন্তু সে সময় তো অরুণ গেল না। গেল রেণু তাকে স্মৃতির দংশনে তিল তিল করে' দগ্ধে মর্‌বার জন্যে পেছনে ফেলে রেখে। বেঁচে থাক্‌লে আজ হয়তো ঠিক অত বড়টিই হতো সে। তার মনের ভিতর তরুণীর যে ছায়াচিত্রের ছাপ উঠে গিয়েছিল সেইটাই কেবল তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌লো আর ততই তাকে কাছে পাবার জন্যে মন আকুলি-বিকুলি করে' চারিদিকে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌লো। যখনই তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো যে' তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, তখনই সে

কেমন আতঙ্কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সে কি স্বপ্নের ভিতর পেয়েছে তাকে, সে ঘুম-ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে!

সেইদিন হতেই তার কাজ হলো যখন-তখন ছাদে গিয়ে দোরের ফাঁক দিয়ে তার দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দেওয়া তরুণীকে খোঁজ্‌বার জন্যে। কোনোদিন খোঁজ পেত, কোনো দিন পেত না। যে দিন তরুণীর সঙ্গে দেখা হতো, তরুণী মুখের উপর বিরক্তি ফুটিয়ে তার দিকে একটা অলস দৃষ্টি হেনে তার চোখের সামনে হতে সরে' গেলে তার মনটাকে দু'পায়ে থেঁৎলে, সেদিনও সে খুসি হয়ে উঠ্‌তো এই ভেবে যে, ক্ষণিকের জন্যেও সে তার রেণুর দেখা পেয়েছে তো। আর যেদিন সে তার দেখা পেত না, সেদিন যেন সমস্ত দিনটা ব্যর্থ মনে হতো, কোনো কিছুতেই মন দিতে পার্‌তো না, সমস্ত দিন পাগলের মত বেড়িয়ে বেড়াতো।

(২)

করুণাময়-বাবু প্রায় সমস্ত জীবনটা পশ্চিমে কাটিয়ে, বাকি কটা দিন পৈতৃক বাড়ীতে কাটাবার মন করে' নিজের মেয়ে জয়ন্তীকে তার শ্বশুরবাড়ী হতে দিন কয়েকের জন্যে সঙ্গে নিয়ে এসে এই বাড়ীতে বহুদিন পরে পা দিয়েছেন। তাঁর এই মেয়েটিই ছিল একমাত্র আশা ভরসা ও সম্বল। জয়ন্তীকে তিনি সঙ্গে করে' এসেছিলেন এইজন্যে যে, সে দিনকয়েক তাঁর কাছে থেকে তাঁকে স্থিতি করিয়ে যাবে।

বাড়ীতে এসে করুণাময়-বাবুর ভারি একলা বোধ হলো সঙ্গীহীন অবস্থায় এসে পড়ে'। তিনি যাদের চিন্‌তেন তাদের অনেকেই পৃথিবী হতে সরে' পড়েছিল। সেইজন্য তাঁকে সঙ্গীর অভাবে একটু ভয় পেতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন একটু বেশী-রকম সঙ্গপ্রিয়, একলা তিনি মোটেই থাক্‌তে পার্‌তেন না। যার সঙ্গে তাঁর একবার পরিচয় হতো সে আর তাঁকে কখনো ভুল্‌তে পার্‌তো না, এমনি মধুর ছিল তাঁর স্বভাব।

দুপুর বেলা; টিপ্‌টিপ্‌ করে' বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ জমে' উঠেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ মেঘবালার সীমন্তে সিঁদুরের রেখা টেনে দিয়ে যাচ্ছে। দূরে গাছের উপর বসে' দু-একটা কাক মাথাটাকে প্রায় পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বুজে ভিজ্‌ছে।

অরুণ তার নিজের ঘরের সমস্ত দরজা-জান্‌লা-গুলো খুলে দিয়ে বৃষ্টি দেখ্‌ছিল। এমন সময় করুণাময়-বাবু এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। অরুণ তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করে' বসালে।

করুণাময়-বাবু বল্‌লেন—'তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এলাম বাবা। তোমরা তো আর আমায় চেন না, আমরা সব ভূতপূর্ব্বের দলের লোক; কাজেই আমাকে নিজে আস্‌তে হলো। আমিই হলাম তোমার এই পাশের পোড়ো বাড়ীর বাসিন্দা ভূত।' বলে' তিনি খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

অরুণের মনটা ভারি খুসি হয়ে উঠ্‌ল। যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, যাকে সে কণ্ঠরোধ করে' মার্‌তে চেয়েছে, আজ সেই মিলনের পথ আপনা হতে তার সাম্‌নে মুক্ত হতে দেখ্‌তে পেয়ে আবার সে তার আকাঙ্ক্ষাকে মুক্ত করে' দিলে তার নিজের পথে।

সে গিয়ে করুণাময়-বাবুকে প্রণাম করে' দাঁড়াতেই তিনি বল্‌লেন,—'চল বাবা, আমার ওখানে, দু'জনে বসে' গল্প করিগে।' তারপর অরুণ কিছু বল্‌বার আগেই তাকে প্রায় একরকম টেনে নিয়ে তিনি নিজের বাড়ীতে এলেন।

সেখানে নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে আলাপ দু'জনের বেশ জমে' উঠ্‌লো ঠিক পরিচিতের পুনর্মিলনের মত। বেলাশেষে অরুণ বাড়ী আস্‌বার জন্যে উঠ্‌তেই করুণাময়-বাবু তার হাতটা ধরে' বসিয়ে বল্‌লেন—'সেকি হয় বাবা, একটু জল খেয়ে যেতে হবে, নইলে তো ছাড়্‌বো না।' অরুণ প্রতিবাদ কর্‌বার আগেই তিনি ডাক্‌লেন,—'জয়ন্তী, মা, অরুণকে খাবার দিয়ে যাও তো।'

খানিক পরে ঘরে ঢুক্‌লো জয়ন্তী, তারই নিজের হাতে গড়া হরেক-রকমের খাবারে থালা সাজিয়ে। অরুণ তার হারিয়ে-পাওয়া স্নেহের জিনিষকে এত কাছে পেয়ে একটা তৃপ্তির দীপ্তিতে মণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লো, জয়ন্তীর দিকে আবেগ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

জয়ন্তী লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি থালাটা অরুণের কাছ থেকে একটু দূরেই নামিয়ে দিয়ে সেখান হ'তে চলে' গেল। অরুণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খেতে বস্‌লো, তাকে আর কোন কথাই বল্‌তে হলো না বা অনুরোধ করতে হলো না। কি তৃপ্তিতেই না সে খাবারগুলো খেতে লাগ্‌লো। তার মনে হ'তে লাগ্‌লো যে এই খাবারের প্রতি ক্ষুদ্র অংশেও যে তার বোনের স্নেহের স্পর্শ মিশিয়ে রয়েছে যে স্পর্শ পাবার জন্যে সে ব্যাকুল। সেকি সে খাবার ফেল্‌তে পারে?

খাওয়া শেষে বাড়ী এসে তার মনে হলো যে, তার ব্যর্থতার পথে-এগিয়ে-চলা দিনগুলো আজ বুঝি সার্থকতার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। কিন্তু সে যেমন জয়ন্তীকে প্রাণ দিয়ে চায় সে তো তাকে কই চায় না। না চাক্ তাকে, জয়ন্তীকে দেখেই অরুণের তৃপ্তি। কতদিন সে সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছে শুধু একবার জয়ন্তীকে দেখ্‌বার লোভে। কতদিন বৃষ্টির পশলা মাথার উপর দিয়ে বর্ষিত হয়ে গেছে তবু তার খেয়াল হয়নি। রৌদ্রের খর তেজের মধ্যে বসে' থেকেও কতদিন সে কাটিয়ে দিয়েছে।

জয়ন্তীর মনে হ'তো লোকটা কি পাগল! আমাকে দেখ্‌বার জন্যে রোদ নেই, বৃষ্টি নেই চুপ করে' ছাদে বসে' আছে। কি আছে বাপু আমার মধ্যে? নাঃ, লোকটা বড় বেহায়া। কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে থাকে আমার দিকে। হয় পাগল, নয় বদ্‌মায়েস্।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু দুঃখও হ'তো তার অরুণের এই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন দেখে। কিন্তু তার সাম্‌নে বেরুতে তার কেমন লজ্জা করতো, রাগও ধরতো, আবার মায়াও হ'তো একটু—তার সঙ্গীসহায়হীন জীবনের দিকে তাকিয়ে। যতই সে অরুণের বিপক্ষে দাঁড়াক না কেন, তার কাজ করে' বা তাকে খাইয়ে সেও কেমন একটা তৃপ্তি পেত। এক-একদিন অরুণ যখন বাড়ীতে থাক্‌তো না, তখন সে ছাদের সেই দোর দিয়ে এসে তার ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে যেত অরুণের অজান্তে। কিসের টানে যে সে এসব করতো তার জবাব সেও নিজেকে ঠিক দিতে পারতো না।

অরুণ ঘরে ফিরে এসে প্রথম দিন খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল তার ঘর কে গুছিয়ে দিয়ে গেছে দেখে। কিন্তু তখনই সে বুঝ্‌তে পারলে যে কার কোমল করের স্নেহস্পর্শে তার ঘর নবশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত ঘরটায় সে পাগলের মত ছুটোছুটি করে' বেড়াতে লাগ্‌লো। কখনো আল্‌নায়-রাখা কাপড়গুলো বুকে করে' জড়িয়ে ধরতে লাগ্‌লো, কখনো বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌লো—সেগুলো যে রেণুর স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়ে গেছে। তার পরই সে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো—রেণু, রেণু, রেণু!

প্রায় প্রতিদিনই অরুণ করুণাময়-বাবুদের বাড়ীতে খেতো করুণাময়-বাবুর জেদভরা নিমন্ত্রণে বাধ্য হয়ে। করুণাময়-বাবু আর সে পাশাপাশি খেতে বস্‌তো, জয়ন্তী পরিবেষন করতো। করুণা-বাবুর অনুরোধে জয়ন্তীকে অরুণের সাম্‌নে বেরুতে হ'তো সমস্ত লজ্জা কাটিয়ে আর মনকে এই বুঝিয়ে যে, তাকাক্ সে অমন করে' আমার দিকে, তাতে আমি তো আর ক্ষয়ে' যাবো না। কিন্তু একটু রাগও হ'তো তার বাবার উপর,—কেন তিনি এই বেহায়া লোকটার সাম্‌নে রোজ রোজ তাকে বেরুতে বলেন।

সময় সময় জয়ন্তী একলা বসে' ভাব্‌তো, সত্যই কি লোকটা খারাপ? সে তো অনেকবার তার দিকে তাকিয়েছে, কই তার মধ্যে ত কখনো পাপের ছোপ সে দেখ্‌তে পায়নি। তবে সে তার উপর এমন বিষদৃষ্টি হানে কেন? এই কেনর উত্তরেই সে অরুণের ঘর-দোর গুছিয়ে দিত, তার অলক্ষ্যে গিয়ে তার সকল কাজই করে' দিয়ে আস্‌তো। করুণাময়-বাবু জয়ন্তীর স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের খবর জান্‌তেন বলে' কিছু বল্‌তেন না, বরং খুসীই হ'তেন। তিনিও লক্ষ্মীছাড়া, অরুণও লক্ষ্মীছাড়া; দুই লক্ষ্মীছাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী জয়ন্তী স্নেহসুধা বণ্টন করছে—এতে তাঁর মনে আনন্দ ধরত না।

(৩)

অরুণ চেয়ারের উপর বসে' টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মাথাটাকে গুঁজে কি ভাব্‌ছিল। প্রভাতের মৃদুল বাতাস তার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে' কত কথাই বলে' যাচ্ছিল। সে-সব দিকে তার মন ছিল না।

হঠাৎ মুখ তুলে একটা কাগজ কলম টেনে নিয়ে আপন মনে সে লিখ্‌তে লাগ্‌লো—

বোন,

জানিনা বোন্ মাহেন্দ্রক্ষণের দেখার ভিতর দিয়ে তোমার ভিতর আমার হারানো বোন রেণুর আদল পেয়েছি। মাবাপহারা রেণু ছিল আমার নিজের হাতে মানুষ করা। আমার বোন-হারা মন তোমাকে পেয়ে শান্ত হতে চায়, কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝ্‌ছ। এই ভুলের সঙ্কোচ জয় করে' তোমার নামের সার্থকতা তো তোমাকে কর্‌তেই হবে। তুমি ছাড়া যে আমার আর কেউ আপনার নেই। তোমাকেই যে আমার সব ভার নিতে হবে। আমি তোমার আশায় আমার হৃদয়ের দোর খুলে রেখেছি। যে দিন তোমার ভুল ভাঙ্‌বে সে দিন যেন তুমি তোমার দাদার কাছে আস্‌তে কুণ্ঠিত না হও ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।......

অরুণ তার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এমনি করেই লেখার মধ্যে দিয়ে কালীর আঁচড়ে ছড়িয়ে গেল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। এতে তার মন কতকটা হাল্কা হয়ে গেল। তার মনে হলো যেন সে এই কথাগুলো জয়ন্তীকেই বলে' গেল। তারপর উঠে আল্‌না হতে একটা জামা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অরুণ বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকলো জয়ন্তী, অরুণের অগোছাল ঘর গুছিয়ে দেবার জন্যে। ঘর গোছাতে গোছাতে সে টেবিলটা গুছোতে গেল। সেখানে অরুণের সেই লেখাটা তখনও তেমনিভাবে পড়ে' ছিল, যেন অরুণই তার হৃদয় খুলে হৃদয়ের সব কথাগুলো বের করে' রেখে গেছে।

টেবিল গুছোতে গুছোতে জয়ন্তীর চোখ পড়্‌লো সেই লেখাটার উপর। সে নিজের অজ্ঞাতে পড়ে' গেল। পড়্‌তে পড়্‌তে তার দু'চোখে অশ্রুর ধারা বয়ে যেতে লাগ্‌লো—এ যে তারই উদ্দেশে লেখা। কি ভুল করেই সে অরুণকে না কষ্ট দিয়েছে। অরুণ চেয়েছে শুধু বোনের স্নেহ; তার প্রতিদানে সে দিয়েছে কেবল তিক্ত বিরক্তি আর তীব্র উপেক্ষা তার স্নেহকে দু'পায়ের দলনে থেঁৎলে। জয়ন্তীর ইচ্ছে হতে লাগ্‌লো তার নিজেকে এই রকম করে' নিপীড়িত কর্‌তে। সে অরুণের লেখাকে বার বার মাথায় ঠেকাতে লাগ্‌লো যেন কোনো অমূল্য বস্তুকে সে পেয়েছে যা এতদিন তার কাম্য ছিল। অরুণের আচরণে অরুণকে তার ভালো মনে হত না, অথচ মন্দ মনে কর্‌তেও তার কি জানি কেন;কষ্ট বোধ হত। অরুণ যে খারাপ লোক নয় এর পরিচয় পেয়ে সে যেন পরম স্বস্তি লাভ করে' হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। জয়ন্তী আস্তে আস্তে চোখের জল মুছ্‌তে মুছতে লেখাটাকে নিয়ে ঘর হতে চলে' গেল, সেদিন তার অরুণের ঘর গুছিয়ে দেওয়া আর হল না।

অরুণ ঘরে এসে লেখাটাকে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো সরিয়ে রাখ্‌বার জন্যে পাছে জয়ন্তী দেখে ফেলে। কিন্তু সেটা সে খুঁজে পেলে না। ভাব্‌লে বোধহয় ভুলে কোথাও ফেলে দিয়েছে। ঘরের অগোছালো ভাব দেখে তার সন্দেহও হল না যে জয়ন্তী এসেছিল।

সেদিনও অরুণ খেতে বসেছিল করুণাময়-বাবুর সঙ্গে তাঁরই বাড়ীতে। জয়ন্তীর আর সেদিন কিছুতেই অরুণের সাম্‌নে বের হতে ইচ্ছা কর্‌ছিল না। সে যে দোষী, কি করে' বেরুবে সে অরুণের কাছে। কত বড় স্নেহের ডাককে সে উপেক্ষা করেছে, অপমান করেছে। দোষী যেমন করে' বিচারকের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় সেও তেম্‌নি করে' এসে অরুণের কাছে ভাতের থালাটা দিয়ে সরে' গেল নিজের অসীম লজ্জাকে আড়াল কর্‌বার জন্যে।

অরুণের কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্য ছিল না। জয়ন্তীর প্রতি পদক্ষেপে তার অন্তর আনন্দে নেচে উঠ্‌ছিল। খাবার মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন গর্ব্বান্বিত হয়ে উঠ্‌ছিল —এ যে তার বোনের স্নেহের দান।

ভোর হয়েছে। তারার দল যেতে যেতে তখনো দু'একটা আকাশের এখানে সেখানে থেকে গেছে, বোধ হয় উঁকি মেরে সূর্য্যদেবকে দেখ্‌বার জন্যে দুষ্টু মেয়ের মত। সূর্য্যদেব চোখ রাঙিয়ে রক্তমুখে সদ্যভাঙা ঘুম থেকে উঠে আস্‌ছিলেন তাদের ধমক দিতে। তারাও ভয়ে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে সরে' পড়্‌ছিল একটির পর একটি করে'।

আজ ভাইফোঁটার দিন। অরুণ বিছানার উপর

চুপ করে' শুয়ে শুয়ে ভাবছিল—সেইবার রেণু তাকে শেষ ফোঁটা দিয়ে যমের দোরে কাঁটা দিয়ে ভাইকে অমর করে' রেখে নিজে যমের দোর আগলাতে চলে' গেল। তার পর কত বছর কেটে গেছে শুধু স্মৃতি বুকে করে'। আজ আবার সেই দিন এসেছে তার স্মৃতিকে আরো উত্তেজিত কর্‌বার জন্যে। অরুণের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। আজ তো আর কেউ এসে তাকে আদর করে' দাদা বলে' ডাক্‌বে না। কেউ তো আর দুষ্টুমি করে' সারা কপালটায় চন্দন লেপে দেবে না। অরুণ চুপ করে' শুয়ে রইল চোখ বুজে আর চোখ দিয়ে অশ্রু-স্রোত বইতে লাগ্‌লো।

দূরে দু'একটা শাঁখ বেজে উঠ্‌লো। হয়তো কোন্ বোন তার স্নেহের ভাইকে আজ ফোঁটা দিচ্ছে। কত আনন্দই আজ তারা পাচ্ছে। আর সে! প্রতি শাঁখের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

ঠিক এমনি সময় ঘরে ঢুক্‌লো জয়ন্তী সমস্ত লজ্জা-কুণ্ঠাকে জয় করে'। পরণে তার একখানি গোলাপী-রঙের সোনালী পাড়ের চেলীর কাপড়। আঁচলটা তার গলার উপর দিয়ে ঘুরে বুকের উপর পড়েছে। হাতে তার এক-খানি থালায় সাজানো শ্বেত-চন্দন আর ধান দূর্ব্বা আর নিজের হাতে তৈরী বিবিধ মিষ্টান্ন। জয়ন্তী থালা হাতে করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরুণের কান্না দেখ্‌তে লাগ্‌লো—সে বুঝ্‌তে পার্‌লে আজ অরুণের এ কান্না কিসের জন্যে। জয়ন্তীরও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে কান্নাধরা গলায় ডাক্‌লো - দাদা, ওঠো; আমি তোমায় ফোঁটা দিতে এসেছি।

অরুণ চম্‌কে বলে' উঠ্‌লো—রেণু এলি!

অরুণ তাড়াতাড়ি মুখ তুলে অশ্রুজলের মধ্যে দিয়ে ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখ্‌লে—রেণুর স্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্তী!

অরুণ একটু লজ্জিত হয়ে কান্না লুকাবার চেষ্টায় চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে হেসে বল্‌লে—তুমি একদিন আমার রেণুর জায়গা দখল কর্‌বে এ আমি জান্‌তাম।

অরুণ তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে এসে আসনে বস্‌ল। জয়ন্তী লজ্জারুণ মুখে তার সাম্‌নে বসে' তার সদ্যস্নানশীতল আঙুলে শ্বেতচন্দন তুলে অরুণের কপালে ভাইফোঁটা দিলে এবং অরুণের পায়ের কাছে মাথাটা নত কর্‌লে, অসীম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে। অরুণ তাড়াতাড়ি থালা থেকে ধানদূর্ব্বা তুলে নিয়ে জয়ন্তীর নত মস্তকের উপর বর্ষণ করে' বল্‌লে—কি আর আশীর্ব্বাদ কর্‌ব—তুমি আজীবন তোমার নামকে সার্থক করে' চোলো।

শ্রী প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরে

আমার হৃদয়খানি লহনি হরিয়া
নিমেষের সম্মোহনে, রূপবহ্নি মাঝে
উন্মত্ত পতঙ্গ সম অন্ধকার সাঁঝে
পড়ি নাই মৃত্যুলোভী। লয়েছ জিনিয়া
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সূক্ষ্ম আকর্ষণে
অপ্রমত্ত চিত্ত মোর, হেমন্ত-নিশীথে
শ্যামতৃণদলরাজি যথা ক্ষণে ক্ষণে
হিমানীর কণাগুলি নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
বক্ষোমাঝে লয় টানি। অরণ্যের স্থানে
ধীরে ধীরে গ্রামখানি বর্ষ বর্ষ ধরি'
ক্রমে যথা উঠে ফুটি' কুটীরে উদ্যানে
শস্যক্ষেত্রে, সুখশোভা সফলতা ভরি',
হৃদয়-প্রান্তর মোরে গহন বিপুল
তেমনি করেছে আজি ঐশ্বর্য্যে অতুল।

শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা

গতিবেগ ও ধ্বনিতরঙ্গের ছবি—

আমাদের একটি বন্ধুর একটিও ফোটোগ্রাফ নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, যতবার তিনি ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার সামনে বসিয়াছেন, ততবারই ঠিক ছবি লইবার মুহূর্ত্তে, হয় তাঁর নাকের উপর একটা মাছি আসিয়া বসিয়াছে, নয়ত পাঞ্জাবীর তলায় ঘাড়ের নীচে একটা পিঁপড়ে কামড়াইয়াছে, বা এমনি কিছু একটা অঘটন ঘটিয়াছে যাহার জন্য একটুও না নড়িয়া কাঠের মূর্ত্তির মতো নিঃসাড় হইয়া বসিয়া থাকা তাঁহার ঘটে নাই। বিরক্ত হইয়া ক্যামেরার মুখের সামনে বসা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কিন্তু সময়ের ক্ষিপ্রতাই এই ছবি লওয়ার কাজে একমাত্র আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। গুলি ক্যামেরার মুখের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ঠিক সময়টি ধরিয়া বোতাম টেপা যে সম্ভব হইয়াছে, ইহাই বেশী আশ্চর্য্যজনক। গুলির বেগজনিত ধ্বনিতরঙ্গকেই এই কাজে খাটানো হইয়াছে। ক্যামেরার মুখের সম্মুখে গুলি উপস্থিত হইবামাত্র এই ধ্বনিতরঙ্গের অদৃশ্য স্পর্শে ক্যামেরার দৃষ্টিমুখের পলক আপনা হইতেই সরিয়া যায়। ধ্বনিতরঙ্গ কোণাচে কি গোল ইত্যাদির মাপ হইতে গুলির গতিবেগও গণিয়া বলা সম্ভব হইয়াছে।

স চ
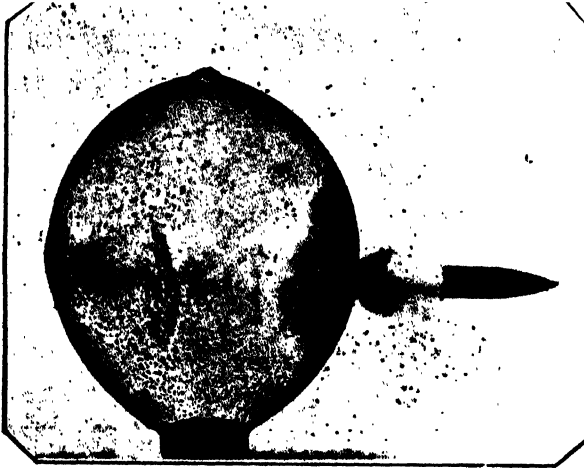
বুদ্বুদ ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির গতির ফোটোগ্রাফ
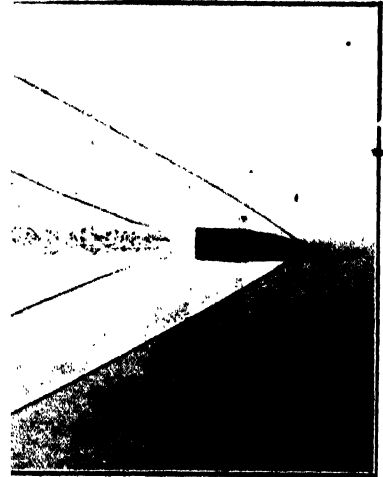
বন্দুকের গুলির গতিবেগে উৎপন্ন শব্দতরঙ্গের ফোটোগ্রাফ

আজকালকার মাঝারি রকম ক্যামেরাতেও এক মুহূর্ত্তের শতাধিক ভাগের একভাগ সময়ে ছবি লইতে পারা যায়। ইহার ফলে খুব দ্রুত চলন্ত গাড়ী, বা উড়িয়া-যাওয়া পাখীর ছায়ার ছবি লওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু রাইফেল বন্দুকের মুখ থেকে বাতাসে ছোটা গুলির ছবিও যে লওয়া সম্ভব, ইহা এতদিন একেবারেই অচিন্তনীয় ছিল। কিন্তু আমেরিকার "ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ ব্যুরো অব্ ষ্টাণ্ডার্ড্‌স্"এর চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। নবোদ্ভাবিত ছবি লইবার পদ্ধতিতে সেকেণ্ডে ৩০০০ ফুট বেগে চলন্ত গুলির ছবি ফোটোগ্রাফের প্লেটে স্পষ্ট উঠিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে আর-এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে, গুলির গতি-মুখে ইথরে শব্দ-কম্পনের তরঙ্গও প্লেটের বুকে ধরা পড়িয়াছে। এত তাড়াতাড়ি এই ছবি লওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়, যে, সাবানের ফেনার বুদ্বুদের মধ্য দিয়া গুলি চলিয়া যাইবার পর সেই বুদ্বুদ ফাটিতে পর্য্যন্ত সময় পায় না।
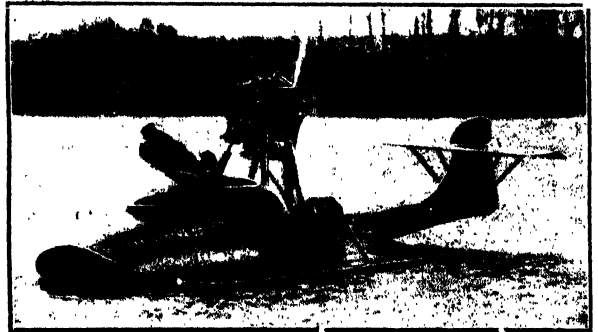
মৎস্যাকৃতি জলযান

মৎস্যাকৃতি জলযান—

দেখিতে প্রকাণ্ড একটা মাছের মত, গতি ঘণ্টায় ৬৩ মাইল, এমন একপ্রকার নূতন জলযান তৈয়ারি হইয়াছে। এই জলযানের প্রপেলার বা ঘূর্ণী-দাঁড় ৩০০ হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিনের শক্তিতে ঘোরে। মাঝখানে যাত্রীদের বসিবার স্থান আছে। চালাইবার ফিরাইবার কলকব্জা সবই উড়ো-জাহাজের মত।

পায়ের জোর—

বার্লিনে এক ভদ্রলোক তাঁর অদ্ভুত পায়ের জোর দেখাইতেছেন। পায়ের উপর একটা ফ্রেমে নাগরদোলা ঝোলান আছে; তাহাতে এক-

পায়ের উপর নাগরদোলা

সঙ্গে আটজন লোক বসিয়া ঘুরপাক খাইতে পারে। ভদ্রলোক একটা রকে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকেন। পায়ের উপর নাগরদোলা থাকে। হাতের সাহায্যে তাহা পায়ের উপরে ঘোরে।

পথে টেলিফোন—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোটর-ভ্রমণকারীর দল অনেক। সময় সময় রাস্তায় মোটরের কলকব্জা বিগ্‌ড়াইয়া গেলে ভ্রমণকারীদের বড় কষ্ট পাইতে হইত। এখন পথে পথে এক মাইল অন্তর টেলিফোন বসাইয়া এই পথকষ্ট দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। টেলিফোন বাক্স-বন্ধ থাকে। মোটর-ভ্রমণকারী সামান্য বাৎসরিক চাঁদা দিয়া একটি চাবি পাইতে পারেন। অনেক স্থানে ফোনের নিকটবর্ত্তী কোন একটা বাড়ীতে চাবি থাকে—চাহিলেই পাওয়া যায়। অনেক স্থলে মোটর-মেরামতীর দোকানদারেরা ফোনের সমস্ত খরচা দেয়, ভ্রমণ-কারীকে কোন খরচা দিতে হয় না। এখন মোটর-ভ্রমণকারীদের মোটর খারাপ হইলে আর তাহা লইয়া পূর্ব্বের মত বিপদে পড়িতে হইবে না।

পাকা সাঁতারী—

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি এখন সাঁতরাইবার সময় একটা নৌকাতে সাতজন লোককে বসাইয়া এক মাইল টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন। এইরূপ ভার টানিয়া লইয়া যাওয়াতে যথেষ্ট শক্তি এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

সাঁতারীর বাহাদুরী

পাথরের নুড়ির তৈরী গির্জ্জা—

যে গির্জ্জার ছবি দেওয়া হইল, তাহা বিশেষ কোন বাঁধা-ধরা ছাঁচে তৈয়ারী না হইলেও দেখিতে বেশ সুন্দর। গির্জ্জাটির নাম "বেথানি মন্দির"—এবং কেবল মাত্র দুইজন লোকের চেষ্টা এবং উদ্যমে তৈয়ারী হইয়াছে। একজন লোক পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক গির্জ্জা দেখিয়া এই গির্জ্জার নক্সা প্রস্তুত করেন এবং দ্বিতীয়জন মিস্ত্রি। আশেপাশের গ্রামের ৫০ জন লোকে বড় বড় পাথরের নুড়ি জোগাড় করিয়া নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করে। মিস্ত্রি একলা এইসমস্ত পাথরের ঢেলা থাকে থাকে বসাইয়া ১৮ মাসে এই গির্জ্জা প্রস্তুত করেন। এই গির্জ্জার হলে ৩০০ জন লোক বসিতে পারে। পাশে একটি নৈশ বিদ্যালয়ের স্থান আছে। জিনিসপত্র খরিদ করিয়া এই গির্জ্জা তৈয়ার করিতে হইলে প্রায় ৫০,০০০ ডলার অর্থাৎ ইহার প্রায় ৪ গুণ টাকা লাগিত এবং কেবলমাত্র ৫০ জন গ্রামবাসীর দ্বারা এই অর্থ জোগাড় করাও অসম্ভব হইত।

দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ—

সুইজারল্যাণ্ডে অনেক পর্ব্বত-আরোহণকারী নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বিষম উচ্চস্থানে দড়ির সাহায্যে আরোহণ করেন। দড়ি একটু আল্‌গা হইয়া বা ফস্কাইয়া গেলেই অনিবার্য্য মৃত্যু। জুঙ্গবার্গ পাহাড়ের মত সোজা খাড়া পাহাড় খুব কমই আছে।

পাথরের নুড়ির তৈরী গির্জ্জা
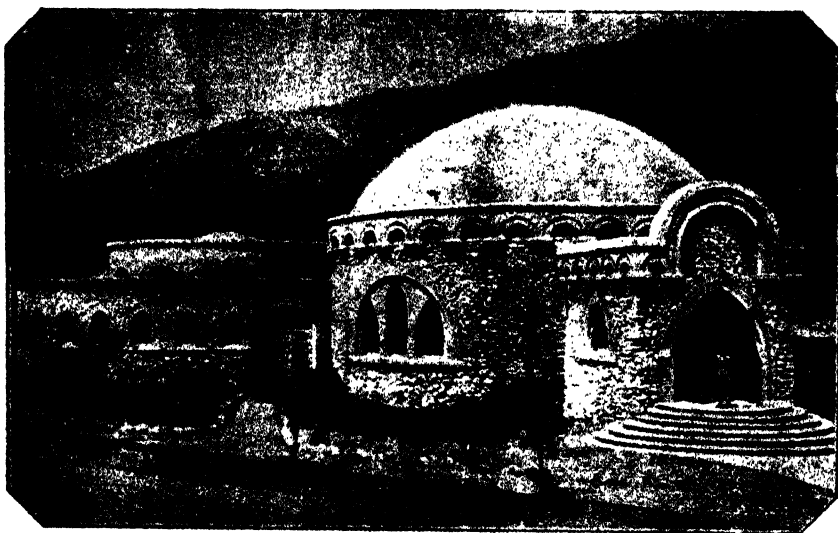
দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ

দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ

এই পাহাড়ের আটটি চূড়া আছে—সবচেয়ে ছোটটির উচ্চতা ৫৬৭৩ ফুট এবং সবচেয়ে বড়টির উচ্চতা ৬০২৭ ফুট। পাথরের ডগায় ডগায় দড়ি বাঁধিয়া আরোহণকারী পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে।

আগুন-জ্বালা ঘড়ি—

ভোর বেলা অনেকে ঘড়ির এলাম্‌-ঘণ্টা শুনিয়া বিছানা ত্যাগ করেন। একজন ফরাসী ঘড়ি-মিস্ত্রী এই এলাম্‌-ঘণ্টা-ওয়ালা ঘড়ির সাহায্যে স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ঘণ্টা বাজিবামাত্র

আগুন-জ্বালা ঘড়ি

ল্যাম্পের বার্ণারের মুখ খুলিয়া যায় এবং চকমকির মত একটা জিনিসের উপর (ferrocerium) একটা হাতুড়ি খসিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ল্যাম্পের উপর যদি রাত্রেই এক বাটি বা কেট্‌লি জল চাপানো থাকে তবে বিছানা ত্যাগ করিয়াই চায়ের আনন্দটুকু বেশ উপভোগ করা যায়।

কুকুর ধাত্রী

কুকুর ধাত্রী—

একটি কুকুরকে পাকা ধাত্রীর মতন শিশুর মুখে দুধের বোতল ধরিয়া দুধ খাওয়াইতে শিখানো হইয়াছে। সে দুধের বোতল বেশ সহজভাবে খোকার সুবিধামত করিয়া ধরিতে পারে।

হেমন্ত

চতুর্ম্মুখ আম—

গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে "পঞ্চমুখী পেঁপের" ছবি বাহির হইয়াছিল। আজ এইসঙ্গে একটি চতুর্ম্মুখ আমের ছবি দেওয়া হইল। আমটি পাবনা জেলার খেতুপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রেরিত। জোড়া বেগুন, জোড়া লঙ্কা ইত্যাদি সচরাচর দেখা যায় বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে ৪টি একসঙ্গে এক বোঁটায় বড় দেখা যায় না। বামদিকের চিত্রে আমটির বাহ্যিক আকৃতি এবং ডানদিকের

চতুর্মুখ আম
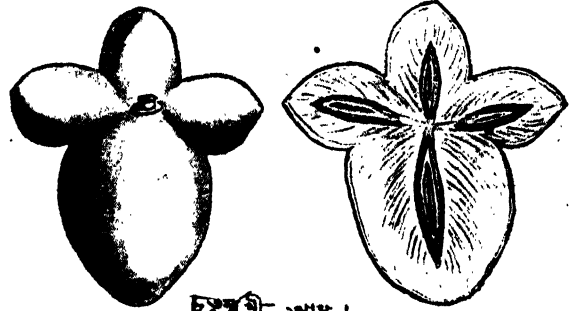
চিত্রে আমটি কাটিয়া ভিতরকার অংশগুলির বিন্যাস ও পরস্পরের সহিত সংযোগ দেখান হইয়াছে।

বীণাগাছের বিচিত্র শ্বাসযন্ত্র—

বায়ু সাধারণ প্রাণীর পক্ষে যেমন, উদ্ভিদের পক্ষেও তেমনই প্রয়োজনীয়। বায়ু হইতে উদ্ভিদ অম্লজান (Oxygen) ও অঙ্গারাম্লজান (Carbon dioxide) গ্রহণ করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সাধারণ প্রাণীর মধ্যে অনেকেরই নাসিকা আছে। কিন্তু উদ্ভিদের বাহ্যত সেরূপ কোন অঙ্গ দেখা যায় না। তবে উদ্ভিদ বায়ু গ্রহণ করে কেমন করিয়া? অধিকাংশ উদ্ভিদ, বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ, তাহাদের গাত্রত্বকস্থ কোষসমূহ (Cells) ও পত্রত্বকস্থ ষ্টোম্যাটা (Stomata) নামক বিশিষ্ট ছিদ্রসমূহের সাহায্যে বায়ু হইতে অম্লজান ও অঙ্গারাম্লজান শরীরস্থ করে।

যে-সমস্ত উদ্ভিদ্ সাধারণ ভূমিতে জন্মে তাহাদিগকে বায়বীয় খাদ্যের অভাব ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু যে-সমস্ত উদ্ভিদ্ জলে বা জলের ধারে কিম্বা কাদা-মাটিতে জন্মে তাহাদিগকে অনেক সময় আংশিক বা পূর্ণভাবে জলের বা কাদার নীচে থাকিতে হয় বলিয়া উপরোক্ত বায়বীয় পদার্থের বিশেষ অভাব ভোগ করিতে হয়। এই অভাব পরিহারের জন্য কোন কোন উদ্ভিদে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বীণা'-গাছের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই 'বীণা' বা "বায়েন" গাছ সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে
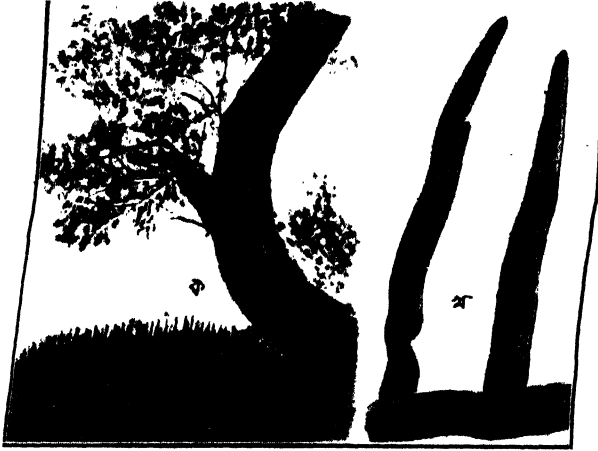
বীণাগাছের বিচিত্র শ্বাসযন্ত্র
(ক) বীণাগাছ ও তাহার শিকড়সমূহ। (খ) শিকড়-যুগল

সমুদ্রের ধারে জন্মে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম এভিসেনিয়া অফিসিনেলিস্ (Avicennia officinalis)। এ গাছের মৃত্তিকানিহিত অংশগুলি অনেক সময় জোয়ারের জলে আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া ইহার পক্ষে বায়বীয় খাদ্য সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইহার গোড়ার আশে পাশে শোলার মত উপাদানে গঠিত এক বিশেষ রকমের শিকড় মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধদিকে উঠে (চিত্রে দেখুন)। এই রূপান্তরিত শিকড়গুলি তাহাদের ত্বকের বিশিষ্ট ছিদ্রসমূহের সাহায্যে বায়বীয় পদার্থ গ্রহণ করে। এই শিকড়গুলিই 'বীণা'-গাছের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অংশের শ্বাসযন্ত্রের কার্য্য করে। উদ্ভিদবিজ্ঞানে এই শিকড়গুলি নিউমেটোফোর্‌স্ (Pneumatophores) নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতির কি অদ্ভুত ব্যবস্থা!

পিয়েমডি

জমানো কেরোসিন—

সম্প্রতি আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক তরল কেরোসিন জমাইয়া বরফের মত শক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই জমানো কেরোসিন টুকরা টুকরা করিয়া কয়লা বা কাঠের মত জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা যায়। বাতির মত ঘরেও ইহা জ্বালাইয়া রাখা চলে। ইহাতে আবার জল মিশাইয়া দিলেও জ্বালান চলে। জমানো এবং সঙ্কুচিত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া এই কেরোসিনের উত্তাপ-শক্তি এক গ্যালন তরল কেরোসিনের উত্তাপ-শক্তি অপেক্ষা ½ ভাগ বেশী। ইহাকে বাতিরূপে ব্যবহার করিবার সময় সলতের দরকার হয় না। দেশলাইর কাঠি দিয়া অনায়াসে জ্বালা যায়, ইহা ঠিক লম্বা কাঠের টুকরার মত জ্বলিতে থাকে। শেষ অবধি ইহার আলো বা উত্তাপ সমানই থাকে, বাড়ে না বা কমে না। শেষকালে খানিকটা তেল পড়িয়া থাকে।

এই আবিষ্কারের একটা খুব সুবিধার দিক আছে। আগুন লাগিয়া কেরোসিনের যে বিস্ফোর ঘটে, ইহাতে তাহা হইবার ভয় নাই।

যমজের জীবন—

সম্প্রতি আমেরিকায় শ্যামদেশের দুইটি যমজ ভগ্নীর মৃত্যু হওয়ায় সেখানকার কৌতূহলী লোকে অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটি অদ্ভুত যমজ বালক-বালিকার জীবন সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তিনটির কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিব।

শ্যামদেশের যমজ-যুক্ত ভাই

প্রথম—শ্যাম-দেশের যমজ-যুক্ত ভাই। পি, টি, বার্ণাম নামে এক ভদ্রলোক শ্যামদেশে ইহাদের সন্ধান পান এবং পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরাইয়া লইয়া তাহাদিগকে জগৎ-প্রসিদ্ধ করিয়া তুলেন। এই ছেলে দুইটির মুখাকৃতিতে পরস্পর বিশেষ সাদৃশ্য ছিল না। কিন্তু তাহাদের রুচি অদ্ভুতভাবে এক-রকমের ছিল। তাহাদের দেহ পাশাপাশি যুক্ত ছিল—যেন কাঁধ ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। জোড়া শরীরেও তাহারা অনায়াসে ডিগবাজি খাইতে পারিত, কোন কষ্ট হইত না। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক ব্রিটিশ বণিক ইহাদের প্রথমে দেখিতে পান। তখন শ্যামদেশের রাজা কুসংস্কার-বশে ইহাদের কোন অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা মনে করিয়া ইহাদের জীবন নাশ করিবার মতলব করিতেছিলেন। ইহাদের নাম ছিল চাং ও ইং।

দ্বিতীয়—যমজযুক্ত ভগ্নী। ইহারা এখন ষোল বৎসরের, ইহাদের দেহও পাশাপাশি যুক্ত,—তবে কিছু পিঠের দিকে। ইহারা দেখিতে পরস্পর প্রায় এক। কিন্তু শ্যামদেশের ছেলে দুটির মত এদের রুচি এক নয়। এরা বুদ্ধিমত্তায় একেবারে বিভিন্ন। সঙ্গীত বিষয়ে আবার ইহাদের শক্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

তৃতীয়—আর-এক যমজ ভগ্নী। ইহারা চেহারায় যেমন এক, বুদ্ধিমত্তায়ও তেমনি এক। ইহাদের দেহ যুক্ত নহে। ডাক্তার আনর্ল্ড্ গেসেল্ নামে এক ব্যক্তি ইহাদের আবিষ্কার করেন।

এই-রকম একটি ছবি আঁক। খানিক পরে দুইজনেরই ছবি আঁকা হইলে পরীক্ষক দেখেন যে তাহাদের দুজনেরই ছবি প্রায় একই রকমের হইয়াছে। এই ভাবে পঁচিশ বার পরীক্ষা করিয়া পঁচিশবারই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যমজ-যুক্ত ভগিনী

যমজ ভগিনী

যমজ ভগিনীর আঁকা ছবির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য

তিনি ইহাদের বার বার পরীক্ষা করিয়া ইহাদের বুদ্ধি, মনোযোগ ও চিন্তা-প্রণালীর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। একবার তিনি এই দুইটি মেয়েকে দুইটি বিভিন্ন ঘরে রাখিয়া বলেন—একটি গাছ, তার তলায় একটি বেঞ্চ ও একটি মানুষ,

দাঁতের উপর দাঁড়ানো—

আমেরিকায় একটি মহিলা এক অদ্ভুত ব্যায়ামের পরিচয় দিতেছেন। মাটির উপর একটি রবারের প্যাড্ রাখিয়া তাহার উপর দাঁতের উপর-পাটি চাপিয়া রাখিয়া তাহাতেই সমস্ত দেহের ভার রাখিয়া এক মিনিটেরও বেশী সময় ইনি খাড়া হইয়া থাকিতে পারেন। ইহাতে গলার পেশীসমূহ যথেষ্ট ভারসহ ও শক্ত হওয়া দরকার।

গুপ্ত

ডাকটিকিটের ইতিহাস—

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানবের আচার ব্যবহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সভ্যতা-প্রয়াসী মানবের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা একে একে জগতে দেখা দিয়াছিল। আজকাল ডাকটিকিটের প্রচলন পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে; এমন কোন স্থান দৃষ্ট হইবে না যেখানে একটা লোক ডাকটিকিটের কথা না জানে।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ডাক-বিভাগের নিয়মানুসারে চিঠি পাঠাইবার সময় চিঠির গায়ে ডাকটিকিট আঁটিয়া দিতে হইত না। যে স্থানে চিঠি বিলি হইবে সেখানকার পোষ্টঅফিসের লোকেরা নগদ পয়সা আদায় করিয়া লইত। ইহাতে প্রধান অসুবিধা ছিল—হিসাবপত্র রাখিবার জন্য অনেক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইত ও তাহাতে প্রভূত ব্যয়াধিক্য ঘটিত এবং তজ্জন্য পত্রাদি পাঠাইবার খরচ বড় বেশী পড়িত। এইসকল ব্যয়াধিক্য ও বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার জন্য তদানীন্তন পার্লামেণ্টের একজন খ্যাতনামা মেম্বর সার রোলাণ্ড্ হিল বিশেষ লাগিয়া পড়েন, এবং তাঁহার চেষ্টাতেই ডাকবিভাগের অসুবিধা নিবারণার্থ ডাকটিকিটের প্রচলনের জন্য ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে "Uniform Penny Postage Act" পাশ হওয়ায় সেই বৎসর হইতে ১ পেনী ডাকটিকিট প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ২ পেনী টিকিট দেখা দেয়। ক্রমে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাকবিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল ও পৃথিবীর সমস্ত দেশসমূহে বিভিন্ন প্রকারের ডাকটিকিট প্রচলিত হইয়া মানবকে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানে সাহায্য করিয়াছিল।

৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার ডাকটিকিট সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব। ২।১ জন সংগ্রহকারীর নিকট ডাকটিকিট প্রচলিত হইবার সময়কার টিকিট কদাচ দুই একখানি পাওয়া যায়। এরূপ একখানি পুরাতন টিকিটের দাম হাজার হাজার টাকা। ডাকটিকিট প্রচলিত হইবার ১০।১৫ বৎসর পরে পূর্ব্ব সময়ের ডাকটিকিট সংগ্রহ করিতে অনেকে আরম্ভ করেন। উহার ফলে পুরাতন ডাকটিকিট সংগ্রহ করা বড়লোকদের মধ্যে একটা ফ্যাসান ও, গরীবদের অর্থ-উপার্জ্জনের একটি উপায় স্বরূপ হইয়া উঠে।

এই পুরাতন ডাকটিকেট সংগ্রহ করাকে ইংরেজীতে Philately

নানা দেশের দুর্লভ ও প্রথম ডাকটিকিট—
(১) ইংলণ্ডের প্রথম ১ পেনী দামের টিকিট, (২) ফ্রান্সের প্রথম টিকিট, (৩) সেডাঙের প্রথম টিকিট, (৪) আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রথম প্রকাশিত দুখানি ডাকটিকিট,
(৫) ব্রেজিলের প্রথম টিকিট, (৬) ব্রিটিশ গায়ানার প্রথম টিকিট,
(৭) মেরুযাত্রার ডাকটিকিট

বা Timbrology বলে। এই কথা দুইটির উৎপত্তির একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। প্যারিসের হারপিন নামে এক ব্যক্তি এই কথা দুইটি সৃষ্টি করেন।

আমেরিকার ব্রুক্লিন ইনষ্টিটিউটে সর্ব্বপ্রথম পুরাতন ডাকটিকিট সম্বন্ধীয় তথ্য আলোচনা করিবার জন্য একটি আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ডাকটিকিট-সংগ্রহকারীদের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত লণ্ডনে ১৮৯০ ও ১৮৯৭ সালে ডাকটিকিটের প্রদর্শনী করা হইয়াছিল। এই সময়ে পাঁচ শতের উপর পুস্তক ও অসংখ্য ডাকটিকিট প্রদর্শিত হইয়াছিল। মূল্যবান আলেখ্যের ন্যায় প্রদর্শিত অনেক টিকিট ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষেরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখিয়া দিয়াছেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'Stamp Collectors' Magazine" ও "Timbre Post" কাগজ প্রথম দেখা দেয়। লণ্ডনে ১৮৬৯ খৃঃ অঃ "The London Philatelic" ও ফ্রান্সে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "La Societe Francaise de Timbrologie" সভা স্থাপিত হয়। পরে পুরাতন ডাকটিকিট একটা আর্টের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচ্যের বিষয় বলিয়া স্থান পাইয়াছে।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রথম ডাকটিকিট ওয়াসিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের প্রতিকৃতি সহিত প্রচলিত হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ফ্রান্সের প্রথম ডাকটিকিট কৃষিদেবী সিরিসের নামাঙ্কিত হইয়া প্রথম দেখা দেয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর প্রথম ডাকটিকিট প্রচলিত হয়।

ইংলণ্ডে ডাকটিকিট প্রচলিত হওয়ার দশ বৎসর পরে কুড়িটি দেশে ডাকটিকিট প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তী ৬০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশে ডাকটিকিটের প্রচলন করা হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলে প্রচলিত রকমারী ডাকটিকিটের সংখ্যা হইবে বিশ হাজারের উপর (যে-সকল ডাকটিকিটের প্রচলন আজকাল আর নাই তাহা বাদে)। নীচে কয়েকখানি মূল্যবান বিরল ডাকটিকিটের উল্লেখ করিতেছি।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচলিত মরিশাস দ্বীপের একখানি ডাকটিকিটের দাম আজকাল ১৪৫০ পাউণ্ড। ব্রিটিশ গায়ানার প্রথম ১ পেনী টিকিটের দামও দুই হাজার পাউণ্ডের উপর। কানাডার ১২ পেন্স মূল্যের টিকিট (Canada 12 Pence) আজকাল পাওয়া যায় না। বাজারে এ পর্য্যন্ত উহা বিক্রীত হয় নাই। আনামের সেডাং (Sedang) প্রদেশের ডাকটিকিট সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। সেডাংএ রাজা প্রথম ম্যারী কর্তৃক ১৮৮৯ সালে ডাকটিকিট প্রথম প্রচলিত হয়। ঐ টিকিটের নামকরণ করা হইয়াছিল "S. M. le Roi des Sedangs." ইংলণ্ডের বর্তমান সম্রাট ডাকটিকিট-বিজ্ঞানে (Philately) বিশেষ অভিজ্ঞ। ১৯০৩ সালে তিনি যখন যুবরাজ ছিলেন সেই সময় তিনি কানাডার

নূতন ডাকটিকিটের ডিজাইন স্বয়ং প্রস্তুত করেন ; এই বৎসর ইংলণ্ডে ডাকটিকিটের প্রদর্শনীতে তাঁর সংগ্রহ মেডেল পাইয়াছে।

আমেরিকার আর্জ্জেণ্টাইন কনফেডারেশনের এক অংশ পূর্ব্বে "করিয়েণ্টিস সাধারণতন্ত্র" নামে অভিহিত হইত। এখানকার প্রথম ডাকটিকিটের নক্সা এক রুটিবিক্রেতার ছেলে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ডাকটিকিটের সহিত রুটিবিক্রেতার ছেলের নাম জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

ক্যানাডার নিউব্রান্সউইকে (New Brunswick) ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সেখানকার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল কর্ণেলকে নূতন ডাকটিকিট প্রচলন করিবার ভার দেওয়া হয়। তিনি ডাকটিকিট ছাপিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যান। আমেরিকা হইতে টিকিট ছাপা হইয়া আসিলে দেখা গেল ৫ সেণ্ট টিকিটে রাজার পরিবর্ত্তে কর্ণেলের প্রতিমূর্ত্তি ছাপা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণেলকে এই টিকিট বাতিল করিয়া পুনরায় ৫-সেণ্ট টিকিট ছাপাইয়া আনিতে বলায় কর্ণেল তাহা করিতে অস্বীকার করেন ও কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য নিউব্রান্সউইক ছাড়িয়া চলিয়া যান।

১৯১০ সালের ২৯ শে নবেম্বর কাপ্তেন স্কট লোকজন সহ টেরা-নোভা জাহাজে নিউজীলণ্ড বন্দর হইতে মেরু আবিষ্কারে গমন করেন। নিউজীলণ্ড-গবর্ণমেণ্ট মেরু-ভ্রমণের জন্য আলাদা টিকিট প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। কেপ্ ইভান্সে একটি মেরু-পোষ্টাফিস স্থাপন করা হইয়াছিল ও কাপ্তেন শ্যাক্‌ল্টন পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেপ ইভান্স্ হইতে অন্যান্য স্থানে যে-সব চিঠি লেখা হইয়াছিল সে-সকল চিঠির একখানি টিকিটের দাম আজকাল অনেক। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী কাপ্তেন স্কটের মৃত্যুর কথা ও টেরা-নোভার দুর্ঘটনার কথা লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলে সকলের মন কাপ্তেন স্কট ও তাঁহার সহচরগণের প্রতি সম্মানে ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেরু-আবিষ্কারে প্রেরিত মৃতদের স্মৃতিরক্ষা ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য মেরু-ভ্রমণে ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত টিকিটগুলি বিক্রয় করা হয়। পেনী টিকিট একখানি ৫ শিলিং ও ½ পেনী টিকিট একখানি ২৫ শিলিং মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

[এই প্রবন্ধের উপকরণ Strand Magazine ও Nelson's Encyclopaedia হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।]

—

ঘোড়া-টানা গাড়ী—

ঘোড়ায় চিরকাল গাড়ী টানে, কিন্তু গাড়ী যে ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যায় একথা শোনা যায় না। আমেরিকায় বাল্‌টিমোর প্রদেশে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য একপ্রকার গাড়ী ব্যবহার করা হয় তাতে ঘোড়ায় গাড়ী না টেনে গাড়ী ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যায়। ঘোড়াকে সামনের দিকে না জুতে পিছনে জোতা হয়। ঘোড়া অনেক সময় গাড়ী টান্‌তে চায় না, সেইজন্য বোধহয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্যাসোলিন-মোটর দ্বারা গাড়ী চালিত হয়, গাড়ীর চালক দরকারমত গাড়ী থামিয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করে। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে "to put the cart before the horse" অর্থাৎ ঘোড়ার অগ্রে গাড়ীকে স্থাপন করা। এইক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই প্রবাদবাক্যের অনুসরণ করা হয়েছে।
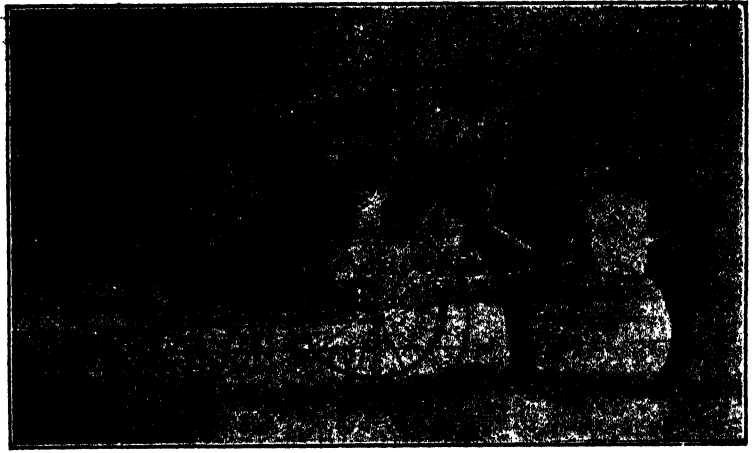
ঘোড়া টানা-গাড়ী

—

বীজের তৈরী থলে—

নিউজীলণ্ডদ্বীপবাসী জুলুরা আপেলের বীজ গেঁথে একপ্রকার থলে তৈয়ারী করে। বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে আত্মীয়গণকে তারা ঐ থলে উপহার দেয়। শক্ত সরু সুতা দিয়ে বীজগুলি অতিপরিপাটী করে গাঁথা হয়। এই সঙ্গে ছাপা ছবির থলেটি গাঁথতে দুইহাজারের উপর বীজের প্রয়োজন হয়েছিল। এই থলেটি এক জুলু সর্দ্দার কর্ত্তৃক অপর এক জুলু সর্দ্দারকে উপহার প্রদত্ত হয়েছিল।
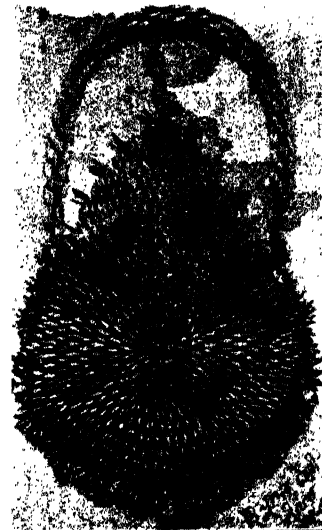
বীজের তৈরী থলে

দিনের পরিমাণ—

দিন ও রাত্রির পরিমাণ সকল দেশে সমান নয়,—কোথাও রাত্রির পরিমাণ বেশী, দিনের পরিমাণ কম ; কোথাও দিনের পরিমাণ বেশী, রাত্রির পরিমাণ কম। নীচে কয়েকটা দেশের বৎসরের সবচেয়ে লম্বা দিন ও রাত্রির পরিমাণ দেওয়া হইল।

সুইডেন—সুইডেনের ষ্টক্‌হলম্ সহরে সবচেয়ে লম্ব দিন ১৮॥০ ঘণ্টা স্থায়ী হয় ও সেদিন রাত্রি কেবল ৫॥০ ঘণ্টায় শেষ হয়।

স্পিজ্ বার্জ্জেন সহরে—স্পিজ্ বার্জ্জেন সহরে বৎসরের লম্বাদিন সমভাবে ৭৫ দিন স্থায়ী থাকে। ৭৫ দিন পরে আবার কিছুকালের জন্ম রাত্রির আকার বর্দ্ধিত হয়।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও প্রুসিয়া—ইংলণ্ডের লণ্ডন ও অন্যান্য কয়েকটি সহরে, জার্ম্মানীর ব্রেমেন ও প্রুসিয়ায় বৎসরের লম্বাদিনের পরিমাণ ১৬॥০ ঘণ্টা এবং জার্ম্মানীর হামবার্গ ও প্রুসিয়ায় ডান্‌জিগ সহরে ১৭ ঘণ্টা।

নরওয়ে—নরওয়ের ওয়ার্ডবুরি সহরে সেখানকার বড়দিন ২১ মে হইতে আরম্ভ লইয়া ২২ জুলাই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৬৩ দিন স্থায়ী হয়।

রুশিয়া ও সাইবেরিয়া—রুশিয়ার পেট্রোগ্রাড্ ও সাইবেরিয়ার টোবলস্ক্ সহরে সর্ব্বাপেক্ষা বড়দিনের পরিমাণ ১৯ ঘণ্টা ও ছোট দিনের পরিমাণ ৫ ঘণ্টা।

ফীন্‌ল্যাণ্ড—ফীন্‌ল্যাণ্ডের টানিয়া সহরে ২১শে জুন হচ্ছে সেখানকার বড়দিন। সে দিন ২২ ঘণ্টা স্থায়ী। কিন্তু খৃষ্টমাসের সময় রাত্রির আকার বর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়ায় ২১ ঘণ্টায় ও দিন কমিয়া আসিয়া ৩ ঘণ্টায় শেষ হয়।

আমেরিকা—আমেরিকার নিউইয়র্কের বড়দিনের পরিমাণ ১৫ ঘণ্টা। মণ্ট্রেয়াল্ ও কানাডায় ১৬ ঘণ্টা।

আমাদের দেশে দিন ও রাত্রির পরিমাণের পার্থক্য অন্যান্য দেশের ন্যায় অত বেশী নয়। ঋতু-বিশেষে কেবল ২।৪ ঘণ্টার তফাৎ দেখা যায়।

জগতের দুইটি বৃহত্তম ঘড়ি—

এতদিন ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলের টাইমপিস্ বিগবেন (Big Ben) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘড়ি আখ্যা পাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু লিভারপুলের "রয়াল লিভার ক্লক" আকারে ও আয়তনে বিগবেনকে পরাজিত করিয়াছে। ১২ বৎসর পূর্ব্বে লিষ্টারের মেসার্স জেণ্ট কোম্পানী রয়াল লিভার ক্লক নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে রয়াল লিভার ফ্রেণ্ডলি সোসাইটির সৌধচূড়ায় উহা স্থাপিত করা হইয়াছে।

দুইটি ঘড়ির তুলনামূলক আকার ও আয়তনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

	রয়াল লিভার ক্লক	বিগবেন
১।	ডালার ব্যাস—২৫ ফুট	২৩৷০ ফুট
২।	মিনিট-কাঁটার দৈর্ঘ্য—১৫ ফুট	১১ "
৩।	ঘণ্টাজ্ঞাপক অঙ্কের আকার ৩ "	২ "
৪।	তলা হইতে ডালার মধ্য পর্য্যন্ত ২২০ ফুট	১৮০ "

ইতরপ্রাণীর ষষ্ঠেন্দ্রিয়—

ইতর প্রাণীদের একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তারা আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা অনেক পূর্ব্বেই জানিতে পারে ও সতর্ক হয়।

সমুদ্রবিহারী গাল পক্ষী (Sea-gull) ঝড়ের সূচনা অনেক পূর্ব্বেই জানিতে পারে ও ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া নিরাপদ স্থানের দিকে যাত্রা করে। ইহাদিগকে আকস্মিক ভাবে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া সমুদ্রবক্ষস্থিত জাহাজের মাল্লারা শীঘ্রই ঝড় আসিবে বুঝিতে পারে। জাহাজস্থিত ব্যারোমিটার যন্ত্রে অনেক সময় ঝড়ের সূচনা ঝড় আসিয়া পড়িবার অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পাওয়া যায় ; সতর্ক হইতে না হইতে ঝড় আসিয়া পড়ে ও অনেক সময় জাহাজ ঝড়ের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া সমুদ্রের অতল জলে নিমজ্জিত হয়। গালপক্ষীর দৃষ্টান্তে অনেক জাহাজ ভীষণ ঝঞ্ঝামুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মানুষের প্রাণ রক্ষা করে বলিয়া নৌসেনা-বিভাগের আইন অনুসারে গালপক্ষী মারা নিষিদ্ধ। কেহ নিয়ম জানিয়াও মারিলে সামরিক বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

বনের মধ্যে পিপীলিকার ঢিপি যেখানে-সেখানে দেখা যায়। অগ্ন্যুৎপাতে অনেক সময় বড় বড় বন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই-সকল অগ্নিকাণ্ডে অনেক পশু প্রাণ হারায়। বন-মধ্যস্থ পিপীলিকারা অগ্নি-কাণ্ড বাধিবার পূর্ব্বেই ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারে ও দলে দলে ডিম ও কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া অন্যত্র বাসার সন্ধানে পলায়ন করে। খরগোশও বন্যা আসিবার পূর্ব্বে জানিতে পারে ও নিজেদের গর্ত্ত ছাড়িয়া বনের মধ্যে কিম্বা দূরবর্ত্তী উচ্চ স্থানে সরিয়া যায়। মাছ ও পাখীদের মধ্যেও আসন্ন বিপদের পূর্ব্বাভাস জানিবার ক্ষমতা দেখা যায়।

বিপদের পূর্ব্বাভাস জানিতে পারার আশ্চর্য্য ক্ষমতা কেবল ইতর প্রাণীদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব উহা হইতে বঞ্চিত।

কালী বৃষ্টি—

বৃষ্টিকালীন বারিধারা অনেক সময় কাল কালীর ন্যায় বর্ণযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে ইহা অমঙ্গলের নিদর্শন বলিয়া থাকেন। কালীবৃষ্টির ন্যায়, রক্তবৃষ্টি, দুগ্ধবৃষ্টির কথা শোনা যায়। কালীর ঝুল, ফুলের পরাগ, গন্ধকচূর্ণ ও বালুকা-কণা প্রভৃতি পদার্থ বৃষ্টির জলে পাওয়া যায় ও তজ্জন্য উহার বর্ণ অদ্ভুত হইয়া থাকে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একবার রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল। বৃষ্টির পর বৃষ্টিমান যন্ত্রে (Rain gauze) যে জল জমা হইয়াছিল তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে বৃষ্টির জলে একপ্রকার ধাতবপদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে। মেঘ জমিবার সময় বায়ুপ্রবাহের আকর্ষণে উহা উত্থিত হইয়া মেঘের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। আগ্নেয়গিরির ধূমোদ্গিরণের সময় বহুল পরিমাণ ধাতবপদার্থের ছাইভস্ম সবেগে আকাশে উত্থিত হয় ও ২।৪ বৎসর পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে অবস্থান করে। পরে ঠাণ্ডা বায়ু ও বাষ্পের সংস্পর্শে আসিয়া মেঘের আকার ধারণ করে ও পুনরায় বৃষ্টিধারায় নিজেদের বর্ণবৈষম্যের প্রভাব বিস্তার করিয়া পতিত হয়।

পদমর্য্যাদাবোধক খাদ্য—

সুইজারল্যাণ্ডে যে পরিবারের পনির যত পুরাতন সেই পরিবার তত পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া মনে করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডবাসীরা অতিথিকে খুব শক্ত পনির খাইতে দেয়—তাঁদের মতে অতিথিকে যত বেশী শক্ত পনির খাইতে দেওয়া যাইবে তত বেশী সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও নরওয়ের লোকেরাও পনির বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু পনিরের ব্যবহার সুইজারল্যাণ্ডে সবচেয়ে বেশী। জার্ম্মাট সহরের পনির সুইসরা অনুষ্ঠানকর্ম্মে ব্যবহার করে ; জার্ম্মাটের পনির এত শক্ত হয় যে কুড়ালি দিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয়। সুইজারল্যাণ্ডে

এক ডিমে দুই কুসুম

এমন অনেক পরিবার আছে যাঁদের বাড়ীতে প্রথম ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে প্রস্তুত পনির পাওয়া যায়। ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ ও বিবাহের সময় ঐ পনির ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন বাড়ীতে নবকুমারের জাতকর্ম্মে যে পনির প্রস্তুত করা হয়, সেই পনিরের নাম নবকুমারের নামে হইয়া থাকে। জাতকর্ম্মের পর এই পনির সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয় ও ছেলে বড় হইয়া যখন বিবাহিত হয়, তখন উহা পুনরায় ব্যবহার করা হয়।

—

ছয় মাইল লম্বা বারান্দা-ওয়ালা বাড়ী—

লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের নিকট যে নূতন "কাউন্টি হল" নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সমস্ত বাড়ীতে ৮০০ ঘর ও উপর নীচে যাতায়াত করিবার জন্য ১০টা বৈদ্যুতিক সিঁড়ি (electric lift) আছে। সমস্ত বাড়ীর বারান্দার দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় ছয় মাইলের উপর, ও বাড়ীর ভিত্তি ৬॥০ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। শীতকালে সমস্ত বাড়ীটাকে গরম করিতে ২১৫২টা উত্তাপ-দান (radiators) যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে। বাড়ীর নীচে উপরে যে জলের কল আছে তার জন্য যে নল ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা লম্বায় প্রায় ৩১ মাইল হইবে। স্থাপত্য-কৌশলে "কাউন্টিহল" দেখিতে অতি সুন্দর। কাউন্সিলের অধিবেশনের সময় বারো হাজার বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা "কাউন্টিহল" আলোকিত করা হয়। বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিতে ৪৩৪৪০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে।

শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

—

প্রকৃতির খেয়াল—

আমরা খ্যাতনামা চিত্রকর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট হইতে এক ডিমে দুই কুসুম থাকার ফটোগ্রাফ এবং অন্য এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে এক নারিকেল মালার মধ্যে দুই খোল থাকার নমুনাস্বরূপ একটি নারিকেল উপহার পাইয়াছিলাম; প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকাদিগকে দেখাইবার জন্য আমরা ঐ দুটি প্রকৃতির খেয়ালের ছবি এইখানে ছাপিলাম।

প্রবাসীর সম্পাদক

এক নারিকেলের মালার মধ্যে দুই খোল

পরচিত্ত—

লাইকারগাস্‌কে (Lycurgus) একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল:—আপনার প্রণীত আইনে অকৃতজ্ঞতার জন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থা নাই কেন? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—সে ব্যবস্থার ভার ভগবানের উপর দেওয়া আছে।

বাইরন্ (Byron) বলিতেন—একফোঁটা কালী খরচ করলে জগৎসুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত করে' তোলা যায়।

ওয়াইকার্‌লী (Wycherley) বলিতেন—মূর্খ যখন রসিকতা করতে চেষ্টা করে, তখনই তার মূর্খতা সব-চেয়ে বেশী অসহ্য হয়ে ওঠে।

মহামতি আলেক্‌জ্যাণ্ডারের (Alexander the Great) সঙ্গে যখন পারস্য-সম্রাট্ ডেরায়াসের (Darius) যুদ্ধ চলিতেছিল সেই সময় একজন সাধারণ সৈনিক পারস্য-সেনাপতি মেম্‌ননের (Memnon) সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকথ্য ভাষায় আলেক্‌জ্যাণ্ডারকে গালাগালি দিতেছিল।

কিছুক্ষণ শোনার পর মেম্নন সেই সৈনিককে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন—চুপ কর। আলেক্জ্যাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই তোমাকে বেতন দেওয়া হয়, তাঁহাকে গালি দেওয়ার জন্য নয়।

রাস্কিন্ (Ruskin) বলিতেন—রেলে বেড়ানকে বেড়ানর মধ্যেই গণ্য করা যায় না। পার্শেল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে এর কোন প্রভেদ নাই।

মার্টিন লুথারের (Martin Luther) অর্থের প্রতি অবজ্ঞা জগদ্-বিখ্যাত; অথচ প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ তাঁর মত খুব কম লোকেই পাইয়াছে। স্যাক্সনির (Saxony) রাজা একটা সোনার খনির সমগ্র আয় তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই নিস্পৃহতার কথা তাঁহার শত্রুদেরও অজ্ঞাত ছিল না। একবার জনৈক পোপ (Pope) একজন কার্ডিনালকে (Cardinal) টাকা দিয়া মার্টিন লুথারের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে বলাতে উক্ত কার্ডিন্যাল উত্তরে লিখিয়াছিলেন—এই জার্ম্মান জানোয়ারটা টাকাকড়ি আদপেই গ্রাহ্য করে না—রাইন (Rhine) নদীরও উজান বহা সম্ভব কিন্তু টাকায় লুথারের মুখবন্ধ হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। একবার লুথার তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—কাল টুবেরিম (Tuberim) আমাকে একশত টাকা দিয়া গিয়াছে। আজ আবার সোয়ার্ট্স্ (Schoartz) এইমাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়া গেল। বল ত এ বিপুল অর্থে আমার কি প্রয়োজন? ভয় হইতেছে, পাছে বা ভগবান এই জন্মেই এইভাবে আমার কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রদান করেন। যাহা হউক অর্দ্ধেক টাকা প্রায়োরাসকে (Iriorus) দিলাম। টাকা পাইয়া সে অত্যন্ত সুখী হইয়াছে।

ডেবিস্ (E. Davis) বলিয়াছেন—অমিতব্যয়িতা কথাটার কেবল অর্থের সঙ্গেই নিকট সম্বন্ধ নয়। জগতে আরও বহু রকমের অমিতব্যয়িতা দেখা যায়। বুদ্ধিবৃত্তির, স্বাস্থ্যের, সময়ের, সুযোগের অমিতব্যয়িতাও সর্ব্বদাই চোখে পড়িয়া থাকে।

ব্রুইয়ার (Brueyere) বলিয়াছেন—পুরুষ নিজের অপেক্ষা পরের রহস্য গোপন রাখিতে বেশী সক্ষম। মেয়েরা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। নিজের গোপনীয় কথা প্রাণান্তেও কাহাকে জানিতে দিতে চায় না; কিন্তু পরের কথা আধ দণ্ড পেটে থাকিলেই পেট ফুলিয়া ওঠার উপক্রম হয়।

কোল্টন (Colton) বলেন—অমিতব্যয়ী ব্যক্তি যেমন যথেচ্ছা ব্যয়ের জন্য সর্ব্বদাই অর্থের প্রয়োজন অনুভব করে, যাহাদের পরের কথা গোপন রাখার অভ্যাস নাই তাহারাও তেমনি অপরের কাছে গল্প করার জন্যই পরের রহস্যের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়।

অষ্ট্রেলিয়ার (Australia) আদিম অধিবাসীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া পাদ্রী সাহেব বলিলেন—তোমাদের যাহা কিছু আছে সবই সেই পরম পিতা জগদীশ্বরের দান বলিয়া জানিবে। তোমাদের মধ্যে কেহ কি এমন কিছুর নাম করিতে পার যাহা ভগবানের দেওয়া নয়? একটি ক্ষুদ্র বালিকা এক পার্শ্ব হইতে উত্তর দিল—হাঁ পারি—পাপ।

ডিমস্থেনিস্ (Demosthenes) বলিতেন—কাহারও উপকার করিলে যতদিন সে সেই উপকারের ফলভোগ করিবে ততদিনই কেবল উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ফলভোগ-নিবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গেই সকল-রকমের কৃতজ্ঞতার স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া যাইবে।

শ্রী বীরেশ্বর বাগচী

অমিতা

শিশিরের কথা

বাড়ীর সাম্নে দিয়ে লাল মাটির পথ। পশ্চিমদিকের ঘরটার জান্লা খুল্লে মাঠের শেষে সাঁওতাল-গ্রামগুলো চোখে পড়ে—সেগুলো সব বাঁশঝাড়ে আর তাল গাছে ঘেরা। আমি অমিতাদের বাড়ীতে দিন কয়েকের জন্যে চেঞ্জে গিয়েছিলাম।

আমিতাকে ছেলেবেলা থেকেই জান্তাম। তারপর আমি পড়া শেষ কর্বার জন্য বিদেশে গেলাম, তখন মনে এই আশাটি বাসা বেঁধেছিল—ফিরে এসে অমিতাকে নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো সুখেই কাটিয়ে দেব। তখন একবারও মনে ভাবিনি যে আমার এবং অমিতার ভাগ্য-দেবতা অন্তরালে বসে' একটা একেবারে আলাদা রঙের ছবি আঁক্ছেন।

একদিন বিকালে অমিতাকে আমি বল্লাম,—অমিতা, একটা কথা বল্বো অনেক দিন থেকে মনে কর্ছি, আজ সেটা বল্তে চাই। যদি অন্যায় হয় তবে মাপ কোরো—

অমিতা তার স্নিগ্ধ করুণ চোখদুটি তুলে বল্লে—"শিশিরদা, তোমার কথায় কোনোদিন ত কিছু মনে করি নি—আজও কর্বো না—কি বল্তে চাও বল্তে পার—"

আমি বল্লাম—আমি তোমায় ভালবাসি। যদি তোমার অনুমতি পাই তবে তোমার মাকে বল্তে পারি—

আর কিছু বল্বার আগেই দেখ্লাম আমিতার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যে চেয়ারটায় সে বসে' ছিল তার হাতল দুটো চেপে ধরেছে। আমি ভয় পেয়ে উঠ্লাম, বল্লাম—অমিতা, আমায় ক্ষমা করো, এমন্ ভাবে আর কোনো দিন তোমায় কিছু বল্বো না, ক্ষমা করো আমায়—

নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে অমিতা বল্‌লে—শিশিরদা, তোমার কোন অন্যায় হয় নি। আমার জীবনের মধ্যে দিয়ে যে কি ঝড় চলে, গেছে, তা তুমি জান না। তোমায় সব কথা খুলে না বলাও আমার বোধ হয় অন্যায় হবে। যদি শুন্‌তে চাও তবে বল্‌তে পারি—

আমি বল্‌লাম—বল অমিতা, আমি সব শুন্‌বো।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আস্‌ছে। দূরের সাঁওতাল-গ্রাম, বাঁশঝাড়, তালগাছ, সব ঝাপ্‌সা হতে হতে চোখ থেকে একেবারে মিলিয়ে গেল। আকাশে দু-একটা তারা ফুটে উঠ্‌ছে। অমিতা বল্‌তে আরম্ভ করলে—

অমিতার কথা

সেদিন আকাশে খুব মেঘ করেছে, যেদিন সে প্রথম আমাদের বাড়ী এলো। পথে লোকজন নেই। দু-একটা গৃহহীন শীর্ণ কুকুর ল্যাজ গুটিয়ে জলে ভিজ্‌ছে। বর্ষার ভিজে বাতাস ঘরে-বাইরে বিকট শোঁ শোঁ কর্‌তে কর্‌তে ছুটে বেড়াচ্ছে। অনন্ত বিরহে বিরহী কোন্ এক যক্ষের দীর্ঘশ্বাসের মত তার শব্দ।

এমন সময় ছেঁড়া জুতো, ময়লা জামা, আর একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করে' নিয়ে সে একেবারে সোজা আমাদের বস্‌বার ঘরে এসে ঢুক্‌লো। চেনা নেই, শোনা নেই—এসেই বল্‌লে—আমায় এখানে একটু থাক্‌বার স্থান দেবেন? আমি বেশ ভাল বাঁশী বাজাতে পারি—আপনারা যদি কেউ শেখেন তবে শেখাবার ভার নিতে পারি—

সে দেখ্‌তে লম্বা, আর-একটু মোটা হলে তাকে সুন্দর বল্‌তাম। তবে সে আর যাই হোক, কুশ্রী মোটেই নয়। দাদা তাকে নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে—নাম? নামে কি হবে, আমি অলক—

আমাদের বাড়ীতে কয়েকটা ঘর খালি পড়ে' থাক্‌তো। বাইরের একটা ঘরে তার স্থান করে' দেওয়া হল।

এক রাত্রে সে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ কর্‌লে। বাঁশী শুনে আমাদের কারো চোখে ঘুম নেই। বাঁশীর সুরের বড় একটা করুণ বেদনার আভাস প্রাণে এসে লাগ্‌ছিল। আমি জান্‌লা খুলে দিলাম, চাঁদের আলো এসে আমার মুখের উপর পড়্‌ল। দেখ্‌লাম সে আমাদের বড় যুঁই-গাছটার তলায় বসে' বাঁশী বাজাচ্ছে। তার লম্বা লম্বা চুলগুলো হাওয়াতে উড়্‌ছে। মা তার বাঁশী শুনে ছাতের আল্‌শের উপর চুপ করে' বসে, আছেন। আমার কলেজের পড়া আর সে রাত্রে হল না। বাঁশীর গানে আমার মন কেমন নিস্পন্দ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ জান্‌লায় বসে, ভাব্‌লাম—এমন বাঁশী সে কেন বাজায়, কি দুঃখ তার অন্তরে জমে' আছে? ভেবে কোনো কূল কিনারা পেলাম না।

রোজ সকালে চা খেয়েই সে পথে বেরিয়ে পড়্‌ত। সারাদিন আর তার দেখা পাওয়া যেত না। সে খেত কি না তাও জানি না। সে বিকেলে একবার বাড়ী আস্‌ত, এক পেয়ালা চা খেত, আবার পথে বেরিয়ে যেত। রাত্রেও কিছু খেত কি না জানি না। দু-এক বার তার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখা হত, কিন্তু সকালে সব তেমনি ঢাকাই থাক্‌তো। এমনি ভাবে তার দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো। মা তাকে দু-একবার বাইরে যেতে বারণ কর্‌তেন, সে, তখন তার করুণ চোখদুটি তুলে বল্‌তো—না, না, আমায় বারণ কর্‌বেন না, যেতে আমায় হবেই, না গেলে চল্‌বে না—

কথা বল্‌তে বল্‌তেই সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ত। তার বোধ হয় ভয় হত, আমরা তাকে আট্‌কে রাখ্‌বো জোর করে'।

কোথায় যে সে যায়, কেউ জান্‌তো না।

বাবা একদিন বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন,—কোথাকার কে তার ঠিক নেই—আপদ দূর করে দাও—

মা কেবল দৃঢ়স্বরে বল্‌লেন—না। ও ত কারো কোনো ক্ষতি কর্‌ছে না—

আমার মাকে বাবা বেশ একটু ভয় কর্‌তেন। সেই থেকে বাবা অলকের বিষয়ে আর কোনো কথা বলেন নি। আমিও কেন জানিনা তাতে নিশ্চিন্ত হলাম।

একদিন বিকেলে ওকে বাঁশী বাজাতে বল্‌লাম। ও বাঁশী বাজাতে বস্‌লো—একটু বাজিয়েই হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বল্‌লে—আর না—সময় বেশী আর নেই, আমায় এখনি যেতে হবে, তার দেখা আজ পাবই—

ঘর ছেড়ে সে চলে গেল।

একটু পরে দাদা, আমি আর আমার ছোট বোন গাড়ীতে করে' বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাচ্ছি। একটা রাস্তার মোড়ে দেখ্‌লাম—বেশ ভিড় জমে' আছে, কে যেন একজন বাঁশী বাজাচ্ছে। গাড়ী আর-একটু এগিয়ে যেতেই দেখ্‌লাম অলক! গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়েছে, আফিস্‌-ফেরতা ক্লান্ত বাবুর দল, কুলি মজুর অনেকেই অবাক্ হয়ে হাঁ করে, তার বাঁশী শুন্‌ছে। অনেকে যাবার সময় তার সাম্‌নে পয়সা ফেলে দিয়ে গেল। তার কোনো দিকে খেয়াল নেই, সে আপন মনে বাঁশীই বাজাচ্ছে। আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। বায়স্কোপে কি যে ছাই দেখ্‌লাম, তাও মনে পড়ে না। এর পর আরো কয়েকবার তাকে এমনিধারা পথে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতে দেখ্‌লাম।

অবাক্ হয়ে গেলাম আমি! কে এ, এমন করে' আপন ঘরদুয়ার ছেড়ে পরের বাড়ীতেই বা আছে কেন? যত ভাবি ভাবনার সুতো ততই বেড়ে যায়, তার শেষ আর পাই না।

একদিন তার শরীর বড় খারাপ হল। সমস্ত দিন অলক শুয়ে কাটাল। বিকেলে আমি তার ঘরে গেলাম। একটা চেয়ারে একটুক্ষণ বসে' তাকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম—একটা কথার উত্তর দেবে? অবশ্য তোমার যদি বিশেষ আপত্তি থাকে তবে বলে' কাজ নেই—আমি কেবল এইটুকু জান্‌তে চাই, তুমি কে—কেন আপনাকে এমন তিল তিল করে' হত্যা কর্‌ছ—আমায় এইটুকু বল্‌তেই হবে, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না—

আমার কথা শুনে সে কেমন যেন একটু উন্মনা হয়ে গেল। তার পর সে তার করুণ চোখদুটি আমার দিকে তুলে বল্‌লে—

অলকের কথা

দেখ, আমি গরীবের ঘরের ছেলে নই। আমার বাবার অবস্থা বেশ ভাল। আমি যখন এম-এ পড়ি তখন আমার ইন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। ইন্দু বিধবা। বারো বছর বয়সে তার যখন প্রথম বিয়ে হয়, সে তখন একেবারে নেহাত ছেলেমানুষ। বিয়ের ছ'মাস পরে তার স্বামী মারা যায়। তার বাবা নিষ্ঠুর সমাজের চলিত আইনকে না মেনে ইন্দুর আবার বিয়ে দেন। ইন্দুর দ্বিতীয় স্বামী বিয়ের এক বছর পরে মারা গেল। দুবছরের মধ্যে ইন্দু দুবার স্বামী হারাল। তার মনে প্রথম বিশেষ কিছুই লাগে নি। কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশী এমন কি বাবা মা পর্য্যন্ত যখন বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন যে মেয়ে অলক্ষণা, যে মেয়ে দুবছরের মধ্যে দুটো লোক খেতে পারে সে মানুষী নয়, রাক্ষসী, তখন ইন্দুও এইটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লে, ইহজীবনে সুখের আশা তার আর নেই। এই ঘটনার পর থেকে ইন্দু কারুকে ভালবাস্‌তে ভয় কর্‌তো, পাছে তাকেও সে হারায়। বাড়ীতে তার আদর যত্ন ছিল না, তার দাদার বৌ এবং অন্য মেয়েরাও তাকে একেবারেই দেখ্‌তে পার্‌তো না। ইন্দু মধ্যে মধ্যে ভাব্‌তো—কেন, এ কোন্ অজানিত পাপের শাস্তি? সে প্রাণ দিয়ে মরণকে ডাক্‌তো। দিন দিন তার জীবন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছিলো। সে সব দুঃখ বেদনা সইতে পার্‌তো, কিন্তু যে দিন থেকে তার মাও তার উপর বিরূপ হলেন, সেইদিন থেকে সে মর্‌বার পথ খুঁজ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

এই সময় ইন্দুদের বাড়ীতে আমি প্রথম যাই। ইন্দুর মা খুব দূর সম্পর্কে আমার কে হতেন। আমি তাঁদের বাড়ীতে খুব আদর যত্ন পেতাম, একেবারে বাড়ীর ছেলের মত। আমি ছেলেবেলা থেকেই খুব ভাল বাঁশী বাজাতে পারি। ইন্দুদের বাড়ী গিয়েও বাঁশী বাজাতাম। ইন্দু চুপ করে' বসে আমার বাঁশী শুন্‌তো। ক্রমে ক্রমে ইন্দুকে ভালবাস্‌লাম -সেও আমায় ভালবাস্‌লো।

এই-রকম করে আমাদের প্রায় এক বছর কেটে গেল। একদিন আমি ইন্দুকে বল্লাম—ইন্দু, আমি তোমায় বিয়ে কর্‌তে চাই। ইন্দু চম্‌কে উঠ্‌লো, সে ভীত কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো—না না, বোলোনা অমন করে'। তুমি জানো আমি তোমায় ভালবাসি, তাই তোমায় বিয়ে করে, আমি তোমায় হারাতে চাই না। আমি জানি আমি যাকে বিয়ে কর্‌বো, তাকেই আমি হারাবো। তুমি ও-কথা বলো না, তোমায় চিরকাল ভালবাস্‌তে দাও, আমি তোমাকে হারালে আর বাঁচতে পার্‌বো না—

ইন্দুর কথা শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। কয়েকদিন পরে তাকে আবার বল্লাম—ইন্দু, আমি পারবো না এমন করে' থাকতে। তোমার বাবাকে আজ সকালে বলেছি, তাঁর বিশেষ অমত নেই, তুমি আর অমত করো না লক্ষ্মী—

ইন্দু কোন কথা বল্লে না। কেবল একবার মাত্র তার স্নিগ্ধ কোমল চোখদুটি আমার চোখের দিকে তুলে, সে কি একটা কাজে অন্য ঘরে চলে' গেল।

পরদিন সকালেই ইন্দুদের বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখ্লাম সবাই চুপ্চাপ। পরে জান্তে পারলাম ইন্দু কাল রাত্রে বাড়ী থেকে চলে' গেছে। পাড়ার লোকে অনেকে অনেক কিছু বল্লে। আমার বিশ্বাস হল না। আমার মন বলে' উঠ্ল, আমি তাকে আবার ফিরে পাব। ইন্দু—সে আমার। আমি তাকে ভালবাসি—তাকে আমি পাবই।

সেবার আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না। দেশ বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক দেশে ঘুরে আজ প্রায় তিন মাস আগে এই চিরনবীন কল্কাতায় ফিরে এসেছি। একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখ্লাম গাড়ীতে করে' ইন্দু যাচ্ছে। আমি গাড়ীর পেছনে চড়ে' তার বাড়ী গেলাম। সে কি বল্লে জানো—সে বল্লে, কেন তুমি এখানে এসেছ—কি চাও তুমি? তোমায় এক সময় ভালবাস্তাম, এখন আর বাসি না। সে-সব কথা ভুলে যাও। দেখ্ছো না, আমি কোথায়—কোন্ নরকে নেমেছি? যাও, যদি তিল মাত্র লজ্জা থাকে তবে এখান থেকে চলে' যাও এক্ষণি—আর এসো না—

আমি চলে' এলাম। আস্বার আগে তাকে বলে' এসেছি—ইন্দু, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। আমি তোমায় পাব, আমি জানি।

এর কয়েকদিন পরে ইন্দুর একখানা চিঠি পেলাম—তাতে সে লিখেছে—মণি আমার,—তোমাকে আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়েছি- এই দুঃখে আমার সমস্ত অন্তর আজ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু তুমি জেনো, আমি তোমায় ভালবাসি—চিরকাল বাস্বো। আমি এখন থিয়েটারের অভিনেত্রী। তবে এটুকু মনে রেখো, আমার নারীত্বের অপমান আমি কোনোদিন হতে দেবো না। কেমন করে' পারবো বলো, তুমি যে আমায় ভালবাস মণি। জেনো, আমি চিরকাল তোমার, তবে এ জগতে মিলন হবে না আমাদের। আমি তোমাকে হারাতে পারবো না, তাই আমি বাপ মা লজ্জা মান এমন-কি তোমাকেও ছেড়ে পালিয়ে এসেছি নরকের দ্বারে তুমি আমাকে পরিহার করবে বলে'। তোমার বাঁশী আমার কানে এসে এখনো বাজে—

আরো চিঠিতে অনেক কথা ছিল। তারপর আরো পত্র তার কাছ থেকে পাই। সব ঐ ক্যাম্বিসের ব্যাগ্‌টাতে বন্ধ আছে। আমি সেই থেকে পথে পথে বাঁশী বাজিয়ে বেড়াই—যদি কোনোদিন তার দেখা পাই। যে পথ দিয়ে সে যাওয়া-আসা করে, সেই পথে আমি রোজ বিকেলে বাঁশী বাজাই। আমি জানি, ইন্দু আবার আস্বে আমার বুকে ফিরে, ইন্দু আমার—সেই পুরাণো ইন্দুই আছে—সে আস্বে—

অমিতার কথা

অলকের কথা শেষ হল। সে একটু হাঁপিয়ে পড়েছিল। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে দুফোঁটা জল টল্‌টল্ করছে দেখ্লাম।

আমি রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগ্লাম। কোন্ অভাগী সে, যে এতবড় ভালবাসার এমন অপমান করছে? কোনোদিন কি সে বুঝ্বে না, এ ভুল তার ভাঙবে না একদিন? এই-সব ভাবতে ভাবতে কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। স্বপ্ন দেখ্লাম—দূর ভবিষ্যতের কথা—সরু সেই পথটা,—দলে দলে প্রেমিক-প্রেমিকারা হাত-ধরাধরি করে' চলে' যাচ্ছে। তাদের অনেককে চেনা বলে' মনে হল। এক জায়গায় দেখ্লাম একটা বকুল-গাছের তলায় এক তরুণ যুবক বাঁশী বাজাচ্ছে। সেই বিচিত্র পথের পথিকেরা সেই বাঁশীর গান শুনে সব-ভোলা হয়ে যাত্রা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেই সুন্দরের পাশে এক তরুণী—তাকে বড় চেনা-চেনা বলে' মনে হল। একটু কাছে এগিয়ে গেলাম—ওমা! সে আমি! আর সেই যুবকের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি সে অলক। সমস্ত অঙ্গে পুলক ভরে,

উঠ্‌ল। তারপর ঘুম ভাঙতে দেখ্‌লাম বেলা অনেক-খানি হয়েছে, মুখে রোদ পড়্‌তেই ঘুম ভেঙে গেছে।

সারাদিন কাজে ভুল কর্‌লাম। অলকের সঙ্গে একবার দেখা হল, তার দিকে মুখ তুলে চাইতে পার্‌লাম না। একি লজ্জা—কেন এমন হ'ল জানি না।

সেদিন বিকালে একটা গাড়ী এসে আমাদের দুয়ারে দাঁড়াল। দুটি ছেলে কাকে যেন ধরাধরি করে' বারাণ্ডায় নিয়ে এল। আমি তাড়াতাড়ি মাকে খবর দিয়ে বারাণ্ডায় গেলাম। গিয়েই আমার বুকটা একেবারে ধড়াস্ করে' উঠ্‌ল—দেখ্‌লাম অজ্ঞান অবস্থায় অলক! ছেলে দুটি বল্‌লে—ইনি গ্যাস-পোষ্ট ধরে' দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর একটা বাড়ীর-গাড়ীতে কেমন করে' ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে' যান। গাড়ীতে একটি ভদ্রমহিলা ছিলেন, তিনি কেমন করে' এঁর ঠিকানা জেনে আমাদের এইখানে পাঠিয়ে দিলেন। গাড়ীর ভাড়াও তিনি দিয়েছেন।

ছেলে দুটি চলে' গেল। সমস্ত রাত্রি আমি আর দাদা অলকের মাথার কাছে বসে' কাটালাম। ভোরের দিকে যখন একটু তন্দ্রার মত এসেছে, তখন শুন্‌লাম অলক বল্‌ছে—ইন্দু গাড়ীতে উঠ্‌তে দিলে না, ফেলে দিলে। আচ্ছা, আমি আবার যাব। তুমি ফিরে আস্‌বেই—

কথাটা শুনে মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। তার সেবা কর্‌লাম প্রায় সাতদিন। ক্রমে সে ভাল হয়ে উঠ্‌ল। ডাক্তার বলে' গেল অলক যেন এখন কিছুদিন বাড়ীর বাইরে কোথাও না যায়।

একদিন দাদা মা আমি আর আমার বোন অলককে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে চড়ে, বিকালে গড়ের মাঠের দিকে যাচ্ছি। বৌবাজারের মোড়ে খুব ভীড়, অনেকগুলো গাড়ী মোটর জমা হয়ে গেছে; আমাদের গাড়ীটাও একটা ফিটন-গাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সেই গাড়ীতে একটি সুন্দরী তরুণী বসে' ছিল একলা। সত্যই সে বড় সুন্দরী। তার সমস্ত নিখুঁত অঙ্গের মধ্যে চোখ দুটিই সবচেয়ে সুন্দর। হঠাৎ অলক সেই গাড়ীটার দিখে চেয়েই—ইন্দু—বলে' চীৎকার করে' গাড়ীর দিকে লাফ দিলে। ফিটন-গাড়ীর মেয়েটি চম্‌কে উঠ্‌ল—তারপর কর্কশ কঠিন আদেশের স্বরে কোচ্‌মান্‌কে গাড়ী হাঁকাতে বল্‌লে। কোচ্‌মান্ তরুণীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভয় পেয়ে পুলিশের বাধা না মেনে গাড়ী বার করে' নিয়ে চলে, গেল। অলক একেবারে ট্রামলাইনের উপর পড়ে' গেল। আমাদের সেদিন আর বেড়ানো হল না।

ডাক্তার এসে' বলে' গেল—এ আর কতদিন বাঁচ্‌বে জানি না, হার্ট ভয়ানক দুর্ব্বল হয়েছে।

চিকিৎসা চল্‌তে লাগ্‌ল।

অলক আর কথা বলে না। সে কেমন অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠেছে। একটা কথা পাঁচ বার বল্‌লে তবে শুন্‌তে পায়। পাঁচ বার শুন্‌লে তার একটা হাঁ বা না জবাব দেয়। উপরের দিকে যখন চেয়ে থাকে, উদাস নয়ন তার স্থির হয়ে যায়। কখনো বা হঠাৎ ঘরে এসে দেখি তার দু চোখে দুফোঁটা জল! কখনো বা সে জান্‌লা দিয়ে আকুল দৃষ্টিতে নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। গাড়ীর শব্দ শুন্‌লেই চম্‌কে ওঠে। একটু যেন উঠে বসে। তার পর গাড়ীর শব্দ দূর হতে দূরে চলে গেলে, সে আবার মড়ার মত শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ চেপে।

একদিন অলকের নামে একটা চিঠি এলো। নীল খামের উপর গোল গোল মুক্তোর সারির মতন লেখা, সবুজ কালীতে। পত্রখানা সে পড়্‌ল না। আপন মনে সে একবার বল্‌লে—পড়্‌লেই শেষ হয়ে যাবে; ভাল হয়ে তারপর পড়্‌বো—আমার ইন্দুর লেখা এমন করে' পড়্‌বো না—। এই কথাগুলো বলেই পত্রখানা বালিশের নীচে রেখে দিলে। তারপর সে আমায় বল্‌লে—পর্দ্দা তুলে দাও, ঘরে বাতাস আসুক,—ওকি! পাঁচটা বেজেছে! দাও, আমার জামা দাও, শীগ্‌গির দাও, ইন্দু কতক্ষণ হয়ত বেরিয়েছে। দাও, ভাবৃছ কি—

তার হঠাৎ এমন ভাব দেখে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। তাড়াতাড়ি মাকে ডাক্‌তে গেলাম। তার-পর দাদা মা আর আমি এসে দেখ্‌লাম অলক চলে, গেছে খালি পায়ে, বাঁশীটা নিতে কিন্তু সে ভুলে যায় নি।

দাদা আর আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্‌লাম। তখন ঝম্‌ঝম্ করে' বৃষ্টি পড়্‌ছে—ঠিক সেইদিনকার মতন বৃষ্টি, যেদিন সে প্রথম আমাদের বাড়ীতে আসে।

প্লাবনে বিপন্ন
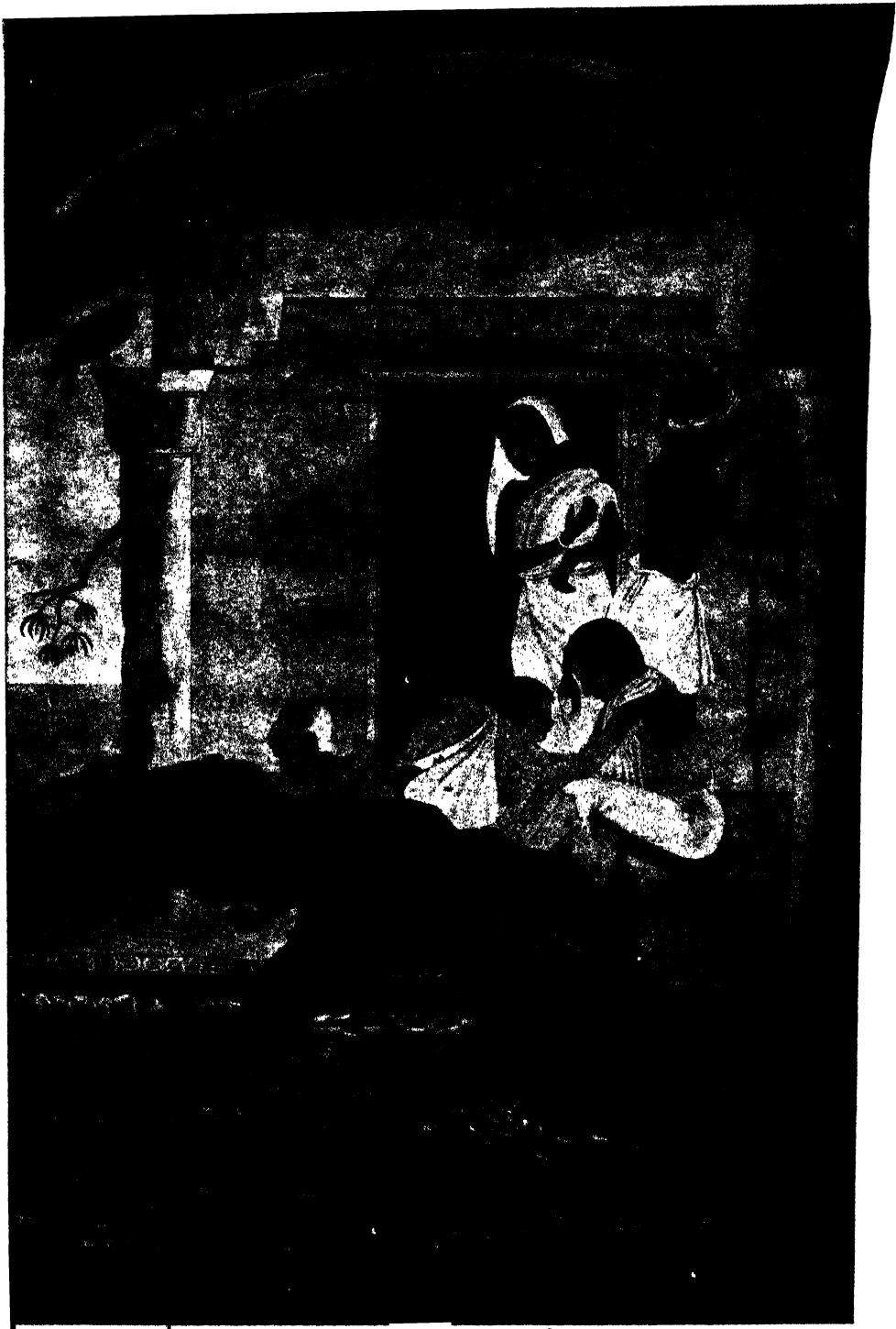
শ্রীমতী শান্তা দেবী

পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল দু-একটা ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে। বৌবাজারের মোড়ের কাছে এসে দেখ্‌লাম অলক একটা ল্যাম্পপোষ্টে হেলান দিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। সেই ঘন বর্ষার মধ্যেও দুচারজান লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বাঁশী অবাক হয়ে শুন্‌ছে। আমরা গাড়ী দাঁড় করিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। একটু পরে দাদা গাড়ী থেকে নেমে তার কাছে গিয়ে ডাক্‌লে—অলক! একি হচ্ছে তোমার? বাড়ী থেকে বাইরে আসা তোমার না বারণ? চল, বাড়ী চল—

দাদাকে অলক একটু ভয় কর্‌তো কেমন। সে একবার সমস্ত পথটার দিকে চেয়ে গাড়ীতে এসে বস্‌লো. পথে কেউ কোথাও নেই। কেবল জলের ঝুপ ঝুপ শব্দ। আমার গায়ের চাদরটা তার গায় বেশ করে' জড়িয়ে দিলাম।

বাড়ী এসেই তার ভেজা জামা কাপড় দাদা বদ্‌লে দিলে। আমি একবাটি গরম দুধ এনে খাইয়ে দিলাম। অলক দুধ খেতে খেতে বল্‌লে একবার—কেন তোমরা গেলে? ইন্দু হয়ত এসে ফিরে গেল—

পরের দিন সকালে অলকের ঘরের জান্‌লা খুলে দিলাম। গত দিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে নীল আকাশটাকে আরো নীল বলে' মনে হচ্ছিল। অলকের মুখে রোদ পড়্‌তেই দেখ্‌লাম তার মুখ লাল—তখন তার ভয়ানক জ্বর। মাকে খবর দিলাম।

ডাক্তার এসে বলে' গেল কোন আশা নেই। আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে' উঠ্‌লো। আশা নেই—মিছে কথা। মন বলে' উঠ্‌লো—আছে, আশা আছে। তিনদিনের দিন সে একটা কাগজ আর কলম চাইলে। আমি এনে দিলাম। তাতে সে কি একটু লিখ্‌লে। লিখে মাথার নীচে বালিশের তলায় রেখে দিলে।

দিন দিন সে মরণের দিকে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো। আমি দিবারাত্রি তার কাছে থাকি—কেন যে থাকি তাও কি তোমাদের বোঝাতে হবে?—অলক—সে যে আমার চোখের আলো! পার্‌লাম না তাকে রাখ্‌তে।—শেষে ঐ আলো জীবনকে চিরকালের মত অন্ধকার করে' দিয়ে নিবে গেল। আর ফির্‌বে না সে—

ভোর রাত্রে তাকে আমায় ছাড়্‌তে হলো। যাবার আগে সে হঠাৎ আমায় বুকে টেনে নিয়ে তার মৃত্যুহিম ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটের উপরে একবার চেপে ধর্‌ল। একবার বল্‌লে—ইন্দু, এত দেরী করে' কেন এলে—বাঁশীটা দাও সেই গানটা বাজাবো—সেই বেলা-শেষের গানটা—

সব শেষ হয়ে গেছে। আমি আর মা শ্মশানে গেলাম। দিনের শেষ-আলোটুকু নিবে গেল। অলকের দেহ তখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মা শুষ্ক-নেত্রে গঙ্গার স্নিগ্ধ ঘোলা জলের দিকে চেয়ে আছেন। বাবা ঘাটের বটগাছটার তলায় সিঁড়িতে বসে' আছেন। আমি—আমি তার চিতার দিকে চেয়ে আছি। আগুন তখনো জল্‌ছে। সেই আগুনে যে চিতা আমার মনে জ্বলেছে কবে তা নিব্‌বে কে জানে! আমার অলকের চিতার পাশে একটি ছোট শিশুর চিতা জল্‌ছিল। তার বিধবা মা উপরের ঘন অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছেন—চোখে জল নেই, দৃষ্টি শূন্য।

বাড়ী ফিরে এলাম। অলকের শেষ পত্রখানা বার করে' রেখেছিলাম। তাতে সে লিখেছে—'ইন্দু, তুমি এলে না, আর, একজনের মাঝে তোমায় পেয়েছি। তবু সব ছেড়ে যেতে হবে—তোমায় ভালবাসি ইন্দু। অমিতার কথা—না থাক—

পরের দিন ইন্দুর লেখা একখানা চিঠি অলকের নামে এলো—সে লিখ্‌ছে—অলক, মণি আমার, এসো, তুমি ফিরে এসো, আমি আর পার্‌ছি না। তোমায় আর তাড়িয়ে দেবো না। এ জীবন আমার অসহ্য—এসো তুমি ফিরে এসো, মণি আমার—

এখনো দেখ্‌তে পাচ্ছি—তার চিতা জল্‌ছে, তার সুন্দর মুখখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাই হয়ে পুড়ে গেল। তার সেই যাবার সময়কার চাওয়া—কি আকুল দুঃখে ভরা মাগো—

সে চলে' গেল। আমি ইন্দু নই, আমি অমিতা। তবুও সে আমারই মধ্যে তার শেষ-বিদায়ের বেলায় ইন্দুকে পেয়েছে। এইটুকুই আমার সারা জীবনের সান্ত্বনা—

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সীন্ ফীন্ আন্দোলন ও আয়ার্ল্যাণ্ড

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ প্রভুর আদেশক্রমে আইরিশ পার্লামেন্টের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইল। ইংরেজ রাজসভায় কয়েকজন আইরিশ সভ্যকে বসিবার অনুমতি দিয়া ব্রিটাশ গভর্ণমেণ্ট আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর মনোবেদনা উপশম করিবার ভান করিলেন।

এই আইরিশ রাষ্ট্রমণ্ডলীর ধ্বংসের পর প্রায় এক শতাব্দী গত হইতে চলিল, কিন্তু নানাভাবে নানা-প্রকারের উদ্যম, কৌশল ও স্বার্থত্যাগের কোনই সুফল ফলিল না। আয়ার্ল্যাণ্ড "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" রহিয়া গেল। কেবল এইটুকু বলিলেও সব বলা হইল না। আয়ার্ল্যাণ্ডের আর্থিক, নৈতিক ও জাতীয়তার অবস্থা দিন দিন ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। রাজনৈতিক পরাধীনতা হইতে পুনরুত্থান কষ্টসাধ্য হইলেও অলোকিক নহে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পরাধীনতা একবার কোন জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসিলে, তাহা হইতে পুনর্জ্জাগরণ ও মুক্তিলাভ অনেক ক্ষেত্রে একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একশতাব্দীব্যাপী সুশাসনের ফলে এই প্রাচীন কেল্টিক্ জাতির আধ্যাত্মিক আকাশ কালিমাময় হইয়া উঠিল। দিন দিন পরাধীনতা ও বিদেশীয়তার আগাছা জাতীয়তার বীজ চাপিয়া মারিতে লাগিল। স্বদেশপ্রেমিক অর্থলোভে গোলাম হইল। স্বদেশী শিল্পবাণিজ্য ইংলণ্ডের বাণিজ্যসংরক্ষণ-নীতির চণ্ডতেজে ভস্মীভূত হইল। ইংরেজ রাজপুরুষদের "স্বদেশীশিক্ষা"-বিস্তারের প্রবল উৎসাহে জাতীয় গেইলিক ভাষা স্কুল কালেজ ছাড়িয়া পলাইয়া বাঁচিল। নব-প্রতিষ্ঠিত মার্জ্জিত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে আইরিশ ছাত্রছাত্রী পিতৃপিতামহের সাধনা ও সভ্যতা হইতে একেবারে মুক্তি পাইলেন। ইংরেজের ৯০-বৎসর-ব্যাপী এই উদার নীতির ফলে গেইলিক ভাষা ও তৎসঙ্গে জাতীয় সভ্যতা, জাতীয় গৌরব বনজঙ্গলে আশ্রয় লইল। আয়ার্ল্যাণ্ডে একতা-স্থাপনই ব্রিটিশ শাসনের মূলমন্ত্র বলিয়া রাষ্ট্রসভা ঘোষণা করিল, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা গেল ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্টের কলহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া "যদুবংশধ্বংসের" প্রশস্ত পথ দেখাইয়া চলিতেছে।

এইরূপে মাতৃভাষা পিতৃসাধনা হইতে বঞ্চিত হইয়া, ইংরেজের বুলি বকিয়া, ম্যাঞ্চেষ্টারের পোষাকে গাত্র ঢাকিয়া আইরিশজাতি যখন জাতীয় অবনতির শেষসীমায় দাঁড়াইয়া আত্মকলহে নিমগ্ন হইল, তখন আয়ার্-ল্যাণ্ডের কয়েকজন মহৎপ্রাণ, দেশমাতৃকার কয়েকজন সুসন্তান মাতৃভূমির এই দুর্গতি দূরীকরণ মানসে শুভলগ্নে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একটি সমিতি গঠন করিলেন। এই "গেইলিক লিগ" দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বর্দ্ধিত হইয়া যখন পূর্ণাকারে জগৎসমক্ষে খ্যাতি ও প্রশংসার বোঝা মাথায় লইয়া উপস্থিত হইল, তখন আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে, তখন আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী ভিক্ষার ঝুলি নামাইয়া রাখিয়া আপনার ভাগ্যনিয়ন্তা আপনি হইয়া উঠিয়াছেন।

১৮৯৩ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই শিশু সমিতি নিজের মনে গেইলিক সাহিত্যের পুনরুদ্ধার, স্বদেশী ললিতকলার পুনশ্চর্চ্চা এবং স্বদেশী শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত রহিল। বাহিরে অন্যান্য দল কি প্রকারে, কোন্ উপায়ে তাহাদের কার্য্যাবলী পরিচালিত করিতেছে সে বিষয়ে গেইলিক সমিতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন রহিল। কিন্তু স্বদেশী ভাষার পুনঃপ্রচার দেশবাসীর মনে জাতীয়তার যে প্রভাব ও আত্মগৌরব সঞ্জীবিত করিল, গেইলিক সঙ্গীতের পুনশ্চর্চায় তাহাদের হৃদয়তন্ত্রী যে নূতন সুরে ঝঙ্কৃত হইল, তাহাই সমিতিকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টানিয়া আনিল।

এই সমিতির মুখপত্ররূপে ১৮৯৮ সালে আর্থার গ্রিফিথ "United Irishman" নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুচিন্তিত রচনাবলীর জ্বলন্ত ভাষা এবং স্বীয় পূতচরিত্র শীঘ্র গেইলিক সমিতির প্রাধান্য ও কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। স্বাধীনতার জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে দেশবাসীর মনে যে জাতীয়তার ভাব, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মত্যাগ প্রয়োজন, গ্রিফিথ তাহাই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অসংবদ্ধ ও এলোমেলো ভাবে যে জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী পড়িয়া ছিল, গ্রিফিথ তাহাকে—স্বদেশী ভাষা, স্বদেশী সঙ্গীত, স্বদেশের গৌরবময় পূর্ব্ব-ইতিহাস ও স্বদেশী আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া—সংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন। অসংবদ্ধ দেশে পাশবিক শক্তির আশ্রয় লইয়া দণ্ডায়মান হইলে পাশবিক-বলপুষ্ট ব্রিটিশ শক্তির নিকট জয়লাভ অসম্ভব বলিয়া গ্রিফিথ ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন।

প্রায় দশবৎসর-কাল-ব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার ফলে গেইলিক সমিতি একপ্রকার পুষ্ট হইয়া উঠিল। জাতীয় চিন্তার ধারা অনেকটা অন্তর্মুখী হইয়া জাতীয়তার আদর্শকে অন্য রঙে রঙীন করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কর্ম্মীদিগের কর্ম্মপথে দিনে দিনে বাধা বিপত্তি বাড়িয়া চলিল। একদিকে মদমত্ত ব্রিটিশ-রক্ত-লোলুপ রিপাব্লিকান্ দল, অন্যদিকে ইংরেজ-আশ্রিত নরমপন্থী দল এই কিশোরী সমিতিকে দলিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়া আত্মপ্রাধান্য ও আত্মবিস্তার সাধনে তৎপর হইল। গেইলিক সমিতির ধুরন্ধরগণ এই অবস্থায় নিরপেক্ষ থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না; গেইলিকদিগের প্রাণ বাঁচাইয়া আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তির পথ নিষ্কণ্টক ও প্রশস্ত করিয়া তুলিবার মানসে তাঁহারা আত্মবিক্রীত সহযোগীদলের কর্ম্মপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ রাষ্ট্রবৈঠকে আয়ার্ল্যাণ্ড যে শক্তি, যে উদ্যম, যে প্রতিভা এত দিন অপব্যয় করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা দেশের প্রকৃত কাজে লাগাইতে হইলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি-প্রেরণ বন্ধ করিতে হইবে—গেইলিকদিগের এই যুক্তি অনেকদিন অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য রহিয়া গেল। এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এইপ্রকার noncoperation অসহযোগ যুক্তির অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে গেইলিক সমিতির প্রথমাঙ্ক শেষ হইল। "সীন্‌ফীন্"-বার্ত্তা জগতে ঘোষিত হইল। ইহার পর প্রায় চারিবৎসর কাল নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে, দেশের শ্রীবৃদ্ধির নানা প্ল্যান আঁটিতে কাটিয়া গেল। আর্থার গ্রিফিথের মস্তিষ্ক এই সময় অতি দ্রুত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার লেখনী বিপুল শক্তিতে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রচার করিতে লাগিল। কি প্রকারে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে, কোন্ উপায়ে দেশের শিল্প-

বাণিজ্যের দুরবস্থা বিদূরিত হইয়া আইরিশজাতির আর্থিক আকাশ মেঘমুক্ত হইবে ইহাই ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিল।

বিশেষ চিন্তা করিয়া, দেশবাসীর মনস্তত্ত্ব ও পার্থিব অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া গ্রিফিথ, রাজনৈতিক আদর্শ হাঙ্গেরী হইতে এবং অর্থনৈতিক যুক্তি জার্ম্মানী হইতে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশিত Hungarian Insurrection নামক রচনায় তিনি দেখাইলেন—কি-প্রকারে অষ্ট্রীয়াকে শত্রুপক্ষ বিবেচনা না করিয়া কেবলমাত্র অবজ্ঞার প্রভাবেই হাঙ্গেরী আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। অষ্ট্রীয়া জীবিত কি মৃত, ক্ষমতাশালী কি দুর্ব্বল, একথা একবারও না ভাবিয়া নিজের মনে হাঙ্গেরী অষ্ট্রীয়াকে সমস্ত বিষয়ে বাদ দিয়া রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমুদয় সমস্যার নিষ্পত্তি করিয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডকেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

তার পর, যে উপায় অবলম্বন করিয়া জর্ম্মান অর্থনীতিজ্ঞ ফ্রীড্রিক লিষ্ট্ (Friedrich List) সম্রাট নেপোলিয়নের পদদলিত বিধ্বস্ত জর্ম্মানীকে পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্যশালী, শিল্প-জগতের মহারাজ করিয়া তুলিয়াছিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষেও তাহাই একমাত্র পন্থা। কিন্তু অর্থনৈতিক এই নিয়ম প্রয়োগ করিতে হইলে স্বদেশী রাষ্ট্র চাই, স্বদেশের আত্মকর্তৃত্ব চাই। তাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে সমিতির এক বিশেষ বৈঠকে "Grattan's Parliament" এখনও জীবিত ও বর্ত্তমান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। স্থানীয় কার্য্যাবলী ইহার মতানুসারে সমাধা হইবে, বিভাগীয় মণ্ডলী-সকলকে ইহার আজ্ঞা মানিয়া চলিতে হইবে,--বৈঠকে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। ব্রিটিশ আদালত বয়কট করিয়া শালিশী বিচার প্রচলন করিতে হইবে,—এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এইরূপ সিদ্ধান্তের পর হইতে "সীন্‌ফীনের" কর্ম্মযুগ আরম্ভ হইল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিরুপদ্রব পন্থা অবলম্বন ও আইরিশ স্বাধীনতা মূলমন্ত্র করিয়া গ্রিফিথ প্রমুখ সীন্‌ফীন্-কর্ম্মীরা নানাভাবে দেশের সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বদেশীচর্চ্চা দেশবাসীর আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিরুপদ্রবনীতি, ও তাঁহাদের শান্তিসহিষ্ণুতা-সাপেক্ষ উপায় সমগ্র দেশবাসীর অন্তর আকৃষ্ট করিতে পারিল না।

হোমরুল আন্দোলনের কয়েকবৎসর রেড্‌মণ্ডের দল দেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রহিল। অ্যাস্‌কুইথের গভর্ণমেণ্ট আশ্বাস দিয়া বলিলেন—যে-প্রকারেই হউক তোমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। ভিক্ষুক আয়ার্ল্যাণ্ড আশাদীপ্ত মুখে ইংরেজ রাষ্ট্রপতির মুখ চাহিয়া রহিল।

রিপাব্লিকানদের অগ্নিঝনঝনানিতে, বা সীন্‌ফীনের নীতিবাক্যে দেশবাসী ভ্রুক্ষেপও করিল না। বহু ধস্তাধস্তির ও সমুদ্রমন্থনের পর পার্লামেণ্টে হোমরুল বিল পাশ হইল। আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী জয়োল্লসিত হইয়া মনে করিলেন বুঝি তাঁহাদের দুর্দ্দশার শেষ হইল, বেদনার উপশম হইল। কিন্তু বিধাতা বুঝিলেন অন্যরূপ। সহসা হরিষে বিষাদ দেখা দিল।

শিল্পবাণিজ্যে উন্নত ইংরেজবংশধরের বাসভূমি উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ড্ ইংলণ্ডের নিকটসম্পর্ক বিসর্জ্জন দিতে রাজি হইল না। ইংলণ্ডের সহিত একতাই তাহার বাণিজ্যোন্নতির একমাত্র প্রকৃষ্ট কারণ। জড়জগতের এই লাভ ছাড়িয়া আলষ্টারের ধনকুবেরগণ দেশহিতৈষী সাজিতে কোনক্রমেই অগ্রগামী হইলেন না। তাঁহাদের মুখপাত্র সার্ (এখন লর্ড) এডওয়ার্ড্ কার্সন আপনার শিঙায় ফুঁ দিয়া গম্ভীর নিনাদে জগৎ-সমক্ষে ঘোষণা করিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে যেদিন স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হইবে, বেলফাষ্টে সেই দিন জর্ম্মান-সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেল্‌মের রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হইবে।

এই ধ্বনিতে ব্রিটিশ রাষ্ট্র কাঁপিয়া উঠিল, অ্যাস্‌কুইথের দৃঢ়তা টলিয়া গেল, স্বায়ত্তশাসন বন্ধ হইল, দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে রিপাব্লিকান্ দল রেড্‌মণ্ডের মাথায় থুথু ফেলিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইল।

তারপর যখন বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র মানবহৃদয় চমকাইয়া দিয়া প্রলয়াকারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আয়ার্ল্যাণ্ডের শূন্য মন নানাসুরে বাজিয়া উঠিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দলে দলে যুবকেরা যোদ্ধৃবেশে সমরক্ষেত্রে প্রাণ দিতে গেলেন, গ্রিফিথ তাঁহার Eire Ireland নামক (separatist) ব্রিটিশ-সম্পর্ক-ছেদন-বাদী কাগজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করিতে দেশবাসীকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। রিপাব্লিকান্ দল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কৃতসংকল্প হইল। শ্রমজীবীরা ঝাঁকে ঝাঁকে নিজেদের দুরবস্থার প্রতিকার মানসে সজ্জিত দলবদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। সমর-ক্ষেত্রে আইরিশ জাতীয়তার মান ব্রিটিশ রাজপুরুষ অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না। ক্ষুব্ধ অপমানিত সৈনিকের দল দেশে ফিরিয়া আসিল। রিপাব্লিকান নেতৃবৃন্দ বুঝিলেন এই সময়। ১৯১৬ সালের Easter ইষ্টার-সপ্তাহে ডাব্লিন নগরে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইল। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সীন্‌ফীন দল কিন্তু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই। ক্রমে ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। সামান্য কনেষ্টবলের আদেশে দেশপূজ্য জননায়কদের অমূল্য প্রাণ নাশ হইতে লাগিল। কত প্রতিভাবান্ পুরুষ চিরকারাবাসে প্রেরিত হইলেন। এইভাবে একপক্ষকাল প্রেতাভিনয় চলিল। দেশসুদ্ধ লোক মরিয়া হইয়া উঠিল। সীন্‌ফীনের যুদ্ধকাল উপস্থিত হইল। শ্রমজীবীদিগের দলপতিকে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া সীন্‌ফীন্ সৈন্যদল পুষ্ট করিল। সমগ্র দেশ সীন্‌ফীন্ নামে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ কামনায় কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ব্রিটিশের ভাত উঠিয়া গেল।

তারপর নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর সাহায্য লইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেশে দেশে রাজদূত প্রেরিত হইল। ডিভ্যালেরা প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান অমাত্য হইয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। তারপর সীন্‌ফীনের প্রথম মন্ত্রগুরু গ্রিফিথ, কলিন্‌স্ প্রভৃতি ইংরেজের স্বল্পদানে প্রলুব্ধ হইয়া যখন সন্ধি করিলেন, তখনও ডিভ্যালেরার দল নিরস্ত হইলেন না—এখনও তাঁহারা নিরস্ত হন নাই; তাঁহারা চাহেন আয়ার্‌ল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ--অনবশেষ বিনাশ।

এখন দেখিতে হইবে সীন্‌ফীনের এত বল এত বিক্রমের উৎসস্থান কোথায়। কোন্ মন্ত্রবলে সীন্‌ফীন্ সেনানীর এত দৃঢ়তা এত কঠোর নিষ্ঠা? এককথায় বলিতে গেলে সীন্‌ফীন্ নেতৃবৃন্দের অসামান্য আদর্শবাদিতাই এই দুর্দ্দমনীয় শক্তির মূলীভূত কারণ। যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তপঃক্লিষ্ট মুনি ঋষি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন "কেবল তোমাকেই চাই", সেই আদর্শপ্রসূত কঠোর সাধনাই দারিদ্র্যব্রতধারী নির্লোভ সীন্‌ফীন বীরগণকে বলিতে উৎসাহিত করিয়াছে—"আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের মূলমন্ত্র, ইহার একচুলও কম হইলে গ্রহণ করিব না।" এই "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" ধর্ম্ম, পরম বিত্ত লাভের দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা, এই বর্ত্তমান-ইউরোপ-প্রদত্ত সম্পত্তি নহে। ইতিহাসপূর্ব্ব কেল্টিক সভ্যতাই ইহার জন্মদাত্রী। আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাবুক কবি জর্জ্জ রাসেল ও ইয়েট্‌স্ ইহাকে পুনর্জ্জন্ম দান করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডে ম্যাক্‌সুইনি, ডিভ্যালেরার মত আত্মবিলোপী সত্যকাম মহাপুরুষদের আবির্ভাব সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রী নরেশচন্দ্র রায়

বাঙ্গালী-বীর ভীম ভবানী

শক্তিচর্চ্চা আমাদের দেশে এক সময়ে খুবই প্রচলিত ছিল। আমাদের বাঙ্গলা দেশে এককালে ঘরে ঘরে শক্তিমান্ পুরুষের কথা শুনা যাইত, এখন সে-সব স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। যে দু চারজন বাঙ্গালী দেহশক্তির জন্য এখনও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন ভীম ভবানী। কিন্তু দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভবানী ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতি জীর্ণকায়, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছিলেন। সেই সময়ে একদিন সমবয়স্ক একটি ছেলে ভবানীকে প্রহার করে। তাহাতে ভবানীর মনে বড়ই ধিক্কার আসে। তিনি এই সময় হইতেই শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় তৎপর হইয়া উঠেন।

কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ায় তখন গুহ বাবুদের বাড়ীতে পালোয়ানের আখড়া। ভবানী ক্ষেতু-বাবুর শরণ লইল। ক্ষেতু গুহের আখড়াতেই বাঙ্গালীর মুখোজ্জলকারী দুইটি যুবকই কুস্তির প্যাঁচ শিখিতে লাগিল। এই দু'জনেই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীর বলিয়া পরিচিত—একটি আমাদের ভীম ভবানী, অন্যটি গোবর-বাবু।

ভবানীর যখন ১১ বৎসর বয়স, তখন সুপ্রসিদ্ধ রামমূর্ত্তি কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসেন। ভবানী খেলা দেখিতে গিয়াছেন। তাঁবুতে তিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী হতাশ ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া ভবানী ফিরিয়া দেখেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দর দিব্যকায় ব্যক্তি! তেমন বীরমূর্ত্তি আর কখনও ভবানী দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আগন্তুক নির্ণিমেষ নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি খেলা দেখিতে আসিয়াছ?" তাহাই উদ্দেশ্য শুনিয়া আগন্তুক ভবানীর হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "তুমি আমার

ভীম ভবানী—শিকলবদ্ধ অবস্থায়
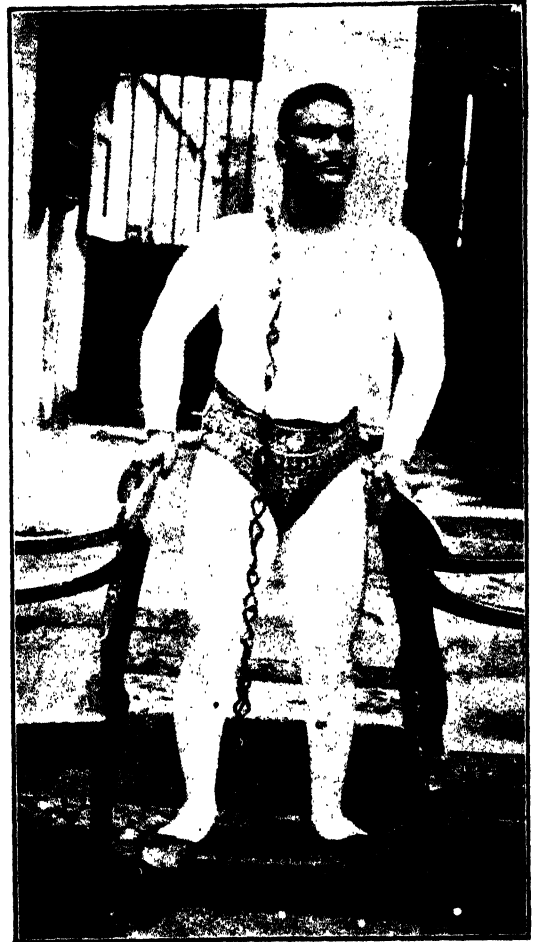
ভীম ভবানীর এক নিশ্বাসে শিকল ছেদন

ভীম ভবানীর বুকে পাথর ভাঙা

সঙ্গে আইস ; আমি তোমাকে ভাল জায়গা দিতেছি।" তাঁবুর মধ্যে যেখানে দলের লোকেরা বসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া তিনি ভবানীকে বলিলেন, "বস !"

বীরকায় পুরুষ পলকহীন নেত্রে তখনও সেই বঙ্গীয় যুবকের দেহের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তিনি ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত ?"

ভবানী বলিলেন, "উনিশ।"

"এই বয়সে তোমার এমন শরীর ! আমি অনেক কুস্তিগীর পালোয়ান দেখিয়াছি। এমন অঙ্গসৌষ্ঠব, এমন বীর গঠন ত দেখি নাই ! তোমার মত যুবক পাইলে আমার সর্ব্ববিদ্যা দিয়া পারদর্শী করিয়া তুলি !"

ভবানী তখনই জানিতে পারেন, ইনিই সুবিখ্যাত প্রোফেসর রামমূর্ত্তি! ভবানীও রামমূর্ত্তির বীরপনা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ; তাঁহার বীর বপুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয়ের মধ্যে তুফান বহিল। খেলা ভঙ্গে রামমূর্ত্তি আবার সস্নেহে ভবানীকে আহ্বান করিলেন।

মনস্থির করিতে, ভবানীর দিন তিনেক লাগিয়াছিল। রামমূর্ত্তির সাদর আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রামমূর্ত্তি ভবানীকে পাইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু বাড়ীর লোকের মত পাওয়া শক্ত। জননী জীবিত, তিনি জানিতে পারিলে কিছুতেই রাজী হইবেন না। অতএব না বলিয়া পলায়ন করাই ভবানী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তিনি রামমূর্ত্তির দলের সহিত একেবারেই রেঙ্গুন যান। রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন।

যবদ্বীপে এক ওলন্দাজ পালোয়ান রামমূর্ত্তির বীরত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে প্রত্যাখ্যান করা বীরধর্ম্মের বিরুদ্ধ। রামমূর্ত্তি সম্মত হইলেন। ভবানী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, "গুরুদেব ! আমি শিষ্য।—আমার সঙ্গে আগে লড়ুক, আমি হারিলে গুরুদেব অ

রামমূর্ত্তি মহা খুশী হইয়া সম্মতি দিলেন।

তিন মিনিটের মধ্যে ওলন্দাজ পালোয়ান পরাজিত হইল। রামমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাহেব, গুরুর সঙ্গে লড়িবে ?"

ওলন্দাজের আর "গুরু" দেখিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি মুখটি চুন করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

রামমূর্ত্তির স্নেহ ভোগ করা ভবানীর ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই। বিদ্যার পারদর্শিতায় শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে দেখিয়া রামমূর্ত্তি ভবানীকে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী বঙ্গদেশে ফিরিলেন।

প্রোফেসর বসাকের হিপোড্রোম সার্কাস তখন এশিয়াখণ্ডে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। তাঁহারা ভবানীকে লইয়া সফরে বাহির হইলেন। ভবানী সেই প্রথম স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আত্মবলের

পরিচয় দিলেন। সে কি পরিচয়! কিছুদিন পূর্ব্বে লোকে রামমূর্ত্তির অদ্ভুত বলের পরীক্ষা দেখিয়াছিল, এবার যাহা দেখিল, তাহা আরো আশ্চর্য্য!

রামমূর্ত্তি একখানা মোটর-গাড়ী টানিয়া রাখিতেন, ভবানী দু'খানাকে দুই হাতে অচল করিয়া দিলেন; ৫ মণ বারবেলটাকে শিশুর ক্রীড়নকের মত দেখাইলেন; সিমেন্টের পিপের উপর ৫।৭ জন লোককে বসাইয়া পিপের ধার দাঁতে চাপিয়া তুলিয়া পিপে শুদ্ধ লোকদের শূন্যে ঘুরাইয়া দিলেন; বুকের উপর চল্লিশ-মণী পাথর চাপাইয়া তাহার উপর বিশ পঁচিশজনকে খাম্বাজ খেয়াল গাহিবার অবসর দিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

ভীম ভবানী—জাপানে, হাতে ভাঁজিবার পাঁচ মণ বারবেল

সাঙ্ঘাইতে থাকিতে কার্ম্মার নামে একজন মার্কিন পালোয়ান ভবানীকে চ্যালেঞ্জ করে। ১০০০ ডলর বাজী। মার্কিন পালোয়ান বেচারা হারিয়া, ১০০০ ডলার গণিয়া দিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মাঠ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কার্ম্মার অপমানের প্রতিশোধ লইতে ভবানীর জীবন-নাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। স্থানীয় কন্‌সাল ভবানীর প্রাণ রক্ষা করেন। কার্ম্মারের ক্রোধের কারণ জানিয়া কন্‌সাল স্বচক্ষে একবার বাঙ্গালী বীরের শক্তির পরিচয় লইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার একখানি নূতন মিনার্ভা মোটর-গাড়ী ছিল। তিনি বলিলেন, আমি গাড়ী চালাইব, ভবানী যদি আমার গাড়ী থামাইতে পারেন এই গাড়ী তাঁহার। ভবানী সফল হইলেন, মিনার্ভা গাড়ীখানি পাইয়া ভবানী তাহা সেইখানেই বিক্রয় করিয়া দেন।

জাপানের মহিমান্বিত সম্রাট মিকাডো মহোদয় একবার ভবানীর বলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একখানি সুবর্ণপদক ও নগদ ৭৫০ টাকা পুরস্কার দেন।

এসিয়া জয় করিয়া ভবানী ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। সংগ্র ভারতময় ভবানীর বীরত্বের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।
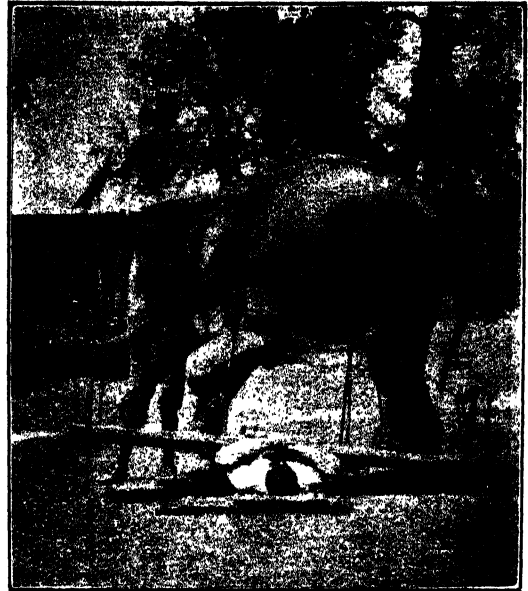
ভীম ভবানীর বুকের উপর হাতী

ভরতপুরের মহারাজ একবার বলেন, ভবানী যদি তিনখানা মোটর ধরিতে পারেন তবে তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিব। ভবানী ইতিপূর্ব্বে দুই হস্তে দুখানা মোটর ধরিয়া তাঁহার অমানুষিক বলের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনখানা যে কিরূপে ধরিবেন তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর ছিল। তথাপি সম্মত হইলেন।

ভরতপুরের মহারাজ বাহাদুর, ইংরেজ রেসিডেন্ট ও রাজমন্ত্রী তিনজনে তিনখানা মোটরে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ীগুলির পিছনে প্রকাণ্ড রজ্জু বাঁধা হইল। ভবানী একটা কোমরে ও দুইটি রজ্জু দুই হস্তে ধরিয়া বলিলেন—"Go"। তিনজনেই একসঙ্গে ষ্টার্ট দিলেন। বিরাট শব্দ করিয়া এঞ্জিন চলিল। স্পীডোমিটারে জানা গেল এঞ্জিন পুরাদমে চলিতেছে, কিন্তু কোন গাড়ীই এক ইঞ্চিও নড়িতে-চড়িতে পারিল না, যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী তিনখানির পিছনের চাকাগুলি শূন্যে উঠিয়া পড়িল—ঘর-র-র শব্দে চাকাই ঘুরিতে লাগিল।

একখানা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লোহার বরগার উপর ৩০ জন লোককে বসাইয়া কাঁধের উপর ঝুলাইয়া ভবানী সেখানাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিণত করিতে পারিতেন। সর্ব্বাঙ্গ লৌহ-শিকলে বাঁধিয়া ভবানী কেবলমাত্র নিশ্বাসের শব্দের সঙ্গেই মুক্ত হইতে পারিতেন—চক্ষের পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যেই ভবানী ফুলের মালার মতই শিকলটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইতেন।

৫০ জন করিয়া মানুষ-বোঝাই দুইখানি গো-শকট একই সময় একসঙ্গে বুক ও উরু-দেশের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও ভবানী ক্লেশ বোধ করিতেন না।

ভবানীর শিক্ষাগুরু প্রোফেসর রামমূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম বুকের উপর হাতী চালাইয়া অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। পরে আরও দুইজন বঙ্গীয় বীর বক্ষে হাতী ধরিয়াছেন। সে-সকলই সার্কাস-দলের শিক্ষিত হাতী। ভবানীও এতদিন সার্কাসের হাতীই বুকের উপর তুলিতেছিলেন—এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী তোলার চেষ্টাও করেন নাই। একবার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের হাতীশালায় এক বুনো হাতী

ভীম ভবানী—শ্মশানে

আসিয়া হাজির হয়। হাতীটা ওজনে ও আয়তনে সচরাচর যে-সব হাতী দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী। দৈর্ঘ্যে জীবটি, নয় ফুট সাত ইঞ্চি। নবাব বাহাদুরের ইচ্ছা, বুনো হাতীটাকে ভবানী বুকের উপর দিয়া চালাইতে পারেন কি না পরীক্ষা করা। ভবানী নবাব-বাহাদুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, নবাব বাহাদুরের সন্তোষবিধানার্থ হাতীটাকে বুকের উপর দিয়া চালাইতে তিনি সম্মত আছেন।

ভবানী যখন সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে স্বয়ং নবাব বাহাদুর ও তদানীন্তন বাংলার লাটের সাক্ষাতে বুকের উপর দিয়া সেই হাতীটাকে চালাইয়া দিয়া সুস্থ ও অক্ষত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল।

ভবানী সর্ব্বসুদ্ধ ১২ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছিলেন। পদক ব্যতীত শাল আলোয়ান অঙ্গুরী মোটর-গাড়ী নগদ মুদ্রাও তিনি যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি—ভারতবাসী—তাঁহার সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

স্বদেশী-মেলায় দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে বীরত্ব-লীলা দেখাইয়া ভবানী 'ভীম' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

পশ্চিমাঞ্চলে ইঁহাকে লোকে "ভীম-মুর্ত্তি" বলিয়া থাকে।

ভীমমুর্ত্তির আসল নাম হইতেছে, ভবেন্দ্রমোহন সাহা। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বীডন ষ্ট্রীটের সা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ভবেন্দ্রের পিতা ৺ উপেন্দ্রমোহন সাহাও বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। ভবানী নয় সহোদরের মধ্যম; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই ভবানীর শিক্ষকতায় শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

ভীম ভবানীর বয়ঃক্রম মাত্র ৩১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মোটামুটি রকমে জীবন যাপন করিতেন।

কিছু দিন হইতে তিনি আমেরিকায় যাইবার জন্য পাস্‌পোর্টের চেষ্টা করিতেছিলেন।

প্রাতে ২০০ শত বাদামের সরবৎ, এক ছটাক গব্য ঘৃত; মধ্যাহ্নে সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহ্নে ২ বা ২৷৷০ টাকার ফল ও ৫০টি বাদামের সরবৎ এবং এক সের মাংস; রাত্রে আধ সের আটার রুটি ও তিন পোয়া মাংস—ইহাই ভীম ভবানীর দৈনন্দিন আহার ছিল।

[এই বিবরণ ১৩২৯ সালের ভাদ্র-সংখ্যা মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত, বিবরণ হইতে সঙ্কলিত হইল।]

"জার্ম্মান্ মার্কের দুরবস্থা"

যুদ্ধ শেষ হবার পরে অনেকেই সস্তায় জার্ম্মানীর মুদ্রা "মার্ক" কিনেছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় মার্ক্ ইংরেজী শিলিংএর সমান মূল্যবান ছিল। যে-সব লোক মার্ক্ কিনেছিলেন তাঁদের আশা ছিল যে আবার মার্কের দাম চড়ে' গেলে সেগুলি বিক্রি করে' কিছু লাভ কর্‌বেন। যুদ্ধের পর আট্ টাকারও কমে এক সময় ইংরেজের পাউণ্ড বিক্রি হয়েছে, কিন্তু এখন পনের টাকা-তেও পাউণ্ড পাওয়া যায় না। অর্থাৎ যাঁরা আট টাকার বদলে এক পাউণ্ড জোগাড় করেছিলেন, তাঁরা এখন সেই পাউণ্ডের বদলে পাউণ্ড-প্রতি পনের টাকা পেতে পারেন। এতে লাভ হল প্রায় শতকরা একশ টাকা। জার্ম্মান্ মার্ক্ যাঁরা কিনেছিলেন তাঁদেরও আশা ছিল যে আস্তে আস্তে, ধরা যাক, দশ মার্কে একটাকা থেকে দাম বেড়ে দুই মার্কে এক টাকা, এই জাতীয় কিছু একটা হয়ে তাঁদের শতকরা দুশ কি তিনশ টাকা লাভ হবে। কিন্তু দাম বাড়া ত দূরের কথা, মার্কের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে আস্‌ছে। অল্পকালস্থায়ী উঠা-নামার মধ্যে দিয়ে মার্কের দাম ক্রমাগত কমে' চলেছে। এতে মার্কের ক্রেতাদের খুবই লোক্‌সান হয়েছে ও হচ্ছে।

অনেকেই ভেবে পাবেন না, যে, মার্ক্ কোথায় কিন্‌তে পাওয়া যায় ও কেনই বা লোকে সাধারণতঃ মার্ক্ বা অন্য কোন বিদেশী মুদ্রা কেনে। কেন যে কেনে তার উত্তরে বলা যায়, "অন্যদেশীয় জিনিস কেনে বলে'"; ও কোথায় কেনে তার উত্তরে সহজে বলা যায়, "অন্যদেশীয় মুদ্রা ইত্যাদির কার্‌বার যারা করে সেই-সব ব্যাঙ্কে।" অন্যদেশীয় জিনিসও আমরা কিনি, আর আমাদের জিনিসও অন্যেরা কেনে। মতিরাম কি রাধারাম কেনে জার্ম্মানীর মাল, আর শ্নাইডের কি কাউফ্‌মান কেনে আমাদের দেশের জিনিস। ধরা যাক, মতিরাম কিনেছে ছুরি-কাঁচি শ্নাইডেরের কাছে, আর কাউফ্‌মান কিনেছে পাট ও চাম্‌ড়া রাধারামের কাছে। দুই ক্ষেত্রেই "ক"-পরিমাণ টাকার জিনিস বেচা-কেনা হয়েছে। এখন শ্নাইডের পাবে "ক" টাকা মতিরামের কাছে, আর রাধারাম পাবে "ক" টাকা কাউফ্‌মানের কাছে। শ্নাইডের একটা হুণ্ডি কাট্‌তে পারে মতিরামের নামে, অর্থাৎ সেই হুণ্ডি দেখালে মতিরামকে টাকা দিতে হবে, আর রাধারাম একটা হুণ্ডি কাউফ্‌মানের নামে কাট্‌তে পারে। অনেক গোলমাল ও খরচ করে' টাকা না পাঠিয়ে যদি মতিরাম "ক"-টাকা রাধারামকে দিয়ে তার হুণ্ডিটা কিনে নেয়, তাহলে রাধারাম তার টাকা পেয়ে যায়; আর সেই হুণ্ডি যদি সে শ্নাইডেরকে পাঠিয়ে দেয় তা হলে শ্নাইডের কাউফ্‌মানের কাছে টাকা আদায় করে' নেয়; সকলেরই দাবি দাওয়া মিটে যায়। যে-কোন দুই দেশের মধ্যে যদি কেনা বেচা প্রায় সমান সমান হয় তা হলে হুণ্ডির সাহায্যেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজ চলে' যায়। শুধু যে ব্যবসাদাররাই হুণ্ডি কাটে তা নয়, যে-সব ব্যাঙ্কের শাখা দুই দেশেই আছে তারাও হুণ্ডি-জাতীয় দলিল বিক্রি করে। অন্য দেশে ঐই-সব দলিল (draft) কিনে পাঠালে সেই দেশের ব্যাঙ্কের শাখার কাছ থেকে অর্থটা পাওয়া যায়। তা ছাড়া অন্য দেশের মুদ্রাও এই-সব ব্যাঙ্কে বিক্রি হয়। সকলেই যে অন্য দেশের মুদ্রা বা মুদ্রার মত কিছু (হুণ্ডি প্রভৃতি), কেনা জিনিসের দাম দেবার জন্যই শুধু কেনে তা নয়। জিনিস কিন্‌বে বলে', অন্য দেশে খরচ কর্‌বে বলে' বা অন্য কোন কারণেও কিন্‌তে পারে। যে-সব জায়গায় অপর দেশীয় মুদ্রা, হুণ্ডি, ইত্যাদি বিক্রি হয়, তাকে টাকার বাজার বলা হয়।

যুদ্ধের আগে জার্ম্মান্ মার্ক্ ছিল এক শিলিংএর প্রায় সমান, অর্থাৎ পাউণ্ডে প্রায় কুড়ি মার্ক্ তখন পাওয়া যেত। সন্ধির পরে বাজারে পাউণ্ডে জার্ম্মান্ মার্ক্ ২০০র চেয়ে বেশী পাওয়া যেতে সুরু হল। তার পর কিছু কাল পর্য্যন্ত ৫০০।৬০০র অবস্থায় থেকে মার্ক্ এই বছরের গোড়ার দিকে ১০০০এর গণ্ডি ছাড়াল। এই কদিন হল পাউণ্ডে ২০।২৫ হাজার মার্ক্ পাওয়া যেতে সুরু হয়েছে। অর্থাৎ আজ-কাল তার দাম তার আসল দামের $\frac{১}{১০০০}$ ভাগেরও কম।

আগেই বলেছি যে পরের দেশে কিছু কিন্‌বে বা

ধার শোধ করবে বা এক কথায় খরচ করবে বলেই অন্য দেশের মুদ্রা লোকে কেনে। কাজেই কোন দেশের মুদ্রা দিয়ে কি পাওয়া যায় তার উপর অন্য দেশের লোক সেই মুদ্রার জন্য কত দাম দেবে তা নির্ভর করে। অর্থাৎ কোন মুদ্রার কিন্‌বার ক্ষমতা কত তার উপর (টাকার বাজারে) তার বাজার-দর বিশেষরূপে নির্ভর করে। কোন মুদ্রার কিন্‌বার ক্ষমতা যে সব সময়ই সমান থাকবে এমন কোন কথা নেই। যেমন আমাদের দেশেই এক টাকায় আটমণ চাল বা সাধারণভাবে অনেক জিনিস পাওয়া যেত এই রকম শোনা যায়। এখন আর তা পাওয়া যায় না, অর্থাৎ অন্য কথায় বল্‌তে গেলে আগে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা বেশী ছিল, এখন কমে' গেছে। সব জিনিসের বা বেশীর ভাগ জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ার মানে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা কমে' যাওয়া, আর সব জিনিসের বা বেশীর ভাগ জিনিসের দাম কমে' যাওয়ার মানে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া।

যুদ্ধের আগে যখন প্রায় সব দেশের মুদ্রারই সোনার সঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ ছিল অর্থাৎ দেশের মান (Standard) মুদ্রাতে* একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা থাক্‌ত বা তাকে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনার সমান মনে করা হত, তখন কোন দেশের মুদ্রায় যে পরিমাণ সোনা ছিল, বা তাকে যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনার সমান মনে করা হত, তাই দিয়ে নানা দেশের মুদ্রার পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করা হত। অর্থাৎ "ক" নামক দেশের মুদ্রায় যদি "খ" নামক দেশের মুদ্রার দুইগুণ সোনা থাক্‌ত, তাহলে "ক" দেশের এক মুদ্রায় (তার নাম শিলিং, ইয়েন, ডলার, মার্ক্, ক্রাউন্, যাই হোক) "খ"এর দুই মুদ্রা পাওয়া যেত।

সোনার দাম বা সোনার কিন্‌বার ক্ষমতা মোটামুটি সব দেশেই সমান থাকায় সব দেশের মুদ্রার কিন্‌বার ক্ষমতা (অন্য সব অবস্থা একই প্রকার থাক্‌লে) একই ভাবে বদ্‌লাত। অর্থাৎ অন্য সব অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাক্‌লে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা কোন দেশে ৪ ও কোন দেশে ৪ হয়ে যেত না। অবশ্য অন্য সব অবস্থা সব সময় সমান থাক্‌ত না। যেমন কোন দেশে যদি গমই সবচেয়ে বেশী কেনা বেচা হত, আর কোন বৎসর গম যদি খুব বেশী মাত্রায় জন্মাত, তা হলে সে দেশের মুদ্রার কিন্‌বার ক্ষমতা খুবই বেড়ে যেত; কেন না বেচ্‌বার জিনিস অপর্য্যাপ্ত থাক্‌লে তার দামও সস্তা হয়ে যায়। অন্য দেশের লোকেরা দেখ্‌ত যে ঐ দেশবিশেষের মুদ্রার গুণ অনেক, অর্থাৎ তা দিয়ে দেদার গম পাওয়া যায়; কাজেই তারা সে দেশের মুদ্রা একটু বেশী দামে কিন্‌তে রাজী হত। কিন্তু মুদ্রার সঙ্গে সোনার নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় বেশী দামের একটা সীমা থাক্‌ত। মুদ্রা (নোট হুণ্ডি ইত্যাদি) কিনে কোন দেশে পাঠান সোনা কিনে পাঠানর চেয়ে সহজে ও সস্তায় হয়। সোনা কিনে পাঠানতে যেটুকু খরচ বেশী, সেইটুকু অবধি মুদ্রার দাম টাকার বাজারে বাড়্‌তে পার্‌ত।† অর্থাৎ এক মুদ্রা পরিমাণ সোনা পাঠাতে যদি খরচ হত "ক", তাহলে টাকার বাজারে মুদ্রার (অর্থাৎ নোট, দলিল, হুণ্ডি ইত্যাদির) দাম, মুদ্রা-প্রতি মুদ্রা+"ক" অবধি বাড়্‌তে পার্‌ত। অর্থাৎ এক কথায় বল্‌তে গেলে লোকে মুদ্রার দাম বেশী বাড়্‌তে দেখ্‌লেই কেনা-বেচাতে মুদ্রা ছেড়ে সোনা ব্যবহার কর্‌ত। কিন্তু যুদ্ধের পর ও যুদ্ধের সময় থেকে মুদ্রার ও সোনার নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ বলে' কিছু, এক আমেরিকা ছাড়া, আর কোন প্রধান দেশে নেই। সেই সময় থেকে সব দেশের গভর্ণমেণ্ট্ই যত দরকার ও যত ইচ্ছা কাগজের মুদ্রা ছাপিয়ে দেশের ধন-সম্পদে গোপনে ভাগ বসান ব্যাপারটা একটা শাস্ত্রের মত করে' তুলেছেন। অকাতরে যদি মুদ্রা সৃষ্টি হতে থাকে, তা হলে শীঘ্রই সমাজে যে-পরিমাণ কেনা-বেচার জিনিস আছে তার তুলনায় কেন্‌বার অস্ত্রের (মুদ্রার) সংখ্যা অত্যধিক হয়ে পড়ে, এবং ফলে একই পরিমাণ মুদ্রার বদলে আগের চেয়ে কম জিনিস পাওয়া যায়। অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চল্‌লে তার কিন্‌বার ক্ষমতা ক্রমাগত কমে' চলে। জার্ম্মান্

* যে মুদ্রার সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে দেশের অন্য সব মুদ্রা বাঁধা, যেমন আমাদের রূপেয়া। আনা মানে রূপেয়ার ১/১৬ অংশ। নোটগুলিও রূপেয়ার ভাষায় ছাপা হয়। জার্ম্মানীর মানমুদ্রা মার্ক্। ইংলণ্ডের পাউণ্ড। আমেরিকার ডলার।

† কথাটা কিন্তু নানাকারণে সর্ব্বক্ষেত্রে অকাট্য সত্য বলে' ধরে' নেওয়া চলে না। কিন্তু সাধারণ ভাবে কথাটা সত্য।

মার্কেরও সেই অবস্থা হয়েছে। যুদ্ধের দরুন অজস্র ব্যয় ও মিত্র-পক্ষের অন্যায় রকম দাবীর ধাক্কায় জার্ম্মান্ গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে ক্রমাগতই কাগজের মুদ্রা ছাপাতে হচ্ছে। তার উপর আরও গোলমাল হচ্ছে জার্ম্মানীর ধনীলোকদের জন্য। তারা কিছু অর্থ পেলেই সেটুকু অন্য দেশের ব্যাঙ্কে রেখে দেয়। যেমন ২৫ লক্ষ মার্ক্ পেলে সেটা দ্বারা সুইট্‌জার্‌ল্যাণ্ডের মুদ্রা কিনে সুইস্ ব্যাঙ্কে রেখে দিল। গভর্ণ্‌মেণ্টের ট্যাক্‌স্ আদায়ের লোক এসে ঠিক করে' গেল ২৫ লক্ষ মার্কের উপর ট্যাক্‌স্; কিন্তু ট্যাক্‌স্ দেবার বেলা ইতিমধ্যে জার্ম্মান্ মার্কের দাম আরো কমে' যাওয়ায়, আগেকার ২৫ লক্ষ মার্কে কেনা সুইস মুদ্রার দাম তখন ৫০ লক্ষ মার্ক্ হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ ইতিমধ্যে মার্কের কিন্‌বার ক্ষমতা কমে' যাওয়ায় যে-পরিমাণ ধন সম্পদ (কাগজের মার্ক্ নয়; তা দিয়ে যা কেনা যায় তাই) গভর্ণ্‌মেণ্ট্ ট্যাক্‌স্ রূপে আশা করেছিল তার হয় ত অর্দ্ধেক পেল। ২৫ লক্ষের উপর যদি ট্যাক্‌স্ ২॥০ লক্ষ হয় এবং ট্যাক্‌স্ নির্দ্ধারণের সময় যদি ২॥০ লক্ষ মার্কে "ক"-পরিমাণ ধন-সম্পদ পাওয়া যেত, তাহলে ট্যাক্‌স্ দেওয়ার সময় মাত্র ২॥০ লক্ষ মার্ক্ পাওয়াতে গভর্ণ্‌মেণ্ট্ হয়ত পেল ½ "ক"-ধন-সম্পদ। বাকী ½ "ক" ধনী ট্যাক্সদাতার হাতেই রয়ে গেল। সে তা দিয়ে বিদেশী মুদ্রা কিনে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রেখে এই ½ "ক" ধনসম্পদ নিজের হাতেই রাখ্‌ল। কাজেই বহুলোকে এই-রকম করার ফলে, দেশের ধনসম্পদের যতটা গভর্ণ্‌মেণ্টের প্রাপ্য, তা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ পাচ্ছে না। এই সমস্যার নাম হচ্ছে The problem of the vanishing Mark, ("ক্রমশঃ তিরোভবনশীল মার্কের সমস্যা")। ফল, পুনর্ব্বার মার্ক্ ছাপান ও মার্কের আরও অধোগতি।

মিত্রপক্ষের দেশগুলি জার্ম্মান্‌দের ঘাড়ে একটা অসম্ভব ও অন্যায় রকম ঋণের বোঝা জোর করে' চাপিয়েছেন। তার সুদ জোগাতেই (আসলের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্) জার্ম্মান্ গবর্ণ্‌মেণ্টের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। এই অন্যায় দাবী না দূর কর্‌লে জার্ম্মান্ গভর্ণ্‌মেণ্টের অবস্থা শেষ অবধি কি হবে বলা শক্ত নয়।

আগেই বলেছি অন্য দেশের লোক পরের দেশের মুদ্রা বা মুদ্রাজাতীয় কিছু কেনে, সেই মুদ্রা দিয়ে কি পরিমাণ কাজ হয় তাই দেখে। অর্থাৎ তার কিন্‌বার ক্ষমতা কতটা তাই দেখে। কিন্তু কোন দেশের মুদ্রার কিন্‌বার ক্ষমতা সে-দেশের ভিতরে যতটা, ততটাই বিদেশীর কাজে না লাগ্‌তে পারে। দেশের ভিতরে লোকে মুদ্রা দিয়ে কি পরিমাণ ঘর ভাড়া দেওয়া, ট্রেনে চড়া, ডাক্তার দেখান, পড়ার খরচ দেওয়া, খাবার ও পোষাক কেনা ও অন্যান্য জিনিস কেনা যায়, তাই দিয়ে তার কিন্‌বার ক্ষমতা বিচার কর্‌বে; কিন্তু বাইরের লোক ত আর অন্য দেশে গিয়ে ঘর ভাড়া করা, ডাক্তার দেখান, ছেলে পড়ান, ট্রেন ভাড়া দেওয়া, চাকরের মাইনে দেওয়া, কাপড় কাচান ইত্যাদি বড় একটা কর্‌বে না। এমন কি ভিতরের লোক যে-সব জিনিস কেনা বেচা কর্‌বে বাইরের লোক তার বেশীর ভাগই কর্‌বে না। বাইরের লোক দেখ্‌বে সে যে-সব জিনিস চায় সেগুলি কিন্‌বার ক্ষমতা মুদ্রার কতটা আছে। কোন দেশে যদি বাণিজ্যের উপযুক্ত জিনিস মাত্র একটাই থাকে, যেমন পাট, তা হলে অন্য দেশের লোক পাটের দর কত দেখে সে-দেশের মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারণ কর্‌বে। অন্য অনেক বা সব জিনিস আক্রা দামে বিকলেও, পাট সস্তা থাক্‌লে সে-দেশের টাকার প্রতি টান অন্য দেশের লোকের বেড়ে যাবে অর্থাৎ সে দেশের মুদ্রা অন্য দেশে বা টাকার বাজারে বেশী দামে বিকবে। জার্ম্মানীর ভিতরে অনেক জিনিস বেশ সস্তা, কিন্তু বাণিজ্যের জিনিসগুলি সেই পরিমাণ সস্তা নয়। অর্থাৎ মার্কের কিন্‌বার ক্ষমতা বাইরের লোকের কাছে যত কম, জার্ম্মানীর ভিতরের লোকের কাছে ততটা নয়।

তারপর অন্য দেশের লোক আরও দেখ্‌বে যে দেশ-বিশেষের সঙ্গে ব্যবসা করা নিরাপদ কি না অর্থাৎ তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী না কম। কোন দেশের মুদ্রার কিন্‌বার ক্ষমতা যদি ক্রমাগতই বদ্‌লায় তা হলে অন্য দেশের লোক কিছুতেই ঠিক বুঝ্‌তে পারে না যে কোন জিনিস কিন্‌তে তার কত খরচ হবে। আমি আজ ১০,০০০ মার্কের জিনিস অর্ডার দিলাম। দাম দিতে হবে ২০০০ মার্ক্ আজ ও ৮০০০ তিন মাস পরে। মার্ক্ যদি ১০ টাকা হাজার হয় ও বরাবর তাই থাকে, তা হলে

আমার খরচ হচ্ছে সব-সমেত ১০০৲ টাকা ; ২০৲ আজ ও ৮০৲ টাকা তিন মাস পরে। আমি যদি দেখি যে যা আম্‌দানি কর্‌ছি তা ১১০৲ টাকায় এদেশে বিক্রি করা চলে ত আমার আর ভাবনা কিছু নেই। কিন্তু যদি মার্কের দাম ক্রমাগত বদ্‌লায় তা হলে দ্বিতীয় কিস্তি দাম দেবার সময় হয়ত দেখ্‌ব যে মার্ক্‌ ৫০৲ টাকা হাজার হয়ে গেছে। (এ রকম হয়েছে গত বছরের শেষের দিকে।) অর্থাৎ আমায় দিতে হল প্রথমে ২০৲ টাকা ও দ্বিতীয়বারে ৪০০৲ ; মোট ৪২০৲ টাকা। এদেশে বিক্রি করে' ১৫০৲ পেলাম মাত্র, কাজেই ক্ষতি ৪২০—১৫০= ২৭০৲ হল ! একসঙ্গে অনেক মার্ক্‌ কিনে রাখ্‌লেও নিস্তার নেই। হয়ত দেখ্‌ব ১০০৲ টাকার মার্ক্‌ দাম কমে' দুমাসে ৩০৲ টাকার মার্ক্‌ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর হয়ত কোন রাজনৈতিক গোলমালে হঠাৎ মালপত্র আনা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আমি বিপদে পড়্‌ব। হয়ত বা আমার ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হয়ে যাবে। কিম্বা হয়ত আমার কেনা কাগজের মার্ক্‌ হঠাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব হয়ে অন্য কোন নূতন রকম গভর্ণ্‌মেণ্টের ঢ্যাঁড্‌রার জোরে মূল্যহীন হয়ে যাবে।

এই-সব কারণে খুব সুবিধা-দরে না পেলে বিদেশী লোক বিপদসঙ্কুল ও অনিশ্চিত রকম অবস্থার দেশের মুদ্রা কিন্‌বে না। আর এর উপর যদি ঐ জাতীয় দেশের লোকে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার দেশের মুদ্রা কিন্‌তে কোন কারণে বাধ্য হয় তা হলে তাদের মুদ্রার দাম টাকার বাজারে আরও কমে' যাবে। যেমন জার্ম্মানীকে মিত্রপক্ষের ঋণ শোধের জন্য মার্ক্‌ বিক্রি কর্‌তে বাধ্য হতে হচ্ছে। (কেন না ঋণটা সোনায় শোধ কর্‌তে হবে এই রকম কথা আছে)। এই-সব কারণে আজ যে-পরিমাণ মার্ক্‌ দিয়ে ১ পাউণ্ডের সমানই জিনিস জার্ম্মানীতে পাওয়া যায়, তা টাকার বাজারে সিকি পাউণ্ডেরও কমে বিক্রি হচ্ছে।

কেউ যেন না ভাবেন যে ক্রমাগত মার্ক্‌ মূল্যহীন হয়ে আসাতে জার্ম্মানীর স্বার্থ নেই। তার এতে অনেক সুবিধা আছে। জার্ম্মানীকে বাধ্য হয়ে পরের দেশের মুদ্রা জোগাড় কর্‌তেই হচ্ছে। সে মুদ্রা জোগাড় করার এক উপায় হচ্ছে পরের দেশে বেশী করে' জিনিস বিক্রি করে' পরের দেশের উপর একটা অর্থের দাবী সৃষ্টি করা এবং আর-এক উপায় হচ্ছে অন্য দেশের লোকের কাছে নিজের দেশের মুদ্রা বিক্রি করে' নিজের দেশের উপর তাদের একটা দাবী সৃষ্টি করে' দেওয়া। দুটির মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে একটিতে অপরকে নিজের দেশের মুদ্রা কিন্‌তে বাধ্য করা হচ্ছে, আর একটিতে নিজেকে অপরের মুদ্রা কিন্‌তে বাধ্য হতে হচ্ছে। দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন কর্‌লে থেকে থেকে (ক্রমাগত না হলেও চলে) মার্ক্‌ বাইরে বিক্রি কর্‌লেই চলে অর্থাৎ যখন ঋণ শোধ বা সুদ দেওয়ার সময় আসে তখন বাজারে কিছু মার্ক্‌ বিক্রি করে' অন্য দেশের মুদ্রা জোগাড় করে' নিলেই হয়। কিন্তু যদি কোন উপায়ে অপর দেশের লোকদের মার্ক্‌ কেনার আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাতে মার্ক্‌-বিক্রেতার সুবিধা, কেননা ক্রেতার আগ্রহ বাড়ালে দর সুবিধা-মত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আর যদি সেই একই উপায়ে জার্ম্মানীর ব্যবসাও বেড়ে যায় তা হলে সুবিধাটা বেশী মাত্রায়ই হয়; কেননা জার্ম্মানীর দ্রব্যউৎপাদনপ্রণালী এরূপ উৎকৃষ্ট যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বা সংখ্যা যতই বেড়ে চলে, ততই উৎপাদন নির্দ্দিষ্টপরিমাণ বা নির্দ্দিষ্টসংখ্যকদ্রব্য প্রতি বর্দ্ধনশীলহারে সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য হয়ে আসে। তা ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে যে প্রায় সর্ব্বত্রই অকেজো (unemployed) লোকেরা দল বেঁধে খাচ্ছে কিন্তু কিছু উৎপাদন কর্‌ছে না, সেই সমস্যারও একটি সমাধান জার্ম্মানীর হয়ে যায়; অন্ততঃ আংশিকভাবে মার্কের দাম টাকার বাজারে ক্রমাগত কমিয়ে আন্‌লে দুই কাজই হয়। ব্যবসাকে সজাগ করে' রাখার একটা উপায় হচ্ছে জিনিসের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা। কেননা সকলেই তা হলে যত শীঘ্র পারে জিনিস কিন্‌তে চায় এবং অনেকে পরে দাম বাড়্‌বে এই আশায় জিনিস কিনে হাতে রাখ্‌তে চায়। তাছাড়া মুদ্রার দাম ক্রমাগত বাড়্‌তে থাক্‌লে অপর দেশীয় লোকে জিনিসের দাম বেড়ে যাবার আগেই জার্ম্মান্ জিনিস কিনে ফেল্‌বার চেষ্টা করে ও সস্তায় পাবে বলে' বেশী করে' কেনে। মার্কের দাম ক্রমাগত কমিয়ে জার্ম্মানেরা এক ঢিলে দুই

পাখী মারে। জার্ম্মান্ ব্যবসাদারেরা আর একভাবে লাভ কর্‌ছে। মার্কের কিন্‌বার ক্ষমতা যে হারে কমে' বা জিনিষপত্রের দাম যে হারে বেড়ে চলেছে, শ্রমজীবীর মাইনে সেই হারে বাড়্‌ছে না। বাইরের সঙ্গে ব্যবসা করে' লাভটা হয় অন্য দেশের মুদ্রায় (দর-দস্তরও তাই হয়) কিন্তু মাইনে দেওয়া হয় মার্কে। ১ পাউণ্ড যদি ২০০০ মার্কের সমান ধরা হয় এবং জার্ম্মান্ ব্যবসাদার কোন জিনিস ১ পাঃ দামে বিক্রি কর্‌ছে যদি ধরি, তা হলে দাম ঠিক করার সময় সে দেখ্‌বে শ্রমজীবীর মাইনে রূপে তার কত খরচ হবে। সে যদি দেখে যে তাকে শ্রমজীবীকে ৫০০ মার্ক্ দিতে হবে, তা হলে দর ঠিক করার সময় সে ১ পাউণ্ডের সিকি শ্রমজীবীর মাইনের খরচ ধর্‌ছে। মাইনে দেবার সময় (ছমাস পরে ধরা যাক) যদি ১ পাঃ ৪০০০ মার্কের সমান হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ৫০০ মার্ক্ দিতে তাকে শুধু ১ পাউণ্ডের ১/৮ দিতে হবে। অর্থাৎ ১/৪—১/৮ পাউণ্ড তার উপরি লাভ হবে। মাইনে যদি ইতিমধ্যে ৫০০ মার্কের জায়গায় ৬০০ হয়ে যায়, তা হলেও উপরি লাভ থাক্‌বে। কাজেই মার্ক্ যতই অন্য সব মুদ্রার তুলনায় মূল্যহীন হয়ে আস্‌ছে ব্যবসাদারের লাভ ততই বেড়ে চল্‌ছে। অবশ্য জার্ম্মান্ জাতির লাভ তাতে খুব বাড়্‌ছে না। থেকে থেকে মার্ক্ বিক্রি করে' এবং থেকে থেকে মার্ক্ ছেপে বাজারে ছাড়্‌লে এই জাতীয় লাভ ব্যবসার সঙ্গে কমে' আসে। কারণ ব্যবসাকে সতেজ রাখ্‌তে হলে ক্রমাগত মার্ক্ সস্তা করে' চল্‌তে হবে। থেকে থেকে কর্‌লে হবে না, কেননা তাতে ব্যবসা ততটা নিরাপদ থাকে না।

জার্ম্মান্‌দের অন্য জাতিদের কাছে ঋণ আছে ধরা যাক ১৩২০০ কোটি মার্ক্। সেই অনুপাতে তাদের স্বদেশীয় ঋণ (National debt) প্রায় ২৪০০০ কোটি মার্ক্। অন্য দেশের কাছে যা ঋণ তা সোনার মার্কে শোধ্য, কাজেই কাগজের মার্কের দাম কমিয়ে সে ক্ষেত্রে লাভ নেই; কিন্তু স্বদেশীয় ঋণ শুধু মার্কে লেখা আছে। কাজেই মার্কের মূল্য কমিয়ে আন্‌লে স্বদেশীয় ঋণের বোঝা কমে' আসে। আগে যদি জাতীয় আয়ের ১/২ অংশ, স্বদেশীয় ঋণের সুদ দিতে খরচ হত, তবে এখন মার্কের, মূল্য কমে' যাওয়ায় তার চেয়ে অনেক কম অংশ খরচ হয়। ধরা যাক্ ১০০ কোটি মার্ক্ শতকরা ৬ সুদে ধার করা হল, আর জার্ম্মানীর বাৎসরিক রাজস্ব ১২ কোটি মার্ক্। এখন যদি ক্রমাগত মার্ক্ ছাপান যায় তা হলে সব জিনিসের দাম বেড়ে চল্‌বে। সকলের আয়ও মার্কে গুন্‌লে বেড়ে চল্‌বে। অর্থাৎ আগে যদি সমস্ত জাতির আয় ৫০০ কোটি মার্ক্ ছিল ধরা যায়, ত ধনসম্পত্তি সমান থাক্‌লেও শুধু মার্ক্ ১০ গুণ ছাপিয়ে দিলে মার্কে আয় (যদিও আসলে কিছুই বাড়্‌বে না) ৫০০০ কোটি হয়ে দাঁড়াবে এবং রাজস্ব একই হারে আদায় হলে ১২০ কোটি হবে। অথচ ১০০ কোটি মার্কের ঋণের সুদ সেই ৬ কোটি মার্ক্‌ই দিতে হবে। অর্থাৎ আগের ১/১০ খরচে ঋণটা চল্‌তে থাক্‌বে অথবা ঋণটা আগের ১/১০ হয়ে দাঁড়াবে। ঋণটা শোধ দিয়ে দিলেও আগে যত কষ্ট হত এখন তার ১/১০ কষ্ট হবে। অন্য দেশে যদি কেউ ঋণের দলিল কেনে ত সে আগের ১/১০ দামেই কিন্‌তে পার্‌বে। বর্ত্তমান জার্ম্মানীর স্বদেশীয় ঋণের বোঝা, মার্কের মূল্যহানির ফলে ৫০০ গুণের চেয়ে বেশী হাল্কা হয়ে গেছে। এই ঋণের দলিল অন্য জাতির লোকের কাছেও অনেক আছে। কাজেই জার্ম্মানী অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বেশ দু পয়সা করে' নিয়েছে। তারপর মার্কের মূল্য কমে' যাওয়াতে কোটি কোটি মার্ক্ অন্য দেশের লোকেরা কিনেছে। মার্ক্‌কে ক্রমাগত মূল্যহীন করে' আন্‌তে অনেকে জলের দরে মার্ক্ বেচে দিয়েছে ও দিচ্ছে। যারা মার্ক্ কিনেছিল তারা আসলে কি কিনেছিল? জার্ম্মানীতে জিনিস কিন্‌বার বা অন্য ভাবে খরচ কর্‌বার একটা অধিকার ত? কাজেই মার্কের কিন্‌বার ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ায় ঐ-সব মার্কের অধিকারীদের জিনিস কিন্‌বার বা খরচ কর্‌বার অধিকার বা ক্ষমতাও কমে' গেছে। তারা যে পাউণ্ড বা ডলার দিয়েছিল তা জার্ম্মানী বেশ ভাল করেই খরচ করেছে, কিন্তু তারা আর ঐ পাউণ্ড বা ডলারের বদলে প্রাপ্ত মার্ক্ দিয়ে বড় কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। টাকার অনাটন বা ভয়ের ধাক্কায় অনেকে আবার অসম্ভব রকম কম দামে মার্ক্ বেচে দিচ্ছে। মার্কের সংখ্যা যদি জার্ম্মান্ গভর্ণমেণ্ট্ ক্রমে কমিয়ে

আনে অর্থাৎ চেষ্টা করে' যদি মার্কের কিন্‌বার ক্ষমতা বাড়ান হয়, তাহলে সেই ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানীর ঋণের বোঝা বেড়ে চল্‌বে (কেননা ঋণের আসল মূল্য বেড়ে চল্‌বে) এবং অন্য দেশের লোকদের কেনা মার্ক্ দিয়ে তারা জার্ম্মানীর ধন-সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে।

জার্ম্মানী মার্ক্‌কে পুরাতন অবস্থায় ফিরিয়ে আন্‌বে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সোজা হয়ে আস্‌ছে।

আর-একটি কথা। জার্ম্মান্ গভর্ণ্‌মেণ্ট্ যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলেই কি জার্ম্মান্ জাতিটিও দেউলিয়া হয়ে যাবে? তা নয়। জার্ম্মানীতে একটি ধনী ব্যবসায়ীদের গোপন সংঘ আছে। এর দলপতি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ষ্টীনেস্ (Herr Stinnes)। এই দলের লোকেরাই বাইরের ব্যাঙ্কে অর্থ জমা রাখেন। অন্য দেশের ব্যাঙ্কে এদের ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের বা ৭৫০০,০০০,০০০ টাকারও বেশী জমা আছে। এদের হয়ত মতলব যে জার্ম্মান গভর্ণ্‌মেণ্ট্ দেউলিয়া হয়ে গেলে জার্ম্মানীর স্বদেশীয় ঋণের দলিলগুলি প্রায় বিনা মূল্যে এঁরা কিনে নেবেন ও গভর্ণ্‌মেণ্ট্ দেউলিয়া বলে' বাধ্য হয়ে মিত্রপক্ষ তাদের জার্ম্মানীর উপর দাবী ছেড়ে দেবে। তার পর আর-একটা গভর্ণ্‌মেণ্ট্ হতে কত দিন? বড় বড় সহরে লোক-দেখান রাষ্ট্রবিপ্লব করার মত জনবল ও অর্থ এদের আছে। সিনেমার লড়াইয়ের মত লড়াইটা হয়ে গেলে পর নূতন কোন গভর্ণ্‌মেণ্ট্ খাড়া করে' সোনার সঙ্গে কাগজের মার্কের একটা সম্বন্ধ বেঁধে দিলেই (যেমন 'ক'-পরিমাণ সোনার তৈরী মার্ক=৪০,০০০ কাগজের মার্ক) এবং সম্বন্ধটা ভালরকম করতে পার্‌লেই অন্য দেশের লোক মার্ক নিয়ে এসে বিশেষ কিছু কিন্‌তে আর কোন দিনও পার্‌বে না। বর্ত্তমান সময়ে কেবলই মনে হচ্ছে জার্ম্মান্ জাত (অথবা Herr Stinnes and Co.) কি নিজেদের গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে দেউলিয়া করে' অপরের দাবী-দাওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা কর্‌ছে?

অশোক চট্টোপাধ্যায়

কুড়ানো মাণিক

আন্‌মনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে—
হাসিমাখা মুখখানি, চির-আদ্‌রী,
ঝ'রে-পড়া স্বরগের রূপ-মাধুরী!

ফণিনীর মত পিঠে বেণী ঝুলিছে,
চঞ্চল সমীরণে দুল্ দুলিছে,
মঞ্জীর-ধ্বনি বাজে চল-চরণে
মিহি নীল ফুর্‌ফুরে শাড়ী পরণে।

বস্ত্রের আবরণ-কারা টুটিয়া
অঙ্গের হেম-আভা পড়ে লুটিয়া,
মিষ্টি-মধুর আঁখি দৃষ্টি চপল,
বঙ্কিম ক্ষীণাধর, রক্ত-কপোল।

চলে' গেল পাশ দিয়ে ক্ষিপ্র পদে—
বিজ্‌লীর ছোট রেখা নীল নীরদে!
ছুঁয়ে দিনু কেশ-পাশ ভালবাসিয়া,
নেচে নেচে গেল সে যে মৃদু হাসিয়া!

শিহরিয়া উঠিলাম ঘন-পুলকে—
হারাইয়া গেনু কোথা কোন্ দ্যুলোকে!
ভরে' গেল সারা প্রাণ এ-কি হরষে!—
এতখানি সম্পদ মৃদু পরশে!

পথ মাঝে কুড়াইয়া পেনু যে মণি
সে যে মোর হৃদি-মাঝে হরম-খনি!

গোলাম মোস্তফা
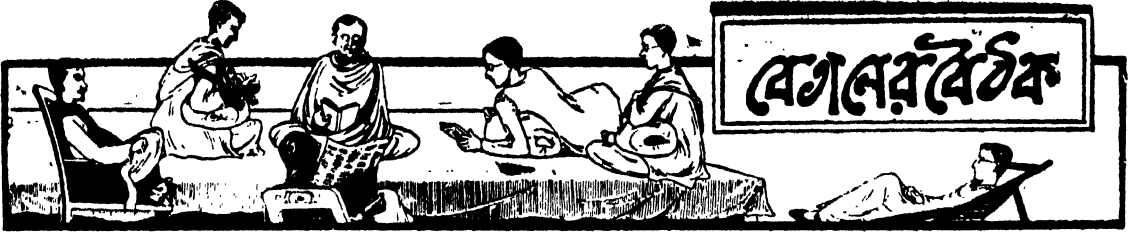
জিজ্ঞাসা

(৭৬)

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন উচিত নয় বলিয়া একটি প্রবাদ বঙ্গ দেশের বহু স্থানে প্রচলিত আছে। ইহার ভিত্তি কোথায়?

শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(৭৭)

আমাদের দেশের পল্লী-অঞ্চলে অনেক স্থানে উৎসবাদির সময় কেহ কেহ আগুন জ্বালাইয়া, সেই জলন্ত অঙ্গাররাশির উপর দিয়া শুধু-পায়ে চলিয়া বেড়ায়, ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় না, বা তাহার পায়ে ফোস্কা হয় না। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি?

শ্রী সারদাপ্রসাদ কর

(৭৮)

চন্দ্রে যে মণ্ডল পড়ে উহা কি পদার্থ? উহার আকার পরিবর্ত্তন হয় কেন? খুব বড় মণ্ডল পড়িলে লোকে শীঘ্র বৃষ্টির আশঙ্কা করে কেন? ইহার কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে কি?

শ্রী সুধীরকুমার পালিত

(৭৯)

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একস্থানে গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—The author (Sandhyakar) belonged to a very respectable family of Varendra Brahmanas. কিন্তু অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া মনে করেন। উভয় মতের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক?

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(৮০)

হিন্দুদের মধ্যে "মা" নিজের ছেলে মেয়ের বিবাহ দেখেন না কেন?

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(৮১)

বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে প্রকাশিত মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—ব্রহ্মর্ষি ঋচীক গাধিরাজ-দুহিতা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ ঐ পর্ব্বের ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে আছে—"ঋচীকের পুত্র জমদগ্নিই…গাধির দুহিতাকে লাভ করিয়া তাহাতে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মসমন্বিত ব্রাহ্মণ পুত্র উৎপাদন করিবেন, আর সেই মহাদ্যুতি… গাধির ঔরসে……বিপ্রকল্প ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র নামক পুত্র প্রদান করিবেন।" এক অধ্যায়ে গাধির দুহিতা জমদগ্নির মাতা এবং অন্য অধ্যায়ে গাধির দুহিতা জমদগ্নির পরিণীতা হন জানিতেছি। ইহা কি গ্রন্থকর্ত্তৃগণের প্রমাদ? তাহা না হইলে পুরাণবেত্তাগণের নিকট এই বৈষম্যের কারণযুক্ত যথাযথ ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৮২)

বর্ষাকালে জামা ঘামে কিংবা জলে ভিজিয়া গেলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রোদে দিবার উপায় না থাকিলে, দেখা যায়, কিছুক্ষণ পরে উহাতে এক প্রকার কালো কালো ছাপ পড়িয়া যায়। উহাকে "মইথ্যা" বলে। ধোপার বাড়ী হইতে কাচিয়া আসিলেও জামার ঐ দাগ থাকিয়া যায়। উহা উঠাইবার কোন উপায় আছে কি?

শ্রী প্রমোদকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮৩)

মাসের পয়লা তারিখে সেই মাসের নাম না-লওয়ার যে নিয়ম স্ত্রীলোকদিগের মুখে শুনা যায় তাহার কারণ কি? শাস্ত্রে এসম্বন্ধে কোনও নিষেধ আছে কি না?

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(৮৪)

কলিকাতার পূর্ব্বাঞ্চলে যে খাল বাগবাজারের গঙ্গা হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত, ইহা কবে এবং কাহার দ্বারা কর্ত্তিত হয়; ইহা দক্ষিণে কোথায় শেষ হইয়াছে; ইহার কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ আছে কি না?

মারহাট্টা ডিচের বা মার্হাটা খাতের কোনও অবশিষ্টাংশ কলিকাতায় এখনও বর্ত্তমান আছে কি না এবং যদি থাকে ত কোথায় আছে?

শ্রী ভবতারণ ভড়

(৮৫)

তিনটি পয়সা পাশাপাশি একটির সঙ্গে অপরগুলিকে সংলগ্ন করিয়া কোনও টেবিলের উপরে রাখুন। তৎপরে মধ্যের পয়সাটিকে খুব শক্তিশালী একজন লোক তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সজোরে চাপিয়া ধরুন। পরে যে কোনও পয়সাকে একটু সরাইয়া আনিয়া ঐ পয়সা দ্বারা চাপা পয়সাতে টোকা মারিলে পর দেখিবেন অপর পাশের পয়সাটি সরিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি?

শ্রী রমেন্দ্রকুমার চৌধুরী

(৮৬)

(১) মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির নাম কোন্ জাতির প্রদত্ত?

(২) রাশির নামকরণ সম্বন্ধে গ্রীসদেশে যেরূপ কিম্বদন্তী আছে, হিন্দুদের ঐ-প্রকার কিম্বদন্তী আছে কি না?

(৩) কালপুরুষের চারি কোণস্থিত চারিটি নক্ষত্রের নাম কি? (ইংরেজীতে ইহাদিগকে Betelgeux, Bellatrix, Regel এবং Saiph কহে।)

(৪) Southern Cross, এবং Centaurus নামক রাশির হিন্দু নাম আছে কি না?

(৫) Vega, Deneb, Achernar, Canopus, Formalhant Castor, এই-সকল নক্ষত্রের হিন্দু নাম কি?

(৬) অভিজিৎ নক্ষত্রের ইংরেজী নাম কি?

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ দাস

(৮৭)

সূর্য্যের কিম্বা বাতির আলোতে হাত ধরিলে আঙুল লাল দেখায় কেন?

শ্রী শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(৮৮)

"পটোল-তোলা" কথার উৎপত্তি কোথা হইতে এবং ইহার অর্থ কি?

শ্রী খগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(৮৯)

মাড়োয়ারীদিগকে "কাঁইয়া" বা কেঁয়ে বলা হয় কেন? কেহ ইহার ঐতিহাসিক তথ্য বা কারণ জানিলে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে সুখী হইব।

শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস

(৯০)

কোনও সংখ্যাকে অন্য এক ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল ভাজ্য কিম্বা ভাজক হইতে কম হয়। যেমন:—৮ ÷ ৪ = ২। কিন্তু কোনও ভগ্নাংশকে অন্য এক ছোট ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল (Quotient) ভাজ্য (Dividend) কিম্বা ভাজক (Divisor) হইতে বেশী হয়। যেমন—½ ÷ ¼ = ২, এ বিষয়ে কোনও গণিতশাস্ত্রবিদ আগামী বৈঠকে কোনও যুক্তিযুক্ত মীমাংসা পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

(৯১)

ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে ফল সংরক্ষণ (Fruit preserving) কারখানা আছে এবং তথায় ঐ বিষয়টি শিক্ষা করিবার কোন বন্দোবস্ত আছে কি না। ভারতে না থাকিলে ভারতের বাহিরে আর কোন্ কোন্ স্থানে শিখিতে পারা যায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ কাহারও জানা থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন।

শ্রী করুণাময় দত্ত

(৯২)

কালীপূজায় দীপদান ও বাজি পোড়ান হয় কিন্তু অন্যান্য পূজায় হয় না, উহার কোনো শাস্ত্রীয় বিধি বা ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি?

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

(৯৩)

বাসীবিবাহের দিন বরকনেকে একত্র রাখা হয় না কেন? শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে কি না?

মনোরঞ্জন সেন গুপ্ত

(৯৪)

বর্দ্ধমান নদীয়া প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে 'নাগা' বলিয়া একপ্রকার লোক দেখা যায়। তাহারা নিজেদের রামাইত মোহান্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদের উৎপত্তি ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংবাদ কোথায় পাওয়া যাইবে? এবিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি কোন্ কোন্ পুস্তকে আলোচনা হইয়াছে?

শ্রী অনাথনাথ বসু

(৯৫)

যতিদের মসুর ও মাষ দুইটি ভক্ষণ নিষেধ। বৈষ্ণবগণ মসুর ভক্ষণ করেন না কিন্তু মাষ (কলায়) ভক্ষণ করিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও শ্রীশ্রী মহাপ্রভুরও মাষ-বড়া ভক্ষণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। খেতুরে যে মহাপ্রভুর সেবা আছে শুনা যায় সেখানে নাকি একদিন মসুরের ডাউলের খিচুড়ী দ্বারা ভোগ হয়। ইহা সত্য কি না? যদি সত্য হয় তবে বৈষ্ণবগণ মসুরের ডাল ভক্ষণ করেন না কেন? মহাপ্রভুর সেবায় যাহা ব্যবহৃত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সেবায় তাহা ব্যবহারে দোষ কি?

মাষ ভক্ষণে দোষ না হইলে মসুর ভক্ষণেই বা দোষ কি? মসুরের বর্ণ রক্ত বলিয়া কোন বৈষ্ণব আপত্তি করিতে পারেন; কিন্তু অনেক বৈষ্ণব লালবর্ণের শাকও তো ভক্ষণ করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় মীমাংসা প্রার্থনীয়।

শ্রী রামদুলাল বিদ্যানিধি

(৯৬)

গোয়ালন্দ ঘাটে ষ্টীমারে এক অতিবৃদ্ধ মুসলমান ফকিরকে সুর-সংযোগে এই পদগুলি গাহিতে শুনিয়াছিলাম—

আগে জন্মিলাম আমি,
পাছে জন্মে মা,
দেখার দেখি ভাই জন্মিল,
পিতা জন্মে না।
নদীর কূলে বটবৃক্ষ,
তাহার নীচে চিতা,
মা পুতে সহমরণ যায়,
শেষে জন্মে পিতা।

এই হেঁয়ালির অর্থ কি? আমি 'ফকিরের গান' নাম দিয়া একখানা বই ছাপিব মনে করিয়াছি। কেহ দুই একটা নূতন গান পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রী মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
পোঃ সালধ (Saldah)
জি—ফরিদপুর

মীমাংসা

১৩৩৭-এর (৯৩)

সাপের বিষের অনেক চিকিৎসাই আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসায় পেয়েছিলুম, অবশ্য সেগুলি কতদূর উপকারে আসে নিশ্চিত জানা নেই। সে দিন Scientific American Cyclopaedia of Formulas (Edited by A. A. Hopkins, 1915) ঘাঁটতে ঘাঁটতে ২১ পাতায় সাপে কামড়ান অধ্যায়ে গিয়ে পড়ি। তাতে এই অদ্ভুত খবরটি পাই—"ব্রেজিলবাসী ডাক্তার করিস্লানো ডি'উৎর (Dr. Corislano d' Utre) বলেন যে সর্পদষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই নেবুর রসের সঙ্গে Calomels দুইঘণ্টা অন্তর তিনবার খাইয়ে নিশ্চয়ই সারানো যায়; প্রতিবারে তিরিশ গ্রেন্ করে' Calomels এক আউন্স্ নেবুর রসের (lemon-juice) সঙ্গে খাওয়াতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, যে ব্যক্তি ৭৫ থেকে ১০০ গ্রেন্ Corrosive Sublimate একটি থলিতে নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবেন, তাঁর কোন সাপের ভয় করতে হবে না। সাপেরা তাঁর কাছ থেকে ছুটে পালাবে, আর যদিও বা দৈবক্রমে সাপে তাঁকে কামড়ায় তাতে তাঁর অনিষ্ট কিছু হবে না।"

শ্রী প্রভানলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৮)

উৎকলে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অদ্যাপি শাস্ত্রসম্মত চারিদিন-ব্যাপী বিবাহ প্রচলিত আছে এবং দিবাভাগে কন্যা সম্প্রদান হইয়া থাকে। বিবাহের পর চতুর্থ দিনে চতুর্থী হোম সমাধানান্তে বিবাহ শেষ হইয়া থাকে। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এবং দক্ষিণাত্যেও ঐরূপ প্রথা আছে শুনিয়াছি।

প্রবাদ আছে শিববিবাহ হইতেই রাত্রিকালে বিবাহ প্রচলিত হয়।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৪১)

আমাদের ১০৮ সংখ্যাটি অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। জ্যোতিষে অষ্টোত্তরী (১০৮) দশা এবং রাশিচক্রের ১০৮ অংশ (৫৪ অংশ অনুলোম ও বিলোম ক্রমে) গমনাগমনে ব্রহ্মাণ্ডের এক এক অয়নাংশের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্রে এই দেহকে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাবয়ব বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। চলিত কথাতেও বলে "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে।"

দেবতার মন্ত্রজপ তিন প্রকারে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা আছে। যথা করমালা, অক্ষমালা এবং বর্ণমালা দ্বারা বর্ণমালার সহিত মন্ত্র জপে অনুলোম ও বিলোমক্রমে ১০৮ সংখ্যা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ণমালার সংখ্যা ৫০টি এবং যং রং বং লং এই চারিটি লইয়া ৫৪টি এবং ক্ষ মেরু বা সাক্ষী বলিয়া অভিহিত হয়। ৫৪ সংখ্যাটি অনুলোম ও বিলোম ক্রমে (৫৪ × ২) ১০৮ সংখ্যা হয়।

দেহমধ্যে চক্রে চক্রে বা পদ্মে পদ্মে জপ করার বিধি আছে। উক্ত চক্রগুলি ৫০ দলে বা পাপড়িতে সজ্জিত এবং প্রত্যেক দলে এক-একটি বর্ণে শোভিত ব্যোমচক্র ব্যতীত অপর চারিটি চক্রের মধ্যস্থিত কোষে যং রং বং লং বর্ণ চারটি আছে সুতরাং যোগশাস্ত্রমতেও চক্রদলের ৫০টি বর্ণসংখ্যা ও কোষমধ্যে ৪টি বর্ণসংখ্যা মিলিয়া ৫৪ এবং অনুলোম ও বিলোম ক্রমে ১০৮ সংখ্যা নিষ্পন্ন হয়। করমালা বা অক্ষমালায় জপ এই অন্তর্জপের বাহ্য প্রণালী। বাহ্যজপেও সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য ১০৮ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

বর্ণমালার "ক্ষ" বর্ণটি মেরু বা সাক্ষী। ইহা অতিক্রম করিলে অনুলোম বিলোম ক্রিয়া হয় না, একটানা হইয়া যায় এবং এই দেহভাণ্ডের অগতি হয়। সাধন-বলে মেরু উল্লঙ্ঘন করিলে আসা যাওয়ার—অনুলোম বিলোম গতির নিবৃত্তি হইয়া যায়—ষট্‌চক্র ভেদ হইয়া কেবল্য প্রাপ্তি হয়। গৃহীর সাধনবল নাই, তাই বাহ্যজপেও মেরু লঙ্ঘন নিষেধ।

হৃদয়দেশে মালা রাখিয়া (ধরিয়া) ও বস্ত্রাবৃত করিয়া জপ করার বিধি আছে এবং মালায় তর্জ্জনী স্পর্শ করিতে নাই। পাছে জপকালীন তর্জ্জনীটি মালায় লাগিয়া জপ নিষ্ফল হইয়া যায় তাই ছিদ্র করিয়া অঙ্গুলীটি একেবারে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। থলির মধ্যে মালা রাখিয়া জপ করা, অঙ্গুলী বাহির করিয়া রাখা, অত্যন্ত আধুনিক। চলিতে ফিরিতে জপ করিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়েরা এই বিধি-প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৪৮)

৪৮ সংখ্যক মীমাংসা সম্বন্ধে আমার আপত্তি—

মীমাংসা-নির্দ্দিষ্টরূপ মহালয়ার অর্থ না হইয়া অন্যরূপ হইলেই মূলের সহিত অর্থের একটু বিশেষ সামঞ্জস্য থাকে।

মহালয়—(মহতঃ লয়ো যস্মিন্) অর্থাৎ মহতের লয় হয় যাহাতে। এখানে এই মহৎ কে? আমরা জানি, আষাঢ় মাস হইতে সূর্য্যের দক্ষিণায়নগতি আরম্ভ হয়। আশ্বিন মাসে যখন সূর্য্য বিষুবরেখার উপর আসে, তখন দিন রাত্রি সমান হয়। সূর্য্য বিষুব রেখার উপর হইতে নিম্নে ক্রমাগত যখন দক্ষিণ দিকে গমন করে, সেই সময় তাহা আর উত্তর-মেরু হইতে দেখিবার উপায় থাকে না; আবার দক্ষিণায়নের পর সূর্য্যের যখন উত্তর দিকে গতি আরম্ভ হয় তখনই তাহার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা হয়। সুতরাং এই সময়টা সূর্য্য অস্তমিতই থাকে। (অবশ্য উত্তরমেরুর নিকট)। এই হইতে মনে হয় সূর্য্যই 'মহৎ', আর তাহার লয় বা অস্তই 'মহালয়'।

রাত্রিকালে কোন দৈব বা পৈত্র্যকার্য্য হয় না; সেইজন্যই যে কয় মাস নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি থাকিবে তাহার পূর্ব্বেই পক্ষব্যাপী তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদির কার্য্য আর্য্যগণ যেন সঞ্চিত করিয়া রাখিতেন। আর পিতৃপুরুষগণও ঐ কয়মাস পিণ্ডোদক পাইবেন না বলিয়া ব্যগ্র হইয়া যমালয় শূন্য করিয়া আসেন। নিমন্ত্রিত পিতৃপুরুষদিগকে শ্রাদ্ধ-ভোজন সম্পন্ন করিয়া ফিরিবার সময় অন্ধকারের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; সেইজন্যই উল্কা ধরিয়া তাহাদের গমনমার্গ আলোকিত করিবার নির্দ্দেশ আছে। আর একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, আর্য্যগণ যে উত্তর মেরুতে বাস করিতেন তাহার প্রমাণ কি? আমরা জানি উপনয়ন চূড়াকরণাদি বৈদিক সংস্কার ও বিবাহ উত্তরায়ণেই প্রসিদ্ধ এবং দক্ষিণায়নে নিষিদ্ধ; ইহা আর্য্যগণের উত্তরমেরুতে বাসের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। উত্তরায়ণে মৃত্যু-কামনাও একটা প্রবল প্রমাণ; কেননা দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে সেই অয়ন রাত্রিকাল বলিয়া, মৃতের শ্রাদ্ধকার্য্য হইতে পারিত না; এইজন্যই উত্তরায়ণে আর্য্যগণ মৃত্যুকামনা করিতেন। ১৩২১ শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'মহালয়া' প্রবন্ধের সাহায্যে এই প্রতিবাদ লিখিলাম।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

মহালয়া শব্দে অমাবস্যা বুঝায়। বিশেষতঃ দেবীপক্ষের অব্যবহিত পূর্ব্বের যে অমাবস্যা তাহাকেই বুঝায়। এই সময়ে অর্থাৎ পিতৃপক্ষে পরলোকগত পিতৃগণ এই ভূলোকে আতিবাহিক শরীরে আগমন করেন বলিয়া এই পৃথিবী মহালয়া বলিয়া গণ্য হয়। পিতৃগণ পিতৃপক্ষে এখানে আগমন করিয়া শ্যামাপূজার রাত্রে উল্কাদর্শনে অন্তরীক্ষে প্রস্থান করেন। আগত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করা আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত। এই লোকে আসিয়া পিতৃগণ যদি স্বীয় বংশধরগণকে শ্রাদ্ধাদিতে ব্যাপৃত না দেখেন তবে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া যান এবং অভিসম্পাত করেন। শ্রাদ্ধতত্ত্বে ও গরুড়পুরাণে ইহার সত্তা ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৫২)

বর্ত্তমান বর্ষের ৫২ সংখ্যক মীমাংসা সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তি আছে। রাহু একটি পৃথক গ্রহ নয়টি, কেন না সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। আবার সেই চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করিলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। সুতরাং চন্দ্রই উভয় গ্রহণের কারণ। আবার চন্দ্র সূর্য্যকে আবৃত করিলে যখন সূর্য্যগ্রহণ হয়, তখন চন্দ্র রাহুর কার্য্য করে এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে আবৃত করিলে যখন চন্দ্রগ্রহণ হয় তখন পৃথিবী রাহুর কার্য্য করে। সুতরাং উভয়েই রাহু, আবার উভয়েই স্বর্ভানু অর্থাৎ কাহারও নিজের ভা বা দীপ্তি নাই, স্বর্গ বা ঊর্দ্ধ হইতে সূর্য্যের দীপ্তিতে দীপ্ত হয়, সুতরাং স্বর্ভানু ও রাহু এক। স্বর্ভানু রাহু হইল কেন? রহ্ ধাতু ত্যাগ করা অর্থে; ঐ ধাতু হইতে রাহু শব্দ হইয়াছে। গ্রহণ করিয়া যে ত্যাগ করে সেই রাহু। চন্দ্র সূর্য্যকে এবং পৃথিবী চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া আবার ত্যাগ করে, সুতরাং উভয়েই রাহু—উভয়েই সূর্য্য হইতে দীপ্তি পায়, এবং এজন্য উভয়েই স্বর্ভানু।

মৎস্যপুরাণ-মতে—

আদিত্যাৎ স তু নিষ্ক্রম্য সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।

আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥১২৮।৩৪॥

এই রাহু শুক্লপক্ষে সূর্য্য হইতে চন্দ্রে প্রবেশ করে এবং কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র হইতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। পৌরাণিক মতে সূর্য্য তৃতীয় স্থানে অবস্থিত নহে ; পৃথিবীই তৃতীয় স্থানে অবস্থিত।

কেন না, মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

উদ্ধৃত্য পার্থিবীং ছায়াং নির্ম্মিতাং মণ্ডলাকৃতিম্।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং স্থানং তৃতীয়স্তু তমোময়ম্॥১০।১২৮ অ

কূর্ম্মপুরাণেও পাওয়া যায়—

উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ঃ॥৪০।১৮ অঃ

অতএব স্বর্ভানুর স্থান তৃতীয়, তমোময় এবং মণ্ডলাকৃতি। পৃথিবীর ছায়া দ্বারা এই স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে।......স্বর্ভানু অর্থে চন্দ্র ও পৃথিবী উভয়েই রাহু হইয়াছে এবং তাহাদের একই তমোময় স্থান হইয়াছে। সেই স্থান তৃতীয়। তবে স্বর্ভানুর অর্থ পুরাণে বিকৃত হইয়াছে।

স্বর্ভানো তুদতে যস্মাৎ স্বর্ভানুরিতি সঃ স্মৃতঃ॥৬২। ২৮ অঃ
মৎস্যপুরাণ।

"স্ব (স্বর্গীয়) ভা (দীপ্তি) দ্বারা পীড়িত হয় যে তাহার নাম স্বর্ভানু ; কারণ তুদ্ অর্থ—পীড়ন করা হইতে তুদতে হইয়াছে। এখানে বুঝা গেল বেদের স্বর্ভানু বিকৃত পৌরাণিক যুগে সূর্য্য ও চন্দ্রের পীড়ক বা ভক্ষক রাহু হইয়াছে।"—পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

এক্ষণে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় গ্রহণকে অশুচি বিবেচনা করিয়া পাকস্থালী ও অন্নাদি পরিত্যাগ এবং স্নানাদি করি কেন ? সেই সম্বন্ধে আমার মনে হয় মূলের 'আসুর' শব্দের অর্থ—অপবিত্র বা অশুচি করিয়া ইহা পুরাণে অপবিত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥৫।৪০।৯ ঋক

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(৬৩)

ঢোল নামে এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য কুকুর আছে, তাহারা সিংহ- ও ব্যাঘ্র-শাবক আহার করিতে ভালবাসে এবং প্রায়ই সিংহ ও ব্যাঘ্রের গহ্বরের নিকট ওত পাতিয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলে শাবকগুলি অপহরণ করিয়া লয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট আমার শোনা কথা মাত্র।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৬৮)

আমাদের দেশে দুর্গা-প্রতিমার পূজা যাহা শরৎ ও বসন্তকালে হইয়া থাকে তাহা মহিষমর্দ্দিনীর পূজা। কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রতিমা শুধু সৌষ্ঠব- ও দেবীবিভূতি-দ্যোতক মাত্র। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ অর্থাৎ কার্ত্তিকাদির বিভিন্নদেশে অবস্থিতি দৃষ্ট হয় না। শিবদুর্গা-প্রতিমা বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণ-মতে নির্ম্মিত হয়।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৬৯)

ভূপৃষ্ঠ হইতে বিভিন্ন বায়ুস্তর আছে। ঐ বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত মেঘরাশি বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই হিসাবে cirrusকে আবর্ত্ত, cumulusকে পুষ্কর, stratusকে সংবর্ত্ত এবং nimbusকে দ্রোণ পর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যায়। মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও গরুড়পুরাণে এবং বরাহাচার্য্য-কৃত বৃহৎসংহিতায় মেঘের অনেক কথা আছে।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৬২)

অবজারভেটারী হিলের নিম্নের সুড়ঙ্গের নাম বাঘগুম্ফা। উহা তিব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। উহার সত্যতা পরীক্ষার নিমিত্ত তিনটি শ্রমণ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া ঐ গুহায় প্রবেশ করে। তাহারা আর ফিরে নাই। কথিত আছে তিব্বতে উহাদের দেখা গিয়াছিল। উহা স্বাভাবিক সুড়ঙ্গ। ব্রাড্লী বার্ট সাহেবের দার্জ্জিলিং নামক পুস্তকে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

(৬৩)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, (The History of the Bengali Language, P. 65) তেলেগু "তাল্লি" হইতে "তালৈ," তামিল "তায়" হইতে "তাঐ" এবং "আম্মা" শব্দ হইতে "মাঐ" শব্দের ব্যুৎপত্তি।

শ্রী সত্যশরণ গুপ্ত

তাঐ ও মাওই শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে বিজয়-বাবু লিখিয়াছেন যে শব্দদুটি দ্রাবিড়ী ভাষা হইতে আসিয়াছে। চেহারা দেখিয়াও তাহাই মনে হয়। তেলেগু 'তালি,' তামিল্ 'তায়্' শব্দের অর্থ মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তি। 'আমৈ' শব্দের অর্থও তাহাই। বাঙ্গালা ভাষায় ত-কারাদি শব্দটা 'তাত' প্রভৃতি শব্দের ছায়ায় পুংলিঙ্গ হইয়াছে ও 'আমৈ' শব্দটির অনুকরণে স্ত্রীলিঙ্গ 'মাওই' শব্দ বাঙ্গলায় রচিত হইয়াছে।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৬৪)

যে-সকল পুষ্করিণীতে গুঁড়িগুঁড়ি পানা জন্মে ঐসকল পানা সমূলে ধ্বংস করিতে হইলে পুষ্করিণীর সমুদয় জল সেচন করিয়া বাহির করিতে হইবে। পুষ্করিণীর পাড় (যে পর্য্যন্ত জলমগ্ন হয়) হইতে তলা পর্য্যন্ত পঙ্ক মৃত্তিকা কাটিয়া পুষ্করিণীর ভিতর পরিষ্কার রাখিলে বর্ষার নূতন জলে ভরিয়া গেলে ঐ গুঁড়ি পানা বন্ধ হইবে।

কাছী বা খড়ের মোটা দড়ি দ্বারা গুঁড়িগুঁড়ি পানা পুষ্করিণীর পাড়ের নিকট টানিয়া আনিয়া জল হইতে ছাঁকিয়া উপরে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। প্রতি শতকরা বর্গফুট জলে পাথরচূনগুঁড়া অর্দ্ধ মণ হিসাবে পুষ্করিণীর জলে ছড়াইয়া দিলে গুঁড়িপানা হওয়া বন্ধ হইবে।

শ্রী জগন্নাথ দাস

(৬৭)

'গরমে প্রসারণ—ঠাণ্ডায় সঙ্কোচন' এক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ এই :—কতকগুলি জিনিস গরমেও সঙ্কুচিত হয়। কারণ, সে-সবে যে জলীয় বাষ্প থাকে, তাহা উত্তাপে চলিয়া গেলে, সেই জিনিষের আঁশগুলি (fibres) শক্ত হইয়া সঙ্কুচিত হয়। যেমন, কলাগাছের খোল, ঢাক বা ঢোলের চামড়া—একটু উত্তাপ পাইলেই আর ঢিলা থাকে না। কোন কোন জিনিষ একটু ঢিলা বা লম্বা করিতে হইলেও জলে ভিজাইয়া দিতে হয়। জলে ভিজিলে কোন কোন জিনিষের আঁশ (fibre) ঢিলা (loose) হয়। 'সুন্দি' বেতও ইহার উদাহরণ।

শ্রী—

(৬৯)

গত ১৩২৩এর আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসীতে বাংলাভাষায় শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত সোম মহাশয় "মীরাবাঈ" নামক নিবন্ধে ঐ ভক্তিমতী হিন্দুনারীর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বাংলাভাষায় বসুমতী কার্য্যালয় হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত—"ভক্তমাল" গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠায় এবং অন্য দু'একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থে মীরাবাঈএর জীবন-ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার

(৭২)

এণ্ডি চাষের বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তিকা দ্রষ্টব্য—কুটীরশিল্পে এণ্ডি-কীট—শ্রী মন্মথনাথ দে প্রণীত। প্রকাশক শ্রী কালীপদ ঘোষ, কৃষিসম্পদ আফিস, ৩১ সূত্রাপুর রোড, ঢাকা। মূল্য তিন আনা।

মহিউদ্ দীন-আহমদ,
মোহাম্মদ আব্‌দুল ধারী

(৭৩)

নেপালে প্রাপ্ত দিব্যাবদান ও অশোকাবদান ও সিংহলের মহাবংশ এবং অশোকের নিজের অনুশাসনগুলি হইতেই অশোক সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়। পূর্ব্বোক্ত অবদানদ্বয়-অনুসারে অশোকের প্রধান মহিষীর নাম তিষ্যরক্ষিতা, এবং অপর রাণীদের নাম পদ্মাবতী ও অসন্ধিমিত্রা। মহাবংশে দেবী নাম্নী অশোকের এক পত্নীর নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহাকে অশোকের বিবাহিতা পত্নী বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রয়াগস্তম্ভে উৎকীর্ণ দেবীলিপিতে তীবরমাতা-কারুবাকী নামে এক মহিষীর নাম দেখা যায়। সমগ্র অনুশাসনে শুধু তাহার নাম হইতেই মনে হয় যে তিনি এবং তদগর্ভজাত পুত্র সম্রাটের খুব প্রিয় ছিলেন।

তিব্বত, নেপাল এবং চীনদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে উপগুপ্ত, অশোকের ধর্ম্মগুরু এবং ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে প্রধান সহায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সিংহলী ইতিবৃত্তে তৎপরিবর্ত্তে মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্যের নাম দেখা যায়। ওয়াডেল সর্ব্বপ্রথম উভয়ের অভিন্নতা প্রমাণ করেন (J. A. S. B., 1897, Part I, p. 763 Proc. A. S. B., 1899, p. 70) ভিন্সেন্ট্ স্মিথও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

"চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের হেলেন ও ছায়া কাল্পনিক নাম। সেলুকস্-নন্দিনীর নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এমন কি চন্দ্রগুপ্ত যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সে কথা কোথাও স্পষ্টভাবে লেখা নাই। এরিয়ান্ এবং ষ্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে সেলুকাস্ সান্দ্রাকোটাসের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দিব্যাবদানে চন্দ্রগুপ্তের নাম একেবারেই নাই। মহাবংশে ও জৈনস্থবিরাবলী চরিতে এবং বুদ্ধঘোষ-কৃত বিনয়পিটকের টীকায় চন্দ্রগুপ্ত মাতুল-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত থাকিলেও তাঁহার নাম নাই। জৈনদের ঋষি-মণ্ডলপ্রকরণ-বৃত্তি নামক গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের লক্ষ্মী মহিষীর নাম পাওয়া যায়। রুদ্রদমনের গিরিনার লিপিতে বৈশ্যপুষ্যগুপ্ত মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক বলিয়া কথিত হইয়াছেন ; কিন্তু রাজপত্নীর নাম তাহাতে নাই।

শ্রী অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে তাঁহার পুত্র "মহেন্দ্র" ও কন্যা "সংঘমিত্রা"ই প্রধান সহায় ছিলেন।

"Asoka's veneration for the Buddhist faith was so profound that he induced those very dear to him—Mahendra, his son, and Sanghamitra, his daughter,—to embrace a monastic life, and sent them to Ceylon to preach Buddhism there."

Vide Chapter V, p. 167—A School History of India by Haraprasad Sastri.

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার

(৭৪)

ভয়েই হউক আর হর্ষেই হউক, আকস্মিক মানসিক উত্তেজনার ফলে, স্নায়ুগুলির স্বাভাবিক কার্য্য-প্রণালীর ব্যত্যয় ঘটে। মনে কোনরূপ আতঙ্কের উদয় হইলে, অথবা কোন ভয়ঙ্কর জিনিস দেখিয়া ভয় পাইলে গ্রীবা-পৃষ্ঠস্থ মেরুমজ্জায় (spinal bulb or medulla) অবস্থিত রক্ত-প্রবাহনালীর কেন্দ্রটি (vaso-motor centre) উত্তেজিত হইয়া উঠে ; কারণ ঐ কেন্দ্রটিকে কখনও প্রত্যক্ষ-ভাবে কখনও বা পরোক্ষভাবে উত্তেজিত (reflexly stimulated) করা যাইতে পারে। ফলে রক্তনালী-সঙ্কোচক নাড়ীগুলিও (vaso-constrictor nerves) রক্তনালীগুলিকে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। এই সঙ্কোচনের আকস্মিক সংঘাতটি (shock) রোমমূলে গিয়া আঘাত করে, রোমগুলিও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে। নালীগুলির সঙ্কোচনের ফলে অতি অল্পপরিমাণ রক্তই উহাদের ভিতর দিয়া চলাচল করিতে পারে। এইজন্যই অনেক সময় ভয়ে মুখও ক্ষণিকের জন্য ফ্যাকাশে হইয়া যায়।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার

(৭৫)

লোণা নষ্ট করিবার বিশেষ উপায় এই যে, ১নং লাল ইট না লাগাইয়া দেয়ালের বা ইষ্টকালয়ের দেওয়ালে পোড়ান ইট, যাহাকে ঝামা ইট বলে, তাহা লাগাইলে সম্ভবতঃ প্রাচীরগুলি সহজে নষ্ট হইতে পারে না। আর একটি উপায় আছে। তাহাতে অনেক বেশী খরচ পড়ে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। সুরকীর সঙ্গে যদি বিলাতী মাটি মিশাইয়া দেওয়ালের গাঁথনি করা যায়, তাহা হইলে দেওয়াল লোণা হইতে মুক্ত হয়। আর প্রত্যেক বৎসর যদি দেওয়ালের সমস্ত স্থানে তেঁতুল-ভিজানো জল দেওয়া যায় তবে লোণা ধরিতে পারে না ; ইহা পরীক্ষিত।

তেঁতুলের কাঠ দিয়া ইট পোড়াইলে অথবা তেঁতুলের জল দিয়া ইট ধুইয়া দেওয়ালে গাথিলে সহজে লোণা ধরে না।

শ্রী মোহিতমোহন রায়চৌধুরী

গৃহের দেওয়ালে লোণা ধরিলে, দেওয়ালের গাত্র হইতে সমস্ত লোণা মৃত্তিকা ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে, এঁটেল মাটির সহিত মোটা বালি ও গোবর মিশ্রিত করিয়া কাদা প্রস্তুত করিয়া তাহা দিয়া উক্ত লোণাধরা স্থান লেপ দিতে হইবে। এই লেপ দেওয়া শুষ্ক হইলে আল্‌কাতরা গরম করিয়া তরল অবস্থায় দেওয়ালে ২।৩ পোঁচ লাগাইয়া দিলে লোণা ধরা বন্ধ হইবে।

ইষ্টকালয়ের দেওয়ালে লোণা ধরিলে, লোণা-ধরা বালি-পলস্তরা ছাড়াইয়া দিয়া জল দ্বারা ধৌত করিতে হইবে। যদি গাঁথনীর কোন কোন ইট লোণা-ধরা দৃষ্ট হয় তাহা বাহির করিয়া তৎস্থানে নূতন ইট গাঁথনী করিতে হইবে। লোণা-ধরা জায়গায় সিমেণ্ট্-পলস্তরা করিয়া দিলে আর লোণা ধরিবে না। প্রত্যেক শত বর্গ ফুটে সিমেণ্ট্-পলস্তরা করিতে হইলে ৩ ঘনফুট সিমেণ্ট্ ও ৪ ঘনফুট বালি আবশ্যক। সিমেণ্ট্ পলস্তরা ১।০ ইঞ্চি পুরু করিলে চলিবে।

শ্রী জগন্নাথ দাস

(৭৬)

আত্মনাম গুরোর্নাম নামাতিকৃপণস্য চ জ্যেষ্ঠপুত্রকলত্রস্য...নাম লওয়া মনুর অনুশাসন অনুসারে নিষেধ।

বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত
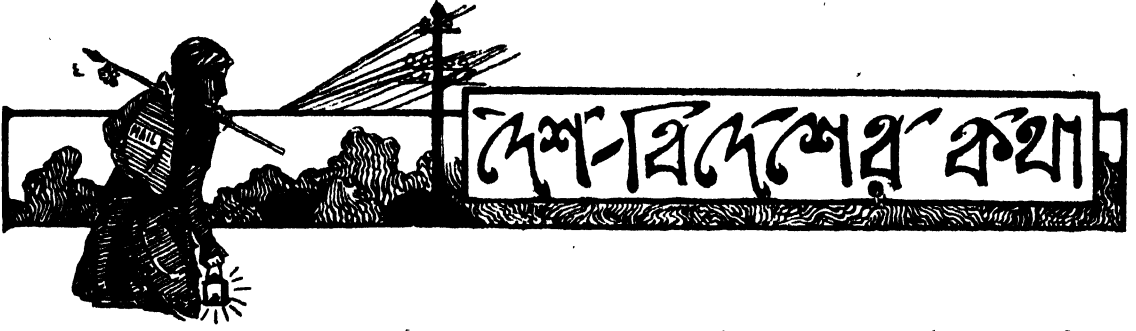
বিদেশ

ইংলণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি—

সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ জার্ম্মানজাতির স্থায় দক্ষতার সহিত কর্ম্ম পরিচালনা করিতে না পারিয়া বিগতযুদ্ধে যখন ইংরেজ-সরকার বিপদ গণিতেছিলেন তখন সেই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া সমবেতভাবে দেশের সেবার জন্য বিভিন্নমতাবলম্বী রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা লয়েড্ জর্জ্জের কর্তৃত্বাধীনে এক সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করেন। প্রয়োজনের চাপে এই যে মিলন তাহা স্থায়ী মিলন নহে; তাই যুদ্ধের পর হইতেই এই সম্মিলন ভাঙ্গিয়া যাইবার জোগাড় হইতেছিল। কিন্তু নানারূপ নূতন নূতন বিপদের সৃষ্টি হওয়াতে লয়েড্ জর্জ্জের কর্তৃত্ব এতদিন পর্য্যন্ত কোনরূপে বজায় ছিল। লয়েড্ জর্জ্জ্ উদারনৈতিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও নিজের স্বার্থের জন্য ভূতপূর্ব্ব উদারনৈতিক প্রধান মন্ত্রী মিঃ অ্যাস্‌কুইথের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা অ্যাস্‌কুইথ্-ভক্ত উদারনৈতিক দল নেতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই মনে করেন এবং সেইজন্য তাঁহারা লয়েড্ জর্জ্জ্ ও সম্মিলনপন্থী উদারনৈতিক দলকে ক্ষমা করেন নাই। এই দলের স্যার ডোনাল্ড্ ম্যাক্‌লিন্, লর্ড গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্, লর্ড্ বাকমাষ্টার, ভাইকাউন্ট্ গ্রে, মার্কুইস্ অফ্ ক্রু, স্যার্ জন্ সাইমন্ ও স্যার্ ওয়াল্‌টার রান্সিম্যান্ প্রভৃতি নেতারা লয়েড্ জর্জ্জের শাসনপ্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ বরাবরই করিয়া আসিয়াছেন। রক্ষনশীল দলের স্যার্ রবার্ট্ সিসিল্ ও ব্যয়াধিক্যের জন্য লয়েড্ জর্জ্জের শাসন-পরিষদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন।

কিন্তু রক্ষণশীলদলের অধিকাংশ নেতাই লয়েড্ জর্জ্জের অনুকূলে থাকাতে এতদিন পর্য্যন্ত সম্মিলিত দলই পার্লামেন্ট মহাসভাতে প্রবল ছিল। কিন্তু পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য, ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ ও আয়ার্‌ল্যাণ্ডের সমস্যার কোনও সুমীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক লয়েড্ জর্জ্জের বৈদেশিক নীতির ধারা সেই সমস্যাকে আরও জটিলতর করিয়া তোলাতে অনেক সম্মিলনপন্থী তরুণ রক্ষণশীল নেতা ক্রমে লয়েড্ জর্জ্জের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। স্যার্ জর্জ্জ্ ইয়ঙ্গারের নেতৃত্বে তরুণ রক্ষণশীল দল মাসকয়েক পূর্ব্বে সম্মিলনের উচ্ছেদ করিয়া রক্ষণশীল দলের স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সম্মিলনের বিরুদ্ধে দল বাঁধিতে আরম্ভ করেন। সম্মিলনের বিরুদ্ধে তরুণ রক্ষণশীলদিগের এই বিদ্রোহ অষ্টেন্ চেম্বার্‌লেন্ ও লর্ড কার্জ্জনের চেষ্টায় এতদিন বড় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের মনোমালিন্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া এবং তুর্কসমস্যায় ইংরেজ জাতি এক নূতন মহাযুদ্ধের জোগাড় করিয়া তুলিতেছে দেখিয়া নবীন রক্ষণশীলেরা লয়েড্ জর্জ্জের নেতৃত্ব অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। লয়েড্ জর্জ্জ্ নিজের নেতৃত্বের অবসান হয় দেখিয়া শেষ চাল চালিবার মতলবে অষ্টেন্ চেম্বার্লেন্, লর্ড্ ব্যাল্‌ফুর্ ও লর্ড্ বার্কেনহেডকে হাত করিয়া রক্ষণশীল দলকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু লর্ড ডার্বি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া চলিতে না চাওয়াতে গোলযোগের অবসান হইল না।

তরুণ রক্ষণশীল দল তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য কার্ল্‌টন ক্লাবে একটি সভা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মিঃ চেম্বার্‌লেন্ ও লর্ড ব্যাল্‌ফুর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে দলপতিরা রাষ্ট্রনীতির যে ধারা প্রবর্ত্তন করিবেন তাহাকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা রাষ্ট্রীয় দলসমূহের কর্ত্তব্য। রক্ষণশীলদলের নেতারূপে ব্যাল্‌ফুর, চেম্বার্‌লেন, বার্কেন্‌হেড প্রভৃতি যে স্থির রাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন করিবেন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু তরুণ দল বলিলেন, যে দলের অধিকাংশ লোক যে মত প্রতিপোষণ করেন তাহাকেই প্রতিষ্ঠিত করা নেতৃবর্গের কর্ত্তব্য। নেতারা যদি দলের অধিকাংশ লোকের মতের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর আনুগত্য করিতে থাকেন, তবে তাঁহাদের নেতৃত্ব আর রক্ষণশীল দল স্বীকার করিবেন না।

নিজেদের মধ্যে দলাদলি করিয়া শক্তিক্ষয় করিলে শ্রমজীবী সম্প্রদায় নির্ব্বাচনে প্রবল হইয়া উঠিয়া শাসনভার গ্রহণ করিবার সুবিধা পাইতে পারে এবং সেইরূপ অবস্থা ঘটিলে ইংলণ্ডে বোল্‌শেভিক্ তন্ত্রের অনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান সমাজ-সংস্থানকে উলট্‌পালট্ করিয়া দিতে পারে, এইরূপ কারণ দর্শাইয়া চেম্বার্লেন্ সাহেব রক্ষণশীল দলকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

লয়েড্ জর্জ্জ্ স্বয়ং ১২ই অক্টোবর ম্যান্‌চেষ্টার সহরে স্বীয় রাষ্ট্রনীতির সমর্থন করিয়া এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীতিকে তীব্র আক্রমণ করিয়া একটি ওজস্বী বক্তৃতা দেন, কিন্তু এই বক্তৃতায় তরুণ-দল সন্তুষ্ট হইলেন না। বাণিজ্য-সচিব স্যার্ ষ্টান্‌লে বল্ড্‌উইন যুদ্ধ-বিভাগের সহকারী-সচিব স্যার্ জর্জ্জ্ স্যাণ্ডার্স্ এবং অন্যান্য তরুণ রক্ষনশীল মন্ত্রীবর্গ একযোগে কর্ম্মে ইস্তাফা দিবার সঙ্কল্প জানাইলেন।

স্যার্ জর্জ্জ্ ইয়ঙ্গার কার্ল্‌টন্ ক্লাবের সভা ১৯শে তারিখে আহ্বান করিলেন। সভায় সর্ব্বপ্রথমে মিঃ চেম্বার্‌লেন্ সম্মিলিত দলকে বজায় রাখিয়া সম্মিলিত মন্ত্রীসভার কর্তৃত্বাধীনে চলা বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। তৎপরে বাণিজ্য-সচিব বল্ড্‌উইন বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে সম্মিলিত দলের চাপ হইতে রক্ষণশীল দলকে মুক্ত না করিতে পারিলে রক্ষণশীল দলের রাষ্ট্রনৈতিক মতগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রচার করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইংলণ্ডের বর্ত্তমান বিপৎসঙ্কুল সময়ে রক্ষণশীল দল যদি আত্মপ্রতিষ্ঠা না করিতে পারে, তবে ইংলণ্ডের সমূহ বিপদ্। ইহার পর ভূতপূর্ব্ব রক্ষণশীল-দলপতি মিঃ বোনার্‌ল বক্তৃতা দিতে উঠেন। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে ইনি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলনে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বোনার্‌ল বলিলেন যে ধীর-ভাবে চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দেশের

লোকের আর সম্মিলিত শাসনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নাই। এই সময় যদি রক্ষণশীল-দল সম্মিলিত দলের নিগড় ছিন্ন করিয়া মুক্ত না হইতে পারে তবে দেশবাসী সম্মিলিত-শাসনতন্ত্রের প্রতি বিতৃষ্ণার জন্য শ্রমজীবী-দলের অনুরক্ত হইয়া পড়িবে। এবং অন্য উপায় না থাকাতে শ্রমজীবী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

মিঃ বোনার্‌লর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রক্ষণশীল দলের অধিকাংশ লোকই সম্মিলন বজায় রাখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। মিঃ উইলসন প্রস্তাব করিলেন যে এখন হইতে রক্ষণশীল দল পুনরায় স্বাধীনভাবে আপনাদের রাষ্ট্রীয় মতের প্রতিপোষণ করিবেন। এবং পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একজন নেতা নির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন হওয়াতে অদ্যকার সভা হইতে একজন দলপতি স্থির করা কর্ত্তব্য। তরুণ রক্ষণশীল সম্প্রদায় খুব উৎসাহের সহিত বোনার্‌ল'কে পুনরায় রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বপদে বরণ করিলেন।

সভাভঙ্গের অনতিবিলম্বে বিদ্রোহী দলের সাতজন সচিব পদত্যাগ-পত্র প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিলেন। অবস্থা দেখিয়া লয়েড্ জর্জ্জ্ পদত্যাগ করিলেন এবং রাজার আহ্বানে বোনার্ ল প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। এই মন্ত্রীসভার প্রায় সকলেই রক্ষণশীল-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সকলেই সম্মিলনের বিরোধী। কেবলমাত্র লর্ড্ নোভার উদারনৈতিক-দলভুক্ত হইয়াও মন্ত্রীসভায় স্থানলাভ করিয়াছেন এইজন্য যে লয়েড্ জর্জ্জের শাসনপ্রণালীর তিনি এতই বিরোধী যে তাঁহার উচ্ছেদের জন্য তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। মন্ত্রীসভাগঠনে কৃতকার্য্য হইলেও বোনার্ ল দেশের লোকের মত জানিবার সুযোগ লাভ করিবার জন্য পার্লামেণ্ট মহাসভা ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ জানাইলেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ্ মহাসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ঘোষণাপত্র জারি করাতে শীঘ্রই নূতন নির্ব্বাচন হইবে। নির্ব্বাচনের ফলে দেশের রাষ্ট্রীয় ধারা স্থিরীকৃত হইবে। রক্ষণশীল দল সম্মিলিত দল উদারনৈতিক দল এবং শ্রমজীবী দল সকলেই জয়লাভের আশা করেন এবং জয়লাভের জন্য সকলেই বিপুল উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে লাগিয়াছেন।

সম্মিলিত দলের পক্ষ হইতে লয়েড্ জর্জ্জ্ যে ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছেন তাহাতে সম্মিলিত দলের আদর্শ বলা হইতেছে যে সর্ব্বপ্রকার দলাদলিকে দূরে রাখিয়া ইংলণ্ডের ইষ্টসাধনই এই দলের মূল মন্ত্র। সাম্যবাদ ও "ধ্বংসের" হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করাই রক্ষণশীল দলের মূলমন্ত্র বলিয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রমজীবী সম্প্রদায় বলেন জাতীয় ঋণের পরিমাণ হ্রাস, শাসন-ব্যয় সঙ্কোচ, বেকার সমস্যার সমাধান ও কৃষির উন্নতিসাধন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। উদারনৈতিক দলের ঘোষণাপত্রে শাসন-ব্যয় সঙ্কোচ, শান্তির প্রতিষ্ঠা, উপনিবেশগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি এবং শাসিত রাজ্যসমূহে স্বায়ত্ত শাসনের ক্রমিক প্রতিষ্ঠাই উদার-নৈতিক দলের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব উদারনৈতিক অর্থসচিব স্যার্ রেজিন্যাল্ড্ ম্যাক্‌কেনা রক্ষণশীল দলের সহিত যোগ দিয়া নিজেকে রক্ষণশীল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব উদারনৈতিক-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও বোনার্ ল'র শাসন-পরিষদের সাহচর্য্য করিতে স্বীকৃত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এদিকে রক্ষণশীল নেতা রবার্ট্ সেসিল সম্ভবত উদারনৈতিক দলের সহিত যোগ দিবেন। এ পর্য্যন্ত ৩০ জন মহিলা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত এইচ জি ওয়েল্‌স্ এবং বিখ্যাত ব্যবহারাজীব স্যার্ প্যাট্রিক্ হেস্টিংস্ শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। এতকাল পর্য্যন্ত কায়িকশ্রম যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শ্রমজীবী সম্প্রদায় মানসিক শ্রমকে শ্রম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। কাজে কাজেই বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমী ব্যক্তিরা শ্রমজীবীদলের রাষ্ট্রীয় মতের প্রতিপোষণ করিলেও শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিতেন না। জীবনের কোনও না কোনও সময়ে সাধারণ শ্রমী না হইয়া থাকিলে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়া যাইত না। এখন শ্রমজীবী দল বুদ্ধিজীবী-দিগকেও নিজেদের দলে গ্রহণ করিতে স্বীকার করাতে বহু শিক্ষক, সাহিত্যসেবক, চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রমজীবী দলে যোগদান করিয়াছেন। এইরূপে দল পুষ্ট হওয়াতে বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে শ্রমজীবী দল জয়লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইবেন। কাজেকাজেই কোন্ দল জয়লাভ করিবে বলিতে পারা যায় না।

তুরস্কের নব জাগরণ—

যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া যখন স্তাম্বুল্-সরকার সেভাস্ সন্ধির হীনতাকে স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইলেন তখন স্বদেশপ্রেমিক তুর্ক বীর গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা স্তাম্বুল্-সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া পশ্চিম-প্রান্তিক এসিয়াতে আঙ্গোরা সরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়া হৃতসর্ব্বস্ব তুরস্কের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য অপূর্ব্ব পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের প্রধান সহায় হইলেন একজন নারী—খালিদা অদিব্ হানুম্। কামালের অদ্ভুত শৌর্য্য ও খালিদা হানুমের অলৌকিক প্রতিভা আঙ্গোরা-সরকারকে অতি অল্পদিনের মধ্যেই অতিপরাক্রান্ত ও সুসংবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিল। কাজেকাজেই তুরস্কে পাশাপাশি দুইটি সরকারের সৃষ্টি হইল।

স্তাম্বুল্-সরকার দেশের চিরাচরিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও রাষ্ট্রনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বৈদেশিক শক্তিসমূহ তাহাকেই তুরস্কের নিয়মসঙ্গত রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার অন্তরালে অবশ্যই একটি স্বার্থপ্রণোদিত অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল। আঙ্গোরার মত প্রবল সরকারকে স্বীকার করিলে সেভাস্ সন্ধির সুবিধাগুলির অনেকটাই ছাড়িয়া দিতে হয়, কিন্তু দুর্ব্বল স্তাম্বুল্-সরকারকে মানিয়া লইলে মিত্রশক্তিবর্গের অনেক সুবিধা আদায় করিবার সুযোগ থাকে। তাই অনেকদিন পর্য্যন্ত আঙ্গোরা-সরকারকে মিত্রশক্তিবর্গ বড় আমল দেন নাই। কিন্তু আঙ্গোরা সরকার দেশের মর্য্যাদা-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের বাহুবলে এতই পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহাকে অস্বীকার করিয়া চলিবার আর উপায় রহিল না। গ্রীকশক্তিকে যখন কামাল বাহুবলে পশ্চিমপ্রান্তিক প্রাচ্য হইতে উৎখাত করিয়া থ্রেস্ ও দার্দ্দেনেলিস্ আক্রমণ করিবার জোগাড় করিতে লাগিলেন, তখন বাধ্য হইয়া ইংরেজ-সরকার কামালের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। অবশ্য ইহার বহু পূর্ব্বেই ফ্রান্স্-সরকার ফ্রাঙ্ক্‌ল্যাঁ বুলিওঁর উপদেশ অনুসারে আঙ্গোরা-সরকারের সহিত এক চুক্তিপত্র সহি করিয়া একটা রফা-নিস্পত্তি করিয়া লইয়া আঙ্গোরা-সরকারকে সুস্থাপিত একটি রাষ্ট্রশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইংরেজ-সরকার অনেক চালবাজীর পর মুদিয়ানা-চুক্তিপত্রে আঙ্গোরা-সরকারের সহিত রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। কিন্তু স্তাম্বুল্-সরকারকেও এতদিন স্বীকার করিয়া আসাতে একটি গণ্ডগোলের সূচনা হইল। লোসান্ সহরে থ্রেস্ ও দার্দ্দেনেলিস্ সম্বন্ধে যে মীমাংসা হইবে তাহার সম্বন্ধে যদি দুইটি সরকারের মত এক না হয়, তবে কাহার কথা মানিয়া লওয়া হইবে? অবশ্য এই গোলযোগ থাকিয়া

শ্রীমতী হালিদা হানুম্—তুর্কনারীদের অধিনেত্রী ও মুস্তাফা কামাল পাশার সহকর্ম্মিণী

যাওয়া ইংরেজের পক্ষে একধারে সুবিধার ব্যাপার ছিল। কেননা যদি অ্যাঙ্গোরা-সরকারের দাবীগুলি অত্যধিক বোধ হইত তবে দুর্ব্বল তুরস্ক-সরকারকে হাত করিয়া তাহাকে অল্পেই সন্তুষ্ট করা চলিত এবং অ্যাঙ্গোরা-সরকারকে অবুঝ ও অধীর বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার সুবিধা থাকিতে পারিত। নতুবা যে সরকারকে রুগ্ন ও অক্ষম বলিয়া চিরকাল অবহেলা করিয়া আসা হইয়াছে সেই স্তাম্বুল-সরকারকে লোসান বৈঠকে ডাকিবার কি প্রয়োজন ছিল? সেভাস্-সন্ধি তো তাহাকে এক প্রকার মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। সে সময় সেভাস্-সন্ধি যে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই এ কথাও তো কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু যখন অ্যাঙ্গোরার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা হঠাৎ সেভাস্-সন্ধির কঠোর সর্ত্তের কথা স্মরণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন, তখন যে শক্তি আপনার বাহুবলে নূতন রফা-নিষ্পত্তির দাবী জানাইয়া সফল হইয়াছে, তাহারই সহিত আলোচনা লোসান বৈঠকে হইলেই চলিত। সেখানে স্তাম্বুল-সরকারকে ডাকিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

দূরদর্শী চতুর রাজনৈতিক কামাল পাশার চক্ষে মিত্রশক্তিবর্গের এই সুবিধাটুকু এড়াইল না। তাই তাঁহার যত্নে তুরস্কের দুইটি সরকারের অবসান হইয়া একটি মিলিত সরকারের সৃষ্টি হইয়াছে। অ্যাঙ্গোরা-সরকার তুরস্কের সুল্‌তানকে মুসলমানধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (খলিফা) ও রাষ্ট্রগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। এবং সুল্‌তান্ অ্যাঙ্গোরা-সরকারের আইন্-মজ্‌লিস্‌কে তুরস্কের একমাত্র আইন্-মজ্‌লিস্ বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সুল্‌তান্ স্বার্থপর কুটচক্রীর চক্রান্তজালে পড়িয়া অ্যাঙ্গোরা-সরকারকে অস্বীকার করিলেন। কামাল উপায়ান্তর না দেখিয়া থ্রেসের তুরস্ক-প্রতিনিধি রাফেৎ পাশাকে স্তাম্বুল দখল করিবার জন্য আদেশ করেন। রাফেৎ পাশা ও স্তাম্বুল্-সরকারের অবসান ও অ্যাঙ্গোরা-সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিয়া এক ইস্তাহার জারি করিলেন। ভীত স্তাম্বুল্-মন্ত্রী-সভা অ্যাঙ্গোরার আধিপত্য নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইলেন। অ্যাঙ্গোরা-সরকার সুল্‌তান্‌কে পদচ্যুত করিয়া তুরস্ক-সাম্রাজ্যের (Turkish Empire) পরিবর্ত্তে তুরস্করাষ্ট্রতন্ত্রের (Turkish State) প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলেন। রাফেৎ পাশা মিত্রশক্তিবর্গের সেনাপতি-গণের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া জানাইলেন যে মুদানিয়া-চুক্তিসর্ত্ত অনুসারে মিত্রশক্তিবর্গ কর্ত্তৃক গ্যালিপোলি দখলের অধিকার মানিয়া চলিতে তিনি প্রস্তুত আছেন; কিন্তু স্তাম্বুলের শাসন-ব্যাপারে মিত্রশক্তিবর্গের কোন-প্রকার হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিবেন না। রাফেৎ স্তাম্বুলের শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণ করিবামাত্র স্তাম্বুল্-সরকারের পুলিশ ও ফৌজ অ্যাঙ্গোরার বশ্যতা স্বীকার করিল। রাফেতের এই কৃতিত্বে মিত্রশক্তিবর্গ বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই। রয়টারের তারের খবরে মিত্রশক্তিবর্গের মনের ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। রয়টার বলিতেছেন—

"The coup d' etat is regarded as having greatly complicated the situation. The late government, though powerless, was supplied with useful machinery for the exercise of allied authority. The contrasubstitution of chauvinistic nationalist agents is not conducive to the smooth working of relations with the Allies."

সহসা এই বিপ্লবে তুরস্ক-সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সরকার শক্তিহীন হইলেও মিত্রশক্তিবর্গের ক্ষমতা পরিচালনের প্রয়োজনীয় যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। তাহার পরিবর্ত্তে আত্মম্ভরি জাতীয়-দলের প্রতিনিধির হস্তে শাসনভার ন্যস্ত হওয়াতে মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে সহজভাবে কর্ম্ম পরিচালনা করিবার সুবিধাজনক অবস্থা রহিল না।

তাই সুল্‌তান্‌কে ভারতে লইয়া আসিবার চেষ্টা হইতেছে। ইংরেজ সরকার সুল্‌তান্‌কে আশ্রয় দান করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই একদল ইংরেজ সুর ধরিয়াছেন যে খলিফার প্রতি এই ব্যবহার মুসলমানধর্ম্মবিশ্বাসকে আঘাত করিয়াছে। কাজে-কাজেই খিলাফতি আন্দোলনের যাঁহারা উদ্যোক্তা তাঁহারা অ্যাঙ্গোরা-সরকারকে সহ্য করিবেন না। কিন্তু এইসব চতুর ইংরেজের কথায় মুসলমান-সম্প্রদায় যে ভুলিবেন এইরূপ মনে হয় না। মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রবীণ নেতা আগাখাঁ বলেন যে—

"সুল্‌তান্‌কে পদচ্যুত করা মুসলমানধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে;

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তিনজন সুলতান্ পদচ্যুত হইয়াছিলেন। খলিফা বংশানুক্রমের ধারায় আপন পদ প্রাপ্ত হয়েন না ; মুসলমানধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে খলিফা নির্ব্বাচিত হয়েন। যেখানেই নির্ব্বাচন হয়, সেখানেই নির্ব্বাচকদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিবার অধিকার থাকে। মুসলমানরাষ্ট্রের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য যদি খলিফার পদচ্যুতি প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে তাহা অন্যায় নহে। অ্যাঙ্গোরা-সরকার যাহা করিয়াছেন তাহা মুসলমান সমাজের মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন এরূপ বিশ্বাস ভারতীয় মুসলমানগণের আছে। কামালপাশার প্রতি বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।”

দিল্লীর প্রসিদ্ধ পীঠস্থান নিজামুদ্দিন আউলিয়ার রক্ষক প্রবীণ মুসলমানধর্ম্মাচার্য্য নিজামী ও কলিকাতা খিলাফৎ সভার সহকারী সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ হোসেন কোরান ও হদিসের নানা স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে মুসলমানধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে খলিফা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি-সভার সুল্‌তানকে পদচ্যুত করিবার অধিকার আছে।

কামালের চেষ্টায় দুইটি বিভিন্ন সরকারের অবসান হইয়া একটি প্রবলপরাক্রান্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। নবীন তুরস্ক নিজের ন্যায়সঙ্গত দাবী জোর করিয়া চাহিতেছেন। যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে তাহাতে হৃতরাজ্যের অনেকটাই তুরস্কের ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা আছে। সিরিয়ার ফরাসী শাসনকর্ত্তা জেনেরাল গুরো উত্তর সিরিয়ার অনেকটাই তুরস্ককে ফিরাইয়া দিবার জন্য ফরাসী-সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

অ্যাঙ্গোরা-সরকার থ্রেস ভিন্ন ইউরোপীয় তুরস্কের দেদিগাচ ও কারাগাচ প্রদেশ এবং এসিয়ার ইংরেজ-অধিকৃত মসুল প্রদেশ ফিরিয়া চাহিতেছেন। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন যে, ভার্সাই-সন্ধি-সূত্র অনুসারে প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াকে স্বসংকল্পানুযায়ী শাসনতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হউক।

—

ইতালীতে ফ্যাসিষ্টি বিপ্লব

ইতালীর অধিবাসীরা বরাবরই একটু বেশী ভাবপ্রবণ ; তাই ইতালী বিপ্লববাদীদের লীলানিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রমজীবীদের দুঃখে ব্য...থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা ইতালীতে খু... আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সামাজিক ন্যায়ের পক্ষপাতী অনে...ক ইতালীয় চিন্তাবীর সাম্যবাদী দলের সহিত যোগ দেওয়াতে যুদ্ধের পূর্ব্বে ইতালীতে সাম্যবাদ যেরূপ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ এমনটি হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের পর ইউরোপের অর্থ-নৈতিক অবস্থার প্র...ভূত পরিবর্ত্তন হওয়াতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থে...র ঘাত-প্রতিঘাত বাধিয়া উঠিয়াছে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বিরোধটি সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভা...বে জাগিয়া উঠিয়াছে ইতালীতে ;—সেখানকার ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এই দ্বন্দ্বের ফলে।

যুদ্ধের সময় বিদেশের সঙ্গে যখন ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় একপ্রকার বন্ধ ছিল তখন দেশজাত দ্রব্যের কাটতি স্বভাবতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই সুযোগ বুঝিয়া নির্ম্মাতারা (manufacturers) অসম্ভব রকম লাভ করিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না থাকাতে অধিমূল্যে জিনিষ ক্রয় করিতে ক্রেতারা বাধ্য হইলেন। খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতে শ্রমজীবীগণও মাহিনা বাড়াইয়া দিবার দাবী করিতে লাগিলেন। দেশময় ধর্ম্মঘট দেখা দিল ; বাজারে মাল সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নির্ম্মাতারা শ্রমিকের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রমিকের দাবী মানিয়া লাভের গণ্ডা হইতে শ্রমিকের কড়াটি বুঝাইয়া না দিয়া ধনী ক্রেতার নিকট হইতে সেইটি আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন।

ইহাতে লোক্‌সান হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সবচেয়ে বেশী। তাহাদের আয় বাড়িল না, অথচ নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গেল। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আয়ের মাপকাঠি উল্টাইয়া যাওয়াতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আর কষ্টের সীমা রহিল না। ক্রমাগত আন্দোলন ও ধর্ম্মঘট করিয়া শ্রমিকেরা তাহাদের আয় দ্রুতগতিতে বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় পূর্ব্বের মত থাকিয়া গেলেও ব্যয়ের অঙ্ক অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাওয়াতে শ্রমিকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার উপর আবার শ্রমিকগণ বুদ্ধিজীবীদলের প্রতি অবিচার করিতে লাগিলেন। কর্ম্ম অর্থে তাঁহারা কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির ব্যবহার বুঝিলেন। বুদ্ধিজীবীদিগকেও যে পরিশ্রম করিতে হয়, ও জগতের পক্ষে তাহাদের কার্য্যের মূল্য যে কম নহে, একথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা বুদ্ধিজীবীদিগকে গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিলেন

ধ্বংসলীলার তাণ্ডব যুদ্ধের প্রতি শ্রমজীবীদিগের ঘৃণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সৈনিক হইয়াছিলেন বেশী। তাই শ্রমিকের দল সুযোগ পাইলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপ নানা ব্যাপারে যখন শ্রমিকের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদিগের দ্বন্দ্ব বেশ পাকিয়া উঠিতেছিল তখন শ্রমিকের দলই ইতালীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯২১ সালের প্রথমভাগে তাহারা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে ইতালীর কোনও লোক শ্রমজীবী সভার (camera del lavoro) বিরুদ্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিলে শ্রমজীবীসভা তাঁহাকে একঘরে করিতেন। তখন তাঁহার কোন জিনিষ ক্রয় বিক্রয় করা দুষ্কর হইয়া পড়িত।

এইরূপ অত্যাচার সহ্য করা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হইল না। সাম্যবাদীদের প্রতি তাঁহাদের বিরক্তিকে আশ্রয় করিয়া একটি আন্দোলনের সৃজন করিলেন ইতালীয় রাষ্ট্র-বিশারদ পণ্ডিত সেনর মুসোলিনী। এই আন্দোলনের নাম ফ্যাসিষ্টি আন্দোলন। ফ্যাসিষ্টি শব্দের উৎপত্তি ইতালীভাষায় fascismo (ফ্যাসিস্‌মো) শব্দ হইতে—ইহার অর্থ ঐক্য। এই সম্প্রদায়ের নেতা সেনর মুসোলিনী পূর্ব্বে সাম্যবাদীদলের নেতা ছিলেন। সাম্যবাদী সম্প্রদায়ের মুখপত্র আভান্তি (Avanti) পত্রিকা খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া ইনি খুব যশস্বী হন। কিন্তু যুদ্ধের সময় যখন সাম্যবাদীদল মেলাতেস্তার প্রচেষ্টায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন তখন দেশপ্রেমিক মুসোলিনী সাম্যবাদী সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক হইয়া যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুসোলিনীকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি যখন রোম সহরে রুটিওয়ালারা ধর্ম্মঘট করিয়া বসে, তখন মুসোলিনী যুদ্ধ-প্রত্যাগত ইতালীয় যুবকদিগকে লইয়া একটি দল গঠন করিয়া রোমের লোকদের রুটি সরবরাহের বন্দোবস্ত করেন। মেলাতেওত্তা ভয় দেখাইলেন যে রুটি-ওয়ালাদিগের সাহায্য করিবার জন্ম সমস্ত ইতালীয় সর্ব্বপ্রকার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিবে। মুসোলিনী সেই মহাবিপদ হইতে ইতালীকে রক্ষা করিবার জন্ম খুব উৎসাহের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন। দলে দলে যুদ্ধ প্রত্যাগত যুবকেরা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফ্যাসিষ্টি দল খুব প্রতাপশালী হইয়া পড়িল। ইহাঁরা বলিতে লাগিলেন যে ইতালী-সরকার যখন শ্রমিকের অত্যাচার হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে অসমর্থ তখন দেশের মঙ্গলের জন্ম ইহাঁরা নিজেদের হস্তে শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ইতালীর বহু গণ্য মান্ত লোক গোপনে ইহাঁদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমেই ইহাঁরা এতই প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন যে মন্ত্রীসভাকে প্রকাশ্যভাবেই ইহাঁরা অমান্ত করিয়া চলিতে লাগিলেন। ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের সহিত সাম্যবাদীদিগের প্রকাশ্য রাজপথে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। সরকারের পক্ষে দেশে শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিপদ দেখিয়া ফ্যাক্টা-মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিলেন। অরলান্দো, সালান্দ্রা, বনোমি, জিওলেত্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিকদলের নেতারা কেহই সাহস করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারিলেন না। ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই যুবক। এই যুবক দলকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দিবার সাহস জাতীয় মহাসভার সভ্যদিগের হইল না। বিশেষতঃ সাম্যবাদীদের অত্যাচার হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া দেশে সুশাসনের অছিলায় ইহাঁরা নিজেরাই যেরূপ অত্যাচার করিতে-ছিলেন তাহাতে ইহাঁদের প্রতি মহাসভার সভ্যদের বড় আস্থাও ছিল না। তাই ফ্যাক্টাকে পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দেওয়া হইল। মুসোলিনী বলিলেন যে ফ্যাক্টা-মন্ত্রীসভা যদি গণতান্ত্রিক দলের সহিত কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখান তবে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন এবং ইতালীর মঙ্গলের জন্ম জোর করিয়া নিজহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ফ্যাক্টা পাল্টা জবাবে বলিলেন—দেশের হিতসাধনের জন্ম ফ্যাসিষ্টি-হাঙ্গামা নিবারণের জন্ম বলপ্রয়োগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। এইরূপ বাদানুবাদ যখন চলিতেছিল সেই সময়েই ইতালীর গণতান্ত্রিক দলের কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্ম এক বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে ইতালীর গণতান্ত্রিক নেতাদের অধিকাংশ লোকই বল্‌-শেভিক্‌বাদ পরিহার করিয়া ধীরে ধীরে সাম্যতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, একমাত্র আভান্তি পত্রের নূতন সম্পাদক সেরাতি (Serrati) বল্‌শেভিক্‌বাদ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিলেন। সাধারণ সভ্যদিগের ভোট লইবার ফলে দেখা গেল সেরাতি জয়লাভ করিয়াছেন। ইতালীর গণতান্ত্রিক দলের অধিকাংশ লোকই সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের পক্ষপাতী। ইহাতে তুরাতি, প্রাম্পোলিনী, তনেলো প্রভৃতি নেতৃবর্গ গণতান্ত্রিক দল পরিত্যাগ করিয়া Partitia Socialista Italiano (পার্টিসিয়া সোসালিষ্টা ইতালিয়ানো) নামে একটি নূতন দল সৃজন করিলেন। সাম্যবাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই এই দলভুক্ত হইলেন। এই দলের সহিত জিওলিত্তির নেতৃত্বে পরিচালিত পপুলিষ্ট দল একযোগে কাজ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে ইতালী-মহাসভায় এই দল সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতে জিওলিত্তির নেতৃত্বে একটি নূতন মন্ত্রীসভা গঠন অনিবার্য্য হইয়া পড়িতে লাগিল। জিওলিত্তি কিন্তু ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের খুব বিরোধী। তাঁহার হস্তে ইতালীর শাসন-ভার পড়িলে ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের সমূহ বিপদ। তাই মুসোলিনী মিলান্‌ সহরে ফ্যাসিষ্টি-সম্প্রদায়ভুক্ত সকলকে আহ্বান করিয়া ফ্যাক্টা-মন্ত্রীসভার নিকট হইতে দেশের শাসনভার দাবী করিলেন। বিপদ গণিয়া ফ্যাক্টা সামরিক আইন জারি করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইতালীর সম্রাট ফ্যাসিষ্টি দলের সহিত সৈন্তদিগের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে দেখিয়া সামরিক আইন জারি করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ফ্যাক্টা পদত্যাগ করিলেন।

মুসোলিনীর দল ইতালীর অনেক প্রদেশের শাসনভার একে একে নিজেদের হাতে লইতে লাগিলেন। বিপদ দেখিয়া জিওলিত্তি, অরলান্দো প্রভৃতি কোন রাষ্ট্রীয় নেতাই শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সম্রাট অবশেষে মুসোলিনীকে মন্ত্রী-সভা গঠনের জন্ম আহ্বান করিলেন। আহ্বানপত্র পাইয়া মুসোলিনী রোমে আগমন করিলেন। রোমের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার অভ্যর্থনায় যে বিপুল উদ্যোগ করিয়াছিল তাহা হইতে তাঁহার প্রভাব স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে। অভ্যর্থনা-সভায় মুসোলিনী বলিলেন—"নগরবাসীগণ! তোমরা অল্পক্ষণ পরেই দুর্ব্বল মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তে সবল শাসনতন্ত্র লাভ করিবে। ইতালী সজীবতা লাভ করুক। ইতালী নবীনতা লাভ করুক। ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের মন্ত্র অক্ষয় হোক।" বিপুল জনসংঘ তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিলেন। মুসোলিনী নবগঠিত মন্ত্রীসভায় প্রধান মন্ত্রীর পদ ভিন্ন পররাষ্ট্র-বিভাগের ভারও নিজের হস্তে রাখিয়া-ছেন। শাসন-ব্যয় সঙ্কোচ এবং খুব কঠোর নিয়মনিষ্ঠা প্রবর্ত্তনই মুসোলিনীর প্রধান লক্ষ্য। তরুণ ইতালীর অনেক যুবক মুসোলিনীর মন্ত্রীসভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। এই তরুণ দলের হাতে ইতালীর ভাগ্য কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা দেখিবার জন্ম জগৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

বাংলা

দরিদ্র দেশের অর্থের অপব্যয়—

কলিকাতা পুলিস-ব্যয়। দেশবাসীর অবিরাম প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট একেবারে বেপরোয়া হইয়া শাসনব্যয় ক্রমাগতই বাড়া-ইয়া চলিয়াছেন। শাসনের প্রত্যেক বিভাগে এই ব্যয়-বাহুল্য দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে বিভাগে যত খরচ হইত, এখন সেই বিভাগে তাহার দ্বিগুণ এমন কি ত্রিগুণ খরচ হইতেছে। অন্যান্ত বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল কলিকাতার পুলিস-বিভাগে গত কুড়ি বৎসরে কিরূপ ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে আমরা তাহাই দেখাইব। গত ১৯০০ সালে কলিকাতার পুলিসের জন্ম ৮১৭৬২০৲ টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০৭ সালে ১১২৮০১৪ টাকা, ১৯২০ সালে মণ্টেগু-মাকাল দেখাইয়া পূর্ব্বের বর্দ্ধনশীল ব্যয়ের উপর এক দফা ব্যয় বাড়ান হইল এবং ঐ সনে কলিকাতার পুলিসের ব্যয় ২৮৩১৪৩০৲ টাকায় পরিণত করা হইল। ১৯২১-২২ সালের যে আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে তাহাতে এই বাবত ৩৬২০০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯০০ সালে এই বাবৎ যত টাকা ব্যয় হয়, ১৯২১-২২ সালে তাহার সাড়ে চারি গুণ টাকা ব্যয়িত হই-তেছে। প্রায় এই অনুপাতে সরকারের অন্যান্ত বিভাগেও ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে কিন্তু দেশবাসীর পেটে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই—তাঁহারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে শীর্ণ, ক্লিষ্ট। ম্যালেরিয়ায় প্রতিবৎসর

উত্তর বঙ্গের ম্যাপ—কালো দাগ দেওয়া জায়গাটি বন্যাপীড়িত
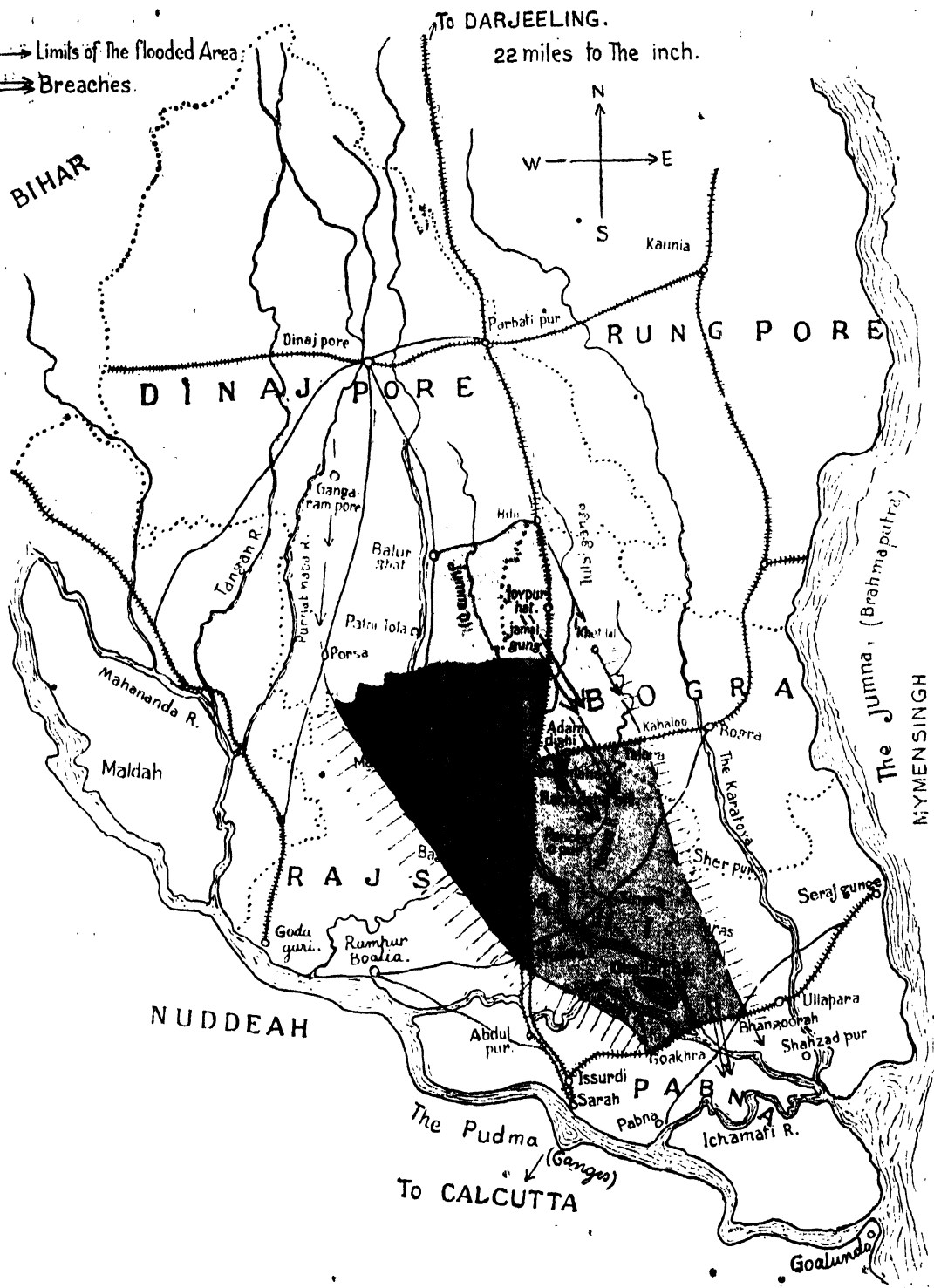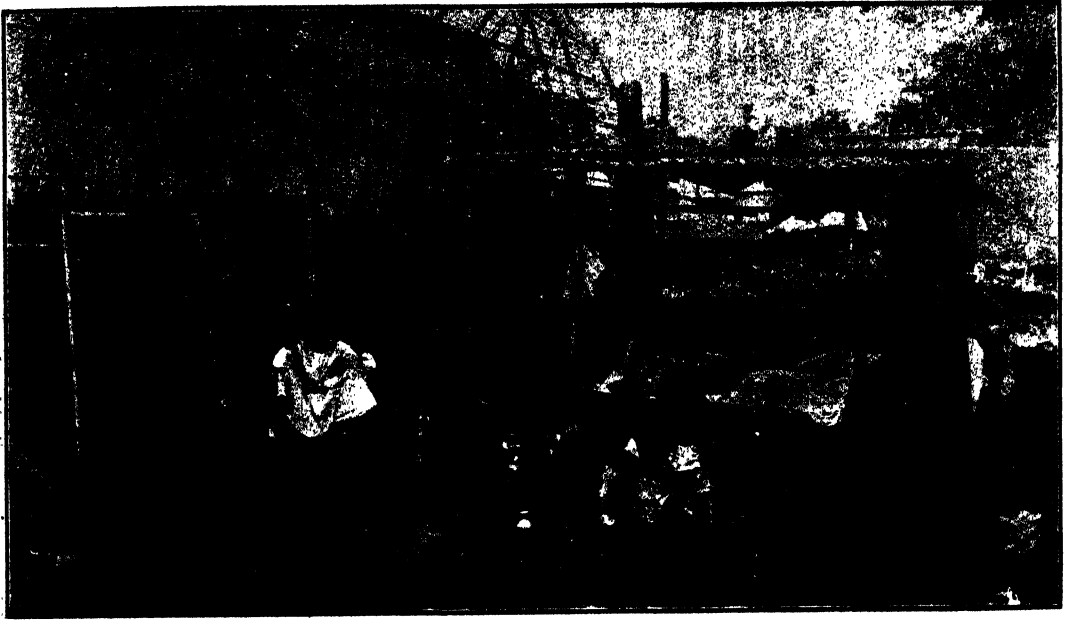
বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এক জমিদার-গৃহ

লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মারা যাইতেছে—গ্রাম কে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা ট্যাক্‌সের উপর ট্যাক্‌স্ বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। তাঁহাদের "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষা হইলেই হইল! গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয় বৃদ্ধির অজুহাতে বলিয়া থাকেন যে অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়াতেই পুলিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের এই যুক্তির কোন মূল্য নাই। পুলিসের সংখ্যাল্পতাই যদি এই অপরাধ-বৃদ্ধির কারণ হইত তবে পুলিসের সংখ্যা বাড়াইলেই অপরাধ কমিয়া যাইত। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা তাহার বিপরীত দেখিতেছি। পুলিসের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত অপরাধও বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং অপরাধ বৃদ্ধির কারণ অন্যত্র বিদ্যমান।

—মোহাম্মদী

মন্ত্রীরা দেশের লোক হইয়া যদি নিরন্ন ও অজ্ঞ দেশবাসীর টেক্সের টাকা হইতে মাসিক ৫৩৩৩৲ টাকা পকেটে পুরিতে দ্বিধা বোধ না করেন, তবে আমরা কোন্ মুখে, কোন্ যুক্তি অনুসারে বিদেশী আম্‌লাদের বলিব—ওগো, তোমরা কম মাহিনা লও, আমাদের দেশ যে বড় গরীব। বিদেশী আম্‌লারা আমাদের কি বলিবে না, আমরা ত এখানে আসিয়াছি টাকা লুটিতে, বিশ্বপ্রেম বিলাইতে নয়; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাদের স্বজাতীয় মন্ত্রীরা এত টাকা মাহিনা লয় কোন্ হিসাবে? ইহার উপর ত কোন কথা নাই—দেশের মন্ত্রীরা যদি পথ না দেখান, তবে শাসন-ব্যয় কমিবে কিসে, তবে গরীবেরা অন্ন বস্ত্র শিক্ষা পাইবে কোথা হইতে, তবে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে কি করিয়া?

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গড়পড়তা মাসিক আয় ২॥০ কি বড় জোর ৩৲, আর সাধারণ লোকের প্রতিনিধিকল্প (?) মন্ত্রীর মাসিক মাহিনা ৫৩৩৩৲।

—হিন্দুস্থান

বাংলায় ডাকাতি—

রোজ একটি। ১৯২২ সালের ২২শে অক্টোবর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গালায় মোট ৮টা ডাকাতি হইয়াছে। তন্মধ্যে ২টা মুর্শিদাবাদে এবং বীরভূম, বর্দ্ধমান, হাবড়া, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও রংপুরে একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। সকল ডাকাতিই গৃহস্থের ঘরে।

—হিন্দুস্থান

দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি—

কলিকাতা সহরে আগুন নিবাইবার জন্য দমকল (ফায়ার্ ব্রিগেড্) থাকা সত্ত্বেও প্রতি বৎসর অগ্নিকাণ্ডে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা সত্য-সত্যই ভীতিপ্রদ। ১৯২১ সালের ৩১শে মার্চ্চ্ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে দেখা যায় কলিকাতার দমকল এলাকার ভিতর অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল ৬৭৩টি; তাহাতে ক্ষতি হইয়াছে ৩৪০৬৫৫৪৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা বেশী ক্ষতি হইয়াছে।

—ঢাকাপ্রকাশ

বন্যা-সংবাদ ও বন্যায় সাহায্য—

রিলিফ কমিটি হইতে যে সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহাতে কুলাইতেছে না। অনেকেরই পরিধানের বস্ত্র নাই, বঙ্গললনাগণ বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না, এবং সেইজন্য সাহায্য লইতেও আসিতে পারিতেছে না। অনেকে একেবারে নগ্নাবস্থায় দিন কাটাইতেছে। একটি স্ত্রীলোক নাকি নিরুপায় হইয়া ৬০ টাকায় তাহার একমাত্র কন্যা বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। রিলিফ কমিটি এ সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া তাহার কন্যা ফিরাইয়া দেন এবং তাহাকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন।

—খুলনাবাসী

বন্যাক্লিষ্ট গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ ও শিশুগণ

বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালীরা অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। রেলওয়ে-বোর্ড স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অল্প ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দেন নাই বলিয়া আচার্য্য রায় মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বন্যাপীড়িত স্থানে পনের জন ডাক্তার পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে কোন ঔষধ নাই।

—হিন্দুস্থান

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবেদন—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বাংলার ছাত্রসমাজকে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছেন, আজ আমি ছাত্রগণকে উত্তরবঙ্গের বন্যা-প্রপীড়িতদের সম্বন্ধে একবার চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতে'ছি। কোন্ ছাত্র বন্যা-প্রপীড়িতদের করুণ কাহিনী না শুনিয়াছে? অনেকেই স্বচক্ষে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া আসিয়াছে। ছাত্রেরা যেরূপভাবে দুঃস্থদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছে সেরূপ সহানুভূতি বস্তুতই আশাতীত। বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে বন্যার সময় ছাত্রেরা যেরূপ অসামান্য ত্যাগের নিদর্শন দেখাইয়াছিল তাহা কল্পনাতীত। এইবারও সেইরূপ ত্যাগের আদর্শ দেখাইবার সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত, এ সময়েও ছাত্রেরা কেহ চুপ করিয়া থাকিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গে এবার যে কিরূপ ভীষণ বন্যা হইয়াছে তাহা দূর হইতে কল্পনা করা যায় না। ছাত্রদের এখন স্কুল কলেজ খুলিয়াছে, কাজেই এখন বন্যাপীড়িত স্থানে যাইয়া সাহায্য করা অসম্ভব বলিয়া সকলে একযোগে কলিকাতায় আসিয়াই যাহাতে বন্যাপীড়িত-দিগকে সাহায্য করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুক। এজন্য বাবুয়ানা বিলাসিতা যাহার যাহা কিছু আছে সে তাহা ত্যাগ করিয়া সেই অর্থ এতদুদ্দেশ্যে ব্যয় করুক।

—হিন্দুস্থান

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি—

৩ লক্ষ আদায়। উত্তরবঙ্গের বন্যা-প্লাবিত নরনারীর সাহায্যকল্পে এখনও দেশের নানাস্থান হইতে পূর্ব্ববৎ সাহায্যের টাকা আসিতেছে। গয়া সহর হইতে ৬ দফায় এক হাজার ৪ শত টাকা এবং পুরী হইতে ৩ হাজার টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। সিমলা নারী-সমিতি ৮০০ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

—হিন্দুস্থান, ২৪ কার্ত্তিক ১৩২৯

ইহা ছাড়া আজ অবধি কাপড় চাউল ইত্যাদি যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মূল্য প্রায় একলক্ষ টাকা হইবে। বাংলার দুর্দ্দশায় বাঙালী এবার আশাতীতভাবে সচেতন হইয়াছে। ইহা খুব আনন্দের কথা।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় দুইজন হাউস্ ফিজিসিয়ানকে ও ৫০ জন সিনিয়র ষ্টুডেণ্টকে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ডাক্তারী সাহায্য দান করিবার জন্য যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহারা এজন্য বাঙ্গালার জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, যদি আরো অধিক ছাত্র বন্যাপীড়িত অঞ্চলে যাইতে চাহে, তাহা হইলে তাঁহারা অনুমতি দিবেন এবং তাহাদের পার্সেণ্টেজ্ অব্যাহত রাখিবেন। এ-সকল কাজে বাঙালী ছাত্র-সম্প্রদায় মনুষ্যত্ব বিকাশের অবসর ও সুযোগ পাইবে সন্দেহ নাই।

—বসুমতী

টাটা দাতব্য-ভাণ্ডারের ট্রাষ্টিদের পক্ষ থেকে স্যর ফিরোজ সেটনা, মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথের নিকট বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন। টাটার আত্মার তৃপ্তি হোক।

বন্যায় তালোয়া গ্রামের গৃহহীন লোকদের অস্থায়ী গৃহ

রিলিফ্ হাস্‌পাতালের জন্য ডাক্তার ভলান্টিয়ারের অভাব অনুভূত হচ্ছে। যাঁরা আর্ত্তের সেবায় জীবন ধন্য করতে চান, তাঁরা ১০৯ আপার সার্কুলার রোডে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সঙ্গে দেখা করুন।

ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার এ কে চাটার্জ্জি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অজিতকুমার কয়েকটি ছাত্র নিয়ে সান্তাহারে গিয়েছেন।

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় একার্য্যে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া কর্ত্তব্য বোধে বহুপূর্ব্বেই কয়েকজন ছাত্রকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

—বিজলী

পুণ্যশ্লোক রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের নাম ও তাঁহার দানখ্যাতি বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার উপযুক্ত বংশধর কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক-বংশের সেই দান-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—তিনি প্রত্যহ ৪০৲ টাকা হিসাবে ছয়মাসকাল বন্যা-সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অর্থ অনেকেরই আছে কিন্তু সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে জানেন কয় জন?

—ময়মনসিংহ-সমাচার

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যে ছয়মাস কাল প্রতিদিন এক মণ করে চাউল দেবেন। সদয় মহাত্মার জয় হৌক।

—বিজলী

উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত নরনারীর সাহায্যে কলকাতার নারী সমিতি থেকে এ পর্য্যন্ত ২০,০০০৲ টাকা পাওয়া গেছে।

সন্তানের দুঃখ মায়ের জাতির চেয়ে বেশী বোঝে কে?

—বিজলী

বন্যা-নিবারণের উপায়—

ডাক্তার বেণ্ট্‌লি এই উৎপাতের প্রতিকার করিবার উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া বলিয়াছেন যে, জেলা-বোর্ডগুলির রাস্তায় ও রেলপথের বাঁধে কয়েক শত গজ অন্তর একটি করিয়া সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রত্যেক রাস্তার অবস্থা বিবেচনা করিয়া সাঁকো নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালায় ধানের জন্য বৃষ্টির জলের বিশেষ প্রয়োজন। সেই জল রাখিবার জন্য সাঁকোগুলি জমির সহিত সমতল না করিয়া জমি হইতে কমবেশী এক ফুট উচ্চ করিয়া উহার তলদেশ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহা হইলে ধানের জন্য আবশ্যক জল থাকিবে এবং অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাবে। তাঁহার এই কথাও সকলের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ডাক্তার বেণ্ট্‌লি খরচের টাকা সংগ্রহ করিবার একটা উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশের দরিদ্র কৃষকরা রাস্তা-নির্ম্মাণের খরচ জোগায়। তাহারা রোডসেস্ দিয়া থাকে, কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজনরা ঐ বাবদ কোন টাকা দেয় না, অথচ পল্লীগ্রামের রাস্তার দ্বারা তাহারাই অধিক উপকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের নিকট সাঁকো প্রভৃতি নির্ম্মাণের টাকা আদায় করিতে হইবে। গরুর গাড়ী ও অন্যান্য যানের উপর টোল ট্যাক্স্ বসাইলে প্রকারান্তরে মহাজন ও ব্যবসাদারদিগের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করা হইবে। সেই টাকা হইতে জেলা-বোর্ডের রাস্তাগুলির সাঁকো নির্ম্মিত হইবে। অবশ্য রেলওয়ের সাঁকো রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারাই নির্ম্মিত হইবে। এদেশের রেলওয়ের লাভ নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু পথে পথে টোল ট্যাক্স্ বসাইলে জিনিষের মূল্য কিছু বাড়িবে। কিন্তু উপায় কি? যে দুর্দ্দৈবের পরিণাম-ফল ধ্বংস, তাহার ত প্রতিকার করিতেই হইবে। সেইজন্য আমরা ডাক্তার বেণ্ট্‌লির নির্দ্দিষ্ট উপায়ের কতকটা সমর্থন করি। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় থাকিলে তাহা অবলম্বন করা যাইতে পারে। আশা করি, লর্ড
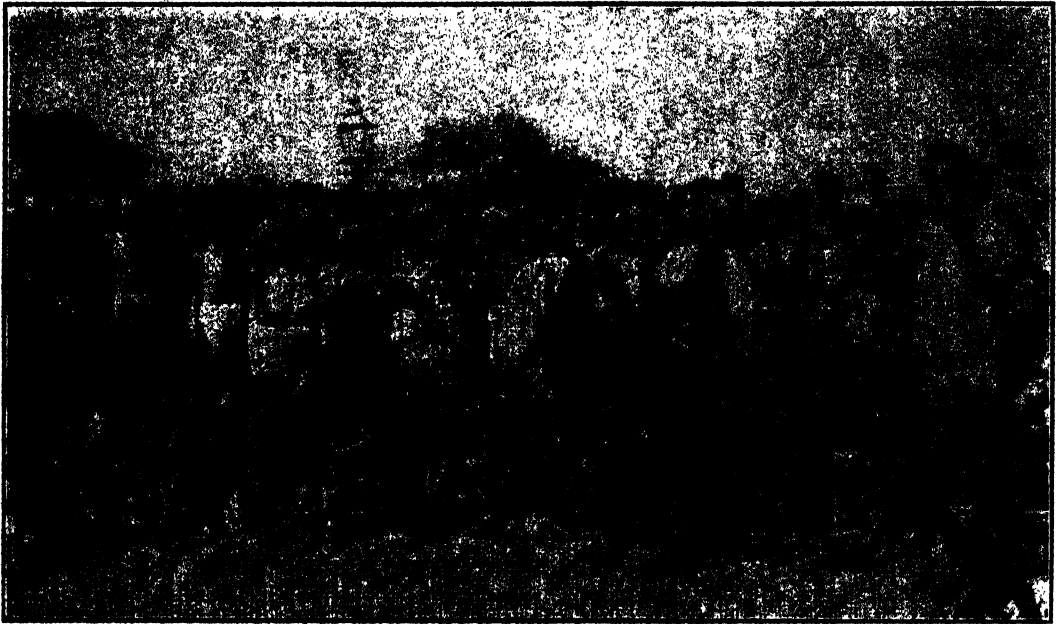
নসরতপুরের বন্যাপীড়িত সাহায্যপ্রার্থী অধিবাসীগণ

বগুড়া জেলার কুসুম্বি গ্রামে বন্যার প্রলয়-কাণ্ড

লিটন্ এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবেন। এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

—নবযুগ

চর্‌কার কথা—

রাণীর চরকা কাটা। —ময়মনসিংহ-রামগোপালপুরের রাণী গত ৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স
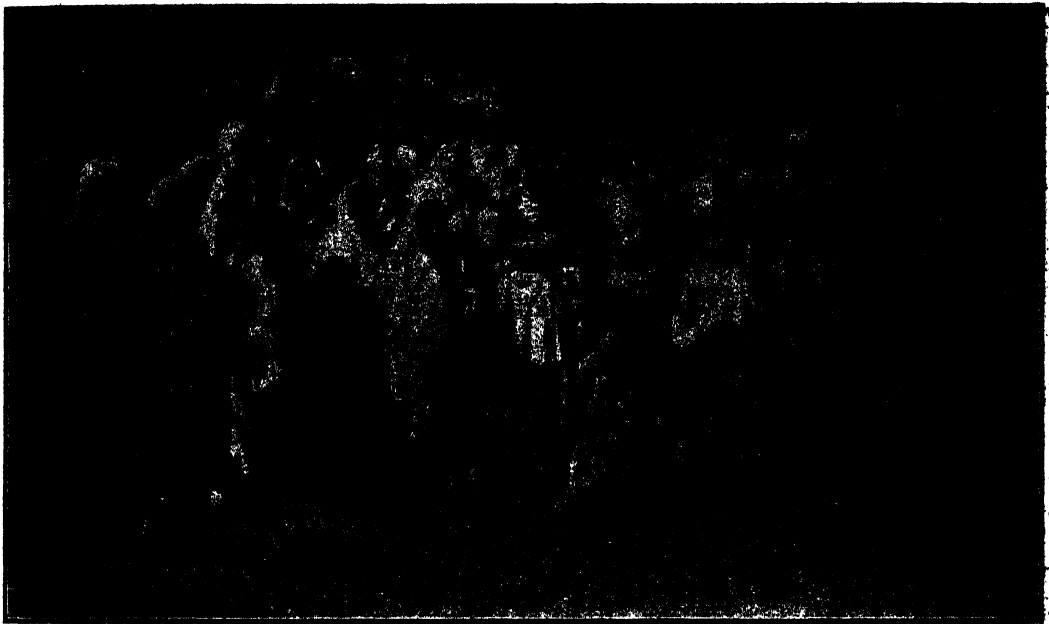
বগুড়ার চৈতনগাঁয়ের বন্যাপীড়িত সাহায্যপ্রার্থী অধিবাসীগণ

বগুড়ার :৫র্মেন গ্রামের বন্যাক্লিষ্ট লোকদের পুকুরপাড়ে অস্থায়ী বাসস্থান

হইয়াছিল ৭৩ বৎসর। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও চরকায় সূতা কাটিতেন। মৃত্যুর প্রাক্কালেও তিনি চরকার সূতা কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

—হিন্দুস্থান

শিক্ষা-প্রসঙ্গ—

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অন্তরায়।—সমগ্র বঙ্গে ১২,০০০টি প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় আছে। এই-সকল বিদ্যালয়ে ১৯২১ সনের ৩১শে

মাড়বারী রিলিফ্ কমিটির ভগবানদাস আগরওয়াল বন্যাক্লিষ্টদের অন্ন ও বস্ত্র দিতেছেন

আদমদিঘীর পশ্চিম দিকে বন্যায় একমাইল ভগ্ন রেলপথ
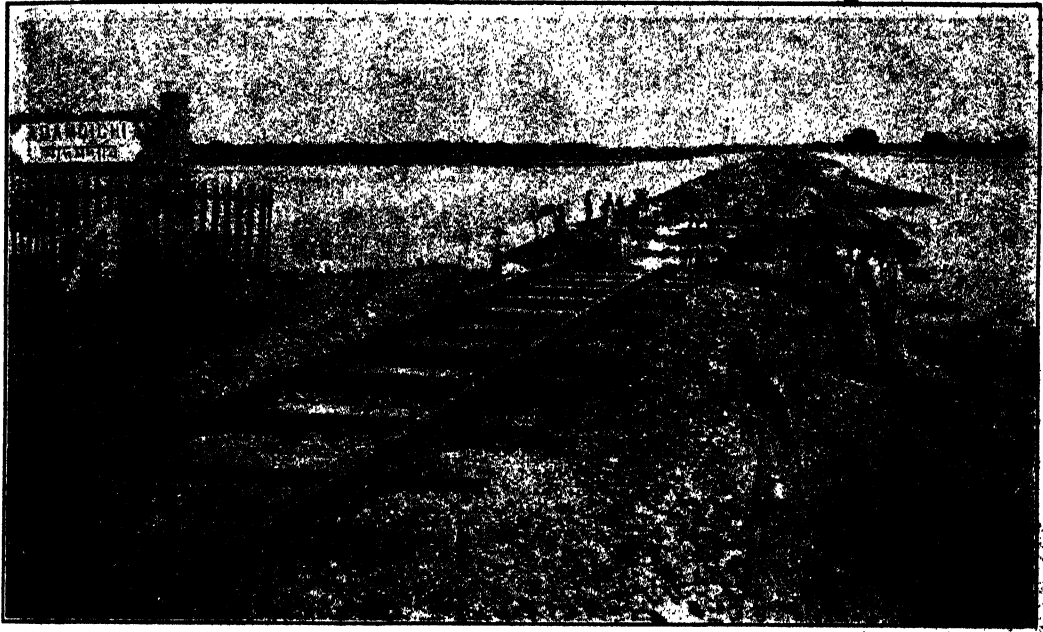
বগুড়া-সান্তাহার লাইনে আদমদীঘি ও নসরতপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বন্যায় ভগ্ন রেলপথ
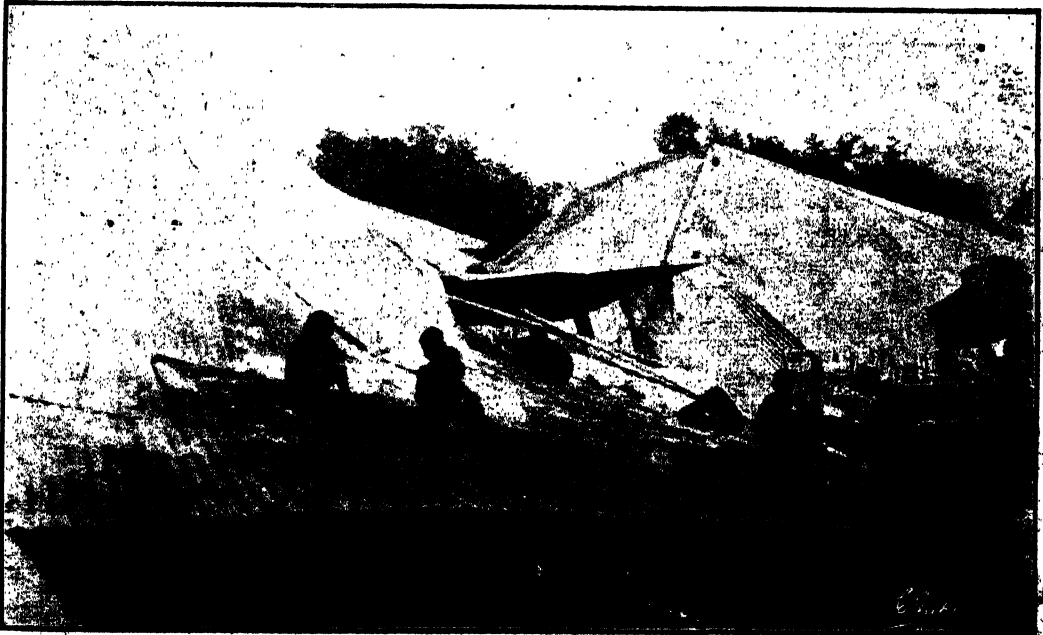
নসরতপুরের এক ব্রাহ্মণ জমিদারের ভগ্ন গৃহ

মাচ্চ ২৭৪২২টি বালিকা অধ্যয়ন করিত, তন্মধ্যে ১১৪২৯৩টি হিন্দু ও ১৫৫৯৫৪টি মুসলমান। বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনে ব্যয় হইয়াছে ৭৮৩১২৪ টাকা। বঙ্গে মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য ৩টি আর্ট্ কলেজ, ১টি টে্নিং কলেজ, ১৩টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ৫৮টি মধ্য-বিদ্যালয় আছে। মহিলাদের বি-টি ও এল-টি পরীক্ষার প্রস্তুত করিবার জন্য কেবলমাত্র একটি কলেজ আছে, কিন্তু মধ্য-শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার কোন টে্নিং কলেজ নাই। এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াও অর্থাভাবে কার্য্যে

বগুড়ার চৈতনগাঁয়ে বন্যার ধ্বংস-লীলা

সান্তাহার রেলষ্টেশনে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি কর্তৃক বন্যাক্লিষ্টদের অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ

পরিণত হইতেছে না। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, শিক্ষয়িত্রীর অভাবেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে না। পুরুষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে-সকল বালিকাবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে তাহা সমাজের নিকট সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত, আর জেলাবোর্ডও এই-সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অতি সামান্য সাহায্য দান করিয়া থাকেন। অনেক গ্রামে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বালিকার সংখ্যা বেশ আছে, শিক্ষায় তাহাদের আগ্রহও দেখা যায়,

বগুড়া তালসন্ গ্রামে বন্যার লীলা

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির মেডিক্যাল ক্যাম্প

সান্তাহারে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি

কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর অভাবে সেই-সকল স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতেছে না। সুতরাং শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা যে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের এক প্রধান উপায় একথা বলাই বাহুল্য।

—সম্মিলনী

গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে খিদিরপুরস্থ যুবকবৃন্দের উদ্যোগে একটি অবৈতনিক নৈশবিদ্যালয় চলিয়া আসিতেছে। এই বিদ্যালয়টি গবর্ণমেণ্ট্ বা মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে পরিচালিত নহে। ইহাতে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিনা বেতনে সন্ধ্যা হইতে অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে প্রথমভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া Matriculation standard পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে-কোন বয়সের ছাত্র ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। ছাত্রদিগের অবস্থা-বিশেষে পুস্তকাদি বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। কয়েকজন স্বার্থত্যাগী স্বদেশবৎসল যুবক অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য নিয়মিতভাবে করিতেছেন।

১৬ নং মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট
খিদিরপুর

শ্রী শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
অবৈতনিক সম্পাদক

কৃষি-কলেজ।—দিঘাপতিয়ার পরলোকগত দানশীল কুমার বাহাদুর রাজসাহী কলেজের সংস্রবে কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠার্থে আড়াই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। তিনি এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, এই কৃষি-কলেজের কোন উপযুক্ত ছাত্র যদি এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পুষা বা অন্য কোন কলেজে অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী হয়, তবে তিন বৎসর কাল মাসিক ৩০্ টাকা হিসাবে তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

—সম্মিলনী

অনুকরণীয় দৃঢ়তা—

বিলাতি নুন ছুঁইব না—জেলের প্রতিজ্ঞা। ফরিদপুর বাজারে এক জেলের নিকট হইতে একটি ভদ্রলোক কাটা মাছ কিনিয়া তাহাতে নুন মাখাইবার জন্য জেলেকে বলেন। জেলে বিলাতি নুন দেখিয়া তাহা কিছুতেই মাছের গায়ে মাখাইতে চাহে না। তখন সেই ভদ্রলোক অগত্যা নিজেই মাছের গায়ে নুন মাখান।

—হিন্দুস্থান

হিন্দু-সমাজের অবনতি—

বাঙ্গালায় অন্ত্যজের সংখ্যা।—দুই কোটী সাড়ে নয় লক্ষ হিন্দুর মধ্যে এক কোটি ২৩ লক্ষ অস্পৃশ্য।

—সনাতন

এগার বৎসরের পুত্রবধূর উপর ভীষণ অত্যাচার।—চেতলার গোপালচন্দ্র রায় ও তাহার স্ত্রী অভিযুক্ত হইয়াছে এই অপরাধে যে, তাহার পুত্রের বিবাহকালে কন্যার পিতা যে বিবাহ-উপহার দিবে বলিয়াছিল তাহা দিতে না পারায়, এই কচি মেয়েটিকে প্রথম দফায়

বেঙ্গল রিলিফ্ কমিটির স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তারগণ

তো গারদ করা হইয়াছে, তারপর পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া হয় না, কখন কখন উপবাসেও রাখা হয়, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী লোহা পুড়াইয়া ছেঁকা দিয়া থাকেন। অবস্থা গুরুতর হইলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এই-সব পাষণ্ডদের শাস্তি এমন গুরুতর দেওয়া হউক, যাহাতে এইরূপ নৃশংসতা করিতে ভবিষ্যতে আর কেহ ভরসা না করে।

—নবসঙ্ঘ

"স্নেহলতার" পুনরভিনয়—

পাবনা ক্ষেতুপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায় মহাশয়ের একটি ষোড়শ বর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা গত অষ্টমী পূজার দিন নাইট্রিক এসিড সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। বালিকার পিতা বহু চেষ্টা করিয়াও কন্যাটির বিবাহ দিতে পারেন নাই। এইরূপ পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও অভাবই বালিকার মন বিচলিত করিয়া তাহার এই শোচনীয় অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। হৃদয়হীন সমাজ! এই নিদারুণ দৃশ্য এখনও নীরবে দেখিতেছে!

—স্বরাজ

ধর্ম্মের নামে পাশবিকতা —

খড়্গপুরে নরবলি। চন্দননগরের ডাক্তার শীতলপ্রসাদ ঘোষের পৌত্র কিছুদিন পূর্ব্বে খড়্গপুরে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে যায়। একদিন রাস্তায় বেড়াইবার সময় একজন যোগীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। উক্ত যোগী তাহাকে ভুলাইয়া একটি জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যায়। সেখানে তাহাকে একটি মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অজ্ঞান করিয়া রাখে। তিন চারি দিন পরে জ্ঞানলাভ করিয়া বালকটি দেখে যে, যেখানে তাহাকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার চতুষ্পার্শ্ব নরকঙ্কালে ভর্ত্তি। বালকটি বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে বলি দিবার উদ্দেশ্যেই যোগী লইয়া গিয়াছে। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কয়দিন না খাওয়ার জন্য তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকায় কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। বালকটি তখন তথায় উপস্থিত জনৈক সাঁওতাল-শিকারীর পদতলে পড়িয়া প্রাণভিক্ষা করে। সাঁওতাল-শিকারীটি বলপূর্ব্বক বালকটিকে কাপালিকের কবল হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দেয়। বালকটি বাটীতে আসিয়া বলিয়াছে যে, কাপালিকের ওখানে আরও একটি বালক আবদ্ধ হইয়া আছে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া সমগ্র জঙ্গলটি ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এখনও কাপালিককে ধরিতে পারে নাই।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী

শোক-সংবাদ—

এবার শারদীয় অবকাশে আমরা তিনজন সাহিত্যিককে হারিয়েছি। "স্পর্শমণি" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিকা ইন্দিরা দেবী গত বিজয়া দশমীতে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ইনি ৺ ভূদেব-বাবুর পৌত্রী, ৺ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা।
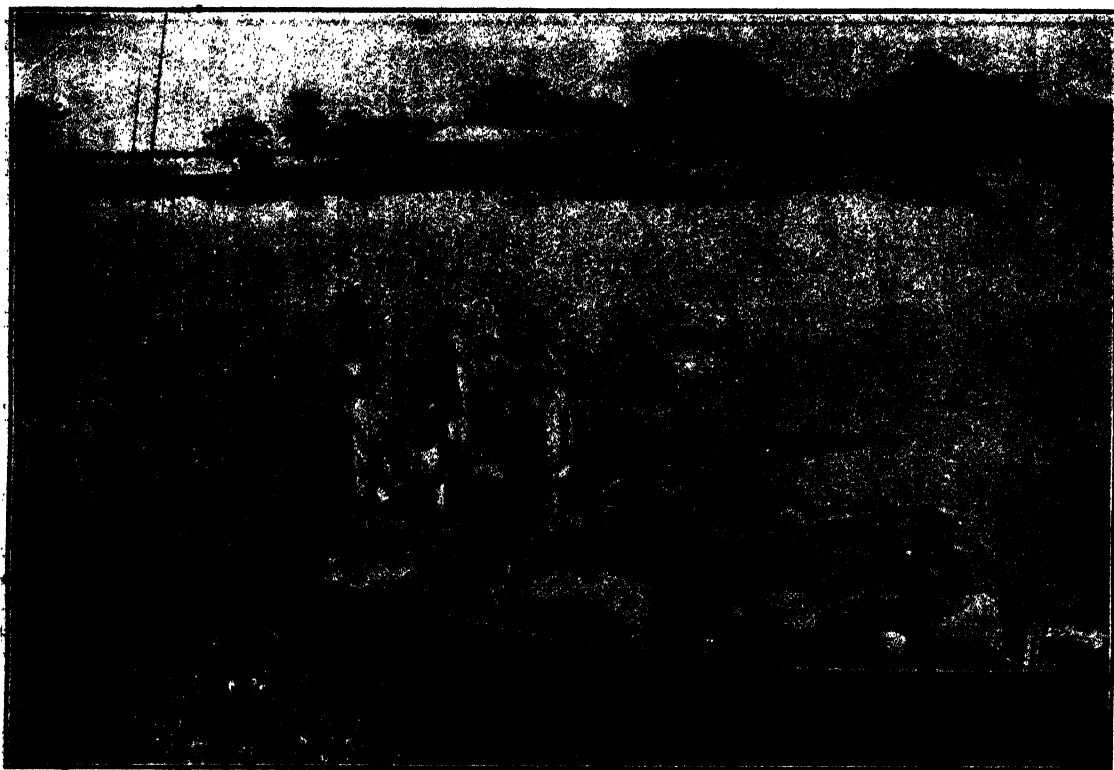
মাড়বারী সেবকগণ বন্যাপীড়িত স্থানে যাইতেছেন

বন্যাক্লিষ্টদের জন্ত খাদ্য- ও বস্ত্রবাহী মোটর-লরী—লরীর উপরে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যখানে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কলিকাতা সায়ান্স্‌ কলেজে বন্যাক্লিষ্টদের জন্য সংগৃহীত কাপড়ের বস্তা

বন্যায় মৃত পশুগণকে কবর দিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবী

[বন্যার ফটোগ্রাফগুলি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক গৃহীত। এবং সায়ান্স্‌ কলেজের ফটোগ্রাফ্‌ দুইখানি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।]

বাংলার উপন্যাসিকদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় সকলেরই সুপরিচিত লেখক ছিলেন। তাঁকেও আমরা এই অবকাশ-মুহূর্ত্তেই হারিয়েছি। তাঁর অকাল-বিয়োগ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

আর-একজন প্রবীণ সাহিত্যিক, "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত সোমবারে বহরমপুরে ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

আমরা এই পরলোকগত সাহিত্যিকগণের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

—বিজলী

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে মধুপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে বয়সে তিনি মারা গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে খুব আকাঙ্ক্ষণীয়। কাজেই সে সম্বন্ধে শোক করা যায় না। তবে ডাঃ মজুমদারের মত চিকিৎসক ও সহৃদয় ব্যক্তি আজকাল বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল, এইজন্যই তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে হয়। প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

—শঙ্খ

বিগত ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ববঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন নবাব স্যার সামসুল হুদা ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ত্রিপুরা জেলার গোকর্ণ গ্রামে। নবাব সাহেব আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্প কাল মধ্যেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে তিনি বাঙ্গালার গভর্ণরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য নিযুক্ত হন এবং পাঁচ বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এই গুরুকার্য্য বহন করিয়া অবশেষে হাইকোর্টের বিচারক-পদ প্রাপ্ত হন। সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ এই কার্য্যভার তিনি অধিককাল বহন করিতে পারিলেন না।

—ময়মনসিংহ-সমাচার

পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ২৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একজন দেশসেবী ছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবারের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

—ময়মনসিংহ-সমাচার

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বাঙ্গালীর গৌরব, মহাবীর ভীম ভবানী আর ইহজগতে নাই। গত বৃহস্পতিবার বেলা ২।৫ মিনিটের সময় তিনি মাত্র ৩১ বৎসর ৮ মাস বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বন্যাপ্রপীড়িতগণের দুঃখ-বিমোচনার্থে ভীম ভবানীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি গতপূর্ব্ব শনিবার দিন বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ডের জন্য আগাসীর সার্কাসে গড়াই নামক স্থানে তাঁহার শেষ কীর্ত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহার আত্মত্যাগের কথা কখন ভুলিতে পারিবে না। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ বারনার্ডো তাঁহার হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আজ ডাক্তারের হৃদপরীক্ষার যন্ত্রও বিফল হইল—তাঁহার বুকে প্রায় চারি ইঞ্চি চর্ব্বি জমিয়া গিয়াছিল। হৃদপিণ্ডের প্রক্রিয়া কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। মৃত্যুর পর আটজন বলিষ্ঠ লোক তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল। এই মহাবীরের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত অসংখ্য লোক শবের অনুগমন করিয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও ভ্রাতাগণকে আমরা সমবেদনা জানাইতেছি।

— ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

পাবনার একটি আদর্শ হিন্দু মহিলা আমাদিগকে শোকাকুল করিয়া অকালে চলিয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ মজুমদার উকীল মহাশয়ের পত্নী রামরঙ্গিনী দেবীর চরিত্রে নিষ্ঠা, একাগ্রতা সংকল্প-দৃঢ়তা স্বাবলম্বনপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণ ছিল। ১৪ বৎসর পূর্ব্বেই তিনি চরকা ও তাঁত গ্রহণ করিয়া নিজেকে স্বাধীনা ও স্বাবলম্বিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইদানিং তাঁহার বাড়ীতে দুইখানি তাঁত এবং কয়েকখানা চরকার কার্য্য চলিতেছিল। তিনি নিজহাতে সুতা কাটিয়া তাঁতে উৎকৃষ্ট খদ্দর প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার আদর্শে অনেক মহিলা চরকার কার্য্য করিতেছেন।

—স্বরাজ

দেশ-সেবা—

সমস্যা অন্নের। অন্নাভাবে জাতির প্রাণশক্তি কমে' যাচ্ছে। ফলে মহামারীর আবির্ভাব। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রামে বার হাজার নরনারীর বাস ছিল, দশবৎসর পরে আদমসুমারীতে দেখা যায়, সে গ্রামে আট হাজার লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল; এবারের লোক-গণনার ফল দেখে আঁতকে উঠতে হয়, সেই গ্রামে এখন দুই হাজার নরনারীর বাস! কথাটা বাড়িয়ে বলা হয় নি, একেবারে খাঁটি সত্য কথা।

গ্রামবাসী তাড়ি খেয়ে যখন মাতলামী করে, তখন মনে হয়, লোকগুলির মতিচ্ছন্ন ধরেছে, নিজের পায়ে কুড়ল মেরে মরছে। কিন্তু তারা প্রকৃতিস্থ হলে জিজ্ঞাসা কর যদি, কেন তারা তাড়ি খায়, তার উত্তরে যা শুনবে, তাতে তোমার চোখ ফেটে অশ্রু উথলে পড়বে। তাদের মুখের কথাই বলছি। একজনকে এই-রূপ জিজ্ঞাসা করায়—সে উত্তর দিলে, বাবু, সাধে কি তাড়ি খাই, এক টাকায় ছটা ক'রে জন দিতে হয়, যা রোজগার করি, এক বেলাই পেট ভরে' খেতে পাই না। চার পয়সার এক ডাবরি তাড়ি খেলে মালুম পাই পেটে কিছু পড়েছে, পেটটা কিছুক্ষণ ভারী হ'য়ে থাকে, গায়েও বল পাই; পেট ভ'রে খাওয়ার ব্যবস্থা করুন, তাড়ি খাব কেন বাবু?

উঃ, এর চেয়েও মর্ম্মঘাতী কথা আর কি আছে? সারাদিন পরিশ্রমের পর, মরণ-যন্ত্রণা এড়াবার এই সাময়িক তৃপ্তিটুকু কেড়ে নেবার আমাদের কি অধিকার আছে, যদি এই আরামটুকুর পরি-বর্ত্তে আমরা তাদের উদর-পূরণের ব্যবস্থা করতে না পারি। দলনে মর্দ্দনে অশ্বের শ্রী ফিরে না, পেট ভ'রে তাকে খেতে দিতে হয়। সহরের বাবুরা, অবনত জাতির উদ্ধার-কল্পে ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে, নৈশ-বিদ্যা-লয় স্থাপনের আয়োজন করছেন, কিন্তু তার আগে তারা কি খেয়ে তত্ত্বকথা শুনতে আসবে তার আয়োজন করতে হবে। পেটে খেতে পেলে, গাঁয়ের পুকুরগুলি তাদের পরিশ্রমের জোরেই সাফ থাকবে, বন-জঙ্গলে গ্রামখানি মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আঁধার-মূর্ত্তি ধ'রে মৃত্যুর বিভী-ষিকা দেখাবে না। জাতির জীবনী-শক্তি বাড়লেই আপনা থেকেই দেশের শ্রী ফিরবে। কিন্তু সে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করার মত শক্ত মেরু-দণ্ড আমরা হারিয়েছি, দুদিন গ্রামে বাস করলেই আমরা হয় ম্যালে-রিয়ায়, নয় আমাশয় রোগে কাবু হ'য়ে পড়ছি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে জাতির জীবন ফিরে আনার কঠোর তপস্যায় কোন্ মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ আত্মনিয়োগ করবেন, তা কে জানে?

—নবসঙ্ঘ

সৎকর্ম্ম—

সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রকাশ যে, মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় মুর্শিদাবাদ ডেভেলাপ নামক এক আমেরিকান্ কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ পাওয়েল, দাঁতন হইতে গোপীবল্লভপুর এবং নবীগ্রাম হইতে পলাশমুণ্ডি পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের প্রায় ৭০ মাইল ব্যাপী একটি রাস্তার সংস্কার করিবার জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ দানই ত চাই। দাতা শতং জীবতু।

—যশোহর

"নারীশক্তি"—

আমরা 'নারীশক্তি' নামক একখানা নূতন মাসিক পত্র সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ইহার সম্পাদক ডাঃ লুৎফর রহমান সাহেব। নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনকল্পেই ইহার প্রচার। ডাক্তার সাহেব বহুদিন যাবত নারী-শক্তি উদ্বোধনের জন্য বহু চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার এই সুচেষ্টাকে বহুদূর-প্রসারিণী করিবার জন্য তিনি এই 'নারী-শক্তি' প্রকাশ করিতেছেন। আমরা খোদার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তাঁহার এই সৎচেষ্টা সার্থক হউক, সফল হউক।

—মোস্‌লেম-জগৎ

মাধবী—

মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষৎ শাখা হইতে মাধবী নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে।

—মেদিনীপুর-হিতৈষী

সেবক

ভারতবর্ষ

সিমলায় বাঙালী-বালিকা-বিদ্যালয়—

১৯০৫ সালে সিমলায় একটি অবৈতনিক বাঙালী-বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গত অক্টোবর মাসের ১লা তারিখে অধ্যাপক কে এন মিত্রের সভাপতিত্বে এই বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এ বৎসরে বিদ্যালয়টিতে ২২ জন ছাত্রী ও ৯ জন ছাত্র ছিল; অবৈতনিক শিক্ষক (একজন সঙ্গীত-শিক্ষক লইয়া) ৪জন ছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত এবং সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে বিকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত। রাত্রিতে বসিবার কারণ—এখানকার শিক্ষকরা সকলেই গভর্ণমেন্টের চাকুরে। এত অল্প সময় শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের উন্নতির অনেক লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ইহা সুখের কথা।

গুরুকাবাগের কথা—

পঞ্জাবের গুরুকাবাগ হাঙ্গামার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। দিনের পর দিন অকালীরা গুরুকাবাগে প্রবেশের চেষ্টায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইতেছেন। অত্যাচার, কারাদণ্ড কিছুই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। বরং অত্যাচার যত বাড়িতেছে, পণ তাঁহাদের ততই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। এ পর্য্যন্ত পাঁচ হাজারের বেশী অকালী পুলিশের হাতে বন্দী হইয়াছেন। এখনও প্রত্যহ প্রায় এক শত জন করিয়া অকালী এই অভিযানে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতেছেন।

শিখদের ভিতর নানা সম্প্রদায় আছে। এতদিন এ আন্দোলন বিশেষভাবে অকালীদের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহাদের সহিত অন্যান্য শিখ সম্প্রদায়ও যোগদান করিতেছে। এ আন্দোলন এখন সমগ্র শিখ জাতির আন্দোলন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। গুরুকাবাগে গিয়া পুলিশের হাতে বন্দী হইবার জন্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভিতরেও তাগিদ পড়িয়া গিয়াছে। 'অকালীন তু পরদেশী' নামক শিখদের একখানি দৈনিক সংবাদপত্র খাল্‌সা কলেজের ছাত্রগণকে গুরু-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। পেন্সন্-প্রাপ্ত অকালী সৈন্যগণও আসিয়া এই-সব তেজস্বী ধর্ম্মবিশ্বাসী অকালীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। যাহারা যুদ্ধে মানুষের রক্তে দুনিয়ার বুকটা লাল করিয়া তুলিবার ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই আজ অহিংস সংগ্রামে নিজেদের রক্ত দিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। যে আন্দোলন এমন ভাবে একটা গোটা জাতির মনের ভাব বদ্‌লাইয়া দেয়, পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় জুড়িয়া দিবার অধিকার যে তাহার আছে একথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

অকালীরা যে কেবলমাত্র পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত ও গ্রেপ্তারই হইতেছেন তাহা নহে, তাঁহারা কঠোর কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হইতেছেন। বিচারক অনেকের আড়াই বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ২৬জন বৃদ্ধের প্রতিও ছয়মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বাদবাকী সকলকে দুই বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং একশত টাকা হিসাবে জরিমানার কড়িও গণিতে হইবে।

শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি সংবাদ দিয়াছেন প্রায় ৫০০ আসামীকে স্পেশাল ট্রেনে করিয়া গত ১৯ অকটোবর সীমান্ত-প্রদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে। পঞ্জাব-গভর্মেণ্ট্ শিখ ধর্ম্মমন্দির-সম্পর্কে যে নূতন গুরুদ্বার বিল পেশ করিয়াছেন গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-কমিটি পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে উহার প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শিখদের প্রায় সকল নেতাই এখন কারাগারে। তাঁহাদের মত না লইয়া ধর্ম্মসম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভাতেও একটা মিট-মাটের চেষ্টা চলিতেছে। গত পয়লা নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় সর্দ্দার দশমেধ সিং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপাপন করিয়াছেন—

(ক) গুরুকাবাগ অশান্তি সম্পর্কে আর যেন কাহাকেও গ্রেপ্তার করা না হয়।

(খ) গুরুদ্বার-শিরোমণি-প্রবন্ধক কমিটি ও মহন্তের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছে তাহা আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য ৫জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক।

(গ) গুরু-কা-বাগ অশান্তি সম্পর্কে যাঁহারা গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে গোলযোগ নিষ্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

প্রস্তাবটির (ক) এবং (গ) অংশ পরিত্যক্ত হইয়া কেবলমাত্র (খ) অংশটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবস্থাপক সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে।

মারা সহজ, মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দেওয়া কঠিন নহে। আমরা সব সময় না পারিলেও অন্ততঃ দুনিয়ার ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত ত যথেষ্টই মেলে। কিন্তু এমন ভাবে একটা সত্যের জন্য দিনের পর দিন, দলের পর দল, মার খাইয়া, মার ফিরাইয়া না দিয়া, প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজিলে হয়তো আর একটিও মিলিবে না। গুরুকাবাগ হাঙ্গামা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন, "পঞ্জাবে স্বরাজ আগমনের পূর্ব্বাভাস আজ আমার চোখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একবার অকালী আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মনে রাখিবেন, এই-সব লোক যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছে না। ইহাই চাই। যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে। স্বরাজ-সংগ্রাম সত্যেরই সংগ্রাম। অকালীদের আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত আমার

মনে স্বরাজ-সংগ্রামের জন্য অধিকতর উৎসাহ সঞ্চারিত করিতেছে। যে-সব অকালী আজ কারাগারে আছেন, তাঁহাদের জন্য আমরা সকলেই গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—

গুরু-কা-বাগের হাঙ্গামা সম্পর্কে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একবৎসর চারি মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

তাঁহার প্রথম অপরাধ—গত ১০ সেপ্টেম্বর তিনি অকালতক্তে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাঁহার দ্বিতীয় অপরাধ—গুরুকা-বাগে জনতা করা।

বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"অকালীদের এ ব্যাপার কেবল শিখ সম্প্রদায়ের ব্যাপার নহে। ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের ব্যাপার। তোমরা তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছ। এবং তোমরা যে তপস্যা করিতেছ এ সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমান কাহারো মতদ্বৈধ নাই। ভগবান তোমাদিগকে এই সাধনার জন্য পুরস্কৃত করিবেন। আমি শিরোমণি গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-সমিতির নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। তাঁহারা অনুমতি দিলেই আমি তার করিব। সে তার পাওয়া মাত্র অনেক হিন্দু-মুসলমান তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইবে। তোমরা অহিংসায় অবিচলিত থাকিও। আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি এই ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাদের জয়লাভ হইবে।"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ত্যাগী, তেজস্বী সন্ন্যাসী। সত্যের জন্য তিনি যে নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারেন, দিল্লিতে রাইফেলের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া তাহার পরিচয় একবার প্রদান করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও তিনি যাহা সত্য তাহারই সমর্থন করিয়াছেন—অকালীর প্রতি প্রকাশ্যভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অকালীদের প্রতি সহানুভূতিতে আজ ভারতের প্রায় পনেরো আনা লোকের মন ভরিয়া গিয়াছে, ভাষাতেও তাহারা সে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কসুর করিতেছে না। শ্রদ্ধানন্দকে যদি এইজন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হয় তবে ভারতের এই পনেরো আনা লোককেও বাদ দেওয়া চলে না।

সারনাথে বৌদ্ধবিহার—

সারনাথ বৌদ্ধইতিহাসের অতি বিখ্যাত স্থান। এইখানেই বুদ্ধদেব তাঁহার প্রথম উপদেশ বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন। সারনাথের ভগ্নস্তূপের ভিতর সেদিনও বৌদ্ধইতিহাসের এমন অনেক উপাদান পাওয়া গিয়াছে যাহার সাহায্যে বৌদ্ধযুগের অনেক অনাবিষ্কৃত জিনিষের উপর ঐতিহাসিকেরা নূতন আলোক নিক্ষেপ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন। মহাবোধি সমিতির চেষ্টায় এই সারনাথে সম্প্রতি একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য হনলুলুর মিসেস্ মেরি ফষ্টার নাম্নী জনৈক ইউরোপীয় মহিলা ২০০০০৲ টাকা দিয়াছেন। মহাবোধি সমিতি দিয়াছেন ৩০০০০৲ টাকা। এই স্থানে একটি চৈত্যে বুদ্ধদেবের দেহভস্ম রক্ষিত হইবে। এইরূপে এস্থানটি একটি বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিহার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মহাবোধি সমিতি একটি কলেজ প্রতিষ্ঠারও সংকল্প করিয়াছেন। এই কলেজে মনোবিজ্ঞান ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে-সব বৌদ্ধগ্রন্থ এদেশে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা চীন জাপান তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতে আনাইবার চেষ্টা চলিবে। এই বৃহৎ ব্যাপারে তিন লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সারনাথ কেবল বৌদ্ধদেরই গর্ব্বের বিষয় নহে, ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই গৌরবের জিনিষ। অতীত গৌরবের জিনিষগুলি চোখের উপর থাকিলে তাহা জাতিকেই বড় হইয়া উঠিতে সাহায্য করে। সুতরাং এই ব্যাপারটাতে ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়েরই মুক্ত হস্তে সাহায্য করা উচিত।

যুক্ত-প্রদেশের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স—

সম্প্রতি দেরাদুনে যুক্ত-প্রদেশের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠাকুর চন্দন সিং এবং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু। ঠাকুর চন্দন সিং স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের ভিতরের গলদগুলি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কোনোরূপ সঙ্কোচ না করিয়াই বলিয়াছেন, যে-ভিত্তির উপর হিন্দুমুসলমানের মিলনকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল। মুসলমানেরা যদি দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে আরো অবহিত না হন, স্বরাজ আন্দোলনে যদি তাঁহারা সমস্ত প্রাণ লইয়া যোগ না দেন, এবং আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহারা যেমন সচেতন, জাতীয় কংগ্রেসের কাজে তাঁহাদের চেতনা যদি সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া না উঠে তবে দুর্দ্দিনের এইখানেই শেষ হইবে না—ইহা অপেক্ষাও দুর্দ্দিন দেশের ভবিষ্যৎ আকাশকে ম্লান করিয়া তুলিবে। কেবলমাত্র মুসলমানদের সম্পর্কেই তাঁহার মন্তব্য তীব্র নহে। হিন্দুদের সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আরো তিক্ত আরো কঠোর। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুরা এক পাল মেষের মত হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ের লাঠি উঁচাইয়া যে খুসী তাহাদিগকে যে-সে পথে পরিচালিত করিতেছে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তা বজায় রাখিয়া কাজ করিবার শক্তি তাহাদের ভিতর একেবারেই নাই। তাহাদের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আগা-গোড়া সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মিলনকে এমন দৃঢ় করিয়া গড়িয়া তোলা দরকার, তাহাদের কর্ম্মশক্তিকে এমন একটা নূতন জীবন দেওয়া আবশ্যক যাহার শক্তি বন্ধু এবং শত্রু উভয়েরই প্রশংসার বিষয় হইয়া পড়ে।

ঠাকুর চন্দন সিং যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য খুব শ্রুতি-মধুর কথা নহে। কিন্তু সেগুলি যে সত্য কথা তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এবং তাহা লইয়া ভাবিবারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু বলিয়াছেন, কংগ্রেসের বয়কট ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে তিনি কোনো মত প্রকাশ করিবেন না। তবে কংগ্রেসের সে-গুলি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা সঙ্গত এবং তাঁহারা পুনর্বিচার করিবেন ও রোগ-নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধির পরিবর্ত্তন অনেক সময় অপরিহার্য্য হইয়াই পড়ে। কংগ্রেস তিন প্রকারের বয়কট দিয়া কাজ সুরু করিয়াছিলেন। এখন অন্য প্রকারের পথও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আবেদনপ্রিয় সদস্যদের প্রস্তাবের বলে মুক্তি লাভ করাটা বিশেষভাবেই ঘৃণাজনক। অপমানকর আপোষের ফলে জহরলাল বা মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি লাভ অপেক্ষা তাঁহাদের জেলে পচাই ভালো।

বিবাহ-উৎসব ফাণ্ড—

যে-সকল ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধে হত অথবা চিরকালের জন্য বিকলাঙ্গ হইয়াছে তাহাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য লেডি চেম্‌স্‌ফোর্ডের দ্বারা এই ফাণ্ডটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহার নেত্রী হইয়াছেন কাউন্টেস্ অব্ রেডিং। এই ফাণ্ডে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশের এবং নানা সম্প্রদায়ের মহিলারা সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর পঞ্চবিংশতিতম বিবাহ

উৎসব উপলক্ষ্যে চাঁদা দিয়া এই ফাণ্ডটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। ভারত-গবর্ণমেণ্ট মৃত অথবা অকর্ম্মণ্য সৈনিকদের অসহায় সন্তান-সন্ততির প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই ফাণ্ডের সংগৃহীত অর্থের দ্বারা তাহাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হইবে। নিম্নলিখিত ভাবে এই ফাণ্ড্ হইতে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

(১) কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে দুই বৎসর পাঠের জন্য ;

(২) কোনো আর্ট কলেজে চারি বৎসর পাঠের জন্য ;

(৩) কৃষি-কলেজে, শিল্প-বিদ্যালয় বা কলেজে, সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে, মেডিক্যাল কলেজে বা নারী মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার জন্য ;

(৪) অন্য কোন প্রকার উচ্চ শিক্ষার জন্য। ব্রিটিশভারতের ন্যায় সামন্ত রাজ্যগুলির বালকবালিকারাও এখান হইতে বৃত্তি পাইতে পারিবে।

জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা—

সমগ্র ভারতে এ পর্য্যন্ত কতটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহাতে কতগুলি ছাত্র জাতীয় শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহার একটা হিসাব নিকাশ পত্তাইয়া দিলাম।—

স্থান	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা
বাংলা	১১৬	১০,২৬৬
বোম্বাই	২২৫	১৪,৮০৮
মাদ্রাজ	৯২	৫,০৭২
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৭৪	১৫,৮৭১
যুক্ত-প্রদেশ	১৭১	৮,৪৭৬
মধ্য-প্রদেশ	৮৬	৬,৩৩৮
বর্ম্মা	৭০	১৪,৫৫৮
আসাম	২৮	১,৫৬১
পঞ্জাব	২১	১,৪১৬
সীমান্ত প্রদেশ	৪	১২০

সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স্ কমিটির রিপোর্ট্—

সমগ্রদেশ জাগ্রতভাবে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কি না তাহাই বিবেচনা করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটির সভাপতি ছিলেন, হাকিম আজ্মল খাঁ এবং সদস্য ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রু, ডাঃ আন্সারি, শ্রীযুক্ত রাজগোপালচারী শ্রীযুক্ত বল্লভভাই ঝাবেরভাই পটেল এবং শ্রীযুক্ত এস কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার। সম্প্রতি এই কমিটির রিপোর্ট্ বাহির হইয়াছে। কমিটিতে ৩৬৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছিল। সদস্যগণ প্রায় ছয় সপ্তাহকাল ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া কংগ্রেসের অন্তর্গত সকল-মতাবলম্বী লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের এই রিপোর্ট তৈরী করিয়াছেন। এই প্রকাণ্ড রিপোর্ট্-খানির মোটামুটি কথাগুলির চুম্বক এখানে দেওয়া গেল।

অসহযোগের ইতিহাস

রিপোর্টের প্রথমেই অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। কমিটি বলিয়াছেন, দেশের লোক অতি ধীর-ভাবে এবং সংযমের সহিত অসহযোগের বিরোধী কার্য্যগুলি সহ্য করিয়াছে। বর্দ্দোলী ও দিল্লীর প্রস্তাবের ও মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ডের পর গবর্ণমেণ্ট্ রুদ্রনীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও দেশ ধীর ও শান্ত ছিল। এজন্য অসহযোগীরা গৌরবের অধিকারী কি না নিরপেক্ষ ইতিহাস-লেখক তাহা বিবেচনা করিবেন।

স্কুলকলেজ বর্জ্জন

অসহযোগের ফলে অনেক ছাত্রই স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অনেকেই আবার স্কুলকলেজে ফিরিয়া গিয়াছে। জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যার অল্পতা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার অসুবিধাই এই প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ—অসহযোগ-নীতি পরিহার করিয়া তাহারা ফিরিয়া যায় নাই।

আদালত বর্জ্জন

যদি ব্যবহারাজীব ও তাঁহাদের মক্কেলদের তরফ হইতে এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করা যায়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে এ ব্যাপারটিতে অসহযোগীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সমগ্র দেশে বারোশ' হইতে পনেরো শ'র ভিতর ব্যবহারাজীব আদালত বর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিশাল ভারতের তুলনায় এ সংখ্যা একান্তই অকিঞ্চিৎকর। তবে ইঁহাদের সকলেই অসহযোগনীতির মূল সত্যটির প্রতি যে আসক্ত তাহাতে ভুল নাই। উকিল হইলেই যে কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারা যাইবে না এরূপ কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। কংগ্রেসের নীতি যে-কেহ স্বীকার করিবেন, তিনিই কংগ্রেসের কার্য্য করিতে পারিবেন। মহাত্মা গান্ধী কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে কোনো কার্য্যে অগ্রণী না হইয়া অদৃশ্যভাবে পিছনে থাকিয়া কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কোনো কোনো প্রদেশে আবার তাঁহাদিগকে কার্য্যের অনুপযুক্ত নির্দ্দেশ করিয়া নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ফলে এই আন্দোলনে কংগ্রেস একটি বিশিষ্ট ও কার্য্যক্ষম সম্প্রদায়ের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

পঞ্চায়েৎ ও স্বদেশী

পঞ্জাব, বাংলা ও বিহারে এই দিক্ দিয়া বেশ কাজ হইতেছে। কমিটি এসম্বন্ধে কয়েকটি সহজ সরল নিয়ম তৈরী করিবার জন্য প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে অনুরোধ করিয়াছেন। স্বদেশী ও খদ্দর সম্পর্কেও বেশ ভাল কাজ হইয়াছে।

তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার

ধর্ষণ-নীতির সমস্ত বাধা সত্ত্বেও তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে নির্দ্ধারিত অর্থ অপেক্ষা ১২,০১,৪০৭ টাকা বেশী আদায় হইয়াছে। কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা সন্তোষজনক নহে। ইহার কারণও ধর্ষণনীতি। স্বেচ্ছাসেবকের ভিতর নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব যথেষ্ট আছে। স্বেচ্ছা-সেবক নিয়োগের সময় সেইজন্য আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অস্পৃশ্যতা

এ সম্বন্ধে লোকের মনোভাব প্রচুর পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত এই ব্যাপারটির সম্বন্ধ নিতান্ত কম নহে। তাহা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে এখন আর দেশের লোকের সহানুভূতির অভাব নাই।

সাম্প্রদায়িক বৈষম্য

কেবলমাত্র দুরভিসন্ধিযুক্ত লোকের কার্য্যের দ্বারাই এই সমস্যাটির উদ্ভব হয়। এই কারণটি দূর হইলে এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে। সিভিল সার্ভিস কেবলমাত্র বৈষম্য বিবাদ ও উপদ্রবের উপরেই নির্ভর করিয়া আছে। স্বরাজ লাভ হইলে এ সমস্যার সমাধান হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

ব্যবস্থাপক সভা

ব্যবস্থাপক সভা বয়কট সম্পর্কে কমিটি একমত হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহারা আধা-আধি ভাগ হইয়া গিয়াছেন।

হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীযুক্ত পটেল মত দিয়াছেন কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষে। তাঁহারা বলেন, পঞ্জাব এবং খিলাফৎ সমস্যার মীমাংসার জন্যই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা দরকার। অসহযোগপন্থীদের লোকই যাহাতে বেশী নির্ব্বাচিত হয়, সেইদিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সভায় কিরূপভাবে কাজ করিতে হইবে ইঁহারা তাহারও পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি এত বেশী অসহযোগী সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন যে তাহাতে 'কোরাম' হওয়ায় বাধা দেওয়া যায়, তবে ইঁহাদের মতে শপথ গ্রহণের পরেই তাঁহাদের সভা ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। অবশ্য পদচ্যুতি নিবারণের জন্য যে-সব ক্ষেত্রে যোগদান অনিবার্য্য তাহা বন্ধ করিলে চলিবে না। কিন্তু যদি সভায় অসহযোগীদের সংখ্যা 'কোরাম' বন্ধ করিবার মত যথেষ্ট না হয় তবে সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে গভর্ণমেণ্টের সকল কাজে এমন কি বজেটে পর্য্যন্ত বাধা দেওয়া। আর যদি খুবই কম-সংখ্যক অসহযোগী নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও প্রথম পথই অবলম্বন করিতে হইবে, অর্থাৎ এককালে সভা ত্যাগ করিয়াই চলিয়া আসিতে হইবে। নূতন কাউন্সিল ১৯২৪ সালের জানুয়ারীর পহেলা তারিখে আরম্ভ হইবে। এইজন্য কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বরের শেষের দিকে না করিয়া ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে করার জন্য ইঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা মনে করেন এই ভাবে সভায় প্রবেশ করিলে, গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে ত বাধা দান করিতে পারা যাইবেই, তাহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টকে পঙ্গুও করিতে পারা যাইবে।

কিন্তু কমিটির বাকী অর্দ্ধেক সভ্য অর্থাৎ ডাঃ আনসারী, শ্রীযুক্ত রাজগোপালচারী এবং শ্রীযুক্ত কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটিতে গৃহীত ৩৬৬ জন সাক্ষীর ৩০২ জনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বলেন যে, আত্ম-সম্মান বজায় রাখার জন্যই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা সঙ্গত নহে। মহাত্মা গান্ধী, আলি ভ্রাতাদ্বয়, লালা লজপত রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কারাদণ্ড ভোগ করার দরুণ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত এই নিয়ম বহাল থাকিবে ততদিন আত্মসম্মানজ্ঞানবিশিষ্ট কোনো অসহযোগীই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। তাহা ছাড়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে সেই দিকেই সকলের নজর পড়িবে। গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতির দিকে আর কাহারো লক্ষ্য থাকিবে না। ফলে কোনো কাজই হইবে না। অন্যদিকে আবার ইহার দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নষ্ট সম্মানেরও উদ্ধার হইবে।

আইন অমান্য

(ক) আপাততঃ জনগত আইন অমান্য আরম্ভ করিবার মত অবস্থা দেশের হয় নাই। কিন্তু কোনো প্রদেশের যদি এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় যে, শীঘ্র জনগত আইন অমান্য করা বিশেষ দরকার, অর্থাৎ কোনো বিশেষ আইন ভঙ্গ বা কোনো বিশেষ ট্যাক্স্ প্রদানের অসম্মতিতে জন-সাধারণ প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নিজেদের দায়িত্বে এইরূপ বিশেষ প্রকার আইন অমান্য করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। অবশ্য নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি এসম্বন্ধে যে সর্ত্ত প্রদান করিবেন, তাহা পূর্ণ করিতে হইবে।

(খ) গত ৪ঠা এবং ৫ই নবেম্বর নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লির অধিবেশনে যে দুই নম্বরের প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে যে-কোনো প্রকার আইন অমান্য করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই প্রস্তাবটির সহিত ২৪শে এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে পরিগৃহীত ১নং প্রস্তাবের ১নং ধারার যে যে অংশের বিরোধ তাহাই বাদ দিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে যে-কোনো প্রকারের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আরম্ভ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। তবে সার্ব্বজনীন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্য অনুমতি এখনও দেওয়া যায় না।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান

গঠনমূলক কার্য্যপ্রণালী সফল করিয়া তুলিবার জন্য অসহযোগী দিগকে লোক্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে প্রবেশ করিতে হইবে। অসহযোগীদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোনো কড়াক্কড় নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা স্থানীয় বা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত এক যোগে কার্য্য করিবেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

সরকারী বিদ্যালয়গুলি বয়কট করিবার জন্য পিকেটিং না করিয়া বার্দ্দোলী সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে অধিক-সংখ্যক ছাত্র সংগ্রহ এবং জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। গবর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে শিক্ষকদিগকে ছাড়াইয়া আনিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করা দরকার।

আইন আদালত

পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা এবং তৎপ্রতি দেশের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করা উচিত। আদালত-গমনকারী উকিলদিগকে কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা চলিবে না।

শ্রমিক সঙ্ঘ

নাগপুর কংগ্রেসে পরিগৃহীত ৮নং প্রস্তাবটিকে অবিলম্বে কাযে পরিণত করিতে হইবে।

ব্যক্তিগতভাবে পক্ষ সমর্থনের অধিকার

ব্যক্তিগতভাবে সকলে আইন-মত নিজের অধিকার রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা কংগ্রেসে কাজ করিবেন বা যেখানে সর্ব্বসাধারণের ভিতর অত্যাচার প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা আছে সেখানে, উহা করা চলিবে না।

ধর্মের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ, স্ত্রীলোকের প্রতি পাশবিক অত্যাচার, বালক বা আর কাহারো উপর অভদ্র অন্যায় ব্যবহার প্রভৃতি হইলে, ব্যক্তিগতভাবে এসব ক্ষেত্রে শক্তি-প্রয়োগ করা চলিবে।

শ্রীযুক্ত পটেল এবিষয়ে কমিটির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে আইনসঙ্গতভাবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার সকল অসহযোগীকেই দেওয়া উচিত। তবে তাহাতে যেন হিংসার ভাব প্রকাশ না পায় এবং নূতন কোনো সর্ত্তের প্রয়োজন না হয়।

ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট

বর্জ্জন-নীতি মানিয়া লওয়া সঙ্গত। এসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া আগামী কংগ্রেসের পূর্ব্বে রিপোর্ট্ পেশ করিবার ভার বিশেষজ্ঞগণের উপর অর্পণ করা দরকার। এই ব্যাপারটিতে রাজগোপালচারী কমিটির অন্যান্য সদস্যের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। এ-সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কমিটির রায়ই চরম ব্যবস্থা ভার কংগ্রেসের উপর। গয়ার কংগ্রেস কোন্ পথ অনুমোদন করেন নহে। সে সমগ্র দেশ তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান—

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে শেট মুলরাজ লাহাড়ু এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিকমদাস ও তুলসীদাস দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

এই টাকার দ্বারা অন্ততঃ একশত ছাত্রীর বাসোপযোগী একখানা বাড়ী তৈরী করিতে হইবে। অন্যত্র রমণীদের শিক্ষার জন্য বড়োদার মহারাণীর দানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। নারীদের শিক্ষার দিকে ঝোঁক দেশের লোকের যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

মিঃ বড়ুয়ার দান—

বিশাখপত্তনের মিঃ বি, বড়ুয়া স্থানীয় হাসপাতালে বৈদ্যুতিক আলো বসানো এবং অন্যান্য সৎকার্য্যের জন্য মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্টের হাতে ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য—বিশেষভাবে এই দুইটি জিনিসের অভাবই এ দেশকে অবনতির পথে টানিয়া লইতেছে। এ দুইটি জিনিস ফিরিয়া পাইলে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো দেশের পক্ষে অসম্ভব হয় না। সুতরাং এ দুইটি জিনিসের জন্য যাঁহারা দান করেন তাঁহারা দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

খৃষ্টান কন্‌ফারেন্স—

এলাহাবাদে মিঃ আল্‌ফ্রেড নন্দীর সভাপতিত্বে এদেশীয় খৃষ্টানদের এক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। মিঃ নন্দীর অভিভাষণে খৃষ্টানদের দিক্ হইতে এবং ভারতের রাজনীতির দিক্ হইতে নানা সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। তিনি খৃষ্টানদিগকে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত আলাদা হইয়া থাকিলে চলিবে না, তাহাদের সহিত সৌহার্দ্দের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে এবং দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতির দিকেও নজর দিতে হইবে। এই জিনিষগুলি উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় খৃষ্টানদের পক্ষে বড় হওয়া কোনো প্রকারেই সম্ভবপর নহে। বরং তাহাতে সম্প্রদায় ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়াই পড়িবে, কিছুতেই শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিবে না।

মিঃ নন্দীর কথাগুলি যেমন খৃষ্টানদের ভাবিয়া দেখা উচিত, তেমনি তাহা ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়েরও উপেক্ষার জিনিস নহে। খৃষ্টানরা যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এতটা সরিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল তাঁহাদেরই দোষ নহে, এদিক্ দিয়া আমাদেরও যথেষ্ট দোষ আছে। এই সম্প্রদায়টির সঙ্গে ভাব ও ভালবাসার আদান প্রদানে আমাদের ভিতরেও যথেষ্টরূপ তাগিদের সাড়া পাওয়া যায় না। ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়কে লইয়াই ভারত এবং তাহাকে বড় হইয়া উঠিতে হইলে সকল সম্প্রদায়কে লইয়াই বড় হইয়া উঠিতে হইবে, এই সোজা কথাটা ভালো ভাবে বুঝিতে পারিলেই এ সম্বন্ধে অনেক ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যায়।

মিঃ লয়েড্ জর্জ্জের বক্তৃতা সম্বন্ধেও মিঃ নন্দী নির্ভীকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, মিঃ লয়েড্ জর্জ্জের বক্তৃতা ভারতের মনে যথেষ্ট ভয় এবং অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বল যাহা সে তাহার সৈন্য-শক্তি নহে, সেটা হইতেছে ভারতবাসীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। ২০শে আগষ্টের ঘোষণা-বাণীতে যে-সব কথা বলা হইয়াছে তাহা ইংরেজ রাজনৈতিকদের অন্তরের কথা নহে, এ সন্দেহ যদি ভারতবাসীর মনে জাগে তবে তাহার ফল কিছুতেই ভালো হইবে না।

এ কথা ইতিপূর্ব্বেও আরো দুই-একজন বলিয়াছেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" ইংলণ্ডের কানের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া এ-সব কথা কতটুকু মর্ম্মস্পর্শ করিবে তাহার পরিমাণ ঐ লয়েড্ জর্জ্জেরই বক্তৃতা।

মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাথমিক শিক্ষা—

দার্জ্জিলিঙের মিউনিসিপ্যালিটি অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাংলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব পেশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। দার্জ্জিলিঙের মিউনিসিপ্যালিটি সর্ব্বপ্রথমে তাহাতে সাড়া দিয়াছেন। সেদিন বাংলার গবর্ণরের দ্বারা দার্জ্জিলিঙে এই ধরণের প্রথম স্কুলটির উদ্বোধন-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে মিউনিসিপ্যাল অধিকারের অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রগুলিতে সর্ব্বত্র এইরূপ স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল; কিন্তু পরে স্থির হইয়াছে—বেশী স্কুল না খুলিয়া স্কুলের সংখ্যা আপাততঃ কম করা হইবে, এবং স্কুলগুলিতে যাহাতে বেশী সংখ্যক ছাত্র পড়িতে পারে তাহারই দিকে নজর দেওয়া হইবে। লর্ড্ লিটন যে স্কুলটির উদ্বোধন করিয়াছেন, তাহাতে তিন শত ছাত্রের পাঠের উপযোগী স্থান আছে। তিন শত বালিকার পাঠের উপযোগী একটি স্কুলও শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুখের বিষয়, দার্জ্জিলিঙের মিউনিসিপ্যালিটি কেবলমাত্র বালকদের শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকেই নজর দেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের শিক্ষার দিকেও তাঁহারা রীতিমত নজর দিয়াছেন। এই ব্যাপারটা অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা উচিত। তাহা ছাড়া আরো একটা দিক দিয়া এই মিউনিসিপ্যালিটিটির বিশেষত্ব সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছে। বাংলার অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিতে গভর্ণমেণ্ট্ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়-ভারের অর্দ্ধেক বহন করিতে রাজি হইয়াছেন। কিন্তু দার্জ্জিলিং এই ব্যবস্থার ভিতর পড়ে নাই। তাহা সত্ত্বেও এই মিউনিসিপ্যালিটিটিই সর্ব্বপ্রথমে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী। লর্ড্ লিটন্ বলিয়াছেন, "দার্জ্জিলিং অনুন্নত প্রদেশ বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদিগকে কিছুতেই এ আখ্যা দেওয়া যায় না।" লর্ড্ লিটনের এ কথার ভিতর কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। উন্নত বলিয়া বাংলার যে-সব অঞ্চলের খ্যাতি আছে, সেই-সব অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদিগকে দার্জ্জিলিঙের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

মুসলমানের গ্রাম ত্যাগ—

তিপতুর মহীশূর রাজ্যের একটা স্থান। সেখানকার হিন্দুরা মসজিদের নিকট দিয়া প্রায়ই গানবাজনা করিয়া যায়। মুসলমান ধর্ম্মানুসারে মসজিদের কাছে গানবাদ্য নিষিদ্ধ। সুতরাং হিন্দুদের এই ব্যবহারে স্থানীয় মুসলমানদের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিপতুরের খিলাফৎ-সম্পাদক খবর পাঠাইয়াছেন, ধর্ম্মে আঘাত দেওয়াতে মুসলমানেরা তিপতুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা লইয়া এদেশে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এই মিলন-প্রশ্নটি যে কত বড় কংগ্রেস তাহাও বুঝাইয়া দিতে চেষ্টার কসুর করেন নাই। তাহার পরেও যে আমাদের ব্যবহারের ভিতর পরস্পরের সম্বন্ধে বিবেচনার অভাব দেখা যায়, ইহা যেমন দুর্ভাগ্য তেমনি লজ্জার কথা। তিপতুরের মুসলমানেরা একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা না করিয়া যে-পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের মহত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের সঙ্কীর্ণতা আরো বেশী করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শ্লোকক্ কমিটির রিপোর্ট্—

মধ্য-প্রদেশের ব্যয়-সঙ্কোচ সম্পর্কে 'শ্লোকক্ কমিটির রিপোর্ট্ বাহির হইয়াছে। কমিটির সদস্যেরা আশী লক্ষ টাকার ব্যয় কমাইবার

ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। গবমেণ্ট্ তাঁহাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যয়ভার সঙ্গে-সঙ্গেই কমিবে এবং বাকী ত্রিশ লক্ষ টাকার ব্যয় কমিবে ধীরে সুস্থে—অর্থাৎ পরিণামে। কমিটির হিসাব অনুসারে ঠাট বজায় রাখার খরচ (establishment charges) প্রভৃতি হইতে উনিশ লক্ষ, পাব্লিক্ ওয়ার্ক্‌স্ ডিপার্টমেণ্ট্ হইতে পাঁচ লক্ষ, দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার হইতে ছয় লক্ষ, এবং উন্নতি-সম্পর্কিত কাজের ভিতর হইতে (development works) বিশলক্ষ টাকার খরচ বাঁচানো যায়। তা ছাড়া কমিটি লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের মাহিনা বাৎসরিক দশ হাজার টাকা এবং ডেপুটি প্রেসিডেণ্টের পদ অবৈতনিক করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। বিভাগীয় কমিশনারের পদও তাঁহারা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। এমনি আরো অনেক ব্যাপারের উল্লেখ তাঁহারা করিয়াছেন যে-সব জায়গায় ব্যয়সঙ্কোচের যথেষ্টই সুযোগ আছে। গবর্ণমেণ্ট্ শ্রোকক্ কমিটির রিপোর্ট্ সম্বন্ধে এখনও কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। মধ্য-প্রদেশের আয়ব্যয়ের হিসাব অনুসারে যদি আশি লক্ষ টাকার ব্যয় কমানো যায়, তবে সেই অনুপাতে বাংলার খরচের কত টাকা কমে এদেশের জনসাধারণ তাহার হিসাব-নিকাশটা ঠিক করিলে আশ্চর্য্য হইবেন। কারণ তাহা হইলে জনসাধারণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন এই অতি দরিদ্র দেশের কত অর্থ গবর্ণমেণ্ট কত অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন।

গঙ্গায় বাঁধ—

হরিদ্বারের নিকট নারোরা নামক স্থানে এক প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়া গঙ্গার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করা হইয়াছে। গঙ্গাকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন নিতান্ত কম হয় নাই। ১৯১৬ সালে একবার বাঁধের দুই ফুট মাত্র স্থান কাটিয়া জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে গঙ্গার স্বাভাবিক গতি না ফেরায় আবার আন্দোলন সুরু হয়। ফলে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন বে-সরকারী সদস্য লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্ট্ পেশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট্ এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট্ অনুসারে কাজ করা কঠিন বলিয়া মনে করেন। গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ-কমিটির সিদ্ধান্ত মত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল বাহির করিবার জন্য নারোরার বাঁধ কাটিয়া দিলে নব্বই হাজার বিঘা হইতে এক লক্ষ বিশ হাজার বিঘা পরিমিত স্থানের রবিখন্দ নষ্ট হইবে এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার বিঘা হইতে ষাট হাজার বিঘা পরিমিত স্থানের জমির আখ নষ্ট হইবে। যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট্ এই ব্যাপারে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জন-অভিমত জানিতে চান ইহাই আমরা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করি। কারণ ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এ জিনিসটা যেমন আকস্মিক তেমনি নূতন। তবে জন-মত অনুসারে যে গবর্ণমেণ্ট কাজ করিবেন এমন নজির এদেশে নাই বলিলেই হয়।

পণ্ডিত দেওশরণ—

গোরক্ষিণী-সমিতির প্রসিদ্ধ কর্ম্মী পণ্ডিত দেওশরণ সম্প্রতি আসাম জোরহাট জেলে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। গত ১১ই জানুয়ারী শ্রীহট্টের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১০৮ ধারা অনুসারে তাঁহাকে একবৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত দেওশরণ জেলের খাদ্যগ্রহণে সম্মত না হওয়ায় জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পৃথক্ রান্নার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইঁহারা তাঁহাকে জেলের ভিতর হোম করিবারও অনুমতি দিয়াছিলেন। কারণ হোম না করিয়া দেওশরণ জল গ্রহণ করিতেন না। তাহার পর গত এপ্রিল মাসে দেওশরণ শ্রীহট্ট জেল হইতে জোড়হাট জেলে স্থানান্তরিত হন। সেখানে জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁহার জন্য কোনোরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে রাজি হন না। ফলে পণ্ডিতজি ২৬ দিন অনশনে থাকিয়া তারপর শুধু ফল খাইতে আরম্ভ করেন। গত ১১ই মে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজনৈতিক কয়েদীগের 'ওয়ার্ড' দেখিতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে দেখিয়া সেলাম না করায় তিনি ক্রুদ্ধ হন। ইহার পর দেওশরণের প্রতি কালা-ঘরে বদ্ধ থাকিবার ব্যবস্থা হয়। তিনি যখন উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ই তাঁহাকে কালা ঘরে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেইখানেই অনাহারে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। জেলে পণ্ডিত দেওশরণকে বলপূর্ব্বক আহার করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। এসব ব্যাপারে টীকাটিপ্পুনি নিষ্প্রয়োজন। কারণ এগুলি অন্তর দিয়া অনুভব করিবার কথা। সৌভাগ্যের বিষয় দেশবাসীর ভিতর এ অনুভব করার কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে।

মুলতানের দাঙ্গা—

মুলতানে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, প্রকাশম, যমুনালাল বাজাজ, দুনীচাঁদ, সারতআলি, আহম্মদআলি, সালকেলাল খাঁ প্রভৃতি মুলতানে গিয়াছিলেন। মুসলমানেরা বলিয়াছেন, হিন্দুরা তাজিয়ার উপর পাথর ছুঁড়িয়াছিল বলিয়াই দাঙ্গা হয়। হাকিম সাহেব বলিয়াছেন হিন্দুরা যে পাথর ছুঁড়িয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ নাই। মুসলমানেরা বলিয়াছেন, হিন্দুরা কোরাণ পুড়াইয়া কুয়াতে ফেলিয়া দিয়াছিল। হাকিম সাহেব বলিয়াছেন, এ অভিযোগেরও কোনো প্রমাণ নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানেরাই বেশী অত্যাচার করিয়াছে। হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ প্রভৃতি অনেক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। তাহাদের অভিযোগগুলিও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

নারী-শিক্ষায় দান—

বরোদার মহারাণী নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শিক্ষাব্যাপারে গায়কোয়াড় ভারতের সামন্ত রাজাদের আদর্শস্থানীয়। সুতরাং তাঁহার মহিষীর পক্ষে এ দান একান্তই স্বাভাবিক। ভারতে পুরুষ অতিমাত্রায় অশিক্ষিত। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষাও অধিকতর অশিক্ষিত হইতেছে ভারতের রমণী। অথচ এই দুইটি সম্প্রদায়ের শিক্ষাই জাতি-গঠনের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য্য। সুতরাং ভারতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার দিকে সমান নজর দেওয়া দরকার। নিজেদের ভিতর তাগিদ্ জাগিলে শিক্ষার পথটা অনেক সহজ হইয়া আসে। নারীদের ভিতরেও যে স্বজাতীয়দের শিক্ষার জন্য একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে মহারাণীর এই দানই তাহার একটা প্রমাণ।

নূতন আইন—

গবর্ণমেণ্ট্ সম্প্রতি একটি আইন তৈরী করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে যে-সব লোক সরকারের অনুরক্ত নহেন তাঁহাদের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের মালপত্র খরিদ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের খামখেয়ালীর অন্ত নাই; এ আইনটি তাহারই আর-একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। বোম্বাইএর ভারতীয় বণিক্ সভার সেক্রেটারী ইহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছে এক আবেদন পেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—এই আইনের মর্ম্ম অনুসারে ভারতীয় বণিক্‌দের নিকট

হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করা একটা সরকারী অনুগ্রহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জিনিষ সস্তা কি দুর্মূল্য, ভালো কি মন্দ, সে-সব দিকে আর নজর দেওয়া হইবে না, নজর দেওয়া হইবে কেবলমাত্র বিক্রেতার মনোভাবের উপর—সে গবমেণ্টের অনুরক্ত কি বিদ্বেষী সেই সংবাদটার দিকে। অর্থাৎ সরকারী মাল খরিদ ব্যাপারটাও আর বাণিজ্য-নীতির গণ্ডীর ভিতর থাকিতেছে না, তাহাও আসিয়া পড়িতেছে রাজনীতির এলাকার ভিতর।

সব দেশেই গবমেণ্টের সহায়তায় নানা রকমের সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে দেশের শিল্প-বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। এদেশে সে-সব দিকে তো গবর্ণমেণ্টের কোনোরূপ তাগিদ নাইই, দুই চারিটা দেশী জিনিষ কিনিয়াও যে দেশের শিল্পকে ইঁহারা সাহায্য করিবেন এই-সব আইন তাহার পথও কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে। শিল্পের দ্বারাই দেশের সম্পদ্ বাড়ে। অসহযোগ আন্দোলনে সেই শিল্পের দিকেই দেশের তরুণ-সম্প্রদায়ের ঝোঁক পড়িয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনকে নষ্ট করিবার জন্য এই যে সব আইন তৈরী হইতেছে, ইহার দ্বারা দেশের শিল্পকেই নষ্ট করার ব্যবস্থা হইতেছে।

চৌড়ীচৌড়ার মামলার ব্যয়—

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় চৌড়ীচৌড়ার মামলা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। মোকদ্দমা সেসনে সোপর্দ্দের তারিখ পর্য্যন্ত ও কেবলমাত্র স্পেশাল কাউন্সেল ও সরকারী উকিলের ফি বাবত এই মামলা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। স্পেশাল কাউন্সেল একা লইয়াছেন পঁচিশ হাজার দুইশত টাকা। এখনও তো সেসন্সের মামলা বাকী আছে। এরূপভাবে ব্যয় করিলে কুবেরের ভাণ্ডারি ফুরাইয়া যায়। এদেশের বজেটে ব্যয়ের সংখ্যা যে অসম্ভব আকার ধারণ করে, এই-সব খরচের বাহুল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু থাকে না!

আলিগড়ে সংস্কৃত শিক্ষা—

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্দ্ধারক সভার বাৎসরিক অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। এই সভায় ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দানের জন্য একটি নূতন বিভাগ খোলার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে। মোরাদাবাদের মহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের নবাগতদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখাই হইতেছে ইসলামের চিরন্তন আদর্শ। মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়কে এই আদর্শই মানিয়া চলিতে হইবে। উদার মত ও পথকে অবলম্বন করিয়া, শিক্ষাব্যাপারের নেতৃত্ব আলিগড়কে গ্রহণ করিতেই হইবে। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়েরও এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া আরবীশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এই-সব ব্যবস্থার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। মহম্মদ ইয়াকুব সাহেবের মত আমরা সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করি। শিক্ষায় জাতিভেদ নাই, থাকিতেও পারে না। যে-সব সঙ্কীর্ণতা মানুষকে জাতের দোহাই দিয়া মানুষের কাছে মানুষকে ছোট বা পর করিয়া রাখে, মনের ভিতর হইতে সেই-সব সঙ্কীর্ণতা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সেই শিক্ষার দুয়ারেই যদি জাতিভেদের প্রাচীরটাকে খাড়া করিয়া রাখা যায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক বন্দী—

যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ সিংহ রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দেশের রাজনৈতিক আব্‌হাওয়ার এখন যথেষ্টই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং এই লোকগুলিকে এইভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবার আর কোনই প্রয়োজন নাই। সরকার-পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ হয়। অর্থ-সচিব বলেন, "এখনও অনেকে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। যদি এইসব বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে জেল হইতে বাহির হইয়াই ইহারাও আবার আন্দোলনে যোগদান করিবে। এই-সব রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কারাদণ্ডের অবশিষ্ট সময়টা আন্দোলনে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহারা রাজি নহে। সুতরাং ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নহে। সিভিল্ ডিস্ওবিডিয়েন্স্ কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলে কংগ্রেস কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন তাহাই দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, তাহার আগে কিছুই করা যাইতে পারে না।" কিন্তু সরকারের পক্ষের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সভায় প্রস্তাবটি পাশ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কাউন্সিলে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাবই পরিগৃহীত হইয়াছে। এই ব্যাপারে যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রস্তাব পাশ হইলেও প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইবে কি না সে-সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ আছে কারণ তদনুসারে কাজ করা না করা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন। তথাপি কাউন্সিলের সদস্যদের এই ধরণের সিদ্ধান্তগুলির মূল্য নিতান্ত কম নহে। সর্ব্বত্র যদি তাঁহারা এইরূপ স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, তবে বেশীদিন তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে এমন ভাবে উপেক্ষা করা চলিবে না, করিলে তাহার ভিতর দিয়া সংস্কার-বিধির নগ্ন মূর্ত্তিটাই প্রকট হইয়া উঠিবে। সেটা যে কম লাভ একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার—

সংবাদপত্র-সম্পর্কে পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটি নূতন ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। ইস্তাহারের মর্ম্ম হইতেছে—"সরকারী কার্য্য-সম্পর্কে যদি কোনো সংবাদপত্রে কোনো সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তবে উক্ত পত্রের সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীগণের ব্যবহারবিষয়ক আইনের ২৪ সংখ্যক বিধান অনুসারে, সরকারী উকিলকে নিযুক্ত করিয়া যাঁহার বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য করিবেন এবং মামলার ব্যয়ভার বহন করিবেন। ফৌজদারী মামলা অপেক্ষা দেওয়ানী মামলায় স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনিতে পারা যাইবে। স্বত্বাধিকারীরা ধনী লোক। সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা সহজ।"

ইস্তাহারে নূতন কথা কিছু নাই। কেবলমাত্র যে জিনিসটা গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিয়তই করিয়া থাকেন, সেই কথাটাই আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইগুলিই প্রেস-আইন উঠাইয়া দেওয়ার পরের ফসল।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়
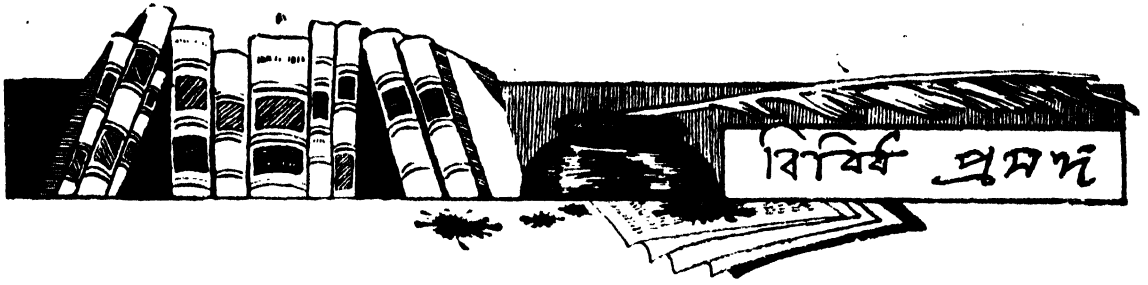
ব্যবসা ও বিজ্ঞাপন

অনেকেই ব্যবসা করেন। কেউ নিজে জিনিস তৈরী করে' বিক্রি করতে চান, কেউ বা অন্যের তৈরী জিনিস জোগাড় করে' বিক্রি করেন। কিন্তু সে যাই হোক, একটা কথা দুই ক্ষেত্রেই সমানে খাটে। খরিদ্দার না পেলে ব্যবসা চলে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসাদারদের বিশ্বাস, খরিদ্দার তাঁদের খুঁজে নেবে, কেননা জিনিস কেনার দরকার তাদেরই। এ কথাটা তাঁরা ভুলে যান, যে, কথাটা শুধু যে-সব জিনিস জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইগুলির পক্ষেই খাটে। যেমন চাল-ডালের দোকানদার জানেন যে খরিদ্দার তাঁর কাছে আসবেই। কিন্তু সংসারে যত জিনিস কেনা-বেচা হয়, তার খুব বেশী একটা অংশ ঐ জাতীয় জিনিস নয়। কাজেই সে-সব জিনিস বিক্রি করতে হলে লোককে জানান দরকার যে ঐ জিনিসগুলি দোকানদারের আছে এবং জিনিসগুলি ভাল। অর্থাৎ খরিদ্দার জুটিয়ে নিতে হয়। আমেরিকানরা বড় ব্যবসাদার। তারা বিজ্ঞাপনে কি রকম খরচ করে দেখা যাক্।

১৯২১ সালে কতকগুলি আমেরিকান্ ব্যবসাদার ৩৮০০০০০০০ টাকা (আটত্রিশ কোটি) বিজ্ঞাপনে খরচ করেছিল। এই টাকাটা মাত্র ৭২ খানা সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লেগেছিল। এ ছাড়া কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দৈনিক কাগজে বেরয়। একটা সাপ্তাহিক কাগজের আয় (Saturday Evening Post) ১৯২০ সালে ১০০০০০০০০ টাকা হয়েছিল। টাকাটা প্রধানতঃ বিজ্ঞাপন্ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। কোন কোন দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০।

শুধু কি কাগজেই লোকে বিজ্ঞাপন দেয়? তা নয়। দেয়ালের গায়ে, প্ল্যাকার্ডে, রেললাইনের দু পাশে অর্থাৎ শুধু ষ্টেশনে নয়, খোলা মাঠে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে, ট্রাম্ গাড়ীতে, বাস্-এ, রাত্রে ইলেক্‌ট্রিক আলোর সাহায্যে, ইত্যাদি নানাভাবে বিজ্ঞাপন দিতে আমেরিকান্‌কে কেউ হার মানাতে পারে না। বাৎসরিক কত টাকা আমেরিকান্‌রা বিজ্ঞাপনে খরচ করে তা বলা শক্ত; কিন্তু বেশীর ভাগ আমেরিকান্ বিজ্ঞাপন-ওস্তাদদের মতে আমেরিকান্ ব্যবসাদাররা উপরোক্তভাবে ও বায়স্কোপে থিয়েটারে বিজ্ঞাপন দিয়ে বছরে ৪০০০০০০০০০ টাকা (চারশ কোটি টাকা) খরচ করে।

—

নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা

বক্সিং অর্থাৎ মুষ্টিযুদ্ধের খেলার ইউরোপ আমেরিকায় খুব চলন আছে। ইহাতে কোন সময়ে যে আর-সব খেলোয়াড়কে পরাস্ত করিতে পারে তাহাকে চ্যাম্পিয়ন্ বা সর্ব্ব প্রধান খেলোয়াড় বলে। নূতন কোন খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়নকে হারাইয়া দিতে পারিলে চ্যাম্পিয়ন্ পদ পায়। মুষ্টিযোদ্ধারা শরীরের ওজন অনুসারে খুব ভারী, মাঝারী, হাল্কা, প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। অনেক বৎসর হইতে ফ্রান্সের কার্পেন্টিয়ার এক শ্রেণীর চ্যাম্পিয়ন্ ছিল। তাহাকে সম্প্রতি সিকি (Siki) নামক একজন নিগ্রো হারাইয়া দিয়া চ্যাম্পিয়ন্ হয়। এই সিকিকে এক ইংরেজ মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে তাহাদের মুষ্টিযুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। ইহার কারণ কেবল এই হইতে পারে, যে, তাঁহারা নিগ্রোর নিকট শ্বেতকায়ের পরাজয় সহ্য করিতে পারিবেন না, কিম্বা শ্বেতকায় নিগ্রোর দ্বারা পরাজিত হইলে ইংরেজরা উত্তেজিত হইয়া শান্তিভঙ্গ করিতে পারে, এবং তাঁহারা সেই শান্তিভঙ্গ নিবারণ করিতে চান। কারণ যাহাই হউক, এরূপ আশঙ্কার মানেই পরাজয়, এবং এরূপ

আশঙ্কার দ্বারা বুঝা যায়, যে, ইংরেজেরা অশ্বেত লোকদিগকে কিরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখে।

—

ডাকাইত ও গ্রামবাসী

এমন কোন সপ্তাহ যায় না যাহাতে বাংলা দেশে কতকগুলি ডাকাইতি না হয়। ইহার মধ্যে যে যে স্থলে গ্রামবাসীরা ডাকাইতদিগকে তাড়াইয়া দিবার বা ধরিবার চেষ্টা করে, এবং যে যে স্থলে তাহারা ডাকাইতদিগকে জখম করিতে বা ধরিতে সমর্থ হয়, তাহার তালিকা ও বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে পল্লীবাসী জনসাধারণ উৎসাহিত হয়।

গত ১লা অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল গ্রামের রামপদ বিশাইয়ের বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাইতি হয়। রামপদর পিতা অধর বিশাই একজন ডাকাতকে গুলি করেন। যদিও ডাকাতরা লুণ্ঠিত টাকা ও জিনিষ পত্র লইয়া পলায়ন করে, তথাপি গ্রামবাসীদের চেষ্টায় পরে দুজন ডাকাত ধরা পড়ে। তাহার মধ্যে গুলিদ্বারা আহত ব্যক্তি হাঁসপাতালে মারা পড়িয়াছে।

২৮শে অক্টোবর চব্বিশ পরগণা জেলার গোজালিয়া-ঘোষপুর গ্রামের দ্বারিক বারের বাড়ীতে ডাকাইতি হয়। এস্থলেও, হরদাস ও দ্বারী ঘরীর চেষ্টায়, একজন ডাকাত ধৃত হয়।

বীরভূম জেলায় নাদির খাঁ ও হাফিজ্‌ খাঁ ত্রিশজন ডাকাইতের সহিত লড়িয়াছিল। তাহারা পরাস্ত হইলেও ডাকাইতদিগকে সামান্য লুট লইয়া পলাইতে বাধ্য করে। কর্ত্তৃপক্ষ নাদির খাঁ ও হাফিজ্‌ খাঁকে তাহাদের সাহসের জন্য পুরস্কার দিয়াছেন।

—

"ক্যাপিটুলেশ্যন্স্‌"

১৩ই নবেম্বরের দৈনিক কাগজগুলিতে পাঠকেরা দেখিয়া থাকিবেন, যে, কমাল পাশার দল অন্য অনেক বিষয়ের মীমাংসার জন্য ইউরোপীয় মিত্রশক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, "ক্যাপিটুলেশ্যন্স্‌" রহিত করা বিষয়ে তাঁহারা দৃঢ়। সংক্ষেপে এই ক্যাপিটুলেশ্যন্সের মানে এই, যে, তুরস্কে অন্য ইউরোপীয় বা আমেরিকান্ স্বাধীন দেশ-সকলের লোকেরা বাস করিলে তাহারা তুরস্কের আইন আদালতের অধীন নহে, তাহাদের বিচারাদি তুরস্কে অধিষ্ঠিত তাহাদের স্বদেশী আইন অনুসারে তাহাদের স্বদেশী গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা হয়, ও হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা তুরস্কের ন্যায়বিচার করিবার অধিকার, ক্ষমতা, ও ইচ্ছা অস্বীকৃত হয়, এবং তাহাকে অন্যান্য স্বাধীন দেশের সমান বলিয়া গণ্য করা হয় না। ইহা অত্যন্ত অপমানের বিষয়। অনেক বৎসর আগে জাপানের এই দুরবস্থা ছিল। তাহা দূর হইয়াছে। কোন শক্তিশালী জাতি এই অপমান সহ্য করিতে পারে না। অতএব কমালের দল ক্যাপিটুলেশ্যন্সের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ঠিকই করিয়াছেন।

—

খিলাফৎ ও সুল্‌তান

আমরা যতদূর জানি, মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র খলিফা নির্ব্বাচন প্রথার সপক্ষে। সুতরাং তুরস্কের বর্ত্তমান সুল্‌তান কিম্বা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের খলিফা হইবার বা থাকিবার এমন কোন দাবী নাই, যাহা মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। তুরস্কের নির্ব্বাচিত জাতীয় সভার (National Assembly) রাষ্ট্রীয় সমুদয় ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ারও কোন বাধা মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। যিনি খলিফা নির্ব্বাচিত হইবেন, তিনি এই জাতীয় সভার সমুদয় রাষ্ট্রীয়শক্তির সাহায্য পাইবেন। গণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে তুরস্ক শাসিত হইলে উহার ধনসমৃদ্ধি ও শক্তি বাড়িবে। এইরূপ শক্তিশালী জাতি খলিফার পশ্চাতে থাকিলে তিনি নিজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য ভাল করিয়াই করিতে পারিবেন।

অতএব ব্রিটিশ পক্ষ হইতে, "কমালপাশার দল খলিফাকে শক্তিহীন করিতেছে, ভারতীয় মুসলমানেরা যাহা চাহিতেছিলেন, এই দল তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে," ইত্যাদি যে-সব কথা উঠিয়াছে, তাহাতে মুসলমানেরা নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবে না। হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্‌সারী এ বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া সময়োচিত কাজ

করিয়াছেন। বস্তুতঃ এখন ইংরেজরা যাহা বলিবেন বা করিবেন, মুসলমানেরা তাহাই সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। তুরস্কের সুল্‌তান ইংরেজদের আশ্রিত হইলে এবং তাহাদের আশ্রয়ে ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহার গৌরব, সম্মান, ও শক্তি কমিবে বই বাড়িবে না।

—

চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন, যে তিনি সেরূপ স্বরাজ চান না, যাহাতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা শক্তিশালী হইবে; কারণ তাহারা স্বার্থপর এবং সেই কারণে তাহাদের মধ্যে ও সাধারণ লোকদের মধ্যে বিরোধ হইবে। তিনি সাধারণ লোকদের জন্য স্বরাজ চান এবং তাহা সাধারণ লোকদিগকেই অর্জ্জন করিতে হইবে বলিয়াছেন। ("Swaraj must be for the masses and the Swaraj must be won by the masses".) সাধারণ লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত থাকে, ইহা আমরাও বাঞ্ছনীয় মনে করি না। কিন্তু তাহারা দেশের অধিকতম লোক হইলেও, দেশের সব-লোক তাহারা নহে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এবং অভিজাত শ্রেণীর লোক, ইহারাও ত দেশের মানুষ? স্বরাজ যেমন সাধারণ লোকদের জন্য হওয়া চাই, তেমনি মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের জন্যও কেন হইবে না? তাহারা সংখ্যায় সাধারণ লোকদের চেয়ে কম বলিয়া কেন ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে? চিত্তরঞ্জন-বাবুর যে মত-বর্ণনাপত্র অমরাবতী হইতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে, তিনি স্বরাজের আমলে শিখ, খৃষ্টিয়ান, পার্সী, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকবিশিষ্ট সম্প্রদায়-সমূহেরও অধিকার পরিষ্কার করিয়া এখন হইতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার মনে করেন। ধর্ম্মসম্প্রদায় হিসাবে যাঁহারা লোকসংখ্যায় কম, তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার তিনি আলাদা করিয়া এখন হইতেই নির্দ্দেশ করিতে চান; অথচ বিত্ত বা পেশা হিসাবে শ্রেণীবিভাগে যাহারা লোকসংখ্যায় কম, স্বরাজ যে সেই মধ্যবিত্ত ও অভিজাতশ্রেণীর লোকদের জন্যও হওয়া চাই, ইহা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন নাই কেন? সকলের চেয়ে বড় জনতার পক্ষে চীৎকার করা রাজনীতিকুশল লোকদের একটা চা'ল আছে বটে, কিন্তু স্বরাজবাদীদের সে পথ অবলম্বন না করাই ভাল।

চিত্তরঞ্জন-বাবু বলিয়াছেন, যে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতা পাইলেই স্বার্থপর হইবে ("we at once become selfish")। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন শ্রেণীর লোক দেখিয়াছেন কি যাহারা ক্ষমতা পাইয়া স্বার্থপর হয় নাই? তিনি সাধারণ লোকদের স্বরাজ চান। রুশিয়ায় সাধারণ লোকদের যেমন অপ্রতিহত ক্ষমতা হইয়াছে, তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা সাধারণ লোকদের পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশে ও যুগে হয় নাই। কিন্তু রুশিয়ার এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাধারণ লোকেরা মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদিগকে ক্ষমতাহীন, এমন কি নির্মূল, করিবার চেষ্টা করিয়া স্বার্থপরতা, নৃশংসতা ও নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে।

মানুষের স্বার্থপরতার মধ্যেও মঙ্গল-উদ্দেশ্য নিহিত আছে। কিন্তু মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তিরই মত, উহারও আতিশয্য খারাপ। সকলের যাহাতে স্বার্থ-সিদ্ধি হয়, আমারও প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধি তাহাতেই হইবে, ইহাকে বুদ্ধিমানের স্বার্থপরতা বলা যাইতে পারে। সচরাচর মানুষ যদি এই রকমের স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হয়, তাহা দ্বারাও অনেক কুফল নিবারিত ও সুফল লব্ধ হয়। স্বার্থপরতার বিনাশ অবশ্য চরম লক্ষ্য। তাহা কিন্তু কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালী দ্বারা হইতে পারে না। অভিজাততন্ত্র, মধ্যবিত্ততন্ত্র, সাধারণ লোকের স্বরাজ, যেরূপ শাসনপ্রণালীই প্রতিষ্ঠিত হউক, ক্ষমতাশালী মানবসমষ্টি স্বার্থপর থাকিবে। স্বার্থপরতা নষ্ট হইতে পারে, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা।

চিত্তরঞ্জন-বাবু পার্লেমেণ্ট দ্বারা শাসনের প্রথা চান না। তাঁহার মতে উহার মানে মধ্যবিত্ত লোকদের শাসন, ধনবান্‌দের দ্বারা শ্রমজীবী ও দরিদ্রলোকদের দ্বারা শাসন—এক কথায় দুর্ব্বলদের উপর প্রবলতরের অত্যাচার। কিন্তু যখন সাধারণ লোকেরা প্রবল হয়, তখন তাহারা কি দুর্ব্বল মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের উপর অত্যাচার করে না? তিনি পার্লেমেণ্টপ্রথা চান না, কিন্তু কি চান, তাহা বলেন নাই। পার্লেমেণ্ট দ্বারা শাসনটা

যে কেন কেবল মধ্যবিত্তদের দ্বারাই শাসন হইবেই, তাহাই বা কেন মনে করা হয়? পার্লেমেণ্ট-প্রথার জননী ইংলণ্ডেও দেখা যাইতেছে যে, ক্রমে ক্রমে শ্রমজীবী লোকদের হাতে অধিক হইতে অধিকতর ক্ষমতা আসিতেছে। তাহারা শিক্ষা, সংবদ্ধতা, এবং নিজদলের অস্তিত্ব-অনুভূতি বিষয়ে সম্যক্ অগ্রসর হইলেই আপনাদের সংখ্যার অনুরূপ ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে।

চিত্তরঞ্জন-বাবু বলিয়াছেন, সাধারণ লোকদের যে-কেহ তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ; কারণ সে স্বাধীন, তিনি গোলাম। তিনি ইউরোপের গোলাম। তিনি ইউরোপ বকেন, ইউরোপ স্বপ্ন দেখেন, এবং ইউরোপ তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত। ইহা সত্য কি না তাহা বক্তা এবং ভগবান্ জানেন। কিন্তু সাধারণ লোকদের যে-কেহ স্বাধীন, একথা সত্য নহে। ইহাও সত্য নহে, যে, সাধারণ লোকদের যে-কেহ মধ্যবিত্ত লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ লোকেরাও গোলাম; তবে তাহাদের গোলামীটা হয়ত অন্য প্রকারের এবং হয়ত তাহাদের অনেকে জানেই না, যে, আসল স্বাধীনতা কি এবং প্রকৃত গোলামীটাই বা কি, এবং অন্নচিন্তা চমৎকারা বলিয়া এসব বিষয় তাহারা ভাবেই না।

সকল দেশে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই খুব শ্রেষ্ঠ লোক থাকিতে পারে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে রাজর্ষি জনক, জৈন ধর্ম্মের অন্যতম মহাপুরুষ মহাবীর এবং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। উত্তরকালে সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেক পুরুষপ্রবরের আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ত্তমান-কালে, অন্যান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, মহাত্মা গান্ধি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক।

—

বাঙালী রাসায়নিক

বিদেশী নানা রাসায়নিক কাগজে গত দশ বৎসরে কোন্ কোন্ ভারতবাসী রাসায়নিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তাহার তালিকা দিতে গিয়া আমরা পাঁচ জনের নাম করিয়াছিলাম। ইহাতে শুনিতে পাই অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন। তাহা দুঃখের বিষয়। কারণ, সমুদয় রাসায়নিক গবেষকের পূরা তালিকা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, এবং কাহার গবেষণার গুরুত্ব ও উৎকর্ষ কিরূপ তাহা নির্দ্দেশ করাও আমাদের অভিপ্রেত ছিল না। রাসায়নিক কোন্ গবেষণার মূল্য ও উৎকর্ষ কিরূপ তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই, যদিও রসায়নী বিদ্যার সামান্য রকম শিক্ষা এক সময়ে আমরা পাইয়াছিলাম। যাঁহারা ঐ বিদ্যায় খুব পারদর্শী, তাঁহাদের মধ্যেও এক একটি গবেষণার গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেবল যে-বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না, তাহা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের সংখ্যা, কারণ তাহা যে-কেহ গণনা করিতে পারে। এবং আমরা কেবল সংখ্যার নির্দ্দেশই করিয়াছিলাম।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র-নাথ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, অনুকূলচন্দ্র সরকার, শিখিভূষণ দত্ত, প্রভৃতির নাম আমাদের তালিকায় ছিল না বলিয়া ইহা অস্বীকৃত হয় নাই, যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই অনেকগুলি সারগর্ভ স্বাধীন গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এবিষয়ে আরো কিছু বক্তব্য "আলোচনা"র মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

—

আইন লঙ্ঘনের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল

কংগ্রেসের এক কমিটি, অসহযোগ-প্রচেষ্টার অন্যতম অঙ্গ নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনের জন্য দেশ প্রস্তুত হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহাদের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। উহা আমরা দেখি নাই। উহার চুম্বক এবং উহা হইতে উদ্ধৃত কোন কোন অংশ ইংরেজী দৈনিকসমূহে দেখিয়াছি। যদিও নামে কমিটির প্রধান বা একমাত্র অনুসন্ধেয় বিষয় ছিল, আইন লঙ্ঘনের যোগ্যতা, তথাপি তাঁহারা রিপোর্টে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন

ব্যবস্থাপক সভায় অসহযোগীদের প্রবেশ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নের। কমিটি যাঁহাদের সাক্ষ্য লইয়াছিলেন, তাঁহাদের খুব বেশী অংশ কৌন্সিলে যাওয়ার বিরোধী। কিন্তু কমিটির তিন জন সভ্য একদিকে এবং অন্য তিন জন অন্যদিকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্নটির উভয় পক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, সম্ভবতঃ তাহা রিপোর্টে কোন না কোন পক্ষের লোক বলিয়াছেন। আমরা নূতন কিছু বলিতে পারিব, এ ধারণা আমাদের নাই। তথাপি প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা বলিতেছি।

যখন ব্যবস্থাপক সভাগুলি মর্লীমিণ্টোর আমলে কিছু বড় করা হয়, তখন হইতে আমাদের এই ধারণা ছিল যে, কৌন্সিলে গিয়া বক্তৃতাদি করিবার জন্য যে সময় যায় ও পরিশ্রম হয়, কৌন্সিলে না গিয়া ততটা সময় ও পরিশ্রম দেশের সেবায় নিয়োগ করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী ও প্রয়োজনীয় কাজ হইতে পারে। যখন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমলে সভাগুলিকে আরও বড় করা হইল, তখনও আমরা আমাদের এই ধারণা বদ্‌লাইবার কোন কারণ দেখি নাই। কৌন্সিলে গিয়া পরিশ্রম করিলে দেশের কোন উপকারই করা যায় না, এ বিশ্বাস আমাদের কোন কালে ছিল না। কিছু উপকার করা যায়। কিন্তু আসল ক্ষমতা গবর্ণ্মেণ্ট্ নিজের হাতে রাখায়, কৌন্সিলে লড়াই করিয়া স্বরাজ্য লাভ হইতে পারে, এ ধারণা আমাদের আগেও ছিল না, এখনও নাই।

বরদোলিতে, এবং তাহার পূর্ব্বে, জাতিগঠনমূলক যে-সব কাজের ব্যবস্থা কংগ্রেস্ করেন, সে-সব কাজ খুব কঠিন। কৌন্সিলে গিয়া কাজ করা (তাহার গুরুত্ব ও উপকারিতা যাহাই হউক) তাহা অপেক্ষা অনেক সোজা। অধিকন্তু কৌন্সিলে বক্তৃতা, প্রশ্ন, ও প্রস্তাব করিয়া যতটা হৈচৈ করা যায়, চরকা ও তাঁত বসাইলে, সুরাপান নিবারণ, অস্পৃশ্যতা দূর, এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিলে তাহা হয় না। অতএব কৌন্সিলে গিয়া একটা গোলমাল করিয়া বাহাদুরী দেখান সহজ পথ বটে। কৌন্সিলে প্রবেশ করিবার অনুকূলে যত কারণ দেখান হইয়াছে, সে-সব কারণ অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভেও বিদ্যমান ছিল। তখন কিন্তু নেতাদের ও অনুচরদের ভরসা ছিল, যে, তাঁহারা কৌন্সিলগুলিতে না গেলে গবর্ণমেণ্টের সংস্কার-আইন দ্বারা যাহা কিছু করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা চুরমার হইয়া যাইবে। কিন্তু অসহযোগীরা দেখিতে পাইয়াছেন, যে, তাঁহারা কৌন্সিলে না যাওয়ায় ঐ সভাগুলি অচল হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা এখন কৌন্সিলগুলিতে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় করিতে চান্। আমাদের ধারণা, ভিতর হইতেও তাঁহারা কৌন্সিলগুলিকে অচল করিতে পারিবেন না। তা ছাড়া, ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্য করিব, বলিয়া শপথ করিয়া পরে তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা আমরা অসরল ও কপট আচরণ বলিয়া মনে করি। মহাত্মা গান্ধীর মত সাধু ও সত্যবাদী লোক যে প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক ও নেতা, এইরূপ অসরল ব্যবহারের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি না।

গবর্ণমেণ্ট্ পক্ষের সব প্রস্তাবের এবং বজেটের প্রত্যেক দফার বিরুদ্ধাচরণ কোন্ ধর্ম্মের অনুমোদিত, তাহাও আমরা বুঝিতে অক্ষম। "তোমরা তোমাদের বিবেচনায় ভালই কর আর মন্দই কর, তোমাদের সঙ্গে কোন যোগ রাখিতে চাই না, কারণ তোমাদের আসল ও প্রধান মতলবটা মন্দ এবং তোমরা ন্যায়কারী ও সত্যানুসারী নও," এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ কেহ যদি গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগ না রাখেন, তবে তাঁহার আচরণের অর্থ বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু একজন অসহযোগী কৌন্সিলে গিয়া যদি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন জায়গায় জলের, ঔষধের, এবং এইরূপ অন্যান্য প্রাণধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক ব্যবস্থারও বিরোধী হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবহারের সমর্থন কেমন করিয়া করিব? আমার কিম্বা আমার দলের লোকদের দ্বারা জলের, ঔষধের, বন্দোবস্ত হইতে পারে না, অথচ অন্যকেও সে বন্দোবস্ত করিতে দিব না, ইহা কিরূপ আচরণ? গবর্ণমেণ্টের দ্বারা দেশের যে-সব কাজ হয়, তাহার কতকগুলা কিছুদিন স্থগিত থাকিলেও চলে, কতকগুলা স্থগিত থাকিলে প্রাণরক্ষা ও সমাজ-স্থিতিতে বাধা পড়ে। অতএব শেষোক্ত রকমের

কাজের ব্যবস্থা যতক্ষণ আমরা করিতে না পারি, ততক্ষণ যাহারা সেই-সব কাজ করিতেছে, তাহাদের ঐ-সব কাজে বাধা দেওয়া গর্হিত।

কুলিদের কাজেও সর্দ্দারের দরকার হয়। সব কাজেই নেতার প্রয়োজন হয়। অসহযোগ-প্রচেষ্টার প্রধান নেতা জেলে গিয়াছেন। অন্য অনেক বড় নেতাও জেলে। বাকী যাঁহারা জেলের বাহিরে আছেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক একটা করিয়া, হাত পা দু দুটা করিয়া, দিনরাত্রিও সাধারণ লোকদের মত চব্বিশ ঘণ্টাতেই হয়। কৌন্সিলে যাইতে হইলে এইরূপ প্রধান লোকেরাই যাইবেন। তাঁহারা কৌন্সিলে কেবল বাধা দেওয়ার কাজও যদি ভাল করিয়া করিতে চান, তা। হইলেও তাঁহাদিগকে বিস্তর সময় ও শক্তি তাহাতে নিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে অসহযোগ-প্রচেষ্টার গঠনমূলক কার্য্যের নেতৃত্ব তাঁহারা একাগ্রতা ও পুরা শক্তির সহিত করিতে পারিবেন না। অথচ ইহা সত্য, এবং আশা করি তাঁহারাও ইহা স্বীকার করিবেন, যে, ঐ গঠনমূলক কাজগুলি কৌন্সিলের কাজে বাধা দেওয়া অপেক্ষা অধিক আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃত্বের কাজ না হইলে কিম্বা ভাল করিয়া না হইলে অসহযোগ-প্রচেষ্টার আসল কাজ হইবে না। সুতরাং উহা পণ্ড হইবে।

অনেকে মনে করেন, উহা ত পণ্ড হইয়াছেই। আমাদের ধারণা তাহা নহে। দফা দফা করিয়া ধরিলে উহার কোনটিতেই অসহযোগীরা সাফল্য দেখাইতে পারিবেন না বটে, কিন্তু অসহযোগ-প্রচেষ্টার অনুপ্রাণনা দেশের অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা আমাদের জাতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ আত্মনির্ভরশীল, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, ত্যাগী, সাদাসিধা জীবনে অভ্যস্ত, ও দীনদুঃখীর প্রতি সমবেদনাপূর্ণ করিয়াছে। নারীদিগকে, এবং দেশের নিম্নতমস্তরের লোকদিগকেও, ইহা যতটা জাগাইয়াছে, ততটা আর কোন প্রচেষ্টা এ পর্য্যন্ত জাগাইতে পারে নাই।

আমাদের বিবেচনায় যাঁহারা কৌন্সিলে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহারা যেন কাজ করিবার জন্যও প্রবেশ করেন, কেবল অন্যের কাজে বাধা দিবার জন্য না যান।

ভারতীয় এবং সমুদয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির মোট সভ্যসংখ্যা কয়েক শত। কিন্তু মোট অসহযোগীর সংখ্যা কয়েক কোটি। বিখ্যাত কতকগুলি অসহযোগী না-হয় কৌন্সিলে গেলেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অপর কর্ম্মী অসহযোগীদের কাজ কি হইবে, এবং কে তাহার ব্যবস্থা ও পরিচালনা কার্য্যতঃ করিবে? রিপোর্টের পাতায় কাজের ব্যবস্থা দেওয়া এক কথা, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করা আর-এক কথা।

—

"অস্পৃশ্যতা"

নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের যে চুম্বক দৈনিক কাগজসমূহে বাহির হইয়াছে, তাহাতে "অস্পৃশ্যতা" দূরীকরণ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :—

"A perceptible change for the better is slowly coming over the question of untouchability, and although the difficulty of the problem is mixed up with religious belief, the general state of antipathy has disappeared and there is no room for despair."

"অস্পৃশ্যতা-সমস্যা সম্বন্ধে মন্থর গতিতে দেশে একটি পরিবর্ত্তন আসিতেছে বলিয়া অনুভব করা যাইতেছে। যদিও সমস্যাটির কঠিনতা ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত, তথাপি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিরোধী মনোভাব তিরোহিত হইয়াছে, এবং নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই।"

নৈরাশ্যের কারণ নাই, ইহা আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু অসহযোগ-প্রচেষ্টা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অস্পৃশ্যতা দূর হইবে, এ আশাও নাই। কতজন উকীল আইনের ব্যবসা ছাড়িয়াছিলেন বা স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা যেমন কমিটি দিয়াছেন, তেমনি যদি কমিটি কত জন "উচ্চ" জাতির গোঁড়া লোক অস্পৃশ্যদের সঙ্গে স্পৃশ্যদের মত ব্যবহার কাজে করিতেছেন, তাহার সংখ্যা দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইত। ইহা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি, যে, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে অসহযোগ-প্রচেষ্টা আমাদের জাতির যত লোককে যতটা সজাগ করিয়াছে, অন্য কোন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধার্ম্মিক-প্রচেষ্টা তাহা করে নাই। কিন্তু কমিটি যে বলিয়াছেন, যে, সমস্যাটির কঠিনতা ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত, ঐ কথার মধ্যেই সমাধানের সঙ্কেত এবং এ বিষয়ে অসহযোগ-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ নিহিত রহিয়াছে।

বস্তুতঃ অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ-প্রথার অঙ্গীভূত এবং ইহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত ও অমানুষিক লক্ষণ বা উপসর্গ। অস্পৃশ্যতাকে বিনাশ করিতে হইলে বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথাকেও ভাঙিতে হইবে। তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশের জাতিভেদ-প্রথা পাশ্চাত্যদেশের শ্রেণীবিভাগের মত নহে, কারণ পাশ্চাত্য শ্রেণীবিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর একত্র আহার এবং ঔদ্বাহিক আদান প্রদানে ঐকান্তিক বাধা নাই। আমাদের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সঙ্গে বরং আমেরিকার শ্বেতকায় ও নিগ্রোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের তুলনা করা যায়। যে-কারণে আমরা আমেরিকাকে দোষ দি, সেই কারণে আমাদের নিজেদেরও দোষ স্বীকার ও সংশোধন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

আমেরিকা নিগ্রোকে অবজ্ঞা করিয়া এবং অপমানকর অবস্থাতে রাখিয়াও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, উহা এ পর্য্যন্ত রক্ষাও করিতেছে। সুতরাং কোন দেশে কোন অবস্থাতেই শ্রেণীবিশেষের অস্পৃশ্যতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, এমন নয়। বাংলা দেশে, মহারাষ্ট্রে, এবং অন্য অনেক প্রদেশে অনেকে এই কারণে মনে করেন, যে, অসহযোগ-প্রচেষ্টায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে এত বড় একটা স্থান দিবার প্রয়োজন নাই। এবং এইরূপ একটা মত থাকায় আমরাও মনে করি, যে, কেবল রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রেরণার বশে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হইবে না। যে প্রকার আধ্যাত্মিক প্রেরণার দ্বারা হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলে আমেরিকার শ্বেতকায়েরা নিগ্রোদিগকে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাম্যলাভে বাধা দিবে না, আমাদের মধ্যেও সেই প্রকার আধ্যাত্মিক প্রভাব যদি কাজ করে, এবং তদ্দ্বারা আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে "অস্পৃশ্যতা" সম্বন্ধীয় কুসংস্কার বিনষ্ট হইবে। তখন বর্ত্তমান আকারের জাতিভেদও টিকিবে না; যদি উহা থাকে, ত, উহা কেবল শ্রেণীবিভাগরূপে থাকিবে। এই-সব পরিবর্ত্তন আধ্যাত্মিক প্রভাবে হইলে সুফল হইবে।

—

ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সদ্ভাব

"অস্পৃশ্য" জাতিরা শিক্ষাবিষয়ে ও ধনশালিতায় নগণ্য, যোদ্ধা বলিয়াও তাঁহাদের বিশেষ খ্যাতি নাই। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন, এখনও অনেক দেশী রাজা মুসলমান, তাঁহাদের মধ্যে ধনী, শিক্ষিত ও পদমর্য্যাদাবিশিষ্ট লোক অনেক আছেন। যোদ্ধা বলিয়া মুসলমানদের খ্যাতি আছে। তদ্ভিন্ন স্বাধীন মুসলমান বিদেশী জাতি ও রাজা থাকায় ভারতবর্ষের মুসলমানদের গৌরব আছে। এই-সকল কারণে রাজনৈতিক হিসাবে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে অসদ্ভাব এ পর্য্যন্ত যত কঠিন সমস্যা বলিয়া প্রতীত হইয়া আসিতেছে, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে অসদ্ভাব তত বড় সমস্যা বলিয়া প্রতীত হয় নাই। "অস্পৃশ্যতা"র বিনাশ কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার আভাস উপরে দিয়াছি। হিন্দু-মুসলমানের কিম্বা অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব কি প্রকারে স্থাপিত হইতে পারে, তাহা বলাও সহজ নহে। তবে ইহা নিশ্চিত, যে, হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু থাকিলে যতদিন প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্ব বা প্রবলতা থাকিবে, ততদিন হিন্দুমুসলমানের অসদ্ভাব কতকটা চাপা থাকিবে। কিন্তু এপথে অসদ্ভাবের বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

অনেকে পৃথিবীর সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষাদ্বেষের অস্তিত্ব দেখিয়া ধর্ম্ম জিনিষটারই বিলোপসাধন করিয়া সকলের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিতে চান। তাঁহারা ধর্ম্মের জায়গায় মানুষের বুদ্ধিকে (reasonকে) প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের সময় যাহারা ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন করিয়া তাহার জায়গায় বুদ্ধিকে (reasonকে) খাড়া করিয়াছিল, তাহারা হিংসাদ্বেষের বশে রক্তপাত খুব করিয়াছিল।

ধর্ম্মকে কেহ বিনাশ করিতে পারিবে না। উহা থাকা চাই। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে যাহা নিত্য ও সনাতন, তাহা অপেক্ষা লোকে কোন না কোন বাহ্য অনুষ্ঠানকেই অধিক আবশ্যক মনে করায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হয়।

সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মনের ভাব যাহা ছিল, তিনি যে-পথ ধরিয়াছিলেন, এবং পরে পরস্পরের সমসাময়িক কেশবচন্দ্র সেন ও পরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশে যাহা স্ফুটতর হইয়াছিল, তাহার প্রভাব যত বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত হইবে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ তত কমিবে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

বহুবৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ আমরা মডার্ন্ রিভিউ ও প্রবাসীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচনা করিয়া আসিতেছি। অধিকাংশ সম্পাদক এবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। কিছু দিন হইতে অনেক কাগজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আলোচিত হইতেছে। ঔদাসীন্য কাটিয়া গিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু আলোচনা যে ভাবে হইতেছে, তাহাতে সন্তুষ্ট বা আশান্বিত হওয়া যায় না। যখন ভারত-গবর্ণ্মেণ্টের প্রধান শিক্ষাকর্ম্মচারী শার্প্ সাহেবকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের নামে উহার রেজিষ্ট্রার একটা কড়া চিঠি লিখেন ও তাহা বিশ্ববিদ্যালয়েরই পক্ষ হইতে দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়, তখন কোন কোন সম্পাদক ভারতগবর্ণ্মেণ্ট তথা শার্পের এবং অপর কোন কোন সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা কোন পক্ষ অবলম্বন করি নাই। উভয়েরই সপক্ষে ও বিপক্ষে কমবেশী বলিবার কথা ছিল এবং তাহা আমরা বলিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে দেখিতেছি, সত্য ও ন্যায্য ও হিতকর কি, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা অপেক্ষা দলাদলির ভাব বেশী প্রবল হইয়াছে। ইহাতে কল্যাণ নাই। বেশীর ভাগ খবরের কাগজ এইভাবের কথা লিখিতেছেন, যে, গবর্ণ্মেণ্ট যথেষ্ট টাকা না দেওয়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থা হইয়াছে। তাহা সত্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরদর্শিতা ও অপব্যয় দুরবস্থার কারণ।

স্যার্ মাইকেল স্যাড্লারের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসাইবার উদ্দেশ্যই এই ছিল, যে, তাহার রিপোর্ট্ বিবেচনা করিয়া ভারতগবর্ণ্মেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও পুনর্গঠন করিবেন। রিপোর্ট্ বাহির হইবার পর দেখা গেল, যে, কমিশন আমূল পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন এবং তদনুরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। এই প্রকারের পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠন ভাল কি মন্দ, আবশ্যক কি অনাবশ্যক, কিম্বা কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব আবশ্যক ও হিতকর, তাহার আলোচনা এস্থলে করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে কেবল বক্তব্য এই, যে, কমিশনের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন রকমে বিশ্ববিদ্যালয়কে চালাইতে হইলে অনেক লক্ষ টাকা এককালীন ও বৎসরে বৎসরে খরচ করিতে হইবে। ইহা অধিক হইলেও এক কোটি টাকার মধ্যে। এরূপ খরচ করিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্ণ্মেণ্টের নিশ্চয়ই ছিল; কেননা ঐ গবর্ণমেণ্ট সামরিক ব্যয় কোটি কোটি টাকা বাড়াইয়া চলিতেছেন। কিন্তু ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট কিম্বা কোন প্রাদেশিক গবর্ণ্মেণ্ট্ই কখন সাধারণ নিম্ন, মধ্য বা উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার জন্য যথেষ্ট খরচ করেন নাই। সুতরাং আমাদের এরূপ আশা ছিল না, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কমিশনের অভিপ্রায় অনুযায়ী আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য ভারত গবর্ণ্মেণ্ট্ যথেষ্ট টাকা খরচ করিবেন।

ইতিমধ্যে, কমিশনের কাজ শেষ হইয়া যাইবার পর, মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড রিপোর্ট্ অনুসারে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হইল, এবং তদনুসারে প্রত্যেক প্রদেশের সর্ব্ববিধ শিক্ষার ভার উহার প্রাদেশিক গবর্ণ্মেণ্টের উপর ন্যস্ত হইল। এখন ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্ একটা বেশ সুযোগ পাইয়া গেলেন। নিজে কমিশন বসাইয়া ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন; কারণ কমিশন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছিলেন। শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্ কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করা না-করার ভার বাংলা-গবর্ণ্মেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া অব্যাহতি পাইলেন। বাংলা-গবর্ণ্মেণ্ট্, কমিশনের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যত টাকা আবশ্যক, তাহা ভারত-গবর্ণ্মেণ্টের নিকট দাবী করিয়াছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু করা উচিত। করিবার পর যদি ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্ বলেন, "টাকা দিব না" বা "দিতে পারিব না," তাহা হইলে বাংলা-গবর্ণ-

মেণ্ট্ ও ন্যায়তঃ অনায়াসে বলিতে পারেন, "স্যাড্‌লার কমিশন আমরা বসাই নাই, আপনারা বসাইয়াছিলেন। উহার প্রস্তাব-সকল কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব আমাদের নহে, আপনাদের। আপনারা যখন ঐ দায়িত্ব লইবেন না, তখন প্রস্তাব-সকল অনুসারে কাজ করা বা না-করা সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।" আমরা বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ হইলে যাহা করিতাম, উপরে তাহার আভাস দিলাম।

যাহা হউক, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, স্যাড্‌লার কমিশনের প্রস্তাবগুলি সবই ভাল, (আমরা স্বীকার করি না, যে, সব প্রস্তাবগুলি ভাল,) তাহা হইলেও দেখিতে হইবে, যে, তদনুসারে কাজ করিতে হইলে যত টাকার দরকার, বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ তাহা খরচ করিতে পারেন কি না। আমাদের ধারণা এই, যে, যদি বাংলা দেশের সমুদয় রাজকর্ম্মচারীদের বেতন দেশের আয় অনুযায়ী করা হয়, যদি জাপানের মত যুক্তিসঙ্গত করা হয়, যদি কমিশনার, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার, প্রভৃতি অনাবশ্যক পদ এবং কয়েকটি অনাবশ্যক ডিপার্ট্‌মেণ্ট্ বা শাসন-বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার পর শিক্ষাদান-কার্য্যকে তাহার উপযুক্ত গৌরবের স্থান দিয়া অন্যান্য বিভাগের তুলনায় শিক্ষাবিভাগকে তাহার গুরুত্ব অনুযায়ী যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্যাড্‌লার্ কমিশনের প্রস্তাবিত টাকা বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরচ করিতে পারেন। কিন্তু এখন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা যেরূপ আছে, তাহাতে পুলিস্ বিভাগ প্রভৃতি "হস্তে রক্ষিত" (reserved) বিষয়ের জন্য খুব বেশী টাকা লইয়া তাহার পর দেশী মন্ত্রীদের "হস্তান্তরিত" (transferred) শিক্ষা প্রভৃতির জন্য অযথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়। এই কারণে শাসন-ব্যবস্থার দোষে নিম্ন মধ্য উচ্চ কৃষি শিল্প বাণিজ্য কোন প্রকার শিক্ষার জন্যই যথেষ্ট টাকা দিবার সামর্থ্য বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্টের নাই।

বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের এক নম্বর বেকুবি এই হইয়াছে, যে, তাঁহারা এমন গবর্ণ্‌মেণ্টের চাকরী কেন লইলেন, যে-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ভিন্নভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালন নিমিত্ত রাজস্ব বণ্টনের সময় তাঁহাদের হস্তে অর্পিত বিভাগগুলিকে যথেষ্ট টাকা দিবে না। দুই নম্বর বেকুবি এই হইয়াছে, যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই সঙ্গতিপন্ন লোক হওয়া সত্ত্বেও কেন বার্ষিক ৬৪০০০ টাকার কম বেতন লইতে রাজী হইলেন না। তাহাতে ফল এই হইয়াছে, যে, কোন প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট টাকা না দিলেই লোকে স্বভাবতঃ বলে, "ভায়া, তোমরা নিজে বৎসরে ৬৪০০০ লইতে পার, আর ভাল কাজের বেলা টাকা দিতে পার না?" মন্ত্রীদের তিন নম্বর বেকুবির কথাটা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বিবৃতির সম্পূর্ণতার খাতিরে বলিতেছি। তাহা, গবর্ণ্‌মেণ্টের কাজ চালাইবার জন্য নূতন ট্যাক্স্ স্থাপনে মত দেওয়া। তাহাতে ফল এই হইয়াছে, যে, লোকে নূতন শাসন-প্রণালীর কোন সুফল দেখিবার পূর্ব্বেই ট্যাক্সবৃদ্ধিরূপ কুফলটা আগে দেখিল। এই-সব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঁইরা ও অন্যেরা সহজেই লোককে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইতে পারে।

ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এপর্য্যন্ত যত টাকা দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা দেওয়া উচিত ছিল। বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্টেরও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেওয়া উচিত। সেই টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইবে, তাহার সর্ত্ত পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ করিবার অধিকার গবর্ণ্‌মেণ্টের আছে, প্রত্যেক দাতারই আছে। এবং নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য, কেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ে অপব্যয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আয়ের টাকা কি প্রকারে ব্যয়িত হইবে, সে সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়সম্পর্কীয় আইনে গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে যাহা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বেশী গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কিছু করিতে পারেন না, করা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই ক্ষমতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা ভ্রান্ত। আমরা আগষ্ট্ মাসের মডার্ন্ রিভিউ এবং ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে এবিষয়ে আমাদের মত যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করিয়াছি। তাহার ভুল এপর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। আমরা

এই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মোক্তারেরা স্বাধীনতার কথা তুলিয়া আপনাদিগকে হাস্যাস্পদ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ব্যয় সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে এবং ব্যয়ের ক্ষমতা বাংলা-গবর্ণমেণ্টের ও উহার শিক্ষামন্ত্রীর হাতে যাইবে। যদি খসড়ায় এইরূপ বিধি থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা আছে? না, সে স্বাধীনতাটা ব্যক্তিবিশেষের "মুঠার ভিতর"? উহার খরচ কি সেনেট, সীণ্ডিকেট্, বা হিসাবের বোর্ড (Board of Accounts) যেরূপ আগে হইতে নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ হয়? আগে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে বজেট্ প্রস্তুত হইয়া গেলে তাহার পর তদনুসারে খরচ হয় কি? ইহা কি সত্য নহে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৎসর আরম্ভ হইবার পরে অনেক মাস যথেষ্ট খরচ হইবার পর অনেক বৎসর হইতে বজেট্ পাস্ ও মঞ্জুর হইয়া আসিতেছে? বাংলাদেশের একাউণ্ট্যাণ্ট্-জেনের্যাল কি হিসাব পরীক্ষা করাইয়া দেখান নাই, যে, বজেটে নির্দ্দিষ্ট টাকা অপেক্ষা বিনা মঞ্জুরীতে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে? হিসাব-বোর্ড সম্বন্ধীয় যে-সব নিয়ম অনেক বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা কেন সেনেটে পেশ্ করিয়া পাস্ করান হয় নাই, এবং কেন সেই-সব নিয়ম অনুসারে কাজ হয় নাই? স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা অনুসারে খরচ হইলে তাহার নাম যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা, তাহা হইলে তাহা আছে বটে। যাহা হউক, যদি সেনেটের সভ্যগণ **প্রকৃত** স্বাধীনতা চান, তাহা হইলে তাঁহারা যথাসময়ে যথানিয়মে বজেট হওয়ার পর তদনুসারে খরচ করাইয়া **দেখান**, যে, তাঁহারা স্বাধীনতার মানে বুঝেন ও তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ। নতুবা শুধু, স্বাধীনতা গেল, স্বাধীনতা গেল, বলিয়া চেঁচাইলে কি হইবে? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।

যাহা হউক, স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার অনুচরদের দল চিরকাল শক্তিশালী থাকিবেন না; বাংলা-গবর্ণমেণ্ট্ বা উহার শিক্ষাবিভাগ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিজের হাতে পাইলে অপব্যবহার করিবেন না, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব, আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ খরচ গবর্ণমেণ্ট্ বা শিক্ষামন্ত্রীর হুকুম অনুসারে হইবে, এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত নয়; ব্যবস্থা এইরূপ হওয়া উচিত, যে, বর্ষারম্ভের আগে বজেট্ হইবে; ঐ বজেট্ বর্ষারম্ভের আগে সেনেট, আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তনের পর, মঞ্জুর করিবেন। তাহার পর তদনুসারে খরচ হইবে।

স্বাধীনতার সুব্যবহার করিবার এবং তাহা রক্ষা করিবার উপযুক্ত মানুষ থাকা চাই। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থিতি (constitution) আবশ্যকমত পুনর্গঠিত হওয়া দরকার। সেনেট্‌কে যথাসম্ভব স্বাধীন মনুষ্যসমষ্টি করিবার জন্য উহার খুব বেশী অংশ—অন্যূন শতকরা ৯০জন—নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। বাকী শতকরা ১০জন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও মনোনীত লোক হইবেন। নূতন আইনের খসড়া না দেখিলে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় না।

তবে একটা কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত, তাহা আগে একাধিক বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্, স্বাধীনচিত্ত লোকেরা নিঃস্বার্থভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরিশ্রম করিতে যদি রাজী না থাকেন, তাহা হইলে আশু-বাবুর একচ্ছত্র রাজত্বের বিরুদ্ধে চীৎকার নিরর্থক। যে পরিশ্রম করিবে, ক্ষমতা তাহার হাতে না আসিয়া অলসের হাতে আসিতে পারে না। অবশ্য আশু-বাবু কেবল পরিশ্রমের দ্বারাই ক্ষমতাশালী হইয়াছেন, এমন নয়। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি দল বাঁধিয়াছেন, এবং তাঁহার হাতে মানুষকে টাকা পাওয়াইয়া দিবার যত উপায় আছে, তাহা বাংলাদেশের আর কাহারও হাতে নাই। তা ছাড়া তাঁহার এবং বাংলাদেশের অন্য নামজাদা লোকদের মধ্যে একটা তফাৎ এই আছে, যে, তিনি অনুগত লোকদের ও স্তাবকদের সাংসারিক উপকার করিতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত এবং

তজ্জন্য দুর্ণাম সহ্য করিবার শক্তিও তাঁহার আছে। কূটনীতি, চাতুরী ও কৌশলেও কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে। দেশী সম্পাদকের দ্বারা পরিচালিত আজকালকার খবরের কাগজগুলি পড়িলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বেঙ্গলীতে দেখিলাম নূতন আইনের খসড়ায় সেনেটের সভ্যসংখ্যা ১৪০ হইবে, এবং তাহার অর্দ্ধেক আন্দাজ নির্ব্বাচিত এবং বাকী অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও গবর্ণমেণ্টের মনোনীত লোক হইবেন। আমরা এইরূপ ব্যবস্থার বিরোধী। শতকরা নব্বই জন সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। বাকী সভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বা মনোনীত লোক হইলেই যথেষ্ট। নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্যে যদি এমন কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর লোক না থাকেন, যাহাদের লোক থাকা গবর্ণমেণ্ট্ দরকার মনে করেন, তাহা হইলে সেইরূপ লোক সরকার মনোনীত করিয়া দিতে পারেন; ইহা হইলেই যথেষ্ট।

আমরা বলিয়াছি, আমরা কেবলমাত্র অর্দ্ধেক সভ্যের নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু যাহারা সেনেটের বর্ত্তমান সংস্থিতিতে (constitutionএ) সন্তুষ্ট, বিশেষতঃ যে-সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অম্লানবদনে আশু-বাবুর তাবেদারী করিতেছেন, সেই-সব সেনেট-সভ্য ও অন্য লোকদের এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক নহে বলিয়া চীৎকার করিবার অধিকার নাই। কারণ বর্ত্তমানে রেজিষ্টরীভুক্ত গ্রাজুয়েট্‌রা ১০০ সাধারণ ফেলোদের মধ্যে মাত্র দশজনকে নির্ব্বাচিত করেন, আর দশ জন ফেকাল্‌টিসমূহ দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। বাকী আশীজন চ্যান্সেলার মনোনয়ন করেন। নূতন আইনের খসড়ায় নির্ব্বাচিতদের অনুপাত ও সংখ্যা, আমাদের মনঃপূত না হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থায় উহা যেরূপ আছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী।

বেঙ্গলীতে দেখিলাম, ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে সেনেটের সভ্যের সংখ্যা বা অনুপাত নির্দ্দেশের মত একটা কি ব্যবস্থা নূতন আইনের খসড়ায় আছে। আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিদ্যামন্দিরে এরূপ ভেদবুদ্ধি থাকা উচিত নয়। দেশে স্বতন্ত্র হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার অশুভ দিক্ যথেষ্ট আছে। তাহার উপর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-সকলেও ধর্ম্ম অনুসারে সভ্যনির্ব্বাচন মোটেই হওয়া উচিত নয়। যদি সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা কোন বা যথেষ্ট মুসলমান নির্ব্বাচিত না হন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট্ যে-কয়জনকে মনোনীত করিবেন তাঁহাদের মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক মুসলমান রাখিতে পারেন।

খসড়া হস্তগত হইলে বিস্তারিত আলোচনা করা চলিবে।

—

মোক্তারী পরীক্ষা

সেদিন একখানি দৈনিকে দেখিলাম, এবার মোক্তারী পরীক্ষা হইবে না, অথচ জেলায় জেলায় পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে ফী লওয়া হইতেছে। একথা সত্য হইলে ফীগুলি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া উচিত, এবং প্লীডারী ও মোক্তারী পরীক্ষার জন্য সেক্রেটারীর বেতন বাবতে যাহা খরচ হয়, তাহাও বন্ধ করা উচিত। বর্ত্তমান বৎসরে ২১শে মার্চ্চ্ তারিখে বাংলার বজেট আলোচনার সময় মৌলবী হামিদ উদ্দীন খাঁ প্রস্তাব করেন, যে, প্লীডারী ও মোক্তারী পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ ১৪৪০০ টাকার জায়গায় তাহা কমাইয়া ৫০০০ করা হউক; কারণ প্লীডারী উঠিয়া গিয়াছে, তাহার পরীক্ষা ২ দিন হইত ও মোক্তারীর হইত ১ দিন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বলেন, যে, যদিও প্লীডারী দুইবৎসর আগে রহিত হইয়াছে, তথাপি তাহার খরচটা চলিতেছে ("Although that examination was abolished two years ago, still the charge continues.") তিনি আরও বলেন,

"What I want to say is that I do not understand why, after the pleadership examination had been abolished, there should still be a Secretary of the Examination Board on Rs. 500 a month, unless it is for the reason that he happens to be the editor of the *Indian Daily News* and that his services are required for other purposes by the President of the Examination Board. For any purpose like this the country must not be bled."—*Bengal Legislative Council Proceedings*, Volume VII—No. 5, pp. 115—116.

আরো তর্কবিতর্কের পর মৌলবী হামিদ উদ্দিন খাঁর প্রস্তাব গৃহীত ও মঞ্জুরী টাকা ৫০০ হয়। কিন্তু যদি মোক্তারী পরীক্ষাও সত্যসত্যই না হয়, তাহা হইলে এই অপব্যয়ই বা কেন হয়?

—

রাজশক্তি ও ধর্ম্মগুরুর শক্তি

এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে, যে, তুরস্কের রাজপরিবার হইতে যিনি খলিফা নির্ব্বাচিত হইবেন, তিনি কেবল ধর্ম্মগুরুই হইবেন, তাঁহার কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি থাকিবে না। ইহা সত্য কি না এখনও ঠিক বলা যায় না। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলেও মুসলমানদের চিন্তার কারণ নাই, কেননা আঙ্গোরায় স্থাপিত তুর্ক গবর্ণমেণ্ট্ খলিফার পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন। তা ছাড়া, জগতের ইতিহাসে এরূপ ব্যবস্থা নূতন নহে। রোমান্ ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মগুরু পোপের আগে রাজ্য ও রাজশক্তিও ছিল। এখন তাহা নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রভাব কমে নাই। বরং তিনি নিজের চরিত্রবলে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে যাহা করিতে পারেন, তাহার মূল্য ও গৌরব বাড়িয়াছে।

—

কৌন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে মুসলমান মত

সেণ্ট্র্যাল খিলাফৎ কমিটি দ্বারা নিযুক্ত নিরুপদ্রব-আইন-লঙ্ঘন-তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট্ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কেবলমাত্র মৌলবী জহুর আহমদ কৌন্সিলে প্রবেশের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটির অন্য সকলে বলেন, কৌন্সিলে প্রবেশের প্রশ্নটা তোলাই এখন অসাময়িক। তাঁহাদের মতে অসহযোগ-প্রচেষ্টা উপলক্ষে যেরূপ প্রভূত স্বার্থবলিদান করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া, অনেক নেতা ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী যতদিন জেলে আছেন, ততদিন এ প্রশ্নের বিচার করাটাই জাতির পক্ষে অসম্মানকর। বর্ত্তমানে জাতির মধ্যে স্বার্থত্যাগের ভাব এবং কর্ম্মিষ্ঠতার ক্ষমতা উৎপাদনেই আমাদের সমুদয় শক্তি প্রযুক্ত হওয়া উচিত। অন্য দিকে এখন মন দিলে বিপদ্ ঘটিবে। কৌন্সিলে প্রবেশ বিষয়ে আলোচনা এখন স্থগিত রাখা উচিত। নতুবা অশুভ ফল ফলিবে।

জামিয়ৎ-উল্-উলেমাও কৌন্সিলে প্রবেশ এবং অন্য সকল প্রকার সহযোগিতার বিরোধী।

—

ভারতীয় মুসলমানগণ ও কমালের দল

জামিয়ৎ-উল্-উলেমা এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক মুসলমান আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিতেছেন। কমালের দল যে ইস্‌লামের মহৎ সেবা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের প্রতি ইঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

—

উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবন

উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবনে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্য দেশের দরিদ্র ও সম্পন্ন লোকেরা এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। অন্ন- ও বস্ত্র-সাহায্যদান, রোগীর চিকিৎসা, পুষ্করিণী ও কূপের জল-সংশোধন, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য স্বেচ্ছাসেবকেরা উৎসাহ শৃঙ্খলা ও একাগ্রতার সহিত করিতেছেন। কয়েক লক্ষ টাকা প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে উঠিয়াছে, এবং চাউল, নূতন ও পুরাতন কাপড়, জামা, কম্বল, ঔষধ, পথ্য, গৃহনির্ম্মাণের দ্রব্যও অনেক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সকলের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার, যে, সাহায্য যত পাওয়া গিয়াছে, আহা অপেক্ষা আরও বেশী সাহায্য এখনও চাই। নতুবা বিপন্ন লোকদিগকে আগেকার অবস্থায় দাঁড় করাইতে পারা যাইবে না। অতএব কলিকাতার চেষ্টা চলিতে থাক্, কিন্তু কলিকাতার বাহিরে বাড়ীতে বাড়ীতে সকল রকম সাহায্য শৃঙ্খলার সহিত ভিক্ষা করা হউক।

আমরা যেসব ছবি ছাপিলাম, তাহার দুইখানি ছাড়া অন্যগুলির ফোটোগ্রাফ বঙ্গীয় রিলীফ কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ নিজ ব্যয়ে তুলিয়া দিয়াছেন।

—

জলপ্লাবন ও গবর্ন্মেণ্ট্

জলপ্লাবনে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ গবর্ন্মেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য তৎপরতার সহিত যথাসময়ে ও

যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই। বরং উল্টাদিকে বিপদের ও ক্ষতির মাত্রা কম করিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের অনিষ্ট করিয়াছেন। দেশী মন্ত্রী ও দেশী শাসন-পরিষদের সদস্য থাকায় অনিষ্ট বেশী হইয়াছে কারণ তাঁহাদের যথেষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সহৃদয়তার অভাব-বশতঃ বিদেশী শাসনকর্ত্তারাও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে বেশী সাহস পাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের অঙ্গীভূত দেশী লোকদের এই অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ত বলিয়াই বসিয়াছেন, যে, গভর্ন্মেণ্ট্‌টা একটা অন্নসত্র বা অন্যবিধ দাতব্য সমিতি নহে, ইহা একটা কার্‌বারের মত (a business concern)। মহারাজাধিরাজ বোধ করি জানেন না বা শুনেন নাই,যে,স্বাধীনদেশে বাৰ্দ্ধক্যের জন্য মানুষ মাত্রকেই পেন্সান দিবার ব্যবস্থা (old age pensions), দরিদ্রদিগকে সাহায্য দিবার আইন (poor laws), বেকার লোকদের কাজ জুটাইবার সরকারী আফিস (unemployment bureau), বেকার লোকদিগকে নিয়মিত সাহায্য দিবার সরকারী ব্যবস্থা, প্রভৃতি আছে। অথবা তিনি জানিয়া শুনিয়াও গোরা মনিবদিগকে খুশি করিবার জন্য ন্যাকা সাজিয়া থাকিবেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি গবর্ন্মেণ্ট্‌টা কারবারই হয়, তাহা হইলেও, যে-সব মানুষের কাছে পবে খাজ্‌না আদায় করিয়া কার্‌বার্‌ চালাইতে ও মুনফা দেখাইতে হইবে, তাহাদিগকে বাঁচাইয়া সুস্থ সবল রাখা বুদ্ধিমান্‌ কার্‌বারীর কাজ।

গবর্ন্মেণ্ট্‌টা যদি কার্‌বার্‌ হইত, তাহা হইলে, বৰ্দ্ধমানের জমিদার মহাশয় মনে রাখিবেন, শ্বেত ও অশ্বেত গবর্ণ্মেণ্টের কোন উচ্চপদস্থ কৰ্ম্মচারীই এত মোটা মাহিনা পাইতেন না। তাঁহাদের বাজার-দর এত বেশী নয়; এবং কার্‌বারের নিয়ম সুলভতম মূল্যে উৎকৃষ্টতম জিনিষ ক্রয়। যে-কোন দিন বিজ্ঞাপন দিলে জগতে মানুষের বাজারে বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সব মোটা মাহিনার যোগ্য কৰ্ম্মচারী বৰ্ত্তমান বেতন অপেক্ষা অনেক কমবেতনে পাওয়া যায়।

গুরু-কা-বাগে আহতদের তালিকা

গুরু-কা বাগে মহন্ত ও শিখদের বিবাদ আসলে সম্পত্তি লইয়া, অর্থাৎ উহার জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা হইতে পারিত এবং এখনও পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মহন্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া "ন্যূনতম" বল প্রয়োগ দ্বারা অকালী শিখ্‌দিগকে গুরু-কা-বাগ হইতে অনেক দিন ভাগাইতে থাকেন। এই "ন্যূনতম" বলপ্রয়োগের ফলে জনকয়েকের মৃত্যু হইয়াছে, এবং অন্য অনেকে গুরুতর আঘাত পাইয়া হাসপাতালে যাইতে বাধ্য হয়। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত কৰ্ম্মচারী কর্ণেল্‌ গুলাব্‌ সিং-প্রদত্ত তাহাদের নিম্নলিখিত তালিকা শিখ্‌দের শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো ১৩০ জন আহত হয়, কিন্তু চিকিৎসকের সাহায্য পায় নাই।

Injuries above the trunk	269
" on the frontal part of the body	300
" to brain	79
" " testicles	60
" " perineum	19
" " teeth	7
Contused wounds	158
Incised wounds	8
Punctured wounds	2
Urine trouble	40
Fractures	9
Dislocations	2

Note:—Injuries on the back, buttocks and legs have not been enumerated in the list.

—

লস্করের মহৎ কাৰ্য্য

গত ২২শেকার্ত্তিক যখন "নলিনী" জাহাজ কাশীপুরের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ছুলা মিঞা নামক একজন লস্কর দেখিতে পায়, যে, কে একজন গঙ্গায় হাবু-ডুবু খাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ দড়িতে বাঁধা একটা জীবন-রক্ষক কটিবন্ধ (life-belt) লোকটিকে ছুড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ আর-একটি জীবন-রক্ষক কটিবন্ধ বগলদাবা করিয়া স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে সে একটি নিমজ্জমান স্ত্রীলোককে চুল ধরিয়া তুলিতেছে। তাহার পর সে বহুআয়াসে স্ত্রীলোকটিকে ঘাটে শুক্‌নো ডাঙার

তুলিল। দুলা মিঞা নিজের বিপদের কথা না ভাবিয়া যে সাহস ও দয়ার কাজ করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে সমুচিত পুরস্কার এবং একটি স্মারক পদক দেওয়া উচিত।

—

জনতার ভীরুতা

অনেক খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, কলিকাতায় একজন পাগলের কথা অনুসারে একজন পুলিশ কনষ্টেব্‌ল্ যতীন্দ্র ধারী নামক এক ব্যক্তিতে গ্রেপ্তার করিতে যায়। সে পলাইয়া এক দোকানে আশ্রয় লয়। পাহারাওয়ালা সিটি দেয় এবং আর কয়েকজন পাহারাওয়ালা আসিয়া হাজির হয়। যতীন্দ্রকে তাহারা নগ্ন অবস্থায় দোকান হইতে টানিয়া আনে এবং এরূপ প্রহার করে যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। তাহার পর একজন পাহারাওয়ালা তাহার পেটের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে। ফলে তাহার অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে এবং লোকেরা চেঁচাইয়া উঠে যে সে মরিয়া গিয়াছে। তখন পাহারাওয়ালারা ভয়ে পলাইয়া যায়। যতীন্দ্রকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়। সে কপালের জোরে বাঁচিয়া উঠে। কিন্তু তাহার নামে মোকদ্দমা হয়। যাহা হউক সে বেকসুর খালাস পায়। পাহারাওয়ালাদের দুই জনের সামান্য দণ্ড হয়। উপস্থিত অন্য পাহারাওয়ালাদের কোন শাস্তি হয় নাই। বিচারক খুব কড়া রায় দেন, কিন্তু শাস্তিটা হয় খুব লঘু। এই-সমস্ত কথা পাঠকেরা আরো বিস্তারিত ভাবে পড়িয়া থাকিবেন। পাহারাওয়ালারা যে বেআইনী এবং পৈশাচিক নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছে, এবং বিচারকের যে তাহাদিগকে আরো কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচারকের রায়ে আছে, যে, পাঁচশত লোক ঘটনাস্থলে জমা হইয়াছিল; তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা মানুষের প্রতি এইরূপ অত্যাচার দেখিল, কেহ পাহারাওয়ালার বেআইনী নৃশংসতায় বাধা দিল না, ইহা কিরূপ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা পুলিসের আছে, তাহাকে প্রহার করিয়া অজ্ঞান করিবার ও তাহার পেটের উপর নৃত্য করিবার অধিকার নাই। সত্য বটে, এই পৈশাচিক আচরণে কেহ বাধা দিলে "সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেওয়া" অপরাধে তাহার নামে নালিশ ত হইতই, অধিকন্তু তাহার আগেই তাহারও পেটের উপর পাহারাওয়ালা নৃত্য করিতে পারিত। কিন্তু, পরাধীনতা ও পুলিসের অত্যাচার আমাদিগকে কাপুরুষ করিয়াছে, না, আমরা কাপুরুষ বলিয়াই পরাধীন হইয়াছি ও পুলিসের অত্যাচার আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও, আমরা যে ভীরু, ইহা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া আমাদিগকে মানিতেই হইবে। কোন স্বাধীন ও সাহসী জাতির দেশে পাঁচশত মানুষ দাঁড়াইয়া এইরূপ অত্যাচার নিষ্ক্রিয়ভাবে দেখিতে পারিত না।

—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে"

ইংরেজ এবং অন্য সব শ্বেতকায় মানুষদিগকে বিধাতা পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা রূপে পৃথিবীর সকল দেশে যাইবার অধিকার দিয়াছেন। তাহারা যেখানে ইচ্ছা গিয়া যা-খুশি করিতে পারে। পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের সব জাতির লোক বাংলাদেশে আসিয়া সব রকম কাজ করিতে ও ধন উপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে গিয়া সামান্য কিছু রোজগার করিলেও তথাকার লোকদের এবং ইংরেজদের চোখ টাটায়। বাঙালী বঙ্গের বাহিরে ভারতের সব প্রদেশে ইণ্টারলোপার অর্থাৎ অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী, ইংরেজ কোথাও ইণ্টারলোপার নহে! এ-সব পুরাতন কথা। এবার কিন্তু একটু নূতন রকমের কথা পড়া গেল। এবার পড়া গেল, বাঙালী নিজের পৈত্রিক ভিটাতেও ইণ্টারলোপার। একঘেয়ে কিছুই ভাল নয়।

পাটনা হইতে বেহার হেরাল্ড্ নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক বাহির হয়। ইহা ভাল কাগজ ও অতি পুরাতন কাগজ, সব বাঙালীর পড়া উচিত। বিহার-ওড়িষা প্রদেশের শ্রম-শিল্পসমূহের পরিচালক মিঃ

আবড়ী কলিন্স্ প্রণীত একটি পুস্তিকা হইতে বেহার হেরাল্ড্ কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিঃ কলিন্স্ বলেন, যে, ঐ প্রদেশের লোকদের সজাগ হইয়া দেখা উচিত, যে, সব লাভটা অন্য জাতিদের পকেটে না যায় ("it is for the people of the province to bestir themselves and see that all the profits do not go into the pockets of other races")। বেশ কথা; ইহাতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তিনি যখন বলিতেছেন, যে, কয়লার খনিগুলি বাঙালীদের আনন্দদায়ক শিকারের জায়গা ("the coalfields are the happy hunting-ground of the Bengali"), তখন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইতে হয়। কারণ, বিহার প্রদেশের অধিকাংশ কয়লার খনি মানভূম জেলায় অবস্থিত। মানভূম কত শত শত বা কত হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙালীর বাসভূমি, তাহা কেহ বলিতে পারে না। হাজার হাজার হিন্দীভাষী কুলি মজুরীর জন্য ঐ জেলায় আসা সত্ত্বেও মানভূমের ১৫ লক্ষ অধিবাসীর এখনও দশ লক্ষ বাঙ্গালী। মানভূম প্রাকৃতিক বাংলার একটি অংশ। শাসন-কার্য্যের "সুবিধার জন্য" কয়েক বৎসর হইল উহা বেহার প্রদেশের সামিল হইয়াছে বলিয়াই উহা অবাঙালীর দেশ হইয়া যায় নাই। অথচ মিঃ কলিন্সের মতে ওখানে বাঙ্গালীদের কয়লার খনি থাকা উচিত নয়! বাঙ্গালী তাহা হইলে যায় কোথা!

আরো মজার কথা এই, যে, বেহার হেরাল্ড্ দেখাইতেছেন, যে, সকলের চেয়ে জবর কয়লার খনিসমূহ ঝরিয়ায় অবস্থিত, সেগুলি হইতে ১২০টি যৌথ কোম্পানী দ্বারা কয়লা উত্তোলিত হয়, এবং সেগুলির গোটা বার বাঙ্গালীদের, বাকী সব ইউরোপীয়দের। তা ছাড়া আরো প্রায় ২৫০টি কয়লার খনির কারবার আছে, যাহার মধ্যে কেবলমাত্র ৭৫টির মালিক বা অংশতঃ মালিক বাঙ্গালী। বাকীগুলির মালিক গুজরাটী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, সিন্ধী ও ইউরোপীয়েরা। এদিকে মিঃ কলিন্সের নজর পড়িল না, কিন্তু বাঙ্গালীরা যে নিজেদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ আদি পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতে অধ্যুষিত জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা কমসংখ্যক কয়লার খনির মালিক, ইহাই হইল তাঁহার চক্ষুশূল!

সংশোধনী

এই মাসের প্রবাসীতে ২০৯ পৃষ্ঠায় "আসন্ন সন্ধ্যা" কবিতায় এই কয়টি ভুল আছে—

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯ম লাইন	কণ্ঠস্বরে	কণ্ঠসুরে

২২১ পৃষ্ঠায় "ধীরে" কবিতায়—

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম লাইন	হৃদয়খানি	হৃদয়খানি
১০ম "	বর্ষ	বর্ষ
১৩শ "	মোরে	মোর
১৪শ "	করেছে	করেছ

প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৯, পৃঃ ২, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ২৯তম পংক্তিতে "আত্মাকে উত্তর অরণি" স্থলে হইবে "প্রণবকে উত্তর অরণি"।

ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণা

প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩২৯ সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গে "ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণা" শীর্ষক আলোচনায় বাঙ্গালোরের অধ্যাপক Dr. J. J. Sudborough মহাশয়ের প্রবন্ধের উল্লেখ না দেখিয়া আপনাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ মনে হইতেছে। আপনারা যদি রাসায়নিকদিগের প্রবন্ধ যে-সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ও যে যে বিষয় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে উল্লেখ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে রাসায়নিকদিগের কাজের গুরুত্ব ও পরিমাণের কথা বুঝিতে পারা যাইত।

শ্রী জগজ্জ্যোতি পাল

সম্পাদকীয় মন্তব্য। সাড্‌বরো সাহেবের নাম ইচ্ছাপূর্ব্বকই দেওয়া হয় নাই; কারণ বিদেশী কাগজে তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা বেশী নহে। যথা ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৫, ১৯১৮, ১৯১৯ ও ১৯২২ সালে তাঁহার কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। ১৯১৬তে ২, ১৯১৭তে ৩, ১৯২০তে ৩ এবং ১৯২১ এ ৪, মোট ১২টি প্রবন্ধ দশ বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ভারতবাসী-ইউরোপীয় ও ভারতীয় রাসায়নিকদের মধ্যে যে পাঁচজনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবন্ধ বিদেশী রাসায়নিক কাগজে বাহির হইয়াছে, তাঁহাদের নাম দিয়াছিলাম এবং তাহা লিখিয়াও দিয়াছিলাম। ঐ পাঁচজনের মধ্যে যাঁহার প্রবন্ধ-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম, তাহাও ২৩। সাড্‌বরো সাহেবের ১২। বাঙ্গালোরের অধ্যাপকদের প্রবন্ধ এখন বোধ হয় (ঠিক্ জানি না) তাঁহাদের কলেজের কাগজে বাহির হয়। আমাদের তালিকাগুলি লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটীর জার্নালে মুদ্রিত চুম্বকগুলি হইতে সংকলিত। কার্ত্তিকের প্রবাসীতে যাঁহাদের প্রবন্ধের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রবন্ধসমূহ নিম্নলিখিত কাগজগুলির কোন-না-কোনটিতে ছাপা হইয়াছিল :—

Journal of the Chemical Society, Transactions of the Faraday Society, Journal of the American Chemical Society, Zeitschrift fur Physikalische Chemie, Zeitschrift fur Anorgische Chemie, Zeitschrift fur Kolloid Chemie, Proceedings of the Royal Academy of Science of Amsterdam, Medelenden der Nobel Institute of Stockholm.

প্রবাসীর অধিকাংশ পাঠক রাসায়নিক নহেন; এইজন্য গবেষকদের প্রবন্ধসমূহের দুর্বোধ্য ইংরেজী, জার্মেন্ প্রভৃতি নাম আমরা ছাপি নাই।

—

পচা গাছের আলো

পচা গাছ-পালা জলে ভিজিলে যে আলো দেয় সজীব ছত্রাক Fungusই যে তার জন্য দায়ী এ কথা প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বেও জানা ছিল। ছত্রাকের এই আলোর কারণ সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা, খুব বেশী নাই। প্রাণাঙ্কুর (protoplasm) গঠনে যে শক্তির আবশ্যক হয় তাহার decomposition বা বিশ্লেষণে সেই শক্তিরই বিকাশ আমরা দেখিতে পাই; এই energy বা শক্তিই আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকি। অধ্যাপক ভাইন্‌স্ (Vines) বলেন যে এই শক্তিরই কিয়দংশ আলোর রূপে আমাদের চোখে পড়ে; এই আলো যে ফস্‌ফরাস্-ঘটিত নয় একথা তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আর একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ইহার সম্বন্ধে একটি থিওরীতে বলিয়াছেন যে "ছত্রাকে একটা বিশেষ কিছু জিনিষ আছে যা অন্যান্য উদ্ভিদে নাই'; এই বিশেষ জিনিষের সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক যোগ হওয়ার ফলে যে শক্তির স্ফুরণ হয়" তাহাই এই আলোর প্রধান কারণ।

বিখ্যাত অধ্যাপক সার্ এড্‌উইন রে ল্যাঙ্কেষ্টার (Ray Lankester) এই কথাই বলেন। তাঁহার মতে এই বিশেষ জিনিষগুলি স্নেহময় অর্থাৎ fatty; কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি এই পদার্থ fungus ইত্যাদির শরীর হইতে বাহির করিয়াছিলেন; এই জিনিসটাকে ঈথারে ডুবাইয়া বায়ুর সংস্পর্শে আনিলে যে ইহা আলো দিতে পারে তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এই আলো যে উত্তাপহীন ইহাও তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

আলো দিবার জন্য আমরা যে যে জিনিষগুলি ব্যবহার করি সেগুলি আলো ত দেয়ই; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তাপ দেয়; লণ্ঠনের আলোর উত্তাপে মাঝে মাঝে জননীরা খোকাখুকীদের দুধ গরম করিয়া থাকেন; আর ঘরে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলিতে থাকিলে ঘরটা যে শীঘ্র গরম হইয়া যায় এ কথা সকলেই জানেন। এই উত্তাপ, শক্তির অপচয় মাত্র, কারণ সাধারণতঃ আলোর সহিত উত্তাপের আবশ্যক আমাদের হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির এই অপচয় নিবারণের জন্য উত্তাপের energy বা শক্তি যাহাতে আলোয় পরিণত হয় আর আমরা শুধু উত্তাপহীন আলোই পাই—সেই চেষ্টা করিতেছিলেন।

প্রিন্স্‌টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিউটন হার্ভি (Harvey) কিছুকাল হইতে পচা গাছপালার এই উত্তাপহীন আলোর কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে অবিচ্ছিন্ন (continuous) উত্তাপহীন আলো পাইবার এক অভিনব প্রণালী তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। কর্ক্‌ট জাতীয় এক প্রকার ছোট জাপানী পোকার শরীর হইতে লুসিফেরিন্ (Luciferine) নামক এক রাসায়নিক পদার্থ তিনি পৃথক করিয়াছেন। এই জিনিষ জলের সহিত মিশাইলে যে উত্তাপহীন আলো বাহির হয়, তাহাতে একটা মাঝারি ঘরের অন্ধকার ত দূর করিতে পারা যায়ই, এমন কি তার সাহায্যে লেখা-পড়াও চলিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই লুসিফেরিন্‌ই পচা গাছ-পালার ও প্রাণী-জগতের অন্যান্য সকল প্রকার উত্তাপহীন আলোর কারণ। অক্সিজেনের অভাবে লুসিফেরিনের আলো দিবার ক্ষমতা আর থাকে না।

লুসিফেরিন্ ও সার্ রে ল্যাঙ্কেষ্টারের স্নেহময় পদার্থের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে কি না জানি না। অক্সিজেন ও জল ব্যতীত কোনোটাই

আলো দিতে পারে না। আলো দেওয়ার প্রক্রিয়াটি যে এই পদার্থ দুটির সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ অক্সিজেনের সহিত অন্য কোনও পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উত্তাপ ও আলো দুইই বাহির হয়,—কোন কোনও ক্ষেত্রে শুধু উত্তাপই বাহির হয়। শুধু আলো অর্থাৎ উত্তাপহীন আলো বাহির হওয়ার দৃষ্টান্ত তাহা হইলে কেবল লুসিফেরিন্ ও রে ল্যাঙ্কেষ্টারের স্নেহময় পদার্থেই আমরা দেখিতে পাই।

জলের আবশ্যক যে এখানে কিরূপ তাহা বৈজ্ঞানিকেরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। দেখা গিয়াছে জলকণাহীন (Absolutely dry) ফস্ফরাস বিশুদ্ধ শুষ্ক অক্সিজেনের সংস্রবে আসিলে তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক যোগ হয় না; কিন্তু একটু আর্দ্র (moist) করিলেই সতেজে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে একদল বৈজ্ঞানিক এক নূতন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন,—Electrolyte বা বিদ্যুৎবাহক তরল পদার্থের অবর্ত্তমানে কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়াই হইতে পারে না। অপরিশুদ্ধ জলই এই Electrolyteএর কাজ করে।

অধ্যাপক হার্ভি যে প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার দ্বারা একদিক দিয়া যেমন লুসিফেরিন্ ও অক্সিজেনের রাসায়নিক যোগ হয়, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদিকে এই যুক্ত পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে যে লুসিফেরিন্ পাওয়া যায় তাহা আবার অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া আলো দিতে পারে। অপেক্ষাকৃত অল্প লুসিফেরিনের দ্বারা এইরূপে আমরা অবিচ্ছিন্ন (Continuous) উত্তাপহীন আলো পাইতে পারি। এই আলো যখন ম্লান হইয়া যায় তখন লুসিফেরিনের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই নূতন আবিষ্কার যে আমাদের অনেক কাজে আসিতে পারে সে কথা লেখাই বাহুল্য। তবে এই জিনিষটাকে সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য করা চাই।—ইহাকে Scientific curiosityর বা বৈজ্ঞানিক কৌতুকের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত আবিষ্কার হয় এই মার্কিন দেশে; একজন বিখ্যাত আমেরিকান মিশনারী একদিন বলিয়াছিলেন "You see, every queer thing comes from America," কথাটা তিনি বিদ্রূপের সুরেই বলিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা যে খাঁটি সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের জ্ঞানের ধারাও যদি এই জাতিটার মত queer পথে ছুটিতে পারিত।

বেনারস সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

"বাঙ্গালী কি ঘরকুনো?"

গত ভাদ্র এবং আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় বাঙ্গালী ঘরকুনো এই মত প্রকাশ এবং তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। সাধারণ শ্রেণীর বাঙ্গালী যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কখনো বঙ্গের বাহিরে যায় না একথা খুবই সত্য। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের দুইটি উদাহরণ বিবৃত করিলাম।

কিশোরগঞ্জ মহকুমার সাধারণ মুসলমানগণ বেশ adventurous। এই মহকুমার অন্ততঃ ৭ হাজার মুসলমান গত ১০ বৎসর মধ্যে আসামের নোয়াগাঁও জেলায় যাইয়া জমী সংগ্রহ পূর্ব্বক চাষাবাদ করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহারও দেশে জমীজমা ছিল না, কিন্তু আসামে যাইয়া অনেকেরই বেশ ভাল অবস্থা হইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত বহুলোক আসামে যাইয়া কালাজ্বর প্রভৃতি রোগে মারা যাইতেছে, তবু প্রতিবৎসরই বহুলোক তাহাদের পৈত্রিক বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সপরিবারে আসামে যাইতেছে।

নোয়াগাঁও সহর হইতে ১৫ মাইল দূরে শ্যামাগুড়ি নামক প্রসিদ্ধ স্থানের আশেপাশে তাহারা এই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এই অঞ্চলে তাহারা দিন দিন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। আসামে রাস্তা ঘাট দুর্গম ও বন্যজন্তুর ভয় আছে বলিয়া সেখানকার হাটগুলি সকাল বেলাতে বসে এবং ৮ টার পূর্ব্বেই ক্রয় বিক্রয় শেষ করিয়া আসামবাসীরা বাড়ী চলিয়া যায়। কিন্তু এদেশে ঠিক উল্টা নিয়ম। সাধারণতঃ বিকাল বেলায় হাট বসে এবং রাত্রি ৮।৯ টা পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় চলে। এ দেশের লোক তথায় যাইয়া তাহাদের দেশের নিয়ম প্রচলন করিতে সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বকথিত শ্যামাগুড়ি হাটে এত বাঙ্গালীর সমাবেশ হয় যে এখন ঐ হাট তাহাদের ইচ্ছামত বিকাল বেলাই বসে। আসামের সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট শুনিয়াছি, যে, মাঠে যাইয়া দাঁড়াইলেই কোন্ কিত্তা জমী বাঙ্গালীর এবং কোন্ কিত্তা আসামীর তাহা চক্ষে পড়ে। বাঙ্গালীর জমী সুন্দরতর রূপে চাস করা, তাহার ক্ষেতের আল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বাঙ্গালী জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তথায় দাঙ্গা হাঙ্গামা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের অনেকেই দেশে থাকিতে দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিল এবং বিদেশেও তাহাদের সেই স্বভাব বদলায় নাই। এই-সব কারণে কোনও কোনও ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী এই-সমস্ত বাঙ্গালীকে "অবাঞ্ছনীয়" undesirable মনে করেন এবং বর্ত্তমানে আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ভয় হয় আইন দ্বারা হয় তো Emigration বা উপনিবেশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

যেমন কয়েকটি থানার লোক আসামে যাইতেছে তেমনি আবার অন্য দিকের লোক চাস-আবাদের জন্য বর্ম্মায় যাইতেছে। এ দেশী কয়েকটি লোক মাত্র সেখানে জমীর মালীক; বাকী সব লোক সেখানে চাস-আবাদের মজুরী করে এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে পাঠায়। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, যে অঞ্চল হইতে এইসব লোক বর্ম্মায় যায় সেই অঞ্চলের পোষ্টআফিসগুলিতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার মানি অর্ডার বর্ম্মা হইতে আসে এবং লোকের সঙ্গেও বহু টাকা আসে। ইহাদের মধ্যে কেহ স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য বর্ম্মায় যায় না।

কিশোরগঞ্জ শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালা ভাষা

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার উদাহৃত শব্দগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সংস্কৃতে সুতরাং = অতিতরাং = নিতরাং। এই তিনটি এবার্থক অব্যয়ের মধ্যমটি অকালমৃত্যুর পথে ছুটিয়া গিয়াছে। 'নিতরাং' নিজের ঠাট বজায় রাখিয়া এপর্য্যন্ত সজীব আছে। কাজেই 'সুতরাং' নিজের পথটা একটু বাঁকাইয়া চলিয়াছে। একই অর্থের জন্য দুইটি শব্দের দরকার ভাষায় থাকে না। তাই একটির অর্থ বদলাইয়া যায়। বদলাইবার ক্রম বোধহয় এইরূপ :—প্রাচীন অর্থ—"তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী স্ফুরৎ প্রভামণ্ডলয়া চকাসে।" (কুমার)। গোলমেলে অর্থ—"ময্যপ্যাস্থা ন তে চেৎ ত্বয়ি মম সুতরামেষ রাজন্ গতোঽস্মি" (ভর্তৃশতক)। এইরূপে 'সুতরাং সিদ্ধং,' 'সুতরাং যুজ্যতে' ইত্যাদি স্থলে প্রমাণের ভাষায় ইহার প্রয়োগ হওয়ায় এটি কারণ-বাচক সংযোজক অব্যয়ে (adverbial conjunction indicating reason) পরিণত

হইয়াছে। ভাষাবিজ্ঞানে এই পরিবর্ত্তনকে transference বা বিষয়ান্তর-প্রাপ্তি বলে।

সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই অশিষ্ট শব্দ বা অপশব্দ বর্জ্জনের উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। মীমাংসা শাস্ত্রে এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'গো' শব্দের অপভ্রংশ রূপে 'গবী' প্রভৃতি কতিপয় শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের নির্ব্বাসন-চেষ্টা উপেক্ষা করিয়াই বোধ হয় 'গবী' শব্দ 'গাভী' আকারে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহার জন্মগত স্বত্বের দাবি করিয়াছে।

'মিনতি' শব্দটা মূলতঃ 'বিনতি'। কিন্তু 'বিনয়' ও 'বিনতি'তে প্রভেদ আছে। প্রথমটির ভদ্র অর্থ, দ্বিতীয়টি হীনতা-বাচক। দুইটিই সংস্কৃত শব্দ। 'নী' ধাতু ও 'নম্' ধাতুর প্রভেদ শব্দ-দুটিতে আছে। ধ্বনি পরিবর্ত্তনের অনুরূপ উদাহরণ 'মিনি (=বিনা) তেলে রান্না'।

কাণ্ডারী শব্দ 'কর্ণধার' শব্দ হইতে উদ্ভূত। একথা বিজয়-বাবু তাঁহার History of Bengali Language পুস্তকে দিয়াছেন—২১৭ ও ২৫২ পৃঃ। [শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ তৎসম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের টীকায় কাণ্ডারীর ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—স. কর্ণধার> প্রা. কণ্ণধার> বা কাণ্ডার, কাণ্ডারী।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

আমোদ শব্দের মৌলিক অর্থই হয়। সে অর্থ সংস্কৃতে আছে। অমরে 'হর্ষঃপ্রমোদামোদসম্মদাঃ' (=হর্ষ অর্থে যেমন 'আমোদ' তেমনি 'মদ') আছে। 'সুগন্ধ' অর্থটা মূলতঃ লাক্ষণিক। বাঙ্গালায় সে অর্থ প্রবল নহে।

'গল্প' শব্দ বোধহয় জল্প্ ধাতু হইতে। 'অবিরলিত কপোলং জল্পতোরক্রমেণ' (উত্তর)। 'জল্প' শব্দের অর্থ 'গল্প' শব্দের সহিত অভিন্ন।

'উপন্যাস' শব্দটা বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি। সংস্কৃতেও অসত্য বা অপ্রকৃত বচন বিন্যাসকে উপন্যাস বলা হইত। কুপিতা শকুন্তলার মুখে "পাবকঃ খলু এষ বচনোপন্যাসঃ"।

'রাগ' শব্দের নানা অর্থ। মৌলিক অর্থ 'রক্তিমা'।—'ক্রোধ' অর্থেও সংস্কৃতে ছিল, তবে বাঙ্গালায় সেইটিই একমাত্র অর্থ দাঁড়াইয়াছে। সংস্কৃতে 'ক্রোধ' অর্থ অতি অপ্রবল।

'তদন্ত' শব্দটা বোধ হয় পুলিসের সৃষ্টি। [শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে তদন্ত শব্দের প্রয়োগ-বচন কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

'একত্র' ও 'একত্রিত' শব্দ অর্থের ভেদ আছে। কতকগুলি জিনিস একত্র হইলে তাহাকে 'একত্রিত' বলা হয়। সুতরাং এখানে যেন একটা ণিজন্ত অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া জুটিয়াছে এবং শব্দস্থিত ই'কার তাহার সহায়তা করিয়াছে। সংস্কৃতব্যাকরণ যাহাই বলুক বাঙ্গালায় শব্দটি সত্তাবান্। 'মুখরিত' শব্দও সেইরূপ। 'মুখর' শব্দের একটি অর্থ ঠোঁটকাটা'। কিন্তু মুখরিত তাহা নহে।

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের নানা অর্থ। সুতরাং 'পাশ্চাত্য' শব্দের পশ্চিমে ভব' অর্থে সীমাবদ্ধ হইবার কারণ নাই। 'পাশ্চাত্য দেশ' ভাষায় চলিয়াছে। 'অত্রত্য' ও 'তত্রত্য' অনুরূপ প্রয়োগ নহে। অনুরূপ হইতে হইলে 'আত্রাত্য' বা 'আত্রত্য' হওয়া চাই, সেরূপ প্রয়োগের আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই বলিয়াই সৃষ্টি হয় নাই;

'দাক্ষিণাত্য' শব্দ সংস্কৃতে ছিল। "অস্তি দাক্ষিণাত্যে জনপদে মহিলারোপ্যং নাম নগরম্" (পঞ্চতন্ত্র)। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-দেশবাসী অর্থে দাক্ষিণাত্য অতি প্রাচীন "প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ", আরম্ভশূরা দাক্ষিণাত্যাঃ", ইত্যাদি। সুতরাং দাক্ষিণাত্যাদিগের দেশ দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে পারে।

'প্রাথমিক' ও প্রথম শব্দের অর্থ বিভিন্ন। সংস্কৃতেই 'প্রাথমিক' শব্দ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা শব্দটিতে ইংরেজী primary education শব্দের ছায়া আছে। prime ও second শব্দ বিশেষণ হইলেও ইংরেজীতে primary ও secondary শব্দ আছে। আবার primitive শব্দও আছে। সুতরাং বাঙ্গালায় অনুরূপ অর্থে প্রাথমিক শব্দের প্রয়োগে বাধা কি? বিশেষ্য হইতে যেমন তদ্ধিত শব্দ রচনা হয়, বিশেষণ হইতেও সেইরূপ হইতে পারে। উত্তমিক শব্দের আবশ্যকতা নাই। অর্থই বা কি হইবে?

বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে সংস্কৃত ব্যাকরণের মাপ-কাঠিতে বাঙ্গালা নিয়ন্ত্রিত নহে।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—

ভাষা-তত্ত্ব

কার্ত্তিকের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি 'অবৈয়াকরণ প্রয়োগের' নমুনা দিতে গিয়া নিজেই একস্থানে ভুল করিয়া বসিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালী বড় বড় লেখকেরাও বাঙ্গালা লিখিবার সময়ে 'একত্রিত' 'মুখরিত' প্রভৃতি শব্দ লেখেন। এই শব্দগুলি ব্যাকরণ-সম্মত নহে। 'একত্র' ও 'মুখর' লিখিলেই হয়। মুখর শব্দটা বিশেষণ। তাহা হইতে আবার কি বিশেষণ হইবে?"

লেখক কি জানেন না যে সংস্কৃত ব্যাকরণে নাম ধাতু বলিয়া একটা জিনিস আছে? মুখরিত কোন ক্রমেই 'অবৈয়াকরণ প্রয়োগ' নহে। মুখর শব্দ+ণিচ=মুখরী নাম ধাতু, তদুত্তরে ক্ত কর্ম্মবাচ্যে। সংস্কৃত সাহিত্যে মুখরিত শিথিলিত বধিরিত প্রভৃতি শিষ্ট প্রয়োগ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষা বে-ওয়ারিশ মাল। তাই, যাঁহার যাহা খুসী তাহাই তিনি অবাধে লিখিতেছেন। যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের এক-একটা দিক্‌পাল-বিশেষ এমন সব লেখক ও গ্রন্থকারেরাও কতকগুলি সংস্কৃতশব্দকে বাঙ্গালায় ভুল অর্থে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন—আর তাঁহাদের অন্ধ-অনুকারীগণ নির্ব্বিচারে উহাদের বহুল প্রচার করিয়া ভাষারাজ্যে বিপ্লব ছড়াইতেছেন। আমরা নিম্নে গুটিকতক উদাহরণ দিলাম :—

(১) আত্মম্ভরি—সংস্কৃত অর্থ=স্বোদরমাত্রপূরক greedy, যথা—
আত্মম্ভরিস্তং পিশিতৈর্ নরাণাম্—ভট্টি।
বাংলা অর্থ=দাম্ভিক, অহঙ্কারী।

(২) বিমর্ষ—সংস্কৃত অর্থ=বিচার, বিবেচনা (বিশেষ্য পদ)
যেমন :—কাব্যবিমর্ষঃ, অলঙ্কারবিমর্ষঃ।
বাংলা অর্থ=বিষণ্ণ, দুঃখিত (বিশেষণ পদ)
যেমন :-তিনি বিমর্ষ হইলেন।

(৩) আয়াস—সংস্কৃত অর্থ=শ্রান্তি, খেদ, শ্রম, যত্ন।
বাংলা অর্থ=আরাম, বিরাম।
(আরবী আয়েস শব্দের সঙ্গে গোল করিয়া।—
প্রবাসী সম্পাদক।)

(৪) কোদণ্ড - সংস্কৃত অর্থ=ধনুক
বাংলা অর্থ=কোদালি
ষড় রিপু হৈল কোদণ্ড স্বরূপ।
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ॥
দাশরথি রায়।

অনেক বিজ্ঞ ও বিখ্যাত লেখকের রচনাতেও প্রায়শঃ কতকগুলি ব্যাকরণদুষ্ট পদ দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিলাম :—

মৃণ্ময় বনাম মৃন্ময়

অল্পে পরে কা কথা, বাঙ্গালা দেশের বার-আনা টুলো পণ্ডিত "মৃণ্ময়" লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধ হয় অনবধানতাবশতঃ মৃণ্ময় লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন—তাই বঙ্গসাহিত্যে "মৃণ্ময়ের" এত ছড়াছড়ি চলিতেছে। মৃদ্+ময়=মৃন্ময়। পদান্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য ণ হয় না। যেমন নর শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে "নরাণ্" না হইয়া নরান্ হয়। হিরণ্ময়ের সহিত সাদৃশ্যই বোধ হয় "মৃণ্ময়" লেখার মূল।

পৈত্রিক বনাম পৈতৃক

বাঙ্গালায় পৈত্রিক ও পৈতৃক দুই-ই চলিতেছে। 'পৈত্রিক'-ই বেশী দেখা যায়—এটি ব্যাকরণদুষ্ট পদ। ঋ বর্ণের পর ঠক প্রত্যয়ে ইক না হইয়া ক হয়। "ইসুসুক্তান্তাৎ কঃ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

জগদম্বে বনাম জগদম্বে

সংস্কৃতানভিজ্ঞ লেখকদের কথা দূরে থাক্, অনেক কাব্যতীর্থ-ব্যাকরণতীর্থোপাধিক লেখকও জগন্মাতাকে জগদম্ব না বলিয়া জগদম্বে বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। ইহাতে কি দেবী প্রসন্না হন ? সমস্ত "জগদম্বা" শব্দটি অযথার্থ নয়। উহার মধ্যে অম্বাটুকুই অযথার্থ শব্দ। তৎপুরুষ সমাসে পর-পদের প্রাধান্য হয়।

সিঞ্চন বনাম সেচন

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের রামাশ্যামা পর্য্যন্ত সকলেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'বারি সিঞ্চন' করিতেছেন। 'সিচ্'+অনট (ভাবে) করিলে 'সেচন' হয়। সিঞ্চন কোথা হইতে আসিল ?

আবশ্যকীয় বনাম আবশ্যক

অনেকে আবশ্যকীয় লেখেন। "আবশ্যক" স্বয়ং বিশেষণ পদ। তাহা হইতে আবার বিশেষণ কেন ?

ক্রোড় বনাম ক্রোর

অনেকে ক্রোড় ও ক্রোরের কোনো পার্থক্য রক্ষা না করিয়া অবলীলাক্রমে ক্রোড়পতি লিখিয়া ফেলেন। ক্রোর কোটি শব্দজ—ক্রোড়=কোল, বক্ষ।

জিজ্ঞাসা

(১) মিনতি শব্দটি সংস্কৃত বিনতির অপভ্রংশ কি? (২) চয়নিকা শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি, অর্থই বা কি? চয়ন বলিলেই ত অর্থ-বোধ হয়। (৩) ইংরেজী secretary ও editor দুইটি শব্দেরই বাংলা—সম্পাদক। ভিন্ন ভিন্ন বাংলা প্রতিশব্দ নাই কি ?

শ্রী রাধাচরণ দাস

চিত্র-পরিচয়

প্রবাসীর পত্র

প্রবাস থেকে প্রিয়জনের পত্র এসেছে; তাতে আশার কথা, আনন্দের কথা কিছু নেই, পত্রখানি অনাদৃত হয়ে খাম থেকে খোলা অবস্থায় শয্যায় পড়ে' আছে, আর মহিলাটি ভারাক্রান্ত মনে শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরে পথ চেয়ে বসে' আছে, বাহিরেও শূন্য আকাশ নীল চোখ মেলে উদাস দৃষ্টিতে তাকে দেখ্ছে।

লক্ষ্যবেধ

দূরে কোনো বস্তু বা চিহ্নকে লক্ষ্য করে' বাণ ছোঁড়া হয়েছে; বাণ লক্ষ্য ভেদ করেছে কি না তাই তরুণ তরুণী উৎসুক হয়ে দেখ্ছে।

প্লাবনে বিপন্ন

বন্যায় বিপন্ন মানুষ, কুকুর, পাখী গিয়ে দেব-মন্দিরে দেবতার আশ্রয় নিয়েছে; বৃহৎ বনস্পতিও যেন জলের তোড়ে ভেঙ্গে পড়ে' দেবতার চরণেই লুণ্ঠিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা কর্‌ছে।

চারু

ব্যথিত-বেদন

ছবিটিতে হতাশ-প্রেমের একটি সুন্দর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :—আরবী কবি আস্‌মাই একদিন এক বনের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন একটি পাথরের উপর লেখা আছে—

জীবন-গাঙে পড়্‌ছে ভাঁটা, ভালোবাসায় পিষ্‌ছে মোরে,
শোকের আগুন প্রেমের আগুন নিভাই বল কেমন করে' ?

আস্‌মাই কবিতাটির উত্তর স্বরূপ পাথরের গায়ে লিখিয়া রাখিলেন—

দগ্ধ প্রেমিক! প্রেমের আগুন নিভাবারো আছে উপায়—
দূর কোরোনা প্রেমের তৃষা, চোখ্ রেখো তার ওঠা-নামায়;
জীবন-পথে যাহা আসে, যে বা আসে সাম্‌নে তোমার,
হাস্য-মুখে তারেই ব'রো, মুক্ত রেখো বক্ষ-আগার।

দ্বিতীয় দিনে কবি আস্‌মাই সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন আবার সেই পাথরের উপর দুইটি ছত্র লেখা আছে—

আর পারি না, জানাই কারে বেদন আমার, শুন্‌বে কে সে?
বক্ষ ভেঙে টুক্‌রা হয়ে রক্ত-স্রোতে যাচ্ছে ভেসে!

ইহা দেখিয়া কবির হৃদয় সমবেদনায় কাতর হইয়া উঠিল, তিনি আবার লিখিলেন—

বিরহ যার আর সহে না, বঞ্চনা যে সইতে নারে,
উপায় নাহি উপায় নাহি, বর্‌তে হবে মরণ তারে।

তৃতীয় দিনে কৌতূহলাক্রান্ত আস্‌মাই আবার সেইখানে আসিয়া হাজির হইলেন। এবার যাহা দেখিলেন, তাহা বড় করুণ। দেখিলেন, শাদা চাদরে ঢাকা একটি মৃতদেহ সেখানে রহিয়াছে, তাহার মুখ শান্ত সুন্দর। পাথরের উপর আর-দুইটি ছত্র লেখা আছে—

সেই তো ভাল, ধন্য তুমি, দিলে না মোর মিট্‌তে আশা,
বেদন নিয়ে' নিলাম মরণ; বিদায়! ওহো ভালবাসা!

কবি আস্‌মাইর চোখে জল আসিল।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যশোদা ও কৃষ্ণ

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

U Ray & Sons, Calcutta

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২২শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২৯

৩য় সংখ্যা

নির্ব্বাণ কি?

বুদ্ধের নির্ব্বাণ কি? এবিষয়ে এখনও অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। এখনও কেহ কেহ মনে করেন "আত্যন্তিক বিনাশের নামই নির্ব্বাণ; নির্ব্বাণ অর্থ মহাবিনাশ এবং ইহা 'মহাশূন্য' হইতেও শূন্যতর।" এই মত নিতান্তই অসত্য। বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে যাহা বলিয়া গিয়াছেন—তাহা লইয়াই আমরা কিছু আলোচনা করিব।

১। সারিপুত্র ও জম্বুখাদক।

এক সময়ে 'জম্বুখাদক' নামক একজন পরিব্রাজক সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে সারিপুত্র! 'নির্ব্বাণ' 'নির্ব্বাণ' এইপ্রকার বলা হয়। কিন্তু নির্ব্বাণ কি?"

সারিপুত্র বলিলেন—"হে আবুষ! 'রাগক্ষয়,' 'দ্বেষ-ক্ষয়,' এবং 'মোহক্ষয়'—ইহাকেই নির্ব্বাণ বলা হয়" (সংযুত্তনিকায়, ৩৮।১)।

বঙ্গভাষায় 'রাগ' শব্দের অর্থ 'ক্রোধ'। কিন্তু সংস্কৃত ও পালি ভাষায় ইহার অর্থ 'আসক্তি' 'কামনা' ইত্যাদি। সুতরাং আসক্তি-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহ-ক্ষয়ের নামই নির্ব্বাণ। কেহ কেহ মনে করেন এ-সমুদয় নির্ব্বাণলাভের উপায়, কিন্তু নির্ব্বাণ নহে। কিন্তু সারিপুত্রের উপদেশ—এই-সমুদয়ই নির্ব্বাণ। যে অবস্থায় রাগ দ্বেষ ও মোহের অবসান হয়, সেই অবস্থাকেই নির্ব্বাণ বলা হয়।

২। সারিপুত্র ও সামণ্ডক।

অন্য একসময়ে সামণ্ডক নামক এক পরিব্রাজকও সারিপুত্রকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। এস্থলেও তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"রাগ-ক্ষয়, দ্বেষ-ক্ষয় এবং মোহ-ক্ষয়ই নির্ব্বাণ" (সংযুত্তনিকায়, ৩৯।১)।

৩। মুসীল, সবিট্ঠ ও আনন্দ।

একসময়ে আয়ুষ্মান্ মুসীল, সবিট্ঠ ও আনন্দ কৌশাম্বী নগরে ঘোষিতারামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে সবিট্ঠ মুসীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুসীল! শ্রদ্ধা-নিরপেক্ষ হইয়া, রুচি-নিরপেক্ষ হইয়া, জনশ্রুতি-নিরপেক্ষ হইয়া, যুক্তিপ্রণালী-নিরপেক্ষ হইয়া, অপরের মতামত-নিরপেক্ষ হইয়া, তুমি কি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছ যে ভব-নিরোধই নির্ব্বাণ?"

মুসীল বলিলেন—"হে সবিট্ঠ! শ্রদ্ধা- রুচি- জনশ্রুতি- যুক্তিপ্রণালী অপরের মতামত-নিরপেক্ষ হইয়া আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ভব-নিরোধই নির্ব্বাণ।"

ইহার পরে সবিট্‌ঠ নারদকেও এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং নারদও মুসীলের ভাষাতেই ইহার উত্তর দিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে সবিট্‌ঠও বলিলেন—"আমিও সম্যক্‌প্রজ্ঞা দ্বারা যথাভূত ইহা সুন্দররূপে দর্শন করিয়াছি যে 'ভব-নিরোধই নির্ব্বাণ' " (সংযুত্তনিকায়, ১২।৬৮)।

"ভব" অর্থ 'জন্ম' বা 'উৎপত্তি'। 'ভবনিরোধ' অর্থ 'জন্মনিরোধ'। যে অবস্থায় আর জন্মগ্রহণ হয় না সেই অবস্থার নামই নির্ব্বাণ।

৪। পুনব্বসুর মাতা।

'পুনব্বসুর মাতা' নামে পরিচিত একজন স্ত্রীলোক কোন ঘটনা উপলক্ষে এই প্রকার বলিয়াছিলেন—নিব্বানং ভগবা আহু সব্ব-গন্থ-প্পমোচনং। অর্থাৎ "ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন—সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করাই নির্ব্বাণ" (সংযুত্তনিকায়, ১০।৭)।

৫। মহা-মোগ্‌গলান।

থেরগাথাতে 'মহা-মোগ্‌গলান' নামক স্থবিরের উক্তিরূপে নিম্নলিখিত অংশ পাওয়া যায়—

"শিথিল চেষ্টা বা অল্পশক্তি দ্বারা সর্ব্বগ্রন্থ-প্রমোচন-রূপ নির্ব্বাণকে লাভ করা যায় না (নিব্বানম্...সব্বগন্থ-পমোচনং)" (থেরগাথা, ১১৬৫)।

এস্থলে নির্ব্বাণ—সর্ব্বগ্রন্থ-প্রমোচন অর্থাৎ সমুদায় বন্ধন হইতে মুক্তি। যে অবস্থাতে কোনপ্রকার বন্ধন নাই, তাহাই নির্ব্বাণ।

৬। বাকুল।

বাকুল নামে একজন স্থবির এইপ্রকার বলিয়াছেন—"সম্যক্ সম্বুদ্ধ ভগবান্ যে নির্ব্বাণ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা 'সু-সুখ', অ-শোক, বি-রজ, ক্ষেম; সে স্থলে দুঃখ নিরুদ্ধ হইয়াছে" (থেরগাথা, ২২৭)।

৭। হারিত।

'বাকুল' যাহা বলিয়াছেন, হারিত নামক স্থবিরের উক্তির মধ্যেও ঠিক ঐ অংশ রহিয়াছে (থেঃ গাঃ, ২৬৩)।

৮। গোতম স্থবির।

গোতম নামক একজন স্থবির একস্থলে বলিয়াছেন—"ইদানীং আমরা নির্ব্বাণে গমন করিব—যে স্থলে গমন করিলে আর শোক করিতে হয় না" (থেঃ গাঃ, ১৬৮)।

৯। ইতিবুত্তক।

ইতিবুত্তক নামক গ্রন্থে বুদ্ধের উক্তিরূপে নিম্নলিখিত অংশ পাওয়া যায়—

"হে ভিক্ষুগণ! 'সংস্কৃত' বা 'অসংস্কৃত' যে-সমুদয় ধর্ম্ম আছে, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল বিরাগ—যাহা এই (সমুদায় নামেও অভিহিত)—মদ-নির্ম্মর্দ্দন, পিপাসা-বিলয়, আসক্তির উচ্ছেদ, সংসারাবর্ত্তনের উপচ্ছেদ, তৃষ্ণা-ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্ব্বাণ" (ইতি-বুত্তক, ৯০)।

ইহার অর্থান্তরও হইতে পারে।—তৃষ্ণাক্ষয়ের পরে ছেদ। শেষ অংশের অর্থ বিরাগই নিরোধ ও নির্ব্বাণ।

আমরা অনুবাদে 'সংস্কৃত' এবং 'অসংস্কৃত' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। মূলে আছে 'সংখতা' এবং 'অসংখতা'। যাহাকে সৃষ্টি করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে যাহার উৎপত্তি, তাহাই 'সংখত'। আর যাহা এ ভাবে উৎপন্ন নয়, তাহাই 'অসংখত'।

এস্থলে নির্ব্বাণ অর্থ কি সে বিষয়ে মতভেদ হইবার কোন কারণ নাই।

'ইতিবুত্তক' নামক গ্রন্থের একস্থলে (১০২) বুদ্ধের এই উক্তিটি আছে—"যাহারা আলস্যপরায়ণ, বাল (অর্থাৎ মূর্খ), অজ্ঞান, তাহারা সর্ব্বগ্রন্থপ্রমোচনরূপ নির্ব্বাণকে লাভ করিতে পারে না (ন নিব্বানং অধিগন্তব্বং সব্বগন্থ-পমোচনং। —ইতিবুত্তক, ১০২)।

এখানে সর্ব্বগ্রন্থি ছেদনকেই নির্ব্বাণ বলা হইল।

পুনব্বসুর মাতা বুদ্ধদেবের এই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন (সং নিঃ, ১০।৭ - পূর্ব্বোক্ত (৪) অংশ দ্রষ্টব্য)।

থেরগাথাতে মহামোগ্‌গলান যে বলিয়াছেন সর্ব্বগ্রন্থ-প্রমোচনই নির্ব্বাণ, ইহা বুদ্ধদেবেরই কথা। (থেরগাথা, ১১৬৫; পূর্ব্বোক্ত (৫ অংশ দ্রষ্টব্য)।

১০। সংযুত্তনিকায়।

সংযুত্তনিকায় নামক গ্রন্থের একস্থলে (৬।১।৩) বুদ্ধের উক্তি রূপে এই অংশ পাওয়া যায় এই যে সংস্কারের উপশম, জন্মোপাদানের বিনাশ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ, নির্ব্বাণ—ইহা নিশ্চয়ই দুর্দ্দর্শ (৬।১।৩)।

এস্থলে তৃষ্ণাক্ষয় প্রভৃতিকেই নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে।

সংযুত্তনিকায়ের একস্থলে (১।৭।৪) এই প্রশ্ন করা হইয়াছে—

"কি বিনাশ প্রাপ্ত হইলে বলা হয় '(ইহা) নির্ব্বাণ' (কিস্সস্সবিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি) ?"

ইহার উত্তর—

"তৃষ্ণা বিনাশ প্রাপ্ত হইলে বলা হয় '(ইহা) নির্ব্বাণ' (তন্‌হায় বিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি)।"

(সং নিঃ, ১।৭।৪)

১১। সুত্তনিপাত।

সুত্তনিপাত নামক গ্রন্থেও (১১০৮—১১০৯) ঠিক এই অংশ পাওয়া যায়।

অদ্যকার আলোচনায় আমরা বুঝিলাম—রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়, ভবনিরোধ, সর্ব্বগ্রন্থ-প্রমোচন ইত্যাদিকে নির্ব্বাণ বলা হয়।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বাংলা ছন্দ

বাংলার সাহিত্যসম্পদ্ আজ নিঃস্ব বাঙালীকেও বিশ্বসমাজে বরেণ্য করেছে। আর সাহিত্যের এই রসপ্রবাহই বাংলার গ্রামে গ্রামে দরিদ্র কুটীরবাসীর দ্বারে দ্বারে এক নবজীবনের আনন্দ-বার্ত্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলা-সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাঙালী জাতীয় জীবনের সার্থকতা লাভ করে' ধন্য হবে। কেবল যে রস-মাধুর্য্যই বাঙালীর কাব্য-সাহিত্যকে সম্পদ্‌শালী করে' তুলেছে তা নয়, ছন্দ-প্রাচুর্য্যও তাকে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও শ্রী দান করেছে। বাংলা-সাহিত্যের এই ছন্দ-শাখা যে কত অসংখ্য বর্ণের বিচিত্র কুসুমরাশিতে রমণীয় হয়ে উঠেছে তাই দেখিয়ে পাঠকগণকে একটু আনন্দদান করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু গোড়া থেকেই এ কথা বলে' রাখা ভাল যে, সাহিত্য-জীবনের নব নব উষায় বাংলার কাব্যোদ্যানে এই অসংখ্য রঙীন্ ফুলগুলি একে একে কি করে' ফুটে উঠেছে ইতিহাসের দিক দিয়ে তা দেখানো, কিংবা ছন্দের নৃত্যলীলা ও সুরবৈচিত্র্য কেমন করে' কাব্যের রসকে বা ভাবের অনির্ব্বচনীয়তাকে রসজ্ঞের অন্তরের মণিকোঠায় পৌছিয়ে দেয় সেই তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলা, আমার উদ্দেশ্য নয়। যোগ্যতর ব্যক্তি তত্ত্বরসপিপাসুর এ পিপাসা নিবৃত্ত করবেন। আমি কেবল সাদা কথায় সিধে রকমে বাংলার সমস্ত ছন্দগুলিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে' তাদের শ্রেণী-বিভাগ করে' এবং তাদের গায়ে এক-একটা নামের লেবেল্ এঁটে দিয়েই খালাস পাব। এই বিচিত্র ছন্দরাশিকে গুচ্ছে গুচ্ছে সাজিয়ে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলেই পাঠক চোখ বুলিয়েই বুঝ্‌তে পারবেন দীনা বাংলাভাষা ছন্দ-সম্পদে নিতান্তই দীনা নয়, বরং পৃথিবীর কোনো ভাষাই ছন্দ-হিসাবে বাংলাভাষার চাইতে অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালিনী কি না সন্দেহের বিষয়।

বাংলা ছন্দের আলোচনা যে আর কখনো হয় নি তা নয়। বহুদিন থেকেই মাসিক পত্রিকাতে ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধ মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার অধিকাংশই ছন্দের আংশিক আলোচনা মাত্র। বাংলার কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৩২৪ সালের চৈত্রসংখ্যা "সবুজপত্রে" 'ছন্দ' নামক প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের প্রাণশক্তি কোথায়, ছন্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্য কিরূপ বিচিত্র উপায়ে কাব্যের ভাবকে ফুটিয়ে তোলে, এবং মোটামুটি বাংলা ছন্দকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। এর আগেও তিনি সবুজপত্রে এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু আমাকে নিতান্ত সভয়ে বল্‌তে হচ্ছে যে যদিও রবীন্দ্রনাথ ওই প্রবন্ধে ছন্দ-রসজ্ঞদের চিন্তার বহু উপাদান জুগিয়েছেন এবং যদিও তিনি বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্বটি বিশদরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন, তবু এ

বিষয়ে আলোচনার আরো অনেক কথা বাকি রয়ে গেছে। তারপর, বাংলা ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ১৩২৫ সালের বৈশাখসংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত "ছন্দ-সরস্বতী' শীর্ষক রচনায় বাংলাছন্দের বিস্ময়জনক যাদুশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি রচনাটি ঠিক সাধারণ প্রবন্ধের আকারে লেখেন নি, রূপকের মায়াজালের আড়াল থেকে ছন্দের ভেল্কী-বাজী দেখিয়েছেন। তাই তাঁর ছন্দের নামকরণ বা শ্রেণীবিভাগ রূপকের আড়ালে দাঁড়িয়েই স্বীয় রূপ-জ্যোতিতে পাঠককে মুগ্ধ করেছে। বিশেষরূপে এই দুটি অতি উপাদেয় প্রবন্ধের নিকট যথাযোগ্য ঋণ স্বীকার করে' আমি আসল কথার অবতারণা কর্‌ছি। জানি না আমার এই নব নামকরণ ও স্তর-বিন্যাস সুধী-সমাজে আদৃত হবে, না, আমি "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

অক্ষর ও মাত্রা

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকার সংস্কৃত ছন্দকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন; এক ভাগের নাম বৃত্ত, আরেক ভাগের নাম জাতি। "পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতি রিতি দ্বিধা।" যে-সকল ছন্দে সাধারণ অক্ষরের সংখ্যা গুণে ছন্দের পরিমাণ স্থির করতে হয় সেগুলোকে বলে বৃত্ত, আর বিশেষভাবে মাত্রার পরিমাণের উপর যেসব ছন্দ নির্ভর করে সেগুলোর নাম জাতি ছন্দ। "বৃত্তম্ অক্ষরসংখ্যাতং জাতির্ মাত্রাকৃতা ভবেৎ"। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি বৃত্ত ছন্দ; গাথা, পজ্‌ঝটিকা প্রভৃতি জাতি ছন্দের অন্তর্গত। এস্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে জাতিছন্দ মাত্রাবৃত্ত নামেও পরিচিত হয়ে থাকে। সুতরাং জাতিকে যদি মাত্রাবৃত্ত নাম দেওয়া যায়, তাহলে শুধু বৃত্তকেও অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়ে মাত্রাবৃত্ত থেকে তার পার্থক্য রক্ষা করা প্রয়োজন। বাংলা ছন্দেরও দুটি প্রধান ভাগকে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত অভিধান দেওয়া যায়।

কিন্তু কি করে' এদুটো শ্রেণী ভাগ করা যায় ও তা দেখানোর আগে অক্ষর ও মাত্রা এ দুটো পরিভাষার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। প্রথমেই মনে রাখা উচিত ছন্দশাস্ত্রের অক্ষর আর ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অক্ষর এক জিনিষ নয়। ব্যাকরণে অক্ষর বা বর্ণ কাকে বলে তা পাঠশালার ছাত্রদের থেকে সুরু করে' কারো অজানা নেই। কিন্তু ছন্দের অক্ষর তা নয়; ছন্দশাস্ত্রের মতে শব্দের অন্তর্গত যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে সিলেব্‌ল্ তারই নাম অক্ষর। যথা, বাগর্থাবিব—যে-কোনো পাঠশালার ছাত্র বলে' দিতে পারে ব্যাকরণের দিক্ থেকে এখানে এগারোটি বর্ণ আছে। কিন্তু ছন্দোর শাস্ত্র-বিদ্‌রা বল্‌বেন এখানে পাচটি মাত্র অক্ষর আছে, কেন না এখানে বা-গ-র্থা-বি-ব—বাগ্‌যন্ত্রের এই পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রয়াস থেকে এই সমগ্র কথাটা উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন সংখ্যার দিক্ দিয়ে বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ-প্রয়াসের unit বা এককে বলা যায় অক্ষর, তেমনি কালের দিক্ দিয়ে উচ্চার্য্য শব্দের ওজন বা পরিমাণের একক বা unitকে বলা যায় মাত্রা। যথা—অর্থ এবং অথ সংখ্যার দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে এই দুটো শব্দের প্রত্যেকটিতেই দুটো করে' অক্ষর আছে। কিন্তু আরেক দিক্ থেকে দেখ্‌লে বোঝা যাবে প্রথম শব্দটি ওজনে দ্বিতীয় শব্দটির দেড়গুণ, কেন না প্রথমটার ঘাড়ে একটা রেফের বোঝা চাপানো হয়েছে। বস্তুতঃ প্রথম শব্দটি উচ্চারণ কর্‌তে দ্বিতীয়টির দেড়গুণ সময় লাগে। এখন দেখ্‌তে হবে এই কাল বা ওজনের দিক্ থেকে একক বল্‌ব কাকে। সকলেই জানে বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ করতে গেলে দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরের দ্বিগুণ সময় নেয়। আসলেও হ্রস্বস্বরকে দ্বিগুণ করেই দীর্ঘস্বর হয়। তা ছাড়া হ্রস্বস্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণেও হ্রস্বস্বরের সমান সময়ই লাগে। অ আর ক—এই দুটো বর্ণ উচ্চারণ কর্‌লেই একথার সত্যতা টের পাওয়া যাবে। সুতরাং হ্রস্বস্বর ও হ্রস্বস্বরান্ত ব্যঞ্জনকে মাত্রার একক বা একমাত্রিক বর্ণ বলা যেতে পারে এবং দীর্ঘস্বর ও দীর্ঘ-স্বরান্ত ব্যঞ্জন-বর্ণকে দ্বিমাত্রিক বর্ণ বলা যায়। শুধু তাই নয়, একমাত্রিক বর্ণের পরে যুক্তবর্ণ অনুস্বার এবং বিসর্গ থাক্‌লে একমাত্রিক বর্ণটিও দ্বিমাত্রিক হয়ে যায়। যথা, পূর্ব্বোক্ত অর্থ শব্দটি। এখানে রকার ও থকারের যুক্তবর্ণ পরে থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী অকারটিকে দ্বিমাত্রিক

বলে' ধর্‌তে হবে; কেননা অকারের উপর ভর দিয়েই রেফ থএর মাথায় উঠেছে; কাজেই অকারের শক্তি দ্বিগুণ। এই হিসাবে দেখা যাবে অর্থ শব্দের অকারে দুই মাত্রা, আর থকারে এক মাত্রা, সবসুদ্ধ তিন মাত্রা; কিন্তু অথ শব্দে দুই মাত্রা। বন—দুই মাত্রা, বর্ণ—তিন মাত্রা; ব্রণ—এখানেও দুই মাত্রা, কেননা ব্ ও র্ অকারের উপর ভর দিয়ে নিজেদের ওজন তার উপর চাপিয়ে দেয় নি, বরং অকারই নিজের কুক্ষিতে ওই দুই বর্ণকে আশ্রয় দান করেছে। এইরূপ বিশ্ব, পূর্ব্ব, দুঃখ, কংস প্রভৃতি শব্দে তিন মাত্রা; আনন্দ, অনন্ত, তরঙ্গ প্রভৃতি শব্দে চার মাত্রা। ছন্দের পরিভাষায় একমাত্রিক বর্ণকে লঘু ও দ্বিমাত্রিক বর্ণকে গুরু বলে—ছন্দে ত্রিমাত্রিক বর্ণের ব্যবহার হয় না।—"সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ। বর্ণসংযোগ-পূর্ব্বশ্চ।"—সুতরাং দেখা গেল অক্ষরের হিসাবে যা এক অক্ষর, মাত্রার হিসাবে তা এক-মাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক দু-ই হতে পারে। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তটাই আবার ধরা যাক্। বা-গ-র্থা-বি-ব,—অক্ষরের হিসাবে এখানে পাঁচ অক্ষর বটে, কিন্তু মাত্রার হিসাবে আট মাত্রা; কারণ বা-গ-র্থা-বি-ব পদটিতে প্রথম তিন অক্ষর গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং পরের দুই অক্ষর লঘু বা একমাত্রিক।

অক্ষর-বৃত্ত

এই তো গেল সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের হিসাব-নিকাশ। কিন্তু বলা বাহুল্য সংস্কৃতের হিসাব বাংলায় অবিকল খাটে না। প্রথমতঃ অক্ষর-বৃত্তের কথা। বাংলা অক্ষর-বৃত্তে সাধারণত শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বর অর্থাৎ হলন্ত-উচ্চারিত ব্যঞ্জন-বর্ণও এক অক্ষর বলেই গণ্য হয়, যদিও সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে এমন বর্ণ অক্ষর বলে' গণ্য হতে পারে না। যথা—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল॥

এস্থলে প্রথম ছত্রের চতুর্থ ও অষ্টম এবং দ্বিতীয় ছত্রের ষষ্ঠ অক্ষর সংস্কৃত নিয়মে অক্ষররূপে পরিগণিত হতে পারে না, কেননা তাদের স্বরান্ত উচ্চারণ হয় না। কিন্তু বাংলায় তারাও অক্ষর, তার এক মাত্র কারণ হচ্ছে এই যে শব্দের অন্তে অ-স্বর ব্যঞ্জন থাকলে তার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের আমরা দীর্ঘ উচ্চারণ করে' থাকি। কিন্তু বাংলা অক্ষর-বৃত্তে অস্বর ব্যঞ্জন-বর্ণ যদি শব্দের মধ্যে স্থান পায় তবে বাংলা ছন্দ তার মর্য্যাদা রক্ষা করে না, তাকে অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে সমান তালে সমান ওজনে উচ্চারণ করে' যায়। এখানে ছোট বড় সব সমান, পূর্ণ সাম্য। যথা—

(১) নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে?

(২) দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃ- কুলবধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটিতে ×-চিহ্নিত কোনো বর্ণেরই স্বরান্ত উচ্চারণ হবে না, তথাপি এগুলো বাংলা অক্ষর-বৃত্তে একেকটি অক্ষর বলে' গণ্য হয়েছে। তার কারণ উদ্ধৃত ছত্র কয়টি পড়্‌লেই বোঝা যাবে এগুলোর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেকটি স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হচ্ছে। সুতরাং এ বর্ণগুলোর স্বরান্ত উচ্চারণ না হওয়াতে প্রতি পংক্তিতে ওজনের যে কম্‌তি পড়ে' যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরগুলোর দীর্ঘ উচ্চারণে তার পূরণ হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং ছন্দ-পতন হয় নি। কিন্তু তা বলে' এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা চল্‌বে না। কারণ পরে যুক্তবর্ণ থাকা সত্ত্বেও দণ্ড-চিহ্নিত অক্ষরগুলো দ্বিমাত্রিক বলে' গণ্য হয় নি। আসল কথা, এখানে হসন্ত, স্বরান্ত এবং যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ, সকলেই এক ওজনে উচ্চারিত হচ্ছে, অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ সকলকেই সমান আসন দিচ্ছে। এই সাম্য-রক্ষা দোষই হোক আর গুণই হোক্, এইটেই হচ্ছে বাংলা অক্ষর-বৃত্তের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব-টুকু না থাক্‌লে এ ছন্দের কোনো মূল্যই থাক্‌ত না। কারণ এই সাম্য-রক্ষার ক্ষমতাই অক্ষর-বৃত্তের

ধ্বনিকে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর স্তরে উঠিয়ে নিতে পারে বা নিম্ন হতে নিম্নতর স্তরে নামিয়ে আন্‌তে পারে। বস্তুত অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ বর্ণের জাতিভেদ না মান্‌লেও সে কোনো বর্ণেরই অমর্য্যাদা করে না, যদিও প্রথম দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে বিশদ কর্‌ছি। যথা—

(১) ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে' আসে
বাধা-বন্ধ-হারা.
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন-ছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘ ধারা।

(২) স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্দ্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি'
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষি-কণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটো পড়্‌লেই বোঝা যাবে ছন্দের তন্ত্রী কত উঁচু সুরে বাঁধা হয়েছে। দ্বিতীয়টির ধ্বনিস্তর প্রথমটির চাইতেও উপরে। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—যুক্তাক্ষরের প্রাধান্য। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে প্রথম দৃষ্টান্তটিতে গুরু-স্বর আছে মাত্র আটটি, আর দ্বিতীয়টিতে আছে ষোলটি। এইজন্যই দ্বিতীয়টির ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য এত বেশী। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে দুটো উদাহরণেই তো গুরুস্বরের চাইতে লঘুস্বর অনেক বেশী, ছন্দের গাম্ভীর্য্য তাদের উপর নির্ভর না করে' গুরুস্বরগুলোর উপরেই নির্ভর করে কেন? এর উত্তর এই যে অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ গুরুস্বরকে লঘুস্বরের সঙ্গে একাসনে না বসিয়ে লঘুস্বরকেই গুরুস্বরের সঙ্গে একাসনে বসায়। সুতরাং পাঁচটা স্বরের মধ্যে যদি একটাও গুরুস্বর থাকে তবে ওই একটি মাত্র গুরুস্বরই বাকি চারটি লঘুস্বরকে এমন শক্তি ও গাম্ভীর্য্য দান করে যে ওই চারটি লঘুস্বর থেকেই অতি গুরু গম্ভীর ধ্বনি উদ্গত হতে থাকে; তখন মোট মাত্রা-পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এবং তার ধ্বনি আকাশের অতি ঊর্দ্ধস্তরে উঠে যায়। যথা—

× ×
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি

পদটিতে দশটি অক্ষরের মধ্যে মাত্র দুটো গুরুস্বর, সবগুলোকে আঘাত করে' কি এক শক্তির সঞ্চার কর্‌ছে আর তাদের মধ্যে কি গম্ভীর আওয়াজ নির্গত কর্‌ছে তা অনায়াসেই বোঝা যায়। যদি লেখা হত—

আলোড়িয়া ঘন তমরাশি

তবে অমনি সমগ্র ধ্বনিস্তরটাই অনেক দূরে নেমে যেত। মেঘনাদ-বধ কাব্যখানা পড়্‌লেই দেখা যায় কবি কেমন অবলীলাক্রমে নিজের প্রয়োজন-মত ছন্দের দুন্দুভিতে যুক্তবর্ণের করাঘাত করে' কাব্যের ধ্বনিকে আকাশের উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে তুলে নিয়েছেন, আবার নিজের প্রয়োজন-মত অযুক্তাক্ষরের প্রয়োগ দ্বারা ধ্বনির স্তরকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছেন। ভাবের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির এই ওঠানামার শক্তিই অক্ষর-বৃত্ত ছন্দকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এমন মহীয়ান্ করে' তুলেছে; এইজন্যই বাংলার সমস্ত মিত্রাক্ষর এবং অমিত্রাক্ষর কাব্য-গ্রন্থে, কাব্য-নাট্যে এবং গম্ভীর কবিতামাত্রেই এই ছন্দের ব্যবহার হচ্ছে।

বাংলা অক্ষর-বৃত্তের এই উত্থান-পতনের ক্ষমতাকেই রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন শোষণ-শক্তি। কারণ এই ছন্দ অক্ষরের সংখ্যা ঠিক রেখে নিজের মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্যঞ্জন-বর্ণ শোষণ করে' নিতে পারে। এ স্থলে তাঁর প্রদত্ত উদাহরণগুলি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ কর্‌তে পার্‌লুম না।

পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।

এ হল ধ্বনির প্রথম স্তর। তার পর—

পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।

এখানে একটি মাত্র যুক্তবর্ণের ঝঙ্কারে সমগ্র ধ্বনিটা এক স্তর উপরে উঠে গেল। তার পর

পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।

সমগ্র পংক্তিটার ধ্বনিমাত্রা বেড়ে যাওয়াতে আওয়াজ অনেক উপরে উঠে গেল।

পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।

আর এক স্তর উঠে গেল।

সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।

এখানে সুর একেবারে পঞ্চমে উঠে গেছে।

সঙ্গীত-তরঙ্গ-রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।

ধ্বনি ষষ্ঠ স্তরে উঠে গেছে! আরেক মাত্রা বৃদ্ধি হলে সপ্তমে উঠে যাবে বটে, কিন্তু তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

কিন্তু একথা বল্‌লে ভুল হবে যে উদ্ধৃত ছয়টি পংক্তির প্রত্যেকটিতেই সমান মাত্রা। কেননা সবগুলোতেই মাত্রা যদি সমান হত তা হলে ধ্বনির স্বরগুলো উচ্চতার হিসাবে পর পর সজ্জিত করা যেত না। অবশ্য প্রত্যেক পংক্তিতেই অক্ষরের সংখ্যা সমান, অর্থাৎ চোদ্দ। কিন্তু একটির পর একটিতে ধ্বনির পরিমাণ যেমন বেড়ে চলেছে, মাত্রার পরিমাণও তেমনি বেড়ে চলেছে। কারণ মাত্রার পরিমাণই ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং মাত্রার আধিক্যই ধ্বনির গাম্ভীর্য্য-বৃদ্ধির হেতু। প্রথম স্তরের পংক্তিটিতে মাত্রা-সংখ্যাও অক্ষর-সংখ্যার মতোই চোদ্দ, কারণ এখানে একটাও গুরুস্বর নেই। সর্ব্বশেষের পংক্তিটিতে মাত্রাসংখ্যা উনিশ, কারণ গুরুস্বর পাঁচটি, তা ছাড়া গুরুস্বরগুলোর সঙ্গগুণে লঘুস্বরগুলোও ভারী হয়ে উঠেছে। সেজন্যই ধ্বনির এত গাম্ভীর্য্য।

ধ্বনিকে গাম্ভীর্য্যের স্তরে স্তরে উন্নীত করার বিচিত্র ক্ষমতা ছাড়া ভাবকেও ক্রমে ক্রমে গুরুগম্ভীর করে' তুল্‌বার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা বাংলা অক্ষর-বৃত্তের আছে। এ ছন্দের এই অদ্ভুত ক্ষমতা কবি মধুসূদন যেদিন আবিষ্কার করেন, সেদিন থেকেই বাংলা ছন্দের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য সহস্রগুণে বেড়ে গেছে। তার পর থেকেই বাংলায় মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গভীর ও গম্ভীর কাব্য রচনা সম্ভব হয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের আগে কবির হৃদয়ের ভাব-স্রোত যতই তীব্র হোক্ না কেন তাকে পয়ারের দুটি ছত্রের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকতে হত, আর সে স্রোত আপনার অন্তরের খরবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেবলি ফোঁপাতে থাকৃত—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

কিন্তু পয়ারের গণ্ডী বিছুতেই ভাঙ্‌ল না, দাসত্বশৃঙ্খল মোচন হল না। তার পর যখন একদিন বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন এসে "পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙি কবিতার" বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়িয়ে দিলেন, সেদিন বাংলার সাহিত্যে কাব্যের বান ডেকে এসেছিল। বাংলা অক্ষরবৃত্তের যে বিচিত্র শক্তির ফলে এমন অঘটন-ঘটা সম্ভব হয়েছিল, সে শক্তিটি হচ্ছে এই যে – ভাবস্রোতের তীব্রতা ও গভীরতার সঙ্গে তাল রেখে এ ছন্দকে যতদূর ইচ্ছা প্রসারিত করে' নেওয়া যায় এবং কবি নিজের প্রয়োজনমত এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বহুস্থানে যতি স্থাপনের দ্বারা এর গতিভঙ্গিকে বিচিত্র লীলায় লীলায়িত করে' তুল্‌তে পারেন। এখানে কয়েকটি মাত্র ছত্র উদ্ধৃত করে' অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই বিচিত্র গতিভঙ্গীর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

দুর্ভাবনা।

দুঃস্বপ্ন-জননী, | ভেবো না আমার তরে
বোন্, | সুখে আছি, | মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, | কে জেনেছে জীবনের সুখ? |
মরণের তটপ্রান্তে বসে', | এ যেন গো
প্রাণপণে | জীবনের একান্ত সম্ভোগ। |

উদ্ধৃত ছত্র কয়টিতে যতিচিহ্নগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেই দেখা যায় কত বিচিত্র উপায়ে এ ছন্দে যতি দেওয়া যায়। যতির এই বিচিত্র সন্নিবেশের ফলে ছন্দ কেমন অদ্ভুত রকমে মোড় ফিরে ফিরে স্বীয় গতিপথকে তরঙ্গিত করে' তুলেছে। কোথাও চার, কোথাও ছয়, কোথাও আট, কোথাও দশ এবং কোথাও বারো অক্ষরের পরে যতি পড়ে' তার একটানা গতিকে বৈচিত্র্য দান কর্‌ছে। বাংলা অক্ষরবৃত্ত রচনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে এবং এই স্বাধীনতার ফলেই কবি এ ছন্দকে একঘেয়ে হতে না দিয়ে নব নব ভঙ্গীতে তরঙ্গিত করে' তুল্‌তে পারেন।

বাংলা অক্ষবরৃত্তের পরিচয় সমাপ্ত করার আগে সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে এর পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত ছন্দ বিবিধ তরঙ্গভঙ্গীতে দোলায়মান, তার প্রতি পংক্তির অক্ষরগুলো লঘু-গুরু-ভেদে এমনি বিচিত্র উপায়ে দুলে ওঠে যে তার ধ্বনিটাও তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছলিত হয়ে পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে দোলা দিতে থাকে। যথা—

॥ ॥। ॥ ॥।।॥ ।॥ ॥
বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃত-চারুতারম্।" (ইন্দ্রবজ্রা)

এই শ্লোকটি যথারীতি উচ্চারণ করে' পড়ে' গেলেই তার অদ্ভুত ধ্বনি-কম্পন পাঠকের মনে দোলা দিতে থাকবে। কিন্তু বাংলা অক্ষরবৃত্তের এই তরঙ্গলীলা নেই, তার স্বর একঘেয়ে; কেবল মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষরের সংঘাতে তার একটানা স্রোতকে ক্ষুব্ধ করে' তুলে' পাঠকের শ্রুতি ও চিত্তকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সচেষ্ট সচেতন করে' তোলে। যথা—

পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে
× × ×
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।

মাত্র তিনটি গুরুস্বর এই শ্লোকটিকে একান্ত নিস্তরঙ্গতা থেকে রক্ষা করেছে। পক্ষান্তরে সংস্কৃতছন্দ নৃত্য-পরায়ণ হলেও সে প্রতি চরণে প্রতি শ্লোকে এক তালেই নাচ্‌তে থাকে, তার গতিবৈচিত্র্য নেই। তাতে তার একতালা নৃত্যটাই ক্রমে একঘেয়ে হয়ে আসে। কিন্তু বাংলা ছন্দের স্রোত নিস্তরঙ্গ হলেও সে স্রোত একটানা না চলে' পর্ব্বত-উপত্যকা-বন্ধুর সমতল বহুবিচিত্র ভূমির উপর এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে পাঠককে স্বীয় গতিপথের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সুষমায় মুগ্ধ করতে থাকে। "দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্ন-জননী" ইত্যাদি কাব্যাংশটি পড়্‌লেই একথা বেশ বোঝা যাবে।

মাত্রাবৃত্ত

দ্বিতীয়তঃ, মাত্রাবৃত্তের কথা। এ সম্বন্ধে একমাত্র বক্তব্য এই যে বাংলায় সংস্কৃতের মতো স্বরবর্ণে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, বাংলায় সব স্বরেরই লঘু বা এক-মাত্রিক উচ্চারণ। কেবল ঐকার ও ঔকারের গুরু বা দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ হয়। তা ছাড়া হসন্তবর্ণ, অনুস্বার বা বিসর্গ পরে থাকলেও পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দুই মাত্রা গণনা করা হয়। অক্ষরবৃত্তের মতো এ ছন্দে অক্ষর-সংখ্যা ঠিক রেখে যথেচ্ছ যুক্তবর্ণের প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু এ ছন্দে মাত্রার পরিমাণ ঠিক রেখে ইচ্ছামত যুক্ত-বর্ণ ব্যবহার করা যায় এবং তাতে অক্ষর-সংখ্যা কমে' যায়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যথেষ্ট পরিমাণ যুক্তাক্ষরের প্রয়োগে ছন্দের সৌন্দর্য্য বা ধ্বনির মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়। কারণ তাতে ছন্দ-প্রবাহের একটানা ভাবটি দূর হয়ে নানা রকম ঢেউ খেল্‌তে থাকে। মাত্রাবৃত্তের কয়েকটা উদাহরণ দিলেই তার স্বভাবটি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যথা—

(১) লঙ্ঘি এ | সিন্ধুরে | প্রলয়ের | নৃত্যে
ওগো কার | তরী ধায় | নির্ভীক | চিত্তে,
অবহেলি | জলধির | ভৈরব | গর্জ্জন
প্রলয়ের | ডঙ্কার | ওঙ্কার | তর্জ্জন ?

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারমাত্রা আছে, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির শেষ ভাগে তিন তিন মাত্রা। কিন্তু বিভিন্ন পংক্তিচ্ছেদে অক্ষর-সংখ্যার কোনও সামঞ্জস্য নেই।

(২) কি কথা উঠে | মর্ম্মরিয়া | বকুল-তরু- | পল্লবে,
ভ্রমর উঠে | গুঞ্জরিয়া | কি ভাষা।
উর্দ্ধমুখে | সূর্য্যমুখী | স্মরিছে কোন্‌ | বল্লভে,
নিঝরিণী | বহিছে কোন্‌ | পিপাসা।"

শেষাংশগুলো বাদে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে পাঁচটি করে' মাত্রা আছে। কিন্তু অক্ষর-সংখ্যার সামঞ্জস্য নেই। প্রথম ও তৃতীয় ছত্রের শেষাংশে চার মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের শেষাংশে তিন মাত্রা করে' আছে।

(৩) এ নহে মুখর | বন-মর্ম্মর- | গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর | গরজে সাগর | ফুলিছে,
এ নহে কুঞ্জ | কুন্দ-কুসুম- | রঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল | কল-কল্লোলে | দুলিছে।

শেষাংশগুলো বাদে প্রতি ভাগে ছয় মাত্রা। প্রথম-তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ ছত্রের শেষাংশে যথাক্রমে চার ও তিন মাত্রা আছে।

(৪) শ্বেত- ললাটে লাঞ্ছনা | রক্ত-চন্দন, |
বক্ষে গুরু শিলা | হস্তে বন্ধন, |
নয়নে ভাস্বর | সত্য-জ্যোতি-শিখা, |
স্বাধীন দেশবাণী | কণ্ঠে ঘন বোলে, |
যে ধ্বনি উঠে রণি | ত্রিংশ কোটি আজি |
মানব-কল্লোলে। |

এখানে প্রতি ভাগে সাতটি করে' মাত্রা আছে, কিন্তু অক্ষর-সংখ্যার স্থিরতা নেই।

আশা করি উদ্ধৃত উদাহরণগুলি থেকেই পাঠক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ধ্বনির গাম্ভীর্য্য এবং বাক্যের সম্প্রসারণ-ক্ষমতা অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব; সুতরাং সে গুরুগম্ভীরভাবের উপযুক্ত বাহন। এজন্যই বৃহৎ কাব্যে, নাটকে এবং গম্ভীরভাবপ্রকাশক কবিতাদিতে অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের ব্যবহার এত বেশী। কিন্তু স্বর-বৈচিত্র্যই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব। এজন্যই এ ছন্দ গীতি-কবিতার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এ ছন্দ গম্ভীরভাবের কবিতার পক্ষে একেবারেই অযোগ্য, তাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনা করা অসম্ভব। অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের ধ্বনি-বৈষম্য অর্থকেও কেমন দুই স্বতন্ত্র উপায়ে ফুটিয়ে তোলে এবং দুই-বিভিন্ন শক্তিতে শক্তিশালী করে' তোলে তা নিম্নোক্ত কাব্যাংশ দুটো পড়লেই বেশ বোঝা যাবে।

(১) "দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ-বন্দনা করি করে নমস্কার,
কারাগার করে অভ্যর্থনা। * * *
* * * আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকার,—
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে; দুর্গতির করে অহঙ্কার;
সেই ভীরু নতশির চির শাস্তি-ভারে,
রাজকারা-বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।" (অক্ষরবৃত্ত)

(২) "আজি কারার সারাদেহে মুক্তি-ক্রন্দন
ধ্বনিছে হাহাস্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যেথা বন্দী কারাগৃহ
সেথা কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীরদলে?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা মুক্ত নভতলে।"
(মাত্রাবৃত্ত)

দুটোতেই প্রচুর শক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রথমটিতে পৌরুষশক্তি যেন সমস্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে' আপনার গতি-বেগে আপনি বীরদর্পে পা ফেলে ছুটে চলেছে। দ্বিতীয়টিতে নারীশক্তি যেন পদে পদে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং ওই নিয়ন্ত্রণের ফলেই তার ভিতরকার শক্তি দ্বিগুণ বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্ছে। (ক্রমশঃ)

বোধচন্দ্র সেন

জয়ন্তী

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হিসাবে ভুল

বেগমদিগের দাসীরাও পর্দানশীন, মহলের বাহিরে যাওয়া কিম্বা কোন ভৃত্য অথবা কর্ম্মচারীর সহিত কথা কহা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু গোপনে অপরাধ করা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই স্বভাব, কেহ শাস্তির ভয়ে নিবৃত্ত হয় না। ফাতেমা বিবির বাঁদী নসরৎ গোপনে রম্‌জানের সহিত সাক্ষাৎ করিত। রম্‌জানের নিকট সংবাদ জানিয়া ফাতেমা বেগমকে বলিত। রম্‌জানকে খুসী রাখিবার জন্য রহস্য-আলাপও করিত। সুবেদার ও শাহজাদা চলিয়া গেলে এক দিন সন্ধ্যার সময় নসরৎ রম্‌জানের সহিত দেখা করিল।

রম্‌জান বলিল, "আজ কি মত্‌লব?"

নসরৎ কহিল, "মত্‌লব আবার কি? মত্‌লব না থাকিলে কি আসিতে নাই? না হয় উঠিয়া যাই।"

নসরৎ উঠিবার ভান করিল। রম্‌জান তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সে কি কথা! একটা দিল্‌লগীর কথা কি বলতে নাই?"

নসরৎ কহিল, "মিঞা, সে পরের কথা। গোড়াতেই কেন?"

রম্‌জান কহিল, "কসুর মাফ!"

নসরৎ বলিল, "এখন ত তোমার কাছে আর কোন খবরই পাওয়া যায় না। বেগম কত রাগ করেন।"

"আমি ত তোমাকে সব খবরই বলি, তবে না থাকিলে কি কাহিনী বানাইয়া বলিব? এমন রাগ বেগমের অন্যায়।"

নসরৎ রম্‌জানের একটু কাছে সরিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সে দিন তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?"

"কবে?" রম্‌জান যেন কিছুই জানে না।

"তুমি আমার কাছে লুকাইতেছ। যে দিন তোমরা কয়জন মিলিয়া সেই বনমানুষীটাকে ধরিতে গিয়াছিলে?"

রম্‌জান তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "চুপ, চুপ, মন্‌সব্‌দার সাহেব ও-কথা শুনিলে আমরা জল্লাদের হাতে যাইব।"

"না শুনিলেই কি তোমরা রক্ষা পাইবে না কি?"

রম্‌জান কহিল, "একথা তুমি কাহার মুখে শুনিলে?"

"যাহারই মুখে শুনিয়া থাকি, এখন তোমার মুখে শুনিতে চাই।"

রম্‌জানের বড় ভয় হইল। সে একা নয়, তাহার সঙ্গে আরও তিন জন ছিল। কে প্রকাশ করিয়াছে কে জানে? আর এখন সে যদি নসরতের নিকট ব্যাপারটা গোপন করে তাহা হইলে বেগম রাগ করিবেন। যদি মন্‌সব্‌দার জানিতে পারেন তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! রম্‌জান উভয়-সঙ্কটে পড়িল। এমন অবস্থায় সে বুদ্ধির কাজ করিল, সকল কথা নসরৎকে খুলিয়া বলিল।

নসরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "অওরৎটা দেখিতে কেমন?"

রম্‌জান চোক উল্টাইয়া বলিল, "কুছ্ পুছো মৎ! বিহিশ্‌তের হুরী বা কোথায় লাগে। তাহাকে পাইলে মন্‌সব্‌দার আর কোন বেগমের দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না।"

"এ কথা বেগমকে এখনি বলিতে হইবে," বলিয়া নসরৎ উঠিল।

রম্‌জান তাহার পথ আগ্‌লাইয়া বলিল, "বাঃ এমন খবরের জন্য কিছু ইনাম দিবে না?"

"তুমি ত বড় বেতমিজ" বলিয়া নসরৎ পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। গিয়া ফাতেমা বেগমকে সকল কথা শুনাইল।

বনবাসিনী রমণী পরমা সুন্দরী শুনিয়া ফাতেমার আশঙ্কা হইল। তিনি মলেকা বেগমের মহলে গমন করিলেন।

ফাতেমা বড় একটা কাহারও মহলে যাইতেন না। সুয়া কি না, আপন গরবেই থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া মলেকা ভাবিলেন একটা কিছু বড় ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে, নইলে ইনি যে হঠাৎ এখানে! মলেকা ফাতেমাকে আদর করিয়া নিজের পাশে বসাইয়া, সোনার শিকল-দেওয়া পান-দানি হইতে কেওড়াজল দেওয়া পানের খিলি বাহির করিয়া দিলেন। "এস, বহীন, বস", বলিয়া মলেকা ফাতেমার হাত ধরিলেন।

ফাতেমার আদব কায়দা বিল্‌কুল দুরুস্ত। বলিলেন, "বেগম সাহেবা, আমাদের তিন ভগিনীরই ত ভারি বিপদ।"

মলেকা মনে মনে হিসাব করিলেন, বিপদ এক জনের, যিনি বলিতেছেন তাঁর। মলেকা কিম্বা খদিজার বিপদের জন্য ফাতেমার ত বড় মাথা-ব্যথা! এখন তিন জনকে একসঙ্গে জড়াইবার অর্থ আর কিছু নয়, কথার একটু অলঙ্কার—গৌরবে বহুবচন। মলেকা মুখে বলিলেন, "কি রকম বিপদ?"

"মন্‌সব্‌দার আবার শাদি করিবেন।"

"সে তাঁহার ইচ্ছা, তিনি ত আরও একটা শাদি করিতে পারেন। তাহাতে আমাদের বিপদ্ কি?"

"শুনিতেছি সে অওরৎ নাকি বড় খুব্‌সুরৎ। তাহা হইলে ত মন্‌সব্‌দার আমাদের দিকে আর চাহিয়াও দেখিবেন না।"

মলেকা মুখ বিকৃত করিলেন। "বহীন, তুমি নিজের কথা বল। মন্‌সবদার আমাদের দিকে কবেই বা চাহিয়া দেখেন?"

ফাতেমা নম্রভাবে কহিলেন, "আমাকে যাহাও বা একটু মেহেরবানি করেন তাহাও করিবেন না। কিন্তু আমি সে কথা ভাবিতেছি না। মন্‌সব্‌দার যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন সে নাকি বনে থাকে, কোন্ দেশে বাস কেহ জানে না, হয়ত এখানে আসিয়া আমাদের সকলের প্রতি অত্যাচার করিবে। তখন আমাদের কি দশা হইবে?"

"কি আর হইবে? নসীবে যাহা আছে তাহাই হইবে। আমাদের ত আর তাড়াইয়া দিতে পারিবে না, তাহা হইলে মন্‌সব্‌দারের বদ্‌নাম হইবে। আর অত্যা-চার করিলে আমরা বাদ্‌শাহকে আর্‌জি করিব।"

এমন সময় খদিজা বেগম আসিলেন। খদিজা সুন্দরী, বয়স অল্প, চতুর, স্বল্পভাষিণী। ফাতেমার কথা শুনিয়া খদিজা কহিলেন, "মন্‌সব্‌দারের যেমন ইচ্ছা সেইরূপ করিবেন, আমাদের তাহাতে কি? আমরা যেমন আছি সেইরূপ থাকিব।"

ফাতেমা বুঝিলেন না। তিনি বুদ্ধিমতী হইলে কি হয়, ঈর্ষাদ্বেষে জর্জ্জরিত-হৃদয় হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন। সে দিন সন্ধ্যার পর মন্‌সব্‌দার সাহেব তাঁহার ঘরে আসিলে তিনি মুখ ভার করিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

জলালুদ্দীনেরও মন ভাল ছিল না। তাঁহার বিরুদ্ধে যদিও কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার ভয় হইয়াছিল। বাদ্‌শাহের নিকট কে নালিশ করিল? এ ত মূর্খ গ্রামবাসীর কাজ নয়। এ কোন বুদ্ধিমান্ শত্রুর কাজ। আরও একটা কথায় তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বনবাসিনী কে? সে ত একাকিনী নহে, সঙ্গে রক্ষকগণ আছে, রম্‌জান ও তাহার সঙ্গীর দুর্দ্দশা তাহার প্রমাণ। বনে কোথায় এমন স্থান আছে যেখানে ইহারা লুকাইয়া থাকিতে পারে? আর এত দেশ থাকিতে ইহারা বনেই বা কেন আছে? এই যে ষড়যন্ত্র, ইহার সহিত কি ইহারা লিপ্ত? এই কথা মনে হইতেই মন্‌সব্‌দার আরও শঙ্কিত হইয়াছিলেন, কিন্তু রমণীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে দৃঢ় হইয়াছিল। এই-রকম নানারূপ ভাবনায় তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত ছিলেন, ফাতেমার মহলে বিশ্রাম ও তৃপ্তির জন্য আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন বেগম মানিনী, কথাই কহেন না।

মন্‌সব্‌দার কৌতুকের ক্ষীণ চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "বিবি, গোসা কেন? বন্দার কোন অপরাধ হইয়াছে?"

বেগম কাঁদিয়া, কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "অপরাধ কাহারও নাই, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

জলালুদ্দীন অবাক্। "কেন, কে কি করিয়াছে, কে কি বলিয়াছে?"

"কে আবার কি করিবে, কি বলিবে? আমি কি আর কাহারও কোন পরোয়া করি? তুমি আমাকে ভাল বাস বলিয়া অহঙ্কার করিতাম, সে অহঙ্কার ঘুচিল।"

"ও কি কথা?"

"তুমি ত আবার শাদি করিবে।"

"কাহার কাছে তুমি শুনিলে!"

"যাহার কাছেই আমি শুনিয়া থাকি। তুমি হলফ্ করিয়া বল, কথা সত্য কি মিথ্যা।

মন্‌সব্‌দার ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া কহিলেন, "তুমি কি পাগল হইলে নাকি? আমার এত রকম ঝঞ্ঝাট, আমার কি এত সময় আছে যে আমি আর-একটা বিবাহের ভাবনা ভাবিব?"

ফাতেমা স্বামীর বিরক্তিভাব লক্ষ্য করেন নাই। তিনি কহিলেন, "তুমি ত আমার কথার উত্তর দিলে না। নূতন বিবাহের কথা সত্য কি মিথ্যা শপথ করিয়া বল।"

কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য জলালুদ্দীন ফাতেমাকে আদর করিবার চেষ্টা করিলেন, বেগমের হাত ধরিয়া কাছে টানিলেন। ফাতেমা রাগিয়া হাত ছিনাইয়া লইলেন, কহিলেন, "তবে সত্য কথা, তুমি বনে যাহাকে দেখিয়াছিলে তাহাকে বিবাহ করিবে।"

মন্‌সব্‌দারের প্রথমে বিস্ময়, পরে রাগ হইল। "তোমার কাছে আসাই আমার ভুল হইয়াছে," বলিয়া তিনি রাগিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। ফাতেমা মনে করিলেন, মন্‌সব্‌দারের রাগ এখনি পড়িয়া যাইবে, আবার ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলেন না।

ফিরিবার উপায়ও ছিল না। রাগের মাথায় জলালুদ্দীন যে পথে আসিয়াছিলেন সে পথ দিয়া না ফিরিয়া অন্য দিকে চলিলেন। পথে খদিজা বেগমের মহল। দরজার সম্মুখে বেগম দাঁড়াইয়া ছিলেন।

জলালুদ্দীন দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া খদিজা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন, কহিলেন, "এখনও ত রাত্রি হয় নাই, এখনি সদর মহলে যাইতেছ কেন?"

জলালুদ্দীন দাঁড়াইলেন, খদিজার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। খদিজা সুন্দরী, নবযুবতী, চক্ষের দৃষ্টি কোমল, উজ্জ্বল, প্রেমপূর্ণ; মস্তকের, বক্ষের ওড়না স্রস্ত হইয়াছে, বক্ষস্থিত হস্তের অঙ্গুলি কম্পিত হইতেছে। জলালুদ্দীন দাঁড়াইয়া সেই প্রেমার্ত্ত নয়ন, ঈষৎবিকশিত ওষ্ঠাধর, ও অঙ্গে অঙ্গে ঈষচ্চঞ্চল যৌবন-তরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন।

এক পদ অগ্রসর হইয়া ব্রীড়াবনত মুখে অতি মৃদু, অতি মধুর কণ্ঠে খদিজা কহিলেন, "আমার কাছে আসিয়া একটু বিশ্রাম কর।" খদিজা কম্পিত অঙ্গুলি দিয়া জলালুদ্দীনের কর স্পর্শ করিলেন। জলালুদ্দীনের অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। "চল," বলিয়া জলালুদ্দীনও খদিজার হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ফাতেমার আশঙ্কা নূতন সপত্নী বন হইতে আসিবে, ঘরের সপত্নী যে তাঁহাকে স্বামীর সোহাগ হইতে বঞ্চিত করিবে এ সম্ভাবনা স্বপ্নেও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট্-সন্নিধানে

প্রভাতে বাদ্‌শাহ তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিলেন, কতক সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। বলের জন্য হকীম ইয়াকুতি ও অপর ঔষধ-মিশ্রিত সরবৎ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে ফল হইয়াছিল। ঔষধের শূন্য পেয়ালা সম্মুখে রহিয়াছে।

পত্রহস্তে ভৃত্য প্রবেশ করিল। ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া পত্র বাদ্‌শাহের হস্তে দিল। বাদ্‌শাহ দেখিলেন পত্র খোলা নয়, বন্ধ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পত্র মীর মুন্‌শীকে না দিয়া আমার নিকট আনিলে কেন?"

"হুজুর, মীর মুন্‌শী দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, পত্র তিনি খুলিবেন না, হুজুর স্বয়ং খুলিবেন।"

বাদ্‌শাহ পত্র আবার দেখিলেন। শিরোনামা পাঠ করিলেন, পত্রের মোহর লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। কহিলেন, "মীর মুনশী সাহেব সত্য কহিয়াছেন। এ পত্র আর কাহারও খোলা উচিত নয়।"

বাদ্‌শাহ পত্র খুলিলেন। নিবিষ্ট চিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কে পত্র আনিয়াছে?"

"উজীর সাহেব তাহাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন।"

"তাহাকে এখানে লইয়া আইস। তাহাকে আগে বসিবার স্থান দাও।"

ভৃত্যের কি শুনিবার ভ্রম হইল? বাদ্‌শাহের সম্মুখে বসিবার স্থান? আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠে কেহ কখন তাঁহার সম্মুখে বসে নাই, অন্ততঃ ভৃত্য ত কখনও দেখে নাই।

বসিবার স্থান দিয়া, শূন্য পেয়ালা উঠাইয়া লইয়া ভৃত্য নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

উজীরের সহিত পত্রবাহক বাদ্‌শাহের কক্ষে প্রবেশ করিল। বাদ্‌শাহ উজীরকে কহিলেন, "আপনার থাকিবার প্রয়োজন নাই। ইঁহার সহিত আমার গোপনে কথা আছে।"

উজীর ত চলিয়া যান। এমন কি গোপনীয় কথা যে তিনি শুনিতে পান না? যাইবার সময় কহিলেন, "ইঁহার সহিত বাদশাহ একা—?"

বাদ্‌শাহ কহিলেন, "হাঁ, আমি একাই দেখা করিব, কোন চিন্তা নাই।"

উজীরের সঙ্গে যে আসিয়াছিল সে আর কেহ নহে—গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর মাথা নত করিলেন না, পিছু হটিয়া কুর্ণীশও করিলেন না, দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া অভিবাদন করিলেন। বাদ্‌শাহ কহিলেন, "বসুন। বালানন্দজী আপনার সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি।"

"পত্রে আমার পরিচয় আছে?"

"আছে।"

"তথাপি আপনি আমার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতেছেন? আপনার কি কোন আশঙ্কা নাই?"

বাদশাহ রুগ্ন, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল। তথাপি চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। মুহূর্ত্ত পরে সংযতচিত্তে, ধীর-কণ্ঠে কহিলেন, "মোগল আশঙ্কা জানে না। সম্রাট্‌কে যে এমন কথা বলে তাহার সেই শেষ কথা, কিন্তু আপনি সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রিত, আপনার অপরাধ লইব না।"

ঈষৎ-হাস্যমুখে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আপনি সম্রাট্ আমি উদাসী ভিখারী, যদি অযথা কথা বলিয়া থাকি, মার্জ্জনা চাহিতেছি। আপনি ভয়শূন্য; আমাকে কি ভীত মনে করেন?"

বাদ্‌শাহের মুখে হাসি দেখা দিল। "আমি ত এমন

কথা বলি নাই। আপনি যে এখানে আসিয়াছেন ইহা হইতে নির্ভীকতার কি পরিচয় হইতে পারে? বরং সিংহের মুখে হস্তপ্রদান করা সহজ, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সম্মুখে শত্রুভাবে আসা কঠিন। কিন্তু এই পত্র আপনার সহায়, আপনি নিশ্চিন্তে আপনার বক্তব্য বলুন। সংক্ষেপে বলিবেন, এই মাত্র অনুরোধ।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "সংক্ষেপেই বলিব। আমরা বিদ্রোহী নহি, গোপনে বাদ্‌শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি না। প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল, এবং আপনি প্রজার মঙ্গলে যত্নবান্। কিন্তু এই বিশালরাজ্যে কোথায় কি হইতেছে আপনি কেমন করিয়া সে সন্ধান রাখিবেন? সহস্র গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেও সকল সত্য সংবাদ পাইবেন না। সকলেরই মুখ বন্ধ করিবার অমোঘ উপায় আছে। অর্থ দ্বারা কত যে অনর্থ সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথায় কোন্ রাজপুরুষ অথবা কর্ম্মচারী কিরূপ প্রজাপীড়ন করে আপনি কিরূপে জানিবেন? অর্থ ব্যয় করিলেই সকল অত্যাচার গোপন করা যায়। সুতরাং প্রজাদিগকে আত্মরক্ষার শিক্ষা দিতে হইবে। প্রজা আত্মরক্ষা করিতে শিখিলে অত্যাচার আপনা-আপনি নিবৃত্ত হইবে। ইহাই আমাদের ষড়যন্ত্র, আর কোন দুরভিসন্ধি নাই।"

বাদ্‌শাহ কহিলেন, "দুষ্টকে দমন করা রাজার কাজ, প্রজার নহে।"

"মানিলাম। কিন্তু দুষ্টের অনিষ্ট প্রমাণ করিবে কে? সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অপরাধ কিরূপে প্রমাণিত হইবে? সত্যকে গোপন করিলে সত্য কিরূপে প্রকাশিত হইবে?"

বাদ্‌শাহ কহিলেন, "আপনার যুক্তি বুঝিতে পারিতেছি না। রাজপুরুষেরা রাজাকর্ত্তৃক নিয়োজিত, অপরাধ করিলে রাজার নিকট অভিযুক্ত হইবে। প্রজারা কিরূপে তাহাদের বিচার করিবে? রাজার ও প্রজার যুগ্ম-শাসন কোথাও শুনিয়াছেন?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আত্মরক্ষা ত শাসন নহে। রাজার ক্ষমতা হরণ করা ত প্রজার উদ্দেশ্য নহে, আমরাও কখন এমন শিক্ষা দিই নাই। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে প্রজার বল হইতেই রাজার বল। প্রজা চিরন্তন, রাজা জলপ্রবাহে বুদ্বুদ মাত্র। চন্দ্র-সূর্য্য-রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রজার লোপ নাই। কোন্ সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী? যুগে যুগে প্রজা আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এইজন্যই উহার বিনাশ নাই।"

বাদ্‌শাহ মৌনী হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এ প্রসঙ্গে কোন ফল নাই। আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; আপনারা বিদ্রোহী নহেন এবং বিদ্রোহের সূত্রপাত করিতেছেন না, বুঝিলাম। আমার যে উদ্দেশ্য, আপনাদেরও সেই উদ্দেশ্য। আপনারা গোপনে মন্ত্রণা করেন, গোপনে প্রজাদিগকে শিক্ষা দেন, তাহার কারণ রাজপুরুষেরা আপনাদের বিরোধী। যদি আপনারা প্রকাশ্যে আমার পক্ষ অবলম্বন করেন তাহা হইলে ক্ষতি কি? আপনি যে কয়জনের নাম করিবেন তাঁহাদিগকে নিয়োগ-পত্র দিব, তাঁহারাও আমার কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "সম্রাট্, তাহা হইলে আমাদের কার্য্য, আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইবে। আমরা দরিদ্র, দরিদ্রই থাকিব। আমাদের কোন প্রার্থনা নাই, আমাদের কোন প্রলোভন নাই। আমরা রাজ-পুরুষ নহি, আমরা প্রজা-পুরুষ, প্রজার সেবায় দেহপাত করিব।"

সম্রাট্ বলিলেন, "যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া আবার আপনার সাক্ষাৎ পাইব?"

গৌরীশঙ্কর বস্ত্র-মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র তাম্রফলক বাহির করিয়া বাদ্‌শাহের হস্তে দিলেন। ফলকে কতকগুলি চিহ্ন ছিল। গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "যে-কোন গ্রামবাসীর হস্তে এই তাম্রখণ্ড দিলে আমি জানিতে পারিব যে বাদ্‌শাহ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার সন্নিধানে কিরূপে আগমন করিব? দ্বিতীয় বার কি স্বামীজীর শরণাগত হইব?"

বাদ্‌শাহ কহিলেন, "প্রয়োজন নাই।" শয্যায় উপাধানের পার্শ্বে একটি হস্তীদন্তের ক্ষুদ্র বাক্স ছিল। বাদ্‌শাহ খুলিয়া একটি অঙ্গুরী গৌরীশঙ্করকে দিলেন। বলিলেন, "যদি কখন আমার কর্ম্মচারীগণ অথবা রাজ্য-সংক্রান্ত

কোন ব্যক্তি আপনাকে কোনরূপ পীড়ন করে, অথবা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই অঙ্গুরী প্রদর্শন করিবেন। বিদায়ের পূর্ব্বে আর এক অনুরোধ। আপনি দূরদর্শী, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী পুরুষ। আমার বিশ্বাস চিকিৎসা-শাস্ত্রে আপনার অভিজ্ঞতা আছে। আপনি একবার আমাকে পরীক্ষা করুন।"

গৌরীশঙ্কর সম্রাটের নাড়ী ও দেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "আপনি কি জানিতে চাহেন?"

"আমার শরীরের অবস্থা।"

"রোগ কঠিন, রক্ষা পাইবেন না।"

"তাহা জানি। কতদিন আয়ু?"

"দুই মাস, সম্ভবতঃ এক মাস।"

"পুত্রেরা সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে? কে জয়ী হইবে?"

"শাহজাদা রুস্তম। আপনার সেই ইচ্ছা। আমরাও সেই চেষ্টা করিব।"

দুই-হস্ত দ্বারা বাদ্শাহ গৌরীশঙ্করের হস্তধারণ করিলেন, আর্দ্র চক্ষে কহিলেন, "আপনার কথায় আশ্বস্ত হইলাম। আমাদের আর একবার দেখা হইবে।"

গৌরীশঙ্কর বাহিরে আসিলে উজীর প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারীগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দান

গৌরীশঙ্করের বেশ সাধারণ ভদ্রলোকের মত, কোনরূপ পারিপাট্য ছিল না। সহরে একজন সাধারণ দোকানদারের গৃহে বাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসের জন্য দোকনদার একটি ভাল ঘর দিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর সেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার লোক জন কেহ ছিল না। তিনি কোথায় যাইতেন, কি করিতেন, দোকানদার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

বাসায় ফিরিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গৌরীশঙ্কর বসিয়া আছেন, এমন সময় দ্বারে আঘাত হইল। গৌরীশঙ্কর দরজা খুলিয়া দেখিলেন এক জন খোজা দাঁড়াইয়া আছে। কোন ধনীর মহলের ভৃত্য হইবে। গৌরীশঙ্কর তাহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া বলিলেন, "আমি বিদেশী, মোসাফির, আমার সহিত তোমার কি প্রয়োজন?"

খোজা ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "বাদ্শাহের অন্দর-মহলে প্রধান বেগম সিরাজী সাহেবার আমি ভৃত্য। যদি বাদ্শাহ জানিতে পারেন আমি আপনার নিকট আসিয়াছি তাহা হইলে তদ্দণ্ডে আমার কতলের হুকুম হইবে।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খোজার প্রতি চাহিয়া গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "তবে আসিলে কেন?"

দক্ষিণ হস্ত উল্টাইয়া খোজা কহিল, "বেগমের আদেশে। যদি তাঁহার আদেশ পালন না করি তাহা হইলে রাত্রিকালে যমুনায় কুম্ভীরে আমার দেহ ভক্ষণ করিবে। উভয় পক্ষে মৃত্যু নিশ্চিত।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এমন চাকরী সুখের নহে।"

খোজা বলিল, "আমি ক্রীতদাস, আমার জীবনের মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে।"

"আমি সামান্য পথিক, এখানে আমি ত্রিরাত্রিও বাস করিব না। আমার সম্বন্ধে বেগম কি জানেন, আর তোমাকেই বা কেন এখানে পাঠাইয়াছেন? ইহাতে আমারও আশঙ্কা।"

"বেগম বলিয়াছেন, আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনি আজ শাহান্‌শাহার নিকট গিয়াছিলেন, বাদ্শাহ আপনার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন?"

"জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কথার উত্তর পাইবে না। তোমার কি বলিবার আছে, বল।"

"আপনি কে বেগম জানেন, আপনার ক্ষমতাও তিনি অবগত আছেন। সাধারণে না জানিলেও বেগম জানেন বাদ্শাহের পীড়া সাংঘাতিক, আরোগ্য হইবেন না। বাদ্শাহের ভাল মন্দ কিছু হইলেই সিংহাসনের জন্য দুই শাহজাদায় যুদ্ধ বাধিবে। বেগমকে আত্মরক্ষার জন্য এক পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। বেগমের আদেশ-মত আপনাকে সকল কথা স্পষ্ট বলিলাম। বেগম আপনার পরামর্শ ভিক্ষা করেন।"

গৌরীশঙ্করের মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। কহিলেন, "বেগম স্বয়ং বুদ্ধিমতী, এমন কি, বুদ্ধিবলে তিনি

বাদ্‌শাহকে আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি কি এ বিষয়ে কিছু ভাবেন নাই?"

"অনেক ভাবিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় শাহজাদা রুস্তমের পক্ষ অবলম্বন করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।"

"বেগমের বিবেচনা বিশেষ প্রশংসনীয়।"

"আপনিও সেই পরামর্শ দেন?"

"সিরাজী বেগম সাহেবাকে পরামর্শ দিব আমার এমন স্পর্দ্ধা নাই। তবে আমার মনে হয় বেগমের বিবেচনা উত্তম।"

খোজা বুঝিল। সে কহিল, "দাসের প্রতি আর কোন আদেশ আছে?"

"আমার কিছুই বলিবার নাই।"

খোজা বস্ত্রের ভিতর হইতে আশ্‌রফির তোড়া বাহির করিল। কহিল, "দরিদ্র প্রজাদিগের জন্য বেগম সৎ-সামান্য সাহায্য পাঠাইয়াছেন।"

"প্রজার জন্য, না আমার পুরস্কার স্বরূপ?"

"জনাব, আপনাকে বেগম এমন অপমান করিতে পারেন না।"

তোড়া রাখিয়া খোজা চলিয়া গেল।

দোকানদার সেই সময় আসিয়া উপস্থিত। দেখিল, খোজা বাহির হইয়া যাইতেছে। দোকানদার আসিয়া গৌরীশঙ্করকে প্রণাম করিল, কহিল, "মহারাজ, বাদ্‌শাহের মহলের খোজা বাহির হইয়া গেল। এখানে কেন আসিয়াছিল?"

গৌরীশঙ্কর হাসিলেন, "তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?"

"আমার কি এমন মাথার উপর মাথা আছে যে জিজ্ঞাসা করিব?"

"তবে এখন কেন করিতেছ?"

"আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। কোন বিপদ্ হইবে না ত?"

"কি জানি? বিপদ্ তোমার, না আমার?"

"আপনি জানেন। আমরা সামান্য ব্যবসাদার, এরকম লোক এখানে আসিলে আমারই বিপদ্।"

"কোন আশঙ্কা নাই। আমাদের দুই জনের কাহারও কোন বিপদ্ হইবে না।"

তোড়ার উপর দোকানদারের নজর পড়িল। বিস্মিত হইয়া কহিল, "এ কি এ?"

"আশ্‌রফির তোড়া।"

"কে দিল? খোজা রাখিয়া গিয়াছে?"

"আর ত কেহ এখানে আসে নাই। কে দিয়াছে খোজা বলিতে পারে।"

"কাহার জন্য?"

"দরিদ্র প্রজাদের জন্য।"

দোকানদার কহিল, "শহরে ত অনেক গরিব প্রজা আছে, আমিও গরিব।"

গৌরীশঙ্কর দুইটি আশ্‌রফি বাহির করিয়া দোকানদারের হাতে দিলেন। কহিলেন, "আশ্‌রফি ভাঙ্গাইয়া গ্রামে বিতরণ করিব, শহরে নয়।"

দোকানদার চুপ করিল। পর দিবস গৌরীশঙ্কর শহর ত্যাগ করিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মুক্তি-বাঁধন

পরল যেচে বোঁটার বাঁধন যে-ফুল নিজে সাধ করে',
গন্ধ কি তার সেই বাঁধনে রইল কভু বন্ধ গো?
কাঁদল যে-গান সুরের কাঁদন্ ছোট্ট বাঁশীর অন্তরে
বিশ্ব জুড়ে বজ্‌ল যে ঐ তারি মোহন ছন্দ গো!

তাই ত এ-মোর পরাণ-পুটে আমার বুকের রস পিয়ে
ফুট্‌ল প্রেমের অরুণ-রাঙা এই যে তরুণ মঞ্জরী,
সুবাস কি এর যায় গো ঢাকা মোর হৃদয়ের বাঁধ দিয়ে
সারা নিখিল-চিত্তমাঝে বেড়ায় সে যে সঞ্চরি!

শ্রী হৃষীকেশ চৌধুরী

গোয়া ও সারস্বত ব্রাহ্মণ

ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজদের উপনিবেশ গোয়ার সঙ্গে আমাদের অধিকাংশেরই কেবলমাত্র ভূগোলের মধ্যে দিয়েই পরিচয় হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে ভারতের পশ্চিমকূলের একপ্রান্তে এই দেশটির সঙ্গে আমাদের যে একটুখানি সম্বন্ধ আছে তা সাধারণের কাছে অজ্ঞাত।

গোয়ার একদিকে সমুদ্র, আর বাকী দিক্‌গুলি ভীষণ অরণ্যময় পশ্চিমঘাট অথবা সহ্যাদ্রি পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই পর্ব্বতসঙ্কুল অরণ্যময় স্থানটি সারস্বত ব্রাহ্মণদের অতি পবিত্র স্থান। এইখানে সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের শান্তা দুর্গা, মঙ্গেশ, নাগেশ, রামনাথ, দেবকীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির আছে।

বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে' গোয়ায় পাড়ি দিতে হয়। জাহাজে একদিন ও একরাত্রি কাট্‌বার পর সকাল বেলা দূর থেকে পাঞ্জিমের বাতি-ঘর (light-house) দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গোয়া সহরটি সমুদ্রের একটা খাঁড়ির উপর অবস্থিত। এই খাঁড়িতে ঢোক্‌বার মুখেই উত্তর দিকে এক পাহাড়ের উপর এই বাতি-ঘর। পাহাড়ে সারি সারি কামান বসান আছে। সমুদ্র থেকে খাঁড়ির ভিতর দিয়ে প্রায় দু-মাইল গেলে তবে গোয়ায় পৌছান যায়। খাঁড়ির দক্ষিণদিকে একটা পাহাড়ের ঢালু এসে নেমেছে। এই ঢালের উপর একটি সুন্দর বাড়ীতে ভারতবর্ষের পর্ত্তুগীজ উপনিবেশগুলির বর্ত্তমান গবর্ণর-জেনারেল বাস করেন। এই বাড়ীখানাতে আগে একটি রোম্যান্ ক্যাথলিক মঠ ছিল।

খাঁড়ির ভিতর দিয়ে জাহাজ যখন ধীরে ধীরে গোয়ার দিকে অগ্রসর হোতে থাকে তখন চারিদিকের দৃশ্যে যাত্রীদের চোখ জুড়িয়ে যায়। দূরে পাহাড়গুলোর সাম্‌নে স্বচ্ছ মেঘের পর্‌দা পড়ে' জঙ্গলগুলোকে স্বপ্নপুরীর মতন দেখায়। উঁচু তালগাছগুলো অশান্ত ছেলের মতন পাহাড়ের কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে' মেঘের পর্‌দা ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, মেঘগুলো আবার পাহাড়ের গা দিয়ে ধীরে ধীরে সরে' যাচ্ছে—সে দৃশ্য যে দেখেছে সেই তার মর্ম্ম জানে।

জাহাজ জেটিতে লাগ্‌বামাত্র মুটের দল হুড়মুড় দুড়্‌দাড়্ কোরে জাহাজে উঠে যাত্রীদের মালপত্র নিয়ে টানাটানি ও নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি সুরু কোরে দেয়। সবার আগে যাত্রীদের বিছানা নিয়ে গিয়ে তাতে বিশোধক ওষুধ (disinfectant) লাগান হয়। এই বিছানায় ওষুধ লাগাবার জন্য যাত্রীদের বিছানা-প্রতি এক' আনা কোরে মাশুল দিতে হয়। যতক্ষণ বিছানায় এই ওষুধ দেওয়া শেষ না হয় যাত্রীদের ততক্ষণ জাহাজেই থাক্‌তে হয়। ডাঙায় নাম্‌বার আগে ডাক্তার এসে সবার হাতে একবার নামমাত্র হাত ঠেকিয়ে যান—তার নাম নাড়ী-দেখা। নাড়ী-দেখার পালা শেষ হোলে চুঙ্গি-বিভাগের কর্ম্মচারীরা আসেন। এই কর্ম্মচারীরা সময়ের কোনো মূল্যই ধরেন না। আস্তে আস্তে গদাইলস্করী চালে জিনিষপত্র তদন্ত কর্‌তে থাকেন, অপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তে বিরক্তি ধরে' যায়। তবে এক মাত্র সান্ত্বনা এই যে, ব্রিটিশ-অধিকৃত বন্দরগুলোর মত এখানে রঙের প্রতি কোনো পক্ষপাত নেই। সাদা, কালো, মেটে, লাল, সব-রকম চাম্‌ড়াধারীদের প্রতিই এদের সমান ব্যবহার। চুঙ্গি-বিভাগের কর্ত্তাদের সম্বন্ধে সেখানে একটা বড় মজার গল্প শুন্‌তে পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে কোল্‌হাপুরের মহারাজা গোয়ার এক সারস্বত ব্রাহ্মণ জমিদারকে (Visconde de Pereneu) একটা হাতী উপহার দিয়েছিলেন। হাতীটা বন্দরে এসে পৌছতে চুঙ্গি-বিভাগের কর্ত্তারা একেবারে অবাক্! এ রকম জানোয়ার ইতিপূর্ব্বে তাঁরা কখনো দেখেন নি। সেটা পশু, পক্ষী, না কীট, তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। শেষকালে হাতীটাকে পক্ষী-শ্রেণীর মধ্যে ফেলে পাখীর জন্য যত মাশুল আদায় করা হয় সেই মাশুল নিয়ে জানোয়ারটাকে ছেড়ে দেওয়া হোলো। এই ব্যাপার নিয়ে নাকি সেখানে ভারি হাঙ্গামা বেধে গিয়েছিল।

এখানকার পর্ত্তুগীজদের উপনিবেশসমূহের রাজধানীর নাম পাঞ্জিম অথবা নোভা গোয়া (নূতন্ গোয়া)। সহরটি সমুদ্রের খাঁড়ির উপর। সহরে লাল টালির

ছাদওয়ালা ছোট ছোট শাদা চুনকাম-করা বাড়ী। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর চারদিকে একটু কোরে বাগান আছে। বাগানে সারি সারি ছোট নারিকেল-গাছ। নারিকেলের ঝোপের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার ঝকৃঝকে বাড়ীগুলি ভারী সুন্দর দেখায়। রাস্তায় নানান্ ধরণের গাড়ী ও রকম-বেরকমের মাঞ্চাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মাঞ্চাল জিনিষটা অনেকটা আমাদের দেশের মহাপায়ার মতন দেখ্‌তে—একখানা গদিমোড়া চেয়ার এক লম্বা বাঁশে বাঁধা, চেয়ারের চারদিকে লাল অথবা সবুজ ভেল্‌ভেটের পর্দা, দু-দিকে দু-জন লোক বয়ে' নিয়ে যায়।

দক্ষিণ-ফ্রান্সের সহরগুলির সঙ্গে পাঞ্জিমের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। রাস্তায় বেরুলে অনেক রকমের পোষাক ও লোকের মুখ দেখা যায়। সেখানকার গরীব ঘরের মেয়েরা আজও সেই পুরাতন পর্ত্তুগীজ মহিলাদের ধরণের রঙীন চওড়া ডোরা-কাটা ফোলানো ফাঁপানো সাদা পাতলা কাপড়ের পেটিকোট পরে। বড় ঘরের মেয়েরা অবশ্য খাস প্যারিস সহরের পোষাকের নকল করেন।

এখন যেখানে গোয়া ভেল্‌হাস্ (পুরাতন গোয়া) অবস্থিত, তারই কয়েক মাইল দূরে হিন্দুদের পুরাতন রাজধানী ছিল। এই রাজধানীর নাম ছিল গোপক-পত্তন বা গোপকপুরী। গোপক-পত্তন কাদম্ব মহামণ্ডলেশ্বরদের রাজধানী ছিল। এই কাদম্ব মহামণ্ডলেশ্বরেরা ত্রিলোচন কাদম্বের বংশধর। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাদম্বরা দেবগিরি রাজ্যের অধীনস্থ করদ রাজা ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দেবগিরির পতনের পর মুসলমানেরা গোয়ায় প্রবেশ কোরে হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস কর্‌তে আরম্ভ করে। এই সময়েই বিখ্যাত সপ্তকোটীশ্বরের মন্দিরটি ধ্বংস হয়। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে কিম্বা ঐ সময়েরই কাছাকাছি বিজয়নগরের প্রধান মন্ত্রী গোয়া অধিকার কোরে সেখান থেকে মুসলমান-দের তাড়িয়ে দেন এবং সপ্তকোটীশ্বর-মূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়নগরের অধীনে গোয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বেড়ে উঠেছিল ; এই সময় ঘোড়া ও মুক্তোর কার্‌বারে গোয়া বিশেষ রকমে সমৃদ্ধ হোয়ে ওঠে। গোয়াবাসীদের সমৃদ্ধির কথা শুনে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মদ (বাহমনী) গোয়া আক্রমণ করেন। গোয়া অধিকার কোরে মহম্মদের এত আনন্দ হয়েছিল যে, ফেরিস্তা বলেন, মহম্মদের হুকুমে সহরময় সাতদিন ধরে' উৎসব চলেছিল ও সৈন্যরা সহরের রাস্তায় শোভা-যাত্রা কোরে বাজনা বাজিয়ে বেড়িয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহম্মদ গোয়াকে বেশীদিন নিজের অধিকারে রাখ্‌তে পারেন নি।

মাকেল-গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শান্তা-দুর্গার মন্দির
(পুরোভাগে দেবীর পূজক সারস্বত পুরোহিত)

১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের রাজা ইয়ুসুফ্ আদিল্ শাহ গোয়া অধিকার কোরে বস্‌লেন। ইয়ুসুফ আদিল্ শাহের আমলে গোয়া আরো সমৃদ্ধিশালী হোয়ে ওঠে। ইয়ুসুফ সহরে বড় বড় বাড়ী তৈরী করেন এবং তা ছাড়া নানা দিক্ দিয়ে তিনি গোয়ার অনেক উন্নতিসাধন করেছিলেন। ইয়ুসুফ্ সহরের উন্নতি করুন আর যাই করুন, হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার কর্‌তে তিনিও কিছু কসুর করেন নি।
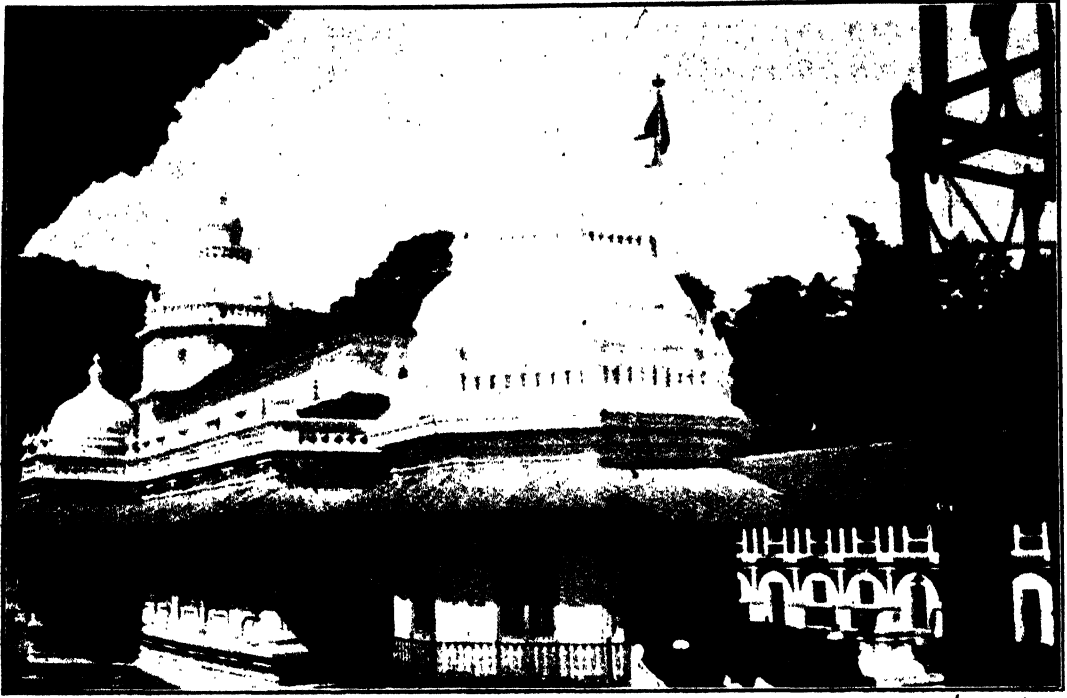
গোয়ার মঙ্গেশ-মন্দির

ইয়ুসুফের প্রতিনিধিরা মুসলমান সৈন্যদের দিয়ে সেখানকার হিন্দু অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করাত এবং তাদের নানা রকম অকথ্য নৃশংসতার প্রশ্রয় দিত। কিন্তু গোয়ায় মুসলমানদের দিন শেষ হোয়ে এসেছিল, ইয়ুসুফ্ আদিলের সময়েই পর্ত্তুগীজ আল্‌বুকার্ক্ এসে গোয়া অবরোধ করেন। আল্‌বুকার্কের আগমনবার্ত্তা শোনা মাত্রই সহরবাসীরা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন কোরে সহরে নিয়ে আসে। আল্‌বুকার্কের দলবল যখন সহরে প্রবেশ করে তখন সেখানে হিন্দুদের ঘরে ঘরে আনন্দের রোল উঠেছিল; পুরবাসীরা নাকি তাদের মাথায় ফুল ও সোনা বৃষ্টি কোরে অভ্যর্থনা করেছিল।

পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে তখন মুসলমানদের ভয়ানক শত্রুতা। ইউরোপে মূরদের সঙ্গে লড়াই কোরে কোরে মুসলমানদের প্রতি পর্ত্তুগীজদের একটা জাতিগত বিদ্বেষ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তারা যখন গোয়ায় বেশ জাঁকিয়ে বস্‌ল, তখন আল্‌বুকার্ক্ সেখানকার সমস্ত মুসলমান স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদের কেটে ফেল্‌তে হুকুম দিলেন। আল্‌বুকার্ক্ সেখান থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ কোরে তাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর্‌লেন। মুসলমানদের প্রতি অত্যধিক ঘৃণা ও বিজাতীয় ক্রোধ থাকায় এবং তাদের সমূলে ধ্বংস কর্‌বার উদ্দেশ্যে তিনি গোয়ার নিকটবর্ত্তী হিন্দু রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। আল্‌বুকার্ক বিজয়নগরে তাঁর দূত পাঠিয়ে সেখানকার রাজাকে জানালেন—"পর্ত্তুগালের রাজা আমাকে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজার প্রতি সম্মান দেখাতে এবং তাঁদের সাহায্য কর্‌তে হুকুম দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি কোনো রকম অসৎ ব্যবহার করব না। তাঁদের জাহাজ কিংবা তাঁদের পণ্যদ্রব্যও লুঠ করব না। কিন্তু আমি মুসলমানদের ধ্বংস করব, তাদের সঙ্গে আমার চিরবিরোধ।"

মালাবারে পর্ত্তুগীজদের চেষ্টায় বহুলোক নেষ্টোরিয়ান খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌তে লাগ্‌লো। পর্ত্তুগীজেরা তখন মনে কর্‌ত যে, কৃষ্ণ-উপাসক হিন্দুরা এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। তাদের এই বিশ্বাসের আদৌ
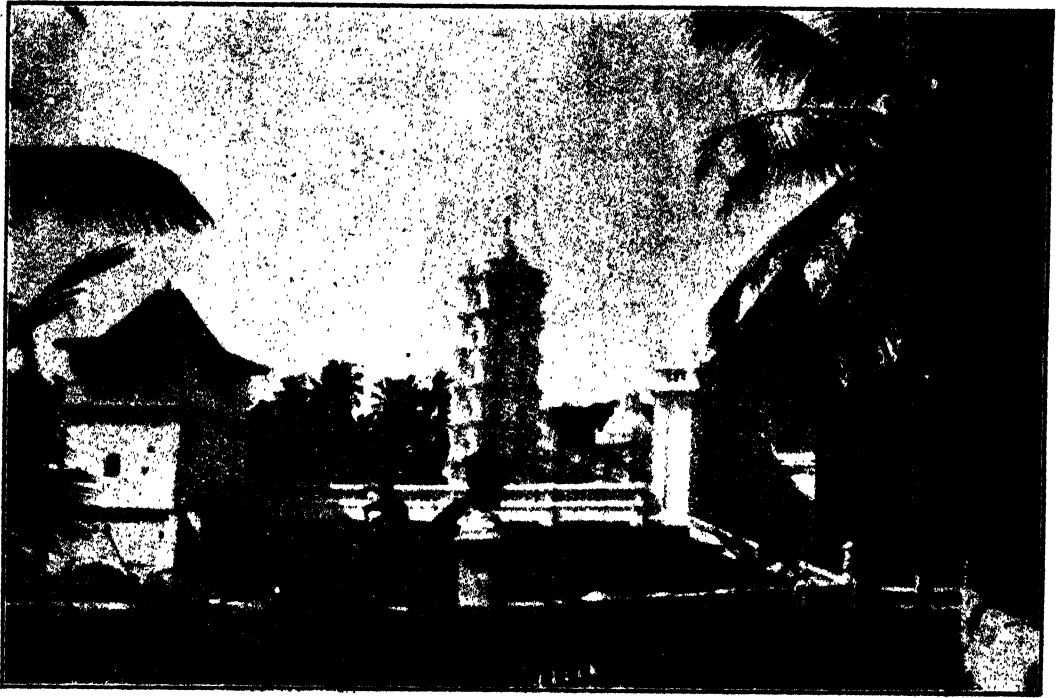
মঙ্গেশ-মন্দিরে দৃশ্য

কোনো কারণ ছিল কি না, অথবা কতখানি কারণ ছিল তা জানা যায় না। তবে কারণ যতই থাকুক আর নাই থাকুক, তাদের মনে এই বিশ্বাস থাকার জন্য কয়েকটা বছর হিন্দুরা সেখানে বেশ শান্তিতে বসবাস করতে পেরেছিল। কিন্তু এই শান্তি হিন্দুদের বড় বেশী দিন উপভোগ করতে হয়নি। কিছুদিন যেতে না যেতেই জেসুইটরা সেখানে এসে আচারভ্রষ্ট লোকদের শাসনের জন্য ধর্ম্ম-আদালত (Inquisition) খুলে বসলেন। ইউসুফ্ আদিলের বিরাট্ রাজপ্রাসাদে এই আদালত বস্‌ল। মুসলমানদের অত্যাচারের কথা ভুলতে না ভুলতেই হিন্দুদের উপর খৃষ্টানী অত্যাচার সুরু হোলো। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ থেকেই সেখানে জোর কোরে খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়েছিল, ক্রমে এই জোরজার বাড়তে লাগ্‌ল। ফলে গোয়া ও তার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লোকেরা বাধ্য হোয়ে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। গোয়ায় কিম্বদন্তী আছে যে প্যানালিষ্টার নামে একদল রাক্ষস হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস করবার জন্য এখানে এসেছিল; তারা এসে গোয়া ভেল্‌হাসে সুন্দর সুন্দর ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তারা যেমন হঠাৎ এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তার চেয়েও সহসা একদিন এখান থেকে কোথায় সরে' পড়্‌ল। এই কিম্বদন্তীর সঙ্গে জেসুইটদের কার্য্যকলাপের যে খুব নিকট সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। গোয়ার লোকেরা জেসুইট পাদ্রীদের পলিষ্ট বল্‌ত; তাদের প্রধান ধর্ম্মমন্দির সেন্ট পলের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল বলেই বোধ হয় লোকেরা সেই নামে তাদের ডাকৃত।

মালাবারে নেষ্টোরিয়ান্‌দের কার্য্যকলাপের কথা শুনে ভারতবর্ষের অন্যান্য ইউরোপীয় খৃষ্টানদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে' যায়। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের উদয়ম্‌পুরের ধর্ম্মসভা (Synod) মালাবারের এই খৃষ্টানদের কার্য্যকলাপ এবং নেষ্টোরিয়ান্‌দের ধর্ম্মমত ও প্রথাগুলির তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই

দীপস্তম্ভযুক্ত শান্তাদুর্গা-মন্দির

প্রতিবাদের উত্তরে জেস্যুইট্‌রা বলেন, অন্তত তাঁরা এমন ভাব দেখাতে লাগ্‌লেন যে, অখৃষ্টানদের এই ভাবে শাসন এবং বিচার করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নয় ও এই রকম ভাবে কাজ চালাবার ষোল আনা অধিকার তাঁদের আছে। পৌত্তলিক মাত্রকেই তাঁরা পর্ত্তুগাল ও খৃষ্টের শত্রু বলে' মনে কর্‌তে লাগ্‌লেন। পৌত্তলিকদের উপর নৃশংস অত্যাচার চল্‌তে লাগ্‌ল। যারা একবার খৃষ্টান হয়ে আবার হিন্দুধর্ম্মে ফিরে গিয়েছিল তাদের আর দুর্দ্দশার সীমা রইল না। জেস্যুইট্‌দের হুকুমে তাদের জীবন্তে দগ্ধ করার ব্যবস্থা হোলো। পর্ত্তুগীজেরা পৌত্তলিকদের মন্দির ধ্বংস ও তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিতে আরম্ভ কর্‌লে। ধর্ম্মের গোঁড়ামীর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থ পদদলিত করা, অগ্নিতে নিক্ষেপ করা প্রভৃতি অনেক রকম অত্যাচার চল্‌তে লাগল। মোট কথা মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রতি বেশী অত্যাচার করেছিল, কি পর্ত্তুগীজেরা বেশী অত্যাচার করেছিল, সেটা এখনও স্থির হয়নি।

সারস্বতদের কেলুস প্রদেশের শান্তাদুর্গা ও কুশস্থলীর মঙ্গেশের মন্দির মুসলমানদের পীড়নের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা এই মন্দির দুটি ধ্বংস কোরে ফেল্‌লে। ধর্ম্মের নামে অত্যাচার-গুলো একটু মন্দা পড়ায় অর্থাৎ ধর্ম্মের ছুতোয় আর কোন অত্যাচার কর্‌বার সুবিধা না পেয়ে এবার তারা সোজাসুজি নিজেদের আর্থিক উন্নতির চেষ্টায় হিন্দুদের ঘর বাড়ী লুট করতে সুরু কর্‌লে। এই লুটপাট সম্বন্ধে পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি Dom Juno de Castro বলেন—পর্ত্তুগীজেরা এক হাতে তলোয়ার ও অন্য হাতে ক্রুশ নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। সুবিধা বুঝে ক্রুশটাকে নামিয়ে রেখে তারা সেই হাত দিয়ে নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করার কাজে লেগে গেল।"

এই অত্যাচার আর কতদিন অবাধে চল্‌ত তা বলা যায় না। ইতিমধ্যে বৃটিশ গবর্মেণ্টের সুপারিশে সেখানকার Inquisition বা ধর্ম্ম-আদালত উঠে গেল।

শান্তাদুর্গা ও মঙ্গেশের মন্দির দুটি ধ্বংস হবার

আগেই ব্রাহ্মণেরা দেবতার মূর্ত্তি দুটি নিয়ে সেখান থেকে গোয়ার নিকটবর্ত্তী অন্ত্রুজ পাহাড়ে পলায়ন করেন। এই প্রদেশটি তখন হিন্দু নরপতি শোণ্ডের অধীন ছিল। কথিত আছে যে, মহার নামে এক শ্রেণীর অস্পৃশ্য জাতি এই পলাতক ব্রাহ্মণদের আশ্রয় দেয় ও নিজেদের বাসভূমির কিয়দংশ শান্তাদুর্গার মন্দির প্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্য দান করে। এই দানের পরিবর্ত্তে তারা ব্রাহ্মণদের অনুরোধ করে যে বছরে একবার কোরে যেন শান্তাদুর্গার মূর্ত্তি তাদের দেখ্‌তে দেওয়া হয়। মাঘ শুক্লা পঞ্চমীর দিনে শান্তাদুর্গার মন্দিরে খুব ধুমধাম কোরে পূজা হয়। এখনও এই পূজার পরদিন দেবীর মন্দির কেবলমাত্র সেই মহারদের জন্যই উন্মুক্ত থাকে।

কেলুসের খৃষ্টান চাষীরা এখনও শান্তাদুর্গার পুরাতন মন্দিরের স্থানটি আগন্তুকদের দেখায় এবং শান্তাদুর্গা সম্বন্ধে অত্যন্ত ভক্তিভরে কথাবার্ত্তা বলে। এই খৃষ্টান চাষীরা শান্তা-দুর্গাকে মাই বলে' সম্বোধন করে।

গোয়ার খৃষ্টানদের—আসল পর্ত্তুগীজ, বর্ণসঙ্কর ও দেশীয় খৃষ্টান – সাধারণতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। আগে সর্‌কারী উচ্চপদগুলি আসল পর্ত্তুগীজদের জন্যই বাঁধা ছিল। তাভ্যানিয়ে বলেন যে সে সময়ে যে-কোনো শ্রেণীর পর্ত্তুগীজ কেপ অব গুড্ হোপ্ পার হোলেই সে (Fidalgo) অর্থাৎ ভদ্রলোক বনে' যেত ও এখানে এসে নিজেকে Dom বলে' পরিচয় দিত।

এখন গোয়ার খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোকই বর্ণসঙ্কর। এদের আধিপত্যই সেখানে বেশী। রাঁধুনীর কাজ থেকে আরম্ভ কোরে সর্‌কারী বড় বড় পদগুলি পর্য্যন্ত এরাই একরকম একচেটে কোরে নিয়েছে। গোয়ায় কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কোনো বিষয়েই সাদা চাম্‌ড়ার কৌলীন্য নেই। সাদা-কালা সেখানে সমান। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে Bernardo Peres de Silva নামে একজন বর্ণসঙ্কর সেখানে রাজপ্রতিনিধি (viceroy) পর্য্যন্ত হয়েছিলেন।

বর্ণসঙ্করদের পুরুষ অথবা স্ত্রীদের মধ্যে সুশ্রী চেহারা প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পুরুষরা ইউরোপীয় ধরণের পোষাক পরে, অধিকাংশ লোকেই ধোপার খরচ বাঁচাবার জন্য রঙ্গীন কাপড়ের পোষাক তৈরি করে। মদ খাওয়ার মাত্রাটা এদের মধ্যে একটু বেশী বলে' মনে হয়। পরিমিত মদ্যপান বলে' কোনো কথা এরা জানে না, একমাত্র নেশা কর্‌বার জন্যই মদ্যপান কোরে থাকে।

গোয়ার অর্দ্ধেক জনসংখ্যা দেশীয় খৃষ্টান। তারা এখনও বামন (ব্রাহ্মণ) ছারাদে (ছত্রী) গাভ্‌ড়ে (বৈশ্য) এবং শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্য মেনে চলে। দেশীয় খৃষ্টানেরা সকলে একসঙ্গে আহারাদি করে বটে, কিন্তু নিজের জাত ছাড়া কখনও অসবর্ণ বিবাহ করে না। বামন খৃষ্টানেরা নিজেদের বংশের চেয়ে বংশমর্য্যাদায় উচ্চ এমন পরিবারে বিবাহ কর্‌তে চেষ্টা করে। এজন্য অনেক টাকার যৌতুকও যদি তাকে ত্যাগ কর্‌তে হয়, তাতে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। গাভ্‌ড়ে খৃষ্টানরা হিন্দু গাভ্‌ড়েদের মত মৎস্য কিংবা মুরগী খায় না। অবশ্য বন্যকুক্কুটে তাদের
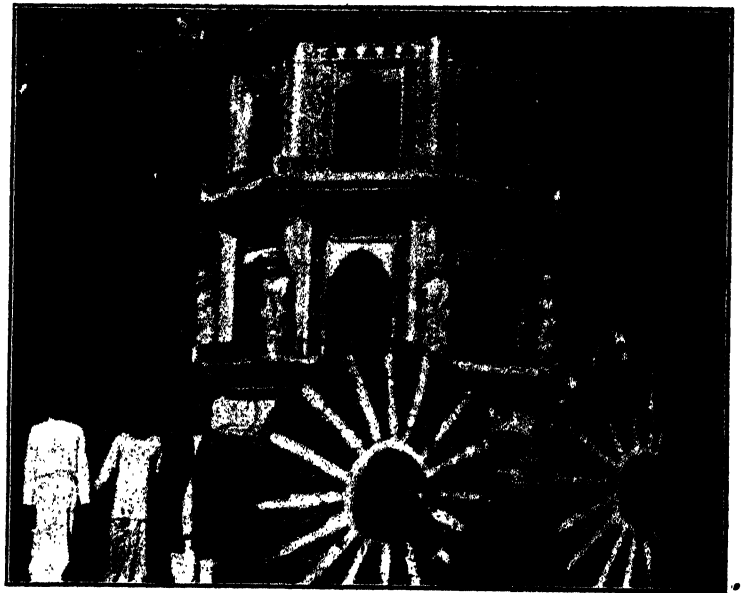
শান্তাদুর্গা দেবীর রথ

অরুচি নেই। গাভড়েরা আর্য্যাবর্ত্ত থেকে সেখানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গাভড়ে রমণীরা দাক্ষিণাত্যের রমণীদের মত কাছা দিয়ে কাপড় পরে না। তারা কাঁধে গেরো বেঁধে শাড়ী পরে। তাদের অলঙ্কারও দাক্ষিণাত্যের মতন নয়। অধিকাংশ সময়েই তারা কাঁসার গয়না পরে। খৃষ্টানদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের কোনো মানা না থাকলেও হিন্দুদের মতন তাদের মধ্যেও বিধবার বিবাহ অত্যন্ত নিন্দার কথা। অধিকাংশ দেশীয় খৃষ্টানই গোমাংস খাওয়ার কথা শুনলে একেবারে আঁৎকে ওঠে। এদের মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের মতন স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। বিবাহ গির্জ্জায় গিয়ে হয় বটে, কিন্তু গির্জ্জায় যাবার আগেই বাড়ীতে বিবাহের হিন্দু আচারগুলি সেরে রাখা হয়।
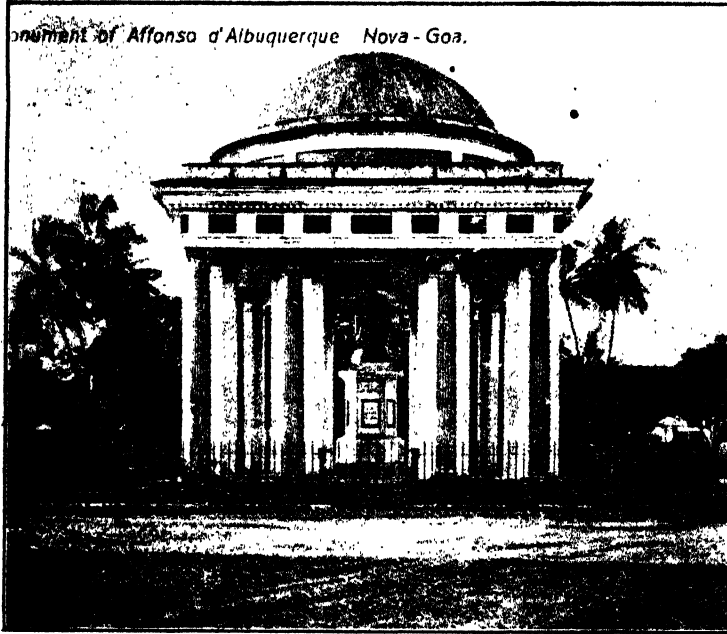
নব গোয়ার আল্‌ফোন্‌সো দা আল্‌বুকার্কের সমাধি

গোয়ায় আর-এক শ্রেণীর খৃষ্টান আছে। তারা দাড়ী গোঁফ কামায়, রঙীন লুঙ্গি পরে, গলায় নানারকমের পুঁতির মালা পরে ও একটা ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখে, গায়ে কোনো জামা অথবা কোনো আচ্ছাদন ব্যবহার করে না। এদের ঘরের মেয়েরাও একমাত্র শাড়ী ছাড়া গায়ে চোলি কিংবা জ্যাকেট্ কিছু পরে না; বক্ষ প্রায় অনাবৃত অবস্থায় থাকে। এদের দেখে মনে হয় যে, এরা অন্যান্য দেশীয় খৃষ্টানদের চেয়ে ঢের বেশী গোঁড়া খৃষ্টান। এরা শূকরের মাংস খায়, খুব বেশী তাড়ি পান করে এবং মুখ ধোয় না। এদের বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। শোনা যায় যে জেস্যুইট্‌রা বাংলাদেশ থেকে কতকগুলি বাঙ্গালী খৃষ্টানকে গোয়ায় নিয়ে গিয়েছিল, এরা তাদেরই বংশীয়; এদের কথার টান, ভাষার বাঁধুনি ও শব্দের মধ্যে বাঙ্গালীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

গোয়ার দেশীয় খৃষ্টানরা বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত এই দুই দলে বিভক্ত। পূর্ব্বপুরুষের কুলদেবতার প্রতি এখনও তাদের বিশেষ ভক্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খৃষ্টানেরা এখনও কুলদেবতাদের নামে ঠাকুরের কাছে অর্ঘ্য দেয়। কোনো নতুন কাজে লাগ্‌বার আগে অথবা কোথাও যাত্রা কর্‌বার সময় এরা পূজারীর হাত দিয়ে দেবতার কাছে পূজা পাঠায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শান্তাদুর্গার মন্দিরে হিন্দুদের আগে খৃষ্টানদের প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

পাঞ্জিম থেকে শান্তাদুর্গার মন্দিরে যেতে হলে লাঞ্চায় (ষ্টিম লাঞ্চে) চড়্‌তে হয়। লাঞ্চ এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। এখান থেকে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে মন্দির পর্য্যন্ত লম্বা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা ধরে' হেঁটে যেতে হয়। মাঘ মাসেই এই পাহাড়ে' পল্লীতে বসন্তের সাড়া পড়ে' যায়। গাছে গাছে নতুন পাতা আমের মুকুল শিমুলফুলে পাহাড় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। নানারকম পাখীর গানে পথ চলার কষ্ট আর থাকে না।

শান্তাদুর্গার মন্দিরটি পাহাড়ের ঢালের উপর নির্ম্মিত। মন্দিরের চারিদিকেই পর্ব্বত-শ্রেণী। মন্দিরের সম্মুখেই শাদা চুনকাম-করা একটা উঁচু দীপস্তম্ভ আছে। এই

পুরাতন গোয়ার সেণ্টফ্রান্সিস্ অফ্ আসিসির গির্জ্জার অভ্যন্তর
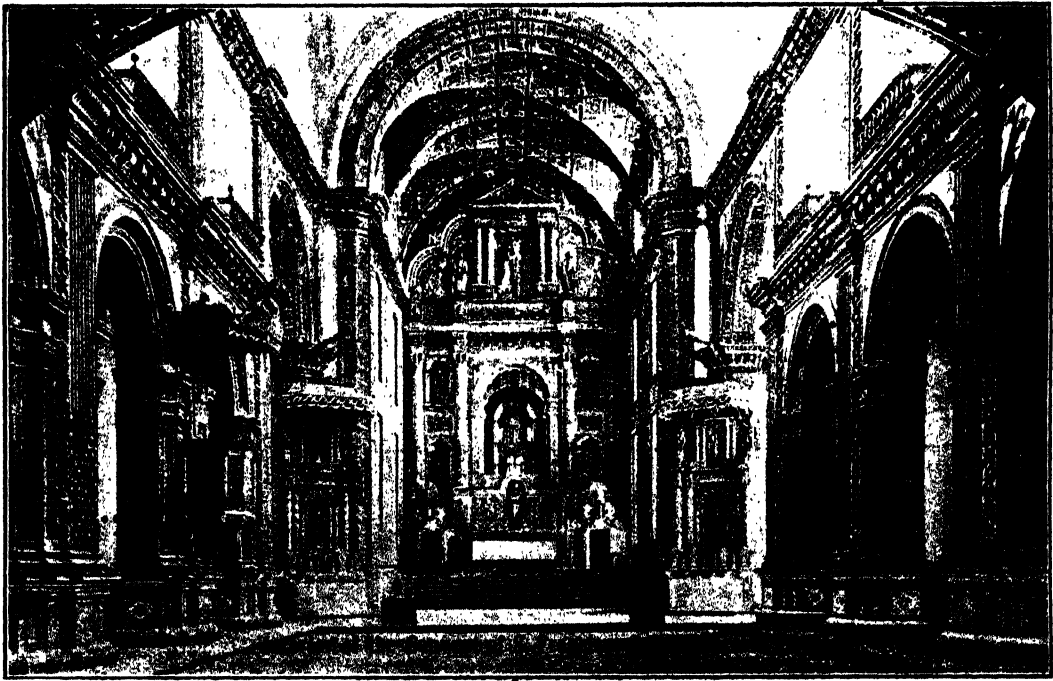
স্তম্ভটি দিনে ও রাত্রে যাত্রীদের পথপ্রদর্শকের কাজ করে। মন্দিরের সাম্‌নেই একটি প্রকাণ্ড কুণ্ড আছে, এই কুণ্ডের দু-পাশে যাত্রীদের জন্য থাক্‌বার ঘর। যে উত্তর-দেশীয় ব্রাহ্মণ শান্তাদুর্গাকে প্রথম দাক্ষিণাত্যে নিয়ে এসেছিল, তার নামে মন্দিরের বাইরে একটি ছোট বেদী আছে। মন্দিরের ঠিক পশ্চাতেই একটি অরণ্যময় পাহাড়। শোনা যায় যে, কেলুসে পুরাতন শান্তাদুর্গার মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে-রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল, প্রায় ঠিক সেই-রকমই একটা জায়গা খুঁজে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এই দেবীর নাম শান্তাদুর্গা কেন হোলো সে সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুন্‌তে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে একবার শিব আর বিষ্ণু এই দুই দেবতার মধ্যে ঘোরতর লড়াই বেধে যায়। আদিশক্তি এই লড়াই থামাবার জন্য জগদম্বার মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরে দুই দেবতাকে শান্ত করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর নাম শান্তাদুর্গা হয়েছে। শান্তা কথাটি পর্ত্তুগীজ সান্তা (Santa অর্থাৎ পবিত্র) এই কথা থেকেও আস্‌তে পারে। বোম্বাইয়ের কাছে পুরাতন পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ সান্তা ক্রুজকে (Santa Cruz) হিন্দুরা শান্তা ক্রুজ বলে। গোয়ার হিন্দুরা পর্ত্তুগীজদের ভাষা থেকে অনেক কথাই নিয়েছে। তাদের মধ্যে পর্ত্তুগীজদের অনেক সামাজিক ও ধর্ম্মের আচারও প্রবেশ করেছে।

গোয়ার নিকটে এক গ্রামে দেবকী-কৃষ্ণের একটি মন্দির আছে। মন্দিরে শিশুকৃষ্ণ ও দেবকীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খুব সম্ভব হিন্দুরা রোম্যান্ ক্যাথলিকদের যীশু ও যীশুমাতার মূর্ত্তির অনুকরণে এই দেবকী ও কৃষ্ণের মূর্ত্তি তৈরি করেছে। গোয়ার হিন্দুমন্দিরগুলিও প্রায় রোম্যান্ ক্যাথলিকদের গির্জ্জার ধাঁচে তৈরি এবং গির্জ্জার মতনই চুনকাম-করা।

মাঘমাসের বাসন্তী পঞ্চমীর দিনেই শান্তাদুর্গার প্রধান পূজা হয়। শীতের পর পৃথিবীর উপর সূর্য্যের উত্তাপকে আবাহন করাই এই পূজার প্রধান উদ্দেশ্য। পূজার দুইদিন পরে রথসপ্তমীর দিনে দেবীকে একটি সুন্দর রথে চড়িয়ে বিরাট্ শোভাযাত্রা বা'র করা হয়। বিজয়ী সূর্য্যরথে চড়ে নিজের আগমন ঘোষণা করছেন—এই

হোলো এই শোভাযাত্রার ভিতরকার অর্থ। সারস্বত রমণীরা সেদিন তুলসী গাছের সম্মুখে সূর্য্যের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সেই মূর্ত্তির পূজা করেন। বাসন্তী পঞ্চমীর পর চৈত্রমাসে ও নাগপঞ্চমীর দিনও শান্তাদুর্গার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়।

আর্য্যদের মধ্যে সর্প পূজার প্রচলন ছিল। যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে সর্পপূজার উল্লেখ আছে। আশ্বলায়নে সর্পদেবতাকে পূজা দিবার ব্যবস্থা আছে। নাগপঞ্চমীর দিনে শান্তাদুর্গার যে পূজা হয়, তা প্রকারান্তরে নাগেরই পূজা বলে মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের সারস্বতরা সর্পকে ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করে, প্রাণান্তেও তারা সর্প বধ করে না। যদি কখনো কেউ সাপ মারে, ব্রাহ্মণের সৎকারের মত সাপকেও পোড়াবার সময় নতুন পৈতা ও স্বর্ণ দিয়ে দাহ করা হয়। রাজতরঙ্গিনীতে আছে যে বিশাখা নামে এক ব্রাহ্মণ নাগ সুশ্রবার কন্যা চন্দ্রলেখাকে বিয়ে করেছিল। কাশ্মীরেও সর্প-পূজার প্রচলন আছে। সেখানকার নগরের অনন্তনাগ, বেরীনাগ ইত্যাদি নামেই তার প্রমাণ। মঙ্গেশ মন্দিরের পশ্চাতে যে ঝরণা আছে, গোয়ার সারস্বতরা তাকে নাগঝরি বলে। চৈত্রমাসের প্রথম দিন থেকে সারস্বতদের বৎসর গণনা আরম্ভ হয়।

পুরাতন গোয়ার প্রাচীন শম্ভুমন্দির,—এখন রোম্যান ক্যাথলিক গির্জ্জায় পরিণত

গোয়ার হিন্দুদের মধ্যে সারস্বত ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চবর্ণ। এদের অপর নাম গৌড় সারস্বত সেখানে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ নামেও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। গৌড় সারস্বতদের আদি নিবাস ছিল পঞ্চগৌড়ে। এরা ঋগ্বেদ মানে, আর এদের অধিকাংশই স্মার্ত্ত। গৌড় সারস্বতদের কুলগুরু আলাদা। গোকর্ণ, কাভলে, নাসিক ও বেনারসে এদের মঠ আছে। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের মত সারস্বতরা শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী নয়। এরা নিজেদের মহারাষ্ট্রীয় চিতপাবন, দেশস্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে মনে করে ও নিজেরা আর্য্য বলে' গর্ব্ব কোরে থাকে। সারস্বতেরা নিজের দেশে অন্য ব্রাহ্মণদের হাতের অন্ন কিংবা জল গ্রহণ করে না, অবশ্য বিদেশে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের রান্না খেতে দেখা যায়। এদের প্রধান আহার্য্য ভাত আর মাছ। মাংস খায় বটে, কিন্তু মুরগী খায় না, অবশ্য বন্য কুক্কুটের কথা স্বতন্ত্র। বন্য কুক্কুটের মত বন্য বরাহেও তাদের অরুচি নেই। গৃহপালিত শূকর তারা স্পর্শ করে না। গোয়ার কোনো কোনো সারস্বত দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেছে। এই বৈষ্ণবদের অধিকাংশই মাংস খায় না, কেউ কেউ মাছ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। এদের মেয়েরা মাছ কিংবা মাংস কিছুই খায় না। দেশে এরা নিজেদের ব্রাহ্মণ দিয়েই পূজা অর্চ্চনা করায়, বিদেশে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেই তাদের পূজা করে। সারস্বতদের কন্যার বিবাহের খরচপত্র কন্যার পিতামাতাকেই দিতে হয়। বরকে যৌতুক দিবার প্রথা আছে বটে, কিন্তু তা অতি সামান্য এবং তার একটা বাঁধা-ধরা হিসাব আছে বিবাহের পর কন্যার পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়েরা বরের বাড়ীতে আহারাদি করে না, কিংবা তাদের কাছ থেকে কোনো উপহারও গ্রহণ করে না।

আর্য্যাবর্ত্তের সারস্বতদের মত দাক্ষিণাত্যের সারস্বতেরাও নিজেদের দধীচির পুত্র সারস্বত ঋষির বংশধর বলে' মনে করে। মহাভারতের গদাপর্ব্বে এই

কথার উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রি ব্রাহ্মণদের ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করার কথা আছে। স্কন্দপুরাণ খণ্ডে সারস্বতদের উপনিবেশ স্থাপন করা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। আগে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। পরশুরাম সমুদ্রকে হুকুম করায় সমুদ্র সেখান থেকে সরে গেলে সেখানে যে নতুন জমি বেরুলো তারই নাম গোয়া। ক্ষত্রিয়দের নির্ব্বংশ কোরে তিনি এইস্থানে এক বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ করবার জন্য পরশুরাম পঞ্চ গৌড় থেকে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিয়ে আসেন এবং এখানে তাঁদের ভূমি দান করেন। শোনা যায় যে বর্ত্তমানের দাক্ষিণাত্যের সারস্বতরা এই পঞ্চ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের বংশধর। ব্রাহ্মণেরা দাক্ষিণাত্যে আসবার সময় তাঁদের গৃহদেবতাদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এবং শান্তা-দুর্গা ও মঙ্গেশ তাঁদেরই গৃহদেবতা।

মঙ্গেশের পুরাতন মন্দির ছিল কুশস্থলীতে। প্রবাদ আছে, যে, শিব ও পার্ব্বতীর মধ্যে একদিন প্রণয়-কলহ উপস্থিত হওয়ায় শিব পার্ব্বতীকে ভয় দেখাইবার জন্য বাঘের মূর্ত্তি ধারণ করেন। পার্ব্বতী ভয় পেয়ে—"মাং গিরিশ"—বলে' চীৎকার করে' ওঠেন। অর্থাৎ ভয়ে তিনি এতই অভিভূত হোয়ে পড়েছিলেন যে, "মাং গিরিশ রক্ষ" এই কথাটি শেষ করতে পারেন নি। প্রকাশ যে, "মাং গিরিশ" থেকেই মঙ্গেশ কথার উৎপত্তি। এ ছাড়া মঙ্গেশ নাম সম্বন্ধে আরও অনেক রকম তথ্য শুনতে পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ সংস্কৃত মঙ্গলেশ কথা থেকেই "মঙ্গেশ" কথার উৎপত্তি হয়েছে। কাঠিয়াবাড়ে গিরণার নামক স্থানে একটি শিবমন্দির আছে। এই শিবকে সেখানে মঙ্গলেশ বলা হয়। প্রভাসপত্তনের নিকট কুশস্থলী নামে একটি স্থান আছে, এই স্থানটিকে সেখানকার লোকেরা অতি পবিত্র স্থান বলে' মনে কোরে থাকে। কাঠিয়াবাড়, কচ্ছ ও ব্রোচেও সারস্বত ব্রাহ্মণের বাস আছে। এরা বলে যে, তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পঞ্জাব থেকে এসে ঐ দেশে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। পঞ্জাবী সারস্বতদের সঙ্গে এদের সামাজিক রীতিনীতির অনেক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এদের ভাষা গুজরাটী। ব্রোচের সারস্বতরা জ্বালামুখী নাম দিয়ে দুর্গার পূজা করে।

দাক্ষিণাত্যে প্রবাদ আছে যে, দেবশর্ম্মা ও লোমশর্ম্মা নামে দু-জন সারস্বত ব্রাহ্মণ রামেশ্বর থেকে তীর্থ কোরে ফিরে যাবার সময় পথে গোয়ায় একদল সারস্বত ব্রাহ্মণের উপনিবেশ দেখতে পান। এই সারস্বতরা দেবশর্ম্মা ও লোমশর্ম্মাকে নিজেদের মধ্যে ডেকে নিয়ে এসে তাঁদের কন্যা অর্পণ করেন। বাৎস্য গোত্রীয় দেবশর্ম্মা মঙ্গেশ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই শর্ম্মাদের বংশধরেরা অধুনা শেনুই নামে খ্যাত। ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে শেনুইরা গিয়ে বসবাস করেছে, সেইখানেই তারা শান্তাদুর্গা ও মঙ্গেশের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং আজ পর্য্যন্ত শান্ত দুর্গা মঙ্গেশের যতগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সমস্তগুলিরই তত্ত্বাবধানের ভার এই শেনুইদের উপরে ন্যস্ত। এই দুই দেবতার মন্দিরের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অন্য সারস্বতদের কোন অধিকার নেই। কাভলের লোকেরা বলে যে, লোমশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা কাশ্মীরী সারস্বত ছিলেন।

কাশ্মীরের ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সারস্বত ব্রাহ্মণ বলে' থাকেন। 'হ্যাপি ভ্যালি'র লোকেরা বলে যে, মুসলমানেরা যখন কাশ্মীরে জোর কোরে হিন্দু অধিবাসী-দের মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করছিল তখন তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য এগারোটি সারস্বত পরিবার সেখান থেকে পালিয়ে পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়ে বাস করতে থাকে। এদের মধ্যে পরে চারটি পরিবার কাশ্মীর ছেড়ে নীচে নেমে আসে। এদের মধ্যে দুটি পরিবার দাক্ষিণাত্যে যায় এবং সেখানকার সারস্বতদের সঙ্গে তাদের বিবাহাদি হয়। অপর দুটি পরিবার পঞ্জাবেই বসবাস করতে থাকে। এই পলাতক চারটি পরিবারের বংশধরদের নাম ভানমাসী। কাশ্মীরের মলমাসী সারস্বতদের সঙ্গে ভানমাসীদের বিবাহাদি চলে। সারস্বতরা দেখতে বেশ সুন্দর। তাদের নাক, মুখ, চোখ, বেশ চোখা। মেয়েদের চোখ ও মাথার চুল কালো এবং রংও বেশ ফরসা। শেনুইরা প্রধানত

লেখাপড়ার কাজই করে। কঙ্কণ প্রদেশের লোকেরা এদের পান্টাজী (পণ্ডিতজী) বলে।

গোয়া এককালে খুবই বড় ব্যবসার জায়গা ছিল, কিন্তু লেখাপড়ার কাজ ছেড়ে এরা কখনো ব্যবসায় অবলম্বন করেনি। বহুদিন থেকেই এরা সরকারী আইন বিষয়ের এবং রাজনৈতিক বড় বড় কাজ বেশ দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে আস্‌ছে। তাভেয়ার্ণিয়ে সময়েই এরা এইসব কাজে সুদক্ষ হোয়ে পড়েছিল। তাভেয়ার্ণিয়ে বলেন—"এদের চেয়ে চালাক ও সূক্ষ্মবিচারক্ষম লোক পৃথিবীতে আর নেই। এদের যেমন বুদ্ধি, এরা তেম্‌নি ভাল সৈন্য। পর্ত্তুগীজ ছেলেরা কলেজে একবছরে যা শিখ্‌বে এরা তা ছমাসে শিখে নিতে পাবে।"

মারাঠাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শেনুইদের আধিপত্যও খুব বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সামরিক অসামরিক সকল বিভাগেই তারা অসামান্য কৃতকার্য্যতা দেখাতে লাগ্‌ল। নরোরাম শেনুই সাহুরাজাদের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁকে সবাই পণ্ডিত-মন্ত্রী বলে ডাকত। বর্ত্তমান শান্তাদুর্গার মন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের খরচ চালাবার জন্য তাঁকে কাভ্‌লে গ্রামের স্বত্ব দান করা হয়। রামচন্দ্র মল্‌হর প্রথম বাজিরাও পেশোয়ার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। শেনুইরা ক্রমে কোলাপুর, গুরোদা, রাজপুতানা, ইন্দোর, এবং গোয়ালিয়ার রাজ্যে নিজেদের আধিপত্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তারা যে শুধু রাজনীতিক ছিল তা নয়, মারাঠাদের বিক্রম ও বীরত্বের যুগেও শেনুইদের বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংরেজরা এদের নাম দিয়েছিল—gallant Sainowees। এখনো শেনুইয়া ব্রিটিশ ও পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারের সময় সারস্বতদের ধর্ম্মগুরু বেনারসে পলায়ন কোরে সেখানে মঠ স্থাপন করেছিলেন। কিছুকাল আগে তাঁরা আবার কাভ্‌লেতে ফিরে এসেছেন। সারস্বতদের বর্ত্তমান গুরুরা জাতিবিচার সম্বন্ধে তেমন গোঁড়ামীর পক্ষপাতী নন্। বর্ত্তমান গুরুর আগে যিনি গুরু ছিলেন তাঁর নাম আত্মানন্দ সারস্বতী। এসব বিষয়ে তাঁর মতামত খুবই উদার ছিল। দাক্ষিণাত্যে যত শ্রেণীর সারস্বত আছে, তাদের মধ্যে যাতে বিবাহাদি চল্‌তে পারে, তার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তিনি, তাঁর কাশ্মীরী শিষ্য বিখ্যাত পণ্ডিত ঘনশ্যাম মিশ্রের সঙ্গে, একটী শেনুই বালিকার বিবাহ দিয়েছিলেন।

পুরাতন গোয়া এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। সেখানকার রাস্তায় এখন দলে দলে শূয়র চরে বেড়ায়। বড় বড় গির্জ্জায় এখন আর সমারোহে উৎসব হয় না। দেশীয় খৃষ্টানেরা গিয়ে সেখানে জড় হয়, আর প্রার্থনা কোরে ফিরে আসে মাত্র। সংস্কারের অভাবে গির্জ্জাগুলি ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে এগুলিও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। সেখানে পুরোনো-দিনের শম্ভুর মন্দিরটি এখন খৃষ্টানদের কন্‌ভেণ্টে পরিণত হয়েছে। এই মন্দিরে একটি কূয়ো আছে; খৃষ্টানেরা বলে যে সেই কূয়োর জল পান করলে কুষ্ঠরোগ সেরে যায়। হিন্দুদের বিশ্বাস যে এই মন্দিরের চূড়োয় ক্রুশ বসাতে পারা যায় না। তার কারণ যতবার নাকি ক্রুশ বসাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, ততবারই একটা না একটা বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে। এখানে হিন্দুয়ানী আর খৃষ্টানী এমন গা ঘেঁসাঘেঁসি কোরে বাস করছে যে কোন্‌টা হিন্দুয়ানী আর কোন্‌টা খৃষ্টানী তা বোঝা মুস্কিল।

শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

জীবদেহে প্রকৃতির খেয়াল

অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে কেহ দীর্ঘদেহ, ক্ষুদ্র-মস্তক ; কেহ অতিস্থূল, কেহ রজ্জুবৎ লম্বা, কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ লাল, কেহ বহুরূপী, কেহ দুইমুখবিশিষ্ট, কেহ অতিকায়, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ সোজা হইয়া চলে, কেহ বুকে হাঁটে, কেহ ভূচর, কেহ জলচর, কেহ খেচর, কেহ উভচর। এই ত স্রষ্টার এক অপূর্ব্ব খেয়াল। তাহার উপর ঐ-সকলের মধ্যেই আবার এক একটি এমন স্বতন্ত্রাকার লইয়া জন্মে যে তাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইয়া পড়ে।

মানুষের মধ্যে জোড়া ছেলে, ক্ষুদ্র বামন, গোঁফ-দাড়ি-বিশিষ্ট স্ত্রীলোক, লাঙ্গুল অথবা শৃঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষ, রবারের মত চর্ম্মবিশিষ্ট লোক, অর্দ্ধেক সাদা অর্দ্ধেক কাল মানুষ বা একেবারে সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত, এই-মত কত প্রকার দেখা যায় বা শুনা যায়। মানবেতরদিগের মধ্যেও এই ভাবের খেয়ালের বশে তৈয়ারী অস্বাভাবিক জীবেরও অভাব নাই।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে অর্থবান্ এমন সব লোক আছে, যাহারা

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট পনি বা টাট্টু ঘোড়া—একটা কুকুরের চেয়েও ছোট

কুকুরের অপেক্ষা ছোট ঘোড়া

ম্যাডাগাস্কারের অত ক্ষুদ্র বানর

আমেরিকার আর-একটি অতিক্ষুদ্রাকার ঘোড়ার কথা জানিতে পারা যায়। এটির আকার দেখিয়া প্রথমদৃষ্টিতে একটি গর্দ্দভশাবক বলিয়াই অনুমান হয়। ইহা দাঁড়াইলে ইহার উচ্চতা মানুষের হাঁটুর অপেক্ষা অতি সামান্য উঁচু দেখায়। দেহের ওজন কয়েক পাউণ্ড মাত্র। আকারের তুলনায় দেহের বল কিন্তু কম নহে। অশ্বের সাধারণতঃ যে-সকল গুণ থাকে, ইহার তাহা সমস্তই আছে। উহার প্রভুকে সে যথেষ্ট ভালবাসে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে, তাহার কাছে থাকিতে বড় পছন্দ করে। অশ্বের মালিক অশ্বটিকে কয়েকটি খেলাও শিখাইতে সক্ষম হইয়াছে। উহার টানিবার জন্য একখানি ছোট আকারের গাড়ী আছে। সাধারণ ঘোড়ার ন্যায় সে উহা টানিতে ও মোড় ফেরা ইত্যাদি যাহা প্রয়োজন তাহা করিতে পারে। এই ঘোড়াটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট আকারের ঘোড়া বলিয়া খ্যাত।

এক জোড়া ক্ষুদ্রকায় বলদ

ঐ ভাবের জীব সংগ্রহ করিতে অনেক অর্থ ব্যয় করে। ক্ষুদ্রাবয়ব বানর, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি জন্তু রাখিতে কেহ কেহ ভালবাসে। প্রদর্শনী বা সার্কাসেও এই ধরণের বিচিত্র জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সে এক ভদ্রলোকের একটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতির ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছিল; উহার আকার এত ছোট যে একটি কোল-কুকুরের অপেক্ষা অধিক উচ্চ নয়। আকার ছোট হইলেও উহার গঠন ও দৌড়াইবার ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্তই দৌড়ের ঘোড়ার অনুরূপ ছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা ছোট আকারের পনিঘোড়ার একটি চিত্র দেওয়া হইল, উহার উচ্চতা একটি হাউণ্ড্‌-কুকুরের অপেক্ষা অধিক নহে। উহা শেট্‌ল্যাণ্ড্‌ জাতীয় পনি। ঐ অশ্বটির অধিকারীর নাম মেকেঞ্জি। এই ভদ্রলোকটি অধুনা এইরূপ ক্ষুদ্র আকারের পনি উৎপাদনের জন্য বহু পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে ইঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতির পনি আছে।

বানর বহুজাতীয় দেখা যায়। আমাদের দেশী হনুমানের অপেক্ষা বড় আকারের বানর প্রায় দেখা যায় না। ম্যাডাগাস্কারে খুব ছোট ছোট বানর পাওয়া যায়। তথায় এমন ছোট আকারের বানর দেখিতে পাওয়া যায় যাহা লম্বা মাত্র কয়েক ইঞ্চি। উহাকে অনায়াসে হাতের তালুর মধ্যে রাখা যায়।

নরদাম্বারল্যাণ্ডে নরম্যান্‌ বুক্‌সন্‌ নামক একজনের একটি প্রায় ৩ ফুট উচ্চ ষণ্ড আছে। এরূপ ছোট আকারের বৃষের কথা শুনা যায় না। ইহার মালিক এই বৃষটি দেখাইয়া বহু প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইয়াছে। রয়েল এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ সোসাইটির প্রথম পুরস্কারও পাইয়াছে।

আর্গাইলশায়ারের ডাার্‌ আর্‌থার্‌ ওর্ড নামক একটি ভদ্রলোকের একজোড়া ক্ষুদ্রাকার ভারতীয় গরুর খবর পাওয়া যায়। আর্‌ল্‌ কোর্টে ইহা সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত হয় এবং তথায় বক্রীত হইয়া হেন্‌রী সমারসেটের সম্পত্তি হয়।

ক্ষুদ্রকায় বৃষ—মাত্র তিন ফুট উচ্চ

এক সার্কাসের স্বত্বাধিকারী একটি অদ্ভুত ছোট পনি, একটি ভেড়া, ও একটি কুকুর লইয়া খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। প্রত্যেক জন্তুটিই অত্যন্ত ছোট আকারের। এখানে তাহার একটি ছবি দেওয়া হইল। মাণ্টা দ্বীপের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি বিচিত্র লোমশ কুকুরের পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় আকার উর্দ্ধে মাত্র ৮ ইঞ্চি এবং ওজনে ৩ সের অপেক্ষাও কম। ইহার নাম টট।

বৃক্ষাদির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন জন্তুদের লইয়া নূতন নূতন জন্তু সৃষ্টির জন্যও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই কার্য্যে হাম্‌বার্গের মিঃ কাল্‌-হাগেন্‌বেক্‌ সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ। ইঁহার ন্যায় বড় জন্তু-ব্যবসায়ী বোধ হয় আর পৃথিবীতে নাই। হাম্‌বার্গের উপকণ্ঠে ইঁহার যে পশুশালা আছে তাহার তুলনা নাই। এসিয়া ও আফ্‌রিকার অনেক নূতন জন্তু তিনি ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম আম্‌দানী করিয়াছেন। তিনি সারা পৃথিবীর প্রায় সকল বড় বড় পশুশালার পশু সরবরাহ করিয়া থাকেন।

বামন সিন্ধুঘোটক

ক্ষুদ্রাকৃতি ঘোড়া ভেড়া ও কুকুরের সার্কাস
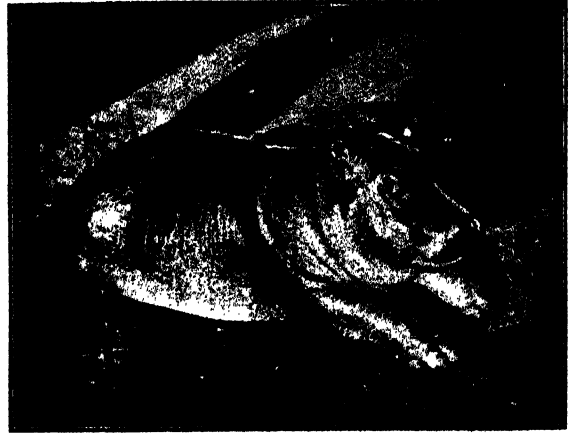
তিনি বহু বৎসর ধরিয়া এই ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকায় এক্ষণে যথেষ্ট অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। নূতন নূতন জন্তু উৎপাদন করিতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহার রীতিমত চাষ আছে এবং অনেকস্থলে কার্য্যে সফলতা লাভও হইয়াছে। ঘোড়া ও গাধার সং-মিশ্রণে এক প্রকার জন্তুর উদ্ভবের কথা অনেকেই জানেন। তিনি চেষ্টা করিয়া সিংহ ও শার্দ্দূলের মাঝামাঝি এক প্রকার জন্তু সৃষ্টি করিতে সফলকাম হইয়াছেন। উহা উভয়প্রকার জন্তুর সংমিশ্রণে হইয়াছে। ইহার মস্তক সিংহের ন্যায়, অবশিষ্ট দেহ শার্দ্দূলের আকারবিশিষ্ট তিনি

সিংহ-শার্দ্দূল

ছোট-গোল-মাথাওয়ালা হিন্দুস্থানী বালক

কঙ্কালসার পুরুষ ও তাহার স্ত্রী পুত্র

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মোটা শিশু—দুই বৎসর বয়সে ওজন আড়াই মন!
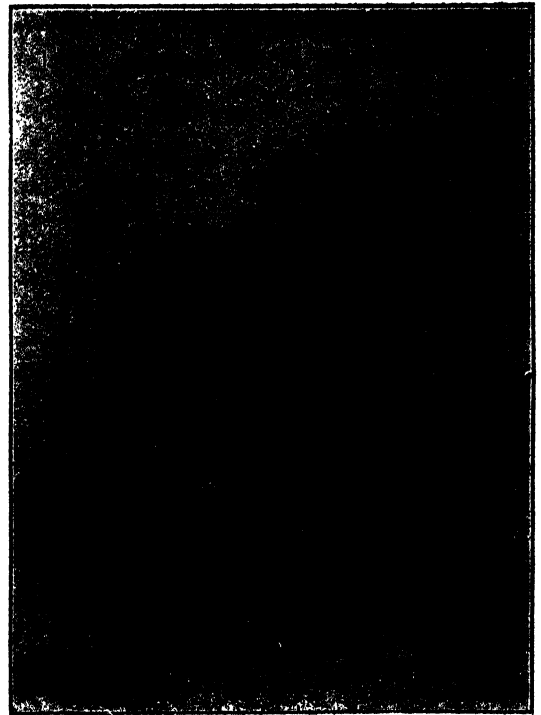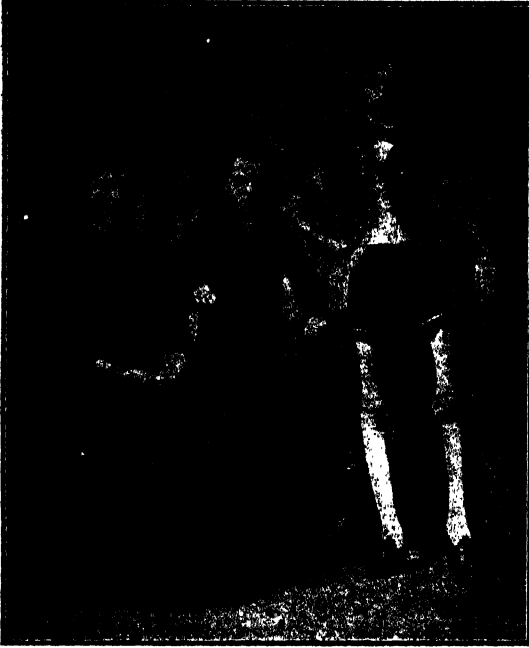
জেব্রা ও অশ্বের দ্বারা জেব্রুল নামক এক ভিন্ন জাতীয় জন্তু উদ্ভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলিকাতার পশুশালায় জেব্রা-গাধার সংমিশ্রণে উৎপন্ন জন্তু আছে। তাঁহার পশুশালায় একটি অদ্ভুত বামন সিন্ধুঘোটক আছে। অজানা লোকের পক্ষে উহাকে দেখিয়া উহা যে কোন্ জন্তু তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এখানে উহারও একখানি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

অন্যান্য জীবের যাদুঘর বা চিড়িয়াখানার ন্যায় আমেরিকায় প্রকৃতির খেয়ালে গঠিত রকমারি মানুষের প্রদর্শনী আছে। সেখানে অদ্ভুত-আকৃতি-বিশিষ্ট নরনারী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এখানে সেরূপ ভাবের প্রদর্শনী কিছু নাই; তবে সময় সময় মেলা বা সার্কাসে দুই একটি অদ্ভুত আকারের মানুষ দেখা যায়। একবার সামান্য একটি মেলাক্ষেত্রে এক পয়সা খরচ করিয়া পেটে পেটে জোড়া একটি ছেলে এবং অন্যবার চারি-হাত বিশিষ্ট একটি বালককে দেখিয়াছিলাম। আর একবার প্রায় একাদশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট হ্যারিসন রোডের মোড়ে ফুটপাথের উপর একটি বিশিষ্ট আকারের হিন্দুস্থানী ছোক্‌রা দেখিয়াছিলাম। তাহার বয়স পনের বৎসর, সমস্ত শরীরের গঠন প্রায় স্বাভাবিক, কেবল মস্তকটি অত্যন্ত ছোট এবং একেবারে গোল বলিলেই হয়। তাহার নাম ধাম আদি প্রশ্ন করিয়া সমস্তই জানিয়াছিলাম, এখন স্মরণ নাই। তখনই তাহার একখানি ফটো তুলিয়া লওয়ার সুবিধা হইয়াছিল। এখানে উহার প্রতিলিপি প্রদান করিলাম।

ছোট আকারের ঘোড়া গরু প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। এখানে অস্থিসার-দেহ একটি মানবের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। চিত্র মধ্যে স্থূলকায়া রমণী উহার স্ত্রী এবং বালকটি পুত্র।

পরিশেষে একটি অদ্ভুত স্থূলাকার মানবশিশুর কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই শিশুর নাম টমাস্ সাবিন্। ইহার বয়স যখন দুইবৎসর তখনকার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। তখন উহার ওজন ৮ ষ্টোন অর্থাৎ কিছু কম আড়াই মণ ছিল। এই শিশু পিতামাতার বিশেষ লাভের কারণ হইয়াছিল। উহারা প্রথম কয়েক বৎসর ইহাকে দেখাইয়া প্রতি সপ্তাহে গড়ে দশ পাউণ্ড করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছিল। তাহার মুখখানি সুন্দর শিশুসুলভ কোমলতাবিশিষ্ট হইলেও, কাহারও তাহাকে আদর করিয়া ক্রোড়ে লইবার সাহস হইত না। উহার জন্য উহার পিতা মাতা বহু লোভনীয় মূল্যের প্রস্তাব পাইয়াছিল। এই শিশুই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার শিশু বলিয়া বিখ্যাত।

পাঁচখানি বিভিন্ন বিদেশীয় মাসিক পত্র হইতে এই-সকল অস্বাভাবিক জীবের কথা এবং চিত্র সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। এগুলি কিছু বৎসর পূর্ব্বের লেখা বিবরণ, সুতরাং এই বিচিত্র জীবগুলির সমস্ত এখনও ধরাধামে আছে কি না বলা যায় না।

শ্রী হরিহর শেঠ

বাবা বৈদ্যনাথ

(১)

নির্ম্মলা ছল্‌ছল্ চোখে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—ইস্!

ডাক্তার সুহৃৎ তখন একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া দু'হাতে প্রিয়তমা পত্নীর মুখখানি বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন - আর ইসে কুলোবে না নির্ম্মলা, মরণ নিশ্চয়! আমি নিজেই আজ আমার স্পিউটাম একজামিন করে' দেখেছি—খাঁটি যক্ষ্মা, স্বয়ং যম!

"হোক্‌না যম, সতী মেয়ের স্বামীর কাছে যমেও ঘেঁস্‌তে সাহস পাবে না।"

ডাক্তার সুহৃৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—You mean that old legend—সাবিত্রী-সত্যবান—that unfounded nonsense! আমি যক্ষ্মায় মরে' যাব তাতেও দুঃখ নেই নির্ম্মলা, কিন্তু তুমি কেন কতকগুলি আজগুবি খোসগল্পে আর কুসংস্কারে বিশ্বাস করে' এই বস্তু-জগতে কেবল ঠক্‌তে-ঠক্‌তেই জীবন হারাবে, তাই ভাব্‌ছি।

নির্ম্মলাও তেম্‌নি সহৃদয় বিদ্রূপের সুরে কহিল—আমিও ভাব্‌ছি, তুমি ভগবানে অবিশ্বাস করে' পুতুল-খেলার মত কতকগুলি এসিড্ আর গ্যাসের বোতল নেড়ে চেড়ে এম্‌নিভাবে জিত্‌তে জিত্‌তে শেষটা যক্ষ্মায় এসে পৌঁছবে—তাই।

ডাক্তার সুহৃৎ তখন একটু কাশিয়া কহিলেন—যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়াটা আমার পক্ষে হার হতে পারে, কিন্তু এই স্পিউটামের ভিতর তাকে ধরে' ফেলার মধ্যে যে আমার মস্ত জিত রয়েছে—তাতে সন্দেহ নেই। এই রোগে তুমি আক্রান্ত না-হয়ে হয়তো ফিজিক্যালি আমার চেয়ে জিত্ রেখেছ, কিন্তু ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়ালি? How ignorant you are!

নির্ম্মলা কর-জোড়ে কহিল - প্রসঙ্গটা এখন ছাড়্‌তে পার? তুমি খুব বাহাদুর! আমায় আর জালিও না।

নির্ম্মলা মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে বসিল। মনে মনে ভগবানকে ডাকিল—ভগবান রক্ষা কর।

দু'জনেই বিষণ্নমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। অনেক-ক্ষণ পরে নির্ম্মলা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, তোমার যে ঐ আল্‌মারি-ভরা রাশি রাশি বইগুলো আছে, ওর একটির ভিতরেও কি ভগবানের নাম-গন্ধ নেই?

ডাক্তার সুহৃৎ আঙ্গুল গণিতে গণিতে কহিলেন—এনাটমি, ফিজিওলজি, সার্জ্জারি, মেডিসিন্, প্যাথোলজি, ব্যাক্‌টিরিওলজি—এর কোথায়ও ভগবান বলে' কোনো স্পেশালিষ্ট্ নেই—নিছক প্র্যাক্‌টিক্যাল্ সায়েন্স্—শুধু কাজের কথা। ঐ যে একটা আল্‌মিরা দেখ্‌ছো—ওতে শুধু ট্রিটিজ্ অন্ থাইসিস্। যক্ষ্মা—তার কারণ—তার বিস্তার—তার চিকিৎসা, আজ পর্য্যন্ত যা-কিছু আবিষ্কার হয়েছে। Valuable acquisitions. দ্যাখো নির্ম্মলা, আমি যদি হঠাৎ মরে' যাই—আমার বইগুলি যেন নষ্ট না হয়। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমারই থাক্‌বে। কিন্তু ঐগুলি কেবল এমন একজন ডাক্তারকে আমি উইল করে' দিয়ে যাবো, যে তার জীবনটা আমারই মত যক্ষ্মার মৃত্যুবাণ-সন্ধানে উৎসর্গ কর্‌বে। কি obstinate ঐ ব্যাসিলিগুলো। আর যদি দুটো বৎসরও মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে থাক্‌তে পারি, তবে নির্ম্মলা, যক্ষ্মার ব্যাসিলি কিসে মরে, সে কেবল আমার ল্যাবরে-টারিতেই আবিষ্কার হতে পার্‌বে। ওঃ কি ভীষণ Statistics!

ডাক্তার সুহৃতের চোখ দুটি জলজল করিতেছিল। তাঁহার হাত দু'খানি এমনই মুষ্টিবদ্ধ যেন তিনি যক্ষ্মার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছেন, এখন টিপিলেই সে মরিবে।

নির্ম্মলার দু'গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল, আর সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল তার স্বামীর মুখের দিকে। কি উদার—কি প্রশান্ত মৃত্যুভয়হীন মুখখানি! পরের জন্য এত যার প্রাণ কাঁদে—যে এত নির্ম্মল—যে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনার কোনো ধার ধারে না, সে যদি তোমাতে অবিশ্বাসী হয়—হে ভগবান্!—শুধু কি সেই অপরাধেই তুমি তাহার উপর এতখানি রুষ্ট হইতে পার?

আবার উভয়ে বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। সহসা নির্ম্মলা সুহৃতের হাতখানি চাপিয়া ধরিল—বলিল—চল আজই আমরা বৈদ্যনাথ যাব।

নির্ম্মলা ভাবিতেছিল—সে বাবা বৈদ্যনাথের পায়ে ধন্না দিবে।

ডাক্তার সুহৃৎ ভাবিলেন—বৈদ্যনাথের জল-হাওয়া মন্দ নহে।

(২)

বৈদ্যনাথে আসিয়া নির্ম্মলা দু'বেলা বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে ধন্না দেয়, উপবাসে থাকে, আর পূজা করে। মন্দিরে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে তাহার কপালটা ফুলিয়া গিয়াছে। ডাক্তার সুহৃৎ কিন্তু তাঁহার শিশি-বোতল আনিতে ভুলেন নাই—একরাশ বইও আনিয়াছেন। তিনি মাইক্রস্কোপের মধ্যে নিজের স্পিউটাম লইয়া সারাদিন বসিয়া থাকেন—আর নির্ম্মলার বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে লজিক্যালি বিধ্বস্ত করিয়া তৃপ্ত হন।

নির্ম্মলা একদিন জিদ্ ধরিল—চল, আমার সঙ্গে একটিবার মন্দিরে যাবে।

ডাক্তার সুহৃৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

নির্ম্মলা কহিল—ভক্তিভরে বাবাকে একটি প্রণাম করবে আর বল্‌বে বাবা আমার রোগ মুক্ত কর।

ডাক্তার সুহৃৎ চীৎকার করিয়া কহিলেন—Hang your বাবা! nonsense! আমি না হয় বল্‌লাম, বাবা আমায় রোগমুক্ত কর। তোমার পাথরের বাবা সে কথা কানে শুন্‌বেন কি করে'? Physically absurd! পাথরের কানে ear-drum থাকে কি?

এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব আরম্ভ করিলেন, বাতাসে কি করিয়া শব্দের উৎপত্তি, কর্ণ-পটহে উহার আঘাত—মোটর নার্ভ্‌স্—ব্রেন-সেল্‌স্—কত কি! নির্ম্মলা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একাই মন্দিরে গেল—কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাবার নিকট ক্ষমা চাহিল—আমার স্বামীকে রক্ষা কর, তাঁহার অপরাধে আমাকে শাস্তি দাও।

আর-একদিন নির্ম্মলা অতিযত্নে একটু চরণামৃত লইয়া আসিল, ডাক্তার-সাহেবের পায়ে ধরিয়া অনুরোধ জানাইল—ঔষধ-জ্ঞানে এইটুকু খেয়ে ফেলো।

গম্ভীরভাবে ডাক্তার সুহৃৎ প্রশ্ন করিলেন—কেন, ওতে কি হবে?

নির্ম্মলা উত্তেজিতভাবে কহিল—তোমার ঐ কাল্ রোগ সেরে যাবে—আমার শাঁখা সিঁদুর বজায় থাক্‌বে। বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নির্ম্মলাকে কাঁদিতে দেখিয়া ডাক্তার সুহৃৎ তাহাকে অতি নিকটে টানিয়া লইলেন, তারপর সান্ত্বনার সুরে বলিতে লাগিলেন—আচ্ছা, বল্‌তে পার ঐ লাল-জলে কি কি আছে? দ্যাখো নির্ম্মলা, ফর্ম্মুলা দেওয়া না থাক্‌লে আমি পেটেন্ট্ ওষুধগুলোকে বড্ডই ঘৃণা করি। হয়তো কোনো ওষুধে একটা ডিজিজ্ সেরে যেতে পারে, কিন্তু তাতে কি থাকে-না-থাকে তা' গোপন-রাখাটা নেহাৎ ব্যবসাদারী। আচ্ছা, তোমার ঐ প্যানেসিয়ার ভিতর কি আছে-না-আছে, ওতে যক্ষ্মা সারতে পারে কি না, তা' আমি এখনই বলে' দিচ্ছি।

ডাক্তার সুহৃৎ চরণামৃতটুকু মাইক্রস্কোপের ভিতর লইয়া বসিয়া গেলেন। নির্ম্মলা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সহসা ডাক্তার-সাহেব কাশিলেন—উৎকট কাশি—একটু রক্ত উঠিল। ওয়াক করিয়া সেটুকু চরণামৃতের মধ্যে ফেলিলেন—মাইক্রস্কোপেই তাঁহার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিবদ্ধ।

নির্ম্মলার মুখখানা ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্বনাশ! চরণামৃতে নিষ্ঠিবন-নিক্ষেপ! বাবা তো আর কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। যে চরণামৃত একটু মাটিতে পড়িলে নির্ম্মলার বুক কাঁপিয়া উঠে, কতবার তটস্থ হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে সে ভূমিতে প্রণাম করে, সেই চরণামৃতের আজ এই অবমাননা! এখন উপায়? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নির্ম্মলা ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের মতই মন্দির-পথে চলিতে লাগিল। ডাক্তার সুহৃতের সেদিকে লক্ষ্যও নাই, তিনি রহিলেন মাইক্রস্কোপ্ লইয়াই।

(৩)

নির্ম্মলার শরীর শুকাইতেছিল—উপবাসে আর অনিদ্রায়। এখন আর ডাক্তার সাহেবকে সে কোনো কথা

লইয়াই বিরক্ত করে না। একান্ত মনে বাবা বৈদ্যনাথের চরণে শরণ লইয়াই সে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে। অন্যদিকে আর-একটা ঘরে ডাক্তার সুহৃৎ, মাইক্রস্‌কোপ, আর স্পিউটাম। ডাক্তার-সাহেব ভাবিতেন—শীঘ্রই তিনি যক্ষ্মারোগের একটা অব্যর্থ ইন্‌জেক্‌সন বাহির করিয়া নির্ম্মলাকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিবেন। অন্যদিকে নির্ম্মলা ভাবিত - বাবা বৈদ্যনাথের কি মাহাত্ম্য তাহা একদিন ডাক্তার-সাহেবকে সে বুঝাইয়া দিবে—উপবাসে আর ধন্নায় দুই দিকেই অনন্যকৃচ্ছ্রসাধনা—অগাধ বিশ্বাস —এমনকি জীবন-মরণ পণ!

ডাক্তার সুহৃৎ একদিন হাসিতে হাসিতে ফুল্লমনে কহিলেন—আর ভয় নেই, নির্ম্মলা। এইবার বোধ হচ্ছে আমার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌টা কৃতকার্য্য হবে। ডাক্তার বোসের চিঠি পেয়েছি, তিনি শীঘ্রই এখানে আস্‌ছেন। আজ ষোল বছর আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কি পরিশ্রম কর্‌ছি—তুমি তো সবই দেখেছ? একটি লোকও যদি যক্ষ্মায় না মরে, সে কি আনন্দ, নির্ম্মলা?' Smallpoxএর vaccination theory যেদিন successful হয়েছিল—সে কি শুভ মুহূর্ত্ত!

ডাক্তার সুহৃতের রোগক্লিষ্ট মুখখানি ভবিষ্যৎ সফলতার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নির্ম্মলাও ঠিক সেই সময়ে ততখানি আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিল - বাবা আমাকে কাল স্বপ্ন দিয়েছেন, তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমি শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বে।

ডাক্তার সুহৃৎ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিলেন— তোমার স্বপ্ন-দেখার তো খুব বাহাদুরী আছে, তা হলে। আমি ষোল বছর চোখ মেলে যে যক্ষ্মার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছি —তুমি একদিন চোখ বুজেই তাকে উড়িয়ে দিচ্ছ। আচ্ছা, যদি আমি এখন আমার নিজের ওপর এ ট্রিট্‌মেণ্ট না করি? তোমার বিশ্বাস, তবুও আমি সেরে উঠ্‌বো?

নির্ম্মলা দৃঢ়তার সঙ্গে কহিল—নিশ্চয়ই।

ডাক্তার সুহৃৎ চোখমুখ ঘুরাইয়া বিদ্রূপের সুরে কহিলেন—বুঝে দেখ, নির্ম্মলা! একদিকে তোমার বাবার স্বপ্ন, অন্যদিকে আমার ইন্‌জেক্‌সন - বেছে নাও একটি। গোলে হরিবোল চল্‌বে না। যক্ষ্মাকে আমি হারিয়েছি, তোমাকেও সেই সঙ্গে হারাব। আমি তোমাকে খুব চিনি। তুমি শাঁখা-সিঁদুরের আশঙ্কায় আমার চেয়েও শুকিয়ে উঠেছ। এখন ভেবে, বুঝে, বল—এই ট্রিট্‌মেণ্ট্‌ কর্‌বো, না তোমার স্বপ্নে কুলোবে?

নির্ম্মলা তেমনি জোরের সঙ্গে কহিল কিসের ভয় দেখাচ্ছ তুমি? তোমার এখন আর কোন চিকিৎসার দর্‌কারই হবে না। বাবা নিজে আমার শিওরে দাঁড়িয়ে বলে' গেছেন—তুমি শীগ্‌গিরই সেরে উঠ্‌বে।

ডাক্তার সুহৃৎ কহিলেন - ঠিক?

নির্ম্মলা কহিল—ঠিক, ঠিক, ঠিক।

ডাক্তার-সাহেব তখন পটপট্‌ করিয়া তাঁহার ফ্লানেল্‌ শার্টের বোতামগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; তারপর আঙুল দেখাইয়া কহিতে লাগিলেন—আমি কিন্তু আজ থেকে ডুব দিয়ে স্নান কর্‌বো, ঠাণ্ডা লাগাবো, তেঁতুল খাব—বুঝেছ—তেঁতুল!

নির্ম্মলা কহিল—খাওনা। ওই তেঁতুল এখন বাবার বরে তোমার সেই ইন্‌জেক্‌সন্‌ হয়ে উঠবে।

হতাশভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

দু'দিন পরে ডাক্তার বোস্‌ যখন দেওঘর পৌছিলেন— তখন ডাক্তার সুহৃৎ একেবারেই নিশ্চেষ্ট এবং নিশ্চিন্ত। ডাক্তার বোস্‌ আসিয়াই তাঁহার হাতে হাত ঝাঁকিলেন —সে হাত তখন বরফের মত ঠাণ্ডা। ডাক্তার বোস্‌ বলিতে লাগিলেন—মার্‌ভেলাস্‌ এফেক্ট্‌ ডক্টর্‌ রয়! আপনার চিঠি পেয়েই আমি দুটো ডাইং পেশেণ্ট্‌কে ঐ প্রোপোর্‌সনে ইন্‌জেক্‌সন্‌টা করেছি—আশ্চর্য্য ফল! কল্‌কাতায় আপনার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে' গেছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে' আপনি যে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করেছেন—সে সম্বন্ধে মেডিক্যাল্‌ জার্ণাল কি লিখেছে দেখুন।

ডাক্তার বোস্‌ তাঁহার সম্মুখে একখানা বই ফেলিয়া দিলেন।

নির্ম্মলা দুই বন্ধুর পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তার সুহৃৎ তাহার দিকে একটা বিজয়ের কটাক্ষ হানিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

তারপর ডাক্তার বোস আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি নিজে ইন্‌জেক্‌সনটা নিয়েছেন তো? একি! ডাক্তার রয়ের যে ফিট্ হচ্ছে—

ডাঃ বোস্ চম্‌কিয়া সন্ত্রস্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, নির্ম্মলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পৃথিবীটা তাহার চোখের উপর ঘুরিতে লাগিল—জল-ভরা ঝাপ্‌সা চোখে নির্ম্মলা দেখিল, মৃত্যুশয্যায় শায়িত তাহার স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন—ছড়িহাতে ডাক্তার বোস্ নহেন—ত্রিশূল-হাতে স্বয়ং বাবা বৈদ্যনাথ! নির্ম্মলা কাঁদিয়া উঠিল—বাবা, বাবা, তুমি এখনি ইন্‌জেক্‌সন্ কর—আমার স্বামীকে বাঁচাও—বাঁচাও!

শ্রী জলধর চট্টোপাধ্যায়

বেলা শেষে

ধরণী দিয়াছে তার
গাঢ় বেদনার
রাঙামাটি-রাঙা ম্লান ধূসর আঁচলখানি
দিগন্তের কোলে কোলে টানি'।
পাখী উড়ে যায় যেন কোন্ মেঘ-লোক হ'তে
সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা গৃহ-পানে ঘর-ডাকা পথে।
আকাশের অস্ত-বাতায়নে
অনন্ত দিনের কোন্ বিরহিনী ক'নে
জ্বালাইয়া কনক-প্রদীপখানি
উদয়-পথের পানে যায় তার অশ্রু চোখ হানি'
'আসি'-ব'লে-চ'লে-যাওয়া বুঝি তার প্রিয়তম-আশে;
অস্ত-দেশ হয়ে ওঠে মেঘ-বাষ্প-ভারাতুর তারি দীর্ঘশ্বাসে।
আদিম কালের ঐ বিষাদিনী বালিকার-পথ-চাওয়া চোখে—
পথ-পানে-চাওয়া-ছলে-দ্বারে-আনা সন্ধ্যা-দীপালোকে
মাতা বসুধার মমতার ছায়া পড়ে;
করুণার কাঁদন ঘনায় নত-আঁখি স্তব্ধ দিগন্তরে।
কাঙালিনী ধরা মা'র অনাদি কালের কত অনন্ত বেদনা
হেমন্তের এমনি সন্ধ্যায় যুগযুগ ধরি' বুঝি হারায় চেতনা।
উপুড় হইয়া সেই স্তূপীকৃত বেদনার ভার
মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকে; ব্যথা-গন্ধ তার
গুমরিয়া গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে যায়
এমনি নীরবে শান্ত এমনি সন্ধ্যায়।...
ক্রমে নিশীথিনী আসে ছড়াইয়া ধূলায়-মলিন এলোচুল,
সন্ধ্যা-তারা নিবে যায়, হারা হয় দিবসের কূল।...
তারি মাঝে কেন যেন অকারণে হায়
আমার দুচোখ পূ'রে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।
বুকে বাজে হাহাকার-করতালি,
কে বিরহী কেঁদে যায় "খালি, সব খালি!
"ঐ নভ, এই ধরা, এই সন্ধ্যালোক,
"নিখিলের করুণা যা-কিছু; তোর তরে তাহাদের
অশ্রুহীন চোখ।"

মনে পড়ে—তাই শুনে মনে পড়ে মম
কত না মন্দিরে গিয়া পথের সে লাথি-খাওয়া ভিখারীর সম
প্রসাদ মাগিনু আমি—
"দ্বার খোলো, পূজারী দুয়ারে তব আগত যে স্বামি!"
খুলিল দুয়ার, দেউলের বুকে দেখিনু দেবতা,
পূজা দিনু রক্ত-অশ্রু, দেবতার মুখে নাই কথা।
হায় হায় এ যে সেই অশ্রু-হীন চোখ,
কেঁদে ফিরি, "ওগো একি প্রেম-হীন অনাদর-হানা
দেবলোক!"
ওরে মূঢ়! দেবতা কোথায়?
পাষাণ-প্রতিমা এরা, অশ্রু দেখে নিষ্পলক অকরুণ
মায়া-হীন চোখে শুধু চায়।
এরাই দেবতা, যাচি প্রেম ইহাদেরই কাছে,
অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূ'র কাছে হায় জল-ধারা যাচে।
আমারি সে চারিপাশে ঘরে ঘরে কত পূজা
কত আয়োজন,
তাই দেখে কাঁদে আর ফিরে ফিরে চায় মোর
ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন,
অপমানে পুনঃ ফিরে আসে,
ভয় হয়, ব্যাকুলতা দেখি মোর কি জানি কখন্ কে হাসে।
দেবতার হাসি আছে, অশ্রু নাই,
ওরে মোর যুগে-যুগে অনাদৃত হিয়া, আয় ফিরে যাই!...
এই সাঁঝে মনে হয়, শূন্য-চেয়ে আরো এক মহাশূন্য রাজে
দেবতার-পায়ে-ঠেলা এই শূন্য মম হিয়া-মাঝে।
আমার এ ক্লিষ্ট ভালোবাসা
তাই বুঝি হেন সর্ব্বনাশা।
প্রেয়সীর কণ্ঠে কভু এই ভুজ এই বাহু জড়াবে না আর,
উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাসা মালা নয়,
খর তরবার।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

"একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যের মীমাংসা"

কার্ত্তিকের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর নন্দী মহাশয় যে "বৈজ্ঞানিক রহস্যের" সমাধান চাহিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে রহস্যই নহে। ঠিক এই রহস্যের উদ্ঘাটন পূর্ব্বে হইয়াছে কি না জানি না; তবে রহস্যটি এত সরল যে Geometrical Theory of Opticsএর প্রাথমিক তত্ত্ব হইতেই অনায়াসে ইহার মীমাংসা হইতে পারে,—Undulatory Theory আলোক-তরঙ্গ উপপত্তি প্রভৃতি উচ্চ উপপত্তি দ্বারা ত হইবেই। প্রশ্নকর্ত্তা যদি হেল্‌ম্‌হোৎসের "Physiological Optics" কিম্বা অন্ততঃ এড্‌সারের "Light for Students"এর "The Eye" শীর্ষক পরিচ্ছেদ পাঠ করেন, তাহা হইলেই উঁহার রহস্যের মীমাংসা অতি সহজেই করিতে পারিবেন। আমরা সংক্ষেপে এই রহস্যের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলাম।

প্রশ্নকর্ত্তা, আশা করি, জানেন যে মোটা লেন্সের দুইটি focal point থাকে; একটির নাম anterior বা first focal point এবং অপরটির নাম posterior বা second focal point। যদি একটি রশ্মিগুচ্ছ first focal point হইতে ক্রমাপসৃত হইতে হইতে ছড়াইয়া লেন্সের উপর পতিত হয়, তাহা হইলে লেন্সের মধ্য দিয়া যাইবার পর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ রূপে বাহির হয়। আর যদি কোন সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের উপর পতিত হয়, তাহা হইলে লেন্সের মধ্য দিয়া যাইয়া বাহির হইবার পর উহা second focal pointএ গুটাইয়া আসিয়া একবিন্দুতে সম্মিলিত হয়।

মানুষের চোখের আকারও একটি মোটা লেন্সের অনুরূপ এবং উহারও দুইটি focal point আছে। Emmetropic বা সহজ চোখের anterior focal pointটি cornea'র সম্মুখে ১৩·৭৫ মিলিমিটার্ দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান আলোচনায় অপর focal pointএর অবস্থান জানিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

প্রশ্নকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে চুলগুলির inverted "image" বা উল্টা ছবি দেখা যায়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা image বা ছবি নহে, shadow বা ছায়া মাত্র। প্রশ্নকর্ত্তা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পোষ্ট্‌কার্ডের ছিদ্রটিকে চোখ হইতে অল্পদূরে যে-কোন দূরত্বে রাখিলেই চোখের উপরের পাতার চুলগুলির inverted বা উল্টা এবং magnified shadow বর্দ্ধিতায়তন ছায়া দেখা যায় না—ছিদ্রটিকে চোখের সম্মুখে একটি নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে রাখিলে তবে প্রশ্নকর্ত্তার উল্লিখিত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই নির্দ্দিষ্ট অবস্থান হইতেছে first focal pointএর অবস্থান। ছিদ্রটিকে যখন first focal pointএ রাখা যায় তখন উহা হইতে বিকীর্ণ আলোক-রশ্মিগুলি চোখে প্রবেশ করিয়া একটি parallel pencil বা সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ সৃষ্টি করে—পরস্পর কাটাকাটি করে না; সুতরাং চোখের পাতার চুলগুলির ছায়া erect বা খাড়া অবস্থাতেই রেটিনায় পতিত হয়—এবং রেটিনার impulse বা অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছিবামাত্র স্বভাবগত ধর্ম্মানুযায়ী মস্তিষ্ক ঐ ছায়াকে উল্টা করিয়া অনুভব করে। সাধারণ ক্ষেত্রে কিন্তু আলোকরশ্মিগুলি চোখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমান্তরাল হয় না, সুতরাং কাটাকাটি করে; সেইজন্য বস্তুর উল্টা ছবি রেটিনার উপর পতিত হয় এবং মানব-মস্তিষ্ক উহাকে উল্টাইয়া সোজা করিয়া অনুভব করে (Edser's "Light for Students"—Fig. 86 দেখুন)।

কেবল চোখের উপরের পাতার চুলগুলি দেখিতে পাইবার কারণ এই যে ঐগুলি নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে এবং সেজন্য চোখের মধ্যে যে আলোক প্রবেশ করে তাহার পথে পতিত হয়। নীচের পাতার চুলগুলিও নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে—সুতরাং আলোকপথে পতিত হয় না, এবং এইজন্যই তাহাদের ছায়া রেটিনার উপর পড়ে না।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই ছিদ্রের এবং চুলগুলির বড় দেখাইবার কারণ স্পষ্টই বুঝা যায়; সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা আর আলোচনা করিব না। তবে এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রশ্নকর্ত্তা বলিয়াছেন যে ছিদ্রটি নিখুঁত বৃত্তের মত দেখায়; বাস্তবিক পক্ষে এ কথা সত্য নহে। আলোকরশ্মিগুলি চোখের মধ্যে যাইয়া সমান্তরাল হয় বলিয়া মনে হয় যেন ছিদ্রটি অনেক দূরে রহিয়াছে, সুতরাং অনেকটা বৃত্তের মত দেখায়।

অনিলকুমার দাস

[শ্রীযুক্ত সুধীরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মীমাংসা পাঠাইয়াছিলেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

কার্ত্তিকের প্রবাসীর বৈজ্ঞানিক রহস্যটা, Physical Opticsএর দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, ক্ষুদ্র বৃত্তাকার ছিদ্রের (small circular aperture) মধ্যে আলোক-তরঙ্গ প্রবেশের নিয়মের দ্বারাই মীমাংসিত হইবে। ঐভাবে আলোক-তরঙ্গের প্রবেশের নিয়ম-সংক্রান্ত ইহা একটি সমস্যা (problem), নূতন কোনও তথ্যের (theory) উপরে ইহা নির্ভর করে না।

সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা আলোক কিরূপে প্রবেশ করে তাহা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে অনেকখানি লিখিতে হয়, এজন্য এসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কোনও আলোক-বিজ্ঞানের পুস্তকের Diffractionএর পরিচ্ছেদের "Small circular aperture"এর ব্যাপারটি পড়িয়া লইবেন (যথা Preston's Theory of Light, Chapter IX, §130)। তবে এ ক্ষেত্রে কেবল তাহাতেই হইবে না, কারণ বর্ত্তমান সমস্যায় অবস্থাগুলি পুস্তকের অবস্থার একেবারে অনুরূপ নহে। একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে যে এ ক্ষেত্রে আলোকের উৎপত্তিস্থল একটি বিন্দু নহে (point source of light নহে)। ইহা ছড়ানো আলোক (diffused light, যেমন দিনের বেলায় আলোকিত বস্তুসমূহের বা আকাশের আলোক) অথবা ইহা লণ্ঠনের বা বিদ্যুতালোকের মত বৃহদায়তন আলোক। এই কারণে ছিদ্রের নিকটের আলোক-তরঙ্গের তল (wave surface) গোলকাংশের (portion of spherical surface) মত না হইয়া উহার কতকটা অনুরূপ একটা অসম-তলের আকার ধারণ করিবে।

মনে করুন ছিদ্রের ভিতর দিকে অর্থাৎ যে দিকে চক্ষু আছে সেই দিকে একটা পর্দ্দা আছে। এখন যদি একটা সাদা আলোকের বিন্দু দ্বারা ঐ ছিদ্রপথ আলোকিত হইত, তবে ছিদ্রপথে আলোক প্রবেশের পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে পর্দ্দার আলোকিত অংশটা (কতকগুলি রঙীন এক-কেন্দ্র বৃত্ত পড়ার জন্য) ছিদ্র অপেক্ষা অনেক বৃহৎ

হইত। এস্থলে ঐ বৃহদায়তন আলোকটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দুর সমষ্টি বলিয়া ধরিয়া পুস্তকের অনুযায়ী ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে আলোকিত অংশটা এখন সাদাই হইবে। এবং পর্দ্দার উপর আলোকটা কিছু অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে। কারণ এখানে wave surface বা তরঙ্গ-তল অসমতল বলিয়া অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত পর্দ্দার কোনও একটা স্থানের পক্ষেও ২।১টি pole ঐ তরঙ্গ-তলের উপর পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

এইখানে বুঝা যাইবে যে ছিদ্রটি নিখুঁত বৃত্তাকার ধারণ করে কেন। (Diffraction) পরাবর্ত্তনের জন্য আলোকের বৃত্তটা যে ভাবে পড়ে তাহাতে তাহার পরিধির প্রতি-স্থান ছিদ্রটির ধার হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী থাকে। এখন ছিদ্রটি অপেক্ষা ঐ আলোকের বৃত্তটি অনেক বড়। অতএব ধরুন যদি ছিদ্রটি (ellipse) বৃত্তাভাস আকারের হয়, তবে তাহার পরিধি হইতে সমান ব্যবধান রাখিয়া দূরে দূরে একটা রেখা টানিলে সেটা প্রায় বৃত্তের মত হয়। কারণ এই অঙ্কিত নক্‌সাটির দীর্ঘ ও হ্রস্ব অক্ষের (minor ও major axesএর) অনুপাত এখন প্রায় ১এর কাছাকাছি পৌঁছে। যেমন মনে করুন যদি বৃত্তাভাসের অক্ষের অনুপাত $\frac{1}{2}$ থাকে, পরে যদি প্রতি দিকে ৭ যোগ হয়, তবে এখন অনুপাত দাঁড়াইবে ৮/৯ = প্রায় ১। সুতরাং ছিদ্রটা কার্য্যতঃ বৃত্তের অনুরূপ হয়।

তারপর, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের রেটিনা পূর্ব্বোক্ত পর্দ্দার কাজ করিতেছে। উহারই উপর ঐ ছিদ্র দিয়া একটা আলোকের বড় "ছায়া" পড়িতেছে—এমন নয় যে ঐ ছিদ্রের একটা প্রতিকৃতি (image) চোখের crystalline lensএর সাহায্যে পড়িতেছে। উহা ছিদ্রটির projection বা ছায়াপাত, উক্ত পরাবর্ত্তনের জন্য অনেকটা বিস্তৃত মাত্র এইরূপ ভাবে ধরা যায়। এস্থানে আর-একটা কথা এই যে মাঝে চোখের লেন্‌সটা আছে। উহার জন্য এই পরিবর্ত্তন হইবে যে আলোকটা পূর্ব্বে যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত এখন তদপেক্ষা কম স্থান ব্যাপিয়া পড়িবে।

অতএব দেখা গেল যে আমরা এস্থানে ছিদ্রের প্রতিকৃতি দেখিতেছি না, কেবল Diffraction বা পরাবর্ত্তনের নিয়মে প্রবিষ্ট আলোক-তরঙ্গ রেটিনাটা আলোকিত করিতেছে ইহাই বুঝিতেছি মাত্র। এই আলোকের কিরণগুলি পরস্পরকে অতিক্রম করিয়াও যায় নাই, এই হেতু যে পর্দ্দাটার একটি স্থান অপর একটি স্থানের যে-দিকে অবস্থিত তরঙ্গ-তলের উপরে তাহাদের poleগুলিও সেইভাবে অবস্থিত।

সুতরাং এখন যদি এই আলোকের মধ্যে একটা জিনিস থাকে তবে তাহার ছায়া (shadow, লেন্‌স্ ঘটিত ছবি নহে) রেটিনার উপর পড়িবে, জিনিসটা যে ভাবে আছে সেই ভাবেই। সুতরাং চোখের পাতা বা সূচ যেটা যে ভাবে আছে তাহার ছায়া রেটিনার উপর সেই ভাবেই পড়িবে। এখন theory বা উপপত্তি অনুসারে দেখা যায় যে যে জিনিসটির উল্টা ছায়া (যেমন সাধারণ ভাবে দৃষ্ট বস্তুর ছবি) রেটিনাতে পড়ে তাহাকেই আমরা সোজা বলিয়া দেখি; সুতরাং এস্থানে চোখের পাতার সোজা ছায়া রেটিনাতে পড়ে বলিয়া তাহা উল্টা বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। ছায়াছবি magnified বা বর্দ্ধিতায়তন হয় এজন্য যে রশ্মিগুলি বস্তুটির পাশ দিয়া diverge বা ক্রমাপসৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়া। এবং বিভিন্ন দুইটি কিরণের মধ্যকার কোণ বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া।

প্রশ্নকর্ত্তা আরও একটু লক্ষ্য করিলে আর-একটা জিনিস দেখিতে পাইতেন। ইহা এই যে, ছিদ্রের বাহিরের দিকে সূচটি যদি ধরা যায় তবে সেটাকে সোজাই দেখায়। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাপার যদি সত্যই সংঘটিত হয় তবে তাহা হইবার কথা নহে। কেননা ঐ সূচের দ্বারা ছিদ্রের যে-দিকের pole অবরুদ্ধ হইবে সেই দিকেই তাহার ছায়া পড়িবে। সুতরাং পূর্ব্বের মত উহা উল্টা দেখাইবারই কথা।

কিন্তু ব্যাপার এই যে ছিদ্রের ভিতর দিয়া যখন আমরা বাহিরের জিনিস দেখিতে চেষ্টা করি তখন সেই বস্তু হইতে যে আলোকতরঙ্গ উদ্ভূত হইতেছে তাহাই ছিদ্রের মধ্য দিয়া সাধারণ ক্ষেত্রের মত ছবি তৈয়ারী করে। এতদ্ব্যতীত diffused বা ছড়ানো আলোকে ছিদ্রটি রাখিলে বিভিন্নদিক্ হইতে এত আলোক আসে যে সূচ দিয়া আলোকের একটা উৎস বন্ধ করিলে অপর আলোক-তরঙ্গসমূহ আবার একটি wave surface তরঙ্গ তল ছিদ্রের নিকটে সৃষ্টি করে। সুতরাং পর্দ্দার কোনও এক বিশেষ স্থানের pole অবরোধ করা ঐ উপায়ে সম্ভব নহে। ঐ সূচটাকে একটা কাগজের কাছে ধরিয়া তাহার ছায়া দেখুন, অত্যন্ত কাছে না আনিলে ভাল ছায়া পড়িবে না।

এজন্য, এক যদি সূচটিকে ছিদ্রের সহিত সম্পূর্ণ সংলগ্ন রাখা যায়, যাহাতে সূচের যে অংশ ছিদ্রটি অবরোধ করিতেছে তাহার ও ছিদ্রের plane বা তলের মধ্যে কোনও ব্যবধান না থাকে, তবেই ঐ pole বন্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি সূচ হইতে নির্গত আলোক ভিতরের পরাবর্ত্তিত আলোক অপেক্ষা যথেষ্ট প্রখর বলিয়া একটা সাধারণ erect image খাড়া প্রতিরূপ দেখিতে পাইবই। ইহার সঙ্গে inverted উল্টা ছায়াটাও পড়িবে বটে, কিন্তু তাহা অপরটি অপেক্ষা যথেষ্ট লঘু (faint)। অধিকন্তু আমাদের মনোযোগ যদি বাহিরের সূচটি দেখিবার জন্যই নিযুক্ত থাকে, তবে সূচটির সোজা প্রতিকৃতিই দেখিতে পাইব। কিন্তু সূচটির উল্টাদিক (এইখানে কতকটা flat বা চ্যাপ্‌টা অংশ পাওয়া যায়) যদি বাহির হইতে ছিদ্রের সঙ্গে একেবারে সংলগ্ন করিয়া ধরিয়া উহার দিকে মনোযোগ না দিয়া ছিদ্রটি হইতে যতদূর পারা যায় আলোক দেখিবার চেষ্টা করা যায়, তবে উল্টা ছায়াটাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-সমস্ত কারণ দেখান হইয়াছে তাহার জন্য সূচের সোজা প্রতিকৃতিটাও একেবারে নষ্ট করা সর্ব্বদা যায় না, উহাও ঐ সঙ্গে পড়ে।

শ্রী রমাপতি গুপ্ত

কার্ত্তিকের প্রবাসীর ৮৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর নন্দী মহাশয় যে "বৈজ্ঞানিক রহস্যের" কথা বলিয়াছেন তাহার নাম Le Cat's Experiment, এবং তাহার বিবরণ E. C. Sanfordএর A Course in Experimental Psychology'র ১৮৫ পৃষ্ঠায় আছে। তাঁহার অবগতির জন্য আমি বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

Retinal Shadows; Le Cat's Experiment. Hold a pin, head upward, as close as possible before the pupil, and, an inch or two in front of the pin, a card pierced with a pin-hole. Move the pin about till it comes into exact line with the hole, when there will be seen in the circle of diffusion representing the hole a shadowy inverted image of the pin-head...... The rays of light from the pin-hole are too divergent to be brought to a focus on the retina, but enter the eye in a favourable state for casting a shadow. The shadow on the retina is erect, like the pin that casts it, but is perceived as inverted. Observe at the same time the still more blurred, erect image of the pin through which the other things are seen. This is not a shadow, but an image (really a blur of diffusion circles) formed in the ordinary way by light reflected from the surface of the pin. When several pin-holes are

used (three at the points of an eighth of an inch triangle, for example), an equal number of shadows will be seen.

The casting of the shadow can easily be illustrated with a candle and a double convex lens. Set the lens a foot or two from the candle, and hold a card on the opposite side of the lens, too near for the formation of an image, then introduce a finger or pencil close before the lens on the side toward the light, and observe the erect shadow on the card.

নন্দী মহাশয় স্বতন্ত্র ভাবে প্রথম অংশটি বাহির করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। বাকী অংশগুলি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Experimental Psychology Laboratory-তে এ পরীক্ষাটি করান হয়।

শ্রী হরিদাস ভট্টাচার্য্য
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১। অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র বা পিন্ হোল্ (pin hole) যে আতসী কাচ বা লেন্সের কাজ করে তাহা বোধ হয় যাঁহারা ফটোগ্রাফি করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জানেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ছিদ্রের সাহায্যে আলোকচিত্র (ফোটোগ্রাফ) তোলাকে পিন্ হোল্ ফটোগ্রাফি বলে। ইহার বিবরণ C. H. Bothamley কৃত Manual of Photography-তে পাইবেন। এ সম্বন্ধে অন্য পুস্তকেরও অভাব নাই।

২। অন্যান্য শক্তির ন্যায় আমাদের দর্শনশক্তিরও একটা সীমা আছে। আমরা খুব দূরের বস্তু অথবা খুব নিকটের বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাই না। যে সীমার মধ্যে বস্তু থাকিলে স্পষ্ট দেখিতে পাই তাহাকে range of distinct vision বা স্পষ্ট দৃষ্টির সীমা বলে। এই সীমার বাহিরে চোখের খুব কাছে কোন জিনিষ থাকিলে তাহার স্পষ্ট প্রতিকৃতি আমাদের চোখের অভ্যন্তরস্থ রেটিনা পর্দ্দার উপর পড়ে না বলিয়া জিনিষটি বৃহদাকার দেখায়। আমরা বাহিরের বস্তু যাহা যাহা দেখিতে পাই তাহাদের উল্টা প্রতিকৃতিই আমাদের চক্ষের অভ্যন্তরস্থ ঐ রেটিনার উপর পড়ে। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক, বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে ঐ জিনিষটি প্রকৃত প্রস্তাবে কিরূপ। পূর্ব্বোক্ত যে কারণে ছিদ্রটি বড় দেখায় সেই কারণেই চক্ষুর পাতার রোমও বড় দেখায়। চক্ষুর পাতার রোমগুলি ছিদ্র ও চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী থাকা হেতু উপর পাতার রোমগুলিই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়।

উপরে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহা অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে। ইহা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে শরীর ও পদার্থ সম্বন্ধীয় কয়েকটি পুস্তক অধ্যয়ন করা আবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে ২টি পুস্তকের নাম করা গেল :—

Halliburton's Physiology.
Glazebrook's (Heat and) Light.

ইচ্ছা করিলে আরও বড় বড় পুস্তক দেখিতে পারেন।

প

মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রে "মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ৮৪০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে 'শ্রী শরৎচন্দ্র সান্যাল এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র মধ্য-প্রদেশে চীফ কমিশনার কর্ত্তৃক জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ শেষোক্ত মুন্সেফ মহাশয়ের এ প্রদেশে আসা ঘটে নাই।' একথা কিন্তু সত্য নহে। ভূদেব-বাবুর উক্ত পুত্রের নাম ৺ শ্রী গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়। আমি তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ৺ শ্রী মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র। আমি জানি যে তিনি প্রথমে মুন্সেফ ও পরে মধ্য-প্রদেশে জজ হইয়াছিলেন, তবে অকালে দেহত্যাগ করার জন্য সাধারণে তাঁহার নাম প্রচারিত হয় নাই। এডুকেশন গেজেট অফিস হইতে ১৩১৮ সালের প্রকাশিত "সংক্ষিপ্ত ভূদেব-জীবনী" গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় আছে যে গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রথমে বাঙ্গালা দেশে মুন্সেফ ও পরে মধ্যপ্রদেশে সিভিল্‌জজ ছিলেন। সম্প্রতি ভূদেব-বাবুর একটি বড় জীবনচরিত প্রকাশিত হইতেছে, তাহা হইতে গোবিন্দবাবু সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইবে।

শ্রী অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহালার পল্লীসংস্কার-সমস্যা

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে শ্রী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'পল্লী-সংস্কার-সমস্যা' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা'তে বেহালা গ্রামের সম্বন্ধে যে-সকল কথার অবতারণা করেছেন তা' সকল জায়গায় ঠিক নয়। প্রথমে বলে' রাখা দরকার—'সারস্বত সমিতি'র সভ্যগণ যে তাঁর প্রবন্ধের প্রতিবাদ কর্‌বার ভার আমার উপর দিয়েছেন তা'র উদ্দেশ্য 'বেহালা' গ্রামের স্বরূপকে ঢাক্‌বার জন্য নয়—নগেন-বাবুর প্রবন্ধে যা' অতিরঞ্জিত তারই প্রতিবাদের জন্য। 'সারস্বত-সমিতি'র সভ্যগণ প্রায় সকলেই ছাত্র—আর এঁদের অধিকাংশই গ্রামের কাজের জন্য নগেন-বাবুকে সাহায্য করেছেন। এ-সকল সত্ত্বেও নগেন-বাবুর village organisation scheme কেন সফল হ'ল না সে কথা পরে আলোচনা করলেই চলবে।

নগেন বাবু লিখেছেন,—"গ্রামের কয়েকজন মিলে বছর খানেক হ'ল একটি পাঠশালা খুলেছে—তারই একজন মৌলভী প্রায়ই আমার কাছে যাতায়াত করেন। একদিন তাঁর সম্মুখে জলপান ক'রে পিপাসা মিটিয়েছিলাম এই অপরাধে তিন দিনের মধ্যে ঝি-চাকর বিদায় নিলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, গাঁয়ের সাত্ত্বিক হিন্দুরা চোখ রাঙিয়ে ঝি-চাকরদের জাতরক্ষা করেছেন।" জাতরক্ষার ভয়টা যে "সাত্ত্বিক" ব্রাহ্মণদের চেয়ে ঝি-চাকরদের মধ্যেই আজকাল বেশী—সে কথা বোধহয় নগেন-বাবুর জানা নেই। আমরা অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি নগেন-বাবু মুর্গী, মুর্গীর ডিম প্রভৃতি ভোজন করেন,—জান্‌তে পেরে ঝি-চাকরেরা পলায়ন করে। তার মধ্যে গ্রামের সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণদের কোনও হাত ছিল না।

নগেন-বাবুর দ্বিতীয় কথা—"পল্লীসংস্কারের পত্তন কর্‌বার উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে গিয়ে যে উপদেশ লাভ করলাম তাতে বোঝা গেল পল্লীসমাজের ঐক্যসূত্রগুলি ছিন্ন হয়ে গেছে। কি ভাবে কাজে হাত দিলে পল্লীসমাজটাকে পুনরায় গড়ে' তোলা যাবে এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চল্‌ছে—একদিন হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার 'প্রধান ভক্ত' আমাকে ডেকে বল্‌লেন, 'যা—ই করুন, মশায়, ব্রাহ্মণধর্ম্ম বজায় রেখে করবেন। এ গ্রাম হচ্ছে ব্রাহ্মণপ্রধান, এখানে অনাচার চল্‌বে না।'" এ কথায় 'প্রধান ভক্ত' মহাশয় বোধ হয় কোনওরূপ অসদ্ভাব প্রদর্শন করেননি—তাঁর কাছে যা সত্য তাই তিনি প্রকাশ করেছেন মাত্র। পল্লীসমাজের ঐক্যসূত্রগুলি যে ছিন্ন হয়ে গেছে' এটা ত জানা কথা—সে ত গবে-

গণার দ্বারা জানতে হয় না। পল্লীর ঐক্যসূত্র ছিন্ন হয়েছে বলেই ত' পল্লীর সংস্কার আবশ্যক হয়েছে। নগেন-বাবু বোধ হয় এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখবার উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি যে পল্লীর লোকেরা আজ অনেক দুঃখে পড়ে' 'নেতা'দের উপরও আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। গ্রামের লোকেরা সহরে লোকদের প্রতি বড় সন্দিহান। নগেন-বাবুকে যে বেহালা গ্রামের লোকেরা নেতার আসনে বসায়নি—তাতে হয়ত তারা দোষ করে' নগেন-বাবুর কোপানলে পড়েছে—কিন্তু তারা ভুল করেনি। নগেন-বাবু তাঁর 'কর্ম্মীসঙ্ঘে'র মধ্যে কি কি হতে দেবেন না তাই বল্‌লেন—কিন্তু বেহালাকে হঠাৎ স্বর্গ করতে হলে কি দরকার তার সম্বন্ধে কোনও কথাই বল্লেন না, সেইজন্যই 'প্রধান ভক্ত' মহাশয় তাঁকে ঐ কথা বলেছিলেন বলে' আমরা জানি।

"কিছুদিন পরে ছেলেদের মুখে শুন্‌লাম,...... এসব কাজের মতলব হচ্ছে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, এর মধ্যে স্বদেশপ্রীতি বা হিতৈষণা লেশমাত্র নেই।" যে সব 'ছেলেরা' নগেন-বাবুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাদের দু'একজন ছাড়া সকলেই প্রায় সারস্বত সমিতির সভ্য।—তারা যে কোনও-দিন নগেন-বাবুর নিকট তাদের গ্রামবাসীর সম্বন্ধে একথা বলেনি তা' আমরা জোর করেই বল্‌তে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-বিদ্বেষী লোক অন্যগ্রামে হয়ত অনেক থাকতে পারেন কিন্তু বেহালায় যে নেই তা' আমরা বিশেষ ভাবেই জানি। উদাহরণ স্বরূপ দেখাতে পারা যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পরিচালিত "বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজ।" এখানকার ব্রাহ্মণ প্রতিবাসীরা ব্রাহ্মসমাজটিকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখ্‌বার পরও সমাজটি কেমন করে' টিকে আছে—তাও ভেবে দেখ্‌বার বিষয়। আমরা জানি ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তা ও হরিসভার কর্ত্তাদের মধ্যে বিশেষ প্রীতি সখ্য ও মেলামেশা আছে।

শ্রী মোহিতমোহন মুখোপাধ্যায়

অঙ্ক কষিবার সহজ প্রণালী

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদাস বৈষ্ণব গোস্বামী যে-সব অঙ্ক কষিবার সহজ প্রণালী নিজে উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নূতন নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য লিখিত সাতটি সুদীর্ঘ আলোচনা আমরা পাইয়াছি। এক বিষয়ে এত লেখা ছাপিবার স্থান আমাদের না থাকাতে আমরা দুঃখের সহিত আলোচনার সারকথা মাত্র উল্লেখ করিতেছি। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত বি-এ, সৈয়েদ মর্ত্তুজা আলী, প্রভাসচন্দ্র গোস্বামী, অমৃতরঞ্জন পালিত ও সুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, এবং পাঁচুগোপাল দাস প্রভৃতি দেখাইয়াছেন যে—'শিক্ষক', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রে পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে; সাধারণ পাটীগণিত ও বীজগণিতে ঐ সব অঙ্ক কষিবার নিয়ম আছে; বীজগণিতের Binomial Theorem, Expansion ইত্যাদি নিয়মের সাহায্যে কষা যায়; ইত্যাদি।

প্রবাসীর সম্পাদক

গ্রহগণের নামানুসারে বার

গত কার্ত্তিকের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাঁ মহাশয় গ্রহগণের নামানুসারে বার সন্নিবেশ প্রসঙ্গে "হোরার" সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কিরূপ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে ত প্রত্যেক রাশিই দুই দুই হোরায় বিভক্ত। এইরূপ দ্বাদশটি রাশি চব্বিশটি হোরায় বিভক্ত। আবার এইসকল হোরার অধিপতি কেবল সূর্য্য ও চন্দ্র, অন্য কোন গ্রহ নহে। রবির পর সোম, সোমের পর মঙ্গল, এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ এইরূপঃ— জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে সপ্ত গ্রহের মধ্যে সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি পুরুষ-গ্রহ; এবং চন্দ্র, বুধ ও শুক্র স্ত্রী-গ্রহ। পুরুষ-প্রকৃতি-পরম্পরা অনুসারে স্থাপন করিলে রবির পর সোম, সোমের পর মঙ্গল এইরূপ পরপর সন্নিবিষ্ট হয়। এইখানে কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, রবির পর সোম না হইয়া বুধ হইল না কেন? তাহার উত্তর—পুরুষ-গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য পৃথিবীর নিকটে, তার পর মঙ্গল, তার পর বৃহস্পতি, পরে শনি; এইরূপ স্ত্রী-গ্রহের মধ্যে চন্দ্রই পৃথিবীর নিকট, তারপর বুধ, তারপর শুক্র। সেইজন্যই রবির পর সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র ও শনি এইরূপ পরপর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর এই গ্রহগণের নামানুসারেই সাতটি বারের নাম ঐরূপ পর পর পঠিত হইয়া থাকে।

শ্রী সুধাংশুভূষণ পুরকাইত

কান্তকবির জন্মতারিখ

কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস কবি রজনীকান্তের জন্মতারিখ সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত কয়টি প্রমাণে সহজে নিরাকৃত হইবে।

"প্রতিভায়" প্রকাশিত রজনীকান্তের আত্মজীবনীতে উক্ত আছে যে, বাঙ্গালা ১২৭২ সালের ১৭ শ্রাবণ, বুধবার, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে রজনীকান্তের জন্ম হয়। কিন্তু উক্ত ১৭ই শ্রাবণ সোমবার এবং স্বাতী নক্ষত্র ছিল; সুতরাং এই তারিখ যে ভুল তাহাতে সন্দেহ নাই। রজনীকান্ত হাসপাতালে থাকিয়া, স্মরণশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তারিখের ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু লোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে, জন্মবার ও নক্ষত্রের ভুল হওয়া সম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের উল্লিখিত তারিখ ১২ই শ্রাবণ ঠিক; উক্তদিবস বুধবার এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ছিল।

কয়েকমাস পূর্ব্বের "প্রবাসীতে" স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ সম্বন্ধে তাঁহার মাতুল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালের ২৯শে মাঘ শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ২৯শে মাঘ শুক্রবার ছিল। এক্ষণে কোনটা ঠিক তারিখ, ২৯শে না ৩০শে? আশা করি তিনি এ বিষয়ে আমার ও অন্য সকলের সন্দেহ দূর করিবেন।

শ্রী ফকিরচন্দ্র দত্ত

ফুলের ভূষণ

প্রবাসীর ৮৫৮ পৃষ্ঠায় কুসুম-শিল্পের কথা পড়িয়া অতীতের গৌরবে বাঙ্গালী মাত্রেই উৎফুল্ল হইবেন। কিন্তু সে শিল্প লোপ পাইয়াছে শুনিলে এবং তাহা প্রবাসীর মত বহুলপ্রচার পত্রে অপ্রতিবাদে ছাপা থাকিলে এদেশের কয়েকটি শিল্পীর—যদিও তাঁরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়—প্রতি বড় অবিচার করা হইবে। বালুচর ইছাগঞ্জ জাজরাগঞ্জ প্রভৃতি মুর্শিদাবাদের কয়েকটি পল্লীতে হিন্দু মুসলমান কুসুম-শিল্পী এখনও বর্ত্তমান আছেন। প্রত্যহই তাঁরা কিছু না কিছু শিল্পকার্য্য করেন। তবে তেমন সৌখীন লোক বা উৎসাহদাতা কেহ নাই। কয়েকটি জৈন ও মুসলমান যুবক এবং ঠাকুরবাড়ীর সেবাইৎ কয়েকজনের নিকট তাঁরা সময়-মত কিছু কিছু পান মাত্র। বৈশাখী পূর্ণিমায় বালুচরে ফুলদোলের খুব ধুম হয়। সে সময় ঐসব শিল্পীদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু তাঁহারা বিগ্রহের যে ফুলের সাজ দেন তাহা অতুলনীয়। সেই-সব বিগ্রহের চূড়া বাঁশী হইতে বস্ত্র উত্তরীয় কঞ্চুক, ফুলের ঘর,

ফুলের মশারি প্রভৃতি দেহ ও গৃহসজ্জার জিনিষ এমন কৌশলে নানাজাতীয় ফুলে নির্ম্মিত হয় যে নূতন দর্শক অনেক সময় তাহার উপাদান স্থির করিতে পারেন না। সেরূপ ফুলের সাজ ঝুলন পর্য্যন্ত তৈয়ারী হয়; পরে ফুলের অভাবে বড় একটা দেখা যায় না। কোন কোন সৌখীন যুবককে প্রত্যহই ফুলের রুমাল, ফুলের কোঁচান চাদর ব্যবহার করিতে দেখি। বর্ষায় যখন প্রচুর ফুল পাওয়া যায় তখন ।৵৹ মাত্র মজুরিতে সে-সব তৈয়ারী হয়। এইজন্য শিল্প লোপ পাওয়া বলা যায় না। যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন শিল্পীদের নাম ধাম সব দিতে পারি।

খাগড়া পোষ্ট অফিস, বহরমপুর,
জেলা মুর্শিদাবাদ।

শ্রী গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র.

লিঙ্গপুরাণে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

পুরাণ বলিতে উপপুরাণ বুঝায় না; সাবধানের জন্য "প্রাচীন পুরাণ ও স্মৃতির" কথা লিখিয়াছি। আঠারখানি পুরাণের নাম করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ কল্কিপুরাণের মত লিঙ্গপুরাণ যে উপপুরাণ ও অর্ব্বাচীন, তাহা অনেকেই জানেন। কল্কিপুরাণে এ কথাও আছে যে, "লণ্ডনের ইংরেজেরা" ভারতের অধীশ্বর হইবেন। কয়েকখানি অর্ব্বাচীন শাস্ত্রে আছে যে, রাবণ-বধের জন্য রাম দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন; অবশ্য রামায়ণে ইহা নাই। এ দৃষ্টান্তে আমার মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধেও তর্ক উঠিতে পারিত।

শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার

আফগান-আমীরের গোহত্যা নিষেধ

কার্ত্তিকের প্রবাসীতে ঢাকা-প্রকাশ হইতে উদ্ধৃত 'আমীরের ঘোষণা' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিত আছে—"গোহত্যা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল, কেহ মৃত গোরুর মাংসও আহার করিতে পারিবে না।" "মৃত গোরুর মাংস!" এর অর্থ কিছু বুঝিলাম না। মুসলমান, সে যে-দেশবাসী হউক, কখন কোন অবস্থাতে মরা গরুর মাংস খায় না; মরা বলিতে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝে সেইরূপ অবস্থায় মুসলমান-রুচি ও শাস্ত্রানুসারে মৎস্য ও টিড্ডি নামক পতঙ্গ ভিন্ন যাবতীয় মরা জীবের মাংস হারাম! সুতরাং উক্ত বাণী যে আমীরের ইহাতে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

আমজাদ

ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচনার কালে আর্য্যগণের সমুদ্র, বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা নদী সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল কি না

অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "বগধ জাতি" নামক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন—

"ঋগ্বেদের প্রথমদিকের মণ্ডল কয়টির মন্ত্র ঈরিত হইবার সময় পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্যগণ বাস করিতেন; সমুদ্রের কথা তখন তাঁহারা জানিতেন না। কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী মণ্ডলের মন্ত্রসকল যখন উদ্গীত হয়, তখন তাঁহারা সমুদ্র জানিতেন, বিন্ধ্যপর্ব্বত জানিতেন, নর্ম্মদা নদীও জানিতেন। জানিবার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহারা তখন এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন।" ৪৮ পৃঃ)

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিয়াছেন যে ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনার কালে আর্য্যগণ সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ বা আধুনিক পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। ওয়েবার (Weber) তাঁহার History of Indian Literature নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"In the more ancient parts of the Rigveda-Samhita, we find the Indian race settled on the north-western borders of India, in the Punjab, and even beyond the Punjab, on the Kubha in Kabul. The gradual spread of the race from these seats towards the east, beyond the Sarasvati and over Hindustan as far as the Ganges, can be traced in the later portions of the Vedic writings almost step by step." (Pp. 3 and 4). অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল্ (Macdonell) তাঁহার "History of Sanskrit Literature" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"There are indications showing that by the end at least of the Rigvedic period some of the Aryan invaders had passed beyond this region (i. e., the most easterly limit of the Indus river-system), and had reached the western limit of the Gangetic river-system. For the Yamuna, the most westerly tributary of the Ganges in the north, is mentioned in three passages, two of which prove that the Aryan settlements already extended to its banks. The Ganges itself is already known, for its name is mentioned directly in one passage of the *Rigveda* and indirectly in another......The southward migration of the Aryan invaders does not appear to have extended at the time when the hymns of the *Rigveda* were composed, much beyond the point where the united waters of the Panjab flow into the Indus. The ocean was probably known only from hearsay." (Pp 142-143.)

বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"ঋগ্বেদের প্রথমদিকের মণ্ডল কয়টির মন্ত্র ঈরিত হইবার সময় পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্যগণ বাস করিতেন; সমুদ্রের কথা তখন তাঁহারা জানিতেন না।" এই উক্তিটি বোধ হয় তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। কেননা ঋগ্বেদের প্রথমদিকের কয়েকটি মণ্ডলে সমুদ্রের উল্লেখ দেখা যায়। বরুণ সমুদ্রে নৌকার পথ জানিতেন (বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ, ১।২৫।৭); ধনলুব্ধ লোকের সমুদ্রে নৌকা প্রেরণের উল্লেখ আছে (১।৪৮।৩); ধনার্থী বণিকেরা সকল দিক্ সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকিতেন (১।৫৬।২); জলরাশি সমুদ্র অভিমুখে গমন করিত (২।১৯।২); অহিহন্তা ইন্দ্র জলপ্রবাহকে সমুদ্রমুখে প্রেরণ করিতেন (২।১৯।৩); সমুদ্রসঙ্গমাভিলাষী নদীগণ সমুদ্রকে পূর্ণ করে (সমুদ্রেণ সিন্ধবো যাদমানা ইত্যাদি, ৩।৩৬।৭)। বিপাশ্ ও শুতুদ্রী নদীদ্বয় রথীদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রের অভিমুখে গমন করিতেছে (সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ, ৩।৩৩।২); বণিক্‌গণ সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে সমুদ্রকে স্তুতি করিতেন (৪।৫৫।৬); বায়ু বন ও সমুদ্র কম্পিত হইয়া থাকে (যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি, ৫।৭৮।৮); বরুণের প্রজ্ঞাবশতঃ শুভ্রবারিমোক্ষণকারী নদীসমূহ বারি দ্বারা একমাত্র সমুদ্রকে পূরণ করিতে পারে না (একং যদুদ্না ন পৃনন্ত্যেনী রাসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রম্, ৫।৮৫।৬); যদু ও তুর্বশ সমুদ্রপারে গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। (প্র যৎ

সমুদ্রমতি শূর পর্ষি পারয়া তুর্বশং যদুং স্বস্তি, ৬।২০।১২) ; ইন্দ্র বারিরাশিকে সমুদ্রে পতিত হইবার নিমিত্ত বিমুক্ত করিয়াছেন (অবাসৃজো অপো অচ্ছা সমুদ্রম্, ৬।১৭।১৪) ; অশ্বিদ্বয় তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে জলের উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের জল হইতে বাহির করিয়াছিলেন (তা ভুজ্যুং বিভি রদ্ভ্যঃ সমুদ্রাত্তুগ্রস্য সূনুম্, ৬।৬২।৬) ; বশিষ্ঠ বরুণের সহিত সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন (আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্, ৭।৮৮।৩)। ঋগ্বেদের প্রথমদিকের কয়েকটি মণ্ডল হইতে আমরা যদৃচ্ছাক্রমে সমুদ্রের উল্লেখযুক্ত কতিপয় মন্ত্র বা তাহাদের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আরও বহু মন্ত্রে সমুদ্রের উল্লেখ আছে। এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, আর্য্যগণ ঋগ্বেদের প্রথমদিকের কয়টি মণ্ডলের মন্ত্র রচনার সময়ে "সমুদ্রের কথা জানিতেন না" বলা নিতান্ত দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া এবং অন্ধভাবে কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতানুবর্ত্তন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই উক্তিতে তত বিস্মিত হই নাই। কেননা ইহা সাধারণ ভ্রম। তিনি লিখিয়াছেন, "ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী মণ্ডলের মন্ত্রসকল যখন উদ্গীত হয়, তখন তাঁহারা সমুদ্র তো জানিতেনই, অধিকন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বত জানিতেন, নর্ম্মদানদীও জানিতেন।" তাঁহার এই শেষোক্ত বাক্যই অতিশয় বিস্ময়জনক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের প্রথমদিকের বা শেষদিকের কোনও মণ্ডলে বিন্ধ্যপর্ব্বত বা নর্ম্মদা নদীর উল্লেখ দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। আমিও যৎসামান্য যাহা গবেষণা করিয়াছি, তাহাতে উক্ত পর্ব্বত বা নদীর কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু ঋগ্বেদ সমুদ্রবিশেষ। যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বা অপরের চক্ষে পড়ে নাই, সম্ভবতঃ তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চক্ষে পড়িয়াছে। কোন কোন্ মণ্ডলের কোন্ কোন্ সূক্তে ইহাদের উল্লেখ আছে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলে বেদপাঠক ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই একান্ত বাধিত হইবেন। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মত এই যে ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচনার কালে দক্ষিণাপথের সহিত আর্য্যগণের পরিচয় ছিল না।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাস

রাসায়নিক গবেষণা

প্রবাসীর উপর্য্যুপরি দুই সংখ্যায় প্রকাশিত রাসায়নিক গবেষকের তালিকা এবং তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর পড়িয়া স্বতঃই মনে হয় যে প্রবাসীর সম্পাদক গবেষণার মূল্য যে মাপকাটী দিয়া ঠিক করিতে চাহিয়াছেন তাহা বাহ্যতঃ সন্তোষজনক মনে হইলেও নিঃসঙ্কোচে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

গবেষণার সংখ্যাধিক্যই যে গবেষকের কৃতিত্বের একমাত্র পরিচায়ক এ মত যাঁহারা রসায়নিক গবেষণার সহিত সামান্য ভাবেও সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারা সহজে গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। রাসায়নিক গবেষণাসমূহ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—প্রথম শ্রেণীর গবেষণা স্বল্পায়তন হইলেও গবেষণার মূল্য অনুসারে মূল্যবান্ বিবেচিত হইতে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণীর গবেষণা কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা (exhaustive treatment) হিসাবে, মুখ্যতঃ আয়তন অনুসারে বৈজ্ঞানিক জগতে আদৃত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ডাঃ রসিকলাল দত্ত মহাশয় halogenation সম্বন্ধে যত মৌলিক গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ অতি অল্পসংখ্যক গবেষকই সেরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের খ্যাতির কারণ মুখ্যতঃ ইহাই। পরন্তু ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গবেষণা পরিমাণে খুব বেশী না হইলেও গবেষণার অন্তর্নিহিত মূল্যের জন্য আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

প্রবাসীর তালিকায় প্রদত্ত কোনো কোনো গবেষকের গবেষণা বা কেমিক্যাল সোসাইটী জার্নালের পরিশিষ্টে প্রদত্ত গবেষণার সারাংশ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সব প্রবন্ধগুলিরই যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হিসাবে মূল্য খুব অধিক এমন নহে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি অনভিজ্ঞ লোক বলিয়া বসে যে শুধু প্রবন্ধের সংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তবে নিন্দুকের অপরাধ একেবারে অমার্জ্জনীয় বলিয়া বোধ না হইতেও পারে। ফলতঃ গবেষণার কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানের সময় সম্পাদকের শুধু পরিমাণের উপর নির্ভর করা সমুচিত হয় নাই—প্রবন্ধের উৎকর্ষানুৎকর্ষের বিষয় আলোচনা করাও উচিত ছিল। আবার শুধু প্রবন্ধের পরিমাণই গবেষকের একনিষ্ঠতার পরিচায়ক এমন নহে—অনেক প্রবন্ধের বিষয় সংগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ বৎসর বা তদিতিরিক্ত সময় লাগিয়া যাইতে পারে।

গবেষকের তালিকায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম না দেখিয়া প্রথমতঃ অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত এবং কেহ কেহ দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার নাম যেরূপ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার কৃতিত্বের প্রতি সম্যক সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গত আগষ্ট মাসের ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত Ionic Adsorption সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, গবেষণা হিসাবে তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক এবং তুলনামূলক সমালোচনার অপরাধে অপরাধী না হইয়াও নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে প্রবাসীতে প্রকাশিত তালিকার যে-কোনো প্রবন্ধ অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ এসম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় শীঘ্রই যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন তাহা হইতে দেখিতে পাইবেন যে Soil Chemistry বিষয়ক অনেক দুরূহ তথ্য তাঁহার থিওরী অতি সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় সম্প্রতি এবিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে।

গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার বিষয় সম্পাদক যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্বারা গবেষণার মূল্য কমে বলিয়া মনে হয় না, বরং গবেষণা যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে ইহা দ্বারা গবেষণার উৎকর্ষই প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ সম্পাদক মহাশয় ঘোষ মহাশয়ের থিওরীর বিপক্ষে আর্হেনিয়াস্, পার্টিংটন, কেণ্ডাল প্রভৃতি গবেষকগণ যে আপত্তি তুলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই কথাটা লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সকলেই যে সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ঘোষ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়াছেন এমন নহে। অবশ্য আর্হেনিয়াস Ionic Theoryর জন্মিতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাঁহার মত সকলকেই সশ্রদ্ধভাবে শুনিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার উপপত্তির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পরন্তু আমেরিক্যান্ কেমিক্যাল সোসাইটী জার্নালের এপ্রিল সংখ্যায় কেণ্ডাল যে প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শুধু লেখকের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে কেণ্ডালের বিশেষত্ব এই যে কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি ওয়াশ্‌বার্নের সঙ্গে যে মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতেও তিনি বিপক্ষের উদ্দেশে অনাবশ্যকভাবে চোখা চোখা বাণ প্রয়োগ করিতে ছাড়েন নাই। উপসংহারে বক্তব্য এই যে প্রবাসীর সুপণ্ডিত প্রবীণ সম্পাদক যদি শুধু গবেষণার সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মৌলিকতার বিচারে প্রবৃত্ত হ'ন তবে সাধারণ লোকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণের সহায়তা করা হইবে।

শ্রী সুবোধকুমার মজুমদার

সম্পাদকের মন্তব্য। লেখকের চিঠি পড়িয়া দুঃখিত হইয়াছি। গবেষণার মূল্য কোনও প্রকার মাপকাটি দিয়া নির্দ্ধারণ করিতে আমি চাই নাই। লেখক আমার ঘাড়ে একটা মত চাপাইয়া বৃথা কলহের সূত্রপাত করিয়াছেন। ভিক্টর হিউগো, কিম্বা শেক্সপীয়ার কিম্বা আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকে বহুসংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকল সংখ্যাধিক্যবশতঃ মূল্যহীন নহে। তাঁহারা সংখ্যা বাড়াইবার জন্যই এত বহি প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ কথা যদি লেখক বলিতে চান, বলিবেন। পক্ষান্তরে, তাঁহাদের চেয়েও বেশী বহি লিখিয়াছেন, এমন লেখকও আছেন, যাঁহাদের লেখার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। সংখ্যা সংখ্যাই; তাহাতে গ্রন্থের বা গবেষণার মূল্যাধিক্য বা মূল্যের অল্পতা কিছুই সূচিত হয় না। কয়েকদিন পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক সভায় বলিয়াছিলেন, যে, গত পাঁচ বৎসরে এক শতের উপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গবেষণা হইয়াছে। এই সংখ্যাটি বেশী বলিয়াই গবেষণাগুলি মূল্যহীন, কিম্বা তিনি সংখ্যা বাড়াইবার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠানের কার্য্যবিবরণে (Transactionsএ) এত প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন, এরূপ বলিবার বা ইঙ্গিত করিবার মত, কিম্বা অন্য কাহারও সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার মত, ধৃষ্টতা বা অভদ্রতা আমার নাই। সংক্ষেপতঃ আমি আবার ইহাই বলিতে চাই, যে, সংখ্যা কেবল সংখ্যা; তাহার বেশী কিছু আমার বক্তব্য নহে। যাঁহার গবেষণার সংখ্যা বেশী, তাঁহার গবেষণার গুরুত্ব বেশী হইতে পারে, কমও হইতে পারে; আবার, যাঁহার গবেষণার সংখ্যা কম, তাঁহারও গবেষণার মূল্য কম বা বেশী হইতে পারে। গ্রন্থ বা গবেষণা বা প্রবন্ধের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয়েও প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এমন কোন নৈতিক বা অন্যবিধ বাধ্যতা আছে বলিয়া আমি অবগত নহি। কেবল মাত্র সংখ্যা নির্দ্দেশ অনেক হইয়া থাকে।

আমার কি করা উচিত বা অনুচিত ছিল, তদ্বিষয়ে লেখকের উপদেশ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। কোন কোন গবেষকের প্রতি আমি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করি নাই বলা হইয়াছে। লেখকের জানা উচিত যে, তাঁহার উল্লিখিত প্রত্যেক গবেষকের এবং অন্যান্য গবেষকের গবেষণা সম্বন্ধে আমার বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে যত কথা যত আগে বাহির হইয়াছে, ভারতবর্ষের অন্য কোন কাগজে তাহা হয় নাই। এই কারণে অনেকে আমাকে বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞাপন-দাতা বলিয়া সন্দেহ করেন। এক্ষণে শুনিতে হইতেছে, যে, আমি কাহারো কাহারো প্রতি "সম্মান" প্রদর্শন করি নাই। বাঁচিয়া থাকিলে আরো নূতন কিছু শুনিতে হইবে।

গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ বিষয়ে আমার মন্তব্য সাধারণ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, লেখক এবিষয়ে বিশেষ বিশেষ যে-সব কথা লিখিয়াছেন, আমি রাসায়নিক নহি বলিয়া তাহা জানিতাম না; সুতরাং আমি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখি নাই। এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করিলাম।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আত্ম-পর

সারা সকালটা খেটেখুটে দুপুর বেলায় দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডায় একটা বিছানা পেতে একটু আরাম কর্‌ছি! তন্দ্রাটি যেই এসেছে—অমনি মুখের উপর থপ্‌ করে' কি একটা পড়্‌ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একটা কদাকার কুৎসিত পাখীর ছানা। লোম নেই—ডানা নেই—কিম্ভুতকিমাকার। রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা কর্‌ছিল—টপ্‌ করে' মুখে করে' নিয়ে গেল। শালিক-পাখীদের আর্ত্তরব শোনা যেতে লাগ্‌ল। আমি এপাশ-ওপাশ করে' আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * * *

* * * *

তারপর চার পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। আমাদের বাড়ীতে হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র ছেলে শচীন সর্পাঘাতে মারা গেল! ডাক্তার—কব্‌রেজ—ওঝা—বদ্যি—কেউ তাকে বাঁচাতে পার্‌লে না। বাছা আমার জন্মের মত ছেড়ে গেল।

বাড়ীতে কান্নার তুমুল হাহাকার—আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিত—অজ্ঞান। বাইরে এসে দেখি বাছাকে আমার নিয়ে যাচ্ছে।

তখন বহুদিন পরে—কেন জানি না—সেই পাখীর ছানাটার কথা মনে পড়ে' গেল।

সেই চার পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখীর ছানাটি—আর তার চারিদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত্ত হাহাকার!

হঠাৎ যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠ্‌লাম।

"বনফুল"

রমলা

(২৩)

ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। মাঘের শেষে শীত যাই-যাই করিয়াও যাইতেছে না। দক্ষিণ-বাতাস বহিতেছে বলিয়া সহরে ধোঁয়া জমে নাই। ঘরের মধ্যে ঝোলান বেতের দোল্‌নায় খোকা ঘুমাইতেছিল, ললিত দোল্‌নার পাশে নত হইয়া ঘুমন্ত শিশুর নবনীকোমল গণ্ডে চুপে চুপে চুমো খাইতেছিল আর আনন্দমুগ্ধ নয়নে এই ক্ষুদ্র মানবশিশুর নিদ্রার ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ইহার ঘুম ভাঙাইয়া ইহাকে খানিকক্ষণ চটকায় হাসায় নাচায় দোলায় কোলে তুলিয়া সমস্ত ঘরে ঘোরে—ইহার তুল্‌তুলে গা, টুক্‌টুকে হাত-পা, রেশমের মত চুল, ননীর মত গাল, ফুলের আধ-ফোটা কুঁড়ির মত ছোট চোখ—এই একরত্তি খোকা যেন বিশ্বের সমস্ত আনন্দ সৌন্দর্য্য চুরি করিয়া আপন বুকে রাখিয়াছে, সেই গুপ্তভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে ললিতের লোভ হইতেছিল। ইহার একটুকু হাসির প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে এ বাড়ীর প্রত্যেকে আপনাকে ধন্য মনে করে, ইহার একটু কান্না উঠিলে গোপাল হইতে মামাবাবু পর্য্যন্ত সবাই হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বাড়ীর সবাইয়ের উপর এই ক্ষুদে রাজাটির কর্ত্তৃত্ব অসীম। ললিত খোকাকে আদর করিয়া পদ্মের পাপ্‌ড়ীর মত আঙুলগুলিতে চুমো খাইতেছিল।

রমলা তখন সিঁড়ির পাশের ছোটঘরে তোলা উনানে রাঁধিতেছিল। ওই ব্যবস্থাটা মামাবাবু জোর করিয়া করাইয়াছেন। একসঙ্গে মাতা ও রাঁধুনীর সব কর্ত্তব্য সম্পাদন করা যে বড় শক্ত, তাহা নানা যুক্তি দিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া তিনি একটি ঝি রাখিয়া দিয়াছিলেন। আর রমলার সিঁড়ি-ওঠানামা বন্ধ করিবার জন্য তিনি তাঁহার রাসায়নিক সরঞ্জাম লইয়া একতলায় আশ্রয় লইয়া রমলাকে এই ছোটঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

উনানে খোকার জন্য দুধ গরম করিতে বসাইয়া রমলা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ললিতের আদরের অত্যাচার দেখিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—দেখ, জাগালে কিন্তু তোমায় ঘুম পাড়াতে হবে, আমি পার্‌ব না। কাঁদ্‌লে জানিনে কিন্তু।

—বেশ, বেশ, আমি কি ডরাই কভু খোকার কান্নারে! খোকা-রাজার বেশভূষার তালিকাটা তৈরী হয়েছে কি?

—না।

- বেশ!

—বেশ কি, আমার সময় কখন?

—না, সময় ত নেই, তবু রজত বাড়ী থাকে না।

কথাবার্ত্তার শব্দে খোকা জাগিয়া উঠিয়াছিল। দোল্‌না হইতে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ললিত বলিল,—রাজা, মায়ের কি শাস্তি হবে বল ত?

খোকা মিটিমিটি চোখে চাহিল, মাকে দেখিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তুমি একটু রাখ, আমি দুধটা নিয়ে আসি,—বলিয়া রমলা ঘর হইতে স্নেহমণ্ডিতমুখে বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে ফিডিং-বোতল লইয়া রমলা ঘরে ঢুকিতে ললিত খোকাকে দোলায় শোয়াইয়া দিল ও দুধ খাওয়াইতে সুরু করিল। দোল্‌নাটা মৃদু দোলা দিতে দিতে ললিত বলিল,—কৈ রজত এখনও ফিরে এল না?

হাতের সোনার রিষ্ট্‌-ওয়াচের দিকে সে একবার চাহিল।

—কি জানি। বলে' গেলেন শরীরটা ভাল নেই, সকাল-সকাল আস্‌বেন।

—হাঁ রজত কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে, কেন বল ত?

—সইবে কেন আফিসের কাজ। এতদিন আদরে আব্‌দারে মানুষ। আফিসের বড়সাহেব ত আর মামা নন।—তা আজই বোধ হয় শেষ করে' আস্‌বেন।

—শেষ কি?

—এই তিনমাস হয়নি, এরি মধ্যে পাঁচবার আফিসে ঝগড়া হয়ে গেল। কাল নাকি বড়বাবুর সঙ্গে খুব কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, আজ resign করে আস্‌বেন বলেছেন।

- বেশ, বেশ, ও কি কেরাণী হতে পারে, বল্লুম,

ভাল portrait আঁক্‌তে শেখ, ছবি এঁকে হাতটা দুরস্ত কর, ওর ত সাধনা দর্‌কার।

—হাঁ, মামাবাবুও ত তাই বলেন, আজ খুব বকুনি দিয়েছেন। বলিয়া রমলা নিজেই মধুরহাস্যে ঘর ভরিয়া তুলিয়া খোকার মুখে একটি মিষ্টি চুম্বন দিল।

রজত যে টাকার জন্য চাকরী লইয়াছিল, তাহা নহে, কেননা মাহিনা খুব বেশী ছিল না। বাড়ীতে একটানা বসিয়া থাকিয়া এই অলসতায় সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আগে প্রায়ই রমলাকে লইয়া ষ্টিমারে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িত, কিন্তু এই শিশু জন্মাইবার পর তাহা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া রমলাও যেন কিরূপ বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে খোকার উপর রজতের হিংসা হইত, সে-ই রমণীর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। রমলা শুধু মামাবাবুর সঙ্গে নয়, তাহার সঙ্গেও এরূপ ব্যবহার করিত, যেন সে বড়খোকা। খোকাকে দুধ খাওয়ান, ঘুমপাড়ানো, তাহার কাঁথা-জামা তৈরী করা, ময়লা জামা, কাঁথা, বালিসের ওয়াড় ইত্যাদি কাচা, শুকাইতে দেওয়া, সাজাইয়া তোলা, ইত্যাদি খুঁটিনাটি কাজে রমলা সমস্ত দিনই ব্যাপৃতা, রজতের প্রতি মনোযোগ দিবার তাহার আর সময় থাকে না। ঘরে থাকার অবসাদ দূর করিবার জন্য সে বাহিরের কাজে যোগ দিয়াছিল। আর, নিজেদের ছোটঘরে দাম্পত্যপ্রেমকে চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ রাখিলে, দুইটি হৃদয়ের প্রেম যতই সুনিবিড় যতই গভীর হউক না কেন, অবসাদ আসিবেই। সংসারে চারিদিকে নব নব মঙ্গলকর্ম্মে যুক্তহৃদয়ের প্রেমকে প্রবাহিত না করিলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়?

* * *

দুই ঘণ্টা পরে। ললিত চলিয়া গিয়াছে। রজত মাদুরে বসিয়া খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল, আজ সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে, সেই আনন্দেই বোধ হয় রমলার কোল হইতে খোকাকে টানিয়া লইয়াছিল। রমলা পাশের চেয়ারে বসিয়া মোজা বুনিতে বুনিতে মাঝে মাঝে রজতের মাথার উপর মাথা ঠেকাইয়া খোকার মুখটা দেখিতেছিল। রজত খোকাকে তুলিয়া ধরিয়া চুমা খাইতে রমলাও তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, অধরে অধর ঠেকিয়া গেল। মধুর হাস্যমাখান মুখে রমলা খোকাকে ধীরে রজতের কোল হইতে লইয়া বেতের দোল্‌নায় শোয়াইয়া দিল, ফিডিং-বোতলটা ধুইয়া রাখিল, হ্যারিকেনের আলোটা মাদুরের মাঝখানে রাখিয়া একখানা পোষ্টকার্ড আড়াল দিয়া দোল্‌নার পাশে বসিয়া মৃদু দোলা দিতে দিতে বলিল,—ওগো একটা কিছু পড়না।

রজত তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল, ধীরে পাশের শেল্‌ফ্‌ হইতে ল্যাম্বের Essays of Elia-খানি টানিয়া বলিল—কি পড়্‌ব?

—ওটা কি? ল্যাম্ব্‌? আচ্ছা, Dream Childrenটা পড়। ল্যাম্বের জীবন ভারী করুণ ছিল, নয়? তিনি নাকি তাঁর বোনকে খুব ভালবাস্‌তেন, তাঁকে দেখাশুনা কর্‌বার জন্য বিয়ে করেন নি?

—হাঁ সেও একটা কারণ বটে, আর হৃদয় দিলেই ত আর হৃদয় পাওয়া যায় না, পৃথিবীতে এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

—বাস্তবিক ঈশ্বরের এমন নিয়ম করে' দেওয়া উচিত ছিল, আমি যদি কাউকে সত্যি ভালবাসি সে আমাকে নিশ্চয় ভালবাস্‌বে, ভালবাস্‌তেই হবে—

—তাই নাকি? মুখ রাঙা করিয়া রমলা বলিল,—যাও, পড়ো। আমি বল্‌ছিলুম যে যাকে ভালবাসে সে যেন তারও ভালবাসা পায়, লোকে প্রেমকে অনাদর করে, তাই ত জগতে এত দুঃখ।

—তা পায় রমু। বুঝ্‌লে, কখন কারও কোন ভালবাসা ব্যর্থ যায় না, সত্যিকার প্রেম হলে তার আনন্দ সার্থকতা আছেই—

—কিন্তু সে যাকে ভালবাসে তাকে ত সবসময় পায় না, এই ধর ল্যাম্ব্‌ যাকে ভালবেসেছিলেন সেই অ্যালিসকে ত পেলেন না।

কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে যখন দুজনা দুজনকে ভালবাসে অথচ মিল্‌তে পারছে না,—বলিয়া রজত Dream Children পড়িতে সুরু করিল।

ওগো, তোমার বন্ধু এই আঙুর এনেছেন,—বলিয়া রমলা টেবিল হইতে এক ঠোঙা আঙুর আনিয়া রজতের

পাশে বসিয়া বাছিয়া রজতকে দিতে লাগিল, নিজেও মুখে পুরিতে লাগিল। কিন্তু প্রথম পাতা পড়া শেষ হইতেই রমলা খাওয়া ভুলিয়া প্রেমভরা চোখে রজতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পড়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, রমলার চোখ জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে পায় না কেন? রজত ধীরে পড়িতেছিল,—how for seven years in hope sometimes, sometimes in despair, yet persisting ever, I courted the fair Alice.

রমলার চোখে ল্যাম্বের অবিবাহিত জীবনের করুণ ছবিখানি ভাসিতেছিল। কত অন্ধকার সন্ধ্যায় বিজনঘরে আগুনের সম্মুখে বসিয়া এই কথাশিল্পী ক্ষুধিত পিতৃহৃদয়ের তৃষিত স্নেহরস দিয়া ব্যর্থপ্রেমের অম্লান পারিজাতের মত এই কাল্পনিক খোকা-খুকীদের সৃষ্টি করিয়াছেন; ভাবিয়াছেন—এরা বুঝি তাঁহার প্রিয়ার, তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, তিনি তাহাদের রূপকথা বলিতেছেন। কিন্তু এ মন-ভুলান স্বপ্ন, এ মায়া যখন টুটিয়া যাইত, তখন যে ব্যথা, তাহা অশ্রুর অতীত। রজত যখন পড়িতেছিল, We are not of Alice, nor of thee. The children of Alice call Bartrum their father.

রমলা অস্ফুটকরুণস্বরে বলিয়া উঠিল,—আহা, বেচারা!

মুখ তুলিয়া দরজার দিকে চাহিতেই রমলা একটু ভয়ে চমকিয়া উঠিল। কার কালো ছায়া দরজার গোড়ায়? একটু ভীতস্বরে বলিল,—ওগো!

রজত পড়িয়া যাইতে লাগল। রমলা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল,—দেখ দরজার গোড়ায় কে দাঁড়িয়ে?

তাহারা দুইজনে পাঠে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে যতীন কখন্ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে তাহা তাহারা দেখে নাই। রজত যখন খোকাকে আদর করিতেছিল, তখনই যতীন আসিয়াছিল, এতক্ষণ সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাম্পত্যজীবনের এক আনন্দময় দৃশ্য দেখিতেছিল, ঘরে ঢুকিতে পারিতেছিল না, চলিয়া যাইতেও পারিতেছিল না। হ্যারিকেন্-লণ্ঠনের আলোয় উজ্জ্বল রমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে মায়ামুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় এই পাড়ায় এক মাড়োয়ারী ধনীর সহিত ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে দেখা করিতে আসিয়াছিল। রজতের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া ফিরিবার সময় দরজার সম্মুখে মোটর কেমন থামিয়া গেল, একবার দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা সে দমন করিয়া রাখিতে পারিল না। এতক্ষণ সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এই ঘরটিকে, রজতকে,রমলাকে দেখিতেছিল। প্রতিদিন তাহার চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য অহর্নিশি থাকে—সেই বয়লার জ্বলিতেছে, মোটর চলিতেছে, চাকাগুলি ঘুরিতেছে, লেদ কাটিতেছে, মিস্ত্রিরা লোহা পিটিতেছে—সেই দৃশ্যের পর এই প্রেমস্নিগ্ধ শান্ত দৃশ্যটি দেখিয়া সে এত বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে এ স্বপ্ন সে ভাঙিতে চাহিতেছিল না।

We are nothing; less than nothing and dreams—বলিয়া রজত থামিল।

রমলা বলিল,—ওগো দেখ, কে তোমায় ডাক্‌ছেন বোধ হয়।

আমি, আমি,—বলিয়া টুপি খুলিয়া যতীন ঘরে ঢুকিল,—হ্যালো রজত!

রজত দাঁড়াইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল,—আরে তুমি! এস, এস।

রমলার দিকে চাহিয়া যতীন বলিল,—কি রকম surprise করেছি বলুন। সত্যি কথা বল্‌ব?—একটু overhearও করেছি।

রমলা হাসিয়া বলিল,—আজ বুঝি আবার আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে মোটরের টায়ার burst কর্‌ল।

—না, আজ পেট্রল ফুরিয়ে গেল। সত্যি এম্নি disturb করা—

আচ্ছা, আচ্ছা,—বলিয়া রজত যতীনের হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল।

রমলা বলিল,—বোথেকে আস্‌ছেন? কারখানা থেকে? এক কাপ্ চা করে' দি।

ব্যথিত-করুণস্বরে যতীন বলিল,—না, না, ব্যস্ত হবেন না। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে?

ধীরে সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দোল্‌নার দিকে অগ্রসর হইল।

কিছুতেই দেখ্‌তে পাবেন না, অম্‌নি কিছুতেই দেখ্‌তে দেওয়া হবে না,—বলিয়া যতীন ও দোল্‌নার মাঝে গিয়া রমলা দাঁড়াইল। অম্‌নি কাকা হওয়া হবে না। কি দিয়ে দেখ্‌বেন, বলুন আগে।

অন্তরের হতাশস্বরকে কণ্ঠে সহজ করিয়া যতীন বলিল, —আমি কি দিতে পারি, সঙ্গে দেবার মত কিছু নেই।

রমলা একটু দুষ্টামির স্বরে বলিল,- তবে আজ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না।

রজত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—রমু!

রমলা হাসিয়া বলিল—বা, ফাঁকি?

সে সরিয়া দাঁড়াইল।

আচ্ছা, আচ্ছা, এই আংটি—বলিয়া ম্লান হাসিয়া যতীন হীরে-বসান সোনার আংটি আঙ্গুল হইতে খুলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দোল্‌নার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

রজত কিছু বলিতে পারিল না, রমলা অতি অপ্রতিভ হইয়া হ্যারিকেন্-লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরিল। কথাবার্ত্তায় খোকা জাগিয়া উঠিয়াছিল। যতীন ধীরে শিশুটিকে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া দুইটি আঙ্গুল এক করিয়া আংটিটি পরাইতে চেষ্টা করিল। তারপর ধীরে মৃদু চুম্বন করিয়া খোকাকে দোল্‌নায় শোয়াইয়া রাখিয়া স্নিগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সোনা দেখিয়া খোকার চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছিল, সে আংটি জোর করিয়া ধরিয়া হাত নাড়িয়া ঘুরাইতে লাগিল। রমলা তাহার হাত হইতে আংটি ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করাতে সে বিশেষ আপত্তি জানাইয়া কান্না জুড়িবার উপক্রম করিল। যতীন বলিল, —Fine baby! রজত এর যা grip! দেখ্‌ছ, কি রকমভাবে ধরেছে! একে আমি একটা খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার করে' দেব দেখ্‌বে।

রমলা পুত্রগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া যতীনের দিকে চাহিল। যতীন ক্ষণিকের জন্য নির্নিমেষনয়নে রমলার দিকে চাহিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া সমস্ত দেহ যেন একটু টলিয়া গেল, তাহার মনে হইল, সেই হাজারিবাগের ডাকবাংলায় বিনিদ্র রজনীর পর কোন দুঃস্বপ্ন হইতে সে জাগিয়া উঠিয়াছে। রমলাই সত্যই তাহার অন্তরবাসী প্রেমিক-পুরুষকে জাগাইয়াছিল, আর মাধবী তাহাকে আবার ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে, এই ক্ষণিকের চাউনিতে এই কথা বিদ্যুতের মত তাহার মনে জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে আবার খোকার চোখ দুইটির উপর চুমা খাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল

রমলা বলিল—বসুন, খেয়ে যেতে হবে, আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যান না। আচ্ছা মাধবী কি একবার ভুলেও আসে না? ভাল আছে সে?

করুণ হাসিয়া যতীন বলিল,—হাঁ ভালই আছে। তাহার মনে হইতেছিল, কাহারও সহিত বসিয়া খাইতে যে আনন্দ আছে, একথা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। মাধবীর সঙ্গে সে কতযুগ খায় নাই, কার্‌খানা হইতে সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া মাধবীর মুখে কোনদিন শোনে নাই,—এক কাপ্ চা করে' দি।

রিষ্ট্‌ওয়াচ দেখিয়া রজতের দিকে তাকাইয়া যতীন বলিল,—ভাই, এক ডিরেক্‌টার্‌স্ মিটিং আছে, আজ আর বস্‌তে পার্‌ব না, আর-একদিন নিশ্চয় আস্‌ব।

সে হবে না, এতদিন পরে এলেন, একটু বসুন—বলিয়া রমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যেই এক পিতলের ঝক্‌ঝকে পানের মত রেকাবীতে নতুন-গুড়ের সন্দেশ, মোয়া, রসগোল্লা আর এক কাপ চা লইয়া রমলা হাজির হইল।

রেকাবীটা হাতে ধরিয়া যতীন বলিল,—আর-একটা কি খাওয়া চল্‌ছিল?

ও! আঙুর, খাবেন?—বলিয়া রমলা কতকগুলি আঙুর ঠোঙা হইতে লইয়া সুন্দর করিয়া রেকাবীতে রাখিল। এক লজনচুষের শিশি হইতে পাটালী বাহির করিয়া যতীনকে দিয়া বলিল,—ভারি সুন্দর পাটালী, চকোলেটের চেয়ে আমার ভাল লাগে।

যতীন সব খাবার খাইল দেখিয়া রজত একটু অবাক্ হইল। বস্তুতঃ আজ এই ঘরে যতীন ক্ষণিকের জন্য যে অমৃতের স্বাদ পাইয়াছিল তাহার আনন্দে ভুলিয়া সে রেকাবীটা নিঃশেষ করিল।

দেখুন সব খেয়েছি, আজ তবে আসি,—বলিয়া যতীন আবার দোল্‌নার কাছে একটু অগ্রসর হইল।

রমলা বলিল,—আবার কবে আস্‌বেন ?

—দেখ্‌ছেন কি ভয়ঙ্কর কাজ! যখন ছুটি পাব ঠিক্ আস্‌ব।

—ঠিক ?

—হাঁ ঠিক, গুড্ নাইট্ রজট্।

রমলা ও রজত তাহাকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

মোটরে উঠিয়া যতীনের নিজে মোটর চালাইয়া যাইবার মত উৎসাহ যেন রহিল না। শোফারকে মোটর চালাইতে বলিয়া নিজে মোটরের ভিতর গিয়া বসিল। কাজের তাড়ায় যখন মোটরে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতে হইত তখনই সোফারকে মোটর হাকাইতে হইত, তা ছাড়া সর্ব্বদাই সে নিজে চালায়। অকারণে সাহেব মোটর চালাইলেন না দেখিয়া পাঞ্জাবী শোফারটা একটু অবাক্ হইল।

রাত্রির অন্ধকারে দুধারে ছায়াবাজীর মত জনস্রোত, প্রাসাদস্রোত, হীরার চুম্‌কির মত গ্যাসের আলোর সারি। চারিদিকে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু কোথাও একটু শান্তি স্নিগ্ধতা পাইতেছিল না। একটি দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে বার বার ভাসিয়া উঠিতেছিল—দৃশ্যটি বিশেষ কিছুই নয়, দুইজনে মাথার সহিত মাথা ঠেকাইয়া আঙুর খাইতে খাইতে বই পড়িতেছে, সম্মুখের দোলায় ঘুমন্ত শিশু দুলিতেছে, বাতির আলো দুইজনের মুখের অর্দ্ধেক উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ছবিটি তাহার মাথায় যেন জলিতে লাগিল, চোখের সম্মুখ হইতে কিছুতেই দূর হইতে চাহিল না।

যতীন ড্রাইভারকে বাড়ীতে যাইতে বলিল। ডিরেক্‌টার্‌স্ মিটিংএ যাইতে তাহার ইচ্ছা বা উৎসাহ রহিল না। ড্রাইভার বিস্মিতনয়নে সাহেবের মুখের দিকে চাহিল, এত সকালে তিনি কোনদিন বাড়ী ফেরেন না।

বাড়ী ঢুকিয়া যতীন শোবার ঘরে গেল,—ড্রয়িংরুমে মাধবী নাই, সেখানেও নাই। একটু রুক্ষস্বরে চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মেম-সাহেব কোথায় ?

দীর্ঘ সেলাম দিয়া চাকর জানাইল, বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বিরক্ত হইয়া যতীন বলিল—কতক্ষণ ?

অতি দীনভাবে চাকরটি বলিল,—সন্ধ্যে বেলা। যেন এ তাহারই অপরাধ।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—গাড়ীতে গেছেন ?

—না, ট্যাক্সিতে।

—কোথায় গেছেন জানিস্ ?

চাকরকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যে কতদূর অনুচিত তাহা যতীনের খেয়াল ছিল না।

চাকরটি ধীরে বলিল,—হাঁ, বায়স্কোপে গেছেন।

তিক্তস্বরে যতীন বলিল,—বায়স্কোপে! আচ্ছা যাও।

কথাগুলি শুনিয়া স্বামীর যেরূপ ক্রোধ বা অভিমান হওয়া উচিত ছিল তাহার বিশেষ কিছু হইল না। তবু অন্তরে কেমন ব্যথা বোধ হইল, কিন্তু তাহা মাধবীর জন্য, না নিজের জন্য, তাহা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

চাকরকে বিদায় দিয়া যতীন ড্রয়িংরুমে পায়চারি করিতে লাগিল। এই সুসজ্জিত ঘরটি পঙ্কের কাজ-করা, বড় আয়না ছবি লাগান, ড্রয়িংরুম সাহেবী আস্‌বাবে ভরা। এই ঘরটি যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিল। মাধবী আবার ঘরটিতে অনেক ভারতীয় শিল্পদ্রব্য রাখিয়াছিল—অবনীন্দ্রের আঁকা ছবি, পিত্তলের ও পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি, চীনে ড্র্যাগন, জাপানী ফ্যাশানের পর্দ্দা, পারস্য-কার্পেট্ ইত্যাদি দিয়া এক ইংরেজশিল্পী আসিয়া ঘরটিকে সাজাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

চাকর চা আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। এই ঘরটিতে যতীনের যেন দম আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল। মোটর হাকাইয়া সে গড়ের মাঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

যতীন যখন ষ্ট্রাণ্ড রোডে মোটর থামাইয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া বসিল, তখন মাধবী ইয়োরোপ হইতে সদ্য-প্রত্যাগত এক তরুণ যুবকের সহিত বায়স্কোপ দেখিতেছে। এতদিন সে ঘরে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এবার সে নিজেকে বাহিরে মুক্তি দিয়াছে। পিতার মৃত্যুসংবাদে সে যতখানি কাতর হইবে ভাবিয়াছিল, তাহা হয় নাই। প্রথম রাত খুব কাঁদিয়াছিল, দ্বিতীয় তৃতীয় দিন কিছুই

খাইতে পারে নাই, তার পর সে শোক অতি শীঘ্রই ভুলিয়া গেল। বস্তুতঃ তাহার বিবাহের পর হইতেই তাহার পিতা তাহার কাছে যেন মৃত হইয়াছিল। এতদিন তবু জীবনটা একটা ভাঙ্গা নোঙ্গরে একটু বাঁধা ছিল, সে নোঙ্গর ডুবিয়া যাইতে,উচ্ছল জীবন-সমুদ্রে সে তরী ভাসাইয়া দিল। নভেল পড়িয়া অত্যন্ত অবসাদ আসিয়াছিল, এবার সত্যকার জীবন কি জানিতে তাহার অন্তর যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

মাধবী যখন বায়স্কোপে এক ফরাসী অভিনেত্রীর রোমান্স্ দেখিতেছিল, তখন যতীন জাহাজের মাস্তুলাকীর্ণ ধূমাচ্ছন্ন কালো নদীজলের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছিল, হয়ত সে ভুলই করিয়াছে। কে যে তাহার সুপ্তচিত্তের প্রেমকে সোনার কাঠি দিয়া জাগাইয়াছিল, হাজারিবাগে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। রমলা যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, সে ত রমলাকে ভালবাসে নাই, মাধবীকে ভালবাসিয়াছে। বিবাহের পরও কয়লার খনিতে নবদম্পতীর জীবন কি আনন্দেই কাটিয়াছে! কিন্তু সে প্রেমস্বপ্ন টুটিয়া গেল কেন? আর এ কি গোপন প্রেম লুকান ছিল, আজ সমস্ত অন্তর যে বেদনাময়! ল্যাম্পের মত কোন্ স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া সে আপন মনকে ভুলাইতে চায়? কোন্ ঘুমন্ত শিশুর দোলার পাশে বসিয়া মৃদু দোলাইতে দোলাইতে কাহার হাত হইতে আঙুর খাইবার জন্য তাহার মন তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে! দুইজনে মাথার সহিত মাথা ঠেকাইয়া বসিয়া আছে—এই ছবিটি তাহার মগজে যেন আগুন জালাইয়া দিয়াছে, এই ভেজা ঘাসের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িতে তাহার ইচ্ছা করিল। রজতের ঘরের ছবিটি বার বার যতীনের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু গঙ্গার তীরে যতীন বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না। কারখানায় একটি নূতন কল আসিয়াছে; সেই কলের নব রহস্য তাহার মনকে টানিতেছে, ওই যন্ত্রশক্তি তাহাকে টানিতেছে। যতীন মোটরে উঠিয়া কারখানার দিকে মোটর হাঁকাইতে বলিল। মোটরে বসিয়া যতীন ভাবিতে লাগিল, আর রজতের বাড়ী যাওয়া ঠিক হইবে কি না। বহুক্ষণ মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া ঠিক করিল, রজতের বাড়ী আর সে যাইবে না।

(২৪)

ফাল্গুনের দুপুর। ঘরের দরজা জান্‌লা সব বন্ধ, শুধু সিঁড়ির দিকের দরজাটা খোলা, সেইখান দিয়া প্রচুর আলো ঘরে আসিতেছে। দরজার পাশে চেয়ারে বসিয়া রজত ছবি আঁকিতেছিল। বিবাহের পর সে মনোযোগ দিয়া বড় ছবি আঁকিতে বসে নাই, দরকারও বোধ করে নাই, কিন্তু আফিসের কাজ ছাড়িয়া কর্ম্মহীন দুপুরে ছবি আঁকায় মন দিয়াছে। রমলা ছাদে খোকার কাঁথা জামা-গুলি শুকাইয়াছে কি না দেখিতে গিয়াছিল। কাঁথা তুলিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে রমলা ঘরে আসিতে রজত বলিল,—একটু দাঁড়াও না গা!

—কেন?

—হাঁ ঠিক ওই রকম ভঙ্গী করে'।

—যাও, আমায় কি মডেল—বলিয়া রমলা খাটের বিছানা ঝাড়িতে সুরু করিল।

এই সংসারের নিত্যকর্ম্মের মধ্য দিয়া রমলা রজতের নিকট নব নব সৌন্দর্য্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। এ কেবল মায়াবিনী প্রিয়া নয়, এ মঙ্গলময়ী মাতা, কল্যাণী নারী, শান্তির আনন্দরূপ। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত রমলা সংসারের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি কি সুন্দরভাবে কি স্নেহের সহিত আনন্দের সহিত করিত—বিছানা তোলা, টেবিল ঝাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, খোকাকে স্নান করান, খাওয়ান, কাপড় কাচা, খোকাকে ঘুম পাড়ান, সেলাই করা—এই কল্যাণময় গৃহকর্ম্মের সৌন্দর্য্যে রজত মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, সব কাজের পরম প্রেম ও আনন্দের মূর্ত্তিকে সে শিল্পীর তুলি দিয়া আঁকিতে চেষ্টা করিতে-ছিল। এত দিনের গল্প করা, উচ্ছল হাসি, গান গাওয়া, হেলাফেলার মত্ত সৌন্দর্য্যের চেয়ে এই মঙ্গলকর্ম্মগুলির স্নিগ্ধ মাধুর্য্যময় রূপ তাহার চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করিত। তাহার ঝাঁটা ধরার ভঙ্গী, রান্না করার গান, সমস্ত কাজের মধ্যে দেহের ছন্দ—এ সমস্ত সে ছবির পর ছবি দিয়া আঁকিতে সুরু করিয়াছিল। রমলা যখন রান্না করিত, কি সুন্দর দেখাইত! সেই জলের ঝরঝর তেলের কলকল ঝোলের খলখল শব্দ, তাহার সঙ্গে সোনার চুড়িগুলির রিনিঝিনি, অকারণ হাসির সুর,

মুক্তকেশে দীপ্ত মুখে আগুনের আভা, ফুলেভরা লতার মত তনুবল্লরী একবার একবার কড়ার উপর নুইয়া পড়িতেছে আবার তুলিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে দু'এক লাইন গান। পুরুষের জন্য নারীর চিত্তে যে কি স্নেহ জমা রহিয়াছে, পুরুষকে রান্না করিয়া খাওয়াইতে যে নারীর কি আনন্দ, রমলার সেবিকামূর্ত্তি দেখিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রজত তাহা বুঝিত।

ইহার চেয়েও সুন্দর দেখাইত, যখন রমলা খোকাকে কোলে করিয়া জামা পরাইত, দুধ খাওয়াইত, আদর করিত, মাতৃস্নেহের আনন্দে আপনাকে ভুলিয়া যাইত, —তাহার চোখে স্নেহভরা চাউনি, গণ্ডে রক্তিম আভা, বুকে ভয়ের দোলা, হাতে প্রেমের ভঙ্গী—সেই মূর্ত্তিমতী ম্যাডোনাকে দেখিয়া রজত আপনাকে ধন্য মানিত।

রমলার এই ছবিগুলি রজত আঁকিতেছিল। রমলা একবার চকিতপদে আসিয়া পেন্সিল কাড়িয়া লইয়া বলিল,—সত্যি, কি হচ্ছে বল ত, আমায় পাগল পেলে? আচ্ছা, খোকার একটা ছবি আঁক না বাপু।

পেন্সিল দিয়া রজতের গালে আঘাত করিয়া সে মামাবাবুর ঘর গোছাইতে চলিয়া গেল।

চৈত্র পূর্ণিমার রাত। মাঝ রাতে রমলার ঘুম হঠাৎ কেমন ভাঙ্গিয়া গেল। পাশে রজত শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে, তাহার মাথাটা ধীরে বালিশে উঠাইয়া দিয়া চুলগুলি লইয়া একটু নাড়িয়া রমলা ধীরে উঠিল। দোলায় খোকা ঘুমাইতেছে, তাহার পাশে গিয়া চুপ করিয়া বসিল, কোণের খোলা জান্‌লা দিয়া জ্যোৎস্না ঘরে ঝরিয়া পড়িতেছে, সেই আলোয় খোকার নিদ্রিত শান্ত মুখ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ধীরে নত হইয়া খোকাকে সে চুমা খাইল। জাপানী মাদুরের উপর ছড়ান তাসগুলি সাজাইতে সাজাইতে খোকার মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে কেমন ঘুম আসিতেছে না। ঘরটা একটু অপরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁদের আলোয় সে ঘরটি নিঃশব্দে গুছাইতে লাগিল।

এখন প্রতি সন্ধ্যায় রজত তাহার চার-পাঁচজন বন্ধুদের আড্ডা দিতে নিমন্ত্রণ করে। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সুতরাং সে বাহিরকেই ঘরে আহ্বান করে। আয়োজন বিশেষ কিছুই থাকে না; রমলার হাতের তৈরী অতি মিষ্ট চা খাইয়া আর ডালমুট, চীনের বাদাম বা যে-কোন একটা খাবার দিয়া মুখ চালাইতে চালাইতে তাহাদের তাসের আড্ডা বেশ সরগরম হয়। রমলা ও ললিতের উচ্ছল হাসিতে, আর যুবক বন্ধুদের তর্কে বিতর্কে গল্পে রসিকতায় প্রতি সন্ধ্যা বেশ জমিয়া উঠে। ইহাতে শুধু অসুবিধা হয় খোকার। সবাই তাহার লাল গাল্‌টা টিপিয়া টিপিয়া ব্যথা করিয়া দিয়াছে; অবশ্য এ আদরযন্ত্রণার জন্য প্রচুর পারিশ্রমিকও সে পায়। বন্ধুরা স্নেহের চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে পাউডার, খেলনা, জুতো, জামা, ইত্যাদি নানা উপহারের বোঝা চাপাইয়া দেয়।

ছড়ানো ডালমুট, তাস, চায়ের প্লেট ইত্যাদি অতি নিঃশব্দে তুলিয়া রমলা ঘরের মাঝখানটি পরিষ্কার করিল। বন্ধুদের সরল প্রাণখোলা হাসি এখনও যেন ঘরের হাওয়ায় ভরিয়া আছে, তাহাদের যৌবনশ্রীমণ্ডিত মুখগুলি, বিশেষতঃ ললিতের মুখ, তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ধীরে রমলা বারান্দায় বাহির হইয়া কিছুক্ষণ জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর আবার দোল্‌নার কাছে আসিয়া ঘুমন্ত শিশুর দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া রহিল। একবার রজতের নিদ্রিত দেহের দিকে চাহিল, তার পর করজোড়ে শিশুর মঙ্গলের জন্য বিশ্বমাতার চরণে প্রণাম করিল। যিনি নব নব জন্মের দেবতা, সৃষ্টির দেবতা, তাঁহার স্নেহময় প্রশান্ত দৃষ্টি এই জাগ্রত ভয়ব্যাকুল মাতার শিয়রে চিরজাগ্রত রহিল। ধীরে রমলা খোকাকে কোলে তুলিয়া চুমো খাইল।

(২৫)

তৃতীয় বৎসর।

শরৎ-পূর্ণিমার রাত। বিছানায় শুইয়া গল্প করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। রজত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, রমলার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। সে স্বামীর কাছে চুপ করিয়া শুইয়া জ্যোৎস্নাভরা ঘরখানি দেখিতে লাগিল। ড্রেসিং-টেবিলের উপর শেফালিফুল ও কাশের গুচ্ছ, তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া বড় করুণ দেখাইতেছে, পিয়ানোর কাঠে আলো

ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। রমলার মনে হইল, কতদিন সে পিয়ানো বাজায় নাই, খোকাকে লইয়া তাহার হাসি-খেলায় সে এত মগ্ন হইয়াছিল যে পিয়ানোর কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল, খোকাই তাহার জীবন্ত পিয়ানো। রমলা স্নেহ-নেত্রে একবার দোল্‌নার দিকে চাহিল, তার পর দোলান-চেয়ারের মাথায় ওয়াট্‌সের "আশা" ছবিখানির উপর চোখ পড়িল। সমস্ত পৃথিবীর কানে-কানে আশা কি মোহনমন্ত্র গাহিতেছে, চক্ষু তাহার বাঁধা, কোন্ স্বপ্নে মাতোয়ারা হইয়া সে ধরণীকে কোন্ নবদেশের গান শোনাইতেছে! আশা—রমলা স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিল, নিদ্রিত শিশুর দিকে চাহিল, কি আশা রমলার? এই আশার বৃন্তের উপর জীবনের আনন্দ কখন্ ফুটিতেছে—কোন্ আশায় রমলা বাঁচিয়া আছে? স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য তাহার কি আশা? সে জানে না, বুঝিতে চায় না, সমস্ত জীবন যেন এম্‌নি করিয়া স্বামীপুত্রকে ভালবাসিয়া সেবা করিয়া সে তাহাদের কোলে আনন্দে মরিতে পারে। ঘরের কোণে পাথরের ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তির দিকে একবার চাহিল। এই তপস্বী মহাপুরুষটিকে সে সবচেয়ে ভক্তি করিত। তার পর খোলা জান্‌লা দিয়া স্নিগ্ধ নীলাকাশে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিল। ললিতের কথা তাহার মনে পড়িল। তিনমাস হইল ললিত জার্ম্মানী গিয়াছে, কি একটা শিখিতে গিয়াছে বটে, তবে ইয়োরোপটা বেড়াইয়া আসাই তাহার মৎলব। আজ মেলে তাহার চিঠি আসিয়াছে। চিঠির কতক-গুলি কথা রমলা ভাবিতে লাগিল। ললিত লিখিয়াছে,—বৌদি, জার্ম্মানী খেল্‌নার জন্য বিখ্যাত, জান ত। কতক-গুলো ক্যাটালগ্ পাঠালুম, কি কি খেল্‌না পছন্দ হয় লিখ। ললিত শেষাশেষি লিখিয়াছে,—বৌদি, তোমার কথা ভাব্‌লেই, তোমার মুখের অনুপম হাসি মনে পড়ে, অমন সুন্দর হাসি দেখ্‌লে সংসারের সব দুঃখ ভুলে থাকা যায়। খোকার একটা ফোটো নিশ্চয় পাঠাবে।

একটা দম্‌কা বাতাস বহিয়া গেল, ফুলগুলি পড়িয়া গেল, ছবিগুলি নড়িয়া উঠিল, জ্যোৎস্না যেন কাঁপিতে লাগিল, রমলার কেমন ভয় হইল। তাহার মনে হইল মামাবাবু যেন তাহাকে ডাকিতেছেন, যেন অতি করুণ-স্বরে বলিতেছেন,—রমলা-মা!

রমলার বুক দুরদুর করিতে লাগিল। রজতকে কয়েক-বার ঠেলিয়া ডাকিল, রজত ঘুমে অচৈতন্য; রমলা বিছানায় বসিয়া থাকিতে পারিল না, দরজা খুলিয়া বারান্দায় গিয়া হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

মামাবাবুর সম্বন্ধে তাহাদের মন অতি উদ্বিগ্ন ছিল, কিছুদিন হইতে তাঁহার শরীর অতি খারাপ যাইতেছে, খাওয়া কমিয়া গিয়াছে, ইকমিক কুকারের রান্না ছাড়া কিছুই খান না।

তলার উঠানে ফুলের গাছে জ্যোৎস্নার আলো ঝক্‌মক্ করিতেছে, গির্জ্জার ঘড়িতে টং করিয়া একটা শব্দ হইল। রমলা দেখিল, নীচের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদের ধ্বনি কানে আসিল। মামাবাবু কি এত রাত পর্য্যন্ত রাসায়নিক পরীক্ষা করিতেছেন? সে ত মামাবাবুকে শুইতে যাইতে দেখিয়াছে। আবার একটু কাতর শব্দ কানে আসিল। চকিতপদে ঘরে ঢুকিয়া রজতের লম্বা চুলগুলি টানিতে টানিতে রমলা ডাকিল—ওগো, ওগো!

ঘুম-বিজড়িত কণ্ঠে রজত বলিল,—কি!

—ওগো শীগ্‌গীর ওঠ।

—কেন, কটা বেজেছে?

—ওগো, নীচে মামাবাবু বোধ হয় এখনও কাজ করছেন, অনেক রাত।

আ, মামাবাবুকে নিয়ে আর পারিনে,—বলিয়া রজত বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। বলিল—চল।

রজত ও রমলা নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিল। নীচের ঘরে দরজার সম্মুখে আসিতেই ঘরের দৃশ্য দেখিয়া রমলা রজতের কাঁধে হাত দিয়া দরজার কাঠে ঠেসান দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

উঁচু টুলে স্থির হইয়া বসিয়া টেবিলের উপর এক হাত রাখিয়া তাহার উপর মাথা গুঁজিয়া মামাবাবু স্থির হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনি কিছু ভাবিতেছেন কি ঘুমাইতেছেন ঠিক বোঝা যাইতেছে না। আর এক হাত মাথার পাশে খোলা খাতার উপর, কলমটা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে; টেবিলের উপর নত মাথার সম্মুখে মাইক্রো-স্কোপ, তাহার পাশে স্লাইডের খোলা বাক্স। ফ্লাস্ক,

অ্যাসিডের শিশিগুলি, টেষ্ট্‌টিউব, দোয়াত, সব খোলা পড়িয়া রহিয়াছে ; টেবিলের কোণে মোমবাতিটি পুড়িয়া পুড়িয়া গলা মোম এক লাল রঙের বইয়ের মলাটে পড়িতেছে।

রজতের তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করিয়া কাটে নাই। সে ধীরে বলিল,—দেখ, মামাবাবু কি দিব্যি ঘুমোচ্ছেন! মামাবাবু! অ মামাবাবু!

কোন সাড়া নাই।

ও, কি ঘুমোচ্ছেন,—বলিয়া রজত অগ্রসর হইয়া মামার শীর্ণদেহ নাড়া দিল।

ওগো অমন করে'—বলিয়া চমকিয়া রমলা রজতের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া মামাবাবুর মাথাটা অতি কোমলভাবে ধরিয়া পরম স্নেহের সহিত তুলিতেই কপোলের হিমস্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। পুরুষকে বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচার করিয়া যাহা বুঝিতে হয়, নারী অন্তরের অনুভূতি দিয়া নিমেষের মধ্যে তাহা বুঝিতে পারে। রমলা মামাবাবুর শান্ত শীতল মুখের উপর করুণভাবে হাত বুলাইল, চোখ দুইটি খোলা, চাহিয়া চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছেন, সারাজীবনও যাহা খুঁজিয়া পান নাই। রমলা অতি কোমল হস্তে চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া, খোলা শার্টের মধ্য দিয়া বুকে হাত দিল ; বরফের মত হিম অসাড় দেহ। কাতর-ব্যাকুলভাবে মাথাটি টেবিলের উপর রাখিয়া সে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, তার পর টুলের কাঠে কপাল আঘাত করিতে করিতে সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল,—মামা মামা! সে জানে তাহার মামা আর সাড়া দিবেন না, তবু স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রি চিরিয়া তাহার ক্রন্দন উঠিতে লাগিল—মামা, মামা!

রজত ব্যাপারটা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, অর্দ্ধরাত্রে হিষ্টিরিয়া রোগীর মত রমলা একি পাগ্‌লামীর অভিনয় সুরু করিয়াছে। যে চিন্তা তাহার মনে উদয় হইতেছিল, তাহাকে সে আমল দিতে চাহিতেছিল না। জোর করিয়া রমলাকে মেজে হইতে তুলিয়া লইয়া বলিল,—কি হয়েছে, রমলা?

ওগো!—বলিয়া রমলা তার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এক হাতে রমলাকে ধরিয়া আর-এক হাত সে মামার দেহে দিল। এই ত বুক ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে! ও, না, না, এ তাহার নিজের নাড়ীর স্পন্দন। মামার সমস্ত দেহ হিম, অসাড়! তবে রমলা যাহা ভাবিয়াছে তাহা সত্য। রজতের সমস্ত মগজ যেন বিদ্যুতের স্পর্শে পুড়িয়া গেল। উঃ, ওঃ, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রমলাকে ছাড়িয়া, মামাবাবুর দেহের কাছে রজত টলিতে লাগিল।

এবার রমলা আপন অশ্রু দমন করিয়া ধীরে রজতকে ধরিল, রজত রমলার বুকে মুখ গুঁজিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল।

সহসা টুলটা যেন একটু নড়িয়া উঠিল, সে যে নিজের দেহের আঘাতে তাহা রমলার খেয়াল হইল না। কিন্তু সে মামাবাবুর দেহে আর হাত দিতে পারিল না, শুধু মৃদুকণ্ঠে রজতকে বলিল,—ওগো, ডাক্তারবাবুকে ডাক।

রমলার বেদনাতুর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রজত বলিল,—একা থাকৃতে পারবে?

নিজের হাতে সেলাই-করা মামাবাবুর গায়ের শার্টের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—পারব। শীগ্‌গির যাও। শীগ্‌গির এস।

রজত শুধু-পায়েই ছুটিল।

প্রতিদিন যেমন করিয়া এই টেবিলটি গুছাইত, তেম্‌নি ধীর শান্ত স্তব্ধ হইয়া রমলা টেবিলের জিনিসগুলি গুছাইতে সুরু করিল। শিশিগুলিতে ছিপি দিল, বইগুলি মুড়িয়া র‍্যাকে রাখিল, ঝাড়ন দিয়া ধুলা ঝাড়িতে লাগিল, সব কাজ যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত করিয়া যাইতে লাগিল। শুধু মামাবাবুর হাত হইতে খাতাখানি টানিয়া লইতে দেহ একটু শিহরিয়া উঠিল, খাতার পাতার মাঝে লেখা, ৫০৩ বার পরীক্ষা হইয়াছে ; শেষের খালি পাতাগুলি উন্টাইতে উন্টাইতে মামার মাথার টাকের দিকে চাহিল। তার প৺ খাতাখানি যথাস্থানে রাখিয়া দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া উঠানের অন্ধকারে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বুকে যন্ত্র বসাইয়া অতিসহজ কণ্ঠে বলিলেন,—হার্ট ফেলিওর।

রমলা একটু নড়িয়া ঘোলাটে চোখে ডাক্তার-বাবুর দিকে চাহিয়া চৌকাটের কাঠের উপর বসিয়া পড়িল। ধীরে রজত আসিয়া তাহার পাশে স্তব্ধ হইয়া রাত্রি-অবসানের জন্য বসিয়া রহিল।

আকাশে চাঁদ মেঘে ঢাকিয়া গেল, বাতাস উদ্দাম হইয়া উঠিল, স্তব্ধ ঘরে বাতির শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া মোম গলিয়া টস্‌টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল। আর অনন্তনিদ্রামগ্ন বিজ্ঞানতপস্বীকে ঘিরিয়া মাইক্রস্কোপ, টেষ্ট্‌টিউব, ফ্লাস্ক্, বইগুলি প্রহরীর মত রাত্রি জাগিতে লাগিল। আকাশের তারাগুলি যেরূপভাবে অন্ধকার বাড়ীটির উপর ঝুঁকিয়া তাকাইয়া রহিল, তেম্‌নি রাসায়নিক সরঞ্জামগুলি এই অনন্তপথিকের উপর চির-উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিল।

রজত ও রমলা মামাবাবুর মত অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। মৃত্যুর দেবতার রুদ্রদৃষ্টি তাহাদের উপর জাগিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

মাণিকজোড়

হিম্ ঝিম্ হ'য়ে নিম্‌ফুলে পড়েছে ঢ'লে,
ঐ থল্-কমলের নীল 'অল্‌কোহলে'।
বায়ু রোজ্ কেঁদে যায় সেধে কুঁড়ি-কদমে
হানি চুম্‌কুড়ি খুন্‌সুড়ি কত রকমে।

অলি ঘুম-চোখে চুম দিয়ে কলি জাগালো,
মধু— ভুঞ্জনে গুঞ্জন-সুর লাগালো;
খেয়ে পরাগের পিচ্‌কিরি জোর্ নাকাল্ ও,
চোখে কোন্ পরী বল্ পরিমল্ মাখালো।

দেখে আফ্‌শোষে ধান্ শীষে ঝুরে হিমানী,
সাথে র'য়ে র'য়ে রোয় বায় ব্যথাভিমানী;
বাজে অনাদর দরদ্ তু' হারা হিয়ারি,
হায় গুল্-বিবি হায় বুল্‌বুল্ পিয়ারি।

কেন ফুল করে ভোম্‌রারি প্রেম্ দাবী রে?
যেন দিল্-ঘরে খিল্ খোলে তারি চাবি রে!
তার কণ্ডসরী মৌ ওরি তু'ট ঠোঁটে কি?
তার সুর বাজে দূর ওরি ছায়ানটে কি?

সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,
যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকী,
চাঁদে চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী,
জানে প্রাণ্ কেন প্রিয়ে প্রিয়-তম্ চুমু দি'।

ভাঙি' সিন্ধুর বাঁধ ডিঙি' হিম-অচলে
খুঁজি বক্ষের ধন একা প্রেম্ সে চলে;
কারে প্রাণ সদা চায় মন্ ঠিক্ জানে রে
থাক্ বিশ্বের পার্ ধায় তারি পানে সে।

শ্রী গিরিজাকুমার বসু
ও
কাজি নজরুল ইস্‌লাম

গম্ভীরা-উৎসব

...ইহা শুধু মালদহ জেলাতেই আবদ্ধ নহে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা-সমূহের ত কথাই নাই, সুবিশাল ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি ভারতের বাহিরের অনেক স্থানেও, ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।...

উৎপত্তি।—বঙ্গদেশের অনেকস্থানে গাজন নামে একপ্রকার উৎসব আছে। গাজন শব্দে মহাদেবের উৎসব ও শিবপূজোপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তিতে বাণরাজ কৃত পর্ব্ববিশেষ বুঝায়। এই গাজন-উৎসবকেই মালদহে গম্ভীরা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যখন দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রবলপ্রতাপের সহিত রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় রাজ্যমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় একপ্রকার পূজাগৃহ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইত।...ঐ-প্রকার পূজাগৃহকে "গম্ভীরা" বলা হইত।...

শিব-সংহিতায় দেবাদিদেব মহেশ্বরের অসংখ্য নাম মধ্যে একটি নাম 'গম্ভীর'। 'গম্ভীরা-উৎসব' উৎকল, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, হুগলী, চব্বিশপরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি বঙ্গের নানা স্থানে শিবের গাজন, ধর্ম্মের গাজন, সাহাযাত্রা, বারোয়ারী পূজা বা গাজন ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়াছে। বিহার প্রদেশেও... শিবোৎসব ও অন্যান্য উৎসব হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, দারভাঙ্গা, মুজাফরপুর, চাপরা, আরা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে গম্ভীরার অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

...গম্ভীরায় শিবদুর্গার প্রতিমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গের পূজা করা হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিই গম্ভীরা-অনুষ্ঠানের প্রশস্ত সময়। তদ্ব্যতীত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসেও অনেক গ্রামে গম্ভীরা-উৎসব হয়।...

যে দিবস গম্ভীরা-উৎসবে শিব-দুর্গা প্রতিমূর্ত্তির পূজা আরম্ভ হয়, সেই দিবসের উৎসবকে ছোট তামাসা ও পরবর্ত্তী দিবসের পূজাকে বড় তামাসা কহে। এই বড় তামাসার দিন শোভাযাত্রা, বাণফোড়া ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহার শোভাযাত্রায় আবালবৃদ্ধ সকলেই নানা বেশে সাজিতে থাকে।...ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজীকর, বাজীকরী, রামাৎ, তুবড়ীওয়ালা, বহুরূপী সাঁওতাল, ফকির, মুণ্ডমালা হস্তে কাপালিক, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ইত্যাদি সাজিয়া লোকে এক গম্ভীরা হইতে অন্য গম্ভীরায় গমন করে। কেহ বক্ষপার্শ্বে বাণ ফুঁড়িয়া নৃত্যসহকারে গমন করে। এই শোভাযাত্রা কালীঘাটে নীলপূজার দিবস গাজুনে সন্ন্যাসীগণের শোভাযাত্রার অনুরূপ। তৎপরে লোকে রাত্রে ফুল অর্থাৎ সিদ্ধি ভাঙ্গে, বিবিধ মূর্ত্তির মুখোস পরিয়া নৃত্য করে। বড় তামাসার পরদিন প্রাতে মাতালের বাজনা বাজাইয়া মশান নাচান হয়, এবং "আহারাদি পূজা" সমাপন করিয়া ইহার পূজাপদ্ধতি ক্রিয়া শেষ করা হয়। তৎপরে গান হয়। এই গান মালদহে "গম্ভীরার গান" নামে খ্যাত। ইহা সমাজের এক উপকার করিয়াছে। যদি কেহ সমাজে গোপনে কোন অন্যায় কাজ করে, তবে গম্ভীরা গানের গ্রাম্য-কবি সেই বিষয় লইয়া গান রচনা করে এবং গানটি গম্ভীরায় সকলের সাক্ষাতে গীত হয়। তাহাতে দোষী ব্যক্তি নিজে নিজে লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে এরূপ কাজ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে এবং নিজের দোষ সংশোধন করিয়া লয়।

গম্ভীরায় অনুষ্ঠিত কার্য্য।—মালদহের ধানতলার গম্ভীরায় "সামশোল ছাড়া' বা "জলপূর্ণ গর্ত্তে জীবিত মৎস্য ছাড়িয়া তাহাতে লম্ফ দিয়া পার হওয়া প্রথা"। শূন্যপুরাণের "গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি করএ পার" এইরূপ 'বৈতরণী পার' অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে।... মালদহের গম্ভীরায় যে ঢেঁকী কাজ হয় তাহা নারদের 'ঢেঁকী মঙ্গল ও ঢেঁকী বাহনে আগমন' অভিনয়। তখন ঢেঁকিতে চুমান হয়। 'ঢেঁকীবাহনে নারদ' স্মরণ করিয়া সাধ্বী বঙ্গললনাগণ বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, নবান্নে, সংক্রান্তি দিবসে, দশমীর দিনে ঢেকীকে আলপনাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। মালদহের লোকে এই ঢেঁকী পূজাকে 'ঢেঁকী চুমান' কহে।...

গম্ভীরায় মোখার নাচ।—গম্ভীরায় লোকে নৃসিংহ, চামুণ্ডা, কালী, হনুমান, বুড়া, বুড়ি, শিব প্রভৃতি প্রকাশক মোখা মুখে লাগাইয়া নৃত্য করে। এই মুখোস্ বা মোখা শোলা কাঠ ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত হয়।...এক সময় মুখোস্-পরা নৃত্য তিব্বত, কাঙ্গাড়া, নেপাল, ভুটান হইতে সমগ্র ভূখণ্ডে প্রচলিত দেখিতে পাই। লামাগণ মুখোস পরিয়া তান্ত্রিক দেবদেবীগণের সম্মুখে যে নৃত্য করিত, তাহাও মালদহের গম্ভীরায় মুখোস-পরা নৃত্যের অনুরূপ।

...গম্ভীরা সুদূর আসামে, চট্টগ্রামে ও রেঙ্গুনে বৌদ্ধ-উৎসবরূপে সম্পন্ন হয়। নেপালে, ভুটানে, তিব্বতে, হিমালয়ের পাদদেশস্থ দেশ-সমূহে, দক্ষিণাপথে, সিংহল এবং ভারতীয় মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে গম্ভীরার ন্যায় উৎসব হয়। গ্রীস দেশে 'কেলিফোরিয়া' নামে 'ব্যাকাস'দেবের একটি উৎসব হইত। ইহা সর্ব্বাংশে মালদহের গম্ভীরার অনুরূপ। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্‌টনের 'কোমাস্' নামক ইংরেজী গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে মালদহের গম্ভীরার বালাভক্তগণের নাচের ন্যায় নাচ, মুখোস্ পরিয়া নাচ ইত্যাদি গ্রীসদেশে ও বেবিলনে হইত। মিশর দেশে আসীরিস্ দেবতার উৎসবে গম্ভীরার ন্যায় উৎসব হইত।...

গম্ভীরার প্রাচীনত্ব।—...চীনদেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান ও হুয়েন সাঙ্ যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহারা মালদহের গম্ভীরার অনুরূপ বৌদ্ধোৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে, ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি নামক পুঁথিতে, মুসলমান শাসনের ভারত-ইতিহাসে, চৈতন্যভাগবতে, মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডীতে, ১৪৪৭ সংবতে রচিত বিপ্রদাসের পুঁথিতে, মনসার গীতে, গৌড়ীয় যুগের ধর্ম্মমঙ্গলে, সিংহল দেশীয় সাহিত্যে, ভারতের খৃষ্টীয় সমাজের সাহিত্যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, বৌদ্ধ সাহিত্যে, শিবপুরাণে, ধর্ম্মসংহিতায়, বায়বীয় সংহিতায়, জ্ঞানসংহিতায়, সনৎকুমার-সংহিতায়, হরিবংশে ও অন্যান্য গ্রন্থে মালদহের গম্ভীরায় অনুষ্ঠিত ভক্তগড়া প্রথা, হস্তে বেতের লাঠি লইয়া নৃত্য, মুখোস বা মোখা পরিয়া নৃত্য, ভূত, প্রেতিনী, কাপালিক, সন্ন্যাসী ইত্যাদিরূপে সং-সাজা, বাণফোড়া, ফুলভাঙ্গা বা সিদ্ধি ভাঙ্গা, মশান নাচ, আহারা পূজা, সামশোল ছাড়া, বৈতরণীপার, বোলবাই, নূতন নূতন মুদ্রা বা বিষয়াবলম্বনে গান, কবিগান ইত্যাদি উৎসবের ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। ধর্ম্মসংহিতায় বর্ণিত—

"রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপটমাতরঃ।
মুখসা নৃত্যন্তি গায়ন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ॥"

...হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধোৎসবের সংমিশ্রণ আধুনিক মালদহের অনুষ্ঠিত গম্ভীরার ক্রমবিকাশে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্মোৎসব-মিশ্রিত বৌদ্ধোৎসব রথযাত্রা বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত মালদহের গম্ভীরার স্থায় ছিল। এক্ষণে বৌদ্ধ রথযাত্রা লোপ পাইয়া মালদহে "রথাই পর্ব্ব" নাম ধারণ করিয়াছে।

ইহাকে সাধ্বী ললনাগণ "রথদুরৎ" বা "রথাই পুজা" বলেন। বৈশাখ মাসের প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। মাণিক দত্তের "মঙ্গলচণ্ডী" একখানি গানের পুস্তক। তখন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই মঙ্গলচণ্ডীর গান হইত। এক্ষণে তাহা লোপ পাইয়া স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুগণের গৃহে মঙ্গলচণ্ডী 'বাসত দেবী' রূপে অবস্থান করিতেছে। বিবাহের সময়, অথবা অন্য কোন শুভ কার্য্যের সময় হিন্দুমাত্রেই আপন আপন গৃহে 'বসন্তদেবী'র পুজা করিয়া থাকেন। মালদহে 'সাঙ্গা' পুজাও এই সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার খৃষ্টের জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তিনি পাঞ্জাবে আসিয়া শিবপূজা ও শিবোৎসব দেখিয়াছিলেন। আধুনিক গম্ভীরায় যেরূপ নৃত্যগীতাদি হয়, তাঁহার সময় শিবোৎসবেও গম্ভীরার স্থায় সমুদায় অনুষ্ঠান হইত। এইরূপ খৃঃ পুঃ ২৬৯ অব্দে অশোকের সময়, তৎপুত্র জলৌকার সময়, ১৮৪ খৃঃ পুঃ শুঙ্গবংশ ও ২৭ খৃঃ পুঃ কাম্বংশের রাজত্বকালে খৃঃ ৯০ অব্দে কাড্‌ফীসের সময়, ১৭০ খ্রীষ্টাব্দ শিবশ্রী ও শিবস্কন্দের রাজত্বকালে যথেষ্ট শিবপূজা ও শিবোৎসব হইত। গুপ্তরাজগণের সময়েও গম্ভীরা অনুষ্ঠানের বহুলপ্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মালদহের পাণ্ডুয়ায় গুপ্তরাজগণের অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন ও অনেক দেবদেবী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহ জেলার যে গ্রামটিকে এখন আমৃতি বলা হয় তথায় প্রাচীনকালে গম্ভীরা শিবোৎসবের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই আমৃতি গ্রামকে রামাবর্তী নগর বলা হইত; এই প্রাচীন গ্রামে অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর প্রভৃতি বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত সমুন্নত মন্দির ছিল। অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি শিবমূর্ত্তি সদৃশ ছিল। গম্ভীরার এই সময়ে শৈবধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।

সেনবংশীয় রাজগণের রাজত্ব...সময় বর্ত্তমান গম্ভীরার স্থায় শিবোৎসব হইয়াছিল।...পদ্মপুরাণে "পাটলং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে" বলিয়া পাটল চণ্ডীপীঠের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাটলচণ্ডীপীঠ মালদহ আমানিগঞ্জের নিকট 'পাতাল' চণ্ডী বিলে'র তীরে অবস্থিত। তথায় এখন পাটলচণ্ডীদেবীর মূর্ত্তি আছে।

মালদহ জেলার বর্ত্তমান রামাভিটা চণ্ডীপুর ১১১৯ খৃঃ অঃ হইতে ১১৬৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বল্লালসেনের প্রিয় রাজধানী ছিল। এই গ্রামে "রূপসনাতন গোস্বামীর জীবন-চরিত"-লেখক পণ্ডিতপ্রবর বৈষ্ণবকুলরত্ন ধনকৃষ্ণ অধিকারীর বসতবাটী ছিল। বৃহন্নীলতন্ত্রে লিখিত আছে এই চণ্ডীপুরে 'প্রচণ্ডা দেবী' বিরাজ করিতেন। তাই তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিকগণ চণ্ডীপুরকে একটি 'পীঠস্থান' মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

'চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা চ চণ্ডা চণ্ডীবতী শিব।'—বৃহন্নীলতন্ত্র।

এই নগরের পশ্চিমে 'দুয়ার-বাসিনী দেবী-মন্দির' হইতে দক্ষিণে পাটলাচণ্ডী দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত বল্লালসেনের নগর বিস্তৃত ছিল। স্কন্দপুরাণীয় প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে—চণ্ডীপুরের সন্নিকটে "মন্দার" নামক শিব বর্ত্তমান ছিলেন।

গম্ভীরা-উৎসবে...বাঙ্গালী জাতির সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের অনুশীলন হয়। গম্ভীরায় বাঙ্গালী-মজ্‌লিসে বা উৎসব-সমাজের বৈঠকে শাসননীতি ও রাজনীতির চর্চ্চা হয়। উৎসবের সময়ে কাহারও মনে আর মতান্তর বিদ্যমান থাকে না। সকলে জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া উৎসবে যোগদান করে।

(মাহিষ্য-সমাজ, কার্ত্তিক)　　　　শ্রী বলরাম যোয়ার্দ্দার

—

চার্ব্বাক-দর্শন

সুরগুরু বৃহস্পতিকে অনুসরণ করিয়া চার্ব্বাক যে দর্শন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহাই এখন চার্ব্বাক-দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শনের মূল-সূত্রগুলি এখন আর সম্পূর্ণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে উহার যেটুকু উল্লেখ আছে তাহাই এখন চার্ব্বাক-দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ। এই দর্শনের আর-একটি নাম লোকায়ত। লোকায়ত-দর্শনকে চার্ব্বাক-দর্শনের একটি শাখা বলাই সঙ্গত। এই লোকায়ত কথাটির উল্লেখ পাণিনীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং চার্ব্বাক-দর্শনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

চার্ব্বাক-দর্শনের মূল সূত্র হইতেছে ঈশ্বরে অবিশ্বাস, পুনর্জ্জন্ম স্বর্গ ইত্যাদিতে অবিশ্বাস। চার্ব্বাকের মতে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষের সমস্ত লোপ পাইয়া যায়। সুতরাং স্বর্গ-নরক ইত্যাদি কবির কল্পনা। সুতরাং উহা উপনিষদের বিরুদ্ধপন্থী। উপনিষদের মতে দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা বাঁচিয়া থাকে। আর চার্ব্বাক বলেন মানুষ নশ্বর। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সব লোপ পায়। এই মর্ত্ত্যলোকই অর্থাৎ জীবিতকালই সত্য। সেইজন্য চার্ব্বাক বলেন —যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন যথাশক্তি সুখ সুবিধা আনন্দ উপভোগ করিয়া লইও।...

মাটি জল তেজ বায়ু ও আকাশ (ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ ব্যোম) এই পাঁচটিকেই চার্ব্বাক আদিসত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই পাঁচটি হইতে যাবতীয় পদার্থ ও জীব গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের দেহ এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে তাহার বুদ্ধিও ঐ পাঁচটি বস্তুর সমবায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন চিনির সহিত কিণ্ব মিশ্রিত করিয়া সুরা প্রস্তুত হয় তেমনই ঐ পাঁচটি পদার্থের মিশ্রণে যে বুদ্ধি প্রস্তুত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুরা যেমন চিনি ও কিণ্ব হইতে ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট, তেমনই মাটি প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ হইতে মানব-দেহ ও মানব-বুদ্ধি ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট।

পান গুপারী খয়ের চুনের মিশ্রণে যেমন অপূর্ব্ব স্বাদ ও আনন্দ-উপাদান সৃষ্ট হয়, তেমনই মাটি ইত্যাদির সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব দেহ ও বুদ্ধির সৃষ্টি হয়। যখন এই পঞ্চ উপকরণের বিনাশ হয় তখনই বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকেও আছে জ্ঞান পঞ্চভূত হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেই পঞ্চভূত বিনষ্ট হইলে জ্ঞানও বিনষ্ট হইয়া পড়ে। মৃত্যুর পর আর কোনও জ্ঞান থাকে না (বৃ, আ, উ—৴—ঘ—১২)। চার্ব্বাকের মতে দেহ এবং বুদ্ধির পশ্চাতে কোনও আত্মা নাই। তাঁহার মতে এই দেহই আত্মা, আর এই দেহের একটি গুণই হইতেছে বুদ্ধি। চার্ব্বাক বলেন এই আত্মার কোন প্রমাণ নাই। আত্মা যদি থাকিত তবে তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইত। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। অনুমান বা স্থায় চার্ব্বাকের মতে জ্ঞানপ্রদ নহে। এক প্রত্যক্ষজ্ঞানই জ্ঞান।

চার্ব্বাকের মতে ইন্দ্রিয়-সুখই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহারা বলেন ইন্দ্রিয়-সুখের সহিত দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-আশঙ্কা সদাসর্ব্বদাই জড়িত, তাঁহাদিগকে চার্ব্বাক বলিয়া গিয়াছেন—কেবল

মূর্খ যে সেই কাঁটা দেখিয়া কমল তুলিতে ক্ষান্ত হয়। বিবেচক ব্যক্তি আপনাকে কাঁটা হইতে যথাসাধ্য বাঁচাইয়া কমল তুলিয়া আনে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কাঁটা ও আঁইসের ভয়ে কখনও মৎস্য পরিত্যাগ করেন না। তেমনই তুষ ও খড়ের ভয়ে তাঁহারা অন্ন পরিত্যাগ করেন না। কাঁটা ও আঁইস পরিত্যাগ করিয়া মৎস্যের যতটুকু তাঁহাদের প্রয়োজন তাঁহারা ততটুকুই গ্রহণ করেন। তদ্রূপ দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা অসঙ্গত। আর এই সুখকে মানিয়া চলাই আমাদের স্বভাব। চার্ব্বাক আরও কহিয়াছেন যে বন্যজন্তু খাইয়া ফেলিবে এই মনে করিয়া কেহও ধান্য বপন করা ছাড়িয়া দেয় না, কিম্বা ভিক্ষুক আসিয়া বিরক্ত করিবে এই ভয়ে কেহ রন্ধন পরিত্যাগ করে না। যাঁহারা যন্ত্রণার ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করেন, চার্ব্বাক তাঁহাদিগকে বন্য পশুর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির সমালোচনা করিয়াও চার্ব্বাক সুখবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাঁহারা সুখকে মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন তাঁহারা কিন্তু ভবিষৎ জীবনের সুখকে মানিয়া চলেন। এবং সেইজন্য তাঁহারা অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যাগযজ্ঞ করিয়া থাকেন। অথচ এই-সমস্ত যাগযজ্ঞ অর্থব্যয়, কঠোর শারীরিক পরিশ্রম ও নানারূপ যন্ত্রণাসাপেক্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইঁহারা দুঃখের ভয়ে কখনও এই ভবিষ্য জীবনের সুখ পরিত্যাগ করেন না।

বেদ অমান্য করিতে গিয়া চার্ব্বাক কহিয়াছেন বেদ অসত্য বিবরণ, পরস্পর-বিরোধী বাক্য, ভ্রান্তমত ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ড মানেন তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড মানেন না এবং যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড মানিয়া চলেন তাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। সুতরাং চার্ব্বাকের মতে দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণ জীবিকার নিমিত্তই ওই ভ্রমপূর্ণ পরস্পর-বিরোধী-মত-বিশিষ্ট বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং বেদকে অপৌরুষেয় বলা একেবারেই অসঙ্গত।

চার্ব্বাকের মতে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মানবের সমস্ত ইতিহাস শেষ হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেহাতিরিক্ত কোনও আত্মা বা মন চার্ব্বাক স্বীকার করেন না এবং সেইজন্য স্বর্গ নরক এই পৃথিবীতে জীবিত অবস্থাতেই মানুষ ভোগ করিয়া থাকে। চার্ব্বাকের মতে সুখই স্বর্গ, আর দুঃখই নরক। মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মোক্ষ বা মুক্তি চার্ব্বাক স্বীকার করেন না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ব্যক্তি চার্ব্বাকের মতে এক রাজা ব্যতীত আর কেহও নহে। রাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কি না তাহা আমরা সকলেই নিজ চক্ষে দেখিতে পাই। চার্ব্বাক বলেন যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাই সত্য। ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা যায় না। সেইজন্য উহারা অসত্য—কবির কল্পনা মাত্র।

চার্ব্বাক বলেন আমরা যাহাকে আত্মা বলি তাহা আমাদের দেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সত্য না মানিলে 'আমি মোটা' 'সে কাল' প্রভৃতি বাক্য বোধগম্য হয় না। কিন্তু "আমার শরীর" এই বাক্যে "আমার" এই শব্দের অর্থ "আত্মার" নয়। এখানে "আমার" শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন কিনা রাহুর মাথা। মস্তক ব্যতীত রাহুর আর কিছুই নাই। সুতরাং রাহুও যে, তাহার মস্তকও সেই। সেইজন্য রাহুর এই শব্দটি রূপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চার্ব্বাক কেবল প্রত্যক্ষ সত্যই স্বীকার করেন। আনুমানিক সত্যকে তিনি অগ্রাহ্য করেন।

যাঁহারা আনুমানিক সত্য মানিয়া চলেন তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতে গিয়া চার্ব্বাক কহিয়াছেন যে এই-সকল ব্যক্তি একটি হেতু বা Middle Term মানেন এবং এই হেতুর সহিত সাধ্যের (Major Term) একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ মানেন। এই অবিচ্ছেদ্য সংযোগের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সদাসর্ব্বদা অনুমান করিয়া থাকেন। যথা—

ধূমের সহিত অগ্নির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান।
ঐ পর্ব্বতে ধূম বর্ত্তমান রহিয়াছে॥
সুতরাং ঐ পর্ব্বতে অগ্নিও বর্ত্তমান রহিয়াছে॥।

এখানে ধূম হইতেছে হেতু। এই ধূমের সহিত অগ্নির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান আছে বলিয়াই আমরা ধূম দেখিয়া অগ্নি অনুমান করিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে এইরূপ একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকিলে অনুমান হইয়া উঠে না।

চার্ব্বাক বলেন এইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আমরা পাইতেই পারি না। চার্ব্বাক দেখাইয়াছেন যে এই-প্রকার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালব্যাপী; এবং তজ্জন্য ইহা প্রত্যক্ষ (Perception) অনুমান (Inference) শব্দ (Testimony) কিম্বা উপমান (Analogy) দ্বারা পাওয়া যায় না।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা এইরূপ ত্রিকালব্যাপী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ লাভ করা যায় কি না বিচার করিতে গিয়া চার্ব্বাক দেখাইয়াছেন যে প্রত্যক্ষ দুই প্রকারের, যথা—মানসিক প্রত্যক্ষ বা আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষ Internal Perception এবং বাহ্য প্রত্যক্ষ বা External Perception। আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষের কর্ত্তা হইল মন, এবং বাহ্য প্রত্যক্ষের কর্ত্তা হইল চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহা কেবল বর্ত্তমান বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে সম্ভবপর। কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বব্যাপী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিছুতেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। হাজার বৎসর পূর্ব্বে অগ্নির সঙ্গে ধূমের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, হাজার বৎসর পরেও ধূমের সহিত অগ্নির কোন সম্বন্ধ থাকিবে কি না, কিম্বা বর্ত্তমান সময়ে দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে এই সম্পর্ক আছে কি না তাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না।

চার্ব্বাক বলেন মানসিক প্রত্যক্ষ দ্বারাও এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। কারণ মানসিক জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতীত হইবার উপায় নাই॥ বহির্জগতের ঢেউ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া সেখানে জ্ঞান-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সুতরাং চার্ব্বাক বলেন ইন্দ্রিয় যাহা দিতে পারে না মনও তাহা দিতে সমর্থ হয় না।

চার্ব্বাকের মতে অনুমান দ্বারাও আমরা এই প্রকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক পাইতে পারি না। কারণ অনুমান মাত্রেই অন্ততঃ একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হইতে অপর একটি ঐ-প্রকার সম্বন্ধে আমাদিগকে আসিয়া পড়িতে হয়। এবং তাহা প্রমাণ করিতে অপর একটির সাহায্য লইতে হয় এবং উহা প্রমাণ করিতে অপর একটির আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে একটি একটি করিয়া অনন্ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে চলিয়া যাইতে হয়। সুতরাং ইংরেজী ন্যায়ে (Logic) যাহাকে Argument in Circle বলে আমরা তাহাই করিয়া বসি। সুতরাং দেখা যাইতেছে অনুমান দ্বারা আমরা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাইতে পারি না।

শব্দ দ্বারাও আমরা ঐরূপ সম্বন্ধ পাই না। চার্ব্বাকের মতে শব্দ এক-প্রকার অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কথা কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং অনুমান দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, শব্দ দ্বারাও তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আরও বলা যাইতে পারে অন্ধের মত একজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার কোন হেতু বা যুক্তি নাই।

উপমান বা analogy দ্বারাও এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আমরা পাইতে পারি না। কারণ উপমান দ্বারা কেবলমাত্র বিশিষ্ট অর্থাৎ particular সত্য পাওয়া যায়। চার্ব্বাক বলেন উপমান দ্বারা একটি নামের সেই নামধারী অপর একটি বস্তুর সহিত যে সম্পর্ক তাহাই সিদ্ধান্ত করা হয়। যেমন মুখও সুন্দর, চাঁদও সুন্দর। মুখের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে চাঁদের সৌন্দর্য্যের যে সম্পর্ক তাহাই উপমান বলিয়া দেয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, কিম্বা উপমান দ্বারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি এইরূপ একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকিলে আনুমানিক সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নয়। সেইজন্য চার্ব্বাক বলেন অনুমান দ্বারা কোন সত্য প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং যাহারা আনুমানিক সিদ্ধান্ত দ্বারা চার্ব্বাকের মত খণ্ডন করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ব্যর্থমনস্কাম হইয়া ফিরিতে হয়।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে ধূম দেখিলেই আমাদের মনে অগ্নির কথা আসে কেন? ইহার উত্তরে চার্ব্বাক বলেন যে পূর্ব্বে আমরা ধূম প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে আমরা অগ্নিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেইজন্যই ধূম দেখিলে আমরা অগ্নির কথা ভাবিয়া বসি। অনেক সময় আবার একটা দেখিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ভাবিতে বসি। সময় সময় এইরূপ ভাবনা প্রত্যক্ষ দ্বারা সমর্থিত হয়। আবার কখন কখনও উহা ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। লোকে যখন মাদুলি ধারণ করে তখন তাহারা ভাবে যে তাহাদের মঙ্গল হইবে। তেমনই রোগী যখন ঔষধ খায় তখন সে ভাবে যে সে আরোগ্য লাভ করিবে। সময় সময় রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায় এবং মাদুলী-গ্রহণকারীরও মঙ্গল হইতে দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মাদুলীর সহিত মঙ্গলের, ঔষধের সঙ্গে আরোগ্যের, আর ধূমের সহিত অগ্নির কোনও সম্বন্ধ বা যোগ নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে একটি বস্তু দেখিয়া অন্য বস্তু কেন যে ভাবি তাহার কোনই কারণ নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া যে চার্ব্বাক অদৃষ্ট বা দৈব মানেন তাহা নহে। কেহ যদি বলেন দৈবও মানিলাম না, কারণও মানিলাম না, তবে এই ভৌতিক ব্যাপারসমূহ ঘটে কেমন করিয়া? ইহার উত্তরে চার্ব্বাক বলিয়াছেন যে ভৌতিক ব্যাপারসমূহ নিজ নিজ প্রকৃতি হইতে ঘটিয়া থাকে। আপনা হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনাবলী সম্ভাবিত হইতেছে। নিজ নিজ প্রকৃতিগুণেই অগ্নির উত্তাপ, জলের শৈত্য, প্রভাত-সমীরণের তৃপ্তিজনক স্নিগ্ধতা এবং পৃথিবীর বৈচিত্র্য।

যজ্ঞাদি সম্বন্ধে চার্ব্বাক কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে জীব বলি দিলে সেই জীবের স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহার উত্তরে চার্ব্বাক কহিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ যদি এইরূপ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা কেন তাঁহাদের নিজ নিজ পিতাকে বলি প্রদান করেন না? পিতাকে স্বর্গে প্রেরণ করা অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য আর কি হইতে পারে? তথাপি এইরূপ কার্য্য হইতে ব্রাহ্মণগণ বিরত থাকেন কেন?

শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধেও চার্ব্বাকের একটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি পরিতৃপ্ত হয় তবে যে-সকল ব্যক্তি জীবদ্দশায় প্রবাসে থাকেন তাঁহাদের উদ্দেশে যদি বাড়ীতে বসিয়া শ্রাদ্ধ করা যায় তবে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন না কেন? শ্রাদ্ধের পিণ্ড দ্বারা যদি মৃত ব্যক্তির ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তবে যাঁহারা ঘরের উপর উঠিয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের জন্য নীচে আহার্য্য রাখিলেই তাঁহাদের পেট ভরিয়া উঠে না কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চার্ব্বাক স্বর্গ-নরক বিশ্বাস করেন না। কারণ, ঐ-সকল প্রত্যক্ষ করা যায় না। চার্ব্বাক আরও বলেন মৃত্যুর পর মানুষ যদি স্বর্গেই চলিয়া যায়, তাঁহার আত্মা যখন বাঁচিয়াই থাকে, তখন একবার ভুল করিয়াও সে তাঁহার প্রেমাস্পদ ও স্নেহাস্পদগণের নিকট ফিরিয়া আসে না কেন? আত্মা মৃত্যুর পর বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই সে তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট ফিরিয়া আসিত এবং তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে দেখিতে পাইত।

চার্ব্বাকের জাতি-বর্ণেও আস্থা ছিল না। জাতিবর্ণানুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে যে কোন সুফল পাওয়া যায় তাহা চার্ব্বাক বিশ্বাস করিতেন না।

অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে চার্ব্বাক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে রাণীর জন্য অনুষ্ঠেয় যে-সমস্ত অশ্লীল জঘন্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই-সকল কথা উল্লেখ করিয়া চার্ব্বাক কহিয়াছেন, বেদের রচয়িতা দুনিয়ার যত হীনচরিত্র লোভী ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না।

বেদের উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাতে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাতেই বোধ হয় চার্ব্বাকের সমগ্র মূল সূত্রগুলি মোক্ষপিপাসু ব্রাহ্মণগণ রক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

(পরিচারিকা, কার্ত্তিক) শ্রী প্রিয়গোবিন্দ দত্ত

—

কলিকাতার কথা

কলিকাতায় ওয়াটারলু যুদ্ধের জয়ডঙ্কা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।...কোন লাটসাহেব হেষ্টিংসের মত খৃষ্টানী ধর্ম্মের পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতায় ৪ঠা অক্টোবর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করিয়াই নিজের নামে ৮ই নবেম্বর কলিকাতায় ফ্রিমেসনদের এক আড্ডা খুলিয়াছিলেন। ...টাউন্-হলে, কলিকাতার রাস্তায় এই-সকল ফ্রিমেসনদের ধুমধামের ভোজ ও শোভাযাত্রার বড়ই ঘটা ছিল। ইহারাই ধুমধাম করিয়া কলিকাতার কষ্টম ঘরের ভিত পত্তন ১৮১৯ ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে করিয়াছিল, আর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির রাজস্বের জায়গা জমি জরিপাদির নক্সা তৈয়ারি করিবার কার্য্যালয় কলিকাতায় হইয়াছিল। দেশের খাজনা বাড়াইবার কল কোম্পানি এই কলিকাতায় আরম্ভ করিয়াছিল।...কোচবিহার ও পাটনার বেহারারা কলিকাতায় জল তুলিত, পাল্কী বহিত ও অনেকে চাষ করিত। তখন চাকরেরা মাহিনার বদলে জমির উপর চাষ করিয়া বেতন লইত।

কলিকাতার নোট পাটনায় খুব চলিত, সেখানে সোনারূপার টাকাকড়ি বড় বেশী কিছু ছিল না,...ইহাতে হেষ্টিংসের আমলে কোম্পানির রাজস্ব প্রায় নয়কোটি টাকা বা আট হাজার পাউণ্ড বাড়িয়াছিল।...সেকালে টাকা ধারে এদেশের রোজগার ছিল। দেনদারকে জেলে পাঠাইয়া টাকা আদায় করিত। ১৮৩০ পর্য্যন্ত

ঐরূপ কয়েদীদের মাসিক খোরাকি ইংরেজের চার টাকা ও অপর সকলের দুই টাকা মাত্র ছিল।...তাহার পর উঁহার হার ডবল হইয়াছিল। জেলে তখন কোনরূপ কষ্ট ছিল না। টিপুর সন্তান জেলের ভিতর ঝাড়লণ্ঠন আয়নাদি সাজাইয়া মাসে তিনশত কুড়ি টাকা খরচ করিয়া আমোদ করিত। কয়েদীরা জেলের ভিতর যা ইচ্ছা তাই করিত।...

'লালবাজারের মোড়ে তখন লোকদিগকে পিলুড়েতে সাজা দেওয়া হইত। হেষ্টিংস্ জেলের পরওয়ানায় নিজে সই করিতেন ও ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে সেরিফের পরওয়ানা পোষ্টে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আগরায় একজন কর্ম্মচারী থাকিত সেই উহা জারি করিত ; এইরূপ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।...

হেষ্টিংস্ সাহেব সকলের বড়ই প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি জেটি ও রাস্তাদি করিয়া কলিকাতার অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন।...

কলিক্যতার বাবুদের সাজ পোষাকাদি ঢাকার নাববদের চেয়ে ভাল ছিল। তাহারা তীর্থযাত্রীর জন্য রাস্তা ঘাট পুল করিয়া দিত, বেশ ইংরেজিতে কথা কহিতে পারিত।...রাজা নরসিং বড়ই সৌখীন ছিলেন। তিনি নানা জাতির ফল-ফুলের উন্নতি করিয়া নিজের নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার বুলবুলির লড়াই ও বাগানে পশুশালা সেকালে দেখিবার জিনিষ ছিল। অনেক অর্থ ইহাতে তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন। তাহাতে কবিরা সেকালের বাবুদের কাণ্ডকারখানার উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন :—

"দুর্গা-পূজা ঘণ্টা-নেড়ে, খোকা হলে বাজে ঢাক।
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে খাঁচায় পুরলে কিনা কাক॥
বিষয়কর্ম্ম গোল্লায় গেল, লড়িয়ে কেবল বুলবুলী।
প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে হায়! মারা গেল লোকগুলি॥"

লর্ড্ আমহার্ষ্টই এদেশের লোকদিগকে প্রথম উপাধি দান আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে দিল্লীসম্রাটের মারফৎ কোম্পানি উহা আনাইয়া দিতেন। হেষ্টিংসের আমল হইতেই দিল্লীর সম্রাটের প্রতি কোম্পানির গবর্ণরেরা সম্মান দিয়া তাঁহাকে দেশের মালিক বলিয়া স্বীকার করিতে চান নাই। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে এক হাতীতে যাইবার সময় তাঁহার পিছনে বসিয়া যাইতেন। আর মার্কুইস্ হেষ্টিংস্, দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে সমান চৌকী না দিতে চাওয়ায়, তাঁহার সহিত নিজে দেখা করিতে যান নাই, তাঁহার পত্নীকে পাঠাইয়া তাঁহার আব্দার রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি বেগম সমরুর সহিত হেষ্টিংসের দেখা হয়। তিনি তাঁহাকে আপনার পত্নীর সহিত দিল্লীতে যাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের অন্দরের উপহারের ভয়ে তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। ভরতপুরের যুদ্ধে জয় লাভ করিবার পর কোম্পানি দেশের একেবারে মালিক হইয়াছিলেন। এই লর্ড্ আমহার্ষ্টের আমলেই ফ্রিমেসনেরা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৪টার সময় বড় ধুম করিয়া হিন্দু কলেজের ভিত পত্তন করিয়াছিল।...লর্ড্ কর্ণওয়ালিসের আমলে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বেনারসের রেসিডেণ্ট্ জোনাথেন ডান্কান্ ব্রাহ্মণের জন্য সংস্কৃত কলেজ করিয়াছিলেন। সেখানে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং হিন্দুকলেজের ছাত্র গৌরচরণ মিত্র ও ঈশানচন্দ্র দে শিক্ষক হইয়া গিয়াছিলেন, আর ভূকৈলাসের ঘোষালদের বেনারস কলেজে খৃষ্টান পাদরীরা পড়াইত। তাহাতে সেকালের হিন্দুস্থানীরা এই বলিয়া দুঃখ করিত :—

"বেদ মনু স্মৃতি পড়ে ন কৈ, এ বি সি পর ধ্যান লাগা,
কলিকাল করাল আয়নকো দিন্‌মে হোটেল্‌মে মাস্ খান্ লাগা।
আর্য্য সনাতন ধর্ম্মকো ছোড়কো গির্জ্জা-ঘরমে নর জান লাগা,
সাবস্ ইংরাজ রাজকো, সবকোই খৃষ্টান হোন লাগা।"

হেষ্টিংস্ "সোনামুখী" ও "ফুলছড়ি" নামে দুইখানি বড় বজরা করিয়া দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য নদীর ধারে লোক ঝাঁকে ঝাঁকে আসিত। হুগলি চুঁচুড়ায় মেয়ে-ছেলেরা ও পুরুষেরা শাঁখ বাজাইয়া উলু দিয়া ঐরূপ দেখিতে আসিলে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। পুরুষেরা মেয়েদের মাথায় ছাতি ধরে নাই বা তাহাদের দুঃখ দূর করে নাই বলিয়া হেষ্টিংস্ দুঃখ করিয়াছিলেন। সে সময় ইলিশ মাছ পয়সায় একটা ছিল। হেষ্টিংসের স্ত্রী বারাকপুরে একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন ও তাঁহারই আমলে স্ত্রীশিক্ষা এদেশে আরম্ভ হইয়াছিল। লাটদরবারে এদেশের ফিরিঙ্গিদের মেয়েরা শিক্ষিত হইয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারী বা অন্য কাহাকে বিবাহ করিলে যে যাইতে পারিত না, সে প্রথা তিনিই প্রথমে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজে বা পত্নীকে দিয়া দেশের রাজা বা নবাবদের নিকট হইতে কোনরূপ উপহার লন নাই।...তাঁহার ভ্রমণবাহিনীতে প্রায় দশ হাজার লোক থাকিত। একদিন মড়কে পাঁচশত লোক মরিয়া যায়, তবুও তিনি কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে প্রাণের মমতায় ভয় পান নাই। তিনি অযোধ্যার নবাবের এককোটী টাকা উপহার নিজে না লইয়া কোম্পানির তহবিলে তুলিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার স্কুলবুক-সোসাইটীর প্রতিষ্ঠায় তাঁহার পত্নীর বেশ হাত ছিল। উহা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। দেশের বালকবালিকার পাঠ্যপুস্তক ঐ সভা ঠিক করিত। বাঙালীর মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, রাধামাধব বন্দোপাধ্যায় ও রসময় দত্ত ঐ সভার সভ্য ছিলেন। হিন্দুরা ঐ সভার কার্য্যের জন্য তিন মাসে এককালীন ৮৮৯ টাকা ও বার্ষিক ৫০৬৯ টাকা চাঁদা দিয়াছিল। ঐ সভার তদারকে প্রকাশ যে, তখন কলিকাতায় ১৯০টি পাঠশালায় ৪১৮০ জন ছেলে লেখা শিখিত। পড়ার রেওয়াজ তখন যা ছিল তা না থাকারই সামিল। শোভাবাজারের গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে উহাদের পরীক্ষা এবং গুরুমহাশয় ও ছাত্রদের পারিতোষিক দেওয়া হইত। শেষে ঐ সভা ঐ-সকল পাঠশালা সহরের চার ভাগে চারজনার অধীনে করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহাদের নাম রাজা রাধাকান্ত দেব, দুর্গাচরণ দত্ত, রামচন্দ্র ঘোষ, ও উমানন্দ ঠাকুর। শ্যাম-বাজার, জানবাজার, ইটালি প্রভৃতি স্থানেও বালিকারা পড়িত। রাজা বৈদ্যনাথ কুড়ি হাজার টাকা দিয়া কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারের পূর্ব্বকোণে চার্চ্চ-মিশনারীদের বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন। লাট আমহার্ষ্টের পত্নী এ বিষয়ে বড় উৎসাহী ছিলেন।...

রাজা রামমোহন রায়ের বড়ভায়ের স্ত্রী ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল তারিখে সহমৃতা হইয়াছিলেন। উহা তাঁহার প্রাণে বড়ই লাগিয়াছিল ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় ঐরূপ সাতশত সতীদাহ হইয়াছিল।

হিন্দু কলেজের নাম মহাবিদ্যালয় ছিল। ইহাতে ছেলেরা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিনাবেতনে পড়িত, তাহার পর হইতে ২৫ জন ছাত্রের নিকট হইতে ৫ টাকা হিসাবে বেতন লওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। শেষে বিনা বেতনে পড়ান উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দু বালকদের শিক্ষার জন্য যেমন হিন্দু কলেজ হইয়াছিল, তেমনি ফিরিঙ্গীদের জন্য কলিকাতায় জন্ উইলিয়াম্ রিকেট "পেরেণ্টাল্ একাডেমি" ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে খুলিয়া-ছিলেন। উহাই ডভ্‌টন্ কলেজের সূত্রপাত।...রামমোহন যে খালি কাগজ বাহির করিয়াছিলেন তাহা নয়, স্কুলও করিয়াছিলেন। জোড়া-সাঁকোর কমল বসুর বাড়ীতে উহা হইয়াছিল। উহা শেষে হরনাথ মল্লিকের বসত-বাড়ী হইয়াছিল। এই স্কুলে হিন্দুর ছেলেরা বড় কেহ যাইত না।

ছেলেরা রাস্তায় দল বাঁধিয়া গান গাহিত তাহাতেই তাহার উপর লোকের নজর পড়ে—

"থানাকুলের বামুন একটা করেছে ইস্কুল,
জাতের দফা হলো রফা থাকবেনাক কুল।"

সেকালের পাদ্রীরাও রামমোহনের স্কুলের উপর বড় সন্তুষ্ট ছিল না।..লার্ড আমহার্ষ্টের পত্নী সহমরণ যাহাতে উঠিয়া যায়, সেজন্য পতিকে দিয়া এক আইন জারি করিলেন যে, নিঃসন্তান সহমৃতার ধন কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করিবেন। সহমরণ করিতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার অভিমত জানাইতে হইবে। আর যাহারা এই সহমরণের প্রশ্রয় দিবে বা যাহাদের বংশে হইবে তাহারা কোম্পানির চাকরী পাইবে না। হিন্দু কলেজের ছেলেরা হেন্‌রি ভিভিয়ান্ ডিরোজিও ও হেয়ার সাহেবের শিক্ষায় প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা দেখাইতে লাগিল। মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ণ বন্দ্যো খৃষ্টান হইলেন। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সমাজে ও কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্ম গেল গেল রব পড়িয়া গেল। রামকমল সেন হিন্দু কলেজ হইতে উক্ত ডিরোজিওকে ছাড়াইতে গেলেন, কিন্তু উইল্‌সন হেয়ার ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহের জন্য তিনি পারিলেন না। ডিরোজিও নিজে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিলেন। গৌরমোহন আঢ্য হিন্দুর হিন্দুয়ানি বজায় রাখিবার ও ইংরেজি শিক্ষা দিবার জন্য পাঠশালা ও বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। সেখানেই দেশের যাবতীয় বড় লোকের ও মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।

দেশের লোক সকলে যাহাতে খবরের কাগজ পড়ে, সেজন্য হেষ্টিংস্ উহার ডাকমাশুল সিকি করিয়া দিয়াছিলেন। দেশের লোক রামমোহনকে খৃষ্টান বলিত। রামগোপাল মল্লিক হিন্দু কলেজের ছাত্রদের গুণ দেখিয়া নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মুর্হিবাগানে শিবস্থাপনা ও লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ভবানী বন্দোপাধ্যায়কে দিয়া সর্ব্বপ্রথমে অষ্টাদশ মহাপুরাণ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার ভাই রামরতন নুনের একচেটে ব্যবসা করিয়া অগাধ টাকা জমা করিয়াছিলেন।...

সেকালের ইংরেজদের বাড়ী ঘর উঁচু উঁচু, রং সাদা ও চড়াই-বাদুড়-চামচিকেতে ভরা ছিল। দেশের বড়লোকদের বাড়ী ঘর গ্রীস দেশের মত বড় বড় থাম ও বারান্দা-দেওয়া হইয়াছিল, ঘর ইংরেজী আসবাবে পূর্ণ।..সেকালে জাতের মারামারি কলিকাতায় খুব ছিল।..১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা জুরিতে বসিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল।...

(সুবর্ণবণিক-সমাচার,
কার্ত্তিক) রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর

রাষ্ট্র-দীক্ষা

দেশ স্বাধীনতা চায়। কোন্ দেশ না চায়? পরাধীন যে তার অন্য ধর্ম্ম নাই, পুণ্য নাই, নীতি নাই—স্বাধীনতা পাওয়াই তার একমাত্র ধর্ম্ম, একমাত্র নীতি ও পুণ্য।..স্বাধীনতার পণ লইয়া যারা দাঁড়াইয়াছে, তাদের আর কিছু না থাকুক মনুষ্যত্ব আছে, এই মনুষ্যত্বই যে পরশ-মণি।...স্বাধীনতার স্বপ্ন যাদের উন্মত্ত করিয়াছে, তাদের পণ যদি সত্য হয়, দেবতা প্রসন্ন হইবেন, সার্থক করিবেন।

...মুক্ত সমাজ ও স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িবার ডাক আসিয়াছে। সে ডাক ত উপেক্ষা করা যায় না। ভারত ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। ধর্ম্মকে মূল করিয়া, তার সমাজ, রাষ্ট্র দুইকেই মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

...আত্মনিষ্ঠায় সাধনার গোড়া-পত্তন হয়।...অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আমরা অনেকখানি ত্যাগ ও তপস্যার সুযোগ, অনেকখানি ইতিহাস-রচনার মালমশলাই খুঁজিয়া পাইলাম।..

স্বাধীনতাকে আর কাম্য লক্ষ্য করিলে শানিবে না। স্বাধীনতাকে তপস্যারই সিদ্ধিরূপে পাইতে হইবে। আর মূর্ত্তি গড়িয়া দিতে হইবেও—তপস্যা দিয়াই। তিলে তিলে আয়ু ঢালিয়া যে জাতির বেদী গড়িয়া তুলিতে পারিব, সেই বেদীমঞ্চের উপরেই তার স্বাধীনতার অমর সিংহাসন প্রতিষ্ঠা হইবে। এ তপস্যায় সবই ছাড়িতে হয়, অহঙ্কারটিকে পর্য্যন্ত, এইজন্য এ তপস্যার বনেদ বড় নিরেট ও খাঁটি, আর এই অহংকে লুটাইয়া দিয়াই যদি দেবত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার পথ হয়, সে পথে এক অমর দেবজাতিই অচিরে গড়িয়া উঠিবে না কি? সেই অমর জাতির আচরণই হইবে—স্বরাজ বা স্বাধিকার।

..ভারতের রাষ্ট্র-সাধনা হইবে জাতি-সাধনারই রূপ, তার বহিরঙ্গমূর্ত্তি।..রাষ্ট্র জাতিরই সমুচ্চ অভিব্যক্তি।

...মানুষ তখনই মুক্তি পায়, যখনই সে নিজের ইচ্ছার মধ্যে সত্যকে ও মঙ্গলকে খুঁজিয়া পায় ও তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিবার অজস্র প্রতিভা ও সহস্রমুখী স্ফূর্ত্তি অনুভব করে। জাতিও তখনই অধিকারী হয় ভোগের, যখন সেই ভোগের অর্জ্জনে জাগ্রত হয় অগাধ শ্রদ্ধা, আর সে শ্রদ্ধা দেয় তাকে বিপুল বীর্য্য, বিশাল প্রাণের তাড়নায় চির-চঞ্চল সহস্র বাহু, সহস্র চরণ বিস্তার করিয়া, সহস্র শীর্ষ সঞ্চালনে সে আহরণ করে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি, শাসন করে লোভ ও অন্যায়, আর সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, চতুরঙ্গ নীতি-প্রসারে জগতের তাবৎ শক্তি ও বাধাপুঞ্জকে বশীভূত করিয়া জগজ্জনের রাজদরবারে আপন শাশ্বত সত্যকে ও মহিমাকে যশস্বী ও জয়যুক্ত করিয়া তুলে। এই স্বাধীনতার বিরাট আদর্শ যে জাতির বিশাল অন্তরে নিলীন হইয়া আছে, সেই জাতিকেই আমরা ভারত-জাতি বলিয়া বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি; এই মহনীয় স্বর্ণস্বপ্নেই যারা উদ্বুদ্ধ, তারাই ভারতের সত্য অধ্যাত্ম-সাধনা ও সত্য রাষ্ট্র সাধনা উভয়েরই প্রকৃত মর্ম্ম বিদিত হইয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা। এই স্বপ্ন, এই রূপ, এই আদর্শ জীবন-সাধনায় ফলাইয়া তুলিতে হইবে।

...জাতির মধ্যে একমুঠা মানুষও যদি ঐকার স্বরূপে আপনাদের স্বাতন্ত্র্যকেই উপচিত করিয়া তুলে, আর, সেই মহারতে সিদ্ধকাম হইয়া অতঃপর সেই বিরাট স্বাতন্ত্র্যের সুরে সারা জাতি-জীবনটিকে বাঁধিয়া লইতে পারে, ভারতের রাষ্ট্রমুক্তির দিন অদূরাগত, এ আশ্বাস আমরা ধ্রুব কণ্ঠে নিঃসংশয়তার সঙ্গেই কহিয়া যাইব।

চাই একটা জাতি, একটা অগ্রণী সঙ্ঘ, একটা বীজ-চক্র, যারা নূতন তন্ত্র লইয়া চলিবে, যারা ধ্বংসের জন্য ধ্বংস করিবে না, যারা গড়িবার জন্যই আয়োজন করিবে, কিন্তু যাদের গতির বেগে সকল ধ্বংসনীয় ধ্বসিয়া যাইবে, আপনি নূতনকে মুক্তপথ, মুক্তক্ষেত্র ছাড়িয়া দিবে। ইহারা সন্ধি করিবে না, বরং মরিবে, কিন্তু শত্রুকেও সফল করিবে; ইহারা চুক্তি করিবে না, কিন্তু মুক্তি দিবে, আর সৃষ্টি করিয়াই আপনাদের জয়কে মূর্ত্তি দিতে দিতে চলিবে; ইহারা ব্যর্থ হইতে জানিবে না, আর কখনও পরাজয়ও মানিবে না। আর এই নবজাতি যেমন অকুণ্ঠচিত্তে ভগবানে নির্ভর করিবে, তেমনি দুর্দ্ধর্ষ শক্তিসাধনায় ভগবান্‌কেই আপনাদের সর্ব্ব সাধনায় প্রকট করিয়া তুলিবে, ইহাদের পরানুচিকীর্ষা পরাসক্তি থাকিবে না, অধ্যাত্মবলকে আত্মাবমানে তারা ভ্রমেও কখনও অবমানিত করিবে না। তাহারা হইবে স্বাধীনতার জ্বলন্ত প্রতীক, আলোকের দীপ্তশিরা জয়স্তম্ভ—শিক্ষায়, সমাজে, অর্থ-প্রতিষ্ঠানে তাদের বিজয়া তপস্যাকেই

অনির্ব্বাণ জ্যোতিঃ-লেখার মত রেখায় রেখায় মূর্ত্ত করিয়া ধরিবে। আর তারা এমনি আত্মবিশ্বাসী হইবে, যেন শূদ্রবৃত্তিকে উঞ্ছবৃত্তিরই নামান্তর বুঝিয়া ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। এই বীজ মূর্ত্তি নব-সমাজ যদি এমনই জ্ঞানের মন্ত্রে, স্বাধীনতার তন্ত্রে আর প্রেমের রসায়নে পূর্ণ দীক্ষা পায়, সে সহস্র কণ্ঠ এক রসনার ন্যায় একদিন উচ্চারণ করিবে—স্ব—রা—জ—সেই দিনই দেখিবে স্বরাজ সজ্জই আমাদের, কেন না আমরা সেদিন শক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছি। অগ্রে রাষ্ট্র নয়, জাতি সিদ্ধ হউক, আর সকল গৌণ সিদ্ধিই অব্যর্থ সংযুক্ত হইবে।

(প্রবর্ত্তক, আশ্বিন)

নারী সাধনা

নারীও পূর্ণতা চায়। কথা উঠিয়াছে, নারী নিজের পূর্ণতা নিজেই বিধান করিবে, পুরুষের বড় জোর যদি সহায়তা দরকার হয় লইতে পারে, তার অধিক কিছু তার কাছ হইতে সে লইবে না—লইবে কেন? নারীর আত্মার জাগরণ নারীর ভিতর হইতেই হউক—ইহার অপেক্ষা ভাল কথা আর কি হইতে পারে? নারী ফুটুক নিজের মহিমা লইয়া, নিজের শক্তির উপর ভর দিয়া। পুরুষ পারে, তারে সাহায্য করুক, যতটা সম্ভব নারীর নিজ মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই—কিন্তু পুরুষ যেন সাহায্যের নামে কিম্বা আনুকূল্যের বিনিময়ে অথবা প্রতিদানে নারীর চিরবশ্যতা এমন কি চির-কৃতজ্ঞতাটুকুও লক্ষ্যের মধ্যে না রাখে। নারী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়াই যদি আত্মজীবন গড়িয়া লইতে পারে, তখন নারী, পুরুষ-সম্বন্ধে তার কর্ত্তব্য যাহা ভাল বুঝিবে, যেমন বুঝিবে, করিবে—এতে সত্য সত্য দুঃখ করিবার কি আছে? ভয়, শুধু পুরুষের, সনাতন একাধিপত্যটা যদি চলিয়া যায়—যদিই বা যায়, সে একাধিপত্য সত্যের বিধান না হইলে উহা যাউক না, তাতে ক্ষতি কি? যাহা মিথ্যা, তাহা লুপ্ত হউক। স্বাধীন নারী, স্বাধীন পুরুষ সত্য-বিধানেই যদি কোনদিন মিলিত হইতে পারে, তার তুল্য সুখের দিন আর নাই। প্রকৃতি-পুরুষের আধ্যাত্মিক বুলি সত্যের দিক্ হইতেই পরখ হইয়া আসুক।

এমনি সব কথাই আসিয়াছে, অন্ততঃ আসিতে পারে। যুক্তি খুবই সরল স্পষ্ট—পুরুষও মানুষ, নারীও মানুষ; পুরুষের বেলায় যে স্বাধীনতা, নারীর বেলায় সে স্বাধীনতা থাকিবে না কেন? নারী কেন চিরপরাধীনা রহিবে? পুরুষ স্বেচ্ছাচারী, কাম-গতি, স্বচ্ছন্দ-বিহারী হইবে নারীকে পদে পদে শৃঙ্খলভার বহিয়া চলিতে হইবে কোন্ ন্যায়ের বিধান? বলিবে, নারী যে দুর্ব্বল, তাই পুরুষের স্কন্ধে ভর দিয়া না চলিলে, ফল ভাল হইবে না। একথা বলা শ্রদ্ধার উক্তি নয়। প্রবল পক্ষ সর্ব্বক্ষেত্রে চিরদিন ঐরূপ কথাই উত্থাপন করে। আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজের মুক্ত কৃপাণের পরে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আত্মরক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় নাই—এ মামুলী বুলী ত হামেশাই শুনিতে হয়, বেশ ভরা মনে সে কথায় সায় দিতে কেহই আমরা পারি কি? শক্তির যোগ্যতা স্বাধীনতার মধ্য দিয়াই যেমন ফুটে, পরনির্ভরতায় তেমনি দিন দিন কুঁড়াইয়া যায়। অতএব এ-সব খোঁড়া যুক্তি খাড়া করা ভাল শুনায়ও না, চলেও না। মানুষের মনুষ্যত্বের এতে অপমানই করা হয়। নারী হউক, পুরুষ হউক, ব্যক্তি হউক, জাতি হউক, কাহারও অন্তর-সত্তার উপর আমরা শ্রদ্ধাহীন নহি, সন্দিহানও নহি, সুতরাং এমন সব অস্বাস্থ্যকর ও অপমানকর কথা আমরা তুলিব না।

...পুরুষের যেমন, নারীরও তেমনি সাধনাটাই বড় কথা, স্বাধীনতা তারই প্রয়োজনে—সিদ্ধি সাধনারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত সত্যরূপে অবশ্যম্ভাবী ফুটিয়া উঠিবেই।

নারীর সাধনা কি? নারীত্বের। নারীকে নারী হইয়াই ফুটিতে হইবে, নারীত্বকেই তাবে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। ভগবানেরই শক্তি নারী-রূপে অবতীর্ণা।...ভারতের নারীজীবনে একটা মুক্তির সনাতন আদর্শ আছে, সেই আদর্শ তপস্যার দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছিল, তপস্যা দিয়াই পূর্ণ হইবে না কি? আজ নারীকে সর্ব্বতোভাবে পুরুষের আবছায়া ছাড়িয়াই দাঁড়াইতে হইবে। এইখানেই, এই পুরুষের ছায়ানুচিকীর্ষাতেই যে পুরুষের কাছে নারীর সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর ও শোচনীয় অধীনতা প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সাফ্রাগেট নারীর মুক্তি-কামনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি ও সর্ব্বান্তঃকরণে তার সাফল্য প্রার্থনা করি, কিন্তু রুদ্ধ বেদনাতেই যে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যখন পুরুষত্বের কাছে নারীর নারীত্বের এতখানি আত্মহত্যা, এতখানি পরাভব পরিলক্ষ্য করি। নারীর নারীত্ব পুরুষের জাগ্রত অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে গিয়া, পুরুষত্বের দারুণ অভিভবে ভিতর হইতে এতখানি পীড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, ইহার চেয়ে ভয়ের কথা আর কি আছে?...

নারীকে আমরা পুরুষের শুধু নাগ-পাশ নয়, মায়াপাশ হইতেও আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া অনাবিল ও শুদ্ধ মহিমায় দাঁড়াইয়া উঠিতে বলি। নহিলে, নারীত্বের মুক্তি নয়, নারীত্বের চিরহত্যাই অবশ্যম্ভাবী হইবে। ভগবান নারীকে রূপ দিয়াছেন, রস দিয়াছেন, পুরুষকে দিয়াছেন বীর্য্য—নারী ধৃতি, পুরুষ স্রষ্টা—এ ভগবানের বিধান, মানুষের মনগড়া চেষ্টায় তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। উড়াইতে চাহিলে, একটা অস্বাভাবিক ব্যভিচার জন্মায়, সেটা কি পুরুষত্ব, কি নারীত্ব কোন দিক্ দিয়াই স্বাস্থ্যকর নয়, স্বস্তিকরও নয়।...

সেইজন্য নারী আত্মসমর্পণ করিবে পুরুষের কাছে নয়, আপনার মধ্যে যে মঙ্গল ও শিব আছেন তাঁহারই কাছে, আপনিও শিবময়ী কল্যাণময়ী রূপে ফুটিয়া উঠিবার জন্যই। পুরুষও তেমনি মোহঘোরে কখনও আত্মদান করিবে না নারীর কাছে, কিন্তু পুরুষোত্তমের নিকটে উৎসর্গ-সঞ্জাত তপঃশক্তির জাগরণে আপনার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে নারীর নারীত্বকেও সাফল্যযুক্ত করিবে।...

তপস্যা করিতে হইবে নরনারী উভয়কেই, যুক্তভাবে, কখনও বিযুক্তভাবেও, পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যকে বিশিষ্ট রাখিয়াই—কিন্তু বিশিষ্টের মধ্য দিয়া যে মিলনই সাফল্য ও চরিতার্থতা চায়, তাহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ও পরম অভিপ্রায়, ইহাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না।...

আমরা নারীকেই বিশেষভাবে আজ এই প্রেমের সাধনায় আহ্বান করিতেছি। পুরুষের আত্মা জাগিয়াছে, নারীর আত্মা যে এখনও ম্লান অথবা মোহাচ্ছন্ন।...নারীর বিমল মহিমা, নারীত্বের তপস্যার মর্য্যাদা ও জয় লইয়া, কোন্ বিদ্যুল্লতিকা কোথায় অপেক্ষা করিতেছ—সাড়া দাও—জাগ্রত নারী-আত্মার প্রতি জাগ্রত পুরুষ-আত্মার বজ্র-আহ্বান সত্য করিয়া তোল। মিলনেরই সরল মন্ত্রে আজ নারী-শক্তিকেও অভিষিক্ত হইতে কহিতেছি—কোনও মোহে, লোভে, অভিমানে যেন আমরা প্রেমের তপস্যাকে আর ক্ষুণ্ণ বা বিড়ম্বিত করিয়া না তুলি।...

(প্রবর্ত্তক, আশ্বিন)

বাঙ্‌লার 'প্রথম'

[১]

প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ

ইংরেজী ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হাল্‌হেডের লেখা ব্যাকরণই ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ।...১৭৪৩ সালে মুদ্রিত পর্ত্তুগীজ ভাষায় লেখা, লিস্‌বনে ছাপান একখানি গ্রন্থের ১ হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা ব্যাকরণ, ৪৯ হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা পর্ত্তুগীজ অভিধান এবং ৩০৭ হইতে ৫৭৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ-বাঙ্‌লা অভিধান। সমগ্র পুস্তকের বাংলা অংশ রোমান অক্ষরে লেখা।... এইখানিই বাঙ্‌লার প্রথম মুদ্রিত ব্যাকরণ।

বঙ্গভাষার প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ তিনখানি। এ তিনখানি পুস্তক লিস্‌বনে ১৭৪৩ সালে Manoel de Asamcao পর্ত্তুগীজদের চেষ্টা ও যত্নে বাহির করেন। একখানির নাম "Compendium des Mysterios da Fe', etc." [a compendium of the mysteries of the faith]। এই বইখানি Asiatic Society of Bengalএ সংরক্ষিত আছে। ইহার ভূমিকা হইতে বোঝা যায় যে ইহা ১৭৩৪ সালে লেখা হইয়াছিল। বইখানি কিন্তু ১৭৪৩ সালে বাহির হয়। ২য় খানির নাম "Cathecismo da Doutrina Christ'a" [Catechism of the Christian Doctrine]। এই গ্রন্থখানি Don Antonio নামক ভূষণানিবাসী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক রচিত এবং Frey Manoel de Asampcao কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। ৩য় পুস্তকখানির নাম "Vocabulario em idioma Bengala Portuguesa" [Vocabulary in the Pengali and Portuguese Language]। এই তিনখানি গ্রন্থ-সম্বন্ধে প্রমাণ-পঞ্জী (authorities) নিম্নে দেওয়া গেল :—

(ক) Barbosa Machado—Bibliotheca Lusitana Historica, etc. Vol III, p. 183,

(খ) Catalogo dos MSS da Bibliotheca Publica Evorera Ordenada par J. H. de Cunha Rivara.

প্রথম প্রথম ব্যাকরণে সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, ষত্ব, ণত্ব, অলঙ্কার, এই কয়টি বিষয় আদৌ আলোচিত হয় নাই। হাল্‌হেড ইংরেজী ১৭৭৮ সালে, কেরী ১৮০১ সালে, কীথ ১৮২০ এবং রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে চারিটি ছন্দের নিয়ম সামান্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বেই পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু উহা ঐ বৎসরই বাহির হয়। পরে ১৮৩৪ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় বিস্তৃতভাবে ছন্দের আলোচনা করেন। তার পর ১৮৫২, ১৮৫৭ ও ১৮৬১ সালে ছন্দোবিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়। শেষে ১৮৬৪ সালে মধুসূদন শর্ম্মা ৮৮টি ছন্দের বিস্তৃত আলোচনা করেন। ১৮২০ সালে মথুরমোহন দত্ত কর্ত্তৃক সন্ধি প্রথমে আলোচিত হয়। ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৫ সালের মধ্যে সন্ধিপ্রকরণের পুনরালোচনা হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে শ্যামাচরণ সরকার সন্ধি-প্রকরণের যথোচিত সংস্কার করিয়া, ইহাকে সাময়িক সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তোলেন। ইহার পর সকলেই ব্যাকরণে সন্ধি-বিধি সন্নিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমাসের আদি পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়। ইনি বহুব্রীহি, উপপদ ও কর্ম্মধারয়, এই তিনটি সমাসের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইনি আবার চলিত বাঙ্‌লাপদের সমাস প্রথম অনুশীলন করেন (১৮৩৩)। পরে ১৮৫২ সালে শ্যামাচরণ সরকার সমাসের রীতিমত প্রয়োগবিধি প্রদান করেন। এই সময় হইতে বাঙ্‌লা ব্যাকরণে সমাসের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। রাজা রামমোহন রায় কয়েকটি বাঙ্‌লা প্রত্যয় ও স্ত্রীত্বের নিয়ম করেন। ষত্ব-ণত্বের প্রথম পথ দেখাইলেন শ্যামাচরণ সরকার। ষত্ব ণত্বের বিস্তৃত আলোচনা ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'সরল ব্যাকরণে' দেখা যায়। শ্যামাচরণ সরকারই সর্ব্বপ্রথমে ব্যাকরণে যমক ও অনুপ্রাস এই দুইটি অলঙ্কারের বিবরণ প্রদান করেন। পরে ১৮৫৭ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও কয়েকটি অলঙ্কার সংযুক্ত করেন। অতঃপর ১৮৬৪ সালে জয়গোপাল গোস্বামী ছন্দ ও অলঙ্কারসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা সহ এক সুন্দর গ্রন্থ বাহির করেন। এইরূপে ছন্দ, সন্ধি, সমাস, ষত্ব, ণত্ব, প্রভৃতি বিষয়গুলি ক্রমশঃ ব্যাকরণের মধ্যে একে একে প্রবিষ্ট হইয়া আধুনিক বাঙ্‌লা ব্যাকরণের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে।...বিদেশী পণ্ডিত বীম্‌স্ ১৮৭২-৭৯ সালে এবং হর্ন্‌লে ১৮৮০ সালে বাঙ্‌লার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া তাহার আসল রূপ বাহির করিবার প্রথম প্রয়াস করেন। তার পর ১৮৮১ সালে চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ লিখিবার উদ্যম বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম করেন। তার পর পদ্মনাভ ঘোষাল ভাষাতত্ত্বের ভিতর দিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শব্দতত্ত্বের' দিক্ দিয়া, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'শব্দকথায়', যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি 'বাঙ্গালা ব্যাকরণে', বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও বিধুশেখর শাস্ত্রী বিবিধ প্রবন্ধে বাঙ্‌লা ব্যাকরণের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন।...

(ভারতী, অগ্রহায়ণ)　　শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

চতুরাশ্রমের প্রাচীনত্ব

...জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেও হিন্দুর আশ্রম-বিভাগ বর্ত্তমান ছিল।...প্রাচীনতম উপনিষদের সময়েই আশ্রম-বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই চারি আশ্রমের ক্রমিক সম্বন্ধও স্থির ছিল।...

বিদ্যাভ্যাস, সংসারধর্ম্ম পালন ও সংসার ত্যাগের কল্পনা হইতেই হিন্দুর আশ্রম-ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। 'আশ্রম' নামটি প্রচলিত না থাকিলেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে আর্য্য-সমাজে বিদ্যার্থী, সংসারী এবং সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থেই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, মুনি ও যতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক)　　শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা

শিল্প ও দেহতত্ত্ব

...একটুখানি বুদ্ধি থাকলেই আর্টের ইতিহাস লেখা চলে, কিন্তু যে জিনিসগুলো নিয়ে আর্টের ইতিহাস, তার রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা নয়, রসবেত্তা।...বীজের anatomy দিয়ে গাছের anatomyর বিচার করতে যাওয়া, আর মানুষী মূর্ত্তির anatomy দিয়ে মানস-মূর্ত্তির anatomyর দোষ ধরতে যাওয়া সমান মূর্খতা।...এই যে মেঘের গতিবিধির মতো সচল সজল anatomy, একেই বলা হয় artistic anatomy, যার দ্বারা রচয়িতা রসের আধারকে রসের উপযুক্ত মান পরিমাণ দিয়ে থাকেন।...আকারের বিচিত্রতা দিয়েই রসের বিচিত্রতা বাহির হয় আর্টের জগতে, আকারের মধ্যে নির্দ্দিষ্টতা সেখানে কিছুই নেই।... মানুষের anatomyতেই যদি মানুষ বদ্ধ থাকতো, দেবতাগুলোকে ডাকতে যেতে পারতো কে?...ইউরোপ যে চিরকাল বাস্তবের মধ্যে আর্টকে বাঁধতে চেয়েছে সে এখন কি সঙ্গীতে, কি চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, কবিতায়, সাহিত্যে, বাঁধনের মুক্তি কামনা করছে।...

অন্যথা-বৃত্তি হল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিষ।...কবিতায় বা ছবিতে এই ভাবে চলন্ত রং রেখা রূপ ও ভাব দিয়ে যে রচনা তাকে আলঙ্কারিকেরা গতিচিত্র বলেন—অর্থাৎ গতিচিত্রে রূপ বা ভাব কোন বস্তু-বিশেষের অঙ্গবিন্যাস বা রূপ-সংস্থানকে অবলম্বন করে' দাঁড়িয়ে থাকে না কিন্তু রেখার রংএর ও ভাবের গতাগতি দিয়ে রসের সজীবতা প্রাপ্ত হয়ে আসা-যাওয়া করে।...আর্টিষ্ট রসের সম্পদ নিয়ে ঐশ্বর্য্যবান্, কাজেই রসবণ্টনের বেলায় রসপাত্রের জন্য তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটুলি, সে রসের সঙ্গে রসপাত্রটাও সৃষ্টি করে' ধরে' দেয় ছোট বড় নানা আকারে ইচ্ছা-মতো।...ছবিতেও যেমনি কবিতাতেও তেমনি, ভাবের চাঁদ অনেক সময়ে মানুষের কি আর কিছুর বাস্তব ও বাঁধা ছাঁদ দিয়ে পুরোপুরি ভাবে প্রকাশ করা যায় না, অদল-বদল ঘটাতেই হয়, কতখানি অদল-বদল সয় তা আর্টিষ্ট—যে রসমূর্ত্তি রচনা করছে সেই ভাল বুঝবে আর-কেউ তো নয়।...রচকের অধিকার আছে রূপকে ভাঙতে রসের ছাদে। কেননা রসের খাতিরে রূপের পরিবর্ত্তন প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম।...আর্টিষ্ট যখন কিছুকে যা থেকে তা'তে রূপান্তরিত করলে তখন সে যা-তা করলে তা নয়, সে প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করলে না, উল্টে বরং বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপমূর্ত্তির নিয়মকে স্বীকার করলে প্রমাণ করে' চলল হাতে-কলমে; আর যে মাটিতেই হোক বা তেল-রংএতেই হোক রূপের ঠিক ঠিক নকল করে' চলল, সে আঙ্গুরই গড়ুক বা আমই গড়ুক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু সে দিয়ে যেতে পারলে না, সে অভিশপ্ত হল, কেননা সে বিশ্বের চলাচলের নিয়মকে স্বীকার করলে না, প্রমাণও করলে না, কোন কিছু দিয়ে, অলঙ্কারশাস্ত্রমতো তার কাজ পুনরাবৃত্তি এবং ভ্রান্তিমৎ দোষে দুষ্ট হল। এ যেন এতটুকু খাঁচায় ধরা এমন একটি পাখী যার রসমূর্ত্তি বিরাটের সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে, বচনাতীত সুর বর্ণনাতীত বর্ণ তার। এই পাখীর মালিক হয়ে এসেছে কেবল মানুষ, আর কোন জীব নয়। বাস্তব জগৎ যেখানে সীমা টান্‌লে, রূপের লীলা শেষ করলে, সুর থামালে আপনার, সেইখানে মানুষের খাঁচায়-ধরা এই মানস-পাখী সুর ধরলে, নতুন রূপ ধরে' আন্‌লে অরূপের রূপ—জগৎ সংসার নতুন দিকে পা বাড়ালে তবেই মুক্তির আনন্দে। মানুষ তার স্বপ্ন দিয়ে নিজেকেই যে শুধু মুক্তি দিচ্ছে তা নয়, যাকে দর্শন করছে যাকে বর্ণন করছে তার জন্যে মুক্তি আনছে। আটঘাট-বাঁধা বীণা আপনাকে ছাড়িয়ে চলেছে এই স্বপ্নে, সুরের মধ্যে দিয়ে বাঁশী তার গাঁটে গাঁটে বাঁধা ঠাট ছাড়িয়ে বার হচ্ছে, এই স্বপ্নের দুয়ার দিয়ে ছবি অতিক্রম করেছে ছাপকে, এই পথে বিশ্বের হৃদয় গিয়ে মিলছে বিশ্বরূপের হৃদয়ে, এই স্বপ্নের পথ।...পড়া পাখী যা শুনলে তারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলো, রচয়িতার দাবী সে গ্রহণ করতে পারলে কি? মানুষ যা দেখলে তাই এঁকে চলল, রচয়িতার দাবী নিতে পারলে কি সে?...তারা কেউ এই বিশ্বসংসারে রচয়িতার দাবী নিতে পারলে না, এক যারা স্বপন দেখলে স্বপন ধরলে সেই আর্টিষ্ট বা ছাড়া!

(বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র

...নবগোপাল মিত্র মহাশয় সেকালের স্বাদেশিকতার একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন।...

সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতির এদেশের উপরে কোনও বিশেষ দাওয়াদাবী আছে, ইহা শিক্ষিত-সমাজের মনে উদয় হয় নাই।...এই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়। সেই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-বিবাহবিধির প্রতিবাদ করেন। আর সেই স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন।...

যেমন নামে সেইরূপ ভাবে ও কার্য্যেও ইহা হিন্দুমেলাই হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ সকলে হিন্দু ছিলেন। এই মেলাতে যে-সকল বক্তৃতাদি প্রদত্ত হয়, তাহা সকলই হিন্দু-ভাবের দ্বারা প্রণোদিত ও হিন্দুর গুণ গরিমায় পরিপুষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুপ্রসিদ্ধ ভারত-গাথা—

জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়—

নবগোপাল-বাবুর প্রথম হিন্দু মেলার জন্য রচিত হয় এবং মেলার উদ্বোধনের দিনে গীত হইয়াছিল। স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের গানও—

দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ,
তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র-অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হায়রে দেশের কি দুর্দ্দিন!
ছুঁচ সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশলাই-কাটি তাও আসে পোতে,
খেতে শুতে যেতে প্রদীপটি জ্বালিতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ
বাকল-টেনা ডোর কোপীন।

...জ্যোতি-বাবু ভারতের প্রাচীন শৌর্য্য-বীর্য্যের স্মৃতি জাগাইয়া স্বদেশবাসীদিগকে এই নবযুগের নূতন শৌর্য্য-বীর্য্য সাধনায় প্রবৃত্ত করেন। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সাধনার একটা নূতন পাঠশালা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।. নবগোপাল-বাবু একটি ব্যায়াম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শঙ্কর ঘোষের লেনের মোড়ে নবগোপাল-বাবুর পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল। ইহারই অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে শঙ্কর ঘোষের লেনের ভিতরে ১নং বাড়ীতে নবগোপাল-বাবুর এই "আখড়া" ছিল। এই আখড়াতে বিলাতী ব্যায়ামের সকল সরঞ্জামই ছিল, কিন্তু নবগোপাল বাবু কেবল বিলাতী ব্যায়াম শিখাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। আখড়ার বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে লাঠিখেলা, তরোয়াল-খেলা, গুলেল-খেলা এবং বন্দুক-ছোড়া পর্য্যন্ত শেখান হইত। নবগোপাল-বাবু ঘোরতর ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন, এবং কি উপায়ে ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে ব্রিটিশের শৃঙ্খলমুক্ত হয়, অহর্নিশ তাহারই ধ্যান করিতেন। ভারতবর্ষ বাহুবলে ইংরেজের নিকট হটিয়া গিয়াছে, তাঁহার এই ধারণা ছিল। সুতরাং ইংরেজ তাড়াইতে হইলে এই বাহুবলেরই ভজনা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু অস্ত্রবল ব্যতিরেকে বাহুবল লাভ সম্ভব নহে।

আবার ইংরেজ আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষকে নিরন্ন ও বিবস্ত্র করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং ইংরেজের কবল হইতে স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে না পারিলে দেশের লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে না, অন্নবস্ত্রের অভাবে অনশনে ও রোগে শীর্ণ এবং নিদারুণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়া রহিবে; সুতরাং স্বজাতির বাহুবলের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে হইবে; স্বদেশের বিপণি হইতে বিদেশের পণ্যকে বহিস্কৃত করিয়া দিতে হইবে; দেশের কৃষি ও শিল্পের চরম উন্নতি সাধন করিতে হইবে:—এই সকলই—ব্যায়াম-চর্চ্চা, অস্ত্রশস্ত্রব্যবহারশিক্ষা, স্বদেশের পণ্যজাতের পুনরুদ্ধার—নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের স্বদেশ-পূজার মুখ্য উপকরণ হইয়াছিল। এই-সকল ভাব ও আদর্শ প্রচারের জন্যই তিনি হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন।

হিন্দু-মেলাতে স্বদেশী পণ্য প্রদর্শিত হইত, ব্যায়ামাদির পরীক্ষা হইত, এবং স্বাদেশিকতা উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হইত, পণ্য- ও ব্যায়াম-প্রদর্শকদিগকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করা হইত এবং যথাযোগ্য মূল্যবান পুরস্কারও দেওয়া হইত। বৎসরে একবার করিয়া মেলা বসিত।…তখনও অস্ত্র-আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক-ছোড়া বা তরোয়াল-খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু-মেলার বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তারা পাখী শিকারের ভান করিয়া বন্দুক-ছোড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন। এই হিন্দুমেলাতেই প্রথম নূতন রকমের তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল; ত্রিপুরা জিলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছের খ্যাতনামা ডাঃ মহেন্দ্র-চন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন, মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া—অথবা কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া—মহেন্দ্র-বাবু তখন পটুয়াটুলি লেনে থাকিয়া একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।…শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই তাঁতে তৈয়ারী গামছা মাথায় বাঁধিয়া হিন্দু-মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোকে বলে নাচিয়াছিলেন।…

শেষবারের মেলাতে একটা জাঁকালো রকমের মারামারি হয়। তার পর হইতেই হিন্দু-মেলা বন্ধ হইয়া যায়।..বাহিরের ময়দানে ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন হয়। আমি একখানা চৌকি লইয়া ব্যায়াম দেখিবার জন্য বাহিরে যাইয়া এক জায়গায় বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন আটকোটধারী পুরুষ একটি মেমকে সঙ্গে লইয়া আমার পিছনে দাঁড়াইলেন। পুরুষটি অতি রূঢ়ভাবে আসিয়া আমাকে চেয়ারটা ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন। আমি সে কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তখন সাহেবটি আমাকে চৌকি হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিলেন।… তখন সাহেব-বাঙ্গালীতে পুরাদস্তুর মারামারি সুরু হইল।..তার পর পুলিস আসিয়া হাজির হইল।…বাঙালী যোদ্ধৃবর্গ ইট ছুড়িয়া পুলিসের দলকে আটকাইতে চেষ্টা করিলেন।…সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত মারামারি চলিয়াছিল।…

এই মারামারির সংস্রবে সুন্দরীমোহন এবং আমি ছাড়া আরও দুইজন গ্রেপ্তার হন।…নবগোপাল-বাবুর কুটুম্বের পঞ্চাশ টাকা ও আমার কুড়ি টাকা জরিমানা হয়।..

নবগোপাল-বাবুর একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজ ছিল; নাম National Paper (ন্যাশনাল পেপার)। কাগজখানির ইংরেজী প্রায় আগাগোড়াই ভুল থাকিত। ইহাও তাহার স্বাদেশিকতারই একটা লক্ষণ ছিল। বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না। এই স্বাদেশিকতাই নবগোপাল মিত্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। আর সে যুগের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে হাতে-কলমে এই স্বাদেশিকতার আদর্শটাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এইজন্য বাংলার নবযুগের ইতিহাসে নবগোপাল মিত্র মহাশয় এবং তাঁহার হিন্দু-মেলাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

(বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ)　　　　শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

—

বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

…প্রথম-যৌবনে চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম—যৌবন বিষমকাল। বার্দ্ধক্যের দরজায় আসিয়া শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্ভুত কথা দেখিলাম—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ!

শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বয়সকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান? ইহার উত্তরে রায় রামানন্দ কহিলেন—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ। বৈষ্ণব সাহিত্যে কৈশোর বলিতে প্রস্ফুট যৌবনই বুঝায়।…

এই কৈশোর বা যৌবনকালেই ত মানুষের পূর্ণ বিকাশের ইঙ্গিতটি ফুটিয়া উঠে ..

মানুষই যে দেবতার প্রতিচ্ছবি।..দেবতার প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম আধার পরিপূর্ণ মানুষ যে কি বস্তু তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, বিশুদ্ধ ও প্রস্ফুট যৌবনের মধ্যে। শিশুতেও তাহা দেখি না; বৃদ্ধেতেও তাহা দেখিতে পাই না। যৌবনের ছবিতে রূপের মধ্যে অরূপের লীলা, ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের খেলা, সসীমের মধ্যেই অসীমের টান প্রস্ফুট হইয়া থাকে। এইজন্যই বিশুদ্ধ ও প্রস্ফুট যৌবনকে দেবতার বিগ্রহ বলিয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।…

কোনও বস্তু যখন নিজের প্রকৃতিতে অবস্থান করে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর সঙ্গে যখন তাহা আত্মহারা হইয়া মিশিয়া না যায়, অথবা যতক্ষণ তাহা নিজের প্রকৃতির উৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়া চলে, ততক্ষণই তাহাকে বিশুদ্ধ কহা যায়। .বিশুদ্ধ যৌবন বলিতে যে যৌবন নিজের সহজ প্রকৃতিতে অবস্থিতি করে তাহাই বুঝি। আর পরিপূর্ণ যৌবন বলিতে তাহাই বুঝি যাহার মধ্যে যৌবনের নিত্যসিদ্ধ আদর্শটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাড়া পাইয়া থাকে। ইংরেজী দর্শনে এই নিত্যসিদ্ধ কথাটাকেই eternally realised কহে।..

এই যৌবনকালে অবান্তর কারণে মানুষের বিকাশের ব্যাঘাত না ঘটিলে, তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের সম্ভাবিত পরিপূর্ণ স্বরূপের মানস-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি। মানুষ যে সত্য বস্তু কি, মানুষের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটাই বা কি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আর এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটি রক্ত মাংসের ভিতর দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তুলিলেও রক্ত-মাংসের অতীত। এ বস্তু অতীন্দ্রিয়। এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই মানুষের সঙ্গে দেবতার গুণসামান্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত। দেবতার সঙ্গে মানুষের সমান-ধর্ম্ম বা সমান-গুণ আছে বলিয়াই মানুষ দেবতাকে জানিবার অধিকারী।

এইজন্যই রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছিলেন—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ।

যৌবন-ধর্ম্মের এবং যৌবনসাধনার ইহাই মূলসূত্র। যুবকেরা নিজের যৌবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য যে সাধনাই অবলম্বন করুন না কেন, তাহাকে এই মূলসূত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সাধনামাত্রই উপাসনা। যৌবনের সাধনা করিতে গেলে যৌবনের উপাসনা করিতে হইবে। যৌবনের উপাসনা করিতে গেলে যৌবন যে কি বস্তু, তাহার প্রকৃতি এবং স্বরূপ কি, ইহা বুঝিতে হইবে। যৌবন যে মানবজীবনে আত্মপ্রকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ইহা বুঝিয়া

যৌবনের প্রতি শ্রদ্ধালু ও ভক্তিমান্ হইতে হইবে। যৌবনের সার্থকতালাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু এ বড় কঠিন উপাসনা।

(নব্যভারত, অগ্রহায়ণ) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

জাতীয় উন্নতির উপায়

.. কোনও জাতির প্রতিভা একদিকে বিকশিত হওয়া সে জাতির পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে কালে শিক্ষালাভ করে' সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাঁদের উচ্চতম লক্ষ্য ছিল গভর্মেন্টের চাকরী। কিন্তু দেশের Aristocrat ব্যবসায়ীগণের কি আদর্শ ছিল? তখন কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেকেই ব্যবসা করে' বেশ বড়লোক হয়েছিলেন। সমস্ত উত্তর- ও পূর্ব্ব ভারতের বাণিজ্য কলিকাতা দিয়ে যাচ্ছে, বাঙ্গালীজাতি তেমন উপযুক্ত হলে বা কার্য্যকারিতা ও দূরদর্শিতা থাকলে, এই বাণিজ্যের অধিকাংশই বাঙ্গালীর হস্তগত হত; কিন্তু সর্ব্বনাশ করলে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ঐ জমিদার নাম কেনার প্রবল প্রলোভন। কলিকাতার বড় বড় পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, হাটখোলার দত্ত-পরিবার, পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক ও শীল-পরিবার, রাণাঘাটের পালচৌধুরী, এঁরা অনেকেই ব্যবসা করে' বড়লোক হয়েছিলেন। কিন্তু তার পর জমিদারী কিনে, কোম্পানীর কাগজ কিনে, এঁরা সকলেই ব্যবসা থেকে আস্তে আস্তে সরে' পড়লেন। বাণিজ্য আস্তে আস্তে একচেটিয়া হল মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালার বাহিরের অন্যান্য জাতির। বাঙ্গালীর যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শিখ্‌বার সুযোগ ছিল তাও ঢের কমে' গেল। এই যে আর্থিক পরবশতা, এর জন্য রাজনৈতিক অধীনতাকেই শুধু দায়ী করলে চল্‌বে না, আমাদের প্রকৃত জাতীয় চরিত্রই এর জন্য দায়ী।

...বাঙ্গালার সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন দারিদ্র্য মোচন এবং বিদেশীয় কর্ত্তৃক ধনলুণ্ঠন নিবারণ।...এজন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চল্‌বে না। পরামুখাপেক্ষিতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মস্ত বড় একটা দোষ।...আমরা নিজেরা মানুষ না হলে ভগবান্ বা তাঁহার কোন ভগ্নাংশ এসে কখনও সমাজের শিকল কেটে দিবে না।...শিক্ষা না পেলে মানুষের কার্য্যকরী শক্তি জেগে উঠ্‌তে পারে না, মানুষ সমাজের সেবায় লাগ্‌বার উপযুক্ত হয় না।...

"বর্ত্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান।. বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা প্রকৃতিরাণীর রাজ্যের যতটুকু দখল করতে পারি, ইউরোপ-আমেরিকার লোকে তখনি তাকে কাজে লাগিয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছে।.. এই শক্তির উৎসকে আয়ত্ত করবার জন্য দেশের কোনও প্রতিভাবান্ ছাত্র এই বিষয়ে শিক্ষিত হবার কোন চেষ্টা করছেন বলে' মনে হয় না।...

দারিদ্র্য ঘুচ্‌লেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটা কম্‌বে। কারণ পীড়িত লোক দুবেলা পেট ভরে' খেতে পায় না; এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অতি সাধারণ উপায় অবলম্বন করতে পারে না। সুতরাং রোগের সাথে সংগ্রাম করার ক্ষমতা তাদের ঢের কমে' যায়। তার দৃষ্টান্ত এই যে গঙ্গার দুধারে পাটের কলের বস্তি ও ইংরেজ মার্চেণ্টদের কুঠি; ম্যালেরিয়া এদের ধারে কাছেও ঘেঁস্‌তে পারে না, কিন্তু একটু ভিতরেই গ্রামে অর্দ্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় অর্দ্ধমৃত। ইংরেজ কলওয়ালাদের অর্থ আছে, তারা জঙ্গল কেটে, নর্দ্দমা করে', ম্যালেরিয়া তাড়িয়েছে। বাঙ্গালী অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে উৎসন্ন যাচ্ছে।..

এই সংগ্রামের উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে।

(নব্যভারত, অগ্রহায়ণ) শ্রী মেঘনাদ সাহা

কর্ত্তব্য পঞ্চক

.. প্রথম, দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করা।...দ্বিতীয়, বিজ্ঞান-বলে প্রকৃতিকে জয় করা।.. তৃতীয়, শ্রমগৌরব।...চতুর্থ, অস্পৃশ্যতা দূর করা।..পঞ্চম, দেশকে রোগমুক্ত করা।. .নিশ্চেষ্টতা ও উদাসীনতা দূর করাই স্বরাজমন্দিরে প্রবেশের প্রথম সোপান।

(নব্যভারত, অগ্রহায়ণ) শ্রী সুন্দরীমোহন দাস

ক্রমবিকাশ ও আকস্মিক বিকাশ

..এখনকার কথা Nature creeps and leaps—প্রকৃতি ধীরে ধীরেও চলে, লাফিয়েও চলে। প্রকৃতিতে ক্রমবিকাশও আছে, আকস্মিক বিকাশও আছে। .বাস্তবিক বল্‌তে গেলে revolution আগে, evolution পরে।.

আজ আমাদের এবং আপনাদের নূতন কাজ—সামঞ্জস্য ও সমন্বয়। নবীন বাঙ্গালা ও নবীন ভারতে সামঞ্জস্যের ও সমন্বয়ের নূতন আহ্বান এসেছে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সামঞ্জস্য, সমন্বয় করতে হবে। সমাজে সকল পার্থক্য দূর করে' ধনী-নির্ধনের সামঞ্জস্য, ভদ্র-ইতরের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে।..

আজ আমাদের দেশে এই সমস্যাই উঠেছে—জড়জগতের ও ইতরপ্রাণী-জগতের নিয়ম পালন ক'রে, তাদের নিয়মের অধীন হয়ে আমরা অবস্থা-মত ব্যবস্থা করবো—না, মনুষ্যোচিত অধ্যাত্মনিয়ম স্বীকার করে' আদর্শ বুঝে ব্যবস্থা করবো? বিজ্ঞান আমাদের বলে' দেন জড়প্রকৃতি (matter) কোন্ পথে যায়। যে পথে কম বাধা—সব চেয়ে কম বাধা, the path of least resistance, সেই-খানে সকল জড়শক্তি ধাবিত হয়।. ইথর-তরঙ্গও বাধা পেলে ঈষৎ হেলিয়া চলে। জড়জগতের এই নিয়ম কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে খাটে না। Spiritual law হচ্ছে the path of the greatest resistance—যেখানে যত বেশী বাধা, সেখানে ততই আত্মার গতি স্থিতি ও বিকাশ।

(নব্যভারত, অগ্রহায়ণ) শ্রী বিমলচন্দ্র ঘোষ

'গোষ্ঠীবিহারে' দেশসেবা

.. স্বদেশ-ভক্তি, স্বদেশ-প্রীতি কাহাকেও শিখাইতে হয় না। স্বদেশ-ভক্তি-প্রীতি মনের সাধারণ বৃত্তি। অন্যান্য বৃত্তির মত এই বৃত্তিরও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। নিজের জিনিষকে সকলেই ভালবাসে, নিজের জিনিষের সংরক্ষণের জন্য সকলেরই চেষ্টা হয়। যুবকদের মধ্যে তাহাদের এই সুপ্ত বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।...

যৌবনের অপরিমেয় শক্তি না হইলে বিশ্বের গঠন হয় না।...এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার দিন।...ধর্ম্মপ্রচারে, সমাজ-সংস্থাপনে, রাজনৈতিক অভ্যুদয়ে, কৃষিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের

আলোচনায় এই সংহতিশক্তির দিব্য বিকাশ যে-কোনও উন্নতিশীল জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই।

প্রাচীন ভারত যখন উন্নতিশীল ছিল, আদর্শ ছিল, তখন ভারতেও এই সংহতিশক্তির দিব্য বিকাশ দেখিতে পাই। প্রাচীনভারতে লোকে "গোষ্ঠীবিহার" করিত। নগরবাসীদের সকল কাজের মধ্যে গোষ্ঠীতে যাওয়া একটা প্রাত্যহিক কাজ ছিল;..এই-সমস্ত গোষ্ঠীর উপর নজর রাখিতেন ঋষিরা।..ঋগ্বেদের যুগে 'গোষ্ঠী' না বলিয়া 'সভা' বলা হইত। সভায় অনেক কাজের কথা হইত। গরু ও চাষের উন্নতি লইয়া আলোচনা হইত। পাশা খেলাও হইত।..সভায় তর্কযুদ্ধ হইত, কবির লড়াই হইত। রচনাকুশল, তর্কনিপুণ ব্যক্তিকে পুরস্কারও দেওয়া হইত।...ইহাদেরই নাম হইত 'সভ্য'। এই সভাগুলি দেশেরও অনেক কাজ করিত। এখান থেকে সময় সময় বিচারালয়ের কাজও হইত। ধর্ম্ম নীতি ও সমাজরক্ষার কাজও হইত। রাস্তাঘাট তৈরী করা এগুলি যাহাতে খারাপ না হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা, এই সভার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। নগরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও অসুবিধা নিবারণের জন্য সভার চেষ্টা বড় কম ছিল না। নগরে বা গ্রামে খানা-ডোবা যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তাহার জন্য এই-সকল সভায় আলোচনা হইত। নগরের জল-নিকাশের পথ যাহাতে বন্ধ না হইয়া যায় তজ্জন্য সভা হইতে ব্যবস্থাও হইত। এই সভাই পরযুগে 'সমাজে' পরিণত হয়। নাম পৃথক্ হইলেও ইহার কাজও সভার অনুরূপ ছিল। সমাজও এই রকম দেশের উন্নতিবিধায়ক ছিল।

আজকাল আমাদের দেশের যুবকেরা 'ক্লাব' করিয়া থাকেন।.. ঠিক এইরূপ ক্লাবই সহরে বা গ্রামে গঠন করিয়া যদি পাড়ায় পাড়ায় এক বা ততোধিক স্থাপন করা যায়, এবং তাহাতে অন্ততঃ সেই সেই পাড়ার অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তাহা হইলে এই ক্লাবের দ্বারাই সেই প্রাচীন ভারতের 'গোষ্ঠীর' কাজ অনায়াসে সুসম্পন্ন হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন।..

গ্রামে গ্রামে এখনও অপাঠ্য ও কুপাঠ্য নাটক উপন্যাস ও গল্পের বই লইয়াই লাইব্রেরী হইতেছে। এই লাইব্রেরীগুলিকেও ক্লাবে পরিণত করিয়া, জনসেবা তাহার উদ্দেশ্য করিয়া, মূল্যবান্ অল্পসংখ্যক গ্রন্থ রাখিয়াও এই অনুষ্ঠান সফল করা যাইতে পারে। সহর বহুপল্লীর সমবায়। প্রতি পল্লীতে এক, দুই, তিন, প্রয়োজন বুঝিয়া যত ইচ্ছা, এইরূপ ক্লাব বাড়াইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।...আমোদ যত বিশুদ্ধ হয়, জীবনীশক্তি মানুষের তত বাড়িয়া যায়। এইজন্য, এই জীবনীশক্তিবর্দ্ধক আমোদের সঙ্গে যাহাতে ক্লাবে ক্লাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আলোচনা হয়, আমাদের প্রতিবেশীর ও আমাদের নানা অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হয়, দেশের ভবিষ্যবংশ, সমাজপতি ও সামাজিক যুবক-বৃন্দের কাছে আমরা তাহাই দাবী করি।

(নব্যভারত, অগ্রহায়ণ) শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা

...আমরা কোন দেশবিশেষের ও কালবিশেষের প্রভাবে জন্মেছি এবং সেই দেশের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। কিন্তু যদি আমাদের প্রাণে বিশ্বজগতের অন্য কোথাকার আকাশ বা বাতাস স্পন্দন উৎপাদন না করে, যদি আমরা অন্য দেশের বায়ুতে আড়ষ্ট মৃতপ্রায় হয়ে থাকি, তবে আমরা হয়ত বাঙ্গালী হব, কিন্তু মানুষ হব না।...এরূপ লিলিপুটদের সাধের ধন "জাতীয় ভাব" বা "স্বদেশীত্ব" বেশীদিন বাঁচ্‌বে না।

আমরা শুধু বাঙ্গালী নই, আমরা মানুষও।..যুগে যুগে দেশে দেশে যে মানুষ হয়েছে, কাজ করেছে, স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে, আমরা তাদের ভাই; আমরা বিশ্বের সর্ব্ববিধ সত্যের সর্ব্ববিধ ধনের সমান অধিকারী। যদি আমরা আমাদের নিজ দেশ বা কালকেই সবচেয়ে বড় করে' দেখি, যদি অন্যদেশ বা অন্য যুগের মানবের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করি, তবে আমাদের বাঙ্গালীত্ব পূর্ণত্ব লাভ করবে না।...

শরীরের মত, মনেরও শ্রেষ্ঠ খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে বিশ্ব-সংসারে খোলা বাতাসে খোলা আকাশতলে বাহির হতে হবে। কারণ আমাদের বাঙ্গালীত্ব অপেক্ষা আমাদের মনুষ্যত্ব অনেক বেশী বিস্তৃত এবং বেশী মূল্যবান্। যদি আমরা বিশ্বমানবের সঙ্গে আমাদের বেশভূষা-রীতিনীতির বাহ্যপার্থক্য সত্ত্বেও, তার চেয়ে অধিকতর গভীর অন্তরের একতা অনুভব করতে না পারি, যদি মানবের সনাতন ভাবে, ভাবনায় এবং বলে চল্‌তে না পারি, তবে বুঝতে হবে যে আমাদের মানব হতে এখনও দেরী আছে, আমরা প্রাণীজগতের অন্য এক শ্রেণীর জীব; অভিব্যক্তির সোপানে এখনও পূর্ণমনুষ্যত্ব লাভ করতে পারি নি। এটা গর্ব্ব করবার নয়; এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক্‌লে, এই নিয়ে বড়াই করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে; বিশ্বজগতের, মানবজাতির ক্ষতি হবে না।

যা সত্য, যা সুন্দর, যা শিব, তা দেশ বা কালের সীমায় আবদ্ধ নয়। কোন দেশ বা কাল তার দেহটা, তার ভাষাটা, তার বাহ্য আবরণটা মাত্র দেয়, কিন্তু তার প্রাণটি দেশকালের অতীত। যা মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার চিহ্ন হচ্ছে যে, তা সর্ব্ব দেশে, সর্ব্বযুগে মানবের প্রাণে প্রবেশ করবে, সকলেই তাকে আদর করবে।...

কেবল বিজ্ঞান নয়, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র-বিদ্যা প্রভৃতি কলার চর্চ্চা যতদিন না দেশে পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠ্‌বে ততদিন বাঙ্গালা-সাহিত্য সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হতে পারবে না। লোহা ও পাথরের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন হয়। এক জ্বলন্ত দীপ হতে অপর দীপ জ্বালান যায়, যদি দ্বিতীয়টির প্রকৃত তেল সল্‌তে থাকে। বিদেশী সাহিত্যের কলার উজ্জ্বল জীবন্তরশ্মি হতে যদি আমরা দূরে থাকি তবে আমাদের অন্তরের দীপ সাজান থাকবে, জ্বলবে না। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে—একঘরেদের সমাজ নহে।..

(নব্যভারত, অগ্রহায়ণ) শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

—

দেব-তত্ত্ব

...মানুষ যখন আপনা হইতেই অন্য কোন প্রবল শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে, তখন স্বভাবতঃই সে তাহার নিকট আপনাকে অবনত করিয়া তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করে।...এ হিসাবে উপাসনা ব্যাবহারিক ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। বহুদিক্ দিয়া বহুভাবে উপাসনার বিকাশ হয়। বিশ্বাসের দিক্ দিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে দর্শন পর্য্যন্ত, প্রচলিত ধর্ম্মমত হইতে বিজ্ঞান পর্য্যন্ত, কল্পনার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতে সত্যের প্রতি সম্মান পর্য্যন্ত ইহার প্রসার।...

মানুষ যাহার মধ্যে আপনার স্পৃহনীয় বস্তু বা ভাবের প্রদান-ক্ষমতা নিরীক্ষণ করে, অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধ হইতে নিজের মধ্যে একটা অনুকূল ভাবের উপলব্ধি করে, তাহাকে ভালবাসে। এই ভালবাসার অবস্থা-বিশেষই ভক্তি। ইহা মনেরই এক প্রকার ব্যাপার। উপাসনাও

মনেরই ব্যাপার। উপাস্যের সহিত সম্বন্ধ হইলে মনের যে একরূপ ব্যাপার হয় তাহারই নাম উপাসনা। এ উপাসনা যে কেবল ভক্তির ভাবের মধ্য দিয়াই হয় তাহা নয়, ভক্তির অভাবের মধ্য দিয়াও হয়। এ ছাড়া অন্য যে-কোন ভাবে মনকে একটা বিষয়ে আবদ্ধ রাখিলে তাহার মধ্যে যে ব্যাপার হয় তাহাকেও উপাসনা বলা হইয়া থাকে।...

আরাধনা প্রবৃত্তির মূলে নির্ভরশীলতার ভাব আছে।...একজন ইয়ুরোপীয় মনীষী বলিয়াছেন, ভয় হইতে আরাধনা-প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইয়াছে।...হিন্দুদিগের যাগ যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্য দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করা।...আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন জিনিস শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ধর্ম্ম অনার্য্যভাবাপন্ন হয় নাই। অনার্য্যদিগের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম আর্য্যদিগের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মকে সম্প্রসারিত করিয়াছে। সকল মানবজাতির মধ্যে সাধারণ কিছু আছে। জাতি-সকলের মধ্যে যেমন সাধারণ কিছু আছে, তেমনিই অসাধারণ কিছুও বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ-রূপে আছে। সেই অসাধারণ কিছু জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে।

(যমুনা, অগ্রহায়ণ) শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

তারা

তারাদেবী মোটেই হিন্দুদিগের দেবতা নহেন, তিনি বৌদ্ধদিগেরই একচেটিয়া।...হিন্দুতান্ত্রিকেরা বৌদ্ধদিগের এই অতি শক্তিশালিনী দেবীকে আপনাদিগের দেবমণ্ডলে টানিয়া লইয়াছিলেন।...

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে চতুর্ভুজা তারার যে ধ্যান আছে এই ধ্যানের ভিতর "পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং" ও "মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং" কথা দুটি বড় দরকারী।...

পাঁচটি মুদ্রা কি কি কেবল বৌদ্ধদের তন্ত্রের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক দেবতার পূজায় পঞ্চমুদ্রার প্রয়োজন। বৌদ্ধদের অনেক দেবতা পঞ্চমুদ্রায় বিভূষিতা। দ্বিতীয়, তারার মাথায় অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি আছে।

অক্ষোভ্যের নাম প্রথম সুখাবতী-ব্যূহে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বড়খানিতে নহে, ছোটখানিতে। সেখানি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনাভাষায় তর্জ্জমা হইয়াছিল। তাহার পর হিউয়েন সাংএর প্রথম বৃত্তান্তে অক্ষোভ্যকে পাওয়া যায়। তাহার পর ইনি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মধ্যে একজন প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ বলিয়া গণ্য হন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পুস্তকে ইঁহার খুব প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যানীবুদ্ধগণ বৌদ্ধদের আদি দেবতা। এই-সকল দেবতা হইতে একটি একটি বোধিসত্ত্ব বাহির হন এবং বজ্রযানের অন্য অন্য দেব-দেবীও উদ্ভূত হন। যাঁহারা যে ধ্যানী বুদ্ধ হইতে বাহির হন তাঁহারা সেই সেই ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি মস্তকে ধারণ করেন।...বজ্রানঙ্গ সিদ্ধৈকবীর একজটা পর্ণশবরী চণ্ডরোষণ মহাচীনতারা অক্ষোভ্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া মস্তকে অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি ধারণ করেন। স্রষ্টার মূর্ত্তি মস্তকে ধারণ করা বৌদ্ধদের দেবীরই স্বভাব, হিন্দু দেব-দেবীর স্বভাব নহে।

আমরা এতদিন এই বৌদ্ধ দেবীটিকে ক্রমক্রমে উপাসনা করিয়া আসিতেছি।

এই তারা বৌদ্ধতন্ত্রের পুস্তকে উগ্রতারা মহাচীনতারা বলিয়া পরিচিত। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শাশ্বতবজ্র নামক কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত স্বরচিত সাধনমালায় যে ধ্যান দিয়াছিলেন, হিন্দু পণ্ডিতেরা সেই ধ্যান হুবহু লইয়াছিলেন। তফাতের মধ্যে এই যে বৌদ্ধেরা ভুল সংস্কৃত লিখিতেন, পণ্ডিতেরা তাহা শুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধেরা দেবতাটির দক্ষিণ ও বাম হস্তে যে যে অস্ত্র বা প্রহরণ দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণেরা সেই সেই অস্ত্রের দক্ষিণের গুলি বামে ও বামের গুলি দক্ষিণে দিয়াছিলেন।

তন্ত্র আমাদের দেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ছিল না এবং প্রথম বৌদ্ধেরাই তন্ত্র ভারতবর্ষে প্রচলন করেন। হিন্দুরা ক্রমে তন্ত্র স্বধর্ম্মে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। খৃষ্টীয় ১৬শ ১৭শ শতাব্দীর পূর্ব্বে এক সংহিতা ছাড়া হিন্দুতন্ত্রের অন্য পুস্তকের নামও শুনা যায় না। সাধনমালার পুঁথি আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর হাতের লেখায়। অতএব ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধদের মহাচীনাচার তন্ত্র ও মহাচীনতারার সাধনা হইতে পরে হিন্দুরা পুস্তকখানি ও দেবীটিকে বেমালুম হজম করিয়াছিলেন।

(প্রভাতী, অগ্রহায়ণ) শ্রী বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

—

শূকরবলি

...শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরিকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের বলিকরণে কথিত হইয়াছে "যে দেবতার উদ্দেশে শূকর বলিদান করিলে দেবতার পঞ্চাশ বৎসর প্রীতি হয়।" আরও অনেক গ্রন্থে শূকর বলিদানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।...বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দেবতার নিকট অদ্যাপি শূকর বলিদান হইয়া থাকে।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ থানার অধীন গাঙ্গাটিয়া গ্রামে থলকুমারী দেবতার পূজায় (এই দেবতা প্রাদেশিক) শূকর বলি হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ জেলার কুলবাড়িয়া থানার অধীন পুটিজানা দেবগ্রাম অঞ্চলে বনদুর্গার পূজায় নাপিত ক্ষুরের দ্বারা শূকরের গলা কাটিয়া দেয়। মহামারী নিবৃত্তির জন্য কৌলিকগণ কালীপূজায় শূকর বলিদান করিয়া ঐ শূকর মাটিতে প্রোথিত করিতেন।...মুক্তাগাছার জমিদার মহোদয়দিগের কৌলিক নিয়মানুসারে বনদুর্গার পূজায় একটি শূকর ও একটি শূকরী বলিরূপে উপন্যস্ত হয়। শূকরের গলায় একটু স্থান ক্ষত করিয়া তাহা হইতে কলার অগ্রপাতে ২৪ বিন্দু রক্ত দেওয়া হয়; ঐ পাতে শূকরীটিকে শোয়াইয়া যাট্-যাট্ বলা হয়। পরে শূকর ও শূকরীকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ডোমে অথবা মেথরে ঐ শূকর ধরিয়া লইয়া যায়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুড়াপাড়ার সন্নিহিত গোলাকান্দাই অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তীতে ঠাকুর পণ্ডিতের (প্রাদেশিক দেবতা) নিকট শূকর বলি হইয়া থাকে। নমঃশূদ্রের বাড়ীতে পূজার অনুষ্ঠান হয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণগণও নমঃশূদ্রের বাড়ীতে শূকর পাঠাইয়া কাটান।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যেরবাজার থানার অধীন সোনারগাঁও পরগণায়..."গৌড়পালের" (প্রাদেশিক) পূজায় শূকর বলি দেওয়া হয়। পূজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতই করেন। পূজার পদ্ধতি আছে।...শিশুকালে ছেলেদের শরীর হঠাৎ নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দুর্লক্ষণ দেখা দেয়, এমন অবস্থায় গৌড়পালের পূজা মানসিক করা হয়।

অর্দ্ধশূকর বলি মানসিক করিলে একটি শূকর দিতে হয়। একটি মানসিক করিলে দুইটি দিতে হয়। সাধারণতঃ লোকে উহাকে "গুড়া পালের" পূজা বলে।...এই পূজা বাহিরে উঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজায় শূকরকে চিৎ করিয়া তাহার গলা কাটা হয়।...

পাবনা জেলার অন্তর্গত বেরা থানার অধীন করঞ্জা গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিকট শূকর বলিদান হইয়া থাকে। এই দেবী একটি পাথরের ঢিপি মাত্র। জ্যৈষ্ঠমাসে সিদ্ধেশ্বরীর মেলা হইয়া থাকে।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দা থানার অধীন মান্দা বিলে প্রথম বাইছের দিনে অর্থাৎ বৎসরের প্রথম যেদিন বিলে জাল ফেলান হয়, সেইদিন "শূকরকালীর" পূজা হইয়া থাকে। উহাতে শূকর বলিদান করা হয়। দক্ষিণা-কালীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূজা করা হয়। পূজা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতই করেন। পূজার অন্তে ডোমে শূকর ছেদন করে। কিন্তু শূকর উৎসর্গ করা হয় না। কালীর উদ্দেশে শূকর বলিদান করা হয়, সম্ভবতঃ এই কারণেই দেবী "শূকরকালী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই মহাশয়ের নিকট শূকরকালী সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত বিবরণ জানা গিয়াছে। তাঁহারা পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহের সময়ে রাজসাহীর একস্থানে গাছতলায় একটি ভগ্ন মকরমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। তত্রত্য সাধারণ লোকেরা উহাকে "শূকরকালীর" মূর্ত্তি মনে করিয়া, উহার উপর পুষ্প, সিন্দুর প্রভৃতি প্রদান করিত। ইহাতে মনে হয়, অতি দীর্ঘকাল হইতে ঐ প্রদেশে শূকরকালীর পূজা অর্থাৎ কালীর নিকট শূকর বলিদান প্রচলিত হইয়াছিল।*

(তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ)

শ্রী গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

* কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে চণ্ডীর কাছে শূকরবলির উল্লেখ পাওয়া যায়—
"নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।"

প্রবাসীর সম্পাদক

খুব্রা

বঙ্গদেশে পাট ও তসর, এবং অল্প কিছু কম্বল ছাড়া সব কাপড় কাপাসের হইতেছে। কিন্তু অতি অল্প কাপাস বঙ্গে উৎপন্ন হইতেছে, অন্য দেশের তুলা না পাইলে বঙ্গের কাপড় কুলায় না।

অল্প-স্বল্প নয়, অত্যন্ত অভাব। আমরা সাড়ে চারি কোটি। হারাহারি বৎসরে এক সের কাপড়ের কমে এক জনের চলে না। মোটা সূতার কথা ধরিতেছি। অতএব বর্ষে বর্ষে এগার লক্ষ মণ তুলা চাই।

বঙ্গে জন্মে কত? এক আনা মাত্র। খুঁটিয়া হিসাব করিলে এতও হইবে না। কৃষি-অধিকারের ইং ১৯২০-২১ সালের বৃত্তান্তে দেখিতেছি,—সে বৎসর প্রায় দেড় লক্ষ বিঘায় কাপাস চাষ হইয়াছিল। বিঘায় হারাহারি আধমণ তুলা জন্মে। অতএব আয় ৭৫ হাজার মণ, ব্যয় ১১ লক্ষ মণ।

জেলার হিসাব ধরিলে চিন্তা বাড়ে। দেড় লক্ষ বিঘার প্রায় সব চাটিগাঁয়ের পাহাড়ে অঞ্চলে। তার পর বাঁকুড়া জেলায় ছয় হাজার, মেদিনীপুর জেলায় তিন হাজার বিঘা। অন্য জেলায় শূ—ন্য।

কেতাবী অর্থনীতি বলে, সব জেলায় কাপাস না জন্মিলে ক্ষতি নাই, বঙ্গেও কিছু মাত্র না জন্মিলে ক্ষতি নাই। যে দেশ কাপাসের সে দেশে কাপাস হউক। বঙ্গ জুটের দেশ, জুট জন্মাইতে থাকুক।

কিন্তু কাপড় নইলে নয়, জুটে কাপড় হইতে পারে না। বঙ্গে বস্ত্রের মাত্রিকা (materials) নাই। এই কারণে বঙ্গে চর্‌কা চলে নাই, বস্ত্রবিষয়ে পরাধীন, বঙ্গের তুল্য দেশও বুঝি বা নাই।

কেতাবী অর্থনীতি প্রবোধ দেয়; বলে, জুটের কড়িতে কাপড় কিনিতে পার। ভূমি-বিভাগ, শ্রম-বিভাগ যত করিবে, উৎপন্ন তত বাড়িবে। মধ্য- ও দক্ষিণ-ভারত কাপাস ও কাপড় জন্মাইতে থাকুক, বঙ্গ কোঁচা দোলাইয়া বাবুগিরি করুক।

কিন্তু, বয়স যত বাড়িতেছে, ততই বুঝিতেছি, বুড়া ব্যাসের কথাই ঠিক, সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্, পরের বশ্যতার তুল্য দুঃখ আর কিছু নাই। মান্দ্রাজ আর বোম্বাই আর নাগপুর কাপড় পাঠাইবে, তার পর ঘরের বাহির হইব, শীতে বাঁচিব? একটাও বাঙ্গালার কাছে নয়, বাঙ্গালার বাধ্য নয়। রেল বিগড়াইলে, বণিক্ বিমুখ হইলে বাঙ্গালা কোথায় দাঁড়াইবে? আমাদের চিরন্তন নীতিও এমন নয়। প্রত্যেক গ্রাম নিত্যপ্রয়োজন নিজে যোগাড় করিত, প্রত্যেক গ্রাম স্বাধীন ছিল। ভূমি-বিভাগ ও শ্রম-বিভাগ ভাল বটে, যদি বসুধাকে কুটুম্ব জ্ঞান করিতে পারি। তা ছাড়া বিভাগের সীমা আছে; সকল দেশের, সকল সমাজের পক্ষে সে সীমা এক হইতে পারে না।

আর এত বিচারই বা কেন করিব ? বঙ্গদেশে কাপাস জন্মিত, এখনও জন্মে।

তবে কাপাসের চাষ উঠিয়া গিয়াছে কেন ? ইহার উত্তর কৃষি-অধিকার দিতে পারেন। শুনি কাপস-চাষে পোষায় না। কেন পোষায় না, কি করিলে পোষাইতে পারে, ইহারও উত্তর কৃষি-অধিকার দিবেন। তবে মনে হয়, উত্তম কাপাসের তরে দ্বীপে দ্বীপে অন্বেষণ না করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কাপাস বাঙ্গালার মাটিতে জন্মাইয়া দেখিলে মন্দ হয় না। রামকাপাসের খ্যাতি আছে; কিন্তু ক্ষেতে চাষের যোগ্য নয়, উহা দীর্ঘায়ু। আয়ু হ্রাস করিয়া উহাকে বর্ষায়ু করিতে পারিলে ভাল কাপাসের তরে দ্বীপান্তরে যাইতে হইত না। সে বিষয়ে উদ্যম করিলে এত-দিন কামনা সিদ্ধ হইতে পারিত। যে ইন্দ্রশালি ধানের আবিষ্কারে কৃষি-অধিকারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে, সে ধান দ্বীপান্তরের নয়, 'ইন্দ্র' এই নামও মিথ্যা পায় নাই।

উত্তম বহুফলবান্ কাপাস আবিষ্কৃত হইলে তাহার চাষ দ্রুত বাড়িয়া উঠিবে না। এক আনা আয়কে যোল আনা করিতে কালবিলম্ব অবশ্য ঘটিবে। কিন্তু দেখিতেছি বঙ্গদেশ হইতে ৯।১০ কোটি টাকা বন্যার স্রোতের ন্যায় বর্ষে বর্ষে বহিয়া যাইতেছে। লাখ নয়, কো—টি ; এক কোটি নয়, দুই কোটি নয়, নয়-দশ কোটি ! সে লোক কেমন, যে বন্যার মুখ খুলিয়া রাখে ? সে কেমন লোক, যে হাতের ধন ফেলিয়া দিয়া নূতন ধন অভিলাষ করে ? যদি রাম-কাপাস উত্তম, সে কাপাসের চাষে ক্ষতি কি ? ক্ষেতে না জন্মে, ডাঙ্গায় করি, বাগানে করি। খদ্দর-প্রচার-সমিতি হউন, অন্য উদ্যোগী সমিতি হউন, এই কাপাসের বীজ গ্রামে গ্রামে গৃহস্থকে দিয়া আসিলে, কোথাও বা বেড়া ও পগারে, পতিত ভিটায় ও পুকুরের পাড়ে বুনিয়া আসিলে, দেখিবেন খদ্দর প্রচার ও চর্কা প্রচার আপনি হইতেছে। বিশ-পচিশটা গাছের দশ-পনরটা গোরু-বাছুরের কবলে যাইবে, কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর যখন বাকি দশ-পাঁচটা ফলিতে থাকিবে তখন সে কাপাস মাটিতে ঝরিয়া পড়িবে না, গৃহস্থ নিশ্চয়ই পাড়িয়া লইয়া যাইবে। তখন তাহাকে আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, গ্রামে দশটা গাছের স্থানে দুই শতটা জন্মিতে থাকিবে। তখন চর্কা আপনি আসিবে; সুতাকাটা চলিতে থাকিবে, খদ্দর পরাও নিন্দার কথা হইবে না। চর্কা ধর, খদ্দর পর,—এখন এই উপদেশ বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু কাপাস হাতের কাছে পাইলে আর কিছু বলিতে হইবে না। গ্রামে দুই শত গাছ থাকিলে এক মণ তুলা নিঃসন্দেহে পাওয়া যাইবে। লক্ষ গ্রামে লক্ষ মণ। এগার লক্ষ মণের অন্ততঃ এক লক্ষ মণ আয় দাঁড়াইবে, মেয়েরা কর্ম পাইবে, দেশের ধন নিশ্চয়ই কিছু বাড়িবে।

কিন্তু বুদ্ধিমান্ জন একটা উপায়ে লুব্ধ হয় না, চাষী একটা ফশলের ভরসায় থাকে না, গৃহী এক পুত্রে তুষ্ট হয় না। কারণ নানা বিঘ্ন, নানা অভ্যাপাত আছে। অতএব কাপাস ছাড়া, অন্য মাত্রিকা খুঁজিতে হইবে, পূর্বকালে আর কি ছিল, প্রথমে তাহা দেখিতে হইবে।

যাঁহারা সংস্কৃত-সাহিত্য কিছুমাত্র চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষৌম ও দুকূল নামক বস্ত্রের নাম অবশ্যই পাইয়াছেন। সে বস্ত্র কত উত্তম ছিল, রাজা-রাণীর পরিধেয় হইত, তাহাও জানেন। ক্ষুমা হইতে জাত ক্ষৌম। অতসীগাছের এক নাম ক্ষুমা। অতসীর বাঙ্গালা অপভ্রংশ তিসী। ইহার বীজের নাম মসৃণা, বাঙ্গালায় মসিনা। অর্থাৎ অতসী গাছের ছালের আঁশ পাকাইয়া সুতা হইত ; সে সুতা বুনিয়া ক্ষৌম হইত। উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম ছিল দুকূল।

যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্য কিছুমাত্র চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা খুঞা নামক কাপড়ের নাম অবশ্যই পাইয়াছেন। সে কাপড় মোটা হইত বটে, কিন্তু ক্ষৌম ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন ভূমি+ইয়া=ভূমিয়া হইতে ভূঞা নাম, তেমন ক্ষুমা+ইয়া=ক্ষুমিয়া হইতে খুঞা নাম উৎপন্ন হইয়াছিল। ক্ষুমা-জাত ক্ষুমিয়া; জাত এই অর্থে বাঙ্গালায় 'ইয়া' প্রত্যয় হয়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ব্যাকরণের সূত্র ধরিয়া 'ক্ষৌম' আর 'খুঞা' এক হইতে পারে বটে, কিন্তু ক্ষৌম যে পট্টবস্ত্র, আর অতসীর ফুল পীতবর্ণ, তিসী বা মসিনা-গাছের ফুল আকাশ-বর্ণ। তাঁহারা সংস্কৃত-কোষ দেখাইয়া ক্ষৌম ও দুকূল যে পট্টবস্ত্র, তাহা প্রতিপন্ন

করিবেন। আর আতসী নামক গাছ দেখাইয়া বলিবেন সে গাছ মসিনার গাছ নহে। কি গ্রহবৈগুণ্যে এই ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা এখানে চলে না। ক্ষুমা অর্থে পরে শণ-গাছও হইয়াছিল। তখন শণ নামও ছিল। অজ্ঞ জনে ফাঁপরে পড়িয়া বনশোণার (বন্য শণ) নাম আতসী রাখিয়া দুই কূল রক্ষা করে।

পূর্বকালে বস্ত্রের আর-এক মাত্রিকা ছিল। সেটা ভঙ্গা বা ভাঙ্গ (বা গাঁজা) গাছের ছালের আঁশ। ছিল, না বলিয়া, এখনও আছে, বলিতে পারি, যদিও পশ্চিম হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে গিয়া ঠেকিয়াছে। ক্ষুমা ও শণ লইয়া যেমন ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, এদেশে ও ইয়ুরোপে ভঙ্গা ও শণ লইয়া তেমন ঘটিয়াছে। ভঙ্গাকে শণ মনে করিয়া গ্রীকেরা ভঙ্গার নাম রাখিয়াছিল cannabis, ইংরেজীতে হইয়াছে hemp। কিন্তু যখন ভ্রম ধরা পড়িল, তখন শণের নাম sunn hemp, Indian hemp হইয়া গেল। কাঁঠালের আমসত্ত্ব সব দেশেই আছে। যাঁহারা ইহাতে তুষ্ট না হইবেন, তাঁহারা আমার লিখিত Textile Industry in Ancient India (Journal of the Bihar and Orissa Research Society, June 1917) পড়িতে পারেন।

এ-সব কথা থাক, কাজের কথা হউক। বলিতেছিলাম, দেশে বস্ত্রের নানা মাত্রিকা ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে কার্পাস-বস্ত্র অল্প হইত। কোষকীট হইতে পট্ট, মেষের লোম হইতে ঊর্ণা, কাপাসের ফল হইতে কাপাস, জানি। কিন্তু ভঙ্গা হইতে ভাঙ্গ্য, ক্ষুমা হইতে ক্ষৌম, অজ্ঞাত হইয়াছে। শণ হইতে শাণ পরিধেয় সুখকর নয় বটে, কিন্তু এখনও গ্রামে শণ-চট দুর্লভ হয় নাই। জুট প্রসারিত হইয়া শণের যেমন হানি করিতেছে, কাপাস-কাপড়ও ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষৌম ও ভাঙ্গ্য ভারত হইতে লুপ্ত করিয়াছে। বঙ্গদেশে ভঙ্গার চাষ গবর্মেণ্টের আয়ত্ত। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের দেশে, কাশ্মীরে, কুমায়ুন ও গঢ়বাল অঞ্চলে ভঙ্গার চাদর কয়েক বৎসর পূর্বে পাওয়া যাইত। এখন পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। পঞ্জাবে অলসীকা কাপড়া এখন নাম মাত্র আছে, যদিও সে কাপড় অতসীর না হইয়া ভঙ্গার হইত। সস্তার বিলাতী কাপড় সর্বব্যাপী মারবাড়ী বণিকের স্কন্ধে চড়িয়া অলিগলি, পাহাড়-পর্বত ছাইয়া ফেলিয়াছে।

ইংরেজী cotton কার্পাসবস্ত্র, canvas (যে নাম হইতে কেম্বিসের বেগ) ভাঙ্গ্য, linen ক্ষৌম। ভাঙ্গ্যের এক প্রধান গুণ, রোদ-জলে শীঘ্র জীর্ণ হয় না। এই হেতু ইহাতে জাহজের পাইল ও দড়া হইয়া থাকে। ক্ষৌমের নানা গুণ। ইহা কার্পাস অপেক্ষা স্থায়ী ও মসৃণ। অ-ত-সী নামের এক ব্যুৎপত্তি, যাহা শীঘ্র টস্‌কে না। উপরে লিখিয়াছি, কালে ক্ষৌম ও দুকূল দুষ্প্রাপ্য হইলে এই দুইকে পট্টবস্ত্র মনে করিত। ইহাতেই দেখা যাইবে ক্ষৌম কত উত্তম হইত।

ইয়ুরোপ এখন আমাদের কাপড় যোগাইতেছে। সে দেশে প্রাচীনকালে বস্ত্রের একমাত্র মাত্রিকা ছিল ঊর্ণা। চীন ও ভারতবর্ষ হইতে পট্টের সন্ধান গিয়াছে। কোষকৃমির (গুটি-পোকার) উদর হইতে ক্ষীর নির্গত হয়। সে ক্ষীর বাতাসে শুখাইয়া পট্টসূত্র হয়। এই হেতু পাটের এক নাম ক্ষীরোদরী, অপভ্রংশে গরদ। গ্রীকেরা চীনাদিগকে seres বলিত। ইহা হইতে silk, sericulture প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু চীনারা seres নাম কেন পাইয়াছিল তাহার সঠিক সংবাদ অজ্ঞাত। আমার মনে হয়, সং ক্ষীর হইতে seres, ক্ষীরোদ-সাগর white sea। অর্থাৎ এদেশ হইতে silk এর জ্ঞান ইয়ুরোপে গিয়াছে।

ভঙ্গার আদি-স্থান হিমালয়ের পশ্চিম। সেখান হইতে রুশিয়া দিয়া ইয়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। এখন সেখানে প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। উপরে লিখিয়াছি, ইংরেজী hemp নাম cannabis নামের, এবং cannabis নাম সং শণ শব্দের অপভ্রংশ। অতএব ভঙ্গার জ্ঞান ইয়ুরোপে এ দেশ হইতে গিয়াছে।

অতসীর ইংরেজী নাম flax, ক্ষৌমের নাম linen। এই দুই নামে ভারতের নিকট ঋণ ব্যক্ত নাই। কিন্তু অতসীর আদিভূমি ইয়ুরোপ নয়, পারস্য হইতে পারে। কিন্তু পারস্য হইতে গিয়াছে, কি ক্ষৌম আকারে ভারত হইতে গিয়াছে, তাহা বলা কঠিন।

ইংরেজী cotton সম্বন্ধে সন্দেহ-মাত্র নাই। সং কর্তন (সূত্রকর্তন) আরবী ভাষা দিয়া cotton হইয়াছে।

আমাদের দেশে বস্ত্রের এত-প্রকার মাত্রিকা থাকিতে আমরা কাপড়ের ভিখারী হইয়াছি। আমরা খুঞা না ধরিলে রক্ষা পাইব না।

ই° ১৯২০.২১ সালে বঙ্গদেশে মসিনা চাষ তিনলক্ষ আটাত্তর হাজার বিঘায় হইয়াছিল। তন্মধ্যে

নদীয়া জেলায়	১১৪ হাজার বিঘায়
মুর্শীদাবাদ	৩৯ ,,
রাজশাহী	৩৬ ,,
পাবনা	৩৩ ,,
যশোর	৩০ ,,
নোয়াখালী	২১ ,,

ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের দুই-চারিটি জেলা ছাড়া সব জেলাতেই মসিনার চাষ আছে। সে বৎসর চাষ কম হইয়াছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বিঘায় নাকি হইয়া থাকে।

সব কিন্তু মসিনা-বীজের নিমিত্ত, অংশুর নিমিত্ত কোথাও হয় না। তিসীর সূতা ও কাপড় হয়, বোধ হয় কোনও চাষী জানে না। কৃষি-অধিকারে জানা আছে বটে, কিন্তু মসিনাগাছের অংশু ভাল নয় বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। কথাটা এই, যে গাছে মসিনা ভাল হয়, সে গাছে অংশু ভাল হয় না। এক গাছের অনেক গুণ প্রায় ঘটে না। কিন্তু তিসীগাছেও তাই কি না, ইয়ুরোপের নয়, এ দেশের গাছের, তাহা দেখা হইয়াছে কি না, জানি না। বিহারে বেলজিয়াম হইতে অতসীপ্রাজ্ঞ আনাইয়া কয়েকবৎসর পুষিয়া জানা গিয়াছে সে দেশের মাটি অতসীর উপযুক্ত বটে। অর্থাৎ পুরাতন কথা নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মগধে ক্ষৌম হইত, বঙ্গের দুকূল শ্রেষ্ঠ ছিল, এ সব ইতিহাসে লেখা আছে। অতসী হইতে ক্ষৌম হইত, ইহা না জানাতেই ইয়ুরোপের কৃষিবিদের জ্ঞান লইয়া আমাদের কৃষি চলিতেছে। তা ছাড়া, যাহারা বস্ত্রের ভিখারী, তাহাদের পক্ষে উনিশ-বিশে কি আসে কি যায়। বস্ত্রের মাত্রিকা চাইই-চাই এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে উপায় আবিষ্কৃত হইত। আমি বাজারের মসিনা বাগানে বুনিয়া দেখিয়াছি, অংশু ভাল হয়। গাছে বীজ পাকিবার আগে ও পরে অংশুর যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ হয়, কিন্তু সে প্রভেদ সহসা ধরিতে পারা যায় না। অংশু মোটা হউক, আমরা দুকূল চাই না, খুঞা পাইলেই তুষ্ট।

মসিনা বিঘায় দুই মণ আড়াই মণ হয়। ৭১-৮১ টাকা মণে ২০১ টাকার ফশল। (বিঘায় কাপাসেও প্রায় তাই হয়।) কিন্তু বিঘায় কত ক্ষুমা হইতে পারে, তাহা আমার জানা নাই। যদি এক মণও হয়, তাহা হইলেও ২০১ টাকার কম নয়।

আমি যে অতসীর গাছ পাইয়াছিলাম তাহা ভাল বাড়ে নাই। মাটি বেল্যে, বোনার সময়ও অতীত হইয়া গিয়াছিল। মেটেল জমিতে ভাল হয়। বর্ষান্তেই বীজ বুনিবার প্রশস্ত কাল। তিসী-চাষে একটা বড় সুবিধা আছে, গোড়ায় জল বসিলে তত ক্ষতি হয় না। কোথাও কোথাও ক্ষেতে ধানের সারির মাঝে তিসী-বীজ বুনিয়া দেওয়া হয়। তিসী-চাষ দেশে নূতন নয়, যে, সবিশেষ লিখিতে হইবে।* তবে একটা কথা এই যে মসিনার তরে গাছ দূরে দূরে জন্মিলে ভাল, আঁশের তরে গাছ ঘন জন্মিলে ভাল। বীজ ঘন বুনিলে গাছে ডাল হইতে পায় না, আঁশ সোজা হয়। শণ ও জুট চাষেও এইরূপ। অতএব ইহাও নূতন নয়।

বস্তুতঃ শণ-চায যেমন, তিসীর চাষও তেমন। যখন নীচের পাতা হলুদা হইয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, তখন উপড়াইয়া আটি বাঁধিয়া কয়েকদিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। গাছে বীজ পাকিবার পূর্বেই গাছ উপড়াইতে হয়। কয়েকদিন পড়িয়া থাকিলে বীজ একটু ডাঁট হয়, সে বীজ হইতে তেল বাহির করা সোজা হয়। পরে বুনিবার নিমিত্ত বীজ চাহিলে গাছ এত শীঘ্র উপড়াইলে চলিবে না। সে কথা সবাই জানে। আটি শুখাইয়া আসিলে ধান ঝাড়িবার মতন আছড়াইয়া ফল ও বীজ পৃথক্ করিতে হয়। এসময় গাছগুলি আঁচড়াইতে পারিলে আরও ভাল। কারণ তাহাতে ফেঁকড়া ডাল-

* জল নিকাশের অভাবে উত্তরবঙ্গে যে দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই শুনিয়াছি। রবি-ফশল করিয়া লোকক্ষয়ের উপায় হইয়াছে। তথাপি বোধ হয় প্রচলিত ফশলের বীজ পর্যাপ্ত পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ জলমগ্ন ভূমিতে যে কাদা (পলি নয়) জমিয়াছে, তাহাতে সে-সব ফসল ভাল জন্মিবার আশা নাই। মসিনা বুনিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। ভিজামাটিতে মসিনা বুনিবার এখনও সময় আছে।

পালা পৃথক্ হয়, পরে কাজ সোজা হয়। ইহার পর তিনটি কাজ আছে। (১) ডাঁটা হইতে ছাল পৃথক্ করা, (২) ভিতরের কাঠ পৃথক্ করা, (৩) ছালের আঁশ বাহির করা। প্রথম কাজে শণ ও জুট যেমন জলে পচাইতে হয়, তিসীর আটিও তেমন পচাইতে হয়। ইহার পর ভাল জলে আছ্ড়াইয়া কাচিয়া ধুইয়া শুখাইয়া কাঠ বাছিয়া ফেলিতে হইবে। প্রথমে মুগুর দিয়া পিটিয়া ভাঙ্গিয়া লইলে হাত-বাছাই সোজা হয়। শণ ও জুটে এই দ্বিতীয় কাজ শেষ হইলেই আর কিছু করিতে হয় না। কিন্তু আমরা তিসীর সূতা করিতে চাই। কাজেই পরস্পর-সংলগ্ন আঁশগুলি যত সরু সরু হয়, ততই সরু সূতা পাওয়া যাইবে। কাপাস-তুলা ধুনিতে হয়, নইলে বোআ পৃথক্ হয় না, চাপ বাঁধিয়া থাকে। তিসীর আঁশ লম্বা, সুতরাং ধোনা চলে না। জাল বুনিবার সরু দোড়ী করিবার শণ কত যত্নে তৈয়ার করিতে হয়। তিসীর সূতা করিতে আরও যত্ন চাই। লোহার চিরণী পাইলে আঁচ্ড়াইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁশগুলি সহজে পৃথক্ করিতে পারা যায়। লোহার কাঁটার চিরণী করিয়া লওয়া কঠিন নহে। অভাবে পিটিয়া পিটিয়া তুলা পিজিবার মতন তিসীর আঁশ আঙ্গুল দিয়া পিজিয়া লইতে হইবে। এখন হাত খানেক লম্বা তিসীর নুড়ী হইবে। ইহার পর সূতা কাটা। চরকায় চলিবে না, তাকুড়ে কাটিতে হইবে। প্রথম প্রথম তাকুড়ই ভাল। পরে তিসীর সূতা কাটার নিমিত্ত চরকা গড়া কঠিন হইবে না।

পিটিয়া আঁচ্ড়াইয়া পিজিয়া তত সরু আঁশ পাওয়া যায় না। চাপ কিছু কিছু থাকে, ফলে সূতা মোটা হয়। সে সূতায় যে কাপড় হইবে, তাহাকে খুঞা বলি। ক্ষৌম করিবার সূতা আরও সরু হইবে, এবং সরু পাইতে গেলেই আঁশ আরও পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবে। লতাপাতার পাঁশের ক্ষার-জলে তিসীর নুড়ী ফুটাইয়া লইলে চাপের আঠা গলিয়া যায়। তখন আঁশ আরও সূক্ষ্ম পাওয়া যায়, শাদা হয়, উজ্জ্বল হয়। ক্ষৌমের দীপ্তি কাপাস-কাপড়ে নাই, গরদে আছে।

উপরে দেখা গেল খুঞা পাওয়া কঠিন নয়, ক্ষৌম করাও কঠিন নয়। যে যে কাজের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার একটাও নূতন ও অজানা নয়। এই বৎসরই মসিনার গাছ লইয়া খুঞা করিবার উদ্‌যোগ করিলে আগামী বৎসরে সব কাজ সোজা হইবে। কৃষকের ক্ষতি কিছুই নাই, বরং লাভের আশা আছে। তেল কিছু পাইবে, গোরুতে খইল পাইবে, গোরুর দোড়ী, গায়ের চাদর সবই হইবে।

কোনও উদ্‌যোগী সমিতি বা জমিদার নাই কি, যিনি প্রাচীন ক্ষৌম উদ্ধার করিতে পারেন? অথর্ব-বেদের কাল হইতে যে ক্ষুমা ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল, সে ক্ষুমা আর আসিবে না কি? কাপাস নাই; আর কিছু চাই ত? সেকালে মসিনার তেলও অজ্ঞাত ছিল না; দুই জাতের উল্লেখও পাই না। একই বীজের গাছে তেল হইত, ক্ষৌমও হইত। তিনশত বৎসর পূর্বের পশ্চিম-বঙ্গের কবিকঙ্কণ আর পূর্ববঙ্গের বংশীদাস খুঞার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মাত্র দেড় শত বৎসর পূর্বে ভারতচন্দ্র খুঞা-তাঁতীর নাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিবাস হুগলী জেলায় ছিল। কিন্তু কি দুর্দৈব, খুঞা-তাঁতীর নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। সে খুঞা শণ-চট কি তিসী-চট, সে সন্দেহ কেহ কেহ করিতে পারেন, কারণ পরবর্তী কালে শণকেও ক্ষুমা বলিত। খুঞা-তাঁতীর সংবাদ না পাইলে তাহারা শণের কাপড় কি তিসীর কাপড় বুনিত, তাহা ঠিক জানা যাইতেছে না। সে ইতিহাস থাক, এখন প্রকৃত ক্ষৌম পুনরাবির্ভূত হউক।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

বুকের ভাষা

সে ছিল মূক। শব্দ-সমুদ্রের তরঙ্গ এসে বারবার তার শ্রবণ-বেলায় শঙ্খধ্বনি কর্‌ত,—সে তার কণ্ঠ-দ্বার মুক্ত করে' আগত অতিথিকে স্বাগত অভিনন্দন জানাতে পার্‌ত না। সাগরের ঢেউ সাগরে ফিরে যেত।

একদিন, সেদিন বসন্তের প্রভাত। দিকের বীণার দুটি তারই সেদিন পরিপূর্ণ রাগে সমান বেজে উঠেছিল—আলোকের ও গানের। সে তখন দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু, হায় রে! দৃষ্টি দিয়ে সে আলোর দেবতাকে পুলক নিবেদন কর্‌লেও গানের দেবতাকে প্রাণের প্রণাম জানাতে পার্‌ছিল না। নীরব রোদনে আঁখি-দুটি শুধু ছল্‌ছল্ কর্‌ছিল,—আর, থেকে থেকে বুকখানি শুধু কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল।

কত পথিক কতদিন তার দুয়ার দিয়ে চলে' গেছে, কতবার সে জল-ভরা চোখের মৌন মিনতি জানিয়েছে তাদের, কেউ বা একবার চেয়ে, কেউ বা না চেয়ে, কেউ একটুখানি দাঁড়িয়ে, কেউবা না-দাঁড়িয়ে আপন মনে আপন কাজে চলে' গেছে সব একে-একে—বুকের বেদনা তার কেউ বুঝেনি এতটুকু—মুখের কথাতেও কেউ তাকে দিয়ে যায়নি একটা সাধারণ সান্ত্বনা।

সহসা অদূরে কার পায়ের ধ্বনি জেগে উঠ্‌ল পথের ঝরা-পাতায় ফুলের ঝরার মতন মৃদু-লঘু,—বাতাস-কাঁপা ফুটন্ত যূথির ঝাড়ের মত কার শুভ্র উত্তরীয়-প্রান্ত তার দৃষ্টির পথে দুলে উঠ্‌ল। পথে যেতে যেতে মূকের মুখে ক্ষণিক চেয়েই কোন্ পথের-পথিক অজানা দরদী এ চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"বলো, বলো ওগো, কী বল্‌তে চাও, বলো!"

মূক তার মুখখানি নত করে' দাঁড়াল, অশ্রুজল গোপন কর্‌বার জন্যে।—একটা হর্ষের ব্যথায় বুকখানি তার দুরু-দুরু কাঁপ্‌ছিল!

পথিক আবার তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"ওগো, বলো তোমার যা বল্‌বার আছে। তোমার মুখে যে লেখা আছে, তোমার অনেক কথা আছে, অনেক ব্যথা আছে!"

মূক শুধু অশ্রু-সজল মুখখানি তুলে' স্থিরচোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল—ওগো, সে যে মূক! কণ্ঠ কাঁপ্‌চে, কিন্তু 'এস' 'এস' বলে' একটিবারও ত সে মুখের ভাষায় ডেকে' উঠ্‌তে পার্‌লে না। হ্যাঁ, বল্‌বার কিছু আছে বইকি তার! কিন্তু, কেমন করে' বল্‌বে সে, জানো কি? চোখের চাওয়ায় যতটুকু সে বল্‌তে পারে, বলেছেই ত, বল্‌ছেই ত, আরো বল্‌তে চাইছেই ত সে,—কিন্তু ওগো তুমি মুখের ভাষার দেশের মানুষ, তুমি যে সে কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না!

কিন্তু ভাব-দরদী পথিক তার সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌লে গভীর হৃদয়ের ব্যথার মধ্য দিয়ে। একটুখানি করুণ হেসে বল্‌লে,—"আহা! তুমি মূক! কিন্তু তা বলে' দুঃখ কোরো না। ভাষা শুধু নেই ঐ পাখীর কলতানে, প্রবাহ-জল-রবে,—ফুলের গানে, আলোর বীণেও ভাষার ঝঙ্কার পাচ্চি। তোমার মুখের রঙে ঠোঁটের রাঙায় সেই ফুলের গান ফুটে উঠ্‌চে,—তোমার চোখের চাওয়ায় সেই আলোক-স্বর্ণতন্ত্রীর সুর-ঝর্‌না ঝরে' পড়্‌চে।"

মূক তার আঁচল তুলে চোখের জল মুছে সেই কান্না-ভেজা আঁচলখানি বুকের উপর চেপে ওষ্ঠ-পুটে রজনী-গন্ধার মৃদু হাসি হেসে' মুখে-পড়া চুলগুলি বাঁ হাতে সরিয়ে দিয়ে মুখখানি আরো-একটু নত করে' তাকে ইঙ্গিতে জানালে,—"দুঃখকে অস্বীকার কর্‌ব না; কিন্তু এই দুঃখের কাঁটা-পথ দিয়েই তুমি এসেচ আমার জীবনের প্রথম পরম সান্ত্বনা!...সেই ব্যথার গৌরবে আমার বুক ভরে' গেছে। আমার কান্না-ভেজা হৃদয়খানি আমি তোমাকেই দিলাম—আমার ব্যথার গৌরবের প্রথম পূজা!"

পথিক তার একখানি হাত ধরে' হাতখানি আপন কর-তলে একটু চেপে আবার ছেড়ে দিয়ে মুখের দিকে পূর্ণ চোখে চেয়ে বল্‌লে,—"ওগো আমার পথে-পড়ে'-পাওয়া শিউলি-ফুল, তোমার পূজা আমি গ্রহণ কর্‌লাম। কিন্তু, আমি চল্‌লাম। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো। আমি চল্‌লাম—তোমার বাক্-এশ্রাজের মুখর মীড়ের ছড়ের সন্ধানে!"

মূক তার হাত ধরে' ছলছল্ চোখে চেয়ে তাকে অনেক বারণ করূলে, কিন্তু সে তা' শুন্‌লে না,—বসন্ত-প্রভাতের মত ধীরে ধীরে পথের রৌদ্রে মিলিয়ে গেল।

(২)

শরতের বেলা-শেষ। জানালার শার্শি বেয়ে যে অপরাজিতা লতাটি লতিয়ে উঠেছিল, ছায়া-দীঘির স্নিগ্ধ বাতাসে দোল খেয়ে সেটি দুলে' দুলে' উঠ্‌চে। সেই অপরাজিতা ফুলের সাথে অপরাজিতার মতই নীল-ঘন কার নয়ন দুটি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল—নিমেষ-হারা প্রতীক্ষায়।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে ক্রমে নেমে আস্‌ছিল বদ্ধ বেণীর মুক্তির মত—কালো চুলের মুক্ত-ধারা। আকাশ তারার মোতি দিয়ে তার সিঁথি সাজাতে সুরু করূলে। আর জানালার ধারে মূকের চক্ষুদুটি নীহার-জলে ভিজে উঠ্‌ল—দীঘির জলের নীলোৎপলের মত।

একটা করুণ সৌরভে চারিদিক ভরে' উঠ্‌তেই ধীর মর্ম্মরের মত কার পায়ের শব্দ পথের তৃণে বেজে উঠ্‌ল,—তার বলাকার মত উত্তরীর শাদা প্রান্ত দেখা গেল। দুয়ারে এসে দাঁড়াল—সেই পথিক। তার হাতে একটি গন্ধ-ভুর্-ভুর্ কেয়া-ফুল— প্রায় মুদিত।

পথিক বল্‌লে—"আমি ফিরে এসেচি হাতের এই কেয়া-ফুল নিয়ে। তপস্যা-তুষ্ট দেবতা এই ঘুমিয়ে-পড়া কেয়ার কুঁড়িটি আমার হাতে দিয়ে বলেছেন, 'মুখর বর্ষার গভীর ব্যথার গোপন মাণিক এই কেয়া তোমাকে দিলাম—তোমার শরৎ-পূর্ণিমার সার্থক মিলনের উপহার! এর মুদিত পাপ্‌ড়ির পরতে পরতে ধারা-শ্রাবণের শত কল-গান ঘুমিয়ে আছে। শিশির-ঝরা কোজাগরের নিশীথ-জ্যোৎস্না-তলে অশ্রুজল-ধারায় এর অভিষেক করূলে এর সব কুঁড়ি ফুটে উঠ্‌বে, এর সমস্ত গন্ধ ছুটে বেরুবে, এবং এর সুপ্ত কল-গান আবার জেগে উঠ্‌বে—এই কেয়া-ফুলের মতই বেদনা-করুণ স্নিগ্ধ-শ্যাম হৃদয়-খানি যার তারি নীরব মুখের নব-স্ফুট কথার মধ্যে। ওগো এই নাও সেই কল্প-কেয়া; কিন্তু সাবধান,—দেখো যেন মাটির ছোঁয়া লাগে না! তাহ'লে হৃত বাক্ ফিরে পেলেও, সে বাক্ দণ্ড-কালমাত্র স্থায়ী হবে।' "

মূক তার প্রিয়তমের হাত থেকে সেই দেব-দত্ত কুসুমটি নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

(৩)

কোজাগরের জাগর-যামিনী। তারা দুজনে পাশা-পাশি জেগে বসে' ছিল দুয়ার খুলে দিয়ে সাম্‌না-সাম্‌নি পূর্ণিমাকে মুখোমুখি করে'।

মূক ভাব্‌ছিল,—"ঐ যে সুন্দর চাঁদের আলো স্বর্গ-পারাবতের পাখা-ঝরা হাল্‌কা পালকের মত চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্চে, আকাশের নীল-কাপাস-ফাটা শুভ্র কোমল তুলার মত রাশি রাশি এলিয়ে পড়্‌চে, ওর কি কোন অর্থ নেই—বাণী নেই? কিন্তু আমি শুন্‌তে পাচ্চি; ওর বাণী স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারূচি কি না জানিনে, কিন্তু বেশ শুন্‌তে পাচ্চি আমার সর্ব্বাঙ্গের শ্রুতি দিয়ে। শুধু কেবল চাঁদের আলোয় নয়, ঐ যে তারায় তারায় কথার কাঁপন দেখ্‌চি, বাতাসে বাতাসে ব্যথার-গন্ধ-ভরা কথার স্পর্শ পাচ্চি,—নীহারে নীহারে অশ্রু-উৎসার ঝঙ্কৃত হচ্চে!...কিন্তু মানুষ তবু কেন চায়, এই সুরের কথা ছেড়ে চীৎকারের কথার কোলাহল?"

পথিক তার মুখের দিকে চেয়ে বসে' ছিল; বল্‌লে—"সুন্দরি! আমি দেখ্‌চি তোমার মধ্যে আর-এক সুন্দর পূর্ণিমার অভিব্যক্তি! তোমার প্রতি-অঙ্গে রূপের জ্যোৎস্না,—তোমার মুখে বিকশিত পূর্ণচন্দ্র!"

অদূর আকাশ দিয়ে দুটি মুখর পাপিয়া ভেসে যাচ্ছিল। মূক ডানহাতখানি আকাশের দিকে তুলে বাঁ-হাতখানি কণ্ঠে ছুঁইয়ে ইঙ্গিতে জানালে,—"হায় বন্ধু! আমার কণ্ঠ-আকাশের বাক্য-পাপিয়া চিরনীরব!"

যাম-ঘোষ ঘোষণা করূলে,—নিশীথ-রাত্রি। তারা দুজনে তাড়াতাড়ি বাইরে নেমে গিয়ে জুঁই-ঝাড়টার পাশে দাঁড়াল।

পথিকের মুখের দিকে একটিবার স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে মূক তার হাতের কেয়াফুলটি শিউরে-ওঠা বুকের উপর চেপে ধরূলে—অনুভূতি চম্‌কে উঠ্‌ল—ব্যথা বেজে উঠ্‌ল—নয়নে ধারা-শ্রাবণ কেঁদে উঠ্‌ল অঝোর-ধারায়! মূক বুকের কেয়া তুলে ধরূলে— সেই রোদন-ধারার তলে।

পথিক বল্‌লে—ঐ যে কেয়া-ফুল পাপ্‌ড়ি মেল্‌চে

ধারা-শ্রাবণের তলে, বুকের কাঁটার হৃদয়-কেয়া! ...এখন উঠুক উঠুক তোমার কণ্ঠ-পল্লবে বৃষ্টি-ঝরার কল-গান!"

মূকের বুকখানি থর্‌থর্ করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল; বিশ্বের সমস্ত কাঁদন পুঞ্জ হয়ে ব্যথার জোয়ারে তার বুকের থেকে মুখের দিকে কেঁপে কেঁপে ফুলে' ফুলে' ঠেলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, ওষ্ঠ-পুট ফুলের কোটার মত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। তার পর তার কেমন মূর্চ্ছার মতন হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে মৌনতা ফেটে বেরিয়ে পড়্‌ল হঠাৎ একটা হাহাকার! আর তার হাত কেঁপে হাত থেকে কল্প-কেয়া মাটিতে পড়ে' গেল।

মূক কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পথিকের পায়ের উপর উপুড় হ'য়ে আছ্‌ড়ে পড়্‌তেই পথিক হায়-হায় করে' কেঁদে' উঠ্‌ল; তার পর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার হাত ধরে' তুলে তাকে বুকের 'পরে টেনে নিয়ে বল্‌লে,—"কেঁদো না, ওগো ব্যথিতা ভাগ্য-বিড়ম্বিতা, কেঁদো না। তবু এখনো আছে এক দণ্ড-কাল, দেবতার অবশেষ আশীর্ব্বাদ, একে কেঁদে নষ্ট কোরো না। বলো—বলো তোমার বুকের কথা মুখের কথায় ফুটিয়ে! ওগো বলো, বলো!"

মূক বুকে হাত চেপে বুকের কাঁদন যত থামাতে চায়, থামে না; কথার আভাষ আন্‌তেই রোদনের স্রোতে বার বার কথার টুক্‌রা ভেসে যায়।...থাক্‌তে থাক্‌তে পথিকের বুকের উপর মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ল সে!

যখন সে চোখ মেলে চাইল, তখন যাম-ঘোষ ঘোষণা কর্‌চে—রাত্রি শেষ-প্রহর। পথিক বল্‌লে,—"কেঁদো না! তোমার মুখের ভাষা নেই বা পেলাম, আমি তোমার বুকের-ভাষা পেয়েছি, বুঝেছি!"

মূকের মুখে একটু করুণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল— বাদর-রাতের মেঘের ফাঁকের তারার চাওয়া!...সে তার মুখখানি পথিকের বুকে লুকাল।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

য়ুরোপীয় সভ্যতার অভিযান

চিত্রকর শ্রী চারুচন্দ্র রায়

অনুবাদের কথা

বাঙালী ছোটগল্প পড়্‌তে ভালবাসে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে বাঙালী বংশে আর্য্য। এবং এখনও সে তার আর্য্যমন হারায় নি।

সংস্কৃত সাহিত্যকে কথা-সরিৎ-সাগর বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের আর্য্য পিতামহেরা গল্প বাদ দিয়ে কি দর্শন কি বিজ্ঞান কি ধর্ম্মশাস্ত্র কিছুই লিখ্‌তে পারতেন না। বেদে গল্প আছে, ব্রাহ্মণে গল্প আছে, উপনিষদে গল্প আছে।

তার পর মহাভারতে অগণ্য উপাখ্যান আছে আর তার একটিও নগণ্য নয়। কেউ যদি অনুগ্রহ করে' সেগুলি গুণে ফেলেন ত দেখ্‌তে পাবেন, যে তার সংখ্যা হাজারের কম হবে না। পুরাণের হিসেবও ঐ। রামায়ণের মূল আখ্যান অবশ্য তার মুখ্য আখ্যান, কিন্তু তাই বলে' যে তাতে বাজে গল্প নেই তা নয়। আর সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে কাব্য, তা ত আগাগোড়াই গল্প, অবশ্য দু-লাইন চার-লাইনের কবিতাগুলো বাদ দিয়ে। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নেই তার কারণ এ দেশ উপন্যাসের দেশ।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্য ছেড়ে যদি বৌদ্ধ-সাহিত্য ধরি—তা-হলে ত একেবারে কথা-সমুদ্রে ডুবে যাই। প্রথমত ভগবান্ বুদ্ধের জীবন-চরিত একটা মহা রূপকথা। তার পর ও-সাহিত্যের মূলগ্রন্থ হচ্ছে ত "কথাবত্থু"। বৌদ্ধ-দর্শন বলে' অবশ্য একটা দর্শন আছে। কিন্তু তার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তা কেউ বুঝ্‌তে পারে না। আর যাঁরা বলেন যে তাঁরা বুঝেছেন, যথা ইউরোপীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিতরা, তাঁরা অপর-কাউকে তা বোঝাতে পারেন না। উক্ত দর্শনের এঁদের ব্যাখ্যা পড়্‌লে আমার মনে হয় যে, হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নয় তাঁদের মাথা খারাপ। সে যাই হোক্ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বৌদ্ধসাহিত্যের আসল জিনিষ হচ্ছে "জাতক"। যদি কেউ মনে ভাবেন যে, "অভিধর্ম্মের" লোভে জনপ্রাণী বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেছিল তাহলে বলি, তিনি পালি জান্‌তে পারেন কিন্তু লোকচরিত্র জানেন না। "জাতক" ও "অবদানই" হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম্মের দেহ ও প্রাণ। আর বৌদ্ধধর্ম্মের দেশী শাস্ত্রীরা তা বিলক্ষণ জান্‌তেন। তাই পালিসাহিত্যে জাতকের একটি স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। আমরা "চার আর্য্যসত্য" মানি আর না-মানি পঞ্চ "অভিজ্ঞা" লাভ করি আর না-করি, এই গল্প-সাহিত্য আমাদের কাছে অতি মূল্যবান্। এই গল্প-সাহিত্য হচ্ছে ভারত-বর্ষের যথার্থ লোক-সাহিত্য। বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করবার পূর্ব্বে এ সাহিত্য ভারতবর্ষের লোক-সমাজে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল—এবং আজ আবার তা হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এই গল্প-সংগ্রহ পালি থেকে বাঙলায় তর্জমা করেছেন। এটা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁর এই অনুবাদ বাঙলার পাঠক-সমাজের কাছে সুপরিচিত নয়। তবে আজ না হোক্ কাল যে তাঁর "জাতক" বাঙলার ছেলে-মেয়েদের হাতে হাতে বে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

* * * *

বৌদ্ধ-সাহিত্য পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে কিন্তু সে অনুবাদ করা হয়েছে—হয় পালি নয় সংস্কৃত হতে—অর্থাৎ আমাদের দুটি ঘরের ভাষা থেকে। চীনে, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় এ সাহিত্যের অনুবাদ কতদূর হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী তা আমি বল্‌তে পারি নে। তবে তার ইংরেজী অনুবাদে যে আমাদের মন ওঠে না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে অনুবাদে সার থাকতে পারে, কিন্তু রস নেই। দেশী কথা আমাদের মনে যত শীগ্‌গির যেভাবে ঘা দেয়—বিদেশী কথা তার সিকির সিকিও দেয় না। এই কারণে আমি মনে করেছিলুম যে অবসর-মত বৌদ্ধসংস্কৃতসাহিত্য থেকে দুচারটি গল্প, বাঙলা করব। আমার ধারণা ছিল যে তা করাও তেমন শক্ত নয়। পালি ভাষা আমি জানি নে, কিন্তু চিনি, অর্থাৎ তার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। ধরুন এই পালি শ্লোকটি হঠাৎ আমার চোখে পড়্‌ল :—

"যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্‌ঠী সমতিবিজ্‌ঝতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্‌ঝতি॥"

তাহলে দেখ্‌বা মাত্র মনে হয় যে, এ আমার চেনা ভাষা, যদিচ এর মানে আমি ঠিক ধরতে পারছি নে। এ শ্লোকের সানুনাসিক কথাগুলোর মানে আন্দাজ করতে পারি, বাকী কথাগুলো নিয়েই একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। এমন সময় কেউ যদি বলে' দেন যে "বুট্ঠি" মানে বিষ্টি, তখনই সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। ইংরেজিতে এর যথার্থ অনুবাদ হতে পারে না, কেননা ইংরেজের ঘর আমাদের ঘরের মত ছাওয়া নয়—তার পর rain মানে "বিষ্টি" নয়। বিলেতের rain হচ্ছে গলিত কুয়াসা, সে তরল পদার্থ কারও ঘরের চাল ফুড়ে তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, যদিচ ইংরেজদের চিত্তে রাগ অতি সহজে প্রবেশ করে।

পালির চাইতে বৌদ্ধ-সংস্কৃত আমাদের ঢের বেশী নিকট আত্মীয়। ও-ভাষা মূলত সংস্কৃত, তবে তার ভিতর অসংখ্য আর্ষ প্রয়োগ আছে। আর না হয়ত তা সেকেলে প্রাকৃতের সাধুভাষা অর্থাৎ তা মূলত প্রাকৃত, তবে তার ভিতর দেদার সংস্কৃত কথা আছে। তার পর এই বৌদ্ধ-সংস্কৃতও এক ভাষা নয়; আমাদের সাধুভাষার মত তার প্রতি গ্রন্থের ভাষা স্বতন্ত্র। এর কোনও বইয়ের ভাষা সহজ, কোন বইয়ের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন। যিনি পঞ্চতন্ত্র পড়ে' বুঝতে পারেন তিনি "দিব্যাবদান" পড়ে' কেন যে বুঝতে পারবেন না তা আমার বুদ্ধির অগম্য। মধ্যে মধ্যে উক্ত গ্রন্থে এমন এক একটা কথা দেখা দেয় যার মানে অবশ্য আমরা জানিনে, কিন্তু ঐ অজ্ঞাত-কুলশীল কথার সংখ্যা "দিব্যাবদানে" খুব কম। "ললিত-বিস্তরের" ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাকৃতদোষে দুষ্ট, আর তার চাইতেও কটমটে হচ্ছে "মহাবস্তুর" ভাষা। তবে সে ভাষা আমাদের কাছে গ্রীক নয়। তার দুটি একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি। ঐ নমুনা থেকেই দেখতে পাবেন যে সে ভাষা অসংস্কৃত সংস্কৃত।

> স্ত্রিয়ঃ সমর্থা পুরুষা নিযোক্তুং
> যো তত্র ভদ্রো স্ত্রিয় এব মূলং।
> যে চাপি সংগ্রামহতা নরেন্দ্রা।
> তেষাং প্যনয়ো স্ত্রিয় এব মূলং॥

উক্ত শ্লোকের ভাষা চাণক্যশ্লোকের ভাষার চাইতে কি এতই তফাৎ যে তার মর্ম্ম আমরা গ্রহণ করতে পারি নে! আর-একটি নমুনা দেওয়া যাক্। রাহুল বল্‌ছেন :—

> অহং চৌরো মহারাজ অদিন্নং উদকং পিবে।
> তস্য করোহি মে দণ্ডং যথা চৌরস্য ক্রিয়তি॥

এ ভাষার ব্যাকরণ অবশ্য মুগ্ধবোধ নয়। কিন্তু তার জন্য তরজমা আট্‌কায় না। জনৈক মহাপণ্ডিতের কাছে শুনলুম যে গীতায় আর্ষ প্রয়োগের অন্ত নেই, কিন্তু সে-কারণ অপণ্ডিত বাঙ্গালী কি গীতা অনুবাদ করতে ভয় পান?

আমি অবশ্য বলতে চাইনে যে "মহাবস্তু"র ভাষা উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের মত সংস্কৃতের একান্ত গা-ঘেঁষা। আমার বক্তব্য এই যে, বৌদ্ধ-সংস্কৃত বাঙ্‌লা করা তাদৃশ কঠিন ব্যাপার নয়। তার জন্য চাই ব্যাকরণকে উপেক্ষা করা আর শব্দার্থ আন্দাজি মারা।

কিন্তু প্রবাসীতে "সৌন্দরানন্দ" কাব্যের অনুবাদের যে সমালোচনা বেরিয়েছে, তা পড়ে অনুবাদ করা সম্বন্ধে আমার উৎসাহ একেবারে কমে' গিয়েছে।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত অনুবাদের যে দোষ দেখিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও আমার বল্‌বার নেই। অনুবাদক মহাশয় বৌদ্ধসাহিত্যে সুপণ্ডিত বলে' বিখ্যাত, অথচ তিনি যে অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ জানেন না, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ জান্‌বার জন্য, কি সংস্কৃত কি পালি কোন ভাষাই জান্‌বার প্রয়োজন নেই, ইংরেজী জান্‌লেই ত ও-কথার মানে জানা যায়। "কার্ণের" বইয়ে ত অভিজ্ঞা ইত্যাদি সকল কথার পূরো মানে দেওয়া আছে। তাই শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিযোগ এ ক্ষেত্রে ডিস্‌মিস করা চলে না। এক্ষেত্রে ছাপার ভুলের দোহাই দিয়ে সাফাই হওয়া যায় না। "অভিজ্ঞা" কম্পোজিটারের হাতে "অভিজ্ঞ" হতে পারে, কিন্তু কি করে' যে "অভিজ্ঞতা" হয়, তা আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। তবে কম্পোজিটার যদি পণ্ডিত হন,—তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

সে যাই হোক উক্ত আলোচনায় আমি যোগ দিতে যাচ্ছি নে। ও বিচার হচ্ছে পণ্ডিতের বিচার এবং তাতে আমার যোগ দেবার অধিকার নেই।

তবে এই সূত্রে শাস্ত্রীমহাশয় অনুবাদ করা সম্বন্ধে যে সাধারণ মতামত প্রকাশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার দু-এক কথা বল্‌বার আছে।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মতানুসারে চল্‌তে হলে, একমাত্র বৈয়াকরণ ও নিরুক্তকার ব্যতীত আর কেউ উক্ত সাহিত্যের অনুবাদ করবার অধিকারী হতে পারেন না। এখন আমার নিবেদন এই যে, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত হচ্ছে science আর গল্প বলা art, গল্প অনুবাদ করার ভিতরও গল্প বলার আর্ট থাকা চাই। সুতরাং বৈয়াকরণ এবং কোষকারের ঘাড়ে "জাতক" অনুবাদের ভার দেওয়া অনেকটা কামারের দোকানে চিনিপাতা-দইয়ের ফরমায়েস দেওয়ার মত। Science এবং art যে এক দেহে ভর করতে পারে না, তা অবশ্য নয়। ব্যাকরণ অভ্যাস করলেই যে মানুষকে "জড়বুদ্ধি" হতে হবে "প্রকাশকার" মম্মটভট্টের এ কথা আমি মানিনে, কেননা তা মান্‌তে হলে কালিদাস উর্ব্বশীকে দেখে যে বলে-ছিলেন :—

> বেদাভ্যাসজড়ঃকথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
> নির্ম্মাতুং প্রভবেন্ মনোহর মিদং রূপং পুরানো মুনিঃ ?

তাতেও সায় দিতে হয়। যিনি বেদাভ্যাস কিম্বা ব্যাকরণ অভ্যাস করেন, তিনি যে মনোহর রূপ সৃষ্টি করতে পারেন না, সংস্কৃত কবি ও আলঙ্কারিকদের এই অত্যুক্তি অগ্রাহ্য করেও বলা যায়, যে, science এবং art মানুষের পৃথক্ সাধনার বিষয়। এবং সচরাচর এক ঘটে ঐ দুই গুণ বর্ত্তায় না। সুতরাং গল্প ভাষান্তরিত করবার অধিকার অপণ্ডিতেরও আছে।

শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে বিমলা-বাবুর অনুবাদ critical নয়। আমার বিশ্বাস এস্থলে শাস্ত্রীমহাশয় editorএর কর্ত্তব্যের সঙ্গে অনুবাদকের কর্ত্তব্য ঘুলিয়ে ফেলেছেন। মূলগ্রন্থের যদি critical edition থাকে, তা হলে সেই গ্রন্থ অবলম্বন করে' অনুবাদক অনায়াসে নির্ভুল তরজমা করতে পারেন। প্রথমটি হচ্ছে তাঁর কাজ যিনি ভাষার তত্ত্ব জানেন, দ্বিতীয়টি তাঁর যিনি কথার রূপ চেনেন। এ দুই একের কাজ হতে পারে, কিন্তু এক কাজ নয়। চরকা-কাটা আর তাঁত-বোনা এক কাজ নয়, এবং ও-দুই একের কাজ কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। "সৌন্দরানন্দ" কাব্যের অনুবাদ দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার আজও হয় নি, কিন্তু আমি নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে, সে অনুবাদ কাব্যও হয় নি, সুন্দরও হয় নি. আনন্দের বস্তুও হয়নি। সেটি পড়ে' কেউ বল্‌বেন না যে A thing of beauty is a joy for ever.

শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে—"এত বড় পুস্তকের অনুবাদে একটি মাত্রও শব্দের অর্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন টীকা বা টিপ্পনি করা হয় নাই।" এর উত্তরে আমার বক্তব্য. যে, উক্ত অনুবাদের সঙ্গে শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিপ্রেত টীকা ও টিপ্পনী জুড়ে দিলে "এত বড় পুস্তকের অনুবাদ" আরও এত বড় হয়ে উঠ্‌ত যে, পাঠক সেটিকে দূর থেকে নমস্কার করে' সরে যেত। সাহিত্যেও বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি মানুষের কাম্যবস্তু নয়। তার পর ওরূপ টীকা-টিপ্পনীর কোনরূপ সার্থকতা নেই। শাস্ত্রী-মহাশয় বলেছেন যে—"চারটি ধ্যান কি কি তাহাও বলা হয় নাই, যদিও অনুবাদকের বলা উচিত ছিল। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারিটি রূপ ধ্যানের (বিতর্ক বিচার প্রীতিসুখ ও একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান, ইত্যাদির) কথা এখানে বলা হইয়াছে।" এখন আমার জিজ্ঞাস্য যে অনুবাদক মহাশয় যদি তা সবিস্তারে বল্‌তেন তাহলেই কি বৌদ্ধ-ধ্যানের মানে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত ? যে পাঠকের বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সঙ্গে কোনরূপ পরিচয় নেই, তাঁর পক্ষে ধ্যানও যা বিতর্ক বিচার প্রভৃতিও তাই, অর্থাৎ সমান নিরর্থক, যেহেতু ওর প্রতিটি হচ্ছে technical শব্দ এবং সংস্কৃত অভিধানে ও-সকল কথার যে অর্থ, বৌদ্ধ-সাহিত্যে সে অর্থ নয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে চল্‌তে হলে' হয় বৌদ্ধ-সাহিত্যের বাঙ্‌লায় অনুবাদ করা চলে না, নয় ত তার প্রতি-কথার মানে করতে হয়। "বুদ্ধ" "ধর্ম্ম" "সঙ্ঘ" "ভিক্ষু" "আরাম" "বিহার" প্রভৃতি কথাগুলো বাদ দিয়ে ও-সাহিত্য সম্বন্ধে এক পাতাও লেখা চলে না। আর এ কথাও ঠিক যে উক্ত শব্দ-গুলির বাঙ্‌লায় যা অর্থ—বৌদ্ধ-সাহিত্যে সে অর্থ মোটেই নয়। এ অবস্থায় যেমন কথাটি মূলে আছে তেমনিটি

অনুবাদে থাকলে—"অভিজ্ঞা" "অভিজ্ঞতা" না হলেই—আমরা খুসি থাকি।

*শাস্ত্রীমহাশয় অপর একটি কারণে অনুবাদে টীকা-*ভাষ্যের সম্ভাবের বিশেষ পক্ষপাতী।

বিমলাবাবুর অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথা এই—"অনুবাদ দেখিয়া ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বহুস্থানে অর্থটা অনুবাদকের নিকটে স্পষ্ট নহে।" যিনি যে কথা ব্যবহার করেন, সে কথার অর্থ তিনি জানেন কি না, এ প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের নেই। ধরে' নিতে হবে তিনি জানেন। তাই অনুবাদকের কাছে এ প্রত্যাশা করা অতি স্বাভাবিক যে তিনি অন্ততঃ মূলের অর্থ জানেন। অপরপক্ষে এও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, যে, বাঙালী লেখকদের সম্বন্ধে এ আশা করা অযথা, যে, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ তাঁরা ব্যবহার করেন তার প্রতি-কথার অর্থ তাঁরা জানেন। যে সংস্কৃত কথার মানে আমরা জানিনে, সে কথা আমরা লেখায় ব্যবহার করতে পারব না, এই যদি সমালোচক মহাশয়দের রায় হয়, তাহলে আমাদের সাধুভাষা লেখা বন্ধ হয়। তুঞ্জ শব্দের মানে আগে জেনে তা যদি পুঞ্জের সঙ্গে মেলাতে হয়, তাহলে আমাদের বাধ্য হয়ে অমিত্রাক্ষরে পদ্য লিখ্‌তে হবে, আর ফোয়ারার "শিৎকারে" যদি আমাদের গায়ের জামা ভিজে না যায়, তাহলে আমাদের কবিহৃদয়ের জ্বালা জুড়োবে কিসে? ভাষা সম্বন্ধে লেখকের সাতখুন মাপ, কিন্তু অনুবাদক বেচারা যে না বুঝে কথা ব্যবহার করলে চোর-দায়ে ধরা পড়্‌বেন, এর চাইতে অবিচার আর কি হতে পারে?

তার পর জান্‌তে চাই, যে, অনুবাদক যে-কথার মানে জানেন না, তার কীদৃশ টীকা তিনি করবেন? আমাদের দেশের লোক এ সম্বন্ধে যে একদম বে-পরোয়া তার নজির আছে। "মালবিকাগ্নিমিত্রের" একটি টীকায় দেখেছি, যে, "মৌর্য্যসেনাপতির" অর্থ মৌর্য্য নামক জনৈক সেনাপতি, আর স্কুলে পড়েছি যে "শাকপার্থিব" মানে শাকভোজী পার্থিব। শাস্ত্রীমহাশয় কি বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদকদের কাছ থেকে এই নমুনার টীকা চান? *আমার মতে অনুবাদক মূলের যে কথার অর্থ জানেন* না, *সে কথার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে' অবিকৃত ভাবেই* তা রেখে দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত। নচেৎ সমালোচকদের ভয়ে তাঁরা সে কথা হয়ত বাদ দিয়ে যাবেন। এ রকম বাদ দেওয়ার অভ্যাস এ দেশের লোকের আছে। একটা দৃষ্টান্ত দেই। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২১৮ অধ্যায়ে বৌদ্ধ-মতের আলোচনা আছে। উক্ত গ্রন্থের বর্দ্ধমান-মহারাজার প্রকাশিত বঙ্গানুবাদে উক্ত অধ্যায়টি কথায় কথায় অনুবাদ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ অনুবাদক পণ্ডিত-মহাশয়েরা তার একটি কথাও বোঝেন নি। হুতোম-পেঁচা একটি বারোয়ারীর সং দেখে ঠাট্টা করে' বলেছিলেন, যে সেটি হচ্চে বর্দ্ধমান-মহারাজার বাঙ্‌লা মহাভারতের মত, প্রকাণ্ড ও দুর্বোধ্য। ফলে কালীসিংহ মহাশয় সম্ভবত তাঁর মহাভারত সুবোধ করবার জন্যই উক্ত অধ্যায়ের সৌগত-মতের বিবরণটি তাঁর অনুবাদ থেকে বেবাক বাদ দিয়েছেন। কালীসিংহ মহাশয় যা করেছেন তা সুবোধ হতে পারে, কিন্তু অনুবাদ নয়। মূলকে নির্ভয়ে যাঁরা ছাঁটতে পারেন, তাঁরা নির্ভয়ে তাকে বাড়াতেও পারেন, ফলে অনুবাদ মৌলিক হয়ে ওঠে।

বাঙ্গালা ভাষায় "কামসূত্রের" একখানি অনুবাদ আছে। তার ভিতর এমন সব পাতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে মূলের সঙ্গে যার এক দপ্তরীর সেলাইয়ের যোগ ব্যতীত অপর কোন যোগ নেই। বাৎস্যায়নের মুখে ইংরেজ রমণীদের রূপ গুণের বিস্তৃত ও বিকৃত বর্ণনা পূরে দেওয়ায় যে কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দেওয়া হয়, সে ধারণা পণ্ডিত-মহাশয়দের আদপেই নেই। যে দেশে অনুবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতের দল এতদূর যথেচ্ছাচারী সে দেশে অপণ্ডিতের দলের পক্ষে মূলের মাছি-মারা অনুবাদ করে যাওয়াই নিরাপদ্‌। "মহাবস্তুর" শেষে আছে—

> যাদৃশী পুস্তকং দৃষ্টা তাদৃশী লিখিতং ময়া।
> যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা শোধনীয়ং মহত্ত্বধৈ॥

উক্ত লেখকের মত অনুবাদকেরও পণ্ডিত ব্যক্তির হাতে সংশোধনের ভার অর্পণ করে মূলগ্রন্থের হুবহু অনুবাদ করে যাওয়া শ্রেয়। পাঠকেরা তা বুঝুক আর না বুঝুক।

মানুষে লেখে অবশ্য অপরে তা পড়বে বলে'। অতএব পাঠক যাতে সে লেখার অর্থগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে লেখকদের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই। কিন্তু লেখার আর-একটা দিক্ যে আছে তা আমরা নিত্য ভুলে যাই। কোনও লেখা বুঝতে হলে পাঠকেরও অনেকটা জ্ঞান থাকা চাই, অন্তত ভাষাজ্ঞান ত থাকাই চাই। যে পাঠক বৌদ্ধসাহিত্য পড়তে চান সে পাঠকের সে সাহিত্যের অন্তত ক খ জানা চাই। বৌদ্ধ গ্রন্থের এমন অনুবাদ কেউ করতে পারবে না, সাধারণ পাঠক যার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। ও শাস্ত্রের প্রথম ও শেষ কথার মানে, দুকথায় কি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব ?

যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতো।
হ্যবদত্তেষাং চ যো নিরোধো এবংবাদী মহাশ্রমণঃ॥
(মহাবস্তু তৃঃ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬১)

উপরোক্ত শ্লোকের দু-ছত্রে অনুবাদ করে দেখুন পাঠক তার মাথা মুণ্ডু কি বোঝে। অথচ এর চাইতে সংস্কৃত আর কত সহজ হতে পারে ?

বৌদ্ধসাহিত্যের গল্প-ভাগ অবশ্য ভাষায় অনুবাদ করা ঢের সোজা। কেননা সে গল্পের রস উপভোগ করবার জন্য কারও পক্ষে বৌদ্ধশাস্ত্র জানা আবশ্যক নয়। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে বুদ্ধ জন্মাবার বহুপূর্ব্বে এ সব গল্প জন্মলাভ করেছে। এ সকলের আরম্ভে ও উপসংহারে বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে সব বাজে-কথা জুড়ে দিয়েছেন তার পুরো মানে বোঝা অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞান-সাপেক্ষ। তবে উপর নীচের ঐ প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু ছেঁটে দেওয়ায় সে গল্পের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় না। ঐ কথামালার ল্যাজা-মুড়ো বৌদ্ধ-দার্শনিকদের চর্ব্বণ করতে দিতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই, তার বাদবাকী অংশ পেলেই আমরা খুসি থাকব। তবে এ-সব গল্প অনুবাদ করার মুস্কিল এই যে, বৌদ্ধ সংস্কৃত আমরা আগাগোড়া বুঝতে পারিনে। এখন শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যদি উক্ত ভাষার একটি শব্দকোষ রচনা করেন, তাহলে তিনি আমাদের সাহিত্যের প্রভূত উপকার করবেন। Senart সাহেব 'মহাবস্তুর' ভূমিকায় লিখেছেন যে তিনি উক্ত ভাষার যে glossary রচনা করেছেন, সেইটিকে এ বিষয়ের খসড়া হিসেবে ধরে নিয়ে, ভবিষ্যতে কেউ একখানি দস্তুরমত বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষার অভিধান তৈরী করবেন, এ আশা তিনি রাখেন। আমার বিশ্বাস শাস্ত্রী-মহাশয় হচ্ছেন বাঙ্গালায় একমাত্র লোক যিনি এ অভিধান রচনা করতে পারেন, কারণ বৈদিক ও অর্ব্বাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও জেন্দ ভাষায় তাঁর সমান এবং অসামান্য অধিকার আছে। অতএব আমার অনুরোধ যে তিনি, আর কালবিলম্ব না করে এই মহৎ কাজটি হাতে নিন্।

যতদিন এ-অভিধান তৈরী না হচ্ছে ততদিন হয় আমরা ভুল অনুবাদ করব, আর না হয়ত আমাদের কথা পাঠকেরা ভুল বুঝবেন।

শাস্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিই যে, বৌদ্ধ-সাহিত্য থেকে আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করতে চাইনে, চাই উদ্ধার করতে আমাদের প্রাচীন উপন্যাস। অতএব অনুবাদ আমরা করবই। যদি বৌদ্ধসাহিত্যের শব্দার্ণবে কেউ আমাদের নাবিক না হন তাহলে আমরা তার পারগামী হতে পারব না। বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে যে,—

"নো হংসো নম দাতীরে নাবিকং পরিপৃচ্ছতি।
স্বকেন বাহু বীর্য্যেন হংসো তরতি নর্ম্মদাং॥"

কিন্তু আমরা ত হংস নই যে নিজ বাহুবলে নর্ম্মদা পার হব ? আমাদের নৌকাও চাই নাবিকও চাই, আর বলা বাহুল্য যে, আমরা সে জাতীয় কর্ণধার চাইনে, যারা ফাঁক্ পেলেই আমাদের কর্ণ ধারণ করবেন কিন্তু আমাদের পার করবেন না। শাস্ত্রীমহাশয়েরা আমাদের এ সাহায্যটুকু যদি না করেন ত আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যের এ পারেই পড়ে থাকব, আর আমাদের মধ্যে যারা পরম-হংস তাঁরা উড়ে তার ওপারে চলে যাবেন। তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু তাঁরা এ পারে আবার ফিরে এসে যে "কচ্চায়ন" করতে আরম্ভ করবেন, সেইটিই ত বিপদের কথা।

বীরবল

জাগৃহি

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে, 'গা তোল গো চোখ মেল' !
পাতাল-পুরীর গর্ভ ছেড়ে আলোক-পুরীর দোর ঠেল' !
জাগো আমার স্ত্রী-জননী ! জাগ আমার বোন-মেয়ে !
দেখ্ছনা কি আলোর কমল ফুট্চে কাদের মুখ চেয়ে !
ঘরছাড়া ঐ রোদ-পাথারে ভাসাও মানস-হংস গো !
নীল আকাশে তোমাদেরও সমান আছে অংশ গো !
ঐ যে অবাধ দখিন-হাওয়া জাগায় বনের মর্ম্মরে,
পুরুষ কেন একলা কেবল রাখ্বে দখল তার পরে ?
শ্যামল তৃণের গাল্চে-ঢাকা উধাও মাঠের চারধারে,
শিকল-খোলা মহোৎসবের জাগ্চে উদার বার্ত্তা রে !
শৈল-নদী পাগল-বেগে আগল ভেঙে যায় চ'লে—
ঐ শোনোনা,মুক্তি-গীতে, ডাক্চে ধারা 'আয়' ব'লে !

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে ! ঘুমিওনা আর ঘুমিওনা,
গামলা-মুখো আম্লাগুলোয় মামলা তোমার শুনিও না।
জাগ্বে যদি নিজেই জাগো, নিজের পায়ে ভর্ দিয়ে,
নিজের কাজ কি হয়গো কভু স্বার্থপর সব পর দিয়ে ?
'দেবতা' ব'লে বিকোন্ যিনি, তুমি যে তাঁর দেবদাসী,
চরণ-সেবা বন্ধ হ'লে যায় যে মুছে তাঁর হাসি।
এমন মানুষ ক'জন আছে—প্রভুত্বতে নেইকো লোভ ?
প্রজা হ'লে রাজার সমান, রাজার তাতে হয় না ক্ষোভ ?
বুকচাপা ঐ পাথর সরাও—দাও ভেঙে ঐ তিমির-বাঁধ,
ঘোম্টা দিয়ে, পরকে দূষে মিছেই কর আর্ত্তনাদ !
সূর্য্য-করের সোনার-কাঠি সাম্নে তোমার জ্বল্চে যে—
'জাগ্রত হও—জাগ্রত হও'—বল্চে তারা বল্চে যে !

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে ! শুন্চনা কি যুগের ডাক ?
ঐ ডাকেতেই সুর মিলিয়ে বাজাও তোমার বিজয়শাঁখ !
তোমরা সতী শক্তিমতী, যেথায় থাকো—যদ্দিনই,
এই জাতেতেই জন্মেছিলেন চিত্রাঙ্গদা, পদ্মিনী !
'আর্কের জোয়ান', দুর্গাবতী, চাঁদবিবি আর লক্ষ্মীবাই—
ধন্য করেন যে জাত ওগো, দুঃখ নাই তার শঙ্কা নাই !

অতীত কালের হাথ্‌সেপ্‌সোথ্, সেমিরামিস, রিজিয়া—
তাঁদের মাথায় কে গিয়েছে বসাতে কর জিজিয়া ?
প্রাচীন রোমের বীরাঙ্গনা গায়ের জোরেই জেগেছে,
সাম্নে তাদের মহাসভার যোদ্ধারাও সব ভেগেছে !
দশমহাবিদ্যা দেখে স্বয়ং শিবই মূর্চ্ছা যান—
তোমরা 'ভীরু অবল জাতি'—যাও ভুলে এ কুৎসা-গান !

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে ! আজও শোনো এই ধরায়,
বিশ্ব-নারীর আত্মা জেগে যুদ্ধ-গীতে দিক্ ভরায়।
বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তিতে যে নারী এবং নর সমান,
প্রতীচ্যেতে সকল কাজে কর্‌চে তারা সপ্রমাণ।
খাচ্ছে নারী রুলের গুঁতো - পর্‌চে হাতে হাতকড়া—
তবু তারা যুঝ্‌চে সমান—তবু তাদের স্বর চড়া !
যাচ্ছে নারী যুদ্ধ-ক্ষেত্রে, উড়ো-রথে চড়্‌চে ঐ,
সাঁৎরে চলে সাগর-পারে, সিংহ-শিকার কর্‌চে ঐ !
নেইকো নিয়ে গয়না-কাপড়, 'পাউডার' আর 'রুজের পেণ্ট্',
হচ্ছে তারা হাকিম-হকিম, দ্বার খুলেছে 'পার্লামেণ্ট্'।
বিনা-রণে একটু জমি দেয়নি ছেড়ে নরের দল,
নারী সেথায় স্বাধীন হোলো দেখিয়ে কেবল বাহুর বল।

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে ! উঠুক তোমার চোখ রেঙে'
স্মার্ত্ত রঘু, মনুর বিধান পায়ের চাপে দাও ভেঙে।
গর্ত্তে বসে' হাঁপাক্ নারী—পুরুষ চলুক্ পথ দিয়ে,
কন্যা করুক্ একাদশী—বাপের কিন্তু সাত বিয়ে !
দস্যু এসে অঙ্গ ছুঁলেও নারীর বেলায় নেই ক্ষমা,
পুরুষ-প্রভুর লক্ষ পাপেও সমাজ-খাতায় নেই জমা !
নয়কো এ-সব বিধির বিধি, চল্‌বে না আর চল্‌বে না—
জোচ্চোরের এ ধাপ্পা শুনে নারীর হৃদয় টল্‌বে না !
স্বামীর ঘরে জাগো বধূ, বাপের ঘরে কন্যা গো !
দর্‌জা খোলো—দর্‌জা খোলো আস্‌চে আলোর বন্যা গো !
তোমরা সবল, তোমরা স্বাধীন, তোমরা মানুষ—স্থির জেনো,
নারীর ভাগে হাত দেবে যে, তার শিরেতে বাজ্ হেনো !

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

মহিলা-প্রগতি

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত মহিলা চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ মেলানি লিপনিস্কা আমেরিকায় অন্ধদের দুঃখ মোচনের জন্য নূতন কিছু শিক্ষা করিতে গিয়াছেন। এই মহিলা নিজেও অন্ধ। তিনি স্বদেশীয় অন্ধদের জন্য অনেক কিছু করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। আমেরিকায় তিনি যাহা কিছু নূতন শিখিবেন তাহা দেশের চক্ষু-শাস্ত্রবিদ্‌দের জানাইবেন এবং আমেরিকাতে তিনি নিজের পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার ওয়েলিংটন জুট মিলের ৩০০ নারী শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। বেতন বৃদ্ধি এবং একজন কড়ামেজাজী উপরিওয়ালার কর্ম্মচ্যুতি, এই দাবী করিয়া ধর্ম্মঘট হয়। নারীদের বোধ হয় এই প্রথম ধর্ম্মঘট। তাহারা বেশ ধীরতা এবং সংযমের সহিত ধর্ম্মঘট চালায়।

মাদ্রাজের সালেম নামক সহরেই নারীদের প্রথম যৌথ-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এগার জন মহিলা এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা ৪১। শতকরা নয় টাকা সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। ধার দশ মাসে দশ দফায় শোধ করিতে হয়।

জাপানে আইন ছিল যে মহিলারা কোন-প্রকার রাজনৈতিক সভাতে যোগদান করিতে পারিবে না। গত ১০ই মে এই আইন উঠিয়া যাওয়াতে মহিলারা এখন প্রায় সব-রকম রাজনৈতিক সভাতে যোগদান করিতেছেন। জাপানে, শাশুড়ি ঘরের কর্ত্রী। তাঁহার হুকুম-মত বধূদের চলা-ফেরা করিতে হয়। ইহাতে বিদেশী কোন মহিলা যদি বধূরূপে জাপানী বাড়ীতে আগমন করে তাহার বড় অসুবিধা হয়। জাপানী মহিলারা এই প্রথা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন।

আমেরিকার ইলিনয় প্রদেশে নারীদের ব্যায়ামের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে। অনেকের ধারণা নারীদের কোন-প্রকার ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না—শ্রীযুক্তা লিডিয়া ক্লার্ক্ (ইলিনয় ষ্টেট মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়ামের ব্যবস্থাপক) এই মতকে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ছেলেদের মত নিয়মিত ব্যায়াম করিলে মেয়েদের যথেষ্ট উপকার হয় এবং তাহাদের শরীরও খুব ভাল হয়। পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল মেয়েদের ব্যায়াম এবং ক্রীড়া ছেলেদের মতই হইবে। এখন এ ধারণা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। মেয়েদের শরীর এবং মন ছেলেদের সহিত সকল বিষয়ে এক নয়। কাজেই তাহাদের জন্য ব্যায়াম এবং ক্রীড়া স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন।

আজকাল নারী দেশের প্রায় সকল কাজেই যোগদান করিতেছেন। কাজেই নারীর দেহের পরিণতি পুরুষ অপেক্ষা হীন থাকিবার কোনই কারণ নাই। দিনের কাজের পর এক ঘণ্টার খেলাতে মন সতেজ এবং প্রফুল্ল হইয়া উঠে। এই ব্যবস্থা কেবল ছেলেদের জন্য করিলে চলিবে না, সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের কথাও ভাবিতে হইবে। আমাদের দেশের নারীদের স্বাস্থ্য খুব বেশী খারাপ—তাহার ফল ছেলে-মেয়েদের ভোগ করিতে হয়। অকাল-মাতৃত্ব-লাভে শরীর দু-এক বছরে একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়ে। নিয়মিত ব্যায়াম এবং ক্রীড়ার বন্দোবস্ত হইলে কয়েক বছরের মধ্যে দেশের মেয়েদের শরীর এবং মনের, স্বাস্থ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ভালর দিকেই দেখা যাইবে।

লণ্ডনের বিদ্যালয়সমূহের ডাক্তার শ্রীযুক্ত হ্যামারের মতে, ছেলেদের কিছু সময় ঘরের কাজে নিযুক্ত করিয়া মেয়েদের বেশ কিছু সময় ক্রীড়ার জন্য ছুটি দেওয়া উচিত। তাঁহার মতে মেয়েদের ঘরের কাজ বড় বেশী করিতে হয়। সেলাইএর কাজ যাহারা বেশী করে তাহাদের শিরদাঁড়া ক্রমে বাঁকিয়া যায় এবং চোখও খারাপ হয়। ছেলেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বাহিরে থাকে। কাজেই তাহারা একটু কষ্ট করিয়া মেয়েদের কিছুক্ষণের জন্য ঘরের কাজ হইতে রেহাই দিলে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না, অথচ মেয়েদের লাভ যথেষ্টই হইবে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে মদ খাওয়ার এবং না-খাওয়ার উপর ভোট লওয়া হয়। তাহাতে দেখা যায় যে শতকরা ৫৭ জন নারী মদ না-খাওয়ার পক্ষে। এবং পুরুষদের শতকরা

৪০ জন মদ না-খাওয়ার পক্ষে। নারীদের ঘরের শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়, তাই তাঁহারা মদ জিনিষটিকে তাড়াইতে চান। পুরুষেরা সে কথা একবার ভাবিয়াও দেখেন বলিয়া মনে হয় না।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

কবি-গাথা

আমরা সবাই সঙ্গীত গড়ি—ছন্দের নির্ঝর,
অসম্ভবের আমরা পূজারী, স্বপনের যাদুকর ;
আমরা বেড়াই উর্ম্মিমুখর বিজন সিন্ধুকূলে,
শ্মশানবাহিনী নদীটির বাঁকে বসে' থাকি মনোভুলে,
পাণ্ডু-চাঁদের জোছনা বিকাশে মোদের মুখের 'পর ;
জগৎ আমরা বিলাইয়া দিই—আমরা লক্ষ্মীছাড়া,
আমরাই তবু চালাই তাহারে, আমরাই দিই নাড়া,
আমরাই যেন যুগ-যুগ এই জগতের নির্ভর।

অতি-অপরূপ শাশ্বত-সঙ্গীতে
কত মহাপুরী নির্ম্মাণ করি ধূলিভরা ধরণীতে,
আমাদেরি গীতি-কাহিনীতে উদ্ভব
অতি-সুবিশাল-জনপদ-গৌরব ;
একজন শুধু একটি স্বপন হাতে করি' বাহিরিবে—
তাই দিয়ে সে যে রাজার মুকুট হেলায় করিবে জয়,
তিনজনে মিলি' একটি যে সুরে নবগীত রচি' দিবে,
তারি আক্রোশে রাজ্য ও রাজা চরণে চূর্ণ হয়।

কবে কোন্ কালে—সেদিন হয়েছে অস্ত,
স্মরণ-অতীত পৃথিবীর ইতিহাসে—
হাহাকার দিয়ে গেঁথেছিনু মোরা পুরী সে ইন্দ্রপ্রস্থ,
স্বর্ণলঙ্কা—কৌতুকে পরিহাসে।
ধূলিসাৎ হল তারা যে আবার—মোদেরি সে মন্তর,
আমরাই গাই বিগত-বাসরে ভাবীযুগ-জয়গাথা,
একটি স্বপন শেষ হ'লে হয় একটি যুগান্তর,
অথবা যেন সে নূতন-স্বপনে ভরে' আসে আঁখিপাতা।

আমরা স্বপন করি যে বপন, গেয়ে যাই শুধু গান,
মোরা নিরলস, চিরদিন নিরাময় ;
ভবিষ্যতের ভাস্বর বিভা সমুখে দীপ্যমান ;
ললাটে তাহারি টীকা সে জ্যোতির্ম্ময় ;
প্রাণে আমাদের বাজে অহরহ সঙ্গীত সুমহান্—
ওগো জগতের নরনারী সমুদয়।
আমরা স্বপন করি যে বপন, গেয়ে যাই শুধু গান,
স্থান আমাদের তোমাদের পাশে নয়।

আমরা দাঁড়াই—খসি' পড়ে যেথা আঁধারের নির্ম্মোক,
সকলের আগে প্রভাত-রবিরে আমরা অর্ঘ্য ধরি,
কণ্ঠ মোদের পার হয়ে যায় অসীম সে উষালোক,
গাই নির্ভীক ছন্দ-ধনুতে ভীমটঙ্কার করি'—
মানুষের হীন-অবিশ্বাসের ভ্রূকুটিরে করি' জয়,
বিধাতার আশা পূর্ণ যে হবে—ওরে তার দেরী নাই !
তোরা পুরাতন জড়পুত্তলি হয়ে যাবি ধূলিময়,
বার্ত্তা সে ধ্রুব গগনে ধ্বনিছে—এখনি শুনিতে পাই !

যারা আসে সেই এখনো-অজানা দিবালোক-তট হতে,
তাদের সবারে প্রাণ খুলে' বলি—স্বাগত ! নমস্কার !
নিয়ে এস হেথা নব-বসন্ত, ভাসাও আলোর স্রোতে,
ধরারে সাজাও নবযৌবনা বধূবেশে আরবার !
নবীন কণ্ঠে নব-গীত গাও, রাগিণী চমৎকার।
যে-স্বপন মোরা এখনো দেখিনি শোনাও তাহারি বাণী –
মোরা শিখি' লব যদিও এ-বীণা ভুলিয়াছে ঝঙ্কার,
স্বপন-দেখা এ আঁখিতে নামিছে ঘুমের পর্দ্দাখানি। *

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

* Arthur O' Shaughnessyর বিখ্যাত Odeএর অনুসরণে।

প্রদীপ ও পতঙ্গ

চিত্রকর মহম্মদ আব্দর্ রহমান চাঘ্তাই।

জিজ্ঞাসা

(৯৭)
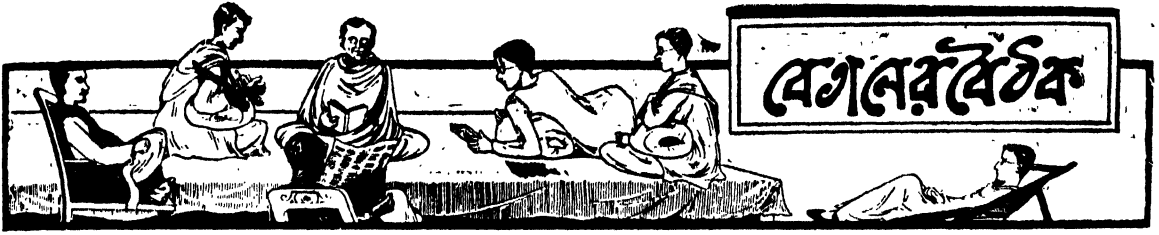
সুশ্রুত-সংহিতার টীকাকার "ডল্লন" কোন্ বংশোদ্ভব এবং তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল ?

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা

(৯৮)

কোন কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় ঢাকা-নগরীর পূর্ব্বে নাম ছিল "জাহাঙ্গীর-নগর"। জাহাঙ্গীর-নগর বলা হইত কেন ? কোন্ সময় এবং কাহার সময় হইতে ঢাকা নাম চলিত ?

শ্রী শচীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

(৯৯)

ঝিনুকের বোতাম তৈয়ার করিবার ও ছোট গুলিসুতা তৈয়ার করিবার কল কোথায় পাওয়া যায় এবং এগুলির মূল্যই বা কত হইবে ?

শ্রী নরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

(১০০)

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোল হয়। দোলের পূর্ব্ব রাত্রে বহ্নি-উৎসব হয়। সাধারণতঃ ইহাকে বুড়ীর ঘর পোড়া বলে। এই ব্যাপারের ঐতিহাসিক তত্ত্ব কি ?

শ্রী আশুতোষ সরকার

(১০১)

দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে, মুন্দর রাজ্য স্বাধীন কি দিল্লীর অধীন সামন্ত রাজা মাত্র ? সে সময়ে মুন্দরের রাজা কে ?

শ্রী সুরেশচন্দ্র রায়

(১০২)

আলুর শ্বেত-সার (starch) হইতে xylonite নামক একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। তাহা হইতে শাঁখা, ও লাঠি বা ছাতার বাঁট, ইত্যাদি পণ্য-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আলু হইতে starch বাহির করা, ও তাহা হইতে xylonite প্রস্তুত করা এবং তৎপরে উল্লিখিত পণ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার বিশিষ্ট প্রক্রিয়া কি কি ? এবং তজ্জন্য যে-সকল ছাঁচ (mould) আবশ্যক, তাহা কোথায় ও কত মূল্যে পাওয়া যায় ? ঐ-সকল দ্রব্য সুচিক্কণ করিবার, ও পরে ফাটিয়া না যায় তাহার উপায় করিবার কোন উপায় আছে কি না ?

ময়দা, শঠি, সাগু ইত্যাদি হইতে যে starch হয়, তাহাতেও ঐরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় কি না ?

শ্রী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(১০৩)

দোকানদারেরা রাত্রে আদা, মধু, সূচ, ধুনা এবং সিন্দুর বিক্রয় করে না কেন ?

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

(১০৪)

ঐতিহাসিকবর নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সেন-রাজগণের রাজধানী "বিক্রমপুর" বঙ্গে (আধুনিক 'পূর্ব্ববঙ্গে') নহে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। রাঢ়েও (নদীয়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে) বিক্রমপুর আছে। তিনি উহাকে প্রাচীন বিক্রমপুর বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কয়েকটি বলবৎ কারণে তাঁহার মত সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে। আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র। সেনরাজগণ যদি বঙ্গে বাস করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বঙ্গের পরিবর্ত্তে রাঢ়ে পাঠাইবার কোনই যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না (রাঢ় হইতে পরে বরেন্দ্রভূমিতে আসিয়া ইঁহারা বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন)। এদেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ আছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আছেন, কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থের ন্যায় বঙ্গজ ব্রাহ্মণ নাই। বৈদ্যদিগেরও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীই দেখিতে পাওয়া যায়।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর "দাসবিক্রয়ের প্রাচীন দলিল" প্রবন্ধ পাঠেও "আগে রাঢ়, শেষে বঙ্গে" কুলজী গ্রন্থের এই কথাটি মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। রাঢ় ও বরেন্দ্রীমণ্ডলই সেকালে বাসের অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইত—হয়ত "তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি" এইজন্য "বঙ্গদেশে" উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ বাস করিতে রাজি হইতেন না। সুতরাং পালরাজগণ যেমন বরেন্দ্রদেশে, সেনরাজগণ তেমনই রাঢ়দেশে বাস করিতেন, ইহাই অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। আর তাহা না হইলে "বঙ্গদেশে" এত স্থান থাকিতে লক্ষ্মণসেন "বঙ্গদেশ" সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া রাঢ়ের নবদ্বীপে রাজধানী করিতে যাইবেন কেন ? সুতরাং নগেন্দ্র-বাবুর অনুমানই ঠিক বলিয়া মনে হয়—সেনরাজগণের রাজধানী নবদ্বীপেরই নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল ; ইন্দ্রপ্রস্থ বা হস্তিনার পর দিল্লীর ন্যায়, লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরের পর তন্নিকটবর্ত্তী নবদ্বীপে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে সুধীবৃন্দের আলোচনা প্রার্থনীয়।

শ্রী দীনেশচন্দ্র চৌধুরী

(১০৫)

নিম্নলিখিত হেঁয়ালিটির অর্থ কি ?

বিধুর করেতে ধরে বামনে ঘোরায়।
দেখিতে আইল তাহা অন্ধ বন্ধ্যার তনয়॥
বধির শুনিল তাহা কবন্ধের মুখে।
করহীন-করাঘাতে পড়েছে বিপাকে॥

শ্রী পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়

(১০৬)

পূর্ব্ববঙ্গে 'কবিগান' নামক এক-প্রকার গান গীত হইয়া থাকে। গায়কগণ কবিদার নামে খ্যাত, এবং গীতগুলি প্রতিপক্ষদলের প্রতি প্রশ্নোত্তররূপে সঙ্গীতস্থলে উপস্থিত-মত রচিত হয়। গানগুলির তানলয় প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। এই বৈশিষ্ট্যময় নূতন সুরের উদ্ভাবয়িতা কে ? তিনি কোন্ সময় কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? গানগুলি কোথায় প্রথম গীত হইয়াছিল ? ইহার বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস কি ?

শ্রী জগচ্চন্দ্র পোদ্দার

(১০৭)

১৫৮০ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ময়ূরভঞ্জের রাজগণের নাম জানা আমার আবশ্যক হইয়াছে। ঐ সময় মধ্যে ময়ূরভঞ্জের কোনও রাজা বা "রাউৎরাও ভঞ্জের" (রাজভ্রাতা বা যুবরাজ) নাম সূর্য্যভঞ্জ ছিল কি না? খৃষ্টাব্দ হিসাবে কোন্ সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন? এ সম্বন্ধে দয়া করিয়া কেহ সংবাদ জানাইলে একটি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে সাহায্য করা হইবে।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ

(১০৮)

একটি ছোট কাঁচের গ্লাসে অল্প পরিমাণ জল ঢালিয়া তাহাতে একটি তেঁতুলের বীজ অথবা একটি কুইনাইন-পিল্ ফেলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা জল স্পর্শ করতঃ গ্লাসের উপরদিকে তাকাইলে নিক্ষিপ্ত বীজ কিম্বা পিলটি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বড় দেখায়। ইহার কারণ কি?

শ্রী ব্রজমোহন নাথ

(১০৯)

কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রদ্বার অঙ্গুলী দ্বারা রুদ্ধ করিলে এক-প্রকার শব্দ অনুভূত হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রী সারদাপ্রসাদ কর

(১১০)

প্রাচীন ভারতে আমরা তিনটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেগুলি—নালন্দা, তক্ষশিলা ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়; এই বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল? বিক্রমপুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

শ্রী কামিনীমোহন দাস

(১১১)

অপেক্ষাকৃত ছোট বড় দুখানা দর্পণ লইয়া একখানা অপরখানার উপর প্রতিবিম্বিত করিলে দেখা যায় যে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর একখানার প্রতিবিম্ব অপরখানার ভিতর দিয়া সমরেখায় শ্রেণীবদ্ধভাবে বহুসংখ্যক প্রতিফলিত হয়; ইহার কারণ কি?

শ্রী অমূল্যচন্দ্র দত্ত

(১১২)

বেদ উপনিষদ্ ও পুরাণাদিতে "কবি" ও "ব্রহ্ম" শব্দ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহাদের যথাসম্ভব উদাহরণ কি কি?

শ্রী নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(১১৩)

তন্ত্রচূড়ামণি পুস্তকে পীঠনির্ণয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরব শম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ॥

রত্নাবলী-নাটিকার দ্বিতীয় অঙ্কের প্রবেশকে—শ্রীপর্ব্বত হইতে আগত শ্রীমন্তদাস ধার্ম্মিকের কথার উল্লেখ আছে।

এই "শ্রীশৈল" বা "শ্রীপর্ব্বত" কোথায় এবং উহার আধুনিক নাম কি?

শ্রী কিরণবালা দেবী

(১১৪)

বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গ-কাব্যের নাম কি?

শ্রী রাধাচরণ দাস

মীমাংসা

(৩৩)

'সে দিলে; সে গেল।'

গত ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে কোচিন ত্রিচূড় হইতে শ্রীযুক্ত রামস্বামী কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের অতীত-কালে প্রথম পুরুষে '-লে' ও '-ল' র প্রয়োগ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন। বাঙ্গলা ব্যাকরণের এইরূপ বহু খুঁটী-নাটী বিষয় বাঙ্গলা-ভাষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়; অথচ এই-সব বিষয়ের সমাধান বাঙ্গলা-ভাষার ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। আমার মনে হয়, এই বিষয়টি সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় আধুনিক-ভাষা অনুশীলন-কারীদের অগ্রণী স্যর জ্যর্জ্ আব্রাহাম গ্রিয়ার্‌সনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রিয়ার্‌সন Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1895 এ দুইটি প্রবন্ধে, এবং তাঁহার বিরাট্ Linguistic Survey of India, Vol. V, Part 1, Specimens of the Bengali and Assamese Languages (1903), ১৩র পৃষ্ঠা ১র পাদটীকায়, বাঙ্গলার অতীতে '-লে' ও '-ল' প্রত্যয়-দ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। গ্রিয়ার্‌সনের মন্তব্যগুলির বিচার পরে সংক্ষেপে করা যাইতেছে; এ-সম্বন্ধে আমার যাহা মনে হয় তাহা আগে বলি।

সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতে '-লে' প্রত্যয় কেবলমাত্র কলিকাতা-অঞ্চলের বাঙ্গলায় নিবদ্ধ নয়, পশ্চিম-বঙ্গের (সাধারণতঃ '-লে-ক্' রূপে) ও উত্তর-বঙ্গে এবং আসামীতে এই প্রত্যয় মিলে; বিশেষত আসামীতে ও উত্তর-বঙ্গের ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়ায় '-লে' ও অকর্ম্মকে হসন্ত '-ল্' এর প্রয়োগ উক্ত স্থানীয় ভাষা-দ্বয়ের সাধারণ নিয়মের মধ্যে অন্যতম; যেমন 'দি লে', 'খা লে', কিন্তু 'গে ল্', 'হ ল্'। পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে (ঢাকার ভাষাকে ইহাদের মুখপাত্র হিসাবে ধরা যাইতে পারে) কিন্তু '-লে' প্রত্যয়ের চলন নাই বলিয়া মনে হয়—সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক উভয় শ্রেণীর ক্রিয়ার উত্তর '-ল' বা '-লো' ব্যবহৃত হয়। গ্রিয়ার্‌সনের Linguistic Surveyতে সংগৃহীত বাঙ্গলার প্রাদেশিক রূপের নমুনা হইতে মোটামুটি ধারণা করা যায় যে, সকর্ম্মক-ক্রিয়ায় '-লে' (বা '-লে-ক') এর ব্যবহার পশ্চিম-বঙ্গের, ব-দ্বীপের পশ্চিমভাগের, উত্তর-বঙ্গের ও আসামের কথিত ভাষাগুলির বিশেষত্ব; পূর্ব্ব-বঙ্গের বাঙ্গলায় এ-কারান্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগ নাই।

যে যে স্থানে সকর্ম্মকে এ-কারান্ত অতীত-বিভক্তির প্রচলন আছে, সেখানে ক্বচিৎ সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়; যেমন রাঁচি-অঞ্চলের সরাকীদের মধ্যে প্রচলিত বাঙ্গলায়, মানভূমের ও সাঁওতাল পরগণার কোনও কোনও স্থলে, অকর্ম্মক-ক্রিয়ার 'লে -ক্' প্রত্যয় মিলে, এবং উত্তর-বঙ্গে ও আসামে কদাচিৎ অকর্ম্মক-ক্রিয়ায়ও '-ল' দৃষ্ট হয়। পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গে এবং আসামে বহু অনার্য্য-ভাষী লোকের মধ্যে আধুনিক যুগে বাঙ্গলা ও আসামী ভাষার প্রসার হইতেছে—তাহাদের মধ্যে '-লে' '-ল' র গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। কালক্রমে '-লে' '-ল' র মূল পার্থক্য-সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গলা-ভাষীর ধারণাও বলবৎ থাকিতেছে না। কলিকাতার কথিত ভাষার ভিত্তির উপর আজ-কালকার সাহিত্যের ভাষা প্রতিষ্ঠিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন কলিকাতার কথিত-ভাষায় পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের '-ই লা ম' প্রত্যয় বাঙ্গলা সাধু-ভাষা বা গদ্য-সাহিত্যের ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, পশ্চিম-বঙ্গের '-লুঁ', '-লু ম্' হয় নাই, যদিও '-লুঁ' হইতে উৎপন্ন '-নু' প্রত্যয় বাঙ্গলা কবিতার

ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধু-ভাষার প্রভাবে, এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের মৌখিক ভাষারও প্রভাবে, পশ্চিম-বঙ্গে কলিকাতা-অঞ্চলে -'লু ম্' এর জায়গায় '-লা ম্ এর এবং '-লা ম্' এর পরিবর্ত্তিত রূপ '-লে ম্' এর ব্যবহার আজকাল খুবই দেখা যায়; এবং বহু 'জাত্' পশ্চিম-বঙ্গীয়ের মুখে '-লু ম্' এর স্থানে '-লা ম্,' (ও কখনও কখনও '-লে ম' শুনা যায়। পূর্ব্ব-বঙ্গীয় বহু লেখক কলিকাতার মৌখিক ভাষায় লিখিয়া থাকেন; তাঁহাদের বাঙ্গলায় সকর্ম্মক-ক্রিয়ায় অতীত প্রথম পুরুষে '-লে' অপেক্ষা '-ল' র প্রয়োগ বেশী দেখা যায়। প্রতিবেশী উপভাষার প্রভাবে কলিকাতা-অঞ্চলেও '-লে'র স্থলে '-ল'র প্রয়োগ আসিয়া যাইতেছে, '-ল' (বা '-লো') অকর্ম্মক-সকর্ম্মক নির্বিশেষে অতীত প্রথম পুরুষের প্রত্যয় হিসাবে সর্ব্বজন-গৃহীত হইয়া যাইতেছে,—'দি ল, খে ল, পে ল, রা খ্ ল,' প্রভৃতি রূপ পশ্চিম-বঙ্গীয়ের মুখে ক্বচিৎ শুনা যায়, কিন্তু এখনও 'জাত্' কলিকাতাই ও পশ্চিম-বঙ্গবাসী জনসাধারণের মুখে সকর্ম্মক-অকর্ম্মক ক্রিয়ার এই পার্থক্য, '-লে' (রাঢ়ে '-লে ক্') ও '-ল', রক্ষিত হইয়া থাকে।

পুরাতন বাঙ্গলায় সকর্ম্মক-ক্রিয়ায় অতীত প্রথম পুরুষে '-লে' (বা '-ই লে') প্রত্যয় তাদৃশ সাধারণ নহে। সাধারণত অকারান্ত '-ই ল' প্রত্যয়েরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এবং '-ই ল' তিন পুরুষেই পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যেই, পশ্চিম-বঙ্গের ভাষাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলায় এক সাহিত্যের ভাষা দাঁড়াইয়া যায়; এই সাহিত্যের ভাষায় আবার লেখকের বা পুথী-নকলকারীর বাসস্থান ভেদে নানা প্রদেশের মৌখিক ভাষায় প্রচলিত প্রত্যয়াদি প্রযুক্ত হইতে থাকে। প্রাচীন বাঙ্গলা পুথীতে সাধারণতই ভাষার প্রাদেশিক রূপগুলি বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হইতে পারে নাই। কিন্তু বাঙ্গলার এক অতি প্রাচীন পুস্তক, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কাব্য, গ্রন্থকারের মূলভাষা অনেকটা বজায় রাখিয়াছে। যে পুথীতে এই কাব্য রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা চতুর্দ্দশ শতকে লিখিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; পুথী-খানি গ্রন্থকারের সমসাময়িক; পরবর্ত্তীযুগের এবং ভিন্ন-প্রদেশ বাসী নকল-কারীর হাতে ইহার ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই; ইহার ভাষাকে মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গে চতুর্দ্দশ শতকে ব্যবহৃত সাহিত্যের ভাষার নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং এই ভাষায় কবির প্রদেশের মৌখিক ভাষার প্রয়োগও কিছু কিছু রক্ষিত হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে।(১) শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বইয়ের শেষে যে শব্দ-সূচী দিয়াছেন, তাহা ভাষানুসন্ধানীর পক্ষে বহু-শ্রমের লাঘব করিয়াছে। ঐ শব্দ-সূচী হইতে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষায়, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম-বঙ্গের কথিত ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের ভাষায়, সকর্ম্মক অতীত প্রথম পুরুষে '-লে' র প্রয়োগ পাওয়া গেলেও, '-ল'র প্রয়োগই বেশী; যেমন, 'ক রি লে, কইলে' (=আধুনিক ক'র্‌লে), ৪ বার, কিন্তু 'ক ই ল, ক রি ল' (=ক'র্‌ল), ১৭ বার; 'ক রি লে' ১ বার, 'ক রি ল' ৬ বার; 'পা ই লে' (=পেলে) ১ বার, 'পা ই ল' (=পেল) ৭ বার; 'পা ঠা ই লে', 'পা ঠা য়ি লে' (=পাঠালে) ৩ বার, 'পা ঠা (য়্) ই ল' ৪ বার; 'বু ই লে' (=ব'ল্‌লে) ১ বার, 'বু ই ল, বু য়ি ল', ২৮ বার; 'দি লে' ২ বার, 'দি ল' ১০ বার; 'নি লে' ৫ বার, 'নি ল' ৬ বার। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সকর্ম্মক অতীত প্রথম পুরুষে এ-কারান্ত প্রত্যয় পশ্চিম-বঙ্গের কথিত বাঙ্গালায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত, যদিও সাহিত্যের ভাষা প্রাচীনতার পরিপন্থী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অ-কারান্ত '-ল' এর-ই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলা-ভাষার যে প্রাচীনতম নমুনা(২) আমরা বৌদ্ধ-সহজিয়া চর্য্যাপদে পাই (খ্রীষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতক), তাহাতে '-লে' পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই প্রথম পুরুষে '-ল'। পুরাতন আসামীতে '-লে' '-ল' এর স্থলে '-লা' পাই; এই '-লা' প্রত্যয় পুরাতন বাঙ্গলায়ও পাওয়া যায়, এবং উড়িয়াতে কেবলমাত্র '-লা' এরই প্রয়োগ আছে। (উড়িয়াতে প্রথম পুরুষে একবচনে '-লা', বহুবচনে ও গৌরবে একবচনে '-লে' ক্বচিৎ '-লে-ক'; উড়িয়ার বহুবচনের এই এ-কারান্ত রূপের উৎপত্তি বাঙ্গলা-আসামীর সকর্ম্মক প্রথম পুরুষের '-লে' হইতে বিভিন্ন)।

পুরাতন বাঙ্গলা ও আসামীতে সকর্ম্মকের '-লে'র বিরল প্রয়োগ, এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের বাঙ্গলায় ও উড়িয়াতে ইহার অভাব দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে-সময়ে বাঙ্গলা-উড়িয়া-আসামীর পৃথক্ উদ্ভব হয় নাই, তখন এই কয় ভাষার মূল প্রাচ্য-মাগধী-অপভ্রংশে '-লে' (বা '-ইলে') প্রত্যয় ছিল না, পরে এক-টানা পশ্চিম-বঙ্গে, উত্তর-বঙ্গে ও আসামে ইহার উদ্ভব হয়; উড়িয়ায় ও পূর্ব্ব-বঙ্গের বাঙ্গলায় ইহার অস্তিত্ব ঘটে নাই—উড়িয়ায় আ-কারান্ত '-লা' (বহুবচনে '-লে') এবং পূর্ব্ব-বঙ্গে অ-কারান্ত '-ল' (বা '-লো') প্রথম পুরুষে শিষ্ট প্রয়োগ হিসাবে দাঁড়াইয়া যায়। এখন এই '-লে'র উৎপত্তি কি, এবং কেনই বা '-ল' হইতে ইহার বিশিষ্ট প্রয়োগ রীতিসিদ্ধ হইল?

বাঙ্গলা অতীতে '-ল' (বা '-ই ল') প্রত্যয়ের উৎপত্তি 'সংস্কৃতের' (অর্থাৎ আদিযুগের ভারতীয় আর্য্যভাষার) নিষ্ঠা 'ত' প্রত্যয়ে, প্রাকৃত-যুগে (অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারতীয় আর্য্যভাষায়) '-ই ল্ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া। প্রাকৃতযুগে এই অতীত প্রয়োগ, আধুনিক হিন্দীর মত, সকর্ম্মক-ক্রিয়ার কর্ম্মবাচ্যে হইত, ও অকর্ম্মক কর্ত্তার বিশেষণস্থানীয় হইত; যেমন সংস্কৃত 'রা মে ণ ভ ক্তং খা দি তং'=প্রাকৃত 'রা মে ণং ভ ত্তং খা ই অং', পরে, প্রাচ্যখণ্ডে, 'খা ই অ' পদে '-ই ল্ল' বা '-ই ল্ল অ-' প্রত্যয় যোগ করিয়া, 'রা মে ণ ভ ত্তং * খা ই অ ই ল্লং, খা ই ল্লং বা খা ই ল্ল অং', তাহা হইতে পুরাতন বাঙ্গলায় 'রা মেঁ ভাত খা ই ল'। (হিন্দীর 'রা ম নে, ভা ত খা য়া' বাক্যের উৎপত্তি, প্রাকৃতের '* রা ম ক য়ে ণং ভ ত্তং খা ই অ অং' এইরূপ বাক্য হইত; হিন্দীর মূলস্থানীয় শৌরসেনী অপভ্রংশে '-ই ল্ল' প্রত্যয়ের প্রয়োগ অতীতে

---

(১) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি রায় বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন (১৩২৬ সাল, পৃঃ ১৯)। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও পরিষৎ-পত্রিকায় ইঁহাদের অভিমত প্রকাশ করেন; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রাচীনত্বেরই পরিপোষক। বহুশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত যোগেশ-বাবু বাঙ্গলা-ভাষা-অনুশীলনকারীদের মধ্যে অগ্রণী; কিন্তু আমিও ইঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে ইহা খাঁটী জিনিস।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র সংগ্রহে যে চারখানি বই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম-খানির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়,'—ইহাতে ৪৭টি চর্য্যাপদ বা গান আছে। চর্য্যাপদের ভাষা যে বাঙ্গলা নয়, এইরূপ অভিমত কেহ কেহ দিয়াছেন। কিন্তু চর্য্যাপদগুলির ভাষা ও ব্যাকরণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আমার নিঃসন্দেহ ধারণা হইয়াছে যে, এই গান কয়টিতে আমরা বাঙ্গলা-ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই; যদিও ইহাতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সাধারণ সাহিত্যের ভাষার ('পশ্চিমা অপভ্রংশে'র) প্রভাব কতকগুলি প্রত্যয়ে ও রূপে আসিয়া গিয়াছে। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র অন্তর্গত আর তিন খানি বইয়ের ভাষা বাঙ্গলা নহে।

হইত না)। সংস্কৃতের 'সঃ চলিতঃ' মাগধী-অপভ্রংশে *'শে (বা শি) চলিল্ল', তাহা হইতে বাঙ্গলায় 'সে চলিল'। হিন্দীতে (ব্রজভাষায়) 'সো চল্যৌ=সো চলিঅ উ=সো চলিঅ ও=সঃ চলিতকঃ'; 'রহ্ চলা=চল্য়া=চলিয়া=চলিঅ অ=চলিতকঃ'। অতীতে সকর্ম্মকক্রিয়া পুরাতন বাঙ্গলায় হিন্দীরই মত কর্ম্মবাচ্যে ব্যবহৃত হইত, এবং অকর্ম্মক-ক্রিয়ার ক্রিয়াপদ কর্ত্তার বিশেষ্য ছিল। চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গলায় এই অবস্থা রক্ষিত আছে; যেমন চর্য্যা ১০—'মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী'=ময়া নিক্ষিপ্তা অস্থিরচিতা মালিকা। পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলায়, বাক্যরীতি অতীতে ক্রমে কর্ত্তৃবাচ্যীয় হইয়া দাঁড়ায়, কর্ত্তৃপদ তৃতীয়া বিভক্তি হইতে প্রথমায় নীত হয়; 'রামে ভাত খাইল' (< 'রামেণ ভক্তং * খাদিত-ই ল-কং') এর স্থলে 'রাম ভাত খাইল'=রামঃ ভক্তং খাদিতবান্ বা খাদয়ামাস। যে ক্রিয়াপদ পূর্ব্বে কর্ম্মের বিশেষণ ছিল, তাহা এক্ষণে পুরাপুরি সমাপিকা-ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সঃ চলিতঃ=সে চলিল (< চলিত-ইল-ক), এইরূপ অকর্ম্মক বাক্যে ক্রিয়াপদের পূর্ব্বেকার বিশেষণ-প্রকৃতি বজায় রহিল; পুরাতন বাঙ্গলায় কর্ত্তৃপদ স্ত্রীলিঙ্গে হইলে, অকর্ম্মক অতীত ক্রিয়াপদ কচিৎ স্ত্রী-প্রত্যয়যুক্ত দেখা যায়; যেমন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'চলিলী রাহী=চলিতা রাধিকা। সকর্ম্মক-ক্রিয়ায় অতীতে যখন আগেকার প্রকৃতি আর রহিল না, তখন মাগধী-প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাগুলিতে (ভোজপুরিয়া, মৈথিল-মগহী, উড়িয়া-বাঙ্গলা-আসামীতে) নিষ্ঠাসিদ্ধ ক্রিয়াপদে সর্ব্বনামদ্যোতক প্রত্যয় যোগের রীতি আসিয়া গেল; যেমন প্রাচীন বাঙ্গলার 'মই ভাত খাইল' (< ময়া স্থলে *ময়েন ভক্তং খাদিত-ইল-কং) স্থলে পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গে 'মই ভাত খাইলাহোঁ' (হোঁ=হউ=অহকং, অহং), ও পরে 'মুই ভাত খেলুম', পূর্ব্ব-বঙ্গে 'খাইলাম'='খাইল+আমি'। পশ্চিম-বঙ্গে, উত্তর-বঙ্গে, আসামে প্রথম পুরুষে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদের প্রত্যয় 'এ' কারের অনুকরণে, সকর্ম্মক-ক্রিয়ায়ও অতীত '-(ই)ল' প্রত্যয়ের উত্তর 'এ' যুক্ত হইতে লাগিল; 'রাম খায়' (খা-এ < খাই, খাঅই < খাদতি) এর অনুকরণে, 'রাম খাইল+এ'='রাম *খাইলে' > 'রাম খেলে, খালে'। কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষায় এই রীতি দাঁড়াইয়া গেল। কিন্তু অকর্ম্মক-ক্রিয়ার বিশেষণ-প্রকৃতির অস্তিত্ব মধ্যযুগের বাঙ্গলায় একেবারে লুপ্ত না হওয়ার দরুণ, অকর্ম্মক ক্রিয়ার উত্তর 'এ' প্রত্যয় আসিল না।

উত্তম ও মধ্যম পুরুষে কিন্তু অকর্ম্মক-সকর্ম্মকের প্রভেদ নাই—'আমি গেলাম, আমি দিলাম, তুমি গেলে, তুমি দিলে'; প্রভেদ লক্ষিত হয় কেবল প্রথম পুরুষে; 'সে গেল, সে দিলে'। ইহার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমি দিতে পারিতেছি না। তবে বোধ হয়, উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম 'মুই—আমি, তুই—তুমি' মূলে তৃতীয়া বিভক্তির পদ বলিয়া [ময়া > *ময়েন > মই > মুই; অস্মাভিঃ > অম্হেহি > আহ্মি > আমি; ত্বয়া > * ত্বয়েন > তই > তুই; যুষ্মাভিঃ > তুম্হেহি > তুহ্মি > তুমি; অহং > অহকং > হকং > হউ এবং ত্বং > তু প্রাচীনতম বাঙ্গলায় পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যযুগের বাঙ্গলায় লুপ্ত, 'মুই তুই আমি তুমি' ইহাদের স্থান পাইয়াছে], সকর্ম্মক-ক্রিয়ার সহিত অকর্ম্মকের উত্তম ও মধ্যম পুরুষে বাহ্য সাদৃশ্য আসিয়া যায়;—'অহং চলিতঃ' (বা '*চলিত-ইল-কঃ') স্থলে প্রাচীনতম বাঙ্গলার 'হউ চলিল', যখন 'হউ' পদের লোপের ফলে 'মই চলিল'-তে রূপান্তরিত হইল, তখন 'ময়া খাদিতং' (> *ময়েন খাদিত-ইল-কং) 'মুই খাইল' '*খাইলাহোঁ, খাইলুম, খাইলাম' ইত্যাদির দেখাদেখি 'মই চলিল'-ও, 'মই চলিলাহোঁ, চলিলুম, চলিলাম' ইত্যাদি রূপ ধরিল। কিন্তু প্রথম পুরুষের সর্ব্বনাম বরাবর আধুনিক বাঙ্গলা পর্য্যন্ত প্রথমা বিভক্তিতে তাহার রূপ বজায় রাখিয়া আসিয়াছে; সংস্কৃতের 'সঃ' মাগধী-প্রাকৃতে 'শে', পরে '*শি' (যাহা হইতে আসামী 'সি'); 'সঃ *চলিত-ইল-কঃ' হইতে 'সে চলিল'—ভাষার রীতিতে এখানে পরিবর্ত্তন আনিবার পক্ষে তেমন দৃষ্টান্ত রহিল না। [তৃতীয়া বিভক্তির 'তেন' বাঙ্গালায় লুপ্ত হয় নাই, 'সঃ'>'সে'র পাশে বরাবর বিদ্যমান; 'তে কারণ, < 'তেন কারণেন', 'তেঁই < 'তেনহি'।]

পশ্চিম-বঙ্গে ভবিষ্যতেও এই পদ্ধতির প্রসার দেখা যায়। 'রামেণ ভক্তং খাদিতব্যং' > মধ্যযুগের বাঙ্গালায় 'রামে ভাত খাইব,' আধুনিক পূর্ব্ব-বঙ্গের ভাষায় 'রামে বা রাম ভাত খাইব', কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে 'রাম ভাত খাইব+এ=খাইবে'; এবং এক্ষেত্রে পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক ভাষার প্রয়োগই সাধু-ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। অকর্ম্মক-ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ প্রয়োগ, অতীতের মত কর্ত্তার বিশেষণ-স্থানীয় নহে; 'রামেণ চলিতব্যং' এখানে চলিতব্য > 'চলিব' পদের ক্রিয়াত্ব, 'রামঃ চলিতঃ (চলিত ইলকঃ)', (> 'চলিল') এইরূপ বাক্যের বিশেষণ-ক্রিয়ার অপেক্ষা বিশেষ পরিস্ফুট। এই হেতু পশ্চিম-বঙ্গের ভাষায় অকর্ম্মক-ক্রিয়াতেও ভবিষ্যৎকালে 'এ' প্রত্যয়ের যোগ ঘটিয়াছে।

গ্রিয়ারসন্, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1895 (পৃঃ ৩৫০, ৩৬৬, ৩৭৪) তে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি '-লে' র এ-কারকে অপভ্রংশ প্রাকৃত ইদম্-বাচী সর্ব্বনাম-পদ 'আয়', অথবা অদস্-বাচী সর্ব্বনাম পদ 'অহহিঁ' হইতে জাত অনুমান করেন; এই ব্যাখ্যা অনুসারে, তাঁহার মতে, সকর্ম্মক-ক্রিয়ার উত্তর সর্ব্বনাম-বিশেষের প্রয়োগ হইত—কর্ম্মকে বিশেষ-ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য; কিন্তু অকর্ম্মক-ক্রিয়ায় তাহার আবশ্যকতা ছিল না। এই ব্যাখ্যা অনুসারে,'মারলে' পদ—< '*মারিল-আয়' অর্থাৎ 'মারিল-এ কে', বা < '*মারিল-অহহিঁ' অর্থাৎ 'মারিল-ও কে'। আধুনিক মৈথিলের ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মদ্যোতক সর্ব্বনামপদের সংযোজন পদ্ধতি দেখিয়া গ্রিয়ারসন্ এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াসী হন। বলা বাহুল্য, মধ্য-যুগের বা প্রাচীন-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করে এমন কিছুই মিলে না; এবং পরে ১৯০৩ সালে গ্রিয়ারসন্ '-লে' র এ-কারকে কর্ত্তৃদ্যোতক সর্ব্বনাম-পদ 'হিঁ' বলিয়া মনে করেন, 'খালে' < 'খাইল+ *হিঁ'=খাদিতং+তেন; কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রাচীন বাঙ্গলায়ও পাওয়া যায় না।

অসমাপিকা-ক্রিয়ার যে '-লে' বা '-ইলে' প্রত্যয় ('সে দিলে আমি দেবো') তাহা অকর্ম্মক-সকর্ম্মক-নির্ব্বিশেষে। অসমাপিকা '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত পদ চর্য্যাপদের বাঙ্গলায় পাওয়া যায়, মধ্যযুগের বাঙ্গলায়ও বিশেষ প্রচল। এই প্রত্যয়ের এ-কার সপ্তমীর বিভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'রাম এলে'='রাম আইলে'='রামে আয়াতে' ('আইলে' < আয়াত-ইল=আইল্ল+সপ্তমী বিভক্তির 'অহিঁ'=সংস্কৃতের সর্ব্বনামের সপ্তমী বিভক্তির '-অস্মিন্'; 'রাম খেলে'='রামেণ খাদিতে ('খেলে < খাইলে < খাইঅ-ইল্ল-অ-হিঁ')। এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এখন স্থগিত রাখা গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৩৩)

কিছু কাল পূর্ব্বে রামস্বামী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের অতীতে 'ল' প্রত্যয়ের

স্থানে কোথায় কোথায় 'লে' হয়। আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে রাঢ় ও কলিকাতা-অঞ্চলের কথিত ভাষায় সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়ায় 'ল' স্থানে 'লে' হয়।

তিনি এ সম্বন্ধে প্রবাসীতে যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। বাঙ্গালা ভাষায় অতীত ইতিহাসের সেরূপ কোনও আলোচনাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে এবিষয়ে একমাত্র নিয়ম বলা যায়, সকর্ম্মক ক্রিয়ামাত্রেই 'ল' স্থানে 'লে' হয়। যেখানে তাহা হয় না তাহা ব্যভিচার, অথবা অন্য অঞ্চলের লোকের লেখা। মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই অবিকল্পে সংবৃত-অকারান্ত ক্রিয়াপদ উচ্চারিত হয়। সুতরাং সেই সকল অঞ্চলের লেখকগণের ভাষায় ব্যভিচার থাকিবারই কথা। কিন্তু রাঢ়ের লোকে সকর্ম্মক ক্রিয়ার শেষে হ্রস্ব বা দীর্ঘ একারের উচ্চারণ করেন। কারণটা বোধহয় এইরূপ :—মলো (উচ্চারণ molŏ) অকর্ম্মক ক্রিয়া; মেলে (mĕlĕ) সকর্ম্মক ক্রিয়া। অর্থাৎ 'মলো' ক্রিয়ার ণিজন্ত (বা Causative) রূপ হইল 'মেলে'। পূর্ণ প্রাচীন আকার 'মরিল' বা 'মইল' এবং 'মারিল' বা 'মাইল'। সব-গুলিরই অন্তঃস্বর সংবৃত 'অ'। কিন্তু যখন আকার ছোট হইয়াছে তখন ণিজন্ত বা কারণজ ক্রিয়ার আ-কার ও ই-কার মিলিয়া এ-কার হইয়াছে এবং তাহারই প্রভাবে পরবর্ত্তী অকার স্থানে হ্রস্ব এ-কার হইয়াছে। মাইল=মে ল্ এ=মেলে (mĕlĕ)। এইরূপ মরল (মরলো)—মারলে; চললো—চাল্‌লে; ঢল্‌লো—ঢাল্‌লে, পড়্‌লো—পাড়্‌লে; প'লো—ফেল্‌লে; রইলো—রাখ্‌লে; নড়্‌লো—নাড়্‌লে; সরলো—সারলে; ছাড়্‌লো—ছাড়ালে; কাঁদলো—কাঁদালে; নাচ্‌লো—নাচালে; ইত্যাদি। এই সকল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এই এ-কার ও সকর্ম্মকভাবের সহিত একটা সম্পর্ক জুটিয়াছে। তাহার ফলে 'পেলে', 'খেলে', 'দিলে', 'নিলে,' 'ধর্‌লে' 'কর্‌লে,' প্রভৃতি সমস্ত সকর্ম্মক ক্রিয়াই এ-কারান্ত। ব্যভিচারও আছে, যেমন 'চাইলে'=তাকা'লো। এখানে বোধহয় দেখা অর্থে 'চাওয়া' সকর্ম্মক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; প্রাচীন ভাষায় 'চাওয়া' অন্বেষণ অর্থে সকর্ম্মকই ছিল। তাহা ছাড়া বোধ হয় প্রার্থনা বা ভিক্ষা করার অর্থও ইহার সহিত যোগ দিয়াছে। কোনও কোনও স্থানে ব্যভিচারের কারণ-নির্ণয়ও কঠিন। কিন্তু মোট কথা সকর্ম্মক অর্থেই এ-কার। এখানে ধ্বনি-বিজ্ঞানের অন্য কোনও বিধি অচিন্তনীয়। ইহার মূলকারণ মনো-বিজ্ঞান ও শব্দশক্তিবিকাশের জটিলতা। ধ্বনি-বিজ্ঞানের কোনও প্রবল বিধি এখানে নাই।

এটি আমার অনুমান মাত্র। কেহ যদি অন্য কোনরূপ কারণ অবগত থাকেন তাহা বেতালের বৈঠকে দয়া করিয়া পাঠাইবেন। কারণ আলোচনা ব্যতীত প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে না।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গত বৎসরের ৬৭)

গত বৎসরের "কাগজ থেকে কালীর দাগ তোলা" প্রশ্নের উত্তরে আরও দুএকটি কালী তুল্‌বার উপায় নীচে লিখ্‌লাম। এই দুটো A. Singson, Manufacturing Chemist কৃত একখানা বহিতে পাওয়া গেল।

(১) ব্লটিং-কাগজ বা ওই রকম একটা কিছু, গরম গাঢ় সাইট্রিক এসিড দ্রবে (hot concentrated solution of citric acid) ডুবিয়ে পেন্সিলের আকারে গুটিয়ে রাখ্‌তে হবে। এই পেন্সিলের অধিকাংশই কাগজ বা বার্ণিশ (lacquer) দিয়ে আবৃত করে' রাখ্‌তে হবে। পরে কালী তোল্‌বার সময় এই পেন্সিলটি জলে ডুবিয়ে লেখার উপর ঘস্‌তে হবে, তারপর কালীর দাগের উপর এক ফোঁটা chloride of lime-মেশান জল দিতে হবে। কালীর দাগ সঙ্গে-সঙ্গে উঠে যাবে।

(২) ফট্‌কিরী (alum), তৈলস্ফটিক (amber), গন্ধক (sulphur), সোরা (saltpetre) সমান সমান ভাগে বেশ ভাল করে' মিশিয়ে, চারিদিক্‌-বন্ধ একটি পাত্রে রাখ্‌তে হবে। কালীর দাগের উপর কিম্বা সদ্য-লিখিত অক্ষরের উপর এই গুঁড়ি ছড়িয়ে একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে ঘস্‌তে হবে; কালীর দাগ সঙ্গে-সঙ্গে কাগজ থেকে উঠে যাবে।

শ্রী শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৪৮)

মহালয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে—"মহালয়া"

"মহালয়" শব্দের অর্থ ;—সৌর আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ। প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত। "মহালয়ে কন্যাগতাপরপক্ষে" ইতি তিথ্যাদিতত্ত্বম্। কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের জন্য প্রশস্ত, তাই উহার এক নাম প্রেত বা অপর পক্ষ। "অপর" শব্দের অর্থ,—পিতৃপুরুষ।

অমাবস্যায় যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহাকে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ কহে। "অমাবস্যাং যৎক্রিয়তে তৎপার্ব্বণমুদাহৃতম্।" আশ্বিনমাসের অমা-বস্যাকে মহালয়া-অমাবস্যা বলায় ঐ সময় যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে "মহালয়া-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ" কহে।

সৌর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী হইতে শারদীয় দুর্গা-পূজা আরম্ভ হয়, তাই "মহালয়া" তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে হইয়া থাকে।

অমাবস্যা'স্তু কন্যার্কে তীর্থপ্রাপ্তৌ তথা নৃপ।
কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেন দদ্যাৎ ষোড়শ পিণ্ডকং॥

শ্রী অনঙ্গমোহন দাস

(৬১)

"মাধবাচার্য্য ভারতবর্ষের একজন অসাধারণ পণ্ডিত। মায়নের পুত্র ও সায়নাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিজয়নগরাধিপ হরিহরের প্রধান মন্ত্রী।............মাধব ভুবনেশ্বরীর প্রসাদলাভের আশায় বিদ্যারণ্যে আসিয়া কঠোর তপস্যা করেন। মহামায়া তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই বনে গুপ্তধন দেখাইয়া দেন। মাধব সেই অপর্য্যাপ্ত ধন দ্বারা বন কাটাইয়া এখানে নগর পত্তন করেন। তখন হইতে বিদ্যারণ্য 'বিদ্যানগর' (পরে চলিত ভাষায় বিজয়নগর) নামে খ্যাত হইল। তাপস মাধবও বিদ্যারণ্য-স্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।...... প্রবাদ এইরূপ যে তিনি হরিহর ও বুক্করায়কে আনিয়া বিদ্যানগর স্থাপন করেন।.........পণ্ডিতপ্রবর মাধবাচার্য্য কম্পরাজপুত্র সঙ্গমরাজের প্রথমতঃ মন্ত্রী ছিলেন। এই সঙ্গমের পুত্র হরিহর ও বুক্করায়। মাধবের অরণ্য-উপাধি দৃষ্টে মনে হয় যে তিনি শঙ্করাচার্য্যের দলভুক্ত ছিলেন। শঙ্কর-মঠের সন্ন্যাসীগণ কেবল বিদ্যাগৌরবে নহে, ধন-গৌরবেও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অধিক সম্ভব উদীয়মান মুসলমান-প্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য তিনি ঐরূপে কোন মঠের টাকা লইয়া সঙ্গম বা তৎপুত্র হরিহরকে হিন্দুধর্ম্মরক্ষায় নিযুক্ত করেন। তিনি যে এই দারুণ দুর্দ্দিনেও বেদমার্গ প্রবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিদ্যানগরের রাজগণও যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহার বেদভাষ্য হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।.........মাধবাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক পরমতাপস ছিলেন। এবং জাতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষায় তৎপর ছিলেন। তিনি একহস্তে শাস্ত্র ও অপর হস্তে শস্ত্র লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।...........খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে মুসলমানেরা গোয়া অধিকার করিয়া হিন্দু দেবালয় ধ্বংস ও হিন্দুনিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে মাধবাচার্য্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ১৩১৩ শকে মুসলমানদিগের করাল কবল হইতে গোয়া নগরী উদ্ধার

করেন। বেদভাষ্য ভিন্ন তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন........."শঙ্কর বিলাস", "শিবখণ্ড ভাষ্য" ইত্যাদি।"

"বিশ্বকোষ", Vol. XIV, 565.

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়

(৬৫)

যে পুষ্করিণীতে গুঁড়িগুঁড়ি 'পানা' হয়, সেই পুষ্করিণীতে টোকা 'পানা' অর্থাৎ বড় বড় 'পানা' ছাড়িয়া দিতে হয়। বড় বড় 'পানা' ছাড়িয়া দিলে গুঁড়ি 'পানা' মরিয়া যায়। তাহার পর বড় 'পানা' তুলিয়া ফেলিতে হয়, বড় 'পানা' তুলিতে কোনও কষ্ট নাই। এই-রূপেই গুঁড়ি পানা নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রী শুভেন্দু ভট্টাচার্য্য

শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু

(৬৭)

আনারসের উপর যে ফ্যাঁকড়া (buds) হয়, তাহার দ্বারা আনারস-গাছের প্রচার হয়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আনারস-গাছ যখন মানুষের অজ্ঞাত বা বন্য অবস্থায় ছিল, তখন ফ্যাঁকড়া তাদৃশ পুষ্ট না হওয়ায় বীজ দ্বারাই ইহার বংশবিস্তার হইত। আম, লিচু প্রভৃতির ন্যায় আনারস সাধারণ ফল নহে, অনেকগুলি ফুলের একত্র সমাবেশে এই ফল হইয়াছে। ফুলগুলি যদিও গায়গায় লাগান ছিল, তথাপি বেশ বড় ছিল। এজন্য ইহাদের বংশবিস্তার বেশ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইত, বীজগুলিও বেশ বড় বড় হইত। এবং বীজ হইতে নিয়মিত গাছ হইত। ইংরেজীতে এরূপ ফলের নাম Infructescence (i.e., a fruit composed of a whole inflorescence)। বীজ যদিও খুব বড় ছিল, কিন্তু ইহাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য খুব কম ছিল। মানুষ যখন জানিতে পারিল ইহা মানুষের খাদ্য, তখন তাহারা নানা-প্রকার আবাদের দ্বারা যাহাতে ইহার বীজগুলি খুব ছোট ছোট হইয়া খাদ্যাংশ খুব বেশী হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী আবাদের পর আনারসের inflorescenceএর ফুলগুলি খুব ছোট হওয়ায় উপযুক্ত fertilization (অর্থাৎ পুংকোষের সহিত স্ত্রীকোষের মিলন) হয় না ; তজ্জন্য বীজগুলি ক্ষুদ্রাকার হয় এবং তাহাতে বৃক্ষোৎ-পাদিকা-শক্তি অতি অল্পই থাকে, কখন কখন আদৌ থাকে না। সেই-জন্য আনারসের বীজ বপন করিলেও অঙ্কুরোদ্গম হয় না, যদিও হয়, তবে তাহা অধিক দিন বাঁচে না।

তবে বীজ হইতে গাছ করিবার একটি উপায় আছে। প্রথমে হাজার হাজার বীজ উৎকৃষ্ট সারযুক্ত জমীতে বপন করিতে হইবে। এইরূপ বপন করিলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বীজে অঙ্কুরোদ্গম হইবে। এইরূপ অনেক চারাকে উপযুক্ত যত্ন করিলে, তাহাদের মধ্যে দু একটি বড় হইতে পারে। আবার বৎসরের পর বৎসর এইরূপ আবাদ করিলে বীজের দ্বারা বৃক্ষ উৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আনারসের বীজগুলি খুব বড় বড় হইবে এবং খাদ্যাংশ খুব কম হইবে। তাহাতে কিন্তু লোকসান্ মানুষেরই।

শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু

(৭৩)

সম্রাট্গণ	প্রধানা মহিষীগণ।
আওরঙ্গজেব	'দীলরাজবানু বেগম (i)
চন্দ্রগুপ্ত	দুর্ধরা (ii)
অশোক	অসন্ধিমিত্রা (iii)

তিস্য অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তিনিই সকল দেশে প্রচারক প্রেরণ করেন। তিস্য বা তিষ্য অশোকের সর্ব্বকনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। চীন, তিব্বত ও নেপালে "উপগুপ্ত" অশোকের প্রধান গুরু ও ধর্ম্ম প্রচারে সহায় ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। (iv)

(i) "History of Aurangzib"—Sarkar. Vol. I, p. 61, 68.

(ii) "বিশ্বকোষ", Vol. VI., p. 134.

(iii) "Asoke"—V. A. Smith, p. 173.

(iv) "Asoke"—V. A. Smith, p. 55, 160, 162, 53.

(৭৪)

ভয় বা হর্ষের সংবাদ মধ্যগ-স্নায়ু (Afferent nerve) বহন করিয়া স্নায়ুমণ্ডলে (Brain) লইয়া যায়, তথা হইতে উক্ত সংবাদ প্রান্তগ-স্নায়ু (Efferent nerve) বহন করিয়া Pilomotor nerveকে দেয়, উক্ত সংবাদ পাইয়া Pilomotor nerve সঙ্কুচিত (অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে) হয়, সেই হেতু শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা

(৭৫)

গত মাসে একজন ভদ্রলোক সিমেণ্ট্ দ্বারা গাঁথনী অথবা সিমেণ্ট পলেস্তারা দ্বারা লোনা নিবারণ উল্লেখ করিয়াছেন। সিমেণ্ট্ ব্যবহারে লোনা নিবারণে বিশেষ সাহায্য করে সর্ব্বতোভাবে সত্য, তবে উহার মূল্য অধিক। আমাদের অনেকের ধারণা যে বায়ুতে অথবা জলে লবণের ভাগ মিশ্রিত থাকাতে দেওয়ালে বা গাঁথনীতে লোনা ধরে এবং বালি পলেস্তারা বা গাঁথনী খসিয়া পড়ে ; কিন্তু সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের বাটীতে লোনা ধরে না। নিম্নবঙ্গ ও কলিকাতার মাটীর খুব অল্প নীচে জল আছে এবং সেই কারণ এমত হইয়া থাকে। অনু-সন্ধান করিলে দেখা যায় যে পুকুর বা ডোবা-বুজান স্থানে বেশী লোনা ধরে, তাহার কারণ মাটীর অতি অল্প নীচে জল বর্ত্তমান এবং যদি বালি-মাটী হয় তাহা হইলে লোনার প্রকোপ আরও বেশী হয়। এখন দেখা যাউক কি উপায়ে উক্ত মাটীর নীচের জল গাঁথনী ও পলেস্তারা খারাপ করে। ভিতের গাঁথনীতে জল বর্ত্তমান থাকাতে ইট জল শোষণ করিয়া লয় এবং ক্রমাগত জল উপরে উঠিতে থাকে এবং গাঁথনীর ভিতরের মসলা ও দেওয়ালের পলেস্তারা ক্রমান্বয়ে ভিজিয়া যায়। কলিকাতার ও বঙ্গদেশের সকল স্থানে পাথরে-চুন দিয়া (Calcium Hydro-oxide) পাকা ইমারত প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। পাথরে-চুন যদি জলের উপরে থাকে তাহা হইলে এক মাসের মধ্যে যথেষ্ট শক্ত হইয়া যায় ; কিন্তু যদি উহাতে জল লাগে তবে কিছুদিনের মধ্যেই উহা নরম হইয়া যায় এবং দেয়ালের সহিত আঁটিয়া থাকিতে পারে না। ইটালী এবং গ্রীস প্রভৃতি দেশে জলের নীচে গাঁথনী করিতে হইলে পাথরে-চুনের সহিত পজলোনা (Pozzolona) নামক আগ্নেয়গিরি হইতে উৎপন্ন ধাতুবিশেষ খুব মিহি করিয়া চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া লওয়া হয় এবং সেই মিশ্রিত দ্রব্য চুনের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। ঐ দ্রব্যে গাঁথনী প্রভৃতি করিলে তাহাতে লোনা ধরে না। ইউরোপে যেখানে ঐ দ্রব্য পাওয়া যায় না তথায় সিলিকা (silica) ও এলুমিনা (alumina) নামক পদার্থ শতকরা ২৫ ও ৭ ভাগে পাথরে-চুনের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা হয়। সিলিকা, এলুমিনা ও চুন ভাল করিয়া মিশাইয়া পোড়াইয়া চূর্ণ করা আবশ্যক, নতুবা উহা ভাল করিয়া মিশিবে না।

ঘুটিং-পাথর (calcium carbonate) বলিয়া এক প্রকার দ্রব্য বিহার ও বোম্বাই প্রদেশে পাওয়া যায়। উহা যদি পোড়াইয়া গরম অবস্থায় ভাল করিয়া চূর্ণ করা যায় এবং টাট্‌কা অবস্থায় চুনের মতন ব্যবহার করা যায় তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

এই চূন জলের ভিতর থাকিলে অথবা জলস্পর্শে আরোও কঠিন হইয়া যায় এবং ইহার পলেস্তরা করিলে লোনা লাগিতে পারে না, কারণ জল লাগিলে ইহা আরও কঠিন হইয়া যায় এবং একমাস পরে সাধারণ-পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া যায়। এই চূনকে hydraulic lime বা water lime কহে।

দেবশঙ্কর মিত্র

(৭৬)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে শয়ন-বিধিতে উত্তর শিরে শয়ন সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"প্রাক্‌শিরঃ শয়নে বিদ্যাৎ ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে,
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে।"

শব্দকল্পদ্রুমধৃতঃ

তার পর গর্গ স্থান-ভেদে তিন দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন-ব্যবস্থার পরে উত্তর দিক্ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"স্বগৃহে প্রাক্‌শিরাঃ শেতে,শ্বাশুরে দক্ষিণাশিরাঃ।
প্রত্যক্‌শিরা প্রবাসে তু ন কদাচিদুদক্‌শিরাঃ"॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃতঃ

উল্লিখিত বিধানানুসারে ও হিন্দুশাস্ত্রবেত্তাগণের নির্দ্দেশানুসারেই সম্ভবতঃ উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন নিষিদ্ধ ছিল, কালক্রমে উক্ত শাস্ত্রীয় বিধি প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত এতদ্দেশে আর-একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে শনির শাপে মস্তকহীন গণেশের জন্য উত্তরশিরঃশায়ী শ্বেতহস্তীর কর্ত্তিত মুণ্ড গণেশের কবন্ধে জোড়া দিয়া গণেশকে মূর্ত্তিমান্ করা হইয়াছিল।

শ্রী লালমোহন চক্রবর্ত্তী
শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

মৃত্যুর পর হিন্দুর শবের শির উত্তর দিকে রাখার রীতি আছে। এই কারণেই বোধহয় জীবিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করা নিষেধ। অমঙ্গল-আশঙ্কাই এই প্রবাদের ভিত্তি বলিয়া মনে হয়।

প

(৭৮)

চন্দ্র ও সূর্য্যের বহির্বেষ্টনকে 'মণ্ডল' বলে।

"বাতেন মণ্ডলী ভূতাঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোকরাঃ।
মালাভা ব্যোম্নি তন্বস্তে পরিবেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" সাহসাঙ্ক।

বায়ুর পরিবর্ত্তনশীল গতির জন্যই মণ্ডলের আকার পরিবর্ত্তিত হয়। অন্য প্রশ্নের উত্তর আশা করি বৈজ্ঞানিকেরা দিবেন।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

চন্দ্রে যে মণ্ডল পড়ে তাহাকে পরিবেষ বলে। বরাহ-সংহিতায় আছে "সংমূর্চ্ছিতা রবীন্দ্বোঃ কিরণাঃ পবনেন মণ্ডলীভূতাঃ। নানাবর্ণাকৃতয় স্তন্বন্তে ব্যোম্নি পরিবেষঃ॥" অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের কিরণসমূহ বায়ু দ্বারা বৃত্তাকার হইয়া আকাশে অল্পমেঘে প্রতিফলিত হইলে, নানাবর্ণাকৃতি দেখায়, এইরূপে বিচিত্র বর্ণাকৃতি পরিবেষ হইয়া থাকে। যোগেশ-বাবুর "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" ৩৫৪ পৃষ্ঠা। বস্তুতঃ জলীয় বাষ্পে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া পরিবেষ বা মণ্ডল হয়। জলীয় বাষ্প খুব উর্দ্ধে থাকিলে মণ্ডলের আকৃতি ছোট হয়, এবং নিম্নে (পৃথিবী হইতে ৩।৬ মাইল উর্দ্ধে) থাকিলে মণ্ডল বৃহদায়তন হইয়া থাকে। কখন কখন জলীয় বাষ্প (চন্দ্র হইতে) দূরে বা নীচের দিকে সরিয়া যাইতে থাকিলে পরিবেষও ক্ষুদ্র হইতে বৃহদায়তন হইতে থাকে। আবার নীচ হইতে উর্দ্ধদিকে (বা চন্দ্রের নিকটের দিকে) যাইতে থাকিলে পরিবেষ বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রাকার হইতে থাকে। সুতরাং জলীয় বাষ্প যত নীচের দিকে আসিতে থাকে, ততই মণ্ডলের আকৃতি বড় হয়। এই কারণে মণ্ডল বা পরিবেষ বড় হইলে শীঘ্র জল হওয়ার সম্ভাবনা হয়।

শ্রী কেনারাম আচার্য্য

মেঘে জলকণার আকার যত বড় হইবে চন্দ্রের মণ্ডলের আকারও ততই বৃহৎ হইবে। এইজন্যই অনেকে মণ্ডলের বিস্তৃতি দেখিয়া বৃষ্টি আসন্ন কি না বুঝিতে পারে। জলকণাবাহী মেঘের মধ্য দিয়া চন্দ্র-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছিবার সময় ঐ রশ্মিগুলি বিচ্ছুরিত হয়। এই ব্যাপার হইতেই মণ্ডলের সৃষ্টি। সূর্য্যকিরণ-সংস্পর্শে রামধনুর সৃষ্টিও এই জাতীয় ব্যাপার। 'প'

(৭৯)

সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রামচরিত"-লেখক কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বীয় মত সমর্থনের জন্য তিনি কোনও প্রমাণ দেন নাই। ব্রাহ্মণের মধ্যে, এমন কি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের মধ্যেও, নন্দী উপাধি দেখা যায় না। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার গ্রন্থের শেষভাগে নিজের পরিচয়স্থলে আপনাকে "করণ্যানামগ্রণীঃ" বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "করণ্য" শব্দের অর্থ করণ বা কায়স্থ করিয়া সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু "করণ্য" নামক কোনও শব্দ আছে কি না সন্দেহ। বোধ হয় উহা লিপিকরপ্রমাদ। "করণ্যানাম্"-স্থলে বোধ হয় "বরেন্দ্রাণাম্" কিংবা তাদৃশ অন্য কোনও পাঠ হইবে। সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দীর নিজ পরিচয় হইতে তিনি কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা বুঝা যায় না। মাত্র এই বুঝা যায় যে তিনি বরেন্দ্রের লোক, তাঁহার পিতামহ পিনাক নন্দী এবং পিতা প্রজাপতি নন্দী। নন্দী উপাধি বৈদ্য, কায়স্থ এবং নবশাখের মধ্যে দেখা যায়।

শ্রী হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত

(৮২)

বর্ষাকালে জামা ঘামে কিংবা জলে ভিজিয়া কাল দাগ ধরিলে উক্ত-স্থানের উপর প্রথমতঃ সোডা বা সাজিমাটী ঘসিয়া পাতিলেবুর রস দ্বারা আর্দ্র করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরিষ্কার জলে কাচিয়া সাবান দিয়া লইলে উক্ত ক'ল দাগ বা "মইশ্যা" উঠিয়া যায়।

শ্রী চৌধুরী শরচ্চন্দ্র রায় মহাপাত্র

স্পিরিট বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ দ্বারা ধুইলে দাগ যাওয়া সম্ভব। এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ছত্রক (Fungus) হইতে এই দাগের উৎপত্তি। লেন্সে (lens) এরূপ দাগ পড়িলে স্পিরিট দিয়া অনেক সময় উহা তোলা যায়। বেশী ক্ষার ব্যবহারে কাপড়ের তন্তু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। 'প'

যথাসময়ে ঠিকমত রৌদ্র না পাওয়ায় কাপড়ে বা জামায় এইরূপ "মইষা" ধরে—সেইজন্য বর্ষাকালে প্রায়ই কাপড়ে জামায় একটুতেই "মইষা" ধরিতে দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে "চিতি"ও বলে। যাহা হউক কাপড়ে বা জামায় এই "মইষা" বা "চিতি" ধরিলে যত শীঘ্র পারা যায় ইহা দূর করিবার ব্যবস্থা করা উচিত,—কেন না যত সময় যাইবে ইহা উঠানও তত কষ্টকর হইয়া পড়িবে।

যেস্থানে "মইষা" বা "চিতি" ধরিবে—ভাল সাবান দিয়া সেই জায়গাটি খুব উত্তমরূপে ঘসা দরকার। তাহাতেই কতকটা উঠিয়া যাইবে। তার পর পরিষ্কার 'চা'খড়ির মিহি গুঁড়া (chalk powder) লইয়া

তাহার উপর একটু একটু ছড়াইয়া দিয়া ঘসিলেই "মইষা" দাগ একেবারে উঠিয়া যাইবে। তার পর ভাল করিয়া শুকাইয়া লইলেই হইল।

কাপড় বা জামা শুকাইয়া যাইবার পরও যদি দাগ্‌ দেখা যায় তাহা হইলে অল্পজলে ভিজাইয়া দু একবার পূর্ব্বের মত করিলেই দাগ্‌ সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইবে।

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(৮৫)

একদিক্‌কার পয়সার আঘাতে আর-একদিক্‌কার পয়সার ছিটকে যাওয়ার কারণ পয়সার স্থিতিস্থাপকতা (elasticity)। স্থিতিস্থাপকতা আর কিছুই নয়—আপনার আকারটিকে স্বাভাবিক রাখ্‌বার চেষ্টা মাত্র। যার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশী বাইরের আঘাতে তার আকারের তত কম পরিবর্ত্তন হয়, আর তেমনি তাড়াতাড়ি আপনার স্বাভাবিক অবস্থাটিও সে ফিরে পায়। এখানে মাঝের পয়সাটার কোনদিকে নড়্‌বার জো নেই। কাজেই প্রথম পয়সাটা তার যেখানে আঘাত করে, সেখানকার অণুগুলি খানিকটা পিছিয়ে আসে। ফলে পিছনের অণুগুলি তাদের ধাক্কা খেয়ে নিজেরা পিছিয়ে যায়। তাদের পিছনের অণুগুলিও এমনিভাবে খানিকটা পিছিয়ে যায়। এইরূপে ধাক্কার বেগটা পয়সার একধার হতে আর একধারে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু স্থিতিস্থাপকতার জন্যে অণুগুলি পিছনের অণুগুলিকে ধাক্কা দিয়েই আপন আপন জায়গায় ফিরে আসে। সুতরাং পয়সাটা আগে যেখানে ছিল শেষেও সেখানেই থাকে। পয়সার স্থিতিস্থাপকতা খুবই বেশী ব'লে' অণুগুলি এত কম নড়াচড়া করে আর তা এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে আমাদের চোখ তা ধরতে পারে না, আমরা পয়সাটিকে নিশ্চল দেখি, যে একটি পয়সা মাঝের পয়সাটির আর-এক ধার স্পর্শ করে' আছে—প্রথম পয়সার ধাক্কার বেগ উপরের নিয়মে অতিক্রম্ভ গিয়ে তার উপর পড়ে। সেইজন্যে সে উল্টাদিকে ছিট্‌কে যায়। শুধু পয়সা কেন, যে-কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের ভিতর দিয়ে উপরের নিয়মে চাপ-তরঙ্গ (compression wave) সৃষ্টি করে' তার একধার হতে আর-এক ধারে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। মোটের উপর জিনিসটা নিজে একটুও নড়ে না। যার ভিতর দিয়ে তরঙ্গ পাঠান হয় তাকে মধ্যস্থ (medium) বলে। আমাদের মাঝের পয়সাটি স্থিতিস্থাপক মধ্যস্থ; প্রথম পয়সাটি ঐ মধ্যস্থের ভিতর দিয়ে চাপ-তরঙ্গ পাঠিয়ে ও-ধারের পয়সাটিকে স্থানচ্যুত করে। ক্যারম্‌-খেলোয়াড়গণ এই ব্যাপারের সহিত পরিচিত। বাতাসও ঠিক এমনি একটা স্থিতিস্থাপক মধ্যস্থ। আমরা যখন কথা কই তখন বাতাসে ঘা দিয়ে দিয়ে চাপ-তরঙ্গ পাঠাতে থাকি; এই আঘাত দূরে'শ্রোতার কানে পৌঁছায় বলে' সে কথা শুনতে পায়।

শ্রী দক্ষিণেশ্বর বক্সী

(৮৬)

১নং। মেষ বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির নাম হিন্দুদিগের প্রদত্ত।

২নং। রাশি ও নক্ষত্রের নামকরণ সম্বন্ধে গ্রীসীয় কিম্বদন্তী অপেক্ষা হিন্দুদের যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা চমৎকার বৈজ্ঞানিকতাপূর্ণ। উক্ত ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখিতে গেলে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়কে মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" পুস্তকের বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ, পৌরাণিক জ্যোতিষ, ও প্রাকৃত-জ্যোতিষ-নক্ষত্র নামক পরিচ্ছেদ কয়টি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৩নং। কালপুরুষের চারিকোণস্থিত চারিটি নক্ষত্রের মধ্যে Betelgeuxএর নাম আর্দ্রা, Bellatrixএর নাম কার্ত্তিকেয়, Regel-এর নাম বাণরাজ, Saiphএর নাম কার্ত্তবীর্য্য বলিয়া কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূগোলচিত্রে পাওয়া যায়।

৪নং। Southern crossকে হিন্দুমতে সারসমণ্ডল ও Centaurusকে মহিষাসুর-মণ্ডল বলে।

৫নং। Vega = অভিজিৎ; Deneb = মকরপুচ্ছ; Achernar = শূলতারা; Canopus = অগস্ত্য; Formalhant = দক্ষিণ মীন-মণ্ডলের মৎস্যমুখ নক্ষত্র; Castor = মিথুন রাশির অন্তর্গত বিষ্ণুতারা, উহা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রদ্বয়ের অন্যতম। Achernar বা শূলতারাটি অগস্ত্য-তারার অল্প দক্ষিণে থাকে।

৬নং। অভিজিৎ নক্ষত্রের ইংরেজী নাম Vega, উহা Lyra বা বীণা-মণ্ডলের অন্তর্গত। ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্বরের হিন্দু নামগুলি কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূগোলচিত্র হইতে পাওয়া যায়।

শ্রী কেনারাম আচার্য্য

(৮৭)

সূর্য্যের আলো সাদা। এই সাদা আলোক-রশ্মি ভিন্ন ভিন্ন সাতটা রংএর সংমিশ্রণে গঠিত। ইংরেজিতে এই সাতটি রংকে Vibgyor বলে। এই সাতটি রং দিয়ে spectrum বা বর্ণচ্ছত্র তৈরী হয়।

সূর্য্য-রশ্মির পথে যদি একখণ্ড লাল কাচ দেওয়া যায়, সূর্য্যের সাদা আলো আর কাচের এ পাশে দেখা যায় না, লাল আলোই শুধু দেখা যায়। নীল কাচ দিলে শুধু নীল আলোই এপাশে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ-সবের কারণ, লাল রং সূর্য্যরশ্মির মধ্যে থেকে লাল রং ছাড়া বাদ বাকী ছ'টা রংকে গ্রাস (absorb) করে, আর শুধু লাল রংটাই বের হ'তে থাকে। এই লাল রং আমাদের চোখে এসে পৌঁছে, তাই আমরা জিনিসটাকে লাল দেখ্‌তে পাই। ঠিক এই একই কারণে গোলাপ-ফুল লাল, গাছের পাতা সবুজ দেখায়। বাতির আলোর পক্ষেও এ নিয়ম খাটে।

আমাদের গায়ের রক্ত লাল। এই লাল রক্ত শরীরের পাতলা চাম্‌ড়ার নীচে আছে। সেখানে আলোকরশ্মি বেশ সহজে যেতে পারে। আলোক-রশ্মি সেখানে পৌঁছলে, সেই আলোর অন্যান্য সব রং, লালটা বাদে, গায়ের লালরক্ত গ্রাস করে, আর শুধু লাল রংটাই চারিদিকে বেরিয়ে পড়ে। এই লাল আলো চাম্‌ড়ার মধ্যে দিয়ে এসে আমাদের চোখে পৌঁছে। তাই আলোর কাছে হাত ধরলে আঙ্গুলগুলো লাল দেখায়। যার হাতের চাম্‌ড়া যত পাতলা তার হাত তত বেশী লাল দেখাবে, অবশ্য গায়ে রক্ত থাকা চাই।

শ্রী শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৯০)

ভাগফল মানে ভাজককে যতবার যোগ কর্‌লে ভাজ্য সংখ্যাটা পাওয়া যায়। ৩৬ ÷ ৯ = ৪। অর্থাৎ ৯কে ৪ বার যোগ করলে ভাজ্য ৩৬ সংখ্যাটি পাব। ভাজক যদি ১ হয় তবে তাকে ভাজ্যের সমানবার যোগ কর্‌লেই ভাজ্য সংখ্যা পাওয়া যাবে। ৩৬ বার ১ যোগ কর্‌লে ৩৬ হবে। ভাজক যদি একের বড় হয়, যেমন ৩, তবে তাকে ৩৬ বার যোগ করতে হবে না, কম কর্‌লেই চল্‌বে—১২ বার ৩ যোগ কর্‌লেই ৩৬ হবে। ভাজক যদি ভগ্নাংশ হয় তবে তাকে ভাজ্যের বেশী বার যোগ না কর্‌লে ভাজ্য সংখ্যা পাওয়া যাবে না। কাজেই ভাগফল ভাজ্যের বড় হবে। ১৭কে ⅕ দিয়ে ভাগ কর্‌তে চাই অর্থাৎ ⅕কে যোগ দিয়ে দিয়ে আমাকে ১৭ কর্‌তে হবে। প্রথমতঃ ১ কর্‌বার জন্যেই আমাকে ৫ বার যোগ দিতে হল। অমন সতরবার ১ করতে হবে। তা হলে সব শুদ্ধ আমাকে ১৭×৫ অর্থাৎ ৮৫ বার যোগ কর্‌তে হবে। (১৭÷⅕

=১৭ × ৫ = ৮৫) তা হলে ভাগফল হল ৮৫ ;—১৭ অপেক্ষা বড় সংখ্যা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। একশ টাকা চাই। ১টা করে' টাকা নিলে একশটি মুদ্রা চাই। (ভাজক ১, ভাগফল = ভাজ্য)। দশ টাকার নোট নিলে দশ খানা চাই। (ভাজক ১০ একের বড়। ভাগফল ১০, ভাজ্য ১০০ অপেক্ষা ছোট)। কেবল সিকি নিলে ৪০০ টা চাই। (ভাজক ১/৪ ভগ্নাংশ, ভাগফল ৪০০, ভাজ্য ১০০ অপেক্ষা বড়)।

শ্রী দক্ষিণেশ্বর বক্সী

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই এক সংখ্যাকে আর-এক সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল উভয় সংখ্যা হইতে কিম্বা প্রধানতঃ ভাজ্য হইতে ছোট হয়। কিন্তু তাহা যে সকল সময় ঠিক হইবে তাহা নয়। কারণ 'ভাগ' অর্থ ছোট করা নয়। প্রধানতঃ 'ভাগ' অর্থ হইতেছে একটি সংখ্যার ভিতর আর-একটি সংখ্যা কতবার (times) আছে, অর্থাৎ আমাদের ভাজ্যরূপে যাহা দেওয়া হয় তাহার ভিতর ভাজক অঙ্কটি কতবার আছে তাহাই বাহির করা। যেমন ১/৪কে ১/৮ দিয়া ভাগ করা অর্থই হইতেছে ১/৮ অঙ্কটি ১/৪এর ভিতর কত 'বার' আছে বাহির করা। আমরা দেখি ২ বার আছে, এবং সত্যই আমরা ইহা প্রমাণ করিতে পারি, দুইবার ১/৮ যোগ করিলে ১/৪ হইবে।

শ্রী অমিয় গুপ্ত
শ্রী হীরেন্দ্র সেন

ভাগপ্রকরণটি বিয়োগের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। কোন সংখ্যাকে (যথা ২৪) অন্য কোন সংখ্যা (যথা ৪) দ্বারা ভাগ করিলে, ভাগফল অন্য আর-একটি সংখ্যা (যথা ৬) হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে যে ২৪ হইতে প্রতিবার ৪ বিয়োগ করিলে ৬ বার এইরূপ বিয়োগ করা চলিতে পারে ; অর্থাৎ উর্দ্ধ-সংখ্যা ৬টি ৪এর পুঞ্জ (group) ২৪ হইতে বিয়োগ করা যায়। সুতরাং কোন রাশিকে তাহার চেয়ে ছোট অন্য কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিতে গেলে ভাগফলে কিছু পূর্ণ সংখ্যা (whole number) আসিবেই। রাশি দুইটি স্বতন্ত্রভাবে (absolutely) নিজেরা কত বড় বা কত ছোট, তাহার সহিত ভাগফলের কোনই সম্বন্ধ নাই ; তাহাদের তুলনামূলক গুণত্বই (relative worth) ভাগফলের পরিমাপক। সেইজন্য অতিক্ষুদ্র একটি প্রাকৃত ভগ্নাংশকে (proper fraction) ক্ষুদ্রতর অন্য একটি ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করিলে, ভাগফলে পূর্ণ-সংখ্যা আসিবেই ; অন্যপক্ষে সেইরূপ অতিবৃহৎ একটি রাশিকে বৃহত্তর আর-একটি রাশি দ্বারা ভাগ করিলে, ভাগফলে পূর্ণ-সংখ্যা আসিতেই পারে না। সুতরাং ভাগফল কোন সময় ভাজক অপেক্ষা বড় হয় (যথা ২৪ ÷ ৪ = ৬), কোন সময় ভাজ্য অপেক্ষা বড় হয় (যথা ২৪ ÷ ১/৩ = ৭২), আবার কখনও বা ভাজ্য, ভাজক উভয় অপেক্ষা বড় হয় (যথা ১/৩ ÷ ১/১৫ = ৫)।

শ্রী অমৃতলাল ঘোষ,
শ্রী ভূদেব ভট্টাচার্য্য

(৯২)

শাস্ত্রীয় নিদেশ আছে বলিয়াই ৺ শ্যামাপূজার দিন দীপ দেওয়া হয় এবং এইজন্যই ঐ দিন "দীপান্বিতা" নামে খ্যাত।

"দীপবৃক্ষাস্তথা কার্য্যা ভক্ত্যা দেবগৃহেষপি।
চতুষ্পথে শ্মশানেষু নদী-পর্ব্বতসানুষু।
বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু চত্বরেষু গৃহেষুচ।
বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈঃ শোভিতব্যাঃ ক্রয়বিক্রয়ভূময়ঃ।
দীপমালা-পরিক্ষিপ্তে প্রদোষে তদনন্তরম্।" ইতি তিথিতত্ত্বম্।

বর্ষার সময় অনেক কীটপতঙ্গের জন্ম হয় এবং তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর হয়। কিন্তু দীপান্বিতার দীপ-মালাতে তাহাদের বংশ অনেক কমিয়া যায় এবং আমরাও অব্যাহতি পাই। সম্ভবতঃ ইহাই বৈজ্ঞানিক কারণ।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

জৈনদের প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু কৃত কল্পসূত্রে (১২৮ শ্লোকে) আছে যে তাঁহাদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে কাশীর নিকট পাপাপুরে শেষ উপদেশ দিয়া রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ১৮ জন কাশী ও কোশল দেশের রাজা, নয় জন মল্লভূমির রাজা ও নয়জন লিচ্ছবি রাজা ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"পৃথিবী হইতে জ্ঞানের আলোক নিবিয়া গেল, আইস, আমরা প্রতিবৎসর ঐ রাত্রে পার্থিব আলোক জ্বালিয়া ঐ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিব।"

শ্রী অমৃতলাল শীল

(৯৩)

এতদ্দেশে বাসী-বিবাহের দিনের রাত্রিকে কালরাত্রি বলে ও তৎপরদিবস "শুভ রাত্রি" বা ফুলশয্যা হয়। প্রবাদ :—দশরথ কৈকেয়ীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কালরাত্রিতে, (বাসী-বিয়ার দিন রাত্রে) তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া কৈকেয়ী নিন্দিতচরিত্রা ও দুর্ভাগ্যবতী হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে দশরথের সুমিত্রা-বিবাহ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"বাসিবিয়া সেইস্থানে কৈল দশরথ।
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত॥
বিদায় হইল রাজা রাজার সাক্ষাতে।
সুমিত্রা সহিতে রাজা চড়ে গিয়া রথে॥
... ...
বাসি-বিয়া পরদিন হয় কাল-রাতি।
স্ত্রী-পুরুষ একঠাঁই না থাকে সংহতি॥
কাল-রাত্রে যে নারীকে করে পরশন।
সে স্ত্রী দুর্ভাগ্য হয় না যায় খণ্ডন॥"

রায় সাহেব শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত রামায়ণ,
আদিকাণ্ড, ৪২পৃঃ।

শ্রী লালমোহন চক্রবর্ত্তী

(৯৬)

ইহা একটি দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত। জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রের স্বাধিষ্ঠান-পদ্মম্—ষট্‌চক্র-নিরূপণম্—আধারপদ্মম্ দ্রষ্টব্য।

শ্রী যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী

(এই মীমাংসাটি লেখক বিস্তৃতভাবে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; তন্ত্রশাস্ত্রের এত গূঢ় ব্যাপার সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইবে না বলিয়া তাহা প্রবাসীতে প্রকাশ না করিয়া আমরা প্রশ্নকর্ত্তাকে পাঠাইয়া দিয়াছি।—প্রবাসীর সম্পাদক)

"অহং" শব্দে জীবকে বুঝায়, জন্মকালীন দেহবিশিষ্ট জীবের জীবত্ব ভিন্ন তৎকালে আর কিছুই থাকে না, তাই বলা হইল "আগে জন্মিলাম আমি।" জন্মের পরক্ষণেই জীবদেহে মহামায়ার আবির্ভাব হয় ; মহামায়াই পরা প্রকৃতি জগজ্জননী বটেন, তদ্‌যথা—"মহামায়া-প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ"—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১ম চরিতে ৪৮ শ্লোক। অপিচ "যা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসার-বন্ধ-হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।" ঐ ৫২ শ্লোক। অতএব "পাছে জন্মে মা"। তার পর দেখিয়া-শুনিয়া বিবেক-রূপী ভাই জন্মিল।

"জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধরূপং" শ্রীগুরুগীতা। শ্রীগুরুদেবই প্রকৃত পিতৃপদবাচ্য। জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানরূপী পিতার জন্ম হয় না, সেইজন্য "পিতা জন্মে না" বলা হইয়াছে।

মূলাধারপদ্মের নিম্নে যুক্তত্রিবেণী হইতে "সুষুম্না" নাম্নী মহা-নদী গঙ্গা গুরুপাদুকাস্থান পর্য্যন্ত অর্থাৎ সহস্রদলকমল-সন্নিহিত দ্বাদশদল-পদ্ম পর্য্যন্ত প্রবাহিতা আছেন। সেই নদীর কূলে বা পাড়ে অক্ষয় বটবৃক্ষ বিরাজিত। তাই "নদীর কূলে বটবৃক্ষ" বলা হইয়াছে।

চিতায় যেমন দেহ নষ্ট করিয়া আমাকে নাশ করে, সেইরূপ সুর-তরুমূলে রত্নবেদিকোপরি মণিপীঠে মজিলেই আমিত্ব লোপ হয়, তাই বলা হইল "তাহার মূলে চিতা"। সেই মণিপীঠরূপ চিতায় পৌছিলেই অহং ও মায়া লোপ হয়, অর্থাৎ মায়ে পোয়ে সহমরণ যায়। অহংকার ও মায়ালোপ হইলেই তত্ত্বজ্ঞানরূপী পিতা জন্মিয়া থাকেন।

শ্রী ভবকালী দত্ত

অলীক

অলীক নাশার অলীক নেশা
এখন ধরার গতিকই ;
রঙের সাথে থাকুক্ সলিল,
এতই তাতে ক্ষতি কি !
শ্যামা-ঘাসে ফেল্‌তে কাটি'
ক্ষেতখানা কে কর্‌বে মাটি ?
আগাছাও অকেজো নয়
জানে সকল পথিকই।

কুয়াসারি ওই মাধুরী
নয়ন জুড়ায় আহা রে,
মাহুকরী কি ফুলঝুরি
ছড়ায় নিতুই পাহাড়ে।
কে চায় সেথা প্রখর আলো,
আব্‌ছায়া যে অনেক ভালো,
রবির কথা যাই ভুলে যাই
কেন্দ্র-উষার বাহারে।

অলীক ত নয় অলীক শুধু—
এই কথাটি ভুলো না,
অলীক যে ওই ইন্দ্রধনু
কোথায় উহার তুলনা।

অলীক আরব-নিশির কথা
কিন্তু তাহার তুল্য'কোথা ?
আকাশকুসুম নাম্‌লো ধরায়
লাগ্‌লো শিকড়, মলো না।

কথ্য তীর্থ-মাহাত্ম্যেতে
সত্য অধিক নাহি রে,
তপ্ত হৃদয় তৃপ্ত যে হয়
তাহাই শুধু গাহি রে।
অপূর্ব্ব সব কাব্যকথা
শিবের গায়ের ভস্ম যথা,
কাগজ-গড়া নৌকা আনে
স্বরগ-সুধা বাহি রে।

আছে অলীক অলোকলতা
কল্পপাদপ জড়ায়ে,
ছায়াপথের পথের পাশে
ফুলের মত ছড়ায়ে।
অলীক যে এই বিশ্বখানা—
মায়ার পোড়েন মায়ার টানা,
সূর্য্য-শশীর সঙ্গে বোনা,
ফেল্‌বে কে তায় ঝরায়ে।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

গরিলার কথা—

যে কয়খানি গরিলার ছবি দেওয়া হইল তাহা টি বার্গস্ কর্ত্তৃক গৃহীত। এই ভদ্রলোক ব্রিটিশ রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির একজন ফেলো। বেলজিয়ান্ কঙ্গোর কিভু হ্রদের কাছে এক জঙ্গলে এই ছবি তোলা হয়। কঙ্গো মধ্য-আফ্রিকায়। নরাকৃতি যত বানরের ছবি এ পর্য্যন্ত তোলা হইয়াছে তাহার মধ্যে এই ছবিগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

প্রথম ছবিতে গরিলাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ ফুট, ছাতি ৬১ ইঞ্চি এবং ওজন ৪৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫ মণ ২৫ সের। তাহার পাশে একজন ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা সবল সুস্থ আফ্রিকাবাসী দাঁড়াইয়া আছে। গরিলার পাশে তাহাকে অসহায় শিশু বলিয়া মনে হইতেছে।

গরিলা ও গরিলার দেশের মানুষের আকারের তুলনা

দ্বিতীয় ছবিতে আর-একটি বৃদ্ধ গরিলার মুখ। ইহার মাথায় পিছনের দিকে চ্যাপ্টা উঁচু হাড় রহিয়াছে। ইহার হনু ও চিবুকের হাড় ভয়ানক শক্ত হয়। ইহাদের দাঁত এমন ভয়ানক শক্ত, যে, বন্দুকের নল ইহারা চিবাইয়া চেপ্টা করিয়া দিতে পারে। এই গরিলার মুখে গরিলা-সম্প্রদায়ের এক বিশেষ জাতির স্পষ্ট পরিচয় বেশ পাওয়া যায়।

তৃতীয় ছবিতে গরিলাটির প্রশস্ত কোঁচ্‌কানো নাসারন্ধ্র লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার চোখা ভ্রূও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিষ। অনেক

বুড়ো মদ্দা গরিলার মুখের পার্শ্বদৃশ্য—মাথার ব্রহ্মতালু উঁচু, কপাল, বারান্দার মতন বার-করা, মুখ ছুঁচালো, কান অতি ছোট, চোয়াল চওড়া

গরিলার মাথা—মানুষের মাথার দ্বিগুণ বড়, কিন্তু তার মধ্যে যে মস্তিষ্ক আছে তাহা মানুষের মস্তিষ্কজাত বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় বুদ্ধি জোগাইতে অক্ষম

পণ্ডিত মনে করেন ইহারা পূর্ব্বকালের নর-বানরের বংশধর। দক্ষিণ-আফ্রিকার রোহ্‌ডেশিয়া নামক স্থানে একটি বানরের মাথার খুলি কিছু দিন হইল মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাওয়া গিয়াছে। এই মাথার খুলির সহিত বর্ত্তমান কালের এই গরিলার মাথার খুব নিকট সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার উইলিয়াম্ টি হর্ণাডে বলেন যে, গরিলাদের যদি বাল্যকাল হইতে মানুষের কাছে রাখা যায়, তবে সে যে কেবল মানুষের আচার-ব্যবহারই নকল করে তাহা নয়, বিপদের সময় মানুষের মতনই বেশ বুদ্ধি খাটাইতে পারে।

অন্ধকারে দাড়ী কামানো—

আমেরিকায় একপ্রকার নূতন ক্ষুরের চলন হইয়াছে, তাহাতে একটা ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি লাগান আছে, অনেকটা মশালের মত। দাড়ী কামাইবার দরকার হইলে অন্ধকার ঘরেও বেশ কামান চলিতে
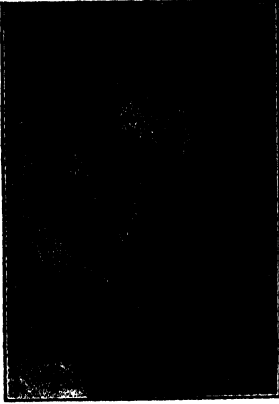
অন্ধকারে দাড়ি কামাইবার সহজ সাধন—
আলোক-যুক্ত ক্ষুর

পারে। টর্চ-ক্ষুরের সুইচ্ টিপিয়া বাতি জ্বালাইলে ক্ষুরের ফলার ঠিক নীচে যেখানে দরকার সেখানে আলো পড়ে, এবং তাহার সাহায্যে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া বেশ দাড়ি কামান চলে।

দুজন-বসা মোটর-বাইক—

সাইড্-কার-যুক্ত মোটর-বাইক পথে ঘাটে আমরা দেখিতে পাই। ছবিতে দেখুন—সাইড্-কার-বিহীন মোটর-বাইকে দুই জন লোক কেমন পরমানন্দে চলিয়া যাইতেছে। এই নূতন ধরণের বাইকে দুইজনের পা রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে—কাহারো কোন কষ্ট হয় না। দুই জনের জন্য দুইটি বসিবার স্থান আছে। এই-প্রকার মোটর-বাইকের বিশেষ সুবিধা—ইহাকে খুব ছোট জায়গায় রাখা যায় এবং অনাবশ্যক একটা তৃতীয় চাকার দরকার হয় না।
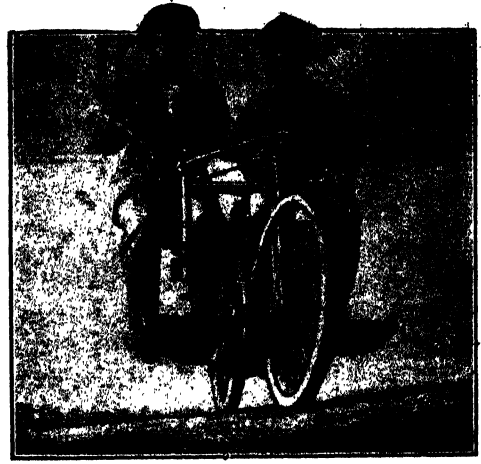
দুজন-চড়া মোটর-সাইকেল

পাঁচজন-চাপা গাড়ী—

ছবিতে যে ভদ্রলোকটি গাড়ী চালাইতেছেন, তাঁহার অবস্থা বড় ভাল নয়, অথচ ছেলেমেয়েদের লইয়া গাড়ী চাপিবার সখও তাঁহার আছে। মোটর কিনিবার পয়সা নাই, কাজেই দুইখানা বাই-

পারিবারিক পাদচারিক গাড়ী

সাইকেলের চাকা, চেন এবং অন্যান্য অংশ লইয়া ঐ অদ্ভুত গাড়ী-খানি তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিলেন। তার পর তাহাতে ছয়টি ছোট ছোট বেতের ঝুড়ি শক্ত করিয়া বসাইলেন। এখন ভদ্রলোক এবং তাঁহার পাঁচ ছেলেমেয়ে বেশ একসঙ্গে আরামে বেড়াইতে পারেন। বড় ছেলে প্যাডেল করিয়া পিতাকে সাহায্য করে।

অগ্নি নিবারক শিক্ষালয়—

আমেরিকায় স্যান্ অ্যান্টোনিয়ো সহরে অগ্নি-নিবারক দলের লোকদের শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এই শিক্ষার

অগ্নি-নিবারক দলের (fire brigades) কর্ম্মকুশলতার কসরৎ শিক্ষা—(১) মই বা দেয়াল বাহিয়া উঁচু বাড়ীতে উঠা, (২) দড়া বা তার বাহিয়া শূন্যপথে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাওয়া, (৩) উঁচু হইতে নীচে জালের উপর লাফাইয়া পড়া, (৪) অজ্ঞান আহত লোকদের কাঁধে বহন করিয়া মই দিয়া নামা, (৫) অজ্ঞান মূর্চ্ছিত লোকের চৈতন্য সম্পাদন, (৬) অসুস্থ-ব্যক্তিকে নিরাপদ্ স্থলে বহন ইত্যাদি

ফলে উক্ত বিভাগের লোকেরা খুব চমৎকার কার্য্য করিতেছে। ইহার জন্য যে-সব বড় বড় উঁচু মঞ্চ আছে, তাহার উপর হইতে নানা প্রকারের শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। তাড়াতাড়ি মই-চড়া-নামা, উপর হইতে লোক নামান, আহত ব্যক্তির প্রাথমিক সাহায্য—এই-সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষালয়ে বিশেষ যত্নের সহিত শিখান হয়। অগ্নি-নিবারকী দলের লোকদের প্রাত্যহিক ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে। এই ব্যায়ামের ফলে তাহাদের শরীর খুব ভাল থাকে।

—

গির্জ্জা-গাড়ী—

নিউইয়র্ক সহরের একজন পাদরী একটি মোটরকার নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা দেখিতে একেবারে একটি ছোটখাট গির্জ্জা-বাড়ীর মত। পাদরী মহাশয় এই গাড়ীতে করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিবেন এবং ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইবেন। গির্জ্জা দেখিলেই সাধারণতঃ লোকের
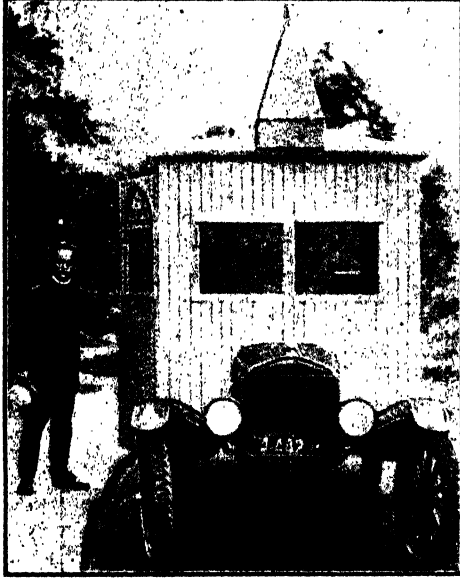
চলন্ত গির্জ্জা ও তার পরিব্রাজক পুরোহিত

মনে একটু ভক্তির ভাব আসে। যে-কোন বাড়ীতে বা খোলা মাঠে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে লোকের মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারা যায় না। সেইজন্যই ধর্ম্মপ্রাণ পাদরী এই সাধু চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই চেষ্টা বিফল হইবে না, আশা করা যায়।

ভাসমান সাঁতারী-পোষাক—

অনেকে একটু একটু সাঁতার জানেন, অথচ ভরসা করিয়া জলে নামিতে পারেন না। তাঁহাদের ভয় হয় পাছে কোন রকমে ডুব জলে হাবুডুবু খান। আমেরিকার চিকাগো সহরের

ভাসমান স্নান পরিচ্ছদ

Popular Mechanics Magazine-এর Bureau of Information এ অনুসন্ধান করিলে এইসব সাহসী সাঁতারুরা একপ্রকার নূতন সাঁতার-জামার সন্ধান পাইবেন। এই ভাসমান জামা উলের বোনা, ইহার ভিতরের দিকে হাওয়া-ভরা রবারের নল আছে। হাওয়া ইচ্ছা মত ভরা যায়। নলে হাওয়া ভরা থাকিলে জামা দেখিতে ফোলা-ফোলা মনে হয়, কিন্তু পরিলে খুব হাল্কা লাগে। হাওয়া ভরা না থাকিলে জামাকে এমনি সাধারণ জামা বলিয়া মনে হয়।

ধূমপান-পাইপ-সাইকেল—

ছবিতে সাইকেলের সঙ্গে ধূমপানের পাইপ বসান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পাইপটা ৫ ফুট লম্বা। ইহাতে ঐ বিশেষ পাইপ-

বাইসাইকেলে তামাকের নলের বিজ্ঞাপন

ওয়ালার দোকানের বিজ্ঞাপন খুব ভাল করিয়াই দেওয়া হয় এবং তামাক ভরিবার স্থানটিতে ধূমপানের নানা রকম সরঞ্জাম ভরিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী পৌছাইয়া দেওয়া চলে।

কর্পোরাল আঁদ্রে প্যাজিও—গত বিশ্বজোড়া যুদ্ধের প্রথম বলি। যুদ্ধ ঘোষণার ৩০ ঘণ্টা আগে ইনি জার্ম্মান উহ্‌লান সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন। যে স্থানে ইনি নিহত হন সেখানে তাঁর সম্মানে স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

গত মহাযুদ্ধের প্রথম ফরাসী-নিহত ব্যক্তি—

কর্পোর‍্যাল আঁদ্রে প্যজিও (Corp. Andre Peugeot) একজন ফরাসী সৈনিক। গত মহাযুদ্ধ ঘোষণা হইবার ৩০ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি জার্ম্মান্ উল্‌হান সৈন্য দ্বারা নিহত হন। ইঁহার মৃত্যুর তারিখ ২রা আগষ্ট ১৯১৪। তাঁহার মৃত্যুস্থলে একটি প্রকাণ্ড স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

—
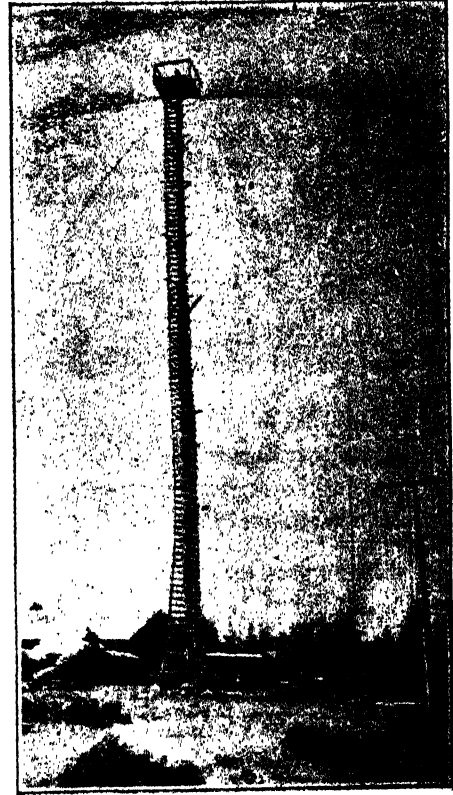
রাস্তা-বুরুশ গাড়ী—

প্যারিসের রাস্তার ধুলা মুছিবার জন্য ছোট তিন-চাকাওয়ালা এক সাইকেল তৈয়ার হইয়াছে।

পথ-ঝাঁটানো গাড়ী

শত ফুট উচ্চ অগ্নি-প্রহরা-স্তম্ভ।
একটি দীর্ঘ সরল-বৃক্ষের চারিদিকে মই ও মাথায় মাচা বাঁধিয়া এই স্তম্ভমঞ্চ গঠিত হইয়াছে।

মেষ-শাবকের গোমাতা—
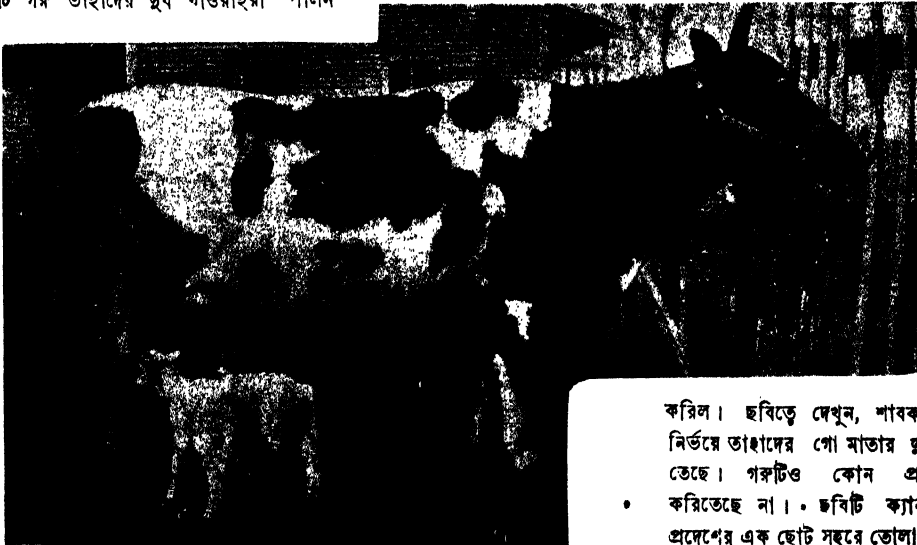
দুইটি মেষশাবক অকালে মা হারাইয়া অনাথ হইল। অবশেষে একটি গরু তাহাদের দুধ খাওয়াইয়া পালন করিল। ছবিতে দেখুন, শাবক দুইটি কেমন নির্ভয়ে তাহাদের গো মাতার দুধ পান করিতেছে। গরুটিও কোন প্রকার আপত্তি করিতেছে না। ছবিটি ক্যানাডার কুইবেক্ প্রদেশের এক ছোট সহরে তোলা হয়।

মেষশাবকের গো-ধাত্রীমাতা
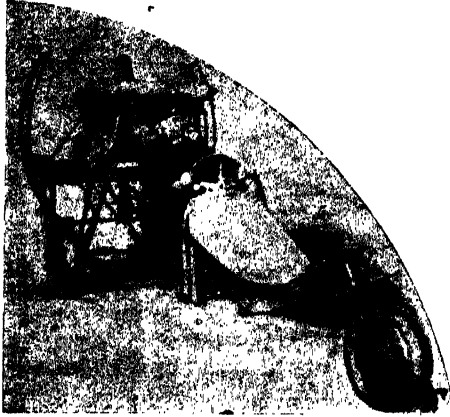
বায়ু-বল বাইসাইকেল—এয়ারপ্লেনের অংশ দিয়া তৈরি ও এয়ারপ্লেনের ন্যায় ঘূর্ণীচাকায় বাতাস কাটিয়া বাতাসের জোরে চলে

১০৫ ফুট উঁচু দেবদারু বৃক্ষ—

ছবিতে একটি খুব উঁচু মঞ্চ দেখা যাইতেছে। এই মঞ্চটি এক দেবদারু গাছের উপর স্থাপিত—তাহার উচ্চতা ১০৫ ফুট। এই মঞ্চের উপর হইতে জঙ্গলে কোথায় আগুন লাগিয়াছে দেখিবার জন্য দিবারাত্র লোক থাকে। এই মঞ্চের উপর উঠিবার সিঁড়ি হইতে নাকি এক এক ধাপে এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থান দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে পড়ে।

এরো-মোবাইল—

আকাশ-জাহাজের ভাঙাচোরা অংশ দিয়া একজন মোটর-মিস্ত্রি একটি গাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। গাড়ীর গতি ঘণ্টায় ৫০ মাইল।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকার আদিম-বাসিন্দাদের আঁকা ছবি—

সম্প্রতি আমেরিকার এক পাহাড়ের গায়ে আমেরিকার আদিম বাসিন্দা লাল মানুষদের আঁকা ছবি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার মধ্যে একটি ড্রাগনের ছবি অতি আশ্চর্য্য-রকম ভালো ও চীন দেশের ড্রাগনের অনুরূপ।

চারু

আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের আঁকা ড্রাগনের ছবি

অশান্ত

এখনো হলিনি স্থির ওরে উচ্ছৃঙ্খল ?
কম্প্রমর্ম্ম মাঝে তোর উঠিছে পড়িছে
ফেনিল তরঙ্গভঙ্গ, ভাঙিচে গড়িছে
উদ্বেলিত বাসনার সংক্ষুব্ধ চঞ্চল
ঊর্দ্ধমুখী ঊর্ম্মিময় সহস্র উচ্ছ্বাস।
আর কেন ? শান্ত হ রে নাহি ত সে আর
মলয়ের স্বপ্নময় মদির নিঃশ্বাস
বসন্তের সন্ধ্যানিল, মিছে কেন তার
উন্মাদনা বক্ষ ভরি রেখেছিস্ ধরি ?
আজি সায়াহ্নের শান্ত স্তব্ধ মুখচ্ছবি
উঠুক্ ফুটিয়া ধীরে সমাহিত করি'
বক্ষের হিল্লোল তোর। অস্ত গেছে রবি
পুঞ্জ মেঘে প্রসারিয়া ধূসর গৈরিক,
তার স্নিগ্ধ ছায়া তোরে আবরিয়া দিক।

শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা
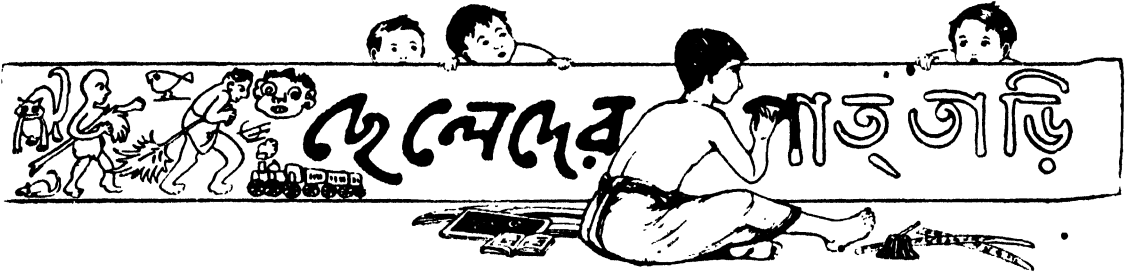
ফুলের বর্ণ

ফুল কত রঙের হয় তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু কোন্ রঙের ফুল সব চাইতে বেশী বল দেখি? তোমরা হয়ত বলিবে—"কেন, লাল।" সত্য বটে আমরা লাল ফুলের কথা ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু বেগুনী ফুলই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফুটিয়া থাকে। তাহার পর শ্বেত বা সাদা ফুল, ইহার পরই পীত বা হলুদে ফুল। তার পরে লাল ফুলের পালা। সুতরাং লাল ফুল প্রথম ত নহেই, দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানও অধিকার করিতে পারে নাই।

কালো ও সবুজ ফুল প্রায় হয় না। কালোকে সর্ব্বাপেক্ষা নীচে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। সবুজ ফুল দু-একটা দেখা যায়, যেমন—কাঁঠালিচাঁপা ও কেনাঙ্গা ফুল, এই দুইটিই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘোর কালো ফুল একেবারে ফুটে না। আমরা সাধারণতঃ ঘোর লাল বা ঘোর বেগুনী ফুলকে কাল দেখি। তবে অন্য রঙের ফুলের মধ্যে যথার্থ কাল রঙের বিন্দু দেখিতে পাই, যেমন—লাল 'পপি' বা পোস্ত ফুলে ঘোর কালো দাগ দেখা যায়।

ফুলের বর্ণ ও গন্ধ কেবল তোমার আমার জন্য হয় নাই, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে কীট-পতঙ্গ-পোকা-মাকড়কে লোভ দেখাইবার জন্যই ফুলের বর্ণ, গন্ধ মধু সৃষ্টি হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যখন মানুষ জন্মে নাই, তখনও কত সুন্দর সুন্দর, কত মধুর গন্ধযুক্ত কত ফুলই ফুটিত, ও কত ভীষণ আকারের কীট পতঙ্গ সেই-সব ফুলের মধু পান করিত। সবুজ পাতার মধ্য হইতে শীঘ্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে বলিয়া ফুলের এমন সব উজ্জ্বল বর্ণ হয়। ফুলের গন্ধে প্রথমে কীট পতঙ্গ কাছে আসে ও রঙের জন্য খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয় না। সবুজ ফুল পাতার সঙ্গে মিশিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের গন্ধ বড় তীব্র হয়, যেন অনেক দূর হইতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

আবার যে-সকল ফুলের বর্ণ খুব উজ্জ্বল, যেমন শিমুল পলাশ ও স্থল-পদ্ম, তাহাদের গন্ধ নাই, কারণ অনেক দূর হইতে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, গন্ধের আর দরকার হয় না। কালো ফুল খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, তাই বোধ হয় কালো ফুল হয় না।

রাত্রির অন্ধকারে লাল, বেগুনী, হলুদে বর্ণগুলি বুঝিতে পারা যায় না, সেইজন্য সকল নিশীথ-পুষ্পই সাদা ও সুগন্ধযুক্ত, যেমন মল্লিকা মালতী যুঁথী কামিনী প্রভৃতি। রাত্রিতে, বিশেষতঃ জ্যোৎস্না-রাত্রিতে, সাদা ফুলগুলি বেশ দেখা যায়। তাহাদের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া রাত্রিচর কীট-পতঙ্গ ইহাদের শীঘ্রই খুঁজিয়া পায়।

কএক রকম ফুল আছে তাহারা রাত্রিতে ফুটে, দিনেও ফুটিয়া থাকে; তাহারা যখন রাত্রিতে ফুটে তখন সাদা থাকে ও দিনে ক্রমে লাল হইয়া যায়। যেমন রেঙ্গুন-লতা, যাহা তোমরা অনেক গেট বা ফটকে অনেকের বাড়ীতে দেখিয়াছ; কএক রকম গোলাপও প্রথমে সাদা থাকে, ক্রমে লাল হইয়া যায়।

ফুলের মধ্যে আর-একটি কথা আছে—যে জাতির ফুলের মধ্যে হলুদে ফুল হয়, প্রায় সে জাতির নীল ফুল হয় না; আবার যে জাতির নীল ফুল হয়, তাহাদের হলুদে হয় না। গোলাপের হলুদে ফুল আছে, নীলগোলাপ ছিল না—চন্দ্রমল্লিকাও তাহাই, আমরা বেগুনী চন্দ্রমল্লিকাকে নীল বলিয়া ভুল করি। শিম, কলমী ও অনেক রকম বিষাক্ত গাছের ফুল নীল শ্রেণীর, তাহাদের হলুদে ফুল হয় না। তবে মানুষ অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করিতেছে—বিলাতে সেদিন এক মালী নীল-গোলাপ ফুটাইয়াছে! কিন্তু সাদা ও লাল রং উভয় শ্রেণীতেই দেখা

যায়—সাদা ও লাল গোলাপ—সাদা ও লাল কল্‌মী, ধুতুরা, আফিং-ফুল আমাদের চক্ষে প্রায় পড়ে।

বিভিন্ন রঙে আবার বিভিন্ন কীট আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া থাকে—ইহা পরে বলিব।

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

—

ফুলে মধু হয় কেন ?

কোন জিনিষই এ জগতে চিরকালের জন্য থাকে না। আজ আছে কাল নেই, এই হচ্ছে প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতি কখনও একই জিনিষ নিয়ে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকে না। সে কেবল নতুন নতুন জিনিষ তৈরী ক'রে চলেছে।

এই নতুন জিনিষ প্রকৃতি কখনো আলাদা করে' তৈরী করে না। পুরাতনের ভিতর থেকে সে নতুনের সৃষ্টি করে' নেয়। গাছ জন্মায়—বৃদ্ধি পায় ; দিন কয়েকের জন্য মাথা উঁচু করে' গাছ বেঁচে থাকে, কিন্তু পুরাণো হ'লেই প্রকৃতি তাকে নিজের রাজত্ব থেকে বার করে' দেয়—বার করে' দেবার আগে তার ভিতর থেকে আর-এক নতুন গাছের বীজ তৈরী করে' নেয়। এই বীজের সৃষ্টির জন্য এক ফুলের পরাগ অপর এক ফুলে সময়ে সময়ে যাবার দর্‌কার হয়। এক ফুলের পরাগের সঙ্গে অপর ফুলের পরাগের মিলন ঘট্‌লে তবে নতুন বীজের সৃষ্টি হয়। কিন্তু গাছের বা ফুলের ত হাত নেই, তবে কেমন করে' একের পরাগ অপরে যায় ?

এই কাজটি কর্‌বার জন্য প্রকৃতি অনেক জিনিষেরই সাহায্য নেয়। কখনও কখনও হাওয়ার বেগে ফুলের পরাগগুলি উড়ে গিয়ে কতকগুলি নষ্ট হয় এবং কতকগুলি হয়ত দৈবক্রমে আর-এক ফুলে পড়ে এবং সেই থেকে বীজের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই-রকম ফুলের পরাগ প্রায় শুক্‌নো ও অত্যন্ত হাল্কা হয়। এই-সব কারণে পরাগগুলি সহজেই হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যায়।

আবার কতকগুলি ফুল আছে যেগুলির পরাগ শুক্‌নো নয়। সেগুলির পরাগ হাওয়ায় ভেসে যেতে পারে না। সুতরাং মৌমাছি বা প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে এক ফুল থেকে অপর ফুলে গিয়ে পড়ে। এই-রকম ফুলে মধু থাকে। মৌমাছিরা মধুর লোভে ফুলের উপর বসে এবং মধু পান করে' যখন পালায় তখন তাদের পায়ে বা ডানায় কতকগুলি পরাগ লেগে যায় এবং যখন সেই মৌমাছি অপরফুলে মধু আহরণের জন্য আবার বসে তখন সেই পরাগগুলি এই অপর ফুলে লেগে যায় এবং তা থেকে বীজের উৎপত্তি হয়। যদি এইসব ফুলে মধু না থাক্‌ত তাহ'লে তাদের পরাগগুলির এক ফুল থেকে আর এক ফুলে যাবার উপায় থাক্‌ত না। তারা যেন এই মধু দিয়ে মৌমাছিকে বা ভ্রমরকে তুষ্ট করে, আর তারা যেন প্রতিদান-স্বরূপ এই পরাগ বহনের কাজটা করে' দেয়। মিষ্টি মুখে কাজ সহজেই করান যায়!

যে-সব ফুলে মধু থাকে না, তাদের একটা জিনিষ খুব থাকে। বাহ্যিক রংএর চটক—এই চটকের চোটেই অনেক জীব এ-ফুল ও-ফুল করে' বেড়ায়, কিন্তু মধু পায় না, মাঝখান থেকে বাহ্যিক ভড়ং দেখিয়ে ফুলগুলিও আপনাদের কাজ সেরে নেয়।

কতকগুলি ফুল আছে তারা সন্ধ্যার পর বা রাত্রিতে ফোটে, যেমন—বেল জুঁই হেনা রজনীগন্ধা প্রভৃতি। এদের বাহ্যিক রংএরও চাকচিক্য নেই, অথবা বুক-ভরা মধুও নেই, সুতরাং এদের পরাগ বহন কার্য্যত বড়ই দুষ্কর। একে রং সাদা, সেটা রাত্রিতে অন্য রংএর অপেক্ষা দেখা যায় ভাল বটে, কিন্তু না আছে তেমন রূপ, না আছে মধু, কিন্তু একটা জিনিষ এদের থাকে যেটার জন্যে সুদূরের জীবও লালায়িত হয়ে ছুটে আসে এবং সেটা হচ্ছে তাদের মন-প্রাণ-মাতানো গন্ধ। এই গন্ধে ছোট ছোট নিশাচর কীট-পতঙ্গ এ-ফুল ও-ফুল করে' বেড়ায় এবং সেই সূত্রে তাদের পরাগ বহনের কাজটা বেশ সুশৃঙ্খলায় হয়ে যায়।

প্রকৃতির ভিতর কেউ বোকা নেই। প্রকৃতি তা চায় না। যার যা গুণপণা আমরা দেখ্‌তে পাই সেটা তার পক্ষে বিশেষ দর্‌কার এবং সেটার অভাব হ'লে তা'র কখনো চল্‌বে না, তাই এমন গুণপণা।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

স্ফিঙ্ক্‌সের গল্প

গ্রীসের থিব্‌স্ দেশের রাজাকে একবার এক জ্যোতিষী বলেন যে তাঁর ছেলের হাতেই তাঁর মৃত্যু হবে। এই কথা শুনে অবধি রাজার ভারী ভয়। তাঁর প্রথম একটি ছেলে হ'তেই তিনি সেটিকে বনে ফেলে দিলেন। একজন কাঠুরে ছেলেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। তার কাছে মানুষ হয়ে রাজপুত্র করিন্থ্ দেশে এসে বাস করতে লাগ্‌লেন। তাঁর নাম হল ইদিপাস্। থিব্‌সের রাজা একদিন সেখানে কি কাজে আসেন, আর ইদিপাসের সঙ্গে দেখা হয় ও উভয়ে ঝগড়া হওয়ায় ইদিপাস্ তাঁকে কেটে ফেল্‌লে। বাপ ছেলে কেউ কাউকে চিন্‌তে পারে নি।

এখন থিব্‌সের রাজা হবে কে এই হল কথা। সেখানকার লোকে ঢ্যাড়া পিটিয়ে দিলে যে, যে-লোক থিব্‌সের স্ফিঙ্ক্‌সের ধাঁধাঁর উত্তর দিতে পারবে সেই হবে থিব্‌সের রাজা। এখন এই স্ফিঙ্ক্‌স্‌কে দৈত্য বা রাক্ষস বল্‌লেও চলে। থিব্‌সের কাছে এক পাহাড়ের ধারে এই স্ফিঙ্ক্‌স্ ছিল। সেখান দিয়ে কোন লোক গেলে সে তাদের একটি ধাঁধাঁ জিজ্ঞাসা করত, উত্তর দিতে পারলে রেহাই পেত, নচেৎ সে লোকটিকে ধরে' খেয়ে ফেল্‌ত।

ইদিপাস্ ছিল রাজার ছেলে, তেজী। সে স্ফিঙ্ক্‌সের কাছে গিয়ে বল্‌লে—বল তোমার কি ধাঁধাঁ, আমি জবাব দেবো, না পারি আমায় খেয়ে ফেলো।

স্ফিঙ্ক্‌স্ বল্‌লে—বল দেখি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন্ জীব আছে যে প্রথমে হাঁটে চার পায়ে, তারপর দু'পায়ে, তারপর তিন পায়ে?

ইদিপাস্ বল্‌লে—এই ধাঁধাঁ? সে জীব হচ্ছে—মানুষ।

স্ফিঙ্ক্‌স্ জবাব শুনে তখনি ফেটে মরে' গেল। আর ইদিপাস্ থিব্‌সের রাজা হল। রাজা হয়ে সে জান্‌তে পারলে যে সে তার বাপকে মেরে ফেলেছে। তখন সে খুব শোক করতে লাগল।

—গুপ্ত

ঘুঘুপাখীর কথা

আমি যে পাখীর কথা তোমাদের বল্‌ছি তার নাম বোধ হয় তোমরা শুনেছ—এই পাখীর নাম ঘুঘু। এ পল্লীগ্রামে বেশি ডাকে, বিশেষত দুপুরবেলা তোমরা যদি এর ডাক শোন তাহলে এই কথা শুন্‌বে যে ঘুঘু বল্‌ছে—উঠ রে চিতু পুর পুর। এর একটি সুন্দর মানে আছে। এক গেরস্ত ছিল। তাদের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির নাম চিতু। এখন একদিন বাড়ীর যে গিন্নি, সে চিতুর দিদিমা, সে একদিন চিতুকে একপোয়া তিল বাছ্‌তে দিয়েছিল। চিতু তিল বেছে ভাল তিলগুলি নিয়ে আর খারাপগুলি সেইখানে রেখে ভালগুলি দিদিমাকে দিলে। দিদিমা সেই আধপো তিল দেখে চিতুকে বল্লে যে আর তিল কি হল? চিতু বল্লে যে আর তিল কোথা পাব? এই যেই বলেছে চিতুর দিদিমা রেগে এক চড় তার গালে মারলে। সেই চড় মারতেই চিতু মরে' গেল। এদিকে চিতুর দিদিমা চিতু যেখানে তিল বেছেছিল সেখানে খারাপ তিলগুলি পড়ে' আছে দেখ্‌লে। তখন সে খারাপ আর ভালগুলি মেপে দেখে যে একপোয়া হল। তখন সে বল্লে—উঠ রে চিতু পুর পুর। এই না বলে' সমস্ত তিলগুলি সে নিজের গায়ে ছড়ালে। ছড়াতেই চিতুর দিদিমা পাখী হয়ে ঐ কথা বল্‌তে বল্‌তে উড়ে গেল।

শ্রী সরলা দেবী

পাল্কী চলে রে

(বেহারাদের পাল্‌কি-গানের ছন্দ)

পাল্কী চলে রে,
পাল্কী চলে রে,
ঘোমটা-ঘেরা কে
বউ ঝি টলে রে!

খোট্টা বেহারা
চোট্টা-চেহারা;
কোন্ গাঁ হ'তে গো
আস্‌ছে ইহারা!

জুল্‌পি কামানো,
নেংটি নামানো,
গাম্‌ছা কোমরে,
সব গা ঘামানো।

হাউচি মাউচি
খাউচি যাউচি,
বল্‌ছে কত-কি—
আউছিঃ! আউছিঃ!

খেঁক্‌কি কুকুরে
ডাক্‌ছে ডুকুরে,
আস্‌ছে লেলিয়া
পাল্কী-মুখ রে।

বৃক্ষে থাকিয়া
গাত্র ঢাকিয়া
ক্লান্ত কোকিলা
উঠ্‌ছে ডাকিয়া;

গাইটি ছায়াতে
বৎস কায়াতে
জিভ্‌টি বুলায়ে
দিচ্ছে মায়াতে;

পত্র-অলকে
রৌদ্র ঝলকে,
ধূম্র উড়িছে
ক্ষেত্র-ফলকে;

তপ্ত মাঠে রে
কেউ না হাঁটে রে,
রৌদ্র-তাপেতে
বিশ্ব ফাটে রে!

এম্‌নি ছুপরে
কোন্‌ সে কুফেরে
আন্‌ল এদেরে
রাস্তার উপরে!

কার সে হেলাতে
এই অ-বেলাতে
বউ ঝি চলিল
অন্য জেলাতে!

সব গা ঘামা রে,
পাল্‌কি থামা রে,
বৃক্ষ-ছায়াতে
একটু নামা রে!

শুন্‌ল না ত রে
করুণ কাতরে,
প্রাণ কি সবারি
তৈরী পাথরে!

চারটি থালেতে
নাম্‌ল খালেতে,
পাল্কী চালাল
ছুল্‌কি তালেতে;

একটু দাঁড়াল,
স্কন্ধ ভাড়াল,—
ওই যে আড়ালে
চরণ বাড়াল!

রইল ঝরিয়া
মর্ম্মে মরিয়া
সুরের রেশটি
চিত্ত ভরিয়া।

গোলাম মোস্তফা

অলকা

বৌদি —এই বাড়ী ?

এই বাড়ীই ত বোধ হচ্ছে।

বোধ হচ্ছে কি, নিজের বাড়ী চেন না ?

হাঁ ভাই, এই যে দরজা, এই বাড়ী।

প্রকাণ্ড রল্‌স্-রয়স্ কারখানি এক হল্‌দে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অলকা নিজেই তাড়াতাড়ি মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। নিজের বাড়ীর চিরপ্রিয় পরিচিত দরজাটা দেখিয়া তাহার বুক যেন দুলিয়া উঠিল। রাত্রের অন্ধকারে গ্যাসের আলোয় কাঠের দরজা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, সমস্ত বাড়ী ধূসর রঙের ছায়ামূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া। অলকার কল্পনার রঙে বাড়ীর সম্মুখটা সুন্দর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

থাক্ ভাই, তোমাকে আর নাম্‌তে হবে না, দরজা খোলাই রয়েছে দেখ্‌ছি।

বাড়ীতে নেমে আর দেরী সইছে না ? কাল যাবে নাকি ?

যাব বৈ কি। পার যদি আমাদের তুলে নিয়ে যেও।

বরকনে ত বিকেলে বিদেয় হবে, আমি দুপরে গাড়ী নিয়ে আস্‌ব ।

আচ্ছা ভাই।

নিঃশব্দচারী রল্‌স্-রয়স্ মশালের মত দুই চোখ জ্বালাইয়া গলি দিয়া বাহির হইয়া গেল । অলকা হাতের দুইটি গোলাপফুল দুলাইয়া দরজা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। এই গোলাপফুল দুইটি সে তাহার অসুস্থ স্বামীর জন্য বিবাহবাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে।

বরকনের কথা, নিমন্ত্রণের ভিড়ের কথা, নিজেদের বিবাহিত জীবনের কথা, স্বামীর কথা, ভাবিতে ভাবিতে অলকা চকিতপদে বৈঠকখানার পাশ দিয়া দেউড়ী পার হইয়া উঠানের পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। বাড়ীখানি অন্ধকার, নিঝুম, সবাই নিদ্রিত। খোলা ছাদের সম্মুখে ঘরের উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে আসিয়া অলকা দাঁড়াইল। দরজা খোলা ! সে একটু সরিয়াছে, আর স্বামী দরজা খুলিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতেছেন ! সজোরে সশব্দে দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দরজার পাশের আলো উস্কাইয়া অলকা ডাকিল,—ওগো, ঘুমোচ্ছ ?

অন্ধকার ঘর সহসা আলোয় উজ্জ্বল হওয়াতে তাহার চক্ষু একটু ধাঁধিয়া গেল, কিছু দেখিতে পাইল না, কোন উত্তরও আসিল না।

স্বামী হয়ত ঘুমাইতেছেন ভাবিয়া সে আলোটা এক কোণে রাখিয়া ধীরপদে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। পথে গোখ্‌রো-সাপের গায়ে অতর্কিতে পা দিয়া সাপের দিকে চাহিয়া পথিক যেরূপ চমকিয়া উঠে, তেম্নি অলকা চমকিয়া উঠিল। একি ! এ কোথায় সে ! কার এ ঘর ? এ ত তাহার ঘর নয়। কোথায় তাহার মেহগনি-কাঠের পুষ্পচিত্রিত খাট, তাহার ড্রেসিং-টেবিল, কাপড়ের আল-মারি, ভেল্‌ভেট-মোড়া কোচ, তার সুন্দর আল্‌না !

একটা সেগুনকাঠের তক্তার উপর এক ছেঁড়া মাদুর পাতা, দুটো বালিশ দুই কোণে পড়িয়া আছে, ওয়াড়-গুলি কতদিন ধোবার বাড়ীর মুখ দেখে নাই, তাহার উপর সরু-মোটা বাঁধান-ছেঁড়া কত-রকমের বই ছড়ান। কেহ তক্তায় শুইয়া নাই ত ! অলকা আলো আনিয়া দেখিল, না, কেহ শুইয়া নাই। তক্তার একদিকে কাঠের টেবিল, তাহার উপর বই, খাতা, খোলা কাগজ, সিগারেটের বাক্‌স, ফাউন্‌টেন্‌পেন, বাঁশী ইত্যাদি স্তূপীকৃত ছড়ান। আর একদিকে র‍্যাকে বই, ম্যাগাজিন, কাপড়, জামা ইত্যাদি ঠাসা। মেজেতে ছেঁড়া ও আস্ত কাগজ, চুরুটের ছাই, ব্লটিং-কাগজ, মাসিকপত্রের কোন ছবি, একখানা রুমাল, ইত্যাদি ছড়ান।

আলোটি টেবিলের উপর একটু জায়গা করিয়া রাখিয়া ঘরের মূর্ত্তি দেখিয়া অলকা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, দেখিল, তাহার কালো ছায়ামূর্ত্তি সাদা দেওয়ালে বাঁশ-পাতার মত কাঁপিতেছে। সম্মুখের চেয়ার সরাইয়া সে দরজার দিকে ছুটিল, চেয়ার হইতে কয়েকখানা খাতা ও বই মেজেতে পড়িয়া গেল। অলকা দরজা ঠেলিয়া টানিয়া খুলিতে গেল, দরজা খোলে না। একি ! দরজা বন্ধ কে করিল ? ও, বাহিরের ছিটকিনি পড়িয়া গিয়াছে। সে যখন

ঘরে ঢুকিয়া জোরে দরজা বন্ধ করিয়াছিল, তখন বাহিরের লোহার ছিট্‌কিনি পড়িয়া গিয়াছিল।

বন্দিনী সে! কোথায়? এবার বুঝি সে চীৎকার করিয়া উঠে, ওগো, কে আছ দরজা খোল। বুক দুর-দুর করিতে লাগিল। হয়ত এটা একটা মেস, একটু শব্দ হইলেই এঘর ওঘর হইতে ছেলের দল বাহির হইয়া আসিবে। কাল সকালে কাগজে কাগজে বাহির হইবে, এক প্রসিদ্ধ উকিলের স্ত্রী রাত্রে এক মেসে কলেজের ছেলের ঘরে। চেঁচাইতে সাহস হইল না। যে ছেলেটির ঘর, সে আসুক, তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে নিশ্চয় সে চুপিচুপি তাহাকে বাড়ী দিয়া আসিবে। আজকালকার ছেলেরা ত খুবই ভাল, নারী যে দেবী, এ সম্বন্ধে মাসিকপত্রিকায় প্রবন্ধ পড়িয়া পড়িয়া তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। এ গান্ধীর যুগে ছেলেরা প্রতি নারীকে নিশ্চয় খুব সম্মান করিবে।

দুই-তিনবার জোরে দরজা টানিল, একটু শব্দ হওয়াতে আর অলকার সাহস হইল না।

ধীরে ধীরে তাহার ভয় কমিতে লাগিল। ব্যাপারটা ভাবিয়া একটু হাসি পাইল। পদ্মের মত সুন্দর মুখে জ্যোৎস্নার মত মিষ্টি হাসি খেলিয়া গেল। সে, অলকা, সাতাশ বছরের নারী, দুই সন্তানের জননী, এক খ্যাতনামা উকীলের স্ত্রী, বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া ভুল করিয়া এক ছেলেদের মেসে আসিয়া উঠিয়া এক যুবকের ঘরে আপনি দরজা বন্ধ করিয়া আপনাকে বন্দিনী করিয়াছে।

রাত্রি ত অনেক হইয়াছে, সে ছেলেটি হয়ত কোন বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, কখন আসিবে? সারারাত্রি এ ঘরে সে বন্ধ থাকিবে? আচ্ছা ছেলেটির জামা কাপড় পরিয়া গরাদে-হীন খোলা জান্‌লা দিয়া ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলে কেমন হয়! সে মনে মনে হাসিয়া উঠিল। সে বাঙ্গালী-ঘরের বধূ—একটু ভয়ও হইল। বাস্তবিক কি করা যায়?

ধীরে অলকা ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইয়া তক্তার উপর বইয়ের গাদায় বসিয়া পড়িল। টেবিলের উপরের আলো তাহার শঙ্কারুণ মুখে, পানে-রাঙা ঠোঁটে, কালো কেশের উপর, শাড়ীর রক্তের ধারার মত রাঙা ফুল-পাড়ে, কানের দুই লাল দুলে, বারাণসী-শাড়ীতে ঝিকিমিকি করিতে লাগিল। অলকা উদাসভাবে বসিয়া আন্‌মনা হইয়া টেবিলের উপরের বইখাতা সব ঘাঁটিতে লাগিল। বেশীর ভাগই কবিতার বই—ইংরেজী, ফরাসী, ফার্সী কবিদের। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির বইগুলি রহিয়াছে—ওই 'কেতকী' 'শেফালি' 'গীতিবীথিকা'—স্বরলিপির বইগুলি তাহার অতি প্রিয়। সহসা তাহাদের দেখিয়া যেন পুরাতন বন্ধুদের মুখের দেখা পাইয়া তাহার মন একটু প্রফুল্ল হইল। পাতাগুলি উল্টাইয়া রাখিয়া দিল। একটা ঘন-নীল মরক্কো চাম্‌ড়ায় বাঁধান খাতা খুলিতে প্রথম পাতার এক কোণে একটা নাম তাহার চোখে পড়িল—অলককুমার রায়। একটু বিস্মিত হইয়া অলকা আবার পড়িল, নামটি চেনা-চেনা। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ধরণে নামটি লেখা। অলকা খাতা খুলিয়া দেখিল, ভিতরে কবিতা লেখা।

শাড়ীর উপর আলোর ঝিকিমিকির মত তাহার সুন্দর মুখ ঝিল্‌মিল্‌ করিয়া উঠিল। সে এক কবির ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। অলককুমার রায়—হাঁ, এঁর কবিতা সে কত মাসিক পত্রে আগ্রহও আনন্দের সহিত পড়িয়াছে, চমৎকার কবিতা লেখেন ইনি। প্রথম যখন এর ফুলের কবিতা বাহির হয়, সে তাহার স্বামীকে পড়িয়া শুনাইয়াছিল, স্বামীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া সে একটু অবাক্‌ হইয়াছিল। তার পর স্বামী যখন বলিলেন,—যাক, ছদ্মনাম যে নিয়েছ, খুব সুবুদ্ধি কাজ করেছ, না হলে ললিত আর নবীন ত তোমার সঙ্গে introduced না করে আমায় ছাড়্‌তেন না।

বস্তুতঃ অনেকেই ভাবিয়াছিল, সে-ই কবিতা লিখিতেছে—তাহার নাম অলকা রায় কিনা। এ ভুল ধারণা এখনও তাহার স্বামীর মন হইতে দূর হয় নাই, মাঝে মাঝে তিনি ব্রিফ্‌ ফেলিয়া অলককুমারের কবিতা পড়িতে বসেন। সে কখনও কিছু লিখিতে বসিলেই তাঁহার প্রশ্ন হয়, কোন্‌ মাসিকে কোন্‌ মাসে বের হবে!

সেই অলককুমারের এই ঘর! ঘরখানি কি রহস্য-মণ্ডিত, কি অপরূপস্বপ্নবিজড়িত হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল! অলকের দু-একটি কবিতা পড়িতে অলকা চেষ্টা করিল,

প্রথম দু'এক লাইন পড়িয়া আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। আলো আরও উস্কাইয়া দিয়া ঘরখানি সে দেখিতে লাগিল। এই জিনিষপত্র-ছড়ান হেলাফেলা-মাখান ছোট ঘর এক কবির খুসি দিয়া ভরা, কত স্বপ্ন-জড়ান। অতি আদরের সহিত সে টেবিলের জিনিষপত্রগুলি ছুঁইয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। এই ফাউণ্টেন্‌পেনে তরুণকবি লেখে, এই টেবিলের উপর মাথায় হাত দিয়া সে ভাবে, এই বইগুলি তাহার প্রাণের ব্যথার সাথী, এই চেয়ারে বসিয়া সে কত গত দিনের কত অনাগত যুগের স্বপ্ন দেখে।

ধীরে অলকা তক্তা হইতে উঠিয়া বেতের চেয়ারে গিয়া বসিল; একটু দুলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু চেয়ারের অবস্থা দেখিয়া সাহস হইল না। চেয়ার হইতে সে বই-খাতা কাগজগুলি মেজেতে ফেলিয়া দিয়াছিল, সেগুলি ধীরে তুলিয়া টেবিল সাজাইতে সুরু করিল। কি অগোছাল ঘরটা! সে তাহার কল্যাণ-হস্তের শ্রীতে চারিদিক মণ্ডিত করিয়া তুলিবে। বইয়ের উপর বই চাপান, বেশীর ভাগ বই খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, পড়িতে পড়িতে খুলিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থখানি মানসসুন্দরী কবিতার জায়গায় খোলা, তাহার উপর চাবির রিং পড়িয়া রহিয়াছে। চাবির গোছা সরাইয়া অলকা বইখানি তুলিয়া লইল, নীল-পেন্সিলের দাগ চোখে পড়িল,—

—— সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দেবেকি ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্বঠাঁই হতে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি?

বইখানি টেবিলের উপর খোলাই রাখিয়া দিল, টেবিল্ আর সাজান হইল না, অলকা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের রক্ত যেন ঝিলমিল করিতেছে, লাল-পাড়ের তলায় আলতা-মাখা, পায়ের নখ হইতে সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দুইখানি খোলা কাগজ ছিল, তাহা টানিয়া অলকা পড়িতে বসিল। এ তরুণ কবির অপ্রকাশিত নূতন লেখা, সে পড়িতেছে! কয়েকটা লাইন পড়িল—

যাবার সময় সে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লে, সেই অনুপম মুখের অতুলন হাসি, কোথায় আমি তাকে ধরে' রাখ্‌ব? প্রিয়, আমার মানস-লোকের স্মৃতি-অলকায় সে হাসি চির-অম্লান পারিজাতের মত ফুটে আছে। এ পৃথিবীতে, প্রভাতের ফুল সন্ধ্যায় ঝরে' পড়ে, বর্ষার ময়ূর হেমন্তে পেখম মেলে নাচে না, ভাদ্রের ভরানদী শীতের দিনে শীর্ণ হয়ে আসে, পূর্ণিমার চাঁদ ঝড়ের মেঘে ঢাকা পড়ে, বসন্তের শেষে কোকিল কোথায় উড়ে যায়, শুধু ঝরাপাতার দীর্ঘনিশ্বাসে করুণ ক্লান্ত সঙ্গীত, সব ঝরে' যায়, চলে' যায়, হারিয়ে যায়, কিন্তু বন্ধু, তোমার একটি কথার ফুল, একটি হাসির গান, একটি চোখের চাউনিচাঁদের আলো ত আমার কাছে হারায়নি, শেষ হয়নি, আমার প্রেমের স্বর্গলোকে সে ফুল, সে গান, সে আলো অজর অমর অম্লান হয়ে আছে। তোমার সে যাবার বেলার হাসি—

অলকা আর পড়িতে পারিল না, মুক্তার মালার মত তার দাঁতগুলির পাশে রাঙা ঠোঁটখানি পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত কি আবেগে দুলিয়া কাঁপিতে লাগিল। কে সে বন্ধু? কাহার হাসি দেখিয়া কবি এই কথাগুলি লিখিয়াছে!

এখন হঠাৎ যদি অলক দরজা খুলিয়া আসে, দেখে তাহার চেয়ারে বসিয়া একটি অলঙ্কৃতা সুন্দরী নারী তাহার মনের লেখা পড়িতেছে!

সাদা দেওয়ালে নিজের কালো ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অলকা যেন কোন্ স্বপ্নের ঘোরে কি ভাবিতে লাগিল—তাহার মনে আর যেন কোন ভয় নাই, এ ঘরে সে নিরাপদ্, এ যেন কোন চিরপরিচিতের ঘর।

ঘরটা বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। মাথার সোনার সেফ্‌টিপিন্‌টা খুলিয়া ঘোম্‌টা খসাইয়া ব্লাউজের একটা বোতাম খুলিয়া চুলগুলি মেলিয়া দিয়া সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের অন্ধকার আকাশ তারায় ঝলমল করিতেছে, অতিক্ষীণ চাঁদের আলো। সার্সির কাঠে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইতে, অলকা দেখিল, দেওয়ালে শার্সির কাঁচে কি সব পেন্সিলে লেখা—নিশ্চয় কবিতা।

ঘননীল আকাশে তারার অক্ষরের লেখার মত এই সাদা দেওয়ালে কালো অক্ষরে তরুণ প্রাণের কি সব কথা লেখা। অলকা আলো আনিয়া পড়িবে ভাবিল, কিন্তু দেহে ততখানি উৎসাহ খুঁজিয়া পাইল না। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা অদূরে গির্জ্জার ঘড়িতে বাজিল—টং। বাহিরের রাত্রির অন্ধকার এক ভারী গোলার মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকে যেন আঘাত করিল—ঢং।

এতক্ষণ যেন কোন্ স্বপ্নমায়ায় সে সব ভুলিয়া ছিল, আবার নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া অলকা ভীত হইয়া উঠিল। সত্যই কি এম্‌নি করিয়া এখানে রাত কাটাইতে হইবে? কটা বাজিল? একটা, না দুটো? ঘড়ি দেখিবার জন্য টেবিলের দিকে ছুটিল, টেবিলের এক কোণে খোলা গীতপঞ্চাশিকার একটা গান চোখের সম্মুখে পড়িল—

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে।

বইটা টানিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে অলকার ইচ্ছা হইল। বই সব সরাইয়া সে ঘড়ি খুঁজিতে লাগিল, কোথাও ঘড়ি নাই।

গির্জ্জার ঘড়িতে বাজিয়া যাইতে লাগিল—টং টং টং... কত যে গণিয়াছিল মনে নাই। ও, ঠিক, বারটা বাজিল, অলকা একটু আশ্বস্ত হইল। না, আর দেরি করিলে চলিবে না, তাহাকে এইক্ষণেই ঘর হইতে বাহির হইতে হইবে। বাড়ীখানা কি স্তব্ধ, একটু শব্দ নাই, একি পোড়ো বাড়ী, না ভূতের বাড়ী, হয়ত বাড়ীতে কেহই নাই। না থাকে ভালই, সে জোর করিয়া দরজা ভাঙিয়া বাহির হইয়া যাইবে। জানালা দিয়া নামা যায় কি না দেখিবার জন্য অলকা জান্‌লার কাছে আসিল। অলকা শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

এ কি সুর অন্ধকারে ধ্বণিয়া উঠিতেছে! এ কি মধুর শব্দ! সে ত আপনার অজ্ঞাতসারে গান গাহিতেছে না? না, এ ত তাহার কণ্ঠ নয়, অন্য কে গাহিতেছে? কোন্ দিকে?

যখন তুমি বাঁধ্‌ছিলে তার—

ব্যস, গান বন্ধ হইল, এবার বেহালা বাজিতেছে। সে কি সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন দেখিতেছে? এ কি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল,—না, ছাদে বসিয়া কেউ বেহালা বাজাইতেছে। ও, নিশ্চয় অলক-বাবু ছাদে বেহালা বাজাইতেছেন, কি করুণ মিষ্টি সুর! যেন হৃদয়ের ব্যথা গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

বেহালা যতক্ষণ বাজিল, অলকা মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। কিন্তু বেহালা বাজান থামিতেই অলকার ভয়ঙ্কর ভয় হইল। সত্যই অলক-বাবু ছাদে আছেন, এক্ষুণি হয়ত ঘরে আসিয়া ঢুকিবেন। তাহাকে পালাইতে হইবে, যাহা করিয়া হোক পালাইতে হইবে।

বনে আগুন লাগিলে হরিণী যেমন ছোটে তেম্‌নি করিয়া অলকা দরজার দিকে ছুটিল, দরজা টানিল,—ও, দরজা বন্ধ! ভুলিয়া গিয়াছিল দরজা যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোনরকমে খোলা যায় না? শিকারের সম্মুখে বাঘিনী যেমন চাহিয়া থাকে তেম্‌নি করিয়া দরজার দিকে অলকা চাহিল।

হাঁ, ওঃ, কি বোকা সে। বাস্তবিক নারীজাতি অল্পবুদ্ধি, এ আইডিয়া তাহার মাথায় আসে নাই,—দরজার যে ঝিলিমিলি রহিয়াছে, তাহা সে দেখে নাই, ঝিলিমিলি দিয়া হাত গলাইয়া বাহিরের ছিট্‌কিনি ত বেশ খোলা যায়। কিন্তু অলক-বাবু যদি আসিয়া পড়েন! না, তিনি গান ধরিয়াছেন, কি সুন্দর গলা!

আর বিলম্ব কোরো না গো
ঐ যে নেবে বাতি—

না, গান শুনিলে হইবে না, এই দরজা খোলার সুযোগ, কোন শব্দ শোনা যাইবে না।

ধীরে অলকা নত হইয়া ডানদিকের খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরে হাত গলাইয়া ছিট্‌কিনি তুলিতে চেষ্টা করিল। পাখীগুলি চুড়ির উপর চাপিয়া ধরিল। আঃ, চুড়িগুলো, কি ঝঞ্ঝাট গয়না-পরা! হাত বাহির করিয়া চুড়িগুলি টানিয়া তুলিয়া আবার সে পাখীর ভিতর হাত ঢুকাইয়া ছিট্‌কিনি তুলিতে চেষ্টা করিল, আঙুলের প্রান্ত লোহার ছিট্‌কিনির মাথায় গিয়া ঠেকিল, ছিট্‌কিনি একটুও নড়িল না। আবার হাত টানিয়া বাহির করিয়া আনিল, সোনার চুড়িগুলি ঝনঝন শব্দ করিয়া উঠিল। তাড়া-

তাড়ি মাথার একটা কাঁটা খুলিয়া লইয়া আবার পাখীর ভিতর হাত দিয়া ছিট্‌কিনির মাথায় কাঁটা লাগাইয়া টানিল। আঃ ছিট্‌কিনিটা একটুও নড়ে না! অলকা দাঁত দিয়া নিজের ঠোঁট কাটিয়া ফেলিল।

খট্—এমন মধুর শব্দ সে জীবনে যেন শোনে নাই, ছিট্‌কিনি উঠিয়াছে!—ধীরে দরজা টানিয়া একটু ফাঁক করিয়া অলকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজা ত খুলিল, কিন্তু গানও যে শেষ হইল। সত্যই যদি অলক-বাবু তাহাকে দেখিয়া ফেলে! তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, দরজা খুলিতে সাহস হইতেছিল না, সে কি লজ্জা!

অলক-বাবু গানের শেষ লাইনে আসিয়া পৌছিয়াছেন, আর দেরী নয়। মরিয়া হইয়া অলকা দরজা খুলিল। দেখিল ছাদের সম্মুখভাগ ঘরের ছায়া পড়িয়া অন্ধকারময়, পিছন ভাগ একটু চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল, সেই স্নিগ্ধ মৃদু আলোয় একটি মূর্ত্তি ছায়ার মত বসিয়া। কি সুন্দর তাহার, পিছনটা, কি ঝাঁকড়া বড় চুল! অতি মৃদুস্বরে বেহালা বাজাইতে বাজাইতে সে গান করিতেছে।

লোকটি পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া অলকার মনে কোন ভয় রহিল না, দুঃসাহসিনীর মত সে পা টিপিয়া টিপিয়া ছাদের দিকে অগ্রসর হইল। মূর্ত্তিটিকে ভাল করিয়া না দেখিয়া যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। কোন্ মায়ামন্ত্রবলে সে অলকের খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বেহালার সুর মায়াবীর মত তাহাকে যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ছাদে যেখানে অন্ধকারের কোলে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলো-অন্ধকারের মিলন-রেখায় আসিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সহসা বেহালা বাজান থামিয়া গেল, যেন বেহালার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। অলক মুখ ফিরাইয়া পিছনে চাহিল, দেখিল অন্ধকারে এক নারীমূর্ত্তি রঙীন স্বপ্নমায়ার মত দাঁড়াইয়া! তাহার দীর্ঘপল্লবঘন ভাবদীপ্ত চক্ষু দুইটি জল্‌জল্ করিয়া উঠিল। হাত হইতে বেহালাটা পড়িয়া গেল, সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না, সে তন্ময় হইয়া এই প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্তব্ধ রঙীন ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রেতাত্মারা শুভ্রবসনমণ্ডিত হইয়া ত দেখা দেয়, এ যে আগুনের শিখার মত রাঙা। এক মাস হইল সে যে তরুণী বন্ধুকে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে, তাহাকে যে দেখিতে পাইবে সে আশা সে করে নাই। অলক দুই চক্ষু ভরিয়া সেই রঙীন ছায়াকে যেন পান করিতে লাগিল, তরুণী বন্ধুর নাম উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, হাঁ, এই রকম জমাট রক্তবিন্দুর মত তাহার দুই কানে দুল দুলিত, তাহার গলায় হার ঝিকিমিকি করিত, এই রকম Venus de Milo'র মত তার মুখখানি নিখুঁত ছিল, ওই রকম অন্ধকারে-হারা তারার মত তাহার চোখের চাউনি ছিল, হাঁ, অমনি সুঠামভাবে সে দাঁড়াইত, অতি সুন্দর ভঙ্গীতে সে ঘুরিয়া মুখ ফিরাইত, চুলগুলি দুলিয়া উঠিত, এই-রকম একখানি বারাণসী-শাড়ী সে তাহাকে উপহার দিয়াছিল, অমনি নৃত্যের তালে চঞ্চলপদে সে চলিয়া যাইত। একি কোথায় অন্ধকারে সে মিলাইয়া গেল, তাহার তরুণী বন্ধুর প্রেতাত্মা নিমেষের জন্য দেখা দিয়া চলিয়া গেল!

অলক হতাশভাবে সিঁড়ির অন্ধকারের দিকে ক্ষুধিত নয়নে চাহিয়া তাহার বহুমূল্যবান্ বেহালার উপর বসিয়া পড়িল, আকাশভরা তারাদের দিকে চাহিতে লাগিল, কোথায় কোথায় সে হারাইয়া গেল?

অলকা যখন সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া নামিয়া শেষ ধাপে গিয়া পৌছিল, তাহার মনে হইল এবার সে মুখ থুব্‌ড়াইয়া ধুলায় পড়িয়া যাইবে। সিঁড়ির রেলিং সজোরে ধরিয়া সে কাঁপিতে লাগিল, সিঁড়ির উপরের দিকে চাহিল, কেহ তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া আসিতেছে কি না। উঠানের অন্ধকার এক নিদ্রিত দৈত্যের বিরাট্ হাঁর মত। দরজার ফাঁক দিয়া সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বৈঠকখানা-ঘরটা যেন কি গুপ্তষড়যন্ত্র করিতেছে, চাঁদের ক্ষীণ আলোয় সদর দরজায় যাইবার পথটা দেখা যাইতেছে।

অলকা রেলিং ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁপাইতে লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন-ধ্বনির তালে তালে গলার হাঁর রিমঝিম সুরে বাজিতেছে। কি স্তব্ধ অন্ধকার! বাড়ীখানা শোক-মূর্চ্ছিতা সদ্যবিধবার মত! চোখ

বুজিয়া অলকা দম লইতে লাগিল। উপরের দিকে নীচের দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। যুবকটি তাহার দিকে শুধু নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিল, তাহাকে ধরিতে ত আসিল না! সে চলিয়া আসিলে, পিছন পিছনও আসিল না!

একটু শ্রান্তি দূর হইতেই অলকা দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে গেল, দরজার কড়া টানিয়া খুলিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার শুধু ভয় হইতেছিল, এইবার বুঝি সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে। —একটু খস্‌খস্‌ ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ হইল। সে কাঁপিয়া উঠিল। না, কেহ নাই, এ তার শাড়ীর ও গহনার শব্দ।

অলকা মুক্তি পাইল বটে, কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে কি করিয়া যাইবে! ভাল করিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া সে করুণ-নয়নে এই বিজন স্তব্ধ আলোছায়াময় মৃদুগ্যাসালোকিত আঁকাবাঁকা গলির দিকে চাহিল। তাহাদের বাড়ী এই পাড়ার কাছাকাছি কোথায় হইবে। এ বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতে কেমন ভয় করিতে লাগিল, সম্মুখে ধীরে অগ্রসর হইয়া গ্যাসের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পাশের বাড়ীর নম্বরটা চোখে পড়িল, চার নম্বর। তাহাদের বাড়ীর নম্বর ত তেরো। কোন্ দিকে তেরো নম্বর? অলকা অগ্রসর হইয়া চলিল। হাঁ, এই দিকেই, এই আশু-ডাক্তারের বাড়ী, দরজার গায়ে মার্ব্বেলের উপর লেখা নামটা দেখিল, ওই মধু-ময়রার দোকান। আর কয়েকখানা বাড়ী পার হইলেই তাহার বাড়ী।

এতক্ষণে তাহার মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল, বুকের স্পন্দন থামিল। বা, সে যেন কোন অভিসারিকা, সুপ্ত নগরের জনহীন পথ দিয়া কোন্ সঙ্কটময় রহস্যপথে তাহার যাত্রা, সম্মুখে অন্ধকার তারালোকে মিশিয়া গিয়াছে, দক্ষিণ-বাতাসে গাছগুলি উতলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হৃদয়ের নৃত্যের তালে তালে গলার হার পায়ের নূপুর বাজিতেছে। স্বামী সুস্থ হইলে তাঁহাকে এই রাত্রের কাণ্ড কিরূপ রং চং দিয়া বলিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে সে নিজের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল।

হাঁ, এই ত তাহাদের বাড়ী। দরজাটা ভাল করিয়া দেখিল, নম্বরটা দেখিল, হাঁ তেরো বটে। দুয়ার বন্ধ ছিল, জোরে ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল। দেউড়িতে চাকরটা ঘুমাইতেছে। দরজায় খিল দিয়া অলকা ত্বরিতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

ঘরের দরজা খোলা, আলো মিট্‌মিট্ জ্বলিতেছে। এবার সে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল না। আলো উস্কাইয়া ভাল করিয়া ঘরটি দেখিল। হাঁ, তাহারই ঘর বটে। ঘরের টেবিল চেয়ার জিনিষ সব তাহার দিকে যেন স্মিতহাস্যে চাহিয়া অভ্যর্থনা করিল। ঘরের প্রতি-জিনিষকে অলকার চুমো খাইতে ইচ্ছা হইল। আদর-মাখান চোখে প্রিয় ঘরটির দিকে দেখিয়া সে স্বামীর খাটের দিকে গেল। স্বামী চুপ করিয়া শুইয়া আছেন, তিনি ঘুমাইতেছেন দেখিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। স্বামীর প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে করিতে সে সমস্ত পথ আসিয়াছে।

স্বামী হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এত রাত হল? সে বলিবে, বিয়ে-বাড়ী।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিবেন, কিসে এলে? সে বলিবে, সুরেন-ঠাকুরপো দিয়ে গেল।

স্বামী বলিবেন, মোটরের শব্দ শুন্‌লাম না? সে বলিবে, নিঃসাড় রল্‌স্‌রয়্‌স্ গাড়ী।

যাক্ কোন উত্তর দিতে হইল না।

স্বামীর মাথার উপর ধীরে এক চুমো খাইয়া অলকা কাপড় জামা বদ্‌লাইতে আরম্ভ করিল। ব্লাউজ খুলিতেই একখানি খাতা মেজেতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া দেখিল, অলককুমারের সেই মরক্কো-লেদার-বাঁধান কবিতার খাতা। কখন যে সে খাতাখানি অতর্কিতে ব্লাউজের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছে তাহা সে নিজেও জানিতে পারে নাই।

ব্লাউজটা ছাড়িয়া শাড়ী না ছাড়িয়াই অলকা আলোটা একটু উস্কাইয়া ঘরের কোণে সোফায় গিয়া খাতাখানি লইয়া পড়িতে বসিল।

খাতাখানির পাতাগুলি উল্টাইয়া সে উৎসর্গপত্রটা পড়িতেছিল, কবি তাহার এক তরুণীবন্ধুকে কবিতা-গুলি দিয়াছেন, সে বন্ধুকে তিনি সারাজীবনের জন্য হারাইয়াছেন, কিন্তু তাঁর প্রাণের চির-অম্লান প্রেমশতদলের উপর সে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী চির-অধিষ্ঠিতা।

স্বামীর কণ্ঠস্বর কানে আসিতেই অলকা চমকিয়া উঠিল,—ওগো, এক গেলাস জল দাওনা।

ও, তুমি এখনও ঘুমোও নি,—বলিয়া মিষ্টি হাসিয়া অলকা স্বামীর দিকে চাহিল। ভাবিল, এবার বুঝি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, কার চিঠি পড়্‌ছ?

স্বামী কোন প্রশ্ন করিলেন না, পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু পরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি যে জল চাহিয়াছেন তাহা অলকা শুনিতেই পায় নাই, সে খাতাখানি হাতে করিয়া চাঁদ ও তারাদের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, কে সে তরুণী বন্ধু, কেমন সে দেখিতে? অলকের বেহালার সুর নিশীথরাত্রি ভরিয়া অলকার কানে বাজিতে লাগিল।

অলক তখন তাহার টেবিলের উপর গোলাপফুলগুলির প্রতি চোখের-জলে-ভেজা-মুখে চাহিয়া অসহনীয় আনন্দের সঙ্গে ভবিতেছিল, সত্যই তাহার তরুণী বন্ধু আসিয়াছিল। এই কাঁচা সোনার রংএর গোলাপ ত তাহার খুব প্রিয় ছিল, তাহার অসুখের সময় এই-রকম গোলাপই অলক তাহার জন্য কিনিয়া আনিত। এই গোলাপদুটি সে দিয়া গিয়াছে, আর তাহার কবিতার খাতাখানি যে সে লইয়া গিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহার সুখের অবধি ছিল না। তাহার বন্ধুর মৃত্যুর পর সে এই ভাবিয়া দুঃখ পাইত যে এলোক ও পরলোকের মধ্যে কথাবার্ত্তার কোন উপায় নাই যে, সে কেমন আছে, জানিতে পারি না, তার কাছে একটি মনের কথা জানাইতে পারি না।

যে কবিতাগুলি তাহাকে স্মরণ করিয়া অলক লিখিয়াছে, সেগুলি সে নিজে লইয়া গেল! শুধু যদি সে একটি কথা কহিয়া যাইত, তার মিষ্ট গলার একটু সুর, একটি কথা শুনিবার জন্য কানদুটো যে দুর্ভিক্ষপীড়িত বুভুক্ষু হইয়া আছে।

তাহার শরীরের ভারে বেহালার একটা তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সেই ভাঙ্গা-বেহালা লইয়া সে আবার ছাদের জ্যোৎস্নায় গিয়া বসিল।

সে রাতে অলক ও অলকা দুজনের কাহারও ঘুম হইল না।

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

পৃথিবীর প্রতি

শ্যামা বসুন্ধরা—
বড় ভালবাসি মাগো, পত্র-পুষ্প-ভরা
তোর এই মনোহর সাজ। ভালবাসি
শ্যামশোভাহীন তোর বালুকার রাশি।
নগ্ন ধূম্র গিরিশির তাও লাগে ভালো,—
তুষার-শৃঙ্গেতে সন্ধ্যা-সকালের আলো
ভুলায় আমার মন। ক্ষুদ্র জলাশয়,
নদী, সিন্ধু, নির্ঝর,—এ সবই শোভাময়।
জানি না কে টানে মোরে সবার অধিক,
সকলেরই পানে চেয়ে থাকি নির্নিমিখ্‌।
জলের কল্লোলে শুনি পরিচিত গীতি,
প্রতিটি পল্লবে যেন মাখা মোর প্রীতি!
ধূলা মাটি পাথরের শীতল পরশ
শুষ্ক দেহমন করে নিমেষে সরস!
কি অঞ্জন পরায়েছ মোর জন্মক্ষণে
কি পরশ বুলায়েছ মোর দেহমনে,—
দেখে দেখে তাই তোরে মেটে না যে আশা,
তোর স্পর্শ বুঝি মোর সর্ব্বতাপনাশা!
তোর প্রতি অণু সাথে জীবন মরণ
বাঁধা যেন মোর; তারা করায় স্মরণ
মাটির নাড়ীর টান। তাই প্রতি পলে
সাধ যায় মিশে থাকি তোরই মাটি জলে।
তাই মা গো তোরে ছেড়ে স্বর্গ নাহি চাই,
জীবনে মরণে তোর কোলে দিস্ ঠাঁই।

শ্রী সুনীতি দেবী

ভারতবর্ষ

জালিয়ানওয়ালা বাগের স্মৃতিরক্ষা—

জালিয়ানওয়ালা বাগের ডায়ারী ও ডায়ারী কাণ্ডের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য ১৯১৯ সালের অমৃতসর-কংগ্রেসে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। ১৫ জন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করিয়া এই স্মৃতি-রক্ষার ভার প্রদান করা হইয়াছিল সেই কমিটির হাতে। কমিটির সদস্য ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালা লাজপৎ রায়, লালা গিরিধারীলাল, ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচ্‌লু, লালা হরকিষণ লাল, লালা দেওয়ানচাঁদ, লালা মুলকরাজ, লালা তুলসীরাম, ডাক্তার সত্যপাল, বক্সি টেকচাঁদ, লালা ছুনিচাঁদ এবং লালা কানাইলাল। এই কমিটির সদস্যদের ভিতর আজ অনেকেই জেলে। তথাপি এই স্মৃতিরক্ষার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে জালিয়ানওয়ালাবাগ ফণ্ড মেমোরিয়াল কমিটি এক রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদের কাজের একটা হিসাব-নিকাশ প্রদান করিয়াছেন।

কমিটি ভারতের নানা প্রদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ফিরিস্তি নীচে দেওয়া গেল :—

বঙ্গদেশ ও আসাম	৩৩৬৬০৲
মান্দ্রাজ ও অন্ধ্র	১৪৯৬৫৲
বোম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক ...	৩৬৫০৬৫৲
সিন্ধু	৩৭৭০৭৲
যুক্ত-প্রদেশ	৪০১২০৲
দিল্লী, আজমীর, রাজপুতনা	৫৫৮০৲
বিহার এবং উড়িষ্যা	৪০২৭৲
পঞ্জাব ও সীমান্ত-প্রদেশ	২১৯৪০৭৲
মধ্য-প্রদেশ	৩৩৭১৲
বেরার	৩৪৬৬৲
ব্রহ্মদেশ	১২৯৭৲
দেশীয় রাজ্য	১২৩৮৲
ভারতের বাহিরের নানা স্থান হইতে ...	২১৮৭১৲
অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নিকট হইতে ...	১২৭৭৲
মোট	৭৮৫৬২৭

এই অর্থের বেশীর ভাগই ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং তাহা ব্যয় হইয়াছে জালিয়ানওয়ালা বাগের জায়গাটার স্বত্বাধিকার কিনিয়া লইতে। ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন ৩২ জন। তাঁহারা ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৩২ টাকার বিনিময়ে এই জমিটা ট্রাষ্টিদের কাছে বিক্রয় করিয়াছেন। সুদ প্রভৃতি লইয়া সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল [illegible] লক্ষ ৮ হাজার ৭৬০ টাকায়। বর্ত্তমান ট্রাষ্টিদের হাতে আছে মোট [illegible] লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৪৬ টাকা।

জালিয়ানওয়ালা বাগের ভিতর একটি কূপ আছে, সে কূপটির সংস্কার করা হইয়াছে। বাগানেরও নানা রকমের সংস্কারের দিকে নজর দিতে ইঁহারা ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এখনও স্মৃতি-সৌধটি গাথিয়া তোলা বাকী আছে। সেইজন্য কমিটির সেক্রেটারী আবার সাধারণের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

পার্ব্বতী দেবীর কারাদণ্ড—

গত ২০শে নভেম্বর পঞ্জাবের অন্যতম দেশসেবিকা শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীকে ১২৪ (ক) এবং ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। বিচারে তাঁহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে। তিনি লালা লাজপত রায়ের বাংলাতে স্বীয় সহোদরের সহিত বাস করিতেছিলেন। ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ব্রজলাল বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পার্ব্বতী দেবী কয়েকখানা ধর্ম্মগ্রন্থ এবং শয্যা ও পরিচ্ছেদ আনাইবার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করা হয় নাই। এই তো গেল গ্রেপ্তারের নমুনা। বিচার-ব্যবস্থা আরো চমৎকার। তাঁহার বিচার প্রকাশ্যে করা হয় নাই, সে কাজটা সারা হইয়াছে জেলের ভিতরে। বিচারের সময় শ্রীমতী একখানি বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছেন। বিচার যে কিরূপ হইয়াছে তাহার নমুনা এই বর্ণনাপত্র খানা পাঠ করিলেই বোঝা যায়।

শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী বর্ণনাপত্রে বিচারের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উপস্থাপন করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাই পত্তাইয়া দিলাম।—সাক্ষীদের ভিতর একজন ব্যতীত সকলেই সরকারী পুলিশ কর্ম্মচারী। যদিও হাজার হাজার লোকের সম্মুখে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তথাপি একজন ব্যতীত বে-সরকারী সাক্ষী কর্ত্তারা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। এই বিশেষ সাক্ষীটিও নাকি অনেকবার জেলের মাটি মাড়াইয়া আসিয়াছেন এবং এখনও পুলিশ-প্রভুদেরই নজরবন্দী হইয়া আছেন। অর্দ্ধশিক্ষিত পুলিশ-কর্ম্মচারীরা আমার বক্তৃতা না বুঝিতে পারিয়া আমার মুখে এমন সব উৎকট আরবী ও পারসী শব্দ বসাইয়া দিয়াছে যাহা আমি তো বলিই নাই, এমন কি সেগুলির অর্থও আমি জানি না। আমি হিন্দিতে যে বক্তৃতা করিয়াছি পুলিশের লোকেরা তাহা নিজেদের মনের মত করিয়া লিখিয়াছে। যে-সব আপত্তিজনক ও অশ্লীল শব্দ উঁহারা বসাইয়াছে, আমি কখনো তাহা উচ্চারণ করি নাই।

অথচ এইরূপ জবানবন্দী পড়ার পরেও এই-সব সাক্ষীর কথার উপর নির্ভর করিয়া একজন মহিলাকে হাকিম দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এরূপ আদেশের সম্বন্ধে মন্তব্য একেবারেই নিরর্থক। অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধে ভারতীয় মহিলা ইতিপূর্ব্বে দণ্ড পাইলেও রাজদ্রোহের অপরাধে ভারতীয়

মহিলাদের ভিতর শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীই সর্ব্বপ্রথম বলি। একবার যখন সুরু হইয়াছে তখন এরূপ অর্ঘ্যের ডালি এ দেশের মহিলা-দিগকে আরো অনেক সাজাইতে হইবে। এজন্য তাঁহাদের নিজেদের তৈরী করিয়া তোলা দরকার।

গুরুকা-বাগ ও শিক্ষাসম্প্রদায়—

গুরুকাবাগে অকালীদের গ্রেপ্তার বন্ধ হইয়াছে। মোহন্ত সুন্দর-দাস গুরুকাবাগ-সংলগ্ন জমী স্যার গঙ্গারাম নামক জনৈক ব্যক্তিকে বার্ষিক দুই হাজার টাকা খাজনায় এক বৎসরের জন্য পত্তনী দিয়াছেন। স্যার গঙ্গারাম অকালীদিগকে কাঠ কাটিতে কোনোরূপ বাধা দিতেছেন না। সুতরাং পুলিশের গ্রেপ্তারের ফুর্‌সৎও ফুরাইয়াছে। কিন্তু এই জমা-দেওয়া ব্যাপারটায় উদাসীন-মোহন্ত-মণ্ডলের তরফ হইতে মোহন্তের নামে এক আপত্তির পরোয়ানা জারী হইয়াছে। তাহারা মোহন্ত সুন্দরদাসকে লিখিয়াছেন—গুরুকাবাগের জমীগুলি ইতিপূর্ব্বে উদাসীন-মোহন্ত-মণ্ডলকে তিনিই জমা দিয়াছেন। সুতরাং নূতন করিয়া উহা আর-কাহাকেও জমা দেওয়ার অধিকার তাঁহার নাই। এই জমী স্যার গঙ্গারামকে জমা দেওয়া হইলে তাঁহারা মোহন্তের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিবেন। মোহন্ত সুন্দরদাস ইহার যে জবাব দিয়াছেন তাহা একটু বিচিত্র। তিনি লিখিয়াছেন—স্যার গঙ্গারামকে জমা দেওয়া সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। আম্বালার তহশীলদার তাঁহাকে কয়েকখানা কাগজে স্বাক্ষর করিতে বলিয়াছেন। তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি উহাতে স্বাক্ষর করেন। কাগজে যে কি ছিল তাহা তাঁহাকে জানানো হয় নাই।

এসব কথা প্রকাশ হইবার পরে ইহার ভিতর গবর্ণমেন্টের যে একটা বড় রকমের চাল আছে, জনসাধারণের মনে স্বতঃই সে কথা জাগিয়া উঠিতেছে—তাহারা মনে করিতেছে অকালীদের নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কাছে সোজাসুজি পরাজয় স্বীকার না করিয়া তাহারই এই কারসাজিটির আমদানী করিয়াছেন। এদিকে তো ব্যাপার এইরূপ। অন্যদিকে অকালীরাও এই জোড়া-তালি-দেওয়া মীমাংসাটাকে গ্রহণ করিতে রাজি নহেন। তাঁহারা গুরুকা-বাগগুলির সকল-রকমের অধিকারই দাবী করিতেছেন—অনু-গ্রহের ক্ষুদকুঁড়া তাঁহাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। গত ২৫শে নবেম্বর অমৃতসরের অকালতক্তে এই-সব ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিবার জন্য একটা বিরাট্ 'দেওয়ানের' অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। •এই দেওয়ানে স্থির হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন গুরু-কা-বাগ দখল করিবার জন্য অকালী 'জাঠা' প্রেরিত হইবে। কোটনাইনার গুরুদ্বারে, রামদাস গুরুদ্বারে, তেজগ্রামের গুরুদ্বারে, দখলের নিরুপদ্রব লড়াই আরম্ভ করিবার জন্য 'জাঠা' তৈরী করিয়া তোলার কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এবারকার লড়াইয়ে অকালীদিগকে গুরু-কা-বাগের মত বেগ পাইতে হইবে না। কারণ এই নিরস্ত্র নিরুপদ্রব অকালী সঙ্ঘ-গুলির শক্তি যে কত অনেক মোহন্তের কাছেই তাহা আর চাপা নাই। সুতরাং লড়াইয়ে না মাতিয়া মোহন্তদের অনেকেই সম্ভবতঃ এবার আপোষে নিষ্পত্তির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবেন। গুরুদাসপুর জেলার নয়নাকোট গুরুদ্বারের মোহন্ত অর্জ্জুনদাস তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া শিরোমণি-প্রবন্ধক-কমিটির হাতেই অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রবন্ধক-কমিটির হাতেই তাঁহার ভাতা নির্দ্দেশের ভারটাও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। হোশিয়ারপুরের তহিল-সাহেব গুরুদ্বার এবং গুরুদাসপুরের দমদমা সাহেব গুরুদ্বারও প্রবন্ধক-কমিটির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অনতিবিলম্বেই আরো কয়েকটি যে গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির হাতে আসিয়া পড়িবে তাহার আভাসও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শিখদের গুরুদ্বারগুলি সম্পর্কে গবর্মেণ্ট যে নেহাত সোজা পথ ধরিয়া চলেন নাই তাহার পরিচয় অন্যান্য আরো অনেক ব্যাপারের ভিতর দিয়া পাওয়া যায়। পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার গুরুদ্বার সম্পর্কে যে বিলটি পাশ হইয়াছে তাহার ভিতরেও এই বাঁকা পথে চলার নমুনা আছে। প্রথমতঃ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার-গুলির ভিতর গবর্মেণ্টের মাথা গলাইবার বিশেষ প্রয়োজনই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ যে সম্প্রদায়ের সমস্যা সে সম্প্রদায়ের একটি মাত্র ভোট না পাইয়াও কোনো বিল পাশ করা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। গুরুদ্বার বিলের প্রস্তাব লইয়া পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় যে তর্কযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে শিখদের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য সম্প্রদায়ের অনেকেই একান্ত তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। দেশীয় খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে মিঃ বৃন্দনলাল রালিয়া-রাম বিলের প্রতিবাদ করেন। কেবল মাত্র সরকারী সদস্য এবং কয়েকজন মুসলমান সদস্যের ভোটের জোরেই বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়া গিয়াছে। কোনো শিখ সদস্য বা হিন্দু সদস্য বিলের পক্ষে ভোট দেন নাই।

জানুয়ারী মাসের প্রথমে অমৃতসরে নিখিল-ভারত-গুরুদ্বার কন্-ফারেন্সের অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে। এই বৈঠকে আলো-চনা করিবার জন্য গুরুদ্বারের সম্পর্কে শ্রী সারদা-পীঠের শঙ্করাচার্য্য সমস্যাগুলি ও তাহার সমাধানের ব্যবস্থার খসড়া তৈরী করিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে শঙ্করাচার্য্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

অকালীদের প্রতি অত্যাচার—

পঞ্জাবে জেলের ভিতর অকালীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই সহিষ্ণুতার গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতেছে। ইহা লইয়া সংবাদপত্রের মারফৎ আন্দোলনও কম হইতেছে না। তথাপি প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের যে নজর পড়িয়াছে তাহার প্রমাণ এখন পর্য্যন্তও আমরা পাই নাই। কয়েকটা অত্যাচারের নমুনা এখানে আমরা বিভিন্ন পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পঞ্জাব ক্যাম্বেলপুর কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী সংবাদ দিয়াছেন, গত ২১শে অক্টোবর একজন জেল-কর্ম্মচারী অকালীদিগকে কীর্ত্তন বা 'সৎশ্রী অকাল' বলিয়া চীৎকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহাতে জাঠাদার বলেন, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা জেল-কর্ত্তৃপক্ষের উচিত নহে। জেল-কর্ম্মচারী এটাকে অবাধ্যতা মনে করিয়া শাস্তি দিবার জন্য একজন অকালীকে ডাকিয়া পাঠান। ফলে কয়েকজন অকালী বাহির হইয়া আসে। ইহার পর বিপদ্‌সূচক ঘণ্টা বাজাইয়া সমস্ত পুলিশকে জড় করা হয়। অকালীরাও 'সৎশ্রী অকাল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ জেলে ছিল না। অন্যান্য জেল-কর্ম্মচারীরা পরামর্শ করিয়া নয় শত অকালীর ভিতর হইতে চল্লিশজনকে দণ্ড দিবার জন্য বাছিয়া লইয়াছিল। চারিজনকে সেই দিন বেত মারা হইয়াছিল, বাকী ৩৬ জনকে পরের দিন বেত মারার জন্য নির্জ্জন কারাকক্ষে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। তিনজন অকালী সৎনাম ওয়াহি গুরু বলিয়া পঁচিশ ঘা বেতই সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ জন সম্ভ্রান্ত-বংশের তরুণ যুবক। সে সাত ঘা বেত খাইয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই অজ্ঞান অবস্থাতেও তাহার উপর আরো কয়েক ঘা বেত চলিয়াছিল।

সার্ভেণ্ট সংবাদ দিয়াছেন, ভাই বার্গাম সিং নামক একজন কয়েদীকে এক সপ্তাহকাল রাত্রিতে হাতকড়ি দিয়া রাখা হইয়াছিল।

তাহাকে পায়ে শিকল দিয়া রাখা হইয়াছিল একমাস কাল। এক মাস তাহাকে ছালা পরিতে দেওয়া হয়। তাহাকে গম ভাঙ্গিতে হইত। কাঁচা আটা জল দিয়া গুলিয়া খাইতে হইত। তিন সপ্তাহ কাল তাহাকে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। আটক জেলে অত্যাচারের বহর আরো চরমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্দী অকালীদিগকে নদী হইতে কেল্লা পর্য্যন্ত কঙ্করময় পথে খালি পায়ে বোঝা মাথায় করিয়া হাঁটিতে হয়। শিখেরা উপাসনার শেষে 'সৎশ্রী অকাল' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। ইহার জন্য তাহাদিগকে প্রত্যহ অশেষবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে।

একদিন আটক জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কতকগুলি শিখকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। শিখেরা অমনি 'সৎশ্রী অকাল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাগিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকেন। ফলে শিখদের চীৎকারের মাত্রা আরো বাড়িয়া যায়। তখনই বিপদের ঘণ্টা বাজাইয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে একশত পুলিশ হাজির হইয়া এইসব নিরস্ত্র নির্ব্বিরোধী শিখদের উপর বেপরোয়াভাবে গুলি চালাইয়াছিল।

গুরুকা-বাগ হাঙ্গামার সংশ্রবে সুবেদার অমরসিংহের কারা-দণ্ড হইয়াছিল। তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন একজন উচ্চ-পদস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছোড়েন। এই ঢিল লাগিয়া অমরসিংহের একদিকের চোয়াল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অমরসিংহের অপরাধ তিনি 'সৎশ্রী অকাল' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। জেলে তাঁহাকে প্রত্যহ এক সের করিয়া দুধ খাইতে দেওয়া হইত বটে, কিন্তু চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত করা হয় নাই। কয়েক দিন পরে জেলের ডাক্তার পরীক্ষা করিয়াই বুঝিতে পারেন তাঁহার চোয়ালের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন তাঁহাকে মিয়ানওয়ালী হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাঁহার অবস্থা নাকি বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না।

ব্যারিষ্টারী ও মহাত্মা গান্ধী —

মহাত্মা গান্ধী বহুদিন ব্যারিষ্টারী ব্যবসার সঙ্গে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিলাতের ব্যবহারাজীবদের তালিকার ভিতর এতদিনও মহাত্মা গান্ধীর নাম ছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ১৯২২ সালের তালিকা তৈয়ারীর সময় তাঁহার নামটা তালিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে!

পালঘাটের দেবমন্দির—

পালঘাটের কাছে এক দেব-মন্দির আছে। বিগ্রহের পূজার জন্য এই মন্দিরের সম্পত্তি আছে বিপুল। পালঘাটের বালিয়া রাজা তাহার তত্ত্বাবধায়ক। বালিয়া রাজা জাতিতে আচান। আচানেরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বলিয়া তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এ ব্যবস্থা অপমানকর মনে করিয়া কয়েকজন আচান যুবক বলপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করেন। বিগ্রহের পূজারী নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ প্রথমবারের এই প্রবেশের পর বিগ্রহকে পবিত্র করিয়া লইয়া পূজা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু আচানদের সেই প্রথম প্রবেশ শেষ প্রবেশে পরিণত হয় নাই। তাঁহারা আবার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এবার পূজারী বিগ্রহ অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া বিগ্রহের পূজা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সামাজিক বিধিবিশেষের অন্যায় অজুহাতে আমরা শ্রেণী-বিভাগের দ্বারা জাতির এক-একটি সম্প্রদায়কে অপমানের চূড়ান্ত করিয়াছি। এ অপমান কেহ চিরদিন সহ্য করিয়া চলিতে পারে না। নিম্ন শ্রেণীর ভিতরেও আজ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা জাগিয়া উঠিলে আমাদের সেই অপমানগুলিকে সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেই। তাহা ছাড়া দেবতা যদি মানুষের সম্পর্কে অপবিত্র হইয়া যায় এবং সেই অপবিত্র দেবতাকে পবিত্র করিয়া লইবার ভার যদি মানুষের হাতে থাকে তবে সে দেবতার দেবত্বটা যে কোন্ জায়গায় তাহারই তো হদিস্ পাওয়া যায় না। কুসংস্কার জাতিকে কতটা অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এইগুলিই তাহার প্রমাণ।

রেলে নূতন গাড়ী—

জি, আই, পি, রেলওয়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য একটা নূতন বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা স্ত্রীলোক পরিজন লইয়া রেলে যাতায়াত করেন তাঁহাদিগকেই অনেক সময়েই নানা রকমের অসুবিধায় পড়িতে হয়। স্ত্রীলোকদের আলাদা গাড়ী সত্ত্বেও অনেকে নানারূপ বিপদের আশঙ্কায় স্ত্রীলোকদিগকে সে-সব গাড়ীতে তুলিয়া দিতে রাজী হন না। এই অসুবিধা কতকটা পরিমাণে দূর করিবার জন্য জি, আই, পি, রেল কোম্পানী কতকগুলি বড় গাড়ী ছোট ছোট কামরায় ভাগ করিয়া তৈরী করিতেছেন। প্রত্যেক গাড়ীতে ১০ জনের স্থান থাকিবে এবং দশজনের ভাড়া দিলেই কামরাটি রিজার্ভ করিতে পারা যাইবে। এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা হয় তো বড় পরিবার লইয়া যাঁহারা রেলপথে যাত্রা করেন তাঁহাদের কতকটা সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ যাত্রীদের বিশেষ কোনই সুবিধা হইবে না। রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা অসংখ্য। সেগুলির প্রতিকারের দিকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। নূতন ব্যবস্থাটি তবু মন্দের ভাল।

নূতন ধরণের অত্যাচার—

আসামের জোড়হাট হইতে সার্ভেণ্ট পত্রিকার জনৈক সংবাদ-দাতা নিম্নলিখিত খবরটি প্রেরণ করিয়াছেন।—"জোড়হাটের আবগারী হেডক্লার্ক শ্রীযুত কালীকুমার বড়ুয়ার সাত বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র পথে দুইটি কুকুরকে ঝগড়া করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রতি ঢিল ছুড়িতেছিল। সিভিল সার্জ্জেন সেই সময় মোটরে করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। বালকের একটা ঢিল তাঁহার মোটরে লাগে। সাহেব তখনই মোটর হইতে নামিয়া বালকটিকে তাড়া করেন। বালকটি ভয়ে বাড়ীর ভিতর পলাইয়া যায়। সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর ঢোকেন। বাড়ীতে তখন পুরুষ কেহ ছিল না। ছেলেটিকে বাহির করিয়া দিবার জন্য তিনি বালকের মাতাকে জেদ করিতে থাকেন। বালক কিন্তু তখন পিছনের দরজা দিয়া পগার পার। পথের লোকজনও এই ব্যাপার দেখিয়া সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। বালকের মাতা তখন সেই-সব লোকজনের মারফৎ সাহেবকে বলেন কালীবাবু বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে ছেলেকে সাহেবের বাংলায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। পরের দিন কালীবাবু সত্য-সত্যই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যান। সাহেব তখনই কালীবাবুর বাড়ীতে আসিয়া একগাছা বেত কালীবাবুর হাতে দিয়া ছেলেকে প্রহার করিতে বলেন। তাহার পর বালকের পিঠে পিতার বেত সপাং সপাং করিয়া পড়িতে থাকে। কয়েক মিনিট প্রহার সহ্য করার পরেই বালকটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়।"

এ অভিযোগ সত্য কি না তাহা আমরা জানি না। যদি সত্য হয় তবে এ জাতির এত বড় দুর্দ্দশা হওয়া কিছু মাত্র অন্যায় হয় নাই। যে জাতির কাপুরুষতা এতদূর পর্য্যন্ত গড়ায় যে ভয়ে পিতৃস্নেহও ছেলের উপরে এত বড় অত্যাচার করিতে পারে, সে জাতির দুর্দ্দশা হওয়াই স্বাভাবিক।

অন্ধ-সাহায্য-সমিতি—

বোম্বাইএর অন্ধ-সাহায্য-সমিতির ১৯২১ সালের রিপোর্ট্ বাহির হইয়াছে। এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯১৯ সালে। এই অল্প দিনের ভিতরেই ইহার কার্য্য-পদ্ধতির দ্বারা এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা বিশেষভাবেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে মোটের উপর ৪৯৭০৬ লোক একেবারে অন্ধ হইয়া আছে। রিপোর্টে প্রকাশ, যথাসময়ে চেষ্টা করিলে ইহাদের অনেককেই দুর্ভাগ্যের এই চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইত না।

প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভাবে ঝোঁক দেন অন্ধত্ব নিবারণের ব্যবস্থার দিকে। গ্রামে গ্রামে ইঁহাদের কর্ম্মীরা গিয়া নবজাত শিশুদের চোখ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। সঙ্গে ইঁহাদের ঔষধপত্রও থাকে। চোখ কি করিয়া ভালো রাখা যায় সে সম্বন্ধে সাধারণকে ইঁহারা উপদেশ দিতেও কসুর করেন না। বালেশ্বরে এই সমিতির উদ্যোগে একটি দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়ে ১৯২১ সালে মোটের উপর ৩১১৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর ২৭৭৩ জন সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইয়াছে। ১৬৬ জনের চোখের অবস্থা অনেকটা ভাল। ৭১ জনের সম্বন্ধে কোনোই আশা নাই।

কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সহজ ব্যাধিগুলি নিজেরাই চিকিৎসা করেন। কিন্তু ব্যাধি গুরুতর বলিয়া মনে হইলে চিকিৎসার ভার নিজেদের হাতে না রাখিয়া রোগীদিগকে বালেশ্বরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। উপরে যে সংখ্যাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি কিরূপভাবে কাজ করিতেছেন। মানুষের জীবনে অন্ধত্বের মত অভিশাপ খুব কমই আছে। অথচ এই অন্ধত্ব অনেকক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞতার ফল। এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ভারতের সকল প্রদেশেই আছে।

মিউনিসিপ্যালিটিতে নারী সদস্য—

মাদ্রাজের সৈদাপেট মিউনিসিপ্যালিটিতে সম্প্রতি দুইজন মহিলা সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহাদের একজনের নাম শ্রীমতী এম্ শুভলক্ষ্মী আম্মাল, আর একজন শ্রীমতী সি কৃষ্ণ আম্মাল। ইতিপূর্ব্বে মিসেস্ দেবদাসও মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং মাদ্রাজে যে নারীদের অধিকার উপেক্ষিত হইতেছে না, অন্ততঃ তাঁহাদের ন্যায্য দাবীর দিকে যে নজর পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই।

বোম্বাইয়েও তিনজন মহিলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনের আসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই তিনটি মহিলার ভিতর একজন হইতেছেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। মিউনিসিপ্যালিটিও ইঁহাদের নির্ব্বাচনের আসরে দাঁড়াইবার দাবী অগ্রাহ্য করেন নাই।

কিন্তু বাংলায় এ-সব লইয়া নারী-সম্প্রদায়ের ভিতর কোনরূপ চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এ-সব দিক্ দিয়া বাংলা ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির অনেক পিছনেই পড়িয়া আছে। কাগজ-কলমের গণ্ডী ছাড়াইয়া সত্যকার অধিকার অর্জ্জনের পথে বাংলার নারী কিছুমাত্র অগ্রসর হন নাই। এই যে নির্লিপ্ত ভাব—এটা বাংলার শিক্ষিতা রমণীদের পক্ষে একেবারেই গৌরবের কথা নহে।

ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ—

মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট্ শ্রীযুক্ত এস্ আর্ দীক্ষিত ২০শে নবেম্বরের বৈঠকে ব্যয়-সঙ্কোচ সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেকবারেই প্রেসিডেন্ট তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ফলে শ্রীযুক্ত দীক্ষিত ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের পদও পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় যদি সং সাজিয়া কেবল মাত্র সাক্ষী-গোপালের মতই থাকিতে হয় তবে সরিয়া পড়াই ভালো। এইরূপ পদত্যাগে দেশী-বিদেশীর চোখ ফুটিবে।

ওকালতির জন্য বিলাতে আপীল—

শ্রীমতী সুধাংশুবালা হাজরা বি-এল, কিছুদিন পূর্ব্বে পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মিস্ হাজরা নারী বলিয়া হাইকোর্ট তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ইহার পর তাঁহার পক্ষ হইতে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের আবেদন পেশ করা হয়। প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি আপীল গ্রাহ্য করিয়াছেন। বিলাতেও এতদিন নারীদিগকে তাঁহাদের জাতির দোহাই দিয়াই ব্যবহারাজীবদের ব্যবসাক্ষেত্র হইতে দূরে রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহারা সে অধিকারটা আদায় করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং হাইকোর্টের এই খামখেয়ালিটা প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারে টিকে নাই। বস্তুতঃ নারীদিগকে যদি আইনের পরীক্ষাই দিতে দেওয়া হয় তবে তাঁহাদিগকে ব্যবসাই বা করিতে দেওয়া হইবে না কেন, তাহার অর্থ বোঝা যায় না। নারীদের সম্বন্ধে আমাদের মন সঙ্কীর্ণতার চাপে পড়িয়া চীনে নারীর পায়ের মত ছোট হইয়া গিয়াছে। এ যুগে সঙ্কীর্ণতা—তা সে যে প্রকারেই হোক—একেবারেই অচল।

বারাণসী-বিশ্ববিদ্যালয়—

বারাণসী-বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি বারাণসী-বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় ব্যয়ের দিকে নজর রাখিয়াই পঞ্জাবের মিঃ গঙ্গারাম একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভাইস-চ্যান্সেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেই সমস্ত সময় নিয়োগ করিবেন। বর্ত্তমানে মূলধন ক্ষয় করিয়া নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইতেছে। অতএব শিক্ষকদের বেতন হ্রাস করিয়া আয়ের সমতা রক্ষা করা হউক।

তাহা ছাড়া মিঃ ঈশ্বরশরণও একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম হইতেছে এই, যতদিন স্ত্রীলোকদের উচ্চ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না হইবে ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় নূতন কোনো বিভাগ খুলিতে পারিবেন না। ঋণ করিয়া কোনো বাড়ীও নির্ম্মাণ করা হইবে না।

প্রস্তাব দুইটি যে বিশেষভাবেই আলোচনার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজে পণ-প্রথার জের—

মাদ্রাজের মালাবার অঞ্চলে নাম্বুদ্রী নামে এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আছে। বিবাহের সময় তাহাদের কন্যার অভিভাবককে বেশ মোটা হারে পণের কড়ি গণিতে হয়। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, নাম্বুদ্রী রমণীদের ভিতর ১৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের কুমারীর কিছুমাত্র অভাব নাই। বাংলাতে এই পণ-প্রথার ফলে অনেক পিতা-মাতাকে ভিটে-মাটির মায়া কাটাইতে হইয়াছে, স্নেহলতার মত অনেক কুমারীকে মৃত্যুর শরণ লইয়া লাঞ্ছনার হাত এড়াইতে

হইয়াছে। বাংলার এই করুণ অভিনয় নাম্বুদ্রী সম্প্রদায়ের ভিতরেও অভিনীত হইতে সুরু হইয়া গিয়াছে। নরীকল্লী ওলোম নামক স্থানে একজন নাম্বুদ্রী রমণী বিবাহ-সমস্যার সমাধানের জন্য আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই-সব সামাজিক গর্হিত প্রথা জাতির জীবনের মেরুদণ্ডটাই ভাঙ্গিয়া দেয়। অথচ এ-সব অনাচারের দিকে আমাদের নজর কত কম।

পাঁচ লক্ষ টাকা দান—

করাচী হইতে সংবাদ আসিয়াছে পরলোকগত নাদিরশা ইদলজি দিনশা ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই টাকার ভিতর হইতে খুরশেদবাই আশ্রমের জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। ৭৫,০০০ টাকা মামা বালিকা-স্কুলে, ২০,০০০ পার্শি-দরিদ্র-ভাণ্ডারে, ৫০,০০০ টাকা লেডি ডাফরিন হাসপাতালে, ২৮,০০০ টাকা খুরশেদবাই নাদিরশা হলে এবং ২২,০০০ টাকা অনাথ-আশ্রমের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। এই-সব দাতার অর্থসঞ্চয়ই সার্থক!

বিহারে ব্যয়-সঙ্কোচ—

বিহারের ব্যয়-সঙ্কোচ-কমিটির বে-সরকারী সদস্যেরা তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা অনুমোদন করা হইয়াছে। কমিটির সদস্যেরা ব্যয়-সঙ্কোচের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেও কসুর করেন নাই। তাঁহারা বিভাগীয় কমিশনারের পদ অনাবশ্যক বলিয়া তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। কোন্ কোন্ পদে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকের বদলে প্রাদেশিক সার্ভিসের লোকের নিয়োগ করিলে ব্যয়ের মাত্রা কমিতে পারে সে কথাও তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মধ্য-প্রদেশের 'গ্লোকক'-কমিটির রিপোর্টের কথা আমরা এই 'প্রবাসী'তেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহারা ৮০ লক্ষ টাকা বাঁচাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্টেও বিভাগীয় কমিশনারের পদটি অনাবশ্যক বলিয়া তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

গুজরাটে পিকেটিং—

গুজরাটে বল্লভভাই পটেলের নেতৃত্বে জোর পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। ২৫০০ স্বেচ্ছাসেবক নাকি এই পিকেটিং চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। স্বেচ্ছাসেবকের দলে মহিলারাও যোগ দিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

সম্পাদকের অর্থদণ্ড—

গত ৮ই অক্টোবরের "বোম্বে ক্রনিকেলে" "Long live our Judges" শীর্ষক একটি প্যারা বাহির হইয়াছিল। এই প্যারা প্রকাশের দ্বারা আদালতকে অপমান করার অপরাধে কিছুদিন পূর্ব্বে সম্পাদক মর্ম্মাডিউক পিক্‌থল অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ৬ই ডিসেম্বর বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ক্রাম্পের বিচারে মিঃ পিক্‌থলের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। প্রেস-আইন উঠিয়া যাওয়াতে সম্পাদকেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন বটে!

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

অসাধুতা নিবারণের সংচেষ্টা—

ঘুষ নিবারণের চেষ্টা।—আজকাল আফিস আদালত আদি সকল স্থানেই ঘুষ না দিলে কোন কাজই হইবার নহে। ঘুষ লওয়া যেমন পাপ, ঘুষ দেওয়াও তেমনি পাপ; তবুও ঘুষ না দিলে কোন কাজ হয় না বলিয়া লোককে এই ঘুষের জন্য অস্থির হইতে হয়। ঘুষ দেওয়া ও লওয়া দুই-ই জাতীয় অধঃপতনের একটা লক্ষণ। সম্প্রতি কি প্রকারে এই ঘুষের আদান-প্রদান বন্ধ করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশ্যে মীরাটের উকীল-ব্যারিষ্টারগণ সম্মিলিত হইয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতি কিরূপে কোর্টের কেরাণী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ঘুষ গ্রহণে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। যদিও বর্ত্তমানে সকলের বেতন বাড়িয়াছে এবং জিনিসপত্রের দরও কিছু কমিয়াছে, তথাপি এই পাপ নাকি ক্রমে বাড়িতেছে। এখন সকল স্থানেই যদি এই-জাতীয় পাপ দূর করিবার চেষ্টা করা হয়, তবে হয়ত কতকটা সুফল ফলিতে পারে।

—নীহার

বাংলা

বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান—

হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস, মুসলমানের বংশবৃদ্ধি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ললিতমোহন সিংহরায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—ধর্ম্ম হিসাবে জন্ম-তালিকা লওয়া হয় না, কাজেই কতজন হিন্দুর জন্ম হইয়াছে এবং কতজন মুসলমানের জন্ম হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। তবে গত দশ বৎসরে নিম্নলিখিত সংখ্যায় হিন্দু-মুসলমানের মৃত্যু হইয়াছে—হিন্দু—৬৪৭১৭১২, মুসলমান—৭৪৭৯৭৪২, গত দশ বৎসরে হিন্দুরা শতকরা একজন বাড়িয়াছে, আর মুসলমান শতকরা ৫টি করিয়া বাড়িয়াছে। এই দুই জাতির লোকসংখ্যা ১৯১১ ও ১৯১২ সালে এইরূপ ছিল:—

হিন্দু— (১৯১১) ২০৩৬৩৪৯৩
(১৯১২) ২০১৭১৯৮৮
মুসলমান—(১৯১১) ২৩৯৮৪৬২১
(১৯১২) ২৫২০৩৫১০

সেন্সাস-অফিসার এই বিষয়ে তাঁহার রিপোর্টে সমস্ত বিশদরূপে লিখিবেন। ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক্ হেল্‌থের কথা এই যে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য কৃষিকার্য্য খুব ভাল চলে। আবার ভয়ানক বন্যা হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া হয় না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুজাতির অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৭০টি বাড়িয়াছে, পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫টি লোক বাড়িয়াছে। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর বাস অধিক। ময়মনসিংহে ৪৯ বৎসরে জন্মের হার শতকরা একশতেরও বেশী হইয়াছে, পক্ষান্তরে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অনেক জেলায় সত্যসত্যই লোক-সংখ্যা কমিতেছে। মুসলমানের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই ও বিধবা-বিবাহ আছে বলিয়া মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

—হিন্দুস্থান

সর্ব্বনেশে নেশা—

আবগারী আয়। এক্‌সাইজ ডিপার্ট্‌মেণ্ট্ বা মাদক-দ্রব্য-বিভাগে ভারত-সরকারের বৎসরে বৎসরে প্রচুর আয় হইয়া থাকে। এই আয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা নিম্নে গত দশ বৎসরের আয়ের একটি তালিকা দিলাম।

সন	আয়	
১৯১০—১১	৭০৩০৩১৪	পাউণ্ড
১৯১১—১২	৭৬০৯৯৫৭	”
১৯১২—১৩	৮২৭৭৯১৯	”
১৯১৩—১৪	৮৮৯৪৩০০	”
১৯১৪—১৫	৮৮৫৬৮৮১	”
১৯১৫—১৬	৮৬৩০২০৯	”
১৯১৬—১৭	৯২১৫৫৯৯	”
১৯১৭—১৮	১০১৬১৭০৬	”
১৯১৮—১৯	১১৫৫৭৫১৮	”
১৯১৯—২০	১২৭৫২৩৫০	”
১৯২০—২১	১৩৬৭৪০০০	”

দেবমন্দিরের মত ভারতের সর্ব্বস্থানে এখন মাদক দ্রব্যের দোকানগুলি বিরাজ করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর আদেশ—এ পাপ ভারত হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। কিন্তু এ কথায় জাতি এখনও কান দেয় নাই। চীন-গবমেণ্ট নিজের দেশের পক্ষে অহিতকর জানিয়া অতকালের পুরানো আফিংখোর জাতির আফিং এক মুহূর্ত্তে বন্ধ করিয়া দিলেন—চীন সরকারের অত বড় একটা বিরাট আব্‌গারী আয় বন্ধ হইয়া গেল, আর আমাদের দেশে উত্তরোত্তর এই পাপের বৃদ্ধিই হইতেছে।

—বঙ্গরত্ন

আমাদের সব চেয়ে বড় বিপদ্ এই যে আমরা ক্রমেই চরিত্রহীন হইয়া পড়িতেছি।

একটা জাতি কি পরিমাণ মদ ও গাঁজা খায়, তাহা বিচার করিয়া ঐ জাতির চরিত্র কিরূপ তাহা বলিতে পারা যায়। যদি দেখা যায় যে কোন দেশের লোক নেশা ত্যাগ করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও নীতিতে ক্রমে উন্নত হইতেছে। আবার যদি দেখা যায় যে কোন দেশ ক্রমে অধিকতর পরিমাণে মদ ও গাঁজা গ্রহণ করিতেছে—তাহা হইলে বোঝা যাইবে যে, সেই দেশ ক্রমে অধঃপতিত হইতেছে।

নিম্নের হিসাবটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোঝা যাইবে যে আমরা কত দ্রুত ধর্ম্ম ও চরিত্র খোয়াইয়া পশু হইয়া পড়িতেছি।

বর্দ্ধমান জেলা হইতে গভর্মেণ্টের নিম্নলিখিত হারে আব্‌গারী আয় হইয়াছে :—

১৮৯০-১৮৯১ সালে—২,৭৫,০০০ টাকা
১৯০০-১৯০১ সালে—৪,৭৪,০০০ টাকা
১৯০৮-১৯০৯ সালে—৭,৫১,০০০ টাকা
১৯১৬-১৯১৭ সালে—৭,১৯,৬৩১ টাকা
১৯১৭-১৯১৮ সালে—৭,৪৩,১৮৭ টাকা
১৯১৮-১৯১৯ সালে—৯,৮০,১৯৬ টাকা

পাবনা জেলার লোক-সংখ্যা প্রায় বর্দ্ধমানের সমান। সেখানে আব্‌গারী আয়—

১৯১৬—১৯১৭ সালে—৭৯,০৫২ টাকা
১৯১৭—১৯১৮ সালে—৭৮,০৮২ টাকা

অর্থাৎ পাবনা জেলার প্রতি লোক গড়ে যতখানি মদ গাঁজা চরস ইত্যাদি সেবন করে, বর্দ্ধমান তাহার চেয়ে দশ গুণ বেশী।

গভর্মেণ্টের ১৯০৮-১৯০৯ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে বর্দ্ধমান জেলায় প্রতি ৩২ বর্গ মাইলে একটি করিয়া মদের দোকান আছে। এখন তাহা আরও বাড়িয়াছে। এবং প্রতি দশ হাজার লোকের নিকট হইতে গভমেণ্ট ৪,৭০৭ টাকা আব্‌কারী আদায় পাইয়াছেন। এখন তাহা আরও অনেক বাড়িয়াছে।

সমস্ত মদ গাঁজা তাড়ি চরস প্রভৃতি নেশার দোকান গভমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তুলিয়া দিতে পারেন। অথবা দোকানগুলির সংখ্যা ক্রমে কমাইয়া তিন বা পাঁচ বৎসর পরে একেবারে বন্ধ করিতে পারেন। মার্কিন্ গভমেণ্ট যুক্তরাজ্য-মধ্যে সমস্ত মদের দোকান বা মদের ব্যবসায় তুলিয়া দিয়াছেন।

ভারতগভমেণ্ট আবগারী বিভাগ তুলিয়া দেন নাই, পরন্তু গভর্ণমেণ্টের এমন ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যাহাতে সকলে নিরাপদে অনায়াসে মদ গাঁজা চরস প্রভৃতি সেবন করিতে পারেন। দেশবাসীকে দোকানের নিকট দাঁড়াইয়া নেশা করিতে সবিনয়ে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া গভমেণ্ট মহারাষ্ট্র-নেতা কেল্‌কার প্রভৃতি শত শত দেশ-সেবককে ভারতবর্ষের নানা স্থানে দণ্ডিত করিয়াছেন।

—বর্দ্ধমান

বাঙালীর দুর্দ্দশা—

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নাই, সাম্য নাই। সাদায় কালায়, ইংরেজে বাঙ্গালীতে এক বিষম বর্ণ-বৈষম্য প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেয়, আমরা "নিজবাসভূমে পরবাসী"।

বর্দ্ধমান জেলায় অনেক কয়লার খনি আছে। যাঁহারা এইসব কয়লার খনিগুলির ভিতরের কথা অবগত আছেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন এই বর্ণ-বৈষম্যের গভীর অপমানের ইতিহাস জ্বালা দেয়। পাছে প্রতিবাদ করিতে গিয়া আপনার সর্ব্বনাশ সর্ব্বাগ্রে হয়, এই ভয়ে কয়লার ব্যবসায়ের ভিতরকার ব্যভিচারের কোন প্রতিবাদ হয় না। যথেচ্ছা-চারিণী প্রভুশক্তির মহীয়সী দুর্ব্বলতা এই যে ইহা প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না।

এদেশীয়দের এই কয়লার খনির ব্যবসায় করিতে গেলে বিশেষভাবে দুইটি অবিচারের কঠিন নির্য্যাতন নীরবে ভোগ করিতে হয়। প্রথমটি, খনি স্থাপিত হইলে কয়লা ওয়াগনে বোঝাই দিবার জন্য নিকটে সাইডিংএর (siding) অভাব ; দ্বিতীয়টি এদেশীয়গণের যথোপযুক্ত অথবা ইউরোপীয় মালিকগণের সমান ওয়াগনের সাপ্লাই না পাওয়া। এই দুইটি অবিচারে এ দেশীয় খনির মালিকগণের যে কত সময় কত কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

—বর্দ্ধমান

বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ—

রাজসাহীর কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে ঐ জেলায় ১২০০ বর্গ মাইল স্থান জলপ্লাবিত হইয়া ৪২১৭১৩ লোকের ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। নওগাঁ মহকুমা হইতে ৩৩ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত জেলায় ১৪০০ গো-মহিষাদি বিনষ্ট হইয়াছে। ৭৯৪০০ গৃহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমন ধান্যও যথেষ্ট পরিমাণ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহার কারণ একমাত্র বন্যার জলই নহে। ১৯২১ সালের অক্টোবর হইতে জুন পর্য্যন্ত বর্ষা না হওয়ায় কৃষকগণ সময়মত চাষ আরম্ভ করিতে পারে নাই, এবং বন্যার পূর্ব্বেও ধান্য অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে না পারাতেই হঠাৎ যে জল আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতে অধিকাংশ ধান্য ডুবিয়া গিয়া এই অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে।

—খুলনা

উত্তরবঙ্গের বন্যা—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সৈয়দ এরুফান আলীর প্রশ্নে বর্দ্ধমানের মহারাজা বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানের নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ দিয়াছেন—

বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানের আয়তন—রাজসাহী ১২ শত বর্গ-মাইল, বগুড়া ৪০৫ বর্গ-মাইল, পাবনা ২ শত বর্গ-মাইল।

বন্যা-পীড়িত অধিবাসীগণের সংখ্যা—রাজসাহী—৭৪১,৪৩৭ ; বগুড়া—২৪৯৫৬০ ; পাবনা—৭০০০০।

বন্যায় নষ্ট গৃহের সংখ্যা—রাজসাহী ৭০৪[illegible], বগুড়া—৮৩৬৮৬ পাবনা ৭০০।

অর্থাৎ বন্যাবিধ্বস্ত স্থানের মোট আয়তন—১৮০০ বর্গমাইল ; নষ্ট গৃহের সংখ্যা প্রায় পোনে দুই লক্ষ ;—বন্যাপীড়িত মোট অধিবাসী-সংখ্যাও প্রায় তদ্রূপ।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ও অন্যান্য স্থানীয় সংবাদদাতাদের বিবরণ হইতে আমরা জানি যে, প্রকৃতপক্ষে লোক্সানের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী। যদি গবর্মেণ্টের হিসাবই ঠিক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও ব্যাপার কিরূপ ভয়াবহ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অথচ ইহার প্রতিকারের জন্য গবর্মেণ্ট প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন নাই বলিলে হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজার কথায় বোধ হয়, আচার্য্য রায়ের ঘাড়েই বোঝাটা চাপাইয়া দিয়া সরকার-পক্ষ পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অন্য কোন সভ্যদেশের গবর্মেণ্ট্ কি এরূপ করিতে সাহস করিত?

—মোসলেম-হিতৈষী

উত্তর-বাঙ্গলার জলপ্লাবনে ৩০০০ মসজিদ ধ্বংস।—বন্যাপ্লাবিত দেশে অন্যূন ৩০০০ তিন হাজার মস্‌জিদ্ ধ্বংস হইয়াছে। এক্ষণে এই-সকল খোদার ঘর (মস্‌জিদ) যেমন-তেমন ভাবে নির্ম্মাণ করিতেও প্রত্যেকখানি গৃহে ৫০ টাকা গড়ে খরচ হইবার কথা। সুতরাং ৩০০০ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণে দেড় লক্ষ টাকা আবশ্যক। বঙ্গের ধর্ম্মপ্রাণ দানশীল মুসলমান ভ্রাতৃগণ চেষ্টা করিলে এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। আর মস্‌জিদ্-নির্ম্মাণে সাহায্য করা এক মহাপুণ্যানুষ্ঠান।

—কাশীপুর-নিবাসী

বাংলায় ডাকাতি—

গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গালায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫০টি ডাকাতি হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব ও তৎপূর্ব্ব মাসে যথাক্রমে ৪৩টি ও ৬২টি ডাকাতি হইয়াছিল। গত ৪ঠা নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৭টি ডাকাতি হইয়াছে।

—বঙ্গরত্ন

দান ও সদনুষ্ঠান—

বন্যা-সাহায্যে ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। —বাসন্তী

বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্য।—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে স্থানীয় ড্রামাটিক ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষগণ ২য় রজনী "বঙ্গে বর্গী" অভিনয়-লব্ধ অর্থ হইতে ১২০ টাকা উত্তরবঙ্গ-বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়াছেন।

—মালদহ-সমাচার

বন্যায় সাহায্য।—চন্দননগর হইতে বন্যায় সাহায্যের জন্য প্রেরিত সাহায্যের তালিকা—নারী-ভিক্ষা-সমিতি ২৫৩, La société de Paris seanx (?) ৩০১, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ৭৩৮, সাহায্য-রজনী ৮৬৭, দুঃস্থ ব্রাহ্মণ-সভা ৮২, তিলিজাতি-হিতৈষী সভা ১০০, বস্ত্রাদি ৭৮৮ খণ্ড ; চুঁচুড়া হইতে বাবু সৌরেন্দ্রমোহন শীল ১০০, অনাথভাণ্ডার ৩৩, স্বদেশী-প্রচার সমিতি ৭০।

—চুচুড়া-বার্ত্তাবহ

তারকেশ্বরের মোহান্ত উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। —নবযুগ

মেথরের মহত্ত্ব।—বি, আই, এস, এন, কোম্পানীর ডক্-বিভাগের কয়েকজন কেরাণী বন্যা-পীড়িতগণের জন্য সালখিয়া হাওড়ায় ভিক্ষা করিতে যাইলে ঐ বিভাগে নিযুক্ত মেথর হিলকরাম ১ টাকা তাঁহাদিগকে দান করিয়াছেন।

—জাগরণ

খদ্দর-প্রচারে মহিলার দান।—পরলোকগত স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ডাবলিউ সি বনার্জ্জীর কন্যা মিসেস্ বেলা গতপূর্ব্ব রবিবার বাগ-বাজারের খদ্দর-মেলায় দেশের কাজে ৫ হাজার পাউণ্ড (ন্যূনাধিক ৭৫ হাজার টাকা) দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শুনিলাম তিনি ঐ টাকা খদ্দর প্রচারে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

—২৪-পরগণা-বার্ত্তাবহ

দাতব্য চিকিৎসালয়।—যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সারসা থানার অধীন কায়েবা গ্রামনিবাসী মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় সম্প্রতি ঐ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রত্যহ এখানে ১৫০।২০০ রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। ১৫০ টাকা বেতনে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন।

—হিন্দুস্থান

আমাদের কাঁথি মহকুমার মারিশদা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় গত রাসপূর্ণিমার দিন মারিশদা তেলীপুকুর-পাড়স্থ তাঁহার স্কুল-বাটীতে তাঁহার স্বর্গগতা জননী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্মৃতিরক্ষার্থ "লক্ষ্মীপ্রিয়া হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে একটি নূতন দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যোগেন্দ্র-বাবুর এই অনুষ্ঠান অতীব প্রশংসনীয়। সুচিকিৎসকের অভাবে পল্লীবাসীদিগকে যে কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। এই হতভাগ্য দেশে প্রতি ২৪,০০০ লোকের মধ্যে একজন করিয়া শিক্ষিত ডাক্তার পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা আশা করি, এই নবপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়টির দ্বারা উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণের একটি বিশেষ অভাব দূর হইবে। এজন্য আমরা যোগেন্দ্র-বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

—নীহার

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বদান্যতা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় বলিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে পুনরায় পাঁচ বৎসরের জন্য বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্য টাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের জন্যই ব্যয়িত হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত ত্যাগ।

—বর্দ্ধমান

দানশীলতা—

পরলোকগত স্যর উইলিয়ম মায়ার ভারতবর্ষে সিভিল সার্ব্বিস বিভাগে চাকরী করিতেন। তিনি উইল করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়া-ছেন। স্যার উইলিয়ম যত টাকা মাহিনা পাইতেন আমাদের দেশীয় সিবি-লিয়ানেরা অনেকেই তত টাকা মাহিনা পাইতেছেন অথবা পাইতেন ; কিন্তু বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ত দূরের কথা, স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কোনো সিবিলিয়ানকে উপুড়হস্ত করিতে দেখা যায় না।

স্যর উইলিয়ামের উইলে আর-একটি দেখিবার জিনিস আছে। তিনি যখন মাদ্রাজে চাকরী করিতেন, তখন কাল্লিগাপাম নামক তাঁহার একটি ভৃত্য ছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার প্রভুভক্ত ভৃত্যের কথা ভুলিয়া যান নাই। ভৃত্যের জন্য তিনি বাৎসরিক দুইশত টাকার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন; বিদেশী ভৃত্যের জন্য এইভাবে অর্থের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন এরূপ বাঙ্গালী কয়জন আছেন?

—মোস্‌লেম হিতৈষী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশপ্রাণতা—

যে-সকল ব্যক্তি দেশমাতৃকার সেবার নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় কঠোর জীবনযাপন করিতে অভিলাষী তাহাদের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র আশ্রম স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। এরূপ আশ্রমে আশ্রয় লইয়া স্বদেশ-প্রেমিক বীরের দল স্বদেশকেই একমাত্র ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবে এবং কঠোর সাধনায় পুষ্ট হইয়া ভারতের গণশক্তিকে পরিচালিত করিবে। কোন কোন স্বদেশ-সেবী উক্ত-প্রকার একটি প্রস্তাব লইয়া জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কুষ্টিয়ায় মোহিনীমিলের সম্মুখে তাঁহার যে জমি আছে তাহা হইতে পাঁচ বিঘা জমি কথিতরূপ একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ঐ জমির বর্ত্তমান বাজার-দর ৫০০০৲ টাকার কম নহে এবং খাজানা বিঘা-প্রতি ৮০৲ টাকার কম হইবে না। ঠাকুরবংশের দেশপ্রাণতার কথা নূতন নহে। বহুক্ষেত্রে বহুবার কথিত-প্রকার দান সুরেন্দ্র-বাবুরা করিয়াছেন। যে দেশে সুরেন্দ্র-বাবুর মত স্বদেশ-প্রেমিক বর্ত্তমান আছেন, সে দেশ কখনই হতভাগ্য নয়—সে দেশের এখনও ভবিষ্যতের আশা আছে। আমরা দেশপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বঙ্গের ধনী, মহাজন ও জমিদার সম্প্রদায় সুরেন্দ্র-বাবুর পূত-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গভূমিকে স্বর্গ করিয়া তুলুন। দেশ প্রেমের বন্যায় সারাদেশ প্লাবিত করিয়া বঙ্গদেশই সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা-জয়ী বীরের জন্ম দিউক।

—জাগরণ

সেবাশ্রম—

মকদুমপুরের ধর্ম্মপ্রাণ দেশহিতৈষী গোসাঞী বলদেবানন্দ গিরি মহাশয় স্বীয় ভবনে একটি সেবাশ্রম খুলিয়াছেন। তিনি নিজ ব্যয়ে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ও দুইজন সেবক রাখিয়া সেবাশ্রম চালাইতেছেন। চিকিৎসক মহাশয় খবর পাইলেই বাড়ী বাড়ী গমন-করতঃ ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন।

—মালদহ-সমাচার

কাল্‌নার নাইট স্কুল—

কয়েকজন সদিচ্ছাপ্রণোদিত যুবকের উদ্যমে ১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী কাল্‌নার টাউনহলে একটি নাইট্-স্কুল খোলা হয়। অশিক্ষিত শ্রমজীবীগণকে মোটামুটি জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্য থাকায় তাহার নাম দেওয়া হয় The Working Men's Institute শ্রমজীবী-বিদ্যালয়।

—পল্লীবাসী

আমাদের গো-সমস্যা—

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে সব গরু রহিয়াছে সংখ্যা ও গুণের হিসাবে তাহাদিগকে শ্রেণীতে বিভাগ করিলে দেখা যায় কৃষিকার্য্য সম্পাদন ও দুগ্ধ সরবরাহের পক্ষে তাহা নিতান্ত সামান্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত এ দেশের লোকসংখ্যা ও ক্ষেত্র-ফলের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দেখাইলে প্রমাণিত হইবে যে, এ দেশের গো-সংখ্যা যতটা মনে করা যায় তাহা কিছুই নহে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে প্রমাণিত হইবে ভারতের লোক-সংখ্যার অনুপাতে গরুর সংখ্যা ডেন্‌মার্ক অপেক্ষা শতকরা ২৫ ও নিউজিল্যাণ্ড অপেক্ষা শতকরা ৫০ কম; আবার ক্ষেত্র-ফলের অনুপাতে ভারতের গো-সংখ্যা ডেন্‌মার্ক অপেক্ষা শতকরা ৫০, এবং নিউজিল্যাণ্ড অপেক্ষা শতকরা ১২৫ কম।

গরুর সংখ্যা:—বৃটিশ ভারতে ১৪৫০০০০০০; ডেন্‌মার্কে ২০০০০০০; নিউজিল্যাণ্ডে ২০০০০০০।

লোক-সংখ্যা:—বৃটিশভারতে ২৪৪২৬৭০০০; ডেন্‌মার্কে ২০৫০০০০০; নিউজিল্যাণ্ডে ১২০০০০০।

প্রতি এক শত লোকে গো-সংখ্যা:—বৃটিশভারতে ৫৯, ডেন্‌মার্কে ৭৪; নিউজিল্যাণ্ডে ১৫০।

প্রতি এক শত একর জমিতে গরুর সংখ্যা:—বৃটিশ ভারতে ১৪·৫; ডেন্‌মার্কে ২২; নিউজিল্যাণ্ডে ৩২।

সম্প্রতি ভারত-গবমে‌র্ণ্ট যে একটি প্রাণী-বিবরণী (live-stock statistics) বহির করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, আমাদের দেশে ১৯১৪-১৫ খৃঃ অব্দ হইতে গোধনের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে; সে সময় আমাদের দেশে গরুর সংখ্যা ছিল ১৪৭০০০০০০; ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪৫০০০০০০; সুতরাং দেখা যায় যে ৫ বৎসরে শতকরা ২টি গরু লোপ পাইয়াছে, এই ধ্বংস উপেক্ষার বিষয় নহে।

এখন দেখা যাউক, আমাদের ভূমি-কর্ষণের জন্য বলদ এবং দুগ্ধ-দানের জন্য পয়স্বিনী গাভী যথেষ্ট আছে কি না? অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন, এক জোড়া বলদ প্রত্যেক ঋতুতে মাত্র ৫ একর ভূমি কর্ষণ করিতে পারে। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৃটিশ ভারতে প্রায় ২২৮০০০০০০ একর কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে, যে কর্ষণ-বলদ আছে তাহার মধ্যে শতকরা ২৫টি বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্ব্বল ও শিশু; অপর ২৫টি গাড়ী-টানা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, এই ভাবে অর্দ্ধাংশ পরিত্যক্ত হইল। সুতরাং প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ বলদ মাত্র কৃষিকার্য্যের জন্য অবশিষ্ট রহিল; ইহাতে প্রত্যেক জোড়া বলদ প্রতি ঋতুতে ১৯ একর ভূমি কর্ষণ করিতে হয়; কিন্তু এই ১৯ একর জমি চাষ করিতে প্রকৃতপক্ষে ৪ জোড়া বলদের আবশ্যক।

গাভীর অবস্থাও এইরূপ শোচনীয়। বৃটিশ ভারতে লোকসংখ্যা ২৪৪২৬৭০০০ এবং দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা প্রায় ৫০০০০০০০। কাপ্তেন মাটুসন ও মিঃ জে, আর, ব্লাকউড্‌এর মতে প্রত্যেক গাভী বৎসরে ৭ মাস গড়ে প্রতিদিন ১৷০ সের মাত্র দুগ্ধ প্রদান করে। এই হিসাবে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতের প্রত্যেক লোক গড়ে প্রতিদিন মাত্র ২৷০ ছটাক দুধ খাইতে পায়। কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন, প্রত্যেক লোকের প্রতিদিন ১৷০ সের দুধ খাওয়া দরকার।

কর্ষণোপযোগী জমি:—বৃটিশ ভারতে ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ২২৭৬-১১০০০ একর; দেশীয় রাজ্যে ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে (যতদূর জানা গিয়াছে) ৩১২৬০০০০।

কর্ষণ-বলদ:—বৃটিশ ভারতে ১৯১৪-১৫ খৃঃ অব্দে (যতদূর জানা গিয়াছে) ৪০০২০০।

দুর্ব্বল, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অন্যান্যভাবে অকর্ম্মণ্য এবং গাড়ীটানা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত বলদ ব্যতীত কর্ষণ-বলদের সংখ্যা;—বৃটিশ

ভারতে ১৯১৪-১৫ সালে ২৪৩২২৫০ ; দেশীয় রাজ্যে ১৯১৪-১৫ সালে (যতদূর জানা গিয়াছে) ২০০১০০০ ।

প্রতি জোড়া বলদ কর্তৃক কর্ষিত জমির পরিমাণ :—বৃটিশ ভারতে ১৯১৪-১৫ সালে ১৯ একর ; দেশীয় রাজ্যে ১৯১৪-১৫ সালে (যতদূর জানা গিয়াছে) ১৬ একর ।

মন্তব্য :—একজোড়া বলদ এক ঋতুতে মাত্র ৫ একর জমি কর্ষণ করিতে পারে ।

দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা —বৃটিশ ভারতে ১৯১৪-১৫ সালে ৫০৯৪৬০০০ । দেশীয় রাজ্যে ১৯১৪-১৫ সালে (যতদূর জানা গিয়াছে) ৫৮৩৮০০০ ।

দুগ্ধের পরিমাণ :—বৃটিশ ভারতে ১৯১৪-১৫ সালে ১৬০৭৫০০ মণ ।

দৈনিক জন-প্রতি প্রাপ্ত দুগ্ধের পরিমাণ :—বৃটিশ ভারতে ২॥০ ছটাক ; দেশীয় রাজ্যে ১ ছটাক ।

এই দুগ্ধবতী গাভী ও বলদের অপ্রাচুর্য্য এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে গোহত্যা এবং-রপ্তানি প্রভৃতি কারণে দেশে শিশু-মৃত্যুর বৃদ্ধি ও খাদ্য-শস্যের দ্রুত অবনতি হইতেছে ; ইহা দেখিয়া গোধন রক্ষা ও তাহাদের উন্নতি করার কথা কোনক্রমেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে দেশের শিশু-মৃত্যুর বৃদ্ধি ও খাদ্য-শস্যের অবনতির একটা সুস্পষ্ট আলেখ্য আমাদের চোখের সম্মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিবে :—

প্রত্যেক হাজারে প্রতিবৎসরে মৃত্যুর সংখ্যা :—

এক বৎসরের কম বয়স্ক :—বৃটিশ ভারতে ১৯০৮-৯ সালে ২৬০।/৭ ; গ্রেট্‌ব্রিটেন্ ও আয়র্লণ্ডে ১৮৯৬-১৯০৫ সালে ১০৫ ; ডেন্‌মার্কে ১৮৯৬-১৯০৫ সালে ১১৬ ; নিউজিল্যাণ্ডে ১৯১৯ সালে ৩২ ।

সর্ব্বসাকল্যে মৃত্যুসংখ্যা :—বৃটিশ ভারতবর্ষে (১৯০৮-০৯ সালে) ৩৮·২ ; জাপানে ১৯০৮ সালে ২০·৯ ; গ্রেট্‌ব্রিটেন্ ও আয়র্লণ্ডে ১৮৯৬ -১৯০৫ সালে ১৭·৫ ; ডেন্‌মার্কে ১৮৯৬-১৯০৫ সালে ১৫·৫ ; নিউ-জিল্যাণ্ডে ৯·৫ ।

১৯১৬-১৭ সালে গোধুম-উৎপাদক ভূমির পরিমাণ :—বৃটিশ ভারতবর্ষে ৩৩০৬৭।০০ একর ; জাপানে ১৪৫৭০০০ একর ; ডেন্‌মার্ক ১৩১০০০ একর ; গ্রেট্‌ব্রিটেন্ ২১০৩০০০ একর ; সুইজাল্যাণ্ড্ ১৩৯০০০ একর ; কানাডা ১৪৭৯৫০০০ একর ; মিশর ১১১৬০০০ একর ।

উৎপাদিত গোধূমের পরিমাণ :—বৃটিশ ভারতে ৩৮১২৬৮২৫০ বুশেল, জাপানে ৩২৬৫৮৬২২ বুশেল ; ডেন্‌মার্কে ৪২৮৭৪৬৬ বুশেল ; গ্রেট্‌ব্রিটেনে ৫৯৬২৩৭১০ বুশেল ; সুইজার্ল্যাণ্ডে ৪৫৪৫৬৬৬ বুশেল ; কানাডা ২৩৩২৫৬৯৯৪ বুশেল ; মিশর ২৯৭৭২২৮৫ বুশেল ।

প্রতি একরে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ :—বৃটিশ ভারতে ১১·৫ বুশেল ; জাপানে ৩২ বুশেল ; গ্রেট্‌ব্রিটেন্ ৩০ বুশেল ; সুইজার্‌ল্যাণ্ড ৩২·৫ বুশেল ; কানাডা ১৭ বুশেল ; মিশর ১৭ বুশেল ।

ধান্যোৎপাদক ভূমির পরিমাণ :—বৃটিশ ভারতে ৭৮৭৩০৯৪২ একর, জাপানে ৯১৬৮০০০ একর ।

পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের গোধনের যে কি অবস্থা এবং তাহার ফল যে কি ভীষণ তাহা আমাদের এই তালিকা-পাঠে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা নানা দিক্ দিয়া অধঃপতনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। ভারতে এই গোধনের অল্পতাও আমাদের অবনতির ও সর্ব্বনাশের একটা কারণ। আমরা কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গরুকে দেবতা বলিয়া মুখে মুখেই স্বীকার করি, কিন্তু সেই গো-দেবতার রক্ষাকল্পে ত কোনও কিছুই করি না। ভারতের গোবংশ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতিটাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। যদি জাতিকে বাঁচাইতে হয়,—যদি এই জাতিটাকে আবার সবল ও সুস্থ করিয়া দীর্ঘজীবী করিতে হয় তবে সর্ব্বাগ্রে ভারতের গোজাতিকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে হইবে। ভারতবাসী! তোমরা একবার এদিকে চোখ মেলিয়া চাও, তোমাদের চেষ্টা ও যত্নে ভারতে আবার বিরাট্ রাজের গোগৃহের প্রতিষ্ঠা হউক।

শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ—ম্যানেজার "গো-রক্ষণ-সঙ্ঘ", কলিকাতা।

—রঙ্গপুরদর্পণ

গুণ্ডা আইন—

ইদানীং কলিকাতায় গুণ্ডাদের উপদ্রব অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ইংরেজ আমলাতন্ত্রের খাস দফ্‌তর যেখানে আড্ডা গাড়িয়া আছে, সেইখানে দিনে, বিশেষতঃ রাত্রে পরস্বাপহারক দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচার একরূপ বিনাবাধাতেই চলিতেছে। ফলে বাঙ্গালার রাজধানীর কোন কোন অংশে টাকাকড়ি লইয়া চলা একান্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-কোন শান্তিকামী ব্যক্তি এই অবস্থার প্রতিকার চাহিবেন। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট্ গুণ্ডার উপদ্রব নিবারণের নামে যে নূতন আইন পাশ করিতে চাহিতেছেন, তাহা সত্য-সত্যই বিধিবদ্ধ হইলে দুর্ব্বৃত্ত-গণের কার্য্যে যত বাধা উপস্থিত হোক, আর না হোক, এদেশের জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করিবার পক্ষে আমলা-তন্ত্রের হস্তে একখানি নূতন অস্ত্র অর্পিত হইবে। প্রস্তাবিত আইনের ৩ ধারার ১ উপধারায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুলিস-কমিশনার যদি বুঝিতে পারেন যে কোন ব্যক্তি (ক) গুণ্ডা বা গুণ্ডাদের দলভুক্ত, (খ) জন্মগতভাবে বাঙ্গালী নহে এবং (গ) কলিকাতায় বাস করে বা স্বভাবতঃই কলিকাতায় আগমন করে এবং (ইহাও বুঝিতে পারেন যে) এইরূপ কোন কোন ব্যক্তি (১) যাহার জামিন হইতে পারে না এমন অপরাধ, বা (২) ফৌজদারী আইনের আমলে আসিতে পারে এমন অপরাধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি (পুলিস-কমিশনার) সেই মর্ম্মে গবর্মেণ্ট্‌কে রিপোর্ট করিবেন এবং গভর্মেণ্ট্ সেই ব্যক্তিকে একটা কৈফিয়ৎ দিবার অবসর দিয়া তাহাকে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত গুণ্ডা-আইনের উল্লিখিত ধারার ফল যে জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। সকলেই জানেন, ব্যবসায় উপলক্ষে বহুসংখ্যক দিল্লীওয়ালা, সিন্ধী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা এদেশের জাতীয় আন্দোলনে খুব বড় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতি পুলিসের মনোভাব কিরূপ, তাহা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। আবার শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে গবর্মেণ্ট্ করিতে পারেন না এমন কোন কার্য্যই নাই। সুতরাং প্রস্তাবিত আইনটি পাশ হইয়া গেলে কলিকাতা-প্রবাসী জাতীয় দলভুক্ত বৈদেশিকগণকে তাড়াইয়া দিবার কোন সুযোগ পুলিস-কমিশনার তথা গবর্মেণ্ট্ পরিত্যাগ করিবেন না। তখন কোথায় গুণ্ডারা পড়িয়া থাকিবে কেহ তাহার সন্ধান লইতে যাইবে না, যত ঝোঁক ও কোপ পড়িবে কংগ্রেস-ও খেলাফৎ-কার্য্যকারিদের সহিত সংশ্লিষ্ট অ-বাঙ্গালীদের উপর। সুতরাং গুণ্ডা আইনের কঠোর প্রতিবাদ করা আমরা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। গত দুই বৎসরের মধ্যে কলিকাতা সহরে কয়েকবার হরতাল হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস ও খেলাফৎ-স্বেচ্ছাসেবকেরা দোকানদারদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া দোকান পাট বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল এইরূপ অভিযোগ সরকার-

পক্ষ হইতে বা আধা-সরকারী লোকদের পক্ষ হইতে বহুবার ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং এখন যেমন ফৌজদারী সংশোধক আইনের ১৭ (ক) ধারা প্রয়োগ করিয়া স্বেচ্ছাসেবক-সংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, ভবিষ্যতে তেমনি গুণ্ডা-আইনটি পাশ হইলে গবর্মেণ্ট্ আবশ্যকস্থলে স্বেচ্ছাসেবকসংঘ কেবল যে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন এবং দিবেন তাহা নহে, স্বেচ্ছাসেবকদিগকে একেবারে দেশের বাহির করিয়াও দিতে সক্ষম হইবেন। তখন অবস্থা কেমন দাঁড়াইবে? তাহা কল্পনা করিতেও মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রস্তাবিত গুণ্ডা আইনটি জাতীয়দলের লোকেদের দ্বারা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

—বঙ্গরত্ন

বাংলার শিল্প—

সরকারী শিল্প-বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ বিশেষজ্ঞের অভাবে একমাত্র কলিকাতা রিসার্চ্চ্ ট্যানারি ছাড়া আর কোথাও গবেষণামূলক কার্য্য তেমন বেশী কিছু হয় নাই। এখানে চক্চকে পাঁঠার চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী ট্যান্-করা চামড়া অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। ট্যান্ করিবার মালমশলা সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া জানিতে পারা গিয়াছে, সুন্দরবনে প্রাপ্ত গরানের ছাল এ কার্য্যের বিশেষ উপযুক্ত, ইহা ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি ট্যান্ করিবার জন্য ব্যবহৃত গাছগাছড়াও আবিষ্কৃত হইয়াছে, আজকাল সে সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে।

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ট্যান ও পালিশ করিবার কৌশল শিখান হইয়াছে, এবং ছোটখাট প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রাদি প্রদান করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। কলিকাতার রিসার্চ্চ্ ট্যানারি আরও পাঁচ বৎসর কাল রাখা হইবে।

দিয়াশলাই নিৰ্ম্মাণ।

বাঙ্গালা দেশে দিয়াশলাই নিৰ্ম্মাণ-কার্য্য ব্যবসায় হিসাবে করা যায় কি না, এবং বাঙ্গলার বনভূমিতে এজন্য উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধান করিবার জন্য এ বিষয় অভিজ্ঞ মিষ্টার এ পি ঘোষকে ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।

রেশম, কাঁচ, সিগারেট প্রভৃতি ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সরকার এ বিষয়ে একটি স্কিম তৈয়ার করিতেছেন।

বাঙ্গলার নদীসমূহকে কল-পরিচালনকার্য্যে নিযুক্ত করা যায় কি না, এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। ইঁহারা প্রথমতঃ পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য-ত্রিপুরা অঞ্চলে অনুসন্ধান করিবেন।

কিছুকাল ধরিয়া সুতা-কাটা ও কাপড় বোনার দিকে লোকের খুব ঝোঁক গিয়াছে, তজ্জন্য স্থানে স্থানে প্রদর্শনী খুলিয়া বিশেষ কাজ হইয়াছে। এজন্য শ্রীরামপুর-বয়নবিদ্যালয়কে বাড়ান হইয়াছে, ঠক্‌ঠকি তাঁতের প্রচলন বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে।

শাঁখার ব্যবসায়।

বয়ন-শিল্পের পরই ঢাকার শাঁখার কাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত সিংহল ও দক্ষিণ-ভারত হইতেই শঙ্খ আমদানী করা হইত। কতকগুলি দালাল ভয়ানক দাম বাড়ায় বলিয়া ইহার প্রতিকারার্থ একটি সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইলে সরকার দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আজকাল মান্দ্রাজের সরকারী মৎস্য-বিভাগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া শঙ্খ আমদানী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

—বঙ্গরত্ন

বস্ত্রের কথা—

গত পূর্ব্ব বৎসর ৩৮ কোটি ২০ লক্ষ গজ কোরা কাপড় আসিয়াছিল, গত বৎসর ৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছিল। রঙ্গীন কাপড়ের আমদানী ১১ কোটি ২০ লক্ষ গজ হইতে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হইয়াছে। ধোলাই কাপড়ের আমদানীর হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। গতপূর্ব্ব বৎসর ৩ কোটি ৭০ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছিল, গত বৎসর তাহাই হইয়াছে। বিলাতী কাপড়ের দাম সস্তা হইয়াছে এবং রঙ্গীন কাপড়ের আমদানী কমিয়াছে, তাই আমদানী কাপড়ের মূল্য প্রায় ১০ কোটি কম হইয়াছে। কিন্তু কোরা কাপড়ের আমদানী বাড়িয়াছে ও ধোলাই কাপড়ের আমদানী সমান আছে, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিলাতী-বর্জ্জনের চেষ্টা বঙ্গদেশে সফল হয় নাই। বিলাতী সুতার আমদানী বেশী হইতেছে। তদ্দ্বারা খদ্দর প্রস্তুত হইয়াছে। বিলাতী কোরা ও ধোয়া কাপড়ের আমদানী কিছুমাত্র হ্রাস করা যায় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ হওয়ার প্রকৃত কারণ এই যে বঙ্গদেশে যত বস্ত্রের প্রয়োজন তত নির্ম্মিত হইতে পারে নাই।

—বঙ্গরত্ন

শিক্ষা-প্রসঙ্গ—

সরকারী বিদ্যালয়াদি বর্জ্জন।—প্রায় ৫০০০০ ছাত্র সরকারী বিদ্যালয় বর্জ্জন করিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ২০০০। ৮ জন অধ্যাপক ও ৯৮ জন শিক্ষক চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছেন।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্।—এই পরিষদের অধীনে প্রায় ১৫০টি বিদ্যালয়ে ১৫০০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে, ঢাকায় একটি ও কলিকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ ও একটি আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ খোলা হইয়াছে। আজকাল এগুলি বিভিন্ন কমিটির অধীনে পরিচালিত হইতেছে। অনেকগুলি নৈশ ও বালিকাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

—নোয়াখালী সম্মিলনী

বাংলার ডাক্তার—

১৯১৪ সালে বেঙ্গল মেডিকেল আইন অনুসারে ৬২৩৮ জন ডাক্তার আপনাদের নাম রেজেষ্টরী করিয়াছেন। ইঁহারা মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

—কাশীপুরনিবাসী

কৃষিবিদ্যায় কৃতবিদ্য বাঙালী—

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ইংলণ্ডে তাঁহার পাঠ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় কৃষ্ণজীবন সেনগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র। নোয়াখালী সহরের কালীতারা ষ্টেটের মালিক। নগেন-বাবু ১৯১৮ সনে বিলাতের আর্মষ্ট্রং কলেজ হইতে কৃষিবিদ্যায় এম-এস সি উপাধি লাভ করেন এবং সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। তিনি আর এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া বি-এস্‌সি অনার্স প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। তাঁহাকে উক্ত কলেজের সভ্য (fellow) পদ প্রদান করা হয়। ১৯১৯ সনে তিনি রোথামষ্টিড্ কলেজের রিসার্চ্চ স্কলার শ্রেণীভুক্ত হন। তথায় তিনি এক বৎসর গবেষণায় ব্যয় করিবার পর কলেজের বৃত্তিলাভ করিয়া আরও এক বৎসর তথায় অবস্থান করেন।

—কাশীপুরনিবাসী

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

নাগপুর দুয়াজানীর জমীদার ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ৺যাদবলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ প্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী গ্লাসগো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাথমিক পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছেন। এজন্য স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটসভা শ্রীমানের কৃতকার্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহার "কোর্স" একবৎসর কমাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমান্ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। বাঙ্গালী ছাত্রের এই গৌরবলাভের সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি। —নোয়াখালী সম্মিলনী

ধর্ম্মের নামে পাশবিকতা—

খড়্গাপুরে নরবলি।—খড়্গাপুরে এক কাপালিক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক তথাকার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রকে অরণ্য মধ্যস্থ পাতালপুরীতে কালী-প্রতিমার নিকট বলি দেওয়ার জন্য লইয়া যাওয়ার এবং তথা হইতে তাহার উদ্ধার হওয়ার সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। কাপালিকের কবল হইতে নীলকণ্ঠ নামক আর-এক বালককে উদ্ধার ও কাপালিককে গ্রেপ্তারের জন্য সশস্ত্র পুলিশদল খড়্গাপুরের অরণ্য বেষ্টন করিয়াছিল। প্রায় সপ্তাহকাল বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কাপালিকের কিম্বা তাহার ভূগর্ভস্থ পুরীর কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া পুলিশদল ফিরিয়া আসিয়াছে। মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ খড়্গাপুরে আসিয়া দ্বিজেন্দ্রকে দেখিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র এখন চন্দননগরে তাহার মাতামহ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে নীত হইয়া চিকিৎসাধীন রহিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্র কাপালিকের কবল হইতে মুক্ত হইবার পর যখন বাড়ীতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত, তখন সে বাঙ্গালায় কথা না বলিয়া হিন্দিতেই কথা বলিত। সেই কথাগুলি কখনও বা বালকের নিজের কথা আর কখনও বা যেন সেই কাপালিক বালকের মুখ দিয়া নিজের কথা প্রকাশ করিত। অনেকের বিশ্বাস যে কালীপুজার রাত্রিতেই কাপালিক নীলকণ্ঠনামক অন্য বালকটিকে কালীর নিকট বলি দিয়া থাকিবে।

যাহা হউক, এই ব্যাপারের পর আর-একটা নূতন কাণ্ডের সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিবরণ এই যে—খড়্গাপুর রেলওয়ে অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দের ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক এক সহোদর খড়্গাপুর স্কুলে পড়িত। বটকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী খড়্গাপুর হইতে দেড় বা দুই ক্রোশ দূরে এক গ্রামে। তাঁহার উক্ত বালক ভ্রাতা মাঝে মাঝে একাকী খড়্গাপুর হইতে সেই গ্রামে যাতায়াত করিত। গত ৬ই কার্ত্তিক সোমবার বালক তাহার গ্রামস্থ বাড়ীতে আহারাদি করিয়া ও পাঠ্য পুস্তক লইয়া খড়্গাপুর স্কুল অভিমুখে গমন করে। তার পর ২।৩ দিন আর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বটকৃষ্ণ বাবু মনে করেন যে তাঁহার ভ্রাতা বাড়ী হইতে আসে নাই, আর বাড়ীর লোক মনে করে যে বালক অন্যান্য বারের ন্যায় খড়্গাপুরে তাহার ভ্রাতার নিকটই আছে। কাজেই তাহার নিরুদ্দেশের কথা কেহই জানিতে পারে নাই।

এর পর ৯ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার হুগলী তারকেশ্বর ডাকঘরের ২৫শে অক্টোবর তারিখের মোহরযুক্ত একখানি বেয়ারিং পত্র ডাক-যোগে পাইয়া বটকৃষ্ণ-বাবু জানিতে পারেন যে, তাঁহার ভ্রাতাও এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। পত্র পাইয়া বটকৃষ্ণ-বাবু সেই রাত্রির ট্রেনেই তারকেশ্বরে যান এবং পরদিন বালকটিকে তথায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাগল-অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া হিন্দিতে প্রলাপ করিতে দেখেন। বালকটির হাতে তাহার পাঠ্যপুস্তকগুলিও ছিল।

বালকের উক্তি হইতে জানা গিয়াছে যে বালক যখন বাড়ী হইতে স্কুলে আসিতেছিল, তখন পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীকে সে দেখিতে পায় এবং সন্ন্যাসীও পূর্ব্বোক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় এই বালকের চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। তখন বালক নীরবে সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকে। পথিমধ্যে তাহাকে দুইবার রেলগাড়ীতে উঠিতে ও নামিতে হইয়াছিল। তার-পর যখন তাহার জ্ঞান হয়, সে দেখে যে একটা গাছতলায় আর-একটি বালকের সহিত সন্ন্যাসীর নিকট শুইয়া আছে। তৎপরে তথা হইতে সে পলাইয়া যায়। ইহার পর সে কিরূপে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল তাহা বলিতে পারে নাই। হাওড়া ষ্টেশনে এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বালক বলে যে সে খড়্গাপুর যাইবে। কিন্তু তাহার কাছে পয়সা নাই। এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তাহার হাতে কি একটা দ্রব্য দিয়া বলেন যে—"এই গাড়ী খড়্গাপুরে যাইবে তুই চলিয়া যা। কেহ তোকে কিছুই বলিবে না।"

গাড়ী খড়্গাপুর ষ্টেশনে পৌছিলে বালক গাড়ী হইতে নামিয়াই সেই সন্ন্যাসী অর্থাৎ যে তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল তাহাকে দণ্ডায়মান দেখিতে পায়। বালককে দেখিয়া সন্ন্যাসী হিন্দীতে বলে "আমার সঙ্গে আয়"। বালক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আবার তাহার অনু-সরণ করে। সেই অরণ্যে একটা ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে বালককে বসাইয়া সন্ন্যাসী চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে হাওড়া ষ্টেশনের সেই ব্রাহ্মণ বালকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে,—"আবার তুই এখানে আসিয়াছিস্। আয় আমার সঙ্গে চলিয়া আয়।" এই বলিয়া বালককে লইয়া মন্দির হইতে চলিয়া যান। তার পর বালক যে কিরূপে ও কখন পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হয় তাহা বলিতে পারে নাই। এই বালক ছাড়া খড়্গাপুরে এক গোয়ালার ছেলেও তথা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

এই সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্ত কাপালিক কি না, আর কে সেই সাঁওতাল যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে কাপালিকের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল এবং কে এই ব্রাহ্মণ যিনি বালককে সন্ন্যাসীর কবল হইতে উদ্ধার করিলেন, কিংবা এই দুইটি ঘটনার পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা জানিতে পারা যায় নাই। আরও প্রকাশ যে, কাপা-লিকের আশ্রমটি ময়ূরভঞ্জের বৃহৎ অরণ্য-প্রদেশের প্রান্তভাগস্থ ৬০।৭০-মাইল-ব্যাপী গভীর অরণ্য-প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানকে নাকি তপোবন বলে এবং এখানে যে একজন কাপালিক থাকে তাহা অনেকেই বলিয়া থাকে। —নীহার

তপোবনের যে গভীর জঙ্গলে কাপালিক অবস্থান করে সেখানে একটি মন্দিরও আছে। ঐ মন্দির-মধ্যে কালী-মূর্ত্তি ও শিবের মূর্ত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত নরবলি দিবার জন্য একখানি বৃহৎ খড়্গাও আছে। ঐ মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বদাই আগুন জ্বালাইয়া রাখা হয়। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক মাথার খুলিও পড়িয়া আছে। ইহা হইতে বোঝা যায় কাপালিক যে নরবলি দিবার জন্যই বালকদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কাপালিক জাতিতে সম্ভবত হিন্দুস্থানী, কারণ দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে তাহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা হিন্দী ভাষাতেই হইয়াছিল। —হিন্দুস্থান

সারস্বত-সমাজ, বাঁকুড়া—

গত শুক্রবার অপরাহ্নে বাঁকুড়া জেলায় সংস্কৃত বিদ্যার ও বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঁকুড়া 'সারস্বত-সমাজ নামে এক সমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

সংস্কৃত বিদ্যায় ও বাঙ্গলা সাহিত্যে যাঁহার অনুরাগ আছে, তিনি সামাজিক হইতে পারিবেন।

তাঁহাকে বৎসরে ১৲ এক টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

সুখের বিষয় কলিকাতা সংস্কৃত-সমিতি বাঁকুড়া সারস্বত-সমাজের প্রার্থনা পূরণ করিয়া এই বৎসর হইতে বাঁকুড়া নগরীতে সংস্কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

সারস্বত-সমাজের ব্যবহর্ত্তা হইয়াছেন রায় বাহাদুর শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

—বাঁকুড়া-দর্পণ

সেবক

—

বিদেশ

তুরস্কের নবজাগরণ ও লোজান্-বৈঠক—

অ্যাঙ্গোরা-সরকার তুরস্কের সুল্‌তান্‌কে পদচ্যুত করাতে ইংরেজ-সরকার রুষ্ট হইলেন এবং ইংরেজ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড্ কার্জ্জন্ এক বক্তৃতায় কামাল পাশার রাষ্ট্রনীতিকে তীব্র আক্রমণ করিলেন। কামালের দাবী অত্যন্ত দাম্ভিকতার পরিচায়ক বলিয়া লর্ড কার্জ্জন তাহা প্রত্যাখ্যান করা উচিত বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন যে "কামালের দাবী সহ্য করা অসম্ভব; সমস্ত ইউরোপকে অবজ্ঞা করিয়া দ্বন্দ্বে আহ্বান করা ভিন্ন এরূপ দাবীকে আর কি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে? তুরস্ককে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে ছাড়িয়া দেওয়ারও একটা সীমা আছে।" ইংরেজ-সরকার স্তাম্বুল অবরোধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী পঁয়াকারে সেই প্রস্তাব সমর্থন না করাতে স্তাম্বুল অবরোধ করা ঘটিয়া উঠিল না। ইংরেজ-সরকার তখন লোজান্-বৈঠক কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজ-সরকারের পক্ষে লর্ড্ কার্জ্জন্ বৈঠক স্থগিত রাখিবার সম্বন্ধে দুইটি কারণ প্রদর্শন করিলেন—(১) ইংলণ্ডের নির্ব্বাচন-ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন্ দলের হস্তে শাসনভার পড়িবে তাহা স্থির হইতে পারে না। তাহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজের তুরস্কনীতি কিরূপ হইবে তাহা বলা যায় না। নীতি স্থির হওয়ার পূর্ব্বে বৈঠক বসিলে কোনই ফললাভ হইবে না।

(২) বৈঠকের পূর্ব্বে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে আলোচনা হওয়া দরকার। কেন না যদি মিত্রশক্তিবর্গ একই নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ না করেন, তবে পূর্ব্বপূর্ব্ব বৈঠকের ন্যায় এ বৈঠকও নিষ্ফল হইবে।

কার্জ্জনের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া পঁয়াকারে ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত বৈঠকের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন। বৈঠক স্থগিত রাখিবার সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সার্ব্বিয়া, রুমেনিয়া ও অ্যাঙ্গোরার প্রতিনিধি লোজান্ যাইবার জন্য রওনা হন। অ্যাঙ্গোরার প্রতিনিধি ইস্‌মৎ পাশা সুবিধা পাইয়া পঁয়াকারের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্যারিস সহরে গমন করিলেন এবং তুরস্কের দাবী বুঝাইয়া দিলেন। এ দিকে কামাল পাশার ব্যবহারকে ঔদ্ধত্য মনে করিয়া ইংরেজ সরকার সামরিক আইন জারি করিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের সামরিক প্রতিনিধিদিগের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সামরিক আইন জারি করার ব্যয়ভার এবং ফলে যুদ্ধ ঘটিলে তাহার দায়িত্ব গ্রহণ সুবিধাজনক বিবেচনা না করাতে সামরিক প্রতিনিধিবর্গ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। প্যারিসে আসিয়া ইস্‌মৎ প্রকাশ করিলেন যে "তুরস্ক শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা লইয়াই লোজান্-বৈঠকে যোগ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মর্য্যাদার হানি না হইলে যে-কোনও সঙ্গত প্রস্তাব তুরস্ক মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। তবে তুরস্ক আপনার আভ্যন্তরিক শাসনের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করিবার দাবী কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের চাপে যে পূর্ব্বে তুরস্ক-সরকার বিদেশীকে বিচার করিবার অধিকার বিদেশীয়ের নিজ দেশের নিযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তাহাতে তুরস্কের ন্যায়বিচার করিবার অধিকার ক্ষমতা ও ইচ্ছা অস্বীকৃত হইয়াছে। এই অপমান তুরস্ক আর সহ্য করিবে না। এই অপমানকর বন্দোবস্তের উচ্ছেদসাধনে তুরস্ক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। এইরূপ কথাবার্ত্তা যখন চলিতেছে তখন ইংরেজ-সরকারের সাহায্য লাভ করিয়া পদচ্যুত সুলতান্ পঞ্চম মহম্মদ গোপনে পলায়ন করিয়া ইংরেজ-যুদ্ধজাহাজ "মলয়"এ আশ্রয়লাভ করিলেন।

সুল্‌তানের পলায়ন-সংবাদ প্রকাশ হওয়াতে অ্যাঙ্গোরার জাতীয় সভা নূতন খলিফা নির্ব্বাচন করিবার জন্য সমবেত হইলেন। সুলতান্ আব্দুল্‌হামিদের পুত্র সেলিম তুরস্কের যুবরাজ আব্দুল্‌মজিদ্ ও আফ্‌গানিস্থানের আমীর পদপ্রার্থী ছিলেন। আব্দুল্-মজিদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া নূতন খলিফা নির্ব্বাচিত হন। ওসমানিয়া বংশের একজন লোক খলিফা নির্ব্বাচিত হওয়াতে পুরাতন প্রথাকেও নির্ব্বাচন-ব্যাপারে লঙ্ঘন করা হয় নাই। আব্দুল-মজিদ্ পদচ্যুত সুল্‌তান্ মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভূতপূর্ব্ব সুলতান্ আব্দুল-আজিজের পুত্র।

এদিকে লোজান্-বৈঠকের উদ্যোগ-পর্ব্ব চলিতে লাগিল। ২০শে নবেম্বর বৈঠকের প্রথম অধিবেশন হয়। সেই দিন প্রাতে পঁয়াকারে লর্ড্ কার্জ্জন্ সেনর মুসোলিনী একত্র হইয়া কোন্ নীতি অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর তাহার আলোচনা করিলেন। বৈঠকের কার্য্যপরিচালনা-পদ্ধতিও এই সভায় স্থির হইয়া গেল।

বৈঠক বসিলে সর্ব্বপ্রথমে সুইট্‌জার্‌ল্যাণ্ডের প্রতিনিধি ডাক্তার হ্যাব রাষ্ট্রীয় প্রথানুসারে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। সভারম্ভের বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে আশা করা যায় এই বৈঠক গ্রীক-তুরস্কের অতি পুরাতন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া ইউরোপে শান্তিস্থাপনের পথ করিয়া দিবে। ইস্‌মৎ পাশা তুরস্কের কথা জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া বলিলেন, "তুরস্কের জনসাধারণ মুক্ত স্বচ্ছ স্বাধীনতার আলোকে বিহার করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পাইলে মুক্তির এই অধীর আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না। স্বাধীনতালাভের সুযোগ পাইলে তুরস্ক শান্তিস্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছে। উইল্‌সন্ সাহেবের নীতিকে অবলম্বন করিয়া শান্তিস্থাপন করিবার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই আশ্বাসে প্রলুব্ধ হইয়া তুরস্ক যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল। সে নীতি অবলম্বিত হওয়া দূরে থাকুক এই চারি বৎসর ধরিয়া তুরস্কের নিকট হইতে অন্যায় করিয়া শান্তির ফলটুকু কাড়িয়া লইবারই চেষ্টা হইয়াছে। তুরস্ক যাহাতে দুর্ব্বল হইয়া একেবারে বিনাশ লাভ করে সেই চক্রান্তই চলিয়াছে। এইরূপে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে তুরস্ক জাতি বুঝিয়াছেন যে মিত্র-শক্তিবর্গের ফাঁকা প্রলোভনে আর লুব্ধ হইলে নিস্তার নাই, নিজের বাহু ও মনের বলে নিজের দাবী আদায় করিয়া লইয়া নিজের উন্নতি নিজে করিতে হইবে। তুরস্ক এই কয়েক বৎসর অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনের মিথ্যা দোহাই দিয়া

এসিয়া-মাইনরে তুরস্কের প্রজাসাধারণকে নির্ম্মূল করিবার প্রয়াস চলিয়াছিল। তুরস্ক জাতি অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ নিজ-বাহুবলে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই তুরস্ক জাতি ইউরোপের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সভ্য-সমাজের জীবন্ত জাতিসমূহের স্বাধীনভাবে বাঁচিবার যে অধিকার আজ তুরস্ক আদায় করিয়া লইয়াছে তাহার অল্প একটুও ছাড়িতে তুরস্ক সম্মত হইবে না।"

সভারম্ভের বক্তৃতাগুলি শেষ হইলে পর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিনটি কমিটি স্থির হইয়া গেল। সর্ব্ব-প্রথমে লর্ড্ কার্জ্জনের সভাপতিত্বে তুরস্কের সীমা-নির্দ্ধারণ-কমিটির বৈঠক বসে। ইস্‌মৎ বলিলেন যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা পুনরায় ফিরাইয়া পাইবার এবং পশ্চিম থ্রেসের অধিবাসীবৃন্দের স্বসঙ্কল্পিত রাষ্ট্রতন্ত্রের অধীনে বাস করিবার দাবী তুরস্ক জানাইতেছেন।

গ্রীকপক্ষে ভেনিজিলস বলিলেন যে গ্রীস পশ্চিম থ্রেসের অধিবাসী-বর্গের স্বসংকল্পের অধিকার স্বীকার করেন না এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের সীমানা পর্য্যন্ত তুরস্ককে ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

যুগোস্লাভিয়া ও রুমেনিয়ার প্রতিনিধি প্রজাদিগের নির্ব্বাচন-অধিকার স্বীকার করিলেন বটে কিন্তু তুরস্ক যে মারিট্‌জা নদীর কূল পর্য্যন্ত সীমানার দাবী জানাইয়াছে তাহা সুসঙ্গত দাবী বলিয়া ইহাঁদের বিশ্বাস। বুল্‌গেরিয়ার প্রতিনিধি পশ্চিম থ্রেসে স্বরাজ্য স্থাপনের পক্ষ-পাতী। ইনি নিজের জন্যও থ্রেসের একটি বন্দর লাভের দাবী জানাইলেন। মিত্রশক্তিবর্গ পশ্চিম থ্রেসের স্বরাজ্যলাভের বা স্বসংকল্পিত শাসনতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী অস্বীকার করিলেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর তুরস্ক একটু নরম হইলেন। মারিট্‌জা নদীর তীর পর্য্যন্ত তুরস্ক ফিরিয়া পাইলেন বটে কিন্তু নদীর উভয় পার্শ্বে ৩০ কিলোমিটার জমিতে কাহারও সৈন্য প্রেরণের অধিকার রহিবে না স্থির হইল। বুল্‌গেরিয়া এই সৈন্যশূন্য স্থানের পাশ দিয়া একটি সরু জমি বাহিয়া দেদিগাচ বন্দরে যাইবার পথ পাইবেন স্থির হইল। দেদিগাচ বন্দর বুল্‌গেরিয়াকে দিতে সকলেই স্বীকৃত হইলেন।

গ্রীসের মুসলমান প্রজা যাহাতে গ্রীস ত্যাগ করিয়া তুরস্কে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে এবং তুরস্কের খৃষ্টান প্রজা যাহাতে গ্রীসে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োজিত হইয়াছে। রুশ প্রতিনিধিরা লোজানে আসিয়া তুরস্ক সম্পূর্ণ স্বাধীনরাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং রুশিয়ার নিকট তুরস্ক যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ছাড়িয়া দিতে রুশিয়া সম্মত আছে বলিয়া জানাইয়াছেন।

দার্দ্দানেলিশ্ প্রণালীতে ব্যবসায়ী জাহাজ অবাধে যাইতে পারিবে। যুদ্ধের সময় ব্যতীত একখানি বিদেশীয় রণতরী দার্দ্দানেলিশে প্রবেশ করিতে পারিবে। যুদ্ধের সময়ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধজাহাজের দার্দ্দানেলিশ-প্রণালীতে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিবে, তবে তুরস্ক ইচ্ছা করিলে সেই জাহাজ তল্লাস করিতে পারিবে।

এইরূপ নানা সর্ত্তের আলোচনা করিয়া একটি সন্ধিসূত্রের সন্ধানলাভ করিবার প্রয়াস চলিতেছে। ফলে কি হইবে তাহা এখনও বলা যায় না।

অ্যানাটোলিয়ার উপকূলস্থ দ্বীপপুঞ্জ তুরস্ক ফিরিয়া চাহিল এবং ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গ্রীস সৈন্য-সমাবেশ করিতে পারিবে না, ইহা নির্দ্ধারিত হইল। ক্যাপিটুলেশন্‌স্ অর্থাৎ বিদেশীর বিচার করিবার অক্ষমতা তুলিয়া দিবার যে দাবী তুরস্ক জানাইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় কমিটি অনুসন্ধান করেন। ফরাসী প্রতিনিধি ব্যারার অক্ষমতা তুলিয়া দিবার পক্ষে মত দিলেন। ইতালীর প্রতিনিধি গ্যারোনি বলিলেন যে সুলতান্ স্বেচ্ছায় নিজের অধিকার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং বিদেশীয় প্রতিনিধির নিকট বিদেশীয়ের বিচার হওয়াতে তুরস্কের শাসনযন্ত্র নিশ্চল হয় নাই, বরং সুন্দর-ভাবে কাজ চলিয়া আসিয়াছে। অতএব ইহা তুলিয়া দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। লর্ড্ কার্জ্জন্ বলিলেন যে তুরস্কের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যদি ইহা প্রত্যাহার করিতে হয় তবে বিদেশীর প্রতি যাহাতে সুবিচার হয় এমন কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে। ইস্‌মৎ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে এরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে ক্যাপিটুলেশন্ নাম তুলিয়া দেওয়া হইলেও কার্য্যত উহা থাকিয়া যাইবে। তুরস্ক এরূপ সর্ত্তে কখনও স্বীকৃত হইবে না। অনেক আলোচনার পর বিদেশীর আইনসঙ্গত অধিকারগুলি বিচার করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োজিত হইয়াছে।

গ্রীসে অবাধ হত্যালীলা—

যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া প্রজাসাধারণের যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন পরাজয়ের কারণ তদন্ত করিবার জন্য গ্রীসে একটি তদন্ত-সভা গঠিত হইল। ইহাদের অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে সম্রাট্ কনষ্টান্‌টাইনের যোগ্যতার অভাবে যখন গ্রীসের পরাজয়-সম্ভাবনা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল তখনও গ্রীক-মন্ত্রীসভা নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য সে সংবাদ গোপন রাখিয়া সম্রাট্ কনষ্টান্‌টাইনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গ্রীক-সেনাপতি ষ্ট্রাটিগস ও হেডজিয়া-নেস্‌টিসের সৈন্য-পরিচালনার দোষে যে যুদ্ধে এইরূপ ভীষণ পরাজয় হইয়াছে তাহাও প্রকাশ পায়। অনুসন্ধানফলে গুনারিস, ষ্ট্রাটস প্রভৃতি ছয় জন মন্ত্রী এবং দুইজন সেনাপতি এবং একজন নৌ-সেনাপতির সামরিক বিচারের আদেশ হয়। বিচারে অসাবধানতা ও অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি দোষ ইহাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিপন্ন হওয়াতে ছয়জনের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের এবং দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। যাঁহারা নিজেদের যোগ্যতার বলে দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছিলেন, যাঁহাদের কর্ণধার করিয়া যুদ্ধের সময় হইতে গ্রীস আত্মপ্রসারের প্রয়াস পাইতেছিল, তাঁহারা যেই শক্তিধর পুরুষ কামালের বাহুবলের নিকট পরাজিত হইলেন, অমনই তাঁহাদের দেশদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করা হইল এবং বিচার-প্রহসন করিয়া তাঁহাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল।

তথাকথিত বর্ব্বর তুরস্কের অত্যাচার হইতে খৃষ্টান প্রজাবৃন্দকে বাঁচাইবার জন্য গ্রীকরা কিছুদিন পূর্ব্বে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তুরস্কের প্রজাপুঞ্জ গ্রীক সৈন্যের নৃশংস ব্যবহারের কথা যাহা প্রকাশ করিয়াছিল, সুসভ্য খৃষ্টান-সমাজ তাহা বিশ্বাস করে নাই। স্মার্ণায় গ্রীক অত্যাচার সম্বন্ধে যে অভিযোগ তুরস্ক সরকার করিয়া-ছিলেন তাহার সত্যতা অনুসন্ধান করিবার জন্য ফরাসী-সরকার রাজী ছিলেন। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের অন্যান্য রাজ্যসমূহ তদন্ত করিতে স্বীকৃত না হওয়াতে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তুরস্ক-চরিত্রে মসীলেপন করিবার জন্য রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। গ্রীসের ব্যবহার যদি তুরস্কের অনুরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইত তবে সে অভিসন্ধি সিদ্ধ হইত না। কাজেকাজেই গ্রীসের প্রতি অগাধ বিশ্বাস দেখাইয়া সুসভ্য ইউরোপ মুসলমান-রাজ্যের অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এখন নিজেদের দেশনায়কদিগের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখিয়া তাঁহাদের কি চৈতন্য হইবে? ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদিগের হত্যা-

ব্যাপারের প্রতিবাদ করিয়া ইংরেজ-সরকার গ্রীসের ইংরেজ প্রতিনিধিকে গ্রীসের সহিত রাষ্ট্রনীতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ দিলেন। গ্রীসের এই পৈশাচিক ব্যবহার কোনও উপায়ে সমর্থন করা যায় না সত্য; তথাপি ইংরেজ-সরকারের ব্যবহারে যেন একটা সঙ্গতি পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীসে যে সময়ে এরূপ নিষ্ঠুর হত্যালীলার আসর জমিয়া উঠিয়াছিল ঠিক সেই সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডেও তাহারই অনুরূপ এক বীভৎস মৃত্যু-তাণ্ডব চলিতেছিল। ইংরেজ-সরকার গ্রীসের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু স্বরাজপন্থী আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যবহারের সমর্থন করিতে লাগিলেন। দুইস্থানে সম্পূর্ণ দুইপ্রকার ব্যবহারে যে অসঙ্গতি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে তাহাতে ইংরেজ-মন্ত্রীসভা লোকচক্ষে হীন হইয়া পড়িয়াছেন।

স্ব-শাসিত আয়ার্ল্যাণ্ডে রক্তপাতের শাসন—

স্বাধীনতা-প্রয়াসী আইরিশ জাতি ইংলণ্ডের সহিত সংগ্রামে খুব সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারাতে মন্দের ভাল মনে করিয়া ইংলণ্ডের দেওয়া স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করিতে আইরিশ বিদ্রোহের অনেক নেতাই স্বীকৃত হন। কিন্তু ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে একদল স্বাধীনতাপন্থী আইরিশ ইংরেজের সহিত রফা-নিষ্পত্তিতে রাজী হইলেন না। এই মতভেদ হইতেই স্বরাজপন্থী ও স্বাধীনতাপন্থীদলের বিরোধের সৃষ্টি হইল। স্বরাজপন্থীদল সৈন্যদিগের সাহায্য লাভ করাতে প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং ইংরেজ-আধিপত্যের উচ্ছেদকামী স্বাধীনতাপন্থীদলকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইংরেজের অনুগ্রহে দেশের শাসনভার এই স্বরাজপন্থীদলের উপর ন্যস্ত হইল। স্বাধীনতাপ্রয়াসীদল কিন্তু নিজেদেরকে দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেশ-শাসন নিজেদের হস্তে লইবার সঙ্কল্প জানাইলেন। কাজে কাজেই আয়ার্ল্যাণ্ডের হিতকামী ভিন্নমতাবলম্বী এই দুই দলে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। স্বরাজপন্থী সেনাপতি রণকুশল মাইকেল কলিন্সের কৌশলে স্বাধীনতাপ্রয়াসীদল পরাস্ত হইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিলেই ডি ভ্যালেরার দল খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া আপনাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। গ্রিফিথ্‌সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে এক কলিন্স্ ভিন্ন স্বরাজপন্থীদলের বেশ সুদক্ষ নেতা বড় একটা ছিল না। স্বাধীনতাপ্রয়াসীদল দেখিলেন কলিন্স্‌কে হত্যা করিতে পারিলে স্বরাজপন্থীদল উপযুক্ত নেতার অভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। তাই স্বাধীনতাপ্রয়াসী গুপ্তঘাতকের হস্তে কলিন্স্ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। স্বরাজপন্থীদল কস্‌গ্রীভের নেতৃত্বে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন এবং স্বাধীনতাপ্রয়াসীদলের লোক যাহাতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিবার সুযোগ না পায় তজ্জন্য অস্ত্র-আইন পাশ করিলেন। বিনা পাশে যদি কাহারও নিকট প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় তবে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। বিদ্রোহী দল কিন্তু ক্ষান্ত হইলেন না। খণ্ডযুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া স্বাধীনতাপ্রয়াসী নেতা আরস্কিন্ চাইল্‌ডাস্ স্বরাজপন্থীদলের হস্তে বন্দী হইলেন। চাইল্ডাসের নিকট গুলিভরা বন্দুক পাওয়া গিয়াছিল। সেই অপরাধে পোর্টোচেলো দুর্গে সামরিক আদালতে চাইল্ডাসের বিচার হয় এবং বিচারফলে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। এই নৃশংস আদেশের ফলে চাইল্ডাস্‌কে হত্যা করা হইয়াছে। স্বরাজপন্থী নেতারা ও চাইল্ডাস্ কিছুদিন পূর্ব্বে একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। আজ যে অপরাধে, চাইল্ডাস্‌কে বিদ্রোহী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল, ও যাঁহাদের আদেশে ইহা সংঘটিত হইল কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারাই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সেইরূপ বিদ্রোহ করিতে চাইল্ডাসের সাহচর্য্য করিয়াছিলেন এবং তখন এই কাজের জন্য চাইল্ডাসের কত প্রশংসাই না তাঁহারা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বরাজ্য-সাধনায় যেই দুইজন ভিন্নমার্গ অবলম্বন করিলেন, অমনি একদল অপরদলের কার্য্যের ঘোরতর নিন্দা আরম্ভ করিলেন এবং অপরদলকে অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

চাইল্ডাসের বিচার-প্রহসনে ক্ষুব্ধ হইয়া ডি ভ্যালেরার দল প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া স্বরাজপন্থীদলের নেতাদিগকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ফলে আইরিশ মহাসভার সভ্য সিনহেলস্ আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। স্বরাজপন্থীদল এই কাজের শাস্তিস্বরূপ স্বরাজপন্থীদলের বন্দী স্বাধীনতাপ্রয়াসী দলের দুইটি জননায়ক লায়ামমেলওস ও রোরি ওকোনরকে হত্যা করিলেন। এই দুইজন আইরিশ নেতা প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে ফোর্-কোর্ট্‌সের যুদ্ধে স্বরাজপন্থীদলের নিকট বন্দী হন। তাঁহারা যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকিতেন তবে বহুপূর্ব্বেই তাঁহাদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাকামী এই দুইটি মহাপ্রাণকে স্বরাজপন্থীদল শুধু জিঘাংসাবশে হত্যা করিলেন। এই নৃশংস বর্ব্বরোচিত ব্যবহার স্বরাজপন্থী আইরিশদলের চিরকলঙ্ক হইয়া উঠিল। দলাদলির কুফলের ইহাই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইয়া রহিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যুদ্ধের সময় যে ইংরেজজাতি যুদ্ধবিমান-ব্যবহারে নিরপরাধ প্রজা সাধারণের হত্যার জন্য জার্ম্মান জাতিকে বর্ব্বর আখ্যা দিয়াছিলেন, গ্রীসের হত্যালীলায় যাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া নিজ প্রতিনিধিকে সরাইয়া লইয়া গ্রীসের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন, এই দুইটি নিরপরাধ মহাপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যুতে সেই ইংরেজ-সরকার কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। বরং যে সময় এই বর্ব্বরজনোচিত ব্যাপার সংঘটিত হইল ঠিক সেই সময়েই পার্লামেণ্টের অনুমোদন অনুসারে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ আইরিশ স্বরাজ্য ঘোষণা করিয়া টিমথি হিলিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রথম রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিলেন। টিমথি হিলি জাতিতে আইরিশ হইলেও স্বাধীনতাসংগ্রামে তিনি স্বরাজপন্থীদলেরও প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। এমন একজন লোককে স্বরাজপন্থী দল স্বীকার করিয়া লইলেও স্বাধীনতাপ্রয়াসী দল স্বীকার করিবেন না বলিয়া ডি ভ্যালেরা ঘোষণা করিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বার্থে স্বার্থে এই যে সংঘাত তাহাতে যে বিষ উদ্গীর্ণ হইতেছে কোন্ নীলকণ্ঠ তাহাকে পান করিয়া বিষজর্জ্জরিত আয়ার্ল্যাণ্ডকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন?

ইজিপ্ট—

জগ্‌লুল পাশা যখন মিশরে অসহযোগ আন্দোলনের বাণী বহন করিয়া দেশবাসীকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন তখন লর্ড আলেন্‌বির আদেশে জগ্‌লুল ধৃত হইয়া মিশর হইতে বন্দী অবস্থায় নির্ব্বাসিত হইলেন। জগ্‌লুলের নির্ব্বাসনে ইজিপ্টের আন্দোলন কিছুদিনের জন্য একটু দমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শুধু আইনের বলে অসন্তুষ্ট প্রজাকে শাসন করা চলে না। তাই লর্ড অ্যালেন্‌বি মিশরবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সরবৎ পাশার মন্ত্রীসভাকে শান্ত করিতে ইংরেজ-সরকারের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কতকগুলি ফাঁকা সংস্কারের মোহে ভুলিয়া সরবতের দল ইংরেজ-সরকারের নির্দ্দিষ্ট শাসন-প্রণালীকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাই মিশরে কিছুদিন কোনই গণ্ডগোল ছিল না। কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তিক প্রাচ্যে তুরস্কের নব-জাগরণ মিশরবাসীর প্রাণে নব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। তাই মিশরবাসী স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র স্বরাজ্য লাভ করি

সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিদেশীর অধীনতা-পাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি-লাভের প্রবল ইচ্ছা মিশরে জাগিয়াছে। তাই আবার নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। জগ্‌লুলের দল অবকাশ বুঝিয়া আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই ইহাদের প্রভাব এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে মিশরের খদিব ফুয়াদ, জগ্‌লুলের দলের সহিত প্রকাশ্যে সহানুভূতি ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে সাহস পাইয়া সরবতের প্রতিদ্বন্দ্বীদল মন্ত্রীসভাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। সরবতের মন্ত্রীসভার পতন হইলে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া জগ্‌লুলের দল সামরিক আইনের অবসান ঘটাইবেন এবং সুদনে মিশরের প্রভুত্ব করিবার অধিকার ইংরেজ-সরকারের নিকট স্বীকার করাইয়া লইবার প্রয়াস পাইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইংরেজ-সরকার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সরবতের মন্ত্রী-সভাকে দুর্ব্বল জানিয়া সে সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করেন নাই। সরবতের দল পরাজিত হইয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। সম্রাট্ ফুয়াদ মিশরের জাতীয়দলের নেতা তওফিক নসিমের হস্তে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দিয়াছেন। নসিমের মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সভ্যই জাতীয় দল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্রাটের সহানুভূতি লাভ করিয়া জাতীয়দল সম্রাটের মঙ্গলকামনা করিয়া এক ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছেন। নসিম বলিতেছেন যে রাজনৈতিক বন্দী এবং নির্ব্বাসিতদিগকে মুক্তি দিয়া সুপ্রতিষ্ঠ করাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য হইবে। তাহার পর স্বরাট্ মিশরকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উন্নতিসাধনে যত্নবান হওয়া তাঁহার লক্ষ্য হইবে। জগ্‌লুলের স্বপ্ন এতদিনে সত্য হইতে চলিল। রক্তের পথে না চলিয়াও অভিনব এক মুক্তির পথে মিশরের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইয়া উঠিতেছে।*

নির্ব্বাচন-ফলে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অবস্থা—

রক্ষণশীলদের নেতা বোনার্ ল মন্ত্রী-সভা গঠনের পর রক্ষণশীল দলের প্রতি দেশবাসীর আস্থা আছে কি না তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে রাজার নিকট নূতন নির্ব্বাচন করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের আদেশে নূতন নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলই জয়লাভ করিয়াছেন। নূতন মহাসভায় রক্ষণশীলদলের ৩৪৫ জন, শ্রমজীবীদলের ১৪১ জন, উদারনৈতিক দলের ৬১ জন, লয়েড জর্জ্জের অনুগত জাতীয় উদারনৈতিক দলের ৫৫ জন এবং স্বাধীনমতাবলম্বী ৮ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রক্ষণশীল দলের বিরুদ্ধে যদি অন্য সব দল একযোগে বিপক্ষতা করেন তথাপি রক্ষণশীলদলের প্রাধান্য বজায় থাকে। এই নির্ব্বাচনের ফলে দেখা যাইতেছে যে লয়েড জর্জ্জের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণ এখনও বড় সন্তুষ্ট নহে। উদারনৈতিকদল অনেকদিন হইতেই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছিল। এখন ইহারা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদলের প্রতিপত্তি ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই দলের মাত্র দুইজন প্রতিনিধি মহাসভার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৯ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন, ১৯১১ সালে ৪২ নির্ব্বাচিত হন, ১৯১৮ সালে ৫৮ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে ১৪১ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যাঁহারা গণমতের উপাসক তাঁহারা ক্রমশই উদারনৈতিক দলের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছেন। উদারনৈতিকদিগের মধ্যে আর পূর্ব্বের মত গণতন্ত্রের উপাসকদিগের প্রতিপত্তি নাই। তাই বিপ্লবপন্থী এই শ্রমিকদলের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান নির্ব্বাচন-ফল এই দলের আশাতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রথা অনুসারে যে দল সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়, শাসন-পরিচালন-ভার তাহাদেরই প্রতি অর্পিত হয়। কিন্তু তাহার পরে যে দল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে পারেন সেই দল সংস্থিতি-সম্মত বিরুদ্ধবাদীদল (official opposition) রূপে পরিগণিত হন। পার্লামেণ্ট্ মহাসভা সাত বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় না। সাত বৎসর পরে একটি নির্ব্বাচন হইবে। কিন্তু যদি সাত বৎসর কাটিবার পূর্ব্বে মন্ত্রীসভা শাসনসংক্রান্ত কোনও কার্য্য-পরিচালনা-পদ্ধতি বা অন্য কোনও গুরুতর রাষ্ট্রীয় নীতি প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া প্রতিবাদীদলের বিরুদ্ধাচরণে পরাভূত হন, তবে সংস্থিতি-সম্মত বিরুদ্ধবাদীদলের প্রতি নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন এবং শাসন-পরিচালনের ভার অর্পিত হয়। শ্রমিকদল সংখ্যাধিক্যবশতঃ এইবার সংস্থিতি-সম্মত বিরুদ্ধবাদীদল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। যদি কোনও একটি বিশেষ ব্যাপারে বোনার্‌ল'র মন্ত্রীসভা পার্লামেণ্ট্ মহাসভায় পরাভূত হন, তবে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রথা অনুসারে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ্ শ্রমিকদলের নেতার হস্তে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দিবেন। এই নির্ব্বাচন-ফলে শ্রমিকদলের হস্তেই ইংলণ্ডের শাসনভার পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস মন্ত্রীসভা গঠনের যোগ্যতা নাকি শ্রমিকদলের নাই। কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় শ্রমিকদলের মধ্যে যোগ্য লোকের খুব অভাব নাই। র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড, ক্লাইনিস, বেনটিলেট, ফিলিপ স্নোডেন, জর্জ্জ ল্যান্‌স্‌বেরি, হ্যাভেলক্ উইল্‌সন্, বেন্‌স্পুর, টমাস প্রভৃতি প্রবীণ শ্রমিক নেতারা ভিন্ন, সিড্‌নি ওয়েব, প্যাট্রিক হেষ্টিংস্, হেমার্ডি, আর্থার পন্‌সন্‌বি, ট্রিভেলিন, লিসস্মিথ প্রভৃতি সুপণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদিগকে শ্রমিক দলে গ্রহণ করাতে শ্রমিকদল শক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি মন্ত্রীসভা গঠনের প্রয়োজন হয় তবে আর্থার হেণ্ডারসন্, এবং এইচ জি ওয়েল্‌স্‌কেও মহাসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া লইবার উপায় শ্রমিকদল করিয়া লইবেন। আর রক্ষণশীল দলের পতন হইলে উদারনৈতিকদল শ্রমিকদলের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে স্বীকৃত হইতে পারেন। এমনকি লয়েড্ জর্জ্জকে শ্রমিকদলের নেতারূপে দেখা যে খুব অসম্ভব নয় একথা অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকেন। লয়েড্ জর্জ্জ্ উদারনৈতিক দলে যখন প্রথম প্রতিপত্তি লাভ করেন তখন তাঁহার কার্য্য ও বাক্য সাম্যবাদীদিগের অনুরূপ ছিল। তিনি বৃদ্ধের ভরণপোষণ-ব্যবস্থা-আইন, বসতবাড়ী-আইন, শ্রমিক-সমিতি-আইন প্রভৃতি আইনের উদ্ভব করিয়া ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতির ধারাকে সাম্যতন্ত্রের পথে পরিচালিত করিয়েছিলেন। বাস্তবিক

* জগ্‌লুল পাশার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নানারূপ বিবরণ বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি পত্রিকায় তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এদেশের কতকগুলি মুসলমান-পরিচালিত পত্রিকায়ও সেইরূপ বর্ণনা প্রকাশিত হয়। সেই-সকল সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া "প্রবাসী"তেও তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। সেণ্ট্রাল খিলাফৎ কমিটির সভ্য সুলেমান নাদভি খিলাফৎ ডেপুটেশনে মিশরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে জগ্‌লুল বিশ্বাসী মুসলমান। তাঁহার অনুসন্ধান-ফল অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ফজলল হক সেলবর্ষী মহাশয় তাঁহার বর্ণনার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া দিয়া আমার ভ্রম সংশোধনের সুযোগ করাইয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পক্ষে তাঁহার মনের স্বাভাবিক গতি সাম্যতন্ত্রের দিকে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডকে মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কার্য্যশৃঙ্খলা ও কর্ম্মতৎপরতার উপাসক হইয়া পড়েন এবং যে প্রকারেই হোক রাষ্ট্রে শক্তিসঞ্চার করা তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এই শক্তি-সংগ্রহ-মানসেই তিনি উৎকট সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিলেন। এই সাম্রাজ্যলিপ্সা ও শক্তি-উপাসনাই তাঁহার পতনের কারণ হইয়া উঠিল। তাই আবার তাঁহার স্বাভবিক গতি যে পথে চলে সেই পথে ফিরিয়া আসা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। তাঁহার অন্তরঙ্গ-বন্ধু ও অনুচর লর্ড বিভারব্রুক খুব বিশ্বাস করেন যে লয়েড্ জর্জ্জ্ পূর্ব্বে অর্থনৈতিক সমতা সাধনের জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদলের নেতারূপে তিনি পুনরায় রাষ্ট্রনৈতিক জগতে আবির্ভূত হইবেন। এইবারের নির্ব্বাচনে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। স্কটল্যাণ্ড্ ও ওয়েল্‌স্ প্রদেশে শ্রমিক আন্দোলন এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। এই দুইটি প্রদেশ উদারনৈতিকদলের আস্তানা ছিল। কিন্তু এই দুইটি প্রদেশের অধিকাংশ স্থানেই এইবার শ্রমিকদল জয়লাভ করিয়াছে। এক গ্লাস্‌গো সহরে ইঁহারা দশটির মধ্যে আটটি নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। এইবার ত্রিশটি মহিলা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি মাত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই দুইজন লেডি অ্যাষ্টর ও শ্রীমতী উইন্‌ট্রিংহ্যাম্ বিগত মহাসভারও সভ্য ছিলেন। নির্ব্বাচিত না হইলেও আরও দুইটি মহিলা ১৪০০০ ভোট এবং একটি মহিলা ৯০০০ ভোট পাইয়াছিলেন।

একজন ভারতীয় পার্শী শ্রীযুক্ত সাপুরজি সাক্‌লাৎবালা শ্রমিক-দলের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে দুইজন ভারতবাসী দাদাভাই নৌরোজি ও মানচার্জ্জি ভাটনগরী মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আরও কয়েকজন ভারতবাসী নির্ব্বাচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সফল হন নাই। সাক্‌লাৎবালা শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইলেও তিনি বিপ্লবপন্থী সাম্যবাদী এবং সেইজন্য তাঁহাকে শ্রমিকদল বোল্‌শেভিক মতাবলম্বী বলিয়া মনে করেন। তথাপি শ্রমিকদলের অন্যতম নেতা ক্লাইনিস সাক্‌লাৎবালার নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছিলেন। সাক্‌লাৎবালা নিজেকে ভারতের পক্ষের সভ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। ইনি প্রসিদ্ধ পার্শীধনকুবের জম্‌শেদজী নাসিরবান্‌জী তাতার ভাগিনেয় এবং তাতা-কোম্পানীর লণ্ডনস্থ কারবারের তুলা-কল বিভাগের প্রধান পরিচালক। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এবার যে-সব জননায়ক নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উইন্‌স্টন্ চার্চ্চিল, ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব স্যামুয়েল্ মণ্টেগু, শ্রমিক দলপতি আর্থার্ হেণ্ডারসন্, বিখ্যাত পণ্ডিত ও শ্রমিক নেতা এইচ জি ওয়েল্‌স্ এই কয়েকজনের পরাজয় খুব উল্লেখযোগ্য।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

উৎসুক

চিত্রকর শ্রী সারদাচরণ উকিল

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

পৃথিবীতে হিংসা দ্বেষ যুদ্ধ যে ভাবে বাড়িতেছে তাহাতে অল্প দিন পরেই হয়ত শেষ দুটি মানুষও পরস্পর মারামারি করিয়া মরিবে, এবং আবার বনমানুষ হইতে মানুষের বিবর্ত্তন আরম্ভ হইবে।
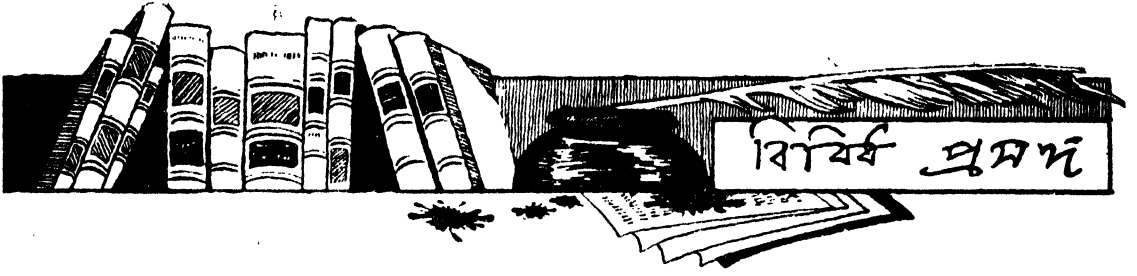
গ্রাম ও নগর

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে শতকরা ৭৮.১জন এবং জাৰ্ম্মেনীতে শতকরা ৫৫.৬ জন লোক শহরে বাস করে। ভারতবর্ষে শতকরা ৯.৫ জন লোক শহরে বাস করে। ইউরোপে কত মানুষের আবাসভূমিকে শহর বলে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা জানি না। এদেশের আদমসুমারীতে কোন লোকালয়ে অন্যূন পাঁচ হাজার মানুষ বাস করিলেই তাহাকে নগর বলা হয়। কোন মিউনিসিপালিটী, ছাউনী বা সিবিল্ লাইন্‌সে পাঁচ হাজারের কম লোক থাকিলেও, তাহাকেও নগর বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং আমাদের অনেক শহরই নামে মাত্র শহর; বস্তুতঃ সেগুলি গণ্ডগ্রাম। ভারতে নাগরিকদের অর্দ্ধেকের কিছু উপর কুড়ি হাজারের অধিক অধিবাসীবিশিষ্ট শহরে, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দশ হইতে কুড়ি হাজার অধিবাসীযুক্ত নগরে, ঐরূপ অংশ পাঁচ হইতে দশ হাজার অধিবাসীযুক্ত শহরে, এবং বাকী, প্রায় এক-পঞ্চদশ অংশ, পাঁচ হাজারের কম বাসিন্দার শহরে বাস করে। শহরে বাস করিবার ঝোঁক পশ্চিম-ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে সর্ব্বাপেক্ষা কম। বোম্বাই প্রদেশে শতকরা ১৮ জন শহরবাসী, আসামে শতকরা তিন জন মাত্র নগরে বাস করে। বাংলা দেশে কলিকাতা, হাবড়া ও ঢাকা কেবল এই তিনটি নগরের প্রত্যেকের লোকসংখ্যা এক লাখের উপর। আগ্রা-অযোধ্যায় এবং পঞ্জাবে বড় বড় শহরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইবার কারণ এই, যে, তথায় পুরাতন রাজধানী ও তীর্থস্থান অনেকগুলি আছে। বঙ্গদেশেও ঢাকা ছাড়া নবাবী আমলের রাজধানী আরও ছিল। কিন্তু গৌড় ত লুপ্ত হইয়াছে, মুর্শিদাবাদেও ম্যালেরিয়া ও অন্যবিধ কারণে লোকসংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে সমগ্রভারতের এবং প্রদেশসমূহের রাজধানী পরিবর্ত্তন কিরূপ হইবে না হইবে, বলা যায় না। কিন্তু সে-কালে কোথাও রাজধানী হইলেই সেখানে সামন্ত, ওম্‌রা, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক, বড় বড় বণিক, শিল্পী ও কারিগরেরা বাস করিতেন। রাজানুগ্রহলাভ এবং পণ্যদ্রব্যের কাট্‌তি সেখানেই বেশী হইত। ভবিষ্যতের রাজধানীগুলি তেমন হইবার কথা নয়। ভবিষ্যতে যেখানে যেখানে বড় বড় কলকারখানা বসিবে, সেখানেই শ্রমিক ও অন্যবিধ বিস্তর লোক বাস করিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত জম্‌সেদ্‌পুর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই শহরের অস্তিত্বও ছিল না। তাতা কোম্পানীর লোহা-ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা হাজার হাজার লোকের বাসভূমি হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে খুব দ্রুতবেগে কলকারখানা স্থাপিত হইলেও ইহার অধিবাসীরা কখনও ইংলণ্ডের মত প্রধানতঃ নগরবাসী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখন ত শতকরা নব্বইজন ভারতবাসী গ্রামের বাসিন্দা। বাংলা দেশে হাজারে কেবলমাত্র ৬৪ জন (শতকরা ৬৪ জন) শহরে বাস করে। বাকী হাজারকরা ৯৩৬ জন গ্রামের বাসিন্দা। সুতরাং ভারতবর্ষের উন্নতি বলিতে প্রধানতঃ গ্রামসমূহের উন্নতিই বুঝিতে হইবে। একথা বাংলা দেশের প্রতি আরো বেশী প্রযুজ্য; কেননা, সমগ্রভারতে গ্রামবাসীদের অনুপাতের চেয়ে বঙ্গে গ্রাম-বাসীর অনুপাত বেশী।

দেশের উন্নতি করিতে হইলে কতকগুলি পুরাতন কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। মানুষ আত্মা বটে, কিন্তু দেহের সহিত এই আত্মা জড়িত। সেইজন্য, দেহের অস্তিত্ব যাহাতে অকালে লুপ্ত না হয়, সেই চিন্তা প্রথমে

করা দরকার। অন্নের সংস্থান আগেই চাই। বাসগৃহ চাই, বস্ত্র চাই, স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল জলবাতাসের ব্যবস্থা, অঙ্গসঞ্চালনের ব্যবস্থা, ময়লা জল ও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক জল এবং সকল রকমের ময়লা ও আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিবার বন্দোবস্ত চাই, যাহাতে মনের ও শরীরের স্ফূর্ত্তি ও আরাম হয় এ প্রকার বিশুদ্ধ আমোদের ব্যবস্থা চাই। হৃদয় মন আত্মার পুষ্টি উন্নতি ও আনন্দের জন্য কি আবশ্যক, তাহা সুপরিজ্ঞাত। শিক্ষালয়; সকল বয়সের লোকদের পড়িবার, মিশিবার, আলোচনা করিবার স্থান; নানাবিধ সৎকর্ম্ম করিবার সমবেত চেষ্টার প্রতিষ্ঠান; ঈশ্বরের পূজা যে সম্প্রদায়ের লোক যে-ভাবে করিতে চান তদনুরূপ মন্দির; ইত্যাদি, ছোট বড় সকল লোকালয়ে আবশ্যক।

সমুদয় দেশটিকে আদর্শ অনুযায়ী গড়িতে হইলে বড় নগরগুলিকে কতকটা গ্রামের ভাব দিতে হইবে, এবং গ্রামগুলিকে কতকটা নগরের ভাব দিতে হইবে। বড় বড় শহরে আরো বিস্তৃত ও বেশী খোলা জায়গা থাকা দরকার, ঘাস গাছ পাতার প্রাচুর্য্যে প্রকৃতির শ্যামল সৌন্দর্য্য আরো অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হওয়া আবশ্যক, এবং শহরগুলি অধিকতর ধূলিবিহীন, কোলাহলবিহীন ও ধূমবিহীন হওয়া চাই। শহরের এক একটা বাড়ীতে খুব বেশী লোক থাকে। তাহাতে স্বাস্থ্য খারাপ হয় ও নৈতিক অবনতি ঘটে। ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। পল্লীগ্রামেও চরিত্রহীন লোক আছে, কিন্তু পাপের ব্যবসা নাই। নগরগুলি হইতে ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে পাপের ব্যবসা দূর করিতে হইবে।

গ্রামগুলিকে নগরের ভাল যাহা তাহা দিবার চেষ্টা যথাসাধ্য করিতে হইবে। গ্রামের লোকদের যথেষ্ট অন্নসংস্থান না হইবার কারণ এই, যে, চাষবাসই তাহাদের আয়ের এক মাত্র বা প্রধান উপায়। শহরে লোকে নানারকম কাজ করিয়া রোজ্‌গার করে। সর্‌কারী ও সওদাগরী আফিসের, স্কুলকলেজের, বড় বড় দোকানের, প্রভৃতি নানা জায়গার ও রকমের চাকরী গ্রামে মিলিতে পারে না। সেখানে জোর জমীদারী কাছারী এবং গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সামান্য কয়েকটি কাজ কয়েক জন লোকের জুটিতে পারে। এই জন্য চাষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং চাষ ছাড়া কি কি কাজ কোন্ কোন্ গ্রামে চলিতে পারে, তাহা নিরূপণ করিয়া তাহা চালাইবার বন্দোবস্ত করা দর্‌কার। শহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে ফলমূল তর্‌কারী মাছ দুধ ঘী দই ছানা ডিম জোগাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ গ্রামের ধোপারা শহরের লোকদের কাপড় কাচিতে পারে, দর্‌জিরা শহরের কাজ পাইতে পারে, ছুতার ঘরামি রাজমিস্ত্রীরা শহরে আসিয়া কাজ করিতে পারে, মুচিরা জুতা তৈয়ার করিয়া শহরের দোকানে দিতে পারে, ইত্যাদি। কিন্তু এই সমুদয় শ্রেণীর লোকদের কথার ঠিক্ থাকা চাই। কথার ঠিক ও শ্রমশীলতা না-থাকায় বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ কাজ হারাইতেছে। ধোপার কথার ঠিক্ আমরা দার্জিলিং কার্শিয়ং ও পুরীতে দেখিয়াছি; কিন্তু তাহারা বাঙ্গালী ধোপা নহে। আজকাল কলিকাতায় অনেক শিক্ষিত লোক কাপড় কাচিবার দোকা. করিয়াছেন। এইরূপ কাজ শহরের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতেও চলিতে পারে।

বড় বড় শহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলে এই প্রকার নানা কাজ চলিলেও, অল্পসংখ্যক গ্রামেই ইহা চলিবে। কারণ, অধিকাংশ গ্রামই নগর হইতে দূরে। সেখানে নানাবিধ কুটীর-শিল্প (অর্থাৎ যাহা লোকে নিজের নিজের ঘরে বা গ্রামে থাকিয়া চালাইতে পারে) প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। নানাপ্রকারের বস্ত্র বয়ন তাহার মধ্যে প্রধান। বাসনও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের, এমন কি বাংলা দেশেরও সকল অঞ্চলের, অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, যে, গ্রামের অস্তিত্ব দূর হইতে দুর্গন্ধ দ্বারা অনুমান করা যায়। মাঠ, পুকুরের পাড় ও পুকুর দূষিত করা এবং আবার সেই দূষিত পুকুরের জল পান করা অত্যন্ত অনিষ্টকর, লজ্জাকর ও জঘন্য প্রথা; ইহার প্রতিকার না হইলে স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব। গ্রামসকলেও ভাল

রাস্তা ও ভাল নর্দ্দামা থাকা দরকার। সেখানেও রাস্তায় ও গলিতে রাত্রে আলো থাকিলে ভাল হয়। প্রত্যেক গ্রামে বালিকা ও বালকদের বিদ্যালয়, প্রাপ্ত-বয়স্ক অজ্ঞ কর্ম্মীদের জন্য নৈশ বা অন্যবিধ বিদ্যালয়, প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার আয়োজন, সার্ব্বজনিক লাইব্রেরী, পাঠাগার ও বক্তৃতাদির স্থান, বালিকাদের ও বালকদের খেলিবার জায়গা, নারীদের খেলিবার স্থান, যুবক ও প্রৌঢ়দের খেলিবার স্থান, গোচারণের মাঠ, পানীয় জলের ও স্নান করিবার জলের সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গ্রামে বা নিকট-বর্ত্তী গ্রামসমষ্টিতে অন্ততঃ একটি এরূপ দোকান থাকা দরকার যাহাতে গ্রামবাসীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিষ পাইতে পারে। ইহা যৌথসমবায়-সমিতির দ্বারা সহজে পরিচালিত হইতে পারে। বড় বড় গ্রামে এবং ছোট ছোট গ্রামের প্রত্যেক সমষ্টিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাত্রী, চিকিৎসক, চিকিৎসালয় এবং ঔষধের দোকান থাকা আবশ্যক। গোবৈদ্যও আবশ্যক। সঙ্গীত, যাত্রা, ভাল নাটকের অভিনয়, উৎকৃষ্ট কথকতা, রামায়ণ পাঠ ও গান, প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে গ্রামবাসীদের আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই হয়। মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক যে-সব গ্রামের অধিবাসী তাঁহাদের জন্য এই রকম কি বন্দোবস্ত থাকা উচিত, তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারিবেন। জ্ঞানের অভাবে আমরা কিছু বলিতে পারিলাম না।

বাংলাদেশের অনেক বড় জমীদার বিস্তর গ্রামের মালিক। তাঁহারা যদি প্রত্যেকে অন্ততঃ একটি করিয়া গ্রামকে আদর্শগ্রামে পরিণত করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে দেশের পরম কল্যাণ হয়। আমরা এইরূপ বাস্তব গ্রামের বর্ণনা ও অনেক ছবি নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিতে প্রস্তুত আছি।

—

শহরের পরগাছা

বাংলা অভিধানে অনেক শব্দকে গ্রাম্য বলা হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা তাহাদের প্রতি কিছু অনাদর প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গ্রাম্য শব্দের মত গ্রাম্য বা পাড়াগেঁয়ে মানুষেরাও নাগরিকদের উপহাস পরিহাসের পাত্র। শহরের পেশাদার ও সৌখীন ভাঁড়েরা পাড়াগেঁয়ে লোকদের কথার ভঙ্গীর ও চালচলনের নকল করিয়া আমোদ পাইয়া ও দিয়া থাকেন। শুধু আমাদের দেশেই যে এইরূপ হইয়া থাকে তাহা নয়। পাশ্চাত্য দেশেও প্রাচীন ও আধুনিক সময়ে গ্রামের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কুলকলেজের ছেলেরা "রাষ্টিকেট্" (rusticate) কথাটির সহিত পরিচিত আছেন। উহার ব্যুৎপত্তি একটি লাটিন কথা হইতে যাহার মানে গ্রাম। রাষ্টিকেটের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ গ্রাম্যী-করণ, অর্থাৎ শহুরে মানুষকে গ্রামে তাড়াইয়া দিয়া পাড়াগেঁয়ে করিয়া ফেলা। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্কুল, প্রভৃতি হইতে কাহাকেও কিছুকালের জন্য তাড়াইয়া দিয়া শাস্তি দিলে তাহাকে রাষ্টিকেট্ করা বলে। এই রাষ্টিকেট্ করার মৌলিক অর্থ কিন্তু গ্রাম্যীকরণ। ইহা যে একটা শাস্তি তাহা হইতেই গ্রামসকলের অনাদর বুঝা যাইতেছে।

যাহা হউক, শহরের লোকেরা অনেকে গ্রাম্য লোকদের চেয়ে মার্জ্জিত ও "সভ্য ভব্য", এবং নানা-প্রকারে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের সুবিধা থাকায় নাগরিকেরা অনেকে যে অনেকস্থলে সাংসারিক নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানে গরীয়ান্, তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া, এই একটা কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, যে, নাগরিকদের জীবন পরগাছার জীবন। গ্রাম্য লোকেরা আমাদের আহার, পরিচ্ছদ ও বাসগৃহের সমুদয় উপাদান উৎপন্ন বা সংগ্রহ করে। তাহা ব্যতীত আমাদের বাঁচিয়া থাকা ও সভ্য হওয়া অসম্ভব। আমরা গ্রাম্য লোকদের পরগাছা মাত্র। নাগরীকদের কাজ একেবারে অনাবশ্যক নহে, তাহারা অকেজো নয়; কিন্তু তাহাদের কাজ সমাজের অস্তিত্বের জন্য একান্ত আবশ্যক নহে।

সভ্যতার ভিত্তি গ্রামের উপর স্থাপিত। অতি সুন্দর প্রাসাদ-সকলেরও ভিত্তি মাটির নীচে থাকে, লোকের চোখে পড়ে না; খুঁড়িয়া বাহির করিলে তাহা প্রাসাদের মত সুন্দর দেখায় না। কিন্তু এই অসুন্দর ভিত্তি ব্যতিরেকে

প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে না। সমাজ সম্বন্ধেও এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

সভ্যতার ভিত্তি গ্রামে। যে-দেশে গ্রাম্য লোকের সংখ্যা বেশী, তাহা অনুন্নত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহার সভ্যতা যেমন স্থায়ী, যে-দেশের লোকদের অধিকাংশ নগরবাসী, তাহার সভ্যতা তেমন নিরাপদ্ ও স্থায়ী নহে। অন্য প্রকারে বলিলে বলা যায়, যে-দেশের সভ্যতা কৃষিপ্রধান, তাহার জীবন ও সভ্যতা যত নিরাপদ্ ও স্থায়ী, নাগরিকপ্রধান কারখানার উপর নির্ভরশীল জাতির জীবন ও সভ্যতা তত নিরাপদ্ ও স্থায়ী নহে। গত বৃহৎ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ করা যখন কঠিন হইয়াছিল, তখন ইংরেজরা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া কৃষিকার্য্যে অধিক-সংখ্যক লোককে নিযুক্ত করিবার জন্য আইন দ্বারা চাষীদের জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরী এবং চাষে উৎপন্ন গম প্রভৃতির ন্যূনতম মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। ফ্রান্স্ ও জার্ম্মেনী নিজেদের খাদ্য নিজেরা যত উৎপন্ন করে, ইংলণ্ড্ তত করে না। এইজন্য যুদ্ধের সময় খাদ্য সম্বন্ধে ফ্রান্স্ ও জার্ম্মেনীর অবস্থা ইংলণ্ড্ অপেক্ষা ভাল ছিল। সমুদ্রে জাহাজের সাহায্যে ইংলণ্ডের প্রাধান্য না থাকিলে ইংরেজদিগকে না খাইয়া মরিতে হইত। এইজন্য জার্ম্মানী সব্‌মেরীন্ দ্বারা ইংরেজদের জাহাজ ডুবাইতে এত চেষ্টা করিয়াছিল।

আমাদের জাতি বলিতে অবশ্য গ্রাম্য নাগরিক সকল শ্রেণীর লোকের সমষ্টিকেই বুঝায়। কিন্তু যদি কেহ জোর করিয়া বলিতে চায়, "আমরাই ত ভারতীয় জাতি", তাহা হইলে সে-কথা গ্রামের লোকদের মুখে যেমন শোভা পায়, এমন আর কাহারও মুখে নহে। অথচ পরগাছা আমরা এই গ্রামের লোকদিগকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছি, এবং গ্রামসকলের উন্নতির জন্য অতি অল্প চিন্তা ও চেষ্টাই করিয়া থাকি। সেই কারণে গ্রামসকল অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, এবং তাহার জন্যই আবার লোকদের শহরমুখো প্রবৃত্তি বাড়িয়া চলিতেছে। অন্য লোকদের চেয়ে জমীদারদের স্থায়ী আয় বেশী; সুতরাং তাঁহারাও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আড্ডা গাড়িতেছেন, এবং যে প্রজাদের রক্ত শোষণ করিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাদের দুঃখের ভাগ লইতে, অন্যের কথা দূরে থাক, তাঁহারাও রাজী নহেন।

ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্ট যে এ পর্য্যন্ত এদেশের গ্রামসকলের প্রতি তেমন মন দেন নাই, তাহার কারণ, উহা বিদেশীর গবর্ণ্‌মেণ্ট এবং এই গবর্ণ্‌মেণ্টের বিদেশী ও দেশী ভৃত্যেরা প্রধানতঃ শহরে বাস করেন। যে দুঃখ ও অসুবিধা কেহ নিজে ভোগ করে না, তাহা দূর করিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে না, ও তজ্জন্য চেষ্টা করে না। কিন্তু আমাদের দেশী শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশ ত বেসরকারী লোক। গ্রামসকলের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের উদাসীনতা অমার্জ্জনীয়।

—

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশ বার্ষিক উৎসব

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশ বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে এই আলোচনা হওয়া উচিত, যে, থিয়েটারগুলির সংস্কার ও উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে। এই সংস্কার ও উন্নতি নানাবিধ। তাহার মধ্যে নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে। কোন কোন ধর্ম্ম-মূলক সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দ্বারা কাহারও কাহারও উপকার হইয়া থাকিলেও, থিয়েটারগুলির দ্বারা অনেকের যে চারিত্রিক অধোগতি হইয়াছে, এবং দেশের নৈতিক হাওয়া কলুষিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে, তাহা সহজে বলা যায় না; কিন্তু প্রশ্নটি আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভিনয়ের উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। থিয়েটার-গৃহগুলি এবং তাহার আসনাদি এরূপ হওয়া দরকার, যাহাতে মানুষের স্বাস্থ্যনাশ না হয়। সমস্ত-রাত্রিব্যাপী অভিনয় আইন দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

—

গণিকাদের দ্বারা সৎকার্য্য করান

মানুষের মন যখন উত্তেজিত থাকে, তখন কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহাতে লোকে মন দেয়

না, কিম্বা, মন দিলেও, বলে, আলোচকদের কোন মন্দ অভিসন্ধি আছে। উত্তেজনা থামিয়া গেলে, এরূপ কিছু না ঘটাই উচিত।

কিছু কাল আগে বোম্বাইপ্রদেশে এই আলোচনা হয়, যে, নারীরা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচনে অধিকারী হইবেন কি না। পুনায় ইহা আলোচনা করিবার জন্য পুরুষদের যে সভা হয়, তথাকার ভদ্রমহিলারা পতাকাহস্তে দল বাঁধিয়া রাস্তায় গান করিতে করিতে সেই সভাস্থলে উপস্থিত হন। মহাত্মা গান্ধীর গত জন্মদিনে বোম্বাইয়ের গুজরাতী মহিলারা জেলে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য রাস্তা দিয়া দল বাঁধিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলে ভদ্রমহিলাদের এই প্রকার মিছিল এই কারণে সম্ভব হয়, যে, তথায় নারীদের অবরোধ-প্রথা নাই।

বাংলাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব প্রবল, তখন কোথাও কোথাও পতিতা নারীদের মিছিল বাহির হইয়াছিল। বোম্বাই অঞ্চলের মত হিন্দু ভদ্রমহিলাদের মিছিল বাংলাদেশে কোথাও হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। যাহা হউক, যদি হইয়া থাকে, আনন্দের বিষয়। আমরা এখন অন্য কথা বলিতেছি। উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনে বিপন্ন হওয়ায় যখন কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গান করিয়া শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বয়সের লোক ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন নারীদের দলও তাহাতে ছিল, কিন্তু তাঁহারা পতিতা নারী। ভদ্রমহিলারা কোথাও রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়াছিলেন কি না, জানি না। সদনুষ্ঠানের জন্য ভিক্ষাসংগ্রহ প্রশংসনীয় কাজ। এইরূপ কাজ করিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। কোন মানুষই এমন নাই, যাহার সব চিন্তা কল্পনা কথা কাজ প্রবৃত্তি পাপাত্মক। ভাল কাজ করিয়া ভাল হইবার অধিকার যেমন পুরুষের আছে, তেমনি নারীরও আছে। পুরুষদের বেলায় দেখিতে পাই, যে, দুশ্চরিত্র পুরুষদের দান গৃহীত হইয়া থাকে, এবং তাহারা সৎকার্য্যের জন্য দান সংগ্রহও করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের অধিকার নাই, একথা কেহ বলে না; বরং এরূপ কাজ করিলে লোকে তাহাদের প্রশংসাই করে। দুশ্চরিত্র পুরুষেরা যে কাজ করিতে পারে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা সেরূপ সৎকাজ কেন করিতে পাইবে না? তবে, তাহারা যদি ভিক্ষার ব্যপদেশে নিজেদের কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চায়, তাহার পথ বন্ধ অবশ্যই করা উচিত।

সত্য বটে, দুশ্চরিত্রা নারীদিগকে পতিতা বলা ও মনে করা হয়, (এবং তাহা ন্যায়সঙ্গত,) কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষদিগকে পতিত মনে করা ও বলা হয় না; কিন্তু তাহারাও বাস্তবিক পতিত। অতএব পতিত পুরুষদের সৎকর্ম্ম করিবার যে অধিকার আছে, পতিতা নারীদেরও তাহা থাকা উচিত। কেহ চিরপতিত বা চিরপতিতা নহে; সকলেরই উদ্ধার আছে ও হইবে।

কিন্তু যাঁহারা পতিতা নারীদের মঙ্গল চান, তাঁহাদের একটি কর্ত্তব্য আছে। গণিকাদের সৎচেষ্টার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাঁহারা বিপন্নের সাহায্য বা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান, তাঁহাদের গণিকাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বলা ও বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যে, পাপ-ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা না করিলে তাহারা অধোগতি হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। পাপ হইতে নিবৃত্ত না হইলে, কোন কাজের দ্বারাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে এই বাজে তর্ক উঠিতে পারে, যে, বুদ্ধদেব, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, প্রভৃতি গণিকাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কি কেহ গণিকাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা গণিকাই থাকিয়া যাও; তাহা হইলেও তোমরা মুক্তির অধিকারী হইবে"?

এস্থলে এই ন্যায্য যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে, যে, দুশ্চরিত্র পুরুষদিগকে ত কেহ বলে না, যে, তাহারা সচ্চরিত্র না হইলে কেবল দান বা দানসংগ্রহ দ্বারা তাহাদের মুক্তি হইতে পারে না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সমাজ পুরুষদের সম্বন্ধে যদি কোন অবহেলা করে, যদি তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেয়, বা তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত বা আদর্শ পোষণ করে, তাহা হইলে নারীদের সম্বন্ধেও তাহাই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। দুশ্চরিত্র পুরুষেরা সমাজে বেশ চলিয়া যায়, তা

বলিয়া কি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদিগকেও সমাজে চালাইতে হইবে? নরনারীর সাম্যের মানে এ নয়, যে, উভয়ের দুর্নীতিকে সমান প্রশ্রয় দিতে হইবে। সেই সাম্য-বিধানই কল্যাণকর, যাহাতে পুরুষ ও নারীর সাধু জীবনের ও আদর্শের সমান আদর করা হয়, এবং পুরুষ ও নারীর অসাধুতাকে সমান গর্হিত মনে করিয়া উভয়ের সম্বন্ধেই সমান কঠোরতা অবলম্বিত হয়। অতএব, দুশ্চরিত্র পুরুষেরা যাহাতে সমাজে দুশ্চরিত্রা নারীদের মতই অনাদৃত ও নিন্দিত হয়, তাহাই করিতে হইবে; দুশ্চরিত্রা নারীরা যাহাতে দুশ্চরিত্র পুরুষদেরই মত সমাজে প্রশ্রয় পায়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে না।

বাংলাদেশে নারীর অবরোধ-প্রথা থাকায় এখানকার বালিকাদের ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের শিক্ষালাভ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের বাধা মহারাষ্ট্র, গুজরাত, অন্ধ্র অপেক্ষা বেশী। সেইজন্য ভারতের ঐ-সকল ও অন্যান্য প্রদেশে এবং যে যে দেশী রাজ্যে নারীর অবরোধ নাই সেখানে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীদের সদনুষ্ঠান যেরূপ বাড়িতেছে, বঙ্গে সেরূপ বাড়িতেছে না। ইহা বাঙালীদের একটি লজ্জার কারণ হইয়া আছে। ইহার উপর আরও লজ্জার কারণ এই হইতেছে, যে, বাঙালী পতিতা নারীরা সৎকর্ম্মের জন্য ভিক্ষাসংগ্রহ কার্য্যে বাঙালী ভদ্রমহিলাদের চেয়ে অধিক অগ্রসর, দেখা যাইতেছে। গণিকারা জীবনের কোন সৎ-আদর্শ-বিষয়ে ভদ্রমহিলাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, ইহা কি কোন সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয়? অথচ খবরের কাগজে ইহাও দেখিয়াছি, যে, কলিকাতার কোন শহর-তলীতে গণিকাদের সভায় সভাপতি হইয়া একজন ভদ্রলোক তাহাদিগকে দলবদ্ধভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিবার কাজে উৎসাহিত করেন এবং এরূপ কাজের শৃঙ্খলা বিধানের ভার গ্রহণ করেন। যদি এরূপ ভিক্ষা করা ভাল কাজ হয়, তাহা হইলে ঐ সভাপতি ভদ্র-মহিলাদের এরূপ সভা করিয়া তাঁহাদিগকে দলবদ্ধ করিবার চেষ্টা কেন করেন নাই? যদি উহা মন্দ কাজ হয়, তাহা হইলে গণিকাদিগকেও কি মন্দ কাজে লাগান উচিত? তাহাদিগকে কেহ ত প্রকাশ্য সভায় চুরি ও খুন করিতে বলে না? তর্ক উঠিবে, সামাজিক প্রথা-বশতঃ ভদ্রমহিলাদের এরূপ ভিক্ষা দ্বারা দানসংগ্রহে বাধা আছে। আছে তাহা জানি; সেইজন্যই ত এত কথা লিখিতে হইতেছে। কিন্তু যে-বাধা থাকায় কোনও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ভদ্রমহিলাদের চেয়ে গণিকাদের কার্য্যসৌকর্য্য অধিক হয় ও পদবী শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা উপযুক্তরূপ সাবধানতার সহিত দূর করিবার চেষ্টা কেন করা হয় না?

বস্তুতঃ, যে-সব কাজ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ভদ্রনারীরা করেন, সেরূপ কিছু বঙ্গে নারীদের দ্বারা করাইতে হইলে পতিতা নারীদের সাহায্য লইতে হয় এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে অল্পকালের জন্যও শ্রেষ্ঠতা দিতে হয়, ইহা বাঙালী সমাজের খুব লজ্জার বিষয়।

শেষে আর একটা কথা বলা দরকার। ব্রাহ্মসমাজে ও খৃষ্টিয়ান সমাজে অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজের চেয়ে কম; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুনারীদের সমান স্বাধীনতা বাঙালী ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান নারীদের নাই। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান নারীরা এই কারণে এবং বৃহত্তর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের প্রভাব ও বিরুদ্ধভাব অতিক্রম করিতে পারেন না বলিয়া, নারীদের দক্ষিণ ভারতের, নারীদের মত স্বাধীনভাবে তাঁহারা শিক্ষালাভ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন না।

—

মৎস্য-ব্যবসায়ের বিদ্যালয়

ঢাকায় এগারটি মৎস্য-ব্যবসায়ের বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। অন্য সব জেলাতেও এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

—

হিন্দুমুসলমানের হ্রাসবৃদ্ধি

১৯২১ সালে যে মানুষ-গণ্‌তি হয়, তাহাতে দেখা গিয়াছে, যে, বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে, হিন্দুর সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। অনেক বৎসর আগে বঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল। ১৯১১ সালের মানুষ-গণ্‌তিতে দেখা যায়, যে, বাঙালী হিন্দু অপেক্ষা, বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা বেশী। এই

পার্থক্য পরবর্ত্তী দশ বৎসরে আরো অধিক হইয়াছে। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বাড়িবার একটা কারণ অবশ্য এই. যে. পূর্ব্ববঙ্গের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া তথায় মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তথায় মানুষের সংখ্যা কমিয়াছে; এবং পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। কিন্তু বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকরতা হিন্দুর হ্রাসের একমাত্র বা প্রধান কারণ হইতে পারে না। কেন না, পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানেরা শতকরা যত জন বাড়িয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা সেই সেই জেলা শহর ও গ্রামে বাস করিয়াও শতকরা তত জন বাড়ে নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে, আবহাওয়া মুসলমানের বৃদ্ধি ও হিন্দুর হ্রাসের একমাত্র বা প্রধান কারণ হইতে পারে না; অন্য কারণও আছে। তৎসম্বন্ধে আমাদের অনুমান ও বক্তব্য লিখিতেছি।

মুসলমান-সমাজে হিন্দু-সমাজের মত জাতিভেদ না থাকায় যে-কোন মুসলমান যে কোন ব্যবসা বা বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করিতে পারে। হিন্দুর জাতিভেদের বন্ধন কিছু শিথিল হইয়াছে বটে; কিন্তু তথাপি বঙ্গের ব্রাহ্মণাদি "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দু জুতা সেলাই করিতে পারে না, এবং চাষ করে না। বাঙালী ব্রাহ্মণাদি জাতি কুলি মজুর মুটের কাজও করে না। চামড়া, হাড়, প্রভৃতির ব্যবসাও "উচ্চ" জাতির হিন্দুরা করে না বলিলেও চলে। কোচ্‌ম্যান্, দরজি, দপ্তরী. ছাপাখানার জমাদার, প্রভৃতি কাজে মুসলমানই বেশী। ইংরেজ-ফিরিঙ্গীদের গৃহভৃত্য ও পাচকের কাজও মুসলমানেরাই প্রধানতঃ করে। সমুদ্রগামী জাহাজে এবং নদীবাহী ষ্টীমারে সারেঙ্গ, লস্কর প্রভৃতির কাজ মুসলমানেরাই করে। সম্ভবতঃ পৈত্রিক ভিটার মায়া হিন্দুর বেশী, এবং সেইজন্য জীবিকার অন্বেষণে সাধারণ হিন্দু-বাঙালী নদীর চর বা নূতন কোন স্থানে গিয়া চাষবাস করিতে তত সহজে চায় না, মুসলমানেরা যত সহজে করে। জীবিকানির্ব্বাহের উপায় যাহাদের যত বেশী-রকম আছে, তাহাদের অন্নাভাব তত কম, সুতরাং তাহাদের সংখ্যাও বাড়ে বেশী।

তা ছাড়া, হিন্দুর খাদ্যাখাদ্যবিচার মুসলমানের খাদ্যাখাদ্যবিচার অপেক্ষা বেশী এবং কঠোর। এইজন্যও মোটের উপর হিন্দুর খাদ্য অপেক্ষা মুসলমানের খাদ্যে রকমওয়ারী ও পুষ্টি বেশী থাকিবার কথা। সেইজন্য মুসলমানদের শারীরিক সামর্থ্য বেশী হওয়ায় সংখ্যাও বাড়ে বেশী।

হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কুলীন, বংশজ, মৌলিক প্রভৃতি ভেদ, কুলীনের নানা শ্রেণী, মেল, থাক্, প্রভৃতি থাকায়, এবং কন্যাপণ ও বরপণ প্রভৃতি থাকায়, অনেক হিন্দু পুরুষের বিবাহই হয় না, এবং অনেকের বিবাহ খুব বেশী বয়সে হওয়ায়, যত সন্তান হইতে পারিত, তত হয় না। মোটামুটি কুড়ি বৎসর বয়স হইতে যদি পুরুষের সন্তান হইবার বয়সের আরম্ভ ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, যদিও বঙ্গে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান বেশী, তথাপি কুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া অবিবাহিত হিন্দু-পুরুষের চেয়ে অবিবাহিত মুসলমান-পুরুষের সংখ্যা কম। তালিকা নীচে দিলাম।

অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
২০-২৫	৩৪১,১৭২	২৯৮,২১৩
২৫-৩০	১৭৪,১৫৮	১২৫,৮৬৭
৩০-৩৫	৬৪,৩৫৬	২৮,৩১১
৩৫-৪০	৩২,৩৭৪	১১,১০৪
৪০-৪৫	২৩,৮৮৩	৮,৪৫৫
৪৫-৫০	১২,৫৭৯	৩,৭৪৬
৫০-৫৫	১০,৯৪৪	৩,৮৮৯
৫৫-৬০	৫,০২২	১,১০৭
৬০-৬৫	৬,২৫০	২,৪০৮
৬৫-৭০	২,০৯২	৫২৫
৭০ ও তার বেশী	৪,১৮৯	১,৭৫৪

তালিকাটি হইতে দৃষ্ট হইবে, যে, প্রত্যেক বয়সে অবিবাহিত মুসলমান অপেক্ষা অবিবাহিত হিন্দুর সংখ্যা বেশী, অথচ বঙ্গের মোট হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের চেয়ে কম। হিন্দু পুরুষ ১০৫৪৫৭১৪; মুসলমান পুরুষ ১২২৪৫৫৪২। ইহার মানে এই, যে, যত মুসলমান পুরুষের বংশবৃদ্ধি ও রক্ষা হয়, তত হিন্দু পুরুষের হয় না। অবশ্য

খুব বুড়া মানুষদের সন্তান হয় না। কিন্তু এককালে তাহারাও যুবা ও প্রৌঢ় ছিল, বলিয়া, তাহাদেরও সংখ্যা দেওয়া গেল।

কোন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই বিধবার বিবাহে বাধা নাই, সকল শ্রেণীর মধ্যে উহা প্রচলিত আছে। কিন্তু বঙ্গে হিন্দুদের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও বিধবার বিবাহ প্রচলিত নাই বলিলেও চলে। এই কারণে সন্তান হইবার আগে হিন্দুনারী বিধবা হইলে তিনি আর পুত্রকন্যার জননী হইয়া গৃহস্থালী পাতিতে পারেন না; সন্তানবতী কেহ সন্তান হইবার বয়স থাকিতে থাকিতে বিধবা হইলে তাঁহারও পুনর্ব্বার বিবাহ হইয়া সন্তান হয় না। মুসলমান সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের মধ্যে জননী বেশী, সুতরাং উহার লোকসংখ্যার বৃদ্ধিও হিন্দুসমাজ অপেক্ষা বেশী হয়।

আমাদের দেশে যদিও পনের বৎসরের আগেও বালিকাদের সন্তান হয়, তথাপি পনেরকেই মা হইবার ন্যূনতম বয়স ধরিয়া লইয়া আমরা দেখাইতেছি, যে, তাহার পর প্রত্যেক বয়সে মুসলমান বিধবা অপেক্ষা হিন্দু বিধবার সংখ্যা বেশী, যদিও মোট হিন্দু নারীর সংখ্যা (৯৮৩২০৭৯) মোট মুসলমান নারীর সংখ্যা (১১৭৪৪১৭৭) অপেক্ষা কম। খুব বেশী বয়সের বিধবাদেরও সংখ্যা দিলাম এইজন্য, যে, এক সময়ে তাঁহাদেরও সন্তান হইবার বয়স ছিল, যদিও তাঁহারা সেই বয়সে কিম্বা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বিধবার সংখ্যা

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
১৫-২০	৯৩১৬৭	৪১৫৮২
২০-২৫	১৪০৭২১	৫৯৯৯০
২৫-৩০	২০৯৩১৮	১০৬৮৩০
৩০-৩৫	২৪১১৫৭	১৫৫৯২৮
৩৫-৪০	২৪৬৭৩৫	১৭৪২৬২
৪০-৪৫	৩১৯১২১	২৬৪৮১২
৪৫-৫০	২৩৯৮১০	১৮৬৫৮৪
৫০-৫৫	৩১৭৬২৩	২৮৬৩৫৩
৫৫-৬০	১৬৫৬৮১	১১৩৬৯১
৬০-৬৫	২৫৪১১৭	২২৯৪৬৯
৬৫-৭০	৮৪৩২৮	৫৩৭৫৮
৭০ ও তার বেশী	১৭৯২৭৫	১৪২৭৩৭

বিবাহের বয়স থকিলেও বিধবার বিবাহ না হইলে যেমন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বাধা হয়, তেমনি পুরুষ বিপত্নীক হইলে, বিবাহ করিবার বয়স থকিতেও যদি পুনর্ব্বার বিবাহ না করে, কিম্বা ইচ্ছাসত্ত্বেও যদি বিবাহ করিতে না পারে, তাহা হইলে, সে বিবাহ করিলে লোকসংখ্যা যত বাড়িতে পারিত, তত বাড়ে না। সেন্সস্ রিপোর্টে দেখা যায়, মুসলমান-সমাজ অপেক্ষা হিন্দু-সমাজে বেশী-সংখ্যক পুরুষ বিপত্নীক থাকে। ইহাও মুসলমানদের সংখ্যা-বৃদ্ধির এবং হিন্দুদের সংখ্যা-হ্রাসের একটি কারণ। বিপত্নীকদের সংখ্যা নীচে দিতেছি।

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
৫ পর্য্যন্ত	৭৫	৫৫
৫-১০	৬৫৮	৬৯৯
১০-১৫	২০৮৭	২২৪৫
১৫-২০	৬১৮৬	৫৯৮৮
২০-২৫	১৪৯৮৭	১৪১১০
২৫-৩০	৩১৮৫৭	২৭১০০
৩০-৩৫	৩৯৯৩১	২৮৩১৮
৩৫-৪০	৪৫০২৬	২৭৫৩৮
৪০-৪৫	৫৯৭১৪	২৯৮৬৭
৪৫-৫০	৫২৭৩১	২৩৪০৮
৫০-৫৫	৬৭১৪৯	৩১৭৭৫
৫৫-৬০	৪২৩৮২	১৬৬২৮
৬০-৬৫	৬১৯০৪	৩২৩৫৮
৬৫-৭০	২৪২০৮	১০৭০৪
৭০ ও তদূর্দ্ধ	৫৭৯৯৮	৩৭৪৫১

বৃদ্ধ বিপত্নীকদের সংখ্যাও এইজন্য দিয়াছি, যে, এক সময়ে তাহাদেরও বিবাহের বয়স ছিল, যদিও তাহারা সেই বয়সে কিম্বা বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

ইহাও দেখা যায়, যে, বুদ্ধি ও বিদ্যায় অগ্রসর শ্রেণীর

লোকদের এবং ধনী ও বিলাসী শ্রেণীর লোকদের সন্তান কম হয়। এই দুই শ্রেণীর লোক বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে কত আছে, জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ হিন্দুদের মধ্যেই বেশী। কিন্তু বুদ্ধিবিদ্যা, এবং ধন ও বিলাসিতায় সংখ্যাবৃদ্ধির ন্যূনতা সাধন করিলেও, তদ্দারা কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা কমিয়া যাইবার কথা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, ইংলণ্ডের লোকদের বুদ্ধিবিদ্যা ও শিক্ষা এবং ধন ও বিলাসিতা বাঙালীদের চেয়ে ঢের বেশী; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে।

ধর্ম্মবিশ্বাসবশতঃ চিরকুমার থাকিয়া বহুসংখ্যক হিন্দু সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। মুসলমানদের মধ্যেও ফকীর অনেকে হন, কিন্তু ফকীর হইলেই অবিবাহিত বা চিরকুমার থাকিতে হইবে, ফকীরীর এমন কোন নিয়ম নাই।

—

বরপণ ও কন্যার স্ত্রীধন

যাহারা ছেলের বিবাহে পণ আদায় করে এবং যে ছেলেরা নিজে তাহার সমর্থন করে, বা নিজেও দাবী করে, কিম্বা এরূপ দাবীতে বাধা না দেয়, তাহাদিগকে মশা, ছারপোকা ও জোঁক বলিলে তাহাদিগকে গালি দেওয়া হয় না, বরং সম্মানই করা হয়। কারণ মশা, ছারপোকা ও জোঁক যে রক্ত শোষণ করে, তাহা তাহাদের স্বভাব, তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু করিবার শক্তি ও স্বাধীন বুদ্ধি তাহাদের নাই। কিন্তু মানুষের স্বাধীন বিচারশক্তি আছে, ভালমন্দ জ্ঞান আছে, ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। তাহা সত্ত্বেও মানুষ যদি নিকৃষ্ট প্রাণীর মত ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারা নিকৃষ্ট প্রাণী অপেক্ষা নীচ হইয়া যায়। কারণ, মশা প্রভৃতি যাহা করে, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবে জীবনযাপন করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই বলিয়াই করে, তজ্জন্য তাহারা দোষী নয়। কিন্তু মানুষ যদি মশা, ছারপোকা ও জোঁকের মত হয়, তাহা হইলে সে অবশ্যই ঐ সকল জীব অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় হইয়া যায়।

এইজন্য সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বরপণ আদায়ের সমর্থন কোন-মতেই করা যায় না।

নরনারীর প্রেমেরই পরিণতি দাম্পত্য সম্বন্ধ। সেই প্রেমের রীতিই এই, যে, পুরুষ নিজের পুরুষকার ও প্রেমের দ্বারা নারীর হৃদয় জয় করিবে। তাহার পরিবর্ত্তে যদি কোন পুরুষ বা তাহার জন্য অন্য কেহ নারীর পক্ষ হইতে খোসামোদ সাধ্যসাধনা ও মূল্য চায়, সে ব্যক্তি কাপুরুষ ও নীচাশয়।

এই দিক্ দিয়াও বরপণ-প্রথা অতীব নিন্দনীয়।

কিন্তু বরপণ যেমন নিন্দনীয়, কন্যার পিতার পক্ষে কন্যাকে আত্মনির্ভরে অসমর্থ রাখাও তেমনি অতিশয় গর্হিত আচরণ। আমাদের দেশে সচরাচর কন্যাদিগকে অশিক্ষিত রাখা হয়। কৃষক প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের বাড়ীর মেয়েরা তাহাদের কৌলিক কাজে সহায়তা করে, এবং বাড়ীর বাহিরে গিয়াও রোজ্গার করে। অবশ্য শিক্ষা তাহাদের জন্যও প্রয়োজন, যদিও শিক্ষা না পাইলেও তাহারা কিছু অর্থাগমের কাজ করে। যে-সকল শ্রেণীর লোকেরা মাঠে বা অন্যত্র শারীরিক শ্রমের কাজ করে না, তাহাদের কন্যাদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন চিরকালই ছিল, এখনও আছে। অধিকন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যে, হিন্দুবালিকাদের শিক্ষার জন্য যে-সব বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তাহার কর্ত্তৃপক্ষেরা হিন্দু শিক্ষয়িত্রী পাইলে ব্রাহ্ম চান না, ব্রাহ্ম পাইলে খৃষ্টিয়ান্ চান না। সুতরাং যদি হিন্দু বালিকারা শিক্ষিতা হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিবাহ হইতেছে না বলিয়া পিতামাতাকে ঘোর বিপন্ন ও উদ্বিগ্ন হইতে হয় না, পিতামাতাকে নিরুদ্বেগ করিবার জন্য কোন কন্যার স্নেহলতা হইতেও হয় না। কিন্তু পিতার অবস্থা ভাল হইলেও অধিকাংশ স্থলে তিনি শিক্ষার জন্য যত কিছু ব্যয় তাহার পুত্রের নিমিত্তই করেন, কন্যার জন্য করেন না, করিলেও পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ের তুলনায় সামান্যই করেন। এরূপ স্থলে, ন্যায় অনুসারে, পিতা যখন কন্যার বিবাহ দেন, তখন শিক্ষার ব্যয়ের সমান মূল্যের সম্পত্তি তাহাকে লেখাপড়া করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভ্রম-নিবারণের জন্য স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, যে, সম্পত্তি কন্যার স্ত্রীধনরূপে তাহাকেই দিতে হইবে, জামাতাকে বা বৈবাহিককে নহে। যে সঙ্গতিপন্ন পিতা

কন্যাকে সুশিক্ষিত করিবে না, অথচ কন্যাকে স্বেচ্ছায় স্ত্রীধনও দিবে না, তাহার গলায় গামছা দিয়া বৈবাহিক যদি খুব টাকা আদায় করে, তাহা হইলে বৈবাহিকের ব্যবহারের নিন্দা করিব বটে, কিন্তু ইহাও বলিব, যে, কর্ত্তব্যবিমুখ পিতার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।

অনেক সঙ্গতিপন্ন পিতা জামাতাকে নিজব্যয়ে শিক্ষা দিয়া চাকরী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী, প্রভৃতি কাজের যোগ্য করিয়া তুলেন। ইহাতেও কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য ঠিক্ করা হয় না। সকলের চেয়ে বড় সম্পত্তি তাহা যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না এবং যাহা মানুষকে আত্ম-নির্ভরক্ষম করে। নারীর পক্ষে সাধারণ বিদ্যা ও পরা বিদ্যা এবং নানাবিধ কারুকার্য্য এই শ্রেণীর সম্পত্তি। টাকা কড়ি জমি জায়গা যদি দিতে হয়, কন্যাকেই তাহার স্ত্রীধনরূপে দেওয়া উচিত, এবং তাহার উপর তাহাকে শিক্ষাও দেওয়া উচিত। শিক্ষা পাইলে স্ত্রীধন রক্ষার ক্ষমতাও বাড়ে। অধিকন্তু কেহ যদি জামাতার শিক্ষার ব্যয় দিতে চান, দিতে পারেন। কিন্তু শ্বশুরের ব্যয়ে শিক্ষালাভ করায় কাহারও গৌরব বা পুরুষকার বাড়ে না, কন্যার মনেও স্বামীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্ভব না হইতে পারে।

যাহাদের অবস্থা ভাল নয়, তাঁহাদের পক্ষে কন্যাকে সুশিক্ষিত করা আরো দরকার। সুশিক্ষিতা কন্যার বিবাহ যতদিন না হয়, ততদিন তিনি আত্মনির্ভরক্ষম হইয়া থাকিতে পারেন; যদি কখনও বিবাহ না হয় তাহা হইলেও তাঁহাকে একান্ত বিপন্ন বোধ করিতে হয় না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত পুরুষ-নারী সকলের পক্ষেই বিবাহ স্বাভাবিক ও শ্রেয়। কিন্তু বাধ্য হইয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া বিবাহিত হওয়া কল্যাণকর নহে।

যাঁহাদের অবস্থা ভাল নহে, তাঁহাদের কন্যাদিগকেও সুশিক্ষিত করা উচিত বলায় অনেকে এই বলিয়া আপত্তি করেন, যে, পুত্রদের শিক্ষা দেওয়াই কঠিন, তাহার উপর কন্যাদের শিক্ষা দিতে বলিলে বোঝাটা দুর্বহ হইবে। কিন্তু "কন্যাদায়" নামক জিনিষটি অপেক্ষা কি ইহা দুর্বহ হইবে? "কন্যাদায়"-গ্রস্ত পিতাকে যে উদ্বেগ ও অপমান সহ্য করিতে হয়, কন্যাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টাতে অন্ততঃ সে উদ্বেগ ও অপমান নাই। "কন্যাদায়" কথাটার মধ্যেই মাতৃজাতির প্রতি এমন একটা অপমান নিহিত রহিয়াছে, যাহাতে সমাজের মাথা হেঁট হওয়া উচিত। গরীব পিতা-মাতাও যে কন্যাকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক গরীব ব্রাহ্ম দেখাইয়াছেন, এবং কাহারও কাহারও শিক্ষিতা কন্যা বার্দ্ধক্যে তাঁহাদের ভরণপোষণেরও সহায় হইয়াছেন।

"কন্যাদায়গ্রস্ত" পিতা ঋণ বা ভিক্ষা করিয়া যদি "বিপদ্" হইতে উদ্ধার পান, তাহার দ্বারা সামাজিক কুপ্রথা এবং মাতৃজাতির অপমানের সমর্থন করা হয়; এবং নিজেকেও অপমানিত হইতে হয়। পুত্রের শিক্ষার জন্য অনেকে ঋণ করেন বা অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। কন্যার জন্যও তাহা করিলে "কন্যাদায়" হইতে উদ্ধার লাভের জন্য ঋণ বা ভিক্ষা করার মত অগৌরব তাহাতে থাকিবে না, এবং তাহার দ্বারা কোন সামাজিক কুপ্রথার সমর্থনও করা হইবে না। অধিকন্তু অসময়ে ইহা কাজে লাগিতেও পারে; কারণ কন্যাদের পিতৃমাতৃভক্তি ও কৃতজ্ঞতা পুত্রদের চেয়ে কম নহে।

বরেরা যতদিন কাপুরুষ ও "নীচাশয়" থাকিবে, বরপণ ততদিন থাকিবে। কন্যারা যত দিন অশিক্ষিতা ও আত্মনির্ভরে অসমর্থা থাকিবেন, বরপণ ততদিন থাকিবে। কন্যারা সুশিক্ষিতা ও তাহার ফলে আত্মনির্ভর-সমর্থা ও তেজস্বিনী হইলে বরেরা শায়েস্তা হইবে, এবং তাহাদের কাপুরুষতা লজ্জা পাইবে। কন্যাদের সুশিক্ষা ভিন্ন বরপণ-প্রথা বিনষ্ট হইবে না।

মা-লক্ষ্মীরা সুশিক্ষিতা হইয়া সমাজের ভূষণ হউন। "কন্যাদায়" কথাটা বাংলা-ভাষার অভিধানে অপ্রচলিত শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত হউক। পিতামাতাকে দায়মুক্ত করিবার জন্য আত্মহত্যা কেন শেষ অবলম্বন হইবে?

—

কুষ্ঠরোগ বৃদ্ধি

আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগ বাড়িতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবিষয়ে সেন্সস্ রিপোর্টের উপর নির্ভর করা যায় না। পাদ্রী ফ্র্যাঙ্ক ওল্ড্রীভ্ তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির বিষয় আমরা

অনেক পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলাম। তিনি বলেন—(১) সেন্সস্ অনুসারে কলিকাতায় কুষ্ঠীদের সংখ্যা ২৫৯; কিন্তু ১৯১০ সালে পুলিস্ কলিকাতায় এক হাজারের উপর ভিক্ষুক কুষ্ঠীই গণিয়াছিল। (২) সেন্সস্ অনুসারে বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠীর সংখ্যা ২১৫২, কিন্তু ১৯২০ সালে ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভাস্ সাহেব লিখিয়াছিলেন, যে, তিনি তাহার আগে দুর্ভিক্ষের সময় নিরন্ন লোকদের সংখ্যা গণনা করাইবার সময় তদ্রূপ কুষ্ঠীদেরই সংখ্যা ৪৬৯৮ পাইয়াছিলেন। (৩) ডাক্তার মিওরের কুষ্ঠচিকিৎসা-কক্ষে চিকিৎসার্থী ত্রিশ জন কুষ্ঠীকে তিনি সেন্সসের পর জিজ্ঞাসা করিয়া জানেন, যে, তাহাদের মধ্যে কেবল দুজনকে কুষ্ঠী বলিয়া সেন্সসে লেখা হইয়াছে।

মধ্য-যুগে ইউরোপে কুষ্ঠ রোগের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল; কিন্তু এখন প্রায় নাই বলিলেই চলে। কুষ্ঠীদিগকে সুস্থ লোকসমূহ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা, জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নতি করা, চিকিৎসা, প্রভৃতি উপায়ে ইউরোপে এই ফল লব্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার নিমিত্ত একদিকে যেমন গবর্ণমেণ্টের সচেষ্ট হওয়া দর্কার, তেমনি জনসাধারণেরও সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। দুই বৎসর আগে সংশোধিত কুষ্ঠ-আইন অনুসারে গবর্ণ্মেণ্ট্ কুষ্ঠী ভিক্ষুকদিগকে জোর করিয়া সুস্থ জনসাধারণ হইতে পৃথক্-স্থানে রাখিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণ্মেণ্ট্ মেদিনীপুরের নিকট কুষ্ঠ-উপনিবেশ স্থাপনার্থ জায়গাও লইয়াছেন। গত বৎসর কুষ্ঠ-মিশন গবর্ণ্মেণ্ট্কে এই উপনিবেশের জন্য ৫২,০০০ টাকাও দেন। এই কাজটি শীঘ্র শীঘ্র হওয়া দর্কার।

কারণ, কুষ্ঠ যে সংক্রামক ব্যাধি, এখন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বলিলেও চলে। সুতরাং ভিক্ষুকেরা যাহাতে রাস্তায় ঘাটে মস্জিদে মন্দিরে গির্জ্জায় রোগের বীজ বিস্তার করিতে না পারে, সে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি এ-বিষয়ে বড় কম। আমাদের বাড়ী বাঁকুড়ায়। সেখানে আমরা শৈশব হইতে দেখিতেছি, কুষ্ঠরোগীরা অন্যের সঙ্গে একই পুকুরে স্নান করে, অন্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে খায়, এমন কি নিমন্ত্রণের সময় পরিবেষণে তাহাদের অতিরিক্ত উৎসাহ দেখা যায়। ইহা অপেক্ষা পরিতাপ ও আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে, যে কুষ্ঠরোগী মিষ্টান্ন, আটা, পাণখিলি, কাপড়সেলাই, প্রভৃতির দোকান করে?

কুষ্ঠরোগীদিগকে একটা আলাদা জায়গায় আবদ্ধ এই উদ্দেশ্যে করা হইবে না, যে, তাহারা তথায় পচিয়া মরুক। এখন চালমুগরার পাকা বীজের তেলের সারাংশ রোগীদের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া ও তদ্বিধ অন্যান্য চিকিৎসা-প্রণালী দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে, অনেক প্রথম অবস্থার রোগী সারিয়া যাইতেছে, এবং অন্য অনেকের রোগের উপশম হইতেছে। পুরুলিয়া, রাণীগঞ্জ, নৈনী, গোব্রা, ডিহ্পল্লী প্রভৃতি স্থানের কুষ্ঠাশ্রম-সকলের সংবাদ লইলে ইহা জানিতে পারা যায়।

ভিক্ষুক কুষ্ঠরোগীদিগকে শীঘ্রই কুষ্ঠাশ্রমে সরান উচিত। যতদিন সরান না হইতেছে, ততদিন তাহাদিগকে পয়সা বা অন্য মুদ্রা ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহা সুস্থ লোকদের হাতে যাইবে; খাইবার জিনিষ দেওয়া যাইতে পারে। চাউল দেওয়াতেও বিপদ্ আছে, কারণ তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাইলে রোগী দোকানে দিয়া পয়সা বা অন্য জিনিষ লইতে পারে। বস্তুতঃ কুষ্ঠরোগীদিগকে স্বতন্ত্র উপনিবেশে রাখিয়া চিকিৎসা করাই একমাত্র নিরাপদ্ উপায়। যে-সব রোগী ভিক্ষুক নহে, তাহাদেরও চিকিৎসা হওয়া উচিত।

—

রেলে যাতায়াত

যুদ্ধের আগে পূজার ছুটি ও বড়দিনের ছুটি প্রভৃতিতে রেল-কর্ত্তৃপক্ষেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে এক ভাড়ায় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে প্রায় দেড়া ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দিতেন; কিন্তু তখনও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে কোন সুবিধা দিতেন না। যুদ্ধের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত কম ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা বন্ধ ছিল। এখন আবার আগামী বড়দিনের ছুটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে কোন কোন রেলে কিছু সুবিধা দেওয়া হইবে। পূজার ছুটিতে কেন দেওয়া হইল না? দেশের

অধিকাংশ লোক হিন্দু, তাহাদের উৎসবের সময় সুবিধা না দিয়া কেবল অল্পসংখ্যক ইংরেজ ফিরিঙ্গী ও দেশী খৃষ্টিয়ানদের উৎসবের সময় সুবিধা দেওয়া ঠিক হয় নাই।

রেল-কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার বরাবর এইরূপ হইয়া আসিয়াছে, যেন গরীব যাত্রীরা কেউ নয়, ধনী এবং ইংরেজ ফিরিঙ্গীরাই সব। অথচ রেলের সমুদয় যাত্রীর মধ্যে শতকরা ৯৮ জন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী; মোট ৫৬ কোটি যাত্রীর মধ্যে ৫৪½ তৃতীয় শ্রেণীর। গত বৎসর তাহারা কেবল সংখ্যাতেই বেশী ছিল না, টাকাও খুব বেশী দিয়াছে। গত বৎসর রেলগুলি যাত্রী বহন করিয়া ৩৫ কোটি টাকা অর্জ্জন করে; তাহার মধ্যে ২৯ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৮৩ টাকা তৃতীয় শ্রেণী হইতে প্রাপ্ত। অথচ তাহাদিগের প্রতি বরাবর পশুর অধম ব্যবহার করা হইতেছে।

ইহা সত্য যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা প্রত্যেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রত্যেকের চেয়ে কম ভাড়া দেয়। কিন্তু তাহারা যে ভাড়া দেয়, তুলনায় তাহার সমতুল্য কিছু সুবিধা ও আরামও যে পায় না। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা প্রত্যেকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের চেয়ে চৌদ্দগুণ বিস্তৃত স্থান পায়, কিন্তু তাহারা ভাড়া দেয় তৃতীয় শ্রেণীর ছয়গুণ বেশী। ইহার সোজা মানে এই, যে, প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ভাড়ার বিনিময়ে প্রাপ্য স্থানের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী স্থান পায়, তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা ভাড়ার বিনিময়ে ন্যায্য প্রাপ্য স্থানের অর্দ্ধেকেরও কম স্থান পায়। শুধু কি তাই? প্রথম শ্রেণীর গাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাহার অপেক্ষা-গৃহ ভোজন-গাড়ী, আলো, পাখা, পায়খানা, হাতমুখ ধুইবার পাত্র, জলের বন্দোবস্ত, আয়না, আল্‌না, সবই উৎকৃষ্ট; তাহাতে যাত্রীরা রাত্রে ঘুমাইতেও পারে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী অতি নোংরা; গদি নাই; সব গাড়ীতে পায়খানা নাই, যাহাতে আছে তাহা অতি সংকীর্ণ, জল কচিৎ পাওয়া যায়, ধোওয়া পরিষ্কার করা কখনও হয় কি না বুঝিবার জো নাই, রাত্রে আলো প্রায় থাকে না, অনেক গাড়ীর পায়খানাতে আলোর বন্দোবস্তই নাই, কাপড় রাখিবার জন্য একটা খুঁটি পর্য্যন্ত নাই, সাবানাদি রাখিবার জায়গার ত কথাই নাই; হাজার মাইলের যাত্রীরও ঘুমাইবার ব্যবস্থা নাই; টিকিট পাইতে হইলে অনেক ধাক্কাধাক্কি ও অপমান সহিতে হয়; অপেক্ষা-গৃহ না থাকার মধ্যে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা অধিকাংশ নিরক্ষর, গরীব; তাহাদের বাক্‌শক্তি থাকিয়াও নাই। সেইজন্য তাহাদের এই দুর্দ্দশা।

তাহার পর আর-একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, যে, তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের দেওয়া ভাড়া হইতেই রেলের লাভ হয়, প্রথম শ্রেণীর গাড়ী-সকলের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা আয় অপেক্ষা বেশী। সুতরাং এখানে একটি প্রতারণা বা ডাকাতি, যাহাই বলুন, চলিতেছে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা অন্যের প্রদত্ত ভাড়ার সাহায্যে নবাবী করিতেছেন। তাঁহারা সকলে একথা জানেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে ভিক্ষুক, প্রতারক বা ডাকাত কিছুই বলা চলে না। কিন্তু রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে নৈতিক অপরাধ হইতে মুক্তি দেওয়া যায় না। উপযুক্তরূপ তেমন কোন আদালত থাকিলে তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করাও যাইতে পারিত।

মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী, পায়খানা আদি, তৃতীয় শ্রেণী অপেক্ষা কিছু ভাল হইলেও, তাহাতেও তৃতীয় শ্রেণীর মত ভীড় এবং ময়লার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। অপরিচ্ছন্নতার জন্য শুধু যাত্রীদের দোষ দিলে চলিবে না। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ গাড়ীগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিতে ও রাখিতে বাধ্য।

ভারতীয় নারীদের গাড়ীর ব্যবস্থা তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীতে খুব ভাল হওয়া উচিত। প্রত্যেক ট্রেনে তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট গাড়ী থাকা উচিত এবং তাঁহাদের সুবিধা ও আরামের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র নারীকর্ম্মচারী থাকা আবশ্যক। ভারতীয় নারীদের গাড়ীতে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোকেরাও কখন কখন ঢুকিয়া যান, যদিও তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী থাকে এবং তাহাতে আমাদের মেয়েরা ঢুকিতে পান না। অন্তঃপুরিকাদের পুরুষদের সঙ্গে যাতায়াত করিবার অভ্যাস নাই। যথেষ্ট গাড়ীর অভাবে তাঁহারা তাহা করিতে বাধ্য হন বলিয়া তাঁহাদের অসুবিধা ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। মেয়েদের গাড়ীতেও খুব বেশী ঠাসাঠাসি হওয়ায় ঐ কুফল ঘটে। যাহাদিগকে

সপরিবারে রেলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হয়, তাঁহাদের সুবিধার জন্য, ৫ জনের ও ১০ জনের স্থান হয়, এইরূপ দুই প্রকারের কক্ষ থাকা উচিত। ৫ জনের কিম্বা ১০ জনের টিকিট কিনিলে তাহা রিজার্ভ করিতে পারা যাইবে, এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত।

—

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যয়সংক্ষেপ

সরকারী সমুদয় কাজের বিভাগে ও আফিস আদালতে ব্যয়সংক্ষেপের কথা উঠিয়াছে। সুতরাং হাইকোর্টে সেরকম কি হইতে পারে লোকে তাহার আলোচনাও করিতেছে। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগনীতি প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উকীল ব্যারিষ্টাররাই প্রধান আন্দোলক ছিলেন (খবরের কাগজওয়ালাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, কারণ আন্দোলন করাই আমাদের প্রধান কাজ)। আদালতের সঙ্গে আইনজীবীদের স্বার্থ জড়িত থাকে বলিয়া তাঁহারা স্বভাবতঃ সহজে আদালত-সকলের সংস্কার ও ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন না। অন্যদিকে অসহযোগীরা আইনের ব্যবসা ও আদালত উভয়ই বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা দেওয়ায় তাঁহারা এ বিষয়ে বড় কিছু বলেন না। কিন্তু স্বরাজ্য বা পররাজ্য কোন আমলেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় ভাল নয়। তাহাকে অপব্যয় বলে, এবং একদিকে অপব্যয় করিলে অন্যদিকে অত্যাবশ্যক ও ন্যায্য ব্যয় করিবারও টাকা থাকে না।

যদিও বিহার-ওড়িষার স্বতন্ত্র হাইকোর্ট্ স্থাপিত হওয়ায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি কাজ কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছে, এবং যদিও বাংলায় দিন দিন আপীলের সংখ্যা ও গবর্ণমেন্টের আয় কমিয়া যাইতেছে, তথাপি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যয় কমাইবার চেষ্টা হইতেছে না, প্রায় পূর্ব্বেকার মত জজের সংখ্যা বাহাল রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। রেজিষ্ট্রার ও তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমে নাই, তাঁহাদের বেতনও কমে নাই; বরং নূতন অনেক পদের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। অরিজিন্যাল বিভাগেও অনেক নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার কাজ পূর্ব্বে দুই-একজন কর্ম্মচারী চালাইতেন।

হাইকোর্টের জজেরা বড় বেশী ছুটি ও অন্য অবকাশ ভোগ করেন। তাঁহারা বৎসরে টানা এগার সপ্তাহ ছুটি পান। তাহা ছাড়া তাঁহারা ৪১টি রবিবার ও ৪১টি শনিবার এই ৮২ দিন ছুটি পান। ইহা ভিন্ন হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান পর্ব্বের ছুটি আছে। সমুদয় একত্র করিলে দেখা যাইবে, যে, তাঁহারা মোটামুটি ছয় মাস কাজ করেন ও ছয় মাস ছুটি পান। কিন্তু বেতন বার মাসেরই জন্য পেয় বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। আগেকার চেয়ে কাজ কমিয়া গিয়াছে, ইহা মনে রাখিয়া আমরা বলিতে পারি, যে, যদি জজেরা শনিবার কাজে বসেন, ১১ সপ্তাহের পরিবর্ত্তে অন্য দেওয়ানী আদালত-সকলের সমান ছুটি লন, প্রতিদিন যদি ঠিক ১০॥০ টার সময় কাজে বসেন এবং মিটিঙের দিন ৪॥০ টার সময় কাজ ছাড়েন, তাহা হইলে বর্ত্তমানসংখ্যক জজ অপেক্ষা চারি জন কম জজ দ্বারা কাজ চলিতে পারে। তাহা হইলে তাঁহাদের ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের বেতনে বৎসরে ন্যূনকল্পে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে।

আমরা প্রস্তাব করি, যে, এইরূপ ব্যয়সংক্ষেপ করা হউক এবং উদ্বৃত্ত বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হউক। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং যে-সব ব্যারিষ্টার ও উকীল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহার্য্যার্থ টাকা তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা হাইকোর্টের ব্যয় হ্রাস করাইয়া সেই টাকাটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়াইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

আর একপ্রকারে হাইকোর্টের ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। স্বাধীন, ও শক্তিশালী ও সঙ্গতিপন্ন জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি বার্ষিক ৯ হইতে ১০ হাজার টাকা বেতন পান। আমাদের হাইকোর্টের জজদিগকে তাহার পাঁচগুণ বেতন দেওয়া উচিত নহে। জজদের বেতন খুব কমান যাইতে পারে। তাঁহাদের বেতন কমাইয়া উদ্বৃত্ত টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হউক।

ভারতের খুব উচ্চপদস্থ এবং গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী

কলিকাতা হাইকোর্টের জজদের মত এত বেশী ছুটি পান না। বড় বড় ইংরেজ বণিক্‌ও এত ছুটি পান না। কোন কোন বড় ইংরেজ কর্ম্মচারী গরমের সময় পাহাড়ে যান বটে, কিন্তু সকলে যান না। জজেরা কেহ গরম সহ্য করিতে না পারিলে ছুটি পাইতে পারেন; কিন্তু ছুটির জন্য ২।১জন ছাড়া অন্য সকলেরই একসঙ্গে এগার সপ্তাহ (তাও আবার গরমের সময় নহে) অবকাশ ভোগ করিবার কি কারণ আছে, জানি না। হয় ত ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে কোন কারণ ছিল; কিন্তু এখন শীঘ্র বিলাত যাতায়াত, প্রতি সপ্তাহে বিলাতী খবরের কাগজ ও চিঠি, অল্প সময়ের মধ্যে তারে ও বেতারে খবর, ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা, বরফ, স্বজাতীয় বিস্তর পুরুষ ও নারীর সঙ্গ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত, এ-সব সত্ত্বেও দীর্ঘ ৭৭ দিন ছুটি এবং তাহার উপর শনিবারেও নিদ্রা, ইহার সমর্থন কিরূপে করা যায়? আমরা শুনিয়াছি সমুদয় হাইকোর্টে শনিবার ছুটি লওয়ার রীতি নাই।

আসামের বাঙালীপ্রধান দুইটি জেলাকে বঙ্গের সামিল করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট্‌কে প্রাদেশিক গবর্ণ্‌মেণ্টের অঙ্গীভূত করিলে ইহার আয়ব্যয়ের আলোচনা করিয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা করিতে পারেন। ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের রাজধানী যতদিন কলিকাতায় ছিল, ততদিন এখানকার হাইকোর্ট্‌কে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সংশ্লিষ্ট রাখার কারণ ও সার্থকতা ছিল। এখন রাজধানী দিল্লীতে হইয়াছে; এখন কলিকাতা হাইকোর্টের সহিত ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক নাই।

সেইজন্য ইহাও মনে হয়, যে, বঙ্গের আইন-কর্ম্মচারীদের কাজ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সংকীর্ণতর হইয়াছে। পাটনায় হাইকোর্ট্ হওয়াও তাহার অন্যতম কারণ। অতএব আইন-কর্ম্মচারী-বিভাগে কর্ম্মচারীর সংখ্যা-হ্রাস, বেতন-হ্রাস, ইত্যাদি হইতে পারে না কি? তাহা হইলে আরও টাকা বাঁচে, এবং তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া চলে।

ব্যারিষ্টার ও উকীল

কলিকাতা হাইকোর্টের অরিজিন্যাল বিভাগে উকীলেরা কোন পক্ষে হাজির হইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল আপীল করিতে পারেন। তাহাতেও আবার যদি কোন পক্ষে ব্যারিষ্টার ও উকিল দুই-ই থাকেন, তাহা হইলে প্রাচীনতম ও প্রসিদ্ধতম উকীলকে নবীনতম ব্যারিষ্টারের নিম্নস্থানীয় মনে করা হয়। ব্যারিষ্টার ও উকীলদের এই অধিকারভেদ ন্যায্য নহে। আইনের শিক্ষার তফাৎ থাকিলে, এদেশে আইন-শিক্ষার উৎকৃষ্টতম বন্দোবস্ত করিয়া, এই প্রভেদ তুলিয়া দেওয়া উচিত। উকীল ও ব্যারিষ্টারদের অধিকারভেদ তুলিয়া দিবার জন্য আইন পাস্ করাইবার চেষ্টা হইবে। ব্যারিষ্টারেরা সাধারণতঃ প্রভেদ থাকারই পক্ষপাতী।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে জনকতক উকীলকে এড্‌ভোকেট করিয়া দিয়া উকীলদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা দেখাইবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এড্‌ভোকেট্ হওয়াটা জজদের অনুগ্রহসাপেক্ষ থাকিলে অনেক কথা উঠে, উকীলদের স্বাধীনচিত্ততার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, এবং অধিকাংশ যোগ্য উকীল অসন্তুষ্ট হন। এইজন্য এ রীতি ভাল নয়; যেরূপ আইন হইবার কথা শোনা যাইতেছে, তাহাই ভাল। ব্যারিষ্টারেরা এলাহাবাদী রফার পক্ষপাতী হইতে পারেন এবং হয়ত কেহ কেহ এইদিকে জজদের সহানুভূতি পাইবেন ভাবিয়া কোন কোন জজের সন্তোষবিধায়ক কাজও করিতেছেন।

—

অসহযোগ আন্দোলনের ফল

অসহযোগ আন্দোলন সর্‌কারী বা সর্‌কারের জানিত স্কুলকলেজ বর্জ্জন, আফিস আদালত বর্জ্জন, প্রভৃতি যাহা-যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, সামান্যই করিতে পারিয়াছেন। খদ্দর-উৎপাদন ও ব্যবহারও খুব বেশী হয় নাই। অস্পৃশ্যতা দূরও না-হওয়ারই মধ্যে। তথাপি অসহযোগ ব্যর্থ হয় নাই। ইহার দ্বারা স্বাবলম্বনের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, মানুষের সাহস বাড়িয়াছে, ইংরেজ সহায় না হইলে আমাদের আর কোন গতি নাই এই ভাব দূর হইয়াছে, প্রবল বিরোধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াই

বার যে ভরসা বিদ্রোহীকে অনুপ্রাণিত করে, তাহা বাড়িয়াছে। যত অল্প পরিমাণেই হউক, অহিংসা-নীতি বদ্ধমূল হইয়াছে, ব্যক্তিগত শুচিতা ও সত্যপরায়ণতার আবশ্যকতা-বোধ জন্মিয়াছে, সরল অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, গরীব নিরক্ষর লোকদের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং অস্পৃশ্যতা দূর করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। —

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক সভা

বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের বার্ষিক সভায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের কার্য্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন তাহাতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে জীবনের ঐক্য, উদ্ভিদের হৃৎ-স্পন্দন ও স্নায়ু, উদ্ভিদে রস-সঞ্চালন সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কার ও নানা আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত অতি অদ্ভুত কয়েকটি যন্ত্র প্রভৃতির কথা বলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে হইলে শীঘ্র শীঘ্র যশোলাভ করিবার ও জন-সমাজে আদৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা দমনের শক্তি, গভীর অভিনিবেশের শক্তি, প্রভৃতি আবশ্যক বলেন। বসু বিজ্ঞানমন্দিরে গত পাঁচ বৎসরে একশতের উপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসন্ধান হইয়াছে, ইহা কম আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে।
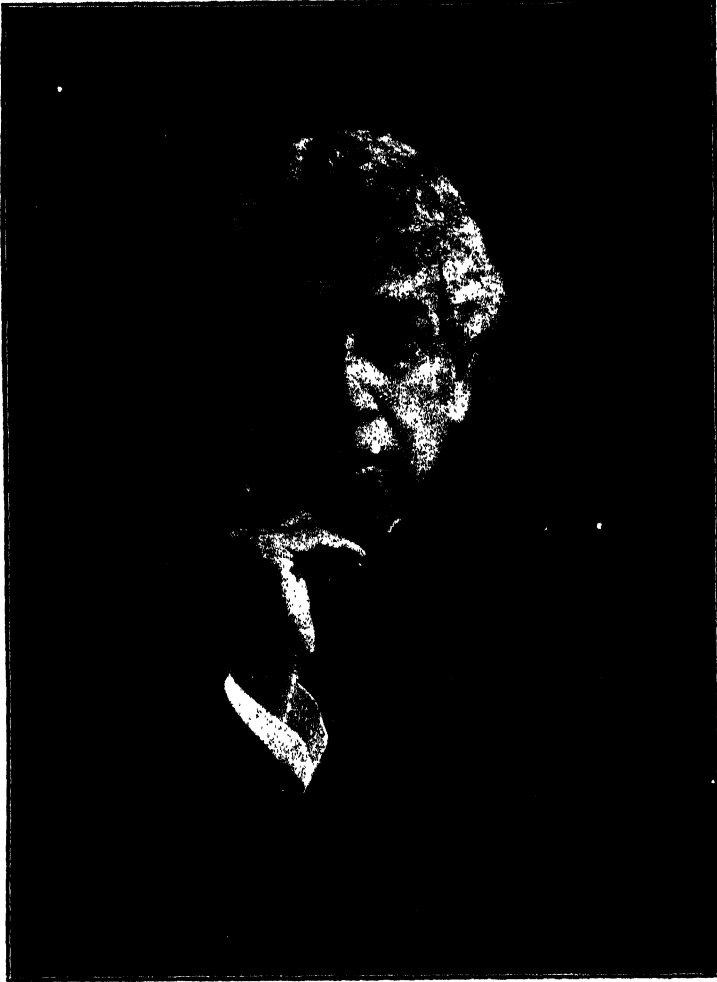
বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, এফ্-আর্-এস্

উদ্ভিদ্-সকল কি প্রকারে রস আকর্ষণ করে, এবং কেমন করিয়া তাহা তাহার শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফলে সঞ্চালিত হয়, সে বিষয়ে বসু মহাশয় প্রচলিত সমুদয় মতকে খণ্ডন করিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার বহি ইংরেজী ও জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত হইবে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে তাঁহার কোন ছাত্র বাংলাতে ইহা লিখিলে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট হয়।

তাঁহার বক্তৃতার পূর্ণ প্রতিলেখন কাগজে বাহির হয় নাই। তিনি তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দিরের নানাস্থানের ছবি দেখাইয়া বলেন, যে, বিজ্ঞানসম্পর্কীয় কিছু জিনিষ বা ঘরবাড়ী প্রতিষ্ঠান আদিকে বিশ্রী হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিজ্ঞান যেমন সত্য, সৌন্দর্য্যও তেমনি সত্য। সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত সুষমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী নহে। আমরা স্মৃতি হইতে তাঁহার এতদ্বিষয়ক কথার তাৎপর্য্য দিলাম। বাস্তবিক বিজ্ঞানাগারে যাহা করা হয়, বিশ্বে জলে স্থলে আকাশে তদপেক্ষা বিশাল ব্যাপার প্রতিনিয়ত সংঘটিত
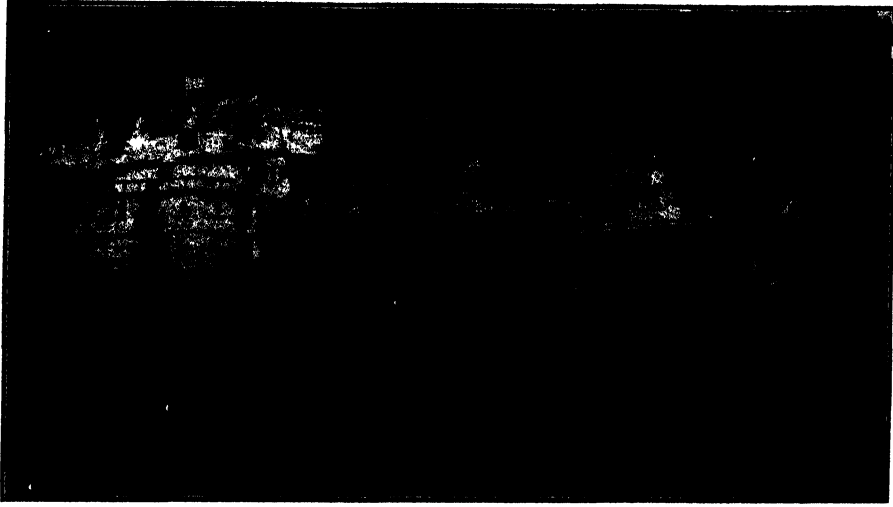
আচার্য্য বসু-মহাশয়ের মায়াপুরী গবেষণা-মন্দির ও বছরাজ বীক্ষণাগার, দার্জ্জিলিং

হইতেছে। অথচ বিশ্বকর্ম্মা এরূপ অনির্ব্বচনীয় চিন্তার অতীত কার্য্য-সকল করিতেছেন বলিয়া বিশ্বকে কারখানার ভাঙ্গা লোহার স্তূপের মত করিয়া রাখেন নাই, তাহাকে নানা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আচার্য্য বসু-মহাশয়ের উদ্ভাবিত বৃক্ষের হৃৎস্পন্দন-লেখক বৈদ্যুতিক-শলাকা

বসু-মহাশয়ের আর-একটি কথা বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীদের আরো বেশী মনে রাখিবার যোগ্য; তাহাও তাঁহার বক্তৃতার প্রতিলেখনে দেখিলাম না। তিনি এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে, আমাদের দেশে আমরা পাশ্চাত্য ধনীদেশ-সকলের মত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তত বেশী টাকা পাইতে না পারি। টাকা না পাইলে আমাদিগকে দারিদ্র্য মানিয়া লইতে হইবে, এবং দারিদ্র্য-সত্ত্বেও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

বয়োবৃদ্ধ ও বয়ঃকনিষ্ঠ, বিখ্যাত ও অবিখ্যাত ভারতীয় সমুদয় বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীর এই কথা মনে রাখা উচিত। আগেকার দিনে জগতের সুবিখ্যাত অনেক বৈজ্ঞানিক খুব সাধারণ রকমের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্র লইয়া মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন।

মন্ত্রীদের ও শাসনপরিষদের সভ্যদের বেতন

জাপানের মত স্বাধীন, শক্তিশালী ও সম্পত্তিপন্ন জাতির প্রধান মন্ত্রী যখন মাসিক পনের ষোল শত টাকা বেতন পান, তখন পরাধীন, শক্তিহীন, দরিদ্র ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ বাংলার শাসনপরিষদের সভ্য ও মন্ত্রীদের বেতন ঐরূপ হইলে যে অন্যায় হয় না, তাহা অনেক বার বলা হইয়াছে; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এইজন্য ঐ কথা পুনঃ পুনঃ বলিবার প্রয়োজন আছে। মন্ত্রীদের বেতন

ব্যবস্থাপক সভাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা। আগামী বৎসরে আবার এই বিষয়টির আলোচনা উত্থাপিত হইলে ভাল হয়। আগে যখন প্রস্তাব হইয়াছিল, যে, মন্ত্রীদের বেতন ১৫০০ হউক, তখন মন্ত্রীরা তাহা গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রভাব বাড়িত, এবং কোন সৎকার্য্যের জন্য সরকারী তহবীলে টাকা নাই বলিলে লোকে যে ভাবে উপহাস করে, তাহা নিবারিত হইত। বেতন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজনই বা কি ছিল? শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ রায় ত আপনা হইতেই বিনা-বেতনে ডেপুটী প্রেসি-ডেণ্টের কাজ করিতেছেন; মধ্যপ্রদেশেও মন্ত্রীরা বার্ষিক ৬৪০০০ অপেক্ষা অনেক কম বেতন লইয়া থাকেন। বাংলার তিন জন মন্ত্রী মাসিক ১৫০০ বেতন লইলে বৎসরে ১৩৮০০০ ব্যয়সংক্ষেপ হইত এবং তাঁহারা এই বৎসরের শেষে দুই বৎসরের উদ্বৃত্ত ২,৭৬,০০০ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঋণ-শোধের জন্য দিতে পারিতেন। যদি শাসনপরিষদের দুজন দেশী সভ্যও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ কম বেতন লইতেন (বর্দ্ধমানের মহারাজার ত একটি পয়সাও না লওয়া উচিত ছিল), তাহা হইলে দুই বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা বাঁচিত, এবং তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া চলিত। এই প্রকারে উহার ঋণ সহজেই শোধ হইয়া যাইত। ঋণ যে যে কারণেই হইয়া থাকুক, উহা যখন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং উহার দ্বারা অতীতে দেশের হিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারে, তখন উহার ঋণশোধ করিতেই হইবে।

আচার্য্য বসু-মহাশয়ের উদ্ভাবিত অণুস্বেদমান (Microtranspirograph) যন্ত্র, যাহাতে বৃক্ষপত্র হইতে নির্গলিত অণুপরিমাণ জলবিন্দুও ধরা পড়ে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ শোধের কথা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করিলাম, কারণ উহা লইয়া সম্প্রতি উত্তেজনা ও দলাদলি হইয়াছে। অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়ের কথাও বলা যাইতে পারে। কুষ্ঠ-উপনিবেশ স্থাপন খুব জরুরী; তাহার জন্য কুষ্ঠ-মিশন (Mission to the Lepers) ৫২০০০ টাকাও গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন। অথচ টাকার অভাবে কুষ্ঠীদিগকে আলাদা জায়গায় রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করা হইতেছে না; ফলে এই বীভৎস ও ভয়ানক সংক্রামক মহাব্যাধি বাড়িয়া চলিতেছে। উত্তর বঙ্গের জলপ্লাবনে নষ্ট হাজার হাজার গৃহ নির্ম্মাণের জন্যও সরকারী সাহায্য খুব আবশ্যক। এইরূপ আরও কত কি ভাল কাজ টাকা থাকিলে হইতে পারে।

—

"নিরেস্ উপাধির কদর্য্য কার্খানা"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট ও উপাধি লাভ কয়েক বৎসর হইতে সহজ হওয়ায় এবং কোন কোন পরীক্ষার্থীকে ভাল পাস করাইবার জন্য নানা অবৈধ উপায় অবলম্বিত হওয়ায় ইহার একটা বদ্নাম হইয়াছে। এই বদ্নাম ভিত্তিহীন নহে। কিন্তু ইহাও সত্য নহে, যে, এখানকার ভাল ছেলেদের উপাধিরও কোন মূল্য নাই। মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছাত্র বঙ্গে এখনও আছে। শিক্ষা দিবার পদ্ধতি এবং পরীক্ষা করিবার প্রণালী মন্দ হইলেও এইসব ছাত্রের কতকটা উৎকর্ষ থাকিবেই। কিন্তু শিক্ষা-প্রণালী ও পরীক্ষার পদ্ধতি উৎকৃষ্টতর হইলে ইহারা আরও ভাল হইতে পারিত, ইহাও ঠিক্। বস্তুতঃ সিবিল সার্ভিস্ এবং রাজস্ব বিভাগের প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বাঙ্গালী ছাত্রদের আগেকার প্রাধান্য রক্ষিত হইতেছে না। সত্য বটে, পরীক্ষা পাস্ করা উৎকর্ষের একমাত্র বা প্রধান প্রমাণ নহে; কখন কখন ইহাতে শ্রম-

শীলতা ও স্মৃতিশক্তি ভিন্ন অন্য কিছুরই বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ছাত্রদেরও উৎকর্ষের পরিচয় পরীক্ষা পাস্ করাতেই প্রধানতঃ পাওয়া যাইত। গবেষণা, নূতন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার তাহার পর তাহারা করিয়াছে। আমাদের ধারণা এই, যে, অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রেরাও সুযোগ পাইলে তাহা করিতে পারিবে। যতটুকু সুযোগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছে, তাহার জন্য প্রশংসা অবশ্য তাহার ন্যায্য পাওনা।

বাংলা দেশের বাহিরে যাঁহারা কাজ করেন কিম্বা যাঁহাদের তথায় যাতায়াত আছে, তাঁহারা জানেন, যে, সর্ব্বত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের প্রতি সম্মানের হ্রাস হইয়াছে। অথচ, বাস্তবিক আমাদের ভাল ছাত্রেরা যে উপেক্ষার যোগ্য নহেন, তাহার একটা স্পষ্ট প্রমাণ এই, যে, এখনও কলিকাতার উপাধিধারীরা ভারতের উত্তরার্দ্ধে নানা কাজে নিযুক্ত আছেন ও হইতেছেন। তাহা হইলেও সকলেই মনে করিতেছেন, "আমরা কলিকাতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছি।" মোটের উপর এই ধারণা ঠিক কি না বলিতে পারি না। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টেই দেখিতে পাই, যে, যে-সব ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িতে আসে, তাহারা অনেকেই কলেজের ব্যাখ্যান বুঝিতে পারে না; কারণ তাহাদের স্কুলের শিক্ষা ভাল হয় নাই। অনেক যোগ্য ব্যক্তি মনে করেন, এবিষয়ে মান্দ্রাজের ছাত্রেরা শ্রেষ্ঠ।

যাহা হউক, কলিকাতা মন্দ হইলেই যে অন্যেরা তাহা অপেক্ষা ভাল, ইহা প্রমাণিত হয় না। আমরা আগেও জানিতাম এবং এলাহাবাদে গত পূজার ছুটিতে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী উভয়বিধ শিক্ষিত লোকদের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, যে, কলিকাতার যে-সব দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, এলাহাবাদেরও সেরকম কোন কোন ও অন্য দোষ আছে; সেখানে লিখিবার লোক নাই বলিয়া সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে না। হয়ত অন্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও এইরূপ দোষ আছে। কিন্তু যদি কোন দোষ সকলেরই থাকে, তাহা হইলেও উহার দূষণীয়তা দূর হয় না; উহা গুণে পরিণত ত হয়ই না।

সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় উহার চ্যান্সেলার স্যার্ হেনরী হুইলার বলেন, যে, তিনি উহাকে "নিরেস উপাধির কদর্য্য কারখানা" (a shabby factory of indifferent degrees) দেখিতে চান না। ভাল কথা। কিন্তু আমাদের মনে হইয়াছে, যে, তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে কলিকাতার প্রতি বিদ্রূপ লুক্কায়িত আছে। নূতন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ কোন বিদ্রূপ না করাই ভাল; বিশেষতঃ যখন উহার অনেক কৃতী অধ্যাপক কলিকাতারই ছাত্র।

—

ঢাকার প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষা

ঢাকার প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষার বোর্ডের নিয়মাবলীতে আছে :—

"The percentage of passes should, as far as possible, reach the average level of Dacca in recent years."

নানা কারণে একই স্কুলের ফল ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন রকম হইতে পারে;—পরীক্ষার্থীরা সব বৎসর সমান দরের থাকে না, পরীক্ষকরাও এক থাকেন না, প্রশ্ন এক এবং (বহু চেষ্টা সত্ত্বেও) সমান কঠিন বা সহজ থাকে না, ইত্যাদি। এই কারণে উল্লিখিত রূপ নিয়ম অসঙ্গত, যদিও, 'as far as possible", "যতটা সম্ভব" বলায় অসঙ্গতি কিছু কমিয়াছে। বহু বৎসর আগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ একটা নিয়ম করিবার প্রস্তাব ও চেষ্টা হয়। আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীণ্ডিকেট্ এই কারণে এই বিষয়ের প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, যে, কৃত্রিম উপায়ে সহজে পাস্-করা ছেলেদিগকে তাঁহারা নিজেদের কলেজসকলে ভর্ত্তি হইতে দিবেন কি না, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তাঁহারা বলিতেছেন :—

"The Hon'ble the Vice-Chancellor and the Syndicate are not able to appreciate how the examiners in each individual subject can mark the answer papers allotted to them in such a manner that the ultimate result of

the examination may reach what is called the average level of Dacca in recent years—unless, indeed, the instruction is interpreted to signify that as many of the candidates should be let through as possible."

কলিকাতার কর্ত্তারা কথাগুলা লিখিয়াছেন ঠিক্। কিন্তু তাঁহাদের ভণ্ডামি দেখিয়া ছুঁচ ও চালুনি সম্বন্ধীয় গ্রাম্য লোকবাক্য মনে পড়ে। ঢাকার কর্ত্তারা "ধরি মাছ না ছুঁই পানী" নীতিতে পারদর্শী না হওয়ায় এবং "শতং বদ মা লিখ" নীতি বিস্মৃত হওয়ায় একটা নিয়ম লিখিয়া ও মুদ্রিত করিয়া বেকুবী করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার কর্ত্তারা কি জানেন না, যে, এখানেও "as many of the candidates should be let through as possible" "যতগুলা সম্ভব পরীক্ষার্থীকে পার করিয়া দিতে হইবে", এই অলিখিত নিয়ম অনুসৃত হয়?

—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কিছুদিন আগে কলিকাতার অনেক ইংরেজী দৈনিকে অধ্যাপক স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব সম্বন্ধে একটি চিঠি ছাপা হয়। তাহার দুএকটা কথা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলিতেছেন :—

"I hold no brief for the faults of omission or commission of which the University authorities might have been guilty during the last few years. No one can deny that unbiassed crticism of public institutions is always desirable and has a healthy effect."

প্রথম বাক্যটির অর্থ ও অভিপ্রায় পরিষ্কার বোঝা যায় না। "might have been guilty," "দোষী হইয়া থাকিতে পরেন", বলিলে ঠিক্ জানা যায় না, যে, তাঁহার মতে দোষ হইয়াছিল বা হয় নাই। গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে তিনি যেমন জোর-গলায় দোষ দিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ হইয়া থাকিলে, তাহাও তেমনি স্পষ্ট করিয়া জোরের সহিত বলা উচিত ছিল। গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে ও সর্ব্বসাধারণকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়াছেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি দোষ দূর করিয়া হয়, এবং টাকা দিয়া হয়। তিনি যদি কেবল টাকা দিতে বলেন, নিজে কোন দোষ নির্দ্দেশ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও ত বলা চলে, যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন, যেহেতু তিনি উহার দোষের উল্লেখ ও সংশোধনচেষ্টা করেন নাই? তবে যদি এমন হয়, যে, তাঁহার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষত্রুটি কিছুই হয় নাই, তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। "Might have been"এর কর্ম্ম নয়; "have been" কিম্বা "have not been" বলিতে হইবে।

সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষ সমালোচনা বাঞ্ছনীয় ও তাহাতে কল্যাণ হয়, তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু এই "নিরপেক্ষ সমালোচনা" জিনিষটি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গবর্ণ্‌মেণ্টের সমর্থিত "অনেষ্ট্‌ স্বদেশীর" (honest Swadeshir) মত কিছু নয় ত? গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ চান এমন স্বদেশী যাহাতে ইংরেজের ব্যবসা একটুও না কমে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও চান এরূপ নিরপেক্ষ সমালোচনা যাহার দ্বারা তাঁহাদের কোন গুরুতর দোষত্রুটি প্রমাণিত হইয়া না যায়। এরূপ বলিবার কারণ এই, যে, সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে যে-কেহ পূর্ণমাত্রায় সমালোচনা করিয়াছে, তাহারই উপর কোন-না-কোন দুরভিসন্ধি আরোপিত ও গালাগালি বর্ষিত হইয়াছে। এইজন্য রায় মহাশয় নিরপেক্ষ সমালোচনার একটা নমুনা, দৃষ্টান্ত বা আদর্শ প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। তিনি তাহা করিলে দেখা যাইত, যে, তাঁহার মত বন্ধুর সমালোচনাকেও কর্ত্তা নিরপেক্ষ মনে করেন কি না।

তাঁহাকে বলিতেছি এইজন্য, যে, তিনি লিখিয়াছেন,

'One could suggest many reforms in the University. It is not very difficult to diagnose its ailments and to suggest the remedies......."

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাধি-নিরূপণ এবং প্রতিকারের উপায়-নির্দ্দেশ যদি বেশী কঠিন নাই হয়, তাহা হইলে এই সোজা কাজটা তিনি কেন করেন নাই, জানিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার খুব সুবিধাও ছিল। তিনি অভাবগ্রস্ত অর্থকামী লোক নন। তিনি চিরকুমার, পুত্রকন্যা নাই। তিনি কিছু সমালোচনা করিলে কর্ত্তারা বলিতে পারিতেন না, যে, লোকটা উমেদার ছিল, নিরাশ হইয়া সমালোচক সাজিয়াছে। তবে হইতে পারে,

যে, একবার আইন-কলেজ ভাঙিবার খেয়াল প্রকাশ করিয়া তিরস্কৃত হওয়ায় (তখন আমরা তাঁহার সমর্থন করিয়াছিলাম মনে থাকিতে পারে) পুনর্ব্বার সমালোচনার সখ্ আর হয় নাই।

যাহা হউক, তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্যাধিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে বেশী কিছু ফল হইত বলিয়াও আশা হয় না। কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "but after all the disease is one of chronic starvation due to want of support from Government", "বস্তুতঃ ব্যাধিটা হচ্চে গবর্ণমেণ্ট টাকা না দেওয়ায় বহুকালব্যাপী অনশন-জাত।" তাহা হইলে বুঝা গেল, যে, ডাক্তার রায়ের মতে গবর্ণমেণ্ট টাকা দিলেই রোগ সারিয়া যাইবে। তাহা হইলে তিনি গোড়ার দিকে "faults of omission or commission of which the University authorities might have been guilty" লিখিয়াছেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। অনশন একটা অপরাধ বা দোষ নয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতেছি, যে, অনশনক্লিষ্ট লোকদেরও দুরকমের দোষ হইতে পারে বটে ; (১) তাহারা শক্তির অভাবে কর্ত্তব্য করিতে পারে না (faults of omission), (২) তাহারা পেটের জ্বালায় পরস্বাপহরণ করে (faults of commission)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রকমের দোষ হইয়া থাকিবে, কিন্তু উহা ত মানুষ নয়, যে, পরস্বাপহরণ করিবে। অতএব যদি উহাকে ডাক্তার রায় faults of commission এও দোষী মনে করেন, তাহা হইলে সে দোষগুলি কি, জানিতে কৌতূহল হয়। যদি তিনি উহাকে ঐ-প্রকার দোষে দোষী মনে না করেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

তিনি লিখিয়াছেন,

> "On principle, I have no sympathy for autocracies, but the public and the keepers of the public purse must remember that there is a great deal of difference between antagonism to a person and antagonism to a cause."

ঠিক্ কথা। কিন্তু তিনি যে একেচ্ছাতন্ত্রের পক্ষপাতী নহেন, তাহার কার্য্যগত প্রমাণ সর্ব্বসাধারণ চাহিলে তাহা কি খুব বেয়াদবী হয়? ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধাচরণ এবং কোন সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠান বা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ এক নহে, ইহা সোজা কথা। কিন্তু এপর্য্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীর চিঠিপত্র, প্রেসের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তর এবং বক্তৃতা অপেক্ষা সেনেট্-হাউসের বক্তৃতা ও কলিকাতা রিভিউয়ের প্রবন্ধ ও টিপ্পনীসমূহে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ কম আছে, না বেশী আছে, তাহা রায় মহাশয় সহজেই স্থির করিতে পারিবেন। কোন্ পক্ষ বেশী উত্তেজিত ও কোন্ পক্ষ বেশী শান্ত আছে, কে আস্ফালন করিতেছে কে করিতেছে না, তাহাও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। একেচ্ছাতন্ত্রকে বিনষ্ট বা শক্তিহীন করিতে হইলে, যে-মানুষে উহা মূর্ত্তিমান্, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার ক্ষমতার উপর যে হাত পড়ে, তাহা বলিয়া দেওয়া কি আবশ্যক? অটোক্র্যাসীকে আক্রমণ কর কিন্তু অটোক্র্যাট্‌কে আক্রমণ করিও না, ইহা ঠিক্ কথা। কিন্তু অটোক্র্যাটের যে কাজে ও কথায়, তাঁহার জীবনের যে যে অংশে, যেরূপ ব্যবহারে, অটোক্র্যাসীর পরিচয় আছে, সেইসব জিনিষকে যদি আক্রমণ করা না চলে, তাহা হইলে ইংরেজীতে যাহাকে টুইডল্‌ডম্ ও টুইডল্‌ডীর প্রভেদ বলে, সেইরূপ একটা নিষ্ফল পার্থক্য-নির্দ্ধারণ-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে আমরা বহু বৎসর ধরিয়া অনেক কথা লিখিয়াছি। সম্প্রতি সব কাগজেই ইহার বিষয়ে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। ফলতঃ জিনিষটি তিক্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে মোটামুটি কয়েকটি কথা লিখিতে হইতেছে।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে-যে সর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই-লাখ টাকা দিতে চান, তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিবার জন্য ২রা ডিসেম্বর সেনেটের অধিবেশন হয়। রিপোর্ট্‌টি পরিশিষ্টাদি-সমেত ২৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী। এত বড় একটি জিনিষের সমালোচনা করিবার মত সময় ও স্থান আমাদের নাই ; এবং বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়া তাহা ছাপিতে হইলে কাগজ মুদ্রণব্যয় প্রভৃতি যাহা হইবে, তাহা পরের পয়সায় হইবে না, আমাদিগকেই দিতে হইবে ;—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা ও

"স্বাধীনতাজান" বাষ্প প্রয়োগ

সদস্যেরা যেমন পরের পয়সায় একই জিনিষ নানা আকারে বার-বার ছাপিয়া থাকেন, সেরূপ কিছু করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা আমাদের নাই। সেইজন্য, যদি এই অখ্যাতিও রটিত হয়, যে, সম্পাদকদের মস্তিষ্ক লক্ষ্য করিয়া সেনেটের কর্ত্তা যে পুঁথি ছুড়িয়াছেন, তাহার আঘাতে আমাদের মস্তিষ্ক জখম ও অকেজো হইয়া গিয়াছে, তাহাও স্বীকার, কিন্তু বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব না—অন্ততঃ "প্রবাসী"তে নয়।

এখন সেনেটের অধিবেশনের একটি বক্তৃতার একটি অংশ সম্বন্ধে কিছু বলিব। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার যাত্রার-দলের-ভীমোচিত বীরত্ব- ও আস্ফালন-পূর্ণ বক্তৃতার শেষের দিকে বলেন :—

What will the Post-graduate teachers say? They will resign to-morrow. They will go into banishment rather than take money under these distressing conditions. What will future generations say? Future generations will cry shame—the Senate of the University bartered away there freedom for 2½ lakhs of rupees. One of the dissenters said that he should do his duties towards his electors. I have also my duty to perform. I am the first elected Vice-Chancellor. I am the representative of the graduates. I would tell you what would happen to this University. You give me slavery in one hand and money in the other. I despise the offer. I will not take the money. We shall retrench and we shall live within our means. We shall starve. We shall go from door to door all through Bengal. We shall ask the post-graduate teachers to starve themselves, to starve their families, but keep their independence. That is what I intend to do.

I tell you as members of this University to stand up for the rights of the University. Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India. Do your duty as the Senators of this University. Freedom first, freedom second, freedom always. Nothing else will satisfy me.

সেনেট গবর্ণমেণ্টের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া সরকারী সাহায্য লইলে পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষকেরা তাঁহাদের চাকরী ছাড়িয়া দিতেন, আমাদের ধারণা এরূপ নয়। কিন্তু একটা

কিছু ঘটিলে আর-একটা কি ঘটিত বা না ঘটিত সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা অন্ততঃ আমাদের নাই; সুতরাং এবিষয়ে বেশী কিছু বলিব না।

ভারতবর্ষের মধ্যে একটি মানুষ আছেন, যিনি কোন একটি আদর্শের জন্য অন্য অনেককে উপবাসী থাকিতে বলিতে অধিকারী; কারণ তিনি স্বয়ং অন্যের সঙ্গে ও অন্যের জন্য বহুদিবসব্যাপী উপবাস একাধিক বার করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার তথাকথিত কোন কোন অনুচর আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্ম্মঘটীদিগকে, "বরং উপবাস শ্রেয় তবু ধর্ম্মঘটত্যাগ ভাল নয়," বলিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অনেকের অনশনক্লেশ ঘটাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজেরা উপবাসী ছিলেন না। আশু-বাবুর জজিয়তী এখনও আছে, পূর্ব্বসঞ্চিত পুঁজিও যে নাই, এমন নয়। সুতরাং তাঁহার নিজের যখন উপবাস-সম্ভাবনা বা উপবাস-প্রবৃত্তি নাই, তখন অপরকে উপবাসী থাকিতে বলা ন্যায়াধীশের পক্ষে অন্যায় ও অশোভন কথা হইয়াছে। বেতনের বদলে "স্বাধীনতাজান" বাষ্প (Freedomogen Gas) কাহারও প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে কি?

যে স্বাধীনতার জন্য পোষ্টগ্রাজুয়েট্ শিক্ষকদিগকে উপবাস স্বীকার করিতে বলা হইয়াছে, তাহাও যে কি চীজ্, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। যদি বাংলা-গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আমার কথা অনুসারে তোমাদিগকে চলিতে হইবে" (যাহা কেহই বলে নাই) এবং যদি তাঁহাদিগকে তাহাই করিতে হইত, তাহা হইলে এখন শিক্ষকেরা ইংরেজের এক ভৃত্য আশু-বাবুর অধীনস্থ হইয়া চলেন, তখন ইংরেজের ভৃত্য আর-কোন লোকের অধীনস্থ হইয়া চলিতেন; স্বাধীনতা এখনও নাই, তখনও থাকিত না। ইহার জন্য এত লম্বাচৌড়া কথা, উপবাসের কথা, সুসঙ্গত নহে। তবে ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে, শিক্ষকদের মতে আশু-বাবুর অধীনতা অন্য কাহারও অধীনতা অপেক্ষা শ্রেয় হইতে পারে। সে-বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে অসমর্থ, কিন্তু ইহা বলিতে পারি, যে, কাহারও অধীনতা স্বাধীনতা নহে।

কলিকাতার সেনেটের স্বাধীনতাও পোষ্টগ্রাজুয়েট্ শিক্ষকদের স্বাধীনতার মত—বাষ্পীয়—ধরিতে ছুঁইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। আশু-বাবু যাহা বলেন, তাহাই হয়; অধিকাংশের ভোট ত তাঁহার "মুঠার ভিতরে!" স্বাধীনতাটা কোথায়! তবে যদি কেহ কেহ বলেন, আশুতোষের অধীনতা বাংলা-গবর্ণমেণ্টের অধীনতা অপেক্ষা ঘন (solid) জিনিষ, তাহার শব্দ ওজন-মূল্য ইত্যাদি আছে; তাহা হইতে পারে। কিন্তু সে-স্থলেও বলি, কাহারও অধীনতার নাম স্বাধীনতা হইতে পারে না।

তা ছাড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টাই যে গবর্ণমেণ্টের অধীন। একটা গরুকে বা ঘোড়াকে তাহার মনিব যদি একটা দেওয়ালদেরা জায়গায় পায়ে লম্বা দড়ি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীনতা যেরূপ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাধীনতাও সেইরূপ। উহার উৎপত্তি ভারত-গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে, অধিকার যাহা কিছু আছে তাহাও ভারত-গবর্ণমেণ্টের দেওয়া, পরিবর্ত্তন হইবে বাংলা-গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে, অনেকবার ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা চাওয়া ও পাওয়া হইয়াছে এবং কখন কখন প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই, বাংলা-গবর্ণমেণ্টও একবার প্রায় দেড় লাখ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার নিকটও টাকা চাওয়া হইয়াছে, এখনও অধ্যাপক-নিয়োগে বাংলা-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন চাই। সুতরাং ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ভুলিয়া যাও, বাংলা-গবর্ণমেণ্টকে ভুলিয়া যাও, ইত্যাকার কথা সেনেট-গৃহে বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের মুখেই শোভা পায়।

অবশ্য ইহা ঠিক, যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি অধিকার দিয়াছেন। আমরা এই অধিকার রক্ষার সমর্থন বরাবর করিয়া আসিতেছি, এখনও করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আশু-বাবুর কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তিনি ও তাঁহার অনুচরেরা কেন ভুলিয়া যান, যে, এই কৃতিত্বের ভিত্তি ও কারণ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ও আনুগত্য। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী চার্টার আছে; চাকরীর বাজারে ও ওকালতী আদি ব্যবসাক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃত (recognised) বলিয়া ইহার উপাধিগুলির মূল্য আছে; ইত্যাকার নানা কারণে ইহার মানমর্য্যাদার উৎপত্তি হইয়াছে। ঐসব কারণে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠান বলিয়াই, মূলধন কেহ কেহ উড়াইয়া

দিতে পারিবে না বলিয়াই; রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ইহাকে এত টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের চার্টারের ভরসা ত্যাগ, উপাধিগুলির গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ত্যাগ, সমুদয় দরবাড়ী ত্যাগ, গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকা না পাওয়া, গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহাকে রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা না পাওয়া, প্রভৃতি মানিয়া লইয়া যদি কেহ একটা স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান বা পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হইতে পারে; অন্যের মুখে নহে।

মহাত্মা মুন্‌শীরাম (শ্রদ্ধানন্দ স্বামী) হরিদ্বারে যে গুরুকুল নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বাধীন-কীর্ত্তি। ঐ বিদ্যালয়ের আদর্শের বিচার অবশ্য হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কেহ বঙ্গে স্থাপন করিয়া বহু বৎসর চালাইলে তাঁহারও মুখে স্বাধীনতার স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্য ও আস্ফালন শোভা পাইত না; অন্যের মুখে ত নহেই।

আশু-বাবুর বক্তৃতার পরে কোনও অসহযোগী কাগজে আশুতোষ অনেকটা অসহযোগী হইয়াছেন, বলিয়া জয়-কোলাহল উত্থাপিত হয়। মোটেই না। আশুতোষ স্বয়ং ত অসহযোগের শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন বলিয়াছেনই, অধিকন্তু তিনি ও তাঁহার অনুচর অন্যান্য নাইট্‌রা কেহ উপাধি ছাড়েন নাই। উপাধি, চাকরী, পেনস্যান ইত্যাদি ছাড়িলে তবে অসহযোগের হাতে-খড়ি মাত্র হয়। স্বাধীনতার চীৎকার যিনি যতই করুন, এদিকে সবাই জানেন, যে, কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

সরকারী দানের সর্ত্ত

উচ্চশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট টাকা মঞ্জুর করিলে তাহার সহিত কোন সর্ত্ত জুড়িয়া দিবার অধিকার সরকারের আছে কি না, সে বিষয়ে স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র বলেন,

"The obvious solution of the present trouble is to set the University on its feet first and that at once by wiping out the deficit without any controversial conditions attached to the grant of money...........The Government have also every right to make conditions for grants of money, provided they are in harmony with the interests of higher education."

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সঙ্কট-অবস্থায় রায়মহাশয় বলেন, যে, যাহাতে মতভেদ হইতে পারে, এরূপ কোন সর্ত্ত না জুড়িয়া, উহার ঋণশোধ করিয়া দেওয়া ভাল। কিন্তু অবিসংবাদী সর্ত্ত যে কি হইতে পারে, তাহা তিনি বলেন নাই। তাঁহার কি ধারণা এই, যে, কোনও-প্রকার সর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা রাজী হইতেন? যাহা হউক, রায় মহাশয় সাধারণভাবে স্বীকার করিতেছেন, যে, গবর্ণমেণ্টের এরূপ সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিবার অধিকার আছে যাহা উচ্চশিক্ষার পক্ষে অকল্যাণকর নহে।

শিক্ষামন্ত্রীর সর্ত্তগুলি ভাল কি মন্দ, তদনুসারে কাজ করা সহজ কি কঠিন, সম্ভব না অসম্ভব, তাহার বিচার না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, একটি সর্ত্তও এমন নহে যাহার সহিত উচ্চশিক্ষার বিরোধ আছে। একটি সর্ত্তে আছে বটে, যে, যতদিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, ততদিন উহার কার্য্যক্ষেত্র আর যেন বিস্তৃত করা না হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এইরূপ নিয়ম অনুসারে চলা উচিত।

ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষা ও সরকারী সাহায্য

স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র বলেন;—

"I have observed public men to dwell upon the exclusive necessity of fostering primary and technical education. I fully realise the need of support to both these types of education; but I hope I shall not be misunderstood, when I say with all the emphasis at my command that it will be nothing short of a national disaster if higher University education and the spirit of research, be it in history, literature or science, are allowed to die an unnatural death due to our shortsightedness. Our primary and secondary schools or properly equipped technical schools are very useful in their own way, but wider outlook and culture are perhaps equally necessary. They cannot turn out scholars or statesmen who will mould the future of the country. If we really care for the development of

the resources of our country in our interest, we must have our own men who can tackle the present-day scientific and engineering problems."

আমাদেরও মত এই, যে, সব রকম শিক্ষাই চাই। ইহাও আমরা অনেকবার বলিয়াছি, যে, বর্ত্তমান সঙ্কটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণশোধ হওয়া চাই। কিন্তু সরকারী তহবীল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেওয়া উচিত, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র কলম ধরিয়াছেন বলিয়া, সাধারণভাবে আমাদের দেশে সরকারী রাজস্বের উপর কোন্ শ্রেণীর লোকদের কোন্ স্তরের শিক্ষার দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার।

সরকারী রাজস্বের প্রায় সমস্তটা, অন্ততঃ অধিকাংশ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে দৈহিকশ্রমজীবীদের নিকট হইতে আদায় হয়। জমীদাররা যে খাজনা দেন, তাহা কৃষকদের ও ক্ষেতের মজুরদের মিহনৎ হইতে প্রাপ্ত। পাটের কল ও কাপড়ের কল, চিনির কল, তেলের কল, প্রভৃতি সমুদয় কারখানার মালিকরা যে ইন্‌কম্-ট্যাক্স্ দেন, তাহাও শেষ পর্য্যন্ত সেই চাষী ও শ্রমজীবীর পরিশ্রম হইতে আসে। বড় বড় কয়লার কারবার, লোহা-ইস্পাতের কারখানা হইতে সরকার যে ট্যাক্স্ পান, তাহাও খনির ও কারখানার মজুরদের পরিশ্রম ব্যতিরেকে পাওয়া যাইত না। উকীল-ব্যারিষ্টাররা যে-সব দেওয়ানী মোকদ্দমা করেন, তাহার কতক চাষীদের, কতক জমীদারদের, ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের টাকাটাও আসে দৈহিকশ্রমীদের নিকট হইতে। তাঁহারা যে ইন্‌কম্-ট্যাক্স্ দেন, তাহাও গরীবের ট্যাঁকের টাকা। অনেক ফৌজদারী মোকদ্দমা মারামারি-প্রভৃতি-ঘটিত। তাহাও অশিক্ষিত সাধারণ লোকেরা বেশী করে। তাহার আয়ও ঐসব লোকদের নিকট হইতে আসে। বিচার বিভাগের অধিকাংশ আয় সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ লোকদের নিকট হইতে আসে।

অতএব সরকারী টাকার উপর সাধারণ চাষী, মজুর, প্রভৃতির শিক্ষারই দাবী বেশী। বাংলা দেশে শতকরা ৯৪ জন গ্রামবাসী। যাহারা সরকারকে সকলের চেয়ে বেশী টাকা দেয়, তাদের শিক্ষার জন্যই সরকারের সর্ব্বাগ্রে সকলের চেয়ে বেশী টাকা খরচ করা উচিত। সাধারণ লোকের, গ্রাম্য লোকের, শিক্ষার জন্য দেশময় প্রাথমিক বিদ্যালয় আগে স্থাপন করিয়া তবে সরকার উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে পারেন। ইহা সত্য, যে, এই-সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য উচ্চতরশিক্ষা-প্রাপ্ত লোক চাই। কিন্তু আমাদের এণ্ট্রেন্স্ স্কুলগুলি, কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাক্ষাৎভাবে বা প্রধানতঃ পাঠশালার শিক্ষক প্রস্তুত করে না, এবং অর্দ্ধ শতাব্দীরও উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেশে চলা সত্ত্বেও সর্ব্বাগ্রে দেশের সকল লোককে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা এখনও বড় বড় পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ স্বীকার করিতেছেন না। উচ্চ শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু যে চাষী শ্রমীদের ট্যাঁক হইতে এই-সব টাকা আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন্ কোন্ ধনী ও পণ্ডিত ব্যক্তি কত লক্ষ টাকা দিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ও গবেষণার দ্বারা দেশের উপকার হইবে ইহা আমরা স্বীকার করিলেও, দেশের অধিকাংশ লোক যে তাহার ফল ভোগ করিতে পাইতেছে না, তাহাদের টাকায় যাহারা শিক্ষা পাইয়া পণ্ডিত হইয়াছে তাহারা তাহাদের প্রতি ন্যায্য ও কৃতজ্ঞতাসঙ্গত কার্য্য করিবার জন্য সময় শক্তি ও অর্থ দান করিতেছে না, ইহা শোচনীয় ও লজ্জাকর সত্য কথা। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক স্বীয় কার্য্য দ্বারা ন্যায়পরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা ধন্য; কিন্তু তাঁহারা মুষ্টিমেয়। উচ্চশিক্ষা দিলে পরে পরোক্ষভাবে নিরক্ষরদের উপকার হইবে, এ কথা বলিলে এখন আর "ভবী" ভুলিবে না। সাধারণ লোকদের উপকার করিবার এই বাঁকা পথ অবলম্বন না করিয়া, সাধারণ লোকদের টাকায় উচ্চশিক্ষা পাইয়া তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধিতে মন না দিয়া, সোজাসুজি সমস্ত দেশে প্রাথমিক সাধারণ বিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, প্রভৃতি খোলা উচিত। ইহা আরও বেশী কর্ত্তব্য এইজন্য, যে, বহুকাল সাধারণ লোকেরা অবহেলিত হইয়াছে।

আরব্ধ না হয়। ইহাও বাস্তবিক আর্থিক সর্ত্ত, এবং ইহার প্রয়োজনও আছে। কারণ, কার্য্যবিস্তার করিয়া যদি ঋণ হয়, তাহা হইলে ত আবার গবর্ণমেণ্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে, এবং আবার নানাপ্রকার অশোভন কলহ হইবে। এই সর্ত্তটিও গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ সাবধানতার জন্য আগে হইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; না করিলেও চলিত। কারণ, বেশী কিছু কার্য্যবিস্তার পরোক্ষ ভাবে বন্ধ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্সের নবম ও দশম অধ্যায় অনুসারে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক বা রীডর নিযুক্ত হইতে পারে না, পোষ্টগ্রাজুয়েট্ শিক্ষাবিষয়ক ৩২শে নিয়ম অনুসারে কোন লেক্‌চ্যারার নিয়োগে গবর্ণমেণ্ট পাণ্ডিত্য বা শিক্ষাদানযোগ্যতা বা তদ্বিধ কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বাধা দিতে পারেন। আর্থিক অসচ্ছলতা এইরূপ একটি কারণ। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্সেই, যাহা উহ্য রহিয়াছে, তাহা একটি সর্ত্তে পরিস্ফুট করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নূতন কোন ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেন নাই, কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কোন অধিকারে হাত দেন নাই।

উহার কর্ত্তা ত স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, বলিয়া খুব চীৎকার করিয়াছেন; কিন্তু যখন গবর্ণমেণ্ট কাশীপ্রসাদ জায়সওয়াল, আবদুল রসুল, প্রভৃতিকে লেক্‌চ্যারার নিয়োগ করিতে দেন নাই, তখন স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

আমরা দেখাইয়াছি, যে, জ্ঞানানুশীলন, গবেষণা, শিক্ষাদান, পরীক্ষাগ্রহণ, ইত্যাদি কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায় কোন সর্ত্তে নাই। সর্ত্তগুলি টাকা-কড়ি-বিষয়ক। এরূপ সর্ত্ত কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রস্তাবসমূহের মধ্যেও আছে। তাহা দেখাইতেছি। প্রস্তাব এই, যে, উভয় ইউনিভার্সিটিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক এক লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দিবেন এবং তা ছাড়া নারীদের শিক্ষা এবং সীমার বাহিরের কাজ (extra-mural work) করিবার জন্য দশ হাজার পাউণ্ড করিয়া দিবেন। এই-সব টাকা ইউনিভার্সিটিদ্বয় যথেচ্ছ খরচ করিতে পারিবেন না। কোন্ কোন্ বাবতে খরচ হইবে, তাহা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ২৫শে মার্চ্চের ম্যাঞ্চেষ্টার্ গার্জেন বলিতেছেন:—

The principal purposes for which the grant is recommended are :—

- Better salaries and pensions for staffs—*the first charge* [ইটালিক্‌স্ আমাদের।]
- Increased staffs.
- Endowment of research and advanced teaching.
- More research scholarships for young graduates.
- More entrance scholarships to widen the door for the poor student.
- Maintenance and improvement of laboratories, libraries, and museums.
- To help the women's colleges and non-collegiate bodies.
- To extend extra-mural work.

গত ১লা এপ্রিলের টাইম্‌স্ এড়ুকেশ্যান্যাল সপ্লেমেণ্ট বলিতেছেন:—

"They [the Commissioners] therefore recommend that each University receive, instead of the existing interim grant of £30,000, an annual grant of £100,000 (£90,000 for general purposes and £10,000 for the Bodleian Library, Oxford, and the University Library, Cambridge), in addition to £10,000 a year for special purposes), women's education, £4,000, and extra-mural work, £6,000, and a lump sum for pension arrears."

তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মঞ্জুরী টাকা হইতে প্রথমেই শিক্ষকদের বেতন এবং পরীক্ষকদের মজুরী দিতে বলিয়া কি অপরাধ করিয়াছেন?

টাইম্‌স্ আরও বলেন—

"The Commission suggests several changes to secure efficiency. Many of these will require Parliamentary legislation, and it recommends the setting up of a statutory commission to carry out the consequent changes in University and college statutes, and where necessary, to revise trusts."

ইহা যে কত গুরুতর পরিবর্ত্তন, তাহা ইংরেজী-জানা লোক মাত্রেই বুঝিবেন। এফিশিয়েন্সীর (সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহের) জন্য বাংলা-গবর্ণমেণ্ট একটা অফিস্-ম্যানুয়েল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন মাত্র; অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ কমিশন এমন সব পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন

যাহার জন্য পার্লেমেণ্টে নূতন আইন করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি, কোন্‌টা বেশী হস্তক্ষেপ? বিলাতী কমিশন ট্রাষ্টের অর্থাৎ ন্যস্ত সম্পত্তির (যেমন পালিত ও ঘোষ ট্রাষ্ট্) নিয়মাবলী পর্য্যন্ত আবশ্যক হইলে বদ্‌লাইতে বলিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাণ্ট্ কমিটির রিপোর্টে ১০১-২ পৃষ্ঠায়, বিলাতের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী ফিশার সাহেবের নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"No one appreciates more fully than myself the vital importance of preserving the liberty and autonomy of the Universities within the general lines laid down under their constitution. The State is, in my opinion, not competent to direct the work of education and disinterested research which is carried by Universities, and the responsibility for its conduct must rest solely with their Governing Bodies and Teachers. This is a principle which has always been observed in the distribution of the funds which Parliament has voted for subsidising University work; and so long as I have any hand in shaping the national system of education, I intend to observe this principle."

সেনেটের কমিটি ফিশার সাহেবের এই-সব কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, যে, শিক্ষামন্ত্রীরূপে} তিনি অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ কমিশনের প্রস্তাবসকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পার্লেমেণ্টে যে আইনের খস্‌ড়া বা বিল্ পেশ করেন, তাহার দ্বারা ইউনিভার্সিটি দুটির স্বাধীনতা ও আত্ম-কর্ত্তৃত্ব (liberty and autonomy) নষ্ট হয় নাই। ঐ বিলের দুটি ধারা উদ্ধৃত করিতেছি।

1. There shall be two bodies of Comissioners to be styled respectively "the University of Oxford Commissioners" and "the University of Cambridge Commissioners".

6. Subject to the provisions of this Act the Commissioners shall, from and after the first day of January, nineteen hundred and twenty-four, make statutes and regulations for the University, its colleges and halls, and any emoluments, endowments, trusts, foundations, gifts, offices, or institutions in or connected with the University in general accordance with the recommendations contained in the report of the Royal Commission, but with such modifications as may, after the consideration of any representations made to them, appear to them expedient.

এই-প্রকার বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিবর্ত্তন করিলেও যদি অক্সফোর্ড্ ও কেম্ব্রিজের স্বাধীনতা ও আত্মকর্ত্তৃত্বে হাত না পড়ে, তাহা হইলে টাকাকড়ি ও হিসাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি সর্ত্ত দ্বারা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা কি প্রকারে বিপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝা সহজ নহে।

স্মৃতি ও আশা

ঝরে' গেছে ফুল, গাওয়া হয়ে গেছে গান
পুরাকালে যাহা হয়ে গেছে অবসান
অতীতের সেই অতি পুরাতন কথা
গত জীবনের হরষ বেদনা ব্যথা
সরম, গরব, রাগ, অনুরাগ, প্রীতি
তুলে তুলে রাখে স্মৃতি!
ফুটিবে যে ফুল, হয়নি যে গান গাওয়া,
অনাগত যাহা হয়নি এখনও পাওয়া,
ভবিষ্যতের মনের গোপন বাণী,
রঙে রঙে ভরা রঙীন জীবনখানি,
অভূতপূর্ব্ব কত স্নেহ ভালবাসা
এঁকে এঁকে রাখে আশা!
ঐতিহাসিক ও কবি—
একজন শুধু আহরণ করে,
আর জন আঁকে ছবি!

"বনফুল"

রবীন্দ্র জন্মতিথি—রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে শ্রী সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ৩৩।১সি ল্যান্সডাউন্ রোড, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

এ একখানি ডায়ারী লেখার বই; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই তারিখের স্মরণীয় ঘটনা বা কথা লিখিবার শাদা জায়গায় রুল টানা আছে, আর প্রত্যেক তারিখের নীচে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে নানা ভাবের ও রসের সংক্ষিপ্ত পদাবলী উদ্ধৃত করা আছে। যিনি রবীন্দ্র-রচনার পক্ষপাতী তিনি তাঁর প্রিয়জনকে তাঁর জন্মতিথিতে এই বই উপহার দিতে পারেন; যিনি রবীন্দ্র-রচনার অনুরাগী তিনি তাঁর জন্মতিথিতে এই বই উপহার পাইতে ইচ্ছা করিবেন। ইংরেজীতে সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকের পদাবলী-সম্বলিত জন্মতিথি-উপহারের বই পাওয়া যায়। আমাদের দেশের—কেবল আমাদের দেশের নয়, সমগ্র পৃথিবীর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির পদাবলী-সম্বলিত এই সুন্দর বইখানি আমাদের একটা দৈন্য ও লজ্জা মোচন করিল। এই বইখানির কাগজ উত্তম, গোলাপী রঙের; ছাপা সুন্দর পরিষ্কার; এমন বাঁধানো বই বাংলায় এর আগে বাহির হয় নাই বোধ হয়। বইএর মুখপাতে কবীন্দ্রের একখানি ছবি আছে। এই বইখানি বাঙালী নরনারীর জন্মদিনের শ্রেষ্ঠ উপহার বলিয়া গণ্য ও সমাদৃত হইবে নিঃসন্দেহ। এ ডায়ারী-বই এমন করিয়া ছাপা যে যে-কোনো বৎসরেই ব্যবহার করা চলিবে।

মুদ্রারাক্ষস

স্বপন-পসারী—কাব্যগ্রন্থ, শ্রী মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। (ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্) মূল্য ১৷০।

কলের গানের সঙ্গে নরকণ্ঠের যে প্রভেদ, মাসিক পত্রে প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতার সঙ্গে মোহিত-বাবুর কবিতার সেই প্রভেদ, যদিও মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় সেই নকল-করা সুরের রেশ মেলে।

কবিতার দুই অঙ্গ—ভাব ও রূপ। রূপতান্ত্রিক কবির রূপে বিশ্বাস আছে, একটা আন্তরিক টান আছে এবং সে বিশ্বাস ও টান প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছন্দের মাধুরীতে ও বৈচিত্র্যে। এ সাফল্যের জন্য তিনি হয়ত কারো কাছে দায়ী নন। কিন্তু তাঁর রচনা-রীতি বার বার আর-একজনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তিনি হচ্ছেন ছন্দ-সরস্বতীর দুলাল সত্যেন্দ্রনাথ।

রূপের মোহ কবিকে একটু বিপথগামী করেছে বলে' মনে হয়, কারণ তাঁর এই রূপচর্চ্চার ঝোঁকে ভাব অনেক জায়গায় মূর্ত্ত হবার সুবিধা পায়নি—ছন্দ ও শব্দের কলনৃত্যে এ দৈন্য ঢাকা পড়্বার নয়, তা না হলে কাব্য-জগতে মোহিত-বাবু একটা বড় জায়গা দাবী কর্তে পার্তেন।

অর্থের গৌরব সুব্যয়ে, শব্দের গৌরব সঙ্গত অর্থে। মোহিত-বাবুর হাতে শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু তা সম্পদ্ হয়ে ওঠেনি, কারণ ভাবকে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে পারেনি। তিনি কথার ও রূপের নেশায় একটু বেশী মশ্গুল এবং তার সেই ধরে', এমন জায়গায় থেমেছেন যেখানে ভাব-প্রকাশের প্রক্রিয়া ও ধারাটা তখনও শেষ হয়নি। তা ছাড়া কবিতা এমন অনেক আছে যা পড়ে' মনের মধ্যে অনেক কল্পনা সজাগ হয়ে ওঠে, কিন্তু কবি যেমন করে' শেষ করেছেন তেমন করে' শেষ হওয়া দেখ্তে মন সরে না, সুতরাং একটা নতুন মনোভাব জাগে যা হচ্ছে আনন্দ ও বিরক্তির একটা অদ্ভুত মিশ্রণ। ভাব আহরণের পথে এ বাধা থাক্লেও কবিতাগুলি না পড়ে' থাকা যায় না; কবির চিন্তা-ধারার অনুসরণ করতে হয় রূপের মোহে; ছন্দের মধ্যে এমন সহজ গতি আছে যা মনে আত্মবিস্মৃতি আনে, কিন্তু যখন হঠাৎ থেমে যায় তখন বিস্মিত হতে হয় আর কবির উপর রাগ হয় আশা-ভঙ্গ করেছেন বলে'।

এই পরলোক-সর্ব্বস্বের দেশে, ইহলোকের অনিত্য রূপ-রসের নেশায় বিভোর কবির "মৃত্যু" "অঘোরপন্থী" "পাপ" প্রভৃতি কবিতা বেশ একটু বিচিত্র বলে' মনে হয়। দুনিয়া যে সুন্দর, কবির এ মোহ আছে, ও সুন্দর ছন্দে কবি সে কথা শুনিয়ে দিতে কোথাও দ্বিধা বোধ করেননি, বরং রচনার গুণে অনেকের মনে সে মোহের ছোঁয়াচ লাগ্বে বলে' আশা হয়।

> "মাটির পৃথ্বী বিদারণ করি' শত মুখে শত রস
> স্নায়ুতে শোণিত শুষিয়া লইব, হোক তায় অপযশ,
> হৃদয়ে আমার যত সাধ আছে ফুটাইব শতদলে—
> জীবন-সায়রে ফুটিয়া উঠিব অপরূপ তামরস!"

উপরের এই চার লাইনে কবির অনেক কবিতার অন্তরনিহিত কথাটি প্রকাশ পেয়েছে।

শুধু বাঁশীর তরল মধুরতা নয়, অসির ঝঞ্চনাও কবির ছন্দে বেজেছে—"নাদিরের জাগরণ" "নাদিরের শেষ" "বেদুইন" "নুরজাহান" নতুন ধরণের এই কবিতা-চতুষ্টয়ে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। খুব উচ্চ শ্রেণীর কবিতা না হলেও এ-সবের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের মনস্তত্ত্বের লীলা সত্যই উপভোগ্য। "শ্রাবণ-রজনী"র মতো চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ও নেহাৎ জোলো কবিতার সঙ্গে এই কবিতাগুলির অসামঞ্জস্য এত বেশী করে' মনে লাগে যে নিজের হাতে তাকে মুছে ফেল্তে ইচ্ছা করে। আর এক কথা—কিশোরী-ভজন যে দেশের ধর্ম্মসাধনার অন্যতম প্রণালী, সে দেশের কবি যে কিশোরীর স্তব করবেন এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কবিযুবার পক্ষে এ স্তব বিচিত্র। কিশোরীর সঙ্গে কিশোরের প্রেম সম্ভব; নোলক-পরা মল পায়ে অস্ফুট-দেহ-মন বালিকার উপর যুবকের যা মনোভাব তাকে স্নেহ বা বাৎসল্য বলা যেতে পারে, প্রেম কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায় না কি? একদিন ব্রাউনিং কিশোরী-প্রেমের কবিতা রচনা করেছিলেন (Evelyn Hope); সে প্রেম চণ্ডীদাস-বর্ণিত কামগন্ধহীন। আর আমাদের বর্ত্তমান কবিতায় যা ফুটেছে তা নিছক দেহসর্ব্বস্ব লালসা—এ মনোভাবটা অস্বাভাবিক ও অতিচারী। কিশোরী রাধার প্রতি কিশোর শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার অজুহাতে বঙ্গযুবকের এ অসঙ্গত ব্যবহার অমার্জ্জনীয়।

আনন্দসুন্দর ঠাকুর

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জনৈক চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু

চিত্রকর আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

[ছবিখানির বিশেষত্ব এই, যে, ইহা দেখিলে পুরাতন মনে হইবে, এই ভাবে অঙ্কিত]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২২শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২৯

৪র্থ সংখ্যা

ব্রহ্ম

ব্রহ্মন্ শব্দের ইতিহাস অতি বিচিত্র। বিভিন্ন যুগে ইহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বেদ-সংহিতায় ইহার এক অর্থ, দার্শনিকগণের অর্থ অন্য। সাহিত্য ও অভিধানে ইহার অর্থ স্তোত্র বা মন্ত্র, মন্ত্রকৃৎ, স্তোতা, বেদ, বেদজ্ঞ, অভিচার মন্ত্র, ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্, বৃহস্পতি, হিরণ্যগর্ভ, পরমেশ্বর, সগুণ ঈশ্বর, নির্গুণ ঈশ্বর, প্রণব, ব্রাহ্মণ জাতি, তপস্যা, সত্য, তত্ত্ব, বুদ্ধি, প্রকৃতি, ইত্যাদি।

এখানে প্রশ্ন,—'ব্রহ্মন্' শব্দের মৌলিক অর্থ কি? ঋগ্বেদ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ব্রহ্মন্ শব্দ বিভিন্ন বিভক্তি ও বচনে ২৯৩ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থলেই ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ মন্ত্র বা স্তোত্র। ব্রহ্মন্ শব্দকে 'বৃহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে এবং এরূপ করিবার কারণও আছে। ঋগ্বেদে ব্রহ্মণস্পতি এবং বৃহস্পতি একই দেবতা।

ব্রহ্মণস্পতি = ব্রহ্মণঃ পতি = ব্রহ্মের পতি = মন্ত্রের পতি।

বৃহস্পতি = বৃহঃ + পতি।

বৃহস্পতির 'বৃহ' শব্দ যে 'বৃহ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কি প্রকারে 'বৃহ্' ধাতু হইতে 'ব্রহ্মন্' শব্দ নিষ্পন্ন করা যায় তাহা বৈয়াকরণগণ আলোচনা করিয়াছেন। সায়ণের ঋগ্বেদ-ভাষ্যে (১।৩।১০) এই মত গৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদিগের ব্যাখ্যা আমাদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মণস্পতি এবং বৃহস্পতি যখন একই দেবতার নাম এবং উভয় নামের যখন একই অর্থ, তখন ইহাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে 'ব্রহ্মন্' এবং 'বৃহ্' এই উভয় শব্দই 'বৃহ্' ধাতু হইতে বিভিন্নভাবে উৎপন্ন। ব্যাকরণের নিয়মানুসারেই 'বৃহ্' ধাতু হইতে 'ব্রহ্মন্' (ব্রহ্ মন্) উৎপন্ন হইতে পারে। 'বৃহ্' ধাতুর অর্থ "বৃদ্ধি পাওয়া"। সুতরাং 'ব্রহ্মন্' শব্দের মৌলিক অর্থ বৃদ্ধি, বিকাশ, উচ্ছ্বাস, ইত্যাদি। স্তোত্র হৃদয়েরই উচ্ছ্বাস, এইজন্যই সম্ভবতঃ স্তোত্রকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্থলেই 'ব্রহ্ম' অর্থ স্তোত্র বা মন্ত্র।

কয়েকটি স্থলে স্তোতা অর্থেও ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়। বৈদিক বৃহস্পতিকে কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। দেবগণের মধ্যে ইনি স্তোতা, এই অর্থে ইনি ব্রহ্ম।

* যজুর্বেদে ৮০ বার ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ মন্ত্র, মন্ত্রকৃৎ, ব্রাহ্মণ জাতি।

অথর্ব্ববেদে বিভিন্ন বিভক্তি ও বচনে ৩৬৪ বার ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই ইহার অর্থ স্তোত্র এবং অভিচার মন্ত্র। অনেকস্থলে স্তোতা ও মন্ত্রকৃৎ অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

কয়েকটি স্থলে 'ব্রহ্ম' (ক্লীবলিঙ্গ) বহুদেবতার মধ্যে একজন দেবতা। স্কম্ভ-সূক্ত এবং আরও কয়েকটি স্থলে ব্রহ্মকে আরও উন্নত স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই-সমুদয় স্থলে উপনিষদের ব্রহ্মের আভাস পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম = ব্রহ্মকৃৎ ?

ব্রহ্মের মৌলিক অর্থ মন্ত্র। পরে মন্ত্রকৃৎ অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। একই শব্দ মন্ত্র ও মন্ত্রকৃৎ, স্তোত্র ও স্তোতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহা অতি আশ্চর্য্য। ইংরেজী ভাষাতেও ইহার অনুরূপ প্রয়োগ আছে। ইংরেজী 'প্রেয়ার' (Prayer) শব্দের দুই অর্থ (১) প্রার্থনা, (২) প্রার্থনাকারী (pray+er)। এই-প্রকার ব্যবহারের কারণও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। স্তোতা হইতেই স্তোত্রের উৎপত্তি, স্তোতাই স্তোত্রের মূল ; স্তোতা স্তোত্র-ভাবাপন্ন, স্তোত্র স্তোতারই একটি ভাব। স্তোতা এবং স্তোত্রের মধ্যে আত্যন্তিক কোন পার্থক্য নাই। সাধারণ লোকে স্তোত্র-বিষয়ে যাহা মনে করে তাহার মূলে এই ভাব যে স্তোত্র স্তোতার প্রতিনিধি ; উপাসক উপাস্য-দেবতার নিকট স্তোত্র রূপ প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কিন্তু অনেক সাধক উপাস্য-দেবতার নিকট কেবল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। স্বয়ং সাধক ও তাহার প্রতিনিধি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। সেই-জন্য তাঁহারা হয়ত মনে করিতেন স্তোত্র স্তোতার প্রতি-নিধি নহে, ইহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী ; স্তোত্র স্তোতার একটি রূপ। স্তোতা দেবতার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন না, স্বয়ংই স্তোত্র-রূপ ধারণ করিয়া দেবতার নিকট উপস্থিত হন। ইহাই যদি উপাসকের মনের ভাব হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই স্তোতা ও স্তোত্র এই উভয়কেই একই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

ব্রহ্মকৃৎ ও ব্রহ্ম (= মন্ত্র) এতদুভয়ের মধ্যে আত্যন্তিক পার্থক্য নাই, এইজন্যই সম্ভবতঃ অনেক স্থলে উভয়কেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই কারণে কোন কোন ব্রহ্মবিৎ ঋত্বিক্‌কেও ব্রহ্ম বলা হইত। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই প্রধানতঃ ব্রহ্মজ্ঞান (অর্থাৎ মন্ত্রজ্ঞান বা বেদজ্ঞান) আবদ্ধ ছিল। এইজন্য ব্রাহ্মণ জাতিরও নাম হইয়াছিল ব্রহ্ম।

বৈদিক মন্ত্রবাদের ক্রমবিকাশ

সংহিতার ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র) পরিবর্ত্তিত হইয়া কি-প্রকারে উপনিষদের ব্রহ্মে পরিণত হইল, তাহার ক্রম সংহিতাতেই পাওয়া যায়।

(ক)

সংহিতার প্রথম স্তরে ব্রহ্ম অর্থ 'মন্ত্র' ; ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এই :—

কণ্বাঃ ব্রহ্ম কৃণ্বন্তি—কণ্বগণ ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র) রচনা করেন।—ঋগ্বেদ ১।৪৭।২।

কৃণবাম ইন্দ্র ব্রহ্মাণি—হে ইন্দ্র! আমরা ব্রহ্মসমূহ রচনা করি। (৮।৫১।৪ কিংবা ৮।৬২।৪)।

ইমা ব্রহ্মণি সন্তু শন্তমা—এই-সমুদয় ব্রহ্ম প্রীতিকর হউক (৫।৭।১০)।

যে চ পূর্ব্বে ঋষয়ঃ, যে চ নূত্নাঃ, ইন্দ্র, ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত—হে ইন্দ্র! প্রাচীন কালের ঋষিগণ এবং নব্য ঋষিগণ ব্রহ্মসমূহ রচনা করিয়াছেন (৭।২২।৯)।

ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্থলেই এই-প্রকার ব্যবহার। বহুবচনে ব্রহ্ম শব্দ ৬৯ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। এ-সমুদয় স্থলে মন্ত্র ভিন্ন দ্বিতীয় অর্থ হইতে পারে না। অথর্ব্ববেদেও বহুবচনে ব্রহ্মের ব্যবহার ৪২ বার।

যাঁহারা ব্রহ্ম রচনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মকার (৬।২৯।৪) এবং ব্রহ্মকৃৎ (৭।৩২।২ ; ১০।৫০।৭ ; ইত্যাদি) বলা হইত।

বেদের একটি অংশের নাম "ব্রাহ্মণ"। ইহাতে ব্রহ্ম (অর্থাৎ মন্ত্র) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অংশ ব্রহ্ম-বিষয়ক, এইজন্য ইহার নাম ব্রাহ্মণ।

জাতিবাচক ব্রাহ্মণ শব্দের মৌলিক অর্থ ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ মন্ত্রজ্ঞ।

অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ৩৩ বার। এ-সমুদয় স্থলেই ব্রহ্ম অর্থ বেদমন্ত্র। যাহারা ব্রহ্ম (অর্থাৎ বেদমন্ত্র) অধ্যয়ন করে, যাহারা ব্রহ্ম লইয়া আচরণ করে, তাহাদিগের নাম ব্রহ্মচারী। ব্রহ্ম

আচরণের (অর্থাৎ বেদ-অভ্যাসের) অবস্থাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়।

সংহিতাতে ব্রহ্ম, ঋক্, সাম, যজুঃ, অর্ক, উক্থ, গায়ত্র, গীঃ, ছন্দঃ, ধিষণা, ধী, ধীতি, নমঃ, নিবিদ্, প্রশস্তি, মতি, মনীষা, মন্ত্র, মন্ম, বচঃ, বাক্, শংস, সুমতি, সুষ্টুতি, সূক্ত, স্তব, স্তুতি, স্তোম ইত্যাদি সমপর্য্যায় শব্দ। বহু ঋকে ব্রহ্ম শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত একাধিক শব্দের একত্র ব্যবহার দৃষ্ট হয় (১।১০।১ ; ৬।৩৫।১ ; ৬।৩৮।৪ ; ইত্যাদি)।

ব্রহ্ম শব্দের প্রাচীন অর্থ যে মন্ত্র, তাহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়বিধ প্রমাণই রহিয়াছে।

(খ) মন্ত্র—প্রাণের ভাব

ব্রহ্মকৃৎ ঋষিগণ নানাভাবে ব্রহ্ম রচনা করিতেন। উপাস্য-দেবতা তাঁহাদিগের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সখা, সুহৃৎ, সহায়। তিনি উপাসকগণকে স্নেহ করেন, বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন এবং তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ বিধান করেন। শিশু সন্তানের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে বা কোন অভাব হইলে, সে ব্যাকুলভাবে মাতা-পিতার নিকট সে কথা বলিয়া থাকে। তাহার নিকট ভাব এবং ভাষার কোন পার্থক্য নাই ; প্রাণে যে ভাব আসিল, তাহাই ভাষায় পরিণত হইল। ভক্ত ঋষিগণের ভাবও ছিল শিশুসন্তানের ন্যায়। তাঁহারাও প্রাণের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতেন। অনেক বৈদিক মন্ত্র ঠিক এই-প্রকার প্রার্থনা। এই শ্রেণীর ঋষিগণের নিকট ভাব এবং ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না।

(গ) সুরচিত ব্রহ্ম

কিন্তু এমন অনেক ঋষি ছিলেন যাঁহারা মনে করিতেন ভাষারও মূল্য আছে। সুন্দর ভাষায়, সুন্দর ছন্দে ব্রহ্ম রচনা করিলে এবং সেই ব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া দেবগণকে আহ্বান করিলে তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন এবং আনন্দিত হইয়া উপাসকগণের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এই-জন্য তাঁহারা 'অসম' অনতিদ্ভুত (=অতুলনীয়) প্রিয়, "মনদ্র" পরম ব্রহ্ম রচনা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন (৮।৯০।৩ বা ৮।৭৯।৩, ১০।১০১।২, ১০।৮৯।৩ ; ইত্যাদি)।

তাঁহাদিগের রচিত মন্ত্র কি প্রকার সুশোভন, তাঁহারা সে বিষয়ের উপমাও দিয়াছেন। বিচক্ষণ স্রষ্টা যেমন সুশোভন রথ নির্ম্মাণ করে তাঁহারাও তেমনি সুশোভন ব্রহ্ম রচনা করিতেন (১।১৩০।৬ ; ৫।২।১১ ; ইত্যাদি)। বরের নিকট কন্যাকে আনিবার সময় তাহাকে যেমন সুসজ্জিত করা হয়, ঋষিগণ তাঁহাদিগের মন্ত্রসমূহকেও তেমনি সুসজ্জিত করিতেন (১০।৩৯।১৪)।

অনেক ঋষি বিশ্বাস করিতেন সুরচিত মন্ত্রই দেবগণের অধিকতর প্রিয়।

(ঘ) মন্ত্রের ক্ষমতা

বর্ত্তমান যুগেও এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন প্রার্থনারই এক প্রকার ক্ষমতা আছে। কলিকাতায় একটি গৃহ আছে, যাহাতে ইংরেজীতে লেখা আছে—"প্রার্থনার ক্ষমতায় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে"। বৈদিকযুগেও অনেক ঋষির এইপ্রকার ধারণা ছিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন এই মন্ত্রের বলে তাঁহাদের কামনা পূর্ণ হইবে। এই মতই বিকশিত হইয়া উত্তরকালের মন্ত্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

(ঙ) মন্ত্রদ্বারা দেবতার বলাধান

মানবের দেহ ও শক্তি সব-সময়ে একপ্রকার থাকে না—কখনও বা দুর্ব্বল থাকে, কখনও বা সবল হয়। দেবগণের বিষয়েও এই-প্রকার। তাঁহাদিগের শক্তিরও উপচয় এবং অপচয় আছে। আবার তাঁহারা 'অসপত্ন'ও নহেন, তাঁহাদের নিজদিগের শত্রু আছে, মানবদিগের শত্রুও আছে। এই শত্রুগণকে বিনাশ করিবার জন্য দেবগণকে নিয়তই সংগ্রাম করিতে হয়। শক্তির অপচয় হইলে সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব হয় না। এইজন্য অপচয় নিবারণ করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে। এবিষয়ে মানব দেবগণের সাহায্য করিতে পারেন। এবং দেবগণও মানবের নিকট হইতে সাহায্য প্রতীক্ষা করেন। মন্ত্রের এমনই প্রভাব যে ইহা উচ্চারণ করিলে দেবগণ বলীয়ান্ এবং বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন।

এইজন্য দেবগণ ইচ্ছা করেন পৃথিবীতে যজ্ঞ সম্পাদিত হউক, মন্ত্র উচ্চারিত হউক ; এবং এইজন্য ঋষিগণও মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবগণের তনু ও শক্তি বর্দ্ধিত করিতেন (৫।৩১।৪ ; ৭।১৯।১১ ; ৮।৬ ; ইত্যাদি)।

(চ) মন্ত্রই জগতের প্রতিষ্ঠা

মন্ত্রের এমনই শক্তি যে দেবগণও ইহার দ্বারা বলীয়ান্ হন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মন্ত্রের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। মন্ত্রের প্রভাবে পৃথিবী বিধৃত এবং আকাশ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে (ঋঃ ।১৬৭।৩)। পরবর্ত্তী-কালেও মন্ত্রের এই-প্রকার শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।২।৪) লিখিত আছে যে এক সময়ে দেবগণের ভয় হইয়াছিল যে সূর্য্য স্বস্থানচ্যুত হইয়া আকাশ হইতে পড়িয়া যাইবে। এইজন্য তাঁহারা মন্ত্র দ্বারা তাহাকে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

(ছ) মন্ত্রের প্রভাবে সৃষ্টি

মন্ত্র দ্বারা দেবগণ যে মানবজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা ঋগ্বেদের সময়েই ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন (১।৯৬।২)। পরবর্ত্তীকালে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২২।৩৩) লিখিত আছে যে প্রজাপতি সৃষ্টি কামনা করিয়া 'নিবিদ্' উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রভাবে ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল।

দেবগণ অনাদি নহেন, তাঁহাদিগের জন্ম আছে। কিন্তু মন্ত্র অনাদি এবং নিত্য। মন্ত্র হইতেই স-দেব জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বমীমাংসার একটি বিশেষ মত। উত্তরমীমাংসাতেও এই মত গৃহীত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (১।৩।২৮) শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—

"বৈদিকাৎ শব্দাৎ দেবাদিকম্ জগৎ প্রভবতি" অর্থাৎ বৈদিক শব্দ হইতে দেবাদি সহ এই জগতের উৎপত্তি হয়।

মন্ত্রের প্রভাবেই সৃষ্টি।

(জ) দেবগণ মন্ত্রের অধীন

দেবগণ মন্ত্র হইতে যে কেবল উৎপন্নই হইয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা চিরকালই মন্ত্রের অধীন। মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদিগকে যথেচ্ছ চালনা করা যায়। দেবগণের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া মন্ত্রানুসারে কার্য্য করিতেই হইবে। ঋগ্বেদের সময়ে যে এই মত বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। ইহা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল পরবর্ত্তী কালে।

অথর্ব্ববেদের অভিচার মন্ত্র এই শ্রেণীর।

(ঝ) সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম-বিষয়ে আলোচনা করিয়া মন্ত্রবাদের এই কয়েকটি স্তর পাইতেছি।

১। ব্রহ্মের মৌলিক অর্থ মন্ত্র।

২। ব্রহ্ম প্রাণের ভাব এবং প্রাণের ভাষায় প্রকাশিত।

৩। সুন্দর ভাষায় ব্রহ্ম রচনা করিলে দেবগণ অধিকতর প্রীত হন।

৪। ব্রহ্মের ক্ষমতা আছে; ব্রহ্ম উচ্চারণ করিলে কল্যাণ সাধিত হয়।

৫। ব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে দেবগণ বৰ্দ্ধিত এবং বলিষ্ঠ হন।

৬। মন্ত্র দ্বারা জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

৭। মন্ত্র দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; দেবগণের সৃষ্টি ত মন্ত্র হইতেই।

৮। মন্ত্র উচ্চারণ করিলে দেবগণকেও বাধ্য হইয়া মন্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে হয়।

উপসংহার

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রহ্ম (=মন্ত্র) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই, শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই। প্রজাপতি এবং অপরাপর দেবগণ সকলেই মন্ত্রের অধীন।

এখন যদি কেহ প্রশ্ন করেন, "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে?" আমাদিগকে বলিতেই হইবে "মন্ত্র" (=সংহিতার ব্রহ্ম)। সর্ব্বশক্তিমান্ কে? না, ব্রহ্ম।

বিশ্বস্রষ্টা কে? না, ব্রহ্ম। সর্ব্বমূলাধার কে? না, ব্রহ্ম। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম কি? না, ব্রহ্ম।

প্রথমে ব্রহ্মের অর্থ ছিল 'মন্ত্র'। কালক্রমে ইহা সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বমূলাধার স্রষ্টৃ-পাতৃ প্রহর্ত্তার স্থান অধিকার করিল। বর্ত্তমান যুগে প্রধানতঃ এই অর্থেই ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মৌলিক ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম বলিলে লোকে আর মৌলিক ব্রহ্ম বুঝে না—তাহার নাম হইয়াছে "শব্দব্রহ্ম"।

বেদসংহিতাতে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ কতটুকু পাওয়া যায়—তাহা পরপ্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য

একশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য যেরূপ উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই সাহিত্য এখন আয়তনে বিপুল ও সৌষ্ঠবে সুন্দর। বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও মন বিচিত্র-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। এক সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলোচনা করিতেন না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য তাঁহারা এবং পাশ্চাত্য-বিদ্যায় যাঁহারা যশস্বী তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গলা-সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এখন আর সে দিন নাই। মাতৃভাষার ও সাহিত্যের গৌরবে আমরা সকলেই এখন গৌরবান্বিত। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা ও অনুসন্ধান বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। গদ্য-সাহিত্যের যাবতীয় বিভাগে উপযুক্ত লেখকগণ পরিশ্রম করিতেছেন। এই নবযুগে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা বিস্ময়াবহ ও অতীব প্রশংসনীয়।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের যে মূর্ত্তি ছিল, এখন আর সে মূর্ত্তি নাই। রচনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে আসিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও যাঁহারা সুলেখক, তাঁহাদের সকলের রচনা-পদ্ধতি একরূপ নহে। কথ্য-ভাষার সাহিত্য যখন বিপুলায়তন হয়, বহু শিল্পী বহু দিক্ হইতে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী যখন রচনাকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তখন সাহিত্য নানা মূর্ত্তি ধারণ করে—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্য যে মূর্ত্তিই ধারণ করুক, প্রত্যেক মূর্ত্তি-বিকাশেরই ইতিহাস আছে। ক্রমে ক্রমে সুনির্দ্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করিয়া সে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। গদ্য-সাহিত্যের এই মূর্ত্তি-বিকাশের ইতিহাস বিশেষরূপে আলোচনার বিষয়।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এবং রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, অনেকেই বাঙ্গলা গদ্য লিখিয়াছিলেন। এই গদ্যগ্রন্থগুলি প্রধানতঃ বিদেশীয়-দিগকে বাঙ্গালা-ভাষা শিখাইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। দুই শ্রেণীর কর্ম্মী এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা। আমাদের দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য যে-সকল বিদেশীয় যুবক এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গলাভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতেরা এই যুবকগণকে কার্য্যোপযোগী বাঙ্গলাভাষা শিখাইবার জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই-প্রকারে সীমাবদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব। তবে, লেখকগণ সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজেই, মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যের রস-সৃষ্টি যে একবারেই হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই রস-সৃষ্টি আনুসঙ্গিক রূপেই হইয়াছিল।

জনসাধারণের উন্নয়ন ও উন্নততর রসাস্বাদনের জন্য যে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তাহাই প্রাণময় সাহিত্য। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতী-সাহিত্যের সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীরামপুরের 'খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের' বাঙ্গলাভাষায় গ্রন্থরচনার দুই-প্রকারের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা একদিকে বিদেশীয়-দিগকে, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগকে এ-দেশীয় ভাষা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন; আর একদিকে দেশের লোককে তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী ভাব, চিন্তা ও ধর্ম্মের দ্বারা উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। জনসাধারণের উন্নয়ন-চেষ্টা 'খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের' উদ্দেশ্যের ভিতর ছিল। সাহিত্য-সাধনার এই দুইটি ধারা যে সময়ে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে মহামনা রাজা রামমোহন রায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশবাসীগণের উন্নয়ন-চেষ্টাই তাঁহারও মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশের যাহা কিছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে; দেশবাসীগণের চিত্তে বিবিধ কারণে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জড়তা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে; নবযুগের যে গৌরবময় আদর্শ প্রতীচ্য-জগতের সাধনা

আশ্রয় করিয়া আমাদের পুরোদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই আদর্শের অভিমুখে দেশকে চালাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য অন্ধ অনুকরণ মাত্র নহে। দেশীয় সাধনার ভূমিতে দাঁড়াইয়া অতীতের সাহায্যে ভারতের স্বপ্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া, সেই প্রকৃতির অনুবর্ত্তনে মাতৃভাষার সাহায্যে এই কার্য্য করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় ভারতের আত্ম-প্রকৃতি নির্দ্ধারণে ভুল করিয়াছিলেন কি না, বৈদেশিক ভাবের দ্বারা কিছু বেশী রকম বাহিত হইয়াছিলেন কি না, সে কথার আলোচনা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত। কারণ, আমরা সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি। দেশবাসীগণের উন্নয়নই যে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই-প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়া যে সাধনা, সেই সাধনাই সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। ইহা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।

অন্য দেশের গদ্য-সাহিত্যের সহিত, বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের তুলনা করিলে দুইটি কথা স্বভাবতঃ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রথমতঃ, এই সাহিত্য তাহার উদ্ভবের প্রথমাবস্থা হইতেই উন্নততর ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি সুস্পষ্ট মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ইহার হেতু। বাঙ্গলা-ভাষার অবশ্য একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের শব্দ-বৈভব, ভাব-সম্পদ্‌, রচনারীতি প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিপদে পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইবার যে সুযোগ পাইয়াছে, সে সুযোগ অন্য কোন ভাষা ও সাহিত্য এত অধিক পরিমাণে পায় নাই। তাহার পর গদ্য-সাহিত্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, বাঙ্গলার পদ্য-সাহিত্য অতিশয় সমুন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতার ভাষা প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ, ও অলঙ্কার-বৈভবে আজিও অতুলনীয়। বৈষ্ণব কবিতার প্রাণময়তা, স্বচ্ছতা ও মাধুর্য্য বিশ্বসাহিত্যের গৌরবের বস্তু। তাহার পর এই বাঙ্গালী জাতি সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে কাব্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি উন্নততর চিন্তারাজ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশের মনীষার জ্যোতি সমগ্র ভারতবর্ষকে চমৎকৃত ও উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভক্তিতত্ত্বের রসসৃষ্টি, রসশাস্ত্রের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, নব্যন্যায়ের বিচারকুশলতা, স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মীমাংসা-কৌশল—এই সকলের মধ্য দিয়া যে জাতীয় চিত্ত বিকশিত হইতেছিল, সেই চিত্তই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতবড় সুবিধা আর কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে ?

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি যেরূপ দ্রুতবেগে সাধিত হইয়াছে, অল্পকালের মধ্যে এই সাহিত্য যেরূপ শক্তিশালী ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও বিস্ময়াবহ। পূর্ব্বোক্ত কারণ ব্যতীত, আর-একটি কারণ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে, আধুনিক উন্নতিশীল জগতের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। সে এক সুবিপুল বন্যার মত। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক জাতি, তাহাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা লইয়া ভারতের পুণ্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইল। আদান-প্রদান, আলাপ-আলোচনা, বাদানুবাদ, চিন্তারাজ্যে বিবিধ প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত—এই সংঘর্ষের মধ্যে নব্যভারতের জন্ম হইল। বাঙ্গালায় রামমোহন, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের পতাকা হস্তে, এই নব্যভারতের অগ্রদূত হইলেন এবং বাঙ্গালী জাতি নব ভারতের গুরুর আসন লাভ করিল। আমরা রাজা রামমোহন রায়কেই, বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা না হউন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রূপে গ্রহণ করিলাম।

আমাদের সাহিত্যালোচনার প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজা রামমোহন রায়ের উপযুক্ত পূজা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রাজা রামমোহন রায়, ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারক রূপে, তাঁহার যুগে বহু আক্রমণ সহ্য করিয়াছিলেন। সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যের উদার মিলন-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সে দিনের সেই বিরোধের স্মৃতি একবারে মুছিয়া ফেলা আবশ্যক এবং তাঁহার সাধনার প্রকৃত মূল্য নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

সুদূর প্রবাসে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার মানব-লীলা সম্বরণ করার পর নব্বই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সংস্কারক রামমোহনকে লইয়া যে বিতণ্ডাময় আলোচনা তাঁহার জীবিতকালে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই আলোচনার বিতণ্ডার অংশ এখন অপসৃত হইয়াছে। তাহার পর এই সুদীর্ঘকালে সমগ্র পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের জ্ঞান-রাজ্যে ও কর্ম্মরাজ্যে বহুপ্রকারের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, সেদিন অনেকে যে-চক্ষুতে রামমোহনকে দেখিয়াছিলেন এবং যে ভাবে তাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন, আজ আর সে বিরোধীভাবের কোন সার্থকতা নাই। এখন আমরা নিরপেক্ষভাবে নানা দিক্ হইতে রাজা রামমোহন রায়ের স্বরূপ এবং তাঁহার সাধনার প্রভাব আলোচনা করিতে পারি।

রাজা রামমোহন রায় মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিলে, রাজা রামমোহন রায় ঔৎসুক্য ও আহ্লাদের সহিত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেন এবং তাহাদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ইংরেজ জাতির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধার কারণ, তিনি এই ইংরেজকে স্বাধীনতার পরিপোষক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মানবের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু এই স্বাধীনতার মহামন্ত্রের সাধনায় রাজা রামমোহন রায় যে-দিন উদ্বোধিত হইয়াছিলেন, তাহার পর এই এক শতাব্দী কালের নানা-রূপ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের দ্বারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের কেবল জনসাধারণ নহে, বিজ্ঞব্যক্তিগণও সে দিন যে-স্বাধীনতার কথা শুনিয়া ভীত হইতেন, আজ সেই স্বাধীনতার জন্য তাঁহারাও বা তাঁহাদের বংশধরেরাও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমগ্র মানবজাতির চিন্তার সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধীয় চিন্তা ও আলোচনা আজ আমাদের এক নূতন-প্রকারের অনুরাগ লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা-কামী মানব কোন বিশেষ মতের দ্বারা বাহিত হইবে না—সকল-প্রকারের মতই সে আলোচনা করিবে। কিন্তু জীবনের পথে চলিবার সময় সে নিজের মতের দ্বারা নিজের ভিতর যে অন্তর্যামী ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়া বীরের মত নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইবে এই-প্রকারের আত্মসংস্থ মানব গঠন করাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিধানের উদ্দেশ্য। এই বিধানের নাম —'উদার শিক্ষা-বিধান' (Liberal culture)। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের কোন বিশেষ মত সম্বন্ধে দেশের বহু বহু মানবের যদি আপত্তি থাকে, তাহা হইলেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ তাঁহার ঐ মতের আলোচনা করিতে বঞ্চিত হইবে না, এ কথাটিও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

পরবর্ত্তী গদ্য-সাহিত্যে যে চেষ্টাকৃত ও সাধনালব্ধ শিল্পচাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রামমোহন রায়ের রচনায় তাহা না থাকিলেও, তিনি একজন স্বাভাবিক সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন। এখনকার উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস বা প্রবন্ধ-পুস্তক যে-ধরণে লিখিত হয়, তাহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের রচনার ভঙ্গী বা রীতির (Style) প্রভেদ অনেক। কিন্তু, এখনকার মাপকাঠি দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের শিল্পনৈপুণ্যের পরীক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে রাজা রামমোহন রায়, গদ্য-সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, গদ্য-সাহিত্য কেমন করিয়া পড়িতে হয় পাঠকগণকে তাহা শিখাইয়া লইয়া, সেই সাহিত্যের সাহায্যে দেশ-বাসীগণকে তাঁহার ভাব ও চিন্তা দান করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ঔপন্যাসিক, নাট্যকার বা ললিত-প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারক। দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি প্রভৃতির দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি লোকশিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক তর্কবিতর্ক করিয়া উপদেষ্টার কার্য্য করিয়াছেন।

আমরা একালে যাঁহাদিগকে সাহিত্য-শিল্পী বলি, তাঁহারা যে সংস্কারক বা উপদেষ্টা নহেন, তাহা নহে। তবে তাঁহারা এই কার্য্য গৌণভাবে করিয়া থাকেন।

মুখ্যভাবে তাঁহারা আনন্দদায়ক বন্ধু, হৃদয় ও মনের সাথী—তাঁহারা সৌন্দর্য্য ও রসের স্রষ্টা।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-সাহিত্যে দেখিতে পাই—বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের দুইটি বিভিন্ন ধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সুন্দর ও স্বাভাবিক সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি ধারা সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের ভাষা—আর-একটি ধারা কথোপকথনের ভাষা। এই দ্বিতীয় প্রকারের ভাষাতে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতুম পেঁচার নক্সা' লিখিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সময়ে এই দুইটি ধারা বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার গৌরব এই যে, তাঁহার ভাষাতে এই উভয় ধারার একটি প্রাথমিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের পর এই দুইটি ধারা বিভক্ত হইয়া দুই মুখে অগ্রসর হইল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া আবার একটি উন্নততর সামঞ্জস্য (higher synthesis) লাভ করিয়াছে—
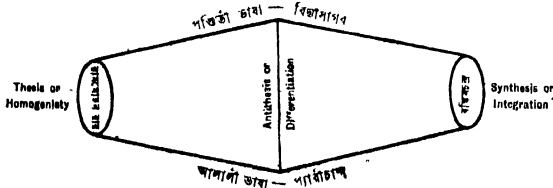
বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ আকার গ্রহণ করিবে, সে সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। তাহাতেও এই দুই ধারার সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যের গতি—মানবীয় চিন্তা ও সাধনার যাবতীয় গতির ন্যায়—এই সনাতন পথে ক্রমবিকাশের অভিমুখী।

রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্য-রচনার রীতিতে যেমন বিচ্ছিন্নতা বা শ্রেণীবিভাগ (differentiation) হয় নাই, তাঁহার চিন্তাতেও ঠিক্ তাহাই। তিনি শাস্ত্র-সর্ব্বস্ব জাতিকে শাস্ত্রের বিচার দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিচারের ভিতর সমাজ সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে। তখনও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সুস্পষ্ট বিভিন্নতা সাধিত হয় নাই। এই বিভিন্নতা-সাধন (specialization) পরবর্ত্তী কালে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গলা-ভাষায় বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তৎসম্পাদিত সংবাদ-পত্রগুলি পাওয়া যায় না। সেগুলি পাইলে হয়ত তাঁহার রাজনীতিক রচনা কিছু কিছু পাওয়া যাইত। তাঁহার ইংরেজী রচনায় অতি উচ্চাঙ্গের রাজনীতিক আলোচনা রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র মনীষা শুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার মধ্য দিয়াই পরিব্যক্ত হয় নাই। সে সময়ে বাঙ্গলা ভাষায়, ইংরেজী-অনভিজ্ঞ জনশ্রেণীর নিকট, রাজনীতিক আলোচনার কোন সার্থকতা ছিল না বলিয়াই মনে হয়। আজিকার অবস্থার সহিত তুলনা করিলে সে-দিন রাজা রামমোহন রায়কে কত অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্য-রচনার ও সাধনার বিশিষ্টতা এই যে পরবর্ত্তী সময়ে যে-সমুদয় বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্য-সেবক ও কর্ম্মীগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যে-সমুদয় বিভাগে তাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় তাহার সকল বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যতের কর্ম্মীগণের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—ইহা তাঁহার অসাধারণতার পরিচায়ক।

রাজা রামমোহন রায়ের মানস-জীবনের ইতিহাস, বিশেষরূপে আলোচনার বিষয়। নব্যভারতের আকাঙ্ক্ষার ও তপস্যার মূল-প্রেরণা, এই ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। প্রাচীনযুগের যে-সমুদয় চিন্তাপ্রণালী ও শাস্ত্র রাজা রামমোহন রায় আলোচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে-সময়ের লোক, সে সময়ে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাক্ষেত্র যে-সমুদয় নেতা শাসন করিতেছিলেন, তাহার একটি স্থূল পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান—এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের সাহিত্যের ও সভ্যতার ধারা, ত্রিবেণী-সঙ্গমের ন্যায়, রাজা রামমোহনের মানস-জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের পিতার বংশ বৈষ্ণব, আর মাতার বংশ শাক্ত। উভয় বংশই শাস্ত্র-আলোচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন দেশীয় ও বিদেশীয় জীবনচরিত-লেখক, শাক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে বিবাহবন্ধন দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ

করিয়াছেন। ইহার কারণ, তাঁহারা হিন্দুসমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। শাক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে বিবাহ হিন্দুসমাজে একটি নিতান্ত প্রচলিত ব্যাপার।

যাহা হউক এই দুই প্রকারের মত ও সাধন-পথ, রাজা রামমোহন রায়ের চিত্তকে যে তুলনামূলক-সমালোচনা-কার্য্যে জীবনের প্রথম অবস্থাতেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুলনা-মূলক ধর্ম্মালোচনা ও বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম্মমতের সমন্বয়-সাধনের প্রেরণা রাজা রামমোহন রায় বাহিরের বা বিদেশের কোন শিক্ষা হইতে যে প্রাপ্ত হন নাই, তাহা তুলনা- ও সমন্বয়-মূলক কালিকাবিলাস, সারদাতিলক ও প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষ চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের তুলনা ও সমন্বয় করিয়াছে; সুতরাং, রাজা রামমোহন রায়ের এই প্রবৃত্তির বা উদ্যমের বৈদেশিক বা বিজাতীয় প্রভাবের অন্বেষণ করার প্রয়োজন নাই। তবে মুসলমান ধর্ম্মের আলোচনা, তিব্বতযাত্রা, তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী, এই চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী যুবকের চিত্তের উপর ক্রিয়া করিয়াছিল। তন্ত্র ও স্মৃতি লইয়া বাঙ্গলার ব্রাহ্মণসমাজ যে সময়ে অভিভূত, সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের আলোক এবং বৈদান্তিক মত ও উপনিষদের সারসত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহার পর খৃষ্টীয় সমাজের নানাবিধ মতের সহিত পরিচয়, ডিগ্‌বী সাহেবের সংসর্গে তৎকালীন ইউরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ,—এতগুলি শক্তি রাজা রামমোহন রায়ের চিত্তের উপর ক্রিয়া করিয়াছে।

ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণের চিন্তা ও তাহার বিবিধরূপ সমালোচনা দ্বারা ইউরোপের চিত্ত উন্মথিত হইতেছিল। এই চিন্তা-সংঘর্ষের প্রভাব, রাজা রামমোহন রায়ের মানস-জীবনে ও সাহিত্য-সাধনায় সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রুসো ও ভল্‌টেয়ারের সহিত একটা বিশেষ-রকমের প্রভেদও আলোচনার বিষয়। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণ, মানবত্মার যে গৌরব-গীতি গাহিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় উল্লাসের সহিত তাহা শুনিয়াছিলেন এবং তাহার ভিতর যে সংস্কারমুক্ত সংযত স্বাধীনতার বার্ত্তা ছিল, তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ধভাবে গ্রহণ করেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণ যখন অতীতকে ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে অনাদর করিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় সেই যুগে, তাঁহাদের চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াও, শাস্ত্র এবং অতীতকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া, নবযুগের প্রয়োজনীয় উন্নতিশীল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে এবং তাঁহার জাতির পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। অবশ্য এ কার্য্যেও মনীষী বার্কের সংরক্ষণ ও সংস্কার নীতির (conservation and reform) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এখন কোন জাতি বা কোন দেশ বিভিন্ন নহে। মনোজগতে সকলেই মিলিয়া গিয়াছে। এই মহামিলনের প্রথম সুর আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্যেই ধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিতে হইলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—অথবা প্রাচীন ও আধুনিক - এই উভয় প্রকারের চিন্তার ও সাধনার সংঘর্ষ ও সমন্বয় আলোচনা করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বদেশের বিশিষ্টতার ভূমিতে দাঁড়াইয়া বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিশিষ্টতা ভারতের ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক জীবন। এই আধ্যাত্মিক জীবনের উপলব্ধিতে ভারতবর্ষ তাহার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই ভারতবর্ষকে নবযুগে সগৌরবে জাগিয়া উঠিতে হইবে। ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার মর্ম্মকথা বলিয়া মনে হয়। বেদান্তে তিনি ভারতের এই আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোত্তম পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেই-জন্যই তিনি সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

ধর্ম্ম ও সাহিত্য সাধারণতঃ পৃথক্ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা ঠিক প্রাচীন জগতের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। এই ধর্ম্ম সর্ব্বজনীন এবং এই

ধর্ম্মে যুক্তি-প্রয়োগ ও স্বাধীন চিন্তা নিরঙ্কুশ ও অক্ষুণ্ণ। রাজা রামমোহন রায়ের সাধনায় সাহিত্যের ও ধর্ম্মের বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সম্মিলিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন—কেবল হিন্দুশাস্ত্র নহে, হিন্দু, মুসলমান, ও খ্রীষ্টানের শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র স্বীকার করিয়াও মানবের স্বাধীন-চিন্তার অধিকার সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম ঠিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, তাঁহার আলোচনা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত। কিন্তু একথা অতিশয় সত্য যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মানুষকে এক সুদূরবর্ত্তী ও অজ্ঞাত পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই উদ্বুদ্ধ করে না—সংসারের সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রকে এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে এবং মানবের সর্ব্বতোমুখ উন্নতিসাধন এই ধর্ম্মের লক্ষণ। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম, সাহিত্যসাধনা হইতে একবারে বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা নহে।

ভারতের প্রাচীনতম ও উন্নততম জ্ঞানভাণ্ডার বেদান্তশাস্ত্র। এই বেদান্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই রাজা রামমোহন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন ভাবে মানুষ যাহাতে চিন্তা করিতে পারে, নিজেদের দেশীয় সাধনার যাহা প্রাণপ্রদ তাহা রক্ষা করিয়া, বাহিরের পুষ্টিকর ও কল্যাণপ্রদ ভাবসমূহ এই প্রাচীন জাতি যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, নিজের বক্তব্য বিষয় সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারের সহিত যাহাতে তাহাদের পরিচয় হয় তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায়, গদ্য সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার আরম্ভ করিলেন।

বিশুদ্ধ সাহিত্য কি, সাহিত্যকে কত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কোন্ শ্রেণীর কি লক্ষণ—এ-সমুদয় নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। আমরা এই স্থানে বিশুদ্ধ সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতেছি। মানুষ নানা প্রকারে মানুষ হইতে পৃথক্। জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, আবার এমন কি, গায়ের বর্ণ পর্য্যন্ত মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবহারিক জগতে এই পার্থক্য ছাড়াইয়া উঠা যায় না। কিন্তু মানব-চৈতন্যের বা মানবহৃদয়ের এমন একটি জাগরণের অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ তাহার এই স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীগুলি সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠে এবং ভাবে, চিন্তায়, কল্পনায়, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, সুখে-দুঃখে, সৌন্দর্য্য-বোধে ও রসাস্বাদনে অতীত অনাগত, দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী যাবতীয় মানবের সহিত এক হইয়া যায়। মহামানব বা নিত্যমানবের জীবন, ক্ষুদ্র মানবের জীবনে সেই সময়ে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থার যে শব্দময় ও রসবৎ-প্রকাশ—গদ্য বা পদ্য যাহাতেই হউক—তাহাই বিশুদ্ধ-সাহিত্য-পদবাচ্য। সাহিত্যের ভূমি, মহামিলনের ভূমি। যাহা নিত্য সত্য ও নিত্য সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের আত্মা।

সাহিত্যের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিলে, দর্শন ও ধর্ম্মের সহিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রভেদ অতি অল্পই থাকে। কাজেই সেই প্রভেদটুকু সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই জাগরণ যদি বিচারমূলক জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহা উচ্চতম দর্শনশাস্ত্র। আর, এই জাগরণ যদি মানবের জীবনের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্ম। আর, এই জাগরণ যদি প্রধানতঃ হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করিয়া রসাস্বাদনের সাহায্যে সুবিশুদ্ধ আনন্দ দানের সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহা সাহিত্যপদবাচ্য। প্রভেদ অতিশয় অল্প; কিন্তু বাঙ্গলা দেশে একদিন, অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিদের যুগে, ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রায় এক হইয়া গিয়াছিল। কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায় এই প্রকারের উদারতত্ত্বমূলক সংজ্ঞা-নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞার সাহায্যে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এই নিত্যসত্য ও নিত্যসুন্দর যে রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই বিশুদ্ধ সাহিত্য বা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য। অন্যান্য শ্রেণীতে বিচার-পূর্ব্বক দেখিতে হইবে, এই সত্য ও সুন্দর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ না করিলেও, মানবহৃদয় সেই রচনার দ্বারা ঐ সত্য ও

সুন্দরের অভিমুখে কি পরিমাণে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ ও বাধাহীন যুক্তিপ্রয়োগ—যাহা মানব-হৃদয়কে সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন করিয়া মৈত্রী ও বিশ্ব-প্রেমের মধ্যে লইয়া আইসে, তাহাও—সাহিত্যপদবাচ্য। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিক্ষা যদি এরূপভাবে ব্যাখ্যাত হয় যে এতদিন যাহা দেশ-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি বলিয়া মনে হইত, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সার্ব্বজনীন, তাহা হইলে ঐ ব্যাখ্যাও সাহিত্যপদবাচ্য হইবে। এই-প্রকারে দেশ-বিশেষে প্রচলিত আচার, নিয়ম, অনুষ্ঠান, এমন কি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, যদি মানব-হৃদয়ের কোন সনাতন ও বিশ্বজনীন মহাসত্যের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলেও ঐ বর্ণনাও সাহিত্য-পদবাচ্য। এক কথায়, মানবতাই সহিত্যের পরিচায়ক এবং মানবতার প্রতিষ্ঠা ও মানবতার অভিমুখীনতা, সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগের অভ্রান্ত লক্ষণ।

সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইল উহা একেবারে আধুনিক যুগের চিন্তা ও ধারণার উপযোগী। পূর্ব্বে সাহিত্য পণ্ডিতগণের সামাজিক সম্মিলনে আনন্দভোগের সামগ্রী ছিল। রাজসভার সাহিত্য, বেশভূষা ও অলঙ্কার-পারিপাট্যের দ্বারা এবং কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী বিস্তার করিয়া ধনী মানী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সেবা করিত। আবার সাহিত্য কখনও নিম্নশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল মানবের ইন্দ্রিয়ভোগের স্থূল উপকরণও জোগাইয়াছে। কিন্তু এখন আর মানবসমাজে শ্রেণীবিভাগ নাই। এখনকার সাহিত্য সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব নহে। মানবতার গৌরব ও মানব-আত্মার অসীম মহিমা সকলেই বুঝিবার অধিকারী। এই বোধের উপর মানবের মহামিলন হইবে। রাজা রামমোহন রায়ের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা হইয়াছে। তবে তখন গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন ছিল না। বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই আদিম প্রাণপ্রতিষ্ঠার কালে এই মানবতার গৌরব এবং প্রত্যেক নরনারীর উচ্চতম পরমার্থ বস্তুতে সমান অধিকার সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছিল। সেই অভয়দান ও অমৃতবিতরণের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে বিশিষ্টতা তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। বৈষ্ণব কবিতা অতি প্রাঞ্জল, সরল এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত শব্দেই রচিত। কোন কোন কবির রচনায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে সত্য। কিন্তু কীর্ত্তনের গানের দ্বারা এই পদাবলী ব্যাখ্যাত ও আস্বাদিত হইয়া আপামর সাধারণের দ্বারে দ্বারে তাহার অমৃত বিতরণ করিয়াছে। সুতরাং এই সাহিত্য জন-সাধারণের মহামিলনের সাহিত্য।

সাহিত্যকে যথার্থরূপে জাতীয় সাহিত্য করিতে হইলে অতীতের সাধকগণের সাধনার সহিত একটি জীবন্ত যোগ রক্ষা করিয়া পরবর্ত্তী কর্ম্মীগণের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। রাজা রামমোহন রায় কি কি সমস্যা অনুভব করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তৎসমুদয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় যিনি লাভ করেন নাই, নব্যবঙ্গের জাগরণ ও সাধনার মূল সূত্র তিনি ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। কাজেই রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে সাহিত্য-সভায় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে নানা দিক্ হইতে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার দ্বারা এই মহাপুরুষকে যাঁহারা ভীত চিত্তে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা স্বদেশের প্রতি বড়ই অবিচার করেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলী হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ নির্ব্বাচিত করিয়া সেই অংশগুলি উচ্চশিক্ষার্থীগণ যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, সে-জন্য দেশের তৎকালীন অবস্থা, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের সাধনা ও তৎকালীন বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সহ প্রকাশিত করিয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃত আলোচনা, এই কার্য্যের দ্বারাই আরব্ধ হইবে। *

শ্রী শিবরতন মিত্র

* লেখকের—'মোহন-সুধা" (রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-সংগ্রহ) নামক গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত।

মাধুরী

১

ঢং, ঢং, ঢং—কলেজের বেল্ বাজিয়া গেল।

"মাধুরী, মাধুরী!"

কমন্-রুমের এক কোণে গোল-টেবিলের একধারে মাধুরী বসিয়া ছিল। আহ্বান শুনিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল, সহপাঠিনী রেণুকা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—"নিশ্চিন্ত হয়ে বসে' রয়েছিস যে? আজ ক্লাসে যাবার মৎলব নেই নাকি?"

মাধুরী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"এঘণ্টায় আমার ছুটি যে—"

রেণু উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ড্রয়ার হইতে বই-খাতা টানিতে টানিতে কহিল—"খেয়েছে রে! এখন কিসের ক্লাস?"

"রুটীন্‌টাও তোমার মনে থাকে না! আজ এখন বটানি না?"

"এইরে! কিচ্ছু পড়া হয়নি আজ, খেয়ে ফেল্‌বে আমাকে।"

"কে?"

"আর জ্বালাস্‌নে ভাই; জানিস, তবু—"

রেণু আর কথা কহিবার সময় না পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বহির হইয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মাধুরী হাসিল। সম্মুখের বইখানা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল।

একটি মেয়ে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার ১৭।১৮ বছর বয়স, মুখখানি কিন্তু একেবারে কচি, ঠিক ১০ বছরের মেয়ের মতন সরল নির্দ্দোষ নিরহঙ্কার মুখ। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িয়াছে, চোখ দুটি ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ, তাহার ললাটে বুদ্ধির প্রখরতা ও হৃদয়ের কোমলতার উজ্জ্বলছাপ সুস্পষ্ট। মেয়েটি পশ্চাৎ হইতে দুইখানি নরম হাতে মাধুরীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। মাধুরী মুখ ফিরাইয়া কহিল—"এতক্ষণ কি হচ্ছিল?"

মেয়েটি হাসিয়া কহিল—"আমার? ওঃ—লাইব্রেরীতে বই দেখ্‌ছিলাম—একটা মনের মত বই পাচ্ছি না—"

"উপন্যাস ত?"

"না, কাব্য; আমি কবিতা পড়্‌তে ভালবাসি।"

"আর লিখ্‌তে বাস না?"

সে তো ভাই তুমি বাস, আমাকে কেন বল?"

"তুমি লেখ না?"

"আমি জানিনে লিখ্‌তে, তার আবার—"

"আচ্ছা থাক্‌গে। এসো একটু পড়ি—"

"মাধুরী!"

"কেন, নীলা?"

নীলা উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দুই নেত্রে সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া রহিল। সেই দৃষ্টিতে ভালবাসার সঙ্গে একটু সহানুভূতির আভাস ছিল। মাধুরী ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করিয়া মুখ নত করিল। নীলা তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"আমি এখানে আস্‌বার আগে কি ভাব্‌ছিলে ভাই বসে'?"

"কৈ?"

"কিচ্ছু ভাব্‌ছিলে না? তুমি ত অনেক সময়েই একা বসে' বসে' ভাব; আমি বোর্ডিংএ থাকি নে, সব সময়ে দেখি নে, কিন্তু রেণুও আমাকে এই কথা বলে যে।"

"কি বলে রেণু?"

"বলে—তুমি চুপ করে' একজায়গায় বসে' থাক, কি ভাব, কি যেন ভাব—"

মাধুরীর ওষ্ঠাধরে একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে একটু বিব্রত হইয়া কহিল—"আমি ভাবি তার মানে কি? সবাই ত ভাবে। ভাবনা কার নেই বল দেখি! ঐযে কাকটা রেলিংএর উপর বসে' আছে সেও নিশ্চয় কিছু একটা ভাব্‌ছে। তোমরা ভাব না?"

নীলা কহিল—"তোমার কথা হ'ল আলাদা।"

নীলা খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা ভাই—তোমার স্বামীকে এখন দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌বে?"

মাধুরীর গালদুটি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল; সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। নীলা তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"বল না ভাই।"

মাধুরী হাত ছাড়াইয়া লইল।

নীলা কহিল—"রাগ করলে ?"

"না।"

"তা হলে আমি সত্যি ধারণাই করেছি—"

"কি ধারণাটা শুনি ?"

"আজকাল একজনের কথাই তোমার মনে পড়ছে বোধ হয় দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা—"

"কার কথা ?"

"সেই পিতৃভক্ত দুগ্ধপোষ্য গ্রাজুয়েট্‌টির—"

"আঃ নীলা, কি বকচ !"

"কি বকচি কি আবার ? তাকে সাম্‌নে পেতাম ত দেখিয়ে দিতাম।"

"সে সৌভাগ্য তোমার হবে না। সুতরাং চুপ করে' থাক।" বলিয়া মাধুরী একটু হাসিল।

"আচ্ছা ভাই কটা টাকা কম পড়েছিল বলে' সত্যি সত্যি তোমায় ফেলে চলে' গেল! কেমন মানুষ ভাই তারা? তবু ভাগ্যিস বিয়েটা হয়েছিল, তা না হলে ?"

"কি জানি ? যা।"

"তখন তোর বয়স পনেরো বছর, না ?

"হ্যাঁ, তখন তো সেকেণ্ড্‌ ক্লাসে আমরা। তখনও আমি বোর্ডিংএ আসিনি।"

"আস্‌তেই কি হত ? তোর বরটিই বা কেমন! সেও কি একটা কথা বল্‌লে না !"

"কেন বাজে বকচ, নীলা! বাপের কথার ওপর কথা কইবে তেমন সাহস ক'টা ছেলের আছে ? তা ছাড়া যা হয়ে গেছে সে-সব কথার আর দর্‌কার কি ?"

"শুভদৃষ্টির সময় চেয়ে দেখেছিলি ভাই ?"

"আবার নীলা !"

নীলা অগত্যা আর প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। শুভদৃষ্টির সময় অত্যন্ত লজ্জা করিয়াছিল, তবু মাধুরী চাহিয়া দেখিতে ভুল করে নাই। এক মিনিট কাল স্পষ্ট চাহিয়া দেখিয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; সেই চন্দনচর্চ্চিত তরুণ সুন্দর মূর্ত্তিটি যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। নীলা সত্য কথা বলিয়াছে—সেই চেহারাই ঘুরিয়া ফিরিয়া কলেজে-পড়া এই মেয়েটির মনে পড়ে।

আর-একটা বেল্‌ বাজিয়া গেল; রেণু আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। হাতের বইগুলো টেবিলের উপর নির্দ্দয়ভাবে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া একটা চেয়ারে হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। মাধুরীর পানে চাহিয়া কহিল—"এখনো তোর ছুটী !"

মাধুরী হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ।"

রেণু একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"থাক্‌, এখন আমিও মুক্ত আছি, আমার আর হিংসে হচ্ছে না।"

২

সেদিন বিকালে বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইল। শুক্রবার; আজ পড়াশুনার তাড়া নাই। মেয়েরা যেখানে-সেখানে হাত পা মেলিয়া বসিয়া ছিল। কেউ শুইয়াছিল; কেউ বা গল্প করিতেছিল; আর কয়জনে গল্পপড়ায় মন দিয়াছিল। সবস্থানেই এক-একটি ছোটখাট দল গঠিত হইয়াছিল; কেবল মাধুরী দলছাড়া হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতল হইতে নামিবার সিঁড়ির অর্দ্ধপথে একটা ছোট জান্‌লা আছে, মাধুরী সেই জান্‌লার উপর বসিয়া ভাবিতেছিল, বাহিরে ঝিরঝির করিয়া বৃষ্টির ধারা কঠিন মাটিতে ঝরিয়া পড়িতেছে; শীতল হাওয়া তাহার কপালের উপরকার পাত্‌লা চুলগুলি দোলাইতেছিল।

মাধুরী দুইবৎসরেরও অধিক কাল এই বোর্ডিংএ বাস করিতেছে, কিন্তু এখানে কাহারো সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতা হয় নাই; তার কারণ মাধুরী তেমন আলাপী বা মিশুনে নয়। তার স্বভাবের সবটা বোঝা যায় না। তাই সকলে নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত ভাব জমাইতে পারিত না, খানিকটা অগ্রসর হইয়া থামিয়া পড়িত। শুধু একটি মেয়ের সহিত মাধুরীর যথেষ্ট হৃদ্যতা হইয়াছিল, সে নীলা। নীলা কিন্তু বোর্ডিংএ থাকে না, তাই মাধুরী বেশীক্ষণ তাহার সঙ্গ উপভোগ করিতে পারিত না। নীলার নিরহঙ্কার স্বভাব, সরল চাহনি ও শিশুর মত কোমল সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মাধুরী মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাই নীলার কাছে সে তার রুদ্ধ হৃদয়ের কবাট খানিকটা খুলিয়া দিয়াছিল।

মাধুরী নিজেও তাহার মনখানি লইয়া কেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত। বিবাহের দিনে টাকার গোলমাল লইয়া তাহার পিতা ও শ্বশুরে যে মনোমালিন্য হইয়াছিল, তাহার ফল-স্বরূপ মাধুরীকে শ্বশুর-ঘরে পদার্পণ করিতে হয় নাই। এই নিদারুণ অবজ্ঞা ও অপমান তাহার কোমল বালিকা-হৃদয়ে অগ্নির মত জ্বলিত; স্বামীর কথাই সে ভাবিত; শুভদৃষ্টির সময় সে যে মুখ যে চোখ দেখিয়াছিল তাহা ত ভারি সুন্দর, তাহা ত নেহাৎ সাধারণ নয়। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে কি বীর্য্য একবিন্দু ছিল না! তিনি পুরুষ, তিনি শিক্ষিত, কেন তিনি সকল আলোচনা উপেক্ষা করিয়া মাধুরীকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন না? পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে তাহাকে তিনি চিরজীবনের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন, তাহাকে অন্যায় অপমানের বেষ্টনে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন কেন? কিসের অধিকারে? কেন আজ তাহার সকলের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ হয়! কেন কেহ মুখের দিকে চাহিলে ভয় হয় বুঝি সহানুভূতি করিতেছে, করুণা করিতেছে! এসব ভাবিতে ধিক্কারে মাধুরীর মনটা ভরিয়া যাইত। এক-একবার মনে হইত স্বামী নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করেন নাই, নিজের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার লজ্জা কি? সে তো আপনি ঠিক আছে। কিন্তু এ ভাবনায় সে শান্তি পাইত না। স্বামী—তা হোক না একদিনের পরিচয়—সে যে কি সম্পর্ক—স্ত্রী হইয়া কিছুতেই কি স্বামীর ত্রুটি উপেক্ষা করা যায়? দুজনের মধ্যে একদিন মুখের কথাটা হওয়া দূরে থাক, শুভদৃষ্টির সময় ব্যতীত চোখের দেখাটাও হয় নাই—তবু কেন সে কথা ভোলা যায় না! কেন ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অন্যায়কারী মানুষটির কথাই মনে পড়ে! তিনি তাহার কে? এক মুহূর্ত্তের জন্যও যিনি সম্পর্ক স্বীকার করিলেন না, তাঁহার জন্য এই বেদনা? নিজের মনোভাবে মাধুরী নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইত। মনে সে কিছুতেই শান্তি পাইত না। তাহার মা-বাপের মৃত্যু হইয়াছে, দাদা আছেন, তিনিই তাহাকে কলেজে পড়িতে দিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সে একটা কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না। হিন্দু নারীর স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির প্রেরণায় সংসারধর্ম্মের দিকেই তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত। একটি গৃহকে আপনার কল্যাণপূর্ণ স্নেহ-হস্তের স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা জাগিত। একটি সন্তানকে আপনার বক্ষরক্তে পালন করিয়া 'মানুষ' করিবার ইচ্ছা হইত। কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে সে বুঝিতে পারিত না। সংসারে যাহাকে তাহার দরকার ছিল, তিনি প্রথম পরিচয়ের দিনেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেছেন, নিজের মনুষ্যত্বের পরিচয় আজিও দেন নাই, কাহাকে আশ্রয় করিয়া সে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিবে! স্বামীর আশ্রয় তার চাই-ই—সে যে নারী; এর চেয়ে বড় কথা তার মনে এখনো জাগে নাই। সে কুমারী থাকিলে হয়তো ভাবিত সে নিজের পায়ে একলাই দাঁড়াইবে—কিন্তু এখন আর সে তাহা ভাবিতে পারে না, তাই সে ভাবিত স্বামী কি একদিন তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসিবেন না? যদি ভুল বুঝিয়া অনুতপ্ত হইয়া তাহার ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে আসেন। মাধুরীর সমস্ত মন তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিত, আবার পরক্ষণে তাহার চিন্তা উলট-পালট হইয়া যাইত। স্বামীর প্রতি একটা রাগে বিদ্বেষে তাহার মন পূর্ণ হইয়া যাইত। ছি, তিনি কি মানুষের কাজ করিয়াছেন? না, তিনি ফিরিয়া আসিলেও সে তাহার কাছে যাইবে না, কখ্‌খনো না।

এই রকম দুইদিকের কল্পনা করিতে করিতে সে দিশাহারা হইয়া পড়িত। তাহার বুদ্ধি প্রখর ছিল, তাই অল্প পড়াতেই কাজ হইয়া যাইত। কিন্তু সে বেশী পড়িতে পারিত না। আপনার ভাবনাতেই তার অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত।

আজও সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল। নীলা কাছে থাকিলে দু-একটা কথা বলিত, কিন্তু আর কাহারও সঙ্গে কহিতে ইচ্ছা হইত না। বাণী একবার আসিয়া ক্যারম্ খেলিতে সাধিল, মাধুরী মৃদু মধুর হাসিয়া অসম্মতি জানাইল।

রেণু কহিল—"না বাণী, ওকে সাধিস্‌নে, ও হয়েছে কবিমানুষ, খেলাটেলা ওর ভাল লাগে না; দিনরাত আকাশের দিকে চেয়ে ভাবনা!"

বাণী কহিল—"হ্যাঁরে মাধুরী, কি ভাবিস্ তুই বল্ দেখি! আজকাল নীলিটারও ঐ রোগে ধরেছে!"

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল—"তার কি হয়েছে ভাই?"

বাণী কহিল—"বল্লুম যে তোমার রোগে ধরেছে!"

মাধুরী হাসিল।

বাণী কহিল—"হাস্‌চ কি ভাই! সত্যি সত্যি নীলা আজ কাল ভাবতে শিখেছে, শুন্‌ছি ওর বিয়ে শীগ্‌গির তাই আর কি!"

মাধুরী অবিশ্বাসের সুরে কহিল—"দূর! নীলার বিয়ে কি বল্‌চ! সে বিয়ে করবে না বলেচে।"

বাণী চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিল—"ইস্, বল্লেই হোলো! হিন্দুঘরের মেয়ে কলেজে পড়তে দিয়েছে বলে' বিয়ের সময় কথাটিও কইতে দেবে ভেবেছ? তা আর হয় না। আর নীলার বাবা যে মানুষ; বাপরে! হিন্দু-সমাজের ভাই ঐ বড় দোষ; আমাদের ব্রাহ্মদের কিন্তু—"

রেণু বাধা দিয়া কহিল—'আচ্ছা হয়েছে সমাজপতি মহাশয়, এখন খেলতে চল।"

বাধা পাইয়া বাণী বুঝিল সামাজিক ন্যায়ান্যায়ের আলোচনাটা না হওয়াই ভাল, সুতরাং যাহা বলিবার ছিল তাহা সে চাপিয়া খেলিতে চলিয়া গেল।

৩

ইহার কয়েক দিন পরেই মাধুরী নীলার বিবাহের সংবাদ পাইল; সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। মাধুরী শুনিতে পাইল নীলার বিবাহ-দিবসে তাহার নিজের বিবাহ-রজনীর অতি নিষ্ঠুর পুনরভিনয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার শেষরক্ষা হইয়াছিল; ফলটা তাহার মত হয় নাই। নীলার জন্য মনোনীত শিক্ষিত পাত্রটি পিতৃ-আদেশে বরাসন হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাত্রের বন্ধু যোগ্যতর একব্যক্তি নীলাকে অপমানের হাত হইতে বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াছে। বিবাহের দিন-পনেরো পরে নীলা কলেজে আসিল, পনেরো দিনেই তাহার চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা, দেহে বসনভূষণের নূতনত্ব, সর্ব্বোপরি মুখখানিতে নববধূসুলভ সলজ্জ হাসির আভা তাহাকে এক নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। মাধুরী বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল; নীলার কল্যাণী বধূমূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে স্বীয় ভবিষ্যৎ-আদর্শের ন্যায় প্রতিভাত হইল।

নীলা কহিল—"মাধুরী, রাগ করিস্‌নে ভাই, আমার ভারি লজ্জা করছিল, তাই তোকে লিখতে পারিনি। কেউ আমার মত জিজ্ঞাসা করে নি, কিছু না, হঠাৎ দেখি সব তৈরি! তার পর আর—"

মাধুরী কহিল,—"তবু তোর মনোমত হয়েছে ত? খুসী হয়েচিস্ তো ভাই?"

নীলার মুখখানি সুন্দর মধুর পরিতৃপ্তির হাসিতে ভরিয়া গেল; তাহাতেই তাহার মনোভাব মাধুরীর কাছে গোপন রহিল না। মাধুরী মনে মনে কহিল, "আজ একদিনেই স্বামী পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছ; বিবাহ করিবে না বলিয়া যে বড় জেদ ধরিয়াছিলে, সে জেদ তোমার রহিল কোথায়? আমি কাহারো কথা ভাবিলে যে তোমার হিংসা হইত, আজ যে তুমি সর্ব্বক্ষণ তোমার স্বামীটির কথাই ভাবিবে, আমার কথা মনে পড়িবে কি?" কিন্তু এই ভাব সে তাড়াতাড়ি মন হইতে দূর করিয়া দিল, সে ভাবিল, "থাক্‌গে আমার কথা, নীলা সুখী হউক।" সে নীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কলেজে আর পড়তে পাবে কি?"

নীলা কহিল—"হ্যাঁ পড়তেই ত এসেছি।"

তার পর আস্তে আস্তে মাধুরী ও নীলার বন্ধুত্ব শিথিল হইয়া আসিল। নীলা নববিবাহের মাধুর্য্যে দিবা রাত্রি মগ্ন হইয়া থাকিত, মাধুরীর কথা তাহার মনেই পড়িত না। নূতন সুখে সুখী হইয়া ভাগ্যহীনা সঙ্গিনীর নিকট সে আপনাকে একরকম অপরাধী ভাবিত, সঙ্কোচে স্বামীর একটু প্রসঙ্গ বা নিজের প্রেমের একটু আভাস সে বন্ধুর নিকট বলিতে বা দিতে পারিত না। তাই মাধুরীর সঙ্গে তাহার কথা-বার্ত্তা জমিতেই চাহিত না। মাধুরীও ক্রমেই নীলার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছিল; সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে এই নূতন যাত্রাপথে নীলার আর তাহাকে দরকার হইবে না।

বিবাহের ছয়মাস পরে নীলা কলেজে আসা পরিত্যাগ করিল। একটু সলজ্জ একটু স্মিত ভাবে নীলা মাধুরীর

কাছে বিদায় চাহিল। মাধুরীর বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল। ছাত্রীজীবনের একমাত্র মূর্ত্তিমতী আনন্দটিকে বিসর্জ্জন করিয়া দিতে তাহার প্রাণের একেবারে মর্ম্মস্থলে ব্যথা বাজিতেছিল; কিন্তু তাহার মুখে কোন ভাব প্রকাশ পাইল না। সে শুধু একটু হাসিয়া কহিল—"একেবারেই যাচ্ছ?"

নীলা কহিল—"হ্যাঁ ভাই, শ্বাশুড়ীর কাছে যাচ্ছি; তাঁরা আর পড়াবেন না।"

মাধুরী কহিল—"আর আসবে না?"

নীলার মুখে লজ্জা ও আনন্দের মিশ্রিত হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে মাথা নত করিয়া রহিল, মাধুরী তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিল—"ও, তুমি তো 'মা' হ'বে এবার। থাক্, একেবারে ভুলে যেয়ো না। খোকা খুকী হ'লে খবরটা দিয়ো।"

নীলা স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল; কিন্তু সেখানে গিয়া একখানি পত্র দিতে তাহার একদিনও মনে পড়িল না। মাধুরী দুঃখের হাসি হাসিল; বোর্ডিং-বাস তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল; পড়াশুনাতেও মন বসিতেছিল না।

৪

মার্চ্চমাসে পরীক্ষা হইয়া গেল; পরীক্ষা সে একরকম দিল; কিন্তু কোনও বিষয়ে তাহার আশা ও উৎসাহবোধ ছিল না। সব সময়েই ঔদাস্য ও আশা-শূন্যতা তাহাকে অবসাদ-গ্রস্ত করিয়া রাখিত।

মাধুরীর দাদা আলীপুর কোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করেন; পরীক্ষার পরে কাল-বিলম্ব না করিয়া সে দাদার বাড়ী চলিয়া গেল।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে মাধুরী তাহার বৌদিদির কাছ-ঘেঁসিয়া বসিয়া আব্‌দারের সুরে কহিল—"বৌদি, আমি আর বোর্ডিংএ যাব না ভাই।"

বৌদি মাধুরীর চেয়ে অনেক বড়। মাধুরীর দাদা অনিল ও মাধুরীর মধ্যে আরও অনেক ভাই বোন হইয়াছিল; তাহারা কেহই বাঁচিয়া নাই; পিতৃমাতৃহীন অবশিষ্ট এই দুটি ভাই-বোন পরস্পরের বড় আপনার। এবং সেইজন্যই মাধুরী ও বৌদির মধ্যে স্নেহবন্ধনটা সুদৃঢ় আকার ধারণ করিয়াছিল। বৌদির নাম নিভা। তিনি সুন্দরী, শিক্ষিতা ও স্নেহশীলা রমণী। নিভা মাধুরীর কথা শুনিয়া হাসিলেন; কহিলেন—"তুই তো জোর করেই যেতে চাস, নইলে আমরা তো তোকে বাড়ী আস্‌তেই বলি। বোর্ডিংএ থেকে তোর কি চেহারা হয়েছে বল্ দেখি। তুই বাড়ী থাক্‌লে আমিও বাঁচি।"

"কেন বল দেখি?"

"তোর দাদাকে নিয়ে আর পেরে উঠিনে ভাই! এমন খেয়ালী মানুষকে নিয়ে সংসার করা এক দায়। কিছু বলেও কোন লাভ হয় না, শুধু আমার প্রাণান্ত।"

"খেটে খেটে বুঝি?"

"দূর, তা কেন? খাটুনিকে বুঝি আমি ভয় করি? উনি যদি অন্ততঃ নিজেকে সাম্‌লে চলেন, তবেই আমি বেশ সংসার চালাতে পারি। তা না, চোখে চশ্‌মা পরে' উনি সারাবাড়ী চশ্‌মা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, নয়তো বন্ধুকে 'খাবার নিমন্ত্রণ করে' এসে আমাকে বল্‌তে ভুলে গেছেন; কি বিষম বিপদে পড়ি তখন!"

"আহা, বৌদি, দাদার কাজ কত, সেটা দেখচ না?"

"ইস্, কাজ তো ভূ-ভারতে আর কেউ করুচে না! আর ঢাকিস্‌নে ভাই, যাকে নিয়ে সংসার করতে হয়, সেই বোঝে?"

মাধুরী হাসিল। এই-সমস্ত কথার মধ্য হইতে বৌদির প্রাণের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি যেন গানের সুরের মত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। স্বামীর সম্বন্ধে তিনি বারে বারে যে-সব যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহার কথার ধরণে ও চেহারায় ঠিক তার উল্টাটি বুঝাইতেছে। এই যন্ত্রণাটাই যেন পরম উপভোগের বিষয় হইয়াছে। কেমন করিয়া আর-একজনের প্রতি এমন মধুর কোমল প্রেমপূর্ণ একত্ব-বোধ হয় তাহা ভাবিতে ভাবিতে মাধুরী চুপ করিয়া রহিল। শিশুর দুরন্তপনায় মাতা অস্থির হইয়া পড়েন, তবু সেই দুরন্তপনা ছাড়া তাঁহার একটি দণ্ড চলে না। সেই শিশু-দস্যুর সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব মার মনে মধুর হইয়া প্রতিভাত হয়। নারীর এই মনোভাব প্রিয়জনের প্রতি

সর্ব্বদাই এক হয়, নারীর মাতৃত্বে সম্পর্ক-বিচার নাই। এত কথা মাধুরী কখনও ভাবে নাই, আজ সে যতই এসব কথা আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার অন্তরে একটা বিরাট্ অভাব বোধ হইল। সে আর কথাবার্ত্তা না কহিয়া আপনার ঘরে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। বৌদির কল্যাণমণ্ডিত শান্ত-সুন্দর সংসার-চিত্রখানি মাধুরীর মনে নূতন ক্ষুধা জাগাইয়া দিল। একদিন সে শেষকালে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"আচ্ছা বৌদি, আমার শ্বশুর-শাশুড়ীরা কোথায় আছেন ভাই?"

বৌদি কহিলেন—"কি করে' বল্‌ব ভাই? সেই বিয়ের দিন থেকে আর খোঁজ-খবর নেই ত।"

"তাঁদের বাড়ী কোথায় ছিল?"

বাড়ী তো এখানেই ছিল; বাগবাজারে তাঁরা থাক্‌তেন। এখন আছেন কি না কি জানি।"

"খোঁজ নিলে হয় না একবার?"

"কে খোঁজ নেবে? তোর দাদার কাছে ওদের নাম কর্‌বার জো নেই। তবে তুই যদি ওঁকে বলিস্।"

"আমি?"

"কেন, বল্‌লিই বা।"

"ছিঃ, লজ্জা করে না?"

"এর আর লজ্জা কি ভাই? আপন জন তাঁরা—"

"তাঁরা আমার খোঁজ নিতে পারেন না?"

নিভা উত্তর দিলেন না; মাধুরীর বেদনাবিদ্ধ মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে অনিল আহারে বসিয়াছিলেন; মাধুরী পাশের ঘরে বসিয়া বৌদির মৃদুকণ্ঠের আলাপ শুনিতে পাইল। বৌদি কি কহিলেন, বোঝা গেল না; কিন্তু উত্তরে অনিল উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"না, না, ও-সব চল্‌বে না। একবার পায়ে ধরে' সাধা হয়েছিল, আর নয়। কেন, হয়েচে কি?"

বৌদি উত্তর দিলেন, "হবে আবার কি? কি হয়েছে জান না? ও কি কোন কালে সংসার করবে না?"

অনিল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"সেই জন্যেই ত ওকে কলেজে পড়্‌তে দিলুম।"

"ভারি ত কর্‌লে! কলেজে পড়লেই সব হ'ল। তার আর সাধ-আশা কিছুই থাক্‌বে না বুঝি? কলেজে কি মানুষকে পাথর হ'তে শেখায়? তা হ'লে কলেজ থেকে গণ্ডায় গণ্ডায় সব যোগী-সন্ন্যাসী বেরুত যে, অথচ দেখ্‌চি তার উল্টো।"

অনিল উত্তর দিলেন না। নিভা আস্তে আস্তে কহিলেন—"অসিত-বাবুকে একবার যদি—"

অনিল বাধা দিয়া কহিলেন—"থাক্, তার নাম আমার কাছে কোরো না।"

স্বামীর নাম কানে যাইতেই মাধুরীর বক্ষ সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন বিশ্বশুদ্ধ সকলে এই দ্রুত-স্পন্দিত হৃদয়ের ধ্বনিটা শুনিতে পাইতেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আর-একটা ঘরে চলিয়া গেল। স্বামী! তাই বটে! মাধুরীর বক্ষ মথিত করিয়া একটা দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

৫

আবার দিন কাটিল; মাস কাটিল। পরীক্ষার ফল বাহির হইয়া গেল। মাধুরী আবার বোর্ডিংএ ফিরিয়া গেল। বি-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হইল। সে বাড়ীতে থাকিবে বলিয়াই ভাবিয়াছিল, কিন্তু আবার কি ভাবিয়া বোর্ডিংএ চলিয়া গেল।

কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। মাধুরী বি-এ পাশ করিয়াছে প্রায় চারি বৎসর হইল। পশ্চিমের একটি সুন্দর সহরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সে। এখনও সে বোর্ডিংএ-ই থাকে, ছোট ছোট মেয়েগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া সে রমণী-হৃদয়ের চিরন্তন ক্ষুধা মিটাইতে চাহে; কিন্তু আজিও তাহার অন্তর পরিতৃপ্ত হয় নাই। যাহাদের লইয়া তাহার সমস্ত সময়টা কাটিতেছে, তাহারা কেহই তাহার আপনার নয়; সবগুলিই পরের ধন, তাহাদের উপর কোন অধিকার ত নাই। পরের ছেলেমেয়েগুলিকে ইচ্ছামত আদর কর, ভালবাসো, তাহাতে কেউ বাধা দিবে না; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য বুকের সঙ্গে জড়াইয়া "আমার" ভাবিতে পারিবে না। তাই এতেও মাধুরী শান্তি পাইতেছিল না। তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া নানা ভাব নানা কল্পনা অহর্নিশি

বিরাজ করিত, সেগুলিকে লইয়া সে যে কি করিবে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

অবশেষে হঠাৎ একদিন সে উপায় খুঁজিয়া পাইল। একদিন চুপ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনে প্রশ্ন হইল, এই ভাবগুলিকে ভাষায় আকার দিলে কেমন হয়? খুব ছোট-বেলায় তাহার ডায়েরী লেখা অভ্যাস ছিল, সে কথা তাহার মনে হইল। তৎক্ষণাৎ সে একখানা খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিয়া গেল। খানিকটা সময় একান্ত মনে লিখিয়া গেল, তার পর পড়িয়া দেখিল, ভাবিল, নেহাৎ মন্দ তো হয় নাই, চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

যাহা হোক, তাহার একটা নূতন কাজ জুটিয়া গেল। তাহার ভাবনার গোপন রাজ্যে সে সম্পূর্ণ একা বাস করিত, খাতাখানি যেন তাহার একটি সঙ্গী হইয়া উঠিল। অবশেষে এমন হইল—সামান্য চিন্তাটাও সে খাতার পাতায় না লিখিয়া রাখিলে শান্তি পাইত না।

খাতাখানি একদিন বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস্ সেনের চোখে পড়িয়া গেল। তিনি বর্ষীয়সী মহিলা, মাধুরীকে কন্যার মত স্নেহ করেন। খাতাখানি তাঁহার হাতে পড়িতেই মাধুরী ব্যস্ত হইয়া কহিল—"ওখানা কিছু নয়—"

"দেখ্‌তে আপত্তি আছে কি?"

মাধুরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া সলজ্জ ভাবে কহিল—"না, আপত্তি আর কি! তবে দেখ্‌বার মত কিছু নয়।"

"দেখি ত—" বলিয়া মিস্ সেন খাতাখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কয়েকটা পাতা পড়িলেন, তারপর খাতাটা রাখিয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মাধুরী একটা কিছু মন্তব্য শুনিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়াই ছিল, কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। মিস্ সেন তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"ছাপাও না এসব, বই লেখ না, বেশ হবে।"

মাধুরী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল—"বই লিখ্‌ব আমি? ঐসব ছাপাব? নিজের মত দিয়ে সবাইকে উপদেশ দিতে গেলে—"

"উপদেশের কথা তো বল্‌ছি না, উপন্যাস লেখ। এগুলো—এই যা লিখেছ, এ যদি বাস্তবিক তোমার খুব অন্তরের কথাই হয়, তবে অনায়াসে এসব নায়িকার মুখে বসিয়ে দিতে পার। খাঁটি জিনিষের আদর হয়ই।"

মাধুরী ভাবিতে লাগিল। মিস্ সেনের প্রস্তাবটা তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল, সে লিখিতে আরম্ভ করিল।

৬

সকাল বেলা বৌদির পত্রের অপেক্ষায় মাধুরী একটু ব্যস্ত হইয়াই ছিল। সাড়ে নয়টার সময় দাসী আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল; পত্র বৌদির।

মাধুরী পত্র খুলিয়া পড়িল—

"মাধু, তুমি যে আবার লেখিকা হয়ে উঠ্‌বে এমন কল্পনা তো আমার উর্ব্বর মস্তিষ্কেও কখনো আসেনি, "বাণী"তে তোমার "অপরিচিতা" পড়্‌লাম। সবটা পড়ে' শেষ না কর্‌লে আমার আর শান্তি নেই, মাসে মাসে অপেক্ষা করে' থাকাও এক জ্বালাতন। আমাকে শেষটুকু অন্ততঃ জানিয়ে দিস্ ভাই।" ইত্যাদি।

তার পরদিন মাধুরী "বাণী" পাইল; প্রথমে সাফল্যের আনন্দের প্রাচুর্য্যে তাহার মনটা পূর্ণ হইয়া গেল।

ছয়মাস অতীত হইয়াছে। বিকাল বেলা স্কুলের ছুটির পর মাধুরী কয়েকটি ছাত্রী সহ মাঠে বেড়াইতেছিল। শীতটা এবার একটু বেশী পড়িয়াছে, বোর্ডিংএর মেয়েগুলির মধ্যে অনেকেই সর্দ্দি কাশী ও জ্বরে ভুগিতেছিল। তাই মাঠে আজ ছাত্রীর সংখ্যা অল্প।

একটি মেয়ে মাধুরীর কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখখানি খুব সুন্দর, বয়স তেরো চোদ্দ। সে বোর্ডার; কিন্তু এখানেই তাহার এক মাসীর বাড়ী আছে, ছুটির দিনগুলি সে মাসীমার বাড়ীতেই যাপন করে। মাধুরী তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল—"কাল পরশু দুদিন ত ছুটি, মাসীমার কাছে যাবে নাকি?"

মেয়েটির নাম গৌরী। সে কহিল—"হ্যাঁ, যাব না? আমার মামা এখানে এসেছেন বেড়াতে। তাঁকে দেখ্‌তে আমার যা ইচ্ছে হচ্ছে।"

মাধুরী তাহার আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিল।

ইহার দুইদিন পরে সকাল বেলাই মিস্ সেনের

শয়নকক্ষে মাধুরীর ডাক পড়িল। মাধুরী গিয়া দেখিল তিনি শুইয়া আছেন।

সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে ?"

মিস্ সেন কহিলেন "জর ; আজকের কাজটা চালিয়ে নাও, আমি একদিনেই ভাল হয়ে উঠ্‌ব সম্ভবত। তুমি তো পারই ; বলে দেবার কিছু দর্‌কার নেই।"

মাধুরী একটু হাসিয়া কহিল—"না, বলে' দেবার কি আছে। তবে কেউ মেয়ে ভর্ত্তি করাতে এলেই মুস্কিল !"

"তাতে আর কি হয়েছে !"

মাধুরী অল্পক্ষণ পরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

সাধারণতঃ লোকে যাহা এড়াইতে চায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই সাম্‌নে পড়ে। সেদিন আফিস্‌রুমে বসিবার ঘণ্টাখানেক পরে মাধুরী সংবাদ পাইল একটি ভদ্রলোক মেয়ে ভর্ত্তি করাইতে আসিয়াছেন। একটু শঙ্কিত চিত্তে মাধুরী ভদ্রলোকটির সহিত দেখা করিতে চলিল।

আফিস্-রুমের সংলগ্ন একটি উপবেশন-কক্ষ আছে। সেখানে একখানা চেয়ারে একটি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন ; তাঁহার বয়স ত্রিশের অধিক নয়, চেহারাটা দেখিবার মত চমৎকার, তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর; দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। একটি বছর পাঁচ-ছয়ের ছোট্ট সুন্দর বালিকা কোলের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল ; ভদ্রলোকটি চক্ষু আনত করিয়া আস্তে আস্তে মেয়েটির কোঁকড়া চুলে হাত বুলাইতেছিলেন।

মাধুরী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোন দিকে না চাহিয়াই নমস্কার করিল।

ভদ্রলোকটি তাহার মুখের দিকে অস্পষ্ট দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্নবোধক কণ্ঠে কহিল—"মিস্ সেন—"

মাধুরী একটা চেয়ারে বসিয়া কহিল—"তাঁর শরীর অসুস্থ ; আজ তিনি নীচে আস্‌বেন না। আপনার যা বক্তব্য আমাকে বলুন।"

ছোট্ট মেয়েটি একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মাধুরী তাহাকে আরও কাছে টানিয়া লইল। বালিকার সরল চাহনি, নির্দ্দোষ কোমল মুখখানি ও কালো কোঁকড়া চুলের রাশি মাধুরীর মনে অতীত-স্মৃতি বহন করিয়া আনিল। সে বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার বর্ত্তমান জীবন যেন শূন্যে মিলাইয়া গিয়া সেখানে একখানি বড় প্রিয় বড় মধুর চিত্র ফুটিয়া উঠিল ; দীর্ঘ দশবৎসর পূর্ব্বে সঙ্গীহীনা মাধুরীকে সুখসঙ্গ দিয়া যে কিশোরী বালিকা তাহার ব্যথিত হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে যেন ক্ষুদ্র শিশুর রূপে মাধুরীর কাছে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কতক্ষণ এমনি কাটিয়া যাইবার পর যেন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল ; সে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্ন করিল—"তোমার নাম কি খুকী !"

বালিকা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—"মাধুরী।"

মাধুরীর মুখে কথা ফুটিল না। নিশ্চয়ই সেই ! সে তার সঙ্গিনীকে ভুলে নাই, নিজের মেয়ের মধ্যে মাধুরীর স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

মাধুরী কহিল—"একে বোর্ডিংএ রাখ্‌বেন কি ?

ভদ্রলোকটি বুঝিলেন এবার তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলা হইতেছে ; তিনি কহিলেন—"হ্যাঁ, এখানকার স্বাস্থ্য ভাল শুনেছি। আমার এক বোন এখানে থাকে ; জানেন বোধ হয়, গৌরী বলে মেয়েটি—"

"ওঃ—গৌরী আপনার বোন ?"

"না—সে আমার ভাগ্নী—আমার বড় দিদির মেয়ে ; আমার একটি ছোট বোনও এখানে থাকে, রমেশচন্দ্র ডেপুটী আমার ভগ্নীপতি।

"ও হ্যাঁ, বুঝেছি।" মাধুরীর মনে পড়িল গৌরী তাহার মামার আসিবার কথা বলিয়াছিল বটে। এই সেই মামা।

সে কহিল—"তা হলে এ তো বোর্ডিংএ-ই থাক্‌বে ? মাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে কি ?"

"ওর তো মা নেই !"

"মা নেই ?" তার পর যেন অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল "নীলা !"

ভদ্রলোকটি বজ্রাহতের মত চমকিয়া উঠিয়া মাধুরীর পানে চাহিলেন ; মাধুরীও চাহিল ; উভয়ের হৃদয়ের মধ্য দিয়া যেন একটা তরল তড়িত-স্রোত বহিয়া গেল। দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ পরে ! তবুও উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া রহিল, কোন দিন যে তাহাদের পরিচয় ছিল না, একথা তাহাদের মনে পড়িল না।

অসিত শুধু কহিল—"মাধুরী—"

শিশু মাধুরী পিতার পানে চাহিয়া কহিল"—কেন বাবা!" পিতা তো কখনো তাহাকে মাধুরী বলেন না, বরাবর খুকী বলিয়া ডাকেন। আজ কি হইয়াছে!

মাধুরী পাষাণ-প্রতিমার মত বসিয়া ছিল। তাহার মুখখানি লাল হইয়া গিয়াছিল, সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

অসিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"তাহলে আজ আমি যাই, কাল না হয় খুকীকে ভর্ত্তি করাতে আস্‌ব।"

মাধুরী এবারে মৃদুস্বরে কহিল—"খুকী থাক্‌।"

অসিত দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই, খুকী ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"বাবা, আমাকে নিয়ে যাবে না?"

"তুমি এখানে থাক—ওঁর কাছে।"

মাধুরীকে দেখিয়া খুকীর খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাহার কাছে থাকিতে কাজেই খুকীর আপত্তি হইল না। সে আস্তে আস্তে কহিল—"উনি কে হ'ন বাবা?"

অসিত একবার মাধুরীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর স্পষ্টস্বরে কহিল—"মা—"

বালিকা ছুটিয়া গিয়া 'মা' বলিয়া মাধুরীকে জড়াইয়া ধরিল।

আঃ—এত দিনের পর! মাধুরীর মনে হইল যেন সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া উঠিয়াছে! অসিতের উপস্থিতি ভুলিয়া সে খুকীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

অসিত বাহির হইয়া গেল।

গৌরী সেদিন মাসীমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসে নাই, বিকালবেলা স্কুলের গাড়ীতে ফিরিবে। স্কুলের ছুটির পর মাধুরী খুকীর হাত ধরিয়া সিঁড়ির কাছে বেড়াইতেছিল, এমন সময় স্কুলের ফিরতি গাড়ী কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল, গাড়ী ভাল করিয়া আসিবার আগেই গৌরী তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল, এবং মাধুরীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিল—"মামীমা—"

মাধুরী লজ্জায় ও সুখে অভিভূত হইয়া কহিল—"কে বল্‌লে?"

গৌরী বেণী দুলাইয়া কহিল—"সবাই জেনেছে, সবাই জেনেছে। মাগো, এতকাল কি করে লুকিয়ে ছিলে মামীমা! ছোটমাসী কাল আস্‌বে, একেবারে তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে। হ্যাঁ মামীমা, তাহলে তো আর খুকী এখানে থাক্‌বে না? সে তোমার সঙ্গেই যাবে—না?"

খুকী কহিল—"আমি মার সঙ্গে যাবো।"

মাধুরী তাহাকে চুম্বন করিল।

তার পরদিন রমেশ-বাবুর পত্নী নির্ম্মলা মাধুরীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মিস্ সেন মাধুরীকে বলিয়া পাঠাইলেন সে যেন বসিবার ঘরে আসে, একজন ভদ্র-মহিলা সাক্ষাৎপ্রার্থিনী।

মাধুরী কক্ষে প্রবেশ করিতেই নির্ম্মলা উঠিয়া প্রণাম করিল। কহিল—"চল ভাই, বাড়ী চল। আমি তোমার অনেক ছোট বটে—তবু কোন কথা শুন্‌ব না। আমার কথাই বরং শুন্‌তে হবে তোমাকে। জান ত ননদিনী রায়বাঘিনী, কথা না শুনে উপায় নেই—"

মাধুরী নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া দেখিল, বছর ১৯।২০ বয়স, ছোটখাট শরীরটি—মুখভাব অসিতের মতই। নির্ম্মলা কহিল—"চলনা। খুকী কোথায়?"

"এখনি?"

"যাবে না?"

"যাব না বল্‌ছি না ত।" মাধুরীর কণ্ঠ কম্পিত হইয়া গেল।

"তবে, কি হয়েছে?"

"মিস্ সেনকে সব বল্‌তে হবে, তার পর।"

"ওঃ—, এতদিন কি এত কথা জানি! তাহলে দাদাকে এতদিন লক্ষ্মীহীন হয়ে থাক্‌তে দিতুম না। নীলা বৌদির সঙ্গে তোমার ভাব ছিল বুঝি?"

মাধুরীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল, সে কহিল—"হ্যাঁ।"

"সে তো বিয়ের পরে প্রায় বছর খানেক বেঁচে ছিল, খুকীকে জন্ম দিয়েই মারা গেল। একদিনও তার শরীর ভাল দেখিনি, যেন খুকীকে দেবার জন্যেই আমাদের সংসারে এসেছিল।"

মাধুরী চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মলা কহিল—"বাবার মৃত্যু হয়েছে, মা কাশীবাসী হয়েছেন, আমাদের বাপের বাড়ীর সংসার যা হয়েছে! তোমার ভাসুর, দেওর আর নেই, জান ত?"

"জানি--"

"বৌদি, তুমি ভাল করে' কথা কইচ না কেন? বাবার যে একরোখা জেদ ছিল তাই তোমাকে একবার কাছে নিয়েও দেখ্‌লেন না। তা হলে কি আর এ ভুলটা করতেন?"

"কবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে?"

"বছর ৬।৭ হয়েছে। তার পরই মা দাদাকে ধরে' পড়্‌লেন বিয়ে করতে হবে; তুমি তখন কলেজে পড়্‌চ—তোমাকে আন্‌তে দাদার সাহস হ'ল না, রাগ কোরো না, সত্যিকথা বল্‌ছি—শেষে কিন্তু ঘটনাচক্রে কলেজ-পড়া মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হ'ল।"

"আমি কলেজে পড়্‌তাম তোমরা জান্‌তে?"

"দাদা সব খোঁজ রাখ্‌তেন। মাঝে মাঝে আমাকে চুপিচুপি বল্‌তেন—না ভাই, সে-সব বলে' দরকার নেই।"

"নীলা জান্‌ত কি?

"না, সে কিচ্ছু জান্‌ত না। তার মেয়ের নাম মাধুরী সেই ত রেখেছে। দাদাও তাই রাখ্‌লেন, কারণ জান্‌তেন যে তুমি কখনোও—"

"কেন ভাই, কেন?" মাধুরী রুদ্ধশ্বাসে কহিল—"আজ নীলা এর মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে বলে' আমি তেমন একটা সুখ পাচ্ছি না বটে, কিন্তু চিরকাল কি আমি অপেক্ষা করে' ছিলাম না? আমার ঘর, আমার আপনার জন, সবই ত ছিল জানি, একবার সমস্ত পেতে ইচ্ছা করেনি কি?"

তাহার বিশালনয়ন ছাপাইয়া দরদর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নির্ম্মলা আস্তে আস্তে মাধুরীর হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিল, কহিল—"বৌদি, কেঁদো না। দাদা তোমার প্রতি খুব অন্যায় করেছেন, সত্যি, কিন্তু কি করবেন ভাই, সব যে বুঝ্‌তে পারেন নি তখন। দাদা জান্‌তেন তুমি বি-এ পাশ করেছ, এমন কি "বাণীর" লেখিকা "মাধুরী দেবী" সম্বন্ধে সন্দেহ করে' আমায় পত্র লিখেছিলেন। সব জানেন, জেনেও সাহস করছিলেন না।"

মাধুরী রুদ্ধস্বরে কহিল—"কিসের সাহস?"

নির্ম্মলা তাহার স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে কহিল—"তুমি রাগ করবে না ত? তাহলে বলি! তুমি ভাই কলেজে-পড়া শিক্ষিতা মেয়ে, ছোট বেলা থেকেই উচ্চশিক্ষার মধ্যে মানুষ হয়েছ, গানবাজ্‌না জান, অন্য অনেক গুণও তোমার আছে, সর্ব্বোপরি তুমি একজন লেখিকাও—তোমাকে আমাদের সামান্য গৃহস্থ-ঘরে—"

মাধুরী বাধা দিয়া কহিল--"কলেজে-পড়া মেয়েরা কি ঘরেও স্থান পাবে না? আকাশে তো ভাই এখনও বাড়ী তৈরী হয়নি।"

"তুমি রাগ করলে বৌদি! তুমি বুঝ্‌তে পারচ না, আমাদের সংস্কার এই। শিক্ষিতা মেয়েরা যে সামান্য গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের মতই ঘর-সংসার করে', দিন কাটাতে পারে, তা আমাদের ধারণাতেই আসে না। নীলার কাছে তো আমরা কিছুই পাইনি।"

"সে যে অসুস্থ ছিল।"

"তা ঠিক, তবু দেখ"—

"থাক্‌, বুঝেছি আমি। মাধুরী বল্‌তে যদি তোমরা একটা বই-মুখস্থ-করার যন্ত্র ভাব তবে আর আমি কি করব? কিন্তু বাস্তবিক আমি তা নই। কলেজে যে মেয়েটি পড়েছিল, 'অপরিচিতা'র লেখিকা যে—সেই শুধু আমি নই; কথা আমি বেশী বল্‌তে পারিনে; শুধু এইটুকু বলি—আমায় যা ভেবেছিলে তা ভুল।"

"বেশত বৌদি—সে ভুলটা আমাদের ভেঙ্গে দেবে চল।" বলিয়া মাধুরীর পানে নির্ম্মলা সহাস্য স্নিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

গৌরী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, কহিল—"মাসীমা, মামা গাড়ীতে বসে' আছেন, শীগ্‌গির চল।"

নির্ম্মলা অশ্রুভরা হাসি হাসিয়া কহিল--"গৌরী, এই তোর মিসেস্ ব্যানার্জ্জি রে! এর প্রশংসা মুখে ধরত না?"

গৌরী হাসিয়া কহিল—"তখন কি জানি সে আমার মামীমা।"

মাধুরী চোখ মুছিয়া হাসিয়া তাহার পানে চাহিল। নির্ম্মলা বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল—"একটু বোস ঐখানে, আমি আস্‌চি।"

সে গৌরীকে লইয়া চলিয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আলো জ্বালিতে কাহারো মনে হয় নাই; অস্পষ্ট অন্ধকারে মাধুরী বাতায়নের সন্নিধানে দাঁড়াইয়া ছিল। অসিত মৃদু পদসঞ্চারে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধুরী ফিরিয়া দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। অসিত সরিয়া দাঁড়াইল। এ কি কাণ্ড! মাধুরী কি সত্যই তাহাকে প্রণামের যোগ্য ভাবে? না, এ ভাণ মাত্র?

তখন মাধুরীর হস্ত-সঞ্চালনে কক্ষে বৈদ্যুতিক আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; সেই আলোকে অসিত মাধুরীর মুখের দিকে, চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল। না, বিশ্বাস হয় না। এই স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি—এই কল্যাণমণ্ডিত অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানি, ইহা কি কপটতার আশ্রয় হইতে পারে?

অসিত নিজের কল্পনায় ক্ষুব্ধ বোধ করিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল—"কাল যাওয়া হবে কি?"

মাধুরী মৃদুস্বরে কহিল—"মিস্ সেনকে আগে বলে' নি, তার পরে।"

"আচ্ছা, খবর দিলেই আমি আস্‌ব।" বলিয়া অসিত চুপ করিয়া রহিল। তাহার কত কথা যেন বলিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছিল। সেই শুভদৃষ্টির সময় দেখা বালিকার কোমল মুখখানি আজ দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর তাহার ধ্যানের বস্তু হইয়া রহিয়াছে, তবু সে তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করে নাই; তবু সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিল, কেমন করিয়া এই অচিন্ত্যরহস্য এই শিক্ষিত নারীকে বুঝাইয়া দিবে? কেমন করিয়া জানাইবে, পিতার কঠোর শাসন, মাতার আজন্মের সংস্কার, নিজের হৃদয়ের দ্বিধা তাহাকে সবলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাই সে নিজের স্ত্রীর কাছে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই? তবে কি মাধুরী একদিন বুঝিবে? নীলার নারীত্বকে অসহ্য অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু পরিপূর্ণ প্রেম তো নীলা কখনো পায় নাই। সে প্রেম মাধুরীর জন্য চিরকাল অপেক্ষা করিয়া ছিল।

অসিত মাধুরীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল; দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মাধুরী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার বুক ভাঙ্গিয়া কেন জানি কিসের কান্না জমিয়া উঠিতেছিল। সহসা খুকী আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ডাকিল—"মা, মা!" মাধুরী তাহাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া তৃষিত তপ্ত হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা একটি সুদীর্ঘ চুম্বনে তাহার রাঙা অধরে বর্ষণ করিয়া দিল।

৭

খুকী ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিল। মাধুরী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছে, উজ্জ্বল আলোকে খুকীর মুখে নীলার মুখচ্ছবি দেখিতেছে।

অসিত ঘরে ঢুকিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল—"নির্ম্মলা কৈ?"

মাধুরী সসঙ্কোচে একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, "সে এখন আস্‌বে না।" তাহার গাল দুটি লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল।

অসিত একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"মার পত্র এসেছে। কাশী হ'য়ে তার পর আমাদের এলাহাবাদ যেতে হবে। কিন্তু একটা কথা—"

মাধুরী চোখে প্রশ্ন ভরিয়া একবার স্বামীর পানে চাহিল, তাহার যেন ভয় করিতেছিল। আবার কি কথা বাকী রহিয়াছে!

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অসিত বোধ হয় তার মনের কথা বুঝিতে পারিল, সে হাসিয়া ক'হল—"তুমি ভয় পেলে নাকি? না, ভয়ের কিছু নয়। আমি খুকীর নামটার কথা বল্‌ছিলাম; মায়ের নামে মেয়ের নাম তো ঠিক হবে না। ওর নামটা বদ্‌লে দিতে হ'বে।"

মাধুরী ধীরে ধীরে কহিল—"আমিও সে কথা ভেবেছি।"

"কি নাম রাখ্‌বে?"

"নীলাকে আমরা কখনও কেউ ভুল্‌তে পার্‌বো না, নীলার স্মৃতি খুকী আরো বেশী জাগিয়ে রাখ্‌বে, ওর নাম থাক স্মৃতি।"

"তাই থাক।" বলিয়া অসিত এই প্রথম মাধুরীর হাত দুটি আপনার হাতে তুলিয়া লইল। নীলার পবিত্র শুভ্র স্মৃতির পার্শ্বে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল।

শ্রী অমিয়া চৌধুরী

কবীরের প্রেমসাধনা

কবীরের পূর্ব্বে রামানুজের সময় হতে আচারী সম্প্রদায় চলে' আস্ছিল। আচারী বৈষ্ণবসম্প্রদায় খুব আচার মেনে চল্‌তেন, তাঁদের আচারের বন্ধন খুব বেশী ছিল--যেমন, খাওয়ার সময় কেউ দৃষ্টি দিলে তাঁদের খাওয়া বন্ধ হ'ত—"দৃষ্টি-দোষ" হ'ত। যিনি প্রথম অনাচারী হন তিনি হলেন গুরু রামানন্দ। কারও কারও মতে তিনি রামানুজের পাঁচ "পীঢ়ি" অর্থাৎ পাঁচ জন গুরুর পরে। আচার নিয়ে রাঘবানন্দের সঙ্গে তাঁর বিরোধ লাগ্‌ল।...

রামানন্দ দল ছেড়ে বেরিয়ে এলে পরে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঘবানন্দই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হয়ে উঠ্‌লেন।...

রামানন্দের প্রধান শিষ্যেরা সবাই প্রায় অন্ত্যজ। সেই সময়ে নারীদের হীন বলে' মনে করা হ'ত। তিনি তাঁদেরও শিষ্য করে' নিয়েছিলেন। নারী সাধিকার মধ্যে রামানন্দের শিষ্যা পদ্মাবতী আমাদের এমন অনেক জিনিস দিয়ে গেছেন যার মূল্য হয় না। তা ছাড়া তাঁর আর-একটি শিষ্যার নাম ক্ষেমশ্রী। তিনি জাতে ছিলেন গোয়ালা।...

কবীরও গুরু রামানন্দের অন্ত্যজ শিষ্য।...গল্প আছে, একদিন কবীর অন্ধকারে রামানন্দের স্নানের পথে শুয়ে ছিলেন। কবীরের গায়ে রামানন্দের পা লাগে। তাতে রামানন্দ "রাম" "রাম" বলে' উঠেন; কবীর বল্‌লেন, "তবেই ত তুমি আমার গুরু হলে। আমি তোমার কাছে 'রাম' নাম মহামন্ত্র পেলাম।" এই-রকম করে' কবীরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও শিষ্যত্ব হয়। রামানন্দের ১২ জন অপ্রধান শিষ্যের মধ্যে প্রায় ৫৬ জন হীনজাতি বা অন্ত্যজ। প্রধান শিষ্যদেরও অধিকাংশই অতি নীচ ও ছোট জাতির লোক।

কবীর সন্ন্যাসীও ছিলেন গৃহস্থও ছিলেন। তিনি বল্‌তেন, সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে প্রাচীরের মত কোন ব্যবধান নেই—যিনি সংসারী তিনিও সন্ন্যাসী হবেন, এই তাঁর মত ছিল। কারণ তিনি বল্‌তেন :—

> কঁহে কবীর অস উদ্যম কীজৈ।
> আপ জীয়ৈ ঔরনকো দী জৈ॥"

অর্থাৎ এতটা শ্রম তোমার করা দরকার যাতে তুমি আপনি জীবনধারণ করে' আরও দুচার জনকে বেঁচে থাক্‌তে সাহায্য কর্‌তে পার।

...তাই তিনি তাঁত বুনে শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করেছেন। তিনি সন্ন্যাসী অথচ তিনি বিবাহ কর্‌লেন। শক্ররা নিন্দা কর্‌তে লাগ্‌ল। তারা বল্‌তে লাগ্‌ল—"যা হোক, বিয়ে করেছেন বটে কিন্তু তাঁর সন্তান হবে না।" পরে যখন তাঁর সন্তান হ'ল, শক্ররা খুব খুসী হল। তারা বল্‌লে—"ডুবা বংশ কবীরকা জবহি উপজা পুত্র কমাল" অর্থাৎ কবীরের পুত্র কমাল যে জন্মাল তাইতেই কবীরের বংশ, অর্থাৎ গুরু-শিষ্য-ক্রমে সন্ন্যাসীর যে সম্প্রদায়ের ধারা তা ডুব্‌ল।

যেদিন তাঁর সন্তান হবে সেদিন তিনি আগে থাক্‌তে তা বুঝ্‌তে পারেন নি। বাজারে গিয়েছিলেন সুতো কিন্‌তে। নিন্দুকের দল ভিড় করে' রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁকে খবর দিয়ে জব্দ করবে বলে'। তিনি কাপড় বিক্রি করে', সুতোর বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আস্‌ছিলেন। পথে জনতা দেখে অবাক্ হলেন। বড় আনন্দে তারা সবাই বল্‌লে—কবীর, তোমার পুত্র হয়েছে। তারা ভেবেছিল, কবীর বুঝি কথাটি শুনে মুস্‌ড়ে যাবেন। কবীর প্রসন্ন হয়ে সুতোর বোঝাটি কাঁধ থেকে নামিয়ে ছয়টি পংক্তি উচ্চারণ কর্‌লেন। মানবশিশুর জন্ম সম্বন্ধে এই-রকম কথা আর কোথাও বলা হয়েছে কি না জানি নে। টেনিসন De Profundis নামে যে কবিতাটি লিখেছেন সে এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ; অথচ তাতেও যে গভীর কথাটুকু এবং মানবজীবনের যে রহস্যটুকু তিনি বুঝিয়ে বল্‌তে পারেন নি, কবীর ছয়টি মাত্র পংক্তিতে তা অনায়াসে বলে গেছেন। তিনি বল্‌লেন :—

> "অহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরো মঙ্গল থার।
> ঘর আংগনকী কদর ভয়ী হৈ রাহ্ হ্ঐ গুল্‌জার॥
> জনম-মরণমেঁ কদম তুম্‌হারা অরস ভয় হয় কাল।
> মেরা ঘরমেঁ ডেরা লাগায়া পায়া হাম কমাল।
> কৌনসী সেবা করিহৌ তুমকো কোন করিহৌ পূজা।
> পংথ পংথী ঘর একহি হৈ জী ভার মির্থা অব দুজা॥"

"এই যে আমার পুত্র সে অসীমের যাত্রী। অসীমযাত্রার সাধনা কর্‌বার জন্য দুচার দিনের তরে সে আমার ঘরে অতিথি এসেছে। তাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য শুভ অর্ঘ্যের থালিটি সাজিয়ে ধর। আজকে আমার ঘর, আমার আঙিনা অর্থাৎ আমার ঘরের ভিতর-বাহির তার যথার্থ কদর পেয়েছে। এই ক্ষুদ্র যাত্রীটি তার যাত্রাপথখানিকে একেবারে পুষ্পিত করে' আমার ঘরে এসেছে। হে অসীমের যাত্রী, আমার পুত্র, জন্ম ও মৃত্যু তোমারই অসীম যাত্রার এক একটি পা-ফেলা ও পা-তোলা। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে পা ফেলে তুমি চলেছ, কাল তোমার কাছে হার মেনেছে। আমার ঘরে যে তুমি এসে আশ্রয় নিলে, আমি তাতে কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলাম। কেমন সেবা বল ত তোমার আমি করি? সেবা আবার কি? তোমাকে আমি কোন্ পূজা দিয়ে ধন্য হব? আজ আমার সব দ্বৈত-ভাব ঘুচে গেছে, আজ প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছি, যিনি অসীম লক্ষ্য হয়ে বিরাজমান তিনিই অসীমের যাত্রী হয়ে সেই লক্ষ্য লাভের সাধনায় যাত্রা করেছেন। আর তিনি পথ হয়ে অসীম-যাত্রীকে অসীম লক্ষ্যের দিকে উপনীত করে' দিচ্ছেন।" শক্ররা নিস্তব্ধ হয়ে চলে' গেল। এই যে কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন বলে' কবীর বল্‌লেন, তাতেই তাঁর পুত্রের নাম হ'ল "কমাল"। এবং পরে যখন তাঁর কন্যা হ'ল তারও নাম রাখ্‌লেন "কমালী"।

...তিনি ভগবান্‌কে নিজের গুরু মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি অসীমের বার্ত্তা এনেছি, গুরু রামানন্দ আমার চৈতন্য দিয়েছেন, কিন্তু আমার গুরু বল্‌তে এক ভগবান্।

> "প্যাস অহদকা সাথ হাম লায়া রামানন্দ চেতায়ে"।

"অসীমের তৃষ্ণা নিয়ে আমি এই জগতে এসেছি। রামানন্দ আমার চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন; কারণ আমি যে কিসের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলাম সে আমি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম না।

সে তৃষ্ণা যে অসীমের তৃষ্ণা, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে এই তৃষ্ণার সূত্র ধরেই আমি চলেছি, এ কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। চেতনা যিনি দিলেন, তিনি গুরু রামানন্দ। তবে সত্য গুরু যদি বল্‌তে হয়, তবে সে স্বয়ং ভগবান্। তিনি এই অসীমের তৃষ্ণা দিয়েছেন, তিনিই প্রতিদিন আমার সেই বন্ধন ক্ষয় করে' তাঁর দিকে আমাকে অগ্রসর করে' নিচ্ছেন। তাঁরই উপলক্ষ্য হয়ে রামানন্দ আমার গুরু হয়েছেন।"

একজন ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক তাঁকে তাঁর সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলেছিলেন, "তোমার সাধনার পথটি আমায় বুঝিয়ে বল্‌তে পার?"

কবীর বল্লেন "পথ কি আমি দেখেছি? রাত্রি ছিল অন্ধকার। তাঁর বাঁশীর সুর শুধু কানে আস্‌ছিল। মন আমার উদাস যখন হ'ল, তখন কি আর পথের খোঁজ খবর নিয়েছি? পাগলের মত সুর শুনেই এগিয়ে চলেছিলাম।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তোমার গুরু?" তখন কবীর গান গাইলেন—

"বাঁসুরী জব মোহে ডগরা ধরাঈ।
রৈন অন্‌ধেরী রহী কারী বাদরনসে,
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।
ঠাড়ী কোঈ দেখত অপনে অংগনসে,
জিন্‌হে কভী বাঁসুরী বুলাঈ।
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।
ডর নাহি কুছো, ডগরা ন পুছো
বাঁসুরী সুনত কবীরা বঢ় জাঈ।
আজি বালম বুলারত আন্‌হর কে পারসে
কৌন বেশরম আজ তোর সাথ জাঈ॥"

"পথ আমি জানি নে। সেই বাঁশরী যখন আমায় রাস্তায় বের করলে, যখন বাঁশরী আমাকে পথে ডাক দিলে, তখন রাত্রি ছিল অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন। আমার ভীত প্রাণ বল্‌তে লাগ্‌ল, "কে আমাকে পথ দেখাবে?"

'যে-সমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তেরা (বশিষ্ঠ, নারদ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি) যাঁরা বাঁশী শুনতে পেয়েছিলেন, বাঁশরী শুনে যাঁরা বেরিয়েছিলেন, তাঁরা, নিজের নিজের আঙ্গিনার দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কে আমাকে পথ বলে' দেবে? তাঁরা বল্‌লেন, যিনি তোমায় এবং আমাদেরও বাঁশীতে ডাক্‌ছেন তিনিই পথ বলে' দেবেন। পথ জিজ্ঞাসা কোরো না। বাঁশী শুনে আজ বেরিয়ে পড়; সোজা চলে' যাও। জীবনবল্লভ অন্ধকারের পার হতে আজ তোমায় ডেকেছেন; প্রেমের মিলন-বাসরে তোমার সঙ্গে তাঁর আজ গভীর মিলন হবে। কে এমন নির্লজ্জ আছে, আজ যখন তুমি প্রিয়তমের কাছে বাসরঘরে চলেছ, তখন সাথে সাথে পথ দেখাবার জন্যে সেও সেখানে যাবে?'

আজ রাত্রি বাদল অন্ধকার। বাঁশী নিয়ে তিনি ডাক্‌ছেন। তিনি দিনে ডাক্‌লে আলো দিয়ে ডাক্‌তেন, কিন্তু রাত্রে ডেকেছেন যে, পথ দেখ্‌তে পাবে না, শুধু বাঁশী শুনে নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁর প্রেম-স্বরূপের ভিতর ডুবে যাবে। যিনি গুরু, তিনি এভাবেই পথ দেখাচ্ছেন। রামানন্দ শুধু আমার মনের মধ্যে এই ভাবটিকে সচেতন করে' দিয়েছেন।

এর পরেই সেই পণ্ডিতটির সঙ্গে কবীরের যে প্রসঙ্গ হল (কবীর-পন্থীদের সাধনার শাস্ত্রে এই-সব প্রসঙ্গকে "রহস" বলে), কবীরের প্রেম সম্বন্ধে প্রসঙ্গের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য "রহস্"। এই প্রসঙ্গে কবীর বল্‌লেন যে ভগবান্‌কে প্রেম দিয়েই সাধনা করতে হবে। সেই পণ্ডিতটি জিজ্ঞাসা করলেন—"যাঁকে প্রেম দিয়ে তুমি সাধনা করবে তাঁর স্বরূপ কি? কোথায় তাঁর নিবাস? কেমন তাঁর প্রকাশ?" কবীর বল্‌লেন—

ঐসা লো নহি তৈসা লো।
মেঁ কেহি বিধি কহো গম্ভীরা লো।
ভীতর কহুঁ তো জগময় লাজে, বাহর কহুঁ তো ঝুটা লো॥
বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চিত অচিত দউ পীঠা লো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর বাত ন কহা জাঈ লো॥

তিনি কোন একটি জায়গায় আছেন, একথা ভাব্‌লে ভুল হবে। যদি বলি তিনি এমন নয়, তিনি তেমন, তা হলে ভুল হবে। তিনি যে কেমন তা আমি কি করে' কি কথা দিয়ে বুঝিয়ে বল্‌ব? এ বড় গভীর কথা। যদি আমি বলি যে তিনি ভিতরে আছেন, তা হলে বাইরের বিশ্বজগৎ লজ্জায় মরে' যাবে। যেমন, যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী চিন্‌তে না পারেন তাহলে সে স্ত্রীর তো আর লজ্জা রাখ্‌বার জায়গা হয় না; তেমনি তিনি যদি বলেন এই বাহিরের বিশ্বজগতে আমি নেই, তা হলে এত বড় বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড একপল কাল কোন্ লজ্জায় বেঁচে থাকে? যদি বলি, তিনি বাইরে আছেন, তা হলে আবার আমার অন্তরাত্মা লজ্জিত হয়—এবং সেকথা মিথ্যাও হয়। বাহির এবং ভিতর সকলকে নিরন্তর করে' তিনি এক করেছেন। বাহির ও অন্তর অচেতন ও সচেতন তাঁর পাদপীঠ। তিনি দৃষ্ট একথা বল্‌তে পারিনে, আবার তিনি অপ্রকাশিত একথাও বল্‌তে পারিনে। তিনি অপ্রকাশিতও বটে, অগোচরও বটে; বাক্যে ইহা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে বাইরের আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর তাঁকে পাই নে, একথা বল্‌তে পারিনে, কিম্বা পাই তাও বল্‌তে পারিনে।

তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে জলে-ভরা কুম্ভ জলের মধ্যে রেখেছি তার বাহিরেও জল ভিতরেও জল। এমনি আমার বাহিরে ও অন্তরে তিনি বিরাজিত।

"জল ভর কুম্ভ জলৈ বীচ ধরিয়া বাহর ভীতর সোই।
উনকা নাম কহনকো নাহি দুজা ধোখা হোই॥"

বাহিরেও তিনি, ভিতরেও তিনি। তবে সব জিনিসেই যদি তিনি প্রকাশিত, তবে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে প্রকাশিত হন না কেন? তিনি বাহির ও ভিতর উভয় স্থানই পূর্ণ করে' আছেন, তাই আলাদা করে' তাঁকে জানি নে। তিনি বিশ্বের আত্মা, বিশ্বের জীবনেশ্বর, তাই তাঁর নাম নেই। যদি কেউ তাঁর নাম দেয়, তবে তিনি আমাদের হতে আলাদা হয়ে যান। মানুষ নাম দিয়ে পরকেই ডাকে, নিজেকে তো নাম দিয়ে কেউ ডাকে না। যেমন স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে না। নাম ধর্‌লে স্বামী স্ত্রী হতে আলাদা হয়ে যান, কিন্তু স্ত্রী ও স্বামী যে এক, তাই তাঁর নাম ধর্‌তে নেই। তিনি বিশ্বনাথ, বিশ্ব যদি তাঁর নাম নেয়, তবে তিনি যে বিশ্ব হতে আলাদা হয়ে যান। তিনি কি বাইরের আলাদা জিনিস?

উনকা নাম কহনকো নাহি দুজা ধোখা হোই॥

পণ্ডিতটি কবীরকে বল্‌লেন—"এসম্বন্ধে যে তত্ত্বটি আপনার মনে প্রত্যক্ষ হয়েছে তা আপনি সকলের কাছে প্রচার করেন না কেন?" তিনি বল্‌লেন—"এ ভাবে ধর্ম্মপ্রচার আমার কাজ নয়।" অতি তীব্র ভাষায় বলেছেন যে, জলের কলসী নিয়ে সকলকে "জল খাও জল খাও" বলে' বেড়ানটা কাউকে উপকার করা নয়।

"পানী প্যারত ক্যা ফিরো, ঘর ঘর সাগর-বারি।
তৃষাবংত জো হোবৈগা পীবেগা ঝখ্‌মারি॥"

আর এমন জল খাইয়ে ফির্‌বার দর্‌কারই বা কি আছে?

প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরেই অনন্তরসের সাগর। যেদিন পরমাত্মার জন্য তৃষ্ণা জাগ্‌বে, সেদিন সকলে নিজের মধ্যে যে অমৃতরস আছে, তৃষ্ণার দায়ে ঠেকে সেই জল পান করতেই হবে—"পিয়েগা ঝখ্‌মারি"।

তৃষ্ণা জাগাও, অন্তরে তৃষ্ণা জাগাও; যেদিন প্রেম জাগ্রত হবে সেদিন আপনি তৃষ্ণা আস্‌বে। প্রেম জাগাও; এই প্রেম যেদিন জাগ্‌বে সেইদিন বৈরাগ্যও আস্‌বে অথচ সংসারের প্রতি যে বিরাগ, বিতৃষ্ণার নামান্তর তা আস্‌বে না। সংসারের মধ্যে কবীর প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাক্‌তেই বলেছেন। তিনি বলেছেন সংসার আমার বাপের বাড়ী, ব্রহ্মধাম স্বামীর বাড়ী। স্বামীর বাড়ীকে ভালবাস্‌তে হবে বলে' যে বাপের বাড়ীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মাতে হবে একথা ভেবো না। এই সংসারেই তাঁকে জান্‌তে পেরেছি। স্বামীর বাড়ী না গেলে যেমন নারীর জীবন সার্থক হয় না, তেমনি পরমাত্মাকে না জান্‌লে জীবাত্মার কোন সার্থকতাই হয় না। যেদিন স্বামীকে চিনেছি, সেদিন বাপের বাড়ীর সকল আকর্ষণ সহজে ছেড়ে গেছে, বিদ্বেষ থেকে নয়, ঘৃণা থেকে নয়; এই প্রেমেরই বলে। এই প্রেমকে জাগ্রত কর। এই প্রেমের বলেই বালিকা মা হয়। একটি ছোট বালিকা যে সন্ধ্যাতেই ঘুমিয়ে পড়্‌ত, আজ সে মা হয়ে রাত দুটোতেও না ঘুমিয়ে ব'সে আছে; কেন, না তার ছেলে ঘুমুচ্ছে না। ভগবান্ এই প্রেমই সকলের মধ্যে দিয়েছেন। বালিকাকে শুধু মা করে' দিচ্ছেন; আর কোন উপদেশ দিতে হয় নি। অথচ শিশুর দাসীকে সহস্র উপদেশ দিয়েও ঢের কথা বাকী থেকে যায় এবং পদে পদেই তার সেবার ত্রুটি হয়ে যায়। মাকে বিধাতা শুধু প্রেম দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। প্রেম দিয়েছেন বলে' আর কিছুই তাঁকে শেখাতে হয়নি। ভগবান্ তাঁর ভবিষ্যৎ-সাধক শিশুদিগকে ঘরে ঘরে মায়েদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাকা পাঠাননি, রসদ পাঠাননি, মায়ের হৃদয়ে শুধু প্রেম দিয়েছেন। এই প্রেমের বলেই মা কি তার নিজ সব সুখ ত্যাগ করতে পারবে? পারবে। স্বামীর জন্য নিজের দেহ পর্য্যন্ত তো এই প্রেমের বলেই সে জ্বালিয়ে দেয়!

"সতী কো কৌন শিখারতা হৈ
সঙ্গ স্বামীকো তন জারনা জী।
প্রেম কো কৌন শিখারতা হৈ
ত্যাগ মাহি ভোগকা পানা জী॥"

"সতীকে প্রেম দিয়েই বিধাতা নিশ্চিত হয়েছেন, স্বামীর জন্য তাকে যে পুড়ে মর্‌তে হয় এ শিক্ষা কে তাকে দিলে? ত্যাগের মধ্যেই যে ভোগকে পেতে হবে এই শিক্ষা প্রেমকে কে দিলে?'

একটি মাত্র পংক্তিতে কবীর প্রেমের একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা definition দিয়েছেন। প্রেম কি? না "ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগকে পাওয়া।' প্রেমের এই মজা—সে ত্যাগ করে অথচ ভোগও করে; সে কিছুই রাখে নি, অথচ সবই পেয়েছে।

ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরমানন্দ মেলে তা যে কত গভীর, কত মধুর ও সুন্দর তা কেবল সেই বৈরাগীই জানেন যিনি বৈরাগ্য দিয়ে প্রেমকে গভীর ও মধুর করে' ভোগ করছেন। ভগবান্ এই বৈরাগী-প্রেমের রহস্য জানেন, তাই বিশ্বে যেমন তাঁর প্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্চে তেমনি সর্ব্বত্র বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ রয়েছে।

এই প্রেমের মধ্যে কামনার স্থান নেই; যে অমৃত দেবতার পানীয় তা দানব এসে পেতে চাইলে হবে কি? সে অমৃতের আনন্দই ত সে জানে না।

"সুর পরকাস তঁহ রৈন কঁহ পাইয়ে,
রৈন পরকাস নহি সুর ভাসৈ।
জ্ঞান পরকাস অজ্ঞান কঁহ পাইয়ে,
হোয় অজ্ঞান তঁহ জ্ঞান নাসে।
কাম বলবান্ তঁহ প্রেম কঁহ পাইয়ে,
প্রেম জঁহ হোয় তঁহ কাম নাহী।
কহৈ কবীর য়হ সন্ত বিচার হৈ,
সমঝ বিচার দেখ মাহী॥"

"সূর্য্য যেখানে প্রকাশিত সেখানে রাত্রি পাবে কেমন করে'? রাত্রি যেখানে বিরাজমান সেখানে সূর্য্য নেই। যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ সেখানে অজ্ঞানের স্থান কই? অজ্ঞান যদি থাকে তবে জ্ঞানকে পালাতে হয়। কাম যেখানে বলবান্ সেখানে প্রেম কোথায় থাকে? প্রেম যেখানে বিরাজমান কাম সেখানে নেই। কবীর বলেন এই আমার সত্য সিদ্ধান্ত। একথা আমি বাইরে থেকে বল্‌ছি নে; অন্তরের মধ্যে বিচার করে' দেখ তুমি তোমার অন্তরেই একথার সাক্ষ্য পাবে। বাইরের থেকে পাবার কোন দর্‌কার নেই।"

(নব্যভারত, পৌষ) শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন

যৌবনের সাধন

যৌবন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম কাল। এই যৌবন-সময়েই মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শের ছবিটা ফুটিয়া উঠে। যার যৌবন বিফলে যায়, সে এ জীবনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। আর যৌবনের সম্যক্ সফলতা লাভ করিতে হইলে যৌবনের সাধন করিতে হয়।

সাধনের প্রথম, সাধ্য-নির্ণয়। সাধনের দ্বারা কি লাভ হইবে' কিম্বা কি লাভ করিতে চাই তাহার পরিষ্কার ধারণা হওয়া আবশ্যক। ইহাই সাধ্য-নির্ণয়ের অর্থ।

যৌবনের প্রকাশ তিন দিক্ হইতে আরম্ভ হয়; অথবা চারিদিকেই আরম্ভ হয় একথাও বলা যাইতে পারে। প্রথম—শরীর; দ্বিতীয় মন; তৃতীয়—রঞ্জনী বৃত্তি; চতুর্থ—আত্মা। এই চারি কলাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এই চারি দিককেই যৌবনের সাড়া পড়িয়া, এই মনুষ্যত্ব বস্তুকে ফুটাইতে আরম্ভ করে। সুতরাং যৌবনের সাধনও এই চারি কলাতেই পরিপূর্ণ হয়। অথবা যৌবনের সম্যক্ সফলতা লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক, রসের বা রঞ্জনীবৃত্তির এবং আত্মার এই সাধন-চতুষ্টয় অবলম্বন করিতে হয়।...

(নব্যভারত, পৌষ) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস

...রঘুনন্দন লিখিয়া গিয়াছেন যে কলিকালে অর্থাৎ বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় হইতে ভারতবর্ষের সমাজ দ্বিবর্ণে পরিণত হইয়াছিল বা হইয়া আছে—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য বর্ণ নাই।...

বৌদ্ধমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পৌরোহিত্য কার্য্যে বৌদ্ধগণ খাঁটি ব্রাহ্মণ পাইলে শ্রমণগণকে নিযুক্ত করিতেন না; শ্রমণগণ প্রধানতঃ প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই নীতি জৈন প্রধানগণ অবলম্বন করিয়া চলিতেন, এখনও সকল জৈন মন্দিরে সারস্বত বা গৌড় ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্যের কাজ করেন। শ্রমণদিগের মধ্যে প্রায় শতকরা আশিজন' ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার ফলে, বৌদ্ধ একাকারের প্রভাব-কালেও ব্রাহ্মণ-জাতির বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। অশোকের সময়েও ব্রাহ্মণের একটা স্বতন্ত্র সত্তা ছিল। পক্ষান্তরে

শক, হূণ, আহীর বা আসীরিয় ও ইরাণী প্রভৃতি রণদুর্ম্মদ জাতি-সকল ভারতবর্ষে আসিয়া ক্ষাত্র শক্তির প্রভাব দেখাইয়া ক্ষত্রিয়-পদবাচ্য হন। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই-সকল জাতি ক্ষাত্রবর্ণের বিশিষ্টতা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। শ্রেষ্ঠী বণিক্‌জাতিসকল পূর্ব্বেই জৈনপ্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, পরে বৌদ্ধ একাকারের কালে বৈশ্য ও শূদ্র একবর্ণে পরিণত হয়। ফলে কয়েকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকল বৈদিক শ্রেণীভুক্ত জাতি শূদ্রের সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হয়।...

বৌদ্ধযুগে নাপিত শল্যচিকিৎসক ছিল, অনেক ব্রাহ্মণ এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নাপিত আখ্যা লাভ করিত। রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের নাপিত (royal surgeon) একজন বৌদ্ধ মহাযানী ব্রাহ্মণ ছিলেন ; চাঁদবর্দ্দায়ের পুস্তকে...লেখা আছে।... বৃত্তিগত জাতি-বিচারে জাতিভেদের অলঙ্ঘ্য গণ্ডী ছিল না, বা এখনও নাই।...

বৌদ্ধযুগের অনেক বৃত্তিগত জাতি কায়স্থদলভুক্ত হইয়াছে,—অনেক শ্রেষ্ঠী, অনেক পুরাতন বণিক কায়স্থ আখ্যা লাভ করিয়াছে। বৃত্তিগত জাতি মূলতঃ বৌদ্ধ বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; নবশাখ নামটাই উহার পোষক প্রমাণ।...

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন হিন্দুর আকার-সাম্যের রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।...স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন আচার-ধর্ম্মের বেষ্টনীর মধ্যে সকলকে রাখিয়া, ব্রতনিয়ম, বিধিনিষেধের বন্ধনীতে আবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ্য type বা আদর্শের উন্মেষসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। তাই তিনি সৎ-শূদ্র বলিয়া এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন, ব্রাহ্মণ-আকার-আকাঙ্ক্ষিত, ব্রাহ্মণভাবে ভাবুক বৈদ্য ও কায়স্থগণ সৎশূদ্র আখ্যা লাভ করেন।...

একপক্ষে দাক্ষিণাত্যের চোল ও পাণ্ড্যদিগের বংশধরগণ বঙ্গাধিকারী হওয়াতে, অন্য পক্ষে কান্যকুব্জ হইতে সমাগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠা বঙ্গীয় সমাজে হওয়াতে, কতকটা দক্ষিণের আদর্শে, কতকটা কান্যকুব্জ ও মিথিলার আদর্শে বাঙ্গলার নব সমাজকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা হয়।...

(১) বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জগতের প্রথম ও প্রধান প্রচারের ধর্ম্ম (proselytizing religion) বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

(২) বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম হওয়াতে উহাই আদিগণবাদের (democratic religion) ধর্ম্ম বলিয়া মান্য ও গ্রাহ্য হইয়াছে।

(৩) বৌদ্ধ-ধর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে প্রাকৃত ও পালি ভাষায়, অর্থাৎ জনগণের ভাষায় প্রচারিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণই ভারতবর্ষের অভিজাতবর্গের সংস্কৃত ভাষাকে পরিহার করিয়া জনসাধারণের পালি ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তরাশি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করে।

(৪) শাক্যসিংহ শক বা Scythian ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকগণের মধ্যে অনেকেই শক বা Chaldean বা হূণবংশাবতংস ছিলেন।...প্রচার-ধর্ম্মের আবিষ্কার এবং ধর্ম্মে গণবাদের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শক-মনীষা-সঞ্জাত ; উহা আর্য্য-মস্তিষ্ক-প্রতিভাত নহে।

বৌদ্ধদিগের এই মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার সহজিয়া ও তান্ত্রিক প্রধানগণ জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও ব্যাখ্যানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই-সকল ধর্ম্মপ্রচারক ব্যাখ্যাতাগণকে সিদ্ধাচার্য্য বলা হইত। ইহাদের এক সম্প্রদায় কেবল গান করিয়া, ছড়া কাটাইয়া সদ্ধর্ম্ম (সহজমত ও বৌদ্ধধর্ম্ম) প্রচার করিতেন, আর এক শ্রেণী কেবল ব্যাখ্যাতা ছিলেন এবং নিজেদের অর্জ্জিত "সিদ্ধাই" বা সিদ্ধির সাহায্যে জনগণকে স্বদলভুক্ত রাখিতেন। এই সিদ্ধাচার্য্যগণের গান ও পাঁচালী বাঙ্গলা সাহিত্যের বনিয়াদ, বাঙ্গলা ভাষার বেদী।...

কাহ্নই বাঙ্গালায় কীর্ত্তনের প্রচলন করেন, তাঁহার রচিত অসংখ্য গীত বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে গীত হইত। "কানু ছাড়া গীত নাই" এই প্রবচনের মূলে সিদ্ধাচার্য্য কাহ্নই আছেন, কানু শ্রীকৃষ্ণ নহেন। শ্রীচৈতন্য দেব ও প্রভুপাদ নিত্যানন্দ এই সিদ্ধাচার্য্যগণের দলবলকে আত্মসাৎ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। নাড় ও নাড়ী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, সিদ্ধাচার্য্যের পদ পাইয়া এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারীবৃন্দকে রাঢ়ের সন্ধ্যা-ভাষায় নাড় ও নাড়ীর দল বলিত ; শ্রীমন্নিত্যানন্দ ইহাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদলভুক্ত করেন এবং পরে উহারাই "নেড়া নেড়ী" বলিয়া পরিচিত হয়। এই-সকল সিদ্ধাচার্য্যসৃষ্ট সম্প্রদায়ে "পণ্ডিত" উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ যজন-যাজনের কাজ করিতেন।...

বল্লাল সেনের সময় উৎকল ও দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক ব্রাহ্মণের আমদানী করা হয়। দক্ষিণের নামবুদ্রীদের ব্যবহারের আদর্শে বাঙ্গালায় এক সময়ে ব্রাহ্মণের রীতিমত চাস চলিয়াছিল।...

হিন্দুর সামাজিক যত কদাচার তাহার প্রায় সকলেরই মূল বৌদ্ধ-শৈথিল্য ও সমাজ-বিক্ষেপ। কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ সিদ্ধাচার্য্যদিগের সহিত আপোষের বিনিময় ফলস্বরূপ। পাঠানদিগের আগমনের পরে সিদ্ধাই দলের নর-নারী যে ভাবে পাঠানদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন, তাহারই কু-ফল সাম্‌লাইবার উদ্দেশ্যে শোণিতগত দোষের cauterization and absorptionএর প্রয়াসে কৌলীন্য, থাক্ মেল, পাল্‌টি প্রকৃতি প্রভৃতির উদ্ভাবন হয়। কৌলীন্য প্রথা social distillation বা সমাজকে চোয়াইয়া পরিশুদ্ধ করিবার নামান্তর মাত্র।...

বাঙ্গালার তথা উত্তর-ভারতের জাতি-বিভাগ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নহে, উহা বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ছাড়া অন্য কিছু নহে।...ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গালার জাতিবিভাগ স্থিতিস্থাপকতা-গুণসম্পন্ন ছিল।...

মহারাজ নন্দকুমার নূতন বড়মানুষ হইয়া একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে সকল প্রয়োজনীয় বস্ত্র এবং আচ্ছাদন মুর্শিদাবাদ হইতে খরিদ করিয়া আনেন। ভাদুরের তন্তুবায়ের দল...বিদেশের কাপড় আনার জন্য ...তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিল।...ক্রমে অন্য শিল্পী-জাতি সে ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। বৎসরেকের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের এমন দশা ঘটিল যে, পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালার কোন হাটে বা গঞ্জে তাঁহাকে কেহ কাপড় যোগাইত না ; গ্রামে প্রবেশ করিতে তিনি পারিতেন না ; মুটে মোট বহিত না, নাপিত কামাইত না, ধোপা কাপড় ধৌত করিত না ; অথচ তখন মহারাজ হুগলীর ফৌজদার এবং মুর্শিদাবাদের নিজামতীর নায়েব দেওয়ান। শেষে মহারাজকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। মহারাজের উপর প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা এই হইল যে, তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন এবং নবশাখ ও অন্য শিল্পীজাতিসকলকে জগন্নাথ-দেবের আট্‌কে ভোগ খাওয়াইবেন। মহারাজ নন্দকুমারের এই প্রায়শ্চিত্ত রাঢ়দেশে একটা বড় জাঁকের ব্যাপার হইয়াছিল।...

এক জাতি হইতে একঘরিয়া হইলে লোকে দেশান্তরে যাইয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্য জাতিভুক্ত হইয়া থাকিত।...

শিল্পী-বণিক্-জাতীয় কেহ বৃত্তিচ্যুত হইলে কায়স্থদলভুক্ত হইত।...

আমাদের এই বৃত্তিগত জাতিভেদের মূলে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসি প্রকট হইয়া আছে। জাতির গণ্ডীর মধ্যে ধনী-নির্দ্ধনের বিচার নাই, পণ্ডিত-মূর্খের বৈষম্য নাই, সবাই সমান অধিকারে অধিকারী। আবার কোন জাতিই অপর কোন জাতি হইতে ন্যূন নহে ; প্রত্যেক জাতিই

self-sufficient and self-contained ; এমন কি ব্রাহ্মণ জাতিকেও অপর জাতি, জাতির হিসাবে বড় বলিয়া মান্য করে না ; ব্রাহ্মণ যজন-যাজন করেন, গুরু-পুরোহিতের কাজ করেন, তাই পূজনীয়।...স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যবস্থা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মান্য হয় নাই।...

(বঙ্গবাণী, পৌষ)　　শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

—

সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র

কোনও সমাজে নূতন চিন্তা ও ভাবের প্রেরণায় যখন একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, কবিতা, নাট্যকলা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই নূতন জীবন আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এ-সকলের দ্বারাই সেই সমাজের নবচেতনা ও নূতনপ্রাণতার প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিতে ধর্ম্মতত্ত্ব, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য গাথা পর্য্যন্ত জাতির ভাব ও চিন্তা যে দিকেই নিজেকে ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তার সাকল্যটা বুঝায়।...বাঙ্গালায় নবযুগের সাহিত্যে বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন।...

রাজা রামমোহনই বাংলার নবযুগের সাহিত্যেরও প্রথম প্রবর্ত্তক।... বাংলার নবযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজেরও একটা বিশিষ্ট স্থান এবং মর্য্যাদা আছে। সে কালের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ কিম্বা তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র।..

বঙ্গদর্শন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে এক যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করে।...মাইকেলের কবিপ্রতিভা তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যাহ্নগগনে যাইয়া উঠিয়াছে।...বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই হুতুমপেঁচা ও আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হয়, এবং এ দু'খানাও শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হইয়া উঠে। এ ছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ", "নবীন তপস্বিনী", "জামাই বারিক" এবং "সধবার একাদশী"ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর নাটকে সেকালের সমাজচিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজের উপরে তখনকার ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কতটা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বকার আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে মোটের উপরে ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য বলিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতাসাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজ-সংস্কার, ইহাই আধুনিক বাংলার ব্রাহ্মযুগের প্রধান লক্ষণ ছিল। এই দুইটি লক্ষণই এই যুগের বাংলা-সাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। এক ব্রাহ্মযুগ, আর এক বঙ্কিমযুগ। বঙ্গদর্শন এই বঙ্কিমযুগের সূচনা করে।...

ব্রাহ্মসাহিত্য য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবেই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে।...ব্রাহ্মযুগের বাংলা-সাহিত্যে কাজেই তেমন একটা মৌলিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান নবযুগের বাংলা সাহিত্যে এই মৌলিকতাটা প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে, বঙ্গদর্শনে। এইজন্যই বঙ্গদর্শন আধুনিক বাংলার চিন্তায় এবং ভাবে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী আগ্রহসহকারে বাংলা-সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করেন।...

বাংলার আধুনিক স্বাদেশিকতাকে বঙ্গদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে ঐতিহাসিক সত্যের উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই কাজটা আরম্ভ করেন স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।...

এদেশের লোকের মনে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতাপ এবং জ্ঞানগৌরব যে একটা গভীর হীনতাবোধ জন্মাইয়াছিল, তাহা দূর করিতে বঙ্কিমচন্দ্রই বোধহয় সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি কখনও মিথ্যা বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও-প্রকারের একটা শূন্যগর্ভ আত্মাভিমান বা স্বাজাত্যাভিমান জাগাইতে চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারের একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গী এই ছিল যে তিনি বিপক্ষের কথার মধ্যে যেটুকু গতি-অপ্রীতিকর সত্য থাকিত তাহা অম্লানবদনে মানিয়া লইতেন।...

তিনি সত্য এবং যুক্তির ধারালো অস্ত্রে প্রথমে এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা বহুকাল পরাধীন হইয়া রহিয়াছে বটে কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের শক্তি ও শৌর্য্যের অভাব বা হীনতা এই পরাধীনতার কারণ নহে। হিন্দুদিগের এই কলঙ্কের কারণ, হিন্দুরা মোটের উপরে পররাজ্যাপহারী ছিল না।... ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃই প্রাচীন কাল হইতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-রহিত ছিল। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব।...

(বঙ্গবাণী, পৌষ)　　শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

কলিকাতার কথা

ভিক্টোরিয়া যুগারম্ভ

সেই সময়ের কলিকাতার সমাজের চিত্র ও লোকের মনের ভাব একটা পুরাতন ছড়ায় পাওয়া যায়, তাহা দেওয়া গেল—

গুরুমশায়ের মারবোর ঘুচে গেল জারিজুরি,
ডফ্ কেরি পাদরীরা সবায় পড়ায় ধরি ধরি।
বিলিতি খানা খাইয়ে তারা ছেলেদের মাথা খেলে,
মুরগী-ভেড়ার ছেনাগুলো কাঁটা-চামচেয় গেলে।
দিঘি-জল হলো চলি, পয়সা দিয়ে জল খাওয়া।
গঙ্গাজলে বিষ্ঠা ভাসে, বন্ধ হলো নাওয়া খাওয়া।
টেবিল চেয়ার ছেড়ে আর কেও যে চায় না খেতে,
আসন পেতে বসলে খেতে বলে "ধুলো পড়ে পাতে।"
শুকনো ডাবা গঙ্গায় দিয়ে ধরে সবে গুড়গুড়ী,
হেঁকে চলে পাল্কী ছেড়ে বেনীয়ান বাবু করে গাড়ী।
গঙ্গাস্নান, ধ্যান করা নিরামিষ খেয়ে পৈতা তুলে
চলবে না জারিজুরি বেদাদির স্বপ্ন মন্ত্র ভুলে।
"মাদ্রী পাণ্ডুর সহমরণ" আগ্য ঋষিরা লেখেন নি,
এই সিদ্ধান্ত জাহির করে ধর্ম্মশাস্ত্রচূড়ামণি।
ব্যাস মনু যা পারে নি জাহির হল আইন-বলে
মাছের মায়ের পুত্রশোকে "সতীধর্ম্ম" গেল চলে।
নেড়ের দলের রাম রাজা বিলেতে তাতেই গেল,
হিন্দুর আর্জ্জি বিলাত গিয়ে তাই ফাঁস হয়ে গেল।
মূর্খ বাদশা তায় পাঠালে ভিক্ষা করে' "রাজা" হতে,
কোম্পানি হলো দেশের রাজা সেই তার দাসখতে।
মাসহারা শুধু বেড়ে গেল আর্জ্জি করার ফলে,
সতীর শাপে ম্লেচ্ছের দেশে তাই বাম্নে পচে মলো'।"

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময়ে চারিদিকে স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়ের চিহ্ন দেখা দিয়াছিল।...অক্‌ল্যাণ্ডের ভগ্নীরাই কলিকাতার নন্দনোদ্যান 'ইডেন

গার্ডেন' করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে যে বর্ম্মিজ প্যাগোডা আছে তাহা প্রোম হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মা-যুদ্ধের বিজয়চিহ্ন-স্বরূপ ঐখানে রাখা হইয়াছে।...ভারতের সকল স্থলেই স্ত্রীজাতির আধিপত্য কর্ম্মক্ষমতা ও স্বাধীনতার লক্ষণসকল দেখা দিয়াছিল। কলিকাতার রাণী কাত্যায়নী ও রাসমণি দানধ্যান করিয়া বেশ নাম কিনিয়া গিয়াছিলেন। রাণী কাত্যায়নী বিখ্যাত লালাবাবুর স্ত্রী। "রাণী" রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র মাড় পীরিতরামের পুত্র।...পীরিতরাম কায়েত হইবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন।—...

"দুলোল হলো সরকার, ওকুর হলো দত্ত।
আমি কিনা থাক্‌বো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত॥"

মুর্শিদাবাদের মহারাণী স্বর্ণময়ী যেমন দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের কথায় অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন, কাত্যায়নী তেমনি তাঁহার গুরু বিনোদীলালের ও রাসমণি ধনা খান্‌সামার কথায় সৎকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতায় ছড়ায় সেই-সকল উপদেষ্টাদের সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল :—

"ঠাকুরে বিনোদিলাল, চাকরে ধনাই।
দেওয়ানে রাজীব রায়, বলিহারি যাই॥"

...ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ-প্রভাকর" ও "সংবাদ-রত্নাবলী" নামে বাঙ্‌লা খবরের কাগজ বাহির হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র মহেশচন্দ্রও স্বভাবকবি ছিলেন। দুই ভাইয়ে একদিন ঠাট্টা করিয়া বড়ই রগড় হইয়াছিল ও সেই হইতে মহেশ ঈশ্বরচন্দ্র জীবিত থাকিতে কবিতা লেখেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র মহেশকে "দাদা, লেজ গুটালে কেন?" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই মধুর উত্তর পাইয়াছিলেন :—

"ওরে, দুই ভাইয়ের দুই থাক্‌লে লেজ
থাক্‌তো না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে
সোনার লঙ্কা ছারখার।"

আর ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহেশ দুঃখে বলিয়াছিলেন :—

"সাত মেড়াতে জড় হ'য়ে নষ্ট কর্‌লে 'প্রভাকর'।
জন্মে কলম ধরেনিকো 'রাম' হল এডিটর।
আগা পাছা বাদ দিয়ে 'শ্যাম' হ'ল কমাণ্ডর।"

মার্শম্যান্ সাহেবও ঐ সময় "ফ্রেণ্ড্ অফ ইণ্ডিয়া" কাগজ বাহির করিয়াছিলেন।...

(সুবর্ণবণিক্-সমাচার, পৌষ) রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর

—

স্বপ্ন

...আধুনিক স্বপ্ন-তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে স্বপ্নের কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টার দুইটি ধারা আছে। এক দল স্বপ্নের Physiological বা শারীরিক কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আর একদল অনুমান করেন, স্বপ্নের কারণ মনের মধ্যেই আছে।...

কোন কোন শারীরক্রিয়াবিদ্ (physiologist) মনে করেন, আমাদের মস্তিষ্ক-মধ্যস্থিত cells বা কোষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের ফলেই মানসিক চিন্তার উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন কোষগুলি পরস্পর-সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। নিদ্রাকালে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যই চিন্তাধারার শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া স্বপ্নের সৃষ্টি করে। আর একদল শারীরক্রিয়াবিদ্ (physiologist) ঠিক ইহার বিপরীত কথাই বলেন। তাঁহাদের মতে নিদ্রাবস্থায় cells বা কোষগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হইয়া বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়; আর এই জট পাকাইবার ফলে স্বাভাবিক চিন্তার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়,—আমরা স্বপ্ন দেখি। আবার কেহ কেহ বলেন, নিদ্রাকালে শরীরের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ জমিয়া কোষগুলির ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়, আর তাহাতেই আমরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকি।...

বৃহদ্-আরণ্যক উপনিষদে স্বপ্নের দুইটি মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) আত্মা বহির্জগতে দৃষ্ট দ্রব্যাদির অনুকরণে স্বপ্নে নূতন জগৎ সৃষ্টি করে। (২) আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া, ইচ্ছামত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। 'চরক' স্বপ্নকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক (ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশক) ও দোষজ। ইহাদের মধ্যে প্রথম ৫টি অমূলক—অর্থশূন্য। বেদান্ত বলেন, স্বপ্ন দেখা কোন কিছুই আমাদের অজানিত নয়' কিন্তু ইহার কোনটিকেই বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলা চলে না।...

জাগ্রত চিন্তাধারার মধ্যে দর্শন (visual) শ্রবণ (auditory) ও স্পর্শেন্দ্রিয় (tactual) ইত্যাদি প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ (image) বর্ত্তমান আছে। কিন্তু স্বপ্নের ভিতর দার্শন প্রতিরূপের (visual imagery) প্রাধান্যই বেশী।...তাই চল্‌তি কথায় আমরা বলি—'স্বপ্ন দেখা'।...

স্বপ্নের সময় চিন্তাধারা আমাদের ইচ্ছামত চালিত হয় না,—ইহাও স্বপ্নের একটা বিশেষত্ব।...স্বপ্নের ঘোরে সময়ে-সময়ে কথা কহিতে বা চলিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহাকে 'নিশিতে পাওয়া' বলে।...Coleridge স্বপ্নে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা Kubla Khan লেখেন। দুঃখের বিষয় ইহা অসম্পূর্ণ। শুনিতে পাই, আমাদের রবীন্দ্রনাথও নাকি স্বপ্নে কোন কোন কবিতা লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে মন্দির-সোপানে রক্তের কাহিনী ও শিশুর মুখে 'এত রক্ত কেন?' কথাটি পর্য্যন্ত স্বপ্ন-সৃষ্ট। তাঁহার সর্ব্বজনপরিচিত 'গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা' গাথার উপাখ্যান-ভাগ, এমন কি কাব্যাংশ পর্য্যন্তও স্বপ্নে প্রাপ্ত। অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও স্বপ্নে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বপ্নকে আমারা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) যে-সব স্বপ্নে কোনরূপ অসংলগ্নতা বা অস্বাভাবিকতা নাই। সাধারণ জাগ্রত চিন্তাধারার সহিত এই শ্রেণীর স্বপ্নের বাস্তব কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। যেমন স্বপ্নে দেখিলাম আমি গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছি। ইহাতে কোন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ভাব নাই। (২) যে-সকল স্বপ্নে ভাবের অসংলগ্নতা না থাকিলেও বাস্তব জীবনের সহিত কোন মিল নাই। ধরুন, স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মরিয়া গিয়াছি। (৩) যে-সব স্বপ্ন একেবারে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত। যেমন, স্বপ্নে দেখিলাম একটা তিন-পা-ওয়ালা সাপ আমার সহিত কথা কহিতেছে। এই ধরণের স্বপ্ন ঘুম ভাঙ্গিবার পর অদ্ভুত ঠেকিলেও স্বপ্ন দেখার সময় তাহার অস্বাভাবিকত্ব প্রায়ই ধরা পড়ে না। ছোট ছেলের স্বপ্ন সাধারণতঃ প্রথম প্রকারের। অনেকে বলেন, অসভ্য জাতিদের মধ্যে বয়স্ক লোকের স্বপ্নও নাকি এইরূপ হইয়া থাকে।...

স্বপ্ন নিদ্রাবস্থার চিন্তামাত্র।

ফ্রয়েডের মতে, আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজ, আর সেই সঙ্গে অনেক চিন্তাধারা সম্পূর্ণতা লাভ করে না; এই অসম্পূর্ণ চিন্তাধারাই স্বপ্নে পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে।...মনের অশান্তি দূর করে বলিয়া স্বপ্ন নিদ্রার সহায়ক।...নিদ্রার ব্যাঘাত থাকিলেই স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, আর এই স্বপ্ন দেখার ফলেই সুনিদ্রা সম্ভব হইয়া থাকে।...

কাহারও কাহারও মতে স্বপ্ন একেবারেই নিরর্থক।...সংস্কৃত গ্রন্থে স্বপ্নের ফলাফল ও অর্থ-নির্ণয়ের জন্য অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ও সামবেদের কোন কোন শ্লোকে স্বপ্নের বিবরণ পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদের মতে কতকগুলি স্বপ্ন নিরর্থক; আবার কতকগুলির শুভাশুভ ফল আছে।...

স্বপ্নের এই ধরণের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত আছে।... বৈজ্ঞানিক হিসাবে এরূপ ব্যাখ্যার বিশেষ কোনই মূল্য নাই।...

স্বপ্নের একটি বিশেষত্ব এই, তাহা অতি সহজেই আমরা ভুলিয়া যাই; ..স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা নিতান্ত সোজা নহে। দ্রষ্টার সম্বন্ধে সমস্ত খবর ও তাঁহার স্বপ্নের খাঁটি বিবরণ লইয়া, পরে অবাধভাবানুবন্ধের (Free Associati)n Method) সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ ধৈর্য্য ও সময়ের দরকার।...

স্বপ্ন খুব ছোট হইলেও তাহার সহিত মনের অনেক চিন্তাই বিজড়িত থাকে।...

(ভারতবর্ষ, পৌষ) ডাঃ শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস-সি

প্রথম বাঙ্‌লা অভিধান

পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্য যখন কোন কোন প্রাচ্যদেশে চলিতেছিল, তখন Nuno da Cunha (১৫২৯—১৫৩৮) তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের সহিত রীতিমত ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। ফলে ১৫৮১ সাল হইতে প্রতিবৎসর একখানি করিয়া পর্ত্তুগীজ জাহাজ বাণিজ্য-ব্যপদেশে চট্টগ্রামে আগমন করিত। ক্রমশঃ Da Cunhar চেষ্টায় পর্ত্তুগীজ বঙ্গে বাস করিতে লাগিল।...১৭৩৪ সালের ২৮এ আগষ্ট তারিখে Padre Frey Manoel da Assumpcao নামক ঢাকার নিকটবর্ত্তী (ভাওয়ালের) "নগরী"র একজন পর্ত্তুগীজ Augustinian মিশনরী বঙ্গভাষা ও পর্ত্তুগীজভাষায় কথোপকথনচ্ছলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতের একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি এবং ইঁহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ সালে লিস্‌বন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় পুস্তকখানি বাঙ্‌লা ব্যাকরণ ও অভিধানের ঐতিহাসিক আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান্‌। এই গ্রন্থখানির নাম—"Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes"।...

আস্থমশাওর এই গ্রন্থের ও অপর দুইখানি গ্রন্থের বাঙ্গালা কথাগুলি রোমান অক্ষরে লিখিত। এ গ্রন্থের ৫৫ বৎসর পরেই Henry Pitts Forsterএর অভিধান মুদ্রিত হয়।...তিনি ১৭৯৩ সালের "Cornwallis Code" বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। বইখানি সরকারী ছাপাখানায় ছাপা হয়। ইনিই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষার বহুল প্রচার ও উন্নতি কামনায় ১৭৯৯ সালে বাঙ্‌লা ও ইংরেজী উভয় ভাষা-সম্বলিত একখানি বাঙ্‌লা অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহার প্রথম খণ্ড ঐ বৎসর প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বাঙ্‌লা হইতে ইংরেজির অংশ ১৮০২ সালে বাহির হয়।...রাজনৈতিক যুক্তি ও ফর্ষ্টারের সাহিত্যানুরাগ, এই কারণদ্বয়ের সম্মিলনে তাঁহার অভিধানের সৃষ্টি হয়। ফর্ষ্টারের অভিধানখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় বিশ্বকোষের ন্যায়। ইহাতে ৪৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার বাঙ্‌লা অক্ষরগুলি চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ কর্ত্তৃক ক্ষোদিত। শব্দসংখ্যা ১৮০০০। পুস্তকখানি কলিকাতায় Post Press-এ মুদ্রিত ও P. Ferris কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অভিধানখানির নাম "A Vocabulary, in two parts, English and Bengalee and vice versa. By H. P. Forster, Senior Merchant on the Bengal Establishment." অভিধানখানি Thomas Graham Esqr.কে উৎসর্গীকৃত।...

ফর্ষ্টার-কৃত অভিধানে সাধু ও চলিত উভয় ভাষার শব্দই একত্র সংগৃহীত ও ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে।...ফর্ষ্টার বঙ্গদেশের আইন-আদালতে পারসী ভাষা প্রচলনের অনৌচিত্য ও অনিষ্টকারিতার প্রমাণ দেখাইয়া, উক্ত ভাষা ব্যবহার স্থগিত রাখিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে বাঙ্‌লা ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব করিলেন। কেরী, মার্শম্যান্, শ্রীরামপুরের যাবতীয় পাদরীগণ, রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন বন্ধু ফর্ষ্টারের এই সাধু প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ফর্ষ্টারপ্রমুখ মহাত্মাদিগের যত্নে ও চেষ্টায় বাঙ্‌লা ভাষা বঙ্গ-বিভাগের আইন-আদালতে প্রচলিত হয়।

বাঙ্‌লাভাষার প্রচলন সংসাধিত করিবার পরই ফর্ষ্টার সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ২৬এ আগষ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটে তাঁহার বাঙ্‌লা অভিধানের এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়। এই বিজ্ঞাপনে ইহাও প্রকাশিত হয় যে, তিনি "Essay on the Principles of Sanskr t Grammar" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছেন—শীঘ্রই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে এবং তাহারই উপসংহারস্বরূপ বোপদেব-প্রণীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। ১৮১০ সালে তাঁহার Essay প্রকাশিত হয়; কিন্তু শেষোক্ত অনুবাদ যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার Essayর মুখবন্ধ পড়িয়া জানিতে পারি যে, ১৮০৪ সালে তিনি তাঁহার সঙ্কলিত মুগ্ধবোধের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি College Councilএর হস্তে ন্যস্ত করেন। কোল্‌ব্রুক, কেরী ও উইল্‌কিন্‌স্ সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে যে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময় তাহার একখানিও প্রকাশিত হয় নাই।...

ফর্ষ্টার যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন। এই দেশে অবস্থিতিকালে তিনি এক জাঠরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। এই রমণীর সহিত বৈবাহিক বন্ধনের খাতিরে তাঁহার এদেশের প্রতি মায়া, বঙ্গভাষার প্রতি ঝোঁক। এই জাঠ-রমণীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের নাম হেন্‌রী ফর্ষ্টার।

ফর্ষ্টার বাঙ্‌লা ভাষার মৌলিকতা সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাঙ্‌লা ও ইংরেজি অভিধানের মুখবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন:—

"The Bengalee in its present corrupted state is perhaps the purest dialect of the venerable Sanskrit now spoken in any part of India, its corruptions being principally confined to revenue and judicial terms, and some few commonplace familiar expressions.

The observation however is not meant to be applied to the Bengalee spoken in and near the larger towns and cities, which have long been the seats of foreign governors, and the rendezvous of all nations, nor in general to the pleadings in the courts of justice, which necessarily partake more or less of the modern Hindoostanee or Moors, being the language we have generally adopted as the medium of communication."

ফর্ষ্টার বাঙ্‌লা শব্দ স্থির করিবার একটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে শব্দে দুইটি স্বরের একত্র সংযোগ হইয়াছে অথচ সন্ধি হয় নাই, সেই-সকল শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্‌লা শব্দ।...তাঁহার অভিধানের বিজ্ঞাপনে ফর্ষ্টার বিশেষণ হইতে বিশেষ্য সাধন করিবার কয়েকটি নিয়ম দিয়াছেন।...

(ভারতী, পৌষ) শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কোর্-আন—অনুবাদক খান বাহাদুর মৌলবী তসলীমুদ্দীন আহ্মদ, বি-এল। প্রকাশক ওরিয়েণ্টাল্ প্রিণ্টার্স্ এণ্ড্ পাব্লিশার্স্ লিমিটেড, ৪০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৫৮+৫৮/০ পৃষ্ঠা। উত্তম কাপড়ে সুন্দর বাঁধা। দাম আড়াই টাকা।

এখানি কোর্-আনের প্রথম খণ্ড, এতে প্রথম দশ পারা, প্রথম নয় সুরা, অর্থাৎ কোর্-আনের এক-তৃতীয়াংশ আছে; অনুরূপ আর দুই খণ্ডে কোর্-আন সম্পূর্ণ হইবে। তফ্সীর হক্কানী আদি বিখ্যাত তফ্সীর অবলম্বনে মূল আরবী হইতে বহু ব্যাখ্যা সহ সরল সবিস্তার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। উর্দ্দু ইংরেজী বাংলা প্রভৃতি ভাষার অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই অনুবাদ করা হইয়াছে। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন বাংলায় কোরানের অনুবাদ প্রথম করেন; সে অনুবাদ এখন আর পাওয়া যায় না। সুতরাং এই অনুবাদ প্রকাশ করাতে বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার করা হইতেছে। সকল বাঙালী-মুসলমান আরবী জানেন না, তাঁদের ধর্ম্ম-গ্রন্থের বিষয় অপরের নিকট হইতে শুনিয়া জানিতে বুঝিতে মানিতে হয়; অ-মুসলমান বাঙালীরাও তাঁহাদের প্রতিবাসী এতবড় এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শাস্ত্র সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকায় অনেক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশ হওয়াতে মুসলমান-অমুসলমান সকলেই নিজে কোরান পড়িয়া তার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব নীতি-উপদেশ আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হইবার পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু অমুসলমান বাঙালী এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের মধ্যেকার একত্ব অনুভব করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে পার্থক্য তাহা দেশ-কালের ব্যবধান-হেতু কতকগুলি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানে; কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রে এক, ইহা বুঝিতে পারা যায় বহু ধর্ম্ম-তত্ত্ব তুলনায় আলোচনা করিলে। ভারতের যে ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিচিত হইতেছে তাহা বিশেষ কোনো ব্যক্তির কালের বা দেশের উদ্ভূত ধর্ম্ম নয়; তাহা বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, নাগ- ও লিঙ্গ-পূজক দ্রাবিড়, তান্ত্রিক মোঙ্গল, সূর্য্যপূজক মগ ও বহু বহু লৌকিক ধর্ম্মের অদ্ভুত সমবায় ও সমন্বয়; সেই ধর্ম্মের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মকেও আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল—আল্লোপনিষৎ, কল্কিপুরাণ, সত্যপীরের পাঁচালী, পীরের শিরণী, মুস্কিল-আসানের মানত প্রভৃতি তার প্রমাণ। আলোচ্যমান কোরান-অনুবাদক খান বাহাদুর সুদীর্ঘ ভূমিকায় হিন্দু-শাস্ত্রে মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উল্লেখের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন; আর আলোচনা করিয়াছেন যে দেশ ও যে কালে হজ্‌রত মহম্মদ অবতীর্ণ হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই দেশ ও কালের ভূগোল ইতিহাস বিশিষ্টতা ও এই ধর্ম্মের সঙ্গে সন্নিহিত দেশ ও কালের অন্যান্য ধর্ম্মের সম্পর্ক। অনুবাদ সহজবোধ্য করিবার জন্য বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্যা ও টীকাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মোটের উপর এই সংস্করণ সুচারু হইয়াছে: ইহা প্রত্যেক বাঙালী মুসলমান-অমুসলমানের কাছে সমাদৃত হইবে; আমরা ইহা উপহার পাইয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি, আমরা এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তাকে অভিনন্দন করিতেছি। ইহার বাকী দুইখণ্ডের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব আগ্রহান্বিত হইয়া রহিলাম।

পুস্তকখানিতে একটি সূচীপত্রের অভাব আছে। অনুবাদকের নিবেদনে দেখিলাম—"সর্ব্বশেষে এক বিস্তীর্ণ সূচীতে বর্ণমালা-ক্রমে প্রত্যেক বিষয় একস্থানে সংগৃহীত হইয়াছে।" সেই সূচীটি যেন এমন বিশদ ও বিস্তৃত হয় যে অমুসলমান ও আরবী-না-জানা লোকও কোরানের কোথায় কি আছে তাহা সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। বাঙালী গ্রন্থকার ও প্রকাশকেরা এখনো সূচীর উপকারিতা উপলব্ধি করেন নাই ইহা বড়ই দুঃখ ও অসুবিধার বিষয়।

ভারত-পরিচয়—শ্রী সরযূবালা দত্ত ও শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সোল্ এজেণ্ট্—পপুলার এজেন্সি, ৬৪।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০৬ পৃষ্ঠা। বহুসংখ্যক-সুন্দরচিত্রসম্বলিত। দাম মোটে দশ আনা।

চতুর্থ ও পঞ্চম মানের পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। কিন্তু এ ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র ধরণে লেখা হইয়াছে। ভারত-ইতিহাসের প্রধান ও মোটা মোটা বিষয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় গল্পের আকারে সময়-ক্রমে পর পর সজ্জিত ও চিত্র দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ইহাতে বইখানি খুব সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে আধুনিকতম ঐতিহাসিক গবেষণা-লব্ধ তথ্যও স্থান পাইয়াছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে ইহা পাঠ করিয়া অনেক কিছু নূতন কথা শিখিয়াছি। বালক-বালিকারাও ইহা আনন্দের সঙ্গেই পাঠ করিবে ও ভারতের সঙ্গে একটি আনন্দময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করিবে।

মানব-প্রকৃতি—শ্রী হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সেণ্ট্-কলম্বাস কলেজ, হাজারিবাগ। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৭৫ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, দেড় টাকা।

আসলে এখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিষবৃক্ষের চরিত্র-সমালোচনা। কোন্ চরিত্র কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া কিরূপভাবে পরিণতি ও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া সাধারণভাবে তাহা মানব-প্রকৃতির বিকাশরীতির সহিত মিলাইয়া দেখানো হইয়াছে। পুস্তকখানি দুইখণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ডে পুরুষ-প্রকৃতি ও দ্বিতীয় খণ্ডে নারী-প্রকৃতি সমালোচিত হইয়াছে। ইহা একখানি নূতন ধরণের সমালোচনা-পুস্তক—ইহা একাধারে সমালোচনা এবং মনস্তত্ত্ব ও চারিত্রনীতির বই। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মানব-প্রকৃতির বিচিত্র জটিলতা ও কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

মুদ্রাদোষ শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্। ১২১ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, এক টাকা।

দশটি রসরচনার সমষ্টি। রচনাগুলির নাম—(১) মুদ্রাদোষ, (২) প্রশংসা-প্রসঙ্গ, (৩) ফলিত-জ্যোতিষ, (৪) যন্ত্র ও জীবন, (৫) ভ্রমণবৃত্তান্ত, (৬) সুবর্ণ-মধ্যম, (৭) তাল ফের্‌তা, (৮) আত্ম-

পরিচয়, (৯) আমার সেতার শিক্ষা, (১০) পূজার ছুটি। বিষয়গুলি সামান্য, রচনার মধ্যে বিষয়বস্তু অতি অল্প, কিন্তু রচনার গুণে তাহা সরস হইয়া উঠিয়াছে; মধুর ভাষা, মনোরম রচনারীতি, সামান্য তুচ্ছ বিষয় লইয়া দার্শনিকতা ও বিদ্যাবত্তা, অনাবিল মৃদুহাস্যরসে মণ্ডিত ও প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রকাশের নিপুণতা, বইখানিকে উপভোগ্য ও সুখপাঠ্য করিয়াছে। বাঙালীর হাসির দৈন্য বিষম; বাংলা-সাহিত্যেও সুস্থ ভদ্র রসিকতারও নিতান্ত অভাব; সেই দৈন্য ও অভাব এই রসমধুর রচনায় কিছুও দূর হইবে। আমি সবচেয়ে উপভোগ করিয়াছি—"আমার সেতার শিক্ষা"; কারণ এটি গ্রন্থকারের যথার্থ আত্মকাহিনী, এই বিবরণে উল্লিখিত সব লোকগুলিই আমার বিশেষ চেনা।

সচিত্র ভাস্করানন্দ চরিতামৃত ও স্বরাজ্যসিদ্ধি—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯২+১১+৵০ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

কাশীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক পরমহংস ভাস্করানন্দস্বামীর জীবন-চরিত ও তাঁর উপদেশ। ভক্তের ভাবে লেখা। পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়—শ্রী নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় c/o. শ্রী ললিত-মোহন দাস, ৮২।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ইত্যাদি।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক অবস্থায় ইহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন; সত্য বলিয়া উপলব্ধ মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করাতে তাঁহাকে পিতৃসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ও পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনভাবে কষ্টকর জীবনসংগ্রামের মধ্যে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল; তথাপি তিনি নিজের চরিত্রের মাধুর্য্য ও নম্রতা রক্ষা করিয়া কর্ম্ম সংস্কার ও বহুজনকে আশ্রয় ও সাহায্যদান ব্রত করিয়াছিলেন। এমন সদ্-গুণসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিলে পাঠক উপকৃত হইবেন।

অগ্নিবীণা—কাজী নজরুল ইস্‌লাম, ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্জের লেন, কলিকাতা। এক টাকা।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম অতি অল্পদিনের মধ্যে নিজের প্রতিভায় বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছেন; নব-অভ্যুদিত তরুণ কবি আপনার গুণপনায় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। এই কবির বিশেষত্ব তাঁর ছন্দের বৈচিত্র্যে, উপল-বিষম ঝর্ণাধারার মতন শব্দের ঝঙ্কারে, অগ্নিগিরির উচ্ছ্বাসের মতন আবেগময় ভাবের উদ্দাম প্রবাহে, বন্যাস্রোতের মতন প্রবল আগ্রহে, বলিবার শক্তিমান্ ভঙ্গীতে এবং হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম্ম ও সভ্যতার ধারার ও চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে সুপরিচয়ে দুইয়ের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটাইবার অসাধারণ শক্তিতে। এই বইখানির নাম অগ্নিবীণা সার্থক হইয়াছে—এর কবিতাগুলি আগুনের শিখার মতন প্রোজ্জ্বল উচ্ছল লেলিহান, অথচ তাতে বীণার মতন বিচিত্র ছন্দে মধুর সুর বাজিয়াছে। এতে ১২টি নামজাদা কবিতা আছে—(১) প্রলয়োল্লাস, (২) বিদ্রোহী, (৩) রক্তাম্বরধারিণী-মা, (৪) আগমনী, (৫) ধূমকেতু, (৬) কামাল পাশা, (৭) আনোয়ার, (৮) রণভেরী, (৯) শাত্-ইল্-আরব, (১০) খেয়াপারের তরণী, (১১) কোরবানী, (১২) মোহর্‌রম। এই বইখানির বাহ্যসৌষ্ঠবও সুন্দর হইয়াছে। পাঠকেরা ইহা দেখিয়া ও পড়িয়া নিশ্চয় প্রীত হইবেন।

পথের সহায়—শ্রী পঞ্চানন রায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, পোষ্টাফিস নাটুদা, জেলা নদীয়া। পাঁচ আনা।

চটি, পদ্যের বই। পরলোক-যাত্রীর পথের সহায় স্বরূপ গুরু গঙ্গা সৎসঙ্গ সংযম প্রভৃতি বিষয়ের উপদেশ ও বন্দনা মামুলি পদ্যে লেখা।

নিবন্ধ -১ম খণ্ড—চন্দননগর সারস্বত-সম্মেলন, বসন্ত-কুটীর গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। বার্ষিক দ্বাদশ খণ্ডের মূল্য ১।০, প্রতি খণ্ড দু আনা। প্রতিখণ্ড স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

প্রতিমাসে প্রকাশিতব্য বিবিধ বিষয়ের রচনা-সমষ্টির স্বয়ং-সম্পূর্ণ পুস্তিকা। এই খণ্ডে "আমাদের অন্ধতার একটা দিক"—"সমুদ্র-যাত্রায় জাতিনাশ কুসংস্কারের আলোচনা," "পৌরোহিত্য" "যে উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে তারই আলোচনা," "গুপ্তহত্যার ইতিহাস", "দেশভক্তির প্রতিযোগিতা" নিবন্ধে ভারতভক্ত ও ইংলণ্ডভক্তের প্রতিযোগিতায় উভয়ের কর্ত্তব্যের আলোচনা, "স্ত্রীজাতি ও ভারত" নিবন্ধে স্ত্রীজাতিকে অবনত করিয়া সহধর্ম্মিণী না করাতে ভারতের অধঃপতনের কারণ আলোচনা, "পাশবিকতা ও আধ্যাত্মিকতা", "অবতার" নিবন্ধে অবতারের স্বরূপ নির্ণয় ও আমাদের দেশে অবতারবাহুল্য সম্বন্ধে আলোচনা, "অধ্যাত্মিক সাধনা", এবং "দান" নামে একটি ছন্দ-মিল-যতি-ভাব-রস-কবিত্ব-সর্ব্ববালাই-বর্জ্জিত পদ্য আছে, সেটির লেখক শ্রী ননিলাল দে।

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়—শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত, অল্ ইণ্ডিয়া পাব্লিশিং কোম্পানী লিমিটেড্, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭২ পৃষ্ঠা; ১১ খানি ছবি। দশ আনা।

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকার বন-নদী-মরুভূমি হিংস্র জন্তুর বাথান। সেই দেশে ভ্রমণের উত্তেজক-ঘটনাপূর্ণ কাহিনী এই পুস্তকে পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে ভাষায় সরস করিয়া বলা হইয়াছে। বালক-বালিকারা এই বই আনন্দ ও কৌতূহলের সহিত পাঠ করিবে। এই কাহিনী প্রবাসীতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং এর অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

মানব-মুকুট—শ্রী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত। ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স্ এণ্ড পাব্লিশার্স্ লিমিটেড্, ৪০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চার আনা।

হজ্‌রত মহম্মদের জীবন ও চরিত্রের পরিচয়। লেখকের ভাষা ভালো, রচনা-রীতি উত্তম। লেখক হজ্‌রত মহম্মদের সত্যসন্ধ মানব-হিতৈষণা ও ধর্ম্মসাধনার পরিষ্কার পরিচয় দিয়া দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যের ন্যায় মহম্মদও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভক্তি ও সম্মান লাভে অধিকারী, তিনি বাস্তবিকই মানব-মুকুট।

পল্লী-মঙ্গল—শ্রী অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এক টাকা; বাঁধাই পাঁচ সিকা।

ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান দেশ; ভারতের সমস্ত সভ্যতা ও জ্ঞান এই পল্লীকেন্দ্র হইতেই উদ্ভাবিত বিকশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে নগর এখন অগ্রণী হইয়া উঠিলেও ভারতে নগরের চেয়ে পল্লীর সংখ্যা বেশী, পল্লীবাসীর সংখ্যা বেশী। নগরের সুবিধা ও প্রলোভনের টানে পল্লীগুলি ক্রমশঃ জনবিরল ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া বাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এইসব পল্লীকে আবার স্বাস্থ্যকর ও সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আধার করিয়া নগরের গ্রাস ও শোষণ হইতে পল্লীকে বাঁচাইতে হইবে। এ বিষয়ে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। গত মাসের প্রবাসীতে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এই পল্লীমঙ্গল গ্রন্থে পল্লীর অভাব ও তার প্রতিকার ও সম্পূরণ করিবার উপায় ও প্রণালী বহু চিন্তাশীল বিশেষজ্ঞ লোকের রচনা ও লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কোনো স্থানে সভ্য মানুষের থাকিতে হইলে প্রধানতঃ তার আবশ্যক হয়—(১) উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ বাতাস, ঋতু অনুসারে উপযুক্ত পরিচ্ছদ; (২) স্বাস্থ্যরক্ষার সহায় চিকিৎসক ও ঔষধ; (৩) মনের খাদ্য শিক্ষা, জ্ঞান লাভের উপায় শিক্ষালয়, পুস্তকালয়, সভা সমিতি, বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের উপায়—যাত্রা পাঁচালী কথকতা, কীর্ত্তন, গান, উৎসব; (৪) অপর গ্রাম নগর জনপদের সঙ্গে বস্তু ও ভাবের আদান-প্রদানের উপায়—জলপথ, স্থলপথ, নৌকা গাড়ী, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, রেলওয়ে ইত্যাদি। প্রত্যেক গ্রাম যদি সভ্য মানবের একান্ত আবশ্যক এই চতুর্ব্বিধ সুবিধা জোগাইতে পারে তবে কেহ সহজে পল্লীর মুক্ত অঙ্ক ছাড়িয়া শহরের ঘেঁষাঘেঁষির দিকে ঘেঁষিতে চাহে না নিশ্চয়। যে কাজ একের অসাধ্য, সমবায় ও পঞ্চায়েতের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য হইতে পারে। সমবেত চেষ্টায় কেমন করিয়া গ্রামের সকল অভাব দূর করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা বিশদভাবে এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রামে থাকিয়াও কেমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা যায়; কেমন করিয়া নিজেরা চেষ্টা করিলে ও অপর কাহারও কাছে সাহায্য চাহিলে গ্রামের অভাব মোচন হইতে পারে; চাষের ও গোরুর উন্নতি কেমন করিয়া করা যায়; ঘরে আগুন লাগিলে, গ্রামে মড়ক হইলে কেমন ভাবে চলা দরকার; আকস্মিক বিপদে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত; গ্রামের প্রধান তিন শত্রু ম্যালেরিয়া কলেরা ও বসন্ত রোগ কি করিয়া প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায়; প্রসূতির মঙ্গলে ভাবী সমাজের মঙ্গল জানিয়া প্রসূতির কর্ত্তব্য কি; পশুচিকিৎসা; পথ্য প্রস্তুত; গভর্মেন্ট ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করিবার প্রণালী; ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁরা পল্লীতে বাস করেন, যাঁরা পল্লীতে থাকিতে চান, যাঁরা পল্লীর মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক, তাঁরা এই বই কিনিয়া পড়িলে ও পরামর্শদাতা সহচর করিয়া রাখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন ও অপরের উপকার করিতে পারিবেন। এই বইখানি ঠিক সময়োচিত হইয়াছে। দাম সস্তা।

মেয়েদের গীতা—শ্রী কুমুদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বেঙ্গল পাব্লিশিং হোম, কলিকাতা। ১৫১ পৃষ্ঠা। পাঁচ সিকা। বাঁধানো বইএর মূল্য দেড় টাকা।

মেয়েদের বোধগম্য করিবার জন্য গীতার তত্ত্ব গদ্যে আলোচিত ও অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু রচনার ভাষা অত্যন্ত ভারী ও কঠিন-শব্দবহুল হওয়াতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

ধর্ম্ম শ্রী শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন। আর্য্য পাব্লিশিং হাউস্, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট দ্বিতল, কলিকাতা। বারো আনা।

(১) আশ্রম প্রতিষ্ঠা, (২) ভারতের তপোবন, (৩) পৃথিবী দর্শনে ত্রিভাব ও ত্রিসঙ্কল্প, (৪) মানবজীবন—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম, (৫) মাতৃজাতি, (৬) উপসংহার—এই ছয় পরিচ্ছেদে ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব ও তার সাধনপন্থা আলোচিত হইয়াছে।

আলেয়ার আলো—শ্রী মণিলাল সেন, ১৬৬ নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা। দশ আনা।

কবিতার বই।

বশিষ্ঠের তপোবন, রাজা দিলীপের গো-চারণ, ইন্দ্র-রঘুর যুদ্ধ, রঘুর দিগ্বিজয়—শ্রী কিশোরীমোহন চৌধুরী সেন রচিত, ৪ নম্বর তেলকলঘাট রোড, হাওড়া। চিত্র ও উপহার সমন্বিত। মূল্যের সন্ধান পাইলাম না।

কালিদাসের কাব্য রঘুবংশের প্রতি সর্গের পদ্য অনুবাদ। অনুবাদক নিজে নিজের পরিচয় দিয়াছেন—"কবিত্ব সন্তোষিত-সর্ব্ব-কোবিদ"। আমরা কোবিদ নই, কাজেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। অনুবাদ উৎকট, ভাষা উদ্ভট, ছন্দ বিকট।

— মুদ্রারাক্ষস

বঙ্কিমচন্দ্র—(বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, যুগ ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনাগ্রন্থ) বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ও ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক শ্রী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন, এম্-এ, প্রণীত। প্রকাশক—শ্রী নগেন্দ্রকুমার রায়, ঢাকা। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৯।১ কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲, সিল্কের বাঁধাই, ২॥০ টাকা।

বাংলা ভাষায় এ শ্রেণীর গ্রন্থ খুব বেশি নাই। কোন বড় সাহিত্যিকের সম্বন্ধে যে দু-এক খানি গ্রন্থ আছে তাহা হয় নিছক্ জীবনী, নয় একেবারে সাহিত্য-সমালোচনা। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যেমন কোন বড় লেখকের জীবনকাহিনী, যুগ ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পর্য্যালোচনা ও তাঁহার রচনাবলী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত পুস্তক আছে—যেমন ইংরেজী ভাষায় English Men of Letters Series, Great Writers Series—সেরূপ পুস্তকাবলী বাংলা ভাষায় এখনো দেখা দেয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি এ শ্রেণীর একখানি পুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই বইখানি লেখার সময় পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছিল বা লেখা হইয়াছিল, গ্রন্থকর্ত্তা তৎসমুদয় পাঠ করিয়া ও তাহাদের প্রামাণিকত্ব ও মূল্য আলোচনা করিয়া এই পুস্তকে যথাস্থানে তাহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বাংলার এই সাহিত্যবীরের রচনাবলী পাঠে এই পুস্তক পাঠককে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু বিষয় একত্র একখানি বইতে পাওয়া দুর্লভ, অক্ষয়-বাবু এ বিষয়ে বাংলা ভাষার ও বঙ্কিমসাহিত্যের একটি অভাব দূর করিলেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। কলেজের অধ্যাপনা-শ্রেণীতে ইহার উৎপত্তি আর বিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাগিদের আবেষ্টনের ভাব এই গ্রন্থকে নিঃস্পৃহ জ্ঞানচর্চ্চার ও বিশুদ্ধ রসপিপাসার উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত করাতে ইহা উচ্চতর সাহিত্যলোকে উন্নীত হইতে পারে নাই। তাহাতেও তত ক্ষতি হইত না, যত ক্ষতি হইয়াছে ইহার দরুণ সামঞ্জস্যের অভাব ঘটাতে। গ্রন্থখানিতে সর্ব্বসমেত—১৬টি অধ্যায় আছে, তাহার মধ্যে পর পর দুইটি অধ্যায় 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে। বি-এ শ্রেণীতে 'কপালকুণ্ডলা' নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকায় সেই কথাগ্রন্থখানিকে কেন্দ্র করিয়াই লেখক ক্লাশে আলোচনা সুরু করিয়াছিলেন, সেইজন্য কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে এত বেশি আলোচনা পর পর দুইটি পরিচ্ছেদে জুটিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বহু নভেল, হয়ত এক এক পরিচ্ছেদেই সারা হইয়াছে, নয় ত বহু উপন্যাস একটি মাত্র অধ্যায়ে গাদাগাদি করিয়া শেষ করা হইয়াছে। ইহাতে আলোচনার মাত্রা-সমতা মোটেই রক্ষিত হইতে পারে নাই।

আর-একটি দোষ—লেখক নিজে রাজকর্ম্মচারী, বঙ্কিমের রাজনৈতিক মতামতের বিষয়ে তিনি এভাবে আলোচনা করিয়া দেশের শ্রেণীবিশেষের উপর কটাক্ষপাত না করিলেও পারিতেন। তাঁহার মতকে এসব বিষয়ে স্বাধীন মত বলিয়া গ্রহণ করা দুরূহ।

কিন্তু এ-সব দোষ সত্ত্বেও বইখানি বঙ্কিম-প্রতিভা আলোচনাকারীর সহায়তা করিবে ও বঙ্গসাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করিবে। একটি প্রমাণ-পঞ্জী ও অন্যান্য বিবরণ-পঞ্জী (bibliography) থাকিলে বড় ভাল হইত।

অ

কুমারী—শ্রী জিতেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

কুমারী প্রণয়িনী কর্তৃক প্রণয়ী ও ভাবী-স্বামীর প্রেমপরীক্ষার আখ্যান। জীবনে বিনা অভিজ্ঞতায় ও সামান্য শিক্ষায় ও অল্প মূলধনে কেমন করে' ব্যবসা করা চলে মাড়োয়ারীরা তার নমুনা দিয়েছেন এবং ঐ-সব বস্তুযোগে কেমন করে' যা-তা লেখ্‌বার ও ছাপাবার কার্‌বার চলে এই বইখানি তার প্রকৃষ্ট নমুনা। গ্রন্থের ভাষা ও আখ্যানবস্তু দেখে এটা কোন বিদেশী বইয়ের তর্জ্জমা বলে' মনে হয়, যদিও গ্রন্থকার কোথাও সে কথার উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এ বই স্বদেশী বা বিদেশী কোন সমাজেরই কুমারী-জীবনের চিত্র নয়। একদিন ছিল বাঙ্গালী-সমাজে যা কিছু অসম্ভব মনে হত রাজপুতানার গল্প বলে' চালান হত; সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ এই-রকম একটা বেওয়ারিশ জিনিস বলে' অনেকেরই ভুল ধারণা হয়েছে—গ্রন্থকার তাঁদের অন্যতম। গ্রন্থের আদিতে তিনি গীতার শ্লোক উদ্ধার করেছেন, কিন্তু যদি তাঁর হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তাঁকে দিয়ে একার্য্য করিয়ে থাকেন তবে তিনি গর্হিত কার্য্য করেছেন। গ্রন্থশেষে একটি ছোট গল্প আছে নাম "স্বাধীনা"—সেটি নেহাৎ বাজে।

সুহাস—শ্রী চরণদাস ঘোষ প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। মূল্য ১॥০।

মণ্টুর মা—শ্রী চরণদাস ঘোষ প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ॥০।

জানি না কি কুক্ষণেই গ্রন্থকারের "সাহিত্যিক জীবনের আন্তরিক বন্ধু ও অভিভাবকেরা" এঁকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহ এবং এঁর "রঙ্গীন বুকের কৃতজ্ঞতা" প্রকাশ্যে জানাবার অবকাশ দিয়েছেন। সুহাস বই-খানির নিবেদন পড়্‌লেই গ্রন্থকারের রচনা ও চিন্তাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়:- "ভারতীর শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক বলেছিলেন, 'একটা কথা বল্‌বো—কখনো নিরুৎসাহ হবেন না। নাই বা কেউ উৎসাহ দিলেন, নিজের অন্তর থেকে আপনার উৎসাহ উৎসারিত কর্‌তে হবে!' কথাটা তখন ভাল করে' বুঝ্‌তে না পার্‌লেও, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি, বুঝ্‌ছি—এতে আর-কিছু না-হোক, লোক হাসাবার ভারি ক্ষমতা বাড়ে। সত্যি-মিছে এই পাতা কথানাই প্রমাণ করে' দেবে। তাই বোলে নিছক হেসে উঠ্‌লেই আপনাদের চল্‌বে না! প্রভাতের উন্মেষ বিশ্বকে ফর্সা কর্‌বার জন্যেই, আঁধারের আলিঙ্গন থেকে ধরিত্রীকে মুক্ত করবে বলেই—এ প্রকৃতির এক প্রকার শোভন স্পর্শ! এমনি ধারাই কুয়াশাচ্ছন্ন ধূলিধূসরিত আমার সুহাসের ওপর প্রভাত-প্রকৃতির স্পর্শের মত ঝরঝর কোরে আপনাদের আশীর্ব্বাদ ঝরে' পড়ুক!"

এর মানে কি! বীরবল এককালে মলাট-সমালোচনা করে' সাহিত্যের অনেক উপকার করেছিলেন; ভূমিকা ও নিবেদন সমালোচনার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে আশা করি কিছু ফল হবে।

'দীন দরিদ্র ভিখারী বিনীত গ্রন্থকার' যে নিজের শক্তিহীন রচনা ও শক্তিশালী গ্রন্থকারের (যথা শরৎচন্দ্রের) কোন কোন গল্প হুবহু নকল করে' অথচ তার বিশেষত্ব নষ্ট করে' নাম বদ্‌লে আমাদের পড়্‌তে দিয়েছেন 'এ এক প্রকার' অন্যায় নয় কি? বাকি গল্পগুলি বিশেষত্ববর্জ্জিত মান্ধাতার আমলের চর্ব্বিতচর্ব্বণ। সব চেয়ে অদ্ভুত এঁর situations ও ভাষা—"মেয়েটি অমলের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া একেবারে অপদার্থ হইয়া পড়িল......ভাবিতে লাগিল অমলের সেই ডবডবে মুখখানি।" "চোখের জলের বড় দাপাদাপি" ইত্যাদি।

নূতন সন্ন্যাস—শ্রী কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১।০।

প্রায় আড়াই শ পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ উপন্যাসে বিশেষ কোন প্লট নেই, চরিত্র-সৃষ্টির কোন লক্ষণ নেই, আছে শুধু স্থানে অস্থানে সস্তা humour বা রসিকতা। প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী দুজন গ্রাম্য বালক ভালবাসায় পড়ে' সন্ন্যাসী হল ও আবার ঘরে ফিরে এল। এ গল্প লেখবার উদ্দেশ্য কি বুঝ্‌লুম না, মনে হয় গ্রন্থকার বর্ত্তমান উপন্যাস-রচনারীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন, এবং যদি তাই হয় তবে তাঁর চেষ্টা কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে, নতুবা আবর্জ্জনার ঝুড়িতে এর স্থান হওয়া উচিত।

পুণ্যচিত্র—শ্রী রসিকচন্দ্র বসু প্রণীত। মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ১৲ টাকা।

কয়েকটি কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে এই চিত্রাবলী অঙ্কিত হয়েছে। রূপ, সনাতন, ঈশা খাঁ ও মীরা বাঈ এই গল্পতিনটি আমাদের বিশেষ ভাল লেগেছে। গ্রন্থকারের ভাষা বেশ সরল, কোথাও অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নেই, ভাবের জটিলতা নেই, তাঁর রচনা-পারিপাট্য প্রশংসার্হ। পুণ্যচিত্রে খনা ও মিহিরের আখ্যান যে কেন স্থান পেয়েছে তা বোঝা যায় না, অবশ্য কাহিনীটি সুলিখিত।

পথস্মৃতি—শ্রী সুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

চবৈতুহির সমষ্টি। আহা, উঃ, হায় হায় দিয়ে প্রায় একশ পাতার কেতাব কেমন করে' লেখা যায় তার এক অদ্ভুত নমুনা! 'কি যে বল্‌তে চাই অথচ বল্‌তে পারি না' লেখকের একথার সার্থকতা তাঁর এই কেতাবেই মিল্‌বে; কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় এই যে, সমস্ত বই হাত্‌ড়ে তাঁর বলার মত কোন কথার আভাসও পেলাম না। তিনি এত ব্যস্ত না হয়ে, ডায়েরীর টুকরো উচ্ছ্বাসগুলো না ছাপিয়ে আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌লে হয়ত বলার মত কথা ও বল্‌তে পার্‌বার শক্তি দুইই লাভ কর্‌তেন।

আনন্দসুন্দর ঠাকুর

রামদাস স্বামী—শ্রী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত, সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৫৯। মূল্য ৷৵০।

রামদাস স্বামী—শিবাজীর গুরু। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা—অধ্যাপক শ্রী অনিলবরণ রায় প্রণীত। ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৪৫। মূল্য ।০।

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়:—শিক্ষার প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট ও লোক-শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, ভারতীয় আদর্শ, শিক্ষার যন্ত্র, বিদ্যালয় ইত্যাদি।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বিপথা—শ্রী যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, সামাজিক উপন্যাস, ২৭।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ মাত্র। বাঁধান ও ছাপা খারাপ নয়।

উপন্যাসের প্লট একেবারে বাজে, তাহার মধ্যে না আছে ভাষার বাঁধন, না আছে ভাবের সামঞ্জস্য। গল্পের মধ্যে অত বেশী খাসিয়া ভাষার বিদ্যা প্রকাশ না করিলেও বোধ হয় চলিত—ইহাতে উপন্যাসের সৌষ্ঠববৃদ্ধি একটুও হয় নাই। বইএর ছবির কথা বেশী না বলাই ভাল, ছবিগুলি না ইংরেজী না বাংলা ধরণের। বটতলার ছাপা উপন্যাসে এ ছবিগুলি মানাইত মন্দ নয়। ছবিগুলি একেবারে জঘন্য, তাহার মধ্যে সুরুচির গন্ধ বিন্দুমাত্র পাওয়া দুষ্কর। উপন্যাসের প্লট বড় বেশী, অদ্ভুত হইয়া পড়িয়াছে; অনেক স্থানে বিষম আজগুবি কল্পনার বেশ পরিচয় আছে।

প্রণয়ে দীর্ঘনিশ্বাস—শ্রী সতীশকুমার আইচ রায় প্রণীত।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ। দাম ॥৵০, কাপড়ে বাঁধাই এক টাকা।

অসহ্য ন্যাকামি। এরকম বই লোকে পয়সা খরচ করিয়া কেন ছাপায় জানি না। পয়সার দ্বারা দেশের আরো অনেক হিতকর কার্য্য হইতে পারে। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"এর নকল করিতে গিয়া, উক্ত কেতাবকে মুখ ভ্যাংচানো হইয়াছে। ভাষার এমন কিম্ভূতকিমাকার জোড়া-তাড়া কোথাও দেখি নাই। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে লেখক বলিতেছেন "আমি পাগল"। অতি খাঁটি কথা বলিয়াছেন। সমস্ত বইএর মধ্যে ঐ একটি সত্য কথা।

খেলাঘর—শ্রী যামিনীকান্ত সোম, ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। এক টাকা।

হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন্ রচিত A Doll's Houseএর ভাবে লেখা। বইখানি মোটের উপর আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। অনেকে পড়িয়া উপকারও পাইতে পারেন। অনুবাদের গন্ধও একেবারে নাই বলিলেও হয়। ছাপা, কাগজ ইত্যাদি বেশ ভাল, তবে দাম আরো কম করিলে অনেকেই কিনিতে পারে। ৮৯ পাতার বই ১৲ দিয়া কেনা সকলের সাধ্য নয়। "প্রায় চার বছর আগে এইটি 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল।"

ভাগ্য-নিরূপিতা—শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ বসু। প্রাপ্তিস্থান—রায় এণ্ড্ রায় চৌধুরী, ২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

বইখানি আগাগোড়াই পড়িয়াছি। প্রথম দিক্‌টায় একটু কেমন যেন লাগিতেছিল—কিন্তু কয়েক পরিচ্ছেদের পরেই প্লট বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। প্রথম চেষ্টার ফল খুবই ভাল হইয়াছে। বইখানিকে সামাজিক উপন্যাস বলা চলে। পতিতা রমণী 'সোনালী'র চরিত্র লেখক বড় সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। উপন্যাসখানি পড়িতে পড়িতে সোনালীর দুঃখে বোধহয় প্রত্যেক পাঠকেরই মন ব্যথিত হইয়া উঠিবে। মোহিত উপন্যাসের নায়ক হইলেও সোনালীর চরিত্রই পাঠকের মনকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। নারী যে নারী, সে হাজার পাপে পাপী হইলেও তাহার অন্তর-দেবতা যে একেবারে মরিয়া যায় না, ভালবাসার পাত্রের জন্য যে সে তাহার ইহকালের সমস্তই ত্যাগ করিতে পারে, পতিতা নারী 'সোনালী'র জীবনে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য চরিত্রগুলিও বেশ পরিষ্কার। কোথাও ফেনানো ভাবাধিক্য নাই বলিয়া বইখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। ভুলচুক দু-একটা আছে, তাহা মারাত্মক নয়। ছাপা বাঁধাই এক-রকম বেশ হইয়াছে।

মশার যুদ্ধ—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক কুলজা লাইব্রেরী, পোঃ কলাউড়া, শ্রীহট্ট। এজেন্ট্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, কলিকাতা।

ছোট একটি হেঁয়ালী-গল্পের ধাঁচাতে মশা মারিবার উপায় বলা হইয়াছে। মন্দ হয় নাই। পড়িলে অনেকে নূতন কিছু শিখিতে পারিবেন।

গ্রন্থকীট

স্রক্—শ্রী মুকুন্দনাথ ঘোষ, বি-এল প্রণীত। রাজসাহী। দাম ছয় আনা।

গানের বই—আগাগোড়াই কৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন।

গুপ্ত

অষ্ট্রেলিয়ার নারী

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা আজকাল অনেক পরিমাণে শ্বেত-সভ্যতার আলোক পাইতেছে। যাহারা শ্বেতমনুষ্য-অধ্যুষিত স্থানের কাছাকাছি বাস করে, তাহারা মদ খাওয়া এবং আরো অনেক প্রকারের সভ্য-অসভ্যতায় পাকা হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের জাত-ভাই -যাহারা এখনো শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা হইতে বহুদূরে বাস করে তাহারা বরং অনেক পরিমাণে ভাল আছে, কারণ তাহারা অসভ্যতার দোষ ছাড়া সভ্যতার দোষগুলিও অভ্যাস করে নাই এবং নিজেদের অসভ্য সারল্যও পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা পুরাপুরিই অসভ্য আছে।

দু-একজন লেখক বলিয়াছেন অষ্ট্রেলিয়ার নারীর শরীরের গড়ন বড়ই চমৎকার, তাহাদের শরীর একেবারে নিখুঁত করিয়া তৈয়ারী। কিন্তু এই প্রকারের গড়ন-ওয়ালা নারী খুব কম দেখা যায়। পূর্ব্বে হয়ত অনেক বেশী দেখা যাইত, কিন্তু পুরুষদের মধ্যে নারীর রূপের প্রতি অমনোযোগিতা বা স্ত্রীলোকদের নিজেদের অতিরিক্ত পরিশ্রম, যে জন্যই হউক, নারীদের চেহারাতে লাবণ্য এবং রূপ খুব কচিৎ দেখা যায়। নারীদের শরীরের লাবণ্য ছেলেবেলাতেই লোপ পায়। তাহারা শরীর এবং মনে পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নারীরা লম্বায় গড়ে পাঁচ ফুট, তাহাদের চুল সাধারণত কালো এবং অনেক ক্ষেত্রে ধূসরও দেখা যায়। চুল রেশমের মত পাতলাও হয়, জট-পাকানও হয়। অন্যান্য অঙ্গে নারীরা পুরুষের মতই, তবে চোখের উপরে পুরুষের মত অত উঁচু হাড় নাই। তাহাদের চোখ দেখিতে খুব খারাপ নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের চোখকে বেশ সুন্দর বলাও চলে।

সমস্ত দ্বীপের নারীদের নানা রকমের পোষাক পরিচ্ছদ

আছে এবং নারীরা নানারকমের বিচিত্র গহনা ব্যবহার করে। তাহার মধ্যে কয়েকপ্রকারের উল্লেখ করিব। দক্ষিণ অঞ্চলে একটু শীত বেশী বলিয়া লোকে ক্যাঙ্গারু-চাম্ড়ার তৈরী একরকমের লম্বা জামা ব্যবহার করিত। কিন্তু শেষে ঐখানের লোকেরা তাহার পরিবর্ত্তে কম্বল ব্যবহার আরম্ভ করে, কেননা ঐ জামায় যথেষ্ট পরিমাণে শীত নিবারণ হইত না। বিলাতী ফ্যাশানের হাতে পড়িয়া তাহাদের নিজত্ব প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা লজ্জা নিবারণের জন্যই সামান্য মাত্র আচ্ছাদন ব্যবহার করে—যদিও তাহাদের লজ্জার পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের সহিত মতের অমিল বহুল পরিমাণে হইবে। একবার একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক একটি উলঙ্গ নারীর কোমরে একখানি কাপড় জড়াইয়া দেন। তাহাতে সে বেচারী নড়িতে-চড়িতে এত কষ্ট বোধ করিতে লাগিল যে শেষে ভদ্রলোককে বাধ্য হইয়া সেই কাপড়খানি খুলিয়া লইতে হইল। বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বেচারী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নববিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়েরা কোমরে একটা লম্বা লোমওয়ালা পেটি পরিয়া থাকে। অনেক সময় একটু বিশেষ সাজসজ্জা করিবার ইচ্ছা হইলে মেয়েরা হাতে এবং গলায় লতা পাতা হাড়ের বা ঝিনুকের নানা-প্রকার গহনা ঝুলায়। মাথাকেও তাহারা নিরাভরণ করিয়া রাখে না। ঝাপটার মত এক-প্রকার গহনা মাথায় পরে। নাকে এক-প্রকার হাড় নাক-ছাবির বদলে ব্যবহার করে। উৎসব-কালে এই হাড়ের বদলে এক-রকম সবুজ লতার নথ মেয়েরা বেশ আড়ম্বর করিয়া পরে। চাপ চাপ জমানো আঠা বা কুকুরের দাঁত মাথায় এবং পেটে অনেক ঝুলাইয়া রাখে। পুরুষেরা নকল গোঁপ পরে। ফুল এবং পাখীর পালকের তৈরী আরো নানাবিধ অলঙ্কার তাহারা পরে। চর্ব্বির পালিশ-দেওয়া চামড়া বস্ত্র-রূপে ব্যবহৃত হয়।

শিশুরা কোথা হইতে জগতে আসে, এই প্রশ্ন অসভ্যদের কাছে বড় কঠিন। নানা-রকম অর্থ দ্বারা তাহারা এই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চেষ্টা করে। নিউ সাউথওয়েল্‌সের উত্তর প্রদেশের নারান নদীর পাশের আদিমকালের লোকেরা বলে যে, কন্যা-শিশুর পৃথিবীতে আগমন চন্দ্রদেবের সাহায্য বিনা হইতে পারে না। তবে সময় সময় কাকও নাকি একটু আধটু সাহায্য করিয়া থাকে। অনেক সময় কোন বালক যদি কোন বালিকার সঙ্গে ঝগড়া করে তবে সে তাহাকে এই বলিয়া গালি দেয় যে "তোমাকে একটা গিরগিটি তৈয়ারী করিয়াছে।" যে-সমস্ত নারীরা কাকের তৈরী, তাহারা নাকি ভয়ানক ঝগড়াটে হয়, এবং কোন পুরুষ তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া পারে না, পুরুষকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হয়।

উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য নারী—নাকের অদ্ভুত গহনা লক্ষ্য করিবার জিনিস

কুলগোয়া নদীর পাশের কোন কোন স্থানের লোকদের বিশ্বাস যে বাহ্‌লু বা চন্দ্রদেব জগতের সমস্ত নারীদের সৃষ্টির কারণ। একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর তাঁহার মেয়ে তৈয়ারীর কারখানা আছে। সেই পাথরখানা অনাবৃষ্টির সময় একটা বিশেষ গর্ত্তের একেবারে তলায় পড়িয়া থাকে—বর্ষাকালে যখন সমস্ত খাল বিল গহ্বর জলে ভরিয়া উঠে তখন সেই পাথরখানা ঠিক জলের উপর ভাসিয়া উঠে। চন্দ্রদেবের কাজ শেষ

উরকি জাতির নারী—বুকের দাগ দেখুন

যমজ শিশুর মাতার বড় বেশী দোষ নাই। তাহার সমস্ত দুঃখের জন্য দায়ী জন্মদেবতা। সে কুলাবা গাছে সন্তান টাঙ্গাইয়া রাখে এবং অসহায় নারীকে এমনি করিয়া বিপদে ফেলে। যমজ সন্তানের মধ্যে যেটি প্রথমে হয় তাহাকে চিরকাল সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। প্রত্যেক মাতার জন্য নূতন করিয়া সন্তান তৈয়ারী হয়। যে-সব শিশু খুব কম বয়সে মারা যায় তাহারা ইচ্ছা করিলে আবার জন্ম লইতে পারে। পূর্ব্ব মাতাকে ভাল লাগিলে তাহার কাছেই যাইতে পারে, ভাল না লাগিলে অন্য কাহারো কাছে যাইতে পারে।

কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডের উত্তরে যে-সব

হইলে পর তিনি মেয়েটিকে জন্মদেবতা ওয়াড্ডাগুড্‌-জ্যাল্‌ওয়ানের (Waddagudjaelwon) হাতে সমর্পণ করেন। এই দেবতা মেয়েটিকে কোন একটা গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া রাখেন। তার পর যখন কোন বয়স্কা নারী সেই গাছের তলা দিয়া যায়, তখন জন্মদেবতা ঝুপ্‌ করিয়া তাহার কোলে ঐ শিশু কন্যাকে ফেলিয়া দেন। তার পর যদি ঐ শিশু পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তবে তাহাকে একজন সংসারী পিতা জোগাড় করিয়া লইতে হয়। যে-সব শিশুর জন্মের জন্য চন্দ্রদেব দায়ী, তাহারা বেশ বড় বড় দাঁত লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

যমজ সন্তান হইলে তাহারও নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আছে। কোন নারী যদি যমজ সন্তানের মাতা হয়, তবে তাহার বড় বেশী আদর হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই তাহাকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। পিতা বলে যে সে একটি সন্তানের জন্য দায়ী। তবে

অসভ্যজাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে ছেলে হওয়া সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প আছে। এক জাতি বলে যে কোন নারী যদি তার উনানের আগুনের দিকে পিঠ দিয়া বসে তবে তাহার সন্তান হয়। আর একদল বলে কোলা ব্যাঙ্‌ ধরিলে ছেলে হয়। আবার কেউ কেউ বলে যে যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে বলে "তোমার সন্তান হইবে" তবে তাহার সন্তান হইবেই।

অষ্ট্রেলিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সন্তান হওয়া সম্বন্ধে এই-রকম নানা-প্রকার গল্প চলিত আছে। সব গল্পগুলি বলিতে গেলে স্থানে কুলাইবে না, তাই মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিলাম।

সন্তান হইবার পূর্ব্বেই ভাবী মাতাকে গ্রাম হইতে দূরে রাখা হয়। গ্রামের কাছে থাকিলে সন্তানের এবং তাহার মাতার অকল্যাণ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কোন কোন জাতি নবপ্রসূতিকে মাত্র কয়েকঘণ্টা গ্রামের বাহিরে রাখে; আবার কোন কোন

জাতি আট দশ দিনও বাহিরে রাখে। নারান্ নদীর পাশের দেশবাসীদের সন্তান হইলে পর তাহার নাক চ্যাপ্টা করিবার জন্য একরকমের আঠা নাকে লাগাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদের সন্তানেরা মায়ের পেটে আসিবার পূর্ব্বে গাছের ডালে ঝুলিতে থাকে, তাই জন্ম হইবার সময়েও তাহাদের মুখে ঐ বিশেষ বৃক্ষের একটি পাতা থাকে। জন্ম হইবামাত্র এই পাতাটা মুখ হইতে বাহির করিয়া না ফেলিলে সন্তান নাকি আবার শূন্যে মিশিয়া যায়। কোন কোন জাতির সন্তান হইবামাত্র তাহার গায়ে বেশ করিয়া বালি ঘসিয়া দেওয়া হয়। কোন জাতি আবার সন্তানের দেহে এক প্রকার চর্ব্বি লেপিয়া দেয়। কেহ বা সন্তানের মাথায় ছাই মাখাইয়া দেয়।

সন্তানের জন্ম হইলে পিতা একজন দূতের দ্বারা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করে। তখন তাহারা সকলে সন্তানকে জামা ছুরী এবং অন্যান্য আরো অনেক কিছুই উপহার দেয়। অষ্ট্রেলিয়ার মধ্য-প্রদেশের অসভ্যজাতির সন্তান হইলে, সন্তানের পিতা ঠাকুরদাদা মাতামহ এবং আরো দু-এক জন নিকট পুরুষ আত্মীয়কে কোন কথা না বলিয়া মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। সন্তানের মাতা আসিয়া সন্তানের পিতাকে সন্তান দেখাইবার পূর্ব্বে পিতা কথা বলিলে সন্তানের জীবন অমঙ্গলে পূর্ণ হয়। এক মাতার ছয় সাতটি সন্তান হইতে পারে, কিন্তু মাতা দুইটির বেশী সন্তানকে অনেক ক্ষেত্রেই পালন করে না। অনেক সময় তাহারা সন্তানদের সোজাসুজি হত্যা করে। অনেক স্থলে মৃত সন্তানের দেহ তাহার ভাই-বোনেরাই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে করিবেন, না যে এই অসভ্যজাতির সন্তানের প্রতি কোন মমতাই নাই। সন্তানের মাতা অনেক সময় নিজে কিছু না খাইয়াও সন্তানের প্রাণ রক্ষা করে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মাতাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মাতাকে দায়ী থাকিতে হয়। সন্তান ঘুমাইবার সময় মা তাহার পাহারায় থাকে। সন্তানের মুখ সব সময় বন্ধ রাখিতে হয়, কারণ মুখ খোলা থাকিলে ডাইনের মন্ত্র ছেলের পেটে প্রবেশ করিয়া তাহার অনিষ্ট করিতে পারে। কাক ইত্যাদি পক্ষী দেখিলে সন্তানের মাতারা বড় সাবধান হয়, কারণ এই-সব পক্ষীরা সব সময় মনুষ্য-সন্তানের অমঙ্গল-চেষ্টাতেই আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। ইহা ছাড়া ইহাদের আকাশে উড়িবার আর কোনই কারণ নাই।

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের নাচ

নৌকার মত দেখিতে একরকম জলপাত্রে খুব ছোট ছেলেদের বহন করা হয়। তাহারা আর-একটু বড় হইলে মায়ের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়ায়। অনেক ছেলে মায়ের চুল ধরিয়াও ঝোলে। অনেকে ছেলেকে পিঠের সঙ্গে একটা মাদুর জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখে। ছেলে ঘুম পাড়াইবার বিশেষ কোন ছড়া নাই। তবে মায়েরা অনেক সময় একটা বিশেষ শব্দ করে, তাহাতে ছেলেরা বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমাইয়া পড়ে। ছেলেকে ভয় দেখাইবার জন্য মাতা অনেক সময় নানা-প্রকার

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের ঝগড়া

নাকের সাম্‌নে ঝুলান হাড়টাতে নাকের মধ্যে বদ্‌গন্ধ আস্‌তে দেয় না।" এই বলিয়া সে তাহার নিজের দুই কান টানিয়া কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। তাহারা বেশ চটপট্‌ এই-রকম সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে।

মেয়েরা খুব কম বয়সেই সকল কাজে মাকে সাহায্য করিতে শিখে। বনে বনে খাদ্যের সন্ধানে ঘোরা, ফল-মূল বাছা, ছোট ছোট গিরগিটি ধরা ইত্যাদি কাজ তাহারা খুব কম বয়সেই করিতে পারে। অনেক জাতির মেয়েরা বেশ মাছ ধরিতে পারে।

অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে। ছেলে শাসন করিবার আর-একটি উপায় আছে, তাহার নাকে ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরাইয়া উপরের দিকে টানা। ছেলেরা খুব বেশী বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ খায়। দুধ ছাড়াইবার পর সন্তানদের মধু, ক্যাঙ্গারুর মাংস ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের নানা-প্রকার অঙ্গচ্ছেদ করিবার প্রথা আছে। কারো একটা আঙুলের ডগা কাটিয়া দেওয়া হয়, কারো বা সাম্‌নের একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কারো বা নাকের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া একটা পালক বা হাড় চালাইয়া দেওয়া হয়। একবার একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে একজন অসভ্য মেয়ের নাকে লম্বা হাড় ফুটান দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। অসভ্য মেয়ে খানিকক্ষণ শ্বেতাঙ্গ মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইয়া বলে—তোমরা কান ছেঁদা কর কেন? ঐ-রকম কর্‌লে কান বড় হয়ে যায়, কুকুরের কানের মত। নাকের হাড় শক্ত, নাকের হাড় ছেঁদা কর্‌লে ভাল গান গাওয়া যায়।

সংসারের কাজ—একজন স্ত্রীলোক বীচি গুঁড়া করিতেছে, আর একজন শস্য হইতে ধুলা উড়াইতেছে

এই অসভ্য দেশের ছেলে-মেয়েরাও সভ্য দেশের ছেলে-মেয়েদের মত খেলা করে। তাহারা সকল সময় কেবল কাজেই ব্যস্ত থাকে না। অনেকস্থানে একটা বেত চিরিয়া পুতুল তৈরী করা হয়। এই দেশের লোকেরা যেমন নিজের কাপড়-চোপড়ের কোন ধারই প্রায় ধারে না তাহাদের পুতুলেরাও তেমনি। তবু অনেকে পুতুলের

কোমরে গাছের ছাল জড়াইয়া দেয়। বয়স্কা মেয়েরাও মাঝে মাঝে নানা-প্রকার খেলা খেলে।

মেয়েদের খেলার দিন খুব তাড়া-তাড়ি চলিয়া যায়—তাহার পর তাহাদের বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়। অনেক সময় মেয়ের জন্মের দু-একদিন পরেই তাহার মাথায় পালকের মুকুট পরাইয়া তাহাকে বাগ্‌দত্তা করিয়া রাখা হয়। বাগ্‌দত্তা করিবার বিশেষ হাঙ্গামা নাই। বাগ্‌দত্ত যুবক পতি, তাহার ভাবী স্ত্রীর মাথার পালক হইতে কয়েকটা পালক খুলিয়া নিজের মাথায় পরে এবং দুদিনের কন্যার কানে কানে বলে—"তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি খুব তাড়াতাড়ি বছর চোদ্দ পরেই তোমায় পাকাপাকি বিবাহ করিব।"

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদের আনন্দের ভোজ—আধপোড়া মাছ খাইতেছে
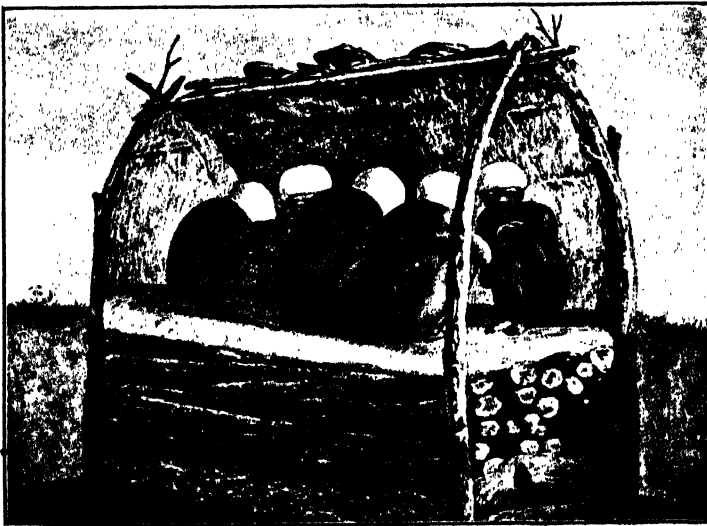
মৃত স্বামীর কবরের উপর বসিয়া বিধবা স্ত্রীরা শোক করিতেছে—মাথায় প্লাষ্টারের টুপী

বিবাহের পূর্ব্বে একজন বয়স্কা নারী কন্যার সমস্ত পায়ে কাদা মাখাইয়া গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়, সেখানে খড়কুটার আগুন জ্বালাইয়া কন্যাকে সেই ধূমপান করানো হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার উপদেশ বর্ষণ করা হয়। তার পর উপযুক্ত পরিমাণ ধূমপান এবং উপদেশ-বর্ষণ হইলে পর কন্যা গ্রামের মধ্যে তাহার ভাবী স্বামীকে দেখিতে যায়। স্বামী তাহার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কন্যা তখন তাহার গায়ে পাথর ছুড়িতে থাকে, এবং কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বেশ করিয়া ঝাঁকানি দিয়া দৌড়াইয়া তাহার ধূমপানের স্থানে ফিরিয়া যায়। ইহার কিছু পরেই কন্যা বিবাহিত হইবার জন্য গ্রামের ভিতর আসে। তাহার পর কন্যাকে পিঠে উল্কি পরিতে হয়। কন্যা উপুড় হইয়া মাটিতে শোয়, একজন বয়স্কা নারী হাঁটু দিয়া তাহার মাথা চাপিয়া ধরে এবং একজন লোক হাতে শাঁখের ভাঙা ধারাল টুক্‌রা লইয়া তাহার পিঠে চাপিয়া বসে। তার পর তার পিঠে সেই ভাঙা শাঁক দিয়া সিকি ইঞ্চি গভীর এবং এক ইঞ্চি লম্বা করিয়া ফালি কাটা হয়। কন্যা প্রাণপণে চীৎকার করে। যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার এক ঘণ্টার কমে শেষ হয় না। তার পর তাহার স্বামী সর্ব্বাঙ্গে চর্ব্বি এবং এক-

রকম লাল রং মাখে—এবং ক্যাঙ্গারু-দাঁতের গহনা পরে। স্ত্রীর মাথায় পাখীর পালক পরাইয়া দেওয়া হয়। পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত কন্যাকে উপবাস করিতে হয়।

বাগ্‌দত্তা না হইয়াও স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়। মেয়ের ভাই বা বাবা তাহাকে অন্য কাহারো বোন বা কন্যার সহিত বদল করিয়া লইতে পারে। অনেক সময় জাতির মোড়লের আড্ডা হইতে মেয়ের স্বামী স্থির করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় কোন্ মেয়ে নিজের ইচ্ছাতে কোন পুরুষের কুঁড়েঘরে আগুন জ্বালিলে সেই পুরুষ আপনাকে ধন্য মনে করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। অনেক সময় কন্যাকে লইয়া অনেকে পলায়নও করে। ইহাতে সব সময় কন্যার মতের দরকার হয় না। অনেক সময় কোন যুবক তাহাকে জোর করিয়া একলা বা বন্ধুদের সাহায্যে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করে। কন্যাপক্ষের লোকেরা কন্যা-চোর যুবককে অনেক সময় সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার সহিত তুমুল যুদ্ধ করে। অনেক সময় কন্যা বেচারী মারা যায়। অনেক স্থলে বাগ্‌দত্ত পতির সহিত কন্যা-অপ-হরণকারী যুবককে লড়াই করিতে হয়। অনেক জাতির মধ্যে অপহরণকারীর শাস্তি খুব সহজেই হয়। সে তাহার ভগ্নীকে কন্যাপক্ষীয়দের দান করিলেই সব গোলমাল চুকিয়া যায়। তবে যদি কোন যুবক শাস্ত্রমতে যাহাকে বিবাহ করিতে পারে না এমন কোন কন্যাকে লইয়া পলায়ন করে, তবে তাহার রক্ষা নাই। কন্যাপক্ষীয় লোকেরা দুর্ব্বল হইলে যুদ্ধের সময় দর্শকেরা তাহাদের পক্ষ লয়। অনাচারী যুবক কোন-রকমেই পলাইতে পারে না।

অনেক জাতির মধ্যেই বরের, কন্যাকে লইয়া পলায়ন করাই বিবাহের একমাত্র উপায়। সমস্ত গ্রামের লোক-দের সাম্‌নে একজন যাদুকর ভাবী বর-কন্যা এবং কন্যার পিতামাতাকে মন্ত্রপূত করিয়া দেয়। তার পর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায়, তখন বর আসিয়া কন্যার অঙ্গে একটি লাঠি দিয়া আস্তে আঘাত করে। কন্যা যদি পলাইতে রাজি থাকে, তবে সে লাঠি ধরিয়া একবার হেঁচ্‌কা টান দেয়। তার পর দুইজনে গ্রাম হইতে বহুদূরে কোথাও পলায়ন করিয়া গোপনবাস করিতে থাকে। একটি সন্তান হইলে পর তাহারা আর কোন বিপদের ভয় না করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতে পারে। বর-কন্যার পলায়নের পর কন্যাপক্ষীয় সকলেই তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে এবং যদি তাহাতে সক্ষম হয়, তবে বর কন্যাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। অনেক সময় কন্যা যাহাতে আবার না পালায়, এইজন্য তাহার পায়ে বর্শার ফলক বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কন্যা-পক্ষের স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়দলের সহিতই বরকে, লড়াই করিতে হয়। এত করিয়াও বিবাহ পাকা হয় না, বরকে দ্বিতীয়বার কন্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়া কিছুদিন গোপনবাস করিতেই হয়।

লারাকিয়া জাতির নারী—পিঠের দাগ বিধবার চিহ্ন

অনেক সময় বাপ-মা জোর করিয়া কন্যার অমতে যে-কোন লোকের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেয়। কন্যা প্রথমে হয়ত খুব আপত্তি করে, কিন্তু বাবার গালাগালি এবং স্বামীর প্রহারের চোটেই তাহারা খুব শীঘ্রই পোষ মানিয়া যায় এবং বেশ মন দিয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম করে। একজন লোক দু-তিনটি স্ত্রী রাখিতে পারে।

তবে এরূপ ক্ষেত্রে তাহার গৃহ সকল সময় সপত্নী-কলহে মুখরিত হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার পুরুষেরা ২৫।৩০ বছর বয়স হইবার পূর্ব্বে প্রায় বিবাহ করে না। এই দেশে একটা বড় মজার ব্যাপার আছে। মজাটা অবশ্য আমাদের কাছেই। স্ত্রীর ৩৫ বছর বয়স হইলে পুরুষ ইচ্ছা করিলে তাহাকে অন্য কোন যুবকের বোনের সহিত বদল করিতে পারে। বয়স্কা নারীরাই যুবকদের বিবাহ-ব্যাপারের বিষয়ে অনেক কিছু উপদেশ দেয়। এইজন্য অনেক সময় যুবকদের প্রৌঢ়া স্ত্রী দেখা যায় এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী দেখা যায়। একজন লোক যতবার ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। সবচেয়ে বড় স্ত্রীর প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। অপর সবাইকে তাহার কথা মানিয়া চলিতে হয়। স্বামী যদি বয়সে ছোট হয়, তবে তাহাকেও সব সময় স্ত্রীর কাছে ভয়ে-ভয়ে থাকিতে হয়। যুবতী সপত্নীদেরও বড় কষ্টে থাকিতে হয়। তাহারা নিজের ইচ্ছামত সন্তানপালনও করিতে পারে না। সময় সময় তাহারা দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অন্য কোন লোকের সহিত স্বামীর ঘর ত্যাগ করিয়া যায়। প্রৌঢ়া পত্নীর মৃত্যুতেও অন্যান্য অল্পবয়স্কা স্ত্রীরা যেন একটু আরামের নিশ্বাস ছাড়িতে পায়।

স্ত্রী যে এক স্বামীর অধীনে চিরকাল বাস করিবে এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় স্ত্রী দেখিতে সুন্দরী (অসভ্য মতে) হইলে, তাহার ঘন ঘন স্বামী-পরিবর্ত্তন ঘটে। স্ত্রীরা অনেক সময় স্ব-ইচ্ছায় এক স্বামী ত্যাগ করে, কখনো বা তাহাকে জোর করিয়া অন্য কোন লোক লইয়া যায়। বাগ্‌দত্তা পত্নীকে তাহার ভাবী স্বামী সব সময় চোখে চোখে রাখে। যুবতী স্ত্রীর ভাগ্য আরো খারাপ। তাহাকে সকল সময় সকল স্থানে স্বামীর কথা-মত তাহার সঙ্গে চলিতে হয়। স্বামী যদি সামান্য কোন-রকমে স্ত্রীকে সন্দেহ করে, তবে তাহাকে নানা-প্রকারে শাস্তি দিয়া থাকে।

সুন্দরীদের অবস্থা বড় সুবিধার নয়। লোকে সব সময় তাহাকে লইয়া পলায়ন করিবার মতলব করে। এক-একজন আসিয়া সুন্দরীকে তাহার সঙ্গে পলাইতে বলে। সুন্দরী যদি রাজি না হয়, তবে সেই ব্যক্তি সুন্দরীকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। এই-রকমে এক-জনের পর একজন আসিয়া আঘাতের পর আঘাতে সুন্দরীর অবস্থা বড়ই বিপন্ন করিয়া তোলে।

স্ত্রীর সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু স্বামী। স্ত্রী বিশেষ অপরাধ করিলে স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করিতেও পারে। তবে যদি স্ত্রীর অপরাধ তেমন বেশী না হইয়াও তাহাকে প্রাণ হারাইতে হয়, তবে স্বামীকে স্ত্রীর আত্মীয়দের কাছে দণ্ড স্বরূপ তাহার বোনকে দিতে হয়। তাহারা এই বোনকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এই দেশে স্ত্রী ধার দেওয়ার প্রথা আছে। অনেক সময় এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে কিছুক্ষণ বা কয়েক দিনের জন্য স্ত্রী ধার দেয়। এক ভাইও অন্য ভাইকে স্ত্রী ধার দেয়। এই বিচিত্র প্রথার কারণ বলাও খুব শক্ত নয়। কোন ব্যক্তি হয়ত কোন কাজে দূরদেশে যাইবে, তখন সে যদি তার স্ত্রীকে একলা রাখিয়া যায়, তবে সে ইচ্ছা করিলে অন্য কোন লোকের সহিত পলাইতে পারে। কিন্তু সে যদি অন্য ব্যক্তির সাময়িক স্ত্রী হইয়া থাকে তবে তাহার এপথ এক-রকম বন্ধ থাকে, আর স্বামী বেচারাকেও বিদেশ হইতে আসিয়া স্ত্রীহীন হইয়া বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে হয় না। ডাইরি জাতির মধ্যে এই প্রথা বিশেষভাবে চলিত আছে। এই প্রথাকে তাহারা পিরাউরু বলে।

আমাদের দেশের মত এখানে স্ত্রী পাওয়া সহজ নয়। প্রথমত কন্যার মত্ হওয়া দরকার, এবং তাহার পর তাহার কুল জাতি ইত্যাদির মিল ও বরের বিবাহ করিবার মত্ হওয়া চাই। কারণ ইহাদের মধ্যেও জাতিভেদ-প্রথা পুরামাত্রাতেই আছে। একজন পুরুষ কিরূপ একজন নারীকে বিবাহ করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে বেশ কড়া আইন-কানুন আছে। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করা একেবারে অসম্ভব বলিলেই হয়। তবে যাহারা দেশপ্রথা ভাঙ্গিয়া অ-কুলীন বা নীচু ঘরের কন্যাকে বিবাহ করে তাহাদের স্বামী-স্ত্রীকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হয়, এবং ধরা পড়িলে কঠিন শাস্তিভোগ কপালে থাকে। কোন পুরুষ তাহার আপন সহোদরা বোন ছাড়া অন্য যে-কোন সম্বন্ধের বোনকে বিবাহ

করিতে পারে। যুবকের পক্ষে বিবাহ করা বড় শক্ত, কারণ বয়স্ক ব্যক্তিরা, এক-একজন অনেক স্ত্রী লইয়া বেশ আরামে থাকে।

এক এক জাতির আবার অনেকগুলি করিয়া শাখা-জাতি আছে। এক শাখা-জাতির যুবক, সেই জাতির যে-কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। অন্য জাতির কোন কন্যাকে সে বিবাহ করিতে পারে না। পূর্ব্বে এই-সমস্ত বিবাহ-নিয়ম খুব শক্তভাবে প্রতিপালন করা হইত, এখন ক্রমে ক্রমে এই-সমস্ত শিথিল হইয়া আসিতেছে।

এই দেশে বর অনেক সময় তাহার শ্বাশুড়ীর সহিত কথা বলে না, কনে তাহার শ্বশুরের সহিত কথা বলে না; অনেক সময় ভাই-বোনের বাক্যালাপ নিষেধ। বাগ্‌দত্তা স্ত্রী এবং স্বামীও কথা বলিতে পায় না। যেখানে পুরুষদের সভা ইত্যাদি হয়, সেখানে কোন স্ত্রীলোক আসিতে পায় না, এবং নারীদের মজ্‌লিসে কোন পুরুষও আসিতে পারে না। সাত বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েরা পিতামাতার কাছেই ঘুমাইতে পায়, কিন্তু তাহার বেশী বয়স হইলেই ছেলেদের পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্টস্থানে রাত কাটাইতে হয়। একজন বৃদ্ধার অধীনে অবিবাহিতা নারীদেরও স্বতন্ত্র নিদ্রার স্থান আছে।

মধ্য অষ্ট্রেলিয়াতে কে কাহার সহিত কথা বলিতে পারে তাহার নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা তাহাদের জাতি-বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। চারিটি জাতির নাম যদি হয় ক, খ, গ, এবং ঘ, তবে ক পুরুষ খ নারী বিবাহ করিতে পারে। ক এবং গ পুরুষ ক-খ স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-শোনা করিতে পারে। ক-খ স্বামী-স্ত্রীও ইহাদের সহিত দেখাশোনা করিতে পারে। কিন্তু যদি কোন ক-নারী ক-স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে চায়, তবে ক-স্বামী যখন বাহিরে থাকিবে, তখন সে ক স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে পাইবে। কিন্তু যদি একজন ঘ-নারী ক-স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে চায়, তবে তাহা ক-স্বামীর বর্ত্তমানেই হইতে হইবে। আবার হয়ত ক-পুরুষ গ কিম্বা ঘ-নারীর মুখ দেখিবে না, কথা বলিবে না, এমন কি তাহার কাছাকাছিও কোন স্থানে যাইবে না।

এই-সমস্ত কড়া নিয়ম-কানুন দেখিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে এইখানের লোকদের ভিতর মেলামেশা একেবারে হয় না। রাত্রে যখন সমস্ত কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া এক এক জাতি এক এক জায়গায় আগুন জ্বালাইয়া নাচ গান করে, তখন উৎসাহের চোটে সকলেই এক স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়া বিরাট্ উল্লাসে নাচ গান করে। স্ত্রীলোকেরাও আসিয়া যোগদান করে, কারণ রাত্রে তাহাদের আর কোন কাজ-কর্ম্ম থাকে না।

সংসারের কাজ-কর্ম্ম সবই প্রায় নারীদের করিতে হয়। পুরুষেরা বনে বনে শীকার করিয়াই বেড়ায়। ফল মূল তরী তরকারী সংগ্রহ সমস্ত নারীদের কাজ। কুঁড়ে-ঘর তৈরী এবং জ্বালানি কাঠ তাহাদেরই সংগ্রহ করিতে হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রার কালে সমস্ত জিনিষপত্র এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের নারীদেরই বহন করিতে হয়। ভারের ওজন বেশ মণ কয়েক হয়। মধ্যে মধ্যে তাহাদের ১৫।২০ মাইল এই ওজন লইয়া চলিতে হয়। এইসঙ্গে ইহাদের দর্‌কারী জিনিষপত্রের একটা তালিকা দিলে অনেকের ভাল লাগিতে পারে। একটা চ্যাপ্‌টা পাথরে গাছের মূল গুঁড়ো করা হয়। কুঠার তৈরী করিতে পাথরের টুক্‌রা লাগে। জমানো আঠা অস্ত্রে লাগাইতে প্রয়োজন হয়, এবং ক্যাঙ্গারুর আঁতে সূতো এবং পাতলা হাড়ে সূচ হয়। শামুকের খোলা চুল কাটিবার অস্ত্র। গাছের ছালে তৈরী জলপাত্র হয়। আগুন জ্বালিবার জন্য শুক্‌নো শ্যাওলাও রাখিতে হয়। বর্ষাকালে নারীরা গাছের ডাল পুঁতিয়া তাহার উপর গাছের ছাল ইত্যাদি দিয়া ছাতা তৈরী করে।

স্ত্রীকেই খাবার তৈরী করিতে হয়। ঘাসের বীজ ইহাদের একটি প্রধান খাদ্য। ঘাসের বীজ সংগ্রহ স্ত্রী-লোকেরাই করে। ঘাসের বীজ গুঁড়া করিয়া জলে ভিজাইয়া খাইতে হয়। নারীকে তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য নিরামিষ খাদ্যের জোগাড় করিতে হয়। পুরুষেরা তাহাদের কাঁধের উপর দিয়া পরিবারের অন্য সকলের দিকে খাদ্যদ্রব্য ছুড়িয়া দেয়। হাতে হাতে খাদ্য বিতরণের আপত্তির কারণ, তাহাতে নাকি এক শরীর হইতে অন্য শরীরে "মন্ত্র" চলিয়া যাইতে পারে।

মাংস খাওয়া সম্বন্ধে নানা প্রকার নিয়ম আছে। বালক-

বালিকারা যাহা ইচ্ছা খাইতে পারে। কিন্তু বয়স্কা নারীদের পক্ষে সকল মাংস খাওয়ায় বাধা আছে। কে কি মাংস খাইতে পারে, তাহার তালিকা সকলের ভাল লাগিবে না, তাই তাহার উল্লেখ করিলাম না।

মাছ এবং গুগ্‌লি ইহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। নারীরাই মাছ ধরে এবং গুগ্‌লি সংগ্রহ করে। ছোট ছোট জালে দুজন দুদিকে ধরিয়া মাছ ধরে। অন্য রকমেও অনেকে মাছ ধরে। অনেকে ভেলাতে চড়িয়া মাছ ধরে। ভেলার উপর খোলায় করিয়া আগুন রাখা হয়। অনেক সময় তাহারা এই আগুনে মাছ ঝল্‌সাইয়া খায়।

বিধবা হইলে নারীদের কষ্টের শেষ থাকে না। অনেক সময় তাহারা তাহাদের স্বামীর ভাইকে বিবাহ করে। অনেক স্থানে মাথা কাটিয়া বা দু-বছর কথা না বলিয়া স্বামীর জন্য শোক প্রকাশ করিতে হয়। অনেক স্থলে আবার স্ত্রীকে, স্বামীর কবরের উপর মাথায় প্ল্যাষ্টার অব্ প্যারিসের টুপী পরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। এখন আর এই প্রথার তত বেশী চলন নাই। ছেলে মরিয়া গেলে মা তাহাকে বেশ করিয়া আগুনে শুকাইয়া লইয়া, আট নয় মাস কোলে করিয়া লইয়া বেড়ায়।

কাহারো মৃত্যু হইলে শোক প্রকাশ করাটা মেয়েদের অবশ্যকর্ত্তব্য। কোন লোকের মৃত্যুর পরে যদি কোন পুরুষ গ্রামে ফেরে, তবে মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকট কোন একজন আত্মীয়া আগন্তুকের সাম্‌নে বসে, তাহার একটা পা বাঁ-হাত দিয়া জড়াইয়া ধরে, এবং ডান হাত দিয়া সেই নবাগত পুরুষের মুখে নখের আঁচড় কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেয়। তার পর সেই নারী বিদেশাগত পুরুষের স্ত্রীর পাশে বসিয়া, একজন আর-একজনের কাঁধে মুখ রাখিয়া কান্না আরম্ভ করে। এই কান্না দেখিলে সকলেরই ভয়ানক কষ্ট হয়। অনেক সময় জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায়, পাঁচছয় জন নারী একটি ছয়সাত বছরের ছেলের চারিদিক্ ঘিরিয়া ভয়ানক কাঁদিতেছে। ছেলেটি তার মুখ পুরুষোচিত গম্ভীর এবং দুঃখপূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অষ্ট্রেলিয়াব আদিমকালের লোকদের মতে মৃত্যু কখনো আপনা হইতে হয় না। কেহ যাদু করিয়া দিলে পর একজনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর মৃতের পরিবারের লোকেরা সেই যাদুকারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অনেক সময় মেয়েদেরও আসিয়া এই যুদ্ধে যোগদান করিতে হয়। প্রথমে সেই যাদুকর এক ঘা মার খাইবে, তাহার পর মৃতের আত্মীয়ের উপর সে হাত তুলিতে পারে। আঘাত পাইবার পূর্ব্বে যাদুকরের কিছু করিবার অধিকার নাই। যাদুকারী নর এবং নারী যে কেহ হইতে পারে। অনেক সময় যুদ্ধে যে হারিয়া যায়, গ্রামের অন্যান্য নারীরা তাহাকে সাহায্য করে। কখনো কখনো এইসমস্ত ব্যাপারের বিচার হয় এবং জাতীয় সভায় বৃদ্ধা নারীরা অনেক ক্ষেত্রে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করে।

নারীরা আরো অনেক কাজে যোগদান করে। বিশেষতঃ উৎসবের সময় নাচে গানে নারীদের খুব প্রয়োজন হয়। সকলে মিলিয়া যখন গান করে, তখন নারীরাও তাহাতে যোগদান করে। তাহাদের নাচের নানা-রকম পদ্ধতি আছে। স্থানাভাবে তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। নারীদের আর-একটি বিশেষ কাজ আছে। তাহারা লোকের অসুখ-বিসুখে মন্ত্র-পাঠ করিয়া ভূত তাড়াইয়া রোগ ভাল করে। তাহাদের মতে মানুষ যখন কোন ভূতকে অসন্তুষ্ট করে, তখন সে তাহার শরীরে আসিয়া রোগ বাধায়।

মন্ত্রজানা নারীদের বেশ সম্মান আছে। প্রেমিক যুবক-যুবতীরা তাহাদের কাছে প্রেমে সফল হইবার জন্য মন্ত্র গ্রহণ করে। কেহ কাহারো অনিষ্ট করিতে চাহিলে এই-সমস্ত যাদুকরীদের সাহায্য লইতে হয়। অনেক সময় পুরুষেরা এই-সমস্ত ডাইনিদের কাছে নানা-রকম ঔষধ লয়, তাহার সাহায্যে তাহারা স্ত্রীকে এবং বাড়ীর অন্য মেয়েদের বশে রাখে। ডাইনিরা প্রায়ই একটা লাঠিতে মন্ত্র পড়িয়া দেয়। এই মন্ত্রপড়া লাঠি দেখিলেই নাকি মেয়েরা ভয়ানক ভয় পায়। লাঠির আঘাত নাকি আরো গুরুতর হয়।

বৃদ্ধারা মরিবার পরই তাহাদের মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। অনেকস্থলে নারীমাত্রেই মৃত্যুর পর সমাহিত হয়। অনেক স্থানে আবার তাহাদের কিছুদিনের

জন্য গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া রাখা হয়, অথবা একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে ফেলিয়া রাখা হয়। মৃতের সৎকার-বিধি সব জাতির এক-রকম নয়। অনেকে শবদেহ পুড়াইয়াও দেয় বলিয়া শুনা যায়। অনেকে বলে যে পুরুষ তার মৃত্যুর পর বৃষ্টি নামায়, পৃথিবীর বুক হইতে তাহার সব স্মৃতি এই বৃষ্টির জলে ধুইয়া যায়।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

স্বরবৃত্ত ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছাড়া বাংলা-কবিতার আরেকটি নিজস্ব ছন্দ আছে যা সে সংস্কৃত বা অন্য কোনো ভাষার কাছে ধার করে' পায় নি। এ ছন্দকে বাংলা-ভাষা নিজের প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি করেছে। সাধু-বাংলা চিরকাল পণ্ডিত-সমাজে আদর পেয়ে আস্‌ছে এবং সে-জন্যই সে দেবভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্ক দাবী করে' স্ফীত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কথিত-বাংলা চিরকালই বাঙ্গালী নরনারীর মুখে-মুখেই ব্যবহৃত হয়ে আস্‌ছে এবং পণ্ডিত-সমাজের চোখের আড়ালে নিজের সুর-তালে ও নিজের ছন্দে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোরঞ্জন করে' আস্‌ছে। এই কথিত-বাংলার ছন্দ বহুদিন ধরে' ছড়া-পাচালীর রূপ ধরে' শিশুর নিদ্রাকর্ষণ করে', মেয়েদের শাস্ত্রজ্ঞানের বাহন হয়ে, গ্রাম্য জেলে-চাষাদের বাউল প্রভৃতি গানের উৎসমূলে কথা জুগিয়েই নিজেকে ধন্য মনে করছিল। কিন্তু এমনি করে' দিনে দিনে যখন তার ভাণ্ডারে নানা ভাষা নানা ভাব থেকে শক্তি ও সম্পদ্ সঞ্চিত হয়ে তাকে ঐশ্বর্য্যশালী করে' তুল্‌লে তখন পণ্ডিতগণের দৃষ্টি তার উপর পড়ল। তখন থেকেই কথিত বা প্রাকৃত বাংলাভাষা সাহিত্যের আসরে একটুখানি স্থান পেয়েছে। এখন গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রাকৃত-বাংলা স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়ে সাহিত্যিকগণকে বিস্মিত করে' দিয়েছে। সম্ভবত প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের পরিচালিত "মাসিক পত্রিকা" নামক মাসিক পত্রিকাতেই প্রাকৃত-বাংলার সরল সহজ সৌন্দর্য্যের প্রতি শিক্ষিত-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণের প্রথম প্রয়াস হয়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) "আলালের ঘরের দুলাল" সে প্রয়াসের অতি উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি। আজকাল আবার কয়েক বৎসর ধরে' এদিকে একটা নব উদ্যম দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে "ঘরে বাইরে" প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে প্রাকৃত-বাংলার গৌরব ঘোষণা করেছে। তথাপি এখনো অধিকাংশ সাহিত্যিক এই সহজ শক্তিশালী প্রাকৃত-বাংলাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে' নেন নি। কিন্তু গদ্যসমাজে এ ভাষা স্বীয় যোগ্য আসন লাভ না করলেও বাংলার কবিসমাজ তার গলায় বিজয়মাল্য অর্পণ করেছেন এবং তার বর্দ্ধিষ্ণু শক্তি ও শ্রী দিনে দিনেই বাংলার কাব্য-রসিকগণের শ্রবণ হৃদয় ও মন মুগ্ধ করছে। যা হোক্ এখন এই প্রাকৃত-বাংলার ছন্দের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব কোথায় তা দেখাবার চেষ্টা করব। প্রথমেই কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি।

(১) বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান
×
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন কন্যে | দান।

(২) "জলস্পর্শ | করব না আর | চিতোর রাজার | পণ
বুঁদির কেল্লা | মাটির পরে | থাকবে যত- | ক্ষণ।"

(৩) "রাত পোহাল | ফরসা হল | ফুটল কত | ফুল,
×
কাঁপিয়ে পাখা | নীল পতাকা | জুটল অলি- | কুল।"

উপরের নমুনা তিনটের ধ্বনি থেকেই বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে, ওই তিনটে একই ছন্দে রচিত। কিন্তু অক্ষরের হিসাব করতে গেলে দেখা যাবে সব গরমিল হয়ে যাচ্ছে। মাত্রাও সব চরণে সমানসংখ্যক নয়। অথচ প্রত্যেক চরণেই যে-কোনো হিসাব থেকে ওজন যে ঠিক আছে তাতে সন্দেহ নেই, কেননা এদের মধ্যে কোনো-রকম ঐক্যের সূত্র না থাক্‌লে তাল ঠিক থাকত না,

ছন্দ-পতন হয়ে যেত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এখানে প্রত্যেক ছেদেই স্বরবর্ণের অর্থাৎ স্বরান্ত ব্যঞ্জন-বর্ণের সংখ্যা সমান আছে, কেবল শেষ ছেদে একটি করে' স্বরান্ত ব্যঞ্জন। (তা-ছাড়া ×-চিহ্নিত দুটো জায়গায় ব্যতিক্রম দেখা যাবে,—এক জায়গায় একটা স্বর কম, আরেক জায়গায় একটা স্বর বেশি। কিন্তু এ ব্যতিক্রমে সাধারণ নিয়ম দুর্ব্বল হয় না, বরং প্রবলই হয়। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরো বলা যাবে।) এজন্যই ছন্দ তাদের উপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, কোনো দিকে কাত্ হয়ে পড়ছে না। যেহেতু এ-ছন্দ প্রতি চরণের অন্তর্গত অক্ষরসংখ্যার বা মাত্রাসংখ্যার উপর নির্ভর না করে' স্বরসংখ্যার উপর নির্ভর করছে, সেহেতু এ ছন্দকে স্বরবৃত্ত নাম দেওয়া সঙ্গত মনে করি। ছন্দের নামকরণের সময় সকলের আগে দেখতে হবে কোন্ মূল সূত্র বা ঐক্য-ভিত্তির উপর নির্ভর করে' ছন্দের সৌধটি দাঁড়িয়েছে, এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তার নামকরণ করতে হবে। অক্ষরবৃত্ত নির্ভর করে অক্ষরসংখ্যার উপর, মাত্রাবৃত্ত মাত্রাসংখ্যার উপর, এবং স্বরবৃত্ত স্বরসংখ্যার উপর। এখানেই বাংলা ছন্দের তিন ধারার পার্থক্য।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে স্বরবৃত্তের গোলমাল হয়ে যাবার বিশেষ কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে স্বর-বৃত্তের পার্থক্য কোথায় এ প্রশ্ন হতে পারে। ছন্দশাস্ত্রে অক্ষরের এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলা হয় এবং এ অক্ষর আর ইংরেজি সিলেব্‌ল্ (syllable) একই জিনিষ। কিন্তু যে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণ একটি স্বরবর্ণকে আশ্রয় করে' থাকে সে কয়টিই একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। সুতরাং কোনো শব্দে বা ছত্রে স্বরসংখ্যা যত অক্ষর বা সিলেব্‌ল্‌এর সংখ্যাও তত। কাজেই স্বরবৃত্তকে অক্ষরবৃত্ত থেকে পৃথক্ করার উপায় কি এ প্রশ্ন হতে পারে। দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

"আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে",

এ ছত্রে স্বরসংখ্যা যত, অক্ষর বা সিলেব্‌ল্‌এর সংখ্যাও তত। আবার—

"হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস"—

এখানেও স্বরসংখ্যা এবং অক্ষরসংখ্যা একই। সুতরাং কোন্‌টা কি ছন্দে রচিত তা নিরূপণ করার উপায় কি? এ পার্থক্য নির্ণয় করার কয়েকটা উপায় আছে।

প্রথমত তাদের ধ্বনিই তাদের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। অক্ষরবৃত্তের ধ্বনি গম্ভীর কিন্তু একঘেয়ে; স্বরবৃত্তের ধ্বনি চপল এবং নৃত্যপরায়ণ। অক্ষরবৃত্তে যুক্তবর্ণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার গাম্ভীর্য্য বাড়তে থাকে, কিন্তু স্বরবৃত্তে যুক্ত-বর্ণ তার চাপল্য এবং নৃত্যপরাণয়তাকেই বাড়িয়ে তোলে। উদ্ধৃত ছত্র দুটো পড়লেই ধ্বনির পার্থক্যটা ধরা পড়ে' যায়।

দ্বিতীয়ত স্বরবৃত্তে যত ঘন ঘন ছেদ বা যতি পড়ে, অক্ষরবৃত্তে তত ঘন ঘন পড়ে না। এই ঘন ঘন যতিই স্বরবৃত্তের নৃত্যচপলতার কারণ। উদাহরণ যথা—

আমারে ফিরায়ে লহ, | অয়ি বসুন্ধরে, ।

এখানে দুটো মাত্র যতি। কিন্তু

হাস্যমুখে | অদৃষ্টেরে | করব মোরা | পরিহাস্।

এখানে যতি পড়েছে চার বার।

তৃতীয়ত, কথিত-বাংলায় হলন্ত বর্ণের সংখ্যা খুব বেশী এবং এ-সমস্ত হলন্ত বর্ণের ঝোঁকে কথিত-বাংলায় একটা তালের সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বরপ্রধান সাধু-বাংলায় তাল নেই, সুরের গাম্ভীর্য্য আছে। এজন্যই আজ পর্য্যন্ত কোনো কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কথিত-বাংলার ব্যবহার করতে সাহস পান নি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কথিত-বাংলার হলন্ত বর্ণকে গ্রাহ্যও করতে পারে না, অগ্রাহ্যও করতে পারে না; কাজেই পাশ কাটিয়ে যায়। করব ধরব প্রভৃতি শব্দকে অক্ষরবৃত্ত দুইও ধরতে পারে না, তিনও ধরতে পারে না; অথচ খর্ব্ব গর্ব্ব প্রভৃতি শব্দ অনায়াসে ব্যবহারে লাগায়। করত ধরত প্রভৃতি শব্দ অক্ষরবৃত্তের ধাতে সয় না, অথচ মর্ত্ত্য গর্ত্ত প্রভৃতি খুব সহ্য হয়। কাজেই যেখানে সাধুভাষার (যথা—ধরিব করিব প্রভৃতির) প্রয়োগ দেখা যাবে, সেখানেই অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার হয়েছে বুঝতে হবে এবং যেখানে কথিত-বাংলার প্রয়োগ ও কাজেই হলন্ত বর্ণের প্রাচুর্য্য, সেখানেই স্বরবৃত্তের তাল কানে ধরা দেবে। কিন্তু এ তিনটে পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে একটাকে অক্ষরবৃত্ত ও আরেকটাকে স্বরবৃত্ত বলার কারণ হতে পারে না। কেননা এ তিন পার্থক্য ওই দুই

ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ কর্‌ছে মাত্র, তাদের প্রকৃতিগত ভিন্নতা বুঝিয়ে দিচ্ছে না। এ ভিন্নতা নিরূপণ করার প্রধান উপায় এই—বাংলা অক্ষরবৃত্তে কেবল স্বরবর্ণ বা স্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণই অক্ষর-সংখ্যার নিয়ামক নয়, কারণ পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে বাংলা অক্ষরবৃত্তে পদান্তস্থিত অ-স্বর বা হলন্ত উচ্চারিত ব্যঞ্জনও অক্ষর বলে' গণ্য হয়। কিন্তু স্বরবৃত্তে স্বরহীন ব্যঞ্জনকে গণনা করা হয় না। যথা,

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?"

এখানে তিনটে অক্ষরের হলন্ত উচ্চারণ হচ্ছে, কিন্তু তথাপি পদের অন্তে আছে বলে' তারা অক্ষর বলে' গণ্য হয়েছে। কিন্তু স্বরবৃত্তে এমন হবার জো নেই। যথা—

"ধ্যানে তোমার রূপ দেখিগো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি !"

এখানে চারটে বর্ণের হলন্ত উচ্চারণ হচ্ছে, তথাপি এদের গণনার মধ্যে ধরা হয় নি। সুতরাং এ ছন্দ স্বরবৃত্ত। কিন্তু যেখানে পদান্তস্থিত স্বরহীন ব্যঞ্জনবর্ণ নেই, সেখানে ধ্বনির বৈচিত্র্য, যতি এবং ভাষার সাহায্যে ছন্দ ঠিক কর্‌তে হয়।

"সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা | কাঁদিলা বিষাদে।"

ধ্বনি গম্ভীর, দীর্ঘ ছেদের পর যতি এবং সাধু-ভাষার প্রয়োগ আছে। সুতরাং ছন্দ অক্ষরবৃত্ত।

"সিন্ধু তুমি | বন্দনীয় | বিশ্ব তুমি | মাহেশ্বরী।"

ধ্বনি নৃত্যপর, যতি ঘন ঘন, সুতরাং ছন্দ স্বরবৃত্ত।

স্বরবৃত্তের আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই—

"কতই কথা | লিখ্‌ছে সাগর | লিখ্‌ছে বারো মাস,
উতলা ঢেউ | লিখ্‌ছে সাগর | মথন-ইতি- | হাস।"

প্রথম দেখ্‌লেই মনে হবে ছন্দপতন হয়েছে, কেননা দুই ছত্রেরই প্রথম চরণে পাঁচটি করে' স্বরবর্ণ দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বটে, কানে কিন্তু পাঁচটি স্বর শোনা যাচ্ছে না; কাজেই কোথাও কোন খট্‌কা লাগ্‌ছে না। তার কারণ কি ? কারণটি হচ্ছে এই—'কতই' এবং 'ঢেউ' এদুটো শব্দের 'অই' এবং 'এউ'—এই জোড়াস্বর দুটোকে একেকটি স্বর বলে' শোনা যাচ্ছে এবং তারা একেকটি স্বর বলেই গণ্যও হয়েছে। কেননা এখানে ইকার এবং উকারের পূর্ণ উচ্চারণ হচ্ছে না, এরা অর্দ্ধস্বর মাত্র। 'ইতিহাস'এর ই এবং 'কতই'এর ইকারের উচ্চারণ কর্‌লেই টের পাওয়া যাবে ইতিহাস-এর ইকারের পূর্ণ উচ্চারণ হচ্ছে, আর "কতই" শব্দের ইকারের অর্দ্ধ উচ্চারণ হচ্ছে। তেমনি 'উতলা'র উ পূর্ণ-উ, কিন্তু 'ঢেউ'এর উ অর্দ্ধ-উ। স্বরবৃত্ত ছন্দে হলন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মত অর্দ্ধস্বরেরও গণনা হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ছন্দটিতে পতন ঘটে নি। আরেকটা দৃষ্টান্ত—

"এই সমুদ্র | ভীষণ মধুর | কাছে থেকেও | দূর।"

এখানে 'এই' এবং 'এও', এ দুটো যুক্তস্বরকে এক এক স্বর বলে' ধরা হয়েছে। এস্থলে একটা খুব প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। বাংলা বর্ণমালায় 'ঐ' এবং 'ঔ'কে একেকটি স্বরবর্ণ বলে' গণ্য করা হয়। কিন্তু বাংলায় অই এবং অউ এ দুটো যুক্তস্বরের উচ্চারণ ঐ এবং ঔএর উচ্চারণ থেকে অভিন্ন। তা যদি হয়, তবে 'আই', 'এই', 'ওই' 'এউ', 'এও' প্রভৃতি যুক্তস্বরকেও বাংলা বর্ণমালায় স্থান দেওয়া উচিত। এ কথার এ উত্তর দেওয়া যেতে পারে না যে, 'ঐ' এবং 'ঔ' সংস্কৃতবর্ণমালায় আছে বলেই বাংলা বর্ণমালায়ও স্থান পাবে, আর 'আই', 'এই' প্রভৃতি যুক্তস্বর-গুলো সংস্কৃত বর্ণমালায় নেই বলে' বাংলায়ও থাকবে না। সংস্কৃত ভাষায় ঐকার এবং ঔকারের উচ্চারণ আছে বলেই ও-দুটো সংস্কৃত বর্ণমালায় স্থান পেয়েছে। বাকি যুক্তস্বরগুলোর উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষায় নেই, তাই সেগুলোকে সংস্কৃতবর্ণমালায় স্থান দেবার প্রয়োজনই হয় নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় এসমস্ত যুক্তস্বরের উচ্চারণ যখন আছে, তখন বাংলা বর্ণমালায় তাদের স্থান না দেবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এদিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে বাংলা বর্ণমালা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বাংলাছন্দের আলোচনায় বাংলা-বর্ণমালা বা বাংলা-উচ্চারণতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা শোভা পায় না। কিন্তু স্বরবৃত্তের আলোচনাকালে বাংলা স্বরতত্ত্বকে তো একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। তাই এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। বাংলার বৈয়াকরণিক বাংলা-স্বরবর্ণমালার যে অসম্পূর্ণতা উপেক্ষা করেছেন, বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের কবি সে ত্রুটিকে সংশোধন করে' নিয়েছেন।

'অই', 'অউ', 'এউ', 'এও' প্রভৃতি যুক্তস্বরের অন্তস্থিত ই, উ, ও প্রভৃতি অর্দ্ধস্বরকে স্বরবৃত্তের হিসাবে গণনা করা

না বটে, কিন্তু তা বলে' তাদের যে কোনোই মূল্য নেই তা নয়। এই অর্দ্ধস্বরগুলো হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মতোই পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরকে গুরুত্বদান করে' তার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং ছন্দকে তরঙ্গিত করে' তোলে। যথা—

কতই কথা লিখ্‌ছে সাগর লিখ্‌ছে বার্ মাস্

এখানে অর্দ্ধস্বর ইকার এবং হলন্ত খ, র ও স এই চারটে বর্ণ ছন্দকে আঘাত করে' করে' নাচিয়ে তুল্‌ছে। যদি লেখা হত

কত কথা লিখে সাগর লিখে বারো মাস,

তা হলে ছন্দ কেমন তরঙ্গহীন একঘেয়ে হয়ে পড়্‌ত।

"অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ্‌পা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে।"

এখানে 'উই', 'অই' (ঐ) এবং 'অউ' (ঔ), এই তিনটে যুক্ত-স্বরের মূল্য কতখানি তা অনায়াসেই বোঝা যায়। পূর্ব্বে বলা হয়েছে সংস্কৃত দীর্ঘস্বরগুলোরও বাংলায় হ্রস্ব উচ্চারণই হয়। বাংলায় দীর্ঘ-ঈকার ও দীর্ঘ-ঊকারের উচ্চারণ হ্রস্ব-ইকার ও হ্রস্ব-উকারের উচ্চারণ থেকে একটুও পৃথক্ নয়। কিন্তু দীর্ঘ উচ্চারণের অভাবে ভাষা অলস ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ আছে, ইংরেজীতেও আছে; তা ছাড়া ইংরেজীতে স্বরের উপর অ্যাক্‌সেণ্ট্ বা ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করার বিধি আছে বলে' সে ভাষা কখনো অলসতা প্রকাশ করে না। বাংলাভাষার এ দৈন্য দূর করছে তার যুক্তস্বরগুলো। পূর্ব্বে বলা হয়েছে বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সব স্বরেরই একমাত্রা, কেবল 'ঐ' এবং 'ঔ' দ্বিমাত্রিক। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ঠিক একই কারণে 'উই', 'এই', 'ওই' প্রভৃতি যুক্তস্বরগুলোকেও মাত্রাবৃত্তে দ্বিমাত্রিক বলেই ধরা হয়।

"ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জল-সিঞ্চিত | ক্ষিতি-সৌরভ | রভসে
ঘন-গৌরবে | নব যৌবনা বরষা
সরসা।"

এখানে যেমন 'ঐ' এবং 'ঔ'কে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়েছে, তেমনি—

"কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
চলে যায় সেই দূরে।
হাতে পাই যারে, পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারিনে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেন-পুঞ্জের পিছু।"

এখানেও 'আই', 'এই' এবং 'আও'কে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়েছে,

"নাই আর দেরী ভৈরব ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।"

এখানে আই কেমন করে ঐকারের সঙ্গে সমান তাল রাখ্‌ছে তা লক্ষ্য করার বিষয়।

স্বরবৃত্তের আরো একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া দর্‌কার।—

"দুঃখে যখন | বাজিয়ে তোলে | প্রাণ
তীব্র সুখে | গাই যে বসে | গান।"

এখানে দ্বিতীয়ছত্রের দ্বিতীয় চরণে ছন্দপতন হয় নি, কেননা 'আই'কে দেখ্‌তে দুটো দেখা গেলেও আসলে সে একটি মাত্র স্বর, সুতরাং 'গাই' এক সিলেব্‌ল্। কিন্তু প্রথম ছত্রের দ্বিতীয় চরণে ছন্দের পতন অনিবার্য্য বলেই মনে হয়। কিন্তু এখানেও কানে বেতাল ঠেক্‌ছে না। কারণ এখানে 'ইয়ে' 'এ' দুটো বস্তুত এক অক্ষরের মতোই উচ্চারিত হচ্ছে; সংস্কৃতের রীতিতে উচ্চারণ কর্‌লে 'যে' আর 'ইয়ে' তুল্যমূল্য। আসলে বাজিয়ে শব্দটি এখানে "বাজ্‌য়ে"এর মতো উচ্চারিত হয়েছে। 'ইয়ে'কে এক অক্ষরের মতো উচ্চারণ করাতে আরো একটু লাভ এই হল যে জকার হসন্ত হয়ে পড়েছে এবং তাতে ছন্দ তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। যথা

"দুঃখে যখন | বাজ্‌য়ে তোলে | প্রাণ
তীব্র সুখে | গাই যে বসে | গান।"

কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দের সর্ব্বত্র ইয়ে একাক্ষরের মতো উচ্চারিত হয় না। কারণ, লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে এখানে দ্রুত উচ্চারণ কর্‌তে হয়েছে বলেই 'ইয়ে'র একাক্ষরের মতো উচ্চারণ হয়েছে। সুতরাং যেখানে দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন নেই সেখানে তার একাক্ষরের উচ্চারণও হবে না। যদি 'ইয়ে'র অব্যবহিত পরেই যতি

থাকে, তা হলে দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন হবে না, সুতরাং তখন তার দ্বিস্বর উচ্চারণই হবে। 'বাজিয়ে তোলে'কে উল্টিয়ে নিয়ে পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌লেই এইটে টের পাওয়া যাবে। 'বাজিয়ে তোলে'—এখানে চার স্বর; কিন্তু 'তোলে বাজিয়ে' বল্‌লে পাঁচ স্বর হয়ে যাবে; কাজেই ছন্দ-পতন হবে।

"অমন আড়াল দিয়ে | লুকিয়ে গেলে | চল্‌বে না।"

এখানে 'দিয়ে'র পরেই যতি আছে, সুতরাং 'ইয়ে'র দ্বিস্বর উচ্চারণ। কিন্তু "লুকিয়ে"র পরে যতি নেই, কাজেই ইয়ের উচ্চারণ একস্বরের মতো। এজন্যই

কাঁপিয়ে পাখা | নীল পতাকা | জুট্‌ল অলিকুল

এখানে ছন্দপতন হয় নি। 'কাঁপিয়ে পাখা' বল্‌তে চার স্বর গণনা করা হয়েছে।

'ইয়ে'র যেমন স্থানবিশেষে একস্বরের মত উচ্চারণ হয়, তেমন হাওয়া, গাওয়া প্রভৃতি শব্দের 'ওয়া'কেও একস্বর বলেই ধরা হয়। কিন্তু 'ওয়া'র উচ্চারণ সর্ব্বত্রই একস্বর এবং সে উচ্চারণ অন্তস্থ ব-এর তুল্য। যথা,

(১) "কে বলে নেই | হাওয়ায় নিশান।
পারিজাতের | সৌরভের" |

(২) "তোমার হাওয়া | লাগ্‌লে পরে |
একটুকুতেই | কাঁপন ধরে।"

প্রথম দৃষ্টান্তে 'হাওয়া'র পরেই যতি নেই, দ্বিতীয়টিতে আছে। কিন্তু দুটোতেই 'ওয়া'র এক স্বর উচ্চারণ।

এবার স্বরবৃত্ত ছন্দের যথার্থ ব্যতিক্রমের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

(১) "মেঘের উপর | মেঘ করেছে | রঙের উপর | রং,
মন্দিরেতে | কাঁশর ঘণ্টা | বাজ্‌ল ঠং | ঠং।"

(২) "গ্রহবিপ্র | আশীর্ব্বাদ | করি
ধান দূর্ব্বা | দিল তাহার | মাথে।"

(৩) "গর্‌ গর্‌ গর্‌ | গর্জ্জে দেয়া | ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ | বৃষ্টি,
চন্দ্র ভায়া | সাঁত্‌রে চলেন | নাইক তাতে | দৃষ্টি।"

উক্ত দৃষ্টান্ত তিনটেতেই চিহ্নিত স্থানগুলোতে এক-একটা স্বর কম আছে। কিন্তু এ অভাবকে ছন্দের পতন না বলে' ব্যতিক্রম বলাই সঙ্গত। কেননা এ-সকল স্থলে কোনো একটা স্বরকে একটু টেনে উচ্চারণ করা হয় বলে মেটের উপর ছন্দের ওজন ঠিক থেকে যায়, সুতরাং পতন হয় না। দৃষ্টান্তের 'ঠং', 'বাদ' এবং 'ধান', এই তিনটে শব্দের স্বর-গুলোকে একটু দীর্ঘ উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু 'গর্‌ গর্‌ গর্‌' এবং 'ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌' এ দু জায়গায় প্রত্যেকটা স্বরকেই একটু টেনে উচ্চারণ কর্‌তে হয় বলে' ব্যতিক্রমটা কানে বড় ঠেকে না। এ-রকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত ইংরেজী ছন্দেও অনেক পাওয়া যায়। যথা—

(১) Hark, | hark, | this hor- | rid sound

(২) But the ten- | der grace | of a day | that is dead।

এখানে চিহ্নিত পদগুলোতে একেকটি স্বর বা সিলেব্‌ল্‌ কম আছে। কিন্তু স্বরবৃত্তের এ ব্যতিক্রম আধুনিক কবিদের রচনায় খুব কমই দৃষ্ট হয়। কিন্তু গ্রাম্য ছড়া পাঁচালী প্রভৃতিতে এ ব্যতিক্রম বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যথা,

বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান,
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন কন্যে | দান।
এক কন্যে | রাঁধেন বাড়েন | এক কন্যে | খান,
এক কন্যে | না পেয়ে | বাপের বাড়ী | যান।

এ ছড়াটিতে পাঁচ জায়গায় ব্যতিক্রম আছে। এমন কি আধুনিক কালে রচিত ছেলেদের ছড়াতেও এ ব্যতিক্রমের অভাব নেই। যথা,

"দুধ দেবে, | ছানা দেবে, | ক্ষীর দেবে | আর;
ময়দা দেবে, | সুজি দেবে, | সাজাইয়া | ভার।
আধা ছানার | গোল্লা দেবে | রসগোল্লা | কত;
সরভাজা | সীতাভোগ | কিন্‌তে পাবে | যত।
আম দেবে | কাঁঠাল দেবে | দেবে তালের শাঁস;
যত্ন করে' | পুষ্‌তে দেবে | পায়রা ময়ূর হাঁস।"

এখানেও পাঁচটি ব্যতিক্রম আছে। প্রাচীন কালের কয়েকটা ছড়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কটা মাথা | কার ঘাড়ে।
রাজার ঘাটে | ডঙ্কা মারে।

সেই কপালে | সেই টিপ,
সাধুর ভিটায় | সোনার দীপ।

যে রন্ধন | পেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে,
আজ কেন | জিভে আমার | সেই রন্ধন | লাগে।

এখানেও পাঁচটি ব্যতিক্রম আছে। কেবল প্রাচীন ছড়ায় কেন প্রাচীন সব রচনায় এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ময়নামতীর গান থেকে নমুনা দেখাচ্ছি।

"খায় না কেন | বনের বাঘ | তাক নাই | ডর।
নিত্ কলঙ্কে | মরণ হউক্ | স্বামির পদ- | তল॥
তুমি হব্ | বট্‌বৃক্ষ | আমি তোমার | লতা
রাঙা চরণ | বেড়িয়া লমু | পালাইয়া যাবু | কোথা॥"

এ দৃষ্টান্তে চার স্থলে একেকটি স্বরবর্ণ কম আছে। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি।

"বঙ্গ দেশে | প্রমাদ হইল | সকলে অ- | স্থির
বঙ্গ দেশ | ছাড়ি ওঝা | আইলা গঙ্গা- | তীর॥
রঘুবংশের | কীর্ত্তি কেবা | বর্ণিবারে | পারে।
কৃত্তিবাস | রচে গীত | সরস্বতীর | বরে॥"

এখানে চার জায়গায় এক-একটি করে' স্বরবর্ণের অভাব আছে। এ-রকম ব্যতিক্রমের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য উদ্ধৃত সমস্তগুলো দৃষ্টান্তই স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত; এবং অধিকাংশ স্থলেই প্রতি ছত্রে তেরো বা চৌদ্দটি করে' স্বর বা সিলেব্‌ল্ আছে। এই স্বরবৃত্ত ছন্দ বাংলাভাষার সমবয়সী, যেদিন থেকে বাঙ্গলা ছড়া পাঁচালী প্রভৃতি রচনার সূত্রপাত হয়েছে, সেদিন থেকে এ ছন্দও বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর বাহন হয়েছে। কিন্তু এ ছন্দে রচিত প্রাচীন কবিতা প্রভৃতিতে এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমের বহুল ব্যবহার দেখে আমার মনে হয় কালক্রমে এই ব্যতিক্রমই সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। তা ছাড়া এ ব্যতিক্রম সচরাচর শব্দের অন্তেই দেখা যায়; তার বিশেষ কারণও আছে। এ ছন্দে যদি শব্দের অন্তে কোনো বর্ণের হলন্ত উচ্চারণ হয়, তবে তার অব্যবহিত পূর্ব্বের স্বরটির দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হয় এবং এই দীর্ঘতাই একটি স্বরের অভাব পূরণ করে দেয়। কিন্তু শব্দের মধ্যে তা হবার সুবিধা নেই, কেননা পরবর্ত্তী বর্ণগুলো সে ফাঁকটা পূর্ণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শব্দের অন্তে বর্ণের হলন্ত উচ্চারণ হলে সে ফাঁক পূর্ণ করার কেউ থাকে না, কাজেই ছন্দের সুরেই সেটা ভরাট হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস শব্দের অন্তস্থিত হলন্ত বর্ণের ফাঁকটা সুর দিয়ে ভর্ত্তি করাই কালক্রমে সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার একটু বিশেষ সুযোগও ছিল। তখনকার দিনে কাব্য ছড়া প্রভৃতি সব জিনিষই সুর করে' পড়া ও গাওয়া হত। সুতরাং গানের সুরে ছন্দের সব ফাঁক ভর্ত্তি হয়ে যেত বলে' এই এক-আধটা স্বরের অভাব কানে বড় টের পাওয়া যেত না। আজকাল কোনো কবিতাই সুর করে' পড়া হয় না, সুতরাং স্বরবৃত্ত ছন্দের এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমের অভ্যাসটা বদলে গেছে। কিন্তু প্রাচীন বাংলা স্বরবৃত্তে যে এই একটি মাত্র পরিবর্ত্তনই দেখা দিয়েছিল তা নয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের পর হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন এদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাও বহুলপরিমাণে আরম্ভ হয়েছিল তখন সংস্কৃত ছন্দও ধীরে ধীরে বাংলা ছন্দের উপর স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। ক্রমে চোদ্দ স্বরের স্বরবৃত্তের পরিবর্ত্তে অক্ষরবৃত্তের পয়ার বাংলা ছন্দের প্রধান আসন অধিকার করেছিল। চোদ্দ স্বরের স্বরবৃত্তে প্রতি পংক্তিতে চারটে যতি থাকে, এবং প্রতি চার স্বরের পরে একটা যতি পড়ে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে অত ঘন ঘন যতির ব্যবস্থা নেই। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দের তালে তৈরী যাদের কান, সেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে পড়ে' বাংলার নিজস্ব ছন্দটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। সংস্কৃতজ্ঞ কবিরা প্রথমত স্বরবৃত্তের দুটো যতি তুলে দিলেন; বাকি রইল আরো দুটো,—একটা আটের পর, আরেকটা ছয়ের পর। তা ছাড়া বাংলা স্বরবৃত্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কবিরা স্বরসংখ্যা

বা সিলেব্‌ল্‌এর দিকে লক্ষ্য না রেখে সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তের অনুকরণে কেবল আট-ছয়ের ঘর ভর্ত্তি করে' যেতে লাগ্‌লেন। এমনি করে' চোদ্দ স্বরের স্বরবৃত্ত-ছন্দের বিকৃতি থেকে চোদ্দ অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে। পয়ার রচনায় যে সংস্কৃত ছন্দের কোনো আদর্শ ছিল না তাও নয়। সম্ভবত জয়দেবের

সরস মসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্‌
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্‌।

প্রভৃতি কবিতা এইসকল পয়ার-রচয়িতাদের আদর্শ ছিল। তার পর

পততি পতত্রে বিচলিত-নেত্রে
শঙ্কিত ভবদুপগানম্‌।
রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্‌।

প্রভৃতি কবিতা বোধ করি বাংলা ত্রিপদী ছন্দের পথ-প্রদর্শক। এমনি করে' বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ অক্ষরবৃত্তের প্রভাবের নীচে একেবারে চাপা পড়ে' গেল। বহুদিন বাংলা সাহিত্যে স্বরবৃত্ত ছন্দের দেখা পাওয়া যায় নি। অনেক কালের পরে আজকাল আবার এ ছন্দ নবীন প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে বাংলা-সাহিত্যে সজীব হয়ে উঠেছে। যাহোক্‌ এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমের পরিণামে স্বরবৃত্ত থেকে কি করে' অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি হল তা আধুনিক কালের দুই একটি রচনা থেকেও অনুমান করা যায়। পূর্ব্বোক্ত "গ্রহবিপ্র আশীর্ব্বাদ করে" প্রভৃতি দুটো ছত্রই অনেকটা অক্ষরবৃত্তের মতো শোনায়। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

\+ +
"জয় রাণা | রাম সিংহের | জয়
মেত্রিপতি | ঊর্দ্ধস্বরে | কয়।"
কনের বক্ষ | কেঁপে উঠে | ডরে,
\+
দুটি চক্ষু | ছল্‌ ছল্‌ | করে,
\+
বর্‌-যাত্রী | হাঁকে সম- | স্বরে
জয় রাণা | রাম সিংহের | জয়"।

উদ্ধৃত কবিতাটিতে তিন স্থলে এক-একটি স্বরের অভাব আছে; ছল্‌ ছল্‌ এখানে দুটো স্বরের অভাব আছে। এ কয়টা ব্যতিক্রম ছাড়া এস্থলে স্বরবৃত্তের সব লক্ষণ বিদ্যমান আছে, অথচ এর ধ্বনিটা কেমন অক্ষরবৃত্তের মত শোনায়। এর কারণ কি? এই ব্যতিক্রমগুলো যে অন্তত এর একটা প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই।

যাহোক্‌, অক্ষরবৃত্ত যে স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে যথেচ্ছ ব্যতিক্রম কর্‌লেই যে এ ছন্দ পাওয়া যাবে তা নয়। এ ব্যতিক্রমও একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়মটি এই যে, সাধারণত শব্দের মধ্যস্থিত হলন্ত বর্ণকে গণনা না করে' পদের অন্তস্থিত হলন্ত বর্ণের স্থানে এক স্বর গণনা করে' ছন্দ রচনা কর্‌লেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ পাওয়া যায় এবং তাতে অধিকাংশ স্থলেই চার বা তার চেয়ে কম-সংখ্যক স্বরের পরে যতি পড়ে না। এছন্দে ক্বচিৎ চার এবং অধিকাংশ স্থলে ছয়, আট, বা দশ অক্ষরের পর যতি স্থাপিত হয়। যথা,

মহাভারতের্‌ কথা | অমৃত সমান্‌।
কাশীরাম দাস ভণে | শুনে পুণ্যবান্‌॥

এখানে যতি পড়েছে আট এবং ছয় অক্ষরের পরে; এবং পাঁচটি শব্দের অন্তেস্থিত হলন্ত-উচ্চারিত বর্ণকেও গণনার মধ্যে ধরা হয়েছে। এইটেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ। স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রম-বিশেষ থেকে উৎপন্ন বলে' অক্ষরবৃত্তকে একটি স্বতন্ত্র ছন্দ বলে' গণ্য না করে' এ ছন্দকে ভঙ্গ-স্বরবৃত্ত বা ব্যতিক্রান্ত-স্বরবৃত্ত নামও দেওয়া যায়। কিন্তু স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রম-বিশেষ থেকে উৎপন্ন বলে' এ ছন্দকে তুচ্ছ করা যায় না। এ ছন্দেরও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে এবং এর অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রবন্ধের আরম্ভেই অনেক কথা বলেছি। সুতরাং খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে' বল্‌তে গেলে বলা উচিত বাংলা-ছন্দপ্রবাহিনীর প্রধান ধারা তিনটে নয়, দুটো—মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত। কিন্তু স্বরবৃত্ত থেকে এক নূতন ধারা উদ্গত হয়ে বাংলা-কাব্যসাহিত্যকে অপূর্ব্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্য দান করেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

জয়ন্তী

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরিচয়

বিহারীলাল পুণ্ডরীককে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। বনবাসিনী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছে। কেন? বিহারীলাল এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

যে বৃক্ষের মূলে গহ্বর দেখিয়াছিল, পুণ্ডরীক বিহারী-লালকে সেই স্থানে লইয়া গেল। গহ্বর মুক্ত, তাহার উপর কোন আচ্ছাদন নাই। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বনবাসিনী।

বনবাসিনী বিহারীলালকে কহিল, "আমার বাসস্থান কেহ দেখিতে পায় নাই। পুণ্ডরীক খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। আজ আপনিও দেখিতে পারেন।"

রমণী গহ্বরে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে বিহারী-লাল ও পুণ্ডরীক। গহ্বরের অভ্যন্তরে দুইজন মশাল লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা পথ দেখাইয়া চলিল।

কিছুদূর গিয়া একটি প্রশস্ত কক্ষ। সেখানে বসিবার মৃগচর্ম্ম, আহারের জন্য ফলমূল। রমণী সেখানে অপেক্ষা করিল না। মশাল্‌চিদিগকে কহিল, "আগে যাও।"

সুড়ঙ্গের পথ দিয়া তাহারা অনেক দূর গেল। সুড়ঙ্গ শেষ হইলে তাহারা আবার বাহিরে সূর্য্যালোকে আসিল। সম্মুখে ভগ্ন প্রাচীন মন্দির। রমণী কহিল, "আসুন।" বিহারীলাল ও রমণী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পুণ্ডরীক ও অপর দুই ব্যক্তি বাহিরে রহিল। সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া তাহারা মশাল ফেলিয়া দিয়াছিল।

মন্দিরের ভিতরে পরিষ্কার, কিন্তু কোন বিগ্রহ নাই। মার্জ্জিত প্রস্তরের উপর রমণী বসিল। বিহারীলাল কিছু দূরে উপবেশন করিলেন।

রমণী কহিল, "আপনাকে অসঙ্কোচে এই নিভৃত স্থান দেখাইয়াছি। তাহার প্রধান কারণ এই যে এখানে আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না।"

বিহারীলালের মুখ ম্লান হইয়া গেল, রমণী তাহা লক্ষ্য করিল। বিহারীলাল কহিলেন, "কেন?"

"এখানকার কার্য্য সমাধা হইয়াছে, এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ আমি এখানে কখনই বাস করিতাম না, আসিতাম-যাইতাম মাত্র। ঐ দেখুন।"

মন্দিরের বাহিরে অঙ্গুলি-নির্দ্দিষ্ট দিকে বিহারীলাল চাহিয়া দেখিলেন। অতি মনোহর বেগবান্ অশ্ব তরুশাখায় বদ্ধ রহিয়াছে। পাশে সহিস দাঁড়াইয়া। বিহারীলাল কোন কথা কহিলেন না।

রমণী আবার কহিল, "আপনার পরিচয় আমি জানি, আপনি আমার পরিচয় জানেন না। আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা আপনি জানেন। আমার নাম জয়ন্তী। সকল পরিচয় দিতে পারিব না। যাঁহাদের আদেশ-মত আমি এই বনে আসি, তাঁহারা মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার সহায়তা-প্রার্থী এবং সে প্রার্থনা নিবেদন করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

"তাঁহাদের ব্রত কি জানিতে পারি?"

"প্রজার মঙ্গলসাধন।"

"ইহার অপেক্ষা মহত্তর ব্রত নাই। আমাকে কি করিতে হইবে?"

"তাঁহারা স্বয়ং আপনাকে বলিবেন। কল্য সন্ধ্যার সময় আপনার গৃহে তাঁহারা গমন করিবেন। আপনার অনুমতি পাইলে তাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

"কাল যে হোলি!"

"তাঁহাদের বিবেচনায় এই উত্তম সুযোগ। তাঁহারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ন্যায় যাইবেন, আপনি পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করিবেন। এই সঙ্কেত।" জয়ন্তী হস্ত দ্বারা বিহারীলালকে সঙ্কেত দেখাইয়া দিল। অপরের অলক্ষ্যে সে সঙ্কেত করিতে পারা যায়।

বিহারীলাল কহিলেন, "কি নাম?"

"অযোধ্যানাথ। তাঁহার সঙ্গীদিগের পরিচয় তিনি দিবেন।"

"তাহাই হইবে।"

জয়ন্তী মন্দির হইতে বাহির হইয়া অশ্বের অভিমুখে চলিল।

বিহারীলাল কহিলেন, "আপনার সঙ্গে ঐ পর্য্যন্ত যাইব ?"

"স্বচ্ছন্দে আসুন।"

অশ্বের সমীপে উপনীত হইয়া বিহারীলাল অশ্বের মুখ ধারণ করিলেন। অশ্বপাল সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। অভ্যস্ত অশ্বারোহীর ন্যায় জয়ন্তী অবলীলাক্রমে অশ্বে আরোহণ করিল। বিহারীলাল অশ্বের মুখ ছাড়িয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিলেন। বল্গা ধারণ করিবার সময় জয়ন্তীর হস্ত বিহারীলালের হস্তে ঠেকিল। জয়ন্তীর হাত কাঁপিতেছিল। বিহারীলাল মুহূর্ত্ত মাত্র কাল জয়ন্তীর হস্তের উপর আপনার হস্ত রক্ষা করিলেন।

বিহারীলাল অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিলেন, "আবার সাক্ষাৎ হইবে ?"

জয়ন্তী কহিল, "তাহার উপায় ত আপনি নিজে করিয়াছেন। এখন আপনি আমাদের এক জন। সাক্ষাৎ হইবেই।"

যুবক ও যুবতীর দৃষ্টি চক্ষে চক্ষে মিলিল। জয়ন্তীর মুখ প্রথমে রক্তবর্ণ তৎপরেই পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। বিহারী লাল কহিলেন, "কবে সাক্ষাৎ হইবে ?"

জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর জড়িত হইল, সেইসঙ্গে অধরপ্রান্তে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিল, কহিল, "কেমন করিয়া বলিব ?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শাহজাদা হাতিম

বাসীনের বারাদরীতে শাহজাদা হাতিমের কিছু মাত্র মনের সুখ ছিল না। তিনি নিজেকে বন্দী বিবেচনা করিতেন। কথা কতকটা সত্য বটে। শাহজাদার ইচ্ছা রাজধানীতে ফিরিয়া যান। বাদশাহের আদেশ না পাইলে সে সাধ্য নাই। শরীর সুস্থ হইয়াছে লিখিলে আবার সেই বীজাপুরে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

বারাদরী অর্থে বারটা দরজা। বাস্তবিক সমুদ্রতীর-বর্ত্তী এই রাজপ্রাসাদে বারটা দরজা ছিল না, কিন্তু চারিদিক খোলা। অতি রম্য স্থান। কিন্তু শাহজাদা স্বেচ্ছায় সেখানে যান নাই, এইজন্য তিনি কিছুতেই আনন্দ অনুভব করিতেন না।

সম্মুখে মুক্ত নীল সমুদ্র আকাশপ্রান্তে মিশিয়াছে; সমুদ্র হইতে নিরন্তর হু হু করিয়া বায়ু বহিতেছে। অষ্ট প্রহরে দুই বার জোয়ার-ভাঁটার খেলা, কখন অবিশ্রান্ত সমুদ্র গর্জ্জন, পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গভঙ্গ, ফেনকিরীটিনী উর্ম্মি-মালার উত্থান পতন, কভু বা নির্ব্বাত নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সলিলরাশি। নিত্য এই অপূর্ব্ব দৃশ্য বৃথাই শাহজাদার দৃষ্টি-গোচর হইত। না সমুদ্র দর্শনে, না সমুদ্র ভ্রমণে, শাহজাদার আনন্দের লেশ ছিল। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার চিন্তা সিংহাসনের জন্য। আসমুদ্রহিমাচল সাম্রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হইবে—তাহার অধিক বিলম্বও নাই—তখন কে সে সিংহাসনের অধিকারী হইবে, কে তখ্‌ৎ-তাউসে উপবেশন করিয়া দর্‌বার্‌-ই-আম্‌ উজ্জ্বল করিবে ? হাতিম বাদ-শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি থাকিতে কনিষ্ঠ রুস্তম কেমন করিয়া সিংহাসনের দাবী করিতে পারে ? ভ্রাতাই ত শত্রু, ভ্রাতাই ভ্রাতাকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে।

শাহজাদা হাতিমের সঙ্গে দুই শ্রেণীর লোক,—এক মোসাহেবের দল, দ্বিতীয় পরামর্শদাতা। প্রথম দলের সংখ্যা অধিক। তাহারা নানা উপায়ে সম্রাট্‌-পুত্রকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে তাহারা কাল কাটাইত, শাহজাদাকেও সেই সঙ্গে জড়াইত। কখন সমুদ্রে নৌকাবিহার, কখন মৃগয়া, কখন নৃত্যগীত,—এইরূপে কাল কাটাইত, কিন্তু হাতিম কিছুতেই রাজ্যের কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। তিনি অনেক সময় প্রমোদমত্ত বয়স্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রৌঢ় পরামর্শদাতাদিগের সহিত রাজ্যের ও রুস্তমের কথা কহিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদ ইস্মাইল প্রধান। ইস্মাইল কহিতেন, "গুপ্তচরের নিকট পাকা কোন সংবাদ না পাইয়া সহসা কিছু করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আপনি যদি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য লইয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহা হইলে সে সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে বাদশাহের নিকট পঁহুছিবে এবং

তিনি রাগান্বিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ্যে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।"

হাতিম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "বাদ্‌শাহ ত আমাকে একরূপ নির্ব্বাসনে রাখিয়াছেন। এখন যদি কিছু হয়, তাহা হইলে রুস্তমের পক্ষে সিংহাসনের পথ অবারিত।"

"আপনার কি স্মরণ নাই যে শাহজাদা রুস্তম পূর্ব্বদেশে প্রেরিত হইয়াছেন? রাজধানী হইতে তিনি আপনার অপেক্ষাও দূরে।"

আপত্তি ঠেলিয়া হাতিম কহিলেন, "তাহার অনেক সৈন্যবল, বুন্দেলখণ্ডে সে যশস্বী হইয়াছে, বাদ্‌শাহের কিছু হইলে ফৌজ তাহার পক্ষে হইবে, তখন কে তাহার গতিরোধ করিবে?"

ইস্মাইল কহিলেন, "শাহজাদা, হিম্মত কখন হারাইবেন না, তাহা হইলেই সব গেল। আমরা শুধু খবরের অপেক্ষায় আছি। খবর পাইলেই দিনরাত কুচ করিয়া আপনি শাহজাদা রুস্তমের পূর্ব্বেই রাজধানী প্রবেশ করিবেন। সেখানে গিয়া একবার সিংহাসন দখল করিলে বাদ্‌শাহী আপনার, প্রজা সৈন্য আপনার তরফ হইবে, কাহার সাধ্য আপনার বিরুদ্ধে কিছু করে? আপনি অনর্থক চিন্তা করিবেন না।"

এ কথা শুনিয়া হাতিমের ভরসা হইল, তিনি গোঁফে চাড়া দিতে লাগিলেন।

দুই চারিদিন পরেই গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল, বাদ্‌শাহের পীড়া কঠিন, আর গোপন করিবার উপায় নাই। রাজধানীতে রাষ্ট্র হইয়াছে, বাহিরেও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শাহজাদা হাতিম সেইদিনই রাজধানী যাত্রা করিলেন। সৈন্যশিবিরে আদেশ প্রেরিত হইল,—সেনাপতি সসৈন্যে অবিলম্বে তাঁহার অনুসরণ করিবেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শাহজাদা রুস্তম

সাম্রাজ্যের আর-এক প্রান্তে শাহজাদা রুস্তমও সিংহাসনের ভাবনা ভাবিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আর-এক প্রকৃতির লোক। হাতিমের মত দুর্ব্বল-প্রকৃতি ও অস্থিরচিত্ত নহেন। সকল বিষয়ে তাঁহার আত্মনির্ভর, যেমন মনের বল তেমনি চরিত্রের দৃঢ়তা। এমন নহে যে তিনি বিলাসী ছিলেন না, কিন্তু কিছুতেই তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। মোসাহবেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত কিন্তু তাঁহাকে ভয় করিত, বিজ্ঞেরা অযাচিতভাবে কোন পরামর্শ দিতেন না, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে শাহজাদা তাঁহাদের অপেক্ষা চতুর, বয়সে যুবা কিন্তু কূটরাজনীতিতে বৃদ্ধেরা তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার আলস্যশূন্য কার্য্য ও সতর্কতা, তাঁহার মিষ্টভাষিতা গাম্ভীর্য্য ও প্রখর বুদ্ধি যে লক্ষ্য করিত সেই বুঝিতে পারিত যে, ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক ইনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন।

রাজধানীর সংবাদ গুপ্তচর প্রতিদিন লইয়া আসিত। রুস্তমের অসংখ্য গুপ্তচর, অনবরত যাতায়াত করিত। বাদ্‌শাহের মৃত্যু আসন্ন তাহা শাহজাদা রুস্তম্ উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। রাজধানীর অভিমুখে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইবার একটা কৌশল তিনি উদ্ভাবন করিলেন। এক দল বিদ্রোহী পরাজিত ও ধ্বংস হইয়াছিল। তিনি বাদ্‌শাহকে জানাইলেন আর-এক দল বিদ্রোহী আজমগড় হইতে এলাহাবাদে যাইতেছে, সেখানে দুর্গ আক্রমণ করিয়া আগ্রার দিকে যাইবে। শাহজাদাও সসৈন্যে সেই দিকে চলিলেন। বস্তুতঃ বিদ্রোহীদের সংখ্যা অল্প ও তাহারা হীনবল। শাহজাদার স্বয়ং যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি এমন সুযোগ ছাড়িবার লোক নহেন।

সেনানায়কদিগের সহিত রুস্তম্ গোপনে পরামর্শ করিতেন। তাহারা সকলেই তাঁহার পক্ষে, সকলে শপথ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিয়াছিল। সৈন্যদের মধ্যেও এ কথা গোপনে প্রচারিত হইয়াছিল। শিবিরে শাহজাদা স্বয়ং সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন, সজ্জিত সেনার সাক্ষাতে যে সময় তিনি অশ্বারোহণে আগমন করিতেন তখন তাহারা উল্লাস-ধ্বনি করিয়া বজ্রনাদে চারিদিক্ কাঁপাইয়া তুলিত। শাহজাদা যে ভাবী বাদ্‌শাহ তাহাতে তাঁহাদের কিছু সংশয় ছিল না।

বাদ্‌শাহের সংবাদ দিন দিন আরও মন্দ আসিতে

লাগিল, কিন্তু শাহজাদা রাজধানীতে যাইবার কোন আদেশ পাইলেন না। তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। বাদশাহ মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু তিনি কোন পুত্রকে আহ্বান করা দূরে থাকুক, দুইজনের একজনকেও পীড়ার সংবাদ দেন নাই। তাঁহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে?

শাহজাদা এলাহাবাদ ছাড়াইয়া কানপুরের নিকট শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হইলে সেনাপতি আসিয়া নিবেদন করিলেন, একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। শাহজাদার আদেশ ছিল যে কোন লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়।

শাহজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রয়োজন?"

"সে বলিতেছে হুজুরের সাক্ষাতে বলিবে, আর কাহাকে কিছু বলিবে না।"

"ডাক তাহাকে।"

প্রহরীর সঙ্গে গৌরীশঙ্কর প্রবেশ করিলেন। দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া শাহজাদাকে অভিবাদন করিলেন, মস্তক অবনত করিয়া, পিছু হটিয়া সেলাম করিলেন না।

সেনাপতি ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "কাহার সম্মুখে আসিয়াছ, জান?"

অল্প হাসিয়া গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "শাহজাদা রুস্তমকে কে না জানে? কিন্তু বাদশাহের উপর বাদশাহ আছেন, আমরা অবনত মস্তকে কেবল তাঁহারই বন্দনা করি।"

শাহজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"সেই কথা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, কিন্তু অপরের সাক্ষাতে বলিতে পারিব না।"

ভয় কি, শাহজাদা তাহা জানিতেন না। তিনি বলবান্, অস্ত্রকুশলী, পাশে সকল সময় তরওয়াল থাকিত। গৌরীশঙ্কর নিরস্ত্র। শাহজাদা সেনাপতিকে কহিলেন, "আপনি আপনার তাঁবুতে যান। আমার তাঁবুর বাহিরে প্রহরী যেন হাজির থাকে।"

সেনাপতি চলিয়া গেলেন।

শাহজাদা কহিলেন, "এখন তৃতীয় ব্যক্তি নাই, তোমার পরিচয় দাও।"

স্নিগ্ধ ধীরস্বরে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আপনি যে ষড়যন্ত্রকারীদের কথা শুনিয়াছেন আমি তাহাদের দলপতি।"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সম্রাট্-পুত্র কহিলেন, "কোন সাহসে তুমি এখানে আসিয়াছ? তুমি এখনি বন্দী হইবে। কাল তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

অবিচলিত ভাবে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আমি স্বয়ং আসিয়াছি, আপনি আমাকে ধরিয়া আনেন নাই, আপনার কর্ম্মচারীরা আমাকে ধরিতেও পারে নাই। আমাকে বন্দী করিবার অথবা বধ করিবার পূর্ব্বে আমার বক্তব্য শুনিলে দোষ কি?"

"বলিয়া যাও।"

"আমরা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্যে কি অনিষ্ট করিয়াছি? কাহারও কিছু লুটপাট করিয়াছি, কোথাও বিদ্রোহের আগুন জালাইয়াছি? প্রজাকে আত্মসম্মান, আত্মরক্ষা শিখাইলে ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহ হয় না, রাজ্যে মঙ্গল হয়। ষড়যন্ত্রকারী বলিলে আমাদের অযথা অপবাদ হয়।"

"আর কিছু বলিবার আছে?"

"আছে বলিয়াই আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য রাজধানীতে যাইতেছেন। বাদশাহের মৃত্যু আসন্ন। আপনি বাদশাহ হইলে কি প্রজাপীড়ন নিবারণ করিবেন, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমদর্শী হইবেন?"

ক্রোধে শাহজাদার চক্ষু জলিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কে?"

"আমার পরিচয় ত আপনি পাইয়াছেন। আমি প্রজার মুখপাত্র।"

"আজ রাত্রে বন্দী থাক। প্রাতঃকালে জল্লাদের নিকট উত্তর পাইবে। তোমার মুণ্ড বর্শায় বিদ্ধ করিয়া ফৌজের অগ্রে লইয়া যাইবে।"

তখন গৌরীশঙ্কর মাথা তুলিয়া দৃপ্ত স্বরে কহিলেন, "আপনার সাধ্য নাই যে আমার অঙ্গ স্পর্শ করেন।"

নিমেষ মাত্র শাহজাদা নির্ব্বাক্ হইলেন, তাহার পর ডাকিলেন, "প্রহরী!"

প্রহরী আসিল। শাহজাদা কহিলেন, "এই ব্যক্তিকে বন্দী কর!"

গৌরীশঙ্কর বাদ্‌শাহের প্রদত্ত অঙ্গুরী বাহির করিয়া শাহজাদাকে দেখাইলেন। শাহজাদা মস্তক নত করিয়া মস্তকে হস্তস্পর্শ করিলেন। প্রহরীকে কহিলেন, "আমার ভ্রম হইয়াছিল, ইনি আমাদের বন্ধু। তুমি বাহিরে যাও।"

প্রহরী বাহিরে গেল।

শাহজাদা কহিলেন, "আপনি সত্য বলিয়াছেন, আপনাকে স্পর্শ করিবার আমার ক্ষমতা নাই।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আমি আপনাকে বৃথা গর্ব্বের বাক্য বলি নাই।"

"তাহা দেখিতেছি। এখন আপনি যেখানে ইচ্ছা হয় যাইতে পারেন।"

"আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই।"

"বাদ্‌শাহের নিদর্শনে আমি আপনাকে কোন রূপ বাধা দিতে পারি না, কিন্তু আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আপনার অধিকার নাই।"

"আর-একটা প্রশ্ন করি। কাল আপনি কোথায় গিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিবেন?"

"কানপুরে।"

"সসৈন্যে?"

"সৈন্য ছাড়িয়া আমি অগ্রে যাই না।"

"কাল যদি সসৈন্যে কানপুর পৌঁছিতে না পারেন?"

"কে আমার গতিরোধ করিবে?"

"আমি।"

"আপনি বাতুল হইয়াছেন।"

"কাল আবার সাক্ষাৎ হইবে, তখন আপনার মত পরিবর্ত্তন হয় কি না বোঝা যাইবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অজান্তে

সে-দিন 'আপিসে' মাইনে পেয়েছি। বাড়ী ফের্‌বার পথে ভাব্‌লাম 'ওর' জন্যে একটা 'বডিস্‌' কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বল্‌ছে।

এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিন্‌তে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। জামাটি কিনে বেরিয়েছি—বৃষ্টিও আরম্ভ হ'ল। কি করি—দাঁড়াতে হ'ল। বৃষ্টিটা একটু ধর্‌তে—জামাটি বগলে করে'—ছাতাটি মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেশ এলাম—তার পরই গলি। তাও অন্ধকার।

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছি—অনেক দিন পরে আজ নতুন জামা পেয়ে তার মনে কি আনন্দই না হবে · আজ আমি—

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়্‌ল্‌। সেও পড়ে' গেল, আমিও পড়ে' গেলাম—জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি উঠে দেখি—লোকটা তখনও ওঠেনি—ওঠ্‌বার উপক্রম কর্‌ছে। রাগে আমার মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে' উঠেছে—মার্‌লাম এক লাথি।—

"রাস্তা দেখে চল্‌তে পারো না শুয়ার!"

মারের চোটে সে আবার পড়ে' গেল—কিন্তু কোন জবাব কর্‌লে না। আমার আরও রাগ হ'ল—আরও মার্‌তে লাগ্‌লাম।

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ীর এক দুয়ার খুলে গেল, লণ্ঠনহাতে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ব্যাপার কি মশাই?"

"দেখুন দিকি মশাই—রাস্কেলটা আমার এতটাকার জামাটা মাটী করে' দিলে—! পথ চল্‌তে জানে না।"

"কে—ও? ওঃ—থাক্‌ মশাই আর মার্‌বেন না—ও বেচারা অন্ধ—বোবা ভিখারী—এইখানেই থাকে।"

তার দিকে চেয়ে দেখি—মারের চোটে সে বেচারা কাঁপ্‌ছে—গা'ময় কাদা। আর আমার দিকে কাতরমুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দু'টি জোড় করে' আছে।

"বনফুল"

অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি

সত্যযুগের মানুষ তার নিজের গ্রামের বাইরে উৎপাদিত জিনিস বড়-একটা দেখ্‌ত না। নানা রকম যন্ত্র-যান আবিষ্কৃত হওয়ার আগে অবধি রাজা বাদ্‌শারাও সচরাচর নানা দেশের জিনিস ব্যবহার করতে সক্ষম হ'ত না। কিন্তু বর্ত্তমান কালে গৃহস্থ লোকের ছেলেরাও স্কুলে যায় ফরাসী সাবান দিয়ে স্নান করে' জার্ম্মান চিরুনি দিয়ে চুল আঁচ্‌ড়ে, ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড় পরে', অষ্ট্রিয়ার পেন্সিল পকেটে করে', ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ঘড়ি হাতে বেঁধে। বাইরের নানা জায়গা থেকে আনা জিনিস আমরা সদা-সর্ব্বদাই ব্যবহার করি। অন্তর্জাতিক বাণিজ্য বল্‌তে এই নানা জাতের মধ্যে জিনিস কেনা-বেচাই বুঝায়। যেমন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে গম, তুলা ইত্যাদি পাঠায় আর ইংলণ্ড পাঠায় ভারতবর্ষকে ম্যানচেষ্টারের মিলের' কাপড়, হাণ্ট্‌লিপামারের বিস্কুট ও আরও অনেক জিনিস। অন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে কি পরিমাণ হয় তা নীচের কটি সংখ্যা থেকেই বেশ বোঝা যাবে। সংখ্যাগুলি শুধু ভারতবর্ষ সংক্রান্ত। অন্য দেশের অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকস্থলে আরও অনেক বেশী। ১৯১৯-২০ খৃঃ অব্দে এক বছরে ভারতবর্ষ অন্য দেশ থেকে ২,০৭,৯৭, লক্ষ টাকার জিনিস কিনে ছিল। তার মধ্যে ৫৪,৭২ লক্ষ টাকার সুতি জিনিস, ২২,৯৯ লক্ষ টাকার চিনি, ১৬,৩৩ লক্ষ টাকার লোহার জিনিস, (যন্ত্র ও রেলের জিনিস ছাড়া) ৩,৭৪ লক্ষ টাকার ঔষধ ইত্যাদি, ৭৭১ লক্ষ টাকার রেশ্‌মি সুতা ও কাপড় এবং ৩,৩৭ লক্ষ টাকার মদ ছিল। এছাড়া আরও হাজার হাজার লক্ষ টাকার অন্যান্য জিনিস ছিল। ভারতবর্ষ ঐ ১৯১৯ ২০ খৃঃ অব্দে ৩,০৯,০২ লক্ষ টাকার জিনিস অন্য দেশে পাঠিয়ে ছিল। এর শত-করা ৫১ ভাগ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলিতে গিয়েছিল, ১৩·৮ ভাগ আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌এ ও ১২৩ ভাগ জাপানে ও বাকি অন্যান্য দেশে। 'এই অন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে কি বিশাল ব্যাপার তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

অনেক জিনিস আছে যা অন্য দেশেও তৈরী হয় আর আমাদের দেশেও তৈরী হয়; আর কতকগুলি আছে যা শুধু অন্য দেশেই তৈরী হয়, আমাদের দেশে তৈরী হয় না, তার মধ্যে কতকগুলি আমাদের দেশে তৈরী হ'তে পারেই না বা হ'লেও বহুকষ্টে হয়, যেমন কএক রকমের খনিজ, যা আমাদের দেশে নেই বা খুব দুর্ল্লভ। আবার অন্য কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলি তৈরী করা যায়, কিন্তু বিদেশী সস্তা দামের জিনিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাজারে টিক্‌তে পার্‌বে না ভয়ে কেউ তৈরী করে না, বা কর্‌লেও শীঘ্রই দেউলিয়া হয়ে যায়। অনেকে হয়ত বহুকষ্টে, বিদেশী জিনিসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে'ও বাজারে থাকে কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে সে-সব জিনিস তৈরী করতে আর কেউ বড় এগোয় না।

দেশের শিল্পকে বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে বঁাচাবার চেষ্টা যদি দেশের রাষ্ট্র করে, তা হলে তাকে সংরক্ষণ-নীতি বলা হয়। সাধারণতঃ দুই উপায়ে দেশের শিল্প সংরক্ষণ করা হয়—(১) দেশের শিল্পকে সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য করে'; (২) বিদেশী ব্যবসাদারের জিনিস বিক্রিতে বাধা দিয়ে। রাষ্ট্র যে-ভাবেই দেশের শিল্পকে সাহায্য করুক্‌ না কেন আমরা তাকে সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োগ বল্‌তে পারি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিদেশীয় বিক্রেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দেশী শিল্পের সর্ব্বপ্রধান শত্রু সে ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসাদারের ব্যবসার পথে বাধা দেওয়াই দেশীয় শিল্প-সংরক্ষণ এবং বিস্তারের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য করাও দরকার;—যেমন নানা প্রকার শিল্পের প্রচার ও বিস্তার চেষ্টা; সেইসব বিষয়ে শিক্ষাদান, সরকারী কারখানা স্থাপন, শিল্প-প্রদর্শনী খোলা, পুরস্কার-ঘোষণা ইত্যাদি। কিন্তু সে-সব আলোচনা করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য, প্রথমতঃ কি ভাবে বাইরের

ব্যবসাদারের বাণিজ্যে বাধা দেওয়া যায় ও দ্বিতীয়তঃ তাতে কি লাভ তা নির্ণয় করা।

বাইরের ব্যবসাদারের বাণিজ্যে বাধা দেওয়ার উপায়—তাদের জিনিসের উপর কর বসিয়ে দেওয়া অথবা তাদের জিনিস দেশে আসা একেবারে বন্ধ করে' দেওয়া। ভারতবর্ষ যখন সূতোর কাপড় বহুল পরিমাণে রপ্তানি কর্‌ত, সে-সময় ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের কাপড়ের উপর অসম্ভব রকম বেশী কর বসিয়ে, কোন কোন রকম কাপড় আম্‌দানী বন্ধ করে', এমন কি সেইসব কাপড়-ব্যবহার আইন-বিরুদ্ধ করে' দিয়ে, ইংলণ্ডীয় সূতোর ও কাপড়ের ব্যবসার বৃদ্ধি সাধন করা হয়। জার্ম্মানী ও আমেরিকার ইতিহাসেও ক্রমাগত ঐরূপ উপায়ে শিল্প-সংরক্ষণের উদাহরণ পাওয়া যায়। বিদেশী জিনিসের উপর কর বসালে সেইসব জিনিসের দাম বাজারে বেড়ে যায়। যথা, বিলাতি কাপড়ের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা কর বসালে, হয় বিলাতি ব্যবসাদারকে তার লাভ (কিছু বা সম্পূর্ণ) ছেড়ে দিতে হবে বা লোক্‌সান দিতে হবে, নয় তাকে ভারতবর্ষের বাজারে কাপড়ের দাম শতকরা ২৫৲ টাকা বাড়াতে হবে। এতে এদেশী কাপড়ের ব্যবসাদারের লাভ হবে, কেননা লোকে বিলাতি কাপড়ের তুলনায় দেশী কাপড় কম দামে পাবে, কাজেই দেশী কাপড়ই কিন্‌বে। দেশী কাপড়ের ব্যবসাদার এই সুযোগে একটু দাম বাড়িয়ে বেশী লাভ করার চেষ্টা কর্‌তে পারে, কিন্তু দেশের অন্য-সব কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, তা বড় সহজ ও সম্ভব হবে না।

আইন করে' কোন জিনিস আম্‌দানী বন্ধ করা যায় এবং খুব ভারি কর বসিয়েও তা করা যায়। শতকরা ৫০০ টাকা কর বসালে সে জিনিস আসা বল্‌তে গেলে বন্ধই হয়ে যাবে—অবশ্য স্থলবিশেষে একেবারে বন্ধ না হতেও পারে।

বিদেশী জিনিসের উপর কর বসালেই যে সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগ করা হয় তা নয়। অনেক সময় কর বসানো রাজস্ব বাড়ানোর পন্থা মাত্র। যেমন আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে মোটরকারের উপর শতকরা ৩০ টাকা কর দিতে হয়। এর উদ্দেশ্য বড়লোকের পকেট হাল্কা করে' গভর্ণ্‌মেণ্টের পকেট ভারি করা; এর উদ্দেশ্য সংরক্ষণ নয়। কেননা আমাদের দেশে মোটর তৈরী হয় না এবং শীঘ্র হবে এমন আশ ও নেই। ফরাসী দেশের শ্যাম্পেনের উপর কর আছে। তার উদ্দেশ্যও রাজস্ব বৃদ্ধি; সংরক্ষণ নয়; কেননা শ্যাম্পেন্ এদেশে হওয়া সম্ভব নয়। কর বসালেই সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগ হয় না, কিন্তু সংরক্ষণ-নীতি ভাল করে' প্রয়োগ কর্‌তে হলে কর বসান দর্‌কার।

কি রকম জিনিসের উপর কর বসান হবে? (১)—যে-সব জিনিস আমাদের দেশে সহজেই তৈরী হ'তে পারে কিন্তু বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয় না। (২) যে-সব জিনিস আমাদের দেশে তৈরী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, যদিও তা তৈরী করা আমাদের পক্ষে অন্য দেশের তুলনায় বেশী কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ।

ছোট ছেলেকে যদি বয়স্ক লোকের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে বলা হয় ত তা মূর্খতা। ছোট ছেলে আগে বড় হোক্, জোরাল হোক, প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হোক, তার পর সে যুদ্ধ কর্‌বে। ফলে হয়ত সেই বেশী জোরাল প্রমাণ হবে। কিন্তু শিশু কখনও বয়স্কের সমকক্ষ হয় না। সেই-রকম, যে-সব শিল্প অল্পদিন মাত্র স্থাপিত হয়েছে বা যেগুলি হতে পারে, তাদের বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে কিছুকাল রক্ষা করা দর্‌কার। তারা কিছুদিন বেঁচে থাক্‌লে বিদেশীর সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে, হয়ত বিদেশীর চেয়ে বেশী সস্তায় জিনিস তৈরী কর্‌বে। কিন্তু প্রথম প্রথম নানা কারণে সস্তায় ভাল জিনিস তৈরী হয় না; অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদিই তার কারণ। কাজেই যে-সব শিল্প আমাদের দেশে সহজেই ও একটু সাহায্য পেলেই গড়ে' উঠ্‌তে পারে সেগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন। অল্প কিছু দিন হয়ত তাতে বেশী খরচে জিনিস তৈরী হবে' কিন্তু শেষ অবধি তাতে লাভ বই ক্ষতি হবে না।

যে-সব জিনিস জাতীয় জীবনের ও জাতির আত্ম-রক্ষার জন্য বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় সে-সব জিনিস অন্য দেশ অপেক্ষা বেশী খরচে হলেও, দেশেই তৈরী হওয়া উচিত। তা নইলে বিপদ্‌কালে হঠাৎ দেখা যাবে সেগুলির একান্ত অভাব। ফল সর্ব্বনাশ।

কোন জাতি যদি তার আত্মরক্ষার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় বন্দুক কামান প্রভৃতি বিদেশ থেকেই আনায়, তা হলে তাকে বিদেশের উপরে নির্ভর করে' থাক্‌তে হয়। এসব ব্যাপারে অপরের উপর নির্ভর করা সুবুদ্ধির লক্ষণ নয়। আজকালকার দিনে আত্মরক্ষা, যুদ্ধ ইত্যাদিতে যন্ত্র যান (রেলগাড়ী, মোটরকার, মোটর সাইকেল, এয়ারোপ্লেন ইত্যাদি), বন্দুক, কামান, গোলাগুলির প্রায় সমান প্রয়োজনীয়। এইসব জিনিস ও তার সরঞ্জাম (টায়ার, তেল ইত্যাদি) দেশে তৈরী হওয়া দর্‌কার। যে জাত ভাবে যে তার দুর্দ্দিন কখনো আস্‌বে না, তার দুর্দ্দিন এসেছে বলে' ধরে' নিলেও চলে। সাবধানের মার নেই, এই সর্ব্বজনজ্ঞাত বাণী অবলম্বন করে' অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি স্বদেশে তৈরী করার বন্দোবস্ত করা উচিত। গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ হয়েছে। ফল—সংরক্ষণ-নীতির প্রধান বিরুদ্ধবাদী (কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বল্‌ছি না) ইংলণ্ডের সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ (The New Tariff for the Protection of Key Industries) ও বহুশত জিনিসের উপর কর স্থাপন। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"। কিন্তু ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি শুধু ঘুম পাড়ান্‌; নিজেরা খুবই সজাগ।

এখন আমরা দেখ্‌ব যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের কি কি গুণ আছে। এগুলি এক এক করে' শুধু দেখে যাব। বিশদ ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

১। সংরক্ষণ শিশু-শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে বড় ও সবল করে' তোলে। সংরক্ষণ ব্যতীত অনেক লাভজনক শিল্প গড়ে' উঠ্‌তেই পারে না। ফলে জাতীয় অবনতি ঘটে। শিশু-শিল্পকে বাঁচাবার জন্যে কর বসান হলে, দেখ্‌তে হবে, (ক) সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প করের সাহায্য ছাড়াও কিছুকাল পরে বিদেশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচ্‌বে কি না, (খ) শেষ অবধি জাতীয় ক্ষতি অপেক্ষা লাভ বেশী হবে কি না। কেননা, সংরক্ষণ যতদিন চল্‌বে তত দিন সস্তা বিদেশী জিনিস কেনা বন্ধ থাকবে। এতে ক্ষতি হয়। কিন্তু শিশু-শিল্প বেড়ে উঠ্‌লে পর জিনিস আরও সস্তা হবে আশা করা যায়, কেননা জাহাজ-ভাড়া ও বিদেশী বণিকের লাভের বোঝা স্বদেশী জিনিসের দামের মধ্যে থাকে না।

২। সংরক্ষণের সাহায্যে জাতীয় উৎপাদনী শক্তি বাড়ে। যেমন ছেলেকে স্কুলে কলেজে পড়াবার সময় কয়েক বছর শুধু খরচই হয়; কিন্তু পরে ছেলের কার্য্যশক্তি গড়ে' উঠ্‌লে সে সেই খরচের চেয়ে অনেক বেশী উপার্জ্জন করে; বা যেমন রেল-লাইন খুল্‌তে কিছুকাল শুধুই খরচ হয় ও পরে লাভ হয়; তেমনি কিছুকাল লোক্‌সান দিয়েও দেশের শিল্প গড়ে' তুল্‌লে ফলে দেশের লোকের কার্য্য-ক্ষমতা বেড়ে যায় ও দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের গতিই ফিরে যায়।

৩। সংরক্ষণের সাহায্যে নূতন নূতন ব্যবসার পথ খুলে যায় এবং লোকে নানা-প্রকার কাজ করার সুবিধা পাওয়ায় অকেজো লোকের সংখ্যা কমে' যায়। আমাদের দেশের গবর্ণমেন্টের ছাপান কেতাব বা তাদের সাহায্যে লেখা কেতাবগুলি পড়্‌লে মনে হয় যেন দেশের বারো আনা রকম লোক বেশ চাষবাস করে' থাকে। কথাটা কিন্তু বিশেষভাবে মিথ্যা। তারা চাষবাস করে' থাকে না, চাষবাসের উপর নির্ভর করে' থাকে। অর্থাৎ কোন জেলাতে যদি চাষের কাজ করে এমন ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক থাকে, ত আরও ৫০ হাজার লোক ভিক্ষা বা অন্য কোন কৌশলে তাদের ঘাড়ে চেপে খেয়ে দিন কাটায়। দেশের জনশক্তিকে চুপচাপ বসিয়ে রাখা সম্বন্ধে ভারত-বর্ষকে হার মানাতে পারে এমন দেশ কোথাও নেই। দেশের ধন-সম্পদ্‌ বাড়াবার উপকরণ দুটি—প্রকৃতি ও জনশক্তি বা শ্রমশক্তি। শ্রমশক্তি যদি কাজের অভাবে অকেজো ভাবে দিন কাটায় তা হলে দারিদ্র্য দেশে না থাকলেই অবাক্‌ হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের সুফল আসবে এই দিক্‌ থেকে। যে বিরাট্‌ জনশক্তি অসাড়ভাবে পড়ে' আছে এদেশে, তাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশে ঐশ্বর্য্য রাখ্‌বার জায়গা থাক্‌বে না। এর উপায়—নানাপ্রকার শিল্পের প্রচার; শিল্প-শিক্ষা দান ও সংরক্ষণ প্রয়োগ।

৪। নানা-প্রকার ব্যবসা গড়ে' তুল্‌তে হলে মূল-ধন দর্‌কার। মূল-ধন আসে অন্য দেশ থেকে ও নিজের

দেশ থেকে। সংরক্ষণ প্রয়োগ করলে দেশের ব্যবসাগুলি অধিক লাভজনক হয়ে ওঠে। ফলে বাইরের ও ভিতরের এই দুই-রকম মূলধনই আরও সহজে ও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ব্যবসা করলে সম্ভাবনা আছে যে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান কিম্বা আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শীঘ্রই সে ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সহজে কে মূলধন সর্‌বরাহ কর্‌বে? কিন্তু সংরক্ষণের সাহায্যে ঐ-সব দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘা লাগাও, দেখ্‌বে মূলধন হু হু করে' আস্‌তে সুরু হবে। "ভারতবর্ষের মূলধন বড় সিন্ধুক-মুখো," ব'লে চীৎকার কর্‌তে ইংরেজরা একটু বেশী ভালবাসে। আকের ক্ষেতে বুনো হাতী ছেড়ে দাও, তার পর বল যে "নির্ব্বোধ চাষা আকের চাষ কর্‌তে চায় না।" সংরক্ষণ-নীতি ভাল করে' ভারতবর্ষে লাগান হোক, দেখি মূলধনের সিন্ধুক-মুখো গতি বন্ধ হয়ে যায় কি না যায়।

৫। সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন কর্‌লে নাকি দেশে জিনিসের দাম বেড়ে যায়। যে-দেশের ব্যবসা কি ভাবে বেড়ে উঠ্‌তে পারে তা কেউ জানে না, সে দেশে এ কথা খাটে না। একবার ব্যবসাগুলি দাঁড়িয়ে গেলে, দেশের ভিতরের ব্যবসায়ীদের পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিনিসের দাম কমে' যাবে। দুই-এক ক্ষেত্রে দাম বিদেশী জিনিসের চেয়ে বেশী থাক্‌তে পারে; কিন্তু তা দিয়ে আমাদের সাধারণভাবে কি করা উচিত, তা ঠিক করা হবে না নিশ্চয়ই। সংরক্ষণ কিছু বরাবর চালান হবে না। (বিশেষ কারণ থাক্‌লে কোন কোন স্থলে ছাড়া।) কাজেই দু-এক জায়গায় তাতে ক্ষতি হচ্ছে দেখ্‌লে তা বন্ধ করা শক্ত হবে না।

৬। জগতের নানা জায়গা থেকে জিনিস কিন্‌লে, বাজার-দাম ক্রমাগত বদ্‌লায়। আজ জার্ম্মানীর মাল সস্তা হল, ফলে ইংরেজী মাল যে কিনেছে তার সর্ব্বনাশ; আবার কাল আমেরিকার মালপত্র আগুন-দর হয়ে গিয়ে যার আমেরিকার উপর সব আশা ভরসা তার দফা নিকেশ কর্‌লে। নিজের দেশের ব্যবসা যতটা সম্ভব নিজেদের হাতে থাক্‌লে বাজার-দরের এই লাফালাফি অনেকটা কমে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা নিরাপদ্ হয়ে আসে। তবে নানাজায়গা থেকে একই জিনিস এলে অনেক সময় একজায়গায় জিনিস না পাওয়া গেলেও অপর জায়গায় পাওয়া যায়।

৭। সংরক্ষণের সাহায্যে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হওয়া বন্ধ হয়। যে-সব জাত শুধু জমির উৎপন্ন জিনিস নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অর্থাৎ যাদের অন্যান্য জিনিস কৃষি-জাত দ্রব্যের বদলে বিদেশ থেকে জোগাড় কর্‌তে হয়, তাদের ক্রমাগত জমির উর্ব্বরতার উপর অত্যাচার কর্‌তে হয়। দেশের লোক হয় জমি চাষ করে, নয় বসে' খায়। এমন অবস্থায় বিদেশী কার্‌খানার জিনিসের উপর কর বসালে' সেই জাতীয় জিনিসগুলির দাম বাড়ে ও অকেজো লোকদের কাজে লাগার সম্ভাবনা বেশী হয়। ফলে জমির উপর অত্যাচার করে' ফসল উৎপাদন করে' তার বদলে বিদেশী মাল জোগাড় করার প্রয়োজনীয়তা কমে' যায়। জিনিসের দাম গোড়ায়, একটু বাড়্‌তে পারে কিন্তু জমির উর্ব্বরতা রক্ষা হওয়ায় ও অকেজোরা কাজে লাগায় জাতীয় লাভ তার চেয়ে ঢের বেশী হয়।

৮। জাতীয় জীবন-সংগ্রামে বা অন্যজাতির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে-সব জিনিস অবশ্যপ্রয়োজনীয় সেগুলি দেশেই উৎপাদিত হওয়া উচিত। যে-সব জিনিসের সর্‌বরাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা সেগুলিকে অল্পবিস্তর ক্ষতি স্বীকার করে'ও স্বদেশে উৎপাদন করা উচিত (সম্ভব হলে)।

৯। সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োগ অন্য উদ্দেশ্যেও সম্ভব। যেমন অপর দেশে আমাদের দেশের জিনিসের উপর কর বসালে বা অন্যভাবে আমাদের অপমান ও অপকার কর্‌লে তাদের জিনিসের উপরেও কর বসিয়ে তাদের জব্দ করা যায়। এটা ঠিক সংরক্ষণ নয়, বরং আক্রমণ। কিন্তু যুদ্ধের শাস্ত্রে বলে, যে, আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভাল রকম করে' আক্রমণ করা।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

রমলা

(২৫)

দেড় মাস পরে।

এই দেড়মাসে রমলাদের সংসারে সব ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মামাবাবুর মৃত্যুর পর রজত একেবারে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর সে হতবুদ্ধি হইয়া কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। প্রথমতঃ শোকের আঘাত, তার পর অর্থের চিন্তা। মামা-বাবু এতদিন রজতের সংসার স্নেহ দিয়া অর্থ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। শৈশব হইতে রজত মামাবাবুর আদরে আব্দারে মানুষ। সেই মামাবাবুকে হারাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া গেল। মামাবাবু তাঁর সাত আলমারী বই ও সেভিংস্ ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছাড়া কিছুই রাখিয়া যান নাই। বইগুলি তিনি কলেজের লাইব্রেরীতে দিয়া যাইবেন, এইরূপ ইচ্ছা ছিল। রমলা সেগুলি সযতনে গোছাইয়া সাজাইয়া কলেজে পাঠাইবার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

সকালে রজত বিছানায় এলাইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, সেভিংস্ ব্যাঙ্কে কয়েকশত টাকা আছে মাত্র, সবগুলি এখন খরচ করা ঠিক হইবে না। টাকা রোজগার করিবার কি করা যায়। টাকার জন্য সে কোনদিন ভাবিতে বসে নাই; লোককে খোসামদ করা, চাকরী করা তাহার হয়ত পোষাইবে না। কিন্তু টাকা ত চাই। তাহার কয়েকখানি ছবি সে কয়েকজন পরিচিতকে বিক্রয় করিতে দিয়াছে। তাহার ছবি যে দেখিয়াছে সে-ই খুব প্রশংসা করিয়াছে, কিন্তু কিনিতে কেহই চাহে নাই। বড় জমিদার-বাড়ী কি রাজবাড়ী গেলে কি সাহেব-মেমদের চোখে পড়িলে হয়ত বিক্রি হইতে পারে, কিন্তু কে বিক্রয় করিয়া দিবে? বন্ধু বলিতে তাহার প্রায় কেহই নাই, চিরকালই সে কুণো, এক সত্যিকার বন্ধু ছিল, সে দূর দেশে। সেই জার্ম্মানী হইতে ললিত তাহাকে খুব শীঘ্র কয়েকখানি ছবি পাঠাইয়া দিতে লিখিয়াছে। নূতন ভাল ছবি আঁকিবার মত তাহার মন বা উৎসাহ নাই। তাহার কি কি ছবি পাঠান যাইতে পারে তাহা রজত ভাবিতে লাগিল।

রমলা ধীরপদে ঘরে ঢুকিয়া রজতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—বা, এখনও শুয়ে আছ? আজ চাল কিনে না আন্‌লে ভাত পাচ্ছ না। ওঠ, বিছানাটা রোদে দি।

নাও, বলিয়া একটু বিরক্তভাবে রজত বিছানা হইতে উঠিয়া ইজিচেয়ারে একটা বালিশ লইয়া শুইল।

বিছানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে রমলা বলিল,—বা মজা! আবার শুলে? দেখ, যাবার সময় ডাক্তার-বাবুর ওখানে এক-বার যেও ত, খোকার পেটের অসুখটা একেবারে সারছে না।

রজত কোন উত্তর দিল না।

চাদর পাট করিতে করিতে রমলা বলিল,—আর দেখ, মামাবাবুর বইগুলো পাঠাবার একটা ব্যবস্থা কর। আর ওই যন্ত্রপাতিগুলো তাঁর কে প্রিয় ছাত্র ছিল, তাঁকেই নয় দিয়ে দাও।

তোমার যে তর সইছে না রমলা, বলিয়া রজত বালিশটা আর-একটু উঁচু করিয়া মাথায় দিল।

রমলা নীরবে বালিশের ওয়াড়গুলি খুলিতে লাগিল। কিন্তু সাংসারিক কথা না বলিলে সংসার কিরূপে চলিবে! একটু পরে রমলা ধীরে বলিল,—দেখ, আজ ত রবিবার, কাল পোষ্টাফিস থেকে কিছু টাকা বের করে' এন। হাতে প্রায় কিছুই নেই, অনেক ধার পড়ে গেছে।

হুঁ, বলিয়া রজত শূন্যনয়নে রমলার দিকে চাহিল।

—আর, নীচের ভাড়াটেরা বল্‌ছিলেন, তাঁদের কলটার কি খারাপ হয়ে গেছে,—

রজত কোন উত্তর দিল না।

—হাঁ, ফুড্‌টা ফুরিয়ে গেছে, বুঝ্‌লে, একটা ফুড্‌ নিয়ে এস। আর, তোমার ছবির কোনটা বিক্রি হল? অমর-বাবু কি ওষুধের বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতে দেবেন বল্‌ছিলেন—

—তুমি একটু চুপ করবে, রমলা!

ম্লানমুখে রমলা ময়লা চাদর ও বালিশের ওয়াড়গুলি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে রমলা আবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রজত তেম্‌নি এলাইয়া হতাশভাবে ইজিচেয়ারে পড়িয়া আছে। সে মৃদুস্বরে বলিল,—ওগো, ওঠ, স্নান করে' নেও। রমলা বুঝিল আজ তাহাকে দিয়া কোন কাজ করান চলিবে না।

রজত নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

আব্‌দার অনুনয়ের সুরে রমলা বলিল,—ওগো ওঠ, এগারটা বেজেছে, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

রজত বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল, তেম্‌নিভাবে শুইয়া থাকিয়াই বলিল,—ক্ষিদে পেয়ে থাকে ত তুমি খেয়ে আমার ভাতটা চাপা দিয়ে রাখগে।

রমলা কঠোর কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে জিহ্বাকে সংযত করিল। সেদিনকার 'মেলে' ললিতের যে চিঠিখানি পাইয়াছিল, তাহারি মধ্যে একটি লাইন তাহার মনে পড়িল—বৌদি, সংসারের সকল দুঃখ-আঘাতে তোমার মুখের অনুপম হাসি যেন কখনও ম্লান না হয়, তাহলে রজত একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌বে। না, সে হার মানিবে না। স্থির প্রসন্নচিত্তে সে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল। রজতের হাতটি টানিয়া লইয়া চুলগুলিতে হাত বুলাইতে লাগিল। হাতের ছোঁয়ায় তাহার মুখ আরও ম্লান হইয়া গেল, রজতের কপালে হাত বুলাইয়া সে শিহরিয়া উঠিল, ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—ওগো, তোমার জ্বর হয়েছে?

করুণ কাতর চোখে রজত রমলার দিকে চাহিয়া অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল—রমু।

রমলা জ্বরের আভামণ্ডিত এই পরমপ্রিয় চিরসুন্দর মুখখানির উপর কোমল আঙুলগুলি বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ-করুণচোখে চাহিয়া রহিল।

তখন বেলা প্রায় একটা হইবে। রমলা রজতের গেঞ্জি রুমাল ও খোকার জামা-কাপড়গুলি বারান্দার কাঠ হইতে তুলিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। কাপড় জামা তুলিতে তুলিতে সে বারান্দার কোণে মেজেতে রেলিং ঠেসান দিয়া বসিয়া পড়িল। রজত অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া একটু শান্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে, এখন তাড়াতাড়ি ঘরে যাইবার দর্‌কার নাই। তাহার মন্‌টা যখন ভারী হইত সে বারান্দার এই কোণটিতে বসিয়া তাহাদের একতলার ভাড়াটেদের জীবনযাত্রার ধারাটা দেখিত। ভাড়াটে একজন যুবক কেরানী। তিনি তাঁর স্ত্রী, একটি খোকা ও দুইটি ছোট মেয়ে ও তাঁহার বৃদ্ধ মাতাপিতাকে লইয়া একতলার তিনখানি ঘর ও বারান্দা জুড়িয়া সংসার পাতিয়াছেন।

রমলা বসিয়া দেখিতে লাগিল নীচের রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দায় কেরানীবধূ উমা কিংখাবের উপর জরি ও রেশমের শিল্পকাজকরা তালিময় আসন পাতিল, আসনটি তার শ্বশুরের পিতার আমলের। আসনের সম্মুখে ঝক্‌ঝকে রূপার থালায় সরু চালের ধপ্‌ধপে ভাত বাড়িয়া আনিয়া রাখিল; তার পর রূপার পাথরের কাঁসার নানা আকৃতির নয়টি বাটি ভরিয়া নয় প্রকার ব্যঞ্জন থালা ঘিরিয়া সাজাইল, শ্বেতপাথরের গেলাসে জল দিয়া থালার দুইদিকে দুইটি মোমবাতি জ্বালাইয়া তাহার শ্বশুরকে ডাকিল,—বাবা। প্রায়-সত্তরবৎসর-বয়স্ক এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিতে দিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আসনে বসিলেন। তিনি একদিন যে সুঠাম সুপুরুষ ছিলেন তাহা তাঁহার জরাজীর্ণ দেহ দেখিয়া এখনও বোঝা যায়; এখন বাতে পঙ্গু—একটু কুঁজো হইয়া গিয়াছেন; মুখখানি দুঃখ-দৈন্যের তাপে কুঞ্চিত, তবু সমস্ত মুখে একটা তেজের দীপ্তি রহিয়াছে। যৌবনে তিনি লক্ষপতি ছিলেন, এখন কপর্দ্দকহীন হইয়া গরীব কেরানী পুত্রের আশ্রয়ে থাকিলেও লাখ্‌পতির খাবারের চালটা ছাড়িতে পারেন নাই। শুক্তানি, মাছের-মুড়ো-দেওয়া ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া দই-মাছ, অম্বল, ক্ষীর ইত্যাদি একুশ ব্যঞ্জন না হইলে তাঁহার খাওয়া হইত না, এখন নয়টি তরকারিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে; আটদিকে আট প্রদীপ জ্বালাইয়া খাওয়া ছিল তাঁর খেয়াল; এখন সেখানে দুইটি বাতি জ্বলে।

বৃদ্ধ খাইতে বসিলেন, উমা পাশে দাঁড়াইয়া পাখার মৃদু বাতাস করিতে লাগিল, বাতাস হইবে অথচ বাতি নিভিবে না। শাশুড়ী ঘরে বসিয়া মালা জপিতেছিলেন, তিনি নামাবলী গায়ে দিয়া কাশিতে কাশিতে বাহিরে আসিয়া স্বামীর খাওয়ার তদারকে বসিলেন। স্বামীর খাওয়া দেখা ও বধূমাতার রান্না সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁর

রোজ চাই-ই; তিনি তরকারি দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারিতেন কোনটায় ঝাল বেশী হইয়াছে, লবণ কম হইয়াছে; স্বামী চাখিয়া আপত্তি করিলেও সে মতভেদ টিকিত না;—তরকারির বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার ভুল হইতেই পারে না। উমা নতমুখে দাঁড়াইয়া পাখা করিতে লাগিল, তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে দুই কন্যা আসিয়া দাঁড়াইল—একজনের বয়স চার, আর একজনের তিন; দুইজনেরই কোন পরিধান ছিল না; তাহার খোকাটি ঘরে ঘুমাইতেছিল, মেয়ে দুইটি মায়ের আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ঠাকুরদাদার খাওয়া দেখিতে লাগিল।

এই শুভ্রবসনাবগুণ্ঠিতা মঙ্গলকর্ম্মরতা বধূটির দিকে চাহিয়া রমলা বসিয়া রহিল। বয়সে সে রমলার চেয়ে ছোটই হইবে। উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ, সুগঠিত ছিপ্‌ছিপে চেহারা, মুখখানি স্নিগ্ধতা গাম্ভীর্য্যে ভরা, মাঝে মাঝে হাসিখুসি ভাব, তরুণী গিন্নির মত। ভোর পাঁচটা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত নয়টা পর্য্যন্ত রমলা তাহাকে অবিশ্রান্ত কাজ করিতে দেখে; বাড়ীতে ঝি নাই; বিছানা তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না করা, বাসন মাজা, ছেলেমেয়েদের সব কাজ করা, শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা করা, সব কাজ তাহাকে করিতে হয়। স্বামীকে নয়টার মধ্যে আফিসের ভাত দিতে হয়; তার পর শ্বশুরকে নয়টি তরকারী রান্না করিয়া খাওয়াইতে একটা বাজে, শাশুড়ীকে খাওয়াইয়া রান্নাঘরের সব কাজ সারিয়া নিজে খাইতে তিনটে হয়। ঘণ্টাখানেক ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করিয়া টেবিল বিছানা ঝাড়িয়া উনানে আগুন দিতে হয় স্বামীর সন্ধ্যার জলখাবারের জন্য। কিন্তু তাসের আড্ডা হইতে স্বামী কোন দিন দশটা কোনদিন এগারটায় ফেরেন। শ্বশুর মহাশয় যে এক বেলা খান, এই রক্ষা। বৃদ্ধা শাশুড়ী মালা জপিতে জপিতে বৌমাকে কখন তিক্ত কখন বা পরিহাসের সুরে সংসার চালাইবার সম্বন্ধে তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা বলা ছাড়া বিশেষ কিছু সাহায্য করেন না। অবশ্য তিনি তাঁর নাত্‌নীদের দুপুর সন্ধ্যা যখন খুসি গল্প বলিতে বসেন, আর নাতিটিকে দুইবেলা ঘুম পাড়ান। ছোট ছেলেমেয়েদের আট্‌কাইয়া রাখিলেও যে কি সুবিধা, কি সাহায্য হয় তাহা গৃহকর্ম্মরতা বহুসন্তানবতী মাতারা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই অবগুণ্ঠিতা তরুণী বধূ নীরবে খাটিতেছে আর খাটিতেছে, মুখে চোখে ঘোমটার ঠুলি বাঁধিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনের পর দিন ঋতুর পর ঋতু একই কাজের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকিয়া ঘুরিতেছে,—শাশুড়ীর ঝঙ্কারে কোন সাড়া দেয় না, শ্বশুরের আদরে অতি উৎফুল্ল হইয়া উঠে না, মেয়েদের আব্‌দারে কান্নায় বিচলিত হয় না, শুধু খোকার মিষ্ট হাসিতে মৃদু মধুর হাসে, কিন্তু তাহার সহিত একটু খেলা করিবারও সময় তাহার নাই। রমলা যখনই তাহাকে দেখে, তখনই সে কোন কাজ করিতেছে—বাসন মাজিতেছে, কাপড় কোঁচাইতেছে, উনানে গোবর লেপিতেছে, খোকাকে দুধ খাওয়াইতেছে। এই নির্ব্বাক্ অবগুণ্ঠিত নারীযন্ত্রটির দিকে চাহিয়া রমলার মাঝে মাঝে গা রি রি করিত, কেন সে বিদ্রোহ করে না! সে আশ্চর্য্য হইত, দিনের পর দিন এত কর্ম্ম করিবার অফুরন্ত শক্তি এ ছোটমেয়ে কোথা হইতে পায়? রমলার সহিত ভাব করিবার, গল্প করিবারও তাহার অবসর ছিল না, আর নীচে হইতে চেঁচাইয়াও সে কথা কহিবে না। তবু মাঝে মাঝে যেটুকু আলাপ হইত তাহাতে রমলা বুঝিয়াছিল, মেয়েটি বেশ সুখেই আছে, এত কাজের বোঝায়, এই খাটুনীর জীবনের জন্য সে কোন দুঃখই করে না, এ যে তাহার ভাগ্য, কাহার বিরুদ্ধে সে নালিশ করিবে? তাহার অন্তরে কোন ক্ষোভ নাই। মনে মনে রমলা এই তরুণীবধূকে শ্রদ্ধা করিত, আপন গৃহকর্ম্মে শ্রান্তি অবসাদ বোধ হইলে এই মেয়েটির কাজকরা কিছুক্ষণ দেখিত, তখন সে নিজের বুকে বল খুঁজিয়া পাইত।

শ্বশুরের খাওয়া শেষ হইল। উমা পাখা রাখিয়া আঁচাইবার গাড়ু হইতে জল ঢালিয়া দিল, খড়কে-কাঠি দিল, আসনটি তুলিয়া রাখিল। মেয়ে দুইটি পাতের ওপর কাকের মত পড়িয়া ঠাকুরদার ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহার করিতে সুরু করিল। তাদের দিকে একবার স্নেহচোখে চাহিয়া উমা উপরদিকে চাহিতেই রমলার সঙ্গে চোখে চোখে চাওয়াচাওয়ি হইয়া গেল, রমলার দিকে মৃদু মধুর

হাসি পাঠাইয়া সে শ্বশুর মহাশয়ের গামছা আনিতে ঘরে ঢুকিল।

এই কল্যাণী তরুণী লক্ষ্মীর মধুর হাসিটি রমলার এখন বড় প্রয়োজন ছিল। রমলাও তাহার দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিল, বহুদিন পরে তাহার মুখে একটু হাসি খেলিল। দুঃখ-দৈন্যের আঁধার রাতে নারীর মুখের শুকতারার দিকে চাহিয়া পুরুষ নির্ভয়ে আনন্দে তরী বাহিতে পাবে, নারীর মুখের হাসির আলো না দেখিলে সে যে পথহারা। স্থির-প্রসন্ন-চিত্তে সব জামাকাপড় তুলিয়া রমলা স্বামীর রোগশয্যার পাশে গিয়া বসিল।

(২৬)

রজত প্রায় দুই সপ্তাহ অসুখে ভুগিল। কয়েকদিন হইল পথ্য পাইয়াছে। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া রমলা তখনও তাহাকে উঠিতে দিত না। সেদিন সকালে অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম রুটি চা খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া রমলা রান্নার কাজে গিয়াছিল। বিছানায় অর্দ্ধহেলান ভাবে শুইয়া প্রভাতের আলোর দিকে উদাসভাবে চাহিয়া রজত রমলার আগমন মনে মনে প্রতীক্ষা করিতেছিল, বিশেষ কিছু করা বা ভাবার মত তাহার যেন শক্তি নাই। অসুখের পর রমলা তাহার অনেক কাজ কমাইয়া রজতের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াছিল। তাহাকে বই পড়িয়া শোনান, অকারণ বসিয়া গল্প করা, পিয়ানো বাজান ইত্যাদি নানা চিত্তরঞ্জন কাজ করিয়া রমলা রজতকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও আনন্দিত রাখিত।

রোগশয্যায় মানুষের মধ্যের চিরকালের শিশুটি জাগে, সে নারীর সেবাহস্তের শান্তিস্পর্শের জন্য তৃষিত হইয়া উঠে। তখন মানুষের অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম হয়। প্রতিদিন আপন স্বার্থের অন্ধবেগে কাজের ধূলা উড়াইয়া চলিতে চলিতে ঘরের কোণে কোণে আনন্দ চাপা পড়ে; যে-সব ছোটখাট কথা, খুঁটিনাটি ঘটনা লইয়া জীবনের মালাগাঁথা, সেই প্রাত্যহিক কথা ও কাজগুলির বুকে লুকান অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগশয্যায় জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত নূতন করিয়া আবিষ্কার করা যায়—একটু পাখার বাতাস, মাথায় হাতের স্পর্শ, এক গেলাস জল গড়াইয়া দেওয়া, একটু মুখের হাসি, শাড়ীর পাড়ের রং, একটু প্রভাতের আলো, একটি ফুলের গন্ধ, আস্তে আস্তে কয়েকটি মিষ্ট কথা—প্রত্যেক জিনিষ নূতন রসে অনুভব করা যায়। রজতও রোগশয্যায় শুইয়া রমলাকে নূতন করিয়া পাইল।

কিন্তু রমলা ঘর হইতে চলিয়া গেলেই তাহার মন উদাস হইয়া উঠিত, কত ভাবনা আসিত, কি করিয়া সংসার চালাইবে তাহার উপায় খুঁজিয়া পাইত না।

রমলা কৈ আসিল না। সে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত, তাহার কাজের দুই একটি শব্দ কানে আসিতেছে, নিশিজাগরণক্লান্ত সেবাক্লিষ্ট তাহার মুখখানি কি মিষ্টি, সেই মুখখানির দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া থাকিবার জন্য সে বুভুক্ষু। কিন্তু রমলা খাটিয়া খাটিয়া কি রোগা হইয়া গিয়াছে!

বিছানায় অর্দ্ধহেলানভাবে শুইয়া প্রভাতাকাশের দিকে চাহিয়া রজত ভাবিতেছিল, হয়ত তাহার বিবাহ করা উচিত ছিল না, হয়ত কোন আর্টিষ্টের বিবাহ করা উচিত নয়। বিধাতা তাহাকে এমন আশ্চর্য্যকর সৃষ্টি-শক্তি দিয়াছেন, কিন্তু সংসারের সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি এত কম দিয়াছেন কেন! যাহাকে তিনি ভাবুক করিলেন, পৃথিবীর বস্তুর ঘা খাইতে খাইতে তাহাকে কি মরিতে হইবে! অর্থের জন্য সুখের জন্য সে গ্রাহ্য করে না, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুপুঞ্জকে তুচ্ছ করিয়া সাতরং-এর স্বপ্নালোকে সে আনন্দে বাস করিতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গিনীকে সে কিরূপে দুঃখের ভার বহিতে দিবে?

সে ছবি আঁকিতে পারে, তাহার কি দাম নাই? এদেশে এ সমাজে সে কি বাজে লোক? ললিত যে বলিয়াছিল, সে ভ্যাগাবণ্ড, তাহার চেয়ে কলের মজুরের, অফিসের কেরানীর বেশী দাম, তাহার চেয়ে যান্ত্রিক ও ব্যবসাদারের এদেশে বেশী দরকার। আচ্ছা তাই মানিয়া লইলাম, তাহা হইলেও আর্টিষ্টের কি দরকার নাই? আছে, বড়লোকের ছবি আঁকিতে পার, বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিতে পার, বর্ত্তমান বণিক্‌সভ্যতার এক যন্ত্র হইতে হইবে। যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর স্পর্শে প্রাণের শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার এক-একটি পাপ্‌ড়ি সে সমাজকে দিতে চায়, তাহার দাম সে চায় না, কেন না একটা ছবির কত দাম কে ঠিক করিতে পারে? সে শুধু চায় তাহার স্রী

পুত্র লইয়া সুখে শান্তিতে থাকিতে, আর্টিষ্টের যেমন জীবন যাপন করা দর্কার, সমাজ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিক। কিন্তু সমাজ ত প্রেমে প্রেমে সম্মিলনের ভূমি নয়, এ যে সংগ্রামের ক্ষেত্র, এ অর্থের জন্য বীভৎস হানাহানি কাড়াকাড়িতে শিল্পী যে যোগ দিতে অসমর্থ।

ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত হইয়া রজত দরজার দিকে তাকাইল, রমলা যদি আসিয়া পড়ে তবে তাহার ভাবনার স্রোত বন্ধ হয়। দেখিল খোকা তাহার পুতুলের বোঝা লইয়া মাতালের মত অসম পদক্ষেপে ঘরে আসিয়া ঢুকিল—তাহার দুই বগলে টেডী ভাল্লুক ও কুকুর, দুই হাতে এক বাঁদর ও এক নিগ্রো মেয়ে। পুত্রকন্যাদের বোঝায় সে বিব্রত হইয়া ডাকিল,—বাবা! শিশুর হাস্যে ও আহ্বানে রজত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কলালক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যকমলের এই একটি পাপ্‌ড়ি আজ তাহার দুয়ারে আনন্দের অতিথি, সেই অতিথিকে যথোচিত সমাদর করিতে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। খোকা ও তাহার খেল্‌না লইয়া রজত খেলিতে সুরু করিল। খোকা আব্‌দার জুড়িল,—বাবা বাঁশি। ডেস্‌ক্ হইতে বাঁশি বাহির করিয়া রজত বাজাইতে সুরু করিল, আর খোকা এক কোলে বাঁদর ছেলেটিকে আর এক কোলে কাফ্রী মেয়েটিকে লইয়া চুল দোলাইয়া মাথা হেলাইয়া কোমর বাঁকাইয়া শিশু কৃষ্ণের মত বাঁশির সুরে সুরে নাচিতে সুরু করিল। সে মধুর আনন্দদৃশ্যে রজতের শিল্পী-প্রাণ জাগিয়া উঠিল। এইটুকু দেহের ভিতর অসীম মাধুর্য্য ভরা—সে যাহা করে তাহাই সুন্দর, মধুর। সে যখন বালিশে কাত হইয়া ঘুমায়, সে যখন জাগে, সে যখন কথা কয়, সে যখন নীরবে চাহিয়া থাকে, সে যখন হাসে, সে যখন মুখ ভার করিয়া ঠোঁট ফুলায়, সে যখন চলে, সে যখন চলিতে চলিতে পড়িয়া যায়, সে যখন বসে, যখন বসিতে বসিতে শুইয়া পড়ে, সে যখন বাঁদরটাকে আদর করে, সে যখন মেয়েটাকে মারে, সে যখন খায়, যখন মিছামিছি ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়—তাহার সব কাজের ভঙ্গী, দেহের সব গতি কি সৌন্দর্য্যে ভরা, কি মিষ্ট। এখন তাহার হীরার মত দুইটি চোখ জ্বলিতেছে, কাফ্রী মেয়েটিকে বুকে জড়াইতেছে, পা দুইটি নৃত্যদোদুল হইয়া উঠিতেছে—এ মধুর ছবিটি রজত একা উপভোগ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছিল না। সে রমলাকে ডাকিল—ওগো দেখে যাও, দেখে যাও।

রমলা রান্নাঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া বলিল—কি, আমার মাংস পুড়ে যাবে, এখন যেতে পার্‌ব না।

রজত আনন্দে উচ্চস্বরে ডাকিল,—ওগো একটু পুড়ুক, তুমি শীগ্‌গির এস।

এক হাতায় দুই খণ্ড মাংস লইয়া রমলা দরজা খুলিয়া চকিতপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,—কি? বা বা বেশ নাচ হচ্ছে, তুমিও সুরু কর।

—তুমিও এস, ওর না হয় কাফ্রীমেয়েটা আছে।

—যাও। দেখ ত মাংসটা কেমন হয়েছে।—বলিয়া একটুক্‌রা মাংস রজতের মুখে পুরিয়া দিল।

রজত খাইতে খাইতে বলিল,—বা বেশ হয়েছে, তুমি বাস্তবিকই লক্ষ্মী, বিনা নুনে মাংস রাঁধ্‌তে পার, অথচ কি মিষ্টি।

বা নুন দিইনি বুঝি, বলিয়া অপর মাংসখণ্ড নিজের মুখে পুরিয়া হাতাটা রজতের হাতে দিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া মাংস চিবাইতে চিবাইতে চুমো খাইতে সুরু করিল।

রজত বলিল,—কি, আমায় রান্নাঘরে যেতে হবে?

—না, গো না, তোমরা নাচো গাও,—বলিয়া হাতাটা রজতের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া খোকাকে নামাইয়া রমলা ত্বরিত পদে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরে গিয়া মাংসে লবণ দিতে দিতে সে মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিল,—

বিনা নুনে রাঁধ, সাজ
বিনা চুনে পান,
টাকা বিনা বিয়ে করে'
কর নাচ গান।

এরূপ রমলা-রচিত গান অনেক আছে। তাহারই আর-একটি গান একটু বদল করিয়া রজত খোকাকে কোলে দোলাইতে দোলাইতে গাহিতেছিল,—

তবে আমার খোকা
হোস্‌নেরে তুই বোকা,
তোর বাবা আস্ত গাধা,
তোর মা মস্ত খ্যাংা,

রাঁধেন শুধু ধোঁকা,
খাওয়ান শুধু ধোঁকা ।

রজতের যখন গান শেষ হইল তখন সে শুনিতে পাইল, রমলা আর-একটি গান সুরু করিয়াছে,—

রাঁধি গো রাঁধি, যাই গো রেঁধে,
মাটির উনুন জলে গো, কোমর বেঁধে
রাঁধি গো, রাঁধি...

কিছুক্ষণ খোকার সহিত খেলা করিয়া রজত ক্লান্ত হইয়া খোকাকে ছাড়িয়া দিল। নারী তাহার শিশুকে লইয়া ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষ তাহা পারে না। সকল দুঃখদৈন্যের মধ্যে শিশুই নারীর আনন্দের আশ্রয়, তাহার স্বপ্নের স্বর্গ, শান্তির ক্রোড়, প্রতিদিনের নবজীবনের শক্তির উৎস। পুরুষ শিশুর মধ্যে পূর্ণ শান্তি পায় না; সে যে বীর, সে নারীকে প্রেম দিয়া জয় করিয়া আপন পৌরুষ দিয়া গর্ব্বের সহিত বহন করে, নারীকে সুখে আনন্দে রাখাতেই পুরুষের আনন্দ-সার্থকতা। বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া রমলার দুঃখের কথা ভাবিয়া রজতের মনে ধিক্কার হইল। অসুখ হইবার আগে তাহার এক বন্ধু এক আফিসে চাকরীর সন্ধান দিয়াছিল, রজত চাহিলে তাহার পিতার সুপারিসে চাকরীটি হইতে পারে। রজত ভাবিতেছিল, চাকরীটি লইবে কি না রমলাকে ডাকিয়া পরামর্শ করে।

খোকা রান্নাঘরে আসিয়া জালাতন করাতে রমলা তাহার পিঠে অতি মৃদু আঘাত করিল। আঘাতের ব্যথায় নয়, অভিমানে খোকা কান্না সুরু করিল। সে কান্না রজতের কানে সূচের মত আসিয়া বিঁধিতে লাগিল, বারিভূষিত কদম-গাছটির দিকে চাহিয়া তাহার যেন কান্না পাইল। বুঝিল বহুদুঃখে রমলা খোকার গায়ে হাত দিয়াছে।

খোকার কান্নার দিকে স্নেহকরুণনয়নে চাহিয়া মাংসটা উনান হইতে নামাইয়া রমলা খোকাকে কোলে করিয়া শোবার ঘরে গেল। খোকা মায়ের গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল. কিন্তু রমলা তাহাকে দোলায় বসাইয়া একটু দোল দিতেই সে হাসিয়া উঠিল। তাহার জন্য দই ও রসগোল্লা আনিতে দিবে ভাবিয়া পয়সা লইবার জন্য বাক্স খুলিয়া দেখিল মোটে তিনটি পয়সা পড়িয়া আছে। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে যা কিছু আনা হইয়াছিল সব রজতের অসুখে খরচ হইয়া গিয়াছে। ম্লান হাসিয়া খোকার গালে চুমো খাইয়া মৃদু দোলা দিতে দিতে রমলা গানের সুরে বলিয়া উঠিল,—

Money, money, money,
Brighter than sunshine, sweeter than honey!

এই বিজাতীয় কথাগুলি শুনিয়া খোকা মায়ের দিকে ভর্ৎসনাকরুণ নয়নে চাহিতেই রমলা হাসিয়া তাকে বুকে তুলিয়া চুমো খাইয়া বলিল—এই যে আমার মণি, মণি, মাণিক! এটা হচ্ছে brighter than sunshine, sweeter than honey.

খোকার কান্না কানে আসিতে রজত একটু অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিছানা হইতে উঠিয়া দরজা পার হইয়া বারান্দায় বাহির হইতেই রমলার ক্লান্তকরুণস্বর তাহার কানে আসিয়া কহিল—money, money, money.

তাহাকে কে যেন চাবুক মারিল। আর সে অগ্রসর হইয়া রমলার কাছে আসিতে পারিল না। ঘরে ঢুকিয়া সেই বন্ধুকে চিঠি লিখিতে বসিল, সে কেরানীর চাকরী লইবে। চিঠিখানি শেষ করিয়া রজত চুলগুলি রোগশীর্ণ আঙ্গুল দিয়া টানিতে টানিতে অতি অবসন্ন হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। শুষ্ক কদমগাছে একটি শীর্ণ পাখী বসিয়া আছে, একটি খোঁড়া কুকুর পোড়ো জমির আঁস্তাকুড়ে আহারের সন্ধান করিতেছে। প্রভাতের প্রখর আলোর দিকে চাহিয়া থাকিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। সে দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল, কখন রমলা আসিবে।

রমলা তখন চেয়ারে দুলিতে দুলিতে খোকাকে বুকে করিয়া আদর করিতেছিল—মণি আমার, রাজা আমার, মাণিক আমার, মিষ্টি।

(২৮)

সেই সময় যতীন তাহার আলিপুরের বাড়ীতে ঘুম হইতে জাগিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল। রাত্রি তিনটে পর্য্যন্ত সে কাজ করিয়াছে, আজ উঠিতে একটু বেলা হইয়া গিয়াছে, তার জন্য সে দুঃখিত নয়, সদ্যজাগ্রত
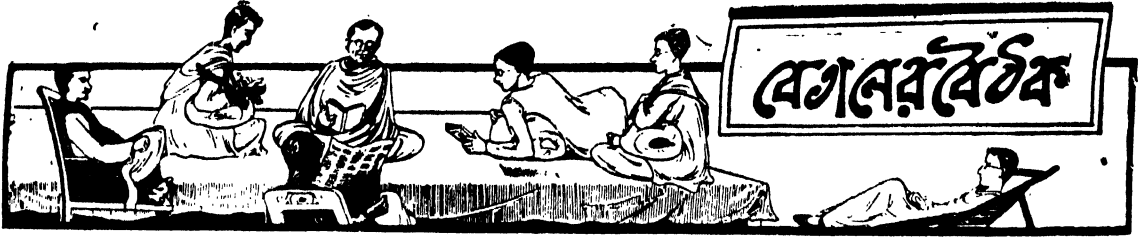
জিজ্ঞাসা

(১১৫)

ভারতে দ্বৈতমত

ভারতে দ্বৈতমত কত কাল হইল ও কাহার দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে ?

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১১৬)

গোরুর নূতন বাছুরকে খুর খাওয়ানো

আমাদের এই জায়গায় (চট্টগ্রাম জেলায়) গরুর নূতন বাছুর হইলে উহার খুরের তলা হইতে কিয়দংশ কাটিয়া কচু-পাতায় মুড়িয়া গরুকে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। উহার কি কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে ?

শ্রী অবনীমোহন দাসগুপ্ত

(১১৭)

ধন্বন্তরি

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থ-প্রণেতা মহর্ষি সুশ্রুত বলেন যে মদীয় শিক্ষক ধন্বন্তরি ইন্দ্রের শিষ্য এবং কাশীরাজ দিবোদাসই ধন্বন্তরি। কিন্তু বেদব্যাস-মতে ধন্বন্তরি বৈদ্যরাজ-রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ, তিনি কাহারও শিষ্য নহেন। এই বিভিন্ন উক্তির সত্যতা ও সামঞ্জস্য নির্ণয় করা যায় কিরূপে ?

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা

(১১৮)

কুমিল্লায় সুজা মস্‌জিদ্‌

কুমিল্লা সহরের উত্তরাংশে (Suburb) একটি বৃহৎ মস্‌জিদ আছে। প্রবাদ যে সুজা বাদসাহ দিল্লী হইতে পলায়ন করিবার সময় এইখানে একটি মস্‌জিদ্‌ নিৰ্ম্মাণ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এজন্য এখনও ইহাকে লোকে সুজা বাদসাহের মস্‌জিদ্‌ বলিয়া থাকে। এই কথার কোন ভিত্তি আছে কি ?

শ্রী অসিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী

(১১৯)

চখা-চখী

আমাদের অনেক সংস্কৃত কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় চখা ও চখী সারাদিন একত্র থাকিয়া রাত্রিকালে বিযুক্ত হয় এবং একে অন্যের বিরহে সারারাত চীৎকার করিতে থাকে। ইহা কি শুধু কবিদের কল্পনা, না বাস্তব ঘটনা ?

শ্রী অবনীমোহন দাসগুপ্ত

(১২০)

ফিনাইল

ফিনাইল আজকাল সভ্য গৃহস্থের পক্ষে একপ্রকার নিত্যব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার দাম কিন্তু খুব সস্তা নহে। কি কি উপাদানে ফিনাইল প্রস্তুত হয় ? সেগুলি আনাইয়া ঘরে ফিনাইল প্রস্তুত করা যায় কি না। কোনও সহৃদয় রসায়নতত্ত্ববিদ্‌ পাঠক যদি জানান তাহা হইলে বাধিত হইব।

কেরোসিন তৈলে কি ফিনাইলের কোনও গুণ আছে ? তাহা হইলে ফিনাইলের পরিবর্ত্তে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্নেহময় সান্যাল

(১২১)

জীরার চাষ

নিম্নবঙ্গে জীরার চাষ করিবার উপায় কি ? আমি গয়া জেলার কোনও বন্ধুর নিকট হইতে বীজ জীরা আনিয়া বপন করিয়াছিলাম। অসংখ্য চারা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ফল অত্যন্ত কম হইয়াছিল। জীরা চাষ সম্বন্ধে কেহ অভিজ্ঞতা জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ

(১২২)

ভাগলপুরের সুড়ঙ্গ

ভাগলপুরের নিকটে একটি বিস্তৃত সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় উহা গঙ্গার ভিতর দিয়া গয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং পূর্ব্বে জলদস্যুগণ এই গুপ্ত পথে যাতায়াত করিত। তৎসম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় কি ?

শ্রী সন্তোষকুমার ঘোষ

(১২৩)

পুরুরাজের পরিচয়

ইতিহাসে লিখিত আছে, আলেক্‌জেন্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, পাঞ্জাবের পুরুরাজা (Porus) তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুরাজা বা তাঁহার বংশের আর-কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার কোন পুত্র বা কন্যা ছিল কি না ? তাঁহাদের ইতিহাস আছে কি না ? তাঁহাদের পরিচয় কি অথবা কোথায় পাওয়া যাইবে ?

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়

(১২৪)

জাপানী যুযুৎসু

'জাপানী যুযুৎসু' ব্যায়াম সম্বন্ধে কোন পুস্তক আছে কি না এবং থাকিলে উহা কোথায় পাওয়া যায় ?

'যুযুৎসু' শিক্ষার কোন আখড়া বাংলা দেশের কোথায়ও আছে কি না ?

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ সেন

(১২৫)

জাপান ও জার্ম্মানীতে শিক্ষা

Civil, Electrical, Mechanical ইঞ্জিনিয়ারিং জাপানে পড়ান হয় কি না ? এই-সব পড়িতে হইলে জাপানে ও জার্ম্মানীতে কি Qualification দরকার ? I. Sc. হইলে চলে কি না ? উপরোক্ত বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে হইলে ভর্ত্তি হইবার জন্য কোথায় কোন্‌ কলেজে কাহাকে আবেদন করিতে হইবে ? একজন বাঙ্গালী ছাত্রের

জাপান ও জার্ম্মানীতে থাকিয়া এই-সব বিষয় পড়িতে আন্দাজ কত খরচ পড়ে? কোথায় থাকিবার সুবিধ?

কেহ অনুগ্রহ করিয়া উক্ত প্রশ্নগুলির জবাব দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শ্রী বৈদ্যনাথ মিত্র
শ্রী রোহিণীকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১২৬)

ব্রহ্মা- ও সূর্য্য-মন্দির

পুষ্কর ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথায় ব্রহ্মামন্দির আছে? ব্রহ্মার মন্দির সাধারণতঃ দেখা যায় না কেন?

কোনারক ছাড়া আর কোথায় সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে? বর্ত্তমানে কোথাও পূজা প্রচলিত আছে এরূপ সূর্য্যমন্দির আছে কি না?

নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২৭)

জমির সার

নিম্নলিখিত প্রতিমণ সারের মধ্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ খাদ্য কত পরিমাণ বর্ত্তমান আছে?

(ক) গোময়। (খ) গোমূত্র। (গ) পুরাতন পানা-পুকুরের শুষ্ক পাঁক-মাটি। (ঘ) বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের গলিত-পত্র। (ঙ) চাপড়া পোড়া-মাটি। (চ) ৩।৪ ফুট উচ্চ শণ বা ধৈঞ্চার গাছ। (ছ) গলিত পানা বা শেয়ালা। (জ) নদীর কর্দ্দমাক্ত পলি-মাটি।

শ্রী রামজীবন গুছাইত

(১২৮)

এক তারা দেখা

একটি তারা দেখিতে নাই। কেন? এ সম্বন্ধে একটি ছড়াও আছে—

"এক তারা মানুষ-মারা,
দুই তারা কাঁটালের কোষ,
তিন তারায় খণ্ডে দোষ॥"

এ ছড়ার কোন ভিত্তি আছে কি?

শ্রী স্নেহলতা অধিকারী

(১২৯)

শব্দের ব্যুৎপত্তি

কুলা, চোক, ঢেঁকী, ধুচুনি, ডুলা প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃতের কোন্ কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন?

শ্রী সুধীরচন্দ্র পুরকাইত

(১৩০)

ভাষাতত্ত্ব

নিম্নলিখিত বাঙ্গালা শব্দগুলির মূল বা সংস্কৃত প্রতিরূপ কি?—

(১) কাহিনী (হিন্দী কহানী)। (২) বানি (কারিগরের পারিশ্রমিক; হিন্দী বানাই)। (৩) ভরসা (হিন্দী ভরোসা expectation. Hope=আশা। Expectation-সূচক সংস্কৃত শব্দ কি?)। (৪) ভিতর (হিন্দী ভীতর। মধ্যে মধ্যে=কখন কখন বা ছাড়িয়া ছাড়িয়া; ভিতরে ভিতরে=গোপনে, অলক্ষিতে। অভ্যন্তর ও অন্তর শব্দ ভাঙ্গিয়া মিশাইয়া ভিতর?)। (৫) সাবান। (৬) আতা, নোনা—পর্ত্তুগীজ শব্দ; জিনিস দুইটা কি পর্ত্তুগীজদের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে ছিল না? যদি ছিল ত নাম কি ছিল? (৭) চাবি—পর্ত্তুগীজ শব্দ; এর বাংলা নাম কি ছিল? (৮) চাহিদা (এই শব্দের প্রয়োগ অতি অল্প দিন হইল কেবল প্রবাসীতেই দেখিয়াছি)। (৯) দাবী শব্দের সংস্কৃত বা বাঙ্গলা কি? (১০) বজায় শব্দের বাঙ্গলা প্রতিরূপ কি? অলুপ্ত শব্দ রঘুবংশে আছে। (১১) বিমলা দেবীর কন্যা রামদাসী, রামদাসীর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার কন্যা গিরিবালা—বুঝাইতে শিক্ষিত বাঙ্গালীও বলিয়া থাকেন যে বিমলা হইতে গিরিবালা চারি-পুরুষ! অথচ ইহাদের একজনও পুরুষ নহে। এরূপ স্থলে কি বলা উচিত? (১২) নেতিবাচক সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ পদ সেই ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়, যথা, আমি যাইব না, তুমি জান না, ইত্যাদি। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে এইরূপ পদ বসিয়া থাকে। যথা, না গিয়া, না চাহিতে, ইত্যাদি। সংস্কৃত, হিন্দী এবং আসামীতে কিন্তু এই পদ সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে, যথা, ন গমিষ্যামি, নেহী জাউঙ্গে, নে যাঁও, ইত্যাদি। বাঙ্গলার এই বিশেষত্বের কারণ কি? দ্রাবিড় ভাষায়ও কি "না" শব্দ সমাপিকা ক্রিয়ার পরে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিয়া থাকে? সাধারণ ভাবে বলিলাম বটে যে বাঙ্গলায় "না" শব্দ সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে, কিন্তু ইহার ব্যতিরেক-স্থলও আছে। ছোটনাগপুর ও বিষ্ণুপুরের লোকেরা বলে "আমি নাই যাব" "আমি নাই জানি" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংরেজীতেও এইস্থলে বাক্‌পদ্ধতি বাঙ্গলার মত। I know not, Drink not, Not knowing, Not to know প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

শ্রী বীরেশ্বর সেন

—

মীমাংসা

(৭৩)

প্রাচীন সম্রাট্ ও মহিষী

সম্রাট্গণ—প্রধানা মহিষীগণ।
চন্দ্রগুপ্ত —দুর্দ্ধরা
(সাহিত্য ১৭শ বর্ষ, ১৩১৩ - ৫৯০ পৃঃ)
অশোক —অসন্ধিমিত্রা
(সাহিত্য ঐ—৬৪৬ পৃঃ)
রাণা প্রতাপ— ?
ঔরংজীব—দিলরাজবানু বেগম
(Sarkar's "Studies in Mughal India," pp. 34, 58, 79.)

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(৭৯)

সন্ধ্যাকর নন্দী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে "রামচরিত" নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটীর ব্যয়ে মুদ্রণ করাইয়াছেন, উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে যে ইংরেজী ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি সন্ধ্যাকর নন্দীকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার কোন প্রমাণ অধ্যাহার করেন নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, "সাহিত্য" পত্রে শাস্ত্রী মহাশয়েরই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় "করণানামগ্রণী" এই পাঠ ধৃত করিয়া সন্ধ্যাকরকে বারেন্দ্রকায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন (সাহিত্য—২৩ শ বর্ষ—১২ সংখ্যা, ৯৪৫—৪৬ পৃঃ।) কিন্তু আমরা এই উভয়মতেরই সমর্থক নহি; কারণ এই উভয় মতই সমালোচনা করিয়া বেদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশ-

চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "মন্দারমালা" পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ৪৪৮—৪৫৬ পৃ) একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, উহাতে তিনি "রামচরিত"-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী মহাশয়কে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ—বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালার জাতি বৈদ্য—বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে প্রমাণ-সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া সন্ধ্যাকরকে বৈদ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন সেগুলিকে কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। যতক্ষণ পণ্ডিত মহাশয়ের মত নির্ভুল প্রমাণ দ্বারা নিরাকৃত না হয়, ততক্ষণ সন্ধ্যাকরকে বৈদ্য ভিন্ন অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ বা নবশাখ বলিয়া গ্রহণ করিতে সুধীসমাজ রাজি হইবেন কি না তদ্‌বিষয়ে গভীর সন্দেহ। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে-সমস্ত প্রমাণ 'হাজির' করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি মাত্র শ্লোক এখানে আমরা উদ্ধৃত করিলাম :—

"সিংহীসুত-বিনাশেন কমলা-বিকাশ-ভেষজ-ভিষজা"। এখানে সন্ধ্যাকর "কমলা-বিকাশ-ভেষজ-ভিষজা" এই উপমাটির দ্বারাই কি তাঁহার ভিষকত্বের পরিচয় দান করেন নাই?

শ্রী ললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ

(৯৬)

ফকিরের হেঁয়ালি গান

ফকিরের হেঁয়ালি গানটিতে বিদ্যা, জ্ঞান, সংসার, সত্যপরায়ণতা, চিন্তাগ্নি এবং দারিদ্র্য-নিপীড়িত হইয়াও বাণীপুত্রদিগের সত্য পরিহার না-করিবার জন্য খ্যাতির কথাই প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ মনে করিবার কারণ বলিতেছি।

মা যেমন সন্তানের শরীর পোষণ করেন, বিদ্যাও তেমনই মনকে পোষণ করে; তজ্জন্য বিদ্যাকে মা বলা হয়। মানুষ জন্মিবার পর এই বিদ্যা অর্জ্জন করে; সুতরাং বিদ্যা-অর্জ্জয়িতার জন্মের পরে বিদ্যার জন্ম। এনিমিত্ত বলা হইয়াছে—

"আগে জন্মিলাম আমি
পাছে জন্মে মা"

অগ্রে আমার জন্ম, পরে আমার বিদ্যারূপিণী মায়ের জন্ম হইয়াছে। এই বিদ্যা হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব অর্থাৎ জন্ম; এই বিদ্যা যখন আমার ও জ্ঞান উভয়েরই মা, তখন সেই বিদ্যা হইতে জাত জ্ঞান আমার ভাই হয়; এই জ্ঞান বিদ্যা হইতে স্বতঃ উদ্ভূত, অতএব জ্ঞানের জননী আছে, জনক নাই; এনিমিত্ত বলা হইয়াছে—

"দেখার দেখি ভাই জন্মিল,"
"পিতা জন্মে না,"

সংসারের চরম লক্ষ্য ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সংসারকে নদী কল্পনা করিয়া তাহার শেষ সীমাকে কূল এবং এই কূলে অবস্থিত সত্যকে বটবৃক্ষ কল্পনা করা হইয়াছে।

"নদীর কূলে বটবৃক্ষ"।

প্রবাদ রহিয়াছে লক্ষ্মী ও সরস্বতী সতীন। লক্ষ্মীর পুত্রগণ ধনবান্; সরস্বতীর পুত্রগণ বিদ্বান্। সতীন-বিদ্বেষ-বশতঃ সরস্বতীর পুত্রগণের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা না থাকায় বাণীপুত্রগণ ধনহীন, সুতরাং দরিদ্র। এই দরিদ্রতার জন্য বাণীর বরপুত্র অপরাজেয় মহাকবি কালিদাস অন্নচিন্তায় কাতর হইয়া বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন। কবিকুল-চূড়ামণি হোমারকে উদরান্নের নিমিত্ত কবিতা গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। বঙ্গকবিকুল-তিলক মাইকেল মধুসূদন দত্তের রোগে চিকিৎসা ও পথ্য জুটে নাই। কবিবর হেমচন্দ্রকে শেষজীবনে ভুক্তিভুক্ হইতে হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাবকবি দারিদ্র্যনিপীড়িত গোবিন্দদাস বঙ্গবাসী-দিগকে লক্ষ্য করিয়া "আমি মরিলে আমার চিতায় দিবে মঠ" এই মর্ম্মন্তুদ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বাণীপুত্রগণের এই দারিদ্র্য-দুঃখকে চিতা কল্পনা করতঃ সংসাররূপ নদীর কূলে অবস্থিত সত্যরূপ বটবৃক্ষের তলায় তাহা কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে—

"তাহার নীচে চিতা,"

বলা হইয়াছে তাঁহাদিগের দারিদ্র্য-জনিত চিন্তাই এই চিতার অগ্নি। তাঁহারা এবং মাতা বিদ্যা এবং জ্ঞান একত্র দারিদ্র্য-রূপ চিতাতে চিন্তাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়াকে লক্ষ্য করিয়াই

"মাপুতে সহমরণ যায়।"

বলা হইয়াছে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট হইয়াও তাঁহারা কখনও সত্য পরিহার করেন না। পুত্র যেমন পিতৃনামে খ্যাত হয়, তাঁহাদিগের এই সত্য পরিহার না করা জনিত খ্যাতিও তাঁহাদিগের লোকান্তরের পর পিতৃনামে খ্যাত পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগকে খ্যাত করি। এই খ্যাতিকেই পিতা কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে

"শেষে জন্মে পিতা।"

"প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটক অবলম্বনে এরূপ ভাবের পদ সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি গানে প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যায়। এই নাটকই এই জিজ্ঞাসার উল্লিখিত পদগুলির রচয়িতার পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে হয়।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(৯৭)

ডল্লন মিশ্র

সুশ্রুতের টীকার প্রারম্ভে বৈদ্য ডল্লন মিশ্র এই ভাবের আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"সমস্তজনপদতিলক-কল্পে শ্রীভাদানক-দেশে নগরীবর-মথুরাসমীপে অঙ্কোলা নাম বৈদ্যস্থানম্ অস্তি। তত্র গৌরবংশজা ব্রাহ্মণাঃ সমস্তভূমিপতি-মান্যা অশ্বিনীকুমার-সমানাঃ পার্ব্বণ-চন্দ্ররুচিযশঃ-প্রসাধিত-দিঙ্‌মণ্ডলা বৈদ্যাশ্চ অভূবন্। তদন্বয়ে গোবিন্দনামা চিকিৎসক-শিরোমণিরভূৎ। ততস্তৎপুত্রো ভিষক্‌শিরোমুকুটমণির্জ্জয়পালঃ সমজনি। তৎতনয়শ্চ সমস্তশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ভরতপালঃ সঞ্জাতঃ। তৎপুত্রঃ স্বকুলনভস্তলচন্দ্রমা বিবেকবৃহস্পতিঃ শ্রীসহনপালদেব নৃপতিবল্লভঃ শ্রীডল্লনঃ সমভূৎ। তেন শ্রীজৈজ্জটাদি টীকাকারাঃ শ্রীগয়াদাশ-ভাস্করৌ চ পঞ্জিকাকারৌ শ্রীমাধবব্রহ্মদেবাদীন্ টিপ্পনকারাংশ্চ উপজীব্য আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রসুশ্রুতব্যাখ্যানায় নিবন্ধসংগ্রহঃ ক্রিয়তে।" সুশ্রুতটীকা-প্রারম্ভঃ।

ডল্লন যে ভাবের আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ (বাঙ্গালার বর্ত্তমান জাতি বৈদ্য) বলিতে আমরা বদ্ধপরিকর। যাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে চিকিৎসক, তাঁহারা গৌণ ব্রাহ্মণ (অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণ-বৈশ্যা-প্রভব। অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্") ভিন্ন মুখ্য ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীতে জাত) ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নামের পূর্ব্বে "শ্রী" শব্দটি ব্যবহৃত হওয়াতেই প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। কারণ বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে নামের পূর্ব্বে "শ্রী" শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। "অঙ্কোলা" একটি বৈদ্যপ্রধান স্থান। সুতরাং মনুর "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" এই বিধি অনুসারেও ডল্লনের অম্বষ্ঠত্ব সংসূচিত হইতেছে। যদি আমরা তাঁহার "মিশ্র" এই উপাধিটির প্রতি সাভিনিবেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহা হইলেও তাঁহাকে দ্বিবর্ণসম্ভূত ব্রাহ্মণ ব্যতীত মুখ্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। এতদ্ সম্বন্ধে মদ্‌বিরচিত "উপাধি-রহস্য দ্বিতীয় প্রস্তাব" শীর্ষক প্রবন্ধ (নব্যভারত, ভাদ্র ১৩২৮) দ্রষ্টব্য। অপিচ ডল্লন আপনাদিগকে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সহিত তুলিত করিয়াও আপনার

অম্বষ্ঠত্বের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। তিনি মুখ্যব্রাহ্মণ হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে ব্যাস, বশিষ্ঠ অথবা বাল্মীকির সহিত তুলনা করিতে পারিতেন। এক সময়ে বাঙ্গালার বৈদ্যগণের মধ্যে যে "মিশ্র" উপাধি প্রচলিত ছিল তাহাও আমরা মহামহোপাধ্যায় ভরতসেন মল্লিক মহাশয়ের "চন্দ্রপ্রভা" পাঠে অবগত হই। তথাহি—

"নারায়ণায় সেনায় পূর্ব্বাথানা-সমুদ্ভবে।
নিরোলে শ্যামসেনায় মিশ্রায় চ কনীয়সী ?॥"

কাল-প্রভাবে এখন এই-সকল উপাধির বিলোপ ঘটিয়াছে। তৎপর বৈদ্য ডল্লন মিশ্র যে আপনার পূর্ব্বপুরুষগণকে "সমস্তভূমিপতিমান্যাঃ" বলিয়া সংসূচিত করিয়াছেন, ইহা দ্বারাও তাঁহাদের অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ্যই প্রতিপাদিত হইতেছে। কেন না মুখ্য ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় রাজারা সম্মান করিবেন বা করেন ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত সত্য; ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় নয়। ফলতঃ ক্ষত্রিয় রাজারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে (বৈদ্যগণকে) সম্মান করিতেন ইহা বলিয়া ডল্লন মিশ্র তাঁহার নিজের জাতি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মহর্ষি হারিতের—

"ব্রহ্ম মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যাঃ ক্ষত্র বিশাবপি।
অমীঃ পূজ্য দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥"

এই বচন দ্বারাও তাহাই প্রমাণিত হয়। অতএব ডল্লন মিশ্র যে বাঙ্গালী বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

শ্রী ললিতমোহন রায়, বিদ্যাবিনোদ

(৯৮)

ঢাকা

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমুদ্রগুপ্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হন ও পূর্ব্বদিকে সমতট ও ডবাক প্রভৃতি দেশ জয় করেন। বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই ডবাক্ই যে ঢাকা জিলার পূর্ব্ব নাম ছিল, এরূপ স্থিরনির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঢাকা জিলাটি অতি প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। ডবাক্ হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি কি না, ইহা চিন্তনীয়। বর্ত্তমান ঢাকার নামকরণ সম্বন্ধে তিনটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। (১) কেহ কেহ বলেন ৺ঢাকেশ্বরী কালীর নাম হইতেই ঢাকা নামের উৎপত্তি। (২) আবার অনেকে বলেন, ঢাক্ বৃক্ষের নাম হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি। (৩) ঢাকের শব্দ হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, এস্কলি সাহেব (Mr. F. D. Ascoli, M. A, I. C. S.) তাহার অসত্যতা প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। *Vide* The Dacca Review, October, 1914.) তিনি দেখাইয়াছেন, যে, "আইন-ই-আক্‌বরীতে" পর্য্যন্ত "ঢাক্কা বাজু" পরগণার নাম আছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালে বাঙ্গালার নবাব ইস্‌লাম খাঁ সম্রাটের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইহাকে "জাহাঙ্গীরনগর" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

"১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইস্‌লাম খাঁ ঢাকাতে বঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'জাহাঙ্গীর-নগর' বা 'জাঙ্গীরাবাদ' রখিয়াছিলেন।"

"ঢাকা অতি প্রাচীন সময় হইতেই পরিচিত। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে তিনি 'ডবাক ও সমতট প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন।' সমতটের সহিত পাশাপাশি ভাবে ডবাকের উল্লেখ থাকায় উহা আধুনিক ঢাকাকেই বুঝাইতেছে সন্দেহ নাই। ফেয়ার সাহেব (Sir A. Phayre)-কৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৪০০ খৃঃ অব্দেও ঢাকা নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাস, ৪৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার

[শ্রী শম্ভুনাথ দাশ ; শ্রী যোগেশচন্দ্র গোস্বামী]

নিতান্ত আধুনিক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ "ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে" দেখা যায়—

বৃদ্ধগঙ্গাতটে বেদবর্ষসাহস্রব্যত্যয়ে
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈর্জাঙ্গিরংপত্তনং মহৎ।
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া সদা
গাস্যন্তি পত্তনং ঢক্কাসংজ্ঞকং দেশবাসিনঃ।

অর্থাৎ :—বৃদ্ধগঙ্গাতটে যবনগণ চারিহাজার বর্ষ পরে জাঙ্গিরপত্তন স্থাপন করিবে। সেখানে ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া মহাকালী আছেন বলিয়া দেশবাসী তাহাকে ঢক্কা নগর বলিবে।"

আর-এক কাহিনীর মতে এখানে সতীর মুকুটের "ডাক" পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ঢাকা।

শ্রী অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর মৎপূজ্য শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের লেখা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"ঢাকা রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে পাওয়া যায়। তথায় লেখা আছে যে, 'সমতট-ডবাক-কামরূপ—' এই রাজ্যত্রয়ের নাম করায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, এই রাজ্যত্রয় পাশাপাশি ছিল। কামরূপের অবস্থান সকলেরই জানা আছে, তাহা প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্য—আধুনিক উত্তর-আসাম। হিউয়েন সঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, সমতট রাজ্য সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দুইএর মধ্যে ডবাক রাজ্য হইবে, ইহাতে কষ্টকল্পনা কিছুই নাই। সেই ডবাক রাজ্য কোথায়? তাহাই আধুনিক ঢাকা জেলা। ডবাক নাম কালক্রমে ঢাকায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—এই পরিবর্ত্তন স্বরশাস্ত্র-সম্মত।

(প্রতিভা, ১৩১৭, ৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা)

* * * *

"তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের প্রারম্ভে নূতন রাজধানী স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে আসিয়া, তদানীন্তন বাঙ্গালার সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অদূরে বুড়ীগঙ্গাতীরে বজরা নঙ্গর করিলেন।........................স্থানটি ইস্‌লাম খাঁর বড়ই পছন্দ হইল।.....................সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সম্মানার্থে নূতন রাজধানীর নাম জাহাঙ্গীর-নগর রাখা হইল।

(৪৩ পৃষ্ঠা ঐ)

বাংলাদেশ হইতে মুসলমানদের আধিপত্য চলিয়া গেলে,—ঢাকা তাহার পূর্ব্ব নাম আঁকড়াইয়া ধরিল।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(৯৯)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় বোতাম প্রস্তুতের কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার ঠিকানা কালীকচ্ছ, সরাইল, ত্রিপুরা জেলা; এস্ এণ্ড্ কোং, ৪৫।১ নং হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা; বোতাম কোং, দয়াগঞ্জ, ঢাকা।

১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"র ২১৮ পৃষ্ঠার ২য় কলম দেখুন।

শ্রী জগন্নাথ দাস

(১০৩)

রাত্রে জিনিষ না বেচা

বৈদ্যদের বীজিপুরুষ অমৃতাচার্য্য। বৈদ্যক শাস্ত্রগ্রন্থে মৃতসঞ্জীবন ভেষজ অমৃতাচার্য্যের নামে সংসৃষ্ট দেখা যায়। উক্ত ভৈষজ্য-বিধানে নানা অনুপান আর্দ্রক, পদ্মমধু, দীপ্তধূনক, স্বর্ণ- ও রসসিন্দূর প্রভৃতির সঙ্গে সূচিকাভরণ প্রক্রিয়ার উল্লেখ লক্ষিত হয়। প্রবাদ,—শক্তিগুপ্ত জ্ঞান রোগীকে রাত্রিকালে ঐসব ভেষজ বিধান করিয়া ফল প্রাপ্ত হন নাই; পরদিন দিবাভাগে ধন্বন্তরি কবিরাজ ঐসব প্রক্রিয়া দ্বারা তৎদণ্ডেই রোগীকে নিরাময় করিলে, তাঁহার নাম দেশবিশ্রুত হয়। এইজন্য বেনেরা এখনও আদা, মধু, সূচ, ধুনা ও সিন্দুর কদাপি সন্ধ্যার পর বিক্রয় করে না।

শ্রী মতিলাল সেন (কবিভূষণ)

(১০৪)

বিক্রমপুর

পূর্ব্ববঙ্গস্থ "বিক্রমপুরে" এবং তৎসংলগ্ন স্থানে যে-সমস্ত ঐতিহাসিক কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানেও দেখিতে পাওয়া যায়, ঐতিহাসিকবর নগেন্দ্র-বাবু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "নদীয়ায় অবস্থিত বিক্রমপুরে" উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতিচিহ্ন কিংবা তাহার ভগ্নাবশেষ আছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই।

মহারাজ আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে পুত্রেষ্টি নামক বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য যে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন, অদ্যাপি সে-সমুদয় গ্রাম "পঞ্চসার" বা "পাঁচগাও" নামে অতীতের প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান আছে। এই স্থান পূর্ব্ববঙ্গস্থিত রামপাল হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় "রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমিই সেকালে বাসের অধিকতর উপযুক্ত স্থান ছিল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই "সমতট" দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজধানী ছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাং বঙ্গদেশের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট ও তাম্রলিপ্তকে সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফারগুসন সাহেব সমস্ত ঢাকা জেলাকেই সমতট বলেন। ওয়াটারসের মতে সমতট ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ-পর্য্যটক ইৎচিংএর মতে সমতট পূর্ব্বভারতে অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ বর্ত্তমান ঢাকার অন্তর্গত বজ্রযোগিনীর উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে অবস্থিত "রঘুরামপুর" নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক এতদঞ্চল শাসন করিতেন। পালবংশীয় নরপতিগণ বিক্রমপুরে (পূর্ব্ববঙ্গের) বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিই এই বিষয়ের জ্বলন্ত নিদর্শন। রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমবার্ত্তা পাঠে জানা যায়, হরিবর্ম্মা দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া বিক্রমপুরে রাজ্য স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সামন্ত সেন নামক কর্ণাটের একজন রাজা, নিজরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, বঙ্গদেশে পলায়ন করিয়া, রাঢ় প্রদেশস্থ নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বল্লাল সেন অতিপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং বঙ্গদেশ জয় করেন। তিনি শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান ঢাকা জেলাস্থিত বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে একটি মনোরম রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কালক্রমে ঐ নগরীকে তিনি তাঁহার রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে (বা second city) পরিণত করেন। এই রামপাল বর্ত্তমান ঢাকা নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। "রামপাল যে বহু-সৌধ-রাজি-সমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল, তাহার বহু নিদর্শন রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী পঞ্চসার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর, জোড়াদেউল প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। রামপালের পূর্ব্বস্থিত পঞ্চসার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীরকাদীমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গীবাজার ও রিকাবী বাজার হইতে দক্ষিণে মাকহাটীরখাল পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ভূমির নিম্নভাগ ইষ্টক-প্রোথিত বলিয়াই মনে হয়। প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইল জোড়াদেউল নামক স্থানে এক মুসলমান স্বর্ণ-নির্ম্মিত একটি তরবারের খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণ গোলা পায়। একবার সপ্ততি-সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড হীরক এখানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন।" (ঢাকার ইতিহাস—শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।) লঘুভারত পাঠে জানা যায় এই রামপাল নগরেই মহারাজ লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করেন।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি যখন বঙ্গদেশ অধিকার করেন, তখন, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন (ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের মতে লক্ষ্মণ সেনের পুত্র লাক্ষ্মণেয়) প্রাণভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় রাজধানী নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পৈত্রিক প্রাচীন রাজধানী বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপাল নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ রাঢ়দেশ অধিকার করিলেও পূর্ব্ববঙ্গ তখনই জয় করিতে পারেন নাই, সেজন্য লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ রামপালে এবং সুবর্ণগ্রামে প্রায় ১২০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। সুতরাং উপরোক্ত নিদর্শনগুলি হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে সেনরাজগণের রাজধানী "বিক্রমপুর" আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত ছিল।

মহারাজ বল্লাল সেন সমগ্র বঙ্গদেশকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগরি এবং মিথিলা এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে প্রাচীন সমতট প্রদেশ বরেন্দ্রভূমিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং তখন যে সমস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ সমতট প্রদেশে বাস করিতেন তাঁহারা "বারেন্দ্র" আখ্যায় অভিহিত হইতেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজগণ বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত রঘুরামপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া এতদঞ্চল শাসন করিতেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে সমতট প্রদেশস্থ উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেজন্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতীয় হিন্দুরা রাঢ় এবং বরেন্দ্র দেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীয় হিন্দুগণ রাঢ় এবং বরেন্দ্র দেশে বাস করার নিমিত্ত রাঢ়ীয় এবং বরেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষী মহারাজ বল্লালসেন যখন সমতট প্রদেশ জয় করিয়া তথায় তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন, তখন উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ পুনরায় সমতটে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য "বঙ্গদেশে" আসিয়া বাস করিলেও তাঁহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা নষ্ট করেন নাই। সেজন্য তাঁহারা "বঙ্গে" বহুদিন বাস করিলেও "বঙ্গজ ব্রাহ্মণ" এই আখ্যা লাভ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত দীনেশ-বাবু "দাস বিক্রয়ের প্রাচীন দলিল" এই প্রবন্ধ দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে "আগে 'রাঢ়', শেষে বঙ্গ" প্রবাদবাক্যটি সত্য, কারণ দলিলে দেখিতে পাওয়া যায় সিমুলিয়া-নিবাসী রামনরসিংহ দত্ত শ্রীরামপুর-নিবাসী রামধন দত্তের নিকট হইতে রঙ্গনদাস নামক জনৈক দাসকে ক্রয় করেন। রামনরসিংহের গৃহে প্রাপ্ত কুলজী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে দত্ত মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষ রাঢ় দেশস্থ

শ্রীরামপুরে বাস করিতেন, রামধনদত্ত মহাশয়ের নিবাসও শ্রীরামপুর বলিয়া (ঐ দলিলে) লিখিত আছে এবং সাক্ষীগণও শ্রীরামপুরের লোক। "দাস বিক্রয়ের দলিল" প্রবন্ধের লেখক শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু এবং দীনেশ-বাবু উভয়েই শ্রীরামপুর নামক স্থানটির অবস্থিতি লইয়া গোলযোগে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, দলিলে উল্লিখিত শ্রীরামপুর রাঢ় দেশে অবস্থিত। বর্ত্তমান ঢাকা জেলাতেও একটি শ্রীরামপুর আছে ইহা তাঁহাদের জানা নাই। সার্ভেয়ার জেনারেল্ মেজর রেনেলের সপ্তদশসংখ্যক মানচিত্রে (ঢাকা জেলার) শ্রীরামপুর দেখিতে পাওয়া যায়।—"১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মেঘনাদ নদীর পশ্চিম-তীরস্থ ইদিলপুর ও শ্রীরামপুর পরগনার জলপ্লাবন ও ভাঙ্গনী সংঘটিত হয়। সেই সময় নদীর ভাঙ্গনী এত বৃদ্ধি পায় যে সমুদয় ইদিলপুর পরগনা মেঘনাদগর্ভে বিলীন হইবে এই আশঙ্কা করিয়া ঢাকার কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ...৭ বৎসর পরে নয়াভাঙ্গনী নদীর ধ্বংসকারী প্রবাহ শ্রীরামপুর যোজকের মধ্য দিয়া মনারপুরের নিকট পদ্মার সহিত মেঘনাদের সম্মিলন ঘটাইয়াছে।" (শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় সম্পাদিত "ঢাকার ইতিহাস" দ্রষ্টব্য)। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে যে শ্রীরামপুর আছে তাহা উপরোক্ত বিবরণটি হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যে "বঙ্গে" বাস করিতেন না তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, অধিকন্তু যতীনবাবু তাঁহার ঢাকার ইতিহাসে (প্রথম খণ্ডে) হোয়েনসাং লিখিত সমতট প্রদেশের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে বিপরীত ধারণাই বদ্ধমূল হয়। হোয়েনসাং লিখিয়াছেন—"সমতট রাজ্য চক্রাকৃতি। তাহার বেষ্টন তিন সহস্র লি, ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তী। রাজধানীর বেষ্টন ২০ লি, ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা।...ত্রিংশৎটি সংঘারামে প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রাজ্যে প্রায় একশত দেবমন্দির আছে" ইত্যাদি। অতএব সমতট প্রদেশে যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বাস করিতেন তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং "তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি" এই প্রবাদবাক্যটি প্রাচীন সমতট প্রদেশে কখনও প্রযুজ্য হইতে পারে না।

বর্ত্তমান ঢাকা-জেলাস্থিত বিক্রমপুর যে একটি অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান ও পূর্ব্বে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, প্রস্তরফলকে এবং বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখিলে পাওয়া যায়। বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দ্বারা জানিতে পারা যায় বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ পূর্ব্বে "বিক্রমপুর" বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও এই স্থান সমতট বলিয়া অভিহিত হইত। নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন প্রভৃতির দ্বারা জানা যায় যে পূর্ব্ববঙ্গস্থ "বিক্রমপুর" কেবলমাত্র সেনরাজগণের রাজধানীই ছিল না, ঐ স্থান ক্রমান্বয়ে পালবংশীয়, বর্ম্মবংশীয় প্রভৃতি নরপতিগণেরও রাজধানী ছিল। ঢাকার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মেসার্স সিয়ারম্যান্ বার্ড, ক্লিম্প্, জন্ কেণ্ডেল্, জেম্স্ গ্রেহাম্ প্রভৃতি মনস্বীগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই স্থানে যে বহুলোকের সমাগম হইত এবং নানা বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী ছিল সে-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—সেনরাজবংশের (বঙ্গের) প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন বঙ্গদেশে আসিয়া রাঢ়ের নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লাল সেন "বঙ্গ" জয় করিয়া স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রামপাল নগরীতে (আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গে) অন্য একটি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপের রাজধানীতে থাকিয়া তাঁহার রাজ্য শাসন করিতেন। সুতরাং মহারাজ লক্ষ্মণ সেনও রাজা হইয়া নবদ্বীপের রাজধানীতে বাস করেন এবং তথা হইতে সমগ্র রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে কখনও রাজধানী স্থাপনের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয় নাই, কোন ইতিহাসেই একথা পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য-বশতঃ মুসলমানেরা নবদ্বীপ অধিকার করিলে, লক্ষ্মণ সেন প্রাণভয়ে তাঁহার পৈত্রিক দ্বিতীয় রাজধানী রামপালে (বিক্রমপুরান্তর্গত) আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রী যোগেশচন্দ্র গোস্বামী

(১০৬)

কবিগণ প্রথমে "দাঁড়-কবি" নামে পরিচিত ছিলেন। আসরে দাঁড়াইয়া কবিতা প্রণয়ন করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘু, লালু, নন্দ এই তিনজনই সর্ব্ব প্রথম কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহারা বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর লোক।

(দীনেশ-বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—৬১৬ পৃষ্ঠা ৩য় সংস্করণ।)

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গেও বহুসংখ্যক কবিওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য। (ঐ ৬১৯ পৃষ্ঠা)

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১০৭)

বৈজ্ঞানিক মতে এই চরাচর বিশ্ব ইথার্ নামক এক-প্রকার পদার্থে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই ইথারের কম্পনই যে শব্দোৎপত্তির মূলীভূত কারণ সম্ভবতঃ তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ইহার কোন অংশ আন্দোলিত হইলে জলতরঙ্গের ন্যায় ইথারেও এক-প্রকার তরঙ্গ উপস্থিত হয়। তরঙ্গগুলির ঘাত-প্রতিঘাতে কর্ণবিবর-মধ্যস্থ ইথারে তরঙ্গোৎপাদন করে এবং কর্ণপটহ নামক (tympanum or eardrum) সূক্ষ্ম ঝিল্লিতে আঘাত করে। এই সূক্ষ্ম ঝিল্লিটি (sensory nerves) মধ্যগম্যস্নায়ুমণ্ডলীর এক প্রান্তের সংহতি মাত্র। ইহা আহত হইয়া স্নায়ুগুলির অনুভূতিকে তড়িৎবেগে মস্তিষ্কে লইয়া যায়। তখন মানবের শব্দজ্ঞান জন্মে। তরঙ্গের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অবস্থা-ভেদে শব্দও গভীর অথবা মৃদু ভাবে শ্রুত হয়।

কর্ণবিবর-দ্বার অঙ্গুলী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয় না। অঙ্গুলি ও কর্ণবিবর-ত্বকের মধ্যে ঈষৎ ব্যবধান থাকিয়াই যায়। শ্রবণ-পথে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিলে রন্ধ্রের মধ্যস্থিত বায়ু উষ্ণ হইয়া এই অতি সূক্ষ্ম পথে বহির্গত হইতে থাকে, এবং বায়ুমণ্ডলের সমতা রক্ষার্থ বাহির হইতেও শীতল বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই তরঙ্গায়িত মৃদু বায়ুপ্রবাহে শ্রবণবিবর-মধ্যস্থ ইথরেও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং কর্ণপটহে অবিরত মৃদু মৃদু আঘাত করিতে থাকে। এই আঘাত-জনিত অনুভূতিই শব্দরূপে শ্রুত হয়।

বংশীবাদন হইতে আমরা ইহার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। একটি সরু বাঁশের চোঙ্গায় ছিদ্র করিয়া ফেলিয়া রাখিলে কোন প্রকার শব্দ শুনা যায় না, কিন্তু ফুৎকার দ্বারা বংশখণ্ডের মধ্যস্থ বায়ুতে (ইথারে) কম্পন জন্মাইলে এক-প্রকার শব্দ শ্রুত হয়। এই ছিদ্রযুক্ত চোঙ্গাটির একদিকে একটি কীলক (গোঁজ, wedge) প্রবেশ করাইয়া ফু দিলে শব্দতরঙ্গ আরও পরিষ্কার

হইয়া উঠে, এবং সুনিপুণ বাদকের অঙ্গুলি-ক্রীড়ায় অতি মধুর স্বরলহরীতে পরিণত হয়।

শ্রী ভুবনচন্দ্র পোদ্দার

(১১০)

বিক্রমশিলা

বিক্রমশিলা মহাবিহার পালরাজ ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন। সে হিসাবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ বা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ ইহার প্রতিষ্ঠা-কাল। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব হ্রাস হইয়াছে।

বিক্রমশিলা বিহারের অবস্থান এখনও ঠিক হয় নাই। উহা গঙ্গার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত ছিল বলিয়া তিব্বতীয় গ্রন্থে দেখা যায়; প্রকাশ, গঙ্গা ঐ স্থানে উত্তরবাহিনী। পূর্ব্বে বেহার মহকুমায় বেহার হইতে তিন ক্রোশ দূরে রাজগৃহ যাইবার পথে অবস্থিত সিলাও নামক গ্রামটিকেই বিক্রমশিলার নিদর্শন বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। ঐ স্থানে এখনও বৌদ্ধযুগের ধ্বংসনিদর্শন পাওয়া যায়। নানা কারণে অনেকে মনে করেন ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী সুলতানগঞ্জ নামক স্থানে বিক্রমশিলা অবস্থিত ছিল। কেহ বা আবার ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁর নিকটবর্ত্তী পাথরঘাটাকেই ঐ স্থান বলিয়া মনে করেন (Jour. and Proc A. S. B. 1909, p. 1-13)। দেশাবলী নামক একটি প্রাচীন ভৌগোলিক গ্রন্থে পিথলট্ট নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে। তাহাই ক্রমে পাথরঘাটায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া অধ্যাপক সমাদ্দার মনে করেন (ভারতী, মাঘ ১৩২৭, পৃঃ ৭৭৭)।

বলা বাহুল্য বঙ্গদেশের বিক্রমপুরের সহিত বিক্রমশিলার কোনই সম্বন্ধ ছিল না।

শ্রী অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুঙ্গের জিলার জামালপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সুলতানপুর গ্রামস্থিত প্রাচীন গৈবীনাথের মন্দিরকেই প্রত্নবিদ পণ্ডিতগণ বিক্রমশিলা বিহার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৌদ্ধ বিদ্যায়তন 'বিক্রমশিলা' প্রাচীন মগধরাজ্যের গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে এক উন্নত পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। অনেকে বলেন, এই পাহাড় পাথরঘাটা নামক স্থানেই হইবে। মেজর ফ্রাঙ্কলিন্ সাহেব বলিয়াছেন—পাথরঘাটার সংস্কৃত নাম শিলাসঙ্গম। সঙ্গম শব্দটা সজ্ঘারাম শব্দের অপভ্রংশ। 'বিক্রমশিলা সঙ্ঘারাম' নামটি বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া শিলা-সঙ্গমে পরিণত হইয়াছে। ইহাই বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের মত। বাহুল্য-ভয়ে ইতিহাসবেত্তাদের পৃথক্ পৃথক্ মত উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১১১)

দুই দর্পণে বহু প্রতিচ্ছবি

প্রশ্নকর্ত্তা যদি Glazebrookএর Lightএর ৪০ পৃষ্ঠায় Two Parallel Mirrors শীর্ষক পরিচ্ছেদটি পাঠ করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহার প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন। আমি সংক্ষেপে তাঁহার প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।
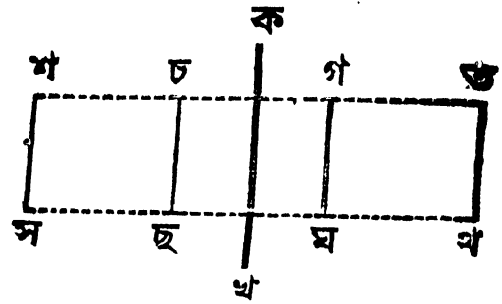
মনে করুন কখ ও গঘ দুইখানি দর্পণ, গঘ-এর প্রতিবিম্ব কখ-এর ভিতর চছ রূপে প্রতিবিম্বিত হইবে। কিন্তু চছ আবার গঘ-এর ভিতর তথ রূপে প্রতিবিম্বিত হইবে। তথ আবার কখ-এর ভিতর শস রূপে প্রতিবিম্বিত হইবে। এইরূপে একটি অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ায় আমরা সমরেখায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বহুসংখ্যক চিত্র দেখিতে পাই।

বস্তুত, বৈজ্ঞানিক মতে আমরা এইরূপে infinite (অনন্ত) সংখ্যক চিত্র দেখিতে পাইব।

কিন্তু প্রতিবিম্বগুলি বার বার প্রতিফলিত হওয়ায় অনেক রশ্মির জ্যোতি কমিয়া যায়, এবং সেইজন্য আমরা অনন্ত-সংখ্যক চিত্র দেখিতে পাই না।

শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ

(১১৩)

শ্রীশৈল

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে,

"গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।
দেবী তত্র মহালক্ষ্মী সর্ব্বানন্দশ্চ ভৈরব॥"

ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে আছে

"শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব, বৈভব যাহা সেবি॥"

বহু প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে, শ্রীহট্ট সহর হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গোটাটীকর নামক গ্রামে দেবীর গ্রীবা পতিত হইয়াছিল। এই পীঠস্থানকে গ্রীবাপীঠ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এখানে প্রত্যেক বৎসর অশোকাষ্টমী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে সুবৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। সরকারের ইতিহাস গ্রন্থেও উক্তস্থান মহাপীঠ বলিয়া লিখিত আছে। Vide "Assam District Gazetteers", Vol. II. Chap. III, p. 86. পি, এম, বাগ্‌চী ও গুপ্তপ্রেস প্রভৃতি পঞ্জিকার পীঠস্থান-পরিচয়-স্থলেও এই গ্রীবাপীঠের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে মদীয় জ্যেষ্ঠতাত ৺ বিশ্বনাথ ন্যায়বাগীশ প্রণীত "সর্ব্বানন্দ-প্রকাশঃ" ও "মোহপটম্" নামক গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রথম ভাগ ২০৯ পৃষ্ঠায় "শ্রীশৈল" সম্বন্ধে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিখিয়াছেন—"মলয় পর্ব্বতের উত্তরাংশে বর্ত্তমান পাল্‌নি হিল্‌ই শ্রীপর্ব্বত। মহাভারতের ৮৫তম অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে। মান্দ্রাজের কার্নুল জিলায় ইহা অবস্থিত।" কাজেই "শ্রীশৈল" হয় লিপিকরের প্রমাদ, না হয় শ্রীহট্টেরই নামান্তর। ইহা শ্রীপর্ব্বত বা পাল্‌নি হিল্ নহে।

শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(১২৯)

শব্দের ব্যুৎপত্তি

কুলা—সংস্কৃত কুল্য হইতে—যোগেশচন্দ্র রায়ের 'শব্দকোষ'।

চোক—সংস্কৃত চতুষ্ক হইতে (চার চোকে এক কাহন), অথবা সং চক্ষু হইতে চোখ, চোক—যোগেশচন্দ্র রায়ের 'শব্দকোষ'।

ঢেঁকি—ওড়িয়া ঢেঙ্কি ; হিন্দী ঢেঁকা, ঢেঁকী। হিন্দীতে ধান-কুট্টী নামও আছে। ধানকুটি—যাহা দ্বারা ধান কোটা যায়—সংক্ষেপে ধান্‌কি—ধাঁকি—ঢেকি হইতে পারে। মাণিকে (মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে) 'ঢক ঢক করে ঢেঁকি'—অর্থাৎ ঢক ঢক শব্দ হইতে ঢেঁকি ?—যোগেশচন্দ্র রায়ের 'শব্দকোষ'।

সংস্কৃত ধক্ক (নাশনে—আঘাতে) + ই (যে আঘাত বা ঘা দেয়) তাহা হইতে ধক্কী—ঢক্কী—ঢেকি।—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'।

ধুচুনি—বাংলা ধু ধাতু হইতে ধুঅন, ধুঅনী। ধুঅনী—চনী। বাংলাতে ধুঅনী—যে নারী চাউল ধোয়। এই হেতু পৃথক করিতে ধুচনী—চ আগম।—যোগেশচন্দ্র রায়ের 'শব্দকোষ'। ধাব্ ধাতু হইতে ধুচনী। ধাবনী—ধুচনী—ধুউনী—যে ধোয়—চাল-ধুউনী,—ধু+চুবনী—চুউনী, ধু+চুউনী = ধুচুনী।—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'।

ডুলা—? ডালা ? ডালা—সং ডল্লক, সং দল = খণ্ড ; বংশখণ্ড-নির্ম্মিত পাত্র, চাঙ্গাড়ী। ডুলী—সং দোলা = পাল্কী। ডোল—সং কণ্ডোল = ধান্যাদি রাখিবার পাত্র।

(১৩০)

ভাষাতত্ত্ব

(১) সং কথানিকা > প্রাং কহাণিআ > হিং কহানী > বা কাহিনী।

(২) সং বাণি = বস্ত্রাদির বয়ন > নির্ম্মাণ-মূল্য।

(৩) ভরসা—সং ভূরি + আশা বা বর + আশয় হইতে হিং সং ভরোসা, ও ২।৩ ভরসা—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় আন্দাজ করিয়াছেন। সং ভর (নির্ভর) + সা (সাদৃশ্যার্থে) = নির্ভরের ভাব।

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

(৪) ভিতর—সং অভ্যন্তর > অপভ্রংশ-প্রাকৃত ভিত্তরি (প্রাকৃত-পৈঙ্গল ২।১৯৫)। যোগেশ বাবু ও শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ সকল ভাষাতত্ত্বজ্ঞই অভ্যন্তর হইতে ভিতর ব্যুৎপন্ন দেখাইয়াছেন।

(৫) সাব্যস্ত—সং সুব্যবস্থ।—যোগেশ-বাবু।

(৬) আতা—সং আতৃপ্য, ফারসী আতা। নোনা—পর্ত্তুং annona, লাটিন anona reticulata.

(৭) চাবি—পর্ত্তুং chave. যোগেশ-বাবু সং চাপ ধাতু হইতে অথবা চাপ (= ধনু) হইতে চাবি শব্দ ব্যুৎপন্ন আন্দাজ করিয়াছেন, পর্ত্তুগীজ শব্দও দিয়াছেন। চাবি না বলিয়া অনেকে এখনও 'ছোড়ান' বলে।

(৮) চাহিদা এই শব্দ খুব সম্ভব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভাবিত (চারিত্রপূজা গ্রন্থে) : ১৩০৮ সালের ভারতীতে শ্রীমতী সরলাদেবী ইহা ব্যবহার করেন মনে পড়িতেছে। হিন্দী চাহিতা (সিস্‌কো লোগ্ চাহ্‌তা হায়)।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা প্রশ্ন করেন তাঁরা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'শব্দকোষ' ও 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রভৃতির 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'শব্দকথা', শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শব্দতত্ত্ব', শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'History of the Bengali Language', J. D. Anderson's 'Bengali Language' প্রভৃতি পুস্তক দেখিলে অনেক সাহায্য পাইতে পারেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখের ভাষা

চোখের ভাষা—চাওয়া,
মণির দুটি প্রদীপ কাঁপে
নীরব লেগে হাওয়া।
ভোরের দুটি ভৈরবী সুর
বাজ্‌ছে মৃদু উজল-মধুর,
ছোট্ট দুটি সুনীল আকাশ
সুরের-আলো-ছাওয়া!

চোখের ভাষা—চাওয়া,
উড়্‌ছে দুটি নীল পাখী ধীর
অলস-পাখা-বাওয়া।
বোধন-দিনের শাঁখ শুনে যে
অপ্‌রাজিতা ফুল ফুটেছে,
চোখের ভাষা ফুলের ভাষা—
মৌন-বিকাশ-পাওয়া।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আফগান আমীরের গোহত্যা-নিষেধ-ঘোষণায় সন্দেহ

কার্ত্তিকের প্রবাসীতে যে আমীরের ঘোষণা উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা "বিষম সন্দেহ"-জনক বলিয়া পৌষের প্রবাসীতে একটি প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। ঘোষণার একস্থানে লিখিত আছে—"গোহত্যা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল, কেহ মৃত গরুর মাংসও আহার করিতে পারিবে না।" ইহাতে প্রতিবাদ-লেখক বলিয়াছেন—"মুসলমান কখন কোন অবস্থাতে মরা গরুর মাংস খায় না." এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি "কেহ মৃত গরুর মাংসও আহার করিতে পারিবে না" অংশটুকু দেখিয়া, আমীরের সম্পূর্ণ ঘোষণাটিই সন্দেহজনক বলিয়াছেন।

বোধ হয় অনেকেই জানেন, বাংলা দেশের অনেকস্থানে কোন কোন জাতি বহুকাল হইতে মৃত গরু মহিষ ছাগল মুর্গী প্রভৃতির মাংস আহার করিয়া থাকে, যদিও এখন হিন্দুপ্রধান স্থানে তাহারা উহা ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিতেছে।

আফগানিস্থানেও হয়ত এমন অ-মুসলমান জাতি থাকিতে পারে যাহারা মৃত গরুর মাংস আহার করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় "কেহ মৃত গরুর মাংসও আহার করিতে পারিবে না" অংশটুকু লিখিত হইয়া থাকিবে। সম্পূর্ণ ঘোষণাটি আফগানিস্থানবাসীর জন্য লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পদের প্রথম অংশটুকু মুসলমান জাতির জন্য ও দ্বিতীয় অংশটুকু অ-মুসলমান মৃত-গো-খাদক জাতির জন্য লিখিত হইয়াছে এরূপ মনে করা বোধ হয় বিশেষ অন্যায় হইবে না।

আব্দুস সোব্‌হান

বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

অগ্রহায়ণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিত উপরোক্ত প্রবন্ধটি পৌষের প্রবাসীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে একটু ভুল আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১০শ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিবরণ আছে—

বল্লভ ভট্টের নিমন্ত্রণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহার বাটীতে গমন করেন। সেখানে রঘুপতি উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। উপাধ্যায় মহাশয় ভক্ত লোক, তাই মহাপ্রভু তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সেই-সকল প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর "বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং।"

বলা বাহুল্য রায় রামানন্দের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, এবং কথাটি "বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ"ও নহে।

শ্রী উপেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্যান্-ইস্‌লামিজ্‌ম্ ও ভারতের মুসলমান

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে "জাতীয়-সমস্যার" লেখক প্যান্-ইস্‌লামিজ্‌মের কথা উল্লেখ করিয়া ভারতের মুসলমান-সমাজের উপর কয়েকটি অভিযোগ আনিয়াছেন। তিনি যখন "একটা মতামত জানিতে" চাহিয়াছেন, তখন অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মোটামুটি ভাবে বলিতে সাহস করিলাম—

Pan-Islamism শব্দটি খাস বিলাতের আমদানী। গত বল্‌কান্ যুদ্ধের পূর্ব্বে এই শব্দটি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বল্‌কান্ যুদ্ধের সময় পতনোন্মুখ তুরস্কের জন্য সমগ্র মোস্‌লেম জগতে যখন সহানুভূতির একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, তখন সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমাজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইস্‌লামকে ভীষণ আকারে রঞ্জিত করিয়া সমগ্র জগৎকে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলেন। বিলাতে Times পত্রিকাই এই শব্দের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। পরলোকগত লর্ড নর্থক্লিফ্ এইরূপ অলীক গুজব রটাইতে বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার পর Morning Post Daily Mail প্রভৃতি পত্রিকা ইহাতে নানাবিধ রং চড়াইয়া কথাটিকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট Yellow peril, Black peril যেমন একটা শঙ্কার কারণ, Pan-Islamismও তেমনি একটি ভয়ের জিনিষ। অমৃতবাজার-পত্রিকা বাস্তবিকই ইহাকে জুজু বলিয়াছেন।

অনেকে ইস্‌লামের মূল তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া Pan-Islamismএর অলীক ভয়ে শঙ্কিত আছেন। ইস্‌লাম মহামানবতা ও বিশ্বপ্রেমের ভিত্তির উপর স্থাপিত। সমগ্র বিশ্ব একটি বৃহৎ পরিবার ও দুনিয়ার সব জাতি ও মানুষ পরস্পরের ভাই-ভাই, ইহাই ইস্‌লামের মূলনীতি। ইস্‌লামে তোমরা ও তাহারা নাই, আছে কেবল উত্তম-পুরুষের বহুবচন—"আমরা"। ইস্‌লামের নবী কেবল আরব ও এশিয়ার নবী ছিলেন না; তিনি সমগ্র বিশ্বের নিকট ভ্রাতৃ-প্রেমের বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন। আল্লাতালা কোরানে বলিতেছেন—"(হে মোহাম্মদ) আমি কি তোমাকে বিশ্বের কেবল রহমত (দয়া) করিয়া প্রেরণ করি নাই?"

গত স্বদেশী আমলে আমরা কেবল বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। তখন আমাদের জাতীয়তা "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশের" মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাবের নির্ম্মম ঘটনা তামাম ভারতে ভারতীয় জাতীয়তার একটা অনুভূতি জাগাইয়া দিয়া গেল। এখনও আমাদের চিন্তার পরিধি এশিয়ার শেষ-রেখায় গিয়া পৌঁছে নাই। সমগ্র বিশ্বকে ডাঃ একবালের ভাষায়—"অন হ্যায় সারা জাহান্ হামারা", সমগ্র বিশ্ব আমার জন্মভূমি—ভাবিতে পারি নাই। ভারতের সে দিন এখনও বহুদূর।

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যদি আমরা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করি; তবে আমাদের ভারতীয়ত্ব বা মানবতা পূর্ণ হইবে না। ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে না, কেবল আমরাই বিশ্বের দরবারে একঘরে হইয়া রহিব। কারণ এ যুগ, বিশ্বের সহিত আদান-প্রদানের যুগ।

ভারতের মুসলমানের বাহির-জগতের সহিত একটা ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তাহার জাতীয়তা বা দেশ-প্রেমের উপর সন্দেহ করা কেবল যুক্তিহীন নহে, অন্যায়ও। ভারতের মুসলমান নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অতীত ও বর্ত্তমানে প্রাণদান করিয়া আসিতেছে। দিল্লীর মুসলমান বাদশাহ ইব্রাহিম লোদী বিদেশী মুসলমান বাবরের গতিরোধ করিতে গিয়া পাণিপথের যুদ্ধে নিহত হন। ভারতের

মুসলমানেরাই বিদেশী মুসলমান নাদীর শাহ ও তৈমুরের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। মহীশূরের টিপু সুলতান ও বাঙ্গলার স্বাধীনতার শেষ-গৌরব নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করিয়া প্রাণ হারান। আর অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যক নাই।

বর্ত্তমান ভারতেও আলী ভ্রাতৃগণ মুসলমাননেতৃবর্গ ও মুসলমান জনসাধারণ Press Act, Rowlatt Act হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবের দুর্ঘটনা ও সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলন প্রভৃতি ছোট বড় সব কাজেই ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। আজ মাতৃভূমির আহ্বানে হাজার হাজার মুসলমান অন্ধকার কারাগারে পচিতেছে। ভারতের মুসলমান কোন দিনই কোন বিদেশীকে ডাকিয়া আনিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসায় নাই, বা বর্ত্তমানেও 'স্বরাজের স্বপ্নের বদলে বাদশাহার স্বপ্ন" দেখিবে না।—সে বিদেশী কাবুলের আমীরই হউন বা তুরস্কের সুলতানই হউন।

তুরস্কের সহিত ভারতের মুসলমানের সম্বন্ধ নূতন নয়। ১৫১৭ খৃঃ সুলতান সেলিম খান যখন মোসলেম-জগতে খলিফা মনোনীত হন, সেই সময় হইতেই ভারতের মসজিদে মসজিদে তুরস্কের খলিফার নামে খোৎবা পাঠ হইয়া আসিতেছে। তখন ভারতবর্ষে মোগল বাদশাহগণের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা তুরস্কের খেলাফত মানিয়া লইয়াছেন। ১৮৫৭ খৃঃ ভারতবর্ষ যখন সিপাহী বিদ্রোহে মাতিয়া উঠে, তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভূতপূর্ব্ব সুলতান আব্দুল মজিদের ফতোয়া আনাইয়া মুসলমানগণকে শান্ত করান। কিন্তু সে সময়ও কেহ Pan-Islamism এর ভয়ে ভীত হন নাই।

তুরস্ক যে কেবল একটি মুসলমান রাজ্য এমন নয়; ইহা এশিয়ার একটা শক্তিও বটে। যতদিন তুরস্ক বাঁচিয়া ছিল, ততদিন তুরস্ক ছিল এশিয়ার Bulwark—The Safeguard of the East. আজ তুরস্কের পতনে যে সাধারণভাবে এশিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এমন নয়, ইহা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে এক প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। ভারতের ভাগ্য এশিয়ার ভাগ্যের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত। এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি ইংলণ্ডের করতলগত হইলে, ইংরেজেরা এক জাতি দ্বারা অন্য জাতির মাথা ভাঙ্গিবে—একবারও ভারতকে মাথা তুলিতে দিবে না। ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের প্রাথমিক ইতিহাস একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়া দেয়। কারণ ইংলণ্ডের নিকট-প্রাচ্য নীতির (Near-eastern policy) আসল মৎলবই যে-কোন-প্রকারেই হউক ভারতবর্ষকে জব্দ করিয়া রাখা। তাহা হইলে মধ্য-এশিয়ার রাজ্যগুলির স্বাধীনতা নষ্ট হইলে ভারতবর্ষের স্বরাজ প্রাপ্তির যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল তাহাও সমূলে নির্ম্মূল হইবে। সুতরাং কেবল খেলাফতের জন্য নহে, ভারতের স্বরাজলাভের জন্যও অধঃপতিত তুরস্কের প্রতি ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের সহানুভূতি প্রদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ

—

গণিকাদের দ্বারা সৎকর্ম্ম করানো

পৌষ সংখ্যার প্রবাসীর ৪২৭—৪২৯ পৃষ্ঠায় "গণিকাদের দ্বারা সৎকার্য্য করান" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। এরূপ উদারতা ও সহানুভূতির প্রসঙ্গ বাঙ্গালা দেশে আর কোন পত্রিকা করেন বলিয়া জানি না। আশাকরি তাঁহারা প্রবাসীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দেশের সামাজিক বহুমুখীন সমস্যার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে দুএকটি আশার কথা বলিতে চাই।

প্রবাসীতে লেখা হইয়াছে,"বোম্বাই অঞ্চলের মত হিন্দু ভদ্রমহিলাদের মিছিল বাংলা দেশে কোথাও হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। যদি হইয়া থাকে আনন্দের বিষয়।" (৪২৮ পৃষ্ঠা তৃতীয় প্যারা)। গত বৎসর মিছিল করা, সভা করা, ও পিকেট্ করার জন্য ছোট ছোট ছেলেদের যখন বরিশাল জেলার পিরোজপুরের কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ দেশ-সেবক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় সেখানে থাকিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার উন্মাদনাপূর্ণ বক্তৃতায় অসূর্য্যম্পশ্যা বাঙ্গালী জননী ভগিনী ও ব্যথার ব্যথী নারীগণ দলবদ্ধ হইয়া ছেলেদের স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইবার জন্য জেলের দ্বারে ও বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পিরোজপুরের হিন্দু মহিলারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও নৌকা হইতে খালের পাড়ের বাসায় মশারী ঢাকা দিয়া উঠিতেন। তাঁহাদের অসঙ্গত লজ্জার আবরণ হঠাৎ মোচন হইল শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, সংশয়ান্বিতও হইয়াছিলাম, পরে জানিলাম উহা সত্যই ঘটিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে স্বামী ও অন্যান্য স্বদেশ-সেবক কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করায় শ্রীমতী সরযূবালা গুপ্ত, আরো কতিপয় ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে, আদালতে, উকীল-মোক্তারদের লাইব্রেরীতে, অসহযোগিতা (Non-Co-Operation) প্রচার করিতে যাইয়া নিজে কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্দী হইয়াছিলেন।

পুণ্যব্রতা-নারী-শক্তিতে, শ্রদ্ধেয় শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের অত্যন্ত প্রত্যয় জন্মিয়াছে, এবং এই শক্তির জাগরণকে দেশের ও দশের কাজে নিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার অনুপ্রেরণাপূর্ণ আহ্বান, সফল হইতেছে, এই বরিশাল নগরে। তিনি প্রথমে পতিতা নারীদের ভিতরে এই সাধু জাগরণ আনিয়াছিলেন, তাহারা বিশেষ বিশেষ সময়ে মিছিলের সঙ্গে বাহির হইত। সহরের বহুলোক আমরা ইহার নিন্দা করিয়াছি। এই অনন্যগতি নারীদের সুব্যবস্থার কথা মহাত্মা গান্ধী বলিয়া গেলেন, পরে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী প্রভৃতি আসিয়া তাহাদের ডাকিয়া অনেক আশা ভরসা দিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে কয়েকজন হীন পথ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আর হইল না। দুইটি স্ত্রীলোক নিজেদের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল, তারা দেশী কাপড়ের বোঝা লইয়া গৃহে গৃহে ফিরিয়া বিক্রী করিত। ইহাতেও কত লোক কত কি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, সেই একটি রমণী সম্পূর্ণরূপে কুসঙ্গ ও বিলাসচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ্ আশ্রয়লাভের প্রার্থিনী হওয়ায়, ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূত-চরিত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় প্রমুখ কতিপয় দেশহিতৈষী নিরাপদস্থানে একটি বাসা ভাড়া করিয়া উহাকে পতিতাশ্রমে পরিণত করিয়াছেন। ঐস্থানে ঐ রমণী আর-একটি বৃদ্ধাকে লইয়া ভদ্রভাবে বাস করিতেছে এবং চরকার সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। আশা করি ইঁহাদের পন্থা আরো অনেক অভাগিনী অনুসরণ করিতে পারিবে।

হিন্দু ভদ্রমহিলাদের সম্মিলন সহরের এক এক কেন্দ্রে হইতেছে এবং তাঁহাদের ভিতরে দেশপ্রীতি ও লোকপ্রীতির আশ্চর্য্য উন্মেষও হইয়াছে, ঐ শরৎ-বাবুর উপদেশে ও জীবনের আদর্শে। শরৎ-বাবুর আহ্বানে দলে দলে ভদ্রমহিলাগণ মিলিত হইতেছেন। বিশেষ বিশেষ দিনে মিছিল করিতেছেন, পথে পথে উলুধ্বনি করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-সেবকগণ জয়ধ্বনি করিতেছে। শুধু তাহা নহে। ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া চরকার সূতা প্রস্তুত করাইতে ও খদ্দরের কাপড় ব্যবহার করাইতে চেষ্টা করিতেছেন, সময় সময় কংগ্রেসের জন্য মহিলা সভা সংগঠন করিতেছেন, চাঁদা তুলিতেছেন। সম্প্রতি উত্তর-বঙ্গের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য চাউল পয়সা ও কাপড় সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। এ ছাড়া সময় সময় স্কুল-কলেজের ছেলেদের নিকট বয়কট প্রচার ও বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে দোকানে পিকেট্ করিয়াছেন, হয়ত আবার করিবেন

হিন্দু মহিলাদের, বালিকা ও বৃদ্ধা নির্ব্বিশেষে, এই-প্রকার প্রকাশ্য রাজপথে মিছিল করা ও অন্যান্য কার্য্য করাটা হিন্দু সমাজের বহুসংখ্যক লোকের কাছে ভাল লাগিতেছে না, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেই সমালোচনা করিতেছেন। শরৎ বাবু একদিন আমার সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন স্ত্রী-শক্তির জাগরণ হইয়াছে, ইঁহাদিগকে অবরোধে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জো নাই, ইঁহারা দলে দলে যাত্রাগান শুনিতে অভিনয় দেখিতে, ঘোড়দৌড় ও সার্কাস্ দেখিতে যাইতেছেন, কই অভিভাবকগণ তো আর ইঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন না, অনেক যুগের অবরোধের পর এই মুক্তধারা ছুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন পুরুষদের কর্ত্তব্য এই ধারাকে দেশ ও দশের হিতসাধনে পরিচালিত করা। তাই জীবনের বিশেষ ব্রত বলিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, নারী-শক্তির প্রভাবে পুরুষকে সংযত ও শোধিত হইতে হইবে, ইত্যাদি।

ভদ্র মহিলাদের এবম্বিধ সদনুষ্ঠানের কথা "বরিশাল-হিতৈষী" নামক সাপ্তাহিক পত্রে ও কখন কখন কলিকাতার "Servant" পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বহুস্থানের পত্রিকা হইতে বহুসংবাদ প্রবাসীর "দেশ-বিদেশের কথা"র মধ্যে উদ্ধৃত হইয়া থাকে অথচ আপনার এরূপ সহানুভূতি আছে যে-বিষয়ে, তাহার কথা ঐসকল পত্রিকা হইতে গৃহীত ও উদ্ধৃত হয় না কেন বুঝিতে পারিলাম না। সম্প্রতি Servant পত্রে প্রকাশিত ভদ্রমহিলাদের কার্য্য সম্বন্ধে একটি সংবাদ এই সঙ্গে কাটিয়া পাঠাইলাম। যে-সকল মহিলা এই কার্য্য পরিচালনায় অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদের নামও আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। যথা—স্বর্গীয় হরকান্ত সেন মহাশয়ের বৃদ্ধা স্ত্রী, ডাক্তার আনন্দমোহন রায় এল এম্-এস্ মহাশয়ের পত্নী, দেশসেবক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-বধূ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ মহাশয়ের পত্নী, সার্ভেণ্ট পত্রিকার প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ ঘোষের স্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্তের মাতা ও পত্নী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্তের মাতা ও ভগ্নী ইত্যাদি। ইঁহাদের সঙ্গে বহু ভদ্রমহিলা মিছিল করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদের সঙ্গে প্রবীণ স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত থাকেন। ইঁহারা এখানে একটি বঙ্গ-নারী-সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে "সারস্বত বিদ্যালয়" নামে একটি বালিকাবিদ্যালয় নূতন আদর্শে পরিচালিত হইতেছে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া পত্র শেষ করিতেছি। খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে, এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নিন্দা গঞ্জনা ও লাঞ্ছনাও কম সহিতে হয় নাই। মফঃস্বলের ব্রাহ্মনারীগণ জুতা মোজা পরিয়া স্বামী পিতা ও ভ্রাতার সহিত প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ করিতেন, গাড়ীর দরজা খোলা রাখিয়া যাতায়াত করিতেন, আর পথের লোক কত কি ব্যঙ্গ করিত। আর আজ হিন্দু মহিলাগণ পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন! কেবল মন্দিরে গমন ও ভ্রমণের জন্য নহে। দেশহিতসাধনেরই জন্য। আর প্রথম যুগে যাঁহারা নিন্দিতা হইতেন তাঁহারাই পশ্চাতে রহিলেন! কাজেই 'প্রবাসীর' শেষ কথাটায় যুক্তি এখন আর খাটে না। পশ্চাৎপদ হওয়ার আরো কারণ আছে। প্রবাসীর কথাগুলি আবার ভাবিবার জন্য এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম:—"শেষে আর একটা কথা বলা দরকার। ব্রাহ্মসমাজে ও খৃষ্টীয় সমাজে অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজের চেয়ে কম; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়া হিন্দুনারীদের সমান স্বাধীনতা বাঙ্গালী ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান নারীদের নাই। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান নারীরা এই কারণে এবং বৃহত্তর হিন্দু ও মুসলমান সমাজের প্রভাব ও বিরুদ্ধভাব অতিক্রম করিতে পারেন না বলিয়া, নারীদের, দক্ষিণ ভারতের নারীদের মত, স্বাধীনভাবে তাঁহারা শিক্ষালাভ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন না।" বরিশালে যেমন হিন্দুনারীদের অভ্যুদয় হইতেছে, হয়ত বাঙ্গালা দেশে আরো অনেকস্থানে এইরূপ হইতেছে। প্রবাসী পত্রিকায় এ-সকল বিষয় প্রকাশিত হইলে ও সুধীগণের সহানুভূতি পাইলে ভদ্র নারীগণের কর্ম্মোৎসাহ আরো বাড়িবে আশা করি।

শ্রী মন্মথমোহন দাস।

পউষ

পউষ এলো গো!
পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এলো গো—
কুজ্ঝটিকার ঘোম্‌টা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ—হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে॥

পউষ এলো গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো! পউষ এলো—
শুক্‌নো নিশাস, কাঁদন-ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ—হা) ভাঙা গলার সুর—
'ওঠ পথিক! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে'॥

কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

কুসুম ও কীট

'ফুলের বর্ণ' প্রবন্ধে বলিয়াছি যে ফুলের রঙ তোমার আমার জন্য হয় নাই, পোকা-মাকড়ের জন্য হইয়াছে। এই কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীর জন্মের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে মানুষের জন্মের পূর্ব্বে ফুলের জন্ম হইয়াছে ও তাহার পূর্ব্বেই কীটের জন্ম হইয়াছে।

প্রথমে ফুলের কোনও রঙ ছিল না। ক্রমে কীট-পতঙ্গদের নজরে পড়িবে বলিয়া তাহাদের বর্ণ ও গন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক ফুল আছে কীট-পতঙ্গের সাহায্য ছাড়া তাহাদের বীজ জন্মে না। ইহা দেখা গিয়াছে যে কোন কোন দেশে কোন কারণে কীট ধ্বংস হইলে, সেখানকার ফুলের বর্ণ ও গন্ধ লোপ পায় ও ফুলগুলিও আকারে খুব ছোট হইয়া পড়ে। সকল উদ্ভিদ্ আদিতে ছোট ছিল। আমাদের প্রধান খাদ্য ধান গোধূম প্রভৃতি শস্যাদি পূর্ব্বে ছোট ঘাসের মত হইত। মানব সেই ঘাসের বীজই বহুকাল চেষ্টা করিয়া ধান ও গম করিয়াছে। এখনও আদি শস্যের জাতি কু-ধান্য (বা কোদো) ও 'বন্য গোধূম'—যাহা প্যালেষ্টাইন দেশে জন্মে-বাঁচিয়া আছে। কিন্তু ফুলের বর্ণ ও গন্ধের উন্নতি মানবের দ্বারা হয় নাই। পৃথিবী এই অফুরন্ত ফুলের ভাণ্ডার যে হইয়াছে তাহা এই কীট ও পতঙ্গদের জন্য ও অনেক স্থলে তাহাদের দ্বারাই হইয়াছে! এ বিষয় পরে বলিব। কোন কীট কেবল গন্ধে আকৃষ্ট হয়, কেহ বা বর্ণে হয়, অনেক কীট অন্ধ, তাহাদের ঘ্রাণ-শক্তি বড় প্রখর, কোন কীটের দৃষ্টিশক্তি খুব বেশী। লাল ফুলে অন্য কীট অপেক্ষা প্রজাপতি বেশী আসে; প্রজাপতি দিনের পতঙ্গ, সে প্রায় সকল উজ্জ্বল ফুলে বসে, বেগুনি হলুদে প্রভৃতি দিনে প্রস্ফুটিত ফুলে বসে। রাত্রির শাদা ফুলে অনেক অন্ধ কীট আসিয়া থাকে—নিশীথের পতঙ্গ রাত্রির আঁধারে শাদা ফুল শীঘ্র খুঁজিয়া পায়, দিনের আলোতে দেখিতে পায় না। অন্য বর্ণের ফুলের মধ্যে মেটে হলুদে ও চুনে-হলুদে ফুলে প্রায় মাছির উৎপাত বেশী। নীল ফুল মৌমাছির প্রিয়, বেগুনী ফুল পিপীলিকার বড় আদরের।

কতকগুলি পাখীও পতঙ্গের মত মধুপায়ী, তাহারাও ফুলে ফুলে মধু খাইয়া বেড়ায়। দক্ষিণ-আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশে ছোট ছোট পাখী পতঙ্গের মত ফুলের ভিতর গিয়া মধু পান করে। সেখানে পতঙ্গ বেশী নাই। আবার যখন যে মৌমাছি যে ফুলে প্রথম মধুপান করিতে যায়, প্রায় সে কেবল সেই জাতীয় ফুল হইতে তখন মধু আহরণ করিয়া থাকে। যদি সে প্রথমে গোলাপ-ফুলে বসিয়া থাকে তবে সম্মুখে নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়া থাকিলেও সে খুঁজিয়া গোলাপ-ফুলেই বসিবে; যদি কামিনী-ফুলে বসিয়া থাকে তবে সে সকল কামিনী-ফুলের মধু শেষ করিয়া তবে গোলাপ-ফুলে বসিবে। এইরূপ করে বলিয়াই এক জাতীয় ফুলের পরাগ সেই জাতীয় ফুলে লইয়া যাইতে পারে ও তাহাতে ফুল-বংশেরও উপকার করে।

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

—

অদ্ভুত প্রাকৃতিক খেয়াল

মানুষ ও অপরাপর জীবসমূহের ভিতর যেমন প্রকৃতির খেয়ালের* বহু উদাহরণ সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়, উদ্ভিদ্ ও ফলমূলের মধ্যে তাহার অপেক্ষা কম দেখা যায় না। দুই তিনটি ফল একত্রে বিচিত্র আকারে জন্মিয়া থাকে, অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। বিভিন্ন গঠনের ফল মূল এবং পত্রাদিও সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। কামিনী, টগর প্রভৃতি গাছ

* গত পৌষের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "জীব-দেহে প্রকৃতির খেয়াল" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ছাঁটিয়া কৃত্রিম উপায়ে হাতী, উট, ফোয়ারা প্রভৃতি বহু প্রকার গঠন দেওয়া হইয়া থাকে। নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ফলের উপর স্বাভাবিক ভাবে চিত্র বা লেখা, একগাছে দুই প্রকার ফুল ও ফল, ফুলের বর্ণ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্য সাধনও করিতে পারা যায়। * কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সময় সময় যে বৈচিত্র্য থাকে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রবাসীর পৃষ্ঠায় অনেকবার এইরূপ বিচিত্র ফল ফুল প্রভৃতির ছবি ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন।

সম্প্রতি দেওঘরের বাজারে আমি একটি অতি আশ্চর্য্য অবয়বের শকরকন্দ আলু পাইয়াছি। ইহার বিক্রেতা সাত পয়সা মূল্যে উহা আমাকে বিক্রয় করে। †

মানুষের পায়ের-আকার আলু

ইহা লম্বা ১২॥ ইঞ্চি, সুতরাং সাধারণ মনুষ্যপদের অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। সেই অনুপাতে ইহার চওড়াও কিছু বেশী। ইহার গঠন মানুষের বামপায়ের মত। গোড়ালির দিকটা সামান্য সরু ভিন্ন অন্য সকল অংশেই স্বাভাবিক পায়ের সহিত আশ্চর্য্যরকম সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার মধ্যে আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, মানুষের পায়ের সহিত উহার উপর ও তলার দুই পিঠের সৌসাদৃশ্যও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে।

শ্রী হরিহর শেঠ

* গত অগ্রহায়ণের "মাসিক বসুমতীতে" "ফল ও ফুলের বৈচিত্র্য সাধন" নামক প্রবন্ধে কৃত্রিম উপায়ে ফল ও ফুলে অস্বাভাবিকতা উৎপাদন বিষয়ে লিখিত হইয়াছে।

† এই মনুষ্যপদাকৃতি শকরকন্দ আলুটি অল ইণ্ডিয়া একজিবিশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

চিত্রকরের খেয়াল

খেয়াল জিনিসটা একরকম ব্যক্তিগত হইলেও, তাহার কার্য্য বা কার্য্যের ফল সকল সময় কেবলমাত্র তার নিজ গণ্ডীর মধ্যে সংবদ্ধ থাকে না। উহা অনেক সময় অপরের অনিষ্ট করে। সময় সময় ইষ্টও যে না করে এমন নয়। খেয়ালের কর্ত্তা যিনি, প্রধানতঃ তাঁর চরিত্র-গত উৎকর্ষ ও অপকর্ষই অপর সাধারণের ইষ্টানিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। সেই হিসাবে বৈজ্ঞানিক, লেখক বা শিল্পীর খেয়ালে কালের সহিত আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতির ভাণ্ডার যে কত অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

কেবল জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে চিত্রকরের খেয়ালে আশ্চর্য্য ছবির সৃষ্টির কথা গত অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে
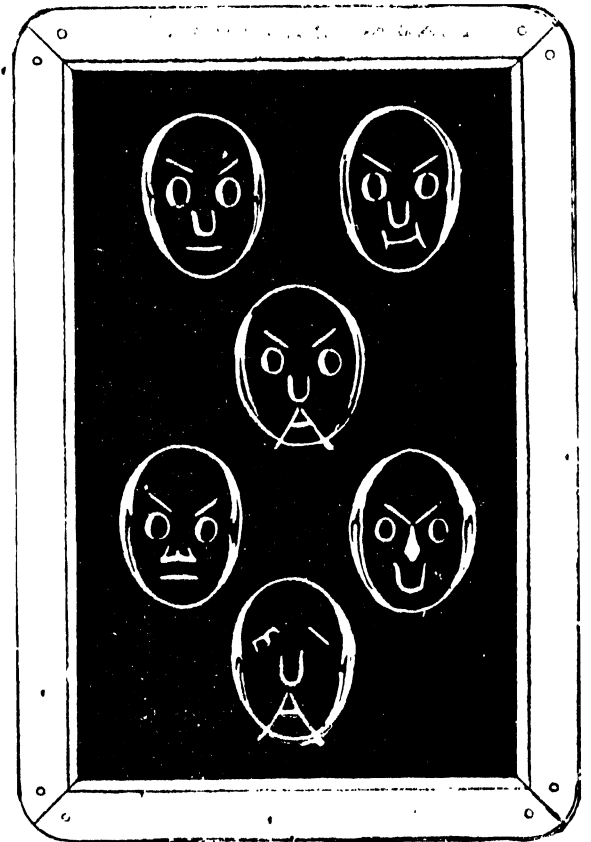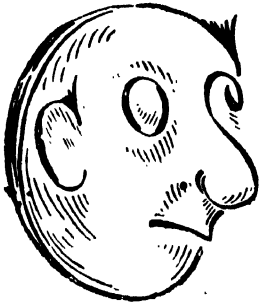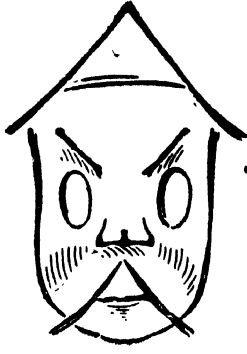
১ম চিত্র—অক্ষর দিয়া অঙ্কিত মুখ

২য় চিত্র—অক্ষর দিয়া অঙ্কিত মুখ

৩য় চিত্র—অক্ষর দিয়া অঙ্কিত ছবি

৪র্থ চিত্র—জাহাজ-খালাসীর ব্যঙ্গচিত্র—
SAILOR এই অক্ষর কয়টি দিয়া রচিত
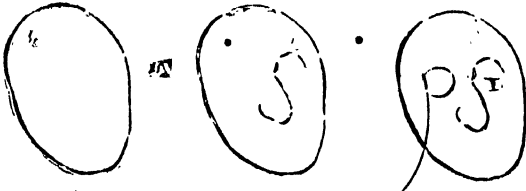
৫ম চিত্র—সৈনিকের ব্যঙ্গচিত্র—
SOLDIER এই কয়টি অক্ষর দিয়া রচিত
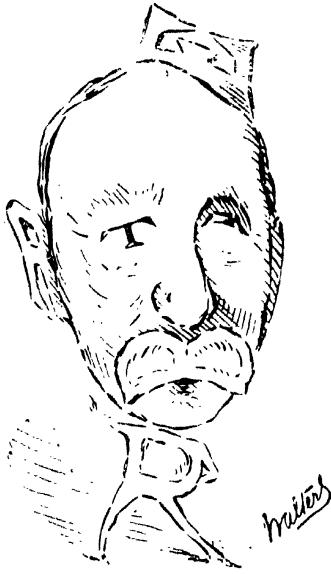
৬ষ্ঠ চিত্র—(লর্ড্) রবার্ট্স্-এর ব্যঙ্গচিত্র—
R O B E R T S এই কয়টি অক্ষর দিয়া রচিত

৭ম চিত্র—অক্ষর দিয়া অঙ্কিত বোয়ার জেনারেল্ পল্ ক্রুগারের ছবি

৮ম চিত্র—অক্ষর দিয়া অঙ্কিত রাজারাণীর ব্যঙ্গচিত্র

"জ্যামিতির চিত্র দিয়া ছবি আঁকা" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। চিত্রকরের খেয়ালে কেবল মাত্র ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা কেমন নরমুখাকৃতি, এমন কি মুখভাব অঙ্কিত হইতে পারে, অদ্য এই প্রসঙ্গে তাহাই দেখান হইবে। এখানেও যে, চিত্রগুলি নয়ন সমক্ষে পতিত হইতে না হইতে, কল্পনা ক্রীতদাসের মত ছবিগুলির বিষয় যথাযথভাবে আমাদের মাথায় প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্য স্বতঃই অগ্রসর হইয়া আসে এবং তদ্দ্বারা চিত্রের প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা সৃষ্ট চিত্রগুলির শিল্পীর নাম ওয়াল্‌টার্‌স্‌। ১ম চিত্রখানিতে ছয়টি বিভিন্ন নরমুখাকৃতি একখানি শ্লেটে অঙ্কিত আছে। এই সকলগুলিই ইংরেজি বর্ণমালার স্বরবর্ণ A. E. I. O. U. দ্বারা চিত্রিত। কোনটিতে উক্ত পাঁচটি অক্ষরই আছে, কোনটিতে ঐ পাঁচটির মধ্যে কয়েকটি মাত্র আছে।

২য় ছবিখানির প্রথমটি পাঁচটি স্বরবর্ণ সাজাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল পার্থক্যের মধ্যে O ও A এই দুইটি অক্ষর প্রথম চিত্রের U-এর স্থান দখল করিয়াছে। বাকি তিনটিতে C G L N J প্রভৃতি অক্ষরও ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩য় চিত্রসমষ্টিতে একটি অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১৪টি অক্ষর কিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই দেখান হইয়াছে। এগুলি ব্যঙ্গ বা কৌতুক-চিত্র, উহাতে কোনরূপ ছায়াপাত (shade) না থাকায়, ছবিগুলি দেখিবার দিক্ দিয়া তত সুন্দর না হইলেও যথেষ্ট নিপুণতার পরিচায়ক।

৪র্থ ও ৫ম চিত্রে চিত্রকর কেবলমাত্র মানুষের মুখ অঙ্কনের সাফল্য দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অক্ষরের সমষ্টির সহিত সামান্য ছায়াপাত সংযোগে দুইটি ছবি—একটি নাবিক ও অপরটি সৈনিকের ব্যঙ্গচিত্র—অঙ্কিত করিয়াছেন—এই চিত্রে শিল্পী আর-একটি নিপুণতা দেখাইয়াছেন. নাবিক ও সৈন্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ sailor এবং soldier এই দুইটি কথায় যে যে অক্ষর আছে দুইখানি ছবির মুখমণ্ডল অঙ্কিত করিতে মাত্র সেই অক্ষরগুলিই ব্যবহার করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রে শিল্পকর যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহার ভূয়সী প্রসংসা না করিয়া থাকা যায় না। ৬ষ্ঠ চিত্রে লর্ড রবার্ট্‌সের সর্ব্বজনপরিচিত প্রকৃতির ব্যঙ্গ-চিত্র দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় এবং পরবর্ত্তী ছবিখানিতেও ঐরূপ তাঁহার প্রবলপ্রতিদ্বন্দ্বী পল্‌-ক্রুগারের মুখাকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। এই দুইখানি কৌতুকচিত্রেই উক্ত দুই প্রসিদ্ধ পুরুষের নামের অক্ষর-গুলি মাত্র সুকৌশলে নিয়োজিত হইয়াছে।

৮ম বা শেষ চিত্রখানির বিষয় রাজারাণীর যুগল মূর্ত্তি। এই কৌতুকাঙ্কনে চিত্রশিল্পী বর্ণমালার A হইতে Z পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষরগুলি বিশেষ কৌশল সহকারে যোজনা করিয়াছেন। রাজার পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত হাস্যময় ভাব ও রাণীর স্ত্রীজাতিসুলভ সহাস্য আনন, এই ছবিখানিতে বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর এই যুগ্ম চিত্রখানিকে এ-বি-সির রাজা-রাণী নামে অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রী হরিহর শেঠ

—

সেয়ানে সেয়ানে

রমাকান্ত আর শ্যামাকান্ত, তারা দু ভাই। তাদের বাপ উমাকান্ত ছিল ভারি গরীব। সে যা' উপার্জ্জন কর্‌ত তাই দিয়ে কোনরূপে নিজের দিন গুজরান কর্‌তে হত, তাই মৃত্যু-সময়ে আপনার ছেলেদের জন্য বড় কিছু রেখে যেতে পারে নি। উমাকান্তের মৃত্যুর পর তার পাড়া-পড়্‌সিরা এসে দেখ্‌লে—সে যা' কিছু রেখে গেছে তার মাঝে আছে একটা গাই, একটা সুপুরী-গাছ আর একখানা কম্বল।

রমাকান্ত ছিল ভারি চালাক, আর শ্যামাকান্ত ছিল ভারি বোকা। রমা দেখ্‌লে, সে যদি ইচ্ছে করে তবে শ্যামাকে ফাঁকি দিয়ে সে নিজেই সব ভোগ কর্‌তে পার্‌বে। তাই একদিন শ্যামাকে ডেকে রমা বল্‌লে—"দেখ্ শ্যামা, তোর পরিবার নিয়ে আমার সঙ্গে একখানে থাকা আর চল্‌বে না। তবে বাবা যা জিনিষ-পত্তর রেখে গেছেন, তার আধা তুই পাবি। এখন তুই কি কর্‌বি ? আমাদের

যখন একটি গাই, একটি স্থপুরী-গাছ এবং একটি কম্বল বই কিছুই নেই, তখন ঐগুলোই ভাগ করে' নিতে হবে। তা হলে দেখ্, গাইয়ের পাবি তুই মুখের দিকের আধা, স্থপুরী-গাছের পাবি তুই গোড়ার দিকের আধা, আর কম্বল-খানা দুভাগ কর্‌লে তোরও কাজে লাগ্‌বে না, আমারও কাজে লাগ্‌বে না, তার চেয়ে ওটা বরং দিনে তুই ব্যবহার কর্‌বি, আর রেতে আমি ব্যবহার কর্‌ব। এখন রাজী তো ?"

শ্যামাকান্ত আর কি করে, দাদা যখন ওরূপ বল্‌ছেন তখন অবশ্যই তা' কর্‌তে হবে। তার বৌও ছিল তারই মত বোকা ভালমানুষ, সেও ভাসুরের মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লে না, তাই সেও কোন আপত্তি কর্‌লে না। শ্যামা-কান্ত রমাকান্তকে জানাল, তারা রাজী আছে।

দিন যায়। ঘুম থেকে উঠে শ্যামাকান্ত গাইকে ঘাস জল খাবার দেয়, কারণ গাইয়ের মুখের দিক তার; স্থপুরী-গাছের নীচেও মাটি দেয়, যত্ন করে, কারণ ওটার নীচের দিক তার; তার পর বেচারী দিন-মজুরী খাট্‌তে যায়। আর রমাকান্ত ধীরে স্থস্থে গাই দুয়ে দুধ নিয়ে যায়, কারণ ওটার পেছনদিক যে তার, এমন কি বেচারা শ্যামা একটু গোবরও নিতে পারে না। স্থপুরী পাক্‌লে রমা-কান্তই সব পেড়ে নিয়ে যায়। রাত হলে সে কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দেয়, আর তারই ছোট ভাই পাশের ঘরে শীতে ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপ্‌তে থাকে, আবার সকাল হলে দাদার বিছানা তাকেই তুল্‌তে হয় কারণ দিনের বেলা কম্বল যে তারই অধিকারে।

এম্‌নি অনেকদিন পরে শ্যামাকান্তের বাড়ীতে এল তার শালা। শ্যামা আর তার বউ ছিল যেমন বোকা, তার শালা ছিল তেম্‌নি চালাক। সে এসে তার বোকা ভগ্নীপতির এমন দুর্দ্দশা দেখে হাস্‌বে কি কাঁদ্‌বে, কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না। সেদিন রাত তো অম্‌নি গেল। সে মনে মনে ভাব্‌লে, আচ্ছা করে' এর শোধ দিতে হবে। পরদিন সকালে শ্যামা যেমন তার গাইয়ের অর্দ্ধেককে খাবার দিতে যাচ্ছে, অম্‌নি তার শালা বল্‌লে—"ও মশায়, কোথায় যাচ্ছ ?"

"বুধীকে খাবার দিয়ে আসি।" (বুধী, গাইয়ের নাম)

"ওহে, দিন দুই তোমার গাইকে খাবার দিয়ো না।"

"তা হলে যে দুধ দেবে না, দাদা খাবে কি ?"

"না দেয় তো বয়েই গেল! দাদা খাবে কি ? কী দরদ রে! আমার কথা শোন, এখন দিন দুই খাবার দিয়ো না। যদি দাদা বকে, তুমি বলো—'আমার ভাগকে আমি খাবার দেব না, তোমার তাতে কি ?'"

বোকারাম কি করে, এত বড় কুটুম্বের কথা তো ঠেলা যায় না, তাই সেদিন আর গাইকে খাবার দিলে না। রমাকান্ত যখন গাই দুইতে এল, আর দুধ পেলে না। তখন সে বল্‌লে,—"ওরে শ্যামা, বুধীকে খাবার দিস্ নি ?" শ্যামা উত্তর দিলে—"আমার ভাগকে আমি খাবার দেব না, তোমার ভাগে তো হাত দিই নি।"

রমাকান্ত তখন বুঝে ফেল্‌লে যে তার ভাইও এখন কার বুদ্ধি পেয়েছে। কি করে, সেদিন হতে সে দুধের আধা অংশ শ্যামাকে দিতে রাজী হল; নইলে গাইকে তো সে আর যত্ন করবে না।

তখন স্থপুরী পাকার দিন। রমাকান্ত যখন গিয়ে স্থপুরী পেড়ে আন্‌বার জন্য স্থপুরী-গাছে চড়েছে, তখন শ্যামার শালা তাকে বল্‌লে,—"যাও হে, এখন গিয়ে স্থপুরী-গাছের গোড়ায় কুড়ুল দিয়ে কোপাতে থাক। তোমার দাদা কিছু বল্‌লে বলো, 'আমার ভাগ আমি এখন কেটে ফেল্‌ব, তোমার তাতে কি ?' যদি স্থপুরী দিতে রাজী হয়, তখন সরে' এসো, বুঝ্‌লে ?"

"হুঁ" বলে' শ্যামাকান্ত স্থপুরী-গাছের তলায় গিয়ে গাছের গোড়া কাট্‌তে স্থরু করে' দিলে। বেগতিক দেখে রমা অর্দ্ধেক স্থপুরী দিতে রাজী হল, তবে শ্যামা ক্ষান্ত হল।

এখন কম্বল সম্বন্ধে কি করা যায় ? সেদিন বিকালে শ্যামার শালা তার ফন্দি আঁট্‌লে। সে কম্বলখানি পুকুর হতে ভিজিয়ে আন্‌তে তার বোনকে বল্‌লে। বোনও সাঁঝের আগেই ভাইয়ের কথামত কম্বলখানি ভিজিয়ে নিয়ে এল। যখন রমাকান্ত কম্বল নেবার জন্য এল, তখন শ্যামাকান্ত সেই ভিজা কম্বল নিয়ে দাদার কাছে দাখিল কর্‌লে। তখন শীতকাল। শীতের রাতে কম্বলের এই অবস্থা দেখে রমাকান্ত তো তেলে-বেগুনে জ্বলে'

উঠ্‌ল আর শ্যামাকে বল্‌লে—"বোকারাম, ওটা ভিজালে কে?" শালার শিখানো-মতে শ্যামা উত্তর করুলে—"আমার দিনের বেলায় ভিজিয়েছি, রেতে তো তোমাকেই দিচ্ছি, এখন রাগ কর কেন?" অগত্যা রমাকান্ত কি করে,—রাগটা সাম্‌লেই চলে' আস্‌তে হল। পরদিন সেই কম্বল বিক্রি করে' যা' পাওয়া গেল, তার অর্দ্ধেক শ্যামাকান্তকে দিয়ে দিতে হল।

শালার চালাকীতে শ্যামাকান্ত সেবার রক্ষা পেলে।

শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নবযুগের কবি

(Sergeev-Tzenski-লিখিত গল্প অবলম্বনে)

ভারতের রাজধানী দিল্লীসহরে প্রধান উজীরের বাড়ীতে বন্দীরা গান করছিল।

তারা দু'জন—একজন বৃদ্ধ, অপর যুবা। প্রথমে বুড়ো গান ধর্‌লে জীর্ণকণ্ঠে, জড়িত স্বরে; গম্ভীর মুখে যুবা তানপুরায় তান রাখ্‌লে। বুড়ো আর কি গাইবে? সে গাইলে—প্রাচীন কালে সূর্য্যকিরণ ছিল আরো প্রখর, প্রচুর ছিল ফল শস্য, মদ্য ছিল মাদকতায় ভরা! সে গাইলে—পুরাকালে ছিল মহা মহা বীর, যাদের স্থান অধিকার করবার মত আজও কেউ এল না! সে গাইলে—অসংখ্য মানুষের ছায়া-মূর্ত্তি নরকের সুগভীর অন্ধকারে বিচরণ করছে, জন্মজন্মান্তরের বিষাদভারে তারা অবনত!

উজীর-ভবনে ভোজের আয়োজন হয়েছিল। সুদীর্ঘ অলিন্দে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের দল প্রাচীন সুপেয় সরাবের নেশায় মশ্‌গুল হয়ে উঠেছিল। বুড়োর কথায় তারা কেউ কান দিলে না।

বুড়োর গান শেষ হলে যুবক বন্দী গান সুরু করলে সুমধুর কণ্ঠে, হৃদয়গ্রাহী সুরে। অভিনব এবং আশ্চর্য্য সে গানের বাণী—বলিষ্ঠচিত্ত, উন্নতমনা কবির রচিত সে গান বলদৃপ্ত মানব-মনের প্রশংসায় পরিপূর্ণ।

'মানুষ অর্দ্ধ-দেবতা' এই ছিল গানের বাণী, 'এবং একদিন আস্‌বে যে-দিন মানুষ পূর্ণ-দেবত্ব লাভ করবে! সুর-লয়ে গান বেজে উঠ্‌লো—'মানুষ আজ স্বপ্ন দেখ্‌ছে এবং সে-দিন আস্‌বে যে-দিন তার স্বপ্ন সফল হবে! অস্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত সুদূর নবযুগের দিকে আজ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

'সেদিন সুনিশ্চিত যেদিন অস্ফুটভাষ শিশুও বিগত দিনের কথা বল্‌তে লজ্জা বোধ করবে।

'বর্ত্তমানের অধীশ্বর, ভবিষ্যতের কর্ত্তা, বিশ্বের বিদ্রোহী-শাসক মানুষই একদিন মানুষকে পরাজিত করে' উন্নত হবে!

'এবং যে-দিন সে সর্ব্বজয়ী হবে সে-দিন সে হবে দেবতা!'

তানপুরা ও গানের শেষ বাণীর রেশ তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। নিমন্ত্রিতের দল তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠ্‌লো বন্দনাকারীকে দেখ্‌বার জন্যে। সে সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে ছিল—তালবৃক্ষের মত সরল ও উন্নত, মাথায় ছিল তার কুঞ্চিত কেশভার, দেহে ছিল যৌবনের দীপ্তি, আর মুখে ছিল আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা।

"এ গান রচনা করেছে কে?" নিমন্ত্রিতেরা সাগ্রহে প্রশ্ন করলে।

"মিয়ামি গ্রামে ক্রীতদাস সগর সিংহের কাছে খুব ছেলেবেলায় এ গান শুনেছিলুম। তারই এ গান।"

পরদিন তিনজন যুবক আমীর ঘোড়ায় চোড়ে বেরিয়ে পড়্‌লো লাহোরের সহরতলী মিয়ামির অনুসন্ধানে, অর্দ্ধ-দেবতা সগর সিংহকে পুষ্পাঞ্জলি দেবার সঙ্কল্পে।

একজন বল্‌লেন, "তালগাছের মত দীর্ঘ বোধ হয় তাঁর দেহ।"

দ্বিতীয় জন বল্‌লেন, "পাহাড়ের মত সবল তিনি নিশ্চয়!"

"সন্ধ্যাকাশে দীপ্ত তারকার মত তিনি সুন্দর!"—তৃতীয় জন স্বপ্নাবিষ্টের মত গুঞ্জন করলেন।

মিয়ামি গ্রামে তাঁরা নির্ব্বাসিত সগর সিংহের কাছে পৌছলেন। উঠান আগাছায় ভরা, ছিন্ন মলিন মাদুরের উপর জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধ পঙ্গু উপবিষ্ট, মাথায় তার ধূলামাখা পাকা চুলের জটা, অস্থিসার কালো কালো হাত দিয়ে সে একমনে মাথার উকুন মারছিল।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

১৭ ফুট লম্বা গোঁপ—

একটি বালকের যখন গোঁপ দাড়ি কিছুই উঠে নাই তখন তার সখ হইয়াছিল যে "আসমান সমান দাড়ি ও সড়ক বরাবর গোঁপ" হইবে। আমেরিকায় একটি ক্লাব আছে তার নাম—Whiskerino Club অর্থাৎ গুম্ফীয় ক্লাব। তাঁরা বড়-গোঁপওয়ালা লোকদের সভ্য করেন, বড়-গোঁপের প্রদর্শনী করেন, দেশের মধ্যে বড়-গুঁপোদের পারিতোষিক দেন। গত প্রদর্শনীতে ৬০০০ গোঁপ আর ২০০০ দাড়ির প্রতিযোগিতা হয়; লম্বা, মোটা, ছুঁচলো, ঝাঁপালো, পেখমধরা রকমারি গোঁপ দাড়ি প্রদর্শিত হয়; ধনী দরিদ্র, যুবা বৃদ্ধ সকলেই প্রতিযোগী প্রদর্শক হইয়াছিলেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সাউথ ডাকোটা

গোঁপ-দাড়ির বহর

ষ্টেটের বারনী শহরের হান্‌স্ ল্যাংসেথ্ তাঁর ১৭ ফুট লম্বা গোঁপের বহর দেখাইয়া "গুঁপোদের রাজা" King of the Whiskerinos রূপে মুকুট পুরস্কার পান; এবং জ্যাক্ উইল্‌ককস্ ১২ ফুট লম্বা গোঁপের বহরে যুবরাজের পদক পুরস্কার পান। জ্যাকবী নামক একজন লোক সবচেয়ে লম্বা দাড়ির জন্ম একটি সুন্দর কাপ্ উপহার পান, একজন দেড়ে হুবহু আব্রাহাম্ লিঙ্কনের ন্যায় দাড়ি রাখিতে সক্ষম হওয়ায় ২৫০০০ ডলারের একটা লাইফ্ ইন্‌সিওর্ পুরস্কার পাইয়াছেন।

—

আলোকিত বায়স্কোপ—

আমেরিকায় একটি বায়োস্কোপ-থিয়েটার খোলা হইয়াছে, সেখানে আলো জ্বালিয়া ছবি দেখানো হইবে; এবং ছবি ও বাজনা সুসঙ্গত

রণ-সঙ্গীত

করা হইবে। সঙ্গীতকে মূর্ত্তিমান্ করিবার জন্ম প্রেক্ষাগৃহের প্রাচীর-গাত্রে দক্ষ চিত্রকরেরা নৃত্যসঙ্গীত, রণসঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত প্রভৃতিকে রূপে রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন।

—
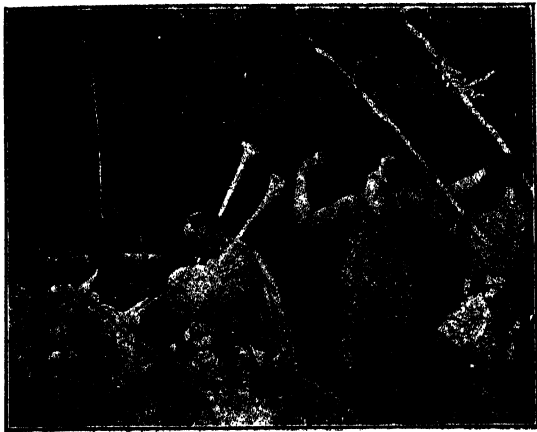
প্রণয়-সঙ্গীত

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মোটা—

জার্ম্মানীর বার্লিন নগরে দুই ভাই ও এক বোন আছে, তাদের বয়স মোটে ১৮, ১৭, এবং ১৪ ; তাদের তিন জনের মোট ওজন ১৪ মণ

সবচেয়ে মোটা বালকবালিকা

৮ সের—প্রত্যেকে গড়ে প্রায় পৌনে পাঁচ মণ করিয়া ভারী। এঁরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মোটা ও ভারী কিশোর কিশোরী বলিয়া দাবী করিতেছেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।

জহুরী

পরমাণু-জগতে পরিবর্ত্তন-সাধন—

কি করিয়া পরমাণু বিভাগ করা যায় ও কি করিয়া এক পরমাণুকে অন্য পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত করা যায় তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহুদিন ধরিয়া গবেষণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে ইঁহাদের দুইজন সফলকাম হইয়াছেন।

বিলাতের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Earnest Rutherford। তিনি নাইট্রোজেনপূর্ণ এক ক্ষুদ্রায়তন গৃহে তাঁহার পরীক্ষা করেন। একটি সূচের অগ্রভাগে একটু রেডিয়াম সংলগ্ন করিয়া তিনি উক্ত প্রকোষ্ঠে রাখেন ও উহার সম্মুখভাগে Zinc-Sulphideএর আস্তরণ-যুক্ত একখানি পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেন ; সূচের পশ্চাৎভাগে একটি খুব বেশী-শক্তিশালী magnifying glass বা প্রবর্দ্ধক কাচ রাখা হয়। আর রেডিয়াম এবং Zinc-Sulphideএর আস্তরণ-যুক্ত পর্দ্দা এতদুভয়ের মধ্যে একটি ব্যবধান দিয়াছেন। ঐ ব্যবধানের মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র করিয়া তাহা আলুমিনিয়মের পাত দিয়া আবৃত করিয়াছেন। এখন রেডিয়াম হইতে সর্ব্বদাই আলোককণা বিচ্ছুরিত হয়। ঐ কণিকাসমূহ আলুমিনিয়মের আবরণ ভেদ করিয়া প্রকোষ্ঠ-স্থিত নাইট্রোজেন-পরমাণুর সহিত ধাক্কা খায়। দেখা গেল যে এইরূপ সংঘর্ষের ফলে নাইট্রোজেন-পরমাণুগুলি হাইড্রোজেন-পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

দ্বিতীয় জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক G. Wendet। তিনি ত্রিশহাজার volt pressureএর তাড়িৎপ্রবাহ tungsten নামক ধাতু-নির্ম্মিত এক সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়া চালনা করেন। ফলে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া তারটি চূর্ণীকৃত হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া

দেখিলেন tungstenএর ক্ষুদ্রতম অংশগুলি heliumএ পরিণত হইয়াছে।

শ্রী—

অভিনয়ে অভিনব "আকাশ-দৃশ্যপট"—

অভিনয়ের সময় নানা-রকমের দৃশ্যপট টাঙ্গানোর প্রথা প্রায় সকল দেশেই আছে। তাহাতে দর্শকেরা যে-রকম-সে-রকম গোছের একটা কিছু কল্পনা করিয়া লইলেও কখনো ভুলিয়া যায় না যে তাহারা দৃশ্যপট দেখিতেছে না। পটের নানা-রকম রংএ স্বাভাবিক দৃশ্যকে অনেকটা অস্বাভাবিক করিয়া তোলে।

আকাশ-দৃশ্যপট

মিলান সহরের লা স্কালা থিয়েটারে একজন স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী একখানি চমৎকার দৃশ্যপট আঁকিয়াছেন। দৃশ্যপটটিকে দেখিলে সত্যকার আকাশ বলিয়া ভ্রম হয়। পটখানি ধনুকাকৃতি; তার শেষের দিকটা ক্রমশ-ঢালু হইয়া মঞ্চের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই আকাশ-দৃশ্যপট দেখিতে অনেকটা আমাদের মাথার উপরের আকাশের মত ক্রমশ-ঢালু। এই থিয়েটারে তিন হাজার ছয় শত লোক বসিতে পারে, ইহা ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয় এবং ইউরোপের থিয়েটারের মধ্যে উহার স্থান দ্বিতীয়। নানা-রকম কলকব্জার সাহায্যে ইহাকে টাঙ্গাইয়া রাখা হয়, এবং প্রয়োজন-মত গুটাইয়াও রাখা যায়। এই পটখানিকে টাঙ্গাইতে ৬২ ফুট স্থানের দরকার হয়।

বায়ুচালিত কলের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদন—

এতকাল ধরিয়া বায়ুচালিত কল (windmill) সাহায্যে লোকে কেবল কূপ হইতে জল পাম্প করা বা এমনি দু-একটা সহজ কাজ করিত। আমেরিকার ওহিও প্রদেশের পূর্ব্ব-ক্লিভল্যাণ্ডবাসী এক ভদ্রলোক বায়ুচালিত কলের সাহায্যে নিজের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক বাতি এবং পাখার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বাড়ীর ছাদের উপর এই কলটি স্থাপিত। কলের পরিধি প্রায় পনেরো ফুট এবং উহা মাটি হইতে পঞ্চাশ ফুট উপরে বসান। হাওয়াতে কল ঘুরিবামাত্র বিদ্যুৎ-যন্ত্র কার্য্য আরম্ভ করে। বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া অপর যন্ত্রে সঞ্চিত হয়।
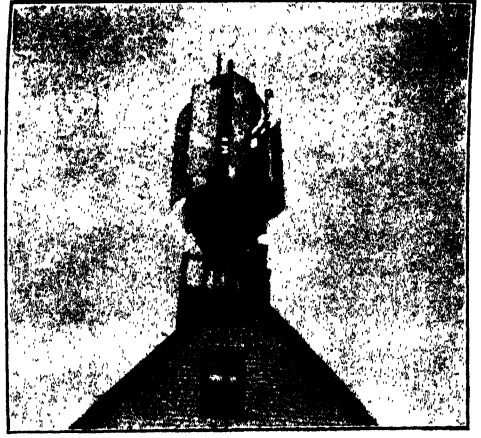
বায়ু-চালিত কলের সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদন

চোর-মারা শিক্ষা—

নিউইয়র্কে পুলিশের জন্য নানা রকমের শিক্ষাবিধি আছে। তাহার মধ্যে একটি—পলায়মান বা যুযুৎসু অপরাধীকে গুলি করা। চলন্ত ছায়া-চিত্রের সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

বেতারে সংবাদ প্রেরণের উচ্চমঞ্চ—

জাপানে বেতারে সংবাদ-প্রেরণ-কার্য্যের সুবিধার জন্য একটি কংক্রিটের ৬৭২ ফুট ফাঁপা স্তম্ভ তৈয়ার হইয়াছে। পৃথিবীতে এত বড় এবং উচ্চ কংক্রিটের স্তম্ভ আর নাই। বেতার-স্তম্ভটি কলের চিম্‌নির মত দেখিতে। গোড়াতে ইহার ব্যাস ৫৫ ফুট এবং একেবারে ডগায় ৩॥০ ফুট। স্তম্ভের দেওয়াল গোড়ার দিকে ৩৩ ইঞ্চি পুরু এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া উপরে মাত্র ৬ ইঞ্চিতে ঠেকিয়াছে। ফাঁপা স্তম্ভের ভিতরে উপরে-উঠিবার সিঁড়ি আছে। প্রত্যেক ১৫০ ফুট অন্তর দর্শকদের দেখিবার জন্য বাহিরের দিকে মঞ্চ আছে। উহা অনেকটা কলিকাতার অক্‌টারলোনী মনুমেন্টের মতন। এখন ইঞ্জিনিয়ারেরা ইহার দ্বিগুণ উঁচু স্তম্ভ তুলিবার মতলব করিতেছেন। তাঁহাদের মতে কংক্রিটের স্তম্ভ ১২০০ ফুট উঁচু করিয়াও তুলিতে পারা যায়।

মিনিটে চার মাইল—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান সহরের মাউণ্ট ক্লেমেন্সে কিছুদিন পূর্ব্বে আকাশ-জাহাজের নানারকম কসরৎ পরীক্ষা হয়। সেই সময় লেপ্টেনাণ্ট্ মঘান নামক যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ-জাহাজ-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী তাঁহার এরোপ্লেন মিনিটে ৪ মাইল বেগে হাঁকাইয়াছেন। এত দ্রুত গতিবেগ পূর্ব্বে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু এত ভীষণবেগে কয়েক মিনিটের বেশী কেহ যাইতে পারে না। ইঞ্জিন এত বেগ সহ্য করিতে পারে না, ফাটিয়া যায়। আরো কয়েক বছর পরে কি হইবে বলা দুষ্কর।

মেক্সিকোর বিশালকায় গুহা—

আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের কুরনাভাকা সহরের ৩০ মাইল দূরে একটি 'লাল' মানুষদের গ্রামের পাশে উঁচু পাহাড়ের তলায় কতকগুলি গুহা আছে। সেখানকার লোকে বলে এইসব গুহাতে দৈত্য-দানবেরা বাস করিত। গুহার প্রবেশ পথটি ৭০ ফুট উঁচু এবং ১৫০ ফুট প্রশস্ত। গুহার মধ্যে কুঠারি কুঠারি ভাগ করা আছে। তাহার মাঝে মাঝে শক্ত পাথরের পর্দ্দা—তাহা দেখিতে ঠিক কাপড়ের পর্দ্দার মতন। এই-সমস্ত পাথরের পর্দ্দা ছাত হইতে নামিয়া গুহার তলাতে গিয়া ঠেকিয়াছে। গুহার মধ্যে একটি খুব প্রকাণ্ড কুঠারি আছে—এই কুঠারির মধ্যে একটা খুব বড় অখণ্ড পাথরের স্তম্ভ অবস্থিত। এই কুঠারিটিকে "আলোক-প্রকোষ্ঠ" বলা হয়। একটি কুঠারির মধ্যে পাথরের সিংহাসনের মত একটা বসিবার স্থান আছে। ইহাকে সিংহাসন-প্রকোষ্ঠ বলা হয়। আর-একটি প্রকোষ্ঠকে ছাগল-গৃহ বলা হয়—কারণ এই ঘরের ভিতরকার একটা পাথরের চাপ দেখিতে অনেকটা একটা ছাগলের মত।

সবচেয়ে বড় গোলা

সবচেয়ে ছোট বন্দুক—

নিউ-ইয়র্কের পুলিশ-প্রদর্শনীতে এক-প্রকার নূতন বন্দুকের আমদানি হইয়াছে। এই বন্দুক এত ছোট যে ইহাকে হাতের তালুর
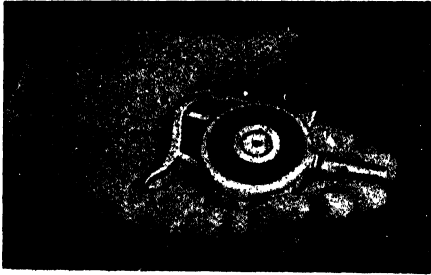
সবচেয়ে ছোট বন্দুক

ভিতর লুকাইয়া রাখা যায় এবং ইহা হইতে খুব তাড়াতাড়ি ১২টি গুলি ছোঁড়া যায়। এই-রকম ক্ষুদ্র অথচ ভয়ানক বন্দুক নাকি মাত্র কয়েকটি তৈয়ার হইয়াছে।

সবচেয়ে বড় গোলা—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাবারডিন সহরে সামরিক বিভাগের প্রস্তুত একটি প্রকাণ্ড গোলার শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গোলাটির ওজন ৪০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫০ মণ। এই গোলার সাহায্যে যে-কোন যুদ্ধ-জাহাজকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়। অ্যাবারডিন সহরে প্রত্যেক বছর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পণ্ডিতেরা জমা হন এবং সেখানে নানারকম নবাবিষ্কৃত যুদ্ধসামগ্রীর শক্তি পরীক্ষা করা হয়। গোলাটির পাশে দণ্ডায়মান সৈন্যটিকে গোলার তুলনায় নেহাৎ বেঁটে দেখাইতেছে।
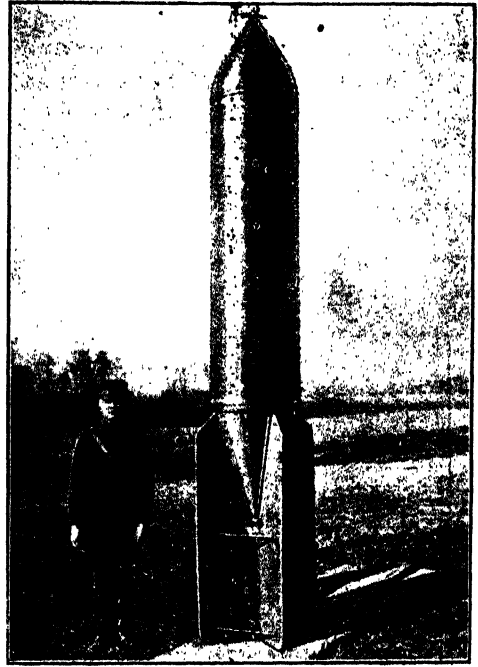
কংক্রিটের তৈরী "পরী-আবাস"—

আমাদের দেশে কংক্রিটের তৈরী নানাপ্রকার বাড়ী ঘর আজকাল হইতেছে। এই-সমস্ত ঘর-বাড়ী খুব শক্ত এবং দরকারী হইলেও দেখিতে বিশেষ ভাল নয় এবং অনেকক্ষেত্রে কিম্ভূতকিমাকার। আমেরিকাতে কিন্তু দেখিতে খুব চমৎকার নানাপ্রকার বাড়ী
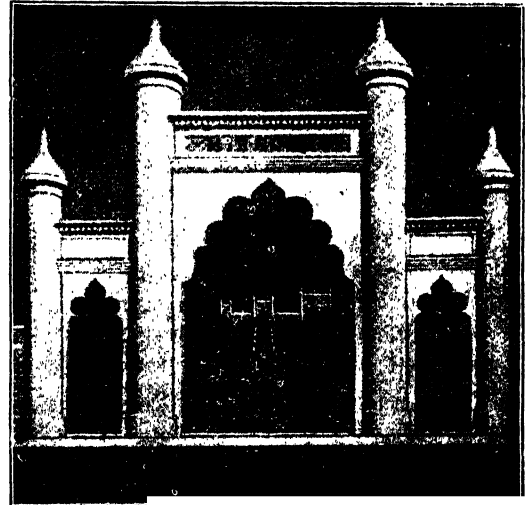
কংক্রিটের তৈরী পরী-আবাস

কংক্রিটে তৈয়ার হইতেছে। ইহার এক একটি দেখিতে স্বপ্নে-দেখা পরীদের দেশের মত। ছবিতে যে বাড়ীর দৃশ্য দেওয়া হইল, তাহা দেখিতে অতি চমৎকার। বাড়ীর পিছনের নীল পাহাড় ইহার সৌন্দর্য্য আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। বাড়ীটি দেখিতে আমাদের দেশের মোগল-রাজকন্যার প্রাসাদ বলিয়া মনে হইতেছে। বাড়ীটি আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর প্লেনডেনের কাছে অবস্থিত।

বেলুনের সাহায্যে উদ্ধার—

প্রকাণ্ড উঁচু চিম্‌নি সাফ করিতে করিতে একজন লোক চিম্‌নির উপর অজ্ঞান হইয়া যায়। গ্যারি পাইরেল্ নামক আর-একজন
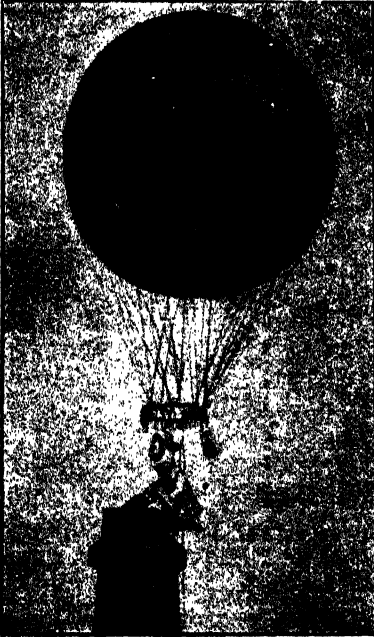
বেলুনের সাহায্যে উদ্ধার

অত্যুগ্র সাহসী ব্যক্তি একটা বেলুনে চড়িয়া সেই অজ্ঞান লোকটিকে নামাইয়া আনে।

বহুকাল স্থায়ী শব্দের রেকর্ড—

কিছুকাল পূর্ব্বে হাজারবর্ষস্থায়ী হইবে এমন ফোটো রাসায়নিক-দ্রব্য-সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে। এবার আর-একটি নূতন জিনিষ আবিষ্কার হইয়াছে। গ্রামোফোনের রেকর্ড যে দ্রব্যে প্রস্তুত হয়, তাহাতে এই নবাবিষ্কৃত দ্রব্যটি মিশাইয়া দিলে তাহা ১০০০০ বর্ষকাল স্থায়ী হইবে এবং গলার স্বরের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

সহরের কল ইত্যাদির ধূমে কি ক্ষতি হয়—

১। প্রত্যেক লোকের এবং তাহার সন্তানসন্ততির আয়ু কমে।

২। প্রত্যেক বছর গৃহ এবং পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য প্রায় ৫০ হইতে ৬০ টাকা গড়ে প্রত্যেক পরিবারের বেশী খরচ হয়।
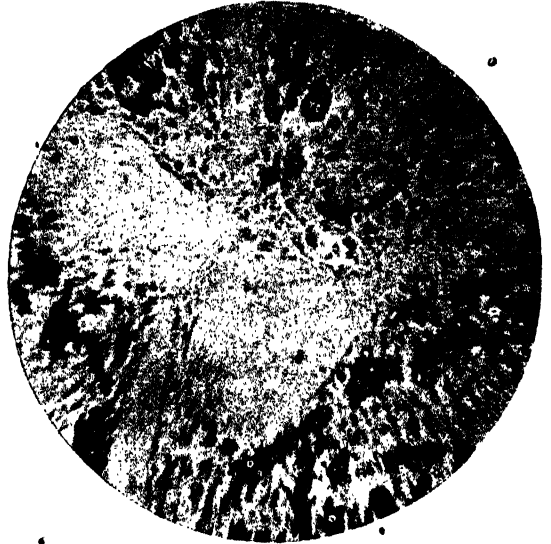
ধূমভরা ফুস্‌ফুস্
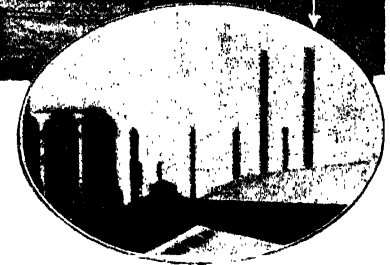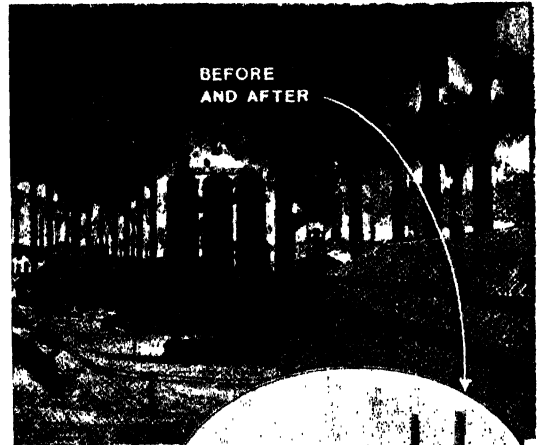
ধূমপূর্ণ সহর ও ধূমশূন্য সহর

৩। রৌদ্রের গতিরোধ করে বলিয়া গলা এবং ফুস্‌ফুসের ব্যাধি জন্মে।

৪। প্রত্যেক লোক বৎসরে যত খাজনা দেয়, ধূমের জন্য নানা-রকমে প্রায় ততই খরচ করিতে হয়।

৫। রাস্তা ঘাটে কুয়াসার সৃষ্টি হইয়া নানারকম দুর্ঘটনা হয়।

ধূমের জন্য আমেরিকার সহরবাসীদের বছরে কত করিয়া খরচ করিতে হয়—

প্রত্যেক লোক (আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা) ৬৮৲ করিয়া খরচ করিতে বাধ্য হয়।

বড় বড় আমেরিকান্ সহরে ৫০০,০০০,০০০ ডলার বা ইহার ৪ গুণ টাকা খরচ হয়। চিকাগো সহরেরই বছরে ধূম্রের জন্য ৫০,০০০,০০০ ডলার খরচ হয়।

ধূম প্রায় সব রকম ধাতুরই আয়ু হ্রাস করে।

১। তামা হাজার হাজার বছর টিকিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে যদি ক্রমাগত ধূম আসিয়া লাগে তবে তাহা ১০।২০ বছরেই নষ্ট হয়।

২। গ্যাল্‌ভ্যানাইজ্‌ড্ লোহা ১৪ বছরের স্থানে ৬ বছর থাকে।

৩। টিন ২৮ বছরের স্থানে ১৫ বছর থাকে।

সহরের ধূমে মানুষের ফুসফুস্ কেমন ভাবে আক্রান্ত হয় তাহার একটি ছবি দেওয়া হইল।

যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় সহরে এখন ধূম্র-রাক্ষসকে বধ করিবার নানা-রকম চেষ্টা উদ্যোগ চলিতেছে। অনেক সহরে এই কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে সহরবাসীদের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইয়াছে। চশ্‌মাধারীদের সংখ্যাও অনেক কমিয়া আসিয়াছে।

একটি চিত্রে ধূম্রে ভরা এবং কলের সাহায্যে ধূম্রহীন একটি সহরের এক অংশের অবস্থা দেওয়া হইল। কলে যে-সমস্ত শ্রমিকেরা কাজ করে তাহাদের সব-রকম স্বাস্থ্যই ধূম্র বিতাড়িত হইবার পর ভাল হইয়াছে।

ধূম্র-রাক্ষস দেশের কত-রকম অনিষ্ট যে করিয়াছে তাহা বলা যায় না। সহরের যক্ষারোগের বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ ধূম্র। সময় থাকিতে সকল দেশ-হিতৈষীর এই রাক্ষসকে তাড়াইবার বা বধ করিবার উপায় করা দরকার। গবর্ণমেণ্ট্ বা "স্বাধীন মিত্র" রাজাদের আশায় থাকিলে বিশেষ কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

কয়েদী

বনের বাঘা, বনের বাঘা! খাঁচায় পূরে বাঁধ্‌লে কে?
চিড়িয়াখানার সং সাজিয়ে, সুখেতে বাদ সাধ্‌লে কে?
জুল্‌জুলিয়ে দেখ্‌চে চেয়ে,
হাত্‌তালি দেয় ছেলে-মেয়ে;
নল্‌খাগ্‌ড়ার দোদুল বনে নিঠুর ফাঁদ সে ফাঁদ্‌লে কে?
নিবিড় বনের স্বাধীন বাঘা! খাঁচায় ধরে' বাঁধ্‌লে কে?

বাঘা ছিল বনের দুলাল,—মাথায় ছিল নীলাকাশ,
থাবার তলায় কাঁটাও ছিল,—ছিল নরম দূর্ব্বাঘাস!
রাত-দুপুরে নদীর তটে
মরণ-ধ্রুপদ কণ্ঠে রটে,
উঠ্‌ত পড়্‌ত ছুটত উধাও, ফেল্‌ত হু-হু ঝোড়ো শ্বাস!
বনের দুলাল ফির্‌ত বনে, মাথায় অসীম নীলাকাশ!

আজ্‌কে দেখি কুলুপ-দেওয়া খাঁচাটার ঐ তিন-দোরে
কোটর্‌-গত চক্ষু-দুটো—উদর অস্থি-লীন ওরে!
নেইকো খোলা-মাঠের বাতাস,
নেই আকাশে অসীম-আভাস,
আছে সুধুই অন্ধকার আর গতির বাধা পিঞ্জরে!
মন-কাঁদানো তিন্‌টে কুলুপ লাগিয়ে গেছে তিন-দোরে!

সোঁদর-বনের সবুজ-স্বপন ভোলেনি ও—ভোলেনি!
চুপ্‌টি ক'রে আছে, কারণ খাঁচার দুয়ার খোলেনি!
বনের কথাই মনের কথা,
ভাব্‌চে এবং পাচ্ছে ব্যথা,—
দেখ্‌চে চেয়ে,—ঝড়ের ঠাকুর মেঘের নিশান তোলেনি!
গভীর বনের শ্যামল স্বপন ভোলেনি ও—ভোলেনি!

উঠ্‌বে জ্বলে' চোখ-দুটো ওর—যে চোখ এখন ঘোলাটে,
ঝল্‌বে যেদিন আগুন-ত্রিশূল কালো মেঘের ললাটে!
খাঁচার মালিক! শুন্‌বে তখন
বাঘার গলায় বাজের বচন,
হাঁক্‌বে যেদিন পাগ্‌লা ঝোড়ো,—ভাঙ্‌বে লোহার কবাটে!
বনের বাঘা ভুল্‌বে দাগা, রইবে না চোখ ঘোলাটে!

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

লাজুক নারী

পর্দ্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড় লাজুক নারীর দল,
অন্ধকারে বন্ধ হ'য়ে থাক্‌লে কিবা ফল ?
স্যাঁৎসেঁতে ঐ আঁধার কোণে ঢের করেছ বাস,
এখনো কি সাধ মেটেনি—পূর্‌ল না কি আশ ?
স্বার্থপর ঐ পুরুষগুলি চোখ রাঙ্গিয়ে আজ
রাখ্‌ছে পূরে তোমাদের ঐ অন্ধকারার মাঝ !
লাজুক নারি ! বারেক তরে দেখ্‌ছ নাকি ভাবি -
মুক্ত বাতাস আলোতে যে পূর্ণ তোমার দাবি ?

দীর্ঘ বিশাল ঘোম্‌টা টানা—ফিস্‌ফিসে ঐ বুলি
ঢের হয়েছে ; এই বারেতে যাও ওগুলি ভুলি।
শীর্ণ রোগা জীর্ণ দেহ ভগ্ন তোমার মন—
ঐ কারাতে বন্ধ হয়ে বাঁচ্‌বে কতক্ষণ ?
বেরিয়ে এস, পেরিয়ে এস অবরোধের বেড়া,
কোন্ আইনে রুধ্‌বে তোমায় পুরুষ-পাষণ্ডেরা ?
লাজুক নারি ! ঘরের ভিতর বন্ধ যদি রবে—
মান সম্ভ্রম আব্রু তোমার রইল কোথা তবে ?

একই বিধির হাতের সৃজন উভয় পুরুষ নারী—
বিশ্বে তারা সব জিনিষে সমান অধিকারী ;
একলা পুরুষ লুট্‌বে মজা বিশ্বখানা ভরে',
রইবে নারী বন্ধ হয়ে অন্দরেরই ঘরে ?
বিধির বিধান ব্যর্থ হবে ? অসহ্য এ ভারি !
চুপ্‌টি করে' আর থেক না—বিদ্রোহী হও নারী !
লাজুক নারি ! আর কতদিন এমনি ভাবে রবে !
অবরোধের প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে পড় সবে।

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

কি কি গুণ দেখিয়া বিবাহ করা উচিত

মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন্ট্ Journal of Heredity, Vol. XIII, No. 1. পত্রিকায় ভাবী স্বামী ও স্ত্রীর কি কি গুণের প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া সেখানকার ছাত্র ও ছাত্রীর নিকট হইতে উত্তর জানিবার জন্য তাহাদিগের নিকট পাঠান। তিনি তাহাদিগকে বেশ ভাবিয়া উত্তর দিতে বলিয়াছিলেন। ছাত্রীদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—

(১) তুমি বিবাহ করিতে চাও কি না ?

(২) যদি বিবাহ করিতে আপত্তি থাকে তবে আপত্তির কারণ কি ?

(৩) তুমি কতগুলি সন্তানের মা হইয়া আদর্শ পরিবার গঠন করিতে চাও ?

(৪) যদি তুমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাক তবে তোমার ভাবী স্বামীর নিম্নলিখিত গুণাবলীর মধ্যে কি কি থাকা দরকার ও কোন্ কোন্ গুণকে ১ম, ২য়, ৩য়, ইত্যাদি স্থান দিবে তাহা উহার পার্শ্বেই উল্লেখ করিবে।

(ক) শারীরিক পরিচ্ছন্নতা
(খ) খ্যাতি
(গ) শিল্পকুশলতা
(ঘ) সৌন্দর্য্য
(ঙ) প্রবৃত্তি
(চ) নৈসর্গিক মানসিক শক্তি
(ছ) ধর্ম্মে মতি
(জ) সাধুতা
(ঝ) চরিত্রশুদ্ধি
(ঞ) শিক্ষা
(ট) পরিবার প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা
(ঠ) তামাক ব্যবহারে বীতস্পৃহতা
(ড) মদ্যপানে বীতস্পৃহতা
(ঢ) নারীর অধিকার সম্বন্ধে মতামত
(ণ) স্বাস্থ্য
(ত) উচ্চাকাঙ্ক্ষা
(থ) ক্রীড়ায় অনুরাগ
(দ) বংশ-মর্য্যাদা
(ধ) বাণিজ্যে নিপুণতা
(ন) ধনসম্পত্তি
(প) সামাজিকতা

(৫) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কি কোন মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? যদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তবে কেন হইয়াছে ? বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বা কি মত ছিল ?

(৬) বয়স

(৭) বিবাহিত কি অবিবাহিত ?

প্রশ্নগুলির উত্তরে শতকরা ৯৮জন ছাত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছুক

জানাইয়াছে। ৩য় প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ ছাত্রী ৪টি সন্তানের জননী হইতে চাহে লিখিয়াছে। ৪র্থ প্রশ্নের উত্তরে (ভাবী স্বামীর গুণাবলী সম্বন্ধে) অধিকাংশ ছাত্রী ১ম, ২য়, ৩য়, করিয়া যাহা লিখিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। অধিকাংশ ছাত্রীর মতামত একরূপ হইয়াছে। ইহারা চরিত্রশুদ্ধিকে ১ম স্থান দিয়াছে। ২য় স্থান দিয়াছে "সাধুতা"কে। ইহার পরে যথাক্রমে "প্রবৃত্তি," "স্বাস্থ্য" "নৈসর্গিক মানসিক শক্তি", "শিক্ষা", "মদ্যপানে বীতস্পৃহতা", "উচ্চাকাঙ্ক্ষা", "ধর্ম্মে মতি", "বাণিজ্য-নিপুণতা", "শারীরিক পরিচ্ছন্নতা", "পরিবার প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা", "বংশ-মর্য্যাদা", "খ্যাতি", "সামাজিকতা", "সৌন্দর্য্য", "তামাক ব্যবহারে বীতস্পৃহতা", "শিল্প-কুশলতা", "ক্রীড়ায় অনুরাগ", "ধনসম্পত্তি", "নারীর অধিকার সম্বন্ধে মতামত", প্রভৃতির স্থান।

ছাত্রদের নিকট যে প্রশ্নাবলী পাঠান হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। ইহাদেরও বেশ ভাবিয়া উত্তর দিতে বলা হইয়াছিল।

(১) তুমি বিবাহ করিতে চাও কি না?

(২) যদি বিবাহ করিতে না চাও তবে আপত্তির কারণ কি?

(৩) তুমি কতগুলি সন্তানের পিতা হইতে চাও?

(৪) যদি বিবাহ করিতে সম্মত থাক তবে তোমার ভাবী পত্নীর নিম্নলিখিত গুণাবলীর মধ্যে কি কি থাকা দরকার ও কোন্ কোন্ গুণকে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি স্থান দিবে তাহা পার্শ্বে উল্লেখ করিবে।

(ক) গৃহকার্য্যে নিপুণতা
(খ) শিল্প- বা সঙ্গীত-কুশলতা
(গ) শিক্ষা
(ঘ) নৈসর্গিক মানসিক শক্তি
(ঙ) শারীরিক পরিচ্ছন্নতা
(চ) ধর্ম্মে মতি
(ছ) চরিত্রশুদ্ধি
(জ) পরিবার প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা
(ঝ) সৌন্দর্য্য
(ঞ) স্বাস্থ্য
(ট) ক্রীড়ায় অনুরাগ
(ঠ) উচ্চাকাঙ্ক্ষা
(ড) ধনসম্পত্তি
(ঢ) নারীর অধিকার সম্বন্ধে মতামত
(ণ) প্রবৃত্তি

(৫) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বিবাহ সম্বন্ধে তোমার কি কোন মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে? যদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তবে কেন হইয়াছে? বিবাহ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বা কি মত ছিল?

(৬) বয়স

(৭) বিবাহিত কি অবিবাহিত?

উত্তরে শতকরা ৯৮ জন ছাত্র বিবাহ করিতে ইচ্ছুক জানাইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ ছাত্র ৪টি সন্তানের পিতা হইতে চাহে। ছাত্র বা ছাত্রী কেহই নিঃসন্তান হইতে চাহে না। ভাবী বধূর গুণাবলী সম্বন্ধে ছাত্রগণ "চরিত্রশুদ্ধি"কে ১ম স্থান দিয়াছে। তার পরে যথাক্রমে "স্বাস্থ্য", "প্রবৃত্তি", "শিক্ষা", "নৈসর্গিক মানসিক শক্তি", "পরিবার পতিপালন করিতে ইচ্ছা", "ধর্ম্মে মতি" "গৃহকর্ম্ম-নিপুণতা", "সৌন্দর্য্য", "উচ্চাকাঙ্ক্ষা", "সামাজিকতা", "বংশমর্য্যাদা", "শিল্প- বা সঙ্গীত-কুশলতা", "বাণিজ্য-নিপুণতা", "ধনসম্পত্তি", "ক্রীড়ায় অনুরাগ", "নারীর অধিকার সম্বন্ধে মতামত"কে স্থান দিয়াছে।

ছাত্র ও ছাত্রী উভয়পক্ষেই "চরিত্রশুদ্ধি" শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে। ছাত্রেরা "সৌন্দর্য্য"কে "গৃহকর্ম্ম-নিপুণতার" নীচে স্থান দিয়াছে, কারণ সংসার করিতে হইলে "গৃহকর্ম্মনিপুণতা"র প্রয়োজন যত, "সৌন্দর্য্যে"র প্রয়োজন তত নয়। যাহা হউক, উভয় পক্ষের মতের একতা অধিকাংশ স্থানে আছে।

অবশ্য আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মতামত পাশ্চাত্য ছেলে-মেয়েদের মতামত হইতে যে পৃথক্ হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মানুষের নৈতিকজীবনে পবিত্র চরিত্রের যে প্রয়োজন কত তাহা আমাদের দেশের অনেকে জানে না—জানে না ঠিক কথা নয়, বোঝে না। আমার মনে হয় যদি কেহ ঠিক ঐ-সকল প্রশ্ন আমাদের ছেলে-মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিতেন তবে ছেলেরা ভাবী বধূর গুণাবলীর মধ্যে ১ম "ধনসম্পত্তি" ও ২য় "সৌন্দর্য্যকে" স্থান দিত। তাহাদের তরুণ জীবনের চরম লক্ষ্য অর্থ ও রূপ। "গৃহকর্ম্মনিপুণতা" ও "লেখাপড়া"টাকে ইহাদের নীচে স্থান দিবে। মেয়েরাও বোধহয় অধিকাংশ জায়গায় ঐ উত্তরই দিত। যাহা হউক, সত্যসত্যই তাহারা ভাবী স্বামী ও স্ত্রীর কি কি গুণ থাকা উচিত মনে করে তাহা অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী সুষমা সিংহ

—

মহিলা-যোগ্য শ্রমশিল্প

সম্প্রতি সিংহল হইতে "শাড়ী" নামে একটি মহিলা-পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে সেখানকার মেয়েরা ঘরে বসিয়া কি কি শিল্পকার্য্য করে তাহার বিবরণ আছে। এ-সব শিল্প আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে বটে; তবে সেগুলির বিশেষ প্রচার নাই। আমরা সেই বিবরণের মোটামুটি কয়েকটি কথা তুলিয়া দিলাম।

(১) মাদুর বোনা; এই কাজে সেখানকার মেয়েরা বেশ অভ্যস্ত। ইহার প্রচলন দ্রুত হইলে সরু কাঠির মাদুর সেখানে বিছানার চাদরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, এমনও আশা হয়। যেমন, আমাদের দেশে মসলন্দের মাদুর পাটি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

(২) মাটি হইতে নানা রকম খেলনা, পুতুল ও ব্যবহারের জিনিস মেয়েরা করিতেছেন।

(৩) মেয়েরা নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি; খোলা হইতে চামচে বা হাতা করিতেছেন। খোলা হইতে আবার বেশ সুন্দর-রকমের সুলভ গহনাও প্রস্তুত করিতেছেন।

(৪) মেয়েরা যাহাতে তাঁতে কাপড় বোনা শিক্ষা করেন তাহার চেষ্টা হইতেছে। বড় কাপড় বুনিতে কষ্ট হইলে তাঁহারা তোয়ালে, গামছা প্রভৃতি অনায়াসে বুনিতে পারেন। অন্য কাজের অপেক্ষা এই কাজে মেয়েদের পয়সাও বেশ উপার্জ্জন হইতে পারে।

(৫) দেশের সূচী-শিল্প প্রায় লুপ্ত। ইহার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইতেছে। আজকালকার প্রয়োজনের মত জিনিস এই শিল্পের দ্বারা তৈরী করা যাইতে পারে। ছোট ছোট হাত-ব্যাগ, টাকার থলি, ছেলেদের ঢাকা প্রভৃতি করা যাইতে পারে।

(৬) সোনা বা রূপা হইতে ছোট ছোট পাত্র তৈরী ও গহনা তৈয়ারী কাজও মেয়েরা করিতে পারেন। হার বালা প্রভৃতির সূক্ষ্ম কাজ করিয়া মেয়েরা স্বর্ণকারের সহায়তা করিয়া রোজগার করিতে পারেন।

(৭) কাঠের উপর গালা দিয়া রং করার কাজও মেয়েদের পক্ষে

সহজ। ইহাতে বাক্স, বুরুশ, ছবির ফ্রেম, বাতিদান, প্রভৃতির সৌষ্ঠব-সাধন হইতে পারে।

(৮) লেসের কাজ, চিকণের কাজ সিংহলে মেয়েদের একচেটিয়া; লক্ষৌ ও মেটেবুরুজের মুসলমান মহিলারাও এ কাজে সুদক্ষ; সকল দেশের মেয়েদের ইহা শিক্ষা করা উচিত।

আমাদের দেশের অনাথ পরমুখাপেক্ষী বিধবাদের দ্বারা এইসব করাইয়া তাঁহাদিগকে কতটা আত্মনির্ভরশীল করা যায় তাহা দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণের পরীক্ষণীয়।

—

নারী প্রগতি

আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরের একটি কর্ম্মীসঙ্ঘের সভ্যরা, গভর্মে‍ণ্ট-অফিসসমূহে নিযুক্ত মেয়ে-পুরুষের ভেদাভেদ উঠাইয়া দেওয়া হোক, এই মর্ম্মে গভর্মে‍ণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিযোগ এই—মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি অবিচার বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক বৎসরে পুরুষরা যত মাহিনা পায় মেয়েরা তাহার প্রায় ছয় শত টাকা কম পায়। অথচ উভয়ের কাজ একই। কতকগুলি উচ্চ পদ মেয়েদের দখল করিবার অধিকার নাই। এই সঙ্ঘ সভাপতিকে এমন একটি আইন পাশ করাইবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন যাহাতে এই অবিচার উঠিয়া যাইতে পারে।

সরকারী ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া ব্যবস্থা-কার্য্যে নিজেদের অধিকার পরিচালন করিতে সমগ্র এসিয়া মহাদেশের মধ্যে ব্রহ্মদেশের নারীরাই অগ্রসর হইয়াছেন। গত নভেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নির্ব্বাচন ব্যাপার সাধিত হয়। এই সময়ে রেঙ্গুনের নানা কাগজে যে-সব বাদানুবাদ হয় তাহা খুব উপভোগ্য। এই নূতন দায়িত্ব সেখানকার নারীরা কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে আমাদের বিশ্বাস সেখানকার কর্ম্মক্ষম মেয়েরা ভোটের জোরে অর্থনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহাদের বাঞ্ছিত সংস্কার ঘটাইয়া তুলিবেন। এ বিষয়ে ব্রহ্মদেশই আমাদের পথ-প্রবর্ত্তক, কেননা সেখানকার মেয়েরা বহুদিন হইতে সামাজিক সাম্য ও স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

মিসেস্ এম্ সি দেবদাস মান্দ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটির নারী সভ্য হইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজকে এবিষয়ে অগ্রণী করিয়াছেন। সওদাপেট্ মান্দ্রাজ সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এখানে ভারতীয় নারী-সমিতির যে শাখা আছে তাহার দুই জন সভ্য, চিঙ্গল্‌পুট্ জেলার কলেক্টার কর্ত্তৃক সওদাপেট্ মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতেও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ মহিলারা সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতবর্ষের কয়লার খনিসমূহে আট হাজারেরও অধিক বালক-বালিকা কাজ করে। খনি-সমূহের আইনের সংশোধক এক আইনে তেরো অপেক্ষা কম বৎসরের বালকবালিকাদিগকে খনিতে নিযুক্ত করা হইবে না, ইহা গভর্মে‍ণ্ট্ স্বীকার করিয়া লইলেও ভারতীয় খনি-পরিচালকদের এক সমিতি সংবাদপত্রে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বালকবালিকা ও মেয়েদের খনি হইতে সরাইয়া লইলে যে দেশের এই ব্যবসা লোপ পাইবে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিবার অন্যায় আগ্রহ দেশের বালকবালিকা ও মেয়েদের স্বাস্থ্যের যে অবনতি ঘটাইতেছে তাহাকে বলিতে হয় ব্যবসায়ের উন্নতির প্রয়োজন নাই। মেয়েদের খনিতে পরিশ্রমে এত অহিত ঘটিতে থাকিলে আমাদের সেই প্রাচীন সরল কৃষিজীবনে ফিরিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনেকে বলিতেছেন খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়া শীঘ্রই দুরবস্থা দূর করা হইবে, খনির কাজ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমাদের নারী-জাগরণের উদ্দেশ্য যেন হয় খনিতে লাঞ্ছিত স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধার সাধন। স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের অনুরোধে গবর্ণমে‍ণ্ট্ নিজেদের আইন-নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে যেন বিচ্যুত না হন।

মান্দ্রাজের আদমসুমারীর হিসাব হইতে সম্প্রতি জানা গিয়াছে, অন্ধ্রদেশের জেলায় জেলায় বাল-বিধবার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে। কলিঙ্গীদের মধ্যে দশ বৎসর বয়সের এক হাজার বালিকার মধ্যে প্রায় ৬৬৪ জন বিবাহিত। বিবাহিত শিশু এবং বালবিধবার সংখ্যা শতকরা ৫০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা হইতেই অন্ধ্রদেশের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার বিফলতা প্রকাশ পাইতেছে। আবার এই দেশ রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকার লাভের জন্য চীৎকার করিতেছে! কচি বয়সের দশটি বালিকার মধ্যে ছয়টিকে এরূপ অবিচারের সহিত বাল-বৈধব্যের কবলে ছাড়িয়া দিয়া এ দেশ ন্যায়ের বিধাতার কাছ হইতে কি করিয়া স্বায়ত্তশাসন আশা করিতে পারে? এর প্রতিকার মাতা ভগিনী প্রভৃতি না করিলে স্বার্থপর পুরুষের দ্বারা শীঘ্র হইবার নয়।

গুপ্ত

দুঃখ-সুখ

হা-হা-হা-হা-য় কোন্ হাহারব চীৎকারেতেই কাঁদে,
সেই হা-হা-তেই হাসির তুফান হুল্লোড়েতেই মাতে।
উহু উহু, কোন্ বেদনার বুক-ফাটানির বোল,
সেই উহু-টি ওহো-র স্বরে তুলচে পুলক-দোল।

আ-হা কেবল দুঃখ দেখেই উঠে না উচ্ছলি',
আনন্দেতে প্রাণ ভরিলে সেই আ-হাটিই বলি।
তবেই মানুষ বুঝতে পার, দুখ নহে তো একা,
একটুখানি বদ্‌লে নিলে সুখ দেবে যে দেখা।

শ্রী নীহারিকা দেবী

বুদ্ধদেব

উন্মত্ত কপিলবাস্তু উল্লাস-উৎসবে,
আজি তার অতি শুভদিন,—
সিদ্ধার্থ পুনরাগত বোধি লাভ করি,
লয়ে' পুণ্য জীবন নবীন,
কি বিশাল জনসঙ্ঘ, শিষ্য-সমাগম!
নাগরিক ছুটে দলে দলে,—
গৌতম পুনরাগত বুদ্ধত্ব লইয়া,
দরশন বহু ভাগ্যফলে।
সমাগত শাক্যসিংহ পিতৃরাজ্য-মাঝে,—
যুবরাজ এসেছেন ঘরে!
ঘোষিছে বিজয়-বার্ত্তা দুন্দুভি-নিনাদে
শঙ্খ-ঘণ্টা-ঝাঁঝরে কাঁশরে।
পল্লব, কুসুমগুচ্ছ,—তোরণে, তোরণে,—
পূর্ণকুম্ভ, কদলী-রোপণ,
লাজে লাজে ছেয়ে গেছে দীর্ঘ রাজপথ,
কি অপূর্ব্ব আনন্দ-জ্ঞাপন!
পথে পথে ছড়াছড়ি কর্পূর, কুঙ্কুম,
ছুটে গন্ধ ফুলে, ফুলে, ফুলে,
চন্দনে কর্দ্দমময়, ছায়াময় ধূমে,—
ধূপ-ধূনা-সুরভি-গুগ্‌গুলে।
গৈরিক তরঙ্গ পথে শুধু বহি যায়—
তেজঃপুঞ্জ মুণ্ডিত মস্তক,
মন্ত্রমুগ্ধ সবে হেরে শোভা-অভিযান
চক্ষে কারো পড়ে না পলক।
"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" উড়িছে পতাকা,
স্তুতি-গীতি মুখে মুখে মুখে,—
"বোধি-সত্ব এসেছেন নির্ব্বাণ লইয়া
নির্ব্বাপিতে জরা-মৃত্যু-দুখে।"
গায় ভিক্ষু বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব বারতা,—
অত্যদ্ভুত বিজয়-ঘোষণা,—
"ত্যজ দ্বৈধ, ত্যজ দ্বেষ মুক্তি-কামী জন,
মৃত্যু ধায় মন্ত্রস্পৃষ্ট-ফণা।"

"ভুলে যাও উচ্চ-নীচ দ্বন্দ্ব-অভিলাষ,
শোন বাণী শোক-তাপ ভুলে,
পূর্ণ আজি সিদ্ধার্থের দিব্য-দিগ্বিজয়,—
সিদ্ধিলাভ বোধিদ্রুম-মূলে।"
পূর্ণ একাকার আজি, অন্দরে বাহিরে
প্রবাহিত ভাবের প্লাবন।
জনস্রোত উপনীত রাজ-অন্তঃপুরে—
পুর-নারী করে সম্বর্দ্ধন।
পুরোভাগে যশোধরা কাষায়-বসনা
রাজবধূ আহা মরি মরি!
দ্বিগুণিত মঞ্জু-কান্তি ব্রহ্মচর্য্যে যেন,
কহিছেন পুত্র-হাত ধরি,—
"রাহুল রে! আজি এল সেই শুভদিন,—
কর তুমি পিতৃ-দরশন;
মা'গি লও পিতৃধনে উত্তরাধিকার
এই তার উপযুক্ত ক্ষণ।"
চাহিয়া মাতার পানে বালক রাহুল
কি বলিবে খুঁজিয়া না পায়,
শৈশবেই পিতৃহারা,—চিনে না পিতায়,—
অচিনায় চিনা কি গো যায়?
স্তম্ভিত রাহুলে হেরি' কহিছেন মাতা,—
"কেন বৎস, অবোধ এমন?
এ জন-সমুদ্র-মাঝে চিনিতে তাঁহায়
করিতেছ প্রমাদ গণন!
চিনায়েছি তরুমাঝে চন্দনপাদপ,
ফুলমাঝে ফুল্ল শতদল,
চিনায়েছি তারাপুঞ্জে, প্রতি পূর্ণিমায়
পূর্ণকল শশী ঝলমল।
বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমে চিন সেইরূপে
নিরখিয়া প্রত্যেক বয়ান,—
যাও জন-সঙ্ঘ ভেদি' পিতার সন্ধানে
হবে তৃপ্তি সন্দিগ্ধ-নয়ান।

* * * *

আগে আগে পুত্র যায় খুঁজিয়া পিতায়,
মাতা তার পিছু পিছু যান,—
অভিনব অন্বেষণ বৈরাগ্য-বন্যায়
বৈরাগ্যের তরঙ্গ-প্রধান !
ভিক্ষুর বেষ্টনী-মাঝে পরম পুরুষ,—
থমকিয়া দাঁড়াল রাহুল,
আনন্দে "বাবাগো—" বলি দু'হাত পসারি
বেড়ি দিল পিতৃ-পাদ-মূল।
সস্নেহে হৃদয়ে ধরি লয়ে শিরোঘ্রাণ,
মহাযোগী চান পুত্র পানে,—
পুত্র কয়,—"তব ধনে দাও অধিকার"—
আর কিছু চাহিতে না জানে !
হাসিয়া কহেন বুদ্ধ প্রিয় শিষ্যবরে,—
"হে আনন্দ ! তনয় আমার
মাগে তার পিতৃধনে উত্তরাধিকার,
দাও বৎস ! যা প্রাপ্য বাছার।"
বিস্ময়ে কহেন শিষ্য,—"কহ মহাভাগ !
রহস্য ত বুঝিতে না পারি,—
বিরাটের অংশ আসি' বিরাটের পাশে—
কি বিরাট্ প্রার্থনা তাহারি ?
কি আছে তোমার প্রভু, তোমার বলিতে,
পুত্র যাহে মাগে অধিকার ?
বুঝাইয়া পালিবারে দাও গো শকতি
পুত্রে তব কি আছে দিবার ?"
বদনে সরস হাসি কহেন গৌতম,—
"নেহারিয়া নব কিশলয়,—
হে আনন্দ ! জ্ঞানী তুমি, একি মতিভ্রম,
হয়েছে কি মমতা উদয় !
জান না কি পিতা যার দীনাদপি দীন
পিতৃধন দৈন্যই তাহার ?
ভিখারীর ভিক্ষা ঝুলি ভিখারী-তনয়
পায় তায় ন্যায্য অধিকার।"
ইঙ্গিত বুঝিল শিষ্য,—দিল রাহুলেরে
পরাইয়া কাষায়-উত্তরী—
রাজ-প্রাসাদের মাঝে রাজপৌত্র-করে
তুলি দিল ভিক্ষাপাত্র ধরি !

* * * *

লুণ্ঠিল বল্লরী ধীরে বনস্পতি-মূলে,—
যশোধরা করিলা প্রণাম,—
মৃদু হাসি' আশীর্ব্বাদ করেন গৌতম,—
"হও সাধ্বি, পূর্ণ-মনস্কাম।"
ভাবগদগদ কণ্ঠে কহিলা আনন্দ,—
"পুত্রে প্রভু, দিলে পরসাদ,
কৃপা কর কৃপাময়, পুত্রের মাতায়,—
ঘুচে যাক সব পরমাদ।"
আনন্দে কহেন বুদ্ধ,—"বৎস, জান না কি
বোধিলাভ কিসের কারণ ?
সাম্যের প্রতিষ্ঠা তরে সাধনা আমার
অপসারি মোহ-আবরণ।
নরনারী ভেদাভেদ, সংকীর্ণ সংস্কার,
জরামৃত্যু-রোগের আকর,
অধিকারী-ভেদে ধর্ম্ম গেছে ছারখার,
লক্ষ্যভ্রষ্ট ভ্রান্ত নারী-নর।
ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মিথ্যাচারে ভরা
সমস্তই স্বার্থ-ক্রীড়নক,
ধর্ম্মশূন্য, কর্ম্মশূন্য, মর্ম্মশূন্য ধরা—
মূর্ত্তিমান্ ঘৃণিত নরক !
চাহি তাহা পালটিতে, শিখাইতে প্রেম,
অকপট প্রীতি, ভালবাসা,
নির্ব্বেদ নির্ব্বাণ মুক্তি চিরযোগক্ষেম,—
এই মের প্রাণের পিপাসা !
পেয়েছি সন্ধান যাহে যাবে অন্ধকার
সমুদিবে নূতন প্রভাত,
পেয়েছি যে অমৃতের আলোক-সম্ভার
অভিনব জ্যোতির প্রপাত ;—
ছড়াইব সেই জ্যোতি বিশ্ব-জনে-জনে,
নরনারী সকলে সমান !
জাগিয়া উঠিবে বিশ্ব নব জাগরণে,
মোহ-ঘুম হবে অবসান।
যশোধরা ! এস সতি ! সঙ্গিনী আমার,
প্রেম-মন্ত্র দিব তব কানে,
লও সখি, মহামৃত-বণ্টনের ভার
এ বিশ্বের ব্যাধি-নিরবাণে।"
যশোধরা সংজ্ঞাহারা চরণে পতির
পূর্ণ হেরি জীবনের সাধ,
দীর্ঘ বিরহের পরে মিলন গভীর,
একি দয়া ! একি আশীর্ব্বাদ !!

শ্রী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঐকতান

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়

ভারতবর্ষ

গয়ার কংগ্রেস—

গয়ার কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে এবার বিশেষভাবে আইন ও শৃঙ্খলা ও কাউন্সিল-প্রবেশের কথাটাই আলোচিত হইয়াছে। যে আইন প্রজার কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে আইন লঙ্ঘনে যে অপরাধ হয় না, নানা ঐতিহাসিক নজির দেখাইয়া সেই কথাটাই তিনি প্রমাণ করিয়াছেন এবং কাউন্সিল ধ্বংসের জন্যই তিনি কাউন্সিল-প্রবেশ সমর্থন করিয়াছেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) মহাত্মা গান্ধী ভারতের ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে শান্তি ও সত্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন, ভারতবাসীর স্বাভাবিক অধিকার লাভের জন্য যে অহিংস অসহযোগ নীতি তাঁহার দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছে, এই মহাসভা তাহার উপযোগিতা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। মহাত্মার কাছে এই মহাসভা সেজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

(২) যে-সব স্বার্থত্যাগী ভারতবাসী কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে জন্মভূমির মঙ্গল-কামনায় কোনো-প্রকার বাধা প্রদান না করিয়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মোৎসর্গের স্মৃতি মনে রাখিয়া সমস্ত ভারতবাসীরই স্বাধীনতালাভের জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করা সঙ্গত।

(৩) যে-সব অকালী বীর অহিংসার উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া বিনা-প্রতিবাদে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, কংগ্রেস গৌরব ও প্রশংসাসহকারে তাঁহাদের কীর্ত্তি স্মরণ করিতেছেন।

(৪) কামাল পাশা ও তুর্কী জাতির জয়লাভে কংগ্রেস বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তুরস্কের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পরে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্‌ যদি যে-সব বাধা স্থাপন করিয়াছেন সেই-সমস্ত বাধা যাহাতে তাঁহারা অপসারিত করেন, ইস্‌লাম ও জাজিরাত্‌-উল্‌-আরব্‌ যাহাতে অ-মুসলমানের প্রভাব হইতে মুক্ত হয় সেজন্য ভারতবাসীকে অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) মতিলাল ঘোষ এবং অম্বিকাচরণ মজুমদারের মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ইঁহাদের মৃত্যুতে কংগ্রেস আন্তরিক দুঃখিত।

(৬) কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং নাগপুর ও আমেদাবাদে ব্যবস্থাপক সভা পরিবর্জ্জন এবং গঠনমূলক কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কে যে-সব [illegible] পরিগৃহীত হইয়াছিল, এই কংগ্রেস তাহার পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক [illegible]।

(৭) [illegible] সামরিক [illegible] গ্রহণ করিতেছেন। ব্যবস্থাপক সভা জন-সাধারণের প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা গঠিত নহে। সেই সভার নামমাত্র অনুমতি লইয়া গবর্মেণ্ট ঋণ-ভার এমন ভাবে বাড়াইয়া চলিয়াছেন যে তাহা পরিশোধ করা ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব। এই-সব বিষয় আলোচনা করিয়া এই কংগ্রেস সমগ্র জগৎকে জানাইয়া দিতেছেন, অতঃপর ভারত-গবর্মেণ্ট যে-সব ঋণ গ্রহণ করিবেন সেই সব ঋণের জন্য ভারতবর্ষ যখন স্বরাজলাভ করিবে তখন স্বরাজ-গবর্মেণ্ট দায়ী হইবেন না।

(৮) ভারতের শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাহাদের [illegible]-প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের [illegible] এবং ভারতীয় উপাদানের সাহায্যে বিদেশীগণ ভারতবর্ষকে অতিমাত্রায় শোষণ করিতেছে। এই শোষণ বন্ধ করিবার জন্য 'অল্‌ ইণ্ডিয়া ট্রেড-ইউনিয়ন্‌ কংগ্রেস' এবং ভিন্ন ভিন্ন কৃষাণ-সভার সাহায্যার্থে একটি কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটি কৃষি এবং শিল্প ব্যাপারে 'অল্‌ ইণ্ডিয়া ট্রেড্‌ ইউনিয়ন্‌ কংগ্রেসের' কার্য্যকরী সমিতিকে যথোচিত সাহায্য করিবেন। এই কমিটিতে কে কে সদস্য হইবেন তাহাও স্থির হইয়া গিয়াছে।

(৯) সরকারী বিদ্যালয়, সরকারের সাহায্য-পুষ্ট বিদ্যালয় এবং সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্জ্জন করা এই কংগ্রেস সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয়গুলির সংস্কারও অত্যাবশ্যক মনে করিয়া কংগ্রেস প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটিকে সেগুলি অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(১০) ব্যবহারাজীব এবং জনসাধারণের সরকারী আদালত পরিহার করিয়া চলা এই কংগ্রেস কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। সর্ব্বত্র সালিসী আদালতের প্রতিষ্ঠা এবং সালিসী আদালতের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা উচিত।

(১১) গবর্মেণ্টের স্বেচ্ছাচার নিবারণের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্ত্তে নিরুপদ্রব ভাবে আইন লঙ্ঘনই একমাত্র সঙ্গত উপায়। শীঘ্র স্বরাজ লাভ করিতে হইলে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনই অমোঘ জানিয়া এই কংগ্রেস তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারের জন্য অবিলম্বে পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছে।

কংগ্রেসে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছিল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব দুইটি লইয়া। ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশ সম্পর্কে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মূল প্রস্তাব ছিল—সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স এন্‌কোয়ারী কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফৎ সম্বন্ধে অবিচারের প্রতিকারের জন্য এবং অনতিবিলম্বে স্বরাজলাভের জন্য অসহযোগীরা যাহাতে ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশলাভের চেষ্টা করিতে পারেন, এবং যাহাতে [illegible] অসহযোগী ব্যবস্থাপক-সভায় [illegible] করিতে পারেন সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে।' শ্রীযুক্ত রাজগোপাল

দ্বারা তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। সভায় প্রস্তাবটি লইয়া বহু তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। অবশেষে উহার সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোটে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই দুইটি ছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব সভায় পরিগৃহীত হয় নাই। সে প্রস্তাবটি হইতেছে—'বৈধ ও সঙ্গত উপায়ে স্বরাজ অর্থাৎ বৈদেশিক প্রভাবশূন্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই এই কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য, কংগ্রেস সে কথা স্বীকার করিতেছেন।' এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল-আচারিয়ার বলেন, কংগ্রেসের বর্ত্তমান মূল সূত্রানুসারে স্বরাজ অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বায়ত্তশাসন এই উভয় জিনিষই বুঝায়। বর্ত্তমানে সেই মূল সূত্রের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে। ভোটের জোরে প্রস্তাবটি ব্যর্থ হইয়াছে।

বুদ্ধগয়ার মন্দির [শ্রীযুক্ত টি-পি সেন কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

আচারিয়ার অহিংস অসহযোগ নীতির দোহাই দিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। কংগ্রেসের ভোটে শ্রীযুক্ত রাজগোপাল-আচারিয়ারের মতই পরিগৃহীত হইয়াছে।

ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জ্জন সম্পর্কীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি। তাঁহার প্রস্তাবটি হইতেছে—'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স্ কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে এই কংগ্রেস বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনে সম্মত হইলেন, ইংলণ্ডে উৎপন্ন কোন্ কোন্ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জিত হওয়া সঙ্গত এবং ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য কোন্ দেশ হইতে সে-সব দ্রব্যের আমদানী সহজ হইবে তাহা নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস হইতেই একটি কমিটি গঠিত হইবে এই কমিটি দুই মাসের ভিতর স্বীয় মন্তব্য অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির দরবারে পেশ করিবেন। খদ্দর এবং বিদেশী বর্জ্জনের সম্বন্ধে কংগ্রেস যে কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছেন, এই প্রস্তাবের

কংগ্রেসের নূতন দল—

এবারকার কংগ্রেসে মতের বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রে একেবারে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ফলে কংগ্রেসের পক্ষে একমত হইয়া কাজ করা আর সম্ভবপর হইবে না। বস্তুতঃ কংগ্রেস দুইটি বড় দলেই ভাগ হইয়া গিয়াছে। নূতন দলের নাম হইয়াছে কংগ্রেস-খিলাফৎ-স্বরাজ-সঙ্ঘ। এই দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন না বলিয়া আভাস দিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি হইতে অনেক স্থলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবে। ইঁহারা যে ঘোষণা-পত্র বাহির করিয়াছেন, তাহাতে নিখিল ভারত-কংগ্রেস-কমিটির ১১০ জন সভ্যের স্বাক্ষর আছে। স্বাক্ষরকারীদের ভিতর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, হাকিম আজ্মল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই ঝাভেরভাই পটেল, এন সি কেলকার, এম আর জয়াকর, সি আর রঙ্গ আয়ার, বি এস মুঞ্জি, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, তরুণরাম ফুকন, যমুনাদাস মেটা, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, লালা দুনীচাঁদ, এস ই ষ্টোকস্, রাঘবেন্দ্র রাও, শ্যামসুন্দর ভার্গব, পণ্ডিত হরকরণ-নাথ মিশ্র, শ্রীপ্রকাশ পূর্ণানন্দ, রুচিরাম শোহনী, মৌলানা আব্দুল কাদের, টি এ শেরওয়ানী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইঁহারা যে ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে,—গয়াব কংগ্রেসে যে-সব কার্য্যপদ্ধতি পরিগৃহীত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি আমাদের মতে আশু স্বরাজলাভের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তাহা ছাড়া স্বরাজলাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এইজন্য কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই আমরা একটা নূতন সঙ্ঘ গঠন করিলাম। এই সঙ্ঘের নাম হইবে কংগ্রেস-খেলাফৎ-স্বরাজ-সঙ্ঘ। এ সঙ্ঘ বৈধ ও নিরুপদ্রব উপায়ে স্বরাজ-লাভরূপ কংগ্রেসের আদর্শ এবং অহিংস অসহযোগনীতি গ্রহণ

বুদ্ধগয়ার মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি [শ্রীযুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

করিতেছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশকে এই সঙ্ঘের নায়ক করা হইল এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত শাসমল, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল এবং চৌধুরী খলিলাজ্জামা এই সঙ্ঘের সম্পাদক হইলেন। এই সঙ্ঘ নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবেন এবং জানুয়ারী মাসের ভিতরেই নিজেদের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া লইবেন। সভাপতি এই সঙ্ঘে আরো নূতন লোক নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন। শীঘ্রই কোনো এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে সঙ্ঘের সদস্যগণের কাছে কার্য্যনীতি বা নিয়মাবলী উপস্থিত করা হইবে।

গত ১লা জানুয়ারীর নিখিল ভারত-কংগ্রেস-কমিটিতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ উক্ত সভার সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

নিখিল-ভারত সামাজিক বৈঠক—

গত ২৯শে ডিসেম্বর গয়াতে নিখিল-ভারত সামাজিক বৈঠকের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বৈঠকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মিঃ জয়াকর। বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় তিন শত মহিলাও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে—

(১) মোহান্ত এবং শঙ্করাচার্য্যগণকে ব্যবস্থা দিতে হইবে যে, হিন্দুরা অস্পৃশ্য জাতিদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না,—তাহাদিগকে নিজেদেরই সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

(২) বালিকাদের প্রতি ব্যবহারের ব্যবস্থা আরো ভাল করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে হইবে। ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বা কোনো বৃদ্ধের সহিত তাহাদের বিবাহ হইতে পারিবে না। পর্দ্দা তুলিয়া দিতে হইবে; শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে ব্যয়ের মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে।

(৩) শিশুহত্যা যাহাতে বিদূরিত হয় সেজন্য বালবিধবাদের আবার বিবাহ দিতে হইবে। বিধবাদের শিক্ষার জন্য ভারতের নানা-স্থানে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার সময় লালা দুনিচাঁদ পঞ্জাবের স্যার গঙ্গারামকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। এই ভদ্রলোকটির যত্নে ও চেষ্টায় বিধবা-বিবাহের জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে তিনি যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

(৪) ভারতবর্ষ হইতে মদের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপেই তুলিয়া দিতে হইবে।

গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির [শ্রীযুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

শ্রীযুত নটরাজন এবং শ্রীযুত সদানন্দ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বৈঠকের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সমস্ত বড় কাজেই মানুষের দরকার। আমরা মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না; আমাদের নিজেদের সামাজিক গলদ, বিধি-নিষেধ, বিরোধ বৈষম্য প্রভৃতি ইহার জন্য দায়ী। যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য দেশ আজ অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা লাভ করিতে হইলেও সমাজের সংস্কার একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। গয়ার এই সামাজিক

অশোক কর্তৃক নির্ম্মিত বুদ্ধগয়ার মন্দিরের প্রস্তর বেষ্টনী [শ্রীযুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ্]

বৈঠকে যে প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই জাতির পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।

নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভা—

বড়দিনের বন্ধে গয়ায় নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—ভারতের অধিবাসীদের ভিতর হিন্দুদেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দুদের জন্মের হার যেমন কমিয়া গিয়াছে, মৃত্যুর হার আবার তেমনি বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা স্বল্পজীবী ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা স্বধর্ম্ম ভুলিয়াছে, বাল্যে বিবাহের প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের সমাজ-শরীরে বহুবিধ বিষ প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সম্পর্কে আজকাল যথেষ্টই আলোচনা করা হয়। কিন্তু হিন্দু যদি এইরূপ দুর্ব্বল থাকে তবে উভয়ের ভিতর মিলন প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় যদি পরস্পর পরস্পরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি অর্জ্জন করিতে না পারে তবে ইহাদের মিলনের আশা আকাশকুসুম মাত্র। বিরোধটা বড় করিয়া তুলিবার জন্য নহে, মিলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্যই হিন্দুদের শক্তি অর্জ্জন করা দরকার। হিন্দুদের দুর্ব্বলতার অজুহাতেই বিরোধ এতখানি বড় হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক হিন্দুদের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস পায়, আর তাহাতেই বিরোধের জেরটা বাড়িয়া চলিতে থাকে। হিন্দুরা যদি শক্তি-সামর্থ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তবে এই অযথা আক্রমণ বন্ধ হইবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর সৌহার্দ্দ্যও প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা ছাড়া অন্ত্যজদের সম্বন্ধেও হিন্দুদের ব্যবহার এবং অস্পৃশ্যতা সমাজের ভিতর যথেষ্ট আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাও দূর করিতে হইবে।

সভায় যে-সব প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাদের কতকগুলির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গোবধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হিন্দুদের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। কসাইদের নিকট যাহারা গোরু বিক্রয় করে তাহাদের কাছে গোরু বিক্রয় করাও হিন্দুদের কোনো কারণেই সঙ্গত নহে। চামড়ার তৈরী জিনিস যতদূর সম্ভব পরিহার করিয়া চলা উচিত।

আফগানিস্থানের আমীর এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহাদের রাজ্যে গোহত্যা বন্ধ করিয়া হিন্দুদের বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। লোকাল বোর্ডের মুসলমান ও খৃষ্টান সদস্যদিগকে আমীর ও নিজামের আদর্শই গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। কারণ গোহত্যার দ্বারা কেবলমাত্র হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসেই আঘাত করা হয় না। তাহার দ্বারা দেশের অর্থ-সমস্যাও অত্যন্ত জটিল করিয়া তোলা হইতেছে।

মালাবারে হিন্দুদের প্রতি যে-সব অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে
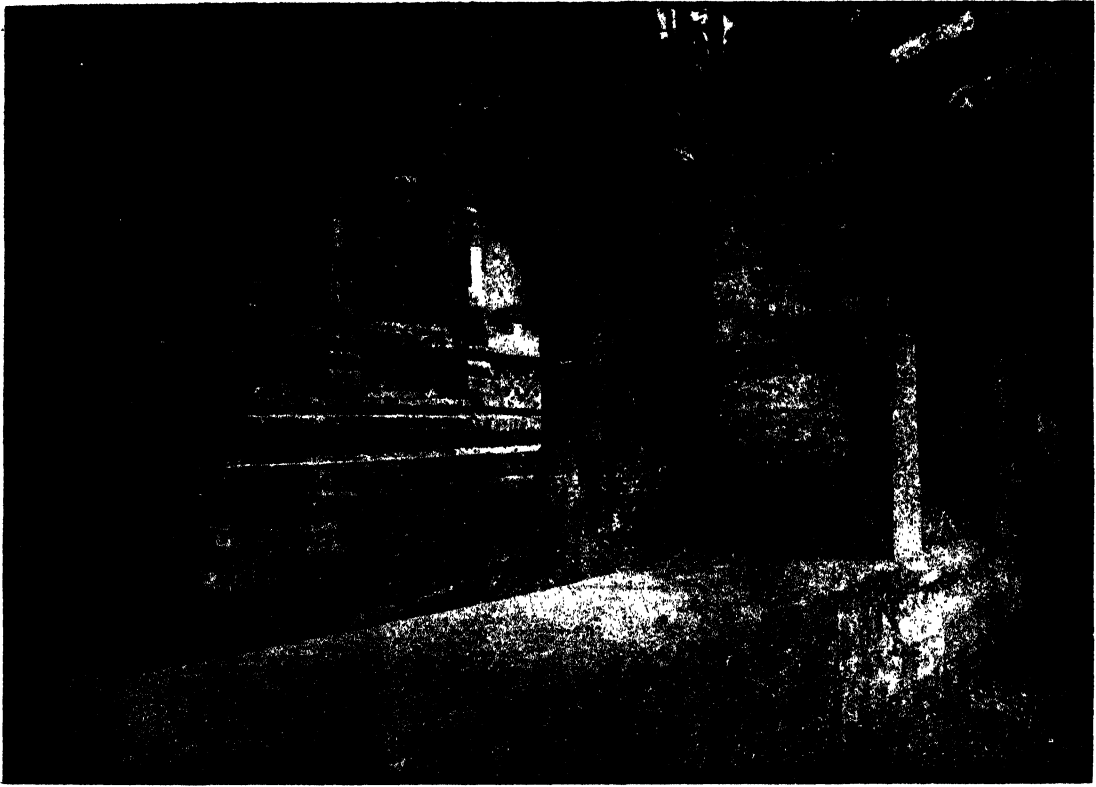
বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছনে বোধিদ্রুম [শ্রীযুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

তাহার জন্য তাহারা বিশেষভাবে সহানুভূতি লাভের যোগ্য। যে-সকল হিন্দুকে মোপ্‌লারা জোর করিয়া মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল তাহাদিগকে বিনা দ্বিধায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। মালাবারে এবং মুলতানে হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপর যে-সব অত্যাচার করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত নিন্দনীয়। এই-সব অত্যাচারিত লোকদিগকে সাহায্য করার জন্য নিখিল-ভারত-হিন্দু-সাহায্য-ভাণ্ডার নামে একটি ফণ্ড খোলা হইবে। কয়েকজন সদস্য লইয়া এজন্য একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে স্বরাজলাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক জিনিষ হইতেছে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর একতার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য হিন্দুদেরও শক্তিশালী হইয়া উঠা প্রয়োজন। এই শক্তিলাভের জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হিন্দু-সভা ও স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে প্রস্তাবিত সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি বলিষ্ঠ লোক লইয়া একটি ব্যবস্থা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ইঁহারাই সকল প্রদেশে হিন্দুসভাসমূহের বন্দোবস্ত করিবেন।

নিম্নশ্রেণী এবং অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের ধর্ম্মনেতাগণকে ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত শিক্ষার সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

উদারনৈতিক সঙ্ঘ—

এবার নাগপুরে জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘের কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে দ্বৈতমূলক শাসনপদ্ধতি, সিভিলসার্ভিস্, সৈন্যবিভাগ প্রভৃতিতে ভারতবাসীর নিয়োগ, ব্যয়-সঙ্কোচ, পূর্ণ-প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি অনেক সময়োপযোগী বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) ভারতের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সহজ ও সুগম করিবার জন্য ভারতসচিব ও পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে, ভারতবাসী দীর্ঘকাল স্বায়ত্তশাসন লাভের আশায় বসিয়া থাকিতে রাজি নহে। তাহাদিগকে শীঘ্রই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা সঙ্গত। তাহা ছাড়া ভারত-গবমেণ্টের সামরিক রাজনৈতিক এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে এদেশবাসীদিগকে অধিকতর দায়িত্ব প্রদান করা উচিত।

(২) সৈন্যবিভাগে বেশী সংখ্যায় ভারতীয় কর্ম্মচারী গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া উচিত। ভারত গবমেণ্টকে এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে দেখিয়া এই সঙ্ঘ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার মতানুসারে কার্য্য করিলে সৈন্যবিভাগের ব্যয়ভার লাঘব হইবে এবং ভারত-গবমেণ্ট ঋণের দায় হইতে বহুল পরিমাণে অব্যাহতি পাইবেন।

(৩) এই সঙ্ঘ আশা করেন যে ইঞ্চকেপ-কমিটি ভারত-গবমেণ্টের এবং প্রাদেশিক গবমেণ্টসমূহের ব্যয়ভার কমাইবার জন্য এমন সব যুক্তিযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিবেন যাহাতে আর করভার বাড়াইবার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) দেশীয়-রাজ্য-সংরক্ষণ পাণ্ডুলিপিটি ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজা এবং
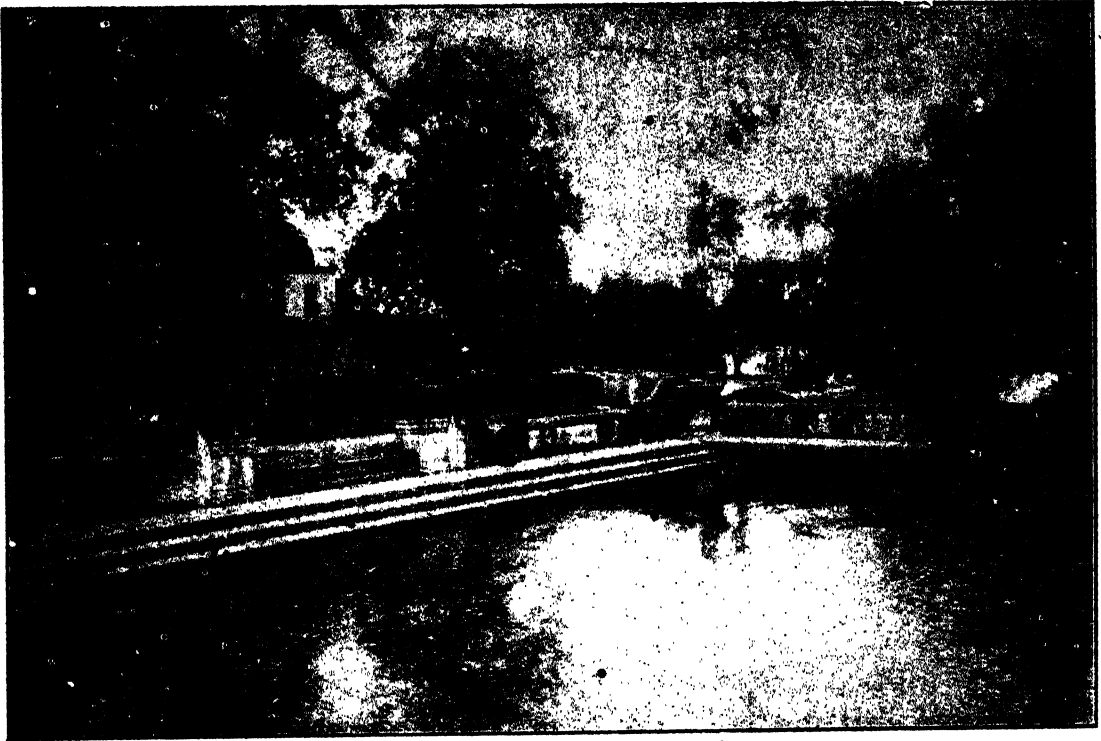
গয়ায় রামশিলা পাহাড়ের নীচে রামকুণ্ড [শ্রীযুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

দেশীয় রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের উন্নতির পরিপন্থী। সুতরাং পার্লামেন্ট যেন সম্রাটকে এই পাণ্ডুলিপিতে সম্মতি প্রদান করিতে নিষেধ করেন।

(৫) এদেশের জনসাধারণের উন্নতিসাধনের জন্য সমুচিত উপায় অবলম্বন করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। গভর্মেন্ট এবং দেশের নেতৃবৃন্দের এসব দিকে নজর দেওয়া বিশেষভাবে দরকার।

(৬) অস্পৃশ্যতার প্রথা হিন্দুসমাজকে অতিমাত্রায় কলঙ্কিত করিয়াছে। এই প্রথা যত শীঘ্র সম্ভব উঠাইয়া দেওয়া দরকার।

(৭) ভারতীয় ও প্রাদেশিক সার্ভিসে বেশী পরিমাণে ভারতীয় কর্ম্মচারী গ্রহণ করিয়া গবর্মেন্টের ব্যয় সঙ্কোচ করা উচিত। ব্রিটিশ কর্ম্মচারী গ্রহণপ্রথা একেবারে বন্ধ করা সম্ভব না হইলেও তাহাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া সঙ্গত। এবিষয়ে ভারতবাসীকে তাহাদের ন্যায্যদাবী হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে।

(৮) এই সমিতি ব্রিটিশ-গবমেন্টকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন, উপনিবেশসমূহে যেন ভারতবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাহাদের অবস্থা এমন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে শীঘ্র প্রতিকার না করিলে সেখানকার অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইবে। কেনিয়া উপনিবেশেও ভারতবাসীদের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হইতেছে। ইহারও আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

এগুলি ছাড়া নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মিঃ মণ্টেগুর পরাজয়ে এবং দেওয়ান বাহাদুর সি করুণাকর মেনন, স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ, স্যার বিঠলদাস ঠাকরসে, রাও বাহাদুর জি কে শেঠ, কে আর গুরুস্বামী আয়ার, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াও প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সভানেত্রী—

সম্প্রতি আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সভার অধিবেশনে সভানেত্রীর পদে বৃত হইয়াছিলেন ভুপালের বেগম সাহেবা। নারীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত রক্ষণশীল বলিয়া অতিমাত্রায় পর্দ্দানশীন বলিয়া আমরা মুসলমান-সম্প্রদায়কে দোষ দিই। কিন্তু তাঁহারা ধীরে ধীরে পথের বাধাগুলিকে যে ঝাড়িয়া ফেলিতে সুরু করিয়াছেন এই-সমস্তই তাহার প্রমাণ। এখন তাঁহাদের নারীদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতেও সভানেত্রীত্ব করা অসম্ভব নহে। মুসলমান সবদিক্ দিয়াই জাগিতেছে, কিন্তু আমরা হিন্দুরা অচলায়তনের আঁস্তাকুড়ের ভিতর সেই সনাতনের জাবর কাটিয়াই চলিয়াছি—এ অধঃপতন আমাদের মনের দুয়ারে কিছুমাত্র ঘা দিতে পারিতেছে না!

ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্স—

বড়দিনের অবকাশে এবার আলিগড়ে নিখিল-ভারতীয় মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মিয়া ফজল হোসেন উর্দ্দুতে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ বারো হাজার টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া এবং ভুপালের বেগম সাহেবা মোসলেম বালিকা-বিদ্যালয়ে সাহায্য করেন বলিয়া সভার পক্ষ হইতে
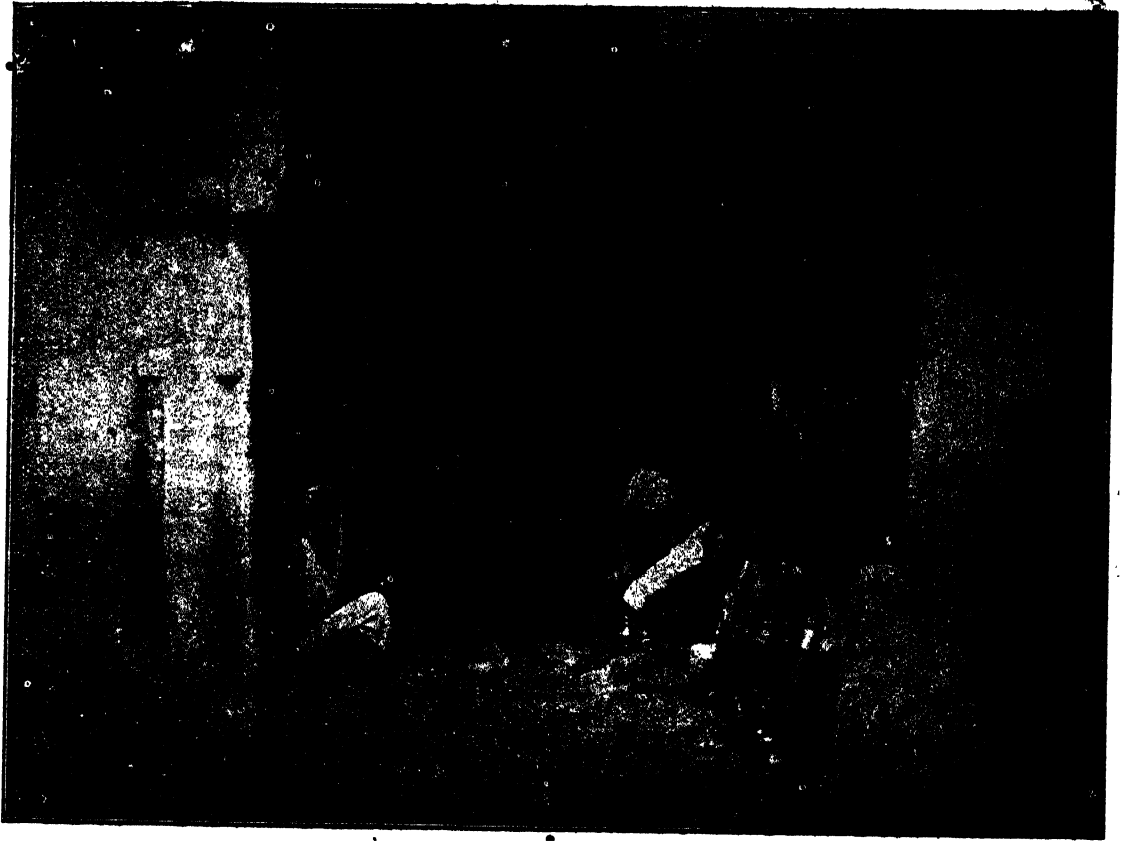
গয়ায় রামগয়া, এইখানে রামচন্দ্র দশরথকে পিণ্ড দান করেন [শ্রীযুক্ত টি পি সেন্ কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ্)

ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। মোস্লেম্ টেক্‌নিক্যাল স্কুলের জন্য ভূপালের জেনারেল ওবেদুল্লা খাঁ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার এব নবাব মোজামিলুল্লা খাঁ একলক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে।

সমিতির সম্পাদক বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, শিক্ষিত মুসলমানদের উদ্যোগে মুসলমান জাতি ধীরে ধীরে কেমন করিয়া জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

স্যাণ্ড্‌হার্ষ্টের ভারতীয় ছাত্র—

ভারতবর্ষের ৩ জন যুবক ইংলণ্ডের স্যাণ্ড্‌হার্ষ্টে সৈন্যবিদ্যালয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইঁহারা আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে পাঠ আরম্ভ করিবেন।

ভারত-সচিবের কাউন্‌সিলের ভূতপূর্ব্ব সভ্য স্যার আব্বাস আলি বেগের পুত্র, ভারত-সচিবের কাউন্‌সিলের বর্ত্তমান সভ্য সাহেবজাদা আহাম্মদ খাঁর পুত্র, বিজাপুরের জেলা-জজ সিভিলিয়ান বালকরামের পুত্র, পাঞ্জাবের রিসালদার-মেজর সন্ত সিংহের পুত্র, কটক রাভেন্‌সা কলেজের অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পুত্র—এই কয়জন গবর্মেণ্ট্ কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই গবর্মেণ্ট-কর্ম্মচারীর পুত্র—ইহা সম্ভবতঃ অনেকের চোখেই পড়িবে। কিন্তু সে যাহাই হোক, গবর্মেণ্টের পক্ষে সম্ভবতঃ কৈফিয়তের অভাব হইবে না।

যে-সকল ভারতীয় ছাত্র আগামী সেপ্টেম্বর মাসে স্যাণ্ড্‌হার্ষ্ট মিলিটারী কলেজে ভর্ত্তি হইতে চান তাঁহাদের সম্বন্ধেও ইস্তাহার হইয়াছে আগামী ৩০শে এপ্রিল শিমলায় তাঁহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষার্থীদের বয়স ১লা জুলাই তারিখে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের ভিতরে হওয়া চাই। যাঁহারা ১৯২০ সনে সৈন্য-বিভাগে কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের বয়স এক বৎসর বেশী হইলেও চলিবে। বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীদিগকে কলিকাতার পুলিস-কমিশনার, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার অথবা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আবেদন করিতে হইবে।

বুদ্ধগয়ার মন্দির—

বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থ। কিন্তু সেখানকার প্রসিদ্ধ মন্দিরটি বহুকাল হইতে হিন্দুদের দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা এখন ঐ মন্দিরটি নিজেদের অধিকারে আনিতে চাহেন—জোর করিয়া নহে, হিন্দুদের নিকট মাগিয়া চাহিয়া। বিগত ১৬ই ডিসেম্বর বিহার-প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে এই সম্পর্কে জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটিতে তিনি তাঁহাদের এই প্রার্থনাটি অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটিতে পেশ করিতে অনুরোধ করেন। এবার কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সনাতনপন্থীরা এই আন্দোলনের
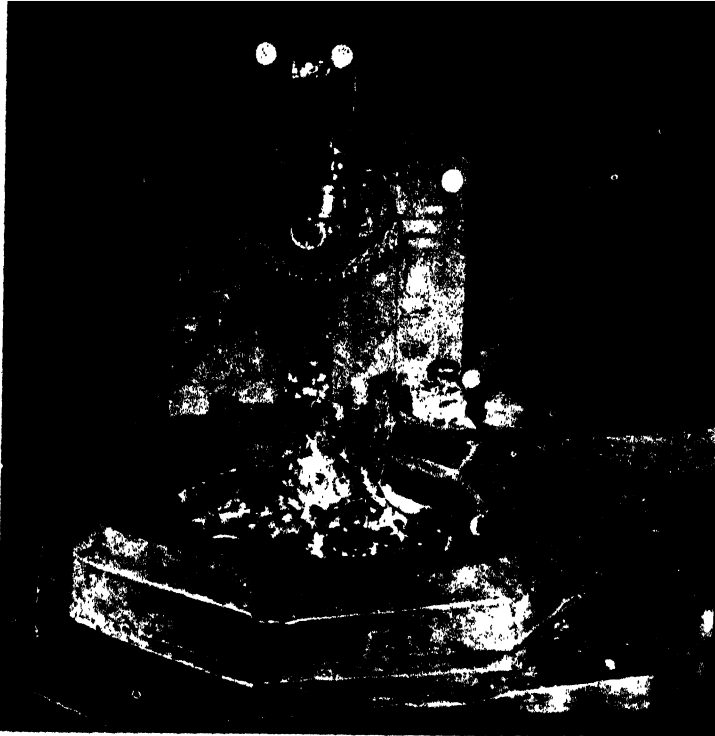
গয়ায় ফল্গুনদীর তীরে সীতাকুণ্ড, এইখানে সীতা দশরথকে পিণ্ড দান করেন
[শ্রীযুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

প্রতিবাদ করিয়াছেন, হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে দশাবতারের অঙ্গীভূত করিয়া পূজা করে। বিশেষতঃ এই বৌদ্ধ-মন্দিরে হিন্দুগণ বহুকাল ধরিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিয়া আসিতেছে। সুতরাং এ মন্দির হিন্দুরা বৌদ্ধদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন না।

হাইকোর্টের সালিসেও মন্দিরটি হিন্দু মোহন্তেরই সম্পত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বাহিরের জোরে বৌদ্ধেরা জয়ী হইতে পারিবে না। কিন্তু ন্যায়ের জোর, সত্যকার অধিকারের জোর লইয়া যদি বিচার করা যায় তবে এই মন্দিরের উপর বৌদ্ধদের দাবীই যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মাইকেল ও-ডায়ারের মানহানি—

পাঞ্জাবের ডায়ারী আমলের ছোটলাট স্যার মাইকেল ও-ডায়ার স্যার শঙ্করণ নায়ারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের আদালতে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। সাক্ষী মানিয়াছেন ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড্ চেমস্‌ফোর্ড্ ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান-সেনাপতি স্যার চার্ল্‌স্ মন্‌রো প্রভৃতিকে। স্যার শঙ্করণ Gandhi and Anarchy নামক পুস্তকে জালিয়ান্‌ওয়ালা-বাগের গুলি-চালানোর যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেই নাকি স্যার মাইকেল ও-ডায়ারের মানের শশাঙ্কে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। স্যার মাইকেল প্রস্তাব করিয়াছেন, স্যার শঙ্করণ যদি ভারতে এবং বিলাতে ক্ষমা-ভিক্ষার ঝুলিটা তুলিয়া ধরিতে রাজি হন এবং কোনো দাতব্য ভাণ্ডারে একশত পাউণ্ড দান করেন তবেই তিনি মামলা প্রত্যাহার করিতে পারেন—নতুবা নহে। স্যার শঙ্করণ জবাব দিয়াছেন—ও-ডায়ার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার একবর্ণও মিথ্যা নহে—সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা অসম্ভব। তিনি মামলা লড়িতেই রাজি।

খিলাফৎ-কন্‌ফারেন্স্—

গত ২৭শে ডিসেম্বর আগ্রায় দিল্লীর ডাক্তার এম এ আন্‌সারীর সভাপতিত্বে খিলাফৎ-কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন বসিয়াছিল। কন্‌ফারেন্সের কাজ ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলে। সভায় খিলাফৎ সম্পর্কে অনেকগুলি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাবে নব নির্ব্বাচিত খলিফা সুলতান মজিদের প্রতি সম্মান দেখানো হইয়াছে এবং প্রাচীন রীতি অনুসারে খলিফা নির্ব্বাচিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী খিলাফতের জন্য যে ভাবে কাজ করিয়াছেন সেজন্য সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন।

অকালীদের নিরুপদ্রব-নীতি প্রশংসা করিয়াও প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

সভায় স্থির হইয়াছে, লোজান্ বৈঠকে খিলাফতের মর্য্যাদাহানিকর কোনো সর্ত্ত পরিগৃহীত হইলে মুসলমানেরা তাহার প্রতিবাদ করিবেন। মুস্তফা কামাল পাশাকে তাঁহার সাহস ও কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে সৈফ-উল্-ইস্‌লাম এবং মুজাহিদ্-ই-খিলাফৎ—এই দুইটি উপাধির দ্বারাও অভিনন্দিত করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, যত দিন তাঁহার দাবী পূর্ণ না হয় ততদিন ভারতীয় মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি মনে ও কাজে সমানভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে।

ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন সম্পর্কে একটি উপ-সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। এই উপ-সমিতি ব্রিটিশপণ্য বর্জ্জন সম্বন্ধে প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবেন।

আলিগড় ন্যাশনাল মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব দৃঢ় করিবার জন্য একটি ফণ্ড খুলিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কাউন্সিলে প্রবেশ সম্পর্কে খিলাফৎ-কন্‌ফারেন্স্ স্থির করিয়াছেন—এক্ষণে এ দিকে বিশেষ জোর না দিয়া তাঁহারা তুরস্ককে সাহায্য এবং খিলাফৎ-রক্ষার দিকেই বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিবেন।

মহাত্মার কারা-জীবন—

বোম্বাই প্রদেশের হিন্দুস্থান পত্রিকার একজন প্রতিনিধি সিন্ধু প্রদেশের প্রসিদ্ধ জননায়ক মিঃ বিরুমলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি কারাগার হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কারাগারে মহাত্মা গান্ধীর জীবনযাত্রার যে চিত্রটি তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে এখানে তাহা আঁকিয়া দেওয়া গেল।

মহাত্মাজী সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। তিনি বিশেষ আনন্দের সহিত কারা-জীবন বহন করিতেছেন। কোনো ঘটনাই তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল
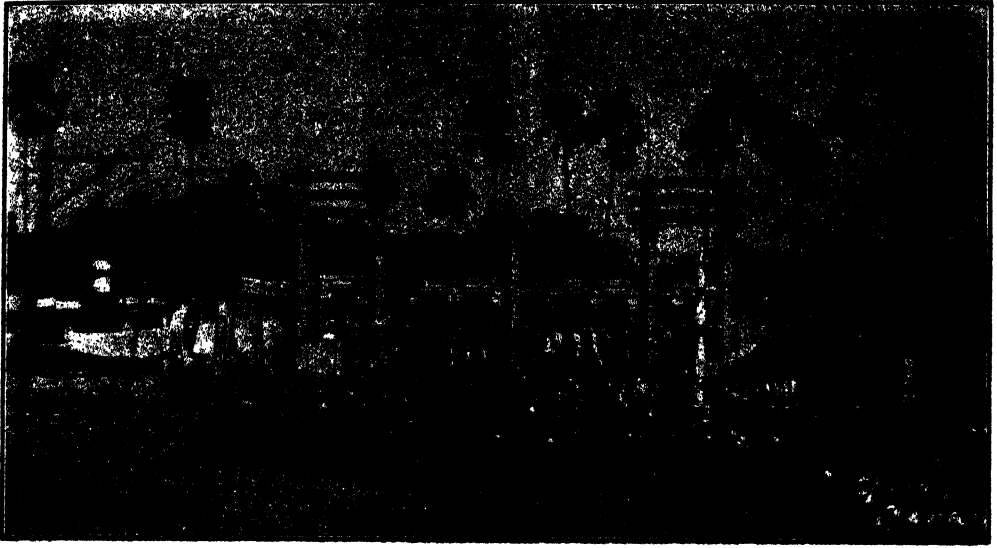
গয়া-কংগ্রেসের মণ্ডপে প্রবেশের প্রধান তোরণ

[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

গয়া-কংগ্রেসের স্বরাজ্যপুরী প্রবেশের একটি তোরণ

[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

করিতে পারে না। ভোর চারিটার সময় তিনি শয্যা-ত্যাগ করেন। তাহার পরেই প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া স্নান ও উপাসনায় মনোনিবেশ করেন। সকালে কিছুক্ষণ লেখা-পড়ার কাজ করিয়া পুরা ৫ ঘণ্টা কাল চর্কায় সূতা কাটেন। অপরাহ্ণ দুই বা তিনটার সময় আহার করেন। সাতটা কি আটটার সময় উপাসনা এবং নয়টা কি দশটার সময় শয়ন—এই হইতেছে তাঁহার প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার বিধি। জেলে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন, কেবল মাত্র প্রত্যেক সোমবারে একঘণ্টার জন্য এই ব্রত ভঙ্গ করেন।

'জনশক্তির' মাম্‌লা—

মাইজভাগ নামক স্থানের জনৈক মুসলমানের বাড়ী ঘেরাও করিয়া ২৫ জন গুর্খা পুলিস গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট করে এবং একখানা কোরান ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। এই ব্যাপার লইয়া আসামের 'জনশক্তি' পত্রিকায় 'মাইজভাগের ছিন্ন কোরান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের জন্য পুলিশ জনশক্তির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব এবং মুদ্রাকর অনাথবন্ধু দাসের নামে ফৌজদারী ১৫৩ক ধারা অনু-

গয়া-কংগ্রেসের মণ্ডপ ও ময়দান
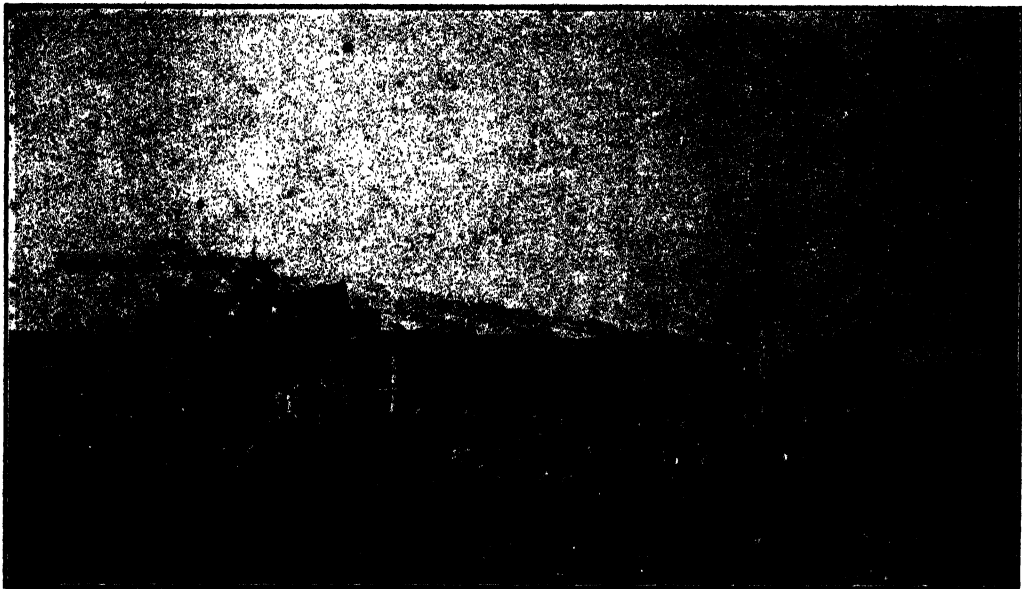
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

গয়া-কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্যপুরীর বাজার ও দোকান

[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

সারে অভিযোগ করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উভয়েরই সাজা হইয়া গিয়াছিল। আসামীরা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে শ্রীহট্টের দায়রা জজের কাছে আপিল করিয়াছিলেন। জজ ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ স্থির করিয়া বেকসুর খালাস দিয়াছেন। বিচারক তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, গুর্খারা কোরান ছিন্ন করিয়াছে, আসামী পক্ষের এ কথায় সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। সরকারী উকিল বলিয়াছেন, খিলাফৎ-দলভুক্ত কোন মুসলমানেই কোরান ছিন্ন করিয়াছে। এ কথা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কারণ কোনো
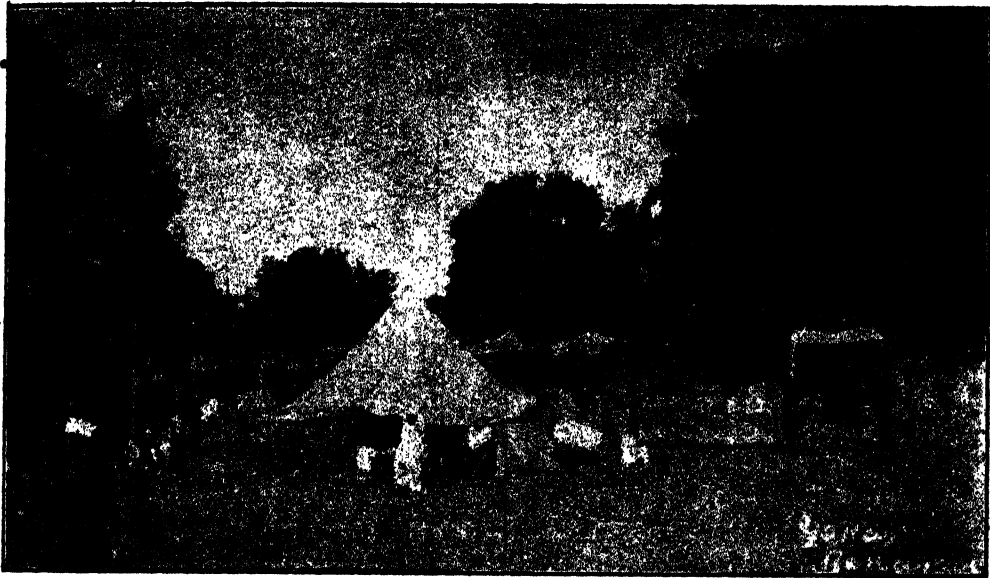
গয়া-কংগ্রেসে সমাগত অকালী শিখদের বাসের তাঁবু
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

গয়ায় সমবেত উদাসী-মহামণ্ডল
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

মুসলমানই ইচ্ছাপূর্ব্বক কোরান ছিঁড়িতে পারে না। আসামীদের অপরাধ সম্বন্ধে বিচারক বলিয়াছেন, গুর্খাদের দ্বারা কোরান ছিন্ন হইয়াছে এই কথা গবর্মেণ্টের গোচর করিবার জন্যই আসামীরা সাধু উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এ সংবাদ খবরের-কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না। অতএব আসামীদের বিরুদ্ধে ১৫৩ক ধারার অভিযোগই আসিতে পারে না। বিচারক স্বয়ং ঘটনাস্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়া এই রায় দিয়াছেন। সরকারী কমিউনিকেও খিলাফৎ-দলভুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা কোরান ছিন্ন হইবার কথা প্রচারিত হইয়াছিল। বিচারপতি সেই কমিউনিকও বিশ্বাস করেন নাই। এই চুনকাম-করা কমিউনিকগুলি যাহা সরকারী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন না তাহাই বিশ্বাস করিতে বলা

গয়া-কংগ্রেসে অকালী শিখের উদ্বোধন-সঙ্গীত

[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী
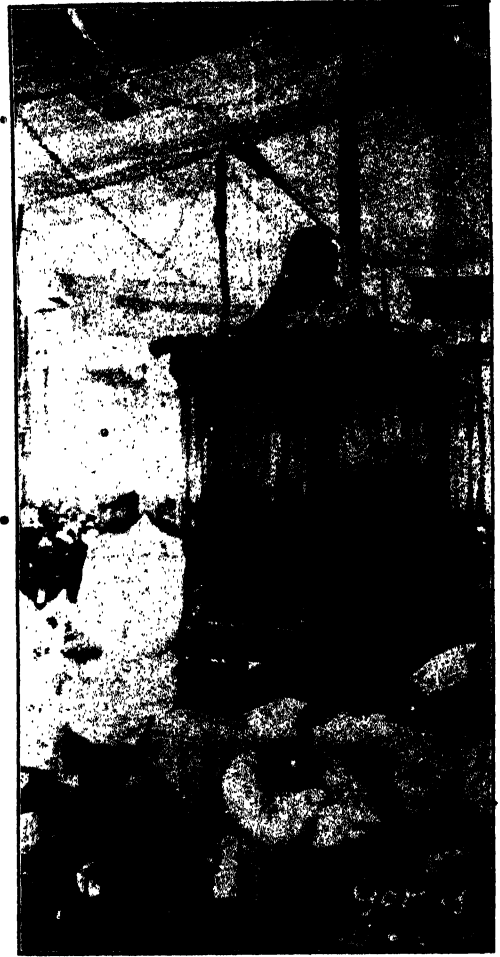
গয়া-কংগ্রেসে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন

[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

হয় জনসাধারণকে। এগুলি এত বিবর্ণ যে চুনকামেও ইহাদের আসল চেহারা ঢাকা পড়ে না। এগুলি তৈরী করা হয় জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবার জন্য—কিন্তু ইহারা এত বিসদৃশ যে ইহাদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে গবর্মেণ্টের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা আরও বেশী করিয়া নষ্ট হইতেছে।

অকালীদের কথা—

অকালীদের সম্পর্কে ব্যাপার যতদূর গড়াইয়াছিল তাহার পর সে সম্বন্ধে একেবারে যবনিকা পড়াই উচিত ছিল। কিন্তু তাহা যে পড়ে নাই, তাহাদের সম্পর্কে নানা রকমের সংবাদ সেই সন্দেহেরই উদ্রেক করিতেছে। অনেকেই মনে করিতেছিলেন, গুরুকাবাগের নিরুপদ্রব প্রতিরোধের অপরাধে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু পঞ্জাব-গবর্মেণ্ট, সে উদারতাটুকুও দেখাইতে সাহস পান নাই। তাঁহারা সমর্থ ব্যক্তিদিগকে কয়েদের কাঠ-গড়ায় পুরিয়া রাখিয়া কেবলমাত্র আঠারো বৎসরের কম এবং পঞ্চাশ বৎসরের বেশী বয়স্ক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন। গত ৭ই ডিসেম্বর লাহোরের সেণ্ট্রাল জেল এবং বোরষ্টাল জেল হইতে উপরোক্ত বয়সের অনেকগুলি অকালী কয়েদীকে ছাড়িয়াও দেওয়া হইয়াছে। গবর্মেণ্ট যদি আর-একটু উদারতা দেখাইতেন তবে এই ব্যাপারে তাঁহাদের অযথা হস্তক্ষেপের অপরাধটা হয়তো বা কতকটা চাপা পড়িতে পারিত। কিন্তু যথেষ্ট সৎসাহসের অভাবে অতটা অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

তাহা ছাড়া এখনও মাঝে মাঝে অকালীদের গ্রেপ্তার করার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সর্দ্দার জয়সিং নামক একজন অকালী সর্দ্দারকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার

গয়া-কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও সকল সভ্য দাঁড়াইয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অকালী শিখদিগকে গুরু-কা-বাগে যাইবার জন্ম উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গুরু-কা-বাগে গমন, এমনকি মন্দির সংলগ্ন গাছ কাটাও যদি অপরাধ না হয়, তবে গুরু-কা-বাগে যাইবার জন্য উৎসাহিত করায় যে কি অপরাধ হইতে পারে সে কথা হয়তো অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না।

শিখগুরুদ্বার বিল লইয়া যে-সব আলোচনা হইয়াছে, এবং যে অবস্থার ভিতর দিয়া বিলটি পাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। যে সম্প্রদায়ের জন্য আইন করা হইল সে সম্প্রদায়ের কোনো সদস্যের সমর্থন না পাইয়াও যে আইন পাশ হয় তাহার মূল্য যে কি, সেকথা বোঝাও খুবই সহজ। শিখ-সম্প্রদায় এমন কি হিন্দু-সম্প্রদায়ের কোনো সদস্যের ভোট না পাইয়াও, এবং ক্রিশ্চান-সম্প্রদায়ের কোনো কোনো সদস্যের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই বিলটি—কেবলমাত্র আইনে পরিণত হইয়া হয় নাই—গত ১লা জানুয়ারী হইতে উহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদের মিঃ দয়ারাম পার্শ্বরাম গুরুকা-বাগের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত এবং সুবিচার প্রার্থনা করিয়া একখানি দরখাস্ত বড়লাটের দরবারে পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার দরখাস্তের মর্ম্ম ছিল —গুরুকা-বাগ হাঙ্গামার জন্য পুলিশেরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাহারাই শিরোমণি-প্রবন্ধক-কমিটির কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া এই ভীষণ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছে। মিঃ দয়ারাম পার্শ্বরাম অবশ্য একথা সোজাসুজিভাবে বড়লাটকে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করেন নাই—তিনি যাহা চাহিয়াছেন তাহা একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি এবং এই তদন্ত-কমিটির রায়ের উপর নির্ভর করিয়া অপরাধীদের দণ্ড। কিন্তু এসম্বন্ধে এদেশের আমলাতন্ত্রের মনের পরিচয় এত সুস্পষ্টভাবে পাওয়া গিয়াছে যে, এরূপ প্রার্থনা করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল বলিয়াই মনে হয় না।

'অকালী' সম্পাদকের জরিমানা—

'অকালী' সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকাশক ও প্রিন্টারের নামে দুই দফা মানহানির নালিশ রুজু করা হইয়াছিল। যাঁহারা নালিশ করিয়াছিলেন তাহার একজন হইতেছেন, মিঃ সি এম্ কিং ফিন্যান্সিয়াল্-কমিশনার; দ্বিতীয় জন হইতেছেন, মিঃ বোরিং পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট্। নান্‌কানা-হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে 'অকালী' পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহাই নাকি ইঁহাদের মানের হানি করিয়াছে। মিঃ কিংএর দাবী ছিল পঁচিশ হাজার টাকার, এবং বোরিংএর ছিল পনেরো হাজার টাকার। গত ২রা জানুয়ারী লাহোরের সিনিয়ার সব্‌জজের এজ্‌লাসে ইঁহাদের মামলার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। মিঃ কিং আট হাজার এবং বোরিং পাঁচ হাজার টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন। বিচারপতির

গয়া-কংগ্রেসে সমবেত সভ্যদের বাসস্থান স্বরাজ্যপুরীর একাংশ
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

গয়া-কংগ্রেসের শিল্পপ্রদর্শনী ও প্রদর্শনীর দোকান
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

দয়া যে অসীম সে কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। আসামীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

আন্দামানে মোপ্‌লা উপনিবেশ—

কালিকটের খবরে প্রকাশ, কতকগুলি মোপ্‌লার উপর মালাবার-অত্যাচার-আইন অনুসারে নির্ব্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের অপরাধ—ইহারা নাকি পরোক্ষভাবে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। গবমেণ্ট্ স্থির করিয়াছেন এই-সব মোপ্‌লাকে আন্দামানে নির্ব্বাসিত করা হইবে। ইহারা সঙ্গে পরিবার-পরিজন লইতে পারিবে, সে সম্বন্ধে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা হইবে না। মিঃ এব্রাহিম নামে একজন সাব্-ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইহাদের উপনিবেশের ভার গ্রহণ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, আন্দামানে আর কাহাকেও নির্ব্বাসিত করা হইবে না। সেই খবরটাই ঝুটা, না এই মোপ্‌লাদের জন্যই আবার গবমেণ্ট্ কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিতেছেন সে খবরটা অনেকেই হয়তো জানিতে চাহিবে।

অস্পৃশ্যতার অত্যাচার—

জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার দ্বারা এদেশের অধঃপতন যে কতদূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সম্প্রতি মান্দ্রাজের একটি ব্যাপারের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ত্রিচূড়ের সংবাদে প্রকাশ, পুদুকোটা

গয়া-কংগ্রেসের বাংলা উদ্বোধন-সঙ্গীত
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

গ্রামের জনৈক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ-মহিলার একজন নায়ার চাকর ছিল। একদিন এই চাকরের মাথা হইতে তিনি একটি তরী-তর্‌কারীর ঝাঁকা নামাইয়া লইয়াছিলেন, এই অপরাধে সমাজ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করে। এরূপ খামখেয়ালী অনুদার সমাজের নমুনা জগতের আর কোথাও মেলে না। আর এইটাই সমাজের বিশিষ্টতা মনে করিয়া আমাদের ধর্ম্মধ্বজীরা গর্ব্ব করেন। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ-মহিলাটি সমাজের এই অন্যায় কষাঘাতকে অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাদের মন স্বাধীন তাঁহারা কখনো এই-সব অত্যাচার বরদাস্ত করিতে পারেন না। হিন্দুসমাজ তাহার অচলায়তনের প্রাচীরটা সঙ্কীর্ণতার দ্বারা যতই উঁচু করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে তাহার জন-বল ততই কমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। লোকগুনতির হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলেই আমাদের কথা যে কতখানি সত্য তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি এদিকে সমাজের কোনো হুঁস্ নাই।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

—

বাংলা

ধানের আশা—

বঙ্গদেশে এবার ধান মোটের উপর ভালই জন্মিয়াছে। ধানের যাহাতে কিছুমাত্র অপচয় না হয়, সে-দিকে সকলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। এ সময় ধানের দর সস্তা হওয়া স্বাভাবিক; এ সময় ধান চাউল যাঁহারা কিনিয়া রাখিবেন, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তাঁহারা কম পক্ষে দেড় গুণ মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। আমরা রায়তের শোণিত-শোষক সুদখোর মহাজনদিগকে ধান কিনিয়া রাখিতে উপদেশ দিই; ছয় মাস পরে যাহা লাভ হইবে তাহা সুদ অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী। ব্যবসায় বৈধ—অর্থাৎ হালাল উপার্জ্জন, সুদ অবৈধ—অর্থাৎ হারাম উপার্জ্জন। অথচ হারাম হইতে হালালে লাভ বেশী। এক্ষণে যাহারা হালাল ফেলিয়া হারাম খায় তাহাদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

—রায়তবন্ধু

শস্যের অবস্থা—এবার মফস্বলে প্রায় সর্ব্বত্র বেশ ধান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় বাজারে বন্দরগুলিতে চাউল রপ্তানি করিবার জন্ম হাজার হাজার বস্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং পাগড়ীপরা মাড়োয়ারীদের মূর্ত্তিও সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ফলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইলেও দেশের লোকের পক্ষে উহার প্রাচুর্য্য অতি অল্পই অনুভূত হইবে।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী

জলকষ্ট—

বগুড়ায় জলকষ্টের সূচনা পৌষমাস হইতেই দেখা গিয়াছে; ফলে পানীয় জলাভাবের জন্য স্বাস্থ্যের দিন দিন অবনতি হইতেছে। ম্যালেরিয়া-ডাইনী ঘরে ঘরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। জেলা-বোর্ড ও মিউনিসিপাল-কর্ত্তৃপক্ষগণ সহরের অনেক স্থানে বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া পাকা কূপ (ইন্দারা) জনসাধারণের ব্যবহারার্থ খনন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু চতুর কন্‌ট্রাক্টারদের এমনি সাফাই কাজ যে, কূপগুলির জল পান করা ত দূরের কথা, কেহ স্পর্শও করে না। সাধারণের অর্থের এরূপ অপচয় অত্যন্ত দুঃখের কথা। কূপগুলির এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের সংস্কার পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছেন না। ক্ষতির দায়ী কন্‌ট্রাক্টারগণ। কিন্তু ম্যাও ধরে কে? বগুড়ার সদাশয় ভূম্যধিকারী ও মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান নবাবজাদা আল্‌তাফ্ আলী সাহেব বগুড়াবাসীর জলকষ্ট নিবারণের ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জলের কল স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

গয়া-কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির দলপতি শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

বগুড়ার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নবাবজাদার এই সদুদ্দেশ্যটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সহায়তা করিতে নবাব-বাড়ীতে এক সান্ধ্যসম্মিলনীতে মিলিত হইয়াছিলেন। একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কমিটির কার্য্য-প্রণালীর বিষয় আমরা জানিতে পারিতেছি না। আমরা নবাবজাদা সাহেবের মুখাপেক্ষী হইয়া আছি, কারণ বগুড়ার তিনিই প্রধান সম্মাননীয় ভূম্যধিকারী। বিশেষ নবাবজাদার চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত জলের কল স্থাপিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। তিনি অগ্রণী হইয়া এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিলে বগুড়াবাসীর এক মহা অভাব দূর হইবে।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা—

গত ১৯০৫ সালে ভারতবর্ষে ৬০ লক্ষ টাকার দেশলাই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। গত বৎসর তাহা ৩ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। সুখের বিষয় বাংলাদেশে কয়েকটি দেশলাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং আরও ২।১টা বৃহৎ কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

—যশোহর

ভারতের কাগজ ব্যয়:—ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর আনুমানিক ১২৬০০ টন কাগজ খরচ হয়। ইহার মধ্যে ইংরেজ বা দেশীলোকদের পরিচালিত কলে ভারতে-প্রস্তুত কাগজ মাত্র ৩১,৯০০ হয়। এক কাগজের ব্যবসায়ে আমরা যে কত টাকা বিদেশে দিই তাহা ভাবিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

—বর্দ্ধমান

বস্ত্রের মূল্য হ্রাস—

দেশী এবং বিলাতি কাপড়ের দাম কমিয়াছে, দেশী কাপড় এখন বিলাতি কাপড়ের দরেই বিক্রয় হইতেছে। যদিও যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমান মূল্য দ্বিগুণের অধিক, তবু বস্ত্রের মূল্য অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে বলিয়া অনেকের লজ্জা নিবারণের পথ হইতে পারে। তদুপরি দেশী বস্ত্রের মূল্য বিদেশী বস্ত্রের সমান হওয়ায় দেশী বস্ত্রের বিক্রয়াধিক্য ঘটিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।

—যশোহর

গয়ায় জমায়েৎ-উল্-উলেমা—মুসলমান উলেমাদিগের সভা-মণ্ডপ
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

ডাকঘরের আয়-ব্যয়—

ষ্ট্যাম্পের হিসাব।—১৯২১-২২ সালের হিসাবে জানা গিয়াছে আদালত-সংক্রান্ত ষ্ট্যাম্পে আয় বাড়িয়াছে ২,১৭,৯৯৮ টাকা, কিন্তু পোষ্টাল ষ্ট্যাম্পে, ১,১১,০৯,২৩৪ হইতে নামিয়াছে ৯৭,২৭,৭৯৯। তাহা হইলে দেখা যায়, ক্ষতি হইয়াছে ১৫,৮১,৪৩৫ টাকা। একা কলিকাতায় কমিয়াছে ৮,৮৪,৬৩৯, ময়মনসিংহে ১,৭৯,৩৩০ টাকা এবং ত্রিপুরায় ৯৪,৬৭৫, টাকা। কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ভাল চলে নাই, তাই এই হ্রাস। মফঃস্বলে কোন কোন জেলায় কার্য্য স্থগিত থাকা, এবং অসহযোগ আন্দোলন ও জনসাধারণের

গয়া-কংগ্রেসে আর্য্যসমাজীদের বাসস্থান—আর্য্যনগর
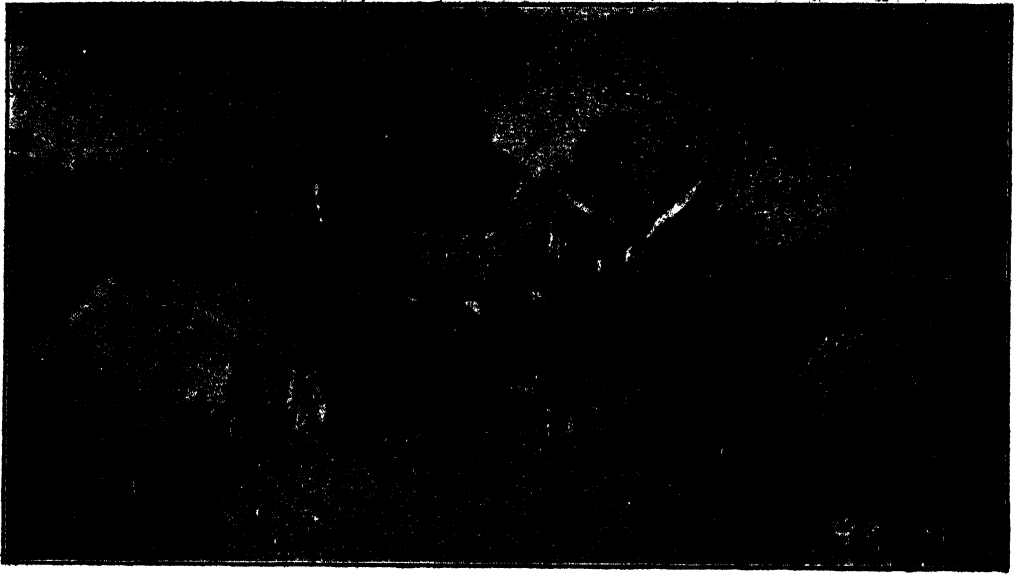
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

দারিদ্র্যই ইহার কারণ। আমরা সর্ব্বশেষের কারণটিই ইহার মধ্যে মুখ্য মনে করি। ষ্ট্যাম্পের খরচ বাড়াতে গরীবদের দুঃখ বাড়িয়াছে। অথচ গবর্মেণ্টের আয় বাড়ে নাই। এই অবস্থায়, পোষ্ট্যাল ষ্ট্যাম্পের মূল্য পূর্ব্ববৎ রাখা উভয় পক্ষেই শ্রেয়। কর্তৃপক্ষ এদিকে মনোযোগ দিবেন কি?

নবসজ্ঘ

বাংলায় ডাকাতি—

বঙ্গদেশে ডাকাতির সংখ্যা কমিতেছে না। গত ৯ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে সমগ্র বঙ্গদেশে ৮টি ডাকাতি হইয়াছে। মেদনীপুর, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলায় একটি করিয়া, রাজশাহীতে ২টি, আর ঢাকা জেলায় ৩টি ডাকাতি হইয়াছে। গত নবেম্বর মাসে মোট ডাকাতি হইয়াছে ৮৩টি; অক্টোবর মাসে ৫০টি ডাকাতি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর নবেম্বর মাসে ৭৭টি ডাকাতি হয়। ইহা দ্বারা দেশের লোকের নৈতিক অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। রাজনৈতিক ডাকাতিটা কমিয়াছে। পেটের জ্বালায়ও অনেকে ডাকাতি করে। দেশে পুলিসের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত, তাহাদের বেতনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে ক্ষেত্রে ডাকাতির এতটা বহর, ইহা পুলিশ-বিভাগের দক্ষতার পরিচায়ক নহে।

—রায়তবন্ধু

বাংলার স্বাস্থ্য—

বাঙ্গালায় কুষ্ঠ।—গত বারের লোক-গণনায় বাঙ্গালার বিভিন্ন বিভাগের কুষ্ঠরোগীদের সংখ্যা দেখ্‌লে দেখা যায়, বর্দ্ধমান বিভাগে ৭২৫০; প্রেসিডেন্সী বিভাগে ২,০০৯; রাজসাহী বিভাগে ২,৬৯৪; ঢাকা বিভাগে ২,৬১৪; ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৯০ জন কুষ্ঠরোগী তালিকাভুক্ত হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশের লোক-সংখ্যার উপর কুষ্ঠরোগীর হার ধরিতে গেলে দেখা যায়, প্রতি লক্ষ নরনারীর মধ্যে ৬৭ জন নরনারী এই ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত। উপরের লোকগণনার তালিকা দেখিয়া এ কথা বলা চলে যে বাঙ্গালার কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এ কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ দেখা যায়—(১) সেন্সাসে কলিকাতার কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা মাত্র ২৫৯ জন, কিন্তু বিগত ১৯২০ সনে কলিকাতার পুলিশ বিশেষ তদন্ত করিয়া সহরের ভিখারী কুষ্ঠরোগীদের একটা তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহাতে দেখা যায় কুষ্ঠরোগীদের সংখ্যা এক হাজারের উপর, তাহারা বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি একসঙ্গে বাস করে। বাঁকুড়া জেলায় ২৭৫২ জন কুষ্ঠরোগী আছে বলিয়া সেন্সাসে লেখা হইয়াছে, কিন্তু ১৯২০ সনে সেখানকার কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়, প্রতি দশ হাজারে সে জেলার ২৩ জন লোকের কুষ্ঠরোগ। গত বৎসর এ জেলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে সাহায্য দান হইয়াছিল; সে সময় দেখা গিয়াছে যে, যাহাদের সাহায্যের দরকার তাহাদের অধিকাংশই কুষ্ঠরোগী এবং সে সময় তাহাদের যে সেন্সাস লওয়া হইয়াছিল তাহাতেও জেলার কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় ৪,৬৯৮। এ তালিকা ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাহা কম ধরার চাইতে ঢের ভাল। (৩) গত বৎসর সেন্সাসের অব্যবহিত পরেই ডাঃ ই মুর এর ওখানে কুষ্ঠরোগীরা ঔষধের জন্য যাইত; সেই সময় তিনি তাহাদের গণনা করিয়া দেখেন যে, প্রতি ত্রিশজনের মধ্যে মাত্র দুইজনের নাম সেন্সাস রিপোর্ট-ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা গেল যে, ১৯২১ সনে সেন্সস-রিপোর্টে বাঙ্গালার কুষ্ঠরোগীদের ঠিক সংখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। সমগ্র বাঙ্গলায় প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে ৬৭ জন কুষ্ঠরোগী। বাঁকুড়ার প্রতি লক্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ২৭০, বীরভূমে ১৪৮, বর্দ্ধমানে ১১২, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অংশে ৮৮ জন মাত্র। বাঁকুড়ার ন্যায় বাঙ্গলায় আর কোন জেলাতেই কুষ্ঠরোগের এত প্রাবল্য নাই।

—সম্মিলনী

যশোহর জেলায় ঝাজারকরা জন্মের হার ২১টি কিন্তু মৃত্যুর ৩৭টি।

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলে গঠিত গয়া কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক-ফৌজ ফল্গুনদীর বালির চড়ায় কুচ্‌কাওয়াজে নিযুক্ত

[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

খুলনায় হাজার জনের মধ্যে জন্ম ২৭ কিন্তু মৃত্যু ৫১টি। কলিকাতায় হাজারকরা জন্ম ১৮, মৃত্যু ৪২টি।

—কল্যাণী

স্বাস্থ্য—

নোয়াখালী সহরে এখনও কলেরার প্রকোপ কমে নাই। এতদ্ব্যতীত অনেকেই অজীর্ণ পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। সহযোগী ত্রিপুরা-গাইড বলিতেছেন:—মফঃস্বলে রোগের প্রকোপ এইবার বড়ই তীব্র দেখা যাইতেছে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে সর্ব্বত্র বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। হেল্‌থ্-অফিসার যখন ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন তখন দেশের স্বাস্থ্য আপনা-আপনি ফিরিয়া আসিবে। তাঁহার লম্বা রিপোর্টে কালাজ্বর পলাইবে, ম্যালেরিয়া ও কলেরা ধ্বংস হইবে। স্বাস্থ্যহানি ও রোগের কারণ নির্ণয় না করিয়া স্বাস্থ্যনীতি প্রচার করিলে স্বাস্থ্য লাভ হইবে না। ডিষ্ট্রিক্ট্‌বোর্ড ডাক্তারদের বেতন বাড়াইয়া দিয়াছেন। ডাক্তারদের বর্দ্ধিত বেতনে বৎসর বৎসর যে টাকা ব্যয় হইবে তদ্দারা ডিষ্ট্রিক্ট্‌বোর্ড ছোট ছোট অনেকগুলি ডাক্তারখানা খুলিতে পারিতেন। হেল্‌থ্-অফিসারের বেতন, ট্র্যাভেলিং আলাউন্স, কেরাণী ও পিয়নে মাসিক অন্যূন ৫০০৲ টাকা, বৎসরে ৬০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। এই ৬০০০৲ টাকা দ্বারা ২৫ জন ডাক্তার নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

—ঢাকা-প্রকাশ

বন্যার কথা—

বিগত ৩০ নবেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রিলিফ ফণ্ডে যে পরিমাণে নগদ টাকা, বস্ত্র ইত্যাদি আদায় হইয়াছে, তাহার তালিকা এই:—মোট আদায় ৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা।

নগদ টাকা	৪,০৫,৫১০৲
নূতন কাপড়	২৩,৮৭৯৷৷০
পুরাতন কাপড়	২৩,১২৯৷৷০
গহনাপত্র ইত্যাদি	৩১,৮৭৯৷৷০
কম্বল	৩২২০৲
গায়ের গরম কাপড়	২১৭৫৲
চাউল	১২,৯০০৲
ডাল, সাগু, লবণ প্রভৃতি	১৪,৩০০৲
বিবিধ	১২,২৭৫৲

এখনও আরও বহু টাকার আবশ্যক।

—নবযুগ

কলিকাতাবাসীর দুরবস্থা—

কলিকাতার দুধের অবস্থা।—কলিকাতার "দুগ্ধ" নামক শ্বেত পদার্থটি যে কি বিষের আধার তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গয়া-কংগ্রেসের স্বরাজ্যপুরীতে ফল্গুনদীর তীরে প্রভাতকালের জনতা
[গোরস্ ষ্টুডিও, কাশী

মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-বিভাগের এত ডাক্তার, এত দুগ্ধ-পরীক্ষক, কিন্তু ভেজাল দুগ্ধ, নানাবিধ দুষিত-পদার্থ-মিশ্রিত দুগ্ধ, ননী-তোলা দুগ্ধ, মহিষ এবং গাভীর মিশ্রিত জল-সম্বলিত দুগ্ধ প্রভৃতি সবই অবাধে চলিয়া যাইতেছে। চেষ্টার ত্রুটী ও উৎকোচ বা ঘুসের জোরে কিছুতেই আট্‌কাইতেছে না। দুগ্ধ ।৵০, ।৶০ সের বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু তবু খাঁটি নয়। এই-সকল দুষিত দুগ্ধ পান করিয়া কলিকাতার শত সহস্র সদ্যোজাত শিশু অকালে মারা পড়িতেছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার-গণেরও এদিকে লক্ষ্য নাই। কলিকাতার সান্নিধ্যে বড় বড় দুগ্ধের ফার্ম্ করিলে, এবং উপযুক্ত লোকেরা তাহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলে, কলিকাতার দুগ্ধাভাব অনেকটা পূরণ হইতে এবং খাঁটি দুগ্ধও পাওয়া যাইতে পারে। রেলপথের ধারে, কলিকাতা হইতে ১৫।২৫।২৬ মাইল দূরে এইরূপ ফার্ম্ করিলে খরচও খুব কম পড়িবার কথা। আমাদের প্রধান প্রধান সহযোগীদিগকে ত এবিষয়ে তেমন আন্দোলন আলোচনা করিতে দেখা যায় না।

—নবযুগ

কলিকাতায় বাড়ীভাড়া যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে অল্প-আয়-বিশিষ্ট চাকুরিয়া বা কারবারী লোকদিগের এখানে সপরিবারে বাস করা অসম্ভব হইয়াছে। ৩।৫টি কামরা-বিশিষ্ট খোলার ঘরের ভাড়াও ৩০৲—৩৫৲ টাকা। সুতরাং আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা বাড়ী-ভাড়ায় চলিয়া যায়। এ অবস্থায় সামান্য-বেতনভোগী কেরাণী বা সামান্য-আয়-বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কিরূপে কলিকাতায় বাস করিতে পারে। ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক বহু পাড়া বা মহাল্লা ধ্বংস হওয়াতে, খোলা-খাপ্‌রেলের এবং ছোট ছোট পাকা ঘর ভাড়া পাওয়া কঠিন হইয়াছে; সুতরাং গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক বাসস্থানের অভাবে নিরুপায়। আবার মুসলমানদিগের মধ্যে পর্দ্দার আঁটাআঁটি বেশী বলিয়া এক বাটীতে বিভিন্ন পরিবার বাস করিতে পারেন না, হিন্দুগণ একগৃহে একাধিক পরিবার বাস করিতে পারেন; সুতরাং মুসলমানদিগের পক্ষে অধিক বিপদ্। সাধারণ শ্রেণীর পশ্চিমা হিন্দু-মুসলমান ৫।৭ পরিবার এক-একটা খোলার ঘরে বাস করে; কিন্তু সে-সকল গৃহ এমনই আলো-ও-বায়ুহীন, নোংরা অস্বাস্থ্যকর যে, তাহাতে বাস করিলে নানারোগে আক্রান্ত হওয়া অনিবার্য্য। ইম্প্রুভ্‌মেণ্টের প্রভাবে ঐ শ্রেণীর গৃহের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। আজকাল কলিকাতা হইতে ১০।২০ মাইল দূরে, রেলপথের ধারে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করা এবং ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া সহরে যাতায়াত করাই অনেকটা সুবিধাজনক।

—রায়তবন্ধু

দান ও সৎকর্ম্ম—

দূরদেশ হইতে দানের টাকা আসিতেছে—বরদা রাজ্যের পেটলাড নামক স্থান হইতে শ্রীযুক্ত নারায়ণভাই কেশবলাল বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকটে ৬ হাজার একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

—কাশীপুর-নিবাসী

আদর্শ সৎকার্য্য।—খুলনা জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সারসা থানার অধীন কায়েরা-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় সম্প্রতি ঐ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রত্যহ এখানে ১৫০।২০০ রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। ১৫০৲ টাকা বেতনে একজন অভিজ্ঞ এল-এম-এস ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন।

—সম্মিলনী

সৎকার্য্য।—ত্রিপুরা জিলার শ্রীযুত শরাফত আলী মিঞা মুরাদাপুরে প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

—মোসলেমহিতৈষী

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় ও হাস্‌পাতালের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটি শ্যামবাজার পার্কের

সম্মুখে প্রায় দেড় বিঘা জমি দান করিয়াছেন। আপাততঃ এই কলেজ ও হাসপাতাল ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে ১৭।১৯ শ্যামবাজার ট্রামরোডে সুবৃহৎ ত্রিতল বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

—সম্মিলনী

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়—

নোয়াখালী জিলার বিনোদপুর, সরিপপুর ও ওজবালিয়া গ্রামে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

—ঢাকা-প্রকাশ

স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষা।—কাঁথি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে সঙ্গীত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। প্রাচীন ভারতে ইহার খুব আদর ছিল, তখন সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ছিল। আজকাল ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সঙ্গীতবিদ্যায় উপাধিদানেরও কোন নিয়ম নাই। কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

—সম্মিলনী

বিনাবেতনে শিক্ষা দান।—২১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে করিমগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাত্রগণকে সাধারণ শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও বয়নবিদ্যা ও দেশলাই নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

—এডুকেশন্ গেজেট্

মৎস্য জিয়ান বিদ্যালয়—রোহিতপুর ফিসারী স্কুলের সফলতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত। ঢাকা জিলায় আরও দশটি ফিসারী প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫টি গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পাইতেছে।

— ঢাকা গেজেট্

শিক্ষা-প্রসঙ্গ -

আসামের শিক্ষক সম্মিলন।—প্রকাশ যে গত ২৬শে ডিসেম্বর আজিমগঞ্জে আসামের শিক্ষক-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। হেডমাষ্টার রায়-সাহেব করুণকণ্ঠ দাসগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, ছাত্রদিগকে কেবল বোঝা বোঝা বই পড়ান হয় কিন্তু তাহাদের শারীরিক ব্যায়াম কিম্বা নৈতিক ধর্ম্মশিক্ষার দিকে আদৌ লক্ষ্য করা হয় না। পাঠ্য কেবলমাত্র ইংরেজী প্রত্যক্ষভাবে শিখাইতে চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। বালক-বালিকাগণকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—এডুকেশন্-গেজেট্

স্কুল-শিক্ষকদের কন্ফারেন্স্।—গত সপ্তাহে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট-স্কুলের শিক্ষকদের সম্মিলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। স্কুল-ছাত্রদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা-প্রদান, প্রভৃতি সম্বন্ধে কন্ফারেন্সে আলোচনা হয়।

—এডুকেশন্-গেজেট্

বাঙ্গলার হাই স্কুল।—বাঙ্গলা দেশে ৮৭৩ গবর্ণমেণ্ট, ১৪৭০ সাহায্যকৃত ও ৬৭৬৯ প্রাইভেট্ হাই স্কুল আছে। গবর্ণমেণ্ট্-সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সম্প্রতি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রাইভেট্ স্কুলসমূহের উপর গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

—সম্মিলনী

বাংলার প্রদর্শনী—

সিউড়ি গবাদি পশু ও শস্যাদির প্রদর্শনী।—প্রদর্শনী কমিটীর অবৈতনিক সেক্রেটারি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, আগামী ২৮শে জানুয়ারী ১৯২৩ সাল, বাঙ্গালা ১৩ই মাঘ তারিখে সিউড়ি বড়বাগানে গবাদি পশু ও খাদ্যশস্যাদির প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। উক্ত মেলা ২রা ফেব্রুয়ারী বাংলা ১৯শে মাঘ পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। উৎকৃষ্ট গো-মেষাদি পশু ও কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য প্রদর্শকগণকে পাঁচ শত টাকা নগদ, মেডেল ও সার্টিফিকেট্ প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই প্রদর্শনীতে যাঁহারা গবাদি পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই সময় হইতে সেই সমস্ত সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইলে ভাল হয়। দোকানদার ও বাজীকর প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণের জন্য বিশেষ সুবিধা করা হইবে।

—সম্মিলনী

বারাসতে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী।—আগামী জানুয়ারী মাসের ২৮শে তারিখে বারাসতে শিল্প, কৃষি ও কলানৈপুণ্য প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করা হইবে। বারাসতের কাছারীর বিস্তৃত জমীতে প্রদর্শনী বসিবে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রদর্শক তাহাদের প্রদর্শনীর জিনিষ-সমূহ লইয়া এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

—সম্মিলনী

স্বাধীন জীবিকার উপায়—

অল্পশিক্ষিত ভদ্র ফেরিওয়ালার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কলিকাতার উত্তরাংশে অনেক ভদ্র যুবক খবরের কাগজ, সাবান, তওলিয়া, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন; ইহা শুভ লক্ষণ। ২০৲—৩০৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি অপেক্ষা এরূপ স্বাধীন ব্যবসায় যে লাভজনক, এবং সুবিধাজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজকাল ম্যাট্রিক্ পাশ বা ফেল, আই-এ পাশ বা ফেল প্রভৃতি যুবকদিগের ২৫—৩০৲ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য যেরূপ উমেদারী করিতে ও বেগ পাইতে হয়, আবার শতকরা ৮০।৯০ জনের ভাগ্যে চাকুরী পাওয়া যেরূপ অসম্ভব, তাহাতে ফেরিওয়ালার কাজ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। এ বিষয়ে মুসলমান যুবকগণ পশ্চাৎপদ, তাহাদের চাকুরীর নেশা আজিও ছুটে নাই। উপরোক্ত শ্রেণীর ফেরিওয়ালার কাজ করিতে বেশী মূলধনেরও আবশ্যক করে না; ৮৲—১০৲ টাকা পুঁজি হইলেই যথেষ্ট। যাঁহারা এই শ্রেণীর ফেরিওয়ালার কাজ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করি। মুসলমান-দিগের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার এবং খাস কলিকাতার কতকগুলি লোককে চটি-জুতার ফেরি করিতে দেখা যায়; আর কতকগুলি মুসলমান বাংলা সাবান এবং গুড়গুড়ি হুকার নলচে তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। ফলওয়ালাদের মধ্যে অধিকাংশ পশ্চিমে মুসলমান। তাহারা ফলের ফেরি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। দৈনিক ১৲ টাকার কম কোনও ফেরিওয়ালারই আয় নহে। অনেকের আয়ই ১॥০—২৲ টাকা। চাকুরি-প্রিয় যুবকদিগকে আমরা অধিক পরিমাণে ফেরিওয়ালার কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

মৎস্যের কারবার একটা মস্ত লাভজনক ব্যবসায়। বঙ্গদেশে মৎস্যের ব্যবসায় প্রায়ই জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে জেলে, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, তিয়র, বাগ্দী প্রভৃতি জাতি এই ব্যবসায় করে; আর মুসলমানদিগের মধ্যে নিকারী, ধাওয়া এই দুই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। নিকারীগণ মাছ ধরার কাজ খুব কমই করিয়া থাকেন; জেলেদের নিকট মৎস্য ক্রয় করিয়া খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করেন, এবং প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন। কলিকাতারও

ইহাদের মৎস্যের বিরাট ব্যবসায় আছে। কলিকাতার পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমান মুটে এবং উড়ে হিন্দুগণ প্রধানতঃ শীতকালে রেলের মৎস্য আনিয়া বাজারে বিক্রয় করে ও প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের দৈনিক ৪৲—৫৲ টাকা লাভও হয়। কলিকাতায় দেশীয় জেলে এবং মেছুনীদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। অবশ্য মিউনিসিপ্যালিটির বাজারসমূহে ও অন্যান্য অনেক বড় বড় বাজারে এখনও ইহাদের প্রাধান্য আছে। পাঞ্জাবের কতিপয় মুসলমান ২৪ পরগণার নানাস্থান হইতে মৎস্য ক্রয় করিয়া কলিকাতায় চালান দিতেছেন, এবং খুব লাভবান্ হইতেছেন। বহু হিন্দু ভদ্রলোকও মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় মৎস্য চালান দিয়া বেশ দশটাকা লাভ করেন। দেশের সাধারণ হিন্দু-মুসলমান মৎস্যের ব্যবসা করেন না। করা যে উচিত, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। অনেকে মৎস্যের ব্যবসায়ে শীতকালের কয়েক মাসে বৎসরের উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত—কিংবা কার্ত্তিক মাসের শেষাংশ হইতে ফাল্গুন মাসের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ৪।৫ মাস কাল এই ব্যবসায় খুব চলিতে পারে। আবার বর্ষাকালে আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ইলিশ মাছের কারবার বেশ চলে। চাকুরীপ্রিয় নিঃসহায় উমেদওয়ারগণ একাকী বা ১০।৫ জনে মিলিয়া সমবায়প্রণালীতে এই ব্যবসায় চালাইয়া লাভবান্ হইতে পারেন।

কোনও ব্যবসায়ই জাতি-বিশেষের হাতে থাকা উচিত নহে। এই প্রথায় দেশের উন্নতি হইতে পারে না। ধরুন গোয়ালার ব্যবসায়। বঙ্গদেশে এই ব্যবসায়টি গোয়ালাদের একচেটিয়া। সকল জেলায় ভাল গোয়ালা না থাকাতে, মফঃস্বলের অনেক স্থলে দুগ্ধ সুলভ মূল্যে পাওয়া গেলেও, দুগ্ধের সদ্ব্যবহার হয় না। সেই সকল স্থানে /০ হইতে /১০ মূল্যে প্রতি সের খাঁটি দুগ্ধ বিক্রয় হয়। সেই-সকল স্থানে দুগ্ধ হইতে মাখন তৈয়ার করিলে প্রচুর লাভ হইতে পারে। সাধারণ নিয়মে বাঁশের চর্কা দিয়া দুধ টানিয়া মাখন তৈয়ার করিলে তদ্দ্বারা ঘৃতও তৈয়ার হইতে পারে। ১/ মণ দুগ্ধের মূল্য ২॥০ টাকা বা ৩৲ কিংবা খুব জোর ৪৲ টাকা হইলেও উহাতে উৎকৃষ্ট /২॥০ সের /৩ সের মাখম তৈয়ার হইবে। তাহার মূল্য কলিকাতায় ৬৲—৬।০ বা ৭৲—৭॥০ টাকার কম নহে। মফঃস্বলে বসিয়া কেহ দৈনিক ।০/ দশ সের মাখন তৈয়ার করিতে পারিলে খরচ-খরচা বাদে খুব কম পক্ষে ৫৲ পাঁচ টাকা লাভ করিতে পারেন। ১০০-১৫০ টাকা মূলধন বা পুঁজি হইলেই এই ব্যবসায় চলিতে পারে। ৪/ মণ দুগ্ধের মূল্য ১৬৲ টাকা (খুব বেশীর পক্ষে), এবং ৪ জন লোকের মজুরী তিন টাকা, এই ১৯৲ টাকা খরচে ।০ দশ সের মাখন হইলে, খুব কম পক্ষে ২৫৲ টাকায় বিক্রয় হইবে। ঘোল বা মাটাগুলি ৫ সের হিসাবে বিক্রয় করিলেও প্রায় ২৲ টাকা আয় হইবে। আর উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ।২—।৪ সেরেই /১ সের মাখন হইবে। যে অঞ্চলে দুগ্ধ সস্তা, আমরা সেই অঞ্চলের লোকদিগকে মাখন ও ঘৃতের ব্যবসা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

—রায়ত-বন্ধু

ছাগল এবং মেষপালন একটি লাভজনক ব্যবসায়। কৃষি-প্রধান স্থানে ইহা পালন করা সুবিধাজনক নহে; কারণ উহারা ক্ষেত্রের ফসল খাইয়া ধ্বংস করে। যে অঞ্চলে বহু পতিত জমি আছে (যেমন নদীয়া জেলার বড় বড় মাঠ, বীরভূম বাঁকুড়া এবং বর্দ্ধমান জেলার শালবনসমূহ ইত্যাদি), সেই অঞ্চলে এবং যে-সকল অঞ্চলে কেবলমাত্র ধানের চাষ হয়, আর প্রায় ৬ মাসকাল মাঠগুলি খালি পড়িয়া থাকে, সেই-সকল প্রদেশে ছাগল এবং ভেড়া পালন করা খুব সুবিধাজনক। আজকাল ছাগল, খাসী ভেড়া প্রভৃতির মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে বৎসরে ঐ সকলের ২টা করিয়া বাচ্চা হইলে প্রত্যেকটার গড়ে ১০৲—১২৲ টাকা আয় হইতে পারে। সুতরাং ১২৫টা ছাগল ও ভেড়া পুষিলে তাহার বাচ্চার মূল্য গড়ে ১০৲ টাকা হিসাবে ধরিলেও ১২।১৩ শত টাকা হইবে। ২জন চাকর রাখিলেই যথেষ্ট; তাহাদের বেতনাদিতে বৎসরে ২০০৲—২১৫৲ খরচ হইলেও ১০০০৲ টাকা লাভ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। পতিত মাঠসমূহে ঘাস খাইয়া, এবং শালবন অঞ্চলে শালপাতা খাইয়া ছাগল এবং ভেড়াগুলি প্রতিপালিত হইতে পারে। সামান্য পরিমাণে ছোলা খাওয়াইলে খাসীগুলি খুব চর্ব্বিযুক্ত এবং মূল্যবান্ হইবারই কথা। খুব-উৎকৃষ্টজাতীয় দেশী ছাগল এবং উৎকৃষ্ট-জাতীয় পশ্চিমা ভেড়া পালন করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত স্থানসমূহ ছাগল ভেড়া পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনেকে সাঁওতাল পরগণার বহুস্থানে এই ব্যবসায় করিয়া প্রচুর লাভবান্ হইতেছেন। সমবায় হিসাবে ১০।১২ হাজার টাকা মূলধন লইয়া সাঁওতাল পরগণায় এই ব্যবসা করিলে খুব লাভবান্ হওয়া যায়। শতকরা ১০০ টাকা লাভ হইবার কথা।

—রায়ত-বন্ধু

কলার বাগান একটি লাভজনক ব্যাপার। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে মুন্‌শীগঞ্জ মহকুমার অধীন রামপাল অঞ্চলে (যে রামপাল হিন্দু রাজত্বকালে বঙ্গের বিরাট্ রাজধানী ছিল) কলার উত্তম চাষ হয়। এমন কলার চাষ বঙ্গদেশের আর কোথাও নাই। তত্রত্য কলা-চাষী অপেক্ষাকৃত উঁচু ভিটা-জমিতে দস্তুর-মতন চাষ করিয়া কলার বাগান করে। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কলার ঝাড় করে না। উপযুক্তরূপ তফাৎ তফাৎ কলার চারা যথাসময় লাইনবন্দী করিয়া পুতিয়া দেয়। চারা বাহির হইলে তাহা তুলিয়া বিক্রয় করে; একটি করিয়া মাত্র গাছ থাকে। তাহারা এমন কায়দায় এবং এমন হিসাবে কলার বাগান তৈয়ার করে যে, একই সময় কলার কাঁদি অর্থাৎ ছড়া বাহির হয়; এবং কাঁদিগুলি একই দিকে হেলিয়া থাকে; তাহা বড়ই সুন্দর দেখায়। রামপালের কবরী, শবরী (গাটিম), অমৃতসাগর, লালসাগর প্রভৃতি কলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। এক বিঘা জমিতে ২০০।২৫০ চারা রোপণ করা যায়। গড়ে ১৲ করিয়া কান্দি বা ছড়া বিক্রয় হইলেও ২০০৲—২৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে। খরচ-খরচা বাদ দিলেও প্রচুর লাভ থাকে। যাঁহারা কলার উৎকৃষ্ট চাষ শিক্ষা করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রামপালে গিয়া উহার চাষ-প্রণালী শিক্ষা করিতে অনুরোধ করি। কলার চাষ মহা লাভজনক, আর বঙ্গদেশের সকল জেলায়ই অল্পাধিক পরিমাণে কলা জন্মিয়া থাকে।

—রায়ত-বন্ধু

মফঃস্বলে জ্বালানী কাষ্ঠের বাগান না করিলে ভবিষ্যতে সকলকে বড় বিপন্ন হইতে হইবে। সমগ্র বঙ্গে কয়লার প্রচলন হওয়া সম্ভবপর নহে; কারণ সহর বন্দর হইতে লইয়া যাওয়া কষ্টসাধ্য ও বহুব্যয়-সাপেক্ষ। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ জ্বালানী কাষ্ঠ মান্দার-গাছ, সিমুল-গাছ, হিজল-গাছ, ছাতিয়ান গাছ প্রভৃতি। অকর্ম্মণ্য প'ড়ো জমিতে এই-সকল গাছের বাগান করিলে জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব পূরণ হইতে পারে। বঙ্গের যে-সকল জেলায় সুপারি-গাছ জন্মে, সেই-সকল জেলায় প্রথমে মান্দারের বাগান করিয়া পরে সুপারির বাগান করিলে সুপারির বাগান খুব উত্তম হইতে পারে। বাখরগঞ্জ জেলার উত্তর শাহ্‌বাজপুর, দক্ষিণ শাহবাজপুর, নোয়াখালী জেলার বহু স্থানে এবং ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার এলাকায় এই প্রণালীতে সুপারির বাগান ও মান্দার-গাছের বাগান করা হইয়া থাকে। মান্দার পাতার সারে সুপারি-গাছ খুব সবল হয় এবং উহার ফলনও অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই মান্দার-গাছের বাগান করিয়া জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব পূরণ করা উচিত।

—রায়ত-বন্ধু

আকন্দ

আকন্দ-গাছ বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত। এই গাছ সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়, যথা শ্বেত ও রক্ত আকন্দ। কতকগুলি শৃঙ্গের ন্যায় ফলের মধ্যে পশমের ন্যায় এক-প্রকার জিনিষ উৎপন্ন হয়, তাহাই আকন্দ-তুলা নামে অভিহিত হয়। কফ ও বাত রোগে এখনও অনেক স্থানে অনেকে শিশুদের জন্য আকন্দ-তুলার বালিশ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

চেষ্টা করিলে আকন্দ-তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। তবে কাপাসাদি তুলার ন্যায় সহজসাধ্য নয়। একটু ধৈর্য্য ও পরিশ্রম চাই। আকন্দ-তুলার সূত্রে যে গেঞ্জি, কম্ফর্টার ও মোজা প্রস্তুত হয় তাহা শীত-কালে মহোপকারী। যদি রীতিমত চাষ করা যায় তাহা হইলে এতদ্দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়। আকন্দের চাষে কোনরূপ কষ্ট বা ব্যয় নাই, পতিত জমীতে বীজ ছড়াইয়া দিলেই গাছ জন্মিয়া থাকে। ছাগাদি পশুতে প্রায়ই এই গাছের অনিষ্ট করে না। একটু চেষ্টা করিলে বোধ হয় এই তুলা রেশমের স্থান অধিকার করিতে পারে।

প্রথমে যদি সূতা প্রস্তুত করিতে না পারা যায় তবে তাহাতেও তত ক্ষতি নাই, বালিশ ও গদীর জন্য সাধারণে না পারেন বিলাসীগণ যে ইহা উচ্চমূল্যে ক্রয় করিবেন তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। রীতিমত চালানাদির ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলে ইহা একটি বিশেষ লাভজনক পণ্যে পরিণত হইতে পারে। চেষ্টাবান্ ব্যক্তি একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না। আমি একেবারে চাষ করিতে অনুরোধ করি না। প্রথমে কিছু আকন্দ তুলা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বড়-সাহেবদের দোকানে নমুনা পাঠাইয়া দর যাচাই করিতে পারেন। পরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই চলিবে। —বঙ্গরত্ন

সাহিত্যিক সদনুষ্ঠান—

পদক প্রদান।—কাঁথি সারস্বত সম্মিলনী-সম্মিলিত ক্লাব হইতে স্বর্গ-গত সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে মুকুন্দপুর-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার মাতা সুগন্ধামণির নামে একটি রৌপ্যপদক, প্রদান করিবার বিষয় পূর্ব্ব হইতে প্রকাশিত হওয়ায় স্থানীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি-এ, ও দৌলতপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া ক্লাবে প্রদান করেন। প্রতিযোগিতায় সতীশচন্দ্রের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহাকেই উক্ত পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

—নীহার

আমাদের কার্য্যপ্রণালী—

ধ্বংসের দিক্

১। গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত স্কুল ও কলেজ-বর্জ্জন।

২। আইন আদালত বর্জ্জন।

৩। কাউন্সিল ধ্বংস।

৪। মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং চালান।

৫। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, বিশেষতঃ ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জ্জন এবং প্রয়ো-জন হইলে সেই উদ্দেশ্যে পিকেটিং চালান।

সৃষ্টির দিক্

১। জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা।

২। জাতীয় সালিশী আদালত স্থাপন।

৩। কংগ্রেস-কমিটিগুলির ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া কংগ্রেসকে জাতীয় মহাসমিতিরূপে গড়িয়া তোলা।

৪। দেশের নৈতিক উন্নতি বিধান এবং মাদকদ্রব্য-নিবারিণী সমি-তির বিস্তৃতি সাধন।

৫। খদ্দর উৎপাদন ও গৃহশিল্পের উন্নতি সাধন।

সমগ্র জাতির শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য—

১। শ্রমিক সংঘ গঠন। ২। কৃষক-সমিতি গঠন। ৩। এসিয়ার বিভিন্ন জাতির সহিত মৈত্রী স্থাপন।

৪। সকল স্বাধীন দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের নিমিত্ত, সে-সকল দেশে কংগ্রেসের শাখা সংস্থাপন।

শেষ সংঘর্ষ (final blow:)

পূর্ণ অসহযোগ গ্রহণ

(ক) সমস্তদেশব্যাপী সম্পূর্ণ ও বহুদিনস্থায়ী হরতাল। (খ) দেশের সকল স্থানে সকলের একসঙ্গে সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ। (গ) রাজস্ব প্রদান বন্ধ করা।

দ্রষ্টব্য—

(ক) স্বরাজের মোটামুটি স্বরূপ (constitution) স্থির করা চাই। (খ) স্বরাজ-শাসনে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক শ্রেণীর স্থান কি হইবে তাহা স্থির করা চাই।

—আত্মশক্তি

নারীমঙ্গল—

মেয়েদের বাঙ্গালা দৈনিক।—শুনা যাইতেছে, কলিকাতা হইতে শীঘ্রই "বঙ্গনারী" নামে একখানা দৈনিক পত্রিকা বাহির হইবে। ইহার সম্পাদিকা হইতেছেন শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার। শুধু ইহাই নহে; প্রকাশ যে, ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকও একজন মহিলা হইবেন এবং ইহা মহিলা কম্পোজিটারদের দ্বারাই মুদ্রিত হইবে। শ্রীযুক্তা সন্ধ্যা বসু কম্পোজিং বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ "বঙ্গনারী" নারী-সমাজের বিশেষত্ব জ্ঞাপক একখানা অভিনব ধরণের পত্রিকা হইবে। সমগ্র এসিয়ার মহিলাদের দৈনিক কাগজ প্রচারের চেষ্টা এই প্রথম।

—মোহাম্মদী

নারী-বয়ন-বিদ্যালয়।—শ্রীরামপুরে খৃষ্টীয় নারী-সমিতির উদ্যোগে একটি নারী-বয়নবিদ্যালয় খোলা হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণীতে বয়নবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে, ও উপরের শ্রেণীতে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা হইবে। প্রবেশার্থিনীদিগের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ হওয়া চাই। বিদ্যালয় খোলার সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইয়াছে। বস্ত্র-বয়নে নারীগণ দক্ষতা অর্জ্জন করিলে দেশের অনেক দৈন্য দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। দেশে বহু কর্ম্মক্ষমা বিধবা উপার্জ্জনের পথ না পাইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া দিন যাপন করেন। প্রবেশার্থিনীদিগের বিদ্যালয় প্রবেশের অধিকার ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া না করিয়া, যাহারা সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহাদিগকেই প্রথমে গ্রহণ করিলে ভাল হইত।

—সম্মিলনী

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, শ্রীমতী রাজকুমারী দাস বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

—পল্লীবাসী

জাতীয় জাগরণের সাড়া কর্ম্মকার জাতির অন্তঃপুরেও পঁহুছিয়াছে। গত ১৫ই ও ১৬ই পৌষ তারিখে বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে কর্ম্মকার মহিলারা পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী ক্ষান্তমণি দাসী নামে জনৈক দয়াবতী কর্ম্মকার মহিলা কর্ম্মকার

জাতির দরিদ্র ছাত্র ও দুঃস্থ বিধবার সাহায্যার্থে ৮০০্ টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ এই সম্মিলনীকে দান করিয়াছেন।

সম্পাদক, বঙ্গীয় কর্ম্মকার-সম্মিলনী

ঢাকা জেলে বন্দীর দুরবস্থা—

ঢাকার মুক্তিপ্রাপ্ত অসহযোগী বন্দী আবদাস সালাম চৌধুরী—"সার্ভেণ্ট" পত্রিকায় লিখিতেছেন—ঢাকা-জেলে প্রায় দুই শত জন নামজাদা অসহযোগী বন্দীকে একত্র করা হইয়াছিল, আজকাল তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া ৩০ জনে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যা হ্রাসের অনুপাতে কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচার বাড়িয়া চলিয়াছে। টাউন খিলাফৎ-কমিটির সম্পাদক মৌলবী সামসুল হুদা এবং আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়ার কর্ম্মী সাদাৎ হোসেনের উপরই এই বিষদৃষ্টি সবচেয়ে প্রখর হইয়াছিল। প্রথমতঃ জেলের মধ্যেই তাঁহাদের বিচার হইয়াছিল। তার পর তাঁহাদিগকে সাধারণ শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করিয়া, তাঁহাদিগকে এমন সব কাজকর্ম্ম করিতে দেওয়া হইয়াছিল, যাহা তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অস্বীকার করিতে হইয়াছিল। ফলে তাঁহাদিগকে এখনও এমন সব শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে, যাহা অসহযোগী বন্দীগণের ভাগ্যে আর কখনও ঘুটে নাই। সাধারণতঃ রাজনৈতিক বন্দীগণকে ফাইলে দাঁড়াইতে হইত না, বা হাত দেখাইতে হইত না। কিন্তু জেলে আসিবার পর হইতেই এই বন্দীদ্বয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল। তাঁহারা সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে দাঁড়াইতে অস্বীকৃত হইলে রাত্রিতে হাতকড়ি প্রভৃতির আদেশ হইল। ফলে নাকি তাঁহারা সময়-মত নমাজও পড়িতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জেলে রাখাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে।

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

জলদস্যুর আবির্ভাব—

ময়মনসিংহের সাইডুলি নদীতে জলপথে বাণিজ্যগামী নৌকাতে দস্যুদলের ভয়ানক অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। সাইডুলী নদী নেত্রকোণা অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য আমদানী ও কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানীর দ্বার-স্বরূপ। বিদেশী ব্যাপারীর পক্ষে বোঝাই নৌকা আটক করিয়া মামলা মোকদ্দমা করা অসম্ভব। সুতরাং তাহারা এই দস্যুগণকে তাহাদের ইচ্ছামত অর্থ প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করে। লোক্‌-সানের ভয়ে বিদেশী ব্যাপারীগণ নীরবে এই-সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতেছে। এরূপ অরাজকতা ও দুপুরে ডাকাতি অবাধে চলিতেছে, ইহা ইংরেজ রাজত্বের বড়ই কলঙ্কের কথা।

—রায়তবন্ধু

মেয়েদের জাগরণ—সমাজের উন্নতি—

হাওড়া শালকিয়াতে গত ২১শে নবেম্বর একটি বিবাহ হওয়ার কথা ছিল। বর ত সহযাত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা বর দেখিয়া বিবাহে নারাজ হইলেন—"এ বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিব না।" বর দেখিতে নাকি মেয়ের ঠাকুরদাদার বয়সী। মেয়েটিও এ বিবাহে অমত জানায়। ফলে এক বিষম হৈ চৈ। উপস্থিত এক ভদ্রলোকের আত্মীয়ের সঙ্গে ঐ দিনই মেয়েটির বিবাহ হয়। ভদ্রলোকের উদারতায় যখন জয়ধ্বনি পড়িল, তখন বৃদ্ধ বর ভগ্ন-হৃদয়ে বিবাহবাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। মেয়েরা একটু সজাগ হইলে, বাধ্য হইয়া সমাজও একটু জাগিয়া উঠিবে। তোমাদের মান তোমরা রেখ,—আমরা ত মনুষ্যত্ব রাখি নাই!

—শঙ্খ

সামাজিক ঔদার্য্য—

অন্ধ বালিকার বিবাহ।—সম্প্রতি কলিকাতা শোভাবাজারে রসিকলাল ঘোষের গলিতে একটি অন্ধ বালিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রটি ই, বি, রেলের স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টর। পাছে সাংসারিক কাজে অসুবিধায় পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার কনিষ্ঠের সহিত অন্ধ বালিকার কনিষ্ঠ ভগ্নীরও বিবাহ দিয়াছেন। উভয় বিবাহই এক রাত্রে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাত্রপক্ষ বিবাহে পণ গ্রহণও করেন নাই। ইহাদের নিবাস ঢাকা-সোণারঙ্গে। পাত্র দুইটির জ্যেষ্ঠের নাম—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কনিষ্ঠের নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। অন্ধ বালিকার নাম শ্রীমতী আশালতা দেবী—তাঁহার কনিষ্ঠার নাম শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী। এ বিবাহে শৈলেন্দ্র-বাবু যে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় যুবকগণের আদর্শস্থানীয়।

—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী নামক একজন বাঙ্গালী ছাত্র, বৃটিশ গভর্মেণ্টের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিভাগ হইতে ১৩০ পাউণ্ড ১৯৫০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় ছাত্র বৃটিশ-গভর্মেণ্টের বৈজ্ঞানিক-গবেষণা-বিভাগ হইতে এই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্বে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা শ্রীমানের দীর্ঘায়ু এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য কামনা করিতেছি।

—রঙ্গপুর-দর্পণ

পরলোকগত কৃতী বাঙ্গালী—

৺ অম্বিকাচরণ মজুমদার।—পুরাতন যুগের কংগ্রেসনেতা ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ১ টার সময় স্বর্গগামী হইয়াছেন। মজুমদার মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও দেশসেবা হইতে বিরত হন নাই। তাঁহার তিরোধানে বাংলাদেশ আজ একজন কৃতীপুরুষ হারাইল। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। তবে আমরা সর্ব্বান্তকরণে স্বর্গগত মহাত্মার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

—জনশক্তি

পরলোকে পূর্ণচন্দ্র।—শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রায় বাহাদুর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত শুক্রবার তাঁহার কলিকাতা ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

—এডুকেশন্ গেজেট্

ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুর অসাধারণ গণনা-শক্তি—

সে-দিন আমরা কার্য্যোপলক্ষে ভবানীপুর স্বদেশী বস্ত্রালয়ে গিয়া উক্ত বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ পরিতোষকুমারের অসাধারণ গণনা-শক্তি দেখিয়া একবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আসিয়াছি। শিশুটি সবে মাত্র পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। এখনও সে "পয়সা"কে পয়ছা এবং "সাত"কে ছাত বলে। বলা বাহুল্য যে সে এখনও নিরক্ষর, এ পর্য্যন্ত তাহার "হাতে খড়ি" হয় নাই। "অ আ" বা "ক খ" পর্য্যন্ত সে এখনও শিখে নাই। তবে শুনিলাম নিজের চেষ্টায় ১ হইতে ১০০

পর্য্যন্ত সে গণিতে শিখিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত গণনা শিখিয়াই শিশু এমন গণনা-শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে যে শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ১ হইতে ১০০ সংখ্যার মধ্যে যে-কোন দুই সংখ্যার যোগ-বিয়োগ সে মনে মনে গণিয়া নির্ভুল বলিয়া দিতে পারে। অথচ সে এখনও "কর" গণা শিখে নাই। আমরা প্রশ্ন করিলাম ২৫এর সঙ্গে ১৬ যোগ করিলে কত হয়। একটু ভাবিয়া শিশু উত্তর করিল ৪১; বলা বাহুল্য যে সে এই যোগ করিতে কর গণে নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম কিরূপে তুমি গণিলে? শিশু উত্তর করিল ২৫ [শিশুর উচ্চারণ পঁচিচ] একধারে রাখিলাম, আর ১৬ [শিশুর উচ্চারণ ছোল] একধারে রাখিলাম; শেষে ২৫কে করিলাম ২৬, আর ১৬কে করিলাম ১৫; এইরূপে ২৫কে উপরের দিকে বাড়াইতে বাড়াইতে যখন ৪১ হইল তখন অপর দিকে আর কিছুই রহিল না। কাজেই বুঝিলাম ২৫ আর ১৬তে হয় ৪১। শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এক টাকা হইতে সওয়া চারি আনা খরচ হইলে কত থাকে। বালক একটু চিন্তা করিয়া বলিল—এগার আনা তিনপয়সা। অতঃপর এগার আনা তিনপয়সায় কত পয়সা হয় তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল। বালক কত আনায় চারি পয়সা হয়, এই হিসাব হইতে গণনা করিয়া একটু পরেই উত্তর করিল ৪৭ পয়সা। আমরা অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম ১৭ পয়সা হইতে ১২ পয়সা গেলে কত থাকে? শিশু মুহূর্ত্ত মধ্যে উত্তর করিল পাঁচ পয়সা। শিশু নামতা জানে না। অথচ কত আনায় কত পয়সা জিজ্ঞাসা করিলেই সে গণিয়া সঠিক বলিয়া দিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই বালক উপযুক্ত শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিলে কালে গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করিবে।

—সম্মিলনী

—

সেবক

বিদেশ

লোজান্ বৈঠক—

সেভার্স্-সন্ধি-সর্ত্তগুলিকে তুরস্ক গ্রহণ করিয়া লইতে অস্বীকার করায় নূতন রফা-নিষ্পত্তি করিয়া পশ্চিম-প্রান্তিক-প্রাচ্যের সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে লোজান্ বৈঠকের সৃষ্টি হয়। এই বৈঠকে প্রধানতঃ পাঁচটি সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা চলে—

(১) দার্দ্দেনেলিশ-প্রণালীতে জাহাজের অবাধগতি ও প্রণালীর কর্ত্তৃত্ব।

(২) তুরস্কে বিদেশীয় ব্যবসায়ীর স্বার্থ সংরক্ষণ।

(৩) তুরস্কের ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণ।

(৪) তুরস্কের পশ্চিম সীমান্ত নির্দ্দেশ।

(৫) তুরস্কের হৃত প্রাচ্য প্রদেশসমূহের সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তুরস্কের পশ্চিম সীমা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মারিট্জা নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। দার্দ্দেনেলিশ-প্রণালীতে ব্যবসায়ী-জাহাজের অবাধে যাতায়াত করিবার অধিকার তুরস্ক স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল। যুদ্ধের সময় ব্যতীত একখানি বিদেশীয় রণতরীর অবাধ প্রবেশের অধিকার এবং যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ শক্তির রণতরী প্রবেশের অধিকারও তুরস্ক মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রজার স্বার্থসংরক্ষণ সম্বন্ধেও রফানিষ্পত্তি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তুরস্কের বিদেশীয় ব্যবসায়ীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মিত্রশক্তিবর্গ যে-সব দাবী জানাইয়াছে তাহা লইয়া খুব একটা গোল পাকাইয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয়কে বিচার করিবার অক্ষমতা বা ক্যাপিটুলেশন সম্পূর্ণ তুলিয়া দিতে মিত্রশক্তিবর্গ নারাজ; অথচ ক্যাপিটুলেশন মানিয়া লওয়া তুরস্ক জাতীয় মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করে। মিত্রশক্তি বিদেশীয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার অছিলায় ক্যাপিটুলেশনের পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল যাহা স্বীকার করিয়া লওয়া তুরস্কের পক্ষে সম্ভব নহে। তুরস্ক-সরকার মনে করেন যে ক্যাপিটুলেশন তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যে-সব বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের চেষ্টা চলিতেছে তাহা কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইলে ক্যাপিটুলেশন নামে তুলিয়া দেওয়া হইবে বটে কিন্তু কার্য্যত উহা থাকিয়া যাইবে। কাজেই তুরস্ক-প্রতিনিধি সে ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। মিত্রশক্তিবর্গ আরও বলে যে বিদেশীয়ের নিকট সাধারণ প্রজা অপেক্ষা বেশি কর আদায় করিয়া লইতে তুরস্ক পারিবে না এরূপ একটি সর্ত্তে তুরস্ক-সরকারকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিদেশী বণিকের নিকট হইতে আয়কর ও বাণিজ্যকর অধিক ধার্য্য করিবার অধিকার তুরস্ক ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। ক্যাপিটুলেশন সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিতে তুরস্ক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। মিত্রশক্তিবর্গ কিন্তু সহজে নিজেদের অধিকার ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। কাজেই দুইপক্ষই বেশ দৃঢ়তার সহিত আপন মত সমর্থন করিতেছে। এবং দুইপক্ষে ইহা লইয়া বেশ তীব্র রকমের বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গোল বাধিয়াছে তুরস্কের পূর্ব্বসীমানা লইয়া। অ্যাঙ্গোরা-সরকার তুরস্কের পূর্ব্ব-সীমানায় অবস্থিত মোজল প্রদেশ ইংরেজ-সরকারের তাঁবেদারী (mandated territory) হইতে ফিরাইয়া চাহে। ইংরেজ-সরকার কিন্তু মোজল ফিরাইয়া দিতে কিছুতেই স্বীকার পাইতেছে না। তুরস্ক-সরকার বলে যে মোজলের অধিকাংশ অধিবাসীই তুর্কী; ইরাক রাজ্যের সঙ্গে মোজল প্রদেশকে যুক্ত করিয়া দিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। ছয়শত বৎসর হইতে মোজল তুরস্কের সহিত যুক্ত। ভাষায়, ধর্ম্মে ও জাতিতে তুরস্কের সহিত মোজলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনীতিক কারণেও তুরস্কের দাবী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তুরস্ক-সরকার জানাইয়াছে। ইংরেজ-সরকার কিন্তু বলে যে তুরস্ক এসম্পর্কে যে-সমস্ত হিসাব দেখাইয়াছে এবং যে-সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছে সেগুলি সত্য নহে, অনেক মিথ্যা অঙ্কের অবতারণা করিয়া তুরস্ক আপন দাবীর সমর্থন করিয়াছে। ইংরেজ-সরকারের প্রস্তুত অধিবাসীবৃন্দের জাতি ও ধর্ম্মের হিসাবের সঙ্গে তুরস্কের হিসাব মিলে না। এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যেরও গরমিল দেখা যাইতেছে। মোজলের অধিবাসী আর্ম্মেনিয়ান ও চালডীয় জাতির প্রতিনিধিবর্গ ইংরেজ-সরকারের যুক্তির সমর্থন করেন। ইংরেজ-সরকার সেইজন্য চালডীয় ও আর্ম্মানী প্রতিনিধিদিগকে লোজান্ বৈঠকে তাঁহাদের দাবী জানাইবার জন্য উপস্থিত করিতে চাহে। ইহার উত্তরে তুরস্কের প্রতিনিধি ইসমৎপাশা ও রাউফপাশা জানাইলেন যে ছয়শত বৎসর মোজলের কর্ত্তৃত্ব করিয়াও যদি তুরস্ক মোজলের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হইয়া থাকে তাহা হইলে এই চার বৎসর মাত্র মোজল অধিকার করিয়া ইংরেজ-সরকার কি করিয়া মোজলের সঠিক সংবাদ পাইল? তুরস্ক-সরকার যে হিসাব দাখিল করিয়াছে তাহা তুরস্কের সরকারী প্রয়োজনে বহুপূর্ব্বেই অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজ-সরকার যে হিসাব দাখিল করিতেছে তাহা এই বৈঠকের জন্যই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা। কাজেকাজেই ইংরেজের হিসাব অপেক্ষা তুরস্কের হিসাব ঠিক হইবার অধিক সম্ভাবনা। মোজলে তুর্কী অধিবাসীই বেশী। কিন্তু তাহা না হইলেও তুরস্কের দাবী কম হয় না। কারণ অধিবাসীর ইচ্ছাই শাসনতন্ত্র নির্দ্দেশ করিবার

একমাত্র মাপকাঠি নহে। ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক সংযোগ এবং সামরিক প্রয়োজন প্রভৃতি আরও অনেক গুরুতর কারণে রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জিব্রাণ্টার ও মাণ্টা সেই কারণেই ইংরেজ-সরকারের অধিকারে আছে এবং এই অধিকার যে ইংরেজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহা সকলেই স্বীকার করে। ঠিক অনুরূপ কারণে মোজলের উপর তুরস্কের দাবী আছে। সামরিক কারণে মোজল অধিকার তুরস্কের একান্ত প্রয়োজনীয়। আর্ম্মানী এবং চাল্‌ডীয় প্রতিনিধির দাবী উপস্থিত করিবার অধিকার তুরস্ক কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে না। কারণ স্বাধীন ও স্বরাট্‌ রাষ্ট্রসমূহের বৈঠকে পরাধীন ও অবনত জাতির প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার নাই; ইংরেজ-সরকার কি ভারত, মিশর ও আয়ার্‌ল্যাণ্ডের প্রতিনিধিবর্গকে বৈঠকে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দাবী জানাইতে অধিকার দিতে প্রস্তুত আছে? তাহা করিতে যদি ইংরেজ প্রস্তুত না থাকে তবে কোন্ নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া ইংরেজ-সরকার আর্ম্মানী ও চাল্‌ডীয় প্রতিনিধির দাবী শুনিতে বৈঠককে অনুরোধ করিতেছেন? বিদ্রোহী প্রজার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের অভিযোগ তুরস্ক অস্বীকার করেন। কিন্তু যদি আর্ম্মানী-হত্যার অভিযোগ সত্যও হয় তাহা হইলেও ইংরেজের বলিবার কিছুই নাই। আয়ার্‌লণ্ডের ব্ল্যাক্ ও ট্যান্ দলের অত্যাচার, ভারতে জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ড, মিশরে সামরিক আইনের অত্যাচার প্রভৃতির পর ইংরেজের মুখে এই-সব কথা বড়ই অশোভন।

তুরস্কের এই তীব্র মন্তব্যে ইংরেজ-প্রতিনিধি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন এবং তুরস্কের এই হঠকারিতা যে বোল্‌শেভিকদিগের প্ররোচনাতেই ইহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস। ইংরেজ কিন্তু মোজলের দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। ইংরেজ-সরকারের অনুগ্রহভাজন ইরাকের আমীর ফয়জলের প্রতি ইংরেজ-সরকারের প্রীতি কিম্বা আর্ম্মানী ও চাল্‌ডীয় জাতির প্রতি ন্যায়বিচারের আগ্রহ হইতে যে ইংরেজ-সরকার মোজল-সংক্রান্ত ব্যাপারে এত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে তাহা মনে হয় না। ইহার অন্তরালে ইংরেজ-সরকারের এক গোপন অভিসন্ধি আছে। মার্কিন তৈল-খনির মালিকরা সে অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর খনিজ তৈলের শতকরা ষাটভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পাওয়া যায়। এই তৈলের মালিক হইল ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী, এবং বিখ্যাত ধনকুবের জে ডি রকফেলার হইলেন এই কোম্পানীর প্রধান পরিচালক। মেক্সিকো, রাশিয়া, পারস্য, মোজল, আসাম ও বার্ম্মাতে যথেষ্ট তৈল পাওয়া যায়। মেক্সিকো, পারস্য, আসাম ও বার্ম্মাতে খনিজ-সম্পত্তির মালিক পিয়ার্সন্ অয়েল্‌ট্রাষ্ট নামক ইংরেজ কোম্পানী ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরাবরই করিয়া আসিয়াছে। এই দুই দলের প্রতিযোগিতার ফলেই মেক্সিকোর গোলযোগ ঘটে ও পারস্যে রাষ্ট্রীয় প্রভাবের অধিকার (sphere of influence) লইয়া ইংরেজ ও রুশের মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই দুই কোম্পানীর মালিকরা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়াতে নিজেদের দেশের শাসন-পরিষদে ইহাদের প্রভাব যথেষ্ট। শাসক-সম্প্রদায় অনেক সময়েই ইহাদের নির্দ্দেশমত চলিতে বাধ্য হয়। মোজলের তৈলখনি হস্তগত করিয়া পিয়ার্‌সন্ ট্রাষ্ট যাহাতে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে তাহা ইংরেজ-সরকার বরাবরই চাহিয়া আসিয়াছে। তাই ফয়জল যাহাতে ইরাকের শাসনভার প্রাপ্ত হয়েন সে চেষ্টা ইংরেজরা করিতেছে। এদিকে রুর ও সার্-এর কয়লাখনি ও লংউইর লৌহের খনির মালিকানা লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীর মনোমালিন্যের কথা জানিতে পারিয়া চতুর রাষ্ট্রনীতিক কামাল পাশা ফ্রান্‌সকে মোজলের তৈল উত্তোলনের অধিকার প্রদান করিতে অঙ্গীকার করাতে ফ্রান্‌স্ কামালের দাবীর সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন। মার্কিনও ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ফ্রান্‌সের অনুকূলেই মত প্রকাশ করিতে থাকে। ফ্রান্‌সের রাষ্ট্রীয় ধারা ও ইংরেজ-রাষ্ট্রের ধারা অর্থনীতিক কারণে এখন বিপরীতগামী। মার্কিন নিজের স্বার্থের দায়ে ফ্রান্‌সের অনুকূলতা করিতেছে এবং দায়ে পড়িয়া ইংরেজ-সরকার জার্ম্মানীর অনুকূলতা করিতেছে। ইংরেজের জার্ম্মান-প্রীতির বিরুদ্ধে নিজের শক্তিসঞ্চয়ের জন্য ফরাসী তুরস্কের প্রীতি আকর্ষণের প্রয়াস পাইতেছে। এইরূপে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে ইউরোপের রাষ্ট্রধারায় এক নূতন আবর্ত্তের সৃষ্টি হইতেছে। স্বার্থে স্বার্থে যে সংঘাত বাধিয়া উঠিতেছে তাহা পুঞ্জীভূত হইয়া আবার একটি নূতন কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে।

বিশ্বের হাটে এই যে রেষারেষি তাহার মূলে রহিয়াছে লৌহ, কয়লা ও তৈলের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার সন্ধান পাইয়া তুরস্ক সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টায় আছে; ইংরেজও সহজে আপনার সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহে। তাই বৈঠক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ফলে একটা যুদ্ধ বাধিয়া উঠা কিছুই বিচিত্র নহে।

ক্ষতিপূরণ-সমস্যা।—

কয়লা লৌহ এবং খনিজ তৈল যুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। যন্ত্রনির্ম্মাণ ও পরিচালন এই তিন বস্তুর সাহায্য ভিন্ন একপ্রকার অসম্ভব। কাজেকাজেই যান্ত্রিক সভ্যতার এইগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই প্রবল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এই-সকল বস্তুর মালিকানা লইয়া প্রবল প্রতিযোগিতা চলে। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অনেক রাষ্ট্রনৈতিক মনোমালিন্যের মূল এই তিনটি বস্তু। ফ্রান্‌স্ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে ক্রমেই অসদ্ভাব বাড়িয়া উঠিতেছে তাহার মূলেও কয়লা ও তৈলের মালিকানা লইয়া বিরোধ দেখা যায়। জার্ম্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ সস্তায় রুর্ ও সার্ প্রদেশের কয়লা আদায় করিয়া লইয়া ফরাসী নিজের ব্যবহারে তাহা লাগাইয়া অল্প মূল্যে বহু পণ্যসামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু তাহা নহে; নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কয়লা ফ্রান্‌স্ জার্ম্মানীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়। সেই কয়লা খুব কম দরে সে হলাণ্ড নরওয়ে সুইডেন ও স্পেনের বাজারে বিক্রয় করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই-সকল দেশে ইংলণ্ডের কয়লা বিক্রয় হইত। পণ্যদ্রব্য-নির্ম্মাণে জার্ম্মানীর এত কয়লা লাগিত যে জার্ম্মানী পূর্ব্বে কয়লা বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিত না। ফ্রান্‌সে কিন্তু এত বেশী পণ্য প্রস্তুত হয় না; ফ্রান্‌সে কৃষিকার্য্যের আদরই বেশী। সেইজন্য ফ্রান্‌সের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরেজ পারিয়া উঠিতেছে না। ইংলণ্ডের কয়লার রপ্তানী কমিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডের বেকার সমস্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে জার্ম্মানীর নিকট হইতে কয়লা আদায় করিয়া ফ্রান্‌স্ আপনার যুদ্ধ-ঋণ কমাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। অন্যদিকে কয়লার অভাবে জার্ম্মানী আর পূর্ব্বের মত পণ্যদ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর আবার ক্ষতি-পূরণ করিতে জার্ম্মানী সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে।

জার্ম্মানী ইংরেজের একজন বড় খরিদ্দার। জার্ম্মানীর অর্থনীতিক দুর্দ্দশায় তাই ইংরেজকেও বিপদ্ গণিতে হইতেছে। জার্ম্মানীর অধোগতিতে ইংরেজের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইংরেজ ঋণের দায় হইতে জার্ম্মানীকে একটু রেহাই দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। ফ্রান্‌স্ কিন্তু নিজের রাষ্ট্রনীতিক মঙ্গলের জন্য জার্ম্মানীকে যতদূর সম্ভব চাপিয়া রাখিতে চায়। তাই ক্ষতিপূরণের

অছিলায় জার্ম্মানীকে দোহন করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবার প্রয়াস ফ্রান্স্ করিতেছে।

জার্ম্মানী প্রতিশ্রুতি-মত ক্ষতিপূরণ করিতে পারিতেছে না। জার্ম্মানীর এই অক্ষমতা প্রকৃত বলিয়া ইংরেজ বিশ্বাস করে। কিন্তু এটা জার্ম্মানীর একটা মিথ্যা ভান বলিয়া ফ্রান্সের ধারণা। তাই জার্ম্মানীকে জব্দ করিবার জন্য ফ্রান্সের একদল লোক রাইন-উপত্যকা, রুর এবং এসেন প্রদেশ অধিকার করিয়া তথাকার খনিজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার পক্ষপাতী। জার্ম্মানীর শুল্ককর ও বন-বিভাগের রাজস্বও ইহারা কাড়িয়া লইতে চাহে। আর একদল লোক ইংরেজ-সরকারের প্রস্তাব আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে চাহে বটে কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণের সমস্ত টাকা-টাই দিয়া ফেলে ততদিন পর্য্যন্ত রাইন-উপত্যকার শাসনভার জাতিসমূহের সংঘের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে চাহে। ইংরেজ কিন্তু রাইন উপত্যাকা কিম্বা রুর প্রদেশে ফ্রান্সের প্রভাব পছন্দ করে না। ইংরেজ-সরকার তাই জার্ম্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় আপাততঃ স্থগিত রাখিবার এক প্রস্তাব করে। সেই প্রস্তাবের যখন আলোচনা চলিতেছিল সেই সময় জার্ম্মানী পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি-মত উত্তর ফ্রান্সের বিধ্বস্ত সহরগুলির পুনর্নির্ম্মাণ-কল্পে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের দেয় কাঠ প্রদান করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। ফ্রান্স তখন কাঠের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দাবী করিল। জার্ম্মানী ঋণের টাকা না দিতে পারিয়া দেউলিয়া হইয়াছে। কাজে-কাজেই তাহার কাছে নগদ টাকা আদায়ের চেষ্টাতে ইংরেজ আপত্তি জানাইল। জার্ম্মানীর সঙ্গে একটা রফা-নিষ্পত্তি সম্ভব কি না তাহা স্থির করিবার জন্য প্যারী সহরে এক বৈঠক বসিল।

ক্ষতিপূরণ-সমস্যার মীমাংসার জন্য ইংরেজ-সরকার একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল। তাহারা জার্ম্মানীর দেয় টাকা আদায়ের চেষ্টা চার বৎসর স্থগিত রাখিবার পক্ষপাতী। এই চারি বৎসর জার্ম্মানীর নিকট কোনও টাকা আদায় করা যাইবে না। জার্ম্মানী পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি-মত কেবল কয়লা, কাঠ, রং এবং জমির সার (nitrates) দিতে বাধ্য থাকিবে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আরও চারি বৎসর জার্ম্মানী বৎসরে দুই মিলিয়ার্ড স্বর্ণমার্ক মিত্রশক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবে। তার পর দুই বৎসর আড়াই মিলিয়ার্ড স্বর্ণমার্ক এবং তার পর দশবৎসর তিন মিলিয়ার্ড স্বর্ণমার্ক দিতে জার্ম্মানীকে বাধ্য করা হইবে। জার্ম্মানীর রাজস্বের সুবন্দোবস্ত যাহাতে সম্ভব হয় সেজন্য বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্ কয়েকজন পণ্ডিতকে মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মানীতে প্রেরণ করিবে। এই পণ্ডিতবর্গের কমিটির নির্দ্ধারণ অনুসারে জার্ম্মানী রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য থাকিবে।

ফরাসীরা এই নিষ্পত্তি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা ক্ষতিপূরণ-সমস্যা সমাধানের জন্য এক নূতন প্রস্তাব বৈঠকে পেশ করিয়াছে। তাহারা বলে যে ফ্রান্সের বিধ্বস্ত প্রদেশগুলিকে পুনর্নির্ম্মানের জন্য জার্ম্মানীকে এখনই সাহায্য করিতে বাধ্য করা হউক। উত্তর-ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলে ফ্রান্স্ মিত্রশক্তি বর্গের নিকট হইতে যে ঋণ করিয়াছে তাহা শোধ করা অসম্ভব। কাজে-কাজেই ঋণমুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে আপনার অর্থনীতিক ব্যবস্থা করিতে হইলে ফ্রান্স্ জার্ম্মানীকে চাপ দিতে বাধ্য। বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে জার্ম্মান মার্ককে উদ্ধার করিয়া জার্ম্মানীতে ধনসাম্য স্থাপনের চেষ্টা, জার্ম্মানীর সরকারী আয়-ব্যয়ের খস্‌ড়াতে যাহাতে ফাজিল (deficit) না থাকে, এবং জার্ম্মানীর ধনসম্পত্তি যাহাতে গোপনে বিদেশে প্রেরিত হইয়া জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য জমা না থাকিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করিতে ফ্রান্স বদ্ধপরিকর। আর জার্ম্মানী প্রতিশ্রুতি-মত দ্রব্যসম্ভার দিতে প্রস্তুত না থাকিলে তাহা আদায় করিয়া লইবার জন্য এসেন্ ও রুর প্রদেশ অধিকার করিয়া কয়লা-খনির কাজ মিত্রশক্তিবর্গের অধীনেই যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলিয়া ফ্রান্সের বিশ্বাস। বনবিভাগের রাজস্ব এবং রপ্তানীমালের শুল্কও ফ্রান্স্ কাড়িয়া লইতে কৃতসংকল্প।

ইংরেজ বলে যে ফ্রান্সের প্রস্তাবগুলি ইউরোপের অর্থনীতিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত হয় নাই; এইগুলির অন্তরালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীতিক অভিসন্ধি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ-সরকারের প্রস্তাবগুলি ইউরোপের আর্থিক দুর্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রস্তুত হওয়াতে সেইগুলিই বর্ত্তমান দুরবস্থার একমাত্র প্রতিকারের উপায়। রুর প্রদেশ অধিকারের প্রস্তাবে ইংরেজ-সরকার কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। কেননা রুর প্রদেশ জার্ম্মান পণ্যশিল্পের প্রাণ। রুরের কয়লা ভিন্ন জার্ম্মান পণ্যশিল্প বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ফরাসী জাতির হিংসাতে যদি জার্ম্মান পণ্যশিল্প ধ্বংস হয় তাহা হইলে সমস্ত ইউরোপে যে ধনচাঞ্চল্য দেখা দিবে তাহাতে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত অকল্যাণ হইবে। সেইরূপ অবস্থা যাহাতে সম্ভব হয় এরূপ ব্যবস্থাতে ইংরেজ কখনই সম্মত হইবে না।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মতপার্থক্য এতই বেশী এবং দুইটি জাতিই আপনার মতে এতই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ যে প্যারী বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ফ্রান্স নিজের বাহুবলে জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবার জন্য সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিয়াছে ও রুর প্রদেশ অধিকার করিয়াছে। ফলে একটা যুদ্ধ বাধিয়া উঠা কিছুই বিচিত্র নহে।

ভ্রম সংশোধন

গত পৌষ মাসের বিজ্ঞাপনের ১৪ পৃষ্ঠায় দি মডেল ট্রেডিং কোং ঠিকানা টাইপ ভাঙ্গিয়া ২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইয়া গেছে, তাহা ২১০।১ হইবে।

জাতীয় মহাসমিতি ও অন্যান্য সভা
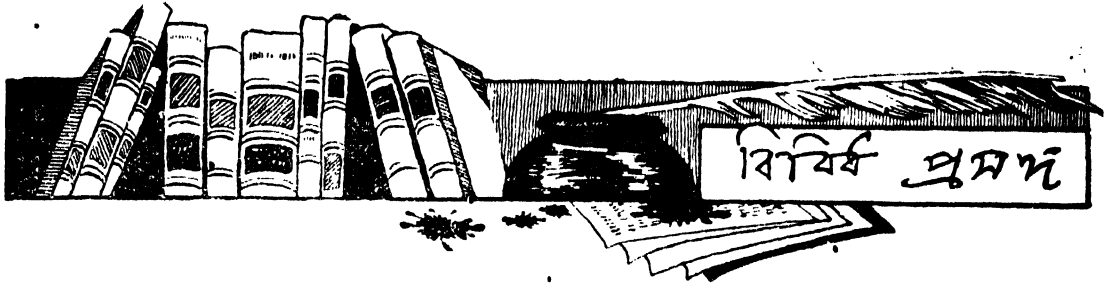
সাঁইত্রিশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কংগ্রেস্ বা জাতীয় মহাসমিতির জন্ম হয়। এদেশে নানাধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে। তাহারা সকলে একজাতি (race) হইতে উদ্ভূত নহে, নানা জাতি (races) হইতে তাহাদের উদ্ভব। হিন্দুদের মধ্যেও—এমন কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উপবীতধারী শ্রেণী-সকলের মধ্যেও—সকলে একজাতি হইতে উৎপন্ন নহে। বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও সকলে এক জাতি (race) হইতে উৎপন্ন নহে। ইহা ছাড়া, ভারতের আদিম নিবাসী যে সকল অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি (tribes) আছে, তাহারাও নানা জাতি (races) হইতে উৎপন্ন। হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত বৈষ্ণবাদি ভাগ আছে, এবং তা ছাড়া নানা জাতি (castes) উপজাতি (sub-castes) এবং তাহাদেরও নানা বিভাগ উপবিভাগ (sections and sub-sections) আছে। মুসলমানদের সুন্নি ও শিয়া এই দুই প্রধান শ্রেণী আছে, অপ্রধান আরও আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের লোক আছে। জৈনেরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর দলে বিভক্ত। খৃষ্টিয়ানেরা রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট দলে বিভক্ত; এবং তদ্ভিন্ন উপদল অনেক আছে। শিখ, পার্সী, ইহুদী, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম, সকলেরই দল আছে।

এত বড় দেশের এত-রকম দল ও উপদলে বিভক্ত বহুকোটি লোকের প্রতিনিধি-স্বরূপ একটি মহাসমিতি গঠন সহজ কাজ নয়। মহাসমিতি স্থাপন খেলা করিবার নিমিত্ত হইতে পারে না; তাহার একটা উদ্দেশ্য চাই। সম্মুখে একটা আদর্শ থাকিলে, সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার ইচ্ছা হয়, এবং আদর্শের অনুযায়ী অবস্থা-লাভই উদ্দেশ্য হয়।

কিন্তু আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা কেবল নিজের অবস্থা সম্বন্ধে চেতনাবান্ মানুষেরই সম্ভব। ইতর প্রাণীরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় খাদ্য ও পানীয়, ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র শীত হইতে আত্মরক্ষার উপায়, এবং সঙ্গী বা সঙ্গিনী অন্বেষণ করে। তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা কি হইতে পারে, সে বিষয়ে তাহারা চিন্তা করে না; অন্ততঃ, করে বলিয়া মানুষ কোন প্রমাণ পায় নাই। আত্মচিন্তা মানুষের লক্ষণ এবং তাহাতেই মানুষের বৈলক্ষণ্য ও উৎকর্ষ। আমাদের কি নাই ও কি হইলে ভাল হয়, আমরা কি প্রকার নহি ও কীদৃশ হইতে পারিলে ভাল হয়, এবং কি উপায়ে অভাব ও অসম্পূর্ণতা দূর হইতে পারে—ইত্যাকার নানা চিন্তা মানুষেরই হয়। কিন্তু ইহাও সব মানুষের সব অবস্থায় হয় না। মানুষ জাগিলে তবে এসব চিন্তা তাহার মনে উদিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর যত জাতি (nation) নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে চেতনাবান্ হইয়াছে, দশবৎসর আগেও সেরূপ ছিলনা। ভারতবর্ষের যত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক এখন সমষ্টিগত ভাবে জাতীয় দুরবস্থা সম্বন্ধে যতটা চেতনাবান্ হইয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তত লোক ততটা সজাগ ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত প্রচেষ্টার ইহাই প্রধান কীর্ত্তি।

যে-যে কারণেই হউক, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কতকগুলি শিক্ষিত লোক দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হন। কংগ্রেসের জন্মকথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, ইহার প্রথম কর্ম্মীরা দেশের সামাজিক দুরবস্থা অনবগত ও তৎসম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, এমন নয়। সামাজিক বিষয় কংগ্রেসে আলোচিত হইবে কি না, সামাজিক সংস্কার আগে হওয়া উচিত, না রাষ্ট্রীয় সংস্কার আগে হওয়া উচিত, কিংবা উভয়ই সমানন্তরাল ভাবে যুগপৎ চলা উচিত;—এরূপ আলোচনাও

সে সময়ে হইয়াছিল। কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী হিউম্ সাহেব তখন বলেন, যে, সর্ব্ববিধ সংস্কারের চেষ্টা যুগপৎ হওয়া বাঞ্ছনীয়, যদিও কংগ্রেসে কেবল রাজনৈতিক বিষয়েরই আলোচনা হইবে।

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। ভারতবর্ষের লোকেরা কত দিকে কত বিষয়ে কত ছোট ও বড় ভাগে বিভক্ত, তাহা আগে বলিয়াছি। এতগুলি লোকের সাধারণ অভাব, দুরবস্থা, অভিযোগ ও আদর্শ স্থির করা সহজ নহে। সকলের সামাজিক ব্যবস্থা, প্রথা, রীতিনীতি ও অবস্থা এক নহে। শিক্ষায় সকলে সমান অগ্রসর নহে। সকলের জীবনোপায় এক নয়, ধনশালিতা বা দারিদ্র্য সমান নহে। কিন্তু দেশের সকল লোকের তাৎকালিক ও বর্ত্তমান অবস্থা এক বিষয়ে এক বলা যাইতে পারে—সকলেই ইংরেজের অধীন। ইংরেজের প্রভুত্ব সকলেরই মাথার উপর জাঁতিয়া বসিয়া আছে। ইহার ভার ও প্রভাব সকলেরই মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখিয়াছে, ও সকলেরই মানবিক অধিকার খর্ব্ব করিয়াছে। এই কারণে কংগ্রেস্ বা জাতীয় মহাসমিতি জন্মাবধি রাজনৈতিক আকার ধারণ করে।

কিন্তু বহুসংখ্যক মানুষ আত্মচেতনাবান্ হইলেও, প্রত্যেকেই সার্ব্বজনিক সাধারণ দুঃখ, দুর্দ্দশা, বা অধিকার-হীনতা সম্বন্ধে সমান বেদনা অনুভব করে না; তাহা দূর করিবার চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে তাহাই সর্ব্বপ্রথমে করে না। কংগ্রেস্ স্থাপিত হইবামাত্রই ইহা দেখা গেল। তা ছাড়া, প্রভু ও ধনলুণ্ঠক উভয়বিধ বহু ইংরেজের কুবুদ্ধি প্রথম হইতেই সকল ভারতীয়কে এবং তাহাদের নানা দলকে নানা উপায়ে বিপথচালিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

স্যার্ সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমানেরা বহু বৎসর কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও কল্যাণের উপায় ভারতবর্ষের অন্য অধিবাসীদের হইতে ভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। এই-জন্য, কংগ্রেসের অধিবেশন যে সময়ে হইত, মুসলমান্ শিক্ষা-কন্‌ফারেন্স্ও সেই সময়ে কিন্তু ভিন্ন স্থানে হইত। ইহা নামে কেবলমাত্র শিক্ষাবিষয়ক হইলেও, কতকটা রাজনৈতিক প্রচেষ্টা প্রথম হইতেই ছিল এবং এখনও আছে। অল্পসংখ্যক মুসলমান প্রথম হইতেই কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন। ভারতীয় খৃষ্টীয়ানেরা মুসলমানদের মত সংখ্যায় বেশী নহেন। কিন্তু তাঁহারাও, অন্যবিধ কারণে, বহু বৎসর কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত অল্প কয়েক জন খৃষ্টিয়ান প্রথম হইতে কংগ্রেস্‌ওয়ালা ছিলেন।

ভারতবর্ষে সমষ্টিগত চেতনার সঞ্চার হইবার পর দেখা গেল, যে, নানা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকসমষ্টি নিজেদের সংকীর্ণ দলের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার জন্য ভাবিতে ও খাটিতে যতটা প্রয়াসী, দেশের বৃহত্তম লোকসমষ্টির সাধারণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ততটা ব্যগ্র নহেন। এইজন্য কায়স্থ কন্‌ফারেন্স্, বৈশ্য মহাসভা, প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

এই-প্রকারের নানা সভাসমিতির সংখ্যা এখন খুব বেশী হইয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশের অধিবেশন পৌষ মাসেই হয়। এ বৎসর গয়ায় কংগ্রেস্, খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স্, জময়েৎ-উল্-উলেমা, হিন্দু-মহাসভা, ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল, সমাজসংস্কারার্থ একটি সমিতি, আর্য্যসমাজ, উদাসী-মহামণ্ডল, অকালী দল; একেশ্বরবাদীদের কন্‌ফারেন্স্, প্রভৃতির অধিবেশন হয়। লক্ষ্ণৌয়ে খৃষ্টিয়ান কন্‌ফারেন্সের, নাগপুরে উদারনৈতিক সংঘের ও সমাজ সংস্কারার্থ আর-একটি সমিতির, লাহোরে মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের এবং মান্দ্রাজে থিওসফিক্যাল কন্‌ভেন্সান্ ও সমাজসেবক কর্ম্মীমণ্ডলের অধিবেশন হয়। এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। এই-সমুদয় সভাসমিতির অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিবার স্থান আমাদের নাই। তাহাদের কাজের আলোচনা করিতেও আমরা এই সংখ্যাতে পারিব না। ভবিষ্যতে যদি পারি, কোন কোনটির সংক্ষেপে করিব। বর্ত্তমান সংখ্যায় কেবল বৃহত্তম সমিতি কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু বলিব।

—

কংগ্রেসের মতভেদের কথা

ষোল বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে কংগ্রেসের চিন্তা প্রধানতঃ

একই ধারায় প্রধাবিত হইতেছিল। তাহার পর মতভেদ দেখা গেল। সুরাটের অধিবেশনে ইহা সুস্পষ্ট হয়, এবং মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী ও চরমপন্থী বা গরমপন্থী এই দুই দল মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করে। এই দুই দল কয়েক বৎসর একই কংগ্রেসভুক্ত ছিল। পরে চরমপন্থীরা প্রচেষ্টাটিতে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করেন, এবং নরমপন্থীরা উদারনৈতিক সংঘ নাম দিয়া অন্য একটি প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন করেন। চরমপন্থীদের অধিকারভুক্ত কংগ্রেসে ঐকমত্যের অভাব বাস্তবিক প্রথম হইতেই ছিল। সহযোগিতা বর্জ্জনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই, অধিকাংশের মতে হইয়াছিল; ইহার বিরোধী দলের লোকদের সংখ্যা সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর ছিল না। আর-এক রকমের মতভেদ আগে ছিল এবং এখনও আছে। একদল লোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত থাকিয়া জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে চান, অন্য দল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে ইচ্ছুক ও ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পক্ষপাতী।

এবারকার কংগ্রেসে আবার আর-একরকমের দলাদলি ও ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা ত্যাগের প্রস্তাব যখন কংগ্রেসে ধার্য্য হয়, তখন স্থির হয়, যে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কোন অসহযোগী প্রবেশ করিবেন না। এবৎসরের কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার অভিভাষণে কৌন্সিল-প্রবেশের সমর্থন করেন, এবং পরে উহার সমর্থক প্রস্তাবও কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। এইজন্য ও অন্যান্য কারণে দাশ মহাশয় ও অন্যান্য কয়েক জন নেতা আলাদা দল গড়িতেছেন। তা ছাড়া আরো দুটি গুরুতর বিষয়ে কংগ্রেসে মতভেদ হইয়াছে—যদিও তাহার জন্য কোন নূতন দল গঠিত হয় নাই। বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব, ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তাহার বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য, এই প্রস্তাব, অধিকাংশ প্রতিনিধির মত অনুসারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রের মোটামুটি অবস্থা এইরূপ। এখানে মতভেদ ও কার্য্যপ্রণালীভেদ-বশতঃ আলাদা আলাদা দল স্থাপনের কারণ বুঝা যায়।

—

সমাজসংস্কারে দলবিভাগ

কিন্তু সমাজসংস্কার-ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, এবার একাধিক দলের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ নানাবিধ হইতে পারে। একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, কতকগুলি লোক সমাজসংস্কার সত্যসত্যই করিতে চান, অন্য কতকগুলি লোক তাহা করিতে চান না, অথচ জগৎকে জানাইতে চান, যে, তাঁহারা সংস্কারপ্রয়াসী। আর একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, কতকগুলি লোক সামান্য রকমের সংস্কার চান, কিন্তু ব্যাধির গোড়া কাটিতে চান না। তৃতীয় কারণ এই হইতে পারে, যে, কতকগুলি লোক গবর্ণমেণ্টের দ্বারা আইন প্রণয়ন করাইয়া কোন কোন প্রকার সংস্কার চান, অপর অনেকে তাহা চান না। আর-একরকমের কারণ এই হইতে পারে, যে, কতকগুলি সংস্কারকের রাজনৈতিক মত একপ্রকার, অপর অনেকের রাজনৈতিক মত ভিন্নপ্রকার এবং সেইজন্য তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে অনিচ্ছুক বা অপারক। কি কি কারণে বা কারণ-সমবায়ে সমাজ-সংস্কারকেরা একত্র কাজ করিতে পারিতেছেন না, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই।

—

একতা ও স্বাতন্ত্র্য

যাহা হউক, ভাল কাজ করা এবং তাহার দ্বারা কল্যাণ সাধন করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা যদি নিজেদের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যক্ষেত্রে নিজেদের নির্ব্বাচিত বা উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে কাজ করেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই—যদিও একত্র কাজ করার সুবিধা ও ফলদায়কতা সহজেই উপলব্ধ হয়। ঝগড়া করা এবং পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করা বাঞ্ছনীয় নহে;—ইহার নাম দলাদলি। স্বতন্ত্র হইয়া হিতসাধনচেষ্টা দলাদলি নহে। কখন কখন এমন ঘটে, যে, বৃহৎ লোকসমষ্টির মধ্যে থাকিয়া অনেকের ব্যক্তিত্ব ও কার্য্যক্ষমতার সম্যক্ স্ফুরণ ও বিকাশ

হয় না, স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র হইলে তাহা হয়। অল্পায়তন ক্ষেত্রে কাজ করাও অনেকে সুবিধাজনক মনে করেন।

সকল সভ্যজাতির মধ্যেই অল্লাধিক এমন লোক আছেন, যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির হিত চান। কিন্তু সমুদয় মানুষের হিত করিবার শক্তি অল্প লোকেরই আছে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণও কঠিন। এরূপ মানুষের সংখ্যা কম, যাঁহাদের বাণী বহু শতাব্দীর পরও জগতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়। কিন্তু কেহ যদি নিজের ক্ষুদ্র গ্রামের হিত করেন, তাহার দ্বারাও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থ চেষ্টা পরিপুষ্ট হয়।

বস্তুতঃ, মানুষের কল্যাণের জন্য একতা ও সমবেত চেষ্টার যেমন প্রয়োজন আছে, পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র চেষ্টারও তদ্রূপ প্রয়োজন আছে। এইজন্য পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী জাতিরা কাহারও বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া নিজ নিজ হিতসাধনের চেষ্টা করিলে তাহাতে কল্যাণই হয়। তদ্রূপ, আবার এমন কাজও অনেকগুলি আছে, যাহার জন্য আন্তজাতিক সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কোন একটি দেশ সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেও এইরূপ, স্বতন্ত্র ও পৃথক্ উভয় প্রকার হিতচেষ্টার সার্থকতা দেখা যায়। "ওয়েল্‌ফেয়ার্" মাসিক পত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়টির সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।

—

বিহারের ও গয়ার মাহাত্ম্য

বহুকাল পূর্ব্বে মানুষেরা ভাবিত, তাহাদের বাসভূমি এই পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র, এবং সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদি তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। এখন আমাদের সে ভ্রম নাই। আমরা এখন বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছি, যে, পৃথিবী সূর্য্যের একটি ক্ষুদ্র গ্রহ, এবং সমস্ত সৌরজগৎ অন্য কোন কেন্দ্রের চারিদিকে ভ্রাম্যমান। তথাপি একটা অহঙ্কার আমাদের এখনও আছে। আমরা মনে করি আমাদের পৃথিবী যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি আমরা যেমন আত্মাবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট জীব, বিশ্বের অন্য কোথাও সেরূপ উৎকৃষ্ট জীবের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

সকল দেশের মানুষেরই গৌরব করিবার কারণ কিছু-না কিছু আছে। ভারতবর্ষেরও আছে। ভারতবর্ষের মধ্যেও প্রত্যেক প্রদেশের গৌরব করিবার বিশেষ বিশেষ কারণ আছে। বিহার প্রদেশ এবিষয়ে কাহা অপেক্ষাও কম নহে, বরং শ্রেষ্ঠ। ইংরেজ লেখক এইচ জী ওয়েল্‌স্ জগতের যে ছয়জন লোককে মহত্তম বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেব এবং সম্রাট্ অশোকের নাম করিয়াছেন। শাক্যসিংহ বিহারের অন্তর্গত গয়ার নিকটে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যেখানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তথায় বুদ্ধগয়ার বর্ত্তমান মন্দির পুরাকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন বিহার অর্থাৎ মগধ তাঁহার অন্যতম প্রধান প্রচারক্ষেত্র ছিল। জৈনদিগের অন্যতম প্রধান তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট্ অশোকের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনায়। পুরাকালের প্রাচীন রাজধানী-সকলের মধ্যে রাজগৃহও বিহারে অবস্থিত। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়-সকলের মধ্যে নালন্দা বিহারে অবস্থিত ছিল। বিহার কেবল অতীত কালের ইতিহাসেই বিখ্যাত নহে। প্রাচীন কাব্যে ও শাস্ত্রেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে। মিথিলা বিহারের একটি অংশ, এবং রাজর্ষি জনক মিথিলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কাব্যে ও শাস্ত্রে লিখিত আছে। মধ্যযুগে যে-সকল বিখ্যাত রাজনীতিবিৎ ভারতবর্ষের কোন-না-কোন অংশ শাসন করিয়াছিলেন, শেরশাহের নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ-প্রচেষ্টা যে-যে প্রদেশে কতকটা সফল হইয়াছে, বিহার তাহার মধ্যে অন্যতম। তিনি এই প্রদেশে নিরুপদ্রবভাবে আইন অমান্য করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে বিহারে মোকদ্দমার সংখ্যা কমিয়াছে। যে প্রদেশের এই-প্রকার বহুশতাব্দীব্যাপী খ্যাতি ও কীর্ত্তি, এবার সেই প্রদেশের অন্তঃপাতী গয়ানগরে জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতির অধিবেশন হইয়াছিল। জাতীয় হিতসাধনের এই পুণ্যক্ষেত্রে আমরা যাইতে পারি নাই; ফটোগ্রাফ হইতে দেখিতেছি, সুন্দর প্রশস্ত স্থানে স্বরাজ্যপুরী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গয়া-কংগ্রেসের দুটি অভিভাষণ

বাবু ব্রিজকিশোর প্রসাদ গয়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে অসহযোগীদের কৌন্সিলের সভ্য হওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি যে যে কারণের উল্লেখ করেন, তাহার কোন-কোনটি আমরাও ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে লিখিয়াছি। তিনি গ্রামসকলকে সকল বিষয়ে আত্মশাসনক্ষম ও নিজ নিজ সর্ব্ববিধ অভাব-মোচনসমর্থ করিয়া তাহার উপর স্বরাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিতে বলেন। তাঁহার মত এই, যে, কংগ্রেসের গঠন-মূলক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইলে ভারতীয় জাতি এরূপ শক্তিশালী হইবে, যে, উহার কোন প্রতিনিধি কৌন্সিলে না গেলেও গবর্মেণ্ট্ উহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য হইবে।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার প্রথম অংশে তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে ইহা সুন্দর রূপে প্রমাণ করেন, যে, আইনের মর্য্যাদা এবং শৃঙ্খলা (law and order) রক্ষার নিমিত্ত রাজশক্তি যা খুশি তাই করিতে, প্রজাদের নিগ্রহাদি করিতে, পারে না; প্রকৃতিপুঞ্জের স্বাভাবিক ও মানবিক স্বাধীনতা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে রাজশক্তির অবাধ্য হইবার ও বিদ্রোহ করিবার অধিকার প্রজাদের সর্ব্বকালে ও সকল দেশে আছে। তিনি নিরুপদ্রব ও নিরস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষপাতী—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে। নানাদেশের স্বাধীনতালাভের ও রাষ্ট্রবিপ্লবের উল্লেখ করিয়া তিনি নিজের মতের সমর্থন করেন।

তিনি ঠিক্ই বলিয়াছেন, যে, আইন ও শৃঙ্খলা (law and order) মানুষের জন্য, মানুষ আইন ও শৃঙ্খলার জন্য নহে। অর্থাৎ যদি আইন ও শৃঙ্খলার ওজুহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব স্বাধীনতা ও অধিকারে হাত দিয়া তাহাকে ছোট করা হয় এবং তাহার অকল্যাণ করা হয়, তাহা হইলে তথাকথিত "আইন ও শৃঙ্খলা" ভাঙাই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত।

অন্যদেশের ধনলুণ্ঠন ও স্বাধীনতা-হরণ পাশ্চাত্য জাতীয়তার একটি লক্ষণ। দাশ মহাশয়ের মতে আমাদের জাতীয়তা অন্য কোন দেশের জাতীয়তার বিরোধী নহে। আমাদের জাতীয় আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধি আমাদের লক্ষ্য। তাহার দ্বারা সমগ্র মানবকুলের আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির সাহায্যই হইবে। চিত্তরঞ্জন-বাবু জগতের জাতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য ও ঐক্য উভয়েরই সার্থকতা জ্ঞাপন করেন। এই-প্রকার মতের সুন্দর বিবৃতি গত কয়েকমাসে রবীন্দ্রনাথ নানা বক্তৃতায় করিয়াছেন। ওয়েল্‌ফেয়ারে প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধেও ইহা আছে।

ভারতের ইতিহাসে যে উদ্দেশ্য পরিস্ফুট, সে বিষয়ে বহুবৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন-বাবুর অভিভাষণে অনেকটা সেইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান শিখ পারসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে, স্বরাজ্যে কাহার কিরূপ অধিকার হইবে, তিনি, তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার বুঝাপড়ার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেন। যাহারা সংখ্যায় কম, তাহাদের জন্য সংখ্যাবহুল সম্প্রদায়-সকলের স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, বলেন। সদ্ভাবের সহিত আপোষে ঝগড়াবিবাদের কারণসকল সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলকে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলেন। যেমন, হিন্দুরা প্রতিজ্ঞা করুন, যে, মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য করিয়া মিছিল লইয়া যাইবেন না; মুসলমানেরা প্রতিজ্ঞা করুন, যে, ঈদ্ বকরীদে গো বলি দেওয়া হইবে না।

বিদেশে ভারতবর্ষের কথা প্রচারিত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আমরা বার বার বলিয়াছি, অন্য অনেক কাগজেও উক্ত হইয়াছে। দাশমহাশয়ও এইরূপ মত ব্যক্ত করেন।

এশিয়ার জাতিসংঘ (Federation) স্থাপন ও তাহাতে ভারতের যোগদান, চিন্তা ও ভাবরাজ্যের একটি আদর্শ বটে। চিত্তরঞ্জন-বাবুর এতদ্বিষয়ক মতের আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু ভারতের রাজশক্তি বা রাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতীয়দের হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত, এই আদর্শ বক্তৃতায় কাগজে ও ভাবজগতে থাকিবে, কার্য্যক্ষেত্রে ফলদায়ক

হইবে না। মতগঠন, মতপোষণ, ও ভাবের প্রবলতা-সাধন অবশ্য ইহার দ্বারা হইবে।

স্বরাজ কেবল মধ্যবিত্ত লোকদের জন্য নহে, সাধারণ লোকদের জন্য, প্রভৃতি কথা চিত্তরঞ্জন-বাবু আগে বলিয়াছিলেন, এবং তখন তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছিলাম। পুনরুক্তি অনাবশ্যক। আমরা ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র অভিজাত নিরক্ষর শিক্ষিত লিখনপঠনক্ষম নারী ও পুরুষ সকল মানুষের স্বরাজ চাই। শ্রমজীবী কৃষক বণিক্ কারিগর শিক্ষক মূলধনী মহাজন প্রভৃতি কোন শ্রেণীর লোককে বাদ দিতে চাই না।

স্বরাজ্যসিদ্ধির ভিত্তি বাস্তবিক প্রত্যেক মানুষের আত্মায়। প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে, ও পরে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর ও বৃহত্তম লোকসমষ্টি আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিলে তাহাই প্রকৃত স্বরাজ; এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন-বাবু যে দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন। সমষ্টিগত স্বরাজ্যের ক্ষুদ্রতম কেন্দ্র গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য, তাহাতেও সন্দেহ নাই। গ্রাম্য বিষয়-সকলে প্রত্যেক গ্রামকে আত্মশাসনক্ষম করাও সম্ভবপর। প্রত্যেক গ্রামকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন আদি বিষয়ে আত্মনিভরক্ষম কতকদূর পর্য্যন্ত করা যায়; কিন্তু সম্পূর্ণ করা যায় না, এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে।

বাবু ব্রিজকিশোর প্রসাদ ও বাবু চিত্তরঞ্জন দাশ উভয়েই গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া স্বরাজ্যের বৃহত্তর ও বৃহত্তম ক্ষেত্রসকল সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে দেশের সমুদয় কাজ চালাইবার পক্ষপাতী। ইংরেজের যে গবর্মেণ্ট্ আছে, তাহা আপাততঃ থাক্, তাহাকে আমল না দিয়া আমরা একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া চালাইব;—ইহা বলিতে ও শুনিতে ভাল। কিন্তু এরূপ মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে দেশের লোকের মনের অবস্থা কিরূপ হওয়া চাই, আর্থিক সঙ্গতি কিরূপ হওয়া দরকার, তাহাও বিবেচ্য। এখন যে লোকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্‌কে মানে, তাহার নানা কারণ আছে। অনেক লোক জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া মানে, অনেকে চিন্তা না করিয়া গতানুগতিকভাবে মানে, অনেকে অনিচ্ছার সহিত মানে এইজন্য, যে, তাহারা না-মানার অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। এ পর্য্যন্ত কয়েক হাজার সাহসী অসহযোগী না-মানার কষ্ট স্বীকারও করিয়াছেন। গ্রাম্য আত্মশাসন-মণ্ডলীকে ভিত্তি করিয়া যে স্বরাজ্য গঠিত হইবে, তাহা চালাইতে হইলে, দেশের, সকলকে না হউক, অধিকাংশ মানুষকে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক মানিতে রাজী করিতে হইবে; কারণ অবাধ্য লোককে শাস্তি দিবার ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের যেরূপ ইচ্ছা সামর্থ্য ও উপায় আছে, প্রস্তাবিত "স্বরাজ্য-গবর্মেণ্টে"র সেরূপ ইচ্ছা সামর্থ্য ও উপায় নাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বরাজ্য-গবর্মেণ্টের বাধ্য হইবার প্রবৃত্তি দেশের মধ্যে কি পরিমাণে বিস্তৃত ও ব্যক্ত হইয়াছে? স্বরাজ্য-গবর্মেণ্ট্ অবাধ্য কাহাকেও যদিও-বা কোন-প্রকার শাস্তি দিতে চান, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ব্রিটিশ-গবর্মেণ্টের শরণাপন্ন হইবে কি না, এবং হইলে ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট্ গ্রাম্য-স্বরাজ নষ্ট করিবার সুযোগ পাইয়া তাহার "সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার" করিবে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

তাহার পর ব্যয়ের কথা। আমরা যত সস্তাতেই কোন একটা কার্য্যপদ্ধতিকে বাস্তব আকার দিতে চাই না কেন, কিছু ব্যয় অবশ্যম্ভাবী। সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার সানন্দ প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্য উভয়ই ভারতীয় জাতির আছে কি না, বিবেচনা করিতে হইবে। দেশের অল্পসংখ্যক ধনী লোকদের ও তদপেক্ষা কিছু অধিকসংখ্যক সচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত লোকদের, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্‌কে ট্যাক্স দিয়াও, স্বরাজ্যগবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিছু টাকা দিবার সামর্থ্য আছে, গরীব লোকদের নাই। কিন্তু যাহাদের আর্থিক সামর্থ্য বেশী, তাহারাই ভয়ে ও ভ্রান্ত-স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় স্বরাজ্য-গবর্ণমেণ্ট্‌কে সাহায্য দিতে অধিক পরিমাণে পশ্চাৎপদ হইবে। তাহা হইলে খরচ চলিবে কি প্রকারে?

পরোক্ষভাবে, আমাদের স্বরাজ্যের একটি প্রধান অংশ, জাতীয় শিক্ষালয়সমূহ। এগুলি যে যে প্রদেশে সংখ্যায় বেশী ও উৎকর্ষে প্রশংসনীয়, সেখানেও স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে এখনও যথেষ্ট হয় নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা যেরূপই হউক,

জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন, তাহাতে শিক্ষা দেওয়া, তাহার শিক্ষাধীন হওয়া, এবং তাহাকে অর্থ-সাহায্য করা, কোনটিই বেআইনী কাজ নহে। তথাপি জাতীয় শিক্ষালয়গুলির অবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই। অর্থাভাব তাহার একটি কারণ।

স্বরাজ্যের গঠনমূলক কার্যসমূহ হইতে কাহাকেও নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত আমরা এসব কথা লিখিতেছি না। পথে কিরূপ বাধা আছে, তাহা জানিয়া ও তাহা অতিক্রম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া কর্মীরা অগ্রসর হউন, আমরা ইহাই চাই। সকলের আগে চাই, মনের অনুকূল ভাব দেশে উৎপাদন। কৌন্সিল-প্রবেশের উত্তেজনায় ঝাঁপ দিলে ইহাতে ব্যাঘাত জন্মিবে মনে করি।

চিত্তরঞ্জন-বাবুর অভিভাষণের কৌন্সিল-প্রবেশ-সমর্থক অংশের সমালোচনা অনাবশ্যক; কারণ তদ্রূপ কথার আলোচনা আমরা গত সংখ্যায় করিয়াছি।

কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে সুশৃঙ্খলদলবদ্ধ করা এখনই উচিত, তাহা আমরাও স্বীকার করি। এই কাজে শিক্ষিত লোকদেরই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কারণ তাহাদের অন্যান্য দেশের এরূপ দলসকল সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান আছে, এবং দেশব্যাপী দল গঠন ও তাহার কার্য্য পরিচালনের জন্য যতটা লেখা-পড়া পত্রব্যবহারাদি আবশ্যক, তাহা আপাততঃ শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাই করিতে সমর্থ। আরও একটি কারণ এই, যে, আমরা এখন ইহাতে হাত না দিলে, কৃষক ও শ্রমজীবীরা যখন দলবদ্ধ হইবে, তখন তাহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন না হইয়া বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে। আমরা সে-রকমের দলাদলি চাই না, সকল শ্রেণীর লোকদের সমবেত চেষ্টা চাই।

চিত্তরঞ্জন-বাবু ব্যবসার জন্য খদ্দর উৎপাদনের বিরোধী। প্রত্যেক পরিবারের নিজের নিজের কাটা সূতা হইতে কাপড় বোনা শুনিতে ভাল বটে, এবং যাহাদের অবসর আছে, তাহাদের ইহা করাও উচিত; কিন্তু সকলের অবসর নাই। যাঁহারা প্রত্যেক পরিবারকে এবিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে বলেন, তাঁহারা সকলে "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখান" নাই। যখন বিদেশী সূতার বিদেশী কাপড়ের আমদানী আমাদের দেশে হইত না, তখনও আমাদের দেশে সকল বা অধিকাংশ পরিবার নিজের কাপড় বুনিত না, বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী লোক তখন বিস্তর ছিল।

চিত্তরঞ্জন-বাবু সরকারী বা সরকারের অনুমোদিত শিক্ষালয়-সকল বর্জ্জনের পক্ষপাতী; আমরা কোন কালে পক্ষপাতী ছিলাম না, এখনও নহি। আমরা বলি, উৎকৃষ্ট বে-সরকারী শিক্ষালয় যাঁহারা যত রকমের যত স্থাপন করিতে ও চালাইতে পারেন, করুন। তাহার দ্বারা যদি কার্য্যতঃ সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত বিস্তর বা সমুদয় শিক্ষালয় পরিত্যক্ত হয়, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; বরং তাহা ভালই।

ইহা ঠিক কথা, যে, আমরা যদি মুরুব্বি সাজিয়া উচ্চস্থান হইতে "অস্পৃশ্য" নামে অভিহিত লোকদের উপকার করিতে চাই, তাহা হইলে তাহাদের উপকার করা হইবে না; জাতির সম্মুখে যে-সব কাজ রহিয়াছে তাহাতে তাহাদিগকেও অংশী করিয়া লইয়া তাহাদের সঙ্গে পাশাপাশি খাটিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলেও শিক্ষাদান আদি যে প্রাথমিক আয়োজন ও কাজ আবশ্যক, তাহার উদ্যোগ কই?

কংগ্রেসের সভাপতি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য "প্রভৃতি"রও উল্লেখ করেন। তাঁহার বক্তৃতাটি প্রধানতঃ রাজনৈতিক। কিন্তু, আমাদের মতে, অসহযোগ-প্রচেষ্টার নাম "অসহযোগ" হইলেও, ইহার সার অংশ প্রধানতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ নহে। ইহার আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক দিক্‌গুলিও গুরুত্বে কম নহে। ইহার আধ্যাত্মিক দিক্ আছে বলিয়া আমরা কিন্তু আধ্যাত্মিক কথাটার দ্বারাই আত্মপ্রতারণা ও অন্যকে প্রতারণা করিতে চাই না। আমরা যতদিন সকল শ্রেণীর পরস্পরের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া সকলের দ্বারা প্রস্তুত ও সকলের দ্বারা পরিবেষিত অন্ন আহার এবং সকল শ্রেণীর বৈবাহিক আদানপ্রদানের অবস্থায় না পৌঁছিতেছি, ততদিন আমরা খুব "আধ্যাত্মিক" হইলেও শক্তিশালী একজাতিত্ব লাভ করিতে পারিব না।

বৃহৎ লোকসমষ্টির দ্বারা ব্যাপকভাবে নিরুপদ্রব

আইনলঙ্ঘন দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে মনে করি। কিন্তু এবিষয়ে কাহাকেও কোন নিয়মে আবদ্ধ করা যায় না। যিনি যিনি প্রয়োজন মনে করিবেন ও পারিবেন, ট্যাক্স্ না দেওয়া বা অন্য কোন ধর্ম্মনীতিসম্মত প্রকারে আইন অমান্য করিবার অধিকার তাঁহাদের অবশ্যই আছে।

—

স্বরাজ লাভের উপায়

স্বরাজ লাভের উপায় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই, যে, বর্ত্তমান কৌন্সিলগুলি দ্বারা স্বরাজ্যলাভ হইবে না। যাঁহাদের ধারণা অন্যরূপ, তাঁহারা প্রবলতম চেষ্টা করিয়া দেখুন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে আনন্দের বিষয় হইবে, বিফল হইলে তাঁহাদের ভ্রম ভাঙিবে। পক্ষান্তরে, ইহাও আমাদের ধারণা, যে, কৌন্সিলগুলি ভাঙিয়া দিলেই স্বরাজের আবির্ভাব হইবে না, এবং সেগুলি ভাঙিতে অসহযোগী কৌন্সিলপ্রবেশেচ্ছুরা পারিবেন না। যাঁহাদের মত অন্যবিধ, তাঁহারাও চেষ্টা করিয়া দেখুন; কৃতকার্য্য না হইলে অন্ততঃ ভ্রমনিরসন হইবে। শেষ পর্য্যন্ত যে যে উপায়ে বা উপায়সমূহ দ্বারা, স্বরাজ লাভ করিতে হইবে, তাহা বলা কঠিন না হইতে পারে, কিন্তু অবলম্বন করা কঠিন। ব্যাপকভাবে বৃহৎ লোকসমষ্টি দ্বারা ট্যাক্স্ না দেওয়া বা অন্য প্রকারে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন একটি উপায়। গবর্ণ্মেণ্টের কাজ করিবার জন্য যথেষ্টসংখ্যক কর্ম্মচারী বা ভৃত্য পাওয়া কঠিন বা অসম্ভব হইয়া উঠিলে তাহা আর-একটি উপায়। বিলাতী যে-সব পণ্যদ্রব্যের কাট্‌তি এদেশে বেশী, তাহার কাট্‌তি বন্ধ করা বা খুব কমান, আর-একটি উপায়। ইহার জন্য সেই-সব জিনিষ আমাদের দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে; নতুবা শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইবে।

গবর্মেণ্ট্ যাহা করিতেছেন না, বা যাহা গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, অথচ যাহা জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক, এরূপ কাজ বিস্তর আছে। সেইগুলি আমরা কি পরিমাণে কিরূপ অনুরাগ উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত করিতেছি, দেখিতে হইবে। আমাদের স্বরাজলাভের ও স্বরাজ্য চালাইবার সামর্থ্যের বিচার আমরা তাহা দ্বারা করিতে পারিব। এই-সব কাজ যদি আমরা না করি বা ভাল করিয়া করিতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের দেশানুরাগ ও কার্য্যক্ষমতা কম, এবং তাহা হইলে গবর্ণ্মেণ্টের ক্ষমতা আমাদের হাতে আসিলেও অর্থাৎ আমরা স্বরাজ পাইলেও তাহা ভাল করিয়া চালাইতে পারিব না। অতএব দেশের বে-সর্‌কারী কাজ ভাল করিয়া করা স্বরাজ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

—

বঙ্গে স্বাধীন শিক্ষানিকেতন

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন :—

"এ মাসের প্রবাসীতে ইউনিভার্‌সিটি সম্বন্ধে আপনি যে আলোচনা করেছেন তার দু-এক স্থান ব্যতীত সমস্তই আমার বেশ মর্ম্মগ্রাহী হয়েছে। কিন্তু এর একটি জায়গা পড়ে' আমি বাস্তবিকই বড় দুঃখিত হয়েছি এবং আপনার কাছ থেকে তা আশা করি নাই বলেই, বোধ হয়, আমার মনে স্বতঃই কষ্ট হয়েছে। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা' প্রবন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন :—"গবর্ণ্মেণ্টের চার্টারের ভরসা ত্যাগ, উপাধিগুলির গবর্ণ্মেণ্টের অনুমোদন ত্যাগ, সমুদয় ঘর বাড়ি ত্যাগ, গবর্ণ্মেণ্টের প্রদত্ত টাকা না পাওয়া, গবর্ণ্মেণ্টের প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহাকে রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা না পাওয়া, প্রভৃতি মানিয়া লইয়া যদি কেহ একটা স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান বা পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার মুখে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হইতে পারে।" এরূপ স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণস্বরূপ হরিদ্বারের গুরুকুলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে কি এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নাই যে উপরি-উক্ত সমস্ত সর্ত্ত প্রতিশব্দে পালন করে' স্বাধীনতা পেতে পারে? আমার মনে হয়, বঙ্গের 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্', যাহার তত্ত্বাবধানে Bengal Technical Institute দেশের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, তাহার নামোল্লেখই বাঙ্গলার গৌরবের কথা হ'তো। এই প্রতিষ্ঠান যে বাঙ্গলাদেশের একটা মস্ত গৌরবের জিনিষ, তা বোধ হয় আপনার মত লোকের অজ্ঞাত নেই। অবশ্য গুরুকুল খারাপ, আমি মনে করি না; তথাপি আমার মনে কষ্ট হয়েছে, তার কারণ বোধ হয়, ঐ গৌরবে সামান্য আঘাত লেগেছে বলেই।"

লেখক আমাদের যে ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অনুল্লেখ ইচ্ছাকৃত নহে, বিস্মৃতি বা অসাবধানতা বশতঃই হইয়াছে। কেন আমাদের এইরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, এখন ঠিক্ করিতে পারিতেছি না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক-যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সিবিল্ সার্বিসে প্রবেশ করেন। তখন বিলাত যাওয়া এখনকার মত একটা সাধারণ জিনিষ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার জীবনের রাজসেবার সমস্ত সময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি ঐ প্রদেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক পরিমাণে তাঁহার প্রণীত "বোম্বাইচিত্র" নামক উপাদেয় পুস্তকে সঞ্চিত আছে। ইহা সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্তের মত বহি নহে। ইহাতে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ, প্রভৃতি নানাবিষয়ক তথ্য নিবদ্ধ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত ছিলেন। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত পুস্তক আছে। তদ্ভিন্ন তিনি গীতা ও মেঘদূতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ভক্ত ও স্বদেশ-প্রেমিক কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত আছে। তাহার অনেকগুলি প্রায়ই গীত হইয়া থাকে, কিন্তু অনেকেই জানেন না, যে, সেগুলি তাঁহার রচনা। কবিতা, নাটক ও অন্যবিধ রচনার যথোপযুক্ত ভাব ও স্বরভঙ্গীর সহিত আবৃত্তি যেমন আনন্দদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। আমাদের দেশে বেশী লোকে ইহা অভ্যাস করেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ইহা সযত্নে শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনি কিছুকাল মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ কাগজের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদক তিনি আগে ও মধ্যে মধ্যে হইয়াছিলেন; মৃত্যুর সময়ও ইহার সম্পাদক ছিলেন।

"ভারতী"তে তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। পেন্সান্ লইবার পর তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহার মত লোকের ভাল না লাগিবারই কথা। সেইজন্য তাহার পর আর তিনি উহাতে যোগ দেন নাই। তিনি যৌবন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া নারীহিতৈষী ছিলেন এবং নারী জাতির স্বাধীনতা ও অধিকার-বর্দ্ধন জন্য বহু সফল চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতি ভদ্র, নিরহঙ্কার, বিনয়ী ও অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি নিজের নাম জাহির করিবার চেষ্টা কখন করেন নাই। কতকটা এই কারণে এই নানা-গুণসম্পন্ন ধার্ম্মিক পুরুষ আশী বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকা সত্বেও অনেকে তাঁহার বিষয় অবগত নহেন। তাঁহার একটি জীবনচরিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাঁহার পুত্র, কন্যা ও জামাতা সকলেই সুলেখক। তাঁহারা যে-কেহ কিম্বা সকলে মিলিয়া এই কাজটি করিলে বাংলা সাহিত্য পুষ্ট ও দেশ উপকৃত হইবে।

—

অম্বিকাচরণ মজুমদার

কংগ্রেসের প্রাথমিক চিন্তার ধারা ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত ইহার যে-সকল নেতা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ও নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সুবক্তা ও দেশের অন্যতম সেবক ছিলেন। ১৯১৬ সালের কংগ্রেসে তাঁহার সভাপতিত্বে হিন্দুমুসলমানেরা ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কি অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, তাহা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হয়। ইহাতে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনাদি বিষয়ে তাঁহার রচিত একখানি ইংরেজী বহি আছে। তাহা মান্দ্রাজের পুস্তকব্যবসায়ী নটেশন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—

কিশোরীলাল গোস্বামী

শ্রীরামপুরের জমীদার রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মহাশয়ের কয়েক দিন হইল হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

অম্বিকাচরণ মজুমদার

তিনি বহু বৎসর হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। বঙ্গীয় শাসন পরিষদের দেশী সভ্য তিনিই প্রথমে নিযুক্ত হন। দেশহিতকর কার্য্য করার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট্ হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি শ্রীরামপুরের জলের কলের জন্য অনেক হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

—

চক্রারূঢ় অন্ধকূপ ও চৌরী চৌরা

মালাবারে মোপ্লা-বিদ্রোহ দমন করিবার সময় সরকারী সৈন্যেরা অনেক বিদ্রোহী মোপ্লার প্রাণবধ করে ও অনেককে বন্দী করে। বন্দীরা যেখানে ধৃত হয়, তাহার নিকটবর্ত্তী জেলে যথেষ্ট জায়গা না থাকিলে তাহাদিগকে অন্য জেলে প্রেরণ স্বাভাবিক। কিন্তু পাঠাইবার সময় এরূপ যানে তাহাদিগকে পাঠান দরকার যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে তাহাদের প্রাণনাশ না হয়। এর চেয়ে সোজা কথা আর হইতে পারে না। কারণ যে-সব বন্দী বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে, আগে তাহাদের যথারীতি বিচার

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী

হইবে। তাহার পর তাহাদের ফাঁসীই হউক কিম্বা তোপের মুখে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়াই হউক।

জন ষাট মোপ্‌লা বন্দীকে কিন্তু একটা এরূপ রুদ্ধদ্বার মালগাড়ীতে বন্ধ করিয়া এক জায়গা হইতে অন্য এক জায়গায় রেলে লইয়া যাওয়া হয়, যে, তাহাতেই তাহাদের নিঃশ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। পথে এবং কোন কোন ষ্টেশনে তাহারা বাতাসের জন্য জলের জন্য প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গাড়ীর ভিতর হইতে খুব চীৎকারও করিয়াছিল। কিন্তু কেহ শুনিয়াও শুনে নাই। এই অতি লোমহর্ষণ ঘটনা যখন ঘটে, তখন ন্যাপ্‌ নামক একজন ইংরেজ মালাবার জেলার স্পেশ্যাল কমিশনার ছিলেন। অনুসন্ধান হওয়া উচিত ছিল, যে, ঐ ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন দায়িত্ব ছিল কি না; কিন্তু যে অনুসন্ধান-কমিটি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট্‌ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়, ন্যাপ্‌কেই তাহার সভাপতি করা হয়! তাহার পর ন্যাপ্‌-কমিটির অনুসন্ধান চলিল, রিপোর্ট্‌ বাহির হইল, ভারত-গবর্মেণ্ট্‌ তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। শেষ মীমাংসা এই হইল, যে, এণ্ড্রুজ নামক একজন সার্জ্জেণ্ট্‌ এবং জনকয়েক কন্‌ষ্টেবল্‌কে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিয়া তাহাদের বিচার করিতে হইবে। সম্প্রতি বিচারের ফলে তাহারা সকলেই বে-কসুর খালাস পাইয়াছে।

অতএব এখন স্থির হইল, যে, এই লোমহর্ষণ ঘটনাটির জন্য কেহই দায়ী নহে, কারণ ইহার জন্য কাহারও আধ পয়সা জরিমানা পর্য্যন্ত হয় নাই। অনুসন্ধান ও বিচারাদির শেষ ফল যে এইরূপ হইবে, আমরা ঘটনাটির খবর কাগজে পড়িয়া বহুপূর্ব্বে তাহা অনুমান করিয়াছিলাম, এবং সেই কারণে লিখিয়াছিলাম, যে, যে মালগাড়ীটাতে মোপ্‌লাদের প্রাণ গিয়াছে, তাহারই ফাঁসী হওয়া উচিত।

কেহ ইচ্ছা করিয়া ও আগে হইতে উপায় স্থির করিয়া মোপ্‌লাদের প্রাণবধ করিয়াছে, ইহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু ইহাই বলিতেছি, যে, এরূপ ভীষণ ঘটনার দায়িত্ব নিরূপণের জন্য এবং কেহ দোষী থাকিলে তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য যেরূপ তৎপরতা, আগ্রহ ও নিরপেক্ষতার সহিত কাজ করা উচিত ছিল, গবর্ণমেণ্ট্‌ তাহা করেন নাই। দোষটা অসাবধানতা বা অন্য যে-কোন প্রকারেরই হউক, তাহা সরকারপক্ষের লোকেরই হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ সেই লোক বা লোকেরা ইংরেজ, এই কারণে তৎপরতার সহিত খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান ও বিচার হয় নাই, সর্ব্বসাধারণের এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। অন্ধকূপ-হত্যা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। উহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক হইলেও, সিরাজদ্দৌলাকে উহার জন্য দায়ী করা করা যায়

না, যেমন মোপ্‌লাদের নিঃশ্বাস রোধে মৃত্যুর জন্য মাদ্রাজের গবর্ণরকে-দায়ী করা যায় না। অথচ সিরাজ-দ্দৌলার অপযশ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এখনও ঘোষণা করিতেছেন।

চৌরীচৌরার ঘটনার সঙ্গে মলাবারের লোমহর্ষণ ঘটনার কোন সাদৃশ্য নাই। বিচারফলের বৈসাদৃশ্যের জন্য উহার উল্লেখ করিতেছি। চৌরীচৌরায় জনতা উত্তেজিত হইয়া থানার তেইশ জন কর্ম্মচারী চৌকিদার প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলে, থানা লুট করে ও পুড়াইয়া দেয় এবং হত লোকদের শব পুড়াইয়া ফেলে, অভিযোগ এইরূপ। এই পৈশাচিক কাণ্ডের জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদের শাস্তি অবশ্যই হওয়া উচিত। হত লোকেরা গবর্ণমেণ্টের চাকর, দগ্ধ ও লুণ্ঠিত জিনিষগুলিও সরকারী সম্পত্তি। এইজন্য অপরাধীদিগকে ধরিবার ও শাস্তি দিবার চেষ্টা খুব বেশী হইয়াছে। ২২৮ জন মানুষকে অপরাধী বলিয়া চালান দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই জেলে ছয় জনের মৃত্যু হইয়াছে। কি অবস্থায় ও কি কারণে মৃত্যু হইয়াছে, খবরের কাগজে তাহার কোন উল্লেখ দেখিলাম না। তাহাদের নিকট হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছিল কি না, প্রয়োজন হইলে তদ্বিষয়ে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হওয়া উচিত। দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার জন্য একজন অভিযুক্তকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ৪৭ জন বিচারে খালাস পাইয়াছে, এবং বাকী এক শত বাহাত্তর জনের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে! তেইশ জন লোক খুন হয়, তাহার জন্য ১৭২ জনের প্রাণ-দণ্ড আজ্ঞা হইয়াছে! অতএব দেখা যাইতেছে, যে, প্রত্যেক হত ব্যক্তির জন্য সাড়ে সাত জনের প্রাণ লইবার হুকুম হইয়াছে। মৃত্যুগ্রাসে পতিত প্রত্যেক মোপ্‌লা বন্দীর জন্য কাহারও নিকট হইতে এক পয়সা করিয়া জরিমানা আদায়ও হয় নাই।

চৌরীচৌরার মোকদ্দমার বিচারকের রায় ৪১৮-পৃষ্ঠা-ব্যাপী। ইহার দেড়শত পৃষ্ঠা মোকদ্দমার সাধারণ বৃত্তান্ত এবং বাকী ২৬৮ পৃষ্ঠা এক এক জন আসামীর সম্বন্ধে আলোচনা। এই রায় কোন কাগজে বাহির হয় নাই। রায় না পড়িয়া বিচারের নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই করা চলে না। কিন্তু কাগজে দেখিলাম, থানা হইতে কেবল একজন কন্‌ষ্টেব্‌ল্ ও একজন চৌকিদার পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে, অন্য সকলে মারা পড়ে। প্রাণভয়ে অস্থির ও পলায়নপর দুই এক জন বা দুই চারি জন লোকের পক্ষে দুইহাজার লোকের এরূপ ভীষণ দাঙ্গার মধ্যে ১৭২ জন লোককে চিনিয়া রাখা অসম্ভব। দুই জন আসামী রাজসাক্ষী হইয়াছিল। তাহাদের কথার উপর সম্ভবতঃ বেশী নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কথার সমর্থক অন্য স্বাধীন সাক্ষ্য না থাকিলে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া মানুষের ফাঁসী দেওয়া চলে না।

রায়ের যে চুম্বক দৈনিক ইংরেজী কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম বিচারক বলিতেছেন :—

"It is proved by the evidence that there was a written reply which has not been exhibited but which the prosecution suggests contained directions which resulted in the outrage."

যে চিঠিখানা বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হয় নাই, তাহাতে কি লেখা ছিল তাহা ফরিয়াদী পক্ষ বলিলেই তাহার উপর বিন্দুমাত্রও নির্ভর করা জজের উচিত নয়। আর-এক জায়গায় বিচারক বলিতেছেন, "perhaps the local zemindar was sympathetic." এইরূপ perhaps ("হয় ত") রায়ে আরও কত আছে জানি না। আসামী-দের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, "the identification evidence was faulty and sometimes biassed by private grudge", "আসামী সনাক্ত করিবার প্রমাণে দোষ ছিল, এবং কোন কোন স্থলে ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ সনাক্ত করা হইয়াছিল"।

যদি আসামীরা আপীল করে, তাহা হইলে ভালই; নতুবা গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতেই সমস্ত রায়টি হাইকোর্ট দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষিত হইবার জন্য প্রেরিত হওয়া উচিত। সেখানে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উকিল ব্যারিষ্টার লাগান উচিত। অতি সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে ১৭২ জন মানুষের ফাঁসী দেওয়া কখনও উচিত হইবে না। রায়টি অতিদীর্ঘ, কোন কাগজে সম্ভবতঃ উহার সমস্তটা ছাপা হইবে না, এবং সর্ব্বসাধারণে উহার

ন্যায্যতা পরীক্ষা করিবার কোন সুযোগ পাইবে না। এইজন্য মোকদ্দমাটি হাইকোর্ট দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

—

বিলাতী পণ্য বর্জ্জন

খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া, উহা কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত করা যায়, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কংগ্রেসের সম্মুখে বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশের মতে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

সমুদয় বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুই প্রকারের প্রবল আপত্তি আছে। এক এক জন মানুষ, খুব জেদ থাকিলে এবং নিজেকে অসভ্য অবস্থার সমুদয় সুবিধাহীনতার মধ্যে ফেলিতে রাজী থাকিলে, এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু বিলাত হইতে এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের জিনিস আসে, যে, তাহার সমস্তই বর্জ্জন করা কোন গ্রাম, নগর, জেলা বা প্রদেশের পক্ষে কি প্রকারে চলিতে পারে, বুঝিতে পারিতেছি না। এই জিনিষগুলির সমস্ত বিলাসদ্রব্য নহে, জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিষও এতন্মধ্যে আছে। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে হয়ত এমন একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, যাহা অনুসারে প্রত্যেক অত্যাবশ্যক জিনিষ বিলাত হইতে না আনাইয়া অন্য কোন বিদেশ হইতে আনান চলে। কিন্তু এরূপ প্রত্যেক জিনিষই বিলাতী অপেক্ষা সস্তায় বা বিলাতীর সমান মূল্যে অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। বেশী দাম দিয়া বা সমান দাম দিয়া বিলাতীর পরিবর্ত্তে অন্য বিদেশী জিনিষ কিনিবার কি উপকারিতা বা সার্থকতা আছে? ইংলণ্ডের বাণিজ্যের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে ইহা করা যায় বটে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে নৈতিক আপত্তি আছে। তা ছাড়া, বিলাতী বাদ দিয়া বাছিয়া বাছিয়া অন্য নানা দেশ হইতে কোন ব্যবসাদার জিনিষ আনাইয়া লাভ করিতে পারিবে কি? আমাদের বোধ হয় পারিবে না। অব্যবসায়ীর দ্বারা ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, যে দেশ ইংলণ্ডের অধীন, এবং প্রধানতঃ ইংলণ্ডের জাহাজ-সকল দ্বারা ইংরেজদের ব্যাঙ্কের সাহায্যে ইংরেজ আমদানীকারীদের দ্বারা যাহার আমদানীকার্য্য চলে, তাহার পক্ষে সমুদয় বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য বিদেশী নানা পণ্যদ্রব্যের আমদানী সম্ভবপর নহে। বিলাতী বা অন্য বিদেশী যতরকম জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানী হয়, তাহার সমস্ত বা অধিকাংশ এদেশেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্তও হঠাৎ হইতে পারে না।

যে-যে জিনিষ ভারতবর্ষে অচিরে প্রস্তুত হইতে পারে, সেই-সব রকমের বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন করা, দুঃসাধ্য হইলেও, সম্ভব, এবং তাহা করা উচিত। নানা স্বাধীন দেশে আত্মরক্ষার জন্য নানা বিদেশী জিনিষের উপর যেমন খুব উচ্চ আমদানী-শুল্ক বসান হয়, ভারতে কোন কোন বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা সেইরূপ উদ্দেশ্যে করা যাইতে পারে। কোন্ কোন্ বিলাতী জিনিষ ভারতীয় পণ্যশিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসারণ জন্য বর্জ্জন করা চলিতে পারে, যোগ্য লোকদের কমিটি দ্বারা তাহা স্থির করিয়া এবম্বিধ আংশিক বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব ধার্য্য করার বিরুদ্ধে কোন নৈতিক আপত্তি দেখিতেছি না। কিছু দিন কিছু অসুবিধা সহ্য করিতে রাজী থাকিলে, কোন কোন পণ্য সম্বন্ধে এরূপ প্রতিজ্ঞা পালন ভারতীয়দের সাধ্যায়ত্ত মনে করি। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে এইসব জিনিষ উৎপাদন ও সর্ব্বত্র বিক্রীর বন্দোবস্ত না করিয়া এপ্রকার প্রতিজ্ঞা করা উচিত নহে।

—

ভবিষ্যৎ সরকারী ঋণ অস্বীকার

কংগ্রেসে এই প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, যে, এপর্য্যন্ত ভারত-গবর্মেণ্ট সরকারী কাজের জন্য যত ঋণ লইয়াছেন, তাহা শোধ করিবার জন্য দেশের লোক স্বরাজ্য লাভের পরও দায়ী থাকিবে, কিন্তু এখন হইতে ভবিষ্যতে ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যত ঋণ করিবেন, স্বরাজ্য লাভের পর স্বরাজ্য গবর্মেণ্ট তাহা শোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। ইহার প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ইহা নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির দ্বারা বিবেচিত হইবার পর

আগামী বৎসরের কংগ্রেসে উপস্থিত করিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসে সমবেত প্রতিনিধিগণের অধিকাংশ ইহা এই বৎসরই মঞ্জুর করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, এত তাড়াতাড়ি না করিলে ভাল হইত।

এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা আপত্তি এই, যে, ঋণ-দাতা বিদেশী জাতিরা, বিশেষ করিয়া ইংরেজরা, আমাদিগকে টাকা কড়ি সম্বন্ধে বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিবে, এবং আমাদের স্বরাজ্যলাভে যথাসাধ্য বাধা দিবে।

কিন্তু বিশেষ বিবেচনার পর আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত আকারেও এরূপ প্রস্তাব কোন অবস্থাতেই আমরা ন্যায়ানুসারে ধার্য্য করিতে পারি না, আমরা এমন মনে করি না। ভারতীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট্ যথেচ্ছ বেতনবৃদ্ধি সামরিক ব্যয়-বৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রকারে ব্যয়বৃদ্ধি করিবেন, ট্যাক্স্ বাড়াইয়া চলিবেন, এবং তাহাতেও না কুলাইলে যত ইচ্ছা ঋণ করিবেন, এবং আমরা বসিয়া বসিয়া দেখিব, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করার মানে ইহা নয়। "আর ঋণ করিও না, যেরূপ আয় সেইরূপ ব্যয় কর; তাহা না করিয়া আরো ঋণ করিলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না," ইহা বলিবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে।

আমরা এতদিন এরূপ কথা বলি নাই, সুতরাং অতীত সব ঋণ শোধ করিতে আমরা বাধ্য। কংগ্রেসও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ঋণ সম্বন্ধেই শোধ করিবার দায়িত্ব কংগ্রেস অস্বীকার করিয়াছেন।

এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবশ্য এই তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে, যে, গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতা ও অপ-ব্যয়িতা নিবারণের জন্য অপর যে-যে উপায় আছে, তাহা ত তোমরা অবলম্বন কর নাই। গবর্ণমেণ্ট্‌কে ট্যাক্স্ না দিলে উহার চেতনা হয় ও উহাকে কতকটা হাত গুটাইতে বাধ্য হইতে হয়। নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন দ্বারাও গবর্ণমেণ্ট্‌কে মিতব্যয়ী হইতে বাধ্য করা যায়। তোমরা ত এসব উপায় অবলম্বন কর নাই। কিন্তু এখনও এই-সব উপায় অবলম্বিত হয় নাই বলিয়া ভবিষ্যৎ ঋণ অস্বীকাররূপ উপায়ও অবলম্বন করা অনুচিত, ইহা আমরা মনে করি না।

অবশ্য কংগ্রেসের প্রস্তাবটি কথার কথা মাত্র, ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, হইতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি, বিজ্ঞ রাজনীতিবিৎ মাত্রেই—তিনি উচ্চপদস্থ রাজভৃত্য হউন বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যই হউন—ইহা হইতে জনসাধারণের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন, এবং তাহা পারিলে তাঁহাদের সবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

মহাভারতের বিবর্ত্ত

গত ১৩২৮ সালের ভাদ্রের 'প্রবাসীতে' দ্রোণ-পর্ব্ব হইতে মহাভারতের শেষার্দ্ধের আলোচনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রথমার্দ্ধের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঘটনার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে মহাভারত রচনা করিতে আজ্ঞা করেন ও বিঘ্নহর গণপতিকে লেখক পদে বরণ করিতে বলেন। গণেশের বাক্য "লেখনীর বিশ্রাম হইলেই থামিব, আর লিখিব না" ও ব্যাসের উক্তি "লিখিবার কালে প্রত্যেক শ্লোকের যথার্থ অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে" ও তাহার ফলে কূটার্থ দুর্জ্ঞেয় অষ্ট-সহস্র অষ্ট-শত শ্লোকের অবতারণার সহিত মহাভারত রচনা; ভারত-গ্রন্থ প্রশংসা ও উহার বস্তুসংক্ষেপ ও প্রসিদ্ধ "যদা-শ্রৌষম্" প্রভৃতি শ্লোকসংবলিত ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ-কথা উল্লেখযোগ্য (১ম অধ্যায়, আদিপর্ব্ব)। ব্যাসদেব শত পর্ব্ব প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে সূতপুত্র নৈমিষারণ্যে সংক্ষেপে অষ্টাদশ পর্ব্ব ক্রমশঃ বর্ণন করেন। উহার সূচী পর্ব্বসংগ্রহ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

কাশীরামের গ্রন্থে এসমস্ত উল্লিখিত হয় নাই।

সমুদ্রমন্থন। মেরুর শৃঙ্গে তপোনিরত দেবগণ অমৃতপ্রাপ্তির লালসায় একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে চিন্তিত দেখিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে সুরাসুরে মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিতে বলিলেন। লক্ষ্মী, সুরা, তুরগ, কৌস্তুভ-মণি ও শেষে ধন্বন্তরি অমৃত-ভাণ্ড-হস্তে উত্থিত হইলেন ও সর্ব্বশেষে ঐরাবত উঠিল। কিন্তু তখনও মন্থন নিবৃত্ত না হওয়াতে সর্পমুখ হইতে

ভীষণ কালকূট নির্গত হইল। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব গরল পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। সেই অবধি তিনি "নীলকণ্ঠ"। দানবগণ লক্ষ্মী ও অমৃত লইয়া দেবতাগণের শক্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলে নারায়ণ মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুগ্ধ দানবদিগের নিকট হইতে অমৃত লইয়া নরদেবের সহিত প্রস্থান করিলেন। দৈত্যগণ অস্ত্রাদি লইয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এদিকে নারায়ণ অতি সত্বর অপহৃত অমৃত দেবগণকে পরিবেষণ করিলেন। রাহু নামক দানব দেবরূপ ধরিয়া তখন ঐ অমৃত পান করিতেছিল, চন্দ্র সূর্য্য দেবতাগণকে উহা বলিয়া দেন। নারায়ণের সুদর্শন অস্ত্রে রাহুর মস্তক ছিন্ন হইল; উহা উর্দ্ধে উঠিয়া ভীষণ চীৎকার করিল ও শরীর ভূমিতে পড়িল। রাহু সেই অবধি জাতবৈর হইয়া চন্দ্রসূর্য্যকে সময়ে সময়ে গ্রাস করে। অনন্তর মোহিনীমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া নারায়ণ দেবগণের সহিত অসুরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। (১৭-১৯ অঃ, আদি)

কাশীরামের গ্রন্থে, দেবতাদিগকে অমৃত দান ও লক্ষ্মীকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সমুদ্র-মন্থন করা হয়; বরুণ মন্থন থামাইবার জন্য নারায়ণকে লক্ষ্মী প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন; মন্থনও থামিল। নারদ মুনি কৈলাসে যাইয়া মহাদেবকে জানাইলেন যে অপর দেবতাগণ তাঁহাকে অমৃতরত্নাদির ভাগ দেন নাই; তাহাতে ভগবতী ক্রুদ্ধা হইয়া মহাদেবের অপৌরুষ কীর্ত্তন করিলেন। তাহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া মন্থন-স্থানে যাইয়া পুনর্ব্বার মন্থনের আদেশ দেন। তাহাতে ঘর্ষণজনিত অগ্নি ও সর্পমুখ হইতে গরল নির্গত হইয়া প্রমাদ উপস্থিত করিল। তখন দেবগণের স্তুতি-বাক্যে ও মন্থনের ফল গ্রহণ করিতে স্বীয় অঙ্গীকার স্মরণ হওয়াতে ও সৃষ্টিরক্ষাকল্পে মহাদেব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া "নীলকণ্ঠ" নামে খ্যাত হইলেন। অনন্তর মহাদেব দেব ও দানবদিগকে কলহে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সমস্যা হইল, কে সুধা বাঁটিয়া দিবে? তখন নারায়ণ মোহিনী-বেশে সেখানে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে মহাদেব চেতন পাইয়া মোহিনীর পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং অবশেষে ত্রিশূল বক্ষে হানিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে মোহিনী তাঁহাকে ধারণ করেন ও পরে আলিঙ্গন দেন। এরূপে হরিহরের অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হয়। রাহুর মস্তক রাহু নামে খ্যাত থাকে ও দেহ কেতু নামে খ্যাত হয়; সুধাপানহেতু রাহু ও কেতুর মৃত্যু হইল না।

মূলগ্রন্থে, তপস্বী ধৌম্যের উপমন্যু আরুণি ও বেদ নামে তিন শিষ্য ছিলেন। ঐ তৃতীয় শিষ্য বেদের উত্তর-কালে তিন শিষ্যের মধ্যে উতঙ্ক নামে এক শিষ্য ছিল।

কাশীরামের গ্রন্থে, ধৌম্য স্থানে সন্দীপন, উপমন্যু স্থানে উদ্দালক, আরুণি স্থানে কোন নাম দেওয়া হয় নাই এবং তৃতীয় শিষ্য বেদের নাম নাই, বরং বেদের শিষ্য "উতঙ্ক"কেই মুনির তৃতীয় শিষ্য উতঙ্ক নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূলগ্রন্থে কুলকামিনীগণের উক্তি আছে ও গুরু বেদ দক্ষিণাবিষয়ে স্বীয় পত্নীর প্রার্থনা জানিবার জন্য উতঙ্ককে আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুপত্নী "আগামী চতুর্থীর দিন" কুণ্ডল পরিতে বাসনা করেন। কাশীরামের গ্রন্থে, স্বয়ং গুরুপত্নীর উক্তি ও দক্ষিণাবিষয়ে উতঙ্ককে নিজের নিকট পাঠাইতে স্বামীর প্রতি উপদেশ রহিয়াছে—সাত দিনের মধ্যে কুণ্ডল আনিতে হইবে। বৃষ ও অশ্ব উতঙ্ককে উপদেশ দিয়াছিল। মূলগ্রন্থে, বৃষারূঢ় ও অশ্বপার্শ্বস্থ পুরুষ উপদেশ দিয়াছিল। উতঙ্ক শুচি হইয়া রাণীকে দেখিতে পান; পশ্চাৎ রাজাকে শাপ দিয়া উহা প্রতিসংহার করেন, রাজাও তাঁহাকে শাপ দেন। উতঙ্ক দন্ত দ্বারা তক্ষকোদ্দেশে ভূমিখননে প্রবৃত্ত হন, নখ দ্বারা নহে।

গরুড়ের অমৃত-হরণ ও গজ-কচ্ছপের বিবরণ ও বালখিল্যদিগের কথা কাশীরাম মূলানুসারেই লিখিয়াছেন।

পরীক্ষিৎ রাজার ব্রহ্মশাপ ও কশ্যপ ও তক্ষকের বার্ত্তা ও তক্ষককর্ত্তৃক রাজাকে দংশন (৪০-৪৩ অঃ, আদি)—এখানেও কাশীরাম মূলের অনুযায়ী লিখিয়াছেন। উতঙ্কের বার্ত্তায় জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন (৫০ অঃ, আদি)। সর্পযজ্ঞের করাল কবল হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য বাসুকি স্বীয় ভগ্নী

জরৎকারুকে মুনির সহিত বিবাহ দেন। পরে যখন মুনি পত্নীকে ছাড়িয়া যান তখন পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে তাঁহার সন্তান ধার্ম্মিক বিদ্বান্ ও তপস্বী হইবে, সে মাতুলকুলকে রক্ষা করিবে (৪৭ অঃ, আদি)।

কাশীরামের গ্রন্থে, পত্নীর অনুরাধে মুনি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার উদরে হাত দিয়া, "অস্তি অস্তি" উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, এই উদরে নাগশ্রেষ্ঠ পুরুষের জন্ম হইবে।

আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ-বিঘ্ন। মূলগ্রন্থে তক্ষক-সহিত ইন্দ্রও মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইলে ইন্দ্র ভয়ে তক্ষককে ফেলিয়া গৃহে পলায়ন করিলেন। তক্ষক বিকলাঙ্গ ও হতজ্ঞান হইল ও অবিলম্বেই অগ্নিতে পতিত হইবে মনে করিয়া বিপ্রবাক্যে রাজা আস্তিককে বর দিতে গেলে আস্তিক সর্পযজ্ঞ রহিত করিতে বলেন (৫৬ অঃ, আদি)।

কাশীরামের গ্রন্থে, ইন্দ্রকে মন্ত্রাকর্ষণ হইতে মুক্ত করা হয়। আস্তিক প্রার্থনা করিলে রাজা তাঁহাকে যজ্ঞশেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলেন। তাহাতে আস্তিক বলিলেন যে তক্ষক পুড়িয়া মরিলে বর লইয়া আর কি হইবে; বিশেষতঃ রাজার আয়ু শেষ হওয়াতে যম তাঁহাকে লইয়াছেন, তাহাতে তক্ষকের দোষ কি, নিরপরাধদিগকে হিংসা করা উচিত নহে। ব্যাসদেব ও অপর মুনিগণ তখন রাজাকে যজ্ঞ নিবারণ করিতে বলেন।

মূলগ্রন্থে, ব্যাসদেব জনমেজয়ের নিকট সর্পযজ্ঞের সংবাদ শ্রবণ করিয়া আগমন করেন। জনমেজয় পুরোহিতাদি-পরিবৃত হইয়া যজ্ঞাসনে বসিয়া ছিলেন। রাজা মহর্ষিকে পূজা ও গোদান করিলেন। ব্যাস তাহা গ্রহণ করিলেন; কিন্তু অনর্থক হিংসা হয় বলিয়া (ভক্ষ্যার্থে) গোবধ করিতে দিলেন না; পরে ব্যাসদেবের আদেশে তৎশিষ্য বৈশম্পায়ন রাজাকে কুরুসমর-কথা শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন (৬০ অঃ, আদি)।

শকুন্তলা-উপাখ্যানে (৬৮-৭৪ অঃ, আদি) মূলের সহিত কাশীরামের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মূলে বনচারী পক্ষীসকল শ্বাপদ হইতে সদ্যজাত শকুন্তলাকে রক্ষা করিয়াছিল। কণ্ব শিষ্যগণের সহিত সপুত্রা শকুন্তলাকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দেন।

কাশীরামের গ্রন্থে, শ্বাপদগণও শকুন্তলাকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিয়াছিল। এবং "শকুনি বেড়িয়াছিল নিকুঞ্জকাননে", সেইজন্য শকুন্তলা নাম হইল। কণ্ব গৃহে আসিয়া ভার নামাইয়া কন্যাকে ডাকিয়াছিলেন। মূলে, ভার না নামাইয়াই কণ্ব কন্যাকে সম্বোধন করেন ও আশীর্ব্বাদ করিলে পর কন্যা তাঁহার ভার নামাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দান করেন। এই প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে ও কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকে দুর্ব্বাসার অভিশাপ বিশেষরূপ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কচ ও দেবযানী (৭৬-৮৫ অঃ, আদি)। মূলে, কচ স্বয়ং গুরুর উদর ভেদ করিয়া বাহির হন। কাশীরামের গ্রন্থে গুরু নিজেই উদর ভেদ করেন, শুক্রাচার্য্য সুরাপান ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার বিবরণ (৭৮-৮৫ অঃ, আদি)। মূলের সঙ্গে কাশীরামের বিশেষ পার্থক্য নাই।

পাণ্ডুর দেহত্যাগ ও মাদ্রীর সহমরণে (৯৫ অঃ, ১১৮-১২৭ অঃ, আদি) বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সত্যবতীর দেহত্যাগ (১২৮ অঃ, আদি)—এখানেও মূলের সহিত কোন তারতম্য নাই।

ভীমের বিষপান (১২৮-১২৯ অঃ, আদি)—মূলে, স্থাবর-বিষ জঙ্গম-বিষের সহিত মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইল। অন্যবার ভীমের খাদ্যের সহিত মিশ্রিত বিষ ভীম অনায়াসে জীর্ণ করেন। কাশীরামের গ্রন্থে, অন্যবারের বিষপান ও উহা জীর্ণ করার উল্লেখ নাই।

দ্রোণের গুরুপদে বরণ (১৩৩ অঃ, আদি)। ক্রীড়ারত যুধিষ্ঠিরাদির গুটিকা কূপে পতিত হইলে কেহ তাহা উঠাইতে পারিলেন না। দ্রোণ তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আপন অঙ্গুরীয় কূপে নিক্ষেপ করিয়া তৃণ দ্বারা গুটিকা ও বাণ দ্বারা অঙ্গুরীয় উঠাইলেন। এই আশ্চর্য্য গুণে ভীষ্ম তাঁহাকে গুরু হইবার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন। কাশীরামের গ্রন্থে, এই ঘটনাটি নাই।

একলব্য-কাহিনী (১৩৪ অঃ, আদি), কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা-পরীক্ষা (১৩৪-১৩৫ অঃ, আদি), ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে বিদ্যা-পরীক্ষা (১৩৬-১৩৯ অঃ, আদি),

দ্রুপদরাজার পরাজয় (১৪০ অঃ, আদি)—মূলের সহিত কাশীরামের বিশেষ পার্থক্য নাই।

বারণাবতে গমন, জতুগৃহদাহ ও যুধিষ্ঠিরাদির পরিত্রাণ (১৪৫-১৫৩ অঃ, আদি); হিড়িম্ব বধ ও ঘটোৎকচের জন্ম (১৫৬-১৫৭ অঃ, আদি) ;—মূলের সহিত কাশীরামের বিশেষ তারতম্য নাই। যুধিষ্ঠির হিড়িম্বাকে ভীমের সঙ্গে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিতে বলেন এবং ভীমও হিড়িম্বার সহিত থাকিবেন বলিলেন। কাশীরামের গ্রন্থে, এ সমস্ত উল্লেখ নাই।

বক-বধ (১৫৯-১৬৬ অঃ, আদি)। মূলের সহিত কাশীরামের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীর পাণ্ডবগণের সহিত বিবাহ (১৯০-২০০ অঃ, আদি)। অর্জ্জুন পঞ্চবাণ দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন; উহা ছিদ্রপথে ভূমিতে পড়িল। তখন অন্তরীক্ষে এবং সমাজ মধ্যে মহাশব্দ হইল। নকুল ও সহদেবকে লইয়া যুধিষ্ঠির শীঘ্র আবাসে গেলেন। অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে জয় করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন অন্য নরপতিগণ দ্রুপদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ভীম ও অর্জ্জুন তখন দ্রুপদের পক্ষাবলম্বন করিয়া নৃপতিদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

কাশীরামের গ্রন্থে, অর্জ্জুন যখন মৎস্যচক্ষু ভেদ করেন, নারায়ণ তখন "সুদর্শন" চক্র সরাইয়া লইয়াছিলেন। শর পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের হাতে ফিরিয়া আসিল। অনেকে "বিদ্ধ হইয়াছে" বলিয়া উঠিল। রাজাগণ বলিলেন যে বিদ্ধ হয় নাই। দুষ্টজনে মৎস্য কাটিয়া মাটিতে ফেলিতে বলিল। অর্জ্জুন তখন তাহাই করিলেন। দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে মাল্য দিতে গেলে অর্জ্জুন বারণ করিলেন; তাহাতে রাজগণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা লইয়া কি করিবে সুতরাং মাল্য দিতে বারণ করিল ইহা মনে করিয়া দূত দ্বারা অর্জ্জুনকে সংবাদ দিলেন যে ধনের বিনিময়ে দ্রৌপদীকে দান কর। তাহাতে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষান্তরে দূতকে বলিলেন যে আমিও ধন দিব, রাজগণ স্ব স্ব পত্নী আমাকে দান করুন। রাজাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে ও দ্রুপদকে মারিতে উদ্যত হইলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া অর্জ্জুনের সাহায্যে গেলেন। বলরাম কৃষ্ণকে অসহায় অর্জ্জুনের কথা বলায়, কৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন সকলকেই পরাজিত করিতে পারিবে; তবে একান্ত সঙ্কটকালে সুদর্শন দ্বারা প্রতিপক্ষ নাশ করিব। মূলে, কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া বলরামকে ছদ্মবেশধারী যুধিষ্ঠিরাদির স্বরূপ বলিলেন। রাজাগণ প্রথমে অর্জ্জুনকে বিপ্র-বোধে আক্রমণ করেন নাই।

সুন্দ ও উপসুন্দ বধ ও তিলোত্তমা সৃষ্টি (২১১-২১৪ অঃ, আদি)। মূলের সহিত কাশীরামের বিশেষ পার্থক্য নাই।

সুভদ্রা-হরণ (২২০-২২৩ অঃ, আদি)। রৈবতক পর্ব্বতে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ মহোৎসব উপলক্ষে গিয়াছিলেন। তথায় অর্জ্জুন সুভদ্রার রূপে মুগ্ধ হন। পরে কৃষ্ণের পরামর্শমত যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা আনয়ন করিয়া সুভদ্রাকে হরণ করেন। বলরাম প্রভৃতি কৃষ্ণবাক্যে সন্তোষলাভ করিলে অর্জ্জুন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দ্বারকায় পরিণয় সমাপন করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ বর্ষ সমাপ্ত হইলে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণ বিবাহোপলক্ষে জ্ঞাতিদিগকে অনেক ধন দান করিলেন। নিয়ম ভঙ্গ হওয়ায় অর্জ্জুন বনে বার বৎসর যাপন করিয়াছিলেন।

কাশীরামের গ্রন্থে, যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সুভদ্রা অর্জ্জুনের রূপ দেখিয়া মোহিত ও মূর্চ্ছিত হন। সত্যভামা তাঁহাকে আশ্বাস দেন ও কৃষ্ণের নিকট একান্তে সুভদ্রার অনুরাগ বর্ণন করেন। তাহাতে কৃষ্ণ সত্যভামাকে যথাকর্ত্তব্য করিতে বলেন। সত্যভামা গভীর রাত্রে সুভদ্রাকে লইয়া অর্জ্জুনের কক্ষে প্রবেশ করেন ও অর্জ্জুনকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিতে বলেন। সত্যভামা দ্রৌপদীর প্রতি ক্রূরোক্তি করেন, অর্জ্জুন তাহাতে সত্যভামাকে পারিজাত-প্রসঙ্গে রুক্মিণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলেন। এইরূপ রহস্যালাপের পর, অর্জ্জুন সুভদ্রাগ্রহণে অসম্মত হইলেন। তখন উভয়ে চলিয়া গেলেন। রতির সাহায্যে সুভদ্রাকে মনোহরা করিয়া সত্যভামা পুনর্ব্বার অর্জ্জুন-সমীপে গেলেন। অর্জ্জুন তখন মুগ্ধ হইয়া সুভদ্রাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করেন। তখন অর্জ্জুন সত্যভামা-বাক্যে কৃষ্ণ-বলরামের সম্মতিবিষয়ে চিন্তিত হইলেন। পরে কৃষ্ণ সুভদ্রাকে স্নান করিতে পাঠান

ও অর্জ্জুনকেও রথ পাঠাইয়া দেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলে, যাদবগণের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয় ও তাঁহার জয় হয়। দুর্য্যোধন সুভদ্রার স্বয়ম্বরে আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া প্রস্থান করেন। সারথিকে বন্ধন করিয়া অর্জ্জুন সুভদ্রাকে সারথ্যে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণ বলরামপ্রমুখ যাদবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া অর্জ্জুন ও সুভদ্রার পরিণয় সুসম্পন্ন করান।

খাণ্ডবদাহন (২২৪-২৩৬ অঃ, আদি)। মূলের সহিত বিশেষ পার্থক্য নাই। পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত খাণ্ডব-দাহন হয়। শিব দুর্ব্বাসাকে শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ করিতে বলেন। দুর্ব্বাসা তাহাতে স্বীকৃত হন। কাশীরামের গ্রন্থে, দুর্ব্বাসা পৌরোহিত্যে আহূত হইলে রাজার উপর ক্রুদ্ধ হন, এবং যজ্ঞ-প্রসঙ্গে ছিদ্র পাইয়া রাজার অনিষ্ট-সাধনে ইচ্ছা করেন।

ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে যুধিষ্ঠিরের জন্য অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ করেন (৩ অঃ, সভা) ; জরাসন্ধের উৎপত্তি (১৮ অঃ, সভা)। মূলের সহিত কাশীরামের এ বিষয়ে অনৈক্য বিশেষ নাই।

জরাসন্ধ বধ (২৪ অঃ, সভা)।—মূলে, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে জরাসন্ধকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সাতপাক ঘুরাইয়া ভীম তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করেন ও জানু দ্বারা তাঁহার মেরুদণ্ড ভঙ্গ করেন। ভীমের জয়ের সিংহনাদে মগধবাসী কম্পিত হইয়াছিল।

কাশীরামের গ্রন্থে, ভীম কর্ত্তৃক ভূতলে পাতন ও পীড়নেও জরাসন্ধের মৃত্যু না হওয়ায় কৃষ্ণ বেণাপাত ছিঁড়িয়া ভীমকে সঙ্কেত করেন। তখন ভীম জরাসন্ধের দুইপদ আকর্ষণ করিয়া মাঝামাঝি ভিন্ন করেন; জরাসন্ধ তখন মরেন।

রাজসূয় যজ্ঞ (৩৩—৪৫ অঃ, সভা)। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া যুধিষ্ঠির যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রধান মনে করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই অর্ঘ্য দিতে সহদেবকে বলিলেন। সহদেব তাহাই করিলেন। শিশুপাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হন, ও কৃষ্ণের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন ও কৃষ্ণের হস্তে নিহত হন।

কাশীরামের গ্রন্থে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিতে বলেন ও ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করিতে বলেন এবং পরম বৈষ্ণব বিভীষণকেও নিমন্ত্রণ করিতে বলেন। (মূলে সিংহলপতির আগমন রহিয়াছে)। দেব নিমন্ত্রণ করিতে পার্থ ইন্দ্র কুবের হর প্রভৃতির নিকট ও পাতালে নাগদেশে গমন করিলেন। বিভীষণ আসিলেন কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনের অদূরে দাঁড়াইয়া বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন। তাহাতে বিভীষণ সহিত ত্রিলোক মূর্চ্ছিত হইয়া সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে পতিত হন। এই দৃশ্য উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সংবর্দ্ধনা করেন। অনন্তর ভীষ্ম রাজগণকে অর্ঘ্য দিতে প্রস্তাব করিলেন ও লোকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে প্রথম অর্ঘ্য দিতে বলিলেন। সহদেব তাহা দিলেন। তাহাতে শিশুপাল কৃষ্ণদ্রোহী হইয়া বিনষ্ট হন।

দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা (৪৮—৫৮অঃ, সভা)। শকুনি দুর্য্যোধনকে পাশা-খেলার মন্ত্রণা দিলেন ও ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি অনুসারে বিদুর পাণ্ডবগণকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া আসিলেন। কাশীরামের গ্রন্থেও এইরূপ সংক্ষেপে আছে। যুধিষ্ঠিরের পরাজয় (৬০—৬৪ অঃ, আদি) সম্বন্ধে কাশীরামের মূলের সহিত অনৈক্য নাই।

দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন ও বস্ত্রহরণ (৬৬—৬৯ অঃ, আদি)। যুধিষ্ঠিরাদির দাস্য মোচন (৭০ অঃ, আদি)। মূলের সঙ্গে কাশীরামের এই বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। মূলে ভগবান্ কমলাকান্ত দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিতে লাগিলেন ও এদিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অদৃশ্যভাবে থাকিয়া দ্রৌপদীকে বস্ত্র জোগাইতে লাগিলেন। কাশীরামের গ্রন্থে চক্রপাণি অস্থির হইলেন এবং জগৎপতি ধর্ম্মরূপে কাপড় জোগাইলেন।

পুনর্ব্বার পাশাখেলার মন্ত্রণা ও যুধিষ্ঠিরের বনগমন (৭৩-৭৮ অঃ, আদি)—মূলের সহিত কাশীরামের অনৈক্য নাই।

বিদুরের নির্ব্বাসন ও পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ-কার, ধৃতরাষ্ট্রের বিরহ ও বিদুরের প্রত্যাগমন (৪-৬ অঃ, বন)। মূলের সঙ্গে কাশীরামের ঐক্য আছে।

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবন প্রবেশ, দ্রৌপদীর খেদোক্তি, যুধিষ্ঠিরের উক্তি, (২৪-৩১ অঃ, বন) কাশীরাম মূলের অনুরূপ লিখিয়াছেন; তবে বক-নামক দালভ্য মুনির উল্লেখ করেন নাই।

ভীমের উক্তি ও যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুক্তি (৩৫ ৩৬ অঃ, বন)—কাশীরামে ইহা নাই।

কৈরাত পর্ব্ব (৩৮—৪০ অঃ, বন), মূক নামে দানব বরাহের মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। কাশীরামে ইহা নাই।

অর্জ্জুনোর্ব্বশীসংবাদ ও অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর শাপ (৪৬ অঃ, বন)। কাশীরামে মূলের অনুরূপ।

নলোপাখ্যান (৫২-৭৮ অঃ, বন)। বনে নল প্রথমে নিদ্রিত হইলেন, পশ্চাৎ দময়ন্তীও নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট নলের শীঘ্র নিদ্রাভঙ্গ হয় ও দময়ন্তীকে ত্যাগ করেন। দময়ন্তীর শাপে ব্যাধ গতাসু হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তপস্বীগণ অগ্নিহোত্র ও আশ্রমাদির সহিত সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। দময়ন্তী অশোক-তরুর নিকট যাজ্ঞা করিয়াছিলেন। বণিক্‌গণ দময়ন্তীকে বিপদের মূল মনে করিয়া মারিবার প্রস্তাব করিলে, দময়ন্তী বনমধ্যে লুকাইলেন ও বণিক্‌গণ যাত্রা করিলে, তাহাদের পশ্চাৎ চলিলেন। বাহুকের রথচালনার গতি এত বেশী ছিল যে রাজার উত্তরীয় বসন নিমিষমধ্যে এক যোজন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। নল কলিকে শাপ দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কলির প্রার্থনায় তাহা দিলেন না। কলি বলিয়াছিল যে নলের নাম করিলে কলি স্পর্শ করিবে না। কলি বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। দময়ন্তী নলকর্ত্তৃক সংস্কৃত মাংস আস্বাদ করিয়াছিলেন।

কাশীরামের গ্রন্থে, দময়ন্তী ঘুমাইয়া ছিলেন, নল ঘুমান নাই। শাপে ব্যাধ ভস্ম হইয়াছিল। একজন তপস্বী মাত্র ছিলেন ও অন্তর্দ্ধান করেন। অশোকতরুর উল্লেখ নাই। বণিক্‌গণের প্রস্তাব উল্লিখিত নাই। দময়ন্তী রাত্রে বিপদ্‌কালে বৃক্ষে উঠিয়াছিলেন। উত্তরীয়-বসন পাঁচ যোজন দূরে পড়িয়াছিল। নল কলিকে খড়্গ দ্বারা মারিতে চাহিয়াছিলেন। কলির বৃক্ষে প্রবেশ উল্লিখিত নাই। কলি বলিল যে কর্কটক, ঋতুপর্ণ, দময়ন্তী ও নল এই-সব নাম লইলে কলিস্পর্শ ঘটিবে না। দময়ন্তী নলের হাতের পাক-করা ব্যঞ্জন খাইয়াছিলেন।

শ্রীবৎস-উপাখ্যান মূলে নাই। ইহা শনিপূজা-সম্পর্কিত, সুতরাং উপপুরাণভুক্ত।

ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যান (১১০-১১৩ অঃ, বন) কাশীরামে নাই। জামদগ্ন্যের মাতৃবধ (১১৬ অঃ, বন) ও ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলন (১১৭ অঃ, বন) কাশীরামে নাই।

বৃত্রাসুর-সংহার (১০১ অঃ,বন) ও বিন্ধ্যাচলোপাখ্যান (১০৪ অঃ, বন)। ইন্দ্র বৃত্র হইতে এত ভয় পাইতেন যে স্বকরচ্যুত বজ্র দ্বারা বৃত্র হত হইল কি না এই ভয়ে সরোবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাশীরামে ইহার উল্লেখ নাই। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্ব্বতকে যাইবার পথ দিতে বলিয়াছিলেন। কাশীরামে ইহার উল্লেখ নাই।

জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণ, পরাজয় ও শিবারাধনা (২৬৬-২৭০ অঃ, বন)। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথে উঠাইবার জন্য আকর্ষণ করিলে, দ্রৌপদী ধৌম্যকে আহ্বান করেন ও তাঁহার চরণযুগল অভিবাদন করেন। ম্রিয়মাণা দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পদাতিগণের মধ্যে ধৌম্য অনুগমন করিলেন ও জয়দ্রথের প্রতি কটূক্তি করিলেন। পাণ্ডবগণ আশ্রমে আসিয়া শূন্য আশ্রম দর্শন ও ধাত্রেয়িকার বাক্য শুনিয়া জয়দ্রথের অনুবর্ত্তী হইলেন ও ধৌম্যের উচ্চ চীৎকার শুনিতে পাইলেন। পাণ্ডবগণও চীৎকার করিলেন। পাণ্ডবগণ পদাতিগণকে বিধ্বস্ত করেন। তখন দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া জয়দ্রথ রথে পলায়ন করেন। দ্রৌপদী ও ধৌম্যকে যুধিষ্ঠির গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে সংহার করিতে ভীমকে নিষেধ করেন। তাহাতে দ্রৌপদী ভীমার্জ্জুনকে জয়দ্রথকে বধ করিতে বলেন। জয়দ্রথের অশ্ব হত হইলে, তিনি পদযোগে পলায়নপর হইলেন; ভীম রথ হইতে নামিয়া দৌড়িয়া জয়দ্রথকে কেশপাশ দ্বারা ধৃত করেন ও প্রহার করেন এবং দাসত্বে স্বীকৃত করান। পরে বন্ধন করিয়া রথযোগে যুধিষ্ঠিরের নিকট আনিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে মুক্ত করিতে বলেন। ভীম বলিলেন যে জয়দ্রথ দাস হইয়াছে, সুতরাং দ্রৌপদীর অভিপ্রায়-মত কার্য্য করিব। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মনোগত ভাব বুঝিয়া মুক্ত করিতে বলেন।

অনন্তর জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বারে যাইয়া মহাদেবের উপাসনায় নিযুক্ত হন। মহাদেব "অর্জ্জুন ব্যতিরেকে সকল পাণ্ডবগণকে একদিন মাত্র জয় করিতে পারিবে" এই বর দিলেন এবং বলিলেন যে বিবিধ-অবতারধারী নারায়ণ (কৃষ্ণ) অর্জ্জুনকে সতত রক্ষা করেন।

কাশীরামের গ্রন্থে, প্রথমে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব আশ্রমে আসেন, ও জয়দ্রথের অনুসরণ করেন। ভীমার্জ্জুন ফিরিবার পথেই জয়দ্রথের সন্নিহিত হন ও অনুসরণ করেন। ধৌম্য ও ধাত্রেয়িকার নামোল্লেখ নাই। পরে ভীম পরাজিত জয়দ্রথের মুখে দ্রৌপদীকে দিয়া তিনবার পদাঘাত করান। ভীমের অশেষ নির্য্যাতনে জয়দ্রথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। যুধিষ্ঠির সেখানে উপস্থিত হইয়া জয়দ্রথকে মুক্ত করেন। হিমালয়ে জয়দ্রথকে মহাদেব পাণ্ডবজয় ভিন্ন অন্য বর দিতে চাহিলে, জয়দ্রথ তাঁহাকে যাইতে বলেন। পুনরায় তপোমগ্ন জয়দ্রথের নিকট মহাদেব আসিয়া অর্জ্জুন ভিন্ন পাণ্ডবজয় বর দিলেন।

সাবিত্রী উপাখ্যান (২৯১-২৯৭ অঃ, বন)। সাবিত্রী সত্যবানের মৃত্যুর চারি দিবস পূর্ব্ব হইতেই ত্রিরাত্র ব্রত করেন। অশ্বপতি কন্যাকে অন্য বর মনোনীত করিতে বলেন। কিন্তু সাবিত্রীর বাক্যে ও নারদের আজ্ঞায় সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দেন। দূত না পাঠাইয়া যমরাজ প্রথমেই নিজে আসিয়াছিলেন। প্রথমে শ্বশুরের চক্ষু প্রসন্ন হওয়ার ও পরে রাজ্যপ্রাপ্তির ও পিতার পুত্রলাভের বর ও পঞ্চম বরে সত্যবানের জীবন প্রার্থনা করেন।

কাশীরামের গ্রন্থে, সাবিত্রী সত্যবানের মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে চতুর্দ্দশীতে ব্রতারম্ভ করেন। অশ্বপতি ও নারদ উভয়েই অমত করিলেন, পুনরায় সাবিত্রীর বাক্যে সম্মত হন। যমরাজ প্রথমে দূত পাঠান। সাবিত্রী প্রথমেই পিতার পুত্রলাভের বর চাহেন।

যক্ষসরোবর ঘটনা (৩১০-৩১২ অঃ, বন)। দ্রৌপদীকে দ্বৈতবনে রাখিয়া মৃগান্বেষী পাণ্ডবগণ কাননে তৃষ্ণার্ত্ত হইলে নকুল সহদেব অর্জ্জুন ও ভীম সরোবরে যাইয়া পঞ্চত্ব পান। পরে বক ও যুধিষ্ঠির অনেক প্রশ্নোত্তর করেন।

কাশীরামের গ্রন্থে, দ্রৌপদী জল আনিতে গিয়া নিহত হন। প্রথমে ভীম, পরে অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী জল আনিতে যান। বক চারি প্রশ্ন মাত্র জিজ্ঞাসা করে। মূলগ্রন্থে অর্জ্জুন শব্দভেদী বাণ বক প্রতি ত্যাগ করেন। তাহা কাশীরামে নাই।

কীচক-বধ—কাশীরাম মূলানুরূপ লিখিয়াছেন।

উত্তরাপরিণয়।—মূলে, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শুক্ল বস্ত্র, কর্ণের পীত, ও অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্র গ্রহণ করা হয়। যুধিষ্ঠিরের অভিমত বুঝিয়া অর্জ্জুন উত্তরাকে স্নুষার্থে গ্রহণ করেন (৬৬-৭২ অঃ, বিরাট পর্ব্ব)।

কাশীরামের গ্রন্থে, ভীষ্ম-দ্রোণের বস্ত্র লইতে অর্জ্জুন নিষেধ করেন। সহদেব পঞ্জিকা গণিয়া জানিলেন যে অজ্ঞাতবাসের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অভিমত বুঝিয়াই অর্জ্জুন কার্য্য করেন।

অম্বোপাখ্যান (১৭৩-১৯৪ অঃ, উদ্‌যোগ পর্ব্ব) কাশীরামে নাই। অম্বার ভীষণ পণ, পরশুরাম ও ভীষ্মের যুদ্ধ, পরশুরামের পরাজয়, অম্বার তপস্যা, শিবের নিকট বর লাভ, দেহত্যাগ, শিখণ্ডী নামে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মলাভ, যক্ষের অনুগ্রহে পুরুষ হওয়া, ভীষ্মের অস্ত্রত্যাগের প্রস্তাব।

ভীষ্মবধ (১১৬—১২৪ অঃ, ভীষ্ম)। যুধিষ্ঠির কহিলেন যে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিবেন, কিন্তু পাণ্ডবগণকে সৎপরামর্শ দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত আছেন। এবং কৃষ্ণকে বলিলেন যে চল ভীষ্মের পরামর্শ গ্রহণ করি। ভীষ্মশিবিরে যাইলে ভীষ্ম শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুনকে বাণ মারিতে বলিলেন। অনন্তর এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুন ভীষ্মকে প্রপীড়িত করিলেন। ভীষ্ম মৃত্যুকাল উপস্থিত এরূপ বোধ করিয়া যুদ্ধ করিলেন না, কিন্তু অর্জ্জুনের শরে আহত হইয়া পুনরায় শরাসন ধারণ করেন। শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জ্জুনের বাণবিদ্ধ হইয়া ভীষ্ম বলিলেন "শিখণ্ডীর বাণ কদাচ এরূপ নয়" এবং খড়্গ চর্ম্ম লইয়া রথ হইতে না নামিতেই অর্জ্জুন তাহা শরে ছিন্ন করেন। তৎপরে বাণজর্জ্জরীভূত হইয়া ভূতলে পূর্ব্বশিরা হইয়া পতিত হন। উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত ভীষ্ম শরশয্যায় ছিলেন। নরপতিগণ উপাধান ও খাদ্যপানীয় ভীষ্মকে দিতে গেলে ভীষ্মাদেশে অর্জ্জুন তাহা সুসম্পাদন করিলেন।

কাশীরামের গ্রন্থে, পাণ্ডবদের ভীষ্মসমীপে পরামর্শের জন্য গমনের কোন উল্লেখ নাই এবং সমস্তই সংক্ষিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ শিখণ্ডীর কথা বলিলে অর্জ্জুন কপটযুদ্ধ অনুমোদন করিলেন না। ভীষ্মের মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ-বিরামের উল্লেখ নাই। উপাধান ও পানীয়ের জন্য ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে প্রথমে বলিয়াছিলেন।

হিরণ্যকশিপুবধ ও প্রহ্লাদ-চরিত্র ও বলি-বামনোপাখ্যান মূলে বিস্তারিত ভাবে নাই, তবে মহাদেব জয়দ্রথকে বরদানকালে নারায়ণের বামন, নৃসিংহাদি অবতারের উল্লেখ করেন।

মহাভারত-প্রসঙ্গ অতি বৃহৎ, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-মধ্যে সংক্ষেপে যতদূর সাধ্য দেওয়া গেল।

শ্রী লোকেন্দ্রনাথ গুহ

ভূ-পর্য্যটক

[রংপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী পায়ে হেঁটে ভূ-পর্য্যটনে বেরিয়েছেন। তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯২২ তারিখে পণ্ডিচারী আসেন। তাঁকেই স্মরণ করে' কবিতাটি লিখিত। উপেন্দ্র-বাবু একদিন পণ্ডিচারীতে কাটিয়ে পরদিন ১৫ই কলম্বোর দিকে যাত্রা করেন।]

পথে পথে পায়ে পায়ে
ঝড় 'জলে বা রৌদ্র' ছায়ে
চলা আমার চলা—কেবল চলা;
পল্লী সহর পাহাড় নদী
ফেল্‌ছি পিছে নিরবধি,
কোথাও কিছুই নেই রে আপন বলা;
দৃষ্টি আমার দিগন্তরে,
আশে পাশে দিগন্ত রে,
সাম্‌নে পিছে অশেষ পথের রেখা;
ওই অশেষেই জীবন কাটে
হাটে ঘাটে কিম্বা বাটে;
সমাপ্তি মোর নয় রে ললাট-লেখা;
দিনের শেষে সন্ধ্যা আসে,
উষা জাগে রাতের পাশে,
আমার সবই সমান কালো ধলা,
পথের পরে পায়ে পায়ে
ঝড়-বাদলে রৌদ্র-ছায়ে
চলা আমার চলা—কেবল চলা।

কত পথেই সন্ধ্যা নামে,
কতই পল্লী ডাইনে বামে,
কতই ঘরে সান্ধ্য-প্রদীপ জলে,
কতই দিনের কাজের শেষে
ক্লান্ততনু শান্ত-বেশে
কত লোকেই আপন গৃহে চলে;
ঝোপে ঝাড়ে জোনাক ফোটে,
ঝিঁঝিঁর কড়া আওয়াজ ছোটে,
সবাই ফেরে আপন জনার পাশে;—
গগন ঘেরে তারার আলা,
তুলসী-তলায় প্রদীপ জ্বালা
উঠান ভরে শিশুর কলহাসে;—
আমার চোখে সকল মায়া,
শুধুই অশেষ পথের ছায়া
ডাক্‌ছে মোরে কিসের চির ছলায়,
সময় যে নেই একটু থামি,
সন্ধ্যা উষা দিবস যামি
মুক্তি আমার শুধুই পথের চলায়।

কতখানেই উষা নামে
দীর্ঘপথের ডাইনে বামে,—
কতই সহর পল্লী জেগে ওঠে,
তরুণ ঠোঁটে রঙিন্ হাসি
অরুণ-আলো বাজায় বাঁশি,—
সোহাগে তার ফুলের আঁখি ফোটে;

লক্ষ পাখী পাতার আড়ে
পক্ষ নাড়ি আলয় ছাড়ে,
শয়ন পরে বধূর সরম লাগা,
জীবন-বাঁশি আবার বাজে
লক্ষ লোকের বক্ষ-মাঝে
ধীরে ধীরে ভুবনখানির জাগা ;
সত্য আমার নয় রে কিছু,
জানি না কার ঘুরছি পিছু,
হাতছানিতে আমায় কে যে ডাকে ;
থম্‌কে গেছে মুখের ভাষা,
স্তব্ধ আমার সকল আশা
দীর্ঘপথের ঐ সুমুখের বাঁকে।

দীর্ঘপথের বাঁকে বাঁকে
ডাকে আমায়—ডাকে—ডাকে
এম্‌নি পরম মোহন মরীচিকা,
ঐ যে সকল থামার মাঝে
ধীর মরণের বংশী বাজে
লাগায় মনে দারুণ বিভীষিকা ;
পথের মাঝে থাম্‌ল যারা
ঘির্‌ল তাদের মরণ-কারা,
কণ্ঠে তাদের থাম্‌ল কলগীতি,
নিভ্‌ল তাদের চোখের আলা
ঝর্‌ল ফুলের কণ্ঠমালা
মৃত্যু দিল মাটীর ঘরের প্রীতি ;
ওই ঘরে যে শিকল বাজে
ব্যথায়-বাজা বংশী বাজে
মরণ-দূতের চিরকালের ছলায়,
তাই কে মোরে ঘিরে ঘিরে
দীর্ঘপথে ধীরে ধীরে
জীবন দানে অশেষ পথের চলায়।

কঠোর চলা ?—হয়ত হবে।
আপন-ভোলা বিশাল ভবে
দীঘল কালো তরুণ আঁখি দুটি
ছায়ায়-ঢাকা কুঞ্জবনে
মায়ায় ঘেরা গেহের কোণে
আমার তরে কোথায়ও নেই ফুটি ;
একটি হিয়া আশায় ত্রাসে
শিউলি-ফুলের মৌন হাসে
নত কোথাও কর্‌বে না রে আঁখি,
হবে না রে উজল বাতি,
বকুল-ফুলের মাল্য গাঁথি
দেবে না কেউ শূন্য এ বুক ঢাকি।
আমার শুধুই পথের চলা
দূরের চলা—স্রোতের চলা—
কালের চলা—নেই রে বিরাম কভু,
থম্‌কু তারা, কাঁপুক্ ধরা
ঝঞ্ঝা-তড়িৎ-প্রলয়ভরা,
আমায় পথে চল্‌তে হবে তবু।

এই যে চলা দূরের ডাকে
একদা এক পথের বাঁকে
জানি—জানি থাম্‌তে হবেই হবে,
হয়ত দুটি আঁখির পাতে
পড়্‌ব ধরা সন্ধ্যারাতে
আপন-নিয়ে-ব্যস্ত বিপুল ভবে ;
দূরের যত স্বপ্নরাশি
কোন্ কিশোরীর মুখের হাসি
এক নিমেষে বিফল করি দেবে,
ছোট্ট দুটি বাহুর ডোরে
দুর্ব্বলতার সহজ জোরে
শেষের ডাকে আমায় ডেকে নেবে ;
শেষ হবে রে পথের চলা
দূরের মরীচিকার ছলা,
সত্য হবে জীবন-ব্যাপী থামা ;
জানিনা সে কোন্ গহনে,
কোন্ কুটীরে, কোন্ বিজনে,
দীর্ঘপথের কোন্ বাঁকে সে বামা।

শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস্ হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
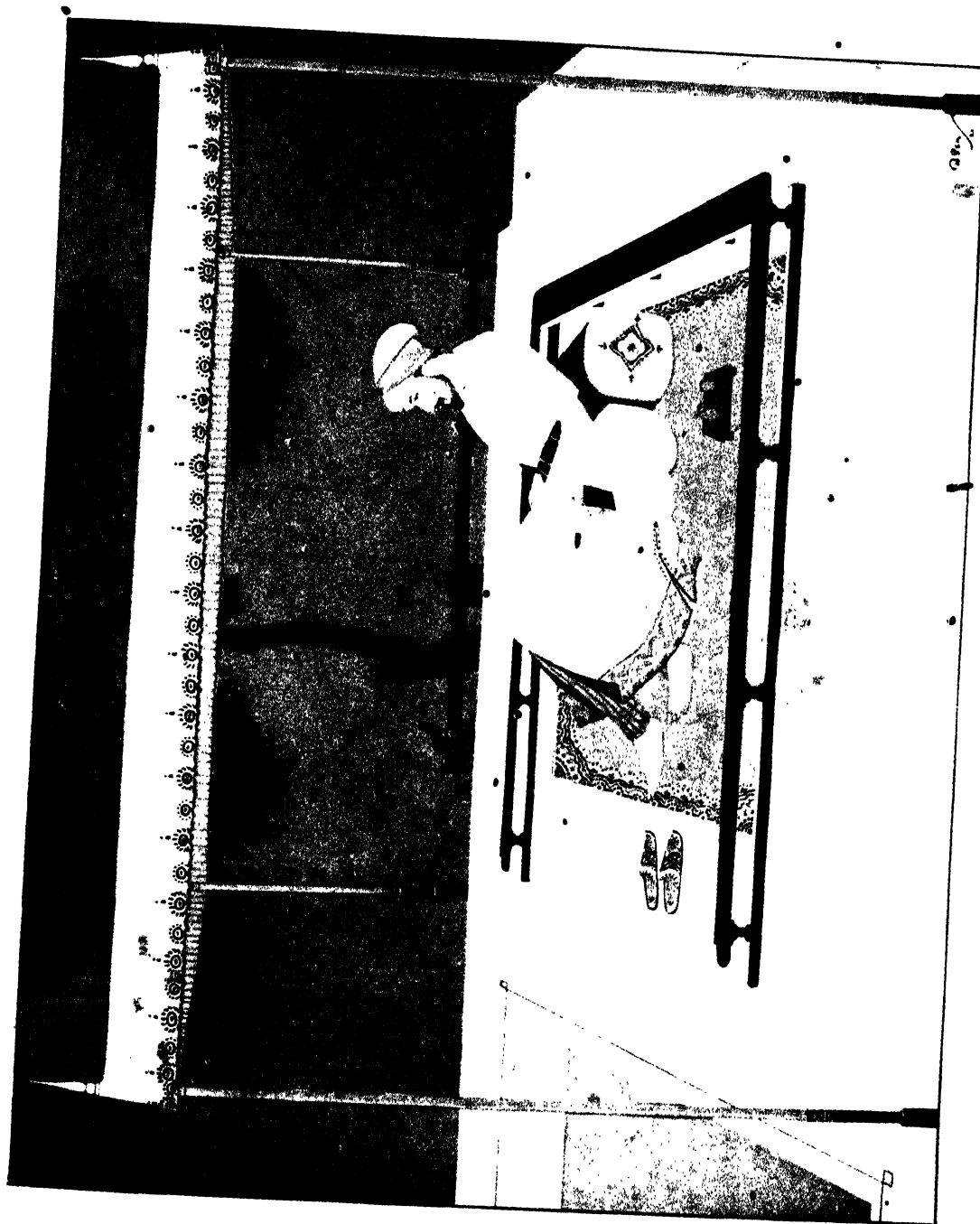
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২২শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২৯

৫ম সংখ্যা

প্রথম আলোর চরণধ্বনি

প্রথম আলোর চরণধ্বনি
উঠ্‌ল বেজে যেই,
নীড়-বিরাগী হৃদয় আমার
উধাও হ'ল সেই॥
নীল অতলের কোথা থেকে
উদাস তা'রে কর্‌ল যে কে
গোপনবাসী সেই উদাসীর
ঠিক-ঠিকানা নেই॥

"সুপ্তি-শয়ন আয় ছেড়ে আয়"—
জাগে যে তার ভাষা।
সে বলে—"চল্ আছে যেথায়
সাগর-পারের বাসা!
দেশ-বিদেশের সকল ধারা
সেইখানে হয় বাঁধন-হারা,
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা
জ্যোতিঃসমুদ্রেই॥"

১০ পৌষ ১৩২৯

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মবাদের সূচনা

"ব্রহ্ম" শব্দের মৌলিক অর্থ "মন্ত্র"। কিন্তু উপনিষদের যুগে ইহা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইত। ব্রহ্মমীমাংসার দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ এই সমুদায়ের জন্মাদি যাঁহা হইতে, তিনিই ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই সমুদায়ের সৃষ্টি, যাঁহাতে এই সমুদায়ের স্থিতি এবং লয়—যিনি সর্ব্বমূলাধার, তাঁহাকেই উপনিষদে ও বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। আমাদিগের আলোচ্য বিষয় "ব্রহ্মবাদ"। 'ব্রহ্মবাদ' বলিলে আমরা উপনিষদের ব্রহ্মবাদই বুঝিব।

কোন দার্শনিক মতই পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে না। আরম্ভে ইহা একপ্রকার, পূর্ণবিকশিত অবস্থায় অন্যপ্রকার। ব্রহ্মবাদেরও এই-প্রকার ইতিহাস। উপনিষদের যুগেই ইহার পূর্ণ বিকাশ, কিন্তু ইহার আরম্ভ বহু পূর্ব্বে। প্রাচীন বেদ-সংহিতাতেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে ব্রহ্ম বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, অদ্য তাহাই আলোচিত হইবে।

১। ব্রহ্ম অন্যতম দেবতা।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মকে বহু দেবতার মধ্যে এক দেবতা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে :—

ব্রহ্ম প্রজাপতিঃ ধাতা, লোকাঃ বেদাঃ সপ্তঋষয়ঃ অগ্নয়ঃ—তে মে কৃতম্ স্বস্ত্যয়নম্।—অথঃ ১১।৯।১২। অর্থাৎ ব্রহ্ম, প্রজাপতি, ধাতা, লোকসমূহ, বেদসমূহ, সপ্তঋষি, অগ্নিসমূহ—ইঁহারা আমার স্বস্ত্যয়ন করুন।

আর একস্থলে (১৪।১।৫৪) আছে :—

ইন্দ্র, অগ্নি, দ্যৌ, পৃথিবী, মাতরিশ্বা, মিত্র, বরুণ, ভগ, অশ্বিদ্বয়, বৃহস্পতি, মরুৎগণ, ব্রহ্ম এবং সোম—এই নারীকে প্রজা দ্বারা বর্দ্ধিত করুন।

এই উভয় মন্ত্রেই ব্রহ্ম বহুদেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা।

২। ব্রহ্মের উৎপত্তি।

(ক)

অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মের উৎপত্তি বিষয়ে এক অতি আশ্চর্য্য কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের পিতার নাম বিরাট্ (বিরাজ্) ৪।১।৭। কিন্তু 'বিরাজ্' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। বিরাট্কে একস্থলে 'বাক্‌বিরাট্' (৯।২।৫) বলা হইয়াছে। এই বিরাট্ 'কাম' নামক দেবতার কন্যা (৯।২।৫)। এই সূক্তে "কাম" অর্থ 'কামনা'; কামনাকেই এই স্থলে দেবপদে উন্নীত করা হইয়াছে। সুতরাং ঘটনা দাঁড়াইল এইরূপ—কামের কন্যা বিরাট্ বা বাক্‌বিরাট্। এই বিরাট্ ব্রহ্মের পিতা।

এখানে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মের সহিত বাক্যের কিছু সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্মের মৌলিক অর্থ যে 'মন্ত্র', এখানে তাহার কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে।

(খ)

অপর একস্থলে কালকে ব্রহ্মের জনক বলা হইয়াছে। মন্ত্রটি এই :—

কাল হইতে জলসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, কাল হইতে ব্রহ্ম, তপঃ, ও দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। কাল দ্বারাই সূর্য্য উদিত হয় এবং কালেই সূর্য্য অস্তমিত হয়। (অথর্ব্ববেদ, ১৯।৫৪।১)।

ইহার পরে বাত, দ্যৌ, পৃথিবী, ভূত, ভব্য প্রভৃতির উৎপত্তি ও স্থিতির কথা বলা হইয়াছে (১৯।৫৪।২,৩)।

ইহার পরে বলা হইল কাল হইতে ঋক্ ও যজুঃ এবং যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই সূক্তের শেষ 'মন্ত্র' এই :—

কাল ব্রহ্ম দ্বারা সমুদায় লোক জয় করিয়া পরমদেব হইয়াছেন।৫।

এই সূক্তে কাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। একস্থলে ব্রহ্ম তপ প্রভৃতির উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, আর একস্থলে বলা হইয়াছে—ঋক্ যজুঃ ও যজ্ঞাদির উৎপত্তির কথা। ইহাতে মনে হইতে পারে হয়ত 'ব্রহ্ম' অর্থ বৈদিক মন্ত্র কিংবা অথর্ব্ববেদের মন্ত্র।

(গ)

ইহার পূর্ব্বের সূক্তে (১৯।৫৩) ব্রহ্মবিষয়ে দুইটি কথা আছে—(১) ব্রহ্ম কালে সমাহিত।৮। (২) কালই ব্রহ্ম হইয়া পরমেষ্ঠীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।৯।

যিনি পরমস্থানে অবস্থিত, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারই নাম 'পরমেষ্ঠী'। এই পরমেষ্ঠীও ব্রহ্মরূপী কাল কর্ত্তৃক বিধৃত।

(৫)

অথর্ব্ববেদের অধ্যাত্মমন্যুস্থক্তে (১১।৮) ব্রহ্ম বিষয়ে অনেক কথা আছে। নিম্নে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইল।

(ক)

"যখন মন্যু সঙ্কল্পের গৃহ হইতে জায়া আনয়ন করিয়াছিল, তখন কাহারা "জন্য" (অর্থাৎ বরপক্ষীয় লোক) হইয়াছিল? কাহারা বর হইয়াছিল? আর জ্যেষ্ঠ বর হইয়াছিলই বা কে? (১) তপঃ এবং কর্ম্ম মহার্ণবের অভ্যন্তরে ছিল। ইহারাই হইয়াছিল "জন্য", ইহারাই হইয়াছিল বর; এবং শ্রেষ্ঠ বর হইয়াছিল "ব্রহ্ম"।

মন্যু, তপঃ, কর্ম্ম প্রভৃতির সঙ্গে "ব্রহ্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে ব্রহ্ম অর্থ বৈদিক মন্ত্র হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচ্য। বহুস্থলে অথর্ব্ববেদের মন্ত্রকেই বিশেষভাবে "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে।

(খ)

ইহার পরে প্রশ্ন করা হইয়াছে—কে মানবদেহে অস্থি মজ্জা স্নায়ু কেশাদি সংযোজন করিয়াছে?

অষ্টাদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে দেবগণ মানবদেহকে গৃহরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন (১৮)।

ইহার পরের চারিটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে—স্বপ্ন, তন্দ্রী, নির্ঋতি, পাপ্মা নামক দেবতাসমূহ, জরা, খালত্য, পালিত্য, স্তেয়, দুষ্কৃত, বৃজি, সত্য, যজ্ঞ, বৃহৎযশঃ, বল, ক্ষত্র, ওজ, ভূতি, অভূতি, রাতি, অ-রাতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিন্দা, অনিন্দা, 'ইতি', 'নেতি', শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা এই সমুদয় মানবদেহে প্রবেশ করিল (১৯—২২)।

ইহার পরেই আছে—

বিদ্যা, অবিদ্যা, উপদেশ্যবিষয়, ব্রহ্ম, ঋক্, সাম, যজুঃ শরীরে প্রবেশ করিল। ২৩।

এস্থলে 'ব্রহ্ম' অর্থ অথর্ব্ববেদের মন্ত্রও হইতে পারে।

(গ)

ইহার পরে আরও অনেকে দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে এস্থলে দুজনের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক।

(১) ব্রহ্ম সহ বিরাট্ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। ৩০

(২) ব্রহ্ম দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। ৩০।

ব্রহ্মের সহিত বিরাটের বা 'বাক্‌বিরাটের' কি সম্বন্ধ তাহা এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রকরণে বলা হইয়াছে।

(ঘ)

ত্রিংশ মন্ত্রের শেষ অংশ এই :—

"প্রজাপতি এই দেহে অধিষ্ঠান করিল"। ৩০।

ইহার পরের দুইটি মন্ত্র এই :—

সূর্য্য চক্ষুকে ভজনা করিল, এবং বায়ু প্রাণকে ভজনা করিল। ইহার যে অপর আত্মা, তাহা দেবগণ অগ্নিকে প্রদান করিল। ৩১। এইজন্য এই পুরুষের বিষয়ে (অর্থাৎ মানবের বিষয়ে) বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন

"ইহাই ব্রহ্ম"।

গোসমূহ যেমন গোষ্ঠে অবস্থিতি করে, তেমনি সমুদয় দেবগণও ইহাতে প্রতিষ্ঠিত। ৩২।

৩১ মন্ত্রে যে 'অপর আত্মা'র কথা বলা হইল, ইহার অর্থ শরীরের অপর একটি অঙ্গ।

৩২ সংখ্যক মন্ত্রে পুরুষকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে এই-সমুদায় দেবগণ এই পুরুষরূপী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

এই মন্ত্রে ঠিক উপনিষদেরই ভাষা এবং ভাব। পড়িলেই মনে হয় ইহা উপনিষদেরই অদ্বৈতবাদ। কিন্তু সমুদায়ই নির্ভর করিতেছে 'ব্রহ্ম' এবং 'দেব' এই দুইটি শব্দের অর্থের উপরে। এই স্থলে এবং এই সূক্তের অপরাপর স্থলে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

৩০ সংখ্যক মন্ত্রে বিরাট্ ও ব্রহ্মকে একত্র সংযোজন করা হইয়াছে। এস্থলে অবশ্যই ব্রহ্ম বিরাট্ অপেক্ষা নিম্নতর, কারণ বিরাট্ হইতেই ব্রহ্মের উৎপত্তি। 'ব্রহ্ম' অর্থ যদি অথর্ব্ববেদের মন্ত্রও হয়, তবুও বলিতে হইবে যে মন্ত্ররূপী ব্রহ্ম ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছে।

বলা হইয়াছে দেবগণ এই পুরুষরূপী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। এস্থলে দেবগণ কে? যে ভাবে নিদ্রা তন্দ্রা, সত্য যজ্ঞ, বিদ্যা অবিদ্যাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় সমুদায়ই দেবতা। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যদি

হইয়া থাকে যে দেবগণ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে অর্থ আর দুর্ব্বোধ্য থাকে না। কিন্তু ইন্দ্র অগ্নি প্রজাপতি প্রভৃতিও দেবতা, ইহারাও পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। কি অর্থে ইহারা পুরুষে প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজবোধ্য নহে।

বিরাট্‌ও একজন দেবতা।

এই বিরাট্‌ও কি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত? বিরাট্ ব্রহ্মের পিতা, তবুও যদি বলা হয় যে বিরাট ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, ঋষি বিরাট্ ও ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

(ঙ)

এই সূক্তে একটি অতি অদ্ভুত কথা আছে। এক স্থলে বলা হইয়াছে, ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র, সোম হইতে সোম, অগ্নি হইতে অগ্নি, ত্বষ্টা হইতে ত্বষ্টা এবং ধাতা হইতে ধাতা উৎপন্ন হইয়াছেন (৯) আরও দশ জন দেবতা আছেন, যাঁহারা পুরাকালে দশজন দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতা স্ব-নামধারী দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতাই 'স্ব-রূপ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন)। ১০।

এই-সমুদায় স্থলে পিতা-পুত্রের একত্ব সংস্থাপন করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের উৎপত্তিও যদি এই-প্রকারেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এস্থলেও বিরাট্ ও ব্রহ্মের একত্ব সংস্থাপিত হইল। এক অর্থে ব্রহ্ম বিরাট্ হইতে উৎপন্ন, আর-এক অর্থে বিরাট্ ও ব্রহ্ম একই। শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে বলা যায় ব্রহ্মই সর্ব্বমূলাধার।

কিন্তু পূর্ব্বাপর যোগ রাখিয়া সমগ্র সূক্ত পাঠ করিলে মনে হয় অধিকাংশ স্থলেই ব্রহ্ম একজন সাধারণ দেবতা; কেবল একটি স্থলেই বলা হইয়াছে ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা।

(৪) স্কম্ভ ও ব্রহ্ম

(ক)

অথর্ব্ববেদের স্কম্ভ-সূক্তে (১০।৭) ব্রহ্ম বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। স্কম্ভ সকলের প্রতিষ্ঠা। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইবে, সমুদায়ই স্কম্ভের অঙ্গ (১০।৭।১০)। তপ, ঋত, ব্রত, শ্রদ্ধা, সত্য, অগ্নি, মাতরিশ্বা, সূর্য্য, চন্দ্রমা, ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ এবং যাহা দ্যৌর অতীত, মাস, অর্দ্ধমাস, সংবৎসর, ঋতু, অহোরাত্র, অপ্, সমুদ্র, প্রজাপতি, ৩৩ জন দেবতা, প্রথমজ ঋষি, ঋক্, সাম, যজুঃ, মৃত্যু, অমৃত ইত্যাদি সমুদায়ই স্কম্ভের অঙ্গ এবং সমুদায়ই স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত।

(খ)

এই সূক্তের দশম ও একাদশ মন্ত্রে ব্রহ্মবিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে:—

"যাহাতে লোকসমূহ, কোশসমূহ, জল এবং ব্রহ্ম বর্ত্তমান, সৎ ও অসৎ যাহার অন্তর্নিহিত, সেই ব্রহ্মের বিষয় বল, তাহা কি? (১০)। যাহাতে তপঃ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ব্রত ধারণ করে, যাহাতে ঋত শ্রদ্ধা অপ্ ও ব্রহ্ম সমাহিত সেই স্কম্ভের বিষয় বল, তাহা কি? (১১)।

এই দুইটি মন্ত্রে ব্রহ্মকে স্কম্ভের অন্তর্ভূত বলা হইল।

(গ)

সপ্তদশ মন্ত্র এই:—

"যাহারা পুরুষে ব্রহ্মকে জানেন (যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুঃ), তাঁহারা পরমেষ্ঠীকে জানেন; যিনি পরমেষ্ঠীকে জানেন, যিনি প্রজাপতিকে জানেন যাহারা জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জানেন, তাঁহারা সেই ভাবেই স্কম্ভকেও জানেন।" ১৭।

পুরুষে ব্রহ্মদর্শন কিংবা পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা উপনিষদেরই ভাব।

(ঘ)

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি মন্ত্রে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে:—

ভূমি যাহার প্রমা, অন্তরীক্ষ যাহার উদর, যিনি দ্যৌকে মূর্দ্ধা করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।১০।৭।৩২।

সূর্য্য ও পুনর্নব চন্দ্র (=যে চন্দ্র পুনঃ পুনঃ নূতন হয়) যাহার চক্ষু, অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার। ১০।৭।৩৩।

যিনি বাতকে প্রাণ ও অপান করিয়াছেন, অঙ্গিরোগণ যাহার চক্ষু হইয়াছিল, যিনি দিক্‌সমূহকে প্রজ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার করিয়াছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার। ১০।৭।৩৪।

এখানে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইল, ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম। উপনিষদের যুগে অশ্বপতি কৈকেয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (ছাঃ ৫।১৮), এখানে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এই ব্রহ্ম যে কেবল মানবেরই উপাস্য তাহা নহে, ব্রহ্মবিৎ দেবগণও এই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। (অথর্ব্ববেদ, ১০।৭।২৪)।

এই অংশে যে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহার কোনটিতেই স্কম্ভের উল্লেখ নাই। কিন্তু ৩২,৩৩,৩৪ সংখ্যক মন্ত্রে ব্রহ্মকে যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম ও স্কম্ভ অভিন্ন, স্কম্ভের যাহা প্রকৃতি, ব্রহ্মের প্রকৃতিও তাহাই।

(ঙ)

ইহার পরের মন্ত্রে আবার স্কম্ভকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমূলাধার বলা হইয়াছে :—

স্কম্ভ দ্যৌ ও পৃথিবী এই উভয়কেই ধারণ করিয়া আছেন, স্কম্ভ অন্তরিক্ষকেও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। স্কম্ভ বিস্তৃত ছয় দিক্‌কেও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং স্কম্ভ এই বিশ্বভুবনে প্রবেশ করিয়াছেন।১০।৭।৩৫।

এই মন্ত্রে ব্রহ্মের কোন উল্লেখ নাই। এস্থলে স্কম্ভই সর্ব্বমূলাধার।

(চ)

ইহার পরের মন্ত্র এই :—

"যিনি শ্রম ও তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যিনি সোমকে একমাত্র আপনার করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার। ১০।৭।৩৬।

এস্থলে বলা হইল ব্রহ্মের উৎপত্তি আছে। এই ব্রহ্ম বহু দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা।

দেখা যাইতেছে স্কম্ভসূক্তের কোন কোন স্থলে ব্রহ্মকে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার ব্রহ্ম একজন সাধারণ দেবতা।

৫। স্কম্ভ ও ব্রহ্ম (২)।

স্কম্ভসূক্তের (১০।৭) পরবর্ত্তী সূক্তেও ব্রহ্ম ও স্কম্ভ বিষয়ে দুইটি মন্ত্র আছে :—

(ক)

১। "যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং সর্ব্ব বস্তুকেই অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন, স্বর্গলোক কেবল যাঁহারই, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার" ।১০।৮।১।

২। স্কম্ভ কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া দ্যৌ এবং ভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহার আত্মা আছে, যাহার প্রাণ আছে, যাহার নিমিষ আছে, সে সমুদায়ই স্কম্ভ।১০।৮।২।

প্রথম মন্ত্রে ব্রহ্মের প্রাধান্য, দ্বিতীয় মন্ত্রে স্কম্ভের প্রাধান্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এস্থলে ব্রহ্ম এবং স্কম্ভ একই। কোন কোন স্থলে ব্রহ্ম ও স্কম্ভের একত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, সত্য; কিন্তু অনেক স্থলে ব্রহ্ম অপেক্ষা স্কম্ভেরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে (১০।৭।১০,১১)। একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম স্কম্ভের মুখ (১০।৭।১৯)। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন স্থলে ব্রহ্ম স্কম্ভের অঙ্গ, কোন স্থলে ব্রহ্ম ও স্কম্ভ অভিন্ন। কিন্তু ব্রহ্ম স্কম্ভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা কোন স্থলেই বলা হয় নাই।

এই স্থলে যে ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা ঔপনিষদ ব্রহ্ম নহে। কিন্তু ইহাতে পরবর্ত্তী কালের ব্রহ্মবাদের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

(খ)

এই সূক্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাওয়া যায় (১০।৮।২৭)।

তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, এবং তুমিই কুমারী; জীর্ণ হইলে তুমিই দণ্ড ধারণ করিয়া বিচরণ কর। উৎপন্ন হইয়াই তুমি বিশ্বতোমুখ হও (অর্থাৎ সর্ব্বদিকেই তোমার মুখ)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই মন্ত্রকে ব্রহ্ম পক্ষে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অংশ দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু ইহা যে ঔপনিষদ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র রচিত হইয়াছে।

(গ)

কিন্তু এই সূক্তের শেষ দুইটি মন্ত্র যে ব্রহ্ম ও আত্মবিষয়ক, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

মন্ত্র দুইটি এই :—

১। নবদ্বারবিশিষ্ট এবং ত্রিগুণ দ্বারা আবৃত একটি পুণ্ডরীক আছে। ইহাতে এক আত্মবান্ যক্ষ বাস করেন ইহা ব্রহ্মবিদ্‌গণ জানেন (১০।৮।৪৩)।

সাধারণতঃ দেহকে নবদ্বারবিশিষ্ট, এবং হৃদয়কে পুণ্ডরীক বলা হয়। কিন্তু এখানে হৃদয়কেই নবদ্বার-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে যে যক্ষের কথা বলা হইল, ইহা মানবাত্মা। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই যক্ষকে জানেন, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে এই যক্ষ ব্রহ্মই। যিনি জ্যোতির্ব্বিৎ, তিনি জ্যোতিষ্কের কথাই জানেন; জ্যোতির্ব্বিৎ অশ্বতত্ত্ব বা গোতত্ত্ব জানেন এ-প্রকার ভাষা অর্থশূন্য। তেমনি যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন। যদি বলা হয় 'ব্রহ্মবিৎ এই যক্ষকে জানেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যক্ষই ব্রহ্ম; অন্ততঃ ব্রহ্মের সঙ্গে এই যক্ষের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ইহাই যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ব্রহ্মই আত্মরূপে এই দেহে বর্ত্তমান।

ইহার পরের মন্ত্র এই :—

২। (তিনি) অকাম, ধীর, অমৃত, স্বয়ম্ভু, ও রসতৃপ্ত, তিনি কিছু হইতেই ন্যূন নহেন। সেই ধীর, অজর, যুবা আত্মাকে জানিলে মৃত্যুর ভয় থাকে না (১০।৮।৪৪)।

এখানে যে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্ম-তত্ত্বের কথা বলা হইল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই দুইটি মন্ত্রে উপনিষদের আত্মা ও ব্রহ্মেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

অন্যত্র (১০।২।৩১-৩৩) ইহার অনুরূপ এবং আরও সুস্পষ্ট কয়েকটি মন্ত্র আছে, তাহার বিষয় পরে (ষষ্ঠ অংশে) আলোচিত হইবে।

৬। পার্ষ্ণি সূক্ত।

অথর্ব্ববেদে পুরুষ সূক্তের অনুরূপ একটি সূক্ত আছে (১০।২)। কোন স্থলে পুরুষকে অমানব এবং বিরাট্ পুরুষ বলিয়া মনে হয় এবং কোন মন্ত্রের পুরুষ একজন সাধারণ মানব। এই পুরুষের সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ তাহাও এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে।

(ক)

একস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে :—

পুরুষের হস্ত পদ অঙ্গুলী প্রভৃতি কে সংযোজন করিল? কোন্ দেবতাই বা অপান ব্যান সমানাদি প্রদান করিল? এই উগ্রপুরুষ কোথা হইতে প্রিয়, অপ্রিয়, আনন্দ, নিরানন্দ, প্রভৃতি প্রাপ্ত হইল? কোন্ এক দেবতা এই পুরুষে যজ্ঞ, সত্য, অনৃত, মৃত্যু ও অমৃত স্থাপন করিল? (১-১৭ মন্ত্র)।

এস্থলে যে পুরুষের কথা বলা হইল, সে পুরুষ সাধারণ মানব।

(খ)

অষ্টাদশ মন্ত্র এই :—

কাহার দ্বারা (এই পুরুষ) ভূমিকে আবৃত করিয়াছিল? কাহার দ্বারা আকাশকে বেষ্টন করিয়াছিল? কাহার দ্বারা 'পর্ব্বতাদি' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল? ১০।২।১৮।

এই স্থলে যে পুরুষের কথা বলা হইল, সে পুরুষ সাধারণ মানব নহে।

(গ)

ঋষির আর-একটি প্রশ্ন এই :—

কাহার দ্বারা সে শ্রোত্রিয় লাভ করিয়া থাকে? কাহার দ্বারা সে পরমেষ্ঠীকে প্রাপ্ত হইয়াছে? কাহার দ্বারা সে অগ্নিকে লাভ করে এবং কাহার দ্বারা সে বৎসরকে পরিমাপ করে? ১০।২।২০।

ইহার উত্তর এই :—

ব্রহ্মই শ্রোত্রিয় লাভ করেন, ব্রহ্মই পরমেষ্ঠী প্রাপ্ত হয়েন, ব্রহ্মই পুরুষরূপে এই অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং ব্রহ্মই বৎসর পরিমাপ করেন।১০।২।২১।

(ঘ)

ইহার পরের প্রশ্ন :—

কি ভাবে সে দেবগণের মধ্যে বাস করে? কি ভাবে সে দৈবজনী লোকের মধ্যে বাস করে? ১০।২।২২।

ইহার উত্তর :—

ব্রহ্মই দেবগণের মধ্যে বাস করেন, ব্রহ্মই দৈবজনী লোকগণের মধ্যে বাস করেন। ১০।২।২৩।

(ঙ)

ইহার পরের প্রশ্ন :—

কাহার দ্বারা ভূমি বিহিত হইয়াছে? কাহার দ্বারা দ্যৌ উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? এই বিস্তৃত অন্তরিক্ষ

কাহার দ্বারা উর্দ্ধে ও তির্য্যক্ দিকে প্রসারিত হইয়াছে? ১০।২।২৪।

ইহার উত্তর :—

ব্রহ্ম দ্বারাই ভূমি বিহিত হইয়াছে, ব্রহ্ম দ্বারাই দ্যৌ উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়াছে, ব্রহ্ম দ্বারাই ঐ বিস্তৃত অন্তরিক্ষ উর্দ্ধে ও তির্য্যক্‌দিকে প্রসারিত হইয়াছে। ১০।২।২৫।

(চ)

যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, সে সমুদায়ই পুরুষ ইহা নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে :—

উর্দ্ধদিকে পুরুষই সৃষ্ট হইয়াছে, তির্য্যক্‌দিকে পুরুষই সৃষ্ট হইয়াছে, পুরুষই সর্ব্বদিক্ হইয়াছে। ১০।২।২৭।

এই সূক্তে যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, সে পুরুষ একদিকে সাধারণ মানব, অপরদিকে অমানব বিরাট্ পুরুষ। যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহা পুরুষই। ব্রহ্মই এই পুরুষের স্রষ্টা, ব্রহ্মই জগতের বিধাতা। কিন্তু এই সূক্তে ইহা অপেক্ষাও একটি গূঢ় কথা আছে।

(ছ)

গূঢ়-অর্থ-প্রকাশক সেই কয়েকটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। ব্রহ্মের পুর অমৃত দ্বারা আবৃত; যিনি ইহার বিষয় জানেন, ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে চক্ষু প্রাণ এবং প্রজা প্রদান করেন। ১০।২।২৯।

২। ব্রহ্মের যে 'পুর', এই 'পুর' শব্দ হইতেই 'পুরুষ' শব্দ হইয়াছে। এই ব্রহ্মপুর বিষয়ে যিনি জানেন জরা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে চক্ষু বা প্রাণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। ১০।২।৩০।

৩। দেবগণের পুর দুর্ভেদ্য; অষ্টচক্র এবং নবদ্বার-বিশিষ্ট। ইহাতে এক হিরণ্ময় কোশ বর্ত্তমান; এই কোশই স্বর্গলোক; ইহা জ্যোতি দ্বারা আবৃত। ১০।২।৩১।

৪। এই পুরের তিনটি অরা, তিনটি প্রতিষ্ঠা। ইহাতে 'আত্মবান্' এক যক্ষ (অর্থাৎ এক পূজ্য পুরুষ) বাস করেন। ব্রহ্মবিৎগণ এই পুরুষকে অবগত হয়েন। ১০।২।৩২।

৫। জ্যোতির্ম্ময়, হরিতবর্ণ (পীতবর্ণ), যশো দ্বারা পরিবেষ্টিত, হিরণ্ময় এবং অপরাজিত সেই পুরে (অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ হৃদয়ে) ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন। ১০।২।৩৩।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে এই কয়েকটি তত্ত্ব পাওয়া গেল :—

১। মানবদেহই ব্রহ্মপুর।

২। ইহার অভ্যন্তরে এক হিরণ্ময় কোশ আছে। হৃদয়কেই এই কোশ বলা হইয়াছে। উপনিষদেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে। (মুণ্ডক, ২।২।৯)।

৩। এই কোশে এক আত্মবান্ যক্ষ বাস করেন। মানবাত্মাকেই আত্মবান্ যক্ষ (আত্মন্ বৎ যক্ষম্) বলা হইয়াছে।

৪। সর্ব্বশেষে বলা হইল ব্রহ্মই মানবদেহস্থ এই কোশে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম মানবদেহে বাস করেন, এইজন্যই দেহকে ব্রহ্মপুর বলা হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে ঋষি বিশ্বাস করিতেন মানবাত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আত্মরূপে মানবদেহে প্রবেশ করিয়াছেন।

এখানে যে ব্রহ্মবাদের কথা বলা হইল তাহা উপনিষদেরই ব্রহ্মবাদ।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গসাহিত্য

রচনা-ভঙ্গী বা রচনা-রীতি (style), শব্দ বা পদ-বিন্যাসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে। কোন বিশিষ্ট লেখকের রচনা-রীতির আলোচনায়, শব্দের ব্যাকরণ-শুদ্ধি বা অলঙ্কারাদির বিশুদ্ধতার হিসাব করিলেই চলিবে না। এই হিসাবের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু উহা গৌণ। সাহিত্যের রচনা-রীতি, তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, লেখকের মানসিক প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং, রচনা-রীতির উন্নততর ও গভীরতর আলোচনা আবশ্যক।

একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত এই রচনা-রীতিকে Organology of writing বলিয়াছেন। ভিতরের প্রয়োজনের তাড়নায় বা বাহ্যপ্রকৃতির সহিত নিত্যসমুত্থিত সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক প্রেরণায় জীব-জীবনে নব নব কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে গড়িয়া উঠে। ইহাই অভিব্যক্তিবাদের মত। কোন কোন জীব-জীবনের কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে, সেই জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। কোন সাহিত্যের রচনা-রীতির পারম্পর্য্য বা ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে, আমরা বাহিরের দিকে যেমন শব্দবিজ্ঞানের ও অলঙ্কারশাস্ত্রের কতকগুলি সঙ্কেত বা সন্ধান পাই, তেমনি ভিতরের দিকে সেই সাহিত্য যে জাতির, সেই জাতির মানস-জীবনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের পরিচয় পাই। অতএব রচনা-রীতি সম্যক্‌-রূপে বুঝিতে হইলে, লেখকের ভাব ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য তাঁহার মানসিক প্রকৃতির স্থায়ী সুর এবং সেই স্থায়ীভাবের উপর নানারূপ সঞ্চারীভাবের বিলাস-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। মানস-ক্ষেত্রে নব নব চিন্তার তরঙ্গ জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে, শব্দের সাহায্যে তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মানসিক জীবনের উপর আবার ক্রিয়া করিতেছে—বাহিরের সহিত ভিতরের এই প্রকারের আদান প্রদান ও ঘাত প্রতিঘাত রচনা-রীতির মধ্যে পরিব্যক্ত হয়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া শক্তির অনুশীলন ব্যতিরেকে রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।

যাঁহারা প্রকৃত সাহিত্যিক, বা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া যান, তাঁহাদের প্রত্যেকের একটি নিজস্ব থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজস্ব আছে—তবে, কাহারও বিকশিত হয়, কাহারও হয় না। এই নিজস্বকে বিকশিত ও পরিস্ফুট করিয়া, যিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহা দান করিতে পারেন, তিনিই ধন্য—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই বরেণ্য। এই নিজস্ব যেমন ভাব, চিন্তা ও অনুভব-বৈচিত্র্য বা কল্পনার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়, তেমনি যে ভাষায় ঐ ভাব পরিব্যক্ত হয়, সেই ভাষার ছন্দ, ভঙ্গী বা রচনা-রীতির মধ্য দিয়াও তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করে। ইহাকে আমরা সাহিত্যিক চরিত্র বা মানসিক প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বলিতে পারি। রচনা-রীতির নির্দ্ধারণ, বাক্যবিশেষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের বিচারণা বা বিশ্লেষণের দ্বারা হইবার নহে। রচনা-রীতির প্রাণ আছে। সমগ্র অখণ্ড অনুভবের দ্বারা সেই প্রাণের উপলব্ধি করিতে হইবে। রচনা-রীতির মধ্যে নিজের মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত করা, সাহিত্যসেবক মাত্রেরই সাধনার বিষয় হওয়া উচিত। সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-রীতির পর্য্যালোচনার সময়, এই সত্যটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-রীতি বুঝিবার জন্য, তাঁহার জীবন ও সাধনা বুঝিতে হইবে। তাঁহার সাধনায় ধ্বংস ও গঠন—এই দুই প্রকারের উপকরণ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে—'খণ্ডন' ও 'মণ্ডন' বলে। এই ভাঙ্গাগড়া সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা, সেকালের রক্ষণশীল পণ্ডিত ও সমাজপতিগণের নেতৃত্বে রাজা রামমোহন রায়ের সুমহৎ সাধনার এই ধ্বংসের দিক্‌ই দেখিয়াছিলেন—গঠনের দিক্‌ অধিকাংশ লোকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার সুবিধা পায় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নততর আলোচনার প্রারম্ভে শিক্ষার্থিগণের সমক্ষে এই সুবিধা আনিয়া দেওয়া আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায় ধ্বংসকামী বিপ্লববাদী ছিলেন না। ইহা তাঁহার রচনা-রীতির দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। তিনি যাহা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কারণ, তাঁহার রচনার গতি একেবারেই সরল ও স্বচ্ছন্দ নহে। মানুষকে উত্তেজিত করিয়া ক্ষিপ্রবেগে কোনও সিদ্ধান্ত বিশেষে লইয়া যাইবার উষ্ণতা, রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়ে ছিল না। তাঁহার মানসিক চরিত্রের ধৈর্য্য ও সর্ব্বতোমুখীনতা ও সকলের প্রতি সুবিচার করিবার প্রয়াস, তাঁহার রচনা-রীতি আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রতিপক্ষকে তিনি সর্ব্বদাই অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মানুষের উপর তাঁহার অটল শ্রদ্ধা ছিল। মানবজাতির অতীতের সাধনা যে অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী, তাহা তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-রীতি হইতে এই সত্যগুলি অনায়াসে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এক শ্রেণীর লেখকের মানসিক উষ্ণতা বা উগ্রতা খুব বেশী। তাঁহারা বিহ্বলভাবে একটি বিশেষ মত প্রতিষ্ঠার জন্য সবেগে ধাবমান হন। ঐ মতের বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে, বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সেগুলিকে ওজন করিয়া তাহাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে তাঁহারা অসম্মত। এই শ্রেণীর লেখকগণের ভাষার গতি স্বভাবতঃ স্বচ্ছন্দ ও সরল হইয়া থাকে। গভীরভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত পাঠকগণ ভাষার প্রবাহের দ্বারা বাহিত হইয়া যান। রাজা রামমোহন রায়ের মানসিক চরিত্র যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই প্রকারের স্বচ্ছন্দ ও প্রবাহময় ভাষা, তাঁহার রচনায় আশা করিতে পারেন না। চিন্তার প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অপর পক্ষে কি বলা যাইতে বা ভাবা যাইতে পারে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতেছেন, এবং তাহাদের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া তাহাদের প্রতি সুবিচার করিয়া ধীর মন্থর গতিতে বহু প্রকারের চিন্তা ও মতবাদপরিপূর্ণ পথহীন অরণ্যের মধ্য দিয়া নিজের চিন্তার রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। এই কারণে চিন্তার গতি হঠাৎ থামিয়া যাইতেছে, সর্ব্বদাই বক্র ও বন্ধুর পথে আলোড়িত হইতেছে। তিনি একটি প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ কাল সেই নূতন প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিতেছেন। এই নূতন প্রসঙ্গের অবতারণাই বা কেন হইল, আর ইহার আলোচনা দ্বারা মূল প্রসঙ্গের পুষ্টিই বা কিরূপে হইল, সাধারণ পাঠক অনেক সময়ে তাহা ধরিতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক যদি সঠিকরূপে তাহা ধরিতে চাহেন, তাহা হইলে রাজা যাঁহাদের জন্য গ্রন্থ লিখিতেছেন, বা যাঁহাদের সহিত তর্ক করিতেছেন, তাঁহাদের সংস্কার ও মানসিক প্রকৃতি উত্তমরূপে অনুভব করা প্রয়োজন হইবে। পাঠক যদি ধৈর্য্যের সহিত, তাঁহার চিন্তার গতি এই-প্রকারে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে কিছুক্ষণ ক্লান্তভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত ঋজু পথে আসিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিবেন। ভাষার এই জটিল ও বঙ্কিম গতি রামমোহন রায়ের পক্ষে যে স্বাভাবিক তাহা, তাঁহার মানসিক চরিত্র অনুভব না করিলে, হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

ভাষা ভাবানুযায়ী হইলে যাঁহারা ভাবগ্রাহী তাঁহাদের তৃপ্তিপ্রদ হয়। লেখক যে ভাব পরিস্ফুরণ বা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, সেই ভাবের পরিস্ফুরণের একটি পথ বা প্রণালী আছে। এই পথ সকল সময় ঋজু পথ নহে। আবার এই পথে অগ্রসর হইবার কালে সকল সময় ক্ষিপ্রবেগে যাওয়া যায় না। সুতরাং ভাবস্ফুরণের প্রণালীর অনুরোধেই ভাষা অনেক সময় জটিল ও মন্থরগতি হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখক যদি নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হন, তাহা হইলে ভাষার জটিলতা সহৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর না হইয়া সুখদায়ক হইয়া থাকে।

রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র বিশ্বাস করিতেন এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার এই শাস্ত্র-বিশ্বাস, কি প্রকারের বিশ্বাস তাহা বলা বড়ই কঠিন। তিনি যাঁহাদের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা নিজেদের শাস্ত্র-বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রামমোহন

রায় প্রতিপক্ষগণের এই শাস্ত্রবিশ্বাস স্বীকার করিয়া লইলেন এবং আলোচনা-রাজ্যে প্রতি পদক্ষেপেই শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় মীমাংসার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই কারণেই, তাঁহার রচনা অতিশয় দুরূহ ও বক্রগতি-বিশিষ্ট বা অসরল হইল। নিজের যাহা ব্যক্তব্য, তাহা বুঝাইবার জন্য, যদি পদে পদে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিতে হয়, এবং নানা শাস্ত্রের বিরোধী বচনসমূহের সমন্বয় ও মীমাংসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে ঐ রচনা স্বভাবতঃই অত্যন্ত গুরুভার হইয়া পড়ে। দুরারোহ ও দুর্গম পথে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিবার সময় পথিকের যেরূপ অবস্থা হয়, এই-প্রকারের রচনা পাঠ করিতে পাঠকেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃগণ অতীতকে ও মানবের সুবদ্ধ সংস্কারসমূহকে উপেক্ষা ও উপহাস করিয়া যে ভাবে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় যদি সেরূপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা সুগম ও সুবোধ্য হইত; এবং বর্ত্তমান যুগের আরামপ্রিয় পাঠকেরাও তাঁহার গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন। রাজা রামমোহন রায় যদি মানুষের জ্ঞান ও বিচারশক্তির নিকট শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ নিজের সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত না করিয়া তাহাদের নিম্নতর রিপু-সমূহকে উত্তেজিত করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল চিত্রাবলীর সাহায্যে অনাদর ও উপহাসের ভাষায় পাঠকগণকে চালাইয়া লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তেজস্বী অশ্বের আরোহী যেমন কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সম্মুখবর্ত্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী মানব পশু বৃক্ষ লতা প্রভৃতিকে চরণে দলন করিয়া সজোরে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়, রাজা রামমোহন রায়ের রচনাও পাঠককে ঠিক সেই প্রকারে আপন সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়া দিতে পারিত। এই প্রকারের সাহিত্য রচনা করিবার যাহা উপকরণ, রাজা রামমোহন রায়ের অধিকারে তাহা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। বিরোধী শাস্ত্রের বিবিধ প্রকারের বচন প্রমাণ তিনি এত জানিতেন যে, সেগুলিকে লইয়া তিনি ব্যঙ্গ ও কৌতুক-রস প্রচুর পরিমাণেই সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু এই প্রকারের ভাবোচ্ছ্বাসময় ঝটিকা সৃষ্টি রাজা রামমোহন রায়ের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। ইংরেজ লেখক লর্ড মেকলের রচনা পাঠ করিলে, এই ঝটিকা-সৃষ্টি বা তেজস্বী অশ্বারোহণ যে কি প্রকারের ব্যাপার, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের পর, আমাদের বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের রচনায় ও বক্তৃতায় এই প্রকারের চঞ্চল ও মসৃণ গতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। রচনারীতি যে মানসিক চরিত্রের অভিব্যক্তি ইহাই তাহার প্রমাণ।

রাজা রামমোহন রায়কে যে কিরূপ দুর্গম, সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা আজ বেশ ভাল করিয়াই আমাদের জানা আবশ্যক। পৃথিবীর দুইটি অংশ পূর্ব্বদেশ ও পশ্চিম দেশ—ইহারা উভয়ে সাধনপথে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বদেশ যেন ভগবানের কৃপায় সুগম পথে ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, আর পশ্চিম দেশ নানা অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিল। কিন্তু পূর্ব্বদেশের এই সৌভাগ্যই, তাহার দুর্দ্দশার হেতু হইল। সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে আরামে নিদ্রাগত হইয়া কেবল স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। পশ্চিম তখন উদ্যমশীল, সে পূর্ব্বদেশের ঘাড়ের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন পূর্ব্বদেশের নিদ্রাভঙ্গের প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায়ের উপর এই ঘুম ভাঙ্গাইবার ভার পড়িয়াছিল। সুদীর্ঘকালের নিদ্রার পর মানুষ যখন প্রথম জাগিয়া উঠে তখন তাহাদের যেরূপ অবস্থা, রাজা রামমোহন রায়ের সময় আমাদের দেশের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে সময়ের ইংলণ্ড্ বা ফরাসী দেশ কি বাহিরের জগতে, কি ভিতরের জগতে, অমিত উল্লাস ও উৎসাহের সহিত নানাদিকে সংগ্রাম করিয়া উন্নতি-পথে সবেগে ছুটিতেছিল। কিন্তু সুপ্তোত্থিত মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ যেরূপ সম্মুখবর্ত্তী বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন কিছু দেখিয়াও দেখিতে পায় না, এবং দেখিলেও বুঝিতে পারে না, নিজের ভিতরের আলস্যের টানে ও সুপ্তাবস্থার স্বপ্নের ঝোঁকে নিশ্চেষ্টবৎ পরিলক্ষিত হয়, রাজা রামমোহন রায়ের যুগে বাঙ্গালা ভাষার পাঠকগণের

অবস্থা অনেকটা সেইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়। এই কারণে তাঁহার রচনায় সমসাময়িক ইউরোপের সমাজ সাহিত্য বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংগ্রামের কথা এত অল্প। একমাত্র 'সংবাদ-কৌমুদী'তে সরল ভাষায় লিখিত ছোট ছোট প্রবন্ধের সাহায্যে, তিনি দেশের লোককে বাহিরের অধ্যবসায়শীল ও উন্নতিমুখ জগতের সহিত পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দেশের লোক তখন শাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই জানিত না। আবার এই শাস্ত্র নিতান্ত আংশিক-রূপে জানিত। নব্যন্যায়ের আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রতিভা যতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক, পরবর্ত্তী সময়ে এই নব্যন্যায়ের আলোচনা যে এই 'বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপ-ব্যবহার' করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ন্যায়দর্শনে—বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প—এই তিন প্রকার তর্ক বা আলোচনার কথা আছে। উভয় পক্ষ যেখানে সত্য জানিতে উৎসুক, কেহ কাহাকেও তর্কে পরাস্ত করিতে চাহে না, সেই অবস্থার যে আলোচনা বা বিচার, তাহার নাম—'বাদ'। আর, অপরের মত না শুনিয়া ও না বুঝিয়া, কেবল তর্কনৈপুণ্য ও বাক্‌চাতুরীর দ্বারা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করিবার যে চেষ্টা তাহার নাম—'জল্প'। আর, প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করিয়া অপদস্থ করিবার যে অবস্থা, তাহার নাম—'বিতণ্ডা'।

নবদ্বীপের নব্যন্যায় প্রধানতঃ এই জল্প, ও বিতণ্ডার উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চরিত্রের যে অধোগতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এযুগে বলিলাম—মানসিক চরিত্রের অধোগতি; কিন্তু রাজা রামমোহন রায় সে কথা বলেন নাই। সে সময়ের পণ্ডিতদিগের মানসিক অবস্থার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংস্কার ও বিশ্বাস মানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদেরই প্রণালী অনুসারে তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কারণেই রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনায় শাস্ত্রীয় আলোচনার বাহুল্য ঘটিয়াছে। কেবল শাস্ত্রের বাক্য ও শাস্ত্রের মীমাংসা লইয়া যদি রাজা রামমোহন রায়কে বিব্রত হইতে না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে হৃদ্য ও সুপাঠ্য অনেক সামগ্রী তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে দিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া, জনসংঘের চিন্তাগত মুক্তিপথ নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাঁহার গদ্য রচনাকে দুরূহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা-রীতি তাঁহার মানসিক প্রকৃতিরই পরিচায়ক।

ভাষা বা সাহিত্য ভাবগোপনের জন্য নহে—ভাব প্রকাশের জন্য। কিন্তু যখন জাতিবিশেষের জীবন ভাবহীন নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সাহিত্যের যাহা লক্ষ্য, তাহার প্রতি মনোযোগ থাকে না, কেবল ভাষার মূর্ত্তি লইয়াই লেখকেরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও অকারণ বাদানুবাদ করেন। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় এবং তাহার অনুকরণে রচিত অনেক বাঙ্গলা কবিতায় এই দুর্দ্দশা পরিলক্ষিত হয়। পণ্ডিতেরা এমন একটি শ্লোক রচনা করিলেন যাহার পাঁচ বা সাত প্রকার অর্থ হয়। এই-প্রকারের রচনায় শব্দ-শাস্ত্রের উপর অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই রচনা ভাবসংক্রমণের উপযোগী নহে। সুতরাং এই-প্রকারের রচনাকে প্রকৃত প্রাণময় সাহিত্য বলা যায় না। রাজা রামমোহন রায় পণ্ডিতদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্য করিলেন—বড় বড় পণ্ডিতদের সহিত বিচার করা বড়ই কঠিন। তাঁহারা ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির সাহায্যে একটি শব্দ বা একটি বাক্যকে নানা সময়ে নানা-রূপে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং কথা লইয়াই মারামারি হয়—কথার যে কি অর্থ তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই প্রকারের নিষ্ফল তর্কের ঝটিকা মানবের মনোবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের একেবারেই অনুপযোগী। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকাতেই রাজা রামমোহন রায় এই-প্রকারের তর্কপ্রিয় ও শব্দসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণকে এমনি ভাবে শব্দ লইয়া ব্যায়ামচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং ব্যবহৃত বাক্য মাত্রেরই একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত অর্থ গ্রহণ করিয়া শব্দের আবরণ ভেদ পূর্ব্বক অর্থরাজ্যে বা ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। সৎ-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই সূত্রপাত।

রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতগণের সহিত অতীব নিপুণভাবে শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া নিজের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিচার মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত এই অতি প্রাচীন দেশে মানবের অধিকার ও রুচিভেদে নানা যুগে নানা শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের শাস্ত্রেরই চর্চ্চা করেন। প্রয়োজন-মত অপর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তর্ক বা বিতণ্ডা করেন বটে, কিন্তু অপরের যাহা যুক্তি তাহা শ্রদ্ধার সহিত নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করেন না। অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপনাদিগকে বেদানুগত বলিয়া স্বীকার করেন। এই-প্রকারের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কারণ ইহাতে বিরোধ ও দলাদলির নিষ্পত্তি হইবার উপায় নাই। রাজা রাম-মোহন রায়ের প্রতিভার নিদর্শন এই যে, তিনি অনেকটা অপক্ষপাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র লইয়া বিচার করিতে পারিতেন; সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে মৈত্রী হয়, প্রত্যেক সাম্প্রদায় সাধুভাবে নিজেদের শাস্ত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক উপদেশ অনুসারে চলিয়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিদ্বেষসম্পন্ন না হইয়া অপরের সহিত তাঁহাদের যে মিলনের ভূমি রহিয়াছে সেই ভূমি যাহাতে দেখিতে পান, রাজা রামমোহন রায় সেজন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল যে হিন্দু সমাজের সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে তিনি এই মিলনের ভূমি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে, খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা খৃষ্টীয়ানদিগকেও এই উদার মতসহিষ্ণুতায় ও মৈত্রীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ভাবজীবনে কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রচলিত মত অনুকরণও করেন নাই। সমগ্র মানবজাতিকে তিনি আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রকৃতিসিদ্ধ পথে অগ্রসর হইয়া কি প্রকারে অপরের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইতে পারে, রাজা রামমোহন রায় তাহারই সাধনা করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমাদের দেশে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এখন আর পক্ষাপক্ষের দিন নাই। আমরা স্বীকার করি বা না করি, তিনি বহুল পরিমাণে আমাদের ভাব-জীবনের ও কর্ম্মজীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্য এবং বিচারপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া লাভবান্ হইবার জন্য এখন বিচারণার সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। প্রণালী নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে আলোচনা ফলপ্রদ হইবে না। রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টীয় বা বিদেশীয়গণের সহিত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম ও সাধনা লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, এখনকার দিনে আমরা যদি সেই আলোচনাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব—তিনি আমাদের কে; এই ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকারে গৌরবান্বিত করিবার জন্য, এই ভারতবর্ষকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে উচ্চতম সিংহাসনে বসাইবার জন্য, তিনি কিরূপ আগ্রহান্বিত ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিলে, আমরা রাজা রাম-মোহন রায়ের অন্তরতম প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারিব। রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার এই নিগূঢ় মর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইলে, তাঁহার অন্যান্য আলোচনা ও মতামত আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। এবং আমরা রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত আদর্শ বুঝিতে পারিব।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ গ্রন্থ ছাপাইয়া ও বক্তৃতা করিয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মের নিন্দা প্রচার করিতে-ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি মানবের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে বিচারপূর্ব্বক নিজ নিজ ধর্ম্মমত গঠন করি-বার অধিকারী, ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের মত ছিল। ইংরেজ জাতির উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম বিশ্বাস ছিল। তিনি বিবেচনা করিতেন,—ইংরেজ সকল সময়েই নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতী। তিনি খৃষ্টীয় প্রচারকগণের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রচারকগণ বিচারে আসিলেন না। তখন

তিনি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন যে, হিন্দু বা মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিষয়ক ধারণায় যে-সমুদয় ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তদপেক্ষা ভীষণতর ভ্রান্তি তাঁহাদের নিজেদেরই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যে রহিয়াছে। যদি সংশোধন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মমণ্ডলীরই সংশোধন আবশ্যক। কেবল নিন্দা করিয়া বা লোক দেখাইয়া একজন লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্লাইয়া দেওয়া বা এক ধর্ম্ম হইতে অপর ধর্ম্মে দীক্ষিত করা, কিছুতেই সঙ্গত নহে। নিরপেক্ষভাবে ও বন্ধুর ন্যায় সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করুন, জনসাধারণ এই আলোচনার সহিত পরিচিত হউক; এইপ্রকারের আলোচনা করিতে করিতে মানবমাত্রেরই হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইবে এবং তাহারা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের মতামত গঠন করিতে পারিবে। রাজা রামমোহন রায় এই মত সজোরে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাজা হিন্দুদের প্রাচীনতম ও উন্নততম বেদান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে এই মত সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়া কাহাকেও তাঁহার মতে আনিয়া দল বাঁধিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যাহা বলিতেছেন, সকলে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনুক ও শুনিয়া চিন্তা করুক—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি নিজেকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। প্রতিপক্ষের মত সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন এবং আশা করিতেন অন্যে তাঁহার মত সুযুক্তির দ্বারা খণ্ডন করুক। কিন্তু কি দেশীয় পণ্ডিতগণ, কি বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ, কেহই তাঁহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। দেশীয় পণ্ডিতগণ বাক্‌ছল, জল্প ও বিতণ্ডায় অতিমাত্র অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার পর যে কারণেই হউক, রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত অভিপ্রায় তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না—সর্ব্বদাই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বার্থহানির আশঙ্কাও যে ছিল না, তাহা নহে।

এখন রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব, জ্ঞানহীন অথচ শক্তিশালী বৈদেশিকগণ আমাদের দেশের সামগ্রীর প্রতি যখন অবিচার করিতেন, তখন রাজা রামমোহন রায় কিরূপ সিংহ-বিক্রমে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। তাঁহারা অবশ্য রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তির দ্বারা নিরস্ত হন নাই; কিন্তু দেশের যাহারা তখনকার বা ভবিষ্যতের শ্রদ্ধালু লোক, তাঁহারা নব্য ভাবুতের সমস্যা কি, এবং এই দারুণ সমস্যার মধ্যে আমাদিগকে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র ও পরাজিত—অতএব তাহার ধর্ম্ম সমাজ ও সাহিত্য সমস্তই উপেক্ষণীয়—এই ধারণার বশবর্ত্তী বৈদেশিকগণ রাজা রামমোহনের দ্বারা বহুল পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মত আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণকে অভিভূত করিতে পারে নাই; তাহার প্রধান কারণ, রাজা রামমোহন রায়ের সাধনা ও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বৈদেশিকগণের সহিত বিচার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাজা রামমোহন রায় দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন—ভাসাইয়া দেন নাই।

বৈদেশিকী চিন্তা ও সাধনার তরঙ্গসমূহ, বিপুল ও প্রচণ্ডবেগে যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষ-নিবন্ধন যে সুবিপুল ঘাত, প্রতিঘাত উপস্থিত হইল, রাজা রামমোহন রায় সেই সংঘর্ষ-তরঙ্গের শীর্ষদেশে অকুতোভয়ে বীরের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ভারতবর্ষকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। আত্ম-প্রকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় না পাইলে, এই সংঘর্ষে আত্মরক্ষা অসম্ভব। ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম কার্য্য। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের বর্ত্তমান জীবনে ও সমাজে অনেক অবাঞ্ছনীয় আবর্জ্জনা জমিয়াছে, যাহা অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা দূর করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনায় দেখা যায় যে, দেশের ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারকার্য্যে তিনি বিদেশের শাস্ত্র অভিজ্ঞতা বা সাধনার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেশীয় পদ্ধতিতে দেশীয় শাস্ত্রের সাহায্যে এবং দেশীয় বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই সংস্কারকার্য্যে দেশবাসিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বৈদেশিক সাহিত্য ধর্ম্ম

ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু দেশীয় জনসাধারণকে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারে আহ্বান করিবার সময় তিনি ঐ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। আমাদের ব্যাধি, আমরাই তাহার নিদান নির্ণয় করিব—আমাদেরই নিজেদের ঔষধের দ্বারা আমরাই তাহার আরোগ্য বিধান করিব। বৈদেশিকগণকে তিনি যেন বলিলেন—"বন্ধুগণ, আমাদের ব্যাধি আমরা বুঝিতেছি, তোমাদের ব্যাধি তোমরা নির্ণয় কর। নিজেদের ব্যাধির খবর না লইয়া, সময়ে অসময়ে অজ্ঞতাবশে আমাদের হিতৈষণা করিও না। যদি তেমনভাবে মিশিতে পার, সকলেরই মঙ্গল হইবে।" পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও প্রত্যেক সমাজ, নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।"

তবেই দেখিতেছি, রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেন নাই—অন্ধভাবে প্রাচ্যকেও গ্রহণ করেন নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—উভয়েরই ঊর্দ্ধে এক সুনির্ম্মল শাশ্বত কল্যাণ তিনি তাঁহার মানস-নেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। বেদান্তের শিক্ষার দ্বারা তিনি এই আদর্শ সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং দেশীয় ও বিদেশীয়গণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক স্বদেশপ্রেমিক ও পণ্ডিতগণ সে সময়ে যদি রাজা রামমোহন রায়কে যথার্থরূপে বুঝিতেন, তাহা হইলে নব্যভারতের সাধন-পথ হয়ত অন্যরূপ হইত। কিন্তু সেজন্য এখন বৃথা আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই।

নব্য-ভারতের আদিগুরু রাজা রামমোহন রায়, কেবল ভারতবর্ষের সাধন-ক্ষেত্রে নহে—সমগ্র মানবজাতির সাধন-রাজ্যে কত উচ্চস্থানের অধিকারী তাহা না বুঝিলে এ কালের লোকে তাঁহার বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবার কষ্ট স্বীকারে সম্মত হইবে না। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য-রচনায় অতি গভীর রস আছে এবং এমন আলোক আছে যাহা পাইলে আমরা বিশেষরূপে ধন্য ও লাভবান্ হইব। কিন্তু পরিশ্রম না করিলে, একটু বিশেষ রকমের কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইলে, এই রসের আস্বাদন হইবে না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সহিত অতি উত্তম রূপে পরিচিত হওয়া আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন। কি করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর বিস্তৃতরূপ পঠন পাঠন প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে, সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। তাঁহার রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি সিদ্ধান্ত পৃথক্ করিয়া, সেই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিগুলি এবং প্রতিপক্ষের আপত্তি ও তাহার খণ্ডনসমূহ যদি উত্তমরূপে সাজাইয়া শিক্ষার্থিগণের নিকট ধরিতে পারা যায়, এবং বর্ত্তমানযুগের চিন্তা ও চেষ্টার সহিত তাঁহার সিদ্ধান্ত ও যুক্তিপ্রয়োগের সম্বন্ধ, যদি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের ও বঙ্গ দেশের অভাবনীয় উপকার হয়।

গতানুগতিকত্ব বর্জ্জন করিয়া সমাজের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তির সূত্র অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রানুগ যুক্তির সাহায্যে প্রত্যেক নরনারী সংযত ও স্বাধীনভাবে আত্মোপলব্ধি করিবে—ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মেলন, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদ্গত মৈত্রী স্থাপন রামমোহনের সাধ্য বিষয় ছিল। মানবতার উন্নততম উদারবার্ত্তা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই বঙ্গদেশে ঘোষিত হইয়াছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি সে সময়ের উপযোগী আকারে এই-সকল কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহার কথা গ্রহণ করিবার ও সম্যক্‌রূপে বুঝিবার সামর্থ্য কেবল ভারতের নহে মানবজাতিরই ভালরূপ ছিল না। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ মহামানবের এই অভাবনীয় জাগরণের দিনে জগৎবাসী ও রাজার স্বদেশবাসীগণ রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। তাহাতে সমগ্র জগতেরই কল্যাণ হইবে এবং নব্যভারতও তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে।

শ্রী শিবরতন মিত্র

আলো

দর্শনেন্দ্রিয় যেরূপ বিস্তৃতভাবে ও যথাযথরূপে বহির্জগতের খবর আমাদিগকে দিতে পারে, আমাদের আর-কোন ইন্দ্রিয় সেরূপ পারে না। চক্ষু এই বিশাল শূন্যের গভীরতা ভেদ করিয়া অনেক দূরের খবর আমাদিগকে আনিয়া দেয়। যে-সমস্ত চেতনাশীল বস্তুর (living matter) সমবায়ে এই প্রাণীজগৎ সৃষ্ট, অতিক্ষুদ্র অণু পরমাণু যাহা জল স্থল পূর্ণ করিয়া আছে, চক্ষু তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ করে; আর প্রাকৃতিক জগৎ যে রং-বেরঙের ছটায় ও সৌন্দর্য্যের মহিমায় বিভূষিত হয়, দৃষ্টি তাহা মনোরাজ্যে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করে।

অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আমাদের এই দর্শনেন্দ্রিয়েরও আমাদিগকে একটি বিশেষ রকমের অনুভূতি দিবার ক্ষমতা আছে—আলোকরশ্মির অনুভূতি দিবার ক্ষমতাশালী চক্ষুর রেটিনা নামক পর্দ্দাটি আলোকজ্ঞাপক-স্নায়ু-মণ্ডলী ভিন্ন আর কিছু নয়। ঐ আলোক-জ্ঞাপক-স্নায়ুমণ্ডলী কোন-কিছুর দ্বারা উত্তেজিত হইলে আলোর অনুভূতি আমাদের মনে জাগে অর্থাৎ আমরা দেখিতে পাই। এই অনুভূতি কোন যান্ত্রিক (mechanical) উপায়ে—যেমন চোখের উপর কোনরূপ আঘাত বা চাপের দ্বারা অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা জাগানো যাইতে পারে। রেটিনার রক্তাধারের রক্ত একটু চালিত হইলেও এই অনুভূতি জাগে।

অতএব দেখা যায় যে বাহিরের কোন বস্তু আমাদের চক্ষু দ্বারা অনুভব করিবার সময় অর্থাৎ দেখিবার সময় সেই বাহিরের বস্তু হইতে কোন-কিছু আমাদের চক্ষুর আলোক-জ্ঞাপক-স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে। ঐ কোন-কিছুকেই আমরা আলো বলিয়া থাকি।

প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত হইলে প্রত্যেক জিনিষেরই আলোকরশ্মি বিকিরণ করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং এইরূপে তাহা স্বতঃ-আলোকিত (self-luminous) হয়। এইরূপ স্বতঃ-আলোকিত অবস্থাকে incandescence—উত্তাপে-সাদা—বলে। কাজেই স্বতঃ-আলোকিত জগৎ—যেমন সূর্য্য নক্ষত্র সর্ব্বদাই খুব বেশী তাপোজ্জ্বল অবস্থায় আছে। যে-সমস্ত কৃত্রিম উপাদানের সাহায্যে সাধারণতঃ আলো পাওয়া যায় সেগুলির আলোর পরিমাণ তাহাদের তাপোজ্জ্বল অবস্থায় আলোর হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। রাত্রিতে ঘর বাড়ী রাস্তা প্রভৃতি আলোকিত করিবার জন্য আমরা অঙ্গার ও জলজান সম্মিলিত কোন দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করি—ঐ অঙ্গার ও জলজানই কয়লা-গ্যাসের প্রধান উপাদান। যখন এই জলজান-অঙ্গার জ্বলে তখন উত্তাপের দরুণ অঙ্গার আংশিকরূপে পৃথক্ হইয়া যায় এবং একটি কঠিন জমাট অবস্থায় পরিণত হইয়া অতিসূক্ষ্ম-অংশে-বিভক্ত ও তাপোজ্জ্বল ভাবে জ্বলন্ত বাষ্পের মাঝে ভাসিতে থাকে—এইরূপে শিখার উৎপত্তি হয়। ঐ শিখার উপর কোন অদাহ্য পদার্থ ধরিলে অঙ্গারের এই অংশগুলি দেখান যাইতে পারে। ঐ সময় অঙ্গার অতিসূক্ষ্ম কালো গুঁড়ায় পরিণত হইয়া ঐ অদাহ্য পদার্থটির উপর জমাট বাঁধে—ঐ জমাট-বাঁধা জিনিষকেই ভুষা বলে। অঙ্গারের অংশগুলি শিখার একেবারে ধারে আসিয়া জ্বলে—এইখানেই প্রথম তাহারা অক্‌সিজেন বা অম্লজানের সংস্পর্শে আসে। যদি অম্লজানের জোগান কম হয় তাহা হইলে অঙ্গারের অংশগুলি আংশিক ভাবে না-জ্বলা অবস্থাতেই পলাইয়া যায় এবং ধূমের সৃষ্টি হয়। অঙ্গারের ঐ কঠিন তাপোজ্জ্বল অংশগুলির উপরই শিখার উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। কারণ জ্বালানি গ্যাসের নিজের অতি ক্ষীণ আলো মাত্র বিকিরণ করিবার ক্ষমতা আছে।

মোম, চর্ব্বি ও কেরোসিনের শিখায় এবং সাধারণ গ্যাসের শিখায় মূলতঃ কোন বেশী-কম নাই। যে জলজান-অঙ্গার গ্যাস সাধারণ গ্যাসের প্রধান উপাদান, তাহা ঐ-সবের মধ্যেও জ্বলে এবং তাহাদের শিখার উজ্জ্বলতাও অঙ্গারের সূক্ষ্ম অংশগুলির তাপোজ্জ্বল

অবস্থায় তাহাদের শিখার মাঝে ভাসার উপর নির্ভর করে।

যখন একটি কেরোসিন্‌-ল্যাম্প্‌ জলে তখন উহা একটি ক্ষীণোজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে ও অত্যধিক পরিমাণে ধূম উদ্গিরণ করিতে থাকে। এই অনুজ্জ্বলতার কারণ এই যে বাতাসের পরিমাণ এত বেশী হয় যে অঙ্গার পৃথক্‌ হইয়া তাহার সূক্ষ্ম কঠিন অবস্থা পাইবার পূর্ব্বেই উহা অম্লজানের সঙ্গে মিশিয়া অঙ্গারাম্ল বা কার্বনিক্‌ এসিড্‌ গ্যাসে পরিণত হয়। এইজন্যই কেরোসিন্‌-ল্যাম্পের শিখা উজ্জ্বল হইতে পারে না। কিন্তু যখন একটি কাচের চিম্‌নি ঐ ল্যাম্পে বসান হয়, তখন উহার আলো উজ্জ্বলতর হয়; কারণ চিম্‌নি থাকার দরুণ যে-পরিমাণ বাতাসে গ্যাসটি সম্পূর্ণরূপে জ্বলিতে পারে সেই পরিমাণ বাতাসই জোগান হয়। ইহাতে অঙ্গারের অংশগুলি তাহাদের কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শিখার উজ্জ্বলতা বাড়াইতে পারে।

এই কথাগুলি হইতে সহজেই ইহা বুঝা যায়—যে-শিখায় জলজান ও অঙ্গার সম্মিলিত ভাবে জ্বলিতে থাকে তাহার সবচেয়ে-বেশী উজ্জ্বলতা পাইতে হইলে পরিমাণ-মত বাতাসের জোগান হওয়া দরকার। যদি এর মাঝে পরিমাণ-মত বাতাস না দিয়া শুধু পরিমাণ-মত অম্লজান দেওয়া হয় তাহা হইলে এর চেয়েও বেশী উজ্জ্বলতা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি অম্লজানের পরিমাণ এই সময়ে প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে শিখার উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়, অপর পক্ষে ইহার উত্তাপ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই সময় যদি এক বাণ্ডিল লোহার তার উহার উপর ধরা যায় তখন তাহারা ছোট-ছোট তারকার ন্যায় জ্বলিয়া-উঠিয়া ফোঁটা-ফোঁটা হইয়া গলিয়া পড়ে। আর যদি চক্‌-খড়ি বা মেগ্‌নিসিয়ার মত কোন অদাহ্য পদার্থ এই উত্তপ্ত শিখার উপর ধরা যায় তাহা হইলে উহা উত্তাপে সাদা হইয়া গিয়া এক চোখ-ঝল্‌সানো আলো ছড়ায়।

যে-সমস্ত বস্তুর নিজের আলো নাই সেগুলি অন্যের নিকট হইতে ধার-করা আলোর সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। চন্দ্র ও গ্রহ প্রভৃতি এই-সব বস্তু-শ্রেণীর মাঝে পড়ে। পৃথিবীর অনেক জিনিষের মত এগুলিও সূর্য্যের নিকট হইতে আলো পায়। এই-সমস্ত অনুজ্জ্বল পদার্থের উপর যে আলো পড়ে তাহা ক্ষীণতর ভাবে প্রতিফলিত হয়, এবং যে অংশে পড়ে সেই অংশই চতুর্দ্দিকে সেই আলো প্রতিফলিত করে।

এই-রকমের প্রত্যেক আলোকিত বস্তুই তাহাদের ধার-করা আলো প্রতিফলিত করার দ্বারা নিজেকে এক-একটি আলো-বিকিরণকারী উপাদান বলিয়া প্রতিপন্ন করে। চন্দ্র ও গ্রহ প্রভৃতির ন্যায় আমাদের পৃথিবীও এই দলে আছে। প্রতিপদের দিন চাঁদ যে অতি ক্ষীণ আলো দেয়—যাহা দ্বারা তাহার একটুখানি অংশ আমাদের নয়ন-গোচর হয়, তাহা সূর্য্যের নিকট হইতে সোজা-সুজি ধার-করা নয়। সূর্য্যের নিকট হইতে ধারকরা পৃথিবীর আলোই চাঁদের উপর প্রতিফলিত হইয়া চাঁদের ক্ষীণ অংশটুকু দেখা যায়।

স্বতঃ-আলোকিত অথবা অপরের আলোতে আলো-কিত বস্তু হইতে যে আলো বাহির হয় তাহা আমাদের চক্ষুর রেটিনাকে উত্তেজিত করিয়া আমাদের মধ্যে আলোর অনুভূতি জন্মাইবার পূর্ব্বে আমাদের চক্ষুগোলক পার হইয়া তবে রেটিনাতে গিয়া পৌঁছে। আমাদের চক্ষু-তারকা, জল, বাতাস, কাচ প্রভৃতির ন্যায় যে-সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়া আলো গমন করিতে পারে সেগুলিকে স্বচ্ছ বলে; আর যে-সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে না তাহাদিগকে অস্বচ্ছ বলে। কিন্তু এই স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছের মাঝে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। কারণ একটি অস্বচ্ছ পদার্থকে খুব বেশী পরিমাণে পাতলা করিলে তাহাও স্বচ্ছ হইতে পারে। আবার স্বচ্ছ পদার্থ গাঢ় হইলে উহার ভিতর দিয়া অল্পই আলো প্রবেশ করিতে পারে। গভীর সমুদ্রে রাত্রির মত অন্ধকার বিরাজ করে, কারণ আলো জলের এক মাইলের অধিক গভীরতা ভেদ করিতে অল্পই সক্ষম হয়। অপর পক্ষে ধাতু প্রভৃতির মত অতি অস্বচ্ছ পদার্থকেও খুব পাতলা করিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে। খুব পাতলা রূপার পাত বা কাগজের ভিতর দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে।

শ্রী চারুভূষণ চৌধুরী

স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব

সাধু-বাংলা ও প্রাকৃত বাংলার মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে এই যে,—সাধু-বাংলায় তাল নেই, নৃত্য নেই, আছে কেবল একঘেয়ে সুর; সে কখনো হেলে দুলে টলে' এঁকে বেঁকে যায়, কখনো সে এলিয়ে পড়ে' লতিয়ে চলে; কিন্তু কখনো সে নর্ত্তন-ভঙ্গীতে তালে তালে পা ফেলে চলে না। পক্ষান্তরে ওই নৃত্যরঙ্গই প্রাকৃত-ভাষার বিশেষত্ব। উঠিবে পড়িবে টলিবে চলিবে ধরিতেছে করিতেছে প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে উঠ্‌বে পড়্‌বে টল্‌বে চল্‌বে ধর্‌ছে কর্‌ছে প্রভৃতি শব্দের তুলনা কর্‌লেই এ পার্থক্যটা ধরা পড়্‌বে। সাধু-শব্দগুলো গড়িয়ে গুড়িয়ে চলেছে; কিন্তু অসাধু-শব্দগুলো সৈন্যদলের মতো তালে তালে পা ফেলে মার্চ্চ্‌ করে' চলেছে। এর কারণ হচ্ছে সাধু-ভাষায় স্বরের বাহুল্য এবং প্রাকৃত-ভাষায় হসন্ত বর্ণের বাহুল্য। সাধু-বাংলায় সংস্কৃতের কাছে ধার-করা যুক্তবর্ণ ছাড়া হসন্ত বর্ণ নেই বল্‌লেই হয়। শব্দের মাঝখানে তো একেবারেই নেই। কিন্তু কথিত-বাংলায় হসন্ত বর্ণের ছড়াছড়ি এবং এগুলো শব্দের মাঝখানে থেকে পরস্পরের গায়ে ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি করে' এক অদ্ভুত তালের সৃষ্টি করে। এজন্যে সাধু-বাংলা যুক্ত-বর্ণের বহুল প্রয়োগ দ্বারা অক্ষরবৃত্তে গম্ভীর হয়ে উঠ্‌তে পারে; যথা—

> "চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সঙ্গীত-ঝঙ্কারে"

এবং মাত্রাবৃত্তে গানের সুরে ঝঙ্কার তুল্‌তে পারে; যথা—

> "ওকি শিঞ্জিত | ধ্বনিছে কনক- | মঞ্জীরে ?"

অথবা যুক্তবর্ণ একেবারে বর্জ্জন করে' একঘেয়ে সুরের ধারায় বয়ে যেতে পারে; যথা—

> "পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,
> সুখময় নীড় পড়ে' রবে তার,
> মহাকাশ হতে ওই বারে বার
> আমারে ডাকিছে সবে।"

কিন্তু এ ভাষা কিছুতেই প্রাকৃত বাংলার মতো ঘন দ্রুত তালে নৃত্যচপল হয়ে উঠ্‌তে পারে না; যথা—

> "মেঘ্‌লা থম্‌থম্‌ সূর্য্য ইন্দু
> ডুব্‌ল বাদ্‌লায় দুল্‌ল সিন্ধু।
> হেম্‌কদম্বে তৃণ-স্তম্বে
> ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রু-বিন্দু"॥

প্রাকৃত-বাংলায় সাধু-বাংলার তুলনায় স্বরসংখ্যা অনেক কম এবং হসন্ত বর্ণের সংখ্যা অনেক বেশী। এজন্যই স্বরবৃত্ত ছন্দে এমন অদ্ভুত নৃত্যতালের তরঙ্গ সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এস্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে স্বরবৃত্ত ছন্দে কেবল যে প্রাকৃত বাংলারই ব্যবহার হয় তা নয়; বরং এ ছন্দে সংস্কৃত যুক্তবর্ণের প্রয়োগ কর্‌লে ছন্দের দ্বিগুণ শোভা বৃদ্ধি হয়। উদ্ধৃত ছত্র চারটিতে আটটি যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে ছন্দের তরঙ্গভঙ্গ কেমন মুখর হয়ে উঠেছে তা অনায়াসেই বোঝা যায়। কিন্তু স্বরবৃত্তে যে-ভাষা ব্যবহৃত হয় সে-ভাষায় ইয়াছে ইয়াছিল ইতেছে ইতেছিল প্রভৃতি ঢিলে-ঢালা রকমের স্বরবহুল প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার অসম্ভব। এই স্বরবর্ণের অল্পপ্রয়োগেই স্বরবৃত্ত ছন্দে ব্যবহৃত ভাষায় বিশেষত্ব। এদিক্‌ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে প্রাকৃত-বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার বেশ সাদৃশ্য আছে এবং ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা স্বরবৃত্তের তুলনা করা যায়। যে-কোনো একখানা ইংরেজি বই খুলে পড়্‌লেই দেখা যাবে এ ভাষায় স্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও হলন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা প্রায় সমান। প্রায় প্রত্যেক শব্দেরই মাঝখানে দু-একটা করে' হলন্ত বর্ণ থাকে এবং এ বর্ণটি তার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বর্ণের মাঝখানে একটা ঢেউ তোলে। তা ছাড়া ইংরেজিতে একস্বর (monosyllabic) শব্দ অসংখ্য এবং তাদের অন্তে প্রায়ই এক-একটি হলন্ত বর্ণ থাকে; সুতরাং দুটো একস্বর শব্দকে পাশাপাশি বসালেই তাদের মাঝখানে একটা হলন্ত বর্ণ পাওয়া যায় এবং এইটেই দুটো শব্দের মধ্যে একটা তরঙ্গ-ভঙ্গী সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজি ছন্দের তরঙ্গ-লীলার প্রধান হেতু হচ্ছে এ ভাষার এ্যাক্‌সেন্ট্‌ (accent) অর্থাৎ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করার ব্যবস্থা।

ওই ঝোঁকের ব্যবস্থা থাকাতেই এ ভাষায় স্বর গুরুত্ব লাভ করে। যথা lo´-ver (লা-ভার্), daugh´-ter (ড-টার্) de´-mon (ডি-মন্)। এখানে মধ্যস্থলে হলন্ত বর্ণ না থাকা সত্ত্বেও আ অ এবং ইকারের উপর ঝোঁক থাকাতে এদের দীর্ঘ উচ্চারণ হচ্ছে। এবিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি ইংরেজি শব্দগুলোকে পর পর এমন ভাবে সাজানো যায় যে প্রতি দুই স্বরের মধ্যে একটি করে' গুরুস্বর অর্থাৎ এক্সেণ্ট্ থাকে, তাহলেই একটা ধারাবাহিক তরঙ্গ-লীলার উৎপত্তি হয় এবং ইংরেজি ছন্দোলক্ষ্মী ওই লহরী-মালায় দুল্‌তে থাকেন। যথা—

(১) (And) out a- | gain´ I | curve´ and | flow´
(To) join´ the | brim´-ming | ri´-ver,
(For) men´ may | come´ and | men´ may | go,
(But) I´ go | on´ for- | e´-ver

(২) Life´ is | re´-al | life´ is | earn´est,
And´ the | grave´ is | not´ its | goal´;
"Dust´ thou | art´, to | dust´ re- | turn´-est"
Was´ not | spo´ken | of´ the | soul´.

ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রকারেরা এ ছন্দকে দুভাগে বিভক্ত করে' থাকেন; যেখানে প্রতি পংক্তি-ছেদে দুটো স্বরের মধ্যে প্রথমটা লঘু দ্বিতীয়টা গুরু তার নাম Iambus; যেখানে প্রথমটা গুরু দ্বিতীয়টা লঘু তার নাম Trochee; কিন্তু আসলে এ দুটো ছন্দই এক, Iambusএর প্রথম স্বরটাকে একটু আল্‌গা উচ্চারণ কর্‌লেই এ ছন্দ Trochee থেকে অভিন্ন হয়ে যায়। উক্ত দৃষ্টান্ত দুটো থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। প্রথম দৃষ্টান্তটি Iambusএর, দ্বিতীয়টি Trocheeর।

দুস্বরের ছন্দ ছাড়া ইংরেজিতে তিন স্বরের ছন্দও আছে। এ ছন্দে প্রতি পাদে একটি গুরু ও দুটো লঘু স্বর থাকে—কিন্তু এ তিন স্বরের সাজানোর প্রকার-ভেদে এ ছন্দের তিনটে আকার-ভেদ হয়। প্রথমটা গুরু ও বাকি দুটো লঘু হলে তার নাম Dactyl; মধ্যস্বর গুরু এবং বাকি দুটো লঘু হলে Amphibrach; শেষের স্বর গুরু হলে তার নাম Anapaest; যথা—

(১) Touch´ her not | scorn´-ful-ly;
Think´ of her | mourn´-ful-ly,
Gent´-ly and | hu´-man-ly. (আদি গুরু)

(২) Most friend -ship | is feign´-ing,
Most lo´-ving | mere fol´-ly. (মধ্য গুরু)

(৩) Like the dawn | of the morn,
Or the dews´ | of the spring´. (অন্ত-গুরু)

কিন্তু ইংরেজিতে মোটের উপর গুরুস্বরের সংখ্যা খুব বেশি এবং লঘুস্বরের সংখ্যা খুব কম হওয়াতে এ ভাষায় দুই স্বরের ছন্দই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, তিন স্বরের ছন্দের প্রয়োগ খুব বিরল। পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে ইংরেজি ভাষা ও প্রাকৃত-বাংলা এবং ইংরেজি ছন্দ ও বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কেবল হসন্তবর্ণের প্রাচুর্য্য ও স্বরবর্ণের অল্পতাই যে এই সাদৃশ্যের একমাত্র হেতু তা নয়, ইংরেজি ছন্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করেছি বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দেও সে নিয়মগুলো অবিকল খাটে। কেবল প্রভেদ এই যে, ইংরেজিতে ঝোঁকের ব্যবস্থা বাঁধা-ধরা এবং ছন্দে এ ব্যবস্থার প্রবলতা খুব বেশি; কিন্তু বাংলায় ঝোঁকের ব্যবস্থাও শিথিল এবং তার শক্তিও অতি মৃদু। আরেকটি প্রভেদ এই যে ইংরেজিতে শব্দের আদি মধ্য অন্ত সর্ব্বত্রই ঝোঁক থাকতে পারে; কিন্তু বাংলায় এ ঝোঁক সর্ব্বদাই শব্দের আদিতে থাকে। বাংলায় যুক্ত বর্ণ বা হসন্ত বর্ণের সাহায্যে এই ঝোঁকের অভাব পূরণ করে' নিতে হয়। যাহোক্ পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলো মেনে স্বরবর্ণ বা সিলেব্‌ল্‌গুলোকে লঘুগুরু-ক্রমে সাজিয়ে গেলেই যেমন ইংরেজি ছন্দের ধ্বনি-তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তেমনি কথিত-বাংলায়ও ওই নিয়ম-গুলোর সাহায্যেই অতি অদ্ভুত উপায়ে নব নব ছন্দের সৃষ্টি করা হয়েছে। দু একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বিশদ কর্‌ছি।—

Tell´ me | not´ in | mourn´-ful num´-bers
Life´ is | but´ an | emp -ty | dream´,

এ দুটো ইংরেজি ছত্রের সঙ্গে

"মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘ্‌স-মুদ্রে চল্‌ছে মন্থন।"

এদুটো বাংলা ছত্র মিলিয়ে পড়্‌লেই দুই ভাষা এবং দুই ছন্দের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে। গুরুলঘু স্বরের এই পর্য্যায়ক্রমিক সমাবেশে যে চলনভঙ্গীর উৎপত্তি হয়েছে সে যেন সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রা। পর্য্যায়ক্রমে গতি

এবং যতি, পদোত্তোলন এবং পদক্ষেপের ফলে এ ছন্দে গমনের বেগ এবং নর্ত্তনের স্পন্দ দুই রয়েছে। যতদিন প্রাকৃত-বাংলার অন্তর্নিহিত এই শক্তিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি, ততদিন বাংলা ছন্দকে এ ভাবে তালে তালে মার্চ্চ্ করিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আবার

Pic´-ture it | think´ of it |
Dis´-so-lute | man.

এ শ্লোকাংশের সঙ্গে

"সিংহল্ দ্বীপ্ | সিন্ধুর্ টিপ্ |
কাঞ্চন্ ময়্ | দেশ্।"

এ দুটো ছত্র মিলিয়ে পড়্লেই ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা স্বরবৃত্তের নিগূঢ় ঐক্যটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রাকৃত বাংলাতেই ছন্দের এ স্পন্দন সম্ভবপর, সাধু-বাংলায় ছন্দের এমন ধ্বনিকম্পন সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব।

প্রাকৃত- বা কথিত-বাংলায় সাধু-বাংলার চাইতে স্বর-সংখ্যা অনেক কম এবং হসন্ত বর্ণের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি—একথা বলা হয়েছে। এই হসন্ত বর্ণের প্রাচুর্য্য হেতু গুরুস্বরের ঐশ্বর্য্যবিষয়ে কথিত-বাংলা সাধু-বাংলার চাইতে অধিকতর সম্পন্ন। কিন্তু তা হলেও গুরুস্বরের প্রাচুর্য্যবিষয়ে কথিত-বাংলা ইংরেজি ভাষার তুলনায় দীন। ইংরেজিতে গড়ে প্রতি দুই স্বরে একটি করে' গুরুস্বর পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলায় সাধারণত প্রতি চার স্বরে একটি যথার্থ গুরুস্বর মেলে। কাজেই ইংরেজিতে যেমন দুই স্বরের ছন্দ বেশি প্রচলিত, তেমনি বাংলা স্বরবৃত্তে চার স্বরের ছন্দের প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যথা—

"বিশ্ব-বাংলা | উঠ্ছে গড়ে' | জাগ্ছে প্রাণের | তীর্থ গো,
জাতির শক্তি- | পীঠ জগতে | গড়্ছে মোদের | চিত্ত গো।"

এই চতুঃস্বরের ছন্দই প্রাকৃত-বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর প্রধান বাহন। দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পংক্তিচ্ছেদের প্রথম বর্ণটি গুরু, আর এইটেই হচ্ছে এ ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি। কিন্তু প্রত্যক্ষত হসন্ত বর্ণ বা যুক্ত-ব্যঞ্জন বা যুক্ত-স্বরের সাহায্যে প্রথম স্বরটির গুরুত্ব টের পাওয়া না গেলেও এ ছন্দের গতির ঝোঁকেই সেটি গুরু হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম স্বর 'আকার'টির গুরু হবার কোনো প্রত্যক্ষ কারণ বিদ্যমান না থাক্লেও এখানে তার গুরু উচ্চারণই হচ্ছে; পড়ার সময় স্বভাবতই এর উপরে একটা ঝোঁক পড়ে; এইটেই এ ছন্দের বিশেষত্ব। 'জাতির' কথাটির জা স্বভাবত লঘু, এবং 'শক্তি'র শ স্বভাবত গুরু; কিন্তু যেমনি ওরা ছন্দের তালের মধ্যে পড়ে' গেল, অমনি 'শক্তি'র 'শ'র চাইতে 'জাতি'র 'জা'র শক্তি অনেক বেড়ে গেল। 'বিশ্ব'র 'বি' এবং 'বাংলা'র 'বা' উভয়ই স্বভাবত গুরু; কিন্তু ছন্দে বিশেষ-সন্নিবেশ-হেতু 'বা'র চাইতে 'বি' অনেক প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, যেখানে স্বরের স্বাভাবিক গুরুত্ব আর ছন্দের ঝোঁক একত্র মিলিত হয় সেখানে ছন্দ-শ্রী দ্বিগুণ শোভা লাভ করে। যেখানে ছন্দের ঝোঁক স্বরের স্বাভাবিক গুরুত্বের সহায়তা লাভ করে না, সেখানে ছন্দ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যথা—

"আজ্কে তোমায় দেখ্তে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান্।
সন্ধ্যারাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায় স্পন্দমান।"

এখানে ছন্দ কেমন আপন শক্তিতেই স্পন্দিত হয়ে উঠেছে; কেবল দুজায়গায় ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু

"কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি।"

এখানে ছন্দের নৃত্যভঙ্গী অনেকটা মৃদু হয়ে এসেছে; কেবল দু জায়গায় পদক্ষেপ সজোরে পড়েছে।

কিন্তু বাংলায় গুরুস্বরের অপেক্ষাকৃত অভাবহেতু যদিও চতুঃস্বরের ছন্দই প্রধানত ব্যবহৃত হয়, তথাপি গুরু-স্বরবহুল শব্দগুলোকে বেছে বেছে প্রয়োগ করলে বাংলায় দ্বিস্বর এবং ত্রিস্বরের ছন্দেও বেশ সুন্দর কবিতা রচনা করা যায়। তার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ইংরেজির মতো অত অনায়াসে বাংলায় দ্বিস্বরের কিংবা ত্রিস্বরের ছন্দ ব্যবহার করা যায় না। ইংরেজিতে প্রতি শব্দের নিজস্ব একসেন্ট্ বা ঝোঁকগুলোর যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করলে ইংরেজি ছন্দে প্রতি পাদের আদি মধ্য

বা অন্তে গুরুত্ব স্থাপন করা যায় ; বাংলাতেও তেম্‌নি হলন্ত বা যুক্তবর্ণের সাহায্যে প্রতি পাদের সকল স্থানেই গুরুত্ব স্থাপন করা যায়। যথা—Amphibrach—

Dear harp´ of | my coun´-try ! | in dark´ness | I found´ thee |
The cold´ chain | of si´-lence | had hung´ o'er | thee long´ |

বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুমটি | প্রায়
জীবন সে | দিনান্তে | ঝরেই কি | যায় ?

এখানে উভয় স্থলেই প্রতিপাদের মধ্যস্বরে গুরুত্ব রয়েছে। যাহোক, আরো কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বাংলা ছন্দের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ-শ্যামল।
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।"
(Iambus)

(২) পাথনায় নাই ফাঁস
মন তার নয় দাস
নীড় তার মোর বুক
এই মোর এই সুখ।
প্রেম তার বিশ্বাস
প্রেম তার বিত্ত
প্রেম তার নিশ্বাস
প্রেম তার নিত্য।"
(Trochee)

(৩) ওই সিন্ধুর টিপ্ | সিংহল দ্বীপ্ |
কাঞ্চনময়্ | দেশ্
ওই চন্দন্ যার্ অঙ্গের্ বাস্
তাম্বুল-বন্ কেশ্,
যার্ উত্তাল্ তাল্-বৃন্তের বায়
মন্থর্ নি-শ্বাস্,
আর উজ্জ্বল্ যার্ অম্বর আর্
উচ্ছল্ যার্ হাস্।"
(Dactyl)

যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতে প্রতিপাদের সবগুলো স্বরই গুরু, তথাপি ছন্দের ঝোঁক স্বভাবত প্রথম স্বরের উপরেই পড়েছে বলে' এদুটোকেও আদি-গুরু (অর্থাৎ Trochee ও Dactyl) বলেই ধরা গেল।

বাংলায় নিজস্ব চতুঃস্বরের ছন্দ ছাড়া ইংরেজি দ্বিস্বর এবং ত্রিস্বরের ছন্দ রচনাও কেবল যে চলে তা নয়; বাংলায় দুই স্বর ও তিন স্বরের মিশ্রণে এক নতুন ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে এই যৌগিক পঞ্চস্বরের ছন্দ রচনা করা চলে না। এ হিসাবে বাংলা স্বরবৃত্ত ইংরেজি ছন্দকেও জিতেছে। দুই স্বর ও তিন স্বরের মিশ্রছন্দের উদাহরণ, যথা—

"কার ই-ঙ্গিত্-বলে সিন্ধুর্ ঢেউ চলে
বজ্রের বেগ বাঁধা কার নিয়মে ?
খুন্-লু-ঠনরত ক্রূর্-নিঠুর যত
কার দুই পায় নত হয় চরমে ?"

তিন স্বর ও দুই স্বরের মিশ্রছন্দের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যথা—

সংসারে একদিন
থাকবে না কেউ ভাই,
আর তবে মৃত্যুর
ভয় কি রে, ভয় নাই।
নিঃশেষে দুঃখীর
অশ্রুটি শেষ কর,
সত্যেরে বক্ষের
লোর দিয়ে বেশ্ কর।

কিন্তু যদিও বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ স্বীয় শক্তিতে সমস্ত ইংরেজি ছন্দের ধ্বনি প্রায় অবিকল প্রকাশ করতে পারে এবং যদিও কোনো কোনো বিষয়ে বাংলা স্বরবৃত্ত ইংরেজি ছন্দের চাইতেও অধিকতর ক্ষমতা দেখিয়েছে, তথাপি একটি অতি গুরুতর বিষয়ে বাংলা ছন্দ এখনো ইংরেজি ছন্দের অনেক পেছনে পড়ে' আছে। ইংরেজি ছন্দের যে শক্তি-বলে ইংরেজিতে Paradise Lost, Childe Harold প্রভৃতি অতি গুরুগম্ভীর বৃহৎ কাব্য রচিত হতে পেরেছে, বাংলা স্বরবৃত্তের সে ক্ষমতা আছে কি না, তা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। বাংলা স্বরবৃত্তে 'পলাতকা'র মতো অতি উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ এবং "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি" প্রভৃতি অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করা যায় তা দেখা

গেছে। কিন্তু এ ছন্দে "মেঘনাদ-বধ"এর মতো কাব্য, বা "বসুন্ধরা"র মতো কবিতা রচিত হতে পারে কি না তা এখনো জানা যায় নি। অর্থাৎ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ ছড়া পাঁচালী ছেড়ে মহাকাব্যের বাহন হতে পারে কি না এইটে হচ্ছে প্রশ্ন। আমার বিশ্বাস ইংরেজি ছন্দে যখন গম্ভীর ও গভীর কাব্য রচনা করা সম্ভব হয়েছে, তখন বাংলা স্বরবৃত্তেও তা পারার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন না দেখা গেছে যেখানে হলন্ত বর্ণের সংখ্যাটা কিছু বেশি—সেখানে নাচুনি তালটাই ওঠে সহজে, গম্ভীর সুর প্রকাশ করা শক্ত। ইংরেজিতেও হলন্ত বর্ণের অভাব নেই এবং ও-ভাষার Trochee ছন্দে নৃত্যেরও অভাব নেই, অথচ ওই ভাষায় যখন Paradise Lost লেখা গেল তখন বাংলা স্বরবৃত্তেও গম্ভীর কাব্য রচনা করার সম্পূর্ণ আশা আছে বলে' মনে করি। আশা করি বাংলার কবিবৃন্দ এদিকে দৃষ্টিপাত করে' মাতৃভাষার রত্নভাণ্ডারের আর-একটি কক্ষ উন্মুক্ত করবেন। বাংলার অমর কবি মধুসূদন পয়ারের বেড়িপরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শৃঙ্খল উন্মোচন করে' বাংলা ভাষায় গুরুগম্ভীর মেঘমন্দ্র ধ্বনিত করেছেন। বাংলার কোন্ ভবিষ্য কবি স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দেও মহাকাব্যের দুন্দুভিধ্বনি নিনাদিত করবেন তা জানি নে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনো কবিই যে স্বরবৃত্ত ছন্দে গম্ভীর কবিতা রচনার প্রয়াস করেন নি তা নয়। বাংলার মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু বিষয়ে বাংলা সাহিত্যিকগণের পথপ্রদর্শক, বাংলার কাব্যোদ্যানে বসন্তসমাগমের তিনিই একমাত্র অগ্রদূত বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের পুরোবর্ত্তী এই বিশাল ক্ষেত্রের দিকে যে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি তা মনে হয় না। অন্তত একটি কবিতায় একবার তিনি স্বরবৃত্তের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে তাকে ছত্রের পর ছত্রে যথেচ্ছ প্রসারিত করে' নেবার প্রয়াস পেয়েছেন। ছন্দপারদর্শী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি কবিতাতেও এ প্রয়াসের নিদর্শন দেখা যায়। এস্থলে রবিবাবুর "পরমায়ু" নামক কবিতা থেকে প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি। পাঠক তার গতি এবং যতির বিচিত্র ভঙ্গীর দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন এ ছন্দ অক্ষরবৃত্তের চাইতে ঢের বেশি স্বাভাবিক অথচ অক্ষরবৃত্তের গাম্ভীর্য্য প্রকাশের সব শক্তিই এ ছন্দের রয়েছে।

"যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝরণা-স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার ধারা
চল্‌ছে বয়ে চতুর্দ্দিকে। কালের যোগে নয়ত মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাতির সাতনলী হার, নয় সে নিশাস-বায়ু।"

কিন্তু এখানেই বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের অদ্ভুত ক্ষমতা শেষ হল না। বাংলা শব্দের প্রত্যেকটি স্বরকে অতি সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করে' লঘুগুরু-ভেদে তাদের এমন ভাবেও সাজানো যায় যে, তাতে বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দে শুধুই ইংরেজি কেন সংস্কৃত আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষারও বহু ছন্দের তালকে ধরে' রাখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা,

'পিঙ্গল্ বিহ্বল্ | ব্যথিত নভতল্ |
কই গো কই মেঘ | উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ
মন্দ্র-মন্থর বচন কও।
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ
দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে' যাও
অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম্।"

সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, একয়টা ছত্র পড়া মাত্রই তাদের কানে মন্দাক্রান্তা ছন্দের মন্দ্র ধরা দেবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এখানে প্রথম পংক্তিচ্ছেদে চারটি গুরু স্বর, দ্বিতীয় পংক্তিচ্ছেদে পাঁচটি লঘু ও একটি গুরুস্বর এবং তৃতীয় পংক্তিচ্ছেদে যথাক্রমে একটি গুরু একটি লঘু ও দুইটি গুরু স্বর এবং চতুর্থ ছেদে একটি লঘু ও দুইটি গুরু স্বর আছে। প্রত্যেক চরণেই এ স্বরগুলো অবিকল এক প্রণালীতেই সজ্জিত হয়েছে। সুতরাং এখানে সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দের পর্য্যায়ক্রম সম্পূর্ণ অব্যাহত রয়েছে। মন্দাক্রান্তার সূত্র হচ্ছে এই—

। । । । _ _ _ _ । । _ । । _ । ।
মন্দাক্রান্তা-মুধি রসনগৈ-র্মো ভনৌ তৌ-গযু গ্মম্।

এমনি করে' যদি বাংলা শব্দের লঘু ও গুরু স্বর-

গুলোকে অতি নিপুণভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে স্বরবৃত্তের সাহায্যে বহু সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় প্রবর্ত্তিত করা যায়। যথাস্থানে আমরা বাংলায় রচিত বহু সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দেবো। কেবল সংস্কৃত কেন, এ প্রণালী অবলম্বন করে' আরবী ফারসী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার বহু ছন্দকেও যে বাংলায় চালানো যায় তার অনেক প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। আরবী হজয্ ছন্দের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

হে মোর ভৈরব ভীষণ সুন্দর,
তোমার কম্বুর নিনাদ গম্ভীর
ডুবাক্ বিশ্বের হৃদয়-কন্দর
কাঁপাক্ অন্তর নিদয় দম্ভীর।

শুধু তাই নয়, লঘু ও গুরু স্বরগুলোর নব নব সমাবেশের দ্বারা বাংলায় অসংখ্য নতুন ছন্দের আবিষ্কারের সম্ভাবনাও রয়েছে। কেবল কানের উপর নির্ভর করে' স্বরগুলোকে লঘুগুরু-ভেদে এমন নতুন পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত করা সম্ভবপর যা অন্য কোন ভাষায় নেই। সুতরাং এ দিক্ থেকে বাংলায় নব নব ছন্দ রচনার যে বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত রয়েছে আশা করা যায় বাংলার ভবিষ্যৎ কবিরা তার সদ্ব্যবহার করে' বাংলা কাব্যসাহিত্যকে অপূর্ব্ব শ্রী ও সম্পদে মণ্ডিত করবেন। বাংলা ছন্দের যাদুকর সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষার এই অতি নিগূঢ় শক্তি আবিষ্কার করে' সাহিত্যিকগণকে বিস্মিত করে' দিয়েছেন, তিনিই বাংলার গুপ্ত ছন্দ-ভাণ্ডারের এই চাবিটি বাংলার কবিবৃন্দের হস্তে তুলে দিয়েছেন। এজন্য বাংলার কবিরা চিরকাল তাঁকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করবে। সত্যেন্দ্রনাথ এই স্বরবৃত্ত ধারার বহু ছন্দে বহু কবিতা রচনা করে' স্বরবৃত্তের অদ্ভুত শক্তি ও সম্পদের পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরা সকলেই তাঁর এ কৃতিত্ব স্বীকার করেন। তার পরে বাংলার তরুণ কবি কাজি নজরুল ইস্‌লাম বাংলা ছন্দ নিয়ে যে অদ্ভুত ভেল্কীবাজী দেখিয়েছেন তাতে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মূলের ভাব এবং ছন্দ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে হাফেজের কতকগুলি ফার্সী গজলের অবিকল বাংলা অনুবাদ করেছেন—এইটেও তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভারই পরিচায়ক। যাহোক আমরা যখন যথাস্থানে বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের বিস্তৃত শ্রেণী-বিভাগে প্রবৃত্ত হব তখন পাঠক অবশ্যই বাংলা ছন্দের বিপুল সম্পদের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হবেন।

বাংলা ছন্দের এই যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশালিতা, বাংলা ভাষায় স্বর-ব্যঞ্জনের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যই তার মূল কারণ। প্রাকৃত বাংলায় হলন্ত বর্ণের সুতরাং গুরুস্বরের সংখ্যা সাধুবাংলার চাইতে অনেক বেশী, কিন্তু ইংরেজি ভাষার থেকে কম। এজন্যই বাংলা স্বরবৃত্তে চতুঃস্বরের ছন্দই সাধারণত ব্যবহৃত হয়, অথচ বেছে বেছে গুরুস্বরবহুল শব্দগুলোকে প্রয়োগ করলে বাংলায় অনায়াসে দ্বিস্বরের ত্রিস্বরের এবং তাহাদের মিশ্রণে পঞ্চস্বরের ছন্দ রচনা করা যায়। কিন্তু ইংরেজিতে হসন্ত বর্ণ এবং কাজেই গুরুস্বরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়াতে সে ভাষায় চতুঃস্বরের বা পঞ্চস্বরের ছন্দ মোটেই রচনা করা যায় না। আবার স্বরবহুল সাধুবাংলা শব্দ, এবং হসন্ত-বহুল প্রাকৃত-বাংলা কিংবা যুক্তবর্ণবহুল সংস্কৃত শব্দের যথাযোগ্য মিশ্রণ করে' সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষার ছন্দ বাংলায় ব্যবহার করা যায়; কিন্তু একান্ত হসন্ত-বহুল ইংরেজিতে সে-সব ছন্দ মোটেই আনা যায় না। পূর্ব্বোক্ত মন্দাক্রান্তা ছন্দের দৃষ্টান্তটাই ধরা যাক্। এ ছন্দের অন্যান্য পর্য্যায়ক্রম ইংরেজিতে আনা যদি বা সম্ভব হয়, তথাপি দ্বিতীয় পংক্তিচ্ছেদের 'ব্যথিত নভতল' প্রভৃতি শব্দের পাঁচটি লঘুস্বর ইংরেজীতে একত্র পাওয়া তো একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া ইংরেজিতে উচ্চারণে যে-ঝোঁকের ব্যবস্থা থাকাতে তার ছন্দের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেই ঝোঁকের ব্যবস্থাই ইংরেজিতে অন্য ছন্দ প্রবর্ত্তনের একান্ত অন্তরায়। অপর দিকে সাধু-বাংলায় হসন্তের এত অভাব যে এ ভাষায় গুরুস্বর পাওয়াই দুষ্কর, সুতরাং গুরুস্বরের অভাব হেতু সাধু-বাংলায় ছন্দের স্পন্দন তোলার আশাই করা যায় না। হসন্ত-বহুল কথিত-বাংলা স্বরবহুল সাধু-বাংলা এবং যুক্তাক্ষর-বহুল সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে যে অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি হয়েছে

তার সাহায্যেই ছন্দোজগতে এ দিগ্বিজয় করা সম্ভব হয়েছে।

আশা করি এখন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত বাংলা-ছন্দপ্রবাহিনীর এই ত্রিধারার বিশিষ্ট স্বরূপ ও শক্তির পরিচয় পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়েছে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত সহ এই তিন ধারার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ও তাদের নামকরণে প্রবৃত্ত হবার আশা রইল।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

মোহমুদ্গার

দেহে তোর প্রাণ আছে ? তবে কেন ওরে ভীরু,
নিত্য-উপবাসী,
চিরমৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী !
রুদ্ধ-অশ্রু শুষ্ক চোখ, ভস্মশেষ জঠরাগ্নি-জ্বালা—
তাহারি বিভূতি মাখি', দেহে পরি' কণ্টকাস্থি-মালা,
হৃৎপিণ্ডে জ্বালাইয়া হোম-হুতাশন,
মমতা-আহুতি তায় করিয়া অর্পণ,
প্রাণ তবু হাহা করে কার লাগি ?—হে কঠোর তাপস উদাসী,
চির-উপবাসী !

রজনী তিমির-ঘোরা, কুহু-অমানিশি যাপি' প্রহরে প্রহরে,
মন্ত্র জপি' শবাসন 'পরে,
ভরিয়া কপাল-পাত্রে অবিরল অনল তরল,
অট্টহাস্যে নিবারিয়া বেদনার গলদশ্রুজল,
প্রেয়সী-নারীর মুখে হেরি' বিভীষিকা,
আপনারি বক্ষ-রক্তে পরি' জয়টীকা,
কি লভিলে ওহে বীর, বামমার্গী কাপালিক, নাস্তিক তান্ত্রিক !
ধিক্ তোমা ধিক্ !

ঊর্দ্ধমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা-মাধবী,
নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,
কল্পনার মধুবনে দ্রাক্ষা চুষি' নীরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
বুভুক্ষু-মানব লাগি' রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
মর্ত্ত্য-জনে ভুলাইবে কতদিন বিলাইয়া মোহন-আসব,
হে কবি-বাসব !

জন্ম যদি হ'য়ে থাকে অন্ধকার শূন্য হ'তে লভি' এই কায়া—
ব্যর্থ কর অদৃষ্টের মায়া !
নামহীন ধামহীন পরিচয় বহিয়া পশ্চাতে,
সম্মুখে সে বিসর্জ্জন—অন্তহীন তমিস্রার রাতে,
দণ্ড দুই দেহ ধরি'—পূর্ণ অবতার,
সুখ-দুঃখ পুণ্য-পাপে মহা-অধিকার !—
তৃপ্তি নাই তবু তাহে ? হা অভাগ্য আত্মঘাতী কাল-ক্রীড়নক
—মূর্খ মানবক !

একমাত্র সত্য এ যে—ধরণীর এই দ্বীপ মিথ্যা-পারাবারে,
মুক্তি-তীর্থ মৃত্যু-কারাগারে !
আলোকে পড়িল ছায়া কত কল্প নিরাকার থাকি' !
অনঙ্গ লভিল অঙ্গ এড়াইয়া সংহারের আঁখি !
দেহ-ক্রমে বিকশিল মনোজ-মন্দার !
শুক্তি-গর্ভে সুদুর্ল্লভ মুকুতা-সঞ্চার !—
তারে করি অবহেলা, শূন্যে বাহু প্রসারিয়া তবু হাহাকার !
একি অনাচার !

আকাশের ছত্রপটে সোম-সূর্য্য-তারকার গ্রন্থি-দীপমালা
চিরদিন এমনি উজ্জ্বলা !
এ-ধরার চেলাঞ্চল যুগান্তেও এমনি নবীন,
অক্ষয়যৌবনা শ্যামা নৃত্যচক্রে যতিভঙ্গহীন !
বিষ্ণুনাভিপদ্মশায়ী স্রষ্টা প্রজাপতি—
তারি আলিঙ্গনে বাঁধা বধূটি যুবতী !
সেই হ'ল ক্ষণ-চ্ছায়া !—তাহারি যে মাতৃ-অঙ্ক প্রত্যক্ষ ভুবন
অলীক স্বপন !

কোটীজীব-কল্লোলিত—দাঁড়াইয়া এ জীবন-বারিধি-বেলায়,
মোর চক্ষে অশ্রু উথলায়!
এই চির-সুন্দরের রূপহর্ম্ম্যে ফিরিব আবার—
কক্ষে কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয়-দুয়ার?
নিরালম্ব বায়ুভূত ছায়ার শরীর
ত্যজিবে কি পুনরায় অনাদি তিমির?
হৃদয়-বাঁশরীখানি বাজাব কি এই দেহ-পঞ্চবটী-তলে,
ভাসি' অশ্রুজলে?

কারে চেয়ে ফেলে দাও এ প্রসাদ-পরমান্ন, রে চির-ভিখারী,
আনন্দের ক্ষণ-অধিকারী!
মহাশূন্য ফিরে' পেতে একি তোর প্রাণান্ত প্রয়াস!
সে যে তোর নিত্য-সত্তা—সে যে তোর অন্তিম-আবাস!
চির-অভিশাপ সে যে—অসীম সে আয়ু!
জীবন—সৌভাগ্য তোর, নাম পরমায়ু—
আনন্দ-বিহ্বল বিধি একবার নির্ব্বিচারে করিয়াছে দান,
ওরে ভাগ্যবান্!

এস কবি, এস বীর, নির্ম্মম-সাধক এস, এস হে সন্ন্যাসী,
ছিঁড়ে ফেল অদৃষ্টের ফাঁসি!
দেহ ভরি' কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি' খুঁড়ি' লও কামনার কাচমণি-হীরা;
অন্ন খুঁটি' লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণীর স্তন-যুগে করি' দিব ক্ষত—
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জ্জর,
আমরা বর্ব্বর!

এ ধরার মর্ম্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহ-ব্যথা, সন্তান-পিপাসা—
তাই র'বে ফিরিবার আশা।
দুধের বাটিটি তুলে' রেখে দিবে সে যে মোর লাগি'—
মৃতবৎসা-জননীর বেদনা যে নিত্য রহে জাগি'!
ক্রোড়ে তার, বার বার আহ্বান-আকুল,
ঝরিবেই পরলোক-নিশীথের ফুল!
তারি তরে, ওরে মূঢ়, জেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ-ভালবাসা!
—নবজন্ম-আশা!

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

বৈদিক বিমান

পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বিমান সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে দেবগণ বিমান ব্যবহার করিয়া ভারতবাসীদিগের নিকট দেবতার সম্মান আদায় করিতেন, এবং কখন কখন কোন রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বিমান ব্যবহার করিতে দিতেন। রাবণ জোর করিয়াই কুবেরের বিমান "পুষ্পক রথ" ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের বিমান সর্ব্বত্র সকল দিকে এমন কি স্থলে ও অন্তরিক্ষে চলিত।

এতদিন বেদে বিমানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বৈদিক যুগের কোন কথা যদি পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, অথচ বেদে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। এজন্য আমি ঋগ্বেদে বিমানের সংবাদ অন্বেষণ করিতেছিলাম। সায়ণের ভাষ্যের সাহায্যে তাহা পাওয়া যায় না দেখিয়া আমি স্বাধীনভাবে ঋকের অর্থ করিতে গিয়া কয়েকটি ঋকে বিমানের সন্ধান পাইয়াছি। প্রবাসীর পাঠকগণকে তাহা উপহার দিলাম।—

(১) সোমাপূষণা রজসো বিমানং
সপ্তচক্রং রথম্ বিশ্বমিন্বং।
বিষুবৃতং মনসা যুজ্যমানং তং
জিন্বথো বৃষণা পঞ্চরশ্মিং॥ ২।৪০।৩ ঋক্

হে অভীষ্টবর্ষী সোম ও পূষা! তোমরা রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত বিমানযুক্ত। তোমাদের রথ সর্ব্বত্রগামী অবাধগতি,

ইচ্ছানুসারে নিয়মিত এবং সপ্তচক্র ও পঞ্চপক্ষ বিশিষ্ট; তোমরা প্রীত হও।

এই ঋকে চিত্রিত বিমানের উল্লেখ আছে। তাহা সর্ব্বত্র সকলদিকে ইচ্ছানুসারে অবাধে চালান যাইতে পারিত। ঐ বিমানের সাতটি চক্র ও পাঁচটি পক্ষ অর্থাৎ পাখা ছিল। সাতটি চক্র দ্বারা সম্ভবতঃ ভূমিতে চলিত। পাঁচটি পাখা দ্বারা সম্ভবতঃ অন্তরিক্ষে চলিত। বোধ হয় দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি পাখা এবং পশ্চাতে অর্থাৎ লেজে একটি পাখা থাকিত।

রমেশ-বাবুর সায়ণানুমোদিত অর্থ—হে অভীষ্টবর্ষী সোম ও পূষা! তোমরা জগতের পরিচ্ছেদক, সপ্তচক্র (১) বিশিষ্ট, বিশ্ব কর্ত্তৃক অপরিচ্ছেদ্য, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান পঞ্চরশ্মি বিশিষ্ট (২) এবং ইচ্ছামাত্রেই যোজিত রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর।

টীকা- (১) সপ্ত ঋতুরূপ সপ্তচক্র। ত্রয়োদশ মাসকে সপ্তম ঋতু বলে।—সায়ণ। (২) পঞ্চ ঋতুরূপ পঞ্চরশ্মি। হেমন্ত ও শীত ঋতু একত্র হইয়া পাঁচ ঋতু।—সায়ণ।

(২) অব সিংধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাদ্দ্রপ্সো
ন শ্বেতো মৃগস্তুবিষ্মান্।
গংভীরশংসো রজসো বিমানঃ
সুপারক্ষত্রঃ সতো অস্য রাজা॥ ৭।৮৭।৬ ঋক্

বরুণ আকাশের ন্যায় সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, মৃগের ন্যায় বলবান্, অত্যন্ত প্রশংসিত, রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত (অন্তরিক্ষ-) পারক্ষম বিমানযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদার্থের রাজা।

রমেশ-বাবুর অর্থ—সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ; গৌরমৃগের ন্যায় বলবান্, গভীরস্তোত্রবিশিষ্ট, উদকের নির্ম্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদার্থের রাজা।

(৩) সহস্রোতিঃ শতমঘো বিমানো রজসঃ কবিঃ।
ইংদ্রায় পবতে মদঃ॥ ৯।৬২।১৪ ঋক্

অশেষ প্রকারে অতি দ্রুতগামী রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত বিমানযুক্ত কর্ম্মকুশল সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছে।

এখানে সোমরস ও সোম বা চন্দ্র রাজার কথা একত্র বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশ বাবুর অর্থ—এই সোম অশেষ প্রকারে রক্ষা করেন, বিস্তর ধন দান করেন, ইনি লোকের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা, ইঁহার ক্রিয়াশক্তি অদ্ভুত। ইনি আনন্দের বিধাতা, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

(৪) অন্তরিক্ষ প্রাং রজসো বিমানীমুপ
শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান্নি
বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে॥ ১০।৯৫।১৭ ঋক্

রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত বিমানযুক্ত বশীকরণে সক্ষম আমি অন্তরিক্ষচারিণী উর্ব্বশীকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতেছি, সুকৃতের ফলদানের ইচ্ছা যেন তোমার থাকে। ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

রাজা পুরূরবা (বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার পুত্র) বিমানে আরোহণ করিয়া অন্তরিক্ষে ভ্রমণ করিতেন, ইহা এই ঋকে জানা যাইতেছে।

রমেশ-বাবুর অর্থ—(পুরূরবার উক্তি) আমি বসিষ্ঠ, অন্তরিক্ষপূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্ব্বশীকে আমি আলিঙ্গন করিতেছি। তোমার সুকৃতের সুফল যেন তোমার নিকট বর্ত্তমান থাকে। হে উর্ব্বশী! ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

(৫) যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবীচ দৃঢ়্হা
যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১০।১২১।৫ ঋক্

যিনি প্রচণ্ড বা সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও দেবলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, যিনি রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত বিমানে গমন করেন, কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?

এই ঋকে তিনটি দেবতার কথা বলা হইয়াছে—(১) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, (২) যিনি স্বর্গ ও দেবলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, (৩) যিনি রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত বিমানে অন্তরিক্ষে ভ্রমণ করেন। ঋষি প্রশ্ন করিতেছেন, তিনি এই তিন জনের মধ্যে কাহাকে পূজা করিবেন? ইহাতে জানা যাইতেছে যে এই সময় বিমানে ভ্রমণ একটি অসাধ্যসাধনের মধ্যে

গণ্য ছিল; যিনি ঐরূপ ভ্রমণ করিতে পারিতেন তিনি ভারতবাসীর নিকট দেবতা বলিয়া পূজা পাইতেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই স্বর্গ বা সুমেরু-প্রদেশবাসীগণ দেববৎ পূজিত হইতেছেন। তাই ঋষি ভাবিতেছেন কাহাকে পূজা করিবেন।

রমেশ-বাবুর অর্থ—এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক নাকলোককে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোক পরিমাণ করিয়াছেন, কোন দেবকে হব্য দ্বারা পূজা করিব?

(৬) বিশ্বাবসুরভিতন্নো গৃণাতু দিব্যো

গন্ধর্বো রজসো বিমানঃ। ১০।১৩৯।৫ ঋক্

সে দেবলোকবাসী রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিতবিমানচারী গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু ঐ সকল বিষয় উপদেশ দিন্।

এই ঋকে জানা যাইতেছে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব্বগণ বিমানে ভ্রমণ করিতেন এবং তজ্জন্য ভারতবাসীর নিকট সম্মান পাইতেন। গন্ধর্ব্বগণ সম্ভবতঃ সুমেরুপ্রদেশবাসী মঙ্গোলীয় জাতি ছিলেন।

রমেশ-বাবুর অর্থ—"বিশ্বাবসু নামে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব্ব জলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ঐ-সকল বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দিন।"

পুরাণ রামায়ণ ও মহাভারতে বিমান সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা মৎকৃত "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্বে" ১৯২ ও ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। মগধের রাজা বসু বিমানে ভ্রমণ করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে উপরিচর বসু বলা হইত।

শ্রী বিনোদবিহারী রায়

মাঘ-শেষের দুপুর

মাঘ-শেষের এই দুপুর বেলার
হাওয়াতে,
মোটেই যে মন বস্‌ল না মোর
ঘরের কোণে দাওয়াতে।
বাসনা জোর বইল উজান—
বেরিয়ে গেলাম পেরিয়ে উঠান,
আঁচল-আভাস পেলাম যে কার
চোখের-পলক-চাওয়াতে!

কে ঐ পথে পলাশ-তলার
পাশ থেকে
পালায়,—মুখে আবীর-জরী
সিঁদুর-ডুরী বাস ঢেকে।

রাঙা পায়ের আল্‌তা ঘেমে
পলাশ-তলাই গেছে রেঙে,
বকুল-বনের বাতাস উদাস
তারি সুবাস-শ্বাস লেগে।

মাঘ-শেষের এই দুপুর বেলার
হাওয়াতে,
আমের বনে জাগল মুকুল,
প্রথম বীণা পিক সাধে।
মৌমাছি ধায় গুঞ্জরণে,—
নূপুর বাজে কার চরণে?
ফাল্গুনী ঐ দাঁড়িয়ে হাসে
শীতের সিঁড়ির শেষ পাদে।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

কবীরের প্রেমসাধনা

প্রেমের যে সাধক তার খেলা যেমন সুন্দর তেমনই কঠিন। সতী যে আগুনে পুড়ে মরে, বীর যে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাও এই প্রেমসাধনার কাছে কিছুই নয়।

সাধকা খেলতো বিকট বেঁড়া মতী
সতী ঔর সূরকা চাল আগে।
সূর ঘমসান হৈ পলক দো চারকা
সতী ঘমসান পল এক লাগে।
সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জুঝনা
দেহ পর্য্যন্তকা কাম ভাঈ॥

সাধকের খেলা তো ভীষণ ও রমণীয়, সতী আর সুরের খেলা এর কাছে কি? বীরের লড়াই তো দুইচার পলকের, সতীর প্রচণ্ড সাধনা তো একটি পলের মাত্র। হয় জয় হবে তাদের, নয় জয় হবে মৃত্যুর। কিন্তু সাধকের? রাত্রি দিন তার যুদ্ধ। সতীর মত আগুনের মধ্যে একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই এক পলে তার খেলা শেষ হয়ে যায় না। কামনা তৃষ্ণা যা কত রমণীয়, যা একেবারে আপনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে, তাও তাকে ক্ষয় করতে হয়। প্রতিদিন আপনাকে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করবার এ বেদনা। এ যে সব আপনার অঙ্গের সামিল হয়ে গেছে। যতদিন একটি পরমাণুও থাকবে ততদিনই যুদ্ধ চলবে। বড় কঠিন এই লড়াই।

আপনাকে ক্ষয় করতে হবে, অথচ সম্পূর্ণ ক্ষয় করলে চলবে না। তাহলে আর সাধনা হবে কাকে নিয়ে? সে তো সাধন নয়, সে হলো নিধন।

অমোয়া কোইলি ঘীসন রহলী
ঘীসত ঘীসত লাগা সুর।

শিশুরা আমের আঁটি যে বাজায়—তারা ঘসে, আর বাজায়। ঘস্‌তে ঘস্‌তে যখন সুরটি বেজে উঠে তখন আর ঘসে না, আর ঘস্‌লে বাজ্‌বে কি? সাধকও আপনার অসার কামনা প্রভৃতি ক্ষয় করে' যখন প্রেমের সুরে বিশ্বের রাগিণীতে বেজে ওঠেন তখন তাঁর আর আত্মহত্যা করার দরকার হয় না।

এই কামকে ক্ষয় করে' সেই প্রেমকে পেতে হবে বিশ্বের সুর যাতে বাজ্‌চে।

কামকে ক্ষয় করে' প্রেমকে লাভ করা বড় কঠিন সাধনা। তা হোক, পৃথিবীতে এসে যদি সেই প্রেম না পেলাম তবে হোলো কি? আনন্দের সাগরে এসে যদি পিপাসায় মর্‌বো এমন হয়, তবে পেলে কি? প্রেমরস যে ভরে' আছে,—প্রতি শ্বাসে শ্বাসে পান কর।

সুখ সাগরমেঁ আয়কে মত জা রে প্যাসা;
নির্ম্মল নীর ভরের তেরে আগে পী লে শ্বাঁসো শ্বাঁসা॥
মৃগতৃষ্ণা জল ছাড় বাররে করো সুধারস আশা।
ধ্রু প্রহ্লাদ সুকদেব পিয়া ঔর পিয়া রৈদাসা॥
প্রেম হি সংত সদা মতবালা এক প্রেমকী আসা।
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো মিট গঈ ভয়কী বাসা॥

"অমৃতের সাগরে এসে পিপাসিত ফিরে যাস্ নে। নির্ম্মল সুধায় ভরে' ভরে' আছে এই সাগর। শ্বাসে শ্বাসে সেই পরমানন্দ-রস পান কর্। পাগল হয়ে যে কামনার মৃগতৃষ্ণার পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছিস, তা ছাড়্। অমৃতরসের তৃষ্ণা তোর্ জীবনে জেগে উঠুক। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, রবিদাস সবাই এই প্রেমরসই তো পান করেছেন। সাধকেরা এক এই প্রেমরসেরই পিয়াসী, এতেই তাঁরা সদা মত্ত হয়ে আছেন। কবীর বল্‌ছেন এই প্রেম-রস-সাগরের সন্ধান পেয়েছি বলে' আমার সব ভয়ের বাসা ভেঙ্গেছে। এই প্রেমকে জেনে আমি এখন নির্ভয় হয়েছি।"

এই প্রেম না পেলে মানবজীবনের মূল্যই বা কি! ভর্ত্তৃহরি লিখেছেন, "যে মানব-জন্ম পেয়ে তা শুধু খেয়ে দেয়েই শেষ কর্‌লে তাকে কি বোল্‌বো? সে সোনার লাঙ্গল দিয়ে আকন্দমূলেরই চাষ করে' গেল। সে বৈদূর্য্যরত্নভাণ্ডে চন্দনের কাঠ জ্বালিয়ে তিল সিদ্ধ কর্‌লে। কর্পূরখণ্ড করে কুধান্যের ক্ষেতের বেড়া দিলে। মানবজন্ম পেয়ে শুধু এই ক্ষণস্থায়ী সুখ মাত্র আদায় কর্‌লে আর কিছুই না?"

এত বড় আত্মা যে পেলে তাতে কর্‌লে কি? পরমাত্মাকে লাভ কর্‌বে না? যদি না লাভ করে' থাক তবে বৃথা জন্ম তোমার। উপনিষদ্ বলেন, "যে তাঁকে জেনে এই পৃথিবী থেকে চলে' গেল, সে ধন্য হয়ে গেল। যে তাঁকে না জেনেই চলে' গেল, সে কৃপার পাত্র হয়ে গেল।"

সামান্য যশ, সামান্য মান, ধন, গৌরব এই সবের জন্য এমন অমূল্য জীবন ফুঁকে দিলাম! সেই পরম সত্যকে জান্‌বার জন্য কিছুই কর্‌লাম না?

য়হ জীয়রা অনমোল হৈ
ভরো কৌড়ীকা ফেকা রে॥

"হায়, অমূল্য এই জীবন, এক কড়ার দানের জন্য ইহা বাজি রেখেছি।"

আমি তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলায় দান খেল্‌তে বসেছি। আমি যদি হারি, আমি তোমার; তুমি যদি হার, তুমি আমার; কোনও দিকে হার নেই। আমি অন্তরের মধ্যে যে প্রেম এনেছি, সেই বরণমালা যদি তাঁকে না দিই, তবে যে আমার সকল পবিত্রতাই নষ্ট হয়ে গেল। মনে কর দময়ন্তীর কথা। যে পরমাত্মার গলে মালা দিল, তার জীবাত্মা পবিত্র হল। তার মান রইল। যদি পরমাত্মাকে না চিন্‌তে পেরে সংসারের গলে মালা দেয় তবে জীবাত্মার পবিত্রতা সতীত্ব সবই গেল। এই যে জীবনস্বামী বিশ্বনাথের ঘরে এলাম, তাঁকে না দেখেই যদি গেলাম, তবে যে সবই বৃথা হল। যুগ যুগ তোমারই রাজত্ব; বিশ্ব তোমারই অধিকারে; কেননা জগন্নাথ যে স্বয়ংই তোমার! এই প্রেম জাগ্‌লে সব সার্থক হয়ে যাবে। তাঁর জন্যে যে বরণমালা তা তাঁকে দিলে সংসারধর্ম্ম সবই সার্থক হবে। তা নৈলে ত সব বৃথা।

সাঈঁ সব কুছ দিনহ দেত কুছ না রহ্যো।
হমহী অভাগিন নার সুকথ ত্যজ দুখ্ খ লহ্যো॥
গঈ পিয়াকে মহল পিয়া সঙ্গ ন রচী।

কহেঁ কবীর সমঝায় সমঝ হিরদে ধরো।
জুগন জুগন করো রাজ ঐসী দুর্মতি পরিহরো।

"স্বামী সবই দিয়েছেন, কিছুই বাকী রাখেন নি। আমিই যে অভাগিনী নারী সুখ ছেড়ে দুঃখই বেছে নিয়েছি। প্রিয়ের ধামে এসেও তাঁর সঙ্গে মিলন হলো না। কবীর বলেন, হৃদয়ে সমঝে দেখ, যুগ যুগ তোমারই ত রাজত্ব, এমন দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দাও।" স্বামীকে এড়িয়ে আর সব পাবার চেষ্টাই তো যথার্থ দুর্বুদ্ধি!

প্রেমে জাগ্রত আমার যৌবন আজ আমাকে তাঁর খবর দিয়েছে। তাঁকেই বরণমালা দিতে হবে,—জ্ঞান আমাকে সে খবর দিয়েছে। তাই ত তাঁর পত্র পেয়েছি। আজ আমি ব্যাকুল; হে অবিনাশী, হে প্রিয়তম, তোমার ত কালেতে কিছু আসে যায় না। হে অনাদি অনন্ত, তুমি ত অপেক্ষা করতে পার, আমি ত পারি না।

সখিয়েঁ। হমহু ভই বলমাসী।
আয়ো জোবন বিরহ সতায়ো
অব মৈঁ জ্ঞান গলী অঠিলাতি:
জ্ঞান গলীমেঁ খবর মিল গয়ে
হমেঁ মিলী পিয়াকী পাতী॥
য়া পাতীমেঁ অজব সংদেসা
অব হম মরনেকো ন ডরাতী॥
কহত কবীর সুনো ভাঈ সাধো
বর পায়ো অবীনাসী॥

"হে সখীগণ, আমিও বল্লভ-পিয়াসিনী হয়েছি। যৌবন যে এসেছে। যৌবন যে দুঃখ দিচ্ছে, এখন কিনা আমি জ্ঞানগলি ঘুরে ঘুরে মরবো! তবে জ্ঞানও ধন্য, সেখানেই তো খবর পেলাম, প্রিয়তমের পত্র মিলে গেল। সেই পত্রে অপরূপ সন্দেশ। কেমন করে' তা বুঝিয়ে বলি? তবে এটা ঠিক যে এখন আমি মরতেও ভয় করিনে। কবীর বলেন, এখন যে অবিনাশীকে বর পেয়েছি।"

হে অবিনাশী, তোমার হয়ত কালের অন্ত নাই, তাই তোমার কোন তাগিদ নাই। কিন্তু আমার যে কাল পরিমিত। এই জীবনটি আজ কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই যে অস্থায়ী সৌন্দর্য্য এ জীবনটিকে ধরে' ফুটে উঠেছে, তাকে তুমি যদি ধন্য না কর, তবে তোমার কোন তাড়া না থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো আর উপায় নেই।

চল চল রে ভঁবরা কমল পাস।
তেরা কমল গাবৈ অতি উদাস॥
খোজ করত রহ বার বার।
তন বন ফুল্যো ডার ডার॥
দিবস চারকা সুরংগ ফুল।
রহিলগ মনমেঁ লাগল শূল॥
পুহুপ পুরানে জৈবে সুখ।
তব ভোঁরা কহাঁ সমারে দুখ॥

"চল চল হে ভ্রমর, তোমার কমলের পাশে চল। তোমার কমল বড় উদাস সুরে গান করছে। বার বার সে তোমার খোঁজ করচে, তা'র তনুবনখানি যে ডালে ডালে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু হায় সে সুন্দর মনোহর ফুল' যে দিন চারেকের জন্য, সেইজন্যই তো মনের মধ্যে বেদনা লেগেই আছে। এই ফুল পুরোনো হলেই শুকিয়ে যাবে। তখন হে ভ্রমর, এই দুঃখ মিটবে কিসে! কোথায় এই দুঃখ রাখবার জায়গা হবে!"

এই জীবনটি যে শাখায় শাখায় পুষ্পিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের ভ্রমর কোথায়? এইজন্যেই তা'র মনের মধ্যে ব্যথা। এই যে সে আজ বিকশিত হয়েছে, কালই ত সে পুরাতন হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে, তখন হে ভ্রমর, আমি এ দুঃখ কোথায় রাখব? এই তো অসীমের জন্য সীমার কান্না। তিনি যদি বৈরাগী অনাসক্ত হয়ে থাকতেন, তবে তো আশাই ছিল না। আমি সীমা, তিনি অসীম। কিন্তু এখানে তো ছোট বড়র কথা নয়, এ যে প্রেম। আমি ছাড়াও তো তাঁর চলে না।

তিনি তাঁর বিশ্বপ্রকৃতিতে রাজা হলেও আমি না হলে তাঁর প্রেমস্বরূপ অসম্পূর্ণ। এই যে আমাকে ছাড়া তাঁর চলে না এই তত্ত্বটি মধ্যযুগের কবি জ্ঞানদাস বৈদেলি চমৎকার কবিত্বে প্রকাশ করেছেন।

এই লোকলোকান্তরের অধীশ্বর মহোৎসব-রত। এই প্রকৃতি তাঁর দূত। আমি তাঁর একমাত্র অতিথি। অথচ দূত এত আড়ম্বরে আসচে যে আমি তার ঐশ্বর্য্যই দেখ্‌চি। যে হিরণ্ময় পাত্রটি সত্যকে ঢেকে রেখেছে তাই দেখ্‌ছি।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্‌"

এই পাত্রখানি না সরালে দেখি কেমন করে'? দূতের আড়ম্বরই যে বাধা হোলো।

ফজরমেঁ জব আয়া য়লচি
পুশাক সুনহলী তেরি।
গমক ভর জব্ শাঁস লগায়া
চিত জাগায়া মেরী॥
দুপমেঁ হমকো কিয়া উদাসা
ক্যা পীড় দুব সমায়া।
গায়া গেরুয়া সুর মঘরবী
মরনসা রৈন আয়া॥
কাগজ কালা হরফ উজালা
ক্যা ভারী খত পায়া।
ইত্তী রৌনক কোঁরে য়লচী
তুহি য়াদ ভুলায়া॥
ভারী জলসা আজম দারত
তুহী ইক মেহমান।
খল্ক খল্কমেঁ খত হৈ ফৈলী
মগরুর হম ফরমান॥

প্রভাতে যখন এলে হে দূত, তখন তোমার সোনালী পোষাক। পুষ্পগন্ধে ভরা পবনের সুরভি নিশ্বাস লাগিয়ে আমার চিত্তকে জাগালে। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আমাকে উদাস করলে। আকাশের দিগন্তের চক্রবালে কি এক ব্যথা যেন তুমি ভরে' রেখেছ। (প্রভাতে তোমার সোনার পোষাকে, সুরভিগন্ধে মুগ্ধ হলাম, তোমার বার্ত্তা শুনবার অবসর আর হোলো না। মধ্যাহ্নে তোমার উদাস আকাশই দেখতে পেলাম। তাই আমার মন বৈরাগ্যে ভরে' গেল)। সন্ধ্যার সময় গেরুয়া সান্ধ্য সুর পশ্চিমাকাশে গাইলে, মরণের মত রাত্রি এলো। তার পর একখানি পত্র দিলে—তার কাগজখানা কালো, তার উপর আগুনের মত জ্যোতিষ্কের অক্ষরগুলো জ্বলচে। কি বিরাট পত্রখানি পেলাম। হে দূত! এত আড়ম্বর কেন তোমার? তোমাকে দেখেই তো আমার মন ভুলে গেলো। তুমি যাঁর দূত তাঁর বার্ত্তাটি আর বুঝতেই পারলাম না।

দূত (বিশ্বপ্রকৃতি) বল্লেন, "বিরাট তাঁর সভা, মহামহোৎসব তিনি করচেন, তুমি তাতে একমাত্র অতিথি। তাই লোকে লোকান্তরে পত্রখানি আমি ছড়িয়ে ধরেছি।' যেন তোমার নজরে পড়ে। আর একমাত্র অতিথির দূত বলে' আমি গর্ব্বিত। তাই আমার এই আড়ম্বর। তোমার কাছে কি আমি দীন বেশে আসতে পারি?

তাই বুঝ্‌তে পারি আমি ছাড়াও তাঁর বিশ্ব-মহোৎসব অচল হয়ে রয়েছে। আমার জন্যও তিনি ব্যগ্র। আমাকে পাবেন বলেই তিনি ভিখারী হয়ে বেরিয়েছেন।

"তোহি মোহি লগন লগায়ে রে ফকীররা।
সোবতহি মৈঁ অপনে মন্দিরমেঁ
শব্দ মার জগায়ে রে ফকীররা॥
বুড়তহী মৈঁ ভবকে সাগরমেঁ
বহিয়া পকড় সমঝায়ে রে ফকীররা॥
একৈ বচন দুজৈ বচন নহী
তুম মোসে বন্দ ছুড়ায়ে রে ফকীররা॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
প্রাণন প্রাণ লগায়ে রে ফকীররা॥

হে ফকীর, তোমাতে ও আমাতে যে প্রেমের বাঁধন বেঁধেছ! আপন মন্দিরে শুয়ে ছিলাম, সুরের আঘাতে জেগে উঠেছি। ভবসাগরে ডুবে যাচ্ছিলাম, হাতখানি ধরে' আমাকে বাঁচিয়ে দিলে, হে ফকীর! একটি মাত্র কথা কইলে, আর দ্বিতীয় কোনো কথাই নেই, আমার সব বাঁধন অম্‌নি ছুটে গেল, হে ফকীর! কবীর বলেন, হে ফকীর, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ লাগালে।

হয় তো তাঁকে দেখিনি, তবু তাঁর সুর শুনেই প্রাণ উদাসী। আমার ফকীর যিনি আমার জন্য ভিক্ষুক হয়ে বেরিয়েছেন তাঁকে কি আমি ফেল্‌তে পারি? তাঁকে আমার অদেয় কি হতে পারে?

"মোর ফকিররা মাংগি জায়,
মৈঁ তো দেখহুঁ ন পৌলোঁ।
মংগনসে ক্যা মাংগিয়ে
বিন মাংগে জো দেয়।
কহৈঁ কবীর মৈঁ হৌ রাহী কো
হোনী হোয় সো দেয়॥"

আমার ফকির ভিক্ষা করে' চলেছেন, আমি তো দেখ্‌তেও পেলাম না। ভিক্ষুকের কাছে আবার কিসের ভিক্ষা, না চাইতেই যে দেয়? কবীর বলেন, আমি তাঁরই, যা হবার হয় হোক না কেন।

তুমি আমার সব কেড়ে নিয়ে ভিখারী করে' আজ আমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছ। আজ আর আমার তো কিছু নেই, আজ আমাকেই দিতে হবে। তিনি কত যুগ ধরে' জীবন-দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছেন। আজ এখন গোলমাল কর্‌বার সময় নয়।

"জীব মহলমেঁ শিব পহুনবা
কহাঁ করত উনমাদ রে।
পহুঁছা দেরা করিলে সেরা
রৈন চলী অরন্তা রে।
জুগন জুগন করে পতীছন
সাহবকা দিল লাগারে।
সুঝত নাহী পরম সুখ-সাগর
বিনা প্রেম বৈরাগ রে॥
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
পায়া অচল সোহাগ রে।"

"জীবন মন্দিরে শিব আজ অতিথি। আজ কোথায় গোলমাল কর্‌ছিস্? দেবতা আজ পৌঁচেছেন, আজ সেবা করে' নে, রাত যে হয়ে চলে এলো। যুগ যুগ তিনি যে প্রতীক্ষা করেছেন, তাঁর চিত্ত আমাকে চেয়েছে বলেই তো। বিনা প্রেম-বৈরাগ্যে সেই পরমসুখসাগরকে দেখাই যায় না। কবীর বলেন, অচল সৌভাগ্য আজ মিলেছে।"

আজকে গোলমাল কর্‌বার সময় নয়। আজ তাঁকে সেবা কর। প্রেম-বৈরাগ্য বিনা সে পরমানন্দসাগর দেখ্‌তে পাবে না। আজ তাঁকে সব দিয়ে ধন্য হও। শিখাতে আত্মদান করে প্রদীপ, ধন্য। সমুদ্রে আপনাকে ডুবিয়ে নদী ধন্য, ফুল বিকশিত হয়ে সৌরভ লুটিয়ে দিয়ে ধন্য, সূর্য্য জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে জ্যোতি দান করে' ধন্য। এই দান বিনা, এই জ্বালা বিনা জীবন ব্যর্থ। আজ সর্ব্বস্ব দিয়ে ধন্য হও।

"আজকে দিন মৈঁ জাঁউ বলিহারী।
পীতম সাহব আয়ে মেরে পহুনা।
ঘর আংগন লগেঁ সুহৌনা॥
সব প্যাস লগেঁ মাংগন গারন।
ভয়ে মগন লখি ছবি মন ভারন॥
চরন পখারুঁ বদন নিহারুঁ।
তন মন ধন সব সাঁঈ পর বারুঁ॥
সুরত লগী সত্ত নামকী আসা।
কহৈঁ কবীর দাসনকে দাসা॥

বলিহারী যাই আমি আজকের দিনের। আজ প্রিয়তম আমার ঘরে অতিথি এসেছেন। ঘর বাহির (অঙ্গন) আজ কি শোভাই পাচ্চে! সব তৃষ্ণা আজ তৃপ্ত হয়ে মঙ্গল গাইতে লেগেছে। মনোহর তাঁর রূপ দেখে মন কোথায় ডুবে গেছে! তাঁর চরণ ধোয়াবো, বদনখানি দেখ্‌বো, তনু মন ধন সব তাঁকে উৎসর্গ কর্‌বো। প্রেম যে লেগেছে, তাঁর নামের তৃষ্ণা জেগেছে। দাসের দাস কবীর এই কথা আজ বল্‌ছেন।"

এই তো সাধনা। আমার প্রেম তাঁর প্রেমে পূর্ণ। তাঁর প্রেমও আমার প্রেম ছাড়া অপূর্ণ। তাই তিনি অসীম ধৈর্য্যে আমার জীবন-মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার সেই ভিখারীর করুণ নয়ন দুটি যদি চেয়ে দেখ তবে সব ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হতে হবে। কত যুগ আর তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বে? দেখ, আমার ফকির আজ আমাকেই ভিক্ষা করে' উদাস গান গাইতে গাইতে চলেছেন। আমার অন্তরের অন্তরে সে সুর গিয়ে বেজেছে।

(নব্যভারত, মাঘ) শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন

—

সংঘবাদ ও শিরগুজা ষ্টেট্

শিরগুজা রাজ্য, রেল ষ্টেশন থেকে ১২০ মাইল দূরে একটি উপত্যকা-ভূমি। প্রজাসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। রাজধানী অম্বিকানগর। কয়েক জন উচ্চরাজকর্ম্মচারী যুক্তি করে' রাজার কাছে এক "সংঘ" গঠনের অনুমতি চাইলেন। সে "সংঘের" উদ্দেশ্য দেশের দারিদ্র্য অভাব দূর করে' দিয়ে প্রজার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা প্রচার করা; চাষ আবাদের উন্নতি, শিক্ষা-বাণিজ্যের প্রসার, আমদানী রপ্তানীর শৃঙ্খলা প্রভৃতির দ্বারা প্রজার ন্যায্য প্রাপ্য দিয়ে এক ধনভাণ্ডার স্থাপন করা হবে; মোটামুটি রাজাকে প্রতিভূ রেখে, প্রজা তাদের উন্নতিবিধানের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে কার্য্য করবে। রাজার সম্মতি পেয়ে, এই ৩০৫৫ বর্গমাইল দেশটাকে ১৬ অংশে বিভক্ত করে' ফেলা হলো, প্রতি অংশে ৫০টি থেকে ১২০টি গ্রাম নিয়ে এই বিভাগ-গুলি গড়ে উঠ্‌লো। প্রতি বিভাগের প্রজারা তাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে' এক প্রজা-সংঘের কেন্দ্র নির্ম্মাণ করে' ফেল্‌লে। এখন এই রাজ্যের সকল দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী এই সংঘকর্ত্তৃক পরিচালিত করে' দেশের যাবতীয় কৃষিজাত বনজাত খনিজ পদার্থের লভ্যাংশ দেশহিতে ব্যয়িত হচ্ছে। সকল দেশজাত দ্রব্য কেন্দ্রশক্তির হাতে থাকায়, ভাণ্ডারে অর্থসঞ্চয় হচ্ছে এবং সে অর্থ জাতির শিক্ষা-প্রচারে শ্রমশিল্পে খনিজ দ্রব্য উদ্ধারে বহুবিধ সদনুষ্ঠানে

ব্যয়িত হচ্ছে; মোটামুটি রাজাকে প্রতিনিধি রেখেও প্রজারা নিজেদের রাজা নিজেরাই শাসন করছে, পোষণ করছে। কর্ম্মীদের ধারণা, দেশের অবস্থা এমন দাঁড়াতে পারে যে ভবিষ্যতে প্রজারা আত্মশাসন-ব্যবস্থায় সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি করবে, পুলিস আদালত এ-সবের প্রয়োজনই হবে না।

(প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ)

রামায়ণীয় যুগের কৃষিসম্পদ্

রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বরীতির অনুসরণে নিজ হস্তে হল পরিচালনা করিয়া কৌলিক রীতির সম্মান রক্ষা করিতেন। মিথিলার রাজা জনকের উক্তি হইতে এই কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজা জনক সীতার উৎপত্তি ও সীতানামের কারণ সম্বন্ধে নিজ মুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন :—

"অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ ॥
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।"

(বালকাণ্ড ৬৬ সর্গ)

অর্থ—নিজ হস্তে আমি হল কর্ষণ করিতেছিলাম, এমন সময় এই কন্যা লাঙ্গলের ফলা-মুখে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছিল, সেই-জন্য আমি উহার নাম সীতা রাখিয়াছি।

মুনি-ঋষিরা যে হল কর্ষণ করিয়া নিজ নিজ আশ্রম-ভূমির সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ চাষ আবাদ করিয়া তাহা হইতে ফসল উৎপন্ন করিতেন তাহার উল্লেখ দাক্ষিণাত্যের তপোবনসমূহের বর্ণনায় আছে। ঋষিদিগের শিষ্যেরা যে গুরুর উপদেশে ক্ষেত্র কর্ষণ ও ক্ষেত্র রক্ষা করিত মহাভারতের "ধৌম্য-আরুণী-সংবাদ" আখ্যানে তাহা পাওয়া যায়।

রামায়ণী যুগে আর্য্য-ভারতে কৃষির অবস্থা খুব উন্নত ছিল। বৃষ্টির সাময়িক অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য তখন কৃষককে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। "অদেবমাতৃক" ভূমিসমূহের জন্য রাজাকে (state) যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইত।

ভরত রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে গেলে রাম প্রশ্নচ্ছলে ভরতকে কতকগুলি রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছেন। রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ।
পরিত্যক্ত ভয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ খনিভি শোপশোভিতঃ ॥

(অযোধ্যা-কাণ্ড ১০০ সর্গ)

অদেবমাতৃক ভূভাগসমূহ ও ধাতুসমূহের খনিসমূহ দ্বারা যে-সকল ভূমি শোভিত সেই-সকল ভূমি ভয়ানক মানব ও শ্বাপদসমূহ হইতে মুক্ত ও সমৃদ্ধ আছে তো? অর্থাৎ সেই-সকল ভূমির প্রতি রাজার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য, তাহা তোমার আছে তো?

সে কালে কৃষি-ভূভাগগুলি সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিশেষিত হইত—(১) নদীমাতৃক ভূমি, (২) দেবমাতৃক ভূমি, ও (৩) অদেবমাতৃক ভূমি।

নদীমাতৃক ভূমি—যে স্থানের ভূমিতে বহু নদী প্রবাহিত হয়, সুতরাং ফসল উৎপন্ন হইতে বৃষ্টির জলের অপেক্ষা করে না। যেমন আধুনিক নিম্নবঙ্গের ভূমি।

দেবমাতৃক ভূমি—বৃষ্টির জল যে ভূভাগের কৃষির সহায়তা করে। যেমন বঙ্গ ও বেহারের ভূমি।

অদেবমাতৃক ভূমি—বৃষ্টির জল বা জলের যে স্থানে অভাব। যেমন রাজপুতনা।

জলশূন্য দেশে শত শত কূপ খনন করিয়া এবং বড় বড় নদী হইতে খাল খনন করিয়া জল প্রবাহিত করিয়া সরকার হইতে কৃষি-ব্যবস্থার সাহায্য করা হইত।

গো-সেবায় তখন জনসাধারণের প্রবল অনুরাগ ছিল। ফলে দেশে গোধনসংখ্যা এত সুপর্য্যাপ্ত ছিল যে, যে-কোন কার্য্যে সামান্য ব্যক্তিও শত শত গো অনায়াসে দান করিত।

দেশের গোধন রক্ষার জন্য রাজা গোচারণের ভূমি রক্ষা করিতেন। গাভীকুলের স্বাস্থ্য উন্নত রাখিবার জন্য বালবৎসযুক্ত গাভীদোহন পাপ বলিয়া নিষিদ্ধ ছিল।

রাম বনে গমন করিয়াছেন শুনিয়া ভরত কৌশল্যার নিকট সে সম্বন্ধে নিজ নির্দ্দোষিতা ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"বালবৎসাঞ্চ গাং দোগ্ধু র্যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥"

(অযোধ্যা ৫৭)

রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন তাহার বালবৎসযুক্ত গাভী দোহনের যে পাপ তাহা হউক।

গাভীকে পদে স্পর্শ করায় যে পাপ হয়, বলিয়া বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের বিশ্বাস, সে বিশ্বাস সুপ্রাচীন রামায়ণীয় যুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। ভরত বলিতেছেন—

গবাং স্পৃশতু পদেন গুরূন্ পরিবদে সঃ। ৩১ অ ৫৭।

তখন গো ও অন্যান্য পশুদিগের জল পানের জন্য রাস্তার পার্শ্বে রাজকীয় ব্যবস্থায় প্রতিপান-হ্রদ নির্ম্মিত থাকিত। (অযোধ্যা কাণ্ড।)

রামায়ণীয় যুগে বৃষ ও মহিষ দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ হইত। তখন দেশের বনপ্রদেশসমূহে বন্য হস্তী ছিল। রাম ভরতকে সেই বন-কুঞ্জরসমূহের রক্ষার ব্যবস্থা করেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (অঃ ১০০)

নিম্নলিখিত কৃষি-ফসলগুলির নাম রামায়ণের প্রথম ছয় খণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শালি ধান্য, নিবার ধান্য, ইক্ষু, কর্পূর, গম, নারিকেল। গাভীর দুগ্ধে তখন ঘৃত, মিষ্টান্ন, পায়স, তক্র (ঘোল), দধি উৎপন্ন হইত।

ইক্ষু হইতে শর্করা প্রস্তুত হইত। (অযোধ্যা কাণ্ড ৯১।)

ক্ষুমা (তিসি), কার্পাস, কোষ প্রভৃতির চাষ হইত।

লবণ তখন ভারতের পার্ব্বত্য ভূমিতে উৎপন্ন হইত। লবণ-সমুদ্রে লবণের উৎপত্তির কথাও রামায়ণে আছে। (সুন্দরা কাণ্ড ১১।)

(সৌরভ, মাঘ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

গৃহে প্রস্তুত কালী

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি এক স্থানে, আমাদের লিখিবার কালী সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের লোকে পূর্ব্বে এক মুষ্টি চাউল গোঁড়াইয়া, জলের সঙ্গে মিশাইয়া এবং তাহাতে প্রদীপের কালী দিয়া দিব্য কালী তৈয়ারী করিত। ইহাতে খরচও ছিল অতি সামান্য অথচ জিনিষও হইত চিরস্থায়ী। ঐ কালীর রং কিছুতেই বদ্লাইত না, যে কাগজের উপর লেখা হয় সেই কাগজ নষ্ট হইত না। কিন্তু আজকাল আর তাহা নাই। কালীর দরকার হইলে এখন লোক দোকানে দৌড়ায় এবং দুই পয়সা দিয়া বিদেশ হইতে

আমদানী কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ব্ল্যাক কালীর একটি ক্ষুদ্র বড়ি কিনিয়া আনে। সুদূর মফঃস্বলে পর্য্যন্ত আজকাল এইসব বড়ি যাইয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বেকার গৃহে প্রস্তুত কালীর তুলনায় যে এই কালী কত নিকৃষ্ট, লোক তাহা একবার ভাবেও না। ডাকপিওন চিঠি বিলি করিতে যাইয়া রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজিল, আর তাহার সঙ্গে যে-সব চিঠিপত্র ছিল তাহাতে জল লাগিয়া একেবারে অপাঠ্য হইয়া গেল। এই ত আজকালকার কালীর অবস্থা। তার পর যদি ইহা সস্তা হইত তবু একটা কথা হইত। কিন্তু তাহাও নহে। এক মুষ্টি চাউল পোড়াইয়া যদি এক বোতল কালী তৈরী হয়, তবে তাহা অপেক্ষা সস্তা আর কোন কালী হইতে পারে না। তবু যে লোক বাজারের কালী কেনে তাহার কারণ এই যে, বিদেশী জিনিষের উপর এদেশের লোকের মনে একটা ভয়ঙ্কর টান দেখা যাইতেছে। 'সভ্য' হইবার জন্য দেশের লোকের মনে একটা ভয়ঙ্কর তাগিদ জাগিয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই বিদেশে প্রস্তুত কোন জিনিষ আমরা যত দামেই হউক কিনিয়া আনিতে দ্বিধা বোধ করি না।" স্বদেশপ্রীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, অর্থসমস্যার দিক দিয়াও যে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্য অতিশয় মূল্যবান্, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

(ভাণ্ডার, অগ্রহায়ণ)

—

লতা পাতা দ্বারা কাপড় রং করা

সোনার ভারতে এত সব অফুরন্ত লতা পাতা রহিয়াছে যাহা দ্বারা কাপড়ের যে-কোন রকম ইচ্ছা রং করা যায়। পূর্ব্বে এ দেশে তাহা করাও হইত। আমাদের দেশে প্রস্তুত যে-সমস্ত কম্বলের নমুনা আছে, তাহাতে দেখা যায়, শত শত বৎসর পরেও উহাদের রং বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নাই। আজকালও আমাদের দেশে যে-সব অতি দামী এবং সুন্দর সুন্দর কার্পেট শাল বনাত তৈরী হয় এবং পাশ্চাত্য দেশে চালান দেওয়া হয়, সে-সব গাছ-গাছড়া দ্বারাই রং করা হয়। ইংলণ্ডের বড় বড় রংয়ের ব্যবসায়ীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, অতি মিহি উলের জিনিষ রং করিবার পক্ষে ভারতের নীল যতটা কার্য্যকারী, অন্যান্য নানা রকম কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত নীল ততটা নহে। ভারতের নীল লাক্ষা কুট প্রভৃতি বহু জিনিষ এখনও বিদেশে বড় আদরের জিনিষ বলিয়া গণ্য হয়। ইংলণ্ড, রুশিয়া ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া এবং জাপানে আজকাল রং করিবার বহু লতা পাতা আমেরিকা হইতে আমদানি করা হয়। একটু চেষ্টা করিলেই ভারতের এই-সব জিনিষ বিদেশের বাজারে রপ্তানী করা যাইতে পারে। আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে পাঞ্জাবে গবমেণ্টের রংয়ের বিশেষজ্ঞ মিঃ এম্ আর খোসলা ভারতের এই লুপ্ত সম্পদের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন। যদি তিনি কৃতকার্য্য হন, তবে এদেশের অনেকের একটু অন্ন-সংস্থানের উপায় হইবে। আমাদের বাংলা দেশেও গভর্মেণ্টের শিল্প-বিভাগে ডাক্তার রসিকলাল দত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার যেরূপ যশ ও প্রতিপত্তি তাহাতে তাঁহার নিকটও আমরা এই দেশী গাছ-গাছড়ার রং প্রস্তুত প্রণালী যাহাতে লোপ না হয়, এরূপ চেষ্টা অবশ্যই আশা করিতে পারি।

(ভাণ্ডার, অগ্রহায়ণ)

—

ঘরে বসিয়া ব্যবসায়

কোন একজন বিখ্যাত শ্রমশিল্পবিৎ কতকগুলি জিনিষের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, এই-সমস্ত জিনিষ অতি অল্প মূলধনে ঘরে বসিয়া প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে লাভও বিস্তর হয়। তিনি যে তালিকা দিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কতকগুলির নাম করিলাম :—

(১) মোজার কলের সাহায্যে মোজা, ছেলেদের ফ্রক প্রভৃতি প্রস্তুত; (২) নানা রকমের রুমাল; (৩) কাগজ, ছেঁড়া চট এবং মাটি দ্বারা নানাবিধ খেলনা; (৪) সূতা রং করা; (৫) বিড়ি ও সিগারেট; (৬) কাগজ এবং সিল্কের হাতপাখা; (৭) কাগজের এবং কাপড়ের নানা রকম ফুল; (৮) সতরঞ্চী ও মাদুর; (৯) পাট ও শণ দ্বারা সরু মোটা নানা রকমের দড়ি; (১০) বেত এবং বাঁশ দ্বারা নানাবিধ জিনিষ; (১১) হাতের তাঁতে কাপড় বোনা; (১২) চরকা কাটা; (১৩) নানাবিধ কার্য্যের জন্য বিভিন্ন রকমের বুরুস; (১৪) পেটেণ্ট ঔষধ; (১৫) কাগজ কাটিয়া তদ্দ্বারা খাম; (১৬) পিন-কুশন্; (১৭) সাইনবোর্ড লেখা; (১৮) ঝিনুক প্রভৃতি হইতে বোতাম; (১৯) লেস্ বোনা; (২০) সাবান প্রস্তুত প্রভৃতি। পাঠশালার ছেলেদের লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই-সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন সমবায় সমিতির সভ্যগণ এই দিকে একটু মনোযোগ দিয়া দেখিতে পারেন। বাড়ীতে নিজেরা এবং মেয়েরা অতি সহজে এই-সব কাজ করিতে পারেন।

(ভাণ্ডার, অগ্রহায়ণ)

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কালনির্ণয়

মহাভারতের আভ্যন্তর জ্যোতিষিক প্রমাণে ও পুরাণাদির সমর্থক প্রমাণে জানা যায় ১২২২ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল।

(মাধবী, মাঘ)

গোরের 'পরে ফুল

গোরের 'পরে ফুল ফুটেছে—
রঙীন ফুলের থর,
শীতের বুকে নিবিড় শত
অশোক-ফুলের নর!

আসর-ভাঙা সভায় এসে
বাজায় বীণা হায় রে কে সে,
মরার কোলে শিশুর প্রসব—
করুণ মনোহর!।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

তোষলা বা তুষু পূজা

বালিকা শিশুকাল হইতেই যে মাতৃত্বের অভিনয় করিতে ভালবাসে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা তোষলা বা তুষু পূজার মধ্যে দেখিতে পাই। আজকাল গ্রাম্য ছড়া ইত্যাদির বহুল আলোচনা দেখিয়া আমি এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে সাহসী হইলাম। আশা করি যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহা কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপভাবে প্রচলিত আছে তাহার আলোচনা করিবেন এবং ইহার মধ্যে কোন পৌরাণিকতা থাকিলে তাহা দেখাইবেন।

বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর অঞ্চলে দেখিয়াছি স্ত্রীলোকেরা কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে 'এয়োতি' বা 'ইয়তি' পূজা আরম্ভ করেন। এই পূজা অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে শেষ হয়। একখানি মাল্‌সার মধ্যে পঙ্ক দিয়া তাহার উপর নানাবিধ ওষধি ও জলজ-লতার চারা রোপণ করিয়া তাহাতে সরিষা মটর ইত্যাদি বপন করেন এবং প্রতি রবিবার তাহাতে জল দেন। উক্ত মাল্‌সাখানি অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির উষায় ভাসান হয় এবং সেই মাল্‌সাখানি বালিকাগণ গাঁদা সরিষা গুঞ্জা ইত্যাদি পুষ্পে সুশোভিত করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাহার চারিদিকে সকলে মিলিয়া নানাপ্রকার ছড়া বলে। এই ছড়াগুলির মধ্যে যেগুলি আমার স্মরণ হইতেছে সেগুলি নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

(১) তোষলা গো রাই তোমার দৌলতে আমরা
ছ'ব্‌ড়ি পিঠা খাই।
ছ'ব্‌ড়ি ন'ব্‌ড়ি গাঙ সিনানে যাই,
গাঙের জলে বাঁধি বাড়ি যমুনার জল খাই,
ছ মাস বর্ষা পথন্যাতে যাই,
পথন্যাতে দেখে এলাম দুয়ারে মরাই।
ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে বড় মরাইয়ে হাত দিয়ে
রাই উঠ্‌ছেন ঝল্‌মলিয়ে।
উঠ রাই ঝলমলিয়ে।
বেগুন-পাতা ঢলঢল মায়ের কানে সোনা দোল,
সেই সোনা জাগে ত ভাইএর বিয়ে লাগে ত।
আমরা যাব ঔড়া আন্‌ত সোনার মৌড়া
দিব ভাইয়ের বিয়া আল্‌পনাতে চাল নাই ত
নাচব ধেইয়া ধেইয়া।

(২) কুলগাছ কুলগাছ ঝাঁকুড়ি, সতীন বেটী মাকুড়ী,
সাত সতীনের সাতটা বেটা, আমার মায়ের নব কৌটা,
নব কৌটা নড়ে চড়ে, সাত সতীনের মুখটা পুড়ে।

(৩) তুষ্ তুষ্ করি আমরা তুষ্ নাই মা ঘরে গো।
কে তুষুকে নিয়ে গেল ফুলের মালা দিয়ে গো।
কাজ কি আমার ফুলের মালা বিনা ফুলে আলা গো।
একটি ফুলের জন্য তুমি করেছিলে অভিমান।
তোমার দুয়ারে দিব পারিজাত-ফুলের বাগান॥

অন্যান্য ছড়ার ন্যায় এগুলিরও অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে। প্রথমটির মধ্যে বিশেষ সুসম্বদ্ধ ভাব পরিদৃষ্ট হয় না; তবে ইহার মধ্যে বঙ্গীয় বালিকাদের Harvest Home উৎসবের ভাবী আনন্দের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। তুষু পূজার সময় পৌষ মাস। এই পৌষমাস বাংলার কৃষকের বড়ই আনন্দের সময়। কৃষকদিগের হৃদয় তখন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, কারণ এই মাস তাহার সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল প্রদান করে। মকরসংক্রান্তির পূর্ব্ব রাত্রিতে বালিকাগণ তোষলার মাল্‌সায় চারিধারে বৃত্তাকারে প্রদীপ সাজাইয়া তোষলাকে চতুর্দ্দোলে বসাইয়া গ্রাম ভ্রমণ করায় এবং সংক্রান্তির উষায় নিকটবর্ত্তী নদী তড়াগ বা পুষ্করিণীতে ভাসাইয়া দিয়া স্নান করিয়া গৃহে আসে। উক্ত রাত্রিভ্রমণকালে বালিকাগণ যখন করুণ স্বরে নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিতে থাকে তখন মনে হয় আজি যে কাল্পনিক দুঃখে তাহার হৃদয় পূর্ণ, ভবিষ্যতে সেই দুঃখ অনুভব ও সহ্য করিবার জন্যই যেন বালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

তিরিশ দিন রাখ্‌লাম মাকে তিরিশ সল্‌তে দিয়ে গো,
আর রাখিতে নার্‌লাম মাকে মকর আইছেন
নিতে গো।
এতদিন রাখ্‌লাম মাকে মা বলে' ত ডাকলে না।
যাবার সময় নগড় নিলে মা না হলে যাব না।

শ্রী রাধারমণ চক্রবর্ত্তী

কংক্রিটের তৈরী বাড়ী—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলি কংক্রিটের বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে, সেগুলিকে কয়েক হাত দূর হইতে দেখিলেও কাঠের তৈয়ারী বলিয়া ভ্রম হয়। অথচ এই সব বাড়ীর দুয়ার জান্‌লা কার্‌নিস্
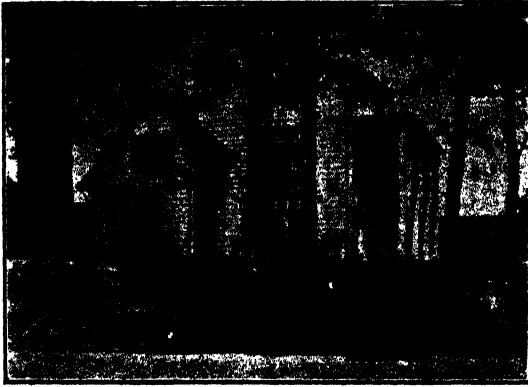
কংক্রিটের তৈরী বাড়ী

ছাদ মেঝে সীলিং সবই কংক্রিটের তৈরী। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-ইংলণ্ড্ প্রদেশে এই বাড়ীগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানের বাড়ীওয়ালারা এই নূতন রকমের বাড়ীর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেছেন। বাড়ীগুলি দেখিতেও অতীব সুদৃশ্য।

ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন—

ইংলণ্ডে আমেরিকার মত গত ১৫।২০ বছর হইতে বৈদ্যুতিক গাড়ীর চলন হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে ইংলণ্ড্ রেল-গাড়ীর মত এই গাড়ীর বহুল প্রচার করিতে পারে নাই। আমেরিকাতে এই গাড়ীর চলন খুবই বেশী হইয়াছে। ইংলণ্ডে সম্প্রতি রেল-লাইনের উপর ইলেক্‌ট্রিক
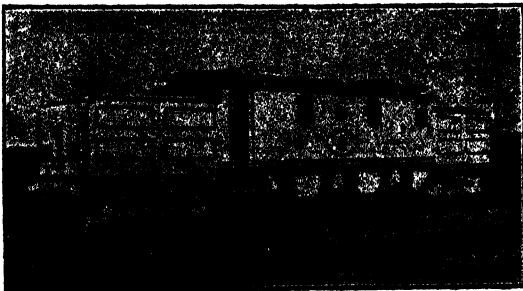
ইংলণ্ডের প্রথম ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেণ্

ইঞ্জিন চালান হইবে—অবশ্য বর্ত্তমানে কেবল ইয়র্ক এবং নিউক্যাসলের মধ্যেই এই গাড়ীর চলাচল হইবে। গাড়ীর গতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। তবে খুব বেশী দূর যাইতে হইলে গাড়ী ঘণ্টায় এক মাইলের কিছু বেশী বেগে চলিবে। ইঞ্জিনের জোর ১৮০০ 'অশ্বশক্তি' হইবে এবং ৫০০ টন ভার টানিতে পারিবে।

বিদ্যুতের শক্তি—

মানুষ আকাশের চঞ্চল বিদ্যুৎকে ধরিয়া তাহার নিজের কাজে লাগাইয়াছে। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিন এই কাজ প্রথম করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল্ ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানিতে তিন-কোণা ভাবে তিনটে ইলেক্‌ট্রোড্ ৯ ফুট অন্তর বসান হয়। এই তিনটি
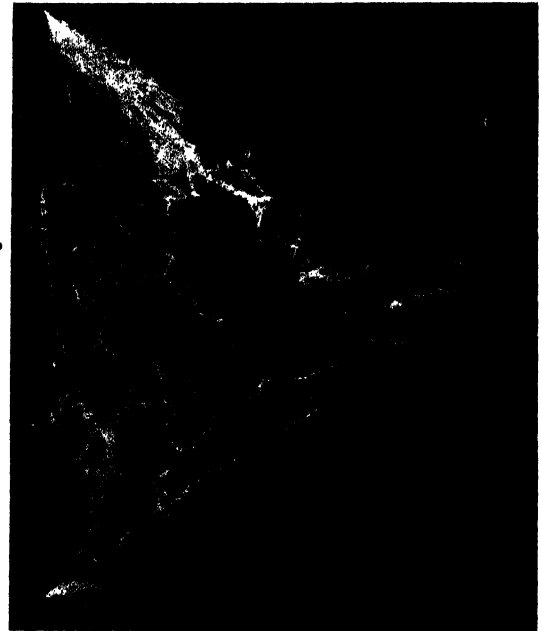
বিদ্যুৎ-শক্তির ছবি

ইলেক্‌ট্রোডের মধ্যে কোন যোগ ছিল না। ইলেক্‌ট্রোড্ তিনটির মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিবামাত্র আকাশে যেমন করিয়া মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝল্‌কাইয়া উঠে, তেম্‌নিভাবে খানিকটা বিদ্যুৎ ঝল্‌কাইয়া উঠে। এই বিদ্যুতের শক্তি দশ লক্ষ ভোল্ট। ক্যামেরার সাহায্যে সেই বিদ্যুতের ঝল্‌কানির ছবি তোলা হয়।

ধূলিভক্ষক গাড়ী—

নিউ ইয়র্কে এক প্রকার নূতন মোটর গাড়ী হইবার কথা হইতেছে।

ধূলিভক্ষক গাড়ী

এই গাড়ী রাস্তা দিয়া চলিবার সময় যে ধূলা উড়াইবে, আর এক মুখ দিয়া তাহাই আবার ভিতরে টানিয়া লইবে। তার পর গাড়ী ধূলা ভিতরে রাখিয়া বিশুদ্ধ বায়ু উপর দিয়া ছাড়িয়া দিবে, ইহাতে যাহারা রাস্তায় হাঁটিয়া যাইবে তাহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না এবং অনাবশ্যক নাকে মুখে ধূলা প্রবেশ করিবে না।

সূচীশিল্পে জীবন্ত ভল্লুক—

একজন জাপানী সূচীশিল্পী রেশমের উপর একটি মেরু-প্রদেশের ভালুক রেশম দিয়া সেলাই করিয়াছেন। ভালুকটিকে দেখিলে একেবারে

সূচীশিল্পের জীবন্ত ভল্লুক

জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। সেলাই এত সূক্ষ্ম এবং মিহি যে তাহা চোখে ধরিতে পারা যায় না। এই ভালুকের ছবি শিকাগো সহরের চিত্র-বিদ্যালয়ে দেখান হইতেছে।

মুক্তামালার নাচ—

ইউরোপে মুক্তার মালা পরিয়া নাচ হয়। প্রধান নর্ত্তকী এবং তাহার সহচরী আলোর মধ্যে আসিয়া নাচিতে থাকে, তখন হঠাৎ

মুক্তমালা-পরিহিতা নর্ত্তকী

আলো নিবাইয়া দেওয়া হয়। সেই সময় কালো পোষাকের উপর মুক্তার মালাগুলি মাত্র ঝলমল করিতে থাকে। চারিদিক্ অন্ধকার, তাহার মধ্যে মুক্তার মালার ঝিল্‌মিলানি দেখিতে বড়ই মনোরম হয়। নর্ত্তকীরা এই সময় ধীরে ধীরে তাহাদের অঙ্গ দোলায়, তাহাতে মালাগুলিও সাপের গতির মতন তালে তালে আঁকিয়া বাঁকিয়া দোল খাইতে থাকে।

মুক্তামালা পরিয়া নর্ত্তকীদের নাচ

অন্ধকারে মুক্তামালার নাচ

মোটরগাড়ীর লম্ফ—

একটা মোটরকার একটা ক্রমশঃ উঁচু রাস্তার উপর দিয়া খুব জোরে গিয়া মাঝামাঝি ধরণের উঁচু বাধা লাফ দিয়া পার হইয়া যাইতে পারে। ছবিতে দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন—একটা কাঠের রাস্তার উপর দিয়া আসিয়া মোটরকারটা কেমন অনায়াসে ১৫ ফুট উঁচু একটা ঘর পার হইয়া যাইতেছে। কাঠের রাস্তার শেষের দিক্‌টা একটু উঁচু করা আছে, তাহাতে মোটরের মুখ আকাশের দিকে ফিরিয়া গতি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া যায়।

অভিনয়

অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি সহরের একটি বিদ্যালয়ে ছেলেদের ইতিহাস
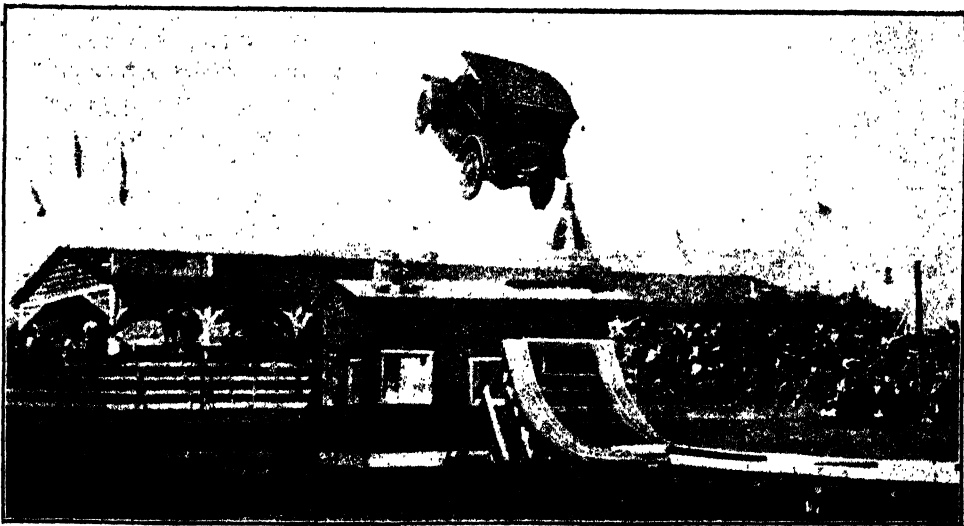
মোটর গাড়ীর লাফ
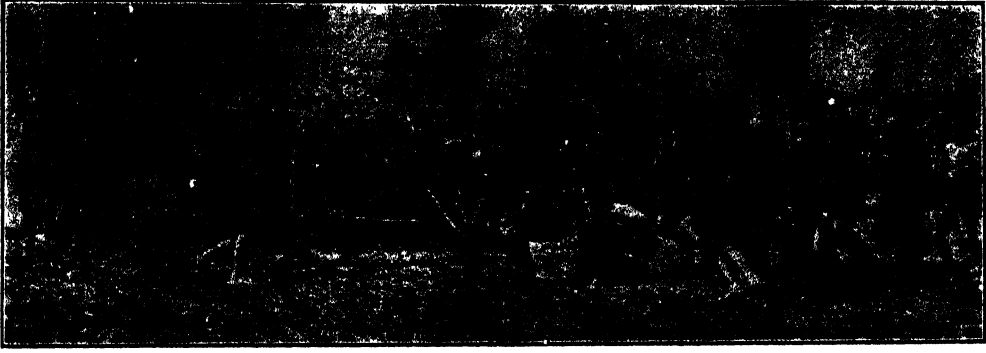
বাস্তব অভিনয়ে ইতিহাস শিক্ষা

পড়াইবার জন্য এক চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। ইতিহাসের অভিনয় করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন যুদ্ধের কথা পড়াইবার সময় শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদের লইয়া সেই যুদ্ধের অভিনয় করেন। তাহাতে ছেলেরা আনন্দ এবং শিক্ষা একই সময়ে লাভ করে। ছবিতে ছেলেরা একটা যুদ্ধের অভিনয় করিতেছে।

—

চুলের তৈরী ছবি—

যে ছবিটি দেওয়া হইল তাহা ৪০ জন মানুষের ছাঁটা চুল লইয়া তৈয়ারী হইয়াছে। এই চল্লিশ জন লোক একই পরিবারের। ছবি-

চুল দিয়া তৈরী ছবি

খানির বয়স একশ বছর। ছবিটির আকাশ, বেড় এবং আরো দু একটি সামান্য বিষয় ছাড়া সবই চুলের তৈরী।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

—

৫০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার পাদুকা—

সম্প্রতি নেভাডার এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছে। মিঃ জন্ টি রিড্ নামক একজন ভূতত্ত্ববিদ্ নেভাডার প্রস্তরস্তরের মধ্যে প্রস্তরীভূত নিদর্শনাদি খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ মানুষের পায়ের চিহ্নের মতো কি একটা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন ; ভালো করিয়া দেখিয়া পরে বোঝা গেল, উহা কাহারো খালি-পায়ের চিহ্ন নয় ; ওটি একটি জুতার 'সুকতলা', ক্রমে প্রস্তরীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সামনের অল্প খানিকটা নাই ; কিন্তু এদিকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বেশ অবিকৃতই রহিয়াছে। যাহা হোক, বিজ্ঞানের রাজ্যে এটি একটি বিষম রহস্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ যে প্রস্তর-স্তরের (triassic-যুগের স্তর) মধ্যে ইহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর। আর যদি সত্যই এটি একটি জুতার প্রস্তরাবশেষ বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকদের একটা বিশেষ ভাবনার কথা! কারণ আজ পর্য্যন্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিকের মতে মানব-সৃষ্টির বয়স সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয় তো পঞ্চাশ হাজার বৎসর ;—অর্থাৎ, ৫০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের আদিম পূর্ব্ব-পুরুষগণ তাঁহাদের বীভৎস, লোমশ, বানরাকৃতি দেহ লইয়া বিপুল লগুড় হস্তে হিংস্র পশুর মতোই বনে-বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তখন তো মানব-জ্ঞান-বিকাশের সবে অরুণোদয়!

সুতরাং "মাত্র" পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার আধুনিক প্রথার মতোই সুনির্ম্মিত একপাটি পাদুকা, বিজ্ঞানের অচল সিদ্ধান্তগুলি বেশ একটু জটিল ও সচল করিয়া তুলিয়াছে!

বিশগুণ বর্দ্ধিতাকারের ছায়াচিত্রে (microphoto) তার সেলাই-গুলি, এমনকি তার সুতার গ্রন্থিগুলি পর্য্যন্ত বেশ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে কেহ কেহ ইহাকে আসলে প্রস্তরীভূত "সুকতলা" বলিয়া স্বীকার করিতে চান নাই ; তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে উহা প্রকৃতির একটি খেয়াল বিশেষ,—a 'lusus naturae' বা freak of nature। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা ও এই পরিবর্দ্ধিত ছায়াচিত্রে সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহা মানুষের হাতে প্রস্তুত জুতার সুকতলা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার নির্ম্মাণে যথেষ্ট নৈপুণ্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। কাজেই যে মানবজাতি, পঞ্চাশলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীতে যখন 'dinosaur' জাতীয় মহাকায় ভীষণাকৃতি সরীসৃপেরা নির্ভয়ে বিচরণ করিত, সেই সুপ্রাচীন গতযুগে আধুনিক (!) প্রণালীর জুতা নির্ম্মাণ শিখিয়াছিল তাহাদের সভ্যতা নিশ্চয়ই খুব নিম্নস্তরের ছিল না!

আমরা পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের সভ্যতার নিদর্শন দেখিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাই! আর পঞ্চাশলক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার—? মানব সৃষ্টি তাহা হইলে কত বৎসরের?

প্রভাকর দাস

—

নখের বৃদ্ধি—

আমাদের হাতের নখ ঋতুবিশেষে কম-বেশী বাড়িয়া থাকে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে নখ অধিক বাড়ে। ডান হাতের নখ বামহাতের নখের অপেক্ষা বেশী বাড়ে। আঙুলের মধ্যে কড়ে আঙুলের নখ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা তর্জ্জনী ও অনামিকা অপেক্ষা বেশী বাড়ে। নখের বৃদ্ধির এইরূপ বিভিন্নতার কারণ কি জানা যায় না। সম্পূর্ণভাবে বাড়িতে প্রত্যেক নখের প্রায় সাড়ে চারিমাস সময় লাগে। সত্তর বৎসর ধরিয়া যদি নখ না কাটিয়া ক্রমান্বয়ে বাড়িতে দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রতিবৎসরে আধ ইঞ্চি হিসাবে বাড়িয়া লম্বায় ৭ ফুট ৯ ইঞ্চিতে দাঁড়ায়। চীনারা খুব বড় নখ রাখে, লম্বা হইয়া পাছে ভাঙ্গিয়া যায় এইজন্য তাহারা বাঁশের চোঙের ভিতর সযত্নে নখ রক্ষা করে।

—

আদিমকালের শাকসব্জী—

পেঁয়াজ এ্যাস্‌প্যারাগাস (Asparagus) ও শশা মানবের খাদ্যরূপে আদিমকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তিনহাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিশরবাসীরা এই তিনটি জিনিষের চাষ করিত; এ ছাড়া মটরের চাষও তারা করিত বলিয়া জানা যায়। মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুতের জন্য পেঁয়াজের চাষ করা হইত বলিয়া মনে হয়। গ্রীসের প্রাচীনকালে লিখিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় গ্রীকেরা বাঁধাকপি ও এ্যাস্‌প্যারাগাস খাদ্যরূপে ব্যবহার করিত; এখনও গ্রীসের বনজঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে এই দুই জাতীয় সব্জী জন্মায়।

—

ব্রিটিশ মিউজিয়াম্ লাইব্রেরী—

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী অধুনা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পুস্তকাগার। পঞ্চাশ লক্ষ পুস্তক এই পুস্তকাগারে আছে ও সমস্ত পুস্তক রাখিতে ষাট মাইল লম্বা শেল্‌ফের প্রয়োজন হইয়াছে। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকাগার সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা হয়। আজকাল এই পুস্তকাগারের ক্যাটালগ বহির সংখ্যা ১৫০০ ও সাধারণ পাঠাগার-কক্ষটি এত বৃহৎ যে একসঙ্গে পাঁচ শত লোক বসিয়া পড়িতে পারে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সমস্ত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক পত্রিকা এই পুস্তকাগারে লওয়া হয় ও প্রতিবৎসর এক লক্ষ নূতন বই এই পুস্তকাগারের জন্য কেনা হয়।

—

পাখীদের প্রসাধনকার্য্য—

পাখীরা প্রসাধনকার্য্যে প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করে। পাতিহাঁস নিজ শরীরমধ্যস্থ একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই তৈলাক্ত পদার্থ উহাদের লেজের দিকের পালকের গোড়ায় সঞ্চিত থাকে। প্রসাধনের পূর্ব্বে উহারা মুখ পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য অনবরত লেজের পালকের গোড়ায় মুখ ঘসিতে আরম্ভ করে। টিয়া ময়না প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পাখীর ডানায় পোকা হইলে উহারা মরিয়া যায়; কিন্তু পেঁচার পালকে পোকা ধরিলে উহারা পায়ের ধারাল নখ দিয়া পোকা-লাগা স্থান আঁচড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া লয়। পায়রা ও বাজপাখী তাহাদের গায়ের একপ্রকার নরম পালকের দ্বারা প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করে, এই পালকগুলি এত নরম ও ভঙ্গুর যে টান দিবা মাত্র গুঁড়া হইয়া যায়, পরে উহারা ঠোঁটদ্বারা গায়ের পালকের উপরে ও গোড়ায় ঐ পালকচূর্ণ লাগাইয়া লয়। কোন কোন জাতীয় পাখী আবার জল দ্বারা প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করে। কাক, শালিক, গাং-শালিক, পায়রা, ছাতার ও চড়ুই পাখীকে অনেক সময় জলাশয়ের নিকট গিয়া ডানা দ্বারা গায়ে জল ছিটাইতে দেখা যায়। মুরগী আবর্জ্জনার উপর গড়াগড়ি দিয়া প্রসাধন সম্পন্ন করে। পাখীদের প্রসাধনক্রিয়া এইরূপে বিনাখরচে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রী অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গাছ-শিকারী—

শুনিতে পাই আমাদের দেশে অনেকপ্রকার বৃক্ষ লতাদি আছে, যাহার রস বা ফল ভক্ষণে মানুষ অমর না হউক অনেক কাল দিব্য স্বাস্থ্য লইয়া বাঁচিতে পারে। পুরাকালের লোকেরা নাকি সেই-সমস্ত বৃক্ষ-লতাদির সন্ধান জানিতেন, আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে সন্ধান করিলে হয়ত খোঁজ মিলিতে পারে। কিন্তু তার সন্ধান করিবে কে? বন জঙ্গলে ভূত পেত্নী আছে, ম্যালেরিয়া আছে, বিছুটি আছে, হিংস্র জন্তুদের কথাও বাদ দিলে চলে না। এই-সমস্ত কাজে প্রাণের ভয় আছে। সেইজন্য অনাবশ্যক বনজঙ্গলে ঘুরিয়া অকালে প্রাণ হারানো অপেক্ষা, সনাতন ধান যব গম এবং পাট আলু কচু কাঁচকলার চাষ করিয়াই দিন বেশ আরামে চলিয়া যায়। বড় জোর বিদেশীদের দয়া করিয়া আনা দুচারটা আনাজ বা ফলমূলেরও চাষ করিতে আমরা কেউ কেউ রাজি।

ইউরোপ-আমেরিকার কথা স্বতন্ত্র। সেখানের লোকেরা মরণ জয় করিয়া বাঁচিতে চায়। যতদিন বাঁচিব, মরিয়া মরিয়া বাঁচিব না, বাঁচার মতই বাঁচিব—এই তাহাদের পণ। তাই তাহারা নিজেদের এবং পরের তিলমাত্র সুখ বাড়াইবার সম্ভাবনা পাইলে নিজের প্রাণকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের একদল লোক গত ২৫ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নানা অরণ্য-প্রদেশে নূতন নূতন বৃক্ষ লতাদির সন্ধান করিয়াছেন। এই সন্ধানের ফলে আজ তাঁহারা ৫১,০০০ নূতন রকমের তরিতরকারির আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ৫১,০০০ আবিষ্কারের মধ্যে ফল মূল, তরিতরকারি, নানা প্রকার শস্য ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। এই-সমস্ত অরণ্যচারীরা পরের দেশ হইতে এই-সমস্ত নূতন খাদ্য তরুলতা আবিষ্কার করিয়া নিজের দেশে চালান করিয়াছেন—দেশের সম্পদ বাড়াইয়াছেন।

প্রায় প্রত্যেক বছর দু-এক রকম নূতন শস্য বা ফল যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের খাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। রাশিয়াতে এক-প্রকার গম হয়। ১৯২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ নিজের দেশে তাহার চাষ করিতে আরম্ভ করেন। এখন প্রায় দশ কোটি টাকার এই গম উৎপন্ন হইতেছে। আমেরিকাতে ইজিপ্টের তুলার চাষ হইতেছে, তাহার দাম বছরে অন্তত দুই কোটি টাকা। জাপানী চাল এবং সুডানী ঘাস হইতেও যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা বছরে প্রায় আট কোটি টাকা পাইয়া থাকে।

এই-সমস্ত তরুলতা শিকারীরা এমন সমস্ত ভীষণ জঙ্গলে একলা ভ্রমণ করেন, যে, আমরা তাহার কল্পনাও করিতে পারি না। আফ্রিকার যে-সমস্ত জঙ্গলে গত দুহাজার বছরে কখনো সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে নাই, বাঘ ভালুক সিংহ ইত্যাদি জন্তুরা মানুষের জন্য

দিবানিশি ওত পাতিয়া আছে, সেই-সমস্ত স্থানেও যুক্তরাষ্ট্রের এই-সমস্ত বীরগণ দেশের কল্যাণকে জীবনব্রত করিয়া প্রবেশ করেন। যদি প্রাণ যায়, তবে দেশের কাজেই প্রাণ যাইবে, এই তাঁহাদের একমাত্র সান্ত্বনা। ভীষণ জ্বরবীজে পূর্ণ জলাভূমিতে তাঁহারা ভ্রমণ করেন, যেখানে মানুষের বাঁচিবার সম্ভাবনা মাত্র শতকরা এক। সেখানে মশার দলকে বর্ষাকালের আকাশের ঘন কালো মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়। এই-সমস্ত স্থানে কত লোক যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এত কষ্ট সহ্য করিয়া যদি তাঁহারা মানুষের খাওয়া চলে, এমন একটা নূতন কিছু ফল, বৃক্ষ শস্য, আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে তাহাতে দেশের কিঞ্চিৎ সম্পদ্ বাড়িবে এই আনন্দে সকল শ্রম সার্থক মনে করেন।

সমস্ত বিপদ্ জানিয়া শুনিয়া এই নূতন শিকারীদল আফ্রিকা, চীনা, মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা এবং পৃথিবীর আর-সব জঙ্গলাবৃত স্থানে বৎসরের পর বৎসর নির্জ্জনবাস করিতেছেন। একটা নূতন কিছু পাইলেই তাহা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-পরীক্ষাগারে আসে—সেখানে তাহার দোষ গুণ পরীক্ষা হয়। তাহাতে যদি তাহা খাদ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে তাহার চাষ আরম্ভ হইয়া যায়। বিশেষ বিশেষ জিনিষের চাষ কেমন জমিতে হইবে, তাহা কি পদ্ধতিতেই বা হইবে, তাহা ঐ বিশেষ বৃক্ষ বা লতার জন্মস্থানের আবহাওয়া দেখিয়া স্থির করিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আর-একটি বিশেষ সুবিধা আছে। ঐ স্থানের এক প্রদেশের জল মাটি হাওয়ার সহিত অন্য আর-এক প্রদেশের কোনই মিল নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে যে-সমস্ত জমি বেকার পড়িয়া ছিল, সেই-সব জমিতে এখন নানা-প্রকার নূতন নূতন শস্যের আবাদ হইতেছে।

উত্তর প্রদেশের কৃষকেরা এখন বেশীর ভাগ রাশিয়া হইতে আনীত ঐ বিশেষ প্রকারের গমের চাষই করিতেছে। এই গমের নাম ইংরাজিতে durum wheat। এখন সর্ব্ব-সমেত প্রায় কোটি বিঘা জমিতে এই গমের চাষ হইতেছে।

ক্যালিফর্ণিয়াতে এক প্রকার নূতন কমলালেবুর চাষ হইতেছে। এই বিশেষ কমলালেবুর আমদানি ব্রেজিল হইতেই প্রথম হয়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জানা এবং অজানা অসংখ্য রকমের ফল মূল শস্য ইত্যাদির চাষ আবাদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হইতেছে।

এই কার্য্যে মিঃ বারবোর ল্যাথরপই একরকম প্রথম ব্রতী হন। তিনি এবং মিঃ ডেভিড্ ফেয়ারচাইল্ড প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার নূতন ফলের গাছ এবং শস্য আমেরিকায় চালান করেন। তাঁহাদের কার্য্যই এক রকম বর্ত্তমান কৃষিবিভাগের এই বিরাট্ কার্য্যের মূল-ভিত্তি স্বরূপ।

ফ্র্যাঙ্ক এন মেয়ার এই কার্য্য করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ক্রমাগত নয় বৎসর চীন, সাইবেরিয়া, তুর্কিস্থান, কোরিয়া প্রভৃতি স্থানে একলা নূতন নূতন খাদ্য-প্রদায়ক বৃক্ষের সন্ধান করিয়া বেড়ান। তিনি প্রায় দশ হাজার মাইল পায়ে হাঁটেন। সময় সময় চীন দস্যুদলের আক্রমণ তাঁহাকে একলাই সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি, এক এক সময় কোন দ্বিতীয় মানুষের মুখ না দেখিয়া তাঁহাকে আট নয় মাস জঙ্গলে বাস করিতে হইয়াছে। তিনি নিজের দেশে হাজার হাজার নূতন ফলবৃক্ষ আমদানী করিয়াছেন। এই-সমস্ত ফলের ব্যবসা করিয়া অনেকে লক্ষপতিও হইয়াছে এবং হইতেছে। তিনি হয়ত আরো অনেক কার্য্য করিতে পারিতেন, কিন্তু দেশে ফিরিবার সময় হঠাৎ জাহাজ ডুবি হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নামে একটি পদক আছে। যে কৃষিসম্পর্কীয় ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে কৃষিবিভাগ হইতে সে-ই এই পদক পায়।

ডাঃ এইচ্ এল সানট্জ্ আর-একজন বিখ্যাত লোক। তিনি আফ্রিকার প্রায় সমস্ত বন জঙ্গলে একলা ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণের পরিধি প্রায় ৯০০০ মাইল। তিনি ১৬০০ রকমের আফ্রিকার নানা রকম ফলমূল ইত্যাদি যুক্তরাজ্যে চালান করেন। কেপ কালোনীতে ডাঃ সানট্জ্ ঘোড়া-গোরুর সুখাদ্য একপ্রকার গাছড়া আবিষ্কার করেন। যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিম অঞ্চলে পতিত যে-সমস্ত জমি ছিল তাহাতে এখন ঐ পশু-খাদ্য গাছগাছড়ার আবাদ হইতেছে। পূর্ব্ব আফ্রিকাতে তিনি এক প্রকার লাউ আবিষ্কার করেন, তাহা প্রায় তিন ফুট লম্বা, তাহার মধ্যে যে বিচি থাকে তাহা খাইতে অনেকটা বাদামের মত এবং সুগন্ধযুক্ত। এই বিচি বেশ পুষ্টিকর।

ডাঃ জে এফ্ রক্ ব্রহ্মদেশে চালমুগ্‌রার সন্ধানে আসেন। চালমুগ্‌রার তেল কুষ্ঠের মহৌষধ। চালমুগ্‌রা বৃক্ষ নামে পরিচিত অনেক বৃক্ষ আছে। যথার্থ চালমুগ্‌রা খুব কম স্থানে পাওয়া যায়। অনেক অনুসন্ধান এবং কষ্ট স্বীকারের পর তিনি যথার্থ চালমুগ্‌রা বৃক্ষের যথেষ্ট পরিমাণে বীজ সংগ্রহ করিয়া দেশে প্রেরণ করেন। এখন আমেরিকাতে হাওয়াই প্রদেশে চালমুগ্‌রার আবাদ বেশ চলিতেছে।

নানা দেশ হইতে এই-সমস্ত নূতন নূতন বৃক্ষ লতা ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপরীক্ষাগারে আসিয়া জড়ো হয়। সেখানে তাঁহাদের দোষ-গুণ বিশেষ যত্ন করিয়া পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফল ভাল হইলে পর তাহার চাষ আরম্ভ হয়।

আমাদের বাড়ীর পাশের ঝোপে ঝাড়ে কত ফল ফুল রহিয়াছে, তাহার সব নামও আমরা জানি না। পরের বাগানে কোন একটা ভাল ফলের গাছ দেখিয়া জিবে জল পড়ে, কিন্তু আমাদের সংযম আশ্চর্য্যজনক তাহার দিকে আর ফিরিয়া তাকাই না। হয়ত সামান্য একটু চেষ্টা করিলে সেই সুফলের গাছ বাড়ীর উঠানে জন্মান যাইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিবে কে? প্রপিতামহ এবং তাঁর পিতামহ যে আম জাম এবং কচু কাঁচকলা খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন—তাহার বেশী আর দরকার কি? লোভেই মানুষ পাপী হয় এবং তাহা হইতে মৃত্যু নিশ্চয়। সেই জন্যই আমরা পরম বিজ্ঞের মত যাহা সামনে পাই তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করি আর অন্যদেশের লোকেরা বোকার মতন যেখানে সেখানে ঘুরিয়া পিতার দেওয়া অমূল্য প্রাণটাকে হারাইয়া ফেলে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মতারিখ

পৌষমাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মতারিখ সম্বন্ধে যে ভ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক। পিতৃদেবের প্রবন্ধে জন্মতারিখ ২৯ মাঘ লিখিত আছে; উহা ছাপার ভুল। কোষ্ঠীপত্রের সহিত মিলাইয়া দেখা হইল, জন্মতারিখ ৩০শে মাঘ শনিবার ১২৮৮।

শ্রী সুধীরকুমার মিত্র

—

কান্তকবি রজনীকান্ত

১। গত ভাদ্রের 'প্রবাসীতে' মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত 'কান্তকবি রজনীকান্তের' সমালোচনা করিয়াছেন। কার্ত্তিকের প্রবাসীতে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ প্রবন্ধের স্থল বিশেষের একটি অনবধানতার উল্লেখ করিয়াছিলাম, যদিচ তখন অবধি আমি সমালোচ্য গ্রন্থটি আদ্যন্ত পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। সম্প্রতি কান্তচরিত পাঠ শেষ করিয়া দেখিলাম, শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় আর-একটা গোল আছে। তিনি বলিয়াছেন,—"আর-একজন রজনীকান্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যশস্বী হইয়াছেন, তিনি দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। ইনি...স্বতঃ পরতঃ পরমেশ্বরতঃ, অনবরত, রজনীবাবুর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার একটি কথায় একটু ব্যথিত হইয়াছি, তিনি রজনীবাবুকে 'রাজসাহীর কবি' বলিয়াই সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ সংকীর্ণতাটা ভাল দেখায় না। রজনীবাবু সমস্ত বাঙ্গালার কবি।" (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯, ৭৩৭ পৃঃ, ১ম স্তম্ভের পাদদেশ)।

এই 'কথা'টা শাস্ত্রী মহাশয় কোথায় পাইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। পরন্তু ইহার বিরোধী কথা সমালোচ্য পুস্তকেই (২৪২—৪৩, ২৬২ পৃঃ) রহিয়াছে,—

(ক) "কাশী হইতে রজনীকান্ত কুমার শরৎকুমারকে সাহায্যের জন্য পত্র লিখিলেন। কুমার উত্তরে লিখিয়াছিলেন,—"আমার নিকট আপনি প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতে আপনার লজ্জার বিষয় কিছুই নাই, কেননা আমি যে আপনাকে, যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার সুযোগ পাইতেছি, ইহা আমার বিশেষ গৌরবের বিষয় এবং ইহা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আপনার ন্যায় বাণীর বরপুত্র আমাদের রাজসাহীর কেন, সমগ্র বঙ্গদেশের শ্লাঘার বিষয়।"

(খ) "আজ লোকে বুঝিতেছে আমাদের রাজসাহীর (? পাবনার) কবি সমগ্র বঙ্গের কবি।......আমরা রাজসাহীর (? পাবনার) কবিকে সমগ্র বঙ্গের কবিরূপে ফিরিয়া পাইয়া ধন্য হইব।"—রজনীকান্তের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণের অল্পক্ষণ পূর্ব্বের লিখিত কুমার শরৎকুমারের পত্র।

আশা করি, শাস্ত্রী মহাশয় এই সমস্যার সমাধান করিয়া সাধারণের সংশয় অপনোদন করিবেন।

২। সমালোচ্য পুস্তকে—কান্ত কবি রজনীকান্তেও গুটিকতক ভ্রম, ত্রুটি ও অসঙ্গতি আছে। শাস্ত্রী মহাশয় সে-সম্বন্ধে নীরব। সমালোচনার উদ্দেশ্য—দোষ-গুণ উভয়ই প্রদর্শন। একে একে সে সকলের উল্লেখ করিতেছি;—

(ক) 'অভয়া-বিহার' নহে—'সতী-বিলাপ'

"ভ্রাতৃভক্ত গুরুপ্রসাদ শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ব্রজবুলিতে "অভয়া-বিহার" নামক আর-একখানি কাব্য লিখিলেন। ইহাতে দক্ষ প্রজাপতিগৃহে সতীর জন্ম হইতে দক্ষ-যজ্ঞে তাঁহার দেহ ত্যাগ পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে।"—কান্তকবি রজনীকান্ত; ১১—১২ পৃঃ। প্রমাণ—"ইহা শুনিয়া পিতৃদেব ঐ ব্রজবুলিতেই "সতী-বিলাপ" নামে সতীর জন্ম হইতে দক্ষ যজ্ঞ-ভঙ্গ পর্য্যন্ত আর-একখানি কীর্ত্তন গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।"—রজনীকান্তের আত্ম-জীবনী, প্রতিভা (ঢাকা) ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

কাহার কথা সত্য?

(খ) রজনীকান্ত ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র পরলোকগত হন। অথচ নলিনীবাবু তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে নিঃসঙ্কোচে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ২য় সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইলে সুখের কারণ হইবে,—

(১) "হাঁসপাতালের রোজনামচা, ৬ই ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।"—৫ পৃঃ

(২) "কাশীধাম হইতে তিনি (কবি) ১৩১৭ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়কে পত্র লেখেন।" পৃঃ ৬১

উভয় স্থলেই '১৩১৬' হইবে।

(গ) পাবনা সিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ কবিরাজ, সুপণ্ডিত, কবির বাল্যসহচর ও সঙ্গীতগুরু প্রবীণ শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনো জীবিত আছেন, বয়স ৬০এর উর্দ্ধে। তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি দেখুন,—"কান্তকবির সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্বন্ধে তারকেশ্বর লিখিয়াছেন।" ৩৬ পৃঃ। শুধু "তারকেশ্বর" লেখার উদ্দেশ্য কি? সাধারণ প্রচলিত শিষ্টাচার অনুসারে নামের পূর্ব্বে "শ্রীযুক্ত" বা পরে "বাবু" নাই কেন?

শ্রী রাধাচরণ দাস

রমলা

(২৯)

আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল। কলিকাতার গরীব কেরানী-সংসারে সহজ সুখে দুঃখে ব্যথায় হাসি-কান্নায় দিনের পর দিন যেমন একটানা কাটিয়া যায়, ঠিক তেম্‌নি-ভাবে কাটিল না বটে, তবু রমলাদের বাড়ীর একতলার সংসারযাত্রার সহিত দোতালার জীবনধারা প্রায় একই রূপ ধরিতে লাগিল। সুখের দিন নানাবর্ণময় ঘটনাবহুল, তাহার নানা গতি নানা ছন্দ; কিন্তু দুঃখের দিন একটানা চলিয়া যায়,—তাহার এক কালো রংএ সব রং, তাহার একটানা ক্লান্ত করুণ সুরে সব সুর মিশিয়া মিলিয়া যায়।

রজত ও রমলা যৌবনের সেই রঙীন স্বপ্নরাজ্য হইতে সহসা সংসারের রৌদ্রঝঞ্ঝাময় সংগ্রামপথে আসিয়া পড়িয়া তাহার আঘাতে দিন দিন অন্তরে পীড়িত হইতে লাগিল। প্রভাতের আলোয় রঙীন মায়া কাটিয়া গিয়াছে, এবার সম্মুখে খররৌদ্রময় পথ, এই পথে দুইজন দুইজনের হাত ধরাধরি করিয়া যাইতে হইবে।

এই বৎসরের প্রধান ঘটনা, রমলার এক কন্যাসন্তান হইল। এই কয়টিকে পাইয়া তাহার খুব শান্তি বোধ হইলেও, চিন্তা বাড়িল, কেননা খরচ বাড়িল। খোকা এখন দুরন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সে আপনমনে ঘুরিয়া বেড়ায়, দিন দিন পিতার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতেছে, এখন এই খুকীকে পাইয়া রমলা এক নতুন আনন্দের খনি খুঁজিয়া পাইল।

সংসারদুঃখের বোঝাটা রমলার খুব বেশী বোধ হইত না। সে তাহার খোকাখুকী, সংসারের খুটিনাটি কাজ লইয়া আনন্দেই থাকিত। সুখভোগ করা, সব কাজ হইতে আনন্দ নিংড়াইয়া লওয়া তাহার ধর্ম্ম ছিল, ইচ্ছা করিয়া কোন-প্রকার দুঃখ বাড়ানকে সে ভীরুতা মনে করিত। শ্রান্ত হইলেও সে কখনও বিরক্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িত না, মাধবীর মত কখনও মুখ ফুটিয়া বলিত না, I am so bored। রজতের জন্য নতুন নতুন রান্না করা, খোকাখুকীকে স্নান করান, খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, ঘর-গোছান ইত্যাদি সংসারকর্ম্মে তাহার অন্তরের মাতৃলক্ষ্মী জাগিয়া তাহাকে আনন্দমণ্ডিতা করিয়া রাখিত। ঘরের টেবিল চেয়ার খাট সব জিনিষ তাহার যেন সঙ্গী ছিল, তাহার ভাঁড়ারঘরে চিনি লবণ ইত্যাদি ভরা হর্‌লিকের শিশির সারি, রান্নার মসলা ভরা বিস্কুটের চায়ের টিনের কৌটাগুলি, নানা জিনিষভরা আম-চাট্‌নীর শিশিগুলি—সব জিনিষের প্রতি তাহার যেন মাতৃস্নেহ ছিল, তাহাদের নাড়িয়া ঝাড়িয়া গুছাইয়া ঠিকভাবে সাজাইয়া তাহার দিন সহজ আনন্দে কাটিত। সেই গিরিঝর্ণার অকারণ কৌতুক, উচ্ছল হাস্য, প্রাণখোলা গীতঝঙ্কার আর শোনা যাইত না বটে, সে ঝর্ণা এখন সমতলভূমে আসিয়া স্নিগ্ধ ও করুণ সুরে বহিতেছে, সে নৃত্যভঙ্গিমা প্রাণোচ্ছ্বাস গিয়াছে, এ ধীর স্নিগ্ধ ধারা।

কিন্তু রজতের কাছে জীবনটা দিন দিন বোঝা হইয়া উঠিতে লাগিল। সকালে রমলার উঠিবার অনেক পরে সে উঠে, চা খাইয়া কি করিবে খুঁজিয়া পায় না, কোনদিন খোকাকে ধরিয়া তাহার ছবি আঁকিতে বসে বা বাজার করিতেই বাহির হইয়া যায়, কোনদিন খবরের কাগজটা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়ে; রমলার রান্নাঘরে বড় যায় না। সকাল-সকাল খাইয়াই আফিস ছুটিতে হয়; সন্ধ্যাবেলা শ্রান্ত হইয়া আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে খুঁজিয়া পায় না। কোন সন্ধ্যায় কোন বন্ধুর বাড়ীতে তাসের আড্ডায় যায়, কোন সন্ধ্যা চুরুট টানিতে টানিতে কোন নভেল লইয়া পড়িতে বসে। চুরুটটা বিবাহের পর সে একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিল, আফিসে ঢুকিয়া আবার আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ কোন সন্ধ্যায় রমলা আসিয়া পাশে বসে বটে কিন্তু গল্প জমে না, সাংসারিক খুঁটিনাটি কথা আলোচনা করিতে তাহার ভাল লাগে না। দুইজনে একসঙ্গে পড়া বা গল্প করা বড় ঘটিয়া উঠে না। কোন গভীর রাত্রে তাসের আড্ডা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রজত দেখে রমলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কোন রাতে রমলা রান্নাঘরের সব কাজ সারিয়া আসিয়া দেখে, রজত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দিন দিন রজতের দেহ-মন শীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, এ বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন কেরানী-জীবনে বুভুক্ষিত শিল্পীপ্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিত; কিন্তু নতুন কেরানী মানুষটি দাবাইয়া বলিত—চুপ রও, জীবনের বোঝা বও।

বোঝা অনেকরূপে বহন করা যায়। রজত বহিত, ঘোড়া যেমন তাহার পিঠে গাড়ীর বোঝা টানে; কিন্তু রমলা বহিত, নদী যেমন আপন বুকে তরীর বোঝা বয়। সংসারের কাজ করিতে করিতে সে যে গুন্‌গুন্ গান গাহিত তাহা আনন্দের সুরেই, কিন্তু রজতের কানে তাহা বড় করুণ লাগিত।

রজত ভাবিত, তাহার সেই স্বপ্নলোকের রমলা, তাহার প্রিয়া বুঝি মরিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাসূর্য্যাস্তের শরৎ আকাশের মত তাহার স্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সে খুঁজিত, কোথায় সেই মোহিনী রমলা, তাহার মন-মাতানো রূপ, মদের মত ফেনিল, পুষ্পসৌরভের মত আবেশময়? —এ মুখ বড় করুণ মধুর। সে বেশ বুঝিতেছিল, দিনের পর দিন তাহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম বিচ্ছেদের জাল রচিত হইতেছে, সেই অতি সূক্ষ্মতন্তুময় পর্দ্দাটা একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাহার প্রাণ ছটফট্ করিত। কোন দিন বিকালে আসিয়া সে দেখিত রমলা হয়ত বাসন মাজিতেছে, ঝি আসে নাই। ঝি আসিলে রমলা মাঝে মাঝে বাসন ধুইতে বসিত, ঝির ধোওয়া পছন্দ হইত না। বিবাহিত জীবনের প্রথম বৎসরে রমলার বাসনমাজায় যে সৌন্দর্য্য সে খুঁজিয়া পাইত, আজ সে সৌন্দর্য্য কোথায়? রজত গভীর বেদনা বোধ করিত, নিজের উপর তাহার ঘৃণা হইত; এই দৃশ্যটা, ওই বাসনমাজার ঝকমক্ শব্দটা সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। কোনদিন দেখিত কাজের তাড়াতাড়িতে একটু বিরক্ত হইয়া রমলা অতি ধীরেই খোকার গায়ে এক চাপড় মারিল বা হাতা দিয়া মাথায় একটা ঘা দিল। এখন খোকা আস্তে মারাতে কাঁদে না, কিন্তু ওই মৃদু আঘাত রজতের গায়ে ছিপ্‌টির ঘায়ের মত বাজে। কোনদিন দেখিত ভাঙ্গা পিয়ানোটায় বসিয়া রমলা খোকাকে পিয়ানো বাজান শিখাইতেছে, পিয়ানো খারাপ হইয়া যাওয়াতে মাঝে মাঝে বেসুরে বাজিতেছে, সে ভুল সুরে যে রমলার অন্তর পীড়িত হইয়া যাইতেছে, তাহা সে বুঝিত। কিন্তু রমলা হাসিমুখেই খোকাকে পিয়ানো বাজান শিখাইতেছে। রজত পিয়ানোর পাশে একটু দাঁড়াইত, রমলা রজতের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধমুখে হাসিত, রজত চলিয়া যাইত, এ দৃশ্যও তাহার ভাল লাগিত না, ওই মাতাপুত্রের আনন্দজগতে তাহার যেন প্রবেশের অধিকার নাই।

মাঝে মাঝে রমলার উপর রজতের রাগ হইত। ঘরের প্রতি কোন ফিটফাট সাজান, প্রতি জিনিষ ঝাড়া, মেজেটা মোছা চকচক্ করিতেছে, বিছানা কাপড় জামা সব ধপ্‌ধপ্ করিতেছে, কোথাও একটু ধূলা নাই। বস্তুতঃ, দিন দিন রমলার ধূলার প্রতি দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, কি বাসনে কি জামাকাপড়ে কি ঘরে কোথাও একটু ময়লা সে সহ্য করিতে পারিত না। তার পর, রোজ ঠিকসময়ে সে খাবার দেয়, প্রতি তরকারী কি সুন্দরভাবে রান্নাকরা, কোন গৃহকর্ম্মে একটু অবহেলা অবসাদ অনাদর নাই। কেন রমলা এত খাটে? তাহাকে কিছু বলিতেও রজতের সাহস হইত না, তাহাকে যেন সে একটু ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুধু নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে রমলা একটু উদাসীন ছিল। একদিন সাহস করিয়া পরিহাসের সুরে রজত বলিল, ওগো তোমার সাদাকাপড় যে গেরুয়া রংএর হয়ে উঠ্‌ল, বৈরাগিনী হলে নাকি? তার পর হইতে কোনদিন রমলাকে ময়লা কাপড় পরিয়া তাহার সম্মুখে আসিতে রজত দেখে নাই। আর, তাহার অকলঙ্ক মুখের অনুপম হাসি—এ হাসি দেখিলে রজত মনে মনে বল পাইত, আবার এ হাসি দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহার ক্ষোভ হইত। কেন রমলা তাহার জন্য সর্ব্বদাই হাসিবে,—কেন সে মুখভার করে না, একটু দুঃখের কথা বলে না, কেন বলে না তাহার মত সেও জীবনের ভারে নুইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত রজতের রূপকথাপুরীর রমলা জাগিয়া উঠিত, তাহার সন্তানসেবা গৃহকর্ম্ম সে ভুলিয়া যাইত, কল্যাণীমাতা মোহিনীনারীরূপে পরম-মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিত। সে সুখের দিনগুলিতে রজত আপনাকে ধন্য মানিত। কোন বর্ষার দিনে চেয়ারে দুলিতে

দুলিতে সহসা রমলা লাফাইয়া উঠিয়া ভাঙা পিয়ানোর উপর প্রেমিকের মত পড়িয়া সুরের ঝঞ্ঝা তুলিত—বীটোফেন বধির হইয়া যাইবার পর যে সুরগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলি সে বাজাইত। কোন জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায় রমলা রান্না ফেলিয়া ঘরে রজতের কোলের কাছে আসিয়া বসিত, অকারণে উচ্ছলহাস্যে কত অর্থহীন গল্প সুরু করিত। কোন ছুটির দিন দুইজনে খোকাকে লইয়া কোথাও বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িত। খুকী উমার তত্ত্বাবধানে থাকিত। যেদিন তাহারা আলিপুরের বাগানে গেল, সেদিন খোকা না রমলাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হইল, তাহা রজত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এই বেড়ানর মধ্যেও মাঝে মাঝে মন উদাস হইয়া যাইত, পুরাতন বৎসরের সুখস্মৃতিগুলিতে দুইজনের মন ভরিয়া উঠিত।

কিন্তু এ সুখের দিনগুলিও ক্রমে ক্রমে অতি কম হইয়া আসিতে লাগিল। বাহিরে কোন প্রকাশ না হইলেও রমলার মগ্নচৈতন্যলোকে ভাঙন বহুদিন ধরিয়াছিল। পরের বৎসর তাহার প্রকাশ সুরু হইল। তাহার কল্যাণময় হাসির তলে তলে যে অন্তরতম বেদনার অশ্রু ফল্গুনদীর মত বহিতেছিল। প্রথমে রমলা আপন আত্মার এই দুর্ব্বলতাকে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু যখন দুঃখের দেবতা তাহার অন্তরের ব্যথার ইতিহাস তাহার চোখের তটে তাহার গণ্ডের কোণে কপোলতলে তাহার এলায়িত দেহে লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে না মানিয়া থাকিতে পারিল না।

পরিবর্ত্তন অতি দ্রুত ঘটিল। সমস্ত মন ওলটপালট হইয়া গেল। রজতের মধ্যে যে অবসাদ ধীরে ধীরে আসিতেছিল, তাহা ঝঞ্ঝার মেঘের মত রমলার অন্তর ছাইয়া ফেলিল। পুরুষ অপেক্ষা নারী অতি অল্প সময়ে অতি দ্রুততালে নবরূপ লইতে পারে; প্রাণকে তাহারা জন্ম দেয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রাণের লীলা অতি চঞ্চলভাবে হইতে পারে; নতুনরূপ লইতে তাহাদের সময় অল্প লাগে। পরিবর্ত্তনের ধারা রমলার মধ্যে অতিদ্রুত বহিয়া জীবনের আনন্দময় কূল হইতে তাহাকে অবসাদের কূলে নিমেষে তুলিয়া দিল। রজতের তাহা যখন চোখে পড়িল, সে দেখিল যে রমলা হইতে সে যেন বহুদূর সরিয়া পড়িয়াছে। নারী প্রবহমান নদীধারার মত, যে মানুষ তাহাকে ভালবাসে সে আপন জীবনের প্রেমতট দিয়া সেই ধারাকে বাঁধিয়া যদি তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তবেই মঙ্গল।

পর বৎসর রমলার দেহমন যেন একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। শুধু শ্রান্তি নয়, শূন্যতা, ব্যর্থতার বোধ। রজতের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে গিয়া সহসা তাহার হাসি মিলাইয়া যাইত, সে মুখ ফিরাইয়া লইত। খোকাকে চুমো খাইতে গিয়া একটি চুমো দিয়া চোখে জল ভরিয়া আসিত। সে কোন প্রভাতে রাঁধিতে রাঁধিতে উনানের ছাইগুলির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিত, ভাত ধরিয়া যাইত, মাছ পুড়িয়া যাইত। কোন রৌদ্রধূসর উদাস স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ঘর ঝাড়িতে ঝাড়িতে দেহ যেন এলাইয়া পড়িত, চেয়ারে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃদু দুলিত; কখনও বা বই গোছাইতে গোছাইতে, জামা সেলাই করিতে করিতে আর ভাল লাগিত না, মাদুরে হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িত, ঘুম হইত না। কোন মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় সে বারান্দার কোণে চুপ করিয়া বসিত, একতলার জীবনধারাটাও ভাল লাগিত না, নারিকেল-গাছগুলির উপর মুমূর্ষু আলোর আভার দিকে চাহিয়া থাকিত, খুকীকে বুকে টানিয়া লইত, বুকে শান্তি পাইত না। কোন জ্যোৎস্নারাতে পশ্চিমদিকের বারান্দায় মেজেতে শুইয়া পড়িত, কদমগাছের মাথায় তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত,—একা, বড় একা বোধ হইত। বড় শ্রান্ত, নিঃসঙ্গ সে, কিছু ভাল লাগে না।

পুরুষ যখন আপনাকে একা মনে করে সে নিঃসঙ্গতার ভার সে বহুদিন বহিতে পারে। কিন্তু নারী যখন আপনাকে একা মনে করে, সে নির্জ্জনতা শূন্যতার বোঝায় সে ঝড়ে-ভাঙা লতার মত ভাঙিয়া পড়ে, তাহার অবসন্নতা মনের বৈরাগ্য বড় ভয়ানক। যখন তাহার ঘরকন্না ভাল লাগে না, স্বামী অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না, তাহার সন্তান হৃদয়ের অজানা বেদনা দূর করিতে পারে না, প্রাণের প্রাচুর্য্যে প্রেমের গভীরতায় সে পূর্ণ, তবু জীবনের

পাত্র শূন্য মনে হয়—নারীর অন্তরাত্মার এ শূন্যতার বোধ বড় ভয়ানক।

ভাল লাগে না। কাজ করিতে করিতে তাহার অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, মন উদাস ঘর-ছাড়া হইয়া যাইত। কিসের জন্য কাজ, কেন সে বাঁচিয়া আছে, কেন তাহার জন্ম হইয়াছিল? তাহাকে এমন জন্ম দিয়া এ জীবন না দিলে বিশ্ববিধাতার কি ক্ষতি হইত?

শরীরে অসুখ কিছুই নাই, পূর্ব্বের মতই সে কাজ করে, খায়, হাসে, গল্প করে, গান গায়, তবু শরীরে কেমন শক্তি পায় না, সহসা মন এলাইয়া পড়ে, মনে হয় সে যেন কলের মত কাজ করে, প্রাণের আনন্দ জাগে না।

মধ্য রাত্রে প্রায়ই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। কত চিন্তা মাথার ভিতর ঘুরিত, হয়ত সে বেশীদিন বাঁচিবে না। মাথা দপ্ দপ্ করিত, চোখ জ্বলিত, অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকিত, মনে হইত এই ছয় বছরে তাহার যেন ষাট বছর বয়স হইয়াছে।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইলে বিছানা হইতে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিত। একি হইল তাহার জীবনটা? তাহার জীবন কি এইরূপ চিরকাল কাটিবে? মাথার শিরগুলি তারাগুলির মত দপ্ দপ্ করিত।

"আশা" ছবিখানি চোখে পড়িত। কি আশা তাহার? সত্যই এবার তাহার আশার দুইচোখ বাঁধা, সম্মুখে রাত্রির অন্ধকার। তাহার এই ছোট ছেলেমেয়েরা? হয়ত সে মরিয়া যাইবে, রজতও মরিয়া যাইবে, আর ইহাদের কি দুঃখের জীবন আরম্ভ হইবে, ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠিত, তবু মনটা দুঃখের কথাই ভাবিতে চাহিত। ওই যে খুকী ঘুমাইতেছে, হয়ত সেও তাহারি মত সরল আনন্দে শৈশব হইতে যৌবনে বাড়িয়া উঠিবে, তার পর তাহারই মত তেমনই জীবনের বোঝা উহার উপরে চাপান হইবে। কি অর্থ এই সৃষ্টির? এই বংশের পর বংশ নবনব দুঃখের মধ্যে যাত্রা?

রমলা বিছানায় গিয়া শুইতে পারিত না, মেজেতে দোলনার পাশে মাদুরে শুইত, ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকিত। এই কি জীবন? প্রথম যৌবনে বোর্ডিং-ঘরে কত জ্যোৎস্নারাত্রে জীবনের কত রঙীন স্বপ্ন-জাল বুনিয়াছে, আর কিছুদিন পরে তাহার সহিত নীচে-কার উমার জীবনধারার কোন প্রভেদ থাকিবে না। সব দুঃখকে সব অবস্থাকে কি মানিয়া লইতেই হইবে?

কেন এমন হইল? হয়ত তাহার জীবন অন্যরূপ হইতে পারিত। সে যেন বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না, যেন পাথরচাপা অন্ধকার গহ্বরে ঝর্ণাধারার মত ছট্‌ফট্ করিতেছে।

কে ইহার জন্য দোষী? রমলা রজতের দিকে চাহিয়া থাকিত, তাহার উপর একটু বিরক্ত হইত, পর মুহূর্ত্তে তাহার মন করুণায় ভরিয়া যাইত। তাহার কি দোষ, সে ত সত্যই তাহাকে ভালবাসে, তাহার জন্য প্রাণপণ খাটিতেছে। কাহার দোষ? এই যে জীবন ভাঙিয়া চুরিয়া গলিয়া পিষিয়া দণ্ডে দণ্ডে মরিতেছে—এই জীবন ভাল লাগে না।

ঘর অন্ধকার, স্বামী শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে, পাশে খুকী মুদ্রিত কমলের মত নিদ্রিত। এ স্তব্ধতা তাহার ভয়ানক বোধ হইত; দিনের বেলায় নানা কাজে সে মন ভুলাইয়া থাকিত, কিন্তু রাত্রে তাহার চিন্তাগুলি এই স্তব্ধ ঘরে শূন্য অন্ধকারে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের দূর করিতে চাহিলেও পারিত না। ভাগ্য—এই তার ভাগ্য। মামাবাবুর কতকগুলি কথা কানের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত—heredity—environment—cirumstances—life-force—struggle—adaptation—survival of the fittest. হয়ত মামাবাবুর মত সত্যি, মানুষ একরকম বড় পোকা, সমাজে শুধু হানাহানি কাড়াকাড়ি। ঈশ্বর হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন, আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। আর আত্মা? ওটাও মন-ভুলান কথা, বিরাট্ প্রাণ-সাগরে ঢেউয়ের মত উঠিয়া ঢেউয়ের মত মিলাইয়া যাইবে, আমি অমর নই, তৃণ পোকার মতনই আমার জীবন। কে অমর? Man the Universal—শাশ্বত মানুষ—সেই শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, কোন স্বপ্নলোকের দিকে তাহার যুগযুগের দুঃখের সাধনা, প্রত্যেকের জীবন সেই পথের দিকে মানব-সভ্যতার রথটাকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।

এ-সব কথা সে ভাবিতে চায় না। কেন তাহার অন্তরে

এ বেদনা এ অশান্তি? Life-force, জীবনশক্তির আনন্দ-ভাণ্ডার তাহার মধ্যে দিন দিন ফুরাইয়া যাইতেছে।

বাহিরে রমলার দেহের সৌন্দর্য্যের খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই, শুধু একটু পাণ্ডুরতার করুণ আভা। কিন্তু তাহার অন্তরের আনন্দতট কোন গুপ্ত স্রোতের বেগে কোন্ অতলে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। একদিন সে মুখ ফুটিয়া তাহার স্বামীকে বলিল,—ওগো, দেখ, শরীরটা কেমন দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, যেন একটা ভয়ঙ্কর অসুখ করবে।

ডাক্তার আসিলেন। তিনি তিন দিন আসিয়া দেখিলেন, বহু পরীক্ষা করিয়া কোন রোগের সন্ধান মিলিল না। ডাক্তার ম্লান হাসিয়া বলিলেন, neurasthenia। মনটা সর্ব্বদা কাজে ডুবিয়ে প্রফুল্ল রাখ্‌বেন, আর কোথাও চেঞ্জে যাওয়া দরকার, environment বদল কর্‌তে হবে।

করুণ হাসিয়া রমলা রজতের দিকে চাহিল। রজত তাহার দিক্ হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইল।

(৩০)

চৈত্র মাস শেষ হয়-হয়। দিন-দিন দিনের তাপ বাড়িয়াই যাইতেছিল, বহুদিন অনাবৃষ্টিতে নগর তাতিয়া পুড়িয়া উঠিয়াছে। সেদিন বিকালে আকাশ ঘোলা হইয়া কালো হইয়া আসিল, অগ্নিবরণী নাগিনীদের মত মেঘের দল আকাশে ভিড় করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলকি, এক ঝড়ের সাজসজ্জা আকাশ জুড়িয়া মহাসমারোহে ঘনাইয়া আসিল।

বহুদিন পরে মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রমলার মনও সে বিকালে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার মন বড় দুলিত;—কখনও অতি উল্লসিত, কখন অতি অবসন্ন হইয়া পড়িত। বারান্দার কোণে দোলানো-চেয়ারে বসিয়া খুকীকে কোলে করিয়া সে ঝঞ্চনার সমারোহের দিকে চাহিয়া দুলিতেছিল। খুকীর সঙ্গে অস্ফুটস্বরে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সে কথাবার্ত্তার ভাষা খুকী ও তাহার মার স্বরচিত, তাহারাই এ কথা বোঝে।

খুকীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার রমলার চোখ একতলায় গিয়া পড়িল। উমা এক কাঁসার রেকাবীতে সাজাইয়া তাহার স্বামীর খাবার লইয়া যাইতেছে, সে নতমুখে যাইতেছে দেখিয়া রমলা একটু হাসিয়া লোহার রেলিংএ আঘাত করিল, উমা একবার মৃদু হাসিয়া উপরের দিকে চাহিল, রমলার মুখের দিকে তাকাইতেই তাহার মুখ রাঙা হইয়া গেল, খাবারগুলি ঠিক করিতে করিতে সে চকিতপদে ঘরে গিয়া ঢুকিল। রমলা খুকীকে চুমো খাইয়া দোলনায় শোয়াইয়া আসিয়া নারিকেল-গাছগুলির উপর মেঘের ঘনঘটার দিকে চাহিয়া চেয়ারে দুলিতে লাগিল।

এই শান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবন তাহার ভাল লাগে না, এক ঝড়ের দোলায় দুলিতে ইচ্ছা করিতেছে, এইরূপ ঝঞ্চার ঘন সমারোহের মত তাহার জীবনে যদি কোন প্রলয়যাত্রাপথের সাজসজ্জা সুরু হইত। সাপের ফণার মত বিদ্যুৎ কালো মেঘ চিরিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খেলিয়া গেল। রমলার উল্লসিত অন্তর দেখিয়া তাহার ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে হাসিলেন।

বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে সুরু হইল। রৌদ্রতপ্ত বাড়ীর ছাদে ছাদে, শুষ্ক দেওয়ালে, তাপিত নগরের পথের পাথরে, তৃষিত বৃক্ষগুলির পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে পড়িতে নিমেষে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। রমলা বারান্দার কোণে বসিয়া রহিল, তাহার মুক্তকেশে, তপ্তমুখে, ধূপছায়ারংএর শাড়ীতে, ব্লাউজে, চোখের জলের ফোঁটার মত জল পড়িতে লাগিল, কিন্তু বাতাস এত উত্তপ্ত যে জল পড়িতে পড়িতে কাপড়ে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে জল-ঝরা থামিয়া গেল, শুধু ঘনায়মান অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিলকি। কোন প্রমত্তা নাগিনী কি দুর্জ্জয় ক্ষোভে আপন মুক্ত কৃষ্ণবেণী সুতীক্ষ্ণ নখ দিয়া চিরিয়া চিরিয়া ফেলিতেছে! ভিজে-মাটির গন্ধভরা ঈষদার্দ্র বাতাস মৃদু বহিতে লাগিল, সে বাতাস রমলার রক্তের সহিত মিশিয়া দেহে মনে কি আবেগ আনিয়া দিল। কত মুক্ত প্রান্তরের, কত ঝঞ্চারাত্রির স্মৃতি তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল, বহুদিন পরে সে ঘরে গিয়া পিয়ানো বাজাইতে সুরু করিল।

বাহিরে ঝড়ের বেগ বাড়িয়া বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি সুরু হইল, রমলাও তাহার ভাঙা পিয়ানোতে সুরের ঝড়

তুলিল। বীটোফেনের প্রেমের গানগুলি একের পর একে বাজাইয়া যাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পিয়ানো বাজাইয়া প্রদীপ্ত মুখে দরজার দিকে চাহিতে রমলার মনে হইল কে যেন দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অন্ধকারে এক ছায়ামূর্ত্তির মত; এ আলো-অন্ধকারের কোন মায়াখেলা ভাবিয়া সে 'সোনাটা' সুরু করিল। শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল যতীনের দীপ্ত চোখের মত দুইটি চোখ তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। চোখের ভুল ভাবিয়া সে বাহিরের ঝড়ের সহিত পাল্লা দিয়া সুরের ঝড় তুলিল।

সত্যই যতীন তখন দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ছিল। বৃষ্টির ছাটে একটু ভিজিতেও ছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না; সে নির্নিমেষ নয়নে পিয়ানোবাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। তাপশীর্ণ গিরিনদীতে গেরুয়া-রংএর বন্যাজলের মত রমলার ব্যথাকরুণ পাণ্ডুর মুখে আজ সুরের বান ডাকিয়া আসিয়াছে, কালোচুলের মধ্যে সিন্দূররেখা অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে, তাহার উপর শাড়ীর লালপাড় রক্তের ধারার মত,—এই লাল রং প্রাণের রং, আগুনের রং, এই রংএর দিকে সে প্রদীপ্ত চোখে চাহিয়া ছিল, পিয়ানোর সুরে সুরে দেহের রক্ত ঝিল্‌মিল্‌ করিতেছিল। চৈত্রের ঝড়ে ও সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারভরা ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রমলার দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল এ কোন অপূর্ব্ব মায়াপুরীতে সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বহুদিন পরে হঠাৎ রজতের বাড়ীতে যতীনের আসাটা আশ্চর্য্যের বটে। ব্যাপারটা এইরূপ। সেদিন শরীরটা একটু খারাপ থাকায় যতীন নিজের বাড়ীতে লাইব্রেরীতে বসিয়া আফিসের সব কাজ করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর কথা মনে পড়াতে তাহার সন্ধানে ড্রয়িংরুমের দরজায় গিয়া দেখিল, ড্রয়িংরুমে বেশ একটি ছোট পার্টি বসিয়াছে। মাধবী এক বাসন্তীরংএর সিল্কের শাড়ী পরিয়া সোফায় হেলান দিয়া বসিয়াছে, কার্ড-টেবিল ঘিরিয়া আর-সকলে বসিয়া আছেন। চ্যাটার্জ্জী-সাহেব মজার মজার হাসির গল্প যোগাইতেছেন, মাধবী তাস বণ্টন করিতেছে, মাধবীর ঠিক বাম পাশে এক তরুণ যুবক বসিয়া মৃদুগুঞ্জরণে মাধবীর সঙ্গে গল্প করিতেছে, তাহার সরবতের গেলাস ধরিয়া রহিয়াছে। কচি বাঁশের মত তাহার সুকুমার মুখের দিকে তাকাইয়া মাধবীর উপর যতীনের একটু রাগ হইল। মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে নিজের ঘরের দিকে চলিল। বহুবৎসর পূর্ব্বের এক ঘরের চিত্র তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল, সে বোধহয় চারবৎসর পূর্ব্বের রজতের ঘরের এক দৃশ্য।

রজতদের পাড়া দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ সেদিন যতীন রজতের বাড়ীর সম্মুখে মোটর থামাইয়াছিল। ধীরে দোতালায় উঠিয়া রজতের ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে স্নিগ্ধদৃশ্য সে সেদিন দেখিয়াছিল, তাহাই তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। দোলনা মৃদু দুলিতেছে, তাহার পাশে রমলা নীলশাড়ী পড়িয়া হাস্যমুখে সবাইকে চা দিতেছে, রাত্রে নীলরং যে এত সুন্দর দেখায় তাহা যতীনের ধারণা ছিল না। মামা-বাবু গলাবন্ধ জড়াইয়া অতি স্থিরভাবে বসিয়া অতি সন্তর্পণে তাসগুলি দিতেছেন, ললিত পাশে চেয়ারে বসিয়া খোকাকে পায়ে দাঁড় করাইয়া উঠাইতেছে নামাইতেছে নাচাইতেছে আর তাহার সহিত পাল্লা দিয়া হাসিতেছে, মামা-বাবুর আর-এক পাশে তাঁহারই মত এক শীর্ণকায় যুবক, বোতাম-ছেঁড়া শার্টের আস্তিন দোলাইয়া মেজেতে হাত ঠুকিয়া কি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর রজত দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া হাস্যব্যঙ্গমিশ্রিত দৃষ্টিতে সবাইকে দেখিতেছে আর মাঝে মাঝে শীস দিয়া উঠিতেছে।

যতীন ঘরে ঢুকিতেই সকলে উচ্চ হাসিয়া তাহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল, রমলা আনন্দের সঙ্গে চেয়ারে বসাইয়া চা দিল, তার পর আবার সকলে গল্পে পরিহাসে তাস-খেলায় মগ্ন হইল।

চ্যাটার্জ্জীর সাহেবী-য়ানা, ঘোষের ফরাসী-কায়দা, সেনের আমেরিকান্ ঢং আর ওই তরুণ যুবকটির মোহবিহ্বলতা দেখিয়া যতীনের সেই মন-খোলা হাসি প্রাণভরা আনন্দ সেই কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর ঘরের কথা মনে পড়িল, কোন শান্তিময় আনন্দ-আশ্রমের জন্য মন তৃষিত হইয়া উঠিল। একখানি দেশী ধুতী পরিয়া সিল্কের পাঞ্জাবীটি গায়ে দিয়া যতীন মোটরে করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

হায়, সে ত জানিত না রক্তের সেই সুখসন্ধ্যাগুলি স্বপ্নের মত কবে মিলাইয়া গিয়াছে।

পিয়ানো বাজান থামাইয়া রমলা আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই যতীন তাহার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইল সে যেন ওই ধূপছায়ার রং ও শাড়ীর উপর উল্কার মত গিয়া পড়িবে। ওই সুন্দর হাতের পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত যে আঙুলগুলি এতক্ষণ পিয়ানোর উপর খেলিতেছিল, তাহারই সুরের অমৃতমাখান স্পর্শ সে যদি একবার পায় তবে তাহার দেহ-মনে কোন স্বপ্নের গান বাজিয়া উঠে। আপনাকে দমন করিয়া যতীন তাহার শক্ত মোটা আঙুল দিয়া পিয়ানোর কাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেমন করিয়া সে মোটরের steering wheel ধরে।

রমলা প্রথমে একটু চমকিয়া উঠিল, তার পর দীপ্ত মুখে হাসিয়া বলিল, বা, সত্যিই আপনি এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন ?

—হাঁ, এসে আপনার পিয়ানো বাজান বন্ধ করলুম। ও, কতদিন আপনার গান শুনি নি, ভাগ্যিস এসেছিলুম।

—আমি আর পিয়ানো বাজাই না, বসুন, আলোটা জেলে আনি।

রমলা আলো জ্বালিয়া আনিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতীন ঘরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝঞ্ঝার মেঘ হইতে বিচ্ছুরিত সন্ধ্যালোকরঞ্জিত রমলার এই ঘরখানি কোন রূপকথাপুরীর মায়াগার, কিসের রংএ মন রঙীন হইয়া উঠিয়াছে, সে যে কি করিতে চায় কি ভাবিতে চায় কি বলিতে চায় তাহা সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

আলো লইয়া ঘরে ঢুকিয়া রমলা দেখিল, যতীন পিয়ানোর পাশে কোন্ মায়ায় যেন মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই কালো চোখে হাসি ঠিক্‌রাইয়া সে বলিল—বা, বসুন, আজ যে দিব্যি বাঙালী বাবু।

যতীন কোন উত্তর দিতে পারিল না, দীপ্তনেত্রে একবার রমলার দিকে চাহিল। রমলার মুখের দিকে একটুখানি চাহিতেই তাহার স্বপ্নমায়া যেন কাটিয়া গেল। একি, রমলা এত রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখের সেই অনুপম লাবণ্য কোথায় ? কৃষ্ণচূড়ামঞ্জরীর মত রাঙা রং যে তুষারের মত সাদা হইয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ পিয়ানো বাজানোতে মনের উত্তেজনার পর তাহার যে অবসাদ আসিয়াছে তাহা তাহার মুখেও প্রকাশিত হইতেছিল। যতীনের দীপ্তচক্ষু ব্যথায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিল, তাহার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে, রমলার কোন অসুখ হইয়াছে কি। পারিল না। রমলার দিক্ হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইতে দোল্‌নার উপর তাহার চোখ পড়িল। ধীরকণ্ঠে যতীন বলিল,—খোকা ঘুমোচ্ছে বুঝি ?

—না, ওটি আর-একটি নতুন অতিথি।

—নতুন ? খবর ত পাইনি।

—খবর কি নেন, না রাখেন, আপনারা কলকারখানা নিয়েই ব্যস্ত।

দোলনার দিকে অগ্রসর হইয়া যতীন বলিল,—আর-একটি খোকা ?

—না খুকী।

দোল্‌নার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যতীন বলিল,—বা, বেশ, সুন্দর ত, lovely।

যতীন আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিদ্রিতা খুকীকে একটি চুমো খাইল, রমলার দিকে নিমেষের জন্য চাহিল, আবার দোল্‌নার দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীনের স্তব্ধতা, ভাবভঙ্গী দেখিয়া রমলার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল, কোথায় তাহার চাঞ্চল্য, তাহার বাক্‌পটুতা, তাহার প্রাণের স্বাভাবিক গতি।

মৃদুকণ্ঠে রমলা বলিল,—কার্‌খানা থেকে আস্‌ছেন, কিছু খাবেন ?

যতীন আপত্তি জানাইতে পারিল না, সম্মতিও জানাইল না, ব্যথাকরুণ চোখে একবার রমলার দিকে চাহিল।

আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষণি আস্‌ছি,—বলিয়া রমলা ধীরপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যতীন সমস্ত ঘরখানির প্রতি-কোণে চাহিতে চাহিতে ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরপদে কিছুক্ষণ ঘুরিল, একবার দরজার দিকে দেখিল, রমলা

আসিতেছে কি না, তারপর দোলনায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া খুকীকে কয়েকটা চুমো খাইল, তাহার চুলগুলি লইয়া আদর করিল। সে বারান্দায় বাহির হইয়া কালো আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, একটি তারা এককোণে জ্বলিতেছে, জল পড়িতেছে না, বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ঝিকিমিকি করিতেছে,—আবার ঘরে ঢুকিয়া দোলনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত ঘর ভরিয়া দারিদ্র্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহারই পেষণে রমলা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এই কথাটি ভাবিতে তাহার মন বাহিরের কালো আকাশের মত ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

রমলা চা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যতীন খুকীর দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া দোলনা মৃদু মৃদু দোলাইতেছে। চা ও মিষ্টিভরা প্লেট টেবিলে রাখিয়া রমলা বলিল,—দেখুন, ঘরে কিছুই নেই, শুধু চা নিয়ে এলুম, আপনি এমন হঠাৎ আসেন। বসুন।

ধীরে পাশের চেয়ারে বসিয়া যতীন রমলার দিকে চাহিল। যতীনের এ ব্যথাভরা চাউনি রমলার সম্পূর্ণ অজানা। সে ধীরে বলিল,—কয়েকখানা কাট্‌লেট ভেজে আনব, একটু যদি বসেন, কিছু আপনায় দিতে পারলুম না।

—না, না, আপনি বসুন, একটু গল্প করা যাক্।

নিন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে,—বলিয়া রমলা দোল্‌নার পাশে মোড়ায় বসিল।

চা খাইতে খাইতে যতীন বলিল,—কৈ রজত এখনও এল না?

—না, এখনও ত আসেন নি দেখ্‌ছি, বোধ হয় বায়োস্কোপে গেছেন।

—আপনি যান না?

—না, কাজ, সময় পাই কোথা?

—রজত সেই আপিসেই কাজ করছে?

—হাঁ, সেই আপিসেই।

—ছবি কিছু আঁকে?

—কৈ, দেখি না ত।

—আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে!

—না, কষ্ট কি, বেশ সুখে আছি। আপনি মিষ্টিগুলো সব খাবেন। আমি খুকীর দুধটা নিয়ে আসি।

রমলা চলিয়া গেলে যতীন অর্দ্ধেক চা খাইয়া টেবিলে রাখিয়া দিল। বুকের কি একটা বেদনায় সে আর খাইতে পারিল না। এ বেদনা তাহার সম্পূর্ণ অজানা। কি করিতে পারে সে, ইহাদের দুঃখ কি করিয়া দূর করিতে পারে? যাহাকে ভালবাসি, সে দুঃখে দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার তিলমাত্র ব্যথা দূর করিতে পারিতেছি না, অন্তরের এ বেদনা অসহনীয়। সূচের মত তাহার বুকে কিসের ব্যথা বিঁধিতেছে।

রমলা খুকীর দুধ লইয়া আসিয়া দেখিল, যতীন চুপ করিয়া বসিয়া আছে। খুকীকে কোলে তুলিয়া লইয়া রমলা বলিল,—বা, কিছুই খান নি, অ খ করেছে বুঝি?

না, এই যে খাচ্ছি,—বলিয়া যতীন ঠাণ্ডা চা ও মিষ্টিগুলি নীরবে খাইতে লাগিল। রমলা খুকীকে দুধ খাওয়াইতে লাগিল। দুইজনেই নীরবে বসিয়া। যতীন রমলার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিতেছিল না, তাহারই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কি স্নিগ্ধ কি মধুর কি সুন্দর এই মুখখানি। কিন্তু উচ্ছ্বসিত আনন্দের তীব্র দীপ্তি যে নাই; এ কোন্ মেঘের কালো ছায়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

খুকীকে দুধ খাওয়ান শেষ হইতেই যতীন চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। রমলা ধীরে বলিল,—যাবেন, এত শীগ্‌গির? ওর হয়ত আস্‌তে দেরী হবে।

যতীন অবশ্য যাইবার জন্য উঠে নাই, কিন্তু তাহার মনে হইল, যাওয়াই ভাল। যাহার সহিত হাতে হাত ধরিয়া দুঃখ ভাগাভাগি করিয়া বহন করিতে পারিব না, তাহার দুঃখের সংসারে চুপ করিয়া ব্যথিত অন্তরে বসিয়া কি হইবে!

ব্যথিত করুণ চোখে রমলার দিকে চাহিয়া যতীন বলিল—হাঁ যাচ্ছি। তার পর সে খুকীর গালে আঙুল দিয়া একটু আদর করিল।

রমলার আলো দেখানোর অপেক্ষা না করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

রমলা খুকীকে শোওয়াইয়া পিয়ানোর পাশে বসিয়া

খোলা জান্‌লা দিয়া ঝড়ের কালো আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

রজত যখন অনেক রাতে বাড়ী ফিরিল, সে রজতকে অস্বাভাবিকরূপে চঞ্চল দেখিল, যতীনের আসার কথাটা তাহার আর বলা হইল না।

(৩১)

যতীন বাড়ী হইতে বাহির হইবার একটু পরেই মাধবী তাহার সভা ভঙ্গ করিয়া দিল। বেশীক্ষণ ধরিয়া একটা কিছু কাজ করিতে তাহার ভাল লাগিত না। এই তাসের আড্ডা, চায়ের পার্টি, নভেল পড়া, গল্প শোনা, বায়োস্কোপ, এই সাজসজ্জা, সুখের জীবনে সে দিন দিন শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল। কোথাও সে সুখ খুঁজিয়া পায় না।

একদান তাস খেলিয়া নিজে জিতিতেই সে সোফা হইতে লাফাইয়া উঠিল। মাধবী জিতিলেই তাহার আর তাস খেলা ভাল লাগিত না। তাহার তরুণ বন্ধুটি বলিল —মাধবী-দি, বায়োস্কোপে চল না।

হাসিয়া ভ্রূকুটি করিয়া মাধবী বলিল—কি, তোমার হুকুম?

—না, আপনাকে হুকুমক র্‌তে পারি, এ হচ্ছে অনুরোধ।

—আচ্ছা, শচী, আমি চুলটা ঠিক করে' আস্‌ছি।

—বেশী দেরী কর্‌বেন না, হয়ত এখন আরম্ভ হয়ে গেছে।

—আবার হুকুম?

—না, না, বিনীত প্রার্থনা।

আবার শাড়ী বদ্‌লাইতে, চুল ভাল করিয়া বাঁধিতে মাধবীর ভাল লাগিল না। সে শুধু একটু আতর মাখিয়া শীঘ্র আসিল।

মোটরকার বায়োস্কোপের সম্মুখে আসিয়া থামিতে মাধবী বলিল—যাও শচী, দু'খানা টিকিট কেনগে।

তারপর মোটর হইতে নামিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সম্মুখের থামে এক মেরী পিক্‌ফোর্ড ফিল্‌মের কতকগুলি বাঁধান ছবি দেখিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পাশের থামের দিকে তাহার চোখ পড়িল। গেরুয়া-রংএর পাঞ্জাবী-পরা একটি ছিপ ছিপে লম্বা বাঙ্গালী দাঁড়াইয়া, পাশের সাহেবের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোঁক্‌ড়া লম্বা চুলগুলি কি সুন্দর দেখাইতেছে! তন্ময় হইয়া সে কি ছবি দেখিতেছে তাহা দেখিবার জন্য একটু অগ্রসর হইতেই মাধবীর বুকের রক্ত দুলিয়া উঠিল। এ রজত! এই সেই সুন্দর শিল্পী? একি মলিন মুখ, কি শীর্ণ চোখ, কিসের তৃষ্ণাতুর মুখখানি। মাধবী একটু অস্ফুটধ্বনি করিয়া ওঠাতে রজত একবার জ্যাকী-কুগানের অভিনয়ের ছবিগুলি হইতে মুখ তুলিল, পাশে এক অপরিচিতা ভদ্রমহিলাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মাধবী বিস্মিত ব্যথিত নেত্রে রজতের দিকে চাহিয়া বলিল,—কি, চিন্‌তে পার্‌ছেন না?

রজত কোন্ স্বপ্নমায়াজড়ান উদাস চোখে মাধবীর দিকে চাহিল। চোখ দুইটি একটু জল্‌জল্ করিয়া উঠিল, ধীরে বলিল,—হাঁ পার্‌ছি বৈকি, আপনি বায়োস্কোপ দেখ্‌তে এসেছেন?

মাধবী রজতের মুখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল,—ও, কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। ভাল আছেন?

রজতের কর্ম্মক্লান্ত উদাস মুখ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ভাল করিয়া মাধবীকে দেখিতে লাগিল। তাহার কেশে বেশে দেহভঙ্গীতে যৌবন সহস্রশিখায় জলিতেছে, ক্ষুব্ধ বাসনার রহস্যে ভরা এ নারী! এ সেই শান্ত গুহাবদ্ধ ঝর্ণাজলের মত শুভ্র মাধবী নয়, একদিন হাজারিবাগে রঙীন প্রভাতে তাহার এইরূপ চঞ্চলা নৃত্যময়ী অগ্নিশিখার মত মূর্ত্তি রজত দেখিয়াছিল। একটু ভীত হইয়া সে মাধবীর দিকে চাহিল।

শচী আসিয়া বলিল,—মাধবী-দি, house full, শুধু একটা বক্‌স্ খালি আছে।

শচীর দিকে কটাক্ষ করিয়া মাধবী বলিল,—থাক্, শচী আজ বায়োস্কোপ, এই কুগান-ফিল্‌ম্‌টা এলে আসা যাবে, তার চেয়ে চল গড়ের মাঠে বেড়াইগে, কি grand ঝড় ঘনিয়ে আস্‌ছে।

রজতের দিকে ফিরিয়া মাধবী বলিল,—আপনার সেই ঝড়ের ছবিটা মনে পড়্‌ছে?

শচী বলিল,—মাধবীদি, বিষ্টি পড়্‌ছে যে।

ব্যথাতুরার অশ্রুজলের মত বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার

দিকে চাহিয়া মাধবী রজতকে বলিল,—তাইত, আপনি কোথায় যাবেন, চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি, আমাদের বাড়ীতে একবারও ত যান না।

রজত একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—আপনারা ত আবার কোথায় নতুন বাড়ীতে উঠে গেছেন, জানিও না।

—এখন ত কত ওজর দেবেন। ও, আমাদের নতুন বাড়ীতে কখনও যাননি। এখন সময় আছে? শচী, মোটরটা কোথায় দেখ ভাই।

মোটর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে মাধবী রজতকে ডাক দিল,—আসুন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত রজত মাধবীর সঙ্গে মোটরে গিয়া উঠিল। তাহারা উঠিলে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া শচী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—মাধবী-দি, আমায় মার্কেটে যেতে হবে, একটু কাজ আছে। নিমেষে সে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ড্রাইভারকে বাড়ীর দিকে মোটর চালাইতে বলিয়া মাধবী রজতের পাশে বসিয়া রজতের মুখের দিকে চাহিল। রজত দেখিল চৈত্র মাসের আকাশের তৃষ্ণার মত মাধবীর চোখ, সে চোখ কাজলঘন মেঘের মত স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিসের বেদনায় তাহার মুখ করুণ হইয়া উঠিতেছে। এই আতর-সুবাসিত সুন্দরী নারীর পাশে বসিয়া এই ঝড়ের সন্ধ্যায় আলো-অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিলকি ও জলের বড় বড় ফোঁটাঝরার মধ্য দিয়া হু হু করিয়া মোটরে যাইতে যাইতে তাহার উদাস মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মোটরের দোলায় চড়িয়া সে শুধু মাধবীর সঙ্গের রেশটুকু অনুভব করিতে লাগিল, দুইজনেই প্রায় শুব্ধ বসিয়া রহিল। মোটর অশ্রান্ত বেগে ছুটুক্, এই দীপালোকিত জনবহুল পথ প্রাসাদশ্রেণী পার হইয়া ওই বিদ্যুদ্‌বিদীর্ণ তমিস্রাপুঞ্জে গিয়া পড়ুক্ – who knows but the world may end to night !

মোটর যখন বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছাইল, মাধবী যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল, যেন কোন মধুস্বপ্ন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রজতকে লইয়া আবার ড্রয়িংরুমে ঢুকিতেই তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ড্রয়িংরুমের ছবি, কারুকার্যকরা চেয়ার, সোফা, কার্পেট, পর্দা, নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য,—প্রত্যেক জিনিষ কোথা হইতে কেনা বা তৈরী করান হইয়াছে, আর কোথায় ইহা হইতে ভাল জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে, কোন্ জিনিষ কোথায় রাখিয়া কি ভাবে সাজাইলে ঘর আরো ভাল দেখাইবে, কোথায় কোন্ রংয়ের সঙ্গে কোন্ রং মানাইবে, ইত্যাদি প্রতি জিনিষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তর্ক করিয়া আলোচনা করিয়া মতামত লইয়া সে রজতকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ড্রয়িংরুম দেখান শেষ হইলে, সে রজতকে লাইব্রেরীতে লইয়া গেল, সেখানে কি কি নূতন বই সে কিনিয়াছে, কোন্ কোন্ লেখক তাহার প্রিয়, রজতের কোন্ কোন্ লেখক প্রিয়, ইত্যাদি নানা গল্প হইল। সেখান হইতে রজতকে খাবার ঘরে লইয়া গেল, নিজের হাতে চা তৈরী করিল, রুটিতে মাখন লাগাইল, কেক্ কাটিল। কখন কখন খেয়াল হইলে পার্টিতে সে নিজের হাতে এসব কাজ কিছুক্ষণের জন্য করে। তার পরে দেওয়ালে কি রং, জানালায় কি রং, দরজায় কি রং দেওয়া যাইতে পারে, কি রংএর পর্দা কোথায় মানাইবে, চায়ের কাপে কি রকম লতাপাতা আঁকা বেশ দেখায়, old china তাঁহার কি সংগ্রহ আছে, ইত্যাদি নানা গল্প হইল।

রজতের মনও কেমন খুলিয়া গেল। বহুদিনের ঘুমাইয়া-পড়া শিল্পীপ্রাণ জাগিয়া উঠিল। গল্পে তর্কে, পরিহাসে সে ভরপুর হইয়া উঠিল।

রাত প্রায় নয়টার সময় রজত বিদায় লইল। শীঘ্রই আবার সে আসিবে, এই সর্ত্তে মাধবী তাহাকে ছাড়িল। ট্রামে সমস্ত পথটা মাধবীর সঙ্গের রেশ, হাসির সুর, চোখের মায়া, কেশের উদ্যত ফণা, কথার ছন্দ, আতরের গন্ধ তাহার দেহমন ঘিরিয়া রিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

সোক্রাটীস

সোক্রাটীস (প্রথম খণ্ড)—ভূমিকা :—গ্রীকজাতি ও গ্রীক সভ্যতা। —অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম্ এ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ১৯২২ সাল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮/০+৫৫৭; মূল্য পাঁচ টাকা।

কে একজন অ-ফরাসী লেখক ফরাসী জাতির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রত্যেক মানুষের দুইটি করিয়া স্বদেশ আছে; প্রথম তাহার নিজের দেশ, আর দ্বিতীয়, ফ্রান্স।' এই উক্তি কোনও ফরাসী লেখকের একখানি বইয়ে সগর্ব্বে উদ্ধৃত দেখিয়াছিলাম। যিনি একথা বলিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই বিপ্লবের যুগের ফ্রান্স কর্ত্তৃক প্রচারিত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী স্মরণ করিয়া, এবং ইউরোপে নানা বিষয়ে ফ্রান্সের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠাদ্বারা অভিভূত হইয়া এই কথা বলিয়া থাকিবেন। আধুনিক কালের কোনও বিশেষ দেশ বা জাতি সম্বন্ধে কেহ ব্যক্তিগতভাবে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বমানবের মনের টান যাঁহারা অনুভব করেন, মানবের ইতিহাসকে এক অখণ্ড ও সমগ্র বস্তু বলিয়া যাঁহারা বুঝিয়া থাকেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি, দর্শন ও চিন্তা, সাহিত্য ও ললিতকলা প্রভৃতি এক বা একাধিক বিষয়ের মধ্য দিয়া গ্রীকমনের সঙ্গে যাঁহাদের স্বল্পমাত্রও পরিচয়লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, আজকালকার এইরূপ শিক্ষিত জনের নিকট একমাত্র প্রাচীন গ্রীস-ই ভাব ও চিন্তা জগতের দ্বিতীয় স্বদেশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ভারতের বাহিরে কোথাও যদি আমাকে আমার জন্মভূমি ও জীবনের যুগ নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ভার দেওয়া হইত, তাহা হইলে আমি স্বতঃ প্রথমেই খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতকের গ্রীসের কথা মনে করিতাম। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন, সরল ও অনাড়ম্বর, সংযত ও সু-কৃত, অন্তর্মুখী ও সৎচিন্তার পোষক, ন্যায় ও সুযুক্তির অনুসারী, তাহার উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীসে। সাহিত্য ও শিল্প, বাস্তুবিদ্যা ও বিজ্ঞান, পৌরনীতি ও দর্শন, প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপাদান-গুলি প্রাচীন গ্রীক জাতির দান। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত প্রাচ্যের নিজস্ব কতকগুলি উপাদান—যেমন ভারতের অহিংসা ও জীবে দয়া এবং তত্ত্বানুসন্ধান-প্রবণতা, ও চীনের শান্তিভাব ও ও বিরোধে বিরতি—সংযোজিত হইতে পারিলেই এই সভ্যতা আর একদেশদর্শী না থাকিয়া বিশ্বমানবের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। কতকগুলি বিশেষ মনোবৃত্তি আর্য্যভাষী হিন্দু-ইরাণীয় ও গ্রীক জাতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; যেমন, চিত্তের প্রসন্নতা, সৌন্দর্য্যবোধ, প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃতকে কল্যাণের আধাররূপে দেখা, সমস্ত বিষয়ের সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দানের ও মূল কারণে গিয়া পঁহুছিবার প্রয়াস, এবং সমবায়-প্রগতি, বা সমাজ ও দলভুক্ত হইয়া সমবেতভাবে সাধারণের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা; ও অসাধারণ কল্পনাশক্তি, এবং যোগ্য পাত্রে শ্রদ্ধার ভাব। ভারতের সভ্যতা আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতির সভ্যতা ও চিন্তার মিলনে সৃষ্ট, সত্য; কিন্তু ইহাতে আর্য্যজাতির আহৃত উপাদানই সমধিক প্রবল; বিশেষতঃ বেদ- ও উপনিষৎ-পন্থী সমাজের মন বিশেষভাবে আর্য্যপ্রভাবের ফল, এবং বৌদ্ধ ও জৈন মার্গও "আর্য্যসত্যের" প্রচারকামী। আর্য্য মনের আর এক বিকাশ পাই গ্রীস-দেশে, প্রাচীন গ্রীক জাতিতে। বহু শতাব্দীর পর আধুনিক ইউরোপের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া এই মনটিই আবার ভারতে তাহার জাতির উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। উদার, সত্যকামী, প্রিয়দিদৃক্ষু গ্রীকমনের সত্য স্বরূপটির সহিত ভারতে আমাদের যতই পরিচয় হইবে, ততই তাহা আমাদের জাতীয় চিত্তের কল্যাণের ও উন্নতির পক্ষে সহায়ক হইবে। অমৃতের সাধনে ভারতের অন্তরতম মন বাস্তবকে অনেকটা ভুলিয়াছিল; গ্রীস অমৃত-সাধন একেবারে ভুলে নাই, কিন্তু বাস্তবকেই সে সাদরে ও সাগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। শিব ও সত্যের রূপ ও সৌন্দর্য্যই তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় বলিলে আমি বুঝি, প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের আর্য্যমনের সমন্বয়; এবং এই সমন্বয়ে কোনও কোনও বিষয়ে প্রাচীন চীনেরও সহায়তা আবশ্যক হইতে পারে। সে প্রাচীন গ্রীস আর নাই; প্রাচীন গ্রীক জাতির প্রায় লোপসাধন হইয়া গিয়াছে, প্রাচীন গ্রীক চিন্তার সহিত 'আধুনিক গ্রীক' নামধারী গ্রীকভাষী জাতির কোনও যোগ নাই; আধুনিক গ্রীসের অধিবাসীরা মুখ্যতঃ স্লাব ও আল্বানীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, গ্রীসের বিজাতীয়-যুগের খ্রীষ্টানী সভ্যতা, মুসলমানী অর্থাৎ আরবী-তুর্কী-ইরাণী সভ্যতা ও পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার ভগ্নাংশ লইয়া এক সম্পূর্ণ নূতন জাতি হিসাবে বিদ্যমান।

কিন্তু প্রাচীন গ্রীস এখনও তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত সৌমনস্য লইয়া, তাহার সাহিত্য ললিতকলা দর্শনের মধ্য দিয়া মানবের চিরন্তন চিত্তসুখের ভাণ্ডার খুলিয়া আছে। The glory that was Greece: যেন ছন্দের অতীত এক কল্পনাময় রাজ্য হইতে প্রাচীন গ্রীসের গৌরব কীর্ত্তি চিরকালের জন্য মানবচিত্ত আলোকিত করিবে। অধ্যাপক গুহের কথায়, '"গ্রীস্" এই নাম উচ্চারণ করিলেই অন্তরে একটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন মনোহর সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই এক দেশ, যাহার সকলই সুন্দর, মনোমোহন, নয়নাভিরাম। বিধাতা গ্রীকদিগকে কি এক উপাদানে গড়িয়াছিলেন, যে তাহারা যাহাতে হাত দিত, তাহাতেই লাবণ্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িত। মনে হয়, মানবকে সৌন্দর্য্য-রচনা-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রীকেরা ধরাতলে আগমন করিয়াছিল। তাহারা যেন জগদ্বাসীকে বলিতেছে, "সর্ব্বপ্রকার কদর্য্যতা পরিহার কর; চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে সংযত, সুললিত, সুশোভন হও; যদি সুন্দর হইতে না পারিলে, তোমার বাঁচিয়া থাকাই বৃথা।"' 'সমন্বয়-সাধনের আকাঙ্ক্ষাই গ্রীকজাতিকে সৌন্দর্য্যের উপাসক করিয়া তুলিয়াছিল। দেহ, মন ও আত্মা; পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র; জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান; বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ, সর্ব্বত্র তাহারা সুন্দরকে অন্বেষণ করিত, সাম্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ থাকিত, অন্তরে ও বাহিরে, জড়ে ও চৈতন্যে বিরোধ বিদূরিত করিয়া সুখ ও শান্তি পাইতে প্রয়াসী হইত।...পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের উপকরণ গ্রীক সভ্যতায় যেমন বিদ্যমান ছিল, এমন অন্য কোথাও দেখা যায় না।' 'স্থিরযৌবন ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা, অর্থাৎ যুবজনোচিত স্ফূর্ত্তি, উদ্যম ও আনন্দ, এবং মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত বন্ধনহীনতা ও স্বচ্ছন্দগতি গ্রীক সভ্যতায় দুইটি প্রধান লক্ষণ। প্লেটো লিখিয়াছেন, মিসরের এক স্থবির পুরোহিত সলোনকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা গ্রীকেরা মনে সকলেই তরুণযুবক; তোমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ কেহই নাই।" গ্রীক জাতি যে অর্ব্বাচীন, পুরোহিত কথা কয়টিতে ইহাই বলিতে চাহিতেছেন; কিন্তু আমরা উহা অন্য

অর্থে গ্রহণ করিয়া উহাতে তাহাদিগের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। তবে গ্রীকেরা যে যৌবনোচিত উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতার মধ্যে জরা, মৃত্যু ও দুঃখকে ভুলিয়া যায় নাই, আমরা তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। দুঃখবাদ গ্রীকদিগকে নৈষ্কর্ম্ম্যের পথে লইয়া যাইতে পারে নাই। তাহারা দুঃখকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া অপরাজিত চিত্তে তাহাকে বরণ করিয়াছে।' (সোক্রাটীস, পৃঃ ৪৯২, ৪৯৩)।

যে গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে, তাহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত। ইনি প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক; গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের সহিত যে দুই চারিজন বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সভায় আগত গ্রীকদূত মেগাস্থেনেস্-এর ভারত-বর্ণন (ইণ্ডিকা) পুস্তক, ও রোমক-সম্রাট্ স্তোইক মতবাদী দার্শনিক মার্কুস্-আউরেলিউস্-আন্তোনিনুস্-এর চিন্তা-সংগ্রহ, এই দুইখানি মূল্যবান গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ইনি বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রীকজাতি ও গ্রীকসভ্যতা সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে কিছু শুনাইবার মত যোগ্যতা ইঁহার যেমন আছে, তাহা খালি বাঙ্গলাদেশে নয়, ভারতবর্ষেও দুর্লভ। সুতরাং বড়ই সুখের বিষয় যে ইনি গ্রীক মনস্বী সোক্রাতেস্-এর জীবন আলোচনা বঙ্গদেশে বাঙ্গলা-পাঠীকে এই অভিনব পুস্তকখানি উপহার দিয়াছেন। গ্রীক সংস্কৃতির (cultureএর) উপর একখানাও প্রামাণিক বই বাঙ্গলা ভাষায় ছিল না, ইহা বাঙ্গলা-ভাষীর পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয় ছিল। রজনীবাবুর বই এতদিনে সে অভাব মোচন করিল। বহু পূর্ব্বে পরলোকগত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলায় "গ্রীক ও হিন্দু" নাম দিয়া গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার এক তুলনা-মূলক আলোচনা প্রকাশ করেন। ঐ বইয়ের কথা রজনী-বাবু নিজ গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। "গ্রীক ও হিন্দু" বইখানিতে বেশীর ভাগ এই দুই আর্য্য সভ্যতার বিরোধের দিকটার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে; ইহা অনেকটা বিগত যুগের "আর্য্যামি" দোষ যুক্ত; অনেক অবান্তর কথা ইহাতে আছে; বাঙ্গালী Philistineএর অবতার এক "বাঞ্ছারাম"-কে খাড়া করিয়া মাঝে মাঝে গ্রন্থকার বিস্তর অনাবশ্যক উপদেশাদিও দিয়াছেন। ইহাতে যে গ্রীক সভ্যতার প্রতি সুবিচার করা হইয়াছে, তাহা বলা চলে না। তবে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ঐ বই খানি এই বিষয়ে বাঙ্গলায় এক মাত্র বই ছিল, বলা চলে। এই বই এখন দুষ্প্রাপ্য। গ্রীক সভ্যতা ও কৃতির উপর বাঙ্গলায় আর কোন বই আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সুতরাং রজনী-বাবুর বইয়ের উপযোগিতা কিরূপ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; বিশেষতঃ যখন তিনি গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া গ্রীক চিন্তার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত।

রজনী-বাবুর বই দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহার মধ্যে কতকগুলি অধ্যায় বহু পরিচ্ছেদময়। ১ম অধ্যায়ে গ্রীসদেশের প্রাকৃতিক সংস্থানের পরিচয় দিয়াছেন। ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে গ্রীক জাতির উৎপত্তি ও গ্রীকজাতির বিভিন্ন শাখার মৌলিক একত্বের আলোচনা আছে। ৪র্থ অধ্যায়ে আত্তিকা এবং আথেন্সের সমাজ ও শাসনতন্ত্র, ও ৫মে আথেন্সের এবং স্পার্ত্তার শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে সাধারণ তথ্যগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে গ্রীকজাতির পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতির ও সাধারণ গার্হস্থ্যজীবনের সবিশেষ বর্ণনা আছে। ৮ম ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ে গ্রীক ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত ইহাতে আদি আর্য্যধর্ম্মের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া, গ্রীকমতে সৃষ্টি প্রকরণ, দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি পর্ব্বোৎসব, গ্রীকধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধন ও গ্রীক ও আর্য্য হিন্দুধর্ম্মের তুলনা, এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বিস্তর বচন উদ্ধার করিয়া বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রজনীবাবু গ্রীকধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের যে তুলনা-মূলক চর্চ্চা করিয়াছেন তাহা হইতে হিন্দু পাঠকের পক্ষে, প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্ম ও চিন্তা আমাদের ধর্ম্ম ও চিন্তার কতটা স্বগোত্রীয়, তাহা দেখা সহজ হইবে। ১১শ অধ্যায়ে প্রাচীনতম যুগ হইতে সোক্রাতেস্-এর মৃত্যু পর্য্যন্ত গ্রীক ইতিহাসের সার সঙ্কলন করা হইয়াছে; এই অধ্যায়ে পেরিক্লেস্ এর যুগে আথেন্সের কৃতি, ও নাট্য ও অন্য সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য মূল তথ্যগুলি অতি সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে। ১২শ অধ্যায়ে গ্রীক সভ্যতার প্রকৃতি আলোচিত হইয়াছে: শিক্ষিত হিন্দুর চোখে গ্রীক সভ্যতার দোষ গুণ কেমন ঠেকে, কোথায় আমাদের সভ্যতার সঙ্গে ইহার মিল কোথায় বিরোধ, ইহা বুঝা যায়। পরিশিষ্টে একটি ইংরেজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত প্রমাণ পঞ্জী দেওয়া হইয়াছে; ইহার দ্বারা, ও চারিটি বিষয়সূচীর দ্বারা ছাত্র ও অন্য অনুশীলনকারীর পক্ষে পুস্তক-খানির উপকারিতা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রন্থের আলোচ্য-বস্তু নির্দ্দেশ হইতে দেখা যায় যে গ্রন্থকার গ্রীকজীবনের প্রায় সমস্ত দিক বাঙ্গালী পাঠককে দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। একটি দিকে তিনি হাত দেন নাই—গ্রীকজাতির যাহা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দান—ললিতকলা ও বাস্তুশিল্প; কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে মুখবন্ধে সবিনয়ে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। রজনীবাবু আমাদিগকে এইরূপ সুন্দর একখানি বই দিলেন; গ্রীক ললিত কলা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় থাকিলে (এবং সোক্রাতেস-এর পরবর্ত্তী যুগে, অন্ততঃ আলেকজান্দ্রীয়-যুগ পর্য্যন্ত, গ্রীক জাতির প্রগতির কথা একটু সংক্ষেপে থাকিলে) বইখানি সর্ব্বাঙ্গ-পূর্ণ হইত; তাহা হইল না বলিয়া আমাদের একটু ক্ষোভ রহিয়া গেল।

রজনীবাবুর মতামত বা আলোচ্য বিষয়গুলির অনুশীলন-প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের কিছু সমালোচনা করিবার নাই, কারণ আমরা গ্রীক সভ্যতার, সাহিত্যের, শিল্পের অনুরাগী মাত্র, এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই। পুস্তকে রজনীবাবু মুখ্যতঃ আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি চয়ন করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন, বোধ-সৌকর্য্যার্থে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও অনুরূপ বিষয় উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, নিজের মতামত তাঁহার দিবার বড় একটা আবশ্যকতা হয় নাই; গ্রীক মনের ও গ্রীক কৃতির সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত দিয়াছেন, তাহা এ বিষয়ে যাঁহারা শিষ্ট, তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইবে বলিয়া মনে হয়। রজনীবাবু গ্রীক সভ্যতা ও জীবনের চিত্র দিয়াছেন। এই জীবনচিত্র একেবারে বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া; এক্ষেত্রে এতদ্বিষয়ক ইংরেজী ফরাসী জার্ম্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার পুস্তকে সাধারণত যেরূপ করা হয়, গ্রীক ভাস্কর্য্য, গ্রীক মৃন্ময় ভৃঙ্গার কলস পাত্র ভাজনাদিতে অঙ্কিত চিত্র, গ্রীক ভিত্তিচিত্র, mosaic, মুদ্রা প্রভৃতির ছবি খুব অধিক পরিমাণে দিয়া বিষয়টিকে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষী-ভূত করিয়া আরও চিত্তাকর্ষক করিতে পারা যাইত; কিন্তু এখানে গ্রন্থকারের কোনও হাত নাই, ভবিষ্যতে বাঙ্গলা বইয়ের আদর সাধারণে আরও হইলে পরে এই বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে। রজনীবাবু সমস্ত বিষয়টি অতি প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য সাধুভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এ বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু অধ্যয়ন করা না থাকিলেও অবলীলাক্রমে যে কোনও বাঙ্গলা-পাঠী সমস্ত বইখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন, আগ্রহের কোনও অভাব হইবে না।

গ্রীক শব্দের ও সমস্তপদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ যাহা তিনি দিয়াছেন

তাহা আমাদের বেশ সুন্দর লাগিয়াছে। গ্রীক ভাষার এক একটি সমস্ত-অভিধা এক একটি পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত করে; একমাত্র সংস্কৃতেই এইরূপ পদ মিলে। গ্রীক ধর্ম্মের বর্ণনা-প্রসঙ্গে এইরূপ বহু পদের প্রয়োগ আসিয়াছে।

ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে পরিচিত গ্রীক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বহু-সুবিদিত বচন ও গদ্য এবং পদ্য অংশ রজনীবাবুর বাঙ্গলা অনুবাদে পড়িয়া আমাদের বেশ লাগিয়াছে। এখানে আমরা রজনীবাবুর বই হইতে তাঁহার অনূদিত সোফোক্লেস্-এর "নরাশংস-গাথা" বা নর-স্তুতি উদ্ধার করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

'জগতে অনেক আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, কিন্তু মানব অপেক্ষা আশ্চর্য্যতর কিছুই নাই। মানুষ স্বীয় শক্তিতে দক্ষিণ-বায়ুর সাহায্যে ধবল সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইতেছে; যে তরঙ্গমালা তাহাকে প্রতিক্ষণ গ্রাস করিতে চাহিতেছে, তাহার নিম্নে সে পথ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। দেবগণের মধ্যে প্রাচীনতম, অমর, অক্লান্ত পৃথিবীকে অশ্বশাবক দ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া সে খিন্ন করিতেছে; তাহার হল বৎসরের পর বৎসর, একবার এদিকে এবং আবার ওদিকে সঞ্চালিত হইতেছে।

'নর তীক্ষ্ণবুদ্ধি; সে চঞ্চলচিত্ত বিহঙ্গমকুল, দুর্দ্দান্ত বন্য পশুবৃন্দ এবং সাগরবিহারী প্রাণিবর্গকে (স্বহস্ত) বয়িত জালের পাশে আবদ্ধ করিতেছে। যে পশু বনে-বাস করে, যে পশু পর্ব্বতে বিচরণ করে তাহাকে সে সুকৌশলে জয় করিতেছে। সে কেশগ্রীব অশ্বকে বশীভূত করিয়া তাহার স্কন্ধে যুগভার স্থাপন করিয়াছে; সে শৈলবিহারী শ্রান্তিহীন বৃষকে আপনার বশে আনিয়াছে।

'আর সে আপনি আপনাকে ভাষা, বায়ুতুল্য দ্রুতগামী মনন এবং রাষ্ট্রপরিচালিনী মনোবৃত্তি শিক্ষা দিয়াছে। উন্মুক্ত আকাশতলে বাস করা যেখন কঠিন, তখন কিরূপে তুষার সায়ক ও ঘন বর্ষার তীর ধারা হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে হয়, তাহাও সে আবিষ্কার করিয়াছে। এমত কিছুই নাই, মানুষ যে স্থলে নিরুপায়; ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, সে পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছে; সে কেবল মৃত্যুকে পরিহার করিবার সহায় পায় নাই; কিন্তু সে দুঃসাধ্য ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ পাইয়াছে।

'মানুষের উদ্ভাবনী বুদ্ধির কৌশল চিন্তার অতীত। উহা তাহাকে কখনও সুখ দিতেছে, কখনও দুঃখে নিপতিত করিতেছে। যে, ন্যায়-ধর্ম্মকে রক্ষা করিবে বলিয়া সে দেবগণের নামে শপথ করিয়াছে, মানুষ যখন সেই ন্যায়ধর্ম্মকে ও স্বদেশের বিধিসমূহকে মান্য করিয়া চলে, তখন তাহার পুরী মহোচ্চ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে; আর যে দুঃসাহস-ভরে পাপে লিপ্ত হয়, সে পুরীহীন, তাহার কোনও দেশ নাই।" (পৃঃ ৩২৭-৩২৮)।

রজনীবাবু গ্রীক নামগুলির গ্রীক উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গলায় লিখিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। এবিষয়ে আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কবি যাহাই বলুন, নামের একটি মোহ আছেই। পশ্চিম ইউরোপে বহুকাল হইতে গ্রীক দেবতাদির নামের পরিবর্ত্তে তাহাদের লাটিন প্রতিনাম বা বিকৃতরূপ চলিয়া আসিতেছে; যেমন 'আফ্রোদীতে' স্থলে 'বেনুস্' (বা 'ভীনাস্'), 'ওদুস্সেউস্' স্থলে 'উলিসসেস্' ইত্যাদি। আজকাল ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষার বইয়ে গ্রীক নামের যথার্থ রূপগুলি স্বগৌরবে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীক ভাষার প্রায় সমস্ত ধ্বনিগুলি বাঙ্গালীর মুখে উচ্চারিত হয়, বাঙ্গলা অক্ষরে ইহাদের নির্দ্দেশও সহজ; তবে কেন আমরা Aiskhulos (লাটিন বানানে Aeschylus) কে 'আইস্খুলোস' না বলিয়া, 'ইস্কাইলাস্' বলিতে যাই? আমাদের তো মনে হয়, গ্রীকের Platon 'প্লাতোন' ইংরেজী 'প্লেটো' অপেক্ষা শ্রুতিমধুর। রজনীবাবু ইংরেজীর পুরা কদুচ্চারণ অপহার করিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ডে প্রচলিত গ্রীক ভাষার শিষ্ট উচ্চারণ অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এক্ষেত্রে ইউরোপে সর্ব্বত্র গৃহীত গ্রীকের প্রাচীন উচ্চারণ, যাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা ধরিয়া লিখিলেই ভাল হয়। অনবধানতাবশতঃ দুই চারি জায়গায় গ্রীকশব্দের লাটিন রূপও প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, এটা একটা সামান্য ব্যাপার। তবে সাধারণ পাঠকের সাহায্যের জন্য গ্রীক বর্ণমালা ও উচ্চারণের উপর একটি নোট পুস্তক থাকিলে বোধ হয় ভাল হইত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িল—গ্রীক ভাষার উপর একটি অধ্যায় থাকিলে আমরা খুশী হইতাম। গ্রীক সংস্কৃতের কত নিকট সম্পৃক্ত, একের ভাষাতত্ত্বসম্মত পূর্ণ আলোচনায় অপরের সঙ্গে অল্প পরিচয়ও যে কত উপকারী, তাহা দুই চারিটি বাছা বাছা উদাহরণ দিয়া দেখাইতে পারিলে, আমার মনে হয় তাহা বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহলকে বিশেষ ভাবে জাগরিত করিত। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে আশা করি বেশী দেরী হইবে না; রজনীবাবু তখন এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে আমরা সুখী হইব।

গ্রীকদেবী Aphrodite আফ্রোদীতে (বা -দীতা)-র নাম রজনীবাবু 'অভ্রদত্তা' রূপে লিখিয়াছেন; যেন ইহার সংস্কৃতরূপ অভ্রদত্তা, যেমন 'জেউস্'-এর 'দ্যোস্', 'এওস্' এর 'উষস্'। 'আফ্রোদীতা' নামটি আর্য্যভাষার কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে; গ্রীক নামের প্রথম অংশ aphro সংস্কৃত 'অভ্র' শব্দেরই গ্রীকরূপ হইতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ ঈ-কার যুক্ত '-দীতা' বা '-দীতে' (ইংরেজী উচ্চারণে 'ডাইটী') যদি কোন আর্য্য ধাতু-জ শব্দ হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত 'দা' ধাতুর সহিত ইহার যোগ একেবারে অসম্ভব; শ্রোডার্ (Schroeder) Aphroditeর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'মেঘে উড্ডীয়মানা', এবং উৎপতনার্থক সংস্কৃত 'দী' ধাতুর (পরে 'ডী', 'উৎ+ডী' = 'উড্ডী'তে পরিণত) সহিত যোগ অনুমান করেন; হির্ট (Hirt) ও মাইয়র্ (Meyer) ব্যাখ্যা করেন 'ফেনপুঞ্জে দীপ্যমানা', এবং ইঁহাদের মতে দ্যোতনার্থক সংস্কৃত ধাতু 'দী' 'দীদী'র সহিত গ্রীক dite সংশ্লিষ্ট। (প্রেল্‌ভিৎস্ Prellwitz কৃত গ্রীক অভিধান দ্রষ্টব্য)।

১৫২ পৃষ্ঠার পরে গ্রীকদেব দিওনুসস্-এর চিত্রস্থলে অনবধানতাবশতঃ মাইনাস্ (mainas, ইংরেজী maenad মীনাড্)-নামধারী দিওনুসস্-এর সেবাসিনী বা উপাসিকার ছবি আসিয়া গিয়াছে; ফার্ণেলের Cults of the Greek States বইয়ের পঞ্চম খণ্ডে XLVIa ও XLVIb সংখ্যক দুইখানি গ্রীক ভৃঙ্গারাঙ্কিত চিত্রের মধ্যে প্রথম খানিই হইতেছে দিওনুসস্-এর।

মানসিক উৎকর্ষকামী সাধারণ বঙ্গভাষী, যাঁহার নানা ইংরেজী পুস্তক দেখিবার সুবিধা বা অবকাশ নাই, তাঁহার কাছে রজনী-বাবুর বই বিশেষ সমাদৃত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন কলেজে যে সব ছাত্র গ্রীক ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদেরও ইহা পাঠ করা উচিত। ইণ্টারমিডিয়েট-এর ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য এইরূপ একখানি বাঙ্গলা বইয়ের আবশ্যকতা ছিল। ইংরেজীতে গ্রীক সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তর সুচারু ও সহজলভ্য পুস্তক আছে। কিন্তু কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ সে সম্বন্ধে ছাত্রদের কিছু বলেন না, বা পড়িতে উৎসাহও দেন না। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, যুদ্ধ বিগ্রহ ভিন্ন আর কোনও বিষয় লইয়া ইতিহাসের পরীক্ষা হয় না, ফলে গ্রীক সাহিত্য, বা গ্রীক কৃতির সম্বন্ধে স্থূল কথাগুলিও না জানিয়া কেবল পেলোপোন্নেসীয় যুদ্ধের কারণাবলী, ও কি কি উপায়ে রোমানেরা গ্রীস জয় করিয়াছিল, এইসব বিষয়ের খুঁটিনাটি মুখস্থ না করিলে পাস করা যায় না। এই

রূপ একখানি বই ইণ্টারমিডিয়েট্ ছাত্রদের জন্য অনুমোদিত পুস্তকাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিলে অনেক ছাত্র ইহা পড়িতে পারে। কলেজে ও স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে এরূপ চমৎকার প্রাইজের বই অতি অল্পই বাঙ্গলায় আছে। প্রত্যেক স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড থাকা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা ও উন্নতি-কল্পে স্যর্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এযাবৎ যাহা সাধিত হইয়াছে, এই পুস্তক প্রকাশ তাহার মধ্যে অন্যতম কার্য্য। এই রূপ মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন প্রকাশ ও পাঠের সুযোগের জন্য গ্রন্থকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালী পাঠক, সকলকেই অভিনন্দিত করা যাইতে পারে।

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সিন্ধু-সাধ

হে সিন্ধু, তোমারে রাখি ভরি' আঁখি আঁখিজল করি',
এ আমার সাধ।—সমস্ত চেতনা মোর ভরি'
তুমি থাকো ভিতরে বাহিরে,
ইহ-পরকাল ঘিরে
তুহিন পরশ দিয়ে তব,
নিতি নব
আলোক উচ্ছল ছলছল জ্বালাময় মাধুর্য্যের রসে,
আঁধারের বিবশ অলসে,
ঝড়ের তাণ্ডব-দোলে, ক্রন্দনের সুর-খরধারে।
তোমাতে হারাই আপনারে,
আপনার যাহা-কিছু সকল ডুবায়ে তোমা-মাঝে।

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর! তোমার আহ্বান প্রাণে বাজে
মরণের ভেরীরব সম।
জীবন-সঞ্চয় যত মম
আজিকে কোথায় পড়ি' রয়,
পরিচয়
শুধু মোর যেন তোমা সনে
কোটি কোটি নিবিড় মরণে;
কারে আর নাহি চিনি, নাহি মানি, ভালো নাহি বাসি,
তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু তোমা পানে ছুটে আসি, ফিরে যাই,
পুনঃ ছুটে আসি,
অতন্দ্র চেতনা ভরি' তোমা সনে এক হয়ে জেগে
অনন্ত তৃষ্ণায় আর অনন্ত চঞ্চল চল-বেগে
কাল-অন্ত ধরি'।

কূল তব নাহি হেরি চোখে
অলক্ষ্যের পথ বাহি' চলেছি সে কোন্ স্বপ্নলোকে;
এ পথের কোথা শেষ?—শেষ যেন নাহি! মনে হয়,
এ নহে চোখের মায়া শুধু, নয়, নয়।—
কূল তব কোথা আজি হায়?
সুদূর ধরার স্মৃতি মন হতে ধুয়ে মুছে যায়
মলিন মাটির চিহ্ন সম।
শুধু হেরি তুমি আছ, দুনয়নে মম
আছে শুধু অশ্রুধারা, বেদনার আকুল প্লাবনে
তোমা সনে মেশামেশি হয়ে।...এত ব্যথা কেন মোর মনে
কে তা জানে? জানো কি তুমি যে কেন আছ,
কার পথ চেয়ে থাকো, কার লাগি বাঁচ
চির যুগ ধরি'? কার তরে উতল স্নেহের ব্যাকুলতা,
নাশিতে গ্রাসিতে চাহ, পিষিতে বক্ষের চাপে, নির্ম্মম মমতা?
আমার ক্রন্দন
তোমারই মতন হায় নাহি জানে তীরের বন্ধন,
নাহি মানে আপনার অবসান।
তরঙ্গে তরঙ্গে খরশান
বহে যায় যুগে যুগে লোক হতে লোকে লোকান্তরে—
কার তরে,
কোথা কার পানে,
আপনি তা নাহি জানে।

এ ধরা বেসেছে মোরে ভালো,
তার স্নিগ্ধ শ্যাম আলো
পরিপূর্ণ করে' ঢেলে আমার নয়ন মন ভরি',
নির্নিমেষে রাত্রি দিবা ধরি'
আমারে ঘিরিয়া তার জাগিয়াছে স্নেহ-আঁখি,
দিয়েছে যা দিতে পারে, কিছু আর দিতে নাহি বাকী,
তবু আরও দিতে চাহে। আমি কাঁদি অনন্ত তৃষ্ণায়;
যা পেয়েছি যা দিয়েছি কিছু তার সাথে নাহি হায়!
জানি না কেন যে আছি, জানি না কারে যে আমি চাই;
তুমি আছ, আমি আছি, আছে মোর অশ্রুধারা,
আজি আর কোথা কিছু নাই।

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

ভিন্ দেশের খেলার সাথী

সে অনেক দিনের কথা, নীল সমুদ্রের উপকূলে বাস করত এক জেলে আর জেলেনী।

জেলে সারাক্ষণ তার মস্ত বড় জালখানা নিয়ে মাছ ধরে' ধরে' সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত, আর জেলেনী ঘরে বসে' জাল বুনত আর কত কথাই ভাবত।

সে ভাবত—তাদের সব আছে, নেই কেবল একটি কচি মুখের মিষ্টি হাসি, একটি আধ-আধ ডাক। তার জন্যে সে দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করত।

কত বর্ষা কত বসন্ত তাদের সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে নেচে চলে' গেছে। এবার যখন বসন্ত আবার এল, তার ফুলে-ভরা সাজি থেকে একটি ফুলের মত ফুটফুটে মেয়ে জেলের ঘর আলো করতে দিয়ে গেল।

জেলে-জেলেনী এই ছোট মেয়ের রূপ দেখে' অবাক্ হ'য়ে গেল, দেবতার দান ভেবে তারা ভক্তিভরে মাথা নোয়ালে।

মা-বাপের আদরের ধন কচি মেয়েটির নাম রাখ্‌লে তারা রূপসী।

দিনের পর দিন সেই অনন্ত সমুদ্রের কোলে বনের ধারে মা-বাপের বুকে রূপসী যত বড় হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল তার রূপ তত উছলে পড়্‌তে লাগ্‌ল। যখন সে তার একরাশি কাল চুল ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত, তখন তাকে যে দেখ্‌ত সেই ভাব্‌ত এ অপরূপ সুন্দরী বুঝি বা কোন বনদেবী হবে।

সমুদ্রকে তার ভয় ছিল না, তার পারেই ছিল তার খেলাঘর। ঢেউএর নাচন আর তার নাচন সমান তালে উঠ্‌ত পড়্‌ত। এমনি করে' হেসে খেলে' আনন্দে তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল।

জেলে প্রতি দিন ভোর না হ'তে পাখী না জাগ্‌তে তার মস্ত জালখানি গুটিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ত। যখন সে সমুদ্রে এসে তার ছোট ডিঙ্গি খানিতে পাল্ল তুলে যাত্রা করত, তখন সবেমাত্র উষার আলোয় পূর্ব্বপার রাঙ্গা হয়ে আস্‌ত। সেই ভোরের সোনালি আলোতে ঝিরঝিরে বাতাসে, মনের আনন্দে জেলে মাছ ধরে' ধরে' ঘুরে বেড়াত।

সেদিন সে এমনি ভোরে উঠেই বেরিয়েছে, জাল ফেল্‌ছে আর মাছ ধর্‌ছে, একবার জাল ফেলে তুল্‌তে গেল, কিন্তু এ কি! জাল যে বড় ভারী! কোনমতে ত জেলে জাল টেনে ডিঙ্গিতে তুল্‌লে; জাল খুলে দেখে' ত জেলে অবাক্। দেখে কি একরাশ সোনালি রূপালি মাছের সঙ্গে, মাছের চেয়ে মস্ত বড় কি-একটা জন্তু জাল থেকে পালাবার জন্যে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে আর কেমন যেন করুণ কান্নার সুর করছে।

জেলে তাকে ভাল করে' দেখে শুনে আনন্দে নাচ্‌তে লাগ্‌ল, এ ত আর কিছু নয়, এ যে মানুষের মত হাত মুখ নাক চোখ সব আছে, কেবল মাছের মত চক্‌চকে লেজ, এ নিশ্চয় সেই যে সমুদ্রের তলায় মাছেদের রাজা-রাণী থাকে তাদেরই ছেলে। একে নিয়ে গেলে আর আমার কোন কষ্ট থাক্‌বে না। জেলে তাড়াতাড়ি ডিঙ্গি পাড়ে ভিড়িয়ে বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

বাড়ী গিয়ে জেলেনীকে ডেকে ডেকে বল্‌লে—"ওগো, দেখে যাও দেখে যাও কি এনেছি!"

জেলেকে এত শীঘ্র ফির্‌তে দেখে জেলেনী ভাব্‌লে বুঝি আজ গিয়েই ভাল মাছ পেয়েছে, তাই সে ঘর থেকে বল্‌লে—"কি এনেছ? আজ বুঝি খুব মাছ পেয়েছ, তাই এত ডাকাডাকি?"

জেলে হেসে বল্‌লে—"না গো, একবার এসে দেখে যাও না কি জিনিস, এমন কখনো দেখনি—"

জেলেনী একথা শুনে হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে জেলের হাতে ঐ অদ্ভুত জীবটিকে দেখে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

রূপসী খেলা-ধুলা ফেলে ছুটে এসে তাকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে—"দাওনা বাবা, ওকে নিয়ে আমি খেলা করব।"

জেলে তাকে মাটীতে নাবিয়ে দিতেই সে কেমন ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল, রূপসী তাকে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে—"দেখ তোমরা একে মের না, আমি এর সঙ্গে রোজ খেল্‌ব, একে খেতে দেব, কেমন মা?"

জেলেনী এতক্ষণে ভেবে ভেবে কিছুই বুঝ্‌তে পারে নি, কিন্তু ঐ অসহায় জীবটির কচি শিশুমুখখানি তার মনে অনেকখানি দয়া জাগিয়ে দিয়েছিল, সে বল্‌লে—"তুমি তো খেল্‌বে মা, কিন্তু ও যে জল না হলে মরে যাবে—"

জেলে বল্‌লে—"কি হবে ওকে নিয়ে, ও এখনি মরে' যাবে।"

কিন্তু আদুরে মেয়ে আব্‌দার করে বল্‌লে—'না মা, ওকে আমি জলে রাখ্‌ব, ঐ যে ছোট্ট হ্রদটা আছে ওকে ওখানে রাখ্‌লে আমি রোজ খেল্‌তে পাব।"

একথা শুনে জেলেনী বল্‌লে—"সেই ভাল, চল ওকে আমরা রেখে আসি।"

রূপসী তাড়াতাড়ি ছুটে মার সঙ্গে সঙ্গে সেই হ্রদের ধারে এল। যেমন তারা তাকে জলে নামিয়েছে, অমনি সে যে কোথায় চলে গেল তা মা ও মেয়ে কেউ দেখ্‌তে পেলে না।

সেদিন ছিল ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না রাত, সমুদ্রের ঢেউ চাঁদের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে। চারিদিক যেন জ্যোৎস্নায় ডুবে গেছে। এমন দিনে বেশী মাছ পাওয়া যায় বলে' জেলে তার জালখানি নিয়ে ডিঙ্গিতে উঠে বসে' পাল তুলে ভাসিয়ে দিলে।

একটু যেতেই তার যেন মনে হ'ল, অতল সমুদ্র ছাপিয়ে যেন কান্নার সুর ফেটে পড়ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার চারিপাশে মৎস্যরাজ তার সঙ্গীদের নিয়ে ভেসে উঠ্‌লেন।

রাজা রাণী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন—"আমাদের বাঁচাও, আমাদের একমাত্র ছেলেকে ফিরিয়ে দাও, তুমি যত কিছু মণি মুক্তা যা চাও তাই দেব, শুধু তাকে দিয়ে যাও। আমাদের বরুণকুমারকে দিয়ে যাও—"

এই কথা বলে' তারা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জেলের ডিঙ্গিখানি ঘিরে ধর্‌লে।

জেলে দেখ্‌লে, রাজার মাথার ঝাঁক্‌ড়া চুলের উপর লতাপাতা শেওলা দিয়ে তৈরী এক প্রকাণ্ড মুকুট, তাতে বড় বড় মুক্তা ঝিনুক দিয়ে সাজান, আর এক মস্ত বড় দাড়িতে রাজ্যের শামুক ঝিনুক ঝুল্‌ছে।

রাণীর গলায় এক মস্ত বড় মুক্তার সাতলহরী, পরণে সমুদ্রের ফেনার শাড়ী, মাথায় প্রবালের মুকুট, হাতে ঝিনুকের চুড়, শঙ্খের কঙ্কণ।

রাণী তাঁর গলার মুক্তার হার খুলে হাতে নিয়ে জেলেকে দেখিয়ে বল্‌লে—"এই নাও আমার হার তোমার মেয়েকে দিও, শুধু আমার ছেলেকে দিয়ে যাও। তোমার জালে রোজ মাছ পাঠিয়ে দেব। ঝড়ে জলে তোমায় রক্ষা করব। সমুদ্রের প্রবাল মুক্তা যখন চাইবে এনে দেব, শুধু দয়া করে' তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাও, তাকে না দেখে আমরা বাঁচব না।"

জেলে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল—"সরে' যাও, সরে' যাও, তোমাদের মায়া আমি জানি; ও-সব মণি মুক্তা আমাদের হাতে এলেই ফেনা হয়ে হাত পুড়িয়ে দেয়, চাই না আমি কিছু, তোমাদের ছেলেকে পাবে না, আমার মেয়ে দেবে না। আগে তোমরা ছয় বৎসর আমার সাহায্য কর, তখন দেখা যাবে ছেলে পাবে কি না। সরে' যাও, তোমাদের চোখের জলে এখনি আমার ডিঙ্গি ডুবে যাবে।"

যেই এই কথা বলা অমনি তারা একসঙ্গে এমনি করে' চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্‌ল যে, জেলে চোখে অন্ধকার দেখ্‌লে, ভয়ে চাঁদ লুকিয়ে গেল, সমুদ্রের জল গর্জ্জে' উঠ্‌ল। আর সেই চঞ্চল সমুদ্রের ঢেউএ ঢেউএ মায়ের বুকভাঙ্গা কান্না উছ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

জেলে চোখ চেয়ে দেখ্‌লে, মৎস্যরাজ একটা প্রকাণ্ড ঢেউয়ের উপর গম্ভীর হয়ে বসে' দাড়ি থেকে ঝিনুক শামুক খুলে জলের ভিতর ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে জেলে আর কোনদিকে না চেয়ে ঘরে ফিরে চল্‌ল।

বাড়ী ফিরে জেলে জেলেনীকে ডেকে চুপিচুপি সব কথা বল্‌লে। জেলেনী শুনে বল্‌লে "হাঁগা—তোমার কি আক্কেল বল ত, মাত্র ছয় বৎসরের কড়ার করতে গেলে কেন? ছয় বৎসর আর কয় দিন? দেখ্‌তে দেখতে ত কেটে যাবে। অনেক দিন সময় নিতে হয়। তা হলে আর তোমায় কষ্ট পেতে হ'ত না—"

জেলে হেসে বল্‌লে—"এখন ত কিছুদিন আরাম করা যাক্, এর পরে ওকে না দিলেই হবে।"

এদিকে রূপসী রোজ রোজ সেই হ্রদের কাছে যায়. দূর থেকে জলের উপর খেলার শব্দ পায়, কিন্তু কাছে গিয়ে সে আর তাকে দেখ্‌তে পায় না। রোজ সে কত খাবার নিয়ে গিয়ে ডাকে। কিন্তু প্রথম প্রথম বরুণ-কুমারের বড় ভয় কর্‌ত, শেষে আস্তে আস্তে তার ভয় ভেঙ্গে গেল, সে এসে রূপসীর কচি হাত থেকে খাবার খেত, নরম নরম আঙুলগুলিতে চুমা দিত, জলের উপর ডিগ্‌বাজী খেল্‌ত। রূপসী তাই দেখে আনন্দে বিভোর হয়ে অবাক্ হয়ে বসে থাক্‌ত। আর নিজের মনে কত কথা তার সঙ্গে বকে' যেত। কিন্তু বরুণ কোন কথা বল্‌ত না দেখে' রূপসী ভাব্‌ত, হয়ত বা সে বোবা।

কিন্তু একদিন যখন বরুণ মস্ত বড় হাঁ করে' ডাক্‌লে—রূ-প-সী, তখন তার আনন্দ দেখে কে। সে দুহাতে তালি দিয়ে নেচে গিয়ে বাবা মাকে বলে' এল। সেদিন থেকে তার অন্য সব খেলা ঘুচে গেল, সে সারাক্ষণ তার কাছে বসে' গান কর্‌ত গল্প কর্‌ত। আজকাল সে সমুদ্রের ধারে যেতে পায় না, তার মা বাবা বারণ করেছেন, কাজেই তার খেলার সঙ্গী হ'ল বরুণকুমার। আর বরুণও রূপসীকে দেখ্‌লে জলের ধারটিতে সরে' এসে বসে' বসে' শরের বাঁশি বাজায়, হ্রদের নীল লাল পদ্ম এনে দেয়। ক্রমে সে রূপসীর কাছে তাদের কথা শিখ্‌লে, গান শিখ্‌লে। দুজনে আর কেউ কাউকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না। তাদের ভাবও যত বাড়্‌তে লাগ্‌ল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বয়সও বাড়্‌তে লাগ্‌ল।

রূপসী আর এখন ছোট নেই, তার সর্ব্বাঙ্গে যেন সৌন্দর্য্যের জোয়ার এসেছে, তার মেঘবরণ চুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, চোখ দুটিতে নীলকান্ত মণির আভা ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। যখন রূপসী হ্রদের ধারে ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ে' বরুণের সঙ্গে গল্প করে, আর গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে সোনার মত রোদ এসে তার কালো চুলে ছড়িয়ে পড়ে, চঞ্চল বাতাস এসে সেগুলো নিয়ে খেলা করে, তখন বরুণ অবাক্ হয়ে কেবল তাকে চেয়ে দেখে।

একদিন গল্প কর্‌তে কর্‌তে রূপসী বল্‌লে—"জান ভাই বরুণ, আমাদের খেলা বুঝি শেষ হয়ে এল।"

চম্‌কে উঠে বরুণ বল্‌লে—"কেন রূপসী, তোমরা কি কোথাও চলে যাবে?"

রূপসী ম্লান হাসি হেসে বরুণের হাতখানি ধরে' বল্‌লে—"না, আমরা আর কোথায় যাব, তোমার যে ছয়বৎসর পরে তোমার বাপ-মার কাছে ফিরে যাবার কথা, ছয় বৎসর তো হয়ে এল ভাই।"

"ওঃ তাই বল, আমি ত যাব না, তোমায় ছেড়ে এই সুন্দর আলো বাতাস, গাছ পালা ফেলে, সেই অন্ধকারে সমুদ্রের তলায় আমি ফিরে গেলাম কিনা। তুমি ভেব না রূপসী, আমি আর যাব না।"

আনন্দে রূপসী তার হাতখানি জড়িয়ে ধরে' বল্‌লে—"না ভাই যেও না, তুমি গেলে আমি কি করে' একা থাক্‌ব, আমি কার সঙ্গে গল্প কর্‌ব, কার কাছে আস্‌ব?"

বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দুটিতে জল ভরে' এল।

বরুণ রূপসীর চোখে জল দেখে বল্‌লে—"না ভাই, আমি কিছুতে যাব না, তুমি তোমার বাবা-মাকে বলে' দিও, যদি আমার বাবা মা আমায় চান, তবে বল্‌বে যে আমি এখান থেকে গেলে এক দিনও বাঁচ্‌ব না।"

রূপসী ছুটে গিয়ে তার বাপ-মাকে বরুণের সব কথা বল্‌লে।—কিন্তু সময় তো নেই; এই সাম্‌নের পূর্ণিমায় ছয় বৎসর পূর্ণ হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা রাত। সমস্ত জল স্থল আলোয় আলো হয়ে গেছে। জেলে জাল নিয়ে গিয়ে ডিঙ্গি খুলে দিলে, মাঝ সমুদ্রে এসেছে যখন তখন জেলে দেখ্‌লে যে,

মৎস্যরাজ তার সঙ্গীদের নিয়ে এসে হাজির। জেলে ভাবলে না জানি আজ কপালে কি আছে।

রাজা-রাণী জেলেকে ডেকে বল্‌লে—"কই আমাদের বরুণকুমারকে নিয়ে এলেনা, আজ ত ছয় বৎসর শেষ হ'ল। এ ছয় বৎসর ধরে' আমরা নিয়ত তোমায় ঝড়ে জলে আপদে বিপদে রক্ষা করেছি। প্রতিদিন মাছদের ভুলিয়ে তোমার জালে এনে দিয়েছি, আমাদের ছেলেকে এনে দাও।"

জেলে ভয়ে ভয়ে বল্‌লে—"সে তোমাদের কাছে আস্‌তে চায় না। সে পৃথিবীর আলো বাতাস ছেড়ে তোমার অন্ধকার ঘরে যেতে চায় না। সে বলেছে, তোমাদের বল্‌তে, যে, তাকে নিয়ে গেলে সে একদিনও বাঁচ্‌বে না। কি হবে তার আশা করে' বসে' থেকে। সে যেখানে ভাল থাকে সেখানেই থাক না কেন। আর তার আশা কোরো না, যাও।"

যেই জেলে এই কথা বল্‌লে, অমনি সকলে একসঙ্গে বলে' উঠ্‌ল—"ও! এমনি করে' অকৃতজ্ঞ মানুষে কথা রাখে।" সকলে এমন একটি মর্ম্মভেদী চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্‌ল যে, সে শব্দে পৃথিবী থর্‌থর্ করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, দূরের নৌকা কিনারায় ঠেকে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কাল মেঘ করে' প্রলয়ের ঝড় এল!

জেলে ত কোনমতে প্রাণে প্রাণে বাড়ী ফিরে এল, কিন্তু ঝড় জল আর তিন দিনের মধ্যে থাম্‌ল না।

বাতাসের শন্‌শনে, সমুদ্রের গর্জ্জনে মায়ের কান্না হা হা করে' বেড়াতে লাগ্‌ল।

তিনদিন পরে ঝড় জল থাম্‌লে রূপসী আবার বন্ধুর কাছে ফিরে গেল। ঝড়ে জলে তিন দিন দেখা হয়নি, কত কথাই তাদের জমে' ছিল, সেই সব গল্প কর্‌তে কর্‌তে তাদের সময় কেটে গেল।

একদিন বরুণ হ্রদের তলা থেকে কতকগুলি শামুক ঝিনুক নিয়ে এসে রূপসীকে দিলে। রূপসী সেগুলি পেয়ে ভারি খুসী হ'ল। তার হাসিভরা মুখখানি দেখে বরুণ বল্‌লে—"তুমি এইগুলি নিয়ে এত সুখী হ'লে রূপসী, আর সমুদ্রের নীচে যে কত রং-বেরংএর শামুক ঝিনুক আছে তার অন্ত নেই। আমি ছোট বেলায় যেগুলি নিয়ে খেলা কর্‌তাম, সেগুলি কেউ এনে তোমায় দিলে তুমি কত খুসী হতে।"

রূপসী তার দুঃখ দেখে বল্‌লে—"তোমার বুঝি সেগুলির জন্যে মন-কেমন কর্‌ছে? আচ্ছা বস, আমি আস্‌ছি।"

এই কথা বলে' সে মা-বাপের মানা ভুলে গিয়ে একেবারে এক দৌড়ে সমুদ্রের কূলে গিয়ে হাজির। সেখানে গিয়ে রূপসী ডেকে বল্‌লে—"ও সমুদ্ররাজ, ও বরুণকুমারের বাবা, শুনে যাও বরুণ কি বল্‌ছে। সে যে তার সেই ছোট বেলার খেলার লাল নীল শামুক ঝিনুকগুলি চায়, দেওনা সেগুলি, তাকে দিয়ে আসি।"

মৎস্যরাজ রূপসীর কথা শুনে উঠে এসে বল্‌লেন—"কি বল্‌ছ রূপসী,—বরুণ কি বল্‌চে?"

"বরুণ তার ছোট বেলার খেলার সেই লাল নীল শামুক ঝিনুকগুলি চায়, দিয়ে যাও না তাকে দেব।"

"আচ্ছা দাঁড়াও আন্‌ছি।"

এই কথা বলে' এক ডুবে মৎস্যরাজ সমুদ্রের তলা থেকে সুন্দর সুন্দর কতকগুলি শামুক নিয়ে এসে রূপসীকে দেখালেন। রূপসী হাত বাড়িয়ে যেই সেগুলি নিতে যাবে অমনি মৎস্যরাজ তার কোমরটি জড়িয়ে ধরে' তার মুখে এক ফুঁ দিলেন। রূপসী চোখে আঁধার দেখে রাজার কোলে ঢলে' পড়্‌ল। তাকে নিয়ে মৎস্যরাজ এক ডুবে সমুদ্রের তলায় প্রাসাদে গিয়ে পৌছলেন। চারিদিকে আনন্দের রোল উঠ্‌ল।

এধারে বেলা ডুবে গিয়ে রাত ঘনিয়ে এল, তবু রূপসী খেলা সেরে ঘরে এল না দেখে মা-বাপের মনে ভয় হ'ল। এধার ওধার খুঁজে যখন তাকে কোথাও পেলে না তখন তাদের আর বুঝ্‌তে কিছুই বাকী রইল না। জেলেনী কপালে হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে বস্‌ল। জেলে ছুটে সমুদ্রের পাড়ে এসে ডেকে বল্‌লে—"ওগো সমুদ্ররাজ, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমাদের এক মাত্র মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে যাও। তোমাদের বরুণকে এখনি এনে দিচ্ছি।"

মৎস্যরাজ এসে বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্‌লে—"এখন কেন? আগে ছয় বৎসর যাক্, তার পর মেয়ে নিয়ে যেও।"

মৎস্যরাজ ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে জেলের কাতর মুখের দিকে চেয়ে বিজয়-গর্ব্বে ফিরে গেল।

নিজের ফাঁদে নিজে আটকে জেলে ঘরে ফিরে এসে কেঁদে কেটে দিন কাটাতে লাগ্‌ল।

একদিন যায়, দুদিন যায়, রূপসী আসে না কেন, বরুণ অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। রোজ জেলেনী তাকে খাবার দিতে যায়, বরুণ দুই আগ্রহভরা দৃষ্টি তুলে জেলেনীকে রূপসীর কথা জিজ্ঞাসা করে। জেলেনী 'আজ আস্‌বে কাল আস্‌বে' করে' তাকে ভুলিয়া রাখে। কিন্তু আজ যখন তাকে জেলেনী খাবার দিতে গেল, সে কেঁদে বল্‌লে—"কই রূপসী ত এল না, কেন তাকে তোমরা আসতে দিচ্ছ না, আমি যে একা থাক্‌তে পারি নে।"

এ কথায় জেলেনী কেঁদে ফেলে বল্‌লে—"বাছা, তাকে কি আমরা আন্‌তে পারি? সে যে তোমাদের রাজ-বাড়ীতে আছে, তোমার বাবা তাকে নিয়ে গেছেন।"

এই কথা শুনে বরুণ চম্‌কে উঠ্‌ল, তবে রূপসী এখন আস্‌তে পাবে না। সেদিন হতে তার চোখে দিনের আলো ম্লান হয়ে গেল, রাতের তারা নিবে গেল। সে খেলেও না হাসেও না, বসে' বসে' পথ চেয়ে দিন গুনে সময় কাটিয়ে দেয়।

মৎস্যরাজের রাজ-পুরীতে রূপসীর দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল কেঁদে কেটে। সেখানে সে না বোঝে ভাষা, না পায় আলো। প্রাণের সঙ্গী বরুণের খেলাঘরে তার হাতে নাড়া চাড়া খেল্‌নাগুলি কোলে করে' তার জন্যে বসে' বসে' রূপসী কাঁদে। মৎস্যকন্যারা তাকে কত খেলা কর্‌তে ডাকে, কত বোঝায়। ক্রমে সে তাদের ভাষা শিখ্‌লে তাদের খেলা শিখ্‌লে, রাজপুরীতে রাজকন্যার আদরে থাক্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তার মন পড়ে আছে যেখানে তার প্রিয় সাথী একলা তার পথ চেয়ে দিন গুন্‌ছে।

ছয় বৎসর আর কতদিন, এক বৎসর, দুবৎসর করে' দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছয় বৎসর ফুরিয়ে এল।

একদিন জেলে হ্রদের ধারে এসে বরুণকে বল্‌লে—"এস বরুণ, আজ রূপসীর আসার দিন। চল তাকে আমরা নিয়ে আসি।"

এ কথা শুনে বরুণ আহ্লাদে ছুটে এল। জেলে তাকে নিয়ে নীল সমুদ্রের কিনারায় এসে ডিঙিতে তাকে তুলে দিয়ে নিজে উঠে ডিঙি খুলে দিলে। একটু যেতেই তারা রূপসীর আসার শব্দ পেতে লাগ্‌ল; অধীর উৎসুক মনে তার জন্যে তারা অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলের ঢেউয়ের উপর রূপসীর সুন্দর মুখ-খানি ভেসে উঠ্‌ল। আগ্রহভরে দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বরুণ রূপসীকে তুলে নিতে গেল। রূপসী মনের আনন্দে বন্ধুর হাত ধরে' ডিঙিতে উঠে বল্‌লে—"এই যে আমি এসেছি—"

এবারে রূপসী ডিঙিতে উঠা মাত্র জেলে বরুণকে ঠেলে জলে ফেলে দিলে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজা-রাণী তাকে বুকে তুলে নিয়ে অতলে তলিয়ে গেল।

রূপসীকে পেয়ে জেলে-জেলেনী প্রাণ ফিরে পেলে। কিন্তু তার যে কিছুই ভাল লাগে না,—ছয় বৎসর রাজ-প্রাসাদে থেকে গরীব বাপের ঘর কেমন যেন ছোট মনে হয়। পৃথিবীর আলো বাতাস সব যেন তার অন্য রকম লাগে। আর যার জন্যে সে ফিরে আস্‌বার জন্যে প্রতিদিন উৎসুক হয়ে ছিল, যার জন্যে এই হ্রদ এই ঘর তাকে নিত্য টান্‌ছিল সেই বন্ধুকেই যখন এসে পেলে না তখন তার কাছে সব যেন মলিন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের হাসি চোখের আলো যেন নিবে গেল। সোনার বর্ণ কালী হল। দেখে মা-বাপের মনে ভয় হ'ল। কি করে, মেয়ের এ দুঃখ কি করে' দূর করবে তারা। একদিন মা ডেকে বল্‌লে—"রূপসী মা আমার, তুই সারাক্ষণ তার কথা ভাবিস্ নে, সে ত আর আস্‌বে না। তোর মুখের হাসি আমার ঘরের আলো, তোর মুখ অন্ধকার দেখ্‌লে কেমন করে' ঘরে থাকি! তুই মা, তার কথা ভুলে যা!"

রূপসী ছল্‌ছল্ চোখে মার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চলে' গেল, কোন কথা বল্‌লে না।

সে দিন যখন পশ্চিম কোণে মেঘ করে' ঝড় ঘনিয়ে এল, চঞ্চল সমুদ্র উছ্‌লে উঠে আছ্‌ড়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, তখন রূপসী উদাসমনে তার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঝড়ো হাওয়ার তালে তালে সমুদ্রের জল উঠে পড়ে' ছুটে চলেছে, আর তার স্রোতে গা ভাসিয়ে ফেনার ফোয়ারা নিয়ে মৎস্যকন্যারা খেলা করুছে। তাদের

কল্‌কল্ ও ভাষা ও চল্‌চল্ শব্দে রূপসীর বুক কেঁপে উঠ্‌ল, সে ভাব্‌লে যদি সেও এর মধ্যে থাকে।

আগাছার আড়ে লুকিয়ে শুয়ে পড়ে' আস্তে আস্তে রূপসী ডাক্‌লে—"বরুণ।"

জলের তলা থেকে সেই পরিচিত ডাক শুনে বরুণ ছুটে এসে রূপসীর হাতটি ধরে' দুঃখের কথা বল্‌তে লাগ্‌ল।

রূপসী আদর করে' বল্‌লে—"ভাই এসনা আবার আমরা আগের মত থাকি।"

বরুণ বিষণ্ণভাবে বল্‌লে—"কি করে হবে রূপসী, আমি কি করে যাব?"

রূপসী বল্‌লে—"তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাই চল। এই ছয় বৎসর তোমাদের বাড়ীতে থেকে আর জলে থাকতে আমার কষ্ট হয় না।"

"কি করে' তা হয়? বাবা না নিয়ে গেলে তোমায় বাঁচিয়ে আমি ত নিয়ে যেতে পারি নে। আর বাবা যে মানুষদের বড় ঘৃণা করেন। তার চেয়ে আমি কি করে' যাই তাই বল না?"

রূপসী বল্‌লে—"তাই ত ভাব্‌ছি কি করা যায়। এমন করে' আর ভাল লাগে না একা একা। দেখ, এক উপায় আছে। তুমি যে হ্রদে থাক্‌তে, এবার বর্ষায় ঐ পশ্চিমের মোহনার সঙ্গে তার যোগ হয়ে গেছে। এই ধার দিয়ে তুমি যদি উজান বেয়ে যেতে পার, তবে তিন দিনে তুমি সেখানে পৌঁছতে পার্‌বে। কিন্তু ভাই এত কষ্ট করে' কি যেতে পার্‌বে?"

বরুণ আনন্দে রূপসীর সুন্দর হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে' বল্‌লে—"খুব পার্‌ব রূপসী, তুমি সে জন্যে ভেব না। এই ঝড়টা থেমে গেলে, কাল ভোরে উঠে আমি রওনা হব।"

"তোমার পথ চেয়ে আমি এই তিন দিন সেখানে বসে' থাক্‌ব, তুমি সেখানে গেলে আর আমাদের কেউ দূরে রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

"হ্যাঁ কালই আমি যাব তুমি কিছু ভেবো না।"

ভোর না হ'তে হ'তেই বরুণ উঠে তার বন্ধুর উদ্দেশে যাত্রা করলে। আস্তে আস্তে জলে শব্দ না করে' সাবধানে জল কেটে কেটে সে এগিয়ে চল্‌ল। তার কেবলি ভয় হচ্ছিল পাছে কেউ জান্‌তে পারে।

উজান যেতে তার বড় কষ্ট হচ্ছিল, একটু করে' যায় আবার থামে. কিন্তু যখনি মনে করছিল যে তার রূপসী তার প্রতীক্ষায় বসে' আছে, তখনি সে প্রাণপণে তাড়াতাড়ি চলার চেষ্টা কর্‌ছিল। ক্রমে সে দুদিন পরে মোহনার কাছাকাছি এসে পড়্‌ল। এমন সময় হঠাৎ শিকারীর বাঁশি শুনে সে চম্‌কে উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল, কিন্তু প্রতিকূল স্রোতের তাড়নায় সে কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পার্‌ছিল না। আবার যেই ভেসে উঠেছে, অমনি শিকারীর দল চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ঐ ঐ ঐরে।"

বল্‌তে বল্‌তে একটা তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীর এসে বরুণের প্রাণভরা আশা মনভরা ভালবাসা এফোঁড় ওফোঁড় করে' দিয়ে চলে' গেল।

একটি রক্তজবার মত বরুণের সুন্দর দেহ নীল জলে তলিয়ে গেল।

একদিন গেছে, দুদিন গেছে, তিন দিন গেল। অধীর আবেগে উৎকণ্ঠায় রূপসী জলের পথে দৃষ্টি রেখে বসে' আছে। কিন্তু প্রতিক্ষণের প্রতীক্ষা প্রতি পদে পদে পিছিয়ে যাচ্ছে, কই বন্ধু ত এল না। আরো দুদিন সে তার পথ চেয়ে কাটিয়ে দিলে। কিন্তু আর ত পারে না। নানারকম ভয়ে তার বুক দুরুদুরু কর্‌তে লাগ্‌ল। সে আর বসে' থাক্‌তে পারলে না, খুঁজ্‌তে বার হ'ল। ক্রমাগত সমুদ্রের কূল ধরে' ছুটে ছুটে তার পাদুখানি রক্তাক্ত হয়ে গেছে, আকুল প্রাণে সে গাছ-পালা পশু-পাখী সকলকে বরুণের কথা জিজ্ঞাসা করে, আর দুচোখে তার জল বয়ে যায়। জলের উপর কিছু দেখে চম্‌কে দাঁড়িয়ে যায়, তাকিয়ে দেখে হয়ত ফুলের রাশ, না হয় ফেনার দল ভেসে যাচ্ছে। একবার মনে হ'ল জলে যেন রক্ত ভেসে যাচ্ছে, ভয়ে দুঃখে অবসন্ন হয়ে সে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে' বল্‌লে—"ও গো বন্ধু এস, আর ত পারি নে, না হয় বল তোমার কাছে যাই।"

হঠাৎ রূপসীর মনে হ'ল যেন অতল সমুদ্রের তলা থেকে সেই সুপরিচিত স্বর তাকে আকুল হয়ে ডাক্‌ছে—"এস ওগো এস, আর সময় নেই।"

রূপসী আনন্দে অধীর হয়ে বল্‌লে—"এই যে আমি এসেছি—"

বল্‌তে বল্‌তে সেই অগাধ জলের বুকে রূপসী পরীকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

তার হিম দেহখানি কোথায় মিলিয়ে গেল তা কে জানে?

অনন্ত সমুদ্র যেমন নেচে চল্‌ছিল তেমনিই চল্‌ছে, কে বল্‌বে তাকে দেখে যে সে কিছু জানে! *

শ্রী কাত্যায়নী দেবী

ফুলের গন্ধ

মানুষ মাত্রেই ফুলের গন্ধের আদর করিয়া থাকে। সকল জাতিই দেবপূজায় গন্ধ-পুষ্প ব্যবহার করে। অসভ্য বন্য নরনারীও ফুলের অলঙ্কার পরিয়া থাকে। মানব ভিন্ন কেবল কীট পতঙ্গই ফুলের গন্ধ ভালবাসে, অন্য কোন প্রাণী বোধ হয় ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয় না।

কয়েকপ্রকার পাখীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে; তাহারা তাহাদের বাসা সুন্দর সুন্দর শামুক, নুড়ি ও নানা-বর্ণের ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখে, কিন্তু গন্ধের জন্য নহে, কারণ পাখীদের ঘ্রাণশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

হস্তী পদ্মবনে উৎপাত করে—ফুলের লোভে নহে—মৃণালের লোভে। গরু ছাগল প্রভৃতি পশুগণ নিমীলিত নয়নে ফুল পাতা চর্ব্বণ করে—গন্ধের জন্য নহে। কেবল কীট পতঙ্গই গন্ধে আকৃষ্ট হয়।

ফুলের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে আদিতে ফুলের বর্ণ ছিল না; তবে গন্ধ যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পতঙ্গগণ ফুলের গন্ধেই প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়। অনেক পতঙ্গ আছে তাহারা অন্ধ, কেবল গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই ফুলের সন্ধান পায়। নিশীথপুষ্পের রূপ নাই—কিন্তু প্রায় সকলগুলির সুগন্ধ আছে।

আবার অনেকগুলি ফুলের গন্ধ আমাদের নিকট মনোরম না হইলেও মক্ষিকাদির নিকট সুন্দর, যেমন কোন ফুলের গন্ধ পচা মাংসের মত, কেহ বা পুরীষ-গন্ধী।

মৌ-মাছিরা গন্ধের দ্বারা পরস্পরকে চিনিতে পারে। দুইটি পিপীলিকার দেখা হইলে তাহারা শুঁড় নাড়িয়া পরস্পরকে সম্ভাষণ করে, বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। কেন জান? প্রত্যেক দুর্গেতে বা অনেক সম্প্রদায়-মধ্যে একরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা বাক্য থাকে যাহার দ্বারা নিজ দুর্গের বা সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরকে বুঝিতে পারে যে তাহারা স্বপক্ষের। সেইরূপ প্রত্যেক দলের মৌমাছি ও পিপীলিকা পরস্পরের গন্ধে বুঝিতে পারে তাহারা স্বপক্ষের কি না। অন্য চাকের মৌ-মাছি অপর চাকে যাইলে এ চাকের মৌমাছিরা তাহার গন্ধ শুঁকিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। একজন মৌমাছি-পালক মাছির গন্ধ দ্বারা বুঝিতে পারেন তাহা কোন্ চাকের মাছি।

অনেক পতঙ্গ ফুলের বর্ণে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ মাছি-জাতির চক্ষের গঠন এমন যে তাহারা কয়েক ফুটের বেশী দূরে দেখিতে পায় না। কিন্তু তাহাদের ঘ্রাণশক্তি বড় প্রখর. ফুলের গন্ধ পাইলেই তাহারা আসিয়া জুটে ও পরে বর্ণের জন্য ফুল খুঁজিয়া পায়।

অনেক ফুল আছে যে কীট-পতঙ্গের সাহায্য বিনা তাহাদের বীজ জন্মে না। সাধারণতঃ ফুলদিগকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—(১) কীটপ্রিয়, (২) বায়ু-প্রিয়। কীটপ্রিয় ফুলমাত্রেই সুগন্ধ ও সুবর্ণ ও মধুযুক্ত হয়; তাহাদের পরাগ প্রায়ই কীট পতঙ্গ ও কদাচিৎ পক্ষীর দ্বারা বাহিত হইয়া গর্ভকেশরে যায়। বায়ুপ্রিয়গুলি প্রায় ক্ষুদ্র, গন্ধ- ও বর্ণ-বিহীন; বায়ু ও জল তাহাদের পরাগ বহিয়া আনে। দেবদারু, ঝাউ, শস্য ও তৃণবর্গ এই শ্রেণীর। ধানের ক্ষেতে যে বাতাস ঢেউ খেলিয়া যায় তাহা আমাদের পক্ষে কেবল দেখিতে সুন্দর নহে, জীবনধারণের পক্ষেও একান্ত আবশ্যক—কারণ বাতাস না বহিলে ধান-গাছে ধানই জন্মিবে না। ইহাদের একের পরাগ বা রেণু বাতাসে অপরের গর্ভকেশরে না পৌঁছিলে বীজ জন্মে না।

দেখা গিয়াছে যে যদি কোনও গন্ধবিহীন ফুলে কোন সুগন্ধ মাখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে অনেক বেশী কীট পতঙ্গ আসিয়া জুটে।

ফুলের গন্ধ বর্ণ ও মধু ফুলের বা গাছের ত্যাগ করিবার অংশ—অর্থাৎ আমাদের শরীরের যেমন বিষ্ঠা মূত্র ঘর্ম্ম, ফুলের তেমনি বর্ণ গন্ধ ও মধু। এ বিষয় পরের প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে রচিত।

জিজ্ঞাসা

(১৩১)

"উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে"

'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' কথাটার উৎপত্তি কোথা হইতে? কোন্ সময়ে কে কাহাকে বলিয়াছিল বা কি ভাবে উঠিয়াছিল?

শ্রী বিজয়গোপাল বক্সী

(১৩২)

ভূতের ব্যাগার খাটা

'ভূতের ব্যাগার খাটা'—ইহার তাৎপর্য্য কি? এখানে ভূত শব্দের শব্দগত অর্থের কিছু সার্থকতা আছে কি?

শ্রী সুধাংশুভূষণ পুরকাইত

(১৩৩)

নেবু-গাছের পোকা

শ্রাবণ মাসের শেষে গান্ধি নামক এক প্রকার সবুজ বর্ণের পোকা কমলা লেবু পাতি লেবু ইত্যাদির উপর বসিয়া ওগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয় এবং ২।১ দিবস পরে লেবু গাছ হইতে পড়িয়া যায়। যদি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক কেহ ঐ পোকার হস্ত হইতে লেবু রক্ষার উপায় জানান তাহা হইলে বিশেষ কৃতার্থ হইব।

ত্রৈলক্যমোহন চক্রবর্ত্তী

গাঙ্গেরখেমখোর গ্রাম, হাইলাকান্দী পোষ্টাফিস, জেলা কাছাড়

(১৩৪)

মুর্শিদাবাদের জঙ্গলে কামান

মুর্শিদাবাদ ষ্টেশনের উত্তর-পূর্ব্ব পাকা রাস্তা ধরিয়া প্রায় আধ মাইল যাইলে জঙ্গলের ভিতর একটি বৃহৎ তোপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নিকটে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে এবং উহার গুঁড়ি তোপটিকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ঐ জঙ্গলের ভিতর অতবড় একটি তোপ কি করিয়া আসিল? কোন্ নবাবের সময় ইহা সম্ভব হইতে পারে? স্থানটিকে তোপখানা এবং জাহান-কোশ দুইই বলে। তোপখানার জন্য স্থানটির নাম তোপখানা হওয়াই সম্ভব, কিন্তু জাহান-কোশের সহিত কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে কি না? তোপ-স্থাপনকর্ত্তার নামের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই ত?

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বসু

(১৩৫)

জলুস সন

মেদিনীপুর জেলার কাঁথিমহকুমার খেজুরী থানায় সাহাপুর গ্রামের জমিদার জনৈক প্রাচীন মুসলমানের গৃহে দুইখানি পারস্য ভাষায় লিখিত সনন্দে দেখিলাম—একখানিতে "১৫ই মহরম সন ৮ জলুস্ মোতাবেক ১৫ মাহা ভাদ্র সন ১১৩৩ সাল" ও অন্যটিতে "৯ রবিয়ল-আউল ২১ জলুস্ মোতাবেক সন ১১৪৬ সাল" লিখিত আছে। সনন্দগুলি নবাবের কর্ম্মচারী ও জমিদারের সহি-মোহর-যুক্ত। উভয় সনন্দের দ্বারা জানা যায়—এই 'জলুস' নামক সনের আরম্ভ ১১২৬ সাল। এই 'জলুস্' সন কাহার দ্বারা প্রচলিত বা কি অনুসারে গণনীয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ

(১৩৬)

চীনে আলু ও চীনে বাদাম

শক্ক-আলুকে (শাঁক-আলু) মেদিনীপুর জেলায় কাঁথিতে "চীনে-আলু" বলে কেন? "চীনে-বাদাম" নামক যে এক-প্রকার বাদাম সচরাচর বাজারে দৃষ্ট হয় উহার নামই বা "চীনে-বাদাম" কেন? উহারা কি চীন দেশ হইতে আনীত?

শ্রী সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য

(১৩৭)

ছায়া-রহস্য

সূর্য্যরশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের যে ছায়ার সৃষ্টি হয়, তাহার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শূন্যে দৃষ্টিপাত করিলে সাদা রকমের আর-একটি ছায়া দেখা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রী সুরথকুমার সরকার

[শ্রী দিগেন্দ্রনাথ পালিত]

(১৩৮)

কাশীর অশোকস্তম্ভ এখন কোথায়?

বিশ্বকোষে "কাশী" (৪র্থ খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা) ও "সারনাথ" (২১ খণ্ড পৃঃ ৪৮৯) প্রবন্ধে দেখিলাম যে লাট ভৈঁরো বা ভৈরবলাট নামে পরিচিত একটি অশোক-প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ বারাণসীর সন্নিকটে অবস্থিত আছে। ভারতবর্ষ ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক মাসের ৭১৫ পৃষ্ঠায় বারাণসীর অশোকস্তম্ভ বলিয়া একটি এলাহাবাদ-স্তম্ভের অনুরূপ স্তম্ভের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। হিউয়েন সঙ্গ ও বারাণসীর বিবরণ-প্রসঙ্গে রাজধানীর উত্তর-পূর্ব্বে বরণা-নদীর পশ্চিমে একটি অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন। সারনাথ-স্তম্ভ ছাড়া বারাণসীর নিকটের এই অশোকস্তম্ভটি কোথায় অবস্থিত? কোন্ পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যাইবে?

শ্রী নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩৯)

চামচিকা তাড়াইবার উপায়

চাম-বাদুড় বা চামচিকা বাড়ী হইতে তাড়াইবার উপায় কি?

শ্রী সারদাপ্রসন্ন দত্তগুপ্ত

(১৪০)

দন্তে তৃণ

দন্তে তৃণ ধরিয়া শপথ করিবার তাৎপর্য্য কি? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়।

শ্রী রাধাচরণ দাস

(১৪১)

পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ

পরাগল খাঁ ও ছুটিখাঁর বিস্তৃত কাহিনী কোন্ কোন্ পুস্তকে পাওয়া যায় ?

শ্রী অবনীমোহন দাসগুপ্ত

(১৪২)

কমলা-লেবুর ছাল

কমলা-লেবুর ছিল্‌কা একটি সুগন্ধি জিনিষ। ইহার গন্ধ বা রং বাহির করিয়া কোন কাজে লাগান যায় কি না। পারিলে কিরূপে ? অন্য কোনরূপে ইহা ব্যবহার করা যায় না কি ?

এ, এফ, মোহাম্মদ আব্দুল হক

(১৪৩)

মীন-পূজা

বাংলা ছাড়া অপর কোন প্রদেশে মীন পূজার প্রচলন আছে কি ? থাকিলে কোথায়। এবং বাংলার কোন্ কোন্ জেলার কোন্ কোন্ স্থানে উহা প্রচলিত আছে।

শ্রীরাধাচরণ দাস, পাবনা।

(১৪৪)

ইংলণ্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ইংলণ্ডের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানগুলির (Educational Institutions, both General and Technical) কোনও নির্দ্দিষ্ট তালিকা আছে কি ? থাকিলে তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে ?

স্নেহময় সান্যাল

(১৪৫)

বিদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সবচেয়ে ভাল Technical Institute এর বিষয়ে (সেখানকার terms, course, খরচপত্র, বাসা ইত্যাদি বিষয়ে), কেহ বিশদভাবে জানাইলে বাধিত হই।

শ্রী—

(১৪৬)

যাত্রায় কচ্ছপ

যাত্রা-কালে কচ্ছপের নাম স্মরণ করিতে নাই বলিয়া একটি প্রবাদ বঙ্গদেশের বহু স্থানে প্রচলিত আছে। ইহার ভিত্তি কোথায় ? এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাত্রা-কালে ঐ নাম স্মরণপথে উদিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

শ্রী অক্ষয়কুমার বিশ্বাস

—

মীমাংসা

কানে আঙুল দিলে শব্দ

মাঘ মাসের প্রবাসীতে ৫২৫ পৃষ্ঠায়, শ্রী জগচ্চন্দ্র পোদ্দার মহাশয়, কানে আঙুল দিলে কেন শব্দ হয়, তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ইথারের স্পন্দনে শব্দের উৎপত্তি হয়, আবার ইথার ও বাতাসের এক মানে ধরিয়া গুরু গোলমাল ঘটাইয়াছেন।

এতদিন ত ইথারের মধ্যে শুধু তাপ (heat,) আলোক (light, visible and invisible), ও তাড়িত-চৌম্বক-তরঙ্গই (electro-magnetic wavesই) চলিত। এখন দেখিতেছি যে শব্দতরঙ্গও (sound waves) চলিল। Huygens, Fresnel, Kelvin ইথারের যে সকল গুণ নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত শব্দতরঙ্গ চালাইবার কোনও ব্যবস্থা দিয়া যাইতে পারেন নাই।

পোদ্দার মহাশয় লিখিয়াছেন, কাণের ছিদ্রের মধ্যে আঙুল দিলে আঙুলের পাশে ঈষৎ ব্যবধান থাকিয়াই যায়। এখন এই ঈষৎটির পরিমাণ কত ? এক ইঞ্চিকে শতকোটি ভাগ করিলে হয়ত বা তাহার প্রতিভাগের সিকিভাগ হইবে। মাইকেল্‌সন্, বা ফেব্রি-পেরো কেহই ইহা মাপিবার কথা ভাবিতে সাহস করিতেন না। যেটুকু ব্যবধান থাকে, সেটুকু যদি তিনি মোম বা ময়দা দিয়া আঁটিয়া পরীক্ষা করেন, দেখিবেন শব্দ বন্ধ হইবে না। তবে কেন এ শব্দ হয়, তাহার কয়েকটা মামুলী কারণ দিতে পারি।

১। মানুষের শরীর কোনও মুহূর্ত্তেই স্থির থাকিতে পারে না, শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্পন্দন কিছু না কিছু হয়ই। সেইজন্যই, কাণের মধ্যের আঙুল কানের পাশে ঠেকিয়া কম্পিত হওয়াতে এই শব্দ হয়। যদি আঙুল না দিয়া তাহার স্থানে একটি পেন্সিল রাখিয়া পেন্সিল হইতে হাত ছাড়িয়া দেওয়া যায়, দেখা যায় শব্দ অনেকটা কম ও বিভিন্ন হয়।

২। শব্দের অনুভূতি কেবল কানের পটহের উপর বায়ুতরঙ্গের আঘাতের জন্যই হয় তাহা নহে, কান বন্ধ করিলে বাহিরের সমুদয় শব্দ মাথার হাড়গুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য ইহা যথাযথ ভাবে হাড়ের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় না বলিয়া ঐরূপ একটা অস্পষ্ট মিশ্র-ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

৩। কর্ণপটহ (Tympanic membrane) ও Cochlear মধ্যস্থিত বিবরের গাত্র হইতে Eustachian canal বলিয়া একটি নালী গলনালীর সঙ্গে সংলগ্ন আছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস, ও শরীরের অন্যান্য চলাচলের জন্য যে কম্পন গলনালীতে উৎপন্ন হয়, তাহারই কিছু ভাগ কান বন্ধ করিলে শুনা যায়। তবে ইহা (Physiologist) দেহতত্ত্ব-বিদ্‌দের আন্দাজ। এই তিনটি কারণের মধ্যে ১ম ও ২য়টিই প্রধান।

লেখক বংশীবাদন হইতে তাঁহার ব্যাখ্যার সত্যতা উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু বংশীবাদন হইতে কোন কিছুই ঠাহর করিতে পারিলাম না।

এ আর কে ?

(১১০)

বিক্রমশিলা

মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে ৫২৬ পৃষ্ঠায় ১১০ নং জিজ্ঞাসার উত্তরে বিক্রমশিলা বিহার কোথায় সে সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে, আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গে কামরূপ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। বিক্রমশিলা বিহার ধর্ম্মপাল দেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বৌদ্ধ পালরাজগণ সেকালের বিক্রমপুরে, আধুনিক ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সীমায়, বাস করিতেন তাহাও জানা যায়। সাভার অঞ্চলে ইহার বহু চিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে। সাভারের কিছু উত্তর-পশ্চিমে বাজাসন মৌজা অবস্থিত। দক্ষিণে রোয়াইল, উত্তরে নান্নীর পূর্ব্বে রঘুনাথপুর ও পশ্চিমে সুয়াপুর রৌহা প্রভৃতি আধুনিক গ্রামের মধ্যবর্ত্তী প্রায় ২৫০০ বিঘা জমিতে বৌদ্ধ যুগের ইটপাথর প্রোথিত থাকিয়া নানা প্রবাদ বহন করিতেছে। এখানকার জিয়সপুকুরও দীর্ঘে ৬৬৭ হাত এবং প্রস্থে ৩৯৬ হাত (পল্লীবাণী, ভাদ্র ১৩২৬)। এই রহৎবিস্তৃত পল্লী-বিরহিত বাজাসন ভিটাই বিক্রমশিলা বিহারের ধ্বংসাবশেষ কি না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। এই বাজাসনের পার্শ্ববর্ত্তী ৪।৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী

বহু গ্রামেই পুরুষানুক্রমিক বহু দপ্তরীর বাস। ইঁহারা ইদানীং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে ও আকৃতিতে তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ হিন্দু বলিয়াই মনে হয়—তাঁহারাও তাহা স্বীকার করেন। ইরুতা গ্রামের এক অশীতিপর বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতামহের নিকট শুনেন, তাঁহারা (দপ্তরীবংশ) নিকটবর্ত্তী কোনও শিক্ষায়তনে থাকিতেন; মুসলমান বিজয়ের পরে তাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন এবং বহু সহস্র পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত দপ্তরী (কলিকাতা মির্জ্জাপুর-রাজাবাজারের সমস্ত দপ্তরী) বংশানুক্রমে এই অঞ্চলবাসী। শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার "Indian Pandits in the Land of Snow" গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন বৌদ্ধাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাজাসন বিহারে দ্বাদশ বৎসর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গদেশবাসী এবং অনেকের মতে তিনি বিক্রমপুরনিবাসী সেন-বংশোদ্ভূত। তিনি এই বিক্রমশিলা বিহারে—কানাই, কংশাই ও হীরানদীর (অধুনা-লুপ্ত রেনেলের মানচিত্র দ্রষ্টব্য) সঙ্গমমূলে অবস্থিত—দেশ-বিশ্রুত বিদ্যায়তনেই দ্বাদশ বৎসর শিক্ষালাভ করেন (প্রবাসী, ১৩১৯ আষাঢ়)। কাজেই বিক্রমশিলা বিহার বঙ্গে তথা পূর্ব্ববঙ্গে ছিল এবং তাহা তদানীন্তন বিক্রমপুরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু ভাগলপুরের নিকট কহলগাঁর পাহাড় বা সুলতানগঞ্জের নিকট গঙ্গামধ্যবর্ত্তী গৈবীনাথের মন্দিরের নিকটে সেরূপ কোনও প্রবাদ বা ঐতিহ্য-কথা প্রচলিত নাই। এই মাঘ মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "বিক্রমশিলায় তিব্বতী পণ্ডিত" শীর্ষক প্রবন্ধেও বিক্রমশিলার সংস্থান সম্বন্ধে কোনও মীমাংসার চেষ্টা করেন নাই। তিনিও ভাগলপুরের পাথরঘাটা সম্বন্ধেই বিশ্বাস-প্রবণতা দেখাইয়াছেন। আমাদের দেশে কোনও কার্য্যকারী Geographical Society নাই। "শ্রাবস্তী" কোথায় তাহা আজও অবিসংবাদীরূপে নির্ণীত হয় নাই। ফণীন্দ্র-বাবু প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের এ বিষয়ে সচেষ্ট না হইলে উপায় কি?

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

(১১৮)

কুমিল্লায় সুজা মস্‌জিদ্

বাদ্‌সাহ সুজা ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে একখানি তরবারি উপহার দেন, গোবিন্দমাণিক্যও বাদ্‌সাহের নামে উক্ত মস্‌জিদ্ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। (District Gazetteer Tippera)

শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ

কুমিল্লা সহরের উত্তরাংশে "সুজা মস্‌জিদ" বলিয়া যে একটি বৃহৎ মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা খুব সম্ভব সুজা বাদ্‌সাহের নির্ম্মিত নয় বলিয়া মনে ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে চার্ল্‌স্ ষ্টুয়ার্টই সুল্‌তান মহম্মদ সুজা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে সুজা বাদ্‌সাহের কুমিল্লায় মস্‌জিদ নির্ম্মাণের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। "আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্‌লা পশ্চিমবঙ্গের শাসন-শৃঙ্খলা সমাধান করিয়া সুজাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে যখন ঢাকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন সুল্‌তান সুজা কৃতসঙ্কল্প হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে সপরিবারে চট্টগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া তিনি ত্রিপুরার জঙ্গলময় পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করেন এবং সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলেন।" ("Stewart's History of Bengal'এর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী-কৃত বঙ্গানুবাদ, ২৪৮-২৪৯ পৃষ্ঠা)।

ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে সুজা বাদ্‌সাহের জীবনের সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়—কেবলমাত্র ঐ মস্‌জিদের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেজন্য ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে ঐ মস্‌জিদটি অন্য লোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে আওরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধের সময় পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাবর্গ তাঁহার জয় প্রার্থনা করিয়া ঐ মস্‌জিদে নামাজ করিয়াছিল কিংবা তাঁহার নিহত হওয়ার পর তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থে ঐ স্থানে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রী যোগেশচন্দ্র গোস্বামী

এসম্বন্ধে ত্রিপুরার "রাজমালায়" লিখিত হইয়াছে:—

"রসাঙ্গেতে হিরাঙ্গুরী বাদ্‌সা দিয়াছিল,
সে অঙ্গুরী মহারাজা বিক্রয় করিল।
গোমতী-নদীর কূলে মজিদ স্থাপিয়া,
সুজা বাদ্‌সার নামে মজিদ করিয়া।
সুজা নামে এক গঞ্জ রাজা বসাইল,
'সুজাগঞ্জ' নাম বলি তাহার রাখিল।"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি" নামক গ্রন্থ বঙ্গভাষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পাঠ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের নায়ক ৺গোবিন্দমাণিক্য যখন ভ্রাতৃরক্তপাতরূপ পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্বেচ্ছায় রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া রসাঙ্গের রাজাশ্রয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিতেছিলেন সেই সময় বাদ্‌সার পুত্র "সুজা" তথায় উপস্থিত হন। এমন সময় রসাঙ্গ-রাজবন্ধু ৺গোবিন্দমাণিক্য সে দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

রসাঙ্গরাজ বাদ্‌সা-পুত্রকে বসিবার আসন দিতেছিলেন না, কিন্তু ত্রিপুরার "মাণিক" গোবিন্দ সুজাকে নিজ আসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 'রাজমালায়' বর্ণিত হইয়াছে:—

"রসাঙ্গের মহারাজা বলিল আপন
কি কারণে ম্লেচ্ছ রাজা দিছ সিংহাসন।
রাজা বলে নরেশ্বর করি নিবেদন,
এহিত সুজা বাদ্‌সা বিখ্যাত ভুবন।
তুমি আমি হেন রাজা আছে বহুজন,
তাহান রাজ্যেতে কত হইছে পালন।
সভা ভঙ্গে রাজা সুজা একত্রে গমন,
সুজা বাদ্‌সা গোবিন্দমাণিক্য কথন।
রাজা সম্ভোদিয়া বাদ্‌সা বলিল তখন।
আমার মর্য্যাদা তুমি রাখিছ এখন,
হেন কালে কিবা দিব নাহি কিছু হেন।
দোলিত নিমচা গলে রাজাতে প্রদান।
মহারাজা গলে দিল করিয়া সাদর,
হিরার অঙ্গুরী দিল মূল্য বহুতর।

যখন গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুরায় অরাজকতা আরম্ভ হয়, তখন ত্রিপুরার প্রজাগণ রসাঙ্গ হইতে গোবিন্দমাণিক্যকে ত্রিপুরায় লইয়া আসে এবং তাঁহাকে পুনঃ অভিষেক করিয়া লয়। ইতিমধ্যে সুজার দুর্দ্দশাপূর্ণ মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া বন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থে কুমিল্লা নগরীতে (তখন কুমিল্লা ত্রিপুরার রাজধানী ছিল) সুজা-প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরী বেচিয়া এই স্থানীয় বিখ্যাত মজিদ প্রস্তুত করিয়া দেন এবং "সুজাগঞ্জ" নামক একটি পল্লী স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন যাহা এক্ষণেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রী মহিমচন্দ্র ঠাকুর

(১১৯)

চকা ও চকী

রজনীর অন্ধকার যে চক্রবাক ও চক্রবাকীর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকে, সংস্কৃতকাব্যগ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। বাঙ্গালাভাষার অনেক গ্রন্থেও এই কবিপ্রসিদ্ধির প্রচলন চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে, এক ব্যাধ রাত্রিকালে জোর করিয়া একটি চক্রবাক ও একটি চক্রবাকীকে খাঁচার ভিতরে পুরিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের তৎকালীন ভাবসন্দর্শনে রসসাগর লিখিলেন :—

"চকা কহে চকী প্রিয়ে, এ বড় কৌতুক।
বিধি হইতে ব্যাধ ভাল, বড় দুখে সুখ॥"

দিবাভাগে চক্রবাক ও চক্রবাকীর একত্র সংস্থান অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। রাত্রিকালে নদীর উভয়তীর হইতে চকবাক ও চক্রবাকীর ডাকাডাকি অনেকের কর্ণগোচর হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। এমন কি বিরহাতুর চক্রবাক দম্পতির ঈদৃশ করুণক্রন্দন পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্ববিদের শ্রুতিপথবর্ত্তী হইয়াছে—"Who is there, when travelling by river during the winter months, has not heard at night the warning call of Kwarko, Kwarko, repeated at intervals !—this call seeming often to come and being answered from opposite banks."—Small Game Shooting in Bengal, by "Raoul", p. 93. বোধ হয় এই কবিপ্রসিদ্ধির মূলে কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে।

শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(১২১)

জীরার চাষ

দেশ-ভেদে ঋতু-ভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে জীরার চাষ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে কি প্রকারে জীরার চাষ হয় আমরা তাহাই লিখিতেছি। যথানিয়মে মাটি তৈয়ারী করিয়া আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে হাপোরে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইয়া যখন প্রত্যেক চারায় ৪।৫ টি করিয়া পত্র হইবে, সেই সময় দো-আঁশ মাটিতে কয়েকটি চাষ দিয়া বেশ করিয়া মাটি প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে চৌকাবন্দী করত নয় ইঞ্চি হইতে বার ইঞ্চি পর্য্যন্ত ব্যবধানে এক একটি চারা রোপণ করা আবশ্যক। যদি রস অভাবে গাছ বর্দ্ধিত হইতেছে না বোধ হয় তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হইবে ও আবশ্যক-মত নিড়ানী করিতে হইবে। এই প্রকারে চাষ করিলে যথাকালে সুপুষ্ট শস্য পাওয়া যাইবে।

যদি কৃষিক্ষেত্র সরস বেলে মৃত্তিকা হয়, তাহাতে উপর্য্যুপরি কয়েকটি চাষ দিয়া মৃত্তিকা গুঁড়া করতঃ জীরার বীজ বপন করিয়া একবার হাত-মৈ টানিয়া দিতে হইবে। বীজ হইতে চারা অঙ্কুরিত হইলে যদি ঘন দেখা যায় তাহা হইলে ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট চারাগুলি উঠাইয়া দিয়া ফাঁক ফাঁক গাছ রাখিতে হইবে। বেশী জমি চাষ করিতে হইলে এই প্রকারে চাষ করাই সঙ্গত। সরস বেলে মাটি হইলে জল সেচন করার আবশ্যক হয় না।

শ্রী জগন্নাথ দাস

(১২২)

ভাগলপুরের সুড়ঙ্গ

মুঙ্গের কেল্লার মধ্যে গঙ্গাতীরে কষ্টহারিণী ঘাটের নিকটে বিস্তৃত সোপানাবলী সুড়ঙ্গপথে অবতরণ করিয়াছে দেখা যায়। আরও একটি সুড়ঙ্গপথ জেলখানার ভিতরে গঙ্গার তীরে অবস্থিত আছে। বাঙ্গলার নবাব মীর কাশিম আলি মুঙ্গের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইংরেজ বণিক্‌দের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়তো তাঁর মনোগত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সময়ের অশান্তিপূর্ণ রাজত্বে দুর্গ দৃঢ় করা ও গুপ্তপথ নির্ম্মাণ করা স্বাভাবিক মনে হয়। মুঙ্গেরের এই দুটি সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে প্রকাশ—একটি গঙ্গার তলদেশ বহিয়া ভাগলপুর অঞ্চলে, অপরটি পাটনা (বা গয়া) অঞ্চলে যাওয়ার পথের দ্বার। ভাগলপুরের সুড়ঙ্গ এই সুড়ঙ্গের অপরমুখ বা অন্য কোনও সুড়ঙ্গ মাত্র। কিম্বদন্তী আছে যে পাটনায় এলিস প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের পরে মুঙ্গের দুর্গ ইংরেজ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে গুরগণ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দুর্গের উত্তরদ্বার উন্মুক্ত হইলে কাশিম আলি কষ্টহারিণী ঘাটের সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করেন। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই বা থাকিতেও পারে না। মুঙ্গেরের এই সুড়ঙ্গপথে লোকে বহুদূর অবতরণ করিতে পারিত, তবে অব্যবহারে বিপদসঙ্কুল হওয়ায় এবং চোর দস্যু লুকাইয়া থাকিতে পারে আশঙ্কায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ-গবমেণ্ট গঙ্গাপ্রবাহের দিকের খিলান তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন। এখন গঙ্গার জল ও পলিমাটি পড়িয়া উহা বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

এই-সব সুড়ঙ্গ গুপ্তপথ বলিয়া যে প্রবাদই থাকুক, আমার মনে হয় ইহারা 'তয়খানা' মাত্র। লাহোর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নবাবী সহর যিনি দেখিয়াছেন তিনি জানেন যে গ্রীষ্মাধিক্য বশত সে দেশে ধনী নির্ধন সকলেই বাড়ীতে একটি বা দুইটি মাটির নীচে ছোট কুঠরী করিয়া রাখেন। নিদাঘ-মধ্যাহ্নে সেখানে সকলে আশ্রয় লন। ইহাকেই 'তয়খানা' বলে। লাহোর সাহাদারা বাগানে এইরূপ একটি তয়খানার পার্শ্বেই গভীর কূপ। উপরের খোলা কূপমুখে বায়ুতাড়িত হইয়া জলস্পর্শে তাহা শীতল হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে বিশ্রামকারীকে মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ করিত। মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটের নিকটে কাসিম আলিও এইরূপ এক তয়খানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন মনে হয়। সোপান-শ্রেণী দেখিয়া মনে হয় পাত্র মিত্র বা বেগমগণ লইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য নীচের ঘর বৃহদাকারেরই ছিল এবং তাহাতে বায়ুপ্রবাহের জন্য রাস্তার ধারে গঙ্গার তীরেই সম্ভবতঃ নীচের ঘরের উপরেই একটি কূপ-মুখ ছিল। ইহা এখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। ভাগলপুরের সুড়ঙ্গও এরূপ একটি স্থানীয় তয়খানা কি না তাহারই বা স্থিরতা কি ?

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

(১২৩)

পুরুরাজের পরিচয়

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ আলেকজান্দারের সহিত পুরুরাজার কেবলমাত্র যুদ্ধই বর্ণনা করিয়াছেন ; পুরুরাজার শেষ অদৃষ্ট কিংবা তাঁহার পুত্র কন্যার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। একমাত্র হাণ্টার সাহেবের ইতিহাসে পুরুরাজার বিবরণ অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়। (W, W, Hunter, "Indian Empire", pp. 158-161)

শ্রী যোগেশচন্দ্র গোস্বামী

পুরুরাজ সম্বন্ধে গ্রীক ঐতিহাসিকগণের সামান্য উল্লেখ ব্যতিরেকে অপর কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাঁহার যথার্থ নাম কি ছিল তাহাও ঠিক বলা যায় না। গ্রীকগণের লিখিত পোরস (Porus) নাম যে ভারতীয় পুরু নামেরই প্রতিশব্দ তাহা কেহ কেহ মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে উহা পৌরব বা পুরূরবা (পুরূরবস্) হইতে পারে।

আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধে পুরুর এক পুত্র রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিলেন (Anabasis, Vol V, p. 18) তাছাড়া পুরুর এক

ভ্রাতুষ্পুত্রেরও পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকগ্রন্থে ইনিও পোরস্ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি গাণ্ডারিস জনপদের রাজা ছিলেন ও পুরুর পরাজয়ের পর আলেক্‌জান্দারের বশ্যতা স্বীকার করেন।

ষ্ট্রাবো, প্লুটার্ক, এরিয়ান, কার্টিয়াস, জাষ্টিন, ডিওডোরাস প্রভৃতির গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে যাহাকিছু জ্ঞাতব্য পাওয়া যাইবে।

শ্রী অমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রেপ্‌সন্ সাহেব বলেন :—"The name, or rather the title, 'Porus', probably represents the Sanskrit Pourava, and means 'the prince of the Purus,' a tribe who appear in the Rigveda." Vide, Ancient India: By E. J. Rapson, M. A., p. 92. বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যভাগে পুরুরাজের রাজ্য ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল হস্তিনাপুরে। আলেক্‌জেন্দার দেশে প্রত্যাগমন-কালে তদ্বিজিত অধিকাংশ রাজ্যই পুরুরাজের অধীনে রাখিয়া যান। আলেক্‌জেন্দারের মৃত্যুর পর পুরুরাজ গ্রীক সেনাপতি Edemos-এর হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বা অধস্তন পুরুষের কোন নামই ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার যে পুত্রাদি ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। Hydaspas-এর যুদ্ধে তাঁহার দুইটি পুত্র নিহত হইয়াছিল। Vide, McCrindle's Ancient India, p. 106। পুরুরাজের Poros নামে একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাঁহার রাজ্যের নাম ছিল Gondaris (গান্ধার)। Vide, Strabo XV. 1. P. 699। পুরুরাজের বংশাবলী সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না।

শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(১২৪)

"জাপানী যুযুৎসু"

Stahara Publishing Company, 221 Exchange Building, Columbus, Georgia—এই ঠিকানায় ২৫০ খানি চিত্র সমেত ৭ খানি পুস্তকে যুযুৎসুর full course কিনিতে পাওয়া যায়; ইহা ছাড়া Tom Shah Institute, Dept. C. 1029 S. Wabash Ave, Chicago, Ill, পত্রযোগে যুযুৎসু শিক্ষা দিয়া থাকেন।

সুবাদার-মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু একটি যুযুৎসুর আখ্‌ড়া কলিকাতায় খুলিয়াছিলেন। একজন জাপানী হগ সাহেবের বাজারের নিকট যুযুৎসু শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের আখ্‌ড়া এখনও আছে কি না ও থাকিলে কোথায় আছে জানি না।

শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ

গত ১৩২৭ সালের 'নারায়ণে' শ্রীযুক্ত হেম সেন 'যুযুৎসু' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তিনি তাঁহার আখ্‌ড়ায় শিখিবার জন্য বাঙ্গালী বালকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এখন 'বিজলী' আফিসে তাঁহার ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

শ্রী বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

জাপানী যুযুৎসু ব্যায়ামের পুস্তক নিম্নলিখিত দুই দোকানে পাওয়া যায়।—১। Ghosh & Sons, 68, Harrison Road, Calcutta. ২। Thacker, Spink & Co., Esplanade, Calcutta.

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে

(১২৫)

জার্ম্মানীতে শিক্ষা

ভারতবর্ষীয় যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এসসি হইলেই জার্ম্মান যে-কোন ইউনিভার্সিটিতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায়। জার্ম্মানীতে অনেকগুলি টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটি আছে। আই-এসসি পাশ করিয়া গেলে টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে, আর মেট্রিকুলেশ্যন পাশ করিয়া গেলে টেক্‌নিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউশানে ভর্ত্তি হইতে হয়। আজকাল জার্ম্মান মুদ্রা মার্কের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, তাই আজকাল ৪০।৫০ টাকাতে বেশ ভাল ভাবেই থাকা যায়। কিন্তু আজকাল জার্ম্মানীতে ভারতীয় ছাত্রের খুব ভিড়; তাই আগে ভর্ত্তি না হইয়া যাওয়া উচিত নহে। আজকাল জার্ম্মান পরিবারের মধ্যে খরচ দিয়া থাকা যায়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে বিস্তারিত খবর পাওয়া যাইবে। এই সমিতির সাহায্যেই ভর্ত্তি হওয়া যায় এবং তাঁহারাই থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দেন। ঠিকানা—India News Service and Information Bureau Ltd. Burgstrasse 27, Berlin C2. Germany.

শ্রী শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্তরায়

(১২৬)

ব্রহ্মার মন্দির ও সূর্য্যমন্দির

পুষ্কর ছাড়া ভারতে আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মার মন্দির আছে। ভুবনেশ্বরের বিন্দুসরোবরের পার্শ্বস্থ ঘাটের ধারে একটি মন্দির অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ডে দুভাহি নামক স্থানে, ধারওয়ার জেলার উক্তল গ্রামে ও ইন্দোরের খেড়ব্রহ্ম নামক স্থানে ব্রহ্মার মন্দির আছে।

ব্রহ্মার মন্দির সচরাচর বড় দেখা যায় না। কারণ ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মার পূজা অনেক দিন হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। মেগাস্থিনিসের ভারতে অবস্থানকালে ভারতীয়েরা শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মার পূজা লোপ হইয়া যায়। কাজেই ব্রহ্মার মন্দির নির্ম্মাণও বন্ধ হইতে থাকে। পুরাণকার ব্রহ্মার পূজা বন্ধ হওয়ার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মার প্রতি (১) শিবের শাপ ও (২) মোহিনীর শাপ। ব্রহ্মা সম্বন্ধে বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ লিখিত [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৮ সন] "ব্রহ্মা" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

কোনারক ছাড়াও ভারতের নানা স্থানে সূর্য্যমন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে মুলতান ও (রাজপুতানার) ভিলমালের সূর্য্যমন্দিরই প্রসিদ্ধ। গুজরাট প্রদেশে একটি সূর্য্যমন্দির ছিল। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরে কার্কোটবংশীয় রাজা মুক্তাপীড় কর্ত্তৃক "মার্ত্তণ্ডমন্দির" নামে একটি সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পুষ্কর ছাড়া ভারতবর্ষে অনেক স্থানে ব্রহ্মার মন্দির আছে:—(১) খেড়ব্রহ্ম (মধ্য ভারতের ইদার রাজ্যে), (২) ডুদাহি (মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডে), (৩) কোদাকাল (মালাবারে), (৪) পায়েচ (কাশ্মীরে। এখানে ব্রহ্মার সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে), (৫) কুম্ভকোণম্ (মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলায়। এখানে অনেক যাত্রী যান কিন্তু ব্রহ্মার মন্দির বোধ হয় তত্টা লক্ষ্য করেন না), (৬) শিহোর (কাথিবাড় প্রদেশে), (৭) সাবড়ি (বোম্বাইয়ে ধারবার জেলায়)।

[১, ২, ৩—Imperial Gazetter of India, Vol. I., pp. 420. ৪—Vol. XV, pp. 98. ৫—Vol. XVI, pp. 20. ৬—Vol. XXII, pp. 360. ৭—Vol. XXII, pp. 157.]

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। পুরাণাদিতে অন্যান্য দেবতাদিগের ন্যায় তাঁহার তাদৃশ

পরাক্রম অথবা পূজা পাইবার আশায় কাহারও প্রতি নির্য্যাতনাদি দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মামন্দিরের অল্পতার বোধ হয় ইহাও একটি কারণ।

কণারক ছাড়া কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ডমন্দির পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ধ্বংসাবশিষ্ট সূর্য্যমন্দির বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া ভারতে নিম্নলিখিত জায়গায় সূর্য্যমন্দির ও সূর্য্যপূজা প্রচলিত আছে। কাথিবাড় মুলীতে (Imp. Gaz. XVIII, pp. 21), মুলতানে (XVIII, pp. 35-36), কাথিবাড় থানে (XXIII, pp. 288), বরমজ্জ বা উনাউ গ্রামে (মধ্য-ভারতের দাতিয়া রাজ্য)।

বাংলাদেশে বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে ব্রহ্মাকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড আছে, তথায় ব্রহ্মার ও সূর্য্যের মন্দির বিগ্রহ আছে কি না এবং নিয়মিত পূজাদি হয় কি না স্থানীয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

যতীন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ

গয়া সহরের (বিহারে) চতুর্দ্দিকে যে ছোট ছোট পাহাড় আছে, উহার একটি পাহাড়ের নাম "ব্রহ্মযোনি পাহাড়"। ঐ পাহাড়ের উপর ব্রহ্মার একটি মন্দির আছে। মন্দিরের বাহিরে বারান্দায় ব্রহ্মার পদচিহ্নদ্বয় অঙ্কিত এবং মন্দির-অভ্যন্তরে চতুর্মুখ ব্রহ্মামূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়

ভারতবর্ষে এক কালে যে সূর্য্যপূজা বহুল প্রচলিত ছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপ এখনও অনেক জায়গায় প্রাচীন সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নানা স্থানে খননের ফলে অনেক প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তিও বাহির হইয়াছে। প্রাচীন যুগের সৌরপ্রভাবসম্বন্ধে মগ বা শাকদ্বীপীয় ভোজকব্রাহ্মণগণের ইতিহাস ও ভবিষ্যপুরাণোক্ত কাহিনী সুপরিচিত। প্রাচীন কালের অনেক নৃপতির নামের পূর্ব্বে "পরমসৌর" বা "পরমাদিত্যভক্ত" আখ্যা দেখা যায়।

মুলতানের বিখ্যাত সূর্য্যমন্দিরের অস্তিত্ব এখন দেখা যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন্‌সাঙ্ ও একাদশ শতাব্দীতে আবু রিহান্ তাহা দেখিয়াছিলেন।

সাহাবাদ জেলার দেও মার্কণ্ড এবং দেও বর্ণারক গ্রামে (দেবমার্ত্তণ্ড ও দেববরুণার্ক) দুইটি পুরাতন সূর্য্যমন্দির আছে (A. S. R. Vol. XVI)। শেষোক্ত স্থানে মগধরাজ জীবিতগুপ্তের একটি শিলালিপিতে প্রাচীনযুগে মগধ ও করুষদেশে সৌরপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় (Gupta Inscriptions, p. 65.)।

বিহারের নিকট সাহপুরেও আদিত্যসেন-প্রতিষ্ঠিত একটি সূর্য্যমন্দির আছে।

কাশ্মীরে ইস্‌লামাবাদ হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত মার্ত্তণ্ডমন্দিরের কথা অনেকেই জানেন।

আলিগড় হইতে ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে স্থিত ইন্দোয়খেরা গ্রামে (ইন্দ্রপুর) প্রাপ্ত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের একটি তাম্রশাসন হইতে তথায় প্রতিষ্ঠিত একটি সূর্য্যমন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার ধ্বংসাবশেষ কার্লাইল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। (A. S. R. Vol XII, p. 68).

গুর্জ্জরপ্রতিহার রাজবংশের রাজধানী ভিলমালের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটি সুন্দর সূর্য্যমন্দির আছে। ঐ স্থান আবু হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে ("বিশ্বকোষ", ২২শ খণ্ড, ১৩৯)।

যোধপুর রাজ্যে ওঁসিয়া নামক স্থানে একটি প্রাচীন সূর্য্যমন্দির আছে। উহা দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত ঐ সুন্দর মন্দিরটি গ্রামবাসীরা সাধারণ শৌচাগার রূপে ব্যবহার করে।

গয়ার বিষ্ণুপদমন্দিরের কিছু দূরে একটি সূর্য্যমন্দির আছে। ঐ মূর্ত্তি মৌনার্ক নামে পরিচিত। এখানে এখনও পূজা হয়।

শ্রী অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩০)

চাহিদা

মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে "মীমাংসা" বিভাগে [৫২৭ পৃষ্ঠা—(৮)] লিখিত হইয়াছে :—" 'চাহিদা'—এই শব্দ খুব সম্ভব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভাবিত।" একথা ঠিক নহে। হাসখোলায় আমার যখন পাটের আড়ৎ ছিল, demand অর্থে "চাহিদা" শব্দ পাটের ব্যবসাদারদের মুখে প্রায়ই শুনিতাম। তাহারা "সেরাজগঞ্জ" "সাহাজাদপুর" অঞ্চলের লোক। এই শব্দটি স্থানবিশেষে প্রচলিত কিংবা সর্ব্বত্র প্রচলিত তাহা আমি বলিতে পারি না।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চরিতার্থতা

সুদূর গগনপটে শোভে যে নীলিমা
তারি নীলছায়াখানি বক্ষোমাঝে ধরি'
স্বপ্নাতুর নদীধারা সর্ব্বাঙ্গে শিহরি'
উঠে লক্ষ উর্ম্মিদলে ; দূরত্বের সীমা
ভুলি গিয়া তরঙ্গের লক্ষ বাহু মেলি
আলিঙ্গিতে চায় হায় নভো-নীলিমায়।
উদ্দাম-প্রবাহ তার মাধ্যাকর্ষ ঠেলি
উঠিতে না পারি ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়
ধরার বন্ধন মাঝে ; দেয় প্রসারিয়া
তরঙ্গ-উচ্ছল-ধারা, অঙ্গে মাখি লয়
আকাশের নীলাঞ্জনে। কবে কোথা গিয়া
অগাধ অসীম শূন্যে লভিবে সে লয়
এই আশা ধরি' বুকে ছুটিতে ছুটিতে
নীলসিন্ধুনীরে শেষে পায় সে মিশিতে।

শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা

বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী

বাঙ্গলার সঙ্গে চাটগাঁর সংশ্রব।

উত্তরপশ্চিমে বাঙ্গলা এবং দক্ষিণে মগরাজ্য আরাকান এই দুই প্রবল দেশের মাঝামাঝি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ চাটগাঁ; সুতরাং সে ক্রমান্বয়ে উভয়েরই আক্রমণ সহ করিয়াছে, উভয়দেশেরই তেজী রাজারা রাজ্যবিস্তার করিতে গিয়া চাটগাঁকে গ্রাস করিয়াছেন। অনেক সময় আবার তাঁহারা দেশটাকে ভাগে দখল করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চাটগাঁ শহর এবং তাহার উত্তরের প্রদেশটি বাঙ্গলার অধীন ছিল, আর সেই সময়ই দক্ষিণ চাটগাঁ (বা রামু) আরাকানের শাসন স্বীকার করিত। ফলতঃ মগ নৌবলের প্রাধান্য-সময় (১৫৫০-১৬৬৬) ভিন্ন, বাঙ্গলার রাজারা সহজেই নৌকার সাহায্যে চাটগাঁ শহর নিজবশে রাখিতে পারিতেন। যখন বঙ্গ বা ব্রহ্মে রাজশক্তি ক্ষণিক অন্তর্হিত হইত, তখন চাটগাঁর সহিত নিজ অতি নিকট প্রতিবাসী ত্রিপুরারাজ্যের সংঘর্ষ বাধিত।

১৬৬৬ * খৃষ্টাব্দে শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখিয়াছেন যে "প্রাচীনকালে ফখরুউদ্দীন নামক বঙ্গের সুলতান [রাজ্যকাল ১৩৩৬-৫২] চাটগাঁ অধিকার করেন এবং চাঁদপুর হইতে চাটগাঁ শহর পর্য্যন্ত দেউল (আল) বাঁধিয়া দেন। চাটগাঁয়ের মস্‌জিদ এবং পীর বদরের আস্তানার পথের কবরটি এই ফখরুউদ্দীনের সময়ে নির্ম্মিত হয়। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ আছে।" এই উক্তি অসম্ভব নহে, কারণ ফখরুউদ্দীনের নৌবল খুব প্রবল ছিল, (রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গলার ইতিহাস, ২-১০৫)। কিন্তু ভারতের কোন ইতিহাসে এই বিজয়ের উল্লেখ নাই। আরাকানীরা তখনও চাটগাঁ জয় করে নাই, সুতরাং ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এ ঘটনার উল্লেখ আশা করা যায় না। কিন্তু ইহা সত্য হওয়া বিশেষ সম্ভব।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আরাকানের রাজা উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরিয়া যাওয়ায় ঐ দেশ গোলমালে ও অরাজকতায় ভরিয়া গেল, সম্রান্তগণ কেহ ব্রহ্মদেশের রাজাকে ডাকিয়া আনিলেন, কেহ বা নিজকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ব্রহ্মদেশের সৈন্য আসিয়া আরাকানের রাজধানী অধিকার করিল এবং দেশীয় রাজা মেং সোমুউন্‌কে তাড়াইয়া দিল। রাজ্যহীন রাজা গৌড়ে আশ্রয় লইয়া ২৪ বৎসর নির্ব্বাসনে কাটাইলেন। তাহার পর ১৪৩০ শালে বঙ্গের সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ শাহ [রাজ্যকাল ১৪৩১-৪২] বঙ্গীয় সেনা পাঠাইয়া মেং সোমুউন্‌কে নিজরাজ্যে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কৃতজ্ঞ আরাকান-রাজ নিজকে বঙ্গদেশের করদ সামন্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং ইঁহার পর কয়েক পুরুষ ধরিয়া এই বংশীয় রাজারা নিজ বৌদ্ধ নামের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি মুসলমানী নাম (যথা সেলিম্‌ শিকন্দর ইত্যাদি) জুড়িয়া দিতেন এবং ইস্‌লামের মন্ত্র ('কালিমা') নিজ মুদ্রার উপর ছাপিতেন। ১৪৫৯ খৃঃ আরাকান-রাজ চাটগাঁ অধিকার করিলেন।

এই কটি কথা আমরা ফেয়র্‌-রচিত ব্রহ্মদেশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। কিন্তু এই শেষ তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। মুদ্রা ও প্রস্তরলিপি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্ততঃ ১৪৭০ হইতে ৫২০ পর্য্যন্ত চাটগাঁ বাঙ্গলার অধীনে ছিল, কারণ ১৪৭৩ খৃঃ রুকনুউদ্দীন বারবক শাহের রাজ্যকালে চাটগাঁতে একটি মস্‌জিদ্‌ প্রস্তুত হয়; আবার সুলতান হুসেন শাহ চাটগাঁতে পরাগল খাঁকে ভূমি দান করেন। (রাখাল, ২—২১৫ এবং ২৬২)। চাটগাঁ যে শের শাহের অধীনে ছিল (১৫৩৫—৪০) তাহা সত্য।

সে যাহা হউক, শের শাহের মৃত্যুর পর বঙ্গের পাঠান সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল, এবং সেই সুযোগে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ধরিয়া আরাকানের রাজারা উত্তর দিকে নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া চাটগাঁ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। তখন বঙ্গে মুঘলপাঠান কে রাজা হইবে তাহা লইয়াই যুদ্ধ চলিতেছিল; জমিদারগণ সকলে বিদ্রোহী, নিজ নিজ

* বড্‌লিয়ন লাইব্রেরীর ফারসী হস্তলিপি ৫৮৯ নম্বর ১৬৪ক পৃষ্ঠা।

গ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছেন। আরাকান-রাজ মেং ফলউং (১৫৭১—৯৩) সমস্ত চাটগাঁ প্রদেশ এবং নোয়াখালী ও ত্রিপুরার অনেক অংশ দখল করিলেন। (তাঁহার উপাধি সিকন্দর)। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র মেং রাজাগ্যী সলিমশাহ (১৫৯৩-১৬১২) এবং পৌত্র মেং খামাউং (১৬১২-২০) রাজত্ব করেন। এই পৌত্রটি ভুবনবিজয়ী বীর। (ফেয়ার, ১৭১-১৭৩)।

ফিরিঙ্গী জলদস্যুগণ

ইতিমধ্যে পর্ত্তুগীজেরা আসিয়া আরাকানে ও চাটগাঁয় বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা জলদস্যু, পোর্ত্তুগাল-রাজার অবাধ্য পলাতক প্রজা, অর্থাৎ এই-সব ফিরিঙ্গী-বসতিগুলি গোয়ার শাসনকর্ত্তার অধীনে বা রাজার স্বীকৃত ও আইনসঙ্গত উপনিবেশ ছিল না, অরাজক ডাকাতের আড্ডা মাত্র। সুতরাং পোর্ত্তুগীজ ইতিহাসে ইহাদের বিবরণ বড় কম পাওয়া যায়, এবং আদি মাতৃভূমি হইতে বিচ্যুত হওয়ায় এদেশী স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়া তাহারা অতি দ্রুত ফিরিঙ্গী বা মিশ্রজাতি হইয়া পড়িল, ইউরোপীয় সভ্যতা ক্রমে হারাইল।

আরাকানরাজ্যে ফিরিঙ্গীদের দুটি প্রধান পল্লী ছিল, একটি ডিয়াঙ্গা, (বর্ত্তমান 'ফিরিঙ্গীবন্দর)' অর্থাৎ চাটগাঁ শহর হইতে ২০ মাইল দূরে, সমুদ্রতীরে কর্ণফুলীর মোহানার দক্ষিণে অপরটি থান্‌লীন্ (ইউরোপীয় নাম সিরিয়ম্) ব্রহ্মদেশের প্রধান বন্দর। আরাকান-রাজপুত্র ১৬০৪ সালে সিরয়ম্ আক্রমণ করিলে পর ফিরিঙ্গীদের হাতে পরাস্ত ও বন্দী হইয়া পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা দিয়া মুক্তি লাভ করেন। সেই রাগে ১৬০৭ সালে তিনি ডিয়াঙ্গা দখল করিয়া তথাকার ফিরিঙ্গীদের হত্যা করেন। তাহাদের মধ্যে সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালভেস টিবাও নামক প্রসিদ্ধ বীর ও ক্রূর দস্যু এবং আর জন-কত পলাইয়া বাঁচে। ১৬০২ সালে ব্রহ্মের রাজা সিরিয়ম অধিকার করিয়া পোর্ত্তুগীজদের নেতা ফিলিপ ডে ব্রিটোকে শূলে দেন, এবং অপর সকলকে হত বা দাসত্বে পরিণত করেন। (ফেয়ার)। গঞ্জাল্‌ভেস্ দুবৎসর পরে (১৬০৯) সোনদ্বীপ দখল করিয়া সেখানে স্বাধীন রাজা হ'। এবং বাখরগঞ্জের সাগরকূলের খাড়ী ও নদীর পাড়ের গ্রামগুলি লুঠিতে থাকে। এই সময় আরাকানের রাজা একটি সিংহল-দেশীয় গজরাজ কাড়িয়া লইবার জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনাফোরংকে (যিনি চাটগাঁর শাসনকর্ত্তা ছিলেন) আক্রমণ করিলেন। আনাফোরং সোনদ্বীপে পলাইয়া আসিয়া গঞ্জাল্‌ভেসের আশ্রয় লন, কিন্তু ঐ ফিরিঙ্গী তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া তাঁহার ধন অধিকার করিল এবং তাঁহার বিধবাকে নিজ ভ্রাতা এণ্টোনিও কার্ভালোর সহিত বিবাহ দিবার বন্দোবস্ত করিল। (বোকারো)।

ইস্‌লাম্ খাঁর ভালুয়া অধিকার

এ সময় ইস্‌লাম খাঁ বঙ্গের সুবাদার প্রবল প্রতাপে দেশ শাসন করিতেছেন ও পাদিশাহের ক্ষমতা স্থাপিত করিতেছেন। বঙ্গের জমিদারদের মধ্যে অনেকেই পরাজিত বা ভীত হইয়া বাধ্য হইয়া আসিয়াছে। এখন তিনি মেঘনার পূর্ব্বদিকের প্রদেশ মগের হাত হইতে পুনরধিকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ইহাতে আরাকান-রাজা ও গঞ্জাল্‌ভেস্ নিজ নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য একজোট হইল।

১৬১০ সালের শেষাশেষি অথবা ১৬১১ সালের প্রথমার্দ্ধে আরাকান-রাজের ভ্রাতুষ্পুত্র অনেক ফরাং * মুঘল সেনাপতি ইহতমাম্ খাঁর সাহায্যে দূত দিয়া ইস্‌লাম খাঁর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে নিজে আসিয়া বঙ্গের সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুত্রদের ঢাকায় তাঁহার নিকট জামিনস্বরূপ রাখিয়া গিয়া গঞ্জাল্‌ভেস্‌কে আক্রমণ করিবেন, এবং সোনদ্বীপ কাড়িয়া লইয়া নিজ জাগীর স্বরূপ ভোগ করিয়া পাদিশাহের চাকরী করিবেন। কিন্তু ঢাকার জমিদার মুসা খাঁর সহিত মুঘলদের যুদ্ধ বাধায় মগ-রাজপৌত্র আসিতে পারিলেন না, কারণ তখন ইস্‌লাম খাঁ অন্যদিকে ব্যস্ত, সৈন্য ও নৌকা সোনদ্বীপে পাঠাইতে পারেন না।

* বহারিস্তানে নামটি এইমত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বোকারো ইহার পিতার নাম লিখিয়াছেন আনাফোরং Anaporanএ দুটি কথা দেখিতে বিভিন্ন বোধ হয় বটে, কিন্তু পোর্ত্তুগীজের মুখে প্রথম নামটি দ্বিতীয়ের আকার ধারণ করা সহজ। আর বহারিস্তানের লেখকের পক্ষে ব্রহ্মদেশীয় পিতার নাম পুত্রকে দেওয়া অতি স্বাভাবিক ভুল হইতে পারে।

১৬১১ সালে মুসা খাঁ শেষ হার হারিয়া বশ মানিলেন। তখন ইস্‌লাম খাঁ দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমানার দিকে তাকাইলেন। আবদুল ওয়াহিদকে সেনাপতি করিয়া ৪০০০ অশ্বারোহী, তিন হাজার বর্ক-আন্দাজ এবং ৫০টি হাতী সহিত রাজা অনন্তমাণিক্যের দেশ ভালুয়া জয় করিতে পাঠাইলেন। অনন্তমাণিক্য ভালুয়া সুরক্ষিত করিয়া, পাঁচদিনের পথ অগ্রসর হইয়া ডাকাতিয়া * খালের ধারে দুর্গ গাঁথিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। আবদুল ওয়াহিদ সেখানে পৌঁছিলে উভয়পক্ষে কয়েকদিন ধরিয়া প্রত্যহ যুদ্ধ ও গোলা-বৃষ্টি চলিতে লাগিল, উভয়পক্ষেই হত আহত হইল। ইস্‌লাম খাঁ ঢাকা হইতে ক্রমাগত নূতন সৈন্য ও খাদ্য পাঠাইতে লাগিলেন।

ভালুয়ার রাজার এক মুসলমান মন্ত্রী ও সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ম্মচারী ছিল, তাহার নাম মির্জ্জা ইউসুফ্ বির্লাস্। আবদুল ওয়াহিদ তাহাকে লোভ দেখাইয়া নিজ পক্ষে আনিলেন এবং মুঘল রাজসরকারে পাঁচশতের মনসব দিলেন। এই সংবাদে অনন্তমাণিক্য দুপুর রাত্রে ভালুয়ায় পলাইয়া গেলেন। পরদিন মুঘল সেনা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। রাজা শেষে মগরাজ্যে আশ্রয় পাইলেন মুঘল সৈন্য তাঁহার বড় ফেণী ও ছোট ফেণী নদী পার হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ভালুয়া দখল করিল; রাজার হস্তীগুলি ও অনেক সম্পত্তি তাহাদের হাতে পড়িল। (বহারিস্তান ৪০খ—৪১ক)।

প্রথম মগ আক্রমণ

১৬১৩ সালের ১১ই আগষ্ট ইস্‌লাম খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা কাসিম খাঁ বাংলায় সুবাদার হইলেন এবং পাঁচ বৎসর এদেশ শাসন করেন। তিনি ইস্‌লাম খাঁর মত তেজী কর্ম্মঠ ও সচেষ্ট লোক ছিলেন না। রাজকার্য্যে শিথিলতা ও বেবন্দোবস্ত দেখা দিল। বাহিরের শত্রুরা জাগিয়া উঠিল।

ভালুয়ার থানাদার আবদুল ওয়াহিদ চিঠি লিখিয়া কোন ফল হয় না দেখিয়া, অবশেষে নিজে ঢাকায় সুবাদারের নিকট দরবার করিতে গেলেন। সেই সময়ে তাঁহার পুত্র ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, কাজেই ভালুয়া একেবারে সৈন্য- ও সেনাপতি-হীন হইয়া পড়িল। মগরাজা মেং খামাউং (উপাধি 'হুসেন', রাজত্বকাল ১৬১২—২২) এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র অগণিত সৈন্য হাতী তোপ ও নৌকা লইয়া ভালুয়া জয় করিতে রওনা হইলেন। তিনি নিজের কাজের জন্য গঞ্জাল্‌ভেসের সহিত আপাততঃ সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কাজেই আরাকানের এবং ফিরিঙ্গীদের রণ-নৌকাগুলি একত্র হইল এবং তাহাদের সকলের উপর গঞ্জাল্‌ভেসের ভ্রাতা এণ্টোনিও কার্ভালো টিবাউ নেতা (পোর্ত্তুগীজ ভাষায় "কাপিতাঁ মোর" অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ ক্যাপ্টেন বা য়্যাডমিরাল) নিযুক্ত হইল।

শ্রীপুর ও বিক্রমপুর হইতে মুঘল থানাদারেরা শত্রু আগমনের সংবাদ দেওয়ায় কাসিম খাঁ তৎক্ষণাৎ আবদুল ওয়াহিদকে ভালুয়ায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে খিজিরপুরে দোলই ও লক্ষীয়ার সঙ্গমস্থলে অগ্রসর হইয়া শিবির স্থাপন করিয়া ভালুয়া পর্য্যন্ত নদীগুলির উপর বড় নৌকা দিয়া সেতু বাঁধিবার চেষ্টায় থাকিলেন। আর আসামের রাঙ্গামাটির সীমানা হইতে সেনাপতি আবা বকরকে নিজ সৈন্য এবং জমিদারদের নৌকা-গুলি লইয়া শীঘ্র ঢাকায় আসিতে লিখিলেন। চারিদিক হইতে সব ফৌজদার থানাদারদের ডাক পড়িল।

দু হাজার অশ্বারোহী এবং চার হাজার বর্কান্দাজকে লক্ষীয়ার উপর পুল পার করিয়া ওয়াহিদের সাহায্যের জন্য ভালুয়ার দিকে পাঠান হইল। ওয়াহিদের পুত্রও ত্রিপুরা হইতে আসিয়া পিতার সঙ্গে যোগ দিলেন।

চরেরা খবর দিল যে মগরাজা তিন লক্ষ পদাতিক এবং অগণিত হাতী ও নৌকা লইয়া বড় ফেণী ও ছোট ফেণী পার হইয়াছেন, শীঘ্রই ভালুয়া পৌঁছিবেন। ওয়াহিদ আগেই ভয়ে, বীরপুত্রের নিষেধ সত্ত্বেও, ভালুয়া হইতে সম্পত্তি ও পরিবার ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভালুয়া ও ইস্‌লামাবাদ * ছাড়িয়া পলাইলেন। মগেরা আসিয়া ঐ

* ইহা চাঁদপুরের দক্ষিণে মেঘনায় পড়িয়াছে।

* এ ইস্‌লামাবাদ চাটগাঁ শহর নহে। ভালুয়া পরগনার গ্রামমাত্র, সম্ভবতঃ লক্ষীপুর।

দুইটি স্থানে দুর্গ শহর ও পাশের গ্রামগুলি পোড়াইয়া দিল, লুঠ করিল।

তাহার পর তাঁহারা মুঘল সেনাপতিকে ডাকাতিয়া খাল (অর্থাৎ চাঁদপুর) পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিল, পথে কোথায়ও বিশ্রাম করিবার অবসর দিল না। এখানে কাসিম খাঁর পত্র পৌছিল, তিনি আবদুল ওয়াহিদকে সেখানে থামিয়া মগদিগকে বাধা দিবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, কারণ শেখ ফরিদ ও আবদুল নবীর অধীনে আরও সৈন্য শীঘ্র পৌছিবে। কিন্তু ভীরু ওয়াহিদ ডাকাতিয়া খাল হইতেও পিছাইয়া মাঝুয়া খালের পাশে আশ্রয় লইতে চাহিলেন, কারণ ঐ মাঝুয়া খাল এত সরু যে তাহার মধ্যে শত্রুদের বড় বড় নৌকা প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁহার বীরপুত্র বলিলেন যে পিতা দাঁড়ান বা পলান, তিনি একেলা সেখানে থাকিয়া প্রাণ দিয়া পাদিশাহের মান রক্ষা করিবেন। আবদুল ওয়াহিদ মন্ত্রণা-ঘর হইতে ফিরিয়া নিজ শয়নগৃহে আসিয়া কি করা যায় এই চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। মুঘলদের কুচ আপাততঃ স্থগিত রহিল।

এমন সময় অভাবনীয় উপায়ে তাহাদের উদ্ধার সাধন হইল। মগরাজা মনে ভাবিলেন "ফিরিঙ্গী নৌবলের সঙ্গে আমি পারিয়া উঠি না। এখন নানা প্রতিজ্ঞা করিয়া ও লোভ দেখাইয়া তাহাদের আমার কাছে আনিয়াছি এবং তাহারা নিজ নৌকা হইতে নামিয়া স্থলপথে আমার সঙ্গে মাঠের ভিতর দিয়া চলিতেছে; তাহাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। এই সময় সকলকে বন্দী করিয়া ফেলি।" তিনি কাভালোর ভাগিনেয় এবং অন্য কয়েকজন ফিরিঙ্গী যোদ্ধাকে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিলেন এবং ভাবিলেন যে "এই যুবক যখন কাভালোর প্রাণের প্রিয়, শেষোক্ত নৌ-সেনাপতি তাহার বিপদের ভয়ে আমার বিরুদ্ধে কিছুই করিবে না।"

কিন্তু যখন নৌকায় স্থিত অবশিষ্ট ফিরিঙ্গীগণ এই সংবাদ পাইল তখন কার্ভালো শীঘ্র ও অতর্কিতভাবে মগ নৌকাগুলি আক্রমণ করিয়া দখল করিল, সম্পত্তি লুঠ করিল এবং মগ নৌবলের কর্ম্মচারীদের বন্দী করিল। এ চেষ্টা অতি সহজেই সফল হইল, কারণ এ সময় মগ নৌকাগুলি অসাবধানে ছড়াইয়া ছিল, রাজা ও সেনানীগণ চাঁদপুরের কাছে মুঘলদের আক্রমণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। মগদের কামান ও টাকাকড়ি তাহাদের নৌকায় রাখা ছিল। বিজয়ী কার্ভালো এ-সব হস্তগত করিয়া সোন-দ্বীপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঞ্জালভেসের নিকট চলিয়া গেল।*

কাভালো সমস্ত মগ-জাহাজ লইয়া সোনদ্বীপে রওনা হইলে সেই রাত্রেই তাহার দলের একজন ফিরিঙ্গী আসিয়া মুঘলদিগকে সংবাদ দিল। আবদুল ওয়াহিদ আহ্লাদে স্থির করিলেন যে এখন যুদ্ধ করিবেন। পর দিন প্রাতে মুঘলসৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ডাকাতিয়া খাল ছাড়িয়া সাম্‌নের শত্রুদুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। মগেরা এতদিন মুঘলদের গর্ত্তে-লুকান কাপুরুষ মনে করিয়া তাহাদের দিক্ হইতে আক্রমণ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অলস আমোদে সময় কাটাইতেছিল। সুতরাং মুঘলসৈন্য ঝুঁকিয়া পড়া মাত্র মগ-রাজা ও তাঁহার সৈন্যগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলাইল। আবদুল ওয়াহিদ তাহাদের বড় ফেণী নদীর ওপার পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া ভালুয়ায় ফিরিলেন, অনেক হাতী দ্রব্যসামগ্রী এবং ৫০০ মগ সৈন্য হস্তগত হইল, অনেকে হত হইল।

ইহা বহারিস্তানের বিবরণ (১৬৬খ-১৬৯ক)। আদিতম পোর্তুগীজ লেখক বোকারো বলেন যে মগরাজা ৮০,০০০ সৈন্য (তাহার অনেকেই বন্দুকধারী) এবং দশহাজার ঢাল-তরবার-ধারী পাইক (Peguez), ৭০০ রণহস্তী (যাহার পিঠে ছোট দুর্গের মত হাওদার ভিতর হইতে সৈন্যগণ যুদ্ধ করিত) লইয়া স্থলপথে রওনা হন, এবং ১৫০ জলিয়া নৌকা এবং ৫০ খানা বড় নৌকা (Navios) চারি সহস্র (জাহাজী) সৈন্য সহ গঞ্জালভেসের সহিত যোগ দিতে পাঠান। তাহারা সমস্ত ভালুয়া রাজ্য (অর্থাৎ চাঁদপুর হইতে বড় ফেণী নদী পর্য্যন্ত) দখল করিল।...তাহার পর গঞ্জালভেস্ মহা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মগ নৌকাপ্তেনদের নিজের জাহাজে ডাকিয়া

* ইহা বহারিস্তানের বর্ণনা। কিন্তু পোর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক বোকারো বলেন যে গঞ্জালভেস্ মগ নৌকাপ্তেনদের নিমন্ত্রণ করিয়া হত্যা করে এবং সমস্ত নৌকা হস্তগত করে।..এখানে মগরাজার বিশ্বাসঘাতকতার কথা নাই। কিন্তু বোকারোও বলেন যে তাহার ভাগিনেয় মগরাজার হাতে দিল।

আনিয়া খুন করিল, এবং তাহার পর অতর্কিত আক্রমণে মগনৌবাহিনী দখল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি সহ সোনদ্বীপে লইয়া গেল। যে সব মগ কাপ্তেন তখনই মারা যায় নাই তাহাদের সোনদ্বীপে লইয়া গিয়া প্রকাশ্য নিলামে দাসরূপে বিক্রয় করিল।…তাহার পর মুঘলেরা ভালুয়া রাজ্য পুনরধিকার করিল, মগসৈন্যদের একবার নয় অনেক বার হারাইল, এবং এমন হার হারাইয়া দিল যে মগ-রাজার সঙ্গে যে অগণিত সৈন্যদল দেশ হইতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এক হাজারেরও কম বাঁচিল, এবং এগুলি মহাকষ্টে ত্রিপুরার জঙ্গলে আশ্রয় লইল। কিন্তু ত্রিপুরা এখন বিদ্রোহী হইয়া মগ-প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া মগদের অনেক প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করিল, রাজা হস্তীপৃষ্ঠে অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইলেন। তিনি আরাকান-নগরে পৌঁছিয়া গঞ্জাল্‌ভেসের ভাগিনেয়কে শূলে দিলেন এবং আর সব পোর্ত্তুগীজ জামিনদেরও বধ করিলেন। (A. Bocarro—*Decada 13 da Historia da India*, parte 2, Lisbon 1876, pp. 440-444.)* এই ঘটনা ১৬১৪ সালে ঘটে।

মগরাজের দ্বিতীয় † আক্রমণ

১৬১৫ সালের অক্টোবরে গঞ্জাল্‌ভেস গোয়ানগর হইতে পোর্ত্তুগীজ রাজকীয় পোত আনাইয়া আরাকান শহর আক্রমণ করে, কিন্তু ফল হয় না। ১৬১৭ সালে মগরাজা সোনদ্বীপ অধিকার করিলেন এবং তাহার পর গঞ্জালভেস্ একেবারে লোপ পাইল, তাহার শেষ জীবনের কোন সংবাদ নাই।

মগরাজা কেবলই ভাবিতেছিলেন যে কিরূপে মুঘল-দিগের হাতে প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবেন, এবং এজন্য যুদ্ধের সাজ ও সৈন্য জমাইতেছিলেন। যখন খবর পাইলেন যে আসাম যুদ্ধের জন্য তথায় ও নানা থানায় পাদিশাহী সব সৈন্য পাঠান হইয়াছে, এবং ঢাকাশহর রক্ষা করিবার জন্য অতি কম লোক আছে,—তখন তিনি নিজ চিরশত্রু ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি করিয়া, প্রকাণ্ড সৈন্যদল লইয়া ভালুয়া আক্রমণ করিলেন। আব্‌দুল ওয়াহিদ (ইতিমধ্যে সর্‌হদ খাঁ উপাধিতে ভূষিত) প্রথম জয়ের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অসাবধান হইয়া ছিলেন। শত্রু কাছে আসিয়া পড়ায় তাড়াতাড়ি সব সম্পত্তি ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়া ভালুয়া হইতে পলাইতে লাগিলেন। সুবাদার কাসিম খাঁ আবার ঢাকা হইতে খিজিরপুরে আসিয়া বসিলেন, নদীতে পুল বাঁধিলেন এবং ওয়াহিদের বল বাড়াইবার জন্য আব্‌দুল নবীকে ২০০০ অশ্বারোহী ৩০০০ বর্ক-আন্দাজ ৭০০ নৌকা ও ১০০ হাতী সহিত আগে পাঠাইলেন। অন্যান্য থানা হইতেও সৈন্যদের ডাক পড়িল।

আব্‌দুল ওয়াহিদ্ পলাইতে পলাইতে মগসৈন্যের দ্বারা প্রায় ঘেরাও হইলেন, তাঁহার নিজের পক্ষের অনেক লোক বন্দী হইতে লাগিল। তাঁহার নিজের পুত্র তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘুরাইয়া তাঁহাকে সেখানে দাঁড়াইয়া শত্রুদের বাধা দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি ভয়ে দ্রুতবেগে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র এবং মির্জা নুরুউদ্দীন তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া মগদের উপর গিয়া পড়িল এবং তরবারির আঘাতে তাহাদের ফিরাইয়া দিল। শত্রু তখন পলাইতে লাগিল এবং এক জলাতে আশ্রয় লইল। মগরাজা মেং খামাউং ("হুসেন") এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলী মাণিক (বা মানং) হাতীতে চড়িয়া জলার গভীর অংশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের সৈন্যগণ দু পাশের কম-জল পার হইয়া দেশে পলাইয়া গেল। শত্রুদের পাঁচশত হত, এক হাজার আহত, অনেকে বন্দী হইল, বাকী সব পলাইয়া গেল। মুঘল পক্ষে একশত হত হইল।

রাত্রি আসিলে মুঘল সৈন্য সেই জলা ঘিরিয়া পাহারা দিতে লাগিল, যেন মগরাজা না পলাইতে পারেন। কিন্তু রাজা দূত পাঠাইয়া নিজের যথাসর্ব্বস্ব ও হস্তীগুলি ওয়াহিদকে ঘুষ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহার ইঙ্গিতে

* গঞ্জাল্‌ভেস সম্বন্ধে বোকারোই আদিতম ও বিস্তৃত লেখক। তাহার বই হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ Faria Y Sousa নিজের *Asia Portuguesa*, tome iii, parte 2, cap. ix, pp. 177-তে দিয়াছেন। এবং ফেরিয়ার ইংরেজী অনুবাদ ষ্টুয়ার্ট ও তাহার পর আর সব লেখক ব্যবহার করিয়াছেন।

† বহারিস্তান ১৮৬ ক অনুসারে ইসলাম খাঁর শাসনকাল হইতে ইহা চতুর্থ মগ আক্রমণ।

তাঁহার বিভাগের পাশ দিয়া এক প্রহর রাত্রি থাকিতে বাহির হইয়া দেশে পলাইয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাতে ওয়াহিদ মহাধূমধামে মুঘলদের সব হাতী একত্র করিয়া প্রত্যেকের পিঠে দুই তিন জন যোদ্ধা বসাইয়া এবং কামানগুলি লাইন পাতিয়া সাজাইয়া হাতী লইয়া জলাতে প্রবেশ করিলেন, আলী মাণিক সহিত অবশিষ্ট মগসৈন্য ধরা পড়িল। "কি নিমকহারাম! ওয়াহিদ অতি সহজেই রাজাকে বন্দী করিয়া সমস্ত আরাকান জয় করিতে এবং তথা হইতে পাদিশাহের জন্য শ্বেত হস্তীটি আনিতে পারিতেন।" (বাহারিস্তান ১৮৫ক ক—১৮৬খ)।

আবদুল্ নবীর ব্যর্থ মগদেশ আক্রমণ ১৬১৭ খৃঃ

তখন কাসিমখাঁর হাত খালি, অন্যত্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সুতরাং তিনি ঠিক করিলেন যে আরাকান আক্রমণ করিয়া রাজার শ্বেত হস্তীটি কাড়িয়া আনিতে হইবে। তিনি নিজে ফেণী নদীর ধারে প্রকাণ্ড সৈন্য-দল লইয়া পৃষ্ঠরক্ষা করার জন্য ছাউনি করিয়া রহিলেন। আবদুল্ নবীকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচহাজার বর্ক-আন্দাজ, দুইশত হাতী ও হাজার নৌকা দিয়া অগ্রে গিয়া মগরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাঠাইলেন।

এই সংবাদে মগরাজা নিজ প্রতিনিধি "করমকারী"কে একলক্ষ পদাতিক, হাজার নৌকা ও চারি শত হাতী সহ আগে আগে পাঠাইলেন যে 'কংখর' নামক স্থানে দুর্গ বাঁধিয়া মুঘলদের পথ রোধ করে, আর নিজে দশ হাজার অশ্বারোহী তিন লক্ষ পদাতিক ও অগণিত হাতী ও নৌকা লইয়া আরাকান শহর হইতে চাটগাঁ অভিমুখে রওনা হইলেন।

চরেরা আবদুল নবীকে বলিল যে এই মহাসুযোগ; এখনই অগ্রসর হইয়া কংখরে দুর্গ শেষ হইবার পূর্ব্বেই মগদের পরাস্ত করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া চাটগাঁ অধিকার করা সহজ, কারণ এখনও চাটগাঁ শহর সুরক্ষিত হয় নাই, এবং মগরাজা দ্বিতীয় সৈন্য দল সহ তথায় পৌঁছেন নাই।

আবদুল নবী শীঘ্র গিয়া কংখর আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধ চলিতে লাগিল কিন্তু কতকগুলি বিশ্বাসঘাতকের পরামর্শে (সত্য কথা বলিতে, ভয়ে), বেগে দুর্গ আক্রমণ না করিয়া তাহার সাম্‌নে থামিয়া থাকিলেন এবং নিজ সৈন্যদলকে বিশ্রাম দিলেন। পরদিন আবার যুদ্ধ হইল কিন্তু কোনই ফল হইল না। দুর্গটির আশপাশে পাহাড়, সুতরাং তাহা ঘেরাও করাও অসম্ভব। তখন মুঘল সৈন্য পিছাইয়া নিজামপুরে আসিয়া শিবির পাতিল এবং পাশের জমিদারদের বশ করিতে (ও টাকা আদায় করিতে) লাগিয়া গেল।

এদিকে 'করমকারী' দশহাজার মগ সৈন্য পাহাড়ের উপর দিয়া পাঠাইয়া দিল, মুঘলদের পশ্চাতে একটি দুর্গ গড়িল, তাহাতে তাহাদের নিজ দেশ হইতে রসদ ও চিঠিপত্র আসিবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। মুঘল-শিবিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাহারা প্রাণভয়ে সর্ব্বস্ব ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। মগেরা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মারিতে কাটিতে লাগিল। এই অভিযানে পাদিশাহের সাত লক্ষ টাকা নষ্ট হইল, পাঁচশ মন বারুদ জ্বালাইয়া দেওয়া হইল যেন শত্রুহস্তে না পড়ে। লাভ বলিতে কিছুই হইল না। (বহারিস্তান ১৯২ খ-১৯৪ খ)।

অপর আক্রমণ

পরে ইব্রাহিম খাঁ (শাসনকাল ১৬১৮-১৬২২) স্থলপথে চাটগাঁ আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু পথের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য অসংখ্য লোক মরিল এবং অবশিষ্ট সৈন্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিল (১৬১৮ খৃঃ)। (তালিশ, ১৭৬ ক)।

১৬২২ সালে দারাব খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। বাকীবেগ নামক একজন বখ্‌শী জলযুদ্ধে নাম করিয়াছিল; তাহাকে ৭০০ অশ্বারোহী এবং ৩০০ নৌকা সহ ঐ দেশরক্ষা করিবার জন্য ভালুয়ায় পাঠান হইল। কিন্তু তাঁহার শাসনকাল অল্পদিন বলিয়া কাজ কিছুই হইল না।

তার পর খানাজাদ খাঁ (১৬২৫-১৬২৬) সাল বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। তিনি স্বচ্ছন্দে রঙ্গমহলে থাকিতে লাগিলেন; লোকে বলিত যে মগদের ভয়ে। তাঁহার নায়েব মুল্লা মুর্শিদ ও হকিম হাইদর ঢাকায় মোতায়েন

রহিলেন। মগেরা নৌকা লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিল, ঐ দুই কর্ম্মচারী তাচ্ছিল্যের ঘুমে আচ্ছন্ন, শত্রুদের সামান্য মনে করিয়া অবহেলার সঙ্গে শহরের বাহিরে যুদ্ধে আসিলেন, কিন্তু শীঘ্রই পরাস্ত হইয়া শহরে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। "যুদ্ধ বীরত্বের জিনিষ, এটা মুল্লা ও হকিমের কর্ম্ম নহে!" (তালিশ ১৭৬ খ)।

বিজয়ী মগেরা ঢাকায় প্রবেশ করিয়া শহর পুড়াইয়া দিল, লুঠ করিয়া ও মানুষ বন্দী করিয়া লইয়া দেশে ফিরিল (ঐ ১৫৪ খ)।

সুবাদার ভয়ে শহরের নীচে নদীতে লোহার শিকল বাঁধিয়া তাহাদের নৌকার পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহার পর ১৬৩৮ এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মগ নৌ-বল ঢাকার কাছে আসে, কিন্তু যুদ্ধ বা লুট করে না। ইহার বিবরণ প্রবাসীতে (১৩১২,৫৬৯ পৃঃ এবং ১৩১৩,৯৬ পৃঃ) প্রকাশ করিয়াছি।

সেখানে মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুর কার্য্যকলাপ ও যাতায়াতের পথ এবং শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে চাটগাঁ অধিকার এবং মগ-ফিরিঙ্গীর উপদ্রব বন্ধ করার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

যদুনাথ সরকার

জয়ন্তী

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রশ্নের উত্তর

পর দিবস প্রত্যূষে শিবির ভঙ্গ করিয়া সৈন্যের যাত্রা করিবার কথা; রাত্রিশেষে তুমুল কোলাহলে রুস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সেলাম করিয়া প্রহরী বলিল, "হুজুর, সব ঘোড়া দড়ী ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে, পাওয়া যাইতেছে না।"

এমন সময় সেনাপতি আসিলেন। তিনি কহিলেন, "এখানে ত কোন দুশ্‌মন্ নাই, বিদ্রোহীরাও অনেক দূরে; কিন্তু ইহা যে কোন দুশ্‌মনের কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই।"

শাহজাদা কহিলেন, "অশ্বগুলা পলাইল কেমন করিয়া?"

"কোন দুষ্ট লোকে তাহাদের দড়ী খুলিয়া দিয়া থাকিবে। কিন্তু একজনের কাজ নয়।"

"সব ঘোড়া খুলিয়া দিয়াছে?"

"না জনাব, কতকগুলা আছে। আপনার অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে।"

"ঘোড়াগুলার তল্লাস হইতেছে?"

"শাহজাদা, অনেক সিপাহী ও সহিস খুঁজিতে গিয়াছে।"

শাহজাদা সেনাপতির সহিত শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অত্যন্ত গোলমাল, সিপাহীরা নানা রকম তর্কবিতর্ক করিতেছে। শাহজাদাকে দেখিয়া গোল থামিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেহ কিছু জানিতে পার নাই?"

"খোদাবন্দ, কিছুই না। দুই একটা ঘোড়া ডাকিয়াছিল, কিন্তু সে রকম ত হামেশাই ডাকে।"

আর-একজন বলিল, "হুজুর, ঘোড়া চুরি গিয়া থাকিবে, এদেশে নাকি অনেক ঘোড়ার চোর আছে।"

অপর কেহ বলিল, "নিশ্চয় বিদ্রোহীদের কাজ।"

শাহজাদা হাত তুলিতেই আবার সকলে চুপ করিল। তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়ায় চড়িয়া কেহ গিয়াছে?"

"পাঁচ ছয় জন গিয়াছে।"

প্রভাত হইল। যাহারা খুঁজিতে গিয়াছিল, তাহারা একে একে ফিরিতে আরম্ভ করিল। অনেক দূরে মাঠে অশ্ব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অশ্বের সংখ্যা অনেক,

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোনটা বা সহজে ধরা যায় না, সকলগুলাকে সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল। ভোরে পাঁচটার সময় ফৌজ কুচ করিবার কথা, বাহির হইতে আটটা বাজিল। শাহজাদা রাগিয়া অস্থির।

অর্দ্ধক্রোশ পথ না যাইতেই রুস্তমের ঘোড়া খোঁড়াইতে আরম্ভ করিল। শাহজাদা নামিলেন। চারি পায়ের খুর উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইল, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই চলিতে পারে না। পল্টনের সঙ্গে একজন ভাল নালবন্দ ছিল; অবশেষে সে আসিয়া অনেকক্ষণ দেখিয়া বাহির করিল যে ঘোড়ার পিছনের একটা পায়ে এভাবে একটা সরু সূচ বিদ্ধ আছে যে চলিতে গেলেই তাহার পায়ে লাগে। নালবন্দ সূচ বাহির করিয়া দিল, কিন্তু বলিল দুই এক দিন ঘোড়া সওয়ারীর মত থাকিবে না।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শাহজাদা কহিলেন, "ঘোড়ার পায়ে সূচ কেমন করিয়া বিঁধিল?"

নালবন্দ কহিল, "গরিব-পরওয়র, এ সূচ আপনি বিঁধিয়া যায় নাই। অত্যন্ত কৌশলের কাজ, যে-সে ইচ্ছা করিলে পারে না।"

শাহজাদা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার মেজাজ বড় খারাপ হইয়া গেল।

পদে পদে এই রকম বিঘ্ন বাধা ঘটিতে লাগিল। কোন সওয়ারের রেকাব খসিয়া যায়, কাহারও বা তরওয়ালের খাপ পড়িয়া যায়। সমস্ত সৈন্য বদ্-মেজাজ হইয়া উঠিল।

তিন ক্রোশ না যাইতেই বেলা দ্বিপ্রহর হইল। সম্মুখে একটা গ্রাম। সৈন্যেরা আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে চায়। সেনাপতি শাহজাদাকে বলিলেন।

সাহজাদা কহিলেন, "আজ সন্ধ্যার সময় হউক, রাত্রে হউক, কানপুরে পৌছিতে হইবে। অর্দ্ধ পথ পঁহুছিলে সৈন্যেরা আহার বিশ্রাম করিতে পারে; কানপুর কত দূর?"

"বার ক্রোশ।"

"এখানে বিশ্রাম করিতে পাইবে না।"

ততক্ষণে গ্রাম উপস্থিত হইল। সৈন্যেরা আপনিই দাঁড়াইল, হুকুমের অপেক্ষা করিল না। অশ্বারোহীগণ নামিয়া পড়িল, পদাতিকেরা বৃক্ষছায়ায় বন্দুক রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

দেখিয়া শাহজাদা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "কাহার হুকুমে ইহারা দাঁড়াইল?"

সেনাপতি কহিলেন, "মধ্যাহ্নের সময় সৈন্যেরা বিশ্রাম করে। অভ্যাস-মত ইহারা কুচ বন্ধ করিয়াছে।"

"আমি কোন হুকুম দিই নাই। ইহাদিগকে আর এক চটী পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।"

সেনাপতি শাজহাদার নিকটে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, "আপনার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু সৈন্য যদি বিগ্‌ড়ায় তাহার দায়ী আমি হইব না।"

"বিগ্‌ড়াইবে কেন?"

"আজ প্রাতঃকাল হইতেই নানা হাঙ্গামা হইতেছে, সৈন্যেরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহারা বিশ্রাম করিতেছে। এখন যদি তাহাদিগকে আরও তিন ক্রোশ চলিতে হুকুম করা যায় তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না।"

"অদলহুকুমি করিবে?"

"হুকুম শুনিতেও পারে, কিন্তু আপনাকে ইহার পর সৈন্যের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। আর ইহাদের এখন যে রকম মেজাজ তাহাতে একেবারে হুকুম না মানিয়া বিগ্‌ড়াইতেও পারে।"

শাহজাদা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি, আপনার কথা অপ্রিয়।"

সেনাপতি সেলাম করিয়া কহিলেন, "আমি সিপাহী, সত্য কথা বলিতে শিখিয়াছি, প্রিয় হউক অপ্রিয় হউক অন্য কথা বলিতে পারিব না।"

সৈন্যদিগের মধ্যে আবার একটা ঘোর কলরব উঠিল। সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন, "আবার কি হইল? আজ না জানি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম!" সেই দিকে তিনি ধাবিত হইলেন।

হইয়াছিল এই।—সিপাহীরা গ্রামের বণিকের দোকানে গিয়া দেখে দোকান বন্ধ। আর কতকগুলা লোক পিপাসী হইয়া কুয়ার কাছে গিয়া দেখে কুয়ার মুখ কাঁটাগাছ দিয়া

বন্ধ। কাজেই বিষম কোলাহল উঠিল—একটা নয় দুইটা, দুইটা দুই দিকে।

সেনাপতি দৌড়িয়া আসিতে প্রথমে কূপ সম্মুখে পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

একজন সিপাহী কহিল, "কাঁটাগাছ দিয়া কুয়ার মুখ বন্ধ করিয়াছে, আমি জল তুলিতে পারিতেছি না।"

সেনাপতি কহিলেন, "রাত্রে কোন জন্তু কূপে পড়িয়া মরিয়া থাকিবে এই ভয়ে হয়ত গ্রামবাসীরা কূপের মুখ বন্ধ করিয়াছে। কাঁটাগাছ সরাইয়া ফেল।"

সেনাপতি গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময় কয়েকজন সিপাহী দৌড়িয়া আসিল। সেনাপতি কহিলেন, "আবার কি হইয়াছে?"

"বেণের দোকান বন্ধ, আমরা রসদ পাইতেছি না।"

"চল, আমি গিয়া দেখিতেছি," বলিয়া সেনাপতি তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

দোকান বন্ধ দেখিয়া সেনাপতি আদেশ করিলেন, "গ্রামের চৌধুরীকে ধরিয়া আন।"

চৌধুরী কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল। সেনাপতি রাগিয়া বলিলেন, "বেণের দোকান বন্ধ, কুয়ার মুখ কাঁটা দিয়া আঁটা, ইহার মানে কি?"

চৌধুরী হাত জোড় করিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার, আমরা কিছুই জানি না।"

"তবে জানে কে? লাগাও বেত লোকটাকে!"

সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ চৌধুরীকে বাঁধিয়া ফেলিল। কয়েকজন বেত খুঁজিতে ছুটিল, এমন সময় শাহজাদা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। চৌধুরীর অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অপরাধ?"

সেনাপতি কহিলেন, "গ্রামে বণিকের দোকান বন্ধ, কূপের মুখে কাঁটা, এ লোকটা গ্রামের চৌধুরী, বলিতেছে কিছু জানে না।"

শাহজাদা কহিলেন, "ইহাকে আরও গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। ইহার বন্ধন খুলিয়া দাও।"

বন্ধনমুক্ত হইয়া চৌধুরী শাহজাদার চরণে পতিত হইল, কহিল, "জাঁহাপনা, আমি কিছু জানি না, আমার কোন অপরাধ নাই।"

শাহজাদা নিজে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বণিক্ কোথায়?"

"ধর্ম্মাবতার, তাহা ত বলিতে পারি না।"

"কাল রাত্রে এখানে ছিল?"

হাঁ হুজুর, কাল সন্ধ্যার সময় আমি তাহার নিকট আটা কিনিয়াছিলাম।"

"কূপ বন্ধ কেন?"

"কাল সন্ধ্যার সময় সকলে জল তুলিয়াছে। কূপের মুখে কাঁটা ছিল না।"

শাহজাদা আদেশ করিলেন, "বণিক্‌কে গ্রামে দেখ।"

গ্রামে তাহাকে পাওয়া গেল না। শাহজাদা কহিলেন, "চৌধুরী, দাঁড়াও। দোকান খুলিয়া মাল লইয়া তাহার মূল্য তোমাকে দিয়া যাইব।"

সৈনিকেরা দরজা বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভিতরে চারিদিকে শূন্য ভাণ্ড পাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, মাল কিছু নাই। ক্রোধান্ধ হইয়া সৈনিকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমরা গ্রাম লুটিব।"

শাহজাদা হাত তুলিলেন, গোল থামিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তাহা হইলে আমার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না, রাজধানীতে অথবা বাদ্‌শাহের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না। আগের চটীতে চল, সেখানে রসদ পাওয়া যাইবে।"

সৈন্যেরা তখন প্রকাশ্যে অবাধ্য হইয়া উঠিল। কয়েক জন বলিয়া উঠিল, "খাইতে না পাইলে আমরা আর এক পাও যাইব না।"

সেনাপতি শাহজাদাকে ইঙ্গিত করিলেন, শাহজাদা সরিয়া আসিলেন।

কিছু দূরে গিয়া সেনাপতি কহিলেন, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, উহাদের মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়াছে। এখন যে অবাধ্যতা দেখিলেন, ইহা বিদ্রোহের সূচনা। আপনি ত সকলই জানেন, বুঝিয়া দেখুন কি করা কর্ত্তব্য।"

শাহজাদা ভাবিতেছিলেন, কহিলেন, "এখন কিছু করা যায় না। উহাদিগকে আর পীড়াপীড়ি করা চলে

না। আপনি দেখিবেন যেন কেহ কোন অত্যাচার না করে। বৈকালে, রৌদ্র পড়িলে পর একটা-কিছু ব্যবস্থা করা যাইবে।"

সিপাহীরা গ্রাম লুটিল না বটে, কিন্তু তাহারা আর উঠিল না। সঙ্গে যাহা কিছু ছিল আহার করিয়া গাছ-তলায় পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

সূর্য্য অস্ত যায় এমন সময় শাহজাদা সেনাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "এইবার সৈন্য চালনা করুন, আগের চটীতে রসদ পাওয়া যাইবে।"

সেনাপতি মাথা নাড়িলেন, "সিপাহীরা আরও বাঁকিয়াছে। আহার করিতে না পাইলে তাহারা যাইবে না; অনেকে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে।'

শাহজাদা কহিলেন, "গ্রামে সন্ধান করিয়াছিলেন ?"

"চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ঘরে ঘরে দেখিয়াছি, গ্রামবাসীদিগকে পুরস্কার দিতে স্বীকার করিয়াছি। গ্রামে পঞ্চাশজন লোকের মতও খোরাক নাই।"

শাহজাদা কহিলেন, "আমি গিয়া সৈন্যদিগকে বুঝাইব ?"

"এ সময় আপনার না যাওয়াই ভাল। কোন মতে রসদের যোগাড় করিতে হইবে।"

"সিপাহীরা কেহ যাইবে না ?"

"না।"

"তবে আপনি গ্রামের কিছু লোক লইয়া গিয়া অন্য কোন স্থান হইতে চাল আটা যাহা পাওয়া যায় লইয়া আসুন।

সেনাপতি গ্রামে গমন করিলেন। শাহজাদা চিন্তায় আকুল হইলেন। এই সৈন্যের ভরসায় তিনি বাদশাহী-প্রাপ্তির স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন? এক বেলা না খাইতে পাইয়াই ইহারা প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের ভরসা কতক্ষণ ?

শাহজাদার একটা ছোট তাঁবু পড়িয়াছিল। তিনি তাঁবুর বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিলেন, এক অশ্বারোহী মাঠ পার হইয়া তাঁবুর অভিমুখে আসিতেছে। সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অভিবাদন করিল। শাহজাদা চিনিলেন, পূর্ব্বরাত্রের সেই ব্যক্তি! জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে ?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "রাত্রে আপনাকে ত বলিয়াছিলাম আবার সাক্ষাৎ হইবে। আর কি কথা হইয়াছিল আপনার স্মরণ আছে, কেন না আপনি কিছু ভুলিয়া যান না। আপনি কানপুরে পৌঁছিয়াছেন ?"

"আপনি আমার অবমাননা করিতেছেন ?"

"না, সত্য কথা বলিতেছি। আপনি আজ কানপুরে পহুছিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম আপনি তাহা পারিবেন না। ফলে, আমার কথাই সত্য হইয়াছে, কারণ কানপুর অনেক দূরে, আজ আপনি কিছুতেই পহুছিতে পারিবেন না।"

"আজিকার সকল বাধা আপনার উদ্যোগে হইয়াছে ?"

"আমার সঙ্গে অপর লোক আছে।"

"আপনি বিদ্রোহী নিজমুখে স্বীকার করিতেছেন। এখন বাদ্‌সাহের নিদর্শনেও নিস্তার পাইবেন না। আপনাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইব, বাদ্‌শাহ স্বয়ং আপনার বিচার করিবেন।"

"তথাস্তু। কিন্তু আপনি যাইবেন কেমন করিয়া? আজ যাহা দেখিলেন তাহা কিছুই নহে। আমাকে বন্দী করিলে আপনার সৈন্য অচল হইবে, কাল হইতে আহার একেবারেই জুটিবে না।"

"এ কথা যদি সৈন্যেরা শুনিতে পায় তাহা হইলে আপনাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিবে।"

"শাহজাদা, যে মৃত্যুকে ভয় করে না, তাহাকে অনর্থক মৃত্যুভয় দেখাইতেছেন। বরং আমার সহিত সদ্ভাব হইলে আপনার লাভ হইবে।"

"আপনি কি চান ?"

"কাল রাত্রে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার উত্তর, আর কিছু না।"

"আমি সম্রাট্ হইলে প্রজার মঙ্গল সাধন করিব, জাতি-ভেদে অথবা ধর্ম্মভেদে কোন বিচার করিব না।"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "আপনার পথ অবারিত হইল। এখন আজ্ঞা করুন সৈন্যদিগের মনস্তুষ্টির উপায় করি।"

"আপনি কি করিবেন ?"

"আমাকে কিছু সময় দিন," বলিয়া গৌরীশঙ্কর অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিল। সৈন্যেরা পরিতোষপূর্ব্বক প্রচুর আহার করিল। তাহার পর শাহজাদার জয়ধ্বনি করিয়া তাহারা যাত্রা করিল। সমস্ত রাত্রি চলিয়া প্রভাতে তাহারা কানপুরে পৌছিল।

শাহজাদা রুস্তম সে রাত্রে আর গৌরীশঙ্করকে দেখিতে পাইলেন না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

খদিজার জিত

রাজপুত রাণীদের একটা করিয়া মানগৃহ থাকিত। স্বামীর সহিত মনান্তর কিংবা কলহ হইলে রাণী মানগৃহে গিয়া খিল আঁটিয়া দিতেন। তাহার পর অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া অনাহারে ধরণী-শয্যায় আলুলায়িত-কেশে শয়ন করিয়া থাকিতেন। রাজা আসিয়া অনেকক্ষণ সাধাসাধি করিলে পর দরজা খুলিয়া দিতেন, মান ভঞ্জন করিয়া রাজা নিজ হস্তে অলঙ্কার পরাইয়া দিতেন।

মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দিনের অন্দরমহলে তেমন গোসাঘর ছিল না, আর থাকিলেও কে আসিয়া ফাতেমা বেগমকে সাধিত? মহলে প্রবেশ করিয়া মন্‌সব্‌দার সোজা খদিজা বেগমের ঘরে চলিয়া যাইতেন, অন্য কোন দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না।

নসরৎ ফাতেমার পুরাতন দাসী, সকল সময়ে বেগমের বড়-একটা খাতির করিত না। বিশেষ, ফাতেমা জানিতেন যে, সে তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসে ও তাঁহার মঙ্গল কামনা করে, এইজন্য তাহার অনেক কথা সহ্য করিতেন।

নসরৎ কহিল, "বিবি, সব তোমার দোষ।"

ফাতেমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, অনিদ্রায় চক্ষের কোলে কালি পড়িয়াছে। কহিলেন, "আমার কি দোষ?"

"ভাল করিয়া না জানিয়া শুনিয়া কোন কিছু ঘটিবার পূর্ব্বেই তুমি বিবাদ করিতে গেলে কেন? আমি যেমন শুনিয়াছিলাম তোমায় বলিয়াছিলাম, তুমিও শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে। পুরুষ মানুষ ত গরু নয় যে তাহার গলার দড়ী ধরিয়া যত ইচ্ছা, জোরে টানিবে। প্রেমের বাঁধন সরু সুতায়, জোরে টানিলেই ছিঁড়িয়া যায়।"

"আমি রাগ সাম্‌লাইতে পারি না।"

"এ ত রাগ নয় ঈর্ষা। যাহাকে দেখ নাই তার প্রতি ঈর্ষা কেমন? বাহিরের শত্রু ত বাহিরে রহিল, এখন ঘরের শত্রুকে কি করিবে?"

"কে জানিত যে এমন কালসাপিনী ঘরে আছে!"

"ওটাও রাগের কথা। স্বামীর সোহাগ কে না চায়? এত দিন তোমার জিদ্ বশতঃ আর দুই বেগম চুপ করিয়া ছিল। এখন সুবিধা বুঝিয়া ছোট বেগম নিজের কাজ গুছাইয়াছে। দোষ আর কাহারও নয়, দোষ তোমার বুদ্ধির আর তোমার কপালের।"

"এখন উপায়?"

"সে-ই আসল কথা। ছোট বেগমকে আমি চিনি, বড় চতুর, সহজে তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। প্রথম দেখিতে হইবে যে মাছ গাঁথা আছে, না বঁড়শী কাটিয়াছে; মন্‌সব্‌দারের মন একেবারে ভাঙ্গিয়াছে, না শুধু খাপা হইয়াছে। যদি গাঁথা থাকে তবে সাবধানে খেলাইতে হইবে। যদি কাটিয়া থাকে তাহা হইলে আবার গাঁথিতে হইবে। ছোট বেগমের সঙ্গে আগেকার মত হাসিয়া কথা কহিতে হইবে।"

"আমি কালামুখীর মুখ দেখিতে চাহি না।"

"ঐ ত বিবি, ঐ তোমার দোষ! রাগিয়া উঠিলে কিছুই হইবে না। এখানে লোহার তরওয়ালে কাজ হইবে না। মিছরির ছুরী চাই। দিলের ভিতর যাহাই থাকুক, মুখে মধু চাই, নইলে কোন কাজই হইবে না।"

"আমি কি ছোট বিবির পায়ে ধরিয়া বলিব, আমার শওহরকে ফিরাইয়া দে?"

"আবার রাগের কথা! তাহাই কি কেহ বলে? স্বামী যেমন তোমার, তেমনি ছোট বিবির ও বড় বিবির। মন্‌সব্‌দার যদি হুঁসিয়ার মরদ হইতেন তাহা হইলে তোমাদের তিনজনকেই খুশ রাখিতেন, না হয় কিছু উনিশ বিশ—কেহবা সাত আনা, কেহবা নয় আনা।"

"তবে কি খদিজার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব?"

"কেন কহিবে না? যখন মন্‌সব্‌দার উহার ঘরে যাইতেন না তখন কি ছোট বিবি তোমার সহিত হাসিয়া কথা কহিত না? বরং বড় বেগম মুখ ভার করিয়া

থাকিতেন। ছোট বেগম ভারি সেয়ানা, সকল দিক্ বজায় রাখিতে জানে।"

পুরুষ হইলে নসরৎ বাদ্‌শাহের উজীর হইত। তাহার কথা শুনিয়া ফাতেমা ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে মলেকা বেগম খুব খুশী। মন্‌সব্‌দার তাঁহার মহলে আসুন আর নাই আসুন ফাতেমার মহল ত ছাড়িয়াছেন। দেমাকে ফাতেমা বেগমের মাটীতে পা পড়িত না, এখন কেমন হইয়াছে! মনের আনন্দ নিজের মনের ভিতর পূরিয়া রাখিতে না পারিয়া মলেকা বেগম খদিজার ঘরে গমন করিলেন। খদিজা তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিয়া বসাইলেন।"

মলেকা বলিলেন, "বহীন, আমি তোমাকে মোবারক-বাদী দিতে আসিয়াছি।"

খদিজা নেকী সাজিলেন, "কিসের মোবারকবাদী, বেগম সাহেবা?"

"এই যে মন্‌সব্‌দার তোমার ঘরে আসেন আর ফাতেমার ঘরে যান না; ফাতেমা যেন তাঁহাকে জাদু করিয়াছিল।"

খদিজা লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া ওড়নার খুঁট পাকাইতে লাগিলেন। "মন্‌সব্‌দারের উচিত ত সকলের ঘরে যাওয়া, তাঁহার কাছে ত সকলেই সমান।"

"তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল? আমাকে ত তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন।"

"অমন কথা বলিও না। তোমার কথা ত প্রায় বলেন। তবে তুমি যদি রাগ অভিমান না করিয়া দুইটা মিষ্ট কথা বল তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না।"

"এবার আসিলে বলিব না, কিন্তু আমার ঘরে কি আর আসিবেন?"

"কেন যাইবেন না? অবশ্য যাইবেন।"

সেই রাত্রে খদিজা জলালুদ্দীনকে বলিল, "তুমি বড় বিবির ঘরে কখন যাও না কেন?"

"উহার মেজাজ বড় খারাপ, কেবল রাগের কথা। তাহা হইলে কি যাইতে ইচ্ছা করে?"

"আর রাগের কথা বলিবেন না, তুমি কাল উহার ঘরে যাইও।"

বড় সতীন ছোট সতীনকে স্বামীর ঘরে দিয়া আসে, এখানে উল্টা রকম হইল। খদিজা উদ্যোগী হইয়া স্বামীকে মলেকার ঘরে পাঠাইয়া দিল। ফলে মলেকা ও খদিজায় খুব ভাব হইল।

ফাতেমার এ কথা জানিতে বিলম্ব হইল না। নসরতের উপদেশ-মত তিনি খদিজাকে কুবাক্য বলিতেন না, তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেন। একদিন হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আর বড় বেগম ত বেশ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছ!"

খদিজা হাসিয়া বলিল, "তাহাই ভাল, সব একেলা লইতে নাই।"

ফাতেমা বুঝিলেন, এ-কথা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হইল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। অন্য দুই এক কথার পর বলিলেন, "আমার উপর উঁহার রাগ কি কখন যাইবে না?"

"তাহা ত জানি না। আমাকে কিছু বলেন না।"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ফাতেমার নামোল্লেখ হইলেই মন্‌সব্‌দার বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, খদিজাও তাঁহার নাম করিতেন না।

ফাতেমা যে সুযোগ খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন না। খদিজা মুখে যতই মিষ্ট হউন, কাজে তাঁহার পথে কণ্টক হইয়া রহিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

হোলি

চৌধুরী বিহারীলালের গৃহে আজ হোলির ধূম। আবিরে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ লাল হইয়া উঠিয়াছে, সকলের অঙ্গে বস্ত্রে আবির মাখা। কাহারও হাতে পিচ্‌কারী, কাহারও হাতে কুম্‌কুম্। বসন্ত-আগমনের উৎসব,—বাহিরে রং, ভিতরে রং। জমিদারের প্রাসাদ খুব গুলজার।

মন্‌সব্‌দার আসিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান, এ-জন্য তাঁহার অঙ্গে বা বস্ত্রে কেহ রং দেয় নাই। হোলিতে নাচ মোজরা হয়, জলালুদ্দিন তাহাই দেখিতে শুনিতে আসিয়াছিলেন। বিহারীলাল তাঁহাকে সমাদর করিয়া, গোলাপজল আতর সরবত পান দিয়া মহফিলে লইয়া গেলেন। তয়ফাওয়ালীরা সেইখানে। একজন হোলির কাফী গাহিতেছিল—

ফাগুনকে দিন য়ার
যো মাঙ্গো সো দিউঙ্গি;
হীরা ভি দিউঙ্গি, মোতি ভি দিউঙ্গি,
দিউঙ্গি গলে-কা হার!

মন্‌সব্‌দার সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া বাইজীরা উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। মন্‌সব্‌দার পান চিবাইতে চিবাইতে তাঁহাদের সম্মুখে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিলেন। তাঁহার ধরণ ধারণ দেখিয়া বাইজীরা বুঝিল লোক রসিক বটে। তাহাদের মধ্যে যে সুন্দরী তাহাকে জলালুদ্দিন ডাকিলেন। সে তাঁহার কাছে আসিয়া ঘাগ্‌রা ছড়াইয়া বসিল। জলালুদ্দিন বলিলেন, "কুছ গাও, বিবি!"

বিবি মুচ্‌কিয়া হাসিয়া সেলাম করিয়া ধরিল,—

তেরো নয়নোনে জাদু ডারা!

মন্‌সব্‌দার তাহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "কিস্‌কি নয়ন? তেরি ইয়া মেরা?"

বিহারীলাল সেখানে ছিলেন না। মন্‌সব্‌দারকে বসাইয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারদেশে থাকা আবশ্যক, অপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সমাদর করিতে হইবে।

প্রথমে যাঁহারা আসিলেন সকলেই পরিচিত। বিহারীলাল ঔৎসুক্যের সহিত দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিলেন। দেখিলেন, চারিজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিতেছেন, অগ্রে একজন গম্ভীর পুরুষ।

বিহারীলাল কহিলেন, "রায় অযোধ্যানাথ?"

অযোধ্যানাথ আর কেহ নহেন, গৌরীশঙ্কর। হাত বাড়াইয়া বিহারীলালের হাত ধরিলেন, কহিলেন, "চৌধুরী বিহারীলাল, আজ এই উৎসবের দিন আপনার সঙ্গে দেখা বড় আনন্দের কথা।"

"আপনার সঙ্গীদের পরিচয় দিন।"

"বংশীধর, রঘুনন্দন, জয়ন্তপ্রসাদ।"

বয়সে জয়ন্তপ্রসাদ সকলের কনিষ্ঠ, কিন্তু দিব্য গোঁফ-দাড়ী, অথচ হাত ধরিবার সময় বিহারীলাল অনুভব করিলেন তাহার হাত বড় নরম। কোন অলস ধনবান্ যুবা হইবে!

পুণ্ডরীক যে পিছনে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। এই নূতন অতিথিদিগকে সেও কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিল। জয়ন্তপ্রসাদকে দেখিয়া পুণ্ডরীক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

অযোধ্যানাথ মজ্‌লিসে না গিয়া বিহারীলালের বাড়ী দেখিতে চাহিলেন। সেই অবসরে তিনি বিহারীলালকে নিজের সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন ও বিহারীলাল মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। জয়ন্তপ্রসাদ পিছাইয়া পড়িলেন, তাঁহার পিছনে পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীককে কেহ দেখিতে পায় নাই। একটা প্রকোষ্ঠে জয়ন্তপ্রসাদ একা, আর সকলে আগাইয়া গিয়াছে, এমন সময় পুণ্ডরীক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া জয়ন্তপ্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন।

পুণ্ডরীক তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কহিল, "মহাশয়, আপনার এই দাড়ী কয় দিনের?"

জয়ন্তপ্রসাদ কহিলেন, "কে হে তুমি? পাগল না কি? কি বলিতেছ?"

পুণ্ডরীক কহিল, "বিহারীলাল দেখিতে পায় না বলিয়া কি আমিও অন্ধ? তোমাকে কি আমি কখন দেখি নাই? মাটীর ভিতর হইতে যখন বাহির করিয়াছি তখন এত আলোকে তোমায় চিনিতে পারিব না?"

জয়ন্তী চুপিচুপি কহিল, "চুপ কর, গোল করিও না। রায় অযোধ্যানাথ আমাদের গুরু, তাঁহার হুকুমে এই বেশে আসিয়াছি।"

"ছদ্ম বেশে আসিতে বলা কেমন গুরুগিরি? তোমার মনে কি আছে কে জানে? যদি পুরুষ সাজিয়া, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারই কর? মহফিলে সরলা অবলা তয়ফাওয়ালীরা আছে, যদি মন্‌সব্‌দারের মত উহাদের সঙ্গে রসিকতাই আরম্ভ কর?"

জয়ন্তী ভয়ে অস্থির, এমন সময় আর সকলে ফিরিয়া আসিল। অমনি পুণ্ডরীক সরিয়া গেল।

কথা কহিতে কহিতে সকলে মহফিল-গৃহের দিকে চলিলেন। জয়ন্তী—উপস্থিত জয়ন্তপ্রসাদ—গৌরীশঙ্করের কানে গোটা দুই কথা বলিল। তিনি মস্তক হেলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিতে জয়ন্তী পিছাইয়া পড়িল, মহফিলে গেল না।

একটু পরে বিহারীলাল আবার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, যদি আর কেহ আসে। তাঁহার অঙ্গে সাদা মলমলের মির্জাই; তাহাতে কেহ রং মাখায় নাই, কেবল টুপিতে অল্প একটু ফাগ। পুণ্ডরীক আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া অকারণে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিতেছ কেন? কি হইয়াছে?"

"আপনার মনে হাসিতেছি।"

"তাহা ত দেখিতেছি, কিন্তু লোকে যে পাগল বলিবে। আর এখন লোকজন আসিতেছে যাইতেছে, তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই?" কথার ভাবে বিহারীলাল যেন একটু রুষ্ট হইয়াছেন।

পুণ্ডরীকের হাসি থামিল, কিন্তু বিহারীলালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডিঙ্গী মারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাকে ত লোকে পাগল বলিবে, আর তোমাকে অন্ধ বলিবে না?"

"আজ তোমার কি হইয়াছে, ভাঙ্গ বেশী খাইয়াছ?"

"হাঁ, সেইজন্য আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

"কি বলিবে, স্পষ্ট করিয়া বল না।"

"অস্পষ্ট কোন্ কথাটা? আমার কি কথা জড়াইতেছে? বোতল দুই সরাব পার করিয়াছি, না?"

"তুমি একটা কোন কথা বলিতে চাও। কি কথা?"

"তোমার চোকও বেশ পটলচেরা, আর আমার চোক দুটো কুৎকুতে। তবু আমি দেখিতে পাই, আর তুমি অন্ধ।"

"কেন?"

"মেয়েমানুষের এক হাত দাড়ী দেখিয়াছ?"

"কি রকম তামাসা?"

"যাহাকে দেখিবার জন্য বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াও সে যদি তোমার ঘরে পুরুষ সাজিয়া আসে তাহা হইলে তাহাকে চিনিতে পার না?"

বিহারীলাল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়াইলেন। ধমনীতে যেন শোণিত-প্রবাহ বন্ধ হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, মুখে রক্তের লেশ রহিল না। শুষ্ক মুখে ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "কোথায়?"

"তুমি চক্ষু বুজিয়া অন্ধ হও, আমি তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাই।" এই বলিয়া পুণ্ডরীক রাগিয়া হন্ হন্ করিয়া আর-এক দিকে চলিয়া গেল।

বিহারীলাল দরজা ছাড়িয়া পাশের একটা ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভাবিবার একটু সময় চাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—'অন্ধ? একবার কেন, শতবার অন্ধ! মূর্খ পুণ্ডরীক দেখিবামাত্র চিনিল, আর আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া হস্ত ধারণ করিয়াও চিনিতে পারিলাম না! কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব, ক্ষমা চাহিবার সুযোগই বা কেমন করিয়া হইবে?"

বিহারীলাল উঠিয়া দূর হইতে দেখিলেন, মহ-ফিলে জয়ন্তী নাই। তখন তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একটা প্রকোষ্ঠে মুক্ত জানালার সম্মুখে জয়ন্তী বসিয়া আছে। বিহারীলাল তাহার নিকটে গিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন। জয়ন্তী মাথা তুলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখানে কেন?"

"মার্জ্জনা চাহিতে আসিয়াছি। পুণ্ডরীক তোমাকে দেখিয়াই চিনিয়াছে। আমি অন্ধ চিনিতে পারি নাই, তুমি জয়ন্তী।"

জয়ন্তী অতি মধুর হাসিল,—"বহুরূপী সাজিলে সকলে চিনিতে পারে না। আমারই লজ্জা পাইবার কথা, পুরুষের বেশে আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু এ বেশ আমি ইচ্ছা করিয়া ধারণ করি নাই, গুরুর আদেশ।"

"অযোধ্যানাথ?"

"উঁহার যথার্থ নাম গৌরীশঙ্কর। আপনি সকল কথা শুনিয়াছেন?"

"কতক কতক শুনিয়াছি। তাঁহার দলভুক্ত হইতে স্বীকৃত হইয়াছি।"

"তাহা হইলে আপনিও আমাদের একজন।"

বিহারীলাল পাশে বসিয়া জয়ন্তীর হস্ত ধারণ করিলেন। জয়ন্তী হাত সরাইল না, কিন্তু তাহার হাত কাঁপিতে-ছিল।

জয়ন্তী কহিল, "আমি বনে কখন বাস করিতাম না,

যাইতাম আসিতাম মাত্র। গুরুদেব ও আর কয়েকজন কখন মন্দিরে কখন গহ্বরে আসিতেন। আমি বনে দাঁড়াইয়া দেখিতাম কোন অপর লোক আসে কি না। ইহার ভিতর আর কোন রহস্য নাই।"

অল্পকাল নীরব রহিয়া বিহারীলাল কহিলেন, "আমি অন্য কথা ভাবিতেছিলাম। আমার হৃদয়ের ভাব তুমি কি বুঝিতে পার নাই? তুমি যুবতী, এমন করিয়া কতদিন থাকিবে? আমার গৃহ শূন্য।"

জয়ন্তী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "ওরূপ কোন কথা শুনিতে আমার নিষেধ। যতদিন না কার্য্যসিদ্ধি হয়, ততদিন গৃহ-সংসারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই।"

"এমন কত দিন যাইবে?"

"জানি না।"

"যদি কোন নিষেধ না থাকিত, যদি তুমি মুক্ত থাকিতে, তাহা হইলেও কি আমার কথায় কর্ণপাত করিতে না?"

"সে কথায় কোন ফল নাই।"

"আছে। বল, সময় আসিলে আমার কথা শুনিবে।"

"তখন সে কথা হইবে, এখন তোমাকে কিছু বলিতে পারিব না।"

'আপনি' নয়, এবার 'তুমি'। বিহারীলালের হৃদয় আনন্দে আশায় পূর্ণ হইল।

বাহিরে কাহারা কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল। গৌরীশঙ্করের কণ্ঠস্বর। বিহারীলাল ও জয়ন্তী ঘরের বাহিরে আসিলেন। দুইজন যুবা পুরুষ ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন, ইহাতে দোষের কিছুই নাই।

গৌরীশঙ্করের মুখে নয়, চক্ষে একটু হাসি। সে হাসির অর্থ বুঝা ভার। কহিলেন, "কেমন, জয়ন্ত-প্রসাদ, চৌধুরী মহাশয়কে কোন গোপনীয় কথা বল নাই ত?"

"কোন বিষয়েই আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি নাই।" কথার অর্থ গূঢ়, গৌরীশঙ্কর বুঝিলেন।

গৌরীশঙ্কর ও তাঁহার সঙ্গীরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পথহারা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন্ অনেক দূরে যাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

'ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে;
পথের পথিক পথেই বসে' থাকে,
জানে না কে তাহার পানে চাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাথায় দিগ্‌বধূদের কেশে,
ডাক্‌তে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,
একলা থাকার গানখানি সে গাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধাঁর আঁধার বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়
আর কি পূবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

ইজিপ্টের নারীশক্তি

নারীদের জীবনের ধারা সনাতনের পথ ছেড়ে নূতন পথ ধরে' চল্‌বার জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে এবং তার জন্য যে সাড়া পড়ে' গেছে তার ঘা লেগে সমস্ত দুনিয়া আজ থর্‌থর্‌ করে' কেঁপে উঠ্‌ছে। আফ্রিকাতেও এই জাগরণের চাঞ্চল্যের ঢেউ গিয়ে পৌছেচে' এবং পৌছেচে যে তার প্রমাণ একান্ত ভাবেই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে সেখানকার নারী-কর্ম্মীদের কাজের ভিতর দিয়ে।

১৯১১ সালে এই সাড়াটার চাঞ্চল্য সেখানে প্রথম অনুভূত হয়। জনকয়েক মহিলা মিলে সে সময় একটা 'নারী-সঙ্ঘ' গড়ে' তুলেছিলেন। তার নাম "La Femme Nouvelle" বা "নবনারী"। তখন নারীদের আন্দোলনের শক্তি বোঝা না গেলেও ১৯১৯ সালে তাঁদের আন্দোলন যে শক্তি অর্জ্জন করেছে তাকে অস্বীকার কর্‌বার জো নেই। একদল মহিলা ইজিপ্টের স্বাধীনতার জন্য আত্মসমর্পণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে এই সময় যে নারীসমিতিটি গড়ে' তুলেছেন আজ তার প্রভাব সমস্ত ইজিপ্ট্‌কে চঞ্চল করে' তুলেছে। এই নারীসমিতি ইজিপ্টের অভিজাত সম্প্রদায়ের মুসলমান খৃষ্টান অনেককেই দলে টেনে এনেছেন; মনের ভিতর বড় হবার স্পৃহা জাগিয়ে তুলে', শিক্ষার বিস্তার করে' এঁরা মধ্য-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেছেন; এঁদের সাধনা কৃষকদের হৃদয়ও নূতন ধরণের আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে' তুলেছে।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছেন সোফিয়া হানুম। সোফিয়া খুব বড় ঘরের মেয়ে। এঁর বাপ মুস্তাফা পাশা ফাহমী দ্বিতীয় আব্বাস হিলমার সময় পনর বৎসর ধরে' প্রধান-মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বাপের দিকের পরিচয়ের চেয়ে এঁর স্বামীর দিকের পরিচয়ের গৌরব আরো বেশী। ইনি সৈয়দ জগ্‌লুল পাশার সহধর্ম্মিণী, যে জগ্‌লুল পাশা ইজিপ্টকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে' তুলেছেন। জগ্‌লুল পাশার দ্বিতীয় বারের নির্ব্বাসনের পর, ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাস হ'তে সোফিয়া হানুম স্বামীর পরিত্যক্ত পতাকা তুলে' ধরে' তাঁর কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে' দিয়েছেন। সোফিয়ার চারি পাশে এসে জড়ো হয়েছেন সেইসব রমণী, যাঁদের স্বামীরা জগ্‌লুল পাশাকে সাহায্য করার অপরাধে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত হয়েছেন।

সোফিয়া যে গৃহে বাস করেন তাকে 'জাতীয় মন্দির' নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান রাজা বাদ্‌শা বেগম-সাহেবাদের নামের সঙ্গে বিলাস এবং ঐশ্বর্য্য এমনভাবে জড়িত যে এগুলো ছাড়া তাঁদের কল্পনা করা দস্তুর-মত কঠিন হ'য়ে ওঠে। সুতরাং এ কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এই 'জাতীয় মন্দিরে'ও বিলাসের আতিশয্যের অভাব থাক্‌বে না, সেখানেও শ্বেতপাথরের ফোয়ারা হ'তে গোলাপজলের উৎস উৎসারিত হয়ে উঠ্‌ছে, বাঁদীদের বীণায় সুরতরঙ্গ ঝঙ্কৃত হচ্ছে, দুয়ারে দুয়ারে মুক্তকৃপাণ হাতে খোজা প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আদতে এ সকলের বাহুল্য জাতীয় মন্দিরে কিছু মাত্র নেই। খোজার বদলে সেখানে একালের আটপিঠে পরিচারিকারা সমস্ত ব্যাপারের খবরদারী করে' বেড়ায়; বিলাসী, ভয়কাতুরে, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছে-পড়া মেয়েদের বদলে সেখানে গিয়ে জড়ো হয়েছেন যত তেজস্বিনী ও নির্ভীক স্বার্থত্যাগী রমণী।

জগ্‌লুল পাশার সহধর্ম্মিণীর চেহারার ভিতরেও তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ যথেষ্ট রকমেই সুস্পষ্ট। চোখে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, গোলগাল মুখখানিতে বাঁশীর মত সরু হয়ে নাক নেমে এসেছে। দেশের এই নিদারুণ উত্তেজনা এবং সঙ্কটের মুহূর্ত্তে তাঁর চার পাশের আর-সকলে যখন উত্তেজিত ও চঞ্চল হ'য়ে রয়েছে, তখনও তাঁর ভিতরে কোনই চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই। আপনার পরিপূর্ণ মহিমায় তিনি স্থির হয়ে আছেন, কণ্ঠস্বর কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে চল্‌বার সাহস পায় না। তাঁর মনের দৃঢ়তা

যে কতখানি বেশী, তা তাঁর স্বামীর বন্দী হওয়ার পর তিনি যে কথাটা বলেছিলেন তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছিলেন, নিজের ঘরে আমি বন্দী, এ বন্দিত্বের শিকল আমি স্বেচ্ছাক্রমেই পরেছি। আমার স্বামী দূরে আটক হয়ে আছেন। কিন্তু আমি এখানে আছি—তাঁর স্ত্রী, তাঁর সহধর্ম্মিণী—তাঁরই পরিত্যক্ত জায়গা গ্রহণ কর্‌বার জন্যে।

জগলুল পাশাকে ১৯২১ সালের ২২শে ডিসেম্বর বন্দী করা হয়। তখন তাঁকে জোর করে' ছিনিয়ে নেবার জন্য তাঁর প্রাসাদ ঘিরে দেশের লোক বিদ্রোহী হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে সোফিয়া হানুম স্থির করেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে তিনিও নির্ব্বাসন-দণ্ড বরণ করে' নেবেন। কিন্তু তাঁর নিজের বাড়ীর দোরেই যখন বিদ্রোহীদের একটি পনেরো বৎসরের বালক গুলির আঘাতে মারা পড়্‌ল, তখনি তাঁর সঙ্কল্প ঘুরে গেল। তিনি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লেন, তাঁকে দিয়ে তাঁর স্বামীর যে প্রয়োজন, তার চাইতে ইজিপ্টের প্রয়োজন অনেক বেশী। স্বামীর পরিত্যক্ত কর্ত্তব্য তাঁর মাথায় তুলে নেবার জন্যই তাঁর স্বামীর সঙ্গ গ্রহণ করা চল্‌বে না। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোঁতে গিয়ে ব্রিটিশ হাই-কমিশনারকে ডেকে পাঠালেন। সেক্রেটারী এসে টেলিফোঁর চোঙ্‌ ধর্‌তেই তিনি বল্‌লেন, লর্ড এলেন্‌বীকে আপনি জানাবেন, আমি কায়রোতেই থাক্‌ব এবং আমার স্বামীর স্থান গ্রহণ কর্‌বার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টাও কর্‌ব। আপনারা আমার স্বামীর দেহটাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত কর্‌তে পার্‌বেন কিন্তু তাঁর আত্মাকে নির্ব্বাসিত কর্‌তে পার্‌বেন না। তাঁর নিজের ঘরেই সে আত্মা জেগে থাক্‌বে। যতদিন সৈয়দ ফিরে না আসেন, ততদিন আমি তাঁর স্থান অধিকার করে' থাক্‌ব। দীর্ঘকাল আপনারা তাঁকে নির্ব্বাসিত করে' রাখ্‌তেও পার্‌বেন না, এদেশের জনসঙ্ঘই তা হতে দেবে না। তবে যদি তিনি মারা যান, তবে তখন বানের স্রোতের মত লোক জেগে উঠ্‌বে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, ইজিপ্টের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের বহ্নি জাগিয়ে তুল্‌তে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে আজ হতে চেষ্টা কর্‌ব। এর বেশী আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।"

এর একঘণ্টা পরে স্বামীর সঙ্গ নেবার অনুরোধ জানিয়ে তাঁর কাছে হাই-কমিশনারের চিঠি এসে হাজির হল। এই চিঠির উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন, অনেক সংবাদ-পত্রেই তা প্রকাশ হ'য়ে গিয়েছে।

সোফিয়া হানুমের নিত্যপ্রয়োজনের জিনিষপত্রের ভিতরেও বিদেশী কোনো দ্রব্যের স্থান নেই। তাঁর সব জিনিষ স্বদেশী। বেশীর ভাগই তাঁর নিজের ঘরে তৈরী হয়। কোনো অভ্যাগত বাড়ীতে এলে তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা করেন ঘরের তৈরী খাবার দিয়ে, বিদেশী কেক প্রভৃতি তাঁর ঘরে চল্‌বার জো নেই।

তাঁর এই স্বদেশীর মূলে রয়েছে বয়কট। নেতারা যখন তাঁদের দেশ হ'তে নির্ব্বাসিত হলেন, তখন তার প্রতিবাদ-স্বরূপ মহিলা-সঙ্ঘের দ্বারাই এই বয়কটের আন্দোলন সুরু হয়। নব-নারী-সঙ্ঘের (La Femme Nouvelle) এবং মহম্মদআলী সোসাইটির বহু বিখ্যাতা মহিলা ব্রিটিশপণ্য বয়কট করার কাজে তখন একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এজন্য তাঁরা যে পথ গ্রহণ করেছিলেন তা একান্তভাবেই আধুনিক। ছয় জনে মিলে টেলিফোঁতে কথা চালিয়ে প্রথমে এই পথ গ্রহণ করার কথা ঠিক করে' ফেলেন। তার পর দুপুরে ২৪জন মহিলা নিয়ে গঠিত একটা দল নিজেদের মোটরকার ও গাড়ীতে করে' গিয়ে হাজির হন একেবারে কায়রো এবং আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বড় বড় দোকানীদের কাছে। প্রথমে অবশ্য তাঁদের ভাগ্যে যে জিনিষটা জুটেছিল তা উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দোকানীদের হার মান্‌তে হল। অবশেষে তাঁরাই রমণীদের সহযোগিতা লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠ্‌লেন। কায়রোতে চল্লিশজন মহিলা নিয়ে এই বয়কট কমিটি গড়ে' উঠেছে, এ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশেও এর শাখা-কমিটি গঠিত হয়েছে। গত মে মাসে এঁদের একটা সম্মিলনী হয়েছিল। এই সম্মিলনীতে দেশের সমস্ত স্থান হ'তে প্রায় দুই হাজার মহিলা এসে যোগ দিয়েছিলেন। এই বয়কটের কালে প্রথম কয় মাসে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের যে ক্ষতি হয়েছে তার বহর বড় কম নয়। তার পর গবর্মেণ্টের পরিবর্ত্তন এবং ব্রিটিশ প্রোটেক্‌টোরেট্‌ তুলে নেবার ফলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা

অনেকটা কমে' গিয়েছে। তবুও ব্যবসায়ীরা এখনও বিদেশীর সঙ্গে এমন কোনো ব্যবসা কর্‌তে পারে না যাতে স্থানীয় ব্যবসা নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। স্বীকার করুক আর নাই করুক, এই ব্যাপারের পর থেকে অনেক বিদেশী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আয় ঢের কমে গিয়েছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

এই বয়কট-ব্যাপারে যিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম বাহি-উদ্-দীন বে বয়াকৎ। উনি খুব বড় ও প্রতিপত্তিশালী ঘরের মেয়ে। ইনি যে কিরূপ ভাবে বয়কট চালিয়েছিলেন তার একটা নমুনা দিচ্ছি। একদিন রাস্তার আর একদিক্ থেকে ইনি দেখ্‌তে পেলেন দুইজন ইজিপ্‌সিয়ান ভদ্রলোক জিনিষ কিন্‌বার জন্য একটি ইংরেজের দোকানে ঢুক্‌লেন। কোনো ইতস্ততঃ না করে' তিনি সটান রাস্তাটুকু পেরিয়ে এসে তাঁদের বল্লেন, "মশাইরা ইংরেজের পণ্য কিন্‌বেন না।" মুখ তাঁর ঘোমটায় ঢাকা, বয়স বিশ বাইশ বৎসর। তাঁর দেহের সৌন্দর্য্য বসনের বাঁধনকে ছাপিয়ে উথ্‌লে পড়্‌ছে। ভদ্রলোক দুটির আর জিনিষ কিন্‌বার সামর্থ্য রইল না। দামী জিনিষগুলো তাঁরা ক্রুদ্ধ দোকানীর টেবিলের উপর রেখে দিয়ে দোকান হ'তে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

ঘোমটা-পরা নারীদের পক্ষে পুরুষকে এমন ভাবে সম্বোধন করা ইজিপ্টে লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু ধীরে ধীরে এসব কুসংস্কার ব্যাঙাচির লেজের মত খসে পড়্‌ছে।

সোফিয়া হান্থম বলেন, তাঁর স্বামী নারীদের রীতিনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার। তাঁর নিজের মতও হচ্ছে এই যে ঘোম্‌টার সঙ্গে ধর্ম্মের কিছুমাত্র সংস্রব নেই। ঘোমটা-টানা প্রথাটাকে যত শীঘ্র সম্ভব তুলে দেওয়া সঙ্গত। পুরুষের সাম্‌নে বক্তৃতা কর্‌বার সময়েও তিনি নিজের মুখ ঘোম্‌টায় ঢেকে রাখেন না। একটা পর্দ্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যা তাঁর বল্‌বার তা বলে' যান। সাধারণতঃ তাঁর বক্তৃতার বিষয় থাকে ইজিপ্টের স্বাধীনতা। স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রাণের আবেগ, ব্যথা ও বেদনা যখন শব্দময় হয়ে বেরিয়ে আসে তখন শ্রোতাদের পক্ষে চোখের জল বন্ধ করে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে।

নবা নারীসম্প্রদায়ের চেষ্টায় সমাজ ও শিক্ষার দিক দিয়ে ইজিপ্টের এই অল্পদিনের ভিতরেই অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। তাঁদের এই বৃহত্তর জীবনের প্রভাবে দেশের অনেক বৈষম্যও বিদূরিত হয়েছে। দুটি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আজ সহজেই কাজের ক্ষেত্রে এক হয়ে দাঁড়াতে পার্‌ছে। মিলনই যে শক্তি এ তারা আজ বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে সুতরাং ধর্ম্মে গোঁড়ামী কাজের সময় এক হয়ে দাঁড়াবার পক্ষে আর বাধার সৃষ্টি কর্‌তে পারে না।

La Femme Nouvelle বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবসা-বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, এমনি হাজার রকমের প্রতিষ্ঠান গড়ে' তোল্‌বার ভার এঁরা গ্রহণ করেছেন, আমেরিকার আদর্শে কায়রোতে একটি সামাজিক ক্লাবের গোড়াপত্তন কর্‌বার চেষ্টা চল্‌ছে। এজন্য যে চাঁদা উঠেছে তার পরিমাণ সম্ভবতঃ ৫০ হাজার ডলারের কম হবে না। এই বিরাট্‌ স্ত্রী-সঙ্ঘটিতে জ্ঞান, অর্থ এবং বুদ্ধির দিক্ দিয়ে যে-সব লোক দেশের সেরা তাঁরাই এসে জড় হয়েছেন। এঁদের উদ্দেশ্য—দেশের সবরকম কল্যাণের কাজে এঁরাই উৎসাহ ও রসদ জুগিয়ে চল্‌বেন। কায়রো হ'তে নূতন জীবনের ধারা এবং ভাবপ্রবাহ সমস্ত বড় বড় সহরগুলিতে সঞ্চারিত হবে।

কিন্তু তথাপি এখনো ইজিপ্টের এই নব-নারী-সমাজ কেবলমাত্র শক্তিই সঞ্চয় করে' চলেছেন; ক্রমাগত অজ্ঞতা, রীতিনীতি, সংস্কার এবং পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এঁদের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠ্‌ছে। যে নূতন নারী-শক্তি ইউরোপে আমেরিকায় চীনে জাপানে সমাজ এবং শাসনতন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করে' দিয়ে তাকে নূতন করে' গড়ে' তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, ইজিপ্টের নারী-সমাজও আজ সেই শক্তির ভাণ্ডারে ভাগ বসাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

—

নারীযোগ্য ব্যবসা

ভারতের এই অর্থ সমস্যার দিনে, নারী নিজেদের হাতে কোন্‌ কোন্‌ কাজের ভার গ্রহণ কর্‌তে পারে

বৃষ্টিভির-উৎকণ্ঠিতাঃ

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

U. Ray & Sons Calcutta
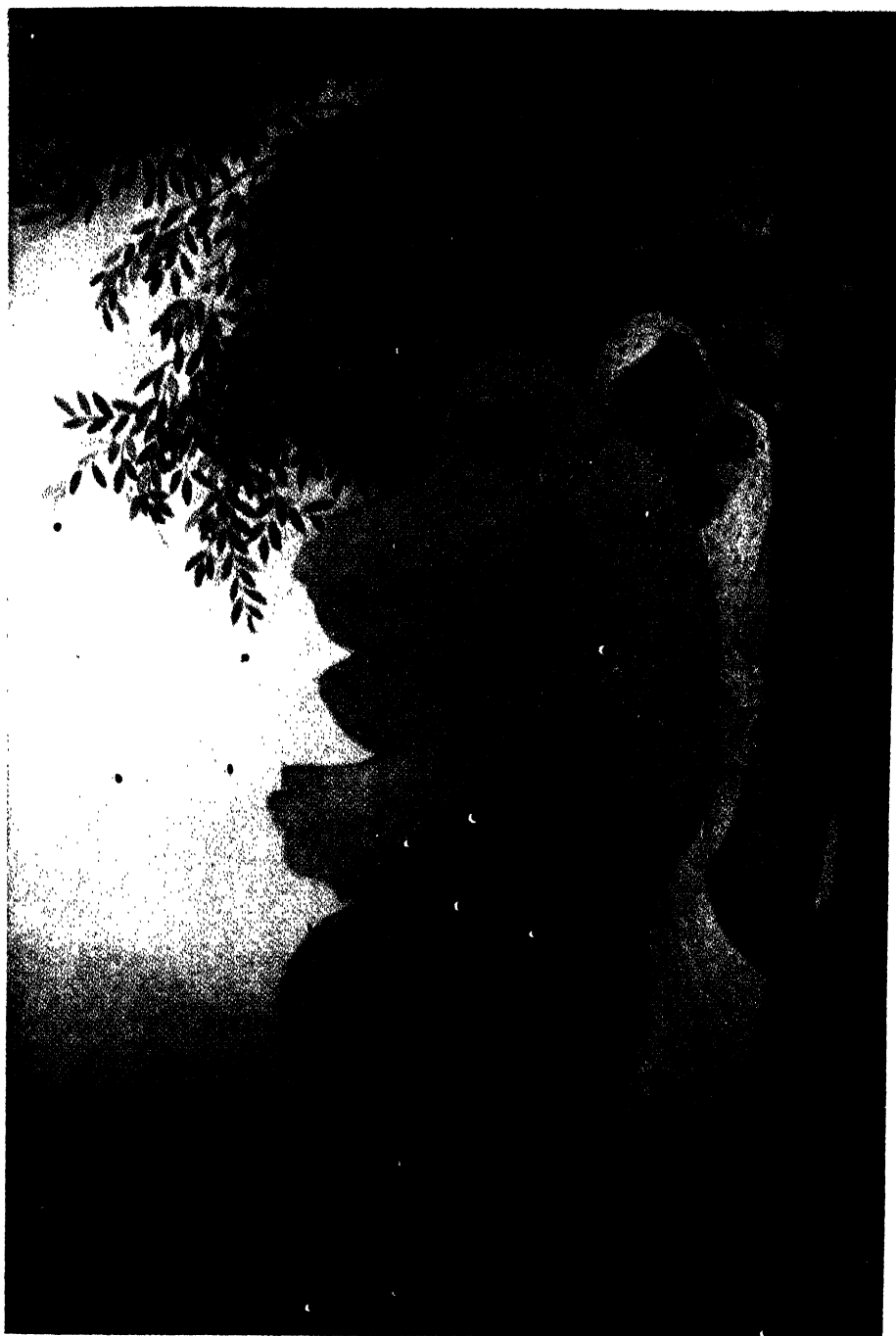
তা নিয়ে যথেষ্টই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ যুগে নারীদের ঘরের কোণ আগ্‌লে বসে' থাক্‌লে যে চল্‌বে না, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে' পুরুষের মত বাইরের সমস্ত কাজেই তাদের নেমে দাঁড়ানোও হয়ত সঙ্গত হবে না। কল-কার্‌খা-ায় খনির কাজে নারীদের যোগ দেওয়ার ফলে যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটে ইউরোপকেও আজ সে কথা স্বীকার কর্‌তে হচ্ছে।

কিন্তু এই-সব বিপদের ক্ষেত্র ছাড়া এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে রমণীরা নিঃসঙ্কোচেই নেমে দাঁড়াতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কতকগুলোর নাম দেওয়া যাচ্ছে।

লঙ্কা, পেঁয়াজ, আলু—এগুলোর চাষ ধান পাট প্রভৃতির চাষের মত আয়াসসাধ্য নয়। পুরুষ অনায়াসেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়্‌তে পারে, এগুলোর ভার স্ত্রী মেয়ে বোনেরা যদি গ্রহণ করে। গ্রামে অনেকেরই অল্প স্বল্প জমি জমা আছে। আমাদের দেশের পুরুষেরা সেইগুলো নিয়েই পড়ে' থেকে কোনরকমে দিন গুজ্‌রান করে। এই-সব চাষ-আবাদের ভার ঘরের মেয়েরা যদি হাতে তুলে নেয় তবে পুরুষেরা অন্য কাজে মন দেবার অবকাশ পায়; অর্থোপার্জ্জনের নূতন পথ ধরে' তারা চল্‌তে পারে।

মৌমাছি পালন বা হাঁস মুর্‌গী পোষার ব্যবসাটাও অনায়াসেই মেয়েরা নিজেদের হাতে তুলে নিতে পারে। এতে পরিবারের উপার্জ্জন অনেকখানিই বাড়িয়ে তোল্‌বার সুযোগ আছে। তা ছাড়া এর আর-একটি সুবিধা হচ্ছে এই যে, গোড়াতে এ ব্যবসা সুরু কর্‌তে বিশেষ অর্থেরও প্রয়োজন হয় না।

আমাদের দেশে ফল অপর্য্যাপ্তভাবেই ফলে। রক্ষা কর্‌বার উপায় না জানায় এবং সেদিকে কোনো চেষ্টা না হওয়ায় তাদের বেশীর ভাগই পচে' নষ্ট হয়। মেয়েরা যদি এদিকে নজর দেয়, তবে তাদের রক্ষা করে' বেশ বড় ব্যবসা ফাঁদা যেতে পারে। এদিক্ দিয়ে খুব বড় ক্ষেত্র পড়ে' রয়েছে। উপযুক্তভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করে' বোতলে টিনে পুরে দেশে এবং বিদেশে সেগুলো চালান্ দেওয়া যেতে পারে। আচার একটা জিনিষ যা ভারতবাসীরা অনেকেই পছন্দ করে। এই আচার তৈরীর ভারও মেয়েরা স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ কর্‌তে পারে, কেবলমাত্র নিজেদের পরিবারের ভিতর ব্যবহারের জন্য নয়, ব্যবসা কর্‌বার জন্য। "জ্যাম" মোরব্বা সাহেবেরাও খুব ব্যবহার করে এবং বিদেশের আম্‌দানী ঐ জিনিষটা আমরা ভারতবাসীরাও কম ব্যবহার করি না। এ ব্যবসাটাও মেয়েরা স্বচ্ছন্দেই নিজেদের হাতে গ্রহণ কর্‌তে পারে। আমাদের দেশে এমন অনেক মেঠাই আছে যার পচন বন্ধ কর্‌বার ব্যবস্থা করে' সুদৃশ্য বাক্সে মুড়ে যদি বিদেশে চালান্ দেওয়া যায় তবে বেশ চড়াদামেই তা বিক্রী হবে। দুধের ব্যবসাটাও একটা খুব বড় ব্যবসা করে' তুল্‌তে পারা যায়, যদি কেবলমাত্র দুধ বিক্রি না করে' তার থেকে মাখন ছানা প্রভৃতি বের করে' নিয়ে ব্যবসা করা যায়। তবে এ-সব ব্যবসার জন্য রীতিমত মূলধনের প্রয়োজন, টাকা খরচ কর্‌তে পার্‌লে তা অনেক-গুণ করে' ফিরিয়ে আন্‌বার সুযোগ এ-সব ব্যবসায়ে প্রচুর পরিমাণেই আছে।

চর্‌কায় সুতো কাটা এবং তাঁতের কাপড় বোনা নিয়ে বর্ত্তমানে বেশ আন্দোলন সুরু হয়ে গিয়েছে। এক একটি পরিবারে কম কাপড়ের প্রয়োজন হয় না। নিজেদের কাপড়ও যদি নিজেরা তৈরী করে' নিতে পারা যায় তবে তাতে অনেকগুলো টাকা বাঁচাতে পারা যায়। এই বয়ন-শিল্পে যদি সাফল্যলাভ কর্‌তে হয় তবে তুলোর গাছ নিজেদের বাগানেই জন্মাতে হবে। যত্ন নিয়ে তদ্বির কর্‌লে দুচারটে গাছে এমন তুলো ফলাতে পারা যায় যে সেই তুলোতে স্বচ্ছন্দেই একটা পরিবারের বস্ত্রের উপযোগী তুলো সর্‌বরাহ হ'তে পারে।

এম্‌নি আরো ছোটখাট অনেক ব্যবসা আছে যাতে সমাজে শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক সুখ বজায় রেখেও নারীদিগকে স্বচ্ছন্দেই নিযুক্ত করা যেতে পারে। খুঁজে বের করে' সেই-সব কাজে মেয়েদের নিযুক্ত করে' দিলে একটা খুব বড় রকমের সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়।

নারীদের পথ

"The Wealth of India" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মদন-মোহন বর্ম্মা লিখিয়াছেন—নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে হ'লে, তাদের পথ থেকে সকলের আগে পর্দ্দার আব্রু এবং অন্যান্য সামাজিক বিধি-নিষেধের বাধা দূর করতে হবে। তার পর তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যবস্থার ভিতর কোন-রকমের ত্রুটি থাকলে চল্‌বে না। তৃতীয়তঃ তাদের বিবাহের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে এমন করতে হবে যাতে বিয়ের আগেই তারা আপনাকে যথেষ্ট রকমে শিক্ষিত করে' নিতে পারে। চতুর্থতঃ শিশুপালনে তাদের রীতিমত শিক্ষিত করে' তুল্‌তে হবে। সর্ব্বশেষে, পৌর কর্ত্তব্যের অধিকারে, মানুষের হিত-সাধনার কাজে, শিক্ষা ব্যাপারে তাদের এমন সব সুবিধা দিতে হবে যাতে করে' তারা দেশকে বিশেষতঃ তাদের শিশুসন্তানগুলিকে গড়ে' তুল্‌তে পারে।

এই ধরণের সমাজ-সংস্কারে যদি আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি তবে দু'পুরুষ পেরিয়ে যেতে না যেতেই ভারতের মেয়েরা যথার্থই দেবী হ'য়ে উঠ্‌বে। আর তাদের আশীর্ব্বাদের উপরেই যে ভারতের সুখ সম্পদ স্বাধীনতা নির্ভর করছে তাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।

—

নারীদের কর্ম্মক্ষেত্র

সম্প্রতি মাদ্রাজে সমাজ-সেবা-ধর্ম্মীদের (All India Social Service workers') একটি কন্‌ফারেন্স্ হ'য়ে গিয়েছে। শিশু-স্বাস্থ্য এবং মায়েদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব করে' সভায় কর্ত্তব্যের একটি খস্‌ড়া তৈরী করা হয়েছে। সভায় শ্রীমতী কজিন্‌স্ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, শিক্ষিতা রমণীদের প্রত্যহ দু'ঘণ্টা করে' স্কুলে বিনা বেতনে পড়ান কর্ত্তব্য। তা ছাড়া বিধবাদের জন্য, নারীশ্রমজীবীসম্প্রদায়ের জন্য ব্যবসা-কেন্দ্র স্কুল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যে-সব হতভাগিনী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, নারী-কর্ম্মিষ্ঠাদের জেলে জেলে ঘুরে তাদের সংস্কারের জন্য চেষ্টা করতে হবে। এদিকে নারীকর্ম্মিষ্ঠাদের একটা বড় কাজ করণীয় রয়ে গিয়েছে।

—

মিউনিসিপ্যালিটিতে নারী সদস্য

করাচী মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ভোটের অধিকার স্বীকার করে' নিয়ে একটি প্রস্তাব সম্প্রতি পাশ হয়েছে। যারা বৎসরে ৩৬ টাকার বেশী খাজনা দেয় তাদের সকলেই স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে নির্ব্বাচনের আসরে ভোট দিতে পারবে। এই নূতন ব্যবস্থাটি প্রবর্ত্তনের জন্য মিঃ জম্‌সেদ্ বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

—

চীনের নারী সদস্য

'গত ১৩ই নভেম্বর চীনের ক্যাণ্টন সহরে নাগরিক আইন-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। চীনে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। একজন রমণী এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির সদস্যদের ভিতর স্থান পেয়েছেন।

—

আদেশের প্রতিবাদ

ডাঃ এম ই ষ্টেট্‌লি নাম্নী জনৈকা মহিলা ডাক্তার ফিজির শুভা হাস্‌পাতালে ডাক্তারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। গত দু'বৎসর ধরে' তিনি প্রবাসী ভারতীয় রমণী এবং শিশুদের চিকিৎসায় বিশেষ দরদ দেখিয়েছেন। সম্প্রতি ফিজিগবর্মেণ্ট্ জানিয়েছেন যে, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাঁকে কাজ হতে অবসর গ্রহণ করতে হবে। তিনি সেখানে একটি চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই চিকিৎসালয়ে এক বৎসরের ভিতর অন্তত দু'হাজার রোগী চিকিৎসিত হয়েছে; এই চিকিৎসালয়টাকেও বন্ধ করবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। গবর্মেণ্টের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার নারীসঙ্ঘ (Australian Women's Organisation) তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটিই ডাঃ ষ্টেট্‌লিকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। ভারতীয় নারীদের শুভাশুভের দিকেও এঁদের বেশ নজর আছে। ফিজিষ্টেটের নারীরাও গবর্মেণ্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে গবর্ণরের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেছেন।

নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অস্বীকার

গত ২১শে নভেম্বর ফ্রান্সের সিনেট সভায় নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার বিল (Suffragist Bill) নামঞ্জুর করা হয়েছে। এর ফলে ফ্রান্সের নারীরা স্থির করেছেন, যে পর্য্যন্ত না তাঁদের ভোটের অধিকার মঞ্জুর করা হবে সে পর্য্যন্ত তাঁরা ট্যাক্স্ দিবেন না।

দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও নারীর রাষ্ট্রীয়-অধিকার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব নামঞ্জুর হয়ে গেছে।

—

রয়াল একাডেমির নারীসদস্য

নিউইয়র্কের সংবাদপত্রে প্রকাশ, মিসেস্ এ্যনি এল সইনার্‌টন লণ্ডনের রয়াল একাডেমি নামক চিত্রকর-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। গত একশত বৎসরের ভিতর আর কোনো মহিলা এ সম্মান লাভ করেন নি। রয়াল একাডেমিতে মিসেস্ সইনার্‌টনের বহু চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

—

ডাক্তারী শিক্ষায় আফ্‌গান রমণী

আফ্‌গানিস্থানের মেয়েরা সময়ের সঙ্গে পা ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছেন। কাবুলে নারীদিগকে ডাক্তারী বিদ্যায় পারদর্শিনী করে' তোল্‌বার জন্য একটি ডাক্তারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাচশত আফ্‌গান ছাত্রী এই চিকিৎসা বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানটিতে যোগদান করেছেন।

—

কামাল পাশার ঘোষণা

ব্রুসার শিক্ষকদের সভায় মুস্তাফা কামাল পাশা ঘোষণা করেছেন, "নারীদের এখন আর হারেমে বন্ধ করে' রাখ্‌বার সময় নেই। এখন তাদের মুক্তি দিতে হবে, অন্তঃপুর ছেড়ে এখন তাদের পুরুষদের সঙ্গে অধিকার সমানভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করে' নিতে হবে। প্রাচীন রীতি-নীতি মাত্রা ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এর পর এখনও যদি নারীরা নিজেদের ঘরের ভিতর বন্ধ করে' রাখে তবে তাতে সমাজের অকল্যাণই বেড়ে উঠ্‌বে। এই পর্দার অন্তরালে নিরালায় বাস ছেড়ে দুনিয়ার সকল রকমের কর্ম্মকেন্দ্রে তাদের এখন ঝাঁপিয়ে পড়া দর্‌কার। তাদের লেখক হ'তে হবে, বক্তা হ'তে হবে, শিক্ষক হ'তে হবে, পুরুষদের ন্যায় জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধনে সহায়তা কর্‌তে হবে।"

—

নিউজিল্যাণ্ডে নূতন বিল

নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে শ্রমিকদলের জনৈক প্রতিনিধি Motherhood Endowment Bill নামে এক বিল পেশ করেছেন। বিল্‌টির মর্ম্ম হচ্ছে এই—যে-সমস্ত শ্রমিক-পরিবারের জনসংখ্যা স্বামী স্ত্রী ও দুটি পুত্র মাত্র, তাদের জীবিকার জন্য তাদের নিজেদের উপার্জ্জনের উপরেই নির্ভর কর্‌তে হবে। কিন্তু পরিবারের জনসংখ্যা এই মাত্রাটা ছাড়িয়ে উঠ্‌লে পনেরো বৎসরের কম বয়স্ক প্রত্যেক বালকের জন্য গবর্মেণ্টকে সাহায্য কর্‌তে হবে সপ্তাহে ১০ শিলিং হিসাবে। যে-সমস্ত বালক বাপ-মার অধীনে থাকে না তাদের ভরণপোষণের ভারও গবর্মেণ্ট্‌কে বহন কর্‌তে হবে।

—

চীনের বালিকাবিদ্যালয়

চীনে কতগুলি বালিকাবিদ্যালয় আছে এবং কতজন ছাত্রী তাতে শিক্ষা লাভ কর্‌ছে নর্থ্ চায়না হেরাল্ড্ পত্রিকা তার একটা অঙ্ক কষে' দিয়েছেন। তাঁর হিসাব অনুসারে চীনে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে পনেরো হাজার এবং তাতে শিক্ষালাভ কর্‌ছে পাঁচ লক্ষ ছাত্রী।

—

বোম্বাই কর্পোরেশনে মহিলা সদস্য

বোম্বাই কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে এবার চার জন মহিলা কমিশনার পদের প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন—চার জনই নির্ব্বাচিত হয়েছেন। নির্ব্বাচিত মহিলাদের একজন ইউরোপীয়। ইনি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সাহায্য না পেয়েও নির্ব্বাচিত হয়েছেন। বাকী তিন জনের একজন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, এবং আর একজন শ্রীমতী গোপেল। এঁদের দু'জনেই অসহযোগী। চতুর্থ

জন যিনি নির্ব্বাচিত হয়েছেন তিনি কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতী।

—

আমেরিকান নারীর কর্ম্মক্ষেত্রে

আমেরিকার নারী-সমাজ সব রকমে পুরুষদের সমান হ'য়ে উঠ্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌ছেন—ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ওকালতি কোন কাজেই তাঁরা পেছ-পা হচ্ছেন না। আর এ-সব কাজে দক্ষতাও দেখাচ্ছেন তাঁরা চমৎকার। বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৭৩৮ জন রমণী আইন-ব্যবসায়ে, ১৭৮৭ জন ধর্ম্মপ্রচারে, ১৪৬১৭ জন শিল্পকার্য্যে, ৭২১৯ জন চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, ১৮২৯ জন দন্ত-চিকিৎসায় এবং ১১১৭ জন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইমারত তৈরীর কাজে নিযুক্ত আছেন। একজন নারী আমেরিকার এক রাষ্ট্রীয় সভার অধিনেত্রীত্বও লাভ করেছেন।

—

মহিলা বৃত্তি

আমেরিকার মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় মহিলাদের জন্য কয়েকটি বৃত্তি স্থাপন করেছেন। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। তবে এই বৃত্তির টাকায় ছাত্রীদের বিদেশের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হবে না। কাজেই যাঁরা বিদেশ-গমনেচ্ছু তাঁদের এমন ব্যবস্থা করে' যেতে হবে যে অন্য স্থান হ'তেও তাঁরা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পেতে পার্‌বেন। কলিকাতা ৮নং রসেল ষ্ট্রীটে আমেরিকান কলেজের মহিলা-সমিতির নিকট লিখ্‌লে সব সংবাদ পাওয়া যাবে।

—

ব্যবস্থাপক সভায় নারীদের অধিকার

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি রমণীদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে প্রস্তাব উঠানো হইয়াছিল। প্রস্তাবটি পাশ হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারে যুক্ত-প্রদেশের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে কোনো সম্প্রদায়ের সদস্যই প্রতিবাদ উত্থাপন করেন নাই। এমন কি মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যেরাও উহা সমর্থন করিয়াছেন। পণ্ডিত গুটু এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—"নারীদিগকে ভোটের অধিকার প্রদান করিলে তাহাতে তাহাদের আত্মসম্মান ও দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, জনসাধারণের হিতকর কাজে যোগদান করিবার জন্য তাহাদের মনের ভিতর একটা তাগিদ জাগিয়া উঠিবে। জাতির পক্ষে এটা কম লাভ বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নৈতিক আবহাওয়াটাও যে পবিত্রতর হইয়া উঠিবে তাহার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। নারীরা ভোটের অধিকার পাইলে গবর্মেণ্ট্ কতকগুলি বড় সমস্যার দিকেও অধিকতর নজর দিতে বাধ্য হইবেন। শিশু-স্বাস্থ্য এবং মদ্যপান প্রভৃতি সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।"

বোম্বাই মাদ্রাজ ইতিপূর্ব্বেই নারীসমাজকে এ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ভারতের বড় এবং উন্নতিশীল প্রদেশগুলির ভিতর এ সম্বন্ধে বাংলাই এক অপূর্ব্ব প্রহসনের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। তাহার ব্যবস্থাপক সভা নারীদিগকে কিছুতেই রাজনৈতিক আবহাওয়ার ভিতর মুক্তি দিতে রাজী নহে। সম্প্রতি বঙ্গীয় নারী-সমাজের এক ডেপুটেশন কবি শ্রীমতী কামিনী রায়ের নেতৃত্বে ভোটের অধিকার দাবী করিবার জন্য লর্ড লিটনের দরবারে গিয়া হাজির হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন বাংলাকে এমন কতকগুলি কথা শুনাইয়া দিয়াছেন যাহার জন্য তাহার লজ্জিত হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছেন—"কোন্ জাতি কতটা উন্নত, কোন্ জাতি বা দেশ কতটা সভ্য তাহা নিরূপণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সেই দেশের নারী-সমাজের অবস্থা। দেশের বা জাতির নারীগণ কিরূপ শিক্ষিত, তাহারা দেশের কোন্ কোন্ কার্য্যে কিরূপভাবে আত্মনিয়োগ করে, তাহা হইতেই তাহা বোঝা যায়। আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ভারতের যে প্রদেশটার সহিত আমার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সে প্রদেশটা বিশেষ উন্নত নহে, বিশেষ অগ্রগামী নহে। সে অনেকের পিছনেই পড়িয়া আছে ······ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে—জাতি গড়িয়া তোলা। নারী-সমাজকে বাদ দিয়া জাতি গড়িয়া তুলিতে পারা যায় না। আমরা প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু রমণীদিগকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে

কথা বলিবার অধিকার না দিলে, তাহাদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র দিলে সত্যকার প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।"

গভর্ণরের তিরস্কারে পারিষদ্‌দের লজ্জা ও চৈতন্য হইবে আশা করি।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ-আফ্রিকার ও ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভাতেও নারীর ভোটের অধিকার অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিদেশেও দেখিতেছি এতদিনে বাংলার জুড়ি মিলিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষে অবশ্য এ পথ গ্রহণ করা মোটেই আশ্চর্য্যজনক কিছু নহে। কারণ এদেশটি সভ্যতার কোন্ ধাপে রহিয়াছে; প্রবাসী ভারত-বাসীদের প্রতি সে দেশবাসীদের ব্যবহারই তাহার নমুনা।

ভারতীয় মহিলা ব্যারিষ্টার

বোম্বাইএর আরদেশর টাটার কন্যা শ্রীমতী এম্ এ টাটা সম্প্রতি ব্যারিষ্টারীর সনদ লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের ভিতর তিনিই প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার। কেবলমাত্র ব্যারিষ্টারীর দিক্ দিয়া নহে, ভারতীয় মহিলাদের ভিতর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এস্‌সি ডিগ্রীও সর্ব্বপ্রথমে ইনিই লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের পুরুষদেরই কর্ম্ম-ক্ষেত্র এত ছোট যে, তাহার জন্য জাতিকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে। ভারতীয় রমণীদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র অন্তঃপুর ছাড়া নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশের রক্ষণশীলতার আবহাওয়াও এমনি জমাট যে ঘরের বাহিরের কোন কাজে রমণীদিগকে হাত দিতে দেখিলে আমরা একেবারে আঁৎকাইয়া উঠি। এ অবস্থায় শ্রীমতী টাটা যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার বিষয় নহে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প

কেবল বিদ্যা-চর্চ্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনা অথবা ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা কোন জাতির সভ্যতা সপ্রমাণ হয় না। এই-সকল বিষয় সভ্যতার যেরূপ অঙ্গ, চারুশিল্পও সভ্যতার সেইরূপ অঙ্গ। কোন জাতি সভ্য বা অসভ্য তাহা স্থির করিতে হইলে, সেই দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্য্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত আবশ্যক। লেখাপড়ার চেষ্টায় মানসিক উন্নতিসাধন হয়, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্যবোধের কোন সাহায্য হয় না। মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে ততই তাহার মানসিক ও শারীরিক উন্নতি হইতে থাকে। সভ্যজাতির আদর্শ কেবল জ্ঞানে বা ধর্ম্মে নহে, সৌন্দর্য্যেও আছে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অর্থাৎ সেকালের বাঙ্গালীদের আচার ব্যবহার সমস্তই যে সভ্যতানুমোদিত ছিল, তাহা আমরা বলি না, তবে সেকালের বাঙ্গালীরা যে সভ্যতা-মার্গে তৎসাময়িক কোন জাতি অপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া ছিলেন তাহা আমরা মনে করি না।

যে সময় বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণের অতুলনীয় কাব্যরসে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ সিক্ত হইতেছিল, যখন রামপ্রসাদের ভক্তি প্রচারে বাঙ্গালীর প্রাণে বান ডাকিতেছিল, তখনকার বাঙ্গালীকে অসভ্য বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বিদ্যাবত্তায় বাঙ্গালী তখন ভারতে—কেবল ভারতে কেন, বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে—শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজ অধিকারের ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপ ভারত-বর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। প্রাচীন নবদ্বীপে যত অধিক সংখ্যক বিদ্বানের আবির্ভাব হইয়াছিল, পৃথিবীর কোন দেশে, কোন নগরে সেরূপ হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রগণ যেরূপ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়া দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন, অশিক্ষিত শিল্পীরাও সেইরূপ চারুশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধন দ্বারা বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঢাকার বস্ত্রশিল্পের পরিচয় সুদূর ইউরোপেও অজ্ঞাত ছিল না। ভাস্কর্য্য এবং গজদন্তের সূক্ষ্ম-শিল্পের জন্য বঙ্গদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চিত্রবিদ্যাতেও বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ ছিল না।

কিন্তু এসকলই ত পুরুষ-সমাজের কৃতিত্বের পরিচয়। বাঙ্গালার অন্তঃপুরেও তখন যেরূপ শিল্প-কলাবতীর সংখ্যা-বাহুল্য ছিল, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেই-সকল প্রাচীন নারীশিল্পীর নির্ম্মিত কারুকার্য্য এখন আর বিদ্যমান নাই, তাঁহারা যে-সকল শিল্পকার্য্য করিতেন তাহার অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী। তবে বংশাবলী-ক্রমে কোন কোন শিল্প এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে বলিয়াই আমরা সেকালের নারীশিল্পীদিগের দক্ষতার বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারি।

বঙ্গের মহিলা-শিল্পীদিগের শিল্প প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম গৃহসজ্জা, দ্বিতীয় আহার্য্য। বঙ্গ-নারীর গৃহসজ্জা সম্বন্ধে কারুকার্য্যের পরিচয় এখনও অনেক স্থলে বিদ্যমান আছে। যদি বঙ্গের সকল জেলার শিক্ষিত ব্যক্তিরা এবিষয়ে মনোযোগী হয়েন, তবে লুপ্তপ্রায় শিল্পের বিষয় সকলেই জানিতে পারেন এবং পুনরায় উহার উন্নতিও হইতে পারে। আমরা আশা করি "প্রবাসীর" পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ নারীশিল্পের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইবেন।

উত্তর-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থানে গৃহস্থ মহিলারা এখনও এমন সুন্দর কাঁথা নির্ম্মাণ করিতে পারেন যে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই শিল্প পশ্চিম-বঙ্গে নাই বলিলেই হয়। উত্তর-বঙ্গের মালদহের কোন কুলললনার নির্ম্মিত একখানি কাঁথা একবার আমাদের নয়নগোচর হইয়াছিল। সেই কাঁথা দেখিয়া আমাদের প্রথমে বহুমূল্য শাল বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। শুনিলাম, যে রমণী সেই কাঁথা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা ও মাতামহী তাহা অপেক্ষাও সুন্দর কাঁথা প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

এই কাঁথা-শিল্প বাঙ্গালী রমণীর শিল্পকলার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। কাঁথাতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের চিত্র, প্রভৃতি এমন সুন্দররূপে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সূত্র দ্বারা সেলাই করা হইত যে সহসা দেখিলে উহা তুলি দ্বারা অঙ্কিত একখানি সুবৃহৎ চিত্র বলিয়া ভ্রম হইত। কাঁথাতে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা, রামসীতা, রাসমণ্ডল, কালীয়-দমন, চৈতন্য-দেবের নগরসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি এরূপ দক্ষতা-সহকারে বিবিধবর্ণের সূত্র দ্বারা চিত্রিত হইত যে তাহা দেখিলে দর্শককে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হইত। যাঁহারা ঐ-প্রকার কাঁথা প্রস্তুত করিতেন, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবোধ যে কিরূপ প্রবল ছিল, বর্ণবিন্যাসে তাঁহাদের যে কতদূর দক্ষতা ছিল, তাহা চিন্তা করিলে গর্ব্বে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। অথচ যে সকল রমণী ঐসকল কন্থা প্রস্তুত করিতেন, তাঁহারা নিরক্ষর ছিলেন, কেহই কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই।

সেকালের বঙ্গরমণীদিগের আলিপনা আর-একপ্রকার শিল্পের উদাহরণ ছিল। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ এবং কোন ব্রত উপলক্ষে আলিপনা-দেওয়া পীঠ বা পিঁড়ার ব্যবহার আছে, ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ভিজা চাউল বাটিয়া তাহা জলে গুলিয়া দুগ্ধের মত তরল করিয়া তদ্দ্বারা পিঁড়ার উপরে আলিপনা দেওয়া হয়। আলিপনা দিবার জন্য সাধারণতঃ কোন রমণীই তুলিকা ব্যবহার করেন না। ছোট একখানি ন্যাকড়া পিটুলি-গোলাতে ভিজাইয়া তাহা দক্ষিণ-হস্তের তালুতে স্থাপন করিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে কাষ্ঠ-ফলকের উপরে আলিপনা দেওয়া হয়। সিক্ত বস্ত্রখণ্ড হইতে "গোলা" তর্জ্জনীতে গড়াইয়া আসে, শিল্পী সেই তর্জ্জনীকে তুলিকারূপে পিঁড়ার উপরে বুলাইয়া চিত্র অঙ্কন করেন। আলিপনায় যাঁহারা বিশেষ সূক্ষ্মকার্য্য দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একটা কাটিতে একটু তুলা বা ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তুলিকা প্রস্তুত করিয়া লয়েন। তর্জ্জনীর সাহায্যে বা এই সামান্য স্থূল তুলিকার সাহায্যে কোন কোন রমণী এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন যে তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। উচ্চ অঙ্গের আলিপনার জন্য অনেকে নানা প্রকার রঙিন "গোলা" ব্যবহার করেন। ঐ-সকল রঙীন গোলাও তাঁহারা হরিদ্রা, শিমপাতার রস, আলতা প্রভৃতির সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লয়েন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরে একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনীতে কোন বঙ্গমহিলা পিঁড়ার উপর আলিপনা দিয়া একটি নোট অঙ্কিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেটি এতই সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল যে দর্শকগণ দূর হইতে দেখিয়া কিছুতেই

মনে করিতে পারেন নাই যে উহা কাষ্ঠফলকে চিত্রিত; সকলেই উহাকে একখানা দশ টাকার নোট মনে করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যিনি ঐ নোট আলিপনা দিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি একজন অশিক্ষিতা গ্রাম্য-কুলবধূ। চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে তিনি কখনও কাহারও নিকটে শিক্ষালাভ করেন নাই।

বঙ্গমহিলার চিত্র-শিল্পের আর-এক সুন্দর উদাহরণ ছিল "পঞ্চগুঁড়ির আসন"। তণ্ডুল-চূর্ণকে বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সেই রঙীন চাউলের গুঁড়া দ্বারা এক-একজন রমণী আসনের অনুকরণে এমন সুন্দর আসন রচনা করেন যে তাহা দেখিলে কেহই সহসা উহাকে কৃত্রিম আসন বলিয়া বুঝিতে পারেন না। নূতন জামাতা বা বৈবাহিককে ঠকাইয়া আমোদ উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে কুল-রমণীরা ঐরূপ আসন রচনা করিয়া তাহার সম্মুখে ভোজ্যপাত্র স্থাপন করিতেন। যাঁহার উদ্দেশে ঐ আসন রচিত হইত, তিনি সেই আসনকে প্রকৃত আসন জ্ঞান করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া যাইত, তাহা দেখিয়া মহিলাকুল আনন্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেন। এখনও মফঃস্বলের অনেক স্থানে এই-প্রকার পঞ্চগুঁড়ির আসন দ্বারা জামাতা বা বৈবাহিককে ঠকাইবার প্রথা বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চগুঁড়ির আসন নির্ম্মাণে কোন কোন রমণী অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার আসন গৃহসজ্জা না হইলেও ইহার রচনায় বঙ্গনারীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও শিল্পকার্য্যে দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এখনও পল্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থের বাটীতে কড়ির আল্‌না, কড়ির দোল্‌না, কড়ির শিকা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ব্রত এবং পূজাদিতে কড়ির পেথে বা চুবড়ি আবশ্যক হয়। এই-সকল দ্রব্যও বাঙ্গালায় গৃহস্থরমণীরাই প্রস্তুত করেন। যাঁহারা এই-সকল গৃহসজ্জার নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেই হইবে। আজকাল আমরা পাশ্চাত্যভাবে আচ্ছন্ন হইয়া এই-সকল খাঁটি বাঙালীর গৃহসজ্জার প্রতি উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য গৃহসজ্জার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া কড়ির আল্‌না বা কড়ির দোল্‌না নগর অঞ্চলে আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে যদি আমরা নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিয়া দেখি তাহা হইলে এই-সকল খাঁটি স্বদেশী গৃহসজ্জাকে আমরা কখনই উপেক্ষা করিতে পারি না। এই-সকল দ্রব্য এখনও কোন কোন স্থানে এরূপ সুন্দররূপে নির্ম্মিত হয় যে তাহা ধনবানের সুসজ্জিত কক্ষে ব্যবহৃত হইলে সেই কক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় বই কমে না। কিন্তু আমরা বিদেশী ভাবে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছি যে সৌন্দর্য্যবিচার করিতে হইলেও আমরা পাশ্চাত্য দৃষ্টির দ্বারা সৌন্দর্য্য বিচার করি।

সকল-প্রকার মঙ্গল-কার্য্যে "স্বস্তিক" বা "শ্রী" নির্ম্মাণ করিবার প্রথা এখনও বঙ্গের হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। এই "শ্রী"কে অশিক্ষিত রমণীরা সাধারণতঃ "ছিরি" বলিয়া থাকেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ এবং পূজাপদ্ধতিতে "ছিরি" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই "শ্রী" বা "ছিরি" নির্ম্মাণে বঙ্গরমণীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "শ্রী" নির্ম্মাণ করিতে হইলে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয় না। খানিকটা পিটুলি বা পিষ্ট তণ্ডুল এবং কয়েক প্রকার রং হইলেই "শ্রী" প্রস্তুত করিতে পারা যায়। লুচি বা রুটি প্রস্তুত করিবার জন্য যেরূপভাবে ময়দা মাখিতে হয়, তণ্ডুলচূর্ণকে সেইরূপভাবে মাখিয়া একখানা পিত্তলের থালার উপরে পিরামিডের আকারে অর্থাৎ তলদেশ স্থূল ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া স্থাপন করিতে হয়। ইহার তল-দেশের ব্যাস ৫।৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৭।৮ ইঞ্চি হইয়া থাকে। এই পিরামিডের গাত্রে নানা-বর্ণে-রঞ্জিত পিটুলির সূতা বিশেষ কৌশল সহকারে লাগাইয়া দিতে হয়। পিটুলিকে রঞ্জিত করিবার জন্য শিমপাতার রস, হলুদের গুঁড়া, মেটে সিন্দুর, কয়লাচূর্ণ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। মুসলমান বা হিন্দুস্থানী রমণীরা ময়দা দ্বারা যেরূপ "সিমাই" প্রস্তুত করেন, রঞ্জিত পিটুলি দ্বারা সেইরূপ সূতা প্রস্তুত করিতে হয়। এই "শ্রী" এক একটি এত সুন্দর যে উহা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। "শ্রী" নির্ম্মাণে এক-একজন রমণী অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। আমরা প্রাচীনাগণের মুখে শুনিয়াছি যে, সেকালে এক-একজন গৃহিণী এমন সুন্দর

"শ্রী" নির্ম্মাণ করিতেন যে তাঁহাদের খ্যাতি পাঁচ-সাত-খানা গ্রামে প্রচারিত হইত।

নূতন জামাতা বা বৈবাহিককে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া যেমন "পঞ্চ গুঁড়ির আসন" দিয়া ঠকাইবার চেষ্টা হইত, সেইরূপ কৃত্রিম খাদ্য দ্রব্য দ্বারাও তাঁহাদিগকে ঠকাইবার চেষ্টা করা হইত। ঐ-সকল কৃত্রিম খাদ্য নির্ম্মাণে বঙ্গ রমণীর বিশেষ দক্ষতা ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কোন সম্ভ্রান্ত পুরমহিলার দ্বারা প্রস্তুত সোলার মুড়ি দেখিয়াছি, সেই মুড়ি দেখিতে এত স্বাভাবিক যে হাতে করিয়াও তাহা কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ছোট ছোট সোলার টুক্‌রাকে এমনি কৌশল সহকারে কাটা হয়। এই সোলার মুড়ি নির্ম্মাণে সাধারণতঃ তীক্ষ্ণধার বঁটি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রই ব্যবহৃত হয় না।

কোন মহিলা অর্দ্ধপক্ক পেঁপে দ্বারা এমন সুন্দর চাঁপা ফুল নির্ম্মাণ করেন যে তাহা দেখিলে সহসা প্রকৃত চাঁপা ফুল বলিয়া মনে হয়। অর্দ্ধপক্ক পেঁপের ভিতরের বর্ণ ঠিক চাঁপা-ফুলের বর্ণের ন্যায়, ইহা বোধহয় সকলে দেখিয়াছেন। এইরূপ পেঁপের খানিকটা শস্য লইয়া তাহাকে ঠিক অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত চাঁপা-ফুলের আকারে কাটিয়া তাহার তলদেশে একটি পানের বোঁটার কিয়দংশ কাঁটা দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত চাঁপা-ফুলের উপরের দুই চারিটা পাপড়ি যেমন ঈষৎ বিভিন্ন হইয়া থাকে কৃত্রিম চাঁপা-ফুলের উপরের দুই চারিটা পাপড়ি সেইরূপ প্রস্তুত করা হয়। পানের বোঁটা লাগাইবার জন্য সাধারণতঃ বাব্‌লা-কাঁটা অথবা আল্‌পিন ব্যবহার করা হয়। ঐরূপ ২।৪ টা কৃত্রিম পুষ্প যদি একটা পুষ্পাধারে কতকগুলি প্রকৃত চাঁপাফুলের সঙ্গে রাখা হয়, তাহা হইলে, কোনটা কৃত্রিম কাহার সাধ্য সহজে বলিতে পারে। এই কৃত্রিম চাঁপাফুল নির্ম্মাণেও বঁটি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হয় না।

কোন কোন স্থলে গৃহস্থ রমণীরা থোড় অতি সুন্দররূপে কাটিয়া মাছের মুড়া তৈয়ারী করিয়া নব জামাতা প্রভৃতিকে ঠকাইয়া থাকেন। ঐ কৃত্রিম মাছের মুড়ার উপরে মশ্‌লা মাখাইয়া অন্য পাঁচটা ব্যঞ্জনের সহিত অন্নপাত্রের উপরে রাখিলে উহাকে সত্য সত্যই মাছের মুড়া বলিয়া ভ্রম হয়। কলাগাছের গোড়ার এঁটে কাটিয়া ডাব, ডেঙ্গোর ডাঁটার গোড়া কাটিয়া কেশুর, পানিফল, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও অনেকে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। আমরা মাত্র দুই এক প্রকার কৃত্রিম খাদ্যের উল্লেখ করিলাম, এইরূপ কৃত্রিম খাদ্য বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই পূর্ব্বে বহুল প্রচলিত ছিল এবং এখনও অনেক স্থলে আছে।

শাস্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার অন্তর্গত তণ্ডুল-কুসুমাবলি বিকার অর্থাৎ পিটুলির ফুল, মাল্যগ্রন্থন, কেশরচনা, প্রভৃতি শিল্পকর্ম্মে দক্ষতাও অনেকের বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

এইবার আমরা বঙ্গমহিলার রন্ধনশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা রন্ধন-বিদ্যাকে শিল্প বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, আমাদের শাস্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার ভিতরে রন্ধন একটি কলা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবাহে আমাদের যে-সকল চিরন্তন গৌরবকর ব্যাপার ভাসিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে, রন্ধন-বিদ্যা তাহার অন্যতম। সেকালে হিন্দু পুরস্ত্রীরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ মহিলারা, রন্ধনবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আজকাল প্রায় সকলেই বিলাসে আত্মহারা হইয়া রন্ধনশালার ভার হয় হিন্দুস্থানী "মহারাজ" না হয়ত বাঁকুড়া মেদিনীপুর বা উড়িষ্যার "ঠাকুরের" হস্তে সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। "মহারাজ" বা "ঠাকুর" অনুগ্রহ করিয়া ছাইভস্ম যাহা রাঁধিয়া দেয় আমরা বাধ্য হইয়া তৃপ্তি বা অতৃপ্তি সহকারে তাহাই কোনরূপে গলাধঃকরণ করি। নগর অঞ্চলের এই ভাব মফঃস্বলেও শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু সেকালে এরূপ ছিল না। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে গৃহিণী স্বয়ং রন্ধনশালায় ভারগ্রহন করিতেন এবং কন্যা ও পুত্রবধূ-দিগকে রন্ধনবিদ্যা রীতিমত শিক্ষা দিতেন। মাতা মাতামহী বা শাশুড়ী প্রভৃতির নিকট হইতে কিশোরী ও যুবতীরা সযত্নে রন্ধন শিক্ষা করিতেন। তাঁহারা যদি রন্ধনে প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন তবে আর তাঁহাদের আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না।

সেকালে ভোজের সময় বাজারের পেশাদার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত পাচকে রন্ধন করিলে কেহ সে বাটীতে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাটীতে, বাটীর

সেকালে ভোজের সময় বাজারের পেশাদার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত পাচকে রন্ধন করিলে কেহ সে বাটীতে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাটীতে, বাটীর এবং প্রতিবেশিনী রমণীরাই রন্ধন করিতেন। যখন ভোক্তারা ভোজন করিতেন তখন গৃহস্বামী তথায় উপস্থিত থাকিয়া, ভোক্তৃমণ্ডলীকে ব্যঞ্জনের দোষ-গুণ সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিতেন। কোন ব্যঞ্জন ভাল হইয়াছে শুনিলে অন্তঃপুরে সংবাদ দিতেন, এবং যিনি সেই ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেন। এই-রূপে রন্ধনকারিণী রমণীরা উৎসাহ পাইয়া রন্ধনকার্য্যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ফলে একএক-জন স্ত্রীলোকের রন্ধনকৌশল বিখ্যাত হইয়া উঠিত। কোন কোন গৃহস্থের বাটী এক একটা বিশিষ্ট রন্ধনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

কিন্তু এখন প্রত্যহ বেতনভোগী "ঠাকুর" রন্ধনের ভার প্রাপ্ত হওয়াতে বাঙ্গালীর রন্ধনশিল্পের এই বৈচিত্র্য নষ্টপ্রায় হইয়াছে। রন্ধনে ব্যঞ্জনের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বই কমে নাই, কিন্তু তাহাতে রন্ধনশালার কিছুমাত্র উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না, বরং সমধিক অবনতিই দেখিতে পাওয়া যায়। আজ আমার বাটীতে ভোজে যে "ঠাকুর" মাছের কালিয়া রন্ধন করিল, কাল তোমার বাটীর ভোজেও সেই 'ঠাকুর"ই মাছের কালিয়া রন্ধনে নিযুক্ত; সুতরাং আজকাল সকল বাটীতেই একই-প্রকার রন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থের আর্থিক সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে ব্যঞ্জনের সংখ্যার বাহুল্য বা হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল ব্যঞ্জনে রন্ধন-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বেতনভোগী পাচকের হস্তে রন্ধনের ভার সমর্পিত হওয়াতে আমাদের মুখরোচক অনেকপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। সেকালে নানা-প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া বঙ্গরমণীরা স্বামী পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়ের রসনার তৃপ্তি-সাধন করিতেন। এখন সেই পিষ্টকের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। আমাদের পরিচিতা কোন প্রাচীনা ব্রাহ্মণ-মহিলা এমন সুন্দর "চকচাকলি" নামক পিষ্টক প্রস্তুত করিতেন যে সেই পিষ্টককে সহসা একখণ্ড কাগজ বলিয়া ভ্রম হইত। সেরূপ মসৃণ শ্বেতবর্ণ ও সুন্দর পিষ্টক আজকাল আর কাহাকেও প্রস্তুত করিতে দেখি না। এখনও প্রতিবৎসর পৌষ মাসের সংক্রান্তির সময় প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুর বাটীতে প্রচুর পরিমাণে পিষ্টক প্রস্তুত হয়। কিন্তু পিষ্টকের প্রকার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। যদি এইরূপভাবে পিষ্টকের প্রকার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, তবে বোধ হয় যে আর ৩০।৩৫ বৎসর পরে বাঙ্গালার পিষ্টক গল্পে পরিণত হইবে এবং সাহেবের হোটেল হইতে কেক্ কিনিয়া আনিয়া পৌষ-পার্ব্বণ সম্পন্ন করা হইবে।

আজকাল চপ্ কাটলেট ক্রুকেট কোর্ম্মা প্রভৃতি নানা-প্রকার বিদেশীয় খাদ্য নগর অঞ্চলে হিন্দু ধনবানের বাটীতে ভোজে স্থান পাইয়াছে এবং নগর অঞ্চল হইতে ধীরে ধীরে ঐসকল বিদেশীয় খাদ্য মফস্বলে বিস্তার লাভ করিতেছে। ঐ-সকল খাদ্য মৎস্য বা মাংস দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইদানীং কেহ কেহ আলুর চপ মোচার কাট্‌লেট প্রভৃতি রন্ধন করাইয়া নিরামিষ-মতে বিদেশীয় খাদ্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের যাহা খাঁটি দেশীয় খাদ্য সেই ডাল্‌না ঝোল ঘণ্ট শুক্ত এবং পায়স পিষ্টক প্রভৃতি ক্রমশঃ বিনাশপথে অগ্রসর হইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে যেমন বাঙ্গালীর অন্তঃপুরচারিণীরা রেশম-পশমের ফুলতোলা প্রভৃতিকেই একমাত্র নারীশিল্প বলিয়া মনে করিতেছেন, সেইরূপ রন্ধন-শিল্পেরও পরিবর্ত্তন স্বয়ং স্বহস্তে না করিয়া বেতনভোগী পাচকের দ্বারা করাইতেছেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রাচীন সভ্যসমাজ মাত্রেরই এক একটা বিশিষ্টতা আছে। সেইসকল বিশিষ্টতা তাহাদের আচার ব্যবহার গৃহসজ্জা সঙ্গীত চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যে প্রকটিত হইয়া উঠে।

জাপান চীন মিশর পারস্য ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশেই আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ ভাষা সাহিত্য এবং শিল্পকার্য্যে এই বিশিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায়। কাল সহ-কারে এই-সকল বিশেষ লক্ষণের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সংস্কার ও সংহার এক কথা নহে। আমরা বাঙ্গালী। আমাদের বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখিয়া বাঙ্গালীর পরিচায়ক লক্ষণসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কার আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালার অন্তঃপুরশিল্পের যে অবনতি ঘটিতেছে তাহা আমরা শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি না।

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সিঁদেল-চোরের আত্মকথা

(সত্যঘটনামূলক কাহিনী)

সিঁদেল-চোরের কথা শুনতে তোমাদের ভাল লাগবে না জানি—তবুও আমায় বল্‌তে হবে। রাজা-মহারাজা, নবাব-বেগমের কাহিনী, বড় জোর ভদ্দর-লোকদের কথা তোমাদের কেতাবে পড়তে পাও ; কিন্তু একটা সিঁদ-কাটার কথা কি তোমাদের শুনতে ইচ্ছে হবে? সাহিত্যিকের মুখ দিয়ে কল্পনার রঙে রঙিয়ে বলা নয়—এ একেবারে নিছক আমার নিজের বলা। তোমরা খুসি না হ'তে পারো—কিন্তু আজ গল্প নয়—একটা সত্যিকার জীবনকথা শোনো।

আমার বয়স ৩১ বচ্ছর—এই বয়সে দশবার জেল খেটেছি। ৩১ বছরের ২৪ বচ্ছর আমার জেলখানায় আনাগোনা করেই কেটে গেছে। ৭ বছর বয়স থেকেই আমার মাথা খোলে। দিদিমা যখন আমায় আমাদের মুদির দোকানে বসিয়ে রেখে খেতে যেতো, সেই ফাঁকে আমি পয়সা-টয়সা সরিয়ে রাখ্‌তাম। সে জন্য বাপমা আমায় Reformatory ইস্কুলে দেন। সেখানে থেকে হাত-পাকা হ'য়ে কিছুকাল পরে ফিরে আসি।

আমার একটা বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মেয়েটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। আমার কিছু টাকা পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। আমার ভগ্নীপতির মা'র কিন্তু সইল না। তিনি বল্‌লেন—আমার লেখাপড়া-জানা ছেলের বিয়েতে এক পয়সা পেলাম না, আর ও-বেটা মূর্খ হয়ে পয়সা পাবে। তারই ভাংচিতে বিয়েটা ভেঙে গেল। তখন আমার বয়স ১৭ বচ্ছর।

সংসারে এই আঘাত পেয়ে আমি বিপথ অবলম্বন করি। এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সংস্রবে পড়ে' ভাল করে' চুরি আরম্ভ করি। শেষে ঐ স্ত্রীলোকটাই আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। আমিও প্রতিহিংসার বশে ওকে চোরাই মাল রাখার অপরাধে জড়িয়ে দিই। তাতে তার জেল হয়, আমিও শান্তি পাই।

সকলের ব্যবহারে আমার হৃদয় যেন দিন দিন পাষাণ হয়ে উঠ্‌ল। একদিন চুরি করতে গিয়ে দেখি ঘরে একটি যুবতী মেয়ে শুয়ে আছে। আমি ভাব্‌লাম এই যুবতীরাই সংসারের সকল দুঃখের কারণ। মেয়েটি হঠাৎ জেগে উঠে আমায় দেখ্‌তে পেয়ে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে "বাবা" বলে' ডেকে আমার কাছে হাত জোড় করে' পায়ে পড়্‌ল। আমি তাকে "মা" বল্‌লাম, কিন্তু পাছে সে চীৎকার করে' ধরিয়ে দেয় এজন্য তার জিবটা কেটে দিলাম।

এক-একদিন খাওয়ার অভাবে বড়ই কষ্ট পেতাম। একদিন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, আর ক্ষিদে সইতে পারিনে। এদিকে রাস্তায় লোকের ভিড়ও কমে না। নিকটের এক বিচালির গুদোমে আগুন লাগিয়ে দিলাম ; লোক জন সব ছুটে গিয়ে সেখানে জম্‌ল। আমিও সেই ফাঁকে টাকা কড়ি চুরি করে আন্‌লাম। আর-একবার চুড়িদার পাঞ্জাবী প্রভৃতি পরে' নবাবের ছেলে সেজে এক শূন্য নবাব-বাড়ী থেকে গাড়ী গাড়ী মালপত্র ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাই। তোমরা জান না কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে এখন এত বিজলি-বাতি কেন হয়েছে। এক দিন না খেতে পেয়ে আমি মায়ের মন্দিরে গিয়ে কেঁদে পড়ি। মা আমায় খেতে দিলেন না, পুরুৎপাণ্ডারা আমায় মেরে তাড়িয়ে দিল। রাত্রে সিঁদ কেটে মায়ের মন্দিরে ঢুকে গয়নাপত্র নিয়ে পালাই। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে ভয়ে এক পাইখানার তলায় গিয়ে ঢুকি। ঢুকে দেখি একটা গোখ্‌রো সাপ ফণা তুলেছে। আমি সাপটার দিকে চেয়ে রইলাম। সেটা খানিক পরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। মা আমায় নিতে সাহস করলেন না, চোরকে ঠাকুর-দেবতাও ভয় করে।

আমাদের বাড়ীতে মেয়েরা চুরির পয়সা ছুঁতো না। আমি চোর বলে কেউ আমায় দেখ্‌তে পারত না।

চোরদের উপর আমারও ভয়ানক রাগ। জেলে গেলে কোনও বেটা খোঁজ নেয় না, কিন্তু বাইরে থাক্‌তে দাদা বলে' কত ভালবাসা দেখিয়ে চুরি করায় আর সেই টাকায় স্ফূর্ত্তি করে। কত টাকাই যে নষ্ট করেছি। একবার অগ্নিকাণ্ডের সময় আগুনের মধ্যে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে' একটা ছেলেকে বাঁচাই। সেই ছেলেটার পিছনে কত টাকাই খরচ করেছিলাম, কিন্তু ছেলেটা এমন পোড়া পুড়েছিল যে বেচারা আর সেরে উঠ্‌ল না। আর একবার মনে আছে গঙ্গার ঘাটে একটি মেয়ে ডুবে যায়; মা মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেও ডুবে মরে; আমি তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে' তাদের তুল্‌তে চেষ্টা করি। মেয়েটি বাঁচ্‌ল, কিন্তু মাকে আর বাঁচাতে পার্‌লাম না। সেই মেয়েটিকে কত কষ্টে মানুষ কর্‌ছিলাম; বসন্ত রোগে তার মৃত্যু হয়। তার জন্য আজও আমার চোখে জল আসে।

বাইরে এসে কারও আশ্রয় পেলে আমি কোনও দিন নিমকহারামি করি নি। কিন্তু পুলিশের লোক গিয়ে কাজ ছুটিয়ে দিত—দাগী বলে' কেউ আমায় বাড়ীতে রাখ্‌তে সাহস পেতো না। তাই বাধ্য হ'য়ে জেলে আস্‌তে হ'ত—আর জেলেই যদি আস্‌তে হয় তো এক হাত মেরে আসাই ভাল—এই ভেবেই আমি চুরি কর্‌তাম। থানার লোকে আমায় কত তোয়াজ কর্‌ত—খাবার দিত, মদ দিত, যদি কোনও চুরির সন্ধান পায়। আমি সে ছেলেই ছিলাম না। সময় সময় মেরে হাড় গুঁড়ো করে' দিত—কিন্তু আমি কারও নাম কখ্‌খনো বলি নি।

আমি জান্‌তাম না এমন কাজ নেই—তবুও আমার সৎপথে থেকে চল্‌বার উপায় ছিল না। ময়রার কাজ, ছুতোরের কাজ, ধোপার কাজ, গাড়ী হাঁকানো, দরোয়ানী করা, রান্না করা—সকল কাজে আমি ওস্তাদ। পেশোয়ারে Labour Corpsএ নায়েকের কাজও কিছুদিন করেছিলাম। যুদ্ধের সময় বোগ্‌দাদে যাবো ঠিক হয়েছিল—কিন্তু জামা-জুতোর খরচ বাঁচাতে গিয়ে এক সাহেবের দোকানে চুরি করে' আমি শেষবার জেলে যাই।

জেলে থাক্‌তে একবার কয়েদীরা আমায় রাগিয়ে দেয়, বলে—তুই পালাতে পারিস? আমি সেই দিনই জেলখানা থেকে বে-মালুম চম্পট দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আমার ক্ষমতা। তার পর আবার কয়েকদিন পরে নিজেই এসে ধরা দিলাম—এতে কেবল আমার তিনমাস জেল বেড়ে গেল। তাতে আর কি? সাগরে যে শয়ান, শিশিরে আর তার কি হবে? "কয়েদী পালালে বাঘ, আর মর্‌লে ভাগ"—পালালেই পাগলা-ঘণ্টি বাজে, কত সেপাই ছুটোছুটি করে, বন্দুক আওয়াজ হয়;—কিন্তু যখন মরে, তিনদিন ধরে' পচ্‌লেও ফেল্‌বার বন্দোবস্ত হয় না।

গান্ধী মহারাজের চেলারা জেলে এসে জেলখানার চেহারা বদ্‌লে দিয়েছিল। আমাদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে যত ভাল ভাল নামী নামী কয়েদী সকলেই বলেছিল, "ছেলেবেলা হ'তে জেল খাট্‌ছি, এমন তর্‌কারী খাই নি।" আমার এক পোষা বিড়াল ছিল; সে নর্দ্দমা দিয়ে আমার কাছে জেলের ভিতর আসা যাওয়া কর্‌ত; সেই আমার চোরাই কার্‌বারের বাহন ছিল, সে আমার খবর বাইরে নিয়ে যেত, আর বাইরে থেকে এনে আমাকে রসদ জোগাত। এখন জেলের সে সুখ গিয়েছে, প্রথম যখন জেলে আস্‌তাম কয়েদীরা চুরি করে পয়সায় তিন সের দুধ বেচ্‌তো, এক পয়সায় আধসের কই-মাছ-ভাজা জেলের হাঁসপাতালে পাওয়া যেত—এই সব সুবিধে হওয়ায় চোরের দল বেড়ে গেছে, এখন তো জেলের ভিতর চোরাই মাল অগ্নিমূল্য! আগে জেলের ভিতর চুরি করে' দৈনিক ৫০।৬০৲ টাকার আফিম, মদ, গাঁজা, কোকেন বিক্রি হ'ত—আর আজকাল সব বন্ধ! সেপাইরা এখন টাকায় আট আনা কেটে নেয়—আগে নিত চার আনা। এখন জেলের ভিতর চোরাই কার্‌বারে আর বেশী লাভ নেই। রুশদেশে চোরেরা কেন ধর্ম্মঘট করেছিল এখন বুঝ্‌তে পারি। আমিও তাই সঙ্কল্প করেছি—আর চুরি কর্‌ব না, জেলে গিয়ে সে সুখ আর নেই—স্বরাজ হ'লে আশা করি দুটো খেতে-পর্‌তে পাব।

শ্রী হেমন্তকুমার সরকার

আফ্‌গানিস্থান

আফ্‌গানিস্থানের পরিমাণ-ফল ২ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গমাইল; অর্থাৎ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ। বৈদেশিক জাতিদিগের সংস্পর্শ ও আক্রমণ হইতে নৈসর্গিক পর্ব্বতপ্রাকারে সুরক্ষিত হওয়ার হিসাবে তিব্বতের পরেই আফ্‌গানিস্থানের ন্যায় বৃহৎ দেশ পৃথিবীতে আর নাই। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আফ্‌গান-চরিত্র ও তিব্বতের লামাচরিত্রে কতকটা বৈষম্য দৃষ্ট হয়; আফ্‌গান জাতি স্বভাবতঃ রাজনীতিপ্রবণ ও যুদ্ধপ্রিয়, পক্ষান্তরে লামাগণ স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় ও তপশ্চর্য্যাশীল।

সমুদ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং বিশাল মরুময় প্রান্তর ও উচ্চ পর্ব্বতপ্রাচীরে বেষ্টিত হওয়ায় আফ্‌গান-রাজ্য স্বভাবতঃ দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু স্বাধীনতা ও বাণিজ্যের ক্ষতির আশঙ্কায় রাজবিধান অনুসারে সকল শ্বেতজাতি ও খৃষ্টানদিগের আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশলাভ আদৌ সহজ নহে।

বৃটিশ সৈন্য "পৃথিবীর ছাদ" পামীরের অদূরবর্ত্তী এই পাহাড়-পর্ব্বত-সঙ্কুল রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ভারত হইতে বহুবার অভিযান করিয়াছে, এবং আফ্‌গানদিগের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া সম্পূর্ণ পরাজিত, বিধ্বস্ত ও নিহত হইয়াছে। জার সম্রাটের গৌরবোজ্জ্বল যুগে রুশিয়াও এক সময় দুর্দ্ধর্ষ কসাক্ সৈন্য লইয়া তুর্কি-স্থানের বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উত্তর দিক্ হইতে সুচতুর আফ্‌গানজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিল।

আফ্‌গান রাজ্যে কোন রেল কিংবা টেলিগ্রাফ বিভাগ নাই; অন্য রাজ্য হইতেও কোন রেল ও টেলিগ্রাফ্ লাইন প্রবেশাধিকার পায় নাই। সুতরাং ইহার এক কোটি অধিবাসী কদাচিৎ অন্য জাতির সহিত সভ্যতা ও ভাবের আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয়।

আফ্‌গান-আমীরের ন্যায় অধুনা জগতের আর কোন নরপতি তেমন অপ্রতিহত-প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন না এবং তাঁহার ন্যায় আর কেহ প্রকৃতিপুঞ্জের দৈনন্দিন জীবনের সহিত অমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশেন না। আমীর স্বয়ং পররাষ্ট্র ও ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপার পরিচালনা করিয়া থাকেন; এমন কি তিনি রাজ্যের অধিকাংশ কৃষি

কাবুলের আমীর আমানুল্লা খাঁ

ও শিল্পবাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তিনি "আমানে আফ্‌গান" নামক একটি পত্রিকার মালিক; তিনি নিজে তাহা পরীক্ষা করেন। বর্ত্তমান আমীর
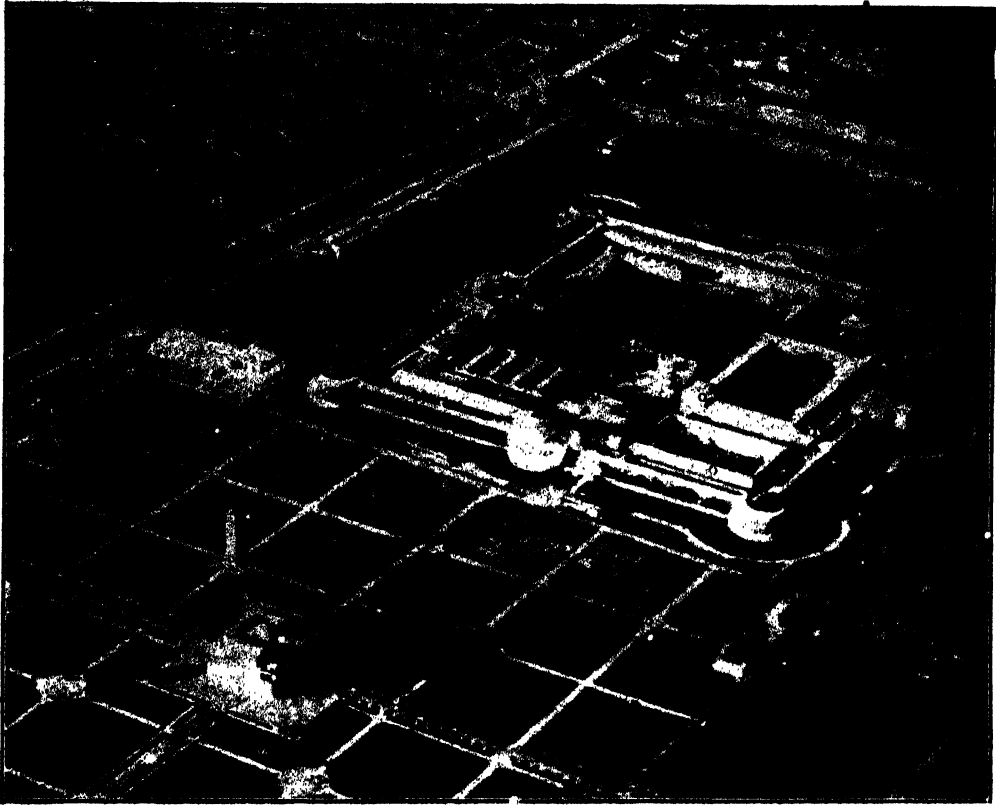
আফ্‌গান আমীরের কাবুল রাজপ্রাসাদের নক্সা
(আকাশ হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ)

আমানুল্লা খান্ তদীয় পররাষ্ট্রসচিব ও রাজদূতদিগের সাহায্যে সর্ব্বদা জগতের নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্ত্তন ও ঘটনাপ্রবাহের সহিত সুপরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই বর্ত্তমান জগতের একমাত্র স্বেচ্ছাতন্ত্রশাসক—আধুনিক প্রাচ্য-প্রেট্রিয়ার্ক স্বরূপ বিরাট্ জাঁকজমক ও পরাক্রমের সহিত রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন।

আফ্‌গানিস্থান চারিটি রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত; যথা:- আফ্‌গান, তুর্কিস্থান, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট। ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আফ্‌গানিস্থানের উত্তর-পূর্ব্ব দিকের উচ্চ গিরিশৃঙ্গমালাই উহার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য; বৃহৎ হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার সহিত উহা সম্মিলিত হইয়াছে। আফ্‌গানিস্থানের উত্তরপূর্ব্বদিকের এই-সমস্ত পর্ব্বত-মালার ভিতর দিয়া পৃথিবীর কোন কোন অতি বিচিত্র ঐতিহাসিক পথ চলিয়া গিয়াছে। বহুযুগ পর্য্যন্ত তুর্কিস্থানের সহিত ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য এই-সকল গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বিবিধ পণ্য-সম্ভারে বোঝাই-করা উষ্ট্র অশ্ব ও খচ্চর প্রভৃতি লইয়া প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার সার্থবাহদল আফ্‌গানিস্থানে যাতায়াত করে।

মহাবীর সেকেন্দার শাহ হিরাট ও কান্দাহার নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। কাবুল, লোখার ও ব্যাক্ট্রিয়ার উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া প্রাচীন গ্রীকগণ যে অভিযান করিয়াছিল, স্থানে স্থানে নানা ধ্বংসাবশেষ ও স্মৃতিস্তম্ভ-গুলি এখনও তাহার পরিচয় দিতেছে। আইবগ ও আফ্‌গানিস্থানের অন্যান্য জায়গায় প্রাচীন জরথুস্ত্রীয় (পারসিক) অগ্নিপূজকদের মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে বলখের "তোপ-ই-রুস্তম" নামক ধ্বংসাবশেষই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "তাচাত-ই-রুস্তমের" নিকটেও
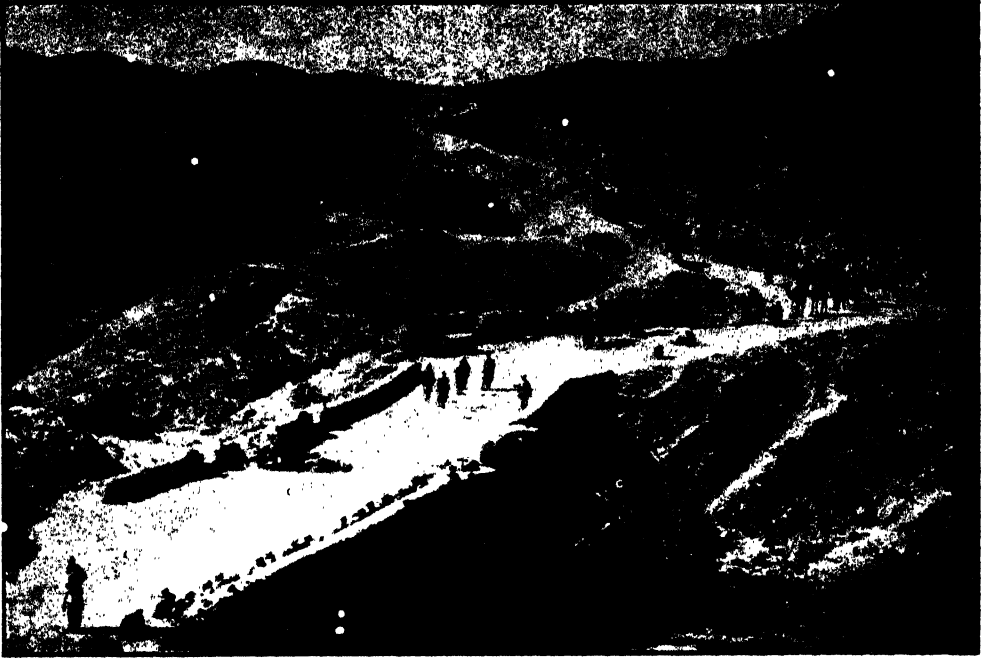
খাইবার-গিরিপথে সার্থবাহদল
(প্রভাতে আফগানিস্থান-যাত্রী ও অপরাহ্নে ভারত যাত্রী সার্থবাহদলকে এই গিরিপথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কতকগুলি গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহাদের প্রাচীরগাত্র বড় বড় সূর্য্যমুখী পুষ্পের খোদাই দ্বারা অলঙ্কৃত। ব্যাবিলনের ন্যায় বল্‌খ্‌ নগরও বিভিন্ন মানব-সভ্যতার স্মৃতিকাগার। ইহার ধ্বংসাবশেষ-দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে বহুযুগ হইতে একটি নগরের ধ্বংসস্তূপের উপর আর-একটি নগর স্থাপিত হইয়া আসিয়াছে। আফ্‌গানিস্থানের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়ের মন্দিররাজিই প্রধান।

আফ্‌গানিস্থানে বহু সম্প্রদায় ও ভাষার মিশ্রণ বিদ্যমান; উহার বেশীর ভাগ লোকই খাঁটি আফ্‌গান নহে। আর্য্য-ইরানীয়া তাড্‌জিক্‌গণ বড় বড় গ্রাম ও সহরে বাস বাস করে; মঙ্গোলীয়-হাজারাগণ মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্যভূমিতে এবং তুর্কোমান ও উজ্‌বেগ্‌ উত্তর-আফ্‌গানিস্থানে বাস করে। দেশের অধিকাংশ লোকই এই তিন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। খাঁটি আফ্‌গান বা পাঠানগণ পূর্ব্বে স্থলেমান্ পর্ব্বতমালা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে গজনী ও কান্দাহারের নিকট দিয়া হিরাট্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর অধিত্যকা প্রদেশে বাস করে।

আফ্‌গান জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান; কিন্তু তাহারা সেমিটিক বংশোদ্ভূত বলিয়া যে প্রাচীন মতবাদ প্রচলিত আছে অধুনা তাহা অস্বীকৃত হইয়া থাকে। আফ্‌গানগণ তুরাণীয় জাতির সঙ্কর বলিয়াই মনে হয়। এস্থানে আসিয়া তাহারা অনেক যুগ পর্য্যন্ত ঘন ঘন উপনিবেশ, জাতি ও বংশগত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান উন্নতাকারে উপনীত হইয়াছে।

দৈহিক আকারে প্রকারে আফ্‌গানজাতি তুর্কী-ইরানিয়ান বংশোদ্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের ক্ষুদ্রসম্প্রদায়গুলির মধ্যে ভারতীয় রক্ত মিশ্রিত আছে। পাঠানদের "আফ্‌গান" বা "আগওয়ান" নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আফ্রিদিদিগের শিরায় ইস্রাইল বংশীয়দের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া কথিত হয়। আফ্‌গানগণ রাজা সা'লের বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি

খাইবার-গিরিপথের দৃশ্য
(আলি মস্‌জিদ হইতে আফ্‌গানিস্থানের দিকে)

করে। নেবুখাদ্‌নেজার পালেষ্টাইন হইতে যে-সকল লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন আফ্‌গানজাতি তাহাদেরই অন্তর্ভূত বলিয়া নিজদিগকে অভিহিত করে।

সম্প্রদায়গুলি 'খেল' নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত; এই-সমুদয় "খেল" প্রায়ই গো, ছাগল, উষ্ট্র ও মেষপালন করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। ভারতের ন্যায় এখানেও অনেক লোক সর্পাঘাতে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। নানাবিধ বৃশ্চিক ও বিষধর মাকড়সা যাযাবরদিগকে প্রায়শ:ই উত্যক্ত করে; শীতকালে আফ্‌-গানদের কম্বলাবৃত তাঁবুগুলি ছারপোকা ও কীটপতঙ্গাদিতে পূর্ণ হইয়া যায়। আফ্‌গানগণ স্বভাবত: বিস্তৃত পর্ব্বত-শ্রেণীতে স্বাধীন জীবন যাপন করে।

জাখাখেল, আফ্রিদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যুদ্ধই প্রধান ব্যবসায়। তাহারা অবিরত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কলহে প্রবৃত্ত রহে; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কদাচিৎ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান আফগানভাষা প্রাচীন ইরানী ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও, ইহাতে আজকাল ভারতীয় প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। লেখ্য ভাষায় আফ্‌গানগণ একপ্রকার আরবী অক্ষর ব্যবহার করে। আফ্‌গানজাতির অনুন্নতভাষা, পারসিক বাক্য-সাহিত্যসম্পদে পুষ্ট ও গঠিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। আফ্‌গান-সাহিত্যে এস্‌লামের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। পারসিক সভ্যতা বহুযুগাবধি আফ্‌গানদের সামাজিক জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। শিয়া-সুন্নির পরস্পর ঘৃণাবিদ্বেষ সত্ত্বেও পারসিক রীতিনীতি, আচারব্যবহার মধ্যএসিয়ার সমগ্র মোস্‌লেম-সমাজে অল্পাধিক মাত্রায় অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু আফ্‌গানদের পারিবারিক জীবন পারসিকদের চেয়ে অধিকতর নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণত: বিবাহের পূর্ব্বে আফ্‌গান যুবক স্বীয় পরিণেয় বধূকে দর্শন করিতে পায় না। বরকন্যার আত্মীয়া রমণীগণ বিবাহের প্রাথমিক কথাবার্ত্তা চালান।
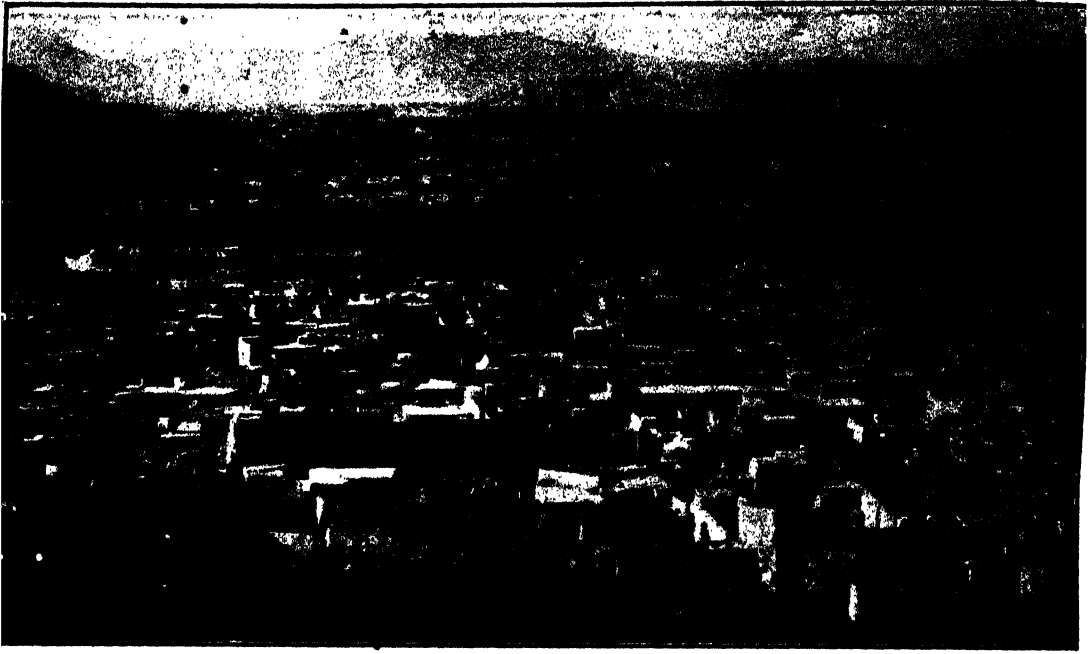
আফ্‌গান নারীগণ অন্যান্য মোস্‌লেম রাজ্যের নারী-

কাবুল শহরের দৃশ্য

দের চেয়ে অধিকতর পর্দ্দার সহিত রক্ষিত হয়; তাহাদের অবগুণ্ঠনের বিধানও একটু বেশী কড়াকড়ি রকমের। আফ্‌গানগণ নিজেদের অন্তঃপুরচারিণীদিগের বিষয়ে কিছু অতিমাত্রায় সতর্ক; বস্তুতঃ কোন পরপুরুষই কোনও নাগরিক আফ্‌গান-রমণীর মুখদর্শন করিতে কদাপি সমর্থ হয় না। কিন্তু যাযাবরদিগের স্ত্রী কন্যা ও মরু-প্রান্তরবাসীদিগের বেলা এতটা কড়াকড়ি বিধান দৃষ্ট হয় না। অবগুণ্ঠন ব্যতীত কোন আফ্‌গান-রমণীকে ফোটো তুলিতে সম্মত করানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দরিদ্র আফগান-রমণীরা কার্পাস-নির্ম্মিত লম্বা আস্তিনের কুর্ত্তা, ঢোলা জামা ও কার্পাসের চাদর বা পর্দ্দা ব্যবহার করেন। ধনী মহিলারা মস্তকে জরির কারুকার্য্য-খচিত গোলাকার একপ্রকার টুপি ব্যবহার করেন। সকলেই মাথার মধ্যভাগে সীঁথি তুলে; চিকুরদাম চিক্কণ বেণীসুবিন্যস্ত হইয়া সীমন্তের উভয় পার্শ্ব দিয়া ঐ জরিদার টুপির পশ্চাদবস্থিত কৃষ্ণ রেশমী-সূত্রে প্রস্তুত থলের সহিত যাইয়া সংবদ্ধ হয়। বিবাহিতা যুবতীগণ মস্তকের উভয়পার্শ্বের কেশদাম কুঞ্চিত ও ঝালর-বিশিষ্ট করিয়া রাখে।

নারীপুরুষ নির্ব্বিশেষে আফ্‌গান জাতি শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বপ্রকারের শিক্ষা দীক্ষা ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও, এখনো তাহাদের মধ্যে বহুলোক নিরক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু আফ্‌গান-মহিলাদের ভিতর এই সাময়িক নিরক্ষরতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারে অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিচালনা করেন। সচরাচর আফ্‌গান-মহিলাবর্গ সুখ আরাম ও মর্য্যাদার সহিতই জীবনাতিপাত করেন।

আফ্‌গান-রমণীগণ নিঃসন্তান হওয়াকে জীবনের চরম দুর্ভাগ্য বলিয়া গণ্য করেন। সাধারণতঃ পরিবারের মেয়েরা যে বয়সে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে, প্রায় সেই সময়ই বা তাহার অল্প কিছু পূর্ব্বে বালকগণ বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করে। প্রথমতঃ বালকদিগকে অশ্বারোহণ শিক্ষা দেওয়া হয়; তৎপর শিকার, লক্ষ্যভেদ ও বন্দুক শিক্ষা দেওয়া হয়। অশ্ব আফ্‌গানজাতির চিরসহচর।

পরলোকগত আমীর হবিবুল্লা খান্ বিশেষ বিদ্বান্ ছিলেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞানে তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন।
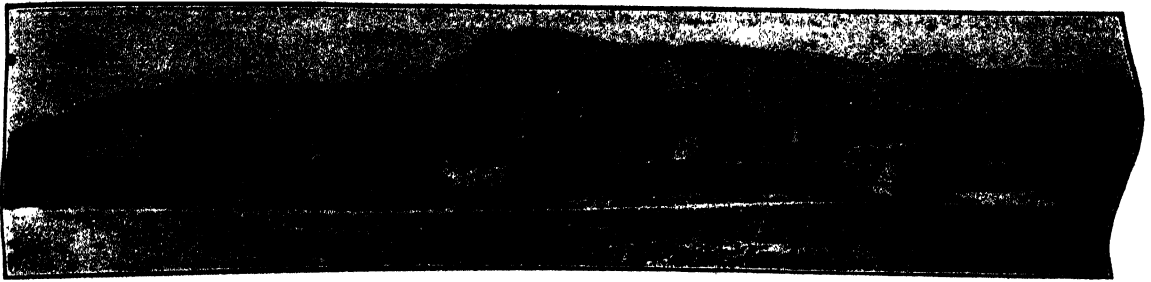
জম্রুদ্ কেল্লা
(এই কেল্লা খাইবার-গিরিপথের ভারত-সন্নিহিত মুখের ঘাঁটি। খাইবার-গিরিসঙ্কট পেশোয়ারের ১০॥০ মাইল দূর হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে ৩৩ মাইল বিস্তৃত হইয়া আফ্গানিস্থানের ডাক্কা নামক স্থানে শেষ হইয়াছে)

আফ্গান সৈন্য

আফ্গান প্রহরী
(জবুল-উস্-সিরাজ হইতে জলালাবাদের পথে)

নিহত আমীর হবিবুল্লা খানের ভ্রাতা সর্দ্দার নসরুল্লা খানই আফগানদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিদেশভ্রমণ করিয়াছেন; তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড্ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আমীর মহোদয় আফ্গান রাজ্যের বাহিরে কখনো দেশ পর্য্যটন উদ্দেশ্যে গমন করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা কয়েকবার ভারতভ্রমণে আসিয়াছেন বটে। তথাপি মোটের উপর প্রত্যেক আফ্গানের হৃদয়েই স্বাভাবিক তীব্র বিদ্যানুরাগ বিরাজ-

মান দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি শুধু ভারতীয় নয়, তুর্কী জার্ম্মান রুশ প্রভৃতি অন্যান্য দেশের শিক্ষা সভ্যতা ও নীতি-পদ্ধতি আফ্‌গানিরাজ্যে দ্রুত প্রবেশ লাভ করিয়া অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আফ্‌গানদের ভাষার নাম পুশতু। কিন্তু স্কুল কলেজে ও রাজকার্য্যাদিতে পারস্য ভাষাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। সকল আফ্‌গানই পারস্য ভাষা উত্তমরূপে বুঝিতে ও বলিতে পারে। পশ্চিম ও মধ্য আফ্‌গানিস্থানের তুর্কী-মঙ্গোলীয় সম্প্রদায় নিজেদের মাতৃভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলে।

কাবুলের প্রহরী বালা-হিসার দুর্গ
(কাবুল শহরের পাশের একটি ১৫০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত)

আমীর আমানুল্লা খান্ পারস্য, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি দেশীয় পত্রিকা ছাড়া দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক ইত্যাদি নানা প্রকার বৈদেশিক সাময়িক পত্রিকা অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং যে-সকল ভাষা জানেন না সেই ভাষার পত্রিকা ও পুস্তকাদি অনুবাদ করিয়া শুনাইবার জন্য ঐ-সকল ভাষাভিজ্ঞ লোকদিগকে বেতন দিয়া রাখিয়াছেন। সুন্দরচিত্রাবলীসমন্বিত পত্রিকা আমীর খুব পছন্দ করেন। তিনি নিজে একজন ভাল ফোটোগ্রাফার।
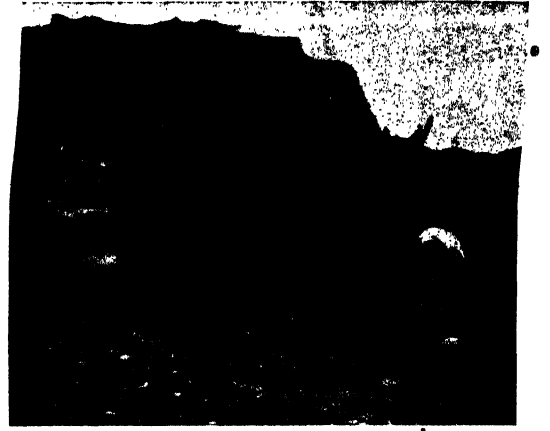
আফ্‌গান পোষ্ট্-অফিস
(জলালাবাদ হইতে কাবুলের পথে)

আমোদ উৎসবের জন্য আফ্‌গানেরা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ক্রীড়া-কৌতুকের বড়ই পক্ষপাতী। মৃগয়া ঘোড়দৌড় মল্লযুদ্ধ ও অপরাপর শারীরিক ব্যায়াম তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। সম্প্রতি কাবুলের শিক্ষিত ভদ্র ও অভিজাত শ্রেণীর যুবকদিগের মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট ও টেনিস্ খেলার রেওয়াজ হইয়াছে। মেষ-যুদ্ধ মোরগের যুদ্ধ এমন কি বিবিধ পাখীর লড়াইও তাহাদের প্রিয় আমোদ-প্রমোদের অন্তর্ভূত। আফ্‌গানিস্থানের সর্ব্বত্র নৃত্যগীতাদি ও নানা-অলঙ্কার-বিভূষিত ভাষায় বিবিধ গাথার আবৃত্তি হইয়া থাকে।

দেশের এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাঞ্চলের আফ্‌গানদের বেশ কতকটা পশ্চিম ভারতীয় প্রথানুযায়ী। আজকাল কোন কোন আফ্‌গান পাশ্চাত্য পোষাক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আফ্‌গানিস্থানে তিন প্রকারের শিরস্ত্রাণ ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বিচিত্রবর্ণের অনুচ্চ টুপি ব্যবহার করে; কেহ কেহ আতপ নিবারণের জন্য পশ্চাদ্দিকে কতকটা লম্বিত শ্বেত ও ফিরোজা রঙের জরিদার উষ্ণীষ পরিধান করে; আবার কোন কোন প্রদেশের লোক "কুল্লা" নামক উচ্চ ও ক্রমশঃ সরু এক প্রকার টুপি পরে, উহা দেখিতে কতকটা প্রায় তুর্কী ফেজটুপির অনুরূপ। কার্পাস-নির্ম্মিত লম্বা জামা, সাদা পায়জামা, চর্ম্মপাদুকা কিংবা
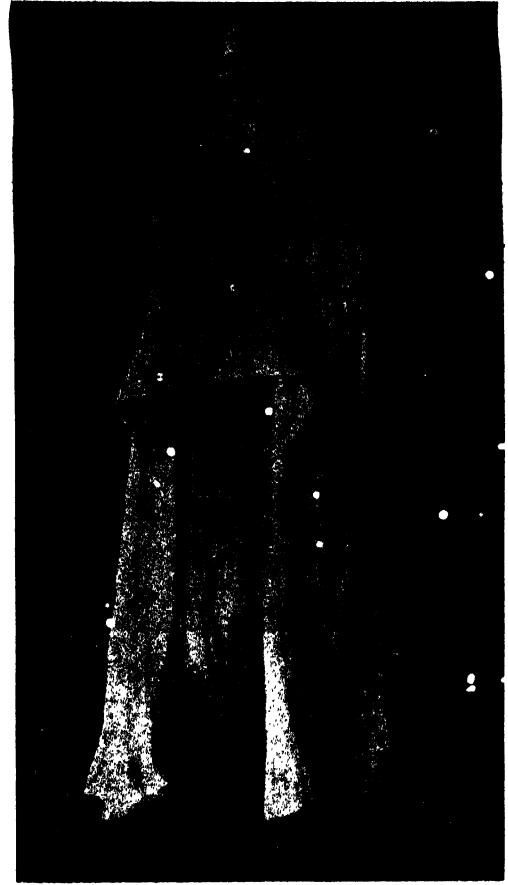
আফ্‌গান-মহিলার পোষাকের সম্মুখ দৃশ্য
(আফ্‌গান-মহিলা কেহ ঘোমটা খুলিয়া ফোটো তুলাইতে স্বীকৃত হন না ; সেই জন্য একজন য়ুরোপীয় মহিলাকে আফ্‌গান-পোষাকে সজ্জিত করিয়া ফটো তোলা হইয়াছে ।)

আফ্‌গান-মহিলার পোষাকের পশ্চাৎ দৃশ্য

বুট ও হরিৎবর্ণের রেশমের কারুকার্য্য-বিশিষ্ট সুসংস্কৃত মেষচর্ম্মের কোট আফ্‌গানদের আদর্শ জাতীয় পোষাক। এই কোটের পরিবর্ত্তে তাহারা সময় সময় এক-প্রকার লাল চোগাও পরিধান করে।

গৃহে ও বাহিরে কাজকর্ম্মের সময় রমণীগণ কার্পাসের দীর্ঘ কুর্ত্তা ঢোলা রঙ্গীন পেশোয়াজ ও পুরুষদের মত জরির কাজকরা টুপির উপরে শিরোবস্ত্র ব্যবহার করে। রাস্তায় বাহির হইবার সময় আফ্‌গান-মহিলারা ঢোলা লম্বা পায়জামা ও আশ্‌মানী কিংবা কাল উর্দ্দী পরিধান করে; তদুপরি বোর্‌কার ন্যায় আজানুলম্বিত একটি মোটা বস্ত্র ঝুলাইয়া দেয়। রমণীগণ একপ্রকার লাল জুতা পায় দেয়।

আফ্‌গানদের খাদ্য প্রায়ই অতি সাদাসিধা ধরণের—রুটি ফলমূলাদি তরিতরকারি চা দুগ্ধ ও পনীরই প্রধান খাদ্যদ্রব্য। চাউল মেষ- ছাগ- মোরগ- ও পক্ষীমাংস এবং বিবিধ প্রকারের প্রস্তুত মিষ্টান্ন ধনীলোকদের আহার্য্যের অন্তর্গত। আফ্‌গানেরা কদাপি মদ গাঁজা ইত্যাদি স্পর্শ ও সেবন করে না।

আফ্‌গানিস্থানে যে তামাক জন্মে তাহা বেশ ভাল নহে; সুতরাং পারস্য রুশিয়া ভারতবর্ষ ও মিশর হইতে তাহারা উত্তম তামাক আম্‌দানি করে। যুবাবৃদ্ধ সকল আফ্‌গানই নস্য লইয়া থাকে।

শর্করাযুক্ত ও শর্করাহীন উভয় প্রকার চা-ই
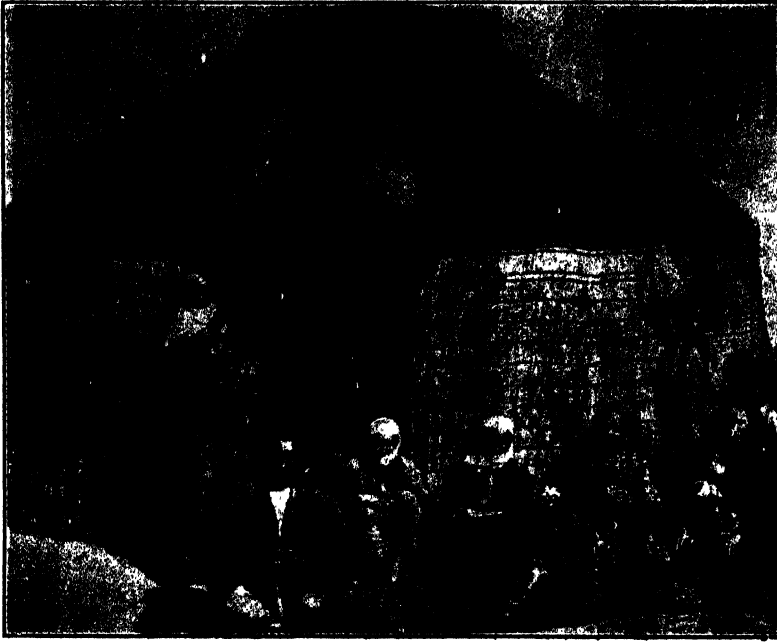
আফ্‌গান-গৃহস্থের দরমা-চাটাই-ঘেরা ও চামড়ায় ছাওয়া ঘর
(এইসব ঘর এত হাল্কা যে তাঁবুর মতন টানা-দড়ি দিয়া খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া ঘর খাড়া রাখা হয়। এক ঘরের মধ্যে পর্দ্দা টাঙাইয়া কুঠুরী ভাগ করা হয়। এক-একটা ঘরে কুঠুরী ভাগ করিয়া একসঙ্গে বহু পরিবার বাস করে। মেঝেতে কম্বল বনাত বিছানো থাকে।)

যদি কোন লোক খোদার ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় তবে নিশ্চয়ই সে পাপের ভাগী হইবে। এমন কি তাহারা বিনা কারণে মক্ষিকা প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী পর্য্যন্ত হত্যা করে না। যদি কখনো এমন কোন জীব তাহাদের সম্মুখে পতিত হয়, তাহারা উহা উঠাইয়া একপার্শ্বে সরাইয়া রাখে।

আফ্‌গানিস্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য একমাত্র উষ্ট্রযূথের দ্বারা পরিচালিত হয়; এই-সকল ব্যবসায় প্রধানতঃ হিন্দু ও তাড্‌জিক্‌স্‌-আফগানদের হস্তে ন্যস্ত। সুপ্রসিদ্ধ খাইবার গিরিসঙ্কট এই ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান পথ; ভারতবর্ষ হইতে আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশের ইহাই একমাত্র প্রসিদ্ধ সিংহদ্বারস্বরূপ। ভারত ও আফ্‌গানিস্থানের মধ্যে উষ্ট্র ও খচ্চর দ্বারা ব্যবসাবাণিজ্য চলিয়া থাকে। এই গিরিপথ সপ্তাহে দুই দিন, মঙ্গল ও শুক্রবার উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাও এক শুক্রবার ব্যতীত অন্যদিন খোলা থাকে না। যে সকল লোক আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশ করে ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করে আফ্‌গান-রাজকর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে বিশেষ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া ছাড়পত্র দেন। ভারত হইতে যাত্রীদল যেইমাত্র আফ্‌গানিস্থানে প্রবিষ্ট হয় অমনি তাহাদের ভারতীয় দলপতিকে পশ্চাদপসারিত করিয়া সশস্ত্র সজ্জিত আফ্‌গান-রক্ষীগণ তাহাদের স্থান অধিকার করে। সামরিকভাবে গঠিত এই-সকল আফ্‌গান কাফেলার কোন কোনটায় হাজার হাজার উষ্ট্র ও তদনুপাতে উহাদের হাজার হাজার চালক থাকে। আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশার্থী কাফেলাগুলির জন্য প্রাতে, ও তথা হইতে ভারতবর্ষে যাত্রীদের জন্য অপরাহ্ণে খাইবার-গিরিপথ উন্মুক্ত রাখা হয়। সূর্য্যাস্ত হইতে

আফ্‌গানদের অতি প্রিয় পানীয়; তাহারা ইহা অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিয়া থাকে। একজন আর-একজনের বাড়ীতে কিংবা দোকানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে অন্ততঃ চারি পাঁচ পেয়ালা চা পান না করা পর্য্যন্ত সেস্থান হইতে উঠিয়া আসিবার জো নাই। আফ্‌গানদের পাকপ্রণালী-জ্ঞান প্রশংসনীয়।

আফগানিস্থানে অসংখ্য কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ-সকল কুকুর আফ্‌গানদের অনেক উপকারে আইসে। কিন্তু লোক উহাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করে। ধার্ম্মিক আফ্‌গানগণ কুকুর স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না।

আফ্‌গানগণ সহজে জীব হত্যা করে না। কোথাও গমনাগমনের সময় পথে কোনও ভারবাহী জন্তু যদি একেবারে পঙ্গু হইয়া যায় অথবা যে-সকল উষ্ট্র গিরিবর্ত্মের মধ্যে হিমে অবশ হইয়া পড়ে, আফ্‌গানেরা উহাদিগকে ভাগ্যের উপর ন্যস্ত করিয়া চলিয়া যায়। তাহারা বলে "ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জীবের প্রাণই আল্লাহ্‌তাআলার হাতে;"

সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সারারজনী উহা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে। যে উষ্ট্রযূথ আফ্‌গানিস্থান হইতে বাণিজ্যের জন্য দেশবিদেশে যাত্রা করে, সচরাচর তাহা পশম চর্ম্ম আঙ্গুর বেদানা মস্কট আখ্‌রোট সেব নাসপাতি মনক্কা কিস্‌মিস্ পেস্তা বাদাম নানাবিধ বৃক্ষনির্য্যাস, আটা ও মশলা ইত্যাদিতে বোঝাই করা থাকে।

পোলো খেলা ও যুদ্ধের জন্য আফ্‌গান দেশ হইতে সহস্র সহস্র অশ্ব ভারতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

আফ্‌গান রাজ্যের রাজধানী কাবুল সহর কাবুল নামক নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উহার উচ্চতা প্রায় ৭,০০০ ফুট্। কাবুলের লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষাধিক হইবে। এই কাবুল নগরের বক্ষের উপর দিয়া গিয়াই একদা মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার, চেঙ্গিজখাঁ ও অন্যান্য দিগ্বিজয়ীদের বিরাট্ সেনাচমূ পরপর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে।

কাবুলে একটি উৎকৃষ্ট দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে; জনৈক তুর্কি ডাক্তার উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন। আমীর মহোদয় চিকিৎসাবিদ্যায় সুপণ্ডিত; কোন কোন ভারতীয় চিকিৎসককে তাঁহার রাজ্যে বাড়ীঘর করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

গ্রীষ্মকালে কাবুলের অনেক অধিবাসী তাঁবুতে বাস করে। কাবুলের রাজকীয় দুর্গ সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডের অতি প্রসিদ্ধ পুরাতন দুর্গরাজির মধ্যে অন্যতম। এই জীর্ণদশাগ্রস্ত সুপ্রাচীন দুর্গের প্রাচীর পর্ব্বতের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কাবুলের অদূরবর্ত্তী বালাহিসার দুর্গ উচ্চ অধিত্যকাভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, উহার উচ্চতা ১৫০ ফুট। যে সমতল ভূমির উপর কাবুল সহর স্থাপিত, ঐ দুর্গ হইতে সে স্থান স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এই দুর্গ ভূতপূর্ব্ব আমীর আব্‌দুর রহমান খানের আমলে আংশিক ধ্বংস হইয়াছিল; তদবধি উহা আর সংস্কৃত হয় নাই।

পেশোয়ার হইতে সাড়ে দশ মাইল পশ্চিমে জম্‌রুদ নামক একটি কেল্লা আছে। খাইবার-গিরিসঙ্কটের ভারতীয় প্রবেশপথের এক পার্শ্বে ইহা স্থাপিত। এই জম্‌রুদ দুর্গের পাদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ গিরিবর্ত্ম উত্তর-পশ্চিম দিকে ৩৩ মাইল পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া পর্ব্বতের পার্শ্বে অবস্থিত আফ্‌গান-সীমান্তের ডাক্কা বন্দরে যাইয়া উপনীত হইয়াছে।

অধিকাংশ গরীব ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের বাসগৃহ রৌদ্রশুষ্ক মৃত্তিকার ইষ্টকে নির্ম্মিত। ছাদগুলি বরগার ন্যায় দণ্ডের উপরে নলের চাটাইর দ্বারা আচ্ছাদিত। চাটাইর উপর প্রায় ২ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু মাটির স্তর লেপিয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টির জল নিকাশের জন্য উক্ত মৃত্তিকাস্তরের সহিত লম্বা ফাঁপা কাষ্ঠদণ্ড দৃঢ়রূপে বসাইয়া দেওয়া হয়।

আফ্‌গানিস্থানে অনেক গৃহই মৌচাকের ন্যায় দেখা যায়। বৃষ্টির জল ও তুষার-পাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই-সকল গৃহের ছাদ গম্বুজাকৃতি করিয়া গঠিত হয়। দেশের আব্‌হাওয়া স্বাস্থ্যকর হইলেও, সাধারণ অধিবাসীদের অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহের দরুণ সময় সময় মহামারী দেখা দেয়।

আমীর তাঁহার সকল রাজপ্রাসাদে ও সরকারী আফিসাদিতে আমেরিকান্ ডেস্ক্ টাইপ্-রাইটার যন্ত্র, সিঙ্গারের সেলাইর কল, ঘড়ি প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক নানাপ্রকার জিনিস আম্‌দানি করিয়াছেন। ইয়াঙ্কি ফাউন্‌টেন্ পেন ও বিবিধ প্রকারের ঘড়ি আফ্‌গানিস্থানের লোকের বড়ই প্রিয়। বিদেশ হইতে যে-সকল দ্রব্য আম্‌দানি হয় তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষ ও চীনদেশের; আজকাল মাঝে মাঝে জাপানী জিনিষও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত হইতে আফ্‌গানিস্থানে যে-সমুদায় দ্রব্যজাত আম্‌দানি হয় তন্মধ্যে কার্পাসবস্ত্র, লৌহ ও তাম্রের তৈজসপত্রাদি, চা, চিনি, রঙ্গের উপাদান, টাকা প্রস্তুতের জন্য রৌপ্যদণ্ডই প্রধান। স্বাধীন ও যুদ্ধপ্রিয় আফ্‌গান জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ আম্‌দানি হইয়া থাকে।

কাবুল হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত যে রাজপথটি বিদ্যমান, আমীরের চেষ্টায় তাহার প্রভূত সংস্কার ও উন্নতি হইয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া পণ্যদ্রব্য আনা-নেওয়ার জন্য আফ্‌গান সরকারের অনেকগুলি আমেরিকান্ গাড়ী আছে। সচরাচর হিন্দু দালালদিগকে মাল সরবরাহ করিতে দেখা যায়।

যে-সকল রাস্তা দিয়া কাফেলা বা সার্থবাহদল যাতায়াত করে সেই-সকল পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে অনেক উত্তম ও দৃঢ়গঠিত পান্থশালা বা সরাই আছে।

আফ্‌গানিস্থানের বাহিরে অন্যান্য দেশে যে-সকল রাজপথ গিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পথগুলি নিম্নলিখিত স্থানাদিতে গিয়াছে :—পশ্চিমে হিরাট্ হইতে মেসেদ; উত্তরে মেইসিনি ও আকট্চা হইতে কার্কি; পূর্ব্বে কাবুল হইতে পেশোয়ার ও দক্ষিণে কান্দাহার হইতে কোয়েটা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

কাবুল, কান্দাহার, মেইমিনি ও মাজার-ই-সরিফের ন্যায় প্রসিদ্ধ সহরগুলি বিশাল প্রান্তরের উপর দিয়া প্রবাহিত যাত্রীপথগুলির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই রাজপথসমূহ এতটা দীর্ঘ ও প্রশস্ত যে ঐ-সকল রাস্তা মোটর-গাড়ী চলাচলের জন্য স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাবুল ও কাবুলের বাহিরে চতুর্দ্দিকে মোটর-গাড়ী চলাচলের উপযোগী অসংখ্য ভাল ভাল রাস্তা আমীরের প্রাসাদসমূহের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

আফ্‌গান-গবর্মেণ্টের একাগ্র চেষ্টায় আফ্‌গানিস্থানের নামজাদা দস্যুদল ধৃত ও অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় আজকাল তাহারা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ফলে এখন যাত্রী ও বণিক্‌দল মরু-প্রান্তরময় স্থান দিয়াও নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত হইয়া যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু সীমান্তের নিকটে কোন কোন প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যুদ্ধ কলহ অবিশ্রান্ত লাগিয়াই আছে।

আফ্‌গানরাজ্যে একটি ডাকবিভাগ* স্থাপিত আছে; উহার কার্য্যাদি দ্রুতগামী অশ্বারোহী বার্ত্তাবাহকের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু উহা এখন পর্য্যন্তও আন্তর্জ্জাতিক ডাকবিভাগের সহিত সংযুক্ত হয় নাই। বৈদেশিক লোকদের অবাধ চলাচল ও ব্যবসাবাণিজ্যের অনভিলষিত প্রসার ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় এযাবৎ আমীর তদীয় রাজ্যে রেলপথ † ও টেলিগ্রাফ্ প্রতিষ্ঠায় বাধা দান করিয়া আসিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে আফ্‌গানিস্থান অতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও এখনো ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করণীয় রহিয়াছে। পারসিকদের ন্যায় আফ্‌গানরাও অনেক উত্তম প্রাচীন জাতীয় কুটিরশিল্প পরিত্যাগ করিয়াছে। আজকাল তাহারা প্রায়ই প্রতীচ্য সস্তা দ্রব্য-সম্ভার খরিদ করে, দেখিতে পাওয়া যায়। কাষ্ঠোপরি খোদিত চিত্রাঙ্কন, রমণীদের অলঙ্কার, রেশম ও পশমের জিনিষ ও কিংখাপের কাপড় ব্যতীত শিল্পনৈপুণ্য-প্রকাশক দেশজ আর কোন মূল্যবান্ বিলাসদ্রব্য বাজারে দৃষ্টিগোচর হয় না। কান্দাহারের ক্ষুদ্র একদল দেশীয় শিল্পী তস্‌বিহ বা জপমালা প্রস্তুত করিয়া নিজেদের জীবিকার সংস্থান করে। ঐ-সকল কারুখচিত তস্‌বিহের অধিকাংশ হজযাত্রীদের সহিত মক্কাশরিফে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

আফ্‌গান সমর-বিভাগে তুর্কীদের প্রভাব দেদীপ্যমান। অনেক তুর্কী কর্ম্মচারী ও সমরবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষাদান-কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। আফ্‌গান সেনাদলের ন্যায় সমগ্র এসিয়ায় যোদ্ধৃদল আর কোথাও এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়—কোথাও পুরাতন ও আধুনিক সমর-নীতির এমন অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় না। অধিকাংশ সৈনিকই উষ্ট্র ও অশ্বারোহী ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। আমীরের কতকগুলি উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট্ বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যদলের আকারে গঠিত। স্থায়ী রক্ষীসৈন্যদল প্রধানতঃ নাগরিক তাড্‌জিক্‌স্ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সংগৃহীত হয়। মালেকিরা বিভিন্ন প্রদেশে শান্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে; উহাদের প্রায় সকলেই বর্শাধারী। হাতাহাতি যুদ্ধে শত্রুনিধন করিবার সময় তাহারা একপ্রকার দীর্ঘ ও বক্র তরবারি ব্যবহার করে।

আফ্‌গান ফৌজ ৮০,০০০ পরিমিত সৈন্যে গঠিত। আমীরের বহুসংখ্যক হাউইট্‌জার কামান ও পাহাড়-পর্ব্বতে

---

* সম্প্রতি আফ্‌গান গবর্মেণ্ট্ একটি ইতালীয় কোম্পানীকে আফ্‌গানিস্থানে ডাক ও মোটর সার্ভিস্ প্রতিষ্ঠার একচেটে অধিকার প্রদান করিয়াছেন।—অনুবাদক।

† কিছুদিন হইল কাবুল হইতে জালালাবাদ পর্য্যন্ত লাইট্ রেলওয়ে স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।—অনুবাদক।

ব্যবহার উপযোগী বন্দুক আছে বটে; কিন্তু তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা এখনো আশানুরূপ হয় নাই।

আফ্‌গানগণ সকলেই সুন্নীমতাবলম্বী। মোস্‌লেম-অধ্যুষিত অন্যান্য দেশের ন্যায় পারসিক শিয়া কিংবা মধ্য-পার্ব্বত্য প্রদেশের হাজারা-শিয়া সম্প্রদায়ের সহিত সুন্নীদের বড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। তুর্কীগণ সুন্নীমতাবলম্বী বলিয়া আফ্‌গান জাতির নিকট সমধিক আদর ও সম্মান লাভ করিয়া থাকে।

ধার্ম্মিক আফ্‌গানগণ প্রতিবৎসর মক্কাশরিফে হজ করিবার জন্য গমন করেন। শিয়া-হাজারাগণ ও কতক কতক সুন্নী আফ্‌গান-পারস্যের উত্তরপূর্ব্বদিকে অবস্থিত মেসেদ সহরে ইমাম রেজা সাহেবের পবিত্র মাজার শরিফ জেয়ারৎ বা প্রদক্ষিণ করিবার বাসনায় গমন করেন; কেহ কেহ আবার পারস্যরাজ্যের মধ্য দিয়া নানাবিঘ্ন-সঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া মেসোপটেমিয়ার কারবালা ও নজফের পবিত্র পীঠস্থানেও যান। অগ্নিপূজকদের যুগ হইতে উত্তর-আফ্‌গানিস্থানে অবস্থিত মাজার-ই-শরিফ নামক স্থানের একটি পবিত্র মন্দির প্রদক্ষিণ কামনায় দেশের নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রীদল সমবেত হন। বস্তুতঃ আফ্‌গানিস্থানের সর্ব্বত্র বিভিন্ন গ্রামে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ জেয়ারৎগাহ্‌ ও পবিত্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

জাতি হিসাবে আফ্‌গানগণ তাহাদের অপেক্ষাকৃত পশ্চিমদিক্‌স্থিত কোন কোন দেশের মোস্‌লেম ভ্রাতাদের চেয়ে কোরানের নিষেধাজ্ঞা অধিক মাত্রায় প্রতিপালন করে। সমুদয় বৈদেশিকদের প্রতি আফ্‌গানজাতির চির-বিরাগ ভাব ও আমীরের সুকৌশলপূর্ণ বিদেশী-বর্জ্জননীতির গুণে অন্যদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নির্জ্জন মরুপ্রান্তর- ও দুর্লঙ্ঘ্য-পর্ব্বতরাজি-বেষ্টিত এই আফগান-রাজ্যে সুদূর ভবিষৎ পর্য্যন্ত বৈদেশিক প্রভাব অতি অল্পই বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

এতৎসত্ত্বেও আমীর ও তদীয় সামরিক অভিজাত-বর্গ সাগ্রহে কর্ম্মকোলাহলমুখর বহির্জ্জগতের সর্ব্বপ্রকারের উন্নতি-ঘটনাস্রোত ও যুগবিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া থাকেন। আফ্‌গানেরা মার্কিনদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন। সাধারণ নিরক্ষরতা সত্ত্বেও হালের ইতিহাস ও ভৌগো-লিক জ্ঞান তাহাদের এত বেশী যে তাহা দেখিয়া প্রকৃতই স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইতে হয়! এমন কি বিগত মহাসমরের সময় গিরিকন্দর ও তুষারাবৃত নির্জ্জন ঊষর স্থানের যাযাবরগণও মহাযুদ্ধ উড়োকল ও ডুবোজাহাজ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখিত।

অধুনা জগতের সমগ্র মুসলমান জাতি নব অভ্যুত্থান করিয়াছে। সরকারীভাবে মহাসমরের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হইলেও এখনও এসিয়ার সর্ব্বত্র যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি বিরাজমান। এখনও যে-সকল প্রাচ্য বৃহৎ শক্তিবর্গ আত্মপ্রতিষ্ঠায় বিব্রত, কালক্রমে আফ্‌গানিস্থান যে একসময়ে তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই।*

মোহাম্মদ আব্‌দুল হাকিম বিক্রমপুরী

* জনৈক ইউরোপবাসী, রাজনৈতিক ও সামরিক কার্য্যোপলক্ষে, "হাজি মির্জ্জা হোসেন" ছদ্ম-নামে পারসিক পরিব্রাজকরূপে আফ্‌গানি-স্থানের রাজধানী কাবুল নগরে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে আমীরের অতিথিস্বরূপ অবস্থান করিয়া সমস্ত আফ্‌গানিস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারই ভ্রমণ-ডায়ারী অবলম্বনে যুক্তরাজ্যের বোগ্‌দাদ-স্থিত রাজদূত ফে্‌ডারিক সিম্‌পিচ্‌ একটি কাহিনী লিখিয়া আমেরিকা হইতে প্রকাশিত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের "দি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্‌ ম্যাগাজিন" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন। মিষ্টার সিম্‌পিচও সমগ্র ভারতবর্ষ ও উত্তর পারস্য পরিদর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাঁহারই ইংরেজ প্রবন্ধ হইতে অনুদিত হইয়াছে। ঐ ইউরোপীয় ভদ্রলোকের আফ্‌গানিস্থান ভ্রমণ রাজনৈতিক ও সামরিক বিশেষত্বপূর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার নিকট কখনও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিবরণ ও অভিমত আশা করা যায় না। তাই অনাবশ্যক ও অসাময়িক বোধে স্থানে স্থানে কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

—অনুবাদক।

রুর অবরোধের কারণ -

জার্ম্মানী পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি-মত ক্ষতিপূরণ করিতে অসমর্থ হওয়াতে ফ্রান্স্ তাহা আদায় করিবার অছিলায় রুর প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিল, এবং রুরের কয়লার খনি ও বনবিভাগের কাজ নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত করিয়া তাহার আয় ফরাসী সরকারে বাজেয়াপ্ত করিবার অভিপ্রায় জানাইল। এই কার্য্যে যদি জার্ম্মান জাতি বাধা প্রদান করে তবে রাইন প্রদেশকে জার্ম্মানী হইতে বিচ্যুত করিয়া রাইন্‌ল্যাণ্ডে একটি স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া ফ্রান্স্ ঘোষণা করিল। জার্ম্মানী হইতে রাইন্‌ল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায় ফ্রান্সের অনেক দিন হইতেই ছিল।

বিসমার্কের চেষ্টায় যখন প্রুসিয়া সমস্ত জার্ম্মানীর উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল তখন হইতেই রাইন্‌ল্যাণ্ডকে জার্ম্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ফ্রান্সের একদল লোক প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিল। সুবিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক তিয়ের্ এই দলের প্রধান নায়ক ছিলেন। নেপোলিয়ানের বিজয় অভিযানে বহু ফরাসী বীর রাইন্‌ল্যাণ্ড জয় করিতে দেহপাত করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যরক্তরঞ্জিত দেশ যাহাতে ফ্রান্সের সহিত মিলিত হয় তাহার জন্য তিয়ের্ অনেক চেষ্টা করেন। তিনি প্রচার করেন যে ফ্রান্সের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখা সমুদ্র, পিরিনিস পর্ব্বত, আল্পস্ পাহাড় ও রাইন নদী। জার্ম্মানী রাইন প্রদেশ অধিকার করিয়া ফ্রান্সের প্রকৃতিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে রাইন আন্দোলনের ফরাসী নেতা হইলেন মরিস্ বারেস।

ইনি বলেন, জার্ম্মান আক্রমণের আশঙ্কাকে নষ্ট করিতে হইলে ফ্রান্সের পক্ষে রাইন্‌ল্যাণ্ডে প্রুসিয়ান প্রভাব হইতে নির্ম্মুক্ত একটি স্বাধীন রাজ্যের স্থাপনা একান্ত প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ড যেমন ভৌগোলিক কারণে আয়ারল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে পারে না, ফ্রান্সের এত সন্নিকটে জার্ম্মানীর ন্যায় প্রবল শত্রু থাকাতে রাইন্‌ল্যাণ্ডে আপনার প্রয়োজনমত কতকগুলি সর্ত্ত আদায় করিয়া না লইলে নিরাপদে বসবাস করা ফ্রান্সের পক্ষে তেমনই অসম্ভব। তাই তিনি বলেন—"We have Geographical arguments to consider in our relations with Germany. We do not yield a particle on this point. The Rhine Country must be a safety zone for France. In our age, the only effective guaranties are economic. We must have, on the Rhine, economic guaranties that are practical and certain."

বর্ত্তমান যুগে ধনই সকল শক্তির কেন্দ্র। ধন যাহার আয়ত্তে তাহারই প্রভাব টিকিয়া থাকে। তাই রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীনে রুর প্রদেশকে না আনিয়াও তথায় আপন প্রভাব স্থায়ী করিবার জন্য ফ্রান্স্ রুরের ধন-সম্পত্তিকে আয়ত্ত করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। ক্ষতিপূরণ করিতে জার্ম্মানী অপারক হওয়াতে ফ্রান্সের সুযোগ জুটিল। ফ্রান্স্ রুর প্রদেশ অধিকার করিয়া খনি ও বন-বিভাগের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করিল। ইহার মূলে জার্ম্মানীকে পদদলিত করার উদ্দেশ্যই নিহিত আছে। Nation পত্রিকা এই সূত্রে বলেন—"obviously if the German mines can be controlled, Germany herself can be controlled."

রুর প্রদেশ অধিকার করিতে পারিলে ফ্রান্সের পক্ষে লাভ দুই দিকেই। একদিকে রুরের খনিজসম্পত্তি নিজ অধিকারে আসিলে ফ্রান্সের শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে জার্ম্মান শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হইয়া জার্ম্মানীর আর্থিক দুর্গতি যত ঘটিতে থাকিবে জার্ম্মানী ততই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবার অধিক সম্ভাবনা ঘটিবে; ফ্রান্সের পক্ষে তাহা পরম লাভের বিষয়। ইংরেজ কিন্তু নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্যাপারে ফ্রান্সের সহায়তা করিতে পারে না। রুর ফরাসীর হাতে আসিলে ইংরেজের সমূহ ক্ষতি। রুরের কয়লাখনি ইস্পাত প্রস্তুতের উপযোগী কোক্ কয়লার জন্য প্রসিদ্ধ। কোক্‌কয়লা যেখানে পাওয়া যায় সেই স্থানেই ইস্পাত প্রস্তুত সুবিধাজনক, তাই স্পেন ও সুইডেন হইতে বহুল পরিমাণে লৌহ রুর প্রদেশে আমদানী হয়। রেলপথ হইতে নৌপথে মাল সরবরাহ সস্তায় হয়। সেইজন্য এইসব লোহা নৌপথে হল্যাণ্ড ঘুরিয়া নদীর মধ্য দিয়া রুর প্রদেশে চালান্ আসে। কাঁচা-লোহা-বোঝাই নৌকা রুরে বোঝা নামাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ইস্পাত এবং খাদ্য-সামগ্রী বোঝাই করিয়া চলিয়া যায়। এই আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারটা ইংরেজদের পরিচালনেই চলিয়া আসিতেছে।

Furness Withey & Co. নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজ জাহাজী কোম্পানীর হাতে ইহার শতকরা ছিয়ানব্বই ভাগ কারবার।

ফ্রান্সের হাতে রুরের কয়লাখনি পড়িলে এই ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষতির অন্ত থাকিবে না। ইংরেজ কয়লাখনির মালিকদের ক্ষতিও যে কম হইবে তাহা নহে। জার্ম্মানীর সার্ প্রদেশ, বেল্‌জিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রীয়ার টেসেচেন প্রদেশ, পোলাণ্ডের ডোমব্রোয়া এবং আপার সাইলিসিয়া প্রদেশ প্রভৃতির প্রসিদ্ধ কয়লার কারখানাগুলি ফ্রান্সের হাতে আসাতে ফ্রান্স্ কয়লার কারবারে ইংরেজের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রুরের কয়লা ইংরেজদের ডারহাম, ফাইফ, ইয়র্ক্‌শায়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কয়লার কারখানার কয়লা হইতেও উৎকৃষ্ট। এই রুরের কয়লা যদি ফ্রান্সের আয়ত্তাধীনে আসে তাহা হইলে ইংরেজের কয়লার কারবারের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া পড়ে। অন্য দিকে জার্ম্মান কয়লার মালিক ষ্টিনেস্, রাটেনো, হ্যানিয়েল প্রভৃতিদের সঙ্গে ইংরেজ কারবারী এলারম্যান, পিস, ফারনিস প্রভৃতির কারবার বহুদিনের। রুর

জার্ম্মানীর হাতে থাকিলে এই-সব যুদ্ধে-বিপন্ন জার্ম্মান কারবারী-দিগের নিকট হইতে অনেক সুবিধা ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। সেইজন্যই ইংরেজ ফ্রান্সের রুর অব-রোধে বড় প্রসন্ন নহে। এই সূত্রে পার্লামেণ্ট্ মহাসভার সভ্য মিঃ নিউবোল্ড বলেন,—

"France is only too obviously desirous of making Germany bankrupt, and causing her to default in her payments of reparation and in-demnity. France wishes to foreclose upon the debtor and to take by way of compensation, at terrifically depreciated values the magnificent means of production which Germany has developed in the Rhine Valley. The political and economic aspiration of Parisian high finance aiming at the buying up at bankrupt prices of all kinds of industrial concerns in the Rhine Valley and their exploitation to the detriment of British exporters, conflict with the ambitions of the Dutch financiers as well as British industrialists. The British will therefore like to come to the aid of German Government and save it from bankruptcy by extending to it credits. They would like to do a trade with Stinnes, Haniel and Rathenau as they have already done with Simon Krausz in Hungary."

জার্ম্মানীর ক্ষতিপূরণ প্রদানের অন্তরায় পরোক্ষে ফ্রান্সই হইয়াছে। পঁয়াকারে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "আমরা জার্ম্মানীর বাণিজ্য নষ্ট করিয়া দিবার শক্তি ধারণ করি এবং এই শক্তির ব্যবহার করিয়া জার্ম্মান পণ্য ও শিল্পের ধ্বংসসাধন করিতে আমরা পরাঙ্মুখ হইব না।" হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া জার্ম্মান পণ্যশিল্পের অবাধ যাতায়ত বন্ধ করিতে সমর্থ হইবার উদ্দেশ্যে ভার্সাই সন্ধিসূত্রের সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া ফান্স্ রুরট ড়ুসেল্‌ডর্ফ্ ও ডুইস্‌বুর্গ্ অধিকার করেন। রাইনের অপর পারে জার্ম্মানীর মধ্যে মাল রপ্তানীর উপর শুল্ক বসাইয়া জার্ম্মানীতে প্রস্তুত রঙ্গের শতকরা যাটভাগ আদায় করিয়া লইয়া জার্ম্মান শিল্পের অবনতি ঘটাইবার প্রয়াস ফ্রান্স্ করিতেছেন। কাজে-কাজেই জার্ম্মানীর পক্ষে ক্ষতি-পূরণের টাকা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। জার্ম্মানীকে দেনদার করিয়া রাখাই ফ্রান্সের অভিপ্রায়। জার্ম্মানীর ঋণভার হইতে মুক্তিলাভ করিলে ফ্রান্সের পক্ষে বড়ই বিপদের সম্ভাবনা। ফ্রান্সের জন-সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে জার্ম্মানীর লোকবল খুবই বেশী। জার্ম্মানজাতি দক্ষতায়, কর্ম্মেচ্ছায় এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিতে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যুদ্ধে হারিয়া গিয়াও জার্ম্মানী আপন শক্তি হারায় নাই। নূতন করিয়া গঠন করিবার কাজে জার্ম্মানী যে পরিমাণ সজীবতা দেখাইয়াছে তাহাতে ফ্রান্সের ভয় পাইবারই কথা। তাই জার্ম্মানীকে নানা প্রকারে দুর্ব্বল করিবার অভি-সন্ধি ফ্রান্স্‌কে খুঁজিতে হইতেছে। রুর অধিকার এইরূপই একটা অভিসন্ধির ফল।

রুর অবরোধের পরে—

জার্ম্মানী ইচ্ছা করিয়া প্রতিশ্রুতিমত ফ্রান্স্‌কে কয়লা সরবরাহ করে নাই এই অভিযোগ করিবার সুযোগ পাইয়া ফ্রান্স্ রুর প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। জার্ম্মান-সরকার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে জার্ম্মান জাতি আপন প্রতিশ্রুতিরক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফ্রান্সের দাবী জার্ম্মান জাতির পক্ষে এত অত্যধিক যে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা জার্ম্মানীর পক্ষে অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত দাবী না রাখিতে পারার জন্য ফ্রান্স্ নিজেই দায়ী। রুরট, ডুইস্‌বার্গ ও ডুসেল্‌ডর্ফ্ অন্যায়রূপে অধিকার করিয়া, অধিকৃত প্রদেশে সামরিকআইন জারি করিয়া, দেশবাসীর প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিয়া ফ্রান্স্ যে ঘোর অশান্তি সৃজন করিয়াছে তাহার ফলে জার্ম্মানীর সর্ব্বত্রই শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কিম্বা কার্য্যে অবহেলা করিয়া কয়লা-সরবরাহ-কার্য্যে বাধা ঘটাইয়াছে। ইহার জন্য জার্ম্মানীকে দোষী সাব্যস্ত করা অন্যায়। যদি কাহারো দোষ থাকে তবে তাহা ফ্রান্সের। ফ্রান্স্ কিন্তু ক্ষতিপূরণ-বৈঠকের নির্দ্ধারণ অনুসারে জার্ম্মানীকেই দোষী সাব্যস্ত করিল এবং রুর প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল। জার্ম্মান নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সের কার্য্যে বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিলেন এবং ভার্সাই সন্ধিসূত্রের সর্ত্ত অনুসারে ক্ষতি-পূরণ করিবার দায়িত্ব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া প্রচার করিলেন। জার্ম্মান ধনসম্পদের কেন্দ্র রুর প্রদেশ অধিকার করিয়া ফ্রান্স্ জার্ম্মানীর ধনবলের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত জার্ম্মান জাতি অহিংস অসহযোগনীতি অবলম্বন করিয়া ফরাসীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। ফরাসী সৈন্যের রুর প্রদেশে প্রবেশ ভার্সাই সন্ধিসূত্রের বিরোধী মনে করিয়া মার্কিন সরকার এই কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ আপন সৈন্য জার্ম্মানী হইতে সরাইয়া লইলেন।

ইংরেজ সরকারকেও মার্কিনের পদানুসরণ করিতে অনেক ইংরেজ রাষ্ট্রীয়নেতা অনুরোধ করিলেন। বৃটিশ মন্ত্রীসভা নির্দ্ধারণ করিলেন যে যেহেতু ফরাসী নীতির ফলে আর্থিক সুবিধা ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না, বরং ইহা জার্ম্মান জাতির আর্থিক দুরবস্থা ঘটাইয়া ভবিষ্যতে নানা নূতন গণ্ডগোল সৃজন করিতে পারে, সেহেতু ইংরেজ-সরকার কয়লাখনি অধিকার ব্যাপারে ফরাসী জাতির সহায়তা করিবেন না। কিন্তু ফরাসী জাতির সহিত ইংরেজের যে মিত্রতা, তাহা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্য ইংরেজ-সরকার বর্ত্তমানে জার্ম্মানী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইবেন না। জার্ম্মান প্রধান মন্ত্রী কুনো এক ইস্তাহার জারি করিয়া ঘোষণা করিলেন যে জার্ম্মানী যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, সেজন্য যুদ্ধ-ঘোষণা করা হইবে না। কিন্তু জার্ম্মানী এত নিরুপায় নহে যে সে বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপমান ও নির্য্যাতন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবে। জার্ম্মানী নিশ্চিন্ত প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়া ফ্রান্সকে প্রতি পদেই বাধা দিতে থাকিবে। এবং ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ করাতে জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ করিতে আর বাধ্য বলিয়া স্বীকার করিবে না।

জার্ম্মান কর্ম্মচারীগণ এবং ব্যবসায়ীবৃন্দ জার্ম্মান-সরকারের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। চারিদিকেই ধর্ম্মঘটের সাড়া পড়িয়া গেল।

ফরাসী সেনাপতি জেনারেল দেগুৎ ইহার প্রতিকারের জন্য সামরিক আইন জারি করিলেন।

ইংল্যাণ্ডের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব রোল্যাণ্ড ম্যাক্‌নিল ইংরেজ-সরকারের আচরণের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে ইংরেজ ও ফরাসী জাতির মধ্যে ক্ষতিপূরণ-সমস্যা লইয়া যে মতান্তর তাহা দুইটি জাতির বার্ত্তাশাস্ত্রের দৃষ্টির বিভিন্নতা হইতে উদ্ভূত। ফরাসী পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে জার্ম্মানীর প্রধান

প্রধান কারখানাগুলি (Manufactury) হস্তগত করিতে পারিলেই জার্ম্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় সহজ হইবে। তাই জার্ম্মানীর বাণিজ্যকেন্দ্র রুর অবরোধ করিতে ফরাসী জাতির এত আগ্রহ। কিন্তু ইংরেজ পণ্ডিতরা মনে করেন যে এইরূপে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা অসম্ভব। কোনও সুসংবদ্ধ ও সুপরিচালিত জাতির আশাকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়া তাহাকে অবনত রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা। জার্ম্মানীর নিকট টাকা আদায় করিতে হইলে জার্ম্মানীর প্রদান করিবার ক্ষমতার প্রতি যাহাতে সকলের আস্থা বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা দেখা উচিত এবং সেইজন্য জার্ম্মান বাণিজ্যের প্রসারে বাধা প্রদান করা উচিত নহে। ইংরেজ নীতি জার্ম্মানীর প্রতি প্রীতিপ্রসূত নহে, ইহা মিত্র-শক্তিবর্গের মঙ্গলের জন্য।

ফ্রান্স্ কিন্তু আপন শক্তির উপর নির্ভর করিয়া রুরের কয়লাখনি চালাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত জার্ম্মান জাতির নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ফলে ফরাসীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। অবরুদ্ধ প্রদেশে কোন কাজই সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করা যায় কি না দেখিবার জন্য হ্যার্ টাইসেন এবং আরও পাঁচজন খনির মালিককে ধরিয়া সামরিক বিচার আদালতে ফ্রান্সের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হইল। টাইসেন এবং অন্যান্য জার্ম্মান বন্দীরা নির্ভীক হৃদয়ে মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে ফরাসী জাতীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। টাইসেনের বন্ধনের প্রতিবাদ করিয়া ষ্টিনেস্ হানিয়েল, মুলার প্রভৃতি কয়লার খনির মালিকেরাও কাজ বন্ধ করিলেন। ষ্টিনেস্ ফ্রান্সের বিধ্বস্ত প্রদেশসমূহ নির্ম্মাণের জন্য ফরাসী সরকারের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহা মানিতে অস্বীকার করিলেন। জার্ম্মান শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়া থাকাতে তাহাতে যে অর্থের কষ্ট হইতেছে তাহা দূর করিবার জন্য সার্ব্বভৌমিক ব্যবসায় সম্মিলন মহাসভা (International Trade Union Congress) ও সার্ব্বভৌমিক শ্রমিক মহাসংঘ (International Labour Union) সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। ইংরেজ শ্রমিকদল ও সুইডেনের শ্রমিক-দল ফ্রান্সের অন্যায়কর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। সুইডেনের শ্রমিকনেতা ব্রান্টিং জাতি-সমূহের সংঘে ফ্রান্সের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জাতিসংঘের কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। হ্যার্ কুনো রাইন্‌ল্যাণ্ড্ পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মঘট যাহাতে আরও প্রবল হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। ধর্ম্মঘট ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া ইংরেজ-সরকার সৈন্য প্রত্যাহার করিবার কল্পনা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। জার্ম্মানীর এই অভিনব সংগ্রামের ফল কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

লোজান বৈঠক—

লর্ড কার্জ্জন ও ইস্মৎ পাশার মধ্যে বহু তর্কযুদ্ধের পর তুরস্কে বিদেশীয় ব্যবসায়ীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও মোজল অধিকার এই দুইটি প্রধান বিষয় ভিন্ন অন্য প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটা মীমাংসা সম্ভবপর হইয়া উঠিল। দুই একটি বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমানে একটু চাপা দিয়া অন্যান্য বিষয়গুলির রফানিষ্পত্তি করিবার জন্য ইংরেজ-সরকার একটি খসড়া সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন। এই সন্ধিসর্ত্তের কতকগুলি সর্ত্তেও তুরস্ক ঘোর আপত্তি জানাইলেন। ইংরেজ-সরকার এই সন্ধিসর্ত্তে গ্যালিপোলিতে নিহত ইংরেজ ও উপনিবেশবাসী সৈন্যের কবর যে ভূমিখণ্ডে আছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অধিকার দাবী করিলেন। এই ভূমিখণ্ডের সকল ব্যবস্থা ইংরেজের হস্তে না থাকিলে ইংরেজের স্বদেশপ্রীতি ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়া ইংরেজ-সরকারের ধারণা। তুরস্ক-সরকার বলিলেন যে মৃতদেহ যে স্থানে প্রোথিত হইয়াছে সেইখানেই যে বরাবর রাখিতে হইবে এরূপ কোনও সামাজিক বা ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা ইংরেজের নাই। ইতিপূর্ব্বে অনেক সম্মানার্হ ব্যক্তির মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে। কাজে-কাজেই ইহা কখনই অপমানসূচক কাজ নহে। ইংরেজ-সরকার যদি ইচ্ছা করেন কবরস্থ মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া যাইতে পারেন। গ্যালিপোলির কোনও অংশে ইংরেজ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে তুরস্ক স্বীকার করিতে পারে না।

মদিনায় মোস্লেম-ধর্ম্মগুরু হজ্‌রৎ মহম্মদের কবর হইতে তুরস্ক-সরকার যুদ্ধের সময় যে-সমস্ত অমূল্য ধনরত্ন স্থাম্বুলে সরাইয়া লইয়াছিলেন তাহা ইংরেজের মুসলমান প্রজার ক্লেশের কারণ হইয়াছে, এবং প্রজার ক্লেশ দূর করিতে ইংরেজ-সরকার ন্যায়ত বাধ্য, এই কারণ দর্শাইয়া তুরস্ক-সরকারকে সেই-সকল দ্রব্যসম্ভার ফেরৎ দিতে ইংরেজ-সরকার অনুরোধ করিলেন।

তুরস্ক-সরকার উত্তরে বলিলেন যে এই-সকল রত্নরাজী মোস্লেম্-ধর্ম্মগুরু খলিফার রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবার কথা। খলিফাই ইহার ধর্ম্মসঙ্গত রক্ষক। মদিনা যতদিন পর্য্যন্ত খলিফার ছিল ততদিন এইগুলি মদিনাতেই ছিল। আরবের রাজা হুসেন ইহার রক্ষক হইতে পারেন না। যতদিন পর্য্যন্ত না আরবের পুণ্যভূমির অধিকার সম্বন্ধে একটা সুবিচার হয় ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থাই বাহাল থাকিবে। এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে মুসলমানের যাহা কর্ত্তব্য তাহা মুসলমান উলেমারা স্থির করিবেন। ইংরেজ-সরকারের তাহা স্থির করিয়া দিবার অধিকার নাই। তাই এসম্বন্ধে ইংরেজ-সরকারের কোনও কথা শুনিতে তুরস্ক সম্মত হইবে না।

তুরস্ক ছোট ছোট অনেকগুলি প্রস্তাব খুব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া তুরস্ককে ভয় দেখাইবার জন্য লর্ড্ কার্জ্জন জানাইলেন যে ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবারের মধ্যে তুরস্ক যদি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত না হয় তবে তুরস্কের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদন করিয়া লর্ড্ কার্জ্জন লোজান পরিত্যাগ করিবেন।

ফরাসী প্রতিনিধি ইস্মৎকে জানাইলেন যে লর্ড্ কার্জ্জন চলিয়া গেলেও ফরাসীরা তুরস্কের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকিবেন। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পঁয়াকারে ইংরেজ-সরকারকে জানাইলেন যে লোজান বৈঠক ভাঙিয়া গেলে তুরস্কের সহিত ভিন্ন বন্দোবস্ত করিবার অধিকার ফরাসী প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করিবে। ফরাসীর ব্যবহারে সাহস পাইয়া তুরস্ক আরও দৃঢ়তা অবলম্বন করিল। ইংরেজ-সরকার ছোট ছোট অনেকগুলি বিষয়ে তুরস্কের দাবী গ্রাহ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবার সময় ক্যাপিটুলেশন প্রসঙ্গে আবার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। তুরস্ক ক্যাপিটুলেশন স্বীকার করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে নারাজ হইল। তুরস্কের পশ্চিম সীমা গ্যালিপোলির গোরস্থান এবং দার্দ্দেনেলিশ প্রণালী সম্বন্ধে মিত্রশক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত তুরস্ক স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু ক্যাপিটুলেশন ও পবিত্র রত্ন-রাজী সম্বন্ধে ইংরেজ-সরকারের প্রস্তাব তুরস্ক গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। তাই লর্ড্ কার্জ্জন লোজান্ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

স্মার্ণাবন্দরে মিত্রশক্তিবর্গের যে-সব যুদ্ধজাহাজ ছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বন্দর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে তাহাদের প্রতি তুরস্ক-সরকার আদেশ করিয়াছেন। স্মার্ণার সেনাপতি মিত্রশক্তিবর্গকে

জানাইয়াছেন যে এই আদেশ মানিয়া না লইলে জোর করিয়া মিত্র-বর্গের জাহাজ সরাইয়া দিবার জন্য তিনি অ্যাঙ্গোরা-সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন। ইংরেজ-সরকার হুকুম না শুনিয়া আরও যুদ্ধজাহাজ স্মার্ণায় প্রেরণ করিয়াছেন। নৌসেনাপতি অ্যাড্‌মিরাল নিকলসন্ স্মার্ণায় ও স্যার অ্যাল্‌ফ্রেড চ্যাটারফিল্ড চানক অভিমুখে নৌবহর লইয়া রওনা হইয়াছেন। তুরস্কেও সাজসাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। প্রধান সেনাপতি সৈন্যবিভাগের সমস্ত কর্মচারীকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠা খুবই সম্ভব।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

বাংলা

বাঙ্গালার ব্যয় সংক্ষেপ—

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় কয়েক বৎসর যাবৎই অধিক হইতেছে। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয়-সংক্ষেপ করা যাইতে পারে তজ্জন্য বিগত জুন মাসে সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক কমিটী গঠন করতঃ গবর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগের আয় ও ব্যয়ের অবস্থা নিরাকরণ করিয়া তাঁহাদের মতামত দেওয়ার জন্য ভার দিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট এই কমিটীর মতামত গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন। কমিটি সুদীর্ঘ ছয়মাস কাল যাবৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণ ও বিভিন্ন বিভাগের আয়-ব্যয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

লাট সাহেবের কাউন্সিলের দুইজন সদস্য, একজন মন্ত্রী, বিভাগীয় সমুদয় কমিশনর, কয়েকজন সেক্রেটারী, অণ্ডার-সেক্রেটারী, ডেপুটী সেক্রেটারী, সব বিভাগেরই রেজিষ্ট্রার, পুলিশের এসিষ্টাণ্ট-ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল, চারিটি ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল ও রেজেষ্ট্রি বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেলের পদ রহিত করার জন্য মত দেওয়া হইয়াছে। লাটসাহেবের বডি-গার্ড, মিলিটারী বাদ্যকরদল রাখার কোনও আবশ্যক নাই বলিয়া মত দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতায় বর্ত্তমানে দুইটি পুলিস-কোর্ট আছে, তৎস্থলে একটি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সভাপতির পদ অবৈতনিক হইতে পারে।

শিক্ষা-বিভাগের গুরুট্রেনিং স্কুলসমূহ তুলিয়া দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণের ট্রেনিং বন্ধ করিতে এবং সব্-ইন্‌স্পেক্টর ও এসিষ্টাণ্ট সবইন্‌স্পেক্টরের পদ তুলিয়া দিতে বলা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের স্কুলগুলিকে জেলা-বোর্ড বা অন্য কোন কমিটীর হস্তে দিতে বলা হইয়াছে। মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলসমূহ, কলিকাতা ও ঢাকার ট্রেনিং কলেজ তুলিয়া দিতে বলা হইয়াছে। একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখিয়া আর সব কলেজ মাদ্রাসা ইত্যাদি জেলা-বোর্ড বা অন্য কোন কমিটীর হাতে ছাড়িয়া দিতে বলা হইয়াছে।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কমিটী ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি লক্ষ টাকা সাহায্য দিতে বলিয়াছেন।

বাঙ্গালায় ৩২৩ জন ডেপুটী ও ৩৫৮ জন সব-ডেপুটী আছেন। কমিটী ডেপুটীর সংখ্যা ২০০ করিয়া সব-ডেপুটী বাড়াইতে বলিতেছেন। মাজিষ্ট্রেটদের আরদালীর সংখ্যা কমাইতে বলা হইয়াছে।

অনেক ছোট ছোট জেলাগুলিকে একত্র করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

দেওয়ানী বিভাগে ১০ জন এডিশন্যাল ও ৫ জন সবজজের পদ কমাইতে এবং অনরারি মুন্সেফের পদ সৃষ্টি করিতে বলা হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ২১ জন জেলা-জজ, ১৫ জন এসিষ্টাণ্ট সেসন জজ, ৪০ জন সবজজ ও ২৪০ জন মুন্সেফ দ্বারাই দেওয়ানী বিভাগের কার্য্য চলিতে পারে।

সাক্ষীর খোরাকী বন্ধ করা যাইতে পারে। দেওয়ানী আদালতের ৩০০ আমলার পদ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। দেওয়ানী আদালত ১১৩ দিনের পরিবর্ত্তে ৯১ দিন বন্ধ দিলে খরচ কম হইবে বলিয়া কমিটী মনে করেন।

কোন বিভাগে মোটের উপর কত ব্যয় হ্রাস করা যাইতে পারে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

বিভাগের নাম।	কত ব্যয় হ্রাস হইবে	কত আয় বৃদ্ধি হইবে
সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট	—	৪ লক্ষ
আব্‌কারী ও লবণ	৫,০২,২০০	
বন-বিভাগ	৮,৭০০	
রেজিষ্ট্রেশন	৭২,৬০০	২০লক্ষ
খাল	—	৩½লক্ষ
কাউন্সিলের সভ্য ও মন্ত্রী	২,১৬,০০০	
গবর্ণরের কর্ম্মচারী	১,২০,০০০	
ব্যবস্থাপক সভা	২৭,৫০০	
গবর্ণমেণ্টের দপ্তর	৪,৫৫,৯০০	
বিভাগীয় কমিশনার	৫,২০,০০০	
রেভিনিউ বোর্ড	২৫০০০	
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বিভাগ	৪,১০,০০০	
দেওয়ানী ও সেসন আদালত	১১,৫০৭০০	১৯০০০০
কলিকাতায় মাজিষ্ট্রেট্	১৭০০০	
ছোট আদালত	৪,৮০০	
লিগেল রিমেম্ব্রান্সার	১৫০০	
পুলিস-বিভাগ	২৬,২৮,৮০০	
কলিকাতা-পুলিশ	৮,১৩,৫০০	
হস্তান্তরিত শিল্পবিভাগ	৩৫,৯৮,৮০০	
স্বাস্থ্য-বিভাগ	১,৭৬, ৩০০	
চিকিৎসা	২, ৯০,৫০০,	৫০,০০০
এঞ্জিনিয়ারিং-বিভাগ	৭,৬০০	৭৫০০০
পশু-চিকিৎসা	৯৫,৫৫০	৮০০০
কৃষি-বিভাগ	১৯২০০০	
সমবায়-সমিতি	২,৬৬৫০০	
শিল্প	৩০৭,৩০০	
পূর্ত্তবিভাগ	৮ লক্ষ	
কলেজ	২,১০,০০০	
কর্ম্মচারীর বেতন	৯লক্ষ	
ছুটি ও পাহাড়বাস	২,১০,০০০	
ভ্রমণ	৭লক্ষ	
নৌকা ষ্টীমার	২লক্ষ	
টেলিফোঁ	১,২০,৫০০	
আনুসঙ্গিক	১০লক্ষ	
রেশম-চাষ	১৯০০০	৫২০০০
বিবিধ		৮০,০০৪

ইহাতে শিল্প-বিভাগে ৬,২৫,০০০, কৃষি-বিভাগে ৩৮৫০৲ টাকা ক্ষতি হইবে। ইহা বাদ দিলেও সর্ব্বসমেত ১,৯০,২৫,৯২০৲ টাকা ব্যয় হ্রাস হইতে পারিবে।

—ময়মনসিংহ-সমাচার

আমাদের অর্থের অপব্যয়—

আবগারী-বিভাগ ভাঁটীখানা—তিন লাখ পনের হাজার। মাতাল সাম্‌লাবার কোতোয়ালের খরচা (Allowances & Contingencies)—পাঁচ লাখ একাত্তর হাজার।

শৈল-বিহার—ষাট হাজার, শফর—সাত লাখ, বাজে খরচ—এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ।

লাট সাহেবের দেহরক্ষী—এক লাখ বিশ হাজার।

পুলিশের লালটুপী আর কালো কোর্ত্তা—দুই লাখ তিয়াত্তর হাজার। থানাবাড়ীর খরচা—সাড়ে চার লাখ।

তিন শ' দশ জন শ্বেতাঙ্গ ছেলের স্কুল-খরচ—দুই লাখ।

কৃষি-বিভাগের মোড়লীর ব্যয় (Superintendence)—পাঁচ লাখ নব্বই হাজার। —বিজলী

ডাকাতি ও নরহত্যা—

সাপ্তাহিক ডাকাতির খতিয়ান। গত ১৭ই এবং ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাঙ্গালায় ৩৮টি ডাকাতি হইয়াছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বগুড়া, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পাবনা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এবং বাখরগঞ্জে একটি করিয়া; হুগলী, ২৪পরগণা ও ঢাকায় ২টি করিয়া; বর্দ্ধমানে ৩টি; দিনাজপুরে ৪টি; নদীয়া ও রংপুরে ৫টি; এবং মেদিনীপুরে ৬টি ডাকাতি হইয়াছে। —নবযুগ

বাঙ্গালার ডাকাতি, সপ্তাহে—২০টি। গত ৬ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গালায় সর্ব্বসমেত ২০টি ডাকাতি হইয়াছে। হুগলী, হাওড়া, দিনাজপুর, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরে—১টি করিয়া; পাবনা ও ২৪পরগণায় ২টি করিয়া; এবং এক ময়মনসিংহেই ৮টি ডাকাতি হয়। ময়মনসিংহে ডাকাতেরা নাকি বন্দুক লইয়া ডাকাতি করিতে আসে।

—বাঙ্গলার কথা

নরহত্যার সংখ্যা।—১৯২২ জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে সমগ্র বঙ্গদেশে ১৪৫ এক শত পয়তাল্লিশটি নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। ১৯২১ সালের এই কয় মাসে হইয়াছিল মোট এক শত একত্রিশটি; সুতরাং এবার চোদ্দটা বেশী নরহত্যা হইয়াছে।

—পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী

বাংলার স্বাস্থ্য—

বঙ্গে রোগের প্রসার।—কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগে বাঙ্গালার সকল অঞ্চলের নরনারীই নিত্য প্রপীড়িত। বঙ্গের গবর্ণর লর্ড লিটন বলেন—বঙ্গের ৪ কোটী ৬৫ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রতি বৎসর কলেরায় ভোগে আড়াই লক্ষ, মরে প্রায় চুরাশী হাজার। প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী বসন্ত রোগে ভুগিয়া থাকে, ইহার মধ্যে প্রায় সতের হাজার জনের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় ভোগে ৩ তিন কোটি নরনারী; তাহার মধ্যে ৩ লক্ষ মারা পড়ে। নানা রকমের জ্বরে ভুগিয়া প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পড়িয়া থাকে। শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অদ্ভুত। যত শিশু জন্মে, এক বৎসরে তাহার মধ্যে প্রতি হাজারে দুই শতটির মৃত্যু হয়।

—সম্মিলনী

কলিকাতায় আজ-কাল যক্ষ্মা রোগের বড়ই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এক্ষণে এই রোগের প্রকোপে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই রোগের এত প্রাবল্য কেন হইল, চিকিৎসকগণই তাহা ভাল বলিতে পারেন। তবে যক্ষ্মা রোগীর শ্লেষ্মা ও থুথু দ্বারা যে এই রোগের বীজাণু পরিবারের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং যক্ষ্মা-রোগী পিতা-মাতার সন্তান সন্ততি যে এই রোগগ্রস্ত হইয়া এক একটা বংশকে মাটী করিয়া দিতেছে, তাহা সচরাচর দেখা যায়। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলে রোগ-বিস্তৃতিটা কতক কমিতে পারে বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতার দেশীয় বস্তির পাড়াগুলির অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের অভাব, উপযুক্ত রৌদ্র ও আলোকের অভাব, গৃহের সঙ্কীর্ণতা, অপরিসর স্থানের মধ্যে পায়খানা, প্রস্রাবের স্থান, ময়লা জল ফেলিবার স্থান, ইহারই মধ্যে হাঁস, মুর্গী, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, গরু-বাছুরের থাকার জায়গা, নর্দ্দমা বা ড্রেন হইতে অনবরত দূষিত গ্যাস উত্থিত ও দুর্গন্ধ বিস্তৃত হওয়া, রাস্তার ধূলা বালি, নাক মুখ দিয়া উদরে প্রবেশ করা ইত্যাদিও যক্ষ্মা রোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। কেবল যক্ষ্মা কেন, কলেরা, উদরাময়, বসন্ত, প্লেগ, শ্বাসরোধ প্রভৃতি রোগেরও কারণ ইহাই। আর কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর অন্যতম কারণ এই ঘনবস্তি, ক্ষুদ্র গৃহে আলো এবং বিশুদ্ধ-বায়ুশূন্য গৃহে বহু লোকের বাস এবং "গলিজ গলাজৎ"। শহরের যত মহল্লা বা বস্তি ভাঙ্গা হইতেছে ততই অল্প স্থানের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। জমির মূল্য ও খাজানা বৃদ্ধি, ঘর ভাড়া বৃদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ইহা ঘটিতেছে। শহরের খুব নিকটে গরীব লোকদের বসবাসের সুবন্দোবস্ত ও যাতায়াতের সুবিধা না করিলে কলিকাতা ক্রমে "মরণাগারে" পরিণত হইবে।

—রায়তবন্ধু

কলিকাতাবাসীর অপব্যয়—

কলিকাতার রং-তামাসা।—শীতকালে কলিকাতায় নানা আমোদ-প্রমোদের প্রবল স্রোত চলিয়া থাকে। সময় বুঝিয়া নানা সার্কাস বায়স্কোপ, অপেরা প্রভৃতি রং-তামাসাওয়ালাগণ কলিকাতার নানা স্থানে ডেরা তাম্বু ফেলিয়া বোকা বঙ্গবাসীদের অর্থ শোষণে প্রবৃত্ত হয়। এই-সকল রং-তামাসায় কলিকাতাবাসীর কত লক্ষ টাকা উড়িয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। গড়ে ২০টা তামাসার আড্ডা (থিয়েটার সহ) যদি হয়, এবং যদি প্রত্যেক আড্ডায় দৈনিক গড়ে ১০০০৲ টাকা করিয়া আয় হয়, তবে দৈনিক ২০ হাজার টাকা, এবং মাসে ৬ লক্ষ এবং ৩ মাসে ১৮ লক্ষ টাকা লোকের হাত হইতে চলিয়া যায়। অবশিষ্ট নয় মাসে গড়ে ৫০০০৲ টাকা করিয়া হইলেও প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবার কথা। সুতরাং খুব কম পক্ষে গড়ে প্রায় ৩৩।৩৪ লক্ষ টাকা অসার আমোদ-প্রমোদে প্রতি বৎসর নষ্ট হয়। ইহার অর্দ্ধেক-টাকা বাঁচাইতে পারিলেও দেশের মহোপকার সাধন হইতে পারে। যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহা খুব কম করিয়া, বরং বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকাই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কারণ এতৎসঙ্গে মদ, সোডা, লেমনেড্, হোটেলের খানা, গাড়ী, ট্যাক্সি, ট্রামভাড়া প্রভৃতি আছে। তার পর থিয়েটার প্রভৃতিতে লোকের নৈতিক অধোগতি যাহা হয়, তাহা অবর্ণনীয়।

—নবযুগ

উত্তরবঙ্গের বন্যা—

মিঃ সি এফ্ এণ্ড্রুজ সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বিপন্ন অঞ্চলে কৃষকেরা

প্রত্যহই দলে দলে আসিয়া চাষের গরু ও বীজ ধান ক্রয়ের সাহায্য চাহিতেছে। নিম্নভূমি অঞ্চলে জমীতে চাষ দিবার সময় এখনই। আগামী কয় সপ্তাহের মধ্যে চাষ আবাদ আরম্ভ করিতে না পারিলে আগামী বৎসরও ভাল ফসল পাওয়া যাইবে না। উচ্চভূমিগুলির চাষ-আবাদের এখনও কিছু দেরী আছে, কিন্তু সে-সকল অঞ্চলের জন্যও অর্থসাহায্য আবশ্যক; কিন্তু বেঙ্গল রিলিফ কমিটির হস্তে পর্য্যাপ্ত অর্থ নাই। তাঁহাদের যাহা আছে, তাহার সাহায্যে তাঁহারা লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহাই উচিত ব্যবস্থা। কাজেই কৃষকদিগকে চাসের গরু ও বীজ দিয়া সাহায্য করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের উপরই পড়িতেছে। ওদিকে স্থানীয় জমীদারেরাও সরকারী খাজনা জোগাইতে ও অন্যান্য কারণে ইতিমধ্যেই গুরুতরভাবে পীড়িত। কাজেই তাঁহারাও কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। গভর্ণমেণ্টের এখন এই বাবদে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া দরকার। তন্মধ্যে পাঁচ লক্ষ এখনই দরকার, আর পাঁচ লাখ্ দুই মাস পরে দিলে চলিবে। গবর্মেণ্ট্ ধার করিয়া এ টাকাটার সংস্থান করিতে পারেন। এই আবশ্যক সাহায্যের ব্যবস্থা হইলে শ্রমিকরাও ভাবী দুর্ভিক্ষের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবে। এবৎসর চাসের ব্যবস্থা করিলে ফসলও ভাল পাওয়া যাইবে। আর, ব্যবস্থা না করিলে অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।

—নবযুগ

চাষের উপযুক্ত গোরু ও বলদের একান্ত অভাব; গ্রামে যে দুই চারিটি গোরু ও বলদ দেখা যায় তাহাও খাদ্যাভাবে শীর্ণ, কঙ্কালসার ও একরূপ অকর্ম্মণ্য। গোরু বলদ প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য যে কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা অতি নগণ্য। হিসাব করিয়া দেখিলে উহা জন-প্রতি আট আনার বেশী হয় না। এই গোরু ও বলদের অভাবে অধিকাংশ জমিই আবাদ হয় নাই, পতিত অবস্থায় আছে। আবার অনেকে সেরূপ ভাবে বীজও প্রাপ্ত হয় নাই। রবিশস্য যাহা রোপিত হইয়াছিল বৃষ্টি না হওয়ায় তাহার অবস্থাও আশাপ্রদ নহে।

—হিন্দুরঞ্জিকা

রাজসাহী জেলার বন্যাপীড়িত অনেক স্থান হইতেই আমরা সংবাদ পাইতেছি, সেখানে অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অদূরে অনাহার ও দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর অট্টহাস্য শ্রুতিগোচর হইতেছে। এতদিন বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি প্রভৃতি ও গবর্মেণ্টের সাহায্য পাইয়া এই-সব লোক কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া আছে। এপর্য্যন্ত অনেকেই যথোপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। যাহার বাড়ীতে ৪।৫ খানা গৃহ ছিল, সে একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পুত্র পরিজন লইয়া এই দুরন্ত শীতে তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। গবর্মেণ্ট্ যে পরিমাণ সাহায্য দান করিয়াছেন তাহাতে একখানা কুটীর নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ও সংকুলান হয় না।

—হিন্দুরঞ্জিকা

বাংলায় জলকষ্ট—

সমস্ত বঙ্গদেশেই ভীষণ জলকষ্ট হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায় বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত এই জলকষ্ট অতি প্রবল ছিল। জলদান অতি পুণ্য কার্য্য, অযাচিতভাবেও লোকে জল দিয়া থাকে। কিন্তু কঠিয়াদি থানার অন্তর্গত এক সৌধ-শোভিত বাড়ীতেও এক গ্লাস পানীয় জল প্রার্থনা করিয়া পাই নাই। জল-পানার্থ পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত প্রায় তিন মাইল স্থান ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, বাজিতপুর থানায়ও ঐরূপ তিন মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া স্নানাদি করিতে হইয়াছিল। নান্দাইল ঈশ্বরগঞ্জ, ইটনা, মিটামইন, কেন্দুয়া, তারাইল, করিমগঞ্জ কুলিয়ারচর, তপেনিখলি, হোসেন-পুর প্রভৃতি স্থানেও অবগাহন স্নানের কিছু মাত্রই সুবিধা ছিল না। কচিৎ দুই একটি পুষ্করিণী বা 'কুড়' কি নদীতে বারুণী যাত্রীর মত লোক ঠেলিয়া দিয়া দুই কি আড়াই মাইল দূর হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হইত। ভৈরব হইতে জল আনিয়া নান্দাইল ষ্টেশনে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইত। জলাভাবে বৃক্ষপত্রে আহার করিতে হইত, যেহেতু বাসনাদি ধৌত করা বা আচমনের জলও পাওয়া কঠিন ছিল। অনেকস্থানে এক কলসী পানীয় জল আট আনা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল, তাহাও অতি দুর্লভ ছিল। অতি বৃদ্ধেরাও এদেশে পূর্ব্বে এরূপ জলকষ্ট কখনও অনুভব করেন নাই।

—ময়মনসিংহ-সমাচার

মাগুরা থানার দ্বারিকাপুর হইতে মাগুরা পর্য্যন্ত নবগঙ্গা-তীরবর্ত্তী পল্লীসমূহে এই মাঘের প্রথম ভাগেই ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। নবগঙ্গার উত্তর তীরস্থ জনপদসমূহে একটিও পুষ্করিণী নাই। লোকে নবগঙ্গার জল পান ভোজনে ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানে ঐ নদীতে অতি সামান্য মাত্র জল অবশিষ্ট আছে। ঐ জলটুকু লোকে প্রত্যহ নানাভাবে দূষিত করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের বা পল্লীবাসীর কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

—আনন্দ-পত্রিকা

তুলায় ট্যাক্স—

'পাইওনিয়ার' পত্রে প্রকাশ, কার্পাস উৎপাদনের সুব্যবস্থার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে প্রতি তুলার গাঁইটে চারি আনা করিয়া ট্যাক্স্ বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই উপায়ে সরকারের আয় নাকি ৯ নয় লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাইবে।

—বাঙ্গলার কথা

সদনুষ্ঠান—

কাশীমবাজারের মহারাজের অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় কলিকাতা ২০নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে স্থাপিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্রগণের যথারীতি শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা অনেক আশান্বিত হইয়াছি।

—খুলনা

অনাথ-আশ্রমের আবেদন—

৩১ নং কালীঘাট রোডস্থিত নিখিল-ভারত আশ্রমে গড়ে প্রায় ২০০ অনাথ আশ্রয় পাইয়া আসিতেছে ও প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। আশ্রমের মাসিক খরচ গড়ে ২৫০০৲ হইয়াছে, দেনা দাঁড়াইয়াছে ৭০০০৲, তন্মধ্যে বকেয়া বাড়ী ভাড়া বাবদ ৪৬০০৲ ডিক্রী হইয়াছে। বাড়ীওয়ালা ১২০০৲ ছাড়িয়া দিয়া উচ্চ অন্তঃকরণ দেখাইয়াছেন। ইহার ভিতরে শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ছেলে-মেয়েদের স্কুল ছিল। শিল্পশিক্ষার জন্য ইহার সহিত কামারের কার্য্য, দর্জ্জির কার্য্য, ফটোগ্রাফের কার্য্য, বেতের কার্য্য ইত্যাদি খোলা হইয়াছিল। অর্থাভাবে সমস্ত বন্ধ করিতে হইয়াছে। সত্বর ব্যবস্থা আবশ্যক। আপনারা একবার কৃপাদৃষ্টি করুন। আশ্রমের উদ্দেশ্যে টাকাকড়ি কাপড়চোপড় অতি সামান্য দানও সাদরে গৃহীত হইবে। আশ্রমের সভাপতি—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সহকারী সভাপতি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র। সম্পাদক—শ্রীকালী লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার।

স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের উপায়—

পেঁপে একটি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় সুস্বাদু ফল। ইহা বাঙ্গলা

দেশের সকল জেলায়ই প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে ; আবার এক বৎসরের মধ্যেই ইহা ফল দান করে। ইহার চাষ করাও বেশী কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। মাটি কোপাইয়া বা লাঙ্গল দিয়া ভালরূপ চাষ দিয়া বীজগুলি ৭।৮ হাত অন্তর বসাইলে ক্রমশঃ সতেজ হইয়া উঠিবে। অবশ্য উপযুক্তরূপ গর্ত্ত করিয়া স্থানান্তরে বসানো ভাল ভাল চারা বাছিয়া রোপণ করিলেও চলিতে পারে, কম-জোর চারা না বসানোই উচিত। ছোটনাগপুর-রাঁচি অঞ্চলে একপ্রকার বৃহদাকারের পেঁপে হয় ; লাভের হিসাবে উহার চাষ করাই কর্ত্তব্য। কলিকাতার বাজারে উহার এক একটি পেঁপে গড়ে ।০—।৵০ বা ॥০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং ১ বিঘা জমিতে ৭ হাত অন্তর এক একটি চারা বসাইলে প্রায় ১৪০টি চারা বসিবে। মরা হাজা বাদ দিয়া ১২৫টি গাছ বাঁচিলে এবং প্রত্যেক গাছে বৎসরে গড়ে ১০টা করিয়া পেঁপে ধরিলে প্রতি গাছে ।০ আনা হিসাবে ২॥০ টাকা, এবং ১২৫ টি গাছে ৩১২॥০ টাকার পেঁপে হইতে পারে। সাধারণ বড় জাতীয় পেঁপেতেও ১৫০৲ টাকা লাভ হইবার খুব সম্ভাবনা। অবশ্য ইহা কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের কথা। রেলপথের ধারে দূরবর্ত্তী স্থানে বাগান করিলেও কলিকাতায় উহা চালান্ দিয়া লাভবান্ হওয়া যাইতে পারে। পেঁপেগাছগুলি ৩।৪ বৎসর ফল প্রদান করিবে ; অবশ্য পরবর্ত্তী বৎসর-সকলে ক্রমশঃ ফলন কম হইবে। কিন্তু তবু খরচ-খরচা বাদ ১০০৲ টাকা লাভ প্রতি বিঘায় হওয়া অসম্ভব নহে। চাকুরীর বাজারে যেরূপ আগুন লাগিয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের এই-সকল চাষবাসে মনোযোগী হওয়া উচিত। কৃষকদিগের ত বিশেষ ভাবেই পেঁপের বাগান করা কর্ত্তব্য।

—রায়তবন্ধু

এই কুল বা বরইর সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে টক কুলের অভাব নাই। কলিকাতায় চালান্ দিলে কম পক্ষে ২॥০—৩৲ মণ বিক্রয় হইতে পারে। সংগ্রহ-খরচ ও রেলভাড়াদি বাবদে ১৲ টাকা বা ১॥০ খরচ পড়িলেও মণ-প্রতি ১৲—১॥০ লাভ হইতে পারে। কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ও হইতে পারে। আবার একটু শুকাইয়া চালান্ দিলে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। মণ-প্রতি খুব কম পক্ষে যদি ১৲ টাকাও লাভ থাকে, ও ২০।২৫ মণও চালান্ দেওয়া যায়, তবে কম কথা কি? সামান্য আয় বা লাভকেও উপেক্ষা করিতে নাই।

—রায়তবন্ধু

পল্লী-সংস্কার—

ভারতসভা বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় ৩।৪টি আদর্শ পল্লীসমাজ গঠন করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

"যে স্থলে পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে তথায়

১। বালকবালিকাদের জন্য প্রাইমারী স্কুল ও প্রবীণদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয়

২। সাধারণের জ্ঞানোন্নতির জন্য পাঠাগার

৩। রোগীদের জন্য চিকিৎসালয়

৪। রোগ নিবারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, জলপ্রণালী নির্ম্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার, ধাত্রী নিয়োগ, সংক্রামক ব্যাধির সময় ঔষধ বিতরণ, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ সহ প্রসূতি ও শিশুর জীবন-রক্ষা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দান ইত্যাদির জন্য স্বাস্থ্যসমিতি

৫। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, ধান্য, পাট, আলু, তুলা ও ঘাসের বীজ বিতরণ ও ধর্ম্মশালা

৬। গৃহশিল্প—যথা বস্ত্রবয়ন, বাঁশ ও বেতের কাজ, লেস তৈয়ারীর জন্য কর্ম্মশালা

৭। কৃষক, তাঁতী, জেলে, কর্ম্মকার প্রভৃতির সাহায্যার্থ সমবায়-সমিতি ও ব্যাঙ্ক

৮। শালিসি আদালত ও গ্রামরক্ষা সভা

৯। বেকারদিগকে কর্ম্ম জুটাইয়া দেওয়া ও দরিদ্রের সহায়তার জন্য সাহায্যসমিতি

১০। দেশের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবার জন্য সংঘ

১১। পল্লীবাসীদের মনে পরস্পরের সেবা ও স্বাবলম্বনের ভাব জাগাইবার নিমিত্ত ভ্রাতৃমণ্ডলী,—প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

যাঁহারা এইরূপে পল্লীসংস্কার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভারত সভার সম্পাদকের নামে ৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

আমরা চাই স্বরাজ। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞানে উন্নত, দৈহিক শক্তিতে দৃঢ়িষ্ঠ, চরিত্রে পবিত্র, নরসেবাতে উৎফুল্ল, অর্থে সচ্ছল করিতে না পারিলে স্বরাজ যে কল্পনার বস্তু হইয়া থাকিবে, আমরা তাহা চিন্তা করিতেছি না।

ভারতসভা তাই পল্লীসমাজ গঠন করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞানী, সুস্থ, চরিত্রবান্ সেবাপরায়ণ ও শক্তিশালী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

—সঞ্জীবনী

বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়—

১৯২১ সনে বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৩৫৬৯৫ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩০৭০ টি উচ্চ প্রাইমারী ও ৩২৬২৫ নিম্ন প্রাইমারী পূর্ব্ববৎসর হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬১ হ্রাস পাইয়াছে।

—সম্মিলনী

কাপালিকের অত্যাচার—

কাপালিক।—কৃষ্ণচরণ দে ১২।১৩ বৎসরের বালক, ১৪।১ রাজচন্দ্র লেনে তাহার বাড়ী। একজন কাপালিক বালকটিকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। কাপালিক মধ্য-বয়সের লোক, উহার পরণে লাল কাপড়, মাথায় কোঁকড়া চুল। প্রকাশ, কাপালিক নেবুতলা অঞ্চলে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিতেছিল। কৃষ্ণচরণ তাহা শুনিয়া তথায় যায় ও আকৃষ্ট হয়। আর একটি বালক তথায় উপস্থিত হয়। কাপালিক তখন বালক দুটিকে লইয়া চলিয়া যাইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে ভুলাইবার জন্য ইন্দ্রজাল দেখায়। কাপালিক যখন খিদিরপুর ডকের নিকট উপস্থিত হয়, সেইসময়ে তাহার সঙ্গে ৬।৭ টি বালক ছিল। কৃষ্ণচরণের পরিচিত এক ব্যক্তি আফিস হইতে ফিরিতেছিল, সে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া আনে। অন্যান্য বালকদের গতি কি হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

—ঢাকা-প্রকাশ

বাংলার মেয়ে—

বাল্য-মাতৃত্বের ফলে বাঙ্গালী ক্রমে বামনের জাতিতে পরিণত হচ্ছে। এবারকার আদমসুমারীতে বালিকা-বধূদের সংখ্যা ও বয়স দেখিলেই ব্যাপারটা কিরূপ ভয়াবহ তা বোঝা যাবে—

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
১—২	৫	১৩
২—৩	১০৮	২৭

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
৩—৪	১৫৮	৫২
৪—৫	২৪৫	৭৪
৫—১০	১৪২৫	৬২৪
১০—১৫	১২,২০৬	৩৩৪০

তালিকা দেখ্‌লে আরও বোঝা যাবে যে, মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের অবস্থাই শোচনীয়। যাদের সমাজে এক বৎসর বয়সের মেয়েরও বিয়ে হতে পারে, তাদের সাগরের জলে ডুবে মরাই উচিত।

—(আঃ বাঃ)
দেশের বাণী

কলিকাতায় বালবিধবা—

গতবার লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে যে, এক কলিকাতা সহরেই ১৮,২৫৬ জন বালবিধবা আছে। ইহাদের মধ্যে ১৪,৭৪৯ জন হতভাগিনীর বয়স ১০ হইতে পনের বৎসরের মধ্যে। ১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্কা ২৬৯৬টি নাবালিকা বৈধব্যের নিগ্রহ ভোগ করিতেছে। নিম্নে যে বিবাহিত ব্যক্তির বয়স ও সংখ্যা দেওয়া হইল তাহা হইতে হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক জীবনের অবস্থা পরিস্ফুট হইবে।

বিবাহিত ব্যক্তি বয়স	হিন্দু	মুসলমান
১ হইতে ২	৫	১৩
২ হইতে ৩	১০৮	২৭
৩ হইতে ৪	১৫৮	৫২
৪ হইতে ৫	২৪৫	৭৪
৫ হইতে ১০	১৪২৫	৬২৪
১০ হইতে ১৫	১১,২০৬	৩৩৪০

খৃষ্টান অধিবাসীদের পূর্ণ সংখ্যা ৩৯,১৫৪। তাহার মধ্যে ২৩৯৬২ সংখ্যা অবিবাহিত এবং ১৫,৫৬৭ জন বিবাহিত। মোট অবিবাহিত নারীর সংখ্যা ৮,৮৫০।

—যুগবার্ত্তা

নারী-মঙ্গল—

গত অক্টোবর মাসে উত্তর চীন হইতে বাঁকুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মিত্র (মিশ্র) বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস্ মহোদয়কে একখানি পত্র লিখেন। ঐ পত্রের সঙ্গে একটি রৌপ্য পদক ও ৫০০ টাকার একটি পোষ্ট-অফিসের ক্যাশ্ সার্টিফিকেট্ ছিল। আশু-বাবু লিখিয়াছেন যে কলিকাতার আহিরীটোলার একটি বাঙ্গালী বধূর উপর তাঁহার শ্বশুরালয়ে যে অকথ্য নির্য্যাতন হইয়াছিল তাহা তিনি হিতবাদীতে পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে বঙ্গনারীর সামাজিক উন্নতিকল্পে তিনি উক্ত টাকা ও পদক দান করিলেন। এবং তাঁহার ইচ্ছা এই যে একটি মাতৃভক্তি-প্রচার-সমিতি গঠিত হউক এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যের জন্য উক্ত রৌপ্য পদক প্রতি বৎসর প্রদত্ত হউক।

এই বালিকাটির নির্য্যাতনের কথা বহুলোক পাঠ করিয়াছেন। কিছুদিন কাগজে হা-হুতাশও হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র এই চীন-প্রবাসীর হৃদয়ে তাহা যথার্থ আঘাত করিয়াছে। এ বিষয়ে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এইরূপভাবে অর্থদান আর কেহ করিয়াছেন শুনি নাই। বোধ হয় প্রবাসে হিন্দু-নারীর মাধুর্য্য ও বেদনা যথার্থ উপলব্ধি করা যায়।

মিষ্টার দত্ত তাঁহার প্রস্তাবটি বাঁকুড়া-অন্তঃপুর-শিক্ষাসমিতির সহিত আলোচনা করেন। ১১ই জানুয়ারী তারিখে উক্ত সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। আশু-বাবুর দানটি সমিতির হস্তে অর্পিত হইল।

২। মাতৃ-ভক্তি সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ- বা সঙ্গীত-রচয়িতাকে ঐ পদকটি প্রদত্ত হইবে। এই মর্ম্মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। রচনাগুলি সভাপতি মিষ্টার জি এস্ দত্ত আই-সি-এস্ মহোদয়ের নিকট ১৫ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। ঐ রচনাগুলিতে সমাজে বঙ্গনারীর স্থান ও অধিকার কি উপায়ে উচ্চতর করা যায় তাহার আলোচনা বা আভাস থাকা আবশ্যক।

৩। সমিতির মত এই যে বাঁকুড়াতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কাজ করিতে হইবে এবং ইহাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হইবে। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অর্থ কি ভাবে ব্যয় করা উচিত তাহা স্থির করা যাইবে।

৪। সমিতি আশু-বাবুকে তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি যে কার্য্যে আমাদের সাহায্য চাহিয়াছেন, তাহা অতি দুরূহ। বহু পরিশ্রম, বহু প্রচার, ও সমস্ত দেশের সম্মিলিত চেষ্টা আবশ্যক। একজন প্রবাসী বাঙ্গালীর এই সামান্য চেষ্টাটি একেবারে ব্যর্থ না হয়, সেজন্য আমরা দেশবাসীর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সম্পাদক, বাঁকুড়া-অন্তঃপুর-শিক্ষা-সমিতি।
সেবক

ভারতবর্ষ

লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি—

লাহোরে লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া খুব জোর আন্দোলন চলিয়াছে। কংগ্রেসের কর্ম্মচারীরা এই মূর্ত্তিটি সরাইবার জন্য আইন-অমান্যনীতি অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ধর পাকড় সুরু হইয়া গিয়াছে। লাহোর জেলা কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি ডাঃ গোপীচাঁদ সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ডাঃ গোপীচাঁদকে গ্রেপ্তার করার ফলে লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি সরাইবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দলে ভর্ত্তি হইতেছে। গত ৩০শে জানুয়ারী কংগ্রেস আফিস অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ ৪৯টি কোমরবন্ধ, এক হাজার লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তির ছবি এবং এই মূর্ত্তি-সম্পর্কিত সমস্ত কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরো অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তিটি লাহোরের মূল রাস্তার উপর স্থাপিত। লরেন্স দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে একটি কলম। নীচে লেখা রহিয়াছে—"তোমরা কলমের শাসন চাও, না তরবারির শাসন চাও?" মূর্ত্তিটি এরূপভাবে তৈরী যে এই লেখা না থাকিলেও অর্থ বুঝিতে দেরী হয় না। ২০ গজ লম্বা একটি ত্রিকোণাকৃতি জমির উপর মূর্ত্তিটি স্থাপিত। জমিটি গবর্মেণ্টের, কিন্তু উহা মিউনিসিপ্যালিটিকে নজর দেওয়া হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ মূর্ত্তিটিকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে এই মূর্ত্তিটির

নাচের লেখা তুলিয়া ফেলিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে মিউনিসিপ্যালিটির বিতর্কে ধরা পড়ে, সমগ্র মূর্ত্তিটি জাতির পক্ষে অবমাননাকর। সুতরাং লেখা উঠানোর বদলে মূর্ত্তিটিকেই সরাইয়া ফেলিবার প্রস্তাব সদস্যেরা সমর্থন করেন। সেই অনুসারে মিস্ত্রীও প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। তাহার পর নবেম্বর মাসে মহাত্মাজী লাহোরে যান। এরূপ মূর্ত্তি সরাইবার জন্য যে আইন অমান্য নীতি স্বচ্ছন্দেই অবলম্বন করা চলে সে কথা তিনিই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। ইহার পর হইতে মূর্ত্তিটিকে রক্ষা করিবার জন্য রীতিমত সৈন্য পাহারা বসানো হইয়াছিল। চারিমাস পূর্ব্বেও মিউনিসিপ্যালিটিতে আবার মূর্ত্তিটি অপসারিত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। কেবলমাত্র একজন ব্যতীত মনোনীত এবং নির্ব্বাচিত সদস্যের সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট, তাহা সত্ত্বেও অনুমতি দেন নাই। এখন কংগ্রেস আইন-অমান্যের দ্বারা মূর্ত্তিটি সরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। লাহোরের মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারেরা তাঁহাদিগকে কয়েকটি দিন সবুর করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধের খাতিরে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত লরেন্স-প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে সমস্ত কাজ বন্ধ থাকিবে।

ইতিমধ্যে লাহোরের মিউনিসিপ্যালিটিতে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। লালা উসুনফ রায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন—মিউনিসিপ্যালিটিতে মূর্ত্তিটি সরাইবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বিভাগীয় কমিশনারের আদেশে প্রতিমূর্ত্তিটি প্রকাশ্য স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে জনসাধারণের ভিতর ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং উক্ত আদেশ নাকচ না করা পর্য্যন্ত, মূর্ত্তিটি জনসাধারণের দৃষ্টির বাহিরে রাখিবার জন্য প্রতিমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে ২০ ফুট উঁচু প্রাচীর গাঁথিয়া দেওয়া উচিত। আলোচ্য বিষয়ের তালিকার ভিতর প্রস্তাবটি না থাকায় সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেন নাই। ৮ই ফেব্রুয়ারীর পরে এসম্বন্ধে আবার আলোচনা চলিবে।

এই কলিকাতা সহরের বুকের উপরেও এমন একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে, জাতির পক্ষে লরেন্সের এই প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষা যাহা কম লজ্জাকর ও অপমানজনক নহে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের আমদানী-করা অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিচিহ্নটি জাতিবিদ্বেষের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। লরেন্সের এই প্রতিমূর্ত্তিটির ভিতর তবু নাকি খানিকটা ঐতিহাসিক সত্য আছে। পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার রাজপুতগণকে একত্র করিয়া লরেন্স সত্য সত্যই নাকি মসী এবং অসি—এই দুইটির ভিতর একটিকে বাছিয়া লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ধকূপ-হত্যার ঐতিহাসিক সত্য যে কতটুকু, ঐতিহাসিকদের ভিতরেও তাহা লইয়া মতদ্বৈধের অন্ত নাই। তথাপি জাতির মিথ্যা-কলঙ্কের এই চিহ্নটি নিরাপদে এখনো কলিকাতার বুকের উপর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

জেলে অকালীদের প্রতি অত্যাচার—

গুরু-কা-বাগ হাঙ্গামার অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের জের এখনো শেষ নাই। খবরের কাগজে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ বাহির হইতেছে তাহা যেমন শোচনীয় তেমনি করুণ। জেলের ভিতর তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিতেছে। আমরা কয়েকটি জেলের অত্যাচার সম্বন্ধে জনরব এখানে দিতেছি।

আম্বালা জেলে অকালীরা প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন, অবাধ্যতার জন্য তাঁহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাহারই ফলে তাঁহারা অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। অকালীদের অভিযোগ, জেলে তাঁহাদের প্রতি যদৃচ্ছা ব্যবহার করা হয়, তাহাদিগকে গ্রন্থসাহেব রাখিতে দেওয়া হয় নাই। প্রায়োপবেশনের ফলে ২৪ জন শিখ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। অকালীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য জেলের অন্যান্য বন্দীরাও আহার করিতেছে না। মোটের উপর দুই শতেরও অধিক লোক প্রায়োপবেশনে যোগদান করিয়াছে। ৭০ জনকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া জোর করিয়া দুধ খাওয়ানো হইতেছে। তাহাদের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুণার য়ারবেদা জেলেও শিখ বন্দীগণ প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্মেণ্ট সম্প্রতি ইস্তাহার জারী করিয়া জানাইয়াছিলেন, বন্দীদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মের চিহ্নগুলি দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ কিছুই নাকি করা হয় নাই। সেখানে প্রায়োপবেশন পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। জেল-কর্ত্তৃপক্ষ কোনো সাক্ষাৎকারীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিতেছেন না। গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-কমিটি খবর জানিবার জন্য সর্দ্দার রঘুবীর সিংহকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও সাক্ষাৎকারের অনুমতি পান নাই।

মুলতান জেলে শিখ বন্দীদিগকে অখাদ্য খাইতে দেওয়ায় তাঁহারাও সকলে আহার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পন্থের জাঠাদার সর্দ্দার খড়্গসিংহের উষ্ণীষ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। তাঁহার অপমান সমস্ত শিখজাতি নিজের অপমান বলিয়া মনে করিতেছেন। ভাই রণবীর সিংহকে নাকি গোমাংস ও তামাক খাওয়াইবার ভয় দেখানো হইয়াছে। নাগপুর জেলের ভিতর তিনি কঙ্কালসার অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

আটক জেলে নয়জন কয়েদীকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অন্যের পরিত্যক্ত কাপড় সাফ করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে পরিধান করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই আদেশ অগ্রাহ্য করার জন্য বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দেরাগাজীখাঁ জেলের অবস্থা প্রতিদিনই গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। বহু অকালী ও কংগ্রেস-নেতা জেলে কামরার ভিতর সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে পড়িয়া আছেন। তাঁহারা প্রচণ্ড শীতে জর্জ্জরিত হইতেছেন। জলন্ধরের উকিল শ্রীযুক্ত এল নওবৎ রায়ের প্রতি আবার অতিরিক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শিরোমণি-গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-কমিটি জানাইয়াছেন, ফেরোজপুর জেলের অকালী কয়েদীরা সাংকালীন উপাসনার পর "সৎশ্রী অকাল" বলিয়া ধ্বনি করিয়াছিল, এই অপরাধে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কাহাকেও চিঠি লিখিতে পারিবেন না, কাহারও সহিত দেখা করিতে পারিবেন না, উপাসনার পুস্তক পাইবেন না, নিজের আহার্য্য নিজেরা রান্না করিয়া লইতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে নির্জ্জন কক্ষে থাকিতে হইবে। জ্ঞানী শের সিং এই দণ্ডিত কয়েদীদের ভিতর একজন। ইনি বিশেষ সুশিক্ষিত এবং শ্রদ্ধাভাজন শিখ নেতা। অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও কার্য্যতঃ ইঁহাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের অপেক্ষাও অধিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে। অন্ধ বলিয়া ইঁহার সঙ্গে একজন লোক থাকিত। সে লোকটিকে আর থাকিতে দেওয়া হইতেছে না। তাহার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত ইনি একটা নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ আছেন—এই কক্ষেই আহার করেন, এই কক্ষেই নিদ্রা যান এবং

এই কক্ষেই মল-মূত্র ত্যাগ করেন। ইহার ওজন ২৬ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। ভাই সাধু সিং এবং ভাই শরণ সিং উভয়েই এই ভাবে নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ আছেন। ইঁহাদের উভয়েরই ওজন যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেককে প্রত্যহ পনেরো সের করিয়া গম পিষিতে দেওয়া হয়। পুরা পনেরো সের পিষিতে না পারিলে দাঁড়া হাতকড়ি অথবা পায়ে শিকল দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

এই-সমস্ত অত্যাচারের সংবাদে পঞ্জাবে শিখ-সম্প্রদায়ের ভিতর ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দেরাগাজী খাঁ শহরে হরতালের পর হরতাল অনুষ্ঠিত হইতেছে। জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতারা প্রতিদিন শোভাযাত্রা বাহির করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। সভা-সমিতি করিয়া বক্তৃতা দিতেও তাঁহারা কসুর করিতেছেন না। গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-কমিটির ঘোষণা অনুসারে গত ১লা ফেব্রুয়ারী শিখেরা একত্র হইয়া ভগবানের কাছে তাঁহাদের এই নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের জন্য উপাসনা করিয়াছেন।

কংগ্রেস-কমিটির প্রস্তাব—

সম্প্রতি বোম্বাই শহরে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) মুলতানে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতর বিরোধ ঘুচাইয়া মিলন ও প্রীতির প্রতিষ্ঠার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সহযোগে একটি ডেপুটেশন মুলতানে পাঠানো হইবে।

(২) আগামী ১৮ই মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধীর কারারোধের এক বৎসর কাল পূর্ণ হইবে। উক্ত দিবস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভারতবাসীরা যেন শান্ত ও সংযতভাবে হরতালের অনুষ্ঠান করেন। তাহা ছাড়া ভারতের সমস্ত স্থানেই সভা আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাবটিও গ্রহণ করিতে হইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত সরকার ভারতের দাবী পূর্ণ না করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত দেশের লোক স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া অহিংস সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবে। মহাত্মা গান্ধীকে ১০ই মার্চ্চ গ্রেপ্তার করা হয়; ১৮ই মার্চ্চ তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সুতরাং ১০ই মার্চ্চ হইতে ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই নয় দিন তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের অর্থ-সংগ্রহের কাজে, স্বেচ্ছাসেবকদের নাম তালিকাভুক্ত করার কাজে এবং খদ্দর প্রচারের কাজে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) কমিটি পূর্ব্ব- ও দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতবাসীদের সমস্যার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন। ব্রিটিশ গবমেণ্ট যদি ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীদের ধন-প্রাণ নিরাপদ্ রাখিতে অসমর্থ হন তবে ভারতবাসীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার থাকিবে কি না সে সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে। এই কমিটি পূর্ব্ব- এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের কার্য্য সমর্থন করেন।

(৪) কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে কেমন কাজ চলিতেছে সেই সম্বন্ধে সাধারণ সম্পাদককে একটি রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

(৫) লাহোরের অধিবাসীরা লরেন্সের মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিমান জাতীয় অপমানটিকে সরাইবার উদ্যোগ করার জন্য কংগ্রেসকমিটি লাহোরের অধিবাসীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। কমিটি আশা করেন, নিরুপদ্রবভাবে তাঁহারা কার্য্য করিবেন, এবং এ কাজে যতটা আত্মত্যাগের প্রয়োজন তাহা দেখাইতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

(৬) কংগ্রেসের কাগজ পত্র রাখিবার জন্য একটি আফিস দরকার। দিল্লীর গান্ধীনগর-ম্যানেজিং-কমিটি কংগ্রেসকে কিছু জমি দান করিয়াছেন—এই জমির মূল্যের পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ টাকা। শেঠ রঘুমলও একটি বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য একলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কমিটি ইঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(৭) দেশের লোকের ভিতর কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা প্রচারের জন্য একটি ডেপুটেশন গঠিত হইবে। এই ডেপুটেশনে শ্রীমতী নাইড়ু, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, ডাক্তার আন্সারী, শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী এবং আরো দশজন সদস্য থাকিবেন।

(৮) পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ্ যদি সঙ্গত মনে করেন তবে মুলতানের লোকদের সাহায্যের জন্য ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে।

(৯) গয়ার বৌদ্ধ মন্দির বৌদ্ধদের হাতে যাওয়া উচিত কি না সে সম্বন্ধে তদন্তের ভার বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন—

মাদ্রাজের ইলোর সহরে সেদিন অন্ধ্র কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থির হইয়াছে কোকনদ শহরে আগামী ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

মুলশী-পেটায় সত্যাগ্রহ—

মুলশী-পেটায় সত্যাগ্রহীদের সংগ্রাম পুরা দমে চলিতেছে। বাঁধ বাঁধার কাজে বাধা দিতে আসিয়া গত ২২শে জানুয়ারী ৪১ জন স্বার্থ-ত্যাগী দেশভক্ত পুলিশের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। এই ৪১ জন বন্দীর ভিতর মহিলা ছিলেন ছয় জন এবং বালক ছিল দুইটি। সম্প্রতি ইঁহাদের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বিচারে সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুক্ত ভুস্কুটে এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইহার উপর তাঁহাকে আবার এক বৎসরের জন্য সচ্চরিত্রতার জামিনও দিতে হইবে। না দিলে কারা ভোগের মিয়াদ বাড়িয়া যাইবে আরো ছয় মাস। বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী তাজিদাস, রত্নগিরির কংগ্রেস-কর্ম্মী রামকৃষ্ণদাস মেঘরাজ, নাগপুরের শ্রীযুক্ত আপ্তে, মহারাষ্ট্র পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেলকার এবং আরো ১১ জনের প্রতি তিন মাস হইতে চারি মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ছয় জন চারি মাস হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ইঁহাদিগকেও সচ্চরিত্রতার জামিন দিতে হইবে। অন্যথা আরো ছয় মাস ইঁহাদিগকে জেলে থাকিতে হইবে। ছয় জন মহিলা এবং ১৩ জন পুরুষের প্রতি ৫০ টাকা হিসাবে জরিমানার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জরিমানার কড়ি না দিলে ইঁহাদিগকে একমাসের জন্য কারাগারে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। অতিথি, সুতরাং ইঁহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হইবে না। হুকুমের পয়সা সংগ্রহের জন্য ইঁহাদিগকে ১৫ দিন সময় দেওয়া হইয়াছে।

ন্যায়ের জন্য, অধিকারের জন্য, দেশের জন্য নর-নারী নির্ব্বিশেষে এই যে নিরুপদ্রব সংগ্রাম—ইহার ফল কখনো ব্যর্থ হইবে না। এইগুলিই জাতিকে মানুষ করিয়া তোলে, তাহাকে শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং তাহার স্বাধীনতা লাভের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া দেয়।

স্যার উইলিয়াম্ ম্যারিসের সৎসাহস—

স্যার উইলিয়াম ম্যারিসের ঘোষণা অনুসারে গত ২৯শে জানুয়ারী একজন ভিন্ন যুক্ত-প্রদেশের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। যাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই, তিনি নাকি বক্তৃতায় হত্যাকাণ্ডসাধনের জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় ৭০ জন বন্দী মুক্তি পাইয়াছেন।

কোচিনের শিক্ষা-ব্যবস্থা—

কোচিন রাজ্যের ১৯২১-২২ সালের রিপোর্ট্ বাহির হইয়াছে। শিক্ষা সম্বন্ধে কোচিন যে দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে এই রিপোর্টের ভিতর তাহার পরিচয় আছে। কোচিনের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, সেখানে এ ক্ষেত্রটায় অন্ততঃ বালকবালিকাকে পৃথক্ করিয়া দেখা হয় না,—উভয়ের শিক্ষার দিকেই সমান নজর দেওয়া হয়। কোচিনের লোকসংখ্যা মোটের উপর ৯,৭৯,০৮০ জন; এই লোকসংখ্যার ভিতর স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হইতেছে ৯৮,৬৩৫ জন। স্কুল, কলেজ, প্রাথমিক পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয়—এগুলির সংখ্যা প্রচুর এবং প্রতিদিন তাহা আরো বাড়িয়া উঠিতেছে। কোচিনের ১,৪১৮ বর্গমাইল সীমার ভিতরে ৩টি কলেজ, ৩৩টি হাই স্কুল, ৬৬টি মাঝারি স্কুল, ৯৯৫ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সেখানে ১৫টি নৈশ বিদ্যালয়, ৯টি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল, ১২টি রুরাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল এবং বালিকাদের জন্য অনেকগুলি গবর্মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল আছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্কার এবং দেশের লোকেরা সমানভাবে নজর দিতেছেন। সরকারী বিদ্যালয় সেখানে যেমন বাড়িয়া উঠিতেছে বে-সর্কারী বিদ্যালয়ও তেমনি বাড়িয়া উঠিতেছে। গবর্মেণ্ট অনুন্নত শ্রেণীর ভিতর শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিশেষ ভাবেই চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য নানা রকমের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহারা খুববেশী অনুন্নত শ্রেণীর, তাহাদের ছাত্রদের মাহিনা এবং থাকা ও খাওয়ার খরচা ত লাগেই না, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র, পাঠ্য পুস্তক, শ্লেট পেন্সিল প্রভৃতিও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। শিক্ষা-বিষয়টিতে অন্ততঃ আমাদের প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির কোচিনের নিকট হইতে পাঠ গ্রহণের যে প্রয়োজন আছে, এই রিপোর্টখানি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলেই তাহা বোঝা যায়। ভারতসাম্রাজ্যের ভিতর শিক্ষায় কোচিন দ্বিতীয় স্থানীয়; এখানকার লেখাপড়াজানা লোকের সংখ্যা শতকরা ২৮ জন; ব্রহ্মদেশের সংখ্যা শতকরা ৩১ জন।

শিশু-কল্যাণ-সমিতি—

বেরিলীতে প্রতিবৎসর প্রায় চারিহাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই শিশুদের প্রায় নয়শতটি এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হয়। শিশুমৃত্যুর এই অস্বাভাবিক অবস্থাটা দূর করিবার জন্য সেখানে সম্প্রতি একটি শিশু-কল্যাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২২,৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সমিতি আপাততঃ একজন লেডি ডাক্তার ও দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। কাহারো প্রসব-বেদনার সংবাদ পাইলেই এই লেডি ডাক্তার ও ধাত্রী দুইজনকে তাহার শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দশদিন পর্য্যন্ত প্রসূতি ও সন্তানকে প্রত্যহ দেখিয়া দেশী 'দাই'দিগকে উপদেশ দেওয়াও ইঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সমিতির দ্বারা একবৎসর-বয়স্ক শিশুদের চিকিৎসার জন্য একটি ছোট দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের অভাব অসংখ্য; এসব অভাবে ভুগিতে হয় স্থানীয় লোকদিগকেই; সুতরাং এসব অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য দেশের লোকদের ভিতরে তাগিদ জাগা সর্ব্বাগ্রে দরকার। পরস্পরের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থার দ্বারাই নাগরিক জীবনের বিকাশ ও সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মূষিকের অত্যাচার—

ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার কারণের অন্ত নাই। সম্প্রতি তাহার দুর্দ্দশার আর-একটি কারণ ধরা পড়িয়াছে। ইন্দুর, ভারতবর্ষের যে ক্ষতিটা করিতেছে 'পাব্লিক্ হেল্থ্ কমিশনার' তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে তাহার একটা পরিচয় দিয়াছেন। রিপোর্টে প্রকাশ—ব্রিটিশ ভারতে এক কালো ইন্দুরের সংখ্যাই নাকি প্রায় ৩৭,৫০,০০,০০০ এবং এই মূষিকদের দ্বারা শস্যের যে অপচয় হইতেছে তাহার পরিমাণ নাকি দশ লক্ষ টন। অর্থাৎ এই মূষিকের অত্যাচারে প্রতি বৎসর প্রায় ১৬ কোটি টাকার শস্য নষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই শস্য নাশই ইন্দুরের একমাত্র অত্যাচার নহে। ইহাদের দ্বারা মানুষের প্রাণ-হানিও যথেষ্ট হইতেছে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর যে-সব জীবাণু দেশের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে তাহার ক্ষতি খতাইয়া দেখিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। গত বিশ বৎসরের ভিতর এই কালো ইন্দুরের অনুগ্রহে প্রায় এককোটি লোকের জীবনান্ত ঘটিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা—

'আকাশবাণী' নামক পত্রিকা জানাইয়াছেন, আগ্রা, মিরাট, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রায় ৪,৫০,০০০ মুসলমান-রাজপুত হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও ইহাদের অনেক আচার ব্যবহার এখনও হিন্দুদের অনুরূপই রহিয়া গিয়াছে।

জানি না, আমাদের একালের মনু-পরাশরেরা বিধি-নিষেধের যে অচল-আয়তন গড়িয়া বসিয়াছেন তাহা ডিঙ্গাইয়া সমাজ ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে সাহসী হইবে কি না। কিন্তু এ সংবাদে ইতিমধ্যেই মুসলমানদের ভিতর বেশ উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। জমায়েৎ-উল্-উলেমা এই ব্যাপারের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন।

পঞ্জাবের একজন শিখ কোনো মুসলমান বালিকাকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। ইহাতেও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর নাকি ভীষণ চাঞ্চল্য এবং আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু চায় কেবল ত্যাগ করিতে, আর মুসলমান চায় কেবল গ্রহণ করিতে।

তালুক বোর্ডের স্বার্থত্যাগ—

মাদ্রাজের কোইলকুণ্ডলা তালুক-বোর্ডের সদস্যেরা স্থির করিয়াছেন, অতঃপর কেহ আর বোর্ডের সভায় যোগদান করার জন্য বারবরদারী খরচ গ্রহণ করিবেন না। এ ব্যাপারটার আরো বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, এ প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রেসিডেণ্ট্ বাৎসরিক বারোশত টাকা বরাদ্দের ভিতর হইতে চারিশত টাকা মাত্র এই বাবদে গ্রহণ করিবেন। এইরূপে উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা ইঁহারা একটি আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্যান্য ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড, লোকাল্ বোর্ডের সদস্যেরা এই তালুক-বোর্ড্টির আদর্শ লইয়া আলোচনা করিতে পারেন।

বিদেশীর দান—

স্যার আলেক্জাণ্ডার ম্যাকরবার্ট্ সম্প্রতি পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন।

মৃত্যুকালে বিলাতে তিনি যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ হইতেছে প্রায় ৩৯,৬০,০০০ টাকা। এই অর্থ ব্যয়ের যে ব্যবস্থা তিনি তাঁহার উইলে করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে, বিশেষতঃ ভারতবাসীদের কাছে। উইলে তিনি কানপুর এবং ধারিওয়াল পশম-ফ্যাক্টরীর ভারতীয় কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের প্রত্যেকের জন্য এক মাসের মাহিনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; কানপুরের হাসপাতালের জন্য মাসিক অন্ততঃ পনের শত টাকা হিসাবে সাহায্য ও কানপুরের প্রস্তাবিত শিল্প-শিক্ষালয়টিকে সাহায্য করার প্রস্তাবও এই উইলটির ভিতরে আছে। এইসব উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত অর্থের প্রায় এক পঞ্চমাংশ দান করিয়া গিয়াছেন। স্যার আলেক্জাণ্ডার দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষ ভাবে ছিল কানপুরে। সেখানে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁহার এই কর্ম্মক্ষেত্রটাকে ভুলিতে পারেন নাই। এদেশকেও যে ভালোবাসা যায়, স্যার আলেক্জাণ্ডারের নিকট হইতে সে পাঠটা অনেক শ্বেতাঙ্গই গ্রহণ করিতে পারেন। এদেশের কাছে ঋণী, এমন শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী—

১৯২১-২২ সালে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে রেলওয়ে কোম্পানী যে অর্থটা পাইয়াছেন তাহার পরিমাণ হইতেছে ২৮ কোটি টাকারও বেশী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে তাঁহাদের লাভের অঙ্ক হইতেছে যথাক্রমে, ১,৩৮,৪৭,০০০ এবং ২,২৯,৬৩,০০০ টাকা। এই আয়ের অনুপাতে যদি সুবিধা-অসুবিধার হিসাব-নিকাশটা খতাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুর্ভাগ্যের স্বরূপটা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। রেলওয়ে কোম্পানী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার দিকে নজর দেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে যেরূপ অন্ধ সেইটাই আমরা বিশেষ ভাবে আপত্তিজনক বলিয়া মনে করি।

সায়ান্স্ কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতা—

লক্ষ্ণৌ সহরে সম্প্রতি সায়ান্স্ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্যার বিশ্বেশ্বরায়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নানা রকমের হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, ভারতের দারিদ্র্য জগদ্দল পাহাড়ের মত ভারতের ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকিবার কোনোই মানে নাই—নানা দিকে তাহার এমন সব ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, যে-সব ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিতে পারিলে তাহার দারিদ্র্য সহজেই ঘুচিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন, এই-সব ক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক উন্নততর পদ্ধতি-গুলিই অবলম্বন করিতে হইবে। কৃষি সম্বন্ধে, খনিজ বিদ্যা সম্বন্ধে, ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি মানিয়া লইয়া সেই অনুসারে কর্ম্মপথ নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে এই বিজ্ঞানের যুগে উন্নতি লাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তিনি বলিয়াছেন—আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের কৃষি, আমাদের খাদ্যাভাব, আমাদের জীবনযাত্রার ধারা, এক কথায় আমাদের সমস্ত প্রকার সমস্যার সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পথ এবং নানা রকমের গবেষণার পথ ধরিয়া চলা একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। এই পথের অনুসরণের উপরেই এসব সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। অথচ এজন্য আমাদের মনের ভিতর বিশেষ তাগিদ জাগে নাই। যুদ্ধের ফলে আর-সমস্ত জাতির ভিতর নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং নানা রকমের অনুসন্ধিৎসার যে ঝোঁকটা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা হইতে আমরাই কেবল বঞ্চিত হইয়া আছি। দারিদ্র্য জিনিষটা এমন, যে চেষ্টা করিলেই তাহার প্রতিরোধ করা যায়। আমাদের ভিতর সেই চেষ্টাই জাগিতেছে না।

দেশের কাজ ও শারীরিক শক্তি—

বোম্বাইএর একটি সভায় 'রেড্ক্রশ' সোসাইটির ডিরেক্টর জেনারেল স্যার ক্লড্ হিল বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে যে লোকাধিক্য হইয়াছে একথা তিনি বিশ্বাস করেন না এবং এদেশের জনগণের খাদ্য যে এদেশে উৎপন্ন হইতে পারে না একথাও তিনি অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে করেন। তবে ভারতবর্ষ যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তাহার কারণ, অন্যান্য সুস্থ ও সবল দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষের লোকেরা অতিমাত্রায় দুর্ব্বল। সুতরাং এদেশের পক্ষে সকলের আগের কর্ত্তব্য হইতেছে, যাহাতে দেহের জোর বাড়ে, যাহাতে শারীরিক ব্যাধির আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারা যায় সেই সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলা। কারণ স্বাস্থ্যই মানুষের বল এবং বলের দ্বারাই সম্পদ অর্জ্জিত হয়।" স্যার ক্লড্ হিলের একথা বাঙ্গালীর পক্ষে আরো বিশেষ ভাবে খাটে। এই বাতাসে-হেলিয়া-পড়া দেহ লইয়া কোনো বড় কাজই যে করা চলে না তাহা বলাই বাহুল্য।

মন্ত্রীদের ত্যাগ—

আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার মন্ত্রীরা মাসিক ৫৩৩৩ টাকা মাহিনা পাইতেন। গবর্মেণ্টের অর্থভাণ্ডারে অর্থের অনাটন দেখিয়া তাঁহারা মাহিনার কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা ৪০০০ টাকা মাহিনায় কাজ করিবেন। চারিহাজার টাকা নেহাৎ অল্প স্বর্থ নহে। দুনিয়ার খুব কম দেশেরই মন্ত্রীর মাহিনা চারি হাজার টাকা আছে। তথাপি স্বেচ্ছায় যে ইঁহারা ১৩৩৩ টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন এজন্য ইঁহাদিগকে প্রশংসাই করিতে হয়।

কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষাও বড় কাজ করিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশেরই এক্জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য মামুদাবাদ রাজা। তিনি ১৯২৩ সালে বিনা বেতনে কাজ করিতে রাজি হইয়াছেন। তাঁহার অর্থের অভাব নাই। সুতরাং ত্যাগের দিক্ দিয়া ইহার মূল্য খুব বেশী না হইলেও, আদর্শের দিক্ দিয়া ইহার দাম বড় কম নহে।

জেলে পার্ব্বতী দেবী—

পাঞ্জাবের মহিলা-কর্ম্মী শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী মিরাট জেল হইতে আগ্রা জেলে আসিয়াছেন। এখানে তাঁহার প্রতি সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইতেছে। এই দারুণ শীতে তাঁহাকে দুইখানা মাত্র কম্বল ব্যতীত আর কোনো বিছানা দেওয়া হয় নাই। মিরাট জেলে তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, আগ্রা জেলে কিন্তু তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মল্লবিদ্যাশালা—

আজমীরে একটি মল্লবিদ্যাশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ডাকাতি বা বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যাশালার ছাত্রেরা লাঠি ও তলোয়ার খেলিতে পারে এবং ধনুর্বিদ্যাতেও তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করে। রাজস্থানের এই মল্লবিদ্যাশালার সভ্যগণ শীঘ্রই ভারত ভ্রমণে বাহির হইবেন। এ বিষয়ে যাঁহারা কোনো সংবাদ জানিতে চান তাঁহারা

"প্রফেসর জি আর পাণ্ডে, রাজস্থান মল্লবিদ্যাশালা, আজমীর" এই ঠিকানায় পত্র দিলে প্রয়োজনীয় খবর পাইতে পারিবেন। বাংলাতে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে খুব বেশী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ছিন্ন কোরানের মামলা—

শ্রীহট্ট মাইজভাগের মৌলবী মহম্মদ মগফুরের বাড়ীর ছিন্ন কোরানের কথা লইয়া গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই ছিন্ন কোরান সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট 'জনশক্তি'র সম্পাদককে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আপীলের বিচারে সেসনস্ জজ্ এই দণ্ডাদেশ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মৌলবী মহম্মদ মগ্‌ফুর ২২৩৯।৶০ আনার দাবী করিয়া কয়েকজন পুলিশকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা লইয়া শীঘ্রই একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের হইবে।

মাইজভাগে ছিন্ন কোরান

ভাগলপুরে আইন অমান্য—

ভাগলপুরের বংশী নামক স্থানে গত ১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তির মেলা বসিয়াছিল। এই মেলা ছিল ১৫ দিন। সেখানকার কংগ্রেস-কমিটি মেলায় মদের দোকান ও জুয়ার আড্ডাগুলিতে পিকেটিং করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে মেলায় প্রায় ৫০ জন প্রধান কর্ম্মীর বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারার আদেশ জারি হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও পিকেটিং বন্ধ হয় নাই। এই আদেশ অমান্যের জন্য পুলিশ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গমের রপ্তানী—

কিছুদিন পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট্ আদেশ দিয়াছিলেন,—ভারতের গম বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে না। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ফলে বিদেশে গমের রপ্তানী পুরাদমে চলিয়াছে। সেদিন লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্‌ব্লিতে মিঃ লি যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, বিদেশে গমের রপ্তানি বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারত হইতে বিদেশে গমের চালান গিয়াছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ মণ। ভারতে যে আটার মণ আট টাকায় উঠিয়াছে, ইহার পর তাহাতে বিস্মিত হইবার আর কোনো কারণ নাই। পরাধীন জাতির পক্ষে এইজন্যই অবাধ বাণিজ্য অনেক ক্ষেত্রে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ওয়াজিরি যুদ্ধের খরচা—

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের ওয়াজিরিদের সহিত ভারত গবর্মেণ্টের দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধে ১৯২০-২১ সালে খরচ হইয়াছে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, ১৯২১-২২ সালে খরচ

হইয়াছে ৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। কুবেরের ভাণ্ডার হাতে থাকিলেও বছরের পর বছর এরূপ খরচের তাল সাম্‌লানো যায় না।

ভারতের হাই-কমিশনার—

শ্রীযুক্ত ডি এম দালাল বিলাতে ভারতের হাই-কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারীর কাউন্‌সিলের একজন সদস্য। বর্ত্তমানে ইঞ্চ্‌কেপ কমিটির সদস্য-রূপে তিনি ভারতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দালাল অর্থনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। তিনি কারেন্সী কমিশনের সদস্য ছিলেন। অন্যান্য সদস্যদের সহিত মত না মেলায় তিনি সে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে মন্তব্যের ভিতর যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় আছে। ভারতবাসীকে এপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমরা গর্ব্বী হইয়াছি।

অস্ত্র আইন কমিটির রিপোর্ট—

অস্ত্র-আইন সম্পর্কিত বিধিনিষেধগুলির পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা করা হয়। তাহারই ফলে এসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সহিত শ্রীযুক্ত বাজপাই এবং মিঃ ফয়েজ খাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা স্বতন্ত্র রিপোর্ট্ পেশ করিয়াছেন। রিপোর্ট সম্বন্ধে মোটামুটি যে জিনিষগুলি জনসাধারণের জানিয়া রাখা দরকার এখানে কেবলমাত্র তাহারই চুম্বক দেওয়া গেল।

কমিটির অধিকাংশ সদস্যের অভিমতে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মন্ত্রী ও সদস্যগণকে এবং প্রিভি কাউন্‌সিলের সদস্যগণকে তাঁহাদের কার্য্যকালের ভিতর বন্দুকাদি রাখার জন্য লাইসেন্‌স্ গ্রহণের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া সঙ্গত। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে তাঁহারা এই শ্রেণীর ভিতর ফেলেন নাই। শ্রীযুক্ত বাজপাই এই শেষোক্ত মত সমর্থন করেন নাই। তিনি বলেন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা—এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যই এক শ্রেণীর লোকের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত হন। সুতরাং এরূপ বৈষম্য থাকা উচিত নহে।

কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতে, যে-সমস্ত লোকে ইন্‌কাম ট্যাক্স প্রদান করেন, যাঁহাদের খাজনার পরিমাণ পাঁচশত টাকা বা তদতিরিক্ত, পথকর প্রভৃতি বাবদ যাঁহারা একশত টাকা দেন, যে-সব সরকারী কর্ম্মচারীর মাহিনা একশত টাকা বা তাহার বেশী, তাঁহারা সকলেই লাইসেন্‌স্ পাইবার যোগ্য।

শ্রীযুক্ত বাজপাই ও শ্রীযুক্ত রেডিড় এবং মিঃ ফয়েজ খাঁ লাইসেন্স্ সম্বন্ধে এত কড়াকড় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতে অবাঞ্ছনীয় (undesirable) সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া আর সকলকেই লাইসেন্স্ গ্রহণের অধিকার দেওয়া উচিত। কাহারা যে অবাঞ্ছনীয় সম্প্রদায়ের লোক তাহা ঠিক করাও কঠিন নহে। পুলিশের লিষ্ট্ হইতে অসচ্চরিত্র ব্যক্তিদের এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস হইতে গুরুতর অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম স্বচ্ছন্দেই পাওয়া যাইতে পারে।

মিঃ ফয়েজ খাঁ বলিয়াছেন, কেন যে কেবলমাত্র অর্থের উপরে ভিত্তি করিয়াই লাইসেন্‌স্ দেওয়া না-দেওয়ার কাঠামো তৈরী হইবে তাহার অর্থ তিনি খুঁজিয়া পান না। অস্ত্র-আইনে লাইসেন্‌স্ দেওয়া সম্বন্ধে শিক্ষাও অন্যতম গুণরূপে বিবেচিত হওয়া দরকার। অর্থ লোককে অনেক সময় বিপথগামী করিয়া তোলে। কিন্তু বিদ্যা মানুষকে চরিত্রে ও সংযমে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লাইসেন্‌স্ না লইয়াও আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার পক্ষে মত দিয়াছেন :—

(১) ব্যারিষ্টার, উকিল, হাইকোর্টের উকিল যাঁহাদের পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে।

(২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত কলেজের প্রোফেসার, রীডার, লেক্‌চারার।

(৩) এম-এ উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

(৪) ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতাযুক্ত বি-এ উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

(৫) গবর্মেণ্টের পেন্‌সন্ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা মাসিক অন্ততঃ একশত টাকা পেন্‌সন্ পান।

চোর ডাকাত প্রভৃতি অস্ত্র রাখে এবং তাহা তাহারা তাহাদের ইচ্ছা ও খেয়াল-মত ব্যবহারও করিয়া থাকে। লাইসেন্‌স্ না পাইয়াও সেজন্য তাহাদিগকে বিশেষ কোনো অসুবিধায় পড়িতে হয় না। কিন্তু লাইসেন্সের কড়াকড়িতে ভালো লোকের পক্ষেও অস্ত্র রাখা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। তাহা ছাড়া দেশকে অস্ত্রহীন করিয়া রাখায়, দেশের লোক যে সাহসহীন নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রে সবল ও শক্তিমান্ গবর্মেণ্ট মিঃ ফয়েজ খাঁর ব্যবস্থাই মানিয়া লইবেন। তবে আমাদের গবর্মেণ্ট্ যে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন তাহা যথেষ্ট রকমেই সুস্পষ্ট।

দিল্লী রাজধানী তৈরীর খরচ—

দিল্লীর রাজধানী সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য গত ১লা নবেম্বর দিল্লীতে একটি কমিটি বসিয়াছিল। ১২ই নবেম্বর কমিটির তদন্তের কাজ শেষ হয়। কিন্তু তাঁহারা রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তিন মাস পরে—গত জানুয়ারী মাসে। স্যার ম্যাকম্ হেলী এই তদন্ত-কমিটির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমিটি সকল দিক্ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এখন আর কোন রকম পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইবে না। কারণ পরিকল্পনা যেরূপ ছিল সেই ভাবে কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং কাজ বন্ধ না করিয়া যাহাতে অধিকতর ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। নূতন রাজধানী গড়িয়া তুলিতে খরচ পড়িবে ১৮ কোটি টাকা। ইহাতেও কুলাইবে কি না সন্দেহ। বিশেষ চেষ্টা করিলে সামান্য কিছু পরিবর্ত্তনের ফলে পনেরো লক্ষ টাকার খরচ কমাইতে পারা যায়। কিন্তু কাজ শীঘ্র শেষ করিতে হইলে খরচের দিকে তাকাইলে চলিবে না।

বেশ পরিষ্কার সাফ জবাব। খেয়ালের জন্য মোগল বাদসাহদের শ্রাদ্ধ করিতে আমাদের কর্ত্তারা কখনো কসুর করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা নিজে যে কত বড় খেয়ালী, দিল্লীতে নূতন করিয়া রাজধানী গড়িবার পরিকল্পনাই তাহার প্রমাণ।

সৈনিকের সাহস—

ওয়াজিরিস্থানে যুদ্ধকালে ৪৮নং পাইয়োনিয়ার সৈন্যদল, যখন সাঙরটাঙ্গী নামক একটি জলস্রোত পার হইতেছিল তখন নদী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ফলে হাবিলদার-মেজর রুড় সিং ভাসিয়া যান। এই বিপজ্জনক অবস্থাতেও এক গাছি রজ্জু ধরিয়া নিজের প্রাণ রক্ষার সময় তিনি আরো একটি সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। লণ্ডন গেজেটে প্রকাশ, এই সাহসিকতার জন্য ইংলণ্ডের রাজা রুড় সিংকে 'এলবার্ট' মেডেলের দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

রেজিং রিপোর্ট *

এক

এক্, দো, তিন্!!!

কয়লা-খাদের মুখে ঘণ্টাওয়ালা ঘণ্টা বাজাইল—এক্ দো, তিন্!

নীচে হইতে গম্ গম্ করিয়া চানকের + গহ্বরের স্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উত্তর আসিল,—ঠং, ঠং, ঠং!!!

তিন-ঘণ্টা—মানুষ নামিবার সঙ্কেত।......খাদের নীচে খুন হইয়াছে। সর্দ্দারের নিকট খবর পাইয়া খাদের 'রেজিং বাবু'—চঞ্চলকুমার, ডাক্তারবাবু ও ম্যানেজার সাহেব লাশ দেখিতে চলিলেন।

পৌষের সন্ধ্যা। দূরে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপারে, শালবনের মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল, কিন্তু বড় বড় পত্রহীন দু'একটা গাছের শীর্ণ ডালপালার মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী দেখা যাইতেছিল না; তথাপি কাটা ধানের মাঠ-গুলার উপর কুয়াশার মত ধমে আচ্ছন্ন আধ-ফুটন্ত জ্যোৎস্নার হর্ষ-হিল্লোল বেশ একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

উপরে যখন এই আনন্দ-সুন্দরের খেলা, খাদের নীচে তখন কোন্ এক নিবিড় আঁধার-ঘন গুহায় মৃত্যুর নগ্ন বীভৎসতা!

তিনজন সর্দ্দার আর একজন ঘণ্টাওয়ালা ব্যতীত খাদের সমস্ত কুলী তখন উপরে উঠিয়া আসিয়াছে।

তিনটা গ্যাস্-ল্যাম্প্ লইয়া সর্দ্দার তিনজন পথ দেখাইয়া সকলকে সেই অন্ধকার পাতালপুরীর সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া লইয়া চলিল। সম্মুখে একটুখানি স্থান ছাড়া, পশ্চাতে এবং দুই পার্শ্বে বিরাট্ অন্ধকার যেন মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলা পায়ের শব্দ এবং মাঝে মাঝে দু'-একটা কথা ছাড়া কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নাই।

—এইটা সাতে যাবার মেন্-গ্যালারী।

—চালটা এখানে একটু খারাপ আছে।

—হ্যা, একটু সাবধানে আস্‌বেন।

—ইস্! পাশের গোফটার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে দেখুন!

মাঝে-মাঝে এম্‌নি দু-একটা কথা, আবার সব চুপ্।

একসঙ্গে কতকগুলা পায়ের জুতার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

অগ্রগামী সর্দ্দার হঠাৎ একটা সুড়ঙ্গের মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।—হঁা, এহি তেরা নম্বর কাঁথি।

গ্যাসের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর-একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, আইয়ে বাবুজি।

বৃদ্ধ ম্যানেজার—মিষ্টার জেম্‌স্, কয়লাকুঠিতে কাজ করিয়া চুল পাকাইল; বাঙলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বেশ বলিতে শিখিয়াছিল। জল-শপ্‌শপে পথের মধ্যে চলিতে চলিতে সাহেব সতর্ক করিয়া দিল,—একটু সাবধানে, চালের পাথরটা এখানে বড্ডো নরম।

পাশে একটা পিলারের নিকট ছাত হইতে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাংড়া সশব্দে ঝড়াং করিয়া ছাড়িয়া পড়িল।

'ওরে বাপ্‌রে' বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া সকলে ম্যানেজার সাহেবকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল,—তিনিই এখানে একমাত্র ভরসা-স্থল।

আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া সকলেরই বুকগুলা তখন ধাঁই-ধাঁই করিতেছিল।

—ওটা মাথায় পড়্‌লেই গিয়েছিলুম আর কি!

—এদিকে সরে' আসুন, আর ভয় নেই, এটা খুব সেফ্।

......মিষ্টার জেম্‌স্ হাতের বাতিটা তুলিয়া ধরিতেই সকলে বিস্ময়ে দেখিল, এক সাঁওতাল যুবক হুমড়ি খাইয়া কয়লাস্তূপে মুখ গুঁজিয়া সেইখানে পড়িয়া আছে। একটা কয়লার প্রকাণ্ড চাংড়া তাহার মাথার উপর পড়িয়া মুখের

---

* 'রেজিং রিপোর্ট'—খনি হইতে কয়লা তোলার যে মোট হিসাব মালিকের কাছে পাঠাইতে হয়, তাহার নাম—'রেজিং রিপোর্ট'। রেজিং—(Coal-Raising শব্দ)—কয়লা তোলা।

+ 'চানক'—(এতদ্দেশে প্রচলিত বাঙ্‌লা কথা) কূপের মত খনির মুখগহ্বর।

খানিকটা অংশ উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। কানের ভিতর দিয়া এক ঝলক্ রক্ত বাহির হইয়া আসিয়া কালো কয়লার উপর জমাট বাঁধিয়াছে। লোহার গাঁইতিখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।...

ডাক্তারবাবু তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন।

কি দেখ্‌ব আর— বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তারবাবু ছাড়িয়া দিলেন।

চঞ্চলকুমার মুখে কিছুই বলিল না। তাহার তরুণ বক্ষের তলা হইতে একটা করুণ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সাহেবের মুখের পানে একবার তাকাইতেই সাহেব চোখ টিপিয়া কহিল, Come along! চলে' আসুন।

অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতি সাবধানে পথ দেখাইতে দেখাইতে সাহেব সকলকে লইয়া চানকের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনজন সর্দ্দার মৃতদেহটা একটু সরাইয়া রাখিয়া, কাঁথির মুখে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিল।

অন্‌-সেটার * পুনরায় ঘণ্টা মারিয়া তাহাদিগকে উপরে তুলিয়া দিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। খাদের নীচে যেমন অন্ধকারের অন্ত নাই, উপরে তেমনি জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি!

এক যুবতী সাঁওতালের মেয়ে ট্রাম-লাইনের ধারে তাহাদেরই অপেক্ষা করিতেছিল। সজল চোখে তাহাদের মুখের পানে একবার তাকাইয়া সকরুণ ভাবে কহিয়া উঠিল,—টুইলাকে একলাটি ফেলে রেখে এলি, বাবু?

কাছেই কয়েকজন সাঁওতাল দাঁড়াইয়া ছিল; একজন বুঝাইয়া দিল, এ মৃত টুইলার স্ত্রী সোহাগী। এ ছাড়া তাহার নিজের বলিতে আর কেহই নাই।

চঞ্চলকুমার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই সাহেব ও ডাক্তারবাবু দাঁড়াইল। সোহাগী আবার বলিল—একা সে রইতে লার্‌বেক্, বাবু। আমাকে যেতে দে,—আমি যাই।

চঞ্চলকুমারের চোখ দুইটা ছল্‌ছল্ করিতেছিল, কহিল—কি কর্‌বি সোহাগী, সে তো মরেই গেছে। পুলিশ এলেই তুলে দিব।......আয়, তুই আমাদের সঙ্গে আয়।

সোহাগী ভাবিল, ম্যানেজার সাহেব একবার হুকুম করিলেই তাকে নীচে নামিতে দিবে, তাই উন্মাদের মত সাহেবের পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—তুই একবার বল্ সাহেব, আমি সারারাত টুইলাকে আগুলে থাক্‌ব। একলাটি তাকে রইতে দিতে লার্‌ব যে আমি!

সোহাগী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাহেব সজোরে বুটের ধাক্কা দিয়া সোহাগীর হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,—নেই, হাম কিসিকো নেই যানে দেগা। ছোঁড়ী পাগ্‌লা হো গিয়া,—যাও!—

কয়েকজন সাঁওতাল কুলি দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; সাহেব তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল—মৎ যানে দেও উস্‌কো। পুলিস্ আনেসে হাম্ লাশ উপরমে লে আয়েগা। যাও হাত পাকড়কে ইস্‌কো ধাওড়ামে লে চলো।...Come along, Babus! come along. I can't allow her to come down the pit. She may do anything, kill herself, ever, eh!......

চঞ্চলকুমার ভাবিতেছিল, এই শোকাতুরা রমণীকে খাদের নীচে তাহার মৃত স্বামীর নিকট একটিবার লইয়া গেলে যদি তাহার শোকের মাত্রা কিছু কম হয়, তাহা হইলে এমন কি ক্ষতি হইতে পারে? কিন্তু সাহেব যখন অনুমতি দিল না, তখন অগত্যা তাহাকেও চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

সাহেব নিজের অফিসে বসিয়া চঞ্চলকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইল। চঞ্চল কাছে যাইতেই দেখিল, সাহেব মুখে একটা তামাকের 'পাইপ' ধরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। চঞ্চলকে পাশের চেয়ারে বসিতে বলিয়া বলিল,—কি করা যায়, চঞ্চলবাবু?

* 'অন্‌-সেটার'—খাদের নীচে যে ব্যক্তি ঘণ্টা বাজাইয়া উপরের ঘণ্টাওয়ালাকে ইঞ্জিন্ চালাইবার সঙ্কেত জানায়। এক ঘণ্টা—খালি টব-গাড়ী, দু ঘণ্টা—কয়লা-বোঝাই টব-গাড়ী, এবং তিন ঘণ্টা—মানুষ উঠিবার সঙ্কেত। উপরে আর-একজন ঘণ্টাওয়ালা থাকে, তাহারও ঐ একই কাজ। 'অন্‌-সেটারের' অর্থ এক কথায় বলা চলে—'খাদের নীচের ঘণ্টা-ওয়ালা'।

চঞ্চলকুমারের মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, একটু রাগিয়াই উত্তর দিল,—আমাকে কেন পাপের ভাগী কর্‌লে সাহেব? আমি আগে থেকেই বলে' এসেছি, খাদে কোথাও এতটুকু আয়তন নেই, বেশী রেজিংএর আশা ছেড়ে দাও। তুমি আমার সে কথা শুন্‌লে না, বল্‌লে নেহি মাংতা কুছ্‌—রেজিং চাই—রেজিং!...নাও এবার রেজিং!...ও 'আন্‌সেফ্‌ গ্যালারীতে' ও-বেচারাকে কেন পাঠালে সাহেব?

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—তুমি ছেলেমানুষ চঞ্চল, কিছু বুঝ্‌তে পার না। বাঙালীর ওই তো দোষ, একটু কিছু হলেই অম্‌নি ভয়েই অস্থির!

চঞ্চলকুমার মুখে কিছু না বলিলেও অন্তর্যামী হয়তো বুঝিলেন, কিসের ভয়ে আজ তাহার মুখে কথা ফুটিতেছে না। পুলিসের পরোয়ানার ভয় সে বড় একটা করে না; কিন্তু সবার উপরে যিনি আছেন, তাঁহার কাছে সে কি জবাবদিহি করিবে? চঞ্চল মনে-মনেই বলিল, নির্দ্দোষ ওই সাঁওতাল কুলিযুবকের প্রাণের দাম, তোমার রেজিংএর দামের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান্‌। নিজের স্বার্থের জন্য নিরীহ বেচারীদের খুন ক'রে সাহসী হওয়ার চেয়ে বাঙ্গালী যেন তার ভীরুতার কলঙ্ক নিয়েই বেঁচে থাকে চিরকাল,—তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না সাহেব।

চঞ্চলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, সাহেব বলিল,—কুছ্‌ পরোয়া নেই। এমন কত খুন হয়ে গেছে আমার হাতে। আমি সব ঠিক করে' নিচ্ছি চঞ্চল, তুমি চুপ করে' সব দেখে' যাও।...আর রেজিংএর কথা বল্‌ছো, একটা খুন হ'ল বলেই কি আমি দমে' যাব?...এখনও চাই, আরও বাড়াতে হবে রেজিং।...হেড্‌ অফিসের তাড়া সইতে হয় আমাকেই, বুঝ্‌লে চঞ্চল?

চঞ্চল কিছু বুঝুক্‌ আর নাই বুঝুক্‌, সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—তাই কর সাহেব।

...পুলিস আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মড়া জ্বালাইবার হুকুম দিয়া গেল।

পরদিন 'মাইন্‌স্‌ ইন্‌স্‌পেক্টরের' নিকট দু'-একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, বৃদ্ধ ম্যানেজার মিষ্টার জেম্‌স্‌ হাসিতে হাসিতে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, চুরি করিয়া বেশী কয়লা কাটিবার আশায় তারের বেড়া পার হইয়া টুইলা hanging coal (ঝোলা কয়লা) কাটিতে গিয়া মরিয়াছে। সেখানে কাজ করিতে তাহাকে কেহই হুকুম দেয় নাই।

'মাইন্‌স্‌-ইন্‌স্‌পেক্টর' সাহেব চলিয়া গেলে, মিষ্টার জেম্‌স্‌ তাহার দন্তহীন মুখে খুব একচোট হাসিয়া লইয়া চঞ্চলকুমারকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন,—দেখ্‌লে চঞ্চল, এসব কাজে ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন?...... লাগাও, ফের্‌ রেজিং লাগাও,—কুছ্‌ পরোয়া নেই।

এ-সব কথা চঞ্চলকুমারের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। মিষ্টার জেম্‌সের কথা শুনিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই তো টুইলাকে এই বিপজ্জনক স্থানে কয়লা কাটিতে লাগাইয়া আসিয়াছিল এবং ভাল করিয়া দেখিতে গেলে, সে-ই সে হতভাগ্যের মৃত্যুর কারণ। টুইলা না হয় মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্ত্রী সোহাগী কি করিবে? তাহার তো নিজের বলিতে আর কেহই নাই! একটা ছেলে মেয়েও নাই, যাহাকে লইয়া সে বাঁচিয়া থাকে! এ দুঃসহ আঘাতের বজ্র-বেদনা সে সহিবেই বা কেমন করিয়া, আর জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যই বা কি উপায় করিবে সে?—এই-সব নানা কথা ভাবিয়া গত রাত্রিটা চঞ্চলকুমার বিনিদ্রভাবেই কাটাইয়াছে। হায় রে অভিশপ্ত কুলি-জীবন!......

সাহেব সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, চঞ্চলকুমার বলিল,—টুইলার স্ত্রীকে কিছু সাহায্য কর্‌লে হয় না?

সাহেব সজোরে পায়ের বুটটা মাটিতে আছ্‌ড়াইয়া বলিল,—Damn your Twila, Babu! কোম্পানীর বাজে খরচ আমি হ'তে দিব না—জান? তুমি খাদে যাও, সে-সব দেখ্‌বার কোন দর্‌কার নাই তোমার।

এ কথায় উত্তরে চঞ্চলকুমার সাহেবকে বেশী কিছুই বলিতে পারিল না। যে হতভাগিনীর স্বামীকে কোম্পানীর স্বার্থের জন্য জানিয়া শুনিয়া হত্যা করা হইল, তাহাকে আজ এই দুর্দ্দিনে কিছু সাহায্য করা যদি কোম্পানীর বাজে খরচ হয়, তাহা হইলে

কোম্পানীর আসল এবং সত্য ন্যায়ের খরচ যে কোন্খানে, চঞ্চল সেইটাই ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। কথাটা শুনিয়া তাহার রাগও হইল, ভাবিল, মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত এই ক্ষুদ্র সাহেবের দল নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য করিতে পারে না, এমন কাজ বোধ হয় দুনিয়ায় কিছুই নাই।

চঞ্চলকুমার ধীরে ধীরে বলিল,—খাদে না হয় গেলুম সাহেব, কিন্তু বল্‌ছিলুম কি, ওই মেয়েটা আজ থেকে খাবে কি?

সাহেব বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল,—খাটবে খাবে। তোমার তাতে কি? You have nothing to do with it, চঞ্চল! যাও, অনেক সময় নষ্ট করলে। এমন করলে কাজ চল্‌বে না বলে' দিচ্ছি।

চঞ্চলের মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না। সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া লাঠিটা তুলিয়া লইয়া খাদের দিকে চলিল।

চানকের নীচে নামিয়া খাদের ভিতর যাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল অসহায়া সোহাগীর কথা। টুইলাকে যে সে-ই তের নম্বর কাঁথিতে কাজ করিতে বলিয়াছিল,—সে তো চুরি করিয়া কয়লা কাটিতে যায় নাই।......

চঞ্চল ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই তের নম্বর গ্যালারির বেড়া-দেওয়া মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার। লোকজন কেহই সেখানে নাই। দূরে কুলিরা কয়লা কাটিতেছিল। কয়লা-কাটা গাঁইতির ঠং ঠং শব্দ, আর হৈ হৈ গোলমাল পিলারগুলার গায়ে প্রতিহত হইয়া অতি ক্ষীণভাবে কানের কাছে আসিয়া বাজিতেছিল। টুইলা যেখানে মরিয়া পড়িয়া ছিল, দূর হইতে সেই দিকে তাকাইতেই তাহার মনে হইল, তাহার মৃত আত্মা হয় তো এখনও সেই অন্ধকার স্থানটায় ঘুরিয়া ফিরিতেছে!......চঞ্চলকুমারের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল! যদি টুইলা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলে,—বল্ বাবু, আমাকে খুন করবার জন্যে কেন তুই সেখানে পাঠিয়েছিলি, বল্! আমি তো যেতে চাই নি!

হঠাৎ সেই বেড়া-দেওয়া কাঁথির ভিতরে পায়ে চলার একটা থম্‌থম্ শব্দ হইতেই, তাহার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার মনে হইতেছিল, সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া যায়, কিংবা চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকে। কিন্তু না পারিল ছুটিতে, না পারিল কথা কহিতে। মাত্র একটু সরিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, বেড়া ডিঙাইয়া কে একটা মানুষ অন্ধকারে তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। হাতের বাতিটা যে কোন সময় নিভিয়া গিয়াছে, তাহার সে খেয়াল নাই। তাড়াতাড়ি কম্পিতপদে পাশের একটা খোলা রাস্তার মধ্যে ঢুকিয়া চঞ্চল পিলারটা ধরিয়া দাঁড়াইল। চঞ্চলকুমারের মনে হইতেছিল, তাহার আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই,—আজ হয় তো সে এইখানেই মরিয়া যাইবে। মরিবার পূর্ব্বে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, সে একবার প্রাণপণ চেষ্টায় ডাকে,—টুইলা! কিন্তু কণ্ঠে তাহার স্বর জোগাইল না! লোকটা কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার নিকট আগাইয়া আসিল। হাতের আলোটা নিভিয়া গিয়া চারি পাশের অন্ধকার আরও বিরাট বলিয়া মনে হইতেছিল।

চঞ্চল সেই অন্ধকারের মধ্যেই চক্ষু স্থির করিয়া দেখিতেছিল, লোকটা ক্রমেই তাহার নিকটে,—আরও নিকটে আসিতেছে! মুখে কথা নাই!

—বন্দ চলা কানা, টুইলা? (যাবি কোথা, টুইলা?)—বলিয়া সে চঞ্চলকে ব্যাকুলভাবে হাত বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতেই, তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া গেল!

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই একটা গ্যাস্-লাইটের তীব্র রশ্মি উভয়ের মুখের উপর আসিয়া পড়িল।......আঁ্যা একি! চঞ্চলকুমার সবিস্ময়ে দেখিল—যে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে সে টুইলার স্ত্রী সোহাগী, এবং সোহাগী দেখিল—তাহার মৃত স্বামী টুইলা বলিয়া যাহাকে ভ্রম করিয়াছিল, সে তাহাদেরই খাদের রেজিং-বাবু—চঞ্চলকুমার!

যে লোকটা গ্যাস্-বাতি লইয়া তাহাদের মুখের উপর ধরিয়াছিল, সে লোকটা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেল। চঞ্চলকুমার বুঝিল না সে কে। বুঝিবার সময়ও ছিল না তাহার।

বিস্ময়াহতা সোহাগী লজ্জায় তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

কেমন করিয়া যে, কি ঘটনা ঘটিয়া গেল, চঞ্চলকুমার বুঝিতেছিল, তথাপি একবার জিজ্ঞাসা করিল,—তুই এখানে কেন সোহাগী?

ক্রন্দনরতা রমণী চোখের অশ্রু মুছিয়া কহিল,—কিছু মনে করিস্ না বাবু, আমি টুইলা মনে করেছিলাম তোকে।......

সোহাগী চলিয়া যাইতেছিল; চঞ্চলকুমার বলিল,—তুই আজ কাম করতে এসেছিস্ নাকি?

—কি করব বাবু, কে খেতে দিবেক্? গাড়ী বোঝাই দিছি উধারে।

আর কোন কথা না বলিয়া সোহাগী চলিয়া গেল।

চঞ্চলকুমার ভাবিল, সোহাগী নিশ্চয় গাড়ী বোঝাই দিতে দিতে টুইলা যেখানে মরিয়াছিল, সেই জায়গাটা লুকাইয়া একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সোহাগী ভাবিতেছিল, যদি একবার মরিয়াও দেখা দেয় সে! তাই অন্ধকারে আমায় চলিয়া আসিতে দেখিয়া, সে টুইলা মনে করিয়া এই কাণ্ডটা করিয়াছে!......আঃ, দুভাগা নারী!

পকেটে যে দিয়াশলাই ছিল, চঞ্চলের এতক্ষণ সে কথা মনেই ছিল না। সে আলোটা পুনরায় জ্বালিয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

দুই

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে খাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া চঞ্চলকুমার নিজের বাসায় বসিয়া ছিল। সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের উপর, পশ্চিম আকাশে অস্তরবির করুণ রক্তিমা মেঘের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দূরে কয়েকটা কয়লাকুঠির বড় বড় 'পাল্লা',—লাল ধূলার পাকা রাস্তার পরেই তাল তমাল আর মহুয়া বনের সারি!...কতকগুলা সাঁওতাল কুলি-ধাওড়ার উঠানে ইহারই মধ্যে আগুন জ্বালানো হইয়াছে। কয়েকটা ছাগল ঘাসের সন্ধানে প্রান্তরের উপর এদিক্ ওদিক্ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

চঞ্চলকুমারের মনটা বেশ ভাল ছিল না!

......মিষ্টার জেম্‌সের চাপ্‌রাশী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

—কে? দরাপ্ সিং?

—জি! চিঠ্‌ঠি হ্যায় বাবু!

চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়া খুলিয়া পড়িতেই চঞ্চলকুমারের মুখখানা কেমন একরকম হইয়া গেল। সাহেব লিখিয়াছে,—

Chanchal,

I am sorry. Your services are no longer required. I dismiss you and give you orders to be cleared up and leave Colliery within 24 hours.

Herewith I send a slip to the Cashier who will pay you up.

You should not call for any explanation as I have seen you, with my own eyes, in the pit No. 5.

G. D. JAMES.

চঞ্চলের মুখ হইতে কিছুক্ষণ কোন কথা বাহির হইল না। কষ্টে চেষ্টা করিয়া সে চাপ্‌রাসীকে বলিল,—যাও।

চঞ্চলকুমার ধীরে ধীরে উঠিল।..... কতকগুলা তাল-গাছের সারির মধ্যে অস্তরবির শেষ বিদায়ের করুণ চাহনিটুকু অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে।

চঞ্চলের মূল্যবান্ জিনিসের মধ্যে ছিল একটা চিঠির তাড়া। সমস্তগুলি একসঙ্গে গুছাইয়া একটা ব্যাগে পূরিল।

একবার মনে হইতেছিল, খাজাঞ্চি-বাবুর নিকটে গিয়াও কাজ নাই। কিন্তু কি করিবে, নিঃসম্বল অবস্থায় কোথায় বা যাইবে সে?...

সাহেবের চিঠিখানা দিবামাত্র খাজাঞ্চিবাবু চঞ্চলের বাকী পাওনা ষাট্‌টি টাকা তাহার হাতে দিয়া একটা রসিদ লিখাইয়া লইল। চল্লিশ টাকা অগ্রিম লইয়া সে বাড়ী পাঠাইয়াছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতি সন্তর্পণে ব্যাগ্‌খানি মাত্র হাতে লইয়া, চঞ্চলকুমার বাহির হইল।...কোথায় যাইবে সে?

কয়লাকুঠির ময়লাঢাকা কালোরঙের ধূলার রাস্তার ধারে যে কুলি-ধাওড়াটা ছিল, তাহারই একটা ঘরে সোহাগী থাকিত। এক সাঁওতালের নিকট সন্ধান লইয়া চঞ্চল তাহারই দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল, ডাকিল,— সোহাগী!

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, সোহাগী বাহিরে আসিতেই কুকুরটা চুপ করিল।

চঞ্চল ধীরে-ধীরে পকেট হইতে পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া সোহাগীর হাতে দিতেই, সে চমকিয়া উঠিল। বলিল—এত টাকা কি হবেক্, বাবু?

—রেখে দে, যতদিন চলে চালাস্। এখন খাদে খাটতে যাস্‌নে।

সোহাগী বলিল,—কে দিলেক্ বাবু? কোম্পানী? না তুই?

চঞ্চল ভাবিল, নিজের নাম করিলে সে হয়ত এ পাপীর নিকট হইতে তাহার স্বামীর প্রাণের মূল্য গ্রহণ না করিতেও পারে, তাই বলিল,—হ্যাঁ কোম্পানী।

চঞ্চল সেখান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া আসিল।...... যুক্তকরে সেই অনাদি অনন্তের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া মনে-মনে কহিল,—হা ভগবান্! দাসত্বের পায়ে নিজের মনুষ্যত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আমাকে সে পাপের শাস্তি দিতে তুমি কুণ্ঠিত হইও না। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

চঞ্চলকুমার আম-বাগানের ভিতর অগ্রসর হইয়া রাস্তা ধরিল। কোথায় গেল, সে আর তাহার অন্তর্য্যামী ব্যতীত কেহই জানিল না।

পথিকহীন নিস্তব্ধ পথে সে যখন বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছে, তখনও পশ্চাতে একটা কুলিধাওড়া হইতে গানের আওয়াজ তাঁহার কানে আসিয়া বাজিতেছিল; মাদল বাজাইয়া তাহারা নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে—

'পরে' আছেন বাঘের চাম্,
মুখে বলেন হরির নাম,
বাজে শিঙ্গা ডিমিকি ডিমিকি রে—
বাজে শিঙ্গা ডিমিকি ডিমিকি!"—

শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

আকাশে ভুবনে বসেছে যাদুর মেলা,
নিতি নব নব খেলিতেছে যাদুকর—
রবি-শশী-তারা-ঝঞ্ঝা-অশনি-খেলা,
লুকোচুরি কত চলিছে নিরন্তর!
আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারা বেলা,
কিছু বুঝি নাকো—বিস্মিত অন্তর;
হাসা-কাঁদা আর ভাঙা-গড়া-হেলা-ফেলা—
সকলেরি মাঝে ভরা যাদু-মন্তর!

কবি! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে,
পিতার ঘরের অনেক খবর জান,
কেমন করিয়া কিসে কোন্ খেলা খেলে
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আন!
দর্শক মোরা, কিছু জানা-শুনা নাই,
যাহা বল, শুনি অবাক্ হইয়া তা'ই!

গোলাম মোস্তফা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজশক্তির কর্ত্তব্য

বাংলা দেশের ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে (১.৯-২০ পৃষ্ঠা):—

"It is axiomatic that the first duties of Government are to give security, to enforce law and order, to collect the public revenues, and to provide an efficient judiciary and magistracy... ...What remains after the provision of the essential services should be devoted to the development of the resources of the country, and to what, for want of a better collective expression, may be described as the nation-building activities."

তাৎপর্য্য।—"ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে গবর্ণমেন্টের প্রথম কর্ত্তব্য প্রজাদিগকে নিরাপদে জীবনযাপন করিতে সমর্থ করা, আইন বলবৎ রাখা, শৃঙ্খলা রাখা, রাজস্ব আদায় করা, এবং কার্য্যক্ষম শাসক ও বিচারকের বন্দোবস্ত করা। এইসব একান্ত-প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা দেশের উদ্ভিজ্জ খনিজাদি দ্রব্য হইতে দেশের ধন-বৃদ্ধির কার্য্যে এবং শিক্ষাস্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি জাতি-গঠন কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত।"

কমিটি রাজশক্তির যাহা প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সে বিষয়ে আপাততঃ কোন তর্কের উত্থাপন না করিয়া, গবর্ণমেণ্ট যে যে উদ্দেশ্যে উপরে উল্লিখিত রাজকার্য্য-সকলের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা সিদ্ধির নানাবিধ উপায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

প্রজাদিগকে নিঃশঙ্কতা দান গবর্ণমেন্টের প্রথম কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। তাহার পর আইনকে বলবৎ রাখা ও শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুত এই তিনটি কর্ত্তব্য একই কর্ত্তব্যের অংশ। সবগুলিরই উদ্দেশ্য এক। সুশাসক ও সুবিচারকের বন্দোবস্ত করাও ঐ উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। মোটামুটি বলিতে গেলে, দেশের লোকদের মধ্যে কেহ কাহারও প্রাণনাশ না করে, কেহ কাহাকেও আঘাত বা উৎপীড়ন না করে, কেহ কাহারও স্বাধীনতা হরণ না করে, কেহ কাহারও সম্পত্তি অপহরণ না করে, তাহার বন্দোবস্ত করা রাজশক্তির উদ্দেশ্য। আইন প্রণয়ন ও পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট্ জজ প্রভৃতির নিয়োগ, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই করা হয়। ইহা প্রধানতঃ শাস্তির ভয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা। কিন্তু মানুষকে শাস্তির ভয়ের দ্বারা অপকার্য্য ও অপরাধ হইতে নিবৃত্ত রাখা কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব হইলেও তাহা প্রকৃষ্ট প্রণালী নহে। এবং কেবল বা প্রধানতঃ তাহার দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধও হইতে পারে না। পুরাকালে সকল দেশেই লোকে মনে করিত বটে, যে, খুব ভয়ানক শাস্তি দিলেই অপরাধের সংখ্যা কমিবে। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতে দেখিতে পাই,—

"The combat with crime was long waged with great cruelty. Extreme penalties were thought to constitute the best deterrent, and the principle of vengeance chiefly inspired the penal law. The harshness of ancient codes makes a more humane age shuddder. It was the custom to hang or decapitate, or otherwise take life in some more or less barbarous fashion, on the smallest excuse. The final act was preceded by hideous torture."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুরাকালের দণ্ডবিধি প্রতিহিংসামূলক ছিল, এবং সামান্য কারণেই মানুষকে প্রথমে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া পরে ফাঁসী, মুণ্ডচ্ছেদ প্রভৃতি দ্বারা বধ করা হইত।

ঐ গ্রন্থেই দেখিতে পাই যে, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে দুইশত রকম অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত; তাহার অধিকাংশ তুচ্ছ। অথচ যে যে অপরাধের জন্য ঐ শাস্তি হইত, তাহা তখন ইংলণ্ডে সংখ্যায় এখনকার চেয়ে খুব বেশী ছিল (such forms of crime were far more numerous than they are now)। সেকালে অপরাধের সংখ্যা এত বেশী থাকিবার প্রধান দুটি কারণ, লোকদের দরিদ্রতা ও সামাজিক মন্দ অবস্থা, বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেকালে প্রাণদণ্ডরূপ কঠোর শাস্তিদ্বারাও অপরাধের সংখ্যা কমান্ যায় নাই, কিন্তু এখন এই দুই বিষয়ে উন্নতি হওয়ায় অপরাধ কমিয়াছে। অপরাধ ও অপরাধীর

সংখ্যা কোন দেশে ও কালে বাড়িবার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

"The growth of criminals is greatly stimulated where people are badly fed, morally and physically unhealthy, infected with any forms of diseaso and vice."

তাৎপর্য্য। লোকেরা ভাল করিয়া খাইতে না পাইলে, তাহাদের দৈহিক ও নৈতিক অসুস্থতা থাকিলে, এবং তাহারা নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত ও পাপাসক্ত থাকিলে, অপরাধীর সংখ্যা খুব বাড়ে।

বিলাতে কোন্ রকমের অপরাধ শতকরা কত হয়, এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় প্রদত্ত তাহার তালিকায় দৃষ্ট হয়, যে, চৌর্য্যাদি দ্বারা জিনিষ বা অর্থ পাইবার ইচ্ছা-বশতঃ অপরাধই বেশী, অর্থাৎ শতকরা ৭৫টি এই প্রকারের; শতকরা ১৫টি দ্বেষজাত, এবং ১৫টি কামজ।*

শাস্তির ভয়ে অপরাধের সংখ্যা তত কমে না, অন্য উপায়ে যত কমে। মানুষের দারিদ্র্য দূর করিলে, দেশকে স্বাস্থ্যকর করিলে, মানুষকে স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষা দিলে, সাধারণ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা ও নির্দ্দোষ আমোদের ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিলে, সামাজিক কুপ্রথা দূর করিয়া সামাজিক অবস্থার উন্নতি করিলে, অপরাধের হ্রাস হয়।

সরকারী কাজের কোন্ কোন্ বিভাগের দ্বারা এই-সব দিকে উন্নতি হইতে পারে? মানুষের ভাল খাওয়া থাকা পরা ধনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। ধনবৃদ্ধি হয় কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা; এবং তাহার উন্নতি হয়, কৃষি (agriculture) শিল্প (industries) ও বাণিজ্য (commerce) বিভাগ দ্বারা। এই এই বিষয়ে শিক্ষা এবং তাহার আগে সাধারণ শিক্ষা না পাইলে মানুষ কৃষি-শিল্পবাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে না। মানসিক ও নৈতিক সুস্থতার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। তাহার দ্বারা চরিত্রের উন্নতি এবং অপরাধের হ্রাস হয়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগ দ্বারা দেশের স্বাস্থ্যকরতা বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা অপরাধের হ্রাস হয়। মানুষ সুস্থ সবল হইলে দেশের ধন বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্যও বাড়ে।

* "Crimes of malice ... 15 per cent
Crimes of greed ... 75 " "
Crimes of lust ... 10 ""

প্রকৃত শিক্ষা হইলে সামাজিক কুপ্রথা দূরীভূত হইয়া অপরাধের সংখ্যা কম হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি রাজকীয় যে যে বিভাগগুলিকে প্রধান স্থান দিয়াছেন, তাহাদিগকে অনাবশ্যক না মনে করিলেও আমরা ইহা বলিতে পারি, যে, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ধনবৃদ্ধি সম্পর্কীয় বিভাগগুলি গুরুত্বে তাহাদের চেয়ে বিন্দুমাত্রও কম নহে, বরং মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের দিক্ দিয়া শিক্ষাদি বিভাগের গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ, যে আত্মরক্ষায় সমর্থ, সে-ই বাস্তবিক সুরক্ষিত। এবং অপরাধ করিবার প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি কমাইয়া দিয়া দেশে অপরাধীর সংখ্যা কমাইতে পারিলে তাহাই স্থায়ী ও প্রকৃত উন্নতি; শাস্তির ভয় দেখাইয়া লোককে দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা দ্বারা সেরূপ উন্নতি হইতে পারে না।

কোন গবর্ণমেণ্ট, বিশেষতঃ বিদেশী গবর্ণমেণ্ট, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৈন্য, পুলিস, মাজিষ্ট্রেট, জজ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য কলেক্টর যত বেশী নিযুক্ত করুন না কেন, এবং তাহাদের কার্য্যদক্ষতা যত বেশী হউক না কেন, তাহার দ্বারা দেশের কোনও একটি লোকের এবং সমগ্র জাতির আত্মরক্ষার সামর্থ্য বিন্দুমাত্রও বাড়িবে না। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যাদি ও ধন বৃদ্ধির দ্বারা মানুষ যদি সুপুষ্ট সুস্থ সবল হয়, দেশের স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ও রোগ নিবারণ দ্বারা যদি লোকদিগকে সুস্থ সবল রাখা যায়, এবং যদি দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে সুস্থ, ধনোৎপাদনসমর্থ, পরিশ্রমী, পরার্থপর ও সাহসী করা যায়, তাহা হইলে দেশের লোকেরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টি-গতভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে। এই কারণে আমরা ধনোৎপাদনের সহায়ক কৃষিশিল্প-বাণিজ্য-বিভাগ-গুলি, শিক্ষাবিভাগ, এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিভাগকে সৈনিক পুলিস শাসন বিচার রাজস্বআদায় বিভাগগুলি অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ও জাতীয় জীবনে অধিক গুরুত্বসম্পন্ন মনে করি। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখিতে চান, প্রজাদিগকে নিরাপদ্ রাখিতে চান, প্রধানতঃ এইজন্য, যে, দেশ ও দেশবাসীদিগকে তাঁহারা

নিজেদের সম্পত্তি মনে করেন; এবং ঐ সম্পত্তি বেদখল বা কম-লাভজনক যাহাতে না হইয়া যায়, এইজন্যই তাঁহারা বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুসমূহের আক্রমণ নিবারণের বন্দোবস্ত রাখেন। এই বন্দোবস্তে তাঁহারা প্রধানতঃ নিজের দেশের লোকদের উপরই নির্ভর করেন। এই-জন্য সৈনিক ও পুলিস বিভাগের ও শাসনবিভাগের প্রধান পদগুলি ইংরেজদের হাতে আছে। অধিকাংশ জজিয়তীও ইংরেজের। তা ছাড়া গোরা সৈন্য যথেষ্ট আছে, এবং আধুনিক যুদ্ধের প্রকৃষ্টতম শিক্ষা এবং অস্ত্র শস্ত্র গোরারাই পাইয়া থাকে। ভারতীয় কোন জলযোদ্ধা নাই, ভারতীয় বায়ুযুদ্ধ (এরোপ্লেন) বিভাগ গোরাদের একচেটিয়া, এবং গোলন্দাজী বিভাগের বলবত্তম ও উৎকৃষ্টতম শাখাসমূহ ও অস্ত্রশস্ত্র গোরাদের একচেটিয়া। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কি।

ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে সিবিল সার্ভিস ও পুলিসবিভাগকে অন্যতম সিকিউরিটি সার্ভিস্ অর্থাৎ "নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কর্ম্মচারীবর্গ" বলিয়াছেন। সৈনিক বিভাগও তাহাই। এই নিঃশঙ্কতাটা কিন্তু ইংরেজদের। আমরা গোরা, পুলিস্ ও মাজিষ্ট্রেট্‌দিগকে নিঃশঙ্কতার কারণ মনে করা দূরে থাক্, তাহাদের ভয়েই অস্থির; তাহারা আমাদের শঙ্কার একটা প্রধান কারণ।

আমাদের নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক সর্‌কারী কার্য্যবিভাগ কেবল তাহাই হইতে পারে, যাহা আমাদিগকে পুষ্ট, সুস্থ, সবল, জ্ঞানবান্, চরিত্রবান্, সাহসী, আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ করিতে পারে। বিদেশী গবর্ণ্‌মেণ্টের এরূপ কোন কার্য্যবিভাগ বা কর্ম্মচারীবর্গ থাকিতে পারে না। কারণ, আমরা তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বল, জ্ঞান, চরিত্র, সাহস, আত্মরক্ষাসামর্থ্য লাভ করিলে তাহাদের বিপদের কারণ হইব, এই যুক্তি-সঙ্গত ভয় তাহাদের আছে। যদি আমাদের জাতীয়-আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকে, কেবল মাত্র তাহা হইলেই আমাদের নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক সর্‌কারী কার্য্যবিভাগ ও কর্ম্মচারীবর্গ থাকিতে পারে। সেই জাতীয়-আত্মকর্তৃত্বের অবস্থায় যে সৈনিক পুলিস্ শাসক ও বিচারক কর্ম্মচারীবর্গ থাকিবে, তাহারাই বাস্তবিক আমাদের নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কর্ম্মচারীবর্গ ("security services") আখ্যা পাইবার যোগ্য হইবে।

কিন্তু সে অবস্থাতেও নিঃশঙ্কতার প্রকৃত ভিত্তি ঐ কর্ম্মচারীবর্গের উপর স্থাপিত থাকিবে না; উহা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে জাতীয় দৈহিক বল, মানসিক বল, জ্ঞান, চরিত্র, ও সাহসের উপর। যে জাতিটা দেহে ও মনে তাল-পাতার সিপাই, যাহারা অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন ও চরিত্রহীন, তাহাদের মধ্য হইতে দেশকে নিরাপদ্ রাখিতে সমর্থ ধর্ম্মোপদেষ্টা রাজনীতিজ্ঞ সেনানায়ক বৈজ্ঞানিক কবি শিল্পী প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের অর্থাৎ স্বরাজের অবস্থাতেও নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কর্ম্মচারীবর্গ প্রধানতঃ হইবেন তাঁহারাই, যাঁহারা দেশের পুরুষ ও নারীসমূহকে সুপুষ্ট সুস্থ সবল জ্ঞানবান্ সাহসী পরার্থপর এবং আত্মোৎসর্গ ও আত্মরক্ষায় অভ্যস্ত ও সমর্থ করিতে পারিবেন।

এই-সব কারণে আমরা মনে করি, যে, ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্টের মূল নীতিটাই ভ্রান্ত, এবং বিদেশী শাসননীতির কলুষিত-প্রভাব-প্রসূত বলিয়া আমাদের গ্রহণের অযোগ্য; যদিও আলাদা আলাদা করিয়া ধরিলে কমিটি ব্যয়সংক্ষেপের যত রকম উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সংখ্যায় তাহার অধিকাংশেই আমরা সায় দিতে পারি।

—

রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য কি ?

অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, যে, আইনের মর্য্যাদা, এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা (law and order) রক্ষা রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য। এই মতের সমালোচনায় ইহা দেখান হইয়াছে, যে, নানা দেশে নানা সময়ে যখনই রাজশক্তি স্ব-প্রণীত আইনের মর্য্যাদা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে গিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তখনই প্রজাশক্তি মাথা তুলিয়াছে, এবং, কোথাও কোথাও বিদ্রোহ ও বিপ্লব দ্বারা, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা

করা যে রাজশক্তির প্রধান ও প্রাথমিক বা একমাত্র কর্ত্তব্য, এইরূপ মত আধুনিক শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের অনুমোদিত নহে।

ডক্টর বেরল্‌ৎস্‌হাইমের্ (Dr. Berolzheimer) কর্ত্তৃক লিখিত "The World's Legal Philosophies" (পৃথিবীর ব্যবস্থাদর্শনসমূহ) বিষয়ক জার্ম্মেন্ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা লিখিয়াছেন স্যার্ জন্ ম্যাক্‌ডনেল্। মূল গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যে, ইহা সাতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ, এবং জার্ম্মেন্ পণ্ডিতেরা কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহা কিরূপ চূড়ান্ত ও সর্ব্বাঙ্গীন করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভূমিকা-লেখক স্যার্ জন্ ম্যাক্‌ডনেল্ লণ্ডনের ইউনিভার্‌সিটি কালেজের কম্প্যারেটিভ্ ল (তুলনামূলক ব্যবস্থাতত্ত্ব) বিদ্যার অধ্যাপক, এবং সোসাইটি অব কম্প্যারেটিভ্ লেজিস্‌লেশ্যানের সহকারী সভাপতি। ইনি মূল-গ্রন্থ-লেখকের অনুসন্ধানের ফল সংক্ষেপে ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In the opinion of the great majority of authors considered, the functions of Government cannot be confined to the maintenance of peace and order. It is and must be an instrument of culture. ....If humanity is to get a great lift upwards, all must aid, including the representative of the will of all.........

"I note another conclusion to be deduced from the examination of the writings of the long list of authors, and especially of the moderns. There is a new conception of liberty which it is the aim of law to carry out. Much has been written about political freedom; freedom to speak, write, meet, form associations, enter into contracts--in other words, protection against external pressure and freedom to do as one likes. It may mean also the minimum amount of interference compatible with each being free to do as he likes; regulations imposed upon all citizens in the interest of all.

"But there is another conception of it as freedom for the development of all human faculties; freedom not merely from violence or tyranny and external pressure, but freedom from the pressure which checks, stunts and impoverishes the best in human nature; freedom which enables one to say, 'we can do what we ought.' There is the conception of the larger liberty, the higher liberty, the removal of all that stands in the way of the full development of man. Originating in philosophy, this conception has come to be recognised as one of the objects of law."

তাৎপর্য্য। "অধিকাংশ গ্রন্থকারের মতে, গবর্ণ্‌মেণ্টের কর্ত্তব্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতার অভিবৃদ্ধির সাধক হইতে হইবে। মানব-সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সকলের সাহায্য চাই। সকলের সমবেত ইচ্ছার প্রতিনিধি গবর্ণ্‌মেণ্ট্; সুতরাং গবর্ণ্‌মেণ্টেরও এবিষয়ে সাহায্য চাই।

"বেরল্‌ৎস্‌হাইমের্ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত, দীর্ঘ তালিকায় উল্লিখিত, গ্রন্থসমূহ, বিশেষতঃ আধুনিক গ্রন্থসমূহ, হইতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তাহা, স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি নূতন ধারণা; এবং আইনের উদ্দেশ্য এই ধারণাটিকে কার্য্যে, বাস্তবে, পরিণত করা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হইয়াছে; অর্থাৎ বলিবার, লিখিবার, একত্র হইবার, সভা গড়িবার, চুক্তি করিবার স্বাধীনতা—বাহিরের চাপ হইতে সংরক্ষণ এবং প্রত্যেকে যাহা করিতে চায় তাহা করিবার স্বাধীনতা। প্রত্যেকে যাহা করিতে চায়, তাহা করিবার স্বাধীনতা দিতে হইলে, প্রত্যেকের স্বাধীনতায় ন্যূনতম হস্তক্ষেপ—ইহার মানে ইহাও হইতে পারে; অর্থাৎ সকলের কল্যাণের জন্য সকলের উপর কতকগুলি নিয়ম প্রয়োগ।

"কিন্তু স্বাধীনতার ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ও বিশালতর ধারণা আছে। যে-কোন প্রকার চাপ বা অন্যবিধ কারণে মানুষের সকল দিকে সম্পূর্ণ বিকাশ বাধা পায়, সেই-সব বাধা দূরীকরণ এই স্বাধীনতার নামান্তর। এই স্বাধীনতা মানুষকে বলিতে সমর্থ করে, 'যাহা আমাদের করা উচিত তাহা আমরা অবাধে করিতে পারি।' স্বাধীনতার এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে দর্শনশাস্ত্র হইতে; এবং তাহার পর ইহা আইনের একটি উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, আইনতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক মত এই, যে, মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উচ্চতম কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবার এবং তদ্দ্বারা মানব-প্রকৃতির ও মানব-সমাজের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের আছে, এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা আইনের উদ্দেশ্য। ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্টে যে সরকারী কার্য্যবিভাগগুলিকে নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক (security services) বলা হইয়াছে, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা দ্বারা এই নিঃশঙ্কতা-উৎপাদন তাহাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, আইনের উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের "নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কর্ম্মচারীবর্গ" সম্বন্ধে কি একথা বলা

যায়, যে, তাঁহারা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশের সহায় ও পরিপোষক; মানুষকে যাহাতে খাট করে, ছোট রাখে, মানব-প্রকৃতিকে যাহা হীন করে, যাহা মানবাত্মার দৈন্য দূর হইতে দেয় না, তাঁহারা সেই সব বাধা-বিঘ্নের বিনাশে বদ্ধপরিকর ?

নিঃশঙ্কতা, নিরাপদ্ ভাব (security), সঙ্কীর্ণ অর্থে বুঝিলে চলিবে না। আধুনিক ব্যবস্থাদর্শন (Legal Philosophy) তাহার বিরোধী। মানুষের সকল দিকে সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নতির সকল বাধা মানবীয় শক্তির সাধ্যানুসারে দূরীভূত হইলে যে নিঃশঙ্ক নিরাপদ্ ভাব জন্মে, তাহাই প্রকৃত সিকিউরিটি বা নিঃশঙ্কতা।

—

"শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষার মূল্য

"শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষার মানে সাধারণতঃ যাহা ধরিয়া লওয়া হয়, তাহাতে জনসাধারণের সামান্য রকমের স্বাধীনতাতেও অনেক সময় হস্তক্ষেপ করা হয়; উপরে বর্ণিত উচ্চতর ও বিশালতর স্বাধীনতা ত থাকেই না। অবশ্য যাহারা ইতর প্রাণীর মত কেবল জান্তব-জীবন যাপন করিতে চায়, সাধারণ অর্থে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইলে তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে, এমন কি কখন কখন আরামে কাল যাপন করিতেও পারে। কিন্তু মানুষ হইতে পারে না। আমরা খুব শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার কথা বলিতেছি না। ইতর প্রাণীরাও আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করে; না পারিলে কখন কখন মারা পড়ে, কিন্তু চেষ্টাটা করে। কিন্তু মানুষ যখন অধঃ-পতিত হয়, তখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ এবং কখন কখন আত্মরক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ে। অন্যের দ্বারা রক্ষিত হইলে—বিশেষতঃ আত্মরক্ষার অভ্যাস, প্রয়োজন ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলে—তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটে; সে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কোন দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত না হইলে, দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইলে, তাহা উহার অধিবাসীদের নানা দুঃখের এবং অনেকের বিনাশের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, বাহির হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অতিরিক্ত চেষ্টায় যদি অধিবাসীদের নিজের আত্মরক্ষার উদ্যম ও শক্তি নষ্ট হয়, তাহাও কম অমঙ্গলের কারণ নহে। অরাজকতাকে সকলেই ভয় করে, এবং তাহা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অরাজকতা সত্ত্বেও দেশ অধিবাসী-শূন্য হয় নাই, বরং অধিবাসীদের মধ্যে অত্যাচার দমনের ইচ্ছা, সাহস ও শক্তি জন্মিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ত্রৈমাসিক "কলিকাতা রিভিউ"য়ের প্রথম ভল্যুমে ১৯০—১৯১ পৃষ্ঠায় একজন ইংরেজ অযোধ্যা রাজ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, নীচে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তখন অযোধ্যা ব্রিটিশভারতের অন্তর্গত হয় নাই।

"Anterior to the era of British rule in the East, this country, it is true, had been immemorially scourged by foreign invasion, or torn by domestic anarchy and violence. But the least meditation on the history and elements of human societies will make it abundantly evident, that a very broad gulf intervenes between anarchy and annihilation; and that even in the full roar and spring-tide of violent and bloody periods, the communities of the earth are steered onwards, by an unseen hand, through healthy revolutions to regeneration and prosperity.........During the era of Muhammadan domination, towns and villages were sacked and burnt, and vast multitudes perished and were blotted from the face of the earth by sword, fire, and famine. But gradually a spirit of resistance sprang up in men's hearts, and the homes and properties of countless millions were preserved by the valour and wisdom of their own struggles. This is no speculation. It is a true allusion to a real and living principle of protectiveness, rooted out, in a great measure, from the provinces under British sway, but seen in active operation in Native States. In Oude, for instance, anarchy and violence may be called the law of the principality. Nevertheless, men continue to people the face of the soil. The population is undiminished. Annihilation makes no progress even in the footsteps of sanguinary feuds and open rapine. Affairs find a real and powerful adjustment by the principle of resistance and self-defence; and it

may be safely averred, that even the ceaseless struggles, which prevail in that turbulent kingdom, denote a political and social frame of more healthful vigour and activity, than the palsied lethargy of despair, which characterizes the festering and perishing masses under the rule of the British. If national annihilation be indeed attainable by mere human wickedness or human errors, we hesitate not to declare our solemn opinion, that British India is lapsing more visibly towards its gulf than any other community of the earth." (*The Calcutta Review*, Vol. I, pp. 190-191.)

এই ইংরেজ লেখক ব্রিটিশ ভারতের সহিত অযোধ্যার যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ তখনকার ব্রিটিশ ভারতের সহিত মুসলমান নৃপতিদের অধীনস্থ তখনকার অযোধ্যার তুলনা; বর্ত্তমান সময়ের নহে। আমাদের মন্তব্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা উদ্ধৃত করিলাম। শান্তি ও শৃঙ্খলা অপরের দ্বারা রক্ষিত হওয়া অপেক্ষা আত্মরক্ষার সাহস ও শক্তি, অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবার উদ্যম ও শক্তি যে কম প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ নহে, তাহা উক্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে।

—

লোকসংখ্যা হ্রাসের প্রবলতম কারণ

ত্রৈমাসিক কলিকাতা রিভিউ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে প্রায় ৮০ বৎসর কোন না কোন বিদ্বান্ ইউরোপীয়ের দ্বারা উহা সম্পাদিত হইত, এবং উপরে উদ্ধৃত অংশও কোন বিদ্বান্ ইংরেজের লেখা। এই ত্রৈমাসিক কলিকাতা রিভিউয়ের আদর ঐতিহাসিক ও অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলী এখনও করিয়া থাকেন। এহেন কাগজে ইংরেজ লেখক ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বলিতেছেন, যে, "অরাজকতা অত্যাচার ও জুলুমকে অযোধ্যা রাজ্যের 'আইন' বলা যাইতে পারে। তথাপি মানুষ এই ভূখণ্ডে বসবাস করিতেছে। লোকসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। রক্তপাত-বহুল ভিন্ন ভিন্ন দলের অন্তর্যুদ্ধ এবং প্রকাশ্য লুটতরাজ সত্ত্বেও অধিবাসীদের নির্মূল হইবার দিকে গতি দেখা যাইতেছে না।" অযোধ্যার অধিবাসীদের মধ্যে আত্মরক্ষা ও অত্যাচারের প্রতিরোধের ইচ্ছা ও উদ্যম জাগিয়া উঠায় ফল ঐরূপ হইয়াছিল, ইংরেজ লেখকের এই মত। তাঁহার অন্যান্য কথাও অবধানযোগ্য।

অসভ্য অনেক দেশে, যেখানে "নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কর্ম্মচারীবর্গ", যথা পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট্ জজ আদি নাই, তথায়, অধিবাসীরা নির্মূল হয় নাই, সংখ্যাতেও কমে নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

কিন্তু এই সভ্য বাংলা দেশে, আইনের মর্য্যাদা, এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পুরা বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও ১৯১১ হইতে ১৯২১ এই দশ বৎসরে বর্দ্ধমান বিভাগে ৪১,৬৮৬৪ জন মানুষ, নদীয়া জেলায় ১২৯৮৯০০জন, মুর্শিদাবাদে ১০৯৭৬০ জন, যশোরে ২১১৫২, পাবনায় ৩৯০৯২ এবং মালদহে ১৮৪৯৪ জন মানুষ কমিয়াছে। এই অঙ্কগুলি হইতে হ্রাসের ঠিক্ পরিমাণ বুঝা যায় না। বহু সভ্য দেশে প্রতি দশ বৎসরে শতকরা ১০।১৫ জন মানুষ বাড়ে; বঙ্গের বিস্তর জেলায় বাড়ার পরিবর্ত্তে কমিয়াছে। ১০০ এর জায়গায় যেখানে বাড়িয়া ১১০ হইবার কথা, সেখানে যদি কমিয়া ৯৬ হয় তাহা হইলে প্রকৃত হ্রাস শতকরা ৪ নহে, শতকরা ১৪। সেইজন্য বাংলা দেশে লোকসংখ্যা হ্রাসের যে অঙ্ক উপরে দেওয়া গেল, হ্রাস তদপেক্ষা বাস্তবিক অনেক বেশী হইয়াছে।

—

এই হ্রাসের কারণ কি?

সম্প্রতি বঙ্গের স্বাস্থ্যের যে বার্ষিক বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে, ১৯২০ সালে এদেশে মানুষ মরিয়াছিল ১৪,৮১,৬১২, কিন্তু জন্মিয়াছিল মোট ১৩,৫৯,৯১৩; সুতরাং জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হইয়াছিল ১,২১,-৬৯৯ বেশী। ১৯২১ সালে মানুষ জন্মিয়াছিল ১৩,০১,০০১, কিন্তু মরিয়াছিল ১৪,০৩,০৩০; জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু ১,০২,০২৯ বেশী হইয়াছিল। অনেক বৎসর এইরূপ জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী হওয়ায় বঙ্গের নানা জেলায় দশ বৎসরে লোক-সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে।

এখন কথা উঠিতে পারে, যে, জন্মমৃত্যু বিধাতার হাতে; ইহার উপর গবর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের কি ক্ষমতা আছে? ইহা ভুল। সবই ভগবানের নিয়মাধীন, তাহাতে

সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবান্ মানুষকে যে বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য শক্তি দিয়াছেন, তাঁহার নিয়মানুগত হইয়া তাহার চালনা করিলে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস ও জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাহার দ্বারা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি করা যায়। অনেক দেশের লোকে তাহা করিয়াছে।

মানুষ বুড়া হইয়া মরিলে তাহা অনিবার্য্য; কিন্তু সাধারণতঃ যে-সব রোগে লোকদের মৃত্যু হয়, তাহা নিবার্য্য। যেমন ধরুন, ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া আগে ইংলণ্ডে ছিল, ইটালীতে ছিল, পানামায় ছিল, আরও অনেক দেশে ছিল। এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইংলণ্ড, ইটালী, পানামা প্রভৃতি দেশে উহা নির্ম্মূল হইয়াছে। বাংলা দেশেও তাহা হইতে পারে। বাংলাদেশে ১৯২০ ও ১৯২১ সালে, প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ায় ও তাহার পর কম পরিমাণে অন্যান্য জ্বরে, যথাক্রমে ১১,৪৪,৫২১ ও ১০,৭০,৩৬৮ জন লোকের মৃত্যু হয়। মোটামুটি ধরুন বৎসরে দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু ম্যালেরিয়ায় হয়। এতগুলি মানুষের প্রাণরক্ষা গবর্ণমেণ্ট ও দেশের লোকের সম্মিলিত চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে হইতে পারে। ১৯১৯ সালে ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছিল ১,২৪,৯৪৯ জনের, বসন্তে হইয়াছিল ৩৭,০১০। এদুটিও নিবার্য্য রোগ। এক বৎসর বয়স হইতে না হইতেই ১৯২০ ও ১৯২১ সালে যথাক্রমে ২,৮২,০৯০ ও ২,৬৮,১৬২টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। এই-সব মৃত্যুর অধিকাংশ নিবার্য্য। ১৯২১ সালে সন্তান-প্রসব-ঘটিত কারণে বঙ্গে ৬০,০০০ জননীর মৃত্যু হয়। ইহারও অধিকাংশ নিবার্য্য। উক্ত সকল স্থলে নিবার্য্য বলিতেছি এইজন্য, যে, সভ্যতম দেশ-সকলে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তে মৃত্যু প্রায় হয় না বলিলেই হয়, এবং শিশু-মৃত্যু ও প্রসবঘটিত কারণে মাতার মৃত্যু খুব কম হয়।

এই যে মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস সাধন, ইহার জন্য অবশ্য দেশের লোকদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই চেষ্টার পরিচালক, পরামর্শদাতা, আইনকর্ত্তা, ব্যয়ভার-বাহক ও সহায় হইবেন প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট্। সভ্যতম দেশে তাহাই দেখা যায়। গবর্ণমেণ্টের কোন্ বিভাগ দ্বারা এই কার্য্য সাক্ষাৎ ভাবে হইবে? চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ দ্বারা। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ-গুলিকে তেমন অবশ্যপ্রয়োজনীয় ও প্রাথমিক কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না, যেমন পুলিস্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ প্রভৃতিকে মনে করেন। ব্যয়সংক্ষেপ কমিটিও এই বিভাগগুলিকে "নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক" বিভাগের (security services) মধ্যে গণ্য করেন নাই।

মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস সাধন সাক্ষাৎভাবে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের কার্য্য হইলেও পরোক্ষভাবে শিক্ষাবিভাগের দ্বারাও এই কাজ হয়। কেন না, স্বাস্থ্য-তত্ত্বের জ্ঞান মানুষ শিক্ষা হইতেই পায়, স্বাস্থ্যরক্ষা শিখান সমুদয় সভ্যতম দেশের বিদ্যালয়গুলির অন্যতম কর্ত্তব্য। দৈহিক শিক্ষা ও উন্নতিসাধনও (physical culture) ঐ-সব দেশের শিক্ষালয়সকলের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য।

খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং অন্যান্য প্রকারের ধন উৎপাদনে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া যে-সব সরকারী বিভাগের কাজ, তাহাদের দ্বারাও খুব বেশী পরি-মাণে মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস ও জন্মসংখ্যার বৃদ্ধি সাধিত হয়। দুর্ভিক্ষ হইলে ত মানুষ মরেই; কিন্তু দুর্ভিক্ষ না হইলেও, দারিদ্র্যবশতঃ যথেষ্ট খাইতে যে দেশের লোক পায় না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, শীতাতপবৃষ্টি হইতে যথেষ্ট আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সে দেশে মানুষ মরে বেশী জন্মে কম। সম্প্রতি বঙ্গের বার্ষিক যে স্বাস্থ্যবিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, যে, স্বাস্থ্যবিভাগের পরিচালক বঙ্গের দারিদ্র্যকে উহার রুগ্নতার কারণ বলিয়াছেন। "১৯২০ সালে দেশ উহার অধিবাসীদিগকে খাদ্য যোগাইতে পারে নাই" ("The country was not in 1920 providing subsistence for its population")।

খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রকার ধন উৎপাদনে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া কৃষিবিভাগ, শিল্পবিভাগ ও বাণিজ্য-বিভাগের কাজ। কিন্তু ইহাদের কাজকে গবর্ণমেণ্ট কিম্বা ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি রাজশক্তির প্রাথমিক কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না।

"নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক"দের কৃত কাজ

"নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কর্ম্মচারী"দের কাজ প্রধানতঃ মানুষের প্রাণনাশ এবং সম্পত্তিনাশ ও অপহরণ নিবারণ। এই দুরকমের কাজ পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজেরা কি পরিমাণে করেন, বলা কঠিন। দেশে প্রতিবৎসরই কতকগুলি খুন ও কতকগুলি চুরি ডাকাতি হয়। ঐ-সব কর্ম্মচারী না থাকিলে খুন চুরি ডাকাতি আরও কত হইত, বলা সম্ভবপর নহে। তবে একটা আনুমানিক সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কারণ, যে-সব দেশে পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট জজ নাই বলিলেও চলে, সেখানে লোকে কেবলই হত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া লোপ পাইতেছে না।

সম্প্রতি-প্রকাশিত বঙ্গের ১৯২১সালের পুলিস্ রিপোর্টে দেখিতে পাই, যে, পুলিসের মতে ঐ বৎসর ৬৫৫টি প্রকৃত খুন হইয়াছিল, যদিও জজদের রায়ে অতগুলির জন্য শাস্তি হয় নাই। আমরা পুলিসের সংখ্যাই ধরিলাম। পুলিস্ ম্যাজিষ্ট্রেট জজ প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও এই ৬৫৫ জন মানুষের প্রাণ গিয়াছে। এই-সব কর্ম্মচারী না থাকিলে আরও যত খুন হইত, তাহাদের প্রাণরক্ষা ইহারা করিয়াছে বলিয়া ধরিতে পারা যায়। কিন্তু আরও কত খুন হইত, তাহা কে বলিতে পারে? পুলিস্আদি-বিহীন অসভ্য দেশ-সকলে আমাদের দেশের চেয়ে কত বেশী খুন হয়? ১০ গুণ, ২০ গুণ, ৫০ গুণ, না ১০০ গুণ? আমরা যতটা জানি, মোটের উপর বেশী হয় না। তবু ১০ গুণ হয় ধরিলে বলা যায়, যে, পুলিস্আদি না থাকিলে দেশে আরও ৬৫৫০ জন মানুষ মারা পড়িত। পুলিস্-প্রভৃতিরা এই ৬৫৫০ জনের প্রাণরক্ষা করিয়াছে ধরা যাক্। বাংলা দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিভাগ প্রায় না-থাকার মধ্যে। এই-সব বিভাগের সমুচিত বন্দোবস্ত হইলে, উপরে যে বার্ষিক ১৩।১৪ লক্ষ নিবার্য্য মৃত্যুর কথা বলিয়াছি, তাহা নিবারিত হইত। অর্থাৎ পুলিস্প্রভৃতি বৎসরে ৬৫৫০ জনের প্রাণ রক্ষা করে; কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিভাগ বৎসরে ১৩।১৪ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং পুলিস্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ জজ্ প্রভৃতি অপেক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা কৃষি শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগকেই অধিকতর "নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক" মনে করিয়া তাহাদের সমুচিত বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

কোন আপত্তিকারী বলিতে পারেন, যে, পুলিস্ আদি না থাকিলে খুন দশগুণ বাড়িত বলিয়া যে ধরা হইয়াছে, তাহা বড় কম অনুমান। তথাস্তু। আচ্ছা, একশত গুণ বাড়িত বলিয়া ধরা যাক্। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই, যে, ৬,৫৫,০০০ খুন হইত, এবং এই সাড়ে ছয় লক্ষ লোকের প্রাণ পুলিস্ প্রভৃতির অস্তিত্বে বাঁচিতেছে। তাহা হইলেও দেখা যায়, যে, সমুচিত বন্দোবস্তযুক্ত স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের চেষ্টায় যে ১৩।১৪ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিতে পারে, উক্ত সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেকও নহে। অবশ্য পুলিস্-আদি বিহীন অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য দেশ-সকলে বাংলাদেশের শতগুণ খুন হয় ইহা সত্য নহে; তর্কের খাতিরে ঐরূপ অনুমান করিয়াছি। কোন দেশে সারা বৎসর যুদ্ধ চলিলেও সাধারণতঃ পাঁচ ছয় লক্ষ মানুষ মরে না। ভারতে ইংরেজ-স্থাপিত শান্তির যুগে কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বেশী মানুষ মরিতেছে।

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার দ্বারা অন্ততঃ ইহা বুঝা গেল, যে, দেশের অধিকাংশ মৃত্যু যে-সব কারণে হয়, তাহা নিবারণ করিবার পক্ষে পুলিস্ প্রভৃতি কিছুই করিতে পারে না, স্বাস্থ্য-আদি বিভাগ তাহা পারে। অতএব স্বাস্থ্য-আদি বিভাগকেই প্রকৃত নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কার্য্যবিভাগ (security services) বলা উচিত। তাহার আরও একটি কারণ এই, যে, এইসব বিভাগ মানুষকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে পারে (পুলিশ-আদি তাহা পারে না ও করে না), এবং আত্মরক্ষাই প্রকৃত রক্ষা।

নিঃশঙ্কতা-উৎপাদকদিগের আর-একটি প্রধান কাজ সম্পত্তিরক্ষা। ইংরেজ-রাজত্বের আগে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা বেশী ধনী ও পুষ্টদেহ ছিল, না এখন আছে, তাহার আলোচনা এখানে করিব না; যদিও তাহা করিলে নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কর্ম্মচারীবর্গের কৃত কাজের প্রকৃত মূল্য বেশ বুঝা যাইত। আমরা এখন কেবল দেখিব, যে, পুলিস্-আদি থাকা সত্ত্বেও চুরি ডাকাতি কত হয়, এবং না থাকিলে আরও কত হইত।

১৯২১এর-পুলিস্ রিপোর্টে দেখিতেছি, যে, ঐ বৎসর পুলিসের মতে প্রকৃত ডাকাতি ৭১৬, দস্যুতা ৩৮০, ও চুরি ২৩৬০০ হইয়াছিল। এই সব-রকমে মোট কত টাকার সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছিল, এবং পুলিস্ প্রভৃতি না থাকিলে আরও কত টাকার সম্পত্তি অপহৃত হইত জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, যে, দারিদ্র্য পরের ধন অপহরণের প্রধান কারণ; দারিদ্র্য দূরীভূত হইলে অপহরণের সংখ্যা খুব কমিয়া যায়। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস্ ধন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূর করিতে সাহায্য করে না। শিক্ষা কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য বিভাগ তাহা করে। সুতরাং শেষোক্ত বিভাগগুলির কাজ এই হিসাবে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীদের কাজের চেয়ে কম মূল্যবান্ নহে।

সভ্যদেশ-সকলে এক এক জন মানুষের গড় বার্ষিক আয় কত, এবং গড়ে মানুষ কত বৎসর বাঁচে, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। এবং তাহা হইতে গণনা করা হইয়াছে, যে, গড়ে এক এক জন মানুষের জীবনের আর্থিক মূল্য কত। আমাদের দেশে লর্ড্ কার্জ্জনের মতে প্রত্যেক মানুষের গড়ে বার্ষিক আয় ত্রিশ টাকা। এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা কম ও বেশী অনুমানও আছে। আমরা কার্জনের অনুমান মাঝামাঝি বলিয়া তাহাই ধরিলাম। অনেক সভ্য দেশে মানুষের গড় আয়ু-কাল ৪০ বৎসরের বেশী। আমাদের দেশে ২৩ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গড়ে কয় বৎসর মানুষ রোজ্‌গার করে, বলা যায় না। যদি খুব কম করিয়া তিন চারি বৎসরও ধরা যায়, তাহা হইলে বঙ্গের এক এক জনের জীবনের আর্থিক মূল্য ন্যূনকল্পে এক শত টাকা হয়। তাহা হইলে বঙ্গে প্রতিবৎসর নিবার্য্য কারণে যে তের চৌদ্দ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, তাহাতে দেশের বার্ষিক ক্ষতি ১৩।১৪ লক্ষের এক শতগুণ অর্থাৎ ১৩।১৪ কোটি টাকা হয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন, ইহাও সকলে জানেন, যে, যেখানে ম্যালেরিয়াতে এক জন মরে সেখানে অন্ততঃ আরও চারিজন রোগ্ ভোগ করে। এই রোগীরাও রোগের অবস্থায় রোজ্‌গার করে না, এবং দুর্ব্বল হইয়া যাওয়ায় আরোগ্যের পরেও রোজ্‌গার কম করে। এই-সব অবস্থা বিবেচনা করিলে বলা যায়, যে, মৃত্যুর জন্য ১৩।১৪ কোটি টাকা বার্ষিক ক্ষতি ছাড়া রোগভোগের জন্যও অন্যূন আরও ১৩।১৪ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। স্বাস্থ্য-আদি বিভাগের সুবন্দোবস্ত হইলে এই আটাশকোটি টাকা ক্ষতি নিবারিত হইয়া এই পরিমাণ আয় বাড়িতে পারে। ইহা কেহই বলিবেন না, যে, পুলিস্ প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা থাকায় এত কোটি টাকার অপহরণ নিবারিত হয়; এত লক্ষেরও হয় কি না সন্দেহ। অতএব সম্পত্তিসম্বন্ধীয় ক্ষতি নিবারণ বিষয়েও পুলিস প্রভৃতি বিভাগ অপেক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের কার্য্যকারিতা ও মূল্য কম নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি তাহা মনে করেন না।

এখানে আর একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, যে, ডাকাতি, দস্যুতা ও চুরি দ্বারা সম্পত্তি নাশ অল্পই হয়, সম্পত্তি **হস্তান্তরই** বেশী হয়। অর্থাৎ এই-সব অপরাধের পরোক্ষ ফল যাহাই হউক, সাক্ষাৎভাবে উহাদের ফলে এক জনের সম্পত্তি অপরের হাতে যায় মাত্র, সমস্ত জাতির ধনের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না; যদিও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে অপহরণ খুব বেশী পরিমাণে হইতে থাকিলে ধন-উৎপাদকের উৎপাদন-আগ্রহ ও -শক্তি কমিয়া যায়। অন্যদিকে বঙ্গে প্রতিবৎসর যে ১৩।১৪ লক্ষ লোক নিবার্য্য কারণে মরে এবং আরও যে বহু লক্ষ লোক রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা দেশের সম্ভাবিত ধনোৎপাদন কমিয়া গিয়া বাস্তবিক ক্ষতি প্রায় আটাশ কোটি টাকার হয়। পুলিশের দ্বারা অপহরণ নিবারণ অপেক্ষা এই ক্ষতি নিবারণ বেশী দর্‌কারী কাজ। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ ও ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি তাহা মনে করেন না। আমরা তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত মনে করি।

অতএব আমাদের মত এই, যে, আগে পুলিস্ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার পর উদ্বৃত্ত টাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষিশিল্প-আদির বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এই নীতি ভ্রান্ত। শেষোক্ত বিভাগগুলির গুরুত্ব প্রথমোক্তগুলির অন্ততঃ সমান। ব্যবস্থা এবং বরাদ্দও তদনুরূপ হওয়া দর্‌কার।

—

বাংলার ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্ট্

কোন প্রাদেশিক ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্ট্ সন্তোষজনক হইতে পারে না। কারণ ভারত-গবর্ণমেণ্ট্

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলির নিকট হইতে যথাসাধ্য টাকা শুষিয়া লন এবং তাহার বেশীর ভাগ সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় করেন। এই ব্যয় খুব না কমাইলে ভারত-সরকারের আয়ব্যয়ের সাম্য হইতে পারে না, এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকল হইতে অতিরিক্ত অর্থ শোষণ ও তদ্দ্বারা তাহাদের দারিদ্র্য উৎপাদন নিবারিত হইতে পারে না। তাহার পর সিবিলিয়ান্, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী, প্রভৃতি যাহাদিগকে ভারতসচিব বিলাত হইতে নিযুক্ত করেন, তাহাদের বেতন কমাইবার প্রস্তাব করিবার ক্ষমতা কোন প্রাদেশিক কমিটির নাই; বড় লাট, মাঝারি লাট প্রভৃতির বেতন কমাইবার প্রস্তাব ত তাঁহারা করিতে পারেনই না।

বাংলার ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি কিরূপ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন, জানিবার উপায় নাই; কারণ তাঁহারা সাক্ষ্য প্রকাশ করেন নাই। তাহা হইলে কেমন করিয়া বুঝিব, যে, তাঁহারা কোন্ প্রস্তাবটি সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া করিয়াছেন, কোন্‌টিই বা তাঁহাদের মনগড়া কথা? সাক্ষীরাও কতটা নির্ভরযোগ্য জানিবার উপায় নাই।

—

সরকারী ইস্কুল সম্বন্ধীয় প্রস্তাব

কমিটি সরকারী ইংরেজী ইস্কুলগুলিকে সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুলে পরিণত করিতে চান। আমরা ইহার সমর্থন করি না। সরকারী ইস্কুলগুলির প্রয়োজন এখনও আছে, এবং সেগুলির আরও উন্নতি করা দরকার। এই উন্নতি সরকারী ব্যয়ে ভিন্ন হইবে না। কোন কোন বে-সরকারী ইস্কুল হইতে সরকারী কোন কোন ইস্কুল অপেক্ষা বেশী ছেলে পাস্ হয় বটে। কিন্তু মোটের উপর সরকারী বিদ্যালয়-সকল হইতেই শতকরা বেশী ছাত্র পাস্ হয়। নীচের তালিকায় সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়-সকলের তিন বৎসরের শতকরা পাসের সংখ্যা দিলাম।

	১৯১৭-১৮	১৯১৮-১৯	১৯১৯-২০
সরকারী	৭৪.৩	৮০.১	৮৩
বে-সরকারী	৫৬	৬২.৭	৬৫.৫

কিন্তু যদি বেসরকারী সব বিদ্যালয়গুলি হইতেই শতকরা বেশী ছাত্র পাস্ হইত, তাহা হইলে অন্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবল তাহাই উহাদের শিক্ষার উৎকর্ষের প্রমাণ বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যাইত না—বিশেষতঃ যখন পরীক্ষার কার্য্যটা করেন দোকানদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সরকারী বিদ্যালয়-সকলের চাকরীর ব্যবস্থায় শিক্ষার যে উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন ("the benefits which the system of Government service has brought to secondary schools in Bengal") এবং বেসরকারী বিদ্যালয় সকলে চাকরীর স্থায়িত্ব, বেতনের ক্রমবৃদ্ধি, পেন্‌শ্যন, প্রভৃতি না থাকায়, এরূপ বন্দোবস্তের নিন্দা করিয়াছেন। পাসের হারের আধিক্য ছাড়াও সরকারী বিদ্যালয়গুলির উৎকর্ষের অন্য প্রমাণ আছে।

পৃথিবীর সভ্য দেশসকলে শিশুর মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাবিজ্ঞান, শিক্ষাদান প্রণালী, প্রভৃতির অনুশীলন হইয়া শিক্ষাদান বিষয়ে কত উন্নতি হইতেছে, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক তাহার কোন খবরই রাখেন না। কমিটির সভ্যেরাও সম্ভবতঃ কোন খবর রাখেন না। যাহা হউক, উন্নততম দেশসকলে শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষারীতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহার ফল আমাদের বালক-বালিকাদিগকে দিতে হইলে, প্রধানতঃ সরকারের টাকাতেই তাহার আয়োজন হইতে পারে। বেসরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুলগুলির আর্থিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে তাহাদের দ্বারা এই কাজ হইতে পারে না।

—

শিক্ষকদের শিক্ষা

শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য নিম্নতম হইতে উচ্চতম যত বিদ্যালয় আছে, কমিটি কোন না কোন কারণ দেখাইয়া সেগুলি উঠাইয়া দিতে চান। আমরা তাহার বিরোধী। বেশী বেতন দিয়া শিক্ষাকার্য্যে যোগ্যতর লোকদিগকে আকৃষ্ট করা এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান কার্য্যে আধুনিক-প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন এদেশে শিক্ষার উন্নতি হইবে না, দেশেরও উন্নতি হইবে না। কমিটির ধারণা যেন প্রধানতঃ এইরূপ, যে, ভাল শিক্ষক প্রধানতঃ

স্বাভাবিক শক্তি ও সহজ বুদ্ধিতে হয়। কেহ কেহ হন বটে; যেমন অনেক সেকেলে নাপিত বেশ অস্ত্র করিতে পারিত, অনেক পাড়াগেঁয়ে লোক আইন-কলেজে না পড়িয়াও মোকদ্দমা বেশ বুঝে, অনেক রাজমিস্ত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে না পড়িয়াও বড় বড় বাড়ী তৈয়ার করে, এবং অনেক প্রায় নিরক্ষর ব্যবসাদার বাণিজ্য-কলেজে না পড়িয়াও লক্ষপতি হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া কোন বুদ্ধিমান্ বিবেচক শিক্ষিত লোক মেডিক্যাল কলেজ, আইন-কলেজ, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বাণিজ্য-কলেজগুলি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন না। আসল কথা এই, যে, শিক্ষাদান কার্য্য যে শিক্ষাবিজ্ঞান নামক একটি বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে আবার কতকটা শিশু ও বালকবালিকার মনস্তত্ত্বের এবং সাধারণ মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষকদের যে শারীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি জানা দরকার, এরূপ ধারণা এখনও এদেশে শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও না জন্মায়, গুরুট্রেনিং স্কুল হইতে ট্রেনিং-কলেজ পর্য্যন্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার সমুদায় প্রতিষ্ঠানগুলি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু সেগুলির উৎকর্ষ সাধন ও সংখ্যা বৃদ্ধিই বরং দরকার।

ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি চান ব্যয় কমাইতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন দেখাইয়াছেন, যে, বাংলার ইংরেজী ইস্কুলগুলিতে যদি যোগ্যতর ও শিক্ষাদানকার্য্যে শিক্ষা-প্রাপ্ত শিক্ষকগণ শিক্ষা দেন, তাহা হইলে ছাত্রেরা এখনকার চেয়ে দুই বৎসর কম সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা পাইতে পারিবে, এবং তাহাতে বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় কমিবে। শিক্ষাও উৎকৃষ্টতর হইবে। অন্যান্য দিকে যে-সব সুবিধা ও লাভ হইবে, তাহারও উল্লেখ তাঁহারা করিয়াছেন।

সরকারী কলেজ সম্বন্ধে প্রস্তাব

কমিটি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বেথুন কলেজ ছাড়া আর সব সরকারী কলেজকে বেসরকারী করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা ইহারও পক্ষপাতী নহি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীগুলির আর্থিক অবস্থা এরূপ নহে, যে, তাহারা কিছু সরকারী সাহায্য লইয়া বর্ত্তমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, এবং গবর্ণমেণ্ট কলেজগুলি চালাইতে পারে। অনেক স্থলে দেখা যায়, যে, অল্পবেতনভোগী লেক্‌চারাররা অধ্যাপকদের সমান, এবং সমান উৎকৃষ্ট কাজ করেন। বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ লোককে উৎসাহ দিলে, ছুটি কমাইয়া দিলে, এবং কলেজের শিক্ষাদাতাদিগকে আগেকার মত সপ্তাহে অন্যূন ১৮ ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে বলিলে ক্রমশঃ ব্যয়সংক্ষেপ হইয়া আসিবে। অধিকাংশ অধ্যাপক ক্লাসে পড়াইবার জন্য যতটুকু দরকার তাহার বেশী পড়াশুনা করেন না, গবেষণাও করেন না। সুতরাং অধ্যাপনার ঘণ্টা কমাইবার ও লম্বা ছুটি দিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার কোন উপায় অবলম্বিত হইলে অধ্যাপনার সময় ও ছুটির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমাদের আপত্তি নাই।

ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির কু-নীতি

শিক্ষার নানা শাখায় ও অন্য কোন কোন বিভাগেও কমিটি এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, যে, অমুক শাখা বা বিভাগের দ্বারা ভাল কাজ হইতেছে না, অতএব উহা ছাঁটিয়া ফেল। অথচ কাজটার গুরুত্ব বা সম্ভাবিত উপকার বিবেচনা করিয়া উৎকর্ষবিধান চেষ্টাই কর্ত্তব্য। কাহারও হাত বা পা বা চোখের দ্বারা ঠিক কাজ পাওয়া না গেলে কি তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া ফেলিতে হইবে? ঐ অঙ্গগুলিকে যথেষ্ট কার্য্যক্ষম করিবার চেষ্টাই কি বিহিত নহে?

শিক্ষাপরিদর্শক কর্ম্মচারী

বিদ্যালয়-সকলের পরিদর্শন জন্য কর্ম্মচারীর বাহুল্য কিছু ঘটিয়াছে—উপরের দিকে ঘটিয়াছে, নীচের দিকেও ঘটিয়াছে। ইহার কারণ কতকটা রাজনৈতিক খবরদারী ও গোয়েন্দাগিরি বলিয়া অনুমিত হয়। উপরের দিকে ও নীচের দিকে এই বাহুল্য ছাঁটিয়া ফেলা দরকার। কিন্তু সমুদয় সব-ইনেস্পক্টর ছাঁটিয়া ফেলার আমরা বিরোধী।

বালিকা-বিদ্যালয়-সকলের জন্য মহিলাপরিদর্শকের সমস্ত পদ কমিটি উঠাইয়া দিতে চান। আমাদের মতে ইন্‌স্পেক্‌ট্রেসের কাজ করিবার জন্য ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী মহিলা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। এসিষ্ট্যাণ্ট্‌ ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্‌রা যে বেতন পান, সেই বেতনে উপযুক্তসংখ্যক দেশী পরিদর্শিকা রাখা দরকার—তাঁহাদের পদের নাম যাহাই রাখা হউক, তাহাতে আসিয়া যায় না। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, স্ত্রী বা পুরুষ, যে জাতীয়ই হউন, শিক্ষা-বিভাগের ও অন্যান্য অনেক বিভাগের কার্য্যে তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে সমান অধিকার থাকা উচিত। সুতরাং যদি গবর্ণমেন্টেরও এই মত হয়, যে, ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্‌ ও এসিষ্ট্যাণ্ট্‌ ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্‌দের পদ উঠাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে নিম্নতম হইতে উচ্চতম পরিদর্শকদের চাকরীর কর্তকগুলিতে শিক্ষিতা মহিলাদের দাবী কার্য্যতঃ স্বীকার করা আবশ্যক হইবে। নারীরা শিক্ষা পাইবেন, অথচ শিক্ষার ফল দেখাইবার কার্য্যক্ষেত্র পাইবেন না, ইহা হইতে পারে না। কমিটি বলিতেছেন, যে, তাঁহাদের প্রাপ্ত সরকারী ও বেসরকারী সাক্ষ্য সমস্তই মহিলা-পরিদর্শকের প্রতিকূল। সাক্ষীরা কে এবং তাঁহারা কি সাক্ষ্য দিয়াছেন, জানিতে না পারায় আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিবার সুযোগে বঞ্চিত হইলাম। যাহারা খুন করে, তাহারাও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধার নিমিত্ত কে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল এবং কি সাক্ষ্য দিল, তাহা জানিতে পারে, এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকজন পুরুষ নারীদের বিরুদ্ধে রায় প্রকাশ করিলেন, অথচ কাহার সাক্ষ্যের ও কি সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহা করিলেন, জানা গেল না। চমৎকার বিচার!

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড্‌ মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতির আয় যথেষ্ট নহে। তাহাদের উপর প্রাথমিক শিক্ষার সমুদয় ভার চাপাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। দিলে তাহাদিগকে খুব বেশী অর্থসাহায্য গবর্ণমেন্টের দেওয়া উচিত। তাহাতে কি ব্যয়সংক্ষেপ হইবে?

প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন কমিটি বাড়াইতে বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সরকারী বৃত্তিগুলি দ্বারাই গরীব ছাত্রদের শিক্ষার দাবী কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইবে। কমিটির বাঙ্গালী সভ্য তিন জন কোন কালে গরীব ছিলেন কি? দেশে গরীব ও খুব বুদ্ধিমান্‌ ছাত্র কত আছে এবং গবর্ণমেণ্ট্‌ কয়টি বৃত্তি দেন, তাঁহারা কি তাহা মনে রাখিয়া এইরূপ কথা লিখিয়াছেন? তাঁহারা বোধ হয় জানেন না, যে, এখন সভ্যতম ও ধনী কোন কোন রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক হইয়াছে, এবং অন্যত্রও আদর্শের গতি ঐদিকে হইতেছে, এবং ইহাও শিক্ষানীতিজ্ঞদের স্বীকৃত, যে, বৃত্তির সংখ্যা খুব বেশী করিলেও গরীব বুদ্ধিমান্‌ ছাত্রসমষ্টিকে উচ্চতম শিক্ষা পাইবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া যায় না। কমিটি ত সরকারী কলেজ রাখিবেন মোটে একটি, তাহার আবার বেতন বাড়াইয়া দিবেন। তাঁহারা যে বেতনকে বেশী বলিতেছেন, তাহা কোন্‌ মাপ-কাটি অনুসারে? তাঁহারা ইংলণ্ড্‌ বা অন্য কোন দেশের জন প্রতি গড় আয় ধরুন; এবং তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-সকলের উচ্চতম ও নিম্নতম বেতন ধরুন; তাহার পর আমাদের দেশেরও ঐরূপ অঙ্ক লউন। দেখিতে পাইবেন, আমাদের ছাত্রেরা তুলনায় বেশী বেতন দেয়, কম দেয় না। আমরা "মডার্ণ্‌ রিভিউ"য়ে এইরূপ তুলনা নিজেই একবার করিয়া দেখাইয়াছিলাম। এখন তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া বাংলায় লিখিবার সময় ও স্থান নাই।

কমিটি আমাদের ছাত্রদের অল্প বেতনে পড়া সহ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু কার্সিয়ঙ্গে ইংরেজ-ফিরিঙ্গীদের ছেলে-মেয়েদের সস্তায় শিক্ষা পাওয়ার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহারা দেশী শিক্ষকদের শিক্ষাদান-কার্য্য শিখিবার প্রতিষ্ঠানগুলি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু কার্সিয়ঙ্গের ইংরেজ-ফিরিঙ্গী ট্রেনিং-কলেজের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। চমৎকার অপক্ষপাত বিচার!

শিক্ষার ও পুলিসের ব্যয়সংক্ষেপ

১৯২১ সালে বঙ্গীয় পুলিসের ব্যয় রাজকোষ হইতে ১,৪৭,০০,০০০ টাকা হইয়াছিল। ১৯২০-২১ সালে শিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে ব্যয় হইয়াছিল ১,০৮,৭৮,৪৮৪

টাকা। শিক্ষার জন্য ব্যয় পুলিস ব্যয়-অপেক্ষা ৩৮ লক্ষেরও উপর কম। অথচ কমিটি শিক্ষার ব্যয় ছাঁটিতে চান ৩৫,৯৮,৮০০ এবং পুলিসের ব্যয় ছাঁটিতে চান ২৬,২৮,৮০০০! যেন শিক্ষার জন্যই ভয়ানক বাজে খরচ হয়!

—

কমিটির আশ্বাস-বাক্য

কমিটি বলিতেছেন,—

"If our proposals are accepted a moderate revenue surplus will be secured, the major portion of which will presumably be spent on the activities we are considering."

"আমাদের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে যে রাজস্ব বাঁচিবে তাহার অধিকাংশ (শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি-আদি) জাতিগঠন বিভাগে ব্যয়িত হইবে অনুমান করি।"

এই অনুমান ও আশ্বাস-বাক্যের কোনই মূল্য নাই। রাজকীয় ঘোষণারও সম্মান যখন রক্ষিত হয় নাই, তখন একটা প্রাদেশিক কমিটির "অনুমানের" মূল্য কতটুকু?

—

অধস্তন রাজ-ভৃত্যদের ছুটি

কমিটি সরকারী আফিস বেশী বন্ধ রাখার বিরোধী। আমাদেরও মত সেইরূপ।

পীড়াদি কারণে কর্ম্মচারীদিগকে ছুটি দেওয়া সম্বন্ধে কমিটি একটি অত্যন্ত অবিবেচনার ও অমানুষের মত কথা বলিয়াছেন।

"We think, also, that except for special reasons, no leave should be granted to inferior Government servants if extra cost is thereby entailed."

"আমরা আরও মনে করি, যে, বিশেষ কারণ ভিন্ন, অধস্তন সরকারী চাকুরিয়াদিগকে ছুটি দেওয়া উচিত নয় যদি তাহাতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়।"

কমিটির বড়-মানুষেরা কি মনে করেন যে গরীব লোকদের শরীর, শরীর নয়? না তাহাদের বাড়ীর কাজ, সামাজিক কাজ, বিশ্রাম ইত্যাদির দরকার নাই? বড়লোকেরা যে যে কারণে ছুটি লন, গরীবদের জীবনেও সেই-সব কারণ ঘটে। বড় চাকুরেদের ছুটির জন্য যদি গবর্ণমেণ্ট দু-শ পাঁচ-শ, দু-হাজার পাঁচ-হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারেন, তাহা হইলে গরীবদের জন্য দু-দশ বিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ কেন করিতে পারিবেন না?

ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে আরও অনেক বলিবার কথা আছে, কিন্তু আর সময় ও স্থান নাই।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় ছুটি বিল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক একটি ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু একটি বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। সরকারী বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসে মুদ্রিত যে এক এক খণ্ড আমরা পাইয়াছি, তাহা অবলম্বন করিয়া আমাদের মত কিয়ৎপরিমাণে বলিতেছি। সব কথা বলিবার স্থান ও সময় নাই।

প্রথমে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের বিলের তাৎপর্য্য দিতেছি।

বঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রীকে রেক্টর নিযুক্ত করিতে হইবে।

কেবল পরীক্ষার ফী নহে, সর্ব্বপ্রকার ফী ও সর্ব্বপ্রকার আয় গবর্ণমেণ্টের পরিচালনা ও রেগুলেশ্যন অনুসারে ব্যয়িত, এবং বৎসরে একবার পরীক্ষিত হইবে।

হিসাবের জন্য এক বোর্ড থাকিবে। সেই বোর্ডের ৩ জন সভ্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক, ৩ জন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ও ৩ জন ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ঐ বোর্ড গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ক্রমে একজন কোষাধ্যক্ষ ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন। কোষাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অর্থের ভারপ্রাপ্ত হইবেন, তিনিই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিবেন। বজেটে যাহার বরাদ্দ নাই, তাহার জন্য কোন অর্থ যাহাতে ব্যয় না হয়, তাহা হিসাব-বোর্ড দেখিবেন। বোর্ড প্রতি ৩ মাসে তুলনা করিয়া দেখিবেন, বজেটে যে আয়ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে, বাস্তবের সহিত তাহার মিল আছে কি না, ও তদ্বিষয়ে রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট ও সিনেটের নিকট পাঠাইবেন। বোর্ড প্রতি বৎসরের সেশ্যন আরম্ভ হওয়ার ৩ মাস পূর্ব্বে বজেটের খসড়া প্রস্তুত করিবেন। এতদ্ব্যতীত আর যে-সকল ক্ষমতা বোর্ডকে রেগুলেশ্যন্‌স্‌-অনুসারে দেওয়া হইবে, তাহা পরিচালন করিবেন।

রেজিষ্টরীভুক্ত গ্রাজুয়েটগণ আইন চিকিৎসা-আদি পেশা অবলম্বী যোগ্য লোকদের মধ্য হইতে রেগুলেশ্যন্‌-নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যূন ৩০ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে কিম্বা বাহির হইতে অন্যূন ১২ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

অঙ্গীভূত কলেজসমূহের টীচার ও প্রোফেসারগণ অন্যূন ২৪ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ ব্যয়ে রক্ষিত কলেজসমূহের টীচার ও প্রোফেসারগণ অন্যূন ১০ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট অন্যূন ৬৩ জন সভ্য নিযুক্ত করিবেন। তন্মধ্যে অন্যূন এগার জন মুসলমান হওয়া চাই।

গবর্ণমেণ্ট সভ্যসংখ্যা ১৫০ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যদের উপরি-উক্ত অনুপাত যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট সিনেটের সহিত পরামর্শ করিয়া রেগুলেশ্যন্‌স্ পরিবর্ত্তন বা আইনানুযায়ী নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু পরীক্ষাগ্রহণ, পাঠ্য বিষয় ও পুস্তক নির্ব্বাচন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে, তাহার পরিবর্ত্তন গবর্ণমেণ্ট করিতে পারিবেন না।

এই নূতন আইন প্রণীত হওয়ার ৩ মাসের কিম্বা গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট তদধিক সময়ের মধ্যে সিনেট নিয়ম প্রণয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্মতি পাইবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে সিনেটের সহিত পরামর্শ করিয়া উহার পরিবর্ত্তন বা নূতন নিয়ম রচনা করিতে পারিবেন।

সিনেট যদি এই আইন প্রণয়নের পর ৩ মাসের বা গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট তদতিরিক্ত সময়ের মধ্যে কোন নিয়ম রচনা না করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট ঐ সময় অতীত হওয়ার পর ৩ মাসের মধ্যে স্বয়ং নিয়ম রচনা করিবেন, এবং তাহা বলবৎ হইবে।

অতঃপর বাবু যতীন্দ্রনাথ বসুর খসড়ার তাৎপর্য্য দিতেছি।

শিক্ষা-মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টার নিযুক্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সভ্য হইবেন,

(১) রেজিষ্টারীভুক্ত গ্রাজুয়েটগণ কর্ত্তৃক, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত কলেজসমূহের প্রোফেসার লেক্‌চারার ও টীচার কর্ত্তৃক, (৩) অঙ্গীভূত প্রথম শ্রেণীর কলেজসমূহের প্রিন্সিপালগণ কর্ত্তৃক, (৪) ইউনিভার্সিটির প্রোফেসার লেক্‌চারার ও টীচার কর্ত্তৃক, (৫) কলেজসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাসমূহ কর্ত্তৃক, ও (৬) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ, এবং (৭) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক, (৮) বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স্ কর্ত্তৃক, ও (৯) বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স্ কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সভ্যের সংখ্যা ১৩০-এর কম বা ১৫০-এর বেশী হইবে না। তাহাদের মধ্যে, (ক) আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট ব্যতীত অন্যান্য গ্রাজুয়েটগণ ১৮ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। তন্মধ্যে অন্যূন ৬ জন মুসলমান হইবেন। (খ) রেজিষ্টারীভুক্ত আইন-গ্রাজুয়েটগণ কর্ত্তৃক ১২ জন নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে অন্যূন ৪জন মুসলমান হইবেন। (গ) রেজিষ্টারীভুক্ত চিকিৎসক-গ্রাজুয়েটগণ কর্ত্তৃক ১০ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে অন্যূন ২ জন মুসলমান হইবেন। (ঘ) রেজিষ্টারীভুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং-গ্রাজুয়েটগণ কর্ত্তৃক ৪জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। (ঙ) অঙ্গীভূত কলেজসমূহের প্রোফেসার লেক্‌চারার ও টীচারগণ কর্ত্তৃক ২৫ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে অন্যূন ৪ জন মুসলমান হইবেন। (চ) প্রথম শ্রেণীর কলেজের প্রিন্সিপালগণ আপনাদের মধ্য হইতে ৬ জনকে সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। (ছ) অঙ্গীভূত কলেজসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাসমূহ কর্ত্তৃক ৫ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে অন্যূন ১জন মুসলমান হইবেন। (জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর লেক্‌চারার ও টীচারগণ কর্ত্তৃক ১০জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে অন্যূন ২জন মুসলমান হইবেন। (ঝ) ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক ১০জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে অন্যূন ৩জন মুসলমান হইবেন। (ঞ) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স্ কর্ত্তৃক ২জন মনোনীত হইবেন। (ট) ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্স্ কর্ত্তৃক ২জন মনোনীত হইবেন।

১০৪ জন সভ্য উপরিউক্ত প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইবেন। অবশিষ্ট ২৬ কি ৪৬ জন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হইবেন।

মাষ্টার, ডক্টর, ও যে-সব গ্রাজুয়েট ৭ বৎসর হইল উপাধি পাইয়াছেন, যাঁহারা একদা ২ টাকা ও বার্ষিক ২ টাকা ফী দিবেন, তাঁহাদের নাম রেজিষ্টরীভুক্ত হইবে। একদা ৫০ টাকা দিলে আর বর্ষে বর্ষে ২ টাকা দিতে হইবে না।

কোন সভ্য একাধিক নির্ব্বাচকসমষ্টির সভ্য হইতে কিম্বা একাধিক সমষ্টি হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

আমরা বিল দুটির এক একটি ধারা ধরিয়া অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিলাম না। স্থূল মর্ম্ম দিলাম।

দুটি বিলে সব বিষয়ে মিল নাই। সুতরাং দুটিই আইনে পরিণত হইতে পারে না। দুটিকে একটিতে পরিণত করিয়া ও সমঞ্জসীভূত করিয়া পাস করিতে হইবে।

উভয় বিলেই শিক্ষা-মন্ত্রীকে রেক্টর করা হইয়াছে। কিন্তু রেক্টর যে কি কাজ করিবেন, তাহা কোথাও লেখা নাই। ১৯০৪ সালের ৮ আইনের ২৮ ধারার দ্বিতীয় উপধারা অনুসারে চ্যান্সেলার রেক্টরকে নিজের যে-কোন ক্ষমতা সঁপিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ ধারা রদ্ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কার্য্যহীন একটা পদ সৃষ্টি করিয়া কি লাভ? হইতে পারে যে নূতন আইন দুটির প্রস্তাবকদ্বয় চান, যে, ভবিষ্যতে রেক্টরকে রেগুলেশন্‌স্ দ্বারা কোন কোন অধিকার বা কাজ দেওয়া হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উহার বিশেষ বিবরণ না জানিয়া আমরা শিক্ষা-মন্ত্রীকে রেক্টর করিতে রাজী নহি। কখন কোন্ শিক্ষা-মন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতা কিরূপ হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই।

আমরা চাই, যে, ভাইস্-চ্যান্সেলার রেজিষ্টরীভুক্ত গ্রাজুয়েটদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার আয় ও ব্যয় গবর্ণমেণ্টের হিসাববিভাগ দ্বারা পরীক্ষিত হউক, ইহা আমরা চাই; কিন্তু সমুদয় ব্যয় (ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যয়ও) গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্‌শন্ ও রেগুলেশন্‌সের অনুযায়ী ("under the

direction and regulations of the Local Government of Bengal") হইবে, এইরূপ ব্যবস্থার অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে আমরা জানিতে চাই, যে, "direction and regulations of the Local Government of Bengal"এর মানে কি, এবং সেই direction and regulation কি জাতীয় পদার্থ। কারণ সরকারী পরিচালনায় খরচ করিতে হইলে ভবিষ্যতে শিক্ষাকার্য্যেও পরোক্ষভাবে সরকারের হাত পড়িতে পারে। ঐ ইংরেজী কথাগুলি ৮৫৭ সালের আইনে আছে। কিন্তু তখন তদ্দ্বারা কয়েকটি ফীর উপর মাত্র সরকারকে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের বোধ হয় সেনেটের অধিকাংশ সভ্য বেসরকারী ও নির্ব্বাচিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের সমুদয়-হিসাব পরীক্ষার ক্ষমতাই অপব্যয় নিবারণে সমর্থ হইবে। অধিকন্তু আমরা বরং চাই, যে, সরকারী হিসাব-পরীক্ষক যে-সব ভুল বা অনিয়ম দেখাইবেন, তাহার প্রতিকার করিতে বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য হইবেন, এইরূপ কিছু নিয়ম হউক। তাহা না থাকায়, একাউণ্ট্যাণ্ট্-জেনারেল লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান হিসাব পরীক্ষার রীতি প্রহসনে পরিণত হইয়াছে।

হিসাব-বোর্ড্ নিয়োগে ও তাহাকে প্রস্তাবিত ক্ষমতাদানে আমাদের মত আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ এবং ব্যবস্থাপক সভা উভয়েই যখন সেনেটের কতকগুলি সভ্য যথাক্রমে মনোনীত ও নির্ব্বাচিত করিবেন, তখন আবার পৃথক্ করিয়া হিসাব-বোর্ডে তাঁহাদের সভ্য মনোনয়ন ও নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ভাল লাগিতেছে না। হিসাব-বোর্ড্ ও তাহার কোষাধ্যক্ষ সেনেটের দ্বারা নিযুক্ত ও সরকার দ্বারা অনুমোদিত হইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু যদি আমাদের মন্তব্য অনুযায়ী বোর্ড্ গঠনের ধারা ব্যবস্থাপক সভা মঞ্জুর না করেন, তাহা হইলে ধারাটি এইরূপ করা উচিত, যে, সেনেট যে বোর্ড্ নির্ব্বাচন করিবেন, তাহাতে দুজন সরকারী সেনেট-সভ্য, দুজন ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সেনেট-সভ্য, তিন জন রেজিষ্টরীভুক্ত গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সেনেট-সভ্য এবং দুজন অপর সেনেট সভ্য থাকিবেন। এরূপ ধারাও যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে সুরেন্দ্র-বাবুর বিলের অনুযায়ী তিন তিন সভ্যকে সেনেটই নির্ব্বাচন করিবেন।

সুরেন্দ্র-বাবুর বিলে ৭৭জন সেনেট-সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, ৩৩জন গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, এবং তা ছাড়া এখন যে দশজন পদবলাৎ (ex-officio) সভ্য আছেন তাঁহারাও থাকিবেন। অধিকন্তু চ্যান্সেলার আছেন। তাহা হইলে ৭৭জন নির্ব্বাচিত এবং ৪৪জন গবর্ণমেণ্টের লোক হন। গবর্ণমেণ্টের তরফের এত বেশী লোক আমরা চাই না। মোট সেনেট-সভ্য গবর্ণমেণ্ট্ ১৫০ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে নির্ব্বাচিতদের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়িবে বটে। কিন্তু সুরেন্দ্র-বাবুর বিলের মূল-অনুপাতটাই আমাদের মনঃপূত নহে। নির্ব্বাচিত সভ্য শতকরা ৮০জন হওয়া চাই।

মুসলমানেরা বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী। তাঁহারা চিরকাল কেবল গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহবলে সেনেটে প্রবেশ করেন, এই স্থায়ী অগৌরব তাঁহারা চান কি না, জানি না। তাঁহারা নির্ব্বাচনের দ্বারা সেনেটে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, ইহা আমরা চাই। সেনেটে সুশিক্ষিত স্বাধীনচেতা মুসলমান সভ্য থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকার হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। এইজন্য আমরা মুসলমান সভ্যও চাই, এবং তাঁহারা নির্ব্বাচিত হন, ইহাও চাই। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত সভ্যদের স্বাধীনচেতা না হইবারই অধিক সম্ভাবনা। অবশ্য গবর্ণমেণ্টের যতগুলি সভ্য মনোনয়ন করিবার অধিকার থাকিবে, তাহার মধ্যে যদি তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জনকতক মুসলমানকে মনোনীত করেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমাদের মত এই, যে, (১) ন্যূনকল্পে কতকগুলি মুসলমানকে সেনেটের সভ্য করিতেই হইবে, এই অগৌরবকর ধারা যেন না থাকে; (২) যদি এরূপ ধারা থাকে, তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম হউক, যে, এই ন্যূনতম সংখ্যা হিন্দু জৈন বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান মুসলমান শিখ ব্রাহ্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন (যেমন ব্যবস্থা যতীন-বাবুর বিলে আছে); এবং (৩) এই ন্যূনতমসংখ্যক মুসলমান সভ্য নির্ব্বাচনের নিয়ম আপাততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য হউক।

সুরেন্দ্র-বাবুর বিলে যেখানে যেখানে গবর্ণমেণ্টের রেগুলেশ্যন্‌স্ প্রণয়ন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ক্ষমতা

আছে, তাহাতে "ব্যবস্থাপক সভার সম্মতিক্রমে" এইরূপ কথা যোগ করা হউক। গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ কোন আইন ব্যবস্থাপক সভায় পাস্ না করিয়া করিতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা ভাল। আমাদের বোধ হয়, ইহা অতিরিক্ত সাবধানতা নহে।

যতীন্দ্র-বাবুর বিলেও শিক্ষামন্ত্রীকে রেক্টর করিবার ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে অনেক কথা আগে বলিয়াছি। আরো দু'-একটি বলি। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যে-যে ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য আছে তাহার পরিচালন ও সম্পাদন ত শিক্ষামন্ত্রীই করিবেন; সুতরাং তিনি নাই বা রেক্টর হইলেন? আমরা যত দূর জানি, বিলাতের বা অন্য কোন দেশের শিক্ষামন্ত্রী ঐ পদেরই বলে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হন না। তবে যদি কেহ বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীকে একটা অকেজো সম্মান দিতে চান, ত, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাকে কোন ক্ষমতা যদি ভবিষ্যতে দিবার মতলব কাহারও থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষমতা কি, তাহা না জানিলে মত প্রকাশ করিতে পারি না।

যতীন্দ্র-বাবু যে বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স্‌কে দুজন সেনেট-সভ্য বা ফেলো মনোনয়নের অধিকার দিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছে। বেঙ্গল চেম্বার বাণিজ্যিক সভা, বাণিজ্যশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিতে সমর্থ। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ অনেক লোককে ঐ চেম্বারের সভ্যেরা নিজেদের হাউসে চাকরী দেন। কিরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে তাঁহারা কাজ দিতে চান, তাহা জানা ভাল। এইরূপ কারণে ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স্‌কেও যে ফেলো মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে। মাড়োয়ারী চেম্বার অব্ কমার্স্‌কে এবং এবম্বিধ আরো কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভা থাকিলে তাহাকেও এই অধিকার দেওয়া উচিত।

যতীন-বাবুর বিল অনুসারে ফেলোর সংখ্যা অন্যূন ১৩০ ও ১৫০এর অনধিক হইবে। তাহার মধ্যে একশত জন নির্ব্বাচিত ও চারিজন দুটি চেম্বার দ্বারা মনোনীত হইবেন। যদি ফেলোর মোট সংখ্যা ১৩০ থাকে, তাহা হইলে তন্মধ্যে ১০০র নির্ব্বাচন ও চারিজনের চেম্বারদ্বয়ের দ্বারা মনোনয়ন এবং বাকী ২৬এর গবর্ণমেণ্ট দ্বারা মনোনয়ন মন্দ ব্যবস্থা নহে। ইহাতে নির্ব্বাচিতদের অনুপাত সুরেন্দ্র-বাবুর বিল অপেক্ষা অধিক হয়। তাহা ভাল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি ফেলোর সংখ্যা বাড়াইয়া ১৫০ করেন, তাহা হইলে নির্ব্বাচিতদের সংখ্যাও সেই হারে বাড়িবে, যতীন্দ্র-বাবু এরূপ কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ফেলোর পূর্ণসংখ্যা ১৫০ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি ৪৬ জনকে মনোনয়ন করেন, তাহা হইলে সরকারী দল বেশী পুরু হয়। পূর্ণ সংখ্যা ১৩০ হইতে ১৫০ হইলে নির্ব্বাচিতের সংখ্যাও সেই হারে বাড়িবার ব্যবস্থা করিলে যতীন্দ্র-বাবুর বিল এই বিষয়ে সুরেন্দ্র-বাবুর অপেক্ষা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ হইবে। অবশ্য সুরেন্দ্র-বাবুর বিলের নির্ব্বাচন-ব্যবস্থাও বর্ত্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল। সুরেন্দ্র-বাবুর বিলে রেজিষ্টারীভুক্ত গ্রাজুয়েট কাহারা হইবেন তৎসম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা নাই। যতীন-বাবু যে ব্যবস্থা করিতে চান, তাহা বর্ত্তমান বিধি অপেক্ষা ভাল। আমরা আরো অধিকসংখ্যক গ্রাজুয়েটকে ফেলো নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে চাই। আমরা বলি, সমুদয় মাষ্টার ও ডক্টার এবং নির্ব্বাচনের পাঁচ বৎসর আগে উপাধিপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট মাত্রেই প্রারম্ভিক এক টাকা ও বার্ষিক এক টাকা ফী দিলেই রেজিষ্টারীভুক্ত থাকিয়া ভোট দিতে পারিবেন, এইরূপ নিয়ম হউক।

—

ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী

কলিকাতায় ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর যতটা ব্যবহার হইতে পারে, তাহা না হইলেও, ইহা কলিকাতায় থাকায় সাধারণ পাঠক, বিদ্যার্থী ও গবেষকেরা ইহার যতটা ব্যবহার করেন, দিল্লীতে গেলে তাহার দশ ভাগের এক ভাগও হইবে না। অধিকন্তু এমন অনেক পুরাতন বহি আছে, যাহা রেলে লইয়া যাইতে যাইতেই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই লাইব্রেরী আগে কলিকাতা পাব্লিক্ লাইব্রেরী বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং কলিকাতার পৌরজনেরাই ইহা স্থাপন করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় বাংলা দেশের ও কলিকাতার লোকেরাই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে, পরে অবশ্য ভারতসাম্রাজ্যের রাজস্ব হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দিল্লী নগর বিশেষ করিয়া ইহার জন্য কিছু করে নাই, যেরূপ কলিকাতা করিয়াছে। কলিকাতাও ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত, দিল্লীও ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কলিকাতায় যত শিক্ষিত লোক, গবেষক, কলেজ, বিদ্বজ্জন সভা আছে, দিল্লীতে তাহা নাই। অতএব লাইব্রেরীটিকে কলিকাতায় রাখাই উচিত। তাহা রাখিবার জন্য যদি অনেক টাকা লাগে, ব্যবস্থাপক সভা ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর তাহা দেওয়া উচিত। বাঙ্গালীর অল্প যাহা গৌরব আছে, তাহা বিদ্যাসম্পর্কীয়। বিদ্যালাভের একটি প্রধান আয়োজনকে হাতছাড়া হইতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়।

ইম্পীরিয়্যাল রেকর্ড্স্

ইহাও শুনা যাইতেছে, যে, ভারতসাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থার কলিকাতায় রক্ষিত অনেক ঐতিহাসিক কাগজ-পত্রও দিল্লী লইয়া যাওয়া হইবে। ভারতসাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন বলিতে গেলে কলিকাতাতেই হয়। ব্রিটিশ শাসনের সেই প্রাথমিক যুগের কাগজপত্র কলিকাতার নিজস্ব সম্পত্তি। সেগুলিতে দিল্লীর কোনই অধিকার নাই। সেগুলির ব্যবহারও দিল্লী অপেক্ষা কলিকাতাতেই বেশী হইবে। অনেক কাগজ এমন জীর্ণ যে দিল্লী পৌঁছিবে কি না সন্দেহ। এই-সমস্ত দলিল কলিকাতাতেই রাখিবার জন্য বাংলার গবর্ণ্মেণ্টের ও ব্যবস্থাপক সভার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

—

অসহযোগ প্রচেষ্টার অবস্থা

দুঃখের বিষয় আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। অসহযোগ প্রচেষ্টার জাতিগঠনমূলক কাজগুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি এখন তত নাই; এখন কৌন্সিলে প্রবেশ করা না-করার কথা লইয়াই যত আন্দোলন হইতেছে।

—

বাণিজ্যিক লাইব্রেরী

কলিকাতায় যে সর্কারী বাণিজ্যিক দ্রব্য ও পুস্তকাদির সংগ্রহ আছে, বাঙ্গালীরা তাহার সমুচিত ব্যবহার করেন না। এমন সুবিধা ছাড়া উচিত নয়। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের এবং অন্য সকলের সাবধান থাকা উচিত, যাহাতে ইহা কোনদিন হঠাৎ অন্য কোথাও স্থানান্তরিত না হয়।

—

সামাজিক কলুষ

গণিকাদের দ্বারা যে সামাজিক অপবিত্রতা বৃদ্ধি হয়, তাহা দমন ও নিবারণ করিবার জন্য বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের খস্ড়া পেশ্ হইয়াছে। এরূপ আইনের আবশ্যকতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এত-গুলি স্ত্রীলোক কেন গণিকা হইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া সেই কারণের মূল উচ্ছেদ না করিলে, সামাজিক অপবিত্রতা দূর হইবে না। গণিকাদিগকে করিবে দূর দূর, এবং যে শ্রেণীর লোক প্রথমে তাহাদের সর্ব্বনাশ করে এবং এখনও তাহাদের অস্তিত্বের কারণ হইয়া আছে, তাহাদিগকে করিবে স্বাগত— অন্ততঃ তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিবে, এরূপ সামাজিক রীতি হইতে কল্যাণের আশা করা বাতুলতা মাত্র। বক্ষ্যমাণ পাপের দুই পক্ষ আছে। যদি নারী-পক্ষকে পতিতা বল ও তদ্বৎ ব্যবহার তাহার সম্বন্ধে কর, তাহা হইলে পুরুষ-পক্ষকেও পতিত বল এবং তাহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ আচরণ কর।

—

বঙ্গের উপর ঘোরতর জুলুম

ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্ বাংলার গবর্ণ্মেণ্টের ও বাংলা দেশের উপর কিরূপ অবিচার ও জুলুম করিয়াছেন, তাহা ন্যাশন্যাল লিবার্যাল লীগের একটি ইংরেজী পুস্তিকা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। ইহা প্রকাশ করিয়া লীগ্ বঙ্গের উপকার করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা একটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতে বুঝা যাইবে, ১৯২০-২১ সালে কোন প্রদেশে মোট কত লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, কত লক্ষ ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্ তাহা হইতে লইয়াছিলেন, এবং কত লক্ষ প্রাদেশিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণ্মেণ্টের হাতে ছিল।

প্রদেশ	মোট আদায়	ভারত-সর্কারের গৃহীত	প্রাদেশিক সর্কারের হস্তস্থিত
মান্দ্রাজ	২১৪২	১১৭৮	৯৬৪
বোম্বাই	৩১৪২	১৯৬৮	১১৭৪
বাংলা	৩৪০৩	২৫৬৩	৮৪০
আগ্রা-অযোধ্যা	১৪২৯	৫৮০	৮৪৯
পঞ্জাব	১১৯৪	৫৩০	৬০৪
বিহার-উড়িষ্যা	৫০২	১৩৩	৩৬৯
মধ্যপ্রদেশ	৫৭৭	১৯২	৩৮৫
আসাম	২৫৫	৭১	১৫৪

বাংলাদেশ হইতে ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্ যদি ন্যায়সঙ্গত টাকা লইতেন এবং যদি বাংলা-গবর্ণ্মেণ্টেরও দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে নূতন ট্যাক্স্ না বসাইয়াও বঙ্গের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-শিল্পাদির উন্নতির ব্যবস্থা করা যাইত। মান্দ্রাজের লোকসংখ্যা ৪১৪ লক্ষ, বোম্বাইয়ের ১৯৬ লক্ষ, বঙ্গের ৪৫৪ লক্ষ, আগ্রা-অযোধ্যার ৪৭১ লক্ষ। লোকসংখ্যা অনুসারেও, বাংলাকে যেরূপ সামান্য টাকা রাখিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অযথেষ্ট।
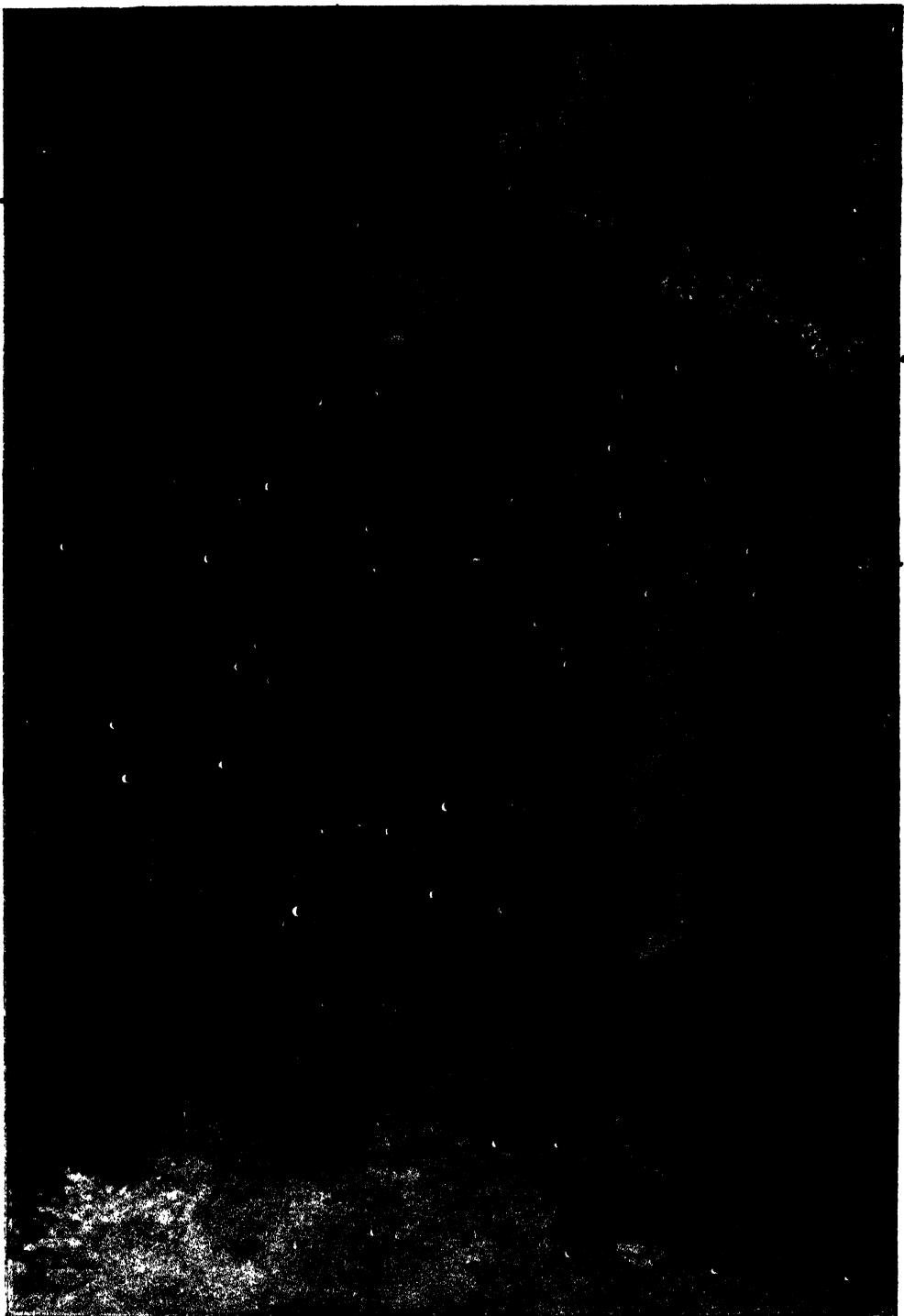
চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি-লিট্‌, সি-আই-ই

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২২শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

কবীর

কবীরের ইতিহাস, তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখের বিচার আজ আমি করতে চাই নে। তা যদি করতেই হয়, তবে সে অন্য সময় করার চেষ্টা করা যাবে।

কবীরের মন ও দৃষ্টি কত বড় ছিল, তাঁর প্রাণের ভিতর কি আকাঙ্ক্ষা আগুনের মত জ্বলেছিল, কি সাধনা তাঁর জীবনের সাধনা ছিল, তারই একটুখানি আজ আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে চাই।

প্রায় পাঁচশত বছর আগে কাশীর কাছে খুব সম্ভব এক দরিদ্র জোলা-মুসলমানের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। নিজে তিনি লিখতে পড়তে জানতেন না। তবে তাঁর প্রতিভা ও সাধনার জোরে যে দৃষ্টি তাঁর খুলে গিয়েছিল, সে দৃষ্টি জ্ঞানী বা পণ্ডিতের হয় না। ভক্ত ও মহাপুরুষ ছাড়া সে দৃষ্টি কেউ পায় না। তাঁর গান, সাখী, সবদ, দোহা প্রভৃতি কবিতাগুলি তাঁর ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যেরা সব লিখে লিখে রেখেছেন। তাই তাঁর লেখায় একই গান একই কবিতা নানা হাতে নানা রকম হয়ে গেছে। তাঁর কবিতা যে ভারতময় কত ছড়িয়ে আছে তা কেউ এখনও ঠিক করে বলতে পারেন না। সাধু-সন্ন্যাসী ছেলে-বুড়ো সবার মুখেই কবীরের দোহা, সবদ, সাখী লেগেই আছে। তা ছাড়া তাঁর বহু গল্প আলোচনা সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখে মুখে চলে আসচে। সেগুলি যে কত চমৎকার ও মূল্যবান্ তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। যাঁরা হিন্দুস্থানে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরেছেন তাঁরা সকলেই মহাত্মা কবীরের অনেক গল্প আলোচনা ও "প্রসঙ্গ" শুনতে পেয়েছেন। সে-গুলি সরস গল্পে বেশ চমৎকার ভাষায় গুরুপরম্পরা-ক্রমে খুব সরসচিত্ত সাধকদের মধ্য দিয়ে চলে আসচে। এগুলিকে অনেকে "বহস্" বলেন। এই বহস্‌গুলি আজও কেউ সংগ্রহ করেন নি। সংগ্রহের অভাবে এগুলি নষ্ট হয়েই চললো, এ-সব বহুমূল্য জিনিষ গেলে যে ক্ষতি হবে, তার আর পূরণ হবার কোন আশা নেই। আমি নিজেও এসব সংগ্রহ করে রাখিনি। ছেলেবেলা কাশী ও হিন্দুস্থানের নানা জায়গায় অনেক বহস্ শুনেছি, কিছু কিছু আমার চুম্বক করা আছে। কিন্তু রীতিমত কিছুই করিনি। "কবীর-মনশূরে" ও

"কবীর-গোষ্ঠী" প্রভৃতিতে কিছু কিছু বহসের মত লেখা আছে। কিন্তু সেগুলি কখনও খাঁটি নয়। তাতে কবীরের বিষয় সামান্য কিছু কিছু জানা যায় বটে, কিন্তু তা ঘোর সাম্প্রদায়িক রকমের। সেগুলি তাঁর উঁচুদরের শিষ্যদেরও লেখা নয়। তাতে কবীরকে উঁচু কর্‌তে গিয়ে কেবল খাটোই করা হয়েছে।

কবীর তখনকার চলিত সব ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বহস করেছেন। সে আলোচনাগুলি চমৎকার। তাতে তাঁর মনের উদারতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও হৃদয়ের গভীরতা প্রতিকথায় বোঝা যায়। আমাদের দেশের সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা আছে। কি হ'লে ভারতের ধর্ম্মসমস্যা মিট্‌তে পারে তারও বেশ চমৎকার আলোচনা আছে। কিন্তু আজও তো এইসব "বহসের" কোন সংগ্রহ বা কোন সংগ্রহের চেষ্টা হলো না। তাঁর "বহসের" একটু একটু আভাস তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা বোধহয় প্রায়ই সংগ্রহ করা আছে, তবে সব এখনও কোথাও ছাপা হয়নি।

কবীরের যুগটিই একটি অসাধারণ যুগ। ভারতে তখন হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ্ব, সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের, ঝগড়ার আর অন্ত নেই, তবু তারই মধ্যে একটি বিরাট্ সমন্বয় ও ঐক্যদৃষ্টির চেষ্টাও চলেছে। এত বিরোধের মধ্যে যে এমন ঐক্যের চেষ্টা চল্‌তে পারে, তা কেউ সেই যুগের বিষয় অনুসন্ধান না করলে বিশ্বাস করবেন না।

কবীরের কিছুদিন আগে থেকেই এই মহাযুগের আরম্ভ হয়েছে। যিনি আরম্ভ করেছেন, তিনি কবীরের গুরু—রামানন্দ।

কোনো কোনো ভক্তধারার মতে রামানন্দ রামানুজের শিষ্যক্রমে ৫ম পুরুষ। রামানন্দ আচারী-সম্প্রদায়ের গুরু, অথচ তখনকার যত নীচ জাতির বড় বড় ভক্ত তাঁরই কাছে দীক্ষিত। প্রত্যেকবারেই এক-একটি নীচজাতীয় ভক্তের দীক্ষাটিকে একটা অপরূপ ঘটনা দিয়ে কোন গতিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে তো আসল কথা চাপা থাকে না। অন্ধকারে কবীরের গা মাড়িয়ে তিনি হঠাৎ "রাম রাম" করে' উঠেন—অম্‌নি কবীর মন্ত্র পেয়ে জপ্‌তে বস্‌লেন, এই তো গেল চলিত গল্প। অথচ তাঁর শিষ্য সেনা জাতে নাপিত, ধন্না জাতে জাঠ চাষা, রবিদাস জাতে চামার, কবীর জাতিতে জোলা, পদ্মাবতী স্ত্রীলোক, তাঁর ১২ শিষ্য ও ১২ ভক্তের মধ্যে নীচ ও অনাচরণীয় জাতি অনেক আছে। এ তো হঠাৎ হবার কথা নয়। আর-এক কথা, গুরু রামানন্দ একবার তীর্থভ্রমণে যান। তখন নাকি তিনি সব ছোঁয়া ও আচারের নিয়ম মেনে চলেন নি—তাই তিনি ফিরে এলে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন। এঁদের সম্প্রদায়ের মতে আহার কালে যদি বাইরের কেউ দেখ্‌তে পায় তাতেই ভোজন নষ্ট নয়—কারণ তাতে দৃষ্টি দোষ হয়। রামানন্দ মনে করেছিলেন এসব আচারের কোন মানে নেই—তাই তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকার কর্‌লেন। যিনি সম্প্রদায়ের গুরু, তাঁর এসব দোষ থাক্‌লে চল্‌বে কেন, তাই গোল উঠ্‌লো। তিনি বল্লেন, "বেশ তো আমায় ছেড়ে দাও। আমি সম্প্রদায়ের সম্মান চাইনে। হরিকে পেলেই আমার সব পাওয়া সার্থক হবে।" স্বামী রাঘবানন্দ তখন রামানন্দকে সরিয়ে দিয়ে ঝগড়া থামিয়ে দিলেন। এসব তো হঠাতের কথা নয়।

তার পর রামানুজ থেকে সব গুরুই সংস্কৃতে লিখেছেন, প্রাকৃত ভাষা কেউ ব্যবহার করেন নি। রামানন্দ যখন প্রাচীন আচারের পাশ থেকে মুক্ত হলেন তখন তিনি সংস্কৃতভাষা ছেড়ে হিন্দী ভাষাতে লিখ্‌তে সুরু কর্‌লেন; তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ আর সংস্কৃতে লেখেন নি। কবীর তো সোজা বুঝিয়ে দিলেন—

> সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতা নীর।
> জব চাহৈ তবহি ডুবৌ শান্ত হোয় শরীর॥

হে কবীর, সংস্কৃত তো কূপজল; খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে জল পাবার আগেই সব কাল ফুরিয়ে আসে—জল পেলেও এক এক ঘটী জল তোল আর ব্যবহার কর। তাতে গা ভাসিয়ে দেহ ডুবিয়ে তলিয়ে যাবার সুখ নেই। 'ভাষা' অর্থাৎ হিন্দী হ'ল বিনা-আয়াসে-লভ্য 'বহতা নীর'। তা প্রবহমান, কাজেই নির্ম্মল নির্দ্দোষ। তাতে দেহ ভাসাও ডুবাও যা খুসী কর। কোন কাজ না থাক্‌লেও, তার গীত, ভাষার music, তার তীরে বসে শোন। কূপে তো এসব চল্‌বে না। হিন্দীর জোরে দেখ্‌তে

দেখ্‌তে ধর্ম্ম দীন দরিদ্র অন্ত্যজের দ্বারেও গিয়ে উপস্থিত হল। আর রামানন্দের লেখা প্রধানতঃ গান ও ভজন। তাঁর লেখা এখন বড় পাওয়া যায় না। তবে শিখ্‌দের আদি-গ্রন্থে তাঁর কিছু ভজন আছে। সেই ভজনে আছে যে সবাই তাঁকে মন্দিরে হরিভজনে যেতে বল্‌চে। তিনি বল্‌চেন যে হরির দর্শনে তিনি আর মন্দিরে যাবেন না। তাঁর হরি চরাচর ভরে আছেন। হৃদয়ের মধ্যেই রামানন্দ তাঁর হরির দেখা পেয়েছেন। তাঁর ভগবান্ অলখ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা। গানেও তাঁর মুক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সাধুদের মধ্যে তাঁর গান কিছু কিছু প্রচলিত আছে। তাতে তাঁর মুক্তপ্রাণের পরিচয় ছত্রে ছত্রে মেলে।

রবিদাসের সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানন্দের স্বপ্ন নামে চমৎকার একটি বিবরণ আছে। তাতে তাঁর হৃদয়ের ভিতরে কি যুদ্ধ গিয়েছে তার বেশ একটি চিত্র আছে। আজ সেটি বল্‌বার অবসর নেই।

ভারত যখন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের ঝগড়ায় খণ্ড খণ্ড হয়ে রয়েছে, তখন এই নিরক্ষর জোলার পুত্রটি কেবল আপনার সাধনার বলে কি করে যে অখণ্ড দৃষ্টি পেয়ে সব ঝগড়ার উপরে উঠে গেলেন তা বলাই অসম্ভব।

সকল সম্প্রদায়েরই অসম্পূর্ণতাকে বাদ দিয়ে তার ভিতরের মর্ম্মটি তিনি ঠিক ধরে' নিতে পেরেছেন আর প্রেম দিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরেছেন। অথচ চল্‌তি সম্প্রদায়গুলোর বাহিরের আবর্জ্জনার উপর তিনি যে প্রচণ্ড আঘাত করেছেন তা পড়্‌লে মনে হয় যে কী প্রচণ্ড আঘাত করবার শক্তিই তাঁর ছিল। তিনি যে সময় হিন্দুধর্ম্মের সব বাইরের সংস্কার ও আবর্জ্জনার উপর আঘাত করছিলেন তখন এক "বুৎশিকন" অর্থাৎ দেবমূর্ত্তিচূর্ণকারী তাঁকে আপনার দলের লোক মনে করে' অভিবাদন করে' বল্‌লে—'মহাশয় আপনি যুক্তি দিয়ে যা কর্‌ছেন আমি তা হাতুড়ী দিয়ে কর্‌ছি। কত মন্দির কত মূর্ত্তি যে ভেঙেছি তার আর সংখ্যা নেই।'

কবীর বল্‌লেন, "বাবা, মূর্ত্তিগুলো বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিষ, তারা গুঁড়ো হবার সময় তাদের সব বিষ তোমার হাতুড়ীর মধ্যে চালিয়ে দিয়ে গিয়েছে।"

লোকটি বুঝ্‌তে না পেরে একটু খুসী হয়েই চলে গেল। কবীরের এক নবাগত ভক্ত জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আপনার ও-কথাটার তাৎপর্য্য কি?"

তিনি বল্‌লেন, "আগুন যদি কাঠের লাঠি দিয়ে ঘা মেরে নেভাতে যাও তবে আগুন নিভ্‌লেও কাঠের লাঠি জ্বলে উঠ্‌তে পারে। লোকটা মূর্ত্তি ভাঙ্‌চে; মূর্ত্তির উপাসনা না করে' হাতুড়ীর উপাসনাটাই কর্‌ছে। আসল ধর্ম্ম তো চুলায় গেছে, ভাব্‌ছে মূর্ত্তি-ভাঙাটাই বুঝি ধর্ম্ম; মূর্ত্তিপূজার বদলে ওর হাতুড়ীর পূজাই চল্‌চে; ভালো তবে আর কি হ'ল? যে বিষ ছিল মূর্ত্তিতে তা এল হাতুড়ীতে। যে মূর্ত্তিপূজা করে সে তবু জানে যে সে মূর্ত্তিপূজক; বিনয় করে' বলে, 'কি আর কর্‌বো, বুদ্ধি কম, তাই মূর্ত্তির পূজাই করি।' আর এ ব্যক্তি জানেও না যে সে হাতুড়ীরই পূজা করে, তাই অহঙ্কারে একেবারে বে-হোস হয়ে আছে।"

সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গেই তিনি পরমপ্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আলাপ করেছেন। ধর্ম্মের বাইরের যে আবর্জ্জনা বা সাম্প্রদায়িকতা সে-সব ছাড়িয়ে তার যা সর্ব্বজনীন সত্য তা চট্ করে' বুঝে নিয়েছেন। এমন বুঝেছেন যে সেই-সব ধর্ম্মের লোকেরা নিজেরাও তা ধর্‌তে পারেন নি।

বৌদ্ধ সাধকদের সঙ্গে, জৈন সাধুদের সঙ্গে, কান-ফাটা যোগীদের সঙ্গে, খৃষ্টান সাধকদের সঙ্গে, গ্রীক দর্শনবাদী ও নিরীশ্বরযুক্তিবাদীদের সঙ্গে, তান্ত্রিকদের সঙ্গে—এমন কত সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে যে তাঁর আলোচনা আছে তা বলে' শেষ করা যায় না।

গ্রীকদর্শনবাদীদের কথা শুনে চম্‌কে ওঠ্‌বার কারণ নেই। যাঁরা মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরেস্তা প্রভৃতিদের লেখা ইতিহাস পড়েছেন, এমন কি তার ইংরেজী তর্জ্জমাও পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে আবুল ফজল ও ফৈজী এই দুই বিখ্যাত পণ্ডিত আকবরের দক্ষিণ ও বাম হস্তের মত ছিলেন। এঁদের পিতা ছিলেন একজন "য়ূনানী" মুবিদ অর্থাৎ গ্রীক দার্শনিক। তিনি সুক্রোত অফ্লাতুন অর্থাৎ সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতির দর্শন পড়াতেন, বিশেষ করে Neoplatonism পড়াতেন, ঈশ্বর মান্‌তেন না।

তিনি অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাঁর দু'ছেলের একজনকে দিলেন গ্রীক্ ও আরবদর্শন পড়্তে, আর একজনকে দিলেন সংস্কৃত দর্শনাদি পড়্তে। পশ্চিম ও পূর্ব্বের দু'দিকের দর্শনের উপরেই তাঁর সমান শ্রদ্ধা ছিল। তাই দুটি ছেলেকে দুইরকম culture দিয়ে তৈরী করে' তোল্বার তাঁর ইচ্ছা ছিল। তিনি অবশ্য কবীরের পরে। তবু এটা বোঝা যায় যে মধ্যযুগটাকে যতটা অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর মনে হয় সব সময়েই ততটা নয়।

কবীর রামানন্দের শিষ্য, যদিও তিনি হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনার উপর কঠোর আঘাত করেছেন। তেমনি তিনি সুফিদের বিখ্যাত সুরবর্দ্দী শাখার "জ্ঞানী তক্কী"র কাছে অনেক শিক্ষা পেয়েছিলেন। তবু শেষটায় তার সঙ্গে মতের এত অনৈক্য হ'ল যে দু'জনে মিল রাখ্তে পারেন নি। কবীরের সময় ভারতে ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের পরিচয় হচ্ছিল বটে, কিন্তু হচ্ছিল অনেকটা বিরোধের ভাবে। বিরাট্ কোনো একটা ভাবের ক্ষেত্রে সবগুলি ধর্ম্মের সমন্বয়চেষ্টা হয়নি। এক ধর্ম্মের লোককে আর এক ধর্ম্মের লোক আপন দলের মধ্যে এনে' মীমাংসাটা সোজা করে' ফেল্তে চেয়েছেন! দু' একজন এমনও ভাব্ছিলেন যে সব ধর্ম্মের সার সত্য নিয়ে এমন একটা ধর্ম্ম তৈরী কর্বেন যা একেবারে সর্ব্বজনীন। এঁরা প্রায় সবাই গ্রীক "মুবিদ" বা পারস্যের "মতাজলী" দার্শনিকের মত দল। এঁরা জ্ঞানী, খুব উঁচুদরের জ্ঞানী। ধর্ম্মের মধ্যে যে ভক্তের প্রেম সাধকের হৃদয় ও প্রাণ আছে, তা তো এঁরা দেখ্তে পান না। এঁরা একেবারে ধর্ম্মের একটা "ল-সা-গু" বা "গ-সা-গু" বার কর্তে পার্লেই কৃতার্থ।

কবীর ভক্ত ও সাধক। তিনি জানেন ধর্ম্ম প্রেমের জিনিষ, প্রাণের জিনিষ। ধর্ম্মকে তো যুক্তির চাপে ঠেসে এক করে' দেওয়া চলে না। তিনি দেখ্লেন সব ধর্ম্মের অসত্য আবরণ আবর্জ্জনা যদি দূর করে ফেলা যায় ও তার বিশেষত্বটি প্রাণ মন দিয়ে সাধন করে' ফুটিয়ে ওঠান যায়, তবে ধর্ম্মের পার্থক্য থাকে বটে, কিন্তু তাতে ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের যথার্থ মিলটি ঠিক ফুটে ওঠে। সব পার্থক্য ভেঙ্গে ফেলে যদি সবগুলোকে পিণ্ডি পাকান যায়, তবে তাতে মিলনই হয় না,—সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়টা কীচকের মৃতদেহটার মত একটা মাংসপিণ্ড হয় মাত্র, প্রাণ আর থাকে না। তাই কবীর বল্লেন প্রত্যেক ধর্ম্মের সত্যটুকু রাখ্তে হবে। তার যথার্থ বিশেষত্বটুকুই তার আসল সত্য। বরের সঙ্গে যে কন্যার সম্বন্ধ তা বৈচিত্র্যের দ্বারাই সার্থক হয়েছে। এই বৈচিত্র্য যাঁরা বোঝেন না তাঁরা ধর্ম্মের আনন্দ জানেন না।

"জ্যোঁ নরনারীকে সুখ-কো ক্লীব নহী পহিচান
ত্যোঁ অনভবকে সুখকো অজ্ঞান নহী জান॥ (সত্য কবীরকী সাখী)

পৃথিবীতে শ্যাম সবুজ পীত অরুণ শ্বেত প্রভৃতি নানা বর্ণের বিচিত্র শোভা। এই বৈচিত্র্যটি গুলে 'একসা' যে করে' দিতে চায় সে তো চক্ষুষ্মান্ নয়—সে চক্ষুষ্মানের আনন্দ বোঝেই না।

শ্যাম সবজ বিধি পংচ জে পীত অরুণ ঔর শ্বেত।
চক্ষুষ্মান্ অচক্ষুকো জ্যোঁ নহিঁ উপমা দেত॥ (সত্য কবীরকী সাখী)

এই বৈচিত্র্য দিয়েই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। ধর্ম্মজগতের সৌন্দর্য্যও বৈচিত্র্য দিয়েই কেন না হবে?

তাঁর আর-একটি শিক্ষা মিল্লো আমাদের দেশের বৈরাগী তীর্থযাত্রীদের দেবতার অভিষেকের পদ্ধতি থেকে।

আমাদের দেশে ভক্তরা তাঁদের দেবতার দু'রকম অভিষেক করেন। এক রকম অর্দ্ধাভিষেক অর্থাৎ যে দেবতার তীর্থে ভক্ত দীক্ষা নিলেন সেখানকার তীর্থোদকেই যদি দেবতার অভিষেক হয়। আর ভক্ত যদি বাঁশের বাঁক নিয়ে বেরোন, তার দু'দিকে দু'ঝাঁপি থাকে, পেছনেরটাতে নিজের তল্পী তল্লা, আর সাম্নের ঝাঁপিতে থাকে তাঁর দীক্ষা-তীর্থের পুণ্যবারি; ভক্ত সেই জল নিয়ে সব তীর্থে যান আর তাঁর ঝাঁপি থেকে একটু জল দিয়ে সেই তীর্থের দেবতাকে পূজা করেন, আর সেখান থেকে একটু করে' জল নেন। এমনি করে' আদি-তীর্থেতে ফিরে গিয়ে তাঁর দেবতাকে সর্ব্বতীর্থ-বারিতে তিনি অভিষেক করেন, এর নামই পূর্ণাভিষেক। অবশ্য তান্ত্রিকদের পূর্ণাভিষেক সম্পূর্ণ আলাদা।

মানবের জন্মের-পর-জন্মকেও কবীর এই তীর্থযাত্রার সঙ্গেই উপমা দিয়েছেন। এই যে জন্মের পর জন্ম এটা পাপের ফল বা সাজা বা পরীক্ষা নয়। এ শুধু তীর্থযাত্রীর

মত এক লোকের পর অন্য লোকতীর্থে যাওয়া। আমরা জগতে এসে যদি হাট-বাজার মাত্র করি আর এই লোকের লোকনাথের চরণে গিয়ে যদি এজন্মের তীর্থবারি না দিই তবে জন্মই বৃথা। কারণ সকল তীর্থের পর যখন সকল লোকাতীত ইষ্টদেবতার পূর্ণাভিষেক হবে তখন যে লজ্জা পেতে হবে। এই জগতের ফুলটি যদি বরণমালাতে না রইল তবে সেই অঙ্গহীন মালা দিয়ে বরণ করা চল্‌বে কেমন করে'?

এমনিও দেখতে পাই কবীর আপন ধর্ম আপন দেশ থেকে সব ধর্মে ও সব দেশের সাধনার তীর্থে যাত্রা করে' অন্তরের ঝারিটি পূর্ণ করে' নিজের দেবতারই অভিষেক পূর্ণ কর্‌তে চেয়েছেন। কবীর তাই তিব্বত, আফ্‌গানিস্থান, তুর্কিস্তান, খুরাসান, বাল্‌খ্‌, বুখারা, ইরাণ প্রভৃতি দেশে যান। কবীর-কসৌটি ও কবীর-মনশূর প্রভৃতি পড়্‌লে তা জানা যায়। আর সত্য-কবীরকি সাখী গ্রন্থের প্রস্তাবনা পড়্‌লে জানা যায় যে এখনো কোনো কোনো তীর্থযাত্রী কবীরের-যাওয়া সেই-সব স্থানে গিয়ে তাঁদের তীর্থযাত্রা পূর্ণ করেন। তাই তাঁদের বেলুচিস্তান আফ্‌গানিস্থান তিব্বত তুর্কিস্তান খুরাসান বাল্‌খ্‌ বুখারা ইরান, প্রভৃতি দেশে যেতে হয় এবং কেউ কেউ এখনো যান। এমন তীর্থযাত্রী দু'একজনকে আমিও দেখেছি।

আপাত দৃষ্টিতে দেখ্‌লে ভারতবর্ষকে একটা ধর্মের জঙ্গল বলেই মনে হয়, এখানে যে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মিলন হতে পারে তা মনেই হয় না। কিন্তু কবীরের প্রতিভাদৃষ্টিতে এই সত্যটাই প্রকাশ পেল যে ভারতই সব ধর্মের সমন্বয়ের প্রধান ক্ষেত্র।

কাশীতে কবীরের জন্ম। সেখানে এক এক দল ও সম্প্রদায়ের এক এক ঘাট; এক এক প্রদেশ ও মন্দিরের এক এক-ঘাট। দীপালির দিন যার যার ঘাট দীপাবলি দিয়ে সাজায়—তাতেই গঙ্গাতীরটি দীপালির রাত্রে অপূর্ব্ব রমণীয় হয়ে ওঠে। এমনি করে' সব রকমের ধর্ম্মসাধনার দীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠ্‌লে সকলের উজ্জ্বল শিখায় ভারতের দীপালি পূর্ণাঙ্গ হবে। এই তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভারতে যে ধর্মের পরে ধর্ম প্রবেশ করেছে আর বাধা পায় নি, আর সব ধর্ম্মই যে ভারতের কোণ জুড়ে আছে তার অর্থ কি? জগন্নাথের রথযাত্রা হবে। ভারতে ছত্রিশ জাতির লোক যদি রথের দড়ি টানে তবে তো জগন্নাথের রথ চল্‌বে।

এইজন্য ধর্মের সঙ্গে ধর্মের এই যে প্রেমের মিলন—আপন আপন বিশেষত্ব রেখেও যে বিচিত্র সমাবেশ—ইহাই ভারতের সাধনা।

তাই তিনি এই সাধনাকে "ভারত-পংথ" নাম দিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল তাঁর ধর্ম্মবংশে এই "ভারত-পংথ" অর্থাৎ নানারকমের সকল সাধনার দীপালি জ্বালাবার তপস্যা চল্‌তে থাক্‌বে। এই ভারত-পথিকদের সাধনার বলেই ভারতে জগন্নাথের রথ চল্‌বে; ভারতেই জগন্নাথের পূর্ণাভিষেক হবে। মানবজাতির বরমাল্য এখানেই পূর্ণভাবে রচিত হবে। পুরুষোত্তমকে সকল সাধনার ফুলের মালা দিয়ে বরণ কর্‌বার খবর ভারতই সকল পৃথিবীকে শোনাবে! সকল ধর্মের মিলনে একটি সাধন-কমল ফুটে উঠ্‌বে, এক-একটি সাধনা তার এক-একটি দল। সবাই যদি হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে বসে তবেই তো কমল পূর্ণ হবে। সকল দল তো একটি কেন্দ্রে সংগত হয়ে এখনো কমল হয়ে উঠ্‌লো না, তাই ভ্রমর নিরাশ হয়ে ফির্‌ছেন। জগৎস্বামী তো ভ্রমর হয়েই রসভোগ কর্‌তে চাচ্ছেন। তাঁর তৃপ্তি হবে কবে? তাঁর পিপাসা কবে মানব মেটাবে? ভারত তার সাধনার এই সহস্রদল কমলকে বিকশিত করে' কমলদলরসপিয়াসী ভ্রমরের তৃষ্ণা কবে দূর কর্‌বে?

কিন্তু কবীরের পর সে-সব কথা চাপা পড়ে' গেল। ভেবেছিলাম—তাঁর ধর্ম্মবংশে এখন হয়ত একথা আর নেই। কিন্তু ছত্রিশগড়ের শাখায়, মহাত্মা উগ্রনামের দলের আশেপাশে এই উপাধি এখনও কোথাও কোথাও ব্যবহৃত আছে। রসীদ্‌পুরের শিবহর হতে ১৯০২ অব্দে স্বামী যুগলানন্দ যে সত্য-কবীরকী সাখী নামক পুস্তক লিখেছেন তাতে তিনি আপনাকে "ভারত-পথিক" বলেই পরিচয় দিয়েছেন।

কবীরের প্রধান চেষ্টাই হ'ল প্রথমতঃ হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়ে। এই দুই ধর্ম্মই ভারতে প্রধান।

এই সমস্যা মিট্‌লে অন্য সব ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধটা সহজ হয়ে আস্‌বে।

"তুরুক সুঈ, হিন্দু ধাগা, চিথড়া সিয়ৈ লাগি।
সিয়ৈ অংগিয়া সিয়ৈ চুন্দরি ওঢ়ৈ জোগী রাগী॥
তুরুক তানা, হিন্দু বানা, কপড়া বিনৈ লাগি।
বনৈ গুদড়ী, বনৈ অংগিয়া ওঢ়ৈ জোগী রাগী॥

মুসলমান সূচ আর হিন্দু সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই হবে। কাচুলী ও চাদর সেলাই হবে। প্রেমিক যোগী সেই প্রেমের বসন পর্‌বেন। মুসলমান টানার সুতো ও হিন্দু পড়েন সুতো, এতে কাপড় তৈরী হবে—এতে যে কাঁথা হবে, কাঁচুলী হবে তাই প্রেমিক যোগীরা সাধনার বস্ত্র করে' পর্‌বেন।

"তুরুক তেল, হিন্দু ফলিতা, দিয়না বরনে লাগি।
বীচ মহলমৈ বরৈ আরতী রীঝৈ সাহিব রাগী॥

মুসলমান বাতির তেল, হিন্দু পলিতা, এই দীপে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রেমিক স্বামীর আরতি চলেছে, তাতেই তিনি তৃপ্ত।

"তুরুক তুম্বী, হিন্দু তঁতিয়া, বীন্ বাজন লাগী।
সুরত নিরত বাজা বাজৈ রীঝৈ সাহব রাগী॥

মুসলমান হল বীণার তুম্বী আর হিন্দু হল তার। এই বীণায় প্রেম ও বৈরাগ্যের পরিপূর্ণ সুর বাজ্‌ছে। তারই সঙ্গীতে স্বামীর হৃদয় জুড়াচ্ছে।

কবীরের মনের এই মহা আকাঙ্ক্ষা এই বিরাট্ আশা তাঁর আগাগোড়া লেখায় ছড়িয়ে আছে,—তাঁর গানে তাঁর দোহাতে তাঁর সাখী সবদে সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কত ফাঁক দিয়েই তাঁর হৃদয়ের এই ব্যথাটি উঁকি মার্‌ছে। সর্ব্বত্রই তাঁর সাধন-কমলটি বিকশিত করে' তুল্‌বার চেষ্টাটি দেখ্‌তে পাই। নিখিল মানবের বরণের মালার ফুলগুলি তিনি গাঁথ্‌তে যে চেয়েছেন তা তাঁর সব গানেই বেজে উঠেছে। কবে তাঁর দীপালি পূর্ণ হবে—কবে যে ভারতের পূর্ণতীর্থবেদীতে জগন্নাথের পূর্ণাভিষেক হবে, কবীরের সমস্ত মনপ্রাণ সেই দিনটির দিকে চেয়ে ছিল।

আজ কবীরের নানা স্থানের নানা রকমের লেখা থেকে তাঁর এই প্রাণের স্বপ্নটি আপনাদের হৃদয়ের কাছে আন্‌তে চাই। কারণ এখন জগতে সবচেয়ে দুঃখ ও দুর্দ্দশার দিন। কোন্ উদার প্রেমে, কোন্ অসীম সাধনায় যে নিখিল-লোক-কমল বিকশিত হবে আর নিখিলেশ্বর তৃপ্ত হবেন, সে আজ জান্‌বার কথা। মোহে, দর্পে, লোভে, অসত্যে, নিষ্ঠুরতায় আজ পৃথিবীর দৃষ্টি অন্ধ হয়ে আস্‌ছে। যাঁদের হৃদয় আছে, মন আছে, প্রাণ আছে, তাঁরা কাতর হয়ে বল্‌ছেন, "আলো কোথায়? কে পথ দেখাবে? প্রেমের ও মিলনের মন্ত্র কে দেবে?"

ভারত কি আজ তার সেই প্রাচীন মন্ত্রটি উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌বে না? এই সাধনাই তো ভারতের। ভারত-পংথের এই সাধনার কথা ভারতের আজ শোনা দর্‌কার। সমস্ত হৃদয় মন প্রাণ দিয়ে সাধনা করে' আপনাকে এই বাণীর যোগ্য করে' জগতের কাছে এই বাণীটি শোনাবার ভার আজ ভারতের। মুখের কথা দিয়ে তো এই বাণী উচ্চারণ করা চল্‌বে না! এই বাণী বল্‌তে হবে প্রেম দিয়ে, সাধনা দিয়ে, জীবন দিয়ে! তেমন করে যদি এই বাণী ভারত বল্‌তে না পারে তবে এই বাণীর মধ্যে মন্ত্রের শক্তি আস্‌বে কেন? সেই বাণী নিখিল-মানবের কানে পৌঁছাবে কেন, আর তাদের হৃদয় মন অধিকার কর্‌বে কেন?

এইবার কবীরের সব গান সাখী সবদ্ দোহা প্রভৃতি থেকে আমরা তাঁর বাণীটি বোঝ্‌বার চেষ্টা করে' দেখি! তাঁর একটি একটি কথার সঙ্গে তখনকার সব ইতিহাস, তাঁর জীবনের কত আঘাত, কত ব্যর্থ চেষ্টার ব্যথা সব জড়িয়ে আছে, সেগুলোও সঙ্গে সঙ্গে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। অবশ্য, এজন্য আমরা সব কথার বিচার ঐতিহাসিকদের মত 'সন তারিখ' দিয়ে দিয়ে কর্‌বো না। তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে সেই-সব কথার সম্বন্ধটি বুঝে বুঝে অগ্রসর হ'তে হবে।

হিন্দু ও মুসলমান দুয়েরই হাত ধরে' যখন কবীর তাদের বোঝাচ্ছেন তখন দু' দলই সমানভাবে তাঁর উপর খড়্গ-হস্ত। তাই তিনি দুঃখ করে' বল্‌ছেন, "দেখ ভাই, জগৎটা পাগল হয়ে গেছে। সত্য যদি বল তো মার্‌তে আস্‌বে, অথচ মিথ্যা বল্‌লে সে দিব্যি বিশ্বাস কর্‌বে। হিন্দু বল্‌চেন—'আমার রাম'; মুসলমান বল্‌চেন—'আমার রহিম'। পরস্পর লড়াই করে' মর্‌ছেন, অথচ কেহই মরম

বুঝ্‌লেন না। হিন্দুর দয়া, মুসলমানের মেহের (কৃপা) দুইই ঘর ছেড়ে পালালো। একজন দিচ্ছেন বলি, আর একজন করছেন জবাই। দু'জনের ঘরেই আগুন লেগেছে! তাঁরা নিজেদের বেশ সেয়ানা মনে করে' আমার দিকে উপহাসের মত একটু হেসে তাকাচ্ছেন। কবীর বলেন, ভাই বল দেখি, আমাদের মধ্যে পাগল তবে কে?"

সাধো দেখো জনা বৌরানা।
সাঁচ কহো তো মারন ধাবৈ ঝূঠে জগ পতিয়ানা॥
হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা, মুসলমান রহিমানা।
আপস-মেঁ দোউ লড়ে মরত হৈ মরম কোই নাহি জানা॥
হিন্দুকী দয়া, মিহর তুরকন্‌কী, দোনো ঘরসে ভাগী,
বহ করে জিবহ, বহ ঝটকো মারৈ, আগ দোউ ঘর লাগী।
য়া বিধি হসত চলত হৈঁ হমকো আপ কহাবৈ স্যানা,
কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো, ইন্‌মেঁ কৌন দিবানা॥
[কবীর, ১।৬]

আসল কথা "এরা দুজনেই যথার্থ পথটি পাননি। হিন্দুর হিন্দুয়ানীও দেখা গেল, মুসলমানের মুসলমানীও দেখা গেল। কবীর বলেন, কোন্ পথ ধরে' তবে চলি।"

অরে ইন দুহু রাহ ন পাঈ॥
হিন্দুকী হিন্দুয়াঈ দেখী তুর্কনকী তুরকাঈ।
কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো, কৌন রাহ হ্বৈ যাই॥
[কবীর ১।৫]

"সব দলের লোকই আপন আপন দলপতির, আপন আপন নেতাদের পিছনে চলেছেন। তাঁদেরই এঁরা মেনে নিয়েছেন। অথচ ভগবানের আদেশ যে দূরে পড়ে' রইল, তা কেউ টেরই পেলেন না।"

অপনে অপনে সিরেঁকো সবন লীন হৈ মানি।
হরিকী বাত দুরংতরী পরী ন কাহু জানি॥
[বঘেলখণ্ডী কবীর]

কাজেই "আপন আপন দলের আগুনে সবাই বিনাশ পাচ্ছেন। এমন জীবন তো মিল্‌ল না যাকে বুকে চেপে ধরে' বুক জুড়াই।"

সারি দুনিয়া বিনসতী অপনী অপনী আগি।
ঐসা জিয়রা না মিলা জাসোঁ রহিয়ে লাগি॥
[বঘেলখণ্ডী কবীর]

দুনিয়া সুদ্ধ লোক আমাদের সব কথাকে ভাবের কথা (idealism) বলে' উড়িয়ে দেয়, নিজেদের খুব "করমিয়া" (practical) মনে করে।

"এই-সব মূঢ় করমিয়া লোক একেবারে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যে প্রাণহীন পাথর হয়ে আছে" সে কথা তারা নিজেরাও জানে না।

মূঢ় করমিয়া মানবা নখসিখ পাথর আহি॥
[বঘেলখণ্ডী কবীর]

এই-সব দল দল করে' যারা পাগল, তাদের তো কিছু বোঝানও শক্ত। "সবাই কেবল আপন আপন মানই চান কিনা, তাই বিস্তর মিথ্যা জাল জোচ্চোরীকে সত্য বলে' জান্‌তে হয়। দল যখন বেঁধেছেন, তখন এসব অসত্যের হাত তো এড়াবার জো নেই। আমি মানা করে' বল্‌চি, ওরে নির্লজ্জ, শোন্, ঝুঠা দিয়ে কোন কাজই হবে না।"

আপন আপন চাহত মান।
ঝূঠ প্রপংচ সাঁচ করি জান॥
ঝুঠা কবহুঁ ন করিহৈঁ কাজ।
হৌঁ বরজোঁ তোহি সুন নিলাজ॥
[কবীর, ৩।৫]

কিন্তু এসব কথা বল্‌লে কি হয়। যদি দলের হাতে শক্তি এসে পড়ে তারা কি আর বুঝ্‌তে পারে যে এমনি সুচারুরূপে গড়া দলের কোথাও মরণ আছে? যখন কোনো দল দুর্ব্বল থাকে তখন তারা নিজেদের শক্তির গর্ব্বে মত্ত হয় না বটে, কিন্তু যার কাছে শক্তি দেখে তারই পায় লুটিয়ে পড়ে, তারই অনুকরণ করে। শক্তিকেই সত্য বলে' মনে করে; সত্য যে কোথায় পড়ে থাকে তার ঠিকানাই থাকে না। কিন্তু বাপু, একথাও বলি—"উচ্চ সভায় বসে' যাঁরা সব বিচার ও শাসনদণ্ড চালিয়েছেন, তাঁরা আজ কোথায়? মাটীতে সব মিশে গেছেন, আর নজরেই পড়েন না। ধন-ধামের মায়া দেখে তুই কিন্তু ভুলিস্ না। ও-সব দিন চারেকের রঙ্গ। সত্য যদি না থাকে তবে ধূলায় মিলিয়ে যেতেই হবে।" শক্তি আছে বলেই টিকে থাক্‌বে এমন কোনো কথাই নেই।

উচে বৈঠু কচহরী ন্যার চুকারতে।
তে মাটী মিলিগয়ে নজর নহি আরতে॥
তু মায়া ধন ধাম দেখ মত ভুল রে।
দিনা চারকা রংগ মিলেগা ধূল রে॥
[কবীর ৩।১৫]

যাঁরা আজ সব শক্তিমদে মত্ত তাঁরা সব রাজসিক

সফলতার স্বপ্নই দেখ্‌ছেন, সফলতাও যে দীনবেশে আস্‌তে পারে—তা তাঁরা মনেই কর্‌তে পারেন না। বসন্তে দীন-বর্ণ আমের ফুল দেখে কে বুঝ্‌বে যে লাল টক্‌টকে শিমুল ফুলকে সে পরিণামে হারিয়ে দেবে? মানুষও শুকপাখীর মত।

"শুক-পাখী ফলের আশায় শিমূলের ফুলের সেবা করে' মর্‌ল। যেই শিমূলের ঢেড়ি চটক্ করে' ফুট্‌ল আর অমনি খানিকটা তুলো দেখে পাখী নিরাশ হয়ে চল্‌ল।"

সেমর সুবনা সেইয়ে গয়ে ঢেড়িকী আশ।
ঢেড়ি ফুটি চটক দৈ সুবনা চলৈ নিরাস।
[বাঘেলখণ্ডী কবীর]

সত্য সাধ্‌বার পথ তো আর সোজা নয়। "পথও লম্বা, গন্তব্য স্থলও দূর। বিকট পথে বিপদেরও অন্ত নেই।"

লংবা মারগ দূর ঘর বিকট পংথ বহুমার॥
[সত্য কবীরকী সাখী]

অবশ্য সত্যের পথে কত লোকই নিষ্ফল হয়, কিন্তু তাতে লজ্জা কি?

"সত্যের পথে চল্‌তে চল্‌তে যদি কেউ পড়েই যায় তবু তাকে কোন দোষই দেওয়া যায় না।"

মারগ চাল্‌তা জো গিরৈ তাকো লগৈ ন দোষ॥
[সত্য কবীরকী সাখী]

এখন সফলতার নিষ্ফলতার কথা তো পরে, প্রথমে সত্য পথটাই মেলে কেমন করে'? সত্য পথ পাবার কত রকম বাধাই আছে। প্রথমতঃ এক এক সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক উপাস্য খাড়া করে' লোক ঘুরে' মরে। "কেউ বা রহিমের গুণ গাচ্ছেন, কেউ বা রামের গুণ গাচ্ছেন, কেউ বা 'আদেশ' আশ্রয় করেই চলেছেন। নানা ভেক বানিয়ে সবাই কেবল চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মর্‌ছেন।"

কোই রহিম কোই রাম বখানৈ কোই কহৈ আদেস।
নানা ভেষ বনায়ৈ সবৈ মিল ঢুঢ় ফিরৈ চহুঁ দেশ।
[কবীর ১১ পৃঃ]

তার পর নিজের পরিচয়ও মানুষ ঠিক জানে না। তাতেই যার যে পথ নয় তাতেই সে ঘুরে ঘুরে মরে। মানুষ যে আসলে জগৎস্বামীর সেবক সে খোঁজই সে রাখে না। "কেউ বলে আমি জ্ঞানী, কেউ বলে আমি ত্যাগী, কেউ বলে আমি ইন্দ্রিয়জয়ী, এমনি করে' সবাই এক একটা অহঙ্কারে মর্‌ছে। কেউ বলে আমি দাতা, কেউ বলে আমি তপস্বী। নিজ তত্ত্বনামটি কি তা তো আর নিশ্চয় জানে না। তাই ভ্রমের মধ্যে ডুবে মর্‌ছে। কবীর বলেন, আমি আমার স্বামীর সেবক, তাই জেনে আমি আপনার সত্য পদে পৌঁচেছি।"

কোঈ কহৈ মৈঁ জ্ঞানী রে ভাই, কোঈ কহে মৈঁ ত্যাগী।
কোঈ কহে মৈঁ ইন্দ্রিজীতী, অহং সবনকো লাগী॥
কোঈ কহে মৈঁ দাতা রে ভাই, কোঈ কহে মৈঁ তপ্‌সী।
নিজ তত নাম নিশ্চয় নহি জানা, সবৈ ভর্ম-মে খপ্‌সী॥
কহৈ কবীর সাহবকা বন্দা পহুচা নিজ পদ মাহী॥
[কবীর ১ ১১ পৃঃ]

মানুষের এক ভরসা ছিল তার দেবতার প্রতি যে ভক্তি তাতে সে এই সব মিথ্যা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু সে যে আপন দেবতাকেও ছোট করে' নিয়েছে। এখন তাকে বাঁচায় কে? নিজ নিজ দলের ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে এরা যে নিজেদের দেবতাদেরও ভরে রেখেছেন। যে ধ্রুবতারা দেখে পথহীন সমুদ্রের মধ্যে তরী চালান যেত সেই ধ্রুবতারাটি খুব সুগম করে' পাবার জন্য নিজেদের তরীতে তুলে এরা ধ্রুবতারাকে শুদ্ধ আপনাদের সম্পত্তি করে' নিয়েছে। বিনা ঠিকানায় অন্ধকারে পথ খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে তাই এখন এরা ঘুরে ঘুরে মর্‌চে। তাই দাদূ বলেছেন, তোদের ব্রহ্মকে তোরা যদি জ্যান্তো মনে কর্‌তিস্, তবে কি আর দলে দলে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ভাগ করে' নিতে পার্‌তিস্?

"খণ্ড খণ্ড করি ব্রহ্মকো পচ্ছ পচ্ছ লিয়া বাঁট।
দাদূ জীবত ব্রহ্ম তজি বাঁধে ভরম-কী গাঁঠ॥"

জীবিত ব্রহ্ম ছেড়ে, আপন ভ্রমকে নিজ নিজ আঁচলে গেরো দিয়ে এরা সবাই ধর্ম্মের সাংসারিকতা করুছে। তাই ত কবীর বল্‌ছেন, "আচ্ছা, খোদা যদি মস্‌জিদেই থাকেন তবে বাহির মুলুকটা কার? রাম যদি তীর্থে মূর্ত্তিতেই থাকেন, তবে বাহির রক্ষা করে কে? পূর্ব্ব দিক্‌টা হ'ল হরির, আর পশ্চিমটা হ'ল আল্লার মোকাম। ওরে আপন হৃদয়ের ভিতর একবার খুজে দেখ না, এখানেই রাম খানেই করীম। যত নর যত

নারী সবই, হে দেবতা, তোমারই রূপ। কবীর সেই আল্লা-রামের সন্তান, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।"

> জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ, ঔর মুলুক কেহি কেরা।
> তীরথ মুরত রাম নিবাসী, বাহর করৈ কো হেরা॥
> পুরব দিশা হরিকো বাসা পশ্চিম অলহ মুকামা।
> দিল-মেঁ খোজী দিলহিমা খোজো ইহৈ করীমা রামা॥
> জেতে ঔরদ মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্হারা।
> কবীর পোংগরা অলহ রামকা সো গুরু পীর হমারা॥

[কবীর ৩।২]

সবাই মরছেন আপন মূর্ত্তি মন্দির তীর্থ নিয়ে নিয়ে। "তীর্থে তো কেবল জল। স্নান করে' দেখেছি, কিছুই হয় না। প্রতিমা-সকল তো জড়। ডেকে দেখেছি, সাড়াই দেয় না। পুরাণ কোরান সব কেবল মাত্র কথা। এই ঘটের (আত্মতত্ত্বের) পরদা খুলে দেখেছি। কবীর কেবল প্রত্যক্ষ অনুভবের কথাই বলে। আর সব ঝুঠা, আর সব অসার, সে দেখাই গেছে।"

> তীরথমেঁ তো সব পানী হৈ, হোবৈ নহী কছু নহায় দেখা।
> প্রতিমা সকল তো জড় হৈ, বোলে নহিঁ বোলায় দেখা॥
> পুরান কোরান সব বাত হৈ য়া ঘটকা পরদা খোল দেখা।
> অনুভবকী বাত কবীর কহৈঁ য়হ সব হৈ ঝুঠী পোল দেখা॥

[কবীর ১।৭৭ পৃঃ]

কবীর বলেন "তুই সত্যকে নজর করে' দেখ্। সব ঘট সব রূপ ও আকারকে জ্যোতির্ম্ময় করে' ব্রহ্মই তাঁর বাণী স্বয়ং বলছেন। পুস্তকে তাঁর বাণী নেই, তাঁর বাণী তিনি নিজেই বলছেন।"

> কহৈঁ কবীর তু সত্যকো নজর কর
> বোলতা ব্রহ্ম সব ঘটকো উজারী॥

[কবীর ১।০৫]

ব্রহ্মের সেই বাণী শুনে মন প্রেমে পূর্ণ করে' তুই সত্য পথে চল্। যে তোকে কাঁটা দেয় তুই তাকে দিবি ফুল, তুই কাকেও আঘাত করবি না। যদি পরে আঘাত করে, তুই তাকে দিস্ প্রেম।

> জো তোঁকো কাটে বোয়ে তাকে বো তু ফুল।

[কবীর কসৌটী]

যাঁরা কাঁটাতে কাঁটাতে তাঁর জীবন দুঃখময় করে' দিয়েছিলেন সেই-সব কঠিন হৃদয়কে কি কবীর কম সেধেছেন? তাদের মন তো গলাতে পারেন নি। তবু তাদের অহিত তিনি চান নি। তিনি বলছেন, "কত না তাদের পায়ে ধরেই আমি বুঝিয়েছি, কত না চোখের জলেই বুঝিয়েছি। হিন্দু তার দেবতা-পূজাই করবে, আর মুসলমান কারও আপন হবেই না।"

> কিতনো মনারো পাঁর ধরি কিতনো মনারো রোয়।
> হিন্দু পুজৈ দেবতা তুর্ক ন কাহু হোয়॥

[কবীর ৪।১]

কিন্তু মনের ভিতরে প্রেম থাকলেও এক এক সময় সকলের মিথ্যা দেখে ঝুঠা গর্ব্ব দেখে নিষ্ঠুরতা দেখে তিনি বাইরে আগুনের মত জলে' উঠেছেন। বজ্রের মত কঠোর ভাষায় তিনি বলেছেন, "ওরে কপট চণ্ডাল মহাপাপী অপরাধী, দয়া বিনা তোর কায়া অজ্ঞান। কেন অজ্ঞান ও নির্দ্দয় কায়াকে নির্দ্দোষ করবার সাধন না করবি? উপদেশ তো আর মানবি না! তোর মত মনের ভিতর মিথ্যা গুমান (অহঙ্কার) নিয়ে এমন কত লোকই ফিরছে। কবীর বলেন, প্রেমকে যে ছেড়েচে নরকই তার নিদান।"

> অরে কপট চণ্ডাল মহা পাপী অপরাধী।
> বিনা দয়া অজ্ঞান কায়া কাহেঁ নহিঁ সাধী॥
> তোহি অস নিগুরা বহুত ফিরত হৈঁ মনমেঁ করৈ গুমান।
> কহৈঁ কবীর জো প্রেমসে বিছুড়ে তাকো নরক নিদান॥

[কবীর ১।২৯]

কিন্তু রাগ করে' লাভ কি? ক্রোধ করলেও কবীরের মনটি প্রেমেতে ভরা ছিল। ভালবাসেন বলেই তিনি মনের দুঃখে এই-সব কঠোর কথা বলেছেন। রাগ যখন পড়ে' গেছে তখন ভগবানের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করেছেন—"হে ভগবান, এদের বড় দুর্দ্দিন, অথচ ব্রত মহৎ। দয়া কর প্রভু, তুমি যোগ্য গুরু পাঠাও। ঐ যে সব গুরু বুজরুকী ও অদ্ভুত সব কাণ্ড করিয়ে লোককে আরও অজ্ঞান করে' রাখেন তাঁদের চাই না। সত্যগুরু পাঠাও—যিনি নিজেও খাঁটি, আর উপদেশও দেন খাঁটি। ভাই, এমন সাধক সদ্‌গুরু কে আছেন যিনি নয়নে অলখকে দেখাতে পারেন? এমন গুরু চাই "যিনি দরজাও বন্ধ করেন না, নিশ্বাসও বন্ধ করান না, সংসারও ত্যাগ করান না। এই মন যখনি যেখানে যায় অমনি পরমাত্মাকে দেখতে পায়—এমনি অবস্থা যিনি করে' দিতে পারেন সেই গুরুকে চাই; যা ভিতরে আছে তাই বাহিরেও দেখাতে পারেন, আর কিছুই যেন চোখে না পড়ে।"

তাই কোই সৎগুরু সংত কহাবৈ নৈনন অলখ লখাবৈ।
দ্বার ন রুধৈ পবন ন রোকৈ নহি ভরখণ্ড তজাবৈ॥
রহ মন জায় জহাঁ লগ জবহী পরমাতম দরসাবৈ।
ভিতর রহা সো বাহর দেখৈ দুজা দৃষ্টি ন আবৈ॥

[কবীর ১।৬৮]

ধর্ম্মের সঙ্গে সংসারের সঙ্গে তো বিরোধ নেই। তবে ধর্ম্মসাধনার নামে লোকে অস্বাভাবিক হবে কেন? কবীর সৌন্দর্য্যের একজন মস্ত ভক্ত। জগতের শোভা না দেখ্‌লে তাঁর কবি-হৃদয় শুকিয়ে মরে' যায়। তাই তিনি বল্‌ছেন, এই পরম সুন্দরের সুন্দর জগতে "আঁখিও মুদ্‌বো না, কানও রুধ্‌বো না, কায়াকষ্টও কর্‌বো না। নয়ন খুলে' আমি হেসে হেসে দেখ্‌ব আর সুন্দর রূপই দেখ্‌ব। যা বল্‌ব, তাই হবে আমার নাম জপ, যা শুন্‌ব তাই হবে আমার নাম-স্মরণ। যা কর্‌বো তাই হবে পূজা, যেখানেই যাই তাই হবে আমার প্রদক্ষিণ, যা কিছু করি তাতেই হবে তাঁর সেবা।"

আঁখ ন মূদূ কান ন রূধূঁ কায়াকষ্ট ন ধারূঁ।
খুলে নয়ন মৈঁ হঁস হঁস দেখূঁ সুন্দর রূপ নিহারূঁ॥
কহূঁ সো নাম সুনূঁ সোই সুমিরন জো করূঁ সো পূজা।
জহঁ জহঁ জাউঁ সোই পরিকরমা জো কুছ করূঁ সো সেবা॥

[কবীর ১।৭৭]

কিন্তু এই স্বাভাবিক সাধনার পথ তো বাইরের জগতে নেই। এই পথ যে অন্তরের; তাই তো কঠিন দুর্গম এই পথ। "বিনা পায়ের এই পথ, (দেহ) মাঝ-সহরের মধ্যেই তার স্থান। বিকট তার পথ, অগণিত দুর্গম স্থান এই পথে। কেবল সাধক সুজনই সেখানে পৌছতে পারে।"

বিনা পাউ কা পংথ হৈ মংঝি সহর অস্থান।
বিকট বাট ঔঘট ঘনা পহুঁচৈ সন্ত সুজান।

[সত্য কবীর সাখী]

কিন্তু এই অন্তরের পথ তো সহজ নয়। অন্তরের বলে'ই সে কঠিন। একটু অসাবধান হলেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে মানুষ সত্য পথ ছেড়ে কল্পনার পথে ঘুর্‌তে থাকে। শূন্যতার পথে ঘুর্‌তে থাকে। "পথিকই যদি না বিচার করে তো পথ বেচারার দোষ কি? পথ বেচারা কর্‌বেই বা কি? 'পথিক আপন সত্যপথ ছেড়ে' কেবল অসত্যের মধ্যে শূন্যতার মধ্যে ঘুরে ঘুরে মর্‌তে থাকে।"

রাহ বিচারি ক্যা করৈ পথিক ন চলৈ বিচার।
আপন মারগ ছাড়ী কৈ ফিরে উজার উজার॥

[কবীর, বীরা]

সেই সাধন যদি মেলে, একবার অন্তরের সেই ঠিকানায় যদি সাধক পৌছায়, তবে সর্ব্বত্রই পরমাত্মার দর্শন ঘটে। "সব ঘটেই আমার স্বামী। কোন ঘটই তো খালি নয়। এই যে ঘটে ঘটে তাঁর প্রকাশ তাই বলি ধন্য এই ঘট।

সব ঘট মেরা সাঁইয়া খালী ঘট নহী কোয়।
বলিহারী উস্‌ ঘট্‌কে জা ঘট পরগট হোয়॥

[কবীর কসৌটি]

'এই দর্শন যেদিন মেলে সেদিন ইন্দ্রিয়গুলিকেও শুকিয়ে মর্‌তে হয় না। সবাইকে নিয়ে সব ইন্দ্রিয়কে জুড়িয়ে অমৃতের সম্ভোগ চল্‌তে থাকে।

"রসনার পেয়ালা ভরে ভরে পান কর। পাঁচ ইন্দ্রিয় সাথে সাথে তৃপ্ত হোক্‌।"

রসন কটোরী ভর ভর পীরো পাঁচো ইন্দ্রী সাথা।

[কবীর কসৌটি]

কবীরকে সবাই প্রশ্ন কর্‌লেন—এমন কঠিন সাধনার উপদেশ দেবেন কে? এমন সব গুরু কোন্‌ জাত থেকে কোন্‌ দেশ থেকে জন্মাবেন? কবীর বল্লেন, সে কি কথা! "ওরে নির্গুণ, সাধুর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিস্‌নে। সাধনেতে ছত্রিশ জাতিই (কৌম = nation) আছে। তোর প্রশ্নটাই যে টেড়া। সাধনাতে চামার রবিদাস সাধক আছেন, শ্বপচ ঋষি আছেন তিনি তো মেথর। হিন্দু, মুসলমান দুই পন্থাই তো সাধনায় আছে। সাধনাতে সাধনা ছাড়া অন্য পরিচয়ের স্থানই নাই।"

সন্তন জাত ন পুছো নিরগুনিয়া।
সাধনমাঁ ছত্তিস কৌম হৈ টেঢ়ী তোর পুছনিয়া।
সাধনমাঁ রবিদাস সন্ত হৈ সুপচ ঋষি সো ভংগিয়া।
হিংদু তুর্ক দুই দীন বনে হৈঁ কছু নহীঁ পহচনীয়া।

[কবীর ১।১৬]

"তোমরা ভুলে গিয়েছ যে সারা সংসারে যে আগুন জলে তার শান্তি হয় ধর্ম্মের শান্তিধারার অভিষেকে। সেই ধর্ম্মেই যদি আগুন লাগে তবে সে আগুন নেভাবে কে? দলাদলির আগুন স্বার্থের জগতে আছে। ধর্ম্মেও কি তা টেনে আন্‌বে? তবে বাঁচ্‌বে কেমন করে? "সমুদ্রে যে আগুন লাগ্‌ল, এখন কাদা জঙ্গল সবই জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। পূর্ব্ব পশ্চিম সব দেশের পণ্ডিত এই সমস্যার বিচার করে' করে'ই মর্‌ছেন। এই আগুন নিভ্‌বে কিসে?"

আগি জো লাগি সমুদ্রমেঁ জরৈ সো কাদো ঝারি।
পুরব পশ্চিম পংডিতা মুয়ে বিচারি বিচারি॥

[কবীর, রৈন্না]

ধর্ম্ম দিয়েই সব ভেদের অবসান হবার কথা। সে-ই যদি ঝগড়া-বাধায় তবে যাই কোথায়? যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয় তবে উপায় কি? "ক্ষেত রক্ষার জন্য বেড়া দিল ক্ষেতে। দেখা গেল বেড়াই ক্ষেতকে খাচ্ছে। তিন লোক সংশয়ের মধ্যে পড়ে' গেল। আমি বুঝাই কাকে? সম্প্রদায় হ'ল সাধনা রক্ষা করতে। এখন সম্প্রদায়ই খাচ্ছে ধর্ম্মকে।"

বেড়া দীন্হী খেতকো বেড়া খেতহী খায়।
তীন লোক সংশয় পড়ী মৈঁ কাহি কহোঁ সমুঝায়॥

[কবীর ৪।১১]

তবে কি বিশেষ বিশেষ সাধনার কোনো বিশেষত্ব নাই? সবই কি হবে একাকার? প্রত্যেক সাধনারই তো এক একটা বিশেষত্ব আছে। তবু সে সাধনা বদ্ধ নহে যদি পরমাত্মার দিকে তার নিরন্তর অব্যাহত গতি থাকে। পরমাত্মার মধ্য দিয়েই এক সাধনার সঙ্গে সব সাধনার যোগ থাকে। সাধনা যেন নদীর মত। তার দুই দিকে যদি দুই তীরের সীমা না থাকতো তবে নদী চলতোই না। দুই তীরের মধ্য দিয়েই সে নিরন্তর অসীম সমুদ্রের দিকে চলেছে। এ যে চলা, এই যে অসীমের উদ্দেশ্যে তার নিত্য যাত্রা, এতেই সে মুক্ত। সমুদ্র দিয়েই বিশ্বের সঙ্গে তার যোগ। এই স্রোত বদ্ধ হলেই নদী পচে' ওঠে।

(স্রোতের ধারার) "বহতা জলই নির্ম্মল। বদ্ধ জলই দুর্গন্ধ। সাধকও যদি চলতে থাকেন তাঁর গতি যদি মুক্ত থাকে তবে তাঁতে কোন দাগই লাগে না তিনি নির্ম্মল থাকেন।"

বহতা পানী নির্ম্মলা বংধা গংধীলা হোয়।
সাধক তো চালতী ভলা দাগ লগৈ ন কোয়।

[সত্য কবীর সাখী]

সাধকরা যদি মুক্তই থাকেন তবে সম্প্রদায় গড়বে কেমন করে'? সাধকদের দল হবে কেমন করে? কবীর তাতে বলেন, সাধকদের আবার দল কি? সব দেশের সাধকরাই এক দলের। সবাই ভগবানকে চান। সবাই সাচ্চা, সবাই প্রেমী, সবাই ত্যাগী, তাই তাঁরা এক। পথ না হয় এক এক জনের এক এক রকমেরই হ'ল। সাধক কি এক এক দেশে দল বেঁধে জন্মান—যে তাঁদের মণ্ডলী বানিয়ে দেবে?

"হীরা যেমন খনিতে এক জায়গায় এক রাশ জন্মায় না, মলয় পর্ব্বতের যেমন পংক্তি নাই—সে একাই দাঁড়িয়ে থাকে, সিংহের যেমন পাল হয় না, সাধুও তেমনি দল বেঁধে চলেন না।"

হীরাকী ওবরী নহীঁ মলয়া গিরি নহীঁ পাঁত।
সিংহোঁকে লেহংডা নহীঁ সাধু ন চলৈঁ জমাত॥

[কবীর ৪।১২]

তাই জগতে আনন্দের সঙ্গে কাজ করে' যাও। আপনাকে যদি মুক্ত রাখ তবে তোমার কাজ তোমার পক্ষে আনন্দের হবে। কাজ তোমার খেলার মত হবে।

"মুক্ত হয়ে সংসারে খেলা কর, কেহই তোমাকে বাঁধতে পারবে না।"

খুলি খেলো সংসারমেঁ বাঁধি সকৈ ন কোয়॥

[সত্য কবীর সাখী]

মুক্ত হয়ে সাধন সেই করতে পারে যে এই জগতে সহজ হয়ে আছে। সাধক যদি স্বাভাবিক হন, তবে বিশ্বের আনন্দ-সাগরে সহজে ডুবে গিয়ে সহজ আনন্দের রসে ভরপূর হয়ে উঠেন। ঘট যদি সেই ব্রহ্মরসের মধ্যে ডুবে যায় তবে আর তার ভিন্নতা কেমন করে' থাকে? "উল্টা ঘট তো জলে ডোবে না, সোজা ঘটই জলে ডুবে জলে ভরে' ওঠে। যে কারণ লোকে ভিন্ন ভিন্ন করে, গুরুর প্রসাদে সে সেই বিপদটা তরে' যায়।"

ওঁধে ঘড়া জল নহী ডুবৈ সুধেসোঁ ঘট ভরিয়া।
জেহি কারণ লোক ভিন্ন ভিন্ন করু গুরু প্রসাদতে তরিয়া॥

[কবীর বাগেলখণ্ডী]

কবীর বলেন, এই সহজ সাধনাই তাঁর সম্বল। তিনি সহজ হতে পেরেছেন বলে'ই তাঁর কিছু দরকার হয়নি। তাই তিনি বলছেন—"আমি গুরুও নই, চেলাও নই, মুরীদও নই, পীরও নই। আমি একও নই দুইও নই, এমন করেই দাস কবীরের আনন্দ বিলাস চলছে। হিন্দু ধ্যান করছে মন্দিরের, মুসলমান ধ্যান করে মসজিদের। দাস কবীরের ধ্যান সেখানেই চলেছে যেখানে দুই দলেরই প্রতীতি। হিন্দু মরছে রাম বলে' বলে', মুসলমান মরছে খোদা বলে' বলে'। কবীর বলেন, যার জীবন আছে, সে জীবিত, এই দুয়ের কারুর সঙ্গেই সে যায়

না। যদি বলি আমি হিন্দু, তবে আমি তো তা নই; আবার মুসলমানও আমি নই। পাঁচ তত্ত্বে তৈরী আমার দেহ পুতুলটি বটে, তবু আমার মধ্যে অদৃশ্য রহস্যের (mystery) খেলা চলেছে। মহা রহস্য হ'তে এই রহস্যময় জীবনটি এখানে এসেছে—যা কিছু সীমা ও খণ্ডতার দোষ তা এখানে এসে লেগেছে। যদি আবার সেই মহারহস্যেই ফিরে গিয়ে ডুবে যায় তবে তার দোষটুকু আর থাক্‌বে কোথায়?"

গুরু নহীঁ চেলা নহীঁ মুরীদহু নহি পীর।
এক নহীঁ দুজা নহী বিলসে দাস কবীর॥
হিংদু ধ্যাবৈ দেহরা মুসলমান হি মসীত্।
দাস কবীরা তহাঁ ধ্যায়হীঁ জহাঁ দোনোকী পরতীত॥
হিংদু মুয়া রাম কহি, মুসলমান খুদায়।
কহৈ কবীর সো জীবতা দোউকে সংগ ন জায়॥
হিন্দ কহুঁ তো মৈঁ নহীঁ, মুসলমান ভী নাহিঁ।
পাঁচ তত্ত্বকা পুতলা গৈবী খেলে মাহিঁ॥
গৈবী আয়া গৈবতে যহাঁ লগায়া ঐব।
উলটি সমানা গৈবমেঁ তব কহাঁ রহৈগা ঐব॥

[সত্য কবীর সাথী]

কবীরকে সবাই যখন প্রশ্ন কর্‌ছেন, "কোথা হতে এলে? কি তোমার স্থান (ধাম), কি তোমার জাতি, তোমার স্বামীর কি নাম? কবীর উত্তর কর্‌ছেন, "অমর লোক হ'তে এলাম, সুখ-সাগর আমার ধাম, জাতি আমার অজাতি, আমার স্বামীর নাম অগম-পুরুষ, জাতি আমার আত্মা, প্রাণ আমার নাম, অলখ আমার ইষ্ট পুরুষ, গগন আমার নিবাস।"

কহাঁতে তুম আইয়া কৌন তুম্‌হারা ঠাম।
কৌন তুম্‌হারা জাতি হৈ কৌন পুরুষ কৌন ঠাম॥
অমর লোকতে আইয়া সুখকে সাগর ঠাম।
জাতি হমারী অজাতি হৈ অগম পুরুষ কো নাম॥
জাতি হমারী আত্মা, প্রাণ হমারা নাম।
অলখ হমারা ইষ্ট হৈ গগন হমারা গ্রাম॥

[সত্য কবীর সাথী]

"যেখান হ'তে এসেছি অমর সেই দেশ। সেখানে না আছে ব্রাহ্মণ শূদ্র, না আছে সেখ। সেখানে না আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু, না আছে মহেশ। না আছে সেখানে যোগী জঙ্গম দরবেশ। কবীর বলেন, সেখানকার বার্ত্তা আমি এনেছি। সার-সুরকে গ্রহণ করে' সেই দেশে চলো।"

জহাঁ সে আয়ে অমর ব দেশরা।
ন হুরা ব্রাহ্মণ সুদ্র ন সেখরা
ন হুরা ব্রহ্মা বিষ্ণু ন মহেসরা।
ন হুরা জোগী জংগম দরবেসরা।
কহৈ কবীর লৈ আয়ন সংদেসরা।
সার সুর গহো চলো রহি দেসরা॥

[কবীর ১৮৬]

এই সুরের কথাটা আর একটু পরে বলছি। এ-সব কথা শুনে লোকে বল্‌তে লাগ্‌লো কবীর তবে এসেছেন এক আস্‌মানী (abstract) তত্ত্ব নিয়ে। এই তত্ত্বটা একটা আলগা (abstract) তত্ত্ব। লোকে এই কথাটি বলে'ই কবীরের বাণী উড়িয়ে দিতে চাইলো। কবীর বল্লেন, "আমি সবার সঙ্গে এক নিরন্তর হয়ে আছি, কারও সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ নেই। আমি সবার মধ্যেই আছি, বিশ্বের সবার মধ্যেই যদি আমি না থেকে থাকি তবে আমি একেবারেই নেই। আমাকে এইজন্য স্বতন্ত্র কর্‌তে কর্‌তে একেবারে স্বতন্ত্র করে' দিয়েছে।"

এক নিয়ংতর অংতর নাহী।
তৌ সবহিনমেঁ না মৈ নাহীঁ॥
মোহি বিলগ বিলগ বিলগাইল হো॥

[কবীর ৪।৫২]

লোকে যাই বলুক না কেন এই বিশ্ব হল প্রেমের ঘর। যার প্রেম যত দূর, তার ঘর তার জগৎ তত বড়। আমি প্রেমের বলে এই ঘর জিতে নিয়েছি। আমাকে স্বতন্ত্র করে' দিলেই বা আমি স্বীকার কর্‌বো কেন? "এই বিশ্বঘর তো প্রেমের ঘর; চামড়ায় রং দিয়ে তো এখানে কারু ঘর নির্ণয় হবে না। লোভ গরব মাটীতে ফেলে দিয়ে তবে এই প্রেমের ঘরে প্রবেশ কর্‌তে হয়।"

য়হ তো ঘর হৈ প্রেমকা খালাকা ঘর নাহিঁ।
লোভ গরব ভুইঁ ধরৈ তব পৈঠে ঘর মাহিঁ॥

[সত্য কবীর সাথী]

এই বিশ্বকে যে ঘর কর্‌তে চায় তার কুল খোয়াতে হয়। "কুল খোয়ালেই কুল বিস্তৃত হয়ে যায়। কুল রাখ্‌তে গেলেই কুল যায়। কুলহীনের কুলে এসে দেখা দেন ভগবান্। কুলহীনের স্থিতি তখন সকল কুলের মধ্যে উদার হয়ে গভীর হয়ে যায়।"

কুল খোয়া কুল উবরৈ কুল রাখৈ কুল জায়।
রাম নিকুল কুল ভেটিয়া সব কুল রহা সমায়॥

[সত্য কবীর সাথী]

পরব্রহ্মের যে বিশ্বময় স্বরূপ কবীর প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে একেবারে পরম সামঞ্জস্যের। ব্রহ্মের কোথাও একটু

কমী বা বেশী নেই তাঁর মধ্যে জ্ঞান বল ক্রিয়া সব সুসঙ্গত হয়ে আছে। বীণা যেমন আপনার সব তার সব খুঁটির মধ্যে সুসঙ্গত হ'লেই তার ভিতরের পরম রমণীয় সুরটি বেজে ওঠে, তেমনি ব্রহ্ম তাঁর বিশ্বচরাচর নিয়ে এমন সুসঙ্গত হয়ে আছেন যে এই নিখিল জগৎ বীণার মত নিরন্তর বাজ্‌চে। নয়নে—ইহার "রূপ-রেখা-বরণের বীণা"। কর্ণে—"সুর-তালের বীণা"। তেমনি স্পর্শে স্বাদে গন্ধে, সব ইন্দ্রিয়ের কাছে এই বীণা "তরহ্ তরহ্" বিচিত্র রমণীয় হয়ে বাজ্‌বে। তাই কবীর এক ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে অন্য ইন্দ্রিয় দিয়েও তাঁর গানে সাখীতে শবদে বার বার উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, "চেয়ে দেখ নয়নে কি সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য উছ্‌লে উঠ্‌ছে।" "তোমার রূপের সৌরভে মন-ভ্রমর মাতাল হয়েছে।" ইত্যাদি। আসল কথা পরমাত্মার ঐ একই সৌন্দর্য্য বিশ্বের নানা বিষয় আশ্রয় করে' নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আত্মার কাছেও সেই সৌন্দর্য্য নানা ইন্দ্রিয়-দ্বারে নানা বিচিত্রভাবে এসে ধরা দিচ্ছে। তাই প্রাণ যখন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়, তখন এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্য একই সময়ে হয়ত নানা দুয়ারে নানা ভাবে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন কোন্ পথে যে কোন্ আনন্দের অনুভব চল্‌চে তা আর ঠিক থাকে না।

বিশ্বেশ্বর তাঁর বিশ্ববীণাটি বিরাট্ অসীম (অহদ) ও অনাহত্ সুরে নিত্যকাল নিত্য বিচিত্রভাবে বাজিয়ে চলেছেন। তিনি হলেন ওস্তাদ্। আমরা চেলা, ছোটো; তাঁর সঙ্গে মিল্‌তে হলে আমাদেরও সুরেই মিল্‌তে হবে। কারণ বড়র সঙ্গে ছোটর মিল আয়তনে ওজনে জ্ঞানে বা শক্তিতে হয় না। তবে বৃহৎ বীণার সঙ্গে এক সুরে বাঁধ্‌লে ছোট বীণাও সঙ্গত চালাতে পারে। এই সুরের যোগই যোগ। পূর্ব্বের একটি গানেও এ সুরের পথে চল্‌বার কথা আছে। সর্ব্বত্রই কবীরের এই কথা। আমাদের ছোট বীণাটি বিশ্ববীণার সুরে বাঁধ্‌তে হবে। আমাদের কায়া, আমাদের জীবন, আমাদের কর্ম্ম আমাদের ভাব, আমাদের প্রেম বৈরাগ্য (সুরত, নিরত) এই সব নিয়ে আমাদের বীণা। এইজন্যই কবীরপন্থীরা দেহের মধ্যেই বিশ্বের সব তত্ত্ব আছে মনে করেন। কারণ বড় বীণার সবই ছোট বীণার মধ্যে আছে, না হয় ছোট আকারে আছে। অবশ্য কবীর এই উপমাটি যত উদার ও সুন্দরভাবে দিয়ে সাধনার একটি রমণীয় চেহারা বের করেছিলেন, শিষ্যেরা তা ঠিক রাখ্‌তে পারেননি। তাঁরা একেবারে দেহের মধ্যে বিশ্বটাকে রাখ্‌তে গিয়ে এমন দেহতত্ত্ব বার করেছেন যে তাতে আর কোন সৌন্দর্য্য কোন রসই থাক্‌বার যো নেই; দেহ-ভূগোল নিয়ে মস্ত গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছেন।

ওস্তাদ বড় বীণা বাজাচ্ছেন। এই বিশ্বকে কখনও কবীর বলেছেন বীণা, কখনও বলেছেন এই বিশ্ব তাঁর গান। বিশ্বের মধ্য দিয়েই যে শুধু সঙ্গীত বেরুচ্ছে তা নয়, বিশ্বটাই ব্রহ্মের আনন্দ-নিঃসৃত একটি অপরূপ সঙ্গীত। তাই আমাদের জীবনকেও তিনি কখনও বীণা, কখনও সঙ্গীত বলেছেন। যাক্ যে ভাবেই হউক বিশ্বচরাচরে যেমন তার সমস্ত সামঞ্জস্য সমস্ত সুরের তালের ওজন নিরন্তর ঠিক আছে, কোথাও বেশী কম নেই, তেম্‌নি আমাদের জীবনকেও পরিপূর্ণ সুর কর্‌তে হবে। সব দিক্ সুসঙ্গত আছে বলে'ই বিশ্বটি একটি পরিপূর্ণ সুর। এই বিরাট্ সুরের সঙ্গে ছোট সুরটি মিলানই আমাদের সাধনা।

"হে সাধু, এই দেহখানি যেন একটি বীণার ঠাট (আয়োজন)। এর খুঁটি মুচ্‌ড়ে যদি ঢিলে তারগুলি বেশ টান করে' তুল্‌তে পারি, তবেই হুজুরের রাগিণীটি এর মধ্যে থেকে বের হবে। কিন্তু যদি তার ছিঁড়ে যায় আর খুঁটির সঙ্গে যদি খুঁটির যোগ না থাকে তবে ধূলোর যন্ত্র ধূলোয় মিলিয়ে যাবে। কবীর বলেন, হে ভাই সাধু, ওই প্রভুর সুরটি পাবার পন্থাটি বড় অগম্য।"

> সাধো য়হ তন ঠাট তংবুরেকা ॥
> ঐঁচত তার মরোরত খুঁটি, নিকসত রাগ হুজুরেকা।
> টুটে তার বিখর গই খুঁটি হোগয়া ধুরম ধুরেকা ॥
> কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো অগম পংথ কোই সুরেকা ॥
> [কবীর ১।৫৯]

"অপরূপ এই বীণাটি তৈরী। সুরে এর তার বেঁধে নিলে মন মাতে। আর যদি খুঁটি ভেঙ্গে যায়, বা তার আল্‌গা হয়ে যায়, তবে কেউ এই বীণাকে পুছ্‌বেও না।"

অজব তরহ্ কা বনা তংবুরা তার লগে মন মাতরে।
খুঁটি টুঁটি তার বিলগানা কোউ ন পুছত বাতরে॥
[কবীর ৩।৯০]

এই তো গেল সাধকের "খাস" অর্থাৎ ব্যক্তিগত বীণা। এখানে তাঁর সাধনা, তাঁর ব্যক্তিগত সুর, যদি "হুজুরী রাগ" অর্থাৎ প্রভুর সুরের সঙ্গে না মিল্‌লো, তবে তার জীবনটি ধূলোয় ধূলো মাত্র। এই "খাস" অর্থাৎ ব্যক্তিগত বীণা বাজাতে হলে আমাদের সমগ্র জীবনের একটি তারও বাদ দিলে চল্‌বে না। একটি খুঁটি টুটে গেলেও প্রভুর সুরের সঙ্গে মিল হবে না, সাধনা নিষ্ফল হবে।

তাই কবীর কোনোখানে সাধকের কোন শক্তি বা সম্ভাবনাকে একটুও নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চান্ নি। সাধকের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সব বোধ, তনু, মন, প্রাণ, প্রেম, বৈরাগ্য সব অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। পবিত্র হয়ে প্রভুর সুরের অনুগত হলে তবেই সাধনার পূর্ণতা সম্পাদন কর্‌বে। নিজেকে কোনো অংশে একটুও যদি নষ্ট করি ("বিথড়ে") তবে সুর আর মিল্‌লো না। তাহলে পরমাত্মার সঙ্গে না মিলে মিল্‌তে হবে গিয়ে ধূলোর সঙ্গে। তাই তো সাধনা এত কঠিন। প্রথমে আমাদের ছোট বীণার প্রত্যেক অংশের সঙ্গে প্রত্যেক অংশের এমন মিল থাকা চাই যাতে আমাদের সমগ্র জীবনটিই একটি বীণা হয়ে উঠে। এর একটি খুঁটিও যদি বাদ দিই বা অন্য খুঁটির সঙ্গে তার বিরোধ থেকে যায়, তবে "টুটি জায় বিথড় জায় খুঁটি।" তবে বীণাই হয় না। আবার খুঁটি ভাঙ্গার ভয়ে ভয়ে যদি সুর না বাঁধি, তবে শিথিল তারে সুরই বাজ্‌বে না। "ঐঁচত তার" যে বীণা তাকে বাজিয়ে তুল্‌তে হবে। তার উপর সুর যখন বাজ্‌বার মত হ'ল তখন "হুজুরী রাগের" সঙ্গে এক সুরে তাকে বাজিয়ে তুল্‌তে হবে। কাজেই বড় কঠিন সাধনা। যদি কঠিন বলে' সাধনা এড়িয়ে চলি তবে এমন দুর্লভ জন্ম, এমন অপ্রাপ্য জীবন, ধূলোয় ধূলো হয়ে যাবে। একেবারে "ধুরম্ ধুরেকা" হবে। তাই কবীর বার বার প্রেমের নয়নে জগতের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে বলেছেন।

"প্রেম-নয়নে চেয়ে দেখ না, তিনি ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করে' রয়েছেন। প্রেম দিয়ে হৃদয় দিয়ে যদি বুঝে দেখিস্ তবে দেখ্‌তে পাবি যে এই জগৎ আমার জগৎ।

"সারাটা জগৎই সত্যের ধাম। তার চমৎকার সব বাঁকা বাঁকা পথ আমাদের চিত্তকে ভুলিয়ে কোথায় নিয়ে যায়। যে পৌঁছেচে সে বিনা পায়েই চলে পৌঁছেচে। এই তো এক অপার খেলা।

"তিনি এই রূপ আর রেখায় মূর্ত্তি লোককে প্রেমেতেই সঙ্গীতের মত বিকশিত করে' তুলেছেন। সত্যপুরুষ নব নব রূপের ধারাতে আনন্দের বন্যা বহিয়ে দিয়েছেন। স্বামী আমার সব রূপ পূর্ণ করে' রয়েছেন।

"পংথ-বীণাতে সত্য-রাগিণী বেজে উঠেছে। হৃদয়ের মাঝে গিয়ে এই সুরের ব্যথা লাগ্‌ছে। জন্ম-জন্মের অমৃত-ধারা এই সুরের মধ্য দিয়ে উৎসারিত হয়ে বের হচ্ছে। অসীম অমৃতের এই তো ফোয়ারা।"

তূ সুরত নৈনন নিহার য়হ অণ্ডমেঁ সারা হৈ।
তূ হিরদে সোচ-বিচার য়হ দেশ হমারা হৈ॥
সকল জগৎমেঁ সতকী নগরী চিত ভুলাবৈঁ বাঁকী ডগরী।
সো পহুঁচে চালে বিন পগরী ঐসা খেল অপারা হৈ॥
..................সুরতি মুরতি লোক পসারা।
সত্তপুরুষ নূতন তন ধারা, সাহিব সকলরূপ সারা হৈ॥
পংথ-বীণা সত্ত রাগ উচারৈঁ জো বেধত হিয়ে মঁঝারা হৈ।
জন্ম জন্মকা অমৃতধারা জহঁ অধর অমৃত ফুহারা হৈ॥
[কবীর ৩।৪৮-৪৯]

এই পংথ-বীণাটি কবীরের আর-একটি অপরূপ ভাব সৃষ্টি। ব্যক্তিগত জীবনের যেমন সব খুঁটি পরস্পরে সুসঙ্গত করে' জীবন বীণাটি বাজাই, তেমনি সমস্ত মনুষ্য জাতির মনুষ্যত্বের (humanity-"ইনসানী") সাধনা দিয়ে একটি বড় রকমের বীণা বাজ্‌ছে। এক পংথের সঙ্গে আর পংথের ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু বিরোধ নেই। যেমন বীণার প্রত্যেক ঘাটে ও খুঁটিতে সুর ভিন্ন ভিন্ন। যদি এক সুরই হ'ত তবে তো বীণাই ব্যর্থ। আবার তাই বলে যদি খুঁটির সঙ্গে খুঁটির, ঘাটের সঙ্গে ঘাটের সুসঙ্গতি না থাক্‌তো, তবে বীণায় সুরই বাজ্‌তো না।

মনুষ্য জাতির এক এক দেশে এক এক দলে এক এক রকম সাধনা। এর একটি সাধনাকেও যদি আমরা জগৎ থেকে লুপ্ত করি বা একটি সাধনাকেও আর-একটি সাধনার নকলে বেঁধে দুই খুঁটির বা দুই ঘাটের সুর এক করি,

তবে মনুষ্যত্বের বীণা বাজ্‌বে না। প্রবল জাতি যখন দুর্ব্বল জাতিকে জগৎ থেকে লুপ্ত কর্‌তে বসে, তখন সে জানে না যে মনুষ্যত্বের বীণার সুর সে নষ্ট কর্‌তে বসেছে। সে বিশেষ কোনো দেশের শত্রু এইটুকু মাত্র নয়। সে একেবারে ব্রহ্মদ্রোহী। জগতে তার আয়ু পরিমিত। কারণ সমগ্র মনুষ্যত্বের মহা-আরতি-গান তো দীর্ঘকাল বন্ধ থাকতে পারে না। যত বড় মূঢ় করমিয়া (materialist) পাথর পর্ব্বত যাই হও না কেন, তোমাকে গুঁড়ো করে' এই সুরের তরল ধারা তার অসীম সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হবেই হবে।

যে সাধনা জুলুম করে' অন্য সাধনাকে ঠিক নিজের মত করে' নিতে চাইবে, সেও দুই খুঁটির সুর এক রকম করে মনুষ্যত্বের সঙ্গীতটি নষ্ট করে' দেবে। তবে কি সাধনার সঙ্গে সাধনার যোগ নেই? আছে বৈ কি! সে যেমন সুরের সঙ্গে সুরের যোগ, এক হবে না অথচ পরস্পরে সুসঙ্গত হবে। কবীর তাঁর মহাপুরুষীয় দৃষ্টিতে দেখেছেন নানা সাধনার একত্র যোগে পংথ-বীণা বাজ্‌ছে। পংথবীণার সুর ও তার বেদনা তাঁর হৃদয়ে গিয়ে বেজেছে। হয়তো যেখানে সুরের কিছু ত্রুটি ছিল, সেই অসম্পূর্ণতার কান্নাও তাঁর বিশাল হৃদয়ে প্রবেশ করে' তাঁকে ব্যাকুল করেছিল।

এই যে মনুষ্যত্বের বিরাট রাগিণী এখানেই মানব-ইতিহাসের যুগ-যুগের অমৃত ধারা "জন্ম-জন্ম-কা-অমৃত ধারা"; এইখানেই মানব-ইতিহাসের অসীম অমৃতের নিত্য-উৎসারিত ফোয়ারা।

কবীরের দেশকে আবার এই পংথ-বীণার সাধনার ভার নিতে হবে। মানব-ইতিহাসের বীণা কেবল আঘাতের পর আঘাতের কান্না কাঁদ্‌ছে। পংথ-বীণাকে নির্ম্মল করে' প্রেমের সীমাহীন সঙ্গীতের সাধনার কথা কবীরের দেশকেই শোনাতে হবে। ভারতকেই ভারত-পংথের সাধনা কর্‌তে হবে।

এই অসীম বাণী শুনেই তিনি বৈরাগী হয়ে বেরিয়েছিলেন, মা, বাপের প্রতি রাগ করে' তিনি ঘর ছাড়েন নি। "ওগো, সেই অসীমের বাণী শুনেই তো আমি কুল ছেড়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছি।"

সুনি অহদকী বাণী লো।
তাহি চিন্হ হম ভয়ে বইরাগী পরিহর্‌ কুলকী কাণী লো॥
[কবীর ২।৪৩]

সমগ্র মনুষ্যত্বের সুর দিয়ে যেই নিখিল দেবতার আরতি চলেছে সেই অসীম অখণ্ডিত দেবতার পূজায় তিনি তখন সকল পৃথিবীকে ডাক দিলেন। কিন্তু সবাই তখন আপন আপন দেশের দেবতার, আপন আপন দল ও সম্প্রদায়ের দেবতার সঙ্কীর্ণ পূজাতেই অস্থির। কবীরের কথা কেউ শুন্‌তেই চায় না। মন্দিরে মন্দিরে সব আপন আপন দলের দেবতাকে বসিয়ে পূজা কর্‌চে। তাই কবীর বড় দুঃখে বল্‌ছেন—

"হে অন্‌গড়া (অপ্রতিষ্ঠিত, স্থাপনাবিহীন) দেবতা, তোমার সেবা আজ কর্‌বে কে? আপন আপন স্থাপিত দেবতার পূজাই সবাই করে, তার কাছেই নিত্য সেবা এনে উপহার দেয়। পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ডিত স্বামীর খবরও তারা নেয় না। কবীর বল্‌ছেন, শোন ভাই সাধু, তাঁর রাগিণী যে শুনেছে সেই সব সীমা তরে' গেছে।"

অন্‌গঢ়িয়া দেবা, কৌন করৈ তেরী সেবা॥
গঢ়ে দেব-কো সব-কোই পূজৈ নিতহী লাবৈ সেবা॥
পুরণব্রহ্ম অখণ্ডিত স্বামী তাকো ন জানৈ ভেবা॥
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো রাগ লখৈ সো তরিয়া॥
[কবীর ২।৩৭]

কবীর আরও ব্যাকুল হয়েছেন এইজন্য যে তিনি দেখেছেন মানব-ইতিহাসের মন্দিরে দেবতা অতিথি হয়ে মানবের আনন্দে যোগ দিতে এসে দাঁড়িয়েই আছেন। যদি দেবতার মন্দিরে গিয়ে মানবের পূজা কর্‌তে হ'ত তবে না হয় সবুর চল্‌তো। কিন্তু সাধনার নেত্রে কবীর দেখ্‌লেন মানবের মন্দিরে দেবতা এসে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন উপায় কি? নির্ব্বাক্ হয়ে যে দেবতা শুধু প্রতীক্ষাই কর্‌চেন।

"মানব-মন্দিরে মানব-মন্দিরের অতিথি শিব এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন তোরা সব কোথায় দাঁড়িয়ে পাগ্‌লামি কর্‌চিস্? দেবতা এসে পৌঁছেচেন, এখন সেবা করে নে, রাত্রি যে চলে আস্‌ছে। যুগ যুগ যে তিনি এই মন্দিরের বাহিরে বৃথা প্রতীক্ষাই কর্‌চেন, তাঁর যে এখানে মন মজেছে। প্রেম ও বৈরাগ্য বিনা এতদিন সেই পরমানন্দ-সাগর তো চিন্‌তেই পারা যায় নাই।"

জীব-মহল-মেঁ সিব পহুনবা কহাঁ করত উনমাদ রে।
পহুঁচা দেবা করিলে সেবা রৈন চলী আবত রে ॥
জুগন জুগন করে পতিচ্ছন সাহবকা দিল লাগা রে।
সুঝত নাহি পরম-সুখ-সাগর বিনা প্রেম বৈরাগ রে ॥
[কবীর ৩।৯৬]

তা ছাড়া প্রতি সাধনাই অন্য সাধনার দ্বারে অতিথি। প্রতি জাতিই একটি স্বতন্ত্র মন্দির। এক জাতি যখন অন্য জাতিকে আতিথ্য করে, সেই অতিথি-সৎকারের সঙ্গে সকল জাতির দেবতা বিশ্বনাথেরও সৎকার চল্‌তে থাকে।

"যত ঘট তত মত। বহু বাণী বহু ভেখ এই জগতে। কিন্তু সব ঘট ব্যেপে সেই এক অসীম অলেখ দেবতা সব ঘট পূর্ণ করে' আছেন।' জাতির দুয়ারে জাতি আজ উপস্থিত। জাতির মন্দিরে জাতি অতিথি এসে দাঁড়িয়েছেন। স্বামী আবার সব জাতি, তাই তিনি সব জাতির মন্দির পূর্ণ করে' রয়েছেন। আমি যে হয়েছি শিশুর মত। তাই আমার আর আপন-ঘর পর-ঘর নেই, সব ঘরেই আমার খেলা চল্‌চে। শিশু বলে'ই আমি যা খুসী করুচি কারও ভয়ই রাখি না।"

জেতা ঘট তেতা মতা বহু বাণী বহু ভেখ।
সব ঘট ব্যাপক হবে রহা সোঈ আপ অলেখ ॥
জাতি জাতি-কে পাহুনে জাতি জাতিকে জায়।
সাহব জাতি সব জাতি হৈ সব ঘট রাহ্যো সমায় ॥
বালক-রূপী হম হুঁ খেলোঁ সব ঘট মাহি।
জো চাহৌঁ সো করত হৌঁ ভয় কা চুকা নাহি ॥
[সত্য কবীর কী সাখী, ব্যাপক অঙ্গ]

জগতের মহা কলহের দিনে জগতের ভরসা শিশুর দল। কবীর চিরকালই শিশুর দলের লোক। বাইবেলে আছে স্বর্গরাজ্য শিশুদেরই। কবীর নিত্য সেই স্বর্গবাসী ছিলেন। তাঁর লেখায় শৈশবের আর যৌবনের জয়গান লেগেই আছে। তিনি চিরদিন তাই কাঁচার দলে, সবুজের দলে, এগিয়ে-যাবার দলে, নিত্য-নূতনের দলে, ঘর-পর-ভেদ-না-করার দলে ছিলেন।

কবীর তাঁর এত বড় দৃষ্টিটি জগতের সাম্‌নে ধর্‌লেন বটে কিন্তু ফল বোধহয় তেমন হ'ল না। তাই দুঃখ করে' বল্‌ছেন, "হে কবীর, বীণা' তো বাজ্‌লো না সব তার কেবল ভেঙ্গেই চলেছে। যন্ত্র বেচারা আর কর্‌বে কি? যিনি এই যন্ত্রে তাঁর সুরটি বাজিয়ে তুল্‌বেন তিনিও নিরাশ হয়ে চল্‌লেন।"

কবীরা জংত্র ন বাজঈ টুটি গয়া সব তার।
জংত্র বিচারা ক্যা করৈ চলা বজাবনহার ॥
[সত্য কবীর সাখী]

সবাই বল্‌লেন, এক জাতির সঙ্গে এক ধর্ম্মের সঙ্গে এক সাধনার সঙ্গে অন্য জাতি অন্য ধর্ম্ম বা অন্য সাধনার আবার সম্পর্ক কি? এদের আবার ঐক্যের সূত্র কি? তাই তিনি বল্‌ছেন—"তোর হাত পা মুখ মাথা যদি ভিন্ন ভিন্ন করে' ধরিস্‌ তবে ভিন্ন ভিন্ন সব অঙ্গের নাম। কবীর বিচার করে বল্‌ছেন, বল্‌ দেখি তবে তোর নাম এই-সব অঙ্গের মধ্যে কোন অঙ্গে? হাত পা মুখ মাথার ভিন্ন ভিন্ন নাম বটে, কিন্তু কবীর বিচার করে বল্‌চেন যে আমার নাম সব অঙ্গের সব ঠাঁইয়েই রয়েচে। আমি কবীর, সকলের কথাই বল্‌চি, আমার কথা তো সর্ব্বজনের কথা থেকে স্বতন্ত্র করে' বলা যায় না। তাই আমি বল্‌ছি পূরবের কথা, আর পশ্চিমে সেই কথা গিয়ে পশ্চিমকে পূর্ণ করে' তার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ কর্‌চে।"

হাথ পাঁর মুখ সীস ধরি বেগর বেগর নাম।
কহৈঁ কবীর বিচারি কৈ তোর নাম কহাঁ ধাম ॥
হাথ পাঁর মুখ সীস ধরি বেগর বেগর নাম।
কহৈঁ কবীর বিচারি কৈ মোর নাম সব ঠাম ॥
কবীরা হম সবকী কহৈঁ হমরী কহী ন জায়।
পূরবকী বাতা কহৈঁ পশ্চিম জায় সমায় ॥
[সত্য কবীর সাখী]

যদি দেখ্‌তে জান তবে দেখ্‌বে "পূরব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর সব পরিপূর্ণ করে' প্রতিষ্ঠিত আছেন তিনি। যেখানে দেখ সেখানেই দেখ্‌বে অগম্য গুরুর তত্ত্ব পূর্ণ করে' ভরে' রয়েছে।"

পূরব পশ্চিম দেখ দক্‌খিন উত্তর রহৈ ঠহরায়কে।
জহাঁ দেখো অগম্য গুরুকী তহীঁ তত্ত্ব সমায়কে
[কবীর ৪।৩৯]

তাই কবীর বলেন, এই ভাব যখন আমার প্রত্যক্ষ হয়, তখন আর আমি নির্ব্বাণ-মুক্তি চাই না। আমি এই দেখ্‌তে চাই যে মানবের সকল পথের সকল সুরের মিলনে মানব-বীণার তানে "হুজুরী" রাগ বাজ্‌ছে। জাতির মন্দিরে জাতির আতিথ্য চল্‌চে—মানবের মন্দিরে নিখিল মানব-জাতির অভ্যর্থনা হচ্চে। এ যদি দেখি, তবে আর আমি নির্ব্বাণ চাই না, সিদ্ধি চাই না। বার বার যেন এই

মহা-মহোৎসব দেখ্‌তে এই মানব জগতে আস্‌তে পাই। জন্মে জন্মেই যেন এই অপরূপ লীলা দেখ্‌তে পাই।

"সিদ্ধ হ'লাম তো কি হ'ল? না হয় চার দিকে তার সুরভি ছুটলো। আজও অঙ্কুরের মধ্যে আমার বীজ আছে, ফিরে ফিরে আমার বিকশিত হবারই ইচ্ছা। যদি জন্মাই, তবে যেন ব্রহ্মের মধ্যেই জন্মাই, আর যেন কোথাও না যাই। হরিরসে এই জীবন-লতাকে সেচন করা হয়েছে, সেই রস কি ব্যর্থ হবে? অনন্ত জীবন আমি পাবই।"

সিদ্ধ ভয়ে তো ক্যা হুআ চহুঁ দিস ফুটি বাস।
অজহুঁ বীজ-অংকুরমেঁ ফির জামনকী আস।
জো জনমে তো ব্রহ্ম-মেঁ অনত ন কহুঁ সমায়।
হরিরস সীচী বেলড়ী কদে ন নিফল জায়॥

[সত্য কবীর সাখী]

এই সকল জগতের সামঞ্জস্যে যে সুর বাজ্‌ছে সেই সুর শোনাই আমার মুক্তি। সেই অসীম রাগিণী যদি শুনতে পাই তবে আর কোন মুক্তিই চাই নে। সামঞ্জস্যের দৃষ্টি যতদিন না হবে ততদিন তো এই মুক্তি পাবার আশা নেই। "সদ্‌গুরুর কৃপায় সমদৃষ্টি লাভ হয়েছে, মন আমার বিশ্রাম পেয়েছে, আর তো কিছু দেখা যাচ্চে না, সর্ব্বত্র কেবল রামই ভরপুর রয়েছেন।"

সমদৃষ্টি সতগুরু কিয়া পায়া মন বিশ্রাম।
দুজা কোই দীখে নহী রহা ভরপুর রাম॥

[সত্য কবীর সাখী—সমদৃষ্টি অংগ]

এই মুক্তি যখন পেলাম তখন সব মুক্ত হয়ে গেল। আমার ঘরে, তোমার ঘরে, আমার সাধনায়, অন্যের সাধনায়, আমার জাতিতে অন্যের জাতিতে, আর কোনো বিরোধ রইলো না। সব মিলেই নিখিলেশ্বরের আরতি-মন্দিরের পরিপূর্ণ সুর বেজে উঠ্‌লো, পরিপূর্ণ মানব-সাধনার সুর "হুজুরী রাগে" ভরপুর হয়ে বাজ্‌তে লাগ্‌লো, সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতির সব সঙ্কীর্ণতার বাঁধন এক পরিপূর্ণ রাগিণীর মধ্যে মুক্তি পেলে। এই ব্রহ্মরাগিণী শুনে যখন সাধনার পথ মুক্তি পেলে, তখন প্রাণ নির্ব্বাণ-মুক্তির শান্তিতে ভরে' গেল। নয়ন খুলে যখন দৃষ্টিতে তাঁর বিরাট্ নিখিলস্বরূপ চিনে নিলাম, তখন যে পরিপূর্ণ রূপমুক্তি লাভ হ'ল তা জান্‌তেই পেলাম। ডাইনে বাঁয়ে এখন আমার মুক্তি, আগে পিছে এখন আমার মুক্তি, ধরণী-আকাশে এখন মুক্তি, কারণ আমার দৃষ্টিই এখন মুক্ত হয়ে গেছে।"

নিখিলমানবের বিরাট্ দেবতার চরণামৃত-সলিলে না ধৌত হ'লে নয়নের অন্ধতা তো ঘোচে না। এই বিরাট্ স্বরূপ যে দেখ্‌তে পেলে তার আর কোথাও যে বন্ধন থাকৃতে পারে না।

মুক্তা পৈড়া জব ভয়া প্রাণ মুক্তি নিরবান।
রূপমুক্তি তব জানিয়ে জব দেখৈ দৃষ্টি পিছান॥
মুক্তা বাঁয়ে ডাহিনে মুক্তা আগে পীঠি।
মুক্তা ধরণী অকাস-মেঁ মুক্তা মেরী দীঠি॥

[সত্য কবীর সাখী—জীবনমুক্তি অংগ]

শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন

যোগি-জাতি

নাথ-সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় দুইটি প্রবন্ধে যোগীদের নানা কথার আলোচনায় কয়েকটি কথা বলা হয় নাই। এবার যোগীদের সম্পর্কে তার দুটা কথা বলিতে চেষ্টা করিব। বঙ্গদেশে যোগীর সংখ্যা সাড়ে চারি লক্ষের কম নয়। ইহার দুইভাগ পূর্ব্ববঙ্গের, এবং একভাগ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ ও ঢাকায় অনেক যোগীর বাস। ধুবড়ীর নিকটবর্ত্তী বিদ্যাপাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে যোগীরা থাকে। গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত সালকোচা, রহা হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে চরাইবাহী মৌজায়ও ৪০০—৫০০ যোগী আছে। নওগাঁজেলায় পেটবড়া ও দীঘলদড়িতে যোগীরা থাকে। রংপুরের মধ্যবর্ত্তী অভিরামপুর, বগুলাবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ ও থলাইঘাটেও যোগীদের নিবাস আছে। এদিকে ওদিকে আরও অনেক যোগী আছে। যোগীদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যায়, বঙ্গদেশে তিন রকম যোগীর বাস। তাহাদের (১) যোগী,

(২) জাত যোগী ও (৩) সন্ন্যাসী যোগী বলা যাইতে পারে।

যোগী

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় সকল যোগীই তাঁত বুনিয়া খাইত। তাহারা অস্পৃশ্য ও সমাজচ্যুত ছিল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা কাপড়ে ভাতের মাড় দিত, অন্যান্য তাঁতিদের ন্যায় কাপড়ে খইয়ের মাড় দিত না। এখন কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে যোগীদের জল হিন্দুসমাজে কেহ ব্যবহার করিত না। এখনও হিন্দুর গৃহে তাহাদের বড় একটা যাওয়া আসা নাই। কিন্তু যদি কোন যোগী হিন্দুগৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে হিন্দুর অন্ন অপবিত্র হয়। ব্যবহার্য্য জল পর্য্যন্ত তাহারা ফেলিয়া দেয়। অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতির ন্যায় তাহারা বাঙলার সীমান্তস্থিত অঞ্চলে বিতাড়িত। হিন্দুসমাজে যোগীর দল অস্পৃশ্য হইলেও তাহারা কিন্তু আপনাদিগকে হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত বলিয়া মনে করে না। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দুর অন্নও তাহারা ভোজন করে না। এমন কি, পতিত ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও তাহারা খায় না; শূদ্রের বাড়ীতেও খায় না। যোগীদের হিন্দুসমাজে চলন নাই বটে, কিন্তু হিন্দুর ধোপা নাপিত তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। বাঙলা দেশে জোলা, তাঁতি, যোগী, সকলেই কাপড় বুনিয়া খায়, কিন্তু যোগীরাই অস্পৃশ্য, হেয় ও সমাজচ্যুত। তাহাদের অপরাধ কি, বুঝিয়া উঠা কঠিন। তবে অন্যান্য তাঁতিদের সহিত অনেক বিষয়েই তাহাদের গরমিল। যোগীরা যে মাকু ব্যবহার করে, তাহা অনন্যসাধারণ। তাহাদের তাঁতে অন্যান্য তাঁতিরা কাজ করিতে পারে না। যোগীদের তাঁত বড় ভারী এবং অন্য তাঁতিদের পক্ষে তাহাতে কাজ চালান বড়ই কষ্টকর।

তাঁত বুনিয়া যখন তাহদের উদরপূর্ত্তির অসুবিধা হইতে লাগিল, তখন তাহারা অন্য ব্যবসায়ও গ্রহণ করিল। আজকাল গত্যন্তর না দেখিয়া যোগীদের মধ্যে অনেকে লাঙ্গল চালায়, অনেকে আবার চাকরীও করে। যোগী-দের মধ্যে যাহারা পানের কাজ করে, তাহাদের 'পানাতি যোগী' বলে। যাহারা চুনের ব্যবসায় করে, তাহাদের নাম 'চুনো' বা 'চুনাতি যোগী'। বরাবর ইহারা গামছা ও মোটা কাপড় বুনিয়া খাইত। এখন ইহাদের প্রধান ব্যবসায় —কৃষি ও বস্ত্র বয়ন। রংপুরে চুনাতি বা পানাতি যোগীই বেশী। রংপুরের গোবিন্দগঞ্জে অন্যান্য ব্যবসায়ী যোগীর সংখ্যার আধিক্য। জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার, ত্রিপুরা অঞ্চলের কতক লোক 'চুনো যোগী'। অপর যোগীরা চুনোযোগীদের সঙ্গে জলপূর্ণ হুঁকায় তামাক পর্য্যন্ত খায় না; আজকাল তাহাদিগকে একজাতি বলিয়াও মানিতে চায় না। কিন্তু চুনোযোগীরা শিবগোত্র বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়, দশ দিন অশৌচ পালন করে, মৃতদেহ সমাধিস্থও করিয়া থাকে। ময়নামতী, মাণিকচাঁদ ও গোপীচন্দ্রের গান ইহারা ছাড়া আর কেহ গায় না। ত্রিপুরা প্রদেশে এইরূপ অনেক যোগী চুন পোড়ায়, অনেকে আবার স্বর্ণকারের ব্যবসাও খুলিয়াছে। যোগীদের যাহারা কৃষি করে, তাহারা যোগীদের সমাজেও হেয়। তাদের নাম 'হালওয়া যোগী'।

সকল যোগীদের সাধারণ উপাধি বা নাম—নাথ। যোগীরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখে। বিদ্যাশিক্ষার যে কিঞ্চিৎ মূল্য আছে, তাহা এখন তাহারা বুঝিয়াছে। পূর্ব্বে যোগীর ছেলের লেখা পড়া শেখার অনেক বাধা ছিল; হিন্দুর ছেলে তাহাদের সঙ্গে একত্র থাকিতে বা পড়িতে চাহিত না। এখন আর সে দিন নাই। দারিদ্র্য-বশতঃ উচ্চশিক্ষায় প্রায় বঞ্চিত হইলেও যোগীদের মধ্যে ৩০০০এরও অধিক গ্রাজুয়েট আছে। চট্টগ্রামে অন্যূন ৬০,০০০ যোগীর মধ্যে ২০ জনও শিক্ষিত নয়। উত্তরবঙ্গে একটিও যোগী আজ পর্য্যন্ত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

যোগীরা তাহাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। মৃতের সমাধিতে সকল যোগীই একরূপ অনুষ্ঠান করে। চক্রাকারে আট ফুট গভীর করিয়া তাহাদের সমাধি খনন করা হয়। তলদেশে শবের অবস্থানের জন্য একটি কুলুঙ্গি কাটা হয়। প্রথমে সাত কলসী জলে মৃতদেহ ধুইয়া, নূতন বস্ত্র দিয়া আবৃত করা হয়। এটি যে মুসলমানের প্রথা নয়, এই বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রাখিবার জন্য ওষ্ঠাধরে অগ্নিস্পর্শ করান হয়। শবের গলদেশে তুলসীমালা পরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে একটি জপমালা দেওয়া হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুড়িয়া দিয়া, দক্ষিণ হস্ত বক্ষের উপরে রাখা হয়

এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঐরূপে মুড়িয়া বাম হস্ত উৎসঙ্গের উপর রক্ষিত হয়। মৃতদেহ পায়ের উপর পা দিয়া আসীন অবস্থায় রাখা হইয়া থাকে। একটি থলির ভিতর চারি কড়া কড়ি দিয়া থলিটি স্কন্ধের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। সমাধির খোলের ভিতর মৃতদেহ উত্তর-পূর্ব্ব-মুখ করিয়া বসাইয়া, সমাধি মৃত্তিকাবৃত করা হয়। সমাধির উপর একখানি বড় মৃন্ময় থালায় তণ্ডুল, কদলী, চিনি, ঘৃত ও সুপারি রাখা হয়। হুঁকা ও কলিকা আর তার সঙ্গে কিছু তামাক, কিছু কাঠ-কয়লাও দেওয়া হয়। সকলের শেষে তিনকড়া, কি সাতকড়া কড়ি মৃতদেহের অধিকৃত স্থানের মূল্যস্বরূপ জমীর উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকদের সমাধি ঠিক পুরুষদের মতই হয়।

মৃতদেহের সঙ্গে যে কড়ি দেওয়া হয়, যোগীদের বিশ্বাস, তাহা বৈতরণী পারের জন্য মৃত ব্যক্তির খেয়া পারের মূল্য। মৃতদেহকে উত্তরপূর্ব্বমুখী করিয়া উপবেশন করাইবার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবীর উত্তরপূর্ব্ব দিকে কৈলাস অবস্থিত।* ১৮৮৩ সালে ডাক্তার ওয়াইজ মৃতের সংকার-পদ্ধতি এইরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর সকল জায়গার রীতিও একরূপ নয়।

যদিও সকল যোগীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উল্লিখিত প্রকারেই হয়, তথাপি তাহাদের মধ্যে দুইটি বিভাগ থাকায় শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বিধি কিঞ্চিৎ পৃথক্। যোগীদের মধ্যে এক ভাগ মাস্য যোগী—ইহারা মাসান্তে মৃতের শ্রাদ্ধ করে। অপর ভাগ একাদশী যোগী—একাদশ দিবসে ইহাদের শ্রাদ্ধ-কার্য্য হইয়া থাকে। ঢাকায় মাস্য যোগীর সংখ্যা অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা অধিক। বিক্রমপুরের দক্ষিণাঞ্চলে, ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে অনেক মাস্য যোগী আছে। বিক্রমপুরের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা জেলার সর্ব্বত্র একাদশী যোগীর বাস। এই দুই যোগীদের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাহ নাই এবং ইহারা পরস্পরের অন্ন ভোজন করে না। তবে ইহারা পরস্পরের পানপাত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গে এক পুরোহিত-বংশ আপনাদিগকে যোগীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের গোত্র কিন্তু যোগীর গোত্র। ইহারা যোগীই ছিল। কালে নিজেদের আলাদা করিয়া লইয়াছে। গোত্রটুকু পর্য্যন্ত এখন বদলাইয়াছে।

মাস্য যোগীদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। তাহাদের এই কাজ অধিকারী দ্বারাই সম্পন্ন হয়। অধিকারীরা পুরোহিতদিগের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হয়। অধিকারীরা উপবীত ধারণ করে এবং আপনাদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। ত্রিপুরা ও নোয়াখালির অধিকারীরা এখনও উপবীতধারী। কিন্তু ঢাকার অধিকারীরা ৪২।৪৩ বৎসর পূর্ব্বে উপবীত ত্যাগ করিয়াছে। সম্প্রতি কেহ কেহ আবার উপবীত গ্রহণ করিয়াছে।

ফরিদপুর ও বরিশালের অধিকারীরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু এদিকে যোগীর কন্যাও বিবাহ করেন।

একাদশী যোগীদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। ইহাদের বর্ণশ্রমণ বলা হয়। এই বর্ণশ্রমণেরা মহাত্মা নামে অভিহিত। মহাত্মারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ঔরসে যোগী স্ত্রীর গর্ভজাত পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। ডক্টর ওয়াইজ (Dr. Wise) ১৮৮৩ সালে কেবল বিক্রমপুরেই শতসংখ্যক এই যোগীর ব্রাহ্মণ গণনা করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে, ঢাকার বুড়াশিবের মন্দিরে, মেঘনার বারুণী উৎসবে, সাগরের কপিল মুনির আশ্রমে এই যোগীর ব্রাহ্মণেরা বহুদিন হইতেই 'মহান্ত' হইয়া আসিতেছেন।

শিবরাত্রি মাস্য যোগীদের প্রধান উৎসব। কিন্তু তাহারা জন্মাষ্টমীও পালন করে। বটবৃক্ষতলে ইহারা সিদ্ধেশ্বরীদেবীর পূজা করে, বলিও দিয়া থাকে। ইহারা সকল কার্য্যে যজ্ঞডুমুর ব্যবহার করে। বট, তুলসী, তমাল ইহাদের নিকট নিতান্ত পবিত্র। বৃন্দাবন, মথুরা ও গোকুল

* ডাক্তার ওয়াইজ লিখিত বিবরণ হইতে, আমি কিছু কিছু সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি। এই মনীষিলিখিত যোগী সম্বন্ধীয় উক্তির চৌদ্দ আনা অংশ গ্রহণ করিয়া রিজলী সাহেব তাঁহার নাম না করিয়াই কয়েকটি শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের Tribes and Castes of Bengal পুস্তকে বসাইয়া দিয়াছেন। রিজলীর গ্রন্থ ৩৮৮-৩৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহাদের তীর্থমধ্যে গণ্য। এই সকল পুণ্যক্ষেত্র তাহাদের নিকট "থান" নামে পরিচিত। বারাণসী, গয়া এবং সীতাকুণ্ডও তাহাদের প্রধান তীর্থ।

একাদশী যোগীরা "বৃদ্ধশাতাতপীয় সংহিতা" ও "চন্দ্রাদিত্য পরমাগমসংহিতাকে" আপনাদের শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া থাকে। ইহাদের শাস্ত্র মৃতকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা দেয়; কিন্তু পুত্র বা পৌত্রকে মৃতের মুখাগ্নি করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। একাদশী যোগীরা ব্রাহ্মণ বিধবা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকে। একাদশ দিনে তাহাদের অশৌচান্ত হয়। কিন্তু তাহারা উপবীত ধারণ করে না। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষ্ণোপাসক, কেহ কেহ শক্তিরও উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব যোগীরও সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

যোগিজাতি আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি বিবরণ দিয়া থাকে—তাহারা বলে, বারাণসীর এক সন্ন্যাসী অবধূতের দুই পুত্র হয়; এই অবধূত শিব-বতার; অবধূতের জ্যেষ্ঠ পুত্র, এক ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভে এবং কনিষ্ঠ পুত্র এক বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হয়; অবধূতের জ্যেষ্ঠ পুত্রই একাদশী যোগীদিগের পূর্ব্বপুরুষ এবং কনিষ্ঠপুত্র মাস্য যোগীদিগের পূর্ব্বপুরুষ। ডাক্তার ওয়াইজ বলেন, একাদশী ও মাস্য যোগীদের অশৌচান্তের সময়ের পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই এই আখ্যায়িকাটি কল্পিত হইয়াছে।

জাতযোগী

এই শ্রেণীর যোগীরা হিন্দুস্থানী, ভবঘুরে। ইহাদিগকে "মদারি," "তুবড়ীওয়ালা" বা "সন্যা" নামে পরিচিত করা হয়। ইহারা বাঁশী বাজাইয়া, সাপ খেলাইয়া বেড়ায়। ইহারা প্রায়ই গোরক্ষপুরের নিকট গোরখনাথের সন্নিধানে দুই প্রসিদ্ধ উৎসব দেখিয়া ঢাকায় ও অন্যান্য স্থানে গমন করে। সাপুড়িয়াগিরি করিয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়ানই ইহাদের কাজ। পূর্ব্বে কুৎসিত আচরণ দ্বারা লোকদের উৎপীড়িত করিত। ইহারা গলায় নানারকমের মালা ও কানে পিতলের ভারি আভরণ পরে। এই কর্ণাভরণকে তাহারা 'গোরখনাথ কা মুন্দ্রা' বলে। ইহারা দিল্লী ও মীরাটের অধিবাসী। এই-সকল স্থানে ইহারা 'জাতযোগী' বলিয়া পরিচিত। জাতযোগীরা প্রায়ই বিবাহ করে। সাপুড়িয়াগিরিতে ইহাদের পত্নীরা সহায়তা করিয়া থাকে। ইহারা দীর্ঘাকার, সুন্দর ও পরিশ্রমী, কিন্তু ইহাদের বসনভূষণ অত্যন্ত মলিন, বৃত্তিও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল। এই-সকল জাতযোগীদের সঙ্গে 'কানফট' যোগীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উভয় শ্রেণীর যোগীই একরূপ আভরণ ব্যবহার করে এবং উভয় শ্রেণীর যোগীই আচরণে শৈব না হইলেও শৈবধর্ম্মের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে 'শৈব' নামে পরিচিত করে।

সন্ন্যাসী যোগী

সন্ন্যাসী যোগীরা সকলেই গোরক্ষপন্থী; শৈব বলিয়াও নিজেদের পরিচয় দেয়। কানফট যোগীরাও তাই। কিন্তু কানফটযোগীরা গোরখনাথকে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করে না। তাহাদের মতে গোরখনাথ ঐ সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করিয়াছেন মাত্র। ইহাদের মূল সম্প্রদায় গোরখনাথের বহুপূর্ব্বে ছিল। ইতালীয় পণ্ডিত তেসিতরি রংপুর জেলায় প্রচলিত একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহারা পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত ছিল, তবে পানাসক্ত হইয়া গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে গোরখনাথ একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীরা কতকটা স্বধর্ম্মত্যাগী শাসনকর্ত্তাদের অধীনে পড়িয়া এবং কতকটা রাজানুগ্রহ লাভ করিবার জন্য শৈবধর্ম্ম অবলম্বন করায় ধর্ম্মবিষয়ে অপরাধী হইয়াছিল। এই যোগীদের সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। তেসিতরির মতে, ইহারা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল হইতে আসিয়াছিল এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তির সময়েও ইহারা বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইতে থাকে, সেই সময়েই এই সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবশালী ছিল, তখন যোগীরাও বৌদ্ধপ্রভাবের অধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং গোরখনাথই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে উহাদিগকে সংগ্রহ করেন এবং উপনিষদের মূলনীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উহাদিগকে লইয়া এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। গোরখনাথ শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ পরবর্ত্তী নহেন। তিনি যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রভাবে পড়িয়া কার্য্য

করিয়াছিলেন, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। এই যোগিসম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্যও যে কি, তাহা তাহাদিগের নিজেদের মধ্যে যাহারা বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাহারাও একরূপ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহাদিগের সম্প্রদায়ের মূল নীতিসকল এখন সাধারণের পক্ষে জানিবার উপায় নাই। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত কি, উপাসনা কিরূপ, তাহা সাধারণকে বোঝান যায় না। প্রথমতঃ ইহাদের তত্ত্বের পরিভাষা লইয়াই গোলমাল। একস্থানের নাথ যোগীদের পরিভাষা বা ব্যাখ্যা অন্য এক স্থানের পরিভাষা বা ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুরূপ নয়। কোথাও ঐক্য থাকে, আবার কোথাও অনৈক্য। এরূপ হইবার কারণ কি? পূর্ব্বে সংজ্ঞা ও পরিভাষা একরূপই ছিল। বিভিন্ন সময়ের নাথগুরুরা প্রয়োজন-মত একটু-আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তার পর মাঝে কবীর-পন্থী ও নানকপন্থীদের সময়ে অনেক মত নাথ যোগীদের ভিতর প্রবেশ করে। অন্যদিকে নাথদের অনেক মত উহারাও গ্রহণ করে। এখন যে নাথ-মত চলিতেছে, তাহার সঙ্গে আসল নাথ-মতের সম্বন্ধ খুব বেশী, এ কথা বলা যায় না। উত্তর, পূর্ব্ব- ও পশ্চিম-ভারতের নানা শ্রেণীর নাথদের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, খাঁটী নাথ-মত অর্দ্ধেকেরও বেশী লোপ পাইয়াছে। তবে সুবিধার মধ্যে এই যে, দু'পাঁচখানি প্রাচীন বই এখনও আছে। তবে সেগুলির মধ্যে যে কেহই লেখনী সঞ্চালন করেন নাই, একথা হলপ করিয়া বলিতে পারা যায় না।

জৈনকবি বানারসিদাসের ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক "গোরক্ষ-নাথকে বচন", "গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী", "কুলাঙ্গিপটল", "যোগসার", "যোগান্ত আগমসার", "ব্রহ্মবোধ", পুণ্যনাথ-রচিত "অর্জ্জুনগীতা" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নাথদের মূলনীতি সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। এগুলি হইতে এইটুকুই জানা যায় যে, শিব তাহাদের পরমেশ্বর এবং তাহাদের মতে শিবের সহিত এক হওয়াই জীবের মুক্তি। তবে এই মুক্তি যোগের দ্বারা সাধিত হয়। স্বর্গীয় পণ্ডিত তেসিতরি এবং স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন্ যোধপুর দরবারের বাণীভাণ্ডারের 'গোরখবোধ' নামে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখকও তাহা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। গ্রন্থখানি প্রাচীন হিন্দী ভাষায় লিখিত—চতুর্দ্দশ শতকের বলিয়া বিবৃত। ইহা গদ্যপদ্যে লিখিত। গোরখনাথ ও গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রশ্নোত্তররূপে কথোপকথন হিসাবে এই পুঁথিখানি ৬০ শ্লোকে সমাপ্ত। সকল জায়গা পড়িয়া অর্থবোধ করাও কঠিন। তেসিতরি গোরখবোধ পাঠ করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ - কানফট যোগিসম্প্রদায়ের মূলনীতিতে শৈব ও যোগতত্ত্ব সম্মিলিত। মাধবাচার্য্যের শৈবসম্প্রদায়ের মত হইতে ইহার পার্থক্য দেখা গেলেও মাধবাচার্য্যের মতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, একথা বলা যাইতে পারে। পতঞ্জলির যোগতত্ত্ব ও উপনিষদের যোগতত্ত্বের সহিত যে ইহাদের যোগতত্ত্বের নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা চক্র, কৌশল, নাল (ধমনী, arteries), পবন ও হংস (শ্বাস, breaths) প্রভৃতির ব্যবহারে ও তত্ত্বে এইগুলির সাধারণ অনুশীলন হইতে বুঝিতে পারা যায়।

গোরখবোধের মতে পবন নাভিচক্রে অধিষ্ঠিত এবং সর্ব্বব্যাপী শূন্য ইহার প্রতিষ্ঠা। পবন অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত মনকে অনুপ্রাণিত করে। আকাশে অবস্থিত চন্দ্র মনের উপর প্রভাববিশিষ্ট। পবন সূর্য্যের প্রভাবের অধীন, এবং শূন্য কালের প্রভাবাধীন। একটি ভূত (element) আছে —তাহা শব্দরূপে অধিষ্ঠিত। অন্তঃকরণ, নাভি, রূপ ও আকাশের উৎপত্তির পূর্ব্বে মন শূন্যে অবস্থিত ছিল, প্রাণবায়ু বা পবন নিরাকার ছিল, শব্দেরও কোন রূপ ছিল না এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে চন্দ্র অবস্থিত ছিল। শূন্য চারি প্রকার—সহজ, অনুভব, পরম এবং অতীত শূন্য। নিদ্রাকালে বা মৃত্যুতে প্রাণ এই শূন্যেই চলিয়া যায়। পাঁচটি তত্ত্ব আছে, তন্মধ্যে বোধ হয় নির্ব্বাণ একটি। দশটি দ্বার বা পূর্ণতা (perfection) প্রাপ্তির উপায় আছে। সেগুলির নাম লিখিত হয় নাই।

একমাস পূর্ব্বে যোধপুর দরবার বাণীভাণ্ডারে 'গোরখ-বোধের' অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই গ্রন্থখানি আর বাণীভাণ্ডারে নাই। বহু অনুসন্ধানে আর-একখানি 'গোরখবোধের' সন্ধান পাইয়া, তাহা আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গোরখবোধ কি? মহাদেবের অংশবিশেষ গোরখনাথ মচ্ছেন্দ্রনাথকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। মচ্ছেন্দ্রনাথ তাঁহার সেই প্রশ্নগুলির প্রত্যুত্তর দেন। এই প্রশ্নোত্তর-মূলক সংবাদই—'গোরখবোধ'।

প্রথম প্রশ্ন,—মন কি? মৎস্যেন্দ্রনাথের উত্তর—মন চঞ্চল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছু গতিশীল, তৎসর্ব্বাপেক্ষা মন চঞ্চল। বোধ হয়, মৎস্যেন্দ্রনাথ অন্য কোনও ভাবে মনকে বুঝাইতে না পারিয়া একটি বিশেষণের সাহায্যে মনকে বুঝাইয়াছেন। বিদ্যুৎ যে এত চঞ্চল, মন তাহা অপেক্ষাও চঞ্চল; সুতরাং 'চঞ্চল' এই বিশেষণ মনের প্রতি প্রযোজ্য। মন কি? না, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল, তাহাই মন। দ্বিতীয় প্রশ্ন,—মন কোথায় থাকে? মৎস্যেন্দ্রনাথের উত্তর—জীবহৃদয়ে মনের বাস। কিন্তু যতদিন দেহ ততদিনই হৃদয়। দেহের অভাবে হৃদয়ের অভাব হয়। তখন মন কোথায় অবস্থিতি করে? মৎস্যেন্দ্র বলেন,—হৃদয়াভাবে মন অনুপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে। ব্রহ্মের উপমা নাই বলিয়া তিনি ব্রহ্মের বিশেষণ 'অনুপ' করিয়াছেন।

মৎস্যেন্দ্র বলিয়াছেন—পবন মনের জীবনস্বরূপ।

পবনের দুই প্রকার অবস্থা আমরা নিরীক্ষণ করি। এক অবস্থায় পবন স্থির, শান্ত; আর-এক অবস্থায় পবন অত্যন্ত চঞ্চল। পবন কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না এবং চাঞ্চল্য ব্যতীত পবন কখনও অনুভূত হয় না। মৎস্যেন্দ্রের মতে এই পবনই মনের জীবনস্বরূপ। এখন প্রশ্ন হইতেছে—পবন কি? মৎস্যেন্দ্রের উত্তর—পবন সন্ধি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল পবন। শ্বাস-প্রশ্বাসেই জীবন, শ্বাস প্রশ্বাস পবনের সাহায্যেই হয়। যাহা জীবনের শেষ ও মৃত্যুর আরম্ভ, তাহাই জীবন-মৃত্যুর সন্ধি। শ্বাস-প্রশ্বাসে জীবন, কিন্তু নাভিশ্বাসে মৃত্যু। প্রাণি-শরীরে বায়ু যেমন অবস্থা-বিশেষে জীবের জীবন, ইহা আবার অবস্থাবিশেষে মৃত্যুর কারণ। এই যুক্তিতে বায়ুকে (জীবন-মৃত্যুর) সন্ধি বলা যাইতে পারে। কিন্তু নাভি-মূল পরিত্যাগ করিয়া পবন কোথায় যায়? শরীরস্থ পবন নাভিতেই অবস্থিতি করে। নাভিমূল পরিত্যাগ করিয়া পবন আদিত্যহৃদয়রূপ নিরঞ্জনে অবস্থান করে।

পবনের উৎপত্তি শব্দ হইতে। শব্দ ওঁকারধ্বনি। স্থিরবায়ু ওঁকারধ্বনি হইতে উৎপন্ন। আকাশ স্পন্দিত হইয়াই ধ্বনির উদ্ভব হয়। জগৎ স্পন্দনসম্ভূত। স্পন্দন স্থগিত হইলে কিছু থাকে না, প্রথম স্পন্দনেই শব্দ সম্ভূত হয়। সে স্পন্দন অতি সূক্ষ্ম। স্পন্দন যখন অপেক্ষাকৃত স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা পবনাকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বায়ুর উৎপত্তি- ও লয়-স্থান নাদ। কিন্তু নাভিমূল পরিত্যাগ করিয়া পবন আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করে।

মৎস্যেন্দ্রনাথ দেখিতেছেন—পবনই সব। জগতের সকল চাঞ্চল্যের একমাত্র আদর্শ পবন। শব্দও চাঞ্চল্য-সম্ভূত; সুতরাং পবনেরই অবস্থা-বিশেষ। মৎস্যেন্দ্রের সিদ্ধান্ত সবই মূলে এক; এবং একেরই অবস্থান্তরে নামান্তর হয়। সুতরাং মৎস্যেন্দ্র স্থিরবায়ুকে মাতা স্বরূপ ব্রহ্ম বলিতেছেন। তাই তাঁহার মতে বায়ু স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে, অর্থাৎ পবনের ব্রহ্মে লয় হয়। ইহাকে ক্রিয়ার পরাবস্থা বলে; কারণ, ক্রিয়া চাঞ্চল্যেরই নামান্তর।

চঞ্চল মন যখন স্থির হইয়া শূন্যে থাকে, তখন ওঁকারধ্বনি শ্রুত হয়। ওঁকারধ্বনি শব্দের পরাবস্থা। মনের চঞ্চল অবস্থায় সে ধ্বনি শোনা যায় না। ওঁকার-ধ্বনি হইতে জগতের উৎপত্তি। যখন সকলই স্থির থাকে, তখন সমস্তই মহাশূন্যে বিলীন থাকে। কিন্তু সেই মহাশূন্যে যখন স্পন্দন সম্ভূত হয়, তখনই জগতের সৃষ্টি হয়। আকাশের স্পন্দন হইলেই শব্দ সম্ভূত হয়, সেই শব্দই ওঁকারনাদ। মহাব্যোমে এই ওঁকারনাদ অনবরতই হইতেছে। মনের চাঞ্চল্যের বিরাম হইলে প্রথমে ভৃঙ্গ, বেণু, বীণাসদৃশ ধ্বনি, পরে ঘণ্টানাদ এবং মেঘরব, শঙ্খ, কাঁশর, ঝাঁজ, ডফ ও সিংহনাদ এই দশপ্রকার অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

মৎস্যেন্দ্র প্রাণকে শব্দের উৎপত্তিস্থল বলিয়াছেন। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, তাঁহার মতে প্রাণই স্থির বায়ু। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরস্থ পঞ্চবায়ু যখন পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করে, তখন প্রাণসম্ভব হয়। শরীরস্থ এক বা একাধিক বায়ুর বৈষম্যবশতঃ স্বাস্থ্যহানি হয়। জগতের কিছুই স্থির থাকে না এবং থাকিতেও পারে

না, সকলই চঞ্চল। আমাদের মনও চঞ্চল। কিন্তু অনেক সময় আমাদের স্থিরভাব অনুভূত হয়। যখন বাস্তবিক কিছুই স্থির নয়, অথচ আমরা স্থিরত্ব অনুভব করি কেন? ইহার কারণ, সামঞ্জস্যই স্থিরত্ব। এই স্থিরত্বই চাঞ্চল্যের রূপান্তর বা অবস্থান্তর। আমাদের সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায়ও শরীরের সকল পরমাণু চঞ্চল থাকে, কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরিক কোন চাঞ্চল্যই অনুভূত হয় না। শরীরস্থ পরমাণু-সকলের কার্য্যের সামঞ্জস্য থাকিলে তাহাদের চাঞ্চল্য অনুভব করা যায় না। সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইলে, এই শরীরই আমাদের পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। প্রাণ বলিতে শুধু দেহের প্রাণ বুঝায় না। জগতেরও একটা প্রাণ আছে। যোগী বলেন,—স্থিরবায়ুই সেই প্রাণ। যে অবস্থায় বায়ুর গতি সর্ব্বাপেক্ষা সমতা প্রাপ্ত হয় এবং বায়ুর কার্য্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, সেই অবস্থায় বায়ুই জগতের প্রাণস্বরূপে অবস্থান করে।

মৎস্যেন্দ্র বলেন, প্রাণ না থাকিলে শব্দ শোনা যায় না। সুতরাং প্রাণ শব্দের জীবন। ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থাতে এই প্রাণাগ্নি সকল কর্ম্মকে দগ্ধ করে।

যখন সকল ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়, এবং সকল চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়, তখন একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছুই থাকে না। তখন জল যেমন জলে মিশাইয়া যায়, সেইরূপ অবিনাশী জীব ব্রহ্মে বিলীন হয়। যখন ব্রহ্মাণ্ড থাকে, তখন ব্রহ্মের স্থিতি ব্রহ্মাণ্ডে। চাঞ্চল্য বিদূরিত হইলে ব্রহ্মাণ্ডের অভাবে ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন।

এইরূপে মৎস্যেন্দ্র যে-সকল তত্ত্বের বিষয় বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

হৃদয় না থাকিলে, মন অরূপে থাকিত। নাভি না থাকিলে, পবন নিরঞ্জনে থাকিত। অনহদ না থাকিলে, শব্দ অরূপে থাকিত। নিরঞ্জন না থাকিলে, ব্রহ্ম অবিনাশীতে থাকিতেন। ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলে, ব্রহ্ম জ্যোতি-স্বরূপে থাকিতেন। গগন না থাকিলে, হংস অবিনাশীতে থাকিত। অনুপ না থাকিলে, শূন্য ওঁকারে থাকিত। কমল না থাকিলে, কাল শূন্যে থাকিত। কাল না থাকিলে, জীব শিবে থাকিত। চন্দ্র না থাকিলে, শিব নিরঞ্জনে থাকিতেন। সুষুম্না না থাকিলে, নিরঞ্জন ব্রহ্মে থাকিতেন।

মনের জীব পবন। পবনের জীব সংন্যাস। সংন্যাসের জীব শব্দ। শব্দের জীব প্রাণ। প্রাণের জীব ব্রহ্ম। ব্রহ্মের জীব হংস, হংসের জীব অবিনাশী। অবিনাশীর জীব শূন্য। শূন্যের জীব অনুপ। অনুপের জীব কাল। কালের জীব—জীব। শিবের জীব নিরঞ্জন। নিরঞ্জনের জীব—এক ব্রহ্ম।

নিরঞ্জন অনিল হইতে উৎপন্ন। শিব নিরঞ্জন হইতে উৎপন্ন। কাল শিব হইতে উৎপন্ন। ওঁকার কাল হইতে উৎপন্ন। শূন্য ওঁকার হইতে উৎপন্ন। হংস শূন্য হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম হংস হইতে উৎপন্ন। প্রাণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। পবন শব্দ হইতে উৎপন্ন। শ্বাস পবন হইতে উৎপন্ন। মন শ্বাস হইতে উৎপন্ন।

তনুত্যাগ হইলে, মন পবনে মিশিয়া যায়, পবন শব্দে মিশিয়া যায়, শব্দ প্রাণে মিশিয়া যায়, প্রাণ ব্রহ্মে মিশিয়া যায়, ব্রহ্ম হংসে মিশিয়া যায়। হংস সুরতিতে মিশে। শূন্য ওঁকারে মিশে। ওঁকার কালে মিশে। কাল জীবে মিশে। জীব শিবে মিশে। শিব নিরঞ্জনে মিশে। নিরঞ্জন আপে মিশে। আপ আপে মিশে।

এই গোরখবোধের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত গোরখবোধের কিছু পার্থক্য আছে। থাকিবার কারণ, বোধ হয় কবীর-পন্থীদের একটু আধটু মত ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের কানফট যোগীরা অল্পাধিক সংখ্যায় ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। সকল জায়গায় এই যোগীদের আচার প্রায় একই রূপ। ইহাদের মধ্যে জাতিবিচার নাই। ইহারা হিন্দুর অভক্ষ্য মাংস ব্যতীত প্রায় সকল মাংসই খায়। মদ্য ও অহিফেনের সেবা ইহাদের মধ্যে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যাহারা সংসারী, তাহারা টাকা ধার দেয়, তাঁত বোনে, চাষ করে। কেহ ফিরি করিয়া বেড়ায়, কেহ বা সৈনিকের কার্য্য করে। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা গাথা বা ধর্ম্মগীতি গাহিয়া জীবন যাপন করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহারা ছেলেদের রোগ সারাইতে পারে এবং

কুদৃষ্টি হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইবার শক্তি ইহাদের আছে। ইহাদের মধ্যে প্রায়ই সকলে বিবাহ করে। যাহারা ভিক্ষাজীবী, তাহারা গায়ে ছাই মাখে, কটিবস্ত্র পরিধান করিয়া, তাহার উপর একটি গেরুয়া বহির্বাস পরে। গলায় 'শেলি' নামক পশমী হার জড়ায় এবং সেই হারে 'নাদ' নামক একটি শিঙ্গাবাঁশী বাঁধিয়া দেয়। কাঁধে ঝুলি এবং দক্ষিণ হস্তে ভিক্ষা লইবার জন্য ফাঁপা অলাবুপাত্র থাকে।

বারান্তরে নাথদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সঙ্গীতে স্বরসন্ধি বা হার্ম্মনি

ভারতের সঙ্গীত, সাধনারই একটা অঙ্গ-বিশেষ। আমাদের রাগরাগিণীর যে রূপ, তাহা কোন বিশেষ দেশ কাল বা পাত্রগত নহে, তাহা চিরন্তন ও সমগ্র বিশ্বের বিভব। ইহা শাশ্বত, সম্পূর্ণ বস্তু, ইহার উপর সংস্কারকের হস্তার্পণের স্থান নাই।

যে দেশে যুগের পর যুগ অনন্তের ধ্যানে দিন কাটিয়াছে সেখানে এতাবৎ সঙ্গীতের এই রাগিণীর রাজ্য অতিক্রম করিবার প্রয়োজন হয় নাই। আজ ভারতের জীবনের ধারায় বিচিত্র নূতন স্রোত আসিয়াছে,—তাহার হৃদয়ের ব্যথার ব্যঞ্জনা একমাত্র রাগিণীতে আর কুলায় না, প্রকাশের অভিনব পথ অন্বেষণে আজ সে ব্যাকুল। কোথায় সে পথ? ভূমার আহ্বানে যার চিত্ত আজ জাগিয়াছে, সঙ্গীতের কোন্ সুরে সে তার সাড়া দিবে?

ভারতের স্থবির জীবনে সঙ্গীতের যে বিকাশ হইয়াছিল তাহা melodyর দিক দিয়া। বাহিরের চাঞ্চল্য আজ তাহাকে গতির স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে, সে এই সঙ্গীতের গতিসুলভ বস্তুটি গ্রহণ করিবে কি না? বহু সুরের সঙ্গতিকে—হার্ম্মনিকে—তাহার গানের আসরে স্থান দিবে কি না?

এই বিদেশিনী হার্ম্মনির কাছে আমাদের রাগরাগিণীর কোনও আশঙ্কা নাই। যাহা সনাতন, যাহা অখিল জগতের, তাহার বিনাশ হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের এই দীনহীন রিক্ত জীবনে ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তিরও যে প্রয়োজন রহিয়াছে। পাশ্চাত্যের গতিশীল উদ্দাম জীবনে সঙ্গীতের যে প্রাণময় চঞ্চল রূপের বিকাশ হইয়াছে, তাহার সাহায্যে কি আমাদের লুপ্ত প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়? বিচিত্র স্বরের সঙ্গমে যদি এমন রসায়নের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা সর্ব্বদেশের মানবেরই উপভোগ্য, তবে তাহাকে শুধু প্রতীচ্য বলি কেন? তাহা সমগ্র মানবজাতির, সুতরাং আমাদেরও বটে। তবে কি এই সন্ধিঘটিত নব সঙ্গীতে রাগিণীর ছায়ামাত্র থাকিবে না? তাহা বোধ হয় সত্য নয়। ইহাতে ভারতীয় ছাপ থাকা চাই। এই রাগরাগিণীকেই হার্ম্মনিতে ঘিরিয়া পুষ্পিত-পল্লবিত করিতে হইবে। তবে এই harmonic chordএর চাপে আসল গানের সুরের যেন শ্বাসরোধ না হয়। Hass music যেন প্রধান সুরের—আপাততঃ two-part counter-point ধরিতেছি—একটা অলঙ্কার মাত্র থাকে, অথচ এই দুইএর অখণ্ড ধারার মধ্যে যেন ভাবের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে।

এরূপ রচনা সহজ নয়। তানসেনের একজন যুগ-সংস্করণ চাই। কোথায় তিনি? আমাদের কলা-সাধকদের মধ্যে একজনও কি নাই, যিনি এই ব্রতে ব্রতী হয়েন?*

পঞ্চানন দাস

* কিছুদিন পূর্ব্বে Statesman কাগজে লেখক কর্ত্তৃক এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, প্রফেসার সাল্রে, মিসেস্ এভারেট্ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই বিচারে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বিচার অবলম্বনে প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

'রেনি ডে'

সেদিন 'রেনি ডে'। বোধ করি স্কুল-কামাই-প্রিয় ছেলেদের ঐকান্তিক প্রার্থনার ফলে আকাশখানি হঠাৎ চৌচির হয়ে ফেটে সারা বর্ষার ধারাগুলো ঠিক দশটা থেকে ঝম্ ঝম্ করে' পড়্‌ছিল, এবং ছেলের দল হেড্‌-মাষ্টারের ঘরের সমুখে ছুটির জন্য মহা কোলাহল সুরু করেছিল। হেড্‌-মাষ্টার প্রথমটা তাদের কাপড় পরীক্ষা করে' ছাড়্‌তে লাগলেন। যাদের কাপড় ভিজে গিয়েছিল তারা মহা হল্লা করে' বাড়ী পানে ছুট্‌ল, ফলে যাদের কাপড় শুক্‌নো ছিল তারাও চট্ করে' স্কুলের চাতালের বাইরে খোলা মাঠটিতে দাঁড়িয়ে ভিজে দ্বিতীয়বার ছুটির জন্য এল জলে টস্‌টসে ভিজে কাপড়ে। কয়েকজন ফাঁকি দিয়ে ছুটিও পেলে কিন্তু একজনকে ধরে' ফেলে হেড্‌-মাষ্টার এমনি চটে' উঠ্‌লেন যে তাঁর মূর্ত্তি দেখে সবাই বুঝে নিলে যে বাইরের দুর্যোগের চেয়েও বেশী দুর্য্যোগের সূত্রপাত হ'ল স্কুলের ভিতর। হেড্‌-মাষ্টার ব্ল্যাক্‌বুকের জন্য দপ্তরীকে হাঁক ডাক সুরু কর্‌লেন এবং তাকে না পেয়ে নিজেই সেখানা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেন। ব্ল্যাক্‌বুক যখন মিল্‌ল তখন অপরাধী ছেলেটি হেড্‌-মাষ্টারের সমুখ কেন, স্কুল-কম্পাউণ্ডের ত্রিসীমানা পার হয়ে গিয়েছিল এবং যাবার আগে পলিটিক্সের একটি শ্রেষ্ঠ চাল দিতে ভোলে নি—তা ঢং ঢং করে' গেটের সাম্‌নের বড় ঘণ্টাটি বাজিয়ে যাওয়া! ঐ ঘণ্টাটির ঐরকম আওয়াজের সদর্থ লাষ্ট ক্লাশের ছেলেটির কাছেও অজ্ঞাত ছিল না, তারা বই বগল-চাপা করে' হৈ হৈ শব্দে বেরিয়ে পড়্‌ল পঙ্গপালের মতন, হেড্‌-মাষ্টারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সেই হল্লা ভেদ করে' কারু কানেই পৌঁছাল না।

হেড্‌-মাষ্টার লোকটি ডিস্পেপ্‌টিক্। শুক্‌নো খড়ের মত দপ্ করে' জ্বলে' ওঠা তাঁর রোগের একটি প্রধান লক্ষণ এবং সেই সঙ্গে তাঁর একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ছেলেদের নাম মনে না রাখার। কাজেই ব্ল্যাক্‌বুকের পাতা উল্টে কার নাম লিখ্‌বেন খুঁজে পেলেন না এবং বইখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের বস্‌বার ঘরে এসে আদেশ জারি কর্‌লেন—

"এখুনি যার যার ক্লাশে গিয়ে নাম ডাকুন, যারা পালিয়েছে তাদের জরিমানা পাঁচ পাঁচ টাকা।"

কেদার-বাবু বল্‌লেন—"স্কুল গেছে ভেঙে, এখন খালি ক্লাশে নাম ডেকে কি হবে মশাই?"

হেড্‌-মাষ্টার দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লেন—"কি হবে তার আমি কি জানি? আমি রয়েছি, আপনারা রয়েছেন, স্কুল ভাঙ্‌লো কি করে'?" কিন্তু তাঁর দাঁত-খিঁচুনীর ভঙ্গিমা এমনি মনোরম যে কেদার-বাবু রাগ না করে' হেসে ফেল্‌তে বাধ্য হলেন।

প্রভাত-বাবু বল্‌লেন—"আজকের বর্ষা সোজা নয়। ছাত্র হ'লে আমরাও হয়ত ছুটি আদায় না করে' ছাড়্‌তেম না। রেনি ডে ছাত্র-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ আমোদ বলা যেতে পারে।"

হেড্‌-মাষ্টার তেমনি রুক্ষ স্বরে বল্‌লেন—"আমোদের জন্যই স্কুলে আসা! আপনাদের কাছেই ছেলেরা আস্কারা পায় মশাই। জানেন, আজকের কাণ্ডটা শুধু বাঁদ্‌রামী নয় জোচ্চুরি। আমি এমনি শিক্ষা দেবো যেন জীবনে আর বাঁদ্‌রামী না করে। দপ্তরী, সব ক্লাশের রেজেষ্টারীগুলো দিয়ে এসো আমার ঘরে।" তিনি অস্বাভাবিক জোরে পা ফেলে চলে' গেলেন।

তখন প্রভাত-বাবু বল্‌লেন—"এ দস্তুর-মত অপমান মশাই! আমরা ছেলেদের আস্কারা দি! মাষ্টারী কর্‌তে কর্‌তে চুল পাক্‌লো, আজ ডিসিপ্লিন্ শিখ্‌তে যাব ওঁর কাছে! সেদিনকার ছোক্‌রা, ছাত্রের বয়সী। কত কত ঝুনো হেড্‌-মাষ্টারের সঙ্গে কাজ করেছি, কেউ আমায় কন্‌সাল্ট্ না করে' কোনও কাজ করে নি, আর এই ইয়ংষ্টার কিনা......ছোঃ!"

কেদার-বাবু বল্‌লেন—"ডিস্পেপ্‌টিক্ লোকগুলোই এমনি খিট্‌খিটে মেজাজের। বাস্তবিক আজকের বর্ষা ত কম নয়। কি ক্ষেতিট বাবু, যা না বাড়ী চলে', দু কাপ চা খেয়ে গিন্নির সাথে মেঘদূত পড়্ বা রসালাপ কর্, তোদের ত কাঁচা বয়েস।"

প্রভাত-বাবু বল্‌লেন—"আবার গিন্নি! পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী!"

উপমাটা যদিও বেখাপ্পা তবুও সবাই হো হো করে' হেসে উঠলেন।

হেড্-মাষ্টারটি এসেছেন নূতন, কিন্তু এমনি মূর্ত্তিতে যে আমরা কেউ তাঁকে বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌তেম না। আমি জিজ্ঞেস কর্‌লেম—"কৌমার্য্যব্রতাবলম্বী নাকি?"

প্রভাত-বাবু উৎসাহিত ভাবে বল্‌লেন—"হাঁ। মধুর সোয়াদ ত পায় নি, কাজেই মধু বিলোতেও জানে না। দেখেছেন কোনও দিন ওর ঠোঁটে এক ফোঁটা হাসি, বা শুনেছেন ওর মুখে এক টুক্‌রো মিষ্টি কথা?"

কেদার-বাবু এক টিপ নস্য টেনে বল্‌লেন—"নিশ্চয় লোকটি ব্যর্থ-প্রেমিক। ব্যর্থ-প্রেমিকের যে যে লক্ষণ উপন্যাসে পড়া যায় ওর ভিতর সব আছে।"

দাঁত-খিঁচুনী খেয়ে প্রভাত-বাবুর আক্রোশটাই ছিল সব চেয়ে বেশী, তিনি সোজা হয়ে বসে' সোৎসাহে বল্‌লেন—"যথা?—"

কেদার-বাবু গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—"প্রথম নম্বর ধরুন খিট্‌খিটে রুক্ষ মেজাজ। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়াই হ'ল গিয়ে প্রেম। ফুলগাছের গোড়ায় যেমন জল দিলে তবে গাছ তাজা হয়, ফুল ফোটে, তেমনি এই যে মানবজীবনরূপ ফুল-গাছ তাতে প্রেমরূপ বারি সিঞ্চন কর্‌লে তবে তাতে মাধুর্য্য-কোমলত্বরূপ ফুল ফোটে। কিন্তু গাছের গোড়ায় ঢাল্‌বার জল থেকেই যে বঞ্চিত তার জীবনটাও বোশেখ মাসের রোদে-পোড়া গাছের মত শ্রীহীন,—না থাকে তার মাধুর্য্য, না থাকে কোমলত্ব। দ্বিতীয় নম্বর উদাসীনতা। এর কারণ বুকের ধারাগুলোকে একটা কিছুর দিকে চালিত কর্‌তে না পারা। বেঁচে থাক্‌তে হ'লে মানুষ এমন একটা কিছু অবলম্বন করে' নিতে চায় যাতে জীবনের গ্লানিগুলো দূর হয়ে যায়, কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত যে সে দারুণ আক্রোশে সংসারের সাথে লেনাদেনার সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলে। তৃতীয় নম্বর কৌমার্য্য। সাড়ে পনর আনা লোকই এ বয়সে ঐহিক সুখটাকেই শ্রেষ্ঠ বলে' বরণ করে। পর-মার্থিকের গন্ধ যে এতে পায় নি, অথচ ইহলোকের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য 'পদপল্লবমুদারম্'ও পায়নি, তারই এমনি সৃষ্টিছাড়া মেজাজ হয়।"

আমরা হেসে আকুল হলেম। পরচর্চ্চায় সময় কাট্‌ছিল মন্দ নয়, কিন্তু হঠাৎ মেঘ ফেটে এক ঝলক রোদ মুখে চোখে পড়ায় আমাদের হুঁস হ'ল এবং যারা বয়ঃপ্রাপ্ত তাদের ছেলেমেয়েগুলোর এবং অল্পবয়সী যাঁরা তাদের গৃহের ব্যক্তি-বিশেষের কথা মনে পড়ায় সকলে গাত্রোত্থান করে' বাইরের ফটকটির কাছে এসে দাঁড়ালেম। রাস্তায় পা দিতে আমার মনে পড়ে' গেল একটি ফর্‌মাস, এবং তা এমন দিক্ থেকে এসেছিল যে সঙ্গীদের মিথ্যা অজুহাত দিয়ে আমায় ফির্‌তে হ'ল হেড্-মাষ্টারের ঘরে। লাইব্রেরীর চাবী তাঁর কাছে এবং গল্পের বই নিতে হ'লে চাবী তাঁরই কাছ থেকে সংগ্রহ করা চাই।

হেড্-মাষ্টার তখনও বাড়ী ফেরেন নি। তাঁর ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেম। দেখি তিনি এই দিকে পেছন ফিরে বসে', মাথাটি তাঁর সাম্‌নের টেবিলের উপর। প্রথমটা ভাব্‌লেম ঘুমিয়ে পড়েছেন, ফিরে যাই। কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল হয়ত তাঁর অসুখ করে' থাক্‌বে, যে রোগা মানুষ! তা ছাড়া অন্তঃপুরের তাগিদটাও ছিল প্রচণ্ড! এগিয়ে গেলেম, তবু তিনি মাথা তুল্‌লেন না। কাছাকাছি গিয়ে দেখি টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি। নিজের অজ্ঞাতেই তা পড়ে ফেল্‌লাম। কে একজন হারাণদত্তের স্ত্রীর হিষ্টিরিয়ার ফিট্ খুব বেড়ে গেছে, হার্ট দুর্ব্বল, ডাক্তারেরা জীবনের আশঙ্কা করেন।

কিন্তু অবাক্ হলেম, চিঠির এই মর্ম্ম জেনে তাঁর হঠাৎ ঘুম পেল বা অসুখ কর্‌ল কেন? লোকটি যে দিবানিদ্রার ভয়ঙ্কর বিরোধী এবং নিতান্ত বেদরদী।

বোধ করি এম্‌নি সময় হঠাৎ আমার হাত লেগে কাগজ-চাপাখানি মাটিতে পড়ে' গেল, তিনি চম্‌কে উঠে মুখ তুলে চাইলেন। আমি অবাক্ হলেম তাঁর চোখে জলের ফোঁটা দেখে,—এ যে মরুতে নির্ঝর!

মিহি গলায় বল্‌লেম—"আমি জান্‌তেম না, কিছু মনে কর্‌বেন না। একটা কাজে এসেছিলেম—"

তিনি একমিনিট আমার মুখের পানে চুপ করে' চেয়ে রইলেন, তার পর বল্‌লেন—"বসুন।" তাঁর কণ্ঠ আর্দ্র বলে' বোধ হ'ল, আর এ শ্রেণীর লৌকিকতা তাঁর এই প্রথম। চোখের নীরব দৃষ্টির ভিতরে মানুষ মানুষের

কতখানি দেখ্‌তে পায় আগে জান্‌তেম না, সে দিন প্রথম জান্‌লেম। আমি বস্‌তেই তিনি আমায় বল্‌লেন—একটা "দুঃসংবাদ পেয়েছি প্রীতি-বাবু, তাই মনটা ভারি খারাপ লাগ্‌চে।"

তাঁর কণ্ঠে এমন ব্যথার রেশ ছিল যে নিমেষের জন্য তাঁর প্রতি সমস্ত তিক্ততা উবে গেল, মনে হল এ লোকটার জীবনে এমন কিছু বেদন আছে যা তাঁকে সংসারের সমস্ত হাসি থেকে দূরে ঠেলে রাখে। তাঁর সম্বন্ধে একটু আগে যে-সব অপ্রীতিকর আলোচনা করেছিলেম ভুলে গেলেম। বল্‌লেম—কি খবর পেয়েছেন শুনতে পাই কি?"

তিনি বল্‌লেন—"একটি আত্মীয়ের ভারি অসুখ।"

"আত্মীয়ের?"

"না,—হাঁ আত্মীয়ই বটে?"

"কখন খবর পেলেন?"

"খানিকক্ষণ, স্কুলের ডাকের সঙ্গে।"

"কি অসুখ?"

"দেখুন পড়ে'"—বলে' তিনি চিঠিখানি এগিয়ে দিলেন। পড়া চিঠি, তবু পড়ার ভান করলেম। তিনি আমার দিকে চেয়ে ছিলেন, বল্‌লেন—"মনটা ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

আমি সহানুভূতি জানিয়ে বিজ্ঞভাবে বল্‌লেম—"সংসারে রোগ শোক তাপ এ-সবের জন্য মানুষকে তৈরী থাক্‌তে হয়, সইবার জন্যই ত জগতে আসা।"

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়্‌লেন, মনে হল তাঁর বুকের সবগুলো পাঁজর কেঁপে উঠ্‌ল। একটুক্ষণ স্থির নেত্রে আমার পানে চেয়ে তিনি বল্‌লেন—"প্রীতি-বাবু, এ যে এক শোচনীয় ইতিহাস! দেখুন, প্রত্যেক মানুষের জীবনে ব্যথার অধ্যায় থাকেই,—কারো বেশী কারো কম। কিন্তু সে ব্যথা দরদীর কাছে ব্যক্ত করতে না পারলে আগ্নেয়গিরির মত সে ব্যথার আগুন একদিন হৃদয় ধ্বংস করে' ফেলে। আমার এমন দরদী বন্ধু কেউ নেই যার কাছে ব্যথার ইতিহাস কয়ে একটু সান্ত্বনার প্রলেপ পেতে পারি। যার দিকে তাকাই সহানুভূতির আলো যেন দেখ্‌তে পাই নে, তাই ফিরে আসি নিরাশ হ'য়ে, আর জীবনটা ক্রমে ভরে' উঠ্‌ছে ব্যথায়, নিরাশায় তিক্ততায়। আমার অন্তর শুষ্ক, বাইরেও তাই।—আপনি জানেন না যে-ক'দিন আমি এসেছি প্রত্যহই আমার অন্তর হা হা করে' ছুটেছে দরদীর জন্য। আপনারা হয়ত আমার বাইরের কঠোরতা দেখে অবাক্ হয়েছেন; কিন্তু জানেন না, কি জ্বালা আমি বুকে চেপে রাখ্‌চি।" এক মিনিট চুপ করে' থেকে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"চোখের ভেতর দিয়েই মানুষের পরিচয় এবং সে পরিচয়টা হঠাৎ কোন্ মুহূর্ত্তে ধরা পড়ে' যায় কেউ তা বল্‌তে পারে না। আমার এ ব্যথার তীব্র মুহূর্ত্তে হঠাৎ আপনাকে ধরে' ফেলেছি দরদী বলে', তাই আপনাকেই বল্‌চি আমার ব্যথার কথা। একটা অজ্ঞাত, অমীমাংসিত ব্যাপার—যা কুয়াসার চেয়েও অস্পষ্ট—আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছি এই ক'মাস। তার আবরণ ভেদ করতে আমার কত শক্তি খরচ হয়েচে আপনি তা ধারণা করতে পারচেন না, কিন্তু তবু পারিনি। তাতে শুধু বলহীন নীরস কঠোর হয়েই পড়েছি, জীবনটা স্বস্তিহীন হয়ে পড়েচে। এইমাত্র যে চিঠিখানি পড়্‌লেম আমার মনে হয় আমার জীবনটা কোনখান দিয়ে এর সাথে জড়ান এবং প্রথম যে দিন আমার এ ধারণা জন্মেছে সেদিন থেকেই আমার ভিতর একটা দারুণ অসোয়াস্তির বীজ ঢুকেচে।"

আমি অবাক্ হয়ে বল্‌লেম—"এ চিঠির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?"

তিনি বল্‌লেন—"জানিনে, এবং সেইজন্যেই ত অস্বস্তি। এ ভ্রান্ত ধারণা, না সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বের সমস্ত যাঁর নখদর্পণে তিনিই জানেন; কিন্তু তাঁর প্রতিনিধিরূপে যে শক্তি মানুষের অন্তরে অহরহ বাস করছে সে আমায় ফাঁকি দিচ্ছে কেন এ কথা ভেবে ভেবেই আমি ব্যথিত হচ্ছি।"

আকাশে কালো মেঘের টুক্‌রোগুলো আবার এসে মিলিত হচ্ছিল। সে দিকে চোখ বুলিয়ে তিনি বল্‌লেন—"আপনাকে আজ জান্‌তে হবে, বুঝ্‌তে হবে আমার কথা, আমার আড়ষ্ট বিবেককে সচেতন করে' দিতে হবে। বলে' দিতে হবে, যে জীবন আমি বরণ করেছি তা কি একটা মিথ্যা কল্পনামাত্র, না এতটুকু সত্য তাতে আছে? প্রীতি-বাবু, আজ আমার সত্যমিথ্যার একটা হিসেব-নিকেশ করে' দিন।"

তাঁর কণ্ঠস্বর আমায় আকুল করে' তুল্‌লে, আমি মৃদুকণ্ঠে বল্‌লেম—"বল্‌বেন ইতিহাসটা?"

তিনি বল্লেন—"বল্‌ছ বলেই 'ত আমার নির্ব্বাসিত রাজ্য থেকে আজ বেরিয়ে এসেচি। জানেন বোধ করি আমি অবিবাহিত।"

আমি বল্লেম—"জানি।"

"কারণ জানেন?"

"না।"

"বল্‌তে পারেন কিছু?"

"না। মানবজীবন দুর্জ্ঞেয়। একটা অনুমান করা চলে মাত্র।"

তিনি অবসন্ন স্বরে বল্লেন—"ঐখানেই যত গোল প্রীতি-বাবু। ভগবান্ মানুষের বড় বড় দুটো চোখ দিয়েছেন যার সাহায্যে তারা পৃথিবী ও আকাশটাকে এক নিমিষে দেখে ফেলে, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে ফেরে অন্তর-রাজ্য থেকে! চোখের একটা দিক্ তিনি এমনি শক্তিহীন করে' রেখেচেন।... শুনুন আমার ইতিহাসটা।"

তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"এম্-এ পাশ করে' তখন সবে মাত্র ঢুকেচি মফঃস্বলের এক স্কুলে। হারাণ-বাবু সেখানকার একজন নামজাদা লোক,—জমীদার, সভাসমিতি সব বিষয়ে অগ্রণী। তাঁর সাথে হয়ে গেল হঠাৎ পরিচয় আমাদের স্কুলে এক বক্তৃতা উপলক্ষে। আমার বক্তৃতায় তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তার উপর স্কুলের দীনেশ-বাবু আমায় কবি বলে' পরিচিত করায় তিনি আমাকে ও দীনেশ-বাবুকে একেবারে নিমন্ত্রণ কর্‌লেন তাঁর গৃহে সাহিত্যচর্চ্চার জন্য। যথাসময়ে দীনেশ-বাবু বাহন হয়ে আমাকে হারাণ-বাবুর গৃহে নিয়ে গেলেন। হারাণ-বাবুর লাইব্রেরীটি দেখে তাঁর উপর ভারি শ্রদ্ধা হল। লোকটি বাস্তবিকই সাহিত্যের উপাসক। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে আলমারির ভিতর সযত্নে সাজানো অসংখ্য বাংলা পুস্তক, বোধ করি বাঙ্গলার ছোট বড় কোনও লেখক ও মাসিকই এ সংগ্রহ থেকে বাদ যায় নি। দীনেশ-বাবু অহল্যার পাণ্ডুলিপি আমার আপত্তি সত্ত্বেও সঙ্গে নিয়েছিলেন, হারাণ-বাবুর আগ্রহে তার খানিকটা পড়্‌তে হ'ল। হারাণ-বাবু ভারি প্রশংসা কর্‌লেন এবং ভালো করে' পড়্‌বার জন্য সেদিন সেখানি রেখে দিলেন। তার পর হারাণ-বাবুর বাড়ীতে আমাদের মজলিস বেশ জমে' উঠ্‌ল এবং তাতে দক্ষিণ-হস্তের সুচারু বন্দোবস্ত থাকায় দীনেশ-বাবুর উৎসাহও বেড়ে গেল।

এর ভিতর আমার 'উর্ব্বশী' কাব্য 'ধরিত্রীতে' ছাপা হয়েছিল। একদিন দীনেশ-বাবু তার সমালোচনা তুল্‌তেই হারাণ-বাবু ধরা পড়ে' গেলেন। আমার বিশ্বাস জন্মেছিল লোকটি আমার একজন প্রধান উপাসক, নিশ্চয় সবার আগে আমার লেখা বেছে বেছে পড়েন। আমার শ্রেষ্ঠ কাব্যটিই তিনি পড়েন নি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেম—"এ যে আজ সাত দিন হ'ল বেরিয়েছে।"

হারাণ-বাবু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন—"ওহ্, বল্‌তে ভুলে গেছি, আমার অন্দর যে সদরের চেয়ে ঢের বড় সাহিত্যপীঠ, সব বই ওখান হয়ে তবে পৌঁছে আমার হাতে।"

আমি বল্লেম—"তাই নাকি? খুব সৌভাগ্যবান্ বল্‌তে হবে আপনাকে। স্বামী-স্ত্রীতে কাব্যালোচনার মত আনন্দ নেই।"

তিনি হাস্‌লেন, কিন্তু হাসিটি খুব উজ্জ্বল মনে হ'ল না। বল্লেন—"আপনার 'অহল্যা' কাব্যও ত ঐখানে। ভারি ঝোঁক তার বই-পড়ার।" এবং হঠাৎ প্রসঙ্গের স্রোত বদ্‌লে দিলেন।

পরদিন হারাণ-বাবুর বাড়ী গিয়েছিলেম আমি একা। সেদিন নবীন লেখকদের লেখার আলোচনা তুলে আমি অবাক্ হলেম তাঁর অজ্ঞতা দেখে। দেখ্‌লেম লব্ধপ্রতিষ্ঠ দুইচারিটি প্রধান লেখক ছাড়া অপর কারু লেখা তিনি পড়েন নি, এমন কি নামও জানেন না। ভারি দুঃখিত হলেম। মনে হল, তাঁর লাইব্রেরী সাজানো গৃহসজ্জা মাত্র, অথবা সাহিত্যনিষ্ঠার মিথ্যা মুখোস পরে' সাহিত্যপ্রীতির গৌরব ক্রয়ের প্রয়াস মাত্র। যেসব পুস্তক তাঁরই লাইব্রেরীতে আছে সেসবের মর্ম্ম দূরে থাক গ্রন্থকারদের নাম অবধি তিনি শোনেন নি! বোধ করি আমার রুষ্ট অন্তর কোনও রূঢ় ইঙ্গিতও করেছিল, তাঁর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি বল্লেন—"বঙ্গসাহিত্যে আমার নিষ্ঠা আছে তা প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্য আমার লাইব্রেরী সাজানো নয়। এ-সব সাজিয়েছি অন্দরের আনন্দের জন্য। জানেন ত সদরের উপর অন্দরের প্রভাব কত।"

আমি টিপ্পনী কর্‌লেম—"কিন্তু তার ফলে ত আপনার সাহিত্যিক হবার কথা। আপনি একটি ব্যতিক্রম বল্‌তে হবে তা হলে।" কথাটা বলে' নিজেই লজ্জিত হলেম।

তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বল্‌লেন—"বাস্তবিকই আমি ব্যতিক্রম। বয়সে আপনি আমার প্রায় সমান, আপনাকে বল্‌তে বাধা নেই সময় সময় আমি যেন তার একাগ্র সাহিত্যনিষ্ঠাকে সইতে পারি নে। মশাই, সে ত সাহিত্যনিষ্ঠা নয়, একেবারে সমাধি। সে রাজ্যে যেন আমার প্রবেশের অধিকার নেই। সাহিত্যটাকে অবসর সময়ে মন তাজা কর্‌বার উপায় ছাড়া আর কিছু অতিরিক্ত আমি মনে করি নে; কিন্তু সে যে মনে করে সাহিত্যটাকে জীবনের অবলম্বন! এবং আমাদের দুজনকার ব্যবধান ঘটেচে এই মধ্যবর্ত্তী সাহিত্য দিয়ে। বলুন ত, কি প্রয়োজন এ-সব অখ্যাত লেখকের পুঁথি—যা আগাছার মত সাহিত্য-তরুকে বরং দুর্ব্বল করে,—সে-সব ভক্তি সম্ভ্রমে জড়ো কর্‌বার? এ কি অপাত্রে শ্রদ্ধা-অর্পণ নয়?

আমি বুঝ্‌লেম তাঁর ক্ষত কোন্‌খানে, এবং মনে মনে হাস্‌লেম। বয়সের মাধুর্য্যে অশরীরী সাহিত্যটাকে ব্যবধান-কারী মনে করে' তিনি তা বরদাস্ত কর্‌তে পারেন না, অথচ এর সাধারণ প্রতীকারের ব্যবস্থাও এঁর মাথায় খেলেনি! হেসে বল্‌লেম—"কেন তবে ব্যবধানের কারণটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? বই ত আপনিই জোটাচ্ছেন!"

তিনি বল্‌লেন—"কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কর্‌বার বিরোধী আমি। স্ত্রীলোক বলে' যে তার আকাঙ্ক্ষার টুঁটি চেপে মারা—ভারি অন্যায় এ। আর এ ত নির্দ্দোষ আনন্দ। তবে—শুনুন আরো নেশা তার,—অখ্যাত প্রখ্যাত সমস্ত সাহিত্যিকের ফোটোতে তার এল্‌বাম ভরে' গেছে।"

আমি খুসী হয়ে বল্‌লেম—"এ দেশের সাহিত্যিকরা বোধ করি এমন শ্রদ্ধা এর পূর্ব্বে পায় নি।"

তিনি বল্‌লেন—"আপনিও বাদ যান্ নি। ফরমাস হয়ে গেছে আপনার ফোটো সহ 'অহল্যা' কাব্য ছাপাবার।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেম—"বলেন কি! কাগজের এ মহার্ঘতার দিনে!"

তিনি বল্‌লেন—"তার জন্য ভাবনা নেই, খরচ জোগাবেন তাঁর এজেণ্ট, অর্থাৎ আমি। হুকুম যখন হয়েচে, তামিল কর্‌তেই হবে।"

কথাটা ঠাট্টা বলেই মনে করেছিলেম। কিন্তু যেদিন হারাণ-বাবু সত্য সত্যই ভাল ফোটোগ্রাফার দিয়ে আমার ফোটো তুলিয়ে বই ছাপ্‌তে দিলেন, আমি অবাক্ হলেম স্ত্রীর প্রতি তাঁর আনুগত্য দেখে! এমনটি বোধ করি শুধু কাব্যেই সম্ভব, কিন্তু রক্তমাংসে গড়া কাব্যের মানুষও যে আছে তা এর আগে জানা ছিল না। পরের খরচে বই ছাপাবার সুযোগ আমিও হেলায় হারালেম না। উষ্ণ রক্ত আমার মাথায় চন্‌চন্ কর্‌ছিল, তাঁদের স্বামীস্ত্রীর অদ্ভুত শ্রদ্ধা অবলীলাক্রমে পরিপাক কর্‌লেম, কিন্তু তখন তলিয়ে দেখিনি এর পিছনে কত বড় অর্থ আছে।

হেডমাষ্টার-বাবু গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—"এর ভিতর দীনেশ-বাবু অন্যস্কুলে বদ্‌লি হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি থাক্‌লে হয়ত টিপ্পনীর চোটে আমাকে অস্থির করে' তুল্‌তেন। দিন চারেক পরে হারাণ-বাবুর বাড়ীতে যেতে তিনি বল্‌লেন—কবির ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্টের খবর রাখেন?"

আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেম—"কি রকম?"

তিনি অন্দর থেকে নিয়ে এলেন সোনালি-কাজকরা মেহগনি-কাঠের ফ্রেম বাঁধান আমার ফোটো। আমি অবাক্ হয়ে তাঁর পানে চেয়ে রইলেম। তিনি বল্‌লেন—আপনাকে হিংসে হচ্ছে মশাই। আঃ যদি কবি হতেম।"

আমি হেসে বল্‌লেম—মানুষ মাত্রেই কবি হারাণ-বাবু—কেউ কাব্য অন্তরে লুকিয়ে রাখে, কেউ তা চাপ্‌তে না পেরে বাইরে প্রচার করে, এই তফাৎ। তা এবার থেকে সম্পাদকের শরণাগত হয়ে পড়ুন।"

তিনি বল্‌লেন—"না মশাই, অন্তরের অনুভূতিগুলোকে আকৃতি দেবার শক্তি সকলের নেই। আপনারা মানুষের বুকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেন, সবাই তা পারে কৈ!" তিনি আর-একটা নিঃশ্বাস ছাড়্‌লেন।

এমন সময় বেয়ারা ট্রেতে করে' চা আর নানারকম মুখরোচক খাবার নিয়ে এল। হারাণ-বাবু বল্‌লেন—"আজ সব নিজ হাতে তৈরী। 'অহল্যা' ও 'উর্ব্বশী'র লেখকের এ অভিনন্দন।"

ভারি পুলকিত হলেম। একটি প্রাণী অন্তঃপুরে থেকে এমনি নৈষ্ঠিক উপাসকের সম্ভ্রমে আমার লেখার অর্চ্চনা করছেন তা জান্‌তে পেরে অসীম আনন্দ হ'ল। এ গৃহে অনেকদিন খেয়েছি, কিন্তু সেদিনকার খাদ্যের স্বাদের তুলনা ছিল না, যেন হৃদয়ের সমস্ত মধু ঢেলে তার প্রত্যেকটি তৈরী। বল্লেম—"ভারি সৌভাগ্যবান্ আপনি হারাণ-বাবু!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিচয় জান্‌বার আগ্রহ সহসা জেগে উঠ্‌ল। স্প্রিং টিপে দিতে কলের গাড়ীর মত হারাণ-বাবু হড়্ হড়্ করে' বলা সুরু কর্‌লেন, কিন্তু দেখ্‌লেম তাঁর বুকের ভিতর একটা অপূর্ণতার ব্যথা ছেয়ে আছে। মনে হ'ল, তা পত্নীর দিক্ থেকে উচ্ছ্বাসের পূর্ণপ্রতিদান না পেয়ে। দেখ্‌লেম, তখনো নবীন যুবকের মত ভাব-তরঙ্গে তিনি সাঁতার কেটে চল্‌তে চান,—পারেন না তাই ক্ষোভ।

স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অনেক তর্ক, কথা-কাটাকাটি হ'ল এবং অবশেষে তিনিও মেনে নিলেন যে এ দেশের স্বামী যতই আধুনিক উদার হোক স্ত্রীকে সে-সংসারের সমস্ত থেকে ছিন্ন করে' লতাটির মত একমাত্র তার অবলম্বিনী-ভাবে পেতে চায়, ভুলে যায় যে স্ত্রীরও স্বাধীন চিন্তা, ভাবনা, কাম্য, অভিরুচি আছে বা থাকৃতে পারে।

ক্লকটায় টুং টুং করে' এগারটা বাজ্‌তেই আমি বল্লেম—"আপনাকে বিরক্ত কর্‌লেম অনেকক্ষণ।"

তিনি বল্লেন—"কিছু না, ১২টার আগে ত সাহিত্য-চর্চ্চাই শেষ হয় না।"

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ চোখ পড়্‌ল অন্দরের দিকের জানালায়। হারাণ-বাবুর পিঠ ছিল ঐ দিকটায়। দেখ্‌লেম, জানালার নীলপর্দ্দার ফাঁকে ফোটা গোলাপটির মত একটি মুখ, কিন্তু সেই সুন্দর মুখে কি নিবিড় বিষণ্নতা! মুহূর্ত্তের ভিতর আর-একটি মুখের ছায়া আমার মনে পড়্‌ল, কিন্তু বিশ্বাস হ'ল না যে এ দুটি মুখ এক। বোধ করি আমি নিজের অজ্ঞাতেই মিলিয়ে দেখ্‌ছিলেম, কিন্তু হঠাৎ ঐদিক্‌টায় দড়াম্ করে' শব্দ হওয়ায় হারাণ-বাবু ও তাঁর পেছনে আমি ছুটে গেলেম। গিয়ে দেখি মূর্চ্ছা। ডাক্তার এল, শুশ্রূষা চল্‌ল। মূর্চ্ছাভঙ্গ অবধি আমার অপেক্ষা কর্‌তে হ'ল। শুন্‌লেম, হিষ্টিরিয়ার ফিট্ আছে, মন একটু আলোড়িত হলেই ফিট্ হয়।

বাড়ী ফিরে বিছানায় পড়ে' ওলটপালট করে' ফেল্‌লেম আমার অতীতের ইতিহাস। ঐ রোগক্লিষ্ট শ্রান্ত চোখের ব্যথিত দৃষ্টি আমার অতীত ও বর্ত্তমানকে যেন একটা অশ্রুর মালায় গেঁথে ফেলেছিল। যে শীর্ণ মুখখানি এইমাত্র দেখে এসেছিলেম তার পিছনে এসে দাঁড়াল একটি কচি মুখ। যৌবন তার অপরূপ রং ফলিয়ে ঐ কিশোর মুখখানিকে অপূর্ব্ব ছাঁচে ঢেলেছিল, কিন্তু রূপের পূর্ণতার বদলে কেড়ে নিয়েছিল তার হাসির সমস্ত আলোগুলো। আজকের হিমানী ও অতীতের হিমানীর ভুলে-যাওয়া স্মৃতি দিয়ে একটা মালা গেঁথে আমি শিউরে উঠ্‌লেম! মনে হ'ল, দেওঘরের দিনগুলো আমাদের দুটি বুকের ভিতর যে সোনার আখর লিখে দিয়েছিল আমি পুরুষ বলে' ছেলেখেলা ভেবে সে-সব পরিপাটী-রকমে মুছে ফেল্‌তে পেরেছি, কিন্তু তরুণীর কোমল অন্তর তা পারে নি।

বুকের ভিতর যে তুফান বয়ে যাচ্ছিল দুহাতে চেপে তিনি তা রোধ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন, তার পর আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—"দেওঘরে পাশাপাশি বাড়ীতে আমরা ছিলেম। আমার বয়স তখন তের, হিমানীর দশ। খেলায় গল্পে হিমানী ছিল আমার নিত্যসাথী। বিকেলের রোদ যখন কোমল হ'য়ে আস্‌ত আমরা সাম্‌নের সবুজ মাঠটিতে ছুটোছুটি কর্‌তেম, মহুয়া গাছ থেকে রসেভরা মহুয়া পাড়্‌তেম। ভোরের বেলা শিশিরে-ধোয়া বকুল-ফুল কোঁচড় ভরে' কুড়িয়ে সে মালা গাঁথ্‌ত আমারি জন্য; আবার যেদিন বৃষ্টি-রোদের মধুর মিলনে আকাশ জুড়ে রামধেনু দেখা দিত আমরা পাহাড়ের গায়ে আনন্দে মাতামাতি কর্‌তেম। আমারি ঘরটিতে ছিল তার অবাধ অধিকার। আপনিই সে ঐ অধিকার বেছে নিয়েছিল। আমি ছিলেম দুনিয়ার এলোমেলো। স্কুল থেকে ফিরে কোথায় বইগুলো ছুড়ে ফেল্‌তেম, সে গুছিয়ে না রাখ্‌লে হয়ত আমাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হ'ত। যতক্ষণ পড়্‌তেম সে কাছে বসে' থাকৃত, পড়া হ'য়ে গেলে বই থেকে তাকে গল্প বল্‌তে হ'ত। দুটি বচ্ছর এ ভাবে তর্ তর্ করে' বয়ে' গেল।

ঐ বয়সে উপন্যাস পড়বার গোপন আগ্রহ মানুষের যেমন থাকে আমারও ছিল তার চেয়ে কম নয়। চুরি করে' যেদিন প্রথম আমবনে লুকিয়ে 'বিষবৃক্ষ' পড়ি, সেদিন সবাইকে এড়াতে পেরেছিলেম কিন্তু তাকে নয়। সে আমায় খুঁজে সেখানে আবিষ্কার করেছিল এবং বিষফলের ভাগ তাকেও দিতে হয়েছিল। তার পর নিত্য নূতন উদ্ভাবিত জায়গায় আমরা উপন্যাসের মধুবিষ পান করতে' লাগলেম। পড়ে' কতখানি বুঝতেম মনে নেই, কিন্তু ভাবতেম অনেক। কেঁদে কেঁদে দুজনার চোখ ফুলে উঠত, ব্যথায় বুক ভেঙে ধ্বসে যেত। মনে পড়ে যেদিন 'মাধবীকঙ্কণ' পড়ি, আমাদের চার চোখে 'বীরেন'. ও 'হেমের' চেয়ে কম অশ্রু নাবে নি। তার পর যেদিন 'চন্দ্রশেখর' পড়ি, সেদিন হিমানীকে ঠাট্টা করে' বলেছিলেম 'তুমি শৈ'; সে গম্ভীরমুখে বলেছিল 'তুমি প্রতাপ'; কিন্তু তখন বুঝিনি ঐ উক্তির সাথে বালিকার হৃদয়ে কিছু গেঁথে ছিল কি না। এ বাল্য অভিনয়ের পরিণাম তখনো ত ভাবতে শিখিনি।

উপন্যাস হজম করে' কাঁচ বয়সে লিখবার নেশা আমায় পেয়ে বসেছিল এবং আমার লেখা পড়ে' হিমানী মেতে উঠল আমার চেয়েও বেশী। তার আগ্রহে আমার ঝোঁক বেড়ে গেল এবং পরিচয় গোপন করে' সে-সব অখ্যাত মাসিকে ছাপিয়ে ফেললেম। মনে পড়ে প্রথম যেদিন আমার লেখা মাসিকে বেরয় হিমানীর সেই পরম উৎসাহ! তার অভিনন্দনের পিছনে কি ছিল তখন তা জানিনি। আমার লেখাশিশুগুলোকে সে যে মরার মতন উৎসাহ-ধারায় পুষ্ট করছিল তাই ছিল আমার আনন্দ। এভাবে আরও একটি বছর কেটে গেল।

এ সময় আমি এণ্ট্রান্স পাশ করলেম, এবং বাবা ঢাকায় বেশী মাইনের কাজ পাওয়ায় আমরা সবাই ঢাকা চলে' এলেম। হিমানীর বড় বড় চোখের ধারাগুলো আজ স্পষ্ট মনে পড়ছে। সে চেঁচিয়ে কাঁদেনি, কিন্তু ঐ মৌন অশ্রুর ভিতর দিয়ে আমি কি তার অন্তরের সবখানি বুঝতে পেরেছিলেম? বোধ করি সে চেষ্টাও করি নি।

কালেজের নূতন সঙ্গী, নূতন আনন্দ, প্রবল উদ্যম তখন আমায় বাঁধহীন নদীতরঙ্গের মত বিপুল উচ্ছ্বাসে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই আনন্দে এগিয়ে চলবার ঝোঁকে আমি পিছনের মৃদুচ্ছবি হিমানীকে ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে ফেললাম পুকুরের জলে ছোট্ট ঢেউএর দাগের মত। আমার এতটুকু বাধল না, ব্যথা লাগল না,—আমার সামনে তখন স্পোর্টিং, ডিবেটিং ক্লব, থিয়েটার, সান্ধ্য সম্মিলন ও কত কিছু!

তার স্মৃতিটা আমার গোচরে একবার এসেছিল যেবার বি-এ পড়ি। হিমানীর বাবা আমার বাবাকে লিখেছিলেন আমাদের সম্বন্ধের প্রস্তাব করে'। তখন ভবিষ্যৎটা খুব উঁচু পর্দায় বেঁধে ফেলেচি। বি-এ পাশ করে' শ্বশুরের খরচে বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী বা চার্টার্ড একাউন্টেণ্টশিপ পড়ব। কাজেই বাবা কি উত্তর লিখলেন তা জানবার জন্য মাথা ঘামাই নি।"

খানিকক্ষণ থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন—"এর কিছুদিন পরে টাইফয়েড জ্বর হয়ে আমার সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেল। জীবন বাঁচল বটে, কিন্তু ডাক্তাররা বাবাকে বললেন যে বিয়ের কল্পনা সম্প্রতি ছেড়ে দিতে হবে। বিলেত যাবার কল্পনাও কাজেই কিছুদিনের জন্য চাপা পড়ল এবং প্রোফেসর হবার আশায় বি-এ পাশ করে' আমি এম্-এ পড়তে লাগলেম। এম্-এ পাশ করতেই বাবা মারা গেলেন। টায়ফয়েডের পর শরীর আমার ভেঙে গিয়েছিল, কাজেই আমাকে বিলেতে পাঠাবার জন্য কোনও মেয়ের বাপই এগিয়ে এল না এবং সংসারের চাপ কাঁধে পড়ায় তাড়াতাড়ি আমাকে একটা মাষ্টারী খুঁজে নিতে হ'ল। এই মাষ্টারী করতে এসেই হয়ে গেল হারাণ-বাবুর সাথে পরিচয়। এ পরিচয় যদি না হ'ত! উঃ কে জানত এতদিন পর তার সাথে দেখা হবে এম্নি-ভাবে!"

তাঁর কণ্ঠ কান্নায় জড়িয়ে এল। বহু কষ্টে নিজকে সামলে তিনি বলতে লাগলেন—"আমার বাল্যের সংসর্গ তার বুকে যে সাহিত্যপ্রীতি জাগিয়েছিল তা শাখাপল্লবে পল্লবিত দেখে আমি অবাক হইনি, আমি অবাক হয়েছি সাহিত্যরাজ্য মন্থন করে' তার আমাকেই খুঁজে নেবার আকুল আগ্রহে। হারাণ-বাবুর মুখে তার সাহিত্যপ্রীতির ইতিহাস শুনে আমি উৎফুল্ল হয়েছিলেম। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আমার সারা অন্তর সন্দেহে ভরে' গেছে,—ঐ অনুরাগ কি সাহিত্যের প্রতি? কেন বাঙ্গলাসাহিত্য মন্থনের প্রয়াস তার? কেন

অখ্যাত প্রখ্যাত সাহিত্যিকের ফোটোতে এল্‌বাম সাজিয়ে রাখা? বাংলায় ত যশস্বী লোকের অভাব নেই, তবে এই অখ্যাত লেখকের লেখার প্রতি তার হৃদয়ের অভিনন্দন কেন? কেন তার আমার ফোটো অমন সযত্নে বাঁধিয়ে রাখা? যেমন স্বামী পেলে নারী নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করে সে ত তেমনি পেয়েছে, তবু কেন তার মলিনতা? কি ম্লানিমা তার মুখে, যেন অকালবৃন্তচ্যুতার শুষ্কতা তার আনন্দকে হত্যা করে' ফেলেচে! কেন হৃদয়ঢালা যত্ন দিয়ে আমার জন্য খাবার তৈরী করা? কেন তার সজল চোখে অমন নীরব ভাষা? আজও কি তা হ'লে সে তার শৈশব-সহচরটিকে ভুল্‌তে পারে নি? শৈশবে তার কচি অন্তরে' প্রণয়ের যে ক্ষীণ দাগটি পড়েছিল বয়সের সাথে কি তার বুকে তা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে? সে জানে এ জীবনে তার ও আমার মিলন অসম্ভব, তাই কি সে আমার সঙ্গ চেয়েছিল আমার লেখার ভিতর দিয়ে, এবং তাই কি সাহিত্যরাজ্য মন্থন করে' আমাকে আবিষ্কার কর্‌বার প্রয়াস তার? জানে সে, পরিচয় গোপন করে' আমি লিখি, তাই কি সে স্তূপীকৃত করেচে বাংলার ছোট বড় সমস্ত লেখককে এবং তাদের ফোটো?

আমাকে কেন্দ্র করে' যে প্রণয়বৃক্ষটি তার কচি অন্তরে পল্লবিত হয়ে বিষফলের সৃষ্টি করেচে আমার মনে হয় সেজন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি। স্নেহ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, কাব্য উপন্যাস শুনিয়ে কে ঐ তরুণীর তরুণ বুকে প্রণয়-রস সঞ্চার করেছিল? করেছিল যদি, কেন সে তা জান্‌তে প্রতীকার কর্‌তে চেষ্টা করে নি?

আমার মনে হয় হয়ত এসব আমার মিথ্যা কল্পনা। কল্পনাপ্রিয় মস্তিষ্কের একটা মিথ্যা রং-ফলান। কিন্তু কল্পনাও ত একেবারে ভিত্তিহীন নয়, এও ত সত্যিকার জীবনের উপর একটা কোমলতার কিরণ সিঞ্চন।

অনেক ভেবেচি, ভেবে ভেবে কূল পাইনি এর কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা? এ অজানার মীমাংসায় পাগল হয়ে উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছি আজ মাসের পর মাস। কত স্কুল ছাড়্‌লেম, কত স্কুল ধর্‌লেম, কিন্তু নতুন সংসর্গ, নতুন পরিচয় কিছুই আমায় নবীনতা দিচ্ছে না।

সাহিত্য-চর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছি, মাসিকের সাথে আর কোনও সম্পর্ক নেই। যদি সত্যি সে আমায় ভুলে না থাকে আমার অস্তিত্বটা তার কাছে থেকে বিলীন করে' তাকে আমার ভুল্‌বার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আমার ভাবি—তাও কি আমার ধর্ম্ম হবে? অনেক বঞ্চিত করে' তার জীবনটা যদি ব্যর্থ করে' থাকি একটুখানি স্মৃতি দিয়েও তা সার্থক করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়? মীমাংসা পাইনি, প্রীতিবাবু, আমায় এর মীমাংসা করে' দিন্।"

হেড্-মাষ্টার-বাবু থাম্‌লেন। মনে হল আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে তিনি কণ্ঠস্বর থামিয়ে ফেল্‌লেন। তিনি জলে টস্‌টসে চোখে আমার পানে এম্‌নি করে' চাইলেন যেন আমার মীমাংসার উপরই আজ তাঁর সমস্ত নির্ভর কর্‌ছে।

বাইরে তখন ঝরঝর করে' বৃষ্টি পড়্‌ছিল। বোধ হ'ল যেন এই ব্যথার কাহিনী শুনে প্রকৃতির বুকও ভেঙে ধ্বসে' যাচ্ছে। আমার বুকও ফুলে ফুলে উঠ্‌ছিল, বাঁ হাতে চোখ রগ্‌ড়ে ব্যথিত-স্বরে বল্‌লেম—"একটু ভাব্‌তে দিন্।"

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বসু

বসন্ত

মস্‌গুল্ বুল্‌বুল্ বনফুল-গন্ধে,
বিল্‌কুল্ অলিকুল গুঞ্জরে ছন্দে!
টুক্‌টুক্ তুলতুল্ কার ফুলমুখখানি,
চঞ্চল চুল্‌বুল্ কার চোখ দুখানি,
ঝলমল্ অঞ্চল নবীন বসন্তে!

নর্ত্তকী নেমে এল কোন সুরতরীতে
হাসিরূপগান বহি' মুনিমন হরিতে!
বাঁধা নাহি পড়ে সে যে ফেরে শুধু বাঁধিয়া,
মঞ্জীর-তালে তার ওঠে প্রাণ কাঁদিয়া!
স্বপ্নের সৃষ্টি সে ব্যাকুল আনন্দে

শ্রী শিবরাম চক্রবর্ত্তী

স্মৃতিশক্তির বাহাদুরী—

বিখ্যাত ফরাসী প্রবন্ধলেখক মন্টেন্ বলিয়াছেন—প্রখরস্মৃতিবিশিষ্ট লোকেরা প্রায়ই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া থাকে। জানি না তাঁহার এই উক্তি কতদূর সত্য; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা জগতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে লোকের মনের উপর আধিপত্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ছিল। বীরকেশরী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট্ একসঙ্গে বার জন মন্ত্রীকে বার রকমের বারখানা চিঠি মুখে মুখে বলিয়া দিতেন, চিন্তা করিবার জন্য এক মিনিটও থামিতেন না—একটুকুও ভুলভ্রান্তিও কোথাও হইত না; এইসব চিঠির প্রায় সবগুলিই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লিখিত, ঘোড়ার পিঠে বসিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে করিতে যাহা বলিতেন সঙ্গের মন্ত্রী অথবা এডিকংয়েরা তাহাই লিখিয়া লইত; সেই সব তাড়াতাড়ি-লেখা চিঠিপত্রগুলি আজও রাজনৈতিক পত্রের আদর্শরূপে গণ্য হইয়া থাকে। কমিসেরিয়েট বিভাগের অতি সূক্ষ্ম ভুলগুলিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে অমুক সৈন্যদল অমুক সময়ে কোথায় ছিল এবং তখন তাহাদের খাদ্যের জন্য কত পরিমাণে কি কি রসদ প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তাহাতে সেই তারিখে ব্যয়ই বা কত হইয়াছিল ইত্যাদি সর্ব্বদার জন্য তাঁহার নখদর্পণে থাকিত। পণ্ডিতবর জনসন্ একবার যাহা দেখিতেন শুনিতেন কিম্বা পড়িতেন জীবনে কখনও তাহা ভুলিতেন না। বার্ক্, ক্ল্যারেণ্ডন এবং টিলোসন্ প্রত্যেকেরই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। সার্ উইলিয়ম হ্যামিল্টনের মতে স্মৃতিশক্তি-বিষয়ে কেহই প্যাস্কাল এবং গ্রোটিয়াসের সমকক্ষ নন; ইঁহারা একবার যাহা পড়িয়াছেন অথবা চিন্তা করিয়াছেন তাহা আর কখনও ভোলেন নাই। বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক লাইব্‌নিৎস্ এবং অয়লার অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিশক্তিও কম প্রখর ছিল না,—দুইজনেই ঈনিড্ কাব্যখানা আগাগোড়া মুখস্থ বলিতে পারিতেন। ডনেলাস্ 'কর্পাস্ জুরিস' নামক আইনের সুবৃহৎ বইখানি সমগ্র কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; অথচ তাঁহার মত প্রতিভাশালী আইন-ব্যবসায়ী এপর্য্যন্ত খুব কমই দেখা গিয়াছে। বেন্‌জনসন্ নিজে যে কয়েকখানা বই লিখিয়াছিলেন এবং শৈশব হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত যতগুলি বই পড়িয়াছিলেন তাহার সমস্তগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিতেন। থেমিষ্টোক্লিস্ আথেন্স্ নগরীর কুড়িহাজার নাগরিকের প্রত্যেককে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। পারস্যরাজ সাইরাস্ তাঁহার বিপুল বাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকের নাম জানিতেন। হর্টেন্‌সিয়াস্ (সিসেরোর পর রোমে আর ইঁহার মত বাগ্মী জন্মে নাই) সারাদিন নীলামের কাছে বসিয়া থাকিয়া কত রকমের কতটি জিনিষ কি দরে বিক্রয় হইল এবং কে কি খরিদ করিল সমস্ত অভ্রান্তভাবে বলিতে পারিতেন। জর্ম্মান ঐতিহাসিক নিবুহর্ স্মৃতিশক্তি-বিষয়ে বিখ্যাত ছিলেন; যৌবনে ইনি ডেন্‌মার্ক্ দেশের এক অফিসে কেরানীগিরিতে বহাল হন; দৈবাৎ আগুন লাগিয়া সেই অফিসের কতকগুলি দরকারী হিসাবের বই পুড়িয়া যায়; শুনা যায় নিবুহর্ নাকি নিজের স্মরণশক্তির সাহায্যে আবার নিভুলরূপে সেগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের বাঙ্গালী বাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্বপ্রথমে মিথিলা হইতে ন্যায়ের পুস্তক আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল খোলেন। তৎপূর্ব্বে ন্যায় পড়িতে হইলে মিথিলায় গিয়া পড়িয়া আসিতে হইত। ন্যায়ের পুস্তক কাহাকেও সেখান হইতে সঙ্গে আনিতে দেওয়া হইত না। একবার নাকি দুইজন গোরাসৈন্য গঙ্গার ঘাটে মারামারি করে; জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তখন ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন; মারামারিতে সৈন্যদের একজন সাংঘাতিক জখম হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে প্রমাণ মানে; যদিও তিনি মোটে ইংরেজী জানিতেন না, কিন্তু অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির বলে কে কি বলিয়াছিল তাহা সমুদায় অবিকল বিচারকের নিকট আবৃত্তি করেন এবং প্রথমে যে আঘাত করিয়াছিল তাহাকেও দেখাইয়া দেন। প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়ের সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ ছিল। বালগঙ্গাধর তিলক রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ পর্য্যন্ত মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। দাদাভাই নৌরজী বিলাতের যে পকেটবরো হইতে পার্লামেন্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক অধিবাসীর নাম জানিতেন। ভারতের যে-সব মনীষী আজও জীবিত আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই প্রখরস্মৃতিশক্তিসম্পন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকেরই নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট্ বলিতেন কাহাকেও ঘৃণা না করাই খাঁটি লোকের লক্ষণ। ডাক্তার ভিনেটের মতে যে অপরকে ঘৃণা করে তাহার অধোগতি অনিবার্য্য। হেন্‌রী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বীচার বলিয়াছেন লোকের অন্তঃকরণের সবলতা দুর্ব্বলতা পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার অপরকে ঘৃণা করার প্রবৃত্তি দেখিয়া। মানুষের মনের যতপ্রকার বৃত্তি আছে তার মধ্যে ঘৃণা সবচেয়ে প্রবল এবং সর্ব্বব্যাপী। এক জাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা করে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে দেখিলেও নিজদিগকে অপবিত্র মনে ভাবে, এর পরও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ঘৃণার ত কথাই নাই। মানুষের এই বৃত্তিটি ঝড়বৃষ্টি অথবা বিদ্যুতের মত শক্তিশালী হইলে পৃথিবী এত দিনে উৎসন্ন হইয়া যাইত।

কোল্টন বলেন কতকগুলি লোককে আমরা না জানিয়া ঘৃণা করি, আবার কতক লোককে ঘৃণা করি বলিয়া তাহাদের বিষয় কিছুই জানিতে চাহি না। মেরিয়া এজ্‌ওয়ার্থ লজ্জাকে প্রকৃতির শীঘ্রগামী বিবেক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'সেকার' বলেন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই লজ্জাকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন।

মানুষের কেন লজ্জা হয় জিজ্ঞাসা করাতে ডাক্তার ওয়েবেষ্টার বলিয়াছিলেন কুকর্ম্মের স্মৃতি এবং তদ্দ্বারা বদনাম হওয়ার আশঙ্কাতেই মানুষের মনে লজ্জা আসে। বিশপ টেলারের বিশ্বাস ছিল কুকর্ম্ম করিয়াও যে লজ্জিত হয় না, বরং উল্টা বেহায়াপনা করিয়া তাহা ঢাকিতে চেষ্টা করে, তাহার চরিত্র শোধরান সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মহামতি লক্ বলিয়াছেন ভবিষ্যৎ বিপদে নিজের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হওয়ার নামই ভয়।

আর্চ্চবিশপ অ্যাবট বলিতেন ভয়ের ভান করার চেয়ে অতিমাত্রায় ভীত হাওয়াও ভাল।

ডাক্তার লীর মতে ভগবান ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করাই দোষের লক্ষণ।

শ্রী বীরেশ্বর বাগছী

—

উভচর গাড়া—

কামানধারী উভচর গাড়ীর ব্যবহার গত মহাযুদ্ধেই প্রথম হয়। যুদ্ধের সময় বাঁধা রাস্তার আশায় বসিয়া থাকিলে চলে না—সংচেয়ে সোজা
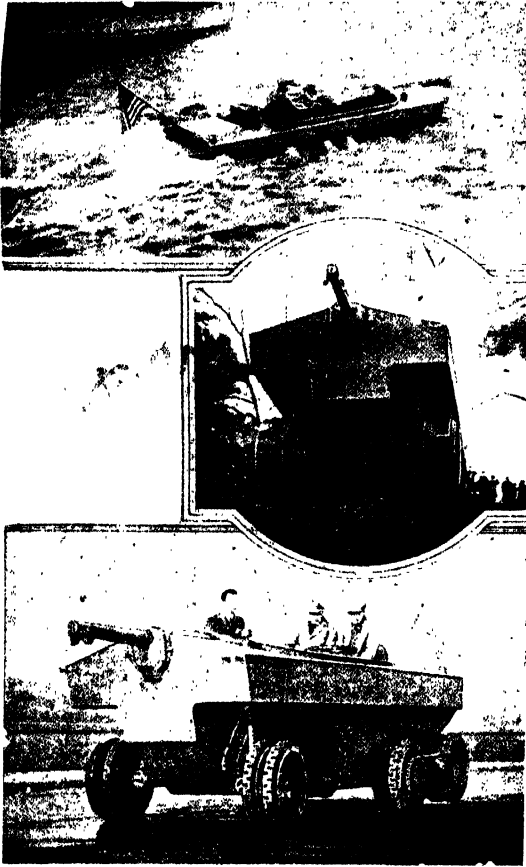
উভচর গাড়ী—জলে স্থলে এবং পাহাড়ে চলিতে পারে

পথেই চলিতে হয়। এই কামানধারী গাড়ীর (armoured truck) জলে এবং স্থলে চলিবার ক্ষমতা আছে। ছোটখাট পাহাড়েও সে বেশ উঠিতে পারে। জলেও তাহার গতি ঘণ্টায় প্রায় ২০ মাইল।

—

চিরস্থায়ী মোমবাতি—

নিউ ইয়র্কে ১৬ ফুট উচ্চ, ৫ ফুট পরিধি এবং উপযুক্ত-পরিমাণ সলিতা-যুক্ত একটি মোমবাতি তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার ওজন ২৭ মণ।

কারুসোর স্মৃতি চিহ্ন—চিরকালস্থায়ী মোমবাতি—

পরোলোকগত জগদ্বিখ্যাত গায়ক এন্‌রিকো কারুসোর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এই মোমবাতিটি ইটালির লেডি অফ্ পম্পিয়াই নামক গির্জ্জাতে থাকিবে। কারুসো এই গির্জ্জাতে তাঁহার শেষ উপাসনা করেন। প্রত্যেক বৎসর ২রা নভেম্বর (All Souls' Day) এই মোমবাতিটি একবার করিয়া জ্বলিবে। আশা করা যায় এই মোমবাতিটি শত শত বৎসর ধরিয়া কারুসোর স্মৃতি রক্ষা করিবে।

৯২ ফুট লম্বা রলা—

আমেরিকার এক জঙ্গলে ৯২ ফুট লম্বা অনেকগুলি বেশ মোটা মোটা রলা কাটা হয়। পাশাপাশি (কিছু দূর অন্তর) দুটি মোটর ট্রাকে করিয়া তাহাদের বহন করা হয়। মোটর দুটিকে একই সময়ে ঘুরাইবার
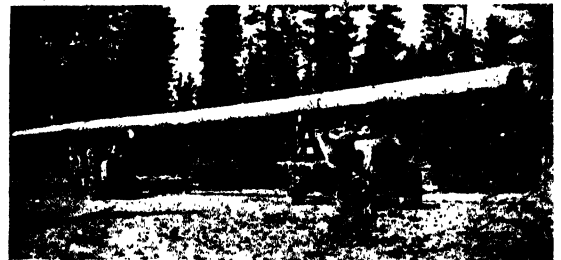
৯২ ফুট লম্বা রলা

ফিরাইবার এবং থামাইবার অসুবিধার জন্য খুব জোরে জোরে ভেঁপু বাঁশি বাজান হয়।

পা-বাজ্‌না—

এই বাজ্‌না অনেকটা পিয়ানোর ধরণে তৈয়ারী—তবে ইহার সুবিধা এই যে ইহা পা দিয়া বাজানো চলে, হাতে বেহালা বা অন্য কোন যন্ত্র বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যতানে এই বাজনা বেশ বাজানো

পা-বাজ্‌না— এক সঙ্গে হাতে ও পায়ে দু-রকম বাজ্‌না বাজানো চলিতে পারে

যায় এবং তাহা শুনিতেও বেশ হয়। পা দিয়া ইহার রিড্‌ টিপিতে হয়। ইহাতে কয়েকটি সুর বাঁধা আছে। সেইজন্য অন্য কোন গৎ কিম্বা গানের সঙ্গে ইহা না বাজাইলে ইহা শুনিতে ভাল লাগে না।

টেলিফোনের কথা—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আজকাল টেলিফোনের উন্নতির জন্য সকলেই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজ হইতে ৪৭ বছর পূর্ব্বে টেলিফোনের জন্ম হয়। ডাঃ আলেকজেণ্ডার গ্রাহাম্ বেল্ ইহার জন্মদাতা। বর্ত্তমান যুগে যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল্ জন্ জে কার্টি (Gen. John J. Carty, vice-president in charge of Development of the American Telephone and Telegraph Company) টেলিফোনের সবচেয়ে বেশী উন্নতি করিয়াছেন। ৪৫ বছর পূর্ব্বে ইনি সপ্তাহে ১৫ বেতনে বষ্টন সহরে টেলিফোন্ আফিসে কাজ করিতেন। তখন মাত্র কয়েকটি লোহার তার বষ্টন্ সহরের টেলিফোন-সম্পত্তি ছিল। যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বিষয়েই প্রায় ৫০ বছর আগাইয়া আছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে টেলিফোন নেহাৎ সাদাসিধা ছিল। ঐ

টেলিফোনের প্রথম যুগ—মাঝখানে একজন চারিদিকের ডাক শুনিতেছে এবং সেইরূপ কনেক্‌শন্ করিবার হুকুম করিতেছে—লোকের দৌড়াদৌড়ি এবং কাজের গোলমাল
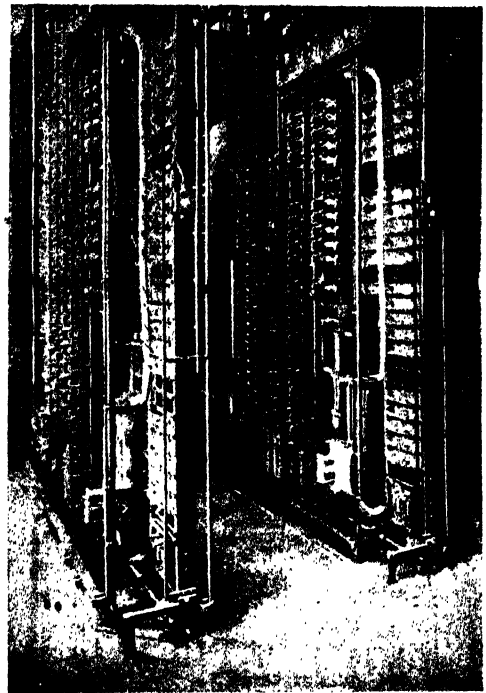
নিউ ইয়র্কের বর্ত্তমান টেলিফোন সুইচবোর্ড—সমস্ত কাজ আপনা-আপনিই হয়

বছর জেনারেল কার্টি প্রথম বর্ত্তমান টেলিফোনের প্রবর্ত্তন করেন। জেনারেল কার্টি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের এই কাজ সম্পূর্ণ করিতে যে কত রকমের বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ডাঃ বেল টেলিফোনের সূত্রপাত করেন, কিন্তু

ইহার যাহা কিছু উন্নতি তাহা জেনারেল কার্টি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীর দল করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এক কালে যে টেলিফোনে রাস্তার এপার হইতে ওপারের কথা বলিতে হইলে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কথা বলিতে হইত সেই টেলিফোনে এখন আস্তে আস্তে কথা বলিলে সমুদ্রের এপার হইতে ওপারে শোনা যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

টেলিফোনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করা সহজ নয় এবং তাহা সকলের ভাল না লাগিতেও পারে। টেলিফোনের ক্রমোন্নতি কেমন করিয়া হইয়াছে তাহাই কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।
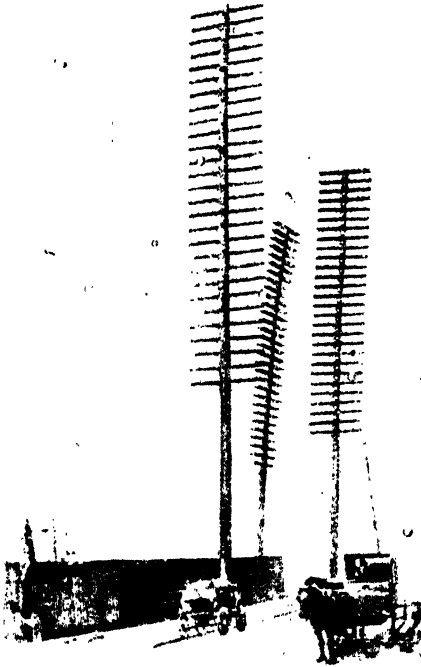
পৃথিবীর মধ্যে টেলিফোনের তার বহনকারী সবচেয়ে লম্বা থাম (নিউ ইয়র্ক)

প্রথম চিত্রে ঘরের মাঝখানে একজন লোক বসিয়া চারিদিকের "কল" অর্থাৎ ডাক শুনিতেছে এবং কর্ম্মচারীদের (operator) তার-সংযোগ (connection) করিবার জন্য চীৎকার করিয়া বলিতেছে। ইহাতে কাজের বড় বিশৃঙ্খলা হইত এবং অনাবশ্যক ভয়ানক ছুটোছুটি এবং গোলমাল হইত। কলিকাতায় এবং আরো অন্যান্য অনেক দেশে এখনো এমনি ভাবেই কাজ হয়। তবে আস্তে আস্তে সকল দেশেই টেলিফোনের উন্নতি হইতেছে।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখুন প্রকাণ্ড সুইচবোর্ড রহিয়াছে। ডাক দিলে আপনা হইতেই সেই তারে "যোগ" অর্থাৎ connection হইবে। কোন লোককে প্রত্যেক নম্বরে হাত দিয়া তারের যোগাযোগ করিতে হইবে না, সমস্ত কাজই আপনা হইতেই হইবে। ইহাকে automatic switch-board বা স্বয়ংক্রিয় চাবির পাটা বলে।

তৃতীয় চিত্রে টেলিফোনের তার বহন করিবার খুঁটির। পৃথিবীর মধ্যে নিউইয়র্কের এই খুঁটিগুলি টেলিফোনের সবচেয়ে লম্বা খুঁটি। এক একটি খুঁটিতে ২৮০টি করিয়া তার ঝুলিতেছে। ক্রমশঃ তারের সংখ্যা এত বেশী হইয়া পড়িল যে লোকে মাথার উপর আকাশে তার লাগানোতে বিষম আপত্তি করিতে লাগিল। তখন মাটির তলায় বায়ুশূন্য চোঙাতে তার রাখিবার বন্দোবস্ত হইল।

চতুর্থ চিত্রে দেখুন মাটির তলায় কেমন করিয়া তার রাখা হয়। এই স্থানটিতে ২১,৬২৪টি তার আছে এবং এই তারের মধ্য দিয়া যত বেশী কাজ হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও আর তত হয় না।

প্রথমে একটি তারের সাহায্যে কোন বিশেষ দুইটি স্থানের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিত। তারের দুই প্রান্ত মাটিতে সংযুক্ত থাকিত। জেনারেল কার্টি প্রথমে দুই তারের ব্যবহার আরম্ভ করেন। ইহাতে কাজের অনেক সুবিধা হয় এবং তারের প্রান্তদ্বয় আর মাটিতে যোগ করিবার দরকার হইত না। দুই তারের ব্যবহারকে full metallic circuit বা পূর্ণ ধাতব সংবেষ্টন বলে।
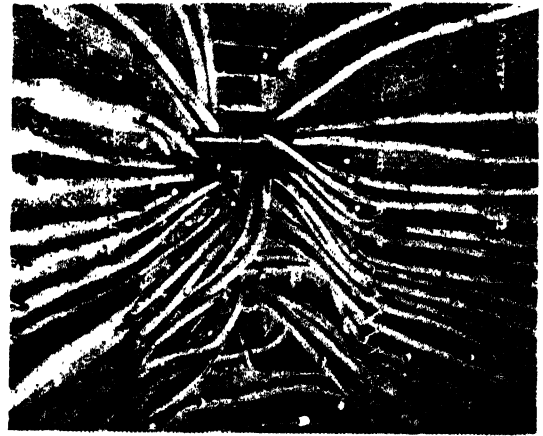
মাটির তলায় টেলিফোন কেব্‌ল্—খুব সামান্য স্থানে হাজার হাজার তার চালানো যায়

প্রথমে লোহার তার ব্যবহার হইত। কিন্তু বেশী দূরে লোহার তারের মধ্য দিয়া শব্দ পাঠান অসম্ভব হইল। জেনারেল কার্টির সহকর্ম্মীরা তখন তামার তার ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তামার তার অত্যন্ত নরম বলিয়া ইহাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া শক্ত করা হইল। প্রথম তামার তারের ব্যবহারের খরচ ভয়ানক হইল। নিউইয়র্ক এবং শিকাগোর মধ্যে যে দুইটি তামার তার ছিল তাহার ওজন হইল প্রায় দশ হাজার আটশত পঁচাত্তর মণ এবং দাম হইল ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। তার প্রথমে মানুষের আঙুলের মতন মোটা ছিল। তার পর ক্রমে ক্রমে ছোট এবং পাতলা তার ব্যবহারের উপায় করা হয়।

বেতার টেলিফোনের জন্মও টেলিফোন-ল্যাবোরেটারি হইতেই হয়। কার্টিই এই পথপ্রদর্শক বলিলেও চলে। তাঁহারই উৎসাহে রেডিও-টেলিফোন কাজে লাগাইবার চেষ্টা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের আর্লিংটন্ ষ্টেশন হইতে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে কথা চলাচল হয়।

টেলিফোনের বিষয়ে মাত্র দু একটি কথা বলা হইল। টেলিফোনের বিষয়ে এমন এক একটি কথা আছে যাহার সম্বন্ধে এক একটি প্রকাণ্ড কেতাব লেখা যায়।

সমস্ত ইংলণ্ডে যত টেলিফোন আছে একমাত্র নিউইয়র্ক সহরেই তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে। শিকাগো সহরের টেলিফোনের সংখ্যা ফ্রান্সের অপেক্ষা বেশী এবং প্রায় সমস্ত জার্ম্মানীর সমান। যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর $\frac{1}{16}$ জন লোক বাস করে; কিন্তু পৃথিবীর $\frac{2}{3}$ টেলিফোন

যুক্তরাষ্ট্রেই রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের টেলিফোন্ বিভাগের এই অসামান্য উন্নতি এবং তাহা দশের কাজে লাগাইবার জন্য জেনারেল কার্টির কাজ ও নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এবং তাঁহার অপেক্ষাও বেশী বৈজ্ঞানিক সহকর্ম্মীদলের চেষ্টাতেই এই ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে।

চুম্বকের জোর—

ছবিতে দেখুন একটা গোল প্রকাণ্ড চুম্বকের তলায় একটা লোহার ডাণ্ডা আট্‌কাইয়া গিয়াছে। সেই লোহার ডাণ্ডাতে ৭ জন লোক ঝুলিতেছে, তাহার মধ্যে একজন আবার তলার দিকে মাথা করিয়া

চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির পরিমাণ লোহার ডাণ্ডা চুম্বকের আট্‌কাইয়া আছে, তাহাতে সাতজন লোক ঝুলিতেছে

ঝুলিতেছে। ইহার জুতার তলায় যে লোহার পেরেকগুলি আছে সেগুলি এমনভাবে চুম্বকের গায়ে লাগিয়া গিয়াছে যে লোকটির সমস্ত ওজন তাহারা ধরিয়া রহিয়াছে। এই ৭ জন লোকের ওজন প্রায় সাড়ে বারো মণ।

বরফকে নূতন কাজে লাগানো—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের ও আ্যাকরন্ সহরের সদর-আদালত-গৃহের সামনে দুইটি মর্ম্মর-সিংহ বরফের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসান হয়। সিংহ দুটিকে গাড়ী হইতে নামাইবার আর কোন উপায় হাতের কাছে না পাইয়া, গাড়ীর সমান উঁচু করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান দুটিতে বরফের চাপ বসান হয়, তাহার পর গাড়ীকে তাহার কাছে আনিয়া মর্ম্মর-সিংহকে বরফের চাক্‌তির উপরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। তারপর

বরফের চাপের উপর পাথরের সিংহ—বরফ গলিয়া গেলে পর সিংহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনা হইতেই চাপিয়া বসিবে

গরম-জলের সাহায্যে বরফ ক্রমে ক্রমে গলাইয়া ফেলা হইলে পর সিংহ দুইটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেশ করিয়া বসিল।

পুলিশের বুকে পিঠে লাল বাতি—

যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রদেশের ট্রাফিক্-পুলিশের বুকে এবং পিঠে লাল বাতি জ্বলে। তাহাতে গাড়ী থামাইবার জন্য আর তাহাকে হাত তুলিতে

ট্রাফিক্ পুলিশের পিঠে এবং পেটে লাল বাতি—আর হাত তুলিয়া গাড়ী চলাচল শাসন করিতে হইবে না

হয় না। পিছন এবং সামনের গাড়ীওয়ালারা পুলিশের পিঠের এবং বুকের সঙ্কেত-বাতি দেখিয়া গাড়ী থামায় বা চালায়।

সবচেয়ে বড় মুরগির-ডিম—

আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া সহরের এক ভদ্রলোকের সবচেয়ে বড় মুরগীর-ডিম আছে। তাহার লম্বা লম্বি পরিধি ৭·৮৭ ইঞ্চি এবং চওড়া
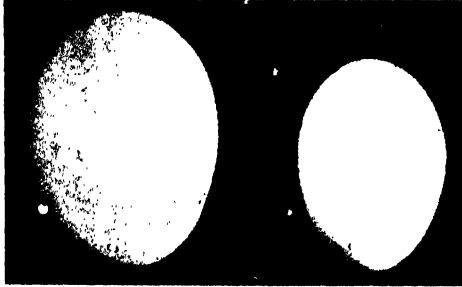
সবচেয়ে বড় মুরগীর ডিম

ভাবের পরিধি ৬·৭৫ ইঞ্চি। ডিম্বটির লম্বা-লম্বি ব্যাস ২·১৫ ইঞ্চি এবং চওড়া-চওড়ি ব্যাস ২·৮১ ইঞ্চি। ওজন ৪½ আউন্স।

—

বলদটানা নৌকা—

চীনদেশে গরমকালে অনেক নদীতে জল ভয়ানক কমিয়া যায়। তখন নদীর সব জায়গা দিয়া নৌকার চলাচলের সুবিধা হয় না, মাঝে মাঝে

চীনদেশে বলদে নৌকা টানে

বালির চড়াতে নৌকা ঠেকিয়া আটকাইয়া যায়। চীনদেশের বহু লোক নৌকাতেই তাহাদের জীবন কাটায়। গরম কালে তাহারা নৌকা টানিবার জন্য বলদ লাগায়। এই দৃশ্য দেখিতে বেশ অদ্ভুত।

—

যুদ্ধ-বিরাম-পত্র স্বাক্ষরের স্মৃতিস্থান—

ফ্রান্সের কঁপিয়েঞ্ নামক স্থানে গত মহাযুদ্ধের যুদ্ধ-বিরাম অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষরিত হয় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর। কঁপিয়েঞ্ জঙ্গলের মাঝে যেখানে এই পত্র স্বাক্ষরিত হয়, সেখানটি পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং একটি স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। কয়েকটি স্মারকস্তম্ভের দ্বারা এই স্মৃতি রক্ষিত হইবে। যেখানে মার্শাল ফশ্ ট্রেন্ হইতে অবতরণ করেন সেখানে একটি মর্ম্মর-স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে। যেখানে জার্ম্মান্ পক্ষ ট্রেন্ হইতে অবতরণ করেন সেখানেও একটি মার্ব্বেল-পাথরের চিহ্ন আছে। যেখানে বসিয়া অঙ্গীকারপত্র সই করা হয়

যুদ্ধ-বিরাম-পত্র স্বাক্ষরের স্মৃতিস্থান (ফ্রান্স)

সেখানেও একটি চিহ্ন আছে (ছবির মাঝখানে)। ডান দিকে ফরাসী দল অবতরণ করেন এবং বামদিকে জার্ম্মান্ দল অবতরণ করেন। ছবির উপরে একটি মর্ম্মর-স্তম্ভ দেখা যাইতেছে, উহা যুদ্ধে নিহত ফরাসী সৈন্যদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। প্যারিসের এক খবরের-কাগজওয়ালা উহা কঁপিয়েঞ্ সহরের লোককে দান করিয়াছে।

—

মাছধরা বাতি—

রাত্রে অন্ধকারেও এবার ছিপে মাছধরা চলিবে। বঁড়শীর সুতার সঙ্গে একটি ছোট বিদ্যুতের বাতি বাঁধা থাকিবে। তাহা জলে ডুবিবে না—সব সময়ে জলের উপর ভাসিবে। যখন মাছ টোপ গিলিবে তখন বাতিটি মাঝে মাঝে জলে ঈষৎ ডুবিবে। মাছের ঠোক্রান বাতির জলে ওঠানামা দেখিয়া বেশ ভালই বুঝা যাইবে। এই বিদ্যুতের বাতি বেশ ভাল ফাৎনার কাজ করিবে।

ভাসমান মাছধরা বাতি—ইহার সাহায্যে রাত্রেও মাছ ধরা চলিবে

জুতা-বুরুশ-করা কল—

পা-দানীতে পা ভরিয়া দিয়া কলের একটি গর্ত্তে একটি এক-আনি ফেলিয়া একটা হাতল ধরিয়া টানিবা মাত্র তিন মিনিটে জুতা বুরুশ এবং কালি লাগান হইয়া যাইবে। এই জুতাবুরুশ কল অনেকটা ওজন-করা কলের মত দেখিতে। কেবল পা রাখিবার জায়গাটা একটু ভিন্ন রকমের। কলের ভিতরে একটি সিকি-মাত্রা ঘোড়া-জোরের মোটর আছে—হাতল টানিবা মাত্র এই মোটরের সাহায্যে চারটি বুরুশ চলে। প্রথমে জুতা ঝাড়া হয়; তার পর বুরুশে আপনা-আপনি কালি ছিটাইয়া যায়। তাহা জুতার গায়ে লাগিয়া বুরুশের ঘসানিতে চক্‌চকে হইয়া উঠে। এই কলে জুতা পরিষ্কার খুব ভাল হয় এবং সময় ও খরচ খুব কম লাগে। ক্রমে এই কলের বিস্তার সব দেশেই হইবে আশা করা যায়।

—
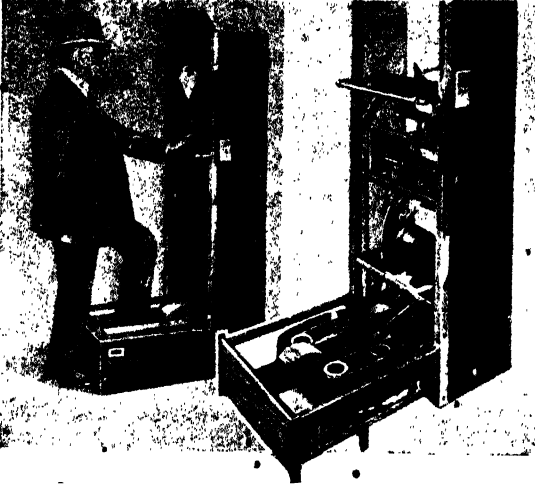
জুতা বুরুশের কল—ইহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পয়সা দিয়া পা ভরিয়া দিলেই কালি-বুরুশ হইবে

হারানো-ছেলের খোঁয়াড়—

কলিকাতায় অনেক মেলা ইত্যাদিতে এবং এম্‌নি সাধারণ সময়েও অনেক ছোট ছেলে মেয়ে হারাইয়া যায়। কাহারো ছোট ছেলে হারাইয়া গেলে ৩২টি থানা ঘুরিয়া হায়রান হইয়াও অনেক সময় কোন ফল লাভ হয় না। অনেকে আবার হারানো ছেলে পাইয়া নিজেদের বাড়ীতে রাখিয়া খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন, বা কাহার ছেলে হারাইয়াছে

হারানো ছেলের খোঁয়াড়

নিজেরাই খোঁজ করেন। তাহাতে যাহাদের ছেলে হারাইয়াছে ও যাহারা পাইয়াছে তাহাদের উভয় পক্ষকেই অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উইস্‌কন্‌সিন্ প্রদেশের এক সহরে একটি পার্কের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে হারানো ছেলেদের রাখা হয়। যদি কেহ হারানো ছেলে পায় তবে সে তাহাকে এইখানে রক্ষকদের হাতে পৌঁছাইয়া দেয়। যাহার ছেলে হারায় সেও অন্য কোথাও ছেলের খোঁজ না করিয়া বরাবর এই হারানো ছেলের খোঁয়াড়ে আসিয়া হাজির হয়। হারানো ছেলে মেয়ে এইখানে খাবার খেলনা সঙ্গী ইত্যাদি সবই পায় এবং বেশ মনের আনন্দে থাকে।

কলিকাতায় এমনি ধরণের একটা কিছু করিলে অনেকের অনেক অনাবশ্যক খাটুনি ও উদ্বেগ বাঁচিয়া যাইবে। মিউনিসিপ্যাল ও পুলিস কর্ত্তাদের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বয়স্কাউটদের কৃতিত্ব—

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ের ইভ্যান্‌ষ্টন প্রদেশের বয়স্কাউটদল ৳৮০০ দিয়া একটি নাবিকদের পুরাতন বাড়ী ক্রয় করে। তার পর বাড়ীটিকে ২০ মাইল

এই বাড়ীখানিকে ২০ মাইল টানিয়া আনা হয়

দূরে স্থানান্তরিত করে। এখন বাড়ীকে মেরামত ইত্যাদি করিয়া তাহারা রূপান্তরিত করিয়াছে।

জ্যাকি কুগানের বাহাদুরী—

যাঁহারা চলন্ত ছায়াচিত্র বা বায়স্কোপ দেখেন তাঁহারা জ্যাকি কুগানকে

জ্যাকি কুগান তাহার পিতার সহিত মোটর দৌড় দিতেছে—তাহার বাচ্চা গাড়ী দেখিবার জিনিষ

বেশ ভাল রকমই চেনেন। ছবিতে দেখুন সে তাহার বাচ্চা মোটরকারে করিয়া তাহার পিতার প্রকাণ্ড মোটরের সহিত সমানে দৌড় দিতেছে।

হেমন্ত

কষ্টিপাথর

গান

আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাইরে দাঁড়া!
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরাণ দিক না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।
বোস্‌না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন ল'য়ে
অরুণ-আলোর স্বর্ণ-রেণু-
মাখা হ'য়ে।
যেথানেতে অগাধ ছুটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া;
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া;

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, পৌষ, ১৩২৯) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

তুমি ভাবো গোপন র'বে
লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া?
তোমার আসা হাওয়ায় ঢাকা
ওগো সৃষ্টিছাড়া।
হিয়ায় হিয়ায় জাগ্‌ল বাণী
পাতায় পাতায় কানাকানি
"ঐ এল যে", "ঐ এল যে"
পরাণ দিল সাড়া।
এই ত আমার আপ্‌নারি এই
ফুল-ফোটানোর মাঝে
তোমায় দেখি নয়ন ভরে'
নানা রঙের সাজে।
এই যে পাখীর গানে গানে
চরণধ্বনি ব'য়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই ত দিলে নাড়া॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৯)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে
তারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস্‌নে।
তার একলা ঘরের ব্যথা হতে
উঠুক না গান নানা স্রোতে,
তার আপন সুরের ভুবন মাঝে
তারে থাক্‌তে দে।
তোর প্রাণের মাঝে একলা মানুষ যে
তারে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস্‌নে।
কোন্ আরেক একা তারে খোঁজে
সেই ত তারি দরদ বোঝে,
যেন পথ খুঁজে পায় কাজের ফাঁকে
ফিরে যায় না সে॥

(প্রবর্ত্তক, মাঘ, ১৩২৯) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব

নগেন-বাবু ও দীনেশ-বাবু দুজনেই মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি ১১ শতকে আরম্ভ। তাঁহাদের প্রমাণ শূন্যপুরাণ আর ধর্ম্মমঙ্গল। নিরঞ্জনের উষ্মা নামে রামাই পণ্ডিতের একটি ছড়া মুসলমান আক্রমণের অনেক পরে ইংরেজী ১৪ শতকের লেখা।

ধর্ম্মমঙ্গলের গল্পটা একটু পুরাণ বটে। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল বইখানা তত পুরাণ নহে। সেটা ১৪ শতকের বেশী আগের বলিয়া মনে হয় না।

বৌদ্ধ গান ও দোহা খৃষ্টের ১০ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ১১র শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল বোধ হয়। সেগুলি সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গান। লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য। লুই ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুইজনে "লুই-অভিসময়" নামে একখানি সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন। শ্রীজ্ঞান ৯৮০ সালে জন্মান, ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে ভোটের রাজার অনুরোধে ভোটদেশে যান। সেখানে ১৪ বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ১০৫২ সালে মরেন। সুতরাং লুই যখন একটা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা গান লেখা হইয়াছে, তখনই শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। শ্রীজ্ঞান নাড়ু পণ্ডিতের শিষ্য এবং লুইএরও শিষ্য। কাজেই লুইএর যখন অনেক বয়স হইয়াছে, তখন শ্রীজ্ঞানের বয়স অল্প। "লুই-অভিসময়" যদি ১১ শতকের প্রথম ভাগে লেখা হয়, তাহা হইলে লুইএর গানগুলি তার আগে লেখা হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি ১০ম শতকে আরম্ভ হইয়া ১১ শতকে শেষ হইয়াছে।

লুই বাঙ্গালী ছিলেন।

নেপালীরা বলে,—যে প্রসিদ্ধ ৮৪ জন সিদ্ধ ছিলেন। ১৩২৫ সালে মিথিলার রাজা হরিসিংহের সভামণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য তাঁহার বর্ণনরত্নাকর নামক গ্রন্থে ৮৪ সিদ্ধার নাম দিয়াছেন। সম্প্রতি হল্যাণ্ড হইতে যাভা দ্বীপের ৮৪ সিদ্ধার নাম বাহির হইয়াছে। আমি যে টেঙ্গুর হইতে ৩৩ জন গীতিকারের নাম দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ২৪টি মিলিল, বাকী মিলে না।

আমার বোধ হয়, অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই বহুসংখ্যক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। নাথপন্থ যোগীদিগের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি সিদ্ধ পুরুষের নাম পাইয়াছি। তাই মনে হয় যে, ৮৪ সিদ্ধা একটা পুরাণ কথা মাত্র। কোন সম্প্রদায়েই এত সিদ্ধ পুরুষ থাকা সম্ভব নয়, সকল সিদ্ধ পুরুষের তালিকায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাই একটি তালিকা আর-একটি তালিকার সঙ্গে মেলে না।

আমি নেপালে একটু ভুটিয়া ছবি দেখিয়াছিলাম। উহাতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি আছে। নেওয়ারীতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি পাইলাম না—অষ্টসিদ্ধার ছবি আনিয়া দিল।

খৃঃ ১০ম ১১শ শতে বাঙ্গালা সাহিত্যটা খুব বিস্তৃত ছিল। লেখকদের জীবনচরিত লেখার রীতি ছিল। তাঁহাদের চিত্ররক্ষার রীতি ছিল। কৃষ্ণাচার্য্য হেবজ্রতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন, হেবজ্রতন্ত্রেই বাঙ্গালা গান অনেক রহিয়াছে। সুতরাং সেগুলি কৃষ্ণাচার্য্য এবং হেবজ্রতন্ত্র, দুইএরই আগে;—কত আগে, জানি না; অন্ততঃ ১০০ বছর আগে ত হইবে। তাহা হইলেই সাহিত্যটা গিয়া খৃঃ নবম শতে পড়িল। এইরূপ অভয়াকর গুপ্ত বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি বাঙ্গালা গান তুলিয়াছেন। এক জায়গায় খানিকটা বাঙ্গালা তুলিয়া সংস্কৃতে তাহার টীকা করিয়াছেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথের আর-একটা নাম মচ্ছন্দনাথ। তিনি কৈবর্ত্ত ছিলেন—তাঁহাকে অনেক জায়গায় কেয়ট পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, ধীবরও বলা হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্রের বাড়ী চন্দ্রদ্বীপে ছিল। এ চন্দ্রদ্বীপ বরিশালের চেঁদো। চন্দ্রদ্বীপ অনেক কাল হইতে তান্ত্রিকদের একটা বড় আড্ডা এবং উহারই নিকটে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামকে গ্রাম লইয়া নাথপন্থী যোগীরা বাস করে।

(সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

—

চিত্রলক্ষণ

৯ বৎসর পূর্ব্বে বের্টোল্ড্ লাউফের (Berthold Laufer) নামক একজন জার্ম্মান পণ্ডিত তিব্বতীয় তাঞ্জুর-গ্রন্থমালা হইতে "রিমোস্‌শান্তি" বা "চিত্রলক্ষণ" নামক একখানি শিল্পশাস্ত্র জার্ম্মান অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থনিবিষ্ট বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর, বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তকের তিব্বতী অনুবাদ প্রস্তুত হয় এবং এই-সকল পুস্তক লইয়া কাঃ জুর এবং তাঞ্জুর নামক দুইটি বৃহৎ গ্রন্থমালা গ্রথিত হয়। আমাদের আলোচ্য "চিত্র-লক্ষণ" পুস্তকখানি তাঞ্জুর-গ্রন্থমালাভুক্ত। উক্ত গ্রন্থমালার সূত্র-বিভাগের ১২৩ খণ্ডে চারিখানি শিল্প-শাস্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে,—

১। দশতলন্যগ্রোধপরিমণ্ডলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণনাম। ২। সম্বুদ্ধভাষিতপ্রতিমালক্ষণবিবরণীনাম। ৩। চিত্রলক্ষণম্। ৪। প্রতিমামানলক্ষণনাম।

"চিত্রলক্ষণ" তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে নানা পরিমাপ ও নানা আকৃতির চক্ষু উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, ৩৬ প্রকার নয়নভঙ্গী আছে। তৃতীয় অধ্যায়েই চিত্রশিল্পের রীতি-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা ও "চিত্র-লক্ষণ" গ্রন্থের পার্থিব উৎপত্তি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায়ের শেষে "নগ্নজিৎ-কৃত চিত্র-লক্ষণ" বলিয়া গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

রাজা নগ্নজিৎ প্রথম পৃথিবীতে চিত্রবিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন। পুরাকালে ভয়জিৎ নামক এক যশস্বী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন—আমার বালকপুত্র আজ অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার প্রিয় পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনুন।

রাজা তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে যমকে সম্মুখে আনিলেন ও ব্রাহ্মণ-তনয়কে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। যম অস্বীকার করিলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শেষে যম যখন পরাজিতপ্রায়, তখন ব্রহ্মা আসিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ-তনয়ের আকৃতি অনুসারে বর্ণসহকারে একটি চিত্র অঙ্কিত কর।" রাজা তাহাই করিলেন ও ব্রহ্মা সেই চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন।

ব্রহ্মা তখন রাজাকে বলিলেন,—"তুমি অদ্য যেরূপ নগ্নপ্রেত-দিগকে জয় করিলে, চিরকাল সেইরূপ নগ্নজিৎ হইয়া থাক।" তিব্বত ও চীনদেশের চিত্রবিদ্যায় এটি একটি মূলতত্ত্ব যে, চিত্রকর দেব-দৈত্যাদির চিত্রাঙ্কণ করিয়া তাহাদিগকে বশ করিতে পারেন।

জীবলোকে ইহাই প্রথম চিত্র। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে একাধিক স্থলে নগ্নজিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গান্ধারী ও শকুনির পিতা—গান্ধাররাজ সুবলই নগ্নজিৎ। তাঁহাকে "প্রহ্লাদশিষ্য" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—"সর্ব্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছিল। চৈত্য নির্ম্মাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কণ আবশ্যক হয়। এইজন্য চিত্রবিদ্যা বেদস্বরূপ পরিগণিত হয়। আমিই প্রথম মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি এবং আমিই মানুষকে প্রথম এই বিদ্যা শিখাইয়াছি।" নগ্নজিৎ শব্দ চিত্রশিল্পী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নগ্নজিৎ বিশ্বকর্ম্মার শিষ্য। নগ্নজিতের চিত্রলক্ষণ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, কারণ বরাহ মিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় অন্ততঃ দুই স্থলে নগ্নজিতের শিল্প-মতের উল্লেখ করিয়াছেন। চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে মুখমণ্ডলকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—চিবুক ৪ অঙ্গুলি, নাসিকা ৪ অঙ্গুলি, কপাল ৪ অঙ্গুলি—মোট ১২ অঙ্গুলি। ইহা ব্যতীত চক্রবর্ত্তীর মস্তকোপরি উষ্ণীষ বলিয়া যে কেশগুচ্ছ থাকে, তাহার মাপ ৪ অঙ্গুলি। সুতরাং সর্ব্বসুদ্ধ ১৬ অঙ্গুলি।

চিত্রলক্ষণ সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগ্রন্থ। মহাদেবকে বারংবার নমস্কার করায় অনুমান হয়, আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শৈব ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মারই প্রাধান্য। বৈদিক যজ্ঞে বিগ্রহাদির স্থান নাই। কিরূপে ও ঠিক কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দেবদেবীর মূর্ত্তি-গঠন বা প্রতিমা-চিত্রণ আরম্ভ হইল, তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যে ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, জাতক ও ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রে ঋষিগণ যে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কল্পনার অভাব ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এই কল্পনাকে তাঁহারা রূপদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তথাপি বৈদিক যজ্ঞবেদীর পরিকল্পনায় ও যূপস্তম্ভাদি নির্ম্মাণে তাঁহাদের শিল্পকল্পনা কতকপরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চিত্রলক্ষণকার বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে চৈত্যশব্দের উল্লেখ বিরল। আমরা বৌদ্ধ চৈত্যের সহিতই বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞসম্পর্কে এক প্রকার চৈত্যের উল্লেখ চিত্রলক্ষণ মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৯৪ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

চিত্রলক্ষণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবলোকে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির পর দেবতারা নিজেরাই নিজেদের মূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন। এইরূপে পূজা ও বলিবিধি উৎপন্ন হইল। প্রথম অধ্যায়ে মানুষ স্বাভাবিক স্নেহপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে মনুষ্যচিত্রাঙ্কণে

প্রবৃত্ত হইয়া, তাহার কথা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বের কল্যাণের জন্য জীবলোকের পক্ষে দেবোপাসনার পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মপ্রণোদিত হইয়া দেবগণ কিরূপে স্ব স্ব মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন, তাহার কথা আছে।

চক্রবর্ত্তি-চিত্রলক্ষণই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য বিষয়। শিল্প-রচনাপদ্ধতি ও শিল্পের নিয়ম সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

গান্ধারের অনেক ভাস্কর্য্য-নিদর্শনে চিত্রশিল্পসুলভ লক্ষণের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, এ কথা কল্পনা করা যাইতে পারে যে, গান্ধারে একটা প্রাচীন চিত্রকলা ছিল। তিব্বতীয় ধর্ম্মচিত্রগুলি সেই চিত্রকলার একটা প্রত্যন্ত-শাখা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

চীনদেশে একটি ঐতিহ্য আছে যে, বাজনা ও ওয়াই-চি-ই-সোঙ্গ নামক দুইজন খোটানি চিত্রকর ভারতীয় চিত্রশিল্পের আদর্শ কোরিয়া ও চীনদেশে প্রবর্ত্তিত করেন।

পরিমাপগুলি বরাবর অঙ্গুলি-হিসাবে পরিমিত। যাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহারই অঙ্গুলি দ্বারা মাপ লইতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য, বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন পরিমাপ হইতে পারে, কিন্তু একটি চিত্রমধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর অনুপাত ঠিক থাকা চাই।

চক্রবর্ত্তী পুরুষের রূপবর্ণনা—

"মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্রমা চক্রবর্ত্তী ভূপতির সহিতই তাহার তুলনা, তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া প্রভামণ্ডল চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রপ্রভার ন্যায় শুভ্র। তাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, তাঁহার গ্রীবা সুন্দর, তাঁহার কপাল সুন্দর। তাঁহার কেশের বর্ণ সুন্দর, উজ্জ্বল ও কোমল, তাঁহার কেশাগ্র কুঞ্চিত। তাঁহার নাসিকা উন্নত ও ঋজু, তাঁহার ওষ্ঠাধর রক্তিম। তাঁহার দন্তরাজি মুক্তাধবল, তাঁহার চক্ষুদ্বয় আকাশের ন্যায় নীলাভ, সুদীর্ঘবিশ্রান্ত। তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে তেজঃপুঞ্জ ঊর্ণা শোভমান। তাঁহার শুভ্রকায় অতি সুন্দররূপেই চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কর্ণদ্বয় সমভাবে চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায়। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পরিপুষ্ট। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সুসংযুক্ত। হস্তপদ সুপুষ্ট ও সুগোল এবং শরীর মাংসল। নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত ও গভীর। তাঁহার শরীর সকল দিকেই সুগোল, সুতরাং সন্ধিস্থলগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার উরুযুগল হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল। তাঁহার জানু বা গুল্‌ফগ্রন্থি দৃষ্টিগোচর হইবে না। তাঁহার নখর অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়। তাঁহার পদতল চক্র-চিহ্নিত। তাঁহার অঙ্গুলি দীর্ঘ ও সুগোল। তাহার বর্ণ চম্পকপুষ্পের ন্যায়।"

আদর্শ পুরুষের শরীর মাংসল হইবে বটে, কিন্তু চিত্রমধ্যে কোথাও বন্ধুর মাংসপেশী, শিরা বা গ্রন্থি দেখান হইবে না। বক্ষস্থল সুপুষ্ট হইবে, অথচ সমতলভাবে চিত্রিত হইবে। চক্রবর্ত্তী বা দেবতার মূর্ত্তিতে গুম্ফ-শ্মশ্রু আদৌ থাকিবে না। তাঁহাদিগকে ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় চিত্রিত করিতে হইবে। তাঁহাদের শরীর সিংহোদরের ন্যায় দীর্ঘবিস্তৃত। এই-সকল লক্ষণ ভারতীয় ও তিব্বতীয় চিত্রে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রলক্ষণকার নয়ন-চিত্রণ সম্বন্ধে যত বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন, সেরূপ আর কোন অঙ্গ সম্বন্ধে দেন নাই। কারণ, চক্ষুই ভাব-ব্যঞ্জনার প্রধান সহায়। তিনি আকার-ভেদে পঞ্চপ্রকার চক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন ;—(১) ধনুরাকৃতি ; (২) উৎপলপত্রাকৃতি ; (৩) মৎস্যোদরাকৃতি ; (৪) পদ্মপত্রাকৃতি ; (৫) কড়ি-সদৃশাকৃতি। প্রত্যেক আকারের চক্ষুর দৈর্ঘ্য-বিস্তারের পরিমাপ দেওয়া হইল। ধনুরাকৃতি চক্ষু নিমীলিতপ্রায়, ইহার বিস্তার ৩ যব মাত্র। ধনু হইতে উৎপলাদিক্রমে বিস্তার ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। কড়িচক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ফারিত। ইহার বিস্তার ১০ যব। ধ্যানস্থ যোগীদের চক্ষু ধনুরাকৃতি। সাধারণ লোকের চক্ষু উৎপলাকৃতি। রাজা, রমণী ও প্রেমিকের চক্ষু মৎস্যোদরাকৃতি। ভয় বা ক্রন্দনসূচক চক্ষু পদ্মপত্রাকৃতি। যাতনা- ও ক্রোধব্যঞ্জক চক্ষু কড়ির ন্যায় বিস্ফারিত। দেবতাদিগের চক্ষু চিত্রিত করিলে রাজা-প্রজার কল্যাণ বৃদ্ধি হয়। দৈবনেত্র দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও স্নিগ্ধ নয়নপল্লবে কোন কর্কশতা নাই, আভা পদ্মপত্রের ন্যায় এবং নীলবর্ণ মণির মধ্যে নানা বর্ণলীলায় সুচঞ্চল, চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ।

চক্ষুর ন্যায় ভ্রূরও প্রকারভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, প্রশান্ত ব্যক্তির ভ্রূ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, নর্ত্তনশীল ; ক্রোধাবিষ্ট ও ক্রন্দনশীল ব্যক্তির ভ্রূ ধনুরাকৃতি ; ভীতিগ্রস্ত ও বিলাপকারী ব্যক্তির ভ্রূ নাসাসন্ধি হইতে উত্থিত হইয়া অর্দ্ধকপাল জুড়িয়া থাকে।

যে কয়প্রকার বর্ণের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

১। লাল—উৎপলাকৃতি চক্ষুর ধারবর্ত্তীভাগে ; ওষ্ঠাধরপ্রান্ত (বিম্বফলের ন্যায়) ; নখর (লালাভ) ; নখের ভিতর দিক্‌ (উৎপলবৎ, নাগরাজ-ফণাবৎ) ; করতল (রক্তপদ্মবৎ, শশাসৃক্‌বৎ) ; জিহ্বা (রক্তবৎ) ; পদপ্রান্তে অলক্তরাগ।

২। শুক্ল—দেবতাদিগের চক্ষু (দুগ্ধবৎ) ; দন্ত (মুক্তাবৎ) দুগ্ধবৎ পদ্মবীজবৎ তুষারবৎ সুমন (জাতি)-পুষ্পবৎ ; চক্রবর্ত্তীর পরিচ্ছদ।

৩। নীল—চক্ষুতারকা (আকাশবৎ) ; কেশ (ইন্দ্রনীলমণিবৎ, ভ্রমরবৎ, অঞ্জনবৎ, ময়ূরকণ্ঠবৎ, আকাশবৎ)।

৪। কৃষ্ণ—চক্ষুর মণি।

৫। জাফরান—করনখপ্রসাধনে ব্যবহৃত।

৬। সুবর্ণ—চক্রবর্ত্তীর গাত্রবর্ণ (জাম্বুনদসুবর্ণবৎ, প্রস্ফুটিত পদ্মবীজবৎ, চম্পকবৎ)।

এই ছয়টি বর্ণের মধ্যে লাল, শুক্ল, নীল ও সুবর্ণ, এই কয়টি বর্ণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা) শ্রী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

কলিকাতার কথা

লর্ড এলেনবরার আমলে এদেশের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট পদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

রুড়্‌কীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হার্ডিঞ্জের সময়ে স্থাপিত হয়।

রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ছাপাখানা করিয়া বিনামূল্যে বিরাট্‌ সংস্কৃত অভিধান বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাকে দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাজ ও অন্নসংস্থানের উপায় হইয়াছিল। এই অক্ষয় কীর্ত্তির জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তিনি কলিকাতার ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য করিতেন। মতিলাল শীল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গায় বিদ্যালয় করিয়াছিলেন ও অসমর্থ অক্ষম নরনারীদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের অতিথিশালায় অগণ্য নিরন্ন আতুর আজও অন্নলাভ করিয়া থাকে।

রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর

(সুবর্ণবণিক-সমাচার, মাঘ)

জিজ্ঞাসা

(১৪৭)

বৎসযুক্তা গাভী সুযাত্রিক

গোবৎসকে গাভীর স্তন্য পান করিতে দেখিলে, লোকে "যাত্রা" দেখিলাম বলিয়া থাকে কেন ?

শ্রী অসিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী

(১৪৮)

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম-রচয়িতা

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম রচয়িতা দ্বিজ হরিদাস কোথায় এবং কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? তাঁহার রচিত আর কোন পদাবলী আছে কি ?

শ্রী সুধাংশুভূষণ পুরকাইত

(১৪৯)

আম-আদা

আম-আদা সচরাচর মিষ্টান্নে ও চাটনীতে ব্যবহৃত হয়। ইহা কি অন্য কোনরূপ কাজে ব্যবহার করা যায় না? পারিলে কিরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা হয় ?

শ্রী আনন্দময় মুখোপাধ্যায়

(১৫০)

ধান্যদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ

ধান্য দূর্ব্বা মস্তকে দিবার আবশ্যকতা কি ? ইহার কি কোন শাস্ত্রীয় বিধান আছে ?

শ্রী অসিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী

(১৫১)

হেঁয়ালি

বাজার হইতে আনীত বেনে-মসলার একটি মোড়ক খুলিবার সময় সেই কাগজখণ্ডে নিম্নলিখিত কয়টি লাইন পাইলাম। তাহা পাঠ করিয়া ইহা একটি হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইল। ইহার অর্থ কি ?

"মা বাপ জনম না ছিল যখন,
আমার জনম হল,
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল।
ভগ্নীর জনম না ছিল যখন
ভাগ্নে হইল বুড়া,
অনিত্য কুলেতে একি বিপরীত,
ন মাতা ন পিতা খুড়া।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস,
মাটীর জনম না ছিল যখন
তখন হয়েছে চাষ।
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ,
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছি
ইহা না বুঝয়ে কেউ।"

শ্রী সতীশচন্দ্র সরকার

(১৫২)

ইংরেজি-বাংলা বারের নামের মিল

আমাদের বাংলা সন মাস ও তারিখের সঙ্গে ইংরেজী সন মাস তারিখের কোন মিল নাই, কিন্তু বারের মিল আছে। যেমন সন ইং ১৯২৩ বাংলা ১৩২৯ ; মাস ইং ফেব্রুয়ারি বাং মাঘ ; কিন্তু সোমবার মঙ্গলবার এই-সকলের মিল আছে। কবে হইতে এই বারের মিল হইল ? কেন মিল হইল ? ইহার কারণ কি ?

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে

(১৫৩)

হেঁয়ালি

দ্বাদশ লোচন তার বিংশতি চরণ।
রণচণ্ডী নহে সেই পৃথিবীদলন॥
রিপুগণ দেখি সেই উদ্ধ মুখে ধায়।
বন্ধন ঘুচায়্যা দিলে রিও (?) মুখে খায়॥১॥
তিন চরণ ধরি সেই চলে পর-পায়।
অস্থি মাংস নাই বৈসে রাজার সভায়॥
বুঝ বুঝ পণ্ডিত হে হেঁয়ালি প্রবন্ধে।
মুণ্ড থাকিতে সে ভোজন করে কন্ধে॥২॥

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর এক পুঁথিতে এই দুটি হেঁয়ালি আছে। অর্থ কি ?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৫৪)

ইতিহাসের তামস যুগ

নবম শতাব্দী হইতে রাজপুত অভ্যুদয় পর্য্যন্ত এই সময়টাকে ইতিহাসে Dark Age বা তামস যুগ বলে কেন ? ইহার কি কোন ইতিহাস এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই ? যদি গিয়া থাকে তবে কোথায় এবং কোন্ ইতিহাসে পাওয়া যাইবে ?

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার

(১৫৫)

মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষেধ

মাঘ মাসে মূলা না খাইবার কারণ কি ? এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বা পৌরাণিক কোন কারণ আছে কি না ?

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৫৬)

গালি দিতে আঙুল মট্‌কানো

মেয়েরা অপরকে গালি দিবার সময় আঙুল মট্‌কায় কেন ?

শ্রী কামাখ্যাপদ নন্দী

(১৫৭)

সাত সমুদ্র তের নদী

সাত সমুদ্র তের নদী কি কি ?

শ্রী সুধাংশুভূষণ পুরকাইত

(১৫৮)

ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ

ভূমিকম্পের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক কারণ কি ?

শ্রী নির্ম্মাল্য সেন

(১৫৯)

নারিকেল গাছ কাটা নিষেধ

হিন্দুরা নারিকেল গাছ কাটে না কেন ?

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

(১৬০)

অম্বুবাচী

অম্বুবাচীর মধ্যে বিধবাগণ অগ্নিপক্ক জিনিষ খায় না কেন ?—ইহার শাস্ত্রসঙ্গত কারণ কি ? স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোনও কারণ থাকিলেই বা তাহা কি ?

শ্রী ক্ষিতীশ রায়

(১৬১)

নারিকেল কাতা তৈয়ারীর কল

আমাদের বাংলা দেশে নারিকেলের ছোব্‌ড়াগুলির অপব্যবহার হয়, অথচ আমাদিগকে গৃহ-কার্য্যের জন্য নারিকেল কাতা (দড়ি ও দড়া) উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। আমাদের দেশের গরীব লোকের উপযোগী নারিকেল দড়ি প্রস্তুতের কোন যন্ত্র আছে কি না ? থাকিলে কোথায় কি মূল্যে পাওয়া যায় ?

শ্রী মহিমচন্দ্র সরকার

(১৬২)

বামাকণ্ঠ

যদিও উচ্চারিত শব্দার্থ হইতেই মেয়েদের কথা বলিয়া অনুমান করা যায় না, তথাপি অপরিচিত স্ত্রীলোকও অদৃষ্ট অবস্থায় যে-কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে উহা স্ত্রী-স্বর বলিয়া প্রায়ই চিনিতে পারা যায়। ইহার জন্য "শব্দবিজ্ঞান" (science of sound) কোন কারণ দর্শাইতে পারে কি ?

শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(১৬৩)

গার্শী ব্রত

পাবনা অঞ্চলে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রিতে প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে "গার্শী" নামে একপ্রকার পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোথায়ও এরূপ আছে কি ?

শ্রী রাধাচরণ দাস

মীমাংসা

(৮৮)

পটল তোলা

পটল = চক্ষুর পাতা। চক্ষুর পাতা উল্টায় মৃত্যুকালে। তাহা হইতে পটল তোলা মানে মরিয়া যাওয়া। পটোল তোলা নহে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯৯)

বোতামের কল

নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে সকল প্রকার বোতামের কল পাওয়া যাইবে।

(1) Jolly Button & Co.—Dayaganj, Dacca

(2) Basanti Button & Co.—Shahajlal Nagore, Dacca

(3) Allibhoy Vallijee and Sons—Multan Cantonment

(4) Dacca Manufacturing Co.—75, Lyall Street, Dacca

(5) S. Gupta and Co.—45-1 Harrison Rd., Cal.

(6) Hindu Button Factory—Bombay.

বোতামের কলের সম্বন্ধে অন্য বেশীকিছু জানিতে হইলে ৯১নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে, দর্জ্জিপাড়ায় শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লিখিলেই, জানিতে পারিবেন। গুটিসুতার কলের একটি সচিত্র বিবরণ বর্ত্তমান বর্ষের মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে বাহির হইয়াছিল। বিবরণ-দাতা শ্রীযুক্ত বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়কে পত্র লিখিলে কলের ঠিকানা পাওয়া যাইবে। বিবরণে কোন ঠিকানা ছিল না।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(১০৯)

কানে আঙুল দিলে শব্দ

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে কানে আঙুল দিলে শব্দ হওয়ার যে কারণ বিবৃত হইয়াছে, উহা সন্তোষজনক মনে হয় না। কর্ণবিবর-মধ্যস্থিত বায়ুর উষ্ণ হাওয়াই যদি মূল কারণ হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ বায়ু যে উষ্ণ হয়, উহার প্রতপ্ত হইবার কারণ কি ? প্রত্যুত্তরে এই বলা যাইতে পারে কর্ণবিবরের ত্বক্, প্রবিষ্ট অঙ্গুলির অগ্রভাগ অথবা এই দুইটাই। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইবা মাত্রই শব্দ উৎপন্ন হইতে থাকে। কিন্তু রন্ধ্রের ত্বক্ বা অঙ্গুলির তাপ এত অধিক নয় যে রন্ধ্রস্থিত বায়ু তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত হইবে।

আরও একটা বিরুদ্ধ যুক্তি দেখান যাইতে পারে। অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্র সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় না বটে, কিন্তু খানিকটা কাপড় রন্ধ্রে বেশ করিয়া চাপিয়া পুরিয়া দিলে একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। এক-প্রকার বলিতেছি এইজন্য যে ঐ প্রকারে বন্ধ করিলে ভিতরের বায়ু একটা শোষণযন্ত্রের সাহায্যে বাহির করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সামান্য একটুখানি উত্তপ্ত হাওয়ার দরুণ বায়ুর যে বেগ সঞ্চারিত হয় উহা মৃদু এবং চাপ দেওয়া মোটা কাপড়ের ভিতর দিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিতে পারিবে না। কিন্তু কাপড় দিয়া কর্ণবিবর ঐরূপ বন্ধ করিলেও দেখা যায় যে ভিতরে একটা শব্দ অনুভূত হয়, যদিও ঐ শব্দের জোর কম।

কর্ণবিবরে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইলে রন্ধ্রের ত্বক্ এবং অঙ্গুলিতে অবস্থিত

ছোট ছোট ধমনীগুলিতে (arteries) চাপ পড়ে। তাহাতে যে উদ্বেগ সঞ্জাত হয় তাহা রক্তস্থিত বায়ুতে প্রবাহিত হওয়ায় বায়ুতে কম্পন উৎপন্ন হয়। উহাই কর্ণপটহে লাগিয়া শব্দ উৎপন্ন করে। অবশ্য এই কারণ কোনও পুস্তকে লেখা নাই, ইহা কল্পনাপ্রসূত। তবে ধমনীর উপর চাপ দিয়া উহাতে ষ্টেথোস্কোপ বসাইয়া শুনিলে একপ্রকার শব্দ হয় উহা জানা আছে।

শ্রী হরিসাধন ভড়

(১১৬)

বাছুরকে খুর খাওয়ানো

গরুর নূতন বাছুরকে খুর খাওয়ানোর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। খুরে জেলাটিন নামক একপ্রকার প্রোটীন (আমিষ) জাতীয় দ্রব্য প্রচ্ছন্ন থাকে। উহা বেশ দুষ্পাচ্য এবং শুন্যদুগ্ধেরও উপরে ঐ দুষ্পাচ্য পদার্থ খাওয়াইলে কি যে উপকার হইবে তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। যদি বিশেষ কুসংস্কার না থাকে তবে ঐ স্থলে দুই চারিটা বাছুরকে খুর না খাওয়াইয়া উহাদের জীবনেতিহাসের সহিত গোটা-কতক খুর-খাওয়ান বাছুরের জীবনেতিহাস তুলনা করিয়া দেখিলেই প্রশ্নকর্ত্তার এ বিষয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে।

শ্রী হরিসাধন ভড়

(১২০)

ফিনাইল

ফিনাইল আল্‌কাৎরার fractional distillation হইতে প্রস্তুত হয়। দুই বা ততোধিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে হয় না। তৈয়ারী করিতে হাঙ্গামও আছে এবং অত্যধিক তাপে (১৮০°—১৯০°C) চোলাই করিবার জন্যও কতকগুলি যন্ত্রপাতিও দরকার হয়। গৃহে তৈয়ারী করিয়া লইতে যথেষ্ট অসুবিধা হয় এবং আমার বিশ্বাস খরচও বেশী পড়ে। কারণ আল্‌কাৎরা উক্ত উপায়ে চোলাই করিবার সময় আরও অনেক জিনিস প্রস্তুত হয় (যেগুলি গৃহস্থের নিত্য ব্যবহারোপযোগী নহে) এবং ঐ-সকল বাড়্‌তি জিনিষ বিক্রীত হয় বলিয়াই ফিনাইল আন্দাজ ৩৲ টাকা গ্যালন দরে বাজারে পাওয়া যায়।

ফিনাইল বিষনাশক এবং দুর্গন্ধনাশক। কেরোসিন তৈল উহার তুলনায় খুব কম বিষনাশক এবং উহার যেটুকু বিষনাশক শক্তি আছে তাহাও জলে মিশেনা বলিয়া বিশেষ কাজে লাগে না। আরও কেরোসিন তৈল ড্রেন ইত্যাদির গন্ধ নাশ করিলেও নিজের গন্ধ বজায় রাখে এবং অনেকের পছন্দমতে কেরোসিনের গন্ধ ফিনাইলের গন্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তার পর যেখানে-সেখানে ছড়ানো কেরোসিন তৈলের উপর পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি চুরুট প্রভৃতি ফেলিলে অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়া যাইতে পারে।

শ্রী হরিসাধন ভড়

কেরোসিন তৈলের সহিত পানে-খাওয়া চুনের জল মিশাইলে উত্তম ফিনাইল হয়। ফিনাইল তৈয়ার করার আরও সহজ উপায় বাহির করার জন্য কতকগুলি compound যাহাদিগকে ডাক্তারী ভাষায় deodorant এবং disinfectant বলে তাহাই স্থির করা হইয়াছে এবং সামান্য কৃতকার্য্য হইয়াছি। জিনিসগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল—১। কেরোসিন। ২। তারপিন। ৩। কাঠকয়লা-পোড়া। ৪। Bleaching powder। ৫। ফটকিরি। ৬। হীরাকষ।

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দাস

(১২৪)

জাপানী যুযুৎসু

জাপানী যুযুৎসু খেলার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত—W. H. Garrud প্রণীত The Complete Ju-jitsuan নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। প্রকাশক Methuen & Co. Ltd., 36 Essex St, London W. C.

শ্রী অমরেন্দ্র সাহা

(১২৬)

ব্রহ্মা- ও সূর্য্য-মন্দির

ব্রহ্মা :—পাটনা জেলার অন্তর্গত রাজগৃহে ব্রহ্মকুণ্ড নামক তীর্থে ব্রহ্মার সুন্দর পুরাতন মূর্ত্তি আছে, তাহার পূজার্চ্চনা এখনও রীতিমত হয়। রাজগৃহের সকল কুণ্ডগুলির মধ্যে ব্রহ্মাকুণ্ডেরই বেশী প্রাধান্য। হরিদ্বারেও মন্দিরের ভিতর এক ব্রহ্মকুণ্ড আছে, ইহা "হর কি পৈড়ি" নামক প্রসিদ্ধ ঘাটের উত্তরে। অনেকে "হর কি পৈড়ি"কেই ভ্রমক্রমে ব্রহ্মকুণ্ড বলে। বদরিনারায়ণে—ব্রহ্মকপাল তীর্থে পিণ্ডদান হয়; এখানে মূর্ত্তি দেখি নাই, একটা ছোট্ট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

সূর্য্য :—পাটনা জেলার অন্তর্গত "বড়গাঁও" গ্রামে এক প্রাচীন মন্দির ও কুণ্ড আছে। এইখানেই "নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের" লুপ্তোদ্ধার হইয়াছে। কার্ত্তিক ও চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে এইস্থানে এতদ্দেশীয় "ছঠ্" ব্রত উপলক্ষে মেলা হয়।

রাজগৃহেও সূর্য্যকুণ্ডে এক সূর্য্যমূর্ত্তি আছে—প্রতি রবিবারে এই কুণ্ডে স্নান করিবার জন্য অনেকে যায়। এই কুণ্ডের জলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

আচার্য্য শ্রী শ্যাম ভট্ট

(১৩৩)

লেবু-গাছের পোকা ধ্বংস।

কেরোসিন তৈল ও দধি সমান ভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটি মৃত্তিকা-পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়। ২।৩ দিন পরে সকাল ও সন্ধ্যায় উক্ত তৈল লইয়া পিচ্‌কারী সংযোগে লেবু-গাছের উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে। এই-প্রকারে ২।৩ দিন ছড়ান আবশ্যক। বাগানের মধ্যে সন্ধ্যায় আগুন জ্বালাইলেও কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হয়।

ফসলের পোকা নামক পুস্তক ও ১৩২৮ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'র ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রী জগন্নাথ দাস

(১৩৪)

মুর্শিদাবাদের জঙ্গলে কামান

"এই কামানের নাম জাহানকোষা বা জগজ্জয়ী। এই স্থানে মুর্শিদকুলী খাঁর কামানাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত আছে। সেইজন্য আজিও সাধারণে এই স্থানটিকে তোপখানা কহিয়া থাকে।"

মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ শেষ জীবনে এইখানে একটি মসজেদ নির্ম্মাণ ও কাটরা বা গঞ্জ স্থাপন করেন (ইং ১৭২৩।২৪)। জাহানকোষা সেই সময় হইতে এখানে থাকাই সম্ভব।

"জাহানকোষা অনেক দিন পর্য্যন্ত ধরণীবক্ষে স্বীয় বিশালবপু বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; ইহার পার্শ্বে অশ্বত্থ-বৃক্ষ জন্মিয়া জাহানকোষাকে ভূতল হইতে কতকটা ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে।"

—মুর্শিদাবাদ-কাহিনী।

এই বিশাল তোপটির সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় কৃত 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'র জাহানকোষা তোপ পড়িবেন।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(১৩৫)

জলুস সন

জলুস সন ১৭২৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদশাহের রাজ্য প্রাপ্তির সন। মহম্মদ শাহের সময়ে বঙ্গদেশ দিল্লীর সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল। অতএব তাহার পর আর সন জলুস প্রচলিত হয় নাই।

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১৩৬)

চীনে আলু ও চীনে বাদাম

"চিনিয়া" বা "চিনে" কথাটি চিনির শুভ্রতা লক্ষ্য করিয়া হইয়া থাকিবে। চীন দেশের সহিত ইহার আদৌ কোনও সম্পর্ক নাই। হিন্দিতেও "চিনিয়া" শুভ্রতা লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। "চিনিয়া কলা" "চিনিয়া মাটি" ইত্যাদি কথার লক্ষ্য শুভ্রতা। তবে বেনারসী "চিনিয়া পোত" কাপড়ের কি লক্ষ্য বলিতে পারিলাম না।

আচার্য্য শ্রী শ্যাম ভট্ট

(১৩৭)

কাশীর অশোকস্তম্ভ

"ভারতবর্ষে" যে ছবিটা বাহির হইয়াছিল তাহা কুইন্স কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন যুগের স্তম্ভের ছবি। উহা অশোকের প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রায় শতবর্ষপূর্ব্বে কাপ্তেন বার্ট্ নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার গাজীপুর জেলার পহ্লাদপুর গ্রাম হইতে ইহাকে এখানে আনিয়াছিলেন। স্তম্ভটির গাত্রে এক লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছোট খোদিত লিপি আছে। ফ্লীট গুপ্তলিপি সম্বন্ধীয় তাঁহার পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অক্ষরগুলি কিন্তু গুপ্তাক্ষর অপেক্ষা পুরাতন; খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখমালার অক্ষর-সমূহের সর্ব্বাংশে অনুরূপ। লিপিটি হইতে জানা যায় যে ইহা শিশুপাল নামক কোন নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (অলকা, ভাদ্র, ১৩২৯, পৃঃ ৩৯৬-৯৭)

রাজঘাট ষ্টেসন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ এবং গাজীপুরের রাস্তার সংযোগস্থলে কপালমোচন কুণ্ড বা ভৈরোঁতলাও নামক প্রকাণ্ড একটি পুরাতন পুষ্করিণীর পাশে উচ্চ এক ভূখণ্ডের উপর লাট ভৈরোঁর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কুণ্ডের চারিদিকে প্রাচীন কীর্ত্তির যে বিধ্বস্ত নিদর্শন আজও দেখা যায় তাহা হইতে মনে হয় যে এখানে এককালে কোন সুবৃহৎ হর্ম্যাদি ছিল। লাট অর্থে স্তম্ভ এবং ভৈরোঁ বা ভৈরব কোতোয়াল। অর্থাৎ লাট ভৈরোঁ কাশীর দ্বারপাল এবং সেজন্য নগরীর উত্তর সীমানায় যেন পাহারায় দণ্ডায়মান। এইখানে পূর্ব্বে একটি ভৈরোঁর মন্দিরও ছিল। কথিত আছে যে অওরঙ্গজিব তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে বর্ত্তমান ইদ্‌গা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। যে উচ্চ ভূখণ্ডের উপর ইদ্‌গা অবস্থিত তাহাকে হিউয়েন্-সঙ্-বর্ণিত স্তম্ভের পার্শ্ববর্ত্তী সুবৃহৎ স্তূপটির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। দীর্ঘকাল হইতেই এই উচ্চ ভূখণ্ড পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং এই স্থানের অধিকার লইয়া উভয়পক্ষে অনেকবার দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হোলি এবং মহরম একই দিনে পড়ে এবং শোভাযাত্রার অধিকার লইয়া উভয়পক্ষে খুব একটা মারামারি হয়। সেই সময় মুসলমানরা দল বাঁধিয়া আসিয়া লাট ভৈরোঁকে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ভগ্নখণ্ডসমূহ টানিয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দেয়। কথিত আছে যে তাহার পূর্ব্বে লাটভৈরোঁ ২৫ হস্তের অধিক দীর্ঘ ছিল।

লাটভৈরোঁর এখন ৩।৪ ফুট মাত্র অবশিষ্ট আছে। মাটির নীচে কতখানি আছে তাহা বলা যায় না। উহা এক্ষণে আগা গোড়া তাম্রাবরণে মণ্ডিত এবং সিন্দূর-চর্চ্চিত হইয়া শিবলিঙ্গরূপে পূজিত হইতেছে। অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাম্রাবরণ খোলাইতে পারেন নাই। তাই অনেকে মনে করেন যে যাহারা শিবলিঙ্গ বলিয়া ইহার পূজা চালাইয়াছিল তাহারা জানিত যে আসলে ইহা তাহা নহে। তাই পাছে ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে সেইজন্য ইহাকে একেবারে তাম্রের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন এই অংশে কোন খোদিত লিপি বা অপর কোন কারুকার্য্য আছে তাই পূজারীদের এই লুকাইবার প্রয়াস। হিউয়েন্ সঙ্-কর্ত্তৃক অশোক-স্তম্ভের স্থান নির্দ্দেশ, লাটভৈরোঁর এককালে উচ্চতার কাহিনী, সন্নিকটে বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন ও পূজারীদের ভৈরোঁলাটকে লুকাইবার চেষ্টা এবং লাট ভৈরোঁর নাম হইতেই ইহাকে কোন প্রাচীন স্তম্ভের নিদর্শন, সম্ভবতঃ হিউয়েন্-সঙ্-উক্ত বারাণসীর অপর অশোক-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ মনে করিবার কারণ।

সারনাথ ব্যতীত কাশীর নিকটে অনেকস্থানে এখনও বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শন দেখা যায়। মৈদাঘাটের নিকট চোরঘাটেও একটি ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভ শিবলিঙ্গ বলিয়া পূজিত হইতেছে। আলাইপুর রেল ষ্টেশনের দক্ষিণে বকরিয়াকুণ্ড নামক একটি পুরাতন পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখণ্ড প্রস্তরে সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ "কেনা" কথাটি মাসকয়েক পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছিলাম। সেই সময়ে লাট ভৈরোঁও দেখিয়াছিলাম।

লাট ভৈরোঁ সম্বন্ধে E. B. Havellএর Benares, M. A. Sherringএর The Sacred City of the Hindus এবং Dr. Führerএর Monumental Antiquities and Inscriptions in the North-Western Provinces and Oudh দ্রষ্টব্য।

শ্রী অমৃতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৪০)

দন্তে তৃণ

দন্তে তৃণ করিয়া নিজেকে তৃণভোজী পশুর সমান করা, চরম দীনতার লক্ষণ। প্রাচীন কালে এইরূপে দীনতা প্রকাশ করা হইত—

দশনেত তৃন করি বোলো মো তোক্ষারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কাণ্ড মাণ্ড করএ জম দাঁতে করএ খড়।—শূন্যপুরাণ।

দাঁতে খড় গলায় বড় চুনকালি কপালে।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল।

কিষ্কিন্ধ্যায় আসি বেটা দাঁতে করে খড়।

দাঁতে কুটে করে এলি পরশুরামের স্থানে।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

কোন রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে করিলেক তৃণ।—কবিচন্দ্রের রামায়ণ।

দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বাঁধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে কর জোড় করি॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সেনাপতি হরিসিং নুলিয়া পাঠান-দিগকে এমন শাসন করিয়াছিলেন যে তাঁর আগমনের সংবাদ পাইলেই পাঠানেরা দাঁতে কুটা করিয়া হাতে পায়ে ভর করিয়া হামাগুড়ি দিয়া বলিত—ম্যয় গৌ হুঁ - আমি গোরু, তুমি হিন্দু, আমাকে বধ করিও না। Sir Lepel Griffin's Ranajit Singh দ্রষ্টব্য।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৪৫)

বিদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

জার্ম্মানী—খরচপত্র ও কোর্স সম্বন্ধে গত মাসের "প্রবাসীর" "বেতালের বৈঠক" দ্রষ্টব্য। গত জুন মাসের "Collegian" পত্রিকায় এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ১৫ই অক্টোবর ও ১৫ই এপ্রিল সেশন আরম্ভ হয়।

ইংলণ্ড—Secretary, Provincial Advisory Committee, Calcutta or Daccaর নিকট লিখিলেই অথবা সাক্ষাৎ করিলে সকল খবর পাওয়া যাইবে।

আমেরিকা—ইউনিভার্সিটি বুঝিয়া খরচের পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ বাৎসরিক ১০০ ডলার হইতে ২০০ ডলার শিক্ষার দক্ষিণা লাগে। বাস ও আহার ইত্যাদিতেও মাসিক প্রায় (৪·৪৬ ডলার = ১ পাউণ্ড = ১৫ টাকা) ৪৫—৫০ ডলার লাগে। মিশিগান, ওহিও, ইলিনয় ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানকার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক সেই ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিলেই সকল খবর পাইবেন। নীচের ঠিকানায় লিখিলেও যাবতীয় খবর পাওয়া যাইবে।

(1) Hindusthan Association of America
2026 Center St. Berkeley, California U. S. A.

(2) Do. 1400 Broadway, New York, U. S. A.

শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্তরায়

(১৪৬)

কচ্ছপ অযাত্রিক

কার্পাসং কচ্ছপং চূর্ণং কুক্কুরং শব্দকারিণম্—দেখিয়া যাত্রা নিষেধ।—বসন্তরাজশকুন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

"ব্রজেদ্দিগীশং হৃদয়ে নিধায় যথেন্দ্রমৈন্দ্র্যামপরাশ্চ তদ্বৎ। সুগুরু মাল্যাম্বরভূষণেন্দ্রো বিসর্জ্জয়েদ্দক্ষিণপাদমাদৌ। স্নাতঃ সিতাম্বরধরঃ সুমনাঃ সুবেশঃ সম্পূজিতোঽমরগুরুদ্বিজগোদিগীশঃ।"—ইতি বিষ্ণুপুরাণম্।

যাত্রাকালে মন প্রফুল্ল করিয়া পবিত্র ভাবনা ও ঈশ্বরস্মরণ করা বিধেয়। কচ্ছপ কুৎসিত ও অপ্রিয় দর্শন জীব; তাহার দর্শনে উক্ত বিধির লঙ্ঘন হয়, এ জন্যই বোধ হয় যাত্রা কালে উহার নাম করিতে বাধা আছে।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(১৪৭)

বৎসযুক্তা গাভী শুভযাত্রিক

যাত্রাকালে শুভ ও অশুভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বহু দ্রব্যের তালিকা প্রাচীন বহু পুস্তকে প্রচুর পাওয়া যায়।—বিষ্ণুসংহিতা ৬৩ অধ্যায়, মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ গণেশ খণ্ড ১৬ অধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭০ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ ২৩৪ অধ্যায়; গরুড়পুরাণ ৬০-৬১ অধ্যায়; মূল মহাভারতের বহু বহু স্থান; বসন্তরাজশকুন নামক শাকুনিক গ্রন্থ; প্রাচীন বাংলাকাব্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, রামনারায়ণের ধর্ম্মমঙ্গল ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ধেনুর্ব্বৎসপ্রযুক্তা বৃষ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নির্
দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভো দ্বিজ-নৃপ-গণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা, দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলম্ ইহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥
—সময়প্রদীপ।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১৫০)

ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ

দূর্ব্বাকে ঋগ্বেদে ভূরিমূল, ভূরিকাণ্ড, শতগ্রন্থি, সহস্রপর্ণ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছিল। সেই লক্ষণায় দূর্ব্বা ও ধান্য আশীর্ব্বাদের প্রতীক হয়—ধানদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করার তাৎপর্য্য এই যে ধান্য-দূর্ব্বার ন্যায় আশীর্ব্বাদের পাত্রপাত্রী দীর্ঘজীবী ও বহুসন্ততি হোক; একটি দূর্ব্বাঙ্কুর ও একটি ধান্য বপন করিলে তাহা যেমন বহু হয়, তেমনি আশীর্ব্বাদের পাত্রপাত্রী বহুপ্রজা ও দীর্ঘজীবী হউক। আশীর্ব্বাদের বৈদিক মন্ত্রে আছে—কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি, পুরুষঃ পুরুষঃ পরিএবান, দূর্ব্বে প্রতু সহস্রেণ শতেন চ।—প্রত্যেক কাণ্ড বা গ্রন্থি হইতে দূর্ব্বাঙ্কুর যেমন উদ্গত হয় ও পুরুষপরম্পরায় পরিবর্দ্ধমান হয়, তুমি হে দূর্ব্বা সেইরূপ ইহাকে বংশপরম্পরায় শতসহস্র বর্দ্ধিত বিস্তৃত করো।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকার পুলক

ছোট্ট খোকার একটুকু প্রাণ—
পুলক না তায় ধরচে গো,
ঐ, হাসিতে কুটিকুটি
হেসেই লুটে পড়চে গো।
ঘর-পোষা এ পাখীর পাখায়
কে অসীমের হাওয়া লাগায়,
খিড়্‌কি-পুকুর হড়কা-বানে
হঠাৎ বুঝি ভরচে গো!

ছোট্ট খোকার একটুকু প্রাণ—
পুলক না তায় ধরচে গো,
হাজার কথা অফুট কচি
কণ্ঠে যে ভীড় করচে গো।
একতারাটির তারের পরে
কে আজ ধ্রুপদ আলাপ করে,
বিস্ময়ে হায় আমার মুখে
বাক্যটি না সরচে গো!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

তোষলা বা তুষু পূজা

নদীয়া জেলার অনেক স্থানে ঐ পূজা প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলেও উহা পৌষ মাসে হইয়া থাকে। কেবল নামের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বালিকারা এখানে উহাকে 'তুস্‌তুলসী' বলিয়া থাকে। ছড়াতেও পার্থক্য আছে, যেমন—

তুস্‌তুলসী পূজন, সোনার থালে ভোজন,
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু,
শঙ্খের আগে সুবর্ণের খাড়ু।
বেগুনের পাতা ঢোলা ঢোলা, মায়ের কানে সোনা তোলা,
মা যখন পুত বিয়াবে, কলার তাড়া দিয়া রাত পোহাবে।

বালিকারা আশ্বিন-সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে যে পূজা শেষ করে, তাহার নাম, 'যমপুকুর'। এই পূজায় উঠানের কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র পুকুর কাটিয়া তন্মধ্যে কিছু জল ও তাহার চারিদিকে কলাই মটর ইত্যাদি বুনিয়া দেয় এবং কয়েকটা কাঠির ডগায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির পাখী বসাইয়া, সেগুলি ঐ পুকুরের চারপাশে কলাই-মটরের গাছগুলির মধ্যে পুতিয়া দেয় ও নিম্নলিখিত ছড়া বলিয়া প্রতিদিন প্রভাতে পূজা করিয়া থাকে।

হেলেঞ্চা কলমী লক্ লক্ করে, রাজার বেটা পংখী মারে,
মারে পংখী ভরে বিল, সোনার কৌটা রূপার খিল।
খিল খুলিতে লাগ্‌ল ছড়্, আমার বাপভাই লক্ষ্মীশ্বর।
যমরাজার মা পূজন, সোনার থালে ভোজন,
সোনার থালে ক্ষীরের লাড়ু,
শঙ্খের আগে সুবর্ণের খাড়ু।

এইরূপে 'ধোপা, পাট্‌নী, জেলেনী, পশু-পাখালি পূজন,—সুবর্ণের খাড়ু।' বলিয়া পূজা শেষ করে; কারণ ঐ পুকুরের কোণে কোণে ধোপা, পাটনী, জেলেনীর মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি তৈরী করিয়া রাখিয়া দেয়।

তার পর, কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে যে পূজা আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে শেষ করে, তাহার নাম 'সাঁজই বা সেঁজুতি'। এ পূজার সময় সন্ধ্যাকাল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পিটলু বা পিঠালি (চাউল বাঁটা) দিয়া মাটিতে আলিপনা দেয়,—গঙ্গা যমুনা, ময়না, গয়না, হাতাবেড়ি ইত্যাদি। তাহাতে সিঁদুরের ফোঁটা ও দুর্ব্বা দিয়া নিম্নলিখিত ছড়া বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

সাঁজপূজনী সেঁজুতী, বার ঘরে বারতি, বুড়োর ঘরে ঘৃতের বাতি।
কাঁটায় পড়িল ছাতি, তাই তুলিতে এত রাতি।
গম এল ছালা ছালা, তাই তুলিতে এত রাতি।

এইরূপে 'ধান, যব, কলাই, মটর এল ছালা ছালা···এত রাতি', ক্রমে ক্রমে এই ছড়ার আবৃত্তি করে। তার পর বলে,—

হাতা হাতা হাতা খাই সতীনের মাথা,
বেড়ি বেড়ি বেড়ি, সতীন মাগী চেড়ী।
ময়না ময়না ময়না, সতীন যেন হয় না,
এজন্মে দিলাম আমি পিটলুর গয়না।

বলিয়া পূজা শেষ করে। ইহার পরই পৌষ মাসে 'তুস্‌তুলসীর' পূজা। অতএব দেখা যাইতেছে, আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষের সংক্রান্তিতে তিনটি পূজা শেষ হয়। এবং ছড়াতেও অনেক সাদৃশ্য আছে। ছড়াগুলি অবশ্য আমার স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত। উহার স্থানে স্থানে অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তিনটি পূজাতেই সংযোগ আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার ভিতরে পৌরাণিকতা আছে কি না তাহার সবিশেষ সন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার

সন্ধ্যা-রাণী

সন্ধ্যারাণি, সন্ধ্যারাণি!
এই যে মোদের গোপন মিলন,—
কেউ জানে না,—আমরা জানি।
পশ্চিমের ঐ গগন-কোণে
এলে তুমি সংগোপনে
উড়িয়ে দিয়ে মৃদুল বায়ে রেশ্‌মী মেঘের আঁচলখানি॥
রক্ত-রাঙা মুখের পরে অসীম-ছাওয়া ঐ যে নীলা—
ও ত' তোমার এলিয়ে-দেওয়া মুক্ত কেশের সহজ লীলা।
শান্ত নদীর মুকুর-তলে
দেখ্‌ছ কি মুখ কৌতূহলে!
সীমন্তে কে পরিয়ে দিল হীরক-টিপ্ ঐ কখন্ আনি'!
তোমায়-আমায় এম্‌নি ক'রে নদীর ধারে নিতুই দেখা,
লক্ষ লোকের চোখের তলেও আমরা দু'জন একা-একা!
তোমায় আমি, ওগো প্রিয়া,
ভালবাসি হৃদয় দিয়া,
শুনেছি গো তোমার মুখে ভালবাসার মৌন বাণী॥

গোলাম মোস্তফা

জয়ন্তী

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যর্থ মনস্কাম

বনবিহারিণী জয়ন্তীকে মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীন ভুলিয়া যান নাই। খদিজা বেগমের প্রতি অনুগ্রহের কারণ ফাতেমার উপর রাগ; মলেকা বেগমের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ কৃপার কারণ পূর্ব্বস্মৃতি ও খদিজার সুপারিষ। কিন্তু অজ্ঞাতনাম্নী অপরিচিতা বনবাসিনী সর্ব্বক্ষণ মন্‌সব্‌দারের স্মৃতিতে জাগিতেছিল। সেই সঙ্গে অনুচরদিগের অপমানে তাঁহার দারুণ ক্রোধ হইয়াছিল। একটা স্ত্রীলোক তাঁহার লোককে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়!

যে রাত্রে বিহারীলালের গৃহে হোলির উৎসব, তাহার পরদিন মন্‌সব্‌দার মকদুম শাহকে ডাকাইলেন। তাহাকে বলিলেন, "বিহারীলাল চৌধুরীর সঙ্গে গিয়া একটা স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলাম মনে পড়ে ?"

"হাঁ জনাব, খুব মনে পড়ে। বড়ি খুবসুরৎ অওরৎ, হুজুরের হবেলীর লায়েক।"

"আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল। রমজান ও তিন জন সিপাহীকে তাহাকে আনিতে পাঠাই। তাহার লোকেরা আমার লোককে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।"

মকদুম শাহের চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল—"কি এত বড় হিম্মত! এমন স্পর্দ্ধা!"

"তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া শাদীর বাঁদী করিব।"

"বেশক্ বেশক্, এই সাজাই ঠিক। হুকুম হয় ত আমি লস্কর লইয়া তাহাকে পাকড়াইয়া আনি।"

"না, বেশী লোকের কাজ নাই, বেকায়দা গোলমাল হইবে। আমি নিজে যাইব।"

মকদুম শাহ মস্ত একটা সেলাম করিল, "তাহা হইলে ফৌজের কি প্রয়োজন? আপনি ইচ্ছা করিলে বনের বাঘ ধরিয়া আনিতে পারেন।"

"কাল কেহ উঠিবার আগে দশ জন লোক লইয়া আমার সঙ্গে যাইবে। এ কথা যেন প্রকাশ না পায়।"

মকদুম জিভ কাটিল, "খোদাবন্দ, এও কি কোন কথা! কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত জানিবে না।"

মকদুম শাহ চলিয়া যাইলে রমজানের ডাক পড়িল। সে মনে মনে সব পীরদের নাম করিতে করিতে আসিল।

মন্‌সব্‌দার চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, "বেইমান, তোকে মারিয়া তাড়াইয়া দিতে হইবে।"

"হুজুর, আমার কি কসুর ?"

"তুই জানিস্ না তোর কসুর? সে দিন মার খাইয়া কুকুরের মত লেজ গুটাইয়া পলাইয়া আসিস্ নাই ?"

"হুজুর, এক জন লোককে দশ জন লোক যদি পিছন হইতে হঠাৎ আসিয়া বাঁধিয়া মারে তাহা হইলে কি তাহার অপরাধ ?"

"তুই ভারি নালায়েক। আচ্ছা, এবার মাপ করিলাম। কাল সকালে সেই বদ্‌বখৎ অওরৎকে ধরিয়া আনিতে আমি খোদ যাইব। তুই আর তোর সঙ্গীরা আমার সঙ্গে যাইবি।"

রমজান তৎক্ষণাৎ মানৃতা শিন্নী মনে মনে দ্বিগুণ করিয়া দিল। মাটীতে হাত ঠেকাইয়া সেলাম করিয়া কহিল, "বহুৎ খুব, হুজুর।" সে আর দাঁড়াইল না। তাহার ধারণা বাদ্‌শাহেরা আর মন্‌সব্‌দারেরা অব্যবস্থিতচিত্ত, তাঁহাদের প্রসাদও ভয়ঙ্কর।

রাত্রি থাকিতে দশ জন লোক সঙ্গে লইয়া মন্‌সব্‌দার নিঃশব্দে বাহির হইলেন। বনে প্রবেশ করিতে রৌদ্র উঠিল। সকলে চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। বৃক্ষের মূলে গর্ত্ত সকলে দেখিল, কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। সকলে বলিল, উহার ভিতর বাঘ আছে।

ব্যর্থমনোরথ হইয়া মন্‌সব্‌দার ফিরিলেন। বনের বাহিরে পথের ধারে একটা ডোবায় পুণ্ডরীক মাছ ধরিবার উদ্যোগ করিতেছিল। রমজানকে ডাকিয়া চুপিচুপি বলিল, "শেখ সাহেব, কিছু শিকার মিলিল ?"

রমজান ঘাড় নাড়িল।

পুণ্ডরীক বলিল, "কোন শীকারটা বা উড়িয়া যায়, কোনটা বা গর্ত্তে প্রবেশ করে গর্ত্তে খুঁজিয়াছিলে?"

"উহার ভিতর বাঘ আছে।"

"ঠিক কথা। বাঘটা কোন্ দিন তোর মন্‌সব্‌দারের ঘাড় মট্‌কাইয়া রাখিবে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ ও সন্ন্যাসী

বাদ্‌শাহের আর ভিক্ষুকের ডাক যমরাজের কাছে ঠিক সমান পড়ে, কিছুমাত্র তফাৎ হয় না। প্রভেদ জীবনে, মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই। একটু বুঝিয়া দেখিলে জীবনেও কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু বাহ্য আড়ম্বরে।

বাদ্‌শাহের ডাক পড়িবার সময় আগাইয়া আসিতেছিল। তিনি নিজে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে যাহারা আসিত তাহারাও বুঝিতে পারিত। বাদ্‌শাহ আর শয্যা ত্যাগ করিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সময় কোরান শরীফ পড়িতেন, হাতে সকল সময় তস্‌বি থাকিত।

বাদ্‌শাহ রাজকার্য্যে আর অধিক মনোযোগ করিতেন না। উজীরকে বলিতেন, "আর ত আমার অধিক সময় নাই, খোদাতালার চিন্তা করিতে যাও। ইহার পর তোমাদের কি হইবে?"

"জাঁহাপনা, সে কথা ভাবি না। আমারও ত সময় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন্ শাহজাদা তখ্‌তনশীন হইবেন হুজুরের ইর্‌শাদ হওয়া উচিত।"

"কে আমার কথা শুনিবে? যদি আমি সামান্য নগরবাসী হইতাম তাহা হইলে অন্তিমে কোন আদেশ করিলে পুত্রেরা আমার আদেশ পালন করিত, কিন্তু আমি যে বাদ্‌শাহ, মৃত্যুশয্যায় আমার আদেশ আমার মৃত্যুর পর আমার কোন্ সন্তান পালন করিবে? এ কথা কেহ একবার ভাবে না! যতক্ষণ আমার নিশ্বাস বাহিবে এই বিরাট্ সাম্রাজ্যে আমার মুখের কথা অঙ্গুলির ইঙ্গিত সেই মুহূর্ত্তে রক্ষিত হইবে। কাহার কয়টা মাথা আছে যে আমার ভ্রূভঙ্গ অবহেলা করে? আমার দুই পুত্র এখানে আসিবার জন্ত অস্থির হইয়াছে, কিন্তু আমি অনুমতি না দিলে সাধ্য কি যে নগরে প্রবেশ করে? আর আমি মরিলে? এই মৃত্যুশয্যায় যদি আমি কোন আদেশ করি আমার মৃত্যুর পর কে তাহা শুনিবে? যদি হাতিমকে সিংহাসন ও রুস্তমকে সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলের নিজামত দিয়া যাই তাহা হইলে সে আদেশ কে পালন করিবে? দুই ভাইয়ে বিবাদ হইবেই, যে জিতিবে সেই তখ্‌ৎ লইবে। যে হারিবে সে হয়ত প্রাণ হারাইবে। ভাইয়ে ভাইয়ে এমনি সদ্ভাব, পিতার মৃত্যুকালীন আদেশে এমনি আস্থা! বাদ্‌শাহী যে কি চীজ এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। চক্ষে মৃত্যুর অঙ্গুলিস্পর্শে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছি।"

আসন্ন মৃত্যুর সাক্ষাতে বাদ্‌শাহের চিন্তাশীলতা ও গভীর সত্যভাষিতা লক্ষ্য করিয়া উজীর আশ্চর্য্য হইলেন। এরূপ ক্ষমতাবান্ না হইলে কি যে-সে কোটি কোটি লোকের উপর একাধিপত্য করিতে পারে? একটু পরে উজীর বিনয়নম্র কণ্ঠে কহিলেন, "আপনার তুল্য জ্ঞানী কে আছে? হুজুরের কাছে শাহজাদাদের তলব হইবে? আপনি কি তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহেন না?"

"আমি দেখিতে চাহিলে কি হইবে, তাহারা কি আমাকে দেখিতে চাহে? তাহারা আসিয়া দেখিবে আমি মরিয়াছি কি বাঁচিয়া আছি, আর তাহারা দেখিবে সিংহাসন। শয়নে স্বপনে তাহাদের সেই দিকেই দৃষ্টি থাকিবে। দুই ভ্রাতা দুই জনের মৃত্যু কামনা করিবে, আমার মৃত্যুকালে এই প্রাসাদেই চক্রান্ত করিবে। সৈন্য, প্রজা, রাজপুরুষ, অমাত্য, ভৃত্য, খোজা, বেগম, বাঁদী সকলেই তাহাতেই জড়িত হইবে। কে আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা করিবে? আল্লাহ্‌তালার নিকট কে আমার জন্য দোয়া মানাইবে? এখন বরং ভাল, শান্তিতে মরিব। শাহজাদাদের আসিবার প্রয়োজন নাই।"

উজীর আর কি বলিবেন, অন্য দুই চার কথা কহিয়া উঠিয়া গেলেন। তাহার পর হাতিমের মাতা, জহানারা বেগম, বাদ্‌শাহকে দেখিতে আসিলেন। স্বামীর আদেশ-মত পালঙ্কে তাঁহার পাশে বসিলেন। বাদ্‌শাহ তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন, "তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি অধিক ভাবিও না।"

বেগমের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "তোমার এমন অসুখ, আমরা ভাবিব না? ঈশ্বরের কৃপায় তুমি আরোগ্য হইয়া উঠিবে।"

বাদশাহ ক্ষীণ হাসি হাসিলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় আমি জীবন নামক কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিব। জীবন শেষ হইলে আধি ব্যাধি আর কিছুই থাকে না। সে কথা যাক। তোমার জন্য আমার বিশেষ ভাবনা নাই। হাতিম অথবা রুস্তম যেই বাদশাহ হউক তোমার সহিত কেহ অসদ্‌ব্যবহার করিবে না। তুমি সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত, কাহারও সহিত তোমার বিবাদ নাই। তোমার জন্য আমি স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি, তুমি সেইখানে থাকিবে। তোমার কোন কষ্ট হইবে না।"

"হাতিমকে তুমি ডাকাইয়া পাঠাও না কেন? সে ত তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।"

"তাহা হইলে ঘরোয়া বিবাদ হইবে, অপুর বেগমেরা গোল করিবেন। আর আমি যদি হাতিমকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যাই তাহা হইলে আমার সে কথা থাকিবে না। ভাইয়ে ভাইয়ে রাজ্যের জন্য যুদ্ধ বিবাদ হইবেই, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। তুমি যেমন আছ সেইরূপ থাক, রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে লিপ্ত হইও না।"

বেগম ভাল মানুষ, ক্ষান্ত হইলেন।

বাদশাহের কাছে আর কেহ না থাকিলেই সিরাজী বেগম আসিতেন। তিনি আসিলে বাদশাহ বিচলিত হইতেন। বলিতেন, "তোমার জন্য আমার বিশেষ ভাবনা। তুমি বুদ্ধিমতী, অনেক সময় অনেক বিষয়ে আমি তোমার পরামর্শ লইয়াছি। সকলেই জানে যে তোমার অসাধারণ ক্ষমতা, সকলেই তোমার মনরক্ষার চেষ্টা করে। আমার অবর্ত্তমানেও তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না। কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

বেগম কাঁদিলেন না, কাঁদিবার দিন এখনও অনেক আছে। কহিলেন, "তুমি যেমন বলিবে সেইরূপ করিব।"

"আমার মৃত্যুর পর বিবাদ নিশ্চিত। তুমি কাহার পক্ষ অবলম্বন করিবে?"

বেগম কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন।

বাদশাহ সস্নেহে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কহিলেন, "এখন চুপ করিয়া থাকিবার সময় নয়। আমার সময় অল্প। হয়ত তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারি।"

অগত্যা বেগম কহিলেন, "আমার ত পুত্র নাই, রুস্তমের মা নাই। আমি তাহাকেই অধিক ভালবাসি। আমার বিবেচনায় সেই সিংহাসনের উপযুক্ত।"

ক্ষণকাল বাদশাহ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তোমার বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রশংসার যোগ্য। তোমার সহিত আমার এক মত। তুমি যে রুস্তমের পক্ষে, একথা তাহাকে জানাইতে বিলম্ব করিও না।"

"তাহাকে জানাইয়াছি।"

বেগমের বুদ্ধি ও কার্য্যতৎপরতা দুই সমান বুঝিতে পারিয়া বাদশাহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব হইলেন। বেগম তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

দিন দুই পরে বাদশাহের ভৃত্য তাঁহাকে নিদর্শন-অঙ্গুরী আনিয়া দিল। বাদশাহ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যিনি এই অঙ্গুরী দিয়াছেন তাঁহাকে ডাক।"

গৌরীশঙ্কর গৃহে প্রবেশ করিলে বাদশাহ তাঁহাকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, কহিলেন, "আমার সময় নিকট। আপনার আশায় ছিলাম। আমি জানিতাম আপনার সহিত আর-একবার সাক্ষাৎ হইবে।"

"সমস্ত জানিয়াই আমি আসিয়াছি।"

"কি সংবাদ?"

"সংবাদ আশানুরূপ। দুই শাহজাদাই রাজধানীর অভিমুখে আসিতেছেন।"

"বিনা আদেশে?"

"আপনার আদেশ দিবার ক্ষমতা কতক্ষণ থাকিবে? আর আদেশ পাইলেও তাঁহারা ফিরিবেন না। আপনার অবস্থা তাঁহারা সম্যক্ অবগত আছেন। তাঁহারা আদেশ পালন না করিলে তাহার কোন ব্যবস্থা করিবার আপনার সময় হইবে না।"

"আমি থাকিতে তাহারা নগরে প্রবেশ করিবে না ত?"

"সে আশঙ্কা নাই।"

"দুই জনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

"না, শাহজাদা হাতিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই।"

"রুস্তমের মনোভাব বুঝিলেন?"

"তিনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া সাম্রাজ্য শাসন করিবেন।"

"আর কিছু?"

"আমাদের সহিত সদ্ভাব রাখিবেন।"

"আপনাদের বলের পরীক্ষা হইয়াছিল?"

"হইয়াছিল। শাহজাদার সৈন্য একদিন অগ্রসর হইতে পারে নাই।"

"আপনার কথায় অনেক নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার ক্লান্তি বোধ হইতেছে। আমাদের এখানে আর দেখা হইবে না।"

"না।"

বাদ্‌শাহ হাত বাড়াইয়া দিলেন। গৌরীশঙ্কর দুই হস্তে বাদ্‌শাহের হাত ধরিল।

তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া বাদ্‌শাহ গৌরীশঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কহিলেন, "খোদা হাফিজ!"

"শিবাস্তে পন্থানঃ!"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

লূতাতন্তু

রাজধানীর পূর্ব্বে শাহজাদা রুস্তম, দক্ষিণে শাহজাদা হাতিম। উভয়ের লক্ষ্য রাজধানীর দিকে, দুই জনে দুই জনের ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। শঙ্কাশূন্য পশুকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ব্যাঘ্র যেমন নিঃশব্দে অপেক্ষা করে দুইজনে রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য সেইরূপ অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু দুই জনের কেহই আর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিলেন না। মৃত্যু আসন্ন হইলেও বাদ্‌শাহ বর্ত্তমান, কাহার সাধ্য তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করে?

দুই জনে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল চারিদিকে বিস্তার করিতেছিলেন। অহোরাত্র গুপ্তচরের যাতায়াত, প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত মন্ত্রণা, সৈন্যদিগকে সর্ব্বদা উত্তেজনা। মাকড়সা যেরূপ দ্রুত জাল রচনা করে, রাজপুত্রেরা সেইরূপ করিতেছিলেন; কিন্তু সে জালের মধ্যস্থলে বসিয়া নিয়তি। ভবিতব্যের তাড়নায় দুই জনে চালিত হইতেছিলেন।

গৌরীশঙ্কর শাহজাদা রুস্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলিলেন, "বাদ্‌শাহকে দেখিতে গিয়াছিলাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার সহিত আর-একবার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

"কেমন দেখিলেন?"

"আয়ু পূর্ণ হইয়াছে, মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু বাদ্‌শাহের মেধা কিছু মাত্র ক্ষীণ হয় নাই, মনের দৃঢ়তাও হ্রাস হয় নাই।"

"আমাদের বিষয় কিছু কথা হইল? সিংহাসনের সম্বন্ধে তাঁহার কি অভিলাষ?"

"তিনি কাহাকেও উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবেন না। তিনি জানেন তাঁহার কথা রক্ষিত হইবে না। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। স্থির চিত্তে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

"আমার কর্ত্তব্য পিতার নিকটে এমন সময় উপস্থিত থাকা, কিন্তু আদেশ না পাইলে কেমন করিয়া যাই?"

এমন সময় সিরাজী বেগমের মহল হইতে খোজা আসিল। সে আসিয়া যেরূপ বাদ্‌শাহকে সেলাম করিতে হয়, সেই রকম করিয়া তিন পদ পিছু হটিয়া শাহজাদাকে কুর্ণীশ করিল।

শাহজাদা কহিলেন, "আমি ত বাদ্‌শাহ নই।"

খোজা বলিল, "জাঁহাপনা, আপনার বাদ্‌শাহ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সিরাজী বেগম সাহেবা আপনাকে বহুত বহুত দোয়া দিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজধানীর সকলে আপনার পক্ষে। তিনি বাদ্‌শাহকেও রাজি করিয়াছেন, কিন্তু সহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে ও বাদ্‌শাহের অমতে এখন আপনাকে সহরের ভিতর যাইতে পরামর্শ দেন না।"

রুস্তম বলিলেন, "অম্মা বেগম সাহেবার এ উপকার আমি ভুলিব না। যদি তখ্‌ৎ আমি পাই তাহা হইলে তাঁহার গৌরব বাড়িবে, খর্ব্ব হইবে না।"

শাহজাদা হাতিমের শিবিরেও অনবরত লোক আসিতেছে যাইতেছে। তিনি লঘুচেতা, কখন বলবতী

আশায় বলীয়ান্, কখন নিরাশাসাগরে মগ্ন। মূঢ় মোসাহেবেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে।

একজন বলিল, "শাহজাদা, আপনি বাদ্‌শাহের বড় পুত্র, সকল বিষয়ে আপনি বড়। শাহজাদা রুস্তম কেমন করিয়া আপনার বরাবরি করিবেন?"

দ্বিতীয়। "হাঁ, তাঁহার কিছু সৈন্য আছে বটে, কিন্তু আমাদের লস্করের সম্মুখে কত ক্ষণ দাঁড়াইবে? তিনি সন্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাকে একটা সুবা দিলেই হইবে।"

তৃতীয়। "তাহাই বা কেন? শাহজাদা তখ্‌ৎনশীন হইলে সে পরের কথা। তিনি বড় ভাইয়ের হুকুম মানিলে ভবিষ্যতে তাঁহারই লাভ।"

চতুর্থ। "আমি ত সত্য কথা জানি। অমন কণ্টক পথে না রাখাই ভাল।" কথাটা স্পষ্ট করিবার জন্য এরূপ ভাবে হাতের ভঙ্গী করিল যে যেন হাতে মাথা কাটা তাহার নিত্যকর্ম্ম।

সেনাপতি আসিয়া কহিলেন, "শাহজাদা, আপনার সহিত একান্তে কিছু কথা আছে।"

মোসাহেবেরা চটিয়া লাল। "একান্তে আবার কি কথা? শাহজাদা আমাদের নিকট হইতে কিছু গোপন করেন না।"

শাহজাদা সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমরা উঠিয়া যাও। সেনাপতির কথা হইয়া গেলে আসিও।"

তাহারা রাগিয়া উঠিয়া গেল।

সেনাপতি কহিলেন, "শাহজাদা, খবর খারাপ। শাহজাদা রুস্তমের বল দিন দিন বাড়িতেছে। তাঁহার লোকেরা দেশ-দেশান্তে ঘুরিতেছে, হিন্দু মুসলমান তাঁহার বশীভূত হইয়াছে। তাঁহার শ্রান্তি নাই, আলস্য নাই, নিদ্রা নাই—কখন সৈন্যদের শিবিরে, কখন বড় বড় তালুকদারের সঙ্গে, কখন সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে অত্যন্ত সরলভাবে আলাপ করেন। সকল শ্রেণীর লোকেরা তাঁহার গুণে মোহিত হইয়াছে।"

"কেন, আমি ত খুব উত্তেজনাপূর্ণ উৎসাহ, আদেশ সৈন্যদের দিয়া থাকি, আর সকলের সহিত ত দেখা করিতে রাজি আছি।"

"শাহজাদা গুস্তাকি মাফ, লেখা হুকুমে আর নিজের মুখের কথায় অনেক প্রভেদ। আর লোকের অপেক্ষায় থাকিলে হইবে না, তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইতে হইবে, আপনাকে নিজে গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে হইবে, কেন না আপনি তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী। আপনি সৈন্যশিবিরে যান না, কোন গ্রামেও প্রবেশ করেন না।"

শাহজাদা অঙ্গুলির নখ খুঁটিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে?"

"আপনাকে স্পষ্ট বলিতেছি, এখন আদব-কায়দার সময় নহে। সিংহাসন দখল করা কি ছেলেখেলা? আপনি ত হারাইতে বসিয়াছেন।"

"আমি বাদ্‌শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসন ত আমারই প্রাপ্য।"

"আপনাদের কিংবা অন্য বংশে কি এরূপ দেখিয়াছেন? যে বলবান্, বুদ্ধিমান্, চতুর, কুশলী, আলস্যহীন, রাজ্য তাহার। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন আপনাকে কি করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে এই অলস অকর্ম্মণ্য মোসাহেবের দল বিদায় করিতে হইবে। আপনার আমোদ প্রমোদ অথবা বৃথা সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। তাহার পর আপনাকে সকল কর্ম্মে উদ্‌যোগী হইতে হইবে, সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। বাদ্‌শাহ কখন আছেন, কখন নাই, তাহার কোন স্থিরতা নাই। রাজধানীতে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। শাহজাদা, আমরা আপনার হিতকামনা করি, এ সময় কোন কথা গোপন করিতে পারি না!"

শাহজাদা কহিলেন, "তোমার কথা স্বীকার করিলাম। চল, সৈন্যশিবিরে যাই।"

ঘটনাজাল সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। কেহ হাকিমের পক্ষে, কেহ রুস্তমের পক্ষে। ঘরে ঘরে, সকল দেশে বাদ্‌শাহের আসন্ন মৃত্যুর কথা আলোচিত হইতেছিল। মক্ষিকার মত সকলে লূতাতন্তুতে জড়িত হইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আরোগ্য-দিগ্‌দর্শন বা স্বাস্থ্যনীতি—অনুবাদক অধ্যাপক শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এখানা মহাত্মা গান্ধীর "আরোগ্য বিষে সামান্য জ্ঞান" নামক গুজরাতী পুস্তকের অনুবাদ। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মা তাঁহার নিজের জীবনে যে-সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন এই পুস্তকখানিতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। সাধারণে এই-সব অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া এই-সব চিকিৎসা-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কারণ মহাত্মার নৈতিক জীবন, মহাত্মার আধ্যাত্মিক চরিত্র জনসাধারণের নাই। যে-সমস্ত কাজ এবং ব্যবস্থার অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ, সাধারণ লোকের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি দুঃসাধ্য। তথাপি এগুলি লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে, এগুলি জানিয়া রাখা দরকার। তাহা ছাড়া বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে এবং দেহের ও মনের পুষ্টি সাধনের পক্ষে যাহাদের উপযোগিতাও কম নহে। বইখানি ইতিমধ্যেই বহুভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারাও ইহার আলোচনা নিতান্ত অল্প হয় নাই।"

আরোগ্য-দিগ্‌দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভালো—বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় না।

ভূ-পরিচয়—শিশুদিগের শিক্ষার কথা আমরা আজকাল একটু একটু ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাই মাঝে মাঝে শিশুদিগের জন্য এমন এক-একখানি বই দেখা দিতেছে যাহা শিশুসাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ্ হইয়া থাকিবে।

সে বেশীদিন আগেকার কথা নয়—যখন লোপাট্‌কা কামাস্কাট্‌কা কোথায় আছে, হনলুলুর লোকসংখ্যা কত, প্রভৃতি কতকগুলি সংবাদ আয়ত্ত হইলে শিশুদিগের ভূগোলের জ্ঞান যথেষ্ট হইয়াছে, বলিয়া অভিভাবকেরা মনে করিতেন। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন তাঁহারা চান যে পুস্তকের ভিতর দিয়া শিশুদিগের দেশ-বিদেশের সহিত প্রকৃত পরিচয় হয়—একটি প্রাণের সংযোগ ঘটে।

এই সংযোগ ঘটাইয়াছেন শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় তাঁহার নব-প্রকাশিত "শিশুরঞ্জন ভূপরিচয়" গ্রন্থে।

বাঙ্গালা দেশের কথা জানিতে গিয়া শিশু দেখিবে কেন এই দেশে জন্মিয়া এবং এই দেশকে ভালবাসিয়া তাহার জনম সার্থক হইয়াছে এবং বুঝিবে কবির সেই কথাটা

'তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি'

শুধু কবিত্বের উচ্ছ্বাস নয়।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব রাজধানী গৌড় যথায় এককালে
'মন্ত্রী সাথ নরনাথ বসিতেন ধীর'"

এবং যেখানে এখন
'ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর'

কর্ণফুলি নদীতে মাঝির সারি গান
'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, বাইতে পাল্লাম না'

বর্দ্ধমান বিভাগের
'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ মন ভুলায় রে'

পলাশীর নিকটের গ্রাম্য লোকের সেই গান
'কি হ'লোরে জান!
পলাশীর মাঠে নবাব হারান পরাণ!

তাহার হৃদয়ে যে ছাপ দিবে তাহা সহজে মুছিবে না।

বাঙ্গালার কৃষির কথা অবগত হইতে গিয়া সে দেখিবে যে বাঙ্গালার যাহা কিছু ধন দৌলত তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালার ক্ষেতে, এবং
"ওমা, আমার যে ভাই, তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী'—

তাহার সেই চাষী ভাইরা রোদ-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া দিনের পর দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিতেছে তাই সে খাইতে পাইতেছে, তাই তাহার আমোদে দিন কাটিতেছে।

বাঙ্গালার শিল্পের ইতিহাসে দেখিবে যে সে একটা 'সব ছিল আর কিছু নাই'এর ইতিহাস। কত জিনিষের উপাদান জন্মে এই বাঙ্গালা দেশে, কিন্তু

'চক্ষু থাকিতে হায়! অন্ধ সবে মোরা
ধূলিতে পড়িয়া অসহায়'

বলিয়া সে-সব উপাদান কাজে লাগাইবার কেহ নাই।

বাঙ্গালা দেশের গল্প শেষ করিয়া গ্রন্থের দাদামহাশয় বলিতেছেন—"দেখিলে তো কত সুন্দর আমাদের দেশ? অন্য দেশের গল্প যখন তোমাদিগকে বলিব তখন দেখিবে বাঙ্গালা দেশ কত পিছনে রহিয়াছে। বৃথায় তোমাদের এ দেশে জন্ম যদি তোমরা বড় হইয়া কেবল নিজের সুখ টাকা-কড়ির কথা ভাব। তাহাতে সত্যি কিছু বড় হওয়া যায় না। দেশটাকে যদি বড় করিয়া তুলিতে পার তাহা হইলে সত্য সত্যই তুমি বড় হইলে। তখন তোমার নিজের অবস্থা ভাল করা কত সহজ হয়। নিজের ছোট সুখ নিজের টাকা কড়ির চেয়ে দেশের দশের যাহাতে ভাল হয় সেইটাকেই বড় করিয়া দেখিতে শেখ। গাও দেখি আমাদের কবির সেই গানটা

'বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্!"

দাদা মহাশয়ের এই বাণী বাঙ্গালার গৃহে গৃহে তাঁহার নাতি-নাত্‌নীর কানে পৌঁছাক—মেঘ কাটিয়া গিয়া নবীন গরিমা বাঙ্গালার ললাট উজ্জ্বল করুক্।

শ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পরকালতত্ত্ব—প্রথম খণ্ড; শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত। পৃঃ ১৬০; মূল্য ।৵০।

ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত; উক্ত সভার মাসিক পত্র

'ত্রিশূল' হইতে গৃহীত। প্রাপ্তির স্থল ১নং পঞ্চক্রোশী রোড, নাগোয়া, কাশী।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

কিরূপে রোগী দেখিতে হয়—ডাক্তার ন্যাশের How to Take the Case নামক গ্রন্থের অনুবাদ। প্রকাশক—শ্রী নীহার রায়, পান বাজার, গৌহাটী। মূল্য আট আনা।

G. Raye নামক জনৈক ভদ্রলোক এই অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন এই বলিয়া যে তিনি লণ্ডনের Chemical Societyর সভ্য। এই সংস্করণটি পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ। ইহাতে বুঝা যায় হোমিওপাথী-শিক্ষার্থীরা এই বইখানির কিছু আদর করিয়া থাকিবেন। যিনি উপরি-উক্ত চিকিৎসা-প্রণালী শিখিতে চান তাঁহার এই বই কাজে লাগিবে। ডাক্তার ন্যাশের পুস্তকের খ্যাতি ও উপকারিতা হোমিওপ্যাথী-চর্চ্চাকারীদের অজানা নাই।

বাঙ্গালা শিক্ষা—খান সাহেব আবিদ আলী খাঁ প্রণীত ও মোস্‌লেম ভাণ্ডার মালদহ হইতে প্রকাশিত। বাংলা অক্ষর-পরিচয়ের ও বানান ও পাঠের বই। মলাটে লিখিত আছে বইখানি নূতন প্রণালী অনুসারে লিখিত। প্রণালীর নূতনত্ব বিশেষ কিছু দেখিলাম না। বর্ণাশুদ্ধিও চোখে পড়িল।

অ

বন্দীজীবন—প্রথম খণ্ড—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

বিপ্লব যুগ ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণের যুগ। এই বিপ্লব-যজ্ঞে যাঁহারা হোতা ছিলেন তাঁহাদের অনেকের আত্ম-কাহিনীই আমরা পড়িয়াছি। বারীন্দ্রের বা উপেন্দ্রের আত্মকাহিনী বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব অঙ্গ। কিন্তু তাহাতে আমরা এমন কোন দৃঢ় বা সবল অভিব্যক্তি পাই না যাহা পাঠকের মনে সেকালের আন্দোলনের একটি স্পষ্ট ছবি মুদ্রিত করিয়া দিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শচীন্দ্র সান্যালের 'বন্দীজীবনে' আমরা সেকালের একটি স্পষ্ট সরল ছবি দেখিতে পাই। শচীন্দ্র-বাবুর ভাষায় ও বর্ণনায় তেজস্বিতা আছে। বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টার এমন একটি সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাসের আভাস আমরা এই প্রথম পাইলাম। দুঃখের বিষয়, বইখানিতে ছাপার ভুল অনেক আছে। যাহা হউক আমরা বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

মর্ম্মবাণী—শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত। শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শান্তিপুর, নদীয়া। দাম চার আনা।

কবিতার বই। কয়েকটি ভাল কবিতা আছে।

গুপ্ত

ভারতের বাণী ও যুগবার্ত্তা—শ্রী নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সরস্বতী লাইব্রেরী। দশ আনা।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'বিজলী' পত্রে বীরবল সাহেব 'বুলির' এক সাধারণ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন। বুলির আওতায় এমন অনেক কথা বলা 'চলে যা অন্য কথার আড়ালে বলা অসম্ভব। গত কয়েক বছর ধরে 'বাণী' কথাটা সেই বুলির আকার ধারণ করেছে। আদালতেই যান বা দোকান চালান, চরকা কাটুন বা ঘানি ঘোরান, প্রত্যেকের এক একটা বাণী আছে। এহেন লোকের সংখ্যা করা দায়। অবনত ভারতের আর কিছু না থাক তার বাণী আছে, তাই এই-সব বাণী-আবিষ্কর্ত্তারা সগর্ব্বে প্রচার করেন যে এ বাণী ভারতের। বেচারা ভারত! পরস্পরবিরোধী অসম্বদ্ধ অস্থায় নানা বাণীর উৎপাতের অপবাদ তাকে অকারণে বইতে হবে!

এই যে ভারতের বাণী আবিষ্কার, এ হচ্ছে আমাদের নব স্বাদেশিকতা। যতই না কেন ভারতের 'শুদ্ধ, সত্ত, আধ্যাত্মিক আত্মার' দোহাই দি, 'ইংরেজীগন্ধী' সব-কিছুকে অসৎ বলে' মনে করি, বাস্তবিক শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা বিদেশী প্রভাব এড়াতে পারিনি। ব্রিটানিয়া, জার্ম্মানীয়ার মত ভারতও একটা (fetish) কুসংস্কার হয়ে উঠেছে এবং বাণী-অবতারের দল নিজেদের কথাগুলো ventriloquist হরবোলার মত ভারতের মুখে বসিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান।

'ভারতের বাণী ও যুগবার্ত্তা'-প্রণেতা শ্রী নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ মনোভাব এড়াতে পারেন নি। আয়ারল্যণ্ডের মীনসীমূর্ত্তি Cathleen ne houlihanএর মত ভারতকে অনেকে এতদিন বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে কল্পনা করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকারের কল্পনায় তিনি নীলকণ্ঠের মত বিশ্বের সমস্ত গরল পান করে' মঙ্গলময় বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং এই মঙ্গল সাধনের অন্তে ইম্পিরিয়াল ব্রিটানীয়ার ডমরু-নিনাদ যেন শোনা যাচ্ছে। এই বিচিত্র কল্পনা তাঁকে কতদূরে নিয়ে গেছে তা গ্রন্থের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ভিন্ন জানা কঠিন, কারণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধার করা অসম্ভব। দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতকে যারা সাদা চোখে দুঃস্থ বলে' দেখে, তাদের গ্রন্থকার গালি দিতেও ত্রুটী করেন নি, কারণ সেটা নাকি অলীক অথচ তা নব-যুগের বার্ত্তা বহন করে। ধর্ম্মে কর্ম্মে জীবনের সকল বিভাগের সংস্কার-প্রয়াসে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংস্কারের তালিকার দৈর্ঘ্য ত কিছু কম নয়, তবে এ অহঙ্কার কিসের? যদি ভারতের এই শক্তিই থাকে তবে এ আগা-গোড়া সংস্কারের প্রয়োজনই বা কি? বিশেষণ-কণ্টকিত বাগাড়ম্বরের জঞ্জালের মধ্যে এর কোন উত্তরই মেলে না।

নারী শিশু ও আর্ত্ত সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশে তিনি য়ুরোপীয় পন্থানুসরণের পরামর্শ দিয়াছেন, অথচ "ইংরেজী-গন্ধী" সব কিছুর উপরেই লেখকের একটা অহেতুক বিরাগ ও বিতৃষ্ণার ভাব ভারি বিস্ময়কর মনে হয়। 'ism'-কণ্টকিত রবীন্দ্রনাথ এবং বিধবা বিবাহ-প্রবর্ত্তক ভাবপ্রবণ ঈশ্বরচন্দ্র গ্রন্থকারের মতে বিকট 'ইংরেজী-গন্ধী' এবং উক্ত-দোষ-বিবর্জ্জিত বলেই বোধ হয় এঁর মতে "পূর্ব্ব যুগের একমাত্র মনস্বী, ঋষিস্বভাব শুদ্ধসত্ত্ব ভূদেবচন্দ্র"!

শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনায় তিনি রুসো, ফ্রাবেল ও মন্তেসরীর নাম মাত্র উল্লেখ করেছেন এবং Gary system, Dalton plan, Project method, Play way প্রভৃতি প্রশংসিত পদ্ধতি চতুষ্টয়ের কথা কিছুই বলেন নি।

"মাতৃত্বই নারীচরিত্রের পরম বিকাশ এবং নারীজীবনের চরম সার্থকতা"—এই বচনটি হয়ত সত্য, কিন্তু কথায় কথায় আমরা গার্গী-প্রমুখ যে-সব নারীর দোহাই দি তাঁরা কি অন্য পথে সার্থকতা লাভ করেন নি এবং সে সার্থকতা কি চরম নয়? নব নব গার্গী মৈত্রেয়ীর কল্পনায় গ্রন্থকার অনেক কথাই বলেছেন, অথচ পুরুষসুলভ অহঙ্কারের বশে নারীসমস্যার ভার তাঁদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি।

স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের পরামর্শ পরস্পরবিরোধী হলেও এবং নিরপেক্ষ না হলেও, এ গ্রন্থের মূল্য কালোপযোগী সংস্কারের তালিকায় ও পথ-নির্দ্দেশে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রচনার দোষে অনেক কথা দুর্ব্বোধ্য ও অহঙ্কারের আতিশয্যে অসহনীয় বলে' মনে হয়। এ যুগের বার্ত্তাটা সাদা কথায় বললে বোধ হয় আরও কাজ হত। আধ্যাত্মিকতার হেঁয়ালি আর কতদিন চলবে?

শ্রী আনন্দসুন্দর ঠাকুর

ভাগ্যহত

১

আজ জগতের চোখে আমার মহত্ত্ব বেজায় বাড়িয়া গেছে। আমার মত জেলকয়েদীর অপরাধ-কঠিন বুকের মধ্যে এই মহত্ত্বের অমিয়-উৎসধারা যে কোথায় কেমন ভাবে গোপন ছিল তাহার অন্বেষণে আজ সকলে তাহাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। বিচারকের কঠিন দৃষ্টি আজ নাই, আজ যে জড়জগতের দেওয়া পাপপুণ্যের সকল বোঝা ঘাড়ে করিয়া মৃত্যুর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—জগতও যেন তাই প্রেমের অঞ্জন চোখে দিয়া সকল ক্ষুদ্রতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সবলে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে।—এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! জগতের সব বিষ আজ অমৃতে রূপান্তরিত!—মৃত্যুর সম্ভাবনায় এই, না জানি পরে কত বেশী আছে। আজ প্রাণ ভরিয়া সব ভোগ করিয়া লই—কাল, হাঁ—সে ত আছেই।

প্রথম যৌবনে পৃথিবী যখন তাহার রূপরসগন্ধের মদিরা পান করাইয়া আমাকে মাতাল করিয়া তুলিল—তখন মনে হইয়াছিল এই বৈচিত্র্যময়ী ধরণী রসস্বরূপা—আনন্দস্বরূপা; তাহার মধ্যে যাহা আছে তাহা নিছক আনন্দ—অবিমিশ্র হর্ষ—শুধু দেবতার হস্তলেখা—দানবের পরুষ হস্তের স্থূল অবলেপ তাহাতে কিছুমাত্র নাই।

তার পরে যেদিন নিরুপমা কিশোরী আমাকেই জীবনের অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইল সে দিন আমার সব ভুল হইয়া গিয়াছিল। যৌবন-মদের তরুণ চাঞ্চল্য সজীব প্রাণের স্নেহারুণ দীপ্তিটুকু শুষিয়া লইয়া আমাকে যে অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছিল—তাহাকে কি বলিব জানি না। জীবনের কানায় কানায় ভরা সবুজ নবীন হৃদয়ের উল্লসিত বিভ্রম বিলাস যখন তাহার স্ফুরিত অধরে আত্ম-প্রকাশ করিত—তখন আমার মনে হইত—জীবন একটা অখণ্ড সঙ্গীত—শুধু ভাসিয়া যাওয়া—মানে বোঝাবুঝির ধার ধারা নাই—শুধু শব্দের মধুর মূর্চ্ছনা—আর তাহার অপরূপ পরিপূর্ণ আনন্দ।

তখন বুঝি নাই যে, এতখানি সুখকে সার্থক করিয়া তোলার জন্য ঠিক এতখানি দুঃখের প্রয়োজন। যে মূর্ত্তিতেই আসুক বিষাদ তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সত্য শিব ও সুন্দরকে বহন করিয়া আনে—এ কথা তখন অস্বীকার করিলেও আজ প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি—খাঁটি সত্য যদি এই চির-পরিবর্ত্তনশীল জগতের বুকে কিছু থাকে তবে তাহা হইতেছে দুঃখ-বরণ।

ক্ষীণকায়া গিরিতটিনী যখন বেগের মুখে চলিতে চলিতে প্রথম বাধা পায় তখন সে ভৈরব গর্জ্জনে ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে। বাধার মধ্যেই যে চলার সার্থকতা—দুঃখের মধ্যেই সুখের নিবিড়তা—এ কথা আমও তখন স্বীকার করিতে পারি নাই। যখন জীবনধারার গতিপথে অটুট দুঃখের পাষাণ-প্রাচীর প্রথম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক ঐ নদীর ধারার মতই অসহ্য ক্রোধে বলিয়া উঠিয়াছিলাম—'আমি তোমায় চাই না, ওগো মুক্তিপথের বাধা - ওগো অন্ধ অন্ধকার, জীবনের আলো ছেয়ে ফেলো তুমি কোন্ অধিকারে?' বুঝিতে চাই নাই যে অমঙ্গলের মূর্ত্তি ধরিয়াই মঙ্গল আসিয়া থাকে - মহাদেবের প্রলয়-বিষাণের ভীষণ শব্দের মধ্যেই শিবের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা। ভগবানের সুবিচারে আমার পরিপূর্ণ সুখের হাটে দুঃখের যে ঢেউ আসিয়া লাগিয়া-ছিল- তখন তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইতে পারি নাই। সেই আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ভুল। আর সেই ভুল সংশোধন করিতেই আজ জীবনযজ্ঞে আমার প্রাণ পূর্ণাহুতি স্বরূপে মরণকে আত্যন্তিক ব্যাকুলতায় জড়াইয়া ধরিতে চলিয়াছে।

২

জগতের মধ্যে বাঁচিয়া থাকার সমস্যা যে এত নিষ্ঠুর ও এত জটিল তাহা কোনও দিনই বিশ্বাস করি নাই। সংসারের যে আর-একটা রূপ আছে আর তাহার মধ্যে অভাবের নগ্নচিত্রই বুকফাটা তীব্র হাহাকারের মধ্যে ফুটিয়া উঠে তাহা কে জানিত। ত আসে তাহা

জানিতাম। কিন্তু সে যে মানুষের রূপ ধরিয়াই আসে তাহা জানা ছিল না, তাই বর্ষার এক কালো রাতে নিবিড় নীরদমালায় অলঙ্কৃত আকাশের নীচে যখন প্রকৃতির সজল চোখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম তখন যে লোকটা আমার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মতই আসিয়া জুটিল—তখন তাহাকে মানুষ বলিয়াই ভুল করিয়াছিলাম। সে আর কেহ নহে।—আমাদেরই গ্রাম্য জমিদারের নায়েব বিহারী। লোকটা যৌবনসীমা অনেকদিন যে পার হইয়া গেছে— মাথার ধূসর কেশরাশিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছিল। তাই তাহাকে বড় সম্মানে ডাকিয়া বসাইলাম। জীবনের অভিজ্ঞতায়, বয়সের প্রবীণতায় তাহাকে ত অগ্রাহ্য করা চলে না।

সে প্রথমে যে-সব কথা বলিতেছিল—তাহাকে তাহাতে বেশ ভালই লাগিতেছিল এমন সময় হঠাৎ সুর বদ্‌লাইয়া বলিয়া উঠিল—রমেশ বাবু, একটু দরকারেই আপনার কাছে এসেছিলাম।

এতক্ষণ ইহা ত মনে হয় নাই। বর্ষার রাতে যখন মেঘের অবিশ্রান্ত আনাগোনা চলিতেছিল, চাঁদ ও তারার সঙ্গে যখন তাহার লুকোচুরি খেলা জমিয়া উঠিয়াছিল, তখন কি কোনও প্রয়োজন থাকে? তখন যে সব ভরপুর —পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে কোথাও একটু খাদও নাই।

বিরক্ত হইলাম। কিন্তু সে ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া ভদ্রতা বাঁচাইয়া উত্তর দিলাম—"আজ্ঞে তা অনুমতি করুন।"

তাহার মুখ হইতে প্রশংসার সমাদ-বিজৃম্ভিত বাক্যগুলা হঠাৎ আমার উপর অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসিয়া পড়িল। মুরুব্বিয়ানা চালে তিনি বলিলেন—'এই ত চাই বাবা—বয়সের সম্মান যদি তোমরা না রাখ্‌বে—ত আর—'

এ পর্য্যন্ত বেশ চলিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি যখন পকেট হইতে একটি টাকার থলি বাহির করিয়া আমার কাছে দিয়া বলিলেন—'বাবা, এ টাকাগুলা তোমার'—তখন আমি বাস্তবিকই বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। কারণ আমার ত কোনও কালে উহার কাছে টাকা পাওনা ছিলই না, আর আমার পূর্ব্বতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যেও কেহ যে উহাদের বংশের কাহারও সহিত আদানপ্রদানের কারবার চালাইয়াছিলেন—তাহা স্মরণ হইল না। তাই আমি উত্তর দিলাম—'কেন, বর্ত্তমানে আমার টাকার বিশেষ অভাব হয় নি, আর আমি ত কই আপনার কাছে টাকা পাব বলে' মনে হয় না।'

এবার তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। নৈশ নীরবতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অট্টহাসির সেই বিকট শব্দ দিগন্তে মিলাইয়া গেল। তিনি জানাইলেন—'না, এ তোমার পাওনা টাকা নয়-তবে এটা ইচ্ছে করলে উপার্জ্জন করতে পার—এই মুহূর্ত্তে।'

আমি অবাক্ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি অনেক ভণিতা দিয়া বিশেষ করিয়া যেটুকু আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে-আমাকে জমিদারের স্বপক্ষে তাঁহারই গরীব প্রজা আহাদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হইবে—আর এই টাকা তাহারই নজরানা বা বখ্‌শিস্।

বয়সের প্রাচীনতা আর সম্মানের দাবী রাখিতে পারিল না। উঃ- নরপিশাচ—স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি উৎকট প্রতারণা এ। আমার পায়ের আঘাতে কখন যে তাহার টাকার থলির মধ্যে থেকে টাকাগুলা মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িল—তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে মনে আছে যে সেই টাকাগুলাকে তখন প্রলোভনের উজ্জ্বল স্বর্ণ-শৃঙ্খল বলিয়া মনে হইয়াছিল আর শয়তানের বিকট হাসির মতই মেঘলা রাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেই অর্থরাশির রজতপ্রভা।

বাদ্‌লা রাতের মধ্যে তখন বাতাস হা হা করিয়া ফিরিতেছিল আর মসীমলিন মেঘের কোলে এবং আমার অশ্রুর মধ্যে জাগিয়া উঠিল গরীব প্রজা আহাদের স্ত্রীর অসহায় মুখখানি। শুদ্ধ আঁধারে সে যে কি মিনতি শুনিলাম, তাহার চোখে সে যে কি করুণার আবেদন, তাহা স্মরণ করিলে আজিও আমার মধ্যে জাগিয়া উঠে নারীর মহিমাময় উজ্জ্বল চিত্র। সে যেন কাতরভাবে বলিতেছিল—'ওগো, অত্যাচারের শৃঙ্খলকে বারণ করতে না পার—তাকে টেনে গলায় পরানোর জন্যে সাহায্য করো না। একি চিত্র! অনন্যসহায়া, স্বামীর উপর নির্ভরশীলা—এ কোন্ চিত্র? এ অবস্থায় আমার স্ত্রীর চিত্রও

ত ঠিক এমন করিয়াই অসহায়ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিত। আমি মুগ্ধ আবেগে স্তব্ধ রহিলাম। শিরার মধ্যে রক্তস্রোত উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে আকাশে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল—বায়ুর হুঙ্কার প্রবল হইল আর নিশীথ শ্মশানের প্রেতের ন্যায় বিহারীলাল আমাকে তর্জ্জন করিয়া গেল—"এর ফল আছে রমেশ-বাবু, তোমায় ভাল করেই বুঝাব টাকা কেমন করে' কথা কয়।"

(৩)

কেমন করিয়া যে কি হইল জানিনা! এক দিন হঠাৎ দেখিলাম যে মুক্ত বাতাসে মুক্ত আলোয় আর আমার অধিকার নাই। আমি কয়েদী—জেলের হুকুম আমার হইয়া গেছে। যেদিন জেলে যাইব সেদিন গভীর প্রত্যাশায় চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম—কই সহানুভূতির বেদনার রেখা ত কাহারও মুখে দেখিলাম না; কানে আসিল বিহারীর তীব্র স্বর—"কেমন রমেশ-বাবু, বুঝ্লেন কেমন করে' টাকা কথা কয়?" মনে মনে স্বীকার করিলাম—শুধু যে কথা কহে তাহা নয়—টাকা শয়তান তৈয়ার করে। আহ্লাদ—সেও যে আজ জমিদারের প্রসাদভোজী হইয়া আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। কৃতঘ্নতার চেয়ে অসহ্য কি এই কারাবাস?—না, এ আলোর চেয়ে আঁধার ঢের ভালো।

আমার সেখানে বিশেষ কষ্ট হইত না। মনে হইত অবিচার-অত্যাচারের যে ঘোর লজ্জা তাহা ঢাকিয়া যাউক্ এই অন্ধকারে। আলোর কোন দর্কার নাই। কিন্তু তবুও সেই আলোকের মধ্যেও যে একজন আছে—যে আমার সব। আবার সব গোলমাল হইয়া যাইত। একি চোখের সাম্‌নে সে আসিয়া দাঁড়ায় কেন? কল্পনার নেত্রে দেখিতাম সেই প্রফুল্লা হেমনলিনী, পূর্ণবিকশিতা নারীত্ব-গরিমায় সমুজ্জ্বল সেই আমার স্ত্রী সরযূ—সে যে আজ বিষাদখিন্না দীর্ণা—ধূলায় লুটাইয়া সে যে পৃথিবীর বুকে ঢালিয়া দেয় তাহার বুকের জ্বালার রক্তধারা।

তখনই আবার প্রাণ চাহিত মুক্তি—'ভাঙ্গ এই পাষাণ কারা, ভাঙ্গিয়া ফেল। চাই বাহির হইতেই চাই। সেখানকার আকাশে বাতাসে শোণিত-লেখায় যত লজ্জার কাহিনী লেখা থাকুক না। কেন—তাহার মধ্যে যে চিরজাগ্রত দেবতা রহিয়াছেন শান্তশীলা নারীর মধ্যে। তাহার অখণ্ড আনন্দ-সত্তার মধ্যে আমার সব দুঃখ জগতের সব দৈন্য ডুবিয়া যাক। গভীর অন্ধকারের মধ্যে সেই যে ধ্রুবতারার মত আমার অপেক্ষায় জাগিয়া আছে।' তখন আমার প্রাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কাঁদিয়া উঠিত—হায় মুক্তি! দুই বৎসর—ওঃ কত দীর্ঘ দিন তাহাতে—কত দীর্ঘ। ভাঙ্গ পাষাণ কারা ভাঙ্গিয়া ফেল।

হঠাৎ কনেষ্টবল আসিয়া জানাইয়া দিল—দরজার শক্তি, বহুবার পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে, শুধু শুধু করাঘাত করিয়া অধিকতর লাঞ্ছনা ছাড়া অন্য কোনও ফল নাই।

(৪)

যেদিন মুক্তি পাইলাম সেদিন কেহই আমাকে কারা-গৃহের দ্বার হইতে আগাইয়া লইবার জন্য আসিল না। বন্ধু বান্ধব কেহ নাই—যে আছে সে যে স্ত্রীলোক—লজ্জার বাঁধন কাটাইয়া কেমন করিয়া আসিবে। না, জেলফেরতের বন্ধু ভদ্রসমাজে থাকিতে নাই। এখানকার নিয়মে ভদ্রতার সোপান হইতে মানুষ তখনই পড়িয়া যায় যখন তাহাকে জেলে যাইতে হয়—হোক না কেন তাহা বিনা দোষে, সে কলঙ্কের ছাপ তাহার ললাটে চিরন্তন হইয়াই থাকে আর তাহার চাপে মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সংশোধনের জন্য কারাবাস। কিন্তু হায় সেই কারামুক্তির পরের প্রতি মুহূর্ত্তই যে লোকের ঘৃণাদৃষ্টির মধ্যে তাহাকে ছোট করিয়া ফেলে। কারাবাসে মানুষ ছোট হয় না—কারা-মুক্তির পরে মানুষের ঘৃণাদৃষ্টিই তাহাকে ছোট করে।

দিনের আলো আমার চোখে বিঁধিতে লাগিল। অগ্রসর হইতে পারিলাম না। সারা দিনমান এক আমের বনে পড়িয়া রহিলাম। রাত্রির অন্ধকারে বাড়ীর পথ ধরিলাম। সে কি উত্তেজনা, কি আগ্রহ! প্রতি পদে কি সে হৃদয়ের দ্রুত কম্পন! মনের বেগের সহিত পায়ে-হাঁটা তাল রাখিতে পারিল না। একটা গতিশক্তির প্রবুদ্ধ আবেগ আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল—দৌড়—দৌড়—দৌড়।

বাড়ীর দ্বার—এ কি খোলা! কুটীর—এ কি শূন্য! প্রতীক্ষায় কই কেহ ত বসিয়া নাই! ঝিল্লীমুখর রজনীর তৃতীয় যামে অন্ধকার থমথম করিতেছে! হা ভগবান্!

এই কি আমার মুক্তি? শিরার প্রতি রক্তকণা দিয়া যাহাকে চাহিয়াছিলাম তাহা কি এই! সে কোথায় যাইবে? পৃথিবীতে ত যাইবার তাহার দ্বিতীয় স্থান নাই। বুক জোরে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলাম—সরযূ—সরযূ—একি! কণ্ঠের স্বরও কি আজ আমায় প্রতারণা করিল? নিজের তপ্তশ্বাসে নিজেই কাঁপিয়া উঠিলাম—বাতাস হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'সে নাই—সে নাই।'

উষার উদার বাতাসে চেতনা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। জগতের বুকে আমার জন্য এক বিন্দুও স্থান রাখ নাই, দয়াময়! ওরে অভিশপ্ত, ওরে ভাগ্যহত, পালা—পালা—দিনের আলো ঐ তীরের মত তোর উপর আসিয়া পড়িতেছে।' দৌড়—দৌড়—দৌড়। আত্মগোপন যে আমায় করিতেই হইবে। লোকচক্ষুর তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আমি আমাকে তুলিয়া ধরিতে পারিব না। আমার অবস্থার কপট সহানুভূতির আহা উহু—সে নিতান্তই অসহ্য।

আবার রজনীর অন্ধকার নামিয়া আসিল। আমিও আবার ফিরিয়া আসিলাম খুঁজিয়া দেখিতে জড় প্রকৃতি কোথায় কেমন করিয়া আমার তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সব বৃথা—সে নাই—সে নাই।

পৃথিবীর রূপ বড্ড বেশী। আলো-বাতাসের জোয়ারে সে ভাসিয়া চলিয়াছে। এত আলো কেমন করিয়া সহ্য হয়? যাহাকে অবলম্বন করিয়া আলোর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিব সে যে নাই! সব দোষ উপেক্ষা করিয়া আমার সকল লজ্জা সকল গ্লানি যে মুছাইয়া দিবে সে যে নাই—তবে—এস অন্ধকার—এস রাত্রি, আমার সর্ব্বকালের আশ্রয় হইবে এস।

আবার দৌড় সেই কারাকক্ষের উদ্দেশে, সেই আমার প্রিয়তম, সে ত প্রতারণা করে না। সে ত প্রত্যাশা দিয়া নিরাশ করে না। তাহার কপটতা নাই। তাহার আহ্বান 'এসো—ওগো শ্রান্ত—ওগো ক্লান্ত—তোমায় নির্য্যাতনের যন্ত্রণা দিয়া আদর করিব।'

(৫)

কারাকক্ষের দ্বারে আসার একটু আগেই দেখি কোর্ট লোকারণ্য। মনে পড়িল সেই দিনের কথা, সে দিনও এইরূপ ভীড় ছিল। ওকি বিহারীলাল আবার ওইখানে দাঁড়াইয়া কেন? উহারা আবার কি চাহে? অজ্ঞাত প্রদেশের অন্ধকারে আত্মগোপন সে ত আছেই। তাহার পূর্ব্বে একবার দেখিয়া লই উহারা আবার আমার মত কোন্ ভাগ্যহীনকে অর্থের সম্মান শিক্ষা দিতেছে।

ভীড় ঠেলিয়া দেখি জমিদার স্বয়ংই কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া। বিহারী সজলনেত্রে। কি একটা গভীর বিষাদকালিমাচিহ্ন সকলের ললাটে আঁকা। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় যেমন করিয়া লোকে কাঁপিয়া উঠে, যূপবদ্ধ ছাগশিশু যেমন করিয়া কাঁপিতে থাকে, জমিদার সেইরূপ কাঁপিতেছে।

'ঐ কি দৃশ্য দেখালে দয়াময়! তোমাকে যে বড় যন্ত্রণায় অবিশ্বাস করেছিলাম। আশাভঙ্গের বেদনায় তোমার অস্তিত্বই যে অস্বীকার ক'রে ফেলেছি। কিন্তু না—সত্যই তুমি আছ। ঐ ত সেই দুর্দ্দান্ত জমিদার খুনী আসামী—শাস্তির প্রতীক্ষায় প্রতি পলে মরণযন্ত্রণা সহ্য কর্‌ছে। ভগবান্ তুমি আছ আছ—প্রাণের পূর্ণবিশ্বাসে বল্‌ছি—তুমি আছ।'

কিন্তু জমিদারের ভাল-মন্দে আমার কি? আমার জীবনের শান্তি ত ইহার মধ্যে নাই। ওরা মরুক্ বাঁচুক সরযূকে ত ফিরাইয়া দিতে পারিবে না। সে পরপারে আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে—তাহার নিকট এখনই যাইবার কি কোন উপায় নাই? কিন্তু আত্মহত্যা সে যে বড় ভয়ানক!

'ভগবান্ সত্যই তুমি আছ। এই ত জমিদার খুনী হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঐ ত তুমি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কর্‌ছ—আমি যদি খুনী হই—জমিদার মুক্তি পাবে আমিও এ অরুন্তুদ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাব। এই পথ। জমিদার মর্‌তে ভয় পাচ্ছে—ওর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আজও মেটেনি—ও চায় বেঁচে থাক্‌তে—কিন্তু এ জগতে বেঁচে থাকা যে কত বড় অভিশাপ তা ত ও জানে না। আমি কিন্তু যেতে চাই—তবে জমিদারের বদলে আমি যাই না কেন। একাধারে দুই মুক্তি—জীবনের হলাহল আকণ্ঠ পান করেছি, এখন এস মৃত্যু নিবিড়ভাবে আমায় আলিঙ্গন কর—প্রিয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। তোমায় লোকে ভয়

করে—ভুল করে। এ মিলন ত আর কারও করার সাধ্য নাই। এস তবে—এস মৃত্যু, এস বন্ধু—মিলনের সিঁড়ি গেঁথে দিয়ে যাও—'

"হুজুর খুনী আমি।"

উঃ কি আনন্দ! ওরা বল্‌ছে আমি কত মহৎ। বিহারী আমায় ডাকছে—'ওগো তুমি স্বর্গের দেবতা।' হায় স্বার্থান্ধ মানব—ভাল মন্দের মাপকাঠিকে এতই ছোট করে' ফেলেছ। তুলাদণ্ডের ওজনে কিছু আগে যে নর-পিশাচ জেলের আসামী, সেই পরক্ষণেই তোমার স্বার্থসিদ্ধির ভারে ভারী হয়ে হ'ল স্বর্গের দেবতা।

কিন্তু বড় আনন্দ। এ মৃত্যু-আজ্ঞা যে আমি কতখানি স্বার্থের খাতিরে লইয়াছি—তাহা ত ওরা জানে না। আমার মত এতবড় স্বার্থপর জগতের মধ্যে আজ ত আর কেউ নাই। তবু ওরা বলিবে আমি বড় ভাল। মৃত্যুর মধ্যেই আমার মুক্তি- এ মুক্তি যে ওরা আমায় অবহেলায় দান করিয়াছে—এর জন্য কি আমি কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি?

ওগো তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু। আমি দেবতা নই মানুষ—স্বার্থপর।

উঃ কাল—তার আর কত দেরী?

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রমলা

(৩২)

পরদিন সমস্তক্ষণ রজতের মনে এই কথাটি বাজিতে লাগিল, সে মাধবীর কাছে আবার যাইবে বলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যায় আফিসের ছুটির পর সে ঠিক করিল যাইবে না, যাওয়াটা ঠিক হইবে না। শিল্পী বলিল, চলো; স্বামী বলিল, না। স্বামীরও ঠিক জয় হইল না, রজত মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা গড়ের মাঠে অকারণে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিল।

পরদিন সন্ধ্যায় রজতকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া রমলা একটু অবাক্ হইল, তাহার কোন অসুখ করে নাই জানিয়া আশ্বস্ত হইল। তাড়াতাড়ি কয়েকখানি লুচি ভাজিয়া খাওয়াইয়া মেজেতে বিছানা পাতিয়া রজতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া সে রান্নাঘরে গেল।

রজত তাকিয়া ঠেসান দিয়া চুরুট টানিতে টানিতে একখানি ইংরেজী নভেল পড়িতেছিল, তাহার পাশে খোকা খুকীকে দোলায় আদর করিতেছিল ও তাহার পুতুলগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতেছিল। রজত সেদিন খোকার জন্য একটি জাপানী ফানুস আনিয়াছিল, সেইটি বার বার খুকীর সাম্‌নে নাচাইয়া দোলাইয়া খোকা খুকীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিল। সহসা পিছন হইতে কে তাহার ফানুসটি কাড়িয়া লইয়া চোখ টিপিয়া ধরাতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। খোকার চীৎকারে বিরক্তির সহিত নভেল হইতে মুখ তুলিয়া রজত দেখিল, তাহার সম্মুখে হাস্যময়ী মাধবী দাঁড়াইয়া। রজত ব্যস্ত বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—বা! আপনি কখন এলেন?

খোকার চোখ ছাড়িয়া ফানুসটা দোলাইয়া মাধবী বলিল,—এই ত আস্‌ছি, আপনি যা নভেল পড়ায় মগ্ন! রমু কৈ?

—সে বোধ হয় রান্নাঘরে। খোকা তোর মাকে ডাক্ ত।

খোকা পিতার পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখে আশ্চর্য্যের ভাব দেখিয়া মাধবী ও রজত উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, মাধবী একটু অগ্রসর হইয়া খোকাকে ধীরে জড়াইয়া তাহার গালে চুমো খাইয়া বলিল—আপনার ছেলেটি lovely, কি সুন্দর চোখ, ঠিক আপনার মত মুখ।

তার পর দোল্‌নার দিকে অগ্রসর হইয়া খুকীকে কোলে তুলিয়া মৃদু দোলাইয়া বলিল,—কি সুন্দর বেবী, কৈ বেবীর মা-টি কৈ?

হাসির শব্দ রান্নাঘরে রমলার কানে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। দুধের কড়া উনানে চাপাইয়া সে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। জান্‌লার ফাঁক দিয়া দেখিল—মাধবী খুকীকে নাচাইতেছে ও নিজে হাসিতেছে। এ হাসি যেমন মধুর,

তেমনি করুণ। রজতের কাছেও সে হাসি আশ্চর্য্য লাগিতেছিল, মাধবীর বহুপূর্ব্বের এক কথা মনে পড়িয়া গেল,—হাঁ, জীবনটা কান্নায় ভরা, তা বলে' কি হাস্‌তে মানা। মাধবী খুকীকে নাচানো থামাইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া এক চেয়ারে বসিল। ও lovely lovely, বলিয়া মুগ্ধ হইয়া সে আপন হাতের সরু সোনার বালা খুলিয়া খুকীর হাতে পরাইয়া দিতে লাগিল।

রজত বাধা দিয়া বলিল,—ও কি কর্‌ছেন?

মাধবীর ভঙ্গীতে সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

সুন্দর খোঁপাটা নাড়িয়া মাধবী বলিল,—বেশ, চুপ করুন, দেখুন্‌ত কি সুন্দর দেখাচ্ছে। আচ্ছা আপনি না কাল আমাদের বাড়ী যাবেন বলে' এসেছিলেন?

একটু অপ্রতিভ হইয়া রজত বলিল,—রোজ রোজই কি যেতে হবে!

মাধবী আপন মনে কথাগুলি উচ্চারণ করিল,—রোজ রোজই কি যেতে হবে!

ধীরে রমলা ঘরে প্রবেশ করিতেই মাধবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—কি ভাই, খুব রান্না কর্‌ছিলে! ভারি সুন্দর হয়েছে ত খুকীটা! কি নাম রেখেছিস্?

মাতৃস্নেহমণ্ডিত চোখে খুকীর দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—কিছু নাম হয়নি এখনও।

খুকীকে চুমো খাইয়া মাধবী বলিল,—আচ্ছা, আমি ওর godmother হব, নাম ঠিক করে' দেব। আচ্ছা ভাই, আমাদের ওখানে কি একবারও যেতে নেই?

খুকী কাঁদিয়া ওঠাতে তাহাকে মাধবীর কোল হইতে লইয়া রমলা বলিল,—তুমিও ত ভুলে গেছ ভাই। তোমায় বুঝি যতীন-বাবু পাঠিয়ে দিলেন?

কথাটি না বুঝিতে পারিয়া মাধবী রমলার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। যে কথা শুনিলে মনে সন্দেহ জাগে তাহা বুঝিতে সে অনর্থক প্রশ্ন করিত না। সভ্যসমাজের নীতি তাহার জানা ছিল, প্রশ্ন করিও না,—তাহা হইলে মিথ্যা কথা শুনিবে। কিন্তু রজত একটু সন্দিগ্ধ নেত্রে রমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাধবী রমলার হাতটা ধরিয়া বলিল,—কি রোগা হয়ে গেছিস্!

ম্লানমধুর হাসিয়া রমলা বলিল, আর তুমিই কি মোটা আছ!

ধীরে সে খুকীকে দোলায় শোয়াইয়া দিল।

খোকা মায়ের পাশে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে আবার এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মাধবী বলিল—জানিস্ ভাই, এসেই তোমার খোকার চোখ টিপে ধরেছিলাম বলে' সে কি চীৎকার। খোকা, আমি তোমার মাসী হই বুঝ্‌লে?

খোকা বিস্মিত হইয়া মাতার দিকে চাহিয়া বলিল,—কি মাসী, মা?

রমলা হাসিয়া বলিল—রাঙা-মাসী রে, দেখ্‌ছিস না কি সুন্দর দেখ্‌তে।

মাধবী খোকার গাল ধরিয়া আদর করিতে করিতে বলিল,—থাক্ ভাই, ঠাট্টা কেন, তোমার ছেলেমেয়ে বাস্তবিক কি সুন্দর, গোলাপ-ফুলের মতন মুখটি ফুটে আছে, ভোমরার মত কালো কুচ্‌কুচে কোঁকড়া চুল! এর মুখটা তোর মত হয়েছে অনেকটা।

গলার সোনার সরু হারটা খুলিয়া খোকার গলায় পরাইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া রজতের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া মাধবী বলিল,—কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

রমলা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—ও কি হচ্ছে ভাই!

বেশ কর্‌ছি, বলিয়া খোকাকে চুমো খাইয়া মাধবী রজতের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। রজতের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

বস ভাই, আমি খুকীর দুধটা নিয়ে আসি,—বলিয়া রমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, তখনও দুধ ফোটে নাই, উনানের আগুনের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া এক মোড়ায় বসিয়া পড়িল। মাধবীর এ রূপ তাহার সম্পূর্ণ অজানা, এ চঞ্চলা মাধবী তাহার অপরিচিতা। মাধবীর তৃষিত মাতৃহৃদয় আজ রমলার দৈন্যের সংসারে আসিয়া যে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে তাহা রমলা কি করিয়া বুঝিবে।

রান্নাঘরে বসিয়া থাকিতেও রমলার ভাল লাগিল না।

ধীরে বারান্দায় এক অন্ধকার কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কথাবার্ত্তা তাহার কানে আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। রজতের গম্ভীর কণ্ঠের কথাগুলি কানে পৌঁছাইলেও ঠিক বোঝা যাইতেছিল না, মাধবীর কথাগুলি স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।

বা! পর্শু ত অনেক suggestion দিয়ে এলেন,—আপনার ঘরটা কি সুন্দর ছবি দিয়ে সাজান গোছান,—আচ্ছা আপনার ষ্টুডিও কোথায়, আপনাকে সব ঘর দেখালুম, আমায় কিছু দেখাচ্ছেন না—রমু আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল, এমন কুণো হয়েছে—এ ছবিখানা ত ভারি সুন্দর, সেই আপনার ঝড়ের ছবির চেয়েও ভাল হয়েছে, ঝড় আমার এত ভাল লাগে।

আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। সুন্দর চাঁদের আলোর দিকে চাহিয়া রমলা দাঁড়াইয়া রহিল। এম্‌নি চন্দ্রালোকমধুর হাজারিবাগের এক রাত্রির কথা মনে পড়িল, মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল দুধ উথ্‌লাইয়া উনানে পড়িয়া আগুন প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। আর কিছু করিবার যেন তাহার উৎসাহ রহিল না, শ্রান্তভাবে মোড়ায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিল, পিছন ফিরিয়া দেখিল রজত ও মাধবী দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া।

বা! ঠিক যেন সিণ্ডেরেল্লার মত বসে' আছে—বলিয়া মাধবী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া ঘরখানি দেখিয়া বলিল,—বাঃ! কি সুন্দর সাজান, আর্টিষ্টের স্ত্রীর রান্নাঘর বটে।

রমলা ম্লান হাসিয়া বলিল,—ঠাট্টা কেন ভাই।

রান্নাঘর দেখা শেষ করিয়া মাধবী রজতের ষ্টুডিও দেখিতে চলিল; রান্নাঘর হইতে রমলাকে টানিয়া লইয়া গেল।

রজতের সব ছবি দেখিয়া, একখানি আদায় করিয়া, মাধবী আবার খুকীকে দেখিতে চলিল। তাহাকে বহু চুমো খাইয়া, খোকাকে আদর করিয়া, বিদায় লইবার সময় ধীরে মাধবী রমলাকে বলিল,—বেশ সুখে আছিস্ ভাই। একবার আমার ওখানে যাবে না?

রমলা শুধু করুণভাবে হাসিল। এম্‌নিই রাতে তাহার ঘুম হয় না, সে রাত্রে তাহার মোটেই ঘুম হইল না।

(৩৩)

ইহার পরে প্রায় প্রতিদিনই মাধবী রজতের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। রমলার ঘরে সে যেন কোন্ চির-ঈপ্সিত আনন্দের নীড় খুঁজিয়া পাইল। রমলাকে ঘর হইতে বাহির করা অসম্ভব, রজতও তাহার বাড়ীতে যাইতে চায় না, সুতরাং মাধবী রমলার বাড়ী যাইতে সুরু করিল। ইহাদের দুঃখের সংসার, এই সাজান ছোট ঘরগুলি, এই সুন্দর খোকাখুকী কোন্ মায়ামন্ত্র-বলে তাহাকে প্রতিদিন টানিয়া লইয়া আসিত, তাহার অশান্ত অতৃপ্ত অন্তর এখানে আসিয়া যেন কি অমৃতের স্বাদ পাইত। তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়, তাহার প্রেমতৃষিত প্রাণ, তাহার চঞ্চলচিত্তের বিরক্তিময় জ্বালা, রজতের খোকাখুকীদের সঙ্গে রজতের সঙ্গে গল্পে পরিহাসে, রমলার সঙ্গে হাস্যে কৌতুকে, একটু শান্ত হইত। সে খোকাখুকীদের জন্য জামা-কাপড় খেল্‌না খাবার পুতুল ইত্যাদি দিয়া রজতের ছোট-ঘর ভরিয়া তুলিল।

মাধবীর প্রতিদিনের ব্যবহারের রূপে রমলা অবাক্ হইয়া যাইত। তাহার দীন শান্ত জীবনধারার মধ্যে এ চঞ্চলা আসিয়া না জানি কি ঘটাইবে ভাবিয়া তাহার বক্ষ কোন্ অজানা আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিত। রমলা দেখিত, রজত এখন প্রতি সন্ধ্যায় আফিসের পরই বাড়ী ফিরিয়া আসে, সে ছবি আঁকায় মন দিয়াছে, মাধবীর সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় রজতের দীপ্ত মুখ দেখিয়া উচ্চ হাস্য শুনিয়া স্বামীর এ মনের প্রফুল্লতায় সুখ বোধ করিলেও, কোন্ অজানা বেদনায় সে ব্যথিত হইত। ঈর্ষা? না, ঈর্ষা নয়, কি অজানা আশঙ্কা।

আর মাধবী রমলার কাছে রহস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছিল প্রতিদিন তাহার নব মূর্ত্তিতে। হঠাৎ সে কোনো দুপুরে আসিয়া খোকাকে গল্প বলিয়া লুকোচুরি খেলিয়া বই পড়াইয়া সমস্তদিন কাটাইয়া রজতের আসিবার আগেই সন্ধ্যায় চলিয়া যাইত। কোনদিন রমলার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ভাঁড়ার-ঘরে ঘুরিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। কোন সন্ধ্যায়, বা রজতের সঙ্গে ছবি আর্ট ইয়োরোপীয়

সাহিত্য সম্বন্ধে গল্পে তন্ময় হইয়া যাইত। কোন বিকালে খোকাখুকীকে লইয়া মোটরে বেড়াইয়া আসিত। একদিন জোর করিয়া রমলাকে ধরিয়া গড়ের মাঠে ব্যাণ্ড শুনাইয়া আনিল।

সেদিন সমস্তদিনের তীব্র রৌদ্রদাহের পর সন্ধ্যার আকাশ কালো মেঘে ভরিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে দমকা বাতাস পথের ধূলি উড়াইয়া দরজা-জানালাগুলি সজোরে নাড়াইতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছে, আকাশ বাতাস জুড়িয়া এক প্রলয়ের সমারোহ ঘনাইয়া আসিতেছে। রমলা বারান্দায় তাহার দোলানো চেয়ারে বসিয়া পশ্চিমাকাশের ঝঞ্ঝারু রুদ্র আলোর দিকে চাহিয়া দুলিতে লাগিল। স্বামী এখনও আসেন নাই, তিনি যে কোথায় গিয়াছেন তাহা ভাবিতে তাহার মন উদাস অবসন্ন হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যাশেষে তারাহীন রাত্রির অন্ধকার নামিল। স্বামীর অসুখ হওয়াতে আজ উমার কাজ শীঘ্র শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার রান্নাঘর ধোওয়ার শব্দ নীচে থেকে আসিতেছে, এই ঝাঁটার শব্দ শুনিয়া রমলার মনে হইল ঝড়ের ধূলায় সমস্ত ঘর বিছানা জিনিষ ভরিয়া রহিয়াছে, ঝাড়িতে বা ঝাঁট দিতে তাহার কোন ইচ্ছা বা শক্তি যেন নাই।

গির্জ্জার ঘড়িতে সাতটা বাজিল। স্বামীর আসিতে দেরী হইবে বুঝিয়া ধীরে রমলা উঠিয়া আলো জ্বালাইয়া সেলাই করিতে বসিল। সেলাইয়ের কলটি অনেক দিন চালান হয় নাই। খোকাখুকীর সব জামা রমলা নিজেই কাপড় কাটিয়া তৈরী করিত। মাধবী আসার পর হইতে কোন নূতন ফ্রক বা জামা তৈরী করিবার দরকার হয় নাই। রজতের একটা পাঞ্জাবী বহুদিন কাটা পড়িয়া রহিয়াছে, সেইটি সেলাই করিতে বসিয়া বার বার মাধবীর কথা তাহার মনে ঘুরিতে লাগিল। মাধবী যে তাহার খোকাখুকীদের খুব ভালবাসে, তাহাদের দেখিয়া আদর করিয়া তাহার তৃষিত মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা মিটায়, তাহা রমলা বুঝিত। কিন্তু মাধবী কি কেবল সেইজন্যই আসে? মাঝে মাঝে রজতের প্রতি তাহার চাউনি দেখিয়া রমলার ভয় হইত রজতের প্রতি তাহার গোপন প্রেমকে সে দমন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, অগ্নিশিখার মত বুঝি জ্বলিয়া উঠে।

বাহিরে বজ্রধ্বনির সঙ্গে একটা মোটর থামার শব্দ শোনা গেল। মাধবী আসিয়াছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কলটা সরাইয়া রাখিল। সহসা দরজার সম্মুখে যতীনের মূর্ত্তি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, ভীত হইল, কোনরূপ অভ্যর্থনাও করিতে পারিল না।

যতীনের মূর্ত্তি আজ সত্যই ভয়ের—মোটরের আলোর মত তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতেছে, মুখ যেন কিসের তীব্র আবেগে প্রদীপ্ত, মাতালের মত একটু টলিয়া যতীন ঘরে ঢুকিল, আজ সে মরিয়া হইয়া আসিয়াছে।

আর-এক ঝড়ের সন্ধ্যায় শেষবার যখন যতীন আসিয়াছিল, সে ঠিক করিয়াছিল, আর রমলার দৈন্যভগ্ন জীবনের দৃশ্য দেখিতে সে আসিবে না। যাহার দুঃখ দূর করিতে পারিবে না তাহার দুঃখের ঘরে আসিয়া কি হইবে। কিন্তু সেইদিনের পর হইতে তাহার দিনগুলি শান্তিহারা হইয়াছে, রমলার দুঃখ ভাবিয়া রাতে তাহার ভাল ঘুম হয় না। পিয়ানোর গান সে বিশেষ কিছুই বোঝে না, কিন্তু রমলা ভাঙা পিয়ানো বাজাইতেছে এ কথা ভাবিতে তাহার বুকে কি ব্যথা লাগে। ব্যর্থ তাহার পৌরুষশক্তি, ব্যর্থ তাহার পুঞ্জিত স্বর্ণ, ব্যর্থ এই কলকারখানা, যে নারীকে সে ভালবাসিয়াছিল, কে তাহার প্রাণে সোনার কাঠি বুলাইয়াছিল, আজ তাহার তিলমাত্র দুঃখ সে দূর করিতে পারে না।

একথা ভাবিয়া গতরাত্রে তাহার ঘুম হয় নাই। আজ কোন্ শক্তি তাহাকে রমলার ঘরে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহার দ্বারা রমলার কি কোন উপকার হয় না? রমলা তাহার অর্থসাহায্য কি গ্রহণ করিতে পারে না—এ ত বন্ধুর নিবেদন? রমলার জন্য রজতের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা উচিত, স্বাস্থ্যের জন্য রমলার সব খাটুনী বন্ধ করা দরকার, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া দরকার। এরূপভাবে রজতকে অর্থ দিতে আসার মধ্যে যে কি অন্যায় রহিয়াছে তাহা যতীনের খেয়াল ছিল না, সত্যই তাহার মাথা ঠিক ছিল না।

খোকার জন্য যে ইঞ্জিন গাড়ী ও বাড়ী তৈরী করিবার কাঠের খেলনা আনিয়াছিল তাহা টেবিলে রাখিয়া যতীন

রমলার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—এগুলো খোকার জন্য আনলুম।

খোকার নাম হওয়াতেই রমলার মুখ খুসিতে ভরিয়া উঠিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল,—ও, খোকা নীচে গল্প শুনছে আপনি বসুন।

যতীন সম্মুখের চেয়ারটা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বলিল,—রজত কৈ?

—তিনি ত এখনও আসেন নি, বোধ হয় রাত হবে আস্‌তে।

চেয়ারটা রমলার দিকে অগ্রসর করিয়া যতীন বলিল,—আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

একটু ভীত হইয়া রমলা যতীনের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিল। আবার কথা আছে! হাজারিবাগের রান্নাঘরের কথা মনে পড়াতে তাহার মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল। প্রেমকরুণ নয়নে যতীনের দিকে সে চাহিল, মৃদুস্বরে বলিল—আপনি শান্ত হয়ে বসুন।—চা খাবেন?

যতীন আপনাকে শান্ত করিয়া বলিল,—না। আচ্ছা আমি বস্‌ছি, আপনিও বসুন।

দুইজনে দুই চেয়ারে মুখোমুখি বসিল। মোহমায়াভরা চোখে রমলার দিকে চাহিয়া যতীন একটু অনুনয়ের সুরে বলিল,—দেখুন, আপনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন, মনে আছে।

একটু বিস্মিত হইয়া যতীনের বেদনাময় মুখের দিকে চাহিয়া রমলা চুপ করিয়া রহিল। যতীনের চোখ দুইটি একবার দ্বিপ্রহরের আকাশের মত জ্বলিয়া উঠিতেছে, একবার ঝড়ের সন্ধ্যার মত কালো হইয়া আসিতেছে।

যতীন একটু ব্যথার সুরে বলিতে লাগিল,—সেই হাজারিবাগে, আমি বলেছিলুম, আমি আপনার বন্ধু হতে চাই—

ধীরে রমলা বলিল,—হাঁ মনে পড়্‌ছে, আমি বলেছিলুম আমার কোন আপত্তি নেই।

নম্রস্বরে যতীন বলিল,—হাঁ, আজ সেই বন্ধু হিসেবে আপনার কিছু কাজে লাগ্‌তে চাই।

ভ্রূকুটি করিয়া রমলা কহিল—কি?

ধীরে পকেট হইতে একতাড়া নোটের বাণ্ডিল বাহির করিয়া যতীন অতি লজ্জিতভাবে অস্ফুটস্বরে বলিল—এই।

রমলা একবার যতীনের নোটের বাণ্ডিল আর একবার তাহার আবেগময় মুখের দিকে খরদৃষ্টিতে চাহিল, চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার বুকের রক্ত-চলাচল যেন কোন গভীর আঘাতে একবার ঝলকিয়া উঠিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে, চেয়ারটা সজোরে ধরিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া সে দৃঢ়স্বরে বলিল,—না, দেখুন—

যতীন একবার করুণচোখে রমলার মুখের দিকে চাহিল, বিনীতস্বরে বলিল,—আপনি বুঝ্‌ছেন না, আমি এ রজতকে দেব, তবু আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে—

রমলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুধু মাথাটা নাড়িল।

বুঝ্‌ছ না, বলিয়া যতীন আপন দৃঢ় হস্তে রমলার হাত চাপিয়া ধরিল, ইঞ্জিনচালক যেমন চালাইবার চাকাটা জোর করিয়া ধরে। কোন্ আবেশে রমলার দেহের সমস্ত রক্ত যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল, বুক দুলিতে লাগিল, ফণিনীর মত সে যতীনের দিকে চাহিল, হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,—আপনি যান।

ঠিক সেই সময়ে জুতার শব্দে দুইজনে চমকিয়া উঠিল, যতীন চাহিয়া দেখিল সম্মুখে রজতের দীর্ঘধূসর মূর্ত্তি, রমলা দেখিল রজতের অঙ্গারের মত কালো চোখ। নোটের তাড়া যতীনের হাত হইতে পড়িয়া মেজেতে গড়াইয়া খুকীর দোল্‌নার কাছে গেল। যতীন বলিতে-যাইতেছিল,—হালো রজত,—কিন্তু তাহার ব্যঙ্গঘৃণা-পূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া একটু ভীত হইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। মাতালের মত টলিতে টলিতে রজত রমলার দিকে যাইতেছিল, সম্মুখের দৃশ্যটা যেন সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, রমলার স্থির শান্তমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। এ কোন্ মহীয়সী নারী! রজত কি বলিতে যাইতেছিল, পারিল না।

এক মুহূর্ত্ত, তিনজনেই স্তব্ধ দাঁড়াইয়া। সহসা এক হাসির শব্দে তিনজনেই চমকিয়া উঠিল, ঘরে যেন একটা বাজ পড়িল। রমলা ও যতীন চাহিয়া দেখিল অগ্নিশিখার নৃত্যভঙ্গিমার মত মাধবী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বিস্ময়ব্যঙ্গ-মিশ্রিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল,—Oh dear ! তুমি এখানে ? আমি ভেবেছিলুম কারখানায়।

অতি অপ্রতিভ হইয়া যতীন তাহার দিকে চাহিল। চঞ্চলপদে দোলনার দিকে অগ্রসর হইতে মেজেতে নোটের তাড়াটা মাধবী তাহার লাল ভেলভেটের নাগরা দিয়া মাড়াইয়া ফেলিল। এটা কি, বলিয়া ব্যস্ততার সহিত বাণ্ডিলটা তুলিয়া নাচাইয়া হাসিমাখা স্বরে বলিল,—কার এটা ? বা, সব চুপচাপ ! কারো নয় ত ? unclaimed property কার হয় রমলা ? যে পেয়েছে তার ত ?

রমলার মনে পড়িয়া গেল হাজারিবাগে একদিন যতীনের মোটর লইয়া সে এই প্রশ্নটি করিয়াছিল, কিন্তু আজ সে পরিহাস তাহার ভাল লাগিল না, অতি অবসন্ন হইয়া করুণ মুখে সে সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

গ্লানিভরা চোখে যতীনের দিকে চাহিয়া মাধবী কান্নার চেয়ে করুণ হাসিতে বলিয়া উঠিল—বেশ ! এ নোটের তাড়া আমার আর খুকীর, কি বল টুনি, বলিয়া সে দোলায় নিদ্রিতা খুকীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

সমস্ত দৃশ্যটা এক দুঃস্বপ্নের মত রজতের চোখে যেন চাপিয়া ছিল, তাহার দম যেন আটকাইয়া যাইতেছিল, মাধবীর এই মত্ত ব্যবহারে সে দিশাহারা হইয়া গেল, তাহার কালো কেশে রক্তবেশে দেহভঙ্গিমায় প্রাণ যেন সহস্রশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এ নগ্ন অগ্নির মূর্ত্তি, তাহার সাহসের অন্ত নাই, এ যে কি করিবে তাহার ঠিক নাই।

ঘৃণাবেদনাময় চোখে একবার রমলার দিকে চাহিয়া রজত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার দম আটকাইয়া যাইতেছে, অন্ধকার বারান্দায়ও আসিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, এ বাড়ীতে তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া যাইতেছে। ওঃ, বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

রজত ঘর হইতে বাহিরে যাইতে রমলা বাণবিদ্ধা হরিণীর মত মাধবীর দিকে চাহিল, করুণস্বরে যতীনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল,—ওটা ওঁকে দাও। যাও ভাই, তোমরা যাও।

যতীন নির্নিমেষনয়নে একবার রমলার দিকে চাহিল। হায় সে এ কি করিল ! তাহার বুকের মধ্যে হৃদয় যেন বিঁধিল, হৃৎপিণ্ড বুঝি সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ্‌-হীন বয়লারের মত ফাটিয়া যাইবে। মাধবীর হাত হইতে নোটের বাণ্ডিল লইয়া নতমুখে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মাধবী একবার মুদিত কমলের মত ঘুমন্ত খুকীর দিকে চাহিল, একবার ঝঞ্ঝাহতা লতার মত ব্যথিতা রমলার দিকে চাহিল, তাহার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। রমলাকে সে কি সান্ত্বনার বাণী বলিতে পারে ! ক্ষমাভিক্ষা-পূর্ণ বেদনাময় চোখে চাহিয়া রমলার মাথায় ধীরে হাত বুলাইয়া মিনতিস্বরে মাধবী বলিল,—ক্ষমা কর ভাই, সব দোষ আমার, তোমাদের দুঃখের সংসারে দুঃখ বাড়িয়েই গেলুম !

খুকীকে নীরবে একটি চুম্বন করিয়া মাধবী চলিয়া গেল।

এতক্ষণ রমলা আপনাকে শান্ত করিয়া স্থির হইয়া চেয়ারে বসিয়া ছিল, সকলে চলিয়া গেলে সে বৃন্তচ্যুত পদ্মের মত মেজেতে লুটাইয়া পড়িল, তার পর দুই চক্ষুর তট ভাঙিয়া কত দুঃখদিনের কত নিরুদ্ধ অশ্রুর বান ডাকিয়া আসিল।

ইহার পর রজত ও রমলার তিনদিন তিনরাত্রি বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মত কাটিল। নানা খুঁটিনাটি কাজ দিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত ভরিয়া দিন কোন রকমে কাটিত, কিন্তু অন্ধকারময় বিনিদ্র রাত্রি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহিত না। রজত খাটে চুপ্‌চাপ শুইয়া থাকিত, রমলা মেজেতে পাটি বিছাইয়া বা ঠাণ্ডা মেজেতেই শুইয়া থাকিত। দুই জনেই স্তব্ধ, দুই জনের মাথা দপ্‌দপ করিত, চোখ জ্বলিত, বুক দুলিত, অন্ধকারে চাহিয়া থাকিত, কিন্তু কেহই ছট্‌ফট্‌ করিতে পারিত না, পাছে অপর জন ভাবে—ও জাগিয়া আছে। রজত যখন মাঝে মাঝে বেদনায় বিছানা হইতে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইত, রমলা মড়ার মত অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিত। আবার কিছুক্ষণ পরে রজত বিছানায় আসিয়া শুইলে, রমলা উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিত, রজত নিঃশব্দে শুইয়া থাকিত। রাত্রে দুইজনে কতবার এইরূপ ঘর ও বাহির করিত।

অন্ধকার আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া রজত

ভাবিত, এ কি হইল; দৈন্য-দারিদ্র্যের বোঝা বহন করা যায়, কিন্তু প্রেম না থাকিলে সে সত্যই মরিয়া যাইবে। হায়, সে রজত, মরিয়া গিয়াছে, তাহার প্রেত এ অন্ধকার বাড়ীর বারান্দায় বেড়াইতেছে। তাহারই ত দোষ, কেন সে মাধবীর সঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। না, রমলার প্রেম মরে নাই। আচ্ছা সত্যই যদি প্রেম মরিয়া যায়, কি করা যাইতে পারে, জীবনে শুধু নৈরাশ্য, শুধু ব্যর্থতা! সে আমাকে আর ভাল বাসিতে পারিতেছে না, কিন্তু একদিন সে যে আমায় মনপ্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিল, সে কথা যে ভুলিতে পারিতেছি না। বিবাহটা হয়ত আদর্শ পথ নয়, ওটা অস্বাভাবিক অবস্থা, একজনের সঙ্গে সারাজীবন এম্নিভাবে জড়িত হইয়া বাঁধা থাকা ত প্রেমের পায়ে শিকল বাঁধা। এ বিবাহবন্ধনের খাঁচায় প্রেমের পাখীটি যেদিন মরিয়া যায় সেদিন সংসার যে সত্যই কারাগার হয়, জীবন হয় মেয়াদ খাটা। সত্যই যদি রমলা তাহাকে ভাল-না বাসে তবে রজত তাহাকে মুক্তি দিতে চায়। অবরোধ-হীন নারীর দুর্ভাগ্য এই যে তাহারা অর্দ্ধমুক্ত। তাহারা একেবারে মুক্ত হইলে আপনাদের পূর্ণবিকাশের জন্য নিজেরাই সমাজ-নিয়ম রচনা করিত। মুক্তির রূপ তাহারা দেখিয়াছে কিন্তু পায় নাই, বাহিরের জন্য তাহাদের মন চঞ্চল, কিন্তু ভাঙা ঘরেই থাকিতে হইবে। না, না, রমলার প্রেম মরে নাই, ও প্রেম হারাইলে রজত বাঁচিতে পারিবে না।

রমলা ভাবিত, আর কেন, আর সে বহিতে পারে না। সত্যকার রমলা ত অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ভূত এই ঘরবাড়ী এই স্বামী পুত্র কন্যাদের সংসার জুড়িয়া বসিয়া আছে, সে ভূত হইতে এ সংসারের কবে ত্রাণ হইবে? মাঝে মাঝে সে যেন জ্বরে শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিত, সত্যই হয়ত সে মরিয়া যাইবে। বারান্দায় বাহির হইয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিত—না, দেবতা, মরিতে সে চায় না। স্বামীর প্রেম যদি সে সত্যই হারাইয়া থাকে তবু মরিতে সে চায় না; মাতার দোষে এই ফুলের মত নির্ম্মল নিষ্পাপ শিশুদের দণ্ড দিও না. প্রভু, তাহার অসহায় খোকাখুকীদের সুখে রাখ, তাহাদের জন্য তাহাকে বাঁচিতে দাও।

রজত প্রার্থনা করিত—প্রভু এ বিভীষিকা হ'তে রক্ষা কর; রুদ্র, দয়া কর, দয়া কর, সব পাপ ক্ষমা কর, জীবনের এ অংশটাকে তোমার ত্রিশূল দিয়ে কেটে তোমার বজ্র দিয়ে ছিন্ন বিছিন্ন করে' তোমার তৃতীয় নেত্র দিয়ে দগ্ধ কর, যে অগ্নিচক্ষু দিয়ে তুমি মদনকে ভস্ম করেছিলে, তার পর তোমার জটাবাহিনী প্রেমমন্দাকিনীর জল ছোঁয়াও, ছোঁয়াও।

চতুর্থ নিশীথে অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া রমলা বহুক্ষণ গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিল। এ প্রেম-হীন জীবন সে বহিতে পারে না। আকাশে মেঘের ঘন-ঘটা ভ্রুকুটি করিয়া রহিল। শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া রমলা বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙিল, সম্মুখে অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ ঝল্সিয়া উঠিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, জলের ছাটে শাড়ীর অর্দ্ধেক ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার সিক্ত মাথাটা রজত কোলে করিয়া বসিয়া আছে।

বিদ্যুতের আলোয় দুইজনের অশ্রুজলভরা চোখের মিলন হইল। রজত রমলাকে কোলে করিয়া ঘরে মাদুরে আনিয়া শোয়াইল। রজতের ঈষদার্দ্র কোলে মাথা রাখিয়া রমলা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অশ্রুজলসিক্তকণ্ঠে রজত বলিল,—চলো রমু, আমরা কোথাও চলে' যাই।

রমলা ভাঙা গলায় বলিল,—তাই চলো। কিন্তু কোথায় যাবে?

রজত রমলার ভিজে চুল খুলিতে খুলিতে বলিল,—হাজারিবাগ যাবে?

একটু আশ্চর্য্য হইয়া রমলা বলিল,—হাজারিবাগ! কোথায় থাক্বে?

রমলার গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে রজত বলিল,—যেখানে তোমায় প্রথম পেয়েছিলুম, সেই বাড়ীতে।

রমলা বলিয়া উঠিল,—না-না।

—তুমি জান না, সে বাড়ী কাজী-সাহেবের।

—কাজী? তিনি এসেছেন?—রমলার চোখের জলের বাঁধ আবার ভাঙিয়া গেল।

মৃদুকণ্ঠে রজত বলিল,—হাঁ তিনি এসেছেন, কাল তোমার কাছে আস্বেন।

ছোট মেয়ের মত আনন্দের স্বরে রমলা বলিয়া উঠিল—কাজী আস্‌বে, কাজী!—রমলা চোখের জলে রজতের ক্রোল ভাসাইয়া দিল।

রজত চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল,—হাঁ, কাজী-সাহেব মক্কায় গিয়েছিলেন, কিছুদিন হ'ল ফিরেছেন। ও বাড়ী যোগেশ-বাবু কাজীসাহেবকে দিয়ে গেছেন।

অতি ধীরে রমলা বলিল,—কিন্তু টাকা? তোমার ত' ছুটি নিতে হবে।

রজত রমলার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—ললিত ছবি বিক্রির পাঁচ শ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, আর বোম্বের একজিবিশনেও কিছু বিক্রি হয়েছে।

ললিত!—নামটি উচ্চারণ করিতেই রমলার অশ্রু আবার ঝরিতে লাগিল।

রমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া রজত বলিল,—রমু চলো, আমরা এখান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

স্বামীর গলা জড়াইয়া রমলা বলিল,—তাই চলো, তাই চলো।

বাহিরে আকাশে বারিঝরার বিরাম নাই, ঘরেও দুই-জনের চোখে অশ্রু-জলের বাঁধন রহিল না।

সুপ্তশিশুর দোলার পাশে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া বহুরাত্রি পরে রমলা শান্ত হইয়া ঘুমাইল।

(৩৪)

রজতের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মড়ার মুখের মত মরা আলোয় ভরা আকাশের দিকে চাহিয়া যতীন কারখানার দিকে মোটর হাঁকাইয়া চলিল। দুধারে ভূতের ছায়ার মত বাড়ীর সারি কোন প্রচণ্ড প্রলয়ের আশঙ্কায় যেন ভীতস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, গ্যাসগুলির দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে, ঝড়ের আকাশ শনির দৃষ্টির মত তাপিত পীড়িত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে, মাঝে মাঝে মড়ার অট্টহাসের মত বিদ্যুতের ঝিলিক। কালীর মত অন্ধকার কালো খাল পার হইয়া ধূমে অবগুণ্ঠিত কদর্য্য বস্তি ছাড়াইয়া কারখানার কাছে আসিতেই যতীন শিহরিয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশে একখানা কালো মেঘের পটে কে রক্তের প্রলেপ বুলাইতেছে, ও কি সাপের ফণার মত লক্ লক্ শিখায় অন্ধকার আকাশ দংশন করিতেছে! ও কি বজ্রগর্জ্জন! উন্মত্তের মত লাফাইয়া যতীন চেঁচাইয়া উঠিল,—Oh! fire, fire!

মোটরটা পাশের এক গাছে গিয়া ধাক্কা খাইল, ড্রাই-ভার হীরা সিং চকিতপদে উঠিয়া পিছন হইতে মোটরের চালন-চক্র না ধরিলে হয়ত পাশের নর্দ্দামায় গিয়া পড়িত। হীরা সিংহের হাতে মোটর চালান ছাড়িয়া যতীন অগ্নি-নেত্রে সম্মুখের অগ্নিলীলার দিকে চাহিয়া রহিল। চেঁচাইয়া বলিল—হীরাসিং, জল্‌দি হাঁকাও, জল্‌দি। আগুন না?

গম্ভীর কণ্ঠে হীরা সিং বলিল,—হাঁ সাহেব, কারখানায় আগুন লেগেছে।

মোটর যখন কারখানার গেটের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, যতীন মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মত কারখানার মধ্যে মাঠে ছুটিয়া গেল। সাহেবকে মরিবার মত ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া হীরা সিং যতীনের পিছনে পিছনে ছুটিল।

শ্মশানের মত সম্মুখের অন্ধকার সহস্র জ্বলন্ত চিতার আলোকে ও ধূমে ঝলমল্ করিয়া উঠিয়াছে, কি যে হইয়াছে যতীন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। চারিদিকের অন্ধকারে কতরকম শব্দের ঢেউ মত্ত সমুদ্রতরঙ্গের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আগুনের শিখা লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতেছে।

সম্মুখে অগ্নির এই তাণ্ডব নৃত্য এই প্রলয়-দৃশ্য দেখিয়া যতীনের প্রাণ যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। সব ভাঙিয়া চুরিয়া পুড়িয়া গলিয়া ছাই হইয়া যাক। পকেট হইতে নোটের তাড়াটা টানিয়া বাহির করিয়া সে সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

এ কি শব্দের ঝঞ্ঝা! চিমনী ফাটিতেছে, মেজে ফাটিতেছে, দেওয়াল ভাঙ্গিতেছে, ছাদ পড়িতেছে, মজুরেরা চীৎকার করিয়া কণ্ঠ ফাটাইতেছে, চারিদিকে ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে ভূতের মত মানুষেরা অগ্নি ঘিরিয়া প্রেতলোকের কোন্ তাণ্ডব-রাগিণী বাজাইতেছে।

এ কি অগ্নির নৃত্য! ওই গুদামঘর হইতে আগুন অফিসের ছাদে নাচিয়া পড়িল, ওই এদিকে হইতে ওদিকে লাফাইয়া যাইতেছে, কুলীদের খোলার বস্তির মাথায় লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে। ইট পুড়িতেছে, কাঠ

পুড়িতেছে, মাটি পুড়িতেছে, মানুষ পুড়িতেছে। মাটি জ্বলিতেছে, লোহা জ্বলিতেছে, আকাশ জ্বলিতেছে, বাতাস জ্বলিতেছে, হৃদয় জ্বলিতেছে।

এই অগ্নিময় ধ্বংসের রক্তিম রূপ যতীনকে যেন প্রমত্ত করিয়া তুলিল, রুদ্রের পিনাকধ্বনি যেন কোন্ মায়ামন্ত্র পড়িয়া ডাক দিল। আফিস-ঘর হইতে যতীনের বাংলোর উপর আগুন লাফাইয়া পড়িতেই সে উন্মত্তের মত সেইদিকে ছুটিল। হীরা সিং তাকে আট্‌কাইতে পারিল না। যতীন চেঁচাইল,—ম্যানেজার ম্যানেজার! কোথায় ম্যানেজার? মানুষ পোড়ার একটা গন্ধ নাকে আসিতেই সে দিক্ হইতে ফিরিয়া ক্ষিপ্তের মত গুদামঘরের দিকে ছুটিয়া যাইতেই তাহার সম্মুখে একটা বাক্স প্রচণ্ড শব্দে ভাঙিয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ফাটিয়া গেল, তাহার ভিতরের শিশিগুলি ফাটিতেছে আর গলিতেছে। অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া সে দিক্ হইতে আসিয়া যতীন এবার ইঞ্জিন-ঘরের দিকে পাগলের মত ছুটিয়া যাইতেছে দেখিয়া হীরা সিং জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া মাঠে টানিয়া আনিল। ছোড়্ দেও, the boy is burning there—বলিয়া জোরে ঝাঁকুনি দিয়া হীরা সিংহের হাত ছাড়াইয়া যতীন ইঞ্জিনঘরের দিকে চলিল, সে দিক্ হইতে একটি ছেলের তীব্র আর্ত্তনাদ আসিতেছে, আর মাংস পোড়ার গন্ধ। একটু অগ্রসর হইতেই ভীম অজগরের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া এক মোটরকার আসিয়া তাহার পথরোধ করিল। দি ডেভিল!—বলিয়া মোটরকারের পাশ দিয়া সে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটিয়া চলিল। আর-একটু যাইতেই কে পেছন হইতে টানিল, সঙ্গে সঙ্গে কার্‌খানার শেষ প্রান্তে সমস্ত কার্‌খানার জমি কাঁপাইয়া একটা কল ফাটিয়া গেল, ভগ্ন লোহার অংশগুলি বন্দুকের গুলির মত চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া গেল। সেই প্রচণ্ড শব্দে মুখ ঘুরাইয়া যতীন দেখিল মাধবী তাহার হাত ধরিয়া টানিতেছে। কান্নার সুরে মাধবী বলিল,—বাড়ী চল।

ছেড়ে দাও, বলিয়া যতীন আবার অগ্রসর হইল। মাধবী তাহার পিছনে ছুটিল। যতীন বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। আগুনের তেজে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এক জলের পাইপে পা আট্‌কাইল, একটা লোহার শিক সজোরে কপালে আঘাত করিল, মূর্চ্ছিত হইয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চঞ্চল চরণে মাধবী আসিয়া নতজানু হইয়া যতীনের দেহ দুই হাতে জড়াইয়া আগুনের ঝলকা হইতে অনেকখানি টানিয়া লইল। মাথাটায় হাত বুলাইয়া, এবার সে কি করিবে ভাবিতেছে, তাহার সম্মুখে একটা দেওয়ালের এক পাশ ভাঙিয়া পড়িল। অগ্নির তেজ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এরূপভাবে যতীনকে ফেলিয়া যাইতেও ত সে পারে না।

না, কেন সে যাইবে, ওই অগ্নির লক্‌লক্ শিখা তাহাকে যেন বাঁশি বাজাইয়া ডাকিতেছে, এ প্রলয়-উৎসবে অগ্নি-নাগিনীদের সঙ্গে সেও যোগ দিক, ওই তাণ্ডব নৃত্যে অগ্নির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সেও ছাই হইয়া যাক্ না। অগ্নি-মদিরা তাহাকে যেন মত্ত করিয়া তুলিতেছে, যাদুমন্ত্রে ডাকিতেছে, আবেগের সঙ্গে মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইল, মরিআ হইয়া বুঝি অগ্নিকুণ্ডে ঝাপাইয়া পড়ে। পায়ের কাছে যতীন আর্ত্তনাদ করিয়া নড়িয়া উঠিল। যতীনের অর্দ্ধদগ্ধ সিল্কের সুটের দিকে চাহিয়া মাধবী নতজানু হইয়া তাহার পাশে বসিল। যতীনের কপাল দিয়া রক্ত ঝরিতেছে। মাধবী আতর-সুবাসিত রুমালটা কপালে চাপিয়া ধরিল। সম্মুখে অগ্নি-নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। পিছনে এক দরজা ভাঙিয়া-পড়িয়া যাইবার পথ বন্ধ করিল। মাধবী নির্নিমেষ নয়নে যতীনের রক্তাক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মা—জী!

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া একটু ভীত হইয়া মাধবী চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে যেন আরব্য উপন্যাসের কোন দৈত্য আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ জ্বলিতেছে, মুখ জ্বলিতেছে, জ্বলন্ত দরজাখানা সে ঠেলিয়া যাইবার-পথ করিতেছে।

ভাঙা দরজাখানা ঠেলিয়া দিয়া যাইবার-পথ করিয়া গালপাট্টা দাড়ি নাড়িয়া হীরা সিং ডাকিল—মা-জী! সে পাগড়ী খুলিয়া যতীনের মাথায় জড়াইল, তার পর আপন সবল দুই বাহু দিয়া যতীনের অর্দ্ধমূর্চ্ছিত দেহ তুলিয়া কোলে করিয়া মোটরের দিকে ছুটিল। মাধবী যতীনের

মাথাটা হাত দিয়া ধরিয়া হীরা সিং এর সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

মোটরে অর্দ্ধশায়িত ভাবে যতীনকে রাখিলে, বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে যতীন একটু সচেতন হইয়া নড়িয়া উঠিল, রক্তাক্ত পাগ্‌ড়ী খসিয়া গেল, মাধবী তসরের শাড়ীর আঁচল ছিঁড়িয়া কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া তাহার পাশে বসিয়া আপন বুকে যতীনের মাথাটা রাখিয়া বলিল, —হীরা সিং, জল্‌দি।

হীরা সিং মোটর ছুটাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ইঞ্জিনচালকের মত কয়লার গুঁড়া ধোঁয়া ধূলোয় কালো অর্দ্ধেক-পোড়া স্যুট-জড়ান যতীনের তপ্ত দেহ নিজের বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার রক্তাক্ত কপাল নিজের কাঁধে রাখিয়া মাধবী একবার ঝড়ের আকাশের দিকে চাহিল। কালো আকাশে বিদ্যুৎ অগ্নিবরণী নাগিনীর মত খেলিয়া বেড়াইতেছে, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিল, সজল ঝোড়ো হাওয়া দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে।

জলহাওয়ার স্পর্শে যতীনের মূর্চ্ছা ভাঙিয়া গেল, বিকারগ্রস্ত রোগীর মত সে আর্ত্তনাদ করিয়া চেঁচাইয়া মাধবীর বাহুবেষ্টন ছাড়াইয়া লাফাইয়া উঠিতে চাহিল।

কে—পালাও—আগুন—চুরমার—বয়লার—রমলা—ছেড়ে দিচ্ছি—পালাও—boy burning—ছোড় দেও—আহা grand—জ্বলে যাক্—সব পুড়ে যাক্—আহা—ছেড়ে দাও—fire—রমলা—

হীরার মত উজ্জল মাধবীর চোখ নীলার মত স্নিগ্ধ হইয়া আসিল, গভীর প্রেমের সহিত সে যন্ত্ররাজের অগ্নি-লীলাদগ্ধ এই যান্ত্রিককে আপন বক্ষে সজোরে জড়াইয়া রাখিয়া তাহার রক্তাক্ত কপালে ধীরে চুম্বন করিল। একবার দূরে কারখানার দিকের আকাশে ধূমের কুণ্ডলীর দিকে চাহিল, যেন কোন সর্পযজ্ঞ হইতেছে। তার পর অনিমেষ নয়নে যতীনের মুখের দিকে মাধবী চাহিয়া রহিল। কত যুগ পরে সে স্বামীকে এইরূপ বক্ষে জড়াইয়া চুম্বন করিল! যতীন শান্ত হইয়া মাধবার বুকে শুইয়া রহিল। অন্ধকারে উল্কার মত মোটর ছুটিয়া চলিল।

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

আহ্বান

(ভিক্টর হুগোর অনুসরণে তরু গুল্মের ছায়ায়)

ওগো এখনো রুদ্ধ দ্বার—
পূর্ব্ব আকাশে তরুণ তপন
এসেছে লইয়া নবীন কিরণ,
প্রভাতের বায় নবীন জীবন
ভরিয়াছে চারিধার;
গোলাপ যখন ফুটেছে, তখন
সময় কি ঘুমাবার?
আর ঘুম কেন?
শোনো, কথা রাখ;
কেঁদে কেঁদে মরি,
কেন দূরে থাক?

বাহির হইয়া দেখ ওগো আসি
কেমনে তোমার তরে
আলো প্রেম আর সুমধুর গান
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধ'রে;
—পূরবের আলো তোমারেই চায়,
তোমারে শুনাতে পাখী গান গায়,
মোর ভালবাসা তোমা-পানে ধায়
বিশ্রাম লভিবারে।
আর ঘুম কেন?
শোনো, কথা রাখ;
কেঁদে কেঁদে মরি,
কেন দূরে থাক?

দূরে দূরে রহি বহি মোরা শুধু
ব্যর্থ জীবনভার,—
বিফল করিয়া কাজ কিবা বল
অভিলাষ বিধাতার?
মোর হৃদয়ের সুচির প্রণয়
শুধুই তোমার লাগি
রহেনি কি বঁধু?—তব রূপরাশি
মোরি দরশন মাগি'?

শ্রী অশ্বিনীকুমার ঘোষ

ছন্দের শ্রেণী বিভাগ

সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক শ্লোকের চারটে করে' ভাগ আছে এবং অধিকাংশ স্থলেই এ চার ভাগের গঠন-প্রণালী অবিকল এক রকম। সুতরাং এক ভাগের গঠন-ভঙ্গী নির্দ্দেশ করে' দিলেই সবটা শ্লোকের নির্ম্মাণ-কৌশল আয়ত্ত হয়ে যায়। এ চার ভাগের প্রত্যেক ভাগকে এক-একটি চরণ বা পদ বলা হয়। আবার অনেক স্থলেই প্রত্যেক চরণের এক বা ততোধিক জায়গায় যতি বা বিরামের ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত ভাষায় এক যতি থেকে আর-এক যতি পর্য্যন্ত শ্লোকাংশের কোনো নাম নেই, নামের দরকারও হয় না। কিন্তু বাংলায় এক যতি থেকে আর এক যতি পর্য্যন্ত যে পদ্যাংশ, তার উপরেই প্রধানতঃ ছন্দের গঠন-কৌশল নির্ভর করে। সুতরাং এ রকম এক-একটি অংশকেই বাংলা পদ্যের পদ বলা সঙ্গত। ইংরেজিতেও দুই যতির মধ্যবর্ত্তী অংশের উপরেই সমস্ত ছন্দ নির্ভর করে এবং এ অংশকে ইংরেজিতেও foot বা পদ বলা হয়। কিন্তু প্রত্যেক পদের নির্ম্মাণ-প্রণালীর উপর সমস্ত কবিতাটার অন্তঃপ্রকৃতি নির্ভর করলেও কয়েকটি পদের বিভিন্ন সমাবেশের দ্বারাই কবিতার বাহ্যপ্রকৃতি নিয়মিত হয়। কোন কবিতার ছন্দের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হ'লে তার ভিতরের গঠন ও বাইরের গঠন এ দু-ই জানা চাই; অর্থাৎ জানতে হবে এ কবিতায় প্রতি ছত্রে কয়টি করে' পদ আছে এবং প্রত্যেক পদ গঠিত হয়েছে কোন্ প্রণালীতে। সুতরাং কোনো পদ্যের প্রত্যেক পাদের নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং তার প্রত্যেক ছত্রের অন্তর্গত পাদ-সংখ্যার উপর লক্ষ্য রেখেই বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নামকরণ করতে হ'লে প্রত্যেকটি নাম অর্থদ্যোতক হওয়া চাই। অর্থাৎ ছন্দের নাম থেকেই ছন্দের অন্তর্গঠন ও বহির্গঠন অনায়াসেই বোঝা যাবে এবং নামগুলোর সঙ্গে একবার পরিচয় হয়ে গেলেই কোনো এক ছন্দের একটি কবিতা পড়লেই তার নাম মনে জেগে উঠবে। এখন আমরা শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। পাঠক নামের অর্থ ও তৎসঙ্গে প্রদত্ত উদাহরণ থেকেই এ রকম নামকরণের সার্থকতা উপলব্ধি করবেন। সুতরাং এ নামকরণের পক্ষে আমার কোনো রকম ওকালতি করা নিষ্প্রয়োজন। প্রথমে স্বরবৃত্ত ছন্দটাই ধরা যাক্।

স্বরবৃত্ত ছন্দ

প্রতিপাদে স্বরের সংখ্যা, স্বরগুলোর গুরু-লঘু-ভেদে বিভিন্ন সন্নিবেশ এবং প্রতি ছত্রে পাদ-সংখ্যা—এই তিনটে বিষয়ের বিচিত্র সমাবেশের ফলে স্বরবৃত্ত-ধারায় বহু শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি হয়েছে। এই বহু শাখা-প্রশাখার মধ্যে অনেকগুলো ইংরেজি সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার অনেক ছন্দের অবিকল অনুরূপ। যথাস্থানে সে কথা উল্লেখ করা যাবে। প্রথমত, দেখা যায় স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে দুই স্বর, তিন স্বর, চার স্বর, এমন কি দুই-তিন বা তিন-দুয়ের মিশ্রণে পাঁচ স্বর এবং তিন-চার বা চার-তিনের মিশ্রণে সাত স্বর পর্য্যন্ত থাকতে পারে। সুতরাং স্বরবৃত্ত ছন্দকে প্রথমতঃ দ্বিস্বর পাদ, ত্রিস্বর পাদ, চতুঃস্বর পাদ, পঞ্চস্বর পাদ এবং সপ্তস্বর পাদ, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক পাদের আদি, মধ্য কিংবা অন্তস্থিত স্বর লঘু বা গুরু হ'তে পারে। সুতরাং এ দিক্ থেকে এ ছন্দকে আদিগুরু বা আদিলঘু, মধ্যগুরু বা মধ্যলঘু প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করা যায়। তৃতীয়ত, এ ছন্দের কোনো কবিতায় যদি প্রতি ছত্রে দুটো, তিনটে, চারটে বা পাঁচটা করে' পদ থাকে তবে সে ছন্দকে দ্বিপদী ত্রিপদী, চৌপদী পঞ্চপদী প্রভৃতি নাম দেব। কিন্তু অনেক সময় কোনো ছত্রে কয়েকটি পূর্ণ পদ এবং শেষে একটা অপূর্ণ পদ থাকে, যেমন তিনটে পূর্ণ পদ ও একটা অপূর্ণ পদ, সে স্থলে ছন্দকে অপূর্ণ চৌপদী প্রভৃতি নাম দেওয়া যায়। এ অপূর্ণতা আবার অনেক রকম হ'তে পারে; কোথাও একটি স্বরের অভাবে অপূর্ণ, কোথাও দুটো স্বরের অভাবে অপূর্ণ, ইত্যাদি। এখন আমরা এই বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টান্ত দিতে প্রবৃত্ত হব। প্রত্যেক দৃষ্টান্তের সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ণপরিচয়সূচক নাম দেওয়া যাবে এবং

বিভিন্ন ভাষার কোনো ছন্দের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য থাকলে যথাস্থানে সে কথার নির্দ্দেশ করা যাবে। বলা বাহুল্য এই-সকল বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাবেশের ফলে যে বহুসংখ্যক ছন্দের উৎপত্তি হ'তে পারে সে-সমস্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া অসম্ভব, নিষ্প্রয়োজনও বটে। আমরা প্রধানত ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচায়ক দৃষ্টান্ত-সমূহই উদ্ধৃত করব।

১। দ্বিস্বর পাদ।

(১) আদিগুরু—

হায়রে বন্ধু দুঃখ মোর সে
বল্‌তে চক্ষে ঝর্‌ছে জল;
বেদ্‌না- সিন্ধু উথ্‌লে উঠ্‌ছে
মোর এ বক্ষে, নাইক তল।
(অপূর্ণ আটপদী)
ইং—trochee ; সং—তূণক।

(২) অন্তগুরু—

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ-শ্যামল;
মহে- শ্বরের প্রলয়- পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।
—সত্যেন্দ্রনাথ
(পূর্ণ আটপদী)
ইং—iambus ; সং—পঞ্চচামর বা প্রমাণিকা।

(৩) উভয়গুরু—

ভোম্‌রায় গান গায় চর্‌কায় শোন্ ভাই,
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই
ঘর বার করবার দর্‌কার নেই আর—
মন দাও চর্‌কায় আপনার আপনার।
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর ঘর
ঘর ঘর ক্ষীর সর আপনায় নির্ভর।—সত্যেন্দ্রনাথ।
(পূর্ণ চৌপদী)
সংস্কৃত—বিদ্যুন্মালা।

(৪) মিশ্র—

সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ- হিল্লোল,
ঝিল্লী- গুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল,
মূর্চ্ছে বীণ আর মূর্চ্ছে বীণকার
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দ- হিন্দোল।—সত্যেন্দ্রনাথ।
(পূর্ণ চৌপদী)

২। ত্রিস্বর পাদ।

(১) আদিগুরু—

ত্রিশ কোটি দেশ-বাসী
ডুব্‌ছে রে বন্যায়;
তোম্‌রা কি ষণ্ড সবে
সইছ যে অন্যায়?
ওঠ্ তোরা জাগ্ তোরা
আয় ছুটে আয় না,
লাখ তাজা প্রাণ দিয়ে
দেশ রাখা যায় না?
(অপূর্ণ চৌপদী)
ইং—dactyl, সংস্কৃত- মোটক।

(২) আদিলঘু—

সমুদ্রের তরঙ্গের গভীর তান্ ভয়ঙ্কর
বাজায় কোন্ অনন্তের বেদন্ গীত্ এ সুন্দর!
বসন্তের আনন্দের কুসুম কার পরাণ-ছায়,
বিহঙ্গের কূজন তান্ জাগায় তার কি বাঞ্ছায়!
অরুণ, কার মুখের পর করিস্ তুই কিরণ দান,
আগুন, তার বুকের ওই পরাণটার সে সন্ধান।
(পূর্ণ চৌপদী)
আরবী—মোতাকারের, সংস্কৃত—ভুজঙ্গপ্রয়াত।

(৩) মধ্যগুরু—

ওরে জীবন কি শুধুই রে দুখ,
তার দেখিস্ না আনন্দ-টুক?
না না, জীবন সে ব্যথার তো নয়,
সে যে অনন্ত আনন্দ-ময়।
ওরে মরণকে কি ভয় রে আর
সে প্রাণের যে তোরণ দু-য়ার।
তাই ফেলিস্‌নে চোখেরও জল,
বল্ আনন্দ আনন্দ বল্।
(অপূর্ণ ত্রিপদী)
ইং—amphibrach.

(৪) মধ্যলঘু—

চাইছে বুক দিব্যসুখ,
সুখ অভয় দ্বন্দ্বক্ষয়,
মৃত্যুজিৎ ছন্দগীত,
তার নাগাল পায়না মৃৎ।
নিত্যরূপ, কল্পভূপ,
এক অনুপ পূর্ণ সেই,
সেই ভূমায় অর্ঘ্য দেই।—করুণানিধান।
আরবী—মোত দারিক

(৫) অন্তগুরু—

ওরে ওঠ্ তোরা সব ছেড়ে সংশয়
মুছে ফেল্ হৃদয়ের ব্যথা-সঞ্চয়;
নব শক্তিতে বুক করি বন্ধন
যত দুঃখেরে আজ কর লঙ্ঘন;
মিছা মৃত্যুরে আর বৃথা কোন্ ভয়?
বিনা দুঃখেতে ভাই কোনো সুখ নয়।
তাই ছুটে চল্ ছুটে চল্ ছুটে চল্ সব
যদি মৃত্যুতে চাস্ চির-গৌরব,
বুকে জ্বাল্ জ্যোতি আজ শত সূর্য্যের,—
ওই বাজে সংগ্রামে শোন্ ধ্বনি তূর্য্যের।
(অপূর্ণ চৌপদী)
ইংরেজি—anapæst
সংস্কৃত—তোটক, অপূর্ণ।

(৬) অন্তলঘু—

ঐ শঙ্খ শোন্ বাজ্‌ল ভীম শব্দে গম্ভীর,
গায় মুক্তি-বন্দন রে নির্ভীক্ সে কোন্ বীর।
হয় রাজ্য নয় ভিক্ষা নয় মৃত্যু বন্ধন,
চাই বীর্য্য, নয় তুচ্ছ স্বর্গেরও নন্দন।
বন্ধন সে মুক্তের তো অঙ্গের অ-লঙ্কার;
ওই ঝন্‌ঝন্ কি শুন্‌ছিস্ না স্পন্দন সে ডঙ্কার?
(অপূর্ণ চৌপদী)
সংস্কৃত—সারঙ্গ।

(৭) ত্রিগুরু—

হাসে সুন্দর মুখ, খঞ্জন-চোখ,
জাফ্‌রান্-রঙ্ অঞ্চল।
নাচি নৃত্যের শেষ, সঙ্গীত-রেশ,
ফুলবাণ সব চঞ্চল।
ওই আন্‌মন্ চম্পার
মান; স্বপ্নের আব্‌ছায়
কার যৌবন-লোল হাস্যের রোল,
রূপ-দর্পণ ঝল্‌মল্।
—করুণানিধান।
(অপূর্ণ চৌপদী)
ইংরেজি—dactyl.

৩। চতুঃস্বর পাদ

(১) আদিগুরু—

হায় সে কত কাল গেল রে গাইল বৃথা বুলবুলি,
হয়নি তবু প্রস্ফুটিত কাব্যবনে ফুলগুলি;
আজকে হেসে ছন্দোময়ী যেমনি এল ফাল্গুনে
অমনি যত বাংলা কবি তান ধরেছে ফুলবনে।
(অপূর্ণ চৌপদী)

(২) আদিলঘু—

আপন বক্ষের কাঁপন দেখ্‌লেই
যে জন চম্‌কায়, মরণ তার সে-ই;
কি লাভ তার ওই জীবন থাক্‌লেই
মরণ-ত্রাস যার বুকের পার্শ্বেই?
পরের বেদনায় অধীর মন যার
কি তার শঙ্কাই মরণ-ঝঙ্কার?
অমর বীরদল তারাই বিশ্বের
যাদের প্রাণ মন সেবায় নিঃস্বের।
(দ্বিপদী)
আরবী—হজয্।

(৩) অন্তগুরু—

হর-মুকুট! হর-মুকুট!
ভূ-স্বর্গের সুমেরু-কূট!
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট।
বিজুলি থির হয়ে নিবিড়
রয়েছে কার বেড়িয়া শির,
হীরা ফটিক উজলি দিক্
ঘিরেছে কার জটারি নীড়॥—যতীন্দ্রনাথ
সংস্কৃত—গজগতি।

(৪) অন্তলঘু—

নয় নয় হিংসা, রক্তের বন্যা,—
প্রাণহীন বিশ্বে করতেই ধন্যা,
বন্দীর হস্ত-শৃঙ্খল খুল্‌তে,
দেশ দেশ মুক্তি-মন্দির তুল্‌তে,
প্রাণ-দান করবে এই সব বীর রে,
আর্ত্তের মুছ্‌বে চক্ষের নীর রে।
(পূর্ণ দ্বিপদী)

(৫) দ্বিতীয়লঘু—

হায় কি শঙ্কায় চিত্ত উন্মন,
কাঁপ্‌ছে অন্তর, কাঁপ্‌ছে প্রাণ মন,—
এই যে দুস্তর সিন্ধু দুঃখের
গর্জ্জে ভীমনাদ বজ্র-লক্ষের,
তার কি নিষ্ঠুর গর্ত্তে কুক্ষির
ডুব্‌বে সব সুখ লক্ষ দুঃখীর।
(পূর্ণ দ্বিপদী)
আরবী—রমল্।

বলা বাহুল্য প্রতিপাদের অন্তর্গত স্বরগুলোর লঘুগুরু-ভেদে বিভিন্ন সমাবেশের ফলে চতুঃস্বরপাদের আরো অনেক রকম উপবিভাগ হ'তে পারে; এবং প্রত্যেক উপবিভাগের এক-একটা ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আছে, সবগুলোর ধ্বনি এক রকম শোনায় না। কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত দিলুম না। এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে এরকম বাঁধাবাঁধি নিয়মের ছন্দ সর্ব্বদা ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়, কেন না তাতে কবির চিন্তাধারা পদে পদে বাধা পেতে থাকে। সেজন্যেই চতুঃস্বর পাদের যে শাখাটা সবচেয়ে মুক্ত অর্থাৎ যে নিয়মের বাড়াবাড়ি সবচেয়ে কম, সেইটেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এখন এই অনিয়মিত ধারার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব। এ পর্য্যন্ত কোনো ধারারই দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি উপশ্রেণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় নি। কিন্তু এই অনিয়মিত ধারায় এই-সমস্ত উপশ্রেণীর দৃষ্টান্ত দেখানো আবশ্যক।

(৬) অনিয়মিত—

(ক) ত্রিপদী

রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে!

সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে'
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা !
আয় দুরন্ত আয় রে আমার কাঁচা ।
—রবীন্দ্রনাথ ।
(দুই স্বরের অভাবে অপূর্ণ)

(খ) চৌপদী

সামনেকে তুই ভয় করেছিস্ ! পেছন তোরে ঘিরবে
এমন কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে !
—রবীন্দ্রনাথ ।
(দুই স্বরের অভাবে অপূর্ণ)

সুরু হল নূতন নাট্য সূত্রধারের নূতন নাট,
সাগর পারে গান্ধী করে জাতীয়তার নান্দী পাঠ ।
(এক স্বরের অভাবে অপূর্ণ)
—সত্যেন্দ্রনাথ ।

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি !
দেখ্‌ছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার প্রাণের মাঝে,
বিদ্যুতে তোর খড়্গ জ্বলে বজ্রে তোমার ডঙ্কা বাজে ।
—সত্যেন্দ্রনাথ ।
(পূর্ণ চৌপদী)

(গ) পঞ্চপদী

সবল কর পঙ্গু ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে,
হাত ধরে' নাও, পৌঁছিয়ে দাও সত্যি-বাঁচার নিত্য-সুপ্রভাতে ।
—সত্যেন্দ্রনাথ ।
(অপূর্ণ)

৪ । পঞ্চস্বর পাদ (মিশ্র)

দুই-তিন এবং তিন-দুয়ের মিশ্র পঞ্চস্বর পাদের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। আর নতুন দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ।

৫ । সপ্তস্বর পাদ (মিশ্র)

পঞ্চস্বর পাদের ন্যায় তিন-চার এবং চার-তিনের মিশ্র সপ্তস্বরের ছন্দও ব্যবহার করা যায় । যথা—

(ক) তিন-চারের মিশ্র

মরি কার পরশমণি
গগনে ফলায় সোনা !
হৃদয়ে নূপুরধ্বনি
অজানার আনাগোনা ।
সোনালি জর্দ্দা-চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি
নিথরের পর্দ্দা ঠেলি
উদাসের আঁচল হেলায় ।
সাঁঝে আজ কিসের আলো
ভুলালো মন ভুলালো
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায় ॥
—সত্যেন্দ্রনাথ ।

(খ) চার-তিনের মিশ্র

তোমরা কি গো, হায় নারী, থাকবে চির বন্ধনে ?
থাকবে ক্ষণের সঙ্গিনী, থাকবে শুধুই রঞ্জনে ?
তোমরা তো নও লক্ষ্যহীন, তোমরা তো নও তুচ্ছ গো,
ভগ্নী মাতা কন্যাগণ তোমরা সবাই আজ জাগো ।

৫ । বিবিধ মিশ্র ।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহে প্রতি পংক্তির অন্তর্গত প্রত্যেক পাদের গঠন-প্রণালী একই রকম। কিন্তু প্রতি পাদের নির্ম্মাণ-কৌশল একই রকমের না করে' যদি বিভিন্ন পাদ বিভিন্ন প্রণালীতে রচনা করা যায় তবে ছন্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। ছন্দের এ বৈচিত্র্য বাংলায় এখনো বহুল পরিমাণে দেখা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এস্থলে দিচ্ছি, তার সবগুলোই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। দৃষ্টান্ত-গুলির কয়েকটি বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ, বাকিগুলো অনেকটা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করে' বাংলায় বহু নব নব ছন্দ প্রবর্ত্তিত করা যায় একথা পূর্ব্বেই বলেছি।

(১) অনুষ্টুপ

আর্ত্ত সংসার ব্যথায় কাঁদছে
ওরে শোন্ তুই যে নস্ বধির
দুষ্ট ধায় ধূম-কেতুর দম্ভে
বাড়ে কল্লোল রুধির নদীর ।

(২) মালিনী

সূত্র—ননম যযযু তে য়ং | মালিনী ভোগি লোকৈঃ ।

উড়ে চলে' গেছে বুলবুল্ শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন যৌবনের জীর্ণ নির্ভর ।
রাগিণী সে আজি মন্থর উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন,
ভেঙে দেবে বুঝি অন্তর মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ ।

(৩) মন্দাক্রান্তা

সূত্র—মন্দাক্রান্তা | ম্বুধি রস নগৈ | র্মো ভনৌ তৌ গযুগ্মম্ ।

ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর
মৌন কোন্ সুর বাজায় মন ।
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর,
চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন ॥

(৪) চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত

সূত্র—যদিহ নযুগলং ততঃ সপ্ত রেফা স্তদা
চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতো ভবেদ্দণ্ডকঃ।

গগনে গগনে নীল নিবিড়
ভিড় মেঘের ভিড় গো ভিড়,
শোন্ তাদের শব্দ ভীম
ডম্বরু দুন্দুভির।
তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়;
কচি-কিশলয়ে কুঞ্জ ছায়—
সব তরুণ আজ ধরায়।
নিশ্বাসে কি সৌরভ, কাল চুলে মেঘ সব,
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধর্ গো।
কালো চোখে বিদ্যুৎ, কোনোখানে নেই খুঁৎ,
অদ্ভুত অদ্ভুত তুই স্বর্গ।

আরবী ছন্দের অনেকগুলো এই বিবিধ মিশ্র বিভাগের অন্তর্গত। কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তার দৃষ্টান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করলুম না।

চতুঃস্বরপাদ স্বরবৃত্তের দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পংক্তির বিভিন্ন সমাবেশের দ্বারা বাংলা কবিতায় বহু ছন্দোবন্ধের উৎপত্তি হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত এস্থলে দেখানো নিষ্প্রয়োজন। স্বরবৃত্ত ছন্দে অতি উৎকৃষ্ট মুক্ত-বন্ধ কবিতাও রচনা করা যায়। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের "পলাতকা"ই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অতঃপর আমরা মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের শ্রেণী বিভাগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হব।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

সংশোধনী

মাঘের প্রবাসীতে ছন্দের প্রবন্ধে নিম্নলিখিত সংশোধন করতে হবে—

(১নং) নিম্নলিখিত শব্দগুলোর পরে একটা করে' দণ্ডচিহ্ন দিতে হবে।

(ক) 'বারো' এ শব্দের পরে ; — পৃষ্ঠা—৪৯৮

×
...লিখ্‌ছে বারো | মাস। — কলম—১ম, পংক্তি—২৩

×
(খ) নব যৌবনা | বরষা — পৃ—৪৯৯, কলম—১ম, পং—৩০

×
(গ) ফুটল অলি | কুল — পৃ—৫০০, কলম—১ম, পৃঃ—১১

×
(ঘ) দেবে তাদের | শাঁস,
×
পায়রা ময়ূর | হাঁস — পৃ—৫০০, কলম—২য়, পৃ—২৮, ২৯

(২নং) This hor | rid sound — পৃ—৫০০
এখানে accentএর চিহ্ন — কলম—২য়
ridএর উপর না হয়ে — পৃ—১০
soundএর উপর হবে

(৩নং) লিখ্‌ছে বারো মাস্ — পৃ—৪৯৯, কলম—১ম
'বার মাস' না হয়ে "বারো মাস্" হবে। — পৃ—৫

\+ +
(৪নং) দুটি চক্ষু | ছল্ ছল্ | করে — পৃ—৫০২
এখানে দ্বিতীয় ছল্ শব্দটির — কলম—১ম
উপর একটি + চিহ্ন হবে। — পং—৩০

(৫নং) "পততি পতত্রে বিচলিত নেত্রে" — পৃ—৫০২
এ রকম না হয়ে হবে — কলম—১ম
"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে" — পং—১১

এবৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার

এবার সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার পেয়েছেন জাসিন্তো বেনাভাঁৎ (Jacinto Benavente)। ইনি স্পেনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। অবশ্য 'নোবেল' পুরস্কার পাবার অনেক আগে থেকেই বেনাভাঁৎ পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। 'নোবেল' পুরস্কার পাওয়ায় তাঁর যশ আরো বেড়ে গেল মাত্র।

জাসিন্তো বেনাভাঁতের বাপ ছিলেন ডাক্তার। ১৮৬৬ সালে মাদ্রিদ সহরে তাঁর জন্ম হয়। বাপের ইচ্ছা ছিল ছেলে উকিল হবে, কিন্তু ছেলের আদালতমঞ্চের চেয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রতি টানই বেশী দেখা গেল। বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেনাভাঁৎ অভিনয় করা আরম্ভ করলেন। তবে বেনাভাঁতের মার এবিষয়ে সহানুভূতি ছিল; তিনি ছেলের প্রতিভার গতি কোন্ দিকে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। বেনাভাঁৎ শুধু অভিনেতা হয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁর জীবনে বৈচিত্র্যও আছে, মাঝে তিনি রুশিয়ায় এক সার্কাসের দলের সঙ্গে ভাঁড় হয়েও ঘুরে বেড়িয়েছেন খেয়াল-মত। তাঁর এই ভবঘুরে জীবনের ছায়া তাঁর অনেক লেখায় পাওয়া যায়।

বেনাভাঁতের প্রথম সাহিত্য-চেষ্টা একটি কবিতার বই। তাতে তাঁর বিশেষত্ব কিছু দেখা যায়নি। তাঁর প্রথম নাটক বেরুল ১৮৯৩ সালে El Teatro Fantástico নামে, সেখানারও বড় কদর হল না। তারপর El Nido Ajeno (ভিন্ন নীড়), Gente Conocida (আলাপী লোক) নাটক দুটি বেরুবার পর থেকে স্পেনের সাহিত্যে সাড়া পড়্‌ল। পৃথিবীর আরো অনেক নামজাদা সাহিত্যবীরের মত তাঁর সাহিত্যজীবন সুরু হ'ল কলুষিত সমাজের বিরুদ্ধে চাবুক হাতে। স্পেনের সহরে সমাজ নানা কলুষে কৃত্রিমতায় কুৎসিত হয়ে পড়েছিল, তিনি প্রথম থেকেই তাঁর নাটকের ভিতর দিয়ে সেইসব গ্লানি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে সুরু করলেন, তার সঙ্গে তাঁর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ চাবুক প্রয়োগ করতে ভুল্‌লেন না। বেনাভাঁতের প্রথম লেখা সব নাটকগুলিই সমাজের কলুষ আর কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ভরা। পরের পর অনেকগুলি নাটক বেরুল, স্পেনীয় সাহিত্যে সমাজে একটা নতুন সুর দেখা দিলে। La Comida de las Fieras (বুনো জানোয়ারের ভোজ), La Farándula (টহলদারের দল), La Gato de Angora (কাবুলি বেড়াল) ইত্যাদি প্রত্যেক নাটকখানি সমাজের কোন না কোন পাপের মুখোস খুলে ফেলেছে। Lo Cursi আর La Gobernadora (শাসনকর্ত্তার স্ত্রী) যখন বেরুল তখন স্পেনে ব্যঙ্গ-চতুর-নাট্যকার বলে' বেনাভাঁতের নাম কায়েমী হয়ে গেল।

হঠাৎ বেনাভাঁৎ ব্যঙ্গ ছেড়ে করুণ রস ধর্‌লেন, বিয়োগান্ত নাটক আরম্ভ করলেন। ১৯০১ সালে Sacrificio (বিসর্জ্জন) বেরুল। তার পরের বছর বেরুল Alma Triumfante (বিজয়ী আত্মা)।

'সাক্রিফিসিও' নাটকে ডন ভগিনী আল্‌মার ইচ্ছানুসারে রিকার্ডোকে বিয়ে করলে, তার পর জান্‌তে পার্‌লে রিকার্ডো আর আল্‌মা পরস্পরকে ভালবাসে, তখন সে তাদের জন্য নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়ে জলে ডুবে মরল, কিন্তু রিকার্ডো আর আল্‌মার মিল হল না। আল্‌মার শেষ কথা—আমায় ছেড়ে দাও, আমাদের হাতে যে রক্ত লেগেছে। 'আল্‌মা ত্রিয়াম্‌ফাতে' নাটকে ইসাবেল দুরারোগ্য রোগে কোন আশ্রমে চিরনির্ব্বাসিতা হয়েছিল, হঠাৎ তার অসুখ সেরে গেল, কিন্তু এসে দেখ্‌লে স্বামী আঁদ্রে তার আরোগ্যলাভ অসম্ভব জেনে আরেক জনকে ভালবেসেছে—একটি ছেলে হয়েছে। তার পর দ্বন্দ্ব, শেষকালে বেনাভাঁতের সমস্ত নাট্যের মত ইসাবেল আপনাকে বিসর্জ্জন দিলে—ইচ্ছে করে' পাগল সেজে জন্মের মত গারদে আশ্রয় নিলে। সমস্ত বইয়ের ভিতর থেকে ফুটে উঠ্‌ছে নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমা আর নারীর আত্ম-বিলোপ। বেনাভাঁতের সমস্ত লেখার সুরই ওই মানুষের অত্যানুষিক ত্যাগের করুণ সৌন্দর্য্য।

বেনাভাঁতে আজকালকার বহু শক্তিমান্ লেখকের মত সংসারের কপটতার নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়ে হতাশ্বাস নন, মানুষের মহত্ত্বে তাঁর অগাধ আস্থা—সবচেয়ে নারীর মমতায়। তাই দেখি Mas Fuerte que el amor (প্রেমের বাড়া) নাটকে কারমেনের রুগ্ন স্থবির স্বামীর প্রতি মমতা, তার গুইএর্মোর প্রতি প্রবল প্রেমের আসক্তিকেও ছাড়িয়ে উঠ্‌ল সে স্বামীকে ছেড়ে যেতে পার্‌লে না—গুইএর্মোর কাছে সব সুখের আশ্বাস পেয়েও। বেনাভাঁতের নায়িকারা ইব্‌সেনের নায়িকাদের মতই গোড়া থেকে বিচার সুরু করে, কিন্তু শেষ কালে যুক্তির চেয়ে করুণার সংস্কার বড় হয়ে যায়। নোরা ছেড়ে গিয়েছিল স্বামীকে; কারমেন্ পারলে না।

La Malquerida (নিষিদ্ধ প্রেম) নাটকে বেনাভাঁৎ সাহিত্যের জড়তায় একটা ঘা দিলেন। সাহিত্য কৃত্রিম আর অস্বাভাবিক শ্লীল হয়ে পড়্‌ছিল স্পেনে। বেনাভাঁতের এই কিষাণ নাটক তার জড়তায় ঘা দিলে। এ নাটকের ভাষায় বিদ্রোহ, ভাবে বিদ্রোহ, সৎবাপ সৎমেয়েকে ভালবেসেছে। সমস্ত নাটকখানিতে ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝে ছোট চাষাদের গাঁ-খানি নতুন ফসলের গন্ধে রঙে যেন কথা কইছে। অবশ্য নায়কনায়িকার মিলন হ'ল না, মাঝে থেকে মেয়ের মা নিজেকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য আত্মহত্যা করলে বলে'।

El Hombreito (মানবক) খুব জোরালো লেখা। ভাই একটি বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পড়ে' অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে বোকতিরস্কার করছে তার কাপুরুষতাকে; তার পর বোন নিজেই একটি বিবাহিত পুরুষকে ভালবাস্‌লে, কিন্তু তার সঙ্গে পালিয়ে যাবে ঠিক করেও সাহসের অভাবে পারলে না, বল্‌লে হতাশ হয়ে,—"সত্যকে স্বীকার করার মত শক্তিও নেই আমার—ওই আর-সকলের মত আমিও মানবক।"

১৯০৯ সালে Los Interesses Creados বেরুবার পর থেকে, বেনাভাঁৎ স্পেনের সাহিত্যে একচ্ছত্র সম্রাট্ বলে' স্বীকৃত হয়েছেন, আজ ইউরোপেও তাঁর সে সম্মানের যোগ্য অভ্যর্থনা হ'ল।

বেনাভাঁৎ নিজের লেখা সম্বন্ধে বলেছেন—"আমার মনের মধ্যে যদি কোন গোঁড়া থাকে তবে তা এই যে, অনেক সময়মত প্রচারের জন্যে

আমার আর্টকে তাচ্ছিল্য করতে হয়েছে কিন্তু স্পেনে এখন সত্যকথার যে সবচেয়ে দরকার আর রঙ্গমঞ্চ থেকে গলা যে অনেক দূরে পৌঁছায়।”

বেনাভাঁতের লিপিকুশলতার কোন পরিচয় তাঁর নাটকের সংক্ষিপ্ত গল্পে পাওয়া সম্ভব নয়; তাঁর বিস্তৃত পরিচয় দেবার ক্ষমতাও এ লেখকের নেই; তবু বর্ত্তমান যুগের এই শক্তিমান নাট্যকার সম্বন্ধে যদি কারু মনে একটু কৌতুহলও জাগাতে পারি এই আশাতেই কলম ধরা।

বেনাভাঁতের সবচেয়ে বিশেষত্ব তাঁর ব্যঙ্গ করবার মনোরম ভঙ্গী তাঁর মানুষের মধ্যকার দেবতায় আস্থা, আর তাঁর বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করবার অসাধারণ শক্তি।

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিশ্র

বিরহী-বিশ্ব

১

বিশাল বিস্তৃত নীলাকাশ;
রুধিয়া নিঃশ্বাস
দিগন্তের পানে ঝুঁকে রহে
আকুল আগ্রহে
দিবা রাতি!
দিকে দিকে শত কান পাতি
ধরিবারে চায়—
ধরণীতে উঠিছে কোথায়
তোমার চরণধ্বনিটুক্;
শুনিবারে গগন উন্মুখ!

২

অসীম অকূল পারাবার
নিশিদিন করে হাহাকার,
তোমার অভাবে আফশোসে
ফুলে ফুলে ফোঁসে,
কেবলি গর্জ্জিয়া উঠে
বেলাভূমে লুটে,
আছাড়িয়া মরিছে বিরহে!
নিশিদিন সহে
যে বেদনা মনে মনে
অশ্রান্ত রোদনে
করিছে প্রকাশ
বারোমাস!
উর্দ্ধে তুলি ঊর্ম্মিবাহু তার—
হাজার হাজার—
তোমারেই ডাকে অনিবার
মহাসিন্ধু উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে!
কভু কাঁদে, কভু অট্টহাসে
সমুদ্র পাগল;
উদ্বেলিত অন্তরের অফুরন্ত অনন্ত হিল্লোল
অতলে করেছে উতরোল!

৩

পাষাণে বাঁধিয়া বুক;
ম্লানমুখ
যত গিরিদল
অচল, অটল,
স্থির,
উচ্চে তুলি মেঘচুম্বী শির,
যুগে যুগে রয়েছে দাঁড়ায়ে চিত্রবৎ
আশাপথ
চাহিয়া তোমার নির্নিমেষ,
ক্লান্তি নাহি লেশ!

৪

অন্ধ বায়ু গন্ধে দিশেহারা
ঘুরে ঘুরে সারা,
তোমারে খুঁজিয়া বারে বার
শ্রান্তি নাহি তার,
নিশিদিন উদ্বেগে আকুল!
কেবলি করিয়া ভুল
দ্বারে দ্বারে ফিরে ফিরে যায়,
যদি পায়

তোমার সন্ধান !
অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত প্রাণ
দুরু দুরু হিয়া ;—
প্রসারিয়া
পরশ-লালস কোটি কর
নিখিলের মুখের উপর
বুলাইয়া ফেরে সঙ্গোপনে,
আশার ছলনে !

৫

আসে পিক
মাতাইয়া দিক্,
সুরে, শিসে, গানে,
তোমারই সন্ধানে ;
ব্যাকুলি বিহরে
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনান্তরে !
প্রতি বর্ষে প্রতি মধুমাসে
কানন মুখরি তারা আসে,
শরতের সুন্দর প্রভাতে,
হেমন্ত-শোভাতে
মাধবী নিশাতে
প্রতিবার
তাদের আনন্দ অভিসার
তোমার নন্দনে অনুখন
কূজন-গুঞ্জন !

৬

সব গুণ্ঠন খুলি
দলে দলে ফুলগুলি
অনিমেষ আঁখি মেলি চায়,
তোমারই আশায়
লতার বিতান-বাতায়নে !
বিহ্বল নয়নে
তব লাগি,—
সারা নিশি জাগি
প্রভাতে ঝরিয়া পড়ে বনে
অবসন্ন মনে !
কুসুম-কোমল দেহ অযতনে মিলাইয়া যায়
ধীরে ধীরে ধরার ধূলায় ;
শুধু তার শেষ দীর্ঘশ্বাস—
ব'হে আনে স্মৃতি ভরা সকরুণ সুরভি সুবাস !

শ্রী নরেন্দ্র দেব

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

(ম্যাক্সিম্ গোর্কী হইতে)

সদ্যবিজিত একটি দেশের অধিবাসী একজন একবার বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করিলে ভাল হয় ? অনেক ভাবিয়া শেষে তিনি স্থির করিলেন যে, "আমি এখন হইতে আর বলপ্রয়োগ দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিব না, দেখি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা জয়লাভ করিতে পারি কি না !"

ইনি দুর্ব্বল চরিত্রের লোক ছিলেন না, একবার যাহা স্থির করিতেন কিছুতেই তাহা হইতে বিচলিত হইতেন না। এবারও মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই দেশের রাজা ইজ্‌মনের অনুচরেরা ইজ্‌মনের নিকট দরখাস্ত পাঠাইল যে নগরবাসীগণের মধ্যে যে-কয় জনের গতিবিধির উপর একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবার হুকুম আছে, তাহাদের মধ্যে একজন বড় অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করিতেছে। সে কোথাও যায় না, কাহারও সহিত দেখাও করে না ; বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষদের ফাঁকি দিয়া বুঝাইতে চায় যে সে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

ইজ্‌মন তো শুনিয়া রাগিয়া অস্থির, বলিলেন, "বটে ! এখনি তাহাকে আমার কাছে ধরিয়া লইয়া আইস।"

রাজকর্ম্মচারীগণ লোকটিকে তখনই ধরিয়া আনিল।

ইজ্‌মন হুকুম দিলেন, "দেখ, উহার কাছে কি আছে ?"

লোকটির কাছে দামী জিনিষ যাহা কিছু ছিল, যেমন—ঘড়ি বিবাহের আংটী ইত্যাদি, সব তো কাড়িয়া লওয়া হইল, সোনা দিয়া দাত-বাঁধান ছিল, সে সোনাটুকু পর্য্যন্ত সকলে খুলিয়া লইল। তাহার পর রাজাকে গিয়া তাহারা জানাইল যে তাঁহার হুকুম তামিল হইয়াছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু পাওয়া গেল ?"

"কিছুই না, কেবল কয়েকটি বাজে জিনিষ। তা আমরা সে সব খুলিয়া লইয়াছি।" "মাথার ভিতরে উহার কি আছে কি জান ?"

"মাথার ভিতরটা তো খালি বলিয়াই বোধ হইতেছে।"

লোকটি আসিয়া ইজ্‌মনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি দেখিয়াই ইজ্‌মন বুঝিলেন যে পাত্রটি নিতান্ত সহজ নয়! কিন্তু তবু ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ভারি গলায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এই যে তুমি আসিয়াছ দেখিতেছি!"

লোকটি শান্ত বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ আসিয়াছি, আমার সবখানি লইয়াই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, কিছু ফেলিয়া আসি নাই।"

"এখন তুমি কি কর ?"

লোকটি বলিলেন, "আমি ? আমি তো কিছুই করিতেছি না। সহিষ্ণুতা দ্বারা সব জয় করিব ইহাই শুধু মনস্থ করিয়াছি।"

ইজ্‌মন গর্জ্জিয়া বলিলেন, "বটে! জয়লাভের বাসনা এখনও আছে না কি তোমার ?"

"হাঁ আছে বৈকি; অন্যায়ের উপর জয়লাভ করিতেই হইবে।"

"তোমার খুব স্পর্দ্ধা তো ? চুপ কর, আর কিছু শুনিতে চাহি না।"

"আমি তো তোমার কথা বলিতেছি না, তোমার উপর জয়লাভ করিবার অভিপ্রায় আমার নাই।"

ইজ্‌মন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, "তবে ? কাহার কথা বলিতেছ ? কাহাকে জয় করিতে চাও ?"

"নিজেকে।"

ইজ্‌মন বিস্মিত হইলেন; বলিলেন,—"এখনি যে বলিলে অন্যায় সব জয় করিতে হইবে—সে কি অন্যায় ?"

"প্রতিরোধ প্রতিঘাতের চেষ্টা।"

"মিথ্যা কথা।"

"ভগবান্ সাক্ষী, মিথ্যা বলি নাই।"

ভয়ে, বিস্ময়ে এবার ইজ্‌মনের কপালে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। ভাবিলেন, 'ব্যাপার কি ? লোকটার হইয়াছে কি ?' একটু চিন্তা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি বল তো ?"

"আমি তো কিছুই চাই না।"

"সত্য, কিছু না ?"

"সত্যই, কিছু না।"

ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া ইজ্‌মন ভাবিতে লাগিলেন, "তাই তো!"

ইজ্‌মনের মনটি কল্পনাপ্রবণ ছিল, প্রাণটি স্ফূর্ত্তির ছিল। কেবল কাহারও ঔদ্ধত্য বা কেহ যে কোনও বিষয়ে তাঁহাকে বাধা দিবে ইহা তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

প্রতিরোধকারীর প্রতিরোধের চেষ্টা যতই সুতীক্ষ্ণ থাক্, ইজ্‌মনের নিকট তাহার তীক্ষ্ণত্ব খর্ব্ব হইয়া আসিতই। কিন্তু বিদ্রোহীদের বিষদন্ত ভাঙা হইয়া গেলে খেয়ালী ইজ্‌মন তখন নিশ্চিন্তে নিজের খেয়াল লইয়া দিন কাটাইতে ভাল বাসিতেন।

খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া ইজ্‌মন আবার লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তো বেশী দিনের কথা নয়, এই তো সে দিন তোমার মতলব অন্যরূপ ছিল, আর এখন হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হইল ? ইহার কারণ কি ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "কারণ ? মানুষের মনের ক্রমবিকাশই ইহার কারণ, তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

ইজ্‌মন বলিলেন, "হাঁ, ভাই, ঠিক বলিয়াছ, আমাদের জীবনই এইরূপ, আজ তাহার গতি একদিকে, কাল অন্যদিকে। নিজের পথ নিজেরা আমরা তো ঠিক করিতে পারি না,—ব্যর্থতার আঘাত কেবল আমাদের এক পথ হইতে অন্যপথে ফিরায়।"

একটু দুঃখের সহিতই এ কথাটি তিনি বলিলেন। ইজ্‌মন জানিতেন ইনি আজীবন যেখানে লালিত পালিত হইয়াছেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় তাঁহার সে মাতৃভূমিকে আজ পরের হস্তে দিয়া এ ব্যক্তি কত মনোকষ্টে দিন কাটাইতেছেন।

কিন্তু ইজ্‌মনের মন হইতে সন্দেহ ঘুচিল না। ভাবিতে লাগিলেন,—তাই তো, প্রজাদের এইরকম শান্তি-প্রিয়, বাধ্য দেখিলে ভালই লাগে, কিন্তু দেশসুদ্ধ সকলেই যদি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমার রাজ্য চলিবে কিরূপে? প্রজাশাসন, করসংগ্রহ এ-সব কে করিবে? মন্ত্রণাসভা, বিচারালয় ইত্যাদির কাজই যে বন্ধ হইয়া যাইবে। না, এ কখনও হইতেই পারে না। এ ব্যক্তি আমাকে ভুলাইতেছে, নিশ্চয়ই ইহার অন্য কিছু মতলব আছে। ইহাকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখি।

কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া ইজ্‌মন তখন আদেশ দিলেন,—"দেখ, এ লোকটিকে আমার আস্তাবল পরিষ্কার করিবার কাজে নিযুক্ত কর।"

তাহাই হইল। তিনি নীরবে নিয়মিতভাবে প্রতি-দিন সেই নীচকাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; ইজ্‌মন তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহাকে আর-একটি গুরুভার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল,—ইহাও তিনি অক্লান্তভাবে সম্পন্ন করিয়া গেলেন। এইবার ইজ্‌মনের মন তাঁহার প্রতি করুণায় আর্দ্র হইল। যে-কথা সে-কাজ! এত বিদ্বান্, শিক্ষিত হইয়াও নীরবে, অক্লান্তভাবে এমন কঠিন পরিশ্রম তিনি করিতে পারিলেন। তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ইজ্‌মনের হৃদয় ভরিয়া গেল।

লোকটিকে ডাকিয়া ইজ্‌মন বলিলেন,—"তোমাকে আমি এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, যাও, গিয়া তোমার স্বদেশবাসীগণের কাছে তোমার সত্য প্রচার কর।"

ক্রমে এই ব্যক্তি সেই দেশের অধিবাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন, সকলে তাঁহাকে তাহাদের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিল, এবং তিনি যাহা বলিলেন তাহারা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইল। দেশের পনেরো আনা লোক তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। যাহার যাহা-ইচ্ছা করিলে কেহ আর নিষেধ করে না, চোর সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া গেলেও কেহ তাহাকে বাধা দেয় না,—যে যাহাকে ইচ্ছা ঠকাইতে লাগিল, যে যাহাকে ইচ্ছা মিথ্যা অপবাদ দিতে লাগিল। কাহারও যে কোনও কর্ত্তব্য আছে এ কথাও ক্রমে সকলে ভুলিয়া গেল।

তিনি বলিলেন,—"শাস্ত্রে আছে যে মানুষের জীবন বড় দুঃখময়, তাহার উপর আবার বাসনা কামনা জীবনকে আরও দুঃখময় করিয়া তোলে। দুঃখ দূর করিতে হইলে বাসনা সব বর্জ্জন করিতে হইবে। অতএব আমরা জীবনে আর কোনও বাসনা রাখিব না, তাহা হইলেই আমাদের দুঃখ-গ্লানি সব দূর হইবে।"

এ কথা শুনিয়া সকলে ভাবিল, "ঠিক কথাই তো; এ একরকম ভালই হইবে—বাসনা-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল কর্ম্মেরও শান্তি হইবে, কিছুর আর প্রয়োজন থাকিবে না!" সকলে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।—

কিছুদিন পরে ইজ্‌মন দেখিলেন তাঁহার চারিদিকে গভীর শান্তি বিরাজ করিতেছে; দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন,—"ইহারা বড় দুষ্ট, কেবল আমাকে ভুলাইতেছে।"

ইতিমধ্যে কীট-পতঙ্গে দেশ ছাইয়া গেল; কেহ মারে না, কেহ তাড়ায় না। ইজ্‌মনের সর্ব্বাঙ্গ পোকায় ভরিয়া গেল।—এক জনকে ডাকিয়া ইজ্‌মন বলিলেন,—শীঘ্র আমার গায়ের পোকা বাছিয়া দাও।"

সে বলিল, "আমি পারিব না।"

ইজ্‌মন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন পারিবে না?"

"আহা, উহাদেরও তো প্রাণ আছে,—মারিয়া কি হইবে? আপনাকে একটু বিরক্ত করিলই বা।"

ইজ্‌মন রাগিয়া বলিলেন, "আমার কথা না শুনিলে এখনি তোর মস্তক লইব।"

সে বিনীতভাবে উত্তর দিল,—"আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় মহারাজ!"

তখন হইতে সব কাজেই এইরূপ হইতে লাগিল। ইজ্‌মন কিছু বলিলে সকলে এই একই উত্তর দেয়—

"আপনার যাহা ইচ্ছা হয় মহারাজ।" কিন্তু কাজ করিবার সময়ে কেহ তো করে না—তবে তাঁহার হুকুম তামল করিবে কে?

রাজ্যের কাজ সব একে একে বন্ধ হইয়া গেল। কর্ম্মের শক্তিও সকলের লোপ পাইল; বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্লান্ত হইয়া ক্রমে সকলে শুইয়া পড়িল। ইজ্‌মন আলস্য ও অবসাদের ভারে ভাঙিয়া পড়িলেন।—শুইয়া শুইয়া কেবল তিনি পূর্ব্বের কথা ভাবিতেন—"আহা কি সুখেই তখন দিন কাটিত! কত কাজ ছিল, আজ প্রজা বিদ্রোহ করিতেছে তাহাকে শাসন কর; কাল অমুক দেশ জয় করিতে সৈন্য পাঠাও! আর এখন কি বিরাট্ অলসতায় ও অবসাদে দেশ আচ্ছন্ন—সমগ্রজাতি আজ ধ্বংসোন্মুখ। ইহার পরিণাম কি হইবে? আমার প্রতিবেশীর ঐ রাজ্যটি স্বাভাবিক নিয়মে কেমন শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে, দিন দিন নানারূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। আর আমার এ কি হইল? প্রজারা আমার এ কি করিল?" আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, লাফাইয়া উঠিয়া প্রজাদের গৃহে গৃহে গিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, "উঠ, জাগো তোমরা, এ কি করিতেছ? এরূপ নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে দিন কাটাইয়া তোমাদের কি লাভ হইতেছে?"

নির্জীব মৃতপ্রায় দেশবাসী উত্তর কিছু দিল না,—অসীম আলস্যভরে আবার শুধু শুইয়া পড়িল।

ইজ্‌মন তখন আর-এক পথ ধরিলেন,—একজনের কানে-কানে মিছামিছি বলিলেন, "উঠ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তোমাদের দেশ আক্রমণ করিতে শত্রু আসিতেছে—শীঘ্র প্রস্তুত হও; শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ কর, যুদ্ধ না করিলে আর উপায় নাই।"

ক্ষীণস্বরে সে প্রজাটি উত্তর করিল, "দেশ রক্ষার ভার ভগবানের হাতে, আমরা কি করিতে পারি?"

ইজ্‌মন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"একবার উঠ, দেখি, প্রতিরোধের শক্তি তোমাদের আছে কি না?"

এই কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন,—আগে ইহার বাহুবলের বিশেষ খ্যাতি ছিল, এক মুষ্ট্যাঘাতে বিদ্রোহীর দাঁত ভাঙিয়া দিতে তাহার মত কেহ পারিত না—এখন কোনও মতে ঘাড় তুলিয়া ইজ্‌মনের দিকে চাহিয়া বলিল—"প্রতিরোধ? প্রতিরোধ করিবার আর কিছু নাই তো!"

"এই-সব পোকা-মাকড় তোমাদের যে খাইয়া ফেলল!" "এসব আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।"

ইজ্‌মন আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না, পাগলের মত নিজের চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দোহাই তোমাদের—একটা কিছু কর, বিদ্রোহ কর, নিজেরা নিজেদের হত্যা করিতে হয় তাহাও কর, যাহা খুসী কর, আমি কিছু বলিব না, কখনও আর শাস্তি দিব না, একটা কিছু কর।"

কেহ তো কোনও উত্তর দিল না, সকলে নিজের মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

ইজ্‌মনের এবার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, বলিলেন, "হায়, এ কি হইল? নিষ্ক্রিয়তার অবসাদে প্রপীড়িত, আলস্যে জর্জ্জরিত দেশবাসীদের কি করিয়া আমি জাগাইব? ওগো তোমরা একবার জাগিয়া দেখ, পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখ, এরূপ নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানে দেশের বা জাতির মঙ্গলসাধন কখনও সম্ভব হয় নাই। আমি কি একাই তবে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিব? কে আমার সাহায্য করিবে? আমার সৈন্য সামন্ত সব দেখি পোকা-মাকড়ে খাইয়া ফেলিয়াছে।"

কোথাও কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, সর্ব্বত্রই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা; দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ চক্ষে সকলে শুধু মিটিমিটি চাহিয়া রহিল।

এইরূপে ধীরে ধীরে সেই দেশের সমগ্র জাতি মৃত্যুর কয়াল কবলে পড়িয়া লুপ্ত হইল; সর্ব্বশেষে ইজ্‌মনও নৈরাশ্যে ও দুঃখে মর্ম্মপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুকালে ইজ্‌মন জনহীন বিরাট্ শূন্যতাকে সম্বোধন করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—"শক্তিহীন কর্ম্মোন্মাদনা ভাল নহে, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তার অনুষ্ঠানেও সংযম চাই—তবেই জাতির অন্তঃশক্তি বাড়ে।"

শ্রী লীলা দেবী

মজুরণী
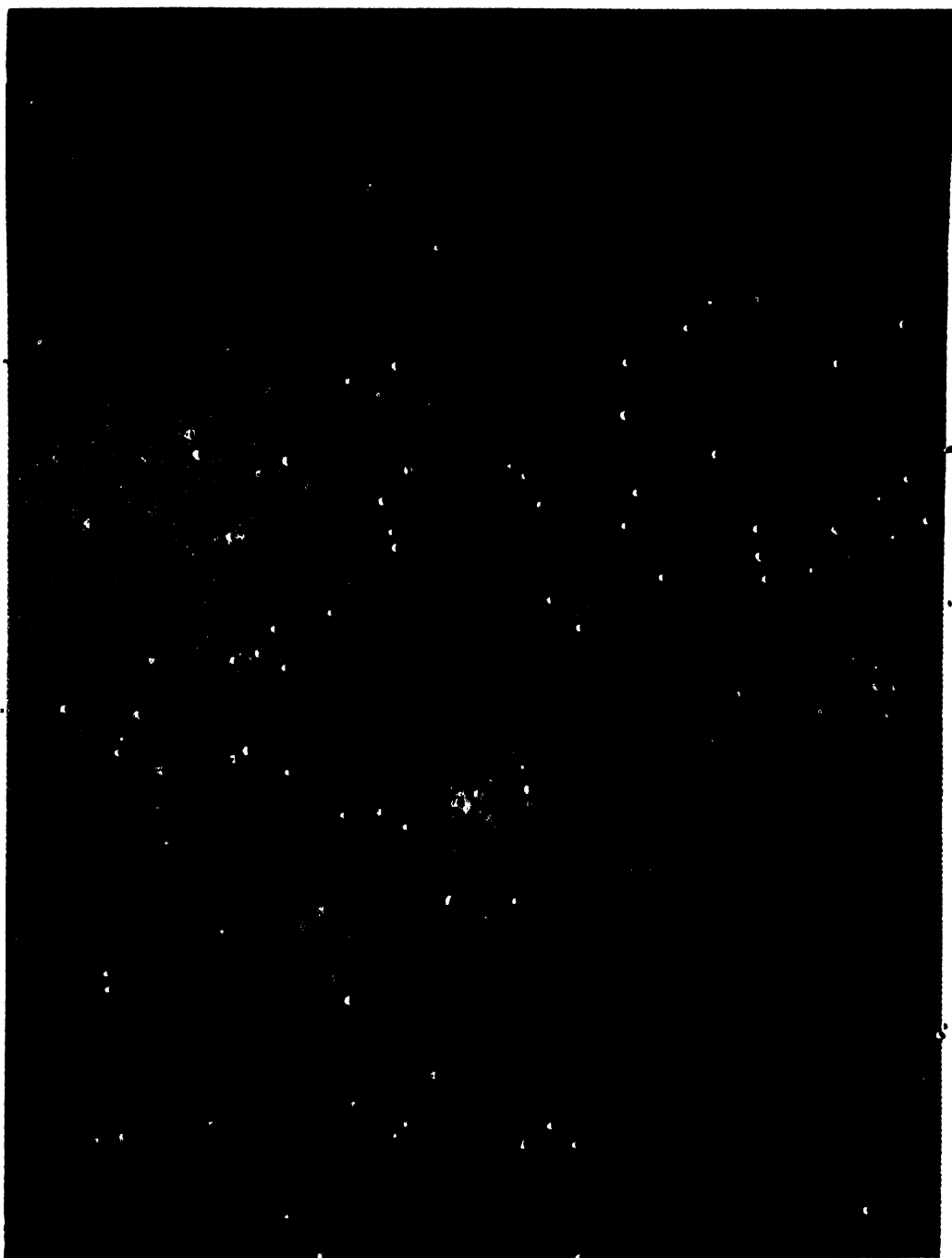
চিত্রকর শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্তের সৌজন্যে

ব্যাবিলনের পথে

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে বাগদাদ লেবার ডিরেক্টরেট্ বা শ্রমিক-বিভাগে চাকরী লইয়া আরও জনকয়েকের সহিত তথায় যাই। পর বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে পদত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া আসি।

বম্বে হইতে বসরা যাইবার পথে প্রথমে আরব-সাগর ও পরে ওমান-উপসাগর ও অরমাজ-প্রণালী পার হইয়া পারস্য-উপসাগরে পড়িতে হয়। এইপথে সমুদ্রের মধ্যে তিনটি খণ্ডপাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার একটির উপর বাতি-ঘর আছে। পারস্য-উপসাগরে পড়িলে দক্ষিণ পারস্যের শত শত মাইল বিস্তৃত পার্ব্বত্য তীরভূমিই প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয়।

পারস্য-উপসাগর পার হইয়া জাহাজ সাৎ-এল্-আরব নদীতে প্রবেশ করে। তাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেতিস্ নদীদ্বয় যেখানে মিশিয়াছে, সেখান হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত নদীর নাম সাৎ-এল্-আরব। সাৎ-এল্-আরবের মুখে মাটি জমিয়া থাকায় জাহাজ জোয়ারের সময় ভিন্ন নদীতে প্রবেশ করিতে পারে না। সাৎ-এল্-আরবে প্রবেশ করিলে তাহার তীরে দেখা যায় মেসোপটেমিয়ার প্রধান শস্য অসংখ্য খেজুর-গাছ। পথে আবাদান নামক একটি ক্ষুদ্র সহর ও দ্বীপ বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবাদান এংগ্লো-পার্সিয়ান্ অয়েল্ কোম্পানীর বন্দর ও কারখানা। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ-সহরটি কলের চিম্নির জঙ্গল বিশেষ। আবাদানের পর মহামেরা—আরাবিস্থানের রাজধানী। মহামেরার পরেই নদীর মধ্যে একখানি জাহাজ ডুবান দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের প্রারম্ভে তুর্কীরা একবাতানা নামক জাহাজখানি ইংরেজ জাহাজের গতিরোধ করিবার জন্য এইখানে ডুবাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই—জাহাজ পথের মধ্যে না পড়িয়া একপার্শ্বে পড়িয়াছে।

সমুদ্র হইতে বসরা ৬৭ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা সাৎ-এল্-আরব নদীর পশ্চিম তীরে, নদী হইতে দেড়মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা প্রথম যে স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ করি, সে স্থানের নাম মার্গিল, মার্গিল বা কুৎ-এল্-ফিরিঙ্গি। এখান হইতে ষ্টীমার যোগে আসার যাই। সাৎ-এল্-আরব নদী হইতে কয়েকটি খাল বা খাড়ি বসরা সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে; ইহার একটা প্রধান খালের উপর আসার সহর অবস্থিত। বসরা সহরে সে সময়ে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের লোকের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ফিরিবার সময় বসরাতেই ছিলাম এবং সহরও দেখিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে বসরা অপেক্ষা আসার সহরই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আসার হইতে মার্গিল ৪।৫ মাইল হইবে। ইহার সমস্তই বালুকাময় মরুভূমি।

বসরার খোরা খালের দুই তীরে খর্জ্জুর-কুঞ্জ

বসরাকে ইউরোপীয়েরা "Venice of the East", প্রাচ্য ভেনিস্ বলেন। ভেনিস্ কিরূপ সুন্দর, তাহা জানি না; তবে বসরা যদি তাহার নমুনা হয়, তাহা হইলে বলিব, সে আমাদের বাংলার সাধারণ নগরগুলির তুলনায় অতি কুৎসিত। মেসোপটেমিয়ার অন্যান্য নগরও যেমন এটিও কতকটা তেমনি—ছোট ছোট অন্ধকার অসমান গলি ময়লা ও দুর্গন্ধে বোঝাই, আর শ্রীহীন গৃহের একটি বিরাট্ স্তূপ। তবে খালগুলি ও তৎসংলগ্ন পার্শ্বস্থ বাটীগুলি অনেকটা মনোরম। এই সৌন্দর্য্যে মানুষের কৃতিত্ব
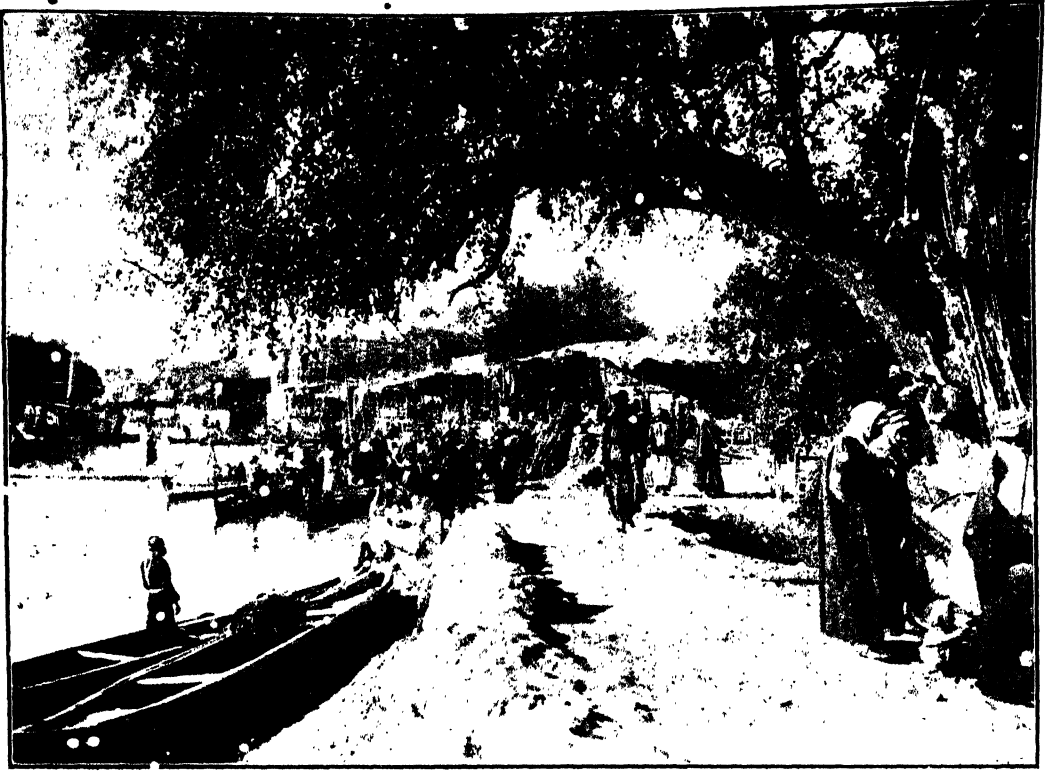
আসারের খালের তীরে বাজার

বড় কিছু নাই; প্রকৃতি দেবীই ইহার প্রধান কর্ত্রী। অধিবাসীদিগের সৌন্দর্য্যবোধ থাকিলে এই স্থানগুলি বাস্তবিক দেখিবার মত স্থান হইত।

আরব্য উপন্যাসে আমরা যে বসোরার উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা বর্ত্তমান বসরা হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার নিকটে বর্ত্তমানে জুবেয়ার নামক একটি ক্ষুদ্র সহর আছে। এখানে প্রাচীন বসোরার সামান্য সামান্য ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বসোরা, গোলাপের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান বসরায় তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই নাই। গাছের মধ্যে তো এখানে এক খেজুর-গাছই আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তবে প্রাচীন বসোরার গোলাপ যদি সুন্দরীর সুন্দর মুখের রূপক মাত্র হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বসরায়ও তাহা যথেষ্ট দৃষ্টিগোচর হইবে।

বসরা হইতে ষ্টীমার যোগে আমরা কুৎ-এল-আমারা গমন করি। বসরা হইতে কয়েক মাইল দূরে গুরমৎ-আলি নামক স্থানে তাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেতিস্ বিভিন্নমুখে গমন করিয়াছে। এখান হইতে মাইল চল্লিশ দূরে কুর্ণা সহর। পূর্ব্বে কুর্ণার নিকট ইউফ্রেতিস্ তাইগ্রিসে মিশিয়া ছিল। এখন এখানে ইউফ্রেতিসের পুরাতন চিহ্নস্বরূপ একটি বিস্তীর্ণ জলা আছে। কুর্ণা বাইবেলের বিখ্যাত Garden of Eden বা ইডেন উদ্যান বলিয়া কথিত। আরবেরা এখানে একটি প্রাচীন গাছ দেখাইয়া বাইবেলে বর্ণিত জ্ঞানবৃক্ষ বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুর্ণার কোন অস্তিত্বই ছিল না; ইহা পারস্য-উপসাগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমানেও ইহার সৌন্দর্য্য মোটেই স্বর্গোদ্যানের কল্পনার উদ্দীপক নহে, কুর্ণা ক্ষুদ্র কুৎসিত সহর। কুর্ণা পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীরে যথেষ্ট খেজুর বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর খেজুর গাছ তত বেশী নাই।

তাইগ্রিস্ নদীর উপরে এজ্‌রার সমাধি-মন্দির

কুর্ণার পর নদীর উভয়তীরে কয়েক সহস্র মাইল বিস্তীর্ণ জলাভূমি। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অর্দ্ধসভ্য আরব-দিগের ছোট ছোট গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই আরবেরা নল দিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। পশু পালন, চুরি ও লুটপাট ইহাদের উপজীবিকা। এখানে অনেকটা পথ তাইগ্রিস্ একেবারে সরু ও অত্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহার কয়েকটি বাঁকের নাম - The

আমারার মিনার

Pear Drop (পেয়ারা পারা), Hairpin Bend (চুলের কাঁটা বাঁক), Devil's Elbow (শয়তানের কনুই)—শুনিলেই বোঝা যায় নদী কিরূপ ঘুরিয়া গিয়াছে।

কুর্ণা হইতে ২৯ মাইল দূরে নদীতীরে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান আছে। ইহার নাম Ezra's Tomb এজ্‌রার কবর ইহা ইহুদিদিগের একটি তীর্থস্থান। এজ্‌রা বাইবেলের Old Testamentএর একজন পয়গম্বর (Prophet)। ইহুদিদিগের মতে শুসা হইতে জেরুসালেম যাইবার সময় এইস্থানে তাহার মৃত্যু হয়। মন্দিরটির নিম্নভাগ ধূসরবর্ণের ইটের দ্বারা এবং চূড়া নীলবর্ণের টালি দ্বারা নির্ম্মিত। নির্জ্জন নদীতীরে খেজুর-বাগানের মধ্যে এই সমাধিমন্দিরটি অতি মনোরম; একবার দেখিলে বহুদিন স্মরণে থাকিবার মত।

আরবের বেদুইনগণ ও উটের লোমে তৈরী তাহাদের আবাস-তাঁবু

কুর্ণার পর আমারাই প্রধান স্থান। আমাদের এই সহরে প্রবেশের সৌভাগ্য হয় নাই। নদীতীর হইতে সহরটি দেখিতে বেশ সুন্দর। নদীর উপরেই কতগুলি ধূসর ইটের বাড়ী ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে। বোধ হয় সমস্ত মেসোপটেমিয়ার এক জায়গায় এরূপ গৃহ-সমষ্ট আর কোথাও নাই। এগুলি নাকি বিগত শতাব্দীতে সুলতান আবদুল হামিদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া-

বেদুইন আরবদের গৃহগুলি

বাগ্‌দাদের সাধারণ দৃশ্য

ছিল। আমারায় তাইগ্রিস্ নদীর উপরে তুর্কীদিগের একটি সেতু আছে। যুদ্ধের সময় আমারা আহত সৈন্যদিগের বিশ্রামস্থল ও হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

আমারা হইতে কূট, নদীপথে ১৫৬ মাইল। যুদ্ধের সময় সকলেই এই কূট-এল-আমারার নাম শুনিয়াছেন। এইখানেই জেনারেল টাউন্‌শেণ্ড্ তুর্কীদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাদের বিজয়ের স্মরণচিহ্নরূপে তুর্কীরা এখানে একটি ক্ষুদ্র মন্নুমেণ্ট নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ষ্টীমার হইতে আমরা যেখানে অবতরণ করি সেস্থানটি মরুভূমির মধ্যে M. E. F.এর একটি প্রধান আড্ডা। আমরা যখন দেখিয়াছিলাম, তখন সুন্দর দেখিয়াছিলাম। এই নূতন সহরের অধিকাংশই অবশ্য বস্ত্রবাস। আসল কূট সহর এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে তাইগ্রিসের একটি বাঁকের উপর অবস্থিত। মেসোপটেমিয়ার যে কয়টি সহরে আমি প্রবেশ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কূটই সর্ব্বাপেক্ষা ন্যক্কারজনক। এই ক্ষুদ্র সহরটি প্রায় হাজার খানেক ধ্বংসপ্রায়, কাঁচা ও পাকা ইটের ঘনসন্নিবিষ্ট স্তূপাকৃতি বাটীর সমষ্টি মাত্র। রাস্তাগুলি নানা রকম ময়লায় ও বিষ্ঠামূত্রে পূর্ণ। আর সে কি দুর্গন্ধ। ইহার মধ্যে হাজার চারেক মানুষ যে কি করিয়া বাস করে তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

কূট হইতে আমরা ট্রেনে বাগ্‌দাদ গমন করিয়াছিলাম। পরে একবার ষ্টীমার যোগেও এ পথ অতিক্রম করিয়াছি। এ পথে বাব্বেলা, আজিজিয়া, স্বয়েরা প্রভৃতি কয়েকটি অপ্রধান স্থান অতিক্রম করার পর দূরে দিক্‌চক্রবালে
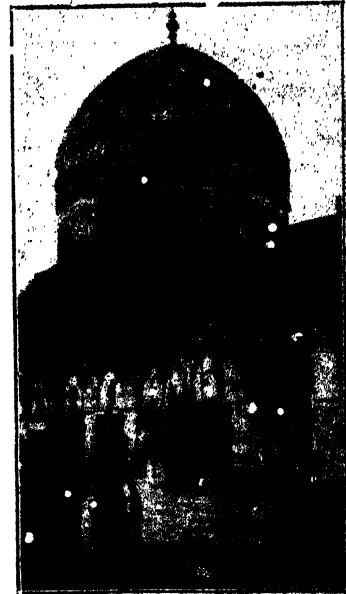
বাগ্‌দাদ—"নীল" বা হায়দার খানা মস্‌জিদ

Arch of Ctesiphon টেসিফোনের তোরণ দৃষ্টিগোচর হয়। নদীপথে পৌছিবার প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই এই বিরাট তোরণটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
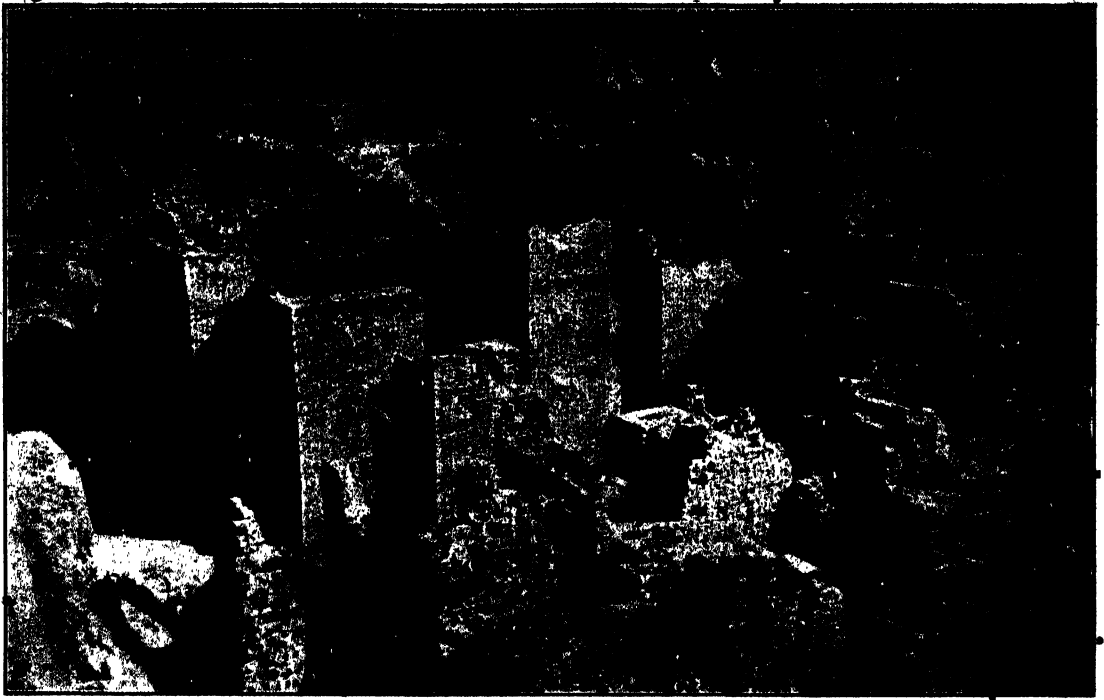
প্রাচীন ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপ

এখানে নদী অত্যন্ত ঘুরিয়া যাওয়ায় ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিয়া তোরণটি দেখিয়া অনায়াসেই অন্যদিকে যাইয়া উঠা যায়। প্রাচীন ইতিহাসের এরূপ স্মৃতিচিহ্ন ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বলিয়া এই টেসিফোনের তোরণ আমার মনে বেশ একটু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইতিহাস-পাঠকেরা টেসিফোনের নাম নিশ্চয় শুনিয়াছেন। ২৩৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পার্থিয়ানেরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে ব্যাবিলনিয়ান প্রদেশ জয় করিয়া তাইগ্রিসের পূর্ব্বতীরে এই সমৃদ্ধ নগর স্থাপন করে। মুসলমান জয়ের পর এই নগরের পতন হয় এবং এখন সেই এককালীন ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত নগরের সামান্য স্মৃতিচিহ্ন-রূপে একমাত্র এই তোরণ ও তৎসন্নিহিত দেওয়াল দুইটি মাত্র অবস্থিত আছে। এই তোরণটি নাকি পার্থিয়ান রাজাদিগের একটি হলের, এবং দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড দেওয়ালটি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। তোরণটি ১২২ ফুট উচ্চ ও ৮২ ফুট প্রশস্ত। দেওয়ালটির নিম্নদেশ ২৫ ফুট পুরু। টেসিফোনের (আরব সল্‌মান্ পাক্) অপর পারে তাইগ্রিসের পশ্চিমতীরে প্রাচীন গ্রীকনগর সেলুসিয়া অবস্থিত ছিল। নদী হইতে সেলুসিয়ার কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। M. E. F.এর ইতিহাসেও টেসিফোনের একটি বিশেষ স্থান আছে। কারণ এখানে জয়লাভ করিয়াই জেনারেল মড্ বাগ্‌দাদ অধিকার করেন।

আমারার পরে এ পথে অনেক স্থলে বেদুইন আরবদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা নদীতীরে উটের লোমে নির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করে; কিন্তু কখনও একস্থানে অধিক দিন স্থির থাকে না।

টেসিফোন পার হইলে অল্প সময়েই বাগ্‌দাদ পৌছান যায়। বাগ্‌দাদ তাইগ্রীস নদীর উভয়তীরে স্থাপিত। নদী হইতে বাগ্‌দাদ মন্দ দেখায় না; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে, আরব্য-উপন্যাসের বাগ্‌দাদের কথা মনে পড়িয়া দর্শকের মনে স্বতঃই উদয় হয়, "এই কি সেই ?" প্রাচীন বাগ্‌দাদের এখন কোনও চিহ্নও নাই। বর্ত্তমান বাগ্‌দাদ মেসোপটেমিয়ার অন্যান্য নগরের ন্যায় নিতান্ত অসুন্দর। তবে নদীতীরে বাগ্‌দাদের পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি স্থান

টেসিফোনের তোরণ
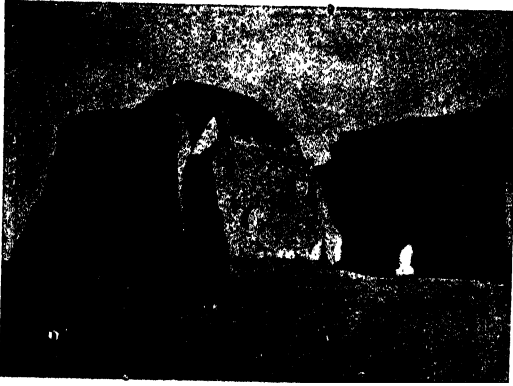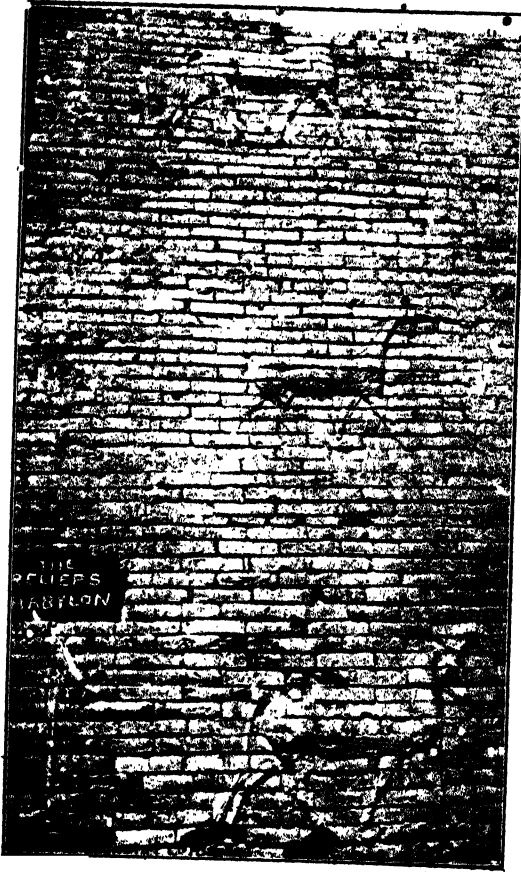
ব্যাবিলনের প্রাচীর-গাত্রে তোলা ছবি

বেশ মনোরম। বাগ্‌দাদের বিবরণ ভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখিবার ইচ্ছা থাকায়, এখানে আর কিছু দিলাম না।

বাগ্‌দাদ হইতে পদত্যাগ করিয়া আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে একবার প্রাচীন পৃথিবীর আশ্চর্য্য নগর ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। বাগ্‌দাদ হইতে রেলযোগে হিল্লা সহর প্রায় ৬৫ মাইল হইবে। প্রাচীন ব্যাবিলন এই হিল্লার নিকট অবস্থিত ছিল। রেলে যাইবার সময়ই ব্যাবিলনের খনিত মৃত্তিকার পাহাড়ের মত স্তূপগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জনৈক জার্ম্মান পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে এই খননকার্য্য হইয়াছিল; তিনটি বিভিন্ন ভাগে এই খননকার্য্য হইয়াছে; মধ্যস্থলেই প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি আছে। বর্ত্তমানে এখানে যে নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পণ্ডিতদিগের মতে দ্বিতীয় নেবুকাদ্‌নেজার কর্ত্তৃক খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। খনন করিয়া যে অংশগুলির উদ্ধার হইয়াছে, তাহা প্রাচীন শিল্পকারদিগের আশ্চর্য্য

ব্যাবিলনের একটি দোকান

ক্ষমতার পরিচয় দেয়। ইহার অনেকগুলি দেওয়াল নূতন বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান অধিবাসীদের অপেক্ষা এই কাল্‌দীয়েরা কত বেশী সমৃদ্ধ ও কত বেশী উন্নত ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাদের এই নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, এই ছিল যথার্থ আরব্য-উপন্যাসের উপযুক্ত নগর। এখানে দেখিলাম দেওয়াল গাঁথিতে পিচ্ বা বিটুমেন্ ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখানে নেবুকাদ্‌নেজারের এনামেল-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, বিখ্যাত ইস্তার গেটের দেওয়ালে খোদিত পশুমূর্ত্তি, মারুডুকের মন্দিরে যাইবার পবিত্র বর্ত্ম, নিন্‌মখের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, প্রাসাদের তলবর্ত্তী জলপথ, রাজ-

প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী ভুবনবিখ্যাত দিব্যোদ্যানের (hanging garden) নিম্নস্থ সুউচ্চ খিলান, প্রস্তরে গঠিত নারীমূর্ত্তির উপর সিংহমূর্ত্তি প্রভৃতি সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিংহমূর্ত্তিটি সম্বন্ধে একটি অশ্লীল গল্পও শোনা যায়। বিশেষজ্ঞদের নিকট কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী কিছু এখানে দেখিবার আছে। শুনিয়াছি পূর্ব্বে এখানে প্রাচীন ব্যাবিলন-সম্পর্কীয় একটি ক্ষুদ্র মিউজিয়ম ছিল; এখন তাহা ইংরেজদিগের দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়াছে। ব্যাবিলনের এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আশ্চর্য্যের সহিত দেখিবার অনেক কিছু থাকিলেও আমাদের মত যাহারা একেবারে অজ্ঞ, তাহাদের নিকট কিন্তু এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নদেওয়ালের ও খনিত মৃত্তিকার বিরাট স্তূপ ভিন্ন আর কিছুই মিলিবে না। তবে অজ্ঞই হউন আর বিশেষজ্ঞই হউন, প্রাচীন মেসোপটেমিয়াকে যে বর্ত্তমান এই ধূলিবালুকাময় অসুন্দর মরুভূমি দেখিয়া একেবারে বিচার করা যায় না, তাহা এখান হইতে সকলকেই স্বীকার করিয়া আসিতে হইবে।

শ্রী বিজয়কুমার ভৌমিক

চৈত্রের বর্ষণ

যে দিকে চাই শুধু জলুনি-ভরা রোদ্
দাঁড়ায়ে ধরণীটা অবাক্ নির্ব্বোধ;
নিশাসে পোড়ে তার গাছের পাতা ফল—
কাঁদিছে, "কোথা বল্ নিবিড় ঘন জল?"
এমন কালে কেবা পূরব-কোলে হাসে
ঘোম্‌টা টেনে মুখে ধরার বুকে আসে?
হৃদ-ষেঁচো ধন সুনীল সাগরের
চোখের জলে ও যে গড়ালো!
কার সে ডাক পেয়ে—এখানে এলো ধেয়ে
সজল ছায়া হেথা ছড়ালো।
কে ওকে বলেছিল হেথায় আসিবারে
কে ওকে ডেকেছিল ভাসিতে আঁখিধারে,
সুখের নীড় থেকে নিবিড় জল থেকে
পাপের ঠাঁই কেন মাড়ালো?
হেথা যে বড় তাপ রুক্ষ জ্বালা শুধু—
আগুন ছোটে হেথা বাতাসে—
জলের পরী ও যে এখানে কিবা খোঁজে
এমন দেশে কেন ও আসে?
কেঁদে কি সুখ ওর ম'রে কি সান্ত্বনা,
জলের বুকে থেকে কি ছিল যন্ত্রণা!

এখানে এল কেঁপে বেদনা বুকে চেপে
শীতলি' অবনীটা নিশাসে?
সাগর কেঁদে ওকে কতই ডেকেছিল
পায়েতে তার কথা ঠেলেছে—
কতনা গাঢ় জ্বালা বুকেতে চেপে বালা
মরণে ভালবেসে ফেলেছে!
উদাস মনটাকে সজোরে বেঁধে নিয়ে
পরের জ্বালা ও যে নিভায় তাই দিয়ে,
পরের ক্লেশ হরি' আপনি যায় মরি,'
তাই ও যেথা সেথা চলেছে।
হেথায় এসো বালা—হেথায় আছে ঠাঁই—
বুকের মাঝে মোর স্নেহ গো,—
আমার যাহা নাই—তোমার তাহা চাই—
মোদের কারো নাই—কেহ গো!
তথাপি ওগো বঁধু তোমায় ডেকে নিতে
তৃপ্ত তৃষ্ণাতুর প্রেমিক বুকটিতে
হেথায় আছে এক আকুল-ছায়া-ভরা
তোমারই তরে বাঁধা গেহ গো!
হেথায় এসো বালা জুড়াবে হেথা জ্বালা—
মধুর সুধাসম স্নেহ গো!

শ্রী সুনীলচন্দ্র সরকার

বুর্গেন্‌ল্যাণ্ড-সমস্যা

মিত্রশক্তিবর্গের মতের অপেক্ষা না রাখিয়া ও জাতিসমূহের সংঘের কর্ত্তৃত্ব উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্স্ রুর অবরোধ করাতে সাহস পাইয়া ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিও ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নিজেদের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছেন। সন্ধিসর্ত্তে হাঙ্গেরীর প্রতি অনেক অবিচার হইয়াছে। সেই সমস্ত অবিচারের প্রতিকারের উপায় করিবার জন্য হাঙ্গেরীতে সশস্ত্র অবরোধের উদ্যোগ চলিতেছে।

মিত্র-শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর প্রথম অভিযোগ এই যে, জাতিসমূহের সংঘের সভ্য হইবার অধিকার হাঙ্গেরীকে দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, স্লাভ্ জাতির স্বার্থের প্রতি মিত্রশক্তিবর্গ বরাবরই অনুকূলতা করাতে হাঙ্গেরীর প্রতি অনেক অবিচার করা হইয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়া রাজ্যের মধ্যে হাঙ্গেরীর অনেকটা স্থান আছে। স্লোভাকজাতি এই দুই স্লাভ্ রাজ্যের মধ্যে এই ব্যবধান ঘুচাইয়া দিতে প্রয়াসী। তাই যদিও মধ্যের এই ভূমিখণ্ডের অধিবাসীরা জাতিতে ম্যাগেয়ার, তবুও তাহাদের স্লাভ রাজ্যের সঙ্গে জুড়িয়া দিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। বুর্গেন্‌ল্যাণ্ডের সমস্যাটি বুঝিতে হইলে স্লাভ জাতির মিলনের এই দাবীটি এবং তাহার অন্তরায়-রূপে ম্যাগেয়ার জাতির স্বসংকল্পের অধিকারের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যখন অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর সহিত মিত্রশক্তিবর্গের সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন নিউলির সন্ধির সর্ত্তে বুর্গেনল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্যের চেষ্টার ফলে অষ্ট্রীয়াকে দেওয়া হয়, যদিও অধিবাসীবর্গের জাতিত্বের দাবী মানিয়া চলিলে হাঙ্গেরীরই উহা পাওয়া উচিত ছিল। চেকোস্লোভাকিয়া যে অষ্ট্রীয়াকে এই প্রদেশটি দিতে এত ঔৎসুক্য দেখাইয়াছিলেন তাহার মূলে যে চেকোস্লোভাকিয়ার কোনও স্বার্থ ছিল না এমন নহে। অষ্ট্রীয়া দুর্ব্বল রাজ্য; অপর পক্ষে হাঙ্গেরীর সামরিক শক্তি বড় কম নহে। দুর্ব্বল অষ্ট্রীয়া বুর্গেনল্যাণ্ডে প্রভুত্ব করিতে থাকিলে, সে প্রভুত্ব নামমাত্র থাকিবে; ফলতঃ স্লাভজাতির ইচ্ছামত সেখানে প্রভুত্ব চালাইতে পারিবে এবং উত্তর ও দক্ষিণ স্লাভ্ রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান প্রকৃতপক্ষে তিরোহিত হইবে। কিন্তু প্রবল হাঙ্গেরীর অধীনে বুর্গেন্‌ল্যাণ্ড আসিলে উত্তর ও দক্ষিণের ব্যবধান প্রকৃত ব্যবধান হইয়া উভয় রাজ্যের প্রসারের অন্তরায় হইয়া উঠিবে। সেইজন্য হাঙ্গেরীর প্রতি অবিচার করিতে চেকোস্লোভাকিয়া কুণ্ঠিত হয় নাই। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী বেনেস্ বলিলেন—

"To strengthen the Slavic block by a closer union with Yugoslavia, Burgenland must either be a Slavic possession or be a part of Austria. Under no circumstances must that territory be allowed to go to Hungary."

ইতালী কিন্তু দুই স্লাভ্ জাতির মিলন পছন্দ করে না; কারণ আড্রিয়াটিক মহাসাগরের প্রভুত্ব লইয়া স্লাভ্ জাতির সহিত ইতালীর একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ফিউম ও ত্রিয়েস্ত বন্দর লইয়া যে ঝগড়া তাহার মূলে এই আড্রিয়াটিকের প্রভুত্ব। কাজে কাজেই স্লাভজাতিকে যেমন করিয়া হউক দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে পারিলে ইতালীর লাভ। তাই হাঙ্গেরীর সহায় হইয়া উঠিলেন ইতালী। অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী ও রুমেনিয়ার মধ্যে সখ্য বাড়িয়া যাহাতে একটি ড্যানুবিয়ান্ রাষ্ট্র-সম্মিলন সম্ভবপর হয় তাহার চেষ্টা ইতালী করিতে লাগিলেন। জার্ম্মেনীর তুরস্কের সহিত সংযোগ এইরূপ সম্মিলনে বন্ধ হইতে পারে আশা করিয়া ফরাসীও ইহার অনুকূলতা করিতে লাগিলেন। আবার এই সম্মিলনে যাহাতে ব্যাভেরিয়া যোগদান করে ফরাসী তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফরাসী ও ইতালীর একটি বিষয় লইয়া মতভেদ হইল। ফরাসী এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের সম্রাট্‌পদে হ্যাপ্‌স্‌বার্গ-বংশের একজন নৃপতিকে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু ইতালী হ্যাপ্‌স্‌বার্গবংশের অধিনায়কত্বের ঘোর বিরোধী। ফ্রান্সের অনুকূলতা লাভ করিয়া হ্যাপ্‌স্‌বার্গ-বংশীয় সম্রাট্ চার্ল্‌স্ হাঙ্গেরী অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ইতালীর প্রিয়পাত্র হাঙ্গেরীর সভাপতি অ্যাড্‌মিরাল্ হর্থী চার্ল্‌স্‌কে হারাইয়া দিলেন। চার্ল্‌সের সহিত যুদ্ধের অছিলায় হর্থী বুর্গেন্‌ল্যাণ্ড অধিকার করিয়া বসিলেন। চেকোস্লোভাকিয়া হাঙ্গেরীর এই হঠকারিতার শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধোদ্যম আরম্ভ করিয়া দিলেন। হাঙ্গেরী বিপদ্ গণিয়া ইতালীকে মধ্যস্থ মানিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবরে ভিনিস্ সহরে এই গোলোযোগের মীমাংসার জন্য এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকের ফলে ওডেন্‌বার্গ অঞ্চল হাঙ্গেরীকে দেওয়া হইল, আর বাকী সবটা অষ্ট্রীয়ার রহিয়া গেল। অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রী রেনারের সহিত চেক্ মন্ত্রী বেনেস্ একটি সন্ধি করিলেন। তাহার একটি সর্ত্ত এই যে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রয়োজন হইলে বুর্গেন্‌ল্যাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিবেন। এই সন্ধিসর্ত্তের ফলে রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বে চেকোস্লোভাকিয়া দ্বিতীয় বার ইতালীকে পরাস্ত করিলেন। ইতালী কিন্তু এই পরাজয় এত সহজে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাই সে আবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

বুর্গেন্‌ল্যাণ্ডের ব্যাপার ভিন্নও হাঙ্গেরীর অভিযোগ করিবার আরও অনেক কারণ আছে। ক্রোসিয়া ও ব্যাকা প্রদেশের অধিবাসীর অধিকাংশই ম্যাগেয়ার, অথচ এই দুই প্রদেশ যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। বানাত্ ও ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়া প্রদেশও এইরূপ অন্যায় করিয়া রুমেনিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। ড্যানুব্ নদীতীরস্থ প্রেস্‌বার্গ বন্দর এক সময় হাঙ্গেরীর রাজধানী ছিল। এই বন্দরটি চেকোস্লোভাকিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। সন্ধিসর্ত্তগুলি হাঙ্গেরীর প্রতি কিরূপে ঘোর অবিচার করিয়াছে তাহা ভৌগোলিক সমিতির সম্পাদক ক্যুর তাঁহার "The Treaty Settlement of Europe" নামক পুস্তকে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"Hungary is being drastically

treated. In cases of doubt the verdict has been almost uniformly against Hungary and in several regions the frontier puts Hungary at a strategical disadvantage." শক্রাক্রান্ত হাঙ্গেরী নীরবে অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে ; জাতি-সংঘের নিকট প্রতিকারের জন্য অনেক আবেদন পাঠাইয়াছে ; কিন্তু কোনও ফল না পাইয়া হাঙ্গেরী আবার বাহুবলে নিজের অধিকার কাড়িয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাই হাঙ্গেরীতে Hungarian Irrendentist নামক নূতন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দলের নায়ক, হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্রসচিব ডাক্তার গুষ্টাভ্ গ্রাটিস্ বলেন—"We are ready for friendly relations with the nations north and south of us ; but we absolutely decline the attitude of servility which some of them demand of us."

মেমল্‌সমস্যা—

অন্তর্দ্রোহের ফলে যখন রাশিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল সেই সময়ে বাল্টিক্‌সাগরের সন্নিকটস্থ প্রদেশগুলি একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হইতে লাগিল। এইরূপে ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্‌থোনিয়া, ল্যাটিভিয়া ও লিথুনিয়া রাজ্যের সৃষ্টি হইল। জাতিগত বিভিন্নতাব জন্য ইহারা আপনাদের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিলেও পরস্পরের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া এই বাল্টিক রাজ্যসমূহ বেশ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কোভ্‌নো ও ভিল্‌না প্রদেশকে লইয়া লিথুনিয়ারাজ্য গঠিত হয়। রুশজাতিদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় লেট্, লিথুনিয়া প্রভৃতি জাতি প্রবল হইয়া উঠে, ইহা মিত্রশক্তিবর্গের ইচ্ছা নয়। তাই যুদ্ধাবসানে নবগঠিত পোল্যাণ্ডরাজ্য মিত্রশক্তিবর্গের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া যখন ভিল্‌না দখল করিয়া বসিলেন তখন মিত্রশক্তিবর্গ পোল্যাণ্ডকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন ; লিথুনিয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবীর একটা মীমাংসা করিবার বিশেষ কোনও প্রয়াস জাতিসমূহের সংঘ হইতে করা হইল না। ভিল্‌না প্রদেশের অধিকাংশ লোকই জাতিতে লিথুনিয়া এবং বহুকাল হইতেই উহা লিথুনিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু ভিল্‌না নগরে বহু পোল্ ও ইহুদীর বাস। এই পোল ও ইহুদী বাসিন্দাদের ইচ্ছাকে আশ্রয় করিয়া অধিবাসীদিগের রাষ্ট্রনির্ব্বাচনের অধিকার যে সন্ধিসূত্রের স্বসংকল্পবিধানে (Self-determination clause-এ) স্বীকৃত হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিবার অছিলায় পোল্যাণ্ড অন্যায় অধিকারের সমর্থন করিলেন। লিথুনিয়া সরকার তদুত্তরে বলিলেন যে সহরে ব্যবসার সূত্রে যে-সকল লোক বসবাস করেন তাঁহাদিগকে অধিবাসীরূপে গণনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে, এবং পোল্যাণ্ডের সামরিক অধিকারের সময় প্রজাবর্গের যে মত লওয়া হইয়াছে তাহা প্রজাবর্গের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অভিপ্রায় বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

পোল্যাণ্ডে ও লিথুনিয়ারাজ্যে এইসব ব্যাপার লইয়া বিবাদ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মিত্রশক্তিবর্গ এই বিবাদের বিচার করিবার জন্য কমিশন পাঠাইবেন প্রতিশ্রুত হইয়াও ক্রমাগত দেরী করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স ভিতরে ভিতরে পোল্যাণ্ডের সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জার্ম্মানীর মেমেল্ বন্দর লইয়া গোলযোগ আরও পাকিয়া উঠিল। পূর্ব্ব সাইলিসিয়ার কতক অংশ পোল্যাণ্ডকে দেওয়াতে মেমেল্ বন্দর জার্ম্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। জার্ম্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন এই বন্দরটি লিথুনিয়া দাবী করিলেন। মেমেলের অধিবাসীবৃন্দের অধিকাংশই লিথুনিয় জাতির লোক। সমুদ্রোপকূলে লিথুনিয়ার আর-কোনও বন্দর না থাকাতে লিথুনিয়ার অবাধ ব্যবসা করিবার অসুবিধা হয়, সেই অসুবিধা দূর করিবার একমাত্র উপায় মেমেলবন্দর অধিকার করা। এইসব নানা কারণে মেমেলের উপর লিথুনিয়ার দাবী সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ফরাসীর চেষ্টায় মেমেল্ পোল্যাণ্ডকে দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লিথুনিয়াগণ আপনাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী বজায় রাখিবার জন্য বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া মেমেল্ অধিকার করিয়া বসিলেন। মিত্রশক্তিবর্গ লিথুনিয়াকে এই হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করিলেন এবং শেষ নিষ্পত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেমেলবন্দর মিত্রশক্তির তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দিতে লিথুনিয়াকে অনুরোধ করিলেন। লিথুনিয়া বাধ্য হইয়া মেমেলবন্দর মিত্রশক্তিবর্গের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এদিকে পোল্যাণ্ড ভিল্‌না প্রদেশের সন্নিকটস্থ ওরানি প্রদেশ অধিকার করিয়া বসাতে লিথুনিয়ার সহিত পোল্যাণ্ডের সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছে। পোলিস্‌সৈন্য লিথুনিয়ার রাজধানী কোভ্‌নোর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে দুই পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে। ইউরোপে শান্তি-প্রতিষ্ঠার দুরাশা একে একে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই যে সন্ধি তাহার বিষময় ফল দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভার্সাইসন্ধি সম্বন্ধে কিন্সের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইতেছে।

ইংলণ্ডে খণ্ড নির্ব্বাচন এবং তাহার ফল—

বিগত নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদল জয়যুক্ত হইলেও রক্ষণশীল দলের মন্ত্রীসভা যে বেশী দিন স্থায়ী হইবে না ইহা অনেকেরই ধারণা। রক্ষণশীল দলের প্রতি লোকের যে বেশী আস্থা নাই তাহা ক্রমেই প্রতিপন্ন হইতেছে। রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার জনকয়েক মন্ত্রী বিগত নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। পার্লামেণ্ট্ মহাসভার সভ্য ভিন্ন মন্ত্রী থাকা সম্ভবপর নহে ; তাই কোনও মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইতে না পারিলে তাঁহাকে মহাসভার সভ্যরূপে পাইবার জন্য যে স্থানে সেই দলের খুব প্রতিপত্তি এইরূপ একটি স্থানের সভ্য পদত্যাগ করিয়া মন্ত্রীর নির্ব্বাচন সম্ভবপর করেন, ইহাই ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় রীতি। তাই রক্ষণশীলদলের প্রধান আস্তানা সেইখানে যে-সকল জায়গায় এইরূপ কতকগুলি স্থানের রক্ষণশীল সভ্য পদত্যাগ করেন। ফলে ইংলণ্ডে তিনটি খণ্ড নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনটি স্থানেই নির্ব্বাচনপ্রার্থী মন্ত্রী দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। একটি নির্ব্বাচনে উদারনৈতিক দল এবং অপর দুইটিতে শ্রমিক দল জয়লাভ করিয়াছে। যে-সকল স্থানে নির্ব্বাচন-ফল প্রায় ধ্রুব বলিয়া রক্ষণশীলদলের বিশ্বাস ছিল, সেইসকল স্থানে নির্ব্বাচনে পরাজিত হওয়াতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে রক্ষণশীল দলের প্রতিপত্তি কমিয়া যাইতেছে। বিগত নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের প্রতি সাধারণের যে অনুরাগ দেখা গিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে এই নির্ব্বাচনগুলি তাহারই পরিচয়। শ্রমিকদলের হস্তে ইংলণ্ডের শাসন-ভার পড়িবার সম্ভাবনা ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। উপনির্ব্বাচনে হারিয়া জি এফ্ ষ্টানলে মহাশয় মন্ত্রীত্ব ইস্তফা দিয়াছেন, এবং রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না তাহা বিচার করিবার জন্য মন্ত্রীসভার গুপ্ত অধিবেশন চলিতেছে। ফল এখনও প্রকাশ পায় নাই।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা

বাংলা দেশের অবস্থা—

জন্মের চেয়ে মৃত্যু বেশী

১৯২০

জন্ম	মৃত্যু
তেরো লাখ ঊনষাট হাজার	চৌদ্দ লাখ একাশী হাজার
নয়শ' তেরো	ছয়শ' বারো

দিলেও পরে অনুতপ্ত হইয়া এই পাপ বাসনা ছাড়িয়া দিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু অন্নসমস্যা তাহাদের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এই পাপ প্রথার গতিরোধ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্নসমস্যার সমাধান করাও আবশ্যক।

—যুগবার্ত্তা

সেবক

ভারতবর্ষ

ভারত-গভর্মেণ্টের বাজেট—

স্যার বেসিল ব্লেকেট ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯২৩-২৪ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বাজেটে রাজস্বের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ১৯৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২০৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। সুতরাং ঘাটতি পড়িবে ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতির অঙ্ক পোষাইয়া লইবার জন্য প্রধানতঃ যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে লবণের উপর মন-প্রতি আড়াই টাকা হিসাবে ট্যাক্স বসিবে। এক লবণের ট্যাক্স হইতেই ইঁহারা মনে করিতেছেন ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয়ের একটা পথ পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া অন্য উপায়েও আরো ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার লাভের অঙ্কও ইঁহারা খতাইয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের হিসাবে ১৯২৩—২৪ সালের বাজেটে ২৪ লক্ষ টাকা ফাজিলে আসিয়া দাড়াইয়াছে।

চলতি বৎসরের বাজেট যখন উপস্থিত করা হইয়াছিল তখন ঘাটতির পরিমাণ করা হইয়াছিল ৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ঘাটতি এই সংখ্যাকে ছাড়াইয়া বহুদূর গড়াইয়াছে। ডাক টিকিট এবং রেলওয়ের বর্দ্ধিত হার ধরিয়া তখন রাজস্বের পরিমাণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ১৩৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকায় এবং ব্যয়ের পরিমাণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ১৪২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে খরচের দিক দিয়া ৫ কোটি কম খরচ হইলেও রাজস্বের অঙ্কটাতেও আবার ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা আদায় কম হইয়াছে, সুতরাং ঘাটতির অঙ্কটা নয় কোটি ছাড়াইয়া একেবারে সাড়ে সতেরো কোটিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ হইবার কারণ খতাইতে গিয়া স্যার বেসিল ব্লেকেট দেখাইয়াছেন, যে যে দ্রব্য হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের আশা করা গিয়াছিল, সে পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ হয় নাই। শুল্ক, ইনকমট্যাক্স, রেলওয়ে, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দফায় গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ রাজস্বের আশা করিয়াছিলেন, আদায় হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ঢের কম।

গত বৎসরের বাজেটের অনুপাতে রাজস্বের ঘাটতি ও বৃদ্ধির তালিকা—

		ঘাটতি	বৃদ্ধি
(১)	কাষ্টমস্ শুল্ক	৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা	
(২)	আয়কর (income tax revenue)	৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা	
(৩)	আফিম ও লবণ		৯৬ লক্ষ টাকা
(৪)	রেলওয়ে	৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা	
(৫)	পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ	৯৪ লক্ষ টাকা	
(৬)	সুদ ও কারেন্সি (interest and currency receipts)		৫১ লক্ষ টাকা
(৭)	সুদ হইতে উদ্বৃত্ত (saving in provision for interest on debt)		১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা
(৮)	সামরিক বিভাগের ব্যয় হইতে উদ্বৃত্ত		৪৬ লক্ষ টাকা
(৯)	অসামরিক ব্যয় হইতে উদ্বৃত্ত (saving in civil expenditure. ইহার ভিতর ওয়াজিরস্থানের রাজনৈতিক খরচটাও ধরা হইয়াছে)		১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা
	মোট	১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা	৫ কোটি টাকা

নূতন বৎসরে ইঁহারা মনে করিতেছেন, রাজস্বের পরিমাণ এমন ভাবে আর ক্ষতির জের টানিয়া চলিবে না। কারণ এ বৎসর রাজস্ব ধরিবার বেলায় নাকি অনেক ছাঁটকাট দিয়া ধরা হইয়াছে। সঙ্কোচের দিক্ দিয়া ইঁহাদের যে অঙ্কটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটা হইতেছে সৈন্য-বিভাগের ব্যয়। এই সৈন্যবিভাগে ৬য় কোটি টাকার খরচ ইহারা ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। এই ছাঁটা সত্ত্বেও যে অঙ্কটা টিকিয়া আছে তাহার পরিমাণ হইতেছে ৫৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়াও ওয়াজিরীস্থানের জন্য বিশেষ ব্যয়ের একটা অঙ্ক আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে—এই অঙ্কটার মাত্রা হইতেছে ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

নূতন বাজেটে ইঞ্চকেপ কমিটির ব্যয়সঙ্কোচ-ব্যবস্থাগুলির দিকে নজর রাখিয়া জমা-খরচের খতিয়ান খতানো হয় নাই। না খতাইবার কৈফিয়ৎ ইঞ্চকেপ কমিটির রিপোর্ট যখন ইঁহাদের হস্তগত হইয়াছে তখন আর এদিকে নজর দিবার অবকাশ ছিল না। স্যার বেসিল ব্লেকেট আশা দিয়াছেন, পরে এই রিপোর্ট লইয়া আলোচনা করা হইবে এবং ব্যয় সঙ্কোচের কোনো কোনো ব্যাপারে এই রিপোর্টের অনুমোদন গৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের দেয় অর্থ সম্বন্ধে স্যার বেসিল ব্লেকেট যাহা বলিয়াছেন তাহার ভিতর আশার কথা বিশেষ কিছু নাই, তাহা পূর্ব্বের কথারই পুনরুক্তি মাত্র। তিনি বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলেই তাঁহারা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের এই দানের কড়িগুলি পরিহার করিয়া চলিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এ স্বচ্ছলতা যে কবে আসিবে তিনি তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা দিতে পারেন নাই। অন্যান্য প্রদেশ এ কথাগুলি কি ভাবে গ্রহণ করিবে জানি না। কিন্তু বাংলাকে যখন রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগই কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের পাওনার কড়ি গণিতেই নিঃশেষ করিতে হয় তখন এ কার্য্য যে তাহার বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। লবণের উপর ট্যাক্স বাড়ানো লইয়া তো ইতিমধ্যেই আন্দোলন রীতিমত তীব্র এবং তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ইঞ্চকেপ কমিটির রিপোর্ট—

ইঞ্চকেপ কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ভারত-গবর্মেণ্টের ব্যয়ের খাতায় কোথায় কোথায় কাঁচি চালানো সম্ভবপর তাহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই কমিটিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটি হিসাবের খাতা খতাইয়া মোট ১৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার ব্যয় সঙ্কোচের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৯৪ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া এই রিপোর্টটি লেখা হইয়াছে। এখানে মোটামুটি তাহার একটা চুম্বক দেওয়া গেল।

কমিটি সৈন্যবিভাগ হইতে সাড়ে দশ কোটি টাকা খরচ কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন—ভারতবর্ষ শান্তি এবং যুদ্ধ এই উভয় সময়েই সৈন্যবিভাগের খরচের জের প্রায়

সমানভাবেই টানিয়া চলিয়াছে ; এরূপ ব্যবস্থা আর কোনো দেশেই নাই—এমন কি ইংলণ্ডেও নাই। ইংলণ্ডে শান্তির সময় সৈন্যবিভাগের খরচা যুদ্ধের সময়ের খরচা অপেক্ষা শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কম। ব্রিটিশ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল হইতে, ভারতীয় সৈন্যদের ভিতর হইতে এবং গোলন্দাজদের ভিতর হইতে কোথায় কয়টি সৈন্যদল নিজেদের পুরা স্বার্থ বজায় রাখিয়া কমানো যাইতে পারে ইঁহারা তাহার হিসাব দিয়াছেন, এবং এই কমানোর ফলে খরচের অঙ্কও যে কত কমিয়া যায় তাহার হিসাব দিয়াছেন। নৌবিভাগ হইতেও ইঁহারা বিস্তর খরচ ছাঁটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন।

রেলওয়ে খরচ সম্পর্কে রিপোর্টে সাড়ে চার কোটি টাকার খরচ কমাইবার কথা হইয়াছে।

পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে ইঁহাদের সঙ্কোচের অনুমোদিত অঙ্ক হইতেছে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। নিম্নলিখিত উপায়ে এই সঙ্কোচ সম্ভবপর :—(ক) পোষ্ট্ এবং টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইয়া ২৫ লক্ষ টাকা, (খ) ডাকগাড়ী যাতায়াতের খরচ হইতে ৭ লক্ষ টাকা, (গ) ডাকবিভাগের ঘরবাড়ী তৈরী ও মেরামতি প্রভৃতির ভিতর হইতে ৯ লক্ষ টাকা, (ঘ) জিনিষপত্রের ক্রয় এবং ব্যবহার কমাইয়া ৫৪ লক্ষ টাকা (ঙ) বাড়ীভাড়া এবং রাহাখরচ হইতে ৯ লক্ষ টাকা, (চ) আসবাবপত্রাদির ভিতর হইতে ১৫ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া অচল বেতার ষ্টেশনগুলি তুলিয়া দিয়াও অনেকগুলি টাকা বাঁচানো যায় এবং টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতেও আরো ৩০ লক্ষ টাকা কমানো সম্ভবপর।

সাধারণ শাসন-বিভাগ হইতে ইঁহারা ৫১ লক্ষ টাকা কমাইবার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। এজন্য সেক্রেটারিয়েটের বিভিন্ন বিভাগের আকস্মিক খরচ ও পিয়নের সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে ; রেলওয়ে, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ একই মন্ত্রীর অধীনে আনয়ন করিতে হইবে ; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও রাজস্বের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ তুলিয়া দিয়া ইহাদিগকে "বাণিজ্য ও সাধারণ" এই দুই মাত্র বিভাগের অধীনে আনিতে হইবে ; 'ইরিগেশন' বা জল সরবরাহ বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেলের পদ তুলিয়া দিতে হইবে ; এডুকেশনাল কমিশনারের পদ তুলিয়া দিতে হইবে এবং সরকারী প্রধান প্রচার-বিভাগের ব্যয় ৪ লক্ষ টাকা কমাইতে হইবে, বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয় নানা দফায় ৫১,৪০০ পাউণ্ড হ্রাস করিতে হইবে ; হাই কমিশনারের আফিসের ব্যয় ৭২০০ পাউণ্ড কমাইতে হইবে।

ল্যাণ্ড্ রেভিনিউ বিভাগে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বাবদ ৩,৯৭,০০০ টাকা, আবগারী বিভাগে ১২০০০ টাকা, রেজিষ্ট্রেশনে ৪০০০ টাকা এবং ধর্ম্মযাজক বিভাগে ২,৯০,০০০ টাকার ব্যয়ভার ছাঁটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা ইঁহারা অনুমোদন করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিভাগ হইতে কমাইতে হইবে মোট ৩০,০২,০০০ টাকা এবং শিক্ষা-বিভাগ হইতে কমাইতে হইবে ৫,১৯,০০০ টাকা। দিল্লীতে যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে সে প্রস্তাবটি আবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিমান-পোত-বিভাগের চিফ্-ইনস্‌পেক্টরের পদটি তুলিয়া দিতে হইবে। বিবিধ-বিভাগের ভিতর হইতে কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্‌স্ বিভাগের ব্যয় হ্রাস করিয়া, ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স্ বিভাগের কাজ কমাইয়া এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান্ ট্রেড্ কমিশনারের পদ তুলিয়া দিয়া ১১,১৮,০০০ টাকা বাঁচাইতে হইবে ; দুর্ভিক্ষ ও পেন্সন বিভাগ হইতে ৭,৬৫,০০০ টাকার খরচ কমাইতে হইবে ; চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ একজন ডিরেক্টর-জেনারেলের অধীনে আনিতে হইবে ; পাব্‌লিক্ হেলথ কমিশনার এবং ডিরেক্টর অব মেডিকেল রিসার্চের পদ তুলিয়া দিতে হইবে, লবণ ও আফিমের বিভাগে মোট ২১,৯৫,০০০ টাকা, ষ্টেশনারী ও প্রিণ্টিং বিভাগে ১০,৩৭,০০০ টাকা এবং বন-বিভাগের ব্যয় ৬,৯০,০০০ টাকা কমাইতে হইবে। বন বিভাগে যাহাতে আয় হয় তাহারই দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। কৃষি-বিভাগের ব্যয় হইতে ২,৮০,০০০ টাকা, জেল-বিভাগের ব্যয় হইতে ৪,৮০,০০০ টাকা, পোর্ট্ ও পাইলটের বিভাগের ব্যয় হইতে ২,১১,০০০ টাকা এবং অডিট বিভাগের ব্যয় হইতে ৩,৭৬,০০০ টাকা বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পেপার কারেন্সি সম্বন্ধে কমিটির মত এই,—এক টাকার নোট ছাপিতে এবং রূপার টাকা তৈরী করিতে যদি খরচ সমানই পড়ে তবে এক টাকার নোট তুলিয়া দিতে হইবে। টাঁকশাল হইতে ইঁহারা ৪,১২,০০০ টাকার ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন।

কমিটি রাহা-খরচের নিয়ম নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ছুটির ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন ইঁহারা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। এইগুলির বর্ত্তমান নিয়মের জন্য খরচের অঙ্কটা অকারণ বাড়িয়া উঠিতেছে।

কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের ত্যাগ—

যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুর আনন্দস্বরূপ এম্ এল সি জানাইয়াছেন যে, গবর্মেণ্টের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার জন্য তিনি তাঁহার তিন হাজার টাকা বেতন হইতে ১৪ শত টাকা ছাড়িয়া দিবেন। আমরা রায় বাহাদুর আনন্দস্বরূপের ত্যাগের প্রশংসা করি। সাড়ে-পাঁচ-হাজারী মন্ত্রীরা যেখানে এক হাজার ছাড়িয়া দিতেই গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছেন, সেখানে তিন-হাজারীর পক্ষে ১৪ শত টাকা ছাড়িয়া দেওয়ায় যথেষ্ট বাহাদুরী আছে।

মদ বন্ধ—

লাহোর মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য-বিভাগের সাব্‌কমিটি লাহোর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার ভিতর হইতে মদের চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশ মিউনিসিপ্যালিটির জেনারেল কমিটিরও অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছেন। গবর্মেণ্টের দরবারে মিউনিসিপ্যালিটির রায় টিকিবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ভূপালের বেগমের মহত্ত্ব—

ভূপালের বেগম সাহেবা তাঁহার রাজ্যের সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার কাজের ভিতর দিয়া এই সংস্কার যেরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা অনেক পুরুষ নৃপতিকেও লজ্জা প্রদান করিবে। রাজ্যের ভিতর ঘোষণা করিয়া তিনি মদের ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মদবিক্রয় হইতে ভূপাল রাজ্যের আয় ছিল প্রায় ৫১৬ লক্ষ টাকা। ভূপালের অপেক্ষা আয়ে বড় অনেক সামন্ত রাজা আছেন, তাঁহারা প্রজাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মদের বিরুদ্ধে এরূপ নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। ভূপালে সম্প্রতি একটি নূতন হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

মহীশূরে মদ্য বর্জ্জন—

মহীশূর রাজ্যের আবগারী বিভাগের রিপোর্ট্ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূপালের মত এখানে মাদক দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ না হইলেও মাদক দ্রব্য বর্জ্জনে মহীশূর যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে। মদ

এবং গাঁজার বিক্রয় মহীশূরে খুব কম। তবে তাড়ীর বিক্রী এখনও তেমনভাবে কমে নাই। হিসাব খতাইয়া দেখা গিয়াছে, গত পাঁচ বৎসরে মহীশূর রাজ্যে মাদক দ্রব্য হইতে রাজস্ব আদায় শতকরা চল্লিশ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে এরূপ হইলে গবর্মেণ্ট হয় তো মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতেন—এবং বিলাতেও হয় তো এজন্য কৈফিয়তের পর কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে হইত।

কংগ্রেসের মিট্‌মাট্—

কংগ্রেসের দুই দলের ভিতর একটা মিটমাটের ব্যবস্থার জন্য এলাহাবাদে কংগ্রেস কমিটির সদস্যেরা মিলিত হইয়াছিলেন। এই সভায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের দলের সহিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল আচারীর দলের একটা সাময়িক আপোষ হইয়া গিয়াছে। আপোষের সর্ত্ত হইতেছে—

(১) আগামী ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কোনো দলই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ সম্বন্ধে কোনো রূপ আন্দোলন করিতে পারিবেন না।

(২) ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পরস্পরের কার্য্যে বাধা না দিয়া উভয় পক্ষ আপন আপন দলের নির্দ্ধারিত অন্যান্য কার্য্য পৃথক্‌-ভাবে করিতে পারিবেন।

(৩) গয়া কংগ্রেসে অর্থ ও ভলেণ্টিয়ার সংগ্রহ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে বড় দল সেই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন।

(৪) গঠনমূলক কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ ও কর্ম্মী সংগ্রহের কাজে, গঠনকার্য্যে এবং উভয় দলের সাধারণ কাজগুলিতে ছোট-দল বড়-দলকে সাহায্য করিবেন।

(৫) ৩০শে এপ্রিলের পর উভয় দল নিজেদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পারিবেন।

(৬) বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলি যতদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে কোনো প্রদেশে যদি তাহার কার্য্য কাল শেষ না হয় তবেই এই আপোষনামা বলবৎ থাকিবে।

এই প্রস্তাবগুলি শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল আচারী উত্থাপন করিয়াছিলেন। এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সমর্থন করিয়াছিলেন।

দেশ অনেকগুলি দলে ভাগ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে জাতির দুর্ব্বলতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সুতরাং সাময়িক হইলেও এ মিলনটা মন্দের ভাল। হয় তো এই সাময়িক মিলন অবশেষে স্থায়ী মিলনেও পরিণত হইতে পারে—অন্ততঃ সেরূপ আশা করিতে দোষ নাই।

কংগ্রেসের নূতন দলের কার্য্যপদ্ধতি—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে নূতন দলের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য সম্প্রতি এলাহাবাদে একটি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় স্থির হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব উপায়ে স্বরাজ লাভ এবং উহার উপায় স্বরূপ অহিংস অসহযোগ নীতি অবলম্বন এই দুই বিষয়ে এদল কংগ্রেসকেই মানিয়া চলিবেন। তবে এই উপায় যাহাতে প্রাণহীন নীতি মাত্রেই পর্য্যবসিত না হয় সে দিকে তাঁহারা বিশেষভাবেই দৃষ্টি রাখিবেন। যাহাতে আমলাতন্ত্রের পক্ষে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার সহায়তা হইতে গবর্মেণ্ট বঞ্চিত হন তাহার চেষ্টা করিতেও ইঁহারা কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না। আইন অমান্যকে এই সভা বৈধ অস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছেন। তবে দেশ এখনও আইন অমান্যের উপযোগিতা অর্জ্জন করে নাই বলিয়া সে প্রচেষ্টায় আপাততঃ ইঁহারা বিশেষ জোর দিবেন না।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরাজ লাভ করা।

(২) শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ভগবানদাস স্বরাজের যে খস্‌ড়া তৈরী করিয়াছেন জনসাধারণের ভিতর তাহা বিতরণ করা হইবে এবং সে সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত কি তাহা জানিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে। আগামী ছয় মাসের ভিতর দেশবাসীর মতামত জানিয়া কমিটি তাহা স্বীয় দলকে জ্ঞাপন করিবেন।

(৩) এই দল আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভেরই চেষ্টা করিবেন। দেশের অবস্থানুসারে বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং শাসনযন্ত্রের প্রবর্ত্তন করার ক্ষমতা লাভ করাই বর্ত্তমানে এই দলের বিশেষ লক্ষ্য হইবে।

(৪) এই দল ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনকারীদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন।

(৫) দেশের জাতীয় দলের লোকেরা যাহাতে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় এদল তাহারই ব্যবস্থা করিবেন এবং ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহারা নিম্নলিখিত ভাবে কাজ করিবেন—(ক) নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহারা গবর্মেণ্টের কাছে স্বরাজের দাবী উপস্থিত করিবেন। (খ) যদি তাঁহাদের দাবী পূরণ করা না হয় তাহা হইলে গবর্মেণ্টের প্রত্যেক কাজে বাধা দিয়া যাহাতে শাসন কার্য্য অচল হইয়া পড়ে তাহার চেষ্টা করিবেন। (গ) নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেলে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ দেওয়া হইবে। (ঘ) কোনো অবস্থাতেই কোন সদস্য সরকারী কাজ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৬) এই দল দেশের সর্ব্বত্র মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডগুলি দখল করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন।

(৭) দেশের ভিতর শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিবার জন্য চেষ্টা হইবে। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হইবে, রায়ৎ ও কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। স্বরাজ-সংগ্রামে তাহারা যাহাতে যোগদান করিতে পারে তাহার জন্যও তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হইবে।

(৮) সাব-কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে যে-সমস্ত ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন করা অসঙ্গত, তাহার বর্জ্জনের চেষ্টায় এদল আত্মনিয়োগ করিবেন।

(৯) স্বদেশী, খদ্দর, অস্পৃশ্যতা, পানদোষ, আন্তর্জাতিক একতা, জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও সালিশ আদালত সম্পর্কে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতিতে এই দলের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

(১০) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর মতদ্বৈধ যাহাতে সন্তোষজনকভাবে মিট্‌মাট্ হয় তদুদ্দেশ্যে এই দল এখন হইতেই চেষ্টা করিবেন। হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌয়ে যে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল এই দল সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মিট্‌মাট্ সম্পর্কে সেই নীতি গ্রহণ করিবেন।

(১১) এশিয়ায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রীস্থাপন এবং এসিয়ার সভ্যতার উন্নতির জন্য এই দল চেষ্টা করিবেন।

(১২) ভারতের প্রকৃত অবস্থা যাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইতে পারে সেজন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র লোক পাঠানো হইবে।

এই দলকে 'স্বরাজ্যদল' নামে অভিহিত করা হইবে। যাঁহারা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাঁহারাই ইঁহার সদস্য হইতে পারিবেন। দলের প্রত্যেক সদস্যকে বার্ষিক ৩৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। এই দলের একটি কার্য্যকরী সমিতি থাকিবে। প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

থাকিবে। তবে সময় সময় কার্য্যকরী সমিতি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান-গুলিকে উপদেশ প্রদান করিবেন।

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার—

কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে আবার তিলক স্বরাজ্য তহবিলের অর্থের জন্য তাগিদ আসিয়াছে। দেশ-নায়কেরা আবার আবেদনের থালা বহিয়া দেশবাসীদের দুয়ারে হাজির হইয়াছেন। ইঁহাদের ডাকে বোম্বাই বেশ সাড়া দিয়াছে। বোম্বাই রাষ্ট্রীয় সমিতি ইতিমধ্যেই দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। একা শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের নিকট হইতেই ১৫ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি আসিয়াছে। জেলের ভিতর হইতেই তিনি এ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আশা করি, এবারকার অর্থব্যয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করিবেন—যেন সমালোচকেরা বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিবার অবকাশ না পান।

জাতীয় কার্য্যে দান—

একজন হিন্দু ভদ্রলোক মিঃ মণিলাল কোঠারীর মারফৎ গুজরাট তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে ৫০,০০০ টাকা এবং আলিগড় জাতীয় মোস্‌লেম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাই হুবার্মান জেলা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে স্থির হইয়াছিল, উক্ত জেলা হইতে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য ১৩,০০০ টাকা চাঁদা তুলিতে হইবে। কন্‌ফারেন্সেই চাঁদার এই টাকাটা আদায় হইয়া গিয়াছে। একজন ভদ্রলোক জাতীয় শিক্ষার জন্য ২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

জেলে অত্যাচার—

জেলের ভিতর সত্যাগ্রহীদের উপর যে সব অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে গত কয়েক মাসের প্রবাসীতে তাহার কতকগুলি নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে। আরো কয়েকটি নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় পুরুষোত্তম সেন মুলশী সত্যাগ্রহী রূপে য়ারবেদা জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া 'মুলসী সত্যাগ্রহ সহায়ক মণ্ডলের' সম্পাদকের কাছে লিখিয়াছেন—"যে কয়জন কয়েদীকে বেত মারা হইয়াছিল আমি তাহাদের একজন। আমাদিগকে জাঁতা পিষিতে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাজ শেষ করিতে পারিতাম না। একদিন মুলসীর ১৫।১৬ জন কয়েদীকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি কৈফিয়ৎ চাহিলে আমরা তাঁহাকে বলি যে কাজ শেষ করিবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি না, কিন্তু তথাপি শেষ করিয়া উঠিতে পারি না। তিনি আমাদের বাপ তুলিয়া গালি দেন। পরের দিন ভোরের বেলা কেবল মুলসী সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগকেই বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদের ভিতর ৭ জনকে বেত মারা হইয়াছিল। বাকী ৩৫ জন বন্দীকে সেই বেত মারার দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিতে হইয়াছে। জেলার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছিলেন 'জোরসে মার'।

নিম্নলিখিত সত্যাগ্রহীদিগকে বেত মারা হইয়াছিল:—

(১) বাবু বিশ্বনাথ কাপুর	(কলিকাতা)	২৫ ঘা
(২) শ্রীযুক্ত এম এন কালে	(নাগপুর)	২০ ঘা
(৩) শ্রীযুক্ত ডি সি পেণ্ডারকার	(তুমসর)	২০ ঘা
(৪) শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম সেন	(নাসিক)	১৫ ঘা
(৫) শ্রীযুক্ত ওয়াই জি ডোমকর		

(চিঞ্চওয়াদ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র

বোম্বে ক্রনিকেল ব্যাপারটার সত্যতা সম্বন্ধে 'ডিরেক্টর অব ইন্‌ফরমেসন্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিয়াছেন, "অনুসন্ধানে জানিয়াছি, বেত্রাঘাতের সংবাদ সত্য। মুলশী সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দণ্ডিত কতিপয় কয়েদী পুনঃ পুনঃ জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এমন কি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কাজও করিতে চাহে নাই। সেইজন্য তাহাদিগকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।"

শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি ডেরা গাজি খাঁ হইতে সংবাদ দিয়াছেন—"ডেরা গাজি খাঁ জেলে খড়্গ সিং, সর্দ্দার যশোবন্ত সিং এবং এবং অন্যান্য শিখ কয়েদীদের মাথা হইতে পাগড়ি এবং টুপি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। প্রায় ১৪ জন কয়েদী ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ তাহাদের বস্ত্রাদি বর্জ্জন করিয়াছেন।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে সর্দ্দার খড়্গ সিং এবং যশোবন্তসিংকে নির্জ্জন কক্ষে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বীর সিংহ গুরুকাবাগ হাঙ্গামার সংশ্রবে ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসেই তাঁহার মুক্তি লাভের কথা ছিল। কিন্তু জেলের ভিতর তিনি 'সৎশ্রী অকাল' বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দণ্ডকাল আরো ছয় মাস বাড়িয়া গিয়াছে।

শিরোমণি গুরুদ্বার কমিটির সংবাদেই প্রকাশ—মুলতানে কাপুড়ের কথা বলার অপরাধে ৩৭ জন অকালী বন্দীকে গম পিষিবার ঘরে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। টানাটানিতে তাহাদের মাথার পাগড়ি খসিয়া পড়িয়া যায়, তখন তাহাদিগকে চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

রাজমাহেন্দ্রীতে রাজনৈতিক বন্দীরা প্রয়োপবেশন করিয়াছিলেন। জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশে তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্মেণ্টের নূতন নিয়ম—

বোম্বাই-গবর্মেণ্ট সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন, যে-সকল ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড লাভ করে তাহাদের চরিত্র, শিক্ষা এবং সামাজিক মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহারা সাধারণ বন্দীর সঙ্গে থাকিবে না। তাহাদের খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, বিছানা প্রভৃতিরও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি অনুসারে তাহাদিগকে লিখিবার সরঞ্জাম, পুস্তক প্রভৃতি সরবরাহ করা হইবে। তাহাদের সহিত দেখা করিবার ব্যবস্থাও হইবে স্বতন্ত্র। এই-সব বন্দী মাসে একখানা করিয়া পত্র লিখিতে পারিবে, পত্র পাইবার অধিকারও থাকিবে ইহাদের একখানা করিয়া। ইহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর লোকের কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইবে না, এবং বিনা প্রয়োজনে ইহাদের হাতে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ী দেওয়ার ব্যবস্থাও তুলিয়া দেওয়া হইবে। ইহারা কারাগারে অন্যায় আচরণ করিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই-সব বিশেষ ব্যবস্থা রহিত করিতে পারিবেন। কিন্তু গবর্মেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কারণেই এই-সব বন্দীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় হাতকড়া বা বেড়ী পরানো, বা বেত্রাঘাত করা চলিবে না।

নিয়মগুলি যে ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাগজে কলমে অনেক নিয়মই ভাল থাকে। সেইজন্যই নিয়মের সার্থকতা, নিয়ম গড়ায় নহে, তাহার প্রয়োগে। প্রয়োগের বেলায় এ নিয়মগুলি কতটা কাজে খাটানো হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ ঘুচিতেছে না।

বোম্বাইয়ে গো হত্যা বন্ধ—

সেদিন বোম্বাইএর ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারী

মন্ত্রী জানাইয়াছেন—বোম্বাই প্রদেশে নিম্নলিখিত মিউনিসিপ্যালিটি-গুলি গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন :—

(১) ইলকাল, (২) গালেন্দ্র গাদ, (৩) বায়াদগি, (৪) গাভাগ, (৫) হুবলী, (৬) ধারওয়ার, (৭) আনন্দ, (৮) আঙ্কেলেশ্বর, (৯) বুলসার, (১০) থাল, (১১) কল্যাণ, (১২) মঙ্গমলার, (১৩) জনর্গাও, (১৪) পারোলা (১৫) চল্লিশ গাঁও, (১৬) আবদা, (১৭) ইরন্দেল, (১৮) ধুলিয়াল, (১৯) শেরপুর, (২০) সাহাদা, (২১) নাসিক, (২২) সোনা, (২৩) পুণা সহর, (২৪) লোলভলা, (২৫) সোনাপুর, (২৬) বার্শি।

বার্শিনগরের মিউনিসিপ্যালিটিটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গোহত্যা বন্ধ করিয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় কলেক্টর নাকি ঐ আদেশ খণ্ডন করিয়া বলপূর্ব্বক আবার গোহত্যা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং মিউনিসিপ্যালিটিও কালেক্টরের ইচ্ছাতেই সম্মতি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি জনসাধারণ সভা করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজের প্রতিবাদ করায় মিউনিসি-প্যালিটি নাকি আবার গোহত্যা বন্ধ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

বোম্বাইএর কেবল মাত্র নাসিক মিউনিসিপ্যালিটিটি ছাড়া আর কোন মিউনিসিপ্যালিটিই গোহত্যা বন্ধ করিবার পূর্ব্বে গবর্মেণ্টের উপদেশের প্রতীক্ষা করে নাই। সম্প্রতি বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় গোহত্যা বন্ধ করা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছিল—প্রস্তাবটির মর্ম্ম হইতেছে,—দুগ্ধের সুব্যবস্থার জন্য কর্পোরেশন ইচ্ছা করিলে যে-কোনো সময় সভা করিয়া দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের মত লইয়া মিউনিসিপ্যালিটির বা ব্যক্তিবিশেষের গোহত্যাধানায় গোহত্যা নিবারণ করিতে পারিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবটি ভোটের জোরে পরাজিত হইয়াছে।

জীবদয়া প্রচারক সঙ্ঘ—

বাঙ্গালোরের দদবালপুর নামক স্থানে গতবৎসর "জীবদয়া প্রচারক সঙ্ঘ" নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘটির উদ্দেশ্য হইতেছে :—

(১) পশু হত্যা, বিশেষ ভাবে গো হত্যা বন্ধ করা।

(২) বিশেষজ্ঞেরা যে-সমস্ত পশুমাংস আহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন, নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে তাহা প্রচার করা।

(৩) পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার বন্ধ করা।

(৪) পশুদের সম্পর্কে নানারূপ সাহায্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা।

(৫) স্থানে স্থানে গোশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাহাতে গোরুর অবস্থার উন্নতি করিতে পারা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা।

(৬) শিশুকল্যাণ ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করা।

(৭) বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহের জন্য 'ডেয়ারী' ফার্ম্ম খোলা।

(৮) নানা প্রকারের মানবহিতকর কাজের আলোচনা করিয়া পুস্তক এবং পত্রিকা প্রকাশ করা ও স্থানে স্থানে কর্ম্মী পাঠাইয়া এইসব কল্যাণকর কাজে মানুষকে প্রবুদ্ধ করা।

এসব ব্যবস্থার অনেকগুলিই যে সমাজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সমাজের সংস্কার করিতে হইলে এই ধরণের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রচুর পরিমাণেই আছে।

প্রত্যানয়ন—

সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, আগ্রার রইবা এবং কটরা নামক গ্রামের প্রায় তিনশত মুসলমান মালিকানা রাজপুতকে হিন্দুক্ষত্রিয়গণ নিজেদের সমাজে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে মালিকান রাজপুত রমণীরা স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রস্তুত সেই-সব অন্ন ব্যঞ্জন সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই আহার করিয়াছেন—তাহাতে কোনরূপ ইতস্ততঃ করেন নাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং আর চারিজন সনাতন পণ্ডিত ধর্ম্মান্তর গ্রহণের যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। প্রধান প্রধান রাজপুতগণ ছাড়াও সাতশত হিন্দু, জৈন, এবং আর্য্য এই যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় উপস্থিত ছিলেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের চাঞ্চল্য—

আগরা, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ৪,৫০,০০০ মুসলমান রাজপুত হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।' স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ আর্য্যসমাজের কর্ম্মীরা ইহাদিগকে সমাজের বুকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সমাজচ্যুতদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ ও পরধর্ম্মীদের স্বধর্ম্মে আনয়ন মুসলমান ও ক্রিশ্চান ধর্ম্মের বিশেষত্ব; হিন্দুধর্ম্মের এদিকটা এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল। সম্প্রতি তাহার চেতনা ও চেষ্টা জাগ্রত হইতেছে। মুসলমান সমাজ ইহাতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। জমায়েৎ উলেমা হিন্দের সম্পাদক প্রচার করিয়াছেন—

"আর্য্যসমাজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইহার একজন 'নামজাদা সভ্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমানের' বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হিন্দু মহাজনগণও ভয় দেখাইতেছে, আর্য্য হিন্দু না হইলে রাজপুত মুসলমানদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইবে'। গত ৯ই ও ১০ই তারিখের জমায়েৎ উলেমা হিন্দের দিল্লীর অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, যাহাতে রাজপুত মুসল-মানগণ ধর্ম্ম ত্যাগ না করে সেজন্য একটি প্রচার বিভাগ খোলা হইবে। এই কার্য্যের জন্য এবং ভারতে ইস্‌লাম রক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকার দরকার। ২৫শে রম্‌জানের পূর্ব্বে ঐ অর্থ সংগ্রহ হওয়া চাই। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিতে চাহেন তাঁহারা পাঠাইবার সময় উহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। এজন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা রাজনৈতিক কাজে ব্যয় হইবে না।"

কাহাকেও জোর করিয়া ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করানো অধর্ম্ম। কিন্তু কেহ যদি স্বেচ্ছায় আত্মার উন্নতির অধিক সাহায্য হইবে মনে করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তবে তাহার জন্য অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করাও অন্যায়। কেবল দলবৃদ্ধি করা কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

ভারতে শিশুমৃত্যু—

ইংলণ্ডে এক বৎসরের শিশু মারা যায় শতকরা ৮টি কিন্তু ভারতবর্ষে মারা যায় ২৭টি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা বোম্বাইএর অবস্থাই শোচনীয়। বোম্বাইএ একবৎসরের শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৬৬টি। ইহার কারণ অনেক—একটি হইতেছে অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও ঘিঞ্জি বসতি। ধাত্রীদের অজ্ঞতাও প্রসূতি ও সন্তানের মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ।

লাহোরে বিধবা-বিবাহ—

লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার সম্পাদক জানাইয়াছেন, এই সভার বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে লাহোরের নানা স্থানে গত জানুয়ারী মাসে মোট ৬৮টি বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের ভিতর ৮টি ছিলেন ব্রাহ্মণ, ১২টি ক্ষত্রিয়, ২৭টি অরোরা, ৯টি আগরওয়ালা, ২টি কায়স্থ, ৪টি রাজপুত, ২টি শিখ এবং ৪টি ছিলেন অন্যান্য জাতির বিধবা। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বিধবাদের

দুঃখ ঘুচাইবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এখনও যদি হয় তবে তাঁহার স্বর্গগত আত্মা যে খুশী হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার এদিকে কোনই খেয়াল নাই!

প্রাথমিক-শিক্ষা-ব্যবস্থা—

মাদ্রাজের কোকনদ মিউনিসিপ্যালিটি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন স্থানগুলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবেন। প্রথমে ছয়টি ওয়ার্ডে কাজ আরম্ভ করা হইবে। এজন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা সংগ্রহ করা হইবে ব্যবসাদারদের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইয়া।

করাচীর মিউনিসিপ্যালিটিও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি একটি সভায় তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে এই বৎসর করাচী মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কুড়িটি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩,০০,৫৭৮ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের শিক্ষা-ব্যবস্থা—

সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের শিক্ষা সম্পর্কীয় বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ছোটখাট রাজ্যটি শিক্ষার দিক দিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি অপেক্ষা যে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, এই বিবরণটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। আমরা এখানে এই বিবরণটির কতকগুলি হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দিতেছি:—

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভিতর মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ৪,২০২টি এবং এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতেছে ৪,৩৫,৭৪০ জন ছাত্র। অর্থাৎ ইহার প্রায় প্রতি ১·৮১ বর্গমাইলের ভিতর এবং প্রতি ৯৫৩ জন অধিবাসীর পিছনে একটি করিয়া স্কুল আছে। ঐ বৎসরে কলেজে পড়ুয়া ছাত্রের সংখ্যা সেখানে বাড়িয়া গিয়াছে শতকরা ২১·৫ জন হিসাবে, মাঝারি শিক্ষার ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে ৪ জন হিসাবে এবং দেশী ভাষা শিক্ষা করিবার স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে ২·৩ জন হিসাবে। বালকদের ভিতর শতকরা প্রায় ৭২·৫ ছাত্র সেখানে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে।

রাজ্যের ভিতর শিক্ষার বিস্তারের জন্য সরকার যে ভাবে ব্যয় করেন তাহার বহরও বড় অল্প নহে। শিক্ষার উন্নতি এবং ব্যয়ের বহর দেখিয়া এ কথা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে এ সম্বন্ধে সরকারের তাগিদেরও কিছুমাত্র অভাব নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার হইতে ব্যয় করা হয় মোট ৩২,২৫,২৮৭ টাকা। এই অঙ্কটি রাজ্যের সমগ্র রাজস্বের শতকরা ১৬ ভাগ।

কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার দিকে নহে, উচ্চ শিক্ষাতেও ত্রিবাঙ্কুর বিশেষভাবেই অগ্রসর হইয়াছে,—রাজ্যের ভিতর ছয়টি কলেজ আছে, ইহাদের ভিতর একটি প্রথম শ্রেণীর, বাকী পাঁচটি দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই পাঁচটির ভিতর একটি মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর কলেজটির এবং স্ত্রীলোকদের কলেজটির সমগ্র ভার বহন করেন ত্রিবাঙ্কুরের রাজসরকার।

শিক্ষা সম্পর্কে ত্রিবাঙ্কুরের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে সেখানে পুরুষ এবং নারী উভয়েই সমান তালে শিক্ষার ক্ষেত্রে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। রমণীদের জন্য পৃথক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে ৪১২টি। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা হইতেছে ২,০৬,১৯৬ জন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদিক কলেজেও কতকগুলি মহিলা অধ্যয়ন করিতেছেন। এমন কি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কলেজেও একজন মহিলা ছাত্রী আছেন।

নারী-শিক্ষার ঝোঁক ত্রিবাঙ্কুরে এমনভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের শিক্ষা একটা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এত পৃথক প্রতিষ্ঠান তাহাদের জন্য গড়িয়া তোলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য অল্পবয়স্কা বালিকারা বালকদের সঙ্গেও স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ সেরূপভাবে শিক্ষা তাহারা লাভও করিতেছে। ছাত্রীদের ৮২,৮৮০ অর্থাৎ শতকরা ৩১·১ জন বালকদের স্কুলেই পড়াশুনা করে, কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে ১২ বৎসরের বেশী বয়স্কা বালিকাদিগকে লইয়া। এই সমস্যার সৃষ্টি না হইলে আরো অনেক বালিকা আসিয়া যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে যোগদান করিত, কর্ত্তৃপক্ষের সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গবর্মেণ্ট জনসাধারণকে এই সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা চলিতেছে। ত্রিবাঙ্কুর যে শিক্ষা-ব্যাপারে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহা তাহার লিখিতে-পড়িতে-জানা লোকের হিসাব-নিকাশটা খতাইয়া দেখিলেই বোঝা যায়। ত্রিবাঙ্কুরে শতকরা ২৮ জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে। এক ব্রহ্মদেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও সাধারণ লোকের ভিতর লিখিতে-পড়িতে-জানা লোকের সংখ্যা এত বেশী নহে।

দেশের এই গভীর অজ্ঞতার অন্ধকারের ভিতর এরূপ উদাহরণ যে অনেকখানি আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করে তাহা বলাই বাহুল্য। যে গবর্মেণ্ট শিক্ষার দিকে এতটা নজর দেয়, সে যে জাতির কল্যাণের পথ, মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশী রাজ্যগুলিতে যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের ভিতর ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিশেষ নূতন ধারা ধরিয়া চলিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন নিজাম গবর্মেণ্ট। এখানে শিক্ষার বাহন করা হইয়াছে উর্দ্দূভাষাকে। কোনো প্রাদেশিক ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রধান প্রতিবন্ধক আমাদের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে উপযোগী পুস্তকের অভাব।

এইসব বাধা সত্ত্বেও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উর্দ্দূকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। বিশ্বের বিদ্যাভাণ্ডার উর্দ্দূতে যাহাতে অনুবাদিত হইতে পারে সেজন্যও তাঁহারা বিশেষভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচার-বিভাগ গত পাঁচ বৎসরে যে-সব পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছে তাহার দ্বারা ইণ্টারমিডিয়েট এবং বি এ ক্লাশের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব ছাত্রদিগকে অনুভব করিতে হইবে না, এ কথা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হইবে না। বিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলি বাছিয়া দিতেছেন। ইতিহাস, দর্শন, অর্থবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুপুস্তক ইতিমধ্যেই অনুদিত হইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধেও অনেক পুস্তকের অনুবাদে ইঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। থিওলজি বা ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান এবং আর্টস্ 'ফ্যাকাল্টির' অর্থাৎ বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। আগামী জুলাই মাসে চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইনের জন্যও এই বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

উর্দ্দূর দিকে এত বেশী নজর দেওয়ার জন্য ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা যে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহাও নহে। ইংরেজি ভাষাকেও

সেখানে বাধ্যতামূলক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিজাম বাহাদুর এই বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নতির দিকে বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। রাজ্যের ৪২০০ বিঘা পরিমিত জমি এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মাণের জন্য তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে এক কোটি টাকাও মঞ্জুর করা হইয়াছে।

১৯২২-২৩ সালের বাজেটে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে অর্থ ধরা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজটিই ইহার একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট এবং বি-এ ক্লাশে এখন মোটের উপর ৫০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে ১১০ জন ছাত্র এই কলেজ হইতে ইণ্টার্‌মিডিয়েট পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ভিতর ৬৫ জন পাশ করিয়াছে। বাহিরের পরীক্ষকেরা এইসব ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া রায় দিয়াছেন,—চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব এইসব ছাত্রের কাগজে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইয়াছে।

বাংলাতেও বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিবার জন্য একটা আন্দোলন সুরু হইয়াছে। যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে, তাঁহারা পুস্তকের অভাবটাকেই বড় করিয়া দেখেন। কিন্তু ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অভাবটা যে অনতিক্রম্য, একথা মনে করিবার আর কোনই কারণ থাকে না।

সফরে রবীন্দ্রনাথ—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর অর্থসংগ্রহের জন্য ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি লাক্ষ্ণৌ সহরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একটি সভায় তিনি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। অযোধ্যার তালুকদারদের পক্ষ হইতে রাজা রামপাল সিংহ বিশ্বভারতীতে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

করাচীতেও রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছে। করাচীর মিউনিসিপ্যালিটি এই অভ্যর্থনার জন্য দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট—

শ্রীমতী মারগারেটই কজিন্সকে মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি সুশিক্ষিতা আইরীশ মহিলা। ভারতবর্ষে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে মহিলা হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিলেন। শ্রীমতী কজিন্স 'স্ত্রী-ধর্ম্ম' নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা। নারীদের নির্ব্বাচন-অধিকার আন্দোলনেরও ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী। এখন আশা করা যায় এ অধিকার অদূর ভবিষ্যতে ভারত মহিলারাও লাভ করিবেন। মান্দ্রাজ নারীদের সম্পর্কে ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে পিছনে রাখিয়া দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে।

কৃতী ভারতবাসী—

ডাক্তার ইউ এন দাস কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন প্রতিভাশালী ছাত্র। গত যুদ্ধের সময় ইনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া কাপ্তেন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর চক্ষু কর্ণ ও গালের ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য এডিন্‌বরা যান। সেখানে এফ্-আর-সি-এস পরীক্ষায় ডাঃ দাস সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনো বাঙালী এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। ডাঃ দাস এপ্রিল মাসে স্বদেশে ফিরিবেন।

মিঃ জে মুখার্জ্জি এফ্-আর-এস-এ, কাশ্মীরের অমর সিং শিল্পবিদ্যালয়ের চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক। ইনি সম্প্রতি বিলাতে "ইন্‌করপোরেটেড ইনষ্টিটিউট অব ব্রিটিশ ডেকোরেটর্স্" নামক সমিতির ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোনো ভারতবাসী বা এসিয়াবাসী এই সমিতিটির সদস্যপদলাভের গৌরব অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

রাওলপিণ্ডির মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মানি মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের "মাষ্টার অব জার্ণালিজ্‌ম্" উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি মিশিগ্যান প্রেস ক্লাবের সম্মানিত সভ্য এবং মিশিগ্যান 'কস্‌মোপলিটান ক্লাবের' ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবাসীর ভিতর মিঃ মানিই সর্ব্বপ্রথমে এই সম্মান লাভ করিলেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়।

শের *

(আকবর হুসেন)

তোপের পরে প্রোফেসর একই অস্ত্র ধরে,
'বাঙ্গলা'র মোটা কাজ 'র্যাঁদা' সোজা করে!
সবাই বলে তলোয়ারে ইস্‌লাম-প্রচার,—
তোপের মুখে কিসের প্রচার,—তাহার নাহি ধার!
স্বাধীনতা?—বহুৎ আছে,, আবার কিবা চাই!—
শ্বাস লই, কথা বলি—কোথাও বারণ নাই!
কামনের কিবা কাজ, তলোয়ার ফেল;—
তোপ যদি দেখা দেয়,—পত্রিকা নিকালো।

মিথ্যা কথা,—হিন্দুস্থান ইস্‌লামের দেশ!—
রাম-কৃষ্ণের দেশ?—ছোঃ, নাহি সত্য-লেশ!
মোরা কুলি, খয়েরখাঁ, সবেই বলি বেশ;—
ইউরোপের জন্য এটা গুদাম-বিশেষ!

শ্রী যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

* উর্দ্দুতে ছোট ছোট কবিতার নাম—'শের'। এই ভাবের Political Satire (বিদ্রূপাত্মক রাজনীতিক কণিকা) লেখায় আকবর হুসেন প্রসিদ্ধ কবি।

ভাষাতত্ত্ব

ভাষা সম্বন্ধে গত পঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে যে কতকগুলি অভিনব মতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারা ভাষার কতদূর উন্নতির আশা বা অবনতির আশঙ্কা করা যায়, আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

১। প্রথম নব্যমত এই যে 'বাঙ্গালী যে একপ্রকার ভাষাতে কথাবার্ত্তা বলে, অন্যপ্রকার ভাষাতে সাহিত্য রচনা করে, ইহা তাহাদের দোষ; যে শব্দকে কথিত ভাষায় যে আকারে ব্যবহার করা যায়, সেই শব্দ সাহিত্যেও সেই আকারে ব্যবহার করা উচিত।' এই মতাবলম্বীগণ তাঁহাদের কল্পিত বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ স্বরূপ প্রথমে 'সুলভ সমাচার' নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু সাহিত্যের ভাষা ও কথিত ভাষা সকল দেশেই পৃথক্। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক, যুবক এবং বালক, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ইহাদের কণ্ঠে ভাষার শব্দ-সকল বিভিন্ন প্রকারে উচ্চারিত হয়। পুরুষ কঠিন উচ্চারণ করিতে পারে, স্ত্রীলোকের উচ্চারণ নরম; এই কারণে সাহিত্যিক ভাষা ব্যঞ্জন-বহুল হয় এবং নারীর ভাষায় স্বরাধিক্য অধিক থাকে,—যেমন, 'অমৃত—অমিয়; বদন—বয়ান; মধু—মৌ, বধূ—বৌ; ভজ্জন—ভাজন; বণ্টন—বাঁটন'; ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে কথা বলিতে শব্দের পূর্ণ উচ্চারণ প্রায় কখনই হয় না। কথিত ভাষার শব্দ অস্ফুট এবং ভগ্ন। আর সাহিত্যিক ভাষার শব্দ স্পষ্ট এবং পূর্ণ।

সকল দেশেই কথিত ভাষার এক আকার, গদ্য ভাষার এক আকার, পদ্যের অন্য আকার এবং সঙ্গীতে আর-এক আকার। ইহারা একে অন্যের রূপ ধারণ করিতে গেলে তাহা অস্বাভাবিক হয়। কথিত ভাষা নিরলঙ্কারা, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা সালঙ্কারা; অতএব সাহিত্যের ভাষায় যেমন কথা বলা যায় না, তেমনি কথিত ভাষাতে সাহিত্য রচনা করা যায় না; করিলে তাহা অস্বাভাবিক হয়।

সংস্কৃত ন+অস্তি='নাস্তি' শব্দের বঙ্গীয় প্রাকৃতাকার 'নাহি'। মৌখিক কথায় তাহাকে সাধারণতঃ 'নাই' বলে। তাহাকে কেহ আবার 'নেই' বলে, আর কেহ একবারে 'নি' করিয়া লইয়াছে। এই-প্রকারে কথা বলার সময় সকল ভাষাতেই দুই শব্দে মিলিয়া এক শব্দের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

ইংরেজগণ কথা বলিবার সময় শব্দ-সকলের যে-প্রকার সংক্ষিপ্তোচ্চারণ করিয়া থাকে, সেই সংক্ষিপ্তাকারে তাহাদিগকে লিখিয়া যদি সাহিত্য রচনা করে তবে তাহা যে কি বিকট রূপ ধারণ করে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু আমাদের নব্যমতাবলম্বীগণ তাহা না বুঝিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সেই কদাকার প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

২। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় নবীন মত এই যে ইহা একটা অনার্য্য ভাষা। এই মতাবলম্বীরা বলেন, বাঙ্গালা দেশে যে-সকল অনার্য্য জাতি বাস করিত তাহারা আর্য্য ভাষা হইতে শব্দাদি গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভাষার পুষ্টিসাধন ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। বঙ্গভাষা সেই সংস্কৃত-মিশ্রিত অসভ্য ভাষা।

কিন্তু তাহা হইলে এই ভাষা সেই পূর্ব্বনিবাসীদের নামে অভিহিত হইত। পূর্ব্বে যে ভাষা ছিল তাহার ত একটা নাম ছিল? পূর্ব্বনিবাসীদের ভাষা হইলে ইহার নাম 'চোলভাষা' বা 'কোলভাষা' বা 'নাগভাষা' অথবা এই-প্রকার কোনও নাম হইত। তাহা না হইয়া ইহা চিরকাল 'প্রাকৃত ভাষা' নামে খ্যাত আছে কেন? প্রাকৃত অর্থ সংস্কৃতের কথিতাকার। কোন চোল বা কোলের ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলার ত কোনও কারণ নাই।

তাঁহারা প্রমাণ দেওয়ার জন্য অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গভাষার দুই একটি শব্দ প্রতিবাসী সাঁওতালদের ভাষাতে ব্যবহৃত আছে দেখিয়া সেই দুই একটি শব্দকেই সম্মুখে ধরিয়া বলিতেছেন, "এই দেখ অনার্য্য শব্দ!" আর বঙ্গভাষার দুই একটি রীতি দ্রাবিড় ভাষাতে দেখিয়া বলিতেছেন, 'এই দেখ বাঙ্গলার মধ্যে অনার্য্য রীতি!' কিন্তু ঐ দুই একটি শব্দ বা রীতি কি সাঁওতাল বা দ্রাবিড়ীগণ প্রাকৃত ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে পারে না?

কেহ বলেন, বাঙ্গলাতে যে আমরা যুক্তাক্ষরগুলি ভাঙ্গিয়া বলি, ইহা দ্রাবিড় ভাষার রীতি। এই কথা লইয়া অনেক বড় বড় লোক অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। ইহার উত্তর "ভাষাতত্ত্ব" ১৬শ অধ্যায়ে ভাষার সৃষ্টিপ্রকরণে পাওয়া যাইবে। সকল ভাষাই যখন প্রথম উৎপন্ন হয় তখন তাহারা যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত থাকে। শৈশবেই ভাষার সৃষ্টি হয়, শিশু কখনই যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না; সুতরাং কোন ভাষার প্রথমাবস্থায় যুক্তাক্ষর থাকিতে পারে না। ইহা ভাষা-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র। সমাজ যখন উন্নত হয় তখন ক্রমে ক্রমে ভাষাতে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার হইতে থাকে, কারণ যুক্তাক্ষরে ভাষাকে সংক্ষিপ্ত এবং বলীয়ান করে। এই কারণেই সাহিত্যে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার অধিক থাকে। কিন্তু কথিত ভাষা স্ত্রীলোক ও বালকের ব্যবহার্য্য, এইজন্য তাহাতে যুক্তাক্ষরের প্রভাব অল্প। কথিত ভাষায় সরল যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত উচ্চারণ স্বাভাবিক এবং সাহিত্যে ও বক্তৃতায় যুক্তাক্ষরবহুল বলীয়ান ও সংক্ষিপ্ত শব্দসকল অধিক উপযোগী।

কথিত ভাষাতে যে বাঙ্গালী যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না, বা করে না, তাহা নহে। কথিত ভাষায় 'দৃষ্টি'কে 'দিষ্টি', 'সৃষ্টি'কে 'সিষ্টি' বা 'ছিষ্টি' বলে; 'বৃন্দাবন'কে 'বিন্দাবন', 'বিদ্যা'কে 'বিদ্যা', 'বুদ্ধি'কে 'বুদ্ধি' বলিয়া থাকে। ইহাদের সকলের মধ্যেই যুক্তাক্ষর আছে, সুতরাং যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ বাঙ্গলাতে হয় না একথার কোন মূল্য নাই। সারল্যার্থে কথিত ভাষায় কোন স্থলে যুক্তাক্ষর উচ্চারিত হয়, কোন স্থানে হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে কথিত ভাষায় যুক্তাক্ষর ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়। ইহা অন্য কোনও ভাষার অনুকরণ নহে।

আবার ইহারা বলেন যে "ও-সব শব্দাদির কথা যাহা হউক, অর্থাৎ সেগুলি সংস্কৃত-সম্ভূত হইলেও, বাঙ্গলাভাষার 'সাঁচটা' অনার্য্য; সংস্কৃত শব্দগুলিকে একটা অনার্য্য 'সাঁচে' ফেলিয়া বাঙ্গলা ভাষা গঠিত হইয়াছে।" কিন্তু এই 'সাঁচ' কথাটার অর্থ কি ইহারা তাহা বলেন না। 'ভাষার সাঁচ' অর্থ—তাহার গঠনপ্রণালী; যেমন—

সং—"পঠিতুম্ যাহি পশ্যসি চেৎ ফলঞ্চ আনয়।

বাং—পড়িতে যাও, দেখ যদি, ফলও আনিও।

ইংরেজী "To read go, see if, fruit also bring.

এস্থলে সংস্কৃতের সহিত ইংরেজী গঠনপ্রণালীর কিছুই মিল নাই, কিন্তু বাঙ্গলার সহিত ঠিক কথায় কথায় মিল হইয়াছে।

আবার দেখুন,—

সং সার্দ্ধত্রীণি, বাং সাড়েতিন, ইং Three and half, এস্থলে বাঙ্গলায় ঠিক সার্দ্ধের নীচে সাড়ে এবং ত্রীণির নীচে তিন বসিয়াছে, কিন্তু ইংরেজীতে সার্দ্ধের নীচে তিন, এবং ত্রীণির নীচে অর্দ্ধ বসিয়াছে,—সুতরাং, 'সাঁচে' পড়িল না।

ইহার নাম ভাষার 'সাঁচ'। আমরা "ভাষাতত্ত্ব" দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই-প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়াছি যে বাঙ্গলা ভাষার গঠনপ্রণালীতে অনার্য্যত্বের চিহ্ন মাত্র নাই। তথাপি ইহারা বলেন, লেখেন,—"বাঙ্গলা ভাষা অনার্য্য সাঁচে গঠিত।" এ কি অত্যাচার!

৩। নব্যমতাবলম্বীগণের তৃতীয় মত এই যে, 'বঙ্গীয় প্রাকৃতের মধ্যে অনেক শব্দ আছে, যথা কামড়ান, চাটন, ইত্যাদি, ইহারা সংস্কৃতসম্ভূত নহে, সুতরাং ইহারা আদিম অনার্য্য ভাষা।' ইহার উত্তর এই যে, কোন শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতসম্ভূত না হইলেই তাহাকে অনার্য্য ভাষা বলার কারণ নাই। বঙ্গীয় প্রাকৃতের অনুমান নব্বই শব্দ সংস্কৃত বা তাহার ভগ্নাকার; অপর দশটি শব্দের কতকগুলা প্রাচীন প্রাকৃত, তাহারা বর্ত্তমান সংস্কৃতের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে, অথচ সংস্কৃত হইয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই, যেমন, 'ভেট' শব্দের ইংরেজী meet উচ্চারণ-ব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে 'ভ' স্থানে ইংরেজীতে 'ম' হইয়াছে; 'থন' একটি বিভক্তি, ইহা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত, যেমন 'তোমার থন ভাল' ইংরেজী 'Better than you'। বাঙ্গলা 'ঘরের থনে'—Gr. 'Oeko then' (from house, সং ওকতঃ), অতএব থন বা থনে বিভক্তির ইংরেজী রূপ than, গ্রীক রূপ then, বাঙ্গলা রূপ থন, সংস্কৃত রূপ তঃ। 'টিপ'—অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চাপ দেওয়া;

আঙ্গুলের মাথার ইংরেজী নাম 'টিপ' (tip)। 'ডুব' ইহার ইংরেজী রূপ 'ডাইব' (dive)। হিন্দি 'লাদ' শব্দের ইংরেজী 'লোড' (load)। যখন ইংরেজ, গ্রীক ও ভারতবাসীগণ একস্থানে বাস করিতেন, তখন হইতে এইসকল শব্দ প্রচলিত আছে, অথচ ইহারা এপর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান পায় নাই। যদি এই-সকল শব্দ ইয়োরোপে আর্য্যভাষা, তবে এখানে অসভ্য জাতির ভাষা মনে করার কারণ নাই।

বঙ্গীয় প্রাকৃতে আর-এক শ্রেণীর শব্দ আছে যাহা 'ভাষাতত্ত্বের' ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত, ভাষা সৃষ্টির অষ্টবিধ নিয়মানুসারে গঠিত হইয়াছে ; যেমন, 'কামড়ান, চাটন,' ইত্যাদি। কোন কোন বস্তু চর্ব্বণ করিতে কড়্‌মড়্‌ শব্দ হয়। তাহা হইতে শব্দানুকরণে 'কম্‌ড়ায়ন' বা 'কামড়ান' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কোন কোন বস্তু লেহন করিতে জিহ্বায় 'চাটচাট' শব্দ করে, তাহা হইতে 'চাটন' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এই-প্রকারে উপজাত শব্দের মধ্যে অনেক শব্দ সাহিত্যে ব্যবহৃত না হওয়ায় সংস্কৃতাকার প্রাপ্ত হয় নাই, প্রাকৃতাবস্থায়ই আছে ; আর কোন কোনটি বা সংস্কৃত হইয়া গিয়াছে। অতএব কোন শব্দ অসংস্কৃত বা অসংস্কৃতসম্ভূত হইলেই তাহাকে অনার্য্য শব্দ মনে করার কারণ নাই। অন্য কোন ভাষাতে ত ঐ-সকল শব্দ নাই।

'প্রাকৃত' এবং 'সংস্কৃত' নামের অর্থ কি? 'প্রাকৃত' অর্থে যে অমার্জ্জিত অনলঙ্কৃত অব্যাকরণিক ভাষাতে লোকে সাধারণ কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। কিন্তু সাহিত্য রচনা করিবার সময় শব্দগুলিকে একটুকু মার্জ্জিত এবং অলঙ্কৃত করিয়া লওয়া হয়। প্রাকৃত শব্দের বল ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি করার জন্য তাহাতে কোন একটি বর্ণ যোগ করিয়া বা কোন একটি উপসর্গ যোগ করিয়া বা অন্য প্রকারে একটু রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয়, তাহাকেই সংস্কার করা বলে।

ক্রমে এই হইয়া দাঁড়াইল যে সাহিত্য রচনায় কেহ আর সংস্কার না করিয়া কোন শব্দ ব্যবহার করিত না। কিন্তু বেদের সময় পর্য্যন্ত সাহিত্যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইত না।

আমরা 'ভাষাতত্ত্বে' দেখাইয়াছি যে বাঙ্গলায় কথিত ভাষার প্রাণিক শব্দাদির মধ্যে কোন একটি শব্দ বা বিভক্তি, কি প্রত্যয়াদি কিছুই অনার্য্যভাষাসম্ভূত নহে।

প্রাণিক শব্দ তাহাকে বলে, যে-সকল শব্দ ভাষাতে থাকিতেই হইবে, যেমন, দেখা, শোনা ইত্যাদি পঞ্চইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় শব্দ ; স্নান, আহার ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় শব্দ ; বস্ত্র, অলঙ্কার, বাণিজ্য, গৃহ, বাড়ী ইত্যাদি সম্বন্ধীয় শব্দ ; হাসি, কান্না, ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়া-বাচক শব্দ ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই-সকল শব্দ ভাষাতে না থাকিয়াই পারে না। আর যে-সকল শব্দ সর্ব্বসাধারণ লোকের সর্ব্বদা ব্যবহারে আসে না, তাহাদিগকে ভাষার অবান্তর শব্দ বলা যায়; আমরা 'ভাষাতত্ত্বে' বিস্তারিত মতে দেখাইয়াছি যে বর্ত্তমানে বঙ্গীয় প্রাকৃতের প্রাণিক শব্দের মধ্যে একটি শব্দও পাই নাই যাহাকে অনার্য্য শব্দ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়।

৫। নব্যমতাবলম্বীগণ বলেন যে বাঙ্গালীর মাথার হাড় মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা আর্য্য জাতির মাথার হাড়ের সহিত সম্পূর্ণ মিলে না, সুতরাং বাঙ্গালী আর্য্য নহে। কিন্তু জল-বায়ুর দোষে অথবা ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে যদি কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াই থাকে তাহাতে কি জাতীয়ত্বের বিলোপ হয়? তাহাতে বাঙ্গালী অনার্য্য হইয়া যায় নাই। আকৃতিই জাতীয়ত্বের প্রধান পরিচয়। জাতীয়ত্বের দ্বিতীয় পরিচয় আচার ব্যবহার। অনেক আর্য্য আচার ব্যবহার এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু অন্যত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জাতীয়ত্বের তৃতীয় পরিচয় ভাষা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কথিত ভাষা-সকল আর্য্যভাষারই সাময়িক বিকার।

আর্য্যজাতির মুখে আর্য্যভাষার পরিষ্কার উচ্চারণ হওয়া আবশ্যক। ইহাও একটা জাতীয়ত্বের পরিচয়। দেখিতে পাই বাঙ্গালীর মত উচ্চারণ-শক্তি পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির নাই। অন্য জাতির মধ্যে যে 'ট' বলিতে পারে সে 'ত' বলিতে পারে না, যে 'ত' বলিতে পারে সে 'ট' বলিতে পারে না। তাহাকে যদি 'ছ' বলিতে বলা যায় তবে সে 'চ' অথবা 'চ্ছ' বলিবে, কখনও 'ছ' উচ্চারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু

বাঙ্গালীকে যে উচ্চারণ করিতে বল বিশুদ্ধরূপে তাহা করিতে পারে। আর্য্যজাতির মধ্যে আর্য্যোচ্চারণ বাঙ্গালীর মুখে যেমন হয়, অন্য কোনও জাতির তেমন হয় কি না সন্দেহ। সেই বাঙ্গালীকেই অনার্য্য বলিব?

সকলেই স্বীকার করে যে আর্য্যজাতি সকল জাতির মধ্যে বুদ্ধিতে প্রধান। বুদ্ধিমত্তা আর্য্যজাতির এক লক্ষণ। দেখিতেছি বঙ্গবাসী এখনও এই অধঃপতিত অবস্থাতেও বুদ্ধিতে অপ্রখর নহে।

৬। আর-এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, "বঙ্গদেশের কথিত ভাষা আর্য্যভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও কালধর্ম্মে, বিশেষ দেশদেশান্তর ভ্রমণে, তাহা বিকৃত হইতে হইতে এখন এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহাকে আর এখন আর্য্যভাষা বলা যায় না, তাহা এক নূতন ভাষা হইয়া পড়িয়াছে।"

সাহিত্যের ভাষা কথিতাকারে যেমন সংক্ষিপ্ত ও সরল হইয়া উচ্চারিত হয়, বাঙ্গলা সংস্কৃতের ঠিক সেই সরল সংক্ষিপ্তাকার: ইহা দেশ বা কালের দূরত্বজনিত নহে। ভাষার সৃষ্টি হইতেই সাহিত্যিক ও কথিত ভাষার এই-প্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে।

প্রকৃত পক্ষে ভাষার বিকৃতি কাল বা স্থানের দূরত্ব অনুসারে হয় না। সাহিত্যের ভাষাকে ব্যাকরণেই ঠিক রাখে, কথিত ভাষার বিকৃতি বা উন্নতি প্রত্যেক স্থানের বা কালের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা অনুসারে হইয়া থাকে। যে দেশে বা যে সময়ে শিক্ষার প্রচলন অধিক থাকে, সেই স্থানে বা কালে প্রত্যেক শব্দের মূলরূপটি লোকের চক্ষের উপর ভাসমান থাকে, তখন সে কোন শব্দের মূলরূপটি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে অধিক বিকৃত করিতে পারে না। আর যে দেশে বা যে সময়ে শিক্ষার প্রচলন অল্প থাকে তখন তথাকার লোকে শব্দ-সকলের মূলরূপ না জানিয়া যথেচ্ছা বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করিতে থাকে। মনে করুন, সংস্কৃত 'কর্ত্তুম্ আসীৎ'; তাহার প্রথম কথিতাকার 'কর্ত্তু আসীল্', কারণ 'ম' অক্ষরটির উচ্চারণ অতি মৃদু, তাহা কথিত ভাষায় প্রায় উচ্চারিত হয় না, যেমন কুমার—কোঁআর, আর 'ত' স্থানে অনেক সময় 'ল' উচ্চারণ হয়, যেমন, 'জীবিত > জীঅল' ইত্যাদি। এই প্রকারে 'কর্ত্তুম্ আসীৎ' বাক্যের প্রথম কথিত বা প্রাকৃত রূপ 'কর্ত্তু আসীল্'; তাহার পর পাঁচ ছয় সহস্র বৎসর পরে এখনও নোয়াখালি, চট্টগ্রামে 'করিতে' অর্থে সেই আদি প্রাকৃতাকার কর্ত্তুই বলিয়া থাকে, কালধর্ম্মে তাহার কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু তদপেক্ষা পশ্চিম ঢাকা প্রদেশে ইহার রূপ 'কর্ত্তে'। অতএব এই শব্দের অবনতি স্থানের দূরত্ব অনুসারে হইল না, মূলভাষার অনভিজ্ঞতা হেতু অন্যান্য স্থানে কর্ত্তুং স্থলে 'করতে' করিয়া লইয়াছে।

পূর্ব্বকালে প্রাকৃতের যে এত অবনতি হইয়াছিল তাহার কারণ এই যে বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণ লোকের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করার জন্য প্রাকৃত ভাষা এবং প্রাকৃত অক্ষরের অধিক উৎসাহ দেওয়ায় সংস্কৃতকে প্রায় ডুবাইয়া দিয়াছিল; সেই কারণে মূল ভাষার সহিত অল্প পরিচয় থাকায় কথিত প্রাকৃত অতিশয় বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর হিন্দুধর্ম্মের যেমন পুনরভ্যুদয় হইতে লাগিল, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষারও পুনরভ্যুত্থান হইতে লাগিল। এই প্রকারে শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থানুসারে কথিত ভাষার উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে, কাল-স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া বিকৃত হইয়া আসে না। কালে যেমন বিকৃত করে, তেমন উন্নতও করে।

কেহ বলিতে পারেন যে আমরা ত পিতা-মাতার নিকটেই ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকি, তাহা হইলে কাল-স্রোতের সহিত ভাষার স্রোত বহিবে না কেন? এবং ক্রমে বিকৃত হইবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, পিতা মাতার নিকট যে ভাষা আমরা শিক্ষা করি তাহাকে আমরা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির আধিক্য বা অল্পতানুসারে উন্নত বা অবনত করিয়া লই। বিদ্যাবলে ভাষা সংশোধিত হয় এবং অজ্ঞতা-দোষে বিকৃত হয়। ভাষার উন্নতি ও অবনতির মূল বিদ্যা ও বিদ্যাহীনতা, তাহার নবীনত্ব বা প্রাচীনত্ব নহে।

৭। সপ্তম নব্যমত এই যে 'প্রাকৃত হইতে ভারত-বর্ষের বর্ত্তমান কথিত ভাষা-সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সাক্ষাৎ-ভাবে সংস্কৃত হইতে হয় নাই।' তাহার উত্তর এই যে ভাষা সংস্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষা কি-প্রকার ছিল

তাহা আমরা জানি না, এবং জানিবার উপায়ও নাই। সুতরাং তাহার সহিত বঙ্গভাষাকে মিলাইবার উপায় নাই।

এখন বঙ্গভাষা যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কয়েকটি সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য শব্দের উদাহরণ দ্বারা দেখাইতেছি। বঙ্গীয় প্রাকৃতের শতেকের মধ্যে অনুমান নব্বই শব্দ সংস্কৃত অথবা তৎসম্ভূত, অবশিষ্ট দশটি শব্দের মধ্যে কতক আমাদের ভাষা সংস্কৃত হওয়ার পূর্ব্বকার এবং কতক ভাষাসৃষ্টির নিয়মানুসারে গঠিত হইয়া কথিত ভাষায় প্রচলিত আছে কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই। এই তিন শ্রেণীরই দুই চারিটি করিয়া শব্দ আমরা উদাহরণের জন্য গ্রহণ করিতেছি। যে-সকল শব্দের দিকে চাহিয়া লোকে বাঙ্গলা ভাষাকে অনার্য্য ভাষা মনে করে আমরা বাছিয়া বাছিয়া সেই-সকল শব্দ হইতেই উদাহরণ গ্রহণ করিলাম।

'গাল' শব্দের ব্যুৎপত্তি।—বাঙ্গলা 'গাল' শব্দের সংস্কৃত 'গল্ল'। আমরা মনে করি এই 'গল্ল' শব্দও মূল সংস্কৃত 'গণ্ড' শব্দের প্রাকৃত রূপ। গণ্ড > গন্দ > গল্ল। অথচ ইহাও সংস্কৃতে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। সারল্যার্থে অধিকাংশ প্রাকৃত ভাষার অন্ত্য অকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল উৎকল প্রদেশের প্রাকৃতে এই প্রথা এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, সে দেশের লোকে এখনও বন, মণ, ফুল ইত্যাদি শব্দের অকারান্ত উচ্চারণই করিয়া থাকে।

গল্ল শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ গাল্ল, কারণ যুক্তাক্ষরে দীর্ঘং—যুক্তবর্ণের পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। পরে প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ-নিয়মে সারল্যার্থে 'গাল্ল' শব্দের অন্ত্য অ লোপ করিলে 'গাল্ল্' থাকে; কিন্তু দ্বিত্ববর্ণের পরে স্বরবর্ণ না থাকিলে তাহার উচ্চারণ করা যায় না। এই কারণে 'গাল্ল' শব্দের অন্ত্য অকারের সহিত তাহার আশ্রিত অন্ত্য 'ল'টি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই প্রকারে সংস্কৃত 'গল্ল' শব্দ বর্ত্তমান প্রাকৃতে 'গাল্' হইয়াছে। ইহা কোন পৈশাচিক বা অনার্য্যভাষার প্রভাবে হয় নাই।

মোচ্ (moustache):—"মোচ" বা "মোছ" একটি প্রাকৃত শব্দ, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই। প্রাচীন প্রাকৃতে ইহার নাম 'মস্সু' ছিল। ইহার ইংরেজী রূপ 'মৌচ্টাচ্', ফরাসী রূপ 'মুচ্তাশ্', ইটালীক 'মোচতিসিও', জার্মেন 'মচ্টিক্স', বাঙ্গলা 'মোচ' বা 'মোছ'। এই-প্রকারে কথিত ভাষার অনেক শব্দ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান পায় নাই। বলা বাহুল্য যে ভাষার অনেক শব্দ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সকল ভাষাতেই এইরূপ। সেই কারণেই আমাদের দেশে প্রাকৃত ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে নাই।

'মাড়ী' একটি প্রাকৃত শব্দ। সম্ভবতঃ সংস্কৃত মর্দ্দ শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। যদ্দ্বারা আহার্য্য বস্তুকে মুখমধ্যে মর্দ্দন করা যায় তাহার নাম 'মাড়ী' বা 'মাঢ়ী'।

চাবান (to chew)। 'চাবান', 'চিবান', 'চিবন', (to chew), ইহার সংস্কৃত রূপ 'চর্ব্বণ'। 'চর্ব্ব' অনট চর্ব্বণ। ইংরেজী chew 'চিও' আর বাঙ্গলা 'চিব' একই শব্দ; কারণ ব > ও। ইহা দ্বারা জানা যায় যে যখন ইংরেজ ও বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণ একত্র বাস করিতেন সেই সময় হইতে এই শব্দটি চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাতে বোধ হয় 'চিব' শব্দই মূল প্রাকৃত এবং তাহা হইতেই সংস্কৃত 'চর্ব্ব' হইয়াছে। পরে 'চর্ব্বণ' হইতে 'চাবান' হইয়াছে। 'চিবান' এবং 'চাবান' ইহাদের প্রথমটি ঐ শব্দ সংস্কৃত হওয়ার পূর্ব্বকার এবং দ্বিতীয়টি ঐ শব্দ সংস্কৃত হওয়ার পরের আকার। একটি মূল প্রাকৃত, অপরটি সংস্কৃতের ভগ্নোচ্চারণ; একটি সংস্কৃতের জননী, অপরটি তাহার সন্তান। যে-সকল শব্দকে আমরা সংস্কৃতের ভগ্ন-উচ্চারণ বলিয়া ধরি, তাহাদের মধ্যে এই-প্রকার অনেক শব্দ মূল প্রাকৃত আছে, কিন্তু তাহাদের সংস্কৃত হওয়ার পূর্ব্বাবস্থা জানিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃতজ বলিয়া ধরিতে বাধ্য হই।

চাটন, চাট্নি, চাট্ (lick)। কোন বস্তু জিহ্বা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া খাইতে মুখমধ্যে 'চকচক্' বা 'চট্চট' শব্দ হয় (যে যেমন মনে করে)। সেই 'চট্' হইতে 'চাট্' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহার সহিত অনট্ প্রত্যয় যোগে 'চাটন্' হয়।

ভাষা সৃষ্টির নিয়ম। শব্দ-সকল অষ্টবিধ প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন হয়, যথা শব্দানুকরণ, ভাবোচ্ছ্বাস, উপমা, ভাবানুক্রম, অনুরূপোক্তি, বক্রোক্তি, ইত্যাদি। পৃথিবীর এক এক-প্রকার বস্তু আমাদের এক এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। ভাষা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। কিন্তু যে বস্তু শ্রবণেন্দ্রিয়েরগ্রাহ্য নয় তাহাকে শ্রবণগ্রাহ্য করার উপায় কি? "ভাষাতত্ত্বে" আমরা তাহারই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইয়াছি যে উক্ত শব্দানুকরণ প্রভৃতি অষ্টবিধ প্রকারে তাহা হইতে পারে। মনে করুন 'কাক' একটি পাখী, তাহাকে আমরা দেখিতে পাই, সে দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু, তাহাকে শ্রবণ-গ্রাহ্য করার উপায় কি? শ্রবণ-গ্রাহ্য করিতে না পারিলে তাহাকে ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কাজেই তাহার বর্ণ বা আকৃতি দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া তাহার 'কাকা' শব্দ দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করি, সেই 'কাকা' শব্দ হইতে তাহার নাম 'কাক'। ইহাকে শব্দানু-করণ বলা যায়। ইংরেজীতে ইহাকে Onomatopœia বলে, এবং ইহাই ভাষা-সৃষ্টির মূল বলিয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন।

আবার মনে করুন—'কালবর্ণ' চক্ষের গ্রাহ্য, তাহাকে কর্ণের গ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ করার উপায় কি? কাকের যেন শব্দ আছে, বর্ণের ত শব্দ নাই। তবে চক্ষের গ্রাহ্য এই কালবর্ণকে শ্রবণ-গ্রাহ্য করার উপায় কি? উপায় এই যে মানুষের একটি স্বভাব আছে কোন বস্তু তাহার দৃষ্টি-পথে আসিলে সেই-প্রকার পূর্ব্বদৃষ্ট অন্য কোন বস্তু স্মরণ হয়, ইহার নাম 'উপমা'। এখানে কাল বর্ণ দেখিয়া কাল 'কাক'কে মনে পড়িল। তাহা হইতে তাহার কা কা শব্দও মনে পড়িল। ইহাকে ভাবানুক্রম (association of idea) বলে। এই-প্রকার ভাবানুক্রমে 'কা' শব্দটি পাইয়া তাহার সহিত স্বরূপার্থে 'ল' যোগ করিয়া কা+ল ='কাল' শব্দ দ্বারা কাল রংটি প্রকাশ করা যায়। 'কাল' শব্দের অর্থ কা রব করে যে পাখী, তার মত। 'ল' অর্থ স্বরূপ বা মত; যেমন 'শ্যামল' অর্থ শ্যামের মত; 'মাতাল' অর্থ মত্ত বা ক্ষিপ্তের মত; তেমনি 'কাল' অর্থ 'কা' পাখীর মত। উক্ত প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মে যে-সকল শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে প্রাকৃত শব্দ বলে। সাহিত্য সেই-শব্দগুলিকে একটু সুন্দর করিয়া লয়, এইজন্য সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের নাম সংস্কৃত।

উক্ত প্রকারে 'ভাষাতত্ত্বে' লিখিত ভাষা-সৃষ্টির নিয়মানুসারেই ভাষার সকল শব্দই উৎপন্ন হয়। আমরা যে পিতা-মাতার নিকট ভাষা শিক্ষা করি তাহাও অষ্টবিধ নিয়মের অন্তর্গত। উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে শব্দানুকরণই ভাষা-সৃষ্টির প্রধান মূল। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে আমরা ভাষা কাহারও নিকট শিক্ষা করি না—প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজ ভাষা নিজে উক্ত নিয়মানুসারে গড়িয়া লয়। কোন বস্তু যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোন শব্দ আমাদের শ্রবণগোচর হয়,—একবার নয়, বারম্বার যদি এইরূপ হয়,—তবে ঐ বস্তুর সহিত ঐ শব্দের একটা সম্বন্ধ দেখিতে পাই, এবং সেইজন্য শব্দ দ্বারা আমরা সেই বস্তু প্রকাশ করি।

লেহন (Lick)। বোধ করি ইংরেজী 'লীক' (Lick) এবং সংস্কৃত 'লিহ্' এক মূল হইতে উৎপন্ন।

কামড়ান (দংশন বা দন্তাঘাত)। ইহা আনুকরণিক শব্দ। কোন কোন বস্তু কামড়াইতে কড়মড় শব্দ হয়, তাহা হইতে কর্মড়ায়ন=কামড়ান। 'বাংলা শব্দকোষ' ইহাকে সংস্কৃত 'কবল' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন; কিন্তু 'কবল' শব্দের অর্থ দংশন নহে। মুখের মধ্যে জল রাখিয়া তাহাকে বিলোড়ন করিলে 'কলবল' শব্দ হয়, তাহা হইতে 'কবল' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; তাহার অর্থ মুখের মধ্যে জল রাখিয়া বিলোড়ন করা।

খাওয়া।—সংস্কৃত 'খাদন' শব্দ 'দ' লোপে 'খাঅন' হয়। অন্য স্বরের পর 'অ' আসিলে তাহার উচ্চারণ ওকারের ন্যায় মৃদু হয়। এই কারণে 'খাঅন' শব্দকে আমরা 'খাওন' উচ্চারণ করি। এইটি প্রাকৃত নিয়ম।

চাখন, চাকন (স্বাদ পরীক্ষা করা)।—ইহা একটি আনুকরণিক শব্দ। কোন বস্তুর স্বাদ পরীক্ষা করার সময় জিহ্বা 'চক্‌চক্' শব্দ করে, তাহা হইতে প্রাকৃত 'চাখন্ বা চাকন্'।

ফু (puff)।—ইহার সংস্কৃত ফুৎকার। ইহা আনু-করণিক শব্দ। ফু দিতে যে ধ্বনি হয় তাহা হইতে 'ফু'

শব্দ হইয়াছে এবং তাহাকেই সংস্কৃতে ফুৎবার বলে। ইংরেজী puff শব্দটিও ঐ-প্রকার আনুকরণিক।

ভেটকি, ভেচ্‌কি (মন্দভাবে মুখভঙ্গী করা)।—ইহার সংস্কৃত 'ভ্রূকুটী'। ভ্রূকুটী শব্দ বর্ণবিপর্য্যয়ে ভেটুকী বা ভেট্‌কি হয়। আবার 'ট' স্থানে 'চ' উচ্চারণ করিয়া ইহাকে ভেচ্‌কিও বলা হয়, যেমন মট্‌কন্—মচ্‌কন্। আঙ্গুল মচ্‌কাইলে আহাতে মট শব্দ হয়, তাহা হইতে সংস্কৃত 'মোটন' বাংলা মট্‌কান বা মচ্‌কান।

হাঁ (মুখ ব্যাদান করা)।—মুখ মুদ্রিত করিয়া ওঁ শব্দ করিতে করিতে মুখ ব্যাদান করিলে প্রথম অ শব্দ বাহির হয়। মুখ অধিক ব্যাদান করিলে আ শব্দ হয়। কিঞ্চিৎ শক্তির সহিত ঐ শব্দ বাহির হইলে 'হা' উচ্চারণ হয়। সেই 'হা' শব্দ হইতে মুখ ব্যাদান করাকে 'হাঁ করা' বলে। ইহা অনার্য্যভাষার শব্দ নহে।

ডাক (ধ্বনি, আহ্বান)।—সংস্কৃতে 'ড' অর্থ শব্দ, ধ্বনি। শব্দের বল বৃদ্ধি করার জন্য প্রাকৃতে উহার সহিত স্বার্থে 'ক' যোগ করিয়া 'ডক' বা 'ডাক' বলে, যথা পাখীর ডাক ইত্যাদি, তাহার অর্থ পাখীর ধ্বনি। আবার জীবমাত্রেই একে অন্যকে আহ্বান করিতে হইলে একটা শব্দ বা ধ্বনি করে, মানুষেও তাহাই করে, তাহা হইতে 'ডাক' শব্দের আর-এক অর্থ আহ্বান করা।

হাইম্, হাম্মিম, হাই।—ইহারা আনুকরণিক শব্দ। যখন হাই উঠে তখন লোকে প্রথম মুখ ব্যাদান করিয়া 'হা' শব্দ করে; তাহার পর 'ইম্' শব্দের সহিত মুখ মুদ্রিত করে। সেই 'হা+ইম্'=হাইম্=হাই। এই শব্দটি সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে। এবং তাহার সংস্কৃত রূপ হর্ম্ম ও হর্ম্মন হইয়াছে। তাহার অর্থ 'জৃম্ভন'।

ভেঙ্গান।—কোন ব্যক্তি একটি কথা বলিলে অন্যে যদি মন্দভাবে মুখভঙ্গী করিয়া সেই কথার পুনরুক্তি করে, তবে তাহাকে ভেঙ্গান বলে; ভঙ্গী হইতে ভেঙ্গান শব্দ হইয়াছে।

কুলকুলা।—মুখে জল রাখিয়া, তাহাকে মুখের মধ্যে চালনা করিলে 'কুলকুল' শব্দ হয়। আর গলার মধ্যে জল লইয়া তাহাকে চালনা করিলে 'গলগল' বা 'গরগল' শব্দ হয়। এই-সকল শব্দ হইতে ভারতীয় আর্য্যভাষায় 'কুলকুলা' এবং ইংরেজী ভাষায় 'গরগল' (gargle) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

সারা।—ইহা সংস্কৃত 'স্বর' শব্দজ। "বাঙ্গালা শব্দকোষ" এই শব্দকে 'সাড়া' লিখিয়াছেন এবং সংজ্ঞা শব্দ হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উথাল (বমি)।—উৎ+ক্ষর (নিঃসরণ)। ইহার অর্থ উপর দিয়া নির্গত হওয়া। 'ক্ষর' ধাতুর প্রাকৃতোচ্চারণ 'ক্ষল', কারণ "রলয়োরভেদঃ"। উৎ+ক্ষল=উৎক্ষাল > উথাল।

চেচান (উচ্চরব)।—বানরের উচ্চরব 'চী চী' শব্দ। 'চী চী' হইতে 'চেচান' হইয়াছে। 'চী চী' শব্দের ক্রিয়াবাচক রূপ চিচ্যায়ন > 'চেচান'। আবার 'চ'এর উচ্চারণ কখন কখন 'ক' হয়, যেমন 'নৃত্য > 'নাচ', 'সত্য' > সাচা, 'কলিককচ্ছ' (বকবিল) > কলিককত্তা > কলিকাতা। (কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি এই প্রথম জানা গেল। পূর্ব্বকালে কলিকাতা মৎস্যজীবীগণের বাস ছিল।) সেই-প্রকার কবিগানের সর্ব্বোচ্চ স্বরের নাম 'চিতান'। উক্ত 'চি শব্দ করা' বা 'চিস্বা' হইতে সংস্কৃত 'চীৎকার' হইয়াছে; যেমন 'ফু—করা'=ফুৎকার, 'থু—করা' =থুৎকার।

ভেবান।—ছাগলের ন্যায় অর্থহীন শব্দ করা। ছাগলে 'ভে ভে' করিয়া ডাকে, তাহা হইতে 'ভেবায়ন' > ভেবান।

তোতলা, থোতলা, থোতা।—কথা বলিতে 'থোৎ থোৎ' বা 'তো তো' করে যে তাহার নাম 'তোত্‌লা'।

বোবা।—কথা বলিতে পারে না, 'বো বো' করে, তাহার নাম 'বোবা'। রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া কথা বাহির করিতে না পারিয়া 'বো বো বো বো' করে, তাহাকে 'বোবায় ধরা' বলে।

আম্‌তা আম্‌তা, আবোল তাবোল।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দিতে পারে না, কেবল 'আ-আ' বা 'আম্-আম্' বা 'তা-তা' শব্দ করে; অর্থাৎ কিছু বলিতে চাহে, কিন্তু কি বলিবে তাহা ঠিক করিতে পারে না, তাহাকে 'আম্‌তা-আম্‌তা' করা বলে।

এই প্রকার ভাষা-সৃষ্টির মূলতত্ত্ব অনুসারে বঙ্গীয়-প্রাকৃতের মধ্যে অসংস্কৃত নিত্যব্যবহৃত শব্দসকলের

ব্যুৎপত্তিসাধন করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে একটিও অনার্য্য শব্দ নহে। আমরা 'ভাষাতত্ত্ব' দুই খণ্ডে সম্পর্ক-বোধক শব্দ, সর্ব্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, বিভক্তি-প্রত্যয়-যৌগিক শব্দ, ইত্যাদির ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছি। এই প্রবন্ধে কেবল মুখ সম্বন্ধীয় শব্দের ব্যুৎপত্তির আলোচনা করা গেল। এই-সকলের মধ্যে একটিও অনার্য্য শব্দ দেখিতে পাইলাম না। মুখের সহিত সম্বন্ধ রাখে এমন অসংস্কৃত শব্দ আর আমরা স্মরণ করিতে পারিলাম না। যদি কেহ পারেন তবে এই প্রণালীতে আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে তাহারাও অনার্য্য শব্দ নহে; কারণ এ পর্য্যন্ত "ভাষাতত্ত্বে" সহস্র শব্দের আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে একটিও অনার্য্য শব্দ নাই। নব্যমতাবলম্বীগণ এই-সকল দেখিতে না যাইয়া নব্যমত-গুলিকে সযত্নে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন।

উপসংহারে নিবেদন সাহিত্যসেবীগণ ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তৎপর হউন। ভাষাতত্ত্ব ব্যতীত সাহিত্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব, কারণ ভাষার মূল না জানিয়া তাহার উন্নতি করিতে যাওয়া রোগ না চিনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করার ন্যায়।*

শ্রী শ্রীনাথ সেন

---

* দক্ষিণ-বিক্রমপুর সাহিত্যসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত সার।

গাছের কাণ্ড

গাছের কাণ্ডকে চলিত ভাষায় কুঁড়ি বা গুঁড়ি বলে। কাণ্ড সাধারণতঃ মাটির উপরে থাকে এবং কাণ্ড হইতেই শাখা-প্রশাখা জন্মে। যে-কোন গাছের কাণ্ড পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাই যে তাহাতে কতকগুলি গাঁট আছে এবং এই গাঁট ভিন্ন অন্য কোন অংশ হইতে পাতা বা শাখা-প্রশাখা বাহির হয় নাই। দুইটি পর পর গাঁটের মাঝের জায়গাটিকে পাব বলে। বাঁশ বা আখ গাছে পাব খুব স্পষ্ট। কাণ্ড হইতে শাখা প্রথমে মুকুল-রূপে বাহির হয়। মুকুলকে চলিত কথায় কুঁড়ি বলে। মুকুল দুই রকমের। যে মুকুল পুষ্ট হইয়া ফুলে পরিণত হয় তাহাকে পুষ্প-মুকুল, এবং যে মুকুল পুষ্ট হইয়া শাখায় পরিণত হয় তাহাকে পত্র-মুকুল বলা হয়।

কোন কোন গাছের কাণ্ড মাটির ভিতরে থাকে। ওই-সব কাণ্ডকে আন্তর্ভৌম কাণ্ড বলে। মাটির মধ্যে থাকে বলিয়া আমরা উহাদের শিকড় বলিয়া ভুল করি, কিন্তু বাস্তবিক উহারা যে শিকড় নয়, কাণ্ড, তাহা একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। আদা, হলুদ, গোল-আলু, পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি এইরূপ আন্তর্ভৌম কাণ্ড। আদা দেখিলে দেখিতে পাই যে উহাতে কতকগুলি গাঁট আছে এবং গাঁটে গাঁটে একরকম ছোট ছোট পাতাও আছে। মাটির ভিতরে থাকে বলিয়া ওগুলি মাটির উপরের পাতার মত না হইয়া বিকৃত হইয়া যায়। আদা ও হলুদের মত আন্তর্ভৌম কাণ্ডকে ইংরেজিতে rhizome (রাইজোম) বলা হয়, বাংলায় আমরা অধোবিহারী কন্দ বলিতে পারি।

গোল-আলুর গায়ে যে ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে, সে-গুলিকে আমরা আলুর চোখ বলি। ওগুলি হইতে মুকুল বাহির হয়। আলুর গায়ে এক প্রকার আঁশের মত বিকৃত পাতাও দেখা যায়। সুতরাং আলু যে শিকড় নয় কিন্তু মাটির ভিতরের কাণ্ড, ইহাও বেশ বুঝা যায়। তবে শাঁক-আলু, রাঙা-আলু প্রভৃতি কিন্তু বাস্তবিকই শিকড়, উহাদের গায়ে গাঁট, মুকুল বা পাতা কিছুই নাই। গোল-আলুর মত আন্তর্ভৌম কাণ্ডকে ইংরেজিতে tuber (টিউবর) বলা হয়।

শ্রী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব

সৃষ্টিবন্দনা*

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত। ভাববৃত্ত দেবতা। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি।]

না ছিল সত্তা নাহি অ-সত্তা,
না ছিল পবন, আকাশতল,
কিবা ছিল ঢাকা? কোথা? কে ধর্ত্তা?
গহন গভীর ছিল কি জল?

না ছিল মৃত্যু, অ-মৃত নেই,
না ছিল রাত্রি অথবা দিন,
বায়ুহীন শ্বাস টানি' এক সেই
ছিল জাগ্রত সকল-হীন।

ছিল শুধু গূঢ় তমসা গহন,
সীমাহীন জল নাহিক তীর,
সম্ভব ছিল শূন্যে গোপন,
নিজ তপে জাগে 'এক' সে বীর।

প্রথমে জাগিল কামনা তাঁহায়—
সে কাম মনের নবাঙ্কুর;
জাগিল কবির মনীষা-বিভায়
অস্তি-নাস্তি-মিলন-সুর।

উজলে আঁধার প্রজ্ঞা-গরিমা—
নিম্নে? ঊর্দ্ধে? 'এক' সে কই?
সৃষ্টি পুরুষ বিকাশে মহিমা
ঊর্দ্ধে, প্রকৃতি নিম্নে ওই।

কে জানে সে কথা, আদিম বারতা?
কিরূপে জন্ম-সৃষ্টি সব?
বিশ্ব প্রথমে পরে ত দেবতা,
কে তবে জানিবে সে উদ্ভব?

কে জানে সৃষ্টি জাগিল কিরূপ?—
তিনি কি স্রষ্টা? অথবা নয়?
শূন্যে বিরাট আছিল যে ভূপ
সেই শুধু জানে, অথবা নয়।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

* শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত শীঘ্র প্রকাশ্য "বেদবাণী" নামক পুস্তকের উপকরণ।

ফুলের মধু

ফুলে যে মধু থাকে তাহা সকলেই জানে। কিন্তু আমরা যে মধু পান করি তাহা মৌ-চাক হইতে পাওয়া যায়; এই মধু মৌমাছি ফুল হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজ দেহের রস মিশাইয়া তৈয়ারি করিয়া থাকে। অবশ্য মৌমাছি আমাদের জন্য মধু সৃজন করে না; তাহার নিজের চাকের রাণী যে-সব ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্বস্থ শিশুমাছিদের খাদ্যের জন্য সে মধু তৈয়ারি করিয়া রাখে। মানুষ মাছিদের বঞ্চিত করিয়া মধু আহরণ করিয়া থাকে।

সকল ফুলে মধু জন্মে না, কিন্তু অধিকাংশ ফুলেই মধু পাওয়া যায়। যে ফুলের পাপড়িগুলি অসমান, তাহাতে মধু থাকিবেই, অর্থাৎ মধুযুক্ত ফুলগুলিতে মৌমাছি ও পতঙ্গের বসিবার সুবিধার জন্য তাহাদের পাপড়িগুলি বিভিন্ন গঠনের হয়। আকন্দ জাতির ফুলে মধু থাকিবার একটি লম্বা নল হয়, তুলসী জাতীয় ফুলগুলি মানুষের মুখের মত হয়, নীচের পাপড়ি নীচের ঠোঁটের মত দেখিতে, তাহাতে মৌমাছি বেশ বসিতে পারে। ইহাদের নাম তাই Labiator ঠোঁট-যুক্ত। শুটি জাতীয় ফুলে, যেমন মটর সীম ইত্যাদির, নীচের পাপড়ি নৌকার খোলের মত হয়, তাহাতে মৌমাছি উড়িয়া আসিয়া অনায়াসে বসিতে পারে। এই-সকল জাতীয় ফুলে মধু জন্মে।

মধু গাছের খাদ্য নহে—আমাদের যেমন মল, মূত্র, ঘর্ম্ম শরীরের পরিত্যাজ্য অংশ, সেইরূপ ফুলের বা গাছের বর্ণ, গন্ধ ও মধু ত্যাগ করিবার অংশ। শরীর ধারণ করিতে হইলে শরীরের কিছু কিছু অংশ ক্ষয় পায়, ও তাহা ত্যাগ

করিতে হয়, আমাদের স্বেদ বা ঘর্ম্ম এইরূপ অংশ। ফুলের মধু তাহাই। পরিমল বা গন্ধও ফুলের মলবিশেষ।

ফুলের গন্ধে কীট পতঙ্গ বুঝিতে পারে ফুল ফুটিয়াছে, পরে বর্ণে খুঁজিয়া পায় ও মধুর লোভে ফুলের ভিতর প্রবেশ করে। ফুলে প্রবেশ করিলে ফুলের পরাগ তাহাদের গায়ে লাগিয়া যায় ও পরে অন্য ফুলে বসিলে সেই পরাগ গর্ভ-কেশরে লাগে, এইরূপে বীজের উৎপত্তি হয়। অনেক ফুলের গঠন এরূপ যে কীট পতঙ্গ ভিন্ন তাহাদের পরাগ গর্ভ-কেশরে যাইতে পারে না, তাহাদের বংশ রক্ষা করিতে কীট-পতঙ্গের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ফুলের বর্ণ, গন্ধ, ও মধু বিশেষভাবে থাকে। যে ফুলের পরাগ আপনি গর্ভ-কেশরে পড়িতে পারে, তাহারা প্রায় বর্ণ- গন্ধ- ও মধুহীন পুষ্প। অন্ততঃ এ তিনের একটি গুণ থাকিলেই কীট পতঙ্গ আসিয়া জুটে।

দেখা গিয়াছে যে কোন নির্গন্ধ পুষ্পে যদি কোনও সুগন্ধ দ্রব্য কিম্বা মধু মাখাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অনেক অধিক কীট-পতঙ্গের সমাগম হয়।

মধুর জন্য যে কেবল কীট পতঙ্গই আসে তাহা নহে, অনেক পাখীও মধু খাইয়া থাকে। কোন কোন পাখীর দ্বারাও ফুলের রেণু বাহিত হয়। কিন্তু অনেক পাখী লম্বা ঠোঁট দিয়া ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিদ্র করিয়া মধু খাইয়া যায়, পরাগ বা গর্ভ-কেশর ছোঁয় না। টুন্‌টুনি পাখীকে কলমী-ফুলের মধু এই ভাবে খাইতে দেখিয়াছি। ইহাকে মধু আহরণ না বলিয়া মধু অপহরণ বলা যায়।

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

কোন্ সে দেবতা ?*

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত। কোন্ দেবতা। হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্য ঋষি।]

ছিলেন স্বর্ণ-গর্ভ সে জন সৃষ্টি-মূলে
সকল সৃষ্টভূতের অধিপ বিশ্বকূলে,
দ্যুলোক ভূলোক আপনার স্থানে স্থাপিল সবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

আত্মা যে দেয়, শক্তি যে দেয়—বিশ্বধ্যেয়,
সকল দেবতা যে করে শাসন সবার শ্রেয়,
অমৃত মৃত্যু যাঁহার দুইটি ছায়াচ্ছবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

কম্প্র সজীব জঙ্গমাদির যেজন পতি,
স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয় যে মহান্ অতি,
যেজন পালেন দ্বিপদ চতুষ্পদ ও গবী,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

যাঁর মহিমায় জন্ম লয়েছে হিমানী-গিরি,
রসধারা যাঁর নদী ও সাগরে রয়েছে ঘিরি',
হস্ত যাঁহার দিক্ ও বিদিক্ প্রদেশ সবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

দ্যুলোকে ঊর্দ্ধে তুলিল, ধরায় করিল স্থির,
স্বর্গ আকাশ যেজন করিল স্তব্ধ ধীর,
অন্তরীক্ষে দীপ্তিবিমান সম যে কবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

ক্রন্দসী যার শরণ পাইয়া অবাক্ মানে,
দ্যুলোক ভূলোক মনে মনে যার মহিমা জানে,
যাঁর আশ্রয়ে দীপ্তি লভিয়া উদিছে রবি,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

বিপুল বিশাল সলিল আছিল বিশ্ব ভরি'
সে জল আগুনে জন্ম দানিল গর্ভে ধরি',
তা' হতে জাগিল দেব-প্রাণ যেই জন্ম লভি',
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

যজ্ঞ-অগ্নি-জন্মদাত্রী ছিল যে অপ্
মহিমাপূর্ণ নয়নে হেরিল সৃষ্টি সব ;
সকল দেবতা অধিদেব মানে যাঁহারে জপি',
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

পৃথিবীর পিতা, স্বর্গের যিনি জন্মদাতা,
সত্যধর্ম্মা, হিংসা জানে না পুণ্য পাতা,
রচিল বৃহৎ সলিল, চন্দ্র হর্ষদ্রবী,
কোন্ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি' হবি ?

ওহে প্রজাপতি, বিশ্বের জাত বস্তু যত
তুমি ছাড়া কে বা ধরিবে করিবে নিয়মগত ?
যে কামনা মোরা নিবেদি' তোমায় এ হবি দিয়া
পূর্ণ কর তা', ধনপতি কর পূরায়ে হিয়া।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

* শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত শীঘ্রপ্রকাশ্য "বেদবাণী" নামক পুস্তকের উপকরণ।

বাণিজ্য-শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী আমাদের জাতির উন্নতির পক্ষে অনুকূল নয়। আমাদের নেতা ও মনীষীগণ এই শিক্ষাকে সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক জীবনের পক্ষে অসুবিধাকর বলে' থাকেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন—আধুনিক শিক্ষা কেবলমাত্র দাসসুলভ প্রবৃত্তি গঠন করে। স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌তেন যে এই শিক্ষায় যুবকগণ কেবলমাত্র পাশ কর্‌তেই পারগ হয়। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ আগাগোড়াই এর নিন্দাবাদ করেছেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ এর বিশেষ সুখ্যাতি করেন নি। এমন কি ফরাসী দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি মনে করেন এই শিক্ষায় আমাদের যুবকগণ মহৎ ও সৎ হ'তে পারে না। আমরাও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখ্‌তে পাই এই শিক্ষার দ্বারা আমাদের যুবকগণ বড় সৈনিক, বড় বণিক্, বড় ব্যবসায়ী হ'তে পারে না, এমন কি কোন উন্নতির আদর্শেও অনুপ্রাণিত হতে পারে না।

এই শিক্ষা-প্রণালী বিদেশীয় সংস্কার ও প্রবৃত্তিমূলক, ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী নহে। এর দ্বারা এমন কতকগুলি লোক সৃষ্ট হচ্ছে যারা ভাব-ভঙ্গিমা পোষাক-পরিচ্ছদে না ভারতী না বিদেশীয়! এর দ্বারা আমাদের ব্যবসায়ের উন্নতি হয় নি, শরীরেরও উৎকর্ষ সাধিত হয় নি, বরং এর দ্বারা লোকে আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মোটের উপর এই শিক্ষা আদৌ কল্যাণকর নয়।

বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষকগণের ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়েছে, তাঁরা অধিকতর প্রয়োজনীয় ও সারবান্ শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা করা সঙ্গত বলে' বুঝেছেন।

হাজার হাজার যুবক, হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট আইন ও ডাক্তারী ব্যবসায়ে মনোযোগ দেন। অবশ্য তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। তাঁদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই দুই ব্যবসায়ের মত আরও অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবসায় আছে। জাতীয় উন্নতিমূলক বিবিধ ব্যবসায়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যুবকগণের কৃষি-বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখায় মনোযোগ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিজাতীয়গণের হস্তে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত যে-সমস্ত গুপ্তমন্ত্র আছে সে সব শিক্ষা কর্‌বার সময় এসেছে। ভারতীয় যুবকগণ সে বিষয়ে মনোযোগী হোন্। ভারত যখন প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ তখন এই দেশেই জগতের বাণিজ্য-কেন্দ্র হওয়া উচিত। ভারতই প্রাচীনকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রধান ছিল। এর পল্লীজাত বাণিজ্য-দ্রব্যসকল তখন ইউরোপ ও আফ্রিকার বাজারে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সাহসী ভারতীয় নাবিকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করে' তখন ভারতের বিভিন্ন বন্দরে সমুদ্র-পথে যাতায়াত কর্‌ত। হায়, সেই উজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত দিন গিয়েছে! অতীত নিয়ে দুঃখ কর্‌বার সময় নেই, আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান পড়ে' রয়েছে।

লেখক প্রায় বিশবৎসর যাবৎ ভারতীয় ব্যবসায়ের সহিত বিশিষ্টভাবে সংযুক্ত। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। ভারতীয় বণিক্‌গণ এখনও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ব্যবসা করেন। তাঁরা নিজ বাসগৃহেরই এক অংশ অফিস বলে' ব্যবহার করেন। এই স্থানে বণিক্ একটি কাঠের বাক্স সাম্‌নে নিয়ে বসেন তাঁকে মধ্যে রেখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে তাঁর আম্‌লারা এক এক ছোট কাঠের বাক্সর উপর বড় বড় জাব্‌দা খাতা নিয়ে কাজ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তার জন্য আগন্তুক ও দালালগণের জন্য বণিকের সম্মুখভাগ শূন্য থাকে। সকাল ৭টা হ'তে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত এই অফিস খোলা থাকে। অবশ্য আম্‌লা বেচারীরা দ্বিপ্রহরে একবার খাবার জন্য ২।৩ ঘণ্টার ছুটি পায়। বণিক্ মশায় দালালদের সঙ্গে আলোচনা করেন, পান খান আর পিচ্ ফেলে ঘরের দেয়াল রঞ্জিত করেন। কাজ তেমন না থাকলে একটু নিদ্রাও দিয়ে থাকেন। গরম কালে অধিকাংশ স্থলেই বৈদ্যুতিক পাখা নেন। এতে আম্‌লাদেরই বিশেষ কষ্ট, সারা গরম কাল অর্দ্ধ-উলঙ্গ দেহে বসে' বসে' ঘামছে আর কাজ কর্‌ছে, অসহ্য হ'লে এক-একবার হাতপাখা চালাচ্ছে। বিদেশী বণিক্ বা তাঁদের প্রতিনিধিগণের জন্য দুএকখানা ভাঙ্গা

চেয়ার আছে। খুব সাদাসিদে ভাবেই এরা লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করে। আমাদের মাহিনা অতি কম, কর্ম্মের সময় ও পরিমাণ খুব বেশী, কোন কাজে নিয়ম বা শৃঙ্খলা নেই, কাজের ধরণ-ধারণও অতিশয় জঘন্য। পরিশ্রমের ঠেলায় কাজের উপর কর্ম্মচারীদের আস্থা নেই, বরং বিরক্ত এইজন্য কর্ম্মব্যপদেশে অন্যত্র পাঠালে তারা বাহিরে অত্যধিক বিলম্ব করে' আসে।

দেশীয় ব্যবসায়ী কেবল দেশকেই চেনেন, বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে জানেন না। চিনি, চাল, গম, কড়াই, নারিকেল প্রভৃতি নানা স্থান হ'তে কিনে এনে গুদামজাত করেন আর সুবিধা পেলেই পাইকারী বা খুচরা হিসাবে বিক্রী করেন। পাট কয়লা প্রভৃতির ব্যবসায়ও করে' থাকেন। অধিকাংশ স্থলেই এইরকম বণিকগণ ভারতের ধনী বণিকগণের সাহায্যে কারবার চালিয়ে থাকেন। হুণ্ডী ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা তাদের কার্য্য সমাধা হয়। খুব কম সংখ্যক বণিকেরই টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকে। টাকার আদান-প্রদান খুবই কম। অনেক ব্যবসায়ীকে ইউরোপীয় রপ্তানী কারবারের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়। এই রকম সংযোগ রাখার জন্য ইংরেজী-জানা কেরানী একজন বা ৫।৭ জন ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করে আর প্রত্যেকের কাছে হ'তে মাসিক ১০।১৫ টাকা করে পায়। আমাদের দেশীয় বণিকগণ অনেক বিষয়ে মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়ী, কিন্তু তাঁরা বিদেশী কারবারের 'ধারা' policy বোঝেন না। আমদানী রপ্তানী, ফিস্‌ক্যাল পলিসি বা অর্থতত্ত্ব, ফরেন্ কারেন্সী বা বিদেশী মুদ্রাতত্ত্ব, ফরেন্ ব্যাঙ্কিং বা বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার প্রভৃতি কিছুই জানেন না। এরা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানের ধার ধারে না। এমন কি স্ব স্ব মাতৃভাষার সংবাদপত্রও পড়েন না। অনেকে কেবল কখনো কখনো ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন।

উচ্চ শিক্ষার কদর তাঁদের কাছে কিছুই নেই। তাঁরা পুত্রগণকে নিজেদের ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা দেন। তাঁরা বলেন "উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন কি? ৬০।৭০ টাকায় বি-এ, এম-এ পাশ চাকর পাওয়া যায়। আমাদের ছেলেরা থার্ড, সেকেণ্ড, ক্লাস অবধি পড়লেই যথেষ্ট—কেবল টেলিগ্রাম পড়বার বিদ্যা থাকলেই হ'ল। তার পর লাখ লাখ টাকা রোজগার করবে।" যখন তাঁরা গ্রাজুয়েট বা আণ্ডার-গ্রাজুয়েটকে ভবিষ্যৎ-আশা শূন্য উদ্যমবিহীন অবস্থায় চাকরীর উমেদারী করতে দেখেন তখন তাদের উপর দয়া করেন, আর তাদের শিক্ষাকে ধিক্কার দেন। তাদের জীর্ণ-শীর্ণ মলিন বদন দেখে' ব্যবসায়ীরা সত্যসত্যই সহানুভূতি দেখান।

যাক সে কথা। কিন্তু এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সঙ্গে এমন বিবাদ থাকলে চলবে না। এখনকার দিনে এই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন খুব কমই দেখা যায়। ব্যবসায়ীদের বিদ্যা নাই, আর শিক্ষিতদের টাকা নাই। এখন এমন উপায় উদ্ভাবন করা দরকার যাতে এক লোকই দুই দেবীরই উপাসক হয়ে উভয়েরই কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। তা হ'তে হ'লে আজকালকার পুঁথিগত-বিদ্যাকে মোড় ফিরিয়ে এমন পথে প্রবাহিত করা চাই যে পথে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে টাকারও সন্ধান পাওয়া যায়।

স্থানীয় বা বিদেশস্থ ব্যবসায়ের অনেক অংশই ইউরোপীয়ানদের হাতে। জাহাজ-নির্ম্মাতা তারা, এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বা বিনিময় ব্যাঙ্ক, এমন কি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া তাদেরই কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। বড় বড় উন্নতিশীল চট্‌কল তাদের একচেটে। বড় বড় চালের কল তাদের অধিকারে। বড় বড় কয়লার খনি তাদের দখলে। কোলার স্বর্ণখনি তাদের হাতে। চা-বাগান তাদের সম্পত্তি। তারা ভারতবর্ষ হ'তে চাল, গম, চামড়া, চা, নীল প্রভৃতি কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে বিদেশীয় কারখানায় পাঠিয়ে নানাপ্রকার দ্রব্যে পরিণত করে এবং তাই আবার ফিরে এদেশে আমদানী করে' প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হয়। জাহাজের দোকর ভাড়া, কমিশন, বিদেশের মজুরদের মজুরী, লাভ প্রভৃতি সমস্ত দিয়ে ঘরের জিনিষ ঘরেই ফিরে আসে অগ্নিমূল্য হয়ে। তাই এক পয়সার এক টুক্‌রা লোহা এক টাকা দামের ছুরি হয়ে আমাদের হাতে এসে পড়ে।

বড় বড় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ বিদেশ হ'তে নানা-প্রকার জিনিষ আমদানী করে' ভারতের বাজার পূর্ণ করছে। যথা; লোহা, ইস্পাত, সিল্ক, তুলা, কল, কব্জা,

প্রভৃতি শত শত দ্রব্য তাদেরই দ্বারা আমাদের দেশে আস্‌ছে। বাস্তবিক, কি আমদানী কি রপ্তানী উভয়বিধ কার্য্যেই তাদের পূর্ণ দখল।

ইউরোপীয়ানরা এক অদ্ভুত সঙ্ঘগঠনকারী জাতি। তাদের ব্যবসার কেন্দ্র সহস্র সহস্র মাইল দূরে, আর এই ভারতবর্ষে তাদের শাখা ঘড়ির মত কাজ কর্‌ছে। হাজার হাজার ভারতবাসী এই-সমস্ত ইউরোপীয়ান আফিসে মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে সুশৃঙ্খলে কাজ কর্‌ছে। সময়ে কাজ, অকারণ বিলম্বের অভাব, বিশৃঙ্খলার অভাব, কার্য্যে যথোপযুক্ত মনোযোগ, স্বল্পসময়ে কার্য্যসম্পাদন, নীরব কর্ম্ম, পরিচ্ছন্নতা, ভাল ঘর, ভাল বাতাস, কাজ কর্‌বার সুব্যবস্থা এই-সমস্ত হ'ল ইউরোপীয়ান ফার্ম্মের বিশেষত্ব। অবশ্য এই-সমস্ত ফার্ম্মে এমন লোকও আছেন যাঁরা শিক্ষায় অধিক দূর অগ্রসর হন নি, কিন্তু তা হলেও তাঁরা ব্যবসার কার্য্যে বিশেষরূপে দক্ষ। ইউরোপীয়ান ফার্ম্ম ভবিষ্যতের আশা আর মাহিনা যথাযোগ্য দেয়।

তবে ইরোপীয়ানদের যেমন পরিমাণে মাহিনা দেওয়া হয় দেশীয়দের সেরূপ দেওয়া হয় না। তাদের বড় বড় পদও দেওয়া হয় না, সামান্য কেরাণীগিরি করেই তাদের জীবন কাটাতে হয়। একজন সামান্য অনভিজ্ঞ ইউরোপীয় যে পদ বা মাহিনা পায়, একজন সুচতুর অভিজ্ঞ দেশীয় লোক সে পদ বা মাহিনা জীবনে উপার্জ্জন কর্‌তে পায় না। এইসব বিদেশীয় ফার্ম্মেই এমনি জাতিগত বৈষম্য বিদ্যমান, ভারতীয়কে ভিতরকার খবর জান্‌তে দেওয়া হয় না, কেনা ও বেচার কাজ প্রায়ই ইউরোপীয়ানরাই করে' থাকে।

অনেকদিন কাজ কর্‌বার পর একজন ভারতীয় বড় জোর বড়বাবু হ'তে পান আর বড় জোর ৩০০।৪০০ টাকা মাহিনা পেতে পারেন। তার উপর আর উন্নতি আশা কর্‌তে পারেন না। অনেক কল-কারখানা ভারতীয়ের হাতে, আর অনেক শেয়ারও ভারতীয়ের অধীনে। উদাহরণ স্বরূপ বল্‌তে পারা যায় অনেক পাট-কলে ভারতীয়ের শেয়ার শতকরা ষাটভাগেরও বেশী। কিন্তু এই ভারতীয়েরা ডিরেক্টর নিযুক্ত কর্‌তে পায় না বা এখানে ভারতীয় দালালও বিশেষ সুবিধা করতে পারে না।

অনেক রকমের অনেক কলেজই এখন ভারতে স্থাপিত হয়েছে। শত শত গ্রাজুয়েট কলেজে সৃষ্ট হচ্ছে। তারা জীবনের অনেক ব্যবসায়ে নিযুক্ত, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বড় একটা কাউকেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ভারতে অনেক জমীদার আছেন, বাঙ্‌লার জেলায় জেলায় জমীদার, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জমীদারেরা এই ব্যবসায়ের সুবিধা বোঝেন না, সুতরাং তাঁরা টাকাও খাটাতে চান না। তাঁদের বুঝিয়ে এই দিকে মতি ফেরাতে হবে, কারণ টাকা না হ'লে কিছুই হ'তে পারে না।

বর্ত্তমানে অনেক ব্যবসায়-বিদ্যালয় আছে। আমি এরূপ অনেক দেখেছি। কিন্তু সেখানে কেবল টাইপ-রাইটিং শর্টহ্যাণ্ড বাণিজ্যিক ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার শিক্ষা-পদ্ধতি দেখেছি আর ছাত্রদেরও দেখেছি, তাতে তাদের কেরানী হওয়া ছাড়া আর অধিক কিছু আশা নেই, কারণ শিক্ষা দেওয়া হয় তারই অনুকূল রকমে। তারা যাতে ভাল ব্যবসায়ী হয়ে উঠে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় না। সেখানটা কেবল কেরানীর আবহাওয়াতেই ভরপূর। এতে দেশের কি উপকার হ'তে পারে? ছাত্রেরা বাস্তবপক্ষে বিশেষ কিছুই শেখে না, তারা শেখে উপর উপর প্রশ্নের উত্তর দিতে আর পাশ কর্‌তে। কারণ পাশ করার পর কার্য্য-ক্ষেত্রে অনেকেই বুঝ্‌তে পারেন যে তাঁরা এতদিন যা শিক্ষা করেছেন তা একেবারেই কিছু না, সময়টা বৃথা গিয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা ছেলেদের বাল্যকাল হ'তেই দেওয়া উচিত। ছেলেরা যেন বাল্যকাল হ'তেই এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়। প্রকৃত ব্যবসা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। এখনকার বিদ্যালয় আমাদের বাণিজ্যের অনুকূল নয়। বালক শিক্ষা সমাধান করে' যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন সে যেন মূলনীতি বুঝ্‌তে পারে। যদি যুবক প্রথম হতেই কার্য্য ঠিকঠিক কর্‌তে পারে যদি তার দ্বারা কার্য্যের বা ব্যবসায়ের উন্নতি হয়, তা হলে মনিব অবশ্যই তাকে পছন্দ কর্‌বে।

বালকদের কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, কি উপায়ে তারা নিজেরাই ব্যবসায়ী হ'তে পারে, সে বিষয়ে কিছু বল্‌ব।

দেশে কোথায় কি কাঁচা মাল (raw material)

পাওয়া যায় তার একটা বিশদ জ্ঞান যেন তাদের থাকে; কি উপায়ে কোন্ পথে সেই-সমস্ত জিনিষ জাহাজে তুলতে পারা যায়; সেই-সব জিনিষের কোন্ কোন্ দেশে কাট্‌তি; কি করে' জাহাজ বোঝাই কর্‌তে হয়; বিল্ অফ্ লেডিং কাকে বলে; রেলওয়ে রসিদ কাকে বলে; কি করে' ফাইল কর্‌তে হয়; অনিশ্চিত-মূলধন-বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সঙ্গে কিরূপ সাবধানে থাক্‌তে হয়; কি করে' কলহের মীমাংসা হয়; ম্যানেজিং এজেন্ট্ কাকে বলে;—বালকদের এ-সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ছেলেদের মধ্যে মধ্যে মিউজিয়ম বা প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতে হয়, সেখানকার নানাবিধ জিনিষ তাদের দেখিয়ে কোন্ জিনিষ কোন্ দেশে উৎপন্ন হয়, কোথায় আমদানী বা রপ্তানী হয়; কোন্‌দেশে কোন্ জিনিষ খারাপ বা ভাল ভাবে প্রস্তুত হয়;—তা দেখান উচিত। কি কি লোহার তুলার বা সিল্কের জিনিষ এদেশে হয়, কি কি হয় না, সে-সমস্ত বিষয় আর জিনিষের মূল্যামূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিয়ে দিতে হয়। জুতা সেলাই হ'তে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সবই তাদের শিখ্‌তে হবে। সহরের নিকটবর্ত্তী কার্‌খানায় তাদের মাঝে মাঝে নিয়ে যেতে হবে। কাঁচা মাল সেখানে কি রকমে আনা হয়, কি রকমে দ্রব্যের ভাল মন্দ বিচার কর্‌তে হয়, কি করে' জিনিষ মিশ্রিত করা হয়, কি করে পর পর রূপান্তরিত হ'তে হ'তে তবে প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত হয়; জিনিষের দর—পরিশ্রমের দরের সামঞ্জস্য কি? স্বত্বাধিকারীর ও শ্রমিকদের লাভের তারতম্য কি?—এই সমস্ত শিক্ষা দিতে হবে। মাঝে মাঝে বড় বড় সহরে প্রদর্শনী খোলা হয়ে থাকে। শিক্ষকগণ বাণিজ্যশিক্ষার্থীদের যেন এ-সকল দেখাতে ভুল না করেন। এখানে অনেক বিষয় শিক্ষা দেবার থাকে। এই-সব প্রদর্শনীর মধ্যে কৃষি ব্যবসায় আর পাব্‌লিক ওয়ার্ক্‌স্ সংক্রান্ত বিভাগগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক অনেক বিদ্যালয়কে বাণিজ্যবিদ্যালয়ে পরিণত করা উচিত। এখন স্কুলে যে-সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তা পরিবর্জ্জিত করে' কেবলমাত্র ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া উচিত। সব শিক্ষাই প্রথমে দেশীয় ভাষায় হবে। আমি অনেক ছাত্র দেখেছি যারা নিজেদের মাতৃভাষায় অভিজ্ঞ নয়। তারা মাতৃভাষায় চিঠি লিখ্‌তে পারে না বা মনের ভাব ব্যক্ত কর্‌তে পারে না। প্রথমে লঘু বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় বা কঠিন বিষয় তাদের সম্মুখে প্রথমেই ধরা ঠিক নয়। ডাক্তার যেমন রোগীকে প্রথমে লঘু পথ্য দিয়ে থাকেন, তাদেরও সেই রকম করা উচিত। শিক্ষক তাদের এ রকম শিক্ষা দেবেন যাতে তাদের উপকার হয় আর আগ্রহও বাড়ে। গণিত বিষয়ে শিক্ষা খুব কঠিন এবং পরিশ্রমসাধ্য। ছেলেরা যাতে তাড়াতাড়ি হিসাব রাখ্‌তে পারে সেরূপ শিক্ষা দিতে হবে। এঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য বড় ব্যাপারে উচ্চাঙ্গের গণিত দর্‌কার বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে সামান্য অঙ্কই যথেষ্ট। জ্যামিতি বা বীজগণিতের প্রয়োজনীয়তা ব্যবসাক্ষেত্রে নাই। অবশ্য আমি ঐসব বিদ্যা শেখাতে নিষেধ কর্‌ছি না। তবে এটাও বল্‌তে হচ্ছে যে আমি এই দুই বিদ্যা যা স্কুলে শিখেছিলাম তার কোন ব্যবহারক্ষেত্রে সারা জীবনে পাইনি। এখন সে সমস্ত প্রায় একরূপ ভুলে গেছি। ব্যবসাক্ষেত্রে চল্‌তে ইংরেজী শেখা খুব দর্‌কার। প্রত্যেক ভারতীয় ব্যবসায়ীকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আদান প্রদান রাখ্‌তে হয়, কাজেই ভাল ইংরেজী জানা না থাক্‌লে ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ইংরেজী জানা না থাক্‌লে ইউরোপীয়দের সঙ্গে কার্‌বার চালাতে হ'লে তাকে দোভাষী কর্ম্মচারীর সাহায্য নিতে হয়। অনেক ব্যবসায়ী ইংরেজী জানেন না বলে' দুঃখ করেন, কারণ অনেক সময় তাঁর কর্ম্মচারীর ভ্রম ত্রুটিতে কি ক্ষতি হয় তা তাঁরা ধর্‌তে পারেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যে ইংরেজী জানা একান্ত প্রয়োজন। তবে ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষা দিতে হ'লে এমন ভাবে দিতে হবে যাতে ইংরেজীও শিখ্‌বে আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞানও লাভ কর্‌বে। আজকাল বাণিজ্য-সংক্রান্ত যে-সমস্ত পুস্তক হচ্ছে সে-সমস্ত পড়ান দর্‌কার।

ভূগোল শিখ্‌তে হবে বটে, কিন্তু স্কুলপাঠ্য ভূগোল নয়; যাতে ব্যবসায়ের কথা থাকে সেই ভূগোল ইতিহাসও শেখাতে হবে; কিন্তু প্রথমে পলিটিক্যাল ইতিহাস, তার পর বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয় তার পর অন্য বিষয় পড়ান ছেলেদের

উপর ভার চালান ছাড়া আর কিছুই নয়। এই-সব শিখানর মধ্যে টাইপ-রাইটিং ও শর্টহ্যাণ্ড সেখান দরকার।

কেবল তত্ত্বটুকু শিক্ষা দিলেই হবে না, বাস্তবশিক্ষা হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হবে। আমেরিকায় যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষক যেন সেইভাবে শিক্ষা দেন। সেখানে ছাত্রদের মধ্যে এক এক কৃত্রিম কোম্পানী গঠন করা হয় এবং এক এক কোম্পানীতে একজন ম্যানেজার একজন সহকারী ম্যানেজার একজন হিসাবনবিশ ইত্যাদি নিযুক্ত করা হয়, আর সেই রকম কাজ দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেকেই নিজের কর্ত্তব্য আনন্দের সঙ্গে শেখে। সময় সময় এই-সব ছাত্রদের বড় বড় ফার্ম্মে নিয়ে যাওয়া হয় তারা নিজের চোখে দেখে আসে কি রকম শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ হয়।

এই সঙ্গে ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের প্রায়ই ভগ্নস্বাস্থ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্কুল কলেজেই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ বালকেরা সে-সব শিক্ষা পেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে নীরোগ হ'তে যত্নবান্ থাকবে, কারণ শরীর ভাল না থাকলে তারা ঘরে বাইরে কোন কাজই করতে পারবে না।

হে ভারতীয় যুবকগণ, উঠ, দলে দলে ব্যবসাক্ষেত্রে অগ্রসর হও।

শ্রী ডুঙ্গারসী ধরমসী

মোগল দরবারে জৈনাচার্য্য সাধু

মঠের মোহান্তরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, অতএব কপর্দ্দক-হীন ও ব্রহ্মচারী, কিন্তু কেহ কেহ রাজ-আড়ম্বর সহ জীবন-যাপন করেন। প্রাচীন নিয়ম-মত, সন্ন্যাসীকে—তা তিনি যে-কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন—বিষয়ীর সঙ্গ করিতে নাই। চৈতন্যদেব যখন জগন্নাথক্ষেত্রে প্রথম আসিলেন তখন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাতে স্বীকৃত হন নাই। যখন রাজা সাধারণ ভক্তের মত—ধুতি ফোতা পরিয়া—আসিলেন, তখন আলাপ করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু দুএকটি "রাজা বাহাদুর অমুক গিরি বা পুরী" দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জৈন সাধুরা এখনও প্রাচীনকালের মত অতি কঠোর নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোনও প্রকার যান বা বাহনে উঠেন না, এমন কি রেলগাড়ীতেও না। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে একজন জৈন সাধু কাঠিয়াওয়াড় হইতে রেলে উঠিয়া মাদ্রাজ গিয়াছিলেন বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যতদূর সম্ভব জৈন শ্রাবকদের গৃহেই ভিক্ষা করেন। জৈন শ্রাবক না থাকিলে বৈষ্ণবদের ভিক্ষা গ্রহণ করেন। মাংসাহারীর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। জৈন মাত্রেই জীবহিংসার ঘোর বিরোধী; সাধুরা ত পথ হাঁটিবার সময়ে একটি লম্বা হাতলযুক্ত পালক বা অন্য কোন নরম জিনিসের সম্মার্জ্জনী লইয়া পথ হাঁটেন। পোকা মাকড় জীব সরাইয়া তবে পাদক্ষেপ করেন। জৈন মতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়; কিন্তু সকল জীবেরই পাঁচটি নাই। তাঁহারা জীবকে একেন্দ্রিয়, দ্বি-ইন্দ্রিয়, ত্রি-ইন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীবে বিভক্ত করিয়াছেন। মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত জীব, কিন্তু বনস্পতি জল ও বাতাস একেন্দ্রিয় যুক্ত জীব। জৈন মাত্রেই দ্বি-ইন্দ্রিয় ও বহু-ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবকে হিংসা করেন না; কিন্তু সাধু একেন্দ্রিয়কেও হিংসা করেন না। অতএব বনস্পতির মধ্যেও কাঁচা ফল, কাঁচা তরকারী, কাঁচা বীজ বা মূল [যথা মূলা, বীট, কচু, ওল] ইত্যাদি আহার করেন না। শুষ্ক বীজ বা ফলে দোষ নাই। তাঁহারা (সাধুরা) কাঁচা জল পান করেন না। তাঁহাদের জন্য শ্রাবকেরা ২।৩ ঘণ্টা জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখে, দুই প্রহরের সময়ে মাধুকরী ভিক্ষার সঙ্গে দান করিয়া থাকে। তাঁহারা বলেন—

জৈনাচার্য্য বিজয়ধর্ম্ম সূরি এবং ডাক্তার এল্‌, পি তেস্‌সিতোরী

আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বায়ু-জীবের কষ্ট হয়। বায়ু একেবারে ত্যাগ করা যায় না, সেইজন্য যতদূর সম্ভব সেই বায়ুজীবের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নাক ও মুখের উপর একখানি পাৎলা কাপড় বাঁধিয়া রাখেন। অনেকে ভাবেন মুখে পোকা মাকড় ঢুকিবার ভয়ে জৈন সাধুরা ঐরূপ কাপড় বাঁধিয়া রাখেন, কিন্তু সাধুদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বায়ু-জীবকে অল্প কষ্ট দেওয়া। তাঁহারা বিহারকালে [বিচরণ করিবার সময়ে] সাধারণ বিশ্রামাগার বা মন্দিরে রাত্রি যাপন করেন। বিশ্রামাগারে যদি স্ত্রীযাত্রী থাকে তবে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করেন। গৃহস্থ বাটীতে কেবল মাত্র দুই প্রহরের সময়ে ভিক্ষা করিতে যাইতে পারেন, অন্য সময়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। গৃহস্থরা যদি নিমন্ত্রণ করেন বা তাঁহাদের জন্য কোনও বিশেষ বস্তু, মুখ-রোচক বা মূল্যবান্ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন, তবে তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। প্রাচীনকালে এরূপ সাধু ছিলেন শুনিয়াছি, কিন্তু আজকালও যে এরূপ কঠোরব্রতধারী আছেন তাহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। গত জানুয়ারী মাসে শ্রীমান্ ন্যায় বিজয়সূরি নামক এইরূপ এক সাধু নাগপুর হইতে পদব্রজে হায়দ্রাবাদে আসিয়াছিলেন, আবার তিন সপ্তাহ পরে হাঁটা পথে গুজরাট চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য যোগী শ্রী বিজয়ধর্ম্ম সূরির শিষ্য। স্বয়ং কাশীতে পরীক্ষা দিয়া ন্যায়বিশারদ উপাধি লাভ করিয়া এখন দেশ-বিদেশে জৈন-ধর্ম্ম উপদেশ দান ও পর্য্যটন করিতেছেন।

মোগল সম্রাট্ আকবর নানাধর্ম্মাবলম্বী সাধু ও আচার্য্য-দের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। তিনি একবার সংবাদ পাইলেন যে গুজরাটে হীরবিজয় সূরি নামক এক জৈনাচার্য্য সাধু আছেন। জৈনাচার্য্য সাধুরা রাজা ও বিষয়ীর, বিশেষতঃ মুসলমান রাজাদের, সহিত বড় একটা ঘনিষ্ঠতা করিতেন না। সেইজন্য সম্রাট্ বোধহয় জৈন সাধুদের নিয়ম জানিতেন না। তিনি গুজরাটের

শাসনকর্ত্তা শিহাব-উদ্দীন মহমদ খাঁকে, হাতী ঘোড়া উট পাল্কী ইত্যাদি রাজা বা মহান্ত রাজাদের মত ভ্রমণ করিবার সকল প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দিয়া, সাধুকে পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন ও আচার্য্যকে এক বিনীত নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন। আচার্য্য আপনার সঙ্ঘের ৬৭ জন আচার্য্য-সাধু ও কতিপয় গৃহস্থ শ্রাবক শিষ্য সহিত আসিলেন বটে কিন্তু হাতী ঘোড়া ইত্যাদি কিছুই স্বীকার করিলেন না। সম্রাট্ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াও ভরু-কচ্ছ (ব্রোচ) নগরের কাছে গান্ধার নামক গ্রাম হইতে ফতেপুর সীকরী পদব্রজে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে করিতে আসিলেন। সম্রাট্ সাধুকে বহু ধন রত্ন জায়গীর ইত্যাদি স্বীকার করিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন নাই। রাজ অতিথি হইয়াও তিনি আপনাদের আশ্রমের নিয়ম ত্যাগ করেন নাই। তিনি সাতষট্টি জন সাধু সহ ফতেপুর সীকুরীর শ্রাবকদের দ্বারে দ্বারে প্রত্যহ মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন ও যাহা পাইতেন তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। সম্রাটের বার বার অনুরোধে কেবলমাত্র সম্রাট্ সংগৃহীত কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহাও পাছে পুস্তকের প্রতি আসক্তি জন্মায় সেই ভয়ে, ও কপর্দ্দকহীন পরিব্রাজকের পক্ষে বহন অসুবিধা বা অসম্ভব ভাবিয়া আপনার কাছে রাখেন নাই। আগ্রা-নগরে একটি ভাণ্ডার (লাইব্রেরী) স্থাপন করিয়া সেই খানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

আচার্য্যের উপদেশে সম্রাট্ এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের পর্য্যুষণ সময়ে (জৈনদের পবিত্রতম পর্ব্ব-দিবস চান্দ্র শ্রাবণের শেষ ছয়দিন ও ভাদ্রের প্রথম ছয় দিন) তিনি ফতেপুরে ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে স্থানান্তরে যাইতে চাহিলেন, কেন না যেখানে প্রত্যহ বহু-জীবহত্যা করা হয় সাধুকে পর্য্যুষণ-কালে সে গ্রামে বাস করিতে নাই। সম্রাট্ সাধুকে ছাড়িলেন না কিন্তু সে বৎসর ফতেপুর রাজধানীতে আটদিন জীবহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে হীর-বিজয়ের শিষ্য বিজয়সেন সূরির সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার অনুরোধে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত সাম্রাজ্যে পর্য্যুষণের বার দিন জীবহত্যা নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

জৈন-সাধুরা কিন্তু এ কঠোরতা বেশী দিন রাখিতে পারেন নাই। এ ঘটনার মাত্র ৪০ বৎসর পরের একখানি ফরমান আমার এক জৈন বন্ধুর কাছে আছে; তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জৈন সাধুরাও রাজাদের মত আড়ম্বর-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন আবার প্রাচীন নিয়মে ফিরিয়া আসিয়াছেন। উক্ত ফরমানখানি জৈন সাধু রত্ন-সূরিকে সম্রাট্ দিয়াছিলেন। তাহার নীচে সন জুলুস ১৪ লেখা আছে ও শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোহের মোহর আছে। বোধহয় শাহজহানের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষে [খৃ ১৬৪১] সম্রাটের আদেশে যুবরাজ এই ফরমান দিয়া থাকিবেন। ফরমানের কতক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে অর্থবোধের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নাই। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে যে অংশ আছে তাহার অনুবাদ নিম্নে লিখিতেছি। বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি ফরমানে নাই। অর্থবোধের জন্য লেখক যোগ করিয়াছে।

সম্রাটের ফরমানের অনুবাদ

এখন যখন স্বর্গীয় সম্রাট্ অবু-উল-মনসূর জলাল-উদ্দীন মহম্মদ অকবর শাহ বাদশাহ গাজীর শাসন প্রচলিত রহিয়াছে.........(প্রায় দুই লাইন নষ্ট হইয়াছে).........উচ্চউপাধিযুক্ত, সম্মাননীয়, জগৎগুরু, পূজ্য, পরম সৎগুরু, জগৎ-আচার্য্য শ্রীপূজ্য, ধর্ম্মচক্রবর্ত্তী, ভট্টারক, জৈনদের ভট্টারক, সকল দেশের সম্রাট্, শ্রী১০৮, শ্রী জিনরত্ন সূরীশ্বর জী দেব শ্রীচরণ সরণ হজরৎ, পূজ্য, পরম পূজ্য, শ্রীমোহন্ত, শ্রীজী মহারাজ......মহারাজ......গুরু, জগৎ-তারণ, পরমেশ্বর-রূপ, জৈন শাহন্শাহ, শ্রীঅষ্টোত্তর শতক ....পরমগুরু.........পূর্ব্বাবধি অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন, (তিনি) সম্রাটের কাছে (অতিরিক্ত) সম্মান লাভ করিলেন।

দোয়া (আশীর্ব্বাদ), তাজীম (সম্মান), প্রণাম দণ্ডবৎ সময়ে সম্রাটের সিংহাসনের সম্মুখে (আপনার)

সিংহাসনের উপর পশ্‌মীনার দুইখানি আসনে তাঁহার বসিবার স্থান (হইবে)।

তখ্‌তে-রওঁা, ছত্র, সায়াগীর, ইত্যাদি সম্রাট্‌দের জুলুস ও খাসার অনুরূপ সমস্ত উপকরণ, নালকী, মোরছল, আফ্‌তাব্‌গীর, দুইটি চামর, সোনা-রূপার দস্তীচোব সকল, জরিবসান সিংহাসন, (এই-সকল দ্রব্য) সম্রাট দ্বারা নজর ভেট করা হইয়াছে।

এই সম্মান ও এই নিয়ম চিরকাল প্রচলিত থাকা উচিত।

যে-কোনও সময়ে, যে-কোনও নগরে, উপরোক্ত ব্যক্তি গমন করিবেন, সে নগরের সমস্ত মুসলমান ও হিন্দু ইত্যাদি জাতির লোকেরা সম্মানার্থ সম্মুখে আসিয়া আপনাদের পরম গুরু বিবেচনা করিয়া পা অন্দাজের জন্য ফর্শ্‌ পাতিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবেন, ও নগরে অভ্যর্থনা করিবেন।

উপরোক্ত ব্যক্তির সম্মুখে দণ্ডবৎ ও তস্‌লীম করিবেন, ও পথরাওনী করিবেন। এ নিয়ম কখনও অতিক্রম করিবেন না।

প্রতি ফসলে, প্রতি বৎসরে, প্রত্যেক গৃহ হইতে একটি টাকা ও একটি নারিকেল নজর দিতে হইবে। প্রত্যেক বিবাহ ও জন্মের সময়ে একটি নারিকেল ভেট দিতে হইবে।

প্রত্যেক অমীর ও রাজা যাহারা (সর্‌কারী) সেবক, বাৎসরিক একশত টাকা দিবেন।

এই নিয়ম সমস্ত হিন্দুস্থান প্রদেশে চিরপ্রচলিত থাকিবে, কোনও কারণে পরিবর্ত্তিত হইবে না। বিশেষতঃ সমস্ত মুসলমান ও হিন্দু ইত্যাদি জাতিরা উক্ত মহাশয়কে শ্রীচরণ জগৎগুরু, আপনাদের তারণ (কর্ত্তা), মুর্‌শিদ, পরম সৎগুরু, পূজ্য ও স্বামী নাথ শ্রীমন্ত, পরমেশ্বর-রূপ, শ্রী অষ্টোত্তর শতক ও আপনার শ্রীপূজ্য বিবেচনা করিয়া ঐ ব্যক্তির আজ্ঞাপালন, সম্মান ও স্তুতি করিবেন। কোনও ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অংশ ত্যাগ করিবেন না।

যদি উপরোক্ত জাতির মধ্যে কোনও দোষ বা অপরাধ ঘটে, তবে উপরোক্ত ব্যক্তি শাস্তি দিবার অধিকারী রহিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মমতে যে-কোনও শাস্তি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, দিতে পারেন কিম্বা ক্ষমা করিতে পারেন।

এই-সকল অধিকার চিরকালের মত দেওয়া হইল।

(রাজ) পুত্রেরা, ক্ষমতাবান্‌ উজির, সম্রাটের উচ্চ-পদস্থ সম্মাননীয় অমীর, সাম্রাজ্যের রাজপুরুষ, জাগীরদার, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রোরী, দেশশাসকহাকিম, আম্‌লা, মুৎসুদ্দী, এবং রাজা বা জমিদার সাধারণ লোক সম্রাটের উপরোক্ত আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, উপরোক্ত ব্যক্তির সম্মান দণ্ডবৎ, নজর, ভেট, ইত্যাদি করিবে, ও (সম্রাটের) আজ্ঞার অমান্য করিবে না। লেখা হইল তারিখ ১৫ মাস সফর সন জুলুস ১৪।

ফর্‌মানের উপর একটি বোঁটা-যুক্ত গোল মোহর। বোঁটাতে "অল্লাহ্‌" শব্দ লেখা। গোল অংশে লেখা—"শাহ্‌ বলন্দ্‌ ইক্‌বাল মহম্মদ দারাশিকোহ্‌ ইব্‌নে সাহ্‌জহাঁ বাদশাহ্‌ গাজী।" উপরে সোনালি কালী দিয়া অরবী অক্ষরে বোধ হয় কোরানের কোন আয়ৎ লেখা ছিল; এখন তাহা এত অস্পষ্ট যে পড়া যায় না।

তখ্‌তে-রওঁা—সচল সিংহাসন। মনুষ্য-বাহিত খোলা পাল্‌কী।

ছত্র—বড় ছাতা। তখ্‌ৎ রওঁা বা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিলেও নিকটে সেবক এই প্রকাণ্ড ছাতা লইয়া যায়।

সায়াগীর—চার জন বা ততোধিক সেবক-বাহিত ছোট চন্দ্রাতপ।

জুলুস ও খাসা—সম্রাটের নিজের ব্যবহারের আড়ম্বর-যুক্ত দ্রব্যাদি। ভ্রমণ-সময়ে বা প্রকাশ্য দরবারে জুলুস, গৃহে খাসা।

নালকী=এক-বাঁশের পালকী। বাঁশটি মাঝখানে বাঁকাইয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার করা হয়। পশ্চিমে বিবাহের সময়ে বর এখনও নালকীতে বসিয়া যাত্রা করে।

মোরছল=ময়ূরপুচ্ছের চামর বিশেষ।

আফ্‌তাব্‌গীর=সায়াগীরের মত সচল চন্দ্রাতপ রৌদ্রের সময়ে ব্যবহার করা হয়। সায়াগীর রৌদ্র না থাকিলেও পাখী ইত্যাদির বিষ্ঠাদি হইতে রক্ষা করে।

দস্তীচোব। দস্তী=হস্তের, চোব=ছড়ি। সোনা-রূপা-বাঁধান ছড়ি যাহা বড়লোকদের সেবকেরা হাতে করিয়া সম্মুখে চলে। এরূপ সেবককে চোব্‌দার বা ছড়ি-বর্দ্দার বলে।

পা-অন্দাজ। বড়লোকেরা যে স্থানে যান ত্যাগ করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করেন সেখানে কাপড় বা ফর্শ্ পাতিয়া দিবার নিয়ম সকল দেশে আছে। এই কাপড় বা ফর্শ্‌কে পা-অন্দাজ অর্থাৎ পা রাখিবার বস্তু বলে।

পধরাওনী। হিন্দীতে পধারনা = আগমন করা। বড়লোকেরা আসিলে এক স্থানে বসাইয়া তাঁহার মর্য্যাদা অনুসারে কিছু ভেট দিতে হয়। এই ধন দিয়া মর্য্যাদা রক্ষা করাকে পধরাওণী করা বলে।

মুরশিদ = মুর্শিদ = দীক্ষাগুরু।

ক্রোরী = করোরী = এক কোটী দাম রাজকর-সংগ্রহকারক রাজপুরুষ বা কলেক্টর।

এক টাকা = ৪০ দাম। অতএব আড়াই লক্ষ টাকা আয়ের পরগনার কলেক্‌টর।

সনজুলুস। রাজার সম্রাটের রাজ্য-প্রাপ্তির সময় হইতে গণিত বৎসর।

শ্রী অমৃতলাল শীল
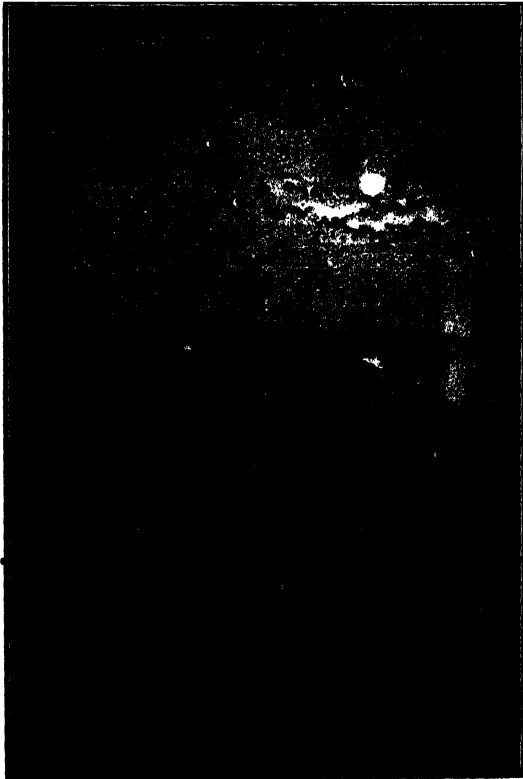
চাঁদের আলো
চিত্রকর শ্রী মহাদেব মণ্ডল
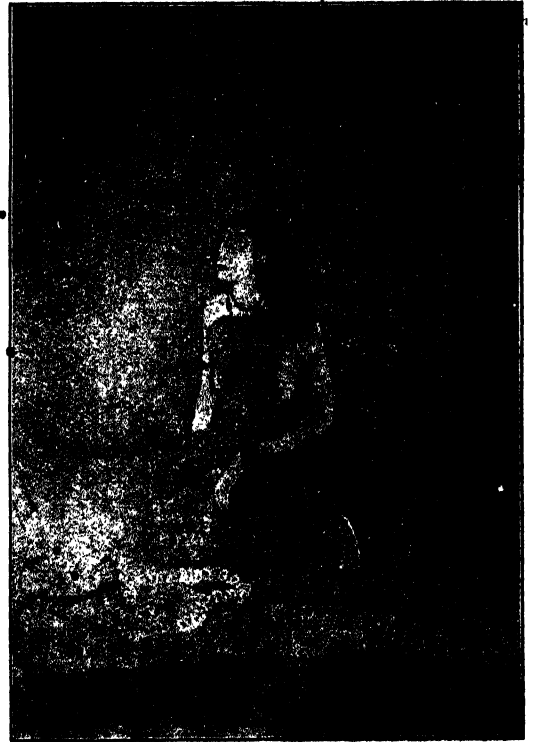
অসম্পূর্ণ মালা
চিত্রকর শ্রী অশ্বিনীকুমার রায়

নৃত্যশীলা
চিত্রকর আচার্য্য শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
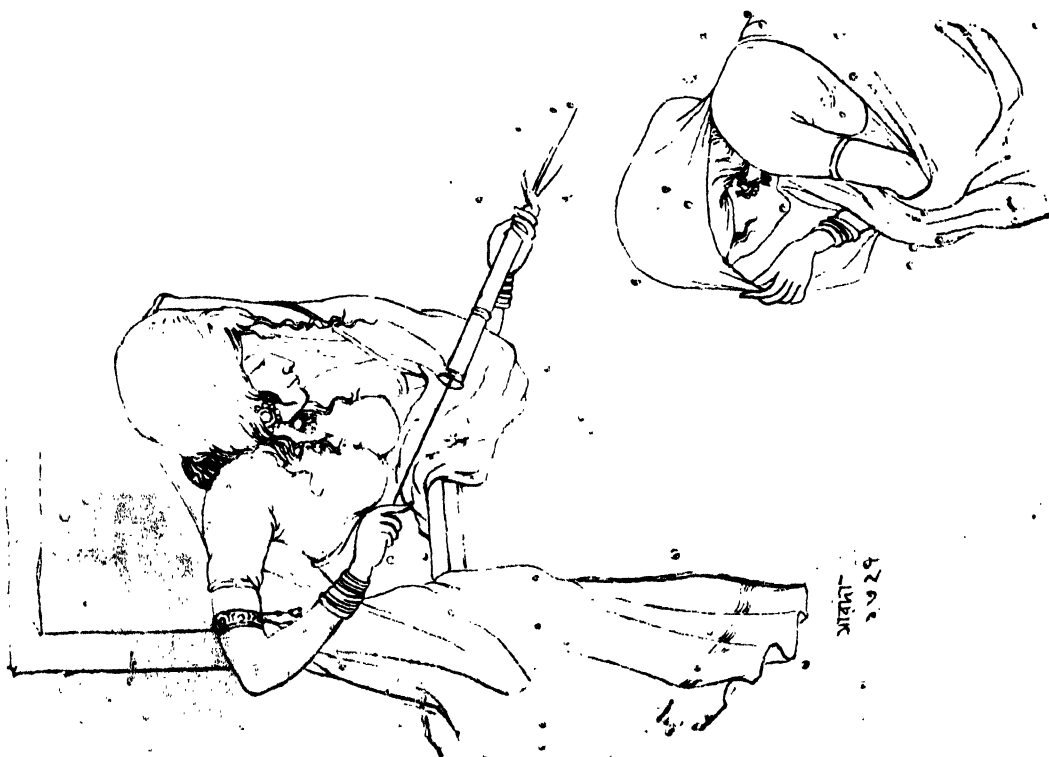
হোলি-খেলা
চিত্রকর শ্রী সারদাচরণ উকিল

মা
চিত্রকর শ্রী সারদাচরণ উকিল

শেফালী-তলায়
চিত্রকর শ্রী দুর্গেশচন্দ্র সিংহ

শাক্তের গান

মুখ তোলো গো পুঁথির পোকা, চশমাখানা সরিয়ে ফেল,
মনটা যে হায় কণ্ঠাগত, শক্ত চাপে ডরিয়ে গেল!
জীবনটা তো বেত্রধারী গুরুর হাতে তৈরি নহে—
বিচিত্র সে স্বাধীন-গতি, মানবতার বৈরী নহে!
শৌর্য্যহীনের বিদ্যা রে ভাই, ব্যর্থ ধরার কর্ম্মশালায়,
মান্‌লে কেবল পুঁথির শাসন পালায় পুরুষ-ধর্ম্ম পালায়!
শৈলচূড়ে ঐ যে পাঠান লাফিয়ে বেড়ায় উচ্চশিরে—
ক্ষেপ্‌লে যারা লুফ্‌তে পারে ধূমকেতুরি পুচ্ছ ছিঁড়ে,
পুঁথির কথা কয় না যারা, যায়-নি কভু পাঠশালাতে—
অবাধ চিত্ত নয়কো বদ্ধ বিদ্যাচুঞ্চুর আটচালাতে—
সূক্ষ্মমতে মূর্খ বটে,—কিন্তু সবল পুরুষ ওরা,
জানেইনাকো পরদেশীদের পায়ের জুতো বুরুশ-করা
স্বাধীনতার করুচে পূজো পেতে প্রাণের তক্ত তারা,
চক্ষে তাদের শৌর্য্য-শিখা, বক্ষে তাতল রক্তধারা!

* * * *

আমরা হেথায় জটলা ক'রে কেতাব-পড়াই করুছি বড়,
পঞ্জরেতে যাচ্ছি খোঁচা, পিঞ্জরেতে হচ্ছি জড়।
কপ্‌চে উঠি এ-বি-সি-ডি, নামের লেজুড় এমে-বি-এ,
হাঁসফাঁসিয়ে ধরুচি ট্রামে চুপ্‌ হেঁটেই থেমে গিয়ে।
একটি আনার মাল কিনে ধিক্, দিচ্ছি দুনো মুটের ভাড়া,
'বাপ্‌রে" ব'লে পালাই ছুটে পেলেই গোরার বুটের সাড়া।
মা-বো-মেয়ের অপমানে দাঁড়িয়ে থাকি ছবির মত,
হাস্যমুখে দাস্য করি, মর্ম্মে নিয়ে গভীর ক্ষত।
নেই ভরসা প্রাণে বটে, নেইকো বটে শক্তি হাতে,
কথায় কিন্তু কেল্লা ফতে, তুবড়ী ছোটাই বক্তৃতাতে।
যৌবন হায় আসে এবং পালায় কখন্ যায় না ধরা!
মিথ্যা কেন জ্যান্তে-মরার স্বরাজ লাভের বায়না করা!
'ধর্ম্ম এবং ব্রহ্ম কভু বীর্য্যহীনের লভ্য নহে'—
শাস্ত্রকারের সত্য বাণী—বাক্যটি এ নব্য নহে।
বাল্য গেলেই জীর্ণ জরায় তুচ্ছ জীবন ভগ্ন যাহার,
বিদ্যা-রত্ন, স্বরাজ-রত্ন ভোগের আশা স্বপ্ন তাহার!
যৌবনেরি জয়পতাকা উড়চে ধরায় প্রাণের তোড়ে,
জীর্ণ যা, তা যাবেই ভেসে কর্ম্মনাশার বানের জোরে।
দেহের দিকে চাইবে না যে, মন কাণা তার হবেই হবে,
কর্ম্মপথে ক্লিন্নমুখে পশ্চাতে সে রবেই রবে।
মনের বাসা দেহের শাখায়, ভাঙ্‌লে দেহ মন সে কোথায়,
দেহের সাধন ভুল্লে পরে সবাই যাবে ধ্বংসে গো হায়!

* * *

জাগ্রত হও, জাগ্রত হও,—জাগ্রতে হে ঘুমন্তরা!
কি ফল ব'সে খাঁচার কোণে, বিফল বুলি কুজন-করা?
শুন্‌চনা কি বজ্র হাঁকে বৈশাখীর ঐ ঝড়ের তালে,
এখন তুমি পড়্‌ছ পুঁথি—আগুন লাগে খড়ের চালে!
জাগো আমার দেশের আত্মা শক্তি-পূজার সন্ধিক্ষণে,
গ্রন্থকীটের আখ্‌ড়াতে আর রেখনাকো বন্দী মনে!
জীবন-রণে সবল জেতে, পুঁথিই তোমার বল্‌চে তো তা—
ঐ দেখনা বিশ্বমাঝে শক্তি-শিখা জল্‌চে হোথা!
ব্যায়াম নহে নিন্দনীয়—শৌর্য্যলাভের পদ্ধতি সে—
ঘুচিয়ে দেবে জীবন-ঘাতক জরার দেওয়া সদ্য বিষে।
শক্তি চোখে, শক্তি মুখে,—শক্ত কর শীর্ণ দেহ,
শক্তি হাতে, শক্তি বুকে,—ভাঙ্‌ বিলাসের জীর্ণ গেহ!
শক্তি সাধো দেশের ছেলে, বক্ষ হবে দরাজ তবে,
প্রবল বাহুর লৌহটানে পাবেই পাবে স্বরাজ সবে।
শক্তি সাধো দেশের মেয়ে,—শক্তিরূপে দাঁড়াও হেসে—
ভীরু প্রাণের দুরু-দুরু হীন ভাবনা তাড়াও এসে।
শক্তি-হোমে দাও আহুতি সব দীনতা শঙ্কাগুলো—
বাঁচার মতন বাঁচ্‌তে শেখ,—তবেই জয়ের ডঙ্কা তুলো!
"হীন বাঙালী, বুটের চোটে হচ্ছে রোজই ছিন্নজাতি—
লাথি খেয়েও পড়্‌ছে কেতাব—এমনি তারা ঘৃণ্য জাতি!
এম্‌নি তারা ঘৃণ্য জাতি—অপমানেও নিদ্রা-দড়,—
মান দিয়ে প্রাণ রেখে করে পুঁথিগত বিদ্যা বড়!"
এমন কথা শুন্‌তে না হয়—এর চেয়ে যে মরণ শ্রেয়—
পিঁপ্‌ড়ে ক্ষুদে, মাড়িয়ে দিলে কাম্‌ড়ে দেবে চরণ দেও!
মার খেয়ে যে মারুতে পারে—মরুবে জেনেও পালায়নাকো—
অধীন হলেও মনিব তাহার ক্রোধের আগুন জালায়নাকো।
দেশ গিয়েচে—করুবে কি আর, তা ব'লে পা চাট্‌বে কেন?
এক বাঁধনের উপর কেন নতুন বাঁধন বাঁধ্‌বে হেন?
বাঙালী নয় ভেড়ার ছানা—ব্যাঘ্রভূমের মরদ্ সে যে—
প্রমাণ কর প্রমাণ কর,—উঠুক্ তোমার দরদ বেজে!
শক্তি ধর্ম্ম, শক্তি মোক্ষ, শক্তি কাম্য—আর-কিছু নয়—
সাধ্‌বে যে এই বীরের সাধন, তার কি কভু ঘাড় নীচু হয়?
বীর্য্যবানের বিশ্বসভায় বিজয়-মাল্য গ্রহণ কর—
দৃপ্ত প্রাণের দীপ্ত তেজে সব কলঙ্ক দহন কর।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

ভারতের ধ্বংসোন্মুখ গোধন

দুগ্ধের অফুরন্ত ভাণ্ডার ভারতবর্ষ আজ দুধের কাঙ্গাল। ভারতের নরনারী আজ দুগ্ধের অভাবে রোগজীর্ণ, দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবী ও নষ্টস্বাস্থ্য। আজ ভারতের ঘরে ঘরে চাহিয়া দেখ, শিশুদের মুখে সে হাসি নাই, দেহে স্বাস্থ্যের সেই লাবণ্যচিহ্ন নাই, প্রাণে স্ফূর্ত্তির সাড়া পাওয়া যায় না; শিশু আজ আর সেই মূর্ত্তিমান আনন্দ নহে, সে যেন গাম্ভীর্য্য, নিরানন্দ ও ব্যাধি লইয়াই সংসারে আসিয়াছে। শিশুজীবনের একমাত্র খাদ্য দুগ্ধের অভাবেই আজ বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতের শিশুকুলের এই শোচনীয় অবস্থা। আমাদের দেশে প্রতি হাজারে প্রতিবৎসর ২৬০টি শিশুই জন্মের অব্যবহিত একবৎসরের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া থাকে। পর্য্যাপ্ত দুগ্ধের অভাবই এই শিশুমৃত্যুর একটা প্রধান কারণ। বাংলায় ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কা নারীর মৃত্যুসংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষে ১২১৫ জন! ইহাদের মধ্যে প্রায়ই সন্তান-প্রসবের পর দুর্ব্বল হইয়া উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি দেশে প্রচুর দুগ্ধ থাকিত তবে এই ভাবে দেশের নারী-গণকে জীবনের সুখ-সম্ভোগের প্রারম্ভেই সংসারের মায়া কাটাইতে হইত না। অবিশুদ্ধ দুগ্ধ পানের জন্য Tuberculosis নামক যক্ষ্মারোগ-বিশেষ ক্রমশঃই দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৩৮৪৩৫ জন ও ১৯১৯ সালে ১০০১৯২ জন উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসাধীন হইয়াছিল। সুতরাং, দেখিতেছি যে ২০০ রোগী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে রোগ ও মৃত্যুসংখ্যার প্রাবল্য যে দেশের পক্ষে একটা ভীষণ সর্ব্বনাশের কারণ তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারিতেছেন। কেবল দুগ্ধের অভাবই এই সর্ব্বনাশের কারণ। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একটি গাভী প্রতিদিন গড়ে ৫ সের দুধ দিত, কিন্তু এখন দেয় মাত্র ১ সের। বর্ত্তমানে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা দুগ্ধের দর ৪০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে গড়ে টাকায় ৪ সের দুধ বিক্রয় হয়। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরামিষাশী; নিরামিষভোজীর পক্ষে দুগ্ধ একটি অত্যাবশ্যক খাদ্য। কিন্তু টাকায় ৪ সের দুধ কিনিয়া খাওয়া যে কয়জনের পক্ষে সম্ভব তাহা আর এই দরিদ্র-দেশবাসীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। এই দুগ্ধাভাবের কারণ দেশ হইতে শনৈঃ শনৈঃ গো-বংশের হ্রাস। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশ অপেক্ষা ভারতই গো-সম্পদে সর্ব্বাপেক্ষা হীন, কিন্তু এই ভারতেই একদিন বিরাট রাজের গো-গৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই ভারতেই একদিন গোজাতি দেবতার সম্মানে পূজিত হইত, একদিন এই ভারতেরই ঘরে ঘরে ক্ষীর সর ননী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত থাকিত। আমাদের দেশে প্রত্যেকটি গাভী গড়ে প্রতিদিন একসের দুধ দেয়, ইংলণ্ডে দেয় ১০ সের, ডেনমার্কে ১০ সের, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৫ সের।

শতকরা লোক প্রতি গরুর সংখ্যা:—ভারতবর্ষে ৫৯, ডেনমার্কে ৭৪, যুক্তরাজ্যে ৭৬, কানাডায় ৮৪, কেপ কলনিতে ১২০, নিউজিল্যাণ্ডে ১৫০, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৪৯, আর্জেণ্টাইনে ৩২৩, উর্গায় ৫০০। নানা কারণে ভারতের গোধন ধ্বংস হইতেছে, আমরা মোটামুটি কয়েকটা কারণের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ গোহত্যার কথাই ধরা যাউক। বৃটিশ ভারতে প্রতিবৎসর নানা কারণে প্রায় এক কোটী গোহত্যা হইয়া থাকে। এই হত্যার কারণ গোরা সৈন্য ও সাধারণের খাদ্যের জন্য মাংস, চর্ম্মের ব্যবসায়, শুষ্কমাংস ও ব্রহ্মদেশে মাংস রপ্তানির ব্যাপার। এই কলিকাতা সহরে টাঙ্গরা কসাই-খানায় প্রতি বৎসর ১৪৯৮৩টি গোহত্যা হইয়া থাকে। গাজীপুর জেলায় গত তিন বৎসরে যে গোহত্যা হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহার একটা তালিকা দিতেছি:—গাভী ৫৭৭৫, বৎস ৩৩৯, বৃষ ৪২৪০।

ব্রহ্মদেশে মাংস সরবরাহের জন্য আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত-প্রদেশে যে গোহত্যা হয় তাহার তালিকা:—

মিরাট বিভাগ ২০০০, আগ্রা বিভাগ ৮৪৯৬৯, রোহিলা-খণ্ড বিভাগ ২৮৭১০, এলাহাবাদ বিভাগ ১১১০, ঝাঁসী বিভাগ ৩০৫৫, গোরখপুর বিভাগ [illegible]

এক প্রদেশ হইতেই যদি ভারতকে এমন ভাবে গোধনে বঞ্চিত হইতে হয় তবে সমগ্র ভারতের অবস্থা যে কি হইবে তাহা একটু বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। গোরা সৈন্য পোষণের জন্য ভারতের গো-হত্যার পরিমাণ সামান্য নহে। পুনঃ পুনঃ এ বিষয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াও কোনই ফল হয় নাই। ফল না হওয়ার একটা কারণ স্পষ্টই লক্ষ্য হয়। গোরা সৈন্যের জন্য যে পরিমাণ মাংসের দরকার গো-মাংস ব্যতীত অন্য মাংস দ্বারা তাহা সম্পূরণ করিতে গেলে অত্যধিক খরচের দরকার। কাজেই সরকার বাহাদুর সমস্ত বুঝিয়া শুনিয়াও নীরব-বধির। ভারতে গোহত্যা দ্বারা মিউনিসিপালিটীর বৎসরে যে আয় হয় তাহা সামান্য নহে। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটা তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম, তাহা হইতে গোহত্যার দ্বারা গভর্মেণ্টের আয়ের একটা খতিয়ান পাঠকগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন :—

	পশুহত্যার জন্য টাক্স......	কসাইখানার খাজনা
১৯০২-০৩ সাল	৪৪৫২০২৲	২৮১৫৮৯৪৲
১৯০৫-০৬ সাল	৫৯১৯০১৲	৩৫৩৪১৫২৲
১৯০৭-০৮ সাল	৬১১৫৪৭৲	৩৫১৮০৩৮৲
১৯০৯-১০ সাল	৬২৩০৮৩৲	৩৬৪৮[illegible]০২৲
১৯১১-১২ সাল	৬৬৬৩৫৭৲	৪০৬৬৮৭১৲

উক্ত তালিকায় দেখা যায় যে ক্রমশই মিউনিসিপালিটীর আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ত গেল ১০ বৎসর আগের কথা, বর্ত্তমানে যে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

নিখিল ভারতীয় গো-মহাসভা ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে এজেণ্টের নিকট হইতে হাওড়া ষ্টেশন হইতে শুষ্কমাংস রপ্তানির যে একটা মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে বৎসরে কিঞ্চিদধিক দুইলক্ষ মণ শুষ্কমাংস কেবল উক্ত ষ্টেশন হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মধ্য প্রদেশ, বিহার, বেরার ও বোম্বে প্রদেশ হইতেও ঐ প্রকার শুষ্কমাংস রপ্তানি হয়। ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ ৫ লক্ষ মণ অনুমান করিয়া লইলেও বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। [illegible] মণ কাঁচামাংসে এক মণ শুষ্কমাংস হয়, সুতরাং পাঁচ লক্ষ মণ শুষ্কমাংসের জন্য কতগুলি গোহত্যা হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভারতের গোধনের যে কি ভাবে ধ্বংস সাধিত হইতেছে তাহার একটা দিক্ পাঠকবৃন্দের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিবে।

হত্যার তুলনায় ভারত হইতে গোরপ্তানি সামান্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেও দেশের সর্ব্বনাশ কম হইতেছে না। পূর্ব্বে ভারতীয় গোজাতিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল, ভারত হইতেই অল্পবিস্তর উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী ও বৃষ বিদেশে রপ্তানি হইত। একশত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের গোধন বিদেশে রপ্তানি হইত সত্য, কিন্তু এখন বিশেষতঃ বিগত বিশ্ব-সমরের পরে, এই রপ্তানি ব্যাপার-এমন ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, ভারতের যেখানে যত উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী ও বৃষ এখনও বিদ্যমান আছে, কিছু কাল পরে আর তাহাদের অস্তিত্বও দৃষ্টিগোচর হইবে না। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, এক হাজার গরুতে ২।৩টি মাত্র উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু পাওয়া যায়, কিন্তু রপ্তানি হওয়ার সময় বাছিয়া বাছিয়া এই উৎকৃষ্ট জাতীয় গরুই রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে ব্রাজিলের দশজন গোব্যবসায়ী প্রতিবৎসর ১৫ শত কংরাজী জাতীয় উত্তম গাভী বৃষ ও বৎসতরী বিদেশে চালান দিতেছে। অঙ্গোলা জাতীয় গরু জাভায় চালান যায়, জাভা-গভর্মেণ্ট এই ব্যবসায়ের আরও প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। মাদ্রাজ ও কলিকাতা বন্দর হইতে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া জাভা দেশীয় দুইজন গো-ব্যবসায়ী প্রতিবৎসর ৫০০টি উৎকৃষ্ট জাতীয় গীর, হারিয়ান, এবং হঙ্গী জাতীয় গাভী ও বৃষ নিজদেশে চালান দিতেছে। ডাচ্ কলোনিয়াল সার্ভিসের পশুবিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী প্রত্যেক চালানে এ দেশ হইতে ৮০০ আঙ্গোলা জাতীয় গাভী চালান দেয়।

সহরের গোয়ালারা যে-ভাবে দেশের গোকুলের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা ভাবিলেও মর্ম্মাহত হইতে হয়। তাহারা পল্লীগ্রাম হইতে বাছিয়া বাছিয়া উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীগুলিকে সহরে লইয়া আসিয়া বৎসগুলিকে কসাইদের নিকট বিক্রয় করে; তৎপর নৃশংস ও জঘন্য ফুকা প্রথায় দুগ্ধ নিঃসরণ করিয়া লইয়া গাভীগুলিকে এমন করিয়া ফেলে যে তাহাদের আর গর্ভধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। ৮৮৯

মাস দুগ্ধ-দানের পর তাহারা কসাইদের নিকট বিক্রীত হইয়া গাভী-জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পায়।

এইরূপে নানা ভাবে দেশের গো-বল দিন দিন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। গোধনের ধ্বংসের সাথে সাথে দেশের স্বাস্থ্যসম্পদ্‌ও লোপ পাইতেছে। দেশবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণ চেষ্টা করিলে সহজেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। গভর্মেণ্ট্ যদি এ-বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাও করেন তথাপি যদি দেশবাসীগণ তাঁহাদের নিজের এই সর্ব্বনাশের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার প্রতিকারে সচেষ্ট হন, তবে গবমেণ্টের সহায়তাতেও যথেষ্ট উপকার হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ

দোদুলদুল

[আরবী "মোতাকা" ছন্দ]

দোদুল দুল্
দোদুল্ দুল্!
বেণীর বাঁধ
আলগ্-চাঁদ,
আলগ্-চাঁদ,
খোঁপার ফুল,
কানের দুল
খোঁপার নীল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল!

অলক-ছায়
কপোল ছায়,
পরশ চায়
অলস চুল,
বিনুন-বিন্
কেশের উল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল!

অসম্বৃত্
কাঁধের ভিত্
অসম্বৃত্
পিঠের চুল,

লোহিত পীত
নোলক দুল
দোদুল্ দুল্!
দোদুল্ দুল!

সোহাগ্ গায়
দোলন্-গায়
কাঁপন খায়
আপন পায়,
পায়ের নখ
মাথার চুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল!

পরাগ-ফাগ
ছড়ায় আগ
শিরাজ-বাগ
ইরাণ-গুল,
দোলন্-দোল
দে বুল্-বুল্
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল!

কাকম্ চায়
নাচিম ফিম্

রিমিক্ ঝিম
ঝিমিক্ ঝিম !
আঁচল্-বীণ
চাবির রিং
বুলায় নিঁদ
ঢুলায় ঢুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

নিশাস-রেশ
কাঁপায় বেশ
মোতির হার
হিয়ার দেশ,
কাঁপায় শেষ
প্রাণের কূল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

বুকের কোল
আদর-ঘায়
দোলায় দোল্
দোলায় দোল্,
শরম-লোল
মরম-মূল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

কলস্-কাঁখ
পুকুর যায়,
আঁচল চায়
চুমায় ধূল,
দখিন্ হাত
ঝুলন্-ঝুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

বাঁকাল ক্ষীণ
মরাল-গ্রীব
ভুলায় জড়্—
ভুলায় জীব,
গমন্-দোল্
অতুল্ তুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

হাসির ভাস,
ব্যথার শ্বাস,
চপল চোখ,
আঁখির লাস,
নয়ন-নীর
অধর-ফুল
রাতুল্ তুল
রাতুল্ তুল
দোদুল্ দুল
দোদুল্ দুল !

মৃণাল-হাত,
নয়ন-পাত,
গালের টোল,
চিবুক দোল
সকল কাজ
করায় ভুল,
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল্ ?
কোথায় তুল
কোথায় তুল ?
স্বরূপ তার
অতুল তুল,
রাতুল তুল,
কোথায় তুল ?
দোদুল দুল
দোদুল দুল !!

কাজী নজরুল ইসলাম

বিবিধ প্রসঙ্গ

সরকারী আয়ব্যয়

সমগ্র ভারতবর্ষের আয়ব্যয়ের বজেট কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ্ করা হইয়াছে। তাহাতে ১৯২২-২৩ সালে আয় অপেক্ষা ব্যয় কয়েক কোটি টাকা বেশী দেখান হইয়াছে। ১৯২৩-২৪এও আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইবে। গত কয়েক বৎসরে ভারত-গবর্ণ্মেণ্টের চল্‌তি খরচের জন্য এক শত কোটি টাকা ঋণ হইয়াছে।

অধিকাংশ প্রাদেশিক গবর্ণ্মেণ্টের অবস্থাও এইরূপ—তাহাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী।

কোন-প্রকারে জোড়াতাড়া দিয়া, নূতন ট্যাক্স্ বসাইয়া, পুরাতন ট্যাক্স্ বাড়াইয়া, ঋণ করিয়া, আয় ব্যয় সমান করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু নূতন বা বর্দ্ধিত পুরাতন ট্যাক্সের আয় আশানুরূপ হইতেছে না। দেশ অত্যন্ত গরীব; নূতন বা বর্দ্ধিত ট্যাক্স্ দেয় কে? ঋণ বাড়াইবারও সীমা আছে। কারণ উহার সুদ ত চল্‌তি আয় হইতেই দিতে হইবে? এবং ঋণ যত বাড়িবে, সুদের মোট টাকাও তত বাড়িবে। তা ছাড়া, যে গবর্ণ্মেণ্ট্ বার বার, প্রতি বৎসরই, ঋণ করে, তাহাকে অন্য ঋণগ্রস্ত লোকদের মতই বেশী হারে সুদ দিতে হয়। আগেকার কোম্পানীর কাগজের (ইহা গবর্ণ্মেণ্টের কর্জ্জপত্রের নামান্তর মাত্র) সুদ ৩, ৩॥০, ৪ টাকা পাওয়া যাইত। এখন গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে শতকরা ৫॥০, ৬, ৬॥০, ৭ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিতে হইতেছে। এবং অনেক স্থলে সুদ বাস্তবিক আরও বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আগামী ২রা এপ্রিল হইতে যে ডাকঘরের ঋণ-সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ২৫ টাকা দিলে ২০ টাকার, ৭৫ টাকা দিলে ১০০ টাকার ঋণের সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে। সুদ শতকরা ৬ টাকা, এবং চক্রবৃদ্ধি হিসাবে সুদ পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ নামে যদিও সুদ শতকরা ছয় টাকা, কাজে কিন্তু গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে ৭৫ টাকা দিলেই বৎসরে তাহার সুদ ৬ টাকা পাওয়া যাইবে; অর্থাৎ শতকরা ৮ টাকা সুদ পাওয়া যাইবে। তাহার উপর চক্রবৃদ্ধি ধরিলে সুদ আরও বেশী হয়। এই সুদের উপর ইন্‌কম্ ট্যাক্স্ বসিবে না। তাহা বিবেচনা করিলে, সুদ আরও বেশী হয়।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে, যে, গবর্ণ্মেণ্টের ধার করিবার ক্ষমতা ও বাজার-সম্ভ্রম (credit) কিরূপ কমিয়া গিয়াছে।

এইভাবে ঋণ করিয়া খরচ করিতে থাকিলে কিছু দিন পরে কেহ আর গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে সহজে ঋণ দিবে না. কোম্পানীর কাগজের দর খুব কমিয়া যাইবে, এবং গবর্ণ্মেণ্টের ধনাগারে যত সোনা মজুত আছে, তাহা অপেক্ষা খুব বেশী কাগজ-মুদ্রা অর্থাৎ নোট বাহির করিয়া গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে খরচ চালাইতে হইবে। তাহা হইলে ঐ কাগজ-মুদ্রাগুলার দাম খুব কমিতে থাকিবে; যেমন এখন অষ্ট্রিয়ার ক্রোনেন্ এবং জার্ম্মেনীর মার্কের অবস্থা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়েই ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্ যত টাকার নোট বাহির করিয়াছেন, তত সোনা সরকারী ধনাগারে নাই। বর্ত্তমান ১৯২৩ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে ভারত-গবর্ণ্মেণ্টের প্রচারিত কাগজ-মুদ্রা অর্থাৎ নোটের মোট মূল্য ছিল ১৭২ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫০৬ টাকা। নোটগুলিতে লেখা থাকে, "আমি [অর্থাৎ কর্ত্তা-প্রাপ্ত কোন গবর্ণ্মেণ্ট ভৃত্য] এই নোটবাহককে চাহিবা মাত্র (এত) টাকা দিতে অঙ্গীকার করিতেছি।" তাহা হইলে গবর্ণ্মেণ্টের হাতে সোনা রূপা প্রভৃতির ধাতুমুদ্রা কিম্বা ধাতুর চাপ ১৭২ কোটি টাকার থাকা উচিত। কিন্তু ঐ ২২শে জানুয়ারী তারিখে বাস্তবিক গবর্ণ্মেণ্টের হাতে নোটের পরিমাণের শতকরা ৬৩·৩৪ টাকার সোনা রূপা ছিল। ইহাও ভারতে ছিল না। ভারতবর্ষে গবর্ণ্মেণ্টের আধ পয়সারও সোনা "রিজার্ভ্" ছিল না। সোনার রিজার্ভ্ বিলাতে থাকে। তাহাতে বিলাতী বণিক্‌দের সুবিধা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষ যে সমান অংশীদার, এই মিথ্যা কথার ইহা একটি অতি সরেস নমুনা।

—

ব্যয়-সংক্ষেপকমিটিসমূহ

আয় ব্যয় সমান করা যাইতেছে না; নূতন ট্যাক্স্ বসাইয়া, পুরাতন ট্যাক্স্ বাড়াইয়া, ঋণ করিয়া, কিছুতেই কুলাইতেছে না। এইজন্য ভারত গবর্ণ্মেণ্ট্ ও প্রাদেশিক গবর্ণ্মেণ্ট্‌সকল ব্যয়সংক্ষেপ-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন,

এবং কোন কোন কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টও প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের কমিটি যে যে দিকে ব্যয় কমাইতে বলিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ১৯ কোটি টাকা বার্ষিক ব্যয় কমিবে।

যদি ধরা যায় যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট সাড়ে উনিশ কোটি টাকা ব্যয় কমাইতে রাজী হইবেন, তাহা হইলেই কি স্থায়ী ভাবে আয়ব্যয়ের সাম্য স্থাপিত হইবে? নিশ্চয়ই হইবে না। তাহার কারণ দেখাইতেছি।

কমিটি যে-সব ব্যয় কমাইতে বলিয়াছেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক ব্যয়, যাহা বৎসর বৎসর পুনঃ পুনঃ হয়। কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যয় ইহাতে ধরা হয় নাই। একটা যদি যুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই ত অনেক কোটি টাকা খরচ বাড়িয়া যাইবে, এবং যে বৎসর বা যে-যে বৎসর যুদ্ধ হইবে, সেই সেই বৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ইংরেজ সিবিলিয়ানরা চীৎকার জুড়িয়াছিলেন, যে, এখন সমস্ত জিনিষপত্রের দাম গত যুদ্ধের আগেকার সময় অপেক্ষা বাড়িয়াছে, অন্যান্য খরচও বাড়িয়াছে, অতএব তাঁহাদের বেতন প্রভৃতি বাড়ান উচিত। ইহা বিবেচনা করিবার জন্য এক রয়্যাল কমিশন শীঘ্রই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, এবং ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে, যে, কমিশন বেতন বাড়াইতে বলিবে। ইতিমধ্যেই এই কমিশন-প্রসঙ্গে বিলাতী পার্লেমেণ্টে কথা উঠিয়াছিল, যে, সিবিলিয়ানরাই সব টাকা লইয়া লইবে না ত? তাহা হইলে ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীরা কি পাইবে? অর্থাৎ মৎলবটা এই, যে, শুধু সিবিলিয়ানদের বেতন বাড়াইলে চলিবে না; সৈনিক কর্ম্মচারীদের বেতনও বাড়াইতে হইবে। তাহা হইলে অন্যান্য যে-সব বিভাগে ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত ইংরেজরা কাজ করে, তাহাদের বেতন আদিও বাড়াইতে হইবে। ইহাতে বার্ষিক কত টাকা ব্যয় বাড়িবে, বলা যায় না।

তাহার পর, যদি ধরাও যায়, যে, বর্ত্তমানে যে যে বিভাগে যত ব্যয় হয়, তাহা আর বাড়িবে না, এবং আকস্মিক ব্যয়ও কিছু হইবে না, তাহা হইলেই কি আয়-ব্যয়ের সমতা [illegible]বর রক্ষিত হইতে পারিবে?

একটা কথা অনেক দিন হইতে শুনা যাইতেছে, যে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের রণতরী ভারতবর্ষকে জলশত্রু হইতে রক্ষা করে, ভারতবর্ষ তাহার জন্য কিছু দেয় না, ভারতবর্ষের কিছু দেওয়া উচিত, ইত্যাদি। এই বাবতে ভারতের ঘাড়ে কবে কত টাকা চাপান হইবে, কে বলিতে পারে? আর, যদি চাপান নাও হয়, তাহা হইলেও ভারতবর্ষেরও সমুদ্রের দিক্ দিয়া আত্মরক্ষার সামর্থ্য ত থাকা উচিত। পরের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। এদেশ যে অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়েরা আসিয়া দখল করিতে পারিয়াছে, তাহার একটা প্রধান কারণ এই, যে, ইউরোপীয়দের রণতরী ছিল, এদেশী রাজা, নবাব, বাদশাহদের রণতরী ছিল না বলিলেই হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রীয় নেতা আঙ্গ্রের রণতরী যত দিন নষ্ট হয় নাই, তত দিন ইংরেজরা সেদিকে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহা কয়েক বৎসর হইল "প্রবাসীতে" মেজর বামনদাস বসু মহাশয় দেখাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নিজের রণতরী চাই; স্থল-যুদ্ধের মত জলযুদ্ধেও ভারতীয়দিগের দক্ষতা লাভ করা চাই। ইহার নিমিত্ত বিস্তর টাকার প্রয়োজন। এই টাকা আয় বাড়াইয়া বা ব্যয় কমাইয়া জোগাইতে হইবে।

ভারতের নিজের কেবল যুদ্ধজাহাজই যে চাই, তা নয়, বাণিজ্য-জাহাজও চাই। পৃথিবীতে যে-সব দেশ সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত—যেমন ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি—তাহারাও সরকারী রাজস্ব হইতে বাণিজ্যজাহাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য ও তাহাদের সুবিধার জন্য অনেক টাকা খরচ করিয়া থাকে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত এস্ এন্ হাজী কর্ত্তৃক লিখিত ষ্টেট্ এড্ টু ন্যাশন্যাল শিপিং * নামক পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষের লোকদের ত সমুদ্রপথে বিদেশগামী জাহাজ নাই বলিলেই চলে; শিন্ধিয়া ন্যাভিগেশ্যন্ কোম্পানীর সামান্য যাহা আছে, তাহারও অবস্থা ভাল নহে। ভারতের লোকদের নিজস্ব সমুদ্রগামী জাহাজ বিস্তর না হইলে দেশী লোকদের কারখানা-শিল্পের এবং দেশী লোকদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি

* State Aid to National Shipping, by S. N. Haji, B. A. (Oxon), Barrister-at-law, Hirji Mansion, Sandhurst Road, Bombay.

কখনও হইবে না। সমুদ্রগামী জাহাজ যথেষ্টসংখ্যক নির্ম্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা কারবার চালাইতে হইলে আইনের সাহায্য যেমন চাই, তেমনি সরকারী টাকার সাহায্যও খুব চাই। এই টাকা আয় বাড়াইয়া ও ব্যয় কমাইয়া জোগাইতে হইবে।

তার পর, এ কথাও আজকাল খবরের কাগজের সাহায্যে শিক্ষিত লোকেরা জানিয়াছেন, যে, শিক্ষার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকল যথেষ্ট খরচ করেন না। প্রথমতঃ, দেশের সব পুরুষ ও নারীকে লিখনপঠনক্ষম করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে সকল বালকবালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। তাহার মত যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, এবং প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যাহারা বড় হইয়াছে, অথচ নিরক্ষর, তাহাদেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রাম্য লোকদিগকে (এবং ভারতের সকল প্রদেশে গ্রামবাসীর সংখ্যাই বেশী) উৎকৃষ্ট আধুনিক প্রণালীতে কৃষি শিখাইতে হইবে, এবং গ্রামেই থাকিয়া যে-সব শিল্পের কাজ করা যাইতে পারে, তাহা শিখাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা কৃষিকাজ ছাড়া আরও কিছু করিয়া আয় বাড়াইতে পারে, এবং কৃষিকাজ করিয়া যে সময় উদ্বৃত্ত থাকে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আলস্য দূর করিতে পারে। নানা সভ্য দেশে যত রকম উপায়ে চাষের উন্নতি হইতেছে, তাহার পরীক্ষা ভারতে করিয়া দেখিতে হইবে, যে, সেই-সব উপায় এদেশে কতদূর ও কি প্রকারে অবলম্বিত হইতে পারে।

ইহার উপর বড় বড় কারখানা-শিল্পের কাজ শিখাইবার ও চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চ-বিদ্যালয়-সকলের বিষয় চিন্তনীয়। এইগুলিতে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি এদেশে হয় নাই। শিক্ষা-প্রণালীর কত উন্নতি সভ্যদেশ-সকলে হইতেছে, শিশুদের মনস্তত্ত্ব, বালক-বালিকা ও যুবা বয়সের লোকদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জগতে কত যে বাড়িতেছে, তাহার খবর পর্য্যন্ত আমরা রাখি না। শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্যই বিস্তর শিক্ষালয়ের প্রয়োজন।

সকল বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এবং বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, প্রভৃতি গবেষণার জন্য যেরূপ বৃহৎ আয়োজনের আবশ্যক, তাহার শতাংশের এক অংশও ভারতবর্ষে নাই। এই-সকলের জন্য চিরকাল অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইবে; এবং তাহা থাকিলে আমরা কখনও মানুষ হইতে পারিব না।

সকল সভ্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের শিশুমৃত্যু ও সাধারণ মৃত্যুর হার বেশী। ইহা কমাইতে হইলে, দেশের ধন বৃদ্ধি দ্বারা মানুষকে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যসংগ্রহে সমর্থ করিতে হইবে, অধিকতর স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ করিতে হইবে, জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং গৃহ পল্লী গ্রাম ও সহরের স্বাস্থ্য রক্ষায় মনোযোগী ও সমর্থ করিতে হইবে, এবং ম্যালেরিয়াদির কারণ দেশ হইতে দূর করিতে হইবে।

এই-প্রকারে নানাদিকে দেশের উন্নতি করিতে হইলে বিস্তর টাকার প্রয়োজন হইবে। আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস দ্বারা এই টাকা জোগাইতে হইবে।

যাহারা কর্ম্মবিমুখ, নিরুদ্যম, যাহারা মনে করিতেই পারে না, যে, এদেশ আবার অন্য সব সভ্য দেশের মত সমৃদ্ধ শক্তিশালী ও শ্রীমান্ হইতে পারে, তাহারা বলিতে, অন্ততঃ মনে করিতে, পারে, "কাজ কি বাপু এত হাঙ্গামায়? আপাততঃ কোন প্রকারে আয় ব্যয় সমান হইলেই বাঁচা যায়। উন্নতি নাই বা হইল?" কিন্তু তাহাতে নিষ্কৃতি কোথায়? উন্নতি না হয় না হইল, কিন্তু মানুষকে ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের ও জেলার এবং অনেক দেশী রাজ্যের লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যথেষ্ট খাদ্য চাই এবং রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া চাই। খাদ্য যথেষ্ট সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার চাই। তাহার জন্য নীরোগ শরীর, কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের জ্ঞান, বিদেশগামী জাহাজ, ইত্যাদি কত কি প্রয়োজন। নীরোগ বলিষ্ঠ শরীরের জন্য দেশ, শহর, গ্রাম, পল্লী, ও গৃহস্থের বাড়ী, স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, এবং নিজের নিজের শরীরকে সুস্থ রাখা চাই। ইহার জন্য টাকাও চাই, জ্ঞানও চাই। অতএব কোন ক্রমে

আপাততঃ আয় ব্যয় সমান করিতে পারিলেই চলিবে না। পরে যে-যে দিকে ব্যয়বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, তাহার ভাবনাও এখন হইতেই ভাবিতে হইবে, এবং কি-প্রকারে ব্যয় কমিতে পারে, ও আয় বাড়িতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা এখন হইতেই করিতে হইবে।

—

ব্যয় হ্রাস ও আয় বৃদ্ধির উপায়

ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি করিবার জন্যই এখনই কোন কোন দিকে ব্যয় বাড়াইতে হইবে; সুতরাং অপর কোন কোন দিকে ব্যয় কমাইতে হইবে। মনে করুন, এখন সরকারী আয় আছে মোট এক শত টাকা। সরকারী আয় বাড়াইতে হইলে প্রজাদের আয় বাড়াইতে হইবে; কারণ সরকারের টাকা প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্স্ হইতে আসে, এবং প্রজাদের আয় বাড়িলে তবে তাহারা অধিক ট্যাক্স্ দিতে পারে। প্রজাদের আয় বৃদ্ধির মানে তাহাদের চাষের শিল্পের ও বাণিজ্যের আয় বৃদ্ধি। তাহা হইতে পারে, যদি তাহারা এখনকার চেয়ে সুস্থ সবল ও পরিশ্রমে সমর্থ হয়, যদি শিক্ষা দ্বারা কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান বাড়াইয়া দেওয়া হয়, যদি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও আদর্শ কারখানা দ্বারা তাহাদিগকে চাষের জিনিষ ও কারখানার জিনিষ উৎপন্ন করিবার পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়, যদি প্রয়োজন-মত মূলধন সহজে অল্পসুদে পাইবার উপায় করিয়া দেওয়া হয়, যদি চারিত্রিক উন্নতি-বশতঃ দেশের লোক পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া সমবেত ভাবে কাজ করিতে শিখে, যদি বিদেশী জিনিষের অন্যায় প্রতিযোগিতা আইন দ্বারা নিবারিত হয়, যদি দেশী লোকদের সমুদ্রবাহী বিদেশগামী বাণিজ্যজাহাজ থাকে, ইত্যাদি। ইহার অনেকগুলি "যদি"ই অর্থব্যয়সাপেক্ষ। যখন প্রজাদের আয় বাড়িবে ও তাহারা বেশী ট্যাক্স্ দিবে, তখন সরকার বেশী খরচ করিতে পারিবেন বটে; কিন্তু প্রজাদের আয় বাড়িয়া তাহা হইতে সরকারী আয় বাড়িবার পূর্ব্বেই, প্রজাদের আয় বাড়াইবার নিমিত্তই যে ব্যয় করিতে হইবে, তাহার টাকা কোথা হইতে আসিবে? ইহার একমাত্র উত্তর ব্যয়সংক্ষেপ।

কোন্ কোন্ দিকে ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে, তাহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকলের ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটিসমূহ দেখাইতেছেন। তাঁহারা বড় বড় রিপোর্ট্ লিখিয়া ইহা দেখাইয়াছেন। আমাদের অত স্থান নাই, এবং বিস্তারিত যথেষ্ট জ্ঞানও নাই। আমরা স্থূল স্থূল কয়েকটা কথা মাত্র বলিব।

ভারতবর্ষের সরকারী ব্যয়বাহুল্যের কারণ প্রধানতঃ তিনটি বা চারিটি। সেই কারণগুলির নিরসন ব্যতিরেকে যথেষ্ট ব্যয় হ্রাস হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন। ইংরেজরা শীতের দেশের লোক। সেখানে মানুষকে খাইতে হয় বেশী, পরিতে হয় বেশী, এবং গ্রীষ্মের দেশের চেয়ে ভলি ঘর বাড়ীও তাহাদের দরকার। তা ছাড়া, ইংরেজেরা মোটের উপর আমাদের চেয়ে ধনী জাতি বলিয়া এমন কতকগুলি আরামের ও বিলাসের জিনিষে অভ্যস্ত, যাহা আমাদের না হইলেও চলে। এই সব কারণে তাহাদের খরচ বেশী। তা ছাড়া, কোন দেশের মানুষ স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে গেলে স্বভাবতঃ বেশী রোজ্গারের প্রত্যাশা করে। সুতরাং ভারতবর্ষের সরকারী কাজ যদি ইংরেজের দ্বারা চালাইতে হয়, তাহা হইলে দেশী লোকের দ্বারা কাজ চালাইলে যত খরচ হইত, তার চেয়ে বেশী খরচ হইবেই। যাচ প্রভুত্ব যখন ইংরেজদের হাতে, তখন তাহারা এ দেশের বড় বড় কাজগুলি নিজেদের জন্য রাখিবে, এবং ঐ পদগুলির বেতনও অধিক রাখিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ২।১ টা বড় কাজ তাহারা নিজেদের উদারতা ও ন্যায়-পরায়ণতা দেখাইবার জন্য দেশী লোকদিগকে দিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ উচ্চপদ যে তাহারা নিজেদের অধিকারে রাখিবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ঐ পদগুলির বেতন কমাইবার ক্ষমতা ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সভার নাই, ভারতের বড়লাটেরও নাই। ভারত-শাসন-সংস্কার আইন (Reforms Act) অনুসারেও ওগুলির সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা ভারতসচিবের হাতে আছে। সুতরাং ব্যয়হ্রাস করিতে হইলে ঐ পদগুলির বেতন কমাইবার ক্ষমতা আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে, এবং উচ্চতম পদে পর্য্যন্ত ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত করিয়া ইংরেজদিগকে বেদখল করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে

হইবে। সেই সঙ্গে এটাও বলা গোড়াতেই দরকার, যে, ঐ-সব উচ্চ পদের কাজ চালাইবার মত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দেশহিতৈষণা ও মানবহিতৈষণা, চরিত্র এবং দৃঢ়তাও চাই। আমাদের জাতির মধ্যে কাহারও এ-সব গুণ নাই, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট ভাষায় বলা দরকার, যে, ইংরেজের আগমনের পূর্ব্বে যাহারা ভারত-বর্ষের শাসন-কার্য্য করিত, তাহাদের অধিকাংশের ঐসব গুণ থাকিলে দেশ বিদেশীর করতলগত হইত না। দেশ যে বিদেশীর অধীন হইয়াছিল, তাহার একটা প্রধান কারণ দেশী অনেক প্রধান প্রধান লোকদের চরিত্রহীনতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতা।

ব্যয়সংক্ষেপের একটা প্রধান উপায় ইংরেজকে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম পদসকল হইতে বেদখল করা। দেশ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, এই উপায়ে ব্যয়হ্রাসও হইতে পারে। কিন্তু কাগজে লেখা, মুখে বলা, মনে কল্পনা করা, যত সোজা, কাজে দেশকে স্বাধীন করা তত সোজা নহে।

দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন আপাততঃ করিতে না পারিলেও জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব যতটা প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গল। ইংরেজের হাতের যতগুলা কাজ আমাদের হাতে আসে, তাহাতে কিছু সুবিধা হইতে পারে যদি ইংরেজদের সমান দক্ষ দেশী লোকেরা ইংরেজদের চেয়ে কম বেতনে কাজ করেন। আমাদের মনে হয়, নিয়ম চালাইলেই তাঁহারা করিবেন।

ভারতের ব্যয়বাহুল্যের আর-একটি কারণ, ভারত-বর্ষের টাকায় এমন অনেক কাজ করা হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের কোন প্রয়োজন নাই, কিম্বা ভারতবর্ষের প্রয়োজন অল্প ও ইংলণ্ডের প্রয়োজন বেশী। অনেক যুদ্ধে ভারতবর্ষের গোরা ও সিপাহী সৈন্য লাগান হইয়াছে যাহাতে ভারতের স্বার্থ ছিল না, বা সামান্যই ছিল। কখন কখন ভারতবর্ষের টাকাতেই তাহারা লড়িয়াছে। যখন ভারতবর্ষের টাকায় তাহারা লড়ে নাই, তখনও ঐ-সব সৈন্য সংগ্রহ করিতে ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে এবং অস্ত্র শস্ত্র প্রথমতঃ কিনিয়া দিতে ভারতের টাকাই খরচ হইয়াছে। অতএব ব্যয় হ্রাস করিতে হইলে, কোন যুদ্ধে ভারতের সৈন্য যোগ দিবে, বা না দিবে, এবং যোগ দিলে তাহাদের সংগ্রহ, শিক্ষা, সজ্জা প্রভৃতির ব্যয়ের কত অংশ ইংলণ্ড দিবে, তাহা স্থির করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ভারতবর্ষের থাকা দরকার। ইহারও মানে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, কিম্বা স্বরাজ, কিম্বা আভ্যন্তরিক আত্মকর্তৃত্ব অর্জ্জন।

ভারতের অষ্টাদশ শতাব্দীর ও উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন, যে, ইংরেজরা কেবলমাত্র বাহুবলে ভারতবর্ষের প্রভু হয় নাই। কিন্তু ভারত-অধিকার-কার্য্যে যে পরিমাণে বাহুবল তাহাদের সহায় ছিল, সেই বাহুগুলা অধিকাংশ স্থলে দেশী লোকদের। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, ঐ দুই শতাব্দীতে ইউরোপীয় যুদ্ধরীতি, যুদ্ধশিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্র ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও ঠিক, যে, দেশী সিপাইরা ইউরোপীয় যুদ্ধরীতিতে শিক্ষিত হইলে ও তাহাদেরই মত অস্ত্রশস্ত্র পাইলে গোরা সৈন্য অপেক্ষা যুদ্ধশক্তিতে কখনও হীন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এইজন্য বলি, ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবার জন্য আধুনিক উৎকৃষ্টতম রীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও উৎকৃষ্টতম অস্ত্রে সজ্জিত সিপাহীরাই যথেষ্ট। ভারতবর্ষের জন্য গোরা সৈন্যের প্রয়োজন নাই, এবং সব-অর্ল্টার্ন্ হইতে আরম্ভ করিয়া জঙ্গী লাট পর্য্যন্ত এত ব্রিটিশ সেনানায়কেরও প্রয়োজন নাই। এগুলি রাখা হইয়াছে দুই কারণে—(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ভারতের ব্যয়ে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্যকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, (২) ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের অধীন রাখিবার জন্য। অতএব সমুদয় গোরা সৈন্য এবং অধিকাংশ গোরা কর্ম্মচারীকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় দেওয়া উচিত;—অন্ততঃ পক্ষে তাহাদের বেতনাদি সমুদয় ইংলণ্ডের দেওয়া উচিত। আমরা স্বাধীনতা, স্বরাজ বা আভ্যন্তরীন সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব না পাইলে ইংরেজ যে ইহাতে সম্মত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে, ভারতীয় ব্যাপারে শ্বেত সৈনিক কর্ম্মচারীদের প্রভাবের প্রাবল্য থাকিতে থাকিতে আমরা যে প্রকৃত আভ্যন্তরীন আত্মকর্তৃত্ব পাইব, তাহারও সম্ভাবনা কম। এই প্রভাব কমাইতে হইবে।

সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীরা যে-যে কারণে অধিক বেতন দাবী করে ও পায়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইংরেজকে বেশী বেতন দিতে হয় বলিয়া তাহাদের মত পদে নিযুক্ত দেশী লোকদিগকেও বেশী বেতন দিতে হয়। শুধু তাই নয়। জজেরা বেশী বেতন পায় বলিয়া সদরালা ও মুন্সেফদিগকেও বেশী বেতন দিতে হয়; ম্যাজিষ্ট্রেটরা বেশী বেতন পায় বলিয়া ডেপুটী-সবডেপুটীদিগকেও বেশী বেতন দিতে হয়। ইংরেজ ইম্পীরিয়াল অধ্যাপকগণ (I.E.S.) বেশী বেতন পায় বলিয়া প্রাদেশিক অধ্যাপকদিগকেও বেশী টাকা দিতে হয়। বেতনের হার সকল বিভাগেই কমাইতে হইবে। ইহা আমরা জানি, যিনি যেমন বেতন পাইতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার খরচও তেমনি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বেতনের হার কমাইলে অধিকতর বেতন প্রাপ্তিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের কষ্ট হইবে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য এই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ইহাতে খুব বেশী আপত্তি হইলে কেবল মাত্র নবনিযুক্ত লোকদের বেতন ন্যূন নূতন হার অনুসারে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

কথা উঠিতে পারে, বেতন কমাইলে ঘুস লওয়া বাড়িবে। খুব কমাইলে একথা প্রথম প্রথম সত্য হইতেও পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সত্য নহে, যে, বেতন কম দিলেই ঘুস বাড়ে। বাংলা দেশে মুন্সেফেরা হাইকোর্টের জজদের মতই ঘুস লওয়ার অপবাদ হইতে নির্মুক্ত। তা ছাড়া, ঘুস লওয়া না-লওয়া মানুষের শিক্ষা, সঙ্গ, চরিত্র, জাতীয় রীতি, প্রভৃতির উপরও নির্ভর করে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ইংরেজ আমলে খুব বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু ইহার কারণ কতকটা বহুকালাগত রীতি ও ধারণার মধ্যেও পাওয়া যায়। "বহুকালাগত" বলিলাম, কিন্তু কতদিন আগে হইতে এই রীতি ও ধারণা চলিয়া আসিতেছে যথেষ্ট ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাবে ঠিক্ বলিতে পারিলাম না। ধারণাটি এই, যে, রাজা যেমন প্রজাদের প্রভু, রাজকর্ম্মচারীরাও তেমনি প্রজাদের মনিব। বস্তুতঃ রাজা ও রাজকর্ম্মচারীরা, সর্ব্বদেই যে প্রজাদের বেতনভোগী সেবক মাত্র, কার্য্যতঃ এই হৃদ্‌গত ধারণা ঐসব শ্রেণীর কয়জন লোকের আছে জানি না। প্রাচীন কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্স্‌কে রাজার বেতন বলা হইয়াছে। অল্পদিন আগে আফ্‌গানিস্থানের আমীর আমানুল্লাহ্ খাঁ নিজেকে প্রজাদের সেবক বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতে ও অন্য কোন কোন দেশে বর্ত্তমান কালেও রাজকর্ম্মচারীরা অনেকে মনে করেন, যে, জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য ও আরাম তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা। এই ধারণা না বদ্‌লাইলে সরকারী কাজের ব্যয় যতটা কমিতে পারে, তত কমিবে না।

এই ধারণা বদ্‌লান চাই। অধিকন্তু রাজকর্ম্মচারীদের মনে করা চাই, যে, যেমন দেশের নানা জনহিতকর সভাসমিতির অনেক কর্ম্মী বিনা বেতনে দেশের সেবা করেন, তাঁহারাও তেমনি দেশের সেবা করিতেছেন—প্রভেদ এই, যে, তাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া দেশের সেবা করিতে পারিবেন বলিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কিছু বেতন লইয়া থাকেন।

জাপানের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের বক্তব্য বিশদ ভাবে বুঝা যাইতে পারে। জাপান শীতের দেশ; অতএব জাপানীদের সংসার-খরচ আমাদের চেয়ে বেশী হইবার কথা। জাপানীরা আমাদের চেয়ে ধনী জাতি, কারণ তাহাদের কৃষি শিল্প বাণিজ্য আমাদের চেয়ে উন্নততর, এবং শিল্প ও বাণিজ্য আমাদের চেয়ে বিস্তৃততর। সে কারণেও তাহাদের সংসার-খরচ আমাদের চেয়ে বেশী হইবার কথা; অথচ দেখিতে পাই, স্বাধীন এবং প্রবলতম দেশের সমান পদবীতে প্রতিষ্ঠিত এই জাপানের প্রধান মন্ত্রী মাসে দেড় হাজার টাকা, এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা এক হাজার টাকা মাত্র বেতন পান। জাপানী প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মাসে সাড়ে সাত শত টাকা বেতন পান। ইহাদের দেশে ইহা অপেক্ষা বেশী রোজ্‌গারের পথ নাই, এমন নহে; কেন না, জাপানের বণিক্ এবং কারখানার ও জাহাজের মালিক এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা কোটীপতি বা লক্ষপতি। জাপানী প্রধান মন্ত্রী প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি লোকেরা নিকৃষ্টদরের মানুষ বলিয়া কম বেতন লয়েন, এমনও নহে; কেন না,

তাঁহাদিগকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও প্রবলতম দেশসকলের ঐ ঐ পদের লোকদের সহিত সমকক্ষতা করিতে হয়, এবং তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই করিয়া আসিতেছেন।

সরকারী কাজ সম্বন্ধে জাপানী জাতির মনের ভাব, এবং তাহাদের স্বদেশপ্রেম যদি আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের দেশের সরকারী কাজের ব্যয় হ্রাস যতদূর সম্ভব হইতে পারিবে। নতুবা, ভারত যদি কখনও স্বাধীনও হয়, তখনও যদি সরকারী কর্ম্মচারীরা রাজার হালে থাকিবার, নবাবী করিবার, প্রভুত্ব করিবার বাসনা পোষণ করেন, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতেও আয় ব্যয় সমান হইবে না, কিম্বা যদি সমান হয়, তাহা হইলেও দেশহিতকর সমুদয় সরকারী কার্য্যবিভাগকে শীর্ণ রাখিয়া ও বঞ্চিত করিয়া হইবে।

যে-সব স্বাধীন দেশের সরকারী কাজ জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা প্রণীত আইন ও নিয়ম অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়, সেখানে কাগজ, কলম, পেন্সিল, ছুরী, দোয়াত ও নানা রকম ফর্মের অপব্যয় ও অপব্যবহার কি পরিমাণে হয় বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতবর্ষে যে খুব হয়, এবং আগে আরো বেশী হইত, তাহা আমরা জানি। আমরা যখন ইস্কুলে পড়িতাম, তখন আমাদের যে-সব সহপাঠীদের অভিভাবক সরকারী চাকরী করিতেন, তাহাদের অনেকের খাতা, কলম, পেন্সিল ও ছুরী কিনিতে হইত না। অভিভাবকেরা সরকারী এইসব জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে আনিয়া তাহাদিগকে দিতেন। তা ছাড়া, আমরা কোন কোন সরকারী দপ্তরীকে গাদা গাদা সরকারী ফর্ম্ ও অন্যবিধ কাগজ চুরি করিয়া বিক্রী করিতে দেখিতাম। এখনও মনি-অর্ডার, টেলিগ্রাফ, প্রভৃতির ফর্মের বিস্তর অপচয় হয়। তদ্ভিন্ন, সরকারী চিঠিপত্রের জন্য অনাবশ্যক বড় বড় চিঠির কাগজ ও লম্বা লম্বা খাম অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। যে-সব চিঠি খুব সরেস কাগজে না লিখিলেও চলে, সেগুলাও কখন কখন খুব ভাল কাগজে লেখা হয়। এইরূপ নানা রকমে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর অপব্যয় হয়।

স্বাধীন গণতন্ত্র দেশসকলের মত এদেশে আমরা ও গবর্ণমেণ্ট এক নহি, জানি; সম্ভবতঃ যখন স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিয়া এক হইব, তখন সরকারী জিনিষে মমতাবোধ জন্মিবে। কিন্তু এখনও সরকারী সব জিনিষ আমাদেরই প্রদত্ত ট্যাক্সের দ্বারা কেনা হয়। সেই-সব জিনিষের যত বাজে খরচ হইবে, এবং সেই-সকলের জন্য যত বেশী টাকা খরচ হইবে, ততই শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় সরকারী কাজের জন্য টাকার অকুলান হইবে। অবশ্য কোন দিকে অপচয় ও অপব্যয় নিবারণ দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ হইলেই যে গবর্ণমেণ্ট সেই উদ্বৃত্ত টাকা শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতে টাকা থাকিলে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা অন্ততঃ সদ্ব্যয়ের দাবী করিতে পারেন।

বেশী সুদে সরকারী ঋণের আধিক্যের আর-এক কুফল

বেশী সুদে সরকারী ঋণ গ্রহণ বাড়িয়া চলিতে থাকিলে কিরূপ কুফলের সম্ভাবনা, তাহা আগে কিছু বলিয়াছি। আর-একটি কুফলেরও সম্ভাবনা আছে।

আমাদের দেশের লোকেরা পণ্যশিল্পের কারখানায় মূলধন খাটাইতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন, ইহা জানা কথা। কারণ এবিষয়ে এদেশে অভিজ্ঞতা কম বলিয়া লোক্‌সানের ভয়ে লোক অগ্রসর হইতে চায় না; তার চেয়ে বরং জমীদারী কেনা, ও বেশী সুদে মহাজনী করা ভাল মনে করে। অবশ্য এরূপ মহাজনীতেও মধ্যে মধ্যে ক্ষতি হয়।

যাহা হউক, লোকে মনে করে, যে, গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দিলে তাহা পাওয়া যাইবেই; অধিকন্তু সুদপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। আগে তবু সুদ কম ছিল; কিন্তু আমরা আগে দেখাইয়াছি, যে, এখন গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিয়া শতকরা আট টাকা সুদ পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহার উপর ইনকম্ ট্যাক্স্ নাই। কোন কারখানার অংশ কিনি[illegible] নিশ্চয়ই লোক্‌সান্ হইবে না, এবং শতকরা আট [illegible] লাভ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, [illegible]

ইহা বলা যায়? এইজন্য নূতন নূতন জিনিষ তৈরী করিবার কারখানার দিকে লোকের ঝোঁক ততই কমিবে গবর্ণমেণ্ট বেশী সুদ দিয়া যতই বেশী ঋণ করিতে থাকিবেন।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে যাহারা ঋণ দেয়, তাহাদেরও সাবধান হওয়া দুটি কারণে উচিত। কোম্পানীর কাগজের দর সব সময় ঠিক থাকে না। কেহ হয়ত ৯৪ টাকা দিয়া ১০০ টাকার কাগজ কিনিলেন, পরে তাহার দাম কমিয়া যাওয়ায় তাঁহার ক্ষতি হইল। ইহা একটা আনুমানিক ব্যাপার নহে, সত্যসত্যই এরূপ ঘটিয়াছে। যুদ্ধের আগে যাহারা সাড়ে তিন টাকা সুদের কাগজ কিনিয়াছিল, তখন ১০০ টাকার কাগজের দাম ৯০এর উপর ছিল। এখন তাহার দাম বোধ করি ৫০ হইতে ৬৮ টাকার মধ্যে। ইহাতে ক্রেতাদের অন্ততঃ শতকরা ৩০।৩৫ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এখন যে-সব ৫॥০।৬ টাকা সুদের কাগজ লোকে কিনিতেছে, ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট আরও বেশী সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইলে, এই ৫॥০।৬ টাকা সুদের কাগজগুলিরও দাম যে কমিয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব স্বার্থের খাতিরে ঋণদাতাদের সাবধান হওয়া উচিত।

দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও ঋণদাতাদের ঋণদানে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ, যতদিন গবর্ণমেণ্ট বেশী সুদ দিয়াও ঋণ পাইবেন, ততদিন সরকারী ব্যয়-বাহুল্য ও অপব্যয় কিছুতেই নিবারিত হইবে না। কেন না, গবর্ণমেণ্ট মানে প্রধানতঃ যেমানুষগুলি, তাহাদের মধ্যে অনেকে এদেশে কখন আসে না, এবং যাহারা আসিয়া এদেশে চাকরী করে, তাহারাও সঞ্চিত টাকাকড়ি ও অভিজ্ঞতা লইয়া স্বদেশে চলিয়া যায়। চরমে ভারতের মঙ্গল অমঙ্গল কি হইবে, তাহা স্বভাবতঃ তাহাদের ভাবনার বিষয় নহে।

লবণের মাশুল বৃদ্ধি

১৯২৩-২৪ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়ায় রাজস্বমন্ত্রী লবণের মাশুল মণকরা ১।০ হইতে বাড়াইয়া ২॥০ টাকা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ৪॥০ কোটি টাকা আয় বাড়িবে বলিয়া তিনি অনুমান করেন। দেশী কাগজওয়ালারা এই বৃদ্ধির বিরোধী, ইংরেজ কাগজওয়ালারা ইহার পক্ষে। তাঁহারা মনে করেন, যে, এই বৃদ্ধি মাথা-পিছু অতি সামান্যই হইবে; কেন না, এক-একজন মানুষ খুব কম নুন খায়। কিন্তু গরীব লোকদের আয়ও অতি সামান্য এবং তাহাদের পরিবারও বড়। নুনই অনেক স্থলে তাহাদের খাদ্যকে স্বাদু করিবার একমাত্র উপায়। মানুষের ও গবাদির স্বাস্থ্যের জন্যও নুনের দরকার। নুনের মাশুল না বাড়াইয়া বরং তুলিয়া বা কমাইয়া দেওয়া উচিত।

কোন কোন মডারেট্ এই বলিয়া মাশুল বৃদ্ধিতে আপত্তি করিতেছেন, যে, ইহা অসহযোগীরা দেশে অসন্তোষবৃদ্ধির উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিবে। তাহাই যদি তাঁহাদের মতে প্রধান আপত্তি হয়, তাহা হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন দেশী সভ্যেরই মাশুল বৃদ্ধিতে সম্মত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি গোপনে গোপনে তাঁহাদিগকে কথা দিয়া থাকেন, যে, ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা রাজী হইতেও পারেন।

আপত্তিকারীদিগকে গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন, "তোমরা যদি নুনের মাশুল বৃদ্ধি না চাও, তাহা হইলে ঐ ৪॥০ কোটি টাকা কিরূপে পাওয়া যাইবে, তাহার উপায় বলিয়া দাও।" আমরা বলি, "উপায় স্থির করা মহাশয়দেরই কাজ। মহাশয়েরা যদি উপায় স্থির করিতে না পারেন, কাজে ইস্তফা দিন, এবং যাহারা পারেন, তাঁহারা কার্য্যভার গ্রহণ করুন। 'মহাশয়েরা মোটা মোটা বেতন ভোগ করিবেন, এবং প্রভূত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন, আর উপায় বলিয়া দিব আমরা, এ-প্রকার চমৎকার কার্য্য-বিভাগে আমরা রাজী নহি।"

কিন্তু উপায় যে নাই, তাহা নয়। অনেক পদের বেতন কমান যাইতে পারে, অনেক অকেজো পদ উঠাইয়া দিতে পারা যায়। তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া বেশী মাশুলের পথটাই দেখাই।

যত রকম মদ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে, এবং চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি যত রকম আকারে তামাক বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে, সেগুলি যে বিলাস-দ্রব্য এবং অনিষ্টকর বিলাস-দ্রব্য, লবণের মত একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ নহে, তাহা স্বীকৃত হইবে। তামাক বিদেশ হইতে ১৯১৯-২০, ১৯২০-২১, ও ১৯২১-২২ সালে যথাক্রমে ২,০১,৮৬,৫৬০ টাকা, ২,৯৫,৯১,২৩০ টাকা ও ১,৬৫,০৫,৭৬৩ টাকার আসিয়াছিল। তামাকের উপর শতকরা একশত টাকা কর বসাইলেও অন্যায় হইবে না। তাহা না করিয়া কিছু কম করিয়া বসাইলেও বিস্তর আয় হইতে পারে। তাহার পর মদ কত আসে দেখা যাক্। পূর্ব্বোক্ত তিন বৎসরে বিদেশ হইতে যথাক্রমে ২,৯০,৭৬,৬৫০ টাকা, ৪,২১,১৭,৩৬০ টাকা ও ৩,৩৭,২০,০৫১ টাকার মদ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ইহার উপরও খুব বেশী মাশুল বসান উচিত। তামাক ও মদ এবং লবণ ঐ তিন বৎসরে মোট আসিয়াছিল—

সন	১৯১৯-২০	১৯২০-২১	১৯২১-২২
তামাক	২০১৮৬৫৬০	২৯৫৯১২৩০	১৬৫০৫৭৬৩
মদ	২৯০৭৬৬৫০	৪২১১৭৩৬০	৩৩৭২০০৫১
মোট	৪৯২৬৩২১০	৭১৭০৮৫৯০	৫০২২৫৮১৪
লবণ	২০৯৫২৪০০	২২৮১৩৪৫০	১৫১৬৮০৫৭

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, লবণ অপেক্ষা অনেক বেশী টাকার তামাক ও মদ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে। অতএব ঐ দুটি বিলাস-দ্রব্যের উপর ট্যাক্স্ বসাইয়া লবণের মাশুল অপেক্ষা বেশী টাকা তুলিতে পারা উচিত।

পাট ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলা দেশের, একচেটিয়া বলিলেও চলে। গত তিন বৎসরে কাঁচা (অর্থাৎ যাহা হইতে সুতা বা চট্ প্রস্তুত হয় নাই) পাট ২০,৬৯,৯৪,৫২০ টাকা, ১৬,৩৬,০৮,৬৪০ টাকা ও ১৪,০৪,৯১,৫৯৭ টাকার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার উপর বেশী করিয়া ট্যাক্স্ বসাইলে অনেক আয় হইতে পারে। তা ছাড়া পাট হইতে প্রস্তুত বহু কোটি টাকার পণ্য দ্রব্যও ঐ তিন বৎসরে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। পাট ও পাট হইতে প্রস্তুত পণ্য দ্রব্য ১৯১৯-২০, ১৯২০-২১, ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৭৪,৭১,৪৯,১৫০ টাকা, ৬৯,৩৫,৫৫,৪৪০ টাকা ও ৪৪,৯৯,৫৭,১৮৬ টাকার বিদেশে গিয়াছিল। ইহার উপর বেশী করিয়া ট্যাক্স্ বসাইলে অনেক আয় হইতে পারে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওকালতী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও পুনর্গঠন জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু যে বিল দুটি পেশ্ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জানিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট্ ঐ দুটি সেনেটের নিকট প্রেরণ করেন। সেনেট এক কমিটির উপর রিপোর্ট্ করিবার ভার দেন। ঐ রিপোর্ট্ সেনেটের যে অধিবেশনে অনুমোদিত হয়, তাহাতে অনেক ফেলো (সেনেটর সভ্য) বক্তৃতা করেন। স্যার্ আশুতোষ চৌধুরী বিদ্রূপ করিয়া বলেন, যে, ইহা খুব সুখের বিষয়, যে, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও বাবু যতীন্দ্রনাথ বসু নিজের ব্যবসা করিয়াও এতটা উদ্বৃত্ত শক্তির অধিকারী, যে, তাঁহারা দেশের মঙ্গলের দিকে মন দিতে পারেন।* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মল্লিক ও যতীন্দ্র বসুর অপরাধ এই, যে, তাঁহারা মূলে আইন-ব্যবসায়ী অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করিবার আস্পর্দ্ধা রাখেন। চৌধুরী মহাশয় নিজেও ত আইন-ব্যবসায়ী। ব্যারিষ্টারী করিয়াও উদ্বৃত্ত শক্তিটা যদি তিনি দেশহিতার্থ নিয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্য লোকেরা কেন পারিবে না, তাহা তিনি বলিবেন কি? অত্যধিক-অহঙ্কার-বশতঃ তিনি হয়ত অকারণ মনে করেন, যে, তিনি ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অন্ত অনুচরেরা অতিমানবশক্তিসম্পন্ন এবং এইরূপ অতিমানব-শক্তি না থাকিলে নিজের নিজের পেশা ছাড়া অন্য কাজে হাত দেওয়া যায় না। অথবা তিনি হয়ত মনে করেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু বলা ও করা তাঁহাদের

* "It was also a matter for congratulation that they found gentlemen who were skilled as practitioners in their profession, having surplus energy to apply to the broader interests of the country."

একচেটিয়া ও অন্যের পক্ষে তাহা অনধিকারচর্চ্চা ও ধৃষ্টতা। কিম্বা এমন বলাও কি তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে পারে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে কিছু বলা ও করা যাহাদের পেশা ("profession") এবং ঐ পেশায় যাহারা পটু ("skilled as practitioners in [that] profession"), তাহারা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কাহারও মাথা ঘামান উচিত নয়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের উকীলগণ, শিক্ষামন্ত্রীকে কোন ক্ষমতা দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা তাঁহাকে রেক্টর করার প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমাদের মতামত জানাইয়াছি। তাহা করার কোন একান্ত প্রয়োজন আমরা দেখিতে পাই নাই। যে-সব সেনেট-সভ্য মনোনীত (nominated) হইবেন, এই উকীলরা চান, যে, ঐ সভ্যদিগকে বঙ্গের গবর্ণর চ্যান্সেলার রূপে মনোনয়ন করেন, বাংলা-গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ শিক্ষামন্ত্রী তাহা করেন, তাহা তাঁহারা চান না। তাহার ভিতরের কারণ এই, যে, চ্যান্সেলার নামে ইহা করিলেও বহু বৎসর হইতে আশুবাবুই বাস্তবিক ইহা করিয়া আসিতেছেন, এবং সেই উপায়ে সেনেট প্রভৃতি এরূপ লোকে বোঝাই হইয়াছে যাহাদের বিবেক-বুদ্ধি ও ভোট আশুবাবুর "মুঠার ভিতর"। যাহা হউক, ইহা যদি সত্য না হইত, তাহা হইলেও এই জিনিষটার আর-একটা দিক্ আছে, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদার উকীলগণের ভাবা উচিত ছিল। শিক্ষা ভারতশাসনসংস্কার আইন অনুসারে একটি হস্তান্তরিত (transferred) বিষয়। শিক্ষাসম্পর্কে যাহা কিছু বাংলা গবর্ণমেণ্ট করিবেন, তাহা শিক্ষা-মন্ত্রীর দ্বারা সম্পাদিত হওয়া চাই। এবং এই মন্ত্রী যাহা করিবেন, তাহার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী। ("responsible") অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা যদি তাঁহার কোন কাজ না-পছন্দ করেন, তাহা হইলে সভ্যেরা প্রস্তাব আনিয়া তাহার আলোচনা করিতে পারেন, তাঁহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পারেন, তাঁহার বেতন কমাইতে পারেন, ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার-রূপে বা অন্য কোন রূপে বঙ্গের [illegible] যাহা করেন, তাহার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী ("responsible") নহেন, তাঁহার কোন অপকর্ম্মের জন্য তাঁহার বেতন কমাইতে ব্যবস্থাপক সভা পারেন না। সুতরাং চ্যান্সেলার যদি অপদার্থ বা গোলামী-ভাবাপন্ন লোকই বেশী করিয়া মনোনয়ন করেন, তাহার কোন প্রতিকার নাই, কিন্তু শিক্ষা-মন্ত্রী যদি তাহা করেন, কিম্বা যদি তিনি কেবল অপদার্থ নিজের দলের বা খোসামোদকারী লোকদিগকেই মনোনীত করেন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করিতে পারেন। অতএব, মনোনয়নের ক্ষমতা কাহার হাতে থাকা দেশের মঙ্গলের জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহা নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ লোক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উকীলরা নানারকম বেফাঁস কথা বলিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, আসামও বাংলা দেশের মত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার অন্তর্গত, অথচ আসামের গবর্ণরকে বা শিক্ষামন্ত্রীকে প্রস্তাবিত নূতন আইন দুটিতে কোন বিশিষ্ট মর্য্যাদা বা ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান আইন অনুসারে বর্ত্তমান অবস্থাতেও আসামের গবর্ণরের ও শিক্ষামন্ত্রীর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কোনও বিশেষ ক্ষমতা নাই; তাঁহারা কেবল পদবলাৎ (ex-offices) ফেলো মাত্র। পদবলাৎ ফেলো ইহার পরও থাকিবেন। তাহা না থাকিলেও, প্রস্তাবিত আইন অনুসারে যে-সব ফেলো গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে আসামের গবর্ণর ও শিক্ষামন্ত্রীকে মনোনীত করিবার কোন বাধা দেখিতেছি না। তাঁহাদের মনোনয়ন একেবারে নিশ্চিত করিবার জন্য প্রস্তাবিত আইনের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তনেও কোন বাধা বা আপত্তি দেখা যাইতেছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উকীলগণ বলিতেছেন, বঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রীকে রেক্টর না করিয়া আসামের গবর্ণর বা শিক্ষামন্ত্রীকে কেন রেক্টর করা হইবে না? তাহার উত্তরে পাল্টা এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঋণশোধের জন্য ৫.৬ লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক বা তদধিক লক্ষ টাকা বাংলা-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে না চাহিয়া আসাম-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কেন চান নাই? বাংলা-গবর্ণমেণ্ট

বিশ্ববিদ্যালয়কে এপর্য্যন্ত অনেক লক্ষ টাকা দিয়াছেন; আসাম-গবর্ণমেণ্ট এক পয়সাও কেন দেন নাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের উকীলগণ এ পর্য্যন্ত বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীকে ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকে অনেক গালাগালি দিয়াছেন ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আসামের শিক্ষামন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক সভার প্রতি এই সম্মান ও সৌজন্য কেন প্রদর্শিত হয় নাই? স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন সেনেটে তাঁহার আস্ফালনপূর্ণ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "সেনেটের সভ্যরূপে আপনাদিগকে আমি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারগুলির জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে আহ্বান করিতেছি। বাংলা গবর্ণমেণ্টকে ভুলিয়া যান। ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ভুলিয়া যান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটররূপে আপনাদের কর্ত্তব্য করুন," * ইত্যাদি; তখন "আসাম গবর্ণমেণ্টকে ভুলিয়া যান" কেন বলা হয় নাই? উকীলরা কি মনে করেন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য গালাগালি যাহা করিতে হইবে সমস্তই বাংলা-গবর্ণমেণ্ট, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীকে করিতে হইবে, এবং টাকাটাও তাঁহাদের নিকট হইতে লইতে হইবে, কিন্তু সম্মান ও ক্ষমতা দিতে হইবে আসামের গবর্ণর ও শিক্ষামন্ত্রীকে?

তোফা ব্যবস্থা!

এসব কথা কেবল কথা-কাটাকাটি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায়, যদিও এসব তাহা নয়। এইজন্য এবিষয়ে কিছু তথ্য ও যুক্তির অবতারণাও করিতে চাই। আসামে কলেজ আছে দুটি। যদি গৌহাটীর আইন-শ্রেণীগুলিকে কটন কলেজ হইতে স্বতন্ত্র ধরা যায়, তাহা হইলে কলেজের সংখ্যা হয় মোট তিনটি। বাংলা দেশে কলেজ আছে চুয়াল্লিশটি। আসামে এণ্ট্রেন্স ইস্কুল আছে ৪৩টি; বাংলা দেশে আছে আট শতের উপর। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, অধিকসংখ্যক স্কুলকলেজের মঙ্গলামঙ্গল যাঁহাদিগকে দেখিতে হয়, টাকা যাঁহাদিগকে দিতে হয়, ক্ষমতা ও সম্মান তাঁহাদের পাওয়া উচিত, না, যাঁহাদিগকে টাকা দিতে হয় না এবং অল্পসংখ্যক স্কুলকলেজের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হয়, ক্ষমতা ও সম্মান তাঁহাদের প্রাপ্য।

* "I call upon you, as members of the Senate, to stand up for the rights of your University. Forget the Government of Bengal. Forget the Governmen of India. Do your duty as Senators of this University,"

—

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কার্য্য

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কীয় আন্দোলনের সময় যতটা আশা ও যে যে উদ্দেশ্য লইয়া জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই আশা পূর্ণ ও সেই সেই উদ্দেশ্য সব সিদ্ধ না হইলেও, কেজো বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান বিষয়ে পরিষৎ অনেকটা সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হইবেন।

কলিকাতা হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী যাদবপুর নামক স্থানে পরিষৎ নিজের বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। এখানে শিক্ষার সমুদয় বন্দোবস্ত থাকিবে, এবং ছাত্রদের বাসস্থানও থাকিবে। পরিষৎ একশত বিঘা জমী কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে মাসিক ২০ টাকা খাজনায় ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লইয়াছেন। আরও ৫০ বিঘা পাইবার আশা আছে। পরিষৎ কাজ আরম্ভ করিবার সময় নিম্নলিখিত দান পাইয়াছিলেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৫ লক্ষ, আয় বার্ষিক ২০,০০০; মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য আড়াই লক্ষ, আয় বার্ষিক ১০,০০০; শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ, আয় বাৎসরিক ৩৬০০ টাকা। তাহার পর স্যার রাসবিহারী ঘোষ দেন ২ লক্ষ টাকার একটি বাড়ী এবং ৮,৯২,০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজের অংশ আদি, যাহার আয় এখন বৎসরে কুড়ি হাজার টাকা হয়, কিন্তু যাহা হইতে কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে পঞ্চাশ হাজার পাইবার আশা করেন। ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ কৃষিশিক্ষা দানের জন্য লক্ষ টাকা মূল্যের একটি সম্পত্তি দিয়াছেন, যাহার আয় বৎসরে ৪৫০০ টাকা হইবে।

বর্ত্তমানে পরিষদের শিক্ষালয় আদি মুরারিপুকুরে আছে। সেখানকার কাজ শিখাইবার কারখানার মূল্য সওয়া লক্ষ টাকা, সরঞ্জামের মূল্য তিন হাজার, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মূল্য আট হাজার,

১৯২১ সালে ৩০০০ ছেলে ভর্ত্তি হইতে চাহিয়াছিল; ১৯২২এ ২০০০; কিন্তু স্থানাভাবে অধিকাংশ ছাত্র লওয়া হয় নাই। এক্ষণে ছাত্রসংখ্যা ৬৫০। ছাত্রেরা প্রত্যেকে মাসিক ছয় টাকা বেতন দেয়, কিন্তু ছাত্রপ্রতি গড়ে মাসিক ১৫ টাকা খরচ হয়। খরচ আরও অনেক বেশী হইত, যদি শিক্ষকগণ স্বার্থত্যাগ করিয়া খুব কম বেতনে কাজ না করিতেন। ইঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং বঙ্গীয় সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষও বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

যাদবপুরে ইতিমধ্যে একটি ঝীল খনিত হইয়াছে, তাহা ৫০০ ফুট লম্বা, ১০০ ফুট চৌড়া ও ১০ ফুট গভীর। পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ৮০,০০০ এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ৭০,০০০ টাকা খরচ পড়িবে। প্রধান কলেজ-অট্টালিকাটির খরচ হইবে দুই লক্ষ টাকা, কাজ শিখাইবার ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কারখানা ৯০,০০০, আপাততঃ একশত জন ছাত্রের জন্য দুটা ছাত্রাবাস ৫০,০০০ টাকা। আরও পাঁচটি ছাত্রাবাস এবং একটি হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিতে হইবে। সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির জন্যও প্রায় দুই লক্ষ টাকা লাগিবে।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, পরিষদের অনেক টাকার দরকার। এ পর্য্যন্ত দেশের কয়েকজন মাত্র ধনী লোক ইহাতে টাকা দিয়াছেন। আরো বিস্তর ধনী লোক আছেন যাঁহারা দিতে পারেন, এবং যাঁহাদের দেওয়া উচিত।

কিন্তু ধনী লোকদের উপরই কোন ভাল কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, এবং সেরূপ ভার দিয়া থাকিলে চলেও না। সাধারণ লোকরাও টাকা দিয়া খুব বড় প্রতিষ্ঠান খাড়া করিতে ও চালাইতে পারেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

—

হরিদ্বারের গুরুকুল

[illegible] আর্য্যসমাজের যে গুরুকুল নামক বিদ্যালয় [illegible] তাহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পূর্ব্বে মহাত্মা মুন্শীরাম নামে পরিচিত ছিলেন। এই গুরুকুলের বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে হাজার হাজার নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাআদি হইয়াছিল। যখন টাকার জন্য সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট আবেদন করা হইল, তখন গুরুকুলের জন্য একলক্ষ টাকা এবং আর্য্যসমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা উঠিল। কেবল এই বৎসরই যে এইরূপ চাঁদা উঠিয়াছে, তাহা নহে। প্রতি-বৎসরই গুরুকুলের বাৎসরিক উৎসবের সময় বেশী পরিমাণ চাঁদা উঠিয়া থাকে। ইহা দু-একজন ধনী লোক দেন না, অল্প আয়ের বহুসংখ্যক লোকে দিয়া থাকেন। বাংলাদেশে কোনও কাজের জন্যই এই রকম দান প্রতি বৎসর দেখা যায় না। অথচ বাঙালী ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, তাহা অল্প কাল আগে উত্তরবঙ্গে প্লাবন-পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে দানে দেখা গিয়াছে।

—

"শান্তি ও শৃঙ্খলা"

দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হওয়া যে খুবই আবশ্যক, কোন প্রকৃতিস্থ লোক তাহাতে সন্দেহ করেন না। কিন্তু যদি কোন দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে, অথচ তথাকার লোকেরা যদি ব্যাধিগ্রস্ত, অসুস্থ, দুর্ব্বল, শ্রমে অসমর্থ, অজ্ঞ ও গরীব হয়, তাহা হইলে সেখানে যত মানুষ মরে, কোন দেশে "শান্তি ও শৃঙ্খলা" না থাকিলেও, কোন দেশে যুদ্ধ হইলেও, কোন দেশ মহাযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেও, সেই সেই দেশে তত মানুষ না মরিতে পারে। আমরা ফাল্গুনের প্রবাসীতে ৭২৯-৩০ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, যে বাংলা এইরূপ একটি দেশ। এখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত; কিন্তু লোকসংখ্যা কমিতেছে। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে ও দেশী রাজ্যে, "শান্তি ও শৃঙ্খলা" থাকা সত্ত্বেও, ১৯১১-২১ দশ বৎসরে মানুষ কমিয়াছে। যথা:—

প্রদেশ বা রাজ্য	লোক কত কমিয়াছে
আজমের মাড়োয়ারা	৫৪৯৬
বিহার ও ওড়িষা	৪৯০৭৬৬
বোম্বাই প্রেসীডেন্সী	৩৫৭৬৮০

প্রদেশ বা রাজ্য	কত লোক কমিয়াছে
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৩৬৪৪
কূর্গ	১০৫১৭
পঞ্জাব	১০৯৯৮২০
আগ্রা-অযোধ্যা	১২১৬৫৪৪
বালুচিস্তানের রাজ্যসমূহ	৪১২৯২
মধ্যভারত এজেন্সী	১৩৫৪১৪
মধ্যভারতের রাজ্যসমূহ	৪৮৬৭০
গ্বালিয়র	২১১৬৩
হাইদারাবাদ	৯২১০৪৯
রাজপুতানা এজেন্সী	৬৭৩৪৯০
সিকিম	৬১৯৮
যুক্ত প্রদেশের রাজ্যসমূহ	৫৫০৫০

অন্যদিকে দেখুন, ইংলণ্ড মহাযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল ছয় বৎসর ধরিয়া; তাহাতে উহার লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে। কিন্তু সেখানে তাহা সত্ত্বেও ১৯১১-২১ দশ বৎসরে ৩৬০৭০৪৯২ হইতে লোকসংখ্যা বাড়িয়া ৩৭৮৮৫২৪২ হইয়াছিল। বেল্‌জিয়মও এই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলই, অধিকন্তু জার্মেনরা, এই দেশকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তথাপি দেখিতে পাই, বেল্‌জিয়মের লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। ১৯১০ সালে উহা ছিল ৭৪২৩৭৮৪; বাড়িয়া ১৯২০ সালে হয় ৭৬৮৪২৭২। আয়ার্ল্যাণ্ডে বহু বৎসর ধরিয়া অশান্তি লাগিয়া আছে। অথচ সেখানেও লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। নীচের তালিকা দেখুন।

৩০শে জুন-অন্ত বৎসর	আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা
১৯১৭	৪,৩৮০,০০০
১৯১৮	৪,৩৯৯,০০০
১৯১৯	৪,৪৬২,০০০
১৯২০	৪,৪৮৫,০০০
১৯২১	৪,৪৯৬,০০০

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, যে, কোন দেশের লোক সম্পূর্ণ বা বহুপরিমাণে স্বাধীন, শিক্ষিত, সুস্থ, সম্পত্তিপন্ন, এবং দেশ স্বাস্থ্যকর হইলে, সেখানে "শান্তি ও শৃঙ্খলার" কতকটা অভাব সত্ত্বেও, কিম্বা তাহা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও, তাহার লোকসংখ্যা বাড়িতে পারে। ইহার একটি সেকেলে দৃষ্টান্ত ফাল্গুনের প্রবাসীতে ৭২৯ পৃষ্ঠায় দিয়াছিলাম। উপরে আধুনিক দৃষ্টান্ত দিলাম।

অবশ্য দেশে যুদ্ধ হইলে এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব হইলে স্থলবিশেষে লোকসংখ্যা কমিয়াও থাকে। যেমন পোলাণ্ড দেশে কমিয়াছে। তাহার কারণ, পোলাণ্ড গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়া জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়ার অধীন এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এবং শিক্ষায় অনগ্রসর ছিল।

এই-সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে, যে, দেশে "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষা করা খুব আবশ্যক বটে, কিন্তু দেশবাসীকে সুস্থ সবল সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত করা এবং জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া তদপেক্ষাও প্রয়োজন। পুলিশ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট না হইলেও চলিতে পারে, এরূপ উন্নত সভ্য অবস্থার দেশের বিষয় কল্পনা করা যায়, কিন্তু শিক্ষাবিহীন, কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পের উন্নতিসাধকবিহীন, স্বাস্থ্যরক্ষক-বিহীন সভ্য দেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

চিত্রপরিচয়

বুদ্ধ ও মেষশাবক

একদা বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহে যাইতেছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, একদল মেষ ও ছাগকে শহরে লইয়া যাওয়া হইতেছে; তাহার মধ্যে একটি মেষীর একটি ছানার পা খোঁড়া হওয়ায় সে পালের সঙ্গে সঙ্গ রাখিতে পারিতেছে না, অপরটি লাফাইয়া লাফাইয়া এদিক ওদিক যাইতেছে; মা কোনটিকেই ছাড়িতে না পারিয়া ব্যাকুল ভাবে ছোটাছুটি করিতেছে। তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেব খোঁড়া ছানাটিকে কাঁধে তুলিয়া লইলেন, এবং তাহার মাকে বলিলেন, তুমি যে [illegible] সঙ্গে সঙ্গে যাইব, তোমাকে [illegible]

ইউরোপের নয়া স্বরাজ

(১)

হ্বার্সাইয়ের সন্ধির ফলে কতকগুলি নয়া জাতি ইউরোপে স্বরাজ লাভ করিয়াছে। এই-সকল নয়া স্বরাজের খবর ভারতবর্ষে বেশী পৌঁছে না। কিন্তু ভারতীয় স্বরাজের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই নয়া ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলার সংবাদ বিশেষরূপেই শিক্ষাপ্রদ।

অষ্ট্রিয়া ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছে চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী এবং জুগোস্লাভকিয়া। অষ্ট্রিয়া এবং রুশিয়ার বিভিন্ন টুক্‌রা জোড়া লাগাইয়া পোল্যাণ্ড তৈয়ারী করা হইয়াছে। রুশিয়া ভাঙ্গিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, লেট্‌ল্যাণ্ড এবং লিথুয়েনিয়া এই চার দেশ গড়া হইয়াছে। এইগুলা বাল্টিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত।

এই আট দেশের প্রত্যেকেই পুরাপুরি স্বাধীন। ইহাদের উপর আইনতঃ কোন বিদেশী রাষ্ট্রের এক্তিয়ার নাই।

(২)

হ্বার্সাইয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা এই স্বরাজগুলা কায়েম করিবার সময় দুইটা উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। প্রথমতঃ জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়া এই দুই দেশের জার্ম্মান জাতিকে যথাসম্ভব ধনে সম্পদে লোকসংখ্যায় এবং ভূমির পরিমাণে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মান-সমাজকে রুশ-সমাজ হইতে একদম তফাৎ করিয়া রাখা হইয়াছে। নয়া স্বাধীন স্বরাজগুলা জার্ম্মান ও রুশ-সমাজের মধ্যবর্ত্তী দেওয়াল বিশেষ।

এই উদ্দেশ্য দুইটা পুরাপুরি সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেকটা স্বরাজের ভিতরই অসংখ্য গণ্ডগোল এবং রাষ্ট্রীয় অশান্তি বিরাজ করিতেছে।

প্রথমতঃ, এই নয়া দেশগুলার কোনোটাই কোনো [illegible] নয়। বহুবিধ-ভিন্ন-ভিন্ন-ভাষাভাষী এবং [illegible] নরনারীর সমাজ এই-সকল দেশে বাস করে। [illegible] পুরানা অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারীর মতন প্রত্যেকটা নয়া স্বরাজই একদম খিচুড়ি বিশেষ। ভাষা ও জাতির অনৈক্যের সঙ্গে ধর্ম্মের অনৈক্যও সর্ব্বত্রই প্রচুর।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক স্বরাজেই রাষ্ট্রীয় শাসনের ব্যবস্থায় ঐক্যের কোনো প্রকার পাকা বন্দোবস্ত করা সুকঠিন। সর্ব্বত্রই "বার রাজপুতের তের হাঁড়ি"। রাষ্ট্রীয় দলের সংখ্যা প্রত্যেক স্বরাজেই অত্যধিক। কোনো দল জাতি হিসাবে, কোনো দল ধর্ম্ম হিসাবে, কোনো দল ব্যবসা হিসাবে, এবং অন্যান্য দল রাষ্ট্রীয় অথবা ধনসম্পত্তি-বিষয়ক মতামত হিসাবে গঠিত।

তৃতীয়তঃ, এই আট দেশের সর্ব্বত্রই জার্ম্মান জাতির নরনারী বাস করে। জার্ম্মানরা এই-সকল স্বরাজে "গোলাম" স্থানীয়। তাহাদের বিরুদ্ধে সামাজিক বিদ্বেষ খুব গভীর। অধিকন্তু আইনের দ্বারাও জার্ম্মানদিগকে কাবু করিবার চেষ্টা দেখা যায়। তাহার উপর বে-আইনি জুলুম এবং অত্যাচার ত আছেই।

(৩)

লেট্‌ল্যাণ্ডের কথা ধরা যাউক। এই দেশের উত্তরে এস্থোনিয়া, পূর্ব্বে রুশিয়া, দক্ষিণে লিথুয়েনিয়া এবং পশ্চিমে বাল্টিক সাগর। প্রধান নগর ও বন্দরের নাম রিগা।

এই স্বরাজে লোকসংখ্যা কোটী কোটী নয়; কয়েক লাখ মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক দল এখানে কতগুলা?

এক মাত্র লেট্‌জাতীয় নরনারীরাই দশ দশটা দল কায়েম করিয়াছে। ইহুদী ধর্ম্মের উপাসকেরা এই দেশে গুনতিতে বেশী নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই, ইহারা তিনটা স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত।

লেট্‌ল্যাণ্ডে রুশদের সংখ্যা অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশী বটে। কিন্তু তাহাদের ভিতর দলাদলি এত বেশী যে, কোনমতেই ঐক্য গড়িয়া উঠে না। এই দেশের পোল এবং লিথুয়েন জাতীয় লোকদেরও সেই অবস্থা।

এখানকার জার্ম্মানরা সংখ্যায় বেশী না হইলেও ধনে ও বিদ্যায় উঁচু। কিন্তু ইহারাও অনেক দলে বিভক্ত। বহু চেষ্টায় ফলে বর্ত্তমানে ইহারা এক দলের অধীনে আসিয়াছে।

লেট্ স্বরাজের পার্লামেন্টে "স্বদেশী" লেট্ জাতীয় দশ দলের প্রতিনিধি আছেন ৮৪ জন। তিন ইহুদীয় দল এবং রুশ, পোল, লিথুয়েন ও জার্ম্মান সকলে মিলিয়া ১৬ জন প্রতিনিধি পাঠাইতে অধিকারী।

৮৪ জন স্বদেশী লেট্‌দের ভিতর আধাআধি সোস্যালিষ্ট অর্থাৎ মজুরপন্থী এবং অপর অর্দ্ধেক মামুলী ধনপন্থী। কাজেই এই দুই শ্রেণীর স্বদেশী দলগুলার ভিতর ঝগড়া বাধিলে "বিদেশীর" দলগুলার ১৬ জন আসিয়া লেট্‌ল্যাণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। তবে "বিদেশী"রা অনেকক্ষেত্রেই একমত হইতে পারে না। কাজেই স্বরাজের শাসনে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার জটিলতা এবং যথেচ্ছাচার হাজির হয়।

এই-সকল গণ্ডগোল সম্বন্ধে হ্বার্সাইয়ের কর্ত্তারা অজ্ঞ ছিলেন না। তাহা সত্ত্বেও কয়েক লাখ লোককে একটা পূরাপূরি স্বাধীন রিপাব্লিক্ গড়িয়া তুলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

লেট্‌রা যদি স্বাধীন স্বরাজের উপযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে তাহা হইলে ভারতবর্ষের নরনারীরা স্বরাজ গড়িতে পারিবে না কেন?

(৪)

লিথুয়েনিয়ায় ঘটিতেছে অদ্ভুত কাণ্ড। এই স্বরাজের "স্বদেশী" লিথুয়েনরা "বিদেশী" অধিবাসীদের উপর জবর বে-আইনি চালাইতেছে।

এই দেশের দক্ষিণে লাগা পোল্যাণ্ড এবং জার্ম্মানির উত্তরপূর্ব্ব কোণ। পূর্ব্বে রুশিয়া এবং পশ্চিমে বাল্টিক-সাগর। প্রধান সহরের নাম কোভ্‌নো।

লেট্‌ল্যাণ্ডের মতন এই দেশেও স্বদেশীরা নানা দলে বিভক্ত। ইহাদের ভিতর দলাদলি এত বেশী যে একদল অপর দলকে কাবু করিবার জন্য ইহুদী পোল, রুশ এবং জার্ম্মান এই চার জাতীয় "বিদেশী"দের সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। এই কারণেই আবার স্বদেশী লিথুয়েনরা বিদেশীদের উপর নেহাত চটা।

কিন্তু স্বদেশী লিথুয়েনরা শিক্ষা-দীক্ষায় খুব নীচু। রুশ ও ইহুদীরা এই দেশের মস্তিষ্কস্বরূপ। ইহাদিগকে বাদ দিলে লিথুয়েনিয়ার স্বরাজ টিকিতেই পারে না।

দেশের শাসনকার্য্য হইতে দূরে রাখিতে চায়। ভোট দিবার ব্যবস্থায় অনেক বে-আইনি এবং যথেচ্ছাচার চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও "বিদেশী"রা ১৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছিল, "স্বদেশী"রা মাত্র ৭৮ জন।

স্বদেশী লিথুয়েনরা ২২ জন বিদেশীর একতিয়ার সহ্য করিবার পাত্র নয়। ইহারা আইন ভাঙিয়া ১৫ জন বিদেশীর স্থানে মাত্র ৫ জনের ঠাঁই দিয়াছে। বিদেশীরা এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ডের লীগ-অব-নেশন্‌স্ বা বিশ্বজাতি-সংঙ্ঘের নিকট দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। দরখাস্তের কোনো সুফল ঘটে নাই।

(৫)

পোল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটী। ইহাদের অর্দ্ধেক মাত্র খাঁটি পোল জাতীয়। চার ভাগের এক ভাগ রুশ। অবশিষ্টের ভিতর পচিশ লাখ জার্ম্মান এবং ছাব্বিশ লাখ ইহুদী।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্যা বেশ মোটা। কাজেই পোল্যাণ্ডকে পুরাণা আমলের অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর মতন জটিলতাময় এবং অনৈক্যাবশিষ্ট রাষ্ট্র বিবেচনা করা চলে।

যে দেশের অর্দ্ধেক মাত্র খাঁটি স্বদেশী সেই দেশের দুরবস্থা অশেষ। "বিদেশী"রা এক জোটে মিলিলে "স্বদেশী"গুলাকে জব্দ করিতে পারে। পোল্যাণ্ডে সর্ব্বদাই স্বদেশীদের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিতেছে।

স্বদেশী পোল্‌রা এগার রাষ্ট্রীয় দলে বিভক্ত। ইহাদের ভিতর তিন দল মামুলী ধনসম্পত্তির পৃষ্ঠপোষক। অপর আট দল মজুরপন্থীদের বিভিন্ন শাখা। পার্লামেন্টের দুই ঘরে ধনীশ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা ২২৮, মজুরশ্রেণীর প্রতিনিধির সংখ্যা ২২২। বলা বাহুল্য, এই দুই শ্রেণীর "স্বদেশী"-দের ভিতর কোনো প্রকার ঐক্য গড়িয়া উঠা একদম অসাধ্য। "বিদেশী"দের প্রতিনিধি-সংখ্যা ১০৯ জন। ইহারা ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধি। যদিও এই ছয় জাতির স্বার্থ বিভিন্ন, তথাপি দায়ে পড়িয়া "স্বদেশী"দের বিরুদ্ধে ইহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। মজুরদলের স্বদেশী পোলরা এই-সকল বিদেশীদের সাহায্য লইয়া ধনীর দলকে হারাইতে

পোল্যাণ্ডের "ভদ্রসমাজ" নানা-প্রকার জুলুম কায়েম্ করিতেছে।

পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট্) নির্ব্বাচনের কাণ্ডে বিগত ডিসেম্বর মাসে লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে। মজুর প্রতিনিধিরা বিদেশীদের সাহায্য লইয়া একজন ইহুদীকে স্বরাজের কর্ত্তারূপে বাছাই করিয়াছিল। সেই ব্যক্তির নাম নারুটোহ্বিচ্। ধনীর দলের এক যুবার হাতে নারুটো-হ্বিচ্ মারা পড়িয়াছেন (১৬ই ডিসেম্বর ১৯২২)।

পোল্যাণ্ডের স্বরাজ যদি ইয়োরোপে সম্মানিত হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর স্বরাজ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইয়োরোপ-আমেরিকার লোক দল পাকাইতেছে কেন?

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

রূপকথা

রূপকথা বা উপকথা—কোন্‌টি ব্যাকরণ-সম্মত শুদ্ধ রূপ তাহার বিচার বৈয়াকরণরা করিবেন। কিন্তু এই দুইটি নামের অন্তরালে দুই বিভিন্ন প্রকারের মনোভাবের, দুই বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। উপকথা নামটির পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায়—নকলের প্রতি আসলের, মেকির প্রতি খাঁটির, নীচের প্রতি উচ্চের যে অবজ্ঞা সেই ভাব। কোন গুরুগম্ভীর বয়স্ক লোক শিশুদের খেলা দেখিয়া যে একপ্রকার সহানুভূতিমিশ্র নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া থাকেন, উপকথার উপর সাংসারিক লোকের যেন সেই-প্রকারের নাসিকা-কুঞ্চন। পক্ষান্তরে রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষের দ্বারে গিয়া আঘাত করে, ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়। সমালোচক বোধহয় উপকথা নামটিই পছন্দ করিবেন; কিন্তু রসপিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক্ দিয়া পুরাতন কালের সুরটি ধরিবার চেষ্টা করা হইতেছে, উপেক্ষিতকে অতীতের আঁধার গুহা হইতে সূর্য্যালোকে টানিবার আয়োজন হইতেছে, কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত গ্রাম্য-সাহিত্যের অবগুণ্ঠন মোচনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রভাব রূপকথার উপরও বিস্তৃত একটা সনাতন রীতি। ইংরেজী সাহিত্যেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অতীতে প্রত্যাবর্ত্তন, মধ্যযুগের পল্লীগাথার রসাস্বাদন-চেষ্টা একটা নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই অতীতের প্রতি মোহের কতকগুলি গূঢ় কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ, বর্ত্তমানের তীক্ষ্ণ জটিল সমস্যা হইতে একটা পলায়নের উপায় আবিষ্কার, তাহার শত নাগপাশের বেষ্টন হইতে আত্মমোচনের চেষ্টা। অতীতের সরল সমস্যা-বিরল মুক্ত বায়ু আমাদের প্রশ্নসঙ্কুল জীবনকে অনিবার্য্য বেগে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মত রক্ষণশীল জাতির পক্ষে জাতীয়ত্বের গোপন মন্ত্র ও মূল রহস্য অতীতের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে; সুতরাং এই নবজাগরণের দিনে, যখন আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তখন এই অতীতেরই কোন অন্ধকার অব্যবহৃত কক্ষে সেই বিস্মৃত রত্নের অন্বেষণের বিবরণ কেবল যে একটা নূতন ধরণের সাহিত্যিক খেলা তাহা নহে, একটা পবিত্র কর্ত্তব্যও বটে। সেইজন্য অতীতের মন্দিরতলে দুইদল সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির লোক যাইয়া সমবেত হইতেছে;—এক স্বপ্নপ্রবণ বিরাম-বিলাসীর দল অতীতের মধ্যে শান্তি-কুঞ্জের রচনা করিতেছে; আর এক উৎসাহী অনুসন্ধিৎসুর দল তাহাদের সমস্ত কৌতূহলের সহিত তাহার কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া নিজেদের নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধারসাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে।

এই প্রবল কৌতুকের ধাক্কা রূপকথাকেও ঠাকুরমার

প্রকাণ্ড দরবারের এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, এবং আধুনিক সমালোচকেরা সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আদর্শে ইহার বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে, ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে ইহা গড়িয়া উঠে নাই, আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালীও ইহার ছিল না। ইহার সমস্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্মমুহূর্ত্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে। বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ; অন্ধকার গৃহকোণে আলোছায়ার লীলা-চঞ্চল নৃত্য; সর্ব্বোপরি কল্পনাপ্রবণ আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল শিশুহৃদয়; এবং ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত সরস তরল কণ্ঠস্বর; এই সকলে মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐক্যতান সৃজন করে, তাহা মীলের কলমের মুখে, ছাপার বইএর পাতায়, ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়ে। শিশুচিত্তের উপরে ইহার অনুপম প্রভাব বুঝিতে হইলে, আগে শিশুর মনোজগতের কতকটা পরিচয় থাকা চাই। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, যাঁহার মনে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট ভাবে টানা হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারে প্রাপ্য অপ্রাপ্যের মধ্যে ভেদ করিতে শিখিয়াছেন, যাঁহার নিকট পৃথিবী আপনার সম্পূর্ণ রহস্যভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে, তাঁহার ইহার মধ্যে প্রকৃত রসের সন্ধান না পাইবারই কথা। শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া আছে, তাহাতে পৃথিবীর সমুদয় রহস্য যেন আপনার নীড় রচনা করে, তাহার চিন্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে, অন্ধকারে তারার মত, নানাবর্ণের আকাশকুসুম ফুটিয়া থাকে, পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই; নানারূপ সম্ভব অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙীন নেশায় সে সর্ব্বদা মশগুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্তবিস্তৃত বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত পথ রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্য্যসম্ভার তাহারই জন্য, যে [illegible] সঙ্কীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ

রূপকথার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্কের প্রধান অভিযোগ—ইহার অলীকত্ব ও অবাস্তবতা। অবশ্য, বাস্তব না হইলেই যে কাহারও পৃথিবীতে স্থান নাই এ কথা কেহ বলেন না। সংসারে অবাস্তবেরও একটা প্রয়োজন আছে। মাটির সহিত যোগ না থাকিলে, মাটিতে শিকড় না গাড়িলেই আমাদের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কে না আসিলেই, কাহাকেও এই সুন্দর পৃথিবী ও মানবমন হইতে নির্ব্বাসিত করা যায় না। নীল আকাশ অবাস্তব হইলেও ইহা শত নিগূঢ় বন্ধনে আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত আপনাকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহা আমাদের তুচ্ছ বিড়ম্বিত জীবন-নাটকের উপর সমুজ্জ্বল চন্দ্রাতপের মত বিস্তৃত; ইহা আমাদের উগ্র কল-কোলাহলের উপর এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়; ইহার ঘন নীলরূপের দিকে চাহিয়া আমাদের উদ্ধত বিদ্রোহ ও অশান্ত প্রবৃত্তি মাথা নত করে। সুতরাং ইহাকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিলে মানব-মন তাহার অনেকটা সৌন্দর্য্য ও উদারতা হারায়। সেই হিসাবে রূপকথারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে রূপকথা অবাস্তব নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বা যে শক্তি আমাদিগকে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে প্রেরণা দেয়, তাহাই যে একমাত্র বাস্তব তাহা নহে। আমাদের মনের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকল যাহারা মুহূর্ত্তমাত্র হৃদয়ে উঠিয়া পরমুহূর্ত্তেই বিলীন হয়, যাহারা আমাদের বাহ্যজীবনে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে না, ও যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই প্রায় অচেতন, তাহারাও মনের একটা অবিসংবাদিত ক্রিয়া বটে, এবং তাহারাও বাস্তবতার দাবী করিতে পারে। সুতরাং রূপকথা আমাদের প্রাণে যে অস্পষ্ট আবেগ, যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যে আপাত-অসম্ভব আশা কল্পনা জাগাইয়া তোলে, তাহারা যে অবাস্তব, আমাদের সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, একথা বলিতে পারি না। তাহারা এখন [illegible] অবস্থায় আছে, কিন্তু ফুটন্ত বাস্তবতার লক্ষণ বহে।

আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব-মনের আদিম সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য্য-পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তি-সম্পদ্ লাভ, পাপপুণ্যের জয় পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিষই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্ত্তিগুলিই, একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া, রূপকথার রাজ্যের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে-সব রাক্ষস খোক্কস আমাদের পথ রোধ করে, তাহারা আমাদের পার্থিব বাঁধা-বিঘ্নেরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র; যে অনুকূল দৈব, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর রূপে সেই-সমস্ত রাক্ষস-খোক্কসের মৃত্যুরহস্য আমাদের শিখাইয়া দেন, তিনি যেন অযাচিত সাহায্যের দ্বারা এই পৃথিবীতে তাঁহার কার্পণ্য-কলঙ্কের স্খালন করেন, এবং তাঁহার উপেক্ষার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা গূঢ় অভিমান পোষণ করি, তাহার কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতে প্রয়াস পান। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিজন রাক্ষসপুরে যে রাজকন্যা প্রবালপালঙ্কে নিদ্রামগ্না থাকেন, তিনি আমাদের গোপন অন্তঃপুরশায়িনী প্রেয়সী, যে বাধা-বিপদের মধ্য দিয়া রূপকথার রাজপুত্র নিজ প্রিয়কে লাভ করেন, তাহা আমাদের বর্ত্তমানের বণিক্-ধর্ম্মী বিবাহের উপর আমাদের অন্তঃস্থ আদর্শ প্রেমিকের অভিমানক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস মাত্র। পাতালপুরে নাগকন্যার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে আমরা এই চিরপরিচিত পৃথিবীর স্পর্শ অনুভব করি, এবং তাহার মণিমাণিক্য দীপ্ত কক্ষের মধ্যেও এই নিত্যসহচর পরিচিততম সূর্য্যালোকের দর্শন পাই।

এই রূপকথার রচয়িতার কোন নামকরণ হয় নাই। সমস্ত লৌকিকসাহিত্যের ন্যায় এখানেও লেখক একটি সমগ্র জাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন। এখানে ব্যক্তি-বিশেষের কোন কথা নাই; সমস্ত জাতিরই প্রাণের কথা, অন্তরতম আশাআকাঙ্ক্ষা ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন সাহিত্যের ইহা একটি অদ্ভুত গুণ। মহাকাব্যের বিশাল দেহে অনেক নামহীন লেখক নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেন জাতির আত্মা বৃন্তহীনপুষ্পসম 'আপনাতে আপনি বিকশি'ত হইয়া উঠিয়াছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি-বিশেষের অপেক্ষা রাখে নাই। লৌকিক গানে গাথায়ও সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাব লক্ষিত হয়; যেন জাতি তাহাদের রচয়িতাকে সম্পূর্ণরূপে অবসর দিয়া সেগুলিকে একেবারে খাস সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে। রূপকথার রাজ্যেও সেই একই নিয়ম—কোথায়ও লেখকের নিজের এতটুকু কোন ছাপ নাই, সর্ব্বত্র একটা উদার, বিশাল, অনাসক্ত ভাবের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। রাজা-রাজড়ার কথা ইহার বিষয়-বস্তু হইলেও সাধারণ লোকের যে ক্ষীণ, সাময়িক সঙ্কেত ইহাতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার লেশ মাত্র চিহ্ন নাই। রাজপুত্র কখনও কখনও বিপদে পড়িয়া দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন ও তাহাদের দ্বারা পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাঁহারি সৌভাগ্যসূর্য্য যখন উদিত হইয়াছে, তখন তাহার কিরণ হইতে তাহার দরিদ্র উপকারকও বঞ্চিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই একটা সাম্য শান্তির ভাব; সমাজের সঙ্গে লেখক এমন সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছেন; যে, তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাহার ভাষা একেবারে মৌন ও নীরব হইয়া আছে।

আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের কি এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলেও, ইহা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যায় যে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার জন্ম। সমস্ত রূপক ও বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী-বিরোধ, সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহ-ভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমাদের

সম্মুখে দেখা দেয়। রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের কাহিনী যখন বক্তীর করুণাদ্র অশ্রুতরল কণ্ঠে কথিত হয়, তখন শিশুর ত কথাই নাই, কোন বয়স্ক ব্যক্তিও বোধ হয় অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। এই গল্পের উপর রামায়ণের ছায়াপাত হইলেও ইহার একটি নিজস্ব অনুপম মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য আছে, ইহার অন্তর্নিহিত গভীর করুণ রস, সরল শব্দাড়ম্বরহীন ও সাহিত্যিকতা-বর্জ্জিত ভাষার সাহায্যে প্রবাহিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দ্রবীভূত করে। এবং এই রূপকথার মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যা এমন একটা আদর্শ শান্তি ও কল্পিত সমাধানের মধ্যে পর্য্যবসিত হয় যাহা বাস্তব জীবনে একান্ত সুদুর্লভ এবং যাহার অভাব আমাদের সমস্ত জীবনপ্রবাহে একটা অব্যক্ত-মধুর অবিচ্ছিন্ন করুণ মর্ম্মর জাগাইয়া তোলে। এইরূপে রূপকথা বাস্তব জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তোলে, নিষ্করুণ দৈবের বিচার উলটাইয়া দেয়; এবং মানুষ নিজের ভাগ্য বিধাতা হইলে কিরূপ পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির মধ্যে আপনার ত্রুটিবহুল ও ভ্রমসঙ্কুল জীবননাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত করিত তাহার সুস্পষ্ট আভাস দেয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রূপকথার বিরুদ্ধে যে বাস্তবতার অভিযোগ আনা হয় তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। এখন রূপকথা আমাদের জীবনের উপর কিরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবি-প্রতিভার অধিকারী তাঁহারা অনেক সময়ে এই রূপকথার নিকট তাঁহাদের কল্পনার উন্মেষ সম্বন্ধে প্রথম সাহায্য লাভ করেন। রূপকথার দিগন্ত-বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠে দিয়াই তাঁহারা প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া দেন ও প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া অজ্ঞাতের রাজত্বে প্রথম প্রবেশ করিতে শিখেন। সেখানকার মণি মাণিক্যের ছড়াছড়ি তাঁহাদের সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধ ও কবিত্ব-শক্তিকে জাগাইয়া তোলে। যে দেশে জীবনে বৈচিত্র্য ও বর্ণসুষমার একান্ত অভাব, যেখানে শান্তশিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে কোন-প্রকার দুঃসাহসিকতার অবসর থাকে না, সেখানে অনেক সময় এই রূপকথার খোলা জানলা দিয়াই আমরা বিচিত্র [illegible] পরিচয় লাভ করি ও বিপুল সুদূরের [illegible] কর্ণপথে প্রবেশিত হয়। [illegible] রূপকথার [illegible] তাঁহাদের ঋণের [illegible] স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার আত্মজীবনকাহিনীতে এই লৌকিক গল্প কিরূপে তাঁহার কল্পনাশক্তিকে উন্মেষিত করিয়াছিল, কিরূপে ইহার সাহায্যে তিনি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা ও সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া এক বিশালতর রাজ্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের সুখ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'শিশু' নামক কাব্যে শিশু-চিত্তের উপর রূপকথার এই মায়াময় স্পর্শটি সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।

আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবিত্ব-সৌভাগ্যের অনধিকারী তাঁহারাও ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সত্ত্বেও তাহার অন্তরে একটি কুহেলিকা-ময় প্রদেশ আছে, যাহা হইতে তাহার সমস্ত রঙ্গীন অনুভব কল্পনার আলোক বিচ্ছুরিত হয়। যাহা সমস্ত তর্ক যুক্তি বাস্তবতার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার মনে একটি ছায়াস্নিগ্ধ স্থায়ী কল্পলোক রচনা করে।

প্রত্যেকেই তাহার প্রাত্যহিক, নীরস, যন্ত্রবদ্ধ কার্য্যের অবসরে এই কল্পলোকে, এই কল্পনার দুর্গে ক্ষণিক আশ্রয় গ্রহণ করে; এখানে বসিয়াই সে আকাশকুসুম চয়ন করে ও শূন্যে প্রাসাদ-নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করে। আমাদের জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্ব্বোধ ও রহস্যময় যাহাই আমাদের উন্মুখ আশাকে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ আকর্ষণ করে, এই সকলই আমাদের অন্তরের কল্পলোক রচনায় সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম ভিত্তি-স্থাপনের প্রশংসা রূপকথারই প্রাপ্য। রূপকথা-রাজ্যের যে মেঘখণ্ড আমাদের শিশু-অন্তরের গোপন স্তরে প্রথম সঞ্চারিত হয় তাহাই পরবর্ত্তী জীবনের রহস্যবোধকে তাহার সমস্ত আলো-ছায়া-ঘেরা বিচিত্রতাকে আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে বরণ করিয়া আনে; এবং সেই সঞ্চিত মেঘরাশির চতুর্দ্দিকেই আমাদের কল্পনার বিদ্যুৎবিলাস স্ফুরিত হয়। শৈশবের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ মানব-হৃদয়ের সনাতন প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তির বশে যখন আমরা সুদূর শৈশবের প্রতি উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করি, তখন তাহার সমস্ত [illegible] কৌতুক ও উচ্ছ্বাস-চাপল্যের মধ্যে সেই বর্ণ[illegible] রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতি আমাদের [illegible] তারার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে ও আমাদের বৈচিত্র্যহীন প্রৌঢ়জীবনের উপরও তাহার মায়াময় [illegible] সংক্রামিত করে।

সারদা
১৩২৬

বধূ
চিত্রকর শ্রী সারদাচরণ উকিল

প্রদীপ ভাসানো—চিত্রকর শ্রী সারদাচরণ উকিল